দেশ

৫ জুলাই, ১৯৭৫।। ৮০ পয়সা

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পেপার-ব্যাক ক্লাসিকস্ ঃ—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পথের পাঁচালী ৬৲

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৬৲

প্রবোধকুমার সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৩৷৷

বনফুলের
স্থাবর ৬৲

অন্নদাশংকর রায়ের
পথে প্রবাসে ৩৲

আগামী আগস্টে আবার বাংলা সাহিত্যের দুই খানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পেপারব্যাক সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

• সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ঃ—

নিমাই ভট্টাচার্যের
নাচনী ৭৲

বিমল মিত্রের
নফর সংকীর্তন ৭৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
আকাশের সীমা নাই ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অশান্ত ঘূর্ণি

সমরেশ বসুর
অবরোধ ১০৲

তরুণকুমার ভাদুড়ীর
কাগজের নৌকো ১০৲

৷৷ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই-এর পুনর্মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ৷৷

শঙ্কু মহারাজের
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা ১৬৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কালোভ্রমর (১ম/২য়) **১২৷৷**

তারাশংকরের
কবি ১০৲
না ৬৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
পঞ্চতপা ৯৲

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ১০৲

টলস্টয়ের
ওঅর এণ্ড পীস (২য়) **১৬৲**

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অথৈজল ৯৲

এবং আশাপূর্ণা দেবীর অবিস্মরণীয় ট্রিলজীর দ্বিতীয় গ্রন্থ
সু ব র্ণ ল তা ২৫৲

বিশেষ আনন্দ সংবাদ

গ্রাহকদের ও পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে সবিনয় নিবেদন, এতদিন কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতাজনিত পকেট বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এখন আবার সে আয়োজন হয়েছে।

আগামী আগস্ট মাসে বাংলা পকেট বইয়ের আরও তিনখানি বই প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্য আনুমানিক প্রতিটি চার টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২; ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ ফোন: ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

(মি ৬৭৬০)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

পত্রাবলী

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৫৫ ॥

ওঁ

Srabasti,
Colombo.

কল্যাণীয়েষু,

রাণীর চিঠিতে সমস্ত খবর পেয়েছি। আজ সকালে ডাঙায় নেমে খুব আরাম বোধ হচ্ছে। যদিও সামনে সুদীর্ঘ রেলযাত্রা আছে তবু মনের আনন্দে সেটাকে উপেক্ষা করবার শক্তি পেয়েছি। এবারে আশ্রমে ফিরে গিয়ে কত কি করবার আছে সেই কথাই ভাবচি। মিস পট[১] প্যাসপোর্ট সংকটে পড়েচে। কলম্বোর জন্যে Visa করতে ভুলেছিল তাই নিয়ে সংকটে পড়েচে। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বারবার বলচে, এখানে তো কারো কাছে আমার চিঠি নেই চিঠি আছে কলকাতার পুলিস কমিশনারের কাছে। সব জায়গার ফরেন্ আফিসের সঙ্গে আনাগোনা থাকাতে কোথাও ওর মুহূর্তকালের জন্যে বাধেনি —এখানকার ফরেন আফিস বা পুলিসের সঙ্গে যোগ রাখার কথা ওর মনে হয়নি। বেচারা! রথী লংকার রাবণের হাত থেকে সীতা উদ্ধারের চেষ্টায় আছে; কলকাতার কিষ্কিন্ধ্যার সঙ্গে ওর যোগ থাকাতে বোধ হয় বেশি হাংগাম করতে হবে না। ইতিপূর্বে তোমার কথা ও সর্বদাই বলত। ওর বিশ্বাস তুমি থাকলে আমাদের সঙ্গে যোগসাধন ওর পাকা হতে পারত। রথীদের সঙ্গে ঠিক পাকা হয়নি। মনেও কোরো না রথী ওর সঙ্গে ব্যারণ বংশীয়ার মত ব্যবহার করেনি। অত্যন্ত সম্মান দেখিয়েচে। হোটেলে তোমরা ওকে নীচে খাওয়াতে—রথী এক-দিনের জন্যেও ওকে দূরে ঠেলেনি এক টেবিলে ডান পাশে বসিয়ে ওকে খাওয়াত, বৌমা[২] বসত বাম পাশে। সর্বদাই ওর মর্যাদা রক্ষা করে চলেচে। কিন্তু তবু রথীর প্রতি ওর যথেষ্ট শ্রদ্ধা হয়নি—এমন কি রথী যে তোমার মতো টাইপ করতে জানে এ শ্রদ্ধাও নেই। তাতে বিশেষ অসুবিধে হয়েছে সে কথা রাণীকে জানিয়েছি। আমার অন্তরঙ্গ হবার যথেষ্ট চেষ্টা করেচে কিন্তু আমার অন্তঃকরণ তাতে সায় দেয়নি। বৌমার সঙ্গে ওর ব্যবহারে এইটেই প্রকাশ পায় যে বৌমাকে সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দিয়ে কোনো একদিন য়ুরোপীয় সমাজের উপযোগী করে তুলতে পারে। বৌমা স্বভাবদোষে শিক্ষা গ্রহণ করতে প্রসন্নতা অনুভব করচেন না। আমাকে জর্মান শিক্ষা দেওয়ার আভাস দিয়েছিল—বরাবর ইস্কুল পালানো অভ্যাস বলে ঘটে ওঠেনি। চড়ুইপাখী সম্বন্ধে ফরাসী বই পড়াবার জন্যে ওর খুব আগ্রহ করেছিল— সাহস হোলো না—কেননা ফরাসী লেখকের রচনা, মেয়ে শিক্ষয়িত্রীকে নিয়ে পড়তে গিয়ে হঠাৎ কর্ণমূলে তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। রথী এই মাত্র ফিরে এল—খবর পেলুম তাকে নিয়ে এখানকার পুলিস অত্যন্ত ব্যস্ত আছে, কখন ছুটি পাবে জানিনে। আশা করি ছুটি পাবে।

রাণীকে বোলো রেখার[৩] সঙ্গে মণি গুপ্তর[৪] বিয়ে পাকা—মাঘ মাসে হবে। আর সব খবর ভালোই। রাণীর চিকিৎসা ও তার ফলাফল যেন জানতে পারি। অবশ্য sulphur খাওয়ানো বাহুল্য হবে—তা হোক তবু আমার খাতিরে মাঝে মাঝে খাওয়ালে অনিষ্ট হবে না। ইতি ১৬ ডিসেম্বর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৫৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

প্রশান্ত, তোমার চিঠি পাবার আগেই আমার মাথায় কি করে সুবুদ্ধি এল জানিনে আমি অমিয়কে[৫] শুদ্ধি-ওয়ালা বিবাহ থেকে নিরস্ত করেচি। প্রমথ ওকে পরামর্শ দিয়েচে Christian Marriage Act বিধান মতে বিবাহ করতে, তাতে দুই পক্ষেরই ধর্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিবাহবিধি সম্বন্ধে তুমি ওস্তাদ, তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে ওর পক্ষে বা বিপক্ষে কি বলবার আছে।

শুদ্ধিটা বাদ দিয়ে যদি কোনোরকম কপটতা না করে আমাদের দেশে প্রচলিত বৈদিক মন্ত্র পড়ে বিবাহটা হয় তাহলে কি আপত্তি থাকতে পারে! বিশ্বভারতীর আদর্শের কথা যদি বল, আন্তর্জাতিক বিবাহে তার সম্মতি থাকাই উচিত। এর মধ্যে মিথ্যাচার না থাকলেই হোলো। নারায়ণশিলা প্রভৃতি উৎপাত ত্যাগ করে দিলে বাকি বিবাহের পদ্ধতিটাতে কোনো সম্প্রদায়ের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কেবল তর্কের বিষয় সম্প্রদান নিয়ে। কন্যা যেখানে নিজেই নিজেকে দান করবার অধিকারিণী সেখানে একটা সম্প্রদানের ভান করাটা ভালো নয় বা বাহুল্য এমন কথা উঠতেও পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সম্প্রদানের আসল মানেটা হচ্ছে সমর্থন, —হৈমন্তী[৬] যে কোনো মানুষকে পিতৃতুল্য মানে, তারই শুভ ইচ্ছার বিশেষ প্রবর্তনায় বিবাহকার্য সম্পন্ন করার মধ্যে কি কোনো আপত্তি থাকতে পারে? বিবাহের ভূমিকাস্বরূপে ভালোবাসায় যে আত্মদান তাতে কন্যা ছাড়া কন্যাকর্তার কোনো হাত থাকতেই পারে না। কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে শুভাকাঙ্ক্ষীর হাত থেকে বিশেষভাবে অনুমোদন নেওয়া কি অসংগত? যদি অনুমোদন না পাওয়া যায় তাহলে বিবাহ হতেই পারে না এমন কথা বলিনে কিন্তু যেখানে সেটা সুলভ, সেখানে পিতৃ-তুল্য শুভাকাঙ্ক্ষীর হাত থেকে নিবেদিত হয়ে কন্যা যদি

১। শান্তিনিকেতনের একদা অধ্যাপিকা

২। প্রতিমা দেবী

৩। সন্তোষ মজুমদারের ভাগিনী

৪। শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

৫। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী,

৬। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর বিদেশিনী পত্নী

পবিত্র, সে তার একটা সৌন্দর্য আছে। একটা দান অন্তরের সেটা সকলের উপরে সেটা কন্যার নিজের ভিতর থেকে, আর একটা দান বাহিরের বহিঃসমাজের প্রতিনিধি দ্বারা কেউ সেই দান সম্পন্ন করচে। এর মধ্যে তর্ক এই যে, দান কথাটা ভালো নয়। কন্যা কি একটা উপহার সামগ্রী? কিন্তু সামাজিক দানের হাতের থেকে আজও তো বিবাহ প্রথা সম্পূর্ণ এড়ায়নি। বৈধ বিবাহের মানেই হচ্চে রাজার দান—তিনি না দিলে নেবার জো নেই মনের মিল থাকলেও। তুমি বলবে তা হোক, কিন্তু সে দান তো একা কন্যার উপরে খাটে না—আইন কন্যাকেও পতিদান করে। কবুল, কিন্তু নানা স্বাভাবিক ও কৃত্রিম কারণে দানের ঝোঁকটা কন্যারই উপরে। তাকেই স্বামীর ঘরে আসতে হয়—সেই স্বামীর নাম গ্রহণপূর্বক নিজেকে Mrs মহলানবিশ বলে, সে স্বামীর ঘরই করে এবং অন্তত আমাদের দেশে স্বামীর সমস্ত আত্মীয়বর্গকে সে একান্তই নিজের আত্মীয় করে নেয়। অপরপক্ষে স্বামী তা ঠিকমত করে না—না করবার প্রধান কারণ সে নিজের আত্মীয়দের মধ্যেই থাকে ও স্ত্রীকে তারই অন্তর্গত করে নেয়—এমন কি শ্বশুরের বাড়িতে থাকা তার পক্ষে অগৌরব বাপের বাড়িতে থাকায় তা নয়। অতএব এ সমাজে পরমার্থত যাই হোক ব্যবহারত কন্যা সমাজের দানস্বরূপে স্বামীর ঘরে এসে সেই ঘরকেই স্বীকার করে নেয়—না করতে পারলে যেন একটা চুক্তিভঙ্গজনিত অপরাধের সৃষ্টি হয়—সেই স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বিকাকে সমাজে নিন্দে করে থাকে। কালক্রমে এ সমাজেরই পরিবর্তন হলে এমন কি, বিবাহ বলতে যা বুঝি তা থাকবেই না কিন্তু যতক্ষণ বর্তমান অবস্থাটা টিঁকে আছে ততক্ষণ সেটা যেন নেই বলে চলবার চেষ্টা করতে গেলে সকল দিকে খাপ খাওয়ানো যায় না। যাই হোক যদি modified-ভাবে বৈদিক বিবাহ গ্রহণ করা যায় তাহলে তোমার বক্তব্য কি জানিয়ো। জিনিসটা জটিল যেহেতু আধুনিক কালের মনোভাবের সঙ্গে সাবেক কালের অনুষ্ঠানের মিল নেই। ইতি ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৫৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

প্রশান্ত, সুনীতির[৭] পত্রে তোমার জ্বরের কথা শুনে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ভয় পাচ্চে তোমাদের ওখানকার হাওয়ার গতিকে ব্যামোটা বৃহৎ হয়ে ওঠে। তোমরা দুজনের কেউ আমাকে খবর দাওনি কেন? কাল তোমাকে অমিয়র বিবাহ সম্বন্ধে শেষ কথাটা লিখে দিয়েছি। অমিয় শুদ্ধিওয়ালাদের জানিয়ে দিয়েচে তাদের মতে ওর বিবাহ হতে পারবে না। কোন্ মতে বিবাহ হলে সকল দিক থেকে ভালো হয় সে সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ নেওয়া দরকার। কিন্তু তুমি যদি শয্যাগত থাক তাহলে এখন চুপচাপ থাকো—কলকাতায় যখন যাব তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা হবে।

তোমাকে কূপখনন নিয়ে যে তাগিদ করেছিলুম দূর থেকে সেটাকে তুমি বড়ো করে দেখেচ। ওটা আমার অল্পে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠবার প্রবণতা প্রমাণ করে, আর কিছুই নয়। রথী বথ-যাত্রা থেকে ফিরে এসে তার স্বাভাবিক অবিচলিত শান্তভাবের সঙ্গে যখনি বললে ব্যাপারটা কিছুই নয়, তখনি আমার দুশ্চিন্তার ঐ কুশাঙ্কুরটা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস তোমার শরীর অসুস্থ ছিল বলেই আমার এই চাঞ্চল্য তোমাকে এতটা বেশি পীড়া দিয়েছে।

নটরাজের জন্যে প্রস্তুত হতে শুরু করেছি—সময় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বলে সঙ্কোচ বোধ হচ্চে। অল্প সময়ের সুবিধাও আছে—প্রবল চাপে কখনো কখনো জিনিসটা সহজে জমে ওঠে—তোমাদের ল্যাবরেটরিতে যেমন করে সংকীর্ণ বাধার মধ্যে প্রচণ্ড তাড়না লাগিয়ে হীরে তৈরি করে তোলো। সুনীতিকে যে চিঠি লিখেচি তার এক অংশের কাপি তোমাকে পাঠাই। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৫৮ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অধ্যাপক লুডারকে ইস্লামী অধ্যাপকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন দুর্ভাগ্যে এখন এমন কেউ নেই যিনি আরবীর সঙ্গে পারসীও জানেন। বস্তুত পারসীর আলোচনা এখন সেখানে নিবে গেছে। বগডানফকে[৮] কি তাহলে পারসী পড়াবার জন্যে দ্বিতীয় শিক্ষকও অল্প বেতনে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে না? ফরাসী পড়বার জন্য অনেক ছাত্র উৎসুক আছে—সেটাও বগডানব পারবেন। তুমি কি মনে করো এমন কাউকে পাবে যিনি অল্প বেতনে ফারসী ফরাসী দুইই পড়াতে পারবেন? ফরাসী ও জর্মান কি এখানে না পড়ালেও চলে?—মেয়েদের জন্যে বিরলা ভবন তৈরির কথাটা চাপা পড়ে গেল বলে ভয় পাচ্চি। মালয় থেকে আরো দশ হাজার পাবার আশাটা মিথ্যে নয়। ওর মধ্যে দেড় হাজার সেদিন এসেচে। অর্থাৎ সবসুদ্ধ এখন সাড়ে পনেরো হাজার হাতে জমল।

জর্মান থেকে একটা দামী আর্ট সম্বন্ধীয় বই আমাকে পাঠিয়েছিল, কথা ছিল তার সমালোচনা এখানকার কাগজে প্রকাশ করব। সুনীতি, সুবোধ মুখুজ্জেকে দিয়ে সমালোচনা লিখিয়ে নিয়ে বইখানি লাইব্রেরিতে ফেরৎ দেবেন বলেছিলেন। দুইয়ের কোনোটাই হল না। কিছু না হোক বইখানা যদি পাই এখানে কলিন্স[৯] বা লেস্নি[১০] কাউকে দিয়ে চার কথা লিখিয়ে লজ্জা নিবারণ করতে পারি। এ সম্বন্ধে একটু চেষ্টা করে দেখবে কি?

এখানে কি দোলপূর্ণিমায় তোমরা আসতে পারবে না? ১১ই মার্চে হীরেন্দ্রবাবুর[১১] বিশেষ অনুরোধে তাঁদের কনভোকেশন সভায় কিছু বলতে প্রতিশ্রুত হয়েচি। ইতি ১৫ই ফাল্গুন ১৩৩৪

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্রমশ

৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৮। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন রুশ অধ্যাপক
৯। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক
১০। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন চেক অধ্যাপক
১১। বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাহিত্য প্রসঙ্গ

গুরু অ-গুরু

গুরুবাদে যাঁদের মতি আছে আমাদের দেশে তাঁদের সংখ্যাই বেশী, সঠিক কোনো হিসেব না থাকলেও বোধ হয় বলা যায়, শতকরা আশি নব্বই ভাগ লোকই গুরুবাদী। গুরুদের রকমফের থাকে, বিখ্যাত, অখ্যাত, এমন কি দু' চারজন কুখ্যাতও। আজকাল আবার ভারতীয় গুরুদের আন্তর্জাতিক খ্যাতিও হয়েছে. বাইরের শিষ্য-শিষ্যাও জুটছে প্রচুর. ছোটখাট গেরস্থ গুরুদের দিকে কে আর তাকায়! এই গুরুর প্রাবল্য ইদানীং এতই বেড়ে গিয়েছে যে কাগজেপত্রেও এ'দের অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের কথা ছাপা হয়। আর প্রচার ও গুজব তো আছেই, মুখে মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ওরিএণ্ট লংম্যানস সম্প্রতি একটি বইও

মহেশ যোগী

ছেপেছেন গুরুদের নিয়ে। নাম : গুরুস, গডমেন অ্যাণ্ড গুড পিপল। খুশওয়ান্ত সিং বইটির সম্পাদক। গুরু সম্পর্কে এগারোটি রচনা, আর একটি রচনা মাদার টেরেসাকে নিয়ে। বিভিন্ন লেখকের লেখা এই গুরু-গ্রন্থটি যে ভারতীয় সমাজে সমাদরে গৃহীত হবে তাতে সন্দেহ নেই, চল্লিশ টাকা দাম সত্ত্বেও।

এর জন্যে লেখকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, কেননা তাঁদের কাছে ব্যাপারটা যতটা কৌতূহলের ততটা অন্য কিছুর নয়। খুশওয়ান্ত সিং নিজেও যে গুরুবাদী তাও নয়।

আমরা গুরু বুঝি। কিন্তু গড ম্যান-টা কি? ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ, না ঈশ্বরের সমকক্ষ পুরুষ? নাকি অবতার? যদি অবতার হয় তা হলেও সেই একই কথা. ঈশ্বর প্রেরিত ঈশ্বরের সমকক্ষ, স্বয়ং ঈশ্বরই। অবতারে আমাদের রুচি নতুন নয়। বহু অবতারের দেশ এই ভারতবর্ষ।

কিন্তু কিছু মামুলি প্রশ্ন থেকেই যায়. যে দেশে এত গুরু, এত ধর্মপ্রাণের সমাগম সে-দেশের আজ এই অবস্থা কেন? কেন এত অপরাধ, খুনোখুনি, লুঠতরাজ, চোরা কারবার, কালো টাকার স্তূপ? কেন খরা? কেন অতিবৃষ্টি? কেন দেশের শতকরা ষাট ভাগ লোক অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে! কেন দশটির মধ্যে ছ' সাতটি শিশু পরিপুষ্টির অভাবে অন্ধ ও বিকৃত অঙ্গ হওয়ে যাবার অভিশাপ মাথায় নিয়ে বেঁচে আছে? গুরুদের অলৌকিক ক্ষমতা কি দেশটাকে ধনধান্যে, সুখে-স্বাস্থ্যে ভরে দিতে পারে না।

স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন, খাঁটি গুরুদের দৃষ্টি এবং চিন্তা ঈশ্বরের দিকে—শুধুমাত্র ঈশ্বরের দিকে. জাগতিক ব্যাপারে ও'রা মাথা গলাতে চান না।

স্বামী প্রভুপাদ কৃষ্ণ-চেতনার আন্তর্জাতিক সংঘটি চালান। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস আজ যথেষ্ট নাম করা সংগঠন. আমেরিকা তাঁদের বড় ঘাঁটি, তাদের একটি কারখানার নাম 'স্পিরিচুয়াল স্কাই সেণ্টেড প্রোডাক্টস কম্পানী।' তেল, শ্যাম্পু, সুগন্ধী দ্রব্য ইত্যাদি বিক্রী হয়। লাখে লাখে বিক্রী হয়, কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা। যারা এই কারখানায় কাজ করেন তাঁরা বেতন পান না (বা নেন না) থাকবার জায়গা পান, পরার কাপড় পান, আর খাবার জন্যে প্রসাদ। এতেই নাকি ভক্তরা দিব্য শান্তিতে আছেন—কৃষ্ণ ভক্তিতে বিহ্বল হয়ে আছেন।

হায় কৃষ্ণ!

গুরুরা আবার অনেক ব্যাপারেই বেশ সতর্ক। অন্তত জাল গুরুর ব্যাপারে। এ'রা দর্শনার্থীদের সতর্ক করে দেন প্রকারান্তরে। অর্থাৎ বলতে চান—আসল গুরুকে ধরো ভেজালের কাছে যেও না, ঠকবে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, ভারতবাসী শুধু দরিদ্র নয় বড় বেশী সরল, সংস্কারাচ্ছন্ন। আরও লক্ষ্য করার কথা, জীবন যত বেশী দুর্বিষহ হয়ে উঠছে, যত বেশী নৈরাশ্য জমছে ততই যেন গুরুবাদের দিকে ঝোঁক প্রবল হচ্ছে। এটাও দেখবার বিষয়, গুরুরা সমাজের ধনীদের অর্ঘ্যই শুধু পান না—সমাজের মানী গুণী—এমন কি সরকারী প্রভু, মন্ত্রীটন্ত্রীদের শুভাগমনেও নিজেদের চটক বাড়িয়ে তোলেন।

এটাকে যাঁরা ধর্মের প্রশ্ন বলবেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। হিন্দু ধর্ম আর সাবানের কারখানা খোলা এক জিনিস নয়. মন্ত্রতন্ত্র, ম্যাজিক দেখানোর সঙ্গে হিন্দু ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ কি ম্যাজিক দেখিয়েছেন? নাকি বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে কৃষ্ণ-চৈতন্যের স্কুল খুলেছেন? শ্রীঅরবিন্দের সাধনার পথ কি সহজলভ্য?

এই ধর্মগুরুদের পাশে আসুন মাদার টেরেসাকে দেখি। ইনি কলকাতার মানুষ। এ'র মধ্যে কোন ভেলকি আছে? কুষ্ঠ রোগীর পরিচর্যা করছেন মাদার টেরেসা, পরিত্যক্ত শিশুদের বুকে তুলে নিচ্ছেন, লালন করছেন, পথের খোঁড়া বেড়ালটাকেও তুলে নিতে তাঁর দ্বিধা নেই। তিনি তাঁর আতুর-সেবা এবং মানব কর্মকে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করেন। বলেন : এত দুর্দশা ও দুঃখের

মাদার টেরেসা

মধ্যে আমাদের এই কাজটুকু সমুদ্রে এক ফোঁটা জলের মতন। কিন্তু যদি ওই জল-বিন্দুটুকু না থাকে তবে সমুদ্র ওইটুকু থেকেও বঞ্চিত হবে।

মাদার টেরেসাকে গুরুবাদীদের নিশ্চয় পছন্দ হবে না। কিন্তু মানুষ মাত্রেই মনে মনে কোথায় যেন তাঁর পায়ে মাথা নত করবেন শ্রদ্ধায়।

আসলে এখনকার ব্যবসায়িক জগতে ধর্মটর্ম নিয়েও ফাঁপানো ব্যবসা করে চলে। বিশেষ করে যদি বাইরে রপ্তানির সুযোগ জুটে যায়। ভারতবর্ষ বিশ্বের বাজারে কতটা সুনাম অর্জন করেছে, তার বৈদেশিক মুদ্রা কত আয় হচ্ছে তা আমি জানি না। কিন্তু আমরা অনুমান করছি—ভারতীয় গুরুরা রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের বিশেষ উপকারে লাগছেন।

অভিনন্দ

ন্যাট

ন্যাট—জুড়ি নেই কাজের
জবাব নেই দামের

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা ১

HT-KPG 8158-1

॥ উনষাট ॥

তিন দিন যেন এই সামান্য পৃথিবীর কেউ ছিল না অজিতের। তার জীবনের সাধারণত্ব থেকে ঐ তিন দিন সে বিদায় নিয়েছিল। রবিবারে অজিত ফেরেনি। সোমবারেও না। ফিরতে ফিরতে বুধ হয়ে গেল। সোমবার থেকেই সে কীর্তনের দল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সুখচরে আশ্রমের জন্য জমি দেখা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটই খবর এনেছে। হাজার দশেকের মতো জমির দাম পড়বে, আশ্রমের জন্য আরো না হোক ষাট সত্তর হাজার টাকা। কুমারস্বামী হেসে বললেন—ওসব তোমরা বোঝো গিয়ে। টাকার হিসেব আমি জানি না। শুধু বলি, আমার বড় ইচ্ছে তোমাদের কাছে থাকি। তোমরা কিভাবে রাখবে তা তোমরা জানো।

পরদিন সকালেই অজিত পাঁচ হাজার টাকার চেক কেটে দিল। যখন চেক সই করছিল তখন হঠাৎ একটু দুর্বলতা এল বুঝি! এত টাকা, রক্ত জল করা টাকা চলে যাচ্ছে! কুমারস্বামী তার দিকেই চেয়েছিলেন। তাঁর কিন্তু বরদা, শংকাহরণ দৃষ্টি। অজিত সই করে দিল। আরো অনেকেই দিয়েছিল। দুই দিনে জমির দাম উঠেও হাজার দশেক টাকা বাড়তি হল। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই জমি কিনতে চলে গেলেন। সবাই বলাবলি করছিল, শুভকাজ আটকে থাকা ঠিক নয়, জমি কিনলেই ভিতপত্তন করতে হবে। বাকি টাকা আসবে কোত্থেকে? একজন মেজো-মধ্যম ফিল্ম স্টার আসেন রোজই। বয়স্ক লোক। তার বাজার পড়তির দিকে। তিনি বললেন—এ আর বেশী কথা কি? বাবার জন্য না হয় রাস্তায় নেমে পড়ব। আমি এক সময়ে স্ট্রিট সিংগার ছিলাম সেই অবস্থা থেকে উঠেছি। আমার কোনো সংকোচ নেই। যদি সবাই রাজি থাকে তো কীর্তনের দল নিয়ে ভিক্ষেয় বেরিয়ে পড়ি।

তো তাই হল। অজিত গানবাজনা প্রায় জানেই না। তবু এক ভক্তের কাছ থেকে ধুতী চেয়ে নিয়ে পরল, খালি গায়ে খুঁটটা জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল দলের সঙ্গে। সে কী উল্লাস! কী আনন্দ! দু' ধারে গৃহস্থ মানুষেরা দোকান পসারে ঘুরছে, সওদা করছে, বিষয় কর্মে ব্যস্ত রয়েছে, আর সে এক সুমহান উদ্দেশ্যে পথের ধুলোয় নেমে মহানন্দে ভিক্ষা করতে করতে চলেছে। নিজেকে এই প্রথম বড় মহৎ লাগল অজিতের। কীর্তনের সঙ্গে গলা মেলানোর কণ্ঠ নেই। সেই উদণ্ড কীর্তন গলা ছাড়লেই মিলে যায়। চোখে জল আসে। গায়ের কাপড় খসে খসে পড়ে। আর মনে হয় আমিই তো নিমাই। ঘরে শচীমাতা কাঁদছেন বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ছিতা, তবু নিমাই চলেছে প্রেম বিতরণে। নদীয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নদের নিমাই।

সেই যে ভাব এল অজিতের তিন দিন সে আর স্বাভাবিক অজিত ছিল না। অফিস থেকে এসে কুমুদ বোস আর সেনদাও দেখে বলে গেছে—তাজ্জব! অজিতের মধ্যে যে এত বড় ভক্ত লুকিয়ে ছিল কে জানত! তুমি বড় ভাগ্যবান হে অজিত, আমরাই পিছুটান ছিঁড়ে আসতে পারলাম না। এই বলে কুমুদ বোস কেঁদেও ফেলছিল।

তিন দিন অফিস করেনি অজিত। বাড়িতে আসেনি। তিন দিন বাদে বিকেলের দিকে সে ট্যাক্সিতে ফিরছিল টালিগঞ্জে। বুকটা অল্প কাঁপছে। যদিও নিশ্চয়ই শীলাকে কেউ না কেউ খবর পাঠিয়েছে, তবু মনটা বড় অশান্ত লাগে। শীলাকে ছেড়ে সে কখনো থাকেনি। একা বাড়িতে শীলা ভয় পায় নি তো! পা পিছলে পড়ে টড়ে যায়নি তো! শীলা কি ভাল আছে? বুকটা কাঁপে, একটা শ্বাসকষ্ট হয়। আবার কুমারস্বামীকে দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার কথা ভাবে। এ টাকাটার কথা শীলার কাছে গোপন করতে হবে। শীলা টের পেলে...।

বাড়িতে এসে অজিত অবাক। বাচ্চা ঝিটা দরজা খুলেই সরে গেল। অজিত ঢুকে দেখে ঘরদোর খাঁ খাঁ করছে। অজিত বলল—কী রে? তোর বউদি কোথায়?

মেয়েটা খুব বিপন্ন মুখ করে বলে—বউদি নেই।

—কোথায় গেছে?

—হাসপাতালে।

অজিত স্তম্ভিত হয়ে থাকে। কিছু জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হয় না।

মেয়েটা নিজে থেকেই বলে—সোমবার, সেই যে দাদাবাবু আসে, তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে চলে গেল। আর আসেনি। বউদির ছোটো ভাই রাতে এসে খবর দিল—বউদি হাসপাতালে। বউদির ভাই এসে রাতে থাকে, আর সারাদিন আমি একা।

অজিত ধপ করে বসে চোখ বুজে বলল—কী হয়েছে জানিস?

—না। বউদির ভাই শুধু বলে, খুব খারাপ অবস্থা।

অজিতের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে

আতঙ্কের। একবার তড়িৎ গতিতে
বসল ও। যাবে! এক্ষুনি যাবে! পরে মু
বুঝল, তার হাত পা কাঁপছে, অবশ
তিন দিনের সুগভীর ক্লান্তি কাকের
ডানার মতো শরীর আর মনের সব
ঢেকে রেখেছে। সে একবার কঁকিয়ে
যন্ত্রণায়। চুপ করে বসে রইল। ঘড়িতে
দেখল, কিন্তু কটা বেজেছে তা ব
পারল না। ঢক ঢক করে অনেক জল
গেল, তবু বুকটা যেমন শুকনো
তেমনই রইল। শীলা কি বেঁচে
এখনো?

টেবিলের ওপর কয়েকটা চিঠি
আছে। তার মধ্যে একটা লক্ষ্মণের এক
গ্রাম। সেটা খুলে অজিত আরো অ
প্রথমেই লিখেছে—বুধবার সকালে দম
পৌঁচোচ্ছি। এয়ারপোর্টে থাকিস।

ফের লাফিয়ে উঠল অজিত। বুধব
বুধবারটা কবে?

তারপরই হতাশ হয়ে বসে পড়ল যে
সময় নেই। আজই বুধবার। লক্ষ্মণ যদি এ
থাকে তবে অনেকক্ষণ আগে এসে গেছে

তিন দিন ধরে রোজ ননীবালা তি
বেলা খাবার সাজিয়ে টিফিনের বাক্সে প
দেন। তিন বেলা খাবার বয়ে নিয়ে হ
পাতালে আসছে সোমেন। কিন্তু খাবে ক
শীলার ভাল করে চেতনা আসছে
যতক্ষণ ভাল থাকে ততক্ষণ ভয়ংকর যন্ত্র
চিৎকার করে। দম ফুরিয়ে গেলে গোঙ
মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। বিকে
ভিজিটিং আওয়ারসে ননীবালা এসে
থাকেন মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে। য
থাকলে শীলা মায়ের হাঁটু চেপে
ফুঁপিয়ে উঠে বলে—মাগো, আমাকে
এনে দাও। নয়তো ডাক্তারকে বলো বাচ্চাটা
নষ্ট করে দিক। এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

ননীবালা পাঁচবার মা হয়েছেন,
একটা সন্তান বাঁচেনি। সেই রুগো হও
সময়ে এরকমই চার পাঁচদিন ধরে ব
কষ্ট পেয়েছেন তিনি। আঁতুড়ঘরের চার
সে এক গেঁয়ো বর্ষা নেমেছিল সেব
অকালের বর্ষা, সৃষ্টি রসাতলে যায় য
ব্রজগোপাল বাউন্ডুলেপনা করতে ক
মুলুকে উধাও হয়েছেন, সাতদিন
পাত্তা নেই, শ্বশুর ভাসুরদের উ
দেওয়া বারণ, এক জগদ্ধাত্রীর ম
শ্বাশুড়িই তখন আগলে রেখেছি
ননীবালাকে। একটা হোমিওপ্যাথ ওষুধ দি
আর ধাই ছিল মোতায়েন, কিন্তু
বলতেই পেট কেটে ছেলে বের করে দে
যে রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে সে
তখন কারো মাথাতেও আসেনি গাঁয়ে গ
ছেলে হতে গিয়ে কত মা মরেছে। চার
ধরে নাগাড়ে ব্যথা সহ্য করার পর পাঁচি
দিন চাঁদমুখ দেখে সব জ্বালা জুড়িয়ে গে

কোল জোড়া শান্তশিষ্ট ছেলে। জামাইকে এটুকুই দেখাতে পেরেছিলেন ননীবালা। সেই অকালের বর্ষা থামল, আর শাশুড়িও চলে গেলেন। যেন রণোকে নিজের আত্মা দান করে গেলেন।

ননীবালা মেয়ের মাথায় জপ করে দিতে দিতে বলেন—ওসব বলিস মা। হলে দেখবি, বাচ্চার কত মায়া। চাঁদমুখ দেখলে সব ব্যথার কথা ভুল পড়বে।

শীলা ব্যথায় নীল হয়ে মার গায়ে কিল মেরে বলে—উঃ মা, ওসব বোলো না, বোলো না, এ ব্যথা যেন শত্রুরও না হয়। আমি বাচ্চা চাই না, আমার ব্যথা সারাতে বলো ডাক্তারদের। আবার ঐ ব্যথার মধ্যেও অনুযোগ দেয় শীলা—আমাকে কেন নার্সিং-হোমে রাখোনি তোমরা? হাসপাতালে কেউ থাকতে পারে? আমি ঠিক মরে যাবো। তোমাদের জামাইকে খবর দাও, সে ঠিক এসে ভাল নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে আমাকে, সে কক্‌খনো এভাবে হাসপাতালে ফেলে রাখত না আমাকে। কেন তোমরা ওকে খবর দিচ্ছো না? নিশ্চয়ই ওর কিছু হয়েছে। বলতে বলতে ফের জ্ঞান হারায় শীলা। আবার যখন চেতনা আসে তখন পূর্বাপর কিছু ভাবতে পারে না, যন্ত্রণার কথা বলে, আবার যখন মনে পড়ে তখন অজিতের কথা বলে কেঁদে ওঠে—ওর ঠিক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমার এ সময়ে নাহলে ও আসছে না কেন? ওর এত সাধের সন্তান, ও আসছে না কেন?

ননীবালা এ সবের কি উত্তর দেবেন? অজিতকে কতবার খুঁজতে গিয়ে ফিরে এসেছে সোমেন আর সুভদ্র। গর্চার কোন গলিতে সে সাধু থাকে। সেখানে অজিত আছে বটে কিন্তু কেউ তার হদিশ দেয় না। ওরা থানা-পুলিসের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে, উল্টে ওদের ভয় দেখিয়েছে এক ম্যাজিস্ট্রেট যে বাড়াবাড়ি করলে মানহানির মামলা করবে। অজিতের মতো ছেলে সাধু-সন্নিসির পাল্লায় কি করে যে গিয়ে পড়ল তা কে জানে? হয়তো অজিতকে গুণ করে রেখে দিয়েছে সাধু, আর আসতে দেবে না। অজিত যে পলিটিকস্ করত সেটা ননীবালা অপছন্দ করতেন না বটে, কিন্তু এর চেয়ে সেটা বরং শতগুণে ভাল ছিল। মেয়েকে নার্সিং হোমে রাখার কথা, কিন্তু সে সাধ্য এখন আর নেই। রণো যখন এরকমটা হয়ে যায়নি তখন হলে কলকাতার ভাল নার্সিং হোমেরই ব্যবস্থা হত। কিন্তু এখন তা পারেন না ননীবালা, অনেক লজ্জার মাথা খেয়ে মেয়েকে হাসপাতালেই পাঠাতে হয়েছে। সে বিকেলটাও বড় ভয়াবহ। বাইরে ট্যাক্সি থামবার আওয়াজ হল, তারপরই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। দরজায় কড়া নড়তে ছুটে গিয়ে খুলল। শীলা ঘরে এসে দাঁড়াল, পিছনে একটা সুন্দরপানা ছেলে। শীলার মুখ খানিকটা গম্ভীর, বলল—সোমেন কই বলো তো মা! ওকে আমার ভীষণ দরকার। বলতে বলতেই হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এসে ননীবালাকে আঁকড়ে ধরল দুহাতে, তীব্র ফিসফিসানির স্বরে কানে কানে বলল—মা, ব্যথা উঠেছে, আর পারছি না, বলতে বলতে ঢলে পড়ল গায়ে। ব্যথা ওঠার কথা নয়। এখনো সময় তো হয়নি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার এসে দেখল, বলল—হাসপাতালে পাঠান। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারী হবে।

তাই পাঠালেন ননীবালা। সুভদ্র আর সোমেন ট্যাক্সি করে নিয়ে এল, সঙ্গে ননীবালাও। সুভদ্রর জোরেই পি, জি হাস-পাতালে জায়গা পাওয়া গেল। ছেলেটা খুব দাপুটে, চেনাজানাও অনেক। একে ধমকে, তাকে হাত করে চোখের পলকে সব ব্যবস্থা করে ফেলল। একটা দিন অবশ্য মেঝেতে থাকতে হয়েছে শীলাকে। সকালেই ভাল বেড পাওয়া গেছে। কিন্তু তিন দিন ধরে ছটফট করছে মেয়েটা। দুবেলা ডাক্তার দেখে বলে যাচ্ছে—এ ব্যথা ডেলিভারীর পেইন নয়। তা ছাড়া ম্যাচুরিটিরও খানিকটা বাকী ছিল, অন্তত আরো চার পাঁচ সপ্তাহ।

নার্সদের ডেকে বলে গেছে—ওয়াচ করবেন। মেমব্রেন যদি বার্স্ট করে তাহলে সিজারিয়ান করতে হতে পারে।

ননীবালা পাঁচ সন্তানের মা হয়েছেন। ডাক্তারদের কথায় বড় একটা ঘাবড়ান না। ওরা কত অলক্ষুণে কথা বলে। রাস্তায় পড়ে গিয়ে বাচ্চা বুড়ো কারো হাত পা ছড়ে কেটে গেলে ধনুষ্টঙ্কারের ইঞ্জেকশন দেয়। জ্বরজারি হলেই পেনিসিলিন ঠাসে. হুট্ বললেই টিকা নিতে বলে। ওসব বড় বাড়াবাড়ি। ননীবালা ছেলে হওয়া নিয়ে ভাবেন না। তিনি মেয়ে জামাইয়ের সম্পর্কটা নিয়ে ভাবেন। অজিত কেন সাধুর কাছে গিয়ে পড়ে আছে, মেয়ের যখন এখন-তখন অবস্থা! তবে কি ওদের সম্পর্ক এখন ভাল নয়? ঠিক বটে, তিনি নিজেও এক বাউন্ডুলের সংসার করছেন চিরকাল। তবু সে লোক কিন্তু এরকম ছিল না। নিজের সংসারের দিকে না তাকালেও পরের সংসারের জন্য করেছে অনেক। কোমর বেঁধে মানুষের দায়ে দফায় খাটত। না ডাকলেও গিয়ে হাজির হত। সংসারে থেকেই সে ছিল সন্ন্যাসী। কিন্তু তার বুকে ভালবাসা বড় কম ছিল না। আর আজকাল হুট্ বললেই ডিভোর্স, না কি যেন ছাই মাটি হয়। স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়। ভাবতে পারেন না ননীবালা। বুকটা বড় কাঁপে। অজিত কেন এ বয়সে সাধু-সান্নিসির পিছনে ঘুরে মরছে। এর মধ্যেই কবে যেন টুকাই তার ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বাস থেকে দেখেছে যে পিসেমশাই গড়িয়াহাটা দিয়ে কীর্তন করতে করতে একটা দলের সঙ্গে যাচ্ছে। টুকাই ছেলেমানুষ, দেখার ভুল হতে পারে. কিন্তু যদি সত্যি হয় তো ভাবনার কথা। অমন চালাক চতুর চৌখোস ছেলে, সে কেন কীর্তন গাইবে রাস্তায়? এসব ভাবেন ননীবালা, আর কেবলই মনে হয়—আর না এবার সংসারের ভাবনা সংসারকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন। আর না। যা হয় হোক গে। তিনি দেখতে আসবেন না।

ভিজিটিং আওয়ারস শেষ হলে ননীবালা ফিরে আসেন বাড়িতে। আসতে বড় কষ্ট হয়। বাসে তখন অফিসের ভিড়। তবু নিজের চিন্তায় এত বিভোর থাকেন যে শরীরের কষ্ট টের পান না। তিন দিন ধরে এসে ফিরে যাচ্ছেন। মেয়েটা কাটা পাঁঠার মতো দাপাচ্ছে। এ সময়ে জামাই এসে শিয়রে দাঁড়ালেও মেয়েটা ভরসা পেত। জামাইয়ের কথা ভাবতেই ফের বুকটা মোচড় দেয়। আজকাল তাই ননীবালা বড় গম্ভীর। বাসায় ফিরে কথা-টথা বলেন না। জপ সেরে ছোটো নাতিকে কোলে করে বসে থাকেন।

সুভদ্রর সঙ্গে এই তিন দিনে খুব ভাব হয়ে গেছে সোমেনের। বয়সে সুভদ্র কিছু বড়, কিন্তু তাতে বন্ধুত্ব আটকায় না। তিন বেলা সোমেন আসে। শুধু দুপুরটা বাদ দিলে দুবেলাই সে সুভদ্রকে দেখতে পায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কার্ড ফার্ড ছাড়াই ও ওয়ারডে ঢুকে যেতে পারে, যখন তখন ডাক্তার ডেকে আনতে পারে। সিস্টারদের সঙ্গে ও দুমিনিটে ভাব জমিয়ে ফেলে। কখনো সুভদ্র অপ্রস্তুত হয় না। চেহারাটা চমৎকার বলেও বোধ হয় ওর সুবিধে আরো বেশী। সোমেন জানে যে, সে নিজেও সুন্দর। কিন্তু তার চেহারায় বা সৌন্দর্যে কোথাও একটা মেয়েলীপনা আছে, একটু দুর্বলতা বা লজ্জা-সংকোচের ভেজাল আছে। সুভদ্রর তা নেই। ও শতকরা একশ ভাগ পুরুষ। তেন জোরালো চেহারা, মারকুট্টা ভাবভঙ্গী, গলা বজ্রগম্ভীর। যে কোনো পরিস্থিতিতে চেঁচামেচি করে লোক জমিয়ে ফেলতে ওর সংকোচ নেই। প্রথম দিন শীলাকে ভর্তি করতে এসে ও এমার্জেন্সীতে তাণ্ডব করে ফেলে। এমার্জেন্সীর কাউন্টার চাপড়ে আলটিমেটাম দিয়ে বলল— আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার রুগী ভর্তি না হলে হেলথ মিনিস্টারকে এখানে আসতে হবে। তাতে এমার্জেন্সীর লোকেরা আপত্তি করায় তাদের ফোন তুলে নিয়ে সুভদ্র বাস্তবিক ফোন করেছিল মিনিস্টারকে। তারপর পুলিস কমিশনারকে, এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককেও। কাউকেই পায়নি, অবশেষে ওর এক রিপোর্টার বন্ধু এসে হাজির হল, আর একজন ডাক্তারও বেরিয়ে পড়ল চেনা। তাতেই কাজ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে না হলেও সুভদ্রর ঐ রুদ্র-মূর্তি দেখেই হাসপাতালে একটা শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বিস্তর রবাহূত লোকজন কোত্থেকে এসে জড়ো

হয়ে সুভদ্রর পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তখন শীলার মাথা কোলে নিয়ে অসহায়ভাবে বসে আছেন ননীবালা, আর সোমেন ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। তাদের কিছু করতে হয়নি। সুভদ্র, অনাত্মীয় এবং অচেনা সুভদ্রই সব করে দিয়েছিল। তাই সুভদ্রর সামনে সোমেনের একটা কমপ্লেক্স কাজ করে। নিজেকে সুভদ্রর চেয়ে ছোটো বলে মনে হয়।

কুমারস্বামীর ডেরায় গিয়েও সুভদ্র একটা কেলো করেছিল। কিন্তু সেটা কাজে লাগেনি। সোমবার শীলাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিল, অজিতের খোঁজ করার সময় হয়নি। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই শীলা ওই ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্যেও কেবলই বলেছে—ওরে, তোরা ওকে খবর দে। ও না এলে আমি বাঁচব না।

মঙ্গলবার শীলার বেড পাওয়া গেল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুভদ্র বলল—চলুন সোমেনবাবু, আজ কুমারস্বামীর ডেরায় হুটোপাটি করে আসি। জোর কেলো করে আসব। বাস্তুঘুঘুদের সব কটা বাসা ভেঙে দেওয়া দরকার।

সোমেন দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভয় পায়। খুব সাহসের কাজ সে কিছু করেনি কখনো। তা ছাড়া কুমারস্বামীর কিছুই সে জানে না যাতে লোকটার ওপর রাগ করা যায়। তবু বিকেলের দিকে সে সুভদ্রর সঙ্গে গড়ের গলিতে এক বড়লোকের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। সুভদ্রর প্রথম চালটাই ছিল ভুল। দোতলায় উঠে সে বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড শব্দ করে চেঁচাতে লাগল—কে আছেন, দরজা খুলুন।

দরজা খুলল। একটি বিশিষ্ট চেহারা মুখ উঁকি দিয়ে বলল—আস্তে। বাবা বিশ্রাম করছেন, ব্যাঘাত হবে। কাকে চাইছেন?

সুভদ্র অনায়াসে বলল—আমরা এই বাড়ি সার্চ করতে এসেছি। এখানে আমাদের একজন লোককে আটকে রাখা হয়েছে।

লোকটা ভীষণ অবাক হয়ে বলে—এখানে কাউকে আটকে রাখা হয়নি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! সুভদ্র তখন গলা তুলে চেঁচাচ্ছে—আলবাত আটকে রাখা হয়েছে। এখানে বহু লোককে হিপনোটাইজ করে আটকে রাখা হয়, সব আমরা জানি। আমাদের দেখতে দিন, নইলে পুলিসে খবর দেবো।

হুজ্জুৎ করার ইচ্ছে সোমেনের ছিল না। সে ভেবেছিল বড়দির অসুখের খবর দিয়ে জামাইবাবুকে নিয়ে যাবে। কিন্তু অসুখের খবরটাই দেওয়া হল না। সুভদ্র ব্যাপারটাকে এত বেশী বাড়িয়ে তুলেছিল যে সেখানেও লোকজন জুটে গেল। অবশেষে এক বেঁটে মতো ভদ্রলোক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বলল—আমি হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট। বেশী বাড়াবাড়ি করলে পুলিসে ধরিয়ে দেবো, মানহানির মামলাতেও পড়ে যাবেন।

এত গোলমালেও কুমারস্বামী বেরিয়ে আসেনি। সোমেন ম্যাজিস্ট্রেট দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সুভদ্র অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আরো কিছু বিতর্ক করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আঙুল তুলে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলল—ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট। এটা গুণ্ডামির জায়গা নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, দুজন কনস্টেবলও কোত্থেকে এসে গেল সে সময়ে। তাড়া খেয়ে সোমেন আর সুভদ্র নেমে এল। সুভদ্র অপমান-টান গায়ে মাখে না, একটু হেসে বলল—লোকটা জেনুইন ম্যাজিস্ট্রেট। আমি ওকে চিনি। একবার ওর এজলাসে যেতে হয়েছিল। খুব কড়া লোক। বলে একটু চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বলল—কুমারস্বামীর ক্ষমতা দেখলেন! সব রকম সেফগার্ড রেখে দিয়েছে!

সোমেন হতাশ হয়ে বলে—কিন্তু অজিতদা? দিদির অসুখের কথা বলে অজিতদাকে আনা উচিত ছিল।

সুভদ্র ঠোঁটে প্রচণ্ড তেতো বিরক্তির ভঙ্গি করে বলে—অসুখের কথা-টথা বলে নিচু হয়ে ভিক্ষে চাইতে হবে নাকি! দাঁড়ান না, এবার অন্য রকম কেলো করব।

সুভদ্রর এই মনোভঙ্গী সোমেনের পছন্দ ছিল না। কিন্তু সুভদ্র ওই রকম।

কখন কি হয়, তাই সোমেন প্রায় সারাদিনই হাসপাতালে থাকল বুধবারে। সকালেই শীলার আয়া জানাল—জল ভাঙছে। কথাটার মানে সোমেন জানে না, তাই ভয় পেয়ে

নার্সকে গিয়ে ধরল। নার্স গা করল না, বলল—ও তো হবেই।

শীলা অসহনীয় যন্ত্রণায় বার বার বেঁকে যাচ্ছে। সোমেনকে দেখেও যেন চিনতে পারল না, শুধু বলল—আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যা। এরা কিছু করছে না, আমি মরে যাবো।

অবস্থা দেখে মরে যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল সোমেনের। কিন্তু এ অবস্থায় কি করা উচিত তা ঠিক করতে না পেরে সে কেবলই নার্স আর ডাক্তারদের কাছে ছোটাছুটি করল।

কাল রাতেও অজিতদা ফেরেনি। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে সোমেন। আজ ক-দিন সোমেন ওদের বাসায় রাতে গিয়ে শোয়।

একটু বেলায় সুভদ্র এল। সোমেন সব কথা বলতে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় সুভদ্র ডাক্তার ডেকে আনল কোথা থেকে। ডাক্তার দেখে টেখে বলে—মেমব্রেনটা বার্স্ট করেছে, কিন্তু ডেলিভারির পেইন শুরু হয়নি। আমি এটাকেই ভয় পাচ্ছিলাম। একটা ইঞ্জেকশন লিখে দিচ্ছি, এনে দিন। যদি তাতে না হয় তবে কাল সকালে সিজারিয়ান হবে। এঁর হাজব্যান্ডকে দরকার, বন্ডে সই করতে হবে।

এই বলে গম্ভীর ডাক্তার চলে গেলেন। কিন্তু চলে যাওয়ার সময়ে তাঁর গম্ভীর মুখশ্রী থেকে সোমেনের ভিতরে একটা ভয় জন্ম নেয়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে ডাক্তার উদ্বিগ্ন, চিন্তিত। কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছেন উনি। সোমেন বুঝল, বড়দির অবস্থা ভাল নয়।

বুঝতে পেরেই তার হাত পায়ে একটা শিউরানি খেলে গেল। বারান্দায় তখনো দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল সুভদ্র। তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সোমেন সিগারেট ধরিয়ে বলল—সামথিং ইজ ভেরী মাচ রং।

সুভদ্র একবার চোখ কুঁচকে তাকাল মাত্র। তারপর মাথা নেড়ে বলল—ভাববেন না। প্রেসক্রিপশনটা দিন, ওষুধ এনে দিচ্ছি। বলে প্রেসক্রিপশন নিয়ে চলে গেল।

সোমেন চুপ করে রইল। সামনে একটু লন, তারপর লাল রঙের হাসপাতালের বাড়ি। কয়েকটা গাছগাছালি। খুব বৃষ্টি গেছে কাল, আজ গাছপালা ঘন সবুজ। ছেঁড়া বাদল-মেঘের ফাঁকে ফাঁকে গভীর নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সব-কিছুই একটা বিষণ্ণতায় মাখানো। এই বিপুল পৃথিবীতে সোমেন বড় একা ও অসহায় বোধ করে। আজ সে বড় বেশী নিজের অপদার্থতা বুঝতে পারছে। কিছু শেখেনি সে। যদি অন্তত ডাক্তারীটা পড়বার চেষ্টা করত তবে আজ এত অসহায় লাগত না। অচেনা এক সমবেদনাহীন যান্ত্রিক ডাক্তারের হাতে দিদির আয়ু—ভাবতেই কেমন লাগে! যদি কোনো ভুল করে ডাক্তার? যদি ঠিকমতো ব্যথার কারণটা ধরতে না পারে? যদি নার্সরা সময় মতো ডাক্তারকে খবর না দেয়? সমস্ত হাসপাতালের ব্যবস্থার মধ্যেই একটা রুক্ষ উদাসীন এবং বিরক্তির ভাব রয়েছে। যেন এরা রুগী কিংবা রোগ পছন্দ করে না। যেন এদের সবাইকে জোর করে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে যে বড়দিকে সে চেনে, যাকে নানা সুখে-দুঃখে, রাগে অভিমানে আপনার লোক বলে জেনেছে তাকে এরা তো সেভাবে চেনে না। এদের কাছে বড়দি এক অচেনা রুগী মাত্র, যার বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়ায় খুব একটা তফাৎ হয় না। বড়দির যে বড় বেশী বেঁচে থাকা দরকার, তা বুঝবে কি করে? রাগে অসহায়তায় সোমেনের হাত পা নিশপিশ করে। দারোয়ান গোছের কিছু লোক বাইরের লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছে। সোমেন তাই নীচে নেমে এল। সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো। তার কিছু করার নেই। সে ডাক্তারীর কিছুই জানে না, এই ভেবে তার চোখে জল এল হঠাৎ।

দুপুরের আগেই সুভদ্র চলে গেল, ইস্কুল আছে। সোমেন কোথাও গেল না। খোলা মাঠের মধ্যে বসে ভাবতে লাগল, বড়দিকে সে বরাবর খুব অবহেলা করেছে। কত ডাকত বড়দি, কতবার বলেছে—একা থাকি, আমাদের কাছে এসে ক'দিন থাক না সোমেন! কতবার বড়দি তাকে দামী জামা প্যান্ট দিয়েছে, নগদ টাকাও দিয়েছে অনেক। সেই বড়দি কোথায় কোন বিপুলে অলক্ষ্যে মিশে মিলিয়ে যাবে! আর কখনো, কোনো দিন দেখা হবে না!

দুপুরে শীলার খাবার নিতে একবার বাসায় ফিরল সোমেন। খাবার নওয়া বৃথা। বড়দি তো খায় না, আয়াই খেয়ে নেয়। তবু খাবার নিতে বাসায় না গেলে ননীবালা চিন্তা করবেন। বাসায় এসে কোনোক্রমে কাকস্নান সেরে দু গ্রাস অনিচ্ছের ভাত খেয়ে নিল সোমেন। ননীবালা উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করেন—কেমন আছে রে?

ভেঙে বলল না সোমেন। কেবল বলল—ঐ রকমই।

টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ফের হাসপাতালে এসে ওয়ার্ডে ঢুকে ভয়ংকর চমকে গেল সোমেন। বড়দির বিছানার পাশে স্ট্যান্ড সেই স্যালাইন বা গ্লুকোজের ওলটানো শিশি, রবারের নল ঝুলছে। লাল কম্বলে দিদিকে চেপে ধরে আছে বুড়ি আয়া। আর বড়দির প্রচণ্ড একটা কাঁপুনি উঠেছে। মুখ সাদা, ঠোঁট মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে, দুটো চোখে দৃষ্টি নেই। কেবল মুখে একটা অবিরল 'হু—হু—হু—হু' শব্দ করছে। আয়া বলল, শিরায় ছুঁচ ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে রিগার উঠেছে। তাই ছুঁচ খুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু একটু বাদেই আবার দেবে। ইঞ্জেকশনটা ঐ শিশির তরল পদার্থের সঙ্গে মেশানো আছে।

সোমেন দৃশ্যটা দেখতে পারল না। খাবার রেখে বেরিয়ে এল। কি অমানুষিক কষ্ট পাচ্ছে বড়দি, ভেবে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোমেন ফের চোখের জল মুছল।

বিকেলের দিকে ওয়ার্ড ভরে গেল লোকে। রণেন, ননীবালা, সুভদ্র, আর সুভদ্রর সঙ্গে শীলার স্কুলের আরো পাঁচ ছ জন দিদিমণি। এত লোককে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু সুভদ্র কি করে ম্যানেজ করেছে। শীলার জ্ঞান প্রায় নেই। মুখে গাজলা উঠছে। আর গভীর বেদনার দীর্ঘ ধ্বনি বুকে থেকে উঠে আসছে কখনো।

একবার সেই অবস্থাতেই বড় বড় চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজল চারদিকে। পেল না। ব্যথায় প্রচণ্ড মুখ বিকৃত করে চোখ বুজল। দুটো হাতের মুঠো মাঝে মাঝে ভীষণ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। বালিশের ওরাড় খিমচে ধরে টানছে এক একবার। ফের নরম হয়ে যাচ্ছে শরীর। আবার ব্যথার ঢেউ আসছে।

ননীবালা শীলার হাতের আঙুলে টেনে দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে মেয়ের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলছেন—ও শীলা, ব্যথাটা কি একটু অন্যরকম টের পাস? ঝলকে ঝলকে ব্যথা আসছে কি?

শীলা সে কথা শুনতে পায় কিনা কে জানে! এক একবার ককিয়ে ওঠে। শুধু একবার যেন পূর্ণ চেতনায় ফিরে এসে ননীবালার হাতটা খিমচে ধরে বলল—ও কোথায় মা? ও কেন আসছে না? যার জন্য আমার এত কষ্ট সে একবার এসে দেখে যাক যে আমি মরে যাচ্ছি। ও কি রাগ করেছে মা? আঁ!

বলেই ফের ব্যথায় ডুবে গেল শীলা। প্রবল ককিয়ে উঠল।

সোমেন পালিয়ে এল। পিছন থেকে সুভদ্র এসে ধরল তাকে। সামনের লনে দাঁড়িয়ে দুজনে সিগারেট ধরায়।

(ক্রমশ)

স্বরলিপি

সেদিন একটি তরুণ প্রশ্ন করেছিল—"রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যে পরিবেশ তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ আমাদের হয়নি—তা হলে আমাদের আদর্শ কি হবে? নিশ্চয়ই আমরা স্বরলিপি থেকে গান তুলব কিন্তু সেই তোলাটা কতখানি সার্থক হবে? মূল থেকে যে বিচ্যুতি এতে ঘটবে তাকে পূরণ করবার বা সার্থকতর করবার উপায় কি?" উত্তরে তাকে বলেছিলুম-রবীন্দ্রনাথের নিজের এবং তাঁর সমসাময়িক আরও অনেকের রেকর্ড রয়েছে যাঁরা তাঁর কাছেই গান শিখেছিলেন; সেগুলি সংগ্রহ করে যদি শোনা যায় এবং বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে ধরতে পারা যাবে মূল বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং কোথায় বিচ্যুতি ঘটছে। কথাটা তার কাছে পরিষ্কার হয়নি, যদিচ সে রবীন্দ্রনাথের এবং আরও অনেকের রেকর্ডই শুনেছে। তার মনে হয় তারাও ভুল গাইছে না, স্বরলিপি থেকে ঠিকই তুলছে, তথাপি তারা যেন আগের জেনারেশনের কাছ অকুণ্ঠ সমর্থন পাচ্ছে না। এইখানেই তার দ্বিধা। এইখানেই একটা খুব গুরুতর এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উঠছে স্বরলিপি বনাম অ্যাকাডেমিক শিক্ষা। স্বরলিপি সম্বন্ধে অনেকের একটা নিরতিশয় অবজ্ঞার ভাব আছে। নোটেশন! ও তো নিষ্প্রাণ কাঠামো—ও থেকে গানের মর্মে কতটুকু প্রবেশ করা যায়? অতএব অনেকে তাকে একটা স্বকীয় রীতিতে পরিবর্তিত এবং সংশোধিত করে নেন। আবার অনেকের মনোভাব বিপরীত। স্বরলিপির এতটুকু পরিবর্তন যাতে না ঘটে সে বিষয়ে তাঁরা অতিমাত্রায় সচেতন এবং তাঁদের গান স্বরলিপির একটি নিখুঁত আবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্বরলিপির দিকে প্রকৃত অ্যাপ্রোচটা কি রকম হবে সে সম্বন্ধে উভয়ের কোন পক্ষেরই চিন্তার অবকাশ ঘটেছে বলে মনে হয় না। আসলে স্বরলিপিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে গেলে একটা বিরাট প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেই প্রস্তুতি হচ্ছে সংগীত সম্বন্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন। যে কোনও একজন সুরকার কতকগুলি বিশিষ্ট পরিবেশে পরিবর্ধিত হন। তাঁদের চিত্তের সংগে কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি-নীতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, যা তাঁদের ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া। তারপর তাঁরা স্থাপন করেন নিজের বৈশিষ্ট্য। এই যে ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যগত বিবর্তন—এ সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান যত সমৃদ্ধ স্বরলিপি তোলার ব্যাপারে তিনি তত অধিক সাফল্য অর্জন করবেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ

গানের আসর

...ন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি। বহু বিভিন্ন পদ্ধতিতে বহু বিভিন্ন পর্যায়ের গান স্বরলিপিতে আবদ্ধ হয়েছে। সেই সব স্বরলিপিতে যে গায়কী ধরা পড়েছে তার আলোচনায় যদি প্রবৃত্ত হওয়া যায় তা হলে বাংলা গানের তাবৎ ঐতিহ্যেরই একটা সুস্পষ্ট পরিচয় মিলবে। এর সংগে পুরাতন রেকর্ড বা প্রাচীন গায়ক গায়িকার কণ্ঠ থেকে যদি নানান ধরনের গানের নমুনা সংগ্রহ করা যায়, তা হলে বিভিন্ন গানের রীতি প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা পাকা ধারণা গড়ে উঠবে এবং তখনই দেখা যাবে স্বরলিপি থেকে গানের স্বরূপটি উপলব্ধি করা কত সহজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাজটি আদৌ সহজ নয়—গুরুতর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ। এইটিই হচ্ছে অ্যাকাডেমিক শিক্ষা, এবং ভবিষ্যৎ শিল্পী, যাঁরা সার্থকভাবে যে কোনও সুরকারের গানকে স্বকণ্ঠে স্বরলিপির মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে চান, তাঁদের পক্ষে আর শ্রেয়তর পন্থা থাকতে পারে না। শিক্ষাটা এমনি হওয়া চাই যে, একটা স্বরলিপি দেখলে বলে দেওয়া যাবে এর গায়কীটা হবে এমনি এবং চালটা হবে এই ধরনের। এ হচ্ছে সমগ্র বাংলা গান সম্পর্কে বেসিক এডুকেশন। যে কোনও বিশেষ সুরকার সম্বন্ধেও এইভাবে জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে—যা বর্তমানে বহু শিল্পী অর্জন করেছেন। অনেকে তাঁদের পরিবারের একটা ঐতিহ্য লাভ করেছেন, যার ফলে একটা শুদ্ধ পদ্ধতি তাঁদের কণ্ঠে স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে। অথবা অনেকে এমন গুরুর সান্নিধ্যে এসেছেন যাঁর কাছ থেকে তাঁরা একটি বিশেষ গায়কী আয়ত্ত করেছেন, কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন না করে। কিন্তু মুশকিল হয় এই যে, তাঁরা যখন দ্বিতীয় কোনও সুরকারের গান গাইতে চেষ্টা করেন তখন সেই ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য আর তাঁদের কণ্ঠে সার্থকভাবে ধরা দেয় না। তখন আবার অপর একজন গুরুর দ্বারস্থ তাঁদের হতে হয়। এই ধরনের শিক্ষার অসুবিধা এই যে, এতে উপলব্ধি অত্যন্ত সীমিত হয়ে থাকে।

যদি একান্তভাবেই স্বনির্ভর হয়ে শিখতে হয় তা হলে পূর্বে যা বলেছি সেই উপায় ছাড়া বোধ করি গত্যন্তর নেই। রবীন্দ্রনাথের নিজের এবং তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপরাপর শিল্পীর রেকর্ড হলে বিভিন্ন গায়কগায়িকার গান থেকে ছন্দ, তাল, মীড়, গমক, ওজস্বিতা, কোমলতা, কারুণ্য, দীপ্তি, উচ্ছ্বাস, আবেদন প্রভৃতি রূপায়ণের বিভিন্ন রীতি প্রকৃতি উপলব্ধি করা যাবে। এক কথায় এইভাবেও রবীন্দ্রসংগীতের সৌন্দর্যতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক প্রখ্যাত রেকর্ড-রেডিওর শিল্পী নানারকম মতামত প্রদান করেন কিন্তু এতটা খাটতে রাজী নন। তাঁদের ধারণা স্বরলিপি থেকে তাঁরা ঠিকই তুলেছেন, কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বিদ্বেষপরবশ হয়েই তাঁদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রশংসা করতে কার্পণ্য করছেন। অর্থাৎ উপলব্ধির অভাবটা যে তাঁদের এটা বুঝতেও তাঁরা অপারগ। একটা জিনিস ওপর ওপর শেখা এবং খেটে শেখার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। প্র্যাকটিস করলে গাইতে পারা যায় কিন্তু মূল্যায়ন করতে না পারলে তাতে প্রাণসঞ্চার করা যায় না।

এটা ঠিকই যে, অতঃপর স্বরলিপিকেই অবলম্বন করতে হবে; কিন্তু এর জন্য যে প্রস্তুতি তাকে এড়িয়ে গেলে ফল অবশ্যই ভাল হতে পারে না। এই শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্র রচনার কপিরাইট থাকবে না। এ দুর্ভাবনা অনেকের যে তখন রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে যথেষ্ট বিকৃতি ঘটবার সম্ভাবনা। তাই স্বরলিপির সুষ্ঠু রূপায়ন সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার। গানের ব্যাপারে আইন করে শাসন করা সম্ভব নয়, শিল্পীর শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। তথাপি, আমাদের অনেকেরই হয়তো মনে হবে কপিরাইট অবর্তমানেও একটা বোর্ড থাকা প্রয়োজন যাঁদের কাজ হবে শিল্পীদের বাধা দেওয়া নয়, নির্দেশ দেওয়া। যদিচ অধিকাংশ গায়ক গায়িকা স্বরলিপি অনুসরণ করেই চলেন, কিন্তু যদি দেখা যায় কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য

নিয়ে বা কেবলমাত্র নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিপরীত রূপ দিতে চলেছেন তখন তাঁকে সংযত করবার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই দেখা দেবে। সঙ্গীত সম্বন্ধে সামগ্রিক উপলব্ধি, মূল্যায়ন, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ—এইগুলিই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মহত্ত্বকে ভাস্বর রেখে যাবে—এই বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি এবং এই দায়িত্বগুলিই তরুণতর সম্প্রদায়কে গ্রহণ করতে হবে।

শার্ঙ্গদেব

চিঠিপত্র

গত ২৯ মার্চ, ১৯৭৫ সংখ্যা দেশ পত্রিকার 'গানের আসর' বিভাগে 'অতি-বিলম্বিত' খেয়াল গান প্রসঙ্গে অত্যন্ত সময়ানুগ একটি সমস্যার কথা তোলা হয়েছে। বর্তমানে খেয়াল গানের অতিবিলম্বিত লয় এমন বৈচিত্র্যহীনতার সৃষ্টি করছে, যার জন্যে বিষয়টির ওপর থেকে অনেক রসপিপাসু শ্রোতার ভালবাসা চলে যেতে বসেছে। বস্তুতপক্ষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনগুলির আকর্ষণ ঐ একই কারণে দিন দিন কমে আসছে। লয়কারির চমক, ছন্দ নিয়ে অনায়াস কারুকাজ বহুদিন শুনি না। আজকের শিল্পীকে নিজস্ব রুচি ও ধীশক্তি প্রয়োগের দ্বারা লয়ের এই দ্রুততা এবং বিলম্বতার মধ্যে সুসামঞ্জস্য সাধন করতে হবে এবং যেহেতু কোন গানেরই লয় স্থিরনির্দিষ্ট করে দেয়া সম্ভব নয়, সেহেতু শিল্পী আপন রসবোধের ফরমায়েশ অনুযায়ীই সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। ভয় হয় সেই সমস্ত সাম্প্রতিক-কালের শিল্পীদের, যাঁদের "ছন্দ বা সুরের দিক থেকে কোনও পরিকল্পনা নেই" তাঁদের নিজস্বতার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত খেয়াল আবার অতিদ্রুততার দিকে না গড়ায়।

সেই সমস্ত মান্য শিল্পীদের, যাঁদের গায়নরীতি শিক্ষার্থী সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত এবং গুণগ্রাহী শ্রোতৃসমাজে বিশেষ সমাদৃত তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা নতুন করে ভাবতে শুরু করুন। তাঁরা যদি সক্রিয় এবং চিন্তাশীল হন, তবে খেয়াল গানের জনপ্রিয়তা বোধহয় এখনও ফিরিয়ে আনা নিতান্ত অসম্ভব হবে না।

পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন আলোচনা প্রতি-আলোচনায় সোচ্চার হয়ে বিষয়টির সত্বর সংশোধন সম্ভব কি না তাতে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। আজকের খেয়াল গান ক্রমান্বয়ে "কমার্সিয়াল" হতে হতে এমন একটি কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, যার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

শিপ্রা মুখোপাধ্যায়,
অনডাল

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ২ ॥

Cleveland
(Ohio) U.S.A.
৬-৬-৭৫

কল্যাণকমলেষু,

নিউ পাল্জ্‌-এ দিন তিনেক বাস করেছিলুম। এটিকে সবাই বলে গ্রাম। এ যদি গ্রাম হয়, তবে চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, রডন-ল্যাউডন-ক্যামাক স্ট্রীট অঞ্চলকে অনুন্নত গ্রাম্যপরিবেশ বলতে দ্বিধা করব না। এখানকার অগণিত সংখ্যক রাস্তাগুলি এত চিক্কণ, মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন যে, সিগারেটের ছাই ফেলতেও হাত ওঠে না। প্রতি বাড়িতে সেন্ট্রাল হীটিং ও কুলিং ব্যবস্থা। গ্যারাজ, আউট হাউস, ফল ও সব্জির বাগান এবং ইলেকট্রিকের সাহায্যে তার বহুবিধ কর্মবৈচিত্র্য ও সুচারু ব্যবস্থাদি। এখানে রয়েছেন অধ্যাপক পার্বতীকুমার সরকার ও তাঁর স্ত্রী প্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী ও নৃত্যশিক্ষিকা শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী সরকার। ইউরোপে, আফ্রিকায় এবং এ-দেশে এঁর নৃত্যকলা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছে। এঁর ভারতীয় নৃত্য দেখার জন্য নিউ ইয়র্কের প্রেক্ষাগৃহগুলি উপচিয়ে পড়ে। এঁদের সঙ্গে বহুদিন আমার পত্রালাপ ছিল। এঁদের বালিকা কন্যা শ্রীমতী রঞ্জাবতী মাত্র ১২ বছর বয়সেই ভাল ইংরেজী কবিতা রচনা করে—যাদের অনেকগুলি ছাপা হয়ে পাকা হাতের পরিচয় দেয়। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী যদিও নারীর স্বকীয়তা ও স্বাধিকারে বিশ্বাসী, তবু তিনি জননী,—তাঁর দুর্ভাবনা এই, পাছে তাঁর কন্যাটি অদূরে ভবিষ্যতে আমেরিকান অষ্টাদশীর রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়।

বনবাগান ও পাখির কাকলিতে ভরা এই গ্রাম একটি পার্বত্য উপত্যকার অংশ-বিশেষ মাত্র। প্রচুর জনবসতি বিলাসবৈভবে ঝলোমলো। প্রতি পরিবারে একখানি অবশ্যম্ভাবী মোটর, টেলিফোন, ফ্রীজ, কুকিং রেঞ্জ, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার যন্ত্রসিন্দুক। কান পেতে যতদূর শোনা সম্ভব, শত শত পরিবার শান্তিপূর্ণ, সর্বত্র নিশ্চুপ। শুধু খেলাধুলোর মাঠগুলিতে বালক-বালিকাদের মৃদু কলরব শোনা যায়। গ্রামের ভিতর দিয়েই উপত্যকাপথ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে উঁচুতে উঠে গেছে। পাহাড় হাজার আড়াই ফুট উঁচু। নাম 'মোহংক'। অনেকেই এই পাহাড়ের নিরিবিলি আরণ্য অঞ্চলে সর্বসুবিধাযুক্ত বাংলোয় বাস করে প্রাচুর্যের মধ্যে। লোকে এখানে ফুলগাছের চারা, বহুবিধ গাছের বীজ প্রভৃতি কিনতে আসে।

প্রথম দিনেই এসে হাজির হলেন সস্ত্রীক অধ্যাপক ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। আমার সঙ্গে তাঁর ৪০ বছরেরও বেশী বন্ধুত্ব। তিনি প্রথিতযশা কবি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব হয়ে তিনি ছিলেন প্রায় দশ বছর। আমার জীবনে এমন অমায়িক, সজ্জন, নিরভিমান ও বিনয়নম্র কমই দেখেছি। একদা তিনি ও আমি তৎকালে সদ্যপ্রসূত পূর্ব-পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক পরিভ্রমণে গিয়েছিলুম। সেই ভ্রমণকালে কিছু কৌতুক ও হাসির ঘটনা ঘটে। তাঁকে কাছে পেয়ে সেই ২৮ বছর আগেকার গল্পটি বলি। এই গ্রামের সুবৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অমিয়বাবু অধ্যাপনা করেন। ছাত্র, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ—এঁরা সকলেই এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় দার্শনিক পণ্ডিতকে একান্ত আপন মনে করেন। ডক্টর চক্রবর্তী এ-দেশে অনেকটা জাতীয় অধ্যাপকের সম্মানে ভূষিত। তাঁকে নিয়ে যে সংবর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান হয়, আমি সেই সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতি আমেরিকান শিক্ষিত সমাজের যে শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদন দেখেছিলুম, সেটি ভারতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। পরদিন অমিয়বাবু 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা তিনটি চমৎকার কবিতা আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন, এবং নিউ ইয়র্কে ফিরে তাঁর হাতের যে প্রীতিশ্রদ্ধাপূর্ণ চিঠি পাই, আমি আজও তার যোগ্য হয়ে উঠিনি।

নিউ ইয়র্কের মধ্য মানহাটন অঞ্চলের গগনচুম্বী বহুতল অট্টালিকাগুলি বোধ হয় আমার মনকে ঈষৎ পীড়া দিয়ে থাকবে। ওতে বিস্ময়াবেশ আছে, রাত্রির আলোকমালাদলের সজ্জায় রূপকথারও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র নীলাকাশ ও রৌদ্রচ্ছটা ওদের উভয়ের মধ্যপথে অবরুদ্ধ হয়ে যেন করুণ বিষণ্ণতায় স্তব্ধ হয়ে থাকে। সম্ভবত এইসব কারণে এক শ্রেণীর নাগরিক সপ্তাহান্তে প্রতি শুক্রবারের অপরাহ্নে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে গাড়ি নিয়ে বাইরে চলে যায়। বাইরে অবারিত সুদূর দেশাঞ্চলে মুক্তি। সেদিন বন্ধুজনের 'ক্রুজ' দিয়ে আমিও চললুম আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীক-মূর্তি 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখতে। হাডসন নদীর তটে লিবার্টি পার্কের পশ্চিম ঘাটে মস্ত এক স্টীমারে চড়ে বসলুম। স্টীমার ছাড়লেই সমগ্র নিউ ইয়র্কের মানহাটন-এর দৃশ্য চোখে পড়ে। এই মানহাটন পূর্ব আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু সম্প্রতি দেশ-জোড়া মন্দা-বাজারে কর্তৃপক্ষ নাকি নিউ ইয়র্কের খরচ কুলোতে পারছেন না। তাঁদের এই অসুবিধা লক্ষ করে এই সেদিন তৈলরাজ ইরানের শাহ্ বুঝি বলে গেলেন, বেশ তো অসুবিধা আর কি! আমার কাছে আপনাদের মানহাটন অঞ্চলটি বিক্রি করুন না কেন? বিশ-তিরিশ-পঞ্চাশ হাজার বিলিয়ন ডলার যা লাগে, আমিই দেবো!

সেদিন আমার সঙ্গী শ্রীমান তড়িৎ চৌধুরী অঙ্ক কষে আমাকে জানালো, একশ কোটি ডলারে মাত্র এক বিলিয়ন হয়। ইতিহাসের চাকা ঘুরছে, মধ্য এশিয়া এবার পৃথিবীর সম্পদ গ্রাস করতে উদ্যত। ওখানকার মরুলোকের তলায় লক্ষ কোটি বছরের তেল জমা রয়েছে। তেল এ-কালে অমৃতবৎ।

হাডসন নদীর মোহানায় কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ দেখছি। একটি দ্বীপ নিউ ইয়র্কের গভর্নরের অট্টালিকা ও বনবাগানে পূর্ণ। যে দ্বীপটি আটলান্টিক মহাসাগরকে বহির্বিশ্বের দিকে শাসন করছে, সেটির মধ্যস্থলে এক কালজয়ী নারীমূর্তি মশালের অগ্নিপাত্র হাতে নিয়ে উচ্চবেদীর উপরে দণ্ডায়মানা। বেদীটি নিয়ে এই মূর্তির সামগ্রিক উচ্চতা মোট ৩০৫ ফুট। শুধু হাত-উঁচু-করা মূর্তিটি ১৫২ ফুট, এবং কেবলমাত্র নারীমূর্তির উচ্চতা ১১১ ফুট। এই মূর্তির অন্য হাতে যে বইখানা রয়েছে, কেবলমাত্র তারই সাইজ হল ২১ ফুট। এই মূর্তিটি উপহারস্বরূপ দান করেন ফরাসী গভর্নমেণ্ট উভয় রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক বন্ধুত্বের প্রতীক হিসাবে। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠায় উভয় রাষ্ট্রেরই খরচ হয় তৎকালীন মোট ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। সেই থেকে এই সাগরতরঙ্গাহত ক্ষুদ্র দ্বীপটির নামকরণ হয়, লিবার্টি আইল্যাণ্ড।

এই মূর্তির নিচে বেদীর ভিতরভাগে একটি মস্ত যাদুঘর—সেটি বিভিন্ন চিত্রে, সামগ্রী সম্ভারে, বিচিত্র অলংকরণে সমৃদ্ধ। তাদেরই মাঝখানে একটি মার্বেল-ফলকে যে কবিতাটি উৎকীর্ণ করা রয়েছে, সেটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছিনে। সেটি এই:

"Not like the brazen giant of Greek
fame,
With conquering limbs astride from
land to land;
Here at our sea-washed, sunset
gates shall stand

A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of exiles. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
"Keep ancient lands, your storied pomp!" cries she
With silent lips. "Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free.
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed to me,
I lift my lamp beside the golden door!"

এই অপূর্ব কবিতাটি ১৮৮৩ সালে লিখেছিলেন আমেরিকান মহিলা কবি শ্রীমতী এম্মা ল্যাজারাস।

এই মূর্তিটি নির্মাণের কাজে ১০০ টন তামা ও ১২৫ টন ইস্পাত-লোহা লেগেছিল।

প্রসংগত বলি, নিউ ইয়র্কে বাঙ্গালীর সংখ্যা কমবেশী চার হাজারের মতো। এ-দেশে উচ্চশিক্ষিত ছাড়া বিশেষ কোনও বাঙ্গালী আসেন না। এম-এ বা এম-এসসি পাস ক'রে যাঁরা আসেন অথবা উচ্চ পর্যায়ে যাঁরা ইঞ্জিনিয়র বা বিজ্ঞানী হয়ে আসেন, তাঁরাও এ-দেশে এসে পি-এচ-ডি করে থাকেন। গ্রাজুয়েট বা কেবলমাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েটের দাম এ-দেশে কম। তাঁরা এ-দেশে এসে অফিসের কেরানী হতে পারেন। কিন্তু সেই সুযোগও সম্প্রতি বিঘ্নসঙ্কুল হয়েছে মন্দা-বাজারের জন্য। এখন বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কারোকে প্রবেশপত্র দেওয়া হচ্ছে না। যেসব ছেলে বা মেয়ে ভাগ্য-অন্বেষণে আসে, তারা হোটেলে, বাজারে, গৃহস্থ-ঘরে, দোকানে বা কারখানায় বলে-করে কাজ নিতে পারত। যে-কোনও কাজ একটা পেলেই সচ্ছলতা আসে। প্রতি সপ্তাহে ভালভাবে আহারাদির খরচ পড়ে ২০ বা ২৫ ডলার। চারজনে মিলে ডরমিটরির ঘর পেলে এবং নিজের সব কাজ নিজে করলে মাসে ১০০ ডলারে খাওয়া ও থাকা চলে। কিন্তু দোকান ও বাজারে সাংঘাতিক লোভের আকর্ষণ। পেটুকদের পক্ষে এটি ভূস্বর্গ। অনেক বেকার বাঙ্গালী যুবক—যারা আগে থেকে আছে—তারা এ রাষ্ট্রের জনকল্যাণ দপ্তরের আপিস থেকে প্রতি- সপ্তাহে ৯৫ ডলার পায়। যারা আদি আফ্রিকান বা কৃষ্ণাঙ্গ,—এ-দেশে যারা শতকরা ১১ জন—তাদের সমাজের লক্ষ লক্ষ নরনারী এই জনকল্যাণ দপ্তরের আনুকূল্যে অনেকটা নিষ্কর্মা হয়েই থাকে। সম্প্রতি কয়েক বছর আগে এখানে সিভিল রাইটস বিল পাস হবার ফলে কৃষ্ণাঙ্গরা এখন প্রচুর পরিমাণে স্বাধিকার-প্রমত্ততা লাভ করেছে। বহু ক্ষেত্রে মাইনরিটির সমাজবিরোধী চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে।

সেদিন নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনসাল জেনারেল শ্রীযুক্ত অশোক রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী গায়ত্রী রায় তাঁদের বাসস্থানে একটি চায়ের মজলিসে ডেকেছিলেন। পথ অনেকটা। সেণ্ট্রাল পার্ক পেরিয়ে বড় পোস্ট অফিস ছাড়িয়ে ব্রডওয়ে বাঁ দিকে রেখে নিরিবিলি পথে ট্যাক্সি নিয়ে তাঁদের ওই প্রাসাদসদৃশ অট্টালিকার উপরে উঠে এলুম। ওখানে উপস্থিত হয়েছেন রবীন্দ্রসংগীতের প্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। তাঁর সংগে এসেছেন মোট ৩২ জন। তাঁকে দেখে খুব আনন্দ পেলুম। কলকাতার রবীন্দ্রসদনে আমরা উভয়েই সহকর্মী। এই যাত্রায় তিনি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করেছেন এবং পশ্চিমবংগের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তিনি উপযুক্ত সহযোগিতা না পেয়ে বিভিন্ন অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাঁর সবিস্তার কাহিনী ঈষৎ দুঃখদায়ক। সে যাই হোক, নিউ ইয়র্কের সুশিক্ষিত ও ভদ্র বাঙ্গালীদেরকে সহজেই বলা যায়, Cream of the society। শ্রীমতী গান্ধী যখন বলেন, আমেরিকা আমাদেরকে যেমন খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করেছে, আমরাও তেমনি ব্রেন দিয়ে তাঁদেরকে সাহায্য করেছি—কথাটি যে অত্যুক্তি নয়, এটি এ-দেশে না এলে তেমন বোঝা যায় না। পৃথিবীর অপর প্রান্তে একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে এতগুলি একত্রিত 'মেরিট' দেখে মন আনন্দিত হয়ে ওঠে। ভয় ছিল পাছে এঁদেরকে উন্নাসিক মনে হয়। কিন্তু তা হয়নি। এঁদের মিষ্ট-মধুর ব্যবহার ও আতিথেয়তা খুবই আন্তরিক। বন্ধুত্ব ঘটতে দেরি লাগে না। অশোক রায় মহাশয় ও গায়ত্রী দেবী যেমন সজ্জন ও মিষ্টভাষী, তেমনি কৌতুকপ্রিয়। বাঙ্গালী মহলে তিনি খুবই সুখ্যাত।

এই ভ্রমণকালে নিউ ইয়র্ক হবে আমার মধ্যকেন্দ্র। অর্থাৎ যেখানে এবং যত দূরেই যাই, নিউ ইয়র্কে আমাকে ফিরতেই হবে। ভারত গভর্নমেণ্টের এইটিই নির্দেশ। আমি কোথায় যাচ্ছি, কি করছি বা কেমন-ভাবে কাটাচ্ছি,—এটি তাঁদের বিচার্য নয়। সাংস্কৃতিক পর্যটনে এই ধরনের অবাধ স্বাধীনতাই আমার প্রয়োজন ছিল।

জনৈক ইহুদি-আমেরিকান মহিলার ওখানে সেদিন আমার নৈশ-ভোজ ছিল। ১৯০৬ সালে তাঁর পিতা তাঁকে রাশিয়া থেকে এ-দেশে আনেন। তখন তিনি নাবালিকা এক নর্তকী ছিলেন। ওখানে আমাকে নিয়ে যান সর্বত্র পরিচিতা ডক্টর রেণুকা বিশ্বাস—যাঁর কথা আগে বলেছি। বৃদ্ধার নাম শ্রীমতী আন্না। আন্না নামটি রুশীয় এবং রুশ রাষ্ট্রে এই নামটি খুবই লোকপ্রিয়। আন্না পাবলোভা, আন্না কারেনিনা—কে না জানে। বৃদ্ধার দুটি বর্ষীয়সী কন্যা এবং এক-আধটি নাতি-নাতনী। ও'দেরই সংগে রয়েছে একটি বছর ২২।২৪এর স্বাস্থ্যবতী সুশিক্ষিতা তরুণী, —মেয়েটি পালিয়ে এসেছে আফ্রিকার উগান্ডা থেকে রাষ্ট্রপতি ইদি আমিনের বহিষ্করণের ধাক্কায়। এরা নামে এশীয়, কিন্তু পূর্বপুরুষ ভারতীয় গুজরাটী। ইংরেজ কোনও এককালে এদেরকে ব্রিটিশ নাগরিক—এই আখ্যা দিয়ে উগান্ডায় নিয়ে যায়—যে দেশে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অবাধ প্রভুত্ব ছিল। একালে ইদি আমিনের তাড়নায় ইংরেজদের সংগে এরাও উগান্ডা ছাড়তে বাধ্য হয়। এখন এই ব্রিটিশ নাগরিক এশিয়ানরা—যারা প্রধানত 'ভারতীয়'—যারা তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনযাত্রায় ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণ ভুলেছে, তাদের অধিকাংশকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। ফলে এশিয়ান-দের সংখ্যা বেড়ে গেছে বিলাতে। এখন সাম্রাজ্যহীন ব্রিটেনকে কথায় কথায় কই-মাছের কাঁটা গিলতে হয়। যাই হোক, এই তরুণীর নাম খাতিজা এবং ইনি পরম্পরায় খবর পেয়ে ইমিগ্রেশন আপিস থেকে শ্রীমতী রেণুকার কর্মস্থলে এসে হাজির হন। রেণুকা এঁর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন এই বাড়িতে—এঁরা রেণুকার বিশেষ বন্ধু। শ্রীমতী খাতিজা এখন পি-এচ-ডি করার জন্য থেসিস প্রস্তুত করছে।

এ-দেশে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাদির সংখ্যা কত লক্ষ আমি হিসেব করিনি। গৃহনির্মাণ, মোটর, খাদ্যসামগ্রী, কৃষি, ফুল ও গাছের চারা, বিমান ও জাহাজ, নাগরিক জীবন, গৃহসজ্জা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এক একটি আর্ট পেপারে ছাপা যে ধরনের সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা আমাদের কাছে স্বপ্নবৎ। সমগ্র দেশে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টন কাগজ খরচ হয়। খাদ্যসামগ্রী মাত্রই কাগজের বা পলিথিনের প্যাকেট, থালা-গেলাস-বাটি কাগজের বা প্লাস্টিক কাগজের, কাগজে হাত মোছা, হোটেলে অজস্র বর্ণবাহার কাগজের খরচ, কাগজ দিয়ে ধরে এরা হামবার্গার নামক খাবারে কামড় দেয়,—প্রতি গৃহস্থের বাড়ি থেকে প্রতি দিন রাশি রাশি কাগজের নুটি ফেলা যায়। প্রকৃতপক্ষে শহরের জঞ্জালের অধিকাংশ হল কাগজ। রান্নাঘরে মেয়েরা কথায়-কথায় যা দিয়ে হাত মোছে, তা কাগজ। সেই কারণে কাগজের বড় বড় রোল থাকে রান্নাঘরে।

এবার কিছু দিনের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছি নিউ ইয়র্ক থেকে। সঙ্গে আছে শ্রীমান আদিত্য দাস ও তার তরুণী স্ত্রী শ্রীমতী

জিনিস। জলি গাড়ির মধ্যে জমা করেছে বিবিধপ্রকার খাদ্য—সবই বাজার থেকে কেনা। আমরা হাডসন নদীর ধারে হল্যান্ড টানেলের ভিতর দিয়ে নিউ জার্সি অঞ্চলে এসেছিলুম। চারিদিকে দূরে দূরান্তরে দেখা যাচ্ছে বিরাট এক-একটি শিল্পাঞ্চল। আমরা এক-একবার হাইওয়ে ও একটির পর একটি সাঁকোর তলা দিয়ে বা উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। এটি ৯৫নং জাতীয় রাজপথ। আপ ও ডাউনে মোট ১২টি লেন। অর্থাৎ আপ লেনগুলি ধরে মোট ৬ খানা গাড়ি অবাধে ও নিশ্চিন্তে ছুটতে পারে। ডাউনেও তাই। কিছু কাল আগেও গাড়ির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭০ থেকে ৯০ মাইল। এখন স্পীড কমিয়ে ৫৫ মাইলে আনা হয়েছে তেলসংকটের জন্য। এর ফলে মোটর অ্যাকসিডেন্টের সংখ্যা কমেছে। এই দু শ ফুট চওড়া রাজপথে পথচারীর পক্ষে হেঁটে চলা নিষিদ্ধ। প্রতি এক মিনিটে শত শত গাড়ি এ পথে ছুটোছুটি করে। পথের দুই ধারে মাঝে মাঝে টেলিফোন ব্যবস্থা, গাড়ি খারাপ হওয়ার বা যে-কোনও দুর্বিপাকের খবর পাওয়া-মাত্রই পুলিস ছুটে আসে। এক একটি জাতীয় সড়কে প্রত্যেক সপ্তাহশেষে লক্ষ লক্ষ গাড়ি যাতায়াত করে।

এখন দুপুরে বেশ গরম, চড়া রোদ। মে মাসের শেষ সপ্তাহ। কিন্তু গাড়ির মধ্যে এয়ার-কন্ডিশন থাকলে আরাম। এ-দেশে দোকান, বাজার, বিদ্যালয়, জনপ্রতিষ্ঠান, প্রতি গৃহস্থ ঘর, আপিস-আদালত—যা কিছু চার দেওয়ালে ঘেরা, সবই এয়ার-কন্ডিশনড। যাই হোক, পথের দু দিকে হরিৎ উপত্যকা দেখতে দেখতে আমরা পেনসিলভানিয়ার প্রান্তপথে ডেলাওয়ার ও বল্টিমোর নগরীর সীমানা ঘেঁষে ওয়াশিংটনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। আমরা ২৪০ মাইল পথ অতিক্রম করছিলুম।

রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে প্রবেশকালে মনে হচ্ছিল যেন এক বৃহৎ অরণ্যলোকে ঢুকছি। যেদিকে তাকাই বনময় পার্বত্য উপত্যকা। রাজধানীর ভিতরে ও বাইরে এমন আরণ্য-প্রকৃতি ইউরোপের কোথাও নেই। এমন মসৃণ ও চিক্কণ, এমন পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ও প্রশান্ত পথের শোভা আর কবে দেখেছি? প্রতি পথের দু দিকে বনময়, মাঝে মাঝে সবুজ প্রান্তর; মাঝে মাঝে প্রাসাদপ্রতিম অট্টালিকাশ্রেণী। দূরে দেখা যাচ্ছে ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মনুমেন্ট—যার উচ্চতা ৫৫৫ ফুট। আকাশের দিকে এই স্মৃতিস্তম্ভ সচাপ্র হয়ে উঠেছে। রাজধানীকে দ্বিধাবিভক্ত করে বয়ে চলেছে বনগ্রাম নদী 'পটোম্যাক'। আমরা লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

আমাদের সময়-গণনায় কিছু ভুল ঘটেছিল। পৌঁছবার কথা ছিল মধ্যাহ্নের আগে। কিন্তু এখন প্রায় সন্ধ্যা, অর্থাৎ আটটা বাজে। আমরা এসে পৌঁছলুম লেক-উড ড্রাইভ-এ। কয়েকটি বহুতল অট্টালিকা নিয়ে এই লেকউড ড্রাইভ কমপ্লেক্স। আমাকে ভয়েস অব আমেরিকা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত রমেন পাইন মহাশয়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে আদিত্যরা গিয়ে উঠবে রাজধানীর এক মোটেলে—এই স্থির ছিল। কিন্তু আমার আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়ে পাইন মহাশয় চলে গেছেন রবীন্দ্রনাথের এক নৃত্যনাট্য অভিনয়ের পরিচালনায়। কিন্তু তাঁর বদলে হঠাৎ লাউঞ্জে এসে ঢুকলেন এক সৌম্যদর্শন বাঙ্গালী স্বামী-স্ত্রী। আমাদের কথা শোনা মাত্র তিনি আমাদের তিনজনকে লুফে নিলেন, এবং কোনওপ্রকার ওজর-আপত্তি না শুনে আমাদেরকে নিয়ে তুললেন তাঁর সাততলা উপরের অ্যাপার্টমেন্টে। আমরা তাঁকে বিব্রত করছি কিনা, এসব কথায় তিনি কানও দিলেন না। ইনি হলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূত দপ্তরের ফার্স্ট সেক্রেটারি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। এমন অমায়িক, সজ্জন এবং অতিথিবৎসল বাঙ্গালীকে পেয়ে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। আদিত্য এবং জলী সেই রাত্রে আর ছাড়া পেল না। সেদিন আমাদের এক রাত্রির জীবন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

আনোয়ারুলের বেসরকারী নাম জয় চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী হলেন মলী, দুটি ছেলের নাম শান্তনু ও আনন্দ এবং কিশোরী মেয়েটির নাম সুদেষ্ণা। এ ধরনের নামকরণের কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি

জানালেন, আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানুষ, এবং মহাভারত-রামায়ণ আমাদের আদিশিক্ষার প্রতীক।

একটি রাত্রি আমরা ও'দের কাছে বড় আনন্দে কাটিয়েছিলুম।

পরদিন প্রায় মধ্যাহ্নকালে মেরিল্যাণ্ডের রকভিল থেকে ডক্টর অরুণ গুহ পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাকে তাঁর নিজস্ব বাড়িতে নিয়ে যেতে এলেন। পথ সামান্য, মাইল দশেক। ওয়াশিংটন শহরের তিন দিকে মেরিল্যাণ্ডের ফ্রেম, এবং এক-দিকে ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের সীমানা অংশ। এই অংশগুলির সঙ্গে মিলে ওয়াশিংটন হয়ে উঠেছে ডি সি অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া। যেমন দিল্লী নগরী—হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের অংশ নিয়ে সে বিস্তারলাভ করেছে।

আরণ্য উপত্যকার পথ ধরে শ্রীমান অরুণ যেন আমাকে কোন এক অমরাবতীর দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পথচারী কারোকে দেখা যাচ্ছে না। দেখছি শুধু শত শত মোটরগাড়ি, যারা সংখ্যাগণনার অতীত। আমরা 'ভানুতেবা ওয়েতে' পৌঁছলুম।

শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা যে বিপুল উদ্যমে গ্রাফিক শিল্পক্ষেত্রে নতুন রূপসৃষ্টির চেষ্টা করে চলেছেন তার পরিচয় ইতিপূর্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কয়েকটি প্রদর্শনীতেই পাওয়া গেছে। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রিন্ট নেবার আধুনিক সুযোগ পেলে কলাভবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা যে শিল্পকলার এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারেন তার সন্ধান পাওয়া গেল আকাদেমি গ্যালারীতে আয়োজিত শিল্পী নির্মলেন্দু দাসের একক প্রদর্শনীতে। নির্মলেন্দু দাস প্রথমে পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে সুপরিচিত শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষালাভ করেন; পরে শান্তি-নিকেতন কলাভবনে খ্যাতনামা শিল্পী-অধ্যাপক সোমনাথ হোড়ের কাছে গ্রাফিক শিল্পে ব্যুৎপত্তিলাভ করে স্নাতক হন ও শেষে বরোদা থেকে গ্রাফিকশিল্পে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।

প্রদর্শনীতে কয়েকটি লিথো ও ইন্টালিও প্রিন্ট নিদর্শন দেখা যায়। লিথোগ্রাফ প্রিন্ট সচরাচর এক জাতীয় পাথর থেকেই নেওয়া হয়। বরোদায় অফসেট প্রিন্ট নেবার সুবিধা থাকায় শিল্পী কয়েকটি অফসেট প্রিন্টও নিয়েছেন। শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তিন শ্রেণীর প্রিন্টমালায় বিষয়বস্তুর উপযোগী আকার প্রধান রূপের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন ও সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন চমৎকার কারুকার্য ও রঙবৈচিত্র্য। ফলে, পরি-কল্পনা, প্রয়োগপদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গিমার দিক থেকে কয়েকটি প্রিন্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে প্যাডি ফিল্ডস প্রিন্টমালার ১ ও ২নং নিদর্শনের নাম করা যায়। দুটি প্রিন্টই পাথর থেকে নেওয়া। প্রথমটির সবুজ, নীল ও সাদা রঙের মেঘ জাতীয় সূক্ষ্মশিল্প ও দ্বিতীয়টির মিশ্র রঙের প্রতীকপ্রধান রেখাবৈচিত্র্য দ্রষ্টব্য। অফসেট পদ্ধতির প্রিন্টগুলি অপেক্ষা আরও মোলায়েম ও মসৃণ এবং এগুলির নিছক সম্পূর্ণতা সকলেরই চোখে পড়ে। তা সত্ত্বেও, কারুকার্যের সূক্ষ্মতম বিকাশ অথবা বিভিন্ন রঙের সূক্ষ্ম সংবেদন যেন এ জাতীয় প্রিন্টে ঠিক ধরা পড়ে না। পাথরে নেওয়া প্রিন্টগুলিই যেন বেশী আকর্ষণীয়। অফসেট প্রিন্টের মধ্যে প্যাডি ফিল্ডস ৬ ও ৭নং উল্লেখ্য—বিশেষত প্রতীকমূলক বলিষ্ঠ রেখা বৈচিত্র্য এবং সোনালী ও রূপালী রঙের অপরূপ ব্যঞ্জনার জন্য। এক্লিপস্ প্রিন্টমালার মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে ১৪নং। গভীর লাল রঙের পটভূমির উপরে নীল ও ছাই রঙের কারুকার্য প্রধান ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। এটির কোলাজ-জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনেকের চোখে পড়ে। সোজাসুজি স্টিল প্লেটের ওপর খোদাইয়ের দিক থেকে রিড্‌স ও স্প্রিং প্রিন্টমালার কয়েকটি নিদর্শন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে ১০, ১৩ ও ১১ নং উল্লেখ্য।

*

আকাদেমি গ্যালারিতে আর একটি অংশে এই সঙ্গে শিল্পী ইন্দুবিকাশ দত্তের একক প্রদর্শনী দেখা যায়। শিল্পী কৃষি বিজ্ঞানের স্নাতক; বর্তমানে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে কাজ করেন। শিল্পী নানাজাতীয় গাছপালার আকার ও রূপ বৈচিত্র্য তেলরঙের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। নিছক নিষ্ঠা, অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসাবে বিচার করে ছবি-গুলির কয়েকটি মন্দ লাগেনি। তবে সর্বত্রই শিল্পী যে কেন অতি হালকা রঙ ব্যবহার করলেন তা বোঝা গেল না। শিল্পীর ড্রয়িং মন্দ নয়, কয়েক স্থলে দৃষ্টিকোণেরও বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। তবে মনে হয় কয়েক ক্ষেত্রে শিল্পী গভীরতর রঙ ব্যবহার করে বা গভীর ও চাপা রঙের তারতম্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করলে নিদর্শনগুলি বেশি উত্তীর্ণ হত। তা সত্ত্বেও কয়েকটি ছবি চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে জলাশয়ের প্রধান অশোক আত্রেয়ক, ছাতিম, টিউলিপ এর নাম করা যায়। শিল্পী শেষোক্ত মধ্যে নাইট এনামারড অব দি মুনে-এ শিল্পী একটি পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। অপর পক্ষে গাছ ও নদীর আকার ও প্রকাশভঙ্গীর বিষয়ে অধিকতর সচেতন হলে রিভার শিলাবতী উল্লেখ্য নিদর্শন হতে পারত।

*

নিউ ইয়র্ক রিনহোল্ড বুক কর্পো-রেশনের সৌজন্যে বিড়লা আকাদেমিতে ভিজুয়্যাল্স অব আর্ট ট্রেনিং বিষয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে 'লাইন ইন আর্ট' ও 'মাস ইন আর্ট' এই দুটি বিভাগে নানাজাতীয় ছবি, গ্রাফিক প্রিন্ট ও স্থিরচিত্র নিদর্শন দেখা যায়।

কয়েক যুগ আগে পর্যন্ত ছবি, ভাস্কর্য ও গ্রাফিক প্রিন্টকেই আমরা শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে স্বীকার করে এসেছি। বিগত কয়েক যুগে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নানা নতুন যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা আবিষ্কার করে একদিকে যেমন নবযুগের সৃষ্টি করেছেন, অন্য দিকে তেমন প্রচলিত তুলি রঙ ও ক্যানভাসের স্থলে পাশ্চাত্ত্য শিল্পী-বৃন্দ এই জাতীয় নতুন আবিষ্কৃত নানা বস্তু অবলম্বনে নতুনতর শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন। এককালে রেখা মাধ্যমে যে শিল্পী কেবল আকারের রূপ দিতেন, বর্তমান যুগে সেই শিল্পীই একই রেখার কারুকার্য মাধ্যমে বা জ্যামিতিক আকারে রেখা জুড়ে দৃষ্টি বিভ্রম (optical illusion) নিদর্শন রচনা করছেন। ফলে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে শিল্পকলার পরিধি বেড়ে গেছে, যার ফলে প্রচলিত ছবি, ভাস্কর্য বা গ্রাফিক প্রিন্টের স্থলে আজকাল আমরা নানাজাতীয় ও নানা উপকরণে রচিত বিচিত্র নিদর্শন দেখতে পাই। তবে এগুলির প্রত্যেকটিই শিল্পকলা পদবাচ্য কিনা সে কথা স্বতন্ত্র। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে, যথার্থ শিল্পকলা শাশ্বত ও চিরন্তন।

কারণ, যুগ যুগ ধরে প্রকৃত শিল্পকলা-নিদর্শন দেখে দর্শকচিত্ত আনন্দে আপ্লুত হয়।

বলা বাহুল্য, প্রদর্শনীভুক্ত সব নিদর্শনই ঠিক এই শ্রেণীর নয়, কয়েকটি কৌতূহল উদ্রেক করে, দু-একবার দেখতেও ভাল লাগে, কিন্তু বারবার দেখলে চোখ ব্যাহত হয়। উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে ডমিয়ার-এর ক্রাউন (পেণ্টিং), এলসওয়ার্থ কেলির আয়তন ও পরিপ্রেক্ষিত প্রধান পেণ্টিং, শেলডন রোডির ভ্যাটিক্যান স্টেয়ারওয়ে (স্থিরচিত্র), হেনরী মুর-এর স্কেচ স্টাডির স্টোন স্কাল্পচার, পিকাসোর লিনো-কাট, গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ডের থর্ন হেডস (পেণ্টিং) ও বিশেষ করে কঙ্গোর আফ্রিকান মাসক (কাঠ ও রঙ)-এর নাম করা যায়।

মাস ইন আর্ট বিভাগের অধিকাংশ নিদর্শনই অপ ও পপ আর্ট জাতীয়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন রঙের চতুর্ভুজ অবলম্বনে রচিত ভ্যাসারেলির পোজিশন দেখে অনেকে মুগ্ধ হন। অ্যালুমিনিয়ম ঢালাই নিদর্শন হিসাবে রবার্ট বার্ট-এর অ্যানটাইটল্ড অনেকের চোখে পড়ে।

চিত্রপ্রিয়

আমার স্মৃতিতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রসঙ্গত

প্রতিভা বসু

॥ ৫ ॥
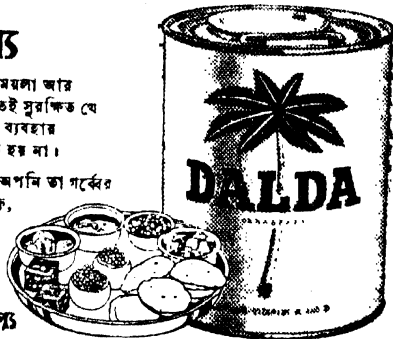
সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখন সেখানে নবাগত, তাই প্রায় প্রত্যহই কোনো না কোনো আয়োজিত টিপার্টির মাধ্যমে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছিলো। পরের দিন বিকেলে তেমনি এক 'টি-পার্টিতে' যাবেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে আমিও পুত্রকন্যা সমেত নিমন্ত্রিত। আমাকে তো সেই কখন থেকে তাড়া দিচ্ছেন, 'সেজে-নাও-রাণু, সেজে নাও, অনেক তো দেরি করবে, ঠিক সময়ে না পৌঁছুলে দেখো কি রকম নিন্দে হয়।'

প্রস্তুত হয়ে গাড়িতে বসলাম গিয়ে। ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি পিছনে, তিনি বসবেন সামনে। তাকিয়ে দেখি, খালি পায়ে আসছেন, কাঁধের উপর পাঞ্জাবি। দরজা খুলে নেমে পড়ে বললাম, 'এ কি? পা খালি কেন? জামাটা গায়ে দিন—'

গৃহসেবক চটি নিয়ে দৌড়ে এলো পেছোবাবু, জুতো জুতো—নিচু হয়ে জুতো পরিয়ে দিল সে, জামাটাও গলিয়ে দিল। আমি বোতাম লাগিয়ে দিলুম। হাসিতে সারা মুখ ভরিয়ে বললেন, 'সেই কখন থেকে ভাবছি জুতোটা পরবো পরবো, আসবার সময়ে একদম ভুলে গেলুম।'

আমার মেয়ে বললো, 'আর জামাটা?'

'জামাটা! তা তুই কেন আগে মনে করিয়ে দিলি না?'

পথে বললুম, 'এবার কলকাতা গিয়ে বউদিকে নিয়ে আসবেন তা নইলে চলে নাকি?'

চুপ করে থেকে বললেন, 'তোর বউদির শরীরটা যে একেবারেই ভালো নেই। কলকাতার সংসার ফেলে আসা খুব অসুবিধের। তা ছাড়া জানিস তো, সারাদিনই তার কল-ঘরে কাটে, জল ঘেটে ঘেটে আর আছে নাকি কিছু? খুকু থাকলে অবশ্য আমার সব ঠিক করে দেয়।'

খুকু সত্যেনদার কনিষ্ঠ কন্যা, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে থাকতে যে দু-একদিন গিয়েছিলুম, আমি খুকুকেই দেখেছি সব সময়, সব সময়েই সে বাবার ছায়া। চিন্তাশীল অন্যমনস্ক ভোলানাথ বাবার মায়ের আসনে অধিষ্ঠিত।

শান্তিনিকেতনে আমি দুদিনের জন্য গিয়েছিলুম, চারদিন থাকতে হলো। উনি বললেন, 'আমার একা একা যাবি কেন, আমার সঙ্গেই চল।'

তাই এলুম। আসবার দু একদিন বাদেই এক সকালে সত্যেনদা এসে হাজির। সেই সুললিত ডাক, 'ওরে তোরা কোথায় রে—'

তাড়াতাড়ি ধরে ধরে এনে বসালাম, সবাই ঘিরে দাঁড়ালাম, বাড়িটা ভরে গেল। একথা সেকথার অব্যবহিত পরেই বললেন, 'কই আমার জামা কই? ভুলে গেছিস তো?'

'মোটেও না।' আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলাম, 'মাপ না হলে জামা হয় নাকি?'

'তা বেশ মাপ নিয়ে নে এবার—

শান্তিনিকেতনে থাকতে আমার মনে হয়েছিলো মাথা গলিয়ে পাঞ্জাবি পরতে সত্যেনদার খুব কষ্ট হয়।

বাড়িতে তো গেঞ্জি গায়েই থাকেন কিন্তু সভাসমিতিতে, কোথাও যাবার সময় তো তা চলে না। তাই বলেছিলাম, আপনাকে আমি এমন একটা জামা বানিয়ে দেব, যেটা গায়ে দিতে আপনার একটুও অসুবিধে হবে না। শুনে বলেছিলেন, 'তা দিস তো, দেখবো কেমন ডিজাইন তোর।'

ডিজাইন আমি ভেবেই রেখেছিলাম, তক্ষুনি নিচে থেকে আমাদের দর্জিকে ডেকে পাঠালাম, সে এলো, সত্যেনদা নির্মল হাসে মাপ দিতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বুদ্ধদেব ভীষণ সংকুচিত, ভীষণ লজ্জিত। বারে বারে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'তুমি করছো কী, ওঁর কষ্ট হচ্ছে না ও রকম ঘুরে ফিরে মাপ দিতে? একটা আন্দাজ মতো করে দাও না, দর্জি তো ওঁকে চোখেই দেখছে।'

আমারও খুব অস্বস্তি হচ্ছিলো, দর্জিকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিলুম। কিন্তু সত্যেনদার কোনো ব্যস্ততা নেই, ঐ ভারী শরীরে নড়াচড়া করে ক্লান্ত ভাবে বসে পড়তে পড়তে দর্জির সঙ্গে আলাপ করলেন, 'মাপ ঠিক মতো নিয়েছিস তো বাবা? দেখিস, আবার যেন বলিসনি যে হয়নি।'

দর্জিটির সামান্য একটু পরিচয় আছে। দুশো দুই নম্বর রাসবিহারী অ্যাভিনিউর বাড়িটিতে আমরা যখন নতুন ভাড়াটে সেই সময়ে এই লোকটি ঐ বাড়ির দারোয়ান ছিলো। দর্জি হবার পরেও আমরা তাকে দারোয়ান সম্বোধনই করতাম। সুশ্রী এক উত্তর প্রদেশীয় তরুণ যুবক, নাম ঠাকুরপ্রসাদ তেওয়ারী। ভিতরের উঠোনে গ্যারেজের দোতালায় ছিলো তার বাসস্থান। ভাড়া আদায় করা আর পাম্প
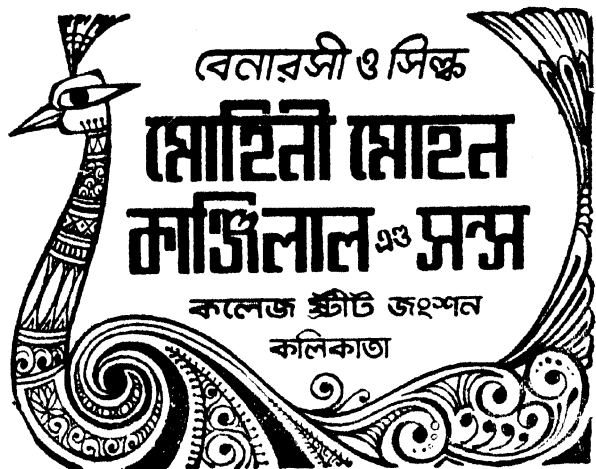
খুলে দেয়া ছাড়া বিশেষ কোনো কর্ম ছিলো না। কিন্তু অসম্ভব সংগীতপ্রেমিক ছিলো। সুতরাং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবিশ্রান্ত গান করতো হারমনিয়ম বাজিয়ে।

আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগেকার দুপাশে বৃক্ষশোভিত অতি সুন্দর নিরালা নির্জন রাসবিহারী অ্যাভিনিউ নামক প্রশস্ত রাজপথটি যে কি সুন্দর ছিলো বলা যায় না। সূর্যের আলো না ফুটতেই অজস্র পাখির কাকলি পাতলা হয়ে আসা ঘুমকে সুরের আবেশে ভরে দিত, আবার তেমনি করেই ফিরে আসতো সন্ধ্যায়। হঠাৎ এক সকালে কর্ণপটাহ ভেদ করে এমন একটি গলা ভেসে এসে আমাদের উচ্চকিত করলো যে প্রথমটায় প্রায় থ' হয়ে গিয়েছিলুম। চোখ চোখ মুছে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম, শব্দ অনুসরণ করে দক্ষিণের বারান্দায় এসেই বুঝতে পারলুম এই শব্দভেদী বাণের উৎসটি কোথায়।

সেই থেকে প্রত্যহই অতি প্রত্যূষে উঠে সে গলা সাধতে শুরু করতো, থামতো বেলা বারোটায়। কোনো মতে স্নান খাওয়া শেষ করে একটু ঘুমিয়ে অবার চারটের মধ্যেই শুরু, কখন যেন সামান্য বিরতি, তারপর আবার। একেবারে রাত দশটা পর্যন্ত।

একদিন সইতে না পেরে ডেকে বললাম, 'গান যদি করতেই হয়, দরজা বন্ধ করে আস্তে আস্তে গাইবে, যেন আমরা কেউ শুনতে না পাই।'

দারোয়ানটি অতি বিনয়ী, তৎক্ষণাৎ দু হাত যুক্ত করে কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'জো হুকুম।'

তারপর সেই হুকুম পালন করতে সে চাপা চাপা গলার গানে এমন সাতসুরের এক বিকট আওয়াজ বার করতে লাগলো যে মনে হলো এর চেয়ে খোলা গলার গান ঢের ভালো ছিলো। তখন তাকে বলা হলো, 'আমাদের সকাল সন্ধ্যার সমস্ত কাজকর্ম নষ্ট হচ্ছে তোমার গানে। কাজেই ঐ সময়টায় অত চেঁচিয়ে গান কোরো না।'

আবার সে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে আভূমি আনত হয়ে বললো 'জো হুকুম।'

এবং সেই হুকুমও সে পালন করলো দ্বিপ্রাহরিক চিৎকারের দ্বারা। বাবুদের কাছারি বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই সে শুরু করে, থামে একেবারে বিকেল চারটেয়। আমার প্রায় পাগলের অবস্থা। তারপর বাধ্য হয়ে বাড়িওলাকে বলতে হলো একটা ব্যবস্থা করো। বাড়িওলা ঠিকই বন্দোবস্ত করলেন। গানের জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা হলো তার এবং দোতলা থেকে একতলায় অধঃপতন। অর্থাৎ গ্যারেজের উপরের ঘরটা উঁচুতে বলে শব্দটা যতো তাড়াতাড়ি আমাদের ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছে যেতো নিচের ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে গান করলে সেই গান আর ততো তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে পারতো না।

রাসবিহারী অ্যাভিনিউর দুশো দুই নম্বর বাড়িটিতে ঢুকেছিলাম আমরা উনিশ শো সাঁইত্রিশ সালে, তখন এই লোকটি ছিলো কুড়ি বাইশ বছরের সদ্য যুবক। ছাপ্পান্ন সাতান্ন সালে পৌঁছিয়ে যতো দিনে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছরের প্রান্ত বয়স্ক মানুষ হলো ততো দিনে বালিগঞ্জ পাড়ার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। অমন সুন্দর গাছে ছাওয়া রাস্তা, এক ঘণ্টার এক ঝড়ের তাণ্ডবে একেবারে ন্যাড়া হয়ে গেছে, মাঠ ঘাট ভর্তি হয়ে গেছে পায়রার খোপের মতো সব ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে, শাড়ি গয়নার দোকানে ছেয়ে গেছে দুধার (খুব

আশ্চর্য, বালিগঞ্জে বইয়ের দোকানের চাহিদা নেই) আর সেই সংগে আমাদের দারোয়ান দারোয়ানজি হলো, দারোয়ানজি থেকে পণ্ডিতজী হলো এবং ঐ গানের জন্যই একদা গ্যারেজের একতলা থেকে ও বিতাড়িত হয়ে রাস্তার ধারের এক খালি হয়ে যাওয়া দোকানের বারান্দা হয়ে শাপে বর হলো। দরজা বন্ধ করে ওস্তাদ রেখে গান শিখতে শিখতে একদিন ছোট্ট একটি দোকান দিয়ে বসলো। সেলাইয়ের দোকান। আমাদের বাড়িওলা ছিলেন অতি ধার্মিক প্রকৃতির এক পার্শি ভদ্রলোক, এমপায়ার স্টোরের মালিক, দারোয়ানের কাছ থেকে ঘর ভাড়া নেবার প্রশ্ন ওঠেনি, গান গেয়ে ভাড়াটেদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে দেখে রাস্তার ধারে চালান করেছিলেন তাকে, বুদ্ধিমান দারোয়ান সেটাকেই মূলধন করে দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠলো। এবং বছর দুয়েক আগে সেই দোকান ঘর সে হাজার টাকায় বিক্রী করে দিয়ে দেশে চলে গেছে।

সত্যেনদার মাপ নিতে নিতে প্রাক্তন দারোয়ান এবং বর্তমান দর্জি অনেকবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে, উনি যে একজন অসামান্য ব্যক্তি সেটা তাঁর সমস্ত অবয়বে এতো অধিক মাত্রায় প্রস্ফুটিত ছিলো যে একটি শিশুও তাঁকে দেখলে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। তার দারোয়ান তো থাকবেই। তার গানের বিরুদ্ধে আমরা যতোই ষড়যন্ত্র করি না কেন, তবু আমাদের সে ভালোবাসতো, আমরাও তাকে ভালোবাসতাম। তাছাড়া কবিতা-ভবনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হলো, পাঁচ টাকা মাইনেতে সে কবিতা পত্রিকার কাজ করতো। নাম জানতো অনেকের, দেখেওছিলো অনেককে। প্রমথ চৌধুরীকে ধরে ধরে উপরে নিয়ে এসেছে, প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখেছে, অমিয় চক্রবর্তীকে চিনতো, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, যামিনী রায়, দিলীপকুমার—কে তার অপরিচিত?

সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথকে দেখেই যে পরিচয় জানতে উৎসুক হয়ে উঠবে সে আর বেশী কথা কী?

সত্যেনদা এসেছিলেন বুদ্ধদেবের সঙ্গে সেই চাকুরী বিষয়ে কথা বলতে। ওঁর কাছে কাজ করতে যাবে তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কী আছে? কিন্তু সত্যেনদার আগেও যে কেউ তাঁকে এই কাজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সে কথা বুদ্ধদেবও স্মরণে আনতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি সত্যেনদার আগ্রহেও তাঁর শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণই নানা কারণে অনেক বেশী আকর্ষণ করেছিলো তাঁকে। একে তো কলকাতার সংসার তুলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো, তার উপর 'তুলনামূলক সাহিত্য' নামক সম্পূর্ণ নতুন বিভাগটি ছিলো তারই পরিকল্পিত বিষয়, সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হবার আহ্বান এড়ানো তাই আর সম্ভব হলো না।

এর কিছুদিনের মধ্যেই সত্যেনদা আবার বিদেশে যান এবং সেখান থেকে ত্রিশ চল্লিশ বছর যাবৎ ইংল্যান্ড প্রবাসী সুধীন ঘোষকে নিয়ে আসেন। তিনি লন্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরিজিরই অধ্যাপক ছিলেন, ইংরিজি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি সর্বজন বিদিত। এই বিদেশী ভাষাতেই একাধিক বই লিখে তিনি তখন যথেষ্ট খ্যাতিমান, তার মধ্যে একখানা বই পৃথিবীর প্রায় দশ বারোটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ইংরিজি সাহিত্যে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর মানুষ কমই ছিলো। কিন্তু মানুষটি একটু পাগলাটে ছিলেন। তাঁর সারল্য অধ্যাপনার উপযুক্ত হলেও গণ্ডি-বদ্ধ সমাজের পক্ষে ছিলো নিতান্ত অযোগ্য। অল্প বয়েস থেকেই বিদেশী শিক্ষা দীক্ষা আচার আচরণে অতিমাত্রায় অভ্যস্ত হবার দরুন বাঙালী মানসতায় তেমন অবহিত ছিলেন না। যা মনে হতো তা গোপন করতে পারতেন না, যা ঠিক বুঝতেন তাই করতেন, যা সত্য নয় তার সংগে আপোস করা ধাতেই ছিলো না। ফল অত্যন্ত খারাপ হলো। কৌটিল্যের অভাবে স্বল্পকালের মধ্যেই অপ্রিয় হয়ে উঠলেন এবং বিতাড়িতও হলেন। বলা হলো অবিরাম মদ্যপানজনিত উন্মত্ত ব্যবহারই এই বিতাড়নের মূল কারণ। সুধীন ঘোষের সংগে যারা ঘনিষ্ঠ তাঁরা সবাই জানতেন, তিনি খুব বেশী পানাসক্ত ছিলেন না। [illegible] কখনো [illegible] কম পরিমাণে। [illegible] রক্ষার্থে [illegible] সেই শিল্পপীঠের কাছে তিনি শিশুমাত্র। কিংবা তার চেয়েও অন্ত্যজ।

সত্যেনদা তখন কোনো কার্যোপলক্ষে দিল্লী গিয়েছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় সপরি-বারে শান্তিনিকেতনে থাকতেন, আধা পাগল মানুষটিকে সেই [illegible] সেই পরিবারই বুক দিয়ে রক্ষা করেন [illegible] জনতার ক্রোধ থেকে। প্রকৃতপক্ষে জান কবুল করেই ও'রা তাঁর জান রক্ষা করেন, আর সেই মহত্ত্বের বিনিময়ে তাঁরা যে শুধু সুধীন ঘোষকেই রক্ষা করেছিলেন তা নয়, আমাদের সকল সাহিত্যিকের পিতৃভূমি, পৃথিবীর সকল সেরা মানুষের অন্যতম রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ভূমি শান্তিনিকেতনকেও অনেক বড়ো কলঙ্ক থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যে রাজত্বে একটি বিষধর সর্পকেও অহিংসার চোখে দেখা নিয়ম, যে রাজত্বে ডাকাতের বংশধররাও গৃহসেবক হিসেবে সমাদৃত, সেখানে একজন সাহিত্যিকের প্রাণহানি ভাবিকালে মানুষেরা অবশ্যই ক্ষমার চোখে দেখতো না।

ক্রমশ

odomos
MOSQUITO REPELLENT
odomos
ओडोमॉस
मच्छर का दुश्मन

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক

বিশ্ব বিজ্ঞান

তরুণ পদার্থবিজ্ঞানী সম্মানিত

সেমি-কনডাকটার বা প্রায়-পরিবাহী বিষয়ক গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনসটিটিউট অভ্ রেডিও ফিজিকস অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকসের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বরঞ্জন নাগ এ বছর জহরলাল নেহেরু ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই ফেলোশিপের উদ্দেশ্য দেশের কৃতী বিজ্ঞানীরা নিজেদের গবেষণায় যাতে আরও স্বাধীনভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারেন সে ব্যাপারে সাহায্য করা। এর কার্যকাল দুই বছর। মাসিক সম্মানমূল্য তিন হাজার টাকা। এবং আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ মোট দশ হাজার টাকা। এ ছাড়া গবেষণার প্রয়োজনে এই ফেলোশিপের প্রাপক বিদেশের গবেষণাগারে বছরে তিন মাস কাজকর্ম করার সুযোগ পাবেন।

ডঃ নাগের জন্ম ১ অকটোবর, ১৯৩২। এম এস সি, এম এস পি, এইচ ডি এবং ডি এস সি। আর এই সঙ্গে কৃতী গবেষক হিসেবে পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি, মোয়াট পদক এবং গ্রেট ব্রিটেনের ইনসটিটিউট অভ্ ইলেকট্রনিকস অ্যাণ্ড রেডিও ইঞ্জিনিয়ার্স-এর জে সি বোস স্মৃতি পুরস্কার। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। ১৯৬৪ সালে রীডার। ১৯৬৮ সালে অধ্যাপক।

গবেষক জীবনের শুরু ১৯৫৪। এবং পরবর্তী কুড়ি বছরে তাঁর কৃতিত্ব: প্রায়-পরিবাহী পদার্থের গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্যে সূক্ষ্ম-তরঙ্গ প্রয়োগের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন ধরনের প্রায়-পরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে কিভাবে ইলেকট্রন কণারা চলাফেরা করে, তাদের নানাভাবে বিন্যস্ত করলে কী কী ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সিলিকন, গেলিয়াম আরসেনায়েড, ইনডিয়াম অ্যান্টিমোনায়েড, ইনডিয়াম ফসফায়েড এবং মারকারি ক্যাডমিয়াম টেলুরয়েড প্রভৃতি পদার্থের কেলাস কণার মধ্যে ইলেকট্রনের বিচ্ছুরণ এবং বিভিন্ন ধরনের শব্দ তরঙ্গের প্রতিক্রিয়ার দরুন বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার ব্যতিক্রমজনিত সমস্যাবলী নিয়ে যে সব বিতর্কের ঝড় চলছিল তাদের ওপর সম্ভাব্য আলোকপাত করে বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে তিনি যথেষ্ট পরিচিতিলাভ করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রায়-পরিবাহী বিষয়ক তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে এ দেশে তাঁর অবদান যদি বিশিষ্টতর বলি, হয়ত বাড়িয়ে বলা হবে না। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রাবলীর সংখ্যা ১২৫। এ ছাড়া পারগামোন, অকসফোর্ড প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'থিওরী অভ্ ইলেকট্রিকেল ট্রান্সপোর্ট ইন সেমি-কনডাকটার' বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে।

অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন নাগ

*

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ইলেকট্রনিক যন্ত্রে পৃথিবীতে প্রথম সেমি-কনডাকটার বা প্রায়-পরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, তাঁর বেতার তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে। যে বস্তুটি প্রায়-পরিবাহী হিসেবে তিনি কাজে লাগান তার নাম লেড সালফাইড। এটা সিসের এক ধরনের আকরিক যৌগ। আচার্য জগদীশচন্দ্র ১৯০৪ সালে এই যন্ত্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেটেন্ট করেছিলেন।

তরুণ বিজ্ঞানী ডঃ নাগ তাঁর নিজের ইনসটিটিউটে জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বললেন, সেমি-কনডাকটারের প্রথম ব্যবহারের বলতে পারেন এটাই নথিভুক্ত রেকর্ড। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, এই পরবর্তী পাঁচ দশকেরও বেশি সময় এই ঘটনার পর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘ এই সময়ে সেমি-কনডাকটার নিয়ে ব্যাপকভাবে মৌলিক গবেষণা যেটুকু হয়েছে তা নাম মাত্র। এর মূলে হয়ত তিনটি কারণ থাকতে পারে। এক, ইতিমধ্যে ভাকুয়াম টিউব (রেডিওতে যে ধরনের ভাল্ব ব্যবহার করা হয়) তৈরি হয়ে গেল। দুই, রেডিও প্রভৃতির কাজে প্রধানত দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ কাজে লাগান হচ্ছিল। এ ধরনের তরঙ্গের গ্রাহক বা প্রেরকের ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রায়-পরিবাহী পদার্থের চেয়ে ভাল্বের কার্যকারিতা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। তিন, প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত যে সব বস্তু সেমি-কনডাকটার হিসেবে কাজে লাগান যায়, দীর্ঘ তরঙ্গের বেতার-সংকেত আদান-প্রদানের ব্যাপারে তাদের নিয়ে নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করা যায় না। কারণটা এই, দেখা গেল, যেমন ধরুন লেডসালফাইড বা গ্যালেনার কথাই ধরা যাক। একই খনি থেকে আপনি গ্যালেনা সংগ্রহ করলেন। তার খানিকটা অংশ ভেঙে নিয়ে আপনি গ্রাহক যন্ত্রে লাগালেন। এতে সংকেত ধরার ব্যাপারটা একভাবে চলতে লাগল। আবার ওই একই গ্যালেনার আর এক টুকরো ভেঙে নিয়ে আর একটি গ্রাহক তৈরি করলেন। দেখা গেল এটি যেন ঠিক আগের মত কাজ করছে না। কেন এমনটি ঘটে থাকে, এ নিয়ে খুব একটা গবেষণা তখনও হয় নি। তেমন কোন তথ্যও জানা যায় নি। ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সেমি-কনডাকটারের চল ব্যাহত হয়েছে।
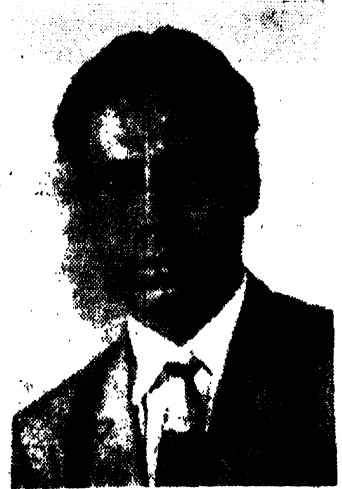
তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেডার প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে সূক্ষ্ম তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে বেতার-সংকেত আদান-প্রদানের জন্যে সেমি-কনডাকটার কাজে লাগান হয়। যাদের বেশির ভাগই সিলিকন কেলাস। যার ব্যবহারিক পদ্ধতি ছিল আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের সেই গ্যালেনা নামক সেমি-কনডাক-টারের ব্যবহারিক পদ্ধতিরই প্রায় অনুরূপ।

*

বলা বাহুল্য, আধুনিক ইলেকট্রনিকসে প্রায়-পরিবাহী পদার্থের সংযোজন সত্যিই যেন এক যুগান্তকারী ঘটনা।

বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার দিক দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু মুখ্যত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক, পরিবাহী। এদের মধ্যে পড়ে সমস্ত ধাতু এবং কার্বনের মত অধাতু। দুই, অপরিবাহী। যেমন কাঠ, কাগজ, প্রভৃতি। এ ছাড়া আরও কিছু কিছু পদার্থ আছে, যাদের সুপরিবাহী বলা চলে না, আবার একেবারে যে কুপরিবাহী তাও নয়। যৎসামান্য উত্তাপের প্রভাবে শেষোক্ত এই পদার্থগুলির পরমাণুর কিছু কিছু ইলেকট্রন অস্থির হয়ে পড়ে। যার ফলে তারা কিছুটা বিদ্যুৎ পরিবহন করার মত ক্ষমতা পায়। এ সব পদার্থকেই বলা হয় সেমি-কনডাকটার যা প্রায়-পরিবাহী পদার্থ। দেখা গেছে, কিছুটা খাদ এদের কেলাসের মধ্যে মিশিয়ে দিলে এদের বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়।

১৯৪০ দশকের শেষের দিকে বিভিন্ন বিজ্ঞানী প্রায়-পরিবাহীর উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা শুরু করেন। গোড়ায় যে অসুবিধে ছিল, বিশুদ্ধ প্রায়-পরিবাহী পদার্থ সংগ্রহ করা, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনার ফলে কেউ কেউ সে অসুবিধেটি দূর করলেন। সেই সঙ্গে চলতে লাগল নানা রকম পরীক্ষার কাজ। যেমন, কোন কোন পদার্থের কেলাসের মধ্যে কি ধরনের খাদ মেশালে কি ধরনের ফল পাওয়া যায়, একই ধরনের প্রায়-পরিবাহীর বদলে বিভিন্ন ধরনের প্রায় পরিবাহী পদার্থ পর্যায়ক্রমে সাজিয়েই বা বিশেষ কোন সুবিধা পাওয়া যায় কি-না—এমন সব ব্যাপার নিয়ে নানাভাবে কাজ চলতে লাগল। ফলে একে একে তৈরি হল ট্র্যানজিস্টার, ক্রিস্টাল রেকটিফায়ার, সৌর এবং তেজস্ক্রিয় তড়িৎকোষ প্রভৃতি। এতদিন চলছিল ভাল্ভের যুগ। পরিবর্তে এবার সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিল নানা রকম সেমি-কনডাকটারের যন্ত্রপাতি। বিজ্ঞানীরা দেখলেন ভাল্ভ ব্যবহারে নানান অসুবিধা। এক একটি ভাল্ভের বিরাট আয়তন। ভাল্ভ গরম করতে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন। অথচ ট্র্যানজিসটার বা অনুরূপ বস্তু ব্যবহার করতে গেলে অতি নগণ্য পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি হলেই কাজ চলে। তুলনায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আয়তনও অকল্পনীয়ভাবে কমিয়ে আনা যায়। এবং এই সঙ্গে এমন কিছু কিছু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হল, মানব কল্যাণে যাদের ভূমিকা অপরিসীম। অথচ যাদের কথা আগে কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না।

যেমন, সিলিকন সৌর কোষ। এই কোষ তৈরির জন্যে দরকার বিশুদ্ধ সিলিকন। ছোট্ট একটি সিলিকন পাতের একপাশে মাখিয়ে দেয়া হয় বোরনের প্রলেপ। এবার ওই পাতের দু পাশে দুটি তার জুড়ে দিলেই হয়ে গেল একটি সিলিকন সৌরকোষ। পাতটিকে সূর্যের আলোয় ধরলেই এ কোষ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করতে থাকবে। আর কোন খরচ নেই। যতদিন সূর্য আকাশে থাকবে ততদিন ধরে অব্যাহতভাবে চলবে শক্তির উৎপাদন।

রেডিও টেলিভেশন, রেডার, সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে বেতার তরঙ্গ আদান প্রদান, যন্ত্রগণক, ধাতুর গুণাগুণ নির্ধারণ, কাপড়ের কলে যে সব সুতো ব্যবহার করা হচ্ছে তারা ঠিক প্রমাণ মানের হচ্ছে কিনা, সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র, মহাকাশ গবেষণার যন্ত্রপাতি, হাসপাতালের রক্ত সংবহন মাপক যন্ত্র, হৃদপিণ্ডের গতি-নির্ণয়ক যন্ত্র,—প্রায়-পরিবাহী পদার্থের গতিবিধি এখন যেন সর্বত্র। যাবতীয় ইলেকট্রনিকসের যন্ত্রপাতি মানেই এখন সেমি-কনডাকটার। সেমি-কনডাকটার ছাড়া আধুনিক ইলেকট্রনিকস কল্পনাই করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত দেশ, জাপান এ সব ক্ষেত্রে এখন শিরোনাম।

*

জহরলাল নেহেরু ফেলোশিপ ঘোষণা করার অব্যবহিত পর এ সব নিয়েই অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন নাগের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বয়েস কম হলেও তাঁর মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। আবেগজনিত অভি-যোগও নয়। বরং কথা বলার সময় তিনি অনেক বেশি সন্তর্পণ। গত কয়েক বছরে তাঁর গবেষণাগারে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। প্রতিরক্ষা বিভাগ থেকে শুরু করে দেশের অনেক প্রতিষ্ঠান সে সব কাজের দ্বারা উপকৃতও হচ্ছেন।

তবে, খানিকটা যেন আবেদনের সুরেই তিনি বললেন, কতকগুলি ব্যাপারে এখনই আমাদের নজর দেয়া উচিৎ। যেমন ধরুন, বিশুদ্ধ সেমি-কনডাকটার। নানা রকম সেমি-কনডাকটার নিয়ে আমরা কাজ করেছি, করছিও। এ সব বস্তুর অনেকই এ দেশে এখনও পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে পারি নি। বিদেশী বন্ধুদের ওপর আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে। বিদেশে যে সব গবেষণাগারে কাজ করেছি সেখানকার বন্ধু। মাঝে মাঝে তাদের অনুরোধ করি অমুক সেমি-কনডাকটার পাঠান। অনেক সময় দু এক সপ্তাহের মধ্যেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পেয়ে গেছি, গিফট্ হিসেবে। কিন্তু এ ভাবে ব্যাপক গবেষণা কি জিইয়ে রাখা যায়?

প্রশ্ন: অতি প্রয়োজনীয় এ সব বস্তু আমদানির ব্যাপারে সরকার আপনাদের কোন সাহায্য করেন না?

ডঃ নাগ: কোন কোন সময় করেন। তবে মুশকিল এই, সরকার একটা সীমা বেঁধে দিয়েছেন। দুই হাজার টাকার বেশি দামের (সম্প্রতি কিছুটা বাড়ান হয়েছে) সাজসরঞ্জাম আমদানিতে বাধা অনেক। এ ছাড়া আমাদের যা দরকার, তার অনেক কিছুই ওদেশের বাজারে পাওয়া যায় না। সংগ্রহ করতে গেলে সেখানকার গবেষণাগুলির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বন্ধু বান্ধবের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। কিনতে গেলেও তাদের দাম দুই হাজার টাকার বেশি পড়ে। ফলে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী নিয়ে আসা যায় না।

প্রঃ কিন্তু ব্যক্তিগত গিফট হিসেবে দুই হাজার টাকার বেশি জিনিস বিদেশ থেকে সংগ্রহ করছেন তাতে কাসটমস অসুবিধে করে না?

আমার এই প্রশ্নে ডঃ নাগ মৃদু

হাসলেন। বললেন, আইন অনুযায়ী করা উচিৎ। তবে এক্ষেত্রে তাঁরাও উদারতা দেখান। সম্ভবত আমাদের অসুবিধেটা উপলব্ধি করেই তাঁরা ওই সব বস্তুর ওপর আর কোন ডিউটি বসান না।

প্রঃ বিশুদ্ধ প্রায়-পরিবাহী বস্তু যখন অপরিহার্য, তখন সে সব বস্তু এদেশে যাতে উৎপাদন করা যায়, সে দিকটা কি কেউ দেখছেন না?

ডঃ নাগ ঃ আমি সে কথাই বলছি, মিঃ কর। সরকারের ব্যবস্থাপনায় এ দেশে সেমি-কনডাকটারের একটি কেন্দ্রীয় উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা উচিৎ। এ সব বস্তু অত্যন্ত মূল্যবান। যাঁরা বাইরে তৈরি করছেন, কাঁচামাল হিসেবে তাঁরা বিদেশে রফতানিও করতে চান না। একমাত্র ফিনিসড্ প্রোডাকট ছাড়া। অথচ আমাদের নিজেদের যদি একটা উৎপাদন কেন্দ্র থাকত, তাতে শুধু যে গবেষকরাই উপকৃত হতেন তা নয়, এ দেশের ইলেকট্রনিকস শিল্পগুলিও বিশেষ-ভাবে লাভবান হতে পারত। তা না করে শুধু আমদানি করে কতদিন চলতে পারে, বলুন! প্রথমত সে ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরের ওপর নির্ভর করতে হয়। ধরুন, জানা গেল, সম্প্রতি বিদেশের কেউ একটি ভাল জিনিস তৈরি করেছে। আর কেউ পারে নি। তেমন জিনিস নিশ্চয় ওরা বিদেশের বাজারে ছাড়বে না। দ্বিতীয়ত আমরা যারা গবেষণা করি, সরকারের ওপর বেশি নির্ভর করতে পারি না। কারণ, সরকারের মাধ্যমে এগোতে গেলে এত বেশি সময় লাগে, কী বলব। চিঠির পর চিঠি লিখুন—তার সঠিক উত্তর পেতে মাসের পর মাস। গবেষণা তার জন্যে বসে থাকতে পারে না। বিশেষ করে ইলেকট্রনিকসের সব গবেষণা, যার সঙ্গে বর্তমান কালের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত।

প্রঃ আপনার গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির জন্যে কতটা আপনি বিদেশের ওপর নির্ভর করেন?

ডঃ নাগ ঃ এখানকার বেশির ভাগ যন্ত্রই এখানেই আমরা তৈরি করেছি। এমন কি ইনটিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি করার মত দক্ষ গবেষকও আমাদের আছে। আমার বিশ্বাস, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যদি প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা নিয়ে দেশের গবেষণাগারগুলির সঙ্গে কাজ করেন, ভাল হয়। এতে তাঁদের প্রবলেমও যেমন আমরা জানব, সে ভাবে নিজেরাও আমরা গবেষণা চালাতে পারব। তাতে উপকৃত হব আমরা উভয় পক্ষই।

ডঃ নাগের কথা শুনে মনে হল, ইলেকট্রনিকসের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গবেষণার ফলাফল শুধু গবেষণা-গারগুলির মধ্যে পড়ে থাকুক এ তিনি চান না। বলা বাহুল্য, যে সব দেশ বিজ্ঞানে এখন অগ্রণী, তাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিই বহু ক্ষেত্রে গবেষকদের নতুন নতুন ক্ষেত্রে চিন্তা করতে প্রলুব্ধ করেছে। ফলে তাঁরা শিল্প ক্ষেত্রেও যতটা অগ্রণী হতে পেরেছেন, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও উন্নতি ঘটিয়েছেন। দুর্ভাগ্য, এমন পরিবেশ আমাদের বিজ্ঞান পরিকল্পকরা এখনও পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারেন নি। এতে করে অর্থনৈতিক অপচয় ছাড়া, কি দেশের কি বিজ্ঞানের কারোরই উন্নতি হতে পারে কি?

সমরজিৎ কর

টিয়াঁরা
সব রকম চুলের জন্য উৎকৃষ্ট শ্যাম্পু
এগ
প্রোটীন বিহীন চুলের জন্য
শিকাকাই
স্বাভাবিক চুলের জন্য
ল্যানোলিন
দুর্বল চুলের জন্য
কনসেনট্রেট
নির্জীব, অবিন্যস্ত,
তেলাতোল চুলের জন্য
সুন্দর চুলের প্রয়োজন টিয়াঁরা
ARMS-HC-16 140 BN

॥ এক শো এক ॥

সাহুজী বৈজুর হাত ছেড়ে খোলা দরজার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে ডাকে, 'ফুলবাসিয়া। এ ফুলবাসিয়া।'

বৈজু ফিরে তাকায় ডান দিকের কলাকি গাছের ঝাড়ের দিকে। তার চিনতে অসুবিধা হয় না, ঝাড়ের আড়ালে ফুলবাসিয়া, যে সাহুর ডাকের কোনো জবাব দেয় না, বরং আরো নিবিড় ঝোপের আড়ালে সরে যায়। ফুলবাসিয়ার ভঙ্গিতে লজ্জা, নাকি লুকোচুরি খেলার কৌতুক, বৈজু বুঝতে পারে না। কিন্তু আকাশের বর্ণবিচিত্র দৃশ্য-সমূহ এখন বিলীয়মান এবং ক্রমে নিবিড়তর ছায়ায় বৈজুর চোখে পড়ে ফুলবাসিয়া কলাকির দীর্ঘ বিরল পাতা সরিয়ে ওর দিকে তাকায়। সাহু তখন ঘরে ঢোকে এবং তার স্বগত জিজ্ঞাসা শোনা যায়, 'লেড়কিয়া কহাঁ গয়ী?' তারপরে তার ডাক শোনা যায়, 'আয় বেটা বৈজুপ্রসাদ ঘরের ভিতর আয়।'

সেই মুহূর্তেই আবার ফুলবাসিয়ার মুখ এবং সারা শরীর কলাকি ঝাড়ের আড়োলে অদৃশ্য হয়। উত্তরের মাঠ জোয়ারের জলে ভাসে। শ্মশান পেরিয়ে আরো উত্তরে ইঁটের ভাটায় স্তূপীকৃত ইঁটের পাঁজাগুলোকে দেখায় ভেঙে-পড়া জীর্ণ প্রাসাদের মতো। পূর্বদিকে নিবিড় গাছপালায় অন্ধকার নামে। সাহুর 'লেড়কিয়া' উচ্চারণের মুহূর্তেই বৈজুর মনে হয়, ফুলবাসিয়া এখন ওর চোখ 'আওরাত।' সাধুদের আচরণ এখনো ওর মস্তিষ্কের সীমানা জুড়ে, তথাপি অতীতে তিনবার দেখা ফুলবাসিয়াকে ওর মনে পড়ে। তিনবার তিনরকম মনে হয়েছিল। দুঃস্থ রুগ্ন ভীরু, তারপরে চটক-লাগা একহারা ছেঁড়ীটি, এবং তারও পরে নদীতে প্রথম পাহাড়ী ঢল নামা হঠাৎ উচ্ছ্বাসে বেড়ে ওঠার লক্ষণ, চোখের তারায় কৌতুকের ছটা ও চঞ্চলতা। ওর বাবা সাহু বলেছিল, নোকরানি। দেখভাল করার জন্য একটা গরীব লেড়কি। যেন সে ফুলবাসিয়াকে নিজের মেয়ের মতোই দেখে, বলার ভাঁগটা ছিল সেইরকম কিন্তু বৈজুর মন নিঃসন্দিগ্ধ ছিল না। ও কোনো মন্তব্য করেনি, কিন্তু কাঁটার খচখচানি ছিল। ফুলবাসিয়ার দিকে বাবার দৃষ্টিতে ছিল কুটিল সন্দেহ আর অবিশ্বাস, সর্বদাই শাসনের ভ্রূকুটি এবং সব সময়েই চোটপাট করে ধমকিয়ে শাসালো। তথাপি ফুলবাসিয়া হাসতো, যা বৈজুকে যুগপৎ বিচলিত ও সন্দিগ্ধ করতো। বাবা এবং ফুলবাসিয়া দুজনের আচরণকেই রহস্য-ময় মনে হতো। অবাক হতো, বাবার মাঝি-মাল্লা নোকরদের ফুলবাসিয়ার প্রতি মালকাইন-সমীহ দেখে, অথচ তাদের দৃষ্টিকে কখনো বিশ্বস্ত মনে হতো না। তাদের চোখ আর ঠোঁটের কোণে কেমন একটা ঝিলিক দেখা যেতো। এবং এখন বৈজু স্থির অনুমান করতে পারে, কিছুক্ষণ আগে দক্ষিণের উঁচু পাড়ে বসে নেংটি-পরা খালি-গা লোক দুটো ফুলবাসিয়ার বুক-জলে দাঁড়িয়ে স্নান দেখছিল, হেসে হেসে ফুলবাসিয়ার বিষয়েই নিশ্চয় কিছু বলাবলি করছিল, অথচ ভয়ে ভয়ে সাধুদের আস্তানার দিকেও দেখছিল। কারণ ওরা সাহুজীর নোকর, সম্ভবত ফুলবাসিয়ার স্নান দেখা তাদের নিষেধ।

বৈজু নিজের ইচ্ছায় কখনো এখানে আসেনি। ভরতপ্রসাদ, এখন যে বাঙলা মুলুকের এই দরিয়া কিনারে সাহুজী, তার বাবা চিঠি লিখে এখানে ডেকে পাঠিয়েছে সাহু তার ছেলেকে দেখতে চেয়েছে। বৈজুকে তার খুড়ো এখানে পাঠিয়েছে এবং ও এলে সাহু ছেলেকে এক বেলা রেখে কলকাতায় বড়োত নিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে টিকেট কেটে আবার পাটনার গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাবা আর ফুলবাসিয়ার সম্পর্কে স্থির কিছু না ভাবতে পারলেও ও উদাসীন থাকতে চেয়েছে। মনের মধ্যে নানা জিজ্ঞাসা জেগেছে, জবাব সন্ধানে কখনোই তেমন উদ্‌গ্রীব হয়নি, এবং তখন ওর বিশ্বাস ছিল এবং এখনো ধারণা বাবার সঙ্গে ও কখনোই বাস করবে না। বাবাকে ও সম্যক চেনে না, অনেকটাই অপরিচিত বাইরের লোক। কিন্তু লোকটি ওর বাবা, এ কথা দেশের বাড়িতে চাচা-চাচী এবং ভাইয়েরা সকলেই বলেছে। সেখানে সকলেই ওকে ভালবাসে, কিন্তু অকারণ দয়া দেখাবার ভাব আছে। অনেক ছেলেবেলায় ও জানতো ওর মা মারা গিয়েছে। পরে পড়শীদের কাছে জানতে পেরেছে ওর মা গৃহত্যাগিনী। কেন? তার কোনো জবাব ও পায়নি এবং জেনেছিল, তারপরেই ওর বাবা সাধু হয়ে যায়। মা গৃহত্যাগিনী, বাবা সাধু, এবং তারপরে সাহু নামে ব্যবসায়ী এই সব ঘটনাবলীর মধ্যে ও ওর বিড়ম্বিত ভূমিকা চিনে নিতে পেরেছিল। অভিমানে ওর বুক ভরে উঠতো। কিন্তু কার ওপরে অভিমান এবং কার ওপরে ও রাগ করবে, ধিক্কার দেবে, কিছু ঠিক করতে পারতো না। মায়ের ওপরেই অভিমান হতো, কিন্তু তার বিফলতাও অনুভব করতো। কারণ, মাকে ওর মনে নেই, তার কোনো অস্তিত্বের চিহ্ন নেই ওর মনে যদিচ ও শুনেছে, ওর চেহারা

নাকি অবিকল ওর মায়ের মতো, বাবার ছিটেফোঁটাও নেই। জ্ঞানত ও বাবাকে প্রথম এখানেই দেখেছিল এবং তখনই তুলনা করে দেখেছিল ও মিথ্যা শোনে নি। খর্বাকৃতি কালো পেশল এবং শ্বাপদচক্ষু লোকটির একটি আবছা অস্পষ্ট ছবি ওর স্মৃতিতে ছিল এখানে বিচারসমর্থ চোখে দেখে কেবলমাত্র চেহারার জনাই তৎক্ষণাৎ একটি দূরত্ব অনুভব করেছিল, বালক-মনে একটি ব্যথা বোধ করেছিল। কিন্তু ব্যক্তিটি ওর পিতা, এ বিশ্বাস ছিল অমোঘ এবং ভরতপ্রসাদ যে কোনোরকমেই ক্ষতিকারক মানুষ না, বরং বিষয়সম্পত্তি বিষয়ে নির্লোভ সাধুপ্রকৃতির মানুষ—এ কথা ওর শোনা ছিল। বৈজু জানে না, বাবা নির্লোভ কি না, এবং ওর বাবার মতো মানুষকে সাধুপ্রকৃতির মানুষ কেন বলা হয়, এ জিজ্ঞাসা জেগেছিল।

বৈজুর মনে অনেক জিজ্ঞাসা জেগেছিল, কোনো উত্তরের জন্যই ও কখনো অতি ব্যস্ত হয় নি, এক ধরনের উদাসীনতা বোধ করত, যে উদাসীনতার মধ্যে একটা বিষন্ন বোধ লেগে থাকতো। বাবার সান্নিধ্যের জন্য কোনো ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কারণ

বাবাকে কখনোই ও মন থেকে একান্ত ক'রে নিতে পারে নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গৃহত্যাগ মনের গ্লানিকে বাড়িয়ে তুলেছিল, অপমানিত বোধ করতে আরম্ভ করেছিল। এক দিকে অনীহা আর বিরাগ আর এক দিকে অপমানবোধ—এ দুয়ের অনিবার্য নানান পরিণামের সম্ভাবনা ছিল, তার মধ্যে একটি অনিবার্য পরিণাম রাজনীতি, যা ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিয়াল্লিশের বিদ্রোহে। দুর্ধর্ষ আর দুর্বার ছিল ওর আচরণ, সরকারী ইমারতে আগুন লাগানো থেকে রেল-লাইন উপড়ে ফেলা, ওয়াগন লাইনচ্যুত করে বাধার সৃষ্টি করা, শহর জুড়ে ব্যারিকেড রচনা আর পুলিসকে পালটা আক্রমণ। বৈজুপ্রসাদ একটি নাম হয়ে উঠেছিল সারা বিহার জুড়ে। লেখাপড়া কখনো ভালোভাবে করে নি, মনোযোগ ছিল না, থার্ড ক্লাসের বিদ্যাকে জেলে কিছুটা শান দেবার চেষ্টা ক'রেছিল। বিশেষ কার্যকরী হয় নি।

বৈজুপ্রসাদ এখন বারাকপুর মহকুমার গঙ্গার ধারের এক উঠোন-ছাওয়া কলকি গাছের মাঝখানে চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। এক আওরত কলকি ঝাড়ের আড়ালে যেন লুকোচুরি খেলে। সাহু ঘরের বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকে, 'ফুলবাসিয়া! এ ফুলবাসিয়া!'

সন্ধ্যার ছায়া দ্রুত ভারী হয়ে আসে। ফুলবাসিয়ার কোনো জবাব শোনা যায় না। সাধুদের আচরণের গ্লানি এবং যুগপৎ জিজ্ঞাসা ও অপমানবোধ বৈজুর চিন্তাকে আবিষ্ট ক'রে রেখেও ফুলবাসিয়ার সেই মূর্তি ওর মনে পড়ে। নদীর ভরা জোয়ারের স্রোতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শরীর তুলে বাঙালী বন্ধুকে তার অতি অপরূপ যুবতী-বুক দেখিয়ে হাসা। চোখে ভেসে ওঠা ছবি মুহূর্তে আবার বৈজুর নিশ্বাসে বাধা ঘটায়। নোকরানি এই আওরত? এবং বর্তমানের এই আচরণও এক নোকরানির? বাবার ডাক শুনে বৈজু ডান দিকে কলকি ঝাড়ের দিকে তাকায়। ঝাড় দ্রুত ঝাপসা হয়ে ওঠে, মাঠের জোয়ারের জলে দ্রুত ছায়া নামে। সাহু বলে ওঠে, 'লেড়কিটা ঘরে আলো জ্বালিয়ে রেখে কোথায় গেল?'

লেড়কি! বাবার কি ও সত্যি লেড়কি নাকি? জোয়ান আওরতের মতো যার চেহারা, পাঁচ বছর আগের চেহারার সঙ্গে যার কোনো মিল নেই। দরিয়া এখন পাহাড়ি ঢলে পরিপূর্ণ। এবং জীবনে এই প্রথম বৈজু দরিয়াকিনারের অধিবাসীদের মতো যেন শিউরে ওঠে, দরিয়ায় যেন প্লাবনের সংকেত। লজ্জাকর এ চিত্তবিক্ষেপ, অথচ অনিবার্যভাবে ঘটে এবং বাবা আর ফুলবাসিয়ার সম্পর্ক কি, জিজ্ঞাসা জাগে।

'আয় বেটা, আমরা ঘরের ভেতরে গিয়ে বসি।' সাহু বৈজুর হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যায়।

বৈজু তথাপি প্রত্যাশার চোখে উত্তরের কলকি ঝাড়ের দিকে তাকায়। নিশ্চল ঝাড়, অন্ধকার দ্রুত ঘনায়, ফুলবাসিয়াকে এখন সেখানে দেখা যায় না। বৈজুর ঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করে না তবু ঢোকে। কারণ, ঘরের ভিতরটা দেখবার জন্য মনে কৌতূহল জাগে। ইতিপূর্বেই এ ঘর দেখা। তবু নতুন করে কৌতূহল জাগে এবং সাহুর সঙ্গে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। জলচৌকির ওপর একটি হ্যারিকেন জ্বলে, তার পাশে কতগুলো লাল খেরো-বাঁধানো খাতা—সম্ভবত হিসাবনিকাশের খতিয়ান। বৈজু খাতাগুলো আগে দেখে নি এবং বাঁশ আর পাটের দড়ি বাঁধানো খাটিয়া ছাড়া দক্ষিণের খোলা জানালার কাছে নেওয়ারের খাটটিও নতুন। ঘরটিকে আগের তুলনায় ছোট দেখায়। খড়ের চালের নীচে, দরমার মাচা

নতুন এবং মাচায় যাবার ফাঁকের মুখে একটি সরু মই দাঁড় করানো। পূর্বদিকের বেড়ায়, ঝোলানো কাঠের তাকে বজরঙবলী ও কালীর ছবিতে সিঁদুর লেপা, একটি টিমটিমে প্রদীপ জ্বলে সামনে। কিন্তু গন্ধ কিসের? বৈজুর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়। চোখ ফেরাতে গিয়ে পায়ের কাছে কাঁচা মাটির লেপা মেঝেয় সাদা গুঁড়ো ছিটানো দেখে বুঝতে পারে মুখে মাখবার পাউডার ছড়ানো। বৈজু চোখ তুলে বাঁশের খাটিয়ার দিকে তাকায়। খাটিয়ার পাশে বেড়ায় ঝোলে আয়না, পাশে কাঠের পাটাতন পেরেকে আটকানো, যার ওপরে চিরুনি পাউডারের কৌটো এবং আরো কয়েকটি ছোটখাটো শিশি-কৌটো। তার পাশেই বেড়ার গায়ে দড়িতে ঝোলানো কয়েকটি নানা রঙের শাড়ি-জামা ঘরের মধ্যে ফুলবাসিয়ার অস্তিত্বকে প্রকট করে তোলে।

ঘরের মধ্যে কেবল পাউডারের গন্ধ না, একটি আওরতের গন্ধে ভরা। জোয়ারের জলে ফুলবাসিয়া আবার একবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং বলে, 'ঘরে গরম লাগছে, বাইরে বসা যায় না?' 'কেন নয়?' সাহু তৎক্ষণাৎ বলে, 'খাটিয়া নিয়ে বাইরে বসা যাবে, কিন্তু তার আগে ঘরে একটু বোস। সাধু লোকদের প্রসাদেই তো পেট ভরে না, একটু খাবার আনাই। তুই কি চা খাস?'

বৈজু বলে, 'খাই।'

সাহু এগিয়ে যায় বাঁশের খাটিয়ার দিকে এবং বেড়ার একটি আগল খোলে। বৈজু জানে, আগলের ওপাশে বেড়া-ঘেরা সরু এক ফালি জায়গা—রান্নাঘর। সেখান থেকে ফিরে সাহুজী বলে, 'তুই বোস বেটা, ওই বড় খাটিয়ায় বোস, আমি দেখি এরা সব কোথায় গেল।' এই বলে সে দরজার দিকে অগ্রসর হতেই সাধুদের আস্তানার কাছ থেকে সমবেত উচ্চ হাসির শব্দ ভেসে আসে। যে হাসির সঙ্গে একটি রমণীস্বরের খিলখিল হাসি অতিঝঙ্কৃত।

সাহু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে পশ্চিমের বেড়ার দিকে ঘাড়ের ঝটকায় ফিরে তাকায়। তার খালি পায়ের পেশীগুলো সাপের মতো কিলবিলিয়ে ওঠে এবং যেন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে শরীরের বিভিন্ন কেন্দ্রে জমা হয়ে ফুঁসে ওঠে। চোয়াল কাঁপতে থাকে, লাল চোখ ধকধক জ্বলে। এই মুহূর্তে সে বৈজুর কথা বিস্মৃত এবং দাঁতে দাঁত ঘষে কড়মড় শব্দে উচ্চারণ করে, 'ছিনার! কসবী!' এবং মুহূর্তেই ছিটকে ঘরের বাইরে চলে যায়।

বৈজু অবাক হয়ে ভাবে, কারা হাসে? বাবার মজুর নোকরেরা, নাকি সাধুরা এবং সমবেত পুরুষদের সঙ্গে কোন্ রমণীর হাসি এমন রঙিলী হয়ে বাজে? এবং সহসাই শোনা যায়, রমণী-হাসি সমবেত পুরুষ হাসির আসর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে যায়, যেতে যেতে মিলিয়ে যায়। বৈজু খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকায়। অন্ধকার নিবিড় কিছুই দেখা যায় না এবং হঠাৎ দক্ষিণ বা পূব কোন অংশ থেকে শেয়াল ডেকে ওঠে। প্রথমে একক শেয়ালের বিলম্বিত ডাক, যার প্রতিধ্বনি করে ওঠে কুকুর ঘরের অতি নিকটেই অনেকটা বিহ্বল স্খলিত গোঙানির মতো এবং যে মুহূর্তে শেয়ালের পাল একসঙ্গে ডেকে ওঠে, কুকুর তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ ঘেউ ঘেউ চিৎকারে ছুটে যায়। শেয়ালের ডাক থেমে যায়, চারদিকে কেবল কুকুরের ডাক শোনা যায়। বৈজুর চোখের সামনে বাবার ক্রুদ্ধ মূর্তি ভেসে ওঠে এবং নীচু স্বরের গর্জিত হুঙ্কার কানে বাজে, 'ছিনার! কসবী!'...

বৈজুর সহসা মনে হয়, লোকটি ওর বাবা না, তিন জগতের আর কেউ, যাকে ও চেনে না। দুস্তর অমিল, সম্পর্ক রহিত। যে নোকরানি লেড়কিকে সে ছিনার আর কসবী বলে গাল দেয় এবং যেন প্রহারের জন্যই ক্ষেপে ছুটে যায় সেই নোকরানি এ ঘরেই বাস করে, খাটিয়ায় শোয়, প্রসাধন করে। কি এর রহস্য এবং এখন স্তব্ধ সমবেত হাসি কাদের?

ফুলবাসিয়া খোলা দরজায় এসে দাঁড়ায়, বৈজুর সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় মাত্র সে চোখের পাতা নামায়। কিন্তু তার ঠোঁটে হাসি, নাসারন্ধ্র কাঁপে। মাথায় সবুজ রঙ শাড়ির ঘোমটা তোলা, যদিও সাদা সিঁথির কিছুটা দেখা যায়। কয়েক গুচ্ছ চুল তার কপালে গালে এলানো। তার দ্রুত নিশ্বাসে লাল জামার ওপরে সবুজ শাড়ি ঢাকা ঘন সংবদ্ধ স্ফীতিত বৃন্ত সুডৌল বুক ওঠা-নামা করে। কপালে খয়েরী রঙের টিপ হ্যারিকেনের আলোয় মুখের দাগ বোঝা যায় না। সে হঠাৎ আবার চোখ তোলে এবং এই সে প্রথম বৈজুর সঙ্গে কথা বলে, 'আমাকে চিনতে পারছো?'

বৈজুর কানে ফুলবাসিয়ার 'তুমি' সম্বোধন ঈষৎ বাজে এবং তা উচিত কি না, তৎক্ষণাৎ স্থির করতে পারে না। কিন্তু অতীতে ওর তিনবার উপস্থিতিতে ফুলবাসিয়া কখনো কোনো কথা বলে নি, সম্ভবত সঙ্কোচবশত অথবা নিষেধ ছিল। বৈজু কোনো জবাব দেয় না, কারণ অর্থহীন। ফুলবাসিয়াকে না চেনার কোনো কারণ নেই। ফুলবাসিয়াও সম্ভবত জবাবের প্রত্যাশা করে না, তবু আবার বলে, 'আমি কখনো জেল-ফেরত মানুষ দেখিনি। তুমি পুলিসের সঙ্গে লড়াই করে জেলে গেছলে। তুমি গান্ধীবাবার সঙ্গে জেলে ছিলে?' ফুলবাসিয়ার দৃষ্টি ও স্বরে বিস্ময় ও ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসা।

বৈজু নিরুত্তর থাকতে চেয়েও আওরতের এই অকপট জিজ্ঞাসার কাছে চুপ করে থাকতে পারে না, মুখ ফিরিয়ে নেবার ভঙ্গি করে বলে, 'আমি আজাদীর লড়াই করে জেলে গেছলাম।'

'আমি এ সব বুঝি না।' ফুলবাসিয়া যেন লজ্জা পেয়ে হাসে, আবার বলে 'আজাদীর লড়াই কাকে বলে আমি বুঝি না, আর আমি কখনো কোনো লড়াই ওয়ালাদের দেখি নি, তোমাকে ছাড়া। তুমি বসো না কেন, ওই নেয়ারের খাটটায় তুমি বসো।'

ফুলবাসিয়া বেশ সহজভাবে বলে। ঠিক অতিথিকে আপ্যায়নের মতো না, ঘরের মানুষকে, ঘরের মানুষের মতো সহজ স্বাভাবিকভাবে বলে এবং রান্নাঘরের আগলের কাছে কয়েক পা ভিতরে ঢুকে

আবার বলে, 'তুমি জেল থেকে কোন খতপত পাঠাতে না, তোমার কোনো খবর ছিল না, আর তোমার চাচারাও জানতো না তুমি কোথায় আছো। তাই তোমার বাবা ভেবেছিল, আংরক্ষরা তোমাকে খতম করে দিয়েছে।' বলেই সে হেসে ওঠে এবং মুখে হাত চাপা দেয়।

বৈজু ভ্রুকুটি চোখে তাকিয়ে বিরক্ত ঝাঁজে জিজ্ঞেস করে, 'এতে হাসবার কি আছে?'

ফুলবাসিয়া থতিয়ে ওঠে, মুহূর্তেই তার মুখের হাসি মুছে যায় এবং বড় কালো চোখ মেলে বৈজুর দিকে তাকায়। বৈজুর মনে হয়, ফুলবাসিয়ার কপালের গোল খয়েরী টিপও যেন চোখের তারার মতো ওর দিকে তাকায়। কুণ্ঠিত স্বরে বলে, 'তুমি ফিরে এসেছো তো। আমার ভালো লাগছে, তাই হাসছি। তোমার বাবার কথা শুনে মনে হতো, তুমি আর বেঁচে নেই, তোমাকে আর দেখতে পাবো না। এখন তোমাকে দেখে—।' ফুলবাসিয়া কথা শেষ না করে হঠাৎ থেমে যায়, বৈজুর চোখের দিকে তাকায় এবং আচমকা জিজ্ঞেস করে, 'তুমি রাগ করছো? আমি খুশিতে হেসেছি। তোমার রাগ হচ্ছে?'

বৈজু ফুলবাসিয়ার কথায় অপ্রস্তুত বোধ করে। তার জিজ্ঞাসায় অতি ব্যগ্রতা, চোখে-মুখে ব্যাকুল অভিব্যক্তি এবং জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে ঘাড়ের ঝাঁকুনিতে ঘোমটা খসে যায়। তার গলায় রুপোর হার, বাঁ হাতে লাল বেলোয়ারি চুড়িগুলো চিকচিক করে, আর নাকের নাকছাবিও। বৈজু কোনো জবাব দিতে পারে না, কিন্তু ফুলবাসিয়ার থতিয়ে ওঠা ভীরু সংশয় এবং অকপট অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসায়, নিজের আচরণের জন্য লজ্জা বোধ করে। তা ছাড়া, কথা বলতেও দ্বিধা বোধ করে, কারণ ফুলবাসিয়ার ভূমিকা ও সম্পর্ক যথার্থ নিরূপিত না।

'তোমাকে দেখে আমার প্রাণটা এমন ধড়কে উঠেছিল।' ফুলবাসিয়া আবার বলে, এবং এবার শব্দ না করে হাসে, যে হাসি ওর সারা মুখে ও চোখে চিকচিক করে ওঠে এবং ঘাড় কাত করে বলে, 'খুবই অচানক তো! আমি তখন দরিয়ার জলে।'

ফুলবাসিয়ার সেই জলের ওপর ভেসে ওঠা বুক, হাসি মুখ, চুড়ো করে বাঁধা চুল মূর্তির ছবি চোখে ভাসে এবং বৈজুর চোখ এই মুহূর্তে তার বৃন্ত ধরা বেল বুকে ঝটিতি স্পর্শ করে।

'সাহু মাঝে মাঝে কাঁদতো।' ফুলবাসিয়া আবার বলে, 'সাধুদের সঙ্গে ভাঙ খেয়ে দরিয়ার কিনারে বসে তোমার নাম নিয়ে চিৎকার করে কাঁদতো। আমি ঘরে বসে বসে শুনতাম, আর তোমার কথা ভাবতাম, কিন্তু তোমার মুখটা আমি কিছুতেই মনে করতে পারতাম না।' ফুলবাসিয়া যেন অস্বস্তিতে হাসে এবং জিজ্ঞাসার সুরে বলে, 'তাজ্জব ব্যাপার, না? এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, এই তো সেই মুখটা, কেন মনে করতে পারতাম না?'

বৈজু ফুলবাসিয়ার কথা শোনে এবং কি জবাব দেওয়া উচিত বা বলা, স্থির করতে পারে না, অতএব কিছুটা অনীহা ও বিব্রত ভাব নিয়ে চুপ করে থাকে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু ফুলবাসিয়া কথা বললে মুখ ফিরিয়ে রাখা যায় না, কথা শোনবার জন্য মুখের দিকে তাকাতে হয়। ফুলবাসিয়ার অনায়াস সহজ ভাব ও কথা বৈজুকে কিছুটা অবাকও করে অথচ তাকে অস্বাভাবিক মনে হয় না এবং তার 'সাহু' উচ্চারণ এখনো তার কানে লেগে থাকে। বাবাকে কি এই নোকরানি, দেখভাল করার আওরত 'সাহু' বলে ডাকে?

ফুলবাসিয়া হঠাৎ মুখে আঁচল চেপে ধরে, তার চোখ দুটি এবং কপালের টিপ চিকচিক করে। স্পষ্টতই সে হাসে এবং বৈজুর নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় দৃষ্টি জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। ফুলবাসিয়া মুখের আঁচল সরিয়ে বলে, 'তব তোমার আগের চেহারা আর নেই, পাঁচ সাল আগের সেই চেহারা। সেইজন্যই বোধ হয় আমি মনে করতে পারতাম না। সেই তুমিই আছো, দেখলেই চেনা যায়, কিন্তু অন্যরকম, বিলকুল বদলে গেছ।'

'কি রকম এখন আমি?' বৈজুর অজ্ঞাতেই যেন স্খলিত আর টুকরো টুকরো

কথাগ্নলো উচ্চারিত হয়, এবং ওর চোখে কৌতূহলিত অনুসন্ধিৎসা।

ফ্লবাসিয়া অতি সহজ মুগ্ধ স্বরে বলে, 'সুন্দর! খুব সুন্দর, ঠিক তসবীরের মতো।'

তসবীরের মতো? কি তার অর্থ, কিসের ছবি, কোন্ ছবির মতো? বৈজুর কালো ঘন স্ফীত গোঁফের বিস্তৃতিতে হাসি ফোটে, বলে, 'তসবীর? কোন্ তসবীর?'

বৈজুর কথা শেষ না হতেই সাহু যেন বাইরের অন্ধকার থেকে উল্লম্ফনে ঘরে ঢোকে এবং দাঁতে দাঁত পিষ্ট স্বরে বলে, 'কোথায়, কোথায় সেই কমিনী কুত্তী!' বলেই সে ফ্লবাসিয়াকে দেখতে পেয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত আচমকা তার ঘাড়ে আঘাত করে।

ফ্লবাসিয়া হাত তুলেও, আঘাত ব্যহত করতে পারে না, বেড়ার গায়ে ছিটকে পড়ে। সাহু আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়। বৈজু চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাবা!'

সাহু থমকে যায়। ফ্লবাসিয়ার মুখের ওপর চুলের গোছা, আঁচল খসে পড়ে মাটিতে।

ক্রমশ

আলোচনা

সাহিত্য সংখ্যা

গত ৩২ সংখ্যার 'দেশ' (৭-৬-৭৫) ...কায় শ্রীমিহির হাজরার 'সাহিত্য সংখ্যা/দেশ' সম্পর্কিত মর্মান্তিক অভিযোগটি পড়ে দেখেছি। আমি বাস্তবিক দুঃখিত, শ্রীহাজরার অভিযোগগুলি পরস্পর ও স্ব-বিরোধী এমনই এক ভিত্তিভূমির ওপরে দাঁড় করানো যে, তাঁকে সাহিত্যের একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান পাঠক হিসেবে গ্রহণ করা আমার পক্ষে রীতিমত পীড়াদায়ক। আলোচ্য সাহিত্য সংখ্যাটিতে 'দেশ'-সম্পাদক সাম্প্রতিক বাঙলা কথাসাহিত্য-জগতের ষোলজন শীর্ষস্থানীয় কথাশিল্পীর আত্মপ্রকাশ ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত তাঁদের স্বকীয় জবানীতে পাঠকদের সামনে তুলে ধরার দুরূহতম দায়িত্ব পালন করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সমালোচক, ঐতিহাসিক, গবেষক, জীবনীকার, ছাত্র এবং শিক্ষকদের চিরায়ত কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

শ্রীহাজরা নাকি "এতদিন 'দেশ'-কেই বাংলা সাহিত্যের মান-নির্ধারক পত্রিকা হিসেবে গণ্য করে" এসেছেন। অর্থাৎ কিনা, 'দেশ' পত্রিকায় যে-সব লেখক-লেখিকা লিখে থাকেন, বা তাঁদের যে-সমস্ত রচনা প্রকাশ পেয়ে থাকে, একমাত্র তাঁরাই বা তাঁদের সে-সমস্ত লেখাই প্রকৃত সাহিত্য-মানের অধিকারী। এখন দেখা যাচ্ছে, আলোচ্য ষোলজন কথা-শিল্পীর প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো সময়ে 'দেশ'-এ লিখেছেন —অনেকের তো একাধিক রচনা, 'দেশ'-এর পাতায় এককালীন অথবা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্ন হলো—তা হলে কোন্ অলোকসম্ভব যুক্তির ভিত্তিতে শ্রীহাজরা "এমন কিছু লেখকদের আত্মপ্রকাশের" বিবৃতি দেখে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করেন, "যাঁরা লিখে সাহিত্যকে যতটা কলুষিত করতে সক্ষম হয়েছেন, না লিখে অতটা পারতেন না?" লক্ষণীয় যে, শ্রীহাজরা আলোচ্য 'ষোলজন লেখক-লেখিকার মধ্যে এমন কিছু লেখক' না বলে কেবল 'এমন কিছু লেখক' বলেছেন। যার ফলে, তাঁর অভিযোগের কাঠগড়ায় পুরো ষোলজনকেই দাঁড় করানো যায়, অথবা কয়েক জনকে শুধু আসামী সাজানো চলে। শ্রীহাজরার কি উচিত ছিল না সেই সমস্ত মহা-পাতকদের নাম-ধাম ইত্যাদি উল্লেখ করে আমাদের বিভ্রান্তির হাত থেকে উদ্ধার করা?

উপরন্তু, যে মিহিরবাবু "বহু বছর যাবৎ 'দেশ'—বিশেষ করে সাহিত্য সংখ্যার 'দেশ'-কে মূল্যবান দলিলের মত সংগ্রহ" করে থাকেন এবং "এখন থেকে আমার পক্ষে 'দেশ'-কে সেই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারছি না", বলে যিনি "দুঃখিত" বোধ করেন, তাঁর সম্পূর্ণ "ভিন্নরুচির" বিচারের মাপকাঠিটি রীতিমত হাস্যকর। সাহিত্যের শুচিতা, পবিত্রতা ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁর এ হেন 'সমাজপতি'-সুলভ আচরণের সঠিক ব্যাখ্যার খাতিরেও তিনি "বিস্তারিত তর্কের মধ্যে" যেতে কেন অনিচ্ছুক, বোঝা গেল না। জনৈক ইউরোপীয় মনীষী সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদনে তিনটি বিশেষ নীতিবাগীশ শ্রেণীকে অপরাগ বলে অভিহিত করেছেন—যথা, রাজনীতিক (Politician), ভাষা-শিক্ষক (Grammarian) এবং সরকারী শুচি-সচিব (Censorist)। প্রথমোক্ত নীতিবাগীশরা সাহিত্যের শরীরে খোঁজেন শুধু 'ইজম'-এর দুর্গন্ধ, দ্বিতীয়োক্তরা খোঁজেন ব্যাকরণগত ভুল-ত্রুটি এবং শেষোক্তরা খুঁজে পান নিছক যৌনতার সুড়সুড়ি। ফলত, সাহিত্যের চিরায়ত স্পন্দন বা আবেদন চিরকালই অজ্ঞাত থেকে যায় এঁদের হৃদয়ে দৃষ্টির কাছে।

ভারবি গুপ্ত
আসাম

॥ ২ ॥

সদ্য সমাপ্ত 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যাটি (১৩৮২) সম্পর্কে যখন নানা রকম মানসিক প্রশ্ন ব্যাকুলতায় অস্থির, সুন্দর সঙ্গলাভের এক মনোরম সুখ-স্মৃতিতে যখন মগ্ন, এবং কি ভাবে মানসিক সেই ভাবনাকে প্রকাশ করা যায়—এমন এক অসহায় অস্বস্তির মধ্যে নিমজ্জিত, তখনই লক্ষ্য করি, আমারই অনুভূতিকে, আমার মতো আকৃষ্ট অনেক সাহিত্য-পিপাসু পাঠকই (ব্যতিক্রম অবশ্য শ্রীমিহির হাজরা মহাশয়, তাঁর প্রসঙ্গে আসছি একটু পরেই), সাপ্তাহিক এই সংখ্যার (৭ই জুন, ১৯৭৫) 'দেশ'-এর পাতায় সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি লেখাই লেখকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের আদলে এক একটি অন্তরঙ্গ, সুন্দর আত্মপ্রকাশ। শুধুমাত্র লেখকের অন্তর ও অন্দর মহল জানার কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়াও, সাহিত্যগত কারণেও, লেখকজীবনের এই রকম আত্মস্বীকৃতির যথেষ্ট মূল্য অনস্বীকার্য। মনে পড়ে, বছর কয়েক আগে, (সম্ভবত ১৩৭৯ সালে), এমনই এক পরিকল্পনায়, সম্পাদক মহাশয় সমকালীন কবি গোষ্ঠীরও এক অতি চিত্তাকর্ষক অন্তর-আলেখ্যের সংগ্রহ আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। ফলে, সেই সমস্ত কবি ও ঔপন্যাসিক, যাঁদের শুধুমাত্র বাণীই শুনেছি, চোখে দেখিনি, তাঁদেরও দর্শনলাভ এই রকম সংকলনের আন্তরিক আত্মকথনে সম্ভব হ'ল। কারণ, এ সত্য তো তর্কাতীত যে, কবিই হোন বা গল্পকারই হোন, সার্থক শিল্পের জীবনী শক্তিতে সঞ্জীবিত হতে হলে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিই তাঁর রচনার মৌল উৎস-উপাদান। সেই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রহস্যময় কাহিনী লেখকের নিজের চেয়ে আর কে মহত্তর ও সত্যতর মহিমায় উদ্ঘাটিত করতে পারেন? তাই যখন আমাদের জোড়হাটে থেকে শ্রদ্ধেয় মিহির হাজরা মহাশয় এই রকম সংকলন উদ্যোগে—"আমাকে হতাশ করেছে"—এই উক্তিতে চিহ্নিত করেন, তখন সেই যুক্তিহীন বোধকে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া বলেই ধরতে হয়। কোন কোন লেখক সম্পর্কে কারো কারো অন্য মত থাকতেই পারে। কিন্তু তাই বলে "এমন কিছু লেখকদের" আত্মপ্রকাশে এবং 'লেখক'-শব্দের পাশে প্রশ্ন বোধক সন্দেহ চিহ্ন দিয়ে (এবং সেই সন্দেহের যথোচিত কারণ না দর্শিয়েই) যদি তিনি বর্তমান সাহিত্য সংখ্যাটির প্রচেষ্টাকে নিন্দা করবার প্রয়াস পান, তবে 'বিস্ময়' তাঁর প্রতিই। তাই তাঁর এই সরল সিদ্ধান্তকে—"সেই সমস্ত লেখকগণ লিখে সাহিত্যকে যতটা কলুষিত করতে সক্ষম হয়েছেন, না লিখে অতটা পারতেন না"—বর্তমানের লেখক সম্প্রদায় সম্পর্কে (যাঁদের নিয়ে এবারের সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত) তাঁর সুচিন্তিত, সুবিবেচিত ও দায়িত্বপূর্ণ মন্তব্য বলে গ্রহণ করতে বাধে। পরিশেষে, 'দেশ'-এর পাঠকবর্গ ভিন্নরুচির বলেই, মিহিরবাবুর কাছে আমার বিনীত প্রশ্ন : বর্তমান সাহিত্য সংখ্যায় কি এমন অ-সাহিত্যসুলভ চটুলতা আপনি পেলেন যার জন্য 'দেশ'-কে আগের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারছেন না বলে আপনি দুঃখিত?

জয়ন্তকুমার দাস
কলিকাতা-৯

॥ ৩ ॥

দেশ-এর সাহিত্য-সংখ্যার কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকে অনেক। সেই সব প্রত্যাশা প্রতিবারই পূরণ হয়, এ কথা বললে সত্যি বলা হয় না। সত্যি যা, তা হল এর অনন্যসাধারণত্ব—সম্পাদকদের নিষ্ঠা ও ভালবাসায় গাঁথা এমন সুরুচিপূর্ণ সুচারু সংকলনের তুলনা অন্যত্র মেলা ভার।

শেষ-বৈশাখে, তেরো শ' বিরাশির সাহিত্য সংখ্যাটি যখন হাতে এল, তখন নতুন পত্রিকা পাওয়ার আনন্দ শিরিষের গন্ধজাল হয়ে ঘিরে ফেলেছিল আমায়; হিসেব করার মতো অবকাশ আসেনি। এখন পাঠের পর সেই আকর্ষণ ফিকে হয়ে এসেছে অনেকখানি। কিছু প্রশ্ন, কিছু কথা জেগে উঠেছে মনে। আমি তাদেরকে নিবেদন করতে চাই।

যাঁরা আত্মকথনের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদেরকে কোন তোলে নির্বাচন করা হয়েছে, জানতে ইচ্ছে করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বাংলা কথাসাহিত্যের রূপান্তরণের ক্ষেত্রে কি কেবলমাত্র এঁদের ভূমিকাই উল্লেখনীয়? মেনে নেওয়া কঠিন।

আপনারা বলবেন, সমস্যা স্থানাভাবের। কিন্তু এরও সমাধান সহজে হতে পারত, যদি লেখক-লেখিকাদেরকে প্রশ্নের সঙ্গে রচনার পৃষ্ঠাসংখ্যাও মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দিতেন। বিমল মিত্র 'বেপদায় পৌঁছে আবার বাঁধা রাস্তায় ফিরে আসার কসরত কায়দা' নিজের লেখক-জীবনের কথা বলতে গিয়েও দেখিয়েছেন। অজস্র-বিজ্ঞাপনে কণ্টকিত হলেও সমরেশ বসুর দুটি রচনার পৃষ্ঠাসংখ্যার যোগফল যেখানে আঠারো, সেখানে বিমল মিত্র একটি রচনাতেই নিয়েছেন আটাশ পাতা।

এই বাহ্য। সুনীলের 'স্বীকারোক্তি স্মৃতি স্বপ্ন' মুগ্ধ হয়ে পড়ার মতন। বিমল মিত্র কথিত 'অনুভূতির অমৃত আস্বাদ' অঞ্জলি পুরে তিনিই দিয়েছেন আমাদেরকে। শংকর অরুণবরণ মধুসূদন দাদার গল্প যতখানি বলেছেন, ততখানিই অনক্ত থেকে গেছে তাঁর সাহিত্যিকজীবনের কথা। এ সম্পর্কে অবশ্য তিনিও সচেতন এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তা সত্ত্বেও 'প্রথম সোনার ধান' একটি চিত্তবপ্পনকারী রচনা। বড় ভাল লাগল সুবোধ ঘোষের নিবন্ধটি। তাঁর অবিস্মরণীয় গল্পমালার মতো এটিও নিঃসন্দেহে 'জীবনের অভিজ্ঞাত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাময় নৈবেদ্য।' বিভিন্ন গল্পের স্মৃতি, বিভিন্ন চরিত্র আঁকিতে সহায়তা করে—এ চমকপ্রদ তথ্য কি জ্যোতিরিন্দ্র ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে জানা যেত?

বিস্তারিত আলোচনা থাক।

যে কথা বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠেনি এ পর্যন্ত, তা হল—রবীন্দ্রনাথের লেখা এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা অমূল্য পত্ররাজির কথা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর উত্তরসূরিদের সম্পর্ক কত নিবিড় ছিল এবং কতভাবে তিনি তাঁদেরকে প্রোৎসাহিত করেছেন, এই পত্ররাজির সংস্পর্শে না এলে তা জানা যেত না। শুধুমাত্র এরই কারণে দেশ পত্রিকার এই সাহিত্য সংখ্যাটিকে অমূল্য সঞ্চয়ের সারিতে স্থান দেওয়া যায়।

সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়
মানকর, বর্ধমান

॥ ৪ ॥

শ্রীমিহির হাজরার (জোড়হাট, আসাম) দেশ সাহিত্য সংখ্যা সম্পর্কিত পত্রটি পড়লাম এবং পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম বর্তমান সাহিত্য ও সাহিত্যপত্রিকা দেশ সম্বন্ধে তাঁর বিকৃত ব্যাখ্যা এবং যুক্তি-হীন উন্নাসিকতার পরিচয় পেয়ে। 'আলোচ্য পত্রে 'এমন কিছু লেখক (?)' বলতে তিনি স্পষ্ট করে কোন নামোল্লেখ করেননি এবং 'কলুষিত' এই শব্দটি উচ্চারণ করেই মাত্র, দেশ সাহিত্য সংখ্যার বিচার কয়েক কলমে শেষ করেছেন। কিন্তু জানতে পারি কি 'কলুষিত' এই শব্দটি তিনি ঠিক ঠিক সজ্ঞানে প্রয়োগ করেছেন কিনা? সম্ভবত শব্দটির ওপর তিনি মোহগ্রস্ত।

শ্রীযুক্ত হাজরার ভাষাতেই বলি, দেশ পত্রিকার পাঠকবর্গ ভিন্ন রুচির। কিন্তু মহাশয় তার আগেই স্বীকার করেছেন, যে সমস্ত লেখক তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে 'সাহিত্যজগৎকে কলুষিত' করতে সক্ষম হয়েছেন দেশে তাঁদের পাঠক-সংখ্যা নগণ্য নয়।

এবার আমার বক্তব্য রাখছি।

পাঠকবর্গ যেমন সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কীর্তির ইমারত দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়, তেমনি তাদের চিরকৌতূহলী মন জানতে চায় বিচিত্র রসে পরিপূর্ণ এই সাহিত্য-জগতের যাঁরা পরিবেশক তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের দুটি চারটি সুখদুঃখের মুহূর্তকে। পাঠকবর্গ রসস্রোতের উৎস-ধারাকে জানতে চায়, চিনতে চায়। জীবন আর সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্কসূত্র রচনা করতে চায়। এ চাওয়া আমার মতে খুবই স্বাভাবিক। আমি নিজে দেশ পত্রিকার একজন আগ্রহী পাঠিকা। দেশ সাহিত্য সংখ্যা পড়ে আমি খুব খুশী হয়েছি। আমার প্রিয় লেখকগণ তাঁদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশেষ করে সাহিত্যজগতে প্রবেশের মুখে যেসব বাধা এবং দুঃখময় দিকগুলি অনুভব করেছেন এবং সেই সঙ্গে শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত সাহিত্যজগতের সোনালী ক্ষেত্রে বিজয়রথ পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছেন, দেশের পাতায় পাতায় তা অত্যন্ত আন্ত-রিকতা ও মননশীল রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আমি মনে করি না দেশ সাহিত্য সংখ্যা লেখকগণের 'স্বরচিত' এই স্বীকৃতি, বেদনা, আশা, ক্ষোভ, স্বপ্ন স্মৃতি এবং সফলতম আনন্দমুহূর্তগুলিকে প্রকাশ করে দুর্মূল্য কাগজ এবং সময়ের অপ-অপব্যবহার করেছেন। আসলে শ্রীযুক্ত হাজরা তাঁর রচিত এই পত্রে কাগজ এবং সময়ের দুর্মূল্যতার উল্লেখ করে বাস্তব সমস্যাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সাহিত্যের জগৎ থেকে জীবনকেই অস্বীকার করেছেন। অস্বীকার করেছেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যরচয়িতার ব্যক্তিজীবনের প্রভাবকে, যে, জীবনের প্রতি পাঠক-কুলের কৌতূহল কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাসের থেকে কোন অংশে কম নয়।

সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামপুর (হুগলী)

॥ ৫ ॥

প্রান্তিক জেলা কোচবিহার থেকে বরণীয় সাহিত্যিকদের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় গড়ে তোলার সুযোগ খুবই সীমায়িত তার মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, ধ্যান, ধারণা সম্পর্কে কোন ধারণাই আমরা করতে পারি না। এ বিষয়ে আমরা অনেকটা রূপকথার সাহিত্যের রাজা বানিয়ে নানা কল্পনার জাল বুনি মাত্র। কিন্তু এবারের সাহিত্য সংখ্যা দেশ পড়ে অনেকদিনের অভাব মিটলো। পত্রিকা পরিচালক গোষ্ঠীর এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। অনেক লেখকই ব্যক্তিগত কথা বলতে গিয়ে স্বভাব সুলভ ভাবের রাজ্যে চলে গিয়েছেন দেখলাম। আবার শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শংকর, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকেরা এমনভাবে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর বিষয় স্মৃতি চারণা করেছেন, যেন একটি জীবন্ত কাহিনী হয়ে আমাদের রস-পিপাসাকে পরিতৃপ্ত করেছে। আমাদের দেশে জীবনী লিখতে শুধু ভাল জিনিসটুকুই লেখা হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে মহাপুরুষ বানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে দেখলাম অনেকেই রক্ত মাংসে গড়া সাধারণ মানুষের মত ভালমন্দ অকপটে স্বীকার করেছেন। এতে বাস্তব দৃষ্টিতে তাকে দেখবার সুযোগ হয়। মনের আয়নায় স্বচ্ছ জীবন ছবি ফুটে ওঠে। আমাদের ধারণা ধনীর ঘরে না জন্মালে সহজে বই প্রকাশ করা বা সাহিত্য জগতে স্থান করা সহজ নয় কিন্তু এই বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়েছে এই সংখ্যার সাহিত্যিকদের নিজস্ব জীবন কথার মাধ্যমে। সংক্ষিপ্ত এবং সহজভাবে লেখা যে আত্মজীবনীর অভাব ছিল সেটা দূর হল।

সর্বশেষে মনে করি এই সংখ্যাটি বাংলা জীবনী-সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি অভিনব সংযোজন।

নৃপেন্দ্রনাথ পাল
কোচবিহার

॥ ৬ ॥

সাহিত্য সংখ্যা সম্বন্ধে ৭ জুন '৭৫ 'দেশ'এ মিহির হাজরা মহাশয়ের মন্তব্য পড়ে কৌতুক বোধ করছি। মনে হয় নিজস্ব ক্রোধ বিশেষ কোন সাহিত্যিকের প্রতি প্রকাশ করেছেন। এইটুকু তো সোজা কথা, কোন সাহিত্যিকের লেখা পড়ে তৃপ্তি পেলে সেই সাহিত্যিককেও অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলি এবং তাঁকে একান্তভাবে জানার কৌতূহল জাগে। বলা চলে, কোন লেখা পড়ে লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে, তা লেখকের স্মৃতিচারণা বা জীবনী পড়লে দূর হয়। কারণ লেখকের নিজের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলই তাঁর সাহিত্য। সাহিত্যিক শুধু চরিত্র সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন না, নিজের বক্তব্য ও মন্তব্যও জুড়ে দেন। চিন্তাশীল পাঠক, সাহিত্যিকের জীবন-দর্শন তাঁর লেখায় কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তাও বিচার করেন। আমার তো মনে হয় সাহিত্যিককে সম্যক না জানলে তাঁর সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়নও করা সম্ভব নয়। দেশ 'সাহিত্য সংখ্যা' সেই দৃষ্টি-কোণ থেকে আমাদের ঋণে আবদ্ধ রেখেছে। মিহিরবাবুর উষ্মার কারণ কি?

ডাঃ সুশীলচন্দ্র দত্ত
তিনসুকিয়া, আসাম

বন্য প্রাণীর অতীত ও ভবিষ্যত

এতদিন আমার মনে একটা চাপা দুঃখ ছিল। কিন্তু দেশ পত্রিকার ৩১শে মে সংখ্যায় জেরাল্ড ডারেলের বন্য প্রাণীর অতীত ও ভবিষ্যত লেখাটির অনুবাদ পড়ে ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা যেন জমে আসতে শুরু করেছে।

ব্যাপারটি একটু খুলে বলা দরকার। আমাদের বাড়ির ঠিক পিছনে চৌধুরীদের মস্ত একটা বাগান। ভিতরে দীঘির মতন শান বাধানো একটা পুকুর। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাগানের ভিতর পাখি-দের জলসা শুরু হয়ে যেত। ঝাঁক ঝাঁক দোয়েল, কোকিল, শ্যামা, বুলবুলি থেকে শুরু করে টিয়া, নীলকণ্ঠ, পাপিয়া এমন কি বৌ-কথা-কও পর্যন্ত কেউ বাদ যেত না। সবচেয়ে বেশি ছিল ফিঙে আর ছাতারে। বাগানের প্রায় আধখানা জুড়ে ওদের ঝুমুর নাচ আর কেত্তন গানের আসর বসত। এছাড়া আরও কত বিচিত্র ধরনের পাখি আসত তাদের নাম আমি জানি না। টকটকে হলুদ রঙ, ডানার দুপাশে কালো ছোপ—এই পাখিটাকে আমরা বলতুম বেনেবউ। এরা যখন ডাকত মনে হত ঠিক যেন—গেরস্থর খোকা হলছে। আমাদের বাড়ির লাগোয়া কোন গাছের ডালে বসে পাখিটা ডেকে উঠলেই আমার ঠাকুমা বলতেন—'আঃ মর! যারা ছেলে পুলের জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে আছে সেখানে গিয়ে ডাকতে পারো না। যা হুস হুস ঐ চৌধুরীদের বাড়ী যা।' আর এক ধরনের পাখি আসত আমরা তাদের বলতুম টাকাটোল। বাদামী, সাদা আর কালোর ডোরাকাটা—টিয়াপাখির মতন ঠোঁট। ঝোলা ল্যাজ। 'পথে কুটুম্ব' বলে অবিকল মানুষের গলায় পাখিটা ডেকে উঠত।

কালচে বাদামী কিংবা সাদা রঙের আর একটা বড় মজার পাখি চোখে পড়ত। শরীরটা ইঞ্চি ছয়েকের বেশি বড় হবে না কিন্তু ফিতের মতন ল্যাজটা প্রায় ফুট খানেক লম্বা। আমরা বলতুম ফিতে বুলবুলি। বাঁশ বাগানের ভিতর উড়ে উড়ে ওরা যখন তিতুকোকার ফল খেয়ে বেড়াত তখন ওদের পাখি বলেই মনে হত না। কতকগুলি যেন ফিতের টুকরো, ঘূর্ণি হাওয়ার মুখে পড়ে এদিক ওদিক ভেসে চলেছে।

সারি সারি তাল গাছের মাথায় কত বাবুই পাখির বাসা ঝুলত। পুকুরে যখন স্নান করতে যেতুম তখন কত রং বেরঙ-এর মাছরাঙা চোখে পড়ত। এ ছাড়া কত ডাহুক, কত পাখি পায়রা—কত বিচিত্র ধরনের কলাপিপি আর কায়েম গুনে তাদের শেষ করা যেত না। সমস্ত মিলিয়ে চৌধুরিদের ঐ বাগান খানা এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের ঝুমঝুমি হয়ে দিন রাত্রি আমার কানের কাছে বাজতে থাকত।

এসব হল মাত্র পনেরো কুড়ি বছর আগেকার ঘটনা। আমাদের গ্রাম আগে যেমন ছিল এখনও প্রায় তেমনই আছে। শুধু গাছগুলি একটু বুড়িয়ে যাওয়া ছাড়া চৌধুরীদের বাগানেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু কোথায় গেল সেই সব রঙ বেরঙের পাখির দল। দু একটা দোয়েল, টুনটুনি শালিক আর

বুলবুলি ছাড়া আজ আর কাউকে চোখে পড়ে না।

কথাটা একদিন আমার এক রাজনীতিবিদ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলুম। বন্ধুটি তো ক্ষেপে অস্থির। বললে না খেয়ে খেয়ে মানুষ মরে শেষ হয়ে গেল, আর তোমার যত মাথা ব্যথা ঐ সব বাজে ব্যাপার নিয়ে।

একদিন প্রাচীন এক অধ্যাপককে ব্যাপারটা বললুম। তিনি উত্তর দিলেন—পাখিরা একটু নিরিবিলি জায়গা পছন্দ করে। তোমাদের গ্রাম তো এখন শহরের মুখোমুখি এসে পড়ছে। তাই ওরা আরও দূর গ্রামের দিকে চলে গেছে।

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হাটে যাবার রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে সেই দূর গ্রামের মানুষরা হাটে আসে। তাদের জিজ্ঞাসা করি—হ্যাঁগো বাপু, তোমাদের ওদিকে ফিঙে বুলবুলি আছে? লোকটা ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়—নাগো বাবু। সেই ছেলেবেলায় আমাদের ওখানে কত দেখতে পেতুম। কিন্তু এখন আর নজরে পড়ে না। আরও দূরের মানুষকে জিজ্ঞাসা করি। সেও ঘাড় নাড়ে। বলে, ফিঙে বুলবুলি, বৌন বউ ঐ পাখি কুটুম্ব পাখির কথা জানতি চাইছেন? ওসব আর আমাদের গ্রামেও নেই গো বাবু। ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞাসা করি—তোমাদের গ্রামে ফিঙে আছে, ছাতার আছে? লোকটি আগের মতই মাথা নাড়ায়। ঝিটকি পোতার লক্ষ্মণ মণ্ডল আরও অনেক দূরের মানুষ। সে বলে, ওসব পাখি আর নেই গো বাবু। তবে ঐ যে কিচেরর কথা বল্লেন না? কখন সখন ভোরের দিকে ওদের ডাক শুনতে পাই। তবে চোখে একটা পড়ে না। একটু থেমে লক্ষ্মণ মণ্ডল আবার বলে, কথাটা কিন্তু আমার মনে লেগেছে গো বাবু। এত বারণ এতো ফিঙে বুলবুলি ছিল, বৌন বউ ছিল—কিন্তু তারা আজ গেল কোথায়?

ফিরে এসে ভাবতুম, হয়ত অধ্যাপক মশাই-এর কথাটাই ঠিক।' তারা হয়ত আরও আরও অনেক দূরের দিকে চলে গেছে। ওদের সেই চলে যাওয়াটা একটা কাঁটা হয়ে আমার বুকের ভিতর বিঁধে থাকত।

শীতাংশু ঘোষ
কামডহরি-গাড়িয়া

বিশ্ববিজ্ঞান

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সম্পর্কে কলকাতার বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল আন্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে গত ১৪ মে তারিখে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, দেশ পত্রিকার (১৪ জুন ১৯৭৫) 'বিশ্ববিজ্ঞানে' সেই বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করে বিষয়টির প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য শ্রীসমরজিৎ কর মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য আমার নিবেদন করবার আছে।

সমরজিৎবাবু সরকারের বিজ্ঞান পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখেছেন যে, এই সব পরিকল্পনার কথা অনেকেই জানেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাঁরা জানতে আগ্রহী, তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই যে, রাজ্য যোজনা পর্ষদ রচিত 'Science and Technology Plan for west Bengal (1974-79)' নামক পুস্তকে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ সমেত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলির রূপরেখা লিপিবদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সমিতির পক্ষ থেকে ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই সব পরিকল্পনাকে বিস্তৃত রূপদানের চেষ্টা চলেছে। তবে এ কথা বোধ হয় ঠিক যে, বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে আরও ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন—পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে পশ্চিমবঙ্গের সব অঞ্চলেরই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানানুরাগী জনগণের অংশ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিকল্পনাগুলি কতখানি কার্যকর করা যাবে, তা এখনই বলা যায় না। কারণ সেটা অনেকাংশে নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদন এবং বরাদ্দ অর্থের উপর।

সমরজিৎবাবু তাঁর প্রতিবেদনে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে কর্মপ্রচেষ্টাগুলির কয়েকটির উল্লেখ করেছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মধারা সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত রয়েছে—বিশেষত গত ২৭ বছর ধরে নিয়মিতভাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক যে বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে পরিষদ বিজ্ঞান প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং যে পত্রিকার বিষয় ১৪ মে তারিখের সভাতেও আলোচিত হয়েছিল, সেই বিষয়টি সমরজিৎবাবুর প্রতিবেদনে স্থান পেলে বোধ করি সংগত হত।

বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব বিজ্ঞান-সংস্থাগুলির নেওয়া সম্বন্ধে আলোচ্য সভায় আমার মন্তব্যকে সমরজিৎবাবু সমর্থন করেছেন বলে আমি আনন্দিত। তবে স্কুলগুলি থেকে 'গবেষণাগারের পাঠ' উঠে যাওয়ার কথা আমি বলেছিলাম বলে উনি যা লিখেছেন, তাতে সামান্য ত্রুটি রয়েছে। আমি বলেছিলাম ভৌত বিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা, কারণ জীববিজ্ঞানে এইরকম শিক্ষা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত আছে। যা হোক, এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে আমার মনে হয়, আমাদের চারপাশের সমাজের সঙ্গে যদি বিজ্ঞান-সংস্থাগুলির গভীর যোগসূত্র থাকে এবং ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষের নানান সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে যদি তাদের কার্যধারা পরিচালিত হয়, তা হলেই তারা সত্যিকারের প্রাণবন্ত ও সার্থক হয়ে উঠবে।

ডঃ জয়ন্ত বসু
সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা।

পত্রাবলী

৭ই জুনের 'দেশ'-এ রবীন্দ্রনাথের চিঠির ফুটনোট-এ (৩১) 'বসন্ত' অভিনয় ম্যাডান থিয়েটারের স্টেজে হয়েছিল বলে লেখা হয়েছে। কথাটা ভুল, তারিখও ভুল। ওটা প্রথম দিন অভিনয় হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের স্টেজে এবং ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৩; ২২শে ফেব্রুয়ারী নয়। সেইদিন রাত্রেই আমাদের বিয়ে হয়, এবং কবি তাঁর সব দলবল সমেত থিয়েটারের শেষে ৭ নং সর্ট স্ট্রীটে ডাক্তার নীলরতন সরকারের বাড়িতে এসে বিবাহ-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। ওঁর জন্যেই বিয়ের রাত ১০টায় আরম্ভ করা হয়েছিল এবং বসন্তটা সেদিনই ছাপা হল বলে গানগুলোর পাণ্ডুলিপি একত্রে বাঁধিয়ে ৪ লাইন আশীর্বাণী লিখে আমাদের বিয়েতে উপহার দিয়েছিলেন—'রাণী প্রশান্ত, তোমাদের এই মিলন বসন্তে দিলেন কবি বসন্ত গান আনি; সুন্দর সে সকৌতুক আনন্দে, পরুক গলায় সুরের মালাখানি।'

নির্মলকুমারী মহলানবিশ

॥ ২ ॥

৩৩ সংখ্যা (১৪ জুন, ১৯৭৫) 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলীর ৩৭ সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'বল্লভ'-এর কোন পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমার বিনীত মত এই, 'বল্লভ' খুব সম্ভবত তদানীন্তন সুখ্যাত রেলওয়ে কেটারিং কন্ট্রাক্টর বল্লভদাস আগরওয়াল। আমার পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের মুখে শুনেছি যে, বল্লভবাবু সময়ে সময়ে বিশ্বভারতীর জন্য সাহায্য করেছিলেন।

আপনার পত্রিকার অন্য কোনো পাঠক এই বিষয়ে আলোকপাত করলে ভাল হয়।

বামাপদ দে
কলকাতা-৯

॥ বত্রিশ ॥

সেদিন সকালে ফাম দা মিনাজ আসবার আগেই দরজায় টোকা পড়ল। শব্দ শুনে প্রথমেই বাঁদিকে, বারান্দার দিকে কাচের দরজায় তাকালুম। ভোর হয়ে গেছে। এক-ঘেয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বাইরের অন্ধকার কখন সরে গেছে টের পাইনি। ঈজেলের পায়ায় আলগা হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলুম। সারারাত ধরে শেষ হয়েছে ছবিটা। মুখে বলে বা লিখে ছবি বোঝানো মুশকিল। আমার কাছে তো দুঃসাধ্য ব্যাপার মনে হয়। 'ক' যেমন 'ক', 'খ' যেমন 'খ'—ছবি শুধু ছবিই। বর্ণনা দিতে গিয়ে হয়তো ধ্যাবলা ধ্যাবলা বিষয়টুকু বোঝানোর শুধু চেষ্টা করা যেতে পারে, বড়। যেমন ধরো, এই আট নম্বর ছবিটি আঁকার জন্যে সাদা ক্যানভাসের সামনে বসে থাকতে থাকতে যে কথা ভাবছিলুম। ভারতবর্ষের কোনো মায়ের কথা। শরীরে হাড় সাজিয়ে বসে আছে। শূন্য তোবড়ানো থালা ধরে আছে হাতে। আকাশে ঝুলছে সেই হাত। কোলে কোনো সনাতন শিশু, অথবা হাত-পা'ওয়ালা বিশুদ্ধ হাড়ের তৈরী ডাকাতে পিণ্ড আপ্রাণ চেষ্টায় মায়ের চামড়ার মতো এককন্তের স্তন শুষছে, দু'এক ফোঁটা জলীয় কিছু পাবে ভেবে। ছবিটি কত পারোনো, কতখানি দেখে দেখে লোকেরা হয়রান, তা বিচার করবার প্রয়োজন নেই। আমারও মনে হয়, যেন এক চিরন্তন ছবি আমার দেশে। সেইজন্যেই ক্যানভাসে তুলে রাখলুম, ইচ্ছে মতন, ভেঙে চুরে, ফর্ম তৈরী করে। রং নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল নিজের সঙ্গে, তাতেই রাত কাবার।

খিদেয় নাড়িভুঁড়ি পাক খাচ্ছে। কাল সারা দিনেরাতে শুধু তিন চার কাপ কফি খেয়েছি। চিনি ফুরিয়ে গেছে আগেই। সুতরাং দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। কফির কৌটোও প্রায় শেষ হতে চলল। বড় জোর আরো পাঁচ ছ' কাপ হবে টেনেটুনে। ক্যাশ পয়সা আর একটা সান্তোমও হাতে নেই, পকেটে নেই। স্যুটকেসের আনাচে-কানাচেও খালি। শেষ ফ্রাঁটি খরচ করে ফেলেছি পরশু রাত্তিরে। লোভে পড়ে মেজোর কাণ্টিনেই একটা গোটা অমলেট খেয়ে ফেলেছি। অথচ আজকে নিয়ে এক-চল্লিশ দিন নাগাড়ে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ নেই। মেঘের তর্জন গর্জন নেই। হয় চুপচাপ বৃষ্টি ফেলে চলেছে আকাশ অথবা সেই অতিকায় ধুনুরির কাজ নেই কম্মো নেই, বসে তুষার ধুনছে। মোঁমার্ত্রের মেলা বসছে না! আমার ধুমসো গরম বর্ষাতিটি চাপিয়ে দু'দিন গিয়েছিলুম মোঁমার্ত্রে। গোটা মেলার আসরে বৃষ্টি হেঁটে বেড়াচ্ছে। জনপ্রাণী বলতে ভেজা কাকের মতো কয়েকটি মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেস্তোরাঁয় বসে ঝিমোচ্ছে। শিল্পী নেই, খদ্দের নেই। রংয়ের ব্যাপার ধরে মুছে সাফ। আলু ভাজার দোকানের ঝাঁপও বন্ধ ছিল। টিলার ওপরে এই গোটা এলাকাটি যেন ঝিম ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ভিজছে। প্রথম দিন কারুর সঙ্গেই দেখা হয়নি। পরের দিন গিয়ে দেখি, রেস্তোরাঁর মধ্যে আমাদের দলটি বসে আড্ডা মারছে। আমিও ভিড়ে গেলুম। মঁসিয় কোতোঁয়া কফি খাওয়ালেন। হাসতে হাসতে বললেন.—"কি ছবি আঁকলেন মশাই, একেবারে আকাশ ছিঁড়ে গেল!"

সকলের হাসির মধ্যে আমি কি জবাব দেব ভাবছি। হাই তুলে মিশ. ফোড়ন কাটলে,

—"সেলাই করার চেষ্টা দেখতে পারেন মঁসিয়। আপনার পূর্বপুরুষদের কে যেন দর্জি ছিল না, বলছিলেন!"

বৃষ্টি থামাবার উপায় হিসেবে এক একজন এক একটি ফরমুলা বের করছে। অভিনব আইডিয়া দেনিসের

—"এসো। আমরা সবাই বুকে বুকে তেল রংয়ের সর্ষে এঁকে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি চত্বরে!"

দিশী প্রবাদটি শুনিয়ে দিলুম এই প্রসঙ্গে। সেই যে ব্যাঙ মেরে চিৎ করে শুইয়ে রাখলে কি যেন হয়! বৃষ্টি থামে কিংবা নামে। ঠিক ঠিক মনে নেই। 'থামে' বলেই চালিয়ে দিলুম।

লিয়' কম কথা বলে। গম্ভীর মুখে মন্তব্য করা হল,

—"বৃষ্টি থামুক, না থামুক, দেনিস বুকে সর্ষে এঁকে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে মোটামুটি ব্যাঙের মতোই দেখাবে!"

বরফ-ঝরাপাতি প্রায় বন্ধ। অলস আড্ডা মেরে যেটুকু মেজাজ ঠিক রাখা যায় তারই চেষ্টা চলছে। যদিও আলোচনার বিষয়ও সেই থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি থোড়। তুষার-আকাশ-বৃষ্টি। বৃষ্টি-আকাশ-তুষার-পাত।...

আবার টোকা পড়ল দরজায়। বেশ জোরে এবার। আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালুম। মুখহাত ধোবার বেসিনের কাছে ধুমসো বর্ষাতিটা ঝুলছে। মনে মনে ঠিক করলুম, যে করে হোক আজকেই এটার একটা গতি করতে হবে। চেনাশোনা কাউকে গছিয়ে দেব। যা পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে দরজা খুলে দিলুম। ও হরি! এ কে!

স্টালিনের গোঁফ এবং দুষ্টুমির হাসি-সমেত জর্জ বোয়াগুনেতিয়ে। চ্যাপলিনের মতো মুণ্ডু ঝাঁকিয়ে চোখ পিট পিট করল। নাটকীয় গলায় বলল,

—"ব' জুর, মঁসিয়।"

ভীষণ ভালো লাগল অনেক দিন পর ওকে দেখে। হাত ধরে ভেতরে টেনে আনতে আনতে বললুম,

—"আরে! কি কাণ্ড! এসো, এসো!"

ঘরে ঢুকেই প্রথম শব্দটি বেরলো ওর মুখ থেকে

—"বাহ্!"

তারপর, আমাকে সরিয়ে পেইন্টিংগুলির দিকে এগোতে এগোতে বলল,

—"কাজ শুরু করে দিয়েছো, ইন্ডিয়ান! সাবাশ!"

জর্জের হাত থেকে ভেজা ওভারকোটটা নিয়ে টাঙিয়ে দিলুম। বললুম

—"জানী-ফিলিপ কেমন আছে?"

ছবির দিকে চোখ রেখেই ঝুপ করে বসে পড়ল খাটে। পাশ কাটাবার মতো জবাব ছুঁড়ে দিল,

—"ভালো, ভালো। সব ভালো।"

তারপর ঘুরে আমাকে দেখে বলল,

—"এখন বিরক্ত কোরো না তো! আগে ছবি দেখি! ততক্ষণে তুমি এক কাপ কফি করো ভায়া। শীতে জমে গেছি একেবারে।"

কফির জল চাপিয়ে দিলুম। জর্জ একটার পর একটা ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। কখনো দূর থেকে, কখনো কাছে গিয়ে নিজের মনে তন্ময় হয়ে দেখছে।

আমার বর্ষাতিটি হ্যাঙার থেকে নামিয়ে আনলুম। ভেতরে ভেড়ার লোম কেমন হলদে মতন হয়ে গেছে। বাইরের তারপোলিন প্রায় অক্ষতই বলা যায়। তবে ভীষণ নোংরা দেখাচ্ছে। কলারের কাছে সেলাই খুলে গেছে খানিকটা। এখনো শীতে-বর্ষায় দারুণ মজবুত।

ঈভলীন হাসতে হাসতে বলেছিল,

—"এখান থেকে তোমার কি আলাস্কায় যাবার প্ল্যান আছে নাকি, শিল্পী?"

কোটের বোতাম আটকে বলেছিলুম,

—"যতই হাসো তুমি। এই সাংঘাতিক তুষার-বৃষ্টিতে এটা না থাকলে মরে যেতুম!"

মেট্রোর সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ও জিগেস করেছিল,

—"পেলে কোত্থেকে এই কিম্ভূত গরম বর্ষাতি?"

পর পর তিন চার দিন ঈভলীনের সঙ্গে বেরিয়েছিলুম বৃষ্টি মাথায় করে। ওর গাড়ি ছিল না। সার্ভিসে দেওয়া হয়েছে। মেট্রোয় চেপে, হেঁটে হেঁটে প্যারিসের নানান গ্যালারীতে ঘুরেছি। আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যালারী, বড়, মাঝারি এমন কি ভ্যাপসা খুদে গ্যালারীও বাদ দিইনি। বুলভার সাঁ জামাঁন, সাঁ মিশেলের অলিগলি কিংবা শাঁ-জে-লিজের প্রশস্ত রাস্তার গ্যালারী থেকে শুরু করে স্যেন নদীর গায়ে গায়ে মুদিখানা সাইজের ঘুপচি গ্যালারী ঘুরে দেখলুম। 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই' এক চিলতে কোথাও। শুধু ফরাসী দেশেই চল্লিশ হাজার শিল্পী বউ। তাছাড়া, পৃথিবীর নামী-দামী ছবি আঁকিয়েও আসছেন এখানে। কোথাকার এক দরিদ্র নামবিহীন বদনামী শিল্পীর জন্যে মাথা ব্যথা নেই কারো। দিল্লির এক পেইন্টার নাকি তিন মাস এ রাজ্যে দশাসই ছবি কাঁধে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মেজোর কানাইবাবু বলেছিল। আমার বয়সী কলকাতার কানাই হালদার। শহর তলির কোন কলেজে ফরাসী শেখায় বা শেখাতো। দুম্ করে স্কলারশিপ বাগিয়ে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর শিক্ষা লাভের জন্যে প্যারিসে হাজির। বছর খানেক হতে চললো মেজোতে আছে। দেশে আছেন স্ত্রী, একটি শিশুপুত্র, বাবা মা ইত্যাদি ইত্যাদি যাদের থাকা উচিত। দু বেলা ঘরের দরজা বন্ধ করে আহ্নিক করে কানাই হালদার। গরু খায় না। মদ ছোঁয় না। সাত্ত্বিক ছাপোষা মানুষ। এর কথা পরে সময় বলব, বউ।

কানাইবাবু বলেছিল,

—"দিল্লির পেইন্টার শেষ কার বাড়ির ড্রয়িং রুমেই তার ছবির প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্যারিসের কোনো শিল্প রসিক, সমালোচক, কাগজওয়ালারা যায়নি সেখানে। সেই ঘরোয়া প্রদর্শনীটি করে সমস্ত ছবি ঘাড়ে আবার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।"—

কানাই হালদারের মুখে নাম শুনতেই চিনতে পারলুম। তুমিও বোধ হয় নাম শুনে থাকবে, বউ। দেশে ফিরে তার সে কি তর্জন-গর্জন! হ্যান কিয়া, ত্যান কিয়া—হুঁহুঁ বাবা, প্যারিসের মতো জায়গায় প্রদর্শনী কিয়া!

সেদিন স্যেন নদীর গায়ে গায়ে ঘুরছি দুজনে। ঈভলীন দূরে আঙুল তুলে দেখাল। বলল,

—"ওই আর একটা গ্যালারী মনে হচ্ছে। চলো!"

গত দুদিন ঘুরে ঘুরে আমার উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়েছে। ঈভলীন দমেনি। মেলায় যেমন নতুন নতুন খেলনার দোকান দেখে শিশুরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, বাবা-মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় একটার পর একটা স্টলে, ঈভলীন ঠিক তেমনি

বছর আসে, বছর যায়
ছন্দসুষমা রয় অক্ষয়!
পরশুরাম থেকে পাবেন স্যানিটারীওয়্যারে পাঁচটি
চমৎকার প্যাস্টেলের রঙের সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে
বর্ণাঢ্য টাইলের একশটিরও বেশী অপূর্ব ডিজাইন। তাই
আপনার বাথরুমও স্থায়ী শোভায় ঝকঝক করে। কারণ, পরশুরাম
টাইল আর স্যানিটারী ওয়্যার তৈরী করা হয়,
এমন উচ্চ-স্তরের সেরামিক দিয়ে যা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
না আর অতি সহজে পরিষ্কার ক'রে সবসময়
ঝকঝকে রাখা যায়। এর পিছনে রয়েছে ইয়োরোপের
অগ্রগণ্য স্যানিটারীওয়্যার নির্মাতা পোর্চার গ্রুপ-এর কারিগরী সহযোগিতা।
national 599
Parshuram
পরশুরাম
বোম্বাই অফিস:
জলি ভবন, নং ১, ২১১/২১২,
১০, নিউ মেরীন লাইনস,
বোম্বাই ৪০০০২০।
টেলিফোন: ২৫৪৪৩১
পরশুরাম পটারী ওয়ার্কস কোং লিঃ মোর্ভী, (গুজরাট)
নয়াদিল্লী অফিস:
৪০৫, এ, রোহিত হাউস,
৪র্থ তলা, কনট প্লেস,
টলস্টয় মার্গ, নয়াদিল্লী ১১০০০১
টেলিফোন: ৩৮৫৭৯৪।

করে আমায় নিয়ে ঘুরছে। আর, আমার কানের কাছে শুধু শুনতে পাচ্ছি, নানান্ গলায় একই কথা ঘুরে ঘুরে,

—'এ দোকানে হবে না, মঁসিয়ে। অন্য দোকান দেখুন—'

প্যারিসে পা রাখার প্রথম দিন জর্জ এবং জানী আমার দিকে কেন অবাক চোখে তাকিয়েছিল, যখন জানিয়েছিলুম ছমাস মতো থেকে, প্রদর্শনী না করে যাবো না; কেন বলেছিলো ওরা,

—'ভালো। ভালো কথা। তুমি খুব আশাবাদী শিল্পী—সেদিন বুঝতে পারিনি কিছুই, আজ সব অক্ষরে অক্ষরে টের পাচ্ছি। জর্জ ঠিকই বলেছিল,

—'ধীরে শিল্পী, ধীরে। সব টের পেয়ে যাবে আপনাআপনি।'

খোলাখুলি এখানকার অবস্থা আলোচনা করলে আমি পাছে গোড়াতেই দমে যাই, সেইজন্যেই ভেঙে ওরা কিছুই বলেনি আমাকে।

গ্যালারীটির ভেতরে ঢুকে খোঁচা দেবার মতো ঈভলীনকে বললুম,

'উহুঁ! একে তো গ্যালারী বলা যাবে না সুন্দরী। দোকান বললে আপত্তি করব না!'

আমার হাতে চাপ দিয়ে নিচু গলায় বলল,

—'আহ্ কি হচ্ছে কি! ভদ্রলোক শুনতে পাবেন। আমার চেনা লোক।'

তাকিয়ে দেখি কোণের দিকে উঁচু টেবিলের পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে আছে যেন মানুষটি। পিট্ পিট্ করে দেখছে আমাদের। ঈভলীনকে জিগ্যেস করলুম,

—'কি রকম চেনা?'

—'না, তেমন কিছু না। তবে যদ্দুর মনে হচ্ছে, ইনি এই এলাকার কোনো গীর্জার পাদরী ছিলেন। হয়তো এখনো আছেন, জানি না। মুখটা চেনা-চেনা। এসো ভগবানের নামে এঁকেই পাকড়াও করি গ্যালারীর জন্যে। চেনা মুখ যখন কপাল আমাদের খুলে যেতে পারে!'

ঈভলীনের মুখে আমাদের শব্দটি শ্রুতির মধ্যে দিয়ে আমার মস্তিষ্ক ছুঁতে ছুঁতে হৃদয়টিতে অবধি চলে গেল। গিয়ে, মেঝে পরিষ্কার করে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল যেন। চোখের কোণে মেয়েটিকে দেখে নিলুম। ও পাদরী সাহেবের কি সব কথা বলছে ফিস্‌ফিস্ করে। আমি সেই 'আমাদের' শব্দটির গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে ভাবলুম, ঈভলীন ছবি বোঝে না। আমার ছবি যে কটি আঁকা হয়েছে তাই দেখেই উচ্ছ্বসিত। বুঝুক না বুঝুক, আমি যেন গভীর পুজোর কাজে লেগে গেছি, এমনি এক শ্রদ্ধা জড়ানো চোখে ও বলেছে,

—'বেশ হয়েছে। আমি জানি ইণ্ডিয়ান, খুব ভালো হয়েছে। বুঝি তো না কিছু, তবে তুমি খারাপ ছবি আঁকবার মতো শিল্পী নও, এটা আমি ষোলো আনা বুঝি।'

প্রদর্শনীর জন্যে গ্যালারী না পাওয়া যেন ওরও দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। শুধু আমার একার নয়, দুজনেরই কপাল খারাপ। আমাদের।

তিন দিকের দেওয়ালে গিজগিজ করছে ছবি। নিসর্গ চিত্র, স্টাডি, স্কেচ সব একেবারে খিচুড়ির মতো ঝুলছে। টেবিলে রাখা একটি স্যুভেনির তুলে নিলুম। শিল্পীর নাম এবং ছাপা ফোটো দেখে ঈভলীন বললে,

—'ও বাবা! এ তো নামকরা আর্টিস্ট।'

বললুম,

—'তাই নাকি!'

বলে আবার একবার দেওয়ালজোড়া খিচুড়ি দেখে নিলুম।

ও বললে,

—'এঁর পেইন্টিং থেকে আমাদের কোম্পানী ক্যালেন্ডারও বানিয়েছে।'

রাস্তা থেকে দেখে মনে হয়েছিল একটাই ঘুপচি ঘর। এখন, বাঁ দিকের দেওয়ালে ছোট্ট দরজা আবিষ্কার করলুম। ওপাশেও ঘর আছে। ছবি ঝুলছে। এসব ছবির দিকে চেয়ে থাকা বেশ কষ্টের ব্যাপার। চোখ সরিয়ে ভালো করে পাদরিকে দেখলুম। ঈভলীন বোধ হয় চিনতে ভুল করেছে। গোলমাল তো হয়ই। কে জানে! তবে চোখ মুখ দেখে প্রশান্ত কোনো ধর্মযাজকের ছবি আমার মনে পড়ল না। ডেঁয়েটে বদমাস, চশমার আড়ালে খিটখিটে যজমান বা আমার চেনা জগতের বামুন পুরুতঠাকুর মনে পড়ল, যারা লুকিয়ে তন্দুরি চিকেন চিবোয়। সাদা সোয়েটার গায়ে এই বুড়ো বা আধাবয়সী লোকটি যদি আদৌ পাদরী হয়, তাহলে, মনে মনে ঠিক করলুম, গ্যালারী না দিলে, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার আগে এঁর কানে কানে বলে যাবো,

—'দাদু, পাদরী আপনাকে মানায় না। ছবি টবির মধ্যেও বড্ড বেমানান আপনি। দোকান খুলুন! মাংসের দোকান খুলুন, ভালো বিকি-কাটা হবে।'

এক একটা লোক হয় না যাদের প্রথম দেখলেই অপছন্দ হয়ে যায় মানুষ হিসেবে, পরে হয়তো দেখা গেল হীরের টুকরো! অথচ গোড়াতেই কোনো বিশেষ কার্যকারণ ছাড়াই এক একটা মুখের আদল কেমন অপছন্দের দিকে ঠেলে পাঠায়। এই পাদরীটিও তেমনি। টকটকে ফর্সা মুখে মুচকি হাসির চেষ্টার দিকে চোখ পড়লেই উচ্ছে করলার মতো তেতো স্বাদ লাগে জিভের ডগায়। চুলতে ... অথচ চঞ্চল চোখদুটি দেখলে শ্রদ্ধা জাগার কথা নয়। আমার অন্তত শ্রদ্ধা উথলে উঠল না। তবু, পাদরি যখন,

—'বঁ জুর, ফাদার!'

ঈভলীনও গদগদ গলায় সুপ্রভাত জানাল।

উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঈভলীনকে বললেন,

—'গুড রেস!'

তারপর, আমায় জিগ্যেস করলেন,

—'তুমি কি ইন্ডিয়া থেকে আসছো?'

ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁ।

আমার হাত ছাড়েননি তখনো। চোখে চোখ রেখে সরিয়ে নিচ্ছেন বারবার। আবার রাখছেন।

বললুম,

—'আমি শিল্পী। তেল রংয়ের ছবি আঁকি।'

খুব খুশির ধরনে মাথা দুলিয়ে বললেন,

—"বাহ্! খুব ভালো!"

ঈভলীন সঙ্গে সঙ্গে কলকল করে উঠল,

—"খুব ভালো আর্টিস্ট, ফাদার। দারুণ সব ছবি এঁকেছে, আঁকছে।"

প্রসঙ্গ এড়িয়ে পাদরী খবর দিলেন,

—"আমার গ্যালারীতে বেশ কয়েক জন ইন্ডিয়ানের এক্সপোজিশন হয়েছে।"

দম করে বললুম,

—"আমাকে একটা সুযোগ দেবেন? অবশ্যই, যদি আমার ছবি পছন্দ হয়!"

হাত ছাড়ে না কেন পাদরীসাহেব! ঘামতে শুরু করেছি হাতের মধ্যে। পায়ে পায়ে ঘুরে দেওয়ালের খিচুড়ি দেখিয়ে চললেন,

—"কেমন লাগছে, শিল্পী?"

—"বেশ ভালোই তো!" কোনো রকমে বলে দিলুম।

—"খুব ভালো ছবি। নামকরা আর্টিস্ট এখানকার!"

নাম করা হলেই ভালো ছবি-আঁকিয়ে হবেন, এমন কথা শাস্ত্রে লেখা আছে কিনা আমি জানি না, বউ! যদি থাকে, তবে তা শাস্ত্রেই থাকুক! পাদরী আমাকে টেনে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। এটি আরো ছোট ঘর। 'কুঠুরি' বললেই ঠিক বলা হবে। দেওয়ালময় নাম-করা শিল্পীর ছবি!

ঈভলীনও পেছন-পেছন এসে পাদরীর অন্য পাশে দাঁড়িয়েছে। ওকে যেন পাত্তাই দিচ্ছেন না সায়েব। আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে। ঈভলীনকে বললুম,

—"কেমন লাগছে ছবি?"

আমাদের দুজনের মধ্যিখানে পাদরী দাঁড়িয়ে। সরাসরি দুজনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছি না। অল্প সামনে ঝুঁকে আমায় দেখে নিয়ে ঈভলীন বললো, ঠিক আমার বলার ধরনে,

—"বেশ, ভালোই তো। গ্যালারীটিও ছোটোখাটোর মধ্যে সুন্দর।"

সায়েবকে জিগ্যেস করলুম আবার,

—"আমাকে প্রদর্শনী করবার একটা সুযোগ দেবেন এখানে?"

আমার পিঠে হাত রাখলেন সস্নেহে। বললেন,

"গ্যালারী তো গোটা বছরের জন্যে 'বুক' হয়ে আছে। একটা সপ্তাহও খালি নেই। তবু, দেখি আগে তোমার ছবি-টবি কেমন!"

ঈভলীন আরেক দফা আমার প্রশংসা জুড়ে দিল। কিন্তু আমি আর শুনতে পাচ্ছি না কিছুই। কারণ, আমার সমস্ত শরীর রাগে, ঘেন্নায় রি রি করতে আরম্ভ করেছে তখন।

এই কুঁজো বুড়ো হারামজাদা যদি পাদরী হয়েই থাকে, এবং ঈশ্বর-টীশ্বর ইত্যাদি ও তাঁর ঘর বলে কিছু থেকে থাকে,
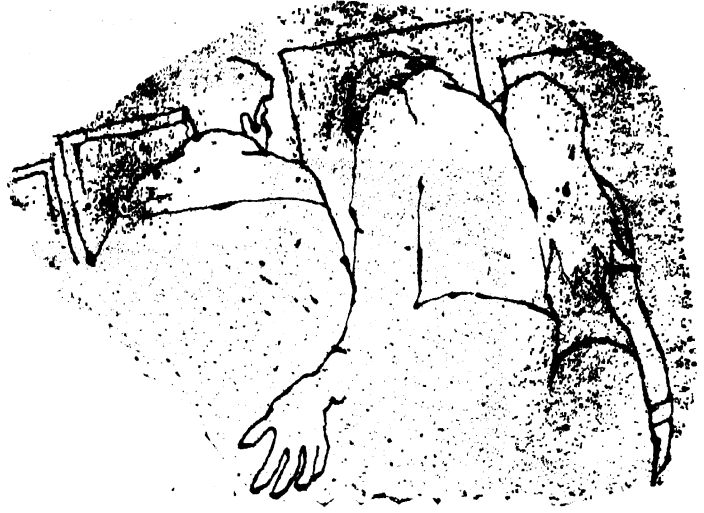
পাদরির 'স্নেহময়' হাত কাঁপতে কাঁপতে

তবে সেই ঘরে বড় ধুলো জমছে। সাফ করা দরকার। প্রচুর ফিনাইল ঢেলে সাফ করবার সময় হয়েছে। কারণ, পাদরীর সেই 'স্নেহময়' বাঁ হাত কাঁপতে কাঁপতে আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে। নামতে নামতে, নামতে নামতে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে মেরুদণ্ড আমার। যদিও পশ্চিমের কোনো কোনো রাজ্যে আইনত এসব কোনো বিকৃতি নয়। গীর্জা-আদালত সাক্ষী রেখে পুরুষে পুরুষে বিয়ে শুরু হয়ে গেছে। তবু, আমার অপটু শরীরের মনের শিরদাঁড়া বেয়ে ঘৃণা নামতে থাকে।

ভগবান অথবা ভালোবাসা কাহাকে বলে আমার জানা নেই, বউ। তোমার ঘরের কোণে কুলুঙ্গিতে একটা ছোট্ট রুপোর মূর্তির সামনে প্রদীপ, ধূপধুনো জ্বলে। বিশ্বাস, সংস্কার অথবা ভয়ের থেকেই জ্বলে। জ্বলুক। তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। দু' চারজন অসামান্য মানুষের মধ্যেই কিছু শ্রদ্ধেয় শক্তি লালিত। যাঁদের তোমরা ভগবান বানাও, অবতার বানাও। ভেজাল ঘিও 'গব্যঘৃত' হয়ে চলে যায় ভয়ের, সংস্কারের বাজারে। এ ক্ষেত্রে ঠিক বিশ্বাস কিনা তা বুঝতে পারছি না। ভয়ের থেকে তো নয়ই। শুধু ধুলো জমছে দেখে সেই অদেখা অদৃশ্য শ্রদ্ধার ঘরের জন্যে আমার কষ্ট হল।

আহা রে! মাথায় কাঁটার মুকুট পরা, পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে ঝোলানো, পুরাতন এক রক্তাক্ত কুমার শরীরকে পুজো দেবার বদলে এই সাদা শুয়োর পদরীটির বাঁ-হাত কেমন অবলীলায় আমার মেরুদণ্ডের শেষ হাড়ে পৌঁছে মাংসের দেওয়ালে আদর করার মতো থরথর কাঁপছে!

ক্রমশ

ঘরে বাইরে

মেক্সিকোতে মহিলা বৈঠক

২৩শে জুন থেকে ৪ঠা জুলাই পর্যন্ত মেক্সিকো সিটিতে কনফারেন্স হয়ে গেল। বিষয় ছিল মহিলা বৎসরের উদ্দেশ্যগুলি— সাম্য, প্রগতি ও শান্তি।

মেক্সিকো দেশটি রোমাঞ্চময়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মায়া, জাপোটেক, টলটেক, আজতেক সভ্যতা একের পর এক এসেছে গিয়েছে। ভারতবর্ষের মত মহামানবের সাগরতীর বলে অনেকে মেক্সিকোর সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করেছেন। তাদের দেশের ভুট্টার রুটি 'টরটিলা' আর 'ফ্রিজোল' বিনের তরকারী আমাদের চাপাটি আর ব্যঞ্জনের মত। সোনারুপোয় ছড়াছড়ি, সুন্দরী সেনোরিটারা পথেঘাটে মিষ্টি হাসিতে আপনাকে পথ ভুলিয়ে দেবে। আকারে ব্রিটেন, ফ্রান্স জার্মানি একত্র করলে যা হয় তার চেয়েও বড়। মেক্সিকো আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ও মধ্য আমেরিকার মাঝখানটি জুড়ে আছে। মেক্সিকোর রুপো দিয়ে প্রথম চীনে ডলার তৈরী হয় এবং তৈরীও হয় মেক্সিকোরই টাঁকশালে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহুদিন পর্যন্ত চীনে ডলারকে বলা হতো ডলার মেক্স। মেক্সিকোর 'কাউবয়' সে-দেশের জগৎজোড়া জনপ্রিয়তার আর একটি দিক।

এই সুন্দর দেশের রাজধানী মেক্সিকো সিটি। সমুদ্র থেকে ৭,৩৫০ উচ্চতা। মালভূমির মাঝখানে মেক্সিকো সিটি। পূর্ব আর পশ্চিম উপকূলে প্রায় সমান দূরে। দক্ষিণে রয়েছে এবড়োখেবড়ো আজুস্কো পাহাড়, দক্ষিণ পূর্বে তুষারধবল পোপোকাতোপতেল গিরিশৃঙ্গ। উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে পুরোনো শহর মেক্সিকো সিটি। ১৩২৫ সালে আজটেকরা তৈরী করেছিল। লেক টেক্সকোকোর ছোট ছোট দ্বীপে মাটি আর নলখাগড়া দিয়ে গ্রাম তৈরী করেছিল তারা। নাম দিয়েছিল মেক্সিটলি। মেক্সিটলি ছিলেন আজটেকদের যুদ্ধদেবতা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মাটির কুটিরের বদলে পাথরের বাড়ি এল। তাও ধ্বংস হলো স্প্যানিশ বিজেতাদের হাতে। কিন্তু বিজেতারাই বানালেন নতুন শহর। আজ অভিজাত পশ্চিম দিক আর গরীব অধিবাসী বহুল পূর্ব দিক মিশেছে একটানা স্বাপত্যে। ভূমিকম্প হয় প্রায়ই। তাই আধুনিক বড় শহরের তুলনায় মেক্সিকো সিটি শহর আকাশচুম্বী, গগনস্পর্শী আধুনিক অসুন্দর আর সব নগরের মত নয়।

আলাপ-আলোচনার বিষয় অনেক। সারা জগতে জানাতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কি, নারী কি করছে এবং কি করতে পারে। মানুষের দাবীতে সে পুরুষের সমান অধিকার পেতে পারবে কিনা এসব নানা আলোচনায় কনফারেন্স নূতন জীবনধারার প্রতি আলোকপাত করছে বলে আমরা ভরসা নিয়ে আছি। উত্তর কালের অপূর্ব সাম্য আর স্বাধীনতা হয়তো আর স্বপ্ন হয়ে থাকবে না। ইবসনের যুগ পিছনে রয়ে গেছে। কিন্তু সামনেও দুর্গম পথ। ইবসেন ১৮৭৯ সালে "A Doll's House"-এ দেখিয়েছেন হেল্‌মার বলছেন—সবার আগে তুমি পত্নী এবং জননী। নোরা বলছেন, আমি আর তা বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি আমি মানুষ, সবার আগে আমি তাই। যা তুমি আমিও তাই। অন্তত তাই হতে আমি চেষ্টা করবো। হেলমার কি বললেন? তুমি শিশুর মত কথা বলছো। যে সমাজে তুমি বাস কর সে সমাজ তুমি জান না।—না আমি জানি না। কিন্তু এখন থেকে জানতে বুঝতে চেষ্টা করবো। মন এবার স্থির করে ভাববো কে ও কি সত্য এবং খাঁটি। আমি না সমাজ?

সেই সমাজের পরিবর্তনে মহিলা বৎসরের এত ধুমধাম করা আয়োজন কতটা করলেন, আমরা আগ্রহে সেদিকে চেয়ে থাকবো। আশা করি, ধুমধাম আর বক্তৃতা এবং বেড়ানোতেই সত্য সন্ধানের শেষ নয়। আমাদের সেই ১৮৭৯ সালেরই মত ভাবনা দিয়েই ভাবীকাল ভরে থাকবে না।

শৃঙ্গ বিজয়িনী

খবরটি আর নূতন নেই। তবু শ্রীমতী জুনকো তাবেই-এর এভারেস্ট বিজয় ইতিহাসের এক অধ্যায়। আলোচনা করার মত। ৩৫ বছর বয়সের জাপানী ঘরনী। গতানুগতিক, নীরস, একঘেয়ে নারীজীবনের ক্লান্তিকে দূরে রেখে যে কৃতিত্ব ও রোমাঞ্চকর বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন তা সারা দুনিয়ার নারীসমাজের এক অভিনব পদক্ষেপ। শ্রীমতী হিসানো ছিলেন এ দলের দলপতি। তিনিও ঘরনী। ১৯৩৩ সালে তাঁর জন্ম। তিনি এর আগে ১৯৬৮ সালে ভারত-জাপান মিলিত পর্বত অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। সেও সম্পূর্ণ নারীদলের অভিযান ছিল। এর পর ১৯৭০ সালে অন্নপূর্ণা অভিযানেও ছিলেন। অন্নপূর্ণার নারী অভিযানে শ্রীমতী তাবেইও যোগ দিয়েছিলেন।

এবারের অভিযান জাপানী মহিলাদের অভিযান। হিসানো এবং তাবেই ভিন্ন দলে

জাপানের মেয়ে পুলিস
(সৌজন্য ইউনাইটেড নেশনস)

ছিলেন কুমারী মিচিকো মানিটা। তিনি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। অন্নপূর্ণা অভিযানে ইনিও ছিলেন। কুমারী ফুমি নাসু '৭৪ সালে যে জাপানী মহিলা দল এভারেস্ট পরিদর্শন পরিক্রমায় গিয়েছিলেন তাতেও ছিলেন। তার দলপতি হিসাবে নিরীক্ষার কাজ করেন। শ্রীমতী ওয়াটানাবোও ঘরনী। শ্রীমতী মাসাকো নাগানোমা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষয়িত্রী। এ ছাড়া ছিলেন কুমারী হিরাসিমা। ১৯৭৪ সালের নিরীক্ষা দলের সভ্য হিসাবে এসেছিলেন। কুমারী ইয়োকো মিহারা জাপান মনোপলি কর্পোরেশনে কাজ করেন। ঘরনীবহুল এ অভিযান সদ্য প্রমাণ করেছে যে, মেয়েরা সুযোগ পেলে সবই পারেন। রান্নাঘর তাদের উৎসাহ দমাতে পারে না।

এভারেস্ট বিজয়ের ইতিহাসও খুব অনেক দিনের নয়। পূর্ব হিমালয়ের তিব্বত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ১৮৫৬ সালে পর্বতশিখরটির সন্ধান মেলে। সে সময় স্যার জর্জ এভারেস্ট ছিলেন ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল। গণিতের ত্রিকোণমিতিক অর্থাৎ Trigonometryর হিসাবে ২৯,০০২ ফুট উচ্চতা ধরা হয়। আজও তাই সাধারণের জন্য official উচ্চতা। তবে এর অন্য হিসাবও মাঝে মাঝে কেউ কেউ দিয়েছেন।

এভারেস্ট যে জগতের উচ্চতম পর্বতশিখর মাত্র তা কিন্তু নয়। এভারেস্ট ভাকাস, মহিমাময় ও সাংঘাতিক এবং দুর্গম। কনকনে বরফের মত হাওয়া দারুণ ঠান্ডা, হিমবাহ ও নদীতুল্য তুষাররাশির মাঝে মাঝে চিড় বা ফাটল পর্বতারোহীকে পদে

পদে বিপন্ন করে। তুষারপাত চারদিকের পরিস্থিতিকে নিয়ত পরিবর্তিত করতে থাকে।

এক সময় তিব্বতের অনুমতি পাওয়া কঠিন বলে এভারেস্ট অভিযান সম্ভব ছিল না। ১৯২০ সালে দলাই লামা দয়া করে একটি ব্রিটিশ অভিযানকে অনুমতি দিতে রাজী হন। ১৯২১ সালে হাওয়ার্ড বেরির অধিনায়কত্বে অভিযান যায়। তখন তিনটি বিপদ তাঁদের সবচেয়ে বিপন্ন করেছিল। বাতাসের হালকা ভাব, আবহাওয়ার বেপরোয়া ওলটপালট এবং ভার বহন করার অসুবিধা। বর্ষার আগে মে মাসে অথবা বর্ষার পর সেপ্টেম্বর মাস ভিন্ন আর কোনও সময় শৃঙ্গ অভিযান সম্ভব নয়। এবারও তাই দলটি মে মাসে যান। তা সত্ত্বেও ওরা মে শ্রীমতী তাবে তুষারস্তূপে চাপা পড়েন। তাঁর যা আঘাত তা সামলিয়ে তার পরেও অসমসাহসী এই মহিলা এগিয়ে চলেছিলেন।

এরিক শিপটন নামে এক অভিযানকারী একবার বলেছিলেন, এভারেস্টের উপরের দিকে চলবার সময় যাত্রীর অবস্থা হয় "কোন অসুস্থ ব্যক্তি যেন স্বপ্নের ঘোরে পাহাড়ে উঠে চলেছেন।" তারপর অক্সিজেন

জল-জননী চুমুলংমা থেকে ফিরে শ্রীমতী গান্ধী সকাশে জাপানী মহিলা পর্বতারোহিনী দল। ডান দিক থেকে দ্বিতীয় হচ্ছেন তাবেই

সিলিণ্ডার নেওয়া আরম্ভ হয়। অক্সিজেন সিলিণ্ডার শেষ ঘাঁটিতে পর্যন্ত শ্রীমতী তাবেই দুটি নিয়েছিলেন। তারপর একটি রেখে একটি নিয়ে উপরে ওঠেন। ফেরার পথে দ্বিতীয়টি আবার তুলে নেন। ভার হালকা করার জন্য এ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন—প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বললেন। বেরির পর বাইশ বছর কেউ এভারেস্টে পৌঁছতে পারলেন না। সেই চুমুলংমা সাধারণের কাছে স্বপ্নের দেবীই রইলেন। তিব্বতী ভাষায় চুমুলংমা মানে জগতের পবিত্রতমা জননী। চুমুলংমার বহু অভিযানের পর দেখা গেল জননী বিরূপ। ১৬টি প্রাণ গেল। তারপর অনেক দিন আর অভিযান হয়নি। ১৯৫১ সালে এরিক শিপটন দক্ষিণ দিক থেকে ভাল করে নিরীক্ষা করার জন্য গেলেন। নেপাল দিয়ে পথ। শিপটনই সেবার সেই ইয়েতির বা তুষারমানবের পায়ের ছাপ-এর ফটোগ্রাফ নিয়ে আসেন। সেই জীবটির কোন চিহ্ন এঁরা দেখেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সবাই সমস্বরে বললেন, 'না, কোনরকম কোন চিহ্ন তাঁরা পাননি।' কিন্তু শিপটনের রিপোর্ট নিয়ে বহু দিন সারা দুনিয়া তোলপাড় হয়েছে। আজও অনেকে অনেকরকম বিশ্বাস করেন। তবে সেটি কি জীব বা কি খায়, জানা যায়নি। প্রাণিতত্ত্ববিদরা কেউ বলেন, বাঁদর বা হনুমান হতে পারে। কারও বা মত, এটি একটি ভল্লুক জাতীয় জীব। শিপটন শেষ পর্যন্ত মানেননি বটে কিন্তু তাঁরই সংগ্রহ করা তথ্য সম্বল করে হাণ্ট তাঁর অভিযান নিয়ে যান ১৯৫৩ সালে। সর্বোচ্চ ঘাঁটিতে উঠে ২৯শে মে দুটি মানুষ এভারেস্টের দিকে এগিয়ে গেলেন। এডমণ্ড হিলারি নিউজিল্যাণ্ড-বাসী। মধুমক্ষিকার পালন তাঁর ব্যবসায়। পর্বতারোহণ তাঁর শখ। হিলারীর সঙ্গে ছিলেন ভারবাহী শেরপা তেনজিং। তেনজিং আগেও বহু অভিযানে গেছেন। এবার দুজনে জয় করলেন শিখরশীর্ষ। এই প্রথম মানুষের পদক্ষেপ চুমুলংমার কোলে।

চুমুলংমার বুকে শ্রীমতী তাবেই দাঁড়িয়েছিলেন আধ ঘণ্টা। বললেন, এমন অদ্ভুত আনন্দে তাঁর মন ভরেছিল যে, নামতে নামতেও থমকে দেখছিলেন। ১৫ মে সকালবেলা তাঁর সব সাধনা সর্থক হলো। প্রেস রিপোর্টার দলনেত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সবাইকে বাদ দিয়ে কেন তাবেইকে তিনি উপরে পাঠালেন। উত্তরে দলনেত্রী বললেন যে, সকলের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে, স্বাস্থ্য দেখে তিনি তাবেইকেই উপযুক্ত মনে করেছিলেন।

তাবেই ভাল ইংরাজী জানেন না। দোভাষী একটি জাপানী ভদ্রলোক বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু দোভাষীও তথৈবচ। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাঙা ইংরাজী আর সুন্দর হাসি দিয়ে তাবেই মোটামুটি কাজ চালালেন। খুব সাধারণ সাদাসিধে মানুষ। মনেই হয় না, সদ্য এমন একটি অসাধ্য সাধন করে এসেছেন। জননী চুমুলংমারই শক্তি যেন তাবেই আর তার দলকে দিয়েছে নারীত্বের মাধুরী আর মহিমা এক সঙ্গে।

আটার ব্রাউনি

উপকরণ ও পরিমাণ: কোকো বড় চামচের চার-পাঁচ চামচ।

মার্গারিন—½ কাপ।

ফেটানো ডিম—২টি।

চিনি—১ কাপ।

আটা—¾কাপ।

বেকিং পাউডার চায়ের চামচের আধ চামচ।

বাদাম বা আখরোট কুচি ½ কাপ। তবে না হলেও চলে যাবে।

প্রণালী: ১। কোকো এবং মার্গারিন ও ডিম আর চিনি একত্র মিশিয়ে নিন ভাল করে।

২। শুকনো সামগ্রীগুলি এবার মেশান ঐ গোলার সঙ্গে।

৩। বাদাম, আখরোট, কাজু ইত্যাদি যদি দেন তবে এ সময় মেশাবেন।

৪। মিশ্রণটি মিনিটখানেক খুব ফেটান।

৫। এবার মাঝামাঝি তাপে অগভীর পাত্রে তেলমাখা কিছু মাখিয়ে বেক করে নিন। মিনিট ২০ লাগবে। ঠাণ্ডা হলে চৌকোণ করে কেটে পরিবেশন করুন। অতি উপাদেয়।

শ্রীমতী

ভারতের অর্থনীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নতুন সাহায্য নেওয়া প্রসঙ্গে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড চলতি বছরে ভারতকে ১৫২ মিলিয়ন ডলার (১২১·৬ কোটি টাকা) সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব মার্কিন কংগ্রেসের কাছে পাঠিয়েছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হবার পর ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতে মার্কিনী অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার চার বছর পর আবার ভারত মার্কিনী সাহায্য পেতে যাচ্ছে। যত দূর জানা গেছে, এই সাহায্যের মধ্যে ৭৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হবে ভারতীয় কৃষকদের জন্য সার আমদানির খাতে, ৭০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বেশী পরিমাণ প্রোটিনযুক্ত খাবার বিনামূল্যে দেওয়া হবে, ৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হবে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর (World Frood Programme) মাধ্যমে, ১ মিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনে উন্নয়ন সাহায্য বাবদ এবং ৫০ হাজার ডলার দেওয়া হবে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের খাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্য বিভাগের প্রধান হলেন মিঃ ডেনিয়াল পার্কার যিনি পার্কার ফাউন্টেন পেনের ব্যবসায়ে বিশ্ববিখ্যাত। মিঃ পার্কার এমন ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৮·৯ মিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্যসামগ্রী (যার পরিমাণ হবে পাঁচ লক্ষ মেট্রিক টন) চলতি বছরে ভারতের কাছে বিক্রি করতে পারে।

বিদেশ থেকে সাহায্য গ্রহণ করার পক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তি যা-ই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য সুদূর-প্রসারী। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করার উপর মার্কিনী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবার প্রতিবাদে কয়েক মাস আগে আমাদের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীচবন ভারত-মার্কিন যৌথ কমিশনের বৈঠক বাতিল করে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া স্থগিত রেখেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথার সুর অন্যরকম। ভারত এখন আলোচনার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে প্রস্তুত। মার্কিন কংগ্রেসে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন উপস্থিত হয়েছে তাতে ভারতের সম্মান খুব বেড়েছে বলে মনে হয় না। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় থেকে উন্নয়নধারার যে মন্থর গতি ভারতে পরিলক্ষিত হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত আছে এবং এজন্য চারটি কারণ দায়ী, যথা; (১) উৎপাদন হ্রাস এবং পেট্রোলিয়াম, খাদ্যসামগ্রী, সার এবং অন্যান্য ভোগসামগ্রীর বর্ধিত খরচের প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতির চাপ, (২) সব জিনিসের পাইকারী মূল্যসূচী ৬০ শতাংশ বেড়ে যাওয়া, বিশেষ করে, খাদ্যসামগ্রীর দাম ৮০ শতাংশ এবং খাদ্যশস্যের দাম ৯০ শতাংশ বেড়ে যাওয়া, (৩) কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন-হার স্থির থাকা এবং শিল্প উৎপাদন মাত্র ৩·৫ শতাংশ বেড়ে যাওয়া, এবং (৪) প্রতি বছর ২·২ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বেড়ে বর্তমানে ৬০ কোটি হওয়া এবং প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া। এই প্রতিবেদনে দেশের বর্তমান খাদ্যাবস্থা যে খুবই শোচনীয় তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে,—(ক) ১৯৭৪-৭৫ সালের ফসল খুবই খারাপ হয়েছে এবং তার কারণ হল বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা, (খ) ভারত সরকার আশা করছেন যে, এ বছর আট থেকে দশ মিলিয়ন টন খাদ্যসামগ্রী আমদানি করার প্রয়োজন হবে, (গ) যদি ভারতকে বেশী করে খাদ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয় তবে তার স্বল্প পরিমাণ বৈদেশিক বিনিময়-মুদ্রার রিজার্ভ আরও কমে যাবে, এবং (ঘ) বেশী দাম এবং পেট্রোলিয়াম, সার ও কীট-নাশক ওষুধের স্বল্পতার দরুন ভারতে বেশী করে খাদ্যশস্য উৎপাদন করার প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

ভারত সম্পর্কে যে প্রতিবেদন মার্কিন কংগ্রেসে উপস্থাপিত হয়েছে, তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ না করেও বলা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের আর্থিক সংকটের চিত্রটি অতিরঞ্জিত হয়েছে। যেমন, ১৯৭৪-৭৫ সালে ফসল খুবই খারাপ হয়েছে এ কথা বলা চলে না। খাদ্যসামগ্রীর দাম ৮০ শতাংশ এবং খাদ্যশস্যের দাম ৯০ শতাংশ বেড়ে গেছে—এই পরিসংখ্যান ভারত সরকারের প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলছে না। তবে ভারত সম্পর্কিত প্রতিবেদনে এ কথাও স্বীকৃত হয়েছে যে, গমের উৎপাদন ভারতে যথেষ্ট বেড়েছে,—জলসেচ ব্যবস্থারও কিছু সম্প্রসারণ হয়েছে এবং গত এক দশকে গড়ে ৩·৫ শতাংশ হারে কৃষি-উৎপাদন বেড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের জন্য যেখানে ১৫২ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রস্তাব রেখেছেন, সেখানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব করা হয়েছে যথাক্রমে ১২৮ মিলিয়ন ডলার ও ১৩৫ মিলিয়ন ডলার। মাথাপিছু সাহায্য হিসাবে ভারতের জন্য যা ধরা হয়েছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য সে তুলনায় অনেক বেশী ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের এখন প্রচুর সাহায্যের প্রয়োজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটু বেশী প্রীতি বিশেষভাবে লক্ষনীয়। আমাদের বক্তব্য হল, ভারত যদি গত চার বছর মার্কিনী সাহায্য না নিয়েই দেশের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারে, তবে আবার সে-দেশ থেকে কি সাহায্য না নিলেই নয়? অর্থনৈতিক দিক থেকে বলা যায়, শুধু বৈদেশিক মূলধনের উপর নির্ভর করে থাকা যুক্তি-যুক্ত নয়। বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বত

ঝাড়বে, ততই সেই ঋণ শোধ দেওয়া এবং ঋণের উপর সুদ দেওয়ার জন্য বৈদেশিক বিনিময়-মুদ্রার প্রয়োজন বাড়বে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মূলধন অপেক্ষা রপ্তানি সম্প্রসারণ ও আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনের উপর বেশী নির্ভর করা অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত। যে-কোন উন্নতি-কামী দেশকেই বর্তমানে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়: ভারতকেও করতে হচ্ছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকেও বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। যতক্ষণ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে সামরিক ঘাঁটি গঠন করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিচল থাকবে এবং যতক্ষণ ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন ভূমিকা গ্রহণ করবে যাতে পাকিস্তান সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শান্তির পরিপন্থী হতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে নতুন বাধ্যবাধকতার ভিতর যাওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে ভাববার অনেক কিছু আছে।

সুব্রত গুপ্ত

রিহার্সাল রুম

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

কথা ছিল সরস্বতী পুজোতে নাটকটা মঞ্চস্থ করা হবে। কথা মতো সব হয় না। অতএব—। তবে সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়নের মতো সরস্বতী পুজোর তারিখ ত আর সরানোর উপায় নেই। অতএব নাটক বাদ দিয়েই ক্লাবের সরস্বতী পুজো হচ্ছে। অবশ্য নাটকের পূর্ণাঙ্গ রিহার্সালও এই দিনে হবার কথা আছে—। অন্তত সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে আলাপ-আলোচনা করা যাবে। আর নাটকখানা এতোকাল ধরে যেমনভাবে অভিনীত হচ্ছিল তার সংগে আরও কিছু কিছু জুড়ে নূতনত্বের আল্পনায় রঞ্জিত করা যায় কি না তাও দেখা যাবে। যুব সংঘের ছোট ঘরখানায় জোয়ার-ভাটার মতো সভ্যেরা যাতায়াত করছে।—'কই, তিনি এখনো এলেন না!' কখনো কলকণ্ঠে কোনো রমা বা মানিক বলে—'ওদিকে পুজো-প্যাণ্ডেলে কাজ রয়েছে, চলি অলকদা, উনি এলে খবর দিয়ো কিন্তু।' মক্ষিরানীর সংগে আবীর, ছোটু ইত্যাদি চুলবুলে ছোকরাও হাওয়া হয়ে গেল। নিতান্ত নাট্যোৎসাহীরা মুখ চুন করে অপেক্ষারত। রিহার্সালটাও বুঝি মোশান মাস্টারের গরহাজিরার জন্যে নাকচ হয়ে যায়! হয়ত বা তিনি—!! মামুলী আলাপেও তেমন গরজ নেই কারুর। সিগারেট, খবরের কাগজে মন দিয়ে সময় কাটাচ্ছে।

সবই কেমন ফিকে। একঘেয়ে। মাইকের আওয়াজে ভেসে আসছে হিন্দী সংগীত।

এমন সময়ে রবিদার গলা শোনা গেল।

বিশু বলল—রবিদাকে নিয়েই না হয় আরম্ভ করা যাক।

হেমন্ত সায় দিল—তা আর বলতে। আমি ত আগেই বাতলাচ্ছিলুম। বড় বড় স্পেশ্যালিস্টের ল্যাজ ভারী, কী দরকার ওসব পায়তারায়—

হয়ত আরও কিছু বলত হেমন্ত। কিন্তু বাধা পড়ল। রবি রায় ঘরে পা দিয়েই স্বভাবসিদ্ধ হাসি বিলিয়ে প্রশ্ন করে—'কই, আর সব কোথায়!' উত্তরের অপেক্ষা রাখে না সে, একটু মেজাজ দেখিয়ে বলল—'এই রকমটাই আশা করেছিলাম।'

তার সংগী ভদ্রলোক খুব কুণ্ঠিত স্বরে বলে—'যাঃ রবি কী হচ্ছে! আমাদেরই ত দেরী হয়েছে। শুধু শুধু দুষছো কেন এঁদের। কোথায় ছটায় আসার কথা, এখন আটটা দশ।' কব্জির ঘড়িতে চোখ রাখেন তিনি।

অলক ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়—আরে আসুন—আসুন। বসুন দেবেনবাবু। আজ আমাদের কত সৌভাগ্য—

বিশু এবং ঘরের আর পাঁচজন যুবক, সকলেই দেবেন দাসকে অভ্যর্থনা জানাতে সতরঞ্জির উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেউ বলল—'পথ-ঘাটের যা অবস্থা তাতে শেষ পর্যন্ত'—কেউ বা দেবেন দাসের জন্য চায়ের অর্ডার হাঁকালো। কেউ বা বলল—'প্লীজ, আপনারা বসুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাইকে ধরে আনছি পুজো প্যাণ্ডাল থেকে।

দেবেন ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিব্রত ভঙ্গীতে হাসলেন—আরে, কাণ্ড! আপনারা সবাই দাঁড়িয়ে? বসুন—বসুন—।

অলক বলল—আমরা ত আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। অবিশ্যি আজকের দিনে আপনার মতো 'বীজি' মানুষকে পাওয়া—নেহাৎ রবি ভরসা দিয়েছিল—

দেবেন ঘাড় নেড়ে কিসের যেন প্রতিবাদ করেন—আরে ছি-ছি! কী যে বলেন—! রবির কোনো দোষ নেই। দেরীও হত না। ঠিক সময়েই বেরিয়ে পড়েছিলাম আমরা। ফড়েপুকুরে একটা কাজে দেরী হয়ে গেল। কাজ মানে তেমন কিছু নয়, এই ইয়ে—

—নিশ্চয়—নিশ্চয় কাজ ত আগে করতেই হবে! আমাদের ত নেহাৎ রিক্রিয়েশন—

অলকের এ কথায় দেবেন হো-হো করে এমনভাবে হাসলেন যে উপস্থিত সকলে

চমকে উঠল। দেবেন বললেন—আরে কাণ্ড, কাজটাও আমার রিক্রিয়েশন মশাই—মানে, কয়েকটা সাউণ্ড ভাড়া করতে গিয়েছিলাম। একটা সাউণ্ড হলে রি-টেপ করতে আর কতোই সময় লাগতো—ঝড় আছে, মিছিলের শব্দ আছে আবার পাখির ডাক—এইরকম টুক-টাক সব জড়িয়ে সাত রকমের সাউণ্ড। যাক গে, ওসব—। এমনিই দেরী করে ফেলেছি, আর নয়। এবার চটপট শুরু করে দেওয়া যাক।

—হ্যাঁ! হ্যাঁ। গলাটা ভিজিয়ে নিন। তা করুন, ওরাও পুজো প্যাণ্ডাল থেকে এসে পড়বে। এই বিশু, কিরে—

বিশু যদিও গোড়াতেই সভ্য-সভ্যাদের ডাকতে যাবার জন্য ব্যস্ততা দেখিয়েছিল, এখন আসরে দেবেনের কথাগুলো হাঁ-করে গিলতে গিলতে সে কথা একদম হজম করে ফেলেছে। অলকের খোঁচা খেয়ে জিভ কেটে 'ইন এ মোমেণ্ট' উচ্চারণ করে দৌড়বার ভঙ্গীতে উধাও হ'ল।

রবি রায় চারমিনারের প্যাকেট বার ক'রে দেবেনের সামনে এগিয়ে দিতেই মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং দেবেন 'রাইট' বলে হাসির পালা শেষ ক'রে কাজের লাটাই ধরলেন। 'আসতে আসতে পথে রবি যে আইডিয়াটা দিয়েছে সেটা খুব ভালো, মানে আমার ত খুবই ভালো লেগেছে। অবিশ্যি আপনাদের কেমন লাগবে জানি না—'

—কি কী বলছেন রবিদা?

দেবেন সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে সবশেষে সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে অলকের ওপর চোখ রাখলেন—আপনাদের পাড়াটা ত কট্টর দক্ষিণপন্থী, তাই—মানে—

অলক জবাব দিল—হাঁ, পোলিটিক্যালি ফিল্ডে এখন সব পাড়াই ত তাই। তবে ক্লাবের আমরা সবাই আলাদা ইউনিট। এই দরজায় রাজনীতি ঢুকতে দেওয়া হয় না। ব্যক্তিগত মতামত যার যার নিজস্ব ব্যাপার—।

কথাটা দেবেনের কাছে কতখানি গ্রহণযোগ্য মনে হ'ল তা বোঝা গেল না। তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন তাও কি সম্ভব? যাক সম্ভব হ'লেই ভালো হাঁ যা বলতে যাচ্ছিলাম। আপনারা চাইছেন নতুন কিছু করতে। তা সেটা একেবারে পাড়াতেই—মানে ড্রামাকে ডিস্টার্ব না ক'রেও—করা যায়। যেমন ধরুন প্রথমে স্টেজটা অন্ধকার থাকবে, সেই অন্ধকারের মধ্যে অডিটোরিয়াম থেকে একটি লোককে, স্টেজের সামনের দিক থেকে তার মানে দর্শকের দিকে পিছন ক'রে মাঝ বরাবর সিঁড়ি দিয়ে—

এই পর্যন্ত ব'লেই দেবেন থমকে থামলেন এবং খেদের সুরে বললেন—আরে কাণ্ড, এটা যে রবির আইডিয়া' আমি কেন—রবি তুমিই বলো না—সেটাই ভালো হবে।

পাগল না কি! আপনার কনসেপশনের ধারে কাছে আমি কেন, কলকাতা শহরে পৌঁছতে পারে এমন জায়াণ্ট দেখি না ত! খামাখো রবি রায়কে গ্যাস দিয়ে ল্যাং মারছেন কেন দাদা!

পোড়া কেৎলী আর কতকগুলো মাটির ভাঁড় হাতে বছর বারোর একটি মেয়ে এল। জনে জনে চা বিলি হ'ল।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—লোকটার ঘাড়ে একটা আস্ত লাইটপোস্ট। লোকটার কাঁধের লাইট পোস্টে আলো জ্বলছে। লাইটিং-এর বন্দোবস্ত এমন ভাবে রাখা হবে যাতে অডিয়েন্স শুধু ল্যাম্পপোস্টওয়ালাকেই দেখতে পাবে। লোকটি স্টেজে উঠে পোস্টটাকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে, এবার দর্শকদের দিকে ঘুরে একটু হেসে মাথা নাড়বে এবং বলবে—আপনারা যা ভাবছেন আমি কিন্তু তা নই। না, না, অভিনেতা নই। এখানে কাজ করি, মানে এই ল্যাম্পপোস্টটা স্টেজে তুলে দেওয়াই আমার ডিউটি। মালিকরা বললেন, ওপারে যাও, ওখানে যাঁরা আছেন তাঁরা যেভাবে বলবেন ঠিক সেইভাবে এটা বসিয়ে দেবে। কিন্তু—কিন্তু—কারুর পাত্তা নেই। বলি কাকে? এখন আমি করি কী! এটা কিভাবে রাখি? আলোটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? মানে, এই আলোতে চারটে পথ—ডানদিকে হ'ল বড়লোক সরণি, তার উল্টো দিকে, মানে বাঁদিকে হ'ল গরীব সরণি, পুবের পথটা চলে গিয়েছে মধ্যবিত্ত সরণিতে,—আর ওই পশ্চিমে মহাপ্রস্থানের পথ। দেখুন ত আলোটা ঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে কি না? নাঃ, মনে হচ্ছে আপনারা আমাকে হদিস দিতে রাজী নন—

ঘরের সকলেই মন দিয়ে দেবেনের কথা শুনছিল। রবি স্মরণ করিয়ে দিল—দেবুদা আপনার চা কিন্তু জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।

—ও, হ্যাঁ!

একটা চুমুক দিয়ে ভাঁড়টা হাতে ধরেই দেবেন আবার শুরু করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অলক বলল—মাফ করবেন দেবেনদা, আমায় যদি মিনিট কয়েকের জন্যে ছেড়ে দেন ত ভালো হয়।

দেবেন একটু অবাক হলেন—আমি ছেড়ে দেবো, মানে?

—মানে যাবার ইচ্ছে মোটেই নেই, এমন চমৎকার আপনার কল্পনাশক্তি, বেঁ, অসাধারণ ব'ললে কিছুই বোঝানো হয় না—মাঝপথে ছেড়ে যাওয়া ত লোকসান, তবু উপায় নেই—। যা দিনকাল পড়েছে এখন ছাই দেখলেও উড়িয়ে সরিয়ে দেখতে হয়, রতন না পাওয়া যাক অন্তত দু-এক টুকরো কয়লা ত পাওয়া যেতে পারে! তা-ই বা কম কী—

অলকের কথাটা শুনে দেবেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—বাঃ, সুন্দর বলেছেন ত, ফাইন! কয়লা মানে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড।

রবি প্রশ্ন করে—হন্তদন্ত হয়ে রাত দুপুরে কোথায় যাচ্ছ?

অলক মুখ কাঁচুমাচু ক'রে জবাব দিল—জনৈক হরিদাস পালের কাছে; তিনি রাত ঠিক নটার সময়ে যেতে বলেছেন, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে যদি মিনিস্টার মশাই এসে পড়েন ও'র বাড়িতে ত—মানে—

মাধব মাঝে পড়ে অলকের ত্রাতা হ'ল—থাক আর দরকার নেই তোমার শুনে রবিদা! অলকদাকে আটকে শুধু শুধু ইয়ে করা।

দেবেনের দিকে তাকিয়ে অলক অসহায় হাসি হেসে অর্ধস্বগত ভঙ্গীতে উচ্চারণ করে—সাইকেল নিয়ে যাবো আর আসবো। চাকরি-বাকরি একটা না জোটাতে পারলে—ইয়ে—

মাধব হাঁ হাঁ ক'রে উঠল—খবরদার সাইকেল নিয়ে ওখানে যেয়ো না। উনি ঠিক কাজের ফরমাস দিয়ে বসাবেন। উঃ সেদিন আমার যা নাকাল হয়েছিল!!

হাতঘড়ির দিকে চোখ রেখে দেবেন তাগাদা দিলেন—আর এক সেকেণ্ডও আপনার দেরী করা উচিত হবে না। উইশ ইউ সাকসেস্।

অলক চলে যাবার পরই ঘরখানা কেমন যেন মিইয়ে গেল।

রবি চাঙ্গা করতে চাইল—আচ্ছা, কাজের কথায় ফিরে আসা যাক দেবেনদা।

মাধবও সায় দিল—হ্যাঁ হ্যাঁ দেবেনদাকে আবার কবে পাওয়া যাবে ঠিক নেই—

রবি টিপ্পনী কাটে—সবাই তা বোঝে কই! অলকদার কি আজই না গেলে চলত না! আরে বাবা এম এল এ তো পাড়ার লোক—তার চামচাগিরির জন্য যথেষ্ট সময় রয়েছে বাবা—আমারই কি [illegible] কিছু কম ছিল নাকি—। সবাইকে চাকরি দিচ্ছেন উনি—হুঃ!

—রবি বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কী? শুনেছে চাকরির ব্যাপার! বলা যায় না, কার ভাগ্যে কি আছে।

রবি হাসল এবং বেশ মুন্সিয়ানার ভঙ্গিতে জবাব দিল—আচ্ছা বেশ, ওর নয় চাকরির ব্যাপার। কিন্তু আরও যারা অ্যাবসেণ্ট, তাদের? আবীর ছোটু, রমা, মুকুল, সন্দীপ? বিশুও সেই যে গেছে—অগস্ত্য যাত্রা। যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই—এমনভাবে ফুল রিহার্সাল হয় নাকি! গরজটা আমাদের না, যে ভদ্রলোকের কাজের ক্ষতি ক'রিয়ে টেনে আনা হয়েছে তাঁর?

মাধব ব্যস্ত হয়ে ওঠে—সত্যি! সত্যি—

বিশন্টোর কী হল? ধনুর্নাচ নাচের খপ্পরে পড়ল নাকি! যাই আমিই—

রবির মেজাজ যেন বেসামাল হয়। সে দাঁতে দাঁত চেপে গজরে ওঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও তুমিই বা বাদ থাকো কেন।

দেবেন ধমক দিলেন—'এই রবি কী ছেলেমানুষী হচ্ছে!' নিজের কথায় নিজেই যেন মজা পেয়ে হেসে উঠলেন—'আরে ক্লাণ্ড, তোমায় বলছি কী! তোমরা তো আসলে সবাই ছেলেমানুষ! ব্যাপারটা র‍্যাসনালাইজ করলে সব পরিষ্কার বোঝা যাবে. আজকে তোমাদের পাড়ায় পুজো, আর পুজোর গ্ল্যামার তো আকর্ষণ করবেই—সেটা খুব স্বাভাবিক! আমার মনে হয়, এই রকম একটা কমিউনিটি উৎসবের দিনে ফুল রিহার্সালের ডেট ফেলাই ভুল হয়েছে। মোটামুটি আলোচনা তো হল। আর একদিন বরং একটু সকাল সকাল বসা যাবে।

মাধব এবং রবি দুজনেই একসঙ্গে প্রতিবাদ করে। মাধব বলে—প্লীজ, আপনি বসুন। দশ মিনিটের মধ্যে সব ক'টাকে টেনে আনছি।

রবি মাথা নাড়ে—দশ মিনিট? ফুঃ! তিন মিনিট—ছোট আদালতে পাঁচ আইনের মামলার শুনানী আর রায় খতম হতে যেটুকু সময় লাগে। পিসাব কিয়া কি নেহী? হাঁ বা না—যাই বলো, জরিমানা হবেই! এও তেমনি! তোমার জন্যে ক্লাবের গ্রেটার ইণ্টারেস্ট সাফার করতে পারে না।

দেবেন হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন—ঠিক আছে, চলো আমিও যাই পুজোর ওখানে।

—যাবেন? বেশ তো!

মাধব বলল—আবার কিন্তু এখানেই ফিরতে হবে।

দেবেনের যেন সব ব্যাপারেই সমান সম্মতি—আরে ছি, ছি—নয়ত বলেন তো বসাতেও পারি, সেটাও মন্দ নয়।

রবি বলল—মনে কিছু করবেন না দেবুদা। এদের কেবলই ভয়, আপনি বুঝি বিরক্ত হচ্ছেন।

রবির মুখের কথার ওপরই একটি প্রশ্ন আছড়ে পড়ল—অলকদা—অলকদা—

রবি তাকাল—এই যে হেমন্ত! রাত দুপুরে হন্তদন্ত হয়ে শ্রীমুখ দেখিয়ে ধন্য করতে এলে? তুমি কি জানো না আজ এখানে সন্ধ্যে থেকে ফুল রিহার্সাল হবে?

নবাগত ছোকরাটি মাথা থেকে চাদরের ঘোমটা খুলে একগাল হেসে জিভ বার করে বলল—আমি মরে গেছি রবিদা, প্লীজ এখন কিছু বল না। আপাতত অলকদাকে খুব দরকার। এখানে তো নেই দেখছি, বাড়িতেও পেলাম না। কিন্তু—

হেমন্তর ভাবভঙ্গী অস্থির অসহায় এবং যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি ত্বরিতে সে বেরিয়ে গেল।

মাধব বলল—ওর কি হয়েছে বল তো।

রবি দরজা থেকে এক পা বার করে হাঁক দিল—হিম্‌—হিমু—

দেবেন মাধবের দিকে তাকিয়ে বললেন—ছেলেটাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

রবি স্বগতভাবে বলল—একটা ঝড়। সর্বদাই ব্যস্ত—। ওকে কিছু দেওয়া দরকার ছিল। অজকের কাছে নিশ্চয় সেই জন্যেই এসেছিল। এখন কোথায় খুঁজে মরবে! যাক গে—

তারপর দেবেনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল—আরে আপনি ওকে চিনতে পারলেন না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! খুব পরিচিত মুখ—অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছি না। নাঃ, আমার দফা গয়া—

বিচলিত ভংগীতে দেবেন পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করে খুলে দেখল এবং ছুঁড়ে ফেলে দিল। রবিকে বলল—এখানে কাছাকাছি সিগ্রেটের দোকান নিশ্চয়ই আছে। আমি চট করে—কিন্তু এমন কেন হচ্ছে! দুর, এ আচ্ছা যন্ত্রণায় পড়া গেল।

রবি, মাধব এবং আরও কয়েকজন দেবেনের মুখের দিকে বিভ্রান্ত হয়ে তাকিয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ! লোকটাকে যেন বোঝা যাচ্ছে না। ওরা বিরত ব্যস্ত হয়ে জনে জনে একক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে।

—যন্ত্রণা? কিসের!—গ্যাস হয়েছে—

—মাথা ধরেছে?

—অ্যানাসিন চাই। বুঝেছি, সিগারেটের জন্যেই আপনার—

দেবেন জবাব দিলেন—আমি ভি আই পি নই ভাই। এমন কি এম আই পি-ও নই যে, মরবার পর খবরের কাগজে তিন চার লাইনের প্যারা পাবো। নেহাতই—নেহাতই এই যাকে বলে ভপ, ভেরি অর্ডিনারি পাসন। এবং তারপরই আচমকা হো-হো হেসে ঘরখানা কাঁপিয়ে দিলেন দেবেন 'আরে রুণ্ড। এ তো সেই ছেলেটা—। এখন একেবারে ছবির মতো, গোটা এপিসোডই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সেদিন ময়ূর মহলে আমায় অ্যাসিস্ট করছিল যারা এ তো তাদেরই একজন। ওরা দুজন ছিল অল রাউন্ডার। সেই ছোকরা ফেরিওয়ালা—আঃ গ্রাণ্ড। আর পাগলের রোলে ও ছিল হ্যাঁ। আর বিমল যখন অডিটোরিয়াম থেকে আধ-কারের মধ্যে ভারী বুটের আওয়াজ করতে করতে স্টেজে ওঠবার সময় ইকো করল "এই যে আমি এখানে এই যে—" আর ওরা দুজন "সেরেছে" খোচর—বলে পিছনের দরজা দিয়ে দে দৌড়। তাই না রবি?

রবি একটা যেন তেতে উঠল—আঃ সেজন্যে ওদের কোনো দোষ দিতে পারেন না। ওরা দুজনেই আন্ডারগ্রাউণ্ডে আছে।

আর 'মুক্ত অঞ্চলের' ডিরেক্টর, মানে শ্যামল চৌধুরী খুব কায়দা করেছিলেন—

দেবেন সায় দিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঠিক! শ্যামলের ব্রেন ওয়েভের জন্যেই লাস্ট সিনটা ক্লাস হয়েছিল। ইউনিট প্ল্যানই বার করেছিল, ওইটুকু ছোকরার মাথা আছে যা-ই বলো।

দেবেনের মুখে এরকম প্রশংসা শুনে কৌতূহলী মাধব মাথা চুলকে বলল—শ্যামল আবার কি করল?

—না, এমন কিছু নয়। ময়ূর-মহলের অডিটোরিয়ামের বিভিন্ন জায়গায় এক-এক জনকে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল। প্রত্যেককে আলাদাভাবে জানিয়েছিল, তাকে কখন কি করতে হবে—কিন্তু একজনের মুভমেন্ট অ্যাকশন অন্য কাউকে বলেওনি টেরও পেতে দেয়নি। ফলে লাস্ট সিনটায় নিজের-টুকু ছাড়া অন্য ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গও কেউ জানতো না। এমন কি আমরা যারা সেট-এ ছিলাম তারাও খুব অন্ধকারের মধ্যেই ছিলাম। হাজার হোক ছেলেমানুষ তবু— এখন হয়েছে কী, বিমলকে পুলিস করে একেবারে পিছনের সারিতে বসিয়ে দিয়েছিল। আর বিমলের যা গলা চলা—

রবি একটু ফাঁক পেয়েই মোক্তারের ভংগীতে শুরু করল—তা হলে?—তা হলে হিমুই বা ঘাবড়ে যাবে না কেন?

দেবেন তাকে সমর্থন করেন—না, না, আমি তা বলিনি। অন্য কেউ হলেও হবে ওরা দুজনে ইলেকট্রিক শক খেয়ে যেন ভোঁ দৌড়। আসলে এমন একটা ইনসিকিওরড মনে নিয়ে—

মাধবও আর মুখ বুজে থাকতে পারল না—হিমু বা নন্দন এমনিতে সাহসী ডেয়ারিং। ওদের এগেনস্টে যদিও কোনো প্রমাণ নেই, তবু—

—প্রমাণের আবার দরকার লাগে নাকি! দাদাদের কারুর কৃপায় একবার নামটা পুলিসের খাতায় উঠলেই ব্যাস—।

দেবেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং হঠাৎ রবিকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই বললেন—আরে রবি, তুমি বরং ছুটে যাও হিমুকে ধরো। নিয়ে এস। ওর যখন পয়সাকড়ি দরকার একটা তো ব্যবস্থা করতে হয়। কি জানি হয়তো আমায় দেখে লজ্জা পেয়েই গা-ঢাকা দিল। সেদিন খুব হাসাহাসি করে-ছিলাম কিনা—

মাথা নাড়ল রবি—ভয় নেই, লজ্জা-সরমের মতো বাজে বালাই আমাদের কারুরই নেই। হিমুর তো আরোই নেই। ত ছাড়া ওকে ডেকে কি হবে আমাদের সবারই তো টিকে ধরাতে জামিন লাগে!

দেবেন পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাসলেন—অল্প দু-চার টাকা হলে আমি দিতে পারবো। খুব বিশ্রী লাগছে—সত্যি!

মাধব হাঁ-হাঁ করে ওঠে—খবরদার! না, না, দাদা—এ কিছুতেই হতে পারে না।

হিমুকে কেন্দ্র করে যখন সমস্যা তুঙ্গে উঠেছে অর্থাৎ দেবেন নিজেই খুঁজতে যাবার জন্য স্যান্ডেল পায়ে গলাচ্ছেন তখনই বিশু এবং তার পিছু পিছু আরও দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে দরজার মুখে যেন পথ আগলে দাঁড়াল। এবং বিশু হাঁপাতে হাঁপাতে কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করে—এই দ্যাখো, দেবেনদা নিশ্চয়ই রেগে চলে যাচ্ছেন আপনি। দোহাই এবারের মতো মাফ করে দিন।

—আরে না, না—আপনারা সব বসুন— আমি একটু—

দেবেনের কথা শেষ হতে দিল না ওরা। সমস্বরে কলরব উঠল—যান তো দেখি! আমরা এই বডি ফেলছি, মাড়িয়ে যান— ঘেরাও করবো! অহিংস অনশন ধর্মঘট।

দেবেন হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন— অল রাইট, তোমরা সবাই সব করো, আমি আর রবি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে দেখতে চাই—

—কোথায় চললেন?

রবি গম্ভীরভাবে জবাব দিল—বদলা নিতে! দেরির বদলে দেরি!

দেবেন মাথা নাড়লেন—উঁহু, ফর্মুলা খুঁজতে।

—কিসের ফর্মুলা?

—আরে আজকাল তো সব বিরোধই ফর্মুলা দিয়ে নিষ্পত্তি হয়।

—না, না, একটু ছোট কাজ আছে—ভয় নেই পালাতে পারব না, তোমাদের সিকিউরিটি গার্ড রবি তো সংগেই রইল!

রমা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পথ আগলে বলে—হ্যাঁ ওই বলে আমাদের ফাঁকি দিয়ে—

রবি ধমক দেয়—মিছিমিছি আরও দেরি করিয়ে দিচ্ছ কেন—মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখো!

এর পর সব বাধা ঘুচে গেল।

বাইরে বেরিয়ে দেবেন বললেন—এটা কিন্তু ভালো হল না রবি। বেচারার মুখখানা কেমন নিবে গেল। অত কড়া শাসন কি খুবই দরকার ছিল?

—আপনি জানেন, একটু শক্ত না হলে চলে না। কিন্তু আমার প্রশ্ন, বেরুনোর জন্য এত উঠোন চচ্চড়ি কি কারণে—

—এমনি। মানে হেমন্তকে একবার খুঁজে দেখা দরকার আর সিগারেটও ফুরিয়েছে—মাথাটা কেমন জাম মেরে—

ক্লাব ঘর থেকে খানিকটা কানাগলির সরু পথ পেরিয়ে বড় গলিতে পৌঁছলো ওরা দুজনে। এবং সংগে সংগে থৈ থৈ মথার ভিড়। পুজোমণ্ডপে রাস্তার মাঝখান জুড়ে থাকার দরুন সাধারণের যাতায়াত চলছে কোল ঘেঁষে এবং ভিড় সেই কারণেই। আসলে প্রতিমার সামনেটা ফাঁকা। তেরঙা পাটপটের সামনে সরস্বতী প্রতিমার পাশেই একটি বড় লাইফ সাইজের

ফোটোগ্রাফ। চোখ গিয়ে সেখানেই প্রথমে পড়ল এবং দেবেন থমকে দাঁড়ালেন। অল্প-বয়সী একটি ছোকরা, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেহেতু মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাফসার্ট আর পায়জামা পরা, ফোটোটাতে প্রাণ ছাড়া বাকী সবই পরি-দৃশ্যমান। এর গুরুত্ব যেন মৃণ্ময়ী প্রতিমার চেয়ে কম ত নয়ই বরং বেশি।

দেবেন চলতে ভুলে গেছেন। রবি বলল—কি দেখছেন, হিমু এখানে নেই। চলুন—

কতটা আচ্ছন্ন সুরে দেবেন প্রশ্ন করেন—কোথায়?

—সিগারেট!

—ও, হ্যাঁ! কিন্তু হেমন্ত?

দুজনে আবার পাশাপাশি চলে। কেউ কোনো কথা বলছে না।

নতুন প্যাকেট থেকে একটি রবির হাতে দিয়ে নিজের মুখে আর একটা গুঁজে অগ্নিসংযোগের পর দেবেন এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে মৃদু দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে জড়তা উড়িয়ে বলেন—আচ্ছা, ছেলেটি কে?

রবি তীক্ষ্ম নজরে প্রশ্নের সূত্র খুঁজল—কার কথা বলছেন? ওঃ, বুঝেছি ওই ফোটো!

—হ্যাঁ!

—কি বলি বলুন তো!

রবির মুখচোখে বিব্রত কুণ্ঠন লক্ষ করে দেবেন সংযত ভঙ্গীতে বলেন—থাক—থাক! কষ্ট হলে—কী দরকার—

—না, কষ্ট যা হবার তা আসল ঘটনার তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ। ও—ও এই পাড়ারই ছেলে। আমাদের বন্ধু—। সেই সময়ে পাড়ার ছেলেদের হাতেই খুন হয়েছিল। কিন্তু ভুল দেবেনদা, বুঝলেন একটা মস্ত ভুল।

—বুঝেছি। এ ভুলের সাক্ষী এখানেই প্রথম দেখছি না। আরও অনেক পাড়াতে পুজোর মণ্ডপে এরকম ছবি টাঙানো হচ্ছে। তবে এটা লাইফসাইজ তাই খুব প্রমিনেন্ট!

—হ্যাঁ, পাছে আবার এ ধরনের ভুল-পথে কেউ পা বাড়িয়ে বসে সেই জন্যই—বড়—।

রবির কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, কথা শেষ হবার আগেই। সে যেন বড় বেশি তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। দেবেন তার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হলেন। রবি সোজা প্যান্ডালের সামনে এসে থামল এবং নিজেকেই শোনালো—ভুলি নি তোমায়, তোমায় ভুলবো না সরোজ।

তারপর মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—চলুন দেবেনদা!

—হ্যাঁ! চলো।

দু-পা এগিয়ে রবি বলে—আচ্ছা দেবেনদা—

—কী?

সাড়া নেই। সামনে ভিড় নেই, অথচ রবি এগোচ্ছে না বা কোনো কথা বলছে না।

দেবেন জিজ্ঞাসা করেন—কি হল?

—না, কিছু না। বলছিলাম, আমরা এইভাবে কোথায় পৌঁছবো?

—মানে?

—বুঝতে পারছেন না। এই আমাদের বয়সী যারা, তাদের সামনে পথ কোথায়! আমি রাজনীতির কথা বলছি না।

—তবে?

—জীবনে চলার মতো পথ ত দেখা যাচ্ছে না। দেবেনদা, সত্যি বলছি, সব কেমন জোড়াতালি আর ফাঁকি মনে হয়। এই সরোজকে যারা দুনিয়া থেকে মুছে দিয়েছিল একদিন, আজ তারাই তাকে দেবতার পাশে ঠাঁই দেবার জন্যে উৎসুক। আদর্শবাদের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু খাঁটি নয়। এটা বেশ টের পাই, উঠতি বয়েসের মানুষের কাছে কলুকে পাবার উপায় হিসেবেই মৃতের শরণ নিতে ছুটে এসেছে।

দেবেন মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন রবি থামবার পর ছাই ঝেড়ে আগুনটা উস্কে নিয়ে মুখ খুললেন—তুমি বলতে চাও এরা হিপোক্রীট!

—যদি বলি তাই!

—তাহলেও, তারপরও একটা কথা থেকে যায়!

—কী!

—এরা অসহায়—বড় অসহায়! এও ত বলা যায়!

রবি ম্লান হাসি হেসে বলে—হতে পারে। আপনার অনুমান যতোই নির্ভুল হোক, আমার প্রেমিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক মানে সংঘর্ষ হচ্ছে না।

ওরা কানাগলির মুখে পৌঁছে গেছে। মধ্যে কখন যে দেবেন সামনে আর রবি পিছনে হয়ে ছিল তা এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি। বাইরের জোরালো আলোর মালা পেরিয়ে সরু এবড়ো-খেবড়ো পথে ঠিক ঠাকর করে চলতে দেবেনের পাছে অসুবিধে হয় তাই সে ব্যস্ত হয়ে এগোলো—দাঁড়ান আমায় আগে যেতে দিন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম দেবেনদা, সেটা এই যে, আমরা কিন্তু মৃতের শরণার্থী এই আত্মপ্রাধান্য লোভীদের কাছেই পথের প্রত্যাশা করছি—বাধ্য, না করে উপায় নেই—বুঝলেন?

—খানিকটা।

—তার মানে? সবটা নয়?

—না।

—আপনিও টিপিক্যাল মধ্যবিত্তর মতো কিছুতেই স্পষ্ট দেখার পক্ষপাতী নন।

ওরা ক্লাব ঘরের মুখোমুখি পৌঁছে গেছে। দেবেন বললেন—আচ্ছা আপাতত

আলোচনাটা মুলতুবী রাখা যেতে পারে।

রবি হাসল—নিশ্চয়।

ভেতর থেকে অলক উচ্চকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানায়—দেখুন দেবুদা, আপনার জন্যে ঘুঘনি আর চা নিয়ে বসে আছি।

—বাঃ, বাঃ, আপনি এর মধ্যে ফিরে এলেন। তা নয় জমানো গেল, কিন্তু যে জন্যে গেলেন তা নিশ্চয়ই ফতে করেছেন—!

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

রবির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেবেন বললেন—কী রবি, বাকী খানিকটা গ্যাপ রাখা খুব খারাপ নয়—এবার দেখছ ত!

অলক রহস্যটার কিছু না বুঝেই বলল—আমার হোক বা না হোক তাঁর কাজ হয়েছে। কালই সকালে একটা প্রধান অতিথির ভাষণ লিখে পৌঁছে দিতে আজ্ঞা হয়েছে। গর্লাস স্কুলের সারস্বত সভার তিনি চীফ গেস্ট হচ্ছেন কিনা।

ঘুঘনির চামচে হাতেনাতে দাঁড়াল, মুখে বিস্ময় নিয়ে দেবেন বললেন—আচ্ছা! ওয়াণ্ডারফুল—

—ফুল এখনো পুরো ফোটেনি হুলটা বাকী আছে।

—সেটা আবার কী?

—একটা রিপোর্টও লিখে খবরের কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করতে হবে। এক পিসতুতো দাদা নিউজ পেপারে আছেন কিনা! যাক ওসব—এখন এরা সব হাজির, আপনি সেরে নিয়ে শুরু করুন দাদা! চা যে জল হয়ে যাচ্ছে—!

দেবেন বললেন—হ্যাঁ, গোড়া থেকে—

—তার দরকার নেই। চারটে রাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের বাহক দাঁড়িয়ে আছে। পথ দেখা যাচ্ছে কি না এই প্রশ্ন নিয়ে—এ পর্যন্ত আমি বুঝিয়ে সেরে রেখেছি—এরা সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছে।

অলকের দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেবেন চাইলেন—বেশ! বেশ! এর পর একটি ছেলে মধ্যবিত্ত সরণি থেকে ছুটে এসে বড়লোক সরণির দিকে একটু এগিয়েই, নাক কুঁচকে চোখ পাকিয়ে ল্যাম্প পোস্টের সামনে দাঁড়াবে—থমকে—

রমা আর মুকুল একসঙ্গে প্রশ্ন করে—তারপর?

—তারপর, সে গরীব সরণির দিকে হন্‌হনিয়ে এগিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে চৌমাথায় যখন ক্লান্ত হয়ে আবার পৌঁছলো—তখন এক অব্যক্ত যন্ত্রণার ছাপ। এবং দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সবেগে মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়েই পিছিয়ে এল—সর্বাঙ্গে ভয়ের, বিভীষিকার ছাপ।

দেবেন থামলেন। গোটা ঘরখানায় শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। থম্‌থম্ করছে।

রবির দিকে তাকিয়ে দেবেন জিজ্ঞাসা করেন—কেমন হবে?

রবির জবাবের আগেই মাধব বলে—ইউনিক। তারপর?

দেবেন বলেন—বাড়িওয়ালা হেসে ছেলেটির পিঠে হাত রেখে বলে—কী, পারলে না! ভয় পেয়েছ? জানতাম পারবে না—এবার ছেলেটি চেঁচিয়ে ওঠে। 'কে তুমি? তুমি কে? তুমি—তুমি—হ্যাঁ, তুমি আমায় ভুল পথে ঠেলে দিয়েছ, তোমায় চিনেছি। বারবার আমাকে নিয়ে তামাশা করেছ।' লোকটি যতই বোঝাতে চেষ্টা করে ছেলেটি ততোই প্রতিবাদে মাথা নাড়ে। আলো নয়, আলো নয়, আলেয়ার জাদু দিয়ে—

—ওয়াণ্ডারফুল!

—মার্ভেলাস!

—তারপর?

রবি এবার বলল—তারপর শুরু হবে নাটক! মূল নাটকের কোনো পরিবর্তন নেই। গতানুগতিক নিয়মে চলবে—আমাদের জীবনের মতো, তাই না দেবেনদা!

দেবেন যেন শুনতেই পাচ্ছেন না। নিবিষ্ট ভঙ্গীতে মাথা হেঁট করে সিগারেট টানতে ব্যস্ত। এবং সেই মুহূর্তে লোড শেডিং-এ গোটা ঘরখানা অন্ধকারে ডুবে যায়। এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর মিলিত চাপা আর্ত শোনা গেল।

দেশলাইকাঠির ঘর্ষণ। মৃদু ক্ষীণ আলোয় অন্ধকার যেন আরও ঘন, আরও দুর্ভেদ্য আর রহস্যময় হয়ে ওঠে। দেবেন বললেন—হ্যাঁ, তবে এমনিভাবেই আলো আনতে হবে। আসবে আলো। যারা আনতে পারবে, তারা মৃত্যুর শরণাপন্ন পথ-প্রদর্শকদের কব্জা থেকে নিজেদের ঠিকই মুক্ত করবে। কিভাবে,—তা, পরে, ইতিহাস বলবে।

বিষাদসিন্ধু : ধ্রুপদী সাহিত্যের স্বাদ

বিষাদসিন্ধু। মীর মশাররফ হোসেন। সম্পাদনা—আবদুল আজিজ আল আমান। হরফ প্রকাশনী। এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-১২। মূল্য সাত টাকা।

১৯৭৪ সালে একশ উনত্রিশতম জন্মদিন পেরোলো একজন বিস্মৃত মানুষের। অর্থাৎ এ বছর নভেম্বরে তিনি ছুঁয়েছেন একশ তিরিশ। অবশ্য মরণোত্তর। অথচ বিস্মরণ তাঁর প্রাপ্য ছিল না, পুনর্মূল্যায়নের ভাগিদে অনুকম্পায় তাঁকে কৃষ্ণবর্ণ অতীতের গহ্বর থেকে তুলে আনাটাই অস্বাভাবিক। মীর মশাররফ হোসেন কি এতটা অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন আমাদের? সাহিত্যের ইতিহাসে করুণায় দু-লাইন উল্লেখে নিঃশেষ হয় তাঁর সাহিত্যচর্চার যাবতীয় সম্ভাবনা সম্পন্ন।

মনে হল না। দীর্ঘদিন পরে সৎ-প্রচেষ্টার সাক্ষ্য হিসাবে মীর মশাররফ গ্রন্থাবলীর সে খণ্ডটি পাওয়া গেল, অন্য একটি নাটক (জমিদার দর্পণ) সংযোজিত করেও মীরের শ্রেষ্ঠ রচনার নামে তার নাম : 'বিষাদসিন্ধু'। ধ্রুপদী অংগনের এই সৃষ্টির নিহিত-সর্বজনীনতাকে কি কেউ উপেক্ষা করতে পারবেন? এবং সর্বকালীনতাকে? বঙ্কিম-চন্দ্রের সমসময়ে বিপন্ন-কিছু ভগবদ্ভক্ত মানুষের ইতিহাস সমর্থিত কাহিনীকে রূপ দিলেন মীর, সম্ভবত নানা রঙে এবং বিশাল এক ক্যানভাস জুড়ে। ভাষা অপূর্ব নিপুণতায় বর্ণময় মাধ্যম হয়ে উঠলো। সেই কারণে কাহিনী উপভোগের পরন্তু সক্ষম স্তম্ভের মতো অনায়াসে ধরে থাকলো গোটা ক্যানভাস। লোভ, কামনা, আত্মনিবেদিত-ঈশ্বরমনস্কতা আর রক্তস্রোত ইতস্তত নানা খাতে সঞ্চরণ করছে এবং পুরো প্রেক্ষিত জুড়ে মিশ্ররঙের বিন্যাসে জেগে উঠছে বিশালতম মানবসত্তার এফেক্ট। বিপুল, কিন্তু সুদূর নয়। বরং তা শিরশিরে এক অনুভূতির স্পন্দন তোলে আমাদের চেনা স্মৃতিতে।

মীর মশাররফের এখানেই কৃতিত্ব। আরবের রুক্ষ বালিময়তা হাসান-হোসেনের কাহিনীর ভিতরকার মানবিক বেদনাকে তিনি সংবাহন করে এনেছিলেন স্বকীয়তায়। কারবালার ছমছমে নিঃশব্দ প্রান্তরে যাট হাজার লোকের মৃত্যু কখনো তাই, সত্য-সীমার অতীত কাহিনীবস্তু বলে মনে হয় না আমাদের, অন্তর্লীন মানবিক সরসতার বড় আপন হয়ে ওঠে, বাক্তিগত বেদনাবোধের সঙ্গে মিশে যায়। এ কৃতিত্ব হয়তো কৃত্তি-বাসের সঙ্গে তুলনীয়।

কিন্তু মানবিকতার সংকেতগুলো ঠিক কোনখানে? কাহিনীর ভাঁজে ভাঁজে কিভাবে সংগুপ্ত থেকে গেছে সে উপাদান কিংবা চরিত্র—এ প্রশ্ন স্বভাবত জাগে। সম্পাদকের দিকনির্দেশ অনুসারে না-হয় মেনে নিলাম—এটি 'ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস'; পরন্তু ঐতিহাসিকতার সঙ্গে আরবী-ফারসীতে সীমাবদ্ধ জ্ঞান মীর মশাররফ হাসান-হোসেনের প্রচলিত গল্প কথাকে মিশিয়ে নিয়েছিলেন এও মানতে বাধা নেই। অন্তত তথ্যের খাতিরে। তবু কি এক মুহূর্তের জন্যও ভোলা সম্ভব এ গ্রন্থের মহাকাব্যিক-প্রবহমানতাকে? যখন ক্রমশ আবিষ্কার করি—ভক্ত মাবিয়া নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সে দৈববিধানে পুত্র-লাভ করলেন—এবং ক্রমশ ঘরোয়া পরিবেশের মনোরম-সীমা-বদ্ধতা ডিঙিয়ে পুত্র এজিদ বাস্তিত পেল দামেস্ক রাজ্যের অধিরাজ হিসাবে, নিয়তির তীব্র টানে সুস্থ পথে নয়, জয়নাবের প্রতি কামনায় তা চরিতার্থ করার বক্র-ইচ্ছায়। ব্যাপ্তির সীমারেখা এখন বহুদূর ছড়ানো, দামেস্ক থেকে মদিনা এবং উপন্যাসের বহুস্তর-অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমশ প্রসার সমগ্র আরব রাষ্ট্রে। কিন্তু ব্যাপ্তির পাশাপাশি সমতালে বইছে আর একটি স্রোত, তাতে অসংখ্য মুখের ছায়া। এজিদের কামনা-জাত তীব্র চতুরালিতে আবদুল জাব্বারের সাধারণ ঘর থেকে বিচ্যুত হল যে নিষ্পাপ জয়নাব, তার পুনর্বিবাহের প্রথম পছন্দ স্বভাবত ঈশ্বর উপাসক পবিত্র হাসান। এজিদ ক্ষিপ্ত হলো, উদ্যোগী হল হাসান হোসেনের সর্বনাশে। এই উদ্যোগ এবং তার কারণে নিম্নমুখী ফলশ্রুতি হাসান-হোসেনের মৃত্যু। মহরমপর্ব। আর সমগ্র পর্বটিতে আদালতে আমরা এক এক করে দেখে যাই, ধূর্ত মারওয়ান, হোসেন-হত্যার নিযুক্ত মায়মুনা, জায়দা কিংবা হাসনেবানু ও জয়নাবকে; রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করি সেই মুহূর্তটিকে, যখন জায়দা পা-টিপে ঢুকছেন ঘুমন্ত হাসানের ঘরে—স্বামীর পা জড়িয়ে ঘুমন্ত সতীন জয়নাব, তাঁর বিষজ্বালার উৎস—সতর্কভাবে হীরে-চূর্ণ মেশাচ্ছেন জলে। কিংবা জীবনের আর একটা ধ্রুপদী ছবি কি দীর্ঘকালের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায় না মনে—কারবালার ধু-ধু মাঠে অসংখ্য মৃতদেহের মাঝখানে যখন ভেসে ওঠে

কাসেমের দেহ, হাসানের পত্নী উনি, সর্বাঙ্গে রক্ত নিয়ে জড়িয়ে রয়েছেন এই তো কিছুক্ষণ আগের বিবাহিতা সখিনাকে? স্বামীর রক্তে মাখামাখি সখিনার শরীর, নবপরিণয়ের বস্ত্র-অলংকার; এবং প্রান্তরের এই অজস্র মৃত বীরেরা মৃত্যুর আগে কেউ একবিন্দু জল পায়নি।

ছবির পর ছবি। মহরম এবং তার পরিপূরক দুটি পর্ব—'উদ্ধার' আর 'এজিদ-বধে'র আগাগোড়া অনেক মানুষের ছবির মেলা। তাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত দুঃখ আছে লোভ-বিরংসা আছে, কিন্তু সেই সব ছোট ছোট মানবিক ভাবমণ্ডল ক্রমশ মিশে যায় এজিদের 'জিঘাংসা' এবং হাসানের বিরাট বিষাদের যুগলবন্দীতে। ধূপদী অঙ্গনে মানুষের জীবন নিয়ে এই সংগীতিক-হার্মনি আমাদের চেতনার বিশাল জমি দখল করে। এবং মহাকাব্যিক ব্যাপ্ততা সত্ত্বেও নৈর্ব্যক্তিক এক দর্শকের বদলে আমরা পেয়ে যাই মানুষের নিকট-ছায়া তাদের নানা মুখ, নানা ভাবনার রঙ-বাহার।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনী

একটি সংকেতের জন্য। সমরজিৎ কর। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। ছয় টাকা

একটি সংকেতের জন্য বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনী। লেখক সমরজিৎ কর বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান লেখক ও সাংবাদিক। বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনী বা সায়েন্স ফিকশনে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার শূন্য বলা চলে, যে দু একটি রচনা আছে আধুনিক পাঠকের চাহিদা মেটাতে সেগুলি সমর্থ নয়। সমরজিৎবাবু দীর্ঘদিন ধরে বাংলা সাহিত্যের এই অভাব দূর করার চেষ্টা করে আসছেন। 'একটি সংকেতের জন্য' তাঁর সেই প্রচেষ্টাগুলির অন্যতম।

কাহিনীর পটভূমি উতকামণ্ডের মানমন্দির। যন্ত্র মানমন্দিরের রেডিও দূরবীন। নায়ক একদল বিজ্ঞানী। বিরাট রেডিও দূরবীন নিয়ে বিজ্ঞানীর দল যখন সারা আকাশ তন্ন তন্ন করে নতুন আবিষ্কারের আশায় চেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন সুদূর মহাকাশ থেকে সংকেত এল 'ত্রিশ ডিগ্রি উপরে দেখা করতে চাই।' এক অদ্ভুত অবিশ্বাসের ও আনন্দের দোলায় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না এও কি সম্ভব। কয়েকদিন পরেই দেখা গেল দূর-বীনের ডিসন প্লেটে চারটি গোলাকার আলোকবিন্দু। অন্য জগতের এই সব সংকেত উদ্ধারের প্রচেষ্টায় সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা একত্রিত হলেন। পৃথিবীর সব মানমন্দিরে তৎপরতা দেখা গেল। একই উদ্দেশ্য নিয়ে একদল বিজ্ঞানী এলেন প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ ক্যালেডোনিয়া দ্বীপে। সেখানকার আকাশে একদিন দেখা দিল পানসী নৌকার মত দেখতে শূন্যে ভাসমান এক মহাকাশ যান যা থেকে গোলাপী রং-এর এক তীব্র আলো ভেসে এসে মুহূর্তে এক একটি দ্বীপকে অদৃশ্য করে ফেলছে। এই পানসীতেই একদিন অন্য জগতের মানুষের হাতে বন্দী হয়ে এলেন পৃথিবীর কয়েকজন বিজ্ঞানী। অদ্ভুত দেখতে সে জগতের মানুষ। চেহারা চারকোণা বাক্সের মত; হাত, পা, দেখতে কৃত্রিম হাত পায়ের মত। তারা কথা বলে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করে। এমন কি অন্য মানুষের মনের কথাও জানতে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। সেই পানসীতে বন্দী হয়ে বিজ্ঞানীরা এলেন বৃহস্পতির পাশ কাটিয়ে ইউরেনাসের উপগ্রহ টাইটা-নিয়াতে। এখানকারই অধিবাসী তারা। এত উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের ভিতরও রয়ে গিয়েছে জাতিভেদ প্রথা—প্রাকৃতিক মানুষ ও কৃত্রিম মানুষ। এই জাতিভেদ প্রথাই পৃথিবীর মানুষদের পৃথিবীতে ফিরে আসতে সাহায্য করল।

স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় লেখা কাহিনী। প্রতি মুহূর্তে সাসপেন্স। একটির পর একটি সাসপেন্সের মাঝে রিলিফ হিসাবে আছে 'বিজ্ঞানী ডঃ বসুর অন্য বিজ্ঞানী ডঃ সুমিত্রা মালহোত্রার প্রতি দুর্বলতা। অবশ্য রুচি ও ভব্যতার মাঝে সীমায়িত। সামান্য দু একটি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্বেও সমগ্র বিচারে কাহিনীর পরিবেশনা এত সুন্দর যে রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত বইটা পড়ে যেতে কোন অসুবিধা হয় না।

উপন্যাস

সূর্যাস্তিরাম : অংশুমান বসু। হরিপদ প্রকাশন। ২৪ এ, আমহার্স্ট স্ট্রিট, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, যা এখন 'বর্তমান' সেটা যেন এক আবর্ত। সেই আবর্তে আমরা সবাই জীবন ধারণ করি। জানি না, সে জীবনের অর্থ কী? বেঁচে থাকি শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে। পারম্পর্য-হীনতাকে অবলম্বন করে। যেখানে কোন ধারাবাহিকতা নেই, আছে অসংলগ্ন ঘটনা। এবং এমন যেখানে পরিস্থিতি, সেখানে আমরা প্রত্যেকে এক একজন ভূমিকাহীন নায়ক ছাড়া আর কী হতে পারি? অংশুমান বসুর নতুন উপন্যাস **সূর্যাস্তিরাম** আজকের এই ভূমিকাহীন কয়েকজন নায়ক এবং একজন নায়িকারই সার্থক চিত্ররূপ যদি বলি হয়ত বাড়িয়ে বলা হবে না।

নায়িকা মালতী ভাল ঘরের মেয়ে। দারিদ্র্যের চাপে পড়ে তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছে চাকরি নিতে হল। অবশ্য চাকরিটা বাইরের ব্যাপার। আসল যা, তা হলো ওই ধনীর হাতে সে যেন একটি 'টোপ'। পরের মনোরঞ্জন করে তার ব্যবসায়ের উন্নতি ঘটানই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল মালতীর একমাত্র কাজ।

নায়ক সন্টি। এবং তার আরও কয়েকজন বন্ধু। কুড়ি পঁচিশের মধ্যে তাদের বয়েস। মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের মধ্যে পড়ে এদের কেউ সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে। কেউ চোরা কারবারী। এরা নেশা করে। খিস্তি করে। আবার নিজের মা যখন না খেতে পেয়ে মরে তখন কান্নার সমুদ্রও ডাকে। এমন বিচ্ছিন্ন এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের মাঝখানে সন্টির সঙ্গে একদিন পরিচয় হল মালতীর। লেখক মুখ্যত এই দুটি ছেলেমেয়ের বেঁচে থাকার মত একটি সুন্দর জীবন তৈরীর সংগ্রামের কাহিনীই বিধৃত করেছেন সূর্যাস্তিরামে। বর্তমান সামাজিক পটভূমিকা নিয়ে লেখা এবং লেখকের সহজ এবং স্বচ্ছ উপ-স্থাপনায় কাহিনীর প্রতিটি চরিত্র পাঠক-পাঠিকাদের মনে দাগ কাটবে বলেই মনে হয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আমার পুতুল (শতরূপা গ্রন্থমালা, হাওড়া-১, চার টাকা) দেবারতি মিত্রর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কাব্য সংকলন 'অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে'-র তিন বছরের মধ্যে প্রকাশিত এই দ্বিতীয় গ্রন্থে দেবারতি যে অনেকটাই পালটে যাবেন, এমন আশা থাকার কথা নয়। বস্তুত, দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে খুব বড়ো পরিবর্তন চট করে ঘটে না। 'লাবণ্য ও নিঃসঙ্গ বিষাদে লেখা'—দেবারতিরই কথা ধার করে তাঁর কবিতা সম্পর্কে পত্রান্তরে প্রয়োগ করেছিলেন যে-আলোচক তিনি খুব অনায়াসে দেবারতির [illegible] প্রবণতার দিকে আঙুল তুলে দেখাতে পেরেছিলেন। 'আজন্ম অজানা এক গান কিংবা উপহার' দেবারতির কাব্য-অন্বেষণের পরম লক্ষ্য।

দেবারতির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের কবিতার পাঠকের খুব সহজেই চোখে পড়বে যে, আদ্যন্ত একটি রমণীয় অনুভব এই রচনা-বলীতে ছড়িয়ে রয়েছে। নায়িকার একান্ত দৃষ্টিপাতে, রমণীর নিজস্ব অনুভবে, তাঁর কবিতা উজ্জ্বল। 'তুমি আমার খুব ভিতরে চলে আস/নিবিড় গোপন ভ্রূণ আমার জরায়ুতে বাড়ো/আমি তোমায় লালন করি', 'ভিত নড়ে যায় জরায়ু পর্যন্ত', 'সবুজ মথের মতো বালাপষ। হাত/তুলে নেবে পশম ও কাঁটা/অপূর্ণ দুপুরবেলা বুনে যাবে নির্জন বিন্যাসে' 'সিঁদুর কৌটোর মতো আমগাছের বলয়িত শাখা', 'রূপোলি সবুজ বন রক্তস্বলা
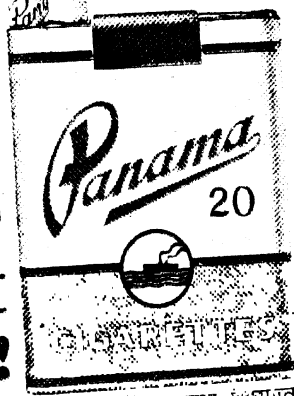
নারীর শরীর......সদালস ওম ঠোঁটে ঘন মধু টেনে আনে শীত......বাঘের উদগ্র চোখে ধক-ধক জ্বলে দুটি স্তনবৃন্ত' জাতীয় পংক্তি কিংবা 'পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী তারা গুঞ্জন'—কবিতায় দেবারতি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার যে-জগতে পাঠককে ডেকে নেন, তার তুলনা বাংলা কবিতায় খুবই কম চোখে পড়ে। শেষোক্ত কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য আরও এই কারণে যে, ভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে মিলনের সৌন্দর্য বর্ণনার ছবিটি অসামান্য রূপে সার্থক। অনুভূতি ও বর্ণনা এই কবিতায় পার্বতী-পরমেশ্বর।

'ক্রিকেটের ছড়া' এবং 'দেবীর সামনে চিত্তরঞ্জন' কবিতায় দেবারতি তাঁর ছন্দের জ্ঞানের এমন নিখুঁত পরীক্ষা দিয়েছেন যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের অসংগতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বলে মনে হবার কথা। তৎসত্ত্বেও কিছু সন্দেহ যে জাগে না, এমন নয়।

✻

'সেই বাড়িটা' নামের কবিতাটি যদি অন্তর্ভুক্ত না হতো, বরুণ চৌধুরীর ছন্দে লেখার কোনো চিহ্ন পাওয়া যেত না তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ **মধ্যরাত হেমন্তে হলুদ এ** (কৃত্তিবাস প্রকাশনী, কলকাতা ১২, তিন টাকা)। কবিতাটি ছন্দের নির্ভুল দৃষ্টান্ত হলেও, শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে পুরো-পুরি সার্থক বলা যাবে না। 'শাখার বাতি দোলে' অথবা 'সেই তারাতে কথার শান্তি তেমনি করেই দোলে'—খুব সুখকর ব্যবহার নয়। বিশেষত সেই কবির পক্ষে যিনি অনায়াসে লেখেন, 'স্মৃতিতে তোমার আজও তেমনি মন-কেমন-করা ধান', অথবা 'আমরা কেউ কারুর দুঃখকে ছুঁতে পারি না/যতই হাত বাড়াই' কিংবা 'বুকের কাছে ছেঁড়া বোতামের মতো ঝুলছে—/সেই রক্তাক্ত আশা!/জলে-জলে শৈশব-ডোবা অন্ধকার'।

বরুণ চৌধুরীর এই কাব্য সংকলন নিঃসংশয়ে জানিয়ে দেয় যে, ছন্দ নয়, ছন্দঃ-স্পন্দই এই কবির রচনার ঋজু মেরুদণ্ড। ছন্দে না লেখা মানেই গদ্যের অমসৃণ রুক্ষতার দিকে ঝুঁকে পড়া নয়, ছন্দঃ-স্পন্দেরও আছে প্রবল বেগ যা সমানভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, পারে প্রয়োজনীয় অভিঘাত তৈরী করতে।

'আমার পাপ আর প্রার্থনার মাঝে/সবুজ মাঠের মতো তোমার নির্জন দৃষ্টি জেগে থাক।' 'সময় দিতে পারা সব থেকে কঠিন/শীত সময় দেয় না কোকিলকে/শিশির সময় দেয় না সূর্যকে,' 'পার্কের শূন্য দোলনার মতো/মেয়েটির শেকল-বাঁধা যৌবনের প্রতীক্ষা।' বরুণ চৌধুরীর এই জাতীয় সপ্রতিভ পংক্তির পাশে 'নিঃসঙ্গ স্মৃতির টায়ার', 'আমার স্মৃতিগুলো তোমার মেঘলা দেহ বেয়ে টিপটিপ করে পড়ছে, স্বপ্নের অম্ল' অথবা 'অভিমানের সোনার সাঁকো' যেন বেমানান।

'মাথার মধ্যে যে ভালবাসার শেকড় ফুলগুলো তার আনন্দের হাবে' এবং 'সেই পুতুলটা ভেঙে গেছে যা আমি এতদিন হৃদয়ের ভিতরে সাজিয়েছিলাম' (যখন ঝড় উঠলো) শেলীর বহুশ্রুত সেই পংক্তি দুটি (আওয়ার সুইটেস্ট সঙ........ইত্যাদি) এবং রবীন্দ্রনাথের 'খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে' মনে করিয়ে দিল।

✻

বিশুদ্ধ একটি ভাবনাকে শিল্পরূপ দিতে গেলে রূপকের আশ্রয় নেওয়া পদ্ধতি হিসেবে খুব নতুন নয়। তবু চেঁচামেচির চিহ্ন কতটা ঢাকা পড়েছে, বা আদৌ পড়েছে কিনা সেটাই লক্ষ করার। সাম্প্রতিক কিছু মঞ্চসফল নাটক দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে, নাট্যকার রূপক ব্যবহার করে ভয় পেয়ে গেছেন, বক্তব্য বোধ হয় ঠিকঠাক পৌঁছে দেওয়া গেল না। সে-কারণে রূপকের রীতি-নীতি অগ্রাহ্য করে শ্লোগান জুড়ে দিয়েছেন। দর্শককে যে পক্ষান্তরে হীনই ভাবা হয় এর ফলে—এ-বোধ, অনুমান করি, চীৎকারসর্বস্ব সে-সব নাট্যকারদের নেই।

তরুণ নাট্যকার স্নেহাশিস শুকুল রচিত **নিশ্চুপ রাজা** (ভাষা, কলকাতা-৯, দু টাকা) পড়তে গিয়ে কিছু আশংকা তাই স্বাভাবিক-ভাবেই জেগেছিল। কেননা, আরম্ভেই বোঝা যায়, নাটকটি রূপকাশ্রয়ী। কিন্তু শেষ করার পর সমস্ত আশংকার সানন্দ পরিসমাপ্তিই ঘটে। বয়সে তরুণ হলেও স্নেহাশিস যথেষ্ট প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন, পরিচয় রেখেছেন সীমারেখা-সচেতনতার। মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংস্কার ও স্থবিরতার একটি ছবি যে এই নাটকে ফুটে উঠেছে, স্বীকার্য। দুটি মাত্র প্রধান চরিত্র, ঘটনার ঘনঘটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নাটকটি তাই বেশী মাত্রায় সংলাপনির্ভর। তার মধ্য দিয়েই অনায়াস গতিতে নাটকটি তার অন্তর্লীন বক্তব্যকে তুলে ধরতে পেরেছে।

পত্রিকা

পর্ণপুট। কবিপক্ষে দুই বাংলার কবিতা।

শুধু কবিতাতেই সংখ্যাটির পৃষ্ঠা-গুলি পরিপূর্ণ। কবিদের অনেকই স্বনামে খ্যাত যেমন অরুণকুমার সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, তুষার রায় প্রভৃতি। এবং এর সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে বাংলাদেশেরও এক-গুচ্ছ কবিতা।

শব্দমন্ত্র। বিশেষ সংখ্যা।

এই সংখ্যাটিও রবীন্দ্র জন্মদিন কেন্দ্রিক। এক ঝাঁক কবির কাব্যগুঞ্জনে সংখ্যাটি গুঞ্জরিত।

খেলার মাঠে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এখন সরকারী ভাবেই ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন

আটটি দেশকে নিয়ে ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব কাপ ক্রিকেট ফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে ১৭ রানে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। যদিও টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে এক দিনের ৬০ ওভারের সীমায়িত ক্রিকেটের অনেক পার্থক্য, তবু এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের নিরিখে, বিশেষ করে প্রতিযোগিতার ৫টি খেলায় জয়ের সুবাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে এখন ক্রিকেটের এক নম্বর দেশ বলা যায়। স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রেলিয়ার স্থান দ্বিতীয়, ইংলণ্ডের তৃতীয় এবং নিউজিল্যাণ্ডের চতুর্থ। এর পরে স্থান পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা ও পূর্ব আফ্রিকার। এক সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে বলা হত ক্রিকেটের বেসরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এখন সরকারীভাবেই তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাকিস্তান 'বি' গ্রুপে পড়ায় যোগ্যতার যথাযথ পরিচয় দিতে পারেনি। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রায় সমান তালে সংগ্রাম করে পাকিস্তান হেরে গেছে। বিশেষ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে পাকিস্তান যেভাবে খেলেছে, বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে তা স্মরণীয় খেলা হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। খেলাটির ফল যে-কোন দিকে গড়াতে পারত। কিংবা ব্রিসবেন টাই টেস্টের মত টাই-ও হতে পারত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক উইকেটে খেলায় জেতে ৬০তম ওভারের (শেষ ওভার) দুটি বল বাকি থাকতে। পাকিস্তানের ২৬৬ রানের উত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করে ৯ উইকেটে ২৬৭ রান, ৫৯-৪ ওভারে। নিঃসন্দেহে এটি ছিল প্রথম বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার খেলা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এবং অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল খেলাটিতেও অবশ্য উত্তেজনা এবং নাটকীয়তা কম ছিল না। নাটকীয় সংঘাত ছিল ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সেমি-ফাইনাল খেলাতেও, যে খেলা ৩৬ রানে ইংলণ্ডের ৭টি উইকেট পড়ার পর ৯৩ রানে ইনিংস শেষ হয়েছিল এবং অস্ট্রেলিয়া ৩৯ রানে ৬টি উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে খেলায় জিতেছিল প্রধানত নতুন চৌকস খেলোয়াড় গ্যারি গিলমোরের বোলিং ও ব্যাটিং দক্ষতায়।

সন্দেহ নেই, এই গ্যারি গিলমোরই বিশ্ব ক্রিকেটের এখন নতুন তারকা। গ্রুপ লীগে পাকিস্তান, শ্রীলংকা বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া ওকে দলে নেয়নি। সেমি-ফাইনালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দলভুক্ত করে অফস্পিনার ম্যালেটের বদলে। অস্ট্রেলিয়া দলে প্রথম খেলার সুযোগে মাত্র ১৪ রানে ইংলণ্ডের ৬টি উইকেট দখল করে এবং বিপর্যয়ের মধ্যে ব্যাট করতে এসে ২৮ রানে অপরাজিত থেকে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নায়ক হয়। ৩৬ রানে ইংলণ্ডের প্রথম যে ৭টি উইকেট পড়ে তার ৬টি দখল করে গিলমোর। গিলমোরের ওই খেলার সুবাদে ফাইনালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরও চিন্তা জেগেছিল ওকে নিয়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়রা বলেছিল, অস্ট্রেলিয়ার নামী তিন ফাস্ট বোলার জেফ টমসন, ডেনিস লিলি এবং ম্যাকস ওয়াকারকে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। চিন্তা নবাগত গিলমোরকে নিয়ে। বলা বাহুল্য, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ফাইনালেও গিলমোর নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে ৪৮ রানে ৫টি উইকেট দখল করে।

২৬ বছর বয়সী ন্যাটা মিডিয়াম পেস বোলার গিলমোরের বল করার ভঙ্গী হুবহু অ্যালান ডেভিডসনের মত, এবং ডেভিডসনের মতই ব্যাটেও হাত ভাল। গিলমোর সত্যিকারের চৌকস ক্রিকেটার।

বিশ্ব কাপ ক্রিকেটের মোট ১৫টি খেলায় আট দেশের অনেকেই ব্যাটে-বলে দক্ষতা দেখিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ডেনিস অ্যামিসের ১৩৭ রান, পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিউজিল্যাণ্ডের গ্লেন টার্নারের ১৭১ এবং ভারতের বিরুদ্ধে নট আউট ১১৪, শ্রীলংকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার নতুন ওপেনার অ্যালান টার্নারের ১০১, কিংবা ভারত-নিউজিল্যাণ্ড খেলায় বিপর্যয়ের মধ্যে নেমে আবিদ আলীর ১০৭ মিনিটে ৭০ রান করার মধ্যে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত ক্রিকেটের নিদর্শন আছে। কিন্তু প্রথম বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে সম্রাটের সম্মান পেয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড তার সাহস-শৌর্য-লাবণ্য ও দীপ্তি-ভরা অনবদ্য একটি ইনিংসের ফলে। ক্রিকেটের পীঠভূমি কালপ্রাচীন লর্ডসে গুণগরিমায় এমন ইনিংস বেশী দেখা যায়নি।

মনে রাখতে হবে লয়েড ব্যাট করেছে লিলি, টমসন, ওয়াকার এবং ওই গিলমোরের

ফুটবল লীগের খেলায় বাটার বিরুদ্ধে গোল করছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের হাবিব
—ফটো দেশ

বিরুদ্ধে। যখন ব্যাট করতে নেমেছিল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। ৫০ রানের মধ্যে বিদায় নিয়েছিল রয় ফ্রেডেরিকস, আলভিন কালীচরণ এবং গর্ডন গ্রিনিজের মত তিনজন নামী ব্যাটসম্যান। অবস্থা বদলে দেবার অভিপ্রায় নিয়েই লয়েড খেলতে নামে রিচার্ডসের আগে। অবস্থাটা পাল্টেও দেয় ব্যাটের বিক্রমে। ২৬ ওভারে ৮২টি বল থেকে ১০০ মিনিটে করে ১০২ রান ১২টি চার ও ২টি ছক্কার মার সমেত। কানহাইয়ের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে যোগ করে ১০৮ মিনিটে ১৪৯ রান। সীমায়িত ওভারের এক দিনের ক্রিকেটে ম্যাচ জয়ের জন্য যে শক্তি ও মানসিকতার প্রয়োজন তার অতি উজ্জ্বল উদাহরণ লয়েডস-এর এই ইনিংস।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার ফাইনাল খেলা দেখার জন্য ইংলণ্ড আগেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। লর্ডস মাঠের একটি আসনও খালি ছিল না। লয়েডসের খেলা দেখে লর্ডস প্রায় উন্মত্ত। মাঠে মারের বন্যা, গ্যালারিতে প্রতিনিয়ত উল্লাসে ফেটে-পড়া দর্শকদের আনন্দরোল। ফাস্ট বোলার লিলির কাছ থেকে লয়েড প্রথম যে ওভারটি পায় তা থেকে সংগ্রহ করে ১১ রান। তার মধ্যে একটি ছিল 'ভয়ংকর' ছক্কার মার। বলটি উড়ে যায় লর্ডস টাভার্নের দিকে। সেখানে পানপাত্র হাতে ছোট একটি মজলিস বিয়ার সহযোগে ক্রিকেটের উত্তাপ উপভোগ করছিল। লয়েডের ব্যাট থেকে ছুটন্ত গোলাটির ভয়ে তারা ছত্রখান হয়ে পড়ে। সত্যি এ খেলা দেখে সুখ আছে।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল ইংলণ্ডে এসেই বলেছিল আমরা বিশ্ব কাপ এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ দুটোই জিততে চাই। আমাদের এক দিনের খেলা অনেকে দেখেনি। ভাল ক্রিকেটাররা ভাল ক্রিকেটারই। তা এক দিনের খেলাই হোক আর পাঁচ দিনের টেস্টই হোক। গ্রুপ লীগে এবং ফাইনালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে অস্ট্রেলিয়া দুবার পরাজিত হয়েছে সত্য, কিন্তু অস্ট্রেলিয়াও দেখিয়ে দিয়েছে তাদের সংগ্রামী শক্তি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বড় রানের বিরুদ্ধে দ্রুত রান তুলতে গিয়ে তাদের পাঁচজন খেলোয়াড় রান-আউট না হলে ১৭ রানের ব্যবধানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফাইনালে জিততে পারত কিনা বলা শক্ত।

চ্যাপেল টসে জিতেও প্রথমে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে পাঠায়। যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক লয়েড তিনটি খেলায় টসে জিতেও প্রথমে ব্যাট করেনি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৬০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯১ রানের উত্তরে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস ২৭৪ রানে শেষ হয়ে যায় ৫৮·৪ ওভারে। অস্ট্রেলিয়ার সবাই দ্রুত রান করতে চেষ্টা করে। অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল ওপেনার অ্যালান টার্নারের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে যোগ করে ৫৬ রান। তারপর টার্নার, গ্রেগ চ্যাপেল এবং ইয়ান চ্যাপেল—তিনজন নামী খেলোয়াড়ই রান-আউট হয়ে যায়, শেষ দিকে রান-আউট হয় টমসন ও ওয়াকার। ইয়ান চ্যাপেলই করে সবচেয়ে বেশী ৬২ রান।

ক্রিকেটের কবি কার্ডাস বলে গেছেন, বিলম্বিত লয় শুধু সংগীতের রাগ-রাগিণীতেই নেই, ক্রিকেটের মধ্যেও আছে। ধৈর্য ও ধীর লয়ের মধ্যেই ক্রিকেট মহৎ স্তরে পৌঁছেছে। ক্রীড়ানটদের চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে কঠিন মানসিকতার আবরণ ও আচরণে। এক দিনের এই ক্রিকেটেও কি সে মানসিকতা ফুটে ওঠেনি? উঠেছে। বিশেষ করে ফুটে উঠেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক রোহন কানহাইয়ের খেলায়। কানহাই ১৫৬ মিনিট উইকেটে টিকে থেকে নিজে ৫৫ রান করেছে, এক দিক আটকে রেখে লয়েডকে মারের অনুপ্রেরণা যোগিয়েছে। সুতরাং খেলার উৎসাহ-উদ্দীপনা মানসিকতা এবং নাটকীয়তার দিক দিয়ে প্রথম বিশ্ব ক্রিকেটের অনুষ্ঠান সফল বলা যেতে পারে।

বিশ্ব প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার প্রুডেন্সিয়াল ট্রফিটি প্রুডেন্সিয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দান—অতীতে ভারতে যে কোম্পানীর বড় ব্রাঞ্চ অফিস ছিল। সঙ্গে আছে ৪ হাজার স্টার্লিং পারিতোষিকও।

ভারতের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ নাকি আগামী বছর ভারতে বিশ্ব ক্রিকেটের উদ্যোগ-আয়োজনে আগ্রহী। এখনো ঠিক হয়নি আগামীবার কোথায় খেলা হবে। যদি ভারতে হয় আমরা কিছু ভাল ব্যাটিং দেখার সুযোগ পাব।

ফুটবল এবং উইম্বলডন

সমসাময়িক ঘটনাই সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার আলোচনার বিষয়বস্তু। সমসাময়িক খেলাধুলোও। কিন্তু সাময়িক ও সাপ্তাহিকের পক্ষে হালফিল বিষয়গুলির টাটকা পর্যালোচনা অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না অনেক আগে লেখা শেষ করতে হয় বলে। এ কৈফিয়ত দেবার প্রয়োজন হত না যদি দুখানি চিঠি না পেতাম। পত্রলেখকদ্বয় অভিযোগ করেছেন, আগে 'দেশ' পত্রিকায় ফুটবলের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা করা হত। এখন হয় না কেন?

কেন হয় না তার কারণ, প্রকাশের তারিখের ১৩ দিন আগে এখন দেশ-এর লেখা শেষ করতে হয়। ওই ১৩ দিনের মধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়।

এ বছরের লীগের কথাই বলা যাক। অন্যান্যবারের তুলনায় এ বছরের লীগের আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বেশী। তিন প্রধান ক্লাব—ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান বিজয় অভিযান বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে। তিনটি দলের খেলা দেখার জন্য মাঠ ভেঙে পড়ছে দর্শকে। কিন্তু কবে যে কোন দল পয়েণ্ট হারাবে কেউ বলতে পারে না। ইস্টবেঙ্গলের তিন ফরোয়ার্ড পঞ্চাশের খেলা এখনো চোখে লাগছে না। মহমেডানের নবাগতের সঙ্গে পুরনো খেলোয়াড়দের এখনও ঠিকমত বোঝাপড়া হয়নি, যদিও তারা বেশী গোলে খেলায় জিতেছে প্রথম দিকে। মোহনবাগানের আক্রমণ ও রক্ষণ ভাগে দুর্বলতা আছে, যার ফলে রাজস্থান ও উয়াড়ী সংঘকে পরাজিত করতে তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছে। মোটের উপর ফুটবলের উন্মাদনায় ময়দান মেতে উঠলেও খেলার মধ্যে সামঞ্জস্য, সৃজনশীলতা এবং নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের এখনো পরিচয় মেলেনি।

উইম্বলডন : এ লেখা যখন পাঠকদের কাছে পৌঁছবে তখন উইম্বলডন টেনিস থেকে অনেক তারকা বিদায় নিয়েছে। উইম্বলডনের বাছাই তালিকা এবং এই সম্পর্কিত খবরাদি আগে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তথ্য সময়মত হাতে না আসায়।

বলা বাহুল্য, পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজাত এবং বনেদি এই টেনিস প্রতিযোগিতায় এবার তরুণদেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। কেননা, জিমি কোনর্স, গিলারমো ভিলাস, জর্ন বর্গ, রাউল র‍্যামিরেজ, রসকো ট্যানার, ব্রায়ান গটফ্রিড প্রভৃতি যে সব নাম এখন সংবাদপত্রে বড় শিরোনামা পাচ্ছে তারা সবাই তরুণ। কারো বয়সই তেইশের বেশী নয়। মেয়েদের মধ্যেও মার্কিন কন্যা ক্রিস এভার্ট ও চেক কন্যা নাভরাতিলোভার খেতাব জয়ের সম্ভাবনা। তরুণদের আধিপত্যের মধ্যে যদি কোন বর্ষীয়ান পুরুষ বা মেয়ে খেতাব পায় সেটা হবে ব্যতিক্রম।

একলব্য

ফুটবলার শ্যাম থাপা

উনিশশো চৌষট্টি সালে জুবিল্যান্ট জ্যোতি নামে দেরাদুনের একটি ফুটবল দল আই এফ এ শীল্ডে খেলতে এসেছিল। নামকরা কোন দল নয়। সুতরাং ওদের খেলা সম্পর্কে দর্শকদের কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন ক্লাবের যে সব কর্মকর্তার নজর থাকে উঠতি খেলোয়াড়দের দিকে, তারা শুনেছিল জুবিল্যান্ট জ্যোতি দলে একটি নেপালী ছেলে আছে যে ভবিষ্যতে নেপালের চন্দন সিং, বীর বাহাদুর, পুরণ বাহাদুর বা রাম বাহাদুরের মতই ভারতীয় ফুটবলে জ্যোতি বিকিরণ করতে পারে। ১৯৬৩-তে সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা সুব্রত মুখার্জি কাপের খেলায় নাকি ছেলেটি খুবই নাম করেছিল।

কলকাতার ক্লাব চাঁইরা অবশ্য ওর খেলা দেখে খুব খুশী হতে পারেনি। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খ্যাতিমান হাফ ব্যাক রাম বাহাদুর বলেছিল, দু-তিন বছরের মধ্যে ও আমাদের ছাড়িয়ে যাবে। পায়ের কাজ, মাথার বুদ্ধি, শরীরের শক্তি, জোরালো শট—সবই ওর আছে। শুধু পরিমার্জনের অপেক্ষা। ক্লাব মহল তখন রাম বাহাদুরের কথায় তেমন মূল্য দেননি। ধরে নিয়েছিলেন দেরাদুনের ছেলে বলেই ওর প্রতি রাম বাহাদুরের দুর্বলতা।

এক বছর পরে ইস্টবেঙ্গল একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গেল দেরাদুনে গোর্খা ব্রিগেডের সঙ্গে। দেখা গেল জুবিল্যান্ট জ্যোতির সেই ছেলেটি শক্তিশালী ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ ব্যূহে বার বার ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে। পরে ডুরাণ্ডের খেলায় ওই ছেলেটিই লীডার্স ক্লাব এবং মোহনবাগানকে রীতিমত বেগ দিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা অতঃপর রাম বাহাদুরের কথা মেনে নিয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমে ছেলেটিকে দলে আনার ব্যবস্থা পাকা করেছিলেন। মা ও বাবার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন সামরিক বৃত্তিতে ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে। কিন্তু ছেলেটিকে শুভানুধ্যায়ীরা বুঝিয়েছিল, সামরিক বাহিনীতে গোর্খা সম্প্রদায়ের বড় বড় অফিসারের অভাব নেই। সেখানে তাদের শৌর্য-বীর্য এবং সুনামেরও অভাব নেই। কিন্তু গোর্খা সম্প্রদায়ের মধ্যে নামী ফুটবলারের সংখ্যা তো হাতে গোনা যায়। ক'জন চন্দন সিং, বীর বাহাদুর, পুরণ বাহাদুর হতে পেরেছে? শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শেই ছেলেটি ১৯৬৬তে ইস্টবেঙ্গল দলে যোগ দিল।

বলা বাহুল্য, ওই ছেলেটিই আজ ভারতীয় ফুটবলের এক বিশিষ্ট নাম—শ্যাম সিং থাপা। '৬৬ ও '৬৭তে ইস্টবেঙ্গলে খেলে আবার ফিরে গিয়েছিল সামরিক বাহিনীতে। '৭০—'৭১ আবার দু' বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলে বোম্বাইতে গিয়েছিল মফৎলাল স্পোর্টস ক্লাবের ডাকে। এ বছর আবার ইস্টবেঙ্গলে ফিরে এসেছে। প্রথম শ্রেণীর দশ বছর ফুটবল জীবনে শ্যাম থাপা যেমন দেরাদুন-কলকাতা-দিল্লি-বোম্বাইয়ে স্থান বদল করেছে, তেমন খেলারও পজিশন বদল করেছে।
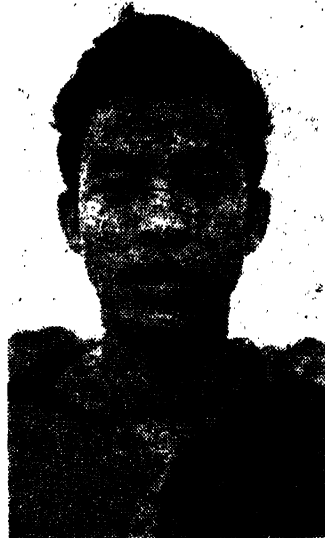
শ্যাম থাপা

প্রথমে ও চন্দন সিং হতে চেয়েছিল। তাই দেরাদুনে মিলিটারী স্কুলে সামরিক শিক্ষার সঙ্গে ফুটবলের শিক্ষা নিয়েছিল সেন্টার হাফ হিসাবে। মাত্র ৪ বছর বয়সে মিলিটারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। স্কুলের ফুটবল দলে যখন একটু নাম করে তখন বয়স বারো-তেরো। ওর সম্পর্কীয় কাকা আনন্দ সিং থাপা ছিলেন ফুটবল গুরু। বাবা এবং ঠাকুর্দাও ফুটবল খেলতেন। চলনসই খেলা। কাকার কিন্তু ফুটবল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। শুধু ফুটবলই নয়, শ্যাম মিলিটারি স্কুলে ক্রিকেট খেলত, বক্সিং লড়ত। উত্তরপ্রদেশ স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপে ওর ওয়েটে একবার রানার্সও হয়েছিল। তবে ক্রিকেট বা বক্সিংয়ের চেয়ে ফুটবল খেলাই ছিল ধ্যান জ্ঞান। ফুটবল নিয়েই মেতে থাকত।

যাই হোক, পজিশন বদলের যে কথা বলছিলাম। সুব্রত কাপের খেলায় সেন্টার হাফ হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করলেও পায়ে জোরালো শট আছে বলে সরে গেল রাইট ইনে। ১৯৬৪তে বহু খেলায় রাইট ইনে নিজেকে চমৎকার মানিয়ে নিল। ডি সি এম-এর খেলায় দেরাদুন জেলা দলের পক্ষে ই এম ই সেণ্টারের বিরুদ্ধে এমন নৈপুণ্যে জয়সূচক গোলটি করেছিল যা দেখে বিশেষজ্ঞরা বার বার বাহবা দিয়েছিল। আরও বহু খেলায় গোল করার ফলে বীর বাহাদুরের পরামর্শে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে শুরু করল। সেখানেও সফল ভূমিকা। যার পায়ের কাজ আছে, জোরালো শট আছে, মাথায় আছে ফুটবল বুদ্ধি সে সব জায়গাতেই মানিয়ে নিতে পারে। উত্তর প্রদেশ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড শ্যাম থাপা। ১৯৬৬তে ইস্টবেঙ্গলে এসেও প্রথম খেলেছিল সেণ্টার ফরোয়ার্ডে। তখন গুরুকৃপাল সিং ছিল ইস্ট বেঙ্গলের এক নম্বর সেণ্টার ফরোয়ার্ড। শ্যাম দুই নম্বর। পরে শ্যাম সরে যায় লেফট আউটে। এবং সবাই জানে ইস্ট বেঙ্গলে, সামরিক দলে মফৎলালে এবং ভারতের জাতীয় দলে লেফট আউট হিসাবেই ভারতীয় ফুটবলে শ্যাম থাপার প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তৃতীয়বার ইস্ট বেঙ্গলে এসে তিন ফরোয়ার্ড পদ্ধতির খেলায় শ্যাম বোধ হয় খেই হারিয়ে ফেলেছে। সবাই স্বীকার করবে শ্যাম সে সুনাম নিয়ে খেলতে পারছে না, ৭০-৭১-এ যে সুনামের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গলে খেলে গেছে। ইস্ট বেঙ্গলের বিজ্ঞ কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি অবশ্য আশা করছেন, আর কয়েকটি খেলার পর শ্যামের স্বমূর্তি তিনি ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

শ্যামের বয়স এখন ছাব্বিশ। সুতরাং খেলায় ভাঁটা পড়বার কথা নয়। প্যারেড করা পেটানো দেহ। মাথায় উঁচু সাড়ে পাঁচ ফুট। খর্বকায়ই বলা যায়। উচ্চতার ঘাটতি মিটিয়ে নিতে পারে ক্রীড়াশৈলীর মাধ্যমে। খেলার টেকনিক চমৎকার। সতীর্থদের কাছে বল পাস যেন সাজানো উপহার। বলতে দ্বিধা নেই—এ বছর এখন পর্যন্ত এই উপহার সাজাতে পারছে না, প্রাপ্ত উপহারও ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে পারছে না।

মুকুল

অরণ্যদেব ★ লী ফক

এসো হে, তোমার মুরোদ আছে কি নেই, এবারে তার পরীক্ষা হবে। উঃ!

মেরে ফেলল... আঁ্যাও-আঁ্যাও ...উঃ...!

রাজা আবদুল্লার অন্ধকূপে... অরণ্যদেব প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছেন...
আঁ্যাও আঁ্যাও উঃ...

লোকটাকে ঠাণ্ডা করতে বুড়িজন সেপাই লাগল....
বাপরে!
উঃ!
আঃ!

মরে যায়নি তো? প্রকাশ্যে ওকে মারা হবে।
বেঁচেই আছে!

বাব্বা, কী ওজন লোকটার... যেন লোহায় গড়া।
ঘেমে গেলুম যে...

বাব্বা, বুড়িজন সেপাই লাগিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করতে হল!
হাতির পায়ের তলায় ওকে পিষে মারো—

হাতি এগিয়ে আসছে!

বনশ্রী বসু (পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সুমিতা মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

মতামতের মন্তাজ
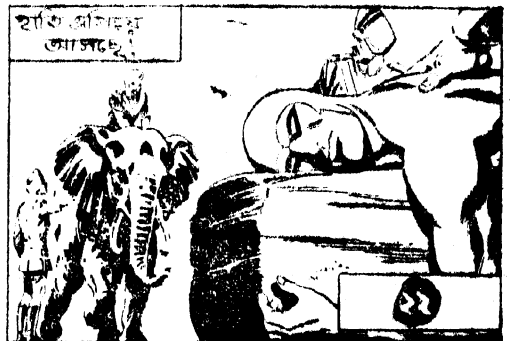
অঙ্কুর দ্বিতীয়, কোরাস প্রথম। চলচ্চিত্র পুরস্কারের নামে এত বড় প্রহসন সম্ভবত এর আগে দেখা যায়নি। এবারের জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতার ফলাফল দেখে অনেকেই হয়তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন। বিস্মিত হবার মতো ঘটনা প্রায় প্রতিবারেই ঘটে। এবারের প্রহসন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। উল্লিখিত দুটি ছবিই দর্শকদের দেখা। কোন ছবি শুধু দেখতে ভাল লাগলেই সেটা বড় জাতের ছবি হয় না। জনপ্রিয়তাও ছবির শিল্পগত গুণাগুণের মাপকাঠি নয়। জনপ্রিয়তা বা বক্স-অফিস সাফল্য ছবির গুণাগুণ বিচারের ভিত্তি হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে যে ছবি বক্স-অফিসে কদর পেল না কিংবা যে ছবি দেখার কালে দর্শকের হাই ওঠে সে ছবিই মহৎ শিল্পকীর্তি নয়। উঁচুমানের ছবির দর্শক সর্বদাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় না। সে ছবি তথাকথিত অর্থে "পপুলার" না-ও হতে পারে। তাই বলে যে ছবি সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের মন মজাতে পারল না সেরকম ছবি মাত্রই মহৎ এই ধারণা নিছক ভ্রান্তি মাত্র। এ-জাতীয় ছবিকে বাহবা দিয়ে কেউ কেউ ইনটেলেকচুয়াল সাজতে চান। সেটা আরও সাংঘাতিক। জাতীয় পুরস্কারের বিচারক কমিটি এই ধরনের কোন "ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন" দেখাতে চেয়েছিলেন কিনা কে জানে। অঙ্কুর-এর জনপ্রিয়তা দেখে হয়তো তাঁরা ভেবেছেন সেটা খুব উঁচু পর্যায়ের ছবি নয়। অথবা যেহেতু অঙ্কুর দেখতে ভাল লেগেছে তাই হয়তো বিচারকরা সেটাকে বড় জাতের ছবি মনে করেননি। মোটের উপর কোরাস-এর প্রথম স্থান অধিকার খুবই হাস্যকর। অঙ্কুর বহু বিদগ্ধ দর্শক ও সমালোচকের দেখা। কোরাস-ও দেখা, তবে বহুজন দেখেছেন কিনা জানি না। তবে দুটি ছবিই যাঁদের দেখা তাঁরা এই বিচার দেখে বিরক্ত ও মর্মাহত হবেন। প্রতিযোগিতায় আরও দু-একটা উঁচু জাতের ছবি ছিল। তার যে কোন একটা কোরাস-এর চাইতে উৎকৃষ্ট ছবি। যাই হোক, অ্যাওয়ার্ড কমিটি সত্যজিৎ রায়কে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান দিয়ে জাতীয় পুরস্কারের ইজ্জত কিছুটা রক্ষা করেছেন।

• • •

এখানেই শেষ নয়। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালনার পুরস্কার পেয়েছে 'কোরাস'। কোরাস-এর সংগীত পরিচালনার কাজই শ্রেষ্ঠ কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। যদি ফিল্ম মিউজিক-কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে গানের জনপ্রিয় সুররচনা নয়—তবে সোনার কেল্লা-ও ছিল। ছিল ছেঁড়া তমসুক। এই দুই ছবির ফিল্ম মিউজিক-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। পুরস্কার প্রাপকের কোন আত্মীয় বা অভিভাবক যদি অ্যাওয়ার্ড কমিটিতে থাকেন তবে সাধারণ লোক সেই বিচারকে অন্য চোখে দেখেন। কমিটিতে নিশ্চয়ই আরও সভ্য থাকেন। একজনের রায়ে কিছু হয় না। এটাও হয়তো সত্য ও বিশ্বাস্য যে, নিজের লোককে পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে কমিটির বিশেষ সভ্য কোন মতামত দেন না। নিজের লোকের স্বপক্ষেও হয়তো তিনি ভোট দেন না। তবু কমিটিতে এমন সভ্য থাকলে প্রশ্ন উঠবেই। এ ক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে সভ্যপদ ত্যাগ করাই হয়তো শোভন।

• • •

এবার আরও এমন কিছু পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যা একেবারেই হাস্যকর। এখানে "যুক্তি তক্কো গপ্পো"-র কথা তুলছি না। এই ছবিটি যে শ্রেষ্ঠ কাহিনীর পুরস্কার পেল তা নিয়েও যুক্তি-তক্কো চলে না। কারণ ছবিটি এখনও জনসাধারণ দেখেনি। এর গল্প কেমন এখনই বলা যায় না। তবে প্রতি-

যোগিতায় আজও ছবি ছিল বায় গল্প জানা। "বৃদ্ধি তজো গপ্পো" কি তায় চাইতেও ভাল? কে জানে, হতেও পারে। নাকি ঋত্বিক ঘটককে অনেক দিন পর পুরস্কার দেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল বলেই এই পুরস্কার? চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার নিয়ে চারিদিকেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। অল ইন্ডিয়া ফিল্ম প্রোডিউসার্স কাউন্সিল তো ইতিমধ্যেই জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতা বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবারকার ফলাফল দেখার পরই তাঁরা জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তা ছাড়া পুরস্কার দেওয়ার জন্য ছবির শ্রেণীভাগ যে-ভাবে হচ্ছে তাতেও প্রযোজক-সংস্থার আপত্তি। আসলে জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা এবং তার ফলাফল এখন থেকে ক্রমেই বিতর্কের বস্তু হয়ে উঠছে। বিতর্ক হয়তো ভাল, জাতীয় পুরস্কারের ফলাফল যে বিতর্কের অবকাশও রাখে না। কখনও হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে।

উমনো ও ঝুমনো

(সোমেন চিত্রম)

উমনো ও ঝুমনো—দুই মেয়ে—এ-কালের মেয়ে নয়। এরা ইতুপুজোর ব্রতকথার চরিত্র। তাই "উমনো ও ঝুমনো" ছবিতে পৌরাণিক কাহিনীর আস্বাদ পাওয়া যায়। ধর্মমূলক ছবি হিসাবে বহু লোকের কাছে "উমনো ও ঝুমনো"র কদর হতে পারে, বিশেষত মফস্বলে। তা ছাড়া সিনেমার চিত্রকাহিনী হিসাবে "উমনো ও ঝুমনো" উপাখ্যানের কদর হতেই পারে। কারণ দৈবলীলা ও ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে পারিবারিক নাটকও সম্পৃক্ত।

এই ধরনের ছবি করার তবুও একটা মস্ত অসুবিধা আছে। এই সব ছবিতে কাহিনীগত পরিবেশ তৈরি করা বড় কঠিন। দেবতাদের অলৌকিক কাণ্ড এবং ছবির অন্যান্য ঘটনা দেখাবার জন্য যে টেকনিক্যাল জৌলুস দরকার, বাংলা ছবিতে সেটা সাধারণত পাওয়া যায় না। এই দিক থেকে "উমনো ও ঝুমনো"র পরিবেশ, রাজবাড়ির সেট এবং নানাবিধ টেকনিক্যাল কাজও নিম্ন-

উমনো ও ঝুমনোতে রূপা চৌধুরী

মানের। ছোটবেলায় উমনো-র পরনে আধুনিক ব্লাউজ ও তার কাপড় পরার ধরন এবং এক কথায় প্রায় সব চরিত্রেরই বেশবাস রীতিমতো অস্বাভাবিক। আরো বেশী হাস্যকর তাদের মুখে পরিশীলিত আধুনিক সংলাপ ও আধুনিক কথার গান। পরিচালকদ্বয়ী এই ধরনের বিসদৃশ ব্যাপার অনায়াসেই বাদ দিতে পারতেন। তবে পরিচালক "উমনো ও ঝুমনো"র স্বামীকে (যথাক্রমে সর্বেন্দ্র ও আনন্দ মুখার্জি) সব সময়েই পৌরাণিক বেশে রেখেছেন। বিয়ের পর "উমনো ও ঝুমনো"কে (যথাক্রমে রূপা চৌধুরী ও কল্যাণী মণ্ডল) মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য লেগেছে। এর মূলে অবশ্য এঁদের অভিনয়ের কৃতিত্বও আছে। তাঁদের স্বামীদের অভিনয়ও ভাল।

ছবির ত্রুটিবিচ্যুতি যাই থাকুক, এতে একটা আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। অভিনয়ে বিশেষ শিল্পীরাও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা হলেন মৃণাল মুখার্জি, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাপিয়া দাস, [illegible]মিতা, রবীন ব্যানার্জি প্রভৃতি। গানের সুরগুলি (সন্তোষ মুখোপাধ্যায়-কৃত) শুনতে ভাল, যদিও কয়েকটি গানের সুর কাহিনীকালের উপযোগী নয়।

যুগোস্লাভিয়ার চলচ্চিত্র

লাইটহাউস সিনেমায় অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী (৬—১২ জুন) যুগোস্লাভ চলচ্চিত্র উৎসবে অন্তত একজন প্রকৃত শক্তিমান পরিচালকের কাজ দেখা গেল। কোল অ্যানজেলভস্কি তাঁর নাম; তাঁর ছবি : উলু আর বিয়ুইচড্, আইভ্রিন। গ্রীক ট্র্যাজেডির আদলে চিত্রটি গড়ে উঠেছে। প্রধান তিন চরিত্র—পিতা, পুত্র, পুত্রবধূ। অরণ্যবেষ্টিত পার্বত্য অঞ্চলের একটি নির্জন স্থান ছবিটির ঘটনাস্থল। সেখানে একসঙ্গে বাস করছে পিতা আর পুত্রবধূ, উভয়ে একই কর্মে নিরত; পুত্র আছে অন্যত্র, শহরে। নিষিদ্ধ বাসনা ক্রমে পিতা আর পুত্রবধূর চিত্ত অধিকার করেছে; হিতাহিত-জ্ঞান-রহিত, ওরা অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে প্রবল কামনার কাছে। আর ঠিক তখনই ঘটনাস্থলে পুত্রের আগমন। পরিণামে একজনের মৃত্যু (আত্মহনন?), বাকি দুই চরিত্র তখন বেদনা আর বিমূঢ়তার প্রতিমূর্তি।

পরিচালক ভয়ংকর এই ট্র্যাজেডি নির্মাণ করেছেন অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে। সুন্দর আর ভয়ানকের সহাবস্থান দর্শককে যেন বিহ্বল করে দেয়। গল্পটি বলা হয়েছে পুরোপুরি সিনেমার ভাষায়। সংলাপের ব্যবহার নামমাত্র, অল্প কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে পরিচালক তাঁর কাহিনীকে অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছেন। পরিচালক, মনে হয়, অংশত ব্রেসঁ, অংশত কুরোসাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত। তবু তাঁর স্টাইলের নিজস্ব জোরটুকুও ভুল করবার নয়।

বি হ্যাডানিক-পরিচালিত হোয়েন লিও কামস চিত্রে অস্থিরচিত্ত, কল্পনাবিলাসী একটি যুবকের কাহিনী বলা হয়েছে। তার জীবনে এসেছে দুটি মেয়ে, যাদের কাউকে সে সুখী করতে পারেনি। পরিচালক জোর দিয়েছেন যুবকটির অস্থিরতার, কখনও বা অসহিষ্ণুতার উপর, যা প্রায় মত্ততার পর্যায়ে পড়ে।

ক্রেসো গলিক-কৃত টু লিভ বাই লাভ কলেজে-পড়া দুই তরুণ-তরুণীর প্রেমের কাহিনী। আবেগপ্রধান ছবি, দেখতে ভাল লাগে, এই পর্যন্ত। ডি টাডেজ-পরিচালিত পেরো অ্যান্ড হিজ কম্প্যানিয়নস কিশোর ছাত্রদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। ছবিটি সুনির্মিত, ছোটদের উপযোগী। পরিচালক এখানে কিছু নীতিশিক্ষা দিয়েছেন।

উৎসবের বাকি তিনখানি ছবি যুগোস্লাভিয়ার মুক্তিযুদ্ধ তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তৈরী। ছবি তিনটি হল : সুটজেস্কা (স্টাইপ ডেলিক), হাউ টু ডাই (এম স্ট্যামেনকাভিক), ওয়ালটার ডিফেন্ডস সারাজেভো (এইচ ক্রাভাক)। এই ছবিগুলিতে আছে দেশপ্রেম এবং বীরত্বের নানা নিদর্শন। উক্ত তিনখানি ছবির মধ্যে প্রয়োগনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সুটজেস্কা চিত্রে। কিছু কিছু দৃশ্যপর্যায় মনে থেকে যায়।

তথ্যচিত্র উৎসব

ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সেনটার ফর মাস কম্যুনিকেশন স্টাডিজের উদ্যোগে ও সোভিয়েত দূতাবাস সাংস্কৃতিক বিভাগের সহযোগিতায় এক তথ্যচিত্র উৎসব হয়ে গেল গত ১৪ জুন গোর্কি সদনে। উৎসবের আগে এক আলোচনা-চক্রে যোগ দেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, হরিসাধন দাশগুপ্ত, আশিস মুখার্জী, চণ্ডী লাহিড়ী ও বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। ধৃতিমানবাবুর বক্তব্য ছিল, তথ্যচিত্র প্রধানত যেন শহরের দর্শকের দিকে মুখ চেয়ে না করা হয়। গণ-সংযোগের বার্তাবহ না হলে প্রামাণ্য ছবির আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। চণ্ডীবাবু বলেন, বিভিন্ন স্কুলে ১৬ মিঃ মিটারের ক্যামেরা থাকা উচিত। সেন্টারের ডিরেক্টর ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভারতে বছরে আড়াই হাজারের বেশী শর্ট ফিল্ম হলেও তথ্যচিত্র সম্পর্কে এখনও সাধারণের মধ্যে আগ্রহের অভাব আছে।

উৎসবে যে সব ছবি দেখানো হয় সেগুলি হল : হ্যানডস, ক্যানসার কি সারে? ঢোলের রাজা, টু লিভস অ্যান্ড দি বাড, পোর্ট্রেট অব এ পেনটার, অ্যান্ড আই মেক এ শর্ট ফিল্ম ও একটি রাশিয়ান ছবি। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত দর্শকেরা বসে বসে ডকুমেন্টারি ছবি দেখেছেন!

এরা এক যুগ (পরিচালনা : অর্চন চক্রবর্তী) ছবিতে সন্ধ্যা রায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ও সমিত ভঞ্জ ফটো—দেশ

শুটিং চলছে ...

এই এতক্ষণে সমিত ভঞ্জ হাটের মধ্যিখানে হাঁড়িটি ফাটালেন।......আমরা চারজন : সুন্দর, শান্তনু, শ্যাম আর রীণা...... আমাদের পেশা লোক ঠকানো......কলকাতার তিনটে বড় বড় ঘটনার সঙ্গে আমরা জড়িত......পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে...... আমাদের সামনে আলোর নিশানা নেই...... পায়ের তলায় মাটি নেই......মাথার ওপরে আকাশ নেই......তবুও অনিশ্চিত অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা ছুটে চলেছি...... আমরা পালাচ্ছি।

চারটি তাগিদে এঁরা পালাতে পালাতে দুর্ঘায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ফ্লোরে দাঁষার পট-ভূমিকায় একটি সাধারণ হোটেলের অন্তর্ভাগ। কাউন্টারের সামনে চারজন দাঁড়িয়ে। কেমন যেন থমথমে পরিবেশ। কারুর মুখে কথা নেই। শুধু দৃষ্টি-বিনিময় হচ্ছে। হোটেলের ম্যানেজার বেচারা ভয়ে জড়সড়। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। হঠাৎ তার চোখ পড়ল সুন্দরের হাতের দিকে। পিস্তলটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। আর কোন ভয় নেই। এবার বাক্যালাপ করা যেতে পারে। জানা হল এরা একটা ঘর চায়। বেশ ভাল কথা। 'দশ নম্বর ঘরটাই আপনাদের জন্য বরাদ্দ করা হল। নিন, চাবি নিন।' বেয়ারা ওদের পথপ্রদর্শকের কাজ করল। একে একে চারজন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। দৃশ্যের যবনিকাপাত এখনই নয়।

আসছেন নয়ন চোর। ইনি চোর নন, ডাকাত নন, অতীব সদাশয় এক ব্যক্তি। সদ্য বিয়ে করেছেন। বউকে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। গ্রাম্য বালিকা সুন্দরী বউ। সেটা চলনে বলনে খুবই বোঝা যায়। দুজনের কাণ্ড-কারখানা দেখে হেসে গড়াগড়ি যাবার দাখিল। নয়ন চোর তাঁর বউকে নয়ন-ছাড়া করতে পারেন না। বউ তাঁর নয়নের মণি। এক দণ্ড আড়াল হবার জো নেই। নয়ন চোর সব সময়ই ভীত সন্ত্রস্ত। এই বুঝি তাঁর বউ হাতছাড়া হয়ে গেল। ঐ তিনজন শক্তসমর্থ যুবক আর একজন যুবতীকে দেখে তাঁর মোটেই ভরসা হচ্ছে না। যদি দুয়ে দুয়ে চার হয়ে যায়। মানে ঐ যুবতী যদি তাঁর বউকে ফুসলে নিয়ে চলে যায়। এজন্য নয়ন চোর স্থির করলেন ওদের নিকটবর্তী কোন ঘরে থাকা চলবে না। ওরা দশ নম্বর ঘরে আছে। অতএব তাঁকে অন্তত সাত হাত দূরে থাকতে হবে। সতের নম্বর ঘরটি চাইলেন। পেয়েও গেলেম।

হোটেলের একটি প্রশস্ত ডাইনিং টেবিলে ওদের চারজনকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন নয়ন চোর। বেয়ারাকে ডেকে ওদের পাশেই একটা জায়গা করে দিতে বল্লেন। আর বলে দেন 'মেমসাহেবকা খানার উপরমে যায়গা'। এদিকে চারজনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। নয়ন চোর এক প্লেট ভাত দিয়ে চেয়ারটা টেনে বসতেই ওরা উঠে পড়ে। 'এ কি! ক্যায়া হোতা হ্যায়। সব খাবার উপরমে।' বলেই তিনি কাল-বিলম্ব না করে ভাতের প্লেট নিয়ে বউ সামলাতে ছুটলেন। ওদের পাশ দিয়ে যেতে

শুভ সংবাদ (পরিচালনা : জগন্নাথ চাটার্জি) চিত্রে শেলী পাল, রাজশ্রী বসু ও মঞ্জুশ্রী বসু

ফটো—দেশ

যেতে বললেন, 'দিনকাল খুব খারাপ হ্যায়। নতুন বিবাহিত স্ত্রী কিনা।'......

এত হাসাহাসির নেপথ্যে সর্বক্ষণই যেন পিস্তলের অগ্রভাগ কিংবা শানিত ছুরির জ্বলজ্বল করছে। উৎকণ্ঠা আর রহস্যের আবর্তে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অর্চন চক্রবর্তী দর্শকদের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি করতে চান। তারপর? প্রশ্ন যদি ছবির শেষ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয় তবেই সার্থক হবে তাঁর দ্বিতীয় চিত্রপ্রয়াস 'এরা এক যুগ'। অর্চন প্রথম স্বাধীনভাবে যে ছবিটি পরিচালনা করতেন—'নির্জন সংলাপ'—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনের জটিলতা' অবলম্বনে, ছবির শুটিং এখনও শেষ হয়নি।

'এরা এক যুগ' বলতে সুন্দর, শান্তনু, শ্যাম আর বীণা—রূপ দিচ্ছেন যথাক্রমে সমিত ভঞ্জ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, পিনাকী সেনগুপ্ত এবং সন্ধ্যা রায়। নয়ন চোর এবং তাঁর স্ত্রী : চিন্ময় রায় এবং জয়শ্রী রায়। এ ছাড়া ছবির অন্যান্য চরিত্রগুলিতে রূপ দিচ্ছেন : রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী এবং শিবানী বসু। চিত্রগ্রাহক : দীপক দাশ। শিল্পনির্দেশক : সঞ্জীব সেন। একটানা বার দিনের সিডিউল শেষ হচ্ছে চলতি সপ্তাহে। এ মাসেই গান রেকর্ড করার কথা। সংগীত পরিচালক নবাগত প্রবীর মুখোপাধ্যায়। আবহসংগীত : ওয়াই এস মুলকী।

* * *

আরেকটি ফ্লোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমন রুম। এখানে সদ্য বিবাহিতা নায়িকা রাজশ্রী বসুর সঙ্গে বসে এক দঙ্গল মেয়ে আড্ডা দিচ্ছে আর বাদাম খাচ্ছে। পরিচালক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এই স্বাভাবিক দৃশ্য তাঁর 'শুভ সংবাদ' ছবির জন্য ক্যামেরা ধরে রাখার তোড়জোড় করছেন। এখা রাজশ্রী একবার গোপা, একবার রূপা। অথ দ্বৈত ভূমিকা রূপায়িত করছেন। গো প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে পড়ছে—ইনট্রোভা রূপা ফিলসফি নিয়ে পড়ছে—এক্সট্রোভার্ট আশ্চর্য! এরা দুজনেই একই রকম দেখতে গোপা! শান্ত ধীর স্থির প্রকৃতির, কম ক বলে, যা বলে ওর বান্ধবী। রূপা অশা অস্থির কথা বলতে মুখের ফেকো উ বাবার দাখিল হয়। তার কথা হচ্ছে—'চেহারাট ধার করেছেন, ভাগ্যিস নামটা ধার কর নি।' গোপা রূপার কথার তোড়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে না। ওর অসহা অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত রূপার করু হয়। ক্ষমা চায়। ফলে বন্ধুত্ব। এই অবস্থার আজ ওরা মুখোমুখি। দুজনে জানতে পারছে একই জায়গায় একই সময় একই দিনে ওদের জন্ম। এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে এসে পরিচালক বললেন : শ... আজকের মত এখানেই মুলতুবি রাখা হল।

রাজশ্রী ফ্লোর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা হল। বিয়ের পরেই তো তাঁর কানাডা চলে যাবার কথা ছিল। শুটিং-এর জন্য থাকতে হচ্ছে। সমস্ত শুটিং প্রায় শেষ করে যাচ্ছেন। 'যাচ্ছি এ মাসের শেষ দিক' জানালেন রাজশ্রী। 'কবে ফিরছেন আবার?'—'এখনও ঠিক করিনি। সেটা নির্ভর করছে ভাল লাগা না লাগার ওপর।'

এ ছবিতে দুই রাজশ্রীর বিপরীতে দুই নায়ক—দীপংকর দে ও নবাগত নির্মাল্য সেনগুপ্ত। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা হলেন : বিকাশ রায়, শিপ্রা মিত্র গীতা নাগ ও শেলী পাল। মোটামুটি এই হচ্ছে শেষ পর্যায়ের শুটিং।

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর অন্য একটি ফ্লোরে নাটকের পটভূমিকা। এখানে দেখা যাচ্ছে সাজানো-গোছানো পাশাপাশি দুটি ঘর। শুনলাম এটা হচ্ছে কাস্টমস্ অফিসার মানস রায়ের বাংলোর ইন্টিরিয়র। মানস রায় দীনেন গুপ্তর পরিচালনার নির্মীয়মাণ 'নিশিমৃগয়া' ছবির নায়ক-চরিত্র। তাঁর ঘরে অতর্কিতে নায়িকা হেনা চৌধুরীর আগমন ঘটেছে। মানস, বলতে গেলে, ভূত দেখার মত চমকে উঠেছেন। 'এ কি, আপনি!' হেনা নির্লিপ্ত। একটু হাসে। মানস রায় যে ঝামেলায় পড়েছেন সেটা তাঁর শুধু অভিব্যক্তিতেই নয়, সংলাপেও প্রকট হ'ল। হেনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের সুরে কথা বলে। মানস খানিকটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ওদিকে খবর রটেছে মানস বিয়ে করে ফেলেছেন। সঙ্গে তার বউকে দেখা গেছে। খবরটা কানে আসতেই জনৈক বর্ডার সিকিউরিটি অফিসার, মানসের প্রিয়জন, ছুটে এসেছেন বউ দেখতে। 'না...মানে... ইয়ে' এইসব করে মানস কিছুতেই সত্য প্রকাশ করতে পারেন না। মিথ্যাকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মেনে নিতেই হয়।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কাহিনী অবলম্বনে কুনাল মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্যে তোলা হচ্ছে এই ছবি। প্রধান দুটি চরিত্র মানস ও হেমা রূপায়িত করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন। বর্ডার সিকিউরিটি অফিসারের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরীকে দেখা গেল। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন : দিলীপ রায়, উৎপল দত্ত, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, চিত্রগ্রহণ করছেন পরিচালক নিজেই। শিল্পনির্দেশনা সূর্য চট্টোপাধ্যায়। সুরকার : হেমন্ত মুখার্জী। গান রেকর্ড করা হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠদান করেছেন : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রাণু মুখোপাধ্যায় এবং সুরকার স্বয়ং। ছবির শুটিং শেষ হয়ে এসেছে।

বার্তাবহ

তিন পরী ছয় প্রেমিক (পরিচালনা : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে নবাগতা নায়িকা সোমা মুখোপাধ্যায়

বোম্বাই বিচিত্রা

গুড্ডি ছবিতে সংগীত পরিচালক বসন্ত দেশাইয়ের অধীনে গান গেয়ে যিনি চিত্রামোদীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সেই কণ্ঠশিল্পী বাণী জয়রাম বোম্বাইয়ের সংগীত পরিচালকদের উদ্দেশে কিছু তীক্ষ্ণ —এবং বলা যায় সময়োপযোগী —বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছেন। জনপ্রিয় নেপথ্য গায়ক-গায়িকাদের সামনে এ'রা নিজেদের মাথা সব সময় ঝুঁকিয়ে রাখেন—এই হল বাণী জয়রামের প্রধান অভিযোগ। হিন্দী ছবির সংগীতের ক্ষেত্রে কোনও নবাগত শিল্পীর পক্ষে প্রতিষ্ঠা অর্জন, তিনি বলেছেন, অসম্ভব ব্যাপার। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বাণী জয়রাম বলেছেন, গুড্ডি চিত্রে সুনাম পাওয়ার পর তিনি সুখ্যাত সংগীত পরিচালকদের কাছ থেকেও (যেমন, লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল) ডাক পেয়েছিলেন, কিন্তু গান রেকরড করবার সুযোগ আর হল না। কোনও কোনও মহল থেকে উক্ত সুরকারকে নাকি জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বাণী জয়রামের গান রেকরড করা হলে সেটা তাঁরা প্রীতিকর চোখে দেখবেন না। যন্ত্রশিল্পীদেরও নাকি সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, বাণীর গানের সঙ্গে তাঁরা যদি বাজান তবে তাঁদের বয়কট করা হবে। ফলে বাণী জয়রাম বাতিল হয়ে যান। কয়েকটি ক্ষেত্রে রিহারসালে যোগ দেওয়ার পরও তাঁকে ওই দুর্ভাগ্য মেনে নিতে হয়েছে। কিছুকাল অপেক্ষার পর তিনি বুঝলেন, এখানে তাঁর কোনও আশা নেই। তখন তিনি চলে গিয়েছেন নিজের মাতৃভূমি তামিলনাড়ুতে। সেখানেও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটি বিরাট, তৎসত্ত্বেও বাণী জয়রাম অল্প সময়ের মধ্যেই দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে প্রথম সারির কণ্ঠশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তিনি দেখিয়ে দিলেন, বোম্বাইওয়ালাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ অসার নয়।

বাণী জয়রাম যে দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছেন সেখানে তিনি একক নন। বছর দুই আগে কলকাতা থেকে এক গায়িকা—চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়—এখানে এসেছিলেন একই সুযোগের অনুসন্ধানে। ও'র বাবার সঙ্গে চন্দ্রাণী একের পর এক সংগীত পরিচালকের বাড়ি গিয়ে ধরনা দেন, গান শোনান, তাঁদের প্রশংসাও পান, কিন্তু গান রেকরড করানোর সুযোগ তাঁর কোনও দিনই হয়নি। সেই সময় চন্দ্রাণীর বাবা প্রতিষ্ঠিত নেপথ্য-শিল্পীদের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এনেছিলেন। তখন তাঁর কথা ঠিক বিশ্বাস্য মনে হয়নি। বাণী জয়রামের অভিযোগ কিন্তু অনেকের চোখ খুলে দিয়েছে। ব্যাপারটাকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি? লক্ষণীয়, গত

দশ বছরের মধ্যে কোনও নবাগত গায়ক বা গায়িকা নেপথ্যশিল্পী হিসাবে এখানে প্রতিষ্ঠা পাননি—কিশোরকুমারের ছেলে অমিতও না।

সিনেমা-সংগীত সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য সম্প্রতি একদিন বোম্বাইয়ের এইচ-এম-ভি দফতরে গিয়েছিলাম। সেখানে সলিল চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল। তিনি তখন এইচ-এম-ভি'র কর্মকর্তা বিজয়কিশোর দুবের সঙ্গে 'গানের রেকর্ডিং এবং যন্ত্রশিল্পী' এই প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। বিজয়কিশোর দুবের বক্তব্য : বোম্বাইয়ের কোনও রেকর্ডিং থিয়েটারে ত্রিশজনের বেশী যন্ত্রশিল্পীকে স্থান দেওয়া যায় না, অথচ কোনও কোনও সংগীত পরিচালক নব্বই থেকে একশোজন যন্ত্রশিল্পীকে নিয়ে গান রেকর্ড করাতে চান। তা ছাড়া ত্রিশের বেশী যন্ত্রশিল্পীকে নিলে সংগীতের সুরকে ধরা যায় না, শ্রীদুবে বললেন, সেখানে তা-সুরের চিৎকারটাই কান ফাটায়। সলিলবাবু তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, তিনি গড়পরতায় পঁচিশজন যন্ত্রশিল্পী নিয়ে কাজ করেন। পরলোকগত বিমল রায় কুড়িজনের বেশী যন্ত্রশিল্পী নিতে চাইতেন না। "মধুমতী"র মতো ছবিতে সেইভাবেই গান রেকর্ড করা হয়েছে।

এটা সর্বজনবিদিত যে সংগীত পরিচালকরা তাঁদের বন্ধু এবং পরিচিত জনেদের তুষ্ট করবার জন্য অনেককে যন্ত্রশিল্পী হিসাবে নিয়োগ করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট প্রযোজককে বলা থাক ওই ধরনের কিছু যন্ত্রশিল্পীর সামনে যেন অকেজো মাইক রাখা হয় এবং তাঁদের বাজনা রেকর্ড করা না হয়। এঁরা জেনে বা না জেনে "নীরব" বাজনা বাজিয়ে যান এবং প্রযোজকের টাকাও পকেটস্থ করেন। গত বছর প্রযোজক-বনাম-যন্ত্রশিল্পী বিরোধ এবং নিষ্পত্তির পরেও ওই সব অন্যায়ের অবসান হয়নি।

সুরঞ্জন

রবীন্দ্রসংগীত : প্রদর্শনীর পরিপ্রেক্ষণীতে

যা কানে শোনবার, প্রদর্শনীর পরিপ্রেক্ষণীতে তাকে উপলব্ধি করবার এবং তার ফলে তার সৃষ্টিরহস্যের গভীরতাকে আরও নিবিড়ভাবে হৃদয়ংগম করবার এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা হল এবার রবীন্দ্র জন্মোৎসব উপলক্ষ তথ্যকেন্দ্রে ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন আয়োজিত 'রবীন্দ্রনাথের গানের প্রদর্শনীতে গিয়ে। সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন অমিয়া ঠাকুর।

'গায়ক রবীন্দ্রনাথ', রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ও উপলব্ধিতে সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথ ও শিশু, সঙ্গীত, পাশ্চাত্ত্য সংগীতবিদের দৃষ্টিতে এবং য়ুরোপীয় স্বরলিপিতে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনাথের গানে পাঠান্তর ও সুরান্তর, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিকার, পুরোন দিনের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমালোচক রবীন্দ্রনাথের সংগীতগুরু প্রভৃতি নানা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় দুর্লভ প্রতিকৃতি, মূল স্বরলিপির আলোকচিত্র এবং দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র-সহ এই প্রদর্শনীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। যাঁদের প্রতিকৃতি কোনোদিন দেখা যায় নি সেই সব ছবি এঁরা সংগ্রহ করেছেন, যে-সব তথ্য আজও অগোচর ছিল এই প্রদর্শনীতে তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত গ্রন্থের অনেক দুষ্প্রাপ্য সংস্করণও এই প্রদর্শনীর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। রবীন্দ্রসংগীত যে কেবল শোনবার বা শোনানোর জন্য নয়, তাকে উপলব্ধি করা এবং জানবারও প্রয়োজন আছে, এই প্রদর্শনীতে সেই কথাটিই অনুভব করা গেল বিশেষভাবে। পুরোনো দিনের রেকর্ডের সংগ্রহ এবং সেগুলি বাজিয়ে শোনাবার আয়োজন এই প্রদর্শনীর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

হয়তো আরও কয়েকটি দিকের সমাবেশে প্রদর্শনীটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতো, যেমন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সম্পর্কটি তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু সেই অভাব ওই প্রদর্শনীর মূল্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস করে নি। 'রবীন্দ্রনাথের গানের' ওই প্রদর্শনীতে যা দেখেছি আর যা পেয়েছি তারই কি তুলনা আছে?

আনন্দবর্ধন

দক্ষিণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান

পনেরোটি সুনির্বাচিত গানের অর্ঘ্য সাজিয়ে এবার উদ্‌যাপিত হল 'দক্ষিণী' রবীন্দ্রজন্মোৎসব, এবং সেই একই সঙ্গে ওঁদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। যে-সব গান বহু-শ্রুত, কিন্তু পরিবেষণার ফলে অতিপরিচিত, গান নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'দক্ষিণী'র উদ্যোক্তারা সযত্নে সেগুলি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেন। ফলে, বরাবরই ওঁদের অনুষ্ঠানের একটা বিশেষ আকর্ষণ বজায় থাকে।

কলামন্দিরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কয়েকটি সম্মেলক গান পরিবেষিত হয়েছিল শুভ গুহ ঠাকুরতার পরিচালনায় প্রায় একশত শিল্পীর কণ্ঠে। নিখুঁত তালে, লয়ে এবং উচ্চারণে গানগুলি অসামান্য শিল্পসুষমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। যৌথকর্মে সাফল্য অর্জনের প্রাথমিক এবং অপরিহার্য শর্ত যে শৃঙ্খলাবোধ, তার পরিপূর্ণ পরিচয় ছিল ওই সংগানের পরিবেষণায়।

একক এবং দ্বৈতকণ্ঠে গীত গানগুলিও একটা সামগ্রিক রসপরিমণ্ডলের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। অভিরূপ গুহ ঠাকুরতার 'কী বেদনা মোর জানো' অমল নাগের 'চিরসখা হে ছেড়োনা' কৃষ্ণ গুহ ঠাকুরতার 'হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু' তড়িৎ চৌধুরীর 'আজি কোন সুরে বাঁধিব' শুচিতা গুপ্তের 'আমার মনের মাঝে যে গান' অর্থাৎ এক কথায় প্রত্যেকটি একক গানই মর্মস্পর্শী হয়েছিল। দ্বৈতকণ্ঠে পরিবেষিত মনোজ্ঞ গানগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন সোমা মিত্র সমীরণ চক্রবর্তী, বন্দনা দাশগুপ্ত কৌশিক রায় এবং মৃদুল বড়া। সম্মেলক কণ্ঠ-সহ 'ভাসিয়ে দে তরী' অংশ বিশেষ সুন্দরভাবে গেয়ে শুনিয়েছেন।

—আনন্দবর্ধন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২·০০ টাকা	৪১·৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মাধ্যমে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

সুন্দরী তোমার মনের মতো
আশ্চর্য নতুন সাবান
LUX
LUX
SUPREME

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাড়া আর কিছুই আমার পছন্দ নয়,"

—বলেন সুচিত্রা দেবী।
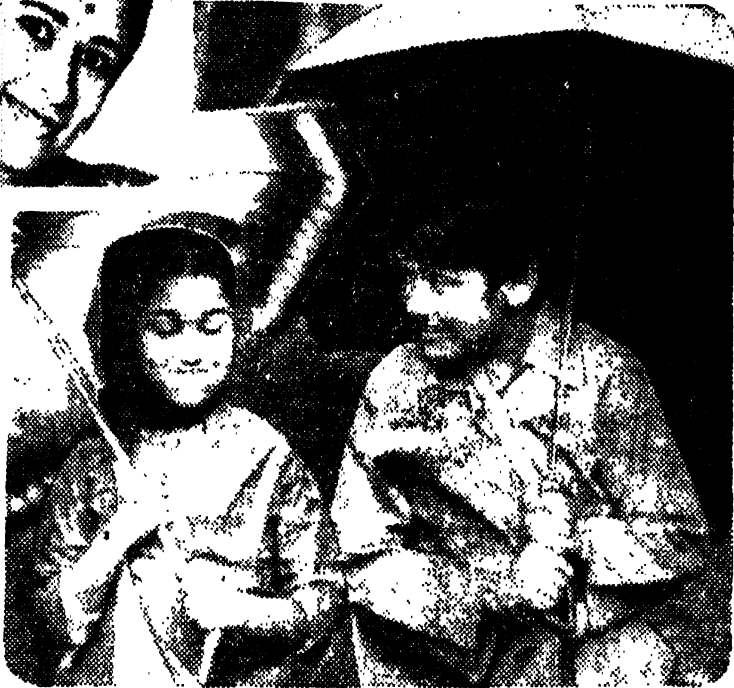
"একমাত্র হরলিক্সই বর্ষাকালের অসুখ।বিসুখ প্রতিরোধ করতে পারে।"

প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে, স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

বর্ষাকালে দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। ফলে এই সময় সর্দি, কাশি, জ্বর, পেটের গোলমাল জাতীয় অসুখ হতে পারে। তাই বাড়ীর কারো এসব অসুখ যাতে না করে, সকলে যাতে সারাটা বর্ষাকাল সুস্থ থাকে, সুচিত্রা দেবী যতটা সম্ভব সেই মত সাবধানে থাকেন। আর, সবচেয়ে বেশী যত্ন নিয়ে সকলকে রোজ খেতে দেন হরলিক্স।

তাঁর ডাক্তারের কথাই ঠিক। হরলিক্সে আছে জীবনী-শক্তির উৎস প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেটস্ ও ভিটামিন যা রোগ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলে, স্বাস্থ্য রক্ষাতেও সাহায্য করে—বিশেষ করে বর্ষাকালে সুচিত্রা দেবীর মত সব মায়েরাই হরলিক্সের ওপর আস্থা রাখেন আর প্রায় ১০০ বছর ধরে ডাক্তাররাও এটি খেতে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। কেবল ভারতেই নয়—পৃথিবীর সর্বত্র।

স্বাস্থ্যের অন্যতম উৎস

হরলিক্স

পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

হরলিক্স—রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক।

তারাশংকর জন্মজয়ন্তী

॥ একটি সানন্দ ঘোষণা ॥

আগামী ৮ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম দিবস উপলক্ষে ২১শে জুলাই সোমবার হইতে ২৮শে জুলাই সোমবার পর্যন্ত নিম্নলিখিত বইগুলি ও তারাশঙ্কর রচনাবলী খুচরা বা এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলির (যাহা মুদ্রিত আছে) সম্পূর্ণ সেট প্রতি ক্রেতাদের বিশেষ কমিশনে দেওয়া হইবে। রচনাবলী ১ম, ২য় ও ৫ম হইতে ১০ম খণ্ড পাওয়া যাইতেছে এই ১৬৫, টাকার গ্রন্থ একত্রে লইলে ১৩২, টাকায় পাওয়া যাইবে। সহৃদয় এজেণ্ট বন্ধুগণও প্রাপ্য কমিশনের উপর অতিরিক্ত কিছু কমিশন পাইবেন।

সন্দীপন পাঠশালা ৯, ১৯৭১ ৮॥ না ৬,

উত্তরায়ণ ৭॥ যোগভ্রষ্ট ৯, কবি ১০, অভিযান ৯, সংকেত ৭,

এক সেট গ্রন্থাবলী ডাকযোগে লইলে অগ্রিম বাবদ ৫০, টাকা পাঠাইতে হইবে।

বিমল মিত্রের

তিন নম্বর সাক্ষী ১০,

নফর সংকীর্তন ৭,

নীহার গুপ্তর

অমৃত পাত্রখানি ৮,

অশান্ত ঘূর্ণি ১০,

নিমাই ভট্টাচার্যের

নাচনী ৭,

সমরেশ বসুর

অবরোধ ১০,

আশাপূর্ণা দেবীর

সুবর্ণলতা ২৫,

যে যার দর্পণে ৮,

জরাসন্ধর

নিশানা ৮,

নিঃসঙ্গ পথিক (১ম) ১৮,

তরুণকুমার ভাদুড়ীর

কাগজের নৌকো ১০,

শুভেন্দ্রকুমার মিত্র সংকলিত

বৈজ্ঞানিক অভিধান ২৫,

শংকু মহারাজের

তমসার তীরে তীরে ১৬,

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা

নূতন মুদ্রণ—১৬,

বিশেষ আনন্দ সংবাদ

গ্রাহকদের ও পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে সবিনয় নিবেদন, এতদিন কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য পকেট বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এখন আবার সে আয়োজন হয়েছে।

আগামী আগস্ট মাসে বাংলা পকেট বইয়ের আরও তিনখানি বই প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্য আনুমানিক প্রতিটি চার টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২, ৮৯/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ ফোন: ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

(দে ৭২৪৪)

সূচীপত্র

ফ্যাশানে
দুর্দান্ত
স্যানিটারীওয়্যারে
চূড়ান্ত

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : ফাল্গুনী দাশগুপ্ত

অমরনাথ রায়ের

বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জীবন-পরিচয়

দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী

দাম ১০·০০

সে-কালের মুনিঋষিরা দীর্ঘ তপস্যার পর যখন সিদ্ধিলাভ করতেন, দেবতার বরলাভ করতেন তাঁরা; সে বরে অলৌকিক আর আশ্চর্য সব ক্ষমতার তাঁরা অধিকারী হতেন—এমন কাহিনী পুরাণ-মহাভারতে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো কতখানি সত্যি, বলা মুশকিল। কেননা, সেসব আমরা, এ-কালের মানুষেরা, কেউই চাক্ষুষ করিনি।

তবে এ-কালের বিজ্ঞানীরা তাঁদের কঠোর সাধনার শেষে যখন সিদ্ধিলাভ করেন, তখন যে তাঁরাও সে-কালের মুনিঋষিদের মতই অবিশ্বাস্য আর চমকপ্রদ সব ক্ষমতা করায়ত্ত করে ফেলেন, তা আমরা চোখের সামনে অহরহই দেখতে পাই এবং পাচ্ছি। দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা থেকে আরম্ভ করে মহাকাশে গমন প্রভৃতি কত কিছুর মধ্যেই না আমরা তা প্রতি মুহূর্তে চাক্ষুষ করছি! আমরা, সাধারণ মানুষেরা, এসব দেখি আর অবাক হয়ে যাই!

শুধুই কি কেবল আমরা অবাক হই? তার সঙ্গে কি বেশ কিছুটা কৌতূহলও উদগ্র হয়ে ওঠে না আমাদের সেইসব বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে এবং তাদের ঘটানো সেইসব আশ্চর্য ব্যাপারগুলোর রহস্য সম্বন্ধে? নিশ্চয়ই ওঠে। 'দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী' আমাদের সেই কৌতূহল তৃপ্ত করবে। কেননা, এতে আছে খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে একেবারে সম্প্রতিকালের—এই আড়াই হাজার বছরের বিশ্ববিখ্যাত ঊনচল্লিশজন বিজ্ঞানী এবং তাদের আবিষ্কারের কথা—যা ছোট বড় সকলের কাছেই সমান আগ্রহের, সমান আনন্দের।

প্রকাশিত হল

বিমল করের উপন্যাস

অসময় ১০.০০

পূর্ণ অপূর্ণ ১০.০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

যার যা ভূমিকা ৭.০০

বিবর ৬.০০

সমরেশ বসুর গল্পগ্রন্থ

ধর্ষিতা ৪.০০

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

দেহ নয় মন ৪.০০

মতি নন্দীর

নতুন উপন্যাস

কোনি

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

অমল দত্তের ফুটবল খেলা শেখার বই | তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

ফুটবল খেলতে হলে ১২·০০

প্র কা শি ত হ ল

ছোট্ট মেয়ে টায়রা—ভারী মিষ্টি মেয়ে! বকুলফুলের মালা গেঁথে গলায় পরে; বাবা যখন রোজ সকালে জাল নিয়ে নৌকোয় চেপে টুংরি নদীতে মাছ ধরতে যায়, টুংরি নদীর ঢেউ-জোয়ারে জলে দোল খেতে ও-ও যায় বাবার সঙ্গে; সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফেরার সময় বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গায়।

এক বর্ষায় টুংরির বান এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই ছোট্ট সোনা টায়রাকে। আছড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল গভীর এক বনে। টায়রার প্রাণ নিল না টুংরি, কথা নিল। টায়রা বোবা হয়ে গেল।

হারিয়ে-যাওয়া ছোট্ট টায়রা—পথ চেনে না ঘাট চেনে না—একলা, সঙ্গে কেউ নেই, বাবা না, মা না, কেউ না—কথাও বলতে পারে না শুধু ভয়-ভয় চোখে কেঁদে সারা হয়—সেই অন্ধকার নির্জন বনের মধ্যে কি বিপদেই না পড়লো!

ছোট্ট মেয়ে মিষ্টি মেয়ে টায়রার সেই ভীষণ বিপদের গল্প এই অপরূপকথা—'আমার নাম টায়রা'॥ দাম ৫·০০॥

শৈলেন ঘোষের

ছোটদের রূপকথা

আমার নাম টায়রা

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৭
শনিবার ২৭ আষাঢ় ১৩৮২

স্বদেশ-দীক্ষার অভাব

আমেরিকাতে যেদিন আইন করে নিগ্রো ক্রীতদাসের মুক্তিবিধান করা হয়েছিল, সেদিন ক্রীতদাস সমাজেরই মধ্যে দুই মনোভাবের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ক্ষুব্ধ ক্রীতদাসদের একটি বৃহৎ অংশ ওই মুক্তি-আইনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। বক্তব্য : আমরা এতদিন যে-রকম জীবনে অভ্যস্ত ছিলাম, এর পরও সেইরকম জীবনের অবলম্বন চাই। নতুন করে একটা অসহায়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে চাই না।

এই মনোবৃত্তির সঙ্গে একশ্রেণীর ভারতীয় মনোবৃত্তির তুলনা করা খুব অযৌক্তিক হবে না। এই ভারতীয় মনোবৃত্তির বয়স বেশী নয়। দেশ স্বাধীন হবার পর কিছুকালের মধ্যে এই মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে এবং জোরও বেড়েছে। এই মনোবৃত্তি হলো, স্বাদেশিক ঐতিহ্যের সম্পর্কে অদ্ভুত এক তুচ্ছতার ভাব, এবং ইংরেজী ঐতিহ্যের প্রতি অদ্ভুত প্রীতিযুক্ত একটি আসক্তি। সাহেবরা (ইংরেজরা) দেশের রাজনীতিক আধিপত্যের মঞ্চ থেকে সরে যেতেই যেন সাহেবী সংস্কার ও কুসংস্কারেরও উপর একটা নতুন মায়ার আবেগ ভারতের সব শ্রেণীরই অনেক ব্যক্তির মনে ও আচরণে প্রবল হয়ে উঠেছে। কোনদিন ছেলে মেয়েকে এ-বি-সি-ডি পড়াবার আগ্রহও বোধ করতো না, এরকম অভিরুচির পিতা-মাতাও হঠাৎ ইংরেজীয়ানার নৈষ্ঠিক ভক্ত হয়ে উঠলো। দেখা গেল, যে মুদি-মানুষটি সারাদিন তাঁর দোকানে বসে চাল-ডাল-মশলা ওজন করছেন ও বেচছেন, তিনিও তাঁর শিশু ছেলেটিকে ইংরেজী সাজে সাজিয়ে অর্থাৎ শার্ট-প্যাণ্টের সাধারণ সাজের সঙ্গে আবার গলায় একটা টাই বেঁধে দিয়ে (দারুণ গ্রীষ্মের সময়েও) বিলেতী নামে অঙ্কিত একটা কে জি স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে খুশি হচ্ছেন। তিনিও বোধহয় এই ভেবে আশান্বিত হচ্ছেন যে, তাঁর শিশু ছেলেটি ভবিষ্যতে একদিন যথার্থ এক সাহেবের মতো হবে ও বড় কাজ করবে। এ কী ব্যাপার! দেশ স্বাধীন হবার পর, ইংরাজ সরে যাবার পর, এ ধরনের দাস্যভাবের ইংরাজীয়ানার প্রসার দেখা দিল কেন? উপরওয়ালা একশ্রেণীর আভিজাতিক গোত্রধর্ম হিসাবে সাহেবীয়ানা আগেই প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের বিশেষ কোন স্পর্শ এবং প্রভাব ছিল না। তাঁরা স্বদেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞানান্বেষণার স্বরূপ সম্বন্ধে শিক্ষাহীন ছিলেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের জ্ঞান ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিরাট বিজ্ঞতায় লালিত-পালিত হতেন না। সে আভিজাত্যের প্রকৃতি ছিল, ইংরাজ সম্পর্কে দাসাভাবে অভিভূত একটা চরিত্র। ইংরাজের ভাষা সাজ ও হাবভাব সম্পর্কে একটা স্থূলতাপ্রধান অনুকরণ।

বিস্ময়ের বিষয়, সমাজের উপরতলার এক শ্রেণীর আচরণে এই সাহেবী রীতিনীতির অনুকৃত একটা উল্লাস আগের তুলনায় অধুনা আরও বেড়েছে। এর মধ্যে যে-সমস্যার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা সাংস্কৃতিক অবনমনের লক্ষণ। সাহিত্য চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র ইত্যাদি কলা-সাধনার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ভারতীয় জনতার প্রশস্তির তুলনায় বিদেশীয় প্রশস্তির কদর ও সমাদর বেশী বলে একটা মান্যতা লাভ করে বসেছে, এবং এই স্বভাবের প্রকোপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যেন দেশীয় বিচার ও সমালোচনার তুলনায় বিদেশী বিচার ও সমালোচনা অনেক বেশী জ্ঞানান্বিত ও মহনীয়, ভারতীয় শিল্পী ও গুণী সমাজের একটি অংশ এরকম একটা মানসিক প্রলোভ অর্থাৎ বিশ্বাসে হিল্লোলিত হয়ে থাকেন।

ঐতিহাসিক পরীক্ষায় এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, বিদেশীয় প্রশস্তির ও অভিমতের কাছে বিকিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক বলিষ্ঠতার লক্ষণ নয়। গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে ইংরাজের সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের সব কিছুরই সার্থক প্রয়োজন আছে। কিন্তু ইংরাজীয়ানার পাদুকা জোড়াকে ভারতীয় সংস্কৃতির সিংহাসনে বসিয়ে দিলে ভারতীয় মহত্ত্বের কোন অভিব্যক্তি কোনদিনই সম্ভব হবে না। স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরীর দিকে তাকিয়ে রামচন্দ্র বলেছিলেন, লক্ষ্মণ, আমার এই স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরীকে দেখতে একটুও ভাল লাগছে না। আমার জননী ও জন্মভূমি (অযোধ্যা) আমার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী। রামচন্দ্রের উক্তি বস্তুত একটি অভিজ্ঞাত ঐতিহাসিক সত্যের উক্তি। স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা মমতা ও মায়ার ভাবে আশ্রিত না হলে, স্বদেশের বিচার-বিবেচনা ও প্রশস্তিকে বিদেশীয় অভিমতের তুলনায় বেশ সম্মানীয় বলে যা মনে করলে ভারতীয়ের সাংস্কৃতিক জীবনে নিদারুণ এক বন্ধ্যাত্ব দেখা না দিয়ে পারবে না। এ ধরনের আত্মসম্মানবোধের রিক্ততায় অভিভূত সাংস্কৃতিক আচরণ কোনদিনও মহত্ত্বপ্রসূ হতে পারবে না। পরিণাম এই হবে যে, চটুল বৈচিত্র্য ও চমৎকার প্রগল্‌ভতা সাংস্কৃতিক সত্য বলে বিবেচিত ও প্রচলিত হবে। অ্যারিস্টটল বলেছেন—'সঙ্গত অহমিকা মানবীয় চরিত্রের পক্ষে একটি কাম্য ঐশ্বর্য'। স্বাদেশিক সংস্কৃতির সম্পর্কে ব্যক্তির মনোভাবে একটি গর্বের ভাব না থাকলে চলে না। সাংস্কৃতিক জীবনে এটা 'সঙ্গত অহমিকা'। আশা করতে পারা যায়, ভারতীয় শিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক জনের মনোভাবে 'স্বদেশের দীক্ষা' আবার প্রবল হয়ে ভারতের সাংস্কৃতিক কৃতিত্বকে আবার নতুন মহত্ত্বে নন্দিত করে তুলবে।

চিঠি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কবে কোন সভামঞ্চে বুঝি দেখেছিলে
আলোকিত অক্ষরের তারার মিছিলে
ব'সে আছি রাজাসনে একশ্চন্দ্র সুন্দরশেখর,
না কি শুভ্র নিভৃতিতে অনন্যতৎপর
মগ্ন মনে পড়েছিলে আমার কবিতা
শব্দের মেঘের ঊর্ধ্বে আবিষ্কার করেছিলে সত্যের সবিতা
না কি শুনে উদ্‌বারিত উচ্চারণে দীপ্ত কণ্ঠস্বর
সর্ব দেহে ধরেছিলে পুলকশিহর
অপরিচিতের মাঝে পেয়েছিলে অপরিমিতের ডাক,
সহসা অবাক
অমৃতে তুলিলে ভরি' দিঠি
তারপর কী কারণে কে বা জানে লিখিলে এ অপরূপ চিঠি।
নেই কোনো প্রয়োজন, না প্রার্থনা স্তুতি চাটুবাদ
নেই ক্ষুদ্র অনুরোধ—তুচ্ছ পত্র-প্রাপ্তির সংবাদ
নেই বিন্দু কৌতূহল, না বা কোনো অলস জিজ্ঞাসা
লিখিলে সংক্ষিপ্ততম দুটিমাত্র কথা : নাও ভালোবাসা।
ইতিতে লিখিলে নাম স্পষ্টাক্ষরে, তারপরে টেনে দিলে রেখা-
যেন সব অন্ত হল—অনন্ত যে অদেখা অলেখা।

সেই হতে খুঁজিতেছি কোথা তুমি শ্রীরূপা শ্রীমতী
কত দূরে তোমার বসতি ?
নাই পেলে শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ের সর্বাঙ্গীণ পূর্ণ আস্বাদন
যায় না তো প্রাণের ক্রন্দন কভু হয় না তো ঋণের মোচন
ঈশ্বরের খোঁজ পাওয়া অতি সোজা, কোথা পাব ভক্তের সন্ধান
ভক্তের হৃদয় খুঁজে পথে-পথে শ্রান্ত ক্লান্ত রিক্ত ভগবান
কোথায় বিশ্রামস্থল, কোথায় বৈঠকখানা,
দ্বারে-দ্বারে অহোরাত্র দিয়ে যাই হানা
কোথা তুমি, কেন তুমি দিলেনা ঠিকানা ?

বৈদেশিকী

দেবরাজ

পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় কম্যুনিস্ট দল হচ্ছে ইটালির পার্তিতো কোম্যুনিতো ইতালিয়ানো অর্থাৎ ইটালির কম্যুনিস্ট দল। দেশের তারা বরাবরই প্রায় দু নম্বর দল অবিশ্যি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। পয়লা নম্বর দল ফ্যাসিস্টদের মুলে হাবাত হবার পর থেকে খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরা—তিরিশ বছর ধরে তারাই সরকার চালিয়ে আসছে যদিও একেশ্বর হয়ে নয় আর পাঁচটা অকম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে জোট বেঁধে' কোয়ালিশন অর্থাৎ পাঁচমিশেলী সরকারই ইতালিতে রেওয়াজ। কোনও সরকারই তাই টেঁকসই হয় না। সরকারের রদবদল ইটালিতে লেগেই আছে। তবে সব সরকারেই মুরুব্বিয়ানা করে খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরা। তারা অনবরত শরিক পালটায় কিন্তু নিজেদের মোড়লি বজায় রেখে। কারুর সঙ্গে ঘর করতে তাদের আপত্তি নেই এক কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ছাড়া। ইটালির রাজনীতিতে কম্যুনিস্টদের তারাই এতকাল কোণঠাসা করে রেখেছে।

খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরা দক্ষিণপন্থী ঠিক নয়। কট্টর দক্ষিণপন্থীদের তারা এড়িয়ে চলে। হালে ইটালিতে যে নয়া ফ্যাসিবাদী দল দেখা দিয়েছে তারা কোনও প্রশ্রয় খৃস্টান ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে পায়নি। দরকার হলে তারা অকম্যুনিস্ট বামপন্থী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার চালিয়েছে। তারা নিজেরা মধ্যপন্থী। সেই ভাবেই দলকে গড়ে তুলেছিলেন অলসিদে দি গাসপেরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামবার পর। তাঁর ইচ্ছে ছিল খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরা মাঝ পথে চলবে বাঁয়ে ঘেঁষে। কিন্তু ইদানীং তাদের ঝোঁকটা বাঁয়ে নয়—ডাইনে। আন্তনিয়ো ফানফানি এখন দলের সর্বেসর্বা। কম্যুনিস্টরা তাঁর দু চোখের বিষ—যেমন করে হোক তাদের ঠেকিয়ে রাখাই তাঁর লক্ষ্য। খোদ কম্যুনিস্ট দল কেবল নয়, কম্যুনিস্টঘেঁষা কোনও দলকে আমল দিতেও তিনি রাজী নন। সোস্যালিস্টদের সঙ্গে তাঁর বনে না তারা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সমঝোতার কথা তোলে বলে। সরকারে তাঁর দলের শরিক লিবারাল, রিপাবলিকান আর সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলো, কখনও সখনও সোস্যালিস্টরাও।

এমনি ভাবে শরিক পালটাপালটি করে তিনি ইটালিতে কম্যুনিস্টদের প্রশাসনের দেউড়ির বাইরে আটকে রেখেছেন ভেতরে ঢুকতে দেননি। আর কী পারবেন? কথাটা উঠেছে ইটালিতে ১৬ জুনের নির্বাচনের পর। দেশ জুড়ে সে নির্বাচনে এক লাফে ওপরে উঠে গেছে কম্যুনিস্ট পার্টি। পয়লা দল অবিশ্যি এখনও খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরাই—কিন্তু ফারাকটা সামান্য, নেই বললেই হয়। তারা পেয়েছে ৩৫·৩ শতক ভোট কম্যুনিস্টরা ৩৩·৪ শতক—মোটে দু শতক ভোটের তফাত। অথচ পাঁচ বছর আগে যে ভোটাভুটি হয় তাতে খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরা কম্যুনিস্টদের চেয়ে দশ শতক ভোট বেশী পেয়েছিল। খৃস্টান ডেমোক্র্যাটদের ভোট অবিশ্যি খুব বেশী কমে নি। আগেরবারের ৩৭·৯ শতক এবারে নেমে এসেছে ৩৫·৩এ। তার মানে ২·৬ শতক কম। কিন্তু কম্যুনিস্টদের ভোট বেড়ে গেছে এক চোটে ৫·৫ শতক। পাঁচ বছরে তারা প্রায় খৃস্টান ডেমোক্র্যাটদের নাগাল ধরে ফেলছে। দেশসুদ্ধ লোক প্রশ্ন তুলছে এ তফাত কী বেশী দিন টিঁকবে?

খৃস্টান ডেমোক্র্যাটদের ভোট কমেছে বামপন্থীরা তাদের ওপর বিমুখ হয়েছে বলে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা তাদের আগের-বার ভোট দিয়েছিল তারা এবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছে—তাদের ভোট বেশীর ভাগই পড়েছে কম্যুনিস্টদের বাক্সে। খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরা বেঁচে গেছে তাদেরই শরিক সোস্যাল ডেমোক্র্যাট আর লিবারালদের পাওনা বিস্তর ভোট বরাতে জুটেছে বলে। তা ছাড়া এবারে ইটালিতে যাদের বয়েস ১৮ থেকে ২১ তারা ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে। সে সব ভোট খৃস্টান ডেমোক্র্যাটরা পায়নি—পেয়েছে কম্যুনিস্টরা। তাদের ভোট বেড়ে গেছে এক কোটি পনেরো লাখ। তার মানে নতুন ভোটাররা ঝুঁকছে তাদের দিকেই। একচোটে তাদের ভোট পঁচিশ লাখ বাড়বে এতটা আশা কম্যুনিস্টরাও করেনি। বোঝা যাচ্ছে কেবল ছেলে-ছোকরারা নয় অনেক মাঝবয়সী ভোটারও তাদের দিকে ঢলেছে। মধ্যবিত্তরা সরকারী দলের ওপর চটেছে জিনিসপত্তরের দাম আর সেই সঙ্গে বেকারি বেড়েছে বলে। তারা দলে দলে ভোট দিয়েছে কম্যুনিস্টদের সরকারী দলের ওপর তাদের রাগ দেখাতে। আগেরবারে যারা সরকারের ওপর বিরূপ হয়ে উগ্র দক্ষিণ-পন্থীদের ভোট দিয়েছিল তারা এবার উলটো টা করেছে—মদত দিয়েছে কম্যুনিস্টদের।

১৬ জুনের নির্বাচনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় আইনসভা কিংবা সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই—সে নির্বাচন হয়েছিল পুরসভা আর প্রাদেশিক আইনসভা নতুন করে গড়বার জন্যে। সে নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ভাগ্য জড়ানো নেই এ কথা ঠিক। কিন্তু এর পর কেন্দ্রীয় সরকারের শরিকানা আদায় করার জন্যে কম্যুনিস্টরা কোমর বেঁধে লেগেছে। কোন্ অছিলায় তাদের একঘরে করে রাখা যাবে? কেন্দ্রীয় আইনসভায় কোনও দলের তো আর নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নেই যে সে দল একাই মন্ত্রিসভা গড়বে। কম্যুনিস্টরা এখন দু নম্বর দল, তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কেন নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়? সোস্যালিস্টরাও তাদের দিকে ঢলেছে। তারাও চাইছে কম্যুনিস্টরাও অন্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে দেশ শাসনের ভার নিক বিশেষ করে দেশের আর্থিক অবস্থা যখন মোটেই ভালো নয়। দরকার হলে খৃস্টান ডেমোক্র্যাটদের বাদ দিয়ে একটা পুরোপুরি বামপন্থী সরকার গড়ার কথাও কেউ কেউ তুলেছে। তা হয়তো হবে না—আপাতত খৃস্টান ডেমোক্র্যাটদের জেদ সম্ভবত বজায় থাকবে। কিন্তু পরের কেন্দ্রীয় নির্বাচনে কী আর কম্যুনিস্টদের রোখা যাবে? বজায় থাকবে খৃস্টান ডেমোক্র্যাট-দের মোড়লি?

ইটালির কম্যুনিস্টদের ধরন-ধারণ একটু আলাদা। মার্কসবাদে তারা বিশ্বাসী, কিন্তু বিপ্লব ছাড়া গতি নেই এমন কথা তারা বলে না। তিরিশ বছর আগে তারা ক্ষমতা জবরদখল করলেও করতে পারতো কিন্তু তারপর থেকেই তারা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবার পথই বেছে নিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর তাদের কোনও মোহ নেই আবার বিদ্বেষও নেই। সংসদীয় কমিটীতে যখনই তাদের নেওয়া হয়েছে তখনই তারা মিলেমিশে কাজ করেছে—বাকনি ঝেড়ে কাজে বাগড়া দেয়নি। তিনটে এলাকায় আগের বারেই তারা গরিষ্ঠতা পেয়েছিল—সে সব এলাকায় তাদের কাজের সুখ্যাতিই হয়েছে। এবারের নির্বাচনে কোথাও তারা পিছু হটেনি বরঞ্চ আগের চেয়ে বেশী ভোট পেয়েছে। তাদের কাজকর্ম লোকে যে পছন্দ করে এ তারই প্রমাণ। এবার আরও একটা এলাকা তাদের হাতে এসেছে—অনেকগুলো বড় শহরও। রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস সমেত ইটালির অনেক বড় শহরই এবার লাল হয়ে গেছে। তা দেখে প্রমাদ গুণেছেন নাটোর কর্তারা—এর পরও কী ইটালিকে কম্যুনিস্ট বিরোধী জোটে রাখা যাবে না রাখা সঙ্গত হবে? রাতারাতি ভোল পাল্টাবার কথা কিন্তু কম্যুনিস্টদের নেতা এনরিকো বের্লিঙ্গুয়েরের বলেননি। দলকে মাথা ঠান্ডা রেখে চলার পরামর্শই তিনি দিয়েছেন।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৫৯ ॥

ওঁ

প্রশান্ত

কাল অনেক মোটরবাহন ভদ্রলোক গল্প শোনার প্রত্যাশায় ছয় নম্বর[১] পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে, দ্বারের কাছে এসে শুনে গেছে যে রবিবারে পড়া হবে। তার ফল হবে এই যে রবিবারেও একদল লোক এসে হতবুদ্ধি হয়ে ফিরবে—কারণ সময় নির্দিষ্ট করোনি। সুধীন ও অপূর্ব[২] কাল এসেছিল তাদের মত এই যে রবিবার আড়াইটায় পড়া আরম্ভ করে চায়ের পূর্বে শেষ করা। নতুবা তিনটের সময় আরম্ভ করে পাঁচটার সময় সকলকেই চা খাইয়ে উপসংহারটুকু পড়া। তোমার মত ছিল চারটের সময় পড়া আরম্ভ করে কাউকেই না খাইয়ে বিদায় করা। তোমার আর একটা বিকল্প ছিল সকাল আটটা থেকে বারোটা। কোনটা যে চরম সিদ্ধান্ত সত্বর না জানলে বিস্তর লোকের পরে অত্যাচার করা হবে এবং যখন তখন লোক এসে পড়ে আমার পাঠটাকে খণ্ড খণ্ড করবে।

Grieg's Economics of Khaddar.

রাণী কেমন আছে এক লাইন লিখে দিয়ো।

মালয় উপদ্বীপে প্রাণপাত করে এসেছি কিন্তু সেখানে চাঁদার টাকা রাহুগ্রস্ত অবস্থায় রয়েই গেল শুনে অবধি মনে হচ্চে আমার অদৃষ্টের চিরপরিচিত বঞ্চনার মূর্তি দেখা দিল না। আরিয়ামকেও ভালো করে জিজ্ঞাসা করে দেখো—ঠিক অবস্থাটা জানা উচিত।

বরণডালার[৪] পাণ্ডুলিপিটা একবার পাঠিয়ে দিলে কবিতাগুলি কি পর্যায়ে সাজানো উচিত চিন্তা করে দেখতে পারি। নন্দলাল[৫] বললেন ছবি করবার খরচ পাঁচ শো টাকার বেশি হবে না। ইতি ৩ অগস্ট ১৯২৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৬০ ॥

প্রশান্ত

বেশ বুঝতে পারচি গল্প পড়ে উঠতে পারব না। কাল সন্ধে বেলায় অসম্ভব রকম ক্লান্ত হয়ে ছিলুম—তার কারণ কাল দুপুর বেলায় রায় বাহাদুর অবিনাশ বাঁড়ুজ্জের[৬] সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা খানেক আলাপ করেছিলুম। লোকে বাইরে থেকে বুঝতে পারে না আমার ভিতরের দুর্বলতা। চেহারা দেখে নিজেই ভুলি, তা অন্যের দোষ দেব কি? যাদের তুমি আসতে বলেচ তাদের এই বেলা খবর দিয়ো নইলে সে এক বিভ্রাট হবে।

আজ যদি বোলপুরে যাও যদি মনে থাকে আরিয়ামকে জিজ্ঞাসা কোরো আমার চেকখানা কি করলে। আরিয়ামকে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যালয়ের কাজে যদি নিযুক্ত করে থাকো তাহলে আমার থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ো—কারণ আমি তো অমিয় এবং আরিয়াম উভয়ের জুড়ি হাঁকিয়ে চলতে পারব না।

কো অপরেটিভ ব্যাঙ্কের পরে তোমার মমতা নেই—আমি ওটাকে খুব আবশ্যক বলে জানি—ওর উন্নতির সঙ্গে আমাদের পল্লির কাজের ঘনিষ্ঠ যোগ। সেই জন্যে ওর পুষ্টিসাধনটা বিশ্বভারতীর তরফ থেকে বাহুল্য নয় অথচ সে কাজে বিশ্বভারতীর লেশমাত্র ক্ষতির আশঙ্কা নেই। শিউড়িজলস প্রভৃতি খেয়ে রাণীর জ্বরটা বোধ হয় ছাড়ব ছাড়ব করচে—কালকের খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৬১ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রাখীর কাপি লোকহস্তে তাড়াতাড়ি পাঠালুম কিন্তু তার পরে তিন দিন কোনোরকম খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়েছিলুম। আজ তোমার চিঠি পেলুম।

"ইরাবতী" ও "আঁধার আলো" মহুয়া থেকে বাদ পড়লে ক্ষতি নেই। সাগরিকা কবিতাটা যদিচ বালি দ্বীপকে উপলক্ষ্য করে লেখা তবু ওটার সম্ভাষণ "বালি"র চেয়ে বালিকার প্রতিই বেশি সংগত হয় অতএব "মহুয়া"তেই ওর স্থান।

বিবাহ উপলক্ষ্যে যে আটটি কবিতার উল্লেখ করেছ তার মধ্যে "অনন্তের বাণী" ছাড়া বাকি কবিতাগুলি মহুয়ার সমসাময়িক—ওদের একত্র সমাবেশ প্রার্থনীয়। "অনন্তের বাণী" তোমরা রাখীতে নিতে পারো।

"শুধায়ো না কবে কোন্ গানটি" আমার হস্তাক্ষরে দিতে ইচ্ছা করি।

বিচ্ছেদ বিদায়সম্বল, এবং বিরহ লিখেছিলুম যখন প্রবাসীতে "শেষের কবিতা" দেবার জন্যে কাপি করছিলুম।

ভবানীচরণ লাহা[৭] আমার রচিত পদগুলিকে তার ছুবিতায়

১। ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি
২। অপূর্বকুমার চন্দ
৩। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও কবির একদা একান্ত সচিব আর্যনায়কম
৪। প্রেমের কবিতার প্রস্তাবিত সংকলন। আজও অমুদ্রিত
৫। নন্দলাল বসু
৬। বীরভূমের জনৈক জমিদার
৭। কলকাতার শিল্পী

পক্ষে কলঙ্কিত করেছে, এটা আমার পক্ষে লজ্জার কারণ। লোকে জানবেই না যে এতে আমার সম্মতি ছিল না।

সহজ পাঠের ছবির সাইজ ব্যয়সংক্ষেপের খাতিরে খর্ব করতে চাও এ প্রস্তাবে নন্দলাল[৮] দুঃখিত। ঠিক একই কারণেই তোমরা আমার লেখাকে ছেঁটে বইয়ের আয়তন ও মূল্য কমাতে পারতে, কিন্তু সেটা আমার পক্ষে প্রীতিকর হত না। এখানে দাম-কমানোর দামের চেয়ে অন্য জিনিসটার দাম বেশি। যে কজন ছেলে চার আনা খরচ করে পড়তে চায় তারাই পড়ুক যারা চার পয়সার বেশি দিতে না চায় তাদের জন্যে বইয়ের অভাব নেই।

সহজ পাঠ ছাপা শেষ হতে আরো কতদিন দেরি?

অমিয়[৯] বলচেন কিন্তুর নূতন গান ছাপার অপেক্ষায় আছে, মহুয়া কিংবা রাখীতে তাদের হরণ করে নিলে অন্যায় হবে। নূতন গানের প্রধান সম্বল তার নূতনত্ব সেটাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই কর্তব্য হবে। অতএব "অনন্তের বাণী" ও অন্য গানগুলি বাদ দিয়ো।

বানানের নূতন বিধি সবগুলি সুনীতিসংগত নয় তা ছাড়া রীতিসংগতও নয়। এ নিয়ে চিঠিতে আলোচনা অসম্ভব, কারণ, উচ্চারণের বিচার ধ্বনি দিয়ে, অক্ষর দিয়ে নয়। কবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে মোকাবিলায় মীমাংসা হতে পারে তাই ভাবচি আপাতত জবরদস্তির সহকারেই আমার মত চালাব যে পর্যন্ত না তর্কে পরাস্ত হই। ইতি ১৪ ভাদ্র ১৩৩৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৬২ ॥

ওঁ

"UTTARAYAN"
Santiniketan
Bengal

কল্যাণীয়েষু,

তোমার তর্জমাটাকে দেখে শুনে দিলুম। এতে পরিশ্রম আছে—কেননা ইংরেজি ভাষাটা পরের জিনিস এবং এ ভাষায় আমি হাত পাকাতে আলস্য করেছি। Unity কাগজে Einstein-এর যে interview বেরিয়েছে সেটার মত আমার সঙ্গে অবিকল মেলে। ওটা উদ্ধৃত করে দিলে মন্দ হবে না। এখানকার কাজকর্ম ভাবগতিক সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলোচনা করবার অনেক আছে। কবে আসবে সে জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম।

বাংলা সহজ পাঠের ব্লকগুলো অবিলম্বে উদ্ধার করে যদি পাঠাতে পারো তবে বাঁচি। আর তো দেরি সয় না—

নন্দলাল ওরফে রাখীর ছবি প্রভৃতি সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করে ফেলো। মোকাবিলায় না হলে সব কথা স্পষ্ট হয় না।

রাণীকে অনেক দিন চিঠি লিখিনি। বড় বেশি ব্যস্ত আছি। সেই বরোদার বক্তৃতা নিয়ে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৬৩ ॥

ওঁ

"পাখীর কথা" রামেন্দ্রসুন্দরবাবুকে[১০] দিতে হবে। গ্রন্থকার ঐ পত্রিকাগুলি ফেরৎ চান। অতএব না হারায়।

॥ ৬৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেকটা পরিমাণে আমি নিজে নিতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এ সময়ে এ কথার কোনো আভাস থাকাও উচিত হবে না যে তুমি কর্মসচিবের পদ ত্যাগ করতে চেয়েছো। যথা সময়ে যথা নিয়মে যদি তোমাদের পদের পরিবর্তন হয় তাহলে বলবার কোনো কথা থাকে না, কিন্তু মাঝখানের থেকে কিছু হওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

যদি তোমরা মনে কর নতুন ব্যবস্থা চলবে না এবং অন্য রকম ব্যবস্থাই ভালো তাহলে সেই অনুসারেই সমস্ত ঠিক করা উচিত—কেননা আমার মেয়াদ বেশি দিনের নয়, এবং আমার কোনো মতের বোঝা ভবিষ্যতের ঘাড়ে আমি চাপাতে চাইনে। যখন বয়স অল্প ছিল তখন নিজের মত পরীক্ষার অবকাশ ছিল। তাতেও আমি যে কৃতকার্য হয়েছি এমন কথা আমি কখনই বলিনে। বস্তুত কর্মের দিকে আমার নিষ্ফলতা ঘটেচে এ কথা আমি অনেক কাল থেকেই অনুভব করেচি। কর্মের দিক থেকে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা আমার শক্তিতে নেই—চারদিকের লোকদের সঙ্গে আন্তরিক যোগসাধনের গুরুতর বাধা আমার স্বভাবের মধ্যেই আছে। ভাষার অন্তরঙ্গতা যার আছে সেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে—মানুষের সঙ্গে যার অন্তরঙ্গতার পথ সহজ কর্মক্ষেত্রে তারই সাফল্য। আমি এই সাফল্য আশাও করিনে। তবু আইডিয়াকে কর্মের মধ্যে আকার দেওয়ার ইচ্ছা আমার মনে প্রবল। সেই জন্যেই গ্রামের কাজে ও শান্তিনিকেতনের উদ্যোগে আমি এত আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিতে পেরেছিলুম। আজও কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আমার মন ভিতরে ভিতরে কেবলি বেদনা বোধ করেচে। অথচ আমি এও জানি কর্মের বন্ধনে নানা লোককে আমার চারদিকে একত্র করবার বন্ধনশক্তি আমার মধ্যে নেই। অতএব কাজের পথে আমাকে একলা পড়ে যেতে হবে—এবং শেষ পর্যন্ত সেই কারণেই কাজ আমার পূর্ণতা লাভ করবে না। এ কথা জেনেও যে কয়দিন বাঁচি আমার কাজ আমাকেই করতে হবে। সেই আমার কাজে তোমার সঙ্গে আমার বিরোধ না থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। লোকে যদি মনে করে বিরোধ আছে সেও আমার পক্ষে কষ্টকর। যাই হোক তোমার সঙ্গে আমার কর্মের যোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে এ একথাটা যেন লোকের মনে স্থান না পায়। ইতি ২১ ভাদ্র ১৩৩৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮। নন্দলাল বসু
৯। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী
১০। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সাহিত্য প্রসঙ্গ

কলিন উইলসনের বিতর্ক

হিটলারের নাজীবাহিনী সত্যিই ষাট লক্ষ ইহুদীকে খুন করেছিল কিনা আজ এত বছর পরে এ-প্রশ্ন যদি কেউ তোলে আমরা নিশ্চয় তার বুদ্ধির তারিফ করব না। জার্মানীতে নাজী বাহিনী কি করেছিল আর না করেছিল তার সবন্ধে অজস্র বই, খবর, ডায়রি, গল্প, গুজব এবং যথার্থভাবে বহু দলিলও রয়েছে। তবু থার্ড রাইখ-এর পতনের তিরিশ বছর পরে বৃটিশ লেখক কলিন উইলসন এই প্রশ্নই তুলেছেন। এই প্রশ্ন যদি নির্বোধের হত হয়ত লোকে তাকে অবজ্ঞা করত। কিন্তু কলিন উইলসন তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, যুক্তিবাদী মনন, উদার দৃষ্টি এবং অধ্যবসায়ের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। উপরন্তু তিনি বৃটিশ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী ইংল্যণ্ডের যে অবস্থা করে তুলেছিল, সমস্ত য়ুরোপকে কেমন করে গ্রাস করে ফেলতে যাচ্ছিল তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তবু কলিন উইলসন সম্প্রতি এই মারাত্মক প্রশ্নটিই করে ফেলেছেন। তাঁর ধারণা, নাজীরা যতটা করেছিল তার বেশী গুজব রটনার সম্ভাবনা রয়েছে।

উইলসনের এই মন্তব্য বহু লোককেই বিরক্ত করেছে। প্রতিবাদও হয়েছে অজস্র। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে অ্যালান সিলিটো-র নাম উল্লেখযোগ্য। সিলিটো এককালের খ্যাতিমান লেখক। তিনি বলেছেন, উইলসন রিচার্ড হারউডের একটা পুস্তিকার ওপর অতি মাত্রায় ভরসা করেছেন। হারউডের ওই পুস্তিকার আগে ১৯৬৯ সালে নুনটাইড প্রেস একটি বই বের করে। বইটির নাম 'দি মিথ অফ দি সিক্স মিলিয়ন।' এই দুটি বইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহ করা যায়।

জবাবে উইলসন বলেছেন, তিনি হারউডের সম্পর্কে খুব খুঁটিয়ে কিছু দেখেন নি। যদি হারউড উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কিছু করে থাকেন তবে এই ধরনের লোকেদের মিথ্যেবাদী বলে খারিজ করা হোক। আর যদি মনে হয়, না তারা মিথ্যেবাদী নয়, তবে পরীক্ষা করে দেখা দরকার ওরা যা বলেছে তার মধ্যে সত্য আছে কিনা! সত্য থাকলে তা স্বীকার করতে হবে।

রিচার্ড হারউড নিজেও তর্কে নেমেছেন। মনে হয়, এই তর্কযুদ্ধ এখন কিছুদিন চলবে।

ষাট লক্ষ ইহুদী নিধনের যে-কথা আমরা এতোকাল ধরে শুনে আসছি, বই-পত্রে দেখছি, যা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে কলিন উইলসন যে তাকে বদলাতে পারবেন এমন হয়ত নয়, কিন্তু তাঁর এই প্রশ্ন আবার বিষয়টির সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের বিতর্ক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

*

উইলসনের সাম্প্রতিক তর্ক-বিতর্কের সূত্রে একটি সংবাদের কথা মনে পড়ছে। কিছুদিন আগে হিন্দুস্থান টাইমস-এর একটি ছোট নিবন্ধে পড়েছিলাম, একদার অনেক কুখ্যাত নাৎসী নেতা—যাঁদের খুঁজে বেড়ানো হচ্ছিল—এখন তাঁরা আত্মপ্রকাশ করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনেক নাৎসী নেতা জার্মানী ছেড়ে পালিয়ে যান দক্ষিণ আমেরিকায়। আর্জেন্টিনার তদ্‌কালীন প্রেসিডেন্ট তো সমাদরে অনেককে গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে এই নাৎসী নেতারা নানা নামে, নানা ধরনের আড়াল খাড়া করে তাঁদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন বছরের পর বছর। নিউ ইয়র্ক টাইমস এক রিপোর্টে এঁদের অনেকের কথা ফাঁস করে দেন একবার। যেমন ক্লাউস অল্টম্যান-এর পরিচয়। দুঃখের বিষয় বলিভিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের আদালতে এঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলেও এঁদের গায়ে হাত পড়েনি। নাজী অপরাধীরা এভাবে বেঁচে থাকার অধিকার অন্য কোনো দেশে পেতেন না হয়ত।

ক্লাউস অল্টম্যান নামকরা যুদ্ধাপরাধী। তাঁর আসল নাম ক্লাউস বারবি। ফরাসী প্রেসিডেন্ট পাঁপিদু নিজে বলিভিয়া সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন বারবিকে বিচারার্থে অন্য দেশের সরকারের হাতে তুলে দিতে। বলিভিয়া সরকার রাজী হননি। বলিভিয়ার আইনে নাকি বলে আট বছর আগে কোনো অপরাধ করে থাকলে বলিভিয়ার নাগরিকেরা সে-অপরাধে আর দণ্ডনীয় হন না।

পশ্চিম জার্মান সরকার ঠিক এই রকমই এক যুদ্ধাপরাধীকে বিচারার্থে চেয়েছিলেন চিলি সরকারের কাছে। চিলি সরকার তা দেন নি। ডাচ সরকার যার নামে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন সেই যুদ্ধাপরাধী দিব্যি ইকুয়েডোরে সুখে সম্পদে বেঁচে আছে।

কোনো কোনো আইনজ্ঞ নাকি তাঁদের মক্কেলদের জন্যে এই যুক্তি খাড়া করছেন যে, যুদ্ধের সময় যত খুশি মানুষ হত্যাই স্বাভাবিক, তা বলে শান্তির সময় তারা তো অপরাধ করছে না তবে তাদের নিয়ে গোলমাল করছ কেন?

কলিন উইলসন এঁদের সম্পর্কে কি বলবেন জানি না। লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে যারা মেরেছে তারা দু-এক লক্ষ কম লোক মারল না বেশী এ-নিয়ে সত্যিই কি কোনো বড় বিতর্ক হতে পারে? হয়ত সংখ্যার দিক থেকে কিছু সংশোধন ঘটতে পারে।

অভিনন্দ

একটি আবেদন

শরৎ জন্ম-শতবার্ষিকী আসন্ন। পশ্চিম বাংলার সর্বত্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে স্বভাবতই দেশের বিভিন্ন শৌখিন নাট্য সম্প্রদায় শরৎ-সাহিত্যের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি এই নাট্য প্রচেষ্টায় একটি বড় বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, শরৎ-সাহিত্যের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করবার অনুমতির দরুন একটা বিশেষ অংকের রয়্যালটি দিতে হবে। এ দেশে অপেশাদার নাট্য-প্রচেষ্টা এমনিতেই আর্থিক অসংগতির দরুন খুঁড়িয়ে চলে। তাদের পক্ষে এই রয়্যালটি দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করা প্রায় অসম্ভব। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমি প্রস্তাব করছি, অন্তত এই একটি বছর যে কোন শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায় কর্তৃক শরৎ-নাটকের উপস্থাপনাকে সম্পূর্ণভাবে রয়্যালটি এবং অন্য সর্ব রকমের করমুক্ত বলে ঘোষণা করা হোক।

অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত,
কলকাতা-৩২

বিকল্প

দীপালি দত্তরায়

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে রূপা মার শোবার ঘরে ঢুকলো। মাম্মি ঘুমিয়ে আছেন ক্লান্ত হয়ে। থাক আজ। এত তাড়া কিসের। মার ঘুম ভাঙাতে মন সরলো না রূপার।

মিনি মুখার্জির ধুমাচ্ছন্ন শরীরের এলায়িত ভঙ্গীতে বস্তুতই ক্লান্তি নির্ভুল ভাবে ফুটেছিল। তাঁর দিন ও জীবন নানান কর্মসূচীতে ভরা। নানারকমের সভা সমিতি, ভি আই পি আপ্যায়ন, আর্ট এগজিবিশন, সমাজসেবা ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা, উদ্যোগ ও উদ্বোধন, এতেই দিন ও রাত্রির বেশীর ভাগ সময় কাটে। এ ছাড়া মহীতোষ মুখার্জির ব্যবসা সংক্রান্ত অতিথিদেরও প্রায়ই আদর আপ্যায়ন করতে হয়। সময় বড় বিশেষ থাকে না হাতে। থাকলে ব্রীজের সেসন আছে। সকাল সাড়ে দশটা এগারোটার সময় যোগ ব্যায়াম, মাসাজ ইত্যাদির পর স্নান সেরে গরমের দিন হলে এক গ্লাস ঠাণ্ডা করা ডাবের জল শীতের দিন হলে এক গ্লাস মাখন তোলা দুধ আর দু চারটে আঙুর এবং আপেলের টুকরো দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়েন প্রায় প্রত্যহ। লাঞ্চ বেশীর ভাগ দিনই বাড়িতে খান না। বেলা আড়াইটে তিনটের সময় বাড়ি ফেরেন। ফিরে বিশ্রাম। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই আবার নানান পার্টি আসর। শেষ হতে হতে অনেক রাত। রূপার সঙ্গে তো দেখাই হয় না বললে চলে। মহীতোষের সঙ্গেও অনেকদিন মুখোমুখি চোখোচোখিও হয়ে ওঠে না।

মহীতোষ সকাল নটা সাড়ে নটার সময় একা ব্রেকফাস্ট সেরে অফিসে বেরোন যখন, মিনি তখন তাঁর এয়ারকণ্ডিশনড শোবার ঘরে ঘুমে আচ্ছন্ন থাকেন। অথবা যোগাভ্যাসে ব্যস্ত।

বাবার সঙ্গে কচিৎ-কদাচিৎ রূপার দু-এক মিনিটের জন্য দেখা হয়, কাজের তাড়ায় যেদিন মহীতোষ একটু তাড়াতাড়ি বেরোন। রূপার কলেজ সাড়ে আটটায়। স্নান সেরে শুধু এক গ্লাস ফলের রস খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ে নিজের গাড়িতে। বাবার সঙ্গে দেখা হলে হাসি মুখে 'হ্যা—ই ড্যাডি এ ভেরী গুড মর্নিং টু ইউ'—বলে হাত নেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় সে। মহীতোষও 'হ্যাল্লো রূপে সে টু ইউ'—বলে হাত নেড়ে বিদায় জানান কন্যাকে। রূপার কলেজ সাড়ে তিনটে পর্যন্ত। তারপর কোনওদিন বাড়ি ফেরে কোনওদিন ফেরে না। ছোট গাড়িটা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি, দোকানে কিংবা একার ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যে হলে ডিসকোথিক পার্টি আড্ডা এইতেই সময় কাটে। কত রাতে সে বাড়ি ফেরে তার খবরও রাখেন না মহীতোষ কিংবা মিনি। তার তেমন দরকার পড়লে সে নিজেই খুঁজে নেয় মাকে। বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত মিনি মুখার্জি তাঁর শোবার ঘরে বিশ্রাম করেন।

সেদিন তেমনি দরকার পড়েছিল। কিন্তু মাম্মি ঘুমোচ্ছেন দেখে রূপা তার নিজের ঘরে ফিরে গেল। ঠিক আছে, কাল বলবো। এভাবে তিনদিন ধরে যাবার পর চারদিনের দিন মাকে আড়মোড়া ভাঙা অবস্থায় দেখলো। মেয়েকে দেখে একটু অবাক হলেন মিনি। জানতে চাইলেন কি ব্যাপার।

ব্যাপার শুনে মুখ সাদা হয়ে গেল তাঁর। রূপার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে পারলেন না। নিজের হাতের নোখগুলি পর্যবেক্ষণ করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন কতদিন? 'তিন মাস।' 'তিন মাস?' চমকে উঠলেন। 'এতদিন কি করছিলে?' 'হ্যাঁ— একটু দেরীই হয়ে গেল।' রূপার গলা বিকারশূন্য। মিনি মুখার্জি ভাবতে শুরু করলেন। তবে তো নার্সিং হোম ছাড়া

উপায় নেই? তার মানেই লোক জানাজানি। আচ্ছা ঝামেলা! বিরক্ত হলেন তিনি। কেন যে এরা সাবধান হয় না? এত বোকাও কেউ থাকে আজকাল? মেয়ের মুখের দিকে আড়চোখে তাকালেন। চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। লাবণ্য ঝরে গেছে। চোখ মুখ বসা, গাল ভাঙা। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করে কিনা কে জানে? সেটাও আমার বলে দিতে হবে? হয়তো ভয় পেয়েছে। ঘুমোতে টুমোতে পারছে না। বোকা। ভীষণ বোকা। এত দেরী করে বলার মানে কি? আরো দু, একমাস আগে বললে বাড়িতে যা করার করানো যেতো। কাকপক্ষীতেও টের পেতো না। দেখা যাক্ কি করা যায়। ডঃ বোস্‌কে আজই কল্ দিতে হবে। মিষ্টিগলায় মেয়েকে সান্ত্বনা দিলেন, 'ভয় পেয়ো না ডার্লিং। সব ঠিক হবে যাবে।' রূপা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো ব্যাপারটা কি খুব ভয়ের? 'না না কিছু না তবে তোমার আরো আগেই আমাকে জানানো উচিত ছিল। অনেক দেরী করে ফেলেছ। তাছাড়া সাবধানই বা হওনা কেন?' রূপা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মিনি অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে শুরু করলেন আবার। রূপা কখন চলে গেল টের পেলেন না।

মিনি ভাবতে থাকেন। মহীতোষকে অবশ্যই জানাতে হবে। মেয়েকে তো বললেন ভয় পেয়ো না; কিন্তু নিজেই কেমন একটু ভয় পেয়ে গেলেন। মেয়েটা এত বোকা কেন, তাই নিয়ে বারবার আফশোস করতে লাগলেন। মহীতোষ আবার কি বলবেন কে জানে? মহীতোষ এখন কলকাতাতেই আছে কি? মনে করতে চেষ্টা করলেন? দিল্লি যাবে বলছিল না? চলে গেছে? না যাবে? ভাবতে ভাবতে টেলিফোনে অফিসের নাম্বার ডায়াল করলেন। অফিসের সুইচবোর্ড তাঁকে মহীতোষের এক সেক্রেটারীর লাইনে কানেকসন্ দিল। 'আমি মিসেস মুখার্জি বলছি। মিঃ মুখার্জি অফিসে আছেন' উনি তো কাল দিল্লি চলে গেছেন।' 'ও! ফিরছেন কবে?' 'আগামী কাল।' 'থ্যাঙ্কউ ভেরী মাচ' বলে মিনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। এবারে কি করবেন ভেবে পেলেন না। বেলা মোটে সাড়ে চারটে। সন্ধ্যার এখনও অনেক দেরী। ও হ্যাঁ। ডঃ বোস্‌কে কল্ দিতে হবে। ফোন করলেন, কিন্তু ধরা গেল না। মেসেজ রাখলেন মিনি মুখার্জি ফোন করেছিল। বিশেষ দরকার।

রূপার কাছে গিয়ে একটু বসবেন? সামান্য ইতস্তত করে উঠে গেলেন। ডাকলেন, 'ডার্লিং আমি আসছি তোমার ঘরে।'

'এসো' শুয়ে শুয়ে রূপা জবাব দিল। ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। 'আঃ এত অন্ধকার কেন? আলোটা জ্বালো, কিছু দেখতে পাচ্ছিনা।'

বেড্‌সুইচ টিপে. রূপা আলো লো। তরল গলায় বললো, 'সারপ্রাইজ প্রাইজ।' হাসিমুখে মিমি জানতে লেন 'কিসে এত অবাক হচ্ছ?' 'এঘরে মার আসাটা একটা অকেসন।' 'ওঃ তাই। তুমি বাড়ি থাক কখন?' 'কিংবা তুমি?' া পাল্টা জবাব করলো। 'হুঁ!' অন্য-ক ভাবে রূপার বেডসাইড টেবিলে া সিগারেটের প্যাকেট থেকে 'মে আই?' ন একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। চার-কে চোখ বোলালেন। ভুরু কুঁচকে গেল। টাকে এমন পিগস্টাই করে রেখেছ কেন? ন একটা গন্ধ ঘরে। কতদিন আলো াস ঢোকে না বলতো? চাকরবাকরো সব র কি?' 'গন্ধ? কিসের গন্ধ? আমি তো াচ্ছি না?' 'আমি পাচ্ছি। বিশ্রী গন্ধ। মার নাকে এই গন্ধও ঢুকছে না তাজ্জব াপার। চারদিকে সব কিছু ছড়ানো ছত্র-ন। ঘরটা কি কেউ পরিষ্কার করে না? মারই বা কি স্বভাব? একটু টাইডি কতে পারো না? ঘরটাকে বাসযোগ্যও রানো উচিত!'

'ও ঠিক আছে। আমার অসুবিধা য় না। কি জানতে এসেছ বল?'

'কি?'

'সে তুমিই জান। হয়তো বা কারু ম।'

'নাম? কার নাম? ওঃ আচ্ছা!' মিমি কটু অপ্রস্তুত হলেন। এটা তাঁর আগেই জ্ঞেস করা উচিত ছিল। অথচ খেয়ালই য়নি। 'জানতে চাইলে বলবে আশা করি?'

'না।'

'কেন?'

'বললেও চিনবে না।'

'ওর বাবা মায়ের নাম বললে হয়তো নবে।'

'তাও না। তোমাদের চেনা কেউ নয়।'

'তবু তোমার বলা উচিত।'

'জেনে কি করবে?'

'খোঁজ খবর নিতে পারি।'

'কেন? বিয়ে করতে বাধা করবে?'

'বাধ্য নয়, অনুরোধ করতে পারি।'

'তাতে লাভ?'

'তুমি কি বলতে চাইছ স্পষ্ট করে ল।'

'আমি ওকে বিয়ে করতে চাইনা।'

'অথচ—'

'অথচর কিছু নেই। যা হয়েছে জেনে-নেই হয়েছে। দায়িত্ব দুজনেরই সমান। ংবা আমারই বেশী।'

'তুমি ছেলেমানুষ। বয়স উনিশও নি।'

'সেও বুদ্ধ নয়।'

'তবু তার দায়িত্ব বেশী।'

'কেন? তার দায়িত্ব বেশী কেন?'

'বাঃ সে পুরুষ মানুষ।'

'অবশ্যই। কিন্তু তাতে কি?'

'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।'

'তবু করছ।'

মিমি সহসা অসহায় বোধ করলেন। দেশী বিদেশী ভি আই পিদের বাক-নৈপুণ্যে সর্বদা চমৎকৃত করে থাকেন, কিন্তু নিজের মেয়ের সঙ্গে যেন কোনও জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। ওর ভাষা দুর্বোধ মনে হচ্ছে তাঁর। ওর চিন্তাধারার খেই ধরতে পারছেন না। কথার মোড় ফেরালেন 'চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছ কেন?'

'আলোটা চোখে লাগছে।'

'নিবিয়ে দিলেই পারো।'

'তুমি অন্ধকারে চলতে পারবে না।'

'আমি তাহলে চলে যাচ্ছি।'

'আমি তোমাকে যেতে বলছি না।'

'থাকতেও বলছ না।' কি মনে হওয়ায় ঝুঁকে মেয়ের মুখ দেখলেন। হাত চাপা দিয়ে কি চোখের জল ঢাকছে? ধরতে পারলেন না। আলতো করে মেয়ের কপালে চুমু খেলেন একটা। 'কিছু ভেবো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রূপা হাত সরিয়ে চোখ মেলে তাকালো মায়ের দিকে। 'ভাবছি না মোটেই।'

'তবে এমন বিকেলবেলায় শুয়ে আছ কেন?'

'শুতে ভালো লাগছে।' চোখে আবার হাত চাপা দিল সে।

'আলোটা নিবিয়ে দাও। আমি যাচ্ছি।'

রূপার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভাব-লেন, কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়? কন জানি ব্যাপারটাকে ঠিক উড়িয়ে দিতেও পারছেন না। অথচ কারও সঙ্গেই তো এ নিয়ে আলোচনা করা যায় না। মহীতোষ থাকলে ভালো হত। কাল ফিরছে। এলেই ধরতে হবে। ব্যবস্থা কিছু একটা করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি। এমনিতেই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। মেয়েটা যে কি বলে, আর যেন কতদূর থেকে। এসময়েও কি একটু মন খুলে কথা বলতে পারতো না? তিনি তো ওর মা। মনে পড়লো না, সে রকম ঘনিষ্ঠতা কখনো তাঁদের ছিল। আদর নয়, শাসন নয়, শুধু স্বাধীনতা। অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে ছেলে-মেয়ে বড় হয়েছে। তাঁদের মনের খবর, যে জগতে ওরা থাকে, সে জগতের খবর কোনও দিনই রাখবার চেষ্টা অথবা ইচ্ছা করেন নি। সময়ও হয়নি।

রবিবার সকালে মিমি মহীতোষকে অবাক করে দিলেন। পূর্বদিকের বারান্দায় বসে মহীতোষ কাগজ পড়ছিলেন। প্রভাতী চায়ের ট্রে তখনও সামনে। চা খাওয়া হয়ে গেছে। মিমি সাটিনের চটি পায়ে নিঃশব্দে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পরনে গাঢ় সবুজ রংএর কিমোনো। চুল সামান্য উশ্‌কো

খুললো। মহীতোষ ভীষণ অবাক। ঘড়ি দেখলেন, সাড়ে ছটা।

'তুমি এত ভোরে?' কাগজ নামিয়ে রাখলেন।

'একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে।'

'বোসো।' সামনের চেয়ারটা হাত দিয়ে দেখালেন মহীতোষ।

'রূপার সম্বন্ধে।'

মহীতোষ চশমার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

'রূপা একটা ঝামেলা বাধিয়েছে। শী'জ প্রেগন্যান্ট।'

'সেকি!'

'হ্যাঁ। আর যথেষ্ট সময়ও চলে গেছে। ও স্টুপিড গার্ল, নিজেও কিছু করেনি, আমাকেও কিছু বলেনি। ইটস অলরেডি থ্রী মান্থস্।'

'এখন জানলে কি করে?'

'ও নিজেই জানিয়েছে।'

'অ্যাদ্দিন জানালো না কেন?'

'তাই বলে কে?'

'ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'কনফার্ম করেছে।'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানালেন মিনি তবে আজ একবার চেম্বারে নিয়ে যেতে বলেছেন, ভালো করে দেখার জন্যে।'

'আজ? আজ সানডে না?'

'সেজন্যেই।'

'হুঁ!' পাইপে টোব্যাকো ভরতে

লাগলেন মহীতোষ। 'হুজ দ্য স্কা—হুজ দ্য বয়?'

'বলছে না।'

'প্রোটেকটিং হিম? বিয়ে করতে চায়?'

'না।'

'তবে?'

'জানি না।'

'হুম। হাও ওল্ড'জ রুপো?'

'জুনে উনিশ হবে।'

'ওভার এইটিন?'

'না হলেই বা কি করতে? কেস্? কাণ্ডাল তাহলে আরো ছড়াতো।'

'না না তা নয়।' মহীতোষ সামান্য প্রতিভ হলেন।

মিনি বললেন 'কোথাও দেওয়া চলবে।'

'কেন?'

'ঠিক জানাচেনা বেরিয়ে পড়বে।'

'তবে?'

'আমি তো বাড়িতেই করাতে চাইছি। বোস বলছেন তাতে অনেক ঝামেলা। ছাড়া চাকর বাকর থেকেও কথা রটিতে রে।'

'কোয়াইট লাইকলি।' মাথা নাড়লেন হীতোষ। 'রুপো কিছু বলছে?'

'না। একটু ভয় পেয়েছে মনে হচ্ছে।'

'স্বাভাবিক।'

'ওকে আমি ভালো বুঝছি না। ও তো ট্রাবল ক্রিয়েট করতে পারে।'

'কিসের ট্রাবল?'

'কি জানি। ভালো ঠেকছে না আমার।'

'আই ডোন্ট থিংক দেয়ারস্ মাচ টু রি।'

'না হলেই ভালো।'

'আজ রাত্তির দিকে ডঃ বোসকে একটু তে হবে। ক্লাবে পাই তো আমিই কথা ব এ বিষয়ে। এভরিথিং উইল বী ডার কন্ট্রোল। দরকার হলে ছোটখাট সিং হোমেই স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট করা ব।'

'তোমার সেখানে না যাওয়াই ভালো।'

'দেখা যাক্।'

'আচ্ছা কলকাতার বাইরে নিয়ে গিয়ে লে হয় না? যেখানে কেউ চেনে না?'

'দেখি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে। হয় না তার প্রয়োজন আছে।'

ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়ার পর, ভালো পরীক্ষা করে, ডঃ বোস মাথা নাড়লেন। ন্ট ওআরি। সবঠিক হয়ে যাবে।

রুপো একটু হাসলো।

'আমাকে বোধহয় খাওয়া দাওয়া ভালো করতে হবে এখন, না আঙ্কেল? লটস ভিটামিনস অ্যাণ্ড আদার থিংস?' ডঃ মিনি মুখার্জির চোখে চোখ রাখলেন। কোর্স? ইউ মাস্ট গেট ভেরী স্ট্রং। আমি কিছু টনিক আর ট্যাবলেট্স লিখে দিচ্ছি, মনে করে নিয়মিত খাবে। আর খাওয়া দাওয়া তো ভালো করে করবেই। ভয় পেয়ো না সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'থ্যাঙ্কউ। চল মাম্মি।' 'হ্যাঁ চল।' গাড়িতে ফেরার পথে রুপো জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার এত ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না করছ কেন বলতো? এতে কি ভয়ের কিছু আছে? ইউ হ্যাড বেবীজ টু, অ্যাণ্ড ইউ ডিডন্ট ডাই?' মিনি কি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। রুপোর কথাটা তিনি ভালো বুঝতে পারলেন না।

সে রাত্রে ডঃ বোসের সঙ্গে মহীতোষের কথাবার্তা হলো। ঠিক হলো দক্ষিণ কলকাতার কোনও এক ছোট নার্সিং হোমেই ওকে পাঠানো হবে। বাইরে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন মনে করলেন না ডঃ বোস। বললেন 'ভাববেন না। উই শ্যাল বী ডিস্ক্রিট। ভেরী ডিসক্রিট। আর তাছাড়া আজকাল এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। হরদম হচ্ছে।' পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি দিন স্থির হলো।

রুপোর চোখ বড় হয়ে গেল। খুউটা পারে ফেলে দিয়ে অবিশ্বাসের গলায় বললো, 'মাম্মি, ইউ ডোন্ট মীন ইট? এ হতেই পারে না। তুমি প্রকৃতিস্থ নও।'

মিনি মুখার্জি আকাশ থেকে পড়লেন।

'কি বলছ তুমি?'

'এ অসম্ভব।'

'তার মানে?'

'মানে ক্রীমিনলি অ্যাণ্ড সিম্প্‌লি ইমপসিবল।'

'তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কি বলছ!'

'সে তুমি, তুমি বুঝতে পারছ না কি বলছ।'

'আমি ঠিকই বলছি। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।'

'ভেবে দেখব? ভেবে দেখার আর কি আছে এতে?'

'কুমারী মেয়ে, বাচ্চা মানুষ করবে?'

'কুমারী আবার কি? আমি মা হতে যাচ্ছি।'

'আঃ বিয়ে তো হয়নি?'

'তাতে কি?'

'তাতে কি? লোকে কি বলবে? সমাজের সবাই?'

'বলুক, আমি গ্রাহ্য করি না।' কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা চুলে ঝটকা মারলো রুপো।

'পাগলামী কোরো না রুপো। তুমি গ্রাহ্য না করলেও আমরা করি।'

'এত মডার্ন হয়েও?'

'মডার্নের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ? এ সুবিধা অসুবিধা রীতিনীতির প্রশ্ন। তোমার ড্যাডির মান সম্মানের কথাটা ভাবো একবার।'

'ড্যাডি তো কিছু করছে না? এতো আমার ব্যাপার।'

'তুমি তাঁর মেয়ে।'

'তো কি? আমার আঠারো বছর হয়ে গেছে।'

'আঠারোই হোক আর আটাশই হোক, তুমি তাঁর, আমাদের মেয়ে থাকছ।'

'কিন্তু আমি একটা আলাদা মানুষ। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা, চাওয়া পাওয়া আলাদা।'

'আঃ বুঝতে পারছ না কেন, তোমার পরিচয় তাঁর মেয়ে বলে?'

'ব্যস্? রূপা মুখার্জি নয়, শুধু মহী-তোষ মুখার্জির মেয়ে আমি এই পরিচয়?'

'তাছাড়া আবার কি?'

'আমি মানি না। যাক সে সব। আমি অ্যাবরসন করাবো না, এই আমার প্রথম ও শেষ কথা।'

'কারণটা কি?'

'আমার বেবীকে আমি মেরে ফেলতে পারবো না। আমি তাকে মানুষ করব।'

'গ্রাম্য মেয়ের মতন কথা বোলো না। কুমারী মা জানলে লোকে তোমায় ছি ছি করবে।'

'কে গ্রাম্য কথা বলছে?'

'কে?'

'তুমি।'

'আমি?'

'হ্যাঁ। যাক্ আমি আমার বেবী মারতে পারব না। আমি তাকে ভালোবাস বাসি।

'এখনও তো কিছুই হয়নি ওটা।'

'কিন্তু হবে। এখনও ওর প্রাণ আ আমি এ বিষয়ে বই পড়ছি।'

'প্লীজ রূপা অবুঝ হোয়ো না। বে আরো হবে।'

'হলে ওদেরও ভালোবাসব। কাছে রা আদর করব, যত্ন করব। লক্ষ্মী মা ওকথা আর বোলো না। কক্‌খনো না।'

মেয়ের বোকামি আর জেদে দিশাহ বোধ করলেন মিনি। মেজাজ খারাপ হ যাচ্ছে। আর কিছু বলা উচিত হবে এখন। মহীতোষকে দিয়েই বোঝাতে হ মহীতোষ শুনে স্তম্ভিত হলেন। 'হো ডাজ শী মীন? বাচ্চা মানুষ করবে?'

'তাই তো বলছে।'

'রাবিশ।'

'ওর সঙ্গে তুমি কথা বলে দেখ আমি হার মানছি।'

'তাতো মানবেই।'

'তার মানে?'

'নিজের মেয়েকে বশে রাখতে পারো হোআট কাইন্ড অভ্ এ মাদার ইউ?'

'ওর বয়স উনিশ হতে চললো।'

'সো হোআট?'

'ওর চিন্তাধারা স্বাধীন।

'স্বাধীন! স্বাধীনতা বার কর বাড়িতে থাকলে ডেকে পাঠাও।'

'তার আগে তুমি মাথা ঠাণ্ডা ক উত্তেজিত অবস্থায় কথা বোলো না।'

'ফল উল্টা হতে পারে।'

'তুমি ওকে ডেকে পাঠাও,' জে গলায় বললেন মহীতোষ।

রূপা এলো। কুণ্ঠাহীন দ্বিধাহী পরনে বেলবটম্, গায়ে ... নামের গেঞ্জি। সহজ সুরে বললো, 'কি ড্যা

'বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে

মায়ের মুখ দেখে নিয়ে শান্ত তাকালো রূপা বাবার মুখের দিকে।

'তুমি নাকি নার্সিং হোমে চাইছ না?'

'না।'

'কেন? ভয় করছে?' নরম মহীতোষ বললেন। 'ভয়ের কিছু তুমি টেরই পাবে না কিছু। অ্যান্ড বী ফ্রী এগেইন।'

'আমি অ্যাবরসন করাবো না।' স্বর অবিচল। মহীতোষের মুখ লাল

'কারণটা কি?'

'আমি আমার বেবীকে মারতে না।'

'বেবী? এখনও ওটা কিছুই হয়নি। হয়ত স্টিলবর্ন'ও হতে পারে।'

'তাহলে দুর্ভাগ্য বলে মেনে নেব।'

'তবু করাবে না? এর কনসিকোয়েন্স বুঝতে পারছ?'

'কি হবে?'

'তুমি অবিবাহিতা মেয়ে! লোকে কি বলবে?'

'তোমার অনেক টাকা আছে। কেউ কিছু বলবে না।'

হাসলেন মহীতোষ। 'বোকা মেয়ে, তবু লোকে বলবে। আমাদের এতে লজ্জা।'

'তোমরা তা কিছু করনি?'

'তুমি আমাদের সন্তান; তোমাকে লোকে নিন্দে করবে, তাতে আমাদের অপমান।'

অন্য প্রশ্নে গেলেন তিনি। 'ছেলেটি কে?'

'তোমরা চিনবে না।'

'কি করে?'

'কিছু না।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। তার ব্যবস্থা আমি করব। বিয়ে করবে?'

'না।'

'কেন? ও কি বলে?'

'জিজ্ঞেস করিনি।'

'করনি? তাহলে কর।'

'বিয়ে টি'কবে না।'

'কিছু যায় আসে না। পরে ডিভোর্স নিও; এখন বিয়ে কর।'

'নাঃ।'

'না? তবে কি করতে চাও?'

'যেমন আছি তেমনি থাকব।'

'তাই তো বলছি নার্সিং হোমে যাও।'

'না।'

'তাও না? তবে কি করবে?'

'বেবী জন্মাবে, তাকে মানুষ করবো।'

'লোকে কি বলবে?'

'লোকের কাছে তো যাব না। আমার বেবী আমি মানুষ করব।'

'তুমি এখনও ছেলেমানুষ, কি বলছ বুঝতে পারছ না। যা হয় না তাই হওয়াতে চাইছ।'

'না, যা হয়েছে তাকে মিথ্যে চেহারা দিতে চাইছি না।'

'এ বাড়িতে সেটা হবে না।'

'তবে অন্য কোথাও যাব।'

'কোথায়?'

'যেখানে হোক কোথাও।'

'তুমি পাগল হয়েছ। চলবে কি করে? হোআট উইল ইউ ইউজ ফর মানি?'

'চলে যাবে।'

'না চলে যাবে না। যেতে পারে না। এ বাড়িতে বসে এ কথা ভাবছ। বাইরে বেরোলে পৃথিবীটা কি জানো না।'

'এ রকম আরো আছে নিশ্চয়ই? তারা যেখানে থাকে সেখানে থাকব।'

'তোমার মায়েরা যে সব অনাথ আশ্রম চালান সে সব জায়গায়? তুমি সেখানে থাকতে পারবে মনে কর?'

'না পারার কিছু নেই। আমি কমফর্টস চাই না। কাজ করতেও রাজী।'

'তুমি জান না তুমি কি বলছ। আর অন্যায় জেদ করছ। যাও এখন ঘরে যাও। বুধবার সন্ধ্যেবেলা নার্সিং হোমে যাবে।'

'না ড্যাডি না। প্লীজ না। ডোণ্ট মেইক মী গো দেয়ার। আমার বেবীকে আমি মারতে পারব না। ডোণ্ট মেইক মী কীল মাই বেবী। প্লী—জ।'

'বেবী বেবী করো না। আমার শুনতে বিশ্রী লাগছে। প্রথম কিছুদিন খারাপ লাগবে। পরে সব ঠিক হয় যাবে।'

'হবে না, হবে না, কোনও দিনও হবে না।'

'হোআই ডিড ইউ লেট দিস হ্যাপন? হোআই ডিডনট ইউ টেইক কেয়ার অভ ইওর সেলফ? কেন?' মহীতোষ ধৈর্য হারালেন।

'আমি চেয়েছিলাম তাই।' রূপার স্বর সামান্য ভাঙলো।

'চেয়েছিলে? হোআট ডু ইউ মীন? তুমি অবিবাহিতা মেয়ে; বিয়ে না করে বেবী চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। তারও চিকিৎসা দরকার।'

'আমার নিজের কিছু নেই, কেউ নেই যাকে ভালোবাসব, যে আমাকে ভালো বাসবে। যাকে নিয়ে আমি সুখী হব।'

'বিয়ে কর। ভালোবাসার লোক পাবে। তারপর সন্তানও পাবে।'

'এমন কেউ নেই। সবাই ফাঁপা আর ফাঁকা।'

'সবাই হতে পারে না। কেউ না কেউ ঠিক মতন আছে।'

'আমার ভালো লাগে না।'

'বেশ তো, তোমার সেটের কাউকে ভালো না লাগে, অন্য কাউকে বিয়ে কর। গরীব কিংবা ইনটেলেকচুয়াল?'

'গরীবকে বড়লোক করে দেবে তুমি। নষ্ট হয় যাবে। ইনটেলেকচুয়াল ভালো লাগে না। সব বাঁকা চোখে দেখে।'

'তুমি বোধ করি সিউডো-ইনটেলেকচুয়ালদের কথা বলছ?'

'সিউডোতেই তো পৃথিবী ভর্তি।'

'তাহলে সাধারণ কাউকে?'

'আমাকে বিশ্বাস করে না। অকারণে

৬০১
রকম
নতুন নতুন রঙ
এবং অসংখ্য নতুন নতুন
নক্সা সবই অসাধারণ
ফিনলে সব সময়ই নতুন নতুন সৃষ্টি করছে
Finlay's
ফিনলে মিলস লিঃ/গোল্ডমোহর মিলস লিঃ
ASP/FM/47 A

ভয় পায়। কাছে এলেও শুধু দেখতে আসে। কেন ড্যাডি?'

মহীতোষ এ 'কেন'র জবাব দিলেন না, বললেন, 'তাহলে সবুর কর। আজ না হয় দুদিন বাদে মনের মতন কাউকে পাবে।'

'ততদিনে আমি যে কারো মনের মতন থাকব না? নষ্ট হয়ে যাবো?'

মহীতোষ মনে মনে বললেন তার বাকী কি? মুখে বললেন, 'ননসেন্স্! পড়াশোনা, খেলাধুলো নিয়ে থাকো। তুমি না চাইলে নষ্ট হবে কি করে?'

'কারণ না থাকলে নিজেকে শাসন করব কি করে?'

মিনি এতক্ষণ চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন এদের কথাবার্তা। আর পারলেন না, মুখ খুললেন, 'কারণ মানে এই অবস্থায় বেবী? সেই একমাত্র কারণ হবে তোমার? এই বয়সে?'

'যাকে ভালোবাসতে পারি, সেই কারণ। আর কে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে সবকিছুর ভরসা নিয়ে? আর কে আমায় বিশ্বাস করবে তেমন করে?' আবেগে রূপার নাকের পাটা ফুলে উঠলো। মিনি আবার চুপ। মহীতোষ অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর রূপাকে বললেন, 'কিন্তু সে বেবীও একদিন বড় হবে। স্বাধীন হবে তোমার মতন। তখন?'

'হবে না। আমি তাকে অন্যভাবে মানুষ করবো। কাছাকাছি রাখব সবসময়।'

মহীতোষ আবার মিনির দিকে তাকালেন। কিছুটা বিমূঢ় যেন। মিনি মুখভঙ্গী করে কাঁধ ঝাঁকালেন। 'তাতেই বোলেন্ সলভড় হবে?' জানতে চাইলেন মহীতোষ।

'অন্তত তার আর আমার মধ্যে আণ্ডার স্ট্যাণ্ডিং থাকবে। রিলেশন অন্যরকম হবে।'

'বাট ইট উইল বী এ বার্ডন টু ইউ। বোথ সোশ্যাল অ্যাণ্ড মর‍্যাল।'

'আই ডোনট্ মাইণ্ড এ বার্ডন ড্যাডি।'

মহীতোষ চুপ করলেন। রূপাকে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হল তাঁর। এ কোন ভাষায় কথা বলে? নাকি বোঝে না কিছুই? তবু ওর মন স্থির হয়ে আছে। বড় মুশকিল। আদরের গলায় বললেন, 'তবু তা হয় না রূপো। দুদিন এখনও সময় আছে। ভালো করে ভেবে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে। তুমি তো বুদ্ধিমতী। যাও এখন গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। রাত অনেক হয়েছে।'

শিল্পপতি মহীতোষের সাংসারিক বিষয় নিয়ে ভাবনা ভাবার সময় বড় কম। ... ইণ্ডাস্ট্রির সূত্রপাত তাঁর ঠাকুরদা ...রিতোষ মুখার্জি করে গিয়েছিলেন, তাকে ...ড়িয়ে গুছিয়ে যে পরিধি দিয়ে গেছেন ...র বাবা মনোতোষ মুখার্জি, মহীতোষ তাই সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টার আর পাব্লিক সেক্টারের মধ্যে নতুন রকমের বোঝাপড়া, এবং শ্রমিকের নিত্য নতুন দাবী মেটানোর পালাতেই, তাঁকে এভাবে হিমসিম খেতে হচ্ছে। সাম্রাজ্যের পরিধি দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে, তবু যা আছে তাই সুদক্ষভাবে পরিচালনা করতে গিয়ে আর কোনওদিকে নজর দেবার সময় থাকে না। পুত্র প্রিয়তোষ সাম্রাজ্যের যুবরাজ, কিন্তু সেও বর্তমানে স্টীল্ ওআর্কস ও টেক্সটাইল মিলস পরিচালনার খুঁটিনাটি কাজ হাতে কলমে শেখার জন্য মার্কিন মুলুকে। সময় সত্যিই তাঁর বড় কম। তবু কদিন ধরেই রূপার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে চলেছেন। ছেলেমেয়ে কোন চিন্তাধারার দিকে পা ফেলছে, তা তাঁর জানা ছিল না, জানার কথাও নয়। লেখাপড়া, হাসি খেলা, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে আর পাঁচটা ছেলেমেয়ের মতন জীবনের হাল্কা এবং গভীর বিষয়ের পাঠ নিচ্ছে এই জানতেন। ছোটখাট ভুল ত্রুটির মধ্য দিয়ে জীবনের রং বদল হতে হতে একদিন পাকা রং ধরবে, এ বিশ্বাস ছিল রূপার ব্যবহারের কুণ্ঠাহীনতায়, ওর মনের জোরের আভাস পেয়েছেন। কিন্তু সে ভুল করছে। অল্প বয়সের রোমাণ্টিকতা দিয়ে সে তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে; সে সমস্যার সমাধান এই প্রাচীন দেশের প্রাচীন পন্থীদের মাঝখানে হবার নয়। এ সমস্যা বৃহদাকার ধারণ করলে, লোকসভায় এ নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করা যায়। সমাজসেবীদের অশ্রু গদগদ ভাষণে, সরকার ও জনসাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করে মোটামুটি একটা ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু সে বাইরে। ঘরে নয়। বাঞ্ছিত হোক, অবাঞ্ছিতও হোক, যে শিশু বাইরের লোকের বিদ্রূপ ও ঘরের লোকের বিরক্তির

কারণ হবে, তাকে এ পৃথিবীতে আসতে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। এ অসম্ভব। তাঁর মেয়ে এতটাই ইমপ্র্যাকটিক্যাল হবে, ভাবতে পারছেন না। কোথায় একটু বেদনাও বোধ করছেন। মেয়ের জীবনের শূন্যতার দিকটাও বারে বারে চোখে পড়ছে। স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু এতকাল বাদে, আজ এ নিয়ে বাদানুবাদ করা বৃথা। তবু বললেন স্ত্রীকে, 'একটু যদি ওকে বোঝবার চেষ্টা করতে, তবে হয়তো এমন হত না।' 'এদের বোঝা অসম্ভব। এরা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এদের চিন্তাধারা আমার কম্‌-প্রিহেনশনের বাইরে। এ সমস্তই ঐ মার্কিনী হিপিগুলো আমদানী করছে। যত সব অ্যাণ্টাই-অ্যাটিচুড।' মিনিকে আজ হঠাৎ মার্কিনীদের ওপর চটতে দেখা গেল।

'থাক্। ও আর কিছু বলছে? রাজী হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখছ?' 'কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনও কথারই জবাব দিচ্ছে না। শুধু একা ঘরে শুয়ে বসে থাকছে। কোথাও বেরোচ্ছে না। কলেজেও না। ডঃ বোস বলেছেন একটু সময় দিতে। জোর করে কিছু করা উচিত হবে না। ওর মনে ইমোশনাল ইমব্যালান্স এসে যেতে পারে। বললেন ওকে নিজে থেকেই ডিসিসন নিতে দিন। আয়্যাম সিওর শী'ল কাম রাউণ্ড টু দ্য রাইট ডিসিসন। ক'দিন দেরী হলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

কিন্তু রূপা আর কিছুই বলছে না, মহীতোষ আর মিনি ভাবনায় পড়ে যাচ্ছেন। দুজনেরই কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটছে। মহীতোষ কাজে মগ্ন থাকলেও বারবারই মনের ভেতর খচ্ খচ করে উঠছে। মিনি তো মেয়ের জন্যই এই প্রথম দু' একটা জরুরী অ্যাপয়েণ্টমেণ্টই ক্যানসেল করে দিলেন। কিন্তু বাড়ি থাকলেও রূপার কাছা-কাছি যেতে পারছেন না। ঘরের দরজা বন্ধ থাকছে। দরজা যদিবা খোলা থাকে তো মুখ একেবারেই বন্ধ। এমন অসহায় অবস্থায় আর কখনো পড়েছেন বলে [illegible]ন মনে করতে পারছেন না। কেবল ছটফট্ করে বেড়াচ্ছেন। জোর করে ওকে দিয়ে কিছু করানো, এ অবস্থায় অসম্ভব। ওর মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে পারে, ডঃ বোস বলছেন। এর পরিণামে দীর্ঘস্থায়ী অথবা চিরস্থায়ী এক স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজে থেকেই একটা সিদ্ধান্ত নেওয়াতে হবে, যা সামাজিক ভাবে গ্রাহ্য। তা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না মোটেই। ওর এই আচরণের কারণ হিসেবে ডঃ বোসের থিওরি হচ্ছে 'ইমোশনাল ইনসিকিওরিটি' বোধ। আর নিঃসঙ্গতা। নিঃসঙ্গতার কথা শুনে মিনি বললেন, 'কিন্তু ওর বন্ধুবান্ধব অজস্র।' 'হতে পারে। তবু তাদের কারো সঙ্গেই হয়তো সে কোনওদিন মনখুলে মেলামেশা করেনি।

নিজেকে তাদেরই একজন ভাবেনি। ছোট-বেলা থেকেই ও বড্ড ইনট্রোভার্ট, আমি জানি। হয়তো তার বন্ধুদের প্রতি তার মনে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা নেই। এই বয়সটা বড় স্পর্শকাতর। এ সময়টিতে হয়তো ও এমন কাউকে পায়নি, যার কাছ থেকে ঠিকমতন গাইডেন্স পেতে পারে। ওর মন আরো নিশ্চয়ই অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছে। তাই আলোড়নও বেশী হচ্ছে। খুব সাবধানে আমাদের পা ফেলতে হবে। ছেলেটিকে একটু ডেকে পাঠা না যায় না? ডঃ বোস জানতে চাইলেন। আমাই তো বলছে না। কত অনুনয় বিনয় করছি, কিছুতেই মুখ খুলছে না।' মিনি বিরক্ত গলায় বললেন, মহীতোষও ওকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওর সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু কে? ওকে একটু জিজ্ঞেস করলে হয় না?' দেখি চেষ্টা করে। মিনি খুব উৎসাহিত হলেন মনে হল না।

শালিনী সেন, রুপোর ছোটবেলাকার বন্ধু। নার্সারি ক্লাস থেকে একই সঙ্গে পড়ে আসছে ওরা। মেলামেশাতেও মনে হয় ঘনিষ্ঠ। তারই শরণাপন্ন হলেন মিনি। শালিনী একটু অবাক হল মিনি মাসীর টেলিফোন পেয়ে। জিজ্ঞেস করলো, রুপোর কিছু হয়েছে? 'বুঝতে তো পারছি না কি হয়েছে। তবে বড্ড মনমরা হয়ে আছে আজ কদিন। বাড়ি থেকেও বেরোচ্ছে না। তুমি কিছু জানো কি? কারো সঙ্গে ঝগড়া টগড়া বা কথাকাটি?'

'না তেমন তো কিছু মনে পড়ছে না? আমাদের কেউ কোথাও নোটিস করেছি। কিন্তু ঝগড়া হবার মতন কারণও তো দেখছি না। ও তো মুখই খোলে না ভালো করে। আড্ডায় থাকলেও চুপচাপই থাকে বেশীর ভাগ সময়। ওর সঙ্গে কারই বা কি নিয়ে ঝগড়া হবে?'

'কত কারণই তো থাকতে পারে। যেমন ধরো, তোমরাও বন্ধুবান্ধব তেমন ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছো না হঠাৎ?'

'ওর তো তেমন কোনও বন্ধু নেই মিনি মাসী। ওর তো কাউকেই বিশেষ ভালো লাগে না বলে ও। কাজেই...'

মিনি মনে মনে বললেন, 'তবু তো!' মুখে বললেন, 'তবে কি হল? ওকে নিয়ে তো একটু ভাবনায় পড়ে গেলাম। কি হয়েছে কিছু বলছেও না।' শালিনী সেন কি নিয়ে একটু ভাবলো, তারপর বললো, 'আজ কদিন হল ও বেরোচ্ছে না?' 'এই চার পাঁচ দিন।' 'একেবারেই না? একবারও না? কেউ ওর কাছে যাচ্ছে না? কারো সঙ্গেই কি ও দেখা করছে না?' 'তাই তো মনে হচ্ছে।' 'ঠিক আছে কিছু ভাববেন না মিনি মাসী। নো হার্ম অ্যাম্‌, প্লীজ বী অ্যাকিউরেট। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ওকে মোটেও ডিসটার্ব করবেন না। এ সময়টা একটু শরীর মেজাজ খারাপ থাকে।' 'এ সময়টা?' আঁতকে উঠলেন মিনি।

'ও ও মিনি মাসী, ডোণ্ট ওয়ারি প্লীজ। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি বলেন তো আমি আসতে পারি। আই কান কাইন্ড আউট ফর ইউ। শ্যালাই?' মিনি কিছু জবাব দিতে পারলেন না তখনই। শালিনী নিজেই বললো 'ঠিক আছে আমার মনে হয় তার দরকার পড়বে না।' মিনি ভাবলেন বলেন ওকে আসতে, কিন্তু তাতে ফল কি হবে বুঝে উঠতে পারলেন না। রুপোর তো কোনও পার্টি অথবা লজ্জা বোধ দেখছেন না এ বিষয়ে। এ এলে হয়তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলেই বসবে। আর তারপরই সারা কোলকাতায় এ নিয়ে হাসাহাসি চলবে। তাই তাড়াতাড়ি বললেন, 'সো ভেরী নাইস অফ ইউ। কিন্তু ওর যা ভাবগতিক দেখছি, কারো সঙ্গে কথা করবে বলে মনে হচ্ছে না। পরে আমি তোমায় জানাবো। কিছু মনে কোরো না যেন, হাঁ?' শালিনী বললো 'না না মনে করার কি আছে? ও কিছুটা মুডী আমি জানি। আচ্ছা বাই মিনি মাসী।'

নাঃ। কিছু সুরাহা হল না। যাই রুপোর কাছে যাই, আরেকবার চেষ্টা করে দেখি কিছু বলে কিনা। রুপো শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। মিনি বললেন, 'শালিনী টেলিফোন করেছিল, তুর কি হয়েছে জানবার জন্য।' রুপো কিছু না বলে, নিজের টেলিফোনটির দিকে তাকালো। মিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'শালিনীর মা কামিনী সেন মিনিকে টেলিফোন করেছিল, তারপর শালিনী তার সঙ্গে কথা বলে রুপোর কি হয়েছে জানতে চাইছিল।' 'ও সত্যিই টেলিফোন! কি এমন হয়েছে, যার জন্য সব বন্ধু বান্ধব ছেড়ে ছুড়ে বাড়িতে একা বসে দিন কাটাচ্ছে? এ নিয়ে এত ভাবনারই বা কি আছে? দুটো পথের একটা ধরলেই তো আবার যেমন ছিল তেমন হতে পারো। এটা একটা প্রবলেমই নয়।' চোখ দুটোকে পরিয়ে মেলে নিয়ে রুপো মায়ের দিকে তাকালো। 'দুটো পথ? দুটো পথ। হয় বিয়ে কর, নয় নার্সিংহোমে যাও। এ নিয়ে এখন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কোনও মানেই হয় না। আজ সমাজে থেকে অসামাজিক কিছু করার কথাও ভাবা যায় না? এতটুকু শুভবুদ্ধিও কি আমরা তোমার কাছে আশা করতে পারি না?' নাঃ মিনি আর গলার আওয়াজ মোলায়েম রাখতে পারছেন না। ডঃ বোস বলেছেন খুব সাবধানে পা ফেলতে। হাঃ বলা সোজা। ভাবতে ভাবতে মিনি বেরিয়ে এলেন রুপোর ঘর থেকে।

কদিন ধরে মহীতোষকে বড় বেশী ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে তাঁর টেক্সটাইল মিল-গুলিকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দিয়ে প্রিয়তোষ চিঠি দিয়েছিল মাসকয় আগে। প্রিয়তোষের পরিকল্পনা মহীতোষের মনে ধরেছিল। ছেলের ব্যবসায়িক বুদ্ধির তারিফও করেছেন মনে মনে। মাস-খানেক আগে জাপানে গিয়ে, এ বিষয়ে খোঁজ খবর করে এসেছেন। সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে মনকাড়া জিনিস তৈরীতে জাপানের জুড়ি নেই। জনকয়েক টেক্সটাইল সংক্রান্ত এক্সপার্টের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে, ওদের এখানে আসার আমন্ত্রণও জানিয়ে এসেছিলেন। আজ দিন কয় হল, তিনজন জাপানী এক্সপার্ট এসেছেন। তাদের নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর মিল দেখিয়ে এবং পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতেই তাঁর সারাদিন কাটছে। আজ রাত্রেও তাঁদের বাড়িতেই ডিনারে নিমন্ত্রিত ছিলেন। রাত অনেক হয়েছে।

অতিথিরা চলে গেছেন। মহীতোষ হাত তুলে মিনিকে ওপরে যেতে বারণ করলেন, বললেন 'বোসো'। ওআইন ক্যাবিনেটের ওপরে রাখা সারি সারি পানীয়ের বোতল থেকে একটি ফ্রেঞ্চ ব্র্যাণ্ডির বোতল বেছে নিয়ে দুটি গব্‌লেটে ব্র্যাণ্ডি ঢাললেন। একটি গ্লাস স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাঁর কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে সোফায় বসিয়ে দিলেন। অন্য গ্লাসটি নিজের হাতে নিয়ে অপর একটি সোফায় বসলেন। এরচেয়েও অনেক বেশী রাত জাগা মিনির অভ্যেস আছে। তবু জাপানী অতিথিরা বড় আড়ষ্ট থাকে। বিশেষ করে এ ধরনের টেক্‌নোক্র্যাট যারা, তারা। ভালো করে ইংরেজী বলতে পারেও পারে না। বেজায়গায় হাসে, অকারণে গম্ভীর থাকে। নেহাৎ কর্তব্য বলেই এদের আপ্যায়ন করতে হয়, কিন্তু মিনি রীতিমতন বোরড্ ফীল করেন। আজও করেছেন। সাংস্কৃতিক বিনিময় কিছুই হয় না এদের সঙ্গে। সারাক্ষণই প্রায় চুপচাপ ছিলেন। তাই ঝিম ধরে গিয়েছেন। ক্লান্তি বোধ না করলেও কেমন অবসাদ বোধ করছেন। তাই খুব উৎসাহিত বোধ করছেন না। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'কিছু বলবে?' 'হ্যাঁ। খুব বোরড্ ফীল করেছ তো? আয়্যাম সরি।' মিনি জবাব দিলেন না। ছোট্ট চুমুক দিলেন ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে। মহীতোষও চুপ করেই রইলেন। অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাঁকে। তর্জনীটা ব্র্যাণ্ডিতে সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে ব্র্যাণ্ডির গ্লাসের কাণায় ঘোরাতে লাগলেন ধীরে ধীরে। ভোঁ ভোঁ আওয়াজ উঠতে লাগলো। মিনি চুপচাপ সামান্যক্ষণ লক্ষ করলেন তাঁকে। তারপর হঠাৎ অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'কি বলবে বলছো না কেন? আঃ কি ছেলেমানুষী করছ? থামাও ঐ শব্দ।' গ্লাসের কাণা থেকে আঙুল সরিয়ে নিলেন মহীতোষ। মুখ তুলে চাইলেন মিনির দিকে।

'রুপোর কথা ভাবছিলাম। কিছু ঠিক করলে?'

'ঠিক করার মালিক কি আমি?' বিরক্ত গলা মিনির।

'ওকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?' সন্ধানী দৃষ্টি রাখলেন স্ত্রীর মুখের ওপর।

'বাইরে? বাইরে মানে এব্রড? কি করবে সেখানে গিয়ে?'

'শী ক্যান হ্যাভ হার বেবী, অ্যাণ্ড শী'জ সো কীন অন ইট। ক'বছর থাকলো, তারপর চলে আসতেও পারে। ইচ্ছে হলে থেকে যেতেও পারে। ইন্ এনি কেস, উইশ্যাল বিলডাপ আ স্টোরি, যে ওখানে গিয়ে ও বিয়ে করেছে আর—'

'আর প্রয়োজনমত ডিভোর্সও করেছে?'

'ওর সঙ্গে কারো দেখা হতেও পারে। সত্যিই বিয়ে করে ফেলতে পারে।'

তারপর? মিনির গলার স্বর মহীতোষের মনোমতন লাগছে না। 'তারপর আর কি? শী'ল বী মেণ্টালি অ্যাণ্ড সোস্যালি রিহ্যাবিলিটেটেড! ইট কুড বী সো!'

'কুড বী! কিন্তু গ্যারাণ্টি কিছু নেই। তখন সারাজীবন ওকে একটা স্টিগ্‌মা নিয়ে চলতে হবে। জীবন থেকে, মন থেকে এ দাগ উঠবে না। আবার নতুন উপসর্গ দেখা দেবে। না মহী, আমি তোমার এই সাজেসান মেনে নিতে পারছি না। তাছাড়া দেখ: এত ভেবেই বা কেন? শী'জ হ্যাড টু বী মেড টু সী রিজন। এরা যা মনে করবে, তাই হবে, যা চালাতে চাইবে তাই চলবে, তা হতে পারে না। আজ ইট ইজ আজকের ইউথ বড্ড বেশী প্যাম্পারড হচ্ছে। না, আমি রাজী নই এতে। তুমি ওকে এসব বুদ্ধি দিও না। সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা উচিত।'

'কিন্তু ও যে রাজী হচ্ছে না।'

'আজ নয় কাল হতেই হবে।'

'দেরী হয়ে যাবে না?'

'কিছুটা হয়তো হবে। কি করা যাবে। ও নিজেই নিজের অনিষ্ট করছে। আফটার অল্ এটা ভারতবর্ষ। সুইডেনও নয় আমেরিকাও নয়। ইয়েস, ও ইয়েস।' সোজা চোখে চাইলেন মহীতোষ মিনির চোখে। গ্লাস নামিয়ে রাখলেন। উঠলেন। বললেন 'চলো ওপরে যাওয়া যাক্। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

ওপরে গিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন। জামাকাপড় বদলে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে। মাথাটা ভারী ভারী লাগছে। আগে ডিনারের পর ব্র্যাণ্ডি খেলে ঘুমটা ভালো হত। এখন কিছুতেই কিছু হয় না। দু চারবার এ পাশ ও-পাশ করলেন। ঘুম আসছে না। অথচ ঘুমটা দরকার। কাল অনেক কাজ রয়েছে।

উঠলেন। আলো জেবলে বাথরুমে গিয়ে মেডিসিন চেস্ট খুলে তাঁর স্লীপিং ট্যাবলেটের শিশিটা বার করতে গেলেন। খালি হাত ফিরে এলো। ভালো করে দেখলেন। নেই। মনে করবার চেষ্টা করলেন, খালি হয়ে গিয়েছিল কি? হাঁ, তাই হবে আবার নতুন কিনে এনে রাখেনি কেউ? ইউজলেস্ লোক সব। বিরক্ত মনে চোখে মুখে জল দিয়ে আবার এসে শুয়ে পড়লেন। মেয়ের মুখ মনে পড়লো। কেন যে এত জেদ করছে। বোঝে না কিছুই, তবু পাকামী। সত্যিই তো, এটা ভারতবর্ষ। কত পুরান আর গভীর এ দেশের কালচার। এতো হঠাৎ বড়লোক হওয়া মার্কিন মুলুক নয়? কি করে যে বোঝানো যায় ওকে, ভেবে পেলেন না। মিনি বোধ হয় তবু আরেকটু সিমপেথেটিক হলে পারতো। কি যে হল আজকালকার ছেলে-মেয়েগুলো। তাদের সময় কেউ ভাবতে পেরেছে এমন বেয়াড়াপনা? যাকগে যাক। এখন একটু ঘুমোন যাক। জাপানীরা দেখেই যাবে মনে হচ্ছে, মিলগুলির অ্যাডভাইজার হিসেবে। বছর দুই, তাতেই চলে যাবে। ততদিনে প্রিয়ব্রত ফিরে আসবে। নাও, প্রিয়! দেয়ারস্ এ ব্রাইট বয়! হী নোজ, হিজ বিজনেস। আর রুপা? বড্ড ইমোশনাল। হ্যাঁ। ইমোশনাল ইনস্টাবিলিটি। কেন? তাঁর মেয়ের ইনসেকিওর ফীল করার কি কারণ আছে? একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে। সে কথাটা তার ভাবা উচিত। আসলে বড্ড সেন্টিমেন্টাল! দেখা যাক কাল আবার একটু কথা বলবেন ওর সঙ্গে, সময় পেলে। ইমোশনালি অনব্যালান্সড হলে জীবন কাটবে কি করে? হঠাৎ কি মনে হওয়ায় বুকটা তাঁর ধ্বক করে উঠলো। আমার স্লীপিং ট্যাবলেটের খালি শিশিটা কি হলো? রেখেছিল কি কেউ বদলে নতুন শিশি যেমন বরাবর রাখে? ধড়মড় করে উঠলেন। আলো জ্বাললেন। চটি পায়ে গলিয়ে তাড়াতাড়ি প্রায় ছুট দিয়ে রুপার ঘরের সামনে এলেন। দরজায় আস্তে নক করলেন। সাড়া নেই। এবার একটু জোরে নক করেই হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললেন দরজা। শুধু লাচ্ করা ছিল। ঘর অন্ধকার। কান পেতে শুনতে চাইলেন কি। না, কারো মৃদু নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছেন না। শুধু ধীর যান্ত্রিক এয়ার কন্ডিশনারের আওয়াজ। রুপা! হাতড়ে হাতড়ে সুইচ খুঁজলেন, পেয়ে আলো জ্বাললেন। রুপা গলা পর্যন্ত গোলাপী চাদরে শরীর ঢেকে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাছে এলেন। রুপা! একটু জোরে ডাকলেন। চোখের পাতাটিও কাঁপলো না। ভীতু হাতে ওর গায়ে হাত রাখলেন। কোনও স্পন্দন নেই। কাঁপা হাতে কব্জি তুলে পালস্ দেখতে চাইলেন। কিছু বুঝতে পারলেন না। কখনও মনে হচ্ছে কিছু নেই। কখনও মনে হচ্ছে মৃদু স্পন্দন যেন রয়েছে। কি করেন? ওর দুই কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকানি দিতে থাকলেন। কোনও মতে ডাকলেন 'রুপা রুপা! রুপা!' ডাক্তার। ডঃ বোস। এদিক-ওদিক তাকিয়ে টেলিফোনটা দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। ঠিক নাম্বার তো? ওদিকে ডাক্তারের বিরক্ত গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'হ্যালো? হ্যালো? ডঃ বোস স্পীকিং।' 'ডঃ বোস? শিগগীর। আমি মহীতোষ। রুপা যেন কি রকম হয়ে আছে। কাইন্ডলী মেক হেস্ট।'

ফিরে এলেন বিছানার কাছে। এদিক-ওদিক দেখলেন। তাঁর স্লীপিং পিলের শিশিটা পড়ে আছে বেড সাইড টেবল-এ। খালি। নতুন শিশি, আনকোরা। একখানা চিঠি, ছোট সুদৃশ্য একটা ট্রাভেলিং ক্লক দিয়ে চাপা দেওয়া। হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন। চিঠিটা পাজামা টপের পকেটে রাখলেন। কিছু কি করার আছে? রুপার চোখের পাতা টেনে তুলে দেখলেন। যা দেখলেন, ভালো লাগলো না। ডাক্তার কত দেরী করছে? মিনিকে ডাকবো? কিছুই করার যেন আর শক্তি নেই। বসে পড়লেন একটা আর্ম চেয়ারে। এমন অবস্থায় কি করতে হয় কিছুই মাথায় আসছে না। দু হাতে মুখ ঢাকলেন। বেল বাজলো কি? গাড়ির আওয়াজ না? নাঃ এ প্রতীক্ষা বড় ভয়ঙ্কর। চিঠিটাই বের করে খুললেন। চশমা নেই চোখে একটু দূরে ধরলেন চিঠিটাকে। 'ড্যাডি—' সব অক্ষরগুলি নাচতে শুরু করেছে। না, ভেঙে পড়লে চলবে না। নিজেকে ধমক দিলেন। চোখ বন্ধ করে একবার জোরে মাথায় ঝাঁকানি দিলেন। আবার ধরলেন চিঠিটা হাতখানেক দূরে। অক্ষরগুলো মোটামুটি স্পষ্ট এবার। পড়লেন, "[illegible] জোর করার আগে শুধু মনের জোরে চলতে গিয়ে থামতে হলো। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করার সময় যে আমার আছে কিনা? তলিয়ে যাচ্ছিলাম কোন অতলে — [illegible] খবর তো তোমরা রাখোনি? জীবনের কোনও উদ্দেশ্য, বাঁচার কোনও আকর্ষণই আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। নিজের বুদ্ধিমত তাই শেষ চেষ্টা করেছিলাম। বিশ্বাস কর, নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসছিল। ভেবেছিলাম ভালোবেসে মানুষ হব। সুন্দর করে বাঁচবো। নিজেকে ঘৃণা করার হাত থেকে রেহাই পাবো। এ কমাস ড্রাগ, পার্টি সব ছেড়েছি, আরো দু একটা কুঅভ্যাসও। কিন্তু যে জন্য ছাড়া তাই যদি না থাকে, তবে কতদিন আর? আবার তো সেই অতলে? যতদিন খারাপ হচ্ছিলাম বাধা দাওনি। যখন ভালো হতে চাইলাম, দিলে। কেন ড্যাডি, এ কেমন নিয়ম? মানুষ কেন মানুষকে বুঝতে পারে না? বুঝতে চায় না? তোমরা কত কথা বল সবাই, কিন্তু বিশ্বাস কর না যা বল। পৃথিবীটা পুরোন নিয়মে চলছে, চলতেই থাকবে। সংস্কারই সব থেকে [illegible] থাকবে। এ কেমন পৃথিবী [illegible]।"

ল্যাকমে
এক্সোটিকা
ট্যাল্ক
এক্সোটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
ল্যাকমে

আজকাল কোনও প্রদর্শনীতে দুটি জিনিস সচরাচর চোখে পড়ে না। একটি হল প্রতিকৃতি, অপরটি নিসর্গ দৃশ্য। অধিকাংশ শিল্পীই আজকাল এই দুটি বিভাগ বর্জন করে চলেন। অথচ একটি নদী ও বিভিন্ন ঋতুর রূপবৈচিত্র্যকে কেন্দ্র করে কি সুন্দর নিসর্গ দৃশ্য রচনা করা যায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল অ্যাকাদেমি গ্যালারীতে আয়োজিত শিল্পী ইন্দ্র দুগারের একক প্রদর্শনীতে। ইন্দ্র দুগার সুদীর্ঘকাল ভারতীয় ও রিয়ালিস্টিক পদ্ধতিতে ছবি এঁকে খ্যাতিলাভ করেছেন। সম্প্রতি বিভিন্ন সময়ে তাঁর বাল্যকালের আবাস মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে গিয়ে তিনি ওখানে প্রবহমান ভাগীরথীর বিভিন্ন রূপ এঁকেছেন। গ্রীষ্মকালে যে-নদী অভিমানী মেয়ের মত মুখ ফিরিয়ে এক পাশে পড়ে থাকে, বর্ষা-সমাগমে সেই নদীই উচ্ছল তরঙ্গে দুকূলে প্লাবিত করে দেয়। ইন্দ্র দুগার প্রধানত নদীর এই দুটি রূপই ফুটিয়ে তুলেছেন। শিল্পীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী, ড্রয়িং নিখুঁত। তার ওপর তুলিচালনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। প্রধানত চাপা ছাই হলুদ ও নীল রঙে তিনি বক্তব্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন এবং বলা বাহুল্য সফলকামও হয়েছেন। কোথাও শীর্ণকায়া নদী বেথাকারে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে, পাশে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির ওপর দিয়ে চলেছে গ্রামের নরনারী। আবার কোথাও বা বালুকাচড়ার ওপর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে কয়েকটি নৌকা (রিভারস্কেচ জিয়াগঞ্জ ও আবানডণ্ড)। অনেকেই মনে করেন যে বস্তুবাদী ছবিতে রসের সন্ধান মেলে না। যাঁরা এই প্রদর্শনী দেখেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে এ ধারণা ভুল। সুনির্দিষ্ট অথচ পরিমিত রেখাবৈচিত্র্য, পরিপ্রেক্ষিত বোধ ও রঙ ব্যবহার কৌশলটুকু আয়ত্তে আনতে না পারলে বাস্তববাদী ছবিতেও রসসৃষ্টি করা যায় না এবং রসসৃষ্টি না হলে এ জাতীয় ছবিও দর্শকচিত্তে দাগ কাটে না। যেমন, দি মিয়েনডারিং গঙ্গা। পরোভাগে বিস্তীর্ণ বালুকাবেলায় কয়েকটি নৌকা, দূরে ছোট্ট একটি বাঁশের পুল ও তার ওপর দিয়ে নরনারী চলেছে—রঙ ও রেখায় চমৎকার একটি আলেখ্য। বর্ষাকালের উচ্ছল নদীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্পেট সিটি। চাপা রঙের মধ্য দিয়ে শিল্পী একটি তীব্র গতিশীলতার আভাস দিয়েছেন। অন্ধকার রাতে এই নদীই যে কি রূপ ধারণ করে তার প্রমাণ মেলে নাইটস্কেপ-এ। কৃষ্ণপক্ষের রাতে মসীলিপ্ত আকাশ ও নদী একাকার হয়ে গেছে, কয়েকটি নৌকা ইতস্তত ভাসছে ও নৌকার আলোককণা জলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। গভীর নীলরঙের স্তরভেদপ্রধান ছবিটি দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। অপরাপর ছবির মধ্যে এ ফগি ডন, জার্নি টু দি ইনফিনিট উল্লেখ্য। শিল্পীর কয়েকটি ক্রিসেনথিমাম স্টাডিও প্রদর্শনীতে দেখা যায়—নিখুঁত ড্রয়িং ও রঙ ব্যবহাররীতির দিক থেকে এগুলি উল্লেখ্য। এই চিত্রমালার মধ্যে ইন ক্লোজ কনভার্স, থ্রি গ্রেসেস ও অল টুগেদার-এর নাম করা চলে।

*

যাদবপুরের ইনস্টিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনলজির কমার্সিয়াল বিভাগের ছাত্রগণ কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে একটি স্থিরচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীতে ২০ জন বর্তমান ও ১২ জন প্রাক্তন ছাত্রের তোলা ১০০-র অধিক স্থিরচিত্র দেখা যায়। কমার্সিয়াল বিভাগের ছাত্রদের স্থিরচিত্র-শিল্প শিখতে হয়, সুতরাং শিক্ষার্থী হিসাবেই তাঁরা এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। দৈনন্দিন জীবনের পথে চলতে চলতে সাধারণত যেসব জিনিস বা দৃশ্য চোখে পড়ে প্রধানত ছাত্রবৃন্দ তা-ই অবলম্বনে ছবি তুলেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে। শিল্পী-সুলভ অনুসন্ধানী চোখ ও বিশেষ কোনও ক্ষণমুহূর্তটি ক্যামেরায় ধরে রাখই যথার্থ স্থিরচিত্রশিল্পীর বিশেষত্ব। সেদিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রশংসা দাবি করেন, যদিও পেশাগত স্থিরচিত্রশিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের তুলনা করা সংগত হবে না। প্রথমেই চোখে পড়ে মাইলস টু গো বিফোর উই রেস্ট। রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের একাংশ—পিছনে ওভারব্রিজের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে—পুরোভাগে কয়েকজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের আশায় বসে আছে—কমপোজিশন হিসাবে উল্লেখ্য। এই প্রসঙ্গে শ্যাডো অব দি সেক্ট-এরও নাম করা চলে। দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য হিসাবে হোয়াট গোজ দেয়ার-এর স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গী দেখে অনেকেই কৌতূহলী হন।

আভ্যন্তরীণ স্থিরচিত্র নিদর্শন হিসাবে যক্ষপুরী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কয়লা-খনির পাতালপুরীর অন্ধকার পরিবেশের মধ্যে কয়েকজন শ্রমিকের মূর্তির নিছক পরিচয় দিয়ে শিল্পী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কমপোজিশন হিসাবে আরও দুটি ছবির নাম করা যায়—দি থার্স্টি মাদার ও হোমেজ টু রেকট্যাঙ্গল। প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ ছিল কয়েকটি স্বাভাবিক প্রতিকৃতি—যেমন স্মাইলিং ফকির, সিমপ্লিসিটি ও দি ইয়ং ফিলজফার। অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে ট্রাইবাল বেল ও গ্লোরিয়াস রিপলস-এর নাম করা যায়।

চিত্রপ্রিয়

পুলস অব রিফ্লেকশন —ইন্দ্র দুগার

॥ ছয় ॥

সরকার একটা খেলা দেখাতেন। বার্ডস্ ফ্রম নোহোয়্যার। চমৎকার খেলা। একেবারে শূন্য থেকে অজস্র সজীব ডানা-ঝাপটানো পাখি ধরে আনতেন। নিস্তব্ধ মঞ্চ হঠাৎ ভরে যেত ডানার শব্দে, কাকলিতে। কি চমৎকার খেলা! তার কৌশলটা আজও অধিকাংশ ম্যাজিশিয়ানের কাছে অজানা।

অনেকবার চেষ্টা করেছে অজিত। পারে নি।

কয়েকটা পাখি কিনে রেখেছে সে। বারান্দায় খাঁচায় ঝোলানো আছে। ঝি-মেয়েটা তাদের দানাপানি দেয়। অজিত সন্ধ্যেবেলা চুপ করে সেই খাঁচাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে পাখিরা ডানা ঝাপটাল কয়েকবার। ভয়ার্ত শব্দ করল। এখন ঝিমোচ্ছে। অজিত চেয়ে থাকে। সে পাখি দেখছে না, সে ম্যাজিকের কথা ভাবছে না। তার কেবল মনে হচ্ছে, শীলাকে সে বড় অন্যায় সন্দেহ করেছিল। শীলা যদি না বাঁচে তবে তাকে অন্তত এ কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, অজিত বড় অন্যায় করেছিল তার প্রতি। পাখিদের দেখে কেন কথাটা মনে হল, কে জানে!

ঘরে এসে সে ঝিকে চা দিতে বলল। এই নিয়ে বোধ হয় পাঁচবার চা হল। আর সিগারেট? না, তার কোনো হিসেব নেই। বিকেল থেকে সে অবিরল সিগারেট টানছে। এখন আর ধোঁয়ার কোনো স্বাদ নেই। আলোতে একবার দুটো হাত চোখের সামনে তুলে ধরল। দেখল, আঙুল স্থির নেই। হাত কাঁপছে। একটু বাদেই কেউ আসবে। বলবে—শীলা নেই। সেই অমোঘ ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছে সে। কি করবে? কিছু করার নেই। যা হওয়ার হোক।

মনে পড়ে, এ বাড়িটা শীলার তাগাদাতেই করেছিল সে। কত প্ল্যান করে, কত শখের নকশায় তৈরি করা বাড়ি! শীলা নিজের গয়না দিয়েছে, কষ্টের রোজগারও ঢেলেছে কম নয়। বুকের পাঁজরের মতো আগলে থেকেছে। মানুষ কী ভীষণ মরণশীল! কেমন হুট্ বলতেই সব রেখে চলে যেতে হয়!

গরম চায়ে জিব পুড়ে গেল অজিতের। গ্রাহ্য করল না। তিন চার চুমুক খেয়েই উঠে হঠাৎ ফুলপ্যান্ট পরতে লাগল। না, যাই গিয়ে একবার দেখে আসি। ফুলপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে জামাটা গায়ে দিতে গিয়েই ফের মনে হয়—থাকগে। আমি দেখতে পারব না।

ফের চায়ের কাপ নিয়ে বসে অজিত। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার ঝিকে ডেকে চা দিতে বলে। সিগারেট ধরায়। হাত দুটো দেখে। আর বিড়বিড় করে বলে—তোমার ওপর নেই ভুবনের ভার......

হঠাৎ বিদ্যুৎ স্পর্শে চমকে ওঠে অজিত। তাই তো! আজ লক্ষ্মণ এসেছে। বহুকাল পরে, বহু যুগ পরে। সম্ভবত জন্মান্তর পরে এসেছে লক্ষ্মণ। তার কাছেই কি চলে যাবে অজিত। লক্ষ্মণের কাছে গেলে মাঝখানের এই ক'টা বছর মুছে যাবে। সেই কলেজের ছোকরা হয়ে যাবে অজিত! লক্ষ্মণের কাছে গেলে সেই, বয়স নেই। দুজনে চীনেবাদাম ভাঙতে ভাঙতে আজ ময়দানে হাঁটবে। আর লক্ষ্মণ তাকে আকাশতত্ত্ব বোঝাবে। বলবে অসীম শূন্যতা আর নিরবধি সময়ের কথা। সংসারের স্মৃতি থাকবে না, মৃত্যুর ভয় থাকবে না, শীলার কথা মনে পড়বে না! অজিত উঠে জামা পরল। ঝিকে ডেকে বলল

—আমি বেরোচ্ছি। সদর বন্ধ করে দে।

—ও মা! চা করতে বললে যে!

—করতে হবে না।

—বলে অজিত বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়েই তার মনে হল, সে বড় অপরাধ করেছে শীলার প্রতি। সে চার দিন বাড়ি ফেরেনি। চারটে দিন সে উপেক্ষা করেছে, অবহেলা করেছে। শীলা তো তেমন কিছু অন্যায় করেনি। বড় ভাল মেয়ে শীলা। ভাবতে বুকের মধ্যে এক চৈত্রের ফাঁকা মাঠে হু হু করে যেন শুকনো খড়-নাড়া তৃণের জঙ্গলে আগুন লেগে গেল। বড় দহন। বড় জ্বালা। চার দিন সে কি করে আসন্নপ্রসবা শীলাকে ভুলে ছিল?

এ সময়ে বাস-টাস চোখেই পড়ে না অজিতের। বড় রাস্তা থেকে ট্যাক্সি নিল। কোথায় যাবে তা হঠাৎ এখন আবার ঠিক

কয়তে পারছিল না অজিত। শীলা কোন হাসপাতালে আছে তা জানে না। জানলেও লাভ নেই। ভিজিটিং আওয়ার সব হাসপাতালেই শেষ হয়ে গেছে। ভাবল, কালীঘাটে লক্ষ্মণের বাসায় যায়। পরক্ষণেই মনে হয়, শীলার একটা খোঁজ পেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারপর লক্ষ্মণের কাছে যেতে ভাল লাগবে।

দু'তিনবার মত পালটে অবশেষে ঢাকুরিয়ার শ্বশুরবাড়ির কাছেই চলে আসে অজিত। ভিতর ঢুকতে সাহস হয় না। ট্যাক্সিটা দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে নামে ওপর দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকে কোনো কান্নার শব্দ আসছে না কি? প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপর মনে হয়, একটা মেয়ে-গলার কান্নার আওয়াজ খুব ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। মনটা নিবে গেল। তাহলে শীলা......! ওপরে আলো জ্বলছে, জানালায় পর্দা, বাইরে থেকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কিন্তু কান্নার শব্দটাই জানান দিচ্ছে, এ বাড়ির কেউ......।

মাথাটা গরম। ফের ট্যাক্সিতে বসে সে বলল—গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। কালীঘাট যাবো। একটু তাড়াতাড়ি।
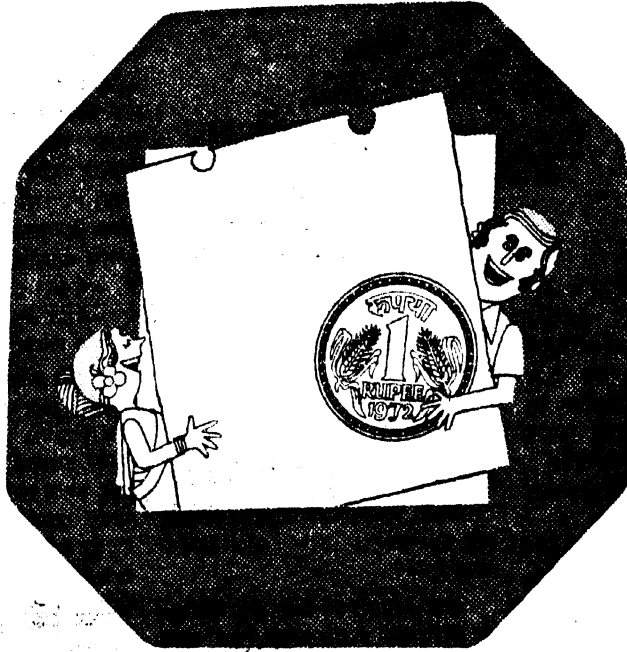
রোজ এক টাকা জমিয়েও দুর্ভাবনা দূরে রাখতে পারেন!

টাকা জমানো নিয়ে এত চিন্তার কী আছে? এতদিন জমান নি? তাতে কী। এখন আমাদের পরামর্শ মত, আজ থেকেই শুরু করুন। যদি এক টাকাও দিনে জমাতে পারেন, দেখবেন জমানো টাকা কীভাবে অচিরে বেড়ে ওঠে। আর এই সঞ্চয়ের ফলে আপনার সুখ ও নিরাপত্তাও পাল্লা দিয়ে বাড়বে।

ইউকোব্যাঙ্কে আপনার সাদর নিমন্ত্রণ বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন শাখায় চলে আসুন।

রিকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনা

মাসে মাত্র ৫ টাকা করে জমালেও বছরে আপনি ৮% থেকে ১০% পর্যন্ত সুদ পাবেন।

মাসে ৫ টাকা	ফেরত পাবেন	সুদ
১২ মাসে	৬৩ টাকা	৮%
২৪ মাসে	১৩১ টাকা	৮%
৩৬ মাসে	২০৭ টাকা	৯%
৪৮ মাসে	২৯০ টাকা	৯%
৬১ মাসে	৩৯৯ টাকা	১০%

ইউকোব্যাঙ্কের অন্যান্য সঞ্চয় পরিকল্পনা:

১। সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট: বছরে ৫% সুদ

২। ফিক্সড ডিপোজিট: বছরে ১০% পর্যন্ত সুদ

৩। রিকারিং ডিপোজিটযুক্ত ফিক্সড ডিপোজিট: ৭ বছরে ১৪.৩৪°, কার্যকরী সুদ

৪। ডিপোজিট সার্টিফিকেট: আসলের চারগুণেরও বেশি ফেরত

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে
ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCOC 52R BEN

ট্যাক্সি চলে। অজিত চুপ করে বসে থাকে। তার চারধারে কলকাতার কোলাহল নেই, আলোর অস্তিত্ব নেই, বর্তমান নেই। এক নিস্তব্ধ, সময়হীন অনন্ত পরিসরের ভিতরে কেবল তাকে গতিময় রেখেছে বেঁচে থাকাটুকু। নিস্তব্ধতায় ভাসমান শব্দহীন একটা স্পেসক্র্যাফটে বসে আছে সে। সে বেঁচে আছে, কিন্তু কিছু বোধ করছে না।

লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ ঠিক ফিরেছে তো! নাকি গিয়ে দেখবে যে লক্ষ্মণ গিয়েছিল তার নির্মোক পরে অন্য একজন সুখী মোটা সাহেবী মানুষ এসেছে! লক্ষ্মণকে নিয়ে তার বড় ভয়।

ট্যাক্সি ঠিক জায়গায় থামল। অজিত ভাড়া মিটিয়ে নামল। কিন্তু রাস্তার নির্দেশ দেওয়া থেকে ভাড়া মেটানো, বা দরজা খুলে নামা, এ সবই সে করেছে এক অবচেতন অবস্থায়। সে টের পাচ্ছে না যে সে কি করছে।

লক্ষ্মণদের দরজা খোলাই রয়েছে। খুব আলো জ্বলছে, আর অনেক লোকের ভিড়। অজিত দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকাতেই একদম সোজা লক্ষ্মণের চোখে চোখ পড়ল। খালি গা, একটা ধুতী পেঁচিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল—একি! এসকেপিস্ট কোথাকার! এয়ারপোর্টে তোকে কত খুঁজেছি!

এক লাফে এসে লক্ষ্মণ তাকে জড়িয়ে ধরল। কানের কাছে মুখ, বলল—চলে এলাম। বুঝলি?

অজিত চোখের জল কষ্টে সামলায়। হেসে বলে—চলে এলি মানে? পার্মানেন্টলি?

লক্ষ্মণ মাথা নাড়ল—না, আর একবার যাবো। তারপর ফিরে আসবো।

অজিত নিঃশ্বাস ফেলে বলে—তোকে বিশ্বাস নেই। গেলে যদি আর না আসিস!

ঠিক বটে, লক্ষ্মণ কিছু মোটা হয়েছে, একটু ফর্সাও। কিন্তু মুখচোখের সেই দীনভাব আজও যায়নি। ওর ঠোঁটের গড়নে লুকোনো আছে একটা চাষীর সরলতা, চোখ এখনো স্বচ্ছ ও অকুটিল। সেই লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ বলল—আমি ভাবছিলাম, তুই তো এসকেপিস্ট, বরাবর ঘটনা এড়িয়ে চলিস। তুই বুঝি এয়ারপোর্ট ভিড়ের মধ্যে পাছে দেখা হলে একটা সীন হয় সেই ভয়ে যাসনি।

অজিত মাথা নেড়ে বলে—না রে। আমি আজ বিকেলে ফিরেছি। তখন চিঠি পেলাম।

লক্ষ্মণ চারদিকে চেয়ে বলল—এখানে বড্ড ভিড়। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। এখানে তো কথা হবে না।

অজিত খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল—শোন লক্ষ্মণ, শীলা হাসপাতালে। অবস্থা খুব খারাপ। হয়তো এতক্ষণ বেঁচেও নেই—বলতে বলতে অজিতের গলা বন্ধ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল—বলিস কি? তুই এই অবস্থায় শীলাকে ফেলে এসেছিস?

—এলাম। বলতে গিয়ে চোখ ভেসে গেল অনিচ্ছাকৃত অশ্রুতে। ঠোঁট কাঁপল, তবু হাসবার চেষ্টা করে অজিত বলে—এলাম। তোর কাছে। তোকে দেখতে। আজ চলি। পরে দেখা হবে।

অজিত বেরিয়ে এল। এখন বয়স হয়ে গেছে। এখন কি আর সেই বয়ঃসন্ধির কালের মতো বন্ধুর আশ্রয় ভিক্ষে করতে হয়! এই বয়সে নিজের আশ্রয় হতে হয় নিজেকেই।

বেরিয়ে আসছিল, পিছন থেকে লক্ষ্মণ চেঁচিয়ে বলল—দাঁড়া। এক মিনিট।

অজিত দাঁড়াল। লক্ষ্মণ তার সেই লুঙ্গি করে পরা ধুতির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে এল, পিছন ফিরে কাকে যেন বলল—আমি অজিতের সঙ্গে যাচ্ছি। আজ হয়তো ফিরব না।

বলে অপেক্ষা করল না। চলে এল।

সেই লক্ষ্মণ। ডাকলে বরাবর বেরিয়ে আসত।

অজিত এইটুকুই চায়। আর কিছু নয়। আর কেউ না হলেও খুব ক্ষতি নেই। কেবল লক্ষ্মণ হলেই চলে যায়। ডাকামাত্র যে আসে। যাকে বলতে হয় না হৃদয়ের দুঃখ বিষাদের কথা। বুঝে নেয়।

ট্যাক্সিতে লক্ষ্মণের পাশে বসে, নিজের হাতের আঙুলে কপাল ছুঁইয়ে অজিত তার কান্নার বাঁধ ভেঙে দিচ্ছিল। নিঃশব্দ কান্না। কেবল লক্ষ্মণ টের পায়। চুপ করে থাকে। অজিতের ভিতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। চৈত্রের সেই আগুন লাগা ক্ষেতের ওপর ঘন মেঘ। ধারাজলে নিবে যাচ্ছে আগুন।

[ক্রমশ]

বিশ্ব বিজ্ঞান

ধাতু না হলেও বিদ্যুৎ পরিবহন চলবে

ধরুন, চাহিদা মেটাতে গিয়ে আগামী এক দশকে পৃথিবীর সব দেশেই বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন দারুণভাবে বেড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে নেমে এল আর একটি বড় রকমের সমস্যা। বিদ্যুৎশক্তি না হয় উৎপাদন করা গেল, কিন্তু সেই শক্তি পরিবহন করার মত অত পরিবাহী কোথায়?

অমূলক ভাবনা হয়ত এটা নয়। কারণ, অনেকেই জানেন, ধাতু মাত্রই বিদ্যুৎ পরিবাহী। এবং একমাত্র অধাতু, যার বিদ্যুৎ পরিবহন করার ক্ষমতা আছে, সে কার্বন। সমস্যাটা কার্বনকে নিয়ে নয়, ধাতুদের নিয়ে।

বিদ্যুৎসুপরিবাহী হিসেবে তামার চল সবচাইতে বেশি। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যে গত কয়েক বছর ধরে তামা এবং লোহার তারও ব্যবহার করা হচ্ছে। কাজে লাগান হচ্ছে কিছু কিছু সংকর ধাতুও। এ ছাড়া নানা রকম সংবেদনশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামেও কত রকমের ধাতু এবং ধাতু সংকরই না ব্যবহার করা হচ্ছে। এদের মধ্যে আছে সোনা, রুপো, প্ল্যাটিনাম, নিকেল প্রভৃতি। কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিবাহী নির্বাচনের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সাংঘাতিক রকমের সযত্ন। যেমন, কোন কোন যন্ত্র আছে যারা স্বাভাবিকের চেয়ে উচ্চতর তাপ-মাত্রায় কাজ করে। আবার কোন কোন যন্ত্র কাজ করে শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রার অনেক নিচে। যাদের মধ্যে অন্যতম যন্ত্রগণক। এ সব যন্ত্রে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যে প্রয়োজন অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু এবং ধাতু-সংকর।

ফলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে দুটি। এক, বিদ্যুৎ পরিবহণ এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির উৎপাদন যে হারে বাড়ছে তাতে আগামী এক দশকে বিভিন্ন ধরনের ধাতব পরিবাহীর চাহিদা যেমন বেড়ে যাবে, ঠিক সেই সঙ্গে সম্প্রসারণশীল শিল্পের চাহিদার জন্যেই দরকার হবে প্রচুর পরিমাণ ধাতু। তখন এত বিপুল পরিমাণ ধাতুর জোগান দেয়া সম্ভব হবে তো? দুই, ধাতুর বিকল্প কি কিছু নেই, যাদের বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য কাজে

১৫ জুলাই সোভিয়েত মহাকাশযান সোয়ুজ এবং মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপলো পৃথিবীর মহাকাশে কিভাবে পরস্পর মিলিত হবে, ছবিতে দেখান হল। ছবিটি এঁকেছেন সোভিয়েত নভোচর এবং শিল্পী অ্যালেকসি লিওনোফ,

লাগান যেতে পারে? এতে করে বিদ্যুৎ পরিবহণ এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্যে যে বিপুল পরিমাণ ধাতুর প্রয়োজন তার চাপ হয়ত অনেকটা কমান যাবে?

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর জুগিয়েছিলেন দ্যুপোঁ করপোরেশনের কয়েকজন রসায়নবিজ্ঞানী। ওই সময় ওঁরা বিশেষ একটি ধরনের জৈব রাসায়নিক যৌগ আবিষ্কার করেন। দেখা গেল, এই যৌগটি সাধারণ ধাতুর মতই বিদ্যুৎশক্তি পরিবহণ করে। বস্তুটির নাম রাখা হল জৈব ধাতু।

এর পর গত দশ বছরে আরও কয়েকটি জৈব ধাতু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। তবে কয়েক সপ্তাহ আগে যে নতুন জৈব ধাতুটি তৈরি করা হল, অভিনবত্বের দিক দিয়ে তার কোন নজির নেই।

নতুন এই জৈব ধাতুর নাম রাখা হয়েছে H.M.T.S.F.T.C.N.Q। তৈরি করেছেন জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী আরোন ব্লক, ডোয়াইন কাউয়ান এবং তাঁদের কয়েকজন সতীর্থ। ঠিক কি কি উপাদান দিয়ে বস্তুটি তৈরি সে সম্পর্কে এখনও কিছু বলা হয় নি। এর রাসায়নিক গঠন এবং প্রস্তুত প্রণালীর ব্যাপারেও উদ্ভাবকরা কোন মন্তব্য করেন নি। শুধু বলা হয়েছে, আগের জৈব ধাতুগুলির চেয়ে নতুন এই জৈব ধাতুটির বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা অনেক বেশি।

যেমন, বেশির ভাগ জৈব ধাতুই স্বাভাবিক তাপ মাত্রায় (room temperature) বিদ্যুৎ শক্তি পরিবহন করতে পারে। তাপমাত্রা কমানর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবাহিতা বাড়ে। এবং এই পরিবাহিতা সব চাইতে বেশি বাড়ে যখন তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় ১৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। কিন্তু তাপমাত্রা এর নিচে নামালে ক্রমে পরিবাহিতা কমতে থাকে, পরিবর্তে বাড়ে বৈদ্যুতিক রোধ (resistance)। অর্থাৎ পরিবাহীর বদলে জৈব ধাতুগুলি তখন কুপরিবাহী এবং শেষ পর্যন্ত অপরিবাহী হিসেবে কাজ করতে থাকে। যার অর্থ—১৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে ওই সব বস্তু স্বভাবিক বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে আর কাজে লাগান যায় না।

হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের দাবি, তাঁদের আবিষ্কৃত জৈব ধাতুটি এই অসুবিধেটি দূর করতে পারবে। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন—২৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ঠাণ্ডা করলেও H.M.T.S.F.T.C.N.Q.র বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা কমে না। ওই অবস্থায় এই বস্তুটির মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রতিরোধ করার মত ইঙ্গিতও দেখা যায় না।

বলা বাহুল্য প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এ ধরনের আবিষ্কারের গুরুত্ব এখন বেশি। এক, কোন ধাতুকে ওই ধরনের তাপমাত্রায় কাজ করার মত উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে প্রযুক্তিগত অসুবিধেও যেমন অনেক, খরচও পড়ে অনেক বেশি। পরিবর্তে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে জৈব-ধাতু তৈরি করে অনায়াসে এবং কম খরচে কাজ চালান যেতে পারে। দুই, অনেক ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম পরিবাহীর দরকার হয়। ধাতুকে অত বেশি সূক্ষ্ম অবস্থায় তৈরি করতে খরচ হয় বেশি। জৈব ধাতুর ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি সহজে দূর করা যাবে। তিন, ভবিষ্যতে যদি বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে জৈব ধাতু উৎপাদন করা সম্ভব হয়, তাহলে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্যে নানারকম ধাতু দিয়ে এখন যেমন বৈদ্যুতিক তার বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাজসরঞ্জাম তৈরি করা হচ্ছে, তখন হয়ত তার প্রয়োজন হবে না। তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সাহায্য না নিয়েও শুধু জৈব ধাতুর সাহায্যে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বিদ্যুৎশক্তি পাঠান সম্ভব হবে। এতে করে যে বিপুল পরিমাণ ধাতুর সাশ্রয় হবে তা দিয়ে বিভিন্ন অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রাখা যাবে। সংশ্লেষণ পদ্ধতি তৈরি করার দরুন জৈব ধাতুর তৈরি বৈদ্যুতিক তার বা বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের দামও কমবে বলেই আশা করা যায়। এবং আরও বড় লাভ, তামা, লোহা অথবা অ্যালুমিনিয়াম উন্মুক্ত পরিবেশে জল হাওয়ার সংস্পর্শে নষ্ট হয়। জৈব ধাতুর ক্ষেত্রে এ অসুবিধেও হয়ত তেমন থাকবে না।

ক্যানসার এবং ভিটামিন-এ

ক্যানসার রোগ ধরা পড়ার পর কিভাবে সেই রোগ সারিয়ে তোলা যায় এতদিন বিজ্ঞানীরা এর ওপরই জোর দিয়েছেন বেশি। ধরুন, কারোর শরীরে দূষিত টিউমার ধরা পড়ল। তেমন ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা তিন রকমের চিকিৎসার কথা ভেবে নেন। এক, তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে ওই টিউমারের দূষিত কোষ, অর্থাৎ এক কথায় যাদের ক্যানসার কোষ বলা হয়, তাদের ধ্বংস করা। দুই, শল্য চিকিৎসার সাহায্যে দেহ থেকে টিউমারটিকে কেটে বাদ দেওয়া। এবং তিন, রাসায়নিক ওষুধ খাইয়ে শরীরের মধ্যে ক্যানসার কোষ যাতে আর না দানা বাঁধতে পারে তার চেষ্টা করা। অর্থাৎ এক কথায়, ক্যানসারের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে সব গবেষণা হয়েছে তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মূল উদ্দেশ্য যেন একটিই। কিভাবে ক্যানসার রোগ নিরাময় করা যায় তার সঠিক উপায় উদ্ভাবন করা, রোগ নিবারণ করা নয়।

কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের টিকে আছে। ওই সব টিকের সাহায্যে ওই সব রোগ নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রশ্ন এই, ক্যানসারের ক্ষেত্রেও কি ওই ধরনের কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেয়া যায় না? মোটামুটিভাবে জানা গেছে কোন্ কোন্ বস্তু ক্যানসার কোষ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন ওই সব বস্তু প্রশ্বাস এবং খাবারের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে ঢুকলে শরীরের বিশেষ বিশেষ কোষ ক্যানসার কোষে পরিণত হয়। তেজস্ক্রিয় রশ্মিও দেহের কোষকণার ওপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তবে তেজস্ক্রিয় রশ্মির কথা আপাতত বাদ দিলে কোন কোন বিজ্ঞানীর বক্তব্যটি দাঁড়ায় এই রকম : ক্যানসার সৃষ্টিকারী কোন বস্তুকণা শরীরের মধ্যে ঢোকার পর শরীরের সবগুলি কোষের ওপরই যে প্রভাব বিস্তার করবে, এমন কোন কথা নয়। বিশেষ বিশেষ বস্তুকণা বিশেষ বিশেষ কোষের ওপর প্রতিক্রিয়া করে। যাকে এক কথায় বলা চলে কোষের ওপর ওই সব বস্তুকণার আক্রমণ। দেখা গেছে এই আক্রমণের পর কোন কোষকণা পুরোপুরি মারাত্মক ক্যানসার রোগ অবস্থায় পরিণত হতে সময় নেয় প্রায় কুড়ি বছরের মত। কখনও বা তারও বেশি।

প্রশ্ন : দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে ধীরে ধীরে রোগটি যখন পাকতে থাকে, ঠিক সেই সময় কি এমন কোন ব্যবস্থা নেয়া যায় না, যাতে করে স্বাভাবিক কোষের ক্যানসার কোষে

রূপান্তরের ব্যাপারটায় বাধা দেয়া যায়? তেমনটি করা সম্ভব হলে তো ক্যানসার রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে?

সম্প্রতি সায়ান্স পত্রিকার (১৮৬ খণ্ড, ১১৯৮ পৃষ্ঠা) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিটামিন-এ শরীরে ক্যানসার রোগ গড়ে উঠতে নাকি বাধা দেয়। ওদের বক্তব্য, যেসব কোষ ক্যানসার সৃষ্টিকারী বস্তুকণার সাহায্যে ক্যানসার কোষে পরিণত হয়, ভিটামিন-এ-র প্রভাবে তারা আর ক্যানসার কোষে পরিণত হতে পারে না।

ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউটের দুজন বিজ্ঞানী ডঃ মাইকেল স্পরন এবং ডঃ ডেভিড কফম্যান হ্যামস্টারের ওপর ব্যাপারটা পরীক্ষা করে যাচাই করার চেষ্টা করেছিলেন। এর জন্যে কয়েকটি হ্যামস্টারকে গোড়ায় ভিটামিন-এ বর্জিত খাবার খেতে দেয়া হয়। পরে ওই সব জন্তুর দেহে ঢুকিয়ে দেয়া হয় ক্যানসার সৃষ্টিকারী বস্তু-কণা। দেখা গেছে এর ফলে হ্যামস্টারগুলি অল্প দিনের মধ্যেই ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের দেহে গড়ে উঠেছে দূষিত টিউমার। সম্প্রতি কয়েকজন বিজ্ঞানী হ্যামস্টার ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের প্রাণীর ওপর অনুরূপ পরীক্ষা চালিয়ে একই ধরনের ফলাফল লক্ষ করেছেন। ও'রা এমনও দেখেছেন, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন প্রাণীদের খাবারের সঙ্গে যদি কিছুটা অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন-এ মিশিয়ে দেয়া যায়, তাহলে ক্যানসার সৃষ্টিকারী বস্তুকণা তাদের শরীরে ক্যানসার গড়ে উঠতে বাধা দেয়। শুধু বাধা দেয়াই নয়, কোন কোন গবেষক এমন কথাও বলছেন, ভিটামিন-এ, যেসব প্রাণীর দেহে ক্যানসার রোগ অনেকটা গড়ে উঠেছে, তাদের পক্ষেও অনেকটা উপকারী।

এ ধরনের সিদ্ধান্ত কতখানি নির্ভর-যোগ্য সে কথা ঠিক এই মুহূর্তে জোর করে বলা শক্ত। কারণ, এ নিয়ে ওই সব বিজ্ঞানী এ পর্যন্ত শুধু মনুষ্যেতর প্রাণীর ওপরেই পরীক্ষা নীরিক্ষা চালিয়েছেন, মানুষের ক্ষেত্রে এটা কতটা কার্যকর সেটা জানতে হলে মানুষের ওপর ব্যাপক গবেষণা চালনার প্রয়োজন আছে। এছাড়াও দেখা দরকার, যে সব বস্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহে ক্যানসার ঘটায় তারা মানুষের দেহেও ওই রোগ সৃষ্টি করে কি না।

এবং আরও একটা কথা। ভিটামিন-এ খাওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন-এ যেমন শরীরের উপকার করে, তেমনি মাত্রার বেশি হলে এই বস্তুটি শারীরিক ত্রুটিও ঘটাতে পারে। অতএব ঠিক কী পরিমাণ ভিটামিন-এ খেতে হবে সেটাও জানা দরকার। ক্ষেত্র বিশেষে এই পরিমাণের পরিবর্তনও হয়ত হতে পারে। ক্যানসার ঘটাতে পারে এমন সব বস্তুকণার সান্নিধ্যে যাঁরা বাস করেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে পরিমাণটি একরকম, আর যাঁরা ওই পরিবেশে বাস করেন তাঁদের ক্ষেত্রে অন্য রকম। এসব [illegible] থো না জেনে অতিরিক্ত ভিটামিন-এ খেলে হিতের পরিবর্তে অহিত হওয়ার [illegible] বেশি।

সমরজিৎ কর

এক নজরে

উপরে : ১৫ জুলাই, ১৯৭৫ কাজাখস্তানের বৈকোনুর থেকে সোভিয়েত মহাকাশ যান সোউজ পৃথিবীর কাছাকাছি এক কক্ষপথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। তার সাড়ে সাত ঘণ্টা পর কেপ কেনেডি থেকে ওই একই কক্ষপথের উদ্দেশ্যে উৎক্ষিপ্ত হবে মার্কিন মহাকাশ-যান অ্যাপলো। অতঃপর দু' দেশের মহাকাশযান পরস্পরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মহাকাশে বিচরণ করবে। ছবিতে সোউজ এবং মার্কিন [illegible] লক্ষ করুন (বাঁ দিক থেকে) দাঁড়িয়ে : টমাস পি স্টাফোর্ড এবং [illegible] এ লিওনোভ। বসে : ডোনাল্ড কে স্লেটন, ভানস ডি ব্রান্ড এবং ভালেরি এন কুবাসোভ।

নিচে : মার্কিন নভোচররা বিশেষ ধরনের এই দূরবীণের সাহায্যে মহাকাশের ১৭টি অঞ্চল থেকে স্বাভাবিক অতি বেগুনী রশ্মি এবং এক্স রশ্মির মাঝামাঝি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকিরণের ওপর পর্যবেক্ষণ চালাবেন। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস [illegible] ধরনের চেষ্টা জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের একটি নতুন অধ্যায় উন্মীলিত করবে

যৌবন

সুশীল রায়

কিছুকাল কাছে থাকো অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত,
সহৃদয় তাপে হাওয়া করে দাও উত্তপ্ত, অথচ
অবিলম্বে হাওয়া হয়ে কোথায় অদৃশ্য হও তুমি?
স্থির হয়ে এতটুকু দাও না তিষ্ঠাতে, অবিরল
ঘোরাও লাট্টুর মত। জন্মলাতন অনির্বচনীয়।
তবুও তোমার স্তুতি-মুখরিত এ বিশ্বভুবন,
আদরের ডাক-নামে ডাকে ওরা তোমাকে—যৌবন।
যতদিন কাছে থাকো, বুঝেও বুঝিনে কাছে আছ
এ এক বিষম জাদু—স্বীকার করি তা আজ খুব।
সাজিয়ে মোক্ষম বর্ণচোরা শত রঙের বাহার
হরতনী ইস্কাবনী রুহিতনী চিড়িতনী ছক
বসে থাকো অধীশ্বর অদ্বিতীয় অনন্ত জুয়াড়ি,
প্রাপ্তবয়স্করা আচরাৎ হয়ে যায় নাবালক
দান ফেলে-ফেলে ভাবে হবে জীবনের অগ্রদূত।
পাশার দানের মত ফেলে-ফেলে সঞ্চয়ের কাঁড়ি
খেলা চলে বেপরোয়া। মুখে হাসি ধরে না তোমার।
সকলেই সার জানে এক-দানে হয় না বাজিমাৎ
খেলা তাই চলেছেই চলেছেই চলেছেই মেলায়-মেলায়।
কোথায় মোহনবাঁশি বাজে তার থাকে না খেয়াল,
বাজায় কানাই-ভেঁপু কে কোথায়, কে করে কেয়ার।
তোমার ডাক-নাম ওরা যাই দিয়ে থাক-না, জুয়াড়ি,
বিষম কুচক্রী তুমি, চেহারা ও চরিত্রের নাই কোনো মিল।
ভুক্তভোগী না-হলে তো দুর্ভোগের বোঝে না কদর।
বিকেলের শেষ-রোদ গাছের মগ-ডালে যেই চড়ে
আসরের খেলা সাঙ্গ করবার উদ্যোগ ঘনায়।
চৌদিকে প্রসন্ন দৃষ্টি বুলিয়ে, জুয়াড়ি, তৎক্ষণাৎ
কানাকড়ি ঢেলে নিয়ে থলে ভরে কর চলি-চলি, সে সময়ে
পকেট হাটকাই, হতবাক হয়ে যাই, হা ঈশ্বর,
নিজের অজান্তে কোন ফাঁকে হয়ে গিয়েছি ফতুর।
জীবনের অস্থিরতা দিয়েছিলে একদিন বন্ধুর মতন
কিন্তু অবশেষে আজ চিনেছি হে তোমাকে, যৌবন,
তুমি ভয়ংকর বস্তু, ভীষণ চতুর।

বাসাবাড়ি সিঁড়ির অধীনে

জাহিদ হায়দার

চলো, পা রাখো প্রথম সিঁড়িতে—
উঠে যাও সমুখে, ভবিষ্যতে—
মনে রেখো আমাদের বাসাবাড়ি সিঁড়ির অধীনে।

পেয়ে গেছ ঘর?
এইভাবে বংশপরম্পর
ওঠে-নামে। মেঘাকাশ বদল দেখে
বিস্ময়ে বাজি রেখে
হারে, জেতে—
ফিরে আসে গভীর অভিমানে।

মনে রেখো আমাদের বাসাবাড়ি সিঁড়ির অধীনে।

পাণ্ডুলিপি

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

শব্দ কেটে-কেটে নকশা, আর
নকশা মুছে ফের খোঁজা,
কোথায় রয়ে গেছে এই খেলার
আড়ালে বন্ধ দরোজা।

খোলে না খিল তার, দুই কপাট
শুধু নতুন করে ঢাকে
দৃশ্যময় চেনা রাজ্যপাট
অন্ধকার কিংখাবে।

শব্দ কেটে-কেটে নকশা-মাছ,
বৃক্ষ-পাতা-আলপনা,
যেন কাঁথার বুকে সুচের কাজ
সূক্ষ্ম ফোঁড় তুলে বোনা।

কেবলই নকশায় ভরেছে ঘর,
খোলেনি তবু সেই খিল;
অন্তহীন পথ ভয়ংকর
রক্তপাতে পিচ্ছিল।

আমার কোন বেহুলা নেই

জিয়া হায়দার

তুমি স্বপ্নের ভেতরে
সোনার নৌকো দিতে চেয়েছিলে।

প্রতি রাতে ঘুমোনোর আগে
অনেকখন ধরে ভাবতে থাকি-
আজকের ঘুমের ভেতরে নিশ্চয়ই
স্বপ্নটা দেখবো,
ঠিক এইভাবেই ঘটবে;
রোজ নতুন-নতুন করে ভাবি,
কোনো রাতেই
কোনো ঘুমেই
আর ঘটে না,
স্বপ্নের ভেতরে কোনো কিছুই হয় না
সোনার নৌকো;

এখন আমার চোখ দুটো মনুষ্যেতর,
হলদে পাখি হতে চেয়ে পাখি হতে পারছে না
কেবল হলদেই;

এবং
অদৃশ্য-স্বপ্নের নৌকোটার
পাল, গুণ, বৈঠা
হলদে সাপের মতো, অসংখ্য,
জড়িয়ে ধরছে সমস্ত শরীর,
যেমন তোমার আবেগার্ত ভালোবাসা;

লখিন্দরের চেয়েও নিষ্ঠুর আমার মৃত্যু,
হায় রে,
আমার কোনো বেহুলাও নেই।

শীতল পানীয়

আদার গন্ধ ও স্বাদ শীতল পানীয়ে অতি উপাদেয় হয়। এর জন্য লাগে এক পোয়া দুধ, একটি ডিম ভাল করে ফেটানো, বড় চামচের এক চামচ লেমন সিরাপ, আর এক চামচ আদা সিরাপ, ফেটানো ফাঁপান অল্প ক্রীম। ক্রীম বাদে সব মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। উপর থেকে ফাঁপানো ক্রীম দিয়ে খেতে দিলে আপনার প্রিয়জন তৃপ্ত হবেনই।

দুধ আর মধু দিয়ে চমৎকার ঠাণ্ডাই হতে পারে। এক কাপ দুধে বড় চামচের এক চামচ মধু লাগবে। আর লাগবে সামান্য জায়ফলের গুঁড়ো। দুধ গরম করে মধু দিন। এবার এই মিশ্রণটিকে ভাল করে ঠাণ্ডা করুন। উপরে জায়ফলের গুঁড়ো দিয়ে পরিবেশন করুন।

ঠাণ্ডা কফি অনেকে অনেক ভাবে বানান। একটি প্রণালী পরীক্ষা করে দেখুন কেমন হয়। কড়া কফি চিনির সিরাপ মিশিয়ে ঠাণ্ডা করুন। চিনির সিরাপে লাগবে এক কাপ চিনি, আধ কাপ জল, একটি ডিমের শ্বেতাংশ, সামান্য লেবু বা ভিনিগার। ক্রীম অব টার্টার হলেও চলবে। অল্প আঁচে লেবু বা অন্য বিকল্প, চিনি ও জল রাখুন। যখন ফুটবে তখন ভাল করে ফেটানো ডিমের শ্বেতাংশ দিন। খুব নাড়তে থাকুন। ১০ মিনিট ফুটলে, ঠাণ্ডা করে বোতলে ভরুন। এবার ওপরে ক্রীম দিয়ে পরিবেশন করুন।

মিল্ক শেকও পরম প্রিয় এক পানীয় হয়ে উঠেছে। একটি প্রণালী পরীক্ষা করুন। লাগবে এক কাপ দুধ, উপরে যে চিনির সিরাপের কথা আলোচনা করছি ঐ সিরাপ পছন্দমত কয়েক ফোঁটা, ভ্যানিলা এসেন্স, ফেটানো ক্রীম, দুচারটি দানাবাঁধা চেরি। দুধ, চিনির সিরাপ ও এসেন্স মিশিয়ে ফেটান। ফাঁপানো ক্রীমের উপর দুচার কুচি চেরি দিয়ে খেতে দিন।

ঘরে বাইরে

আম দিয়ে মিল্ক শেক চমৎকার লাগবে। আমের সময় এমন পানীয় আর কি হতে পারে বা! এক কাপ দুধে আন্দাজমত চিনির সিরাপ দিয়ে বড় চামচের দু চামচ আমের রস দিন। সবটুকু ভাল করে মিশিয়ে ফেটে পরিবেশন করুন।

অরেঞ্জ বা কমলা লেবুর রস পানীয় হিসাবে কি শীত কি গ্রীষ্ম সব সময়েই অত্যন্ত সুস্বাদু। চারটি কমলার রসে ১টি লেবুর রস মিশিয়ে দিন। তাতে দিন আন্দাজমত চিনি। এক গ্লাস ফুটন্ত জল। রসে চিনি মেশান। গরম জল তাতে ঢালুন। ঠাণ্ডা করে পাতলা এক টুকরা কমলা দিয়ে খেতে দিন। দেখতেও সুন্দর। খেতে ভাল।

অরেঞ্জ ডিউ বা কমলা শিশির। লাগবে দুটি কমলার রস, এক বড় চামচ পাতি লেবুর রস। একটু লবণের ছিটে মাত্র। বড় এক চামচ মধু। মধু ও রস মিশিয়ে নিন ভাল করে। লবণ দিন। ঠাণ্ডা করে পাতলা কমলার টুকরো দিয়ে পরিবেশন করুন।

যদি অরেঞ্জ কাপ পরিবেশন করেন তবে পানীয় হিসাবে অথবা আহারান্তে মিষ্টি হিসাবে দিতে পারেন। লাগবে দুটি কমলা লেবুর রস ও আধ পেয়ালা আনারসের জুস। বড় চামচের এক চামচ লেবুর রস। পাতলা কমলা ও আনারসের ফালি। সব মিলিয়ে খুব ঠাণ্ডা করে কমলা ও আনারসের ফালি দিয়ে পরিবেশন করুন।

একটি মিশ্রিত পানীয় নাম তার রোমান পাঞ্চ। নতুনত্ব আছে। তিনটি পাতিলেবুর রস, দুটি কমলা লেবুর রস, শক্ত করে ফেটানো দুটি ডিমের সাদা অংশ, এক কাপ চিনি, এক গ্লাস জল। জল ও চিনি দিয়ে সিরাপ করুন। রস মিলিয়ে ঠাণ্ডা করুন। ভাল করে ছেঁকে নিন। ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে পরিবেশন করুন।

আইসক্রীম

রেফ্রিজারেটরে আইসক্রীম বানাতে হলে মাঝে মাঝে আইসক্রীমের পাত্রটি বের করে ফেটে নেবেন। না হলে আইসক্রীম শক্ত হবে। আইসক্রীম বানাবার যে মেশিন তাতে সে ভয় থাকে না। সব চেয়ে সহজ আইস-ক্রীম হচ্ছে কাস্টার্ড আইস। মুখরোচক অথচ হালকা। ছোটদের মধ্যে যারা দুধ খেতে ভালবাসে না তাদের জন্য আদর্শ ব্যবস্থা।

উপকরণ সাধারণ। লাগবে— ১। আধ সের দুধ হলে দুটি ডিম, ২। আধ কাপ চিনি, ৩। সামান্য মাখন, ৪। ছিটে মাত্র লবণ।

প্রণালী : ১। ডিম ভাল করে ফেটিয়ে ঠাণ্ডা দুধ, মাখন ও চিনি এবং লবণ মেশান। ২। মিশ্রণ গাঢ় করুন। পাক করবেন সাবধানে। Double boiled ভাল। বিকল্পে একটি পাত্রে জল ফুটতে থাকবে ও অপেক্ষাকৃত ছোট পাত্রে মিশ্রণটি রেখে গাঢ় করুন। ঠাণ্ডা হলে জমতে দিন।

এর সঙ্গে কফি, কোকো ইত্যাদি মিশ্রণ দিয়ে দিতে পারেন। কোকো ঠাণ্ডা দুধে গলে মিশিয়ে দেবেন। আমের দিনে আমের শাঁস দিতে পারেন। ইচ্ছা হলে দু'কাপ আমের রস চিনির সিরাপে মিশিয়ে লবণের ছিটে দিয়ে জমাতে পারেন। তরমুজের রসে চিনির সিরাপ মিশিয়ে একটু লেবুর রস দিয়ে জমিয়ে পরিবেশন করুন। তার স্বাদও গ্রীষ্মে বেশ ভালই লাগবে।

যদি বিশেষ কোন উপলক্ষে আর একটু মুখরোচক করতে চান আপনার আইসক্রীম, তবে ক্রীম মিশিয়ে বানাবেন। ডিম বাদ দিলেও চলবে। লাগবে প্রায় দু কাপ ক্রীম ও দু কাপ দুধ। এক কাপ চিনি। সামান্য

ভ্যানিলা বা অন্য এসেন্স। সব মিশিয়ে পাত্রে ঢেলে জমান। খেতে উপাদেয় হবে খুব।

টোম্যাটো সত্ত্ব

আমসত্ত্ব পাকা আমের শুকনো করা রস। এভাবে রোদে রেখে আরও নানা ফলের রসের সত্ব হয়—যেমন কাঁঠালসত্ব, বেলসত্ব ইত্যাদি। টোম্যাটোসত্ব একটু ভিন্ন এবং ব্যবহারও ভিন্ন। টোম্যাটো যখন সস্তা ও প্রচুর মেলে তখন টোম্যাটো কিনে নিন। বেশ টুকটুকে লাল ও বড় বড় টোম্যাটো বেছে নেবেন। পোকা পচা যেন না থাক। অর্ধেক করে কাটুন ও সামান্য জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিন। গরম হয়ে গেলে উপরের পাতলা খোসা ছাড়িয়ে চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিন। বেশী মিহি চালুনি দরকার নেই। এবার ওই নির্যাস বেশ ঘন করে ফুটিয়ে রাখুন। ইচ্ছা হলে লবণ যোগে সিদ্ধ করুন।

আমসত্ত্বের মত করে তেলমাখা থালায় রোদে শুকোতে দেবেন। একদিনেই জলীয় ভাব কমে লেই বা নরম আটার পিণ্ডের মত হবে। দ্বিতীয় দিনের রোদে লেই শক্ত হয়ে আমসত্ত্বের মত হবে। এক ইঞ্চি পরিমাণ সরু লম্বা টুকরো বা ফালি করে কাগজে আলাদা আলাদা ছড়িয়ে রেখে দিন। খুব ভাল বন্ধ হয় এরকম একটি টিনে রাখবেন। টিনের অবস্থা ভাল হলে মাসের পর মাস আপনার টোম্যাটোসত্ব অবিকৃত থাকবে। চাই কি বছরও কেটে যেতে পারে।

এই টোম্যাটোসত্ব যখন বাজারে টোম্যাটো মোটেই থাকবে না তখন বা যখন দাম আমাদের নাগালের বাইরে সে সময় রান্নায় অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। হাতে ছোট ছোট করে ছিঁড়ে নেবেন। তাহলে অতি সহজে গলে যাবে। মাছ মাংসে বা ব্যঞ্জনে ডাল দিন অথবা চাটনি করুন, টোম্যাটো সাপ করুন—সবেতেই চমৎকার হবে। কাজও সহজ হবে। কাটাকুটির ঝামেলা নেই।

টুকিটাকি

গরমে বিশেষ করে তরল দ্রব্যাদি ঠাণ্ডা রাখার জন্য থার্মোস ফ্লাস্ক ব্যবহার খুব হয়। অনবরত নানা ধরনের জিনিস দীর্ঘ সময় ভরে রাখার জন্য ফ্লাস্কে নানারকম দাগ ও গন্ধ হয়। এক টুকরো লেবুর রস এর সঙ্গে খোসা ও কোমল আঁশ ও মজ্জাটুকু পর্যন্ত ছোট করে কুচি করুন। এবার এই মিশ্রণ ফ্লাস্কে ভরে খুব করে ঝেঁকে নিন। অবশ্য বেশী জোর করবেন না। ফ্লাস্ক-এর কাঁচের বোতল ভেঙে যেতে পারে। কিছু পরে দেখবেন দাগ উঠে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর লেবু লেবু গন্ধ অন্য সব দুর্গন্ধ নষ্ট করেছে।

বোতলের কর্ক বোতল থেকে খুলে রাখলে ফের লাগাবার সময় বড় মনে হয়। ফুটন্ত জলে কর্কটি কিছু সময় রেখে দিন। যখন নরম হয়ে যাবে তখন সহজেই বোতলে ঢুকে যাবে।

অনেক ক্ষেত্রে ধোয়ার পরে ফলের বা অন্য নমুনার কোন রং উঠে চারদিকে মিশে যেতে চায়। এক লিটার জলে এক প্যাকেট এপসম সল্ট মিশিয়ে এক রাত্রি ঐ কাপড় ভিজিয়ে রাখবেন। তাতে গলে যাওয়া রং অনেকটা উঠে যাবে।

পুরোনো ছেঁড়া মোজা কেমন করে কেটে নতুন করে সেলাই করা যায় আমরা একবার বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ছেঁড়া মোজার আর একটি ব্যবহার তখন মনে হয়নি। হাঁটু বা কনুইতে ব্যাণ্ডেজ হলে মোজার উপরিভাগ তার উপর দিয়ে রাখলে মোজা স্বস্থানে থাকে এবং ব্যাণ্ডেজটি ময়লা হয় না।

LPG গ্যাস সিলিণ্ডারে কতটা গ্যাস আছে তা নির্ণয়ের ব্যবস্থা নেই। আজকাল অনেকেই সিলিণ্ডার ব্যবহার করেন এবং তাঁরা বলেন কোন সিলিণ্ডার কতক্ষণ চলবে বলা কঠিন। মনে হয় সব সিলিণ্ডারে সমান গ্যাস থাকে না। LPG যাঁরা সরবরাহ করেন তাঁদের এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যে ক্রেতা সহজে জানতে পারবে কত টাকা দিয়ে তাঁরা কতটা গ্যাস পাচ্ছেন।

লেবুর রস করে রেখে দিলে সময়মত ব্যবহার সহজ হয়। বেশ বড় একটি পাত্রে কয়েকটি লেবু রস করে রেখে দিন। দিন তিনেক হাত দেবেন না বা নাড়াচাড়া করবেন না। তলানি বাদ দিয়ে উপর থেকে রসটি কাঁচের বোতলে ভরে কর্ক দিয়ে বন্ধ করে রাখুন। যখন দরকার ব্যবহার করবেন। চিনি মিশিয়ে সরবৎ করুন, ছানা তুলুন, সবেতেই কাজে লাগবে। উপরে দু'চার ফোঁটা অলিভ অয়েল ঢেলে দিলে এ রস অনেক দিন থাকবে। উপরে গাঁজলা দেখলে ছেঁকে রেখে দেবেন।

যদি চিনি মিশিয়ে সরবতের সার করে রাখেন তবে অতি অল্প পরিমাণ লেমন এসেন্স, আড়াই আউন্স সাইট্রিক অ্যাসিড, প্রায় দু'কিলো চিনি এনামেল পাত্রে বেশ করে ফুটিয়ে গাঢ় রস করবেন। ঠাণ্ডা হলে বোতলে রাখুন। যখন দরকার হবে বড় চামচের এক চামচ এক গ্লাস জলে দিয়ে চমৎকার শীতল পানীয় পরিবেষণ করতে পারবেন।

লেমনেড সিরাপ তৈরী করতে ১½ কিলো চিনি, ১½ লিটার জল, ১½ আউন্স টার্টারিক অ্যাসিড, ৬০ ফোঁটা লেমন এসেন্স লাগবে। একটি ডেকচিতে চিনি এবং জল দিয়ে মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে ঢেলে অ্যাসিড দিন। প্রায় যখন ঠাণ্ডা হয়ে আসবে তখন লেমন এসেন্স মিশিয়ে বোতলে ভরুন। ডেকচিতে থাকতে অ্যাসিড মেশাবেন না অথবা লোহার চামচ ব্যবহার করবেন না। এ সিরাপ দীর্ঘদিন পর্যন্ত থাকবে। এক গ্লাস জল বা সোডা দিয়ে খেতে হলে বড় চামচের এক চামচ দেবেন।

শ্রীমতী

আশ্চর্য মানুষ পিকাসো

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

৮ই এপ্রিল, ১৯৭৩, ফরাসী রিভিয়েরার মোজাঁতে ১৭ একর জমির ওপর বিশাল দুর্গসদৃশ বাড়িটা একেবারে চুপচাপ হয়ে প্রতীক্ষা করছিল শতাব্দীর একটি শোকাবহ ঘটনার জন্য। বাড়ির নাম নতরদাম দ্য ভি। মালিক, এই শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং আশ্চর্য মানুষ পাবলো পিকাসো। তাঁর অন্তিমশয্যার পাশে স্ত্রী এবং মুষ্টিমেয় বন্ধুসহ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত।

অথচ এই নৈঃশব্দ কিন্তু ওই বাড়ির পক্ষে একেবারেই বেমানান। এর কদিন আগেও খড়ের একটা টুপি মাথায়, ঝলমলে চড়া রঙের ডোরাকাটা শার্ট আর তার সঙ্গে পায়জামার মতো ঢোলা একটা চোখধাঁধানো পিকাটো প্যান্ট অথবা এমনি ধরনের কিম্ভুত অন্য কোন পোশাক পরা পিকাসোর গমগমে হাসি আর উচ্চপদার্থ কথায় বাড়িটার চল্লিশখানা ঘর মায় ছাদের ওপর গম্বুজ দুটো পর্যন্ত কেঁপে উঠতো।

বাড়ির ভেতর পিকাসোর সঙ্গে দেখা করা অবশ্য খুবই কঠিন ছিল। সাক্ষাৎ-প্রার্থীকে কাঁটাতারে ঘেরা বাড়ির একটি মাত্র দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রায়ই শুনতে হতো—'পিকাসো নেই', অথবা 'ব্যস্ত'। শিল্পী বাড়িতে থাকলেও বন্ধ-দরজার পেছনে বসানো মাইক্রোফোনের মাধ্যমে তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থীর দীর্ঘ ইন্টারভিউ চলত। ভাগ্য প্রসন্ন হলে এর পর মিলতো ভেতরে ঢোকার অনুমতি। শিশুদের জন্য অবশ্য আলাদা ব্যবস্থা। সমস্ত রকম বাধা পেরিয়ে কেউ যদি ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকতেন তাহলে অবাক হয়ে দেখতেন স্টুডিওর দরজায় পিকাসোর পোষা ডালকুত্তা বসে পাহারা দিচ্ছে আর স্টুডিওর ভেতর শিল্পী খালিগায়ে একদল শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে মিশে গল্প করছেন প্রাণখুলে। সঙ্গে সঙ্গে এঁকে চলেছেন একের পর এক ছবি যার যে কোন একটির দাম দিয়ে গোটা ছয়েক 'রোলস্ রয়েস' কেনা চলে।

আশ্চর্য! স্পেনের মালাগা থেকে মাত্র বাইশ বছর বয়সী যে তরুণ শিল্পীটি এই শতকের একেবারে গোড়ায় ভাগ্যান্বেষণে প্যারিসে এসে হাজির হন, তার সম্বলের মধ্যে ছিল কেবল লম্বা চওড়া একটা নাম, আর বাবার কাছ থেকে শেখা চিরাচরিত অঙ্কনরীতি। আমাদের চেনা পাবলো পিকাসোর পিতৃ-মাতৃদত্ত পুরো নামটা শুনলে বোধ হয় পুরাকালের জমকালো নামধারী রাজা-মহারাজারাও মূর্চ্ছা যেতেন।

'পাবলো দিয়েগোয়োসে ফ্রান্সিস্কো দা পল য়ুয়ান নেপোমুথেনো ক্রিসপ্যাঁ ক্রিস্পিয়ানো দ্য লা সান্তিসিমা ত্রিনিদাদ রুইথ্ ঈ পিকাসো' প্যারিসে এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। জয় যখন সম্পূর্ণ, পিকাসোর বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ। চিত্রশিল্পের সমগ্র ইতিহাসে এমনটি আর কখনো হয়নি।

এর মূলে ছিল তাঁর হাত দিয়ে এক নতুন
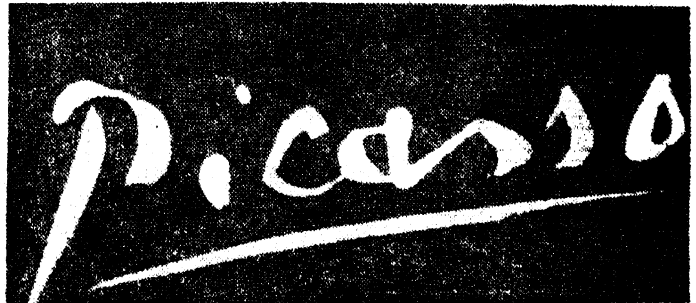
রীতির উদ্ভব। কিউবের সাহায্যে ছবিতে সামগ্রিকতার আভাস এনে এতদিনের প্রায় অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করে তুললেন তিনি। সৃষ্টি হল কিউবিজমের।

প্রায় মাথাজোড়া টাকের পেছন দিকে সামান্য ক'টি সাদা ধবধবে চুল। বেঁটে খাটো শক্তসমর্থ চেহারা। তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল তাঁর চোখদুটি। উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। যার দিকে তাকান, মনে হয় যেন তার অন্তস্তল অবধি দেখে নিচ্ছেন। ঠিক এমনি করে দেখেই তিনি চিনেছিলেন নাৎসীদের। ১৯৩৭ সালে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধের সময় নাৎসীদের বোমাবর্ষণে হাজার হাজার নিরীহ শহরবাসীর সঙ্গে নিরস্ত্র ছোট্ট শহর গোয়ের্নিকা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নিজে সেখানে থেকে যুদ্ধের যে বীভৎস রূপ তিনি দেখলেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিল তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ম্যুরাল 'গোয়ের্নিকা।' ১১½ ফুট চওড়া আর ২৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা বিরাট ক্যানভাসের গায়ে মাঝে মাঝে তিনি সেঁটে দিলেন সেদিনের খবরের কাগজের টুকরো। তার পর কেবল ধূসর আর কালো রং দিয়ে মৃত্যু ও যন্ত্রণার বিভীষিকাময় রূপ ফুটিয়ে তুললেন।

নাৎসীদের দৃষ্টিও তাঁর ওপর পড়েছিল। প্যারিস তখন হিটলারের দখলে। পিকাসোর চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে এসে নাৎসী অফিসার থমকে দাঁড়াল 'গোয়ের্নিকা'র সামনে। আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করল, 'এটাও কি আপনি এঁকেছেন?' পিকাসো অফিসারের চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, 'না, আপনারা।' প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হল। এর পরই পিকাসো যোগ দিলেন ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টিতে।

গোয়া, ভেলাসকোথ আর এল গ্রেকোর দেশের শিল্পী ফরাসী নাগরিকত্ব নিয়ে ফ্রান্সেই রয়ে গেলেন। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্পেনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। মনেপ্রাণে কিন্তু তিনি রইলেন খাঁটি স্পেনীয় হয়েই। সেই রকমই প্রাণখোলা কথাবার্তা, দরাজ গলার হাসি, শুধু রেগে গেলে অন্য মানুষ।

অঁরি মাতিস, জর্জ ব্রাক, এমিল জোলা, জাঁ কক্‌তো, জাঁ পল সারত্রে এইসব বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকরা ছিলেন তাঁর বন্ধু। কিন্তু এই ধরনের খুব বাছাই-করা কয়েকজন ছাড়া আর প্রায় কারও সঙ্গেই তাঁর তেমন আলাপ ছিল না। শুনলে অবাক হতে হয় যে, এই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী সারা বছরে টেলিফোন ব্যবহার করতেন মাত্র দশ কি বারো বার। আর চিঠি তো প্রায় লিখতেনই না বললে হয়। সমস্ত চিঠিপত্র, খবরাখবর আদান প্রদান চলতো তাঁর সেক্রেটারি মারফৎ।

শিল্পী বা কবিদের প্রিয় বোহেমিয়ান লাইফের প্রতি পিকাসোর কোনও আকর্ষণ ছিল না। দারিদ্র্যকে তিনি ঘৃণা করতেন। হয়তো বিশ্বের সর্বকালের সবচেয়ে ধনী শিল্পী বলেই অর্থের প্রতি তাঁর শিল্পী-সুলভ নিরাসক্তি দেখা যেত না। তাঁর স্টুডিওতে কাজ শিখতে হলে বিপুল পরিমাণে টাকা দিতে হত গুরুদক্ষিণা হিসাবে। অবশ্য টাকা পয়সা রাখার ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ তেমন ছিল না। তাঁর সেক্রেটারি অনুযোগ করতেন, পিকাসোর দেরাজে, টেবিলে, বিছানার ওপর প্রায়ই হাজার হাজার টাকা পড়ে থাকত অগোছালো ভাবে। এ বিষয়ে পিকাসোর বক্তব্য, অন্তত এক প্যাকেট সিগারেট কেনার পয়সা তো সবসময় পকেটে থাকা চাই। প্যারিসে প্রথম আসার সময়টুকু ছাড়া পিকাসোর আর কখনও টাকা পয়সার অসুবিধায় পড়তে হয়নি। কিছু দিন আগে নেওয়া একটা হিসাবে দেখা গিয়েছিল, ওঁর বার্ষিক আয় দশ লক্ষ ডলারেরও বেশি। ফরাসী রিভিয়েরার সবচেয়ে সুন্দর বাড়িগুলির মধ্যে দুটো পিকাসোর নিজস্ব। এছাড়া আরও গোটা ছয়েক বাড়ি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। তবু তাঁর তৃপ্তি নেই, তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবেন ছবির ওপর, গ্রাফিক-এর ওপর, ভাস্কর্যের ওপর।

নতুনের প্রতি এই অস্বাভাবিক আকর্ষণই তাঁকে বারবার সঙ্গিনী বদলে প্ররোচিত করেছে। ফার্নান্দে অলিভিয়ের, ইভা, ওলাগা কোকলভা, মেরী থেরেসা, ডোরা মার, ফ্রাঁসোয়া জিলো। একের পর এক নারী তাঁর জীবনে এসেছেন, আবার মিলিয়ে গিয়েছেন। প্রায় আশি বছর বয়সে তিনি শেষবারের মত বিয়ে করলেন তাঁর থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ছোট প্রাক্তন প্রণয়িনী জ্যাকলিন রোক্‌কে। তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাওয়ার ভয়ে নব্বই পার হওয়া শিল্পী বুড়োদের এড়িয়ে চলতেন। জরা তাঁর দেহে বাসা বাঁধলে তিনি যে আর কাজ করতে পারবেন না, এই চিন্তাই তাঁকে আকুল করে তুলতো।

অল্পবয়সে স্পেনের রাস্তায় বুনো ঘোড়ার ছবি এঁকে যে ছেলেটি হাত পাকিয়েছিল, সেই ঘোড়ার বন্য গতির নেশা বোধ হয় তার রক্তে ঢুকে পড়েছিল সারা-জীবনের মত। স্পীড...স্পীড—গতিই জীবন। একেবারে শেষ বয়স পর্যন্ত পিকাসোর চলাফেরা ছিল তরুণের মত ক্ষিপ্র আর স্বচ্ছন্দ। প্রায়ই দেখা যেত ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে খাটো স্নানের পোশাক পরে পিকাসো তাঁর ব্যক্তিগত সৈকত থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়ে সাঁতার কাটছেন দামাল ছেলের মত। অথবা শহরের রাস্তা দিয়ে তাঁর বিরাট ঝকঝকে আমেরিকান গাড়ি নিজে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তীব্র গতিতে। কিম্বা ছুটি কাটাতে স্পেনে গিয়ে স্ত্রী ছেলেমেয়ে, বন্ধুদের মাঝখানে বসে মাটাডোর আর ষাঁড়ের লড়াই দেখতে দেখতে উত্তেজনায় হাততালি দিয়ে উঠছেন ছেলেমানুষের মত।

কিন্তু যে পিকাসো কোনদিন থেমে থাকতে জানতেন না, তাঁকেও থামতে হল নিয়তির নির্দেশে। একানব্বই বছর ধরে যে শরীরযন্ত্রটা পিকাসোকে বুনো ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চলেছিল, হঠাৎ ব্রেক কষলো সেটি। ১৯৭৩-এর শেষ বসন্তের এক রবিবারে ভারতীয় সময় বিকেল চারটে বেজে দশ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন পাবলো পিকাসো—তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হল শতাব্দীব্যাপী পিকাসো যুগের আর বিশ্বের অন্যতম চিত্তাকর্ষক একটি ব্যক্তিত্বের। নব্বই বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে আর কেউ কি ওরকম পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারবেন "আই অ্যাম স্টিল ফিট টু ডু এনিথিং আই ওয়ান্ট।"

গানের আসর

সঙ্গীতশাস্ত্রে অতীত ও বর্তমান

সঙ্গীত শাস্ত্র অনেক রচিত হয়েছে। । যুগে ইতিহাস নির্ণয় করতে বা সঙ্গীত সম্বন্ধীয় বহু ব্যাপার বুঝতে আমরা এই সব শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু এই সব শাস্ত্রে এমন অনেক ব্যাপারও আছে যা আমাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। সবচেয়ে যেটা গোলমেলে ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই যে, বহু লুপ্ত ধারার উল্লেখ এই সব শাস্ত্রে ফলাও করে বর্ণিত হয়েছে অথচ একবারও বলা হয়নি যে সেগুলি শাস্ত্র রচনার বহু শতাব্দী পূর্বেকার বস্তু। যাঁরা ব্যাপকভাবে ইতিহাস চর্চা করেন না বা যাঁদের অভিজ্ঞতা বিস্তৃত নয়, তাঁরা সরল বিশ্বাসে সেগুলিকে এই সব শাস্ত্রের সমসাময়িক বলে ধরে নেবেন এবং তাঁরা এক বিষম প্রমাদে পড়ে যাবেন। কারণ, সেগুলি আদৌ সেই সময়কার নয় এবং তাঁদের সম্পূর্ণ ধারণাটাই ভুল ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, যেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এর কারণ হচ্ছে, যাঁরা শাস্ত্রকার তাঁরা ক্রমাগত এখান থেকে ওখান থেকে আহরণ করে গেছেন এবং সেগুলি নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা নিজেরাও বহুলাংশে এসবের তাৎপর্য বোঝেননি অথচ পাণ্ডিত্য জাহির করবার জন্য এই উপায়ে তাঁরা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করে গেছেন। কিন্তু এটা তো তাঁরা বুঝতেন যে, এই সব মেকি জিনিস গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে তাঁরা পাঠক তথা গবেষকদের বিভ্রান্ত করছেন। এই যে জ্ঞানকৃত পাপ তাঁরা করে গেছেন, আমাদের আগের যুগে তার সমালোচনা হয়নি, পরন্তু উক্ত প্রথাকেই পরিচিতি লাভের সহজতম উপায় বলে মনে করা হয়েছে। আজ যখন আমরা বহু সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করি তখন দেখি নির্ভর-যোগ্য বলতে মাত্র তিনটি সূত্রই বর্তমান—যথা, নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র এবং বৃহদ্দেশী। বাকিগুলি চোরাই মালে এমনভাবে ঠাসা যে চিন্তা করে বিশ্লেষণ না করলে কতটুকু তাঁদের ওরিজিন্যাল সেটা উদ্ধার করা শক্ত।

মুশকিল যে কতখানি সেটা নির্দিষ্ট করবার জন্য প্রসঙ্গত মাত্র একটি বিষয়েরই অবতারণা করছি। যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় এবং মূল অবলম্বন, আমাদের বর্তমান শুদ্ধ স্বরগ্রাম। আমাদের বর্তমান শুদ্ধ ঠাট এবং শাস্ত্রবর্ণিত ঠাটের মধ্যে তফাৎ আছে। বাইশটা শ্রুতি অনুসারে যতগুলি শাস্ত্র শুদ্ধ ঠাট দেখিয়েছেন সব-গুলিই বলতে গেলে আমাদের কাফী ঠাট; কিন্তু আমাদের শুদ্ধ ঠাট হচ্ছে বিলাবল এবং আমাদের গান্ধার ও নিষাদ হচ্ছে কাফী ঠাটের চেয়ে অপেক্ষাকৃত চড়া—সেকালের অন্তরগান্ধার এবং কাকলী নিষাদের মত। এই যে স্বরগ্রাম এ নিশ্চয়ই দু'একশো বছরের পুরোনো নয়—এর ঐতিহ্যও অনেকদিনের, অথচ এই সেদিনের রচিত শাস্ত্রও ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনা করেনি। অনেকে প্রাচীন শাস্ত্রকে অনুসরণ করে সেকালের যে সব রাগরাগিণীর পরিচয় পান সেগুলিকে কাফী ঠাট থেকে 'কনভার্ট' করে একটা ধারনা খাড়া করেন। অর্থাৎ, রত্নাকরে বা পারিজাতে যে বিস্তার দেওয়া আছে সেটা তৎকালীন শুদ্ধ কাফী ঠাটের পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিয়ে বর্তমান শুদ্ধ ঠাটের সঙ্গে বিচার করলে তার রূপটা কি দাঁড়াতে পারে, সেটা তাঁরা নির্ণয় করেন। এইভাবে অনেকে রাগরাগিণীর বিবর্তন সম্বন্ধে থিওরি সৃষ্টি করেছেন। শাস্ত্রগুলিতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেক রাগের স্বর-বিন্যাস দেওয়া আছে। কিন্তু সেগুলি প্রায়ই ভুলে ভরা। লিপিকার প্রমাদ তো আছেই, তাছাড়া কোন্ সূত্র থেকে এ'রা যে কি টুকছেন সেটিরও দিশা পাবার উপায় নেই। আরও বলতে হয়, রাগসমূহের যে লক্ষণ দেওয়া আছে তা যৎপরোনাস্তি সংক্ষিপ্ত হতে হয় তাই। এই রেফারেন্সের ব্যাপারেও গ্রন্থকারদের একটা কায়দা ছিল। গ্রন্থারম্ভে বহু পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ এবং পৌরাণিক সঙ্গীতাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উল্লেখ করা হত, যাতে পাঠকগণ সহজেই বোঝেন যে এ'দের বর্ণিত তত্ত্ব থেকেই গ্রন্থকার নিয়েছেন। কিন্তু এটাও একটা বড় রকমের ফন্দীবাজি, কারণ গ্রন্থ থেকে কিছুতেই বোঝা যাবে না, কোন সূত্র থেকে কী এসেছে। যেখানে 'ভরতবচনাৎ' আছে সেটা গ্রন্থকারের নয়, তিনি কয়েকশো বছর আগেকার যে পুঁথি থেকে এ অংশটুকু টুকেছেন সেই গ্রন্থের উক্তি। তিনি আবার কোথা থেকে টুকেছেন—সেটা গবেষণার বিষয়। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে সমসাময়িক পরিস্থিতি জানাতে গ্রন্থকারদের দ্বিধার অন্ত ছিল না। অতএব এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, নামে সঙ্গীত শাস্ত্রকার হলেও এ'দের যথার্থ সঙ্গীত-বোধ এবং সঙ্গীতচিন্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন একটা সন্দেহ দেখা দেয় এই দ্বিধাবোধ এবং গোপনতার প্রয়াস লক্ষ করে।

সঙ্গীতরত্নাকর ঘটা করে অনেক গ্রামরাগ সমন্বিত গানের স্বরলিপি পেশ করেছেন। কিন্তু সেগুলি যে সমসাময়িক নয় তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। একটি উদাহরণ — 'উদয়গিরিশিখর শেখর তুরগখুরক্ষত বিভিন্ন ঘনতিমিরঃ। গগন-তলসকল বিলুলিত সহস্র কিরণো জয়তু ভানুঃ॥' এটি আসলে কোনও সংস্কৃত নাটকের ধ্রুবা গান। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন ধ্রুবাবহুল সংস্কৃত নাটক নিশ্চয়ই এত

প্রচলিত ছিল না যে সাধারণ্যে খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় সেগুলি প্রায়ই গাওয়া হত। তা ছাড়া যে স্বরলিপি উদ্ধৃত হয়েছে তার চিহ্নাদি দোষযুক্ত এবং গ্রন্থকার এই সব স্বরলিপির সম্পাদনার কাজ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। এই রকম বহু ত্রুটিপূর্ণ আলাপ, করণ প্রভৃতির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে। কারণ, পূর্বেই বলেছি উদ্ধৃতির প্রয়োজন গ্রন্থকারের ছিল কিন্তু বিচারের দায়িত্ব নয়। যিনি নিজেকে নিঃশঙ্ক বলে প্রচার করেছেন তাঁর শঙ্কা কতখানি ছিল এসব ব্যাপারে সেটি স্পষ্ট বোঝা যায়। এইভাবেই তদীয় গ্রন্থে কয়েকটা জাতিগান তথা অপরাপর প্রাচীনতম সংগীতের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধসঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনুরূপ উদাহরণ দেওয়াটা ইনি কর্তব্য মনে করেন নি। অর্থাৎ যেগুলি নিজের দায়িত্বে সংগ্রহ করতে হবে, সেখানে কোনও প্রয়াস লক্ষগোচর হয় না। এর গূঢ় কারণ সেখানে ভুল ভ্রান্তি ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে সংগীত লুপ্ত হয়েছে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ নানা গ্রন্থ থেকে আহরণ করে দেওয়া সহজ, কারণ তাতে কোনও 'রিস্ক' নেই। কেউ তো সেগুলি যাচাই করে নিতে পারবে না। আসলে রত্নাকর রচিত হবার সময় আমাদের শুদ্ধ ঠাট কিরকম ছিল, প্রচলিত রাগসংগীত কিরকম ছিল তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

এর বহুকাল পরে রচিত সঙ্গীত পারিজাতেও ওই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এখানেও শুদ্ধ বলতে সেই কাফী ঠাটকেই বোঝানো হয়েছে, সেই পুরোনো ধারারই ইতর বিশেষ এই গ্রন্থেও চলে এসেছে। সমসাময়িক পদ্ধতিগুলিকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন ধারাগুলির বর্ণনা বিশেষ প্রয়োজন একথা সকলেই স্বীকার করবেন, কিন্তু বর্তমানকেও যে তার সঙ্গে তুলনা করে দেখানো সমান ভাবেই প্রয়োজন। অনেকের অনুমান পারিজাত সপ্তদশ শতকের পরের দিকের রচনা। এ গ্রন্থ অহলে তানসেনের অনেক পরের রচনা। তানসেন মারা যান ১৫৮৯ সালে (আকবরনামা)। তানসেনের সময় বর্তমান ঠাটই যে প্রচলিত ছিল এটা অনেকের বিশ্বাস সেনী ধ্রুপদের ঐতিহ্য এবং গায়নবৈশিষ্ট্য অনুশীলন করে। কিন্তু পারিজাতের রচয়িতা সেই সব দিক একেবারে মাড়াননি। তাঁর গ্রন্থ যেন মধ্যযুগের প্রারম্ভে যে ধরন ধারণ ছিল তাকেই অনুসরণ করেছে। তানসেন, নায়ক বৈজু, —এঁরা ব্রজভাষাতেই গান লিখে গেছেন, সে সব গান তো রীতিমত আধুনিক।

তাল সম্পর্কেও একই প্রশ্ন জাগে। শাস্ত্রগুলি দেশীতালের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে বহু আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমান তালপ্রদানের রীতিপদ্ধতি কবে থেকে প্রচলিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনাও এই সব শাস্ত্রগ্রন্থে কিছুই পাওয়া যায় না। অনেকেরই ধারণা বর্তমান মাত্রাগণনা ও তালপদ্ধতি তানসেনের সময় ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে—না হলে এই ধারাটি এমনভাবে বরাবর চলে আসত না।

দেখা যাচ্ছে, আমাদের বর্তমান স্কেল এবং তাল দেবার পদ্ধতি—এই দুটির ঐতিহ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। সঙ্গীত শাস্ত্র থেকে এসম্বন্ধে কোনও আলোকপাত করা হয়নি, পরন্তু নানা বিষয়ে বিপরীত সিদ্ধান্তের অসার বহু ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ করে রেখে গেছেন এলোমেলো প্রক্ষেপের বাহি অবলম্বন করে। এই লেখকের মনে হয়, বর্তমানে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করা আবশ্যক যাতে পুরাতন ও বর্তমানের একটা পুরোপুরি সমন্বয় থাকে এবং ভবিষ্যতে গবেষকগণ সুপথে পরিচালিত হতে পারেন। যাঁরা সংস্কৃত শাস্ত্রাদির অনুবাদ বা সম্পাদনায় ব্রতী হবেন তাঁদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত সমস্ত অসঙ্গতিগুলি দেখিয়ে দেওয়া এবং কোনটা প্রাচীন, কোনটা গ্রন্থকারের সমসাময়িক সেটি বিশ্লেষণ করে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

শার্ঙ্গদেব

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ

শ্রীসমরজিৎ কর সাপ্তাহিক দেশ-এ (৩১ মে ১৯৭৫) মহাবিশ্বের সংপ্রসারণ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

ডঃ বিয়াত্রিস টিনসলের মতে দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জগুলির গতিবেগ কমে আসছে না বরং দেখে মনে হয় তাদের গতিবেগ যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালে এডুইন হবেল্ট প্রথম আবিষ্কার করেন যারা আমাদের নিকটতম নক্ষত্রপুঞ্জ তারা যতটা দ্রুত সরে যাচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে দ্রুত সরে যাচ্ছে যেসব নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব অনেক বেশী তারা। এইসব তত্ত্ব থেকে অনেক বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন, "কেউ বলতে পারেন না, এই সম্প্রসারণ কতদিন ধরে চলবে। বরং সব কিছু দেখে এটাই তো মনে হয় এর যেন কোন শেষ নেই। যার অর্থ বর্তমানের এই মহাবিশ্ব হয়ত চিরকাল শুধু সম্প্রসারিতই হতে থাকবে। সংকোচনের কোন প্রশ্নই ওঠে না"।

আলোচনা

একটু ভেবে দেখলে আমাদের জানা সম্ভব এইসব বিজ্ঞানীরা যুক্তিগতভাবে কোথায় ভুল করেছেন।

প্রথমত আমাদের মনে রাখা দরকার যে, Big Bang তত্ত্ব যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জগুলির গতিবেগ আজকে যা আছে তা দেখি না বরং তাদের গতিবেগ কোটি কোটি বছর আগে যা ছিল তাই দেখি।

ব্যাকরণিক অর্থে এটা বলা ভুল যে, দূরবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জগুলি দ্রুতগতিতে দ্রুত সরে যাচ্ছে—সঠিক বলা উচিত যে, এরা দূরে সরে যাচ্ছিল। এদের আজকের গতিবেগ জানা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ আলোক বা অন্য কোন radiation যা এই নক্ষত্রপুঞ্জগুলি থেকে আজ ত্যাগ করছে তা আমাদের পৃথিবীতে বা নক্ষত্রপুঞ্জে (Milky Way-তে) পৌঁছবে হয়ত কোটি কোটি বছর পরে। Big bang তত্ত্ব সঠিক হলে আমরা আরো প্রত্যাশা করব যে, দূরতম নক্ষত্রপুঞ্জগুলি আমাদের পৃথিবীর তুলনায় এই অতিকায় বিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থলের অনেক কাছে থাকত (ছিল)। আর যদি তাই হয় তা হলে Distribution of Galaxies in the space-এর প্রশ্নে দূরতম নক্ষত্রপুঞ্জগুলি আকাশের কোন অংশের কাছাকাছি থাকবে (ছিল), কারণ এদের সবারই দূরত্ব Big bang-এর কেন্দ্রস্থল থেকে বেশী দূরে হতে পারে না।

অতিকায় বিস্ফোরণের এবং নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি হওয়ার কিছু সময় পরেও তাদের গতিবেগ থাকবে খুব বেশী এবং মহাবিশ্বের ঘনত্বও থাকবে আজকের চেয়ে অনেক বেশি। তারপর আস্তে আস্তে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের ফলে তার ঘনত্ব যাবে কমে ও নক্ষত্রপুঞ্জগুলির গতিবেগ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ক্রমশ কমতে থাকবে।

প্রশ্ন হল, কোন্ নক্ষত্রপুঞ্জগুলির গতিবেগ ও মহাবিশ্বের কোন্ অংশের ঘনত্বের অনুসন্ধান করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে মহাবিশ্বের গতিবেগ ও ঘনত্ব কমে আসছে বা বাড়ছে। আমরা যদি ভুলে যাই যে দূরতম নক্ষত্রগুলি Big bang-এর কেন্দ্রস্থলের কাছে আর আমাদের Milky Way Space-এর দূরত্ব নিয়ে না হোক অন্তত সময়ের (time scale) বিচারে Big bang-এর কেন্দ্রস্থল থেকে সবচেয়ে দূরে, তা হলে আমরা দূরতম নক্ষত্রপুঞ্জগুলির গতিবেগ ও ঘনত্ব বিচার করে দেখার চেষ্টা করব মহাবিশ্বের গতি কমে আসছে বা বাড়ছে। জর্জ গ্যামো বেশ কিছু বছর আগে (দ্রষ্টব্য—Die Geburt des Alls-Munich 1959) ও এখন ডঃ টিনসলে সেই ভুলই করেছেন। দূরতম নক্ষত্রপুঞ্জগুলির গতিবেগ যদি velocity-distance relationship বা Hubble's law-র অনুপাতে অপেক্ষাকৃত-ভাবে কমতে থাকে তা হলে বুঝতে হবে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের গতিবেগ আগের চেয়ে পরে বৃদ্ধি পেয়েছে, আর এই নক্ষত্র-পুঞ্জগুলির গতিবেগ velocity-distance relationship এর অনুপাতে অপেক্ষাকৃত-ভাবে বাড়তে থাকলে বুঝতে হবে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের গতিবেগ কমতে আরম্ভ করেছে, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইনস্টাইনের General Theory of Relativity-র মতানুসারে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ চিরকাল চলতে পারে না। ধরে নেওয়া যাক, আজ থেকে দশ বছর পরে মহাবিশ্বের সংকোচন আরম্ভ হবে। কোন্ নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারব যে এই সংকোচন আরম্ভ হয়েছে? কোন নক্ষত্রপুঞ্জ যদি আমাদের Milky Way থেকে মাত্র পাঁচ আলো-বৎসর দূরে থাকে (এত কাছে অবশ্য প্রকৃতপক্ষে কোন নক্ষত্র-পুঞ্জই থাকতে পারে না) তা হলে পনের বছর পরে আমরা এই নক্ষত্রপুঞ্জকে আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে আসতে দেখব—(violet

shift), কিন্তু তখন যদি আমরা দূরতম নক্ষত্রপুঞ্জগুলির দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের দূরে সরে যেতেই দেখব; কারণ আমরা সব সময় এই নক্ষত্রপুঞ্জগুলির অতীতই শুধু দেখতে পাই। এণ্ড্রোমিডা নীহারিকা (Great Andromeda Nebula কিম্বা M 31) আমাদের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিবেগে এগিয়ে আসছে (আসছিল কারণ এই নীহারিকার দূরত্ব আমাদের পৃথিবী থেকে ১৮ লক্ষ আলোক-বৎসর)। এটা কী random velocity (যে গতিবেগ মহাবিশ্বের সংকোচন বা সম্প্রসারণের অংশ নয়) না মহাবিশ্বের সঙ্কোচনের প্রমাণ?

ডঃ সত্যব্রত সেন
(২) হাসবুগ-৫৩

গীতিনাট্য

গত ১৪ই জুনের 'দেশ'-এ গানের আসর বিভাগে 'গীতিনাট্য' বিষয়ে শার্ঙ্গদেব যা লিখেছেন তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই।

শার্ঙ্গদেবের মতে গীতিনাট্য বর্তমানে খুবই অবহেলিত। কিন্তু আমার মতে গীতিনাট্য বর্তমানে অবহেলিত নয়। এখন বাঙালীরা রবীন্দ্র গীতিনাট্য এবং অন্যান্য রচয়িতা ও সুরকারের গীতিনাট্যের দিকে বেশী ঝুঁকেছেন। তাই হিজ মাস্টার ভয়েস ও অন্যান্য রেকর্ড কোম্পানী প্রতি বৎসর পুজার সময় একটি করে গীতিনাট্যের রেকর্ড করেন এবং সেগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়। তাছাড়া এখন কলকাতা শহরে ও মফঃস্বলে গীতিনাট্যের দিকে জনসাধারণের খুবই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া এই মেদিনীপুরে প্রতি বৎসর অনেকগুলি গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান হয় ও দর্শক সেইগুলি টিকিট কিনে শোনেন এবং মেদিনীপুরের স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে তার সমালোচনা প্রকাশ করা হয়। এর দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে গীতিনাট্য বর্তমানে অবহেলিত নয়।

শার্ঙ্গদেব আরও বলেছেন যে, গীতিনাট্যের উনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষ সমাদর ছিল কিন্তু আমি মনে করি যে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতে গীতিনাট্যের বেশী সমাদর হয়েছে। প্রধানত রবীন্দ্রনাথই হলেন গীতিনাট্যের প্রতিষ্ঠাতা। উনবিংশ শতাব্দীতে গীতিনাট্যের খুব একটা কদর হয়নি। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পর (১৯১৩ সাল) থেকে তাঁর গীতিনাট্যের কদর হয়েছিলো এই দেশে। আর উনবিংশ শতাব্দীতে একমাত্র শান্তিনিকেতনেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল এই গীতিনাট্য। আর খুব কম জায়গাতেই এই গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করা হতো। বর্তমানে রবীন্দ্র গীতিনাট্যের সবগুলোই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আসরে মঞ্চস্থ করা হয়েছে এবং হচ্ছেও। আর সেগুলো বসোত্তীর্ণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। বেতারে যে সমস্ত গীতিনাট্য প্রচারিত হয় সেগুলো সবই রবীন্দ্রনাথের বা নামকরা গীতিকার এবং সুরকারের রচনা। যদি বর্তমান আকাশবাণী নতুন নতুন গীতিনাট্য রচয়িতাদের পূর্ণ সুযোগ দেন তবে গীতিনাট্য অন্য মোড় নেবে আর কিছু লোকের একচেটিয়া প্রভাব থেকে বেতার বিভাগ মুক্ত হবে। শেষে শার্ঙ্গদেবকে গীতিনাট্য বিষয়ে লেখবার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নীলাঞ্জন কুমার
কর্নেলগোলা, মেদিনীপুর।

চিত্রগত কাহিনী

গত ৩১শে মে ১৯৭৫-এর দেশ-এ (৪২ বর্ষ-এ সংখ্যা ৩১) শ্রীনীরোদ রায়ের চিত্রগত কাহিনীটি নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক; বিশেষ করে কাহিনীগত চিত্রটি। তবে এ সম্বন্ধে বিনীতভাবে একটু বলার আছে। প্রথমেই বলা হয়েছে ফটোখানা ১৯৫২ সনে তোলা হয় ভারত-সিকিম সীমান্তে স্বর্গত নেহরুজী ও বিধান রায় প্রমুখ আরও গণমান্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে সিকিমের অধিপতির সাক্ষাতের সময়। এর পরেই লেখকের কথামতো জানা যায় ১৯৫৩ সনের ভারত-সিকিম চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতেই নেহরুজীর এই সিকিম ভ্রমণ। কথাটা একটু বিভ্রান্তিকর নয় কি? ১৯৫৩ সনের চুক্তির ফলস্বরূপ ১৯৫২ সনে ভ্রমণের যুক্তি কোথায়?

দ্বিজেন্দ্রলাল বণিক
তেজপুর, আসাম

পুনর্মুদ্রিত কবিতা প্রসঙ্গে

ডাইরীর পাতা উল্টে দেখতে পাচ্ছি 'চাইবাসায় দীর্ঘ বিষাদ' কবিতাটি দেড় বছর পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম এবং কবিতাটির মনোনয়ন পত্র পেয়েছি ছ' মাস পরে। এক বছরের মধ্যে 'দেশ' পত্রিকা থেকে মনোনয়ন বা অমনোনয়নের কোন পত্র না পাওয়ার কারণে অন্য পত্রিকায় ছাপাতে দিই। এবং সেই পত্রিকাটি থেকেই 'এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৭৪' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে আমার মতামত চাওয়া হয়েছিল না, যেহেতু পত্রিকা থেকে ওঁরা সংগ্রহ করে নিচ্ছেন তাই আমার কোন আপত্তি ছিলো না।

সুরজিৎবাবু হয়তো বলবেন, লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবার পর 'দেশ'কে পত্র দিয়ে কবিতাটি মুদ্রণ করার ব্যাপার নিষেধ করতে পারতাম। আমি এ-ক্ষেত্রে জানাচ্ছি, একজন অখ্যাত অজ্ঞাত কবি হিসাবে 'দেশ' পত্রিকায় নিজের কবিতা দেখার বাসনা সংবরন করতে পারিনি। সহৃদয় পাঠক আশা করি আমার এই ত্রুটি সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে আমার উপর ক্ষোভ রাখবেন না।

অজিত বাইরী
হাওড়া

আমার স্মৃতিতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রসঙ্গত

প্রতিভা বসু

॥ ৬ ॥

দেশে ফেরার আনন্দে আযৌবন প্রবাসী সুধীন ঘোষ তাঁর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতকালের কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'একেবারে ছাড়বার দরকার কী, ছুটি নিয়ে গিয়ে দ্যাখো থাকতে পার কিনা, এতোকাল এদেশে থেকে দেশের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারো কিনা—'

সুধীন ঘোষ হেসেই অস্থির, 'বলছো কি তুমি? নিজের দেশে যাবো তার মধ্যে আবার খাপ খাওয়ানোর প্রশ্ন কী হে?'

কিন্তু সত্যিই যখন খাপ খাওয়াতে পারলেন না তখন বড়ো অসহায় হ'য়ে পড়লেন। লেখাপড়ার মানুষ, বই কেনা ছাড়া আর কোনো সঞ্চয়ের কথাই ভাবেননি কখনো, তার উপরে বহু বছর যাবৎ স্ত্রী ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। সুইৎসারল্যাণ্ডের কোনো স্যানিটোরিয়ামে থাকেন তিনি, মাস্টারির টাকায় সেই ভার বহন ক'রে খুব কিছু বাঁচেও না, এ অবস্থায় কোথায় বাস করেন, কোথায় আহার করেন, সেটাই সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো। যদিও তিনি একদা ধনীর সন্তানই ছিলেন, তখনো ডোভার লেনের অর্ধেক জুড়ে, তাঁদেরই বাসগৃহ, কিন্তু সেই মালিকানায় তাঁর কোনো এক্তিয়ার ছিলো না, কেননা অতি অল্পবয়সেই বিদেশে চলে যান এবং একটি বিদেশিনী বিবাহ ক'রে সেখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা হন। তাঁর কাছেই শুনেছি, বিদেশিনীকে বিবাহ করার অপরাধেই পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। তাঁর পিতামহ রাসবিহারী ঘোষের নামেই রাসবিহারী অ্যাভেনিউ।

প্রহৃত হওয়ার ফলে একটি চোখ তাঁর অন্ধ হয়ে যায়। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় তিনি এসেছিলেন আমাদের বাড়ি, তাঁর দিকে তাকিয়ে আমাদের মুখে আর কথা সরছিলো না। বললেন, 'আর কিছু ভেবে না পেয়ে লণ্ডনে ছাত্রদের কাছেই সব অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখে দিয়েছি, ওরা তো আমাকে ভালোবাসতো, দেখা যাক কিছু করতে পারে কিনা।'

তা কিন্তু পারলো, ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দিল ফিরে যাবার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় আবার তাঁকে বসিয়ে দিলো তাঁর প্রাক্তন চেয়ারে।

এর পরে আমাদের সঙ্গে আরো দু'বার দেখা হ'য়েছিলো, লণ্ডন শহরে তাঁর সঙ্গে আমরা অনেক ঘুরেছি, অনেক সময় কাটিয়েছি, খেয়েছি, তাঁর বাসগৃহে অবসর যাপন করেছি। এমন সহজ সরল নিরহংকার সজ্জন ব্যক্তি কদাচ চোখে পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেশ থেকে তাড়িত হ'য়েও দেশে ফেরার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা অদম্য ছিলো। দেখা হ'লেই বুদ্ধদেবের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'সাহেব, একটা কিছু জুটিয়ে দাও না, ফিরে যাই, বড্ড যেতে ইচ্ছে করে।' বুদ্ধদেবকে উনি আবেগ হ'লেই সাহেব সম্বোধন করতেন, কিন্তু জানতেন না সাহেবের ক্ষমতা কতো কম, না হ'ব কতো কম জনপ্রিয়।

দিল্লী থেকে ফিরে সত্যেনদা এসেছিলেন একদিন। ঘটনাটা তিনি দিল্লীতে বসেই জেনেছিলেন, জেনে বেশ বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। অসম্মানের বেদনায় তাঁর সদা প্রফুল্ল মুখে হাসি ছিলো না, কণ্ঠস্বরে হতাশা ছিলো, বিবেক দংশনও ছিলো খানিকটা কেননা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে তিনিই তাঁর বন্ধুত্বের দাবীতে নিয়ে এসেছিলেন কাজ ছাড়িয়ে।

অনেক পরে বললেন, 'বুদ্ধ না গিয়ে ভালোই করেছিলো।'

এর পরেই তিনি জাতীয় অধ্যাপকের পদে বৃত হন, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর ক্ষণিক সংস্রবের অবসান ঘটে।

এই ঘটনাটা বোধ হয় ষাট সালের ব্যাপার, উনষাটও হতে পারে, আমার ঠিক মনে নেই। একষট্টি সালে আমরা আবার কিছুদিনের জন্য বিদেশে চলে যাই। বুদ্ধদেব যান নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত অধ্যাপক হ'য়ে, আমি সঙ্গী। সুবিধার মধ্যে এই, স্ত্রী হিসেবে আমার যাতায়াতের খরচও তাঁরা বহন করেছিলেন। এবং লেখক হিসেবে আরো কিছু সুবিধা পেয়েছিলাম। তাছাড়া সেটা ছিলো রবীন্দ্র-নাথের শতবার্ষিকীর বছর, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলো বুদ্ধদেবকে সুতরাং আমাদের গতিবিধি কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই আবদ্ধ ছিলো না। গিয়েছিলাম পূর্বতট হয়ে, ফিরেছিলাম পশ্চিমতট দিয়ে।

কিন্তু ফিরেই, জন্মভূমির মৃত্তিকায় পা দিয়েই এই পৃথিবী ভ্রমণের সুখ এবং সার্থকতা ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেল। হতচকিত হয়ে জানতে পারলুম বাংলাদেশের

সমস্ত কাগজ একযোগে আমার স্বামীকে এই বলে মুণ্ডপাত করছেন তিনি নাকি সারা জগৎ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের নিন্দে করে বেড়াচ্ছেন। এবং এই নিন্দে শোনার জন্যই এতো টাকা দিয়ে তাঁকে সপরিবারে সর্বত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই অর্বাচীন সংবাদের যে কাগজ প্রথম জন্মদাতা তার নাম যুগান্তর।

বুদ্ধদেব অট্টহাস্য করে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'রাণু তোমার মনে আছে, একবার কলকাতায় কলেরা হয়ে খুব লোক মরছিলো, রবীন্দ্রনাথ দেখা হতেই বলেছিলেন, 'তোমাদের দেশে বড়ো গো-মড়ক লেগেছে গো।' তা গো অনেক থাকতে পারে, তাদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? মানুষও তো আছে কিছু?

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল মানুষের সংখ্যা অতি কম। ঘোঁট পাকাবার গন্ধ পেলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করতে তারা কেউ পিছ-পা নয়। একমাত্র দৈনিক পত্রিকা আনন্দবাজার ব্যতীত ছোটো বড়ো মেজ-সেজ এমন কোনো কাগজ রইলো না, এই মিথ্যার বেসাতি করে যারা একটা উৎকট রকমের ফুর্তি উপভোগ না করলো। বিকেলে 'টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম' চেঁচিয়েও কুৎসিৎ কদর্য ভাষায় গালি গালাজ উদ্গার করতে লাগলো। বুদ্ধদেবের সহলেও আমাদের সহ্য অতিক্রান্ত হলো।

যতোদূর মনে পড়ে, প্রথম সংবাদটি যুগান্তর এইভাবে রটনা করেছিলেন যে, বুদ্ধদেব বসু অমুক তারিখে যখন প্যারিসে গিয়ে সদর্প বিবৃতি দেন যে রবীন্দ্রনাথের নিন্দে করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন সেখানকার ছাত্ররা এই অন্যায় সইতে না পেয়ে তাঁর হাত থেকে 'পেপার' কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।'

আর বাংলাদেশ যখন এই সংবাদে উত্তাল, আমরা তখনো প্যারিসে গিয়ে পৌঁছুইনি। লণ্ডনে ছিলাম এবং সেই সময় যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক বন্ধুবর দক্ষিণারঞ্জন বসুও লণ্ডনে সফর রত ছিলেন। একাধিকবার সেখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে এবং আমাদের আগেই তিনি প্যারিসে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে আবার দেখা হলো। বক্তৃতার দিন তিনিও উপস্থিত ছিলেন সেই সভায়। অথচ দেশে ফিরে (আমাদের আগেই ফিরেছিলেন) কেন যে এই মিথ্যাকে খণ্ডন করে তিনি কিছু বললেন না সে কথা ভেবে আমি এখনো অবাক হই।

আমরা ফিরে আসার পরে এম সি সরকারের স্বত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকার বুদ্ধদেবের সম্মানে তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। জ্ঞানীগুণী অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বোধ হয় অসূয়াসম্পন্ন নিন্দা নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধেই ছিলো তাঁর এই সমুচিত জবাব, তাদের প্রজ্জ্বলিত ইন্ধনে এই জবাব দিয়েই তিনি ভস্ম নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন বসুও ছিলেন। বক্তৃতামালা বিষয়ে অনেক ধরনের কথাবার্তা হলো, অনেক উত্তর প্রত্যুত্তর হলো কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন বসু ঐ প্রসঙ্গে একবারের জন্যও মুখ খুললেন না।

অবশ্য অব্যবহিত পরেই সুধীর সরকারের মধ্যস্থতাতেই তুষারকান্তি ঘোষ একদিন তাঁর বাগানবাড়িতে বুদ্ধদেবকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'কাজের তীর ছুটে গেলে কি তাকে আর ফেরানো যায়?'

কিন্তু সেই তীর যে আমাদের জীবনকে কিছুকাল পর্যন্ত কী বিষময় করে তুলেছিলো তার কোনো বর্ণনা নেই। বন্ধু-বান্ধব ভক্ত শিষ্য আত্মীয় পরিজন প্রত্যেকেই অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ছুটে এসেছিলেন, একটা প্রতিবাদের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন বুদ্ধদেবকে। বুদ্ধদেব হেসে উড়িয়ে দিলেন, তাঁর বক্তব্য, এই নোংরামির কোনো জবাব দেয়া মানেই তাদের গ্রাহ্য করা, ততোটা নীচে নামতে কোনো কিছুর বিনিময়েই তিনি রাজী নন। শেষে কি সমতটে দাঁড়িয়ে এদের সঙ্গে এক গোত্র হবেন? তার চেয়ে তো মৃত্যু ভালো।

'না, তবু এই অন্যায়ের একটা প্রতিকার হওয়া দরকার।' একদিন সকালে সুধীরচন্দ্র সরকার তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অতিশয় উত্তেজিতভাবে একথা বললেন।

বুদ্ধদেব বললেন, 'কী প্রতিকার আমি করতে পারি, বলুন?'

'আপনি মামলা করুন।'

'মামলা!'

আমি বললাম, 'মামলা করবো এমন টাকা আমাদের কোথায়?'

সুধীরবাবু দ্বিধাহীনভাবে বললেন, 'টাকার জন্য ভাববেন না, টাকা আমি দেব। আপনারা মানহানির মামলা আনুন। আর চুপ করে থাকা উচিত নয়।'

এ কথায় আমরা দুজনেই অত্যন্ত অভিভূত হলাম, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। এমন নিঃস্বার্থ গুণগ্রাহী উদারচেতা মানুষ তো সংসারে অবিরল নয়!

বুদ্ধদেবের শত্রুর অভাব কোনো দিনই ছিলো না। চিরকাল সমকালের চেয়ে অধিক অগ্রসর এই সাহিত্যকর্মী আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে লেখা গল্প 'রজনী হলো উতলা' এবং কবিতা 'বন্দীর বন্দনা' থেকে শুরু করে এই সেদিনও 'রাত ভরে বৃষ্টি' পর্যন্ত একইভাবে নির্যাতিত হয়ে এসেছেন। 'রজনী হলো উতলা' যখন লেখা হয়, লেখকের বয়েস ছিলো সতেরো। সজনীকান্ত দাস একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ব্যক্তিগত আক্রমণ কিছু করতেই বাকী রাখলেন না। একটি কিশোরকে জন্মের মতো তাঁর সাহিত্যজগৎ থেকে বিতাড়িত করবার পক্ষে যতো রকম যতো সম্ভব তাই করা হয়েছিলো তখন। শেষ পর্যন্ত গল্পটিকে শুধু অশ্লীলতার দায়েই নয়, চুরির দায়েও দায়ী করা হলো। বলা হলো গল্পটি স্টিফেন ৎসোয়াইগের গল্প থেকে হুবহু চুরি। বঙ্গালীরা ইংরিজি জানে, কিন্তু ৎসোয়াইগ নিশ্চয়ই বাংলা জানেন না। নইলে বলা যেত একটি বাঙালী লেখক যেটা ১৯২৬ সালে লিখে সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে চোরের কিল খাচ্ছেন, একটি অস্ট্রিয়ান লেখক সেই গল্পই ১৯৩১ সালে কী করে লিখলেন? চোর বললে তো তাঁকেই বলতে হয়।

তাতে কী? প্রমাণ তো হয় পরে, কিন্তু মিথ্যা রটনার তাৎক্ষণিক প্রভাব যে কী
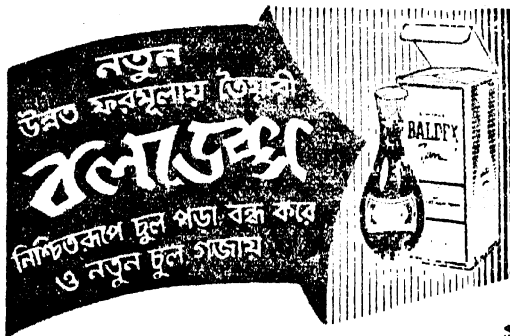
ভীষণ তা শুধু ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে জানে?

এর পরেই 'বন্দীর বন্দনা'। এবার সজনীকান্ত ক্ষিপ্ত হয়ে একার লড়াইতে আবদ্ধ না থেকে নালিশ পাঠালেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে, যাতে তিনি নিজে হস্তক্ষেপ করে এই অনমনীয় ছোকরাকে তাঁর ভাষার চাবুকে বেশ ভালো মতো শায়েস্তা করেন।

তা তিনি করলেন না, উপরন্তু 'বন্দীর বন্দনা' যখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হলো, 'নবীন কবি' প্রবন্ধে অন্যান্য প্রশংসার সঙ্গে এমন লাইনও লিখলেন, 'এই রচনাগুলি জলভরা ঘন মেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত।' ব্যস্, আর যাবে কোথায়, অগ্নিতে একেবারে ঘৃতাহুতি। পদ্যে গদ্যে এমন অশালীন অসম্মানকর ভাষায় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে সেই মাননীয় ব্যক্তিটিকে জর্জরিত করা হতে লাগলো যে মনে হলো গিয়ে একটা থাপ্পড় মেরে আসাও এদের পক্ষে কঠিন কর্ম নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য, এখনকার এই সব রবীন্দ্র-ভক্তির পরাকাষ্ঠরা, যারা বুদ্ধদেব বসু কোথায় কত হাজার মাইল দূরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিন্দে করে এসেছেন রটিয়ে চার পায়ে লাফিয়ে ঘাড় কামড়ে ধরেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই তখন সাহিত্য যশ-লিপ্সু যুবক, কিন্তু সেই যুবকরা অথবা কিঞ্চিৎ বয়স্করা রবীন্দ্রনাথের সেই অপমান চাটনির মতোই আস্বাদন করে আরো কিছু শোনবার আশায় নিঃশব্দ অনুমোদনের দ্বারা সজনীকান্ত দাসের ঐ কেচ্ছার কাগজটিকে নানা উপাচারে বছরের পর বছর পুষ্ট করে এসেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রতি কার যে কতখানি ভক্তি, সততার মাপকাঠিতে কে যে কতখানি উত্তীর্ণ তার হিসেব না হয় থাক, কিন্তু বুদ্ধদেব বসু নামক লোকটিকে যে কিছুতেই এই আটচল্লিশ বছরের চেষ্টায়ও উন্মূল করা গেল না সেই ঈর্ষাতেই দগ্ধ হয়ে এরা আর টিঁকতে পারছিলো না। একটা মরণ কামড় দিয়েছিল, বোধ হয় শেষ চেষ্টা হিসেবে।

সুধীরবাবুর প্রস্তাবে তখনই কিছু সিদ্ধান্ত না নিলেও বাড়ি ফিরে এসে বুদ্ধদেব মনস্থির করলেন। অনুভাষীদের শাস্তি দেবার এই উপায়টিই তাঁর একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ বন্ধু এসে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন প্রত্যেক দিন প্রতিটি কাগজ কিনতে হবে, প্রতিটি লেখা পড়তে হবে, প্রতিটি আপত্তিকর অক্ষরের তলায় দাগ দিয়ে রাখতে হবে।

এর পরে আমরা, বাড়ির অধিবাসীরা একটা নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হলুম। এত বিশ্রী ছিলো সেই কাজ, এতো জঘন্য লাগতো সেই সব অক্ষর চোখে দেখা, পয়সা দিয়ে খুঁজে খুঁজে সেই সব নিকৃষ্ট কাগজ কেনার যন্ত্রণা এতো অসহ্য বোধ হচ্ছিলো যে, এই বাধ্যতামূলক বীভৎস গোয়েন্দা-গিরি আমাদের জীবন থেকে আলো আহার আনন্দ নিদ্রা সব কেড়ে নিল। সর্বদাই মনে হতে লাগলো, ঐ লোকগুলো যেন কিলবিল করছে আশপাশে।

ফরাসী দেশে গিয়ে আমরা ফরাসী সরকারের অতিথি ছিলাম। আরামে আনন্দেই দিন কেটেছে। অল্প সময়ের মধ্যে সর্বন বিবিবিদ্যালয়ের সঙ্গেও নানা রকম ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ঘটেছে, কর্তৃপক্ষের বন্ধুতার বদান্যতায় আপ্লুত হয়েছি, আরো একজন ভারতপ্রেমী ফরাসী মহিলার সঙ্গেও আলাপ হয়েছে, যিনি এককালে শান্তি-নিকেতনবাসিনী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন তিনি, নাম মাদাম বসিনেকে। বক্তৃতা শেষ হবার পরে অভিনন্দন জানিয়ে আলাপ করতে এলেন। আমাদের সঙ্গে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী গায়িকা রাজেশ্বরী দত্তও ছিলেন। তিনজনকেই তাঁর বাড়িতে তিনি পরের দিন লাঞ্চে ডাকলেন। মাদাম বসিনেকের নাম আমাদের অজানা ছিলো না, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম আমরা। ঐ বক্তৃতা অবলম্বন করেই নানা প্রসঙ্গে কেটে গেল সারা দুপুর, বিদায় দিতে দিতে মাদাম বললেন, এই দুপুর আমি বাকী জীবন ভুলবো না।

দ্বিতীয় দফায় এসে আইনজ্ঞ বন্ধু এই সব শুনে বললেন, 'সাক্ষীর দরকার হলে কি এদের কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে? চিঠি লিখে দেখুন না।' লেখা হলো চিঠি। শুধু প্যারিসেই নয়, যেখানে যেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, প্রায় সর্বত্রই লেখা হলো, সব জায়গা থেকেই সহৃদয় উত্তর এসে গেল, সঙ্গে মস্ত মস্ত এনলার্জ করা ছবি। সবই বক্তৃতার ছবি। কীভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছে, শ্রোতারা কীভাবে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে ইত্যাদি। প্রত্যেকেই লিখেছে, মামলা হলে তাঁরা দূরে বসে আর্থিক পরমার্থিক সব রকম সাহায্য করতেই প্রস্তুত, কেননা এর মধ্যে তাদেরও একটা অপমানের অংশ আছে। মাদাম বসিনেকে লিখলেন, 'প্রয়োজন হলে আমি সশরীরে গিয়ে সাক্ষী দেব।'

মামলার এই পর্যায়ে এসেই বুদ্ধদেবের নাড়ি ছেড়ে যাবার দশা। তাঁর কাজ গেল, কর্ম গেল, আড্ডা গেল, অধিক রাত্রির নির্জনতায় বই পড়ার আনন্দ গেল, শুধু

গন্ধিপলীর মতো পচা গন্ধ শ‍ুঁকতে শ‍ুঁকতে জেগে ওঠা আর ঘুমিয়ে পড়া। আমাদের সকলেরই অবস্থা তথৈবচ, এমন কি পুরোনো গৃহসেবক গণেশচন্দ্র জানারও অন্যমনস্কতা উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠলো। মনস্কতা শুধু তার মনিবের অনিষ্টকারীদের বিষয়ে দন্তঘর্ষণে স্থিতিলাভ করলো।

যখন এই অবস্থা, হঠাৎ একদিন অতি অসময়ে ব্যস্ত ব্যাকুলভাবে সত্যেনদা এসে হাজির। আমার দিকে তাকিয়ে প্রায় তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার ধারণা ছিলো তোর মাথায় কিছু বুদ্ধি আছে, দেখছি সেটা ভুল।' বুদ্ধদেবকে বললেন, 'তুমি আবার এ সব মামলাটামলার মধ্যে ঢুকছো কেন। তুমি পারবে শেষ পর্যন্ত এই নোংরামির মধ্যে টি‍ঁকে থাকতে?'

আমি বললাম, 'উপায় কী?' সমানে ঢিল ছুঁড়ে যাবে তা তো আর হয় না? এই মিথ্যে রটনাকে যেভাবে হোক বন্ধ করতেই হবে।'

'এই মিথ্যের আয়ু কদ্দিন? কে বিশ্বাস করছে?'

'সবাই।'

বুদ্ধদেব এবার খু‍ঁটি পেয়ে বললেন,

হ্যাঁ, আপনি রাগুকে বোঝান তো। আমি বলছি যে, কতগুলি অর্ধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যদি এই অর্বাচীন কেচ্ছায় কান দেয় তো দিক না।'

'আরে ঝগড়া কি কখনো একা হয়? ঠিক থেমে যাবে। চ্যাঁচাচ্ছে চ্যাঁচাক না। কতবারই তো এই চিৎকার শুনেছ, তবু অভ্যেস হলো না?'

বুদ্ধদেব আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক। ঠিক বলেছেন।'

কিন্তু আমি অবাক হচ্ছিলাম, এতো খবর সত্তোনদা পেলেন কোথা থেকে? পরে জানা গেল, সেই সকালেই একজন বিখ্যাত লেখক, তিনি সাম্যবাদীও বটে, বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে একটি সই সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন তাঁর কাছে। মামলা হলেও যাতে সত্যেন্দ্রনাথ প্রয়োজন মতো তাঁদের সপক্ষে দাঁড়ান সে বিষয়েও যুক্তিতর্ক সহ আবেদন পেশ করেছেন। বুদ্ধদেব যত নিঃশব্দেই মামলা করবেন স্থির করুন না কেন, বোঝা গেল খবরটা চাপা নেই। অনেকক্ষণ ধরে লেখকটি সত্তোন বসুকে যা যা বলেছেন এবং বুঝিয়েছেন, তা থেকে সত্তোন বসুর এই প্রত্যয় হয়েছে যে, এদের অসাধ্য কর্ম কিছুই নেই। কেননা, ব্যাপারটার মধ্যে শুধু পেশাগত ঈর্ষা নয়, রাজনীতির গন্ধও যথেষ্ট কটু। কাগজওয়ালারা ভয় পেয়ে জাল গুটোতে শুরু করেছে বটে, তাঁরা বিচলিত নন। কেননা, হারজিৎ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই তাঁদের. ঐ পঞ্চাশ বার বিদেশগামী পুঁজিবাদী লেখকটিকে একবার কাঠগড়ায় তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতা সমেত দাঁড় করিয়ে অপমানের চূড়ান্ত করা কাকে বলে সেটাই দেখে নিতে চান একবার।

অনেক পরে সত্যেন বসু জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'রাগ তো তোমাদের বুদ্ধদেব বসুর উপরে, তার মধ্যে স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতা আসছে কী হিসেবে?'

তখন স্ত্রী বিষয়েও যে রকম বিষোদ্গার করতে শুরু করলো, তাতে সত্তোন বসুর মনে হলো, ঐ মেয়েটিও তাঁদের শত্রুশিবিরের একজন পয়লা নম্বরের আসামী। আর জামাতা তো সব কাগজের ভাষায় 'শ্বশুর জামাই দুই ভাই, আনন্দেতে নৃত্য করি রবি কুৎসা গাই।' আর পুত্র কন্যা? আছে, আছে, তাদের বিষয়েও হাটে হাঁড়ি ভাঙবার অনেক খবর আছে।

'বুদ্ধদেব, আমি বলছি এর মধ্যে তুমি যেও না. এদের অশালীন ব্যবহার কতদূর যেতে পারে তোমার ধারণায় নেই।' দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন তিনি।

আমি বললাম, 'লেখকটি কি একাই গিয়েছিলেন?'

সত্তোনদা হাসলেন, 'একা কেন যাবে রে, তোরা ভাবিস যো.দরই শুধু চ্যালা-চামুণ্ডা আছে, আর কারো নেই?'

'নাম কী?'

'বলবো কেন?'

হঠাৎ আমি বুঝতে পেরে একটা নাম উচ্চারণ করতেই তিনি কানে হাত দিলেন, 'ঐটিই তো তোমার দোষ দিদি, সব কথা কি গলা খুলে বলতে হয়? যা বলছি তা শোনো, চুপচাপ থাকো না কদিন, দ্যাখো না জল কোথায় গড়ায়। এই মামলা করলে তোমরা কি ভেবেছ, মামলা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবে? বুদ্ধর কাজ যাবে কর্ম যাবে, লেখা পড়া সব জলাঞ্জলি দিতে হবে সেখানে।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'আমার এখনি সব গেছে। এই তিন সপ্তাহে আমি তিন লাইন লিখতে পারিনি।'

'তবে?' উঠলেন তিনি, সিঁড়ি নামতে নামতে বললেন, 'মামলা বড়ো বাজে জিনিস হে, ও যারা পারে তারা পারে। তোমার কম্মো নয়। তুমি মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নিজের কাজ করো।'

এর পরে আর বুদ্ধদেবকে তাতিয়ে রাখা গেলো না। তাতাবে কে? আমি নিজেই তখন শান্তিলাভ প্রয়াসী। মামলা না করলে কাগজগুলো যে কিনতে হবে না, দেখতে হবে না, পড়তে হবে না, দাগ দিতে হবে না এ কথা ভেবেই মনে শান্তি ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল বাড়ির আবহাওয়া। যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন শেষ হলো।

দু'এক দিনের মধ্যেই সময় করে বুদ্ধদেব সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছে গেলেন। বললেন, 'মামলা থাক, এ আমার পক্ষে বড়ো কঠিন কর্ম।'

হাসি মুখে সুধীরবাবু বললেন, 'জানি। কিন্তু দেখেছেন তো রাতারাতি কেমন সুর পালটেছে কাগজগুলো? লড়লে ঠিক জিতে যাবো।'

বুদ্ধদেব বললেন, 'কী হবে জিতে? আমার শত্রু কি তাতে একজনও কমে যাবে? মৃত্যু পর্যন্ত এমনিভাবেই চলবে আমার।'

তা চললো। এই করতে করতেই শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন একদিন। এখন তিনি আমাদের নন, সত্তোন্দ্রনাথেরই পাশের মানুষ। কিন্তু তখন ছিলেন না যখন আমি এই লেখাটা শুরু করেছিলাম, তাঁর আগ্রহেই শুরু করেছিলাম, অর্ধেকের উপর লেখা হয়েও গিয়েছিলো, কিন্তু কে জানতো —আমার ঘরের দরজায়ও মাতা এসে কোল পেতে দাঁড়িয়েছেন তাঁর এই তাপিষ্ঠ-যুদ্ধক্লান্ত সন্তানটিকে বিশ্রাম দেবার জন্য।

সমাপ্ত

এখন! প্রত্যেকটি দিনেই কিশোরী থাকার আনন্দ উপভোগ করুন

নতুন টীন-এজ* স্যানিটারী ন্যাপকিন

আপনার কৈশোরলালিত শরীরের গঠন অনুযায়ী খাপ খাইয়ে নেবার মত
—বিশেষভাবে চিকন
আপনাকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখতে
—বিশেষভাবে নিরাপদ

আপনার জীবনে কৈশোরের কয়েকটা বছর হ'ল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়।

এবং নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন আপনাকে প্রত্যেকটি দিনের আনন্দ উপভোগের সুযোগ দেয়।

নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন অন্যান্য স্যানিটারী ন্যাপকিনের মত নয়।

এগুলি চিকন, সুদৃঢ় আর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

আপনার কৈশোরলালিত শরীরের গঠন অনুযায়ী ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেবার মত যথেষ্ট চিকন।

এবং নরমভাবে ও নিরাপদভাবে রক্ষা করবার মত যথেষ্ট সুদৃঢ়।

তাই যে কোন কিশোরীই নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবতে পারে—এমন কি কঠিন ঐ দিনগুলি যদি বাড়কমের দিন হয়, তাহলেও।

নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিনের উপর নির্ভর করুন। এগুলি আপনার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী।

সেরা বিশোষক নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন

বিশেষ ধরণের শুষে নেবার প্রকৃতি শক্তি সম্পন্ন এমন এক ফিলিং দিয়ে তৈরী যার জন্য সব জলীয় পদার্থ সারা ন্যাপকিনের ভেতরের স্তরের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। ফলে সব এক জায়গায় জমে থাকে না। গোলাপী এক রক্ষাকবচ এর সম্পূর্ণ তলা আর চারপাশ ঘিরে থাকে। তাই কাপড়ে দাগ লাগারও ভয় নেই।

বিন্যাসযোগ্য নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন বিন্যাসযোগ্য সাইজে পাওয়া যায়, যাতে আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিকভাবে খাপ খাইয়ে পরে নিতে পারেন। প্রত্যেক প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে একটি **টীন-এজ** বেল্ট।

ফ্লাশ করার যোগ্য নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন সহজেই ফেলে দিতে পারা যায়, কেননা একে ফ্লাশ করলেই জলের মধ্যে সব ছড়ায়।

সুন্দর গোলাপী নতুন **টীন-এজ** স্যানিটারী ন্যাপকিন একমাত্র গোলাপী স্যানিটারী ন্যাপকিন যা এখন বাজারে পাওয়া যায়।

কেয়ারফ্রী* স্যানিটারী ন্যাপকিনের প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে

Carefree
SANITARY NAPKINS

Johnson & Johnson*

জনসন অ্যাণ্ড জনসন* একমাত্র স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার জন্যে

॥ তেত্রিশ ॥

ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগলো কয়েক সেকেণ্ড। বুঝতে পেরে প্রথমে খুব হাসি পেল। প্রায় বাপের বয়সী বুড়ো! কি করা উচিত ঠিক ঠাহর পাচ্ছিলুম না। মনে পড়ল, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফাইনাল খেলা দেখছিলুম আমরা র‍্যামপার্টের ভীড়ে দাঁড়িয়ে। পাঁচ-ছজন এক সঙ্গে ছিলুম। করুণাময়ের পিছনে দাঁড়িয়ে এক অবাঙালী এইরকম ছোঁয়াছুঁয়ি শুরু করেছিল। করুণার চেঁচামেচিতে সবাই মিলে ধরে লোকটাকে টেনে আনা হয়েছিল ভীড়ের বাইরে। তারপর বেদম মার। একেবারে 'পাবলিক ধোলাই' যাকে বলে।

মনে মনে এক পলক ভাবলুম, এই সাদা শুয়োরটার চোয়ালে একটা রাম ঘুঁষি ঝেড়ে বেরিয়ে যাবো কিনা। এ দোকান তো খালি। বৃষ্টি-বাদলায় দর্শক নেই একটিও। আপত্তি করছে কে!

একে গ্যালারী খুঁজে খুঁজে হয়রান। মেজাজ এমনিতেই গরম হয়ে আছে। তার ওপরে এইসব। চট করে উল্টো একটা বাতাস বয়ে গেল মাথায়. বুড়োর দুর্বলতা ভাঙিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নিলে কেমন হয়! এ রাজ্যে প্রদর্শনী না করে আমি যাবো না! যদি আপত্তি না করি, তাহলে বুড়ো দু-এক সপ্তাহের জন্যে আমার ছবি-গুলিকে এই গ্যালারীতে ঠাঁই দিতে পারে। ভাবতে ভাবতে আরো বেশি রাগ হল। রক্ত চড়ে গেল ব্রহ্মতালুতে। আমি কি শালা টোরিটি বাজারের বেশ্যা!

কাজ চালানো ফরাসী যেটুকু জানি তাও গুলিয়ে গেছে এখন। দেওয়ালে একটা পেইন্টিংয়ের দিকে চোখ রেখে কলের জল পড়ার মতো শান্ত গলায় বলে উঠলুম, ইংরিজিতে,

—'মাই ডিয়ার ফাদার। তোমার বয়েস যদি আর একটু কম হোতো এবং দুটি স্তন ইত্যাদি থাকতো, তাহলে আমি আপত্তি করতুম না।

বলতে বলতে মন্ত্রের মতো কাজ হল। বুড়োর হাত থেমে আমার শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেল। যেন পাঁচন গিলে ফেলে 'হে'-হে'' করে হাসল। তারপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে যেই বলতে আরম্ভ করল,

—"ঠিক। ঠিক বলেছো, মাই ডিয়ার বয়—"

এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে আমি চিৎকার করে বললুম,

—"চো-ও-ও-প্!"

বলে, মুখের ভেতরে সেই মুহূর্তে যতটা থুতু তৈরী ছিল, থু করে ছিটিয়ে দিলুম শুয়োরটার সারা মুখে!

হাঁউমাউ করে কি সব বলতে লাগল পাদরীটা! কে শুনেছে! ঈভলীন তো হতভম্ব,

—"কি হল, কি করলে, ইণ্ডিয়ান—"

কথা শেষ হবার আগেই ওর হাত ধরে টেনে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। হনহন করে হেঁটে সামনেই নেমে যাবার সিঁড়ি। নানান কথা জিগ্যেস করছে ঈভলীন। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাটতে পারছে না। ওর হাত ধরে টেনে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। সোন নদীর জলের গা ঘেঁষে দু ধারে পায়ে চলার বা বসে মাছ ধরার মতো শান বাঁধানো রাস্তা। ওপরের সদর রাস্তা থেকে অন্তত তিন-চার মানুষ নিচু। লোকজন নেই। প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে ব্রীজের তলায় এসে দাঁড়ালুম। মনের ভেতরে ভয় ঢুকছে। শত হলেও আমি ভিনদেশী মানুষ। তার ওপরে যার মুখে থুতু ছিটিয়ে এলুম, সেই লোকটি যদি সত্যিই পাদরী হয়—পুলিস-টুলিসের ঝামেলায় না পড়ি আবার!

ব্রীজের তলাকার ঝাপসা অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতেই দেখি কয়েক জোড়া কপোত-কপোতি দেওয়ালের খাঁজে-খাঁজে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে প্রেম-ট্রেম করছে। ঘুরেও কেউ দেখলো না আমাদের। ঈভলীন হাঁফাতে হাঁফাতে ফিসফিস করে বলল,

—'কি করলে ইণ্ডিয়ান? তোমার কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল! একজন সম্মানিত পাদরীর মুখে ওইভাবে—ছিঃ ছিঃ—'

—'সম্মানিত পাদরী না, ছাই—'

ফোঁস ফোঁস করে বলে ফেললুম।

ঈভলীন বললে,

—'কেন, কি হয়েছে?'

—'বলছি, দাঁড়াও। আগে বলো, কোনো ঝুট-ঝামেলায় ফেঁসে যাবো না তো?'

—'বলা যায় না। এদিকটায় পাদরীর খুব প্রতিপত্তি থাকা অসম্ভব নয়। চলো—আমরা বরং আর একটু এগিয়ে যাই—'

বলতে বলতে বাঘের ভয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল! পাদরীর 'হাঁউ-মাউ' গলা জোর পায়ে ছুটে আসতে লাগল এদিকে। সঙ্গে আরো কয়েক জোড়া ভারি বুটের শব্দ। হাল্কা বৃষ্টির পর্দায় ওদের প্রায় স্পষ্ট দেখতে পেলুম। হসাত জনের দলটি মাত্র কয়েক গজ দূরে এখন। ভয় পেলে বুদ্ধি কমে যায়। দারুণ ভয় পেয়ে গেছি আমি। কিসের থেকে কি হয়ে গেল। ঈভলীনের হাত ধরে টেনে দৌড়োতে যাবো, ও আমাকে গায়ের জোরে দাঁড় করিয়ে রাখল। অস্থির মনের গা ঘেঁষে বিচ্ছিরি একটা ভাবনা খেলে গেল। নিছক অভিমানে ভর দেওয়া ভাবনা। ঈভলীন কি ওর ধর্ম-যাজকের সম্মানের জন্যে আমাকে পুলিসি ঝামেলায় ফেলতে চায়! না কি, আমি বিপদে পড়েছি তো ওর কি যায় আসে! আমার ঝামেলায় ও নিজেকে জড়াতে চাইছে না বোধ হয়! পায়ের শব্দ, পাদরীর 'হাঁউ-মাউ' এগিয়ে এল আরো।

আর এক মুহূর্ত সবুর না করে, ঈভলীনের হাত ছেড়ে দিলুম। তাড়াতাড়ি বলে দিলুম,

—'ঠিক আছে। যেতে না চাইলে যেও না, আমি চলি—'

বলে সরতে যাবো, ও যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে হাসল। ডান হাত দিয়ে আমার বাহু জড়িয়ে ধরল। বেড়াতে যাবার ধরনের দুলকি চালে হেঁটে দেওয়ালের কাছে নিয়ে এল আমাকে। একটি খাঁজে পিঠ রেখে হেলান দিল। তারপর, আমি কিছু বোঝবার বা করবার আগেই আমার দু'কাঁধে হাত রাখল এবং আস্তে আস্তে ওর শরীরের কাছাকাছি টেনে নিল আমাকে। দেড়-দু'হাত ব্যবধানে বাঁকের তলাকার ঝাপসা অন্ধকার খাঁজগুলিতে যারা জোড়ায়-জোড়ায় দাঁড়িয়েছিল, চুমুটুমু মাখিয়ে গাঢ় স্বরে নিজেদের ছোটো ছোটো স্বপ্নের বাগান অথবা পৃথিবীর কথা বলছিল, তারা তাদের দলে নবাগত দুজনকে গ্রাহ্যও করল না, ফিরেও দেখল না।

তাতে অবশ্য আমার নিশ্চিন্ত হবার কথা নয়। ওরা কাছে এসে গেছে। সঙ্গে ভারী বুটের শব্দ, মানে, পুলিসও নিশ্চয়ই রয়েছে। একে একে প্রত্যেকটি জোড়ার কাছে গিয়ে ওরা দেখবেই। আমি কালো মানুষ। এপাশ থেকে তিন নম্বর জোড়ার কাছে এসে দাঁড়ালেই চিনে ফেলতে অসুবিধা হবে না। পাদরীই সনাক্ত করবে। ঘাড় ধরে টেনে আমাকে ঈভলীনের শরীর থেকে আলাদা করে ফেলবে। তারপর, থানা জেলখানা। সাজা বিশেষ কিছু না হলেও, হয়তো ফ্রান্সের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। চাই কি, আমাদের দূতাবাসে যোগাযোগ করে দেশেও চালান করে দিতে পারে! এক

পলকের রাগের জন্যে ছবি আঁকা, স্বর্গ রাজ্যে প্রদর্শনী, স্বপ্ন সব চৌচির হয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে। যদিও জানি, অন্যায় আমি কিছুই করিনি। তবু, ব্যাপারটা হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যেত। চুপচাপ গ্যালারী থেকে বেরিয়ে এলে এসব কিছুই হত না। কিন্তু, কি করব বউ! রাগ চন্ডাল। তুমি তো জানোই, আমার এই চন্ডালটিকে ভেতরে কিছুতেই পুষে রাখতে পারি না। ভাবছি এইসব, আর ঠোঁট কামড়াচ্ছি। ঈভলীন-টিভলীন, অন্যান্য দৃশ্য ইত্যাদি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। থুতুমাখা শুয়োরটার চশমা এবং মুখ, পুলিসের সাদা বর্ষাতি চোখে ভাসছে।

—'এইদিক দিয়েই গেছে। রাস্তা থেকে ঝুঁকে আমি ওদের এদিকেই দৌড়োতে দেখেছি।'

পাদরীর কথাগুলি ব্রীজের তলায় এসে গমগম করছে,

—'ব্লাডি নিগারকে গ্যালারী দেব না বলেছি, তো, থুতু ছেটাবে মুখে? অ্যাঁ—

এমন সরাসরি মিথ্যে কথাটা শুনে ভয়ের মধ্যেও মুখ খুরিয়ে ফেলেছিলাম আর একটু হলে। ঈভলীন হাত দিয়ে আমার মুখ নামিয়ে আনল। আস্তে আস্তে আমার গাল চেপে ধরল ওর গালের দেওয়ালে। দ্বিতীয় একটি প্রাণের উষ্ণতায় ভরসা হল খানিকটা। এবং, এই এতক্ষণে টের পেলুম, আমরা দুজনেই প্রায় এক তালে থরথর কাঁপছি। শ্বাস ফেলছি জোরে জোরে।

মৃদু বৃষ্টির শব্দে কথা বলল ঈভলীন,

—'ভয়ের কিছু নেই। ওরা চিনতে পারবে না!'

বলতে বলতে আমার বর্ষাতির কলার পুরোটা তুলে দিল ওপরে। পেছন থেকে আমাকে চিনতে পারার সম্ভাবনা কমিয়ে দিল আরো। গলা জড়িয়ে ধরে আমার মাথার পিছন দিকের চুল হাত দিয়ে চেপে রাখল। হালকা গলায় শ্বাস ফেলবার মতো বলল,

—'ভালো মানুষের এমন সুন্দর কালো চুলও লুকিয়ে রাখতে হবে ইণ্ডিয়ান!'

বলে, এমন অবস্থার মধ্যেও রসিকতা জুড়ে দিল,

—'কি থুতুই ছেটালে বাবা!'

মুখ দেখতে পাচ্ছি না ঈভলীনের। ওর গালে গাল রেখে আমার চোখের সামনে এখন খাঁজের বিবর্ণ পাথর। আলো অন্ধকারে জায়গাটুকু ঝাপসা হয়ে আছে। পেছনে কয়েক হাত দূরে কতকগুলো অদৃশ্য ভয়। কানের কাছে ঈভলীনের উষ্ণ নিঃশ্বাস এবং ছেঁড়া-ছেঁড়া কথার বাতাস। কি রকম আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে বুকের শব্দ শুনছি। ঈভলীনের না আমার ঠিক বুঝতে পারছি না। বুট জুতোর
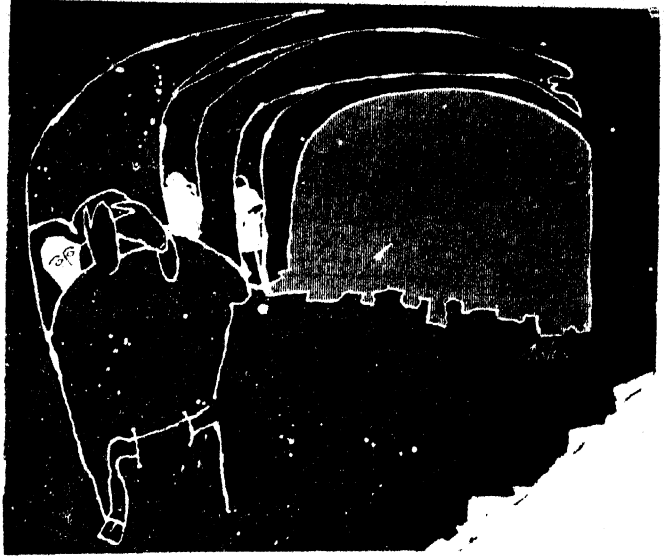
"মনে রাখো, আমরা দুই দারুণ প্রেমিক-প্রেমিকা—"

আওয়াজ, পাদরীর গলা থেমে গেছে। ওরা বোধ হয় এক-এক করে প্রত্যেকটি জোড়াকে খুঁটিয়ে দেখছে এখন।

ঈভলীন আমার কানে কানে বলল,

—'তেমন দরকার হলে, ওরা আমাদের দিকে আসতে আরম্ভ করলে চুমু খেতে হবে কিন্তু! তৈরী থেকো!'

আমার শরীর, মন, মস্তিষ্কের কোথাও কোনো নারী জেগে নেই। মদও পড়েনি পেটে যে গুবরেটার নড়াচড়া টের পাব। থম ধরে পেছনের শব্দের জন্যে কান পেতে আছি।

ঈভলীন আবার কথা বলছে,

—'ফাদারের সঙ্গে হঠাৎ তোমার কি হল, বলোনি কিন্তু!'

পেছনের মানুষগুলোকে ভোলবার চেষ্টা করলুম। বললুম,

—'সেদিন রাত্রে, যিশুর বাড়ি থেকে বেহুঁশ অবস্থায় ফেরবার পথে তোমাকে কি বলেছিলুম, বলোনি কিন্তু!'

দুজনেই চারপাশের বৃষ্টির শব্দের থেকে নিচু স্বরে কথা বলছি। যেন কোনো গভীর প্রেমের জলাশয়ে ডুবে আমরা ভয়ানক স্বর্গীয় সব ভালোবাসার কথা বলছি নিজেদের মধ্যে। পাদরী কাকে বলে, পুলিস কি জিনিস, কিছুই জানবার দরকার নেই আমাদের। ওরা সব যেন অন্য গ্রহের প্রাণী অথবা অনাবিষ্কৃত গাছপালা!

ঈভলীন বললে,

—'ও আমি কোনদিনও বলব না তোমাকে।'

——'থাকগে! আমিও বলব না কিছু।'

—'কিন্তু, তুমি একটু আগেই বলে ছিলে যে, পরে বলবে!'

—'ঠিক আছে। পরে বলবো।'

—'পরে কখন?'

—আপাতত পেছনের পাদরী-পুলিস কেটে যাক—'

চাপা স্বরেই ধমকে উঠল ঈভলীন,

—'উফ্‌! ওদের ভুলে যাও তো এখন! শুধু মনে রাখো, আমরা দুই দারুণ প্রেমিক-প্রেমিকা, আর চারধারে কেউ নেই, কিছু নেই।'

—'সে রকম ভাবতে পারলে এক্ষুনি তোমায় বলবো, কোট-প্যান্ট জামা কাপড় ইত্যাদি সব খুলে ফেলতে—'

মাথার পেছনে মৃদু চাপড় দিল উভলীন। বলল,

—'ধ্যাৎ, অসভ্য কোথাকার!'

চেয়ে থাকতে থাকতে খাঁজের পাথরে চোখ সয়ে গেল। উতপটাং কথার পিঠে কথা বলে যাচ্ছি। মনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। পাদরীটা কি যেন বলছে আবার। শুনবো না। কানে তুলো দিতে পারলে হ'তো।

উভলীনকে বললুম,

—'কানে হাত চেপে রাখতে পারো?'

—'দেখছি।' বলে, হাত দুটি সামান্য সরিয়ে এনে কান বন্ধ করে দিল আমার। বলল,

—'কিন্তু, আমার কথা শুনবে কি করে এখন?'

—'ও আমি ঠিক শুনতে পাবো। তাছাড়া, তুমি তো আপাতত প্রেমিকা আমার। প্রেমিকার কথা শুনতে কি আর কান লাগে, মাদাম! পরাণ থাকলেই হল!'

ওর মাথার অল্প ওপরে কি যেন লেখা
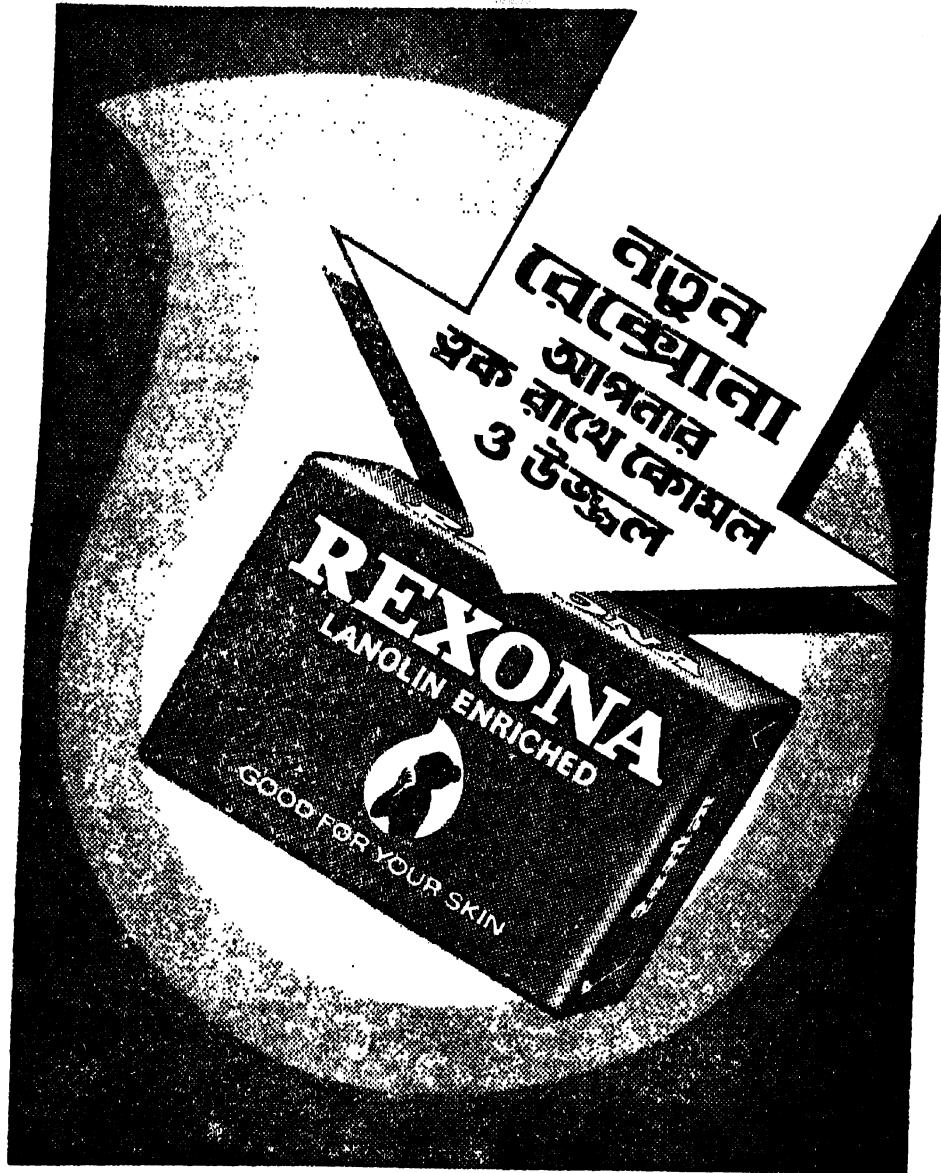
রয়েছে। ধূসর দেওয়ালে আলকাত্‌রা বা অন্য কোনো কালো রংয়ে ফরাসী শব্দ। মসৃণ পাথর নয় বলে পরিষ্কার পড়তে পারছি না। বড়জোর দু'ইঞ্চি আকারের অক্ষরগুলো পর পর সাজানো। বার তিনেক হোঁচট খেয়ে পুরোটা পড়ে ফেললুম। ঈভলীনকে বললুম,

—'তোমার মাথার ওপরে একটি সাবধান বাণী ঝুলছে। শুনবে?'

—'কোথায়?'

—'ঠিক তোমার মাথার ওপরে দেওয়ালে, কালো রংয়ে লেখা!'

ঈভলীন বললে,

—'পড়ো!'

—'এই স্থানে দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ!'

ফিক্‌ করে হাসির শব্দ হল ঈভলীনের। বলল,

—'কে লিখেছে?'

—তা কি করে বলবো! তবে, ঠিক তার নিচেই ব্রাকেটে সাদা রংয়ে আর একটা লাইন লেখা আছে!'

—'কি?'

—'শনি-রবি ও ছুটির দিন বাদে!'

হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেলো ঈভলীন। বলল,

—'তুমি কিন্তু পাজী নম্বর এক!'

—'আমি আবার কি করলুম! যা লেখা রয়েছে, তাই পড়ে শোনালুম তোমায়!'

পেছন থেকে আমাকে প্রায় চমকে দিয়ে হেঁড়ে গলায় কে জিগ্যেস করলে,

—'তোমাদের মধ্যে কেউ ইণ্ডিয়ান আছো?'

সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ভুলে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ শুনতে পেলুম,

—'আমি আছি। আমি আছি!'

আপনা-আপনি চোখ বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে আছি। কে জানে কি করছে ওরা পেছনে। সব চোখগুলি যেন আমার পিঠের কালো চামড়া দেখতে পাচ্ছে। ঈভলীন কোনো কথা বলছে না কেন!

—'ঈভলীন! কি হল? চুপ করে গেলে যে! ওরা কি আমাদের দেখছে?'

ও বললে,

—'জানি না। ওদের দিকে তাকাচ্ছিই না আমি। চোখে চোখ পড়ে গেলেই সন্দেহ করবে!'

—'চুপ করে থেকো না! কানে কানে যা হোক্‌ কিছু কথা বলো, যে কোনো বিষয়—'।

—'বলছি।' বলে, ও যেন ভাবতে বসলো কি বলবে।

চারপাশ থেকে বাতাস-বৃষ্টির শব্দ ভীষণ জোরে বাজতে লাগলো। ঈভলীনের গালে গাল চেপে আছি, অথচ এই মুহূর্তে ওর মুখটি কিছুতেই মনে পড়ছে না। নিজের মুখ ভাবার চেষ্টা করছি। মিলছে না। মেয়েলী গলায় কে যেন বলছে,

—'ইসি পারী। নে কিত্তে পা লে কুত্‌। নু র' শের্শ ভোত্‌ করেসপন্দ'!'

মেয়েটি থেমে যেতেই পুরুষকণ্ঠ ইংরিজীতে বলছে,

—'দিস্‌ ইজ প্যারিস। প্লীজ হোল্ড অন। উই আর ট্রাইং টু কনেক্ট ইউ!'

কে বলছে আমাকে কথাগুলি? কোথায় শুনেছি যেন! ওই আবার বলতে শুরু করেছে মেয়েটি ফরাসীতে। কে মেয়েটি! পুরুষকণ্ঠই বা কার? কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না। গুলিয়ে যাচ্ছে সব! তিন দিন দাড়ি কামাইনি। ঈভলীনের গালে নিশ্চয়ই আমার বাসি দাড়ির খোঁচা লাগছে! হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ইউনেস্কোয় টেলিফোন করেছিলুম এক ভদ্রলোককে। যিশুর পরিচিত ভদ্রলোক। কি যেন নাম? ভুলে গেছি। ইউনেস্কোয় চাকরি করেন। নিজের আর্ট গ্যালারী আছে বুলভার রাসপাইতে। যিশু টেলিফোনে যোগাযোগ করতে বলেছিল। ও'র গ্যালারীতেও জায়গা হবে না এক বছরের মধ্যে। সেটা কথা নয়। কথা হল, ইউনেস্কোর টেলিফোন নম্বর ঘোরালেই লাইন পাওয়া পর্যন্ত ওই কথাগুলি শোনা যায়। একবার ফরাসীতে, একবার ইংরিজীতে। ঘুরে ঘুরে বাজতে থাকে টেপ,

"দিস ইজ ইউনেস্কো—"

অথচ, এইমাত্র আমার কানে 'ইউনেস্কো' শব্দটি পাল্টে গিয়ে কেমন 'প্যারিস' হয়ে গেল,

—"এর নাম প্যারিস। দয়া করে অপেক্ষা করুন। আপনাকে আমরা ঠিকঠাক যোগাযোগ করিয়ে দেবার চেষ্টা করছি!"

ঈভলীনকে জিগ্যেস করলুম,

—"তোমার চেনা জানা উকিল-টুকিল আছে তো?"

—"কেন?"

—"ধরা পড়লে লাগবে!"

—"আহ্‌! বলছি তো ধরা পড়বে না। ওরা চিনতেই পারছে না।"

আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে আবার সেই,

—"এখানে কেউ ইণ্ডিয়ান পেইণ্টারকে দেখেছো?"

ঝিম্‌ ধরার মতো বৃষ্টির শব্দ এবং এই প্রেমের গাঢ় শব্দহীনতাকে ধর্মের হাত ধরে আইনের এক পাহারাদার ভেঙেচুরে খান খান করে দিল। ছন্দছাড়া হেঁড়ে আওয়াজটি এবার একেবারে আমার ঘাড়ের কাছে মনে হল।

গলা বোধ হয় কেঁপে গেল একটু, বললুম,

—"মনে হচ্ছে, চুমু খাবার সময় হয়ে এলো ঈভলীন!"

ও মুখ পিছিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকালো। ওর ঠোঁট ধীরে ধীরে আমার শ্বাসের উষ্ণতার মধ্যে এগিয়ে আসছে। পেছনে বুটের শব্দ পায়ে পায়ে হেঁটে আমার থেকে দু হাত দূরে এসে থামল। এইবার আমার বর্ষাতির কলার ধরে টান পড়বে। পলকের জন্যে ভাবলুম, 'যা থাকে কপালে' করে এক ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাই। এমনিভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতো ধরা পড়বার চেয়ে পালাবার চেষ্টা করলে বোধ হয় ভালো হত। কেন যে ঈভলীনের বুদ্ধি নিয়ে ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লুম!

চাপা গলায় বললুম,

—"আমি আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। তোমাকে ছেড়ে দৌড় দিচ্ছি—"

ও আমার চোখে চোখ রেখে বলল,

—"পাগলামো কোরো না। এসো। প্রেমিকের মতো চুমু খাও দেখি—" বলে, চোখ বুজে ওর মুখটি সামান্য ডান পাশে কাত্‌ করল। অথচ, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, বোধ, অনুভূতি ইত্যাদি পিঠের দিকে এক সঙ্গে জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছে।

ক্রমশ

ভারতের অর্থনীতি

ভারত সাহায্য সংস্থার অধিবেশন এবং ভারত সম্পর্কে বিশ্ব-ব্যাংকের প্রতিবেদন

প্যারিসে ভারত সাহায্য সংস্থা (Aid India Consortium) চলতি বছরের জন্য ভারতকে কত সাহায্য দেবে সে সম্পর্কে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে বিশ্ব ব্যাংক ভারতকে ১৭০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেবার প্রস্তাব রেখেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ ভারত সাহায্য সংস্থা ভারতকে সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে গিয়েছে। এই সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়ায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ভারত বর্ধিত পরিমাণে সাহায্য পাবার যোগ্য। এবং ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন-ধারার সম্ভাবনা আশাপ্রদ। যে ১৭০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার মধ্যে ২৮০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ অথবা ঋণের উপর সুদ প্রদান করার জন্য খরচ হবে। অবশিষ্ট পরিমাণ সাহায্য নগদ টাকায় এবং দীর্ঘ-মেয়াদী সহজ শর্তে ঋণ দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। ভারত সাহায্য সংস্থার বৈঠকের চূড়ান্ত ফলাফল আমরা এখনও জানতে পারিনি; তবে ভারতের দিক থেকে আশা করা হচ্ছে যে, বিশ্ব ব্যাংকের প্রস্তাবিত সাহায্য অনুযায়ী ভারত সাহায্য সংস্থাও অনুরূপ পরিমাণ সাহায্য মঞ্জুর করতে রাজী হবে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারত সাহায্য সংস্থা যে সাহায্য এ-পর্যন্ত দিয়েছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। আলাদাভাবে একটি দেশের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া এবং একটি সংস্থা থেকে সাহায্য নেওয়া—এই দুইয়ের তাৎপর্য আলাদা। ভারত যে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আরও সাহায্য দাবি করতে পারে তার পক্ষে একটি জোরালো যুক্তি হল, তেলের আন্তর্জাতিক দাম কমে না যাওয়া সত্ত্বেও ভারত মুদ্রাস্ফীতির গতি রোধ করতে পেরেছে। মুদ্রাস্ফীতির যে তীব্রতা ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে পরিলক্ষিত হয়েছিল, এখন সে অনুপাতে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা কমে গেছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম কমে যাবার লক্ষণও পরিস্ফুট হয়েছে। পৃথিবীর খুব অল্পসংখ্যক দেশই এভাবে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে পেরেছে বলে অনেকে মনে করেন। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ভারতের প্রয়াস বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রশংসিত হওয়ায় উন্নয়নের হার বাড়াবার জন্য ভারতের প্রয়াস আরও জোরদার হবে—এই যুক্তির ভিত্তিতেই ভারত সাহায্য সংস্থার কাছ থেকে আরও বেশী সাহায্যের দাবি ভারত রেখেছে।

বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে ভারতের উন্নয়ন হার যে এখনও খুবই নীচু তারও উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র বিশ্বেই মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা এখন বেশি,—শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দামও খুব বেড়ে গেছে,—এ সব কারণে ভারতের পক্ষে উন্নয়নের বর্ধিত হার অর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে সরকারী মহল থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে। উৎপাদন হার দ্রুত বাড়ানোর জন্য যে বৈদেশিক সাহায্য ভারতের প্রয়োজন তা যদি পাওয়া যায় তবে উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে ভারত অকৃতকার্য হবে না বলে ভারতের দিক থেকে বলা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের দিক থেকেও এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ভারত তার বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করতে সক্ষম এবং বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার করতেও সক্ষম। ভারতের পক্ষে এখন সবচেয়ে জরুরী ব্যবস্থা হল, কিভাবে উন্নয়ন হার দ্রুত বাড়ানো যায়। আমাদের পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় ৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ হারে উন্নয়ন হার বাড়াবার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। আগেকার তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনায়ও ৫ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বাড়াবার কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু, ভারতের পক্ষে উন্নয়ন হার লক্ষমাত্রা অনুযায়ী বাড়ানোর প্রচেষ্টা এখনও সফল হয়নি। ভারতের এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশক্তির সদ্ব্যবহারের অভাব। যদি শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনীশক্তির পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হতো তবে শিল্পোৎপাদন আরও বাড়ত এবং রপ্তানির পরিমাণও আরও বাড়ত। রপ্তানির পরিমাণ যত বাড়বে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতাও তত কমে আসবে। একে তো আমাদের শিল্প-উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ছে না, অপর দিকে রপ্তানি-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়। খসড়া পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় শিল্প-উৎপাদন ৮ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশ হারে বাড়বে বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিল্প-উৎপাদন এখন গড়ে ৩ শতাংশ থেকে ৩·৫০ শতাংশ হারে বাড়ছে। রপ্তানির পরিমাণ কিছু বেড়েছে বটে,—কিন্তু সামগ্রিকভাবে রপ্তানি ক্ষেত্রে অবস্থা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে মন্দা দেখা যাচ্ছে,—তা ছাড়া ভারতীয় সামগ্রীগুলির তুলনায় বিদেশী সামগ্রী কোন কোন ক্ষেত্রে সস্তা। ১৯৭৪-৭৫ সালে ভারতের বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১০০ কোটি টাকা। ১৯৭৫-৭৬ সালে হয়ত এই ঘাটতির পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। তবে ভারত সরকার যে নতুন রপ্তানি বাজার তৈরী করতে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে তা স্বীকৃত হয়েছে।

ভারত সাহায্য সংস্থা থেকে যে সাহায্য ভারত পাবে তার মধ্যে বেশির ভাগই প্রকল্প-বহির্ভূত সাহায্য হবে বলে আশা করা যায়। ভারতের পক্ষে যে-সব জিনিসের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের বেশী প্রয়োজন সেগুলি হল, খাদ্যসামগ্রী, সার, জ্বালানী, যন্ত্রাংশ এবং বৈদেশিক ঋণের বোঝা লাঘব করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা। আমাদের খসড়া পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার অন্যতম উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। খসড়া পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় বলা হয়েছে যে, পঞ্চম যোজনার শেষে একমাত্র বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা অথবা বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য বাদ দিলে আমাদের নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ শূন্য করতে হবে। কিন্তু তা করা সম্ভব হবে কি? নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ শূন্য করতে হলে যে হারে কৃষি উৎপাদন ও শিল্প উৎপাদন বেড়ে যাওয়া উচিত এবং যে হারে রপ্তানিজনিত আয়ের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া উচিত, তার অভাব প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। উৎপাদন আরও দ্রুত হারে বাড়াবার জন্য যে অনুকূল পরিবেশ থাকা দরকার তারও অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে সরকারের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পাওয়া গেছে।

সুব্রত গুপ্ত

জানেন,
এমন কিছু জিনিস
আছে যা
বিনী
বদ: তে চায় না!
ভাগ্যিস!
কিছু জিনিস কখনো বদলায় না!
আজকাল স্বাভাবিক, সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের
প্রকাশ দেখেও তৃপ্তি! আর ভাল লাগে বিনীর
অপরিবর্তনীয় উঁচু মান।
স্থায়িত্বের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক — ফ্যাশানের
চূড়ান্ত — অপূর্ব সমন্বয়... বিনীর অবদান!
স্বচক্ষে দেখুন — অজস্র রঙের মেলা,
অসংখ্য ফ্যাশানের বাহার! বিনীর
টেরীন ব্লেন্ডসের পোষাক
তৈরী করিয়ে
আনন্দ পাবেন।
ফ্যাশন দুরস্ত অথচ টেঁকসই —
এমন কাপড় যা শুধু বিনীই বানাতে পারে।
বিনী 'টেরীন' ব্লেণ্ডস্
Interpub/BB/55/75 Ben

॥ একশো দুই ॥

বৈজু প্রকৃতপক্ষে রেগে ওঠে না বা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদে বাবাকে ডেকে ওঠে না। ঘটনাটা ওর নক্কারজনক নীচ আর নোংরা লাগে, যা দাঁড়িয়ে দেখতে ওর লজ্জা করে, অস্বস্তি হয়। কিন্তু বাবাকে ডেকে উঠেই ও ফুলবাসিয়া এবং সাহুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকিয়ে থাকতে পারে না। সাহু বলে ওঠে, 'তুই জানিস না বেটা, এ কমিনি ছুকরি একটা পাক্কা ছিনার, ভাদইয়া কুত্তি।' বলে সে বৈজুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঝটিতি আবার ঝুঁকে পড়ে ফুলবাসিয়ার মুখে সপাটে আঘাত করে।

ফুলবাসিয়া এবারও নিজেকে বাঁচাতে পারে না, চকিতে সরে যাবার আগেই ওর ঠোঁট নাক আর চিবুকে সাহুর শক্ত থাবড়া হাতের সজোর আঘাত লাগে। ও সাহুর পুনর্বার আঘাতের আগেই বেড়ায় গা ঘষটিয়ে অনেকখানি সরে যায়। বেড়ায় মচমচ শব্দ হয়, দড়িতে ঝোলানো শাড়ি আর জামার নিচে ফুলবাসিয়া কাত হয়ে দাঁড়ায়, কোমরের কাছ থেকে আঁচল পুরোটাই খাটিয়ার নিচে লুটোয়। মাঝখানে খাটিয়া, যে-দূরত্ব সাহুর কাছে কোনো দূরত্ব না, তার খাটো শরীরের গতিপ্রকৃতি অভূতপূর্ব দ্রুত, লাফঝাঁপ দিতে পারে অনায়াসে। বৈজু ফিরে তাকাবে না ভেবেও ওর দৃষ্টি চলে যায় ফুলবাসিয়ার ওপরে, যার এলো খোঁপার চুল মুখে কাঁধে ছড়ানো, কপালের খয়েরি টিপ এখন ঘষে যাওয়া রেখায় বাঁকা। হ্যারিকেনের রক্তিম আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ে নাকের নাকচাবির পাশ থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঠোঁটের ওপর পড়ে। ওর বেঁকে দাঁড়িয়ে পড়ার ভঙ্গি যেন আক্রান্ত আহত পালানোর রাস্তা-বন্ধ অসহায় পশুর মতো। রাগের থেকেও আতঙ্ক ওর চোখে বেশি এবং দৃষ্টি সাহুর প্রতি। সাহুর ভঙ্গিতে পুনরায় আক্রমণের উদ্যত প্রস্তুতি। বেজন্মা ছিনাল আর ভাদ্রের কুকুরি, তথাপি বাবা কেন এই আওরতকে তার ঘরে রাখে, খেতে দেয় এবং স্পষ্টতই পালন করে, এই জিজ্ঞাসা বিদ্যুচ্চমকে মস্তিষ্ককে হেনে যায় এবং তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মনস্থ করে। কিন্তু ফুলবাসিয়ার স্বর যেন ওকে চুম্বকের মতো টেনে ধরে।

'কেন তুমি আমাকে মারছো, কেনই বা গালি বকছো?' ফুলবাসিয়া বলে ওঠে। ক্রোধের থেকে ওর স্বরে অসহায় আর্ত প্রতিবাদ ফোটে, আক্রান্ত হবার আশংকায় ওর সমস্ত শরীর শক্ত আড়ষ্ট। আতংকিত অপলক চোখের দৃষ্টি কিছুতেই সাহুর দিক থেকে সরাতে পারে না। এমন কি নাকচাবির ছিদ্র থেকে ঠোঁটের ওপর গড়িয়ে পড়া রক্তের ফোঁটা মুছতেও হাত তুলতে ভরসা পায় না।

সাহুর ভল্লুক সদৃশ ঝুঁকে পড়া খালি শরীরে যেন কতগুলো চিকণ রেখা খেলে যায় এবং তার স্বরে সীমাহীন বিস্ময়, 'কেন তোকে মারছি? শড়াড় কমিনি। তোকে কেন আমি গালি বকছি?'

বলতে বলতেই তার এক পা খাটিয়ার ওপর ওঠে।

ফুলবাসিয়া তৎক্ষণাৎ শরীরকে বাঁকিয়ে নিয়ে আরো খানিকটা সরে যায়, ধাক্কা লাগে বেড়ায় ঝোলানো কাঠের তাকে, নিচে পড়ে যায় পাউডারের কৌটো এবং আরো কিছু। বাঁ হাত বুকে আর কাঁধের ওপর রাখে। কিন্তু ও কিছু বলবার আগেই সাহু রুদ্ধ আক্রোশে গর্জে ওঠে, 'আমি তোকে মারবো না তো কে তোকে মারবে, হারামজাদী? কে তোকে গালি বকবে চকবাজারের রেণ্ডি?'

আশ্চর্য, তথাপি বাবা এই আওরতকে কেন নিজের আশ্রয়ে রাখে? বৈজুর মনে আবার জিজ্ঞাসা জাগে এবং আবার ঘর ছেড়ে যাবার সংকল্প করেও, ফুলবাসিয়ার কথা শুনে নিশ্চল থাকে।

'মগর কেন, কী আমার গোস্তাকি? মানুষ তার ঘরের কুকুর বেড়ালকেও এরকম পেটায় না।' ফুলবাসিয়ার স্বরে কিছু ঝাঁজ স্ফুরিত হয় এবং কথা বলতে গিয়ে রক্তের ফোঁটা সারা ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ে এবং আবার বলে, 'আমি একটু হাসলেই তুমি মনে করো আমি ছেনালি করছি। সাধুদের কাছে যাবার জন্য তুমি নিজেই হুকুম দাও, আবার তার জন্যই আমাকে বেশ্যা বলো। কেন, কিসের জন্য?'

মুহূর্তেই আবার সাহুর হাত ওঠে এবং খাটিয়ার ওপর এক পায়ের ভর রেখে আর এক পা মাটি থেকে তুলে সজোরে আঘাত করে। কিন্তু ফুলবাসিয়া এবার প্রস্তুত, ও ঝটিতি মাথার ওপরের শাড়ি জামা টেনে নামিয়ে বাধার সৃষ্টি করে। সাহুর আঘাত জামা কাপড়ে ব্যাহত হয় এবং তার হাতের ওপরে সেগুলো পড়ে। সে শাড়ি জামাগুলো ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে দাঁতে দাঁত ঘষে ফুলবাসিয়াকে ও ওর মা ও বোনের নামে অশ্রাব্য গালাগাল দিয়ে বলে, 'ওহ্, আমার বেটাকে শোনানো হচ্ছে?'

ফুলবাসিয়া চকিতেই নিজের প্রসাধন

সামগ্রীর তাক বাঁচিয়ে, ঘরের উত্তর পূব কোণে সরে যায় এবং বলে, 'কেন আমি তোমার বেটাকে শুনিয়ে বলবো? তুমি তো তোমার বেটার সামনেই আমাকে পিটছো, তবে আর কী কারণে আমি তাকে শোনাবো?'

সাহু রুদ্ধ হুংকারে গর্জায়, 'হাঁ, আমার বেটার সামনেই তোকে পিটবো। আমার বেটা জানুক, তুই একটা ছিনার কসবী।'

বৈজুর নিজের প্রসঙ্গ উঠতেই ওর অস্বস্তি আর বিতৃষ্ণা বাড়ে, তথাপি ঘর ছেড়ে যেতে পারে না। ফুলবাসিয়া বলে, 'কেন সাহু ঝুট বলছো? আমি না ছিনার না কসবী, তুমি ভালোই জানো। তুমি চাও আমি একটা মড়া বুড়ির মতো ঘরের মধ্যে পচে মরি, কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারবো না, হাসতে পারবো না।'

'না, হাসতে পারবি না।' সাহু যেন ফুলবাসিয়ার কথার বিতর্কে আটকে পড়ে আঘাতের উদ্যত ভঙ্গি আড়ষ্ট হয়ে থাকে, গর্জায়, 'সাধুদের সঙ্গে তোর এত হাসির কী আছে? আমি তোকে বলেছি, সাধুদের সেবা করবি, কাজ করতে ডাকলে যাবি।
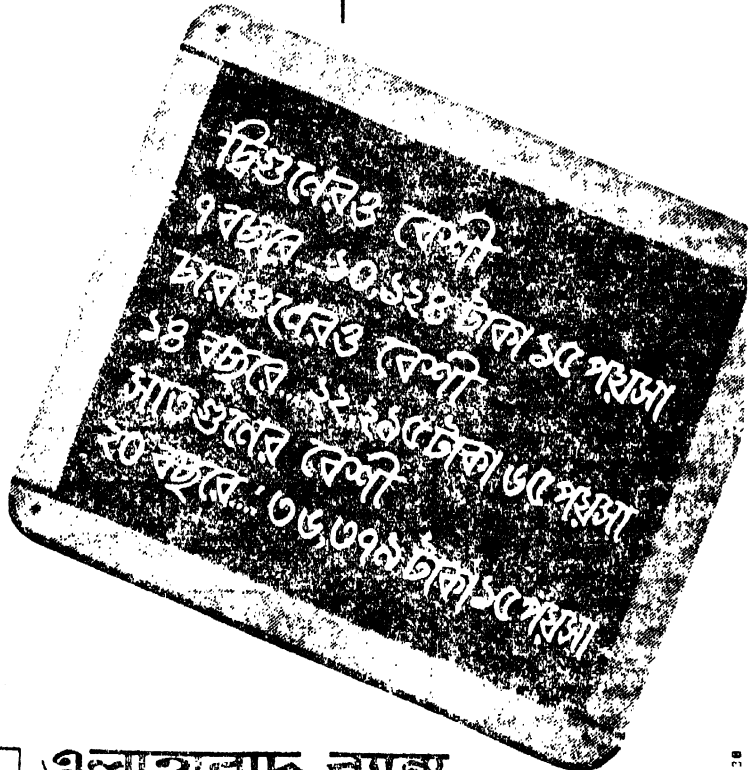
তাদের সঙ্গে তোর এতো হাসি কিসের, বাবালোগদের সঙ্গে?'

ফুলবাসিয়া দ্রুত ঠোঁটের ওপর দিয়ে ডান হাত বুলিয়ে নেয় এবং ঈষৎ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'হা, এই বাত বলো সাহু তোমার সাধুরা বাবালোগ, আর যতো দোষ ফুলবাসিয়ার। তুমি আমাকে সাধুদের সেবা করতে বলো, কিন্তু তুমি কি জানো না, আমার কাছে কী সেবা তারা চায়?'

'চুপ, কমিনি কুত্তি!' সাহু শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জে ওঠে, কিন্তু সে আঘাত করে না, বলে, 'তোর জিভ খসে যাবে সাধুবাবাদের নামে খারাপ কথা বললে। তুই তোর সুরত আর যৌবন দেখিয়ে তাদের লোভ দেখিয়েছিস, তারা আমাকে অনেকবার বলেছে।'

ফুলবাসিয়ার ভয় ক্রমেই কমে, ওর মুখে বিদ্রুপ ফোটে, বলে, 'হাঁ! সাহু, তুমি আমাকে একটা ভুখা রোগা বাচ্চা এনেছিলে। তখনো কি আমি তোমার সাধুবাবাদের আমার শরীর দিয়ে লোভ দেখিয়েছি? তোমাকে কেঁদে কেঁদে কত নালিশ করেছি, তবু তুমি আমাকেই মারতে। কেন? আমি যদি কুত্তি হতাম তো তোমাদের ওই সুখাড়িয়া বাবা কবে আমার পেটে বাচ্চা পয়দা করে ফেলতো।'

'চুপ!' ফুলবাসিয়ার কথা শেষ হবার আগেই, সাহু গর্জে ওঠে এবং আঘাতের জন্য হাত তুলে ঝুঁকে পড়ে।

ফুলবাসিয়া যথাসময়ে ওর বাঁ হাত তুলে আরো একটু সরে যায়, বলে, 'কেন চুপ করবো? গালি যদি দিতে হয় তোমার সাধুবাবাদের দাও। তোমার নামে ওরা আমাকে কী সব বলে, জানো না? আমি সবই তোমাকে বলেছি। তাও আমার দোষ, তুমি আমাকেই মারতে আসো। কেন? আমার জিভ খসবে কেন? রামজী কি ওদের পাপ কাজ দেখতে পায় না ভেবেছো?'

'ওদের কোনো পাপ নেই।' সাহু গর্জিত স্বরে বলে, 'ওরা চিরকাল ঘর ছেড়ে ভগবানের সেবা করছে। পাপ তোর, সেইজনাই তোদের নরকের দেউড়ি বলে। তাই তোর পাপ মুখে তুই তাদের নামে খারাপ কথা বলছিস।'

ফুলবাসিয়া ঘাড় ঝাঁকায়, জিভ দিয়ে ঠোঁটের শুকিয়ে যাওয়া রক্ত চাটে, বলে, 'আমি বলি? সাহু, তুমি বলো না? আমার কাছে এসে ওদের নামে খারাপ কথা তুমিও তো বলো, রামজীকে ডেকে বুক চাপড়াও। তোমাকে তো আমিই কতদিন বলেছি, এখান থেকে ভেগে চলো।'

'চুপ হারামজাদী বেসরম ছিনার!' সাহু আবার গর্জে ওঠে, আঘাত করতে উদ্যত হয় এবং বলে, 'তোর জন্যই ওদের নামে আমাকে খারাপ কথা বলতে হয়। এখান থেকে ভেগে গেলে তোর রেণ্ডিবাজীর সুবিধা হয়, আমি জানি না ভেবেছিস?'

ফুলবাসিয়ার মুখ এবার শক্ত দেখায়, দৃষ্টিতে ঘৃণা, গলায় স্বরে ঝাঁঝ, 'আমি রেণ্ডি তো তুমি আমাকে ছেড়ে দাও না কেন? একটা রেণ্ডিকে তুমি ঘরে রেখেছো কেন? আমাকে তোমার কী দরকার? কতদিন তোমাকে বলেছি, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কলকারখানায় খেটে খাবো, আমি লোকের ঘরে নোকরানির কাজ করবো। তোমার একটা যে কোনো লোক হলেই ঘরঘাটের কাজ চলে যাবে, মেয়েমানুষে তোমার কোনো দরকার নেই।'

'চুপ কর্বি তুই কসবী।' সাহুর সমস্ত শরীর যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে যায়, যা প্রচণ্ড আক্রমণেরই লক্ষণ।

ফুলবাসিয়া মুঠি পাকানো ডান হাত পশ্চিমের বেড়ায় প্রসারিত করে, যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বলে, 'তুমি গালি না বকলে, না পিটলেই আমি চুপ করবো। তুমি আমাকে ছেড়েও দেবে না, মেজাজ খারাপ হলেই পিটবে, কেন? চলে যাবো বললেই

তুমি আমাকে পুলিসের ভয় দেখাও।'

'মনে রাখিস, তোকে আমি টাকা দিয়ে কিনে এনেছি।' সাহুর স্বর নিচু, কিন্তু পূর্বাপেক্ষাও যেন ভয়ংকর শোনায়, 'তোকে আমি না কিনে আনলে এতদিনে তুই দুনিয়া থেকে চলে যেতিস।'

ফুলবাসিয়া ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'হাঁ, এ বাত সচ। মগর ভগবান আমাকে জিন্দা রেখে মুর্দা করেছে। মহাপাপ! তা না হলে তোমার তামার চাকতি খোলার জন্য আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে না।'

'কী বললি?' সাহু কথাটা উচ্চারণ করেই ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে একবার বিস্ময়াহত আড়ষ্ট বৈজুর দিকে তাকায় এবং পরমুহূর্তেই লাফ দিয়ে ফুলবাসিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বৈজু ফুলবাসিয়ার কথায় এমনই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ে, ঘর ছেড়ে বাবার কথা মনেও থাকে না। ফুলবাসিয়ার শেষের কথাটির যথার্থ অর্থও কিছুই বুঝতে পারে না এবং বাবার দুরন্ত আক্রমণ ও ফুল-বাসিয়াকে প্রহারের দৃশ্যে কয়েক মুহূর্ত বিভ্রান্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে। সহসাই ওর চোখে পড়ে ফুলবাসিয়ার চুলের মুঠি ধরে ধোপার কাপড় কাচার মতো সাহু তাকে পশ্চিমের বেড়ায় আছড়ে ফেলে এবং আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে হিংস্র গর্জন করে 'এত বড় সাহস তোর, বেল্লাজ রেণ্ডি, তুই এত বড় কথা বললি?'

'ব্যস করো, ব্যস!' বৈজুর অজ্ঞাতেই যেন ওর মুখ থেকে ক্ষুব্ধ বিরক্ত স্বর বেজে ওঠে এবং ও দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলে, 'আমাকে চলে যেতে দাও, তারপরে তোমরা তোমাদের আখের লড়াই কর।' ও দরজার কাছে এগিয়ে যায়।

সাহুর উদ্যত হাত থেমে যায়, সে দরজার দিকে তাকায়। বৈজু তখন ঘরের বাইরে অন্ধকারে পা বাড়ায়। সাহুর মুখের হিংস্রতা মুহূর্তে অসহায় করুণ অভি-ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেন হিংস্রতা ও কারুণ্য দুই পাশাপাশি স্তর মাত্র। একের পিঠে আর এবং প্রকৃতই সাহু আর্তস্বরে ডেকে ওঠে, 'বৈজু! বেটা শুন!' বলেই সে বেড়ার গায়ে মাথা রেখে মাটিতে অর্ধেক শরীর এলিয়ে পড়ে-থাকা ফুলবাসিয়ার প্রতি দৃকপাত মাত্র না করে লাফ দিয়ে দরজার কাছে যায়, ডাকে, 'বেটা, রামজীর কৃপা লাগে। বৈজু শুন বেটা।' সে ঘরের বাইরে অন্ধকারে ছুটে গিয়ে বৈজুর হাত টেনে ধরে।

বৈজুর অসহ্য বোধ হয় বাবার এই হাত ধরা স্পর্শ। ও সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'ছাড়ো। আমি তোমাদের এসব মারপিটের মাঝখানে থাকতে চাই না।'

'অর মারপিট হবে না বেটা।' সাহু বৈজুর ছাড়িয়ে নেওয়া হাত আবার টেনে ধরে এবং নিজের ঘামে ভেজা বুকের ওপর চাপে, আর্ত করুণ স্বরে বলে, 'তুই যাস না বেটা।'

বৈজু আবার হাত ছাড়িয়ে নিতে উদ্যত হয়, কারণ বাবার ঘামে ভেজা শক্ত বুকের স্পর্শ ওর খারাপ লাগে এবং কিছু বলতে উদ্যত হয়। সেই মুহূর্তেই অন্ধকার কলকে ঝাড়ের কাছ থেকে শোনা যায়, 'সাহু বাবা।'

'কে?' সাহু চমকে জিজ্ঞেস করে।

খুব নিকট থেকেই জবাব আসে, 'আমি রামু এসেছি বাবা।' কাছেই একটি মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সে আবার বলে, 'আমি মিঠাই নিয়ে এসেছি।'

'হাঁ হাঁ, রামু আয়।' সাহু সাগ্রহে ডাকে, বলে, 'যা, ঘরে গিয়ে মিঠাই দিয়ে আয়।' বলেই সে আবার বৈজুর দিকে ফিরে বলে, 'চল বেটা, ঘরে বসে আগে একটু মিঠাই খা। রাগ করিস না বেটা, তোর বাবাকে মাফ কর। আমার মাথার ঠিক নেই।' বলেই সে ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় কোমল স্বর চড়িয়ে বলে, 'ফুলবাসিয়া, এ ফুলবাসিয়া, রামুর কাছ থেকে মিঠাই নিয়ে বৈজুকে থালায় বেড়ে দে। জল দে। তারপরে জলদি চায়ের জল গরম কর।'

বৈজু কিছু বলতে পারে না, ও অবাক চোখে ঘরের দিকে তাকায়। খোলা দরজার ভিতরে হ্যারিকেনের রক্তিম আলো দেখা যায় এবং রামুকে দেখা যায় দরজার সামনে। বৈজু ফুলবাসিয়াকে দেখতে পায় না, কিন্তু এই প্রচণ্ড প্রহারের পরে কি ফুলবাসিয়া আর সাহুর কথা শুনবে? ওর অবাক লাগে বাবার সহসা পরিবর্তন দেখে। একটা গর্জিত বাঘ যেন মুহূর্তেই গাভীর মতো অহিংস কোমল হয়ে ওঠে। বাবার সমস্ত আচরণে এমন অদ্ভুতপূর্ব পরিবর্তন দেখা যায়, বৈজু কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না, চলে যেতে পারে না। কিন্তু সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া ওর অনুভূতি জুড়ে থাকে। বিশেষ করে ফুলবাসিয়ার কথাগুলো ওর কানে বাজতে থাকে। সাধুদের বিষয়ে ফুলবাসিয়ার উক্তি বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য, অথচ ফুলবাসিয়ার বলার ভঙ্গি অতি বিশ্বাসযোগ্য। বাবার প্রতিবাদ অযৌক্তিক আর মিথ্যা আস্ফালনের মতো শোনাচ্ছিল। ফুলবাসিয়ার একটি কথার মধ্যে একটি নির্ঘাত সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল, বাবা নিজেও সাধুদের গালাগালি দেয়। কিছুক্ষণ আগে ওর সামনেই বাবা সুখাড়িয়া নামে সাধুকে বলছিল, 'চুতিয়া চুত্তর বিষ্ঠাখোর।' অথচ বাবা সাধুদের ন্যায় ও পুণ্য সম্পর্কে বারে বারে বলছিল। সমস্ত দোষ দিচ্ছিল ফুলবাসিয়াকে। ফুলবাসিয়া সাধুদের বিষয় যা বলছিল, সে সব কি সত্যি? মনে দ্বিধা জাগলেও অবিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু এই সমস্ত কিছু ঘটনার মধ্যে বৈজুর মনে একটি জিজ্ঞাসাই আবার তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, বাবার সঙ্গে ফুলবাসিয়ার কী সম্পর্ক? এই একটি জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে ফুল-বাসিয়ার অন্যান্য কথাগুলো ওর মস্তিষ্ককে আবর্তিত হতে থাকে।

বৈজুর হঠাৎ খেয়াল হয়, বাবা ওর হাত ধরে দাঁড়িয়ে নেই। সাহু তখন ঘরের দরজার সামনে রামুর পিছনে দাঁড়িয়ে অতি কোমল কাতর স্বরে ডাকে, 'ফুল-বাসিয়া, এ ফুলবাসিয়া, রামুর হাত থেকে মিঠাই নিয়ে বৈজুকে খেতে দে। রামজীর কৃপা লাগে তোকে, ফুলবাসিয়া!'

বৈজুর অবাক চোখে ঘরের মধ্যে একটি ছায়া বেড়ার গায়ে উঠে দাঁড়ায়। ছায়া অন্য দিকে সরে যায় এবং ছায়াকে পিছনে রেখে দরজায় ফুলবাসিয়ার বিস্রস্ত এলো-কেশী মূর্তি জেগে ওঠে।

ক্রমশ

একটি অমূল্য স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা। মীরা দেবী। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলিকাতা। নয় টাকা।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা ও দুই পুত্র। তাঁদের মধ্যে প্রথম সন্তান কন্যা মাধুরীলতা একত্রিশ বৎসর বয়সে (১৯১৮), এবং তৃতীয় সন্তান কন্যা রেণুকা (১৯০৪) ও কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ (১৯০৭)—উভয়েই মাত্র তেরো বৎসর বয়সে মারা যান। সৌভাগ্য ও সুখের বিষয়, পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবী কবিকে ছেড়ে যাননি। ১৯৫৮ সালে রথীন্দ্রনাথ রচিত পিতৃস্মৃতি 'On the Edges Of Time' প্রকাশিত হয়। কবি দুহিতা মীরা দেবীর 'স্মৃতিকথা' সম্প্রতি (২৫ বৈশাখ ১৩৮২) প্রকাশিত হয়েছে। মীরা দেবীর এই গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর (১৯৬৯) ছয় বৎসর পর প্রকাশিত হল। কিছু বিলম্বে হলেও এই মূল্যবান স্মৃতিকথাগ্রন্থ মুদ্রিত করে বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ বাঙালী পাঠক-সমাজের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

আশ্চর্য এই স্মৃতিকথা। যেমন আকর্ষণীয় তেমনই মহনীয়। রবীন্দ্র পরিবারের ঘরোয়া অন্তরঙ্গ ছবিটি যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে; সেই সঙ্গে তদানীন্তন শান্তিনিকেতনের প্রসঙ্গ রূপকথার মত মধুর বোধ হয়। অথচ তা তো রূপকথা নয়, নিতান্তই সত্যভাষণ—ইতিহাসের কথা। পুস্তকের সূচনাংশে মীরা দেবী লিখেছেন, 'এর মধ্যে কোনো কাহিনী বা গল্প নেই; শুধু কয়েকজনের ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি যাঁরা স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। স্বভাবতই এই 'কয়েকজনের' মধ্যে পিতা রবীন্দ্রনাথ প্রধান। তাছাড়াও আছে মহর্ষির কথা, ভাই বোন ও ভগিনীপতিদের কথা, মায়ের কথা। মাকে তাঁর 'স্পষ্ট মনে না থাকলেও আবছায়া মত মনে পড়ে।' আরও যাঁদের ছবি এঁকেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন নীতীন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ, সৌদামিনী দেবী দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী, অজিত চক্রবর্তী, কালীমোহন ঘোষ, নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, জগদানন্দ রায় কিংবা বৃদ্ধ গৃহভৃত্য কুঞ্জোবুড়ো। যাঁদের কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে এখনো আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন। যেমন নন্দলালবাবুর স্ত্রী সুধীরা দেবী, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী সুধা দেবী, শান্তিনিকেতনের 'ডাক্তার শচীনবাবু', 'শান্তিদেব ও নন্দলালবাবুর ছেলে বিশু।'

এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রথমেই আমি বলেছি—আশ্চর্য এই স্মৃতিকথা। কেন বলেছি?

স্মৃতিকথার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ছত্রেই নীতীন্দ্রনাথ বা নীতুর নাম পাই। কিন্তু কে এই নীতু বা নীতীন্দ্রনাথ? মীরা দেবীর একমাত্র পুত্র নীতু বা নীতীন্দ্রনাথ মারা যান জার্মানীতে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে (১৯৩২)। শোকাহত মাতামহ রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করলেন 'নীতুকে'। লক্ষণীয় বিষয়, মীরা দেবীর স্মৃতিকথায় পুত্রের কথা নেই, কন্যা নন্দিতার কথা নেই, স্বামীর কথাও উল্লেখ করেননি তিনি। বোঝা যায় নিজেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখে ছবির মালা গেঁথেছেন। নিজের শোক দুঃখ বেদনা—তা একান্তই ব্যক্তিগত। হয়তো ভেবেছেন কি হবে সে-সকল কথা লিপিবদ্ধ করে? কিন্তু নিজেকে এভাবে দূরে সরিয়ে ক'জন পারে স্মৃতিচিত্র আঁকতে? মীরা দেবীর স্মৃতিকথায় যে নীতীন্দ্রনাথকে পাই তিনি বড়ো-জ্যাঠামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সেজো ছেলে।'

মীরা দেবীর এই গ্রন্থ শুধু বিষয় গুণে নয়, ভাষার গৌরবেও মূল্যবান। এমন অনাড়ম্বর অথচ মধুর ভাষা কদাচিৎ চোখে পড়ে।

বিশ্বভারতী অত্যন্ত যত্ন সহকারে শোভন আকারে গ্রন্থখানি মুদ্রিত করেছেন। আর্ট প্লেটে ষোলটি চিত্র মুদ্রিত এবং তৎসহ আছে 'পাণ্ডুলিপিচিত্র'। কিন্তু এই 'পাণ্ডুলিপিচিত্র' মূল গ্রন্থের কোনো অংশের ছবি নয়। কবিকে লেখা বালিকা মীরার একটি চিঠির প্রতিলিপি। এই পত্রের সঙ্গে মূল গ্রন্থেরও কোনো সম্পর্ক নেই। মূল গ্রন্থের কোনো অংশের পাণ্ডুলিপিচিত্র মুদ্রিত হলে ভালো হতো। কিংবা বইয়ের সূচনায় মীরা দেবী লিখিত ছোট ছত্রের যে ভূমিকাটি আছে সেটির প্রতিলিপিচিত্র ছাপানো যেতে পারতো। যথার্থ কোনো পাণ্ডুলিপিচিত্র মুদ্রিত না হওয়ায় পাঠকের ধারণা হতে পারে কবিদুহিতা রোগশয্যায় যে স্মৃতিকথা রচনা করেছেন তা স্বহস্তে লেখেননি। হয়তো তিনি মুখে মুখে বলে গেছেন পাশে বসে কেউ তা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। এ-সকল কথা আসছে এই কারণে, যেহেতু এই রচনা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। মূল পাণ্ডুলিপিটি এখন কোথায় সে সংবাদও গ্রন্থমধ্যে নেই।

টিয়াঁরা
সব রকম চুলের জন্য উৎকৃষ্ট শ্যাম্পু
এগ
(প্রোটীন বিহীন চুলের জন্য)
শিকাকাই
স্বাভাবিক চুলের জন্য)
ল্যানোলিন
দুর্বল চুলের জন্য)
কনসেনট্রেট
নির্জীব, অবিনাস্ত,
(তেলাতেলে চুলের জন্য)
সুন্দর চুলের প্রয়োজন টিয়াঁরা

এই জাতীয় গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

মীরা দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচনাটি 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে রচনার শিরোনামটি ছিল 'আমার ছোটবেলার স্মৃতি'। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে দেখা যাচ্ছে রচনার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। কেন এই পরিবর্তন করা হল জানা যাচ্ছে না। মূল পাণ্ডুলিপিতে যে নামটি ছিল সেই নামটিকে গ্রহণ করাই আমাদের কর্তব্য।

মন্দির পরিচয়

বাংলার মন্দির। লেখক ও প্রকাশক—শ্রীপঞ্চানন রায়। বাসুদেবপুর (মেদিনীপুর)। পৃঃ ৭৪। মূল্য ৬ টাকা।

মাত্র ৭৪ পৃষ্ঠার (তার মধ্যে, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে, প্রায় ১১ পৃষ্ঠা অধিকার করেছে কোথায় কোন্ মিষ্টান্ন পাওয়া যায় তার দীর্ঘ ফিরিস্তি), এ উচ্চাভিলাষী পুস্তকটির নামকরণ একাধারে বিভ্রান্তিকর ও বিস্ময়জনক। কেননা, উত্তর বাংলার মাত্র দুটি—গৌড়-সন্নিহিত রামকেলির ও জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর মন্দির—আর পূর্ব বাংলার মাত্র আটটি—কান্তনগরের কৃষ্ণ মন্দির, যশোরের কালী মন্দির, ফরিদপুরের দেউল মন্দির, চট্টগ্রামের নবগ্রহ, আদিনাথ ও চন্দ্রনাথ মন্দির এবং কুমিল্লার জগন্নাথ ও ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নামোল্লেখ মাত্র এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। বিবৃত দেবালয়ের বাকি সবই পশ্চিমবঙ্গে, যার অধিকাংশই আবার মেদিনীপুর জেলায়, বিশেষ করে ঘাটাল অঞ্চলে—যাদের মোট সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় উল্লেখ্য মন্দিরের পাঁচ শতাংশও হবে কিনা সন্দেহ। তবুও গ্রন্থের নাম বাংলার মন্দির।

এই অল্পাল্প পুঁজি কিভাবে পরিবেশিত হয়েছে? প্রথমে, মন্দিরশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকের বোধগম্য দু-একটি হাস্যকর দৃষ্টান্ত দিই : "... খালটাকে উড়িষ্যা হইতে আনীত একটি দেউল গঙ্গাসাগর সমীপে প্রতিষ্ঠিত ছিল" (পৃঃ ২৪)। "ইসলামীয় রীতিতে গঠিত (এক শ্রেণীর) দেউল ক্রমশ তাজমহলের রূপ লইয়াছে" (পৃ, ২৮)। "বাঁকুড়ার মণি মহাদেবের মন্দিরটিও বিচিত্র। মধ্যে আমলক বিশিষ্ট প্রাসাদ ও দুই পাশে দুইটি অর্ধ প্রাসাদ" (পৃঃ ২৯)। "সেকালে গ্রীক রাজাদের কেহ কেহ আমাদের দেবতায় অনুরক্ত ছিলেন" (পৃঃ ৬৮)। এ জাতীয় উদ্ভট উক্তি আরও আছে।

পুস্তকটির বিষয়বস্তু আগাগোড়াই অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে বিন্যস্ত। চূড়ান্ত পর্যায়ে, এই অসংলগ্নতা পর পর বাক্যেও দেখা যায়। যেমন—"কলিকাতার বিখ্যাত ভীম নাগ এখানে (জনাইতে) বাস করিতেন। শিয়াখালার উত্তর বাহিনী দেবীর মন্দির আছে" (পৃঃ ৬২)। "সন্দেশের মাধ্যমে দেবতাকে চপ, কেক, ডিম দেওয়া হয়। রাজা রাধাকান্ত দেবের শিবতল চকমিলান ঠাকুরবাড়ী কলিকাতায় বৃহত্তম" (পৃঃ ৬৪)। এহেন অসংলগ্নতা অনেক ক্ষেত্রে প্রলাপোক্তির মত শোনায়।

লেখক মেদিনীপুর জেলায় (বিশেষ করে ঘাটাল অঞ্চলে) মন্দির বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান করছেন সত্য। কিন্তু ছাপার অজস্র ভুল ও পাঠের ভুলে বহু মন্দির লিপির মুদ্রিত বয়ানে অসংখ্য ভ্রান্তি দেখা যায়। গোটা বঙ্গদেশ তো দূরের কথা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার মন্দির সম্পর্কে মৌলিক ও ব্যাপক ধারণা না থাকায়, মন্দিরের শ্রেণীবিভাগ, বয়স, মাপজোখ, গঠন-পদ্ধতি, আঞ্চলিক রূপ, অলংকরণ সংস্থাপন রীতি, মন্দির-প্রাচুর্যের কেন্দ্র, মিথুন ভাস্কর্যের প্রাদুর্ভাব-স্থল প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁর অনভিজ্ঞতা বড়ই প্রকট। তদুপরি, এত সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তকে যেখানে প্রতিটি অপ্রয়োজনীয় শব্দ পরিহার্য হওয়া উচিত, গ্রন্থকার কটি মেডেল পেয়েছেন—এসব অকিঞ্চিৎকর তথ্যের পরিবেশন কি খুবই জরুরী বা প্রাসঙ্গিক ছিল?

পশ্চিমবঙ্গের মন্দির সংক্রান্ত বিদ্যা এখন আর শৈশব অবস্থায় নেই। এ বিষয়ে ইংরেজী ও বাংলায় বেশ কয়েকটি উত্তম পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সে জন্য, অক্ষম উচ্চাভিলাষের তাড়নায় পণ্ডশ্রম না করে লেখক যদি তাঁর নিজের এলাকা ঘাটালের প্রতি মনোনিবেশ করেন, তবে নিজের ও অপরের উপকার করবেন। মন্দিরকলার

আঞ্চলিক রূপের বিস্তৃত অধ্যয়নও মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়।

ছাপা, বাঁধাই ও আলোকচিত্রের পরিস্ফুটন অতি সাধারণ। সে নিরিখে দাম খুব বেশী।

কবিতা

প্রিয়জনের মুখ। ওয়াজেদ আলি। পরিবেশক : দেশ বুক স্টোর, কলকাতা-১২। চার টাকা।

আমি চলে যাব। অমিত চক্রবর্তী। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, কলকাতা-২৭। দাম—তিন টাকা।

নরম ধরনের আত্মমগ্ন কবিতাই বেশি লেখেন তরুণ কবি ওয়াজেদ আলি। 'প্রিয়জনের মুখ' তাঁর প্রথম কবিতার বই। "যে হাতে ছিঁড়েছ ফুল/ সে হাতে ছিঁড় না যেন চোখের মণি" অথবা "যে দণ্ড দাও তুমি/, মাথা পেতে নেব, তবুও/নেব না তোমার ক্রুর-ভালবাসা।"—এ জাতীয় সুন্দর পঙক্তি সহজভাবে লিখতে পারেন ওয়াজেদ। কিন্তু তাঁর ছন্দোবোধ অসম্পূর্ণ, এমন কী পংক্তি সাজাতেও মাঝে মাঝে তাঁর ভুল হয়ে যায়। তবুও এক ধরনের অনায়াস সরলতা তাঁর ছন্দ বা শব্দবোধের ত্রুটিকে (সযত্নে, নৈশরিক, বিরূপতা, ব্যাকে—এ সব শব্দ ব্যবহৃত না হলেই ভাল) মার্জনা করে দেয়; আমরা স্বীকার করে নিই—তার শান্ত চোখ, যেখানে প্রান্তরের সূর্য, সাঁতার বা দুই হাত ভরে রাখ—কবিতাগুলি একজন সৎ কবির মানস উন্মোচনের দলিল।

অমিত চক্রবর্তী স্মার্ট কবিতা লিখতে পছন্দ করেন; 'আমি চলে যাব' সম্ভবত তাঁরও প্রথম কবিতার বই। চোখে লাগার মতো লাইন তিনিও কিছু লিখেছেন যেমন —"দুঃখকে ভুলে থাকার চেয়ে পুষে রাখার মধ্যে অনেক বেশি কৃতিত্ব" (শ্যামশ্রীর জন্যে), অথবা "বসন্তের দাগের মতন তুমিও ক্রমশ আমার বুক থেকে মিলিয়ে যাচ্ছ" (ব্যক্তিগত সংলাপ)। 'এগারোই সেপ্টেম্বরের কবিতা' তাঁকে যেমন কিছু দুঃসাহস পরিয়ে দেয়, আবার 'নেই' কবিতাটি নিরুপায়ভাবে তাঁর প্রতি করুণা জাগাতে বাধা করে। ছন্দ নিয়ে অমিতের মাথাব্যথা নেই কিন্তু 'আমি চলে যাব' নামটির মতো কবিতাটিও অভিমান ও কবিত্বপূর্ণ।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

জঙ্গলে পরিত্যক্ত মানবশিশু ব্যাঘ্র-শাবকের সঙ্গে বেড়ে উঠে পুরোপুরি পশুস্বভাব পেয়েছে—এমন খবর বিরল হলেও কখনো-সখনো সংবাদপত্রের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। এ-রকম কোনো সংবাদই হয়তো নাট্যকার মনোজ মিত্রকে উদ্বুদ্ধ করেছে নেকড়ে-মানুষের কল্পনায়। অবশ্য সুন্দরবনের আরণ্য দ্বীপে বহু বিচিত্র বিশ্বাস ও সনাতন সংস্কার ছড়ানো। কোটিতে একজন শিকারীর ভাগ্যে এমন এক-একটা নেকড়ে-মানুষ জন্ম নেয়—এই জাতীয় এক অন্ধ সংস্কার। এই কল্পনা ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে রচিত ভিন্ন স্বাদের একটি সফল নাটক মনোজ মিত্রের **নেকড়ে** (রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা ১২, চার টাকা)।

পরাক্রান্ত শিকারী কংসারি ঠাকুর সুন্দরবনের একটি দ্বীপ অধিকার করে জমিয়েছিল অতুল ঐশ্বর্য। কুড়ি বছর ধরে তিলে তিলে কংসারি পূর্ণ করেছে তার কুবেরের ভাণ্ডার। দ্বীপের অধিবাসী চাষীদের জমিজমা লুঠ করে, অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে কংসারি যখন একচ্ছত্র অধিপতি, তখনই শুরু হল প্রতিশোধের এক বিচিত্র অধ্যায়। অদ্ভুত এক নেকড়ে-মানুষের আবির্ভাবের কথা শোনা গেল। কংসারির বিশ্বস্ত লাঠিয়াল আকাম এবং প্রিয় একজোড়া বুলডগের একটিকে নৃশংসভাবে খুন করার পর কংসারির অস্তিত্বের ভিত টলে যায়। মনে পড়ে যায়, গুণিনের বউ নীহারিকে নিয়ে ঘর করার সময় নীহারির পেটে জন্ম নিয়েছিল এক কুৎসিতদর্শন নেকড়ে-মানব। যে-গোমস্তার ওপর ভার ছিল তাকে খুন করার, শেষ পর্যন্ত সে খুন না করে দক্ষিণের বিলে ফেলে এসেছিল দশদিনের শিশুটিকে। সেই শিশুই কি আজ ফিরে এসেছে প্রতিশোধ নিতে?

নাটকীয় উৎকণ্ঠা চূড়ান্তে পৌঁছে দিয়ে মনোজ মিত্র খুব সুদক্ষ ভঙ্গিতে উন্মোচিত করেছেন যাবতীয় রহস্যকে। নীহারির নেতৃত্বে দলবদ্ধ শোষিত চাষীরা তাদের বহুদিনের প্রতিশোধস্পৃহা পূর্ণ করেছে। নেকড়ে-মানুষের অস্তিত্বরটনা শুধু কংসারিকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেবার জন্যে।

নাটকটির মূল স্বপ্ন হল, লোভ-লালসা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার। এই বিষয় নিয়ে রচিত নাটকে শ্লোগান কিংবা চিৎকার—যা আজকাল আকছার হচ্ছে—সহজেই জুড়ে দেওয়া যেত। মনোজ মিত্র তেমন কিছুই করেননি। তাঁর নাটকটি সে-কারণেই বাস্তব ও মানবিক হয়েও কখনো শিল্পের শর্তচ্যুত নয়। রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠাকে পূর্ণমাত্রায় ধরে রাখার কৃতিত্বও সানন্দ স্বীকার্য।

*

সমীরণ রুদ্র-র **আলোর ঠিকানা** (সলিল সাহিত্য প্রকাশনী, কলকাতা-৬, সাত টাকা) তাঁর গল্প সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ড। লেখকের বিবৃতি থেকেই জানা গেল, 'বসন্ত তিলক' নামে প্রকাশিত গল্প সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি পাঠক মহলে প্রত্যাখ্যাত হয়নি।

সমীরণ রুদ্রর গল্পগুলি অধিকাংশই বক্তব্য প্রধান। কয়েক ক্ষেত্রে বক্তব্যাংশ তিনি গল্পের শেষে আলাদাভাবে জুড়ে দিয়েছেন। যেমন, 'রাত্রির আঁধারে' গল্পটি। রাতের রেলগাড়ির কামরায় দেখা হল পুরনো মাস্টার মশাই ও ছাত্রীর। সম্পর্কটা কিছু বেশী কাছের হয়ে উঠেছিল এক সময়। মেয়েটি এখন সংসারী। গানের জগতেও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ক্ষোভ, সন্তানহীনা। মাস্টারমশাই যাচ্ছেন সাহিত্য সম্মেলনে। তিনি অবশ্য সংসার পাতেন নি। এ-রকম পরিবেশে দু-জনের দেখা হলে গল্প যে-রকম হতে পারে, সমীরণবাবু সংযত কলমে তা বর্ণনা করেছেন। সংবৃত আবেগ ও ছলোছলো পরিবেশে বিদায়। কিন্তু মেয়েটি নেমে যাবার পর 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে মানুষের যাত্রা—তমসো মা জ্যোতির্গময়' —এ-রকম লেবেল মানায় কিনা এ-নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে।

কিন্তু একটা কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সমীরণবাবুর ভাষা খুব ছিমছাম, বর্ণনাও বেশ জোরালো। গল্প সহজেই তিনি পরিবেশ তৈরী করতে পারেন, গল্প-বলিয়ে রূপে তাঁর সার্থকতাও প্রশ্নাতীত।

*

অশোক কুণ্ডু সম্পাদিত **সাহিত্যিক** বর্ষপঞ্জী ১৩৮২ (পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, পনের টাকা) সদ্য প্রকাশিত। এবারের বর্ষপঞ্জীর অন্যতম আকর্ষণ হল, বাংলাদেশের সমকালীন সাহিত্যিকবৃন্দের পরিচয় সংযোজিত হয়েছে। মনে পড়তে পারে যে, এঁরা ইতিপূর্বের সংকলনে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রকাশ করে এসেছেন। নতুন লেখকদের জন্য 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী পুরস্কার'ও নতুন ব্যবস্থা। ১৩৮১ সালে প্রকাশিত নতুন সাহিত্যিকবৃন্দের আটটি গ্রন্থকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সাহিত্য বিষয়ে খুঁটিনাটি বহু সংবাদের আকরগ্রন্থ হিসেবে এ-ধরনের বর্ষপঞ্জী যে খুবই প্রয়োজনীয়—এ কথা না বললেও চলে। তবে বিভিন্ন সাহিত্যসভার প্রতিবেদন ছাপার আগে দু-তিনটি কাগজের সাহায্য নেওয়া ভাল, অথবা নিজস্ব প্রতিবেদক পাঠানো উচিত, না হলে কিছুটা একপেশে ও অতি-সংক্ষিপ্ত খবর স্থান পায়। পুরস্কৃত সাহিত্যিকবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও গ্রন্থপঞ্জী দিলেও খুব ভালো হয়।

খেলার মাঠে

ইস্ট বেংগল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং—এই তিনটি বড় ক্লাবের পারস্পরিক ফুটবল খেলা ইডেনে করার অনুমতি দেওয়ায় ক্রিকেট প্রেমীরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ক্রিকেট সংস্থা তো প্রতিবাদই জানিয়েছে। অতীতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও বলেছিলেন, ইডেনে আর ফুটবল খেলার অনুমতি দেওয়া হবে না। কারণ, ক্রিকেট মাঠে ফুটবল খেলা হলে মাঠের ক্ষতি হয়। বিশেষ করে যদি খেলা হয় কর্দমাক্ত মাঠে।

সত্যিই ক্রিকেট মাঠে ফুটবল বাঞ্ছনীয় নয়। মাঠের ক্ষতির আশঙ্কায় বটে, ক্রিকেটের পৃথক সত্তার দিক দিয়েও বটে। কিন্তু যতদিন ফুটবলের স্টেডিয়াম তৈরি না হচ্ছে এবং বড় ক্লাবের পারস্পরিক খেলা দেখার জন্য সারা শহর পাগল হয়ে উঠছে ততদিন উপায়ই বা কি? এ বছর তো ফুটবলের পরিবেশ আরও জমজমাট। তিনটি ক্লাবের সাধারণ খেলায় যেভাবে জনসমাগম হচ্ছে তাতে ওদের বিশেষ খেলা দেখার জন্য টিকিটের চাহিদা বহু গুণ বাড়বে। ইডেনে খেলার অনুমতি না মিললে বহু ফুটবল ক্রীড়ামোদীকে আশাহত হতে হবে। সে কথা বিবেচনা করেই পুলিস কর্তৃপক্ষ ইডেনে খেলার অনুমতি দিয়েছেন। আই এফ এ-ও খেলার আগে সারা মাঠ ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে মাঠের ক্ষতি না হয়। এখন ভালয় ভালয় খেলাগুলি শেষ হলেই ভাল।

হকির ব্যাপারে অসহযোগিতা

ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (আই ও এ) সংগে হকি ফেডারেশনের বিরোধের ফলেই ফেডারেশন প্রাক-অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লেখার সময় পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই বহাল আছে। তবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী অরবিন্দ নেতাম দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা করছেন। যদি মিটমাট না হয়, ভারতীয় হকি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রাক অলিম্পিকের খেলা হবে মন্ট্রিলে আগামী আগস্ট মাসে। ১৯৭৬-এ ওখানেই হবে মূল অলিম্পিক প্রতিযোগিতা। বলা বাহুল্য প্রাক অলিম্পিক এবং মূল অলিম্পিকের খেলা হবে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে। এই মসৃণ মাঠে বাধাহীন বল ছোটে ভীষণ গতিতে। গতিবেগের সংগে সামঞ্জস্য রেখে বল কন্ট্রোল করা খুব শক্ত। এবং পায়ে বিশেষ ধরনের জুতার প্রয়োজন। প্রয়োজন বিশেষ ধরনের ট্রেনিংয়েরও। যদি ভারত প্রাক-অলিম্পিকে না খেলে তবে এই বিশেষ ট্রেনিংয়ের ধরন বুঝতে পারবে না। কৃত্রিম ঘাসের উপর খেলার অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারবে না, ফলে মূল অলিম্পিকে মহা অসুবিধায় পড়বে। কুয়ালালামপুরে বিশ্বকাপ হকি প্রতিযোগিতা জয়ের পর খেলোয়াড়দের আস্থা অনেকখানি ফিরে এসেছে। হকির নষ্ট সুনামও কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়েছে। এখন প্রয়োজন আগামী অলিম্পিকের জন্য জোর প্রস্তুতি। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রের গোষ্ঠী কোন্দল প্রস্তুতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আই ও এর কর্মকর্তাদের জেদের ফলেই অচলাবস্থার সৃষ্টি। নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক নবগঠিত হকি ফেডারেশনকে স্বীকৃতি দিলেও আই ও এ কিছুতেই ফেডারেশনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। হকির ব্যাপারে নিজেরাই আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সদস্য হয়ে বসে আছে। তাদের স্বীকৃতি এবং অনুমোদন ছাড়া আন্তর্জাতিক কোন প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দলের অংশ গ্রহণের অধিকার নেই।

আই ও এর মুখপাত্ররা মুখে অবশ্য বলছেন, প্রাক-অলিম্পিকে যোগ দেবার পথে তারা কোন প্রতিবন্ধকতা করবেন না। কিন্তু ফেডারেশনের গঠিত দলকে অনুমোদন দিচ্ছেন না। বলছেন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক যদি দল গড়ে তবে অনুমোদন দেবেন। দল গড়া কি শিক্ষা মন্ত্রকের কাজ? তবে আর বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন ফেডারেশনের প্রয়োজন কি? হকি ফেডারেশনের সভাপতি এম রামস্বামী একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলে বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রক এবং ক্রীড়া পরিষদ যে ফেডারেশনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, মেনে নিয়েছে, আর কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে অনুমোদিত ২৭টি সংস্থার মধ্যে ২৩টি সংস্থা, সেই ফেডারেশনকে আই ও এ স্বীকৃতি দিচ্ছে না, অথচ বলছে শিক্ষা মন্ত্রক দল গড়লে সে দলকে স্বীকৃতি দেবে। এ কেমন যুক্তি?

যুক্তিটা, দেহ থেকে আধ পাউন্ড মাংস কাটা হবে কিন্তু রক্ত পড়বে না—প্রায় এই ধরনের আর কি!

হকি ফেডারেশনের সংগে আই ও এ এবং তার বয়স্য কিছু কর্মকর্তা অসহযোগিতা করেই চলেছে।

ফুটবল লীগের খেলায় হাওড়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক করছে ইস্টবেংগলের সুভাষ ভৌমিক (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়)

প্রাক-অলিম্পিকের জন্য বাঙ্গালোরে কোচিং ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। কুয়ালালামপুরে বিশ্বকাপ দলের কোচ গুরুচরণ সিং বোধি এবং ম্যানেজার বলবীর সিং (প্রাক্তন হকি অধিনায়ক) ওই ক্যাম্পের কোচ নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাব সরকার কাউকেই ছেড়ে দেয়নি। ফেডারেশনের অনুরোধ সত্ত্বেও না। বলবীর এবং বোধি দুজনই পাঞ্জাব সরকারের ক্রীড়া বিভাগের অফিসার। একে কি সহযোগিতা করা বলে?

যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলের হুল্লোড়

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় খেলা বলতে বেসবল, রাগবী, টেনিস, অ্যাথলেটিক স্পোর্টস প্রভৃতি। দক্ষিণ আমেরিকার কথা স্বতন্ত্র। ফুটবলে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকা। বিশ্বকাপের খেলায় অবশ্য ফুটবল স্রষ্টা ইংল্যাণ্ডকেও একবার যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। কাশীতে ভূমিকম্পের মত ফুটবল বিশেষজ্ঞরা সেটাকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিয়েছিলেন। এখন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল খুবই জনপ্রিয় খেলা। এবং বলা বাহুল্য এ বছরের মত এমন হুল্লোড় যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল ইতিহাসে দেখা যায়নি।

প্রধানত দুজন খেলোয়াড়কে কেন্দ্র করে এই হুল্লোড়। একজন ফুটবল সম্রাট পেলে। অপরজন পর্তুগালের ইউসেবিও, ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ ফুটবলে পেলের উপর যে টেক্কা দিয়েছিল। উত্তর আমেরিকা ফুটবল লীগে খেলাবার জন্য নিউইয়র্ক কসমস ক্লাব প্রায় ৪ কোটি টাকার (৪.৫ মিলিয়ন ডলার) চুক্তিতে পেলেকে নিয়েছে। এ ছাড়া ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে পেলের নাম ব্যবহারের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হবে তার দুই তৃতীয়াংশও পাবে পেলে। ইউসেবিও খেলছে বোসটন মিনুটমেন ক্লাবে। ইউসেবিওর জন্য বোসটন ক্লাবকে কত দক্ষিণা দিতে হয়েছে জানা যায়নি। ধরে নেওয়া যেতে পারে তার পরিমাণও বিপুল। বিশ্বখ্যাত এই দুই খেলোয়াড় ছাড়াও নামী পেশাদারদের অনেকেই এখন খেলছে আমেরিকার বিভিন্ন ক্লাবে। তার ফলে ফুটবলের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছে।

ফুটবল নিয়ে ওদেশে কতখানি সাড়া জেগেছে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে তার প্রমাণ মেলে পেলে যেদিন প্রথম প্রদর্শনী খেলায় যোগ দেয়। লীগের খেলা নয় তবু সারা যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশনে খেলাটি দেখানো হয়। সরাসরি টেলিকাস্ট হয়। জাপান কোস্টারিকা মেক্সিকো ব্রাজিল কলম্বিয়া ভেনেজুয়েলা, পানামা, পুর্টোরিকো, কানাডা প্রভৃতি দেশে। স্টেডিয়ামের কোন বুথে দেখা যায় পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত ৩০০ সাংবাদিককে। শুধু পেলের নাম শুনে প্লেনে, মোটরে, বাসে, সাইকেলে এবং হাঁটা পথে হাজার হাজার মানুষ এসে স্টেডিয়ামকে জনারণ্যে পরিণত করে।

যেদিন নিউ ইয়র্ক কসমস এবং বোসটন মিনুটমেন লীগের খেলায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং পেলে ও ইউসেবিও পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলে সেদিন স্টেডিয়ামের দৃশ্য ছিল বর্ণনাতীত। ইউসেবিওর দল খেলাটিতে ২—১ গোলে জিতেছিল। প্রথম গোল করেছিল ইউসেবিও। পেলেও একটি গোল করেছিল, কিন্তু রেফারী সে গোলটি নাকচ করার পর সারা স্টেডিয়ামে বিশৃঙ্খলা, ফুটবল বিগ্রহ পেলে মানুষের পাহাড়ে চাপা পড়ে আহত হয়। খেলার সময়ও তার পায়ের পেশীতে টান ধরে এবং গোড়ালিতে সামান্য চোট লাগে। পেলে সারাক্ষণ খেলতে পারেনি। ইউসেবিও শেষ সময় পর্যন্ত মাঠে ছিল না। তবু মার্কিন মুলুকের মানুষ ওই খেলাটিকে স্বপ্নের খেলা (ড্রিম গেম) নামে অভিহিত করেছে। কেননা পেলে ও ইউসেবিও ছিল দুই পক্ষে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে দুজন পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলল।

ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবলের জনপ্রিয়তা যত বাড়বে পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়দের ভত বাড়বে টাকার অংক। একেই এক একজন নামী পেশাদার খেলোয়াড় এক একটি স্বর্ণখনির মালিক। এরপর যুক্তরাষ্ট্র যদি ফুটবলে মেতে ওঠে তবে তাদেরই পোয়া বারো।

কোচদের কোচিং ক্রীড়া-প্রসার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনুদানে স্ট্যাণ্ডারস্টাডি কোচেস কোচিং স্কিম পরিকল্পনায় অনেকগুলি ক্যাম্প হয়ে গেল। ফুটবল, ক্রিকেট, কবাডি, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, জিমন্যাস্টিকস, ভলিবল, বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলাধুলায় প্রধানত জেলার সেই সব কোচরা সমবেতভাবে ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক শিক্ষা নিয়েছে, যারা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে আগামী দিনের খেলোয়াড়দের গড়ে তুলবেন। জেলায় জেলায় খেলোয়াড়দের শিক্ষা দেবেন। বিশেষ করে খেলাধুলার শিক্ষা ছড়িয়ে দেবেন গ্রাম বাংলায়। কবাডি ফেডারেশন ও ভলিবল ফেডারেশনের মাঠে, নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে, দেশবন্ধু পার্কে আয়োজিত এই সব ক্যাম্পে বিভিন্ন জেলা থেকে বেশ কিছু কোচ যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা উন্নত ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষা নিয়েছেন জাতীয় কোচদের কাছ থেকে। এই সব কোচরাই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বেন।

সারা দেশ বলতে আমি ভারতকেই বোঝাচ্ছি। বিভিন্ন রাজ্য ক্রীড়া সংগঠনের সহযোগিতায় রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের এই স্ট্যাণ্ডারস্টাডি কোচিং পরিকল্পনা খেলাধুলা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের রূপরেখা রূপায়ণেরই প্রথম পদক্ষেপ। কেননা কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চম যোজনায় অন্তত ৮০ লাখ ছেলেমেয়েকে খেলায় জড়াতে চান নেহরু যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী অরবিন্দ নেতাম বলেছেন, চলতি বছরে সারা দেশে ২০০টি যুব কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এখন আছে ৯০টি। ঠিক মত কাজ হচ্ছে ৮৭টিতে। পঞ্চম যোজনায় দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে কেন্দ্র স্থাপিত হবে। প্রতি কেন্দ্রে খেলাধুলার শিক্ষা দেবে দুজন করে এন আই এস কোচ। তাদের সাহায্য করবে স্থানীয় কোচরা। মাসখানেক আগে দিল্লিতে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা ও ক্রীড়ামন্ত্রীদের যে সভা হয় তাতে ঠিক হয় স্বল্প ব্যয়ের এবং কম সরঞ্জামের খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং সুদূর পল্লীর প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেলার প্রসার ঘটাতে হবে। খেলাধুলার সুযোগ বাড়াবার জন্য রাজ্যগুলিকে প্রয়োজন মত আইন প্রণয়নের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিটি খেলোয়াড়কে উৎসাহ ও যথাযথ আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্কুল পর্যায় থেকে শরীরচর্চা ও খেলাধুলাকে আবশ্যিক করতে হবে।

আমাদের দেশে খেলার মান বাড়েনি বলে যে অপপ্রচার হয় সেটা, অন্যান্য দেশের ক্রীড়া মানের সঙ্গে পার্থক্যের মাপকাঠিতে এবং বহু ক্ষেত্রে আহত হবার বেদনায়। আগের চেয়ে খেলাধুলার মান যে অনেক বেড়েছে অ্যাথলেটিক ও সাঁতারের রেকর্ড থেকেই তার প্রমাণ মেলে। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, অন্যান্য দেশ এবং বহু ছোট ছোট দেশ খেলাধুলায় যেভাবে এগিয়ে গেছে আমরা সেভাবে এগোতে পারিনি। আমাদের অগ্রগতি অনেক মন্থর অন্যান্য দেশের তুলনায়।

খেলাধুলা এখন পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক। প্রতিভাধরের পক্ষেও আধুনিক শিক্ষা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অসম্ভব। তাই এই সব শিক্ষা পরিকল্পনা। ঠিকভাবে কাজ হলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। ক্রীড়া প্রসারের সঙ্গেই বাড়বে ক্রীড়া দক্ষতা।

একলব্য

ভারতীয়-ফুটবলের 'জনক'

বিশ ও ত্রিশ দশকে বিভিন্ন খেলায় যাঁরা দিকপাল ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম দিনে তাম্রপত্র ও প্রশংসাপত্র দিয়ে তাঁদের ৮ জনকে সম্বর্ধনা জানানোর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীড়ানুরাগী মহলে অতীত দিনের অনেক কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়ের কথা আলোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে তাঁদের কথা, যাঁরা ছিলেন পথিকৃৎ।

অতীতে প্রদেশ কংগ্রেস আয়োজিত গুণিজন সম্বর্ধনায় বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদদের সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। শম্ভুনাথ মল্লিক যখন রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক ছিলেন তখন পর্ষদের পক্ষ থেকেও সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছে। খোদ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তাম্রপত্র দিয়ে সম্মান জানানোর এটিই প্রথম ঘটনা।

স্পোর্টস কাউন্সিলের পরামর্শে রাজ্য সরকার খেলোয়াড়দের ক্রীড়াদক্ষতা প্রকাশের সময়কাল ঠিক করে নিয়েছেন বিশ ও ত্রিশ দশক। এর পর হয়তো ঠিক করা হবে ত্রিশ ও চল্লিশ দশক। কিন্তু অতীতের কিছু কিছু অসাধারণ খেলোয়াড় হয়তো উপেক্ষিত হয়েই থাকবেন। সাধারণের স্মৃতির পাট আর পত্র-পত্রিকায় অমর হয়ে থাকবে বহু পথিকৃৎ যাঁরা মরজগতের মায়া কাটিয়েছেন অনেক আগে। অনেকেই ক্রীড়া ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়। যেমন ক্রিকেট জনক অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়, মহাবলী ভীম-ভবানী, মল্লবীর গোবর গুহ, ক্রীড়াগুরু 'স্যার' দুঃখীরাম মজুমদার, চৌকস ক্রীড়াবিদ পি কে বিশ্বাস, অলিম্পিকে প্রথম বাঙালী পি সি ব্যানার্জি, ব্যায়ামাচার্য রাজেন গুহঠাকুরতা, লাঠিয়াল পুলিন দাস, ১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের একাদশ রথী। আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে। যিনি ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে প্রথম অধ্যায়ের নায়ক—ফুটবলের ভরা মরসুমে এখন তাঁর নামটিই মনে পড়ছে। ইনি ভারতীয় ফুটবলের 'জনক'। নাম নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী।

কলকাতার তো বটেই, সম্ভবত সারা ভারতের মধ্যে এই বাঙালী সর্বপ্রথম ফুটবলে শর্ট করেছিলেন, সর্বপ্রথম ফুটবল খেলেছিলেন, ক্লাব গড়েছিলেন, পরবর্তী-কালে সাহেবদের সংগে গড়েছিলেন ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। অর্থাৎ আই এফ এ।

ভারতের প্রথম ফুটবল খেলা হিসাবে যে ম্যাচটি চিহ্নিত হয়ে আছে সে ম্যাচটি হয়েছিল ১৮৫৩ সালে এসপ্ল্যানেড মাঠে। জেন্টলম্যান অব ব্যারাকপুর এবং ক্লাব অব সিভিলিয়ানস-এর মধ্যে। তার পর মাঝে-মধ্যে ইউরোপীয়ানদের মধ্য প্রীতি ফুটবল খেলা হলেও কলকাতার প্রথম ফুটবল ১৮৭৯ সালে। ক্লাবটির ক্লাবের সৃষ্টি হয় নাম ছিল ট্রেডস ক্লাব। পরবর্তীকালে সে ক্লাব ডালহৌসী ক্লাবে পরিণত হয়। কিন্তু ডালহৌসী ক্লাব সৃষ্টির আগেই নগেন্দ্রপ্রসাদ বাঙালীদের মধ্যে ফুটবল পয়দা করেছিলেন গড়ের মাঠে সাহেবদের খেলতে দেখে।

সেটা প্রায় একশো বছর আগের কথা। ১৮৭৭ সালের কথা। নগেন্দ্রপ্রসাদ তখন মাত্র দশ বছরের বালক। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে মা যাচ্ছিলেন গংগা স্নানে কিংসওয়ের পথ ধরে। সংগে ছিল নগেন্দ্রপ্রসাদ। গাড়ির
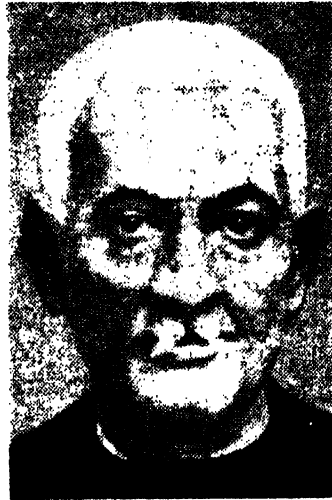
নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

মধ্য থেকেই ছেলেটি উঁকি মেরে দেখল গড়ের মাঠে (এখন যেখানে মোহনবাগান মাঠ) সাহেবরা একটা চামড়ার গোল বস্তু নিয়ে লাথালাথি দৌড়োদৌড়ি করছে। কৌতূহলবশত নগেন্দ্রপ্রসাদ গাড়ি থেকে অনেকক্ষণ খেলা দেখল। পরের দিন হেয়ার স্কুলে এসে সহপাঠিদের কাছে খেলার গল্প করে তাদের উৎসাহিত করল এবং কিছু চাঁদা তুলে ঠিক করল বল কিনে তারাও ওই খেলা খেলবে।

কয়েকজন সহপাঠিসহ নগেন্দ্রপ্রসাদ পরের দিন ক্রীড়া উপকরণ বিক্রেতা এক সাহেবী দোকানে উপস্থিত হয়ে বল কিনতে চাইলে ইউরোপীয় দোকানদার বিস্মিত হয়ে অনেকগুলি বল বার করলেন। কিন্তু একটি বলের জন্য যে টাকা প্রয়োজন ছেলেদের কাছে সে টাকা ছিল না। দোকান-দার সহানুভূতি পরবশ হয়ে তাদের কাছে যত টাকা ছিল তাই নিয়েই বলটি দিয়ে দিল। পরের দিনই হেয়ার স্কুল মাঠে আরম্ভ হল খেলা।

সে খেলা অবশ্য ফুটবল খেলা নয়। কারণ, নগেন্দ্রপ্রসাদ গড়ের মাঠে যে খেলা দেখেছিলেন সেটা ছিল রাগবী ফুটবল খেলা। দোকান থেকে কিনেও এনেছিলেন নারকেলের আকারের একটি রাগবী বল। নিয়ম কানুনও কিছু ছিল না। যেভাবে নগেন্দ্রপ্রসাদ সাহেবদের খেলতে দেখেছিলেন সেইভাবে ছেলেরা দুই দলে ভাগ হয়ে বল নিয়ে কসরৎ করছিল। বাঙালী পাড়ায় বাঙালী ছেলেদের মধ্যে এই অদ্ভুত খেলা দেখে হেয়ার স্কুল মাঠে দারুণ ভীড় জমে গেল। অসম্ভব কৌতুক বোধ করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের খেলা-প্রিয় ইউ-রোপীয় অধ্যাপক মিঃ স্ট্যাক। তিনি ছেলেদের কাছে এসে অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে খেলার নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিলেন। রাগবীর বদলে অপেক্ষাকৃত সহজ ফুটবল খেলার উপদেশ দিলেন এবং পরে নিজেই একটি ফুটবল এবং একখানি আইনের বই কিনে নগেন্দ্রপ্রসাদকে উপহার দিলেন। আরম্ভ হয়ে গেল বাঙালীদের মধ্যে ফুটবল খেলা। নগেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠল হেয়ার স্কুল ফুটবল ক্লাব।

পরে শোভাবাজার রাজবাড়ির জীবেন্দ্র-কৃষ্ণ দেব-এর পৃষ্ঠপোষকতায় নগেন্দ্রপ্রসাদ শোভাজাবার ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। নগেন্দ্রপ্রসাদই ছিলেন ক্লাবের অধিনায়ক। হেয়ার স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা ১৮৮৪ সালে ওয়েলিংটন ক্লাব (বর্তমানের টাউন ক্লাব) এবং ১৯০০ সালে হেয়ার স্পোর্টিং ক্লাব গঠিত হয়।

নগেন্দ্রপ্রসাদ যেমন সর্বপ্রথম ফুটবলের সূচনা করেছিলেন, তেমন ভারতীয় ক্লাব হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শোভাবাজার ক্লাব সর্বপ্রথম আমন্ত্রিত হয়েছিল এদেশের প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা ট্রেডস কাপের খেলায় ১৮৮৯ সালে। ১৮৯৩ সালে যখন আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয় তখনও সে প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় দল ছিল নগেন্দ্রপ্রসাদের শোভাবাজারে ক্লাব। শোভাবাজারকে ইউরোপীয়রা বলত বাবুজ টিম।

শুধু ফুটবলেই নয়, ক্রিকেটে এবং হকিতেও নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ এবং বলা বাহুল্য বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সর্বাধিকারী পরিবারের অবদানের সংগে সঙ্গতি রেখেই নগেন্দ্র-প্রসাদ একাধারে ছিলেন আইনবিদ, সাহিত্যিক, সংগঠক এবং উঁচু দরের খেলোয়াড়। খেলতেন সেন্টার ফরোয়ার্ড। সে যুগে 'বাবুজ টিমের' ওই বাবুর ক্রীড়া-দক্ষতার কথা দেশের মানুষের কান ছাপিয়ে সাগর পারের সাহেবদেরও কানে গিয়ে পৌঁছেছিল।

মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

এইবার!

হাতি এবারে পায়ের তলায় মানুষের খুলি পিষবে!
হুকুম দিন!

ভাল! বেয়াদপির সাজা এবারে টের পাবে!
!
11/24

অরণ্যের অধিবাসীদের রক্ষা করতে এসে অরণ্যদেব নিজেই বিপন্ন
সক্কলের কথা মনে পড়ছে!

এইবার!
!!!!

"বন্দী বিধাতা" (পরিচালনা : প্রভাত মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সোমা দে ও কণিকা মজুমদার

রঙ্গ জগৎ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে এখন ভারতের ছবি নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। উৎসবের জন্য ছবি নির্বাচন যে সব ক্ষেত্রেই খুব সন্তোষজনক হচ্ছে এমন বলার উপায় নেই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন খুব ভাল ভাল ছবি তৈরি হচ্ছে। সত্যজিৎ রায়ের

মতামতের মন্তাজ

ছবি ছাড়াও বছরে অন্তত কয়েকটি ছবি ভারতে তৈরি হয় যেগুলি নিশ্চিন্তে বিদেশে ফেস্টিভ্যাল-এ পাঠানো যায়। এসব ছবিতে ভারতের দুর্নাম হবার কথা নয়, বরঞ্চ সুনামই বাড়ার কথা। ছবি পাঠাবার আগে আরও একটি বিষয় জানা দরকার। বুঝতে হবে কোন্ দেশে কী ধরনের ছবির কদর হওয়া স্বাভাবিক। শুধু ফেস্টিভ্যাল-এ স্বীকৃতি পাওয়াই যথেষ্ট নয়, উৎসব মারফত ছবির ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের যোগাযোগও ঘটে। তাই বাইরের উৎসবের জন্য ছবি ঠিকমত বাছাই হওয়া দরকার। প্রামাণিক বা স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র নিয়ে এই সমস্যাটা দেখা যায় না। কারণ, এই ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি বিস্ময়কর। উঁচু আন্তর্জাতিক মানের স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র এখন ভারতে তৈরি হচ্ছে। বিদেশের নানা ফেস্টিভ্যাল-এ ভারতের তথ্যচিত্র ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রের উৎকর্ষ স্বীকৃত। প্রশ্ন কেবল কাহিনীচিত্রের বেলায়। বিভিন্ন আঙ্গিকের ও নতুন নতুন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র এখন তৈরি হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও ছবি নির্বাচন একটা দারুণ সমস্যা ছিল। সত্যজিৎবাবুর ছবি ছাড়া বিদেশে পাঠাবার মতো আর বিশেষ কোন ছবি পাওয়া যেত না। এখন অবস্থাটা অন্য রকম। বিদেশের সব কয়েকটা ফেস্টিভ্যাল-এ পাঠাবার মত ছবি এখন এ দেশে তৈরি হচ্ছে। কেবল দেখতে হবে যোগ্য স্থানে যেন যোগ্য ছবি যায়। 'দূরবিধা' এবং 'কোরাস'ই কেবল বাইরে পাঠানোর মতো ছবি নয়।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মূল্য এখন অনেকটা কমে আসছে। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, বিভিন্ন দেশের বড় পরিচালকরা আর ওই সব উৎসবে ছবি পাঠাতে তেমন আগ্রহী নন। বেশির ভাগ উৎসবও এখন শুধুই ফেস্টিভ্যাল। প্রতিযোগিতা অনেক ফেস্টিভ্যাল থেকেই উঠে গেছে। প্রতিযোগিতা নেই বলে উৎসবের প্রয়োজন ও আকর্ষণ কমছে এমন মনে করার কারণ নেই। বরঞ্চ সব সময় ভাল ছবি দেখা যায় না বলেই কোন কোন উৎসব নেহাত বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনী বা চিত্রমেলা হয়ে উঠছে। তবু এর দরকার আছে। তবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব কয়েক বছর আগেও যে তাৎপর্য বহন করত আজ তার সেটা করে না। এর প্রকৃত কারণ প্রকৃতপক্ষে উঁচুদরের ছবি উৎসবে যাচ্ছে না। তবু আগেই বলা হয়েছে, উৎসবের যথেষ্ট মূল্য আছে। শিল্প বা আর্ট অনুশীলনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব তো আছেই, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্যও উৎসবের দরকার। তাই উৎসবে ছবি পাঠানোর ব্যাপারেও যথাসম্ভব সতর্কতা ও দূরদর্শিতা দরকার।

খুশবু

(তিরুপতি পিকচারস)

'খুশবু' শুরু থেকে বেশ চলছিল। হেমা মালিনীকে শরৎ-কাহিনীর নায়িকা (পণ্ডিত মশাইয়ের কুসুম) ভাবতে যদি কষ্ট হয় তাতেই বা ক্ষতি কী। হিন্দীচিত্রের নিয়মের সঙ্গে শরৎচন্দ্রর উপন্যাসকে যতটুকু মানিয়ে নেওয়া গেল ততটুকুই তো লাভ। তা না হলে হেমা ও জীতেন্দ্রর মুখে গান থাকে? শরৎ-কাহিনীর নায়ক-নায়িকা হিসাবে ওঁদের মানাচ্ছে কিনা, বিশেষত পোশাকে-আশাকে, এই প্রশ্ন অবান্তর। যেহেতু "খুশবু"র চিত্রনাট্যের ভিত্তি 'পণ্ডিত মশাই' এবং এর পরিচালক হলেন গুলজার তাই ছবিটিকে আর সব সাধারণ মানের হিন্দী ছবি থেকে

'খুশবু'/হেমা মালিনী

সহজেই আলাদা করে নেওয়া যায়। গুলজার তাঁর ট্রিটমেনটে বেশ কিছু ভাল কাজ দেখিয়েছেন। ছবিটিতে পরিচ্ছন্নতাও আছে। তবে একটি বিশেষ পিরিয়ড-এর প্রতি পরিচালক আরও বিশ্বস্ত হতে পারতেন। কেবল হ্যারি কোম্পানির সেলাই কল দেখালেই পিরিয়ড-এর লক্ষণ মেলে না। খুব অসহ্য লেগেছে যখন-তখন গান। গুলজার অকারণ গান বর্জনের (আর তা বর্ণ সুরারোপিত) সাহসও দেখাতে পারতেন।

খুশবু-র ভূমিকা হেমা মালিনীর পক্ষে নতুন। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এই গ্রাম্য মেয়ের (যদিও সম্পূর্ণ গ্ল্যামার-হীন নয়) চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বেশী ভাল লেগেছে জীতেন্দ্রকে—তাঁর সংযত অভিনয়ের জন্য। তাঁর পোশাক আধুনিক যুবকের মতোই, তবে চরিত্রটি ভিন্ন জাতের।

শর্মিলা ঠাকুরকে অল্পকালের জন্য অতিথি শিল্পী হিসাবে দেখা গেল। ওই দেখাটুকু অনেকের পক্ষে হয়ত সুখ। তাঁকে ওই রকম একটি ভুতুড়ে পরিবেশে রাখা হল কেন? শর্মিলাও যেন কেমন অস্বাভাবিক। তবে শরৎ-কাহিনীর নারীর তেজ শর্মিলা যত সহজে প্রকাশ করেছেন হেমা ততটা পারেননি।

শুটিং চলছে ...

বাদ্যি বাজনা নেই, হৈ হুল্লোড় নেই, জোরালো আলো নেই—চারিদিক থমথমে। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ এই যে দস্যু সর্দার রত্নাকর বিয়ের আসর থেকে এক যুবতীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে আসবেন। ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐ তিনি আসছেন। প্রশস্ত বনভূমির ওপর দিয়ে দুরন্তবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে। অদূরে তাঁর পর্ণকুটির কিম্বা আস্তানা। সেট, টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর ফ্লোরের মধ্যে আস্তানার অন্তর্ভাগ—খড়ের ছাউনি, বাঁশের খুঁটি আর খেজুর পাতা দিয়ে গোল করে ঘেরা। পাশে জঙ্গলের একাংশ। বিকট শব্দ করে ঘোড়ার থেমে যাওয়া, ঘোড়া থেকে রত্নাকরের নামা, যুবতীটিকে নামান—এসব অদেখার মধ্যে রইল। দৃশ্যমান হচ্ছে রত্নাকরের পদচারণা। দীর্ঘ পা ফেলে ফেলে আস্তানার দিকে এগিয়ে চলা। আগে আগে চলেছেন যুবতী। যুবতী স্বেচ্ছায় এখানে আসেন নি সেটা তাঁর পদক্ষেপ ঘোষণা করে, চোখ দুটি স্পষ্ট বলে দেয়। বৃত্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। কেবলই ঘুরছেন। ভয়ে আতঙ্কে তাঁর মুখ চোখের অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন বনকুরঙ্গীর সঙ্গে তুলনা চলে। বন্দুকের নলে নত জ্বলছে রত্নাকরের চোখ দুটি। তিনি ক্রমশ এগিয়ে আসছেন। কাঁপা কাঁপা মেয়েলী কণ্ঠস্বর এবং শরীর একজন পুরুষ মানুষকে প্রতিহত করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে। অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে...আমাকে ছেড়ে দাও...তুমি আমাকে ছেড়ে দাও......

ওর নাম ঝিমলি। এই জঙ্গলের আশেপাশেই কোথাও থাকে। একবার রাজার সেপাইরা তাকে দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। রাজাকে খুশী করার জন্য এর চেয়ে খাসা উপহার আর কি হতে পারে! জোর করে ওরা ঝিমলিকে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে ঘটনাস্থলে রত্নাকর এসে হাজির। তাঁর সামনে ঝিমলিকে নিয়ে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। রণকৌশলে শেষ পর্যন্ত রাজার সেপাইরা পর্যুদস্ত। ঝিমলিকে রত্নাকর সসম্মানে তার ঘরে পৌঁছে দেন।

সেই রত্নাকরের মুখোমুখি এই মুহূর্তে

ঝিমলি এতটা ভীত, আতঙ্কিত কেন? কেনই বা সে নিজেকে এতটা অসহায় ভাবছে? রত্নাকর কি তবে তার সম্মানহানির চেষ্টা করছেন? দস্যুবৃত্তি তাঁর পেশা কিন্তু নারী লুণ্ঠন তো নয়। তাহলে কেন তিনি এমন একটা অভাবিত কাজ করে বসলেন? কারণটা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করলেন চিত্রনাট্যকার ও রত্নাকর চরিত্রের শিল্পী শেখর চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলতে চান রামায়ণে রত্নাকরের পরিচয় আমরা যেটুকু পেয়েছি তার ওপর ভিত্তি করেই চিত্রনাট্য। চিত্রনাট্যে তাঁর দস্যুবৃত্তি বিস্তারিত হয়েছে। এটা রামায়ণে অনুল্লিখিত। এই মেয়েটির অংশ। এই মেয়েটির প্রতি রত্নাকর একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। মেয়েটিকে তাঁর প্রেমিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনার পর সে দেখল বলপূর্বক সব কিছু আদায় করা যায় না। অন্তত ভালবাসা পাওয়া যায় না। দস্যু রত্নাকরের ভেতরের মানুষটা ধীরে ধীরে মাথা তুলতে থাকে। বলা যেতে পারে এখান থেকেই রত্নাকরের মানবিকতাবোধের দৃষ্টান্ত মেলে। মেয়েটিকে সে ছেড়ে দেয়। আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে রত্নাকর কিভাবে দস্যু সর্দার হয়েছিলেন। তাঁর মনের মধ্যে বিক্ষোভ তিল তিল করে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। তিনি রাজার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর দস্যুবৃত্তি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য। অর্জিত যা কিছু তিনি ব্যয় করতেন এইভাবে।

পরিচালক জ্ঞানেশ মুখার্জী বললেন: এই ধরনের ছবি করার একটা বিশেষ মজা আছে। হাজার হাজার লোক, ঘোড়া, ঢাল, তলোয়ার, তীরধনুক এমনকি হাতি নিয়ে শুটিং করার ইচ্ছে আছে। একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে থাকবে শুটিং জোন। যুদ্ধের দৃশ্য তোলা হবে। সম্ভবত এ ধরনের চেষ্টা আগে বাংলা ছবিতে হয় নি। খুবই খরচের বিষয়। সেভাবে স্বাধীনতা না পেলে এ ধরনের ছবি জমানো যায় না। আমি প্রতি সেকেন্ডে অ্যাকশন চাই। অ্যাকশন মারপিটও হতে পারে, কথাবার্তায় হতে পারে, চলাফেরায় হতে পারে। এ ছবিকে সব দিক থেকে 'অ্যাকশন-প্যাকড' তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাই বলে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ হবে না এমন কথা নয়।

ঝিমলির ভূমিকায় রূপ দিতে বম্বে থেকে এসেছেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী রেহানা সুলতান। তিনি এই প্রথম বাংলা ছবিতে কাজ করছেন। বাংলা সংলাপ স্পষ্ট বলতে পারছেন না ঠিকই কিন্তু যতদূর সম্ভব স্পষ্ট বলা যায় তার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। শুটিং অবসরে, হোটেলে, যখনই সময় পাচ্ছেন সংলাপ বার বার টেপ করে প্র্যাকটিস করছেন। সেদিন প্যাক-আপ-এর পর তাঁর সঙ্গে কথা হল। তাঁর কথা হল এই যে, 'আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল বাংলা ছবিতে কাজ করা—ভাল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।' নিয়মিত বাংলা ছবি করতে চান কি না জিজ্ঞেস করা হলে তাঁর সোজাসুজি কথা 'এখানে বম্বের মত টাকা তো পাওয়া যাবে না। ছবি করাটা আমার পেশা। যেখানে বেশী টাকা রোজগার করতে পারব সেখানেই নিয়মিত কাজ করব। মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই বাংলা ছবিতে কাজ করব। বাংলা ছবিতে কাজ করার পরও একটা সাধ এখনও আমার অপূর্ণ রয়ে গেল।' কি সেটা? সত্যজিৎ রায় যদি কোন দিন সুযোগ দেন তবেই সেই সাধ......

রত্না ফিলম কর্পোরেশনের 'দস্যুসর্দার রত্নাকর'-এর প্রথম পর্যায়ের শুটিং শেষ হল। অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন সুলতা চৌধুরী, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, শম্ভু ভট্টাচার্য এবং রবীন বন্দোপাধ্যায়। ছবিখানি প্রযোজনা করছেন শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়।

শুটিং চলছে: "দস্যু রত্নাকর"-এর সেই নাটকীয় মুহূর্তে রেহানা সুলতান ও শেখর চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

* * *

এ কী কান্ড! এ কী দুঃসাহস। এই বলে আজ হরতনীকে দেখে রুইতন বিস্মিত। নিয়ম নেই, কিন্তু কার নিয়মে 'তাসের দেশ'-এ এমন ঘটনা। সকাল থেকেই নীল মেঘ আকাশ জুড়ে। এতদিন এই দেশের ময়ূর গুনে গুনে পা ফেলত, নাচত সাবধানে, আজ কেন অনিয়মের নাচ। ঘর হতে যার আঙিনা বিদেশ সেও আজ ফুল তুলতে বেরিয়েছে। হরতনী ভাবছে সে আজ মালিনী। আর জন্মে ফুল তুলত। পূবের হাওয়ায় সেই জন্মের ফুল বাগানের গন্ধ এল। সেই জন্মের মাধবীবন থেকে ভ্রমর এসেছে মনের মধ্যে......ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে.........

আবিষ্কার ছবি তোলবার জন্য বাসু চার্য খার অঞ্চলে একটি ফ্ল্যাটই কিনে লেন। ছবির স্বার্থে ওই ফ্ল্যাটের কিছু ার করা হয়। ক্যামেরার কাজের ধার জন্য একটি দেওয়ালের কিছু অংশ ফেলা হয়েছিল। ছবিটি প্রায় পুরই তোলা হয়েছে উক্ত ফ্ল্যাটে। এখন বাবু ওখানেই থাকেন।

এই প্রসঙ্গে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর মিলি ছবিটির কথা না বলে ছি না। মিলি একটি চমৎকার ীকেশবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি। বিটি কিন্তু স্টুডিও-সেটে নির্মিত। গল্পের নাস্থল ফ্ল্যাটবাড়ি, তাই এখনকার ধারা নুযায়ী ওই রকম লোকেশনেই তিনি কাজ রতে পারতেন। তাছাড়া দর্শকদের ভ্যস্ত চোখে এখন স্টুডিও সেটের ত্রিমতা সহজেই ধরা পড়ে এবং সেটা কছু দৃষ্টিকটু লাগাই স্বাভাবিক। হৃষী-কেশবাবু এখন বাংগালোরে, তাঁর কাছ থেকে জনে নিতে পারিনি, কেন তিনি কোনও াড়িতে শুটিং করেননি। তবে ও'র কাজের ীতি-পদ্ধতি সপর্কে আমার ধারণা থেকে লতে পারি, হৃষীকেশবাবু স্টুডিওতে কাজ রাই পছন্দ করেন। তাঁর আগের ছবি ুপকে চুপকে'র কিছু অংশের শুটিং অবশ্য প্রযোজক এন সি সিপ্পির বাড়িতে য়েছিল, কিন্তু ওই বাড়িতে তোলা অধিকাংশ দৃশ্যের জন্যই আবার আলাদা সেটও তৈরি করে নেওয়া হয়।

সম্পূর্ণত স্টুডিওর বাইরে তোলা কয়েকটি ছবি : রজনীগন্ধা, অনুভব, কুঁয়ারা বাপ, দিল্-কী রাহে', আবিষ্কার, পরিণয়, অংকুর। এই সব কয়টি ছবিই যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। তালিকাটি সম্পূর্ণ য়, এই মুহূর্তে যে-কয়টি নাম মনে পড়ল, সেগুলির কথাই শুধু বললাম।

লোকেশন শুটিঙে খরচ কম পড়ে, সে কথা আগেই বলেছি। আর একটি সুবিধা, এই ব্যবস্থায় কাজও শীঘ্র হয়, আলোক-সম্পাতের পরিপাটি আয়োজনের দরকার হয় না। ত্বরিংগতিতে কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে হৃষীকেশবাবুরও একটা আলাদা সুনাম আছে। যেখানেই শুটিং করুন, স্টুডিওতে অথবা লোকেশনে, হৃষীকেশবাবু ছবি শেষ করে ফেলেন চটপট। বড় বড় স্টার নিয়ে তিনি চুপকে চুপকে শেষ করেছেন ছত্রিশ দিনে। মিলি ছবির বেলায় তাঁর রেকরড আরও চমকপ্রদ—ত্রিশ দিনে শেষ! হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে সাধারণত এই সংখ্যাটা পঁচাত্তর থেকে একশোর মধ্যে থাকে। আবার কখনও কখনও এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়—যেমন বৈরাগ—যেখানে তিনশো দিন শুটিঙেও ছবি অসমাপ্ত থেকে যায়।

হৃষীকেশবাবুর চিত্র নির্মাণ পদ্ধতির কার্যকারিতা অনস্বীকার্য। তবুও মনে হয়, 'হরিকৃষ্ণ'তে যে-কর্মকান্ড চলছে তা নিশ্চয় তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর চিত্র নির্মাণ-ধারায় তা কি পালাবদল ঘটাবে না?

সুরঞ্জন

সংসার সীমান্তে (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবিতে সীতা দেবী ও শিবানী বসু

ঘরোয়া আসরে শাস্ত্রীয় সংগীত

রাগটি—মালুহা কল্যাণ, যতখানি পরিচিত, গায়ক—ইউনুস হোসেন খাঁ, ততখানি নন। ইউনুস আগ্রা অতরৌলি ঘরানার দিকপাল ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খাঁর ছেলে। অবশ্য ইউনুস নিজের একটি ভংগী বেছে নিয়েছেন। মানে ঠিক বাধ্য ছেলের মত বাপের ধারার হুবহু অনুকরণ করাটা তাঁর ইচ্ছে নয়। ইউনুস মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে গান শুনিয়ে যান। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার এক ঘরোয়া আসরে তাঁর গান শুনলাম। ব্যবস্থা করেছিলেন আতা হোসেন খাঁ সঙ্গীত সংস্থা। ঘণ্টা আড়াই-এর আসরে ইউনুস মালুহা কল্যাণ ছাড়া আরও কয়েকটি রাগ রাগিণীতে গান গাইলেন—সম্পূর্ণ মালকোষ রাগেশ্রী এবং যোগ রাগে ধামার। অনুষ্ঠানের শেষে এল পাহাড়ী ঠুমরী। দেখলাম, স্বর বিন্যাস ও তান কর্তবের নানান ঝলমলে নকশা বানাতে ইউনুস মজা পান। শুনেছে যে সেও মজে বৈকি। গায়কের একটি গুণ তাঁর পরিমিতিবোধ। টেনে টেনে রাগ বিস্তারকে অযথা লম্বা করে ছিবড়ে করে ফেলায় আদৌ কোন উৎসাহ নেই। গায়কের সঙ্গে তবলা নিয়ে বসেছিলেন দ্বিজেন ঘোষ। তাঁর হাত কোথাও অতিরিক্ত চঞ্চল হয়নি।

—সুররসিক

রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাত

বয়স কি আংগুরবালাকে ক্লান্ত করেছে? বোধ হয় না। ক্লান্তিকে অতিক্রম করে তাঁর কণ্ঠে এখনও দেখা দেয় বিগত অতীত যেখানে আছে দ্যুতির প্রমাণ, স্বাস্থ্যের প্রকাশ। আংগুরবালা নটরাজ নিবেদিত 'রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাত' অনুষ্ঠানে সেদিন তিনখানি মাত্র গান গেয়েছিলেন। তিনটিই নজরুলের রচনা। প্রথম 'যারে হাত দিয়ে মালা'। কথাবস্তুর যে আবেগ শব্দের অবয়বে আবৃত তা অনাবৃত হল গায়িকার কণ্ঠে। সুরের যে মায়া ব্যাকরণের নেপথ্যে প্রচ্ছন্ন তা প্রকাশিত হল তাঁর পরিবেশনায়। এবং আশ্চর্য, কণ্ঠ কোথাও স্তিমিত হল না, জিহ্বা কোথাও আড়ষ্ট হল না এবং পরিবেশনার ভংগী কোথাও নাটুকেপনার আশ্রয় নিল না। সূচনায় প্রকাশিত ঐশ্বর্য অম্লান রইল শেষ অবধি। সেদিনের আসরে নজরুলের গান গাইলেন তরুণ শিল্পী দিলীপ চক্রবর্তী। বোঝা গেল অনেক যত্ন করে শিখেছেন তিনি। নামী শিল্পী ধীরেন বসুও নজরুলের গান শোনালেন। গানগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় অনেককালের। তবু নতুন করে ভাল লাগল। রবীন্দ্র সংগীতের ভার নিয়েছিলেন তিনজন—সুমিত্রা সেন, বাণী ঠাকুর এবং দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। এঁদের সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে পুরোনো অলংকার-গুলি আবার ব্যবহার করতে হয়। আবৃত্তি-কার কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও অরুণাভ গাংগুলী চেষ্টায় আন্তরিক ছিলেন। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল মহাজাতি সদনে।

সুররসিক

টিপারায় পাঁচ-ছ'টি চা-বাগান রয়েছে, জানাচ্ছেন এক সংবাদদাতা, সংখ্যাতীত ভাল চায়ের বাগিচা। চায়ের পাড়া বলেই হয়তো ওর নাম হয়ে থাকবে টিপারা। কিন্তু সেখানে যাতায়াতের রেলপথ নেই বললেই হয়। পরিবহণ সমস্যাটাই সেখানে সবার বড়ো আর সব চেয়ে বেশী।

'ইট'স এ লং ওয়ে টু টিপারা-রি! এ লং ওয়ে টু গো!

• • •

শ্রী জে মুখার্জি : সংবাদপত্রে দেখেছিলাম যে গুজরাটে কোনও কোনও ভোট প্রার্থীর প্রাঞ্জল বাণীতে ভোটদাতারা এতই বিমুগ্ধ হন যে তাদের বড় বড় ইট পাথর ছুঁড়ে অভিনন্দন জানাতে একটুও কসুর করেন না। আমার মনে হয়, আখেরে *এইসব প্রার্থীর টেকসই হবেন কিনা হাতে-নাতে সেটা পরীক্ষা করে দেখার জনাই ভোটদাতারা এই কাণ্ড করেছিলেন।'*

হাতে হাতে বাজিয়ে নেয়া আর কি!

• • •

সংবাদে প্রকাশ, নয়া রেকর্ডের পশ্চিমবঙ্গে বর্গাদারদের সংখ্যা নাকি দ্বিগুণ হয়েছে।

কাড়িদারদেরও কোনো কমতি নেই অবশ্যই।

• • •

বাদুকর শ্রী এ সি সরকার: 'কাগজে দেখলাম ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা পেলে পেলে আবার খেলা করতে রাজী। এ বিষয়ে আপনার কি মত?'

টাকার খেলা। আবার কি?

• • • •

শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'ছেলের সঙ্গে মেয়েরা চায় সমান তালে দুলতে/তাল থেকে তিল খসলে পরে রাগেও পারে ফুলতে/কিন্তু পারে বাসের গেটে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে?'

• • •

শ্রীহিরণ্ময় সমাদ্দার: 'পনোর খবরে

জানা গেল যে, ওখানের একটি থানায় বেআইনী-আমদানি বিস্তর গাঁজা ধরে রাখা হয়েছিল, তার থেকে ৭৭২ কেজি গাঁজা ইঁদুরের গর্ভে হাওয়া হয়ে গেছে। গাঁজার এই হাওয়া হয়ে যাওয়াটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?'

না। গাঁজা হাওয়া হবার নয়। ধোঁয়া হবার।

• • •

শ্রীসীতানাথ মুখার্জি : 'সেদিন আমার দাদার আফিসে গিয়ে দেখি একখানা *গোলাপী খামের চিঠি পাঠানোর জন্য একটু-খানি আঠার ভারী জরুরি তলব।* বেয়ারার কাছে চাইলেন—গম আছে? 'এখানে গম কোথায় বাবু?' জবাব দিয়েছে বেয়ারা। 'না আমি গম চাইছি না, আঠার দরকার আমার।' বেয়ারার সদুত্তর—'সেই গম থেকেই তো আটা হয় বাবু! আমরা তা পাব কোথায়? এ সব আফিসে কি গম বা আটা পাওয়া যায়? আপনি রেশনের দোকানে যান না মশাই!'

আটাআটির ব্যাপার।

• •

কুল্টি থানার প্রাচীন দুলেবলপুরে ডাকাতরা মিনিবাস যাত্রীদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে বলে খবর।

মিনির থেকে ম্যাক্সি ইনকাম!

• • •

শ্রীচিন্ময় পাল : 'বাইশে মে রাত দশটায় বেতার খবরে বলা হয় যে, কেপটাউনে ১৪ জন ডাক্তার সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে এই প্রথম এক মহিলার অণ্ডধারণের ডিম্বকোষ আরেকজনের দেহে স্থাপন করার কাজে সাফল্য অর্জন করেছেন। কেপটাউনের এই খবরটি নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়িয়ে যায়নি?'

এ কেপ অব গুডহোপ!

• •

পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী যে নববধূটি বিলোল কটাক্ষ আর মিষ্টি কথায় ডাকাতদের ভুলিয়ে তাদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাদের ভাগিয়ে দিয়ে স্বামীকে বন্ধন দশা থেকে উদ্ধার করেছেন, এই মহিলা-বর্ষের উল্লেখযোগ্য বহু মহিলার মধ্যে এই বহুটিকে আপনি কী বলবেন?'

একাই বহুবিধ।

• •

শ্রীবলরাম গাঙ্গুলী : 'ছাঁচিরা গ্রামে এক মহিলা তার তিনটি ছোট ছোট ছেলের সাহায্যে এক কুখ্যাত ডাকাত সর্দারকে ধরে রামধোলাই দিয়ে পিটিয়ে আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছিল—জানেন এ খবর?'

ছাঁচিরার পরেই আলুর দম?

• • •

'বলুন তো, শাড়ি আর মশারির মধ্যে পার্থক্য কী?' একজনের জিজ্ঞাসা।

'আজ্ঞে, নারী আর আনাড়ির মধ্যে যা, তাই-ই।'

• • •

শ্রীঅনির্বাণ রায় : 'সেদিন ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে এক ছাত্রকে প্রশ্ন করেছিলাম : পদ কয় প্রকার ও কী কী?' ছাত্রটি উত্তর দিল : 'দুই প্রকার, আপদ ও বিপদ।'

এবং সেটা পদে পদেই!

• • •

ভারতীয় এয়ারওয়েজের বিমান সেবিকারা প্রায়ই পছন্দসই যাত্রীর প্রেমে পড়ে বিয়ে করে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, উক্ত বিমান সংস্থার এক মুখপাত্রের এই অনুযোগ নাকি।

পঞ্চশরের মত আমাদের বিমানেরও তো বিশ্বময় ছড়ানো। আশ্চর্য কী!

শিবরাম চক্রবর্তী

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

ক্ষত নানা রকমের হতে পারে

সেই অনুযায়ী নানা ধাঁচের নতুন ব্যাণ্ড-এইড* ব্র্যাণ্ড পট্টিও পাবেন

ক্ষত খুব সহজেই দূষিত হয়ে ওঠে।
নতুন ব্যাণ্ড-এইড* পট্টি লাগিয়ে তা সুরক্ষিত রাখুন।
এখন বিভিন্ন আকারে ও সাইজে পাওয়া যায়।
প্রত্যেকটি পাঁচটির স্ট্রিপের সুবিধেজনক মোড়কে।
জমিয়ে তোল খেলার আসর, ব্যাণ্ড-এইড* পট্টি
হবে দোসর। সব সময়ে হাতের কাছে কিছু রাখুন।

সব সময় নতুন ব্যাণ্ড-এইড* ব্র্যাণ্ড
পট্টি-র নাম দেখে নেবেন।
এ ছাড়া অন্য কোন বিকল্প
স্বীকার করবেন না।
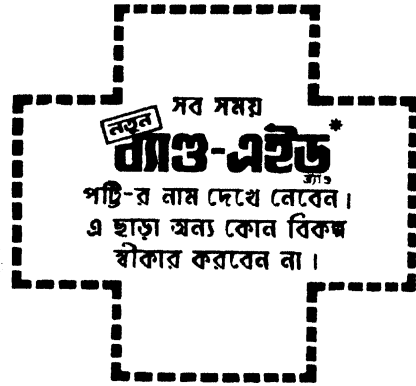
Johnson & Johnson*

* Trademark © J&J 75

OBM-4533-BEN

পরিবেশক :
গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক
মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড
আনন্দ, গুজরাট

PASTEURISED

দেশ
১৯ জুলাই, ১৯৭৫ ৪০ পয়সা

লাক্স সুপ্রীম -নিজস্ব বিউটি ক্রীমে ভরপুর!

সাবানের দুনিয়ায় এক নতুন বিস্ময় লাক্স সুপ্রীম। আপনার ত্বকে এনে দেয় লাবণ্য, আনে যেমন কোমল ছোঁয়া। কারণ কেবল লাক্স সুপ্রীমেরই আছে তার নিজস্ব বিউটি ক্রীম। যার পরশ লেগে থাকে উপচে পড়া অফুরন্ত ফেনার গভীরে। সেই নরম ফেনা আপনার ত্বকে যখন আনে কোমলতা, আপনার সকল অঙ্গে তখন বিকশিত হয় এক অনিন্দ্য মধুর সুরভি—যা লাক্স সুপ্রীমের একান্ত আপন।

সুন্দরীর সৌন্দর্যের সেরা সম্ভার—লাক্স সুপ্রীম
বিউটি ক্রীমে ভরা একমাত্র সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের একটি সেরা প্রসাধন সামগ্রী

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৩৮
শনিবার ৩ শ্রাবণ ১৩৮২

জাতীয় সদাচারের সংরক্ষা

যে অদ্ভুত কদাচারের ইংরেজী নাম র‍্যাগিং, তার প্রথার যদি একটা মানবিক মূর্তি কল্পিত হয়, তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সে এক নিদারুণ নির্বোধের মূর্তি, নিষ্ঠুরাচার তার কাছে একটা আহ্লাদজনক আমোদ। শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসের আগন্তুক নতুন ছাত্রকে ছোট-ভাইয়ের মতো স্নেহভাজন বলে অনুভব করবার কোন মানবীয় মনোবৃত্তির ক্রিয়া নেই যে অগ্রাগত ছাত্রটির আচরণিক স্বভাবে, তারই দ্বারা র‍্যাগিং নিষ্পন্ন হয়। আগন্তুক নতুন ছাত্রটিকে অজস্র অকথ্য অনাচারে ও অত্যাচারে উৎপীড়িত করে অগ্রাগত ছাত্রের পক্ষে প্রাণের আহ্লাদের অনুশীলন বস্তুত একটি হিংস্র অপরাধকর্মের অনুষ্ঠান। বিস্ময়ের বিষয় এইরকম একটি দুষ্কৃতি আমাদের দেশের অনেক শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসের ভিতরে কিছুসংখ্যক ধাড়ি শ্রেণীর ছাত্রের একটি প্রিয় আমোদাচারের প্রথায় পরিণত হয়েছিল। এটি একটি অনুকৃত প্রথা; নিকৃষ্ট অনুকরণের আগ্রহে গৃহীত একটি পাশ্চাত্ত্য কুপ্রথা। জাতির প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারে যে আচরণ গর্হিত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, সে আচরণ ছাত্রাবাসে একটা 'সাংস্কৃতিক আমোদের' অনুষ্ঠান বলে বিবেচিত হবে কেন? দেখে বিস্ময় বোধ করতে হয়েছে যে, এমনতর অভিমত কোন-কোন তরুণ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মতবাদেও উচ্চারিত হয়েছে। বুঝতে হয়, ইংরাজের ও পাশ্চাত্ত্য জীবনের কুপ্রথাগুলিকে বুকে তুলে নেবার ব্যাপারটা দেশীয় কোন-কোন ব্যক্তির কাছে সাংস্কৃতিক সদাচার বলে বোধ হয়ে থাকে। এরাই দেশের জীবনে যথার্থ সাংস্কৃতিক সদাচারের বিপদ ও সমস্যা সৃষ্টি করবার মনোবৃত্তি নিক্ষেপ করে জাতীয় বিভ্রান্তির পথ প্রশস্ত করছে। র‍্যাগিং বিশেষ করে ছাত্রাবাসে অনুসৃত একটা কুপ্রথা হলেও এর প্রেরণার যোগান দিয়েছে সম্প্রতিক কালের ইংরেজীয়ানার স্থূল অনুকরণের নতুন আবেগ।

প্রথমে ভুপাল থেকে প্রচারিত সংবাদ শোনা গেল, মধ্যপ্রদেশ সরকার র‍্যাগিং নিষিদ্ধ করেছেন। ছাত্রাবাসের যে ছাত্রকে আগন্তুক নতুন ছাত্রের উপর র‍্যাগিং নামক নিষ্ঠুরাচার করতে দেখা যাবে, তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ভারত রক্ষা আইনের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনও এই নিষেধ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে। ভুপালের এই সংবাদের পরদিনই সংবাদ পাওয়া গেল, শ্রীলঙ্কায় র‍্যাগিং নিষিদ্ধ হয়েছে। সেদিনই সন্ধ্যায় ভারতীয় বেতারে ঘোষণা শোনা গেল, ভারতে র‍্যাগিং নিষিদ্ধ করা হলো।

এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে আগেই র‍্যাগিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শ্রীলঙ্কা ও ভারতের পক্ষে বস্তুত প্রায় একই সঙ্গে ও একই সময়ে র‍্যাগিং নিষিদ্ধ করবার ঘোষণা নিশ্চয় এশীয় মনোবৃত্তিরই একটি সতর্কতার লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে পারে। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সম্পর্কে অনেক শ্রদ্ধা অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার সংস্কার থাকলেও ভারতের পক্ষে ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য জীবনের নানাবিধ কদাচার সম্পর্কে কঠোর প্রতিরোধ আরোপ করবার দরকার হয়েছে। ভারতের ছাত্র আজও তার শিক্ষককে গুরুজন বলে বোধ করবার সংস্কার হারায়নি। বয়স্ক ব্যক্তিও ছাত্র-জীবনের মাস্টারমশাইকে দেখতে পেলে নমস্কার করেন, সে ব্যক্তি যত বড় কৃতী ও পদস্থ হোক না কেন এবং বৃদ্ধ মাস্টার মশাই যত দীনাবস্থার মানুষ হোন না কেন। ষোল বছর বয়সের বিলিতী ছাত্রের মতো সিগারেট ফুঁকে-ফুঁকে শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলবার রীতি ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসদাচার। কিন্তু ভয় আছে, বিলিতী আবর্জনারও অনুরাগী বিশেষ এক মনোবৃত্তির প্রতিনিধিরা এমন এক প্রকার তাড়না সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন, যার মধ্যে এই দৃশ্য দেখা যাবে যে, তরুণ ভারতীয় ছাত্র তার বৃদ্ধ শিক্ষকের মুখের উপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে-ছেড়ে কথা বলছে। আশঙ্কার কথা, এ ধরনের দৃশ্য দেখা দিতে শুরু করেছে। না, দেশের সাংস্কৃতিক সদাচারের এক-একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু সংস্কার এবং ঐতিহ্যের অদৃষ্টকে এভাবে চটুল এক বিলেতীপনার অনুকরণ-বাতিক প্রভাবের কাছে বিকিয়ে দেওয়া চলে না।

একটা চলতি প্রবাদের কথা; ফ্রান্সের ঠাণ্ডা লাগলে সারা ইউরোপ সর্দিতে ভোগে ও হাঁচে। এটা ফ্রান্সের পক্ষে সাংস্কৃতিক গর্বের প্রবাদ বলে বিবেচিত হলেও সারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জাতীয় মনোবৃত্তির পক্ষে বিশেষ একটি অসম্মানের কথা। ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক অভিরুচির ও রীতির মান যদি উন্নত বলে স্বীকৃত হয়েও থাকে, তবু তা অনুকরণ করবার জন্য বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির দাস্যতার ভাব সে-সব জাতির সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ডের সবলতা প্রমাণিত করে না। আর-একটি প্রবাদ আছে যে, জুপিটার যাকে হত্যা করতে চান, আগে তার বুদ্ধির বিলোপ করে নেন। এই প্রবাদের রকমফের করে বলা চলে; জাতির জীবনশক্তির হত্যা সহজে সম্ভব করতে হলে আগে সেই জাতির সাংস্কৃতিক সদাচারের ঐতিহ্য বিনষ্ট করা চাই। ভারতীয় জাতির সমৃদ্ধি ও শুভ পরিণামের সম্ভাবনা যাদের আতঙ্কিত করে, এবং যাদের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে, তারা ভারতের সাংস্কৃতিক সদাচারের ঐতিহ্যকে বিকৃত খণ্ডিত ও বিপন্ন করবার সুযোগ অন্বেষণ করবেই করবে। কোন জাতিকে শুধু সামরিক অস্ত্রাঘাতে বিপন্ন করাই একমাত্র সার্থক জাতিবিদ্বেষ-পদ্ধতি নয়। জাতির সাংস্কৃতিক বলিষ্ঠতাকে অপঘাতের দ্বারা বিকৃত করাও একটি পদ্ধতি। ইতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, অনেক সময় সামান্য এক ঝাঁক গুলিগোলাও বর্ষণ না করে কোন-এক জাতি বা সমাজের শুধু সাংস্কৃতিক রীতি ও চরিত্রকে অপভ্রংশে বিকৃত করে তার রাজনীতিক বশ্যতা সহজে আদায় করা হয়েছে।

এই সপ্তাহ

গণতান্ত্রিক ভারতে তৃতীয়বার জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়েছে। এই ঘোষণা সংবিধানসম্মত। তবে সংবিধান চালু হওয়ার প্রথম বারো বছরে এরকম কোন ঘোষণার প্রয়োজন কেউ বোধ করেননি। সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে এ দেশে জরুরী অবস্থা প্রথম ঘোষিত হয় ১৯৬২ সালের ২৬ অকটোবর, ভারত-চীন যুদ্ধের সময়। তখনকার রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন, বহিরাক্রমণের ফলে দেশের নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হওয়ায় তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করছেন। এই ঘোষণা প্রত্যাহৃত হয় পাঁচ বছর পরে, ১৯৬৮ সালের ১০ জানুয়ারী।

দ্বিতীয়বার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি গিরি—১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়। সেবারও বলা হয়েছিল, বহিরাক্রমণের জন্য এই জরুরী অবস্থার ঘোষণা। ১৯৭১ সালের ঘোষণা এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি।

গত ২৬ জুন রাষ্ট্রপতি আমেদ যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন তার কারণ আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা। ইতিপূর্বে কখনও আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়নি।

একটি জরুরী অবস্থা বজায় থাকার সময় আর একটি জরুরী অবস্থা ঘোষণার নজিরও নেই। এই দুটি ঘোষণা একসঙ্গে বজায় থাকার অর্থ—বহিরাক্রমণ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, দুই কারণেই দেশের নিরাপত্তা বর্তমানে বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে কেন্দ্রীয় সরকারের চার ধরনের বিশেষ ক্ষমতা জন্মায় নির্বাহী (এক্সিকিউটিভ), বিধানিক (লেজিসলেটিভ), বৈষয়িক (ফিনানসিয়াল) ও মৌল অধিকার (ফানডামেন্টাল রাইটস) সংক্রান্ত। এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে যে কোন বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারেন। স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রের এই নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন হলে যে সব বিষয়ে আইন প্রণয়নে রাজ্য সরকারের একচেটিয়া অধিকার সে সব বিষয়েও আইন প্রণয়ন করতে পারেন। জরুরী অবস্থায় রাজ্যের উপর কেন্দ্রের এক্সিকিউটিভ ও লেজিসলেটিভ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা বেড়ে যায়, রাজ্যের স্বশাসন অধিকার সংকুচিত হয়।

জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের আরও দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ ক্ষমতা জন্মায়। সংবিধানে বলা হয়েছে, লোকসভার আয়ু পাঁচ বছর এবং পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর লোকসভা স্বতই ভেঙে যাবে। কিন্তু জরুরী অবস্থায় লোকসভার আয়ু অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানো যেতে পারে। অবশ্য একসঙ্গে এক বছরের বেশী মেয়াদ বাড়ানো নিষিদ্ধ এবং জরুরী অবস্থা শেষ হওয়ার পর ছ মাসের বেশী পুরনো লোকসভাকে জিইয়ে রাখার উপায় নেই।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্য রাষ্ট্রের যে সব বিশেষ অধিকার বর্তায় তার মধ্যে মৌল অধিকার সংক্রান্ত ক্ষমতাটি সাধারণ নাগরিকের দিক থেকে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ১৯ ধারায় এ দেশের নাগরিককে বাক্ স্বাধীনতা ইত্যাদি সাত দফা স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তার ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় এই কটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নির্বাহী ও বিধানিক ক্ষমতা পরিমিত। জরুরী অবস্থায় এসব ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবাধ হয়। এই সাত দফা স্বাধীনতা কায়েম রাখার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকারও প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র খর্ব করতে পারে।

অবশ্য জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলেই এই শেষ অধিকারটি থেকে কেউ বঞ্চিত হন না, তার জন্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশের প্রয়োজন। ১৯৬২ সালের জরুরী অবস্থায় এই অধিকার মুলতুবি রেখে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ জারী করেছিলেন, কিন্তু ১৯৭১ সালে তা করা হয়নি। পরে অবশ্য ১৯৭১-এর জরুরী অবস্থার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভারত সরকার চোরাচালান ও কালো বাজারির অভিযোগে আটক বন্দীদের কয়েকটি ক্ষেত্রে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। এবার আবার মৌল অধিকার রক্ষার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার সব পথ বন্ধ।

১৯৬২ সালের ঘোষণা প্রত্যাহার করার আগে একটি প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা চলেছিল। জরুরী অবস্থা জারি থাকার সময় সংবিধানের ১৯ ধারার পরিপন্থী যে সব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই সব আইন অনুযায়ী যে সব কাজ হয়েছে জরুরী অবস্থার অবসানে সেগুলির কী হবে, সে প্রশ্ন উঠেছিল। সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন, আইনগুলির বৈধতার প্রশ্ন আদালতে তোলা যেতে পারে, কিন্তু সেই সব আইনের বলে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার বৈধতা সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের চলবে না।

জরুরী অবস্থা একবার ঘোষিত হলে সে ঘোষণা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত জরুরী অবস্থা চলবে। তবে ঘোষণা জারির দু মাসের মধ্যে যদি সংসদের উভয় কক্ষ ঘোষণাটিতে সম্মতি না দেয় তাহলে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটবে। সংসদের সম্মতি পেলে জরুরী অবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে।

সংসদের উভয় কক্ষের সম্মতি সবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়। লোকসভা ভেঙে যাওয়ার পর যদি জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় কিংবা ঘোষণার দু মাসের মধ্যে যদি লোকসভা ভেঙে যায় তা হলে কেবল রাজ্যসভায় একটি সম্মতিসূচক প্রস্তাব গৃহীত হলেই জরুরী অবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য বজায় থাকতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নতুন লোকসভার প্রথম অধিবেশনের ৩০ দিনের মধ্যে লোকসভার সম্মতি নিতে হবে, না হলে ৩০ দিন পরে জরুরী অবস্থার মেয়াদ শেষ হবে।

সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে, জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্য যুদ্ধ বা পরদেশের আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশংকাই যথেষ্ট আশংকা বাস্তবে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। আশংকা আছে কিনা, সে বিচার রাষ্ট্রপতির। তিনি যদি সিদ্ধান্ত করেন, বিপদের আশংকা আছে তা হলেই জরুরী অবস্থা ঘোষিত হতে পারে।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার কারণ বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী ২৬ জুন রাত্রে একটি বেতার বক্তৃতা দেন। ঘোষণার মূল কারণগুলি হল : (১) গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক

দেবরাজ

যুগান্তর

২৪ জুন মাঝ রাতে মোজাম্বিকের রাজধানী লোরেনসো মারকুয়েসের বিরাট স্টেডিয়ামের ওপর থেকে নামিয়ে নেওয়া হলো পর্তুগীজ নিশান। সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো ভারত মহাসাগরের তীরে আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব এলাকার দেশ মোজাম্বিকে পাঁচশো বছরের পর্তুগীজ রাজত্ব। সার্বভৌম স্বাধীন মোজাম্বিক প্রজাতন্ত্রের প্রতীক লাল-সবুজ-হলুদ-কালোর চার-রঙা নিশান তুলে দেওয়া হলো নামিয়ে-আনা পর্তুগীজ নিশানের জায়গায়। কেবল রাজধানীতে নয়, তামাম দেশের শহরে শহরে, গাঁয়ে গাঁয়ে। দুনিয়া জুড়ে উপনিবেশ ফাঁদার ব্যবসায় ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সব আগে নামে পর্তুগাল। সবচেয়ে বেশী টিঁকেছে তারই সে ব্যবসা। উপনিবেশের পাট অবিশ্যি সে নিজেই তুলে দিচ্ছে। গেল বছর স্বাধীন হয়েছে গিনী-বিসাও, ২৫ জুন হলো মোজাম্বিক, ৫ জুলাই কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ। অ্যাঙ্গোলার মুক্তি হবে ১১ নভেম্বর। এ দেশে পর্তুগালের যে সব ক্ষুদে জমিদারী ছিল সেগুলো হাতছাড়া হয়েছে আগেই। তাদের ওপর দাবি পুরনো সরকার ছাড়তে চাননি। নতুন সরকার তাদের ওপর স্বত্ব-স্বামিত্ব খোশ মেজাজেই ছেড়ে দিয়েছেন। বাকী কুচোকাচা যে সব উপনিবেশ আছে তাদেরও মুক্তি দিতে তাঁরা তৈরি।

পর্তুগাল অবিশ্যি যেচে উপনিবেশগুলোকে কালা বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেয়নি। গেল বছর ওলটপালট হয়ে গেছে পর্তুগালে। বিদেয় নিয়েছে কট্টর দক্ষিণপন্থী ফ্যাসি-বাদীরা। ক্ষমতা এখন বামপন্থী-ঘেঁষা আর্মড ফোর্সেস মুভমেণ্টের হাতে। যে সরকারকে ফৌজী নেতারা গদিতে বসিয়েছেন সেটাও বামপন্থীদের নিয়ে গড়া। উপনিবেশ বজায় রাখার উৎসাহ তাঁদের থাকার কথা নয়, নেইও। তবুও তাঁরাও গোড়ার দিকে উপ-নিবেশগুলোকে এক কথায় স্বাধীনতা দিতে একটু দোনোমোনো করেছিলেন। তবে তাঁদের সঙ্গে একটা আপস করে ফেলতে পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোর খুব বেশী অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তাদের মরণপণ করে লড়তে হয়েছে আগের সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরাচারী সরকারের সঙ্গে। লড়াই চলেছে গিনী-বিসাওতে, মোজাম্বিকে, অ্যাঙ্গোলায় বছরের পর বছর। কালো মানুষের লাল রক্তে ভিজে গেছে সে সব দেশের মাটি। সাদা মানুষের রক্তও কম ঝরেনি। তাদের নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে পর্তুগীজ উপনিবেশের স্বাধীনতার সেনানীরা। দু পক্ষেরই সমান জেদ হার মানতে কেউ রাজী নয়। পর্তুগীজদের হাতে বিস্তর হাল আমলের সাংঘাতিক হাতিয়ার। আর মুক্তিবাহিনীর তো ঢালও নেই তলোয়ারও নেই। তবুও জিত হলো তাদেরই।

সাদা মানুষেরা তামাম দুনিয়াতে যা করেছে গায়ের জোরে তাই করেছিল পর্তু-গীজরাও তাদের উপনিবেশগুলোতে। দোহাত্তা তারা লুটেছে। জমি চাষ করেছে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কালা চাষীরা। বিরাট বিরাট খামার তারা গড়ে তুলেছে ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত খেটে। যে ফসল তা চা-ই হোক আর তুলোই হোক—তার ঘরে ওঠেনি, উঠেছে ধলা মালিকের গুদোমে, তারপর চালান গেছে দেশে দেশে, মুনাফা কুড়িয়েছে পর্তুগীজ মালিক। দিন দিন তার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ফেঁপে ফুলে উঠেছে আর না খেয়ে না পরে ভুখা আর নাঙ্গা হয়ে থেকেছে আফ্রিকার চাষী খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষ। তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি মহামান্য পর্তুগীজ শাসক গোষ্ঠী। তাদের কেউ দেশে থেকেই পয়সা লুটেছে, কেউ বা উপনিবেশে বাগানঘেরা অট্টালিকা বানিয়ে স্ফূর্তি করেছে। নিজের দেশেই চোর হয়েছিল মোজাম্বিকের বাসিন্দারা। যারা খোসামোদ করেছে পর্তুগীজ আমলা-আমীর-মহাজনদের তাদের বরাতে ছিটেফোঁটা পেসাদ জুটেছে। বাকীরা মুখে রক্ত তুলে খেটেছে আর বুটের ঠোক্কর খেয়েছে সাদা কর্তাদের।

পর্তুগীজ জঙ্গী শাসনের আমলে মোজাম্বিকের বাসিন্দাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পয়লা, পর্তুগীজ নাগরিক। এদের বেশির ভাগই ধলা, খাস পর্তুগীজ, কিছু দো-আঁশলা। দোসরা, আসিমিলাদো অর্থাৎ যে সব কালা আদমী বিদেশী ঢং রপ্ত করে ফেলেছে। তেসরা, ইন্দিজেনাস অর্থাৎ ঘরের লোক। এরাই মোজাম্বিকের আসল বাসিন্দা অথচ অবস্থা এদেরই শোচনীয়। এদের চালচুলো নেই, নেই মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ। রাজনৈতিক অধিকার বলতে এদের কিছুই ছিল না। এমনই জবরদস্ত ছিল পর্তুগীজ শাসন যে দেশে থেকে কোনও আন্দোলন চালানো অতিসাহসী দেশভক্তের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। খোলাখুলি রাজনীতি করার অধিকার বাসিন্দাদের দেশগুলোর লোকদের পর্তুগীজরা দেয় নি। তাই বলে দেশভক্তরা চুপ করে থাকেননি। দেশের বাইরে তাঁরা গড়ে তুলেছেন মুক্তি-সংগঠন। ১৯৬০ সনে পত্তন হয় উদেনামোর অর্থাৎ মোজাম্বিক জাতীয় গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন সলসবেরিতে। ও বছরই গড়ে ওঠে মানুর অর্থাৎ মোজাম্বিক আফ্রিকান জাতীয় ইউনিয়ন। পরের বছর মালাউইতে দেশান্তরী মোজাম্বিকের বাসিন্দারা গড়ে তোলেন উনামি অর্থাৎ স্বাধীন মোজাম্বিকের আফ্রিকান পরিষদ।

তিনটে সংগঠনেরই একই লক্ষ্য—পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদীদের উচ্ছেদ করে স্বাধীন মোজাম্বিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। শেষ পর্যন্ত তিন দল এক হয়ে গড়ে তুললে ফ্রেলিমো অর্থাৎ মোজাম্বিক মুক্তি ফ্রণ্ট। দেশভক্তরা সবাই ভিড়লেন ফ্রেলিমোতে। দুর্বার হয়ে উঠলো মোজাম্বিকের মুক্তি সংগ্রাম। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ ফ্রেলিমো শুরু করলে সশস্ত্র লড়াই। তাদের সম্বল সামান্য। কিন্তু তাই নিয়েই তারা কাঁপিয়ে দিলে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের ভিত। পর্তুগীজ ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র অনেক দামী আর বেশী হলে কী হয় দেশের লোক তাদের বিরুদ্ধে আর গেরিলাদের পক্ষে। কোথাও কোথাও কেউ কেউ তাদের ধরিয়ে দিলেও গেরিলাদের পাত্তা পাওয়া ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠলো পর্তুগীজদের পক্ষে। জেরবার হয়ে উঠলো পর্তুগীজ ফৌজ। তাদের জেনারেলদের ধারণা হলো হাজার বছর লড়লেও এ লড়াই জেতা যাবে না। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে আপস ছাড়া এ যুদ্ধের ফয়শালা হবে না এই কথাই কেতাব লিখে কবুল করলেন পর্তুগীজ গভর্নর জেনারেল আর সামরিক প্রধান জেনারেল স্পিনোলা। তাঁর কথা না মেনে তাঁকে বরখাস্ত করলেন কায়তানো সরকার। কিন্তু সেই হলো তাঁদের কাল। পর্তুগালে ক্ষমতা দখল করলে ফৌজ। খতম হলো ফ্যাসিবাদী শাসন। স্পিনোলা হলেন রাষ্ট্রপতি।

নতুন সরকার মিটমাট করে ফেললেন ফ্রেলিমোর সঙ্গে। না করে উপায়ই বা কী? শ' তিনেক নিধিরাম সর্দার নিয়ে শুরু হয়েছিল ফ্রেলিমোর গেরিলা লড়াই। দশ বছরে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল বারো হাজারে। ইতিমধ্যে শিক্ষাদীক্ষাও তারা বেশ পেয়েছিল। স্বাধীন মোজাম্বিক ফৌজের এদের নিয়ে পত্তন হয়েছে। আপসের শর্ত ছিল ন' মাস অস্থায়ী দো-আঁশলা সরকার কাজ চালাবে। তারপর মোজাম্বিক হবে পুরোপুরি স্বাধীন। ন' মাস কেটেছে জুনে। মোজাম্বিক এখন আর উপনিবেশ নয়—স্বাধীন রাষ্ট্র। প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ফ্রেলিমোর সামোরা মিচেল। বয়েস তাঁর মাত্র ৪২। তাঁর ওপর বর্তেছে মোজাম্বিকের ৮০ লাখ বাসিন্দার ভার। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরই দলের জোয়াকিম চিসানো। প্রজাতন্ত্রী মোজাম্বিক বেছে নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক পথ। তাতে আপত্তি করে নি পর্তুগাল কেননা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সে তাকেই ঢালাই করার কাজ চলছে। পশ্চিমী দেশগুলো অবিশ্যি এতে খুশী নয়। কিন্তু তাদের খুশি অখুশিতে মোজাম্বিকের কী এসে যায়?

প্রধানমন্ত্রীর ২১ দফা বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক কর্মসূচী

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ভার লাঘব করার জন্য এবং দেশে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য যে ২১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন, তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। অবশ্য এই ২১ দফা কর্মসূচীর অনেকগুলি আগেই ঘোষিত হয়েছিল। দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরে করার যে নীতি সরকার ঘোষণা করেছিলেন তার সংগে সংগতি রেখেই বর্তমান ২১ দফা কর্মসূচী তৈরী হয়েছে। এই কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল, (১) গ্রামের মানুষের ঋণ মকুবের ব্যবস্থা; বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষক, স্বল্পসংগতিসম্পন্ন কৃষক এবং জীবিকার জন্য হস্তশিল্পের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের ব্যাপার স্থগিত রাখা সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা; (২) যে সমস্ত জায়গায় মুচলেকা শ্রমিক প্রথা এখনও চালু আছে তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করার ব্যবস্থা, (৩) কৃষির উপযোগী জমির উর্ধ্বসীমাকে কার্যে রূপায়িত করা—এবং উদ্বৃত্ত জমির দ্রুত বন্টন ও জমির নথিপত্রাদি যথাযথভাবে তৈরি করার ব্যবস্থা, (৪) গ্রামের ভূমিহীন শ্রমিকরা কিছুকাল যে বাস্তু জমিতে আছেন তার মালিকানা দানের ব্যবস্থা, (৫) চোরাকারবারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য বিশেষ আইন তৈরির ব্যবস্থা, (৬) মধ্যবিত্তশ্রেণীর ক্ষেত্রে আট হাজার টাকা পর্যন্ত আয়করের ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা, (৭) হোস্টেলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট মূল্যে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করার ব্যবস্থা, (৮) কৃষি-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কে আইনের পর্যালোচনার ব্যবস্থা, (৯) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অপরাধীদের সরাসরি বিচার ও কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা, এবং (১০) শহর-জমির সীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা। এই দশটি কর্মসূচী ছাড়াও আরও এগারোটি কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীমতী গান্ধীর এই নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে ভূমি-সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভূমি-সংস্কার সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে তার অধিকাংশই আমাদের চতুর্থ ও পঞ্চম পাঁচসালা যোজনার অন্তর্ভুক্ত। জোতের উপর সর্বোচ্চ সীমা আরোপ করার নীতি এখনও পুরোপুরি সফল হয়নি, এবং তার জন্য দায়ী প্রগতিশীল ভূমি নীতির সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর লোকের অসামর্থ্য বা অনিচ্ছা। সরকার নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী কৃষির উপযোগী জমির উর্ধ্বসীমাকে কঠোরভাবে কার্যকর করতে পারলে এবং উদ্বৃত্ত জমির দ্রুত বন্টন করতে পারলে আমরা সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার বুনিয়াদ গঠনের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারব। উদ্বৃত্ত জমির সুষ্ঠু বন্টন করতে পারলেই যে জমির উৎপাদনী শক্তি বাড়বে তা নয়; কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনী শক্তি বাড়াবার জন্য জলসেচ ব্যবস্থার ব্যাপক সুবিধা এবং জমিতে ভাল জাতের বীজ ও উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন খুবই জরুরী। নতুন কর্মসূচীতে আরও পঞ্চাশ লক্ষ হেক্টর জমিকে সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। সেই সংগে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারে জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। ভারতের কৃষিক্ষেত্রে যত সমস্যা আছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল গ্রামীণ ঋণের সমস্যা। আগে গ্রামের কৃষকরা গ্রাম্য মহাজনদের কাছে ঋণের দায়ে আত্মবিক্রীত অবস্থায় বাস করতেন। এখন কৃষকরা ঋণ পেয়ে থাকেন বিভিন্ন উৎস থেকে—তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল গ্রামীণ সমবায় ঋণদান সমিতি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। গ্রামের দুর্বলশ্রেণীর লোকদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে গ্রামীণ ঋণের অবলুপ্তির ব্যবস্থা ঘোষণা করে শ্রীমতী গান্ধী গরীব কৃষকের খুবই উপকার করেছেন। কৃষির উন্নতির জন্য গ্রামে বিদ্যুৎশক্তির সম্প্রসারণ বিশেষ প্রয়োজন। পাম্পসেট চালাবার জন্য যেমন ডিজেল তেলের প্রয়োজন তেমনি বিদ্যুৎশক্তিরও প্রয়োজন। শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেছেন, বিদ্যুৎশক্তি কর্মসূচী ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা করা হবে এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালিত হবে। এই ব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদনও বেড়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সরকার কালো টাকা সঞ্চয়কারীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুবিধার জন্য আয়কর ধার্যের সীমা বার্ষিক ছয় হাজার টাকা থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ায় সরকার কিছু পরিমাণ আয়কর বাবত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সরকারের আশা, কর ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য যেসব ব্যবস্থা নতুন করে গৃহীত হবে তা থেকে যে বাড়তি রাজস্ব পাওয়া যাবে তাতে রাজস্ব হ্রাসজনিত ক্ষতির পূরণ হবে। কালো টাকা মুদ্রাস্ফীতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। কালো টাকার অধিকারীগণ প্রায়ই শহরে জমি কেনেন অথবা নতুন বাড়ি তৈরি করেন—সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে বেনামীতে হয়ে থাকে। নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী শহরে খালি জমির মালিকানা এবং নতুন বসতবাটীর ভিতের আয়তন সম্পর্কে উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চোখে লাগার মত বাড়ির মূল্যায়ন করার জন্য এবং কর ফাঁকি রোধের জন্য বিশেষ বাহিনী গড়া হবে। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, রাষ্ট্রের সম্পত্তিকে হেলাফেলা করা চলবে না। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংসের শাস্তি হবে কঠোর জরিমানা। কৃচ্ছ্রতা সাধনের প্রয়োজন রয়ে গেছে সর্বক্ষেত্রে। সরকারের যেমন প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় কমানোর দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি দায়িত্ব রয়েছে নাগরিকদেরও। জাতির উন্নতি করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সামাজিক দায়িত্বের কথা ভুললে চলবে না। নতুন কর্মসূচীর একটি বিশেষ বিধান হল ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে। বেশী দামের পাঠ্যপুস্তক কেনা গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য স্থির হয়েছে, পাঠ্যপুস্তকের দাম কঠোরভাবে বেঁধে দেওয়া হবে এবং বই-এর ব্যাংক স্থাপন করা হবে। কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে নতুন শিক্ষানবিস পরিকল্পনা রূপায়িত করা হবে বলে কর্মসূচীতে বলা হয়েছে। এই ব্যাপারে দুর্বলতর শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে। এই ২১ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হবার সংগে সংগে চোরাকারবারীদের জব্দ করার জন্য নতুন অর্ডিন্যান্সও জারি করা হয়েছে। চোরাকারবারীদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এখন থেকে চোরাচালান সংক্রান্ত কার্যকলাপ রোধ করার ব্যাপারে ধৃত ব্যক্তিদের আটকের কারণ দেখানোর কোন প্রয়োজন হবে না। নতুন কর্মসূচীতে বিনিয়োগ পদ্ধতি উদার করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সংগে একথাও বলা হয়েছে যে, আমদানি লাইসেনসের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সড়ক পরিবহনের জন্য জাতীয় পারমিটের ব্যবস্থা করা এবং শিল্পে কর্মী সমিতির জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ করাও এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুব্রত গুপ্ত

ইন্দ্রজাল

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনেক বোঝা নিয়ে চলেছি
সকালের নদী তখন রূপো।
নদীতীর থেকে এক কিশোর
উঠে এসে বললো :
আমার এক থলি রূপো নেবে?

বললাম : ভারি ক্লান্ত,
বোঝা বাড়িয়ো না।

দুপুরের নদী তখন সোনা
নদীতীর থেকে এক তরুণ
উঠে এসে বললো :
আমার এক ছালা মোহর নেবে?

বললাম : ভারি ক্লান্ত,
বোঝা বাড়িয়ো না।

সন্ধের নদী তখন অন্ধকার
তাতে চাঁদ নক্ষত্রের চুমকি।
নদীতীর থেকে এক বৃদ্ধ
উঠে এসে বললো :
আমার সারা জীবনের জহরত
নেবে?

বললাম : ভারি ক্লান্ত,
বোঝা বাড়িয়ো না।

তখন অনেক রাত
হঠাৎ এক শিশু
হাতে তার
ঘাসের সাদা ফুল।
নদীতীর থেকে উঠে এসে বললো :
ফুলটা নেবে?

নিলাম।
আর মুহূর্তের মধ্যে
সারাদিনের নদী
সারাদিনের মাঠ
সারাদিনের ক্লান্তি
সারাদিনের তৃষ্ণা

রাতের অবাক
আকাশ হয়ে গেলো॥

গত বছর এমনই জুন মাসে

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

"There is no greater pain than to recall
a happy time in wretchedness."
—Richard Ellman

আপনি আমায় দিয়েছিলেন মুঠোভরতি বকুল
বলেছিলেন, ফুল না ওরা কথা।
আমার কোনো কথা ছিল না। কথা বলি নি
গত বছর এমনই জুন মাসে।
তখন থেকে লোকে আমায় দেখতে পেলে 'বকুল শোন্'
'এই বকুল' বলে
টিটকিরি দেয়, হাসে।

ওদিকে আর যাই না। ভয়।
বড়ো নিঝুম। বখাটে ছেলেগুলো।
তা ছাড়া, যদি হঠাৎ ভুলে বকুল ফুলে লাগে পায়ের ধুলো!
কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।
আপনি নিজে কুড়িয়ে দিয়েছিলেন
গত বছর এমনই জুন মাসে।

আমার কিছু ভালো লাগে না,
আপনি ভালো আছেন?

হয়তো জানে

রত্নেশ্বর হাজরা

রাত্রি জানে তার মধ্যে বহু লোভ ডুবে আছে—তারই এক টা
দুই ভাগে বুক—
তা দেখে শীতের রাতে কালপুরুষ নগ্ন হয়
পৃথিবীর অসুখবিসুখ
কিছুক্ষণ সরে—
বিষুব সংসারী হতে চায়, খুব ভোরে
তার ক্রোড়ে হিম পড়ে। জানে
লুব্ধকের বাচ্চারাও স্বাস্থ্যবান, তবু
বুকের উপরে শুয়ে ভূক্রোড় জানে না। কোনো ঘরে
কাঁচ বাতাসের সঙ্গে দ্রাঘিমার ছবি নেই—কেউ
ভূগোল শেখেনি—।
রাত্রি জানে
তারই কতগুলো লোভ পাহাড় এবং কিছু নদী, নিজেও সে
একা হয়—মুখোশ ছাড়াই
যে কোনো নাভিতে চুমু খেতে পারে—
তলপেট, থাই
ছুঁয়ে বলে দিতে পারে যৌবনের কতো বয়স—অভিজ্ঞ মানুষ
পরিতৃপ্ত কি-না ....। রাত্রি জানে
এখনো সে বিবাহিত নয়, তবু জানা—কোন্
ব্যথাগুলো সুখে আছে আনন্দের প্রস্থান কেমন..........

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৬৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

খবর নিলুম যে হাসপাতালের একটা অংশ অর্থাভাবে অসমাপ্ত থাকাতে ওটা এখনি ঠিকমত ব্যবহার করা যাবে না। অথচ নারীভবনের চুক্তিভঙ্গ জন্যে ডেমারেজ দিতে হবে। সুরেন[1] বলছিলেন ঐ ডেমারেজের টাকায় হাসপাতাল সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। নারীভবনের যে মালমসলা আমাদের হাতে জমা আছে সেটাও এই উপলক্ষে ব্যবহার করলে লোকসান বাঁচবে—নইলে সেও কিছুদিন পরে নষ্ট হবার কথা। যদি এ সম্বন্ধে মত স্থির করতে দেরি না করো তাহলে পুজোর ছুটির মধ্যেই তাড়া দিয়ে কাজ শেষ করে ছুটির পর থেকেই হাসপাতালের ব্যবহার শুরু করা যেতে পারে। বর্তমান হাসপাতালকে নারীসদনের অন্তর্গত করলে অনেক সুবিধে হয়। নইলে নতুন কোনো মেয়ে এলে জায়গা দেওয়া শক্ত হবে।

নতুন ব্যবস্থায় যাদের বিদায় করতে হবে তাদের জানান দিতে যতই দেরি করবে ততই বৃথা লোকসান বাড়ানো হবে। ডাকিলের[2] মতো অধ্যাপক, যাদের কাজ প্রায় কিছুই নেই, অথচ মাইনে বড়ো কম নয়, তাদের আর বহন করা আর্থিক হিসাবে ভাল নয় অন্য হিসাবেও অশোভন। আমি চাই ছুটির পর থেকেই আমাদের নতুন ব্যবস্থা পত্তন করা। যদি কলেজ সম্বন্ধে অসম্ভব হয় অন্তত বিদ্যালয় সম্বন্ধে করতেই চাই। ছুটির পূর্বে সমস্ত পরিষ্কার করতে দ্বিধা কোরো না। ইতি ২৭ ভাদ্র ১৩৩৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ প্রধানত যে জন্যে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলুম সেইটেই ভুলে বসে আছি।

মীরাকে[3] নগেনের[4] কথা জানিয়েছি। এর মধ্যে মীরার উদ্বেগের বিষয় হচ্চে এই যে পাছে ছেলেমেয়েও ঐ সঙ্গে খৃষ্টান হয়ে যায়। সেটা অন্যায় হবে। আমাদের দেশে দেশী খৃষ্টান সমাজের যে দুর্গতি সে তো তুমি জানই। নীতুও[5] বুড়িও[6] যে সেই সমাজের মধ্যে ঢুকে দেশের culture এবং শ্রদ্ধা থেকে বঞ্চিত হয়ে স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াবে এটা মনে করতে ভালো লাগে না। তা ছাড়া ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগে কোনো সাম্প্রদায়িক খাঁচার মধ্যে তাদের পুরে দেওয়া তাদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ। এ সম্বন্ধে অবিলম্বে নগেনের সঙ্গে কথা করে দেখো। এমন কি আমার মনে হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পূর্বে ওদের কোনো বিশেষ ধর্মে দীক্ষিত করা হবে না এই বিশেষ শর্তে লেখাপড়ার মধ্যে থাকা ভালো।

॥ ৬৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রশান্ত তুমি জানো গুরুদয়াল[7] সকল দিক থেকেই আমাদের কাজের উপযুক্ত। অনেক দিন যাবৎ এঁকে পাব বলে আমরা অপেক্ষা করেছি। ইংরেজি বেশ ভালো জানেন; আমাদের এখানে কেউ ইংরেজি লিখতে পারেন না—এঁর লেখবার শক্তি আছে। অত্যন্ত কর্তব্যভীরু spiritual মানুষটি। এর সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে তুমি স্থির করে এঁকেই যদি লিখে পাঠাও ত ভাল হয়। কিন্তু যদি চিঠির উত্তর দিতে কোনো কারণে বিলম্বের সম্ভাবনা থাকে আমাকে জানিয়ো—আমি লিখে দেবো। কলেজ সম্বন্ধে কিরকম ব্যবস্থা করবে জানিয়ো অর্থাৎ কাকে কি কাজে লাগাতে চাও শুনতে ইচ্ছে আছে। গাঙ্গুলি মশায়কেও[8] কি প্রধানপদে পাওয়া যাবে? তিনি কি বিষয়ে অধ্যাপনা করবেন? ভেঙে গড়ার কাজটা বড়ো কঠিন—বাইরের দিক থেকে এবং ভিতরের দিক থেকে। দুঃখ দিতেও হয় পেতেও হয়। কিন্তু যত দেরিতে মীমাংসা হবে দুঃখের পরিমাণ ততই বাড়বে।

অনেক দিন পরে আমার সামনে একটা কাজের ক্ষেত্রের চেহারা দেখতে পাচ্চি এটা আমার ভালো লাগচে। ঠিক যেন একঘেয়ে একটানা রূপহীন শব্দহীন মাঠের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে অপরাহ্ণে গাছপালা পাহাড় নদী দেওয়া একটা ভূদৃশ্য চোখে পড়ল। অনেক দিন কোনো চেহারা স্পষ্ট করে দেখতে না পেলে জীবনটা যেন ভূতে-পাওয়া হয়ে ওঠে। শূন্যতার ভার বড় দুর্ভর। আমি যে শুধু কবি নই কর্মী, সেটা বুঝতে পারি যখন নৈষ্কর্ম্য আমাকে আত্মধিক্কারে অভিভূত করে। অন্য কর্মীর সঙ্গে কিছু তফাৎও আছে—আমি কবি-কর্মী—সেইজন্যে কর্মীরা আমাকে বিশ্বাস করতে পারে না—দো-আঁশলা প্রকৃতির মানুষের এই বিপদ—তাকে কাজ করতেই

১ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ বিশ্বভারতীর একদা-অধ্যাপক জাহাঙ্গীর ভকিল

৩ কবিকন্যা মীরা দেবী

৪ মীরা দেবীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৫ মীরা দেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথ

৬ মীরা দেবীর কন্যা নন্দিতা

৭ শান্তিনিকেতনের একদা-অধ্যাপক গুরুদয়াল মল্লিক

৮ শিক্ষাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলি

হয় অথচ তার কাজের কাঠামোটা দেখেই লোকে বলে এ আবার কি? ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৬৭ ॥

কিন্তু তোমরা একেবারে ডাঙায় দাঁড়িয়ে তুফানে নৌকো ভাসানোটা দেখো না। অপ্রিয়তা অনেক আছে। দূরে সরে থাকলে সেটা কমে না, বরঞ্চ বেড়ে ওঠে। কাছে এসে প্রতিদিন এটা পরস্পরকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে আমাদের ভুলচুক আছেই—কিন্তু তাই নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে আমরা আস্ফালন করব না—এমন কি প্রতিকূলতার ভিতর দিয়েও আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব। বোঝাপড়া করতে যদি অন্তরের সঙ্গে ইচ্ছা করি তাহলে ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। পরস্পরকে ভুল বোঝার ভার বহন করা আমার পক্ষে বড়ো দুঃসাধ্য।

আর সময় নেই।

বগ্‌ডানভকে স্থায়ীভাবে রাখতে আমার মত নেই। যে কয়টা ক্লাস চলচে হঠাৎ মাঝখানে বন্ধ হলে তাতে আমাদের অখ্যাতি হবে—এই জন্যে বলছিলুম ওর জায়গায় অন্য লোকের ব্যবস্থা যেদিন হবে সেইদিনই ওকে বিদায় করলে ভাঙচুর করা হয়।

নলিনীবাবু অক্টোবরেই আসতে পারেন, ছুটির পূর্বে কাজকর্ম বুঝে নেওয়া ভাল।

উকিলকে জবাব দেওয়া হয়েচে। অতএব নলিনীবাবুকে ইংরেজি পড়াবার ভার নিতে হবে।

কলেজ রাখার দরকার আছে, অন্ততঃ ছাত্রীদের খাতিরে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওটা তোমরা যদি গড়ে না দাও তাহলে ভাল হবে না। আমার অনভিজ্ঞতা এবং অক্ষমতার বাধা ঠেলে কলেজকে প্রতিষ্ঠিত করা আমার দ্বারা অসম্ভব। পদে পদে আমি ভুল করব। প্রসন্ন মনেই আমি কলেজ নিচ্চি কিন্তু এর দায়িত্ব আমার উপর ফেলো না—পেরে উঠব না। আমি নীচের বিভাগে সমস্ত চেষ্টা সংহত করতে চাই।

বিদ্যালয়ের ছুটি আসন্ন, তার পরে সেই মেয়েটির সম্বন্ধে একটা কিছু স্থির করা যাবে। আমার বিশ্বাস সে নিজেই থাকবে না।

তুমি যদি আসতে পারতে মোকাবিলায় অনেক কথা পরিষ্কার হত।

এখনি অপূর্ব যাচ্চে তাই তাড়াহুড়ো করে এই কটা লাইন মোটের মতো করে লিখে দিচ্চি।

নেপালবাবু[৯] কাল আশ্রম সমিতিতে প্রস্তাব করেছিলেন কলেজ থেকে ইতিহাস তুলে দেওয়া যেতে পারে। এ সম্বন্ধে তোমার কি মত?

এ সমস্ত ছোটখাটো ব্যবস্থা সংসদের ভিতর দিয়ে প্রত্যেকবার চালনা করা অসম্ভব। এই জন্যে আমি বলি যদি তুমি দেবেন[১০] সুনীতি[১১] প্রভৃতি কয়েকজনে বিশেষভাবে এর ভার নেও তাহলে ভালো হয়। যদি সেটাকে পরামর্শ সমিতির মতো করো তাও হতে পারে। কিন্তু এটাকে কর্ণধারবিহীন করো না। নলিনীবাবু এলে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখব।

অপূর্ব অতি অল্পেতেই বেশি পরিমাণে বিচলিত হয়ে পড়ে। ক্রমশ আপোস করে বাধা ও প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে কোনো জিনিসকে গড়ে তোলবার মতো তার ধৈর্য নেই। কিন্তু যে জিনিসকে একবার দাঁড় করানো হয় তাকে রক্ষা করবার চেষ্টা সমস্ত মন দিয়ে করা উচিত। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই জেনো কলেজ যখন রইল তখন যে করেই হোক তার একটা ভিত্তি গড়ে তোলবার চেষ্টা করতেই হবে। তার পরে ক্রমে তার উপরের তলার দিকে মন দেব। মাঝখানে তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি ঢের হতে পারে—কর্মের সঙ্গে সেই সব বিঘ্ন অপরিহার্যভাবে আপনি এসে পড়ে। মানুষের মন নিয়ে কারবার—সেটা সহজ জিনিস নয়।

॥ ৬৮ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যথাসময়ে বগ্‌ডানভকে[১২] বিদায় করতে হবে। কিন্তু সেই সময় কি উপস্থিত হয়েছে? তোমরা জান যে হায়দ্রাবাদ থেকে একজন মুসলমান অধ্যাপক এখানে ইংরেজি পড়তে উপস্থিত হয়েচেন। তিনি দেখে খুসি আছেন যে বগ্‌ডানভ পার্সি পড়ান—অর্থাৎ ইস্লাম্ কালচারের কিছু একটা হচ্চে। আমি খবর নিয়েছি—সকলেই বলে বগ্‌ডানভ খুব Conscientiously তাঁর কাজ করেন। সেই সঙ্গে ফ্রেঞ্চ পড়ান, তার ছাত্র আছে। যে পর্যন্ত না রথী বা আর কেউ কোন অধ্যাপক উপস্থিত করেন ততক্ষণ হঠাৎ এই ক্লাস দুটো বন্ধ করে দেওয়া কি ভালো? এটা কেমন যেন খামখেয়ালিতার মত দেখায়। যে ছেলেরা পড়চে তাদের হঠাৎ জবাব দিলে তার মধ্যে কি লজ্জা কিছুই নেই? এ যেন একটা নিয়মহীন যথেচ্ছাকারী ছেলেমানুষীর মতো দেখতে হয়। নিজাম ফন্ড থেকে ১১৫ টাকা কয়েক মাস বগ্‌ডানভকে দিলে তোমাদের বাজেটে কোথাও বাধবে বলে তো মনে করিনে। তোমাদের একটা তর্ক এই যে ফরাসী পড়ার টাকাটা নিজাম ফন্ড থেকে কি করে দেওয়া যায়? সেটা ঠিক তর্ক নয়। তোমরাই কতবার বলেচ যে যদি আরবী পার্সিওয়ালা কোনো জর্মান অধ্যাপক পাওয়া যায় তবে তাকে দিয়ে জর্মান পড়ানোর কাজে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। পার্সি পড়ানোর জন্যেই ওকে ১১৫ টাকা দিয়ে ওর কাছ থেকে উপরি কাজ আদায় করার মধ্যে unconstitutional কিছু যদি থাকে তবে সেরকম অবৈধতা আমাদের পরেও করতে হবে। তোমরা জান না, আপাতত এখানে বগ্‌ডানভ আছে বলে আমাদের যথার্থই উপকার হচ্চে। মাঝের থেকে হঠাৎ একটা আলো নিভিয়ে দিলে সেটা অকারণ এবং অদ্ভুত হয়। য়ুরোপ থেকে কেউ আসবে বলে আজ পর্যন্ত কোনো খবরও পাওয়া যায় নি—সুতরাং তোমাদের বাজেটে টান পড়বার কোন আসন্ন হেতুও ঘটেনি। যে ছাত্ররা পড়চে তাদের হঠাৎ ভাসিয়ে দিও না—তোমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে কখনো এরকম খেয়ালি কাণ্ড হতে পারত বলে মনে করিনে। একে কি ব্যবস্থা বলে? ইতি ৩ আশ্বিন ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৯ নেপালচন্দ্র রায়

১০ ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু

১১ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১২ বিশ্বভারতীর তৎকালীন রুশ অধ্যাপক

গালিবের নারীপ্রেম ও ঈশ্বরভাবনা

আবু সয়ীদ আইয়ুব

অন্যান্য ভাষার গীতিকাব্যে যেমন, উর্দু গজলেও তেমনি রোমাণ্টিক প্রেমের আসন খুবই বিস্তৃত। বস্তুতপক্ষে একমাত্র বিষয় না-হলেও প্রেমই গজলের প্রাণকেন্দ্র। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি—বিশেষত যে-সৌন্দর্যকে একাধারে ভয়ংকর এবং মহিমান্বিত (ইংরেজীতে 'সাব্লাইম') বলা যায় তার প্রতি—ভাবাবেগ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর সমসাময়িক কবি গালিবে অনুপস্থিত; এবং সেটা খুব আশ্চর্য নয়। উর্দু সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র দিল্লী আগ্রা লখ্নৌ থেকে সমুদ্র হাজার মাইল দূরে, হিমালয় অপেক্ষাকৃত নিকট হলেও দেড়শো দু'শো মাইল পার হতে হয় তার মহিমা উপলব্ধি করার জন্য। তখন, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যানবাহনের ব্যবস্থা এমনই প্রাথমিক ছিলো যে, উর্দু কবিদের পক্ষে হিমালয় ভ্রমণ করে আসা আজকালকার অনেক বাঙালী কবির পক্ষে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে আসার চেয়ে কম দুঃসাধ্য ছিলো না। আশেপাশে এই কবিরা দেখতে পেতেন ধুধু-করা মাঠ, কোথাও কোথাও কৃষিক্ষেত্র, এবং যমুনার মতো ক্ষীণপ্রাণ শীর্ণকায় নদী। সেই যমুনারই তীরে ছিলো শাহজাহানের মর্মবেদনা-ব্যঞ্জক এক অত্যাশ্চর্য স্থাপত্যের নিদর্শন; বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিকে তা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো, কিন্তু উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবির গজলে সাড়া জাগাতে পারেনি। অবশ্য একজন উর্দু কবি তাজমহল সম্পর্কে বলেছেন, "এক শাহনশাহনে দৌলৎ-কা সহারা লেকর/হম গরীবোঁ-কী মুহব্বৎ-কা উড়ায়া হৈ মজাক।" (এক শাহন্‌শাহ অঢেল ধনভাণ্ডারের সুবিধা নিয়ে/আমাদের মতো সামান্য লোকের প্রেমকে উপহাস করেছেন।) তবে এ-শেরের ভাব ও ভাষা হাল আমলের, গালিবের সময়কার নয়।

এই সূত্রে আর-একটি প্রতিতুলনা এখানে উল্লেখ্য। উর্দু কবিদের রচনায় 'বীরানহ্' শব্দটি বহুব্যবহৃত, বাংলায় তার প্রতিশব্দ খুঁজে পাই না। না-পাওয়ার কারণ ভৌগোলিক। বীরানহ্ বলতে আমার মনে ছবি জাগে ফাটলধরা ধূলিধূসরিত দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের যা শুধু জনশূন্য নয়, পশুপক্ষী-বর্জিতও। আমাদের এই বাংলাদেশে সবুজের সমারোহ এতোই অপর্যাপ্ত যে জনশূন্য প্রান্তরেও জংলি ফুল ফোটে, নানারকমের পাখীর কলগীতি শোনা যায়। বাংলাদেশে বীরানহ্ কোথায় যে বাংলা ভাষায় প্রতিশব্দটার প্রয়োজন বোধ হবে?

বাগান আর ফুলের কথা অবশ্য উর্দু গজলে ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু সে-ফুলগুলি প্রায়শই কাগজের ফুল, অর্থাৎ প্রাক্তন কাব্যের পাতা থেকে তুলে-আনা, ইরান থেকে ঐতিহ্য-বাহী সড়কে কবি-পরম্পরায় আমদানী করা। তাই লালহ্ ও গুল, নার্গিস ও যাসমীনের পৌনঃপুনিক উল্লেখ উর্দু গজলে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ঠেকে।

বিতর্ক উঠেছে, গালিব ও সমসাময়িক উর্দু কবিদের প্রেমকাব্যের প্রকৃত পাত্র কে? বিতর্কের অবকাশ অবশ্য আছে। ফারসী কাব্যে সাকীই প্রধান প্রেমপাত্র, এবং সাকী একজন সুন্দর তরুণ, কদাচ তরুণী নয়। উর্দু কাব্যেও সাকীর উল্লেখ অপর্যাপ্ত, গালিবও কি তবে একজন বা একাধিক জন নেশা-ধরানো রূপবান তরুণের প্রেমে পড়ে কিম্বা প্রেমের কল্পনায় মজে তাঁর অবিস্মরণীয় প্রেমের কবিতাগুলি লিখেছিলেন? ইতিবাচক উত্তরের সপক্ষে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যপ্রমাণও পেশ করা যায়। প্রেমাস্পদের কোনো কর্মের কথা বলতে গিয়ে যে-ক্রিয়ারূপটি ব্যবহার করেছেন তা সর্বত্রই পুংলিঙ্গ, যথা—"আ-হী জাতা বোহ্ রাহ পর", "আ-হী জাতী" নয়। দ্বিতীয়ত, রূপের বর্ণনায় চুল, কপাল, কপোল, চোখ, পক্ষ্ম, ভুরু, ঠোঁট, কোমরের স্তুতি করে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু "নারী-দেহের কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গের (স্তন, নিতম্ব, উরু) উল্লেখমাত্র নেই। ইত্যাদি।

তবে রুমী, খৈয়াম, হাফিজাদির কয়েক শতাব্দী পর মীর, মোমিন, দর্দ, সওদা, গালিবের আবির্ভাব। ইতিমধ্যে সুরাপাত্র, প্রেমের পাত্র এবং প্রেমের মজলিসের চেহারা পালটে গেছে। কবিতার ভাষা যেখানে গতানুগতিক সেখানেও মেজাজে এবং পরিবেশে কিছু নূতনত্ব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মুসলিম সভ্যতা এবং ফারসী ও উর্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল দিল্লী, আগ্রা, লখনৌতে তওয়ায়েফরা এসেছেন, মহাসমারোহেই এসেছেন। তাঁরাই হয়ে উঠেছেন সৌখীন সব

মজলিসের অনুপ্রেরণার উৎস। সে-সব মজলিসে উচ্চপর্যায়ের রাজপুরুষরা, ধনীরা, কবিরা এবং সঙ্গীতকাররা যাওয়া-আসা করতেন। গালিবও। মানী যাঁরা স্বয়ং উপস্থিত হতেন না তাঁরাও অনেক সময়ে তাঁদের তরুণ পুত্রদের পাঠাতেন সোহ্‌বৎ অর্থাৎ আদবকায়দা-দোরস্ত ভাষা ও আচরণ আয়ত্ত করবার জন্য, ঘষা-মাজা শানানো ও চটকদার বাকবিনিময় পটুতা অর্জন করবার জন্য।

পর্দাপ্রথা তখন এমন কড়া ছিলো যে নিকট আত্মীয় এবং মজুর শ্রেণীর মেয়ে ছাড়া আর-কোনো নারীর মুখ দেখারই সুযোগ ছিলো না, আলাপ-পরিচয় করে প্রেমে পড়া তো দূরের কথা। তওয়ায়েফরা এই সামাজিক পরিস্থিতির সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে কসুর করেননি। হৃদয় জয় করে বিবাহ করা, ঘর সংসার করা, ইত্যাকার দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তাঁরা হয়ে উঠলেন বিশুদ্ধ রূপসী, হৃদয়হরণের ছলা-কলায় বিশেষজ্ঞ, পুরুষ হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় অতিশয় দক্ষ।

এক মজুর শ্রেণীর সুন্দরী ডোমনীর সঙ্গেই গালিবের প্রথম নিবিড় প্রেমের অধ্যায়টি রচিত হয়। গালিব তখন যুবক, ধনী না-হলেও বেশ সচ্ছল এবং অতিশয় রূপবান ছিলেন। ডোমনী সহজেই সাড়া দিলো, অন্য সব প্রেমিককে ত্যাগ করে একমাত্র তাঁর প্রেমেই দেহমনপ্রাণ উজাড় করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। গালিবই প্রতিশ্রুতির মান রাখতে পারলেন না। ডোমনীর উক্ত আলিঙ্গনে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে রূপে গুণে উন্নততর প্রেমিকার সন্ধানে তওয়ায়েফদের মহফিলে যাতায়াত শুরু করলেন। মনের কষ্টে এবং সে কষ্টজনিত কোনো শারীরিক পীড়ায় ভুগে-ভুগে ডোমনী অল্পকাল পরে মারা গেলো। গালিব গভীর দুঃখ পেলেন, এবং বেশ কিছুকাল অনুশোচনা করলেন যে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার দরুনই এই একনিষ্ঠ প্রেমিকা অকালে মৃত্যুবরণ করলো। তার স্মরণে কয়েকটি সুন্দর কবিতা লিখলেন। ঐ পর্যন্ত। এর পর থেকে গালিবকে তওয়ায়েফ-প্রেমিক বলা যায়। এই তওয়ায়েফদের কাছ থেকে পাওয়া ক্ষণিক প্রত্যানুরাগ, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি অবমাননা, অবহেলা, উদাসীনতা, এবং নানাপ্রকার যাতনার অনুভূতিই হয়ে উঠলো তাঁর কাব্যের প্রধান উপজীব্য।

উর্দু সাহিত্যের প্রখ্যাত মনীষী অধ্যাপক মুহম্মদ মুজীব 'গালিব, উর্দু কলাম-কা ইন্তখাব' নামক মূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন—'তৎকালীন ভদ্রসমাজে বদ্ধমূল ধারণা ছিলো যে ভদ্রাঙ্গনাদের অবাধে দেখতে পাওয়ার ফল হবে বাচনিক পরিচয়, বাচনিক পরিচয়ের ফল হবে শারীরিক স্পর্শ, এবং শরীর স্পর্শ করলে আত্মসংযম রক্ষা করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হবে না, সমাজ উচ্ছন্নে যাবে।' সুতরাং পর্দা প্রথা এতোদূর বিস্তৃতি লাভ করলো যে কাব্যেও নারীর উল্লেখ অশালীন ব'লে বিবেচিত হ'লো। প্রেমের কবিতায় কবি এমন কিছু লিখতে পারবেন না যাতে বোঝা যায় তাঁর প্রেমাস্পদ পুরুষ কি নারী। সেই কারণে প্রেমের কবিতার পাত্রী তওয়ায়েফ হ'লেও ব্যাকরণে ও রূপ-বর্ণনায় সে কথাটা গোপন থাকতো। তবে একটু তলিয়ে দেখলে হাবভাবের ও চারিত্রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে প্রেমপাত্র নারী, শুধু নারী নয়, তওয়ায়েফ এবং সুরা ও প্রেমের মজলিস তারই নাচঘর। তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসও এ-অনুমান সমর্থন করে। এই শালীনতা-বোধ—যার আওতায় সমযৌন-প্রেম ঊনবিংশ শতাব্দীর উর্দু কাব্যে সমাদৃত হ'লো এবং নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসা বহিষ্কৃত হ'লো বা প্রচ্ছন্ন রইলো—আমাদের আজকের রুচিতে যতোই অদ্ভুত ঠেকুক, তাকে অস্বীকার করবার জো নেই।

গালিবের পার্থিব প্রেমে যে মধুগুরু রসের আমেজ, যে-চাতুর্য—শুধু বাকচাতুর্য নয়, ভাবচাতুর্যও—দেখা যায় সেটা তাঁর অপার্থিব প্রেমভাবনায় প্রতিফলিত। একটি দৃষ্টান্ত দিলে হয়তো কথাটা স্পষ্ট হবে। 'ফারিশ্‌তাদের লেখার উপর ভর ক'রে আমাকে অন্যায়ভাবে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে শাস্তি দেবার জন্য।/লিখবার সময়ে আমার পক্ষের কি কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলো?' মুসলমানদের বিশ্বাস যে প্রত্যেক মানুষের দুই কাঁধে দুই ফরিশ্‌তা (দেবদূত) বসে আছেন; পাপ করলেই বাঁ কাঁধের ফরিশ্‌তা সেটি লিখে রাখেন, কোনো পুণ্যকর্ম করলে ডান কাঁধের ফরিশ্‌তা সেটি তালিকাভুক্ত করেন। কেয়ামতের দিন এই দুটি তালিকা মিলিয়ে হিসাবনিকাশ ক'রে আল্লাহ্‌ স্বর্গ বা নরক বাসের মেয়াদ ধার্য করেন। গালিব যেন খোদার সঙ্গে ঝগড়া করে বলছেন: তোমার প্রেরিত লোকেরা তালিকা প্রস্তুত করার সময় মিথ্যা কিংবা ভুল কথা লেখেনি তা আমি মানবো কেন? আমার পক্ষের কেউ তো উপস্থিত থেকে সায় দেয়নি যে, হাঁ ঠিক লেখা হয়েছে। খোদার বিচারও যেন ফৌজদারী আদালতের বিচার, দৈবী সাক্ষীকেও প্রমাণ দিতে হবে যে সে সত্যবাদী।

অন্য-একটি শেরে গালিব বলেছেন, প্রিয়ার নিষ্ঠুরতায় তিনি দেখেছেন বিধাতার নিষ্ঠুরতার আদল; উলটো ক'রে বললে—বিধাতার নিষ্ঠুরতায় তিনি অনুভব করেছেন প্রিয়ার নিষ্ঠুরতার আদল—আমরা কবিমানসের অন্য দিকটা এবং এক হিসেবে গুরুতর দিকটা ঠাহর করতে পারি। প্রিয়া তাঁর রূপে-গুণে (নাকি পরমপ্রিয় তাঁর সৃষ্ট জগতের রূপে গুণে?) জাগিয়ে তোলেন লক্ষ বাসনা, অথচ ঐ বাসনার ভগ্নাংশও পূর্ণ করার কোন অভিপ্রায় নেই তাঁর, তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন নির্মম। কবির মনে হুতাশ প্রশ্ন জাগে—হে ঈশ্বর, আমাকে আর-কিছুই যখন দেবে না তখন একটি বাসনাহীন হৃদয় দিলে না কেন? কিন্তু গালিব বাসনার নিবৃত্তি চাননি; বলেছেন, আমি যখন কবি তখন আমার বাসনার রঙের খেলা ও রূপের বাহার দেখাবো এবং রসের ভাবায় ব্যক্ত ক'রে সবাইকে দেখাবো; ঐ-সব বাসনা কোনো দিন পূর্ণ হবে কি না সে-কথা অবান্তর। দৈনন্দিনের মানবিক সত্তা এবং দুর্লভ শুভলগ্নের কবিসত্তার মধ্যে এমনতর টানাপোড়েন বা দ্বন্দ্ব তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র গালিব বলেছেন, আমি চাইবো না কেন, তুমি যখন সব দিতে পারো তখন আমি সব-কিছুই চাইবো তোমার কাছে, আমার প্রার্থনাবে সেই সাহস, সেই বল দাও। আবার সুর পালটে বলেছেন, না-চাইতে যা পাওয়া যায় তার স্বাদ, তার মূল্য আলাদা; সেই ভিখারীই শ্রেষ্ঠ ভিখারী, হাত পাতার অভ্যাস হয়নি যার। আমি চাইবো না অথচ তুমি দেবে—এই হোক আমাদের অনুরাগ-রঞ্জিত আদান-প্রদানের সম্পর্ক।

গালিব ও তাঁর খোদার মধ্যে বিশ্রম্ভালাপের সুর স্বতন্ত্র, ভাষা ভিন্ন; রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্বের বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গে মেলে কোথাও-কোথাও, কিন্তু মেলেনা তার চেয়ে অনেক বেশি। আমার মিলন লাগি তুমি আসছো কবে থেকে, ঝড়-ঝঞ্ঝা, গিরীনদী পার হ'য়ে আসছো, এসে পৌঁছবেই একদিন, সেদিন যদি-বা আমার ঘরের (বা অন্তরের) দরজা বন্ধ থাকে তবে প্রবল আঘাতে দরজা ভেঙে আসবে—এ দৃঢ় প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের গানে বারবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। গালিবের পক্ষে এ এক পরম আশ্চর্য, পরম অবিশ্বাস্য ব্যাপার। "তিনি এলেন আমার ঘরে"—আমি কি স্বপ্নের ঘোরে আছি, "আমি একবার তাকাই তাঁর মুখের দিকে, একবার আমার ঘরের দিকে" আর ভাবি এই অসম্ভব ব্যাপার কেমন ক'রে মুহূর্তের জন্য সম্ভব হ'লো। আসবার প্রতিশ্রুতি তিনি দেন কখনো-কখনো, আমি সারাক্ষণ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকি তাঁর প্রতীক্ষায়; কিন্তু তিনি আসেন না। বুঝতে পারি: আমাকে আমার বাড়ির দরজায় দারোয়ান ক'রে দাঁড়িয়ে রেখে কৌতুক করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিলো। অথবা, আরও মর্মান্তিক, তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েন গভীর রাতে রকীবকে (প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিককে)

সঙ্গে নিয়ে, আমার বিরহ-যন্ত্রণাকে ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ করে দিয়ে যাওয়ার জন্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় রকীবকে আমারা খুঁজে পাই না; গালিবের অনেকগুলি প্রেমের কবিতায় তিনি অত্যন্ত উপস্থিত। ঈশ্বর সব মানুষকে ভালবাসতে জানেন না, কয়েকজন ভাগ্যবানই তাঁর করুণাকণা কুড়িয়ে পান। সেইটুকুর জন্য কবি কাতর। একটি শের-এ অবশ্য গালিব বলেছেন—"ঈর্ষা বলে অন্যের সঙ্গে তোমার ভাব,/বুদ্ধি বলে সে নির্দয় কারো সুহৃদ হ'তে পারে না।" সর্বত্রই সৌহার্দ্য খামখেয়ালী ও ক্ষণিক, নির্দয়তার দীর্ঘ ইতিবৃত্তে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি বিরামচিহ্ন যেন। গালিবের প্রায় বিপরীত মেরুর কবি ইকবাল বন্দা ও আল্লার মধ্যে প্রেম প্রসঙ্গে রকীবের প্রত্যয়টি বেশ একটু নতুনভাবে এনেছেন। ইকবাল অবশ্য ব্যক্তি-মানুষের কথা ভাবছেন না, মানব সমাজের দিকেই তাঁর সমূহ মনোযোগ, এবং সে-সমাজ অবশ্যতই ধর্মভিত্তিক। কয়েক শতাব্দী আগে পর্যন্ত মুসলিম ধর্মসম্প্রদায় ছিলো আল্লার বরেণ্য সম্প্রদায়, কিন্তু আধুনিককালে দেখা যায় পশ্চিম য়োরোপের খৃষ্টিয় ধর্মসম্প্রদায় আল্লার পক্ষপাতী প্রীতি লাভ করেছে। তারাই এখন সৌভাগ্যবান রকীব। এই প্রসঙ্গের আলোচনা দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকায় করেছি।

"আর পাব কোথা/দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা"—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বৈষ্ণব কবি সম্বন্ধে, সব ঈশ্বর প্রেমী কবি সম্বন্ধেও বলতে পারতেন; নিজের প্রেমের রূপান্তর বিষয়ে অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক পত্রে। ("একেই বলে ভালবাসা? আমার ভালবাসার লোক কই? আমি ভালবাসি অনেককে। কিন্তু 'মানসী'-তে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?")

গালিব, অন্তত কবি গালিব, তাঁর ঈশ্বরের ভাবচ্ছবি রচনা করেছিলেন তওয়ায়েফপ্রেমে উপলব্ধ উপাদান দিয়ে। তওয়ায়েফ বলতে আজ আমাদের মনে অবজ্ঞা জাগে, গালিবের সময় জাগাতো না। রূপে তো এঁরা অনন্যা ছিলেনই, নৃত্যগীত বাকপটুতা ইত্যাদি গুণেও সেরা ছিলেন। এই গুণগুলিকে অবশ্য বলা যেতে পারে নান্দনিক গুণ (aesthetic quality)। চারিত্র্য নৈতিক গুণ (moral quality) তওয়ায়েফদের মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। তাই গালিবের ঈশ্বরভাবনায় নান্দনিক গুণের প্রাচুর্য দেখি এবং চারিত্র্যনীতিক গুণের অপ্রতুলতা। সর্বজীবের প্রতি, অন্তত সকল মানুষের প্রতি তাঁর করুণা ও প্রীতি অপার, পিতার মতন শাসন করলেও তিনি পিতার মতনই স্নেহশীল, তাঁর বিধান সর্বতোভাবে মঙ্গলময় ও ন্যায়-নিষ্ঠ, অমঙ্গল বা অন্যায় আমরা যা দেখি সেটা আমাদেরই আংশিক দৃষ্টির বিভ্রম—এমন ভাবধারা গালিবের মনে দানা বাঁধেনি, অন্তত কাব্যে তার প্রকাশ অত্যন্ত বিরল; ঈশ্বরের রূপের কথাই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে। গালিব অনেক শের-এ ঈশ্বরের রূপকে রূপের পরম বা পরাকাষ্ঠা বলেছেন। সেই পরম রূপের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে দেখেছেন যতোটা মানুষের রূপে ততোটা দেখেননি। প্রতি-তুলনায় গালিব রূপসীদের মধ্যেই পরম-রূপের আভাস পেয়েছেন বেশি। "সব নয়, অতি অল্পই লালহ্ গোলাপের মধ্যে রূপ নিয়েছে,/না-জানি কী রূপসীই ছিলেন যাঁরা এই মাটির তলায় চাপা পড়ে আছেন।" সুন্দরী নারীর রূপের অত্যল্প ভাগ মাত্র পেয়ে যেমন ফুলগুলি এতো সুন্দর, তেমনি পরম রূপের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র আমরা দেখতে পাই রূপসী নারীর মনোহরণ রূপে।

প্রাসঙ্গিক অন্য-একটি শের আমাকে ভাবিয়ে তোলে: হে অপরিণামদর্শী হৃদয় আমার, অভিলাষ সংবৃত করো;/বন্ধুর রূপের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করবার শক্তি তুমি পাবে কোথায়?" ঈশ্বরকে প্রায় সব ধর্ম-শাস্ত্রেই জ্যোতিঃস্বরূপ বলা হ'য়ে থাকে। গালিব কি সেই প্রাচীন কথাই নতুন করে বলতে চান? বলতে চান যে ঐ জ্যোতি এতোই প্রচণ্ড যে, মানুষের চর্মচক্ষু তথা মনশ্চক্ষু তার সাক্ষাৎ দর্শন সইতে পারে না; অতএব ঈশ্বরদর্শন বা ঈশ্বরের পূর্ণ জ্ঞানের জন্য বৃথা অভিলাষ সম্বরণ ক'রে যে অতীব সীমিত জ্ঞান বা বোধ মানুষের ক্ষুদ্র শক্তির সাধ্যায়ত্ত তাতেই সন্তুষ্ট থাকা সংগত? না কি গালিব রবীন্দ্রনাথের মতন

(সি ৭৭৮১)

আরও দুঃসাহসিক কিছু বলতে চেয়েছেন? 'রাজা' নাটকে রাজা (যিনি ভগবানের প্রতীক) তাঁর প্রেমিকা রাণী সুদর্শনার কাছে আসেন রাত্রিকালেই ঘুটঘুটে অন্ধকার কক্ষে। রাণী তাঁকে দিনের আলোয় দেখবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে রাজা উত্তর দেন, "তুমি আমায় দিনের আলোয় (অর্থাৎ লোকালয়ে) দেখলে আমার রূপ সহ্য করতে পারবে না।" সে-রূপ প্রচণ্ড জ্যোতির্ময় ব'লে সুদর্শনার সহ্য হবে না এ-কথার উপর কিন্তু নাটকে জোর দেওয়া হয়নি, জোর দেওয়া হয়েছে এই কথার উপর যে রাজা একদিকে যেমন মধুর ও মনোহর, অন্যদিকে তেমনি নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর। তাঁর এ সমগ্র রূপ সহ্য করবার শক্তি সুদর্শনা তখনও লাভ করেনি: তাই রাজার দর্শন পাবার সে যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে ঠাকুরদা পর-পর পাঁচটি ছেলে হারিয়ে কঠিন সত্যকে সহ্য করবার শক্তি অর্জন করেছেন, তাই তিনি রাজাকে দিনের আলোতেই দেখতে পান এবং বন্ধু ব'লে সম্বোধন করতে পারেন। গালিবের পূর্বোদ্ধৃত 'শের'-এর এমনতর অর্থ করা যায় কি? এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। তবে এটা নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় পৃথিবীময় দুঃখের যে "অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ" দেখেছিলেন, পরে আরও বিদীর্ণ হৃদয়ে দেখেছিলেন নাৎসী বর্বরতার সংবাদ পেয়ে, গালিব তা দেখেননি। সিপাহী বিদ্রোহের সূত্র ধ'রে উভয়পক্ষের বর্বরতা তাঁকে খুব বিচলিত করেছিলো, তাঁর চিঠিপত্রে আমরা সে-কথা জানতে পারি। কিন্তু গালিবের কাব্যে তার স্বাক্ষর তেমন গভীর ও পরিব্যাপ্ত নয় যেমন রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যের উপর দেশে-দেশে বিস্তৃত নৃশংসতার স্বাক্ষর।

আগেই বলেছি, গালিব সমাজমুখী কবি নন, তাঁর কাব্যের উপজীব্য তাঁর নিজের জীবনের সুখদুঃখ, ভাগ্যের উত্থান-পতন। সেইখানে তিনি উপলব্ধি করছেন ঈশ্বরের খামখেয়ালীপনা, কৌতুকপ্রিয়তা, নিষ্ঠুরতা এবং উদাসীনতা। তাঁর কয়েকটি শের-এ দেখি তিনি প্রিয়ার কাছ থেকে তথা ঈশ্বরের কাছ থেকে আর সব কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত কিন্তু উদাসীনতা সইবার শক্তি তাঁর নেই। আমি নিজে অবশ্য বুঝতে পারি না জীবনের কোন্ দুঃখকষ্টকে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা বলা যায় এবং কোনটাকে তাঁর উদাসীনতা। আমরা যদি বিশ্ববিধানের পিছনে কোনো বিধাতাপুরুষের অস্তিত্ব মানি, তবে যে-কথা খোলা চোখে এবং মুক্তবুদ্ধিতে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে সেটা এই যে বিধাতার উদ্দেশ্য আর যা-ই হোক্ ব্যক্তিমানুষকে সুখী করা বা সুখে রাখা নয়। উদাসীনতাই নিপট সত্য, 'নিষ্ঠুর' বলার মধ্যে খানিকটা আবদারের ভাব রয়েছে। যখন বিশেষ কোনো সৌভাগ্যকে নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নিই অথচ শেষ মুহূর্তে তা থেকে বঞ্চিত হই তখনই ব'লে উঠি—হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হ'লে কেন?

মানুষের জীবনে সমূহ সুখ দুঃখ বিশ্বজাগতিক নিয়মেই ঘটে, এবং নিয়মকে নিষ্ঠুর বা করুণাময় বলার কোনো মানে হয় না। নিয়ম যদি ঈশ্বরের রচনা হয় তবে তিনি পরম ভক্ত, মহান হিতকর্মী, প্রতিভাবান জ্ঞানী ও শিল্পীর বেলাতেও লেশমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাতে, নিয়মের কঠোরতম আঘাতজনিত যন্ত্রণা থেকে তাঁদের রক্ষা করতে অনিচ্ছুক। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, স্পিনোৎজা, কীট্‌স্, বেটোফেন, হোলডার্লিন, ফ্রয়েড, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য—কতো নাম করবো। আমরা সবাই জানি কতো বৎসর ধ'রে এ'দের ক'জনের ওপর শারীরিক যন্ত্রণার বা [illegible]জনিত মানসিক যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলেছিলো, তবে বিধাতার কি অভিপ্রায় তাতে সিদ্ধ হ'লো তা কেউ জানে না। প্রাকৃতিক নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা বিশ্বে এই অর্থহীন যন্ত্রণা অবধারিত। নিয়মের যদি কোনো স্রষ্টা থাকেন তবে তাঁর করুণা, প্রীতি, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা সবই সম্পূর্ণ গোপন রয়েছে কঠিন নিয়মের অন্তরালে। আমাদের মুখোমুখি আছে কেবল উদাসীনতা, বধিরতা, নিরুত্তরতাঃ এদিকে আমি—শত সহস্র আর্তনাদ,/ ওদিকে তুমি—এক পরমাশ্চর্য না-শোনা।'

ভলটেয়র কোনো বন্ধুকে এক পত্রে লিখেছিলেনঃ আমি যখন ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনো আঘাত পাই তখন আমার শাণিত বিদ্রূপবাণের দ্বারা দ্বিগুণে প্রত্যাঘাত করতে বিলম্ব করি না ('I get
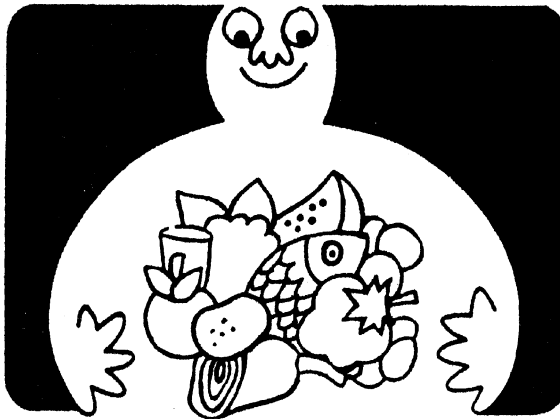
a hundred pike. thrusts I return two hundred and I laugh.')। তেমনি প্রত্যাঘাতের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত গালিবের একটি আশ্চর্য সার্থক এবং সরল শের : "আমি কি এমন জ্ঞানী ছিলাম কোন্ গুণে সেরা ছিলাম অকারণে আসাদ, আসমান আমার শত্রু হলো।" যেন এটা অবধারিত সত্য যে মানুষের মধ্যে যারা সেরা গুণী জ্ঞানী তারা ঈশ্বরের কুনজরে পড়বেনই; ঈশ্বর মানুষের ভালো দেখতে পারেন না, উন্নতি বরদাস্ত করতে পারেন না। কবি ঈষৎ কৃত্রিম বিনয় সহকারে বলছেন—আমি তো সে রকম কিছু নই, তবু ঈশ্বরের কোপ-দৃষ্টি আমার উপর পড়লো কেন?

"নহ থা কুছ তো খুদা থা, কুছ নহ হোতা তো খুদা হোতা/ডুবোয়া মুঝকো হোনে-নে, নহ হোতা মৈঁ তো কেয়া হোতা" (যখন কিছুই ছিলো না তখন খোদা ছিলেন, কিছু না-হলেও খোদা তো থাকতেনই;/হওয়াটাই আমাকে ডুবিয়েছে, আমি যদি না-হতাম তবে কী হতাম")—অর্থাৎ খোদা হতাম। অথবা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তা নাস্তির নাস্তিত্ব,/যাকে জাগা মনে করি সে-ও স্বপ্ন, জেগে ওঠার স্বপ্ন।" এই ধরনের একাধিক শের গালিব রচনা করেছেন, তবে দুটো-চারটে ব্যতিক্রম ছাড়া আমার মতে সেগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি, তত্ত্ব-কথা কিংবা হেঁয়ালি-বিলাসই থেকে গেছে। সেটা কিন্তু গালিবের অক্ষমতা নয়, ভাষারই অক্ষমতা। সমস্ত বিশ্বজগৎ আমারই মনের সৃষ্টি, কিংবা 'অনল হক' (আমিই পরমেশ্বর), "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—এ-সব কথা আজকের কথা নয়, তবে তবু আজও তা ঠিক কথা হয়ে উঠতে পারেনি। এমনতর উপলব্ধি যদি অলীক না-হয় তবু তা একান্তই যোগলব্ধ ও যোগলভ্য, মুনীর (মৌনব্রতীর) বক্ষেই তার সঙ্গত স্থান। দার্শনিকরা যুক্তির ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন, কবিরাও তেমনি ব্যর্থ হয়েছেন রসের ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে। সত্যের সীমা না থাকলেও কথার একটা সীমা আছে। কথার সাধক যাঁরা এবং যাঁদের সাধনা একান্তভাবে কথার উপরই নির্ভরশীল, তাঁদের সেটা মেনে চলাই ভালো। ভালো, তবু দার্শনিকরা কবিরা কথার সীমানা ছাড়িয়ে কথা কইবার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। এই অসম্বৃতির ফলে হয়তো খুব ধীরে ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভাষার সীমানা একটু একটু করে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত হয়েছে। তথা লাভ।

আসল কথা হচ্ছে যে, অদ্বৈতবাদ কিংবা অদ্বৈতবোধ কবির স্বধর্ম নয়। কবিকে প্রেমিক এবং প্রেমিককে দ্বৈতবাদী হতেই হয়। প্রেমিক চায় নিবিড়তম মিলন, আত্মবিলোপ বা তাদাত্ম্য নয়। অবশ্য ইরানের একজন শ্রেষ্ঠ কবিই বলেছেন : "মন তু শুদম তু মন শুদী, মন তন শুদম তু জান শুদী;/তা কস নহ গোয়দ বাদ অজ ইঁ, মন দীগরম, তু দীগরী।" (আমি তুমি হয়ে যাই, তুমি আমি হয়ে যাও; আমি দেহ হয়ে যাই, তুমি প্রাণ হয়ে যাও, পরে যাতে কেউ না-বলে আমি আর তুমি ভিন্ন।") কিন্তু এটা কবিতার ভাষা, অলংকৃত এবং অতিরঞ্জিত। রামকৃষ্ণ তাঁর প্রাকৃত বাংলায় যা বলেছিলেন সেইটাই প্রেমিক হৃদয়ের খাঁটি কথা, বৈদান্তিকের তত্ত্ববিলাস নয় : "আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না।"

উপরে দুটি-চারটি ব্যতিক্রমের কথা বলেছি, তার উদাহরণ এই শেরটি : "প্রিয়ের শোভা ব্যতীত এ মহাবিশ্ব আর-কিছু নয়,/আমি হতামই না যদি পরম সুন্দর নিজের রূপ দেখতে না-চাইত।" ভাবটি দার্শনিকসুলভ শোনায়, কিন্তু আসলে তা কবিরই ভাব, কবিতার ভাষাতেই প্রকাশিতব্য, দার্শনিক যুক্তি বিচারসহ নয়। (এখানে ভাব শব্দটি যে-অর্থে আমি ব্যবহার করেছি তার মধ্যে চিন্তা ও অনুভূতি একাকার হয়ে মিশেছে।) এই শেরের ভাবটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বার বার আবর্তিত হয়েছে। সম্ভবত যৌবনকালে রচিত একটি গানে পাই "আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি/দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব, কবি"; আয়ুর শেষ প্রহরে লেখা 'শ্যামলী'র 'আমি'-শীর্ষক গদ্য কবিতাটিতে দেখি এই ভাবেরই বিস্তার। কবিতাটির ক্রমবিকাশ মন্থর কিন্তু অব্যর্থ। আরম্ভ হয় দার্শনিক তত্ত্ব-কথায় : "আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ" ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তবকে বলছেন বটে একে বোলো না তত্ত্ব কথা, তবু তত্ত্বকথাই আরো একটু কাব্যমণ্ডিত হয়ে এগিয়ে

(সি ৭৭৮২)

চলে। এবার বৈজ্ঞানিকের অবতারণা, তাঁর ভবিষ্যৎবাণী শোনা যায় : প্রাকৃতিক নিয়মে একদিন পৃথিবী ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে, মানুষ আপন "কীর্তির অমরতার ভান নিয়ে" মাস্তিত্বে বিলীন হবে। কিন্তু বিদায়কালে জগৎ থেকে "নিকিয়ে নেবে সব রঙ...ছানিয়ে নেবে সব রস।" পরের ভাব-পর্বটি কবিতারই এলাকাভুক্ত। বর্ণহীন রস-হারা বিশ্বে বিশ্ববিধাতার কি কোনো আনন্দ থাকবে? তাঁকে আবার যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা করতে হবে মানব সৃষ্টির জন্য, জড় জগতের মধ্যে তিনি আবার মানুষকে ডাকবেন, বলবেন : "বলো, তুমি সুন্দর", বলবেন, "বলো, আমি ভালো-বাসি।" মানুষের সৌন্দর্যবোধের জন্য, মানুষের বিশ্বপ্রেমের জন্য ব্যাকুল এই বিশ্বরচয়িতা উপনিষদের পরব্রহ্ম নন, প্রচলিত কোনো ধর্মশাস্ত্রের পাতায় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো, গালিবের মতো, কবির অনুভবেই সত্য। কৃষ্ণের জন্য রাধার ব্যাকুলতা ঐকান্তিক, সেইজন্য যাতনাময়; রাধার প্রেমের জন্য কৃষ্ণ একাধারে আগ্রহী এবং উদাসীন। বিরহিনী রাধার তীব্র বেদনা আমাদের খুবই চেনা, কিন্তু বিরহী কৃষ্ণের একাকীত্ববোধ, স্পষ্ট হয়নি মহাজন পদাবলীতে—যেমন স্পষ্ট হয়েছে মানবহীন বিশ্বের বিধাতার নিরানন্দ (boredom) রবীন্দ্রনাথের "আমি" কবিতাটিতে। একই ভাববৃক্ষের তিনটি ফল, কিন্তু প্রত্যেকটির স্বাদ আলাদা।

গালিবের শেরে দেখি বিশ্বস্রষ্টা আত্ম-দর্শনপ্রিয়, তাই চক্ষুষ্মান জ্ঞানবান মানুষকে সৃষ্টি করলেন নিজের বিশ্বময় রূপ দেখবার জন্য। এ-দেখা নিলিপ্ত দেখা। কিন্তু ভগবান আরও-কিছু চান, তিনি চান তাঁর এই বিশ্বরূপী শিল্প-বস্তুটির গুণগ্রহণ, রসাস্বাদন। উপনিষদের কবি যখন বললেন, "দেবস্য পশ্য কাব্যম্," তখন বিশ্বরচনাকে কাব্যরচনার সঙ্গে তুলনা ক'রেই তিনি তাঁর নান্দনিক গুণগ্রহণ প্রকাশ করলেন। বৈষ্ণব কবিদের কৃষ্ণ (বিশ্বময় অবতীর্ণ বিশ্বস্রষ্টা) রাধার (অর্থাৎ মানুষের) প্রতি উদাসীন থাকলেও তার দেহমনের আকুলতায় এবং আত্ম-সমর্পণে সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'আমি' কবিতাটিকে মানুষের সৃষ্টি ও বিলোপের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে-যে মানবলুপ্ত বিশ্বে বিশ্বস্রষ্টার কোনো আনন্দই নেই, একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হয়ে তাঁকে আবার মানবসৃষ্টির পর্ব সাধন করতে হবে, মানুষের রসবোধরিক্ত বিশ্ব তাঁর কাছেও একেবারেই অর্থহারা। ভগবানের boredom-এর কথা ইতিপূর্বে কোনো কবি বলেছেন কি? যেমন আশ্চর্য তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ এই কল্পনা।

গালিব রবীন্দ্রনাথের পর্যায়ের দার্শনিক ছিলেন না, তাঁর কবি-প্রতিভাও রবীন্দ্র-নাথের সমতুল্য নয় আমার বিচারে। তবু, তাঁর কয়েকটি গজলের এবং অনেক অনেক শেরের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ করবেন সহৃদয় পাঠক, অনেক শেরের ঘনীভূত হাস্যরসে পুলকিত হবেন, অনেক শেরের শব্দবিন্যাসে অসাধারণ দক্ষতা লক্ষ করে মুগ্ধ হবেন, বেশ কয়েকটি শেরের গভীর ও বিশাল মর্ম হৃদয়ঙ্গম করে সেই দুর্লভ আনন্দ লাভ করবেন যাকে প্রকৃত অর্থে রসানন্দ বলা যায়—যদিও কাব্য-বাহিত অনুভূতি তিক্ত দুঃখের কিংবা বিষণ্ণ নৈরাশ্যের।

সোনালী মোরগের গল্প

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেই মোরগের সোনালী পালক, মাথায় লাল ঝুঁটি। মধ্যরাতে বাং দিলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। তিন-চারটে পিঠোপিঠি নেংটা-নেংটি পুঁকড়ো অর্থাৎ পোকায় খাওয়া ছেলেমেয়ে গায়েগতরে লেপটে নিয়ে বেরিয়ে আসে বড় বউ। ঘর তখন মুহূর্তেই শত্তুর, উঠোনে দাঁড়িয়ে চেরা গলায় চেঁচায়। দাওয়ায় ঘুমন্ত বুড়ো শ্বশুরে ফোকলা ফোকলা মুখে রাতের পান্তার স্বাদ নিয়ে স্বপ্ন দেখছিল ধানক্ষেতে পোকা পড়েছে, হলদে-হলদে পোকা, ডানায় চিত্র-বিচিত্র, ফর ফর ফর ফর চিরিক চিরিক শব্দ। তার ঠ্যাং ধরে টানতেই হাউমাউ করে ক্যামকাশা কাঁদে। হাওয়ায় কটু গন্ধ। হাওয়া যেন ডাকা-ডাকিনী হয়ে ওৎ পেতে বসে ছিল রাতের গায়ে গাছগাছালির ডালে-ডালে। মোরগের বাং শুনেই এলোচুলে ডাকিনী উথালপাথাল দোলে, ওড়ে, শন-শনিয়ে হাসে। ঘর তখন শত্তুর। সবাই এখন ঘর ছেড়ে বাইরে। কারও চোখে স্বপ্নের নোনতা ঘোর, কারও মিঠে। কেউ ঘুমের নদী সাঁতরে আসার ক্লান্তি নিয়ে কষ্টে জাগে। কানে আসে মধ্যরাতের ভয়ংকর সেই সোনালী মোরগের বাং। মাথার লাল বিশাল ঝুঁটি আকাশ নাড়া দিয়ে দোলে। বত্রিশ নাড়ি মোচড় দিয়ে বুক ঠেলে ভাঙা খানখেনে চেঁচানি ঝনঝন করে কাঁসার থালার মতো আছাড় খায় মধ্যরাতের গায়ে—আমার ধান! আমার তিনছালা ধান!

গরীব-গুরবো ছোটলোক-টোটলোক মানুষ সব। তিনছালা অর্থাৎ তিন বস্তা বোঝো এনেছিল খরার চাষবাসের নিদেন রোজগার। বিলের জলার ধারে অনেক ঘাম ও রক্ত, ত্রাস ও স্বপ্ন নিয়ে তিনটে মাসের দিন-দুপুর রাতভোর কেটেছে। হঠাৎ কোন পাপে সোনালী মোরগ বাং দিল নিশুতি নির্জন রাতে—চরণ চৌকিদার রোঁদ থেকে ফিরেই লণ্ঠন নিবিয়ে সবে শুয়েছে, তন্দ্রা মতো এসেছে, ঠিক তখনই? কি পাপ, কোন্ পাপ, কেমন পাপ, কেমন পাপ? হুলুস্থুলুসের তলায়-তলায় এই প্রশ্ন শাঁই শাঁই করে ছোটা-ছুটি করে। পবন লোকটা তো ভালই—যার সাতচড়ে রা নেই! মোহনও তাই, লম্বালম্বি চুলে কিঞ্চিৎ বেশি তেল দেয় এই যা। তাদের ঘরের মটকায় কেন সোনালী মোরগ বাং দিল—অর্থাৎ ডাকল?

তিনপুরুষের ঢ্যাঙা তাল গাছের মাথা দাউ দাউ জ্বলছে। শুকনো বাগড়া থেকে মুঠো মুঠো লাল ফুলের পরাগ ঝরছে। স্খলিত উল্কার মতো, যেন বা লাল নক্ষত্র পুঞ্জ অন্ধকারে, যেন বা বনতুলসীতলার বাজিকর মেহেরচাঁদের রংবাজি। আজ অহংকার পবন-মোহন দুভায়ের কপাল, কি কপাল। ছোট মোহনের বিয়েতে রায়বেঁশে নেচেছিল, তিন কাঠা জমি বেচেই তাজ্জব শখ—কি না ছোট ভাই, এবং বাজি পোড়েনি—তাই এই রংবাজির খেল। যাদের কাছে এ আগুন নিশুতি রাতের সৌন্দর্য, তারাই এসব বলাবলি করছে, আড়ালে। যারা মনে মনে মোহনের বউটিকে পাশে শুইয়ে রাত ভোর করে দেয়, তারাই।

জল জল জল। পুকুরডোবা শুকনো খটখটে। বারোয়ারি ইঁদারার তলায় যা আছে, তা রস। অঞ্চলবাবুদের টিউবেলে মরচে ধরেছে। ভোট কুড়ুনিরা আসুক এবার দরদের বুলি বলতে! জল, হা জল! সকাল বিকেল দিগন্তে এক চিলতে শুঁয়োপোকার মতো মেঘের আভাস টের পেলেই গাঁ সুদ্ধ মাঠে বেরিয়ে পড়ে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মেঘা রে মেঘা! নিদয় হোস নে সোনা! কয়েক রাত আগেই অমাবস্যা ছিল। ছোটলোকের বউঝিরা পুরুষদের ঘুম পাড়িয়ে মাঠে গিয়েছিল। মেঘার পরব করে এল। পরনের কাপড়-চোপড় খুলে নেচে নেচে খিস্তি গাইল। মেঘের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রথমে স্তবস্তুতি তারপর প্রেম ভালবাসা, তারপর শরীরে শরীর যোগ করার লোভ দেখানো, শেষে মুক্ত লজ্জাবিহীন স্বাধীনতায় বর্ণনাতীত কামকেলি! তুখোড় নাগর পুরুষও গোপনে শুনলে কানে আঙুল দেবে। চোখের কোণায় জলের ফোঁটা ফুটলেও অবাক হবার নেই। আহা, এতো বড় দুঃসময়। ওই স্বাধীনতা স্রোতে তারও ভাসার সাধ্য নেই। মেঘার পরব মানেই চকিত শিহরণ, বিষাদ, গ্রাম-পুরুষের আত্মার হাহাকার করে ওঠা—কারণ তার বউঝির চরম সম্মানের বদলে বৃষ্টি চাইতে হচ্ছে। ইজ্জতের দাম কম নয়—এ ইজ্জত হাজার বছরের নিশ্চি কষে বের করা।...

হায়, তবু মেঘার মন টলল না। গ্রামীণ অপ্সরাদের ঠাটঠমক লাস্যলীলা ও শরীরের প্ররোচনাতেও হতচ্ছাড়ার ধ্যান ভাঙল না।

তখন অঞ্চলবাবু, হেই অঞ্চলবাবু, হেই বাবা বিডিও সায়েব, এসডু্য, মেজিস্টের, জজ বেলিস্টোর যে যেখানে আছে, এট্টা বিহিত করো। মহল্লা থেকে কাপাসী, গাঁতলা থেকে সৌরিতলা, ইদিকে কাটোয়া উদিকে কান্দী—গঙ্গার সারা পশ্চিম পাড় ধু ধু জ্বলছে খরায়। গাছের ডালে অলক্ষুণে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। ন্যাড়া বাজপড়া তালের ডগায় ডাকছে চিল। গলা ধুক ধুক করছে। হাঁ-করা ঠোঁট। কুকুরের জিভ বেরিয়ে গেছে। গরু-বাছুর গাঁ গাঁ করে হাঁক ছাড়ছে। দূরে বিলের তলা খুঁড়ে জল আনছে লোকে। যেতে আসতে কানে আসে আকাশের কোনখানে বসে গালে হাত রেখে দেয়াশিনীর মতো কাঁদে চাতকপাখি—ফটিক জল! ফ-টি-ক জ ল।...

ঠিক সেই সময় নিশুতি রাতে পবন-মোহন দু-ভায়ের ঘরের চালে বাং দিল লাল-ঝুঁটি ভয়ঙ্কর চিরচেনা সেই সোনালী মোরগ।

অবশ্যি, এলাকার এই যেন রেওয়াজ। খরার দু-তিনটে মাস কোন না কোন ঘরে, কোন না কোন গাঁয়ে আগুন লাগবেই। এই সব রাতে বড় উত্তেজনা। দিনদুপুরেও সারা গাঁ কারও ভুলে পুড়ে লাল হয়ে যায়। কিন্তু এ আগুন সেই ভুলের আগুন নয়। এ আগুনের চলতি নাম সোনালী মোরগ। এর মধ্যে গ্রামীণ ভাঁড়ের আলতো রসিকতা আছে। শত্রুতার ব্যাপারে খরার মাসগুলোর অপেক্ষা করে থাকতে হয়। ঝগড়াঝাটি হলে মনে মনে বলে—থামো, খরা আসতে দাও। সোনালী মোরগ ছেড়ে দেব ঘরের মটকায়। বাং শুনে তাক লেগে যাবে।

সেই মোরগ বাং দিলে কেউ না কেউ বলবেই—এ কার মোরগ হে? চেনা লাগছে যে! পবন-মোহন দু-ভায়ের ঘরে চালে যখন মোরগ ডাকছে, অন্ধকারে ভিড়ের কেউ বলে ওঠে—মোরগ যে চেনা লাগে! হুঁ, চেনাই বটে। চরণ চৌকিদার শাসায়—শালার নাম বলো। শিগ্গির বলো। গাঁজার নেশা তার তখনও দু-চোখে গাঢ়। অনেক কষ্টে তাকায় এবং বলে—বলো নামটা। শালাকে চালান দোব এক্ষুনি। গতিক বুঝে জবাব নেই। থানা পুলিসকে যমের মতো ডরায় সব। মহল্লায় দৈবাৎ লাল টুপি এলেই পুরুষগুলো কাঁদরে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে এবং মেয়েরা খেজুর তালাইয়ের তলায় বাচ্চাগুলো নিয়ে চিলের ভয়ে মুর্গির মতো সেঁধিয়ে যায়। মোড়লের নাম বনবাসী। তার বড় অহংকার ছিল এখনও এ গাঁয়ের কেউ আদালতে যায় নি। আজকাল সেই সুনামে দু-চার মুঠো ছাই পড়েছে। কালের গতিক। তবে সে সব নিতান্ত জমিজমা নিয়ে দেওয়ানী মামলা। পেনাল কোডের যা-কিছু, তা বনবাসীর এক্তিয়ারে। অতএব বনবাসী মোড়লও চরণ চৌকিদারের পাশে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে বলে—নামটা বলো পবন-মোহন। বলো নামটা!

এ কি বলার সময়? চচ্চড় ফট ফটাং বাঁশ ফাটছে। শনশন হু-হু লকলকে শিখা কালো ধোঁয়ার মাথায় নাচানাচি করছে। তোলপাড় হাওয়ায় ধান পোড়ার কটু গন্ধ ভাসছে। বুড়ো গগন ফোগলা মুখে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। পবনের বউকে ধরে আছে পাড়ার বউঝি, ধস্তাধস্তি চলছে, সে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে তার সুখ-দুঃখের সংসারটা তুলে আনার জন্যে মাথা কুটছে। পবন সাদাসিদে মানুষ, গোবেচারা। বেহুঁশ দিশেহারা হয়ে একবার এদিক একবার ওদিক ছোটাছুটি করছে। ছোট ভাই মোহন দু-হাত তুলে লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে—জল! জল! এটু জল দে রে! আর তার নতুন বউ শৈল জবাফুলের ঝাড়ের পাশে আলো-আঁধারে একলা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, মুখের ওপর মাঝে মাঝে ছটা খেলছে। বিস্ফারিত দুটি চোখ তার, নিষ্পলক। পাথরের চেহারা সে। চোখের আয়নায় সেই সোনালী ভয়ংকর লালঝুঁটি-ওলা মোরগের নাচ। ঠোঁটের কোণে ভাঁজ পড়েছে। মুখে থমথম করছে কি এক বিহ্বলতা। সে কি সুখ? সে কি দুঃখ?

সুতরাং এখন নাম বলার সময় নয়। সারা মহল্লার লোক আনাচে কানাচে জড়ো হয়েছে। হাতে চটের ছালা, কাঁথা, শূন্য বালতি আর কলসী—নিছক অভ্যাসে। বাঁশ ফাটলেই মোটা মোটা উকো বা ফুলকি উড়ছে। কাছাকাছি পড়ছে, ভেসে যাচ্ছে। লোকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে কাঁথাসুদ্ধ ফুলকির ওপর। সব ঘরের চালেই দু-তিনজন করে লোক চেপেছে। উড়ন্ত ফুলকির দিকে সতর্ক দৃষ্টি। মধ্যরাতের মহল্লা কেঁপে কেঁপে উঠছে তাদের চিৎকারে। সেই চিৎকার বিপন্ন, ভয়ার্ত, কিন্তু হিংস্র জনগোষ্ঠীর। সেই চিৎকার প্রাগৈতিহাসিক। অন্ধ তীব্র আবেগে ধ্বংসের সৌন্দর্যে অভিভূত হতে-হতে সেই সব চিৎকার মাঝে মাঝে থেমেও যায়। চোখে চোখে ফুটে ওঠে আদি মানুষের প্রথম বিস্ময়। তারপর আবার খানখান হয়ে যায় সব স্তব্ধতা—হুঁশিয়ার! খবর্দার! সাবোধান!

মাঠের পারে পাশের গাঁয়ের ঘুম ভেঙেছে। মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে মহল্লার আকাশে সবাই সেই সোনালী মোরগের বাং শুনেছে, নাচ দেখছে। কাপাসী, গাঁতলা, করিন্দা, সিংহ-বাটি—মধ্যিখানে মাঠ। মাঠ পেরিয়ে চলে আসছে অতি উৎসাহী কেউ-কেউ। কেউ দাঁড়িয়ে পড়ে মাঠের মাঝামাঝি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ঝলমলানি দেখতে থাকে।

কাপাসীর টগর কাঁদর অব্দি এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। গণেশ বলে—থামলি ক্যানে টগরা? চল্, যাই।

ঝাকড়া চুলে একবার হাত বুলিয়ে টগর বলে—না, থাক। কী হবে?

—কার চালে বাং দিচ্ছে, বুঝলি তো?

টগর চকিতে ঘোরে। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে ওঠে দৃষ্টি। —কি বললি?

গণেশ হেসে বলে—পবনারই মনে হয়।

—তা আমার কী?

—তোকে সন্দ করবে।

টগর হিস-হিস করে ওঠে গোখরো সাপের মতো। —ক্যানে? আমাকে সন্দ করবে ক্যানে?

—পবনার ভাই মোনার ঘরে শৈল গেল। আর কে খেপবে ইতে?

—আমি খেপিনি।

—গা ছুঁয়ে বল্, টগরা।

—গণ্শা, ইবারে আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। খবর্দার শালো!

—তু রাগলি?

—হুঁ, রাগলাম। আমি আগুন দিইনি।

—মোড়লদের বুঝিয়ে বলিস, তাইলেই হবে। কেউ বিশ্বেস করবে না।

—ক্যানে বিশ্বেস করবে না?

—বললাম তো। মোনা শৈলকে লিয়ে গেল দু-কুড়ি ট্যাকা দামে। তুর রাগ হবে না? তুই তো পুরুষ বটিস টগ্রা! নাই বা থাকল পয়সা—তুই তো আঁকাড়া যোয়ান বটিস্!

আচমকা টগর ওর চোয়ালে প্রচণ্ড ঘুষি মারে। গণেশ বাপ রে বলে পড়ে যায়। আর হন হন করে শূন্য রুক্ষ কাঠফাটা মাটির ওপর টগর হাঁটতে থাকে। অন্ধকার থেকে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে দূরে—উদ্দেশ্যহীন। আর গণেশ ওঠে। উঠে তার উদ্দেশে বলে—শালো সাধু! সকাল হতে দাও!......

ওখানে তখন পবন-মোহনের ঘরের চাল সবে ভেঙে পড়ল। প্রচণ্ড সব ফুলকি উড়ল শেষবারের মতো। তুমুল হইচই পড়ে গেল—সাম্‌লে! সাম্‌লে! সাবোধান! ধোঁয়ার ডাকা-ডাকিনী হাওয়ায় লোফালুফি করতে থাকল আগুনের ডেলা। সেই ডেলা গিয়ে পড়েছে দিগম্বরের চালের মটকায়। শিমুলগাছের মাথা ডিঙিয়ে। শুকনো খড় যেন বারুদ। অমনি ধু-ধু জ্বলে উঠেছে। ভিড় দৌড়ে যায় সে-দিকেই। হঠাৎ আবার বেড়ে যায় হাওয়া। দিগম্বরের বাড়ির দিকটায় ঠাস-বুনোনি বসতি, চালে চালে ঠেকাঠেকি অবস্থা। মেয়েদের খ্যানখেনে গলার তীক্ষ্ন আর্তনাদ ওঠে। পুরুষেরা অসহায়, বুক চাপড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে হাহাকার করে। আর মহল্লা বাঁচবে না।

হাঁস-মুরগির ডাকাডাকি, গরু-বাছুরের দড়বড়ানি, গাঁক গাঁক চিৎকার—দিগম্বরের গোয়ালঘরেও আগুন লেগে গেল দেখতে দেখতে। তারপরই বনবাসী মোড়লের বড় ঘরের চালে গিয়ে সোনালী মোরগ বাং দিল। রাস্তায়, ফাঁকা ডাঙায়, উঠোনে গেরস্থালির জিনিসপত্র জড়ো হচ্ছে। বনবাসীর বউ দিশে-হারা হয়ে একটা খেজুরে তালাই নিয়ে ছোটা-ছুটি করছে। বুড়ো মেয়েদের কোলে হাঁস-

মুরগি, ছেলেরা ছাগল বা বাছুরের কান ধরে টানছে। মানুষ ও জীবজন্তুর চেঁচামেচিতে বীভৎসতা ক্রমশ বেড়ে যায়। আর সেই সময় রক্তপ্রতিনিধি চরণ চৌকিদারের বউ চেরা গলায় চেঁচিয়ে বলতে থাকে—বের করে দাও ওই কাপাসীর খানকি বেবুশ্যেকে! চুল কেটে ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে বের করো গাঁ থেকে। ওরে গাঁ-গাতানী পাপ! ওরে সর্বনাশী আঁটকুড়ি গতরঢলানি ছুঁড়ি! তুর মোনে এই ছিল রে? হা ভগমান! এ কোন্ পাপ গাঁয়ে আনলে ডাকাবুকোরা?

কানে শোনার সময় এটা নয়। একটার পর একটা ঘর জ্বলে উঠছে। আলোর ছটায় কালো কালো সব বিভ্রান্ত হতচকিত ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে সুর ধরে কোন মেয়ে কাঁদছে: কোন্ দোষে কপাল ভাঙল রে......ভ-গো-মা-ন! বাছারা সব কি খেয়ে বাঁচবে রে......ভ-গো-মা-ন! গাছতলাতে বাস হবে রে......ভ-গো-মা-ন!......

ছাড়া জীবজন্তু পাখিরা এ রাতে অবাধ স্বাধীনতায় আক্রান্ত। অন্ধকার মাঠে ঘুরে ঘুরে করে উদ্দেশ্যহীন। কুকুরগুলো ডেকে ডেকে ক্লান্ত। পেছনের দু-পা দুমড়ে জিভ বের করে দূরে থেকে আগুন দেখছে। নিমগাছের ডাল থেকে হঠাৎ ভয় পেয়ে কার মোরগ উড়ল কোঁ কোঁ কোঁ, এবং আগুনে পেরোতে গিয়ে পড়ে গেল জ্বলন্ত ঘরের মধ্যেই। হা-হা করে উঠল কিছু মানুষ, যারা দেখল। যারা দেখেনি, তারা শুধোল—কি হল, কি হল?

ততক্ষণে কাপাসী গাঁতলা করিন্দা সিংহবাটির লোক এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। দলে দলে সব ডাকাবুকো সমব্যথী মানুষ। সাহায্য করতে চায়। কিন্তু কিভাবে করবে? জল নেই। কে এক দুর্ধর্ষ যোয়ান পাঁচিলে উঠে একটা ঘরের বাঁশের কাঠামো ওপড়াচ্ছে, চালের ওপাশে আগুন তখন। হিংস্র শক্তিধর দুই বাহু মড়মড় করে ছাড়িয়ে আনে একপাশের আস্ত ছাউনিসুদ্ধ চাল। ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিরাপদ জায়গায়। আগুনের ছটায় ঝলমল করে ওঠে তার ঘামন্ত মুখ, মাথার চুল ঝাকড়মাকড়, গলায় কারে বাঁধা রুপোর তক্তি। ও কে গো? ও কে বটে? বিড়বিড় করে প্রশ্ন ওঠে কিছু ঠোঁটে। আবার একটা চালে উঠেছে সে। বাঁশের কাঠামো টানছে। মরবে যে! সাবোধান! কার এত বুকের পাটা!

কে বলে—টিগরো। কাপাসীর টগর।

—তাও বটে!

ধুন্ধুমার প্রজ্বলন্ত উপদ্রবের মধ্যে এই সব টুকরো সংলাপ মুহূর্তে কোথায় হারিয়ে যায়। স্তূপীকৃত গেরস্থালির কাছে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে বাচ্চাকাচ্চা বুড়োবুড়ীরা। এ বড় কঠিন সময়। গোলমালে হরিবোল দিয়ে ছোট্ট মানুষ এটা-ওটা হাতায়। তাই সাবোধান, সাবোধান! তবে কিনা পবন-মোহনের চালেই প্রথম সোনালী লাল-ঝুঁটি মোরগ এসে বাং দিয়েছিল। তাদের প্রায় সবই গেছে। এখন আর পাহারা দেবার কিছু নেই—তাই পবন রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে চুপি চুপি কাঁদছে। তার বউ কেঁদে ক্লান্ত—মাই দিচ্ছে কোলের পুকড়োটাকে। মোহন কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোড়া ছাই দেখছে। আর শৈল? তার নতুন বউ কাপাসীর রূপসী মেয়ে শৈল কোথায়? কেউ কেউ অবচেতনেই খোঁজে। হুঁ, ওই চলে গেছে বনবাসী মোড়লের বাড়ির সামনে রাস্তায়—বারোয়ারি বটতলার নিচে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেও দেখছে। কি দেখছে?

দাউ দাউ বিশাল আগুনের সামনে উঁচুতে একটা মূর্তি—কালো বলিষ্ঠ শরীর, গলায় রুপোর তক্তি, ঝাকড়মাকড় চুল আকাশে নাড়া দিয়ে, জোরালো দুই বাহুর টানে উপড়ে তুলছে বাঁশের কাঠামো—পট্‌পট্ করে বাবুই দড়ির গিঁট ছিঁড়ছে। ছটায় রাঙা রাতের আকাশের পটে ওই মূর্তিটা দেখে অবাক লাগে। বিপদের বিশালতায় সে এক সৌন্দর্য।......

*

সকাল হতে-হতে মহল্লা শ্মশান। কোন আমলে একটা বাঁজা ডাঙায় এসে ঘর বেঁধেছিল এক উদ্যমী চাষাভুষো মানুষ। দেখাদেখি

আরও কিছু এসে জুটেছিল। জমিদারের দয়ায় পাওয়া নিষ্কর মাটি। সেই মাটিতে আজ মহল্লা, তিরিশ ঘর মানুষের সুখে-দুঃখে ভরা। জীবনের দিনগুলো রাতগুলো কেটে যায়। জমিজমা তেমন কিছু নেই কারও। সেরা গৃহস্থ বনবাসী—সে মোড়ল, দশের মাথা। তারই তো মোটে পাঁচ বিঘে ক্ষেত। বেশির ভাগ ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুর। বেমরশুমে পুরুষগুলোও বিলে-জলায় শামুক-গুগলি খুঁজতে বেরোয়। মেয়েরা তো মাঠকুড়োনী—মাঠে মাঠে কাঠ ঘুঁটে কুড়িয়ে দিন কাটায়। শীতের দু-তিনটে মাসে তারা ধানের শীষ কুড়িয়ে বেড়ায়। কেউ কেউ তো চলে যায় সেই গাঁতগাঁ-মৌরীর মাঠে—জেলা বর্ধমানের কোলে। ফেরে রাত গড়িয়ে ফাটা পা আর মাটিতে পড়তে চায় না। শিশিরের ক্ষতে টাটানি সারাক্ষণ। রুক্ষ ফাটাফুটি যুবতীদের গাল ও চিমসে ঠোঁটে যৌবনের ফিকে স্বাদ তবু লেগে থাকে। ওইটুকু পেয়ে ও দিয়েই জীবনের সুখ, এই মহল্লার জীবনের।

সেই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাই পুড়ে শেষ একটি রাতে। সকাল হতে হতে বারোয়ারি বটতলায় ধর্মরাজের থানের সামনে বনবাসী মোড়লের সভা বসেছে। এ আগুন ভুলের আগুন নয়—এর নাম সেই কুখ্যাত সোনালী লাল ঝুঁটি মোরগ। নিশিরাতে বাং দিয়েছে পবন-মোহনের ঘরের মটকায়। অতএব দুই ভাই সভায় হাজির। চরণ চৌকিদার নীল উর্দি পরে মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে, হাতে লাঠি ও কাঁধে নীল ঝোলা ঝুলিয়ে এবং কোমরে পেতলের মোহর লাগানো চওড়া বেল্ট বেঁধে গেছে থানায় খবর দিতে। অগ্নিকাণ্ডের দুঃসংবাদ দিতে হবে তাকে—প্রথমে থানায়, তারপর অঞ্চল অফিসে। তবে কিনা সরকার বাহাদুরের রিলিফ আসবে। সবার মনে চাপা প্রতীক্ষা, কখন চরণ ফিরবে। এদিকে এই মোড়লী দরবার। বিচার চাই। কেন মোরগ বাং দিলে চালে? পবন-মোহনই বলুক, কাকে সন্দ হয়। কার সংগে শত্রুতা তাদের? কে শাসিয়েছিল বটে?

পবন ঘন ঘন মাথা দোলায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে জানে না, কিছু জানে না। সে মাটির মানুষ। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। জীবনে কাকেও কুবাক্য বলেনি।

মোহন? মোহন বিষণ্ণ মুখে বসে মাটিতে কাঠি দিয়ে দাগ কাটে। বলে—না। আমারও সন্দ হয় না কাকেও। কারও সাথে আমার বিবাদ হয়নি।

তা হলে ডাকো পবনের বউকে। সে ঝগড়াটে মেয়ে বটে। কিন্তু তলব শুনে সে কুক কেটে কেঁদে ওঠে মেয়েদের ভিড়ে। বলে—বাবা ধম্মরাজের কিরে। আমি যদি মিথ্যে বলি, আমার পুঁকড়োগুলো ধড়ফড় করে মরবে। আমি কারেও কটুকথা বলিনি বাবারা।

মোড়লের ডান হাত প্রেমথ হঠাৎ বলে—চৌকিদারের বউ কাল রেতে কেঁদে কেঁদে বলেছিল পাঁচ কথা। দশের সবাই তা যদি শুনে থাকেন, তলব করা যাক। কী বলেন আপনারা?

বলতে না বলতে চরণের বউয়ের আওয়াজ আসে চেরা গলায়। সে রাজ-প্রতিনিধির পত্নী—ভয়হীনা স্পষ্টভাষিণী। —এখনও বোঝো না মিনসেরা? মোড়লী ডেকেছ তেরাস্তায়—এখনও মাথার মধ্যে মোরগ বাং দিচ্ছে না তোমাদের? চোখ থাকতে কানা, কান থাকতে কালা?

বনবাসী গম্ভীর মুখে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে—তা তুমিই বলো গোলোকের মা।

ঢ্যাঙা শুকনো খটখটে গতর নেড়ে কাঠি-কাঠি আঙুল তুলে কাছেই দাঁড়ানো বউটিকে দেখিয়ে সে বলে—এই! এই লোতুনী হত-চ্ছাড়ীর জন্যে সোনার সংসার জ্বলেপুড়ে ছাই হল। এর জন্যেই আজ আমরা রাস্তায় দাঁড়ালাম! এর পাপেই পাপের ঢেলা অক্তবন্ন হয়ে লেচে বেড়াল চালে-চালে! শুধোও—শুধোও একে! ভালমানুষের ঝি বলুক মুখ ফুটে। আমি যে লিজের চোখে মাঠের মধ্যে দেখেছি সব!

দম নিয়ে আবার সে বলে—যদি মুখ না খোলে, আমার বিচের শোন। এর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়ে দাও মাঠে। অনা-মুখী! ছারকপালী! ধিক্ ধিক্ তোকে। ঘরের বউ হয়ে মাঠের মধ্যিখানে দেবতার চোখের সামন কি করলি? বল কথাটা ইবারে!

সভা স্তব্ধ। ফ্যালফ্যাল করে তাকায় সবাই। শৈল—নতুন বউ শৈলরানী মুখ নিচু করে বসে আছে—এ ভারি আশ্চর্য! পরমাশ্চর্য! কেন প্রতিবাদ করছে না?

বনবাসী আবার গলা ঝেড়ে খুব শান্ত স্বরে বলে—বেশ। লতুন বউই বলুক।

মোহন তাকায় একবার বউয়ের দিকে। আবার মুখ নামায়। আঁকিবুকি কাটে মাটিতে। পবন হাঁ করে তাকিয়ে তাকে দেখতে থাকে। কার বাচ্চা কেঁদে উঠলে মুখে মায়ের থাবা পড়ে। বনবাসী আবার বলে—হ্যাঁ, ভয়ডর নাই। ছাস্তি যা হবার, হবে—যে দুষী তারই। লতুন বউ বলুক।

মুখ তোলে শৈল। নাকছাবিটা কাঁপে। ভুরু কুঁচকে যায়। ঠোঁটও কাঁপে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—কাপাসীর টগর কালকে মাঠে আমাব হাত ধরেছিল। আমি উকে নাথি মেরেছিলুম। উর রাগ হয়েছিল। শাসাল। বললে, জ্বলেপুড়ে মরবি......

অমনি স্তব্ধতা ভেঙে যায়। প্রথমে লাফিয়ে ওঠে মোহন। হিংস্র গর্জন করে বলে সে—অক্ত লিব। শালোর অক্তে চান করব। শুনে যোয়ানেরাও লাফায়। শুন্যে মুঠো তুলে একস্বরে বলে—অক্ত লিব শালোর! আর শান্ত মানুষ পবনও চেঁচিয়ে ওঠে—ক্যানে তা বলিসনি ছোটবউ? ক্যানে তখন তা বলিসনি? বনবাসী হাত তুলে বলে—ছান্ত হও, ছোন্দ হও!

কেউ কেউ চেঁচিয়ে ওঠে—কাল রেতে শালো এসে ঢং দেখিয়ে চাল ওপড়াচ্ছিল! তখন যদি জানতাম! ওঃ!

বনবাসী আবার বলে—টগরা কাপাসীর নোক। সোতরাং......

তাকে থামতে দেখে সভা সমস্বরে বলে—বলো মোড়ল, বলো।

—সোতরাং আমরা দশে মিলে চলো কাপাসী যাই। হরিহর মোক্তারকে ধরি। বাবু-ভদ্দরলোকের জায়গা। তেনারা কি বিচেরটা করেন, আগে দেখি। তাপরে যা করার করব। ইটা কিনা গাঁয়ের রপমান!

হইচই শুরু হয়ে যায়। সবাই উঠে দাঁড়ায়। মাঠ পেরিয়ে কাপাসী। এক্ষুনি চলো, দেরী নয়। আর সমানে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে নতুন বউ শৈল। তার হাত ধরে বড়জা বলে—উঠে আয় ছোটকি। ঘরে যাই।

ঘর! এখন ঘর নিমতলায়। বুড়ো শ্বশুর চিত হয়ে শুয়ে আছে। অকাশ দেখছে। শূন্য নিষ্ফল বিশাল ভয়ংকরকে দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে বুড়ো। লতুনী

হাত ছাড়িয়ে নেয়। ফোঁস্ ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়ে। চাপা গলায় বলে—যাব না। আমি যাব না। ক্যানে—ক্যানে টগরা আমার হাত ধরল মাঠে? ক্যানে?

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। পিঠে হাত রেখে বড়জা সান্ত্বনা দেয়। —কাঁদিস নে ছোট্কি, কাঁদিস নে। শোধ উরা দিলেই। তখন ছোঁড়ার অঙ্কের ফোঁটা পরে নাচিস! দু-হাত তুলে নাচিস! ধেই-ধেই করে নাচিস।......

ওদিকে সভা চলেছে কাপাসীর পথে—সবার আগে বনবাসী। সে নেতা মানুষ। যেতে যেতে গামছাটা মাথায় পাগড়ির মতো জড়িয়ে নেয়।......

*

মোড়লী বিচারের রীতি এরকমই। মেয়েমানুষ অবলা—বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। সেই মেয়েমানুষ যখন মুখ ফুটে নিজের খিটকেলের নালিশ করেছে, তখন তাতে অবিশ্বাসের এতটুকু কারণ নেই। কাপাসী জুড়ে সেদিন ধিক্কার ছিছিক্কার উঠেছে টগরার নামে। টগরার বাবা নদের-চাঁদেরও মেয়েঘটিত বদনাম ছিল। বাপকা বেটা—রক্তে দোষ বইছে। লম্পট নদেরচাঁদ এমনি গ্রীষ্মে তালগাছ থেকে তাড়ির কলসী নামাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে মরেছিল। কলজে ফেটে গিয়েছিল। জমানো পাপের শাস্তি।

কেউ-কেউ অবশ্য বলল—তাহলেও শৈল এই কাপাসীরই মেয়ে। শ্বশুর-গাঁকে যখন লজ্জা করেনি, মুখ ফুটে দশের সভায় বলেছে—তখন বাপের গাঁকেই বা লজ্জা কিসের? মোহন বউকে নিয়ে আসুক। তার নিজের মুখে আমরা খুঁটিয়ে ব্যাপারটা শুনে নিই।

বনবাসীর মোড়লী আঁতে ঘা লেগেছে। বলেছে—এমন উল্টো কথা তো শুনিনি মশায়! মেয়ে নালিশ করেছে, ব্যস! আর কথা কি? আমাদের গাঁয়ের ছেলে আপনারাই বিচের করুন।

হরিহরবাবু একবার বলেছেন—তা হলেও মেয়ের নিজের মুখে একবার শোনা যাক।

এতে মহল্লাওলারা রেগে কাঁই। —কী? আমাদের মোড়লকে অবিশ্বেস? আমাদের দশের সভাকে অবিশ্বেস? আমরা সবাই শুনেছি, না শুনিনি?

এই সব টেকনিকাল বিতর্কের শেষ হয়েছে শৈলর বাবার কথায়। তার নাম যুধিষ্ঠির। সে আগের দিন মৌরীতলা গিয়েছিল বড় মেয়ের বাড়ি। ফিরেছে এই-মাত্র। ফিরেই শুনেছে জামাইয়ের ঘর পোড়ার খবর। মহল্লা যাবার পথে মোক্তারমশায়ের বৈঠকখানায় বনবাসীদের দরবারের কথা শুনে দৌড়ে এসেছে। সব শুনে সে বলে—কথাটা ঠিক, মাশায়রা। টগরা আমার মেয়েকে চেয়েছিল। দিইনি। দুই
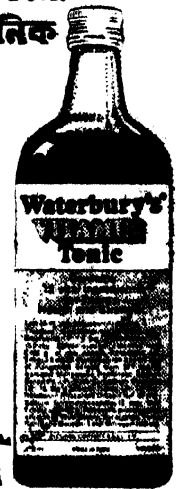
নিনেংটে হাভেতেকে মেয়ে দোব ক্যানে, বলুন? দিইনি। ত্যাখনও আমাকে সে শাসিয়েছিল। কাকেও বলিনি। এখন বলছি। জানেন মাশায়রা? এখনও ছোঁড়াটা আমাকে দেখলে নাল চোক্ষে তাকায়। রা বাক্যি কাড়ে না।......

তবে আর কথা নেই। কাপাসীতে তিন ঘর মোটে বাবুভদ্র, বাকি সব চাষাভুষো মানুষ। হরিহর মোক্তার নিতান্ত জমিজমার টানে অবসর জীবন কাটাতে পড়ে আছেন। আইনজ্ঞ মানুষ। কিন্তু সে সব আইন তো অন্য জগতের। এই জগতটাম ভারতের পুরনো বনিয়াদ এখনও টিকে আছে। এর রীতিনীতি প্রথা ভিন্ন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাড়াগাঁ। এখনও ভাল রাস্তাঘাট হতে বাকি আছে। একালের সভ্যতার আলো দূরে রং ছড়াচ্ছে—এখানে পৌঁছতে পারেনি। তাই তালে তাল দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অবশেষে সায় দিতেই হয়। বলেছেন—ধরে আনো টগরাকে। বড় বাড় হয়েছে ব্যাটার।

কিন্তু কোথায় টগর? গণেশ বলল—এট্টু আগে বিলবাগে গেল।

বিলে গেছে। তার মানে, দিনের খাবার সংগ্রহ করতে। কাঁকড়াগুলি ধরবে। শাকপাতা তুলবে। মাছ পেলে তো রাজভোগ। বিলের জল এখন তলায় ঠেকেছে। পাঁকে হাঁটু দুমড়ে শুওরের মতো চরবে। ফিরতে সেই সন্ধ্যা।

বিশাল বিলে তাকে খুঁজে বের করা কঠিন। এদিকে গনগনে রোদ ছড়াচ্ছে। একটু পরেই ঝাঁঝাল লু বইবে মাঠে। কাঁসার থালার মতো পৃথিবী ঝনঝন করে বাজবে।

ওদিকে মহুলা শ্মশান হয়ে পড়ে আছে। পুঁকড়ো বাচ্চাকাচ্চা খিদেয় কাঁদছে। খাবার দাবার অল্পসল্প বেঁচেছে। এখন ভরসা চরণ চৌকিদারের। রিলিফ আসতে কদিন লাগবে কে জানে! তবে মহুলার বিপদে কাপাসী মুখ বুজে তো থাকতে পারে না। সমবেদনা চিরাচরিত এসব ক্ষেত্রে। সদলবলে বনবাসী সব ছুটে গিয়ে গুড়মুড়ি চিবুচ্ছে। চালডোল তোলা হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি। সব নিয়ে মহুলা ফিরতে তাদের দেরী হবে। বস্তায় করে চালডাল মুড়িচিঁড়ে মাথায় নিয়ে যাবে সবাই। চিরকাল যা হয়।......

*

বিলের কাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল টগর। মাথায় রোদ ছ্যাঁকা দিচ্ছিল। এক কোঁচড় চিংড়ি ধরেছে। কখনও জ্যান্ত চিংড়ি কচমচ করে চিবিয়ে খাচ্ছে। কী স্বাদ! এমন সময় ছায়া পড়ে তার গায়ে। সে মুখ ফেরায়।

গণেশ বলে—পালা। শিগগির পালা টগরা।

—ক্যানে? পালাব ক্যানে?

—তুকে মারবে।

—ক্যানে? মারবে ক্যানে?

—তু মোনাদের চালে আগুন দিয়েছিস। গাঁ পুড়ে ছাই হয়েছে।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুই।

—ক্যানে?

—শৈলর জন্যে।

—গণশা! হুংকার দিয়ে জল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় টগরা।

—শৈল নিজ মুখে দশের সামনে বলেছে। তু শৈলর হাত ধরেছিলি। তুকে নাথি মেরেছি। তু শাসালি—জলেপুড়ে যাবে বললি। বলিস নি?

স্তম্ভিত টগর একটু চুপ করে থেকে ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে। ধরা গলায় বলে—তাই বললে শৈল?

—হুঁ। বললে।

—কিন্তুক গণশা, কথাটো উল্টো রে। শৈল আমাকে বলেছিল—আমাকে লিয়ে গাঁ ছেড়ে পালাও। ভিনগাঁয়ে চলো। আমি বললাম, তা হয় না। তুমি পরের বউ।...... গভীর দুঃখে অভিমানে নদেচাঁদের ছেলে হাসফাঁস করে এসব কথা বলে। আরও বলে—শৈল ত্যাখন শাসাল, বুঝলি গণশা? বললে—তুমাকে জ্বালাব পোড়াব, দগ্ধে মারব। আমি সেই শৈল! মোনে রেখ ইটা।

গণশা হাঁ করে থাকে। মুখে কথা সরে না।

—গণশা, এখন বুঝতে পারলি, কে ঘরে আগুন দিলে? বুঝলি শালো?......হঠাৎ বিকট গর্জন করে সে। গণেশের ঢং তার অসহ্য লাগে, তাই। ক্ষেপে গিয়ে আবার বলে—মোনাদের ঘরের চালে কার মোরগ বাং দিলে এখনও দেখতে পাসনে গণশা? শালো নাবালক! চোখ গেলে দোব। হুঁশিয়ার!

গণেশ গতিক বুঝে ভয় পেয়ে বলে—হুঁ, হুঁ। শৈল ক্ষেপেছে।

কিন্তু আমি...আমি কী করব ভাই? বল্ তো গণশা, আমি কী করব?...মাথার বড় বড় চুল আঁকড়ে ধরে আদিম তরুণটি ছটফট করে।

গণেশ ফিসফিস করে ওঠে—উকে লিয়ে পালা। আমি লুকিয়ে খবর দিই।

একটু ভেবে টগর জোরে মাথা নাড়ে।—না না!

—তুই মরদ লোস?

—কথাটো তা লয় গণশা। পেচণ্ড খরা। চাদ্দিকে হাহাকার উকে লিয়ে গিয়ে কী খেতে দোব? কী পরাব? কাজ পাব কোথা? দ্যাশের অবস্থাটা দেখছিস না রে?

গণেশ ভাবে। তাও বটে।

টগর দম নিয়ে বলে—তা'পরে থানায় যাবে মোনা। যুধিষ্ঠিরও ছাড়বে না। পুলিস লাগবে পেছনে। গণশা, ডর লিয়ে পীরিত জমে না। আর শৈলর পীরিতে বড় আগুন। সে আমি ভালই জেনেছি রে, খুব জানা হয়েছে! উই আগুনে জ্বলার সাধ্য আমার নাই। আর গণশা, আমি উকে ঘেন্না করি। আমি যেদিন উকে বলেছিলাম—তুমার বিয়ে লাগাচ্ছে। এস শৈল, পালিয়ে যাই। সেদিন শৈল যায়নি। আজ উর ডাকে যাব ক্যানে?

আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে সে। জল থেকে উঠে যায়। গণশা ডাকে—কোথা যাবি?

সাড়া দেয় না টগর। বিশাল ধু ধু মাঠে আনমনে হেঁটে যায়—কোথায় যাবে জানে না। গণেশের মনে হয়, ছোঁড়াটা বড্ড ভয় পেয়েছে। সে তাকিয়ে-তাকিয়ে তার হেঁটে যাওয়া দেখে।

*

তারপর সেই রাতে কাপাসীতে যুধিষ্ঠিরের ঘরের মটকায় সোনালী মোরগ লাল ঝুঁটি নেড়ে বাং দিল।

যুধিষ্ঠির শৈলকে বিকেলে বাড়ি এনেছে। জামাইয়ের বাড়ি শ্মশান। না খেয়ে মরবে যে। তাই এনেছে। জামাই আসতে চায়নি। দাদাঅন্ত প্রাণ। দাদার দুর্দিন।

কিন্তু নিশুতি রাতে তার ঘরের মটকায় দাউ দাউ আগুন জ্বলে।

মহুলা পুড়েছে। কাপাসী পুড়ছে। গাঁতলা চারিন্দা পুড়বে। ভয়ংকর লালঝুঁটি সোনালী মোরগটা সত্যি ক্ষেপেছে। ডাকাডাকিনী এলোচুলে উলঙ্গ হয়ে নেচে বেড়ায় গাঁয়ের আকাশে—কালো ধোঁয়ায় তাদের দেখতে পাওয়া যায়। শন শন হাওয়া ওঠে শ্বাসপ্রশ্বাসে। জল নেই কোথাও। শুকনো মাটিতে ভীতচকিত মানুষের ছুটোছুটি ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ...আর্তনাদ ওঠে চারদিকে—গেল গেল, সব গেল্ম রে!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে শৈল আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে। নিষ্পলক চোখের তারায় সোনালী মোরগের প্রতিচ্ছবি, নাকছাপি জ্বলজ্বল করে। একটু কাঁপে। ঠোঁটের কোণে একটু ভাঁজ ফোটে।

মাথা নেওয়া হবে টগরার। কিন্তু কোথায় সে? পগুগ্রামী হবে। চারদিকে লোক ছুটবে তাকে পাকড়াও করতে। ওদিকে চরণ চৌকিদার যাবে থানায়। পরণে রুক্তজ্বল নীল পোশাক, মাথায় নীল পাগড়ি, কোমরের চামটিতে পেতলের মোহর।

—শৈল!

চাপাগলার ডাক শুনে অন্ধকারের দিকে সাঁৎ করে পেছন ফেরে শৈল। গণেশ। ভুরু কুঁচকে শৈল বলে—কি?

গণেশ কি বলবে ভেবে পায় না। চোখে-চোখে তাকাতে তার ভয় করে। সে গাঁয়ের সবচেয়ে ভীতু ছেলে। আর এখন এ কি মূর্তি এই মেয়েটির! দুচোখে খ্যাপা-খ্যাপা সোনালী মোরগের নাচ। সে শুধু ফিস ফিস করে বলে ওঠে—ইটা কি ভাল? তারপর দ্রুত পালিয়ে আসে। তার কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না।......

ঘরে বাইরে

হেঁশেলের জন্য হদিশ

রান্নাঘরের ব্যাপারে জন্তু বা খবর পাবার সহজ ব্যবস্থায় এগিয়েছেন জাপানের গৃহিণীরা। তাঁদের উৎসাহে টেলিফোন 'কিচেন ডায়াল' ব্যবস্থা হয়েছে। টোকিও ইয়োকোহামা, নাগোয়া আর ওসাকাতে বছরখানেক আগেই ছিল। এবার কিছু দিন হলো 'কিচেন ডায়াল' চালু হয়েছে কিয়োটো কোবে, নাগাসাকি ইত্যাদি নানা ছোট বড় শহরে। খবর চান সেদিনের কাঁচাবাজার সম্পর্কে? একেবারে টাটকা সংবাদ পাবেন। কোথায় কুমড়োকুণ্ড মুলো সেল চলেছে, কোন জিনিস বাজারে কি রকম ঘাটতি জানতে পারবেন। এমনকি মাগ্‌গির বাজার আর মহার্ঘ ভোগ্যপণ্য সত্ত্বেও কেমন করে খরচ খরচা চালানো দরকার তার উপদেশ আর আলোচনাও শুনবেন। বিব্রত, বিভ্রান্ত গৃহিণীর জন্য নানা ব্যাপারে সহায়তা করাই এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

আমরা সামান্য সাধারণ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে কি নাকানিচোবানি খাচ্ছি! একটি দেশলাই কিনে দেখুন তার দীপশলাকার অবস্থা। যেন চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা। জ্বলে তো নাই সহজে তার উপর কাঠি ভেঙে যায়, কোন কাঠির মাথায় বারুদই থাকে না। অথচ দাম বাড়ছে দিন দিন। শেষ পর্যন্ত হয়তো বিড়ির দোকানের জ্বলন্ত দড়িটির মত আমাদের রান্নাঘরের কোণে জ্বলন্ত দড়ি রাখবার আয়োজন করতে হবে। ISI একটি Buyer's Guide প্রকাশ করেন। তাতে তাঁরা যা যা জিনিস পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেন তার একটি তালিকা থাকে। তাতেও কোন দেশলাই-এর নাম নেই।

বাজারে সাজানো সুন্দরভাবে সংরক্ষিত ভোগ্যপণ্য কি হয়? সম্প্রতি একটি নামজাদা কোম্পানির সরবের গুঁড়ো মশলাতে সাংঘাতিক আর্জিমোন মিশ্রণ মিলেছে। সেই কোম্পানির প্যাকেট আচার খেয়ে বিদেশিনীর সন্দেহ হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেল তাতেও ভেজাল। বলুন, আপনি বা আমি বাজারে যখন বোতলে বা মোড়কে মোড়া নামী জিনিস কিনি তখন কি রাসায়নিক পরীক্ষা করে ব্যবহার করি? আমাদের রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থাই বা কোথায়? দৈনিক যা ঘরে আসে তার কটি সংগ্রহ করাই যে সাংঘাতিক ব্যাপার! তারপর ভেজালের ভাবনা!

ওজন গৃহিণীকে পাগল করে দেবার মত আর একটি ব্যাপার। আমেদাবাদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের

...র মাথাই জনকয়েক সহকর্মী এবং ছাত্র নিয়ে সারা শহরের দোকান ঘুরে বাটখারাগুলি ওজন করে পেলেন মস্ত এক কথা। শতকরা নব্বইটি দোকানের বাটখারায় লোক ঠকাবার আয়োজন। খুচরো বাজার আশ্চর্য স্বাধীনতায় যা ইচ্ছে করতে পারে। যে কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ করবেন বাণসায়ী তার চেয়ে চতুর। নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ ফাঁকি দিচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি কমিটি বসেছিল—সেই কমিটি—তাঁরা মত প্রকাশ করেছিলেন যে, নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারীদের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তাদের উপার্জন বেশী হওয়া উচিত এবং সবচেয়ে বড় কথা, তাদের ট্রেনিং বা যথোপযুক্ত শিক্ষা চাই। অপরাধীদের শাস্তি কড়া হতে হবে। এ ছাড়া তাঁরা মোড়কে ভরা নামী জিনিসের ওজন সম্বন্ধেও নিয়মকানুনের সুপারিশ করেছিলেন। প্যাকিং করা জিনিস কিনে আমরা অবাক হয়ে থাকি। সাবানের গুঁড়ো কিনলেন। মস্ত বড় প্যাকেটের মস্ত বড় দাম। খুলে দেখলেন কেনা তলায় পড়ে আছে গুঁড়ো। তবে অত বড় মোড়ক কেন? তার উপরে সাবানের গুঁড়োর ওজনটুকু লেখা নেই কেন? মোটা কার্ডের মোড়ক তো আমাদের দরকারে আসবে না। ওজনই বাড়াবে শুধু।

কালো টাকা আর কালো বাজার নেতো এ সঙ্গে সবচেয়ে বেশী আবার এই হোটেলেই। শুনেছি কালো বাজারের জন্ম ইউরোপে এবং বিগত মহাযুদ্ধে। সরল গ্রামের লোকে মাথায় পসরা নিয়ে একে ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে—হ্যাঁগো বলতে পার, কালো বাজারটি কোথায়? সেখানে গেলে নাকি পণ্যসম্ভার বিকোবে চড়া দামে। কিন্তু সে কালোবাজারের কালেও কঠিন শাস্তি মাথায় করতে হত সমস্ত বড় ব্যবসায়ীদের। ১৯৪৩ সালে ব্রিটেনে কড়া র‍্যাশনিং। হোভিস রুটি কোম্পানি নামজাদা প্রতিষ্ঠান। তাঁরা রুটি নিয়ে কালোবাজার করলেন। শাস্তি হলো ১০ লক্ষ পাউন্ড জরিমানা।

র‍্যালফ নেডার নামক আইন ব্যবসায়ী যুবক আমেরিকায় প্রথম ভোগ্যপণ্য ক্রেতাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেন। সে প্রায় বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা। প্রথম তাঁরা ঔষধ ব্যবসায়কে আক্রমণ করেছিলেন। আমাদের দেশেও ক্রেতারা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা লাইসেন্স আছে এরকম দোকান ভিন্ন ওষুধ কিনবেন না। ব্যবসায়ীদের এই লাইসেন্স ভালভাবে দেখা যায় এরকম জায়গায় অবশ্যই ঝুলিয়ে রাখবার কথা। প্রত্যেকটি ক্যাপসুলে বোতলে স্পষ্টভাবে তারিখ ও ওষুধের নাম যেন লেখা থাকে। যে ওষুধ ঠাণ্ডায় রাখবার কথা, তা দোকানে ঠাণ্ডায় রাখা আছে কিনা দেখতে হবে। ওষুধের শিশি বা বাক্স ভাল করে পড়বেন যাতে তারিখ পার হওয়া ওষুধ আপনাকে গছিয়ে না দেয়। ওষুধের প্রেসক্রিপশন থাকলে আপনারই উপকার। ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। নিজে ডাক্তারি নিজে করলে সাংঘাতিক ক্ষতি হতে পারে। ওষুধ ব্যবহার করে শিশি বোতল নষ্ট করে ফেলে দেবেন। ওষুধ সম্বন্ধে সন্দেহ হলে ওষুধ ইনসপেক্টরকে জানাবেন। দরকার হলে ড্রাগ কন্ট্রোলারকেও জানাতে পারেন।

সম্প্রতি আত্মনির্ভরশীল নিরাপত্তা আইন চালু হওয়ার পর ভোগ্যপণ্যের দাম নিম্নমুখী দেখা গেলেও সংসারের খরচের দুই-তৃতীয়াংশ যায় খাদ্যদ্রব্য কিনতে। বাকী যা থাকে তাতে কাপড় জামার দাম হিসাব করে দেখুন!

টুকিটাকি

দেওয়ালের দাগ তোলায় পেনসিলের দাগ তোলায় রবার ব্যবহার করে দেখুন, বেশীর

ভাগ ক্ষেত্রে দাগ উঠে যাবে। যদি না উঠে যায় তবে গায়ে মাখা সাবানে একটুকরো স্পঞ্জ ডুবিয়ে ঘষে দিন। এক দিকে সাবান আর অন্যদিকে জল। সাবানের দিক লাগিয়ে জলের দিক দিয়ে ঘষে দিন।

ফর্মাইকা ইত্যাদি পরিষ্কার করতে গায়ে মাখার সাবান এবং গরম জল ভাল। বেশী ফেনা করার দরকার নেই। পুরোনো কাপড় বা নরম তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুছে নেবেন।

জানালার কাঁচ পরিষ্কার করে খবরের কাগজ দিয়ে মুছে ফেলুন। নতুনের মত ঝকঝক করবে।

বিছানার চাদরের এখন যে রকম দাম হয়েছে, তাকে প্রায়ই ধোবার ব্যবস্থা করবেন না। যাঁরা বিছানার চাদর গায়ে দেন, তাঁরা সপ্তাহখানেক গায়ে দেবার পর সেটি পেতে শুতে পারেন। বিছানার চাদর সাধারণত মাঝখানে আগে ফুটো হয় ও নরম হয়ে যায়। তখন মাঝখান থেকে নরম অংশ বাদ দিয়ে সোজা কেটে ফেলুন। কিনারা দুটি এক করে সেলাই করে নেবেন। দীর্ঘ দিন চলে যাবে।

শ্রীমতী

॥ একত্রিশ ॥

এইখানে এক পীরের কবর। তার চার ধারে বাঁশঝাড়, আর শিমুল আর শিরীষ গাছের জড়াজড়ি। একটা ভাঙা বাড়ির ইটের স্তূপের ওপর সবুজ শ্যাওলা জমেছে। তার ভিতর দিয়েই মেটে রাস্তা। ভাঙা বাড়িটার ভিতরবাগে এখনো গোটা দুই নোনা-ধরা ঘর খাড়া আছে। ছাদ ধসে পড়ে গেছে, তাই ওপরে টিনের ছাউনি। দেয়ালে অজস্র ফাটল, অশথের শিকড় দেখা যায় দেয়ালের ফাটলে। নিচে দুপুরে ঘরের চারপাশে পায়রা ডাকে, বাদুড় চামচিকে আর বাদুড়। দেয়ালের লম্বা পাকা তেঁতুলের রঙের তেঁতুলবিছে লসলস করে হেঁটে যায় এক ফাটল থেকে অন্য ফাটলে। লেজটি উঁচু করে বাঁকিয়ে, ফুরফুর করে হেঁটে যায় কাঁকড়া বিছে। আর ইটের স্তূপে ইঁদুরের গর্তে, ভিতের ফাটলে বাস্তু সাপের প্রকাণ্ড সংসার। মাঝে মাঝে দেখা যায়, খসের রঙের খোলস হাওয়া পোহাচ্ছে। বর্ষার পর রোদ উঠলে অজস্র জাতের সাপের বাচ্চা ফাঁকায় বেরিয়ে কিলবিল করে, মাটির ওপর ঢেউ খেয়ে খেয়ে ধীরে চলে যায় চন্দ্রবোড়া।

এইখানে থাকেন ফকিরসাহেব, হাজী শেখ গোলাম মহম্মদ তসুতাগার। ব্রজ-গোপাল ছাড়া এ নাম আর কেউ জানে না। সবাই জানে ফকিরসাহেব বলে। এই ভাঙা বাড়ি ওঁর নয়। এক ভক্ত মুসলমান মরবার আগে সমস্ত সম্পত্তি দিন দুনিয়ার মালিক আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে দিয়ে যায়। সম্পত্তি বলতে অবশ্য ভাঙা বাড়িটাই—যা এক সময়ে প্রকাণ্ড ছিল, জাঁক জমকও ছিল হয়তো। এখন দাবীদার কেউ নেই। সেই ভক্তজনই ফকিরসাহেবকে এখানে বসিয়ে দিয়ে যায়। ফকির থাকেন। প্রতি পদক্ষেপে সাপের দাঁত, বিছের হুল, পাখি-পক্ষীর পুরীষ। ফকিরসাহেব গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধেয় আজ প্রকাণ্ড পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। ফকিরসাহেব মোমবাতি নিবিয়ে দিয়ে বললেন—চলুন, দাওয়ায় গিয়ে আল্লার আলোতেই বসি, সেই ভাল।

ব্রজগোপাল গম্ভীর ভাবে বললেন—হুঁ।

দুজনে বাইরের খোলা চাতালে এসে বসলেন। ফকিরসাহেব জ্যোৎস্নার আভায় ব্রজগোপালের মুখখানা দেখে নিয়ে বলেন—কিরকম আওয়াজ শোনেন ধ্যানের সময়ে?

ব্রজগোপাল বলেন—সে বড় ভীষণ আওয়াজ। সহস্র ঘণ্টার ধ্বনি, সহস্র শাঁখের আওয়াজ। পাগল করে দেয়। আর একটা নীল আলোর পিণ্ড হঠাৎ ফেটে গিয়ে চারধারে আলোর ফুলঝুরি ছড়াতে থাকে তখন বড় ভয় করে, আবার আনন্দও হয়।

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বলেন—গুরুর কৃপা।

ফিসফিস করে ব্রজগোপাল বলেন—যত দিন যাচ্ছে তত স্পষ্ট হচ্ছে। কান বন্ধ করলে এক রকমের শব্দ শোনা যায়, ছেলেবেলায় শুনতাম সে নাকি রাবণের চিতার শব্দ। বলে হাসলেন ব্রজগোপাল। ফকির সাহেব মাথা নাড়লেন। ব্রজগোপাল বলেন—আসলে তা তো নয়। আমাদের দেহযন্ত্রের মধ্যে যে অবিরল বেঁচে থাকার কারখানা চলছে ও হচ্ছে তারই শব্দ। আমাদের বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলি তা ধরতে পারে না। তেমনি ধ্যানে বসে মনটা কুটস্থে ফেলে দিলে সৃষ্টির মূলে শব্দ পাওয়া যায়। আপনি বিশ্বাস করেন না?

ফকিরসাহেব মৃদু হাসলেন, বললেন—ব্রজঠাকুর, পথ একই, বিশ্বাস করব না কেন? আমি কি অবিশ্বাসী বিধর্মী? শব্দে শব্দেই তার লীলা টের পাই।

বলে একটা শ্বাস ফেললেন ফকির-সাহেব। মুখে পান ছিল। সেটা আবার চিবোতে চিবোতে এক টিপ দোক্তা ফেললেন মুখে। জ্যোৎস্নায় একটা মোরগ ভুল করে ডেকে উঠল। হাত কয়েক দূরে জ্যোৎস্নায় একটা সাপকে দেখা গেল, খোলা চাতালে বেড়াচ্ছে। ফকিরসাহেব একটা হেঁচকি তুলে বললেন—যা, যা...

সাপটা আস্তে ধীরে ইটের পাঁজার ওপর উঠে গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে থেকে ফকিরসাহেব নিমীলিত নেত্রে বললেন—ব্রজঠাকুর, শব্দের কথা মানুষকে বলবেন না। ওরা বিশ্বাস করবে না, ভাববে বুজরুকী।

—বুজরুকেরও অভাব নেই। ব্রজগোপাল উদাস গলায় বলেন—এখন শুনি অনেক ম্যাজিকওয়ালা সব গুরুঠাকুর সেজে বসছে। আহাম্মকেরা তাদের কাছে ভগবান বলে ধেয়ে যায়। বুদ্ধিমান লোকে তাই বুজরুকী বলে পুরো ধর্মকেই অগ্রাহ্য করে। এ বড় ভীষণ অবস্থা।

জ্যোৎস্নাতে কাক ডেকে উঠছে। নিঃশব্দ বাদুড় ঝুলে পড়ল শূন্যে, চাঁদের চারধারে পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল। ভারী নিঃঝুম চারদিক। কেবল মাঝে মাঝে বাতের শব্দ হয়। পাখির অস্পষ্ট ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ, ঝিঁঝিঁ ডাকছে অবিরল, গাছে

গাছে ফিস্‌ফিস্‌ কথা, আর কখনো টিকটিকি ডাকে, কখনো তক্ষক। চারধারে গাছগাছালির ছায়া নিবিড় হয়ে পড়ে আছে। পাতানাতা মাড়িয়ে একটা শেয়াল দৌড়ে গেল, পিছনে দূরে কোন গেরস্তর কুকুর তাড়া করে এল খানিক দূরে।

দুজনেই আসনপিঁড়ি হয়ে মুখোমুখী বসে আছেন। চারধারে মানুষের সাড়া নেই কোথাও। কিন্তু পৃথিবীর গভীর ও রহস্যময় প্রাণস্পন্দনে সজীব আবহ। আকাশে বৃক্ষে ও মাটিতে কত কোটি কোটি প্রাণ বেঁচে আছে। টের পাওয়া যায়।

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বলেন, ইটিন্ডাঘাটে এক বুজরুক ছিল, ঘরে বসে সে নাকি কলকাতার নামী দোকানের রসগোল্লা কিংবা অসময়ের ল্যাংড়া আম খাওয়াত। লোকে বলত, তার পোষা ভূত আছে, সে-ই সব এনে দেয়। খবর পেয়ে দেখতে গেলাম লোকটাকে, কিন্তু আমার ফকিরী চেহারা দেখেই লোকটা ঘেবড়ে গেল। কিছুতেই আর রসগোল্লা বা আম আনারস আনতে রাজি হয় না। লোকজনের বিস্তর ঝোলাঝুলি সত্ত্বেও বলে আজ আমার শরীর ভাল না। পরে আমাকে আড়ালে ডেকে বলল—আপনি তো সবই জানেন, ভাঙবেন না। বলে ফকিরসাহেব হাসলেন, বললেন, ব্রজঠাকুর, আদতে কিন্তু আমি কিছুই জানি না। আমি লোকটার ঐশী শক্তি দেখতেই গিয়েছিলাম, ভাল হাতসাফাই হলে ধরতেও পারতাম না। কিন্তু লোকটা ভয় খেয়ে সব স্বীকার করে ফেলল।

ব্রজগোপাল বলেন—আমার বড় জামাইও কার পাল্লায় পড়েছে শুনেছি। ছোকরার ধর্মকর্মের ওপর খুব রাগ ছিল, এখন নাকি পথে পথে কেত্তন ক'রে চাঁদা তোলে, কোথায় আশ্রম করবে। ঘরে পোয়াতি বউ পড়ে থাকে, আর সে 'বাবা বাবা' বলে গুরুর নামে চোখের জল ফেলে নামগান করে। তা গুরুর নামে চোখের জল আসে সে ভালই, কিন্তু এসব তপ্ত আবেগ তো বেশীক্ষণ টেঁকে না। একদিন চটকা ভাঙলেই ছিটকে যাবে। তখন হয় ধর্মকর্মের ওপর মহা খাপ্পা হয়ে উঠবে, নয়তো সাত গুরু ধরে বেড়াবে। এও বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা। তার চেয়ে নাস্তিক ছিল, সে ঢের ভাল ছিল। নিষ্ঠাবান নাস্তিকেরও উদ্ধার আছে, দুর্বলচিত্তরাই উদ্ধার পায় না।

ফকিরসাহেব নিমীলিত চোখে চেয়ে রইলেন।

পীরের কবর অনেকটা দূরে। গাছগাছালির আড়াল পড়েছে। সেই দূর থেকে কে যেন হাঁক পাড়ে—ব্রজকর্তা, ও ব্রজকর্তা!

কোকা কিংবা কালিপদ হবে। আজকাল একটুক্ষণ বাইরে থাকলে বহেরু চারধারে লোকজন পাঠাতে থাকে। তা সেই লোকজনেরা কেউ এতদূরে আসতে সাহস পায়নি। গাঁ গঞ্জের মানুষ সব, এমনিতে সাহসের অভাব নেই। কিন্তু ফকিরসাহেবের আস্তানায় সন্ধের পর ঢুকতে চায় না কেউ। পায়ে পায়ে সাপ ঘোরে। তার ওপর লোকে জানে, এ সময়টায় ফকীরসাহেব ভূত আর পরী নামান। অনেকে দেখেছে, ক্ষুদে ক্ষুদে পরী গাছের পাতায় পাতায় দোল খায়। জীন ঘুরে বেড়ায়, ভূত এসে ফকিরসাহেবের পা দাবায়, পাকা চুল বেছে দেয়। সেই সব ভয়ে কেউ ঢোকে না। ভূতের গায়ের গন্ধ অনেকটা বুড়ো পাঁঠার গায়ের গন্ধের মতো, সেই বিদ্‌ঘুটে গন্ধে নাকি তখন জায়গাটা ম ম করে। মরার পর মেঘু ডাক্তারও নাকি এখানে থানা গেড়েছে। তাই কেউ আসে না।

একমাত্র ব্রজগোপাল আসেন। সঙ্গে একটা টর্চবাতি থাকে, আর একটা মজবুত লাঠি।

ফকিরসাহেব বললেন—ঐ আপনার শমন এসেছে।

—হ্যাঁ। যাই।

ফকিরসাহেব হেসে বলেন—আমরা দুই ফকির এক ঠাঁই থাকতে পারতাম তো বেশ হত। তাঁর দয়ার কথা বলতে বলতে একটু কাঁদতাম দুজনে। কী বলেন?

ব্রজগোপাল একটা শিহরিত আনন্দের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ঐ হচ্ছে কথা। তাঁর কথাই হচ্ছে কথা।

টর্চবাতি আর লাঠি নিয়ে উঠলেন। টর্চ ফেলতেই একটা শিয়াল দৌড় দিল। চাতালের ঠিক নীচেই মাথা তোলা দিল বাদামী রঙের গোখরো। টর্চ আর লাঠি দু বগলে চেপে নিয়ে হাততালি দিলেন ব্রজগোপাল। সাপটা ধীরে সুস্থে উত্তরবাগে সরে গেল। ব্রজগোপাল মুখ ঘুরিয়ে বললেন—এ জায়গায় বড় মধু। পরমপিতা খোদার ভক্ত থাকেন তো, ইতরজীবও তাই টের পায় এ জায়গায় ভালবাসার তাপ রয়েছে।

—আল্লা মালিক। ফকিরসাহেব বললেন।

ব্রজগোপাল হাঁটতে থাকেন।

ঘরে এসে একটা পোস্টকার্ড পেলেন তিনি। লণ্ঠনের আলোটা উস্কে পড়তে লাগলেন। বুধবার রাত বারোটা কুড়ি মিনিটে শীলার একটি ছেলে হয়েছে। প্রসবে খুব কষ্ট পেয়েছে শীলা, রক্ত দিতে হয়েছে। শীলার কষ্টের কথা আরো অনেকখানি লিখেছেন ননীবালা। জামাই বাড়ি ছিল না। ছেলে হওয়ার পর সে খবর পেয়েছে। তারপর জামাইয়ের সাম্প্রতিক স্বভাবের ওপরেও অনেকটা লেখা, ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর পড়তে গিয়ে চোখে জল চলে আসে। আরো লিখেছেন, ছেলেরা আজকাল তাঁর খোঁজখবর করে না। বীণার ব্যবহার ভাল নয়। ইত্যাদি।

ব্রজগোপাল চিঠি রেখে পঞ্জিকা খুলে বসলেন। কাগজ কলম নিয়ে নিবিষ্টমনে কোষ্ঠীর ছক তৈরী করতে লাগলেন নাতির। মনটায় বেশ একটা ফূর্তির হাওয়া খেলছে। নাতি হয়েছে। আরো তো ক'টা নাতি-নাতনী আছে তাঁর, তবু এই যে একটা রক্তের সম্পর্কিত মানুষছানা জন্মাল, এই খবরটাই কেমন একটা মায়া সৃষ্টি করে বুকের মধ্যে।

একটা লোক এনেছে বহেরু, যে মাটি ছাড়াই গাছ গজিয়ে দিতে পারে। সেই শুনে বহেরু তাকে হাওড়া না কোত্থেকে ধরে এনে ক'দিন জামাই আদরে রেখেছে। একটা বেশ বড়সড় জায়গা বাঁশ-বাখারি দিয়ে ঘিরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কী সব কাণ্ড মাণ্ড হচ্ছে। এই রাতেও সেখানে দু দুটো ডে-লাইট জ্বলছে জাম আর সজনে গাছের সঙ্গে। মেলা লোকজন তামাশা দেখতে ভীড় করেছে। এখন সেখানে মাটি কোঁট কেটে সিমেন্ট জমিয়ে চৌখুপী তৈরী করা হচ্ছে। সেইখানেই চাষ হবে।

ব্রজগোপাল বাইরে এসে দূর থেকে ভীড়টা দেখলেন। সেই ভীড়ে একমাথা উঁচু বহেরু কোমরে হাত দিয়ে জমিদার-টমিদারের মতো দাঁড়িয়ে।

ব্রজগোপাল ডাকতেই বহেরু ছুটে আসে।

—কর্তা ডাকলেন নাকি?

—তুইও ছেলেমানুষ হলি নাকি?

বহেরু হাসে, বলে—না, কায়দাটা দেখে রাখছি, কি ক'রে করে। দরকার হলে নিজেরাই করতে পারব।

—তোর মাটি ছাড়া চাষের দরকার কি? তোর কি মাটির অভাব?

বহেরু ঝুপ করে সামনে বসে পড়ে। লাজুক হেসে বলে—তা হতেও পারে একদিন। শুনি, এই সেদিন ব্রজবাবু মাস্টারমশাই বলছিলেন যে এত মানুষ জন্মাবে পৃথিবীতে যে সব গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। শোওয়া বসার জায়গাটুকুও থাকবে না। তা পৃথিবীর জমিতে তো টান পড়বেই। শিখে রাখা ভাল।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন—তুই যে সেই মোড়লটার মতো কথা বলিস। আমার সেই মুসলমান মোড়লকে একদিন বলেছিলাম—বাপু হে, মাছ মাংস খেলে শরীরে টকসিন হয় রে গবালাই হলে সহজে ছাড়তে চায় না, ওসব আর খেও না। সে তখন হাতজোড় করে বলে—দাদা, মাছমাংস খাওয়া সবাই ছেড়ে দিলে যে নদী পুকুর সমুদ্দুর সব মাছে মাছে মাছময় হয়ে যাবে, ঘাটে ডুববে না জাহাজ চলবে না। আর ডাঙায় পাঁঠা ছাগল মোরগে সব ভরে যাবে, দিনরাত চারধারে ভ্যা ভ্যা ম্যা-ম্যা কোঁকর কোঁ আওয়াজে কান ঝালাপালা। যেন বা সেই ভয়েই ব্যাটা মাছমাংস খাওয়া ছাড়তে পারে না।

বহেরু হেসে বলে—তাহলে তত্ত্বটা কী কর্তা?

—তুই তো কেবল চিরকাল তত্ত্ব শুনতে চাস। মাথায় তো কিছুই সেঁধোয় না। তবে জেনে রাখিস এই দুনিয়াটা যার সে সব দিক নিয়ে ভেবে রেখেছে। তোর আমার ওপর দুনিয়াটা পুরো ছেড়ে দেয়নি। গায়ে গায়ে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, শোওয়া বসার জায়গা থাকবে না—তাই হয় নাকি রে হারামজাদা? তার অনেক আগেই মানুষে মানুষের মাংস খেতে শুরু করবে।

বহেরু বুঝল। ব্রজঠাকুরের কথা শুনলেই তার বুকের মধ্যে একটা বলভরসা আস যায়।

ব্রজগোপাল তার হাতে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলেন—একটু মিষ্টি টিষ্টি কিনে বাচ্চা-লোকে খাওয়াস। আমার নাতি হয়েছে একটা, বড়মেয়ের ঘরে।

বামনবীরটাকে এনে ফেলেছে বহেরু। তার খুব ইচ্ছে ছিল লম্বা সাঁওতাল আর বেঁটে বামনকে জোড় মিলিয়ে বহেরু গাঁয়ে ছেড়ে দেবে। তারা যেখানে যাবে হাঁ করে দেখবে সবাই। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। সাঁওতালটা শয্যাশায়ী রয়েছে কমাস, এখনো মরেনি বটে কিন্তু গোবিন্দপুর আর বৈঁচী থেকে ডাক্তার এসে দেখে বলে গেছে যে, এ আর খাড়া হবে না। যে কদিন বাঁচে বিছানাতেই বাঁচবে। তাই বামনবীর লোকটা একা একাই ঘোরে। তার ধারণা, লোক হাসানোই তার একমাত্র কাজ। বঙচঙে জামা, কাগজের টুপি পরে সে নানা কসরৎ করে লোক হাসায়। ব্রজগোপাল তাকে ভাল চোখে দেখেন না। লোক হাসানোর তাগিদে সে একবার ব্রজগোপালের কাছা টেনে আলগা করে দিয়ে দৌড়েছিল। বহেরু তাকে মারতে গেল ব্রজগোপালই ঠেকিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটাকে এড়িয়েই চলেন তিনি। নিজের শরীরের খুঁত বাজিয়ে ব্যবসা করে যে লোক তাকে তাঁর পছন্দ নয়।

ব্রজগোপাল ঘরমুখো হতেই কোত্থেকে একটা শিশুর মতো বামনটা ছুটে এল। সামনে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট ঠুকলো। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক ধরনের অদ্ভুত সরু মেয়েলী গলায় বলল—ব্রজকর্তা, আপনাকে একটা কথা বলব!

ব্রজগোপাল একটু অবাক হয়ে বলেন—কি?

ঘরে এসে লোকটা টিনের চেয়ারে হামা দিয়ে উঠে বসল। বলল—আমার বয়স কত বলুন তো!

ব্রজগোপাল অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন। কোনো আন্দাজ করতে পারলেন না। বললেন—কত আর হবে! বেশী নয়।

(ক্রমশ)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বাংলা ভাষার দুই ভগীরথ

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

আজকালকার নার্সিংহোমের যুগে ১২৫।১৫০ বছর আগের বাঙালীর আঁতুরঘর যে কি নিদারুণ ব্যাপার ছিল, তা কি কল্পনা করা যাবে? বাড়ির চারদিকে এক কোণে অন্দরমহল ঘেঁষে একখানি সদা প্রস্তুত খপরিঘর—না, না, পাকা ঘর তো নয়ই, এমন কি মাটির তৈরি কাঁচা ঘরও নয়। একফালি স্যাঁতসেঁতে জমি, এই ধরুন চার হাত লম্বা ও সেই অনুপাতে চওড়া হবে আরকি—চার ধারটা আগাছা লতাপাতা, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে কোনরকমে ঘেরা। ছোট্ট একটি প্রবেশপথও আছে বইকি, প্রায় উবু হয়ে সেই পথ দিয়ে আসা যাওয়া চলে। আঁতুরঘর সে-যুগে ঘোর অপবিত্র স্থান বলে বিবেচিত হত, সেইজন্যই এরকম লোমহর্ষক ব্যবস্থা। সন্তানের জন্মের একটা নির্দিষ্ট দিন পরে কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিধান পালন করে তবেই জননী সদ্যোজাত সন্তানটিকে নিয়ে আঁতুরঘর ছেড়ে অন্দরমহলে আবার ফিরে যেতে পারতেন। আঁতুরঘরটিও ধ্বংস করে ফেলা হত তক্ষুণিই। অর্থাৎ কিনা লতাপাতা আগাছা ও ছেঁড়া কাপড়গুলি খুলে ফেলে জ্বালিয়ে এবং সে জায়গার মাটিটুকু আগাগোড়া কোদাল দিয়ে খুঁড়ে ঘরটির চিহ্ন মুছে দেওয়া।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর সরকারবাড়ি" মাঙ্গলশঙ্খে মুখরিত। গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ের প্রথম এবং একমাত্র সন্তান ঐ দিনই ভূমিষ্ঠ হল।

নিকট এবং দূরসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনেরা "সরকারবাড়ি"তে ভিড় করেছেন, আনন্দের আর সীমা নেই। বাড়ির প্রবীণ মহিলারা সেই খপরি আঁতুরঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করছেন সর্বদাই।

ডিসেম্বরের শীত বলে কথা—স্যাঁতসেঁতে আঁতুরঘরে সব সময়েই থাকে কয়লার আগুন ভর্তি একটা মাটির মালসা। প্রসূতিও যেমন ঐ আগুনে হাত পা সেঁকেন, কাপড়ের পুঁটলিতে ঐ আগুনের তাত গ্রহণ করে বাচ্চাটিকেও সেঁকে দেওয়া হয় সর্বদা।

কয়েকদিন গেছে কেটে, ডিসেম্বর মাস শেষ হয় হয়—ভোর রাত্তিরের দিকে বাচ্চাটির সে কি চিৎকার। সেই উৎকট চিৎকার শুনে বাড়ির প্রবীণ মহিলারা চটপট বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন, লতাপাতার আচ্ছাদন সরিয়ে আঁতুরঘরে উঁকিও মারলেন কেউ কেউ। কই তেমন তো কিছু নয়, বৃদ্ধা দাই বাচ্চাটির মাথায় কাপড়ের পুঁটলি পাকিয়ে দিচ্ছে সেঁক, পাশেই রয়েছে জ্বলন্ত আগুনের মালসাটা। প্রবীণ মহিলারা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলেন, তা দেবে বইকি সেঁক, এত ঠাণ্ডায় বাচ্চার মাথায় সেঁক না দিলে চলে? ঠাণ্ডার চোটেই নির্ঘাৎ কাঁদছে বাচ্চাটা। দাওগো দাই, ভালভাবে মালসার আগুনে গরম করে কাপড়ের পুঁটলিটা বাচ্চার মাথায় চেপে চেপে ধর। এখুনিই কান্না থেমে যাবে।

আদেশ পালিত হল তৎক্ষণাৎ—কিন্তু এ আবার কি, যতই কাপড়ের পুঁটলিটি শিশুর মাথায় ঠেসে ঠেসে ধরে বৃদ্ধা দাই, শিশুর কান্নাও বেড়ে চলে সেই অনুপাতে। ক্রমশই কাঁদতে কাঁদতে নেতিয়ে যায় শিশু, হাত পা ক্রমেই শিথিল ও ঠাণ্ডা হয়ে আসে, আসন্ন মৃত্যুর সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠে শিশুর সর্বাঙ্গে।

সকলের মনেই এবার সন্দেহ জাগে, কি ব্যাপার। এক মহিলা দাইয়ের হাত থেকে সেঁক দেবার পুঁটলিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়েই আর্তনাদ করে ওঠেন। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সব মহিলাই জিনিসটা দেখতে পেয়ে গেছেন, চোখ কপালে উঠে গেছে সকলেরই। কি সর্বনাশ! কাপড়ের পুঁটলিটা মালসার আগুনে তাতিয়ে নেবার সময় কখন জানি একটা করে জ্বলন্ত কয়লা আটকে গেছে কাপড়টার ভাঁজে। তাহলে যতবার "চেপে চেপে" শিশুটির মাথায় সেঁক দেওয়া হয়েছে ততবারই ঐ জ্বলন্ত অঙ্গারে পোড়া

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

লাগছিল শিশুটির মাথায়। ধাইয়ের ঘাড়ে পুরো দোষ চাপানো যাচ্ছে না, একে তো সে অতিবৃদ্ধা তায় আবার একচোখ কানা। তাছাড়া অন্ধকারময় খুপরি ঘরে প্রায় কিছুই তো দেখা যায় না, হাতড়ে হাতড়ে কাজ করতে হয়।

আশ্চর্যের কথা, শিশুটি কিন্তু বাঁচল! কি করে? তার অবশ্য বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা চলে না। কেন বাঁচল, তা অবশ্য বলা যেতে পারে। বাঁচল, বাংলা সাহিত্যকে চিরস্থায়ী কিছু সম্পদ দেবার জন্য। বাঁচল, নিজের নামকে সোনার অক্ষরে খোদাই করে রেখে যাবার জন্য—এই শিশুই অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বাবা গংগাচরণ সরকার সে যুগের এক ডাকসাইটে ব্যক্তি ছিলেন। হুগলী কলেজের কৃতী ছাত্র, সিনিয়র বৃত্তিধারী, কলেজের ছাত্র থাকা কালেই তিনি রাজ-কর্মচারী পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে কর্মক্ষেত্রে তিনি প্রভূত কীর্তি ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ ৩২ বছরের কর্মজীবনের শেষে সাবজজের পদে থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

গংগাচরণ সরকার সাহিত্যরসিক ছিলেন, বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে গেছেন আজীবন।

এমন পিতার একমাত্র সন্তান অক্ষয়চন্দ্র অত্যধিক আদর যেমন পেয়েছেন ছোটবেলা থেকেই, কত রকম বই পড়ার সুযোগ যে পেয়েছেন, তার অন্ত ইয়ত্তা নেই। গোলেবকাওলি, হাতেমতাই, জোলেখা বিবি থেকে শুরু করে কাদম্বরী, আলালের ঘরের দুলাল।

গংগাচরণ কাজের অবসরে প্রায়ই সাহিত্য আলোচনা করতেন কিশোর অক্ষয়চন্দ্রের সংগে। এই আলোচনায় দারুণ উপকৃত হয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। সাহিত্য সমালোচকের অপরূপ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমেই অর্জন করতে থাকেন তিনি। সে সময়টা বাংলা সাহিত্যের যুগ-সন্ধিক্ষণ। একদিকে যেমন খুব বেশী রকম সংস্কৃতগন্ধী বাংলায় অজস্র বই লিখছেন বিভিন্ন লেখকেরা, অন্যদিকে চলতি এবং গ্রাম্য ভাষার মিশ্রণে রচিত আলালের ঘরের দুলালও বাজারে এসে গেছে। এবং যা হয়, আলালের ঘরের দুলালের অনুকরণেও লিখতে আরম্ভ করেছেন অনেকে। এই সম্পূর্ণ দুই বিপরীতমুখী ভাষার প্রবল স্রোতে বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা দিশেহারা।

এই দু রকমের ভাষা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র কিশোর বয়সেই এক দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন। সেটি হচ্ছে এই সংস্কৃত অনুসারী বাংলা খুব চমৎকার বটে, শুনতেও যেমন, পড়তেও তেমন—কিন্তু কখনই নিজের জিনিস বলে মনে হয় না। ঠিক যেন অবিবাহিতা কুলীন কন্যা। যতই সুন্দরী হোক, এখনও নিজের ঘর করতে শিখল না। অপরপক্ষে টেকচাঁদ বাংলা একেবারেই নিজের জিনিস বলে মনে হয় বটে, কিন্তু কই, মনের পুরো সংকোচ কাটে না এ ভাষায় কথা বলতে। এ ভাষা নিজেদের পরিচিত আত্মীয় বটে কিন্তু কেমন যেন বখাটে ও চোয়াড়ে। তাহলে কোন রাস্তা সঠিক? ১৮৬৫ এবং ৬৬তে এই প্রশ্নের উত্তর এসে গেল। কে

একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দুর্গেশনন্দিনী ও কপাল-কুণ্ডলা নামে দুটি "নবোন্যাস" প্রকাশ করলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের বয়স তখন ১৯, বঙ্কিম-চন্দ্রের ২৭. বই দুখানা, বিশেষত কপালকুণ্ডলা পড়ে অক্ষয়চন্দ্রের মনে একটি কথাই জেগেছিল, এমনও লেখা যায়?

যা এতদিন কল্পনার বাইরে ছিল, তাই সম্ভব হল। বাংলা ভাষায় রাতারাতি এল জোয়ার। এ ভাষা অবিবাহিতা সুন্দরী কুলীন কন্যাও নয়, আবার নিকট আত্মীয় বখাটে ছোকরাও নয়। এই ভাষা প্রাণের ভাষা, যথার্থই বুকের কাছের জিনিস। পড়তে যেমন আনন্দ, বলাতে আনন্দ ততোধিক। তাঁর মনে বড় ইচ্ছে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে একবার দেখা করি, কিন্তু যোগাযোগ ঠিক হয়ে ওঠে না।

অক্ষয়চন্দ্র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বি এ ও ১৮৬৮তে বি এল পাশ করেন খুব কৃতিত্বের সংগে। আইনের ক্লাস ঘটনাচক্রে প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে দেখা হতে লাগল তাঁর। ব্যাপারটা হল এই, ১৮৫৮ খৃীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বি, এ পাশ করার পরই যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটারের পদে নিযুক্ত হন, সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি আইন পড়ছিলেন বটে, কিন্তু এই চাকরী পাওয়ার ফলে আইন পড়া সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখতে হয় তাঁর। দীর্ঘ দশ বছর পরে আবার আইন ক্লাসে যোগ দেন তিনি, এই সময়েই অক্ষয়চন্দ্রের সংগে দেখা হল।

কিন্তু হায়, অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষ লাভ হল না তো। দারুণ অহঙ্কারী বঙ্কিম ক্লাসে কারুর সংগে একটি কথাও বলেন না। ক্লাস আরম্ভ হবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ফুটফুটে সুন্দর ছিপছিপে মানুষটি চাপরাশীর হাতে ছাতা ধরিয়ে এসে পৌঁছন। ঠোঁটের কোণে সব সময়েই খেলা করে একটুকরো মধুর হাসি। কিন্তু কথা? উঁহু, উঁহু, কথা কারোর সংগে বলবেন না কিছুতেই, গায়েপড়ে কথা বলতেও গেছে অনেকে কিন্তু একটিবারের জন্যও মুখ খোলেননি বঙ্কিম। রকমসকম দেখে অক্ষয়চন্দ্র তো হতাশ! ক্লাস শেষ হওয়া মাত্রই চলে গেলেন বঙ্কিম। জানলা দিয়ে তাঁর যাওয়ার পথের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চেয়ে থেকেছেন অক্ষয়চন্দ্র। চাপরাশীর হাতে ছাতাটি মেলা আর গৌরবর্ণ ছিপছিপে মানুষটি এগিয়ে যাচ্ছেন দ্রুতপায়ে। দেখতে দেখতে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেলেন তিনি।

আইন পরীক্ষা পাশ করে বহরমপুরে ওকালতি করতে গেলেন অক্ষয়চন্দ্র। বাবা গংগাচরণ সরকার সে সময়ে সেখানকার

সদর মুন্সেফ। বহরমপুরে তখন দারুণ জমজমাট—নবরত্নসভা যাকে বলে।
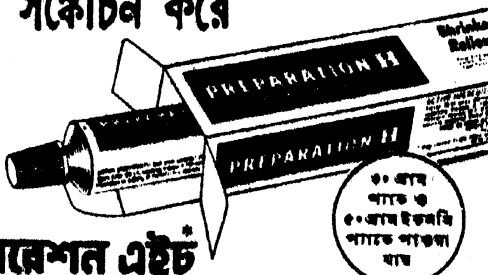
প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ডাক্তার রামদাস সেন রয়েছেন, বিরাট তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী, বই পড়ার অফুরন্ত সুযোগ সুবিধে। "বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস" লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক, প্রখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বহরমপুরেই ওকালতি করছেন। দীনবন্ধু মিত্র বহরমপুরের পোস্টাল ইনসপেকটার।

ওকালতি ব্যবসাটা ভালমতই জমে ওঠে অক্ষয়চন্দ্রের। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে নানা বিষয়ের এন্তার বই পড়ার ও সাহিত্য আলোচনার এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কোথায়? বছর দুয়েক পরে অর্থাৎ ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাচরণ সরকারের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি চিঠি পাঠালেন কাঁটালপাড়া থেকে। চিঠিটির বিষয়বস্তু হল, বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বদলী হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর জন্য ভালমত একটি বাড়ি আগে থেকেই যেন খুঁজে পেতে রাখা হয়।

খবরটা শুনে অক্ষয়চন্দ্রের আনন্দ তো আর ধরে না। দস্তুরমত খোঁজাখুঁজি করে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য একটি ভাল বাড়ি ভাড়া করে রাখেন। যথাসময়ে বহরমপুরে এসে পৌঁছন বঙ্কিম—গঙ্গাচরণের বাড়িতেই ওঠেন প্রথমে। কয়েক ঘণ্টা ছিলেন, কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে একটি কথাও না। এমনকি বিশেষ তাকালেনও না তাঁর দিকে। দু'চার কথা যা বললেন গঙ্গাচরণের সঙ্গে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর বাড়ি দেখাতে নিয়ে গেলেন গঙ্গাচরণ ও অক্ষয়চন্দ্র। ভাল মত খুঁটিয়ে দেখার পর বাড়িটি পছন্দ হল বঙ্কিমচন্দ্রের। পরের দিন বিকেল নাগাদ বাবা ও ছেলে আবার গেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে—উদ্দেশ্য তাঁর খোঁজ-খবর নেওয়া। চাপরাশী বারান্দায় তিনখানা চেয়ার পেতে দিল চটপট, তিনজনে বসলেন। গঙ্গাচরণের সঙ্গে দু'চার কথা বলতে থাকেন বঙ্কিম। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে? আরে রামোচন্দ্র! অক্ষয়চন্দ্র কিন্তু আজ ঠিক করেই গেছেন বঙ্কিমের সঙ্গে কথা বলবেনই বলবেন। গঙ্গাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথার ফাঁকে ফাঁকেই টুকটাক মন্তব্য করতে থাকেন, বঙ্কিমকে দু'চারটি প্রশ্নও করেন আগ-বাড়িয়ে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে নির্বিকার—অক্ষয়চন্দ্রের দিকে ঘাড়টাও ঘোরালেন না একবার।

কথাবার্তা শেষ করে ফিরে আসার আগে গঙ্গাচরণ মুচকি হেসে বললেন, তাইতো হে অক্ষয়, বঙ্কিমবাবু দেখছি একটা কথাও কইলেন না।

অক্ষয়চন্দ্র জবাব দেন, আর কথা!! আমি যে একটা মানুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য ঘুরঘুর করছি, চোখ তুলে একবার দেখলেন না পর্যন্ত।

বেশ কিছুদিন কেটে যায় এরপর, গঙ্গাচরণ কি কাজে বহরমপুর ছেড়ে কলকাতায় গেছেন, একটা কি যেন উপলক্ষে কোর্ট পর পর কয়েকদিনের জন্য বন্ধ। অক্ষয়চন্দ্র ভাবলেন, এই সুযোগে একবার দেশের বাড়ি চুঁচড়ো ঘুরে আসি।

নলহাটি স্টেশনে ঘণ্টা সাত অপেক্ষা করলে তবে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলগাড়ি আসে। অক্ষয়চন্দ্র ওয়েটিং রুমে বসে আছেন চুপচাপ, এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনিও এই কদিনের ছুটিতে কাঁটালপাড়ায় যাচ্ছেন। অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে এইবার কথা বললেন তিনি। দু'চার কথা উভয়পক্ষে হতে হতেই দারুণ আলাপ জমে ওঠে, শুধু গালগল্প নয়, খুব পরিচিত না হলে বঙ্কিমচন্দ্র যে আলোচনা আলতু ফালতু লোকের সঙ্গে কখনই করতেন না—সেই দুর্লভ সাহিত্য আলোচনা শুরু করলেন অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার মত বিরক্তিকর বোধ হয় আর কিছু নেই, কিন্তু সেই বিরক্তিজনক দীর্ঘ সময়

কেটে গেল যেন ঝড়ের গতিতে। সাহিত্য আঙিনায় বক্তা এবং শ্রোতা দুজনেই সমান তৃপ্ত। সেইদিনই বঙ্কিম ও অক্ষয়-চন্দ্রের মধ্যে বন্ধুত্বের অতি দৃঢ় বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হল—এ বন্ধন চিরকালই অটুট থেকেছে।

বহরমপুরে থাকতে থাকতেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন প্রকাশ করেন। সময়টা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল। এই মাসিক পত্রটির লেখক সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্পাদক তো বঙ্কিম, লেখকরা হচ্ছেন—দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

"সবিশেষ উল্লেখযোগ্য" কথাটি ব্যবহার করেছি এই কারণে যে ইতিপূর্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এক কলম লেখাও কখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। ২৬ বছর বয়সী অক্ষয়চন্দ্রের হাতে খড়ি হল এই বঙ্গদর্শনেই, প্রথম সংখ্যায় উদ্দীপনা প্রবন্ধটি লিখে। তাজ্জব ব্যাপার বটে, বঙ্কিমের মত দাম্ভিক ও অভিজাত শ্রেষ্ঠ সম্পাদক সম্পূর্ণ আনকোরা অক্ষয়চন্দ্রকে স্থান দিলেন বঙ্গদর্শন গোষ্ঠিতে—যে গোষ্ঠিতে বাকি যারা ছিলেন, তাঁরা সকলেই সে যুগের রীতিমত ডাকসাইটে ব্যক্তি। সাহিত্য সম্রাটের বাজপাখি-চোখ উঠতি তরুণ অক্ষয়চন্দ্রকে কেমন চিনে নিয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি জগদীশনাথ রায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে। চিঠিটি ইংরাজী ভাষায় লেখা এবং বঙ্গদর্শন প্রকাশের মাস খানেক আগে প্রেরিত। চিঠিটির আংশিক বঙ্গানুবাদ হল এরকম:

প্রিয় জগদীশনাথ,

আমার বঙ্গদর্শন প্রকাশের সব ব্যবস্থাই প্রায় প্রস্তুত, লেখকদের সহায়তার আশ্বাসও পেয়েছি যথেষ্ট, দীনবন্ধু, রাম-দাস, হেমচন্দ্র, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি সব প্রখ্যাত লেখকদেরই পাচ্ছি। আরেকজন নতুন লেখকের পরিচয়ও এই সূত্রে তুমি পাবে। তুমি অবশ্য তার কোন লেখাই এযাবৎ পড়নি এবং আপাতত বিশেষ কেউই তাকে চেনে না। আমার স্থির ধারণা এই তরুণটির মধ্যে সাহিত্য প্রতিভার অতি উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্যে এই তরুণটি যে তার স্থায়ী পরিচয় রেখে যাবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তরুণটির নাম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

তোমার,
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২৭৯ বঙ্গাব্দ একই সঙ্গে অক্ষয়-চন্দ্রের জীবনে আশীর্বাদ ও অভিশাপ বহন করে এনেছে। বঙ্গদর্শনের সূচনা এই বছরই, আর বৈশাখ সংখ্যায় উদ্দীপনা ও আষাঢ় সংখ্যার 'গ্রাবু' প্রবন্ধ দুটি লিখে অক্ষয়চন্দ্র রাতারাতি সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছেন। শিক্ষিত লোকের মুখে তাঁর প্রশংসা আর ধরে না। দুঃখের কথা এ বছরই দুর্গাপুজোর কিছু পরে অক্ষয়চন্দ্রের মা পাগল হয়ে গেলেন।

অক্ষয়চন্দ্র তাঁর মা বাবার একমাত্র সন্তান, এই দারুণ বিপদে প্রথমটায় যেন হতবুদ্ধি! মাকেই বা দেখে কে, ঘর সংসারই বা কে দেখে? এই দোটানার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলেন, ওকালতি ছেড়ে দিয়ে চুঁচড়োয় মায়ের পাশেই থাকবেন। যে কথা সেই কাজ, জমাটি পশার ফেলে বহরমপুর থেকে চলে এলেন, আর কখনই সে ব্যবসায়ে ফিরে যাননি তিনি। আরো একটা কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়—এই ঘটনার পর দীর্ঘ ৪৫ বছর বেঁচেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র, কিন্তু পেশা হিসেবে সাহিত্য-ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেননি, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা, বিভিন্ন সাময়িকপত্রে অজস্র রচনা এবং গ্রন্থ প্রকাশেই নিজেকে সম্পূর্ণ বেঁধে রেখেছিলেন তিনি।

বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলা সাহিত্যের মোড় একেবারে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা তো আমরা সবাই-ই জানি, এ যুগের পাঠককে শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ সময় পর্যন্ত বঙ্কিম সাকুল্যে তিনখানি উপন্যাস, দুর্গেশনন্দিনী, কপাল-কুণ্ডলা ও মৃণালিনী লিখেছিলেন। এইবার তাঁর কলমে যেন বন্যা এল। বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা থেকে বিষবৃক্ষ ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, এ ছাড়া সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে অজস্র সৃষ্টি করে যেতে লাগলেন তাতো অকল্পনীয়! একটির পর একটি উপন্যাসও পৌঁছে যায় পাঠকের কাছে!

এই সময়ে তাঁর সঙ্গে অন্য কোন লেখকের তুলনা করতে যাওয়াই তো দারুণ নির্বুদ্ধিতা, আর করতেই বা যাবে কে? সেই জ্যোতির প্রচণ্ড কিরণে তো সকলেরই চোখ গেছে ধাঁধিয়ে।

এ কথাটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে তিনি যদি জ্বলন্ত সূর্য হন, তাঁর সবচেয়ে কাছাকাছি নক্ষত্রটি ছিলেন অক্ষয়-চন্দ্র সরকার। চন্দ্রনাথ বসুকে ভুলে যাচ্ছি না, কিন্তু নিঃসন্দেহে চন্দ্রনাথের স্থান অক্ষয়চন্দ্রের পেছনে।

বঙ্গদর্শনের প্রথম দেড় বছরের অর্থাৎ ১৮টি সংখ্যার মধ্যে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন অক্ষয়চন্দ্র, যেমন চমৎকার সব বক্তব্য আর তেমনি দোর্দণ্ড স্টাইল—সাহিত্যসম্রাটের রচনা ভঙ্গীটি রীতিমত আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন তিনি, এমন কি একথাও বলা চলে, কোন কোন প্রবন্ধে তো ধরাই যেত না লেখক কে—সাহিত্য সম্রাট না অক্ষয়চন্দ্র। একথাটা এ যুগের পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে তখন মাসিকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ, উপন্যাস বা কবিতার নীচে লেখকের নামটি প্রকাশিত হত না। সাধারণত বঙ্গদর্শনে যখন কমলাকান্তের দপ্তর সিরিজের লেখাগুলি পর পর প্রকাশিত হতে থাকে, অক্ষয়চন্দ্রও দুটি "কমলাকান্তি" প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে একটি প্রবন্ধ "চন্দ্রালোকে", কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় গ্রহণ করেন বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্য সম্রাটের নামের সঙ্গে যুক্ত হবার দুর্লভ সম্মান অর্জন করে অক্ষয়চন্দ্রের প্রবন্ধ "চন্দ্রালোকে" আজও কমলাকান্তের দপ্তরে জ্বলজ্বল করছে! ১২৮০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক, অর্থাৎ বঙ্গ-দর্শনের ১৯তম সংখ্যা প্রকাশিত হবার সময় থেকেই অক্ষয়চন্দ্রের জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা। এই সংখ্যা থেকেই বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনা বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অক্ষয়চন্দ্র, আর এই সময় থেকেই নিজের সম্পাদনায় স্বাধীনভাবে প্রকাশ করলেন সাপ্তাহিক সাধারণী।

বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনা বিভাগটি ছিল সাংঘাতিক। মধ্যে মধ্যে একটি বা দুটি পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনা ছাড়াও আরেকটি নিয়মিত বিভাগ ছিল চালু—"প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।" সৎসাহিত্যের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ও অসার সাহিত্যকে পুরোপুরি কামানের গোলায় উড়িয়ে দেয়া—এই ছিল বঙ্গদর্শনের পুস্তক সমালোচনা বিভাগের আদর্শ। এই দুয়ের মধ্যে কোনদিন আপোস করেননি সাহিত্য সম্রাট। সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেছেন অমিত-বিক্রমে। রবীন্দ্রনাথের সেই সুপরিচিত মন্তব্যটি আবার স্মরণ করি, "সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত নিবারণ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

কিন্তু প্রশ্ন এই সমালোচকের মহৎ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সত্যিই কি একাকী ছিলেন বঙ্কিম? অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিনম্র সহযোগিতার কথা কি ভুলে যাব আমরা?

এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই মনে করি।

বঙ্গদর্শনের ১ম বছরের ৮ম সংখ্যা থেকে (অর্থাৎ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ) 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার" সূত্রপাত। শুরু করলেন বঙ্কিম, চললও তা পরবর্তী ১১টি সংখ্যা অবধি। দ্বিতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা (কার্তিক, ১২৮০) থেকেই বঙ্কিম এই বিভাগের দায়িত্ব দিলেন অক্ষয়চন্দ্রকে, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যবোধের সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই একমত ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র, ফলে সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধারাটির পত্তন করেছিলেন, তাকে অনুসরণ করে একই পথে এগিয়ে যেতে একটুও অসুবিধে হয়নি অক্ষয়চন্দ্রের। পুস্তকের গুণাগুণ বিশ্লেষণ ও অপদার্থ লেখকদের নাকের জলে চোখের জলে করার ব্যাপারে অক্ষয়চন্দ্র এমনই অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে সেদিন অনেকেই মনে করতেন এগুলো বঙ্কিমের কলম থেকেই বার হয়েছে। খুব ভেতরের লোক ছাড়া আর তো কেউ জানতেনই না যে বঙ্কিম পুস্তক সমালোচনা দপ্তরটি অক্ষয়চন্দ্রের হাতে দিয়েছেন। কার্তিক, ১২৮০ থেকে পৌষ, ১২৮১ পর্যন্ত অর্থাৎ পর পর ১৫টি সংখ্যায় সমালোচকের দায়িত্ব পালন করেন অক্ষয়চন্দ্র—এর পরের সংখ্যা মাঘ, ১২৮১ থেকে বঙ্গদর্শনে "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" বিভাগটি তুলে দিলেন বঙ্কিম। এই ঘটনার পরে এবং আগে (যখন অক্ষয়চন্দ্র সমালোচনা করতেন) বঙ্কিম কয়েকটি বাছা বাছা বইয়ের দীর্ঘ সমালোচনা নিজের কলমে করেছিলেন অবশ্য—সে খুব বেশী নয়। হুবহু বঙ্কিমের আদর্শে অনুপ্রাণিত অক্ষয়চন্দ্রের দুর্দান্ত পুস্তক সমালোচনা পড়লে এখনও যে কোন নিতান্ত আধুনিক পাঠক চমকে উঠবেন। কখনও সহানুভূতি, কখনও ঔদার্য, কখনও তীব্র শ্লেষে উজ্জ্বল ভাষা, এর ওপর আছে সমালোচকের অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী—এমন অপূর্ব জিনিস বাংলা সাহিত্যে আর কি হবে?

এ যুগের পাঠকের সামনে অক্ষয়চন্দ্রের সমালোচনার কয়েকটি নমুনা রাখতে চাই। মনে রাখবেন সমালোচনাগুলি ঠিক ৯৯ বছর আগেকার।

অমরনাথ নাটক—কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত।

আমরা এই গ্রন্থ সমালোচনায় অক্ষম। গ্রন্থকারের কোনই দোষ নাই—দোষ আমাদের। আমরা ইহা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। নাটকখানি ২৯৪ পৃষ্ঠা। মনুষ্যজীবন নশ্বর, চিরজীবী কেহ নহে। এক্ষণিক জীবনের কিয়দংশ তিন শত পৃষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া অতিবাহিত করায় কোন পাপ আছে কিনা—এই মীমাংসায় আমাদের কয় মাস কাটিয়া গিয়াছে, এখনও আমরা কোন সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই। যদি ভবিষ্যতে আমরা এইরূপ মীমাংসা করি যে, তিন শত পৃষ্ঠা নাটক পাঠ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত করায় পাপ নাই, তবে আমরা ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

রামোদ্বাহ নাটক—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

অশুভক্ষণে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রামের বিবাহ, রামের বনবাস, সীতার বনবাস, রামের যুদ্ধ, কুশীলবের যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া অসংখ্য অপাঠ্য কাব্য নাটকের সৃষ্টি হইতেছে। সম্প্রতি আর একখানি রামোদ্বাহ নাটক উপস্থিত। রামোদ্বাহ বলিলে কেহ যদি না বুঝিতে পারেন এই জন্য গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "অর্থাৎ শ্রীরামের সহিত সীতার বিবাহ বর্ণন।" আমরা গ্রন্থকারের নিকট বিশেষ বাধিত হইলাম।

ইহাতে কপালে করাঘাত আছে, চরণস্পর্শ আছে, ভূমি শয্যা আছে, বিষবিন্দু আছে, হৃদয়বল্লভও আছে, চাতকিনী আছে, কাদম্বিনী আছে, নীলমণি আছে—নাই কি? তেলভাজা চানাচুর কোথায় লাগে?

রিপুবিহার—মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত।

আমরা ইহা পড়িয়া বলিতে পারি যে, সাহিত্য সংসার মধ্যে কাব্য একটি মনোহর পুষ্পোদ্যানস্বরূপ. ইহাতে "রিপুবিহার" প্রভৃতি নানা প্রকার আগাছা জন্মে। আগাছাগুলি কাটিয়া আখাধরানো গৃহস্থলোকের কর্তব্য।

গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু—মীর মশারফ হোসেন।

গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাংলা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরনীয়। বাংলা হিন্দু মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। বাংলার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন মুসলমানদিগের মধ্যে এ মত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাংলা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাংলা লিখিবেন না বা বাংলা শিখিবেন না—কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, তত দিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল, ভাষার একতা। অতএব মীর মশারফ হোসেন

এই! বালআমুল
কি জান ?
বালআমুল হল এক শস্যের
খাবার। আমি এটা খাচ্ছি
৩ মাস বয়স থেকে। হজমে
হয় খুব সহজে।
আমি এখন মাসে-দু-টিন-
খাওয়া এক পালোয়ান !
গর্ব্ব করতে আমার ভাল লাগেনা,
তবে কিরকম তড়তাড়িয়ে বেড়ে উঠছি
সবাই দেখ! দুধ ছাড়ানোর সময়কার
খাবার ভাত আর সুজির চেয়ে-
বালআমুলে প্রোটিন আছে
অনেক বেশী।
জান, খেতেও দারুণ
স্বাদের !
আমি খেতে ভালবাসি বালআমুল
আর দুধ, বালআমুল আর সুপ,
বালআমুল আর ফলের রস।
এক কথায় বালআমুল
আমার চাই-ই।
আমাদের সবার
পক্ষেই ভাল !
কারণ, আমি বেশ বেড়ে উঠছি
বলে মা খুব খুশী, সারা রাত
ঘুমোই বলে বাবাও খুশী !
RADEUS, GCM-B-2
বিনামূল্যে !
বালআমুল সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা
বিনামূল্যে পেতে হলে এই ঠিকানায়
(ইংরেজীতে) লিখুন: পোস্ট ব্যাগ ১০১২৪
বোম্বাই ৪০০০০১
৩ মাস বয়েসের পর খাওয়ান
বালআমুল
দুধ মিশ্রিত শস্যাহার
মস্তিষ্ক আর শরীরের পুরোপুরি বৃদ্ধির জন্যে
দেখবেন ! দুধ ছাড়িয়ে শক্ত আহার ধরানোর
সময় আপনার বাচ্চা যেন যথেষ্ট প্রোটিন
পায় ! বালআমুল হল, ইউনাইটেড নেশনস্
-এর প্রোটিনক্যালোরি অ্যাডভাইসরী গ্রুপ
দ্বারা নির্ধারিত প্রোটিন ও ক্যালোরির হুবহু
মান অনুসারে তৈরী— দুধ মিশ্রিত
শস্যাহার !
বালআমুল বোতলে-খাওয়া :
১/২ আমূলস্প্রে, ১/২ বালআমুল
বালআমুল চামচে-খাওয়া :
পুরো আহার বালআমুল মিশিয়ে
Bal-amul
cereal with milk
বিতরণ : গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ।

সাহেবের বাংলা ভাষানুরাগীতা বাঙালীর পক্ষে বড়ই প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।

১২৮০ বঙ্গাব্দের ১ইে কার্তিক সাধারণী সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রথম এটি বঙ্গদর্শন মুদ্রণ যন্ত্রেই ছাপা হত, দ্বিতীয় বর্ষের ১৪ সংখ্যা থেকে সাপ্তাহিকটির নিজস্ব প্রেস "সাধারণী মুদ্রণ যন্ত্র" চালু হল চুঁচড়োয়। প্রায় দশ বছর চুঁচড়ো থেকেই সাধারণী প্রকাশিত হবার পর দারুণ একটা ঝামেলার উদ্ভব হল। হঠাৎ সেখানে ম্যালেরিয়ার কি উৎপাত যে বলার নয়। ঠিক আছে, অক্ষয়চন্দ্রও দমবার পাত্র নন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে প্রেসসুদ্ধ সাধারণীকে তুলে আনলেন কলকাতায়। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে সাধারণী উঠে গেল—মোটমাট চলেছিল প্রায় ১৬ বছর। সে যুগের বিচারে সাপ্তাহিকটির যে রীতিমত আয়ু ছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। সাধারণী মূলত রাজনীতিক সাপ্তাহিক। সূচনায় অক্ষয়চন্দ্র নিবেদন করলেন, "এই পত্রিকা বর্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব আকাঙ্ক্ষা করে বটে, কিন্তু রাজ্য প্রণালীর আমূল পরিবর্তনও ইহার বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ইংরাজে অদ্যাপি রাজা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা শাসন করিতেই ব্যস্ত, আইন করিতেই ব্যস্ত, ধন সংগ্রহ করিতেই ব্যস্ত—কিন্তু রাজার যে প্রধান কার্য প্রজারঞ্জন তাহাতে তাঁহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই।" অক্ষয়চন্দ্রের সুর ক্রমেই গরম হতে আরম্ভ হল। একেই তো তাঁর কলম নয়তো ঝকঝকে তলোয়ার, অমিত বিক্রমে ইংরাজের নাকের সামনে ঘোরাতে লাগলেন। বাস্তবিকই ব্যাপারটা অদ্ভুত। দুটো কারণে অদ্ভুত, অক্ষয়চন্দ্র ইংরাজ সরকার ও তার আমলাতন্ত্রকে এত প্রচণ্ড আক্রমণই বা কোন সাহসে করতেন, আর ইংরাজ সরকারই বা নির্বিবাদে হজম করতেন কিভাবে! অক্ষয়চন্দ্রের সাহসেরও যেমন তুলনা হয় না, তদানীন্তন ইংরাজ সরকারেরও অসামান্য ঔদার্য ও সংবাদপত্রের বাক স্বাধীনতার ঢালাও অনুমতি প্রদানেরও বোধ করি তুলনা হয় না।

এ যুগে কেউ যেন মনে না করেন, তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাচ্ছিল্য করে সাধারণীকে কিছু বলেন নি—ভাবটা, ও কাগজ লিখলেই বা কি, না লিখলেই বা কি!

আদৌ তা নয়, সাধারণীর বিক্রি ছিল জোর এবং প্রচার সংখ্যা যথেষ্ট। সাধারণী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হলেও সে যুগে প্রায় সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করে। এই সাপ্তাহিকটিকে উপেক্ষা করার মত মূঢ়তা কারোরই ছিল না। তা ছাড়া, ইংরেজ প্রশাসন যন্ত্রটি ছিল খুবই আঁটোসাঁটো, শকুনীর তীক্ষ্ণ চোখে সে তখন ভারতবাসীদের ওপর লক্ষ্য রাখছে। ইংরাজ গভর্নমেণ্টের একটি শক্তিশালী অনুবাদ দপ্তর ছিল। সেই দপ্তরের প্রধান কাজই হল, সাময়িকপত্রে বা গ্রন্থে রাজদ্রোহমূলক কিছু লেখা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সে সব লেখাগুলি ইংরাজিতে হুবহু অনুবাদ করে বড়কর্তাদের সামনে পেশ করা।

এ যুগের পাঠকের সামনে এ প্রসঙ্গে দু'একটি উদাহরণ রাখলে মন্দ হবে না। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী দিল্লিতে মহাজমকে "দরবার" অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনই রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের রাজরাজেশ্বরী [বিশিষ্ট ভারতীয় প্রজাদের জন্য এই উপলক্ষে কিছু সোনার মেডেল তৈরি হয়। সেই মেডেলের একদিকে রাণীর মুখ খোদা, অন্যদিকে তিন ভাষায় লেখা—ইংরেজিতে Empress of India, ফার্সীতে কৈসর আ-হিন্ড, হিন্দীতে—হিন্দকৈসর] রূপে ঘোষিত হন। দিল্লির এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লর্ড লিটন স্বয়ং। এই উপলক্ষে কয়েকজন বাছা বাছা সাংবাদিক ও সম্পাদক দিল্লিতে আমন্ত্রিত হন। অক্ষয়চন্দ্র এ'দেরই একজন ছিলেন। সাধারণীর সম্পাদক হিসেবেই তিনি গেলেন দিল্লির দরবারে। একখানা বিশেষ প্রেস টিকিট পেয়েছিলেন, সব জায়গায় ঘোরাফেরা ও খোঁজখবর নেওয়ার অনুমতিও ছিল। সব ভালমত দেখলেন, তারপর সেখান থেকে যা রিপোর্ট পাঠালেন সাধারণীতে প্রকাশ করবার জন্য এবং কলকাতায় ফিরে যে সব প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন, তা পড়ে সকলেরই তো চক্ষুস্থির।

তিনি খোলাখুলি লিখে দিলেন, "দেখিতে পাইতেছি যে, দিল্লির দরবার একটি জাঁকজমক বিশিষ্ট প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নহে। লর্ড বিকনসফিল্ড ঐ প্রহসনের রচয়িতা, আর লর্ড লিটন উহার সহকারী অধিনায়ক হইয়া আপনাদের জীবন সার্থক জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু যাহাদের হৃৎক্ষেত্রে ঐ প্রহসন অভিনীত হইল, যাঁহাদের শোণিত শোষণে ঐ প্রহসনের অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পাদিত হইল, তাহারা চিরকাল বলিবে যে, উহা হইতে তাহারা অনুমাত্রও উপকার প্রাপ্ত হইল না। এখন হইতে গভর্নমেণ্ট আর এরূপ দরবার না করিলেই ভাল হয়। সকল বিষয়েরই সীমা আছে।"

বিশেষত একটি ঘটনায় অক্ষয়চন্দ্র ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা হল এই, দিল্লির দরবারে সিংহাসনে বসেছিলেন লর্ড লিটন। দেশীয় রাজারা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে একে একে সেলাম জানিয়ে আসছিলেন। মোগল রাজপরিবারের প্রতিনিধি হিসেবে মির্জা হিদায়েৎ আফজল নামক এক আশি বছরের নিতান্ত শীর্ণ ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে ধরাধরি করে লর্ড লিটনের সামনে খাড়া করে দিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। বৃদ্ধ অতি কষ্টে দু এক কথা কি বলতে গেলে সেক্রেটারী ও এডিকংরা ধাক্কা মারতে মারতে বৃদ্ধকে সভার বাইরে নিয়ে যান। বিনা অনুমতিতে কথা বলতে যাওয়াটা নাকি ভয়ানক বেআইনি। অক্ষয়চন্দ্র পর পর দুটি রিপোর্টে জানতে চাইলেন (ক) বৃদ্ধকে জবরদস্তী করে সভাতে আনাই বা কেন আবার অপমান করে তাড়িয়ে দেয়াই বা কেন? (খ) বৃদ্ধকে কিছু বলতে দেয়া হল না কেন? (গ) ইংরেজ সরকার কি ভুলে গেছেন একদিন এদের পূর্ব পুরুষের পা চেটেই ভারতে ঠাঁই পেয়েছিলেন ইংরাজেরা? (ঘ) রাজদরবারে কে বেশী বেয়াদপি দেখাল, সেই অসহায় বৃদ্ধ দুটো কথা বলতে যেয়ে না দুর্বিনীত এডিকং ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীরা ঐ অমানুষিক ব্যবহার করে?

শোনা যায় ইংলণ্ডে অক্ষয়চন্দ্রের এই রিপোর্টটির ইংরাজি অনুবাদ যথেষ্ট সাড়া জাগায় ও ভদ্র ইংরেজ মাত্রেই মোটামুটিভাবে অক্ষয়চন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত হন। সমগ্র অবিভক্ত ভারতবর্ষে রিপোর্টটি বহুল আলোচিত এবং সমালোচিত হয়েছিল। মহারানী ভিকটোরিয়াও দিল্লির দরবার প্রসঙ্গে সাধারণীতে প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্রের এই তীব্র শ্লেষাত্মক টিপ্পনীটি সে যুগের মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে—"দিল্লির দরবার শেষ হইয়া গেল। পশুরাজ্ঞী সিংহীর গর্ভবেদনা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম তিনি সিংহই প্রসব করিবেন। কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইলাম। বাস্তবিক তিনি সিংহী হইয়াও, এতটা গর্ভবেদনা সহ্য করিয়া যে মূষিক ভিন্ন অন্য কিছু প্রসব করিবেন না—একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

সাহিত্য সম্রাটের সহযোগিতায় ১২৯১ বংগাব্দের শ্রাবণ মাস থেকে "নবজীবন" মাসিকপত্র প্রকাশ করলেন অক্ষয়চন্দ্র। পুরো পাঁচ বছর স্থায়ী এই মাসিকটিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। নানারকম ঝামেলায় পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেও শেষ সংখ্যাটি পর্যন্ত পাঠক সাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন তিনি।

নবজীবন উঠে যাবার পর তৎকালীন প্রায় সমস্ত সাময়িকপত্রের জন্য কলম ধরেছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। তাঁর ১০০টিরও বেশি রচনা এই উপলক্ষে রচিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে থাকা এই রচনাগুলি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র মানুষটি সত্যই খুব অদ্ভুত ধরনের। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু

● রক্ষণশীল প্রকৃতির ছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহের তো কোন অবকাশই নেই। কিন্তু তারই ফাঁকে আবার নির্মোহ উদার দৃষ্টিও উঁকি মেরেছে বারবার। মীর মশারফ হোসেন সম্বন্ধে তাঁর মতামত আগেই উল্লেখ করেছি, এরকম আশ্চর্য উদার সমালোচনা আরও অনেক করেছেন তিনি। তরুণ জ্যোতির্ময় রবি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কেমন, সে কথায় আমরা একটু পরে আসছি। প্রাচীন হিন্দু আদর্শ ও মূল্যবোধে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন, সততায় ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় সর্বত্রই বিপুল শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। একদিকে তিনি যেমন বহু বিবাহ ও বাল্য-বিবাহের ঘোরতর বিরোধী অন্যদিকে আবার বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন বারবার। আশ্চর্যের কথা, পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল, ব্যক্তিগত-ভাবে বিদ্যাসাগরের একজন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র, কিন্তু তবুও, হ্যাঁ তবুও বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন তীব্র সংগ্রামও চালিয়ে গেছেন অক্ষয়চন্দ্র। এ সম্বন্ধে তাঁর মত এমনই অনুদার যে চমকে উঠতে হয়। তাঁর মতে সংসারে তো সবাই নানা কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত, তবে ধর্মকর্ম ব্রত আচার এসব করবে কে? কেন বিধবারা! যত অল্প বয়সেই বিধবা হোক না কেন বিয়ে করে আবার নতুন জীবন আরম্ভ করার কোন অধিকারই তাদের নেই। তারা তো সংসারে থেকে অন্য সবাইকে সেবা করবে, তবেই না পুণ্য! এই জীবনে আনন্দ কি কম? ব্রহ্মচর্য বলে কথা!

ব্যক্তিক বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিরুদ্ধে যেসব প্রবন্ধ লিখেছেন ও ভাষণ দিয়েছেন অক্ষয়চন্দ্র তা আর এযুগে পড়া যায় না। পড়তে গেলে মনটা কেমন করে ওঠে! এমন তেজস্বী ও প্রতিভাবান ব্যক্তির এই একটি বিষয়ে এমন অনুদারতা দেখে খুব দুঃখ হয়। কিন্তু শাস্তি তিনি পেয়ে-ছিলেন। সে যুগের কয়েকটি উদার ও প্রগতিধর্মী সাময়িকপত্রে এই প্রসঙ্গে অতি তীব্র ও তিক্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে সে কি প্রচণ্ড আক্রমণ! একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিই উল্লেখ করছি।

পতাকা, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, "বর্তমান বঙ্গ সমাজে এক শ্রেণীর হৃদয়বিহীন, লঘু-চেতা, স্বার্থপর, কাপুরুষ লোক জন্মিয়াছে, যাহারা পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া ও উৎকৃষ্ট ভোগসুখে নিজেরা থাকিয়া, দুঃখিনী হিন্দু বিধবাদিগকে উপদেশ দিতেছে, তোমরা ব্রহ্মচর্য কর, ব্রহ্মচর্যের সমান গুণ নাই।"

একটা কথা অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন. অক্ষয়চন্দ্র আদৌ "ভোগসুখে" থাকতেন না। নিরামিষাশী ছিলেন, অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়ে গেছেন চিরদিন।

আর একটা কথা ভাবলেও বেশ আশ্চর্য লাগে। দীর্ঘ ৭১ বছর জীবনে অক্ষয়চন্দ্র গ্রন্থাকারে ছাপিয়েছিলেন মাত্র পাঁচখানি বই। পিতাপুত্র, সনাতনী, কবি হেমচন্দ্র এই তিনখানা গদ্য, আর শিক্ষা-নবিশের পদ্য, গোচারণের মাঠ কবিতা।

কবিতার বই দুটি নেহাতই অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। তিনখানি প্রবন্ধ বইয়ের অবশ্য তুলনা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, অক্ষয়চন্দ্র তবে এ বিপুল সাহিত্যখ্যাতি অর্জন করলেন কি করে? "সাহিত্যাচার্য" এই বিশেষণে অবিভক্ত বাংলায় সবাই তাঁকে একডাকে চিনতই বা কি করে? প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু খুব সহজ। সাধারণী ও নবজীবনের সম্পাদক হিসেবে তো নিশ্চয়ই, সাময়িকপত্রের লেখক ও সমালোচক হিসেবে তাঁকে উপেক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। এমনকি একথাও বলা যায় যে, তিনি সাময়িকপত্রের লেখক-সমালোচক হয়েই সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে ১০০টিরও বেশি প্রবন্ধ লিখে গেছেন ও তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে সেগুলি সংকলিত হয়েছে একথা উল্লেখ করেছি আগেই। আর একটুখানি কথা যোগ করি, এ প্রবন্ধগুলির হীরক দীপ্তি ও কৌতুক-ছটার স্নিগ্ধ আলো লেখককে অমরত্ব না দিয়ে পারে না। বাইরে দারুণ রাশভারি ব্যক্তিটির অন্তরে কিন্তু নির্মল কৌতুক-রসের স্রোত বয়ে যেত। স্থানাভাব তাই একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গের ইতি করি।

অক্ষয়চন্দ্রের মেজ ছেলে অজরচন্দ্রের বিয়েয় তৎকালীন প্রায় সব খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিকরা আমন্ত্রিত। জমাটি আড্ডাও চলেছে খুব। সময়টা আষাঢ় মাস, দুর্জয় গরম, গায়ে যেন জামাটাও রাখতে ইচ্ছে করে না। এহেন সময়ে আসরে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ প্রবেশ করেন। এই দুর্দান্ত গরমেও তাঁর হাঁটু অবধি মোজা। দেখে তো সবাই একেবারে "থ", দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আর থাকতে না পেরে গিরিশ-চন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, একি! আপনার পায়ে মোজা কেন? কি ব্যাপার বলুন তো?

গিরিশচন্দ্র প্রশ্নটা এড়িয়ে দীনেশ-চন্দ্রকেই পাল্টা প্রশ্ন করেন, কেন, এতো অবাক হবার কি আছে? আমার পায়ে মোজা কি কখনোও দেখেন নি?

অক্ষয়চন্দ্র খুব মনযোগ দিয়ে এতক্ষণ উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনছিলেন। এবার অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন, হ্যাঁ, আমি দেখেছি বইকি, তবে সে এক পায়ে!

গিরিশচন্দ্র কথাটা শুনে একটু থমকে গেলেন, তারপর তাঁর সেকি হাসি! হেসে একেবারে গড়াগড়ি! অন্য সকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অক্ষয়চন্দ্রকে বললেন, কি হোল বলুন তো, আপনার ঐ কথাটিরই বা মানে কি, আর গিরিশচন্দ্রই বা হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছেন কেন? অক্ষয়চন্দ্র জানালেন, "সধবার একাদশী" নাটকে মাতাল নিমচাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় গিরিশচন্দ্র বরাবরই একপায়ে মোজা পরে স্টেজে নামেন।

এইবার অক্ষয়চন্দ্রের মন্তব্যের অন্ত-র্নিহিত রসটি উপলব্ধি করে সমবেত সাহিত্যিকরা তো হেসেই অস্থির।

জ্যোতির্ময় রবির সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের সর্বপ্রথম যোগাযোগ হয়েছিল কবে? ১২৮২ বঙ্গাব্দে ২৭ বৈশাখ, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত "বিদ্বজ্জন সমাগম" সভায় ১৪ বছরের বালক রবিকে স্বরচিত কবিতা পড়তে শোনেন অক্ষয়চন্দ্র। কবিতাটির নাম প্রকৃতির খেদ। শুনে যে কি ভাল লাগল, বলবার নয়। চটপট সাধারণীতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি প্রকাশ করলেন [১২৮২ বঙ্গাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ] "বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনা-বস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর......"

আরও দু' বছর কেটে গেল। সময়টা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ। স্থান হিন্দু মেলা। সে সময়টা কলকাতায় হিন্দু মেলার খুব জাঁকজমক। বাংলা দেশের গণ্য-মান্য প্রায় সব ব্যক্তিই সে মেলায় হাজির থাকতেন। বিকেল নাগাদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার কবি নবীনচন্দ্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় পৌঁছোলেন। এধার ওধার ঘুরছেন, হঠাৎ তাঁদের একজন পরিচিত ভদ্র-লোক এসে বললেন, ঐ বটগাছটার কাছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে কবিতা পড়বে। আপনারা গেলে সে খুব উৎসাহ পায়, একবার যাবেন?

অক্ষয়চন্দ্র তক্ষুনিই রাজি। গেলেন বটগাছটার কাছে। সেখানে বেশ কিছু উৎসাহী লোকের ভিড় জমেছে। সাদা ঢিলে ইজের ও চাপকান পরা এক অপরূপ সুদর্শন কিশোর "নোটবই" হাতে দাঁড়িয়ে শান্ত, স্থির। মনে হচ্ছে "বৃক্ষতলে যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।" অক্ষয়চন্দ্র ও উপস্থিত অন্য শ্রোতারা চটপট ঘাসের ওপর বসে গেলে কিশোর রবি দিল্লির দরবার সম্পর্কে একটি কবিতা ও আরেকটি গান গেয়ে শোনালেন। উপস্থিত শ্রোতারা তো একেবারেই মুগ্ধ! এমন তো তাঁরা এর আগে কখনও শোনেন নি!

মুগ্ধ ও অভিভূত অক্ষয়চন্দ্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ সংখ্যা সাপ্তাহিক সাধারণীতে যে রিপোর্ট লিখলেন তা খুবেই উল্লেখযোগ্য। "আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষছায়ায় দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া রবীন্দ্রের কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতেরো বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম, তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এইরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে, তাহার কোমল হৃদয় পর্যন্ত ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে তখন আশাতে আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল, রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি 'আয় ভাই' আমরা গাইব অন্য গান।' একজন সুপরিচিত কবিও [নবীনচন্দ্র সেন] সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।"

কিশোর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের মনোভাব তো জানলাম আমরা কিন্তু সে সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সম্বন্ধে কিশোর রবির কি ধারণা ছিল? এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলা মুশকিল! অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য কৃতি সম্বন্ধে কিশোর রবির খুব একটা সচেতনতা ছিল বলে তো মনে হয় না। তবে এই প্রসঙ্গে একটি আকর্ষণীয় তথ্য সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় [এবং সারদাচরণ মিত্র ও বরদাচরণ মিত্রের সহায়তায়] পর পর পাঁচটি খণ্ডে "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" প্রকাশিত হয়। এগুলি যথাক্রমে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ, মুকুন্দরাম কবি কঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল।

কিশোর রবি শুরু থেকেই এই বইগুলি সম্বন্ধে দারুণ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বইগুলি কিনে আনতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বটে, কিন্তু খুব মনযোগ দিয়ে এগুলি তিনি পড়তেন কিনা সন্দেহ। যদিও বা কিছু কিছু পড়তেন, পড়া হয়ে গেলে এগুলো তিনি তাঁর ডেস্কেই ফেলে রাখতেন। কিশোর রবি এই সুযোগে দাদাদের অগোচরে বইগুলো হাতসাফাই করে নিজের ঘরে নিয়ে আসতেন চুপি চুপি। "চুপি চুপির"* কারণ ঐটুকু ছেলের হাতে বৈষ্ণবপদাবলী দেখতে পেলে গুরুজনরা যে বকাবকি করবেন এত জানা কথা। সৌভাগ্যের কথা কিশোর রবির এই চৌর্যবৃত্তি গুরুজনের হাতে ধরা পড়েনি কখনও। নিরালায় অক্ষয়চন্দ্র সম্পাদিত এই বইগুলি কিশোর রবি পড়তেন উদগ্র আগ্রহে। বিশেষত বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলেই যেন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করত। একটা ছোট্ট বাঁধানো খাতা করেছিলেন, তাতে এই পদগুলির বিশেষত্ব এবং অন্যান্য মন্তব্য লিখে রাখতেন তিনি। পরবর্তী সময়ে এগুলিই সম্ভবত তাঁর "ভানু সিংহের পদাবলীর" উৎস হয়েছিল।

আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল, সময়টা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, রবীন্দ্রনাথের বয়স ২১। এই সময় থেকেই তরুণ রবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ঘন ঘন আসা যাওয়া শুরু করেন। এই জ্যোতির্ময় তরুণটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বড় ভালবাসেন সাহিত্য সম্রাট। এক একদিন তো কথাবার্তা এমন জমে ওঠে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে। এই বৈঠকেই তরুণ রবির সঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রের পরিচয় গাঢ়তর হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে তো অনেক দিন আগে থেকেই অক্ষয়চন্দ্রের নিয়মিত যাতায়াত, শুধু যাতায়াতই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের একেবারে ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। বঙ্কিমের বৈঠকখানা এবার তিনজনের নানান ধরনের আলোচনার ক্ষেত্রে পরিণত হল।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে (১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ) অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদনায় "মাসিক নবজীবনের" সূচনা আর প্রথম সংখ্যাতেই দুর্দান্ত একটি রম্য রচনা লিখেছিলেন তরুণ রবি। রম্য রচনাটির নাম, "ভানু সিংহঠাকুরের জীবনী"। ওঃ লেখার কি জেল্লা! সুরসিক পাঠকেরা তো হেসেই অস্থির।

নবজীবনের চতুর্থ সংখ্যায়, কার্তিক মাসে আবার বের হলো রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবির গান'। পরের মাসেই পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হল তরুণ রবির অনবদ্য সৃষ্টি রাজপথের কথা। [illegible] কোন সন্দেহ নেই, নবজীবন প্রকাশে অক্ষয়চন্দ্রের [illegible] সহায়তায় [illegible] এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন তরুণ রবি। [illegible] রচনার ডালি নিয়ে। [illegible] ভাবার [illegible] দুই ভগীরথের [illegible] উজাড় [illegible] জীবনের ভাণ্ডার [illegible] করে উঠল।

কিন্তু হায়, অক্ষয়চন্দ্রের কি দুর্ভাগ্য। তরুণ রবি অক্ষয়চন্দ্রের ওপরে ঘোর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন অবিলম্বেই।

ব্যাপারটা খুব মজার। অক্ষয়চন্দ্র তরুণ রবির রূপ এবং গুণে একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে এই দৃঢ় উপলব্ধিটি এসেছিল, এমনটি আর নেই, আবার কখনো হবে কিনা সন্দেহ। অত্যন্ত ঈশ্বর ভক্ত লোক কিনা, ভাবলেন ভগবানের এমন সৃষ্টি কি কখনও ব্যর্থ হতে পারে? মনে কিন্তু একটা ভাবনাও দেখা দিল। ভয়ও বটে।

সত্যের খাতিরে এই প্রবন্ধ লেখককে স্বীকার করতেই হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্রের সেদিনকার ভয় এবং ভাবনা নেহাৎ অমূলক ছিল না।

তরুণ রবি তখন নেহাৎ-ই উঠতি। বেশ কয়েকখানি বই বাজারে বার হয়ে নিন্দা ও প্রশংসার ঝড় তুলেছে বটে, কিন্তু বয়সটা যে নেহাৎ অল্প। ২৩ বছর হয় কিনা হয়। আরও মুশকিলের কথা, তরুণ রবির বেশ কিছু সমর্থকও সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা তো খুবই উচ্ছ্বসিত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার তৎকালীন প্রবীণ লেখকদের একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বলছেন, রবিবাবুর মত লিখতে না পারলে আবার লেখা! তরুণ রবির একটি চলতি নামও বাজারে দাঁড়িয়ে গেছে, বাংলার শেলী।

আবার এদিকে প্রবীণরাও খুব চুপচাপ নেই, 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' কালীপ্রসন্ন ঘোষের মত দুর্দান্ত সমালোচক পর্যন্ত বান্ধব মাসিকপত্রে একেবারে খোলাখুলি বলে দিয়েছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমাদিগের বোধ হয় বাঙ্গলায় কেহই এমন জ্যোৎস্নাশীল, সরল, কোমল ও মধুর কবিতা রচনা করিতে পারে না।" এমনকি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত ডাকসাইটে ব্যক্তি তরুণ রবির প্রভাত সংগীত কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে এডুকেশন গেজেটে যে প্রথম বাক্যটি লিখলেন, সেটি হচ্ছে এই, "রবীন্দ্রবাবু যে একজন প্রকৃত আর্যকবি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।"

এসব দেখে শুনে দারুণ ভড়কে গেলেন অক্ষয়চন্দ্র। ভাবলেন, এত গ্যাস খেয়ে বাঙালীর ছেলে কি টিকবে? এসব

---

* পরিণত বয়সে কৈশোর জীবনের এই ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত সরসভাবে বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলছেন, "অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় পর্যায়ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলী প্রকাশের কাজে তখন নিযুক্ত হয়েছিলেন আমার বয়স তখন যথেষ্ট অল্প, ধরে নেয়া যাক আমি তখন চোদ্দোয় পা দিয়েছি। খণ্ড খণ্ড পদাবলীগুলি প্রকাশ্যে ভোগ করার যোগ্যতা আমার তখন ছিল না। অথচ আমাদের বাড়ীতে আমিই একমাত্র তার পাঠক ছিলুম। দাদাদের ডেস্ক থেকে যখন সেগুলো অন্তর্ধান করত, তখন তাঁরা তা লক্ষ্য করতেন না।"

"একরাশ সুদীর্ঘ চুল—বহুমূল্য
ছোট বাদামের কাছে অমূল্য
ঋণে ঋণী" বলেন
অ্যানিটা রবিনস।
এআপোর্ট হাউস একজিকিউটিভ
একই কৃপায় পুরোনো
দিনে অযোধ্যের বেশমরা
তাঁদের পায়ের গোড়ালী
পর্যন্ত লম্বা চুল নিয়ে
গর্ব করতে পারতেন!
তাঁরা জানতেন যে
নারকোল, চীনেবাদাম
বা রেড়ির দানার
চেয়ে বাদামের
পুষ্টিগুণ অনেক
শ্রেষ্ঠ!
আজও বাদামের
সহজাত পুষ্টিগুণ দিয়ে
চুলওঠা বন্ধ করে
আপনি পেতে পারেন
ঝলমলে সুন্দর,
সুস্থ চুল! রোজ রাত্রে
আর সকালে চুলের গোড়ায়
লিওর আমণ্ড হেয়ার অয়েল
মালিশ করুন। রাত্রে, এ আপনার
চুলে পুষ্টি যুগিয়ে চুলের গোড়া শক্ত
আর সজীব করে তোলে; দিনে,
চুলকে রাখে পরিপাটি সুন্দর!
যে সব স্ত্রী বা পুরুষরা পরিপাটি আর
সুস্থ চুল চান তাঁদের জন্যে মনোরম
সুগন্ধে ভরা লিওর আমণ্ড হেয়ার
অয়েল অপরিহার্য্য!
লিওর
"লিওর আমার চুলে আনে লোভনীয়
সৌন্দর্য্য...আমণ্ড হেয়ার অয়েল
মেলায় তাতে স্বাস্থ্য অপরিহার্য্য!"
PERFUMED
Liwr
ALMOND HAIR OIL
Creative Unit-1922-Be

"বারেতোলা" কথাবার্তা শুনে মাথাই ঘুরে যাবে নির্ঘাৎ। এসব ফোলানো সমালোচনায় এমন তরুণ প্রতিভা যদি গেঁজে যায়, তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু আছে?

ঠিক আছে, অক্ষয়চন্দ্রও একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেন। নবজীবনের সপ্তম অর্থাৎ মাঘ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল "ভাই হাততালি।" লেখক অক্ষয়চন্দ্র। অপূর্ব প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভালবাসা যেন উপচে পড়ছে, সেই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে বেশি হাততালিতে রবীন্দ্রনাথ নষ্ট না হয়ে যান সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। তরুণ রবিকে কতখানি স্নেহ করলে তবেই এ লেখা যায় এ যুগের পাঠকেরা নিচের সামান্য উদ্ধৃত অংশ থেকে বিচার করুন। "আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল রবীন্দ্রনাথ। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বঙ্কিমবাবুর কথা ধরি না, তোমার (হাততালির) অসার আস্ফালনে উদাসীনতা প্রদর্শনের অধিকার অনেক দিন হইল তাঁহাদের হইয়াছে। বয়সবিগুণে রবীন্দ্রনাথের সে অধিকার এখনও হয় নাই—তাই হাততালি তাহার জন্য, আমাদের রবীন্দ্রনাথের জন্য, আজি তোমার কাছে আমাদের এই উপাসনা।

'রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার দীপশিখা, ধীরে ধীরে জ্বলিলে এই শিখা স্বীয় বর্দ্ধমান আলোকে চারিদিক আলোকিত করিবে, সেই অমল, কোমল, কমলশোভাসমন্বিত মুখশ্রী —সেই সলজ্জ, উজ্জ্বল ভাসা, ভাসা, ভ্রমর ভর স্পন্দিত পদ্মপলাশলোচন—সেই ঝামরচামরনিন্দিত, গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাব-বেণীবিন্যায়িত চিকুর ঝলমল মুখমন্ডল, সেই রহস্যে আনন্দে মাখানো হাসিখুশি ভরা অধর প্রান্ত, সেই সংচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র, সুন্দর, শুভ্র পরিষ্কার দর্পণোপম ললাট—ভগবানের এইরূপ অতুল সৃষ্টি কখনও বৃথা হইবার নহে। এখনও রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশার স্থল, ভরসার সম্বল। তুমি (হাততালি) না লাগিলে তিনি আমাদের দেশের গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। তুমি না লাগিলে—আর তুমি লাগিলে? তোমার সেই লক্ষ হস্তের দশ লক্ষ চটচটি প্রতিনিয়ত ধ্বনি করিলে, বীরের বীরাসন টলে, তা কোমল বঙ্গ সন্তানের কি আর স্থৈর্য থাকিবে! ভাই স্বীকার করিলাম তুমি (হাততালি) বাহাদুর,—তোমার হাতে ধরি, বিনয় করি, তুমি দিনকতক ক্ষান্ত থাকিবে নাকি?"

হাততালিকে সম্বোধন করে লেখা এই সরস প্রবন্ধটি রসিকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। প্রবন্ধটি পাঠ করে তিনি তো রেগেই আগুন! তার কেমন যেন ধারণা হল, এই প্রবন্ধে তাঁকে অপমান করা হয়েছে! ব্যস, নবজীবনের জন্য আর কোনদিনই কলম ধরলেন না তিনি। এই ঘটনার পর নবজীবনের আরও ৫৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর একটি লেখাও দেননি সেখানে। অনেকেই অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু উঁহু, রবীন্দ্রনাথের মত বদল হল না কোনমতেই! ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগে, পরবর্তীকালে অসামান্য সহনশীলতার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছিলেন যিনি, সেই রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রকে এতটা ভুল বুঝলেন, অক্ষয়চন্দ্রের প্রতি এতটা অবিচার করলেন?

অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যাবে যে অক্ষয়চন্দ্র বিনা অপরাধে তরুণ রবির হঠকারিতার বলি হলেন। দুজনের মধুর সম্পর্কে কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। ক্রমেই রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। আর তাছাড়া আরও একটা কথা, জ্যোতির্ময় রবি তখন ক্রমেই মধ্যাহ্নের দীপ্তিতে প্রখর, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের মৃত্যুর পর—সেই সম্রাটের আসনে বসবার দাবীদার তিনি ছাড়া আর তো কেউ নেই। যারা প্রাণপণে তরুণ রবিকে গালাগাল দিচ্ছে, তারাও কথার ফাঁকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে তাঁর অকল্পনীয় আবির্ভাব—এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ-ই বা কোথায় অক্ষয়চন্দ্রই বা কোথায়! সূর্য উঠলে কে খোঁজ করে নক্ষত্রের?

অক্ষয়চন্দ্র কিন্তু তাঁর ভালবাসা, আগেও যেমন, পরেও তেমন উজাড় করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের জন্য। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগে রবীন্দ্রনাথের বিরোধে তিনি এককাট্টা হয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই লড়েছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্য অশ্লীল বলে এক শ্রেণীর সমালোচক যখন মুখর, অক্ষয়চন্দ্র স্থির প্রত্যয়ে রবীন্দ্র সাহিত্যের পক্ষেই ছিলেন অবিচল। এমন কি এই প্রসংগে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যগুলি বিপক্ষ শিবিরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।

"নৈবেদ্য" পড়ে অক্ষয়চন্দ্রের সেই স্মরণীয় মন্তব্য, "রবিবাবুর নৈবেদ্য আমি মাথায় করিয়া লইয়া দেবী সরস্বতীর পাদপীঠ সম্মুখে নৃত্য করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি।"

রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার খবরে দারুণ খুশী হয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। এই প্রসংগে তিনি যা বক্তব্য রেখেছিলেন তার তুলনা হয় না। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথের রচনা রসিকের মন কেড়ে নিয়েছে আগেই। আমরা তো সবাই তাঁকে হৃদয়ের আসনেই বসিয়েছি। এই বিলিতি বাটখারায় তাঁর যে কাঞ্চন মূল্য স্থির করা হল তার জন্য উৎকট উল্লাস প্রকাশের দীনতার কি দরকার? তিনি তো আমাদের যে রবিবাবু, সেই রবিবাবুই আছেন। যে রসিকচিত্ত রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠে আনন্দ খুঁজে পেয়েছে, তার এই কাঞ্চন মূল্যের খবরে কিই বা এসে যায়? আর যারা রবীন্দ্র সাহিত্যকে ভালবাসেনি কোনদিন তারা এই খবরে ভুয়ো আনন্দ প্রকাশ করলেই বা কি না করলেই বা কি! রবিবাবুই তো আমাদের সব, তাঁকে ঘিরেই তো আমাদের আশা ও আনন্দ আবর্তিত হচ্ছে বারবার।

সময় তো থেমে নেই, দ্রুত বয়ে যায়। বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্রের লেখাগুলি পড়ে প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের মন কি বিচলিত হয় নি? তারুণ্যের অভিমান ভুলে যেতে পারেন নি? কে জানে! ১৯০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রকে তাঁর এবং তাঁর পিতা গংগাচরণের জীবনী লেখবার জন্য বার বার অনুরোধ করলেন। এই অনুরোধে খুব খুশী হয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র। পিতা পুত্র গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সেই অনুরোধ রূপায়িত। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের এই অনুরোধের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন অক্ষয়চন্দ্র। বিশ্বাস করি, এই অনুরোধের মধ্যেই অক্ষয়চন্দ্রের সংগে রবীন্দ্রনাথের পুনর্মিলনের ইংগিত চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে গেছে।

সর্ব্বাধিক দাম : টা. ১.২৫ পঃ ১০টি, স্থানীয় কর সাপেক্ষ

আলোচনা
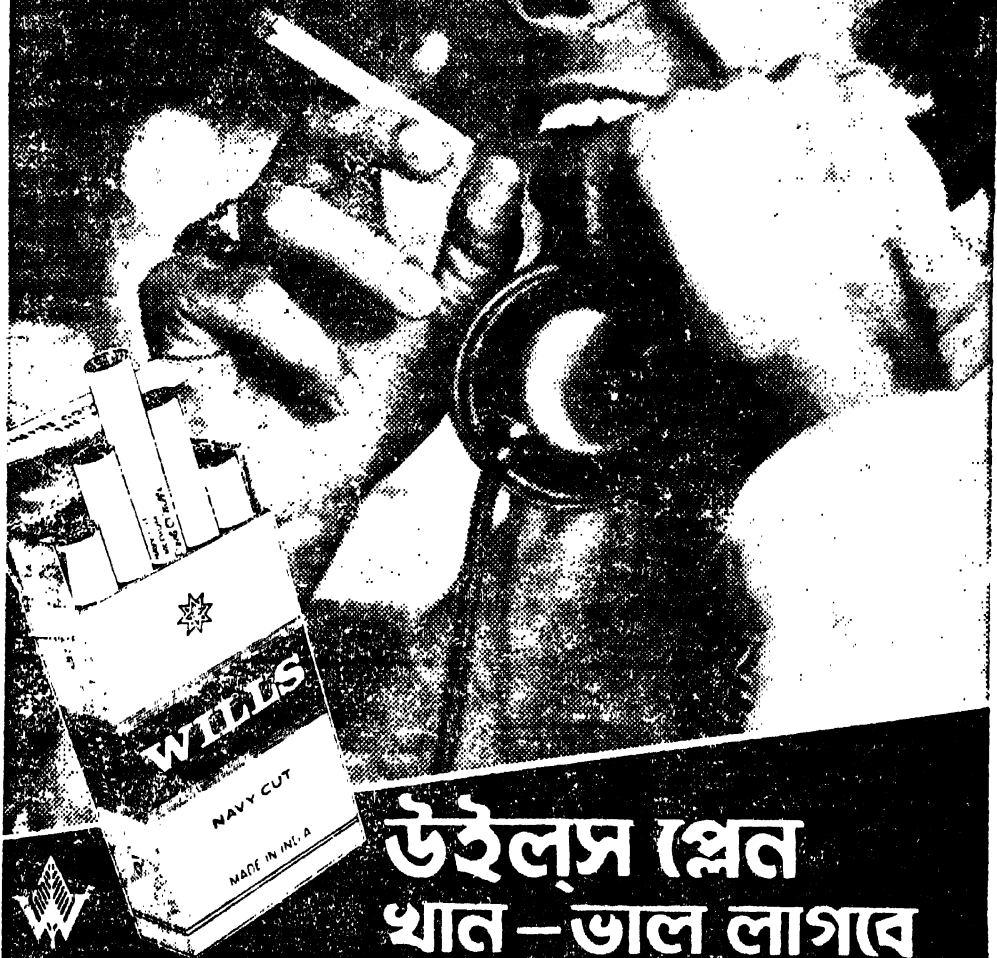
টমাস মান : জন্মশতবর্ষ স্মরণে

'দেশ' পত্রিকায় ১৪ই জুনের সংখ্যাতে অভিজিৎ টমাস মানের জন্মশতবর্ষপূর্তির যে খবর এবং গোলো মানের যে লেখাটির উল্লেখ করেছেন তার ভেতর থেকে টমাস মানের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

টমাস মানের 'বাডেনব্রুকসের' মধ্যে দার্শনিকতা বেশীমাত্রায় নেই যদিও "The book (Buddenbrooks) may imply some theory of cyclical rise and fall in the social organism."

কিন্তু 'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' শীর্ষদেশে পাঠক যখন উপনীত হন তখন তাঁর বিস্ময় 'এ কোন জগতে এসে পড়লাম?' 'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' মধ্যে টমাস মান ফিজিওলজী আর এমব্রায়োলজির প্রসংগ এনেই ক্ষান্ত থাকেননি—রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের ভাবনা উপন্যাসের বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' নায়কের অসুস্থতা হয়ত সাময়িক ছিল—কিন্তু সাময়িকতাই দীর্ঘ কয়েক বছর তাকে সেই স্বাস্থ্যনিবাসে বন্দী করে রেখেছিল। এই স্বাস্থ্যনিবাসে যদিও সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাই ছিল। টমাস মান আত্মজীবনীতে ম্যাজিক মাউণ্টেনের রচনার বিষয় উল্লেখ করে লিখেছিলেন,

> "Also The Magic Mountain profited—in respect of form—by the War, which drove me to a general revision of my principles, to the painful and conscientious searchings exhibited in The Reflections of a Non-Political Man;...." (A sketch of my Life—Thomas Mann).

'ম্যাজিক মাউণ্টেনের' স্বাস্থ্যনিবাসে নায়ক তিনজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকের দেখা পেয়েছিল। একজন মানবতাবাদী, দ্বিতীয়জনের বিশ্বাস সমাজে সর্বহারা মানুষের নেতৃত্ব আসন্ন। তৃতীয়জনের বিশ্বাস জীবনের সংগে গতির একটা যোগসূত্র রয়েছে।

এই তিন ব্যক্তি ছাড়াও পিপারকরন্ নামে জাভানিবাসী সেই ওলন্দাজ মানুষটির রাজকীয় ব্যক্তিত্বে সকলেই মুগ্ধ ছিল। অপরিমিত মদ্যপান ও রাজরোগের শিকার এই চরিত্রটি আত্মহত্যা করেছিল নায়কের সংগে তার প্রেমিকার ঘনিষ্ঠতার কথা ভেবে।

মানের লেখা পড়লেই বোঝা যায় তাঁর মধ্যে মানবতাবাদী ও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভংগী উভয়ই বর্তমান ছিল। একটু জোর দিয়েই বলা যায় যে, মানের সৃষ্ট চরিত্ররা প্রতিনিধিমূলক—কিন্তু তারা সকলেই লেখকের দার্শনিক ভাবনার প্রতিভূ।

সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মানের রচনায় প্রধান গুণ এই যে, ভাষার প্রাঞ্জলতা। এই ভাষার সাহায্যেই টমাস মান ঔপন্যাসিকের বক্তব্যকে পাঠকের ওপরে আলতো করে চাপিয়ে দেন। যুদ্ধপূর্ব জার্মানীর প্রেক্ষাপটে নায়কের অস্থিরতা এবং সেই সূত্র ধরে টমাস মান তাঁর কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। মৃত্যু, বিষাদ, নিঃসংগতা ম্যাজিক মাউণ্টেনের শীর্ষদেশে বিষন্নতার ছায়া ফেললেও,

> "Out of this universal feast of death, out of this extremity of fever, kindling the rain-washed evening sky to a fiery glow may it be that love one day shall mount?" (The Magic Mountain).

কেন লিখি, এই প্রশ্নের জবাবে মান বলেছিলেন, 'মৃত্যুর ভয়ে, ঈশ্বরের ভয়ে।' আত্মজীবনীতে মান নিজেই জানিয়েছেন, 'I have a feeling that I shall die, at the same age as my mother, in 1945." (A sketch of my life).

সোপেনহাওয়ারের দর্শন সম্পর্কে মানের নিজস্ব মত তা আধ্যাত্মিক অনুভূতি বহন করে এনেছিল আর নীটশে সম্পর্কে মতামত হল এই অভিজ্ঞতা বুদ্ধিগত এবং শিল্পসম্মত।

জন্মশতবর্ষে টমাস মানের সম্পর্কে অভিনন্দ সংক্ষিপ্ত পরিসরে যা বলেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যপাঠকদের কাছে টমাস মানের পরিচয় তিনি একজন মহৎ সাহিত্যিক।

তাপস মুখোপাধ্যায়
কোন্নগর, হুগলী।

বিধানচন্দ্র

গত ২৮শে জুন 'দেশ' পত্রিকায় (সংখ্যা ৩৫) শান্তিকুমার মিত্র মহাশয়ের 'বিধানচন্দ্রের স্বপ্নের পশ্চিমবংগ' শীর্ষক লেখাটিতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে প্রাক্তন রাজনীতিবিদ অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিচারণ নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী সার্থক প্রয়াস। বিধানচন্দ্র শুধু মানুষই ছিলেন না, ছিলেন বহুগুণসম্পন্ন একজন কর্মযোগী পুরুষ।

গ্রন্থের অতুল্যবাবু কয়েকটি টুকরো ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডাঃ রায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন ঠিক অনুরূপ প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সর্বজনের অবজ্ঞাতার্থে ডাঃ রায়ের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি গভীর সংবেদনশীলতার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

সম্ভবতঃ আজ থেকে প্রায় পনেরো-ষোল বছর আগের কথা। বর্তমান শিলিগুড়ি শহর তখন অনুন্নত জংলা ভূমি। এই শহরের উন্নতিকল্পে তদানীন্তন বিধানসভার সদস্য স্বর্গত শ্রদ্ধেয় জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করান। বর্তমান ক্রমোন্নয়মান শিলিগুড়ি শহর তারই ফলশ্রুতি। তখন এখানে একটি 'নিউ মার্কেট' নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মার্কেটটি নির্মাণের পর ডাঃ রায় সেটি পরিদর্শনে আসেন। নির্মীয়মান ঘরগুলি দেখে তিনি ভীষণ রেগে যান। বললেন, 'একি! ঘরগুলোতে একটাও জানালা নেই? তাহলে ভেন্টিলেশন হবে কি করে? মানুষ জন কেনাবেচাই বা করবে কি ভাবে?' সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের। ডাঃ রায় বললেন—'আমি দার্জিলিং থেকে সাত দিন পর আসব। এর মধ্যে আমি দেখতে চাই যেন প্রত্যেকটি ঘরে একটি করে জানালা বসানোর কাজ শেষ হয়েছে।' এখানে উল্লেখ্য প্রায় শ'খানেক ঘর নিয়ে গড়ে ওঠা এই নিউ মার্কেটটি বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র। আশ্চর্যের ব্যাপার, ডাঃ রায়ের নির্দেশিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জানালাগুলো বসানো হয়েছিল। দার্জিলিং থেকে ফেরার পথে বিধানচন্দ্র সেগুলি যথারীতি দেখতেও এসেছিলেন।

সাধারণ মানুষের অসুবিধাগুলি ডাঃ রায় খুব গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তা নিরসনের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র কালক্ষয় করতেন না।

উপরোক্ত ঘটনাটি তারই একটি নজির। বর্তমানে 'বিধান মার্কেট' নামে উক্ত মার্কেটটি সেই কর্মযোগী মানুষটির স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গের প্রতি ডাঃ রায়ের অবদান অবশ্যই চিরস্মরণীয়।

বিপ্লব ঘোষাল
শিলিগুড়ি

ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে

গান্ধী-ঘাটে গিয়েছিলাম। স্তম্ভটির গায়ে লেখা আছে দেখলাম—'ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহামান্য পণ্ডিত জবাহিরলাল নেহরু কর্ত্তৃক এই ঘাট প্রতিষ্ঠিত হইল—২রা মাঘ ১৩৫৫ ১৫ জানুয়ারী ১৯৪৯'। অপর পাশে লেখা আছে : 'পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল মহামান্য শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়ার কর্তৃক ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইল। ৫ই বৈশাখ, ১৩৫৫। ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮'। দেখলাম 'কর্ত্তৃক' বানান দু-স্থানে দু-রকম। 'জবাহিরলাল নেহরু' বানান এবং উচ্চারণে অবাক হলাম। 'রাজাগোপাল চারিয়ার' কেন লেখা হলো বুঝলাম না। 'বিজ্ঞপ্তি' পড়লাম। এক পাশে লেখা আছে 'জহর কুঞ্জ', অন্য পাশে 'জবাহির কুঞ্জ'। সেখানে 'নির্মাণ' ও 'প্রাচীর' বানান ভুল লেখা আছে। 'অনুরোধ'টাও পড়লাম, সেখানে কোলাহল, চপলতা না করা, ধূমপান না করা, জুতো না পরা, পবিত্র স্থানের শুচিতা রক্ষা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি লেখা আছে। নিতান্ত দুঃখের কথা, এগুলির কোনোটাই মানা হয় না বলা চলে। প্রশ্ন হোলো, যাঁদের উপর 'ভার' তাঁরা কি করতে আছেন? আর অসংখ্য ব্যক্তির যখন সেখানে যাতায়াত, তখন ভুল বানানগুলো শুদ্ধ কোরে দেওয়াই উচিত। তাছাড়া যাঁরা সেখানে যান, তাঁদেরও কর্তৃপক্ষের অনুরোধগুলো মেনে চলা উচিত নয় কী?

প্রবীর ঘোষ
বসিরহাট

অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলী

১৪ জুন, ১৯৭৫ তারিখের 'দেশ' পত্রিকার 'পুস্তক পরিচয়' অংশে 'অবনীন্দ্র রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় একটি ত্রুটি বিশেষভাবে চোখে পড়ল। অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপতুরীর দেশ'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক মহাশয় ঐ গ্রন্থের পালকি চলার বর্ণনার কিছু অংশ উদ্ধৃত ক'রে সেই সূত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কুহু ও কেকা' কাব্যের 'পালকির গান' কবিতাটির কথা স্মরণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উভয় গ্রন্থের প্রকাশকাল সম্বন্ধেও তিনি কিছু তথ্য জানিয়েছেন। তাঁর মতে "ভূতপতুরীর দেশ" প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে,...... 'কুহু ও কেকা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে, 'ভূতপতুরীর দেশ-এর সাত বছর পরে।" এই ঘোষণার পর সত্যেন্দ্রনাথের 'পালকির গান'-এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে তিনি মন্তব্য করেছেন, 'সত্যেন্দ্রনাথের ওই রচনার সূত্রে অবনীন্দ্রনাথের কথাও অবশ্যই অনেক আগেই উঠে পড়ত।'—সত্যেন্দ্রনাথের 'পালকির গান' আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্বসূরী হিসেবে অবনীন্দ্রনাথের কথা সমালোচক মহাশয় মনে করিয়ে দেবার আগেই যে উঠে পড়েনি, তার একমাত্র কারণ, সত্যেন্দ্রনাথের ওই রচনাটি যে কাব্যে সঙ্কলিত, সেই 'কুহু ও কেকা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে (ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ, তৃতীয় সংস্করণ, ১২৬ পৃষ্ঠা), — ১৯২২ সালে নয়; অর্থাৎ 'ভূতপতুরীর দেশ' প্রকাশিত হবার সাত বছর পরে নয়, তিন বছর আগে।

সুশোভনলাল ঘোষ
কলিকাতা-১৯

নতুন ঘন
সাটিন ডল
শ্যাম্পু
আপনার মত
সোনার মেয়ের
জন্যেই তো!
satin doll
SHAMPOO
FOR LOVELY HAIR
অনেক বেশী ঘন
এই শ্যাম্পুতে
● এত প্রচুর ফেণা হয় যে চুলকে একেবারে পরিষ্কার আর রেশমের মত নরম করে দেয় ● মন মাতানো ফুলের গন্ধে ভরা।
সাটিন ডল-এর প্রচুর ফেণা চুলের থেকে ময়লা পুরোপুরি তুলে দেয়। তারপর জলে ফেণা আর ময়লা ধুয়ে বার করে দিলে চুল একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়—আর পরিপাটী থাকে।
একটু সাটিন ডলেই আপনার চুলের উজ্জলতা বাড়িয়ে দেবে আর সেইসঙ্গে আপনার সুষমাও।
everest/823/ACW-bn

॥ চৌত্রিশ ॥

এখারে প্রায় ধমক দেবার মতো জিজ্ঞাসা ব্রীজের তলায় গমগম্ করতে লাগলো,

—"শুনতে পাচ্ছো! তোমাদের মধ্যে কেউ ইণ্ডিয়ান পেইণ্টার আছে?" আমাদের চমকে দিয়ে ওইদিকের শেষ প্রান্ত থেকে ঝাঁঝালো গলায় কোনো পুরুষ জবাব দিয়ে দিল,

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমরা সব ইণ্ডিয়ান পেইণ্টার এখানে। বিরক্ত কোরো না তো। একটু শান্তিতে থাকতে দাও।"

দেওয়ালের বোধ হয় সব কটি খাঁজ থেকেই হাসির শব্দ উঠল। ঈভলীনও চোখ মেলে ফিক্ করে হেসে দিল।

—"যত্তো সব নিষ্কর্মার দল!"

বলতে বলতে ভারী জুতোর শব্দ তুলে পেগ্গনের ছোট্ট দলটি ওদিকের শেষ প্রান্তে চলে গেল। সামান্য থমকে দাঁড়িয়ে ধন্তাকে খুঁটিয়ে দেখল বুঝি। তারপর আবার সেই বিরক্তির গলায়,

—"যত্তো অপগণ্ড এসে জোটে এখানে—" এবং আরো কি সব বকতে বকতে ওরা সরে যেতে লাগল। ক্ষীণ গলায় পাদরীর হাউ-মাউ শুরু হল আবার। আমরা দুজন বাদে বাকি সকলেই আবার যেন ডুবে গেল ঝাপসা অন্ধকার আর চার পাশের বৃষ্টির শব্দের মধ্যে।

ওরা চলে যেতেই প্রথম খেয়াল হল, আমিও ঈভলীনের কোমর রীতিমত জাপটে ধরে আছি। বেশ জোরে শ্বাস ফেলে হাত-পা-শরীর আলগা দিলুম। এবং নিজেকে আলাদা করতে করতে এতক্ষণে খেয়াল হল যে, আমি একটি সুন্দরী যুবতীকে প্রাণ-পণে বুকের সংগে জড়িয়ে রেখেছিলুম। ভরা বুক সমেত একটি আস্ত নরম শরীর ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গেল এখন। সাংঘাতিক বিপদ-আপদের ভয়ে যেন গুহায় লুকিয়ে পড়েছিলাম। বিপদ কেটে যেতে গুহা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় টের পেলাম এটা একটা গুহা ছিল। অন্ধকার, গহ্বর, সাপ-বাঘ যা খুশি থাকতে পারতো। খেয়াল করে দেখবার মতো অনুভূতি তৈরি ছিল না।

ঈভলীনের দিকে চেয়ে খুব বোকার মতো হাসলুম। হেসে, আরো বেশি বোকার মতো ধন্যবাদ দিয়ে ফেললুম,

- "মের্সি। মের্সি মাদাম!"

গহন সমুদ্রের সেই নীল চোখে তাকিয়ে আছো। আমার কথা শুনে কেমন করে হাসলে। এক মুহূর্তে মনে হয়েছিল, তুমি। হাসতেই ফিরে এলুম। না, তুমি নও, বউ। ঈভলীন। একটা ভয় সরে গিয়ে অন্য একটা গুড়গুড় করে উঠল বুকে। এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, এ আমার সংগে কতদূর যাবে! ও বললে,

—"এবার যাওয়া যাক। চলো।"

ওকে বাজিয়ে দেখবার ইচ্ছে হল হঠাৎ। বললুম,

—"তাড়ার কি' আর একটু থাকি না এখানে? জায়গাটা ভালো!"

মুখ টিপে হাসল। বলল,

—"হ্যাঁ। বেশ নির্জন।"

তারপর, দেওয়াল থেকে পিঠ তুলে এসে এক পা এগোল। আমার হাত ধরে বলল,

—"আসা যাবে, ইণ্ডিয়ান! পুলিসে তাড়া করলে, 'আবার আসা যাবে।"

বলে হাঁটতে লাগলো আগে আগে।

ও বাজলো ঠিকই। সুরেই বোধ হয়। কিন্তু কোন্ সুরে বোঝা গেল না। রোজমারীর মুখটা মনে পড়ল। হাসলে যার গালে ভাঁজ পড়ে। ভাঁজ পড়লে বয়েস ওঠে লাফিয়ে। রোজমারীর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। ও তো করেইনি। আমিও আর গা করিনি বিশেষ। তবে, ওর সঙ্গে ওই রকম একটা কাণ্ড না হয়ে গেলে, আমি বোধ হয় আবার ভুল করতুম। আরো বড় জায়গায়, আরো বেশি ক্ষতি হওয়ার ময়দানে। ঈভলীনের সংগেই হয়তো ভুল থেকে ফেলতুম। ধন্যবাদ রোজমারী। মের্সি বোকু'

এ মেয়েটি কোন্ সুরে বাজে, বুঝতে পারি না। বড় সাবধানে আছি। গুবরেটাকে আর আমল দিতে চাই না। বিশ্বাস নেই ও শালার। তাই, আমি আছি, বউ। তোমাকে চিঠিতে যদি এসব লিখতুম, তাহলে চিঠির ভাষায় লেখা যেত, 'আমি সাবধানে আছি।'

তুমি লিখেছো, যেন আমি সাবধানে থাকি। চিঠি দিই। তোমার দাদা লিখেছেন, তাঁর বন্ধুর নার্সিং হোমে তোমার নাম লেখানো হয়ে গেছে। তোমাদের সব খবর পাচ্ছি, বউ। কিন্তু আমার চিঠি লেখার সময় নেই। ইচ্ছেও করে না। তা ছাড়া, চিঠি লিখতে বসলে তোমাকে নিয়ে আমার সব অভিযোগের খবর যদি ভুল করে লিখে ফেলি। যদি আমার কাটা তর্জনীর কথা, কালো একটা লম্বা উলঙ্গ মানুষের সঙ্গে তোমার সুখের শব্দকে ঘিরে আমার যন্ত্রণার কথা—খামের ভিতরে করে তোমার কাছে চলে যায়, তবে বড় সর্বনাশ হবে। এই সময় মায়েদের মন নাকি হালকা রাখতে হয়, খুশি রাখতে হয়। নাড়িতে নাড়িতে যোগ। গর্ভের সন্তানেরও নাকি ক্ষতি হয়। চিঠি লিখতে ভরসা পাই না। সেই জন্যেই মনে মনে কথা বলি তোমার সংগে। খুঁটিনাটি সব কথা প্রায়। ভালো থেকো। সুস্থ থেকো। নিশ্চিন্ত মনে আচার খেতে খেতে তোমার দাদার বন্ধুর নার্সিং হোমে চলে যাও। ফেরার সময় আর একটা প্রাণ নিয়ে এসো। আমার নামের খুব কাছাকাছি প্রাণ।...

জর্জ যেন কি বলল। জিগ্যেস করলুম,

—"অ্যাঁ! কি বলছো?"

জর্জের জবাব,

—"কফির জল তো সব শুকিয়ে গেল, ইণ্ডিয়ান।"

খাটের ওপরে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়, ছবি-দেখা শেষ হয়েছে ওর। হাতের বর্ষাতিটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিলুম। হিটার বন্ধ করে কফির গুঁড়ো ঢেলে দিলুম সসপেনে। বললুম,

—"ছবি কেমন দেখলে?"

জোরে জোরে মাথা দুলিয়ে জর্জ বলল,

—"ভালো, ভালো। খুব ভালো। তবে—"

—"তবে কি?"

—"ক্রেতাদের কথা ভেবে, মানে, কিছু মনে কোরো না ইণ্ডিয়ান, আর একটু জমকালো রং ব্যবহার করলে পারতে—"

বসে, পিটপিট চোখে তাকিয়ে থাকলো আমার দিকে। গেলাসে অর্ধেক অর্ধেক কফি ঢেলে বললুম,

—"দারিদ্র্য এবং নিঃসঙ্গতার রং কি খুব জমকালো?"

ধীরে ধীরে আবার মাথা দোলাচ্ছে জর্জ। গেলাসটি হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরল। বলল,

—"তুমি রাজা হবে ইণ্ডিয়ান। ছবি আঁকতে বসে আপোস কোরো না। আমি জেনে গেলুম, তুমি রাজা হবে একদিন। চিয়ার্স।"

ওর বলার ধরনে বুক ভরে গেল। সামনা হাসতে গিয়ে লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল মুখে। আমিও কফির গেলাসে চুমুক দিয়ে বললুম,

—"ধন্যবাদ জর্জ।"

হুশ হুশ করে গরম কফি শেষ করল। করে, একটা আরামের শব্দ তুলল।

—"আঃ।" তারপর বলল,

—"বর্ষাতিটা হাতে নিয়ে অত কি ভাবছিলে?"

চারমিনারের শেষ প্যাকেটটি থেকে সিগারেট ধরিয়ে বললুম,

—"এই বর্ষাতিটা কি করে বেচে দেওয়া যায়, তাই ভাবছিলুম।"

জর্জ অবাক,

—"সে কি? বর্ষাতি বেচবে কেন? এই শীতে-বৃষ্টিতে বেরোবে কি করে?"

—"বৃষ্টি তো শেষ হয়ে এল বলে।"

ওর পাশে গিয়ে বসলুম। বললুম,

—"তা ছাড়া টানাটানি শুরু হয়েছে একটু। তুমি নিয়ে নেবে এটা? পারো তো কাউকে গছিয়ে দাও। যা হোক কিছু পেয়ে গেলেই আমার আপাতত চলবে।"

ঈশ্! তখন যদি জানতুম বউ, কি কঠিন সাহায্য চেয়ে ফেলেছি জর্জের কাছে! ও জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত। যেন কিছু ভাবল। তারপর ঝট করে মুখ তুলে দেখল আমায়। সেই দুষ্টুমির হাসি। তখন বুঝিনি ওই এক ফালি হাসি দিয়ে চারপাশের সমস্ত অসুখ ও দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বলল

—"বর্ষাতি নেব না। তোমাকে একশো ফ্রাঁ দিয়ে যাব আমি।"

বেশ রুক্ষ গলায় জবাব দিলাম,

—"না। দান আমার চাই না জর্জ। ধন্যবাদ।"

ও তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরল,

—"দান নয় ইণ্ডিয়ান। ধার দিয়ে যাচ্ছি। তোমার ছবি বিক্রী হয়ে গেলে শোধ দিও। ডাকে পাঠিয়ে দিও।"

ঠিক বুঝতে পারিনি তখনো। ভুরু কুঁচকেই জিজ্ঞেস করলুম,

—"ডাকে পাঠাবো কেন? ধার নিলে, নিজে গিয়ে দিয়ে আসব বাড়িতে।"

ও হাসল। বলল,

—"ও বাড়ি ছেড়ে, মানে, প্যারিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা। বেশ দূরে। আমাদের গ্রামে। দক্ষিণ ফ্রান্সের শেষ প্রান্তে।"

তারপর সেদিন ঘুম ভাঙতেই হঠাৎ একেবারে সকাল। এমন সকাল যেন কত যুগ দেখিনি। কাচের দরজা পেরিয়ে বারান্দায় রোদ যেন হয় না কখনও। এতগুলো বৃষ্টির বিষণ্ণ দিনরাত্রির পর সূর্য এক অলৌকিক ঘটনা। এমন সূর্যের দিনে কেউ মুখ কালো করে এ শহর ছেড়ে চলে যাবে, ভাবতেই পারছি না। দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। মনে হল, পৃথিবীতে প্রথম সূর্য উঠেছে। হলুদ একটা মস্ত ফুলের মতো পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে সারা আকাশে। নতুন নতুন লাগছে সব কিছু। যেন সামনের রূপোলী বাড়ি ছিল না কখনো। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হল। যেন কোনো নরওয়ের ছাত্রাবাস ছিল না এপাশে। রোদ পড়তেই মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। দেশে বসে টেরই পাই না সূর্য কি জিনিস। এখানে হঠাৎ সূর্য উঠলে আপনা থেকে মনের মধ্যে বাজতে থাকে—"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং, ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্—"।

শীত আছে যথেষ্ট। শীতের বাতাস নেই। বৃষ্টিতে ভেজা পিচের কালো পথ এখন রোদ পড়ে চকচকে। আকাশে তাকালে মনে হয় মেঘ বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। অনেক অনেক দিন পর মোঁমার্তে মেলা বসবে। যিশু টেনিস ড্রয়িং বোর্ড হাতে ঘুরে বেড়াবে। অথচ, ওরা কেউ জানবে না, আমাদেরই মতো এক শিল্পী হাসতে হাসতে হেরে চলে যাবে দূরে। আমার পয়সার খুব দরকার। কিন্তু, আজ আমি মোঁমার্তে মুখ চেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারব না।

জর্জের কাছ থেকে টাকা নেবার আর প্রশ্নই ওঠে না। ও তবু বলেছিল,

—"ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান। এক কাজ করা যাক। তোমার বর্ষাতিটা দাও। আসছে মঙ্গলবার আমার বাড়িতেই নিলাম হবে। তোমার বর্ষাতিও নিলামে তুলে দেব। যা পাওয়া যায়।"

আমি দিইনি। মন এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, ওর সঙ্গে আর আমার বর্ষাতি বা ছবিটবির নিয়ে কথাই বলিনি। পরে, যিশুকে গছিয়ে এসেছি ওটা। ও আমাকে একশো ফ্রাঁ নগদ দিয়েছে। বলেছে,

—"এই বাদলা-বিষ্টিতে বর্ষাতি বেচছো যখন, তার মানে বড় ফাঁপরে পড়েছো। আমি তোমাকে কিছু ফ্রাঁ ধার দিলে নেবে?"

'না' বলেছিলুম বলেই ওটা রেখে একশো ফ্রাঁ দিয়ে দিয়েছে। ভিজতে ভিজতে রু দ্য বুক্রার্টের দোকান 'এসকিস' থেকে বেশ দামী একটি সুন্দর রংয়ের বাক্স কিনে এনেছি। আজ সকালেই রোদ।

সেই রংয়ের বাক্স পকেটে নিয়ে ম্যালমেজোঁর এই গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ভাবছি, ঢুকবো কি ঢুকবো না। গেট পেরোলেই উঠোন। উঠোনের ওপারে সোজা সেই একতলা লম্বাটে ঘর দুটি দেখতে পাচ্ছি। জর্জ আর জানীর আতেলিয়ে। ভাস্কর এবং শিল্পীর স্টুডিও। যার দেওয়ালগুলোতে শুধু কংকালের মতো পেরেক দাঁত বের করেছিল। কয়েকটি ছবি শুধু মেঝের কার্পেটে রাখা। তখন বুঝতে পারিনি, এরা চলে যাচ্ছে প্যারিস ছেড়ে। তখন বুঝতে পারিনি, স্বামী-স্ত্রী এই স্বর্গরাজ্যে কি করুণভাবে হেরে গেছে। এদের বাড়িতে প্রথম দিন এসে মনে মনে বোধ হয় একটু ঈর্ষাই হয়েছিল। ভেবেছিলুম, খুব সচ্ছল অবস্থা। দেশে আমার কার্পেট পাতা ঘর থাকলে ক্লিনিকের চামড়ায় মোড়া সোফা, গাড়ি, টেলিফোন থাকলে আর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হত না। সেইসব ভাবনাগুলি বিকৃত মুখে হাসতে হাসতে আমারই গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে আজ। মনে আছে, জর্জের কাজের ঘরে ঢুকে সেদিন দেখেছিলাম কিছু নেই। শুধু প্লাস্টার, কাঠের গুড়ো ছড়িয়েছিল সারা ঘরে। প্রতিমা নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেবার পর যেমন পুজো মণ্ডপে ছেঁড়াখোঁড়া, টুকরো, পরিত্যক্ত জঞ্জাল পড়ে থাকে, জর্জের পুজোর ঘরও তেমনি পড়েছিল। কারণ জিজ্ঞেস করতে কেমন অদ্ভুত হেসে বলেছিল,

—"বিক্রি হয়ে গেছে। সব বিক্রি হয়ে গেছে।"

সেদিন কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু একটু অবাক হয়েছিলুম। আজ সব কথা একটি একটি করে কাঁটার মতো খোঁচা দিচ্ছে স্মৃতির পর্দায়।

—মঁসিয়। ছবি আঁকা কি দোষের?'

জীবনের সব কিছু পণ করে জুয়ো খেললে দোষের। হেরে গেলে ছবি আঁকার প্রতি ঘৃণা ধরে যায়। তবু, ছাড়া যায় না। মুখ থুবড়ে শিল্পময় পৃথিবীর ধুলোয় পড়ে গিয়ে সারা মুখ, মন, শক্তি, আশা ক্ষত-বিক্ষত হলে মনে হয়, আমি, আমার স্ত্রী অথবা আমরা যে পরাজয়ের গ্লানি বয়ে বাকি জীবনটুকু কাটাতে বাধ্য হব, আমাদের সোনাছেলে যেন সে ভুল না করে। রং, ক্যানভাস, সৃষ্টি অথবা নাম-সম্মানের

জুয়োখেলায় সেও যেন মেতে না ওঠে। ওকে তাস চিনতে দিও না। তাস ভালো লাগলে সেই তাসের প্যাকেট বা রংয়ের বাক্স আলমারিতে চাবি বন্ধ করে রাখো। যাতে রংয়ের প্রতি লোভ অংকুরেই মরে যায়। বড় কষ্ট। বড় কষ্টে একমাত্র ছেলের ছবি আঁকার ছেলেমানুষি ইচ্ছেকে তার নাগালের বাইরে তুলে রাখে জর্জ। একটা গোটা জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, পরিশ্রম সবকিছু হেরে গিয়ে কি ভয়ংকর আতংকে, কি অসহ্য বেদনায় ফিলিপকে ছবি আঁকতে দেখলে সে ছবি, সেই খেলা-শেখার তাস ছিঁড়ে ফেলতে হয় তা কি আর কাউকে বলে বেড়াবার কথা—আজ এই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সব বুঝতে পারছি, বউ। কারণ, জর্জের বাড়ির উঠোন আজ খালি নেই। ফ্রিজ, আলমারি, চেয়ার, সোফাসেট, বইপত্র সারা উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কাগজে দেখেছিলুম, এগারোটা থেকে নিলাম শুরু হবে। নিলামওয়ালা আসেনি এখনো। কোম্পানীর অফিসবয় গোছের দুটি ছেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। জর্জ-জানী-ফিলিপ কেউ নেই উঠোনে।

একবার ভাবলুম ফিরেই যাই। কলকাতার শ্মশানঘাটে রাত-বেরাতে যেতুম। ঘুরে বেড়াতুম বন্ধুদের সংগে। গাঁজা, ভাং অথবা যে কোনো নেশায় চুর হয়ে আরো নেশার খোঁজে রোমাণ্টিক ভাবনায় দল বেঁধে উদাস সাজতে চলে যেতুম কেওড়াতলায়। আধা পরিচিত পাড়ার লোক পোড়াতে শ্মশানে যাওয়ার মধ্যে যে উচ্ছলতা বা হুল্লোড় খেলা করতো মনে, প্রায় সেই মন নিয়েই আত্মীয়স্বজন পুড়িয়ে বেড়িয়েছি।

অথচ, এখন জর্জ, জানী বা ফিলিপের মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করছে না। কী বলব! এরা তো আমার কেউ নয়। এদের জন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তবু, স্ট্যালিনের গোঁফের নিচে এক ফালি হাসি আমাকে এখন এই গেটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে ভরসা দিচ্ছে না। কী কথা বলব! রাজ্যপাট হেরে গিয়ে প্রাসাদের বাইরে খালি পায়ে রাজা রাণী অথবা রাজপুত্র দাঁড়িয়ে থাকলে তাদের কী বলতে হয়!

বুক সমান উঁচু গেটের হাতল ধরে এইসব ভাবছি, ডানদিকে ড্রয়িং রুমের দরজা খুলে গুটি গুটি ফিলিপ বেরিয়ে এল। কপালের ওপর চুল, লাল জ্যাকেট গায়ে ছোটো রাজপুত্র উঠোনে এসে দাঁড়াল সোফা সেটের গা ঘেঁষে। তেমনি সরল চোখদুটি জিনিসপত্র দেখতে দেখতে এদিকে ঘুরল। আমাকে দেখে ধীরে ধীরে হেঁটে এগিয়ে এল। মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন নেই। আগের মতোই গম্ভীর।
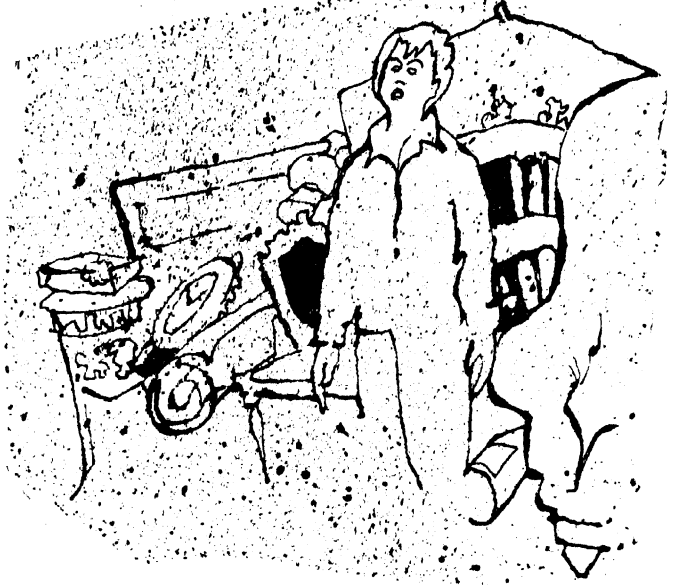
মৃদু মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "ব' জুর, মঁসিয়।"

কাছাকাছি এসে মৃদু মাথা ঝুঁকিয়ে বলল,

—'ব' জুর, মঁসিয়।'

এই ভঙ্গিটুকু দেখলেই জর্জের ছোটোবেলা ভেবে নেওয়া যায়। এতক্ষণ যে ঝামেলা ছিল না, এইবারে সেটা টের পেলুম। পাপার মতো ফিলিপের মাথা ঝুঁকিয়ে আমাকে অভিবাদন জানানোর সংগে সংগে বুঝতে পারলুম, আমার চোখ করকর করছে। ওর দিকে চেয়ে অল্প হেসে সামলে নিলুম। টেনে গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললুম,

—'ব' জুর, ফিলিপ! তোমার পাপা কোথায়?'

—'সকালবেলা বেরিয়ে গেছে। এক্ষুনি আসবেন। আপনি ভেতরে আসুন। মা আছেন।'

তারপর কিছু না ভেবে, না বুঝেই বলল,

—'আপনি কী কিনবেন, মঁসিয়?'

সব বিক্রি হচ্ছে। লোকে কিনবে। আমিও নিশ্চয়ই কিছু কিনতে এসেছি, এই সহজ ভাবনা থেকেই ও আমাকে জিগ্যেস করল। আমি কি জবাব দেব! ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ঘরের দরজার দিকে হাঁটতে লাগলুম।

সারা উঠোনে একটা গোটা সংসার। অবিন্যস্ত, পরাজিত সংসারের ছবি। বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা সোফা সামান্য কাত হয়ে পড়ে আছে। হাতলের কাছে ঝুলছে সেই সুন্দর হরিণের চামড়াটি। শৌখিন জিনিস আর বইপত্র-ভর্তি কাচের আলমারিটিও সোফার কাছে দাঁড়িয়ে। তাক টুকিটাকি জিনিসগুলি আগোছালো। মোটা মোটা খণ্ডে পৃথিবীর শিল্পজগতের ইতিহাস। দেলাক্রোয়া, গেরিকোল্ট, দা ভিঞ্চি থেকে এ যুগের পিকাসো, ব্রাক্ পর্যন্ত প্রায় সব শিল্পীর জীবন ও ছবির বই নিচের তিনটে তাকে ঠাসা। সবাই গায়ে গায়ে ঢলে পড়ে হাসছে মনে হল। ছবির জগতের সেইসব লড়িয়েদের নামগুলি যেন কথা বলছে.

—'ওহে ছোকরা! অতো সোজা নয়, ছবি এঁকে বিখ্যাত হবে। গাড়ি-বাড়ি-টেলিফোন করবে—তোমার বন্ধু আর তার বউকে জিগ্যেস করো, অতো সোজা নয়! তুমি তো কোন্ হরিদাস পাল বিদেশী, এরা চোদ্দ পুরুষ ধরে ফ্রান্সের অধিবাসী। এই স্বর্গরাজ্যে এসেছিল—হুট্ করে নাম-দাম উপার্জন করা যাবে ভেবে। চাকরি নট্ হয়ে গেল। যাও বাছা, গাঁয়ে ফিরে যাও! ক্ষেত-খামার দ্যাখো গে—'

সোনার জলে লেখা নামগুলো দেখতে দেখতে এইসব কথা শুনতে পাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি, নিজের অজান্তেই হাত কখন পকেটে চলে গেছে। শক্ত মুঠোয় ধরে আছে দেশলাই। আর একটু হলেই বইগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতুম। আপন মনের ভয়ের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে চলবে না। জর্জের চলে যাওয়ার তোড়জোড়ে কষ্ট হচ্ছে, আর একটু একটু ভয় উঁকি দিচ্ছে ভেতরে।

পাশে তাকালুম। সেই সুন্দর দামি কার্পেটটি গোল করে রাখা। এর ওপরে

বোয়াগর্নাতিয়ে পরিবারের ঠাটা, চলা শেষ হয়ে গেছে। এক-একটি পরিচিত জিনিসে চোখ পড়ছে আর ভাবছি, সব বিক্রি হয়ে যাবে। বোয়াগর্নাতিয়েরা আজ প্যারিসের ক্রেতাদের সামনে নিলামে দাঁড়াবে। জজ মাথার টুপি খুলে দুহাত ছড়িয়ে বলবে,

—কিনে নিন, বন্ধুগণ! আমাদের স্বপ্ন-সাধের ছাব-আঁকা মিটে গেছে। নামমাত্র দামে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। স্বপ্ন-সাধ কিনে নিন!'

জানীর খোঁজে ড্রয়িংরুমের দরজার দিকে এগোতেই ছোট্ট একটি প্রশ্ন মনে এল। সবই তো গেল! যেতে যেতে সেই দুষ্টুমির হাসিটিও হারিয়ে যাবে! নিলাম-ওয়ালা যখন হাতুড়ি ঠুকে বলবে,

—চলে গেল দেলাক্রোয়া, ভ্যানগঘ্-দা ভিঞ্চির জীবন ও স্বপ্ন—সব চলে গেল! সাতশো চল্লিশ ফ্রাঁ—এক, সাতশো চল্লিশ ফ্রাঁ, দুই—'

স্ট্যালিনের মতো কোনো গোঁফের নিচে সেই দুষ্টুমির হাসি টেনে, গ্রাম থেকে ছিটকে আসা এক ফরাসী শিল্পী কি তার চোখ অথবা হৃদয় ভিজতে দেবে না!

ক্রমশ

বিশ্ব বিজ্ঞান

বিজ্ঞান এবং মানবিক প্রশ্ন

....the progress is never realized as we expect it to be : it is none the less realized because it takes entirely different paths from those we have marked out for it. (from John Christopher)—**Romain Rolland.**

প্রসঙ্গটি এইভাবে তোলা যেতে পারে।

এক বৃদ্ধ। বয়েস ৯০। যথেষ্ট বিত্তবান। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর তাঁর মূত্রাশয়টি নষ্ট হয়ে গেল। চিকিৎসক বললেন, এ-রোগীকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে একটি পথই খোলা আছে। দরকার একটি কৃত্রিম মূত্রাশয়।

রোগীর পুত্র প্রশ্ন করলেন, জিনিসটা জোগাড় করা কি খুবই শক্ত?

চিকিৎসক বললেন, শক্ত নয় তবে ব্যয়সাপেক্ষ। একটি কৃত্রিম মূত্রাশয়ের দাম প্রায় ষাট হাজার টাকা।

তা হোক। এ টাকা আমরা খরচ করতে পারব।

তারপর এক মুহূর্ত কি ভেবে পুত্র আবার প্রশ্ন করলেন, যন্ত্রটি লাগানোর পর কতদিন তিনি আরও বাঁচতে পারেন?

প্রশ্নটি শুনে চিকিৎসক যৎসামান্য যেন ভেবে নিলেন। হয়ত খতিয়ে দেখলেন এ পর্যন্ত সেই বৃদ্ধ রোগী সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাবলী। হ্যাঁ, তিনি জানেন, এ রোগী বেশিদিন বাঁচবেন না। কারণ, এ রোগ বার্ধক্যজনিত রোগ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এ ধরনের দশার রোগীকেই বলা হয় টারমিনাল কেসেস। হয়ত এ কথা ভেবেই তিনি জানালেন, কিছু দিনের জন্যে বেঁচে যাবেন বলেই মনে হয়। যদি কোন উপসর্গ দেখা না দেয় অন্তত বছর পাঁচেক বাঁচবেন।

রোগীর পুত্র চিকিৎসকের কথা শুনে খুশী হয়ে বললেন, ধন্যবাদ ডাক্তার। আমার বাবার জীবনের জন্যে ষাট হাজার টাকা আমি খরচ করতে পারি। হ্যাঁ, আরও কি যেন বলছিলেন আপনি? এ ছাড়াও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ মাসে হাজার চার টাকা খরচ করতে হবে, তাই না? তা হোক। আমার বাবা তো আরও পাঁচ বছর বেঁচে থাকতে পারবেন।

এটা প্রথম উদাহরণ।

এক নজরে
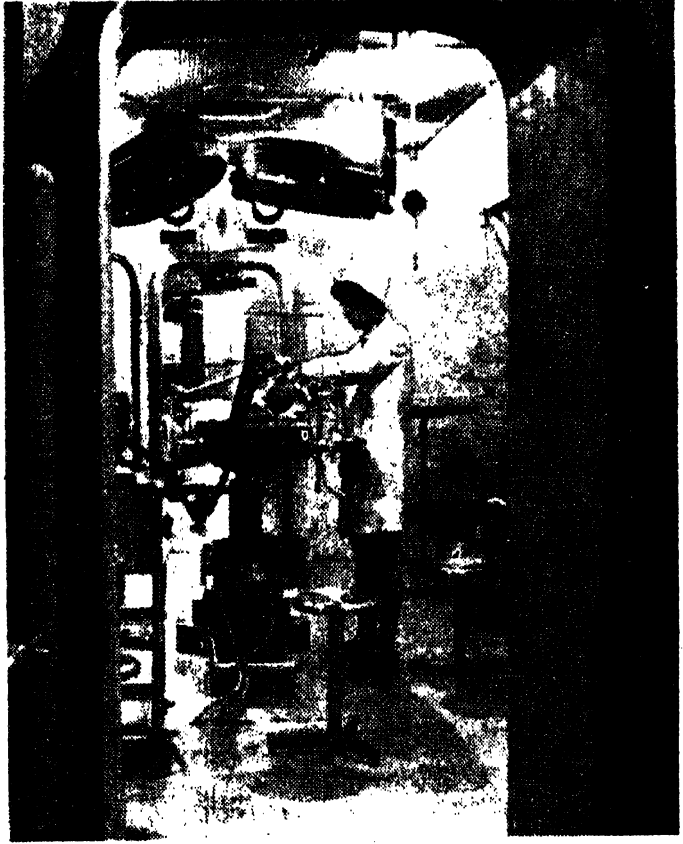
শল্য চিকিৎসার জন্যে তৈরি ইউরোপের প্রথম সচাপ কক্ষ। সাধারণ বায়ুচাপের চেয়ে বেশি চাপে এই কক্ষে অকসিজেন গ্যাস ঢুকিয়ে দিয়ে অপারেশনের কাজ চালান হয়ে থাকে। এটি তৈরি করেছেন সোভিয়েত দেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিসার্চ ইনসটিটিউট অব ক্লিনিক্যাল এবং এক্সপেরিমেন্টাল সার্জারি। বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের কক্ষে হৃদরোগ এবং রক্তসংবহনজনিত রোগের অস্ত্রোপচার অনেক বেশি সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়।

উল্লেখ্য, পৃথিবীতে প্রথম সচাপ কক্ষে অস্ত্রোপচার করেছিলেন রুশ বিজ্ঞানী আকাদেমিশিয়ান পেত্রোভস্কি। অস্ত্রোপচার করেন ৩৬ বৎসর বয়স্কা মস্কোবাসিনী আনা দনস্কাইয়ার দেহে। ভদ্রমহিলা জটিল বাত রোগে ভুগছিলেন। এই সময় তাঁর হৃৎপিণ্ডের ফাঁককে বাড়িয়ে তুলতে হয়েছিল। স্বাভাবিক কক্ষে এ অবস্থায় বিপদ ঘটে। কিন্তু সচাপ কক্ষে অস্ত্রোপচার করার দরুন আনার কোন বিপদ ঘটেনি।

দ্বিতীয় উদাহরণটি ছিল এই রকম।

ছেলেটির বয়স পনের। গরীব ঘরের ছেলে। যথেষ্ট ভাল স্বাস্থ্য। হঠাৎ অজ্ঞাত এক ভাইরাসঘটিত রোগে তার মূত্রাশয়টি অকেজো হয়ে গেল। চিকিৎসক ছেলেটির বাবাকে বললেন, আপনার ছেলের স্বাস্থ্য ভাল। ওর রোগ সারিয়ে তুলতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পারি নি। তবে এখনও একটি মাত্র উপায় আছে যদি একটি কৃত্রিম মূত্রাশয় পাওয়া যেত ছেলেটিকে হয়ত আরও বছর বিশেক বাঁচিয়ে রাখা যেত। এমনও হতে পারে এই বিশ বছর কৃত্রিম মূত্রাশয়ের সাহায্য পেয়ে তার নিজের মূত্রাশয়টি হয়ত ভালও হয়ে যেতে পারে। তখন সে কিন্তু বছর কেন, আরও ষাট সত্তর বছরও স্বাভাবিক জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

চিকিৎসকের মুখে এমন স্বপ্নের আশার কথা শুনে ছেলেটির বাবা সজল বিশ্বাসে চিকিৎসকের দু হাত চেপে ধরে বললেন, তা

হ্যাঁ তাই করুন ডাক্তারবাবু। একটা কৃত্রিম মূত্রাশয়ই না হয় আমার ছেলের জন্যে জোগাড় করে দিন।

বাবার কথায় ডাক্তার গম্ভীর হলেন। সম্পূর্ণ অসহায়ের কণ্ঠস্বরে বললেন, আপনার ছেলের জন্য আমি তা জোগাড় করে দিতে পারব না। তার যে দাম অনেক। ষাট হাজার টাকা। আরও কত খরচ। অত টাকা আপনি পাবেন কোথায়?

এ কথা শোনার পর বাবা পাথর হয়ে গেলেন।

দুটিই বাস্তব ঘটনা। সমস্যা কৃত্রিম মূত্রাশয় এবং দুটি রোগী। প্রথমজন বৃদ্ধ। অর্থবান। কিন্তু টার্মিনাল কেস। দ্বিতীয় জন কিশোর। দরিদ্র। কৃত্রিম মূত্রাশয়টি পেলে হয়ত দীর্ঘদিন সে বেঁচে থাকতে পারে। তার দীর্ঘ জীবন অনেক কিছু উপকার করতে পারে। যদি সে তেমন ধরনের মেধাবী হয় তার সাহায্যে বৃহৎ মানব সমাজও উপকৃত হতে পারে।

প্রশ্ন এই, এই কৃত্রিম মূত্রাশয়টি কাকে দেওয়া উচিত?

সন্দেহ নেই, এ প্রশ্ন জটিল।

নৈতিকতার দিক দিয়ে ওই বৃদ্ধ এবং কিশোর দুজনের জীবনই সমতুল্য। হতে পারে, বৃদ্ধ আর পাঁচ বছর বাঁচবেন, কিশোরের চেয়ে অনেক কম। তবু, মৃত্যুকে যেখানে ঠেকিয়ে রাখা মুহূর্তের জন্যেও সম্ভব নিশ্চয় কেউ সেখানে বলবেন না, সেই সময়টির আগে তাকে মেরে ফেলা হোক। আবার এটাও সত্য, সেই কিশোর জীবনের গৌরচন্দ্রিকা যার কাছে সদ্য ঘটনা, ভাইরাসের আকস্মিক আক্রমণে যে মুমূর্ষু তাকে যদি দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়, কেন বাঁচান হবে না?

মুশকিল এই, একজনের প্রচুর অর্থ আছে। শুধু তার সাহায্যেই কৃত্রিম মূত্রাশয়টি সে কিনে নিয়ে জীবনকে দীর্ঘতর করতে পারে। (জানি না আদৌ তার প্রয়োজন আছে কি না।) আর একজন, তার যেহেতু অর্থ নেই, মূল্যবান এই যন্ত্রটি সে জোগাড় করতে পারল না। ফলে মৃত্যু তার কাছে অপরিহার্য না হয়েও, মৃত্যুকে তার স্বীকার করে নিতেই হলো।

দ্বন্দ্ব এখানেই।

কারণ বিশেষ এই উদ্ভাবনার মূলে যে সব বিজ্ঞানী কাজ করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল একটিই। যদি কারোর নিজস্ব মূত্রাশয় ঠিকমত কাজকর্ম না করতে পারে, তাঁদের এই যন্ত্রের সাহায্যে সে কাজে সাহায্য করা। তখন নিশ্চয় তাঁরা ভাবেন নি, তাঁদের এই উদ্ভাবনায় সমাজের বিশেষ একশ্রেণীর মানুষই লাভবান হবেন।

এবং বলা বাহুল্য, একটি নয়। আধুনিক বিজ্ঞান গত দুই দশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনার পথ সম্প্রসারিত করেছে, তবে তাতে চমৎকারিত্ব যেমন আছে ঠিক সেই সঙ্গে অনেক জটিল মানবিক প্রশ্নেরও তাঁরা সূচনা করেছেন।

পরিবেশ দূষিতকরণের কথাই ধরা যাক। নিশ্চয় কেউ বলেন না, মানুষ গোড়া থেকে ইচ্ছে করেই তার পরিবেশকে ধোঁয়া ধুলো, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, শব্দ প্রভৃতির সাহায্যে কলুষিত করছে। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একে একে গড়ে উঠছে নতুন ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা। এই সব প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে গড়ে উঠছে নানা রকমের কলকারখানা। সেখানে তৈরী হচ্ছে হাজার রকমের শিল্পসামগ্রী। এই সব শিল্পসামগ্রী আজ পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষের জীবনের মানে কত পরিবর্তন ঘটিয়েছে, নিশ্চয় কেউ অস্বীকার করবেন না, এই পরিবর্তন স্বাচ্ছন্দ্যের সূচক নয়।

কিন্তু এই স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত যে পাওনা, তার কথা ভাবলেও তো আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। শহর এবং কলকারখানার শব্দে সহস্র মানুষের কানে শোনার ক্ষমতা আজ অবদমিত। নানা রকম রাসায়নিক ওষুধ রোগ নিরাময় যেমন করছে, সেই সঙ্গে তার উত্তরফলস্বরূপ গড়ে উঠছে কত রকমেরই না জটিল মানসিক রোগ। পারদ জলের সঙ্গে মিশে মাছের দেহে গিয়ে জমছে। সেই মাছ খেয়ে পারদকে মানুষ তার নিজের দেহের মধ্যে এনে পুরে দিচ্ছে। যার উত্তরফল জটিল স্নায়বিক রোগ, মানসিক বিকৃতি।

কৃত্রিম জেনেটিক কোড নিয়ে ইদানীং কত রকমের পরিকল্পনার কথাই না চলছে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে আশাবাদী। তাঁদের ধারণা, এমন দিন হয়ত আসবে যখন মানুষ কৃত্রিম উপায়ে জীব-কোষ তৈরী করতে পারবে। হয়ত বা দেখা গেল কারোর কোষের ক্রোমোজোম অস্বাভাবিক। এর জন্যে তার দৈহিক এবং মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ব্যাহত হচ্ছে। তখন এমন হয়ত কিছু করা সম্ভব হতে পারে, কৃত্রিম পদ্ধতিতে তার ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা নষ্ট করে তাকে আবার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত করা—অতি-কল্পনা? হয়ত নয়।

কিন্তু প্রশ্ন এই, যখন আমরা বলি, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে এমন ধরনের সন্তান-সন্ততি আমরা তৈরী করব, যারা দেহ, মন এবং মানবিক মূল্যায়নে পরম আদর্শ বলে বিবেচিত হবে, গোল বাধে সেখানেই।

প্রশ্ন জাগে, আদর্শ বলতে কাকে বোঝায়? মানুষের সঠিক মূল্যায়নের পরিমাপ কোন্ কোন্ ধারার ওপর নির্ভর করে? কারণ মানুষের চালচলন এবং মানসিকতার মূল্যায়ন নির্ধারিত হয় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে (অনেকটা)। এবং এই মূল্যায়ন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। অতএব, 'জেনেটিক কোড'-এর হেরফের ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহারিক দিকটিকে নিয়ন্ত্রিত করা, অন্ধকারের মধ্যে অজানা কোন কিছুর অনুসন্ধান চালান ছাড়া কি হতে পারে?

ফ্যালাসি এই, আমরা একদিকে বলছি, সংখ্যা কমাও। আবার একই সঙ্গে পঙ্গু, যারা নিজেরাও জীবন্মৃত এবং অপরন্তু অনেককে সে পর্যায়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য করে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বিজ্ঞানীদের অপ্রাণ গবেষণা। চেষ্টা। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, তা কেন, এই ভাবেই তো বিজ্ঞান সম্ভাবনাকে বয়ে নিয়ে আসে। কথাসে ঠিকই। কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে অনিবার্য মৃত্যুপথযাত্রীদের বাঁচিয়ে রাখা—এই উভয় প্রচেষ্টা এ সব কি আধুনিক বিজ্ঞানে কর্মকাণ্ডের 'সপ্রশ্ন' অধ্যায়ের সূচক বলে মনে হয় না?

অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, আমরা যে বড় বড় কলকারখানা তৈরি করছি, তার বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে জনসাধারণের অর্থে। (ট্যাক্স)। কিন্তু তার উৎপাদনের কতটুকু অংশ দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের ভোগে লাগে? বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতর উদ্ভাবনাগুলি অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি দামী। আর যেহেতু দামী, সাধারণ মানুষের নাগালের তারা বাইরে।

বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞানের শতেক উদ্ভাবনা এবং মানব কল্যাণে তাদের প্রত্যক্ষ এবং প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়ে এ যুগে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন, এ সব কথা ভেবে অনেকেই তাঁরা চিন্তিত। কেউ কেউ এমন আশংকাও করেন, এক সময়ে রাজত্ব করত রাজা। এখন করছে বিজ্ঞান। যে দেশ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে বেশি পারংগম—সে দেশ এখন অগ্রজের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি—সর্বত্র। অথচ, বিজ্ঞানের যে মূল উদ্দেশ্য, অজানাকে জানা —মানুষ এ কাজটি করতে গিয়েই একদিন বুঝেছিল, এই 'জানাই' তার জীবনকে একদিন সহজতর করে তুলতে সক্ষম হবে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে এখন প্রশ্ন : এই 'সহজতর' বলতে আমরা কী বুঝি? আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কি চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কি জীবনের মান উন্নয়নে, সর্বসাধারণ মানুষের কাছে কতটা সুগম হতে পেরেছে?

সমরজিৎ কর

সংশোধন : গত ১৪ জুন-এর বিজ্ঞানে নবগ্রাম সায়ান্স ক্লাব প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম জ্যোতিষ্ক হবে, লোকবিজ্ঞান হবে না।

হাঙ্গেরীতে অভিনীত নাটক : গান্ধীজী

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বিদেশী রঙ্গমঞ্চের কোনো সংবাদ সাহিত্য-প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ত কারও কারও কাছে আপত্তিকর হতে পারে, তবু আলোচ্য সংবাদটি সাধারণ পাঠকের কাছে নিবেদন না করে পারলাম না। প্রথমেই বলি, আজকাল এখানে, বিশেষ করে কলকাতা শহরে বিদেশী রাজনৈতিক নেতা, বিপ্লবী, চিন্তানায়কদের নিয়ে থিয়েটার যাত্রার পালা রচনা এবং অভিনয় সাধারণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। লেনিন, হিটলার, মাও সে তুঙ, কার্ল মার্কস—এখন যাত্রার দৌলতে পল্লী অঞ্চলেও অপরিচিত নন। অথচ, আমার মনে পড়ছে না, মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে কোনো নাটক বা যাত্রার পালা রচনা করা হয়েছে। যদি হয়ে থাকে, ভাল, যদি না হয়ে থাকে—তবে ধরে নিতে হবে আমাদের পালা-লেখকদের এবং অন্যান্যদের এ-ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না।

আমাদের না থাক, হাঙ্গেরীর আছে। বুদাপেস্ট শহরের নামকরা রঙ্গমঞ্চ থালিয়া থিয়েটারে সম্প্রতি গান্ধীজীর জীবনী নিয়ে একটি অতি দীর্ঘ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে, আর তা আমাদের থিয়েটারী ভাষায় 'সগৌরবে চলছে'।

নাটকটি লিখেছেন লাসজলো নিমেথ, যাঁকে হাঙ্গেরীর সাহিত্য-মহলে অন্যতম বিখ্যাত সাম্প্রতিক লেখক হিসেবে ধরা হয়। এই লেখক নিজের দেশ এবং জগতের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস খুঁজে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে নাটক লেখায় বরাবরই উৎসাহী। বলা হয়, নিমেথ-এর নাটকে ইতিহাস কোথাও বিকৃত হয় না। তা বলে তিনি জীবনী-নাটক লিখতে গিয়ে জীবনের সাল তারিখ ঘটনার বিবরণ দিতেও বসেন না। তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর মনোভাব, বিশেষ ভাবনা নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। অনেক সময় তাঁর নাটকের বইয়ে একটি প্রবন্ধ তিনি যোগ করে দেন যার মধ্যে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন।

গান্ধীজীকে নিয়ে লেখা নিমেথ-এর নাটকটিকে বলা হয়েছে এপিক ড্রামা। তেরোটি দৃশ্যে এই নাটকটি বিভক্ত। ভারত স্বাধীন হবার ঠিক আগের পর্ব, ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হবার পর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং পিস্তলের গুলিতে গান্ধীজীর মৃত্যু পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী—সেই বিশেষ কালটির কথা নাটকটিতে বর্ণিত হয়েছে।

নিমেথ-এর নাটকের মূল কেন্দ্রটি কোথায়? সমালোচকরা বলেন, গান্ধীজীর বিশাল ব্যক্তিত্বের নৈতিক সংকটই নাটকের মুখ্য বিষয়। মহাত্মাজী নৈতিক বা আত্মিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক নীতির মধ্যে দিয়ে সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি ঘটেছিল। সত্যাগ্রহ তাঁর সেই নীতি, সেই উপলব্ধি। সত্যাগ্রহ বলতে আমরা অহিংস উপায়ে প্রতিরোধ বুঝি কিন্তু সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত অর্থ আরও ব্যাপক ও গভীর। ন্যায়ের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অথবা ঝোঁকই সত্যাগ্রহ। গান্ধীজীর জীবনের চরম বেদনা, বা বলা যাক ট্র্যাজেডি এই যে—স্বাধীনতা সংগ্রামের বেলায় তাঁর সত্যাগ্রহ সফল হলেও, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের ঐক্য ও অবিচ্ছিন্নতা ধর্মীয় কলহ ও বিবাদের মধ্যে সার্থক হতে পারল না।

ইতিহাসের গান্ধী আর নাটকের গান্ধী ঠিক এক নয়। নিমেথ গান্ধীজীর জীবনের কোনো বিকৃতি ঘটান নি, ইতিহাসকে যথাযথ রেখেছেন, তাঁর নাটকের গান্ধী—মহাত্মাজীর নিজস্ব বাণীতে সমৃদ্ধ—তবু একটা পার্থক্য থেকে গেছে। এই পার্থক্য এই যে, পলিটিসিয়ান-মরালিস্ট গান্ধীর ওপর নিমেথ তত জোর দেন নি যতটা দিয়েছেন মরালিস্ট গান্ধীজীর ওপর। নৈতিক বিচারের আদর্শে একটি মানুষ তার সকল কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে—এটাই নাটকের মূল কথা। নিমেথ-এর গান্ধী সেই ব্যক্তি যিনি বলেন, ভীরুতা এবং হিংসার মধ্যে যদি বেছে নিতে হয়—আমি হিংসাকেই বেছে নিতে বলব ("If a choice could be made between cowardice and violence, I would suggest violence....")

নিমেথ-এর গান্ধী চরিত্রকে যেন যীশু খ্রীস্টের মতন মনে হয়, ভারতবর্ষের মর্মাত্মা যেন তাঁর আলোকে আলোকিত হয়ে ছিল।

ইতিহাসের ছাত্ররা হয়ত প্রশ্ন তুলবেন, কোনো বিশেষ মানুষের অতি উচ্চ এবং

বুদাপেস্ট শহরের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক : গান্ধী

[illegible] নৈতিকতা কি সামাজিক বিবাদ, [illegible], সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে পারে? [illegible] পারে না। কিন্তু নিমেথ্ সম্ভবত [illegible] করেন, আজকের বিশ্বে এমন মানুষ [illegible] যিনি নিঃসঙ্গ হয়েও স্বপ্ন দেখেছেন, যিনি শুদ্ধতার জন্যে সমাজ থেকে সরে এসে এক দ্বীপে বাসা বেঁধেছিলেন, এবং তাঁর স্বপ্নের জগৎ ভেঙে যাবার বেদনা সম্বল করে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন।

নিমেথ্ বলতে চেয়েছেন :

You either preserve your cause and you are ruined by it, or you preserve yourself and the cause falls to ruin around you."

সব শেষে একটি কথা নিবেদন করি। আমাদের এখানে নব্য নাটক সম্প্রদায় গুরু বিষয়ে নাটক রচনা ও অভিনয় করছেন, তাঁদের বহু কিছুতেই যৌক লক্ষ করা যায়। ভারতের বহু মনীষীর জীবন ও কর্ম যে নাটকের বিষয় হতে পারে এ-কথাটা যেন একবার ভেবে দেখেন। এ রকম কিছু নাটক নিশ্চয় হয়েছে, কিন্তু সেই জীবনী-কল্পদ আমাদের ফুরিয়ে যায় নি।

অভিনন্দ
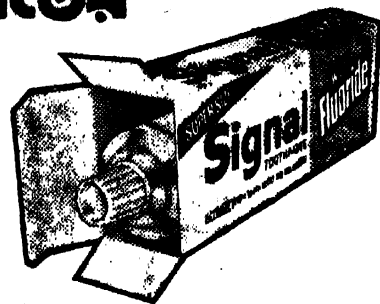
॥ একশো তিন ॥

ফুলবাসিয়ার পিছনে হ্যারিকেনের রক্তিম আলো, ওর মুখ দেখা যায় না। ওর নাকের নাকছাবির ছিদ্র দিয়ে রক্ত ঝরা কি এখন বন্ধ? অথবা সাহুর শেষ আঘাত গুলোতে মুখের বা শরীরের অন্য কোনো অংশে আরো বেশি রক্ত ঝরে? কিছুই দেখা যায় না, এমন কি মুখের অভিব্যক্তিও। সাহু এখন ভিন্ন মানুষ, তার স্বরে গর্জন নেই. একটা ভল্লুক যেন আহত, ভয়ে আড়ষ্ট। তার অস্পষ্ট মূর্তিকে অসহায় আর করুণ দেখায় এবং তার উৎসুক দৃষ্টি যে দরজার ওপরে ফুলবাসিয়ার ওপর তা বোঝা যায়। যার গালাগালিতে ফুলবাসিয়া অপমানিতা, প্রহারে জর্জরিতা, তার কাতর ডাকে অনুরোধে ওর কি দয়া হয়? বৈজুর কাছে সবই অস্পষ্ট আর ঝাপসা লাগে। অস্বাভাবিক মনে হয় বাবার দুই বিপরীত আচরণের সঙ্গে ফুলবাসিয়ার আচরণের এই পরিবর্তন। অপ্রত্যাশিত মনে হয় ওর এই দরজায় এসে দাঁড়ানো। বাবা কি কোনো মন্ত্র জানে, ফুলবাসিয়া কি সম্মোহিতা? ওর আলো আড়াল করে দাঁড়ানো, স্খলিত আঁচল হাতের ডানায় রাখা এলোকেশী মূর্তি দেখে বোঝা যায় না ও রাগে ও ঘৃণায় জ্বলে কী না। প্রহার এবং অপমান কোনো কিছুতেই ও সাহুর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, প্রতিবাদে মুখর ছিল। এখন কি ও রাগে ও ঘৃণায় গর্জন করে উঠবে?

ফুলবাসিয়ার কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা নানা সংশয়ের সৃষ্টি করে এবং তারপরেই রামুর হাত থেকে ওকে মিঠাইয়ের ঠোঙা নিতে দেখা যায়। নিতে নিতেই অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে যেন কিছু বলে এবং দরজার কাছ থেকে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। রামু সরে আসে সাহুর কাছে, বলে, 'বাবা বেটাকে ঘরে যেতে বলছে।'

রামু 'বাবা বেটা' বলতে বৈজুকে নির্দেশ করে। সাহু তৎক্ষণাৎ বৈজুর কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'হাঁ হাঁ, চল বেটা ঘরে চল, একটু চা জলপানী কর।'

বৈজু তথাপি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব কাটে না। সাহু ওর হাত ধরে টানে, কাতর অনুরোধে বলে, 'আয় বেটা, একটু খেয়ে নে। একদিন হয়তো তুই আমাকে বুঝবি, তখন—তখন আর...' সাহু কথা শেষ করতে পারে না, যেন কান্নায় তার স্বর ডুবে যায়।

বৈজু বিরক্ত হয়, কান্নার স্বরে বিতৃষ্ণা বোধ করে, হাত ছাড়িয়ে নেয়। এইসব নাটকীয় রহস্য ওর ভালো লাগে না। যে মুহূর্তে উল্লাস, তার পরমুহূর্তেই অতি হিংস্র ক্রোধ এবং তারপরেই কান্নায় আকুল, যার কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না। ও বলে, 'আমি তোমার এখানে থাকতে আসিনি। অনেককাল বাদে দেখা করতে এসেছিলাম।'

'হায় রাম!' সাহু আর্তস্বরে বলে ওঠে এবং হাত বাড়িয়েও বৈজুর হাত না ধরে বলে, 'একথা বলিস না বেটা, আমার হারানো দৌলতকে আমি ফিরে পেয়েছি। আমি কতদিন তোর জন্যে এই দরিয়া কিনারে বসে কেঁদেছি।'

সাহুর এই কথা শুনেই ফুলবাসিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। দরিয়া কিনারে বসে, ভাঙ বা গাঁজা খেয়ে সাহুর চিৎকার কান্না শুনে ফুলবাসিয়া বৈজুর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করতো, কিন্তু মনে করতে পারতো না। ও ঘরের খোলা দরজার দিকে তাকায়। সাহু আবার বলে, 'এখন তুই চলে যাওয়ার কথা বলিস না বেটা। জয় রামজী! বেটা, তুই একজন ক্রান্তিকার, কিন্তু ভগবান আমাকে নিয়ে কী খেলা খেলছে!' তারপরে সহসাই যেন সাহুর খেয়াল হয় রামুর উপস্থিতি, সে হঠাৎ তার দিকে ফিরে আদেশের সুরে বলে, 'যা রামু, তোর এখন আর কোনো কাজ নেই, নিজেদের রুটি পাকাতে যা। দরকার হলে আমি আবার ডাকবো।'

'জী আচ্ছা।' রামু অতি বশংবদের মতো উচ্চারণ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সাহু হঠাৎ স্বগত উচ্চারণ করে, 'ভগবান মানুষের জীবনের চারপাশে কত-গুলো খাল কেটে রেখেছে. কোন্‌টায় জানোয়ার আছে, কোন্‌টায় নেই, কেউ বলতে পারে না। কিন্তু তাকে একটা দিয়ে যেতে হয়। তাকে যেতেই হবে, আর সে জানে না কোথায় তার মরণ ওৎ পেতে আছে। একবার জানোয়ারের খালে পড়লে আর তার রেহাই নেই, আহ্‌!' এই আর্তধ্বনি করেই যেন তার সহসা সংবিত

ফেরে এবং সে বৈজুর হাত আবার ধরে বলে, 'চল বেটা, ঘরে চল। খা হওয়ার হয়ে গেছে, তোর বাবাকে খাতির কর, একটু খাবি চল।'

বৈজু সাহুর কথাগুলো শোনে, যার কোনো অর্থ ওর হৃদয়ঙ্গম হয় না। কলাকি গাছের ঝাড়ে জোনাকিরা টিপ টিপ জ্বলতে থাকে। ভাটার জল নামার কলকল শব্দ ভেসে আসে কোনো নয়ানজুলি থেকে। বৈজু ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরের দিকে যায়। সাহু ওর পাশে পাশে ঘরের মধ্যে ঢোকে, কাঠের ফ্রেমে ফিতে বাঁধানো খাটিয়া দেখিয়ে বলে, 'এখানে বস বেটা, এই জানলা দিয়ে বাতাস পাবি।'

রান্নাঘরের খোলা আগলের সামনে ফুলবাসিয়া, ওর হাতে একটি কাঁসার থালা। হ্যারিকেনের আলোয় এখন ওকে আর বিস্রস্ত দেখায় না। এখন আবার ওর মাথায় অল্প ঘোমটা, আঁচল বুকে স্থাপিত, চুল ঘাড়ের কাছে গুছিয়ে গোটানো, কিন্তু মুখ নত। বৈজুর আড়ষ্ট অস্বস্তি ভাব কাটে না, ঘটনাসমূহের সংঘাত এখনো মস্তিষ্কে ক্রিয়াশীল। অনিচ্ছা বিরাগ অথচ বাবার আচরণ এবং ফুলবাসিয়ার থালা নিয়ে দাঁড়ানো, ওকে বিমূঢ় করে। কিছু স্থির করতে না পেরে ও নেয়ারের খাটে বসে। বেড়ার গায়ে কাঠের ফ্রেমের ছোট জানালা দিয়ে কিঞ্চিৎ বাতাস আসে।

সাহু আবার কিছু বলবার উপক্রম করতেই শিঙার মতো শাঁখের শব্দ ভেসে আসে, সেই সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টার ঝনঝন ঢং ঢং। সাহু থমকে যায়, পশ্চিমের বেড়ার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় এবং মুহূর্তেই সচকিত হয়ে বলে, 'রাম নারায়ণজীর আরতি শুরু হলো, আমি ওখানে যাচ্ছি। বৈজু, তুই খা বেটা।' বলে সে মুখ ফিরিয়ে ফুল-বাসিয়ার দিকে তাকায় এবং কিছু না বলেই ঘর থেকে দ্রুত চলে যায়।

বৈজু ভ্রূকুটি চোখে কান পেতে শাঁখ কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শোনে; অনুমান করতে পারে সাধুদের আস্তানা থেকেই শব্দ ভেসে আসে। ফুলবাসিয়া এগিয়ে আসে, ওর পিছনে ধোঁয়ার একটা হালকা কুণ্ডলী পাক খায়, পোড়া কাঠের গন্ধ স্পষ্ট। ফুলবাসিয়া নেয়ারের খাটের সামনে এসে কাঁসার থালা নিয়ে ইতস্তত করে এবং শেষ পর্যন্ত খাটিয়ার কাঠের ওপরে সাবধানে রাখে। ফিরে গিয়ে রান্নাঘরের আগলের কোণ থেকে ঝকঝকে ঘটিতে কলসী থেকে জল ভরে এনে থালার পাশেই রাখে। পিছন ফিরে চলে যেতে গিয়ে, দু পা গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়, বলে 'খাও। আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।'

রান্নাঘরের খোলা আগল দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরের মধ্যে ঢোকে, হ্যারিকেনের রক্তিম আলো ঝাপসা করে তোলে। রান্নাঘরের ভিতরে ধোঁয়ার ফাঁকে আলোর রেশ কাঁপে। ফুলবাসিয়া দ্রুত রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে বেড়ার আগল টেনে দেয়। বৈজুর দৃষ্টি তখনো সেই দিকে, বেড়ার ছিদ্রে আগুনের শিখা জ্বলতে দেখা যায়। ফুলবাসিয়ার স্বর ওর কানে বাজে, যার মধ্যে কান্না বা বিরাগ বা রাগ নেই, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যস্ত ঘরোয়া সুর। বৈজু খাবারের থালার দিকে তাকায়। নিমকি সিঙাড়া আর বাঙলা মিঠাই রসগোল্লা সন্দেশ। ও প্রকৃতই ক্ষুধার্ত বোধ করে এবং হাতে থালা তুলে নেবার আগে আর একবার ঝাঁপ বন্ধ রান্নাঘরের দিকে তাকায়। *বেড়ার ছিদ্রে কাঠের আগুনের বা কুপির শিখা জ্বলতে দেখা যায় বিন্দু বিন্দু। এ ঘরের ধোঁয়া পশ্চিমের জানালার কাছে জমা হয়ে ধীরে উধাও হয়।*

বৈজু থালা হাতে নিয়েও নিশ্চল বসে থাকে। বাবার এই মুহূর্তেই আবার রাম নারায়ণজীর পুজো আরতি দেখতে ছুটে যাওয়া ওকে বিস্মিত করে। লোকটির আচরণের কোনো থই পাওয়া যায় না, সবই রহস্যাবৃত লাগে, এবং একটু পূর্বেই তার স্বগতোক্তি, ভগবানের তৈরি মানুষের চলার জন্য খাল কেটে রাখা।

রান্নাঘরের ঝাঁপ হঠাৎ খানিকটা ফাঁক হয়, একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে ফুলবাসিয়ার অস্পষ্ট মুখ ভেসে ওঠে, ওর রুদ্ধস্বর শোনা যায়, 'খাও, খাচ্ছো না কেন। আমি এখুনি চা দিচ্ছি।' বলেই আবার তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়।

বাইরে অবিরাম শাঁখ কাঁসর ঘণ্টা বাজতে থাকে। বৈজু অপ্রত্যাশিত চকিত বিস্ময়ে বন্ধ ঝাঁপের দিকে তাকায়, এবং যেন সম্মোহিতের মতো খাবার তুলে মুখে দেয়। মুখের মধ্যে খাবার সুস্বাদু বোধ হয়, রসের ধারা গলে ও চিবোয়, কিন্তু ঘটনা সমূহ ও ফুলবাসিয়ার কথাগুলো এক ভাবেই একটি জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। কী ভূমিকা ফুল-বাসিয়ার এ ঘরে, কী সম্পর্ক ওর সঙ্গে এ ঘরের মালিকের? নিতান্ত নোকরানি আর একজন বয়স্ক লোককে দেখভাল করার কথা, এখন আর আদৌ মেনে নিতে পারে না, এবং কদাপি এ চিত্র কোনো গৃহস্থ স্বামী-স্ত্রীর না।

'আমি তখন থেকে তাই কথাটা ভাবছি।' ফুলবাসিয়ার সহজ স্বরে কথা এই ভাবে ভেসে আসে, ওর মুখ দেখা যায় আধ-খোলা ঝাঁপের ফাঁকে।

বৈজু দেখতে পায় রান্নাঘরের ধোঁয়া অনেক হালকা, স্পষ্টত কাঠের আগুনের শিখার আলো কাঁপে। ও ফিরে তাকায়। ফুলবাসিয়ার ঠোঁটে কি হাসির আভাস? ও জিজ্ঞেস করে, 'তোমার কোনো লটবহর নেই, বাকসো প্যাটরা? তোমার জামা কাপড় কোথায়? সব কি জেলে রেখে দিয়েছে?'

ফুলবাসিয়ার এই অতি সাধারণ জিজ্ঞাসাটা অসাধারণ মনে হয়। একটি প্রাথমিক প্রশ্ন, যা এতক্ষণ উচ্চারিত হয় নি। বৈজু মুখের খাবার গিলে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে, 'সবই আছে, কিন্তু এখানে আমি কিছু আনি নি।'

'তো কোথায় সে সব?' ফুলবাসিয়া উৎসুক স্বরে জিজ্ঞেস করে।

বৈজু বলে, 'এখানেই শহর মহল্লায় আমার এক বন্ধুর কাছে আছে। সে আমার সঙ্গেই জেলে ছিল, কিছুদিন আগে ছাড়া পেয়েছে। মিশির—দয়াল মিশির তার নাম।'

'দয়াল মিশির? এখানে শহর মহল্লায় থাকে?' ফুলবাসিয়ার জিজ্ঞাসার সুরে অনুসন্ধিৎসা, 'সে কি তোমার মতোই ক্রান্তিকার নাকি? কিন্তু থেমো না, খেতে খেতে বল।'

ফুলবাসিয়ার জিজ্ঞাসা আর নির্দেশ এত দ্রুত এক সঙ্গে উচ্চারিত হয় যা খুব স্বাভাবিক সহজ, অথচ বৈজুর ধন্দ লেগে যায়। ও হাতে খাবার তুলে নিয়ে বলে, 'হাঁ, ক্রান্তিকার। এখানে ওর মা বাবা আছে, ইটা চুনা শুরকির গোলা আছে ওর বাবার।'

'আচ্ছা? খুব ভালো। তো তুমি সেখানে তোমার সব লটবহর রেখে এলে?' ফুলবাসিয়া এ কথা বলেই পিছন ফিরে তাকায়, এবং আবার বৈজুর দিকে ফিরে ব্যস্ত ভাবে বলে, 'চায়ের জল গরম হয়ে গেছে, আমি চা বানিয়ে আনছি, তুমি খাও।' বলেই ও ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়।

বৈজু খাবার মুখে দেয়, কিন্তু অন্য-মনস্ক ওর মুখের অভিব্যক্তি। ফুলবাসিয়ার কথাগুলো এত সহজ আর স্বাভাবিক মনে হয়, যেন সমস্ত পরিবেশের চেহারাটাই বদলিয়ে যায়, এমন কি চরিত্রটাও। একটু আগের ঘটনাকে অবাস্তব বোধ হয়, বিশেষ করে ফুলবাসিয়াকে যেন অপমান লাঞ্ছনা একটুও স্পর্শ করে নেই। কী করে এরকম সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের সঙ্গেই আবার ফুলবাসিয়ার আগের কথাগুলো মনে পড়তে থাকে। সাধুরা ওর কাছে কি রকম সেবা চায়? বাবা কেনই বা ওকে ছাড়তে চায় না? মানুষকে কি সত্যি কেনা যায় নাকি? এতো মিথ্যা কথা। তথাপি বাবা ওকে পুলিসের ভয় দেখায়।

'চা পাতি জলে দিয়েছি।' ফুল-বাসিয়ার স্বরের সঙ্গেই আবার ঝাঁপ খুলে যায়, ওর মুখ উঁকি দেয়।

রান্নাঘরের মধ্যে এখন স্বচ্ছ আলো কাঁপে, ধোঁয়ার চিহ্ন নেই। ও আবার বলে, 'কিন্তু তুমি তোমার জিনিসপত্র বন্ধুর কাছে কেন রেখে এলে? পহুলেই তুমি এখানে এসে উঠলে না কেন?'

বৈজু ফুলবাসিয়ার দিকে তাকায়। ওর

ঠোঁটে এখন রক্তের দাগ নেই, নাকের মাকড়ির ছিদ্রের কাছে স্পষ্টই দেখা যায় না, কিন্তু চিকচিক করে। ওর মুখে আর কোনো আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট চোখে পড়ে না। বৈজু বলে, 'আমার বন্ধুকে আমি কথা দিয়েছিলাম, কলকাতার জেল থেকে ছাড়া পেলে, আমি তার কাছে প্রথম আসবো। আমি ঠিক জানতাম না, এখানে কেউ আছে কী না।'

এখানে 'কেউ' অর্থে বৈজু ওর বাবার কথাই বলে, কিন্তু ফুলবাসিয়ার কাছে তা স্পষ্ট করে বলতে ইচ্ছা করে না। ফুলবাসিয়া স্বাভাবিক দ্রুত উচ্চারণে জিজ্ঞেস করে, 'তো, কি করে জানলে এখানে কেউ আছে কি না? আন্দাজে চলে এলে, না?' ফুলবাসিয়ার বড় বড় চোখে কৌতূহলিত অনুসন্ধিৎসা, এবং নিজেই তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, 'আর যদি দেখতে কেউ নেই, তো কী করতে? চলে যেতে, তাই না?'

বৈজু ফুলবাসিয়ার কথায় অবাক হয়, মনে মনে খানিকটা কৌতুক বোধ না করেও পারে না, বলে, 'হাঁ, কেউ না থাকলে, আমাকে চলে যেতেই হতো। এখানে আমি কার কাছে আসবো, কাকেই বা দেখতে?'

'ঠিক তো।' বলেই ফুলবাসিয়া হঠাৎ তর্জনী তুলে যেন কথা থামাবার ভঙ্গি করে বলে, 'চা পানী ছেঁকে নিয়ে আসি।' বলেই ভিতর দিকে সরে যায়। কিন্তু এবার আর ঝাঁপ বন্ধ করে না।

বৈজু ফুলবাসিয়ার ছায়া দেখতে পায়, লম্ফর আলোয় অতিকায় কিম্ভূত ছায়া বেড়ার গায়ে ছোট হয়ে চওড়া আকৃতি নেয়, ছায়া কাঁপে, নড়াচড়া করতে থাকে। সাধুদের আস্তানা থেকে শাঁখ কাঁসর ঘন্টার শব্দ একরকম ভাবেই ভেসে আসতে থাকে। খেতে খেতে বৈজুর হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ওঠে, মন বিকৃত হয়, জিজ্ঞাসা জাগে, ফুলবাসিয়া কেন এত কথা বলে? কী সূত্রে, এবং সম্পর্কে? ওর মন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, একটা অপমানের কাঁটা যেন খচ্ খচ্ করে। ফুলবাসিয়া কে, কি ওর ভূমিকা এখানে? ও কি কোনো অধিকার বশে বৈজুকে এই সব প্রশ্ন করে? নোকরানি বা দেখ্ ভাল করার একটা আওরতের এত কথা জিজ্ঞাসা করবার অধিকার থাকতে পারে না। ওর মন শক্ত হয়ে ওঠে।

'কিন্তু কেন তুমি তোমার জিনিসপত্র বন্ধুর কাছে রেখে এলে?' ফুলবাসিয়া বলতে বলতে ঘরে ঢোকে, হাতে একটি বড় কাচের গেলাসের বুক পর্যন্ত ভরা ধূমায়িত চা।

বৈজু কোনো জবাব দেয় না, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে তাকায়। দূরে পাওয়ার হাউসের কয়েকটা আলো চোখে পড়ে এবং জোনাকিদের নানা রেখায় জ্বলতে উঠতে দেখা যায়। ফুলবাসিয়া এগিয়ে এসে খাটিয়ার চওড়া কাঠের ফ্রেমের ওপর জলের ঘটির পাশেই চায়ের গেলাস রাখে। আবার বলে, 'তোমাকে তো এখানেই থাকতে হবে, এটা তো তোমারই জায়গা।'

বৈজুর খাবার খাওয়া শেষ। মুখ ফিরিয়ে জলের ঘটি তুলে অনায়াসেই ঠোঁটে স্পর্শ না করে গলায় জল ঢালে। ফুলবাসিয়া অন্য খাটিয়ার কাছে সরে যায়, হ্যারিকেনের আলোয় ওর শরীর এবং মুখ এখন অনেক স্পষ্ট। ওর চোখে কৌতূহল, ঠোঁটে ঈষৎ হাসি ছোঁয়ানো, কিন্তু বাঁ চোখের কোণে খানিকটা জায়গা ফোলা। একটু নীল রঙের ইশারা সেখানে। আবার বলে, 'বন্ধুর কাছে কেন তুমি থাকবে? তুমি তোমার সব কিছু এখানে নিয়ে চলে এসো। এ সব তো তোমারই, এই ঘর, তোমার বাবার এত বড় ব্যবসা, এ সবই—।'

'কেন তুমি আমাকে এসব কথা বলছো?' বৈজু সহসা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের সুরে বলে ওঠে, 'তুমি কে? তুমি আমাকে যা বলবে, তাই আমাকে করতে হবে নাকি? তুমি আমাকে একদম এ সব কথা বলবে না।'

ফুলবাসিয়া কথায় বাধা পেয়ে প্রথমে চমকায়, থতিয়ে ওঠে এবং বৈজুর কথাগুলো শুনে সহসাই যেন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে যায়, প্রতিমাবৎ, তথাপি যেন আচমকা আহত বিস্ময়ে ওর চোখ দুটো আরো বড় আর ম্লান হয়ে যায়। কোনোরকমে উচ্চারণ করে, 'ওহ্, সত্যি। আমাকে মাফ করো।' এবং একটি ব্যথাসূচক অনুশোচনার শব্দ হয় ওর জিভে। মাথা নিচু করে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়, তারপরে রান্নাঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বৈজুও মুহূর্তেই পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে যায় এবং ওর বিরক্ত চোখেও বিস্ময় নেমে আসে এবং অধিকতর বিস্ময়, ওর বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে গিয়ে হঠাৎ যেন তীক্ষ্ম কিছু বিদ্ধ হয়ে যায়, যা একটা ব্যথার মতো সারা বুকে সঞ্চারিত হতে থাকে। ও মুখ তুলে ঝাঁপ-খোলা রান্নাঘরের দিকে তাকায়, সেখানে কোনো ছায়াও দেখা যায় না।

(ক্রমশ)

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ

ক্ষুদিরাম দাস

বাংলার ও বাঙালীর সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে চঞ্চল ও পরিবর্তন-প্রবণতার দেশ। এর মানব-সমাজের মধ্যে কালে কালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রজাতি বিমিশ্রিত হয়ে পড়েছে কি দেহে, কি ভাবে। ফলে জীবনচর্যায়, সাহিত্যে ও দর্শনে এই ভূখণ্ড নানান মত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত আবর্তিত হয়েছে। যেমন মানবিক উপাদানে, তেমনি এর ভূপ্রকৃতিতেও পুনঃপুনঃ পরিবর্তন ঘটেছে এবং আজও ঘটছে। নৈসর্গিক পরিবর্তনের মুখ্য কারণ এর নদীগুলির গতিপথের পরিবর্তন, গতি-অবরোধ, নূতনতর স্রোত-পথের আবির্ভাব প্রভৃতি। অপেক্ষাকৃত প্রাচীনে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-সহ করতোয়া, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকে ভাগীরথী, দামোদর, তিস্তার পরিবর্তন, শাখা-প্রশাখার বিলোপ ও বিস্তার মানুষের অর্থনীতিক জীবনযাত্রায় রুচিতে স্বাস্থ্যে, সুতরাং চিন্তাভাবনায় রূপান্তরের সৃষ্টি করেই চলেছে।

এমনি এক নৈসর্গিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চালিত হয়েছে ভাগীরথী-তীরবর্তী নবদ্বীপ—একদা বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্র ও গৌরবস্থল এবং শ্রীচৈতন্যের বাল্য কৈশোর যৌবনের লীলাভূমি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম প্রকাশ ও বিস্তারের কেন্দ্র। পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে দেশ ও জাতির পক্ষে এত বড় একটা ঘটনা পরবর্তী ইতিহাস লেখকদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি। বৈদেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনের মধ্যে অবশ্য তা হওয়ার কথাও নয়। ফলে জাতীয় চেতনার বিকাশের পর থেকে জাতীয় মানবিক ইতিহাস নতুন করে গঠনের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে মুখ্যত সাহিত্যিক উপাদানের উপর, আর গৌণভাবে তথাকথিত ইতিহাসের বিবরণের উপর অনুমান প্রয়োগ করে এবং কিছু কিছু জন-শ্রুতির উপরও। অথচ আজকের স্বল্প-শিক্ষিত মানুষেরও শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে খুঁটি-নাটি ইতিবৃত্ত জানবার আগ্রহ খুবই প্রবল হয়েছে। মধ্যযুগের নবদ্বীপই বা কোথায় ছিল, আর শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ সেই নবদ্বীপের কোন্ অঞ্চলে হওয়া সম্ভব এটা জানার ঔৎসুক্য কেবল বৈষ্ণব ভক্তদের পক্ষেই নয়, ছাত্রদের ও সাধারণের পক্ষেও সমান স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের ইতিহাসের এত বড় ব্যাপার সম্পর্কে আমরা সচেতন হলেও উদযোগী হতে পারিনি আজও। এখনকার নবদ্বীপ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের মঠ ও সম্প্রদায়-বাদীরা নির্ধারিত ইতিহাস-ভূগোলের অভাবে তাঁদের স্ব স্ব মঠমন্দির প্রতিষ্ঠার ভূমিকেই শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার বিভিন্ন অঞ্চল বলে চিহ্নিত করে চলেছেন, যার ফলে ধর্ম নিয়ে দলীয়তার প্রসার ঘটছে কম নয়।

এরকম অবস্থায় দেশের প্রকৃত ইতিহাস-ভূগোলকে উদ্ধার করে প্রকৃত পরিস্থিতি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা শিক্ষিত গবেষকদের ও স্বদেশী রাষ্ট্রের একটি জাতীয় কর্তব্য বলেই মনে করি। সেকালের এই দ্বীপ অঞ্চলটির উপর নৈসর্গিক পরি-বর্তনের লীলাতরঙ্গ যেভাবে বারংবার আঘাত হেনেছে তাতে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন প্রভৃতি ঠিক কোন্ কোন্ স্থানে ছিল আজ আর তা নির্ধারণ করা হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু গঙ্গাতীরবর্তী সেই এলাকাগুলি মোটামুটি চিহ্নিত করা দুরূহ হবে না, যদি ভূতত্ত্ববিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং মধ্যযুগের সাহিত্যে অভিজ্ঞ সুধীবৃন্দ এক-যোগে আন্তরিকভাবে প্রয়াস করেন। এ বিষয়ে ভাগীরথীর পুরাতন প্রবাহপথ নির্ধারণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মহাপ্রভুর নিতান্ত প্রিয়, তাঁর বেগবতী ব্যাকুলতার সমানধর্মা স্নেহময়ী ভাগীরথী মহাপ্রভুর অদর্শনের পর থেকে চঞ্চলা হতে হতে "আর নবদ্বীপের প্রয়োজন কী" এই বলে পরিশেষে পুরাতন নবদ্বীপ নগরীর সেই সব লীলাক্ষেত্রগুলি কি ধুয়ে মুছে অপসারিত করে দিলেন, অথবা পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজের সাম্প্রদায়িক কলহ ও ক্রম-অবক্ষয় দৃষ্টে ক্ষোভে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিপরীতগতি হলেন? মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত সে নবদ্বীপ আর নেই, যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী! সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে নবদ্বীপ অধ্যয়ন প্রারব্ধ হবে কিনা জানি না, আজকের এই সীমাবিত অবকাশে মধ্যযুগের সাহিত্যে এ বিষয়ে কী প্রমাণ মেলে তা দেখা যেতে পারে।

সাহিত্য বলতে মুখ্যত বৈষ্ণব জীবনী-কাব্যগুলিই এ বিষয়ে আমাদের অবলম্বন। জীবনীকাব্যগুলিতেই বর্ণনা প্রসঙ্গে নবদ্বীপের পথঘাট, শ্রীচৈতন্য সম্পর্কিত ভক্তদের বাসস্থান, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ

এবং ভাগীরথীর প্রবাহপথ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। চৈতন্য জীবনী বিষয়ক পদাবলী ইতিবৃত্ত বিষয়ে নিতান্তই কৃপণ। জীবনী গ্রন্থগুলির লক্ষ্যও ইতিবৃত্ত সঙ্কলন নয়, লীলা-শ্রবণোৎসুক ভক্তচিত্তের তৃপ্তিসাধন। তবু ইতিহাস-ভূগোলকে জীবনীকারেরা বর্জন করতে পারেন নি, প্রাসঙ্গিকভাবে গ্রন্থমধ্যে স্থান দিয়েছেন, আভাসে-ইঙ্গিতে পাঠকদের অনুমানের অবকাশ রেখেছেন. কেউ একটু বেশি, কেউবা অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য এমন চরিতকাব্যও মেলে যার মধ্যে ঐতিহাসিক বর্ণনের মায়া আছে মাত্র, প্রকৃত তথ্য কিছু নেই বললেই চলে। যাই হোক, আমাদের অভিপ্রেত নবদ্বীপ-পরিচয়ের ব্যাপারে চরিতগ্রন্থগুলিকে এইভাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে—

(১) মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্য-চরিতগ্রন্থ। এটির প্রমাণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই গ্রন্থটি লিখিত ও সমাপ্ত হয়, আর শ্রীমুরারি শ্রীচৈতন্যের জ্যেষ্ঠ সহপাঠী এবং একান্ত প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-জীবনীর সঙ্গে নবদ্বীপের ইতিহাস-ভূগোল নির্ধারিত ক'রে যাবেন এমন অভিপ্রায় মুরারির ছিল না। তিনি নিতান্ত ধার্মিক, বিশেষত ভক্তের মতই গ্রন্থ লিখে গেছেন। তবু প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্যের পারিবারিক অবস্থা এবং নবদ্বীপ বিষয়ে ছিটেফোঁটা যেটুকু পরিচয় তিনি দিয়ে গেছেন তারই মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (২) কবিকর্ণপুরের লেখা সংস্কৃত চৈতন্যচরিত মহাকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। নবদ্বীপ প্রসঙ্গে এতে একটি স্মরণীয় সংবাদ পাওয়া যায়। যা চৈতন্য ভাগবতেও মিলছে। তা হল নবদ্বীপ নগরীর সন্নিহিত গঙ্গার পশ্চিম পারে 'কুলিয়া' গ্রামে। (৩) চৈতন্য ভাগবত—এই বাংলা গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অন্তত কুড়ি বছরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়। এটিতেই তুলনামূলকভাবে নবদ্বীপের ইতিহাস ভূগোলের বিশেষ পরিচয় যা-কিছু গ্রথিত দেখা যায়। রচনা হিসেবেও এটি খুবই প্রামাণিক। (৪) লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল। এর বাস্তব ঐতিহাসিক মূল্য নগণ্য। (৫) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। এই কাব্যটির প্রারম্ভে নবদ্বীপের পীরাল্যিয়া নামক মুসলমান-প্রধান একটি গ্রামকে নবদ্বীপের সন্নিকটবর্তী বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, যেমন জয়ানন্দ-পরিবেশিত অন্য বহু তথ্যও বিশ্বাসযোগ্য নয়। (৬) কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত চৈতন্য-চরিতামৃত। চৈতন্য জীবনী এবং বৈষ্ণব ধর্মের দিক থেকে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ হলেও নবদ্বীপ-পরিচিতির দিক দিয়ে চৈতন্য-ভাগবত থেকে নূতনতর কোনো সংবাদ এতে পাওয়া যায় না। (৭) শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বিরচিত ভক্তিরত্নাকর। এটি শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের আনুমানিক দু'শ' বছরের পরে লেখা গ্রন্থ। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈষ্ণব আন্দোলনে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে নতুন করে বৈষ্ণব সংগঠন প্রারম্ভ হয়। এই সময় নিগূঢ় বৈষ্ণব সাধনপদ্ধতি ও কীর্তনাদির সূক্ষ্মতা গড়ে উঠতে থাকে। বহু বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থও রচিত হয়। এরই উপর নির্ভর ক'রে নিছক ধর্মতত্ত্বের বিস্তারই এই গ্রন্থটির লক্ষ্য। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবমণ্ডলী ও কেন্দ্রগুলির একটা সাধারণ পরিচয় এ থেকে পাওয়া গেলেও প্রকৃত ইতিহাসের দিক দিয়ে গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য নয়, সে দৃষ্টি থেকে এটি লেখাও হয়নি। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, দু'শ' বছর আগেকার নবদ্বীপ অঞ্চলের একটি বর্ণনা তিনি তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন, যার মধ্যে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির পুরানো লৌকিক নাম-পরিচয় বর্জন করে তিনি নতুন নামকরণের প্রয়াস করেছেন এবং প্রতিটি অঞ্চলের সঙ্গে একটি ক'রে উদ্ভট আধ্যাত্মিক কাহিনী যোগ করে দিয়েছেন। এ বিষয় আমরা পরে বলছি। এখন দেখা যাক, নবদ্বীপ, ভাগীরথী ও নবদ্বীপ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কী পরিচয় মুরারি, কবিকর্ণপুর, বৃন্দাবন দাস এবং নরহরি চক্রবর্তী তাঁদের গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ এবং নবদ্বীপ অঞ্চলের পরিচয় যদি মুরারি দিতেন তাহলে তা-ই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য হ'ত। কিন্তু মুরারি ইতিবৃত্তে অনুরাগী ছিলেন না। দু'-একটি ঘটনার বর্ণনায় তাঁর অজ্ঞাতসারেই অবশ্য ভাগীরথীর অবস্থান সূচিত হয়েছে। যেমন, (১) গৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ গঙ্গা পার হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। "ত্যক্ত্বা গৃহং স্বর্গনদীং প্রতীর্য জগ্রাহ সন্ন্যাসম্ অশকামনোঃ" (১ম প্রক্রম, ৭ম অঃ)। (২) বাস্তব সন্ন্যাস গ্রহণের কিছু পূর্বেই একদিন শ্রীচৈতন্য মাতার উপর বিরক্ত হয়ে গঙ্গা পার হয়ে উত্তরকূলে গিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে কিছুদূর চ'লে গিয়েছিলেন। মুরারি ও অন্যান্য সহচরেরা উদ্বিগ্ন হয়ে পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন—

ততো ব্যাটাং মুরারে স্তে ঝটিত্যাগতা সেশ্বরাঃ।
উপবিশ্য ক্ষণং স্থিত্বা নিজয়স্য শ্যাং যযুঃ॥
উষিত্বা রজনীং তত্র প্রভাতে ভগবান্ পরঃ।
জগামোত্তরকং কূলং জহ্নব্যা অভ্রমন্ দ্রুতম্॥
(২ প্রঃ, ১২ অঃ)

(৩) নবদ্বীপের বিপরীত কূলে কুলিয়া নামে গ্রাম ছিল। অবশ্য মুরারির চৈতন্য-চরিত গ্রন্থের শেষের দিকে যে অংশে এই সংবাদ রয়েছে সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত ব'লে পণ্ডিতেরা মনে করেন। কিন্তু নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে গঙ্গা পারে যে কুলিয়া গ্রাম ছিল সে সংবাদের নিঃসংশয় প্রমাণ দিচ্ছেন বৃন্দাবনদাস ও কবিকর্ণপুর। সুতরাং মুরারির ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত হলেও নবদ্বীপের পশ্চিমে যে গঙ্গা ছিল (এবং মুরারির অন্য বর্ণনার উত্তরেও ছিল) এ সুনিশ্চিত।

নবদ্বীপের পশ্চিমে গঙ্গা এবং প্রায় বিপরীত কূলে 'কুলিয়া' এ সংবাদ কবিকর্ণপুরও দিচ্ছেন। তাঁর মহাকাব্যে তিনি কুলিয়ার নাম করেন নি, শুধু বলছেন গঙ্গা পারে পশ্চিমে কোনো দেশে গিয়ে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত হলেন। চৈতন্যচরিত মহাকাব্য তাঁর একেবারে প্রথম বয়সের লেখা, কিন্তু শেষ বয়সে তিনি যে নাটক লেখেন (চৈতন্য-চন্দ্রোদয়) তাতে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে গঙ্গাপারের নবদ্বীপের পশ্চিমের এই দেশ হল 'কুলিয়া', যেমন—

প্রতাপরুদ্র। কথয় মে কিয়দ্দূরং ভগবন্তো গতাঃ।
পুরুষোঃ। কুলিয়া গ্রামং যাবৎ।
রাজা। (সার্বভৌমমুখং নিরীক্ষতে)।
সার্বভৌম। দেব, নবদ্বীপপারে পারেগঙ্গং কশ্চন তন্নামা গ্রামোঽস্তি।

*　　*　　*

পুরুষোঃ। ততোঃ শ্বেত বাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতঃ
তথৈব তরণি-বর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাসবট্যাম্ উত্তীর্ণবান্।
(নবম অঙ্ক)

এ হ'ল শ্রীচৈতন্যের নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাবার অভিলাষী হয়ে যাত্রাকালে গৌড়ের পথমধ্যবর্তী ঘটনার বর্ণনা। কবিকর্ণপুর আরও সংবাদ দিচ্ছেন যে, শ্রীচৈতন্যকে দেখার জন্য নবদ্বীপ অঞ্চল থেকে লোকের ভিড় এত বেশি হয়েছিল যে খেয়া নৌকার ভাড়া এক কাক থেকে এক কহন পর্যন্ত উঠেছিল, আর জলপথে মাঝে মাঝে যে সব বাঁশের সেতু করা হয়েছিল তা প্রত্যহই ভেঙে যেতে লাগল। শ্রীচৈতন্য সাতদিন কুলিয়ায় থেকে নবদ্বীপের লোকের মনস্কামনা পূর্ণ ক'রে রামকেলি গ্রামে যান।

উক্ত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক লেখার বিশ-পঁচিশ বছর আগেই বাংলায় লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত বিরচিত হয়। এই গ্রন্থটিও অত্যন্ত প্রামাণিক, আর নবদ্বীপ অঞ্চলের এবং সেই সঙ্গে ঐ অঞ্চলের সমাজস্থিতির ও শ্রীচৈতন্যের পারিবারিক অবস্থার যা কিছু বিশদ বিবরণ এতেই পাওয়া যায়। যদিও শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহ কেমন ছিল, কোন্ মুখে, গঙ্গা থেকে ঠিক কত দূরে এ সব খুচরো খবর তিনি দেননি। বৃন্দাবনের গ্রন্থের মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের নবধর্ম প্রকাশের বর্ণনার মধ্যে কাজীর বিরুদ্ধতা প্রশমন বর্ণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে যে অঞ্চল ও পথ দিয়ে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সংকীর্তনের দল কাজীর বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছিল এবং চক্রাকারে নবদ্বীপ পরিক্রমা করে ফিরে এসেছিল তার

বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তখনকার নবদ্বীপের পরিচয় হিসেবে এই বিবরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবরণ অনুসরণে দেখা যায়, নবদ্বীপে গঙ্গার তীর ধ'রে একটি পথ চলে গিয়েছিল। এই পথটি তীরবর্তী বসতিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এ ছাড়া গঙ্গার উপর বেশ কয়েকটি স্নানের ঘাটও ছিল। শ্রীচৈতন্য নিজে যে ঘাটে স্নান করতে ও সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত ছিলেন সেখান থেকে সংকীর্তন প্রারম্ভ হয়। তার পর মাধাইয়ের ঘাট এবং বারোকোণা ঘাট প্রভৃতি অতিক্রম ক'রে ঐ পথ ধ'রে তাঁরা 'গঙ্গার নগর' অঞ্চলে এসে পৌঁছালেন। গঙ্গার নগরের মধ্য দিয়ে নগরিয়াদের ঘাট অতিক্রম করে এলেন শিমুলিয়া। ঐ শিমুলিয়া গ্রাম এখনও রয়েছে। এর অবস্থিতি বর্তমান নবদ্বীপ শহরের উত্তর-পূর্বে এবং 'মায়াপুর' নামে কথিত অঞ্চলের ঠিক উত্তরাংশে। শিমুলিয়াতে এসে ঐ পথ ছেড়ে দিয়ে "কাজীর বাড়ির পথ ধরিলা ঠাকুর"। শিমুলিয়া সম্পর্কে বৃন্দাবনদাস বলছেন যে এটি নবদ্বীপ শহরের প্রত্যন্ত পল্লী "নদীয়ার একান্ত নগর শিমুলিয়া"। বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে শিমুলিয়া এবং সেখান থেকে কাজীর বাড়ি (যে অঞ্চলকে 'কাজীপাড়া' বলা হয়), সংকীর্তনের প্রারম্ভ স্থান থেকে বেশ কিছু দূর রাস্তা। আর এ অঞ্চলে গঙ্গাও নেই, কোনো ঘাটও নেই। আরও লক্ষণীয় এই যে, নবদ্বীপ থেকে শিমুলিয়া আসতে এবং কাজীর প্রত্যয় উৎপাদনের পর গাদিগাছা, পারডাঙ্গা এবং সম্ভবত মাজিদা দিয়ে অর্থাৎ নবদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল বেষ্টন ক'রে উত্তর-পশ্চিমে ফিরে আসতে গিয়ে সংকীর্তনের দলকে পথে কোনো নদী বা জলপথ অতিক্রম করতে হয়নি। গাদিগাছা অঞ্চল হ'ল এখনকার গঙ্গা এবং জলঙ্গী নদীর মিলনস্থলের নিকটবর্তী তখনকার গ্রাম। তার দক্ষিণের পল্লী হ'ল মাজিদা বা মাঝদিয়া, আর পারডাঙ্গা হল এখনকার নবদ্বীপ শহরের মধ্য-পূর্ব ভাগ। 'নবদ্বীপ' অর্থে জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নটি দ্বীপ—এ নয়। নব উদ্ভূত দ্বীপ, ভাগীরথী এবং জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি অঞ্চল। পুরাতন মানচিত্রাদি এবং ডাচ ও ইংরেজ বণিক ও পর্যটকদের বিবরণ থেকে দেখা যায় জলঙ্গী মুহুর্মুহু তার স্রোতপথ পরিবর্তন করেছে। এখন যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে তার উত্তরে বহু আগে মিলিত ছিল। পরে ঐ পথ ত্যাগ করে কিছু দূরে আগে থেকেই দক্ষিণমুখী হ'য়ে বর্তমান নবদ্বীপের ৪।৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রগড়ের কাছে মিলিত হয়েছিল। আর ষোড়শ শতাব্দীর প্রামাণিক বর্ণনা থেকে দেখছি যে, গঙ্গাপারে নবদ্বীপের পশ্চিমকূলে যেমন ছিল, তেমনি উত্তরকূলেও ছিল। অর্থাৎ গঙ্গা উত্তরে ও পশ্চিমে নবদ্বীপকে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ছিল। এখনকার নবদ্বীপের পূর্ববাহিনী বর্তমানের গঙ্গা বেশ পরেই আবির্ভূত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিতে জলঙ্গীর প্রবাহের নাম পাওয়া যায় না। অনুমান, জলঙ্গী তখন বেশ কিছু দূর দিয়ে প্রবাহিত হত।

এই নগর-সংকীর্তনের বর্ণনায় মুরারি বিস্তারিত ব্যাপারে যান নি। তিনি বলছেন—

> হরি-সংকীর্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ।
> ম্লেচ্ছাদীনুদ্দধার সো জগতামীশ্বরো হরিঃ॥

এ থেকে বোঝা যায় নবদ্বীপের পূর্বপ্রান্তের মুসলমান পল্লীগুলিকেও তিনি স্পর্শ করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলছেন,

> "সর্বনবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।"

পরে তিনি বলছেন, শূদ্রপ্রধান 'নগর' অঞ্চলের নগরিয়াদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং শঙ্খবণিক ও তন্তুবায়দের সঙ্গে নৃত্যকীর্তন করে 'খোলাবেচা শ্রীধরের' গৃহে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্প্রতি শ্রীচৈতন্যের সমকালীন পদকর্তা উদ্ধবদাসের ভণিতায় একটি পদ পাওয়া গেছে। পদটিতে ঐ নগরসংকীর্তনের স্থানগুলির নাম ও পর্যটনের ক্রম উল্লেখিত রয়েছে। বৃন্দাবনদাস থেকে বিশেষ এই যে, শ্রীচৈতন্য রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের গৃহ অর্থাৎ তাঁর শ্বশুরালয় হয়ে তবে নিজালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। আর রয়েছে গঙ্গার ও শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহের অবস্থান সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য—

> বায়ুকোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
> নিজ গৃহে গেলা গোরহরি॥

এ পদটি যদি অকৃত্রিম হয় তাহলে তৎকালীন গঙ্গার প্রবাহ এবং নবদ্বীপ মধ্যে শ্রীচৈতন্যের বাসগৃহের অবস্থিতির অন্বেষণ অনেকটা সহজ হয়ে আসে। অবশ্য মুরারি এবং বৃন্দাবনদাস যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও গঙ্গার দক্ষিণ কূলেই যে শ্রীচৈতন্যের 'নিজঘাট' 'মাধাইয়ের ঘাট' 'বারকোণা ঘাট' এবং 'নগরিয়া ঘাট' ছিল এই তথ্য অনুমিত হয়। সন্ন্যাসের সংকল্প নিয়ে গৃহত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য যে-ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে উত্তরকূলে পেঁছে কাটোয়ার পথ ধরেছিলেন জনশ্রুতিতে তাকে 'নিদয়ার ঘাট' বলে। আমাদের অনুমান ঐটি তখনকার খেয়াঘাটও ছিল এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অথচ শ্রীচৈতন্য-শ্রীবাসের গৃহ থেকে দূরবর্তী যে রাজপথের বিবরণ রয়েছে তা ঐ খেয়াঘাট অতিক্রম করে গঙ্গার তীর ধরে কাটোয়া পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। এখন নবদ্বীপ থেকে কাটোয়া যেতে হলে গঙ্গা অতিক্রম করতে হয় না, তখন হত। নবদ্বীপের আর একটি খেয়াঘাটের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে, যা পার হয়ে জনতা শ্রীচৈতন্যকে দেখার জন্য বিদ্যাবাচস্পতির গ্রাম বর্তমান বিদ্যানগরে সমবেত হয়েছিল। হোসেন শাহের শাসনকালে 'অম্বুয়া' অর্থাৎ বর্তমান কালনার সংলগ্ন অম্বিকা গ্রাম এই অঞ্চলের বা মুল্লুকের প্রশাসনিক হেড-কোয়ার্টার ছিল। ঐখানে মুল্লুকপতির নিবাস ছিল। নবদ্বীপের মধ্যবর্তী যে রাজপথের উল্লেখ রয়েছে তা নিশ্চয়ই অম্বুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত এবং বিদ্যানগরের খেয়াঘাট পার হয়ে নবদ্বীপের মধ্য দিয়ে ও কাজীর বাড়ির সন্নিকট হয়ে কাটোয়া যাবার খেয়াঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এ অনুমান অসংগত হবে না। রাজপথ

যে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীবাসের গৃহ থেকে কিছু দূরবর্তী ছিল এ প্রমাণ পাওয়া যায় চৈতন্যভাগবত থেকেই। অথচ তা শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী ও সুগায়ক মুকুন্দ দত্তর গৃহের নিকটেই ছিল, কারণ—

রাজপথ দিয়া প্রভু আইসে একদিন।

* * *

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা স্নান করিবারে।

(আদি—সপ্তম)

শ্রীবাস কার্যব্যপদেশে একদিন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, অকস্মাৎ কিশোর শ্রীচৈতন্যকে সে-পথে দেখে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথা চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি?" (আদি—অষ্টম)। আনুমানিক ১৬৬০ খৃঃ প্রস্তুত ফ্যান্ ডেন্ ব্রোকের নকশায় দেখছি তখনকার একটি প্রশস্ত রাজপথ ও বাণিজ্যপথ মেদিনীপুর থেকে বর্ধমান ও কাটোয়া হয়ে গঙ্গার ওপার থেকে সোজা কাশিমবাজার পর্যন্ত চলে গেছে। অম্বিকা-নবদ্বীপের এই রাজপথ কাটোয়ায় গিয়ে উক্ত পথের সঙ্গে সম্মিলিত ছিল এই অনুমান হয়। নদীর প্রবাহে বা অন্যভাবে বিনষ্ট না হলে যাতায়াতের পথ কখনও বিলুপ্ত হয় না। ঐ পথের পাশেই শহর গঞ্জ গড়ে ওঠে। আমাদের মনে হয়, বর্তমান পোড়ামা-তলার পাশ দিয়ে যে পথটি দক্ষিণ-উত্তরে বহুদূরে প্রসারিত ঐটিই তখনকার রাজপথ।

গৌড়ে আগমনকালে শ্রীচৈতন্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতির বিষয়ে কবিকর্ণপুরের সঙ্গে বৃন্দাবনদাসের কোথাও কোথাও মতানৈক্য থাকলেও শ্রীচৈতন্য বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এবং প্রবল জনতার চাপ থেকে বিদ্যাবাচস্পতিকে রক্ষা করতে গিয়ে মাঝ-রাতে লুকিয়ে যে কুলিয়া গ্রামে চলে আসেন এ তথ্যে কোনো বিরোধ দেখা যায় না। বস্তুত, কুলিয়া বা 'পাড়পুর-কুলিয়া' যে নবদ্বীপের প্রায় সংলগ্ন এবং গঙ্গার অপর পারে পশ্চিম তীরে ছিল এটি একটি অবিসংবাদিত সত্য। ফলত এও বোঝা যায় যে গঙ্গা নবদ্বীপকে উত্তরে ও পশ্চিমে বেষ্টন করে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত ছিল। এ বিষয়ে অন্য নিঃসংশয় প্রমাণও মিলছে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ষোড়শ শতাব্দীর গঙ্গার এই অঞ্চলের প্রবাহপথ নির্দিষ্ট হয়েছে। ধনপতির সিংহল যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে মুকুন্দরাম অজয় ও ভাগী-রথীর সংযোগস্থল থেকে চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত গঙ্গার পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি গ্রাম নগর ও ঘাটের উল্লেখ করেছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে বর্ণনার ক্রম হচ্ছে এই—অজয় ভাগীরথীর সংযোগ স্থলে ইন্দ্রাণী ডাইনে ভাতৃসিংহের ঘাট বামে মাটিয়ারি চণ্ডীগাছা। বেলনপুর। দিনে ও রাত্রে *চৈতন্যবন্দনা ও রন্ধন ভোজন সেরে নিয়ে রাত্রিযাপন করে পরের দিন যাত্রা করে পাড়-পুর, সমুদ্রগড়, মির্জাপুর, ডাইনে অম্বুয়া, বামে শান্তিপুর, ডাইনে গুপ্তিপাড়া। পরে উলা, খিসমা ঘুরে ফুলিয়ার ঘাট ইত্যাদি। এই বর্ণনক্রম মোটামুটি নির্ভরযোগ্য।* অধিকাংশ স্থান এখনও বর্তমান আছে। কয়েকটির নাম পরিবর্তিত হয়েছে মাত্র। আর গঙ্গার প্রবাহ গত চারশ' বছর ধরে এ-পাশ ও-পাশ করেছে বলে কয়েকটি গ্রাম বর্তমানে একটু দূরে পড়ে গেছে। যেমন মাটিয়ারি গঙ্গা থেকে এখন মাইল তিনেক পূর্বে। বেলনপুরের বর্তমান সংস্কৃতায়িত নাম হল বিল্বগ্রাম—মদনমোহন তর্কালংকারের নিবাস। চণ্ডীগাছা গ্রামটি সম্ভবত ভিন্ন নাম ধারণ করেছে। মুড়া-গাছার নিকটবর্তী কোনো গ্রাম হতে পারে। পূরধলী আর কিছুই নয়, বর্তমান 'পূর্ব-স্থলী' যার পুরস্থলী নামও পাওয়া যায়। লক্ষণীয় পূর্বস্থলীর পরেই নবদ্বীপ, নব-দ্বীপের পরেই পাড়পুরের উল্লেখ। পাড়পুর হল পূর্বোক্ত কুলিয়ার সংলগ্ন গ্রাম। কৃত্রিম শব্দরূপে কদাচিৎ পাহাড়পুর। দুটি গ্রামকে একসঙ্গে চিহ্নিত করা হয় পাড়পুর-কুলিয়া বলে। পূর্বেকার নবদ্বীপ শহরের প্রায় বিপরীত কূলে স্বল্প দক্ষিণে ঐ কুলিয়া অধুনা বিলুপ্ত। সমুদ্রগড় বর্তমান রেল স্টেশনের দক্ষিণের গ্রাম। ঐ সমুদ্র-গড়ের সন্নিকটে একদা গঙ্গার সঙ্গে জলঙ্গী এবং দামোদরের পূর্ব প্রবাহ 'খড়ি' নদী মিলিত ছিল এবং ঐ মিলন স্থলের নাম ছিল তেমোহানী। গঙ্গা তখন ফুলিয়ার পাশ দিয়ে উত্তরমুখে বাঁক নিয়ে উলা অর্থাৎ বর্তমান বীরনগর এবং উলার পূর্বদিকের খিসমা গ্রাম হয়ে আবার দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। গঙ্গার সেই পুরাতন খাতের নিদর্শন আজও স্পষ্ট। আর পূর্বতন গঙ্গা যে বর্তমান নবদ্বীপ শহরের মাইল তিনেক পশ্চিমে ও উত্তরে প্রবাহিত ছিল তারও ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ যথেষ্ট। জলঙ্গী নদী যে মুহুর্মুহু পার্শ্বপরিবর্তন করেছে এবং সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে তা নবদ্বীপ থেকে পূর্বে বেশ কিছুদূরে ছিল তারও প্রমাণ এ অঞ্চলে যাতায়াতের ফলে নিত্যই দেখছি। বৃন্দাবনদাস জলঙ্গীর বর্ণনা দেন নি, কিন্তু তাঁর চৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে উত্তরে পশ্চিমে রাঢ় অঞ্চলে তিন দিন ভ্রমণের পর যখন শান্তিপুরে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁকে দেখার জন্য নবদ্বীপ থেকে ভক্ত ও পার্ষদেরা নৌকায় জলপথ অতিক্রম করে তবে শান্তিপুরে পৌঁছেছিলেন। নবদ্বীপ গঙ্গার যে-দিকে শান্তিপুরও সেইদিকে এবং ফুলিয়া শান্তিপুর থেকে গঙ্গার তীর হয়ে [illegible] হয়, যে-জলপথ তাঁরা নৌকায় অতিক্রম করে-ছিলেন, তা এই জলঙ্গী নদীর, যা শান্তি-পুরের কিছু উত্তরে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হ'ত। জলঙ্গীর এই পুরাতন প্রবাহপথ ১৯১৭ খৃঃ প্রস্তুত বঙ্গীয় সার্ভে মানচিত্রে রয়েছে, তাছাড়া সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত ফ্যান ডেন ব্রোক এবং থরনটনের মানচিত্রে পাওয়া যাচ্ছে। খৃঃ ১৭৫০-৫৫ মধ্যে লেখা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের সীমা বর্ণনকল্পে বলা হয়েছে—"রাজ্যের উত্তর সীমা মুর্শিদাবাদ/পশ্চিমের সীমা গঙ্গা-ভাগীরথী খাদ।" ঐ সীমানা এখনও নদীয়া জেলার সীমানা। বর্তমান প্রবাহিত নবদ্বীপ-পূর্ব গঙ্গা তখনও ছিল না।

এখন অপর বিখ্যাত গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা দেখা যাক। একমাত্র 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থেই বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন সহকারে নবদ্বীপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর আঠারো শতাব্দীর রচনা। গ্রন্থটি সার্থকনামা এবং সাধনপথের পথিক বৈষ্ণব ভক্তের কাছে মূল্যবান নিঃসন্দেহে। কিন্তু গ্রন্থটি যে-পরিমাণে ভক্তিভক্তির উৎকর্ষ-বিধায়ক ঠিক সেই পরিমাণেই ইতিবৃত্ত ও বাস্তবের উপর নিষ্ঠুর অবজ্ঞার পরিচায়ক। যেমন বলা যায়, শ্রীচৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরবর্তী তিন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের কীর্তিকলাপ বর্ণন ভক্তিরত্নাকর রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। অথচ তাঁদের আবির্ভাব-তিরোভাব বা তাঁদের বৃন্দাবন গমন দীক্ষা, প্রত্যাবর্তন, বিখ্যাত খেতুড়ীর মহোৎসব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কোনো সন-তারিখই নরহরি চক্রবর্তী দেন নি। কেবল তিথি নক্ষত্র জানিয়েছেন। একমাত্র দেখা যায়, সনাতন গোস্বামীকৃত বৈষ্ণব তোষণী এবং জীব গোস্বামীকৃত লঘুতোষণীর সমাপ্তির তারিখ তিনি দিয়েছেন। এটি দিতে পেরেছেন কারণ, 'লঘুতোষণী' টীকায় পূর্বেই তা দেওয়া রয়েছে। আসলে এটি পুরোপুরি বৈষ্ণব-সাধন গ্রন্থ, ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা বহু বৈষ্ণবগ্রন্থের থেকে আদর্শ গ্রহণ করে। এর ঐতিহাসিক মূল্য কিছুমাত্র নেই, তবে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গোবিন্দদাসাদির রচিত কিছু পদের উদ্ধৃতি এর মধ্যে দেখা যায়, আর দেখা যায় সংস্কৃতে লেখা জীবগোস্বামীর কয়েকটি পত্র। ঐতিহাসিকের কাছে ঐটুকুই এর আকর্ষণীয় বস্তু। শ্রীনিবাসাদির জীবন ও কার্যাবলীর যে বর্ণনা এতে পাওয়া যায়, তাও বহুল পরিমাণে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেই তাঁকে গঠন করতে হয়েছে। যাই হোক শ্রীল নরহরির নবদ্বীপ পরিক্রমা দেখা যাক।

শ্রীনিবাসকে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী [illegible] পরিদর্শন করাচ্ছেন শচীদেবীর পরি-

চারক ঈশান। আনুমানিক কাল ১৫৭৫-৮০ খৃঃ। তখন ঈশানের বয়ঃক্রম প'চাত্তর বৎসরের কম হবে না। ভক্তিরত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে এই বর্ণনা রয়েছে। এর পূর্বে পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনরহরি অনুরূপভাবে বৃন্দাবনের বর্ণনাও দিয়েছেন। বর্ণনার প্রসঙ্গে তিনি নবদ্বীপকে ন'টি পৃথক দ্বীপের সমাহার মনে করেছেন, যা কেউ কোথাও নির্দেশ করেন নি। আবার তিনি এমন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে, শ্রবণাদি নবধা ভক্তির উদ্দীপন হয় বলে নবদ্বীপ নাম। ঐ ন'টি দ্বীপের তিনি নিম্নলিখিত নাম দিয়েছেন—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, পর্বতাখ্য-কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ। আসলে এগুলি হ'ল বাংলা নামের কৃত্রিম তৎসমকরণ। মর্যাদা বাড়াবার জন্য কেউ কেউ এরকম হাস্যকর কৃত্রিম শুদ্ধতার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। যেমন কলিকাতাকে কালীক্ষেত্র, বেলেঘাটাকে বিল্ব-ঘৃষ্ট এবং মির্জাপুরকে মৌর্যপুরম ব'লে আভিজাত্যের ছদ্মবেশ পরানো যায়। উক্ত নামকরণের মধ্যে সীমন্তদ্বীপ হ'ল শিমুলিয়ার ছদ্মনাম, গোদ্রুমদ্বীপ গাদি-গাছার, মধ্যদ্বীপ মাজিদার, পর্বতাখ্য-কোলদ্বীপ পাড়পুর-কুলিয়ার, জহ্নুদ্বীপ জাননগর বা জাহাননগরের। এই বাংলা নাম-গুলি ঐ সময়কার সাহিত্যে পাচ্ছি। কিন্তু অন্তর্দ্বীপ=আতোপুর, ঋতুদ্বীপ=রাতুপুর, আবার মহৎপুর=মাতাপুর, ভরদ্বাজটিলা= ভারুইডাঙ্গা, এগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। পুরাতন নবদ্বীপের বিলীন হওয়ার পর সম্ভবত চর অঞ্চলগুলি এইসব নামে চিহ্নিত হয়। আদর্শ ভক্ত নরহরি কেবল ঐ অঞ্চল-গুলির সংস্কৃত নামকরণ করেই ক্ষান্ত হন নি। প্রত্যেকটি অঞ্চলের একটি করে কল্পিত অলৌকিক কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। যেমন, সীমন্তদ্বীপ নামের কারণ—পার্বতী শ্রীচৈতন্যের পদধূলি সীমন্তে ধারণ করেছিলেন। গোদ্রুমদ্বীপ নামের কারণ—ঐখানে অশ্বত্থবৃক্ষের নিচে সুরভি গাভী থাকতেন এবং সুরভি গৌর-দরশনে গৌরমহিমা কীর্তন করেছিলেন। তেমনি গৌরাঙ্গ সপ্তর্ষির কাছে মধ্যাহ্নে দর্শন দিয়েছিলেন, তাই মধ্যদ্বীপ। তারপর ব্রহ্মা হরিদাস হয়ে জন্মাবেন এই কথা ব'লে প্রভু অন্তর্ধান করেছিলেন ব'লে নাম হ'ল অন্তর্দ্বীপ। এই রকম সর্বত্র এবং নিতান্ত বিশ্বাসী ভক্তের কাছে এই সব অলৌকিক কল্পিত কাহিনীর মূল্য যেমন অপরিসীম, ইতিহাস-ভূগোলের দিক থেকে এসব তেমনি বিভ্রান্তিকর। নরহরি চক্রবর্তী ভাগীরথী ও জলঙ্গীর অবস্থান বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত কোথাও দেন নি।

এই রকম অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গিরই চরমতা পাওয়া যাবে তাঁর "মায়াপুর" নাম কল্পনায়। শ্রীল নরহরির বিবরণ মতে, নবদ্বীপের মধ্যবর্তী অন্তর্দ্বীপের অভ্যন্তরে "মায়া-পুর" অবস্থিত এবং ঐ "মায়াপুর"ই হল গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলানিকেতন। বস্তুত এই "মায়াপুর" বাস্তবে কোথাও ছিল না। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কোনও জীবনীকার বা পদকর্তা মহাজন মায়াপুরের উল্লেখ করেন নি। শ্রীল নরহরি কোথায় পেলেন তাও স্পষ্ট নয়। "তথাহি" বলে তিনটি সংস্কৃত অনুষ্টুপ অবশ্য তিনি যোজনা করেছেন, যা তাঁর নিজস্ব রচনা হওয়াই সম্ভব। আসলে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে ও অন্যান্য অঞ্চলে নিগূঢ় সাধন-সংকেতময় বহু বৈষ্ণবশাস্ত্র ও কড়চা লিখিত হয়, যার কয়েকটি থেকে তিনি "তথাহি" ব'লে বহু শ্লোক তুলেছেন। এরকম কয়েকটির নাম হ'ল সাধনদীপিকা, ঊর্ধ্বাম্নায়তন্ত্র, বরাহতন্ত্র। এগুলির কোনো কোনোটিতে বৃন্দাবনের গোবিন্দদেব, গোপী-নাথ, মদনগোপালের মন্দিরাঞ্চলকে "যোগ-পীঠ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আর কামবীজ-মন্ত্রে শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে যোগ-সাধনার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। নরহরি চক্রবর্তীও বৃন্দাবন-পরিক্রমায় বৃন্দাবনকে বারংবার যোগপীঠ আখ্যায় ভূষিত করেছেন। এবং তিনি ভক্তদের যেমন বৃন্দাবনের যোগপীঠের তেমনি নবদ্বীপের মায়াপুরের ধ্যান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের বিখ্যাত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ও বৃন্দাবনের গোবিন্দদেবের মন্দিরকে যোগপীঠ বলা হয়েছে। তিনি এইভাবে উক্ত যোগপীঠের বর্ণনা দিচ্ছেন—

> বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণসদন।
> মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্নসিংহাসন॥
> তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
> শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥
> (আদি—অষ্টম)

"মায়াপুর" নাম উক্ত যোগপীঠের অনু-সরণেই কল্পিত। সম্ভবত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ দর্শনের "যোগমায়া" শব্দটি ধরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দুই অঞ্চলে কল্পিত দুই নাম। বৃন্দাবনে যদি যোগপীঠ ধরা হয় তাহলে নবদ্বীপে হওয়া উচিত মায়াপুর, এরকম ধারণা থেকেই "মায়াপুর" নামের উদ্ভব। শ্রীপাদ নরহরি বলছেন—

> নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নাম স্থান।
> যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
> যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
> তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥
> মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধেয়ায়।
> মায়াপুর মহিমা কেবা বা নাহি গায়

অন্যত্র তিনি বলছেন—

> দ্বারকার ঐশ্বর্য দেখয়ে নদীয়ায়।
> রত্নসিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়॥
> ভুবনমোহন প্রভু শ্রীগৌরবিগ্রহ।
> বিলসয়ে রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মীসহ॥

অতএব মায়াপুর ভক্তের কল্পনা মাত্র, সেই অর্থে সত্য বাস্তব ইতিহাস-ভূগোলের সত্য নয়। ভক্তের দৃষ্টিতে গৌরবিগ্রহ যেমন চিন্ময়, শ্রীধাম নবদ্বীপও তেমনি চিন্ময়। তার সেই চিন্ময়ত্বের প্রতীক শব্দই হ'ল মায়াপুর। এ নিয়ে ভক্ত বৈষ্ণবদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধের অবকাশ নেই। কিন্তু বর্তমান নবদ্বীপ শহরই মায়াপুর, অথবা মায়াপুরই যথার্থ নবদ্বীপ এমন কথা বললে ইতিহাস-ভূগোলের বাস্তব সত্যকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করা হয়। সেইজন্যই নবদ্বীপের বাস্তব অবস্থিতি নিয়ে এই আলোচনার অবতারণা করা গেল।

মধ্যযুগের সাহিত্যে নবদ্বীপের অবস্থানের যে পরিচয় ফুটেছে, তাতে দেখা গেল, নবদ্বীপ গঙ্গার দক্ষিণ ও পূর্ব তীর সংলগ্ন নগর এবং পার্শ্ববর্তী বহু পল্লী অঞ্চলে সমৃদ্ধ। বর্তমান নবদ্বীপ শহর পুরাতন নবদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল। ভাগীরথীর নবদ্বীপ-পূর্ববাহিনী গতি তখন ছিল না। আর জলঙ্গীও বহুদূরে ছিল। এই হিসাবে বর্তমান নবদ্বীপ ও পূর্বস্থলী রেল স্টেশনের সমদূরবর্তী স্থানে গঙ্গার অপর তীরে নবদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র ছিল।

চিত্র প্রদর্শনী

বহির্বঙ্গের দুজন শিল্পী সম্প্রতি বিড়লা আকাদমিতে তাঁদের একক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রথম শিল্পী রণজিৎ দে, দ্বিতীয় শিল্পী ফাল্গুনী দাশগুপ্ত। দুজনেই কলকাতার শিল্পী-সমাজে পরিচিত কারণ ইতিপূর্বে তাঁরা এখানে তাঁদের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছেন।

রণজিৎ দে রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থপতিবিদ্যা বিভাগের চিত্রকলার রিডার। প্রদর্শনীতে তেল ও জলরঙে আঁকা ছোট বড় মোট ৬২টি তাঁর শিল্পনিদর্শন দেখা যায়। তেলরঙে আঁকা ছবিগুলি অধিকাংশই আকারপ্রধান। প্রধানত নারীর মুখ ও আকার অবলম্বনে রচিত ছবিগুলি শিল্পী প্রতীকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। দু' এক স্থলে যামিনী রায়ের প্রভাব ধরা পড়ে। ইঙ্গিতপ্রধান সুললিত ও স্থূল রেখার মধ্য দিয়ে তিনি বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, যেমন ১ ও ২নং ছবিতে। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে সঙ্গীত-শিল্পীও অনেকের চোখে পড়ে। তবে অহেতুক বিকৃতকরণের ফলে অন্যান্য নিদর্শনগুলি অস্পষ্ট থেকে গেছে। বরং জলরঙে আঁকা ছোট ছোট ছবিতে শিল্পী অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বস্তুত, এই শ্রেণীর ছবিই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকারে আঁকলে হয়তো আরও রসসমৃদ্ধ হত। এগুলির অধিকাংশই পল্লীদৃশ্য—স্বল্প রেখা, পরিমিত ও সুনির্বাচিত রঙ ব্যবহার ও স্থলবিশেষে আলঙ্কারিক বর্ণনাভঙ্গির ফলে এগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী কোনও ছবিরই নামকরণ করেন নি, তাতে অবশ্য রসভোগে অসুবিধা হয় না, কারণ সহজ ও সরল আলেখ্য দেখামাত্রই দর্শকচিত্ত মুগ্ধ হয়। এই প্রসঙ্গে একটি ছবির উল্লেখ করা যায়—অলঙ্কার ও আকার-প্রধান কয়েকটি গাছ। তুলির স্বল্প, পরিমিত বলিষ্ঠ কয়েকটি টান, পরিপ্রেক্ষিতবোধ, প্রভাতের রৌদ্রঝলমল স্বচ্ছ বনভূমি ও পুরোভাগে উপবিষ্ট দুজন যুবতী—সুন্দর রচনা। আলঙ্কারিক সূক্ষ্ম কয়েকটি রেখা মাধ্যমে আঁকা তরঙ্গবহুল নদী ও তার ওপর দোলায়মান কয়েকটি নৌকা, এ ছবিও অনেকের চোখে পড়ে যায়। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে ওয়াশ পদ্ধতিতে রচিত তরুশ্রেণী ও ক্যাকটাস উল্লেখ্য।

ফাল্গুনী দাশগুপ্ত দিল্লি আর্ট কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর প্রদর্শনীতে তেল ও জলরঙে আঁকা ১৫টি নিদর্শন দেখা যায়। এই শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সুনির্বাচিত অল্প ছবিই পেশ করেন, ফলে দর্শকমাত্রেই যেন প্রদর্শনীটি উপভোগ করেন। বিমূর্ত রীতিতে কাজ করলেও শিল্পীর রচনাপদ্ধতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায়, বিশেষভাবে পরিকল্পনা ও রঙ ব্যবহার রীতিতে। তেলরঙের তিনটি নিদর্শনের মধ্যে একটিতে তিনি লম্বমান রচনাক্ষেত্রটি ছোট ছোট চতুর্ভুজ ও আয়তক্ষেত্রে ভাগ করে লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ রঙে ভরে ফেলেছেন ও পরে অ্যাকশন পেন্টিং রীতির রেখা মাধ্যমে সেগুলি পৃথকীকরণ করেছেন। বিশেষ করে মধ্যস্থলে রঙ ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে ছবির সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। অপরটিও অ্যাকশন পেন্টিং জাতীয়, তবে প্রতীক-মূলক। এক রঙের ওপর অন্য রঙে আঁকা বাঁকাভাবে সংকোণে ছড়িয়ে দিয়ে বা সুপারইমপোজ করে শিল্পী এটিতে সুন্দর কারুকার্য সৃষ্টি করেছেন (কমপোজিশন ও স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্স)। অপর পক্ষে অন্য বা তৃতীয় ছবিটি তন্ত্রশাস্ত্র অবলম্বনে রচিত ও প্রতীকপ্রধান। সাপ, পদচিহ্ন ও কালী-মূর্তি মাধ্যমে শিল্পী যেন ইঙ্গিতে 'শক্তির' অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। জলরঙে আঁকা ছোট ছোট নিদর্শনগুলির কয়েকটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে। রঙ নির্বাচন ও কমপোজিশনে শিল্পী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই, তবে মনে হয় কয়েকটিকে যেন ছোট্ট ক্ষেত্রের মধ্যে অযথা আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে—বৃহত্তর রচনাক্ষেত্র পেলে এগুলি আরও বিশদভাবে ফুটে উঠতে পারত এবং অন্তর্নিহিত রূপও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হত। এই প্রসঙ্গে সমান্তরালভাবে রচিত নীল রঙ-প্রধান কমপোজিশন-২ ও ইঙ্গিতপ্রধান সামার-এর নাম করা চলে। আরও একখানি ছবির উল্লেখ করা যায়—শ্রী। তুলির বলিষ্ঠ ও গতিশীল রেখার মধ্য দিয়ে শিল্পী নারীর দেহলতাটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইম্প্রেশানিস্টিক ছবিটির পরি-কল্পনা, গতিবেগ ও বিশেষ করে অপরূপ রেখাছন্দ দ্রষ্টব্য। অপরাপর নিদর্শনের মধ্যে ল্যান্ডস্কেপ-২, পেন্টিং-৪ ও কমপোজিশন-৩-এর নাম করা চলে।

কমপোজিশন —ফাল্গুনী দাশগুপ্ত

চিত্রপ্রিয়

অচিন্ত্য-রচনাবলী : নবীনতার স্বাদ

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। দাম কুড়ি টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রোত্তর কালের নতুন পালাবদলের অন্যতম ধারক অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অনমনীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে যুগের যন্ত্রণা, জিজ্ঞাসা, নৈরাশ্য, সংগ্রাম ও অপূর্ণতার খেদ নিয়ে তাঁর আবির্ভাব অবশ্যই সাহিত্যের দিক থেকে নতুন দিগদর্শন নিয়ে এসেছিল। আজ পঞ্চাশ বছর বাদে সেই নবীনতার স্বাদ আরও নতুন নতুন বাঁক পরিবর্তনে হয়তো কিছুটা বাসী হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মতো দুঃসাহসী লেখক এসেছিলেন বলেই যে নতুনতর বাঁক সহজতর হয়ে এসেছে একথা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকের অজানা নেই। তাঁর রচনাবলীর প্রকাশ করে গ্রন্থালয় প্রকাশক সংস্থা একটি মহৎ ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

এই খণ্ডে কবিতা পর্যায়ে আছে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রথম দিককার কিছু কবিতা, 'অমাবস্যা' সমসাময়িক কবিতা, প্রিয়া ও পৃথিবী। উপন্যাস পর্যায়ে তিনটি বই : বেদে, কাকজ্যোৎস্না ও অনুবাদ উপন্যাস 'প্যান'। গল্প পর্যায়ে অনুবাদ গল্প ও গল্পগুচ্ছ। নাটিকা পর্যায়ে দুটি : 'সাকি' ও 'কেয়ার কাঁটা'। কাব্যের [illegible] বিরুদ্ধ [illegible] আবেগ, ও ভাষার রোমান্টিকতার সংযম অচিন্ত্যকুমারের এই পর্বের কবি বৈশিষ্ট্য। ব্যর্থ প্রেমে দুরাভিসার নয়, চোখে দেখা বুকে চাওয়ার জ্বালা এই কবিতাবলীকে রবীন্দ্রোত্তরকালে বিশিষ্ট করেছে। বিশিষ্ট হবার আর-এক কারণ তার ঘনবদ্ধ শব্দ সন্নিবেশ। এই স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর অমাবস্যা প্রিয়া ও পৃথিবী ও অন্যান্য কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'বেদে' তাঁর প্রথম উপন্যাস। একটি ছন্নছাড়া মানুষের জীবন নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে বিচিত্র ভঙ্গিহীন নারী-অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পাঠকের কাছে নিশ্চয় নতুন। পরিকল্পনা ও রচনাভঙ্গির মৌলিকতায় এ উপন্যাস পূর্ববর্তী ধারা থেকে কিছু এগিয়ে এসেছে, তবে চেষ্টার মধ্যে যে কৃত্রিমতা আছে তা আজকের পাঠকের কাছে অস্পষ্ট থাকবে না। 'কাক জ্যোৎস্না' উপন্যাসে যে সমাজ বিদ্রোহের ছবি আছে তাকে বহন করবার মতো পৌরুষ যে কেন নায়ক চরিত্রে নেই তার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু লেখার ভঙ্গির মধ্যে দুঃসাহস আছে ঠিকই। 'প্যান' উপন্যাসটি এক সময় যে সাড়া জাগিয়েছিল তার কারণ অচিন্ত্যকুমারের এই অনুবাদ। কিন্তু এই উপন্যাসে এমন এক অস্পষ্ট বর্ণনাত্মক সম্ভাব্যতার প্রকাশ আছে যা কৈশোর সুলভ। এই উপন্যাসের প্রতি আকর্ষণ কল্লোলীয়দের বাস্তবতার মুখোশটিকে খুলে দেয়।

অনুবাদগল্প ও গল্পগুচ্ছ পড়লে বোঝা যায়, কোন আদর্শে অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র ইত্যাদি লেখকগণ ছোটগল্পের নিটোল শিল্পরূপটিকে খাতে আনবার চেষ্টা করেছিলেন। মধ্যবিত্তের যত স্বপ্নভঙ্গই গল্পে থাক, গল্পের কাব্যাস্বাদকে তাঁরা বরাবর বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। নাটিকা দুটির মধ্যেও এই কাব্যগুণ আছে। জীবন প্রশ্নের যতই উত্থাপন থাক, রোমান্টিক আত্মনিগ্রহই তার মূল কথা। বাস্তবতা নয়, বাস্তবতার ছদ্মবেশই তার আসল সাজ।

কিন্তু দোষত্রুটি যাই থাক, অচিন্ত্যকুমারের রচনাবলী প্রমাণ করে, ত্রিবিশের দশকে বাঙলাসাহিত্য নতুন বাস্তবতার দিকে পা বাড়িয়েছে—সে পদক্ষেপে যতই সংশয়ের কুয়াশা থাক। এই যাত্রার পরিচয়-

পত্রটুকু নেবার জন্যেই অচিন্ত্যকুমারের এই রচনাবলী পড়া দরকার। ফেলে-আসা যুগ অচিন্ত্যকুমারের পাঠককে এক ধরনের নস্ট্যালজিয়ার পাকে জড়িয়ে ধরবেই।

তথ্যপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয় অংশে সম্পাদক বহু পরিশ্রম করে অচিন্ত্য-কুমারের জীবন ও সাহিত্যকৃতির পরিচয়ের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের প্রমাণ স্বরূপ অনেক চিঠিপত্র ও মন্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছে এই অংশে, যাতে পাঠকের পক্ষে এককালের নবীনতাকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কোনো সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে নয়, এমনকি ক্রিকেট, ফুটবল অথবা হকির মতো জনপ্রিয় কোনো খেলার প্রতিবেদক রূপেও নয়, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত কবাডি খেলার আন্তর্জাতিক টেস্ট সিরিজ কভার করতে গিয়েছিলেন সাংবাদিক চিরঞ্জীব ওপার বাংলায়: আর ফিরে এসে সেই সফরের স্মৃতি রোমন্থন করে দিব্য একখানি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন: **পদ্মা আমার মা গংগা আমার মা**—এই নামে (**বর্ণালী**, কলকাতা-৯, দাম: শোভন সংস্করণ বারো ও সুলভ সংস্করণ দশ টাকা)।

পাঁচটি টেস্ট, পাঁচটি প্রধান জেলাশহরে। ঢাকা থেকে যশোহর, সেখান থেকে ফরিদপুর, ফের কুমিল্লা, সব শেষে দিনাজপুর হয়ে ঢাকায় ফিরে আসা। এরই মধ্যে টাঙ্গাইলের একটি প্রদর্শনী খেলায় ভারতের প্রথম পরাজয় অবলোকন। ছোটোছুটিতেই কেটেছে সতের দিনের বাংলাদেশ সফর। চিরঞ্জীব জানেন, এমন ঝটিকা-সফরে একটানা কাহিনীর স্বাদ আনা কঠিন। তাই সে চেষ্টা না করে তিনি দিনানুদৈনিক ডায়েরির পৃষ্ঠা কটিই তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। টুকরো টুকরো বহু ছবির মধ্য দিয়ে একটি উষ্ণ আতিথেয়তাপরায়ণ ভালোবাসাপ্রবণ, আবেগতপ্ত, বন্ধুবৎসল জনমানসের ছবি সব কিছু ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে সন্দেহ নেই। সাধারণ মানুষের খেলা বলেই বোধহয় কবাডিকে কেন্দ্র করে আপামর জনজীবনের প্রবলতম উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন চিরঞ্জীব।

চিরঞ্জীব শুধু সফল প্রতিবেদকই নন, সরস গল্প বলিয়েও। আদ্যন্ত ভ্রমণ-কাহিনীটি তাই সজীব এবং উজ্জ্বল। অন্তরায় শুধু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ। এপার বাংলার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত 'দীক্ষার' (পৃ ১৩), করুণাময়ের কাছে মাত্রাহীন 'প্রার্থণা' (১১৪), সুন্দর মতো স্পোর্টিং ছেলেকে 'সদাহাস্যময়ী' (১২৯) করে তোলার মতো আবেগ—বেশ মন খারাপ করে দেয়।

*

তাঁর 'জন্ম নিয়েছে পৃথিবী এবং' নামের পঞ্চাঙ্ক গীতিনাট্যে সমর মজুমদার বিজ্ঞান-ভিত্তিক কিশোর সাহিত্য রচনায় যে পারংগমতা দেখিয়েছিলেন দ্বিতীয় গীতি-নাটিকা **ভূতের দেশ** (তরংগতীর্থ প্রকাশনী, কলকাতা-৯, আড়াই টাকা) গ্রন্থেও সেই দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। দুটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এই গীতিনাটকের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের অসংগতি ও মানুষের আচরণের রীতিবিচ্যুতির দিকে অংগুলি নির্দেশ যেমন করেছেন তিনি, তেমনই রূপক গল্পের মধ্য দিয়ে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার রূপায়নের আভাসও তুলে ধরেছেন। কিন্তু বক্তব্য-প্রধান হওয়া সত্ত্বেও কিশোর মনের আনন্দের আবরণটি খুব যত্নের সংগে রক্ষা করতে ভোলেননি সমরবাবু।

জবরদস্ত গানগুলিতে সুর লাগিয়ে অভিনয় করে ছেলেরা যে আনন্দ পাবে এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে কিছু শিক্ষার খোরাকও জুটবে—এতে সন্দেহ নেই। গীতিনাট্যটির মুদ্রণ পারিপাট্য আন্তরিকভাবে প্রশংসার যোগ্য।

*

মৃণাল বসু চৌধুরী সম্পাদিত **শিলালিপি** (গংগোত্রী পরিষদ, জামসেদপুর, এক টাকা) প্রকাশের উপলক্ষ ছিল জামসেদ-পুরে সম্প্রতি আয়োজিত এক কবি সম্মেলন, তবু সংকলিত রচনাবলীর উজ্জ্বলতায় এই স্মারক সংকলনটি বিশিষ্টতা পেয়েছে। মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গংগোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণ ধর প্রমুখ কবিদের রচনা যেমন সংকলনটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে তেমনই পাশাপাশি জামসেদপুর নিবাসী সুরেশ সেন কমল চক্রবর্তী, প্রণব মিত্র বা বারীন ঘোষাল এর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কবিতা—শিল্পনগরীর সাহিত্য-প্রীতির উষ্ণ উপহার সংকলনটিকে সজীব ও নতুন স্বাদের করে তুলেছে। তবে এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ রচনার লেখিকা শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়। ইস্পাত-উজ্জ্বল ভাষায় তাঁর জামসেদপুর শহরের সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সমীক্ষাটি চমৎকার পাঠযোগ্য এক গদ্যনিবন্ধ।

খেলার মাঠে

এবারের উইম্বলডনের নানা কথা

পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজাত ও বর্ণময় টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডনের দীর্ঘ ৯৩ বছরের ইতিহাসে এবারের অনেক ঘটনাই উল্লেখযোগ্য। যেমন রেকর্ড সংখ্যক দর্শক সমাগম, পুরুষ ও মেয়ে বিভাগে গতবারের দুই চ্যাম্পিয়ন এবং দুই শীর্ষ বাছাইয়ের খালি হাতে বিদায়, দীর্ঘ ২৮ বছর পরে দুই যুক্তরাষ্ট্রীয় খেলোয়াড়ের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রথম এক কৃষ্ণকায় নিগ্রো পুরুষের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ, সেমিফাইনালের ৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৩ জন ন্যাটা খেলোয়াড় এবং ৬ বার বিজয়িনী হয়ে যুদ্ধোত্তর কালে বিলি জিন কিং-এর নতুন রেকর্ড।

সবচেয়ে বেশিবার খেতাব জয়ের রেকর্ডের অধিকারিণী আমেরিকার আর এক মেয়ে হেলেন উইলস মুডি। কুমারী জীবনে ৪ বার এবং বিবাহিত জীবনে ৫ বার মোট ৯ বার ফাইনাল খেলে হেলেন উইলস বিজয়িনী হয়েছিলেন ৮ বার, ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত। ফরাসীর অসাধারণ মেয়ে সুজানে লেংলেনের রেকর্ডও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত ৬ বার ফাইনাল খেলে ৬ বারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, পাঁচবার পেয়েছেন উপর্যুপরি বিজয়িনীর সম্মান। মার্কিন তরুণী বিলি জিন কিং কুমারী ও বিবাহিত জীবনে ৯ বার ফাইনাল খেলে ৬ বার খেতাব পেলেন। যুদ্ধোত্তর টেনিসে কোন মেয়ের এ কৃতিত্ব নেই। উল্লেখ্য, বড় টেনিস থেকে বিদায় নেবার বছরে উইম্বলডনে জয়ী হয়ে সম্রাজ্ঞীর সম্মান সহ কিং টেনিস থেকে সরে গেলেন। অপ্রধান প্রতিযোগিতায় তিনি হয়তো খেলতে পারেন, কিংবা ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসেও। কিন্তু উইম্বলডন প্রতিযোগিতার মধ্যেই ঘোষণা করেছেন তিনি আর কোন বড় প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেলবেন না, এ বছর আমেরিকার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ ফরেস্ট হিলসেও না।

ক্রীড়াদক্ষতার ভাটার টান পুরোপুরি না আসা সত্ত্বেও বিলি জিন কিং-এর এ সিদ্ধান্ত কিছুটা বিস্ময়কর। তবু ডাবলস বা মিক্সড ডাবলস জয়ের সুবাদে শ্রীমতী কিং সর্বকালের রেকর্ডেরও অধিকারিণী হতে পারেন। সব মিলিয়ে কিংয়ের অধিকারে এখন উইম্বলডনের ১৯টি খেতাব, আর এক মার্কিন মেয়ে এলিজাবেথ রায়ানের সমান। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত এলিজাবেথ ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসের ১৯টি খেতাব পেয়েছেন—কোনবার কিন্তু সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন হননি।

পৃথিবীর প্রথম সারির খেলোয়াড়দের উঁচু তারে বাঁধা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াও আঙ্গিক, অঙ্গন, পরিবেশ, বৈচিত্র্য, পোশাক-আসাকের স্টাইল, নাটকীয়তা, উন্মাদনা ও রোমান্স নিয়ে পক্ষকালব্যাপী উইম্বলডনের বর্ণময় অনুষ্ঠান ইংলণ্ডের এক স্মরণীয় বার্ষিক উৎসব। উইম্বলডনের ঘাসের কোর্ট মানুষের পারস্পরিক মিলন বিয়োগ, জোড়-বিজোড়ের বহু ঘটনার সাক্ষী। খেলোয়াড়-দেরও।

গত বছর উইম্বলডনের রোমান্স ছিল জোড়ের জয় এবং সুইডিস তরুণ জর্ন বর্গকে নিয়ে মেয়েদের কাড়াকাড়ি। দুই চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার একুশ বছর বয়সী জিমি কোনর্স এবং ১৯ বছর বয়সী ক্রিস এভার্টের বিয়ে

বিলি জিন কিং

উইম্বলডনেই পাকা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক ছিল নবেম্বরে বিয়ে হবে। এবার উইম্বলডনেই দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সেমিফাইনালে কিংয়ের কাছে ক্রিস হেরে যাবার পরই বলেছে, "জিম আর আমার প্রণয়ী নয়। কারণ চিত্রাভিনেত্রী সুশান জর্জের সঙ্গে ওকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। দুজন পাশাপাশি বসে আমার ও কিংয়ের খেলা দেখেছে। বিয়ের ব্যাপারটা চুকে গেছে। এখন যে যার নিজের পথ ধরে চলবে"।

আবার কোনর্স বলেছে, ক্রিসের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট থাকবে। পাঁচ বছর পরে ক্রিসের কাছে ফিরেও যেতে পারে। ক্রিস যেমন অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে তেমন আমিও করি অন্য মেয়ের সঙ্গে।

গত বছর টেনিসের 'বিস্ময় বালক' সুইডেনের স্বর্ণকেশ জর্ন বর্গ ছিল স্কুল ছাত্রীদের প্রাণের রাজা। চতুর্থ বাছাই আর্জেন্টিনার ২২ বছর বয়সী পিঙ্গলকেশ ভিলাসকে দেখে এবার ছাত্রীদের হৃদস্পন্দন। পেশাদার টেনিসে এখন সবচেয়ে বেশি পয়েন্টের অধিকারী ভিলাসকে অনেকে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন বলেও কল্পনা করে নিয়েছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে মার্কিন মুলুকের রসকো ট্যানারের কাছে হেরে যাওয়ায় মেয়েরা মনে বড় ব্যথা পেয়েছে।

১৯৭১-এর উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী মেয়ে ইভন গুলাগং এবার ছিলেন ৪ নম্বর বাছাই। এ বছরের অস্ট্রেলীয় চ্যাম্পিয়ন। উইম্বলডনের আগে শ্রীমতী কার্লি হয়েছেন, ইংরেজ ইস্পাত ব্যবসায়ী রজার কার্লিকে বিয়ে করে। সেমি-ফাইনালে প্রথম বাছাই মার্গারেট কোর্টকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পর বলেছিলেন, দারুণ আনন্দ হল। স্বামীর জন্যই আবার উইম্বলডন জিততে চাই। পারেননি। ফাইনালে শ্রীমতী কার্লি হেরেছেন শ্রীমতী কিংয়ের কাছে অত্যন্ত সহজভাবে। কিংয়ের পক্ষে খেলার ফল ৬-০ ও ৬-১ বলে দিচ্ছে, উইম্বলডন ইতিহাসে এ ধরনের একপেশে ফাইনাল খেলা হয়েছে মাত্র দুবার। একবার ১৯১১ সালে, আর একবার ১৯৫১য়। প্রথমবার ল্যাম্বার্ট চেম্বার্স ৬-০ ও ৬-০ গেমে ডায়না বুথবিকে হারিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ডোরিস হার্ট হারিয়েছিলেন শার্লি ফ্রাইকে ৬-১ ও ৬-০ গেমে।

পুরুষদের খেলার কথা আলোচনার আগে মেয়েদের খেলার কথাটা সেরে নেওয়া যাক। এবারে বাছাই তালিকা ছিল নিম্নরূপ।

১। ক্রিস এভার্ট (আমেরিকা), ২। মার্টিনা নাভরাতিলোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া), ৩। বিলি জিন কিং (আমেরিকা), ৪। ইভন কার্লি (অস্ট্রেলিয়া), ৫। মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া), ৬। ভার্জিনিয়া ওয়েড

(ব্রিটেন)। ৭। ওলগা মরোজোভা (রাশিয়া), ৮। কেরী মেলভিল রিড (অস্ট্রেলিয়া)।

এই ৮ জন বাছাইয়ের মধ্যে ৭ জনই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন। উঠতে পারেননি শুধু কেরী মেলভিল রিড। অবাছাইদের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন হল্যাণ্ডের বেটি স্টোভ। ফ্রান্স চ্যাম্পিয়নশিপের রানার্স দ্বিতীয় বাছাই চেক-কন্যা নাভরাতিলোভা কোয়ার্টার ফাইনালে হারেন মার্গারেট কোর্টের কাছে। গতবারের রানার্স রুশী মেয়ে ওলগা মরোজোভা হারেন বিলি জিন কিংয়ের কাছে। ইভন কার্ল হারান ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ মেয়ে ভার্জিনিয়া ওয়েডকে, ক্রিস এভার্ট ডাচকন্যা বেটি স্টোভকে। শীর্ষ বাছাই ক্রিস এভার্টকে সেমিফাইনালে হারিয়ে কিং ফাইনালে ওঠেন, ইভন কার্ল ফাইনালে ওঠেন মার্গারেট কোর্টকে হারিয়ে।

বলা বাহুল্য দুটি সেমিফাইনাল হয়েছে এক দেশের দুই প্রতিযোগিনীর মধ্যে। ঘাসের কোর্টে ক্রিস কোনদিনই কিংকে হারাতে পারেননি, গতবার মুখোমুখি হয়েছেন।

পুরুষদের ১২৮ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে যোগ্যতা ও গুণানুযায়ী ১৬ জনকে বাছাই করা হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথম ১০ জন ছিলেন—

১। জিমি কোনর্স (আমেরিকা) ২। কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া), ৩। জর্ন বর্গ (সুইডেন), ৪। গিল্লারমো ভিলাস (আর্জেন্টিনা), ৫। ইলিনাস্তাসে (রুমানিয়া), ৬। আর্থার অ্যাশ (আমেরিকা), ৭। স্ট্যান স্মিথ (আমেরিকা), ৮। রাউল র‍্যামিরেজ (মেক্সিকো) ৯। টম ওকার (নেদারল্যাণ্ডস), ১০। জন আলেকজাণ্ডার (ইংল্যাণ্ড)।

১৯৭৩-এর চ্যাম্পিয়ন চেকোশ্লোভাকিয়ার জান কোডেস ছিলেন ১২ নম্বর বাছাই। তবে ১৯৭৩-এ প্রোফেশনাল খেলোয়াড়দের উইম্বলডন বয়কটের ফলে কোডেসের জয় অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল। সাম্প্রতিককালের কীর্তিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার এবং জন নিউকোম্ব এবার উইম্বলডনে খেলেননি। ১৭ নম্বর বাছাই আমেরিকার গেরুলাইটিসকে এবং সপ্তম বাছাই, ১৯৭২-এর চ্যাম্পিয়ন স্ট্যান স্মিথকে প্রথম রাউণ্ডে বিদায় নিতে হয়। ১২ নম্বর বাছাই কোডেস, ৫ নম্বর এবং ১৯৭২-এর রানার্স ইলি নাস্তাসে, ১০ নম্বর জন আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয় রাউণ্ড থেকে বিদায় নেন। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারেন ১৫ নম্বর বাছাই নিউজিল্যাণ্ডের ওনি পারুন এবং টেনিস 'প্রবাদ' অস্ট্রেলিয়ার কেন রোজওয়াল।

উইম্বলডনের সবচেয়ে ভাগ্যাহত খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল। খর্বকায় এই বিরাট খেলোয়াড় বিশ্ব টেনিসে বহু কীর্তির অধিকারী। কিন্তু চারবার উইম্বলডন ফাইনাল খেলে একবারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। গতবার অসাধারণ দক্ষতায় শীর্ষ বাছাই ও তিনবার চ্যাম্পিয়ন নিউকোম্বকে কোয়ার্টার ফাইনালে ও স্ট্যান স্মিথকে সেমি-ফাইনালে হারিয়ে ফাইনালে হেরে গিয়েছিলেন কোনর্সের কাছে স্ট্রেট সেটে। গত সাত বছরের মত এবারও ছিলেন দ্বিতীয় বাছাই। কিন্তু প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেছেন স্বদেশীয় খেলোয়াড় ১৬ নম্বর টনি রোশ-এর কাছে।

রোজওয়ালের বয়স এখন ৪১। যদিও ৪১ বছর ৬ মাস বয়সে উইম্বলডন জয়ের নজির আছে আর্থার ওয়েন্টওয়ার্থ গোর-এর। কিন্তু সেই ১৯০৯ সালের সঙ্গে আধুনিক কালের টেনিসের বিরাট পার্থক্য। তবু রোজওয়াল টেনিসের নিপুণ শিল্পী, কাঁমত কাঞ্চন কীড়ানট। যদি কোনদিন উইম্বলডন জেতেন টেনিস ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সম্বর্ধনা পাবেন।

যাই হোক, এ বছর কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন-আপ ছিল—কোনর্স : র‍্যামিরেজ; টান্নার : ভিলাস; অ্যাশ : বর্গ; রোশ : ওকার। প্রথম যাদের নাম লেখা হয়েছে তারাই সেমি-ফাইনাল খেলেছে। সেমি-ফাইনালে কোনর্স হারান টান্নারকে, অ্যাশ হারান রোশকে। চারজনের মধ্যে তিনজন যুক্তরাষ্ট্রের এবং অ্যাশ ছাড়া তিনজনই ন্যাটা খেলোয়াড়।

সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত পর পর ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বী জন লয়েড (ব্রিটেন), বিজয় অমৃতরাজ, আর্ক কক্স (ব্রিটেন), ফিল ডেণ্ট (অস্ট্রেলিয়া), র‍্যামিরেজ (মেক্সিকো) ও টান্নারের (আমেরিকা) কাছে কোনর্স একটি সেটেও হারেনি। ফাইনালে আমেরিকার নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ-এর কাছে কিন্তু প্রথম দুটি সেট হারায় মাত্র ১৭ ও ২৪ মিনিটের মধ্যে ৬—১, ৬—১ গেমে। অমর্যাদার গ্লানি কাটাবার জন্য কোনর্স রুখে দাঁড়িয়ে ৭—৫ গেমে তৃতীয় সেট দখল করলেও চতুর্থ সেটে অ্যাশ আবার আধিপত্য বিস্তার করে এবং ৬—৪ গেমে সেট নিয়ে উইম্বলডনজয়ী হয়। অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, নিখুঁত ভলি, দর্শনীয় পাসিং শট, স্পিন মেশানো সঠিক নিশানার সার্ভিস এবং কোর্টক্র্যাফটই আর্থার অ্যাশ-এর চ্যাম্পিয়ন হবার কারণ। খেলার শেষে জিমি কোনর্স বলেছে : "সব বিভাগেই হেরে গেছি, আমি আজ অন্য অ্যাশ-এর সঙ্গে খেলেছি।" এবার অ্যাশ-এর ৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে পর পর ছিলেন বব হিউইট (দঃ আফ্রিকা), কামিওয়াজুমি (জাপান), ব্রায়ান গটফ্রিড (আমেরিকা), গ্রাহাম স্টিলওয়েল (ব্রিটেন), জর্ন বর্গ (সুইডেন), টনি রোশ (অস্ট্রেলিয়া) এবং জিমি কোনর্স।

উইম্বলডনে এবার ভারতের বিজয় অমৃতরাজ দ্বিতীয় রাউণ্ডে হেরেছে কোনর্সের কাছে, আনন্দ অমৃতরাজ প্রথম রাউণ্ডে ১৯৭৩-এর রানার্স রাশিয়ার মেট্রেভেলির কাছে এবং চিরদীপ মুখার্জি দ্বিতীয় রাউণ্ডে চিলির জাইমি ফিল্লোলের কাছে। নীচে ফাইনালের ফল দেওয়া হল :

পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল—আর্থার অ্যাশ (যুক্তরাষ্ট্র) ৬—১, ৬—১, ৫—৭ ও ৬—৪ গেমে জিমি কোনর্সকে (যুক্তরাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিংগলস ফাইনাল—বিলি জিন কিং (যুক্তরাষ্ট্র) ৬—০ ও ৬—১ গেমে ইভন কার্লকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল—ভিটাস গেরুলাইটিস ও স্যাণ্ডি মেয়ার (যুক্তরাষ্ট্র) ৭—৫, ৮—৬ ও ৬—৪ গেমে কলিন ডাউডসওয়েল (রোডেশিয়া) ও অ্যালান স্টোনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস ফাইনাল—কাজুকো সাওয়ামাৎসু ও অ্যান কিয়োমুরা (জাপান) ৭—৫, ১—৬ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত করেন ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া দীর ও হল্যাণ্ডের বেটি স্টোভকে।

একলব্য

উইম্বলডন জয়ী প্রথম নিগ্রো পুরুষ

টেনিস শিখিয়ে ফ্রাংক রস্টন ন'বছর আগে 'অ্যাশ দা ক্রুসেডর' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—উইম্বলডন জয়ের পর শ্বেতকায় চ্যাম্পিয়নরা সেন্টার কোর্টে এ যাবৎ যে সম্বর্ধনা পেয়েছেন, কৃষ্ণকায় আর্থার অ্যাশ তার চেয়ে অনেক বেশি অভিনন্দন পাবে, যদি কোনদিন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়।

ন' বছর পরে রস্টনের ভবিষ্যৎবাণীই সত্য হল। শক্তি, গতি ও দৃঢ়তায় দীপ্ত হয়ে উইম্বলডনে প্রথম একজন কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ন হলেন শ্বেত আধিপত্য ধ্বংস করে।

সত্যি কথা, আর একজন অশ্বেতকায় উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ১৯৫৯ সালে। নাম অ্যালেক্স অলমিডো। তিনিও ছিলেন আমেরিকার নাগরিক, জন্ম পেরুতে। যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো মেয়ে অ্যালথিয়া গিবসনও উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে পর পর দু'বছর। কিন্তু নিগ্রো আর্থার অ্যাশই পুরুষ বিভাগে প্রকৃত প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ চ্যাম্পিয়ন।

ক্রুসেডর কথাটির অর্থ ধর্মযোদ্ধা। অ্যাশ-এর ক্ষেত্রে স্বসম্প্রদায়ের টেনিস যোদ্ধা। খেলাধুলোয় বিশেষ করে বক্সিংয়ে, অ্যাথলেটিকসে, রাগবীতে, বেসবলে নিগ্রো জাতির গৌরবে ঘাটতি নেই। ফুটবলেও অনেক কীর্তি। কিন্তু টেনিসে অ্যাশই প্রথম পুরুষ। প্রথম নিগ্রো হিসাবেই উইম্বলডনে খেলতে এসেছিল ১২ বছর আগে ১৯৬৩ সালে। টেনিস বিশেষজ্ঞরা তখন রয় এমার্সনের সঙ্গে ওই কালো ছেলেটির খেলা দেখেছিলেন আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে। অ্যাশ সহজভাবে হেরে গিয়েছিল। কিন্তু ঈগল-চোখ বিশেষজ্ঞরা বলে দিয়েছিলেন অল্পদিনের মধ্যে ছেলেটি এমার্সনকে বেগ দেবে।

তিন বছর পরে এমার্সন দেখলেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা জয়ের পথে অ্যাশ এক বড় প্রতিবন্ধক। পর পর তিনটি প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিলেন। ফরেস্ট হিলসে এবং অস্ট্রেলিয়ার দুটি রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে। অনমনীয় দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ৬-৪, ৬-৮, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে অ্যাশকে হারিয়ে তিনটি পরাজয়ের শোধ তুলেছিলেন। কিন্তু কল্পনার তুলিতে অ্যাশ-এর গায়ে লিখে দিয়েছিলেন 'ভবিষ্যৎ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন।'

অ্যাশ-এমার্সন খেলা হয়েছিল সিডনির হোয়াইট সিটি স্টেডিয়ামে, যে স্টেডিয়ামের পাশের উন্মুক্ত অঙ্গনে ৬৭ বছর আগে আর এক নিগ্রো, জ্যাক জনসন হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের খেতাবী লড়াইয়ে কানাডার টমি বার্নকে পরাজিত করে বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিলেন। সিডনির পাকা-চুল সাহেবদের মনে সেই স্মৃতি জেগে উঠেছিল অ্যাশ-এর টেনিস লড়াই দেখে। তারপর থেকে টেনিস জগতে আর্থার অ্যাশ গালভরা নাম। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও এতকাল সাফল্য সীমায়িত। বড় কৃতিত্বের মধ্যে ১৯৬৮তে ফরেস্ট হিলসের চ্যাম্পিয়নশিপ এবং '৬৮ ও '৬৯এ পর পর দুবার উইম্বলডনের সেমি-ফাইনালিস্ট। দুবারই পরাজয় গ্রাণ্ডস্ল্যামের অধিকারী রড লেভারের কাছে।

এবার উইম্বলডনের বাছাই তালিকায় ৬ নম্বর স্থান পেলেও শীর্ষ বাছাই জিমি কোনর্সের পরই ফেভারিট ছিলেন অ্যাশ। কোনর্সের পক্ষে জুয়াড়িদের বাজির দর ছিল ৫-৪ ডলার। অর্থাৎ ৪ ডলারে মিলবে

আর্থার অ্যাশ

৫ ডলার। তারপরেই অ্যাশ-এর দর ছিল ১০-১। কেননা ৩১ বছর বয়সী অ্যাশ-এর খেলায় এবার ছিল মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি।

প্রোফেশনাল খেলোয়াড়দের এই প্রতিযোগিতাটি সুপার লীগের মত। প্রোফেশনালদের বিভিন্ন এ গ্রেড প্রতিযোগিতায় যে আটজন খেলোয়াড় উপরে স্থান পায় পয়েন্টের হিসাবে তাঁদের নিয়ে লক আউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা। সুতরাং অ্যাশ এ বছর টেনিসের সুপার চ্যাম্পিয়ন এবং উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন।

যে কোনর্স ছিল এবারের হেভিহট ফেভারিট, যে ভারতের বিজয় অমৃতরাজ ও দুইজন বাছাই সমেত সেমিফাইনাল পর্যন্ত ৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে একটি সেটও হারায়নি, সেই কোনর্সকে ৬-১, ৬-১, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে পরাজিত করা অ্যাশ-এর শ্রেষ্ঠত্বেরও পরিচয়।

আর্থার অ্যাশ একদিন ছিল রিচমণ্ড শহরের (ভার্জিনিয়া) রাস্তার ছেলে। বাবা পুলিসের কাজ করতেন। সমবয়সী নিগ্রো ছেলেদের সঙ্গে অ্যাশ রাস্তায় রাস্তায় খেলা করে বেড়াত। কিভাবে হাতে এসেছিল একখানি পুরনো টেনিস র‍্যাকেট। তাই নিয়েই খেলত প্রাণ ভরিয়ে। ছেলেবেলায় ওর হীরো ছিল বক্সার জো লুই, জো ওয়ালকট, ফ্লয়েড প্যাটারসন। টেনিস খেলতে খেলতেই অ্যালথিয়া গিবসনের ভক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু শ্বেতকায়দের সঙ্গে বা বিরুদ্ধে টেনিস খেলার কোন সুযোগ ছিল না। ওয়াল্টার জনসন নামে এক নিগ্রো ডাক্তার টেনিসে ছেলেটির হাত দেখে সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে এলেন। বলা প্রয়োজন, এই ডাক্তার জনসনই বহুভাবে অ্যালথিয়া গিবসনের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন। পড়াশুনো ও টেনিস খেলার জন্য তিনি অ্যাশকে ভর্তি করে দিলেন সেন্ট লুই-এর একটি স্কুলে। সেখানে খেলার অবাধ সুযোগ মিলল। কালক্রমে আমেরিকার বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় চাক ম্যাকিনলে ওর বন্ধু হয়ে উঠল। অ্যাশ পড়াশুনায়ও ভাল ছিল। স্কলারশিপ পেয়ে ভর্তি হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় ছিল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

খেলার সঙ্গে সঙ্গে ওই সময়ই ওকে টেনিস ব্যবসায়ের মধ্যে জড়ানো। চেষ্টা হল। পেশাদার প্রবর্তকরা টোপ ফেলতে শুরু করলেন। চলে এস আমাদের দলে। এখানে প্রচুর পয়সা। অ্যাশ বলল, আমার এখন জীবনের স্বপ্ন উইম্বলডন জয় (তখন পেশাদারদের জন্য উইম্বলডনের দ্বার উন্মুক্ত হয়নি)।

পেশাদারদের জন্য উইম্বলডনের দরজা না খুললে অ্যাশ-এর স্বপ্ন হয়তো সার্থক হত না। তবে নিঃসন্দেহে টেনিসের প্রথম সারিদের সঙ্গেই ওর নাম উচ্চারিত হত।

টেনিস কেতাবে যে সমস্ত মারের কথা লেখা আছে তার প্রায় সমস্ত মারেই অ্যাশ সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে ভলি ও ব্যাকহ্যাণ্ডে অত্যন্ত শক্তিশালী।

১৯৬৬ সালের দুটি খেলার কথা। তখনো অ্যাশের হাত তেমন পরিমার্জিত নয়। কুইন্সল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ফ্রেড স্টোলের বিরুদ্ধে ২৩টি এস দিয়েছিল, নিউ সাউথ ওয়েলসের সেমিফাইনালে দিয়েছিল ১৭টি। সার্ভিস রিটার্নে যথেষ্ট সুনাম ছিল স্টোলের। সেই স্টোলেই বলেছিল, আমাকে এভাবে কেউ অপদস্থ করতে পারেনি।

৬ ফুট মাথায় উঁচু ৬৩ কিলোগ্রাম ওজনের দোহারা চেহারার অ্যাশ স্বল্পবাক এবং বিনয়ী খেলোয়াড়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আছে স্বজাতির গর্ব।

যুক্তরাষ্ট্রের খেলাধুলোয় শ্বেত-কৃষ্ণের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। টেনিসে কোনর্স এবং অ্যাশ পরস্পরের বিরোধী। উইম্বলডনের ঠিক আগে কোনর্স ৮ কোটি টাকার দুটি টেনিস মামলা দায়ের করে। মানহানির মামলা। একটি মামলার প্রতিবাদী অ্যাসোসিয়েশন টেনিস প্রোফেশনালের প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ অ্যাশ। বাদী কোনর্সকে টেনিস কোর্টে হারিয়ে অ্যাশ বড় লড়াইটাও জিতে গেছে।

মুকুল

অরণ্যদেব

হাতি এতদিন পায়ের তলায় ডাবের খোলা পিষেছে · · ·
এইবার
মচ্‌!

এইবারে মানুষের খুলি পিষবে!

ব্যাপার কী? হাতিটা এগোচ্ছে না কেন?
আমি তো হুকুম দিলুম!
ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না!

জুম্বা!
?!
12/1

জুম্বা যখন বাচ্চা, তখন এই অরণ্যদেবই তাকে রক্ষা করেছিলেন · · ·

হাতিটা যে কেন এরকম করছে, বুঝতে পারছি না!
আশ্চর্য! বেশ, হাতি যদি কথা না শোনে, তাহলে গুলি করে লোকটাকে খতম করো!

জুম্বার কি সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেছে?

আরে!
!
জুম্বা!
২৪
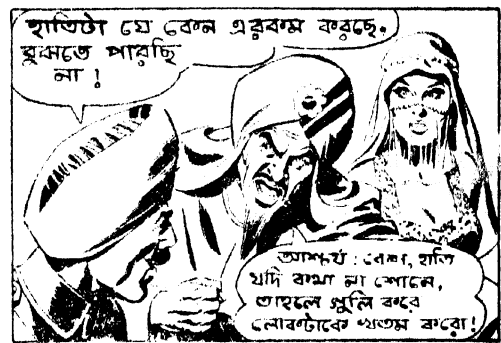
"সন্ন্যাসী রাজা" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে রূপা, অশোক মিত্র, উত্তমকুমার ও তরুণকুমার

সকলেই চান দেখে-শুনে ঘরে সুন্দর বউ আনতে—কথাটা একজন ফিল্ম প্রোডিউসারের বা চিত্রপ্রদর্শকের। প্রদর্শকেরা কেন বেছে বেছে বড় কমার্শিয়াল ছবি নিতে চান এরই সপক্ষে এই যুক্তি। দেখে-শুনে সুন্দরী বউ আনলেই সুখী হওয়া যাবে, এমন গ্যারান্টিটাই বা কে দেবে? বউয়ের আচার-ব্যবহার ও স্বভাব তো আগে থেকে জানা সম্ভব নয়—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জি। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রোটান্ডার এক বৈঠকে (৩০ জুন) চলচ্চিত্র শিল্পের তিনটি প্রধান শাখার (প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শক) প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। পরিচালকরাও ছিলেন। মন্ত্রী সুব্রতবাবুর আমন্ত্রণে এই 'ইনফরমাল' আলোচনা-সভা হয়েছিল। উদ্দেশ্য : কী-করে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের দুর্দশা মোচন করা যায়। প্রথমে চিত্রপ্রদর্শক-গোষ্ঠী খুবই সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বোঝাচ্ছিলেন তাঁদের সমস্যার কথা। তাঁরা বলছিলেন—"ছবির লাভের অংশ তো আমরা নিই না। ক্ষতির বোঝা বা কোন ঝুঁকিই কি তাঁরা নেন? আর ছবি খুব ভাল চললে তাঁরাও কি পরোক্ষভাবে লাভের অংশ নেন না?

রঙ্গ জগৎ

ছবি যদি দিনের পর দিন চলে তবে তো প্রদর্শকেরও লাভ। একজন চিত্রপ্রদর্শক প্রস্তাব করলেন—ছবি যাতে খুব কম সপ্তাহ না চলে সে ব্যবস্থা করতে হবে। অদ্ভুত প্রস্তাব। ছবি তিনটি শো হাউসফুল চললে তাঁদের আপত্তি নেই, তারপরেই বুঝি আপত্তি।

মতামতের মন্তাজ

চলচ্চিত্রশিল্পে সকলেই কোন না কোন ঝুঁকি নেন, নেন না শুধু চিত্রপ্রদর্শক। একথা কি সত্য নয়?

• • •

আলোচনায় অনেকেই যোগ দেন। ই-আই-এম-পি-এ সভাপতি শ্রীশ্যামলাল জালান বললেন—সমস্যা সব শাখারই আছে। সেগুলি অনুসন্ধান করা দরকার। কলকাতার প্রদর্শকরা হয়ত কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকেন, মফস্বলের চিত্রপ্রদর্শকদের সমস্যা সত্যিই গুরুতর। বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট কীভাবে দূর করা যায় সে সম্পর্কে কয়েকটি লিখিত প্রস্তাব তিনি মন্ত্রীর কাছে পেশ করেন। প্রযোজক শাখার প্রতিনিধিরা প্রথমে নীরবই ছিলেন। পরে তাঁরাও স্পষ্টভাবে তাঁদের অভিযোগগুলি জানাতে থাকেন। প্রদর্শকরা কীভাবে অন্যায় সুবিধা আদায় করেন সে-কথাও তাঁরা বললেন। শ্রীঅসিত চৌধুরী বলেন, পারস্পরিক পরিপূর্ণ সমঝোতার ভিতর দিয়ে এগোতে হবে এবং প্রযোজকরা যাতে বাঁচেন সে-ব্যবস্থা নিতে হবে। ই-আই-এম-পি-এ'র প্রস্তাবগুলি খুঁটিয়ে দেখবার জন্য তিনি মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাবার জন্য মন্ত্রী যে ব্যবস্থা নেবেন তাতেই তিনি পূর্ণ সমর্থন জানান।

• • •

চলচ্চিত্রশিল্পের প্রায় ষাটজন প্রতিনিধি সেদিন একত্র হয়েছিলেন। এই সভার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক। শ্রীসুব্রত মুখার্জির উপর যে চলচ্চিত্রশিল্পের আস্থা আছে এটা তারই প্রমাণ। সকলেই এখন বিশ্বাস করেন চলচ্চিত্রশিল্পের এই তরুণ বন্ধু ও অভিভাবক ফিল্ম ইনডাস্ট্রির জন্য

সত্যিই কিছু করতে চান। সভায় সৌমিত্র বিভিন্ন বক্তা তাঁদের এই ভাবধারা ব্যক্ত করেন। আলোচনা-সভায় বাংলা ফিল্মের নানা দিকের সমস্যার কথাই আলোচিত হয়েছে। প্রদর্শকরা এখন একটা যুক্তি বিশেষভাবে উপস্থিত করছেন। বাংলা ছবি দেখালেই তো হয় না, চলবার মতো ছবি হওয়া চাই। ছবি যদি ভাল না হয় তবে বাংলা ছবিকে বাঁচাবে কে? এটাই ওঁদের এখনকার যুক্তি। সেদিনও একথা প্রদর্শক-মহল থেকে বারংবার শোনা গেল। একথা সাংবাদিকরাও বলেন, অনেকেই ভাবেন। কিন্তু সাধারণভাবে বাংলা ছবি উপভোগ্য হয় না বলে প্রদর্শকরা বাংলা ছবি দেখানোর দায় থেকে মুক্ত হবেন এটা কেমন যুক্তি? বাংলা ছবি যে বেশি চলে না সেটা কি সব সময়েই গুণের অভাবে? অনেক শিল্পসমৃদ্ধ বাংলা ছবিও তো বক্স-অফিসে মার খায়। এর কারণ কী? সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদর্শকরা যে বাঙালী দর্শকের মজ্জায় মজ্জায় হিন্দীচিত্রের নেশা ধরিয়ে দিয়েছেন সেটা কি তাঁরা জানেন না? একটা ভাল বাংলা ছবি যদি ভাল চলতে না চায় তবে এক্জিবিটররা সেটা তুলে দেবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। ব্যবসা সকলেই করেন। কিন্তু ফিল্ম ব্যবসার অতিরিক্ত একটা নৈতিক দায়িত্বও থাকে। কারণ ফিল্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির সব চাইতে শক্তি-শালী মাধ্যম। বাংলা ছবিকে জনপ্রিয় করে তোলার সুযোগটাও প্রদর্শকদেরই করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে অভ্যাস খুব বড় কথা। বাংলা ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রদর্শকরা সেটা পারেন। অবশ্য বাংলা ছবির গুণগত উৎকর্ষও বাড়ানো দরকার। সে ব্যাপারে ওইদিন সভায় শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত একটি প্রস্তাবে বলেন—সরকার যদি বছরে অন্তত পাঁচটি শিল্পধর্মী ছবিকে প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দেন তবে নতুন শিল্পসচেতন পরিচালকরা কাজে উৎসাহ পাবেন। তিনি বলেন, বোম্বাইয়ে এখন ভাল ভাল হিন্দী ছবি হচ্ছে। কলকাতায়ও সেটা হতে পারত। টাকা ও উৎসাহের অভাবেই সেটা হচ্ছে না।

"আবিষ্কার"/রাজেশ, শর্মিলা

আসল কথা, বাংলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য সভায় সেনসর-ওয়াইজ রিলিজ-এর কথা ওঠে। পরীক্ষামূলক ব্যবস্থায় এই নীতি কার্যকর করা যেতে পারে। বাধ্যতামূলক বছরে ২৬ সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখাবার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। করবার অনেক কিছুই আছে। ই-আই-এম-পি-এর প্রস্তাবগুলিও মন্ত্রী ভেবে দেখবেন বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে দরকার বাংলা ছবির প্রতি দরদ এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব। বাংলা ছবিকে যদি প্রদর্শকরা নিজের ছবি বলে ভেবে নেন তবে সমস্যার সুরাহা হতে পারে। এই সহানুভূতির পরিবেশ প্রয়োজন। সেটা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি যদি সকলেই দেন তবে, মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জি বলেন, আমি দেখব যাতে বছরে চল্লিশের জায়গায় সত্তরটি বাংলা ছবি তৈরি হয়।

আবিষ্কার

(আরোহী)

'অনুভব'-এর পর 'আবিষ্কার', সমস্যা একই—বিবাহিত নরনারীর সমঝোতা। "অনুভব"-এর অনুভব এবং "আবিষ্কার"-এর আবিষ্কারও প্রায় এক। মনের কুয়াশা তখন কেটে গেছে, ভোরের আলোয় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আবার দেখতে পেয়েছে, জানতে পেরেছে। আবিষ্কার ছবিতেও বাসু ভট্টাচার্য একটি প্রচণ্ড যন্ত্রণাময় রাত্রিতে শুধু ভোরের অপেক্ষায়। সূর্যোদয় বাসু ভট্টাচার্যের ছবিতে এক অর্থপূর্ণ প্রতীক। কিন্তু বক্তব্য জানানোর ব্যাপারে পরিচালক সর্বক্ষণ সোচ্চার হননি। দু-একটি ইঙ্গিত—কী দৃশ্যে কী ধ্বনিতে—হয়ত বেশি স্পষ্ট—যেমন মাতৃত্বের প্রসঙ্গে নেপথ্যে রাম-প্রসাদী গানের সুর কিংবা স্বামী-স্ত্রীর বিষম ভুলবোঝাবুঝির মুহূর্তে প্রতিমা বিসর্জনের এবং 'ঘর অমর মানসী কা' লেখাটি বারবার দেখানো। কিন্তু ছবিতে শিল্পের শর্তানু-যায়ী বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়োগের এমন কয়েকটি উদাহরণ আছে যা অবাক করে, মনকে আবিষ্টও রাখে। এই ছবির শুরু সকাল-বেলার সুরে—ভোরের সরগম দিয়ে। নায়ক নায়িকার জীবন তখন সুন্দর ও নিখুঁত তালে চলেছে—সরগমের মতো। তাল কেটেছে পরে। 'আবিষ্কার' শিক্ষিত দর্শকের কৌতূহলকে ও বুদ্ধিকে প্রায় প্রতি মুহূর্তে উদ্দীপ্ত করে। কারণ সূক্ষ্ম মনন-শীল ও রসসমৃদ্ধ কাজ অনেক রয়েছে ছবিতে। ঘন ঘন জাম্প-কাট অতীতের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক অথবা অপটিক্যালস-এর ব্যবহার ছন্দোপতন ঘটায়নি।

"অনুভব"-এর চাইতে অনেক বেশি পরিণত এ-ছবিতে বাসু ভট্টাচার্য প্রয়োগ-কার হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ একসপেরিমেনট-এর পরিচয় দিলেন। ছবিটি দুর্বোধ্য নয়, কিন্তু অতি কঠিন কাজও যেন স্বচ্ছন্দ, সহজ ও সাবলীল। ট্রিটমেনট-এর খাঁজে খাঁজে পরি-চালক এসথেটিক মেজাজ ও রসও ছড়িয়ে দিয়েছেন। বাসু ভট্টাচার্য সংলাপ ও সংগীতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী। কিছু কথা ও ভাবনা তিনি সংগীতে ও গানে প্রকাশ করতে চান। ছবির শুরুতেও গান আছে (মান্না দে'র গাওয়া খুব চমৎকার)। রবীন্দ্র-নাথের কবিতাকেও হিন্দী অনুবাদ করে গানে পরিবেশন করা হয়েছে। তা-ছাড়া 'আদ্‌লে মোরা সাঁইয়াঁ' (জগজিৎ সিং ও চিত্রা গীত) গানটি ছবিতে আবেগ সৃষ্টি

এবং ক্লাইম্যাক্স রচনায় কাজে লাগানো হয়েছে। গান ও সংগীত (সংগীত পরিচালক কানু রায় অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য) ছবিতে উপভোগের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সংলাপ চমৎকার—শুরুতে মীনা জোহরের মুখের কথাগুলিও স্মরণীয়। সংলাপ বেশি বলে ক্যামেরার ভাষাকে পরিচালক খর্ব হতে দেননি। নন্দ ভট্টাচার্যের ক্যামেরার কাজ যেন ফিলমের ভাষা। অসাধারণ তাঁর ফটোগ্রাফি বা উত্তেজনার সময় নায়ক-নায়িকার মুখের রক্ত-সঞ্চালনও দেখিয়ে দিয়েছে।

"আবিষ্কার" প্রকৃত অর্থে ফিলম। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ও আত্ম-আবিষ্কারের বিষয়ের কাঠামো বা কাহিনী নতুন নয়। কিন্তু সিনেমাটিক ট্রিটমেন্ট-এর দরুন ছবির সব ঘটনা—এমন কী পরিচিত প্রেমের দৃশ্যও মনে হয় খুব গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। রাজেশ ও শর্মিলার অভিনয় ফিলমিক—তথাকথিত অভিনয় নয়, বাস্তব ও ঘরোয়া জীবনে যেন ওঁরা স্বাভাবিক মানুষ। ছবির অন্তর্দৃশ্য—স্বামী-স্ত্রীর ঘরোয়া ঘটনা সবই পরিচালকের বাড়িতে তোলা। দৃশ্যপটে যেমন কৃত্রিমতা নেই তেমনি বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নেই রাজেশ-শর্মিলার অভিনয়ে। তবু যদি তা অভিনয় হয়, তবে এত উঁচুদরের অভিনয় এঁরা আগে কোন ছবিতে করেননি। সব কটি চরিত্রই স্বাভাবিক। শর্মিলার বাবার ভূমিকায় সত্যেন্দ্র কাপ্পু এবং মীনা জোহরের চরিত্র-চিত্রণও চমৎকার।

'আবিষ্কার' দেখা মানে ফিলম-রীতির কিছু নতুন ভঙ্গি আবিষ্কার করা—বিশেষত উঁচু পর্যায়ের সিনেমাটিক এক্সপেরিমেন্ট কত রসমণ্ডিত হতে পারে সেটাও দেখা এবং অনুভব করা। এবং অনুভব করে অভিভূত হওয়া।

শুটিং চলছে ...

অন্তরীক্ষে কোথাও রোদ নেই, ছায়া নেই, শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। এরই মধ্যে তীব্র হচ্ছে ট্রেনের শব্দ, মানুষের কথাবার্তার টুকরো, মসজিদের আজান এবং সুমিতার ভয়ার্ত চিৎকার। মসজিদের চূড়া থেকে দেখা যায় একটা মৃতদেহ। ঘোরানো সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে চাপা অস্থিরতা। সুমিতা কোথাও না কোথাও স্পর্শ করছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম এখন জলের রেখা হয়ে নীচে নামছে। বড় বড় নিঃশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে তার পদক্ষেপ ক্রমশ নিবিড় হচ্ছে। আসলে সে ভয়ের কাছে নত হয়ে পড়ছে। অথচ সুমিতা জানে ভয়ের কাছে যতই সে নত হবে ততই ভয় তাকে গ্রাস করবে। কিন্তু জয়ন্ত এসে গেলে কোন ভয় নেই। তাই এই সময়টুকু বড় সাবধানে থাকতে হচ্ছে। জয়ন্ত কোথায়? সেও তো মসজিদের দিকে আসছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিল চারিপাশ। এদিকে চিৎকার শুনে জয়ন্ত ছুটেছে। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুমিতার সংগে মাঝপথে দেখা। সুমিতা তখনও চাপা উদ্বেগে থরথর করে কাঁপছে। বিষয়টি বিস্তারিত করবার অবস্থাও বোধ হয় তার তখন নেই। সে শুধু ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছে। জয়ন্ত এখন এই মুহূর্তে কেমন যেন জটিল। তার মুখের রেখায় কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সচেতন হয়ে জয়ন্ত তার মুখের রেখা অপরিবর্তিত রাখে। এখন জয়ন্তর মুখের অনেকগুলো টুকরো, যেমন আয়নার কাঁচ ভাঙলে হয়—সুমিতার মনের মধ্যে বার বার আসা। কলকাতায় ফিরে আসার পরও তার দুই ভুরুর মাঝখানে অনুচ্চারিত 'তাহলে হত্যাকারী কে?' প্রশ্নটা সাংঘাতিকভাবে জটিল হয়। সুমিতা বদ্ধ-পরিকর, যেভাবেই হোক হত্যাকারীকে সে একদিন না একদিন খুঁজে বার করবে। প্রেমিক জয়ন্ত, কলকাতার একটা বিখ্যাত ফার্মের বিজনেস এক্জিকিউটিভ—সে এসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না। তার কথা হচ্ছে কে এক মহিলা খুন হয়েছেন তার জন্য আমাদের এত মাথা ঘামান কেন, তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে কি তিনি নিজেই নিজেকে মেরেছেন জেনে আমাদের কি হবে। সুমিতা অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ কৌতূহলী। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর সে রীতিমত পড়াশোনা করছে। জয়ন্ত পছন্দ না করলেও সে যেমন করে সম্ভব হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবে। জয়ন্ত ভেতরকার ভাবনায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অস্বস্তি দুজনের মাঝখানে স্থির হয়ে থাকে। আধুনিক আসবাবপত্রে সাজানো নিজের ড্রইংরুমে সুমিতা বসে আছে অনতিদূরে জয়ন্ত।

যথাক্রমে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় এবং জয়শ্রী রায়কে নিয়ে দৃশ্য পরিকল্পনা করছেন পরিচালক অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং চিত্রশিল্পী গৌর কর্মকার।

আর কুয়াশা নেই আপাত দৃষ্টিতে আলোয় আলোয় ভরে গিয়েছে শুটিং জোন স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এর ফ্লোরে 'সায়লেন্স' 'অ্যাবসলিউট সায়লেন্স' ঘোষণা হয়েছে। উচ্চারিত হয়েছে 'সাউন্ড রানিং'। সুতরাং 'স্টার্ট ক্যামেরা':

সুমিতাঃ না জয়ন্ত, তুমি যা ভাবছ তা নয়।

জয়ন্তঃ তাহলে ব্যাপারটা কি? হোয়াট ইজ দি প্রবলেম...

—হোয়াই ডোন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইজ নো প্রবলেম। নট অ্যাট অল তুমি বুঝতে পারছ না কেন আমি চার জনকে সন্দেহ করছি।

—যেমন,

—প্রফেসর, শোভনলাল, ব্রজেশ আর নূর মহম্মদ। তাছাড়া—

সন্দেহের জট এখনই খুলে ফেলতে চান না পরিচালক। কারণ তাঁর মতে এ-ধরনের গল্পে সন্দেহ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে হয়। এবং এ-ধরনের গল্পে ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার অবকাশ আছে। দেখা যাক কতদূর কি করতে পারি।

শুটিং চলছে: "আবির্ভাব" ছবিতে জয়শ্রী রায় ও ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

রবীন্দ্র গুহের কাহিনী থেকে এ ছবি 'আবির্ভাব'-এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। নির্মাণ করছেন কলাশ্রী চিত্র মন্দির।

'প্রতিদ্বন্দ্বী'র পর আবার সেই জুটি ধৃতিমান-জয়শ্রী, এ ছবিতে। "যদুবংশ" ছবির পর ধৃতিমানকে ফ্লোরে দেখা যায়নি এতদিন। সম্ভবত এটি তাঁর চতুর্থ ছবি। আরও একটি ছবিতে কাজ করবেন জানা গেল। জয়শ্রী বাংলা ছবিতে নিয়মিত কাজ করছেন। হাতে বেশ কয়েকটি ছবি। ফ্লোরে আছে দুটি নতুন ছবি—'ময়না' ও 'এরা এক যুগ'। সুমিতা, 'আবির্ভাব' ছবির নায়িকা চরিত্র সম্পর্কে তিনি খুব আশাবাদী। বললেন, অনেকদিন পর একটি নতুন ধরনের চরিত্র পেলাম।

• • •

কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর উত্তমকুমার গত ত্রিশে জুন শুটিং-এ অংশ নিলেন। ছবি 'রাজবংশ'। পরিচালক : পীযূষ বসু। তাঁকে এক জাঁদরেল জমিদারের সাজে দেখা গেল। বিরতির পর তাঁর শুটিং-এ যোগদানকে কেন্দ্র করে ফ্লোরে সেদিন প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষীর সমাগম হয়েছিল। অন্যদিনের তুলনায় উত্তমকুমারকেও বেশ প্রাণচঞ্চল দেখাচ্ছিল। তিনি সকলের 'কেমন আছেন' প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন হাসি হাসি মুখে: 'ভাল আছি'।

বার্তাবহ

বোম্বাই বিচিত্রা

চলচ্চিত্রকার রূপে ভি শান্তারামের অবদানের কথা সকলেই জানেন। চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। তিনিই সম্ভবত বোম্বাইয়ের একমাত্র প্রযোজক, যাঁর ন্যায়বোধ প্রশ্নাতীত। তিনি কখনও কারও কাছ থেকে 'কালো' টাকা নিয়েছেন অথবা কাউকে 'কালো' টাকা দিয়েছেন বলে শোনা যায়নি।

পরিবেষকদের সঙ্গে শান্তারামের লেনদেনের ব্যবস্থা কীরকম বুঝতে হলে আগে জানা দরকার কীভাবে হিন্দী ছবির ব্যবসা হয়। হিন্দী ফিল্মের দেশব্যাপী ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সাতটি সারকিট আছে—যথা : বাংলা অঞ্চল (আসাম, ওড়িষা, বিহার, নাগাল্যানড, মেঘালয়, অরুণাচল এবং নেপাল-সহ); বোম্বাই (মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের অংশ, গোয়া, গুজরাট নিয়ে); দিল্লি (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও উত্তর প্রদেশ); পাঞ্জাব (হরিয়ানা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ); সি-পি ও সি আই (রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ); দক্ষিণ অঞ্চল (তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রের কিছু অংশ, কর্ণাটকের কিছু অংশ)। হিন্দী চিত্রের প্রযোজক তাঁর ছবির ব্যবসায়িক স্বত্ব বিভিন্ন পরিবেষকের কাছে বিভিন্ন সারকিটের জন্য বিক্রি করে দেন। এই বিক্রয়ের টাকার থেকেই তাঁর ছবির নির্মাণ মূল্য উঠে যায়, সেই সঙ্গে কিছু লাভও থাকে। ব্যবসার আসল ঝুঁকিটা বহন করতে হয় পরিবেষকদের। ছবি 'ফ্লপ' করলে পরিবেষকদের টাকা মার যায়। আর যদি ছবি 'হিট' করে, সেক্ষেত্রে পরিবেষকদের লাভের টাকার পঞ্চাশ শতাংশের দাবিদার হন প্রযোজক। সেটা ব্যবস্থাটা একতরফা। 'সারকিট' বিক্রি করতে বিফল হলে অবশ্য প্রযোজকরা মুশকিলে পড়েন। সেইখানেই ওঁদের যা-কিছু ঝুঁকি। পরিবেষকরা আবার চিত্রনির্মাণ কালে প্রযোজকদের টাকারও জোগান দিয়ে থাকেন।

"নতুন সূর্য" (পরিচালনা : সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী

এখন কথা, শান্তারামের পদ্ধতি কী? হ্যাঁ, তিনিও পরিবেষকদের কাছে 'সারকিট' বিক্রি করে থাকেন—বোম্বাই অঞ্চলটি ছাড়া। বোম্বাই সারকিটে ব্যবসার জন্য তাঁর নিজেরই পরিবেষণ-দফতর আছে। তিনিও ছবি তৈরির সময় পরিবেষকদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নেন। মিল ওই পর্যন্তই। শান্তারাম-প্রযোজিত কোনও ছবি যদি টিকিট ঘরে মার খায়, তবে লোকসানের বোঝা পরিবেষকদের বহন করতে হয় না, শান্তারাম সেই ক্ষতি পূরণ করে দেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। বছর দুই আগে শান্তারাম লড়কী সাহ্যাদ্রী-কী নামে একটি ছবি করেছিলেন। সেটি প্রথমে

বোম্বাই শহরে মুক্তি পায় এবং সেখানে 'ফ্লপ' করে। শান্তারাম সঙ্গে সঙ্গে ছবিটি অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করে নেন এবং দায়মুক্ত করে দেন পরিবেষকদের। ছবিটি পরেও আর কখনও দেখানো হয়নি। পরিবেষকদের কাছ থেকে যা নিয়েছিলেন, সব ফেরত দিয়ে দেন। এই উদারতা আর ন্যায়বোধ শান্তারামের পক্ষেই সম্ভব।

উক্ত ঘটনার পর শান্তারাম মারাঠী চিত্র-প্রযোজনায় ব্রতী হন। তাঁর পিঞ্জরা (প্রথম রঙিন মারাঠী চিত্র) ব্যবসায়িক দিক দিয়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে। মারাঠী "পিঞ্জরা"র জনপ্রিয়তা একমাত্র বাংলা অমানুষ ছবিটির সঙ্গে তুলনীয়। ওই সাফল্যে উৎসাহিত শান্তারাম একই নামে, একই শিল্পীদের নিয়ে 'পিঞ্জরা'র হিন্দী সংস্করণ তুললেন। হিন্দী পিঞ্জরা প্রথমে বারাণসীতে, পরে বরোদায় মুক্তি পেল। এই ছবির দরুণ পরিবেষকরা যে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সেটা বুঝতে শান্তারামের দেরি হয়নি। লড়কী সাহিয়াদ্রী-কী ছবির বেলায় তিনি যা করেছিলেন, এ-ছবির ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই তিনি করলেন। ছবিটিকে ব্যবসায়ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে পরিবেষক-দের লোকসানের টাকা গুনে গুনে দিলেন পুরিয়ে। ফলে তাঁর নিজের লোকসান হল প্রচুর টাকা।

চিত্র নির্মাণের আর্থনীতিক দিকটির ব্যাপারে শান্তারাম কতকগুলি স্পষ্ট নিয়ম মেনে চলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ছবির জন্য কোনও জনপ্রিয় চিত্রতারকাকে নিয়োগ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে ওই শিল্পী অন্য প্রযোজকের কাছে যা দাবি করেন তার দশ শতাংশের বেশী কিছুতেই শান্তারাম তাঁকে দেবেন না—এই তাঁর নিয়ম। শান্তারামের ডাকে কোনও শিল্পী সাড়া দেননি, এমন ঘটনা কদাচ ঘটতে দেখা যায়নি। বেশ কয়েক বছর আগের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি সেদিন সংগীত পরিচালক সি রামচন্দ্রের বাড়িতে ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, বসন্ত দেশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বসন্ত দেশাই যদিও তখন শান্তারামের স্থায়ী সংগীত পরিচালক, তবু পরছাইয়াঁ ছবিটির জন্য সুররচনার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ নিয়ে বসন্ত দেশাই স্বয়ং সি রামচন্দ্রের কাছে এসেছিলেন শান্তারামের নির্দেশে। সব কথা শুনে রামচন্দ্র বললেন, "আন্না সাহেবের (ওই নামে শান্তারাম ঘনিষ্ঠ মহলে পরিচিত) জন্য কাজ করা তো আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়।" বসন্ত দেশাই তাঁর দক্ষিণার অঙ্ক জানতে চাইলেন। সি রামচন্দ্রের উত্তর : "দেখুনে, শান্তারামের ছবিতে কাজ করব, সেখানে মূল্যের কথা কী বলব, প্রশ্নটাই ওঠে না। কারণ এই সুযোগটাই যে অমূল্য!" এই কথা বলে চুক্তিপত্রে টাকার জায়গায় কোনও অঙ্ক না বসিয়েই তিনি সই করে দিলেন।

নিজেদের জীবৎকালেই যাঁরা কিংবদন্তী হয়ে যান, শান্তারাম সেই ধরনের মানুষ।

সুরঞ্জন

"হারমোনিয়ম" (পরিচালনা : তপন সিংহ) ছবিতে অরুন্ধতী দেবী

কয়্যার ইণ্টারন্যাশানাল

সম্প্রতি বিদ্যামন্দির প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত কয়্যার ইনটারন্যাশনালের 'সংগস অ্যান্ড রিদ্‌মস অফ দি ওয়ারলড'-এ নূতনত্ব কিছু ছিল না, কেবলমাত্র সুর ও ছন্দের ভিতর দিয়ে বিশ্ব পরিক্রমার উৎসাহটুকু ছাড়া। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গান ও নৃত্যে কয়্যারের শিল্পীরা উপস্থিত করবার চেষ্টা করেছেন এবং দেশ অনুযায়ী পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা ও পশ্চাদ্‌পটে আলোকচিত্র প্রক্ষেপণের আয়োজনে প্রার্থিত পরিবেশটি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলবার দিকেও যত্নের ত্রুটি ছিল না। তামাম দুনিয়া ঘুরেও ও'দের ক্লান্তি আসে নি, দেশে ফিরেও আসাম, উড়িষ্যা থেকে আরম্ভ করে ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এক চক্কর ঘুরে আবার বাংলাদেশের বারো মাসে তেরো পার্বণের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু এত ব্যাপক আর আড়ম্বর আয়োজন না করে যদি শিল্পসম্মতভাবে নিখুঁত সুরে ও ছন্দে সম্মেলক গানগুলি পরিবেষণার দিকে যত্ন নিতেন তাহলে অনুষ্ঠানটি অনেক বেশি উপভোগ্য হত এবং সেখানে হয়ত প্রেক্ষাপটে কখন ইংলন্ড বা জার্মানের ছবি পড়বে, তার জন্য শিল্পীদের কোনো মাথা ব্যথারও প্রয়োজন হত না।

তুলনামূলকভাবে নৃত্যাংশ প্রশংসনীয়। বার মাসীতে ভাদু গানের নাচে অথবা ভাইফোঁটার নৃত্যাভিনয়ে কিংবা একেবারে শিশুদের সম্মেলক নৃত্যে যথেষ্ট অনু-শীলনী এবং প্রশংসনীয় নৃত্য পরিকল্পনার (নৃত্য পরিকল্পনা : মীরা দাশগুপ্ত) পরি-চয় ছিল। সঙ্গীতাংশে সুরারোপ ও গীত রচনার মধ্যেও (সংগীত : আনন্দ মুখো-পাধ্যায়) মুনশিয়ানার ছাপ ছিল। কিন্তু সামগ্রিক উপস্থাপনা খুবই অপরিণত, অগোছাল। কণ্ঠসংগীতই যদি দুর্বল হল তাহলে কয়্যারের আর রইল কি? প্রত্যেক গানের মাঝে বিলিতি পোশাক পরা বালকের আগমন নির্গমনের পরিকল্পনাও প্রশংসা করা চলে না। উচ্চ গ্রামে ধ্বনিত যন্ত্রা-নুষঙ্গও প্রায়শই অনুষ্ঠানটিকে বিড়ম্বিত করেছে।

আনন্দবর্ধন

সোনাই দীঘি

(যাত্রা অভিনেত্রী পরিষদ)

পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের 'সোনাই দীঘি' সারা দেশ জুড়ে কয়েক হাজার রজনী অভিনীত—পূর্ব অভিনয়ের সকল রেকর্ড ২২ জুন ভাঙলেন যাত্রা অভিনেত্রী পরিষদ রবীন্দ্র সদনে। কলকাতার বুকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃদের নিয়ে কম্বিনেশন নাইটগুলিতে এই পালার যে রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছিল তাও মুছে দিলেন এ'রা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি

সোনাই দীঘির এত সার্থক অভিনয় আগে কখনও দেখা যায় নি—যদিও এখানে পুরুষ, মেয়ে সকল চরিত্রে কেবল মেয়েরাই অভিনয় করেছেন।

যাত্রা অভিনেত্রী পরিষদের প্রথম প্রয়োগ 'সোনাই দীঘি'তে ছিল এক বলিষ্ঠ অথচ সুস্থ প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক শিল্পী তাঁর সবটুকু শিল্পবোধের ভান্ডার ঢেলে দিয়েছেন। ফলে গোটা প্রযোজনার সম্পদ হয়ে উঠতে পেরেছে এর অভিনয়। আশ্চর্য এর টিমওয়ারক। ব্যক্তিত্ব ও শিল্পবোধ, উপলব্ধি ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে এখানে এক এলোমেলো কান্ড ঘটে যেতে পারত—সাধারণত আমরা যা প্রত্যক্ষ করি কম্বিনেশন নাইটে। এখানে কিন্তু আলাদা একটি পূর্ণাবয়ব নিখুঁত ছবি উপস্থিত। আচার্য পূর্ণেন্দু ব্যানার্জি প্রচন্ড এই শক্তিগুলোর রাশ টেনে রেখেছেন। ফলে সোনাই কি ভাবনাকাজী, যাদব কি মাধব, অথবা মুক্তকেশী কি ভাটুক কেউ অত গতিবহ হওয়া সত্ত্বেও সর্বাগ্রে একা সাফল্যের সীমায় পৌঁছতে পারেন নি। নির্দেশক পূর্ণেন্দুবাবুর গাড়ি গোটা প্রযোজনাকে তুলে নিয়ে সীমায় পৌঁছে গেছেন। সুতরাং বলতে অসুবিধা কোথায় যে, এই অভিনয় সকল দলগত অভিনয়ের একটি অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। ওইদিন নাট্যজগতের অনেক খ্যাতনামারাও ছিলেন আসনে উপবিষ্ট, আবিষ্ট হয়ে তাঁরা মঞ্চযাত্রা দেখেছেন। হেসেছেন, কেঁদেছেন। বোধহয় সবশেষে 'বাহবা' না দিয়ে থাকতে পারেন নি।

নাম ভূমিকায় এদিন অবতীর্ণ হন যাত্রা সম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্ত। সত্যম্বর অপেরা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি যত উল্লেখ্য অভিনয় হয়েছে 'সোনাই'-এর সবগুলিতেই ছিলেন শ্রীমতী দত্ত। কিন্তু তাঁর এ-দিনের রূপায়ণে যে শক্তি ও ব্যক্তিত্ব এবং যে আবেগ ও সংযম ছিলো এমনটি দেখা যায় নি আগে কোথাও। ভাবনা-কাজী চরিত্রের যে চিত্র লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আঁকা আছে, সেই ছবিটকে মুছে জনতার দেওয়ালে নতুন চিত্র টাঙিয়ে দিলেন আর এক সম্রাজ্ঞী বীণা ঘোষ। চলায়-ফেরায়, আদব কায়দায়, শরীরের কাজে ও চোখের কারুকর্মের বর্ণবহুল রঙে এই অনুপম চিত্রটি অঙ্কিত। মুক্তকেশী চরিত্রেরও সকল রেকর্ড এদিন ভাঙলেন বেলা সরকার। আপাত কঠোর, মুখরা কিন্তু অন্তরে কেমন করে ফল্গুধারা প্রবাহিত রাখা সম্ভব এই শিল্পীর অভিনয় না দেখলে তা বিশ্বাস করাই কঠিন। ভাটুক ঠাকুর চরিত্রে বেলা ঘোষও তুলনারহিত। রাজশক্তিকে তুচ্ছ করার মত পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব, একজন মহিলার কাছে বোধ হয় আশা করা যায় না। বেলা দেবী শুধু আমাদের বিশ্বাসের ঘরেই টেনে আনেন নি, প্রমাণ করেছেন এর কোনো দোসর থাকাও সম্ভব নয়। মাধব ও যাদব দুই চরিত্রের রূপকার ছিলেন যথাক্রমে বর্ণালী ব্যানারজি ও সীমা বোস। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। দয়িতা সোনাই হারিয়ে গেলে মাধবের যে সান্নিধ্যিক অংশ, সেখানে বর্ণালীর দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। এ চরিত্রে বর্ণালী যে নতুন মাত্রা আরোপ করেছেন, মনে হয় না সেখানে অন্য কোনো বিজয়ীর স্থান হবে ভবিষ্যতে। কনকলতার নিশাচর আরও অবাক হবার মতন। বোঝাই যায়নি এ চরিত্রের রূপকার একজন মহিলা শিল্পী। গানে অভিনয়ে, চরিত্রের আবেগ ও ব্যঞ্জনায় এটি সুশোভিত। মীনা ব্যানার্জির 'আজিম'কে কোনোদিন ভোলা যাবে না। ভোলা যাবে না মিতা চ্যাটারজির মাল্লিকাকে। 'আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই' মুখে বলছেন কিন্তু যাবতীয় চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হাসিমুখে কী করে করা সম্ভব মিতা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পেরেছেন। যুবরাণী চরিত্রের ক্রূরতা ও সহৃদয়তা—এই দুটি দিকই কল্যাণী ভট্টাচার্যের অভিনয়ে মূর্ত। প্রতাপরুদ্র চরিত্রে বাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছেন রিক্তা সরকার। নবাব হোসেন শা রূপে মীনা মুখার্জি সুন্দর। ছবি রায়ের অবতার এক অবিশ্বাস্য চরিত্রায়ণ। যেমন মানিয়েছে তাঁকে, তেমনি ঢেলে দিয়েছেন মন প্রাণ। চলনে বলনে অভিব্যক্তিতে এই ভূমিকাটি এক অনুকরণযোগ্য চরিত্রে রূপান্তরিত। শ্রীমতী নন্দী বাচস্পতিরূপে অসামান্যা। পেলব ও সুবাহুর ভূমিকাকে যথাযোগ্য করে তুলেছেন যথাক্রমে দেবযানী ও আলপনা ব্যানারজি। শ্যামলী ভট্টাচার্যের আগাবাসী রঙ্গ রসিকতায় উজ্জ্বল।

সবশেষে এ-কথা বলা দরকার যে, জ্যোৎস্না ও কণকলতার গাওয়া গানগুলি এ পালার প্রধান সম্পদ। সোনাই দীঘির কোনো প্রয়োগে এমন প্রাণঢালা গান আগে আমরা শুনতে পাইনি।

দিশারী পারিতোষিক বিতরণ উৎসব উপলক্ষে এই অভিনয়ের প্রথম আয়োজন। এদিনে দিশারী পেশাদারী অপেশাদারী, এবং যাত্রা ও উচ্চাঙ্গ সংগীত শাখার ১৯৭৪ সনের কৃতীদের পুরস্কার দিলেন। পারিতোষিক বিতরণ করলেন যাত্রা জগতের বিখ্যাত ও প্রবীণ পরিচালক শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ।

যাত্রা সমালোচক

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

সম্প্রতি বিশ্বরূপায় ব্যারাক নাট্য সংস্থার সভাবৃন্দ হরিদাস ভট্টাচার্য রচিত 'অভিশপ্ত অধ্যায়' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটক মঞ্চস্থ হবার পূর্বে মহিমারঞ্জন কোনারের পৌরোহিত্যে শ্রীমতী কানন দেবীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। নাট্যকার শ্রী ভট্টাচার্যের পরিচালনা ও অভিনয়ে 'অভিশপ্ত অধ্যায়' দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
শুধু শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সংযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
কলিকাতাকে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাক)	৮২.০০ টাকা	৪২.৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লনডন অফিস মাধ্যমে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

OBM-4702-BEN

সূচীপত্র

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা

মাথা-ধরা যায় চলে মাত্র একটি সারিডন খেলে

'রোশ'

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শংকর মজুমদার

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪২
শনিবার ৩১ শ্রাবণ ১৩৮২

আইন ও বিচার

"আমরা দেখছি আইন প্রায় ক্ষেত্রেই নির্দোষীকে শাস্তি দিচ্ছে এবং দোষীকে রেহাই দিচ্ছে। এই অবস্থার প্রতিকার আমাদের করতেই হবে। সামাজিক ন্যায়ের সুরক্ষা বিচার-অনুষ্ঠানের দ্রুততা ও কম ব্যয়সাপেক্ষতা দেখবার আশায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছেন।" প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধী তাঁর অভিমতের এই কথা নিউ-ইয়র্কের স্যাটারডে রিভিউ পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটি সাক্ষাৎ ভাষণে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি বর্তমান বিচার-ব্যবস্থার এবং বিচার-অবস্থারও রূপ প্রকৃতি ও পদ্ধতির একটি বড় পরিবর্তনের আহ্বান বলে অভিহিত হতে পারে। উক্তিটিকে বর্তমান আইন ও বিচার-ব্যবস্থার সমালোচনা বলে মনে না করে, আইনের ও বিচার-ব্যবস্থার অপূর্ণতার সমালোচনা বলে মনে করা চলে। যা-ই হোক, সমালোচনা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর উক্তি তথা মন্তব্য খুবই স্পষ্টভাষিত। এবং অভিযোগ হিসাবে এই সমালোচনা বেশ কঠোর বলে বিবেচিত হতে পারে। নির্দোষী ব্যক্তি শাস্তি পেলে এবং দোষী ব্যক্তি রেহাই পেলে সুবিচারের আদর্শগত সম্ভাবনার ছিটেফোঁটাও থাকে না। এ ধরনের বড় অবস্থা জাতির জীবনের সামাজিক ন্যায়, শান্তি ও নিরাপত্তার ভয়াবহ অপঘাতক। দেশবাসী শুনে আশ্বস্ত হবে যে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর অভিমতের একটি বিশেষ সত্য হয়ে আইন ও বিচার-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিবিধ অপূর্ণতার অবসান ঘটাবার জন্য একটি আদর্শিক অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে।

জনৈক বাঙালী রাজকর্মচারী (ব্রিটিশ আমলের, তাঁর স্মৃতিকথার গ্রন্থে পাটনার এক বাঙালী উকীলের বিশেষ একটি রোচনার উল্লেখ আছে। এই উকীলের নতুন বাড়ির ছাদের আলিসাতে দুটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। একজন বৃদ্ধের মূর্তি, তাঁর সম্মুখে ওজনের নিক্তি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বালকের মূর্তি। দুই মূর্তির ভাব-ভঙ্গীর তাৎপর্য : বিচার (নিক্তি হাতে বালক) আইনের (বৃদ্ধ) কাছ থেকে আশ্বাস লাভ করছে,—ল' কনসোলিং জাস্টিস। এ ধরনের সম্বন্ধিত দুই মূর্তিকে আইন ও বিচার সম্পর্কে প্রাচীন রোমান উপলব্ধির প্রতীক বলে ধারণা করতে হয়। সুবিচারের নিক্তি ন্যায়-অন্যায়কে ঠিক-ঠিক ওজন করবে। কিন্তু ওজন ঠিক রাখতে হলে যার পক্ষে ঠিক থাকা চাই, সে হলো আইন। আইনে কোন দুর্বলতা ত্রুটি অপূর্ণতা ও ফাঁক থাকলে বিচারের নিক্তি ভুল দিকে ঝুঁকে পড়বে।

প্রধানমন্ত্রীর উক্তির পাশে পশ্চিম-বঙ্গের বিধানসভায় রাজ্য অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষের ভাষণের কিছু অংশ রেখে নিয়ে পাঠ করলে সমালোচনার তাৎপর্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের বর্তমান আইনের প্রকার ও রীতি হলো বৈদেশিক অ্যাংলো-স্যাকসন আইন-প্রথার নমুনা। তারই অনুকরণে রচিত ভারতীয় আইনের নির্দেশে ভূমি-স্বত্বের সংস্কার ও খাদ্যশস্যের সংগ্রহ অনেক ব্যাহত হয়েছে। আদালতে এখন প্রায় চার হাজার মামলায় খাদ্যশস্যের সরকারী সংগ্রহ স্থগিত হয়ে রয়েছে। রাজ্য অর্থমন্ত্রী বলছেন : ব্যক্তির মৌলিক অধিকার আর জাতীয় তথা বৃহত্তর সামাজিক অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলে চলবে না। বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের অধিকার সার্থক করে তোলবার জন্য প্রয়োজন হলে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার-বিধির পরিবর্তন করতে হবে।

কোন সন্দেহ নেই সমাজবাদের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী আইন-প্রথা এবং বিচার-ব্যবস্থারও প্রয়োজনীয় উৎকর্ষ ও পরিবর্তনে প্রকারিত হতে হবে। রোমান আইনের আদর্শিক উৎকর্ষের প্রশস্তি করেও বলা চলে যে, ভারত-জীবনের সম্যক ও স্বচ্ছন্দ বিকাশ এবং প্রগতির জন্য রোমান আইনের সুবৃহৎ প্রকারের কোন আইনের প্রয়োজন হয় না। অ্যাংলো-স্যাকসন আইন-প্রথা তো ভারতীয় জীবনের পক্ষে আরও অবান্তর। ওটা ভারতের রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের অর্থাৎ পরাধীনতার দ্বারা সম্ভাবিত একটি শাসনিক উদ্দেশ্যের শিকল, যার মধ্যে বিচারশীল মানবিক আগ্রহের তুলনায় পীড়নের উপাদানই বেশী। ব্রিটিশের রাজসিক আধিপত্যের প্রযোজক হিসাবে এই অ্যাংলো-স্যাকসন ঐতিহ্যের আইন-প্রথার সম্বল নিয়ে বিচারের আদালত জনজীবনের ন্যায় রক্ষা করছেন, অন্যায় নিরোধ করেছেন। যুক্তির কথাটা এক্ষেত্রে এই যে, স্ববিরোধী প্রকারের কারণে বিচার-ব্যবস্থা সৌষ্ঠব যথোচিত মানে উন্নত হতে পারেনি।

মেকলে সাহেব, যিনি ব্রিটিশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একজন কৃতী ঐতিহাসিক ও কবি বলে প্রসিদ্ধ, তিনি কোম্পানীর আমলে ভারতের ফৌজদারী দণ্ডবিধি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে-ছিলেন। মেকলের প্রণীত সেই ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রকৃতি আজকের স্বাধীন ভারতের ফৌজদারী দণ্ডবিধির মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। এ বড় অশোভন ও অসঙ্গত ভুল, জাতীয় বিবেচনার একটি বড় রকমের দুর্বলতার নমুনা। বর্তমান স্বাধীন ভারতের জীবন এবং তার আদর্শিক প্রয়োজনের পক্ষে ব্রিটিশের দ্বারা আরোপিত বৈদেশিক প্রকৃতির আইন-প্রথা ও বিচার-ব্যবস্থার কোন উপকারিতা নেই, বরং অনেক অপকারিতা আছে। প্রধানমন্ত্রীর উক্তির স্পষ্ট তাৎপর্য অনুসরণ করে বলা চলে যদি বিচার-অনুষ্ঠানের শোচনীয় মন্থরতার অভ্যস্ত রীতির অবসান হয় এবং বিচারপ্রার্থীর পক্ষে মামলা পরিচালনার আর্থিক ব্যয় সামান্যতর হয়, তবে সাধারণ মানুষের নাগরিক অধিকারের সম্মান থাকে, এবং সমাজবাদও ত্বরান্বিত হয়।

এই সপ্তাহ

পানজাবের প্রাক্তন অকালি মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল ও তাঁর সহযোগী ছয়জন মন্ত্রীকে গ্রানগানি কমিশন দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ, আনুকূল্য প্রদর্শন ও প্রশাসনিক অনাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এই সঙ্গে পানজাবের আর একজন প্রাক্তন অকালি মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং-এর বিরুদ্ধেও তদন্ত চলছিল, কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে এই তদন্ত পরিত্যক্ত হয়। প্রকাশ সিং বাদল গুরনাম সিং মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন। এই দুই মন্ত্রিসভার কার্যকাল ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে।

বাদল ও তাঁর সহযোগী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন তাঁর মন্ত্রি-সভারই আর একজন অকালি সদস্য ত্রিলোচন রিয়াসতি ও সি পি আই নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী সত্যপাল ডাং। ওই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য ১৯৭১ সালের অকটোবর মাসে গ্রানগানি কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের রায়ে বলা হয়েছে, ৯১টি অভিযোগের মধ্যে ৩০টি প্রমাণিত হয়েছে, ৬১টি হয়নি। বাদল ছাড়া আর যে ছয়জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কমিশন রায় দিয়েছেন তাঁরা হলেন, তেজা সিং, সতনাম সিং বাজোয়া, বাবা হরনাম সিং, নরেন্দ্র সিং, রণধীর সিং চিমা, ও আত্মা সিং।

কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের রায় গ্রহণ করেছেন এবং এই রায়ের উপর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানজাব সরকারকে রায়ের একটি নকল পাঠিয়েছেন। কমিশনের সঙ্গে শুরুতে সহযোগিতা করলেও পরে জনসংঘ ও অকালি দল কমিশনের শুনানী বয়কট করে। কমিশনের রিপোরট পানজাব বিধানসভায় পেশ করা হলে ৩২জন কংগ্রেস ও সি পি আই সদস্য বাদলের পদত্যাগ দাবি করেন। বাদল এখন পানজাব বিধান-সভার সদস্য।

এই সপ্তাহে দেশের প্রায় সবকটি বিধানসভায় বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। লোকসভার মতো বিধানসভা অধিবেশনেও এবার সরকারী কাজ ছাড়া আর কিছু হবে না। একসঙ্গে এতগুলি বিধানসভার অধিবেশন ডাকার উদ্দেশ্য সংসদে সদ্য গৃহীত সংবিধান সংশোধন বিল সম্পর্কে বিধানসভার অভিমত নেওয়া। সব সাংবিধান সংশোধন বিলের জন্য রাজ্য বিধানসভার সম্মতির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দেশের অন্তত অর্ধেক বিধানসভার সম্মতি না পেলে কয়েক শ্রেণীর সংবিধান সংশোধন বিল সংসদে পাশ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো যায় না। সংবিধান (৩৮তম সংশোধন) বিলটিও এই শ্রেণীর। ইতি-মধ্যেই প্রায় ১৫টি বিধানসভা বিলটিতে সম্মতি জানিয়েছেন। কাজেই এখন আর বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানোর কোন বাধা নেই। কয়েকটি বিধানসভার অধি-বেশন ডাকা হয়েছিল কেবল সংবিধান সংশোধন বিলটিতে সম্মতি জানানোর জন্য; অন্তত দুটি বিধানসভার অধিবেশন যেদিন শুরু সেদিনই শেষ হয়। সংবিধান সংশোধন বিল ছাড়া রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে অনুমোদন করেও কয়েকটি বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

আমেরিকার 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক নরমান কাজিনস এক লিখিত প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে জানতে চান, জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর আটক রাজ-নৈতিক নেতাদের কারও শীঘ্র মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। প্রধানমন্ত্রী উত্তরে বলেন, যখনই সরকার বুঝবেন যে আটক নেতারা মুক্তি পেলে আবার বিপদের সৃষ্টি করবেন না ও সংবিধান বহির্ভূত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয় দেখাবেন না তখনই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বর্তমান জরুরী অবস্থা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল বজায় থাকবে বলে তিনি মনে করেন না।

জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রী দেবীকে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরা চালান নিবারণ আইনে আটক করা হয়েছে। গায়ত্রী দেবী লোকসভার সদস্য। সংসদের কোন সদস্যকে গ্রেফতার করলে সে-সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে লোকসভার অধ্যক্ষ বা রাজ্য-সভার সভাপতিকে জানানোর নিয়ম আছে। সংসদের অধিবেশন চলতে থাকলে তাঁরা গ্রেফতারের খবরটি সংসদে ঘোষণা করেন। গায়ত্রী দেবীর গ্রেফতারের খবরটি লোক-সভায় ঘোষিত হয়েছে।

ভারতরক্ষা বিধি অনুসারে জারি এক নির্দেশে ভারত সরকার বলেছেন, আগামী ১লা সেপটেমবর থেকে প্যাকেটে কোন জিনিস বিক্রি করতে হলে প্যাকেটের উপর জিনিসের দাম, বিবরণ, ওজন বা আয়তন লিখতে হবে। এই সব জিনিস ও প্যাকেটের প্রস্তুতকারকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে প্যাকেটের উপর যে দাম লেখা থাকবে সেটি সর্বোচ্চ দাম, তার চেয়ে কম দামে ঐ জিনিস বিক্রি করা যেতে পারে কিন্তু বেশি দামে নয়।

দেশের বড় বড় শহরে সম্প্রতি যেসব প্রাসাদ উঠেছে তাতে কালো টাকা বিনিয়োগ হয়েছে কিনা অনুসন্ধান করবার জন্য দিল্লি, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে আয়কর বিভাগ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে। দিল্লির মহারানীবাগ ও গ্রেটার কৈলাস অঞ্চলে ৭৫টি প্রাসাদে আয়কর বিভাগের অফিসাররা হানা দিয়েছেন। মহারানীবাগের একটি বাড়িতে অন্যান্য বিলাস সামগ্রীর মধ্যে তাঁরা নাকি নয়টি এয়ার কনডিশনার, তিনটি রেফ্রিজারে-টর ও পাঁচটি গাড়ি দেখেছেন। এয়ার কনডি-শনার ও গাড়িগুলির অধিকাংশই বিদেশী। বোম্বাইয়ের প্রায় চারশটি ফ্ল্যাটে হানা দেওয়া হয়েছে। একটি ফ্ল্যাটের প্রধান দরজাটি নাকি আগাগোড়া রুপোর পাতে মোড়া, আর একটি ফ্ল্যাটের আভ্যন্তরীণ সজ্জায় নাকি কয়েক লক্ষ টাকার ইতালিয়ান মারবল ব্যবহৃত হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে শিক্ষামূলক টেলিভিশনের এক প্রকল্প ১লা অগাস্ট থেকে চালু হয়েছে। রাজস্থান, বিহার, কর্ণাটক, ওড়িশা, অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশের তিন লাখ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মোট ২৪০০ গ্রামে এই অনুষ্ঠানসূচী দেখা যাবে। এই প্রকল্প বিশেষভাবে গ্রামবাসী-দের জন্য। প্রকল্পটির উদ্বোধন করে প্রধান-মন্ত্রী বলেছেন, টেলিভিশন কর্মসূচীতে স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, পরিবার পরি-কল্পনা, কৃষি ও পুষ্টি বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হবে। প্রকল্পটি আপাতত এক বছরের জন্য।

এককালে পশ্চিম বাংলার উপ-মুখ্য-মন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিজয় সিং নাহার শৃঙ্খলাভঙ্গ ও দলীয় নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে কংগ্রেস পরিষদীয় দল থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্র ও প্রাক্তন কংগ্রেস সম্পাদক কৃষ্ণকুমার শুক্ল সহ বিধানসভার আরও চার-জন কংগ্রেস সদস্যের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নাহার ও শুক্লর কংগ্রেস সভ্য পদ খারিজ করে দেওয়ার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই দুই নেতাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। তাঁদের দল থেকে তাড়ানোর ক্ষমতা প্রদেশ কংগ্রেসের নেই, সে-ক্ষমতা একমাত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির।

৪।৮।৭৫

শংকর ঘোষ

আচমকা

আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলোর যাঁরা হর্তাকর্তা তাঁদের অনেকেরই কিন্তু ক্ষমতার খুঁটিটা কেমন যেন নড়বড়ে—জোরে একটু টান দিয়েই তাদের উপড়ে আনা যায়। যাঁদের খুঁটি বাইরে থেকে দিব্যি শক্ত বলে মনে হয় দেখা গেছে সময় বুঝে ঘা দিলে তারাও খসে পড়ে। জাঁকিয়ে যাঁরা গদিতে বসেছেন বলে মনে হচ্ছে তাঁদেরও অনেক সময় দেখা যায় পায়ের তলার মাটি নেই, আচমকা খোয়া যাচ্ছে তাঁদের ক্ষমতা। তাঁরা টেরও পান না যে তাঁদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। মুখে তাঁরা বড়াই করলে কী হয় তাঁরা সদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন কখন কোথা দিয়ে অঘটন ঘটে যায়। পারতপক্ষে তাঁরা কেউ বিদেশে যান না কিংবা অন্য কোনও নেতাকে বড় হতে দেন না। এত কড়াকড়ি করেও কিন্তু শেষ রক্ষে করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। আচমকা এক ধাক্কায় তাঁদের আসন টলে যায়। মুখ কালো করে তাঁদের বিদেয় নিতে হয় এত সাধের ক্ষমতার স্বর্গ থেকে। এমনিভাবে যেতে হয়েছে ঘানার এনক্রুমাকে। উগাণ্ডার মিল্টন ওবোটেকে। ওই একই পথের পথিক হয়েছেন ২৯ জুলাই নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াকুব গোওন।

তিনজনের বিদেয় নেবার ধরনটা একই রকমের। তিন প্রধানেরই কপাল ভাঙে যখন তাঁরা ভিন দেশে। এনক্রুমা ছিলেন পিকিঙে, ওবোটে সিঙ্গাপুরে, গোওন কাম্পালায়। তাঁদের সরিয়ে দেবার যে একটা চক্রান্ত চলছে তা তাঁরা আদৌ আঁচ করতে পারেননি। পারলে কী আর তাঁরা রাজ্যপাট ফেলে এক পা নড়েন। তাঁরা নিজেরেও মনে করতেন—বাইরের লোকেরাও করতো—দেশের লোক তাঁদের বই জানে না, গোটা প্রশাসনটা তাঁদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু দেখা গেল তাঁদের যাওয়া-আসা নিয়ে লোকে তেমন মাথা ঘামালো না। তাঁদের বজ্র আঁটুনির গেরোটা ছিল ফসকা। অনেক গরম গরম কথা বলেছিলেন এনক্রুমা কিন্তু সে সব ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছু যে নয় অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গিয়েছিল। মুখে তড়পালেও ইদি আমিনকে হটাতে পারেননি ডঃ ওবোটে। দেশের লোকেরা ভুলেও আর তাঁদের নাম করে কি না সন্দেহ। জেনারেল গোওনের বেলা ইতিহাস যে নতুন মোড় নেবে এমন কোনও আভাস মিলছে না। মনে তাঁর যাই থাকুক নয়া জমানাকে মেনে নিয়েছেন বোধ হয় এনক্রুমা ওবোটের হাল দেখে।

তা ছাড়া জেনারেল গোওনও তো সোজা পথে ক্ষমতার চুড়োয় পৌঁছোননি—তিনিও

বৈদেশিকী

দেবরাজ

জবরদখল করেছিলেন ক্ষমতা নাইজেরিয়াতে ১৯৬১ সনে। দেশে তখন গণতান্ত্রিক শাসন নাকচ হয়ে গিয়েছে, চলছিল নির্ভেজাল ফৌজী রাজত্ব। গোটা দেশে রক্ত গঙ্গা বইছে উপজাতিদের মধ্যে বিরোধের দরুন। এক-একটা উপজাতির পক্ষ নিয়েছে এক-একটা ফৌজী দল। গদিতে বসে কিন্তু এলেম দেখালেন গোওন। দেশটাকে তিনিই বাঁচালেন গৃহযুদ্ধের কবল থেকে, ফিরিয়ে আনলেন শান্তি। নতুন এক ফ্যাঁসাদ বেধেছিল তিনি দেশের সর্বেসর্বা হবার পর। উত্তর নাইজেরিয়া ১৯৬৭ সনে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো হঠাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। শুরু হলো রীতিমত লড়াই। ফ্রান্স আর পর্তুগাল সাহায্য করতে লাগলো বিদ্রোহীদের টাকা-পয়সা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে। গোওন কিন্তু দমলেন না। তিনিও রুখে দাঁড়ালেন—কবুল করলেন দেশকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে তিনি দেবেন না। তাঁর কথার নড়চড় হয়নি। উত্তর এলাকায় যে বিয়াফ্রা নাম দিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গড়েছিল বিদ্রোহীরা তা টিঁকলো না। নাইজেরিয়ার সংহতি বজায় রইলো।

নাম কিনে ফেললেন দুনিয়াতে জেনারেল গোওন ঘরোয়া লড়াই জিতে। তাঁর আমলে দেশে স্থিতি এলো, উপজাতিদের মধ্যে অহরহ হানাহানি কাটাকাটি বন্ধ হলো। তাঁর মর্যাদা আরও বাড়লো যখন তিনি বললেন প্রশাসন চালানো ফৌজীদের কাজ নয়, তার জন্যে দরকার গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। মনে হয়েছিল তিনি ভিন্ন জাতের ফৌজী নেতা, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার ইচ্ছে তাঁর নেই, যখনই দেশে শান্তি পুরোপুরি ফিরে আসবে তখনই তিনি অসামরিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবেন, হয়তো বা বিদেয় নেবেন রাজনীতির আসর থেকে। তিনি যখন অংগীকার করলেন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চালু হবে নাইজেরিয়াতে ১৯৭৬ সনে তখন তাঁর ইজ্জত আরও বেড়ে গেল, নাইজেরিয়ার রাজনৈতিক দলগুলো তৈরি হতে লাগলো পাল্লা বদলের আশায়। সে আশায় কিন্তু ছাই পড়লো গেল বছর অক্টোবর মাসে। হঠাৎ রাষ্ট্রপতি গোওন বেঁকে বসলেন গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার মতলব আপাতত তিনি খারিজ করে দিলেন কেন না দেশ তার জন্যে এখনও তৈরি নয়। এখনও দিনকতক ফৌজী শাসন কায়েম থাকবে এই কথাটাই তিনি লোককে জানিয়ে দিলেন ঘটা করে।

তাঁর এই মত পালটানোকে অনেকেই ভালো চোখে দেখেনি নাইজেরিয়াতে। বিশেষ করে যারা লেখাপড়া শিখেছে। অসন্তোষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে লাগলো তাদের মনে। বিক্ষোভ দেখা দিল ছাত্রদের মধ্যে। মেহনতী মানুষও খুব খুশী ছিল না জেনারেল গোওনের ওপর। নাইজেরিয়া একটা বিরাট দেশ। কমনওয়েলথে ভারতবর্ষ ছাড়া এত বড় দেশ আর নেই। ও দেশে তেল পাওয়া যায় প্রচুর। সে তেল বেচে লাভ হচ্ছে বছরে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু লোকের দুঃখ ঘুচলো কই? দেশকে রক্তারক্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন বলে যতটা খাতির জেনারেল গোওনের হয়েছিল সেটা শান্তি ফিরে আসবার পর কমে গিয়েছিল। গণতন্ত্র নতুন করে পত্তন করতে যখন তিনি রাজী হলেন না তখন লোকের মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। তারই সুযোগ নিয়ে ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন একদল ফৌজী সর্দার ২৯ জুলাই। দেশের বেতারে গোওনেরই প্রিয়পাত্র কর্নেল জোসেফ নামভেন গারবা ঘোষণা করলেন বিদেয় দেওয়া হয়েছে জেনারেল গোওনকে—তিনি তাদের রাষ্ট্রপতিও নন, প্রধান সেনাপতিও নন।

গোওন তখন কাম্পালা গিয়েছেন আফ্রিকান সংহতি সংস্থার বৈঠকে যোগ দিতে। তিনি চালাক লোক। হইচই না বাড়িয়ে ঘোষণা করলেন নতুন সরকারকে তিনি মেনে নিয়েছেন। নাইজেরিয়ায় আর এক প্রস্থ ঘরোয়া লড়াই বাধার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তা কেটে গেল, একটা নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটলো দেশে। নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ব্রিগাডিয়ার জেনারেল মুর্তালা মহম্মদ। তিনি ছিলেন গোওনের আমলে যোগাযোগ মন্ত্রী। তিনি এখন নাইজেরিয়ার প্রধান সেনাপতিও। যাঁরা কাণ্ডটা বাধিয়েছেন তাঁরা যে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এমন কোনও প্রমাণ নেই। কেন তাঁরা এ কাজ করলেন তার এমন কোনও কৈফিয়ত দিতে পারেননি যাতে রহস্যটা বোঝা যায়। তাঁরা শুধু এইটুকু বলেছেন এ ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু কেন উপায় ছিল না এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? পর্তুগালে বিপ্লবের মানে বোঝা যায়, কিন্তু নাইজেরিয়ার ঘটনার তাৎপর্য এখনও অস্পষ্ট। কেউ কেউ সন্দেহ করছেন এর পেছনে আছে বিদেশীদের হাত। কে জানে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে সেখানে কোন অপদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে।

দেশ ও কাল

গৃহহীনকে গৃহদান

গৃহহীনদের গৃহ দেওয়ার একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন সরকার। সব রাজ্য সরকারও এই কাজে এখন উৎসাহী। প্রত্যেকটি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁরা বহু গৃহহীনদের বাসস্থান করে দেবেন, করে দেবেন মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই। কেউ বলেছেন, দশ হাজার গৃহহীনকে গৃহ দেব এক বছরের মধ্যে। কেউ বলছেন, না, আমি ছয় মাসের মধ্যে এই কাজ করব। কেউ বা বলছেন, মাস তিনিকের মধ্যেই এই মহৎ কাজটা সম্পন্ন করব। বলতে গেলে, গৃহহীনদের গৃহ দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতির বা সংকল্পের একটা প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধ্যে।

গৃহহীনদের গৃহ দানের পরিকল্পনাটা যে অত্যন্ত সাধু তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই কাজটা যদি তাঁরা ঘোষণা মত করতে পারেন তাহলে তাঁদের ধন্যবাদ দিতেই হবে।

কাজটা কিন্তু বিরাট এবং তাই অত্যন্ত কঠিন। কারণ, গৃহহীনের সংখ্যা কত তা বলা কঠিন হলেও সহজেই অনুমেয় যে গৃহহীনের সংখ্যা গোটা দেশে কয়েক কোটির বেশি। এই পশ্চিমবঙ্গেই গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা কম করেও তিন চার লাখ হবেই। গ্রামাঞ্চলে সত্যিকারের গরীব যাঁরা, অর্থাৎ যাঁরা ভূমিহীন চাষী (এবং বর্গাদারও নন শুধুই জন-মজুর খাটেন) তাঁরা অধিকাংশই আসলে গৃহহীন। এরা যে জংগলে বা গাছতলায় বাস করেন তা নয়। কুঁড়ে ঘর একটা আছে ঠিকই। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে নিজের জমির উপরে নয়। সে জমির মালিক হয় কোনও জোতদার, নয় সরকার। আইনত এরা সেখানে এতদিন বে-আইনী দখলদার হিসাবেই একখানা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর করে আছেন। এদের জন্য নিজস্ব গৃহের ব্যবস্থা করতে হলে প্রথমত জমি দিতে হবে, দ্বিতীয়ত দিতে হবে বাড়ি করার জন্য কিছু টাকা। সব রাজ্য সরকারই অবশ্য এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন করছেন। সব রাজ্য সরকারই কিছু অর্থও বরাদ্দ করছেন।

তবে, শুধু আইন করে বা অর্থ বরাদ্দ করে গৃহহীনদের গৃহদান পরিকল্পনার সাফল্য আশা করা ভুল হবে। যাঁদের জন্য এই পরিকল্পনা তাঁরা অত্যন্ত দুর্বল। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুই ভাবেই দুর্বল। তাঁরা শিক্ষারও সুযোগ পান নি। তাই তাঁদের ঠকানোও অত্যন্ত সহজ। দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই জোতদাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের বর্গাদারদের তাঁদের আইনত প্রাপ্য ফসল দেন না। দুর্বলতার সুযোগেই চাষের সময় ছাড়া অন্য সময়ে বহু অঞ্চলে গ্রামের গরীব জন-মজুরকে তাঁর আইনত প্রাপ্য মজুরীর চার ভাগের এক ভাগ মজুরী নিয়েই কাজ করতে বাধ্য করা হয়। দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই গ্রামাঞ্চলে বহু ক্ষেত্রে ঠিকাদাররাও এদের মজুরীর পয়সা অনেকটা মেরে দেন।

তাই বলছিলাম, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলকে শুধু আইন করে তাঁর অর্থনৈতিক অধিকার পাইয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। তা যদি হত তাহলে বহু সরকারী জমিতে অর্থাৎ ভেসটেড জমিতে এখনও পুরনো জোতদার চাষ করতে পারতেন না, ভাগচাষীরাও সবাই বর্গাদার বলে নথিভুক্ত হতেন এবং দিনমজুরও ভাল মজুরী পেতেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষকে তাঁর আইনগত অর্থনৈতিক অধিকার পাইয়ে দিতে গেলে আইন প্রণয়নের উপরেও আরও কিছু করা প্রয়োজন।

*

গ্রামের যাঁরা গরীব তাঁরা কত গরীব সে ধারণা আমাদের শহুরে বাবুদের এবং শহুরে নেতাদের অনেকেরই নেই। আমাদের কলকারখানায় যেসব কুলী মজুর কাজ করেন নিজ নিজ গ্রাম কিন্তু তাঁরা ঠিক গরীব নন। গ্রামের গরীবরা আরও অনেক গরীব। শহরে যাঁরা কলে কারখানায় মজুরের বা দারোয়ান বেয়ারার কাজ করেন তাঁদের প্রায় সকলেরই গ্রামে কিছু না কিছু জমি আছে, আছে মাথা গোঁজার নিজস্ব ঠাঁই। কিন্তু গ্রামের গরীব যাঁরা তাঁদের চাষের জমি তো কারু নেই-ই, তাঁরা বর্গাও (অর্থাৎ ভাগ চাষও) করতে পারেন না। বর্গা করতে হলেও হাল চাই, বলদ চাই, বীজ ধান এবং সার কেনার টাকা চাই। গ্রামের গরীবের এসব সংগ্রহ করার মত সংগতি নেই। তাঁরা নির্ভরশীল দিনমজুরীর উপর—তাঁদের স্রেফ গায়ে গতরে খেটে খেতে হয়। এবং, দুঃখের বিষয় এই খেটে খাওয়ার সুযোগও তাঁদের নেই। কারণ গ্রামে কাজ নেই। গ্রামের দিনমজুর ৩৬৫ দিনের ভেতর পূর্ণ মজুরীতে বড়জোর ১০০ দিন কাজ পায়। গ্রামের দিন মজুর বছরের অর্ধেক দিন খেতে পায় না। গ্রামের দিন-মজুর প্রায় কোনওদিনই দু-বেলা খায় না।

গ্রামের গরীবরা অধিকাংশই হলেন হরিজন বা আদিবাসী বা নীচু জাতি বলে পরিচিত গোষ্ঠীর লোক। একদা তাদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভাল ছিল। এদের কিছু কিছু জমি জায়গাও ছিল। ছিল নিজস্ব চাষবাসও। কিন্তু বাইরে থেকে আসা "উন্নত সভ্যতার" মানুষরা সেই যে আদি কাল থেকে এদের কোণঠাসা করতে শুরু করেছে তা এখনও অব্যাহত। ক্রমে ক্রমে এরা রিক্ত, দরিদ্র এবং নিঃস্ব। আমারা কখনও ঠকিয়ে, কখনও গায়ের জোরে, কখনও প্রশাসকদের জোরে, কখনও বা পয়সার জোরে এদের জমিজমা সব কেড়ে নিয়েছে। এরা স্রেফ গায়ে গতরে খাটা লোক।

সরকারী সাহায্য এতদিন যত খাতেই দেওয়া হোক না কেন, তার খুব সামান্যটুকু পেয়েছেন এরা।

সবচেয়ে আগে তাই এদের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রয়োজন। কারণ, এরাই সবচেয়ে দুর্বল এবং সবচেয়ে অবহেলিত। এদের ঋণ দেওয়ারও লোক কম। ভোটের সময় বিভিন্ন দল বিভিন্ন ভাবে এদের ভোট আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু যেহেতু ব্যবসায়ীদের মত বা বড় চাষীদের মত এদের কোনও দাবি নেই সুতরাং ভোটের পর এদের জন্য প্রতিকারের কাজ বড় একটা হয় না।

*

কিন্তু এত বড় একটা অংশকে পেছনে ফেলে রেখে, দুর্বল রেখে কোনও দেশই এগোতে পারে না, সবল হতে পারে না। দেশকে এগোতে হলে গ্রামের গরীব মানুষকে এগিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও করতেই হবে।

একজন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন এদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এদের সবাইকে যদি সরকার চাষের জমি দিতে পারেন তো সবচেয়ে ভাল হয়। এরা যদি নিজ জমিতে প্রয়োজন মত জল ও সারসহ চাষ করার সুযোগ পান তাহলে ফসল উৎপাদনও অনেক বাড়তে পারে। কিন্তু এদের সবাইকে নিজ চাষের জমি দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। অত জমিও নেই, আর এই অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পূর্ণ ওলট পালট ছাড়া তা সম্ভবও নয়।

আসলে যেটা কম টাকায় কিছুদিনের মধ্যেই অনেকটা করা যায় সেটা হল এদের জন্য বছরে অন্তত ৩০০ দিনের মত কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা। দেশের অধিকাংশ জমিতে তিন বা আড়াইটা চাষের ব্যবস্থা হলেই তা হতে পারে। এইটা করতে পারলেই আমরা গ্রামের গরীব মানুষের অনেকটা উপকার করতে পারব। এরা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা সুযোগ পাবে। তখন এরা নিজস্ব গৃহও নিজেরাই করে নিতে পারবে।

৩-৮-৭৫।

সমর রায়

ভারতের অর্থনীতি

বর্তমান বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী চলতি বছরের যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেছেন, তাতে দেশের অবস্থার একটি উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে *যে ১৯৭৫-৭৬ সালেই জাতীয় আয় পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ বেড়ে যাবে; গত বছর জাতীয় আয় বেড়েছিল মাত্র ২ শতাংশ।* চলতি বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও আশাব্যঞ্জক। ১১৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা চলতি বছরের যোজনায় ধরা হয়েছে, তার মধ্যে খারিফ শস্যের উৎপাদন ৬৯ মিলিয়ন টন এবং রবিশস্যের উৎপাদন ৪৪ মিলিয়ন টন হবে বলে দৃঢ় আশা প্রকাশ করা হয়েছে—যে উৎপাদন এ বছর হবে, তাতে গমের উৎপাদন হবে ২৬ মিলিয়ন টন। চলতি বছর শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হারও পাঁচ শতাংশ থেকে ছয় শতাংশের মধ্যে হবে বলে ধরা হয়েছে। আগেকার বছরে শিল্পোৎপাদন বেড়েছিল মাত্র ৩ শতাংশ। শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাবার কারণ হল বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি, ইস্পাত ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি, সরকারী সংস্থাগুলির কাজে ক্রমোন্নতি এবং প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর শিল্পক্ষেত্রে অটুট শান্তি বজায় রাখার আগ্রহ। এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে সরকারী উদ্যোগগুলির উৎপাদন বেড়েছে ১৮ শতাংশ। তা ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম চিনি বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত সিমেন্ট পাট কয়লা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনও যথেষ্ট বেড়ে গেছে। সরকারের রিপোর্টে দেখা যায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তবে ঋণদানের ব্যাপারে যে কড়াকড়ি চলছে তা চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারী ক্ষেত্র ব্যয় সংকোচনের যে ব্যবস্থা হয়েছে তার সঙ্গে ঋণপত্র যোগ করলে আগামী মাসগুলোতে বাজেটের ঘাটতি হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। গত বছরের তুলনায় ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রথম তিন মাসে কর রাজস্বের পরিমাণ ১২৫ কোটি টাকা বেড়েছে। কালো টাকা থেকে আশাতিরিক্ত রাজস্ব পাওয়া গেছে। কালো টাকার পরিমাণ হ্রাস করা এবং কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ সব কারণে আশা করা যায় ১৯৭৫-৭৬ সালে ঘাটতি অর্থ-সংস্থানের পরিমাণ সীমায়িত রাখা সম্ভব হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে সরকার যে সব ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং যেভাবে তারা বিষয়ক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন তার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে জিনিসপত্রের দামের উপর। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পর বাদাম তেল, সরষের তেল, নারকেল তেল, বনস্পতি চিনি, ভুট্টা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চালের দাম কমেছে বলে সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য যাতে অন্তত আট থেকে দশ শতাংশ বাড়তে পারে সে রকম ব্যবস্থা হচ্ছে। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণও বাড়ছে। সরকারী রিপোর্টে বৈষয়িক অপরাধীদের বিরুদ্ধে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে তার উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলেছেন, চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আরও হচ্ছে। চোরাচালানকারীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য আইনও তৈরী হচ্ছে। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত অর্থনৈতিক কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ এবং প্রকৃত মূল্য গোপন করার জন্য বিশেষ কর্মিদল গঠন করা হয়েছে। ফাটকা কারবার বন্ধ করার জন্য ফরোয়ার্ড মার্কেট কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারগুলিও ব্যবস্থা নিয়েছেন যাতে ব্যবসায়ীরা অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দাম ও পরিমাণ প্রকাশ্য জায়গায় টাঙিয়ে রাখে।

সরকারী রিপোর্টে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা যদি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় তবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে চলতি বছরে খুবই উজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। জিনিসপত্রের দাম হয়ত সামগ্রিকভাবে কিছুটা কমেছে। কিন্তু সেজন্য মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে সে-কথা বলা যায় না। এ বছর যে উন্নয়ন-হার ৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে বলে ধরা হয়েছে, তার ভিত্তি হল কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি। কৃষিক্ষেত্রে যে এ বছর ভাল উৎপাদন হবে বলে আশা করা হয়েছে, তার কারণ হল সময়মত বৃষ্টিপাতের সুযোগ পাওয়া। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা স্থায়ী করার জন্য যা যা করার দরকার, যেমন জলসেচ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ করে খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা, আরও বেশী জমি চাষের আওতায় আনা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা এখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রীর নতুন অর্থনৈতিক কার্যসূচীতে অবশ্য এ জিনিসগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সারের দামও কমানো হয়েছে এবং আশা করা যায়, কৃষকগণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন। সরকারী মালিকানাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও প্রকল্পে যে উৎপাদন বাড়াবার তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এ বছর দেশের অর্থনৈতিক চিত্র সম্পর্কে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা যদি পুরোপুরি না-ও পূরণ হয়, তবুও এ কথা বলা চলে যে, চলতি বছরের অর্থনৈতিক অবস্থা আগেকার বছরের অর্থনৈতিক অবস্থার চেয়ে ভাল হবে। তবে উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াবার জন্য যে কর্মসূচী এ বছরের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তা পূরণ *না হবার-ই বা কি আছে? ইচ্ছা ও নিষ্ঠা থাকলে যে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু অবস্থা থেকে চাঙ্গা করে তোলা যায়, তার নজিরও তো বিরল নয়।*

১৯৭৫-৭৬ সালে সরকার বার্ষিক যোজনা খাতেও সাড়ে এগারো শ' কোটি টাকা পরিমাণ লগ্নি বাড়িয়েছেন। ১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় ৫৯৭৮ কোটি টাকার যে লগ্নি নির্দিষ্ট হয়েছে তা ১৯৭৪-৭৫ সালের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশী। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী খাতে চলতি বছরের যোজনায় বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৯১·৪১ কোটি টাকা; ১৯৭৪-৭৫ সালের যোজনায় এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৩৮·৪২ কোটি টাকা, গত বছর সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৮৫·৩২ কোটি টাকা; এ বছর বরাদ্দের পরিমাণ হয়েছে ৪৬৮·২২ কোটি টাকা। বৈদ্যুতিক শক্তি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ গত বছর ছিল ৭৬৬·৫৫ কোটি টাকা; এ বছর বরাদ্দের পরিমাণ হয়েছে ১১০১·৫৮ কোটি টাকা। শিল্প ও খনিজ সামগ্রী খাতে গত বছর বরাদ্দ ছিল ১০৯৩·২৮ কোটি টাকা; এ বছরের বরাদ্দ হয়েছে ১৬৯৯·০২ কোটি টাকা। পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতেও বরাদ্দের পরিমাণ গত বছরের ১০২৬·৮১ কোটি টাকা থেকে এ বছর ১০৪০·৪৪ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। সমাজসেবা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ গত বছর ছিল ৬৯৯·০৬ কোটি টাকা; এ বছর বরাদ্দের পরিমাণ হয়েছে ৭৮২·৮২ কোটি টাকা।

১৯৭৫-৭৬ সালের বার্ষিক যোজনায় সব খাতেই গত বছরের অনুপাতে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক সম্পদ আহরণ করে তার যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হবে কি? বিভিন্ন খাতে যা বরাদ্দ করা হয়েছে তার যদি সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উন্নয়ন-হার অর্জন করা খুব কঠিন হবে না।

সুব্রত গুপ্ত

ত্রিবেণী-সংহার

শান্তিপদ ব্রহ্মচারী

ছেঁড়া বালাপোশ গায়ে চাঁদ
শতচ্ছিন্ন জল
এই স্বাভাবিক দৃশ্যটুকু
রাত্রির সম্বল।

ভিতরে শৈশব জাগে একা
কারুকার্যময়
লাজুক হাতের গন্ধ মাখে
মাটি ও গোময়।

দুঃসময়ে চিনেছি উত্তাল
গোত্রছাড়া কাক
শব্দ শুষে খায় পরমায়ু
অর্থ আর বাক্।

তবু তুমি চাও. ফলত দেখেছি পুবের বারান্দায়
ছায়া ম্লানতর, মেঘ শুধু উড়ে যায়॥

সুখ

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছু একটা আঁকড়ে ধরে ছিলাম, ছিলাম যখন
অরণ্যহীন বনে
মনে পড়লো হঠাৎ আমি হাওয়ায়
অনেকদিন নজরবন্দী আছি

লক্ষ্মী, তোমার চিঠি পেয়েছি
ভালো লাগলো সুখে আছো জেনে
সুখের মতন ভিজে বুকেই
কান্না এখন মানায়

এই কথাটি গয়ংগচ্ছ, আলোর এবং মায়ার
ভালো আছি, ভালো আছি
আমি কি ভালো নেই?
আমার সুখে ফসল ফলার মতন কিছু ধ্বনি
যাবার যখন যাবেই, তখন চোখ কাঁপানোর মানে?

ভালো লাগলো সুখে আছো জেনে
সুখ জমানো ভিজে বুকে
কান্না ভারি মানায়

ভিখারিণী

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

দিয়েছি তাকে নিয়েছে সব মেটেনি তার ক্ষুধা
সে এক আছে জন্ম ভিখারিণী
দুহাত পেতে রয়েছে আজো, অনির্বচনীয়
চিকুর মেলে সুদূরে নন্দিনী।
প্রথমে তাকে দিয়েছি ঠোঁট—তবুও বলে চাই:
নিবিড়তম পাতা সে অঞ্জলি
তীব্র জিভের আস্বাদন দিয়েছি আমি তাকে
বুকের ভাষা হোলো অন্তর্জলি।
অতঃপর ছিলায় টান ধনুকে জুড়ি শর
দুচোখ আমি উপড়ে তুলে আনি
দিলাম তাকে শ্রবণ দিয়ে বধির হয়ে যাই
বাড়িয়ে তবু সোনালী হাতখানি।
শ্রবণহীন অন্ধতায় ভাষণহীন আমি
সূর্য ফোটে ফুলেরা অবিকল
তখনো তার সম্প্রসার দীর্ঘায়িত হাত:
এবারে দাও আত্মা থেকে জল।

কোথায় তারা কোথায়

সুচেতা মিত্র

তোমাকে ডাকিনি বহুকাল।
ভাঙা দরজার কোণে সেই ভুলে-যাওয়া
এক টুকরো ঝুল: মনে পড়ে না,
তোমাকে মনে পড়ে না।
বিছানায় আলস্যে শোয়া-বসা-গড়িয়ে
নেওয়ার ফাঁকে
আঁকাবাঁকা শিথিল কিছু চিন্তায়
কখনও আস না তুমি—তুমি,
এই সেদিনও আমার পাশে ছিলে, আমার
তপ্ত শোণিতে পাল্লা দিয়ে তোমার ওঠাপড়া
শরীরের ভাঙাচোরা রেখায় তোমার
দীর্ঘায়িত অস্তিত্ব কখন ছিল নিরুদ্বেগে।

কোথায় যায় সেই সব দেহলীন মুহূর্তগুলো?
আমাকে বিশ্বাসঘাতক করে, কোথায়
তারা কোথায়?

পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৮৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এ পত্রের উত্তর যথাস্থানে পাঠিয়ো। আমাকে এরা চিঠি পাঠায়, আমি অন্যমনস্কভাবে পড়ি, জবাব দিতে ভুলি।

পঞ্চভূতের উপদ্রব যথাসময়ে এসে পৌঁছেচে। ঘাড়ের থেকে যথানিয়মে নামাবার চেষ্টায় আছি। আজ বোধ করি সমাধা হবে। অনুবাদ একে যদি বলতেই হয় তবে পরমানুবাদ বললে সংগত হতে পারে।

রাখীর নথীপত্র পৌঁছল। মহুয়া পেয়েছি। আরো কিছু শুদ্ধির কাজ করতে হোলো। সংশোধনের জন্যে ভাবী সংস্করণের জন্যে অপেক্ষা করাই শ্রেয়। ভ্রম স্বীকার করাটা একটা মস্ত ভ্রম।

চাতক চেয়ে থাকে বৃষ্টির জন্যে। আমরা উল্টোচাতক হয়ে চেয়ে আছি বৃষ্টি থামবার জন্যে। সমস্ত মুলতুবি বর্ষণ এক-সঙ্গে সেরে নেবার চেষ্টা তোমার বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের মতো—তাই আকারটা খুব মোটা হয়ে উঠেচে।

হারাসান১ দু তিনবার জ্বরে পড়ে উদ্বিগ্ন করে তুলেচে। তাকে বৌমার ঘরে নামিয়ে এনেছি। মনে কোরো না এই সুযোগে তার উপরে আমার চিকিৎসা চালাচ্ছি। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার বাহন যাঁরা তাঁরাই দেখচেন।

রাণীর আশা করি ভালোই চলচে। পূর্বাপর ওর রক্ত-স্রাবের ধাত। আমার বোধ হয় এটা তারি প্রকোপ- কোনো দুষ্ট রোগের দুর্লক্ষণ নয়। কেননা ব্যামো যদি বাড়ত তাহলে জ্বর কমার অর্থ থাকত না।

এখানকার আসল কাজ ও তার আদর্শ সম্বন্ধে অনেক চিন্তাই মাথায় আসে কিন্তু তার বেশি এগোবে না। হাতে আছে একতারা, তাই নিয়ে বীণার সখ মেটাতে গেলে বারো আনাই উহ্য থেকে যায়। সিদ্ধিদাতা গণেশকেই চেয়েছিলুম তিনি ছিদ্রদাতা ইঁদুরকেই পাঠালেন। একমাত্র তাঁর কলা বউ মান রক্ষা করেচেন। ইতি ৩ কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৮৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

রথীর চিঠি পাঠাই, স্পষ্টই বুঝতে পাচ্চি—শান্তিনিকে-তনের ব্যবস্থা এমন অগাধ জলে আজ পড়ছে যার কিনারা নেই। আমি যদি সম্পূর্ণ একলা ও স্বাধীন হতুম তাহলে নিজের সর্বনাশের শেষ সীমায় ছুট দিতুম—ইতিপূর্বে সেই ভাবেই কাজ করেছি—আজ আর সেদিন নেই। শক্তিও নেই—অন্য দিকে নিজের সাধনারও প্রয়োজন হয়েচে। দোহাই তোমাদের শীঘ্র এসে যা হয় কিছু করে দেও—এস্‌পার হোক বা ওস্‌পার হোক্—এই কীর্তি সম্বন্ধে আমার লেশমাত্র অভিমান নেই। আমার সাধ্যের ত্রুটি করিনি সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা। যে কাজ আমার সাধ্য নয় তাই নিয়েছিলুম, আজ তাই একান্তমনে, যে কাজ আমারই সেই দিকেই সমস্ত শক্তি দিয়ে স্বল্পাবশিষ্ট আয়ু চুকিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে ইচ্ছা করি। তুমি নিশ্চয়ই এসো—বিলম্ব কোরো না। ইতি বৃহস্পতিবার।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৮৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

শান্তিনিকেতনের একটা সাংঘাতিক সঙ্কটের অবস্থা এসেচে। এর থেকে উদ্ধার হবার শক্তি আমাদের আছে কিনা জানিনে। কিন্তু কী করা কর্তব্য অনতিবিলম্বে স্থির না করলে অসাধ্য রকমের জটিলতায় বিপন্ন করবে। কোন ক্লাস কোথায় যাবে, বা কার হাতে কী ভার পড়বে—এ কথাটার আলোচনা তুচ্ছ কিন্তু তার চেয়ে গোড়া ঘেঁষে কি করা যেতে পারে তাই ভাবতে হবে। তুমি নিশ্চয় আগামী শুক্রবারে অপরাহ্নে এসে এই সপ্তাহের মধ্যে একটা চরম মীমাংসায় সহায়তা করবে। জিতেন কিম্বা আর কে এলে ভালো হয় সেও তুমি ঠিক করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এসো। যে বিপুল দায়িত্ব সামনে এসে পড়েচে তাকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কারো নেবার সাধ্য নেই। এমন দিন ছিল যখন মরীয়া হয়ে আমিই নিতুম, তেমন করেই অনেকবার নিয়েচি। এখন সেদিন আর নেই। সমস্ত জিনিসটাকে যদি এই গুরুভারে ডুবিয়ে দেয় তাহলে অন্যায় হবে। কতটা রাখবে কতটা ছাড়বে এখনি তা নির্মম ভাবে স্থির করা চাই। এ সব কথা এখানকার মাস্টারদের সঙ্গে আলোচ্য নয়। আমার সানুনয় অনুরোধ, তুমি বিলম্ব কোরো না। সময় খুবই অল্প—আমাকেও শীঘ্র বেরোতে হবে। এর একটা হেস্তনেস্ত না হলে কোনো কাজে মন দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েচে। এমন করে নিষ্ফল প্রয়াসের মধ্যে নিজের সমস্ত শক্তিকে নিষ্পিষ্ট করার মত ক্ষতি আমার পক্ষে আর নেই। আমাকে এর থেকে মুক্তি দাও। তুমি নিশ্চয় নিশ্চয় এসো। ইতি বুধবার

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

১ রবীন্দ্রনাথের জাপানী সেবিকা

॥ ৮৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার প্রতিলিখন পেয়েছি। ঠিক হয়েছে, কেবল সমাপ্ত হয়নি। আমার মুখের কথা তোমার কলমের মুখে ঠিক বেরিয়েছে, অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

অপূর্বকে তিনখানা চিঠি লিখে একখানাও জবাব পাইনি। তুমি জবাব আদায় করে তোমার পত্রযোগে যদি আমাকে জানাতে পারো তাহলে খুসি হই। ছুটিতে ও কি কোথাও বেড়াতে গেছে? ইতি ১৬ পৌষ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৮৮ ॥

কল্যাণীয়েষু

এরকম ধারায় ছাপানো ভালোই চলবে। বরণডালার পাণ্ডুলিপি এই সঙ্গে পাঠাই। নামটা "রাখী" দিলে চলতে পারে।

"তপতী" রিহার্সাল কাল থেকে মন্দগতিতে চলতে আরম্ভ করেচে। লোক নির্বাচন কবিতার নাম নির্বাচনের চেয়ে সামান্য একটুখানি সহজ। বিক্রম আমি সাজতে সম্মত নই—রথীকে আপাতত টেণ্টেটিভলি ধরা গেছে। অজীন২ এলে তাকে পরখ করে দেখব। নিরুপমা৩ সুমিত্রা কিন্তু আমি বিক্রম না সাজলে হয়ত শেষ মুহূর্তে একটা অনিবার্য বিঘ্ন ঘটিয়ে বসবে। তোমাদের বুলুকে৪ কী মনে করো—বুলুকে সাংঘাতিক দুঃখ না দিয়ে ওকে কি মাসখানেকের জন্যে এখানে পাওয়া সম্ভব? রাণী কেমন? তাঁর দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া আর কি দেখা দিয়েছিল?

জাপান সংঘটিত কতকগুলো ব্যাপারের জন্যে অপূর্বকে অত্যন্ত আবশ্যক ছিল—কিন্তু জানিনে কী গূঢ় কারণে আজকাল তাকে পাওয়া কঠিন হয়েচে। বর্তমান কুয়াশা বেশিদিন টিকবে না। কবে সে খোলসা পাবে আন্দাজ করতে পার? সময় চলে যাচ্চে। জাপানী বন্ধুরা আমাকে কী মনে করচে কে জানে।

॥ ৮৯ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এলমহার্স্টের জাহাজে ঠিকমত জায়গা নেই—তাছাড়া ইটালীয় জাহাজে হয়ত কিছু মুস্কিল ঘটতে পারে। ফরাসী জাহাজ ছাড়বে ২রা মার্চে মাদ্রাজ থেকে। রথীর শরীরে রেলযাত্রা সইবে না। একলাই যেতে হল, সঙ্গী হবে এরিয়ম। আশা করচি বিশেষ ক্ষতি হবে না। কলকাতায় যাব ২৩শে—কলকাতা ছাড়ব ২৮শে। এর মধ্যে হয়তো রাণীর সঙ্গে দেখা হওয়া দুঃসাধ্য হবে না।

প্রথমে শীতের ধাক্কাটা কাটাব দক্ষিণ ফ্রান্সে, তার পরে প্যারিস। তার পরে ইংলণ্ড। তার পরে চাই কি ভিয়েনা ও বুডাপেস্ট—তার পরে কোনো একটা রাস্তা বেয়ে স্বদেশে ফিরব যেখানে প্রতাপাদিত্য জন্মেছিল এবং বর্তমান লেখক।

তোমরাও বেরিয়ে পড় না—গর্মির ছুটি তো সামনেই। ইতি ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৯০ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যাত্রার সময় খুব কাছে এল। সম্ভবত ২৩শে ছাড়তে হবে। এর মধ্যে আমাদের এখানকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যথাকর্তব্য যদি শেষ করে দাও তাহলে নিশ্চিন্তমনে পাড়ি দিতে পারি। লোকের মন যেন চঞ্চল হয়ে আছে এবং উদ্বিগ্ন। আমি দেশে বিদেশে ভিক্ষের ঝুলি ঝুলিয়ে দেহে মনে ক্লান্ত—বিশেষত এখনো তার জের রাখতে হচ্চে,—কারণ আশা দিয়েচে যারা, এখনো তারা চেক্ দেয়নি। কিন্তু ব্যাঙ্কের অতিগ্রহ শোধ হবেই বলে বিশ্বাস করচি। তারপর থেকে আবার ঋণের পথে যাতে সকলে মিলে এঁরা নূতন শোভাযাত্রা না করেন সেজন্যে এঁদের সতর্ক এবং দায়ী করতে হবে। দায়ী করবার সদুপায়, দায় এঁদের নিজের হাতে দেওয়া—অন্তত কিছুকালের জন্যে। যাই হোক সত্বর ব্যবস্থা সমস্যার একটা উপসংহার করে দিয়ো।

এতদিন অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল—আজ থেকে তারি ক্লান্তির পালা। আজ আর কিছুতে গা লাগ্‌চে না। তবুও কাজের চাকা তো থামে না—টেনে নিয়ে চলে। মনের মধ্যে একটা কথাই জাগচে, কবে ছুটি পাব।

রাণী লিখেচে যাবার আগে রাণীর সঙ্গে দেখা হবে। তাহলে খুশি হব। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ক্রমশ)

---

২ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ও শিক্ষিকা নিরুপমা দেবী

৪ বুলা মহলানবিশের স্ত্রী

শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালা দেবী

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

॥ ৪ ॥

হেমন্তবালা দেবীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমার দিদি স্কুল-কলেজে পড়েননি, বেশি লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু তাঁর চিঠি পড়ে তা বোঝা যায় না' এই বলে তিনি তাঁকে দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। সে অনুযায়ী পুত্র বিমলাকান্তকে সঙ্গে নিয়ে হেমন্তবালা দেবী 'বিচিত্রা' হলে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শন করতে গিয়েছিলেন ২৪শে আষাঢ় ১৩৩৮, ৯ জুলাই ১৯৩১ তারিখে। তিনি গিয়েছিলেন গৌরীপুরের গাড়িতে "গৃহকর্তার অগোচরে—তিনি আমাদের মত অবরোধবাসিনী অশিক্ষিতা গ্রাম্যবধূকে এমন জায়গায় আসতে দিতেন কি না মনে সন্দেহ থাকায় তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে আমরা চলে এসেছি, তাই বালিকা কন্যাকে সঙ্গে আনিনি।" (স্মৃতিকথা-১)

রাত তখন প্রায় দশটা। নির্জন পুরীতে একা বসেছিলেন কবিগুরু একটা আরাম কেদারায় আধশোয়া অবস্থায়। পাশে টেবিলের উপরে একগাদা ইংরাজী বাংলা বই। একটা নীল শেডে ঢাকা আলোর রশ্মি পড়েছিল তাঁর উপরে, তা ছাড়া সারা ঘর অন্ধকার। খবর আগেই দেওয়া ছিল। "আমি আগেই নিবেদন করেছিলাম যে, তাঁর অভিজাত ভবনে আমি ধনী বিদগ্ধ জনতার মাঝে গিয়ে দাঁড়াব কেমন করে? আমি যে দীনা! আশ্বাস পেয়েছিলাম, বড়োমানুষির কোনোরকম চিহ্ন থাকবে না সেখানে বা কোনোরকম আশঙ্কা।" (স্মৃতিকথা-১)

হেমন্তবালা দেবীর মুখ ছিল বড় ঘোমটাতে ঢাকা, ঘরও ছিল প্রায় অন্ধকার। "আমি আবার স্বল্পদৃষ্টি বিশিষ্টা। চোখে না দেখিয়া প্রথম প্রণাম করিতে গিয়াই এক কাণ্ড করিয়া বসিলাম। উঁহার বাম পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিতে কপালটা সজোরে ঠুকিয়া গেল এবং খানিকটা সিন্দুরে পায়ের আঙুলের উপরে ঝরিয়া পড়িল। নানা দিক থেকে এই সূচনা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করিতেছিল। মনটা খারাপ হইয়া গেল। সিন্দুরটা আঁচল দিয়া মুছিতে চেষ্টা করিলাম।" (স্মৃতিকথা-৫) "তিনি অতি মৃদু স্বরে সম্ভাষণ করছিলেন। আমার দৃষ্টিশক্তি যেমন ক্ষীণ, শ্রবণশক্তিও তাই, আমি তাঁর কোল ঘেঁষে বসতে বাধ্য হলাম, তা না হলে কিছুই শুনতে পাই না। তিনি প্রথমেই বললেন, তুমি ভালো আছ ত? আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। তারপর আমার ছেলেকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি বললেন, আমি মুখ দেখেই চিনেছি। ছেলে দাঁড়িয়েছিল, তাকে বসতে বললেন।" (স্মৃতিকথা-১) পুত্র বিমলাকান্তকে অবশ্য পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না, কারণ তিনি অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাবলী যা মুদ্রিত হয়েছে, তার প্রথম চিঠি ১৯২৭ সালে লিখিত হয়েছিল। কন্যা বাসন্তীকে কেন সঙ্গে আনেননি। এবং তার কথা সব খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন হেমন্তবালা দেবীকে। তাঁর লেখায় সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের প্রাচুর্য রবীন্দ্রনাথকে বিস্মিত করেছিল একথা সেদিন তিনি বলেছিলেন। আরো অনেক কিছুই বলেছিলেন, সব মনে ধরে রাখতে পারেন নি হেমন্তবালা দেবী। কথায় কথায় তিনি জপ করে থাকেন শুনে স্মিতহাস্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমিও জপ করি। বলে অতি বিশুদ্ধ উচ্চারণে যে বেদমন্ত্র তিনি আবৃত্তি করেছিলেন, তাতে হেমন্তবালা দেবীর মনে হয়েছিল, "আমি যেন সেই পৌরাণিক যুগের ঋষিকুলপতির মুখের মন্ত্রপাঠ শুনছি। তাঁকে প্রণাম করে মনে হয়েছিল, তীর্থস্নান করে উঠেছি। এখন মনে হল, আমি সেই বৈদিক যুগের একজন মহর্ষির চরণপ্রান্তে এসে বসেছি।" (স্মৃতিকথা-১)

এইভাবে যাঁকে ভাবতেন আভিজাত্যের তুঙ্গশীর্ষে অধিষ্ঠিত, সাধারণের অনধিগম্য—নিরাকারবাদী ও ধর্মাচরণে বিরুদ্ধবাদী মনে করে যাঁর সম্বন্ধে কতকটা বিতৃষ্ণাবোধ পোষণ করেছিলেন এতদিন, যিনি ছিলেন অন্য জগতের দূরের মানুষ, সেই রবীন্দ্রনাথেরই কাছে জীবনের তরঙ্গাভিঘাতে

একদিন এসে পড়লেন হেমন্তবালা দেবী, শুধু বাস্তবজীবনে নয়, অন্তরের উপলব্ধিতেও।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ছিলেন হেমন্তবালা দেবীর কোনো এক দূর সম্পর্কের মাসীমা, সেই সূবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পাতালেন ঠাকুর্দা-নাতনী সম্পর্ক। হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত চিঠিগুলোতে রবীন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেছেন দাদা বলে। এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ যখনই কলকাতায় আসতেন, হেমন্তবালা দেবী সুযোগ সুবিধামত সর্বদাই তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করতেন। সেই সুযোগ রবীন্দ্রনাথই করে দিতেন। হেমন্তবালা দেবীর শ্বশুরবাড়ির অন্দরে (পিত্রালয়েও) ছিল প্রাচীনপন্থী হিন্দু পরিবারের সনাতনী নিষ্ঠাচার ও গোঁড়ামি, বৌ-ঝিদের স্কুল কলেজে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং পর্দাপ্রথার রেওয়াজ। এইসব কারণে অপরিচিত লোকজনের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দেখা করা হেমন্তবালা দেবীর পক্ষে কঠিন ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ এমন ব্যবস্থা করতেন যাতে নিরিবিলিতে হেমন্তবালা দেবী তাঁর কাছে গিয়ে অসংকোচে কথাবার্তা বলতে পারেন। তিনি কলকাতায় এসে যখন যেখানে থাকতেন—জোড়াসাঁকোতে, বরানগরে শশিপদ ভিলায়, মহলানবিশদের বাড়িতে, খড়দহ শ্যামসুন্দর ঘাটের বাড়িতে, সেখানেই হেমন্তবালা দেবী যে কোনো উপায়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। শান্তিনিকেতনে যাওয়া তাঁর পক্ষে কখনো সম্ভবপর হয় নি। প্রথম প্রথম তিনি স্বামীর অজ্ঞাতে গোপনেই যেতেন, তারপর কবিগুরুর কাছে গতিবিধি যখন আর অপ্রকাশ রইলো না, তখন রীতিমত বাড়ির গাড়ি করেই পুত্রকন্যা পুত্রবধূ জামাতাদের সঙ্গে গেছেন, কেউ কোনো আপত্তি করেননি। হেমন্তবালা দেবী যেভাবে অগ্রণী হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করেছিলেন, তখনকার কথা বলা শক্ত, কিন্তু পরে আপত্তি করার কোনো কারণ ছিল না। পুরীর আশ্রম সম্পর্কেই ছিল ব্রজেন্দ্রকান্তের যত আক্রোশ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর কোনো বিরুদ্ধভাব থাকার হেতু ছিল না, তিনি রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ভক্তই ছিলেন। এই ব্যাপারটা যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে, সেই সময় হেমন্তবালা দেবী একবার স্বামীকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রকান্ত কিন্তু একেবারে বেঁকে বসেছিলেন, বলেছিলেন, আমি কি 'লেডি ডাক্তারের স্বামীর' মত পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হব তাঁর কাছে? যানও নি তিনি কোনোদিন জীবনে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর যাতায়াত নিয়ে ঘোরতর আপত্তি উঠেছিল পুরীর আশ্রম থেকে। "এই উপলক্ষে কিছু মনোমালিন্যও ঘটেছিল এবং ফলে সেখানকার সকলের সঙ্গে প্রায় অর্ধ-বিচ্ছেদই ঘটেছিল। আমার জননী এবং ভগিনী এই ব্যাপারে মর্মাহত হয়েছিলেন, কেননা, আমাদের শ্রীগুরুস্থান রক্ষণশীল, আমার স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং নিজ গণ্ডির বাইরে পদার্পণ তাঁরা ভালো চক্ষে দেখেননি। আমার জননী ত চিরদিনই অবরোধবাসিনী, ভগ্নীও তদ্রূপ ছিলেন অর্থাৎ নিতান্ত আবশ্যকস্থলে তাঁকে বাড়ির বাইরে ইদানীং যাতায়াত করতে হলেও অপ্রয়োজনে তিনি কোথাও কখনোই যেতেন না। কাজেই আমাকে তাঁরা সহজে ক্ষমা করতে পারেন নি। কবিগুরুর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডির সীমা অতিক্রম করে অনির্বচনীয়তা লাভ করেছিল।" (পুরনো দিনের কথা)

প্রসঙ্গত ভগ্নী বসন্তবালার বিয়ে হয়েছিল ১৯০৭ সালে ভিতরবন্দের ছোট তরফের জমিদার ধীরেন্দ্রকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে, তিনি বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ছিলেন। বসন্তবালা দেবী ৫৭ বছর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান ১৯৫৫ সালে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর পত্রালাপের সূচনা একটা দুঃসাহসিক কাজ হয়েছিল সন্দেহ নেই। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম মাত্র শুনেছেন, তাঁর গুটিকয়েক বই পড়েই প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেমনতর লোক, ছদ্মনামের আড়ালে অজ্ঞাত এক অপরিচিত মহিলার চিঠি লেখার ধৃষ্টতাকে তিনি কিভাবে নেবেন, এ সব কথা ভেবে দেখারও চিন্তাবুদ্ধি তখন হেমন্তবালা দেবীর ছিল না। মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে মরিয়া ও দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি কবিগুরুর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজে

বলেছেন—"আমার মনে অনেক অশান্তি জমিয়াছিল। কাহারও কাছে মনের সুখ-দুঃখের কথা উদঘাটন করিবার, কাহারও নিকট হইতে একটু সান্ত্বনার বাণী শুনিবারও প্রয়োজন ছিল।......আমি নাম-ঠিকানা গোপন করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিতাম এবং উত্তরও পাইতাম। এমনি করিয়া আমার অদৃশ্য অপরিচিত এক ভদ্রলোক, এক বিরাট পুরুষকে আমি খেলার পুতুলরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে লইয়াই দিন কাটাইতাম। আমি সারা দিন বসিয়া লিখিতাম, রাত্রি ৩টা পর্যন্তও লিখিয়াছি, তারপর সকলের যখন প্রত্যূষ, আমার তখন ঘুমে চক্ষু জড়াইয়া আসিয়াছে, আমি লিখিতে লিখিতে ঘরের মেঝেতেই শুইয়া কতদিন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। লিখিবারও কোনো বিশেষ একটা বিষয় ছিল না। মনে যখন যাহা আসিত, নির্বিবাদে তাহাই লিখিয়া যাইতাম। 'নিজের কাছ থেকে নিজে পালানো' কাহাকে বলে, তাহা না জানা সত্ত্বেও সেই কাজই আমি করিয়া আসিয়াছি। আমার কল্পিত পুত্তলিকাকে আমি কল্পনাযোগে কখনও আকাশে চড়াইয়াছি, কখনো-বা যা খুশি তাই অনায়াস একটু ভয় না করিয়া অক্লেশে বলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বিশাল দেবতাত্মা হিমালয় যেমন করিয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী-গুলির উৎপাত সহ্য করেন, বিশাল জোব্বার ভিতরে প্রবিষ্ট ক্ষুদ্র পিপীলিকার দংশনের মত আমার লেখাগুলি তিনি সেইভাবে হজম করিয়া গিয়াছেন।" (স্মৃতিকথা-৫)

বাস্তবিক, হেমন্তবালা দেবী তাঁর চিঠিগুলিতে সময়ে সময়ে যত নিন্দা কটূক্তির তিক্ততা বর্ষণ করেছেন রবীন্দ্র-নাথের উপরে, নিজের জীবনের যত তীব্র বিষের জ্বালা ঢেলে দিয়েছেন তাঁর কাছে, নির্বিকার নীলকণ্ঠের মত কবিগুরু শুধু যে তার সমস্তই গ্রহণ ও ধারণ করেছিলেন তাই নয়, অন্তর্যামীর মত নিপীড়িতা নারীর অন্তঃকরণের সত্তাকে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন এইভাবে—

"তোমার সমস্ত প্রকৃতি কথা কয়, ঝরণা যেমন কথা কয় তার সমস্ত ধারাটিকে নিয়ে। আমি বুঝতে পারি আমাকে চিঠি লেখায় তোমার আন্তরিক প্রয়োজন আছে। প্রকাশ করবার আবেগ তোমার মধ্যে আছে, তার উপলক্ষ্য চাই। আমি স্নেহের সঙ্গে শুনছি জেনে তুমি মনের আনন্দে অবাধে কয়ে যাচ্ছ। আমাকে তুমি দেখোনি, স্পষ্ট করে জানো না, সেও একটা সুযোগ। কেন না তোমার শ্রোতাকে তুমি নিজের মনে গড়ে নিয়েচ। তার অনতিস্ফুট পরিচয়ই একটা আবরণ, তার অন্তরালে অসংকোচে আপন মনে কথা বলে যেতে পারো।" (৯ নং চিঠি)

হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেকার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"সেদিন তোমাকে দেখে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল তোমার মুখশ্রী, ভক্তিতে সরস মধুর বাণী আমার মনে রইল।" (২৬নং চিঠি) অর্থাৎ শুধু পত্রালাপে নয়, হেমন্তবালা দেবীর বাক্যালাপেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। এহেন অসামান্যা মহিলা যে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহ আকর্ষণ করবেন, তার আর আশ্চর্য কি! কবিচিত্তে তাঁর এই পরিচয়টাই হল আসল কথা—"যত বড়ো সম্ভ্রান্ত ঘরের দুহিতা বা ঘরণী তিনি হোন, কবির এত সব সেরা পত্র লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর ব্যক্তি-গত পরিচয় নয়" (কবি কথা) অর্থাৎ বংশ-গৌরবের পরিচয় নয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার পরে স্বভাবতই রবীন্দ্র সাহিত্য পড়ার ঝোঁক বাড়লো হেমন্তবালা দেবীর। যতই পড়েন, ততই যেন তিনি নূতন উপলব্ধি নূতন প্রেরণা লাভ করেন জীবনে। তাঁর মনে হয়, "রবীন্দ্র রচনাবলী অধ্যাত্ম পথের সোপান স্বরূপ", মানবতায় পরিপূর্ণতা লাভ যাঁদের কাম্য, তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্ররচনাবলী অবশ্য পাঠ্য। 'শান্তিনিকেতন' ও 'গীতবিতান' গ্রন্থগুলো যেন ধর্মশাস্ত্রেরই প্রতীক। সংগীতকে কেন যে 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদর' বলা হয়, রবীন্দ্রসংগীত যেন তারই আভাস দেয়। এই সব গানের কথা ও সুর এক অপরিচিত এবং সম্পূর্ণ নবীনলোকে পৌঁছে দেয় সমগ্র চৈতন্যকে। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এবং রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্য ও সংগীত হেমন্তবালা দেবীর মানসিক জগতে বিপ্লবের সৃষ্টি করে। ক্রমে ক্রমে তাঁর ক্ষুব্ধ অশান্ত মন জীবনে স্থিরতা লাভের সন্ধান পায়।

হেমন্তবালা দেবী নানা রকম খাবার তৈরি করিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্য গোপনে পাঠিয়ে দিতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, নানা রকম ফলটলও পাঠাতেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁকে বললেন, এত ফল পাঠাও কেন, তার চেয়ে ফুল পেলে আমি খুশি হই। এর পরে তিনি ফলটলের সঙ্গে ফুলও পাঠাতেন। এই কাজে এবং গোপনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে তাঁর এক পিসশাশুড়ি ও জ্যাঠশাশুড়ি তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। গঙ্গা-স্নানে যাবার নাম করে তাঁরা হেমন্তবালা দেবীকে মোটরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন—গঙ্গাস্নানের অছিলা ভিন্ন তখন শ্বশুর-বাড়ির বাইরে যাবার কোনো সুযোগ ছিল না তাঁর। গঙ্গাস্নান হত, দেবালয়াদি দর্শন হত এবং সঙ্গে সঙ্গে জোড়াসাঁকোতেও

যাওয়া হত। তাঁর মনে হত, এও একটি দেবালয়, এখানেও ভগবানের এক বিভূতি প্রকাশিত। এই দেবালয়ে প্রণাম নিবেদন করতে যাওয়ার "সর্বাপেক্ষা কৌতুকের চিত্রটি এই যে, আমার বৃদ্ধা পিসশাশুড়ি ও জ্যাঠশাশুড়ির সঙ্গে তৈলাভিষিক্ত দেহে কলসী-গামছা ইত্যাদি উপকরণ সমেত গঙ্গাস্নানে যাবার প্রাক্কালে মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকো হয়ে গিয়েছি এবং সংবাদ মাত্র না দিয়েও অকস্মাৎ একখানি অর্ধমলিন লাল পেড়ে সাড়ি পরিহিত অবস্থায় তাঁর সম্মুখীন হয়ে তাঁকে চমৎকৃত করেছি।" (পুরনো দিনের কথা)—চমৎকৃত এবং বিব্রত হওয়ারই কথা, কারণ এমন অভিনব বেশভূষায় সজ্জিতা মহিলা দর্শনার্থীর দর্শন লাভ রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় আর কখনো ঘটেছে কিনা জানি না।

গোড়ার দিকে স্বভাবতই কথাবার্তায় হেমন্তবালা দেবীর কিছুটা দ্বিধা সংকোচ ও আড়ষ্টতা থাকত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি স্নেহ-ভাজনদের কাছে সহজ হৃদ্যতার সঙ্গে মিশতেন। কথাবার্তায় আচরণে তাঁদের ভুলিয়ে দিতেন এবং নিজেও ভুলে যেতেন যে, তিনি বিশ্ববরেণ্য কবি, তিনি দুর্লভ মহামানব। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এমন অবস্থা হল যে, তাঁর কাছে এলে হেমন্ত-বালা দেবীর মনেই থাকত না তিনি এক-জন নারী, এক রক্ষণশীল পরিবারের ঘরের কোণের বউ, আর যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তিনিও যেন সমপর্যায়ের বন্ধুস্থানীয় কেউ, কোনো দুরধিগম্য মহৎ ব্যক্তি নন। বলা বাহুল্য, এই সহজ পরিবেশের সৃষ্টি করে সহজভাবে ধরা দিতেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তাইতে হেমন্তবালা দেবী কখন কিভাবে ধীরে ধীরে তাঁর মনকে খুলে ধরেছেন, অন্তরের নানা সমস্যা ও বেদনা-ভারকে নামিয়েছেন এক অনন্য পরম সুহৃদের কাছে, তিনি হয়ত নিজে ও বুঝতেও পারেননি। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের মতামত অসংকোচে বলা একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেল হেমন্তবালা দেবীর পক্ষে, এমন কি তাঁর সঙ্গে কখনো কখনো রীতিমত তর্ক জুড়ে দিতেন তিনি। তর্ক বাঁধত সাধারণত ধর্ম, পুরাণ কথা, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে। হয়ত কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যেতেন, হয়ত কখনো তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন বা তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন মনে পড়াতে হঠাৎ সচেতন ও আড়ষ্ট হয়ে যেতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনো দোষ ধরতেন না বা কিছুই মনে করতেন না। বরং হেমন্তবালা দেবী তর্ক করতে করতে চুপ করে গেলে বলতেন, কি হল গো, হঠাৎ চুপ করে গেলে কেন? আবার বিদায় নিতে গেলেই তিনি সচরাচর আর একটু বসতে অনুরোধ করতেন। জানতেন, ইচ্ছে করলেই সব সময় হেমন্তবালা দেবীর পক্ষে তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভবপর হত না, এর জন্য নিরুপায় গৃহস্থ বধূটিকে অনেক রকম চেষ্টা চরিত্র করে কৌশলের আশ্রয় নিতে হত। হেমন্তবালা দেবী অনুভব করতেন, তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের করুণামিশ্রিত স্নেহের প্রশ্রয় ছিল আর ভাবতেন, "মহাপুরুষরা অদোষদর্শী ও গুণগ্রাহী হয়েই থাকেন।" (স্মৃতিকথা-১)

সে সময় হেমন্তবালা দেবী কোনো রকমে শ্বশুরবাড়ির অজ্ঞাতসারে চুপি চুপি গোপন অভিসারের মত যাতায়াত করতেন জোড়াসাঁকোতে, এই পর্যন্ত। প্রকাশ্য সভায়, অভিনয় বা নৃত্য-আসরে যাওয়া ছিল তাঁর পক্ষে কল্পনার অতীত। তবে ১৯৩১ সালে ঠাকুরবাড়িতে 'নটীর পুজো'র প্রস্তুতি পর্বের সাজ সজ্জা ও 'শাপমোচনে'র মহড়া দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। 'অগ্নিবর্ণ পোশাকে সজ্জিত উপালি'-রবীন্দ্রনাথ ও বীণাহাতে টিম্বাস' সাহেবের শাপমোচনের নাচ তাঁর মনে অপরূপের ছোঁয়া লাগিয়েছিল, স্মৃতি থেকে কখনো তা মুছে যাবার নয়। এই সময়েই মীরাদেবীর সঙ্গে তঁর পরিচয় হয়েছিল, তাঁর আচার আচরণে বড়োমানুষি চালের আভাসমাত্র তিনি পাননি, বরং তাঁর হৃদ্যমধুর ব্যবহারে হেমন্তবালা দেবী মুগ্ধ হয়েছিলেন। মীরা দেবী তাঁকে সঙ্গে করে রিহার্সাল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন শান্তিনিকেতনের অভিনয়ের ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে আসনপিঁড়ি হ'য় কলা পাতায় খিচুড়ি খেতে বসে গেছে, পরিবেশন করছিল মোটা পৈতে গলায় এক বামুন ঠাকুর। মীরা দেবী এঁটো বাঁচিয়ে এবং এঁটো দেখিয়ে সাবধান করে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এসব দেখেশুনে হেমন্তবালা দেবী অবাক হয়ে গিয়ে-ছিলেন। তিনি ভাবতেন, এঁরা সাহেবি-কেতার অভিজাত জমিদার, এঁটো কাঁটার বাছবিচার মানেন না, আর এঁদের সংসার খানসামা বাবুর্চিদেরই পুরো জিম্মায়। তার বদলে বাঙালীসুলভ চালচলন ও সংস্কার মেনে চলার রেওয়াজ দেখে তিনি সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে অতি সহজেই অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে পারলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, তিনি নাকি জন্ম থেকেই ব্রাত্য, সমাজচ্যুত, তাই বাংলাদেশের পল্লীসমাজের একেবারে ভিতরের দিকের ঘনিষ্ঠতর অভিজ্ঞতা তাঁর বেশি নেই। হেমন্তবালা দেবীর কথাবার্তায় বাংলার গ্রাম্য জীবনের একটা অকৃত্রিম পরিচয় তিনি পান। সম্মান ও ভক্তিশ্রদ্ধা অনেকের কাছ থেকেই তিনি পান, কিন্তু হেমন্ত-বালা দেবী যে রকম আপনজনের মত অসংকোচে সহজভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন সেটা তাঁর ভালো লাগে, এই কথা বলতেন রবীন্দ্রনাথ। হেমন্তবালা দেবী চিঠিপত্রে তাঁর 'সামান্য অভিজ্ঞতার কথা, দেশের কাঁথা শিকে আলপনার কথা, বাঁশবেতের কাজ-করা খড়ের কথা এইসব' লিখতেন, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের নানা বর্ণনা' দিতেন। 'এসব কথাকে বাজে কথা বলে রবীন্দ্রনাথ কখনো উপেক্ষা করেন নি, বরং উৎসুক হয়ে আরো জানতে চাইতেন। কোনো কিছুই তুচ্ছ ছিল না তাঁর কাছে।' (স্মৃতিকথা-১) হেমন্তবালা দেবী মনে প্রাণে অনুভব করলেন, নিতান্ত দীন ব্যক্তিকেও তিনি যেন একটা মর্যাদার আসন না দিয়ে পারেন না। 'আমরা শিক্ষা[illegible] জানি না, কতভাবে কত মূঢ়তা [illegible]য়েছি। তিনি অনায়াসে আমাদের উপেক্ষা করতে পারতেন, তা করেন নি। কারণ, তাঁর করুণা ছিল। মানুষকে একটু আনন্দ, একটু শান্তি ও সান্ত্বনা দেওয়া, একটু খুশি করে দেওয়া যেন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। কেন না, মানুষের মধ্যেই তিনি ভগবানের প্রতিবিম্ব দেখতে পেতেন।' (স্মৃতিকথা-১)

হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগের পর তাঁর জীবন-সমস্যার পরিচয় রবীন্দ্র-নাথের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। এই পীড়িত নারীহৃদয়কে তিনি আত্মানুসন্ধান ও আত্মপ্রত্যয়ের পথনির্দেশ করার জন্য সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেছেন। তার জন্য গোড়াতেই প্রয়োজন ছিল উভয়ের মধ্যে এক স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক স্থাপনের। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ধীরে ধীরে সহজ স্বাভাবিকভাবে হেমন্তবালা দেবীকে অন্তরঙ্গগোষ্ঠীর

সামিল করে নিয়েছিলেন। হেমন্তবালা দেবী বলেছেন—'ক্ষুব্ধ অশান্ত মন লইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিলাম। আমি তাঁহার পথের পথিক ছিলাম না, তাঁহার আপনজন বা অন্তরঙ্গ ছিলাম না।...... কোনোদিন উঁহার জন্য আমি ত্যাগ স্বীকার করি নাই। অন্যান্য অনেক সৌভাগ্যবান সৌভাগ্যবতীর মত উঁহার কোনো সেবার কোনো কাজে লাগি নাই। একটু স্নেহ, একটু করুণা, একটু সমবেদনা ও সহানুভূতির স্পর্শ, একটু সৌহার্দ্য, যাহা তখন আমার ক্ষুধিত, পিপাসিত, প্রবঞ্চিত, আর্তচিত্তের কাম্য ছিল, তাহাই তাঁহার কাছে পাইয়াছিলাম। কবিগুরু আমার নিকট হইতে কিছুই পাইবার প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি আশ্রয়চ্যুত নীড়হারা পাখির মত আমার অবস্থা দেখিয়া কিছু দিনের জন্য কিছু আশ্রয় কিছু ভিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার কথায়, তাঁহার পত্রে অনেক সান্ত্বনা, অনেক উপদেশ, অনেক সৎপরামর্শ ছিল। আমি তাহার কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই, তবে একটা দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছি। আগের চেয়ে অনেক দৃঢ় ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার মত ক্ষেত্র পাইয়াছি। নিজেকে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বুঝিয়াছি। অনেকটা নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, অনেকটা আত্মনির্ভর হইতে পারিয়াছি।...... আমার মধ্যে আমার জীবনের যাহা খাদ্য তাহা আমি পাইয়াছি বলিয়াই মনে করি। ঐটুকুই আমার আবশ্যক ছিল।' (স্মৃতিকথা-৩)

শুধু হেমন্তবালা দেবীকে একলা নয়, তাঁর পরিবারবর্গকেও তিনি স্নেহের বন্ধনে আপন করে নিয়েছিলেন। হেমন্তবালা দেবী লিখেছেন—'দেশ কাল পাত্র শিক্ষা ও মতামত, আচার ব্যবহার ধর্মমত ও বয়স—প্রত্যেক বিষয়েই আকাশ পাতাল ব্যবধান ছিল। তবু তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষা কখনো ব্যাহত হয় নাই। বুদ্ধির দোষে কত দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তাহাও সহ্য করিয়াছেন। আমার সন্তানদের কথা ভাবিয়াছেন, আমার কন্যাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিয়াছেন। এত বেশি ব্যবধানের দূরত্ব অক্লেশে, অতিক্রম করিয়া তিনি আমাদের পরিবারের পরমাত্মীয় সমব্যথী দরদী বান্ধব হইয়াছিলেন, কত সময় কথালাপে বিক্ষুব্ধ মনকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।' (চিঠিপত্র নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯-৬০)

এবার হেমন্তবালা দেবীর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কিরকম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল এবং হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কিরূপ সহজ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

(ক্রমশ)
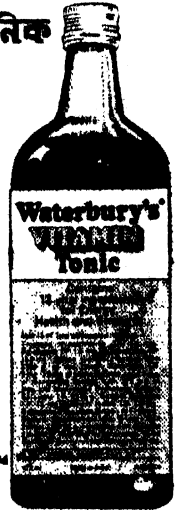
এ কি শুধু কাপড়ের স্মৃতি ?
না, মনে রাখার মত কাপড় !
মনে রাখুন। একমাত্র বিনীর স্থতী
কাপড় এত মজবুত ও টেকসই
যে বহুদিন ধকল সইতে পারে।
বিনী
বিনী—যেমন সৌখীন তেমন টেকসই
BCCM-3: 75 BEN

নৃপেনদের বাড়ি

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

একদম ধানক্ষেত থেকে বাড়ি গেঁথে তুলতে হয়েছিল। নৃপেন বাড়ুজ্যের হাতে টাকা পয়সা ছিল না। ধারধোর করে খেনো জমি কিনেছিল। তাতে ধান ভাল হয় না। জল দাঁড়ায় না। কারণ উঁচু। তাই মন্মথ সরদাররা ও জমি দাঁও বুঝে নৃপেনকেই বেচে দিয়েছিল। একদম শহুরে ভূত। গাঁয়ের তো কিছু বোঝে না। জল ভর্তি খাল, আকাশ ভর্তি মেঘ দেখলে কেবলি বলে, কি সুন্দর, কি সুন্দর।

বাজ পড়লে গাছের কি হয়—কিংবা জোঁকও তো তেমন দেখেনি কখনো শহরে!

আবার বাড়িও ভাল হয় না সেখানে। কারণ নিচু। তাই অল্প পয়সার লোক—নৃপেন একটু একটু করে বাড়িটা তুলেছিল। সিমেন্ট কিনতে গিয়ে দেখল, ভীষণ দাম। বালিও তাই। ইটের তো কথাই নেই।

তখন গাঁয়ের লোকেরা তাকে বলল, বাবু তুমি ইট কাটো।

ইট কাটো মানে যে ইট বানানো—সেই প্রথম তা জানল নৃপেন। তখন তার বয়স বত্রিশ তেত্রিশ। খুব ইচ্ছে—নিজের একখানা বাড়ি হয়। কিন্তু হাতে তেমন টাকা কোথায়?

গাঁয়ের চাষীরা বর্ষায় ধান চাষ করে। শীতে খাল ছেঁচে মাছ ধরে সংসার চালায়। কেনা কাটার মধ্যে বাজারে গিয়ে তারা মাঝে মাঝে সরষের তেল কেনে। এই অ্যাতোটুকু হোমিওপ্যাথির শিশিতে। রান্নার সময় আঙুলে মাখিয়ে কড়াইয়ে ছিটিয়ে দেয় শুধু। বৈশাখ মাসভোর সারারাত ধরে পঞ্চাননতলায় হরির নাম গায়। রাম রাম হরে হরে। হরে হরে রাম রাম।

তারাই বলল, কয়লা কেন সস্তায়। তাই দিয়ে লাথগঞ্জের ইট বানিয়ে নাও। লাথগঞ্জ কেন? কারণ, আর কিছুই না মাটি কেটে জল দিয়ে মেখে নিতে হয়। তারপর পা দিয়ে লাথি মেরে সেই মাথা মাটিকে মাখন করে নিতে হয়। সেই মাথা মাটি কাঠের ছাঁচে ঢুকিয়ে কাঁচা ইঁট বের করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া চাই।

শুকনো কাঁচা ইটগুলো নৃপেন চাষীদের সঙ্গে ধরাধরি করে কয়লা দিয়ে পাঁজা করে সাজালো একদিন। তারপর আগুন দিল। মাসখানেক ধরে সেই ইট পাঁজার ভেতর ধিকি ধিকি জ্বলল। একবার একটু ফাঁক করে দেখে নিল নৃপেন। আগুনে পুড়ে লাল টক টক করছে।

তারপর মাসেকের মাথায় সেই পাঁজা খোলা হল। খুলতেও সময় লাগে। সবচেয়ে ভাল পোড়া ইট এক নম্বর। সেগুলো থাক দিয়ে সাজানো হল। তারপর কিছু নিরেস—দু নম্বর। এইভাবে তিন নম্বর অব্দি সাজানোর পর জায়গাগুলো টাল দেওয়া হল। এই পৃথিবীরই নরম গা থেকে কেমন শক্ত জিনিস বানিয়ে তার নাম রাখা হল—ইট। যা দিয়ে কিনা বাড়ি হয়, রাস্তা হয়, ব্রিজ হয়, দেওয়াল হয়।

পাঁজার পোড়া কয়লার ছাই খুব দামি জিনিস। সেই ছাইয়ের সঙ্গে চুন মিশিয়ে বাড়ির মশলা হল। চাষীরা বলল, নৃপেনবাবু, এই তোমার সিমেন্ট বালি। এবার তুমি বাড়ি গাঁথো। যত্ন করে গাঁথো। গাঁথো ভাই। পাথরের মত শক্ত বাড়ি উঠে গেল। একটু একটু করে। ছাদ ঢালাই হল। চারদিকে ধুধু ধানক্ষেত। মাঠ ভেঙে বৃষ্টি তেড়ে এলে বৃষ্টির সামনের পা বাড়ার আগে দেখতে পায় নৃপেন। তার বাড়ি পার হয়ে তবে বৃষ্টিকে স্টেশনে যেতে হয়।

দিনের বেলা কাঠফাটা রোদে নৃপেনের সাদা রঙের একতলা বাড়িটা একা একা পোড়ে। জ্যোৎস্না রাতে তার বাড়িটাই একা একা চাঁদের আলোয় স্নান করে। বাড়িটার ছাব্বিশটা দরজা জানলা। বাহান্নটা ছিটকিনি। সব পেতলের। জং ধরার ভয় নেই। একখানা করে ইট বিছিয়ে তারপর স্টোনচিপের গুঁড়ো আর পাতলা সিমেন্ট জল দিয়ে মেঝে হল।

বাড়িতে নৃপেন তার বউ আর দুই ছেলেকে নিয়ে গৃহপ্রবেশ করল। গেটে একটা কৃষ্ণচূড়ার চারা বসিয়ে দিল।

দেখতে দেখতে দু বছরের মাথায় নৃপেনদের বাড়ির সামনের কৃষ্ণচূড়ায় ফুল এল। লাল রঙের। পুকুর কেটে নৃপেন বাড়ির ভিত সেই মাটিতে ভরাট করেছিল। সে পুকুরে বর্ষায় ফেলা চারা মাছগুলো একটু বড় হয়েছে। পুকুরে নামলেই ঠোকরায়। তাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চান করা যায় না। নেচে নেচে চান করতে হয়। নইলে মাছগুলো ভীষণ ঠোকরায়। ওরা এখনো বড় হয়নি। মানুষের নিয়মকানুন তাই জানে না। নইলে এত সাহস পায় কোত্থেকে।

বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে, গাছের সঙ্গে সঙ্গে, মাছের সঙ্গে সঙ্গে—নৃপেনের দুই ছেলে—সনৎ আর বিমলও বড় হয়ে গেল। তখন ওদের দুজনকে স্কুলে দিতে হবে।

এদিকে নৃপেনের বউ বেলা সারাদিন কাপড় কাচে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, রান্না করে, ঘর মোছে, গাছ লাগায়, বোগেনভেলিয়ার বাড়তি ডালপালা লম্বা কাঁচি দিয়ে ছাঁটে, চুল বাঁধে, টিপ পরে, খোঁপা করে, কাজল টানে। সময়ই পায় না। নৃপেনেরও সময় কম। ট্রেনে করে কলকাতায় চাকরি করে আসে। ফিরে এসে নিজের বাড়ির নিজের বারান্দায় খালি গা হয়ে বসে আরাম করে। কখনো শুয়ে পড়ে। কখনো দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো হাঁটে। একদম নিজের জায়গা তো। তাই।

তারপর একদিন ইলেকট্রিকও এল সে বাড়িতে। আলো জ্বালানো সন্ধ্যায় তার বাড়িটাকে নৃপেন এক এক সময় নির্জন অন্ধকার মাঠের ভেতর স্টিমারের ডেক বলে ভাবে। অন্ধকার নদীতে বেশ সুন্দর ভেসে আছে।

বাড়ি যত পুরনো হতে লাগল—নৃপেন তার বাড়িটাকে তত ভালবাসতে লাগল। বেলাও বাড়িটাকে ভালবাসতে লাগল। দেওয়ালে ছবি টাঙালো। দরজায় লোহার পাপোস। বাইরে থেকে কাদা পায়ে এসে পা ঘসে নিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে। বাড়ির ছাদে ত্রিশূল বসালো। বাজ আটকানোর জন্যে।

সনৎ সেভেন। বিমল থ্রি। ওরা ট্রেনে করে কলকাতায় পড়তে যায়। শীতকালে ফিরতে সেই সন্ধ্যে। তখন বাড়ি ফিরে সনৎ বিমলদের তো মনে হয়—বাড়িটা তাদের একদম নতুন আলু সেদ্ধর মত মিষ্টি। ভেতরটা এত গরম। কোন শীত ঢুকতে পায় না। দরজা জানলা বন্ধ করে দিলে সারা মাঠের বৃষ্টি বাতাস শুধু বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গর্জায়। ভেতরে ঢুকতে পারে না একদম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চোখে পড়ে সামনের চওড়া খালের সাদা জল। লাল কৃষ্ণচূড়া ফুল। সবুজ ঘাস। নীল আকাশ। বেটে পেঁপে গাছে কালো দোয়েল। লাল সুরকির রাস্তা। এই সারা ছবিটা নৃপেনের মাথার ভেতর সারাদিনের জন্যে গেঁথে থাকে। যেখানেই যায়—ছবিটা মনে থাকে।

ওরা একটা গরু পুষে তার নাম রাখল উমা। সে এ-বেলা ও-বেলা করে দুধ দেয় দশ সের। নৃপেন অফিস থেকে ফিরলে, সনৎ-বিমল স্কুল থেকে ফিরলে উমা কান লটপট করে ওদের স্বাগতম জানায়। ওর ভাষা সনৎ বিমল বুঝতে পারে। এমনভাবে হাম্বা ডাকবে—যার মানে, গোবর চোনা সরিয়ে দাও—শুতে পারছি না। তখনই ওরা দু ভাই ঝাঁটা নিয়ে গিয়ে গোয়াল পরিষ্কার করে দেয়—তবে উমা শোয়। শীত করলে ডাকে। তখন গিয়ে ওরা চারখানা সেলাই করা বস্তা ওর পিঠে চড়িয়ে দিয়ে আসে। তবে উমার কাঁপুনি কমে। উমাকে ওরা ফি রবিবার পুকুরে নামিয়ে চান করায়। দুধ দেয় ঘন ক্ষীরের মত। তাতে জল মিশিয়ে না খেলে লিভার জখম হয়ে যাবে। এত গাঢ়।

এসব নিয়ে ওদের বাড়িটা ওদের কাছে আরও মিষ্টি হয়ে গেল।

কিন্তু মুশকিল বাধলো পড়াশুনো নিয়ে।

সারাদিন চাষীরা আসে নৃপেনের কাছে। নৃপেন এখন আধা চাষী। ধান, গম, বেগুন, কুমড়ো কী করে চাষ করে—তার সব জানে নৃপেন। তাই নিয়েই মেতে থাকে। বীজ আনে। সার আনে। বিষ আনে। চাষীরা তাকে ভালবাসে। বেলা ঠাট্টা করে ডাকে—নেপেন চাষী। এখানে অনেক তাকে নেপেনবাবু তুমি বলে ডাকে। নৃপেন মুখে আসে না তাদের। ওদেরই ভিড়ে বাড়িতে পড়াশুনো উঠে গেল। তারপর ঘণ্টা তিনেক যায় ট্রেনে। ঘুম আছে। খাওয়া দাওয়া স্নান আছে। পড়াশুনোর সময় পায় না সনৎ বিমল।

ওরা দুজনই ফেল করল।

নৃপেন বলল, ছেলেরাই আমার

ভবিষ্যৎ। ওরা ফেল দিলে বাড়ি নিয়ে আমার কি হবে?

বাড়িতে তালাচাবি দিয়ে নৃপেন কলকাতায় বাসা ভাড়া করে চলে এল। বাড়ি টেঁকে না। তবু তাদের থাকতে হয়। তার পড়ে থাকল মাঠের ভেতর। কলকাতায় মন দুজন ভবিষ্যৎ কলকাতায় পড়াশুনো করে যে।

বৃষ্টি হলে বাড়ির কথা মনে পড়ে। বাড়িটা একা একা মাঠের ভেতর ভিজছে। একদিন খবর পেল, পাড়ায় গরু চরানীর রাখলরা নতুন খোলা বারান্দা কেটে কেটে এক্কা দোক্কা খেলার কোর্ট করেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটার ডাল ভেঙে পড়েছে। আরেকদিন খবর পেল—নির্জন খালধারের লাইটপোস্ট থেকে চোর এসে তার কেটে নিয়ে গেছে।

একদিন দুপুরে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে নৃপেন নিজের বাড়িতে গেল। রাখালরা তখন তার বাড়ির বারান্দায় নতুন কাটা কোর্টে এক্কাদোক্কা খেলছিল। চারদিক ফাঁকা। শুধু কিছু গরু চরে বেড়াচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া গাছটা এখন দোতলা সমান উঁচু। বাড়িটা একা একা রোদে পুড়ে যাচ্ছে। পুকুর টোকা পানায় বোঝাই। নৃপেনের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল।

রাখালদের সে কিছু বলল না। থাক। ওরা খেলুক। খেলে খেলে বাড়িটা সরগরম করে রাখুক। উমাকে খালের ওপারে গোষ্ঠদের কাছে গাভিন অবস্থায় বেচে দিয়েছিল। খালের ওপারেই গাছতলায় গোষ্ঠদের গোয়াল। এই দু বছরে উমার সেই বাচ্চা বড়সড় হয়েছে। গোয়ালের বাইরে এসে সে বর্ষার নতুন জালি ঘাস মসমস করে খাচ্ছে। উমা গোয়ালের বাইরে মুখ বাড়িয়ে বসেছিল। নৃপেনকে দেখে চিনতে পারল। কান লটপট করে স্বাগতম জানাল। এমন করে হাম্বা ডাকল—নৃপেন বুঝল, তাকে বলছে—নেপেনবাবু। ও নেপেনবাবু। অনেকদিন দেখি না। কেমন আছো গো। উমার দুধ রোজ সাত সের করে স্টেশনের চায়ের দোকানে নৃপেন বেচে দিয়ে আসতো। তখন দুধের সের ছিল দু টাকা। উমা মাসে গড়ে খেত তিরিশ সের। খোল আধ মণ। এখন আর সব মনে নেই নৃপেনের।

পথেও অনেক বলল, কেমন আছো গো নেপেনবাবু? কবে দেশে ফিরবে?

বাচ্চা দুটো আরেকটু বড় হোক। তখন ফিরে আসব। এটাই তো আমার দেশ। যে লাল বারান্দায় রাখালরা খেলছিল—ওখানে একবার তার গড়াগড়ি দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু কলকাতা বড় মায়াবী। তার অনেক ফাঁদ আছে। বাড়ি থেকে বেরোলেই হরেক সুবিধা। কথা কওয়ার বন্ধু, সিনেমা দেখার ছবিঘর, চা খাওয়ার দোকান, দূরে চলে যাওয়ার বাস, ট্রাম, মিনিবাস। এসব সে কোথায় পাবে তার বাড়ির দেশে।

তার ভবিষ্যৎ দুজনের পড়াশুনোও একটু একটু ভাল হতে শুরু করেছে। এখন আর ট্রেনে করে স্কুলে যেতে হয় না বলে ঘণ্টা তিনেক বাঁচে ওদের। অফিস ফেরত নৃপেনকে আর শেয়ালদা গিয়ে প্যাচপেচে কাদায় ট্রেনের জন্যে দাঁড়াতে হয় না।

তবু এক একদিন মনে হয়—ফাঁকা গোয়ালটা জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। তার চালে দাঁড়াশ সাপ বাতাসে জিভ তুলে তুলে গন্ধ শুঁকছে। পাখির ডিমের খোঁজে ওরা যেখানে সেখানে উঠে বসে। বড় লোভী।

পুকুরে টোকা পানার নিচে মাছগুলো বোধ হয় আর নেই। থাকলে তারা এতদিনে বড়সড় হয়েছে। গভীর রাতে ওপরে উঠে পানার ভেতর হয়তো লেজের ঘাই মারে বড় বড়। ঘুমের মধ্যে নৃপেনের মাথার ভেতর সেই আওয়াজ এসে ধাক্কা মারে—ঘাপাং।

অফিসের বন্ধুরা বলে, কি হে! মাছ বড় হল?

নৃপেন আন্দাজে বলে, তা তিন চার সেরি রুই তো আছেই।

দুধ কতটা হয়?

আগেকার অভ্যেসে নৃপেন বলে, তা দশ সের মত। চার মাস গাভিন থাকে। তখন উমা দুধ দেয় না। মনে মনে বলে, গাভিন থাকার সময় গোষ্ঠরা উমাকে লাউয়ের পায়েস খাওয়ায় তো? জাউ ভাত দেয় তো?

ধান বেচলে কত টাকার?

বছর বিশ বাইশ হাজার টাকার মত হয়।

হাল না ট্রাক্টর?

কালাদের বোকামি কি করে! ট্রাক্টর হলেই কি ধান বেশি হয়। বড় স্বপ্ন ছিল, মাঝমাঠে বড় জোলের হাল নিয়ে নিজে কাদা করে নিজের হাতে অন্তত এক বিঘে রুয়ে দেখবে। চাষীরা জন খেটে তার জমি রুয়ে দিয়েছে। কিন্তু নৃপেনের মনমত কাদা কোনদিন তারা করতে পারেনি।

একদিন মাঝরাতে কলকাতার বাসাবাড়িতে তার মাথার কাছের জানলা দিয়ে তিন ফুট চওড়া একখানা জ্যোৎস্না মশারির ভেতর চলে এল। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে নৃপেনের ঘুম ভেঙে গেল। বউ বেলারা এক-কাতে শোয়। তার মাথা টপকে জ্যোৎস্নার টুকরোটা নৃপেনের বুকে এসে লাফিয়ে পড়েছে। সরে যাওয়ার নাম নেই। বাঁ হাত দিয়ে দুবার মুছে ফেলার চেষ্টা

বসল। জ্যোৎস্নার টুকরোটার সঙ্গে না পেরে নৃপেন উঠে বসল। বড় করে নিশ্বাস ফেলল নৃপেন কলকাতায় তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম পরিষ্কার গলায় বলল, আমার বাড়ি—

আরো অনেক কিছু কথা ছিল গলায়। কিন্তু কিছুই ফুটলো না। কোন সাক্ষী নেই বলে এই দুটো কথা বলতে তার একটুও লজ্জা করেনি। পাছে কেউ জেগে ওঠে—এই লজ্জায় সে আর কিছু বলল না। জ্যোৎস্না দিয়ে সে জানলায় তাকালো। আশ্চর্য! নৃপেনের বাড়িটা নৃপেনদের বাসা বাড়ির জানলার বাইরে এসে একা একা দাঁড়িয়ে আছে। যদি কেউ ভুল করেও দেখে ফেলে।

নৃপেন মশারিসুদ্ধ উঠে দাঁড়াল। পট পট করে চারদিকের দড়ি ছিঁড়ে দিতে মশারিটা খুলে পড়ল। সেই অবস্থায় জানলায় চলে গেল নৃপেন। ধ্যাৎ। মশারিসুদ্ধ কিছু দেখা যায় নাকি। চোখের ওপর থেকে মশারির নেট সরাতে গিয়ে বেলাকে জাগিয়ে দিল। বউ উঠে এসে মশারি সরিয়ে নিতে নৃপেন দেখল—কোথায় কি? সব ভোঁ ভাঁ। বাড়িটা এইমাত্র চলে গেছে।

সিডাক্সের অনেক ব্রোমাইড মিকশ্চার আনা আছে। টেন পারসেন্ট ডাইলিউশন। বেলা তাই খাইয়ে দিল নৃপেনকে। আবার মশারিটা টাঙালো। নৃপেনের দুই ভবিষ্যৎ পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। তারা কিছু টের পেল না।

পরদিন সকালে চাষী হাজরা নস্কর একখানা বড় মানকচু হাতে হাজির হল। নেপেনবাবু। তোমার বাড়ির ভেতর পেল্লায় বড় এক মৌচাক হয়েছে। যাও বাড়ি গিয়ে পূর্ণিমের দিন চাক ভাঙো। তখন ওরা মধু আনতে বেরোয়। সেই ফাঁকে—অনেক মধু হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা অবধি অপেক্ষা না করে নৃপেন সেদিন দুপুরেই আবার বাড়ি গেল। স্টেশনে নেমেই পথ থেকে নেপালকে ধরল। বছর ষোল বয়স নেপালের। নেপালের আরেক নাম ঘড়িচোর। একবার জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার টাইমপিসটা চুরি করে ধরা পড়ে। এখন ট্রেনে করে মাতলা বাজার থেকে চাল এনে ব্যবসা করে।

বলতেই নেপাল রাজি হয়ে গেল। খানিকটা কেরোসিন কেন নেপেনবাবু। লাগবে দেখো।

ক্যাঁচকোঁচ করে সামনের বড় দরজা খুলে ফেলল নৃপেন। মাকড়শার ঝুলে। সামনেই বড় বারান্দা। এখানে নৃপেন অফিস থেকে ফিরে গড়াগড়ি দিত। মুখ ধোবার বেসিনটা ভেঙে পড়েছে। তাতে বোধ হয় পাখির বাসা। একটা কালো পাখি আওয়াজ পেয়েই উড়ে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানলার গ্রিলে জং ধরে গাঁথুনি ফাটিয়ে ফেলেছে। পেতলের ছিটকিনিগুলো এখন কালো। ফাঁকা বাড়ির ভেতর মৌমাছি উড়ছে। খুঁজতে হল না বিশেষ। সামনেই রান্নাঘরের বন্ধ দরজার ওপর থেকে মুশকিল আসানের বড় লম্বা চাপদাড়ির মত তিন হাত প্রমাণ ঝুলে আছে। তেমনি মোটা। সারা গায়ে পুরু করে মৌমাছিরা বসে। বড় সাইজের। নির্জন বাড়িতে। কালো।

কালো চেহারার নেপাল সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে বড় একখানা হাসি হাসলো। অনেক মধু আছে নেপেনবাবু। তুমি এই বাঁশের মাথায় কেরোসিনটুকু দিয়ে আগুন জ্বালো। আমি দেখছি।

কামড়াবে তো। করিস কি নেপাল?

আগুন জ্বালো তো তুমি।

নেপাল একখানা ঝাঁটা জোগাড় করে নৃপেনের হাতে দিয়ে বলল, ঘোরাতে থাকো। নইলে কামড়াবে। বলেই নেপাল নৃপেনের হাত থেকে মশালটা নিল।

চাকের নিচে ধরতেই টুপ টুপ করে মধু খসতে লাগল। আর ফাঁকা বাড়ির ভেতর ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এলোপাথাড়ি উড়তে লাগল। নেপাল আগুনের শিখাটা ঘোরায় আর নিজের গা থেকে মৌমাছি তুলে তুলে মেঝেতে আছড়ে মারে বাঁ হাতে—তারপর পাথুরে গাড়ালি দিয়ে বাঁ পায়ে থেঁতলে মারতে লাগল। [illegible] ফাটা নাক। [illegible] কুড়িয়ে [illegible] মানুষ। অনেক মধু বাবু। [illegible]—

নৃপেন ঝাঁটা ঘোরাচ্ছিল চারদিকে। তবু কি মৌমাছিদের তাড়ানো যায়। দেওয়াল জুড়ে মৌমাছি বসেছে। সেখানে নেপাল মশালের শিখাটা বুলিয়ে নিল। পট্ পট্ পোড়া মৌমাছি ঝরে পড়তে লাগল। যেগুলো আগুনের আওতায় আসেনি সেগুলোকে নৃপেন ঝাঁটাপেটা করে মারলো। দুচারটে তাকেও কামড়ালো।

বাইরে ফাঁকা মাঠ পড়ে আছে। ধানগাছে এবার ফুল আসবে। গাছ গর্ভবতী হবে। খালের ওপারে গোষ্ঠদের গোয়ালে বসে উমা এ সব কিছুই জানে না।

মশালের আগুনে দরজায় কালো দাগ পড়ে গেল। বাকি দুচারটে মৌমাছি তখনো উড়ছিল। তাদের ভ্রূক্ষেপ না করে প্রায় ভালুকের মত সাদা সাদা দাঁতে মুখ এগিয়ে নিয়ে নেপাল হামাগুড়ি অবস্থায় চাকের নিচের দিকে কামড় বসাল। উঃ! কত মধু বাবু!

মশালটা পড়ে পড়ে জ্বলছিল এককোণে। মেঝেতে কালো দাগ পড়ে গেল। মশালটা তুলে নিল নৃপেন। করিস কি নেপাল? করিস কি?

নেপাল খানিকটা চাক ভেঙে নৃপেনের হাতে দিল। তুমিও খাও বাবু। কি মিষ্টি!

ওর। মিষ্টি বলে না। মিষ্টি বলে।

বাড়ির লবিতে নৃপেনের মায়ের ছবি। মৃত্যুর পরে এনলার্জ করার সময় পেছনে মেঘ, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে দিয়েছিল আর্টিস্ট। মশালের আলোয় মুখখানা জ্বল-জ্বল করছে।

নেপাল তখনো ভালুকের মত বসে মুখ ঘিরে চাক চুষে মধু খাচ্ছিল। একবার থেমে নৃপেনকে বলল, বাটি নে এসো।

কোথায় পাব? এই! মেঝেতে গড়িয়ে পড়ছে যে—

পড়বেই তো। বাটি নে এসো।

খুঁজে পেতে একখানা থালা পেল। সেখানা তলায় পেতে চাকখানা [illegible]নের মত চুপসে চেপে ধরল নেপাল। মুহূর্তে থালা বোঝাই। চুমুক দাও বাবু। চুমুক দাও।

চুমুকে শেষ করে নৃপেন আবার থালা পাতল। আবার থালা ভরে গেল। আবার চুমুক দিল।

বুঝলো—এ মধু বাড়ি নিয়ে যাবার মত পাত্র নেই সঙ্গে। রেখে গেলে নেপাল খাবে। নয়ত মেঝেতে গড়াবে।

তখন দুটি ভালুক ভাগাভাগি করে খেতে লাগল। চুষে। চুমুক দিয়ে। গলার ভেতরটা চিনির শিরার চেয়েও মিষ্টি হয়ে গেল। গায়ে তিন চারটে মৌমাছির কামড়ের কথা মনেও পড়ল না নৃপেনের। তখন [illegible]

এক সময় চাক ছেড়ে দিয়ে নেপাল
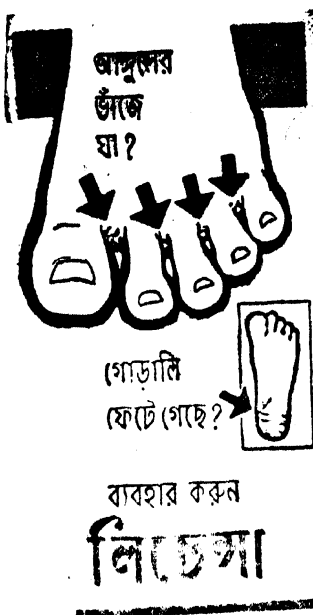
মেঝেতে বসে পড়ল। আর পাচ্ছিনে বাবু গো। তুমি খাও এবারে—

আমি তো খাচ্ছি। তুই খা—

না তুমি খাও। আমার মাথা ঘোরাচ্ছে—

আমারও ঘোরাচ্ছে। বলে নৃপেনের খেয়াল হল—জানলা দিয়ে বাইরে থেকে যে আলোটা এসে পড়েছে—তার নাম জ্যোৎস্না। এ দেশে বলে জ্যোচ্ছনা। এখানে কি আগে আগে চাঁদ ওঠে? হবেও বা! জায়গাটা কলকাতা থেকে পনেরো মাইল এগিয়ে তো।

নেপাল আবার মুখ দিল চাকে। চাকের আর বিশেষ কিছু বাকি ছিল না। ঝুলে খুলে ফাঁপি হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কোষে কোষে মধু। লাইট জেলে দেওয়ায় চাকটার সাইজ এখন আন্দাজ করা যাচ্ছে। লম্বায় আড়াই হাত হবে। কাঁদতে কাঁদতে কিছু মৌমাছি ফিরে আসছিল। নেপাল তাদের হাতের চাপড়েই ফেরত পাঠাতে লাগল আর হাসতে শুরু করে দিল, কি মধুটাই খেলাম বাবু। তোমায় আর টাকা দিতি হবে না। পেট ভরে গেল একদম।

দু টাকার কড়ারে চাক ভাঙতে নেপালকে ডেকে এনেছিল নৃপেন।

ভরপেট খেতে দিলে বাবু। তোমার একটা উবগার করি এবারে। চাকটা নির্মূল করে দি। নইলে আবার এসে জুটবে। বলতে বলতে নেপাল একদম গোড়া থেকে ছেচে চাকখানা তুলে ফেলল।

তারপর মেঝেতে বসে জরাসন্ধ বধের মত লম্বা চাকখানা ধরে চেপে চুপসে শেষ মধুটুকু নিংড়ে থালায় ঢালল। নাও। খেয়ে নাও বাবু।

মাথা ঘোরাচ্ছে রে!

খাও না। কিছু হবে না। প্রমাণ বয়সের মানুষ তুমি।

মাথা ঘোরানির ভেতরেও ষোল সতের বছরের ভুয়োদর্শী নেপালের মুখে নিজের সম্বন্ধে এ কথা শুনে নৃপেনের হাসি এসে যাচ্ছিল। তবু হাসল না। নিয়ম নেই তাই। হাসলে ও পেয়ে বসতে পারে এখন।

শেষ মধুটুকু থালায় চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল নৃপেন। তখন নেপাল নখসুদ্ধ আঙুলে সমস্ত চাকখানা ফেড়ে চিরে তিন টুকরো করে ফেলল। কোথাও যদি কোন মধু থাকে। ফাঁকা বাড়ির লবির দেওয়াল থেকে নৃপেনের মা সব দেখছিলেন। তাঁর মাথার পেছনে আর্টিস্টের আঁকা মেঘ। উল্টো দেওয়ালে একটা ম্যাটমেটে ডুম থেকে সামান্য আলো। জানলা দিয়ে চোরা জ্যোৎস্না।

চিরে ফেলা চাক থেকে একটা ধাড়ি মৌমাছি সোঁ করে বেরিয়ে এসে নেপালের কপালে ঠোকর দিয়েই লবির আকাশে উঠে গেল। ছোট্ট ঘেরা জায়গা। নেপাল বসে ছিল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। বাবাগো! বুড়ি মেম কামড়েছে গো! পালাও বাবু!

কি হল রে নেপাল? কি হল—

কোথায় নেপাল! ও তখন একছুটে খালপাড়ে। খোলা আকাশের নিচে।

লবির ভেতর মধু খাওয়া নৃপেন চাকের রানী মৌমাছিটাকে চিনতে পারল। এখন তার মায়ের ফটোর সামনে উড়ছে। সুইচ টিপে আলোটা নেভানো দরকার। নেপালের ভাষায় বুড়ি মেম গোত্তা খেয়ে নৃপেনের দিকে নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে খোলা দরজা দিয়ে নৃপেন একদম মাঠে। তারপর খালপাড়ে।

উঃ! এতক্ষণে খোলা বাতাসে মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। বুড়ি মেম এত বড় আকাশের নিচে নৃপেনকে খুঁজে পেল না। মেটে জ্যোৎস্নার ভেতর বাতাসের তোড়ে কোনদিকে ভেসে গেল।

নৃপেন তখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

বেলার হাতে বসানো বোগেনভেলিয়ার ঝাড় বারান্দা ঘিরে বাতাসে দুলছে। চাঁদের আলো পেয়ে ছায়াও ফেলেছে। নৃপেন ফাঁকা বাড়ির আলো নিভিয়ে তালা আটকাতে যাচ্ছিল। এমন সময় পরিষ্কার শুনলো তার নাম ধরে কে ডাকছে, নেপেনবাবু। ও নেপেনবাবু।

চারদিক ফিরে তাকাল নৃপেন। কোথাও কেউ নেই। ফাঁকা মাঠের ভেতর বাড়িটা শুধু দাঁড়িয়ে। সামনের দরজা খোলা। আবার শুনতে পেল, ও নেপেনবাবু। নেপেনবাবু—

এবার আর বুঝতে ভুল হল না নৃপেনের। হাঁটার নাম করে মানে মানে দৌড়তেই শুরু করল নৃপেন। পেছনে তার বাড়ির খোলা দরজা। সামনে সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস। তার ভেতর দিয়ে এলোপাথাড়ি হাঁটতে হাঁটতে নৃপেন টের পেল, তার বাড়ি তাকে ডেকে চলেছে, নেপেনবাবু। ও নেপেনবাবু।

মুখের দুর্গন্ধ মস্ত অন্তরায়...

ঘরে বাইরে

জমানা আর জিন্দগী

নবাবজাদী পরীবানু অভ্ররেণু ছড়ানো কালাপেড়ে হাওয়াই শাড়িখানা পরে সকালে সবে স্নান সেরে নাশতাহ্ করছেন। পরীবানুর স্বর্ণাভদেহবর্ণ অভ্রের মতই চিকমিক করছে। টেবিলভরা প্রাতরাশের ব্যবস্থা। সুরুয়া আছে, সানুন আছে, নানাবিধ মুখরোচক মিঠাই আছে। পরীবানু এককালে পরীর মত সুন্দরী ছিলেন। এখন মেদভারে ঈষৎ ক্লান্ত, ঈষৎ বিভ্রান্ত দেখায়। দৃষ্টি উদাস, বিষণ্ণ, অনুরাগ-বিরাগবিহীন।

বিভ্রান্ত দেখাবার কারণটি তাঁর মনের কোথাও লুকিয়ে রয়েছে কি? বেগম-পুরের বড় তরফের লাবুমিয়ার লক্ষ সাধনায় পাওয়া লাডলি কন্যা তিনি। রূপে আলো করা। লাবুমিয়া প্রাণাধিকা কন্যাকে বিষয়-আসয় দিয়েছেন যথেষ্ট। পরীবানু হঠাৎ বাবাকে বলে বসলো, দুআনির রহমৎ চাচার ছেলে পিয়ারাকে সে পিয়ার করে। বয়স তখন পরীবানুর কতই বা আর হবে! চৌদ্দ কি পনেরো বড় জোর। পিয়ারারই বা কতটুকু সে দেখেছে। জুলপি কাটা সুন্দর টুকটুকে ছেলেটা হাসতে খেলতে মাঝে মধ্যে আসে যায়। তাতেই পরীবানুর মন কেড়ে নিয়েছে। লাবু মিঞার কিন্তু মন উঠছিল না। ছেলেটা যেন কেমন কেমন। তবে ঘরে-বরে আভিজাত্যে আত্মীয় স্বজন সায় দিল। সেকালে অমন সোহাগী বলেই পরীবানু মনের কথা প্রকাশ করেছিল। অন্য ঘর হলে ছি ছি হয়ে যেতো। পিয়ারাকে কাজকর্ম করতে হয় না। বেগমপুরের দুআনির মালিকানা তার হাতের কাছে। কাজেই ইয়ার দোস্ত আর পয়সা কিছুই কম নেই।

ঘটা করে বিয়ে হলো। সে কি বান্না-বান্না আর আপ্যায়নের আয়োজন। পরীবানুর মাথায় সোনার ঝাপটা কপালে নেমে এসেছে। স্বচ্ছ সোনালী ওড়না তার উপর। সুরমা টানা নীলনয়নে। বরকনে বসেছে পাশাপাশি। মুখ দেখবে মুকুরে। শুভ-দৃষ্টি। কেউ কারও দিকে চেয়ে দেখবে না। মুকুরের ছায়াতে জীবনসাথীকে নেবে চিনে। সুন্দর প্রথা। প্রথম সলাজ প্রেমের অভিষেক। দুটি তরুণ প্রাণের মাধুরী-সিঞ্চিত বারিতে অজানা রোমাঞ্চকে বরণ। পিয়ারা মিয়াও সুপুরুষ। দুরু দুরু করে উঠলো পরীবানুর বুক।

দর্পণে দর্শন। তারপর হরেক রকম স্ত্রী আচার। পিয়ারা মিঞার মন লাগছিল না। স্বর্ণচাঁপার মত রূপসী পরীবানু পাশে। এই তো বেহেশত, এই তো স্বর্গ। বেহেশতের অবশিষ্টটুকুর জন্য মেয়েরা নবদম্পতিকে রেখে গেলেন দুজনের মধ্যে দুজনকে। পরীবানু এবার পূর্ণ চোখে-চাইল। স্বামী বটে তার। রূপে সুপুরুষ তো বটেই গুণেও কম নয়। ভাল গজল গায়। শতরঞ্চ খেলে এমন যে এ-তল্লাটে তার মত কেউ পারে না। ঘুংঘুড়ি বানিয়ে তো সেবার ব্রিটিশ পল্টনকে ভয় দেখিয়ে দিয়েছিল। বড় লড়াই। ঢাকা শহরে বসে পিয়ারা বানিয়েছে রংবেরঙ্গ ঘুংঘুড়ি। বিরাট। মনের আনন্দে উড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ পল্টনের পেয়াদা এসে হাজির। জাপানীরা নূতন ঈশারা পাঠাচ্ছে। পিয়ারাকে সাহেব নিয়ে গিয়ে নানা প্রশ্ন করলে। পিয়ারা তো হেসেই খুন। সে হাসে আর লালমুখো সাহেব চটেন। ক্রমে সাহেব বুঝলেন ব্যাপারটা। এই গল্প থেকে পরীবানুর পিয়ারার বীরত্বে মুগ্ধ ভাব। কাঁচমনের সব কল্পনার নায়ক হয়ে বসল সে। সাহেবকে কাবু করেছে। সে-কালের কটা বীর পারতো? ধন্য পিয়ারা।

বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতে লাবু মিঞা লক্ষ করেন পরীবানু কেমন যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। সে তেমন আনন্দময়ী মেয়ে আর নেই। লাবু মিঞা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু উত্তর ঠকমত পান না। ক্রমে জানাজানি হলো। কানাকানি হলো যে পিয়ারের প্রাণ বাঁধা আছে শহরের কোন বাঈজীর বাড়ি। বদনাম-মহল্লের কোন অলিগলির কুঠুরিতে তার নিত্য সান্ধ্য আসর। সমাজে সেকালে পয়সা থাকলে যুবাপুরুষ পেশাদারী ফুর্তি কিনবে এ এমন আশ্চর্যের ছিল না। কিন্তু পরীবানু ছিল ভিন্ন মনের মানিনী। তার অপরূপ রূপ, অটুট যৌবন উপেক্ষা করে চলে যাবে তারই বরণ করা স্বামী এ তার আত্মাভিমানে আঘাত হেনেছিল। আর আঘাত হেনেছিল স্নেহময় পিতার বুকে। কন্যাকে কোলে জড়িয়ে বলেছিলেন, পিয়ারার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর। ফিরে এস তোমার শৈশবের লীলাক্ষেত্রে পয়সা-কড়ি যা লাগে সব পাবে। কোন কষ্ট হবে না। রাজার দুলালী তুমি, তোমার অপমান হবে সইতে পারি না যে।

পরীবানু লাবু মিঞার মুখের উপর এমন করে আগে কথা বলেনি। আজ বললো। ওভাবে পিতৃগৃহে এসে থাকলে লোকে ঐ কথাই তো বলবে। বলবে না কি স্বামী পরিত্যক্তা সে! বলবে না মানী মানুষ লাবু মিঞার মান গেল কোথায়? থাক থাক। যেমন আছি তেমন দিন কেটে যাবে। জীবন যাবে নদীর স্রোতের মত বয়ে। কেউ বলবে না পরীবানু পরিত্যক্তা মেয়ে। তার কদর নেই তাই ফিরেছে বাপের ঘরে। আঙুল উঁচিয়ে দেখাবে না

তাকে মেয়ে মহলের আসরে সবাই। পরীবানু তখন মনের আগুন মনে রাখতে শিখবে। বাইরের টীকাটিপ্পনীর চেয়ে যে আব্রু, সে অনেক ভাল। সহ্য করা অনেক অনেক সহজ।

লাল মিঞা অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এত জ্ঞানের কথা ঐ কচি মেয়ে কি করে শিখলো? কে তাকে দিল এ দৃঢ়তা।

দিন যায়। মাস যায়। বছর ঘোরে। পরীবানুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। সন্ধ্যার আসন্ন ঝড়ের মত তার মুখে ঘন অন্ধকার। নবাববাড়ি আসে যায় কিন্তু বেশী দিন থাকে না। শখ করে গয়না কেনে, সাজে নানাভাবে। কিছু কেউ বলে বা পাছে তাই এই ছলনাটুকু। তুলতুলে নরম একটি মেয়ে এসেছে তার কোলে। পরীবানুর মত রূপসী না হলেও সুন্দরী। নাম তার পরীবানু দিয়েছে নূরজাহান। নূরজাহান রূপসী মাত্র ছিলেন না, গুণে গরিমায় ব্যক্তিত্ব ছিলেন অনন্যা। ঠিক সেই রকম হবে পরীবানুর মেয়ে। সেটাই ছিল মায়ের মনের গোপন আশা। লেখাপড়া শিখবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, ভালবাসতে জানবে, আবার শাসন করতে দ্বিধা করবে না। নূরজাহান হলোও তাই। বাপের গলার গজল গান, পরীবানুর রূপ সব মিশে সে আস্তে আস্তে অপরূপা অসামান্যা হয়ে উঠলো। স্কুল কলেজের জলসায়, নানা আসরে নূরজাহান গাইত, বাজাতো, নাচতো অভিনয় করতো। পরীক্ষা দিতো সে মন দিয়া প্রথম পরীবানু ভাবতেন নিজের জীবনের কথা। ব্যর্থ জীবনের স্পর্শ যেন নূরজাহানের ধারে কাছে না আসে—দিনরাত সেই চেষ্টাতেই ছিলেন ব্যস্ত। কিন্তু জিন্দগীর স্বাভাবিক পথ কোথায় যে নূরজাহানকে টেনে নিয়ে যেতে চায়! পরীবানুর প্রথম দৃষ্টি এড়িয়ে সেও ভালবাসে একটি সহপাঠীকে। সহপাঠী আবার সেই পিয়ারার মতই প্রাণবন্ত। তাকে নিয়ে সম্রাজ্ঞীর মত মেয়ে নূরজাহান নিজেকে হারিয়ে ফেলে। কোথায় তার দৃপ্ত তেজ আর কোথায় তার মায়ের সতর্কতা। নূরজাহান নূতন স্বপ্নে বিভোর। বাধা দিলেন পরীবানু। কি হবেই বা বাধা দিয়ে? নিজে হাত ধরে শক্ত হতে শিখিয়েছেন, তাঁকে নরম করবেন কি করে?

নূরজাহানের বিয়ে হ'লো। ধুমধাম ঘটাতে যেন পরীবানুর বিয়ের নূতন সংস্করণ। কিছুদিন পরে আবার সেই কানাকানি। নূরজাহানের মত মেয়ে যাকে বিয়ে করেছে সে কুসংগী আর কু-অভ্যাসের দাস। হায় হায় এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বাজ-পড়া গাছের মত স্তব্ধ হ'য়ে যান পরীবানু। নূরজাহানের মত মেয়ে, একি তার গতি হলো। সে যে ভাবতে পারে না। মনে করেছিল লেখাপড়া শিখে দৃপ্ততেজে তার মেয়ে হবে ভিন্ন। পুরুষের অন্যায় সে সহ্য করবে না।

কিন্তু নূরজাহান? সত্যই সে ভিন্ন। যে বজ্রাঘাতে পরীবানু জ্বলে পড়ে ছাই হয়েছেন, সে বজ্রাঘাত নূরজাহান নিল দমকা ঝোড়ো হাওয়ার মত। ঝড়ের আঘাতে সে নুয়েছিল, কিন্তু আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার তার শক্তির পরীক্ষা। ভালবেসেছিল বলে যে ভেঙে খান খান হবে—পরীবানু সে শিক্ষা দেননি। শিক্ষার এই তো সেরা সম্বল। নূরজাহান অন্যায়কে দূরে ফেলে এগিয়ে যাবে। শুনেছিল পরীবানু তাকে আই এ এস পরীক্ষা দেবার উৎসাহ দিয়েছেন। কাজের পাক ভুলে যাবে সে অতীত। থাকবে এগিয়ে যাবার পদক্ষেপ। পুরুষ বিয়ে করে, ঘর বাঁধে, কিন্তু ঘর বাঁধা ভিন্ন যেমন তার আরও কাজ আছে, নূরজাহান দেখিয়ে দেবে মেয়েদেরও দুনিয়া এখন কেবল অবরুদ্ধতার অশ্রুধারা নয়। তারও দুনিয়া বিস্তীর্ণ, কর্মক্ষেত্র বিশাল।

পরীবানু তৃপ্তিতে আত্মপ্রসাদে ভরে ওঠেন। মনে হয় যেন সমস্ত গ্লানি চুকে গেছে। এখন জিন্দগী নূতন দিশার। নূতন আশার। নূরজাহানের মতই বাঁচতে হবে মেয়েদের। মিলিয়ে দেবার অনাবিল আনন্দের স্রোতে থাকবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি। পরীবানুও পারছেন, সমাজ পারতে দেয়নি।

(সি-৯৫২৫)

টুকিটাকি

কেনাকাটার ব্যাপারে মাছ কেনা একটি আয়ত্ত করার মত ব্যাপার। যে মাছই কিনুন, দামী কিনুন, সস্তা কিনুন, বড় কিনুন, ছোট কিনুন সবার আগে দেখতে হবে মাছ কত টাটকা। টাটকা মাছের গন্ধ ভাল, হাত দিতে দৃঢ় কিন্তু থলথলে নয়। টাটকা মাছের আঁশ চকচকে অথচ ছাড়ানো সহজ। মাছের গায়ের দাগ দেখতে স্পষ্ট ও ঝকঝকে। তাজা মাছের কানকো হবে টুকটুকে লাল। চোখ দুটি কোটরে ঢুকে থাকবে না। স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হবে তাজা মাছের চোখ। টাটকা মাছের গা হবে নালসে হড়হড়ে।

আমাদের অনেকেই পাকা মাছকে ভাল মাছ মনে করি ও পছন্দ করি। কিন্তু সব সময় তা ঠিক নয়। মাঝারি মাছ স্বাদে ভাল, মাছের গঠনে, কাটাতে সুবিধাজনক।

মাছ রান্না ঠিক হলো কিনা বুঝতে হলে ছুরি বা বঁটি দিয়ে চেপে দেখুন। যদি মাছ কাঁটা থেকে ছেড়ে আসতে চায় তবে রান্না তৈরী, অতিরিক্ত সময় আঁচে থাকলে স্বাদ-গন্ধ দু-ই নষ্ট হয়। যাঁরা ছুরি দিয়ে মাছ কাটেন তাঁরা ধারালো ছুরি ব্যবহার করবেন। ছুরি ধরতে নুন মেখে ধরবেন। হাতের 'গ্রীপ' ভাল হবে, দৃঢ় হবে।

যে মাছে আঁশটে গন্ধ বেশী, সে মাছ ঢাকা দিয়ে রান্না করবেন। গন্ধ কম হবে।

যে পাত্রে মাছ রান্না হয়েছে বা খাওয়া হয়েছে, তার বাসনপত্র সব ব্যবহারের পরই নরম কাগজে মুছে নেবেন। বাঙালী বাড়িতে জলের গেলাস থেকে আরম্ভ করে বাসনে মাছের গন্ধ খুব স্বাভাবিক। এভাবেই মুছে নিয়ে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেললে গন্ধ বেশী থাকবে না। যদি থাকে তবে রাইসরষের গুঁড়ো অল্প একটু বাসন-ধোবার জলে ফেলে দেবেন। একেবারে তাজা গন্ধহীন হবে বাসন।

যে মাছ কেটে তুলে রাখবেন তাতে একটু লেবুর রস মেখে রাখবেন। একদিনে বেশী করে কিনে রাখলে সময় এবং ব্যয় দুইই কম হয়। যে ক্ষেত্রে রেফ্রিজারেটর সম্বন্ধে ব্যবহার সম্ভব সে ক্ষেত্রে গৃহিণী এভাবে দু-চার দিনের বাজার করে নিলে অনেক সুবিধা পাবেন। 'ডিপ ফ্রিজ' ব্যবস্থা থাকলে তো কথাই নেই। রান্না, না রান্না সবই অনেক দিন চলে যাবে। তবে আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আবহাওয়ায় বেশীদিন না রাখাই ভাল। স্বাদও তাতে নষ্ট হয়।

শ্রীমতী

আলোচনা

অক্ষয়চন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র

১৯ জুলাই তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত "অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বাংলা ভাষার দুই ভগীরথ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার জানিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগের (কার্তিক ১২৮০—পৌষ ১২৮১) সমালোচক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র নন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার। প্রবন্ধ লেখক, অক্ষয়চন্দ্রের রচনার নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি সমালোচনাও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন।

বঙ্গদর্শনে এই বিভাগের সমালোচনাগুলি কারও নামে প্রকাশিত হত না, বঙ্গদর্শনে অধিকাংশ রচনাতেই লেখকের নাম নেই। এখন প্রশ্ন, 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগের একমাত্র লেখক যে অক্ষয়চন্দ্র ; —বঙ্কিমচন্দ্র বা অপর কেউ নন, তার প্রমাণ কি?

প্রবন্ধকার লিখেছেন, "দ্বিতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা (কার্তিক ১২৮০) থেকেই বঙ্কিম এই বিভাগের দায়িত্ব দিলেন অক্ষয়চন্দ্রকে।" বঙ্কিম অক্ষয়চন্দ্রকে এই বিভাগের দায়িত্ব বিশেষভাবে দিয়েছিলেন, এমন কোনো তথ্য ইতিপূর্বে আমরা পাইনি, বর্তমান প্রবন্ধের মধ্যেও নেই।

প্রবন্ধকার লিখেছেন, "খুব ভেতরের লোক ছাড়া আর তো কেউ জানতেনই না যে বঙ্কিম পুস্তক সমালোচনা দপ্তরটি অক্ষয়চন্দ্রের হাতে দিয়েছেন।" সমগ্র প্রবন্ধের মধ্যে কিন্তু 'খুব ভেতরের লোক' একজনেরও নামের উল্লেখ নেই। বঙ্গদর্শনে সত্যই যাঁরা বঙ্কিমের কাছের লোক ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কি কখনও বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্রের হাতে বঙ্গদর্শনের পুস্তক-সমালোচনার দপ্তরটি তুলে দিয়েছিলেন?

আমাদের হাতে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা থেকে বলা যায় বঙ্কিম অক্ষয়চন্দ্রের হাতে পুস্তক-সমালোচনা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি, বঙ্গদর্শনে ১২৮০-র কার্তিক সংখ্যা থেকে অক্ষয়চন্দ্রও পুস্তক-সমালোচনা বিভাগের অন্যতম লেখক ছিলেন। আমাদের এ-কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ, অক্ষয়চন্দ্রের একটি উক্তি। 'পিতা-পুত্র' শীর্ষক একটি রচনায় তিনি বলেছেন, ১২৮০ সালের কার্তিক সংখ্যা থেকে তিনি প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্রের এ উক্তি থেকে যেমন প্রমাণিত হয় যে তিনিও সমালোচনা বিভাগের একজন লেখক ছিলেন ; তেমনি এ-কথাও কখনই গ্রহণ করা যায় না যে তিনিই এই বিভাগের একমাত্র লেখক ছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র নন বা অপর কেউ নন। ১২৮০ কার্তিক থেকে ১২৮১ পৌষ—এই সময়ের মধ্যে বঙ্গদর্শনে পুস্তক-সমালোচনা বিভাগে পুস্তক ও সাময়িকপত্র মিলিয়ে প্রায় ৭৫টি সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ওই সমালোচনাগুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌টি যথার্থ অক্ষয়চন্দ্রের লেখা এবং কোনগুলি অপরের তা এখন নির্ধারণ করবার উপায় নেই। বঙ্গদর্শনে এই বিভাগে প্রকাশিত কোনো একটি সমালোচনাও অক্ষয়চন্দ্র তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলন করে যাননি। বঙ্গদর্শনে অক্ষয়চন্দ্রের রচনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করেছি 'দেশ' পত্রিকায় "প্রভাতসূর্য বঙ্গদর্শন" প্রবন্ধে এবং "বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন" শীর্ষক গ্রন্থে।

আমাদের মনে হয় বঙ্গদর্শনে পুস্তক-সমালোচনা বিভাগের প্রধান লেখক ছিলেন স্বয়ং সম্পাদক। বঙ্গদর্শনের তৎকালীন পাঠক রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্টই বলেছেন, 'রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।' তা ছাড়া স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিও উদ্ধার করা যায়। নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন বঙ্গদর্শনের অন্যতম নিয়মিত লেখক। তিনি 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখে গেছেন, চার বছর চালানোর পর বঙ্কিম কেন বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ত্যাগ করেন। চতুর্থ বৎসরের পর বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ, এমন সময় নবীন সেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বঙ্কিম তখন নবীনচন্দ্রকে বলেন, 'ইদানীং বঙ্গদর্শনের প্রায় তিন ভাগ লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাজেই আমি আর পারিলাম না। তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়াছি কোনো কোনো গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্যন্ত সংকল্প করিয়াছিল, গালাগালির তো কথাই নাই।' বঙ্কিমের এ উক্তি থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিমই বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ রচনা লিখতেন, বিশেষ করে সমালোচনাগুলি তো বটেই। বঙ্গদর্শনে প্রতি সংখ্যায় কোনো 'সম্পাদকীয়' থাকত না, পত্রিকার বিভাগীয় রচনা ছিল একটিই—সেটি ওই পুস্তক-সমালোচনা বিভাগ। সুতরাং এ বিভাগের দায়িত্ব যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই গ্রহণ করবেন তা বলা বাহুল্য।

বঙ্কিম অক্ষয়চন্দ্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন এ কথা সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, অক্ষয়চন্দ্রের খুব কম রচনাই বঙ্গদর্শনে

প্রাপ্য হয়েছে। প্রবন্ধকার শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্রের রচনা 'উদ্দীপনা প্রকাশিত হয়। এটি অবশ্যই অক্ষয়চন্দ্রের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। কিন্তু এই রচনার দেহে যে বিরাট অস্ত্রোপচার হয় সে সংবাদটিও জানা দরকার। অক্ষয়চন্দ্র নিজেই লিখে গেছেন, 'ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা—নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া আমি উদ্দীপনা প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম।' কিন্তু 'প্রথম সংখ্যায় আমার সেই প্রবন্ধ টিকি কাটিয়া বাহির হলো এবং 'প্রবন্ধের মুখটুকুও দেখা গেল না।' ১২৭৯তে যাঁর রচনা এভাবে প্রকাশিত হলো, ১২৮০তে তাঁর হাতেই সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার সমস্ত দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে কলম বন্ধ করে ব'সে রইলেন—এ কথা কল্পনা করাও রীতিমতো কঠিন।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
শান্তিনিকেতন

গালিবের নারীপ্রেম ও ঈশ্বরচেতনা

গত ১৯শে জুলাই '৭৫-এর দেশ-এ শ্রদ্ধেয় আবু সয়ীদ আইয়ুব রচিত 'গালিবের নারীপ্রেম ও ঈশ্বরচেতনা' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করার সৌভাগ্য হোলো। গালিব সম্পর্কে আইয়ুব এই-বারই প্রথম কিছু একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য উপহার দিলেন আমাদের।

একজন খ্যাতকীর্তি কবির রচনা বিষয়ে পাণ্ডিত্যময় সমীক্ষাপূর্ণ আলোচনা হ'তেই পারে এবং সে সব আলোচনা পাঠক মহলে সাড়া জাগাতেও অবশ্যই অক্ষম নয়। তবু স্বয়ং কবি-র ব্যক্তি জীবন বিষয়ে যখন কোনো সহজ ঘরোয়া আলোচনা দানা বেঁধে ওঠে তখন সাধারণ পাঠক একটু বেশি উৎসাহিত বোধ করেন বৈকি! কারণ, কবির রচনার গুণাগুণ আলোচনার চেয়েও কবির একান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা ও উপাখ্যান বর্ণনের ফলে পাঠক পাঠিকার মানসলোকে কবির মানুষী প্রতীকটি সরাসরি ও প্রত্যক্ষ বিম্বিত হ'য়ে ওঠে, মানুষ-কবি ও মানুষ-পাঠকের মধ্যে তখন গড়ে ওঠে একটি ভিন্ন স্বাদের সখ্যতা।

এবারের প্রবন্ধে আইয়ুব গালিবের ব্যক্তি-জীবনের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছেন দেখে তাই বড়ো ভালো লাগলো। যদিও গালিব সম্পর্কে আইয়ুবের যে ভাবনা ও উপলব্ধি তার সঙ্গে কোনো কোনো অনুভব বিন্দুতে আমি একমত নই।

আইয়ুব বলছেন, গালিবের সময়ে পর্দা প্রথার গভীরতা এবং বিস্তার প্রায় সর্বব্যাপী ছিল এবং অন্ত্যজ শ্রেণী বা আত্মীয় শ্রেণীভুক্তা নারী বাদে অপর নারীরা প্রায় দুর্লভ্য ছিলেন; ফলে তৎকালীন 'শায়র' বা কবি নৃত্য-গীত-শহবৎ-কুশলা 'তবায়ফ'দেরই একমাত্র আলাপচারী সঙ্গিনী হিসেবে পেতেন। অপর প্রান্তে, পর্দা প্রথার নিচ্ছিদ্র ব্যবস্থার ফলেই জন্ম নিয়েছিল পৃথক আর একটি অস্বাভাবিক সম্পর্ক, আইয়ুব যাকে 'সমযোন' সম্পর্ক বলেছেন।

এসব খুবই সত্যি। এবং এটাও ঠিক যে, সেই সময় 'শায়র'-রা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে 'তবায়ফ' অথবা কোনো রূপবান তরুণের কথাই ভাবনায় আনতেন। কিন্তু আইয়ুব যেভাবে জোর দিয়ে বলেছেন যে, 'শায়র'-রা তাঁদের কবিতায় কখনই নারীর স্পষ্ট চিত্রূপ অঙ্কন করতেন না এবং নারী দেহের মোল বর্ণনও তাঁদের রচনায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকতো, একথা এক বাক্যে মেনে নেওয়া বেশ শক্ত।

হ্যাঁ, নারীদেহের বিশেষ বিশেষ অংশের তেমন স্পষ্ট বর্ণন নেই সত্যি, কিন্তু গালিবের কিছু কিছু 'শের' এবং 'গজল'-য়ে এমন অনেক প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে যা অব-ধারিতভাবে নারীসত্তার প্রতিই ইঙ্গিত করে। যেমন—'চিৎওয়ন', 'অদা', গেসু, জুলফে' ইত্যাদি। হ'তে পারে তা 'তবায়ফ'-দের প্রতি উচ্চারিত, আবার এমনও হ'তে পারে যে তা অন্য কোনো নারীর (অন্ত্যজ শ্রেণী-ভুক্তা ও আত্মীয়াদের কথা ছেড়ে দিয়েই বলছি) প্রতি লক্ষ্য রেখে রচিত। গালিবের নিম্নোক্ত 'শের'টি প্রশ্নের আইয়ুব লক্ষ্য করুন :

'নীদ উসকী হ্যায়, দিমাগ উসকা হ্যায়,
রাতেঁ উসকী হ্যাঁয়
তেরী জুলফেঁ জিসকে বাজু পর
পরীশাঁ হো গয়ী'।'

—এখানে এই যে জুলফে' (কেশদাম) শব্দটি তা কিন্তু কখনই কোনো রূপবান তরুণের প্রতি উচ্চারিত হয়নি, হয়েছে কোনো নারীর প্রতিই, এবং এটা জরুরী নয় যে সে নারী 'তবায়ফ'ই। এমনও হতে পারে যে গালিব তা অন্য কোনো নারীর প্রতিই উচ্চারণ করেছেন, কারণ—নিজেই উর্দু চিঠিপত্রের সংকলন 'নামা-এ-গালিব' এবং 'উর্দু-এ-মুআল্লা'-তে গালিব নিজেই তাঁর কিছু ঘনিষ্ঠ নারীবন্ধুর প্রতি নিজের 'অর্জে-নিয়াজে-ইশ্ক' (প্রণয়াকাঙ্ক্ষাজনিত প্রার্থনা)-এর উল্লেখ করেছেন এবং এও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বহুক্ষেত্রেই তাঁর ভাগ্যে 'বিসালে-য়ার' (প্রিয়া মিলন) ঘটেছে। বহু নারীর সঙ্গে গালিবের নিবিড় যোগাযোগের নিদর্শন রয়েছে তাঁর নিজেরই একটি বিখ্যাত 'শের'-এ, যেখানে গালিব নিঃসংকোচিত্তে স্বীকার করছেন :

'চন্দ তসবীরে-বুতাঁ চন্দ হসীনোঁ কে খুতূত
বাদ মরনে কে মেরে ঘর সে ইয়ে সামাঁ নিকলা।'

(অর্থাৎ, আমার মৃত্যুর পর আমার ঘর থেকে যে জিনিসপত্র বেরুবে তা হল সুন্দরীদের কিছু প্রেমপত্র ও ছবি।)

আর একটা ব্যাপারে আমি আইয়ুবের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছি না। গালিবের ঈশ্বরচেতনায় ইঙ্গিত দিতে গিয়ে 'উও আয়ে ঘরমে হমারে খুদা কী কুদরৎ হ্যায়/কভী হম উনকো কভী অপনে ঘরকো দেখতে হ্যায়—' শেরটির উল্লেখ করেছেন আইয়ুব, এবং এখানে উও (অর্থাৎ তিনি) বলতে পরম করুণাময় ঈশ্বরকে বোঝাতে চেয়েছেন।

আমার কিন্তু স্পষ্টতই তা মনে হয় না। এখানে 'উও' কদাপি ঈশ্বর নন, অবধারিত-ভাবেই মানুষ কিংবা মানুষী। কারণ, 'শের' এর প্রথম পংক্তির অন্তিম দিকে বলা হয়েছে 'খুদা কী কুদরৎ হ্যায়' (অর্থাৎ ঈশ্বরের করুণা)। 'শের'টিতে খোদার করুণার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে কারণ খোদার করুণাতেই 'উও আয়ে ঘরমে হমারে।'

আমার মনে হয় আইয়ুব গালিবের নারীপ্রেম ও ঈশ্বরচেতনাকে এখানে কিছুটা গুলিয়ে ফেলেছেন, আমরা যেরকম রবীন্দ্র-নাথের প্রেম ও পূজা পর্বের গান প্রায়শই গুলিয়ে ফেলি।

গালিবের ব্যক্তিজীবনের আর একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করে আইয়ুব ব্যাপারটিকে কিঞ্চিৎ জটিল ক'রে তুলেছেন। তিনি এটি জানাতে ভোলেননি যে গালিব প্রথম জীবনে একটি ডোমনির (আইয়ুবের মতো ভাষাবিদ মানুষও কি 'ডোমনি' শব্দের আর কোনো সুন্দর বিকল্প খুঁজে পাননি!) প্রেমে পড়েন। কিন্তু এই তথ্যটি জানাতে ভুলে গেছেন যে গালিব বিবাহিত ছিলেন। মাত্র তের বছর বয়সে দিল্লীতে নবাব ইলাহী বকশ মারুফ লোহারুর-র কন্যার সঙ্গে গালিবের বিবাহ হয়। এবং এ প্রসঙ্গে যেটা খুবই উল্লেখ করার মতো ব্যাপার তা হল গালিবের স্ত্রী শুধু যে অসাধারণ সুন্দরী ও ফার্সি কবিতার যথার্থ বোদ্ধা ছিলেন তাই নয়, ছিলেন গালিবের হৃদয়েরও খুবই নিকটতমা। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ছিলেন খুবই ধর্মভীরু মহিলা। নিয়ম করে 'নামাজ' ও 'রোজা' পালন করতেন। এবং গালিব সুরা-পানে অভ্যস্ত ছিলেন বলে তিনি নিজের বাসনপত্র সম্পূর্ণ পৃথক রাখতেন। কিন্তু অন্তর্নিহিত ঘটনা হল এই যে নিজের প্রাণ মন সর্বস্ব দিয়ে তিনি গালিবকে ভালোবাসতেন, এবং পক্ষান্তরে গালিবও স্ত্রীর অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন।

গালিবের কোনো কোনো রচনায়, (বিশেষ করে তাঁর গজল এবং চিঠিপত্রে) যে কারণেই হোক এমন কিছু ব্যক্তি

ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে যে অনেকের ধারণা গালিব এবং তাঁর স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক মোটেই সুখের ছিল না। কিন্তু তথ্য সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে।

গালিবের ব্যথা ও দুঃখ-শোকের কারণ ছিল অন্যত্র। পর পর নিজের সাতটি পুত্রের মৃত্যুকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর এই সীমাহীন শোকের তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই করা চলে। রবীন্দ্রনাথকেও একের পর এক বহু প্রিয়জনের মৃত্যু প্রত্যক্ষ ক'রতে হ'য়েছিল। প্রিয়জনের' একের পর এক মৃত্যুতে বিচলিত হ'য়ে গালিব লিখলেন :

'নাকর্দা গুনাহোঁ কো ভী হুসরৎ
কী মিলে দাদ
য়া রব্ অগর ইন কর্দা গুনাহোঁ
কী সজাহ্যায়।'

(অর্থাৎ, হে ঈশ্বর, যখন ক'রে-থাকা পাপের দণ্ড দিচ্ছই তখন সেই সঙ্গে আমার এই দুঃসাহসকেও প্রশংসা কর, কারণ আমি যে না-করা পাপের দণ্ডও গ্রহণ ক'রতে প্রস্তুত।)

রাজেন উপাধ্যায়
বহরমপুর মুর্শিদাবাদ

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ

গত ১৯ জুলাই ১৯৭৫ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় (৪২ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা) শ্রীক্ষুদিরাম দাস 'শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ' নামক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি নির্ধারণের জন্য ভূতত্ত্ববিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও মধ্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে পুনরায় বৈজ্ঞানিক প্রয়াসে সচেষ্ট হবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলে পূর্বে নির্ধারিত মায়াপুরকে 'ভক্তের কল্পনা মাত্র, বাস্তব ইতিহাস-ভূগোলের সত্য নয়' বলে যা লিখেছেন সে বিষয় কিছু নিবেদন করবো।

'মায়াপুর হল গৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলানিকেতন; বস্তুত এই মায়াপুর বাস্তবে কোথাও ছিল না' এই অবাস্তব অনৈতিহাসিক, অশাস্ত্রীয়, অধর্মীয়, অসত্য জিনিসটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই লেখক এই প্রবন্ধটির অবতারণা করেছেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে সিদ্ধমহাজন বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের সাহচর্যে নদীয়ার তৎকালীন কালেকটার ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবস্থান নবদ্বীপের অন্যতম পল্লী জঙ্গলাকীর্ণ মায়াপুর আবিষ্কার করেন। তিনি কয়েক বছর কঠিন পরিশ্রম করে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের শ্রুত পূর্বকাহিনী ও সরকারী নথিপত্র ছাড়া, এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক তথ্য, শাস্ত্র, বৈষ্ণব সাহিত্য, মহাজনবাক্য তৎকালীন ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, সাহিত্যিক ও শ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষ বিদ্বজ্জন মন্ডলীর কাছে উপস্থিত করেন এবং তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান মায়াপুর বলে সিদ্ধান্ত করেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবপ্রধানদের অনেকে গ্রহণ করেন এবং ভৌগোলিক তত্ত্বে অনভিজ্ঞ অনেকে ব্যক্তিগত স্বার্থে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেন। সমর্থক কয়েকজনের নাম : বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, নগেন্দ্রনাথ বসু, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ, কবি মোজাম্মেল হক, রাধিকানাথ গোস্বামী, অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রভৃতি।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনশো বছর আগে রচিত শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বিরচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থকে লেখক 'প্রকৃত ইতিহাসের দিক দিয়ে গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য নয়' বলে যে নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন তা সত্যি বেদনাদায়ক। শ্রীপাদ নরহরি 'নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নাম স্থান—যেথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান' লিখেছেন বলে লেখক 'গ্রন্থটি যে পরিমাণে ভক্ত-ভক্তির উৎকর্ষ বিধায়ক, ঠিক সেই পরিমাণেই ইতিবৃত্ত ও বাস্তবের উপর নিষ্ঠুর অবজ্ঞার পরিচায়ক। এর ঐতিহাসিক মূল্য কিছুমাত্র নেই', প্রভৃতি বলে শেষে লিখেছেন 'নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির পুরানো লৌকিক নাম পরিচয় বর্জন করে নতুন নামকরণের প্রয়াস করেছেন এবং প্রতিটি অঞ্চলের সঙ্গে একটি উদ্ভট অলৌকিক কাহিনী যোগ করে দিয়েছেন।'

কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার 'ভারতকোষে'র ৪র্থ খণ্ডে লিখেছেন : 'নরহরি চক্রবর্তী একাধারে কবি, গায়ক, ঐতিহাসিক, ভূগোলবেত্তা, ছন্দ শাস্ত্রে বিশারদ এবং রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী

ছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এবং সাহিত্যের সর্বপ্রথম গবেষক হইতেছেন নরহরি চক্রবর্তী।' (পৃষ্ঠা ১৫৮), মায়াপুরকে নস্যাৎ করার জন্য লেখকের পক্ষপাতিত্ব এখানে নির্লজ্জভাবে ফুটে বেরিয়েছে।

তারপর দাস মহাশয় 'মায়াপুর ভক্তের কল্পনাপ্রসূত, সেই অর্থে সত্য বাস্তব ইতিহাস-ভূগোলের সত্য নয়' বলে যা লিখেছেন, তার উত্তরে বলবো যে ভক্তের কল্পনাকে বাদ দিয়ে আমাদের কোন দেবস্থানই প্রতিষ্ঠিত নয়। ইতিহাস-ভূগোল দিয়ে সত্য নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। কালীঘাটে সতীর পায়ের কড়ে আঙুল পড়েছিল, ভক্তের কাছে এই কাহিনী সত্য বলে স্বীকৃত, তাই ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী এই মহাপীঠে এসে আজও কৃতকৃতার্থ হন। যদিও তিনি কলিকাতাকে কালীক্ষেত্র, বেলেঘাটাকে বিল্ব-ঘণ্ট বলাতে 'আভিজাত্যের ছদ্মবেশ পরানো' বলেছেন, তথাপি এই তৎসমকরণ কেবল নবদ্বীপের নটি দ্বীপে নয়। বাংলার অন্যত্রও যেমন সাতগা, সপ্তগ্রাম, বাঁশবেড়ে বংশবাটি। এ বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এটা কখনও 'কৃত্রিম' নয়। এটাই হচ্ছে অকৃত্রিম।

'গৌড়ীয়' মাসিকপত্রে (আগস্ট, ১৯২৯) শ্রীধাম মায়াপুর কোথায়? এ সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার কয়েকটি লাইন হচ্ছে : শ্রীধাম মায়াপুর কোথায়, জানিতে হইলে আগম বলেন, গঙ্গার পূর্বতটে যেখানে শ্রীগৌরসুন্দর শচীর নন্দনরূপে উদিত হইলেন সেইখানে। 'মায়াপুরে মহেশানি ভবিষ্যামি শচীসুতে' গান করিতে করিতে সকল বিদ্বন্মণ্ডলী জানিলেন যাহাকে প্রাচীন নবদ্বীপ বলে উহাই শ্রীধাম মায়াপুর।

মহাপ্রভু লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের ভার রাজা প্রতাপ রুদ্রকে না দিয়ে শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর মতন নিঃসম্বল অকিঞ্চনের উপর কেন দিলেন তা আমাদের মত জড়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের ধারণা করা সম্ভব নয়। অধোক্ষজ বস্তু সমস্ত ভক্তি-যোগের প্রভাবে শুদ্ধিভূত হলে তবে তা মনে প্রতিভাত হয়। 'ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেহ মনে' প্রবন্ধ লেখক 'বর্তমান নবদ্বীপ শহরই মায়াপুর অথবা মায়াপুরেই যথার্থ নবদ্বীপ এমন কথা বললে ইতিহাস-ভূগোলের বাস্তব সত্যকে নিতান্ত জলাঞ্জলি করা হয়' লিখেছেন। ভক্তের দৃষ্টিতে ধাম হচ্ছে রশ্মি বা আলো; শ্রীধাম মায়াপুরে সেই আলো দেখাবার জন্যই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। 'দুই ভাই হৃদয়ের খালি অন্ধকার—দুই ভাগবত সঙ্গে করলে সাক্ষাৎকার।' এক কথায় ভক্তিভাবে ভক্তের দৃষ্টিতে না দেখলে বৈষ্ণবধর্মের এই সব মূলতত্ত্বের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা যাবে না।

ভূপ্রকৃতির পুনঃপুনঃ রূপান্তরের ফলে ইতিহাস-ভূগোলের দিক থেকে প্রাচীন নবদ্বীপের রূপ আজ আর সঠিক জানা সম্ভব নয়। বাংলার সমস্ত নদ-নদী উচ্চ ভূমি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পলিমাটি বহন করে নিচু জায়গাগুলি গড়েছে বলে বাংলার মাটি এত কোমল ও কমনীয়। এই নরম মাটি নিয়ে বাংলার নদীগুলি কত গ্রাম, কত দেবদেউল, কত শস্যশ্যামল প্রান্তর যে ধ্বংস করেছে ইতিহাস পাঠকের তা অজানা নেই। এই সব নদী পুরাতন খাত থেকে নতুন খাতে বিপুল জলধারাকে প্রবাহিত করে নব নব ভূমি সৃষ্টি করেছে। সেই নব উদ্ভূত নটি দ্বীপই হচ্ছে পরবর্তী-কালে শিক্ষা সংস্কৃতির মহাপীঠ বৈষ্ণব জগতের তীর্থরাজ নবদ্বীপ। শ্রীদাস লিখেছেন 'নবদ্বীপ অর্থে জলপথের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নটি দ্বীপ—এ নয়। নব উদ্ভূত দ্বীপ। ভাগীরথী এবং জলঙ্গীর প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত দ্বীপাকৃতি অঞ্চল।' কিন্তু এ কথা ঠিক নয়।

আজ ভাগীরথীর যে চেহারা আমরা দেখছি, পূর্বে তার সে চেহারা ছিল না। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ট্রাভারনিয়ার নদীয়াকে (তখন নবদ্বীপের নাম ছিল নদীয়া) জনসংকুল সুবৃহৎ নগর বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর বর্ণনায় দেখা যায়, গঙ্গার জোয়ার তখন নদীয়া পর্যন্ত যেত।

on the 19th February 1666, I passed a large town called Nadia and it is the farthest point to which the tide reaches (Travels in India, Vol. I)

ভাগীরথী ছিল সেকালে বর্ধমান ও নদীয়ার সীমারেখা। আধুনিক নবদ্বীপ শহর তাই পূর্বে বর্ধমান জেলার মধ্যে ছিল। মিউনিসিপালিটির নাম ছিল 'নদীয়া মিউনিসিপালিটি' এবং রেলওয়ে স্টেশনের নাম ছিল 'নদীয়া-গঙ্গা'। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হবার পর মহেশ-গঞ্জের নীলকর সাহেব উইলিয়ম স্যাবি এর চেয়ারম্যান হন। পরে জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে 'রেলওয়ে স্টেশনের নাম 'নবদ্বীপ ধাম', মিউনিসিপ্যালিটির নাম নদীয়ার পরিবর্তে 'নবদ্বীপ' ও পৌর এলাকাটুকু বর্ধমান থেকে নিয়ে নদীয়া জেলাভুক্ত হয়। বর্তমানে নবদ্বীপ মহাপ্রভুপাড়ায় শচীমাতা অঙ্গনে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ যেখানে বিদ্যমান আছেন সেখানে দেড়শো বছর আগে বাস করতো কেবল বারুজীবী ও গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের কিছু লোক। এই অঞ্চলের নাম ছিল তখন চিনাডাঙ্গা। পরে গোস্বামীগণ তাঁদের কাছ থেকে বাড়িঘর জমি প্রভৃতি সব কিনে নিয়ে এখানে মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপ্রভুপাড়ায় দ্বাদশটি প্রধান মন্দির ও শ্রীবাসঅঙ্গন, সোনার গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মন্দিরগুলি শত বৎসরের মধ্যে সব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং, নবদ্বীপ শহর যে আধুনিক শহর, নৈসর্গিক পরিবর্তনের পর যে স্থাপিত হয়েছে তার প্রমাণ প্রাচীন বৈদেশিকদের সব নকশা। ঐতিহাসিকদের গবেষণা ও পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণকারীদের বিবরণ।

আমাদের দেশের নদনদী ও জনপদ-গুলির আকৃতি, পুরাতন নদীর মৃত্যু ও নূতন নদীর সৃষ্টি, প্রধান-অপ্রধান নদী-গুলির খাত পরিবর্তনের বিষয় জানতে হলে
Jao-de Barros (1550), Gesteld (1561) Hondius (1674), Thornton (1675) Cantelli-davignolia (1683), Vanden Broucke (1660), G. Delisle (1720) Izzak Tirion (1730), F. de witt (1726), De-I-Anville (1752), Rennel (1764), Holwell (1765)
এবং ইবন বতুতা (১৩২৮—৫৪ খৃঃ) বারবি (১৫৩০), র‍্যালফ ফিচ (১৫৮৩—৯১), ফারনানডেজ (১৫৯৮), ফনসেকা (১৫৯৯) প্রভৃতি ভ্রমণকারীদের রচিত নকশা ও বিবরণ ছাড়া নবদ্বীপের পরিবর্তনের চেহারা কখনও ধরা যাবে না।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নদীয়া ছিল সরকার সাতগাঁর অন্তর্গত। আইন-ই-আকবরীতে সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম তখন তিপ্পান্নটি মহালে বিভক্ত, আর সেই সরকারের ৪৮তম মহাল ছিল নদীয়া। রঘুনাথ দাসের পিতা ও পিতৃব্য তখন সপ্তগ্রামের 'অধিকারী'। তাই তাঁরা 'নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়—অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়' বলে চরিতামৃতকার লিখেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের দুজন অধ্যাপক ডঃ এস আর দাস ও ডঃ কে কে দাশগুপ্ত একটি সমীক্ষা করে ২৮ মার্চ ১৯৭০ সালে লিখেছেন:

As to the exact location of the birth place of Sri Chaitanya in Navadwipa no definite information is available.

মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নির্ণীত হবার পর নবদ্বীপের উত্তরাংশে দেওয়ান-গঞ্জের চড়া রামচন্দ্রপুরকে 'প্রাচীন মায়াপুর' বলে বিরোধী পক্ষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টাকে ডঃ রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন : 'দেওয়ানগঞ্জের কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানকে টানিয়া লইবার চেষ্টা উপরিউক্ত প্রমাণ-সমূহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ বৈশাখ ১৩৪১) আর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, 'আমি বহু প্রাচীন গ্রন্থ মানচিত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি রামচন্দ্রপুর কখনই মায়াপুর নয়।' এই সব মনীষীদের ঐতিহাসিক কথা উপেক্ষা করাই হচ্ছে একটা 'ট্রাজেডি'।

সুধীরকুমার মিত্র
কলকাতা-২৬

সাহিত্য সংখ্যা

১৩৮২-এর দেশ সাহিত্য সংখ্যা এইমাত্র দ্বিতীয়বার খুঁটিয়ে পড়ে শেষ করলাম। পড়ে যেমন প্রচুর আনন্দ পেয়েছি তেমনি অনেক সময় বিস্মিতও হয়েছি। সে সব কথা বলবার পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আপনাদের নিত্য নব অবদানের জন্য আমার সানন্দ সাধুবাদ জানাচ্ছি।

তবে এ প্রসঙ্গে সামগ্রিক আনন্দের কারণগুলি আর বিশেষ করে বিবৃত করার প্রয়োজন দেখি না। কারণ ইতিপূর্বে 'আলোচনা'স্তম্ভে অনেক পাঠক/পাঠিকাই তা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার নিজস্ব বিস্ময়ের কারণগুলি আপনাকে জানান প্রয়োজন মনে করি।

আমার প্রথম বিস্ময়ের কারণ সাহিত্য সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আপনার একটি মন্তব্য। আপনি লিখেছেন, 'পরিতাপের বিষয় এমন একটি আলোচনায় সতীনাথ ভাদুড়ী ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্থান হল না তাঁদের পরলোকগমনের জন্য। আমরা বঞ্চিত হলাম।' এ ধরনের মনস্তাপ যেখানে প্রকাশ করেছেন সেখানে সৈয়দ মুজতবা আলির নামোল্লেখ হল না কেন? বয়স যাই হোক, বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ও বিচরণকাল যে আপনার ওই সংখ্যারই আলোচ্য সময়সীমার অন্তর্ভুক্ত। আপনি নিজে সৈয়দ সাহেবের অনুরাগী তাই এ কথা অন্তত আপনার নিকট দ্বিতীয়বার উল্লেখযোগ্য নয় যে, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলির স্থান স্বকীয়তায় একাধিক ক্ষেত্রে অনন্য।

আমার দ্বিতীয় বিস্ময় এই যে, যে সংখ্যাটিকে আপনারা 'ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মত অমূল্য গ্রন্থ' হিসাবে বিজ্ঞাপিত করেছেন সেই সংখ্যাটাকে সব দিক থেকেই নিশ্চিতরূপে প্রতিনিধিত্বমূলক করা উচিত ছিল। কিন্তু সেই সংখ্যার জীবিত বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকদের তালিকা থেকে (১) হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, (২) গজেন্দ্রকুমার মিত্র, (৩) সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, (৪) শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা (৫) প্রফুল্ল রায়ের মত সার্থক ও প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিকগণও বাদ পড়লেন কিভাবে? দেশ পত্রিকা নিশ্চয়ই কোন একটি দলের বা মতের মুখপত্র নয়। আপনাদের মননে বা কর্মে কোন সময়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই তুলনা না করেও বলা চলে যে, এঁদের সাহিত্য জীবনের গোড়ার কথা জানতেও আমরা—পাঠক/পাঠিকা সম্প্রদায় সমানভাবেই আগ্রহী।

এ সম্পর্কে অর্থাৎ অধিক সংখ্যক রচনার স্থান সংকুলানের প্রশ্নটা নিয়েও ইতিপূর্বেই দুএকজন পাঠক আলোচনায় তাদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তদনুসারে বলা চলে যে, আপনার দিক থেকে এই সব পাকা লেখক-লেখিকাদের একটা সাধারণ নির্দিষ্ট পরিসরে তাঁদের রচনাকে আবদ্ধ রাখার আহ্বান জানানো বোধ হয় খুব একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। বিশেষ বাংলা গল্প উপন্যাসের পালা-বদলের যে সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা এই সংখ্যায় হয়েছে সেখানে কোন প্রকার বিচ্যুতি বা বিস্মৃতি এড়ানোর প্রচেষ্টার খুবই প্রয়োজন ছিল। তাই এই অভাববোধটা একটি স্থায়ী ক্ষোভের কারণ হয়ে রইল।

সংখ্যাটি পড়ে বেশীর ভাগ লেখক/লেখিকার বিশেষ করে জরাসন্ধ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমল করের আত্মস্মৃতির সহজ সরল সৌন্দর্যে বা আপনার বিবিধ প্রশ্নের উত্তরে তাঁদের অকপট আত্মপ্রকাশে অভিভূত হতে হয়। পাশাপাশি অবশ্য নিজেকে হিরো বানাবার বা অকারণ বড় বড় কথা বলবার দুএকটি দাম্ভিক প্রচেষ্টাও আছে। কিন্তু আমার মতে, পাঠক হিসাবে এ সবই আমাদের সইতে হবে। না সয়ে উপায় নেই। কারণ সামাজিক ভোজে টক, ঝাল, নুন বা মিষ্টি সব কিছুরই তো একসঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। তাই ৭ জুনের ৩২নং সংখ্যায় দেশে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত মিহির হাজরার অহেতুক সমালোচনায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হলেও আমি বলব, এই প্রকার সমালোচনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত। তা না হলেই বরঞ্চ ঐ প্রকার প্রগলভ উক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। তবে ১৪ জুনের ৩৩নং সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, রমাপদ চৌধুরীর লেখা সম্পর্কে অতি সামান্য কারণে যে কঠোর মন্তব্যের আঘাত হেনেছেন তা অসমর্থনীয় ও প্রতিবাদযোগ্য। এ কথা ভুললে চলবে না যে, লেখকও সময় বিশেষে সাধারণ মানুষ। নিজের কথা সাত কাহন (আশাপূর্ণা দেবীর ভাষায়) বলবার সুযোগ পেলে সব সময় তাঁর যে পরিমিতি বোধ থাকবেই এমন আশা করা যায় না। তাই এমন কি বিমল মিত্রের অতিকথন ও অপ্রাসঙ্গিকতা কিংবা সন্তোষকুমার ঘোষের নাক্কারজনক আদিরসাশ্রিত অহমিকার অসরল আত্মকথনেও আমি একেবারে অবাক হইনি, প্রতিবাদে মুখর হওয়া তো দূরের কথা।

পরিশেষে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে এই বলে ক্ষান্ত হতে চাই যে, ভবিষ্যতেও আপনার সার্থকতর পরিকল্পনার আবির্ভাবের আশা নিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

ভারতীয় পটভূমিকায় শব্দ ও দূষণ

"দেশ" পত্রিকার ২৬শে জুলাই সংখ্যায় শ্রীসমরজিৎ কর শব্দ ও শ্রবণ নিয়ে "বিশ্ববিজ্ঞান" পর্যায়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তবে সমরজিৎবাবু বধিরতা রোগ নিরাময়-এর দিকটাই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের পটভূমিকায় অবতীর্ণ। কিন্তু ভারতবর্ষের মত জনবহুল ও দরিদ্র দেশে, যে কোনও রোগ-এর নিরাময় অপেক্ষা নিবারণই শ্রেয়। তাই মনে হয়, নেদারল্যাণ্ডের উদাহরণে-এর পাশাপাশি আমাদের দেশের সম্যক অবস্থাটা উপলব্ধি করারও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

কলকাতার শব্দদূষণ নিয়ে আজ থেকে ৭ বছর আগে জাতীয় পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণাগারের Dr M Panchdy এবং তাঁর সহকর্মীরা এক গবেষণা করেছিলেন। সমীক্ষায় দূষিতক হিসাবে ট্রাম, বাস, লরী, মোটরগাড়ি, কলকারাখানা এমনকি পাখির কূজনও গৃহীত হয়েছিল। এই সমীক্ষার ফলাফল যথেষ্ট শংকাজনক। মোটামুটিভাবে দেখা গেছে যে, কলকাতা শহরের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই শব্দদূষণের প্রকোপ যথেষ্ট বেশী। অঞ্চলগুলি, দিবালোকের ১২ ঘণ্টার প্রায় ৮-১০ ঘণ্টাই, অতি মাত্রায় শব্দ দূষণের কবলে থাকে এবং এই মাত্রা বিপদ সীমার শতকরা ৪০-৪৫% বেশী। সূর্যাস্তের পরেও ৬—৮ ঘণ্টা শব্দ দূষণের মাত্রা বেশীর ভাগ এলাকাতেই থাকে বিপদ সীমার শতকরা ১৫—২০% বেশী। সুতরাং কলকাতা শহরে বা সমতুল্য শহরে বধিরতা রোগ ক্রমশই ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছে বা পড়বে।

সমরজিৎবাবু আর একটি নিদারুণ সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ইদানীং রবারের পরিবর্তে এই শহরের যানবাহনে ব্যবহার করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক হর্ন।" বাস্তবিকই পুরানো প্রথা বর্জন করে আজকাল ট্যাকসী, মিনিবাস সরকারী বাস, বেসরকারী বাস, লরী, টেম্পোভ্যান এমনকি সুন্দরী ট্রামও বৈদ্যুতিক হর্ন বাজিয়ে চলছে। আজ থেকে দশ বছর আগেও কিন্তু কোলকাতা শহরে কোনও ট্যাকসি বা বাসে বৈদ্যুতিক হর্ন থাকলেও বাজাত না (আইনের ভয়ে) এবং ব্যবহৃত হতো রবারের হর্ন। মিনিবাসগুলির জন্ম দেওয়া হয়নি তখন, তাই মনুষ্য সমাজের এই অভিশাপটির কথা আর নাই বা বললাম। অদূরভবিষ্যতেই তাই বহু শহরবাসী স্বল্পাধিক বধির হবেন এবং ঘটবে বহু দুর্ঘটনা। সব চিকিৎসার ব্যবস্থাই কিন্তু করতে হবে সরকারকে, যেহেতু আমরা দরিদ্র দেশ।

শ্রীসুজিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯।

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ৪ ॥
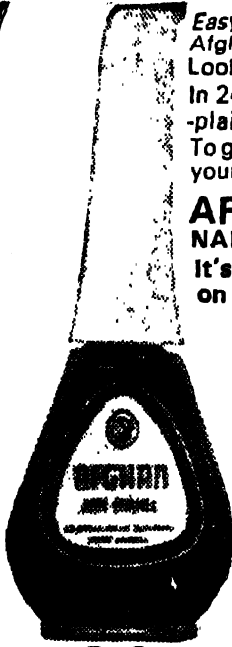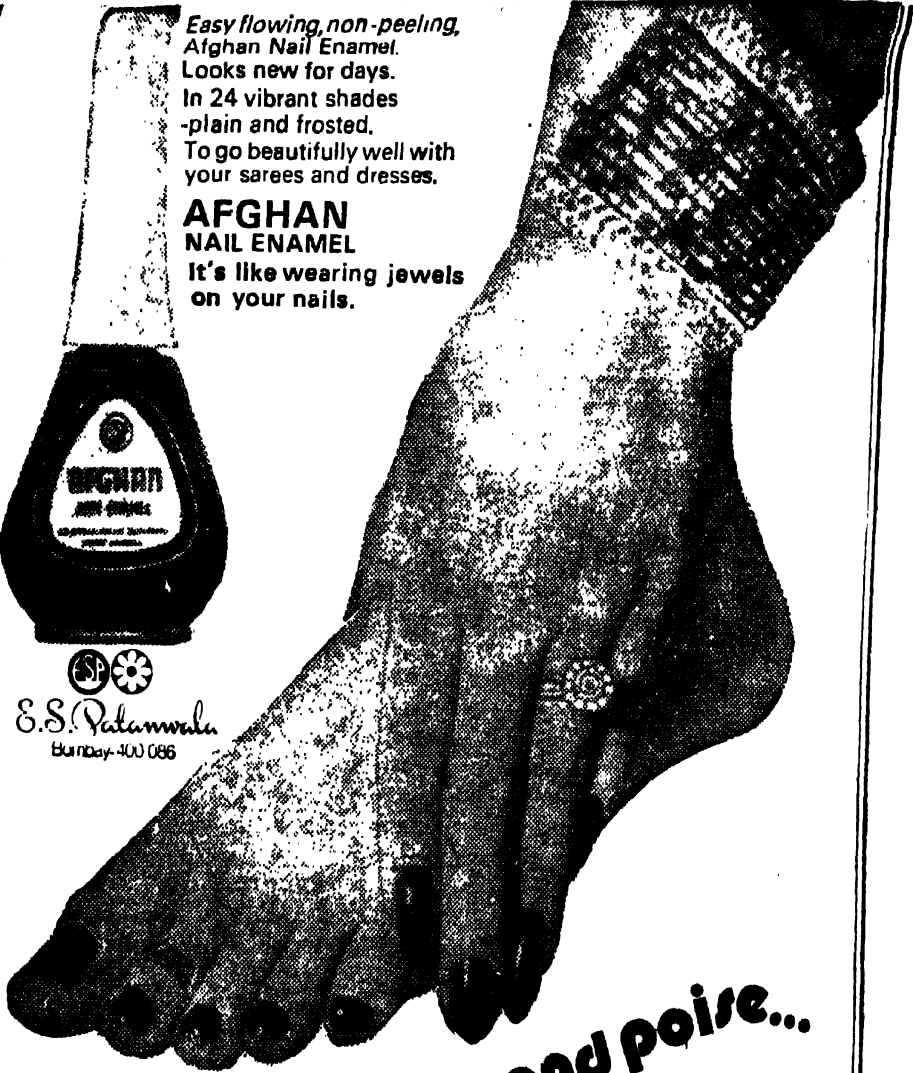
কানাডা ভ্রমণের পর এবার দক্ষিণ পথে নেমে আসছিলুম। সোজা নামছিলুম মন্ট্রিয়াল থেকে। যাবার সময় বোস্টন থেকে উত্তর পথে নিউ হ্যাম্পসায়ার ও ভারমন্ট—এই দুটি অঙ্গরাজ্য ভ্রমণ করি। কিন্তু ফেরবার পথে নিউ ইয়র্ক স্টেটের রাজধানী আলবানি না দেখে ফিরবার যো ছিল না। আমাকে আকর্ষণ করেছিল এদের নিত্যকর্মের বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তিতা। এতকাল ধরে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যত নিরুত্তর প্রশ্ন ছিল মনে মনে, তার জবাব পাওয়া আমার দরকার ছিল।

যে কোনও স্টেটেই প্রবেশ করছি, দেখছি প্রতি মানুষের কর্মজীবনের প্রতি আনুগত্য। কর্মস্থলে পৌঁছবার নিয়ম কোথাও সকাল সাতটা, কোথাও বা আটটা। সমগ্র উত্তর আমেরিকার কোনও অংশে এর তিলমাত্র ব্যতিক্রম নেই। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই একই নির্দিষ্ট নিয়ম। ছাত্ররা যদি লক্ষ করে শিক্ষকের গাফিলতি তারা যথাস্থানে নালিশ জানিয়ে বলে, আমরা পড়তে এসেছি, সারাদিনে আমাদের দরকার মতো কাজ শেষ করা চাই! উনি পারিশ্রমিক নিচ্ছেন, কর্তব্য করবেন না কেন? সুতরাং সব স্কুলেই ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে থাকে সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সেখানে কোনও পক্ষেরই ফাঁকি দেবার উপায় থাকে না। ব্যতিক্রম ঘটলে বহু স্কুলের বহু শিক্ষককেই অপদস্থ হয়ে কাজ ছেড়ে যেতে হয়। ওদিকে ছাত্ররাও সবাই একটি বিশেষ নীতিতে আবদ্ধ থাকে। এদেশের কোনও ছাত্র বা ছাত্রী বাড়িতে পড়া করে না, পরীক্ষা ইত্যাদির কালেও নয়। স্কুলের বাইরে তাদের একমাত্র কাজ খেলাধুলো, গালগল্প এবং টেলিভিসনে ছবি দেখা। সকাল ৭টা বা ৮টা থেকে স্কুল—ছুটি সেই বেলা চারটে। দুপুরের খাওয়া স্কুলে, টিফিন মাত্র আধঘণ্টা। ছোট থেকে গান শেখা, ছবি আঁকা, সেলাই-শিক্ষা, বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ নেওয়া, টি-ভির ছবি দেখা, ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান জানা, ক্রীড়াজগতের খবর রাখা, মানচিত্র নিয়ে ভূগোলের আলোচনা করা, ব্যাকরণ পড়ে যাওয়া। ছয় থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষকরা বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে ছাত্রছাত্রীদেরকে টনটনে করে তোলে এবং সেই পরীক্ষার নাম 'হায়ার সেকেন্ডারী।' একটিও ছাত্র বা ছাত্রী সেই পরীক্ষা বা সমীক্ষায় ফেল করে না। আঠারো বছর বয়সে ওই বিদ্যা নিয়েই তারা রোজগার করতে থাকে। তাদের উপযুক্ত কাজ পাওয়া একেবারেই কঠিন নয় এবং সরকারি নিয়ম অনুসারে সর্বাপেক্ষা কম বেতনও সপ্তাহে প্রায় একশ' ডলার। এই কারণে অধিকাংশ আমেরিকান মেয়ে বা পুরুষ উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় না। তারা নিজ নিজ শক্তি ও যোগ্যতা অনুযায়ী উপার্জন বাড়াতে থাকে। পথেঘাটে হাটে বাজারে হোটেলে দোকানে সাধারণ আমেরিকান যাদেরকে দেখা যায়, তারা কেউ বিদ্যাদিগ্‌গজ নয়—তারা আপিসের বাবু, হোটেলের কর্মী, দোকানের বিক্রেতা, বাস বা ট্রেনের চাকুরে, পথের ঝাড়ুদার প্রভৃতি। একালে তাদের অঙ্ক শিখতে হয় না, কারণ হাতের কাছেই ক্যালকুলেটর মেসিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা খুবই ব্যয়বহুল, সাধারণত তার খরচ মা-বাপ দেয় না—ছেলেমেয়েরা রোজগার করে শিক্ষার খরচ চালায়। প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর উচ্চশিক্ষার জন্য বহু তরুণ-তরুণী উপার্জন করে খরচ চালায়। পিতা-মাতার কাছে হাত পাততে তাদের সম্মানে বাধে। ১৪ বা ১৫ বছর বয়স থেকে বহু মেয়ে জন্মনিরোধক ট্যাবলেট খেতে থাকে নিয়মিত। বিবাহ হোক বা না হোক, ১৮ বছর বয়স থেকেই ছেলেমেয়ে নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে একত্র কোথাও গিয়ে রাত্রিবাস করে, মা-বাপ এতে দুঃখিত বা চিন্তিত হয় না। ওরা বলে, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যৌনজীবনের কোনও যোগ নেই। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রী একই ঘরে রাত্রিবাস করতে পারে—এমন ব্যবস্থা আছে। বহু উচ্ছৃঙ্খল ছেলে বা মেয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে এম-এস বা পি-এচ-ডি ক'রে মোটা চাকরি পায় যেখানে-সেখানে যে-কোনও স্টেটে। ১৬ বছরের ছেলে বা মেয়ে হোমোসেক্সুয়াল হলে নিন্দা বা কানাকানির ঢেউ ওঠে না। এদেশে ও বিষয়ে বহু সাহিত্যগ্রন্থ লেখা হয়, সংবাদপত্রে এ নিয়ে বহু গবেষণা চলে এবং এটিকে তরুণ জীবনের অঙ্গ বলেই ধরে নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য, রূপ এবং উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন গুণপণা আছে—এমন লক্ষ লক্ষ ছেলে ও মেয়ে যৌনব্যাধিতে ভুগছে, এটি মেডিক্যাল জার্নাল ওলটালেই দেখতে পাওয়া যায়। এরা খায় বেশি, রোজগার করে তার চেয়েও বেশি—সুতরাং অভাবের চেহারা দেখে না, অন্নসংস্থানের জন্য কেঁদে বেড়ায় না। এরা কথায়-কথায় ঘর বাঁধে, কথায়-কথায় ঘর ভাঙে। এদেশে অভাবগ্রস্ত তারাই, যাদের গাড়ি পুরনো, যাদের ঘরে সোফার সেটটা ছিঁড়ে গেছে, যাদের বাড়িঘর রংচটা, যারা কম দামের পোশাক পরতে বাধ্য হয়।

পেলহাম ম্যানর নামক একটি গ্রামীণ টাউনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছিলুম। তিনি নিজের হাতে তাঁর গাড়ি মেরামত করছিলেন। ভদ্রলোকের নাম মিঃ উইলসন। তাঁকে প্রশ্ন করলুম, আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু কি? তিনি একবারটি আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, প্রত্যেক আমেরিকানের যা প্রিয়, আমারও তাই। সোমবার থেকে শুক্রবার প্রতিদিন আটঘণ্টা কাজ করি, শনি-রবিবার ছুটি। ওই দুদিন সাপ্তাহিক বাজার, কেনা-কাটা, নিজের লনের ঘাস কাটা ঘরদোর ঝাড়ামোছা, গাড়ি ধোওয়া-মোছা, মেরামতি কাজ কিছু, জঞ্জাল পরিষ্কার। রবিবার আউটিং, বাইরে-বাইরে খাওয়া, বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়দের সঙ্গে দেখাশোনা, এক সঙ্গে ডিনারে বসা, গালগল্প করা। সাধারণ আমেরিকানের প্রিয়বস্তু হ'ল যে কোনও কাজ।

ও'রই সঙ্গে আলাপ ক'রে আরেকবার জানলুম সমগ্র আমেরিকায় কোনও চাকরির নিরাপত্তা নেই। কাজে আসতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে কৈফিয়ৎ লাগে। সকলেরই কাজ সুনির্দিষ্ট। প্রত্যেকদিনের কাজ নির্ভুলভাবে শেষ করতে হয়, সেখানে ক্ষমা নেই। একদিনের নোটিসে চাকরি চলে যায়। আমার অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে উইলসন বললেন, একজন কেন, দশ হাজার লোক ছাটাই হলেও ইউনিয়নের কিছু বলবার থাকে না। তারা যুক্তিবাদী। উৎপাদন বন্ধ হচ্ছে বলেই আজকাল লোকে টেকসাসের দিকে যাচ্ছে। সেখানে লোকে কাজ পাচ্ছে প্রচুর। বেকার-ভাতা থাকার জন্য আমেরিকার লোক চাকরি গেলে ভয় পায় না। স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে বেকার হলে দুশ' ডলার প্রতি সপ্তাহে।*

আপনাদের দেশে লেবার ইউনিয়নের কাজকর্ম কি প্রকার? তাদের সঙ্গে রাজনীতির যোগ কতখানি?

উনি বললেন, রাজনীতির সঙ্গে লেবার ইউনিয়নের যোগ নেই। ওদের কাজ হল শ্রমিকদের নিয়মানুগত্য রক্ষা করা, উৎপাদন বাড়ানো, ফন্দিবাজ শিল্পপতিদের মুখোশ খুলে ধরা, শ্রমিকদের মাইনে বাড়ানো। কিন্তু যুক্তিবাদের বাইরে ওরা যায় না। মনে রাখবেন এ দেশের উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির চেয়ে একজন দক্ষ মিস্ত্রি অনেক বেশি রোজগার করে। একজন 'হোয়াইট কলার' বাবুর চেয়ে রাস্তার একজন সুইপারের রোজগার বেশি। একজন সুদক্ষ শ্রমিক (Skilled labour) প্রতি ঘন্টায় ১৫ ডলারও রোজগার করে। অত বড় শ্রমিক নেতা জর্জ মিনিও একথা জানেন। তিনি বহু ইউনিয়নের অধিনায়ক।

তিনি কি পারিশ্রমিক বাড়াবার কর্তা?

নিশ্চয়ই।—উইলসন সেদিন জবাব দিয়েছিলেন, শিল্পপতিদের গলা টিপতে তিনি জানেন। আমি তাঁর কথায় খুশী হয়েছিলুম। কিন্তু আমার দাঁড়াবার সময় ছিল না।

ফিলাডেলফিয়ায় এসে পৌঁছলুম ৪ জুলাই, সেদিন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সেদিন ১৯৯ বছর স্বাধীনতার কাল পূর্ণ হয়ে ২০০ বছরে পা দিচ্ছে। এই নগরই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী, এবং এখানকার 'লিবার্টি পার্ক' সংলগ্ন এক সুবৃহৎ অট্টালিকা থেকে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ১৭৭৬ সালের এই তারিখে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হয়। এ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মিল পাওয়া যায় আগাগোড়া। অতঃপর এই প্রাচীন ও বনেদী শহর থেকেই ১৭৮৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যে সহজে ঘটেনি, একথা ভুক্তভোগী আমরা অর্থাৎ ভারতীয়রা জানি। এর জন্য ১৭৬৫ থেকে এদেরকে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে যেতে হয়েছিল। এরই সঙ্গে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব, নেতায়-নেতায় বিবাদ, প্রতিক্রিয়াশীলদের আচরণ, পারস্পরিক হানাহানি, ভূমিবণ্টন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জবর-দখল এবং ঈর্ষাবিদ্বেষের বন্যা। বলা বাহুল্য, তখনও আফ্রিকান নিগ্রোদের নিয়ে কেনাবেচা চলছে এবং আমেরিকান আদি-বাসী—যাদেরকে 'রেড-ইন্ডিয়ান' বলে মিথ্যা নামে ডাকা হত—তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার কাজ চলছে। একালে 'রেড' শব্দটা বাদ গিয়ে শুধু 'ইন্ডিয়ান' বলা হচ্ছে--যেটির ভিত্তি আগাগোড়া অলীক। কিন্তু একদিকে এদেশের পুরনো ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি ইন্ডিয়ান মানেই ছিল সভ্যতালেশহীন একটা জাতি, এবং অন্যদিকে ভারতকেও তখন বলা হত অ-সভ্য ইন্ডিয়া! আমেরিকানরা ধরে নিত এ দুটোই এক, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান মানেই বর্বর জাতি! তৎকালীন ইংরাজরা এদের সকলের সম্বন্ধেই বলে বেড়াত, 'White man's burden'

লিবার্টি পার্কের সরকারি ভবনটি এখন যাদুঘর ও পাঠাগারে পরিণত। সেখানে রয়েছে একটি বড় আকারের লোহঘণ্টা—যেটিতে ফাটল ধরে রয়েছে। স্বাধীনতা ঘোষণাকালে এখান থেকেই ঘণ্টা-রব শোনা গিয়েছিল। অনেকগুলি ছবি টাঙানো দেখতে পাচ্ছিলুম। এঁরা সকলেই ছিলেন বড় বড় সংগ্রামী নেতা, প্রশাসক, সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ।

পেনসিলভানিয়া নামক অঙ্গরাজ্যের রাজধানী হল এই সুন্দর ও প্রাচীন ফিলাডেলফিয়া নগরী। এখানে বহুতল বাড়ি খুবই কম এবং এটি নিউ ইয়র্কের মতো ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র নয়। এ যেন দেড়শ' বছর আগে থেকে থেমে গেছে ওর সৌন্দর্য ও আভিজাত্য নিয়ে। সব আধুনিক কালের প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ময়কর প্রগতি যেন আজও এখানে পৌঁছয়নি। এই নগরীকে পূর্বদিকে ঘিরে রয়েছে নিউ জার্সি নামক ক্ষুদ্র স্টেট। ভারতের মতো প্রতি স্টেটের সীমানা নির্দেশ নিয়ে এককালে এদেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বেধে উঠত। অর্থাৎ জার্মান, ইতালীয়ান, ফরাসী, সুইস, বেলজিয়ান, ড্যানিশ, সুইডিশ, পোলিশ--সেই অশান্তি থেকে কেউ বাদ যেত না। সবাই জানে মধ্য আমেরিকা একদিনে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। কিছুকাল আগেও ফরাসী উপনিবেশ লুই-জিয়ানা, স্পেনীয় উপনিবেশ নিউ মেক্সিকো, রুশ-মঙ্গোলীয় এলাকা আলাস্কা, চীন-জাপানী-পলিনেশীয় দ্বীপ 'হাওয়াই'— এরা ছিল বাইরে এবং তখন ৫০ তারকাযুক্ত মার্কিন পতাকা এমন করে ওড়েনি।

পেন্‌সিলভানিয়ায় এখনও একটি অতি প্রাচীন সম্প্রদায় বাস করে, যাদের নাম 'আমিস্‌'। 'আমিসরা' অনেকটা জলপাইগুড়ি জেলার টো-টো গোষ্ঠীর মতো—যারা সভ্যজগৎ থেকে দূরে থাকে। কিন্তু আমিসরা একটু পৃথক ধরনের। এরা ইলেকট্রিক এবং আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করে না। নিজেদের হাতে এরা জমি চাষ করে, সুতো কাটে, কম্বল বোনে, বাসন তৈরি করে, জুতো বানায়, চর্বির আলো জ্বালে, তামাক খায়, নিজেদের বিবাহপ্রথা চালু রাখে এবং মেয়েরা আপাদমস্তক জোব্বা পরে। কল বা পাইপের জল এরা ব্যবহার করে না, কাঠ ও মাটি দিয়ে ঘর বানায় এবং কোনও ধর্মবিশ্বাসকে তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়, এরা শহর বাজারের ত্রিসীমায় আসে না এবং গাছগাছড়ার রস খেয়ে অসুখ সারায়। বিলাস বৈভব এবং আধুনিক উপকরণে এদের আস্থা নেই। চুরি-ডাকাতি এদের মধ্যে নেই। এরা রাষ্ট্রকে খাজনা দেয় না বা কোনও গভর্নমেন্টকে স্বীকার করে না। এদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও নেই, এরা আদিবাসীও নয় এবং নিজেদের সমাজেই বিচারব্যবস্থা করে নেয়। এরা নিরামিশাষী।

ফিলাডেলফিয়ায় বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নয়। এঁরা প্রতি বছরে দুর্গাপুজো করেন। কৌতুকের বিষয়, গত বছরে এখানকার 'সেভিয়র' নামক একটি খৃষ্টীয় গির্জার ভিতরে দুর্গার প্রতিমা বসিয়ে তিন দিন ধরে বাঙ্গালীরা পুজো করেন। শুধু বৈশিষ্ট্য এই, পুজো-পার্বণটি পালন করা হয় সপ্তাহ শেষে, অর্থাৎ শুক্রবারের সন্ধ্যা থেকে রবিবার রাত্রি পর্যন্ত। পাঁজি মিলিয়ে পুজো নয়, ছুটির বারের উৎসব। 'সেভিয়র' গির্জার পাদরিরা প্রতিমা প্রতিষ্ঠায় আপত্তি করেননি। প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের গির্জা ও সিনাগগগুলি এখন অনেকটা অনাদৃত। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবল অগ্রগতির প্রভাবে ধর্মবিশ্বাস কমে এসেছে। লোকে এখন virtue মানে, religionকে স্বীকার করতে তাদের বাধে। চন্দ্ররহস্য যখন ভেদ করা গেছে, ভগবৎ রহস্যজাল ভেদ করতে আর কত দেরি? এ বিশ্বের মহাকাশ কম্পিউটর-এর সাহায্যে এখন করায়ত্ত। এই ত' সেদিন দেখলুম, ওঘরে বসে ছোট্ট এক কম্পিউটর-এর বোতাম টিপলো, এঘরে টি-ভি বন্ধ হয়ে গেল! ধর্মের কৌলিন্য আমেরিকায় কমে এসেছে।

শহর থেকে কিছু দূরে 'ল্যান্‌ড্রিলো' নামক এক বনবাগানঘেরা অঞ্চলে আমার এক আমন্ত্রণ ছিল। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পেনসিলভানিয়া হাসপাতালের প্রসিদ্ধ শারীরবিদ্যাবিশারদ ডাঃ সুখময় লাহিড়ীর স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা। এঁরা এখানকারই অধিবাসী। আমাদের 'কল্লোল যুগের' বন্ধু ডক্টর গিরিজা মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুর আগে প্রায় মাস তিনেক ধরে এঁদের তত্ত্বাবধানেই তিনি ছিলেন। গিরিজা জার্মানি থেকে সস্ত্রীক আমেরিকায় এসেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আমন্ত্রণ পেয়ে। গত ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে নিউ ইয়র্কে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে হঠাৎ ভেঙে পড়ে এবং সেইখানেই তার মৃত্যু ঘটে। গিরিজার পাশে বসেছিলেন ভারতের কনসাল জেনারল অশোক রায় মহাশয়। তিনি এই আকস্মিক ঘটনা দেখে সেইখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ডাঃ লাহিড়ী ও শ্রীমতী কৃষ্ণা গিরিজার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অবশ্য গিরিজার অস্ট্রো-জার্মান স্ত্রী শ্রীমতী ফ্রেডা সঙ্গেই ছিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে ডাঃ লাহিড়ী ও ফ্রেডা আমাকে দুখানি চিঠি লেখেন। ওঁরা জানতেন গিরিজা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং জার্মান ভাষায় আমার একখানি গ্রন্থের অনুবাদক। হিটলারী আমলে জার্মানিতে গিরিজা ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মসচিব। শ্রীমতী কৃষ্ণা সবিস্তারে গিরিজার শেষ জীবনের কথা বলছিলেন।

ফিলাডেলফিয়ায় একদল তরুণ বাঙ্গালী যুবককে দেখছিলুম। তাঁরা কেউ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, কেউ বা ইন্‌জিনীয়ার। তাঁদের মধ্যে অশোক চক্রবর্তী, স্বপন দাস, গুরুপ্রসাদ বসু প্রভৃতি আমার বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু আমার হাতে সময়

ছিল কম। দক্ষিণপথে ফ্লোরিডার দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছিলুম।

আকাশপথে প্রায় ১১৫০ মাইল পেরিয়ে 'ট্যাম্পা' নামক এক বৃহৎ জনপদে এসে নামলুম। এক ভদ্রলোককে বলতে গেলুম, আমি ইন্ডিয়া থেকে এসেছি—তিনি বললেন, ইন্ডিয়ান? কিন্তু তারা ত সবাই আমেরিকান! অতঃপর আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে তিনি বোধ করি আমাকে জনৈক প্রতারক ভেবে শুধু বলে গেলেন, উইশ ইউ গুড লাক!

আমি হাসছিলুম। পৃথিবীর বৃহৎ মানচিত্রে 'ইন্ডিয়া' যেন কোথায় একটি নোংরাকের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় ঝুলে আছে, সবাই কি তার খবর রাখে। আরেক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। কানাডার অংশে নায়গারা জলপ্রপাতের শোভা দেখছিলাম রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এক স্থূলকায়া কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা। তিনি নিগ্রো। তিনি দু-এক কথার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন, ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন? কিন্তু আপনাকে ত ভিখারী মনে হচ্ছে না?

তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, নিশ্চয়ই! আপনারা ত পৃথিবীর সব দেশে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ান আর বড় বড় কথা বলেন! এদেশের চোখে আপনারা অশ্রদ্ধেয়। আমরা ক্রীতদাসের বংশ, কিন্তু আমরা ভিক্ষা করিনে।

মহিলাকে দু'চার কথা শুনিয়ে দেবো ভাবলুম, কিন্তু ভয়ে-ভয়ে চুপ করে গিয়েছিলুম। ভারতের বর্তমান চেহারা আমেরিকা খুব ভাল চোখে দেখে না। আশ্চর্য, নিক্সনের কলঙ্ক-কাহিনী ওরা এরই মধ্যে ভুলতে বসেছে। ভিয়েৎনাম থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এল, কিন্তু জাতীয় লজ্জা গায়ে মাখলো না! ২৩ বছর ধরে চীন ওদেরকে বাপান্ত করল, তবু দেখতে পাচ্ছি ওরা এখন চীনের চাটুকার। ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সের কাছে ওদের মানসম্ভ্রম একেবারেই কম, কিন্তু ডলার ও টেকনোলজির কৃপায় ওদের ধনপতিরা সকলের মুখ বন্ধ রেখেছে। আমেরিকার ধনবাদ পৃথিবীর ওপর আধিপত্য চায়। ওদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-কেন্দ্র ১১৪ তলা উঁচু এক অট্টালিকা। ওটার নাম World Trade Centre।

ক্রীতদাস বংশীয়াকে একথাগুলি বুঝিয়ে বলতে পারলে ভাল হ'ত।

মেক্সিকো উপসাগরের একটি খাঁড়ির কোলে ট্যাম্পা শহর দাঁড়িয়ে। এই শহরটি সামুদ্রিক গলদা চিংড়ির জন্য প্রসিদ্ধ। এখন প্রখর গ্রীষ্মকাল, রোদ্দের তেজ প্রবল। কিন্তু ওই রোদ্রেই সমুদ্রের বালুবেলায় মেয়ে-পুরুষ একপ্রকার নগ্ন অবস্থায় কুমীরের মতো পড়ে থাকে গায়ের ছাল পুড়িয়ে মিসমিসে করার জন্য। ট্যাম্পার সামনে সমুদ্রের এই অংশটিকে বলা হয় 'বে'। যেমন 'বে' অফ বেঙ্গল বা বে অফ বিসকে। এই শহরে আমি দিন তিনেক কাটাবো।

সমুদ্রের ধারে ধারে ট্যাম্পা থেকে একটি হাইওয়ে চলে গেছে অপর একটি শহরে, নাম 'ক্লিয়ার ওয়াটার।' এইখানে চিংড়ি মাছের বড় বড় আড়ৎ রয়েছে। ধনপতিরা এখানে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান খাড়া করেছে। সমগ্র ছোট শহরটি সন্ধ্যাকালে আলোকমালায়, যেন এক ইন্দ্রধনু সৃষ্টি করেছিল। শহরের পশ্চিম সীমান্তে সংকীর্ণ স্থলপথটি শেষ হয়েছে সমুদ্রসৈকতে। সন্ধ্যা সাড়ে আটটা বেজে গেছে, কিন্তু সমুদ্রের দিগন্তে এখনও রক্তিম বলয়টি অদৃশ্য হয়নি। টু-পীস বিকিনিপরা স্নানরতা মেয়েগুলিকে নীলসাগর জলে মনে হচ্ছিল প্রস্ফুটিত রক্তগোলাপ।

'বানবেরিক্স কোর্ট' নামক একটি নিরিবিলি অঞ্চলে আমি বসবাসের জায়গা পেয়েছিলুম। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় এখান থেকে দূরে নয়। শুনেছি ওখানকার প্যাথলজি বিভাগেও একজন ভারতীয় প্রফেসর ডক্টর সি এন মূর্তি নিযুক্ত আছেন। তিনি থাকেন এই স্টেটেরই অপর এক শহর সেন্ট-পিটার্সবার্গে,—যেটি আমার ভ্রমণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

ফ্লোরিডা স্টেটে দেখতে পাচ্ছিলুম স্প্যানিশ ও কিউবানরা জনসংখ্যায় বেশি। ফ্লোরিডা থেকে কিউবা কাছেই—জলপথে আন্দাজ দু'শ মাইল দক্ষিণে গেলে কিউবার রাজধানী হাভানায় পৌঁছনো যায়। এই জলপথটিকে বলা হয় ফ্লোরিডা প্রণালী।

আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছিলুম দেশান্তরে। আমার পক্ষে জল ও স্থলজগৎ কোথায় গিয়ে শেষ হবে, এবং দেখতে দেখতে আমার দেখা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আমি নিজেও জানিনে।

ফ্লোরিডায় আরেক শ্রেণীর লোক বাস

করতে আসে যারা পেন্সনভোগী। যাদের সন্তানসন্ততির সঙ্গে কোনও যোগ নেই, অথবা নিঃসন্তান—তারা আসে এই স্টেটে। ৬৫ বছর বয়স হলে যারা সরকারি মাসোহারা পায়, কিংবা যাদের পুঁজির অভাব নেই—তারাও আসে। উত্তর দেশে তুষারপাত ঘটতে থাকলে ঠাণ্ডায় যারা কষ্ট পায়, তারাও এই দক্ষিণ সমুদ্রতীরের বসন্তের হাওয়ায় এসে জায়গা নেয়। ফ্লোরিডা বিভিন্ন ফলের জন্য প্রসিদ্ধ। আম জাম কাঁঠাল নারকেল তরমুজ কলা,—এদিকে অজস্র। আঙুর আনারস যেখানে সেখানে। দুধ মাখন সব্জি কত খাবে খাও। চাল ডাল আটা ময়দা তেল ঘি—যত চাও। চালের মধ্যে একটিমাত্র কাঁকর খুঁজে বার করতে পারলে এক ডলার বকশিস। শ্রেষ্ঠ রান্নার তেল ওয়েসেন্ বা ক্রিসকো। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম আমেরিকায় এসে খাঁটি সরষের তেলের রান্না খেলুম।

ট্যাম্পা থেকে 'অরল্যাণ্ডো' মোটামুটি একশ' মাইল পথ। চড়া রোদ্রের ভিতর দিয়ে হাইওয়ে ধরে সেই সুপ্রশস্ত মসৃণ পথ চলে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে, অর্থাৎ মেক্সিকো উপসাগরের দিক থেকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দিকে। দুই ধারে বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান। কোথাও বড় বড় পাহাড়ি ময়দানের মাটি খুঁড়ে ফসফেট্ তোলার কাজ চলছে। মাঝে মাঝে দুইধারে মাইলের পর মাইল ধরে কমলালেবুর বাগান। কোথাও বা ফ্রিওয়ে পথের এপার থেকে ওপারে চলে যাচ্ছে। শেষের দিকে একটি ফ্রিওয়ে ধরে আমাদের গাড়ি চললো জগদ্বিখ্যাত ওয়াল্ট ডিজ্নে সাহেবের সর্বাধুনিক জাদু জগতে। এটি সমগ্র পৃথিবীবাসীদের আকর্ষণের ক্ষেত্র।

একদা মিকি-মাউসের অ-বাক ও স-বাক অভিনয়-চিত্র আবিষ্কার করে যিনি মানবসমাজকে চমৎকৃত করেন, তাঁর শেষ জীবনের এটি দ্বিতীয় অবিনশ্বর কীর্তিভূমি। এটি মাত্র চার বছর আগে খোলা হয়েছে এবং এটি শেষ করেই তাঁর জীবনান্ত ঘটে। ক্যালিফর্নিয়ার ডিজনে ল্যাণ্ড এর কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

আজ রবিবার, ছুটির দিন। শত-সহস্র নরনারী, বালক-বালিকা ও শিশু বিমানযোগেও এসে পৌঁছেছে। প্রত্যেক টিকিটের দাম ৮ ডলার ২৫ সেণ্ট। একটি উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, তিনটে বৃহৎ ময়দান জুড়ে অন্ততঃ ৪০ থেকে ৫০ হাজার মোটর পার্কিং করা। দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে বড় বড় জলাশয়—স্টীমার চলছে দু-তিনটি। এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে ডিজ্নেল্যাণ্ড ভিন্ন আর কোথাও কিছু নেই, চারিদিক বন বাগান ঘেরা। শুনেছি প্রত্যেক ছুটির দিনে এই জাদুশহরের অর্থভাণ্ডারে কমবেশি দশ লক্ষ

[illegible]লার জমা পড়ে। এই নগরে দোকান, হোটেল, মনোহারী, ফটোগ্রাফী, কিউরিয়ো শপ, নৌকা, স্টীমার, ঘোড়ার ট্রাম, এমনকি বাদাম-চানাচুর-কোকা কোলার ছোট ছোট দোকানগুলিও এদের নিজস্ব। উপার্জনের পন্থা সংখ্যাতীত।

প্রথমেই আমাদেরকে নিয়ে চললো এক-খানা 'মনোরেল' একটি-মাত্র রেখায়িত লাইন ধরে প্রায় মাইল দুই অবধি। এটি নিজের থেকেই চলে ও থামে—সময়টি বাঁধা। অতঃপর আমরা এক মস্ত শহরের এক প্লাটফরমে নামলুম। প্রথম যেখানে গিয়ে ঢুকলুম সেখানে দেওয়ালের ভিতর থেকে এক ভালুক, বড় একটা পাহাড়ি হরিণ ও বাইসন—এরা হাসিমুখে মানুষের ভাষায় আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালো! স্টেজের ওপরে একটি বন। ও অতিকায় জন্তু গান গেয়ে ল্যাজ নেড়ে বনের দিকে চলে গেল। একটি তরুণী নর্তকী নাচ দেখাল। এর পর একটি অপেরা নাটক আরম্ভ হল এবং জনৈক সূত্রধার সেটি আমাদেরকে বিশেষ অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা বোঝাতে লাগল। গায়ক, বাদক, অভিনেতা ও অভিনেত্রী—যে যার কাজ করে চলেছে মঞ্চের উপর। দেওয়ালের মধ্য থেকে গলা বাড়িয়ে বাইসন বলছে, আমাদের এই অনুষ্ঠানে অনেক ত্রুটি থেকে যাচ্ছে, আপনারা নিজগুণে মার্জনা করবেন। বলা বাহুল্য, এইসব মানুষ ও জন্তু কেউই বাস্তব নয়!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। আমরা হতবাক।

দুশ' বছরের যুক্তরাষ্ট্রে যতজন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাঁদের নিয়ে মস্ত সভা বসেছে। জর্জ ওয়াশিংটন বক্তৃতা করছেন। হাততালি পড়ছে সভা-স্থলে। অব্রাহাম লিংকন থেকে একালের রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, আইজেনহাওয়ার, জন কেনেডি—একে একে সবাই এসে আসন নিচ্ছেন। না, কেউ জীবন্ত পুতুল নয়, যেন সবাই সহজ স্বাভাবিক 'মানুষ!' একে একে সবাই বক্তৃতা করছেন। কেউ কলের পুতুল নয়, পরস্পর কথা বলছেন, গল্প করছেন,—এবং আমরা শুনছি। উনি কে এসে ঢুকলেন? হ্যাঁ, উনিই ত' নিক্সন্! কার সঙ্গে যেন হ্যান্ডশেক করলেন। কে একজন এগিয়ে এসে ওঁ'র বুক পকেটে গোলাপ ফুল গুঁজে দিয়ে কৃতার্থ হল!—আমরা স্তম্ভিত, অভিভূত।

একটির পর একটি জাদুজগতে প্রবেশ করছিলুম। একটি হলের তলার দিকে নৌকায় উঠলুম। প্রবেশ করলুম এক অন্ধকার রূপলোকে, সেখানে জ্যোৎস্না ও তারকাখচিত আকাশ। চারিদিক থেকে পৃথিবীর সব দেশের সুসজ্জিতা নর্তকীরা এক-এক দলে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে,—ভারতের রাজস্থানী নর্তকীরাও বাদ যায়নি। সেই নৌকা অন্ধকার সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে আহত-প্রতিহত হয়ে ডুবে গেল। সজাগ হয়ে দেখলুম, আমরা জীবিত। ভৌতিক মায়া-লোক থেকে যেন বেঁচে ফিরে এলুম!

একটি গৃহস্থের ঘরকন্না দেখছিলুম। উপার্জনশীল বড় ছেলে বাজার খরচের হিসাব নিয়ে বকাবকি করছে। মা রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। বাড়ির কর্তা পাইপ টানতে-টানতে ওধার থেকে ফোড়ন কাটছেন। এমন সময় কলেজ-পড়া ছোট ছেলের বান্ধবী কলরব করে ঢুকল। ছোট পিসি পশমের সোয়েটার বুনছিলেন। পায়ের কাছে পোষা কুকুরটা একবার মাথা তুলে ল্যাজ নেড়ে আবার শুলো। আবার ঘর গৃহস্থালীর নানাবিধ গল্পগুজব এবং বাজার দর নিয়ে সকলের মধ্যে আলোচনা উঠল। তরুণী মেয়েটা সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তরুণ যুবকটিকে ইশারায় ডেকে বাইরে নিয়ে গেল।

সমস্তটাই বাস্তব। কিন্তু সমস্তটাই মায়াময়। প্রত্যেকটি দৃশ্য আমাদেরকে নির্বোধ, মূঢ়, এবং বিস্ময়াহত ক'রে চলেছে। সারাদিন ধরে এক বিস্ময় থেকে অন্য বিস্ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম।

পরে শুনেছিলুম সর্বাধুনিক কম-পিউটরের সাহায্যে এগুলি ঘটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একালের পাপেট-শো এর কাছে কিছু নয়। এমন করে নিজেকেও আর কোনওদিন 'অবাস্তব' মনে হয়নি।

পরদিন ৭ জুলাই। ফ্লোরিডার অপর একটি নতুন শহরের দিকে যাচ্ছিলুম—ট্যাম্পা থেকে ৫০ মাইল দূরে। এখানে সমুদ্রের উপর দিয়ে একটি দশ মাইল লম্বা প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করা হয়েছে মানুষের অভাবনীয় কায়িক কর্মশক্তির দ্বারা। সেই পথ ও মহাসমুদ্রের উপর সাঁকো পার হয়ে চললুম ঝকঝকে এক শহরে। অতঃপর সমুদ্রের তীর ধরে যেখানে পৌঁছলুম, সেটি পেঙ্গুইন পাখির দেশ। সমুদ্রের উপরে ঝাঁকে-ঝাঁকে পেঙ্গুইনরা উড়ছে এবং দল বেঁধে জলের উপর ভাসছে মাছের লোভে। এখানে অজস্র মাছ। ট্যাংরা, পার্সে, বাটা, বাগদা, যার যত ইচ্ছে তীরে বসে ছিপ ফেলে ধরছে। বহুস্থলে ক্যাম্পিং করার ব্যবস্থা, কথায় কথায় রেস্টুরেন্ট। টিনের কৌটো খুলে সব বয়সের মেয়েপুরুষ 'কোক' (কোকাকোলা) গিলছে। মাথার উপরে আতপ্ত রৌদ্র যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমরা এবার ফিরলুম।

এক শহর অন্য শহরের অনুকরণ মাত্র। ঐশ্বর্য ও সম্পদ, প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য, মানুষের সগৌরব কীর্তিকলাপ—সবগুলো মিলে এক সময় যেন মানসিক ক্লান্তি আনে।

দিন তিনেক পরে এসে পৌঁছলুম ৩৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 'মায়ামি' (Miami) শহরে। এটি একেবারে উন্মুক্ত আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। যেমন আমাদের কেরালার দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের তীরে 'কোবালম বীচ।' তবে এ অঞ্চল পার্বত্য উপত্যকা নয়। এটি সমতল। মায়ামি এক বিশাল শহর। এটি আবার অন্যদিকে এক প্রতিরক্ষার ঘাঁটিও বটে। অদূরে কিউবা,—সেটি কম্যুনিস্ট দেশ। কে জানে ক্যাস্ট্রো সাহেবের মনে কী আছে! প্রস্তুত থাকা ভালো। সে যাই হোক, আমি মায়ামির বড় বড় হোটেল-অট্টালিকা, বুড়ো-বুড়িদের গল্পের আসর বা বাজার-হাট দেখতে আসিনি। সুতরাং আমার পক্ষে ২৪ ঘণ্টাই যথেষ্ট। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

পরদিন মেক্সিকো সাগরের উত্তর পথ ধরে জর্জিয়া, আলাবামা, লুইজিয়ানা ও টেক্সাসের পথে পাড়ি দিলুম। কানাডা থেকে বেরিয়ে এ পর্যন্ত কমবেশি ৪ হাজার মাইল দক্ষিণে ঘুরে এসেছি। আমার পথ এখনও বহুদূরে।

॥ আটত্রিশ ॥

শেয়ালদা থেকে রেলগাড়িতে রাণাঘাটের কয়েকটা আগের স্টেশন পালপাড়া। সব লোকাল দাঁড়ায় না সেখানে। সময় দাঁড়িয়ে থাকে। অথবা খুব ধীরে ধীরে হাঁটে নাম-না জানা রিফিউজি কলোনীতে গোবিন্দর বাবা আছেন। তাঁরও নাম আমার জানা নেই, বউ। কলেজে থাকতে লোকমুখে শুনেছিলুম, উনি যজমানীগিরি করেন। মাঝে-মধ্যে ন' মাসে ছ' মাসে হঠাৎ হয়তো ছেলের কাছে আসতেন। কি কারণে, কেউ জানি না আমরা। প্রায় খালি গা। শীর্ণ শরীরে পৈতে। বাবা ও ছেলের গায়ের রং একই প্যালেটে গোলা হয়ে থাকবে। ভদ্রলোকের বয়েস কম করেও পঞ্চান্ন-ষাট। মাথায় ছোটো ছোটো চুল ধবধবে সাদা। প্রথম দিন দেখে আমরা বলাবলি করেছিলুম, 'বিসর্জনে' সমীর চৌধুরীর বদলে গোবিন্দর বাবাকে পেলে 'রঘুপতি' জবযর হতো!

ছেলেকে শুধু দেখতেই আসতেন বোধহয়। কারণ, না উনি পারতেন গোবিন্দকে সাহায্য করতে, না পারত গোবিন্দ ওর বাবাকে কিছু দিতে। ছাত্র তো অসাধারণ ভালো কিছু ছিল না গোবিন্দ। টিউশনি করতো এক-আধটা। থাকতো হস্টেলে। রাতের খাবার ওখানে বাঁধা। 'মেয়ে-ন্যাকড়া' গোবিন্দর দিনের টিফিন জুটে যেত মেয়েদের সঙ্গে থেকে থেকে। ফাই-ফরমাশ খেটে।

—"গোবিন্দ, জিওলজিক্যাল সার্ভের ক্যান্টিন থেকে একটা সাদা ডোসা এনে দেবে, লক্ষ্মীটি!"

—"যাচ্ছিসই যখন, দুটো ইডলিও নিয়ে আয় না ভাই আমার জন্যে! এই নে পয়সা। চাটনি আনিস কিন্তু!"

এটা সেটা ওদের এনে দিত গোবিন্দ। 'না' বলত না। পোরুষে লাগত না ওর। দুপুরের টিফিন হয়ে যেত। আমরা জগাদার ক্যান্টিনে টেবিল চাপড়ে, কচুরি চিবিয়ে ওকে বলতুম, 'মেয়ে-ন্যাকড়া'।

দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে ওর গলা,

—"দাঁড়াও, খুলছি।"

খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ। দরজা খুলতেই দেখি লুঙ্গি এবং তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে গোবিন্দ। জিগ্যেস করল,

—"কি ব্যাপার? এতো রাত্রে!"

ঘরে কেউ নেই। মানে, মিশেল নেই। দ্রুত গম্ভীর গলায় জানাতে চাইলুম,

—"মিশেল কোথায়?"

আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ও সাদরে অভ্যর্থনা জানালো,

—"এসো। ভেতরে এসো।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমার পুনরুক্তি,

—"মিশেল কোথায়?"

নিতান্তই আবেগহীন গলায় গোবিন্দ বলল,

—"মিশেলের খবর তো এখন আর আমার জানার কথা নয়!"

তখনো মনে মনে খানিকটা রেগে আছি। মিশেলের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় রাগ। রুক্ষ জবাব ছুঁড়ে দিলুম,

—"তোমার ওই বাঁকা উত্তর শুনতে আমি এখানে আসিনি। মিশেল কোথায়?"

খাটে বসে পড়ল। পাশের জায়গা চাপড়ে বলল,

—"বোসো তো আগে!"

দাঁড়িয়েই রইলুম। ও আবার বললে,

—"মিশেল কোথায় আমি কি করে জানবো! ও তো তোমার কাছে এসেছিল।"

ওর কথায় রাগ চড়তেই মনে পড়ল, মিশেল সম্পর্কে ও আমায় কি যেন বলছিল ক্যান্টিনে। কাজ করতে করতে ছাড়া-ছাড়া আবছা দু একটা সংলাপ। মনে পড়লুম। বললুম,

—"তুমি ক্যান্টিনের কাউন্টার বন্ধ করবার সময় মিশেল ছিল। আমি ফিরে এসে দেখি, 'বুমে' ও নেই।"

গোবিন্দ ঝকঝকে হাসল। বলল,

—"তার মানেই কি মেয়েটির খবর আমি জানি!"

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই আবার বললে,

—"এক মিনিট! আগে বলো, একটু

জিন খাবে কিনা! তুমি তখন বীয়ার খাওয়ালে। ভাবলুম, কাউণ্টার বন্ধ করবার আগে একটা বীয়ার আমিও তোমায় খাইয়ে দেব।"

হেসে ফেললুম,

—"শোধ-বোধ বলছো!"

দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো আলমারি খুলে জিনের বোতল বের করল। হেসে ফেলল গোবিন্দও। বলল,

—"তা ঠিক নয়। তবে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তার থেকে মনোমালিন্য। কাউণ্টারে কাজ করতে করতে সেই 'আড়ি' ব্যাপারটি ভেঙে গেছে তো! তাই—"

আধ বোতলের একটু কম জিন আছে। দুটো গেলাসে ঢালা হল। গোবিন্দ উঠে গিয়ে বেসিনের জল মিশিয়ে একটা গেলাস আমায় দিল। বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার মতো না হলেও, নেশা আমার হয়েছে। চুমুক দিয়ে বললুম,

—"প্রথমে বীয়ার, তার ওপর হুইস্কি। হুইস্কির পেছন পেছন এখন আবার জিন দৌড়োলো—কাল সকালে যে কি অবস্থা হবে!"

গোবিন্দ বললে,

—"কিসসু হবে না! তাছাড়া আমার কাছে রাজ্যের ওষুধ আছে. মাথা ধরার ওষুধও পাওয়া যাবে। দুটো নিয়ে যেও। সকালে হ্যাংওভার হলে—"

হেসেই বলে ফেললুম,

—"হ্যাঁ, তোমার ওষুধ নিয়ে যাই, আবার তুমি প্যারিসসুদ্ধ লোককে বলে বেড়াও যে, আমাকে ওষুধ দিয়ে 'হেল্প' করেছো!"

এই মুহূর্তে ওকে ঠিক খোঁচা দেবার জন্যে বলিনি। আলগোছে জিভ বেয়ে বেরিয়ে গেছে। বলে ফেলেই একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলুম। নিজের কানেই খারাপ লাগল। এই নিয়ে তো ওকে যথেষ্ট অপমান করেছি সেদিন। আবার কেন? মিশেলকে কোথাও খুঁজে পেতে না পেয়ে বিরক্তিটা কি গোবিন্দর মুখেই ছুঁড়ে দিলুম! অন্য যে কেউ থাকলে হয়তো সেই ব্যক্তিরই কোনো জানা দুর্বলতায় খোঁচা দিতুম। পুরোপুরি ইচ্ছে করে অথবা জেনেশুনে ওকে লজ্জিত করবার জন্যে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি বোধ হয় মিশেলের সঙ্গ না পেয়ে। দেখা যখন আমার সঙ্গেই করতে এসেছিল মেয়েটি, তখন থাকাও উচিত ছিল ওর আমার কাছেই। অথবা ওর সেই গরিবের মতো ভীত চেহারা, ভিক্ষুকের মতো দীন মুখটিই আমাকে আঘাত করছে। সামনে না থেকেও যেন বলছে,

—"কেন তুমি আমায় না বলে উধাও হয়ে গেলে? আমার কাছে তো একটা পাঁউরুটি খাবার মতো পয়সাও আজ ছিল না, তুমি জানতে। তুমি যদি আমাকে বলে যেতে ইণ্ডিয়ান, তাহলে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতুম—" ভাবতে ভাবতে ভয় পেলুম হঠাৎ! গোবিন্দর ঘরে যখন নেই তখন অভুক্ত ভীত মেয়েটি কি একা একাই অত রাতে বাড়ি ফিরে গেছে? পথে আলজেরিয়ান থাকতে পারে। থাকতে পারে নয়, থাকেই। মাতাল পুরুষরাও মাঝরাতে দানবের মতো যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়। কোনো বিপদে পড়ল না তো?

চোখের সামনে একটা আহত পশুর মুখ। আহত কালো একটা পশুর মতো দুঃখিত মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে গোবিন্দ। অন্ধকার মুখে দুটি সাদা চোখ আমাকে দেখছে, যেন কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। মাথার দুপাশে, কানের ঠিক ওপরে অল্প অল্প ধূসর চুল। হাঁ-মুখের সামান্য ফাঁকে গভীরতর অন্ধকার।

যে কথাকটি বলা হয়ে গেছে বা বলে ফেলেছি, তাদের আর গিলে ফেলবার কোনো উপায় নেই, বউ। ঠিক ঠিকানা লেখা ভুল চিঠি ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি অসহায় লাগে। সরি, আমি কিছু 'মীন' করে বলিনি—এসব কথাও তখন অর্থহীন মনে হয়। লজ্জা লজ্জা করে। নিজেকে গুছিয়ে তোলবার আগেই দেখি, গোবিন্দ ছোট একটি ঢোক গিলে অল্প হাসল। দেখলেই বোঝা যায় নকল হাসি। অথবা ক্ষমার হাসি। অথবা আমি যেন কৃপার পাত্র, ভুল করে ফেলেছি, তাই অবজ্ঞার হাসি। ভীষণ কালো মেঘের ভিতর থেকে এক ঝলক বাঁকাচোরা বিদ্যুতের মতো।

—"গোবিন্দ, মানে, আমি ঠিক—"

ও বাধা দিল। বলল,

—"ঠিক আছে, ভাই। কোনো অসুবিধে নেই। কারো ওপরেই আমার আর রাগ-টাগ নেই বিশেষ। তোমার ওপরেও নয়। থাকলে ঠিক সেদিন যেমন তোমার ঘরে যেতে তুমি আমায় অপমান করেছিলে মেয়ে দুটির সামনে, ঠিক তেমনি আমি এখন ঝগড়া বা মারামারি করে ফেলতুম। হয়তো তোমার চেয়ে আমি দুর্বল। তবু দুচারদিন আগের ব্যাপার হলে প্রথম ঘুষিটা অন্তত তোমার চোয়ালে বা নাকেই পড়তো আজ।"

ম্লান হাসিমুখেই বলল কথাগুলো। আমি দুঃখিত গলায় জানালুম,

—"ভেবেচিন্তে কিছু বলিনি। অমনি বেরিয়ে গেছে। সরি।'

আমার কথা বিশ্বাস করুক বা না করুক, ও হাসছে। আবার বললুম, ঝোঁকের মাথায় নয়, খানিকটা অপরাধীর মতো,

—"আমি দুহাত তুলে দাঁড়াচ্ছি। একটা ঘুষি তুমি আমার চোয়ালে মারতে পারো! আমি আপত্তি করব না।"

সত্যি সত্যিই সেই মুহূর্তে ও একটা ঘুষি মারলে মারামারি হতো না। অনিচ্ছায় আঘাত করে ফেলেছি, সেই 'আড়িটাড়ি' ভেঙে যাবার পরেও, তাতেই সেণ্টিমেণ্ট বা মানসিকতা অথবা অন্যায়বোধ এবং এই অবস্থাটি ঝেড়ে ফেলতে পারলে খানিকটা হালকা কিংবা আবার সমাম সমান হওয়া যায়—এইসব জটপাকানো চিন্তা থেকে ওকে বলে দিলুম।

চুপ করে আছে গোবিন্দ। এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। দেওয়াল-আলমারি খুলে কৌটো বের করল একটা। কফির কৌটো। এক মুঠো কফি হাতে নিয়ে এগিয়ে এল আমার কাছে। বলল,

—"খাবে?"

না। কফি নয়। খালি কৌটোয় গোল-মরিচ। কালো কালো মুঠো ভর্তি।

অবাক হয়ে জিগ্যেস করলুম,

—"কি হবে খেয়ে?"

ওর জবাব,

—"কিছুই না। খাবার [illegible], খাওয়া। জিভ, গলা জ্বালিয়ে বুক বেয়ে নেমে যাবে। দারুণ!"

—"পেলে কোথায়?"

—"সুপার মার্কেতে পাওয়া যায়। চাখবে?"

ওর হাত থেকে একটা গোলমরিচ তুলে মুখে দিলুম। ঝাঁঝ লাগল। ঝালও। মদের সঙ্গে ঝাল খেতে ভালোই লাগে। ঝাল বা নোনতা। দেশে 'বাংলা' খেতে গেলে কখনো কখনো কাঁচালঙ্কা চিবিয়ে খেতুম। অথবা, কাঁচা পেঁয়াজ। কিছুই না পেলে, নস্যির মতো এক টিপ নুনেও এক পাঁইট বাংলা নেমে যেত গলা বেয়ে।

মুঠোভর্তি গোলমরিচ একবারে কাউকে মুখে পুরতে দেখেছো, বউ? খালি গোল-মরিচ! সঙ্গে কিছু নেই! মুখে দিয়ে বেশ তৃপ্তি করে চিবোতে লাগল গোবিন্দ।

জবেনান এবং আমামের এক-অখটা 'উ' 'আঃ' শব্দ।

ওর চোয়াল নড়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পুরোনো গোবিন্দকে মনে পড়ে গেল। মেয়ে-ন্যাকড়া গোবিন্দ। কলেজের ক্যান্টিন বলতে জগাদার ক্যান্টিন। ক্যান্টিনের রান্নাঘরের পাশে এক ফালি উঠোন। সেখান থেকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে মেয়েরা ওপর তলায় উঠে যেত। অর্ডার দিত টেবিলে বসে। টেবিল-বেঞ্চি পাতা ক্যান্টিন ঘরের ভীড় এড়াতে মাঝেমধ্যে আমরা সেই এক ফালি উঠোনে চলে যেতুম।

বসবার চেয়ার-টেয়ার কিছু থাকতো না বলেই, কাঠের বাক্সে বসে চা খাচ্ছিলুম করুণাময়ের সঙ্গে। প্লেটে ঢেলে আদ্ধেকটা চা এক চুমুকে শেষ। চারমিনার ধরাচ্ছিলুম। তখনই, স্পষ্ট মনে পড়ছে, গোবিন্দ এসেছিল। সঙ্গে ক্রাফ্ট সেকশনের দুটি মেয়ে। ভারতী বা জগদম্বা—যা খুশি নাম হতে পারে ওদের। যেহেতু, গোবিন্দকে আমরা বিশেষ পাত্তা দিতুম না, তাই গভীর আলোচনায় মেতে ছিলুম দুজনে, অবশ্যই, ভারতী বা জগদম্বাদের এক পলক দেখে নিয়ে।

ওরা তিনজন বোধ হয় ঘুগনি-টুগনি কিছু খেয়েছিল। খেয়ে, মেয়ে দুটি একটু এগিয়ে যেতেই গোবিন্দর গলা,—জগাদা, দুচামচ গুঁড়ো দিন।

দরজার পাশে, উনুনের সামনে বসে জগাদা রান্নায় ব্যস্ত। ভালো করে তাকিয়ে, দেখেছিলুম, চামচ-টামচ নয়, এক মুঠো শুকনো লংকার লাল গুঁড়ো গোবিন্দর হাতে দিয়েছিল জগাদা। ঠিক আজকের মতো চানাচুর খাবার ভঙ্গিতে সেই গুঁড়ো লংকা চিবোতে চিবোতে মেয়ে দুটির সঙ্গে চলে গিয়েছিল গোবিন্দ। জগাদার কাছে হাত পেতে চাওয়ার ধরনে মনে হয়েছিল, ও এমনি লংকার গুঁড়ো প্রায়ই চেয়ে খেত। করুণাময় আর আমি হাসাহাসি করেছিলুম, মনে আছে।

গোবিন্দ আমার ভাবনার খবর জানে না। গোলমরিচ চিবিয়ে বলল,

—সেদিন সন্ধেবেলা মিশেল ওর এক বান্ধবীকে নিয়ে এসেছিল ঘরে। ওদের চা এনে দিতে না দিতেই একোলের চার বন্ধুও এসে হাজির। প্রায় একই সঙ্গে আমার হাসপাতালের সিস্টার—'

বলতে গিয়ে থেমে গেল। থেমে, বোকার মতো তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

বলে ফেললুম,

—"তোমার হাসপাতাল মানে? ঠিক বুঝলুম না, গোবিন্দ!"

ও সামলে নিয়েছে তৎক্ষণে। বলল,

—"আমার, মানে, এখানকার হাসপাতাল। আমাকে প্রায়ই যেতে হয় কিনা—"

কি যেন বলতে চাইছে না গোবিন্দ। ওর ফুসফুস বা ক্ষুদ্র অন্ত্রে কি সব জটিল রোগ আছে, বলেছিল। চিকিৎসাও করাচ্ছে, জানতুম। কিন্তু, এর মধ্যে লুকোবার কি থাকতে পারে, কে জানে? নতুন কোনো জটিলতা! না কোনো গোপন অসুখ।

কিছু জিগ্যেস করবার আগেই কথা ঘুরিয়ে দিল,

—"যা বলছিলুম। আমার ঘরে ছটা গেলাস আর চারজোড়া কাপডিস ছিল। দুদিন আগেই তোমাকে আমি গেলাস আর এক জোড়া কাপডিশ দিয়েছিলুম। একোলের বন্ধুদের সামনে প্রেস্টিজের ব্যাপার। তাছাড়া, মিশেলের সেই বান্ধবীও সেদিন প্রথম এসেছিল ঘরে। গেলাসে চা দিতে একটু লজ্জা-লজ্জাই করছিল। আসলে, সেই লজ্জা ঢাকতে বলে ফেলেছিলুম যে এক পুরনো বন্ধুকে কাপডিশ, গেলাশ আর হীটারটা ধার দিয়েছি। কথার পিঠেই বলে ফেলেছি। মিশেলের বান্ধবীটি আবার এখানকার দু চারজনকে ভালো করেই চেনে। ওর কাছ থেকেই সম্ভবত মেজোঁর বাসিন্দারা তোমার খবর এবং সেই সঙ্গে টিপ্পনী-সমেত আমার ঘরে চায়ের কাপ কম থাকার কথা শুনে থাকবে।"

চুপ করে শুনেছিলুম। ও সামান্য থেমে এক চুমুকে জিন খেয়ে নিল। তারপর বলল,

"তোমাকে ছোট করবার ইচ্ছে আমার সেদিনও ছিল না, এখনো নেই। তবু, সেই পুরনো গ্রুটিটুকু নিয়ে তুমি যদি আবার আমাকে লজ্জা দিতে বা অপমান করতে চাও তো কর!"

বলে, ম্লান হাসল,

—"আমার আর কিছুই যায় আসে না।"

হতাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টালে শেষ কথা কটির সঙ্গে মানিয়ে যেত। তা না করে, খুব নিস্পৃহ গলায়, ক্লাসের সব পড়া-জানা বাধ্য ছাত্রের মতো কেটে কেটে উচ্চারণ করল।

আবার বললুম,

—"ঠিক আছে, বাপু! বললুমই, ইচ্ছে করে জেনেশুনে বলিনি এখন! চাও তো একটা ঘুষি মারো চোয়ালে—" বলে মুখটা ওর দিকে এগিয়ে দিলুম।

টেবিলের কাছে বসেছিল। আর একটু জিন ঢেলে, গেলাস হাতে উঠে দাঁড়াল। শব্দ করে হাসছিল। জল আনতে বোধ হয় বেসিনের দিকে এগোচ্ছিল, ঠিক তখনই ঘটনাটা হল।

পেটে অথবা বুকে হাত চেপে ঝুঁকে পড়ল গোবিন্দ। গেলাসটা ওর হাত থেকে ছিটকে পড়ল, ভাঙল না। পানীয়টুকু ভিজিয়ে দিল মেঝে এবং কার্পেটের খানিকটা। ভয় পাইয়ে দেবার মতো বীভৎস একটা গোঙানির আওয়াজ তুলে গোবিন্দর কালো শরীর দুমড়ে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল। দু হাতে বুক এবং পেট চেপে আছে। মাথাটা দুই হাটুর হাঁড়িকাঠে যেন পিষে যাচ্ছে। কি এক ভীষণ যন্ত্রণার একটানা অসহ্য শব্দ ছোটো ঘরটুকুর ভিতরে আবদ্ধ পশুর মতো আছড়ে পড়ছে। ঘুরছে চক্রাকারে। মেজোঁর বিয়াল্লিশ নম্বর চেম্বারের দেওয়ালে দেওয়ালে।

ক্রমশ

"ও পাঁচটা দিন আমি সকলকে এড়িয়ে চলতাম
এখন পেয়েছি 'কেয়ারফ্রী'– মাসে গোটা ৩০ দিনই এখন আমি নিশ্চিন্ত।"
নতুন "কেয়ারফ্রী" স্যানিটারী ন্যাপকিন আর সেই সঙ্গে ওয়াটারর‍্যাপ স্ত্রীলোকদের শরীর পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ, পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখে।
মাসে পাঁচ দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। সে প্রয়োজন মেটাতে আপনি এখন পাচ্ছেন "কেয়ারফ্রী"।
অদ্ভুত ওয়াটারর‍্যাপ সব জলীয় পদার্থ ভেতরের স্তরের মধ্যে টেনে নেয় নিমেষে। তাই আপনার গায়ের ত্বক শুকনো ঝরঝরে থাকে আর কোন অস্বস্তিও বোধ হয় না।
একমাত্র "কেয়ারফ্রী" এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যা সব জলীয় পদার্থ সারা ন্যাপকিনের ভেতরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। তাই ন্যাপকিনের এক জায়গায় সব জমে থাকে না। নীল রঙের একটি রক্ষা কবচ এর পুরো তলা আর দু'পাশ ঘিরে থাকে। তাই আপনার কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।
"কেয়ারফ্রী" ফেলে দিতেও কোন অসুবিধা নেই— বাথরুমে ফেলে দিয়ে জল ঢেলে দিলেই সব অদৃশ্য। বাইরে কাজে বেরুলে কিম্বা বেড়াতে গেলে আর কোন চিন্তার কারণ নেই আপনার।
তাছাড়া "কেয়ারফ্রী" আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিক ক'রে খাপ খাইয়ে পরে নিতে পারবেন। এই সঙ্গে প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে একটি "কেয়ারফ্রী" বেল্ট।
এখন আপনি মাসে গোটা ৩০ দিনই নিশ্চিন্ত
এখন নতুন ধরনের ছোট প্যাকের মধ্যে
তাছাড়া, যেসমস্ত মহিলাদের পছন্দ বিশেষ ধরনের তাঁদের জন্য নতুন লাক্সারী অ্যাডজাস্টেবল বেল্টও আলাদাভাবে পাওয়া যায়। কেয়ার ফ্রী স্যানিটারী ন্যাপকিন যে দোকানে বিক্রী হয় সেখানে এটিও পাবেন।
Carefree
জনসন অ্যাণ্ড জনসন একমাত্র স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার জন্যে
• Trade Mark © Johnson & Johnson India Ltd.

অ্যাপলো সয়ুজ মিলনের বিভিন্ন পর্যায়

বিশ্ব বিজ্ঞান

অ্যাপলো-সয়ুজ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে

Man will not remain on earth forever, but in quest of light and space he will emerge beyond the limits of the atmosphere, at first tentatively, and later to conquer for himself the whole of the space surrounding the sun.—Tsiolkovsky.

হ্যাঁ, সব কিছুই নিখুঁত কর্মসূচী অনুযায়ী শেষ হয়েছে। কথা ছিল মহাকাশ গবেষণা নিয়ে নিছক আর প্রতিযোগিতা নয়, দরকার পারস্পরিক প্রয়োজনে পারস্পরিক সহযোগিতা। বলা বাহুল্য, এ নিয়ে প্রথম কথাবার্তা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় তেরো বছর আগে। ১৯৬২-র জুন মাসে। কথা বলেছিলেন মার্কিন দেশের ন্যাশনাল এরোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সংক্ষেপে নাসা-র উপ-প্রশাসক স্বর্গত ডঃ হানা এল ড্রাইডেন এবং সোভিয়েত আকাদেমিসিয়ান আনাতোলি এ. ব্লাগোরাভোভ। ফল, উভয় দেশের মধ্যে মহাকাশ গবেষণা সম্পর্কীয় প্রথম চুক্তির সম্পাদন। এই চুক্তিতে ঠিক হয়, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তাঁরা আবহাওয়া সম্পর্কিত যে সব তথ্য সংগ্রহ করবেন সে সব তথ্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা হবে। তাঁরা পরস্পর মিলে-মিশে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের একটি পরিপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য মানচিত্র তৈরি করবেন। এবং এই সঙ্গে চালানো হবে দুই দেশের কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বার্তা-বিনিময়।

ড্রাইডেন এবং ব্লাগোরাভোভের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনার ফলশ্রুতি হিসেবে সম্পাদিত হল আরও একটি চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী তাঁরা জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক গবেষণার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে কাজ শুরু করলেন।

এরপর ১৯৬৯-এ উভয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে এলেন। ঠিক হল, শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। কথা উঠল, দুই দেশের মানব-আরোহীযুক্ত মহাকাশযানের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে মহাকাশে দুই দেশের মানুষ সমবেতভাবে যুক্তে গবেষণার কাজ চালাতে পারে সে-ব্যাপারে চেষ্টা করলে কেমন হয়! এ নিয়ে নাসার মুখ্য প্রশাসক ডঃ টমাস ও পাইন এবং সোভিয়েত আকাদেমির সভাপতি এম ভি কেলদিস ও আকাদেমিসিয়ান ব্লাগোরাভোভ পরস্পর আলোচনা করলেন। বলা বাহুল্য, এবারও উভয়ে রাজী।

রাজী হলেন। কিন্তু বাস্তব সমস্যার কি হবে? কারণ, মার্কিন দেশ এতদিন নিজের পরিকল্পনামত মহাকাশযান তৈরি করেছে। সেই সব মহাকাশযানের পরিকল্পনা এবং পরিচালন-ব্যবস্থা সোভিয়েত দেশের থেকে ভিন্নতর। বড় লাইন এবং ছোট লাইনের রেলগাড়িকে যেমন এক সঙ্গে জোড়া যায় না, কারণ তাদের মাপ-জোক এবং ব্যবস্থাপনার মধ্যে কিছুটা গরমিল থাকে, ঠিক তেমনি এই একই কারণে সোভিয়েত এবং মার্কিন মহাকাশযানের মধ্যে জোড় বাঁধানো সম্ভব নয়।

অর্থাৎ সমস্যা দাঁড়াল মহাকাশ প্রযুক্তিকে নিয়ে।

এবার শুরু হল দু দেশের বিজ্ঞানী-দের একের পর এক বৈঠক। ঠিক হল, মার্কিন দেশ এই গবেষণার কাজে ব্যবহার করবেন অ্যাপলো মহাকাশযান। এই যানের যাত্রী হবেন তিনজন : টমাস পি স্ট্যাফোর্ড—ইনি অধিনায়ক হিসেবে কাজ করবেন, ভানস দ্য ভো ব্রানড'এর ওপর থাকবে কমান্ড মড্যুল পরিচালনার দায়িত্ব, এবং ডোনাল্ড কে. স্লেটন—এ'র দায়িত্বে থাকবে ডকিং মড্যুল বা উভয় যানের মধ্যে যাওয়া-আসা করার সুড়ঙ্গপথ। সোভিয়েত দেশ ঠিক করলেন, তাঁরা তাঁদের সয়ুজ-১৯ মহাকাশযানকে এ কাজে ব্যবহার করবেন। এবং ওই যানের অধিনায়ক হিসেবে কাজ করবেন শিল্পী নভোচর আলেকসি আরকিপোভিচ্ লিওনোভ। আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে থাকবেন ভ্যালেরি নিকোলাইয়েভিচ্ কুবাসোভ।
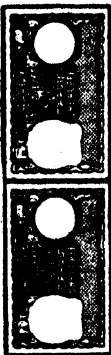
১৯৭০ থেকে ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসের মধ্যে যথেষ্ট হেরফের ঘটিয়ে দুটি দেশই তাঁদের মহাকাশযান দুটির কিছু কিছু ব্যবস্থায় এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করলেন যাতে ওই দুই মহাকাশযান মহাকাশে জোড় বাঁধতে কোনও বাধা না পায়। এ ছাড়া দুই মহকাশযানের ভিন্নতর আবহাওয়ার মধ্যে দু দেশের নভোচররা যাতে কোন অসুবিধে ভোগ না করে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন সে দিকও দৃষ্টি দেওয়া হল। সোভিয়েত দেশের নভোচর এবং মহাকাশযানকে মাটি থেকে যাঁরা বেতার সংকেতের সাহায্যে পরিচালনা করবেন তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে নিয়মিত অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেন। মার্কিন দেশের নভোচর বা পরিচালকরাও ওই একই কাজ সেরে এলেন সোভিয়েত দেশে গিয়ে।

কয়েকটি সমস্যাও দাঁড়াল।

যেমন অ্যাপলোর ভেতরকার আবহাওয়ার কথাই ধরুন। নভোচরদের শ্বাসকার্যের জন্যে এর মধ্যে পুরে দেওয়া হয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন—যার চাপ সাধারণ বায়ুচাপের চেয়ে অনেক কম। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পাঁচ পাউন্ড মাত্র। মার্কিন নভোচররা এ ধরনের আবহাওয়ার মধ্যেই কাজকর্ম চালাতে অভ্যস্ত। অথচ সোভিয়েত মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা মানব-আরোহীযুক্ত যে সব মহাকাশযান তৈরি করেন তার ভেতরে থাকে সাধারণ বাতাস। অর্থাৎ মুখ্যত নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণ। যার চাপও সাধারণ বাতাসেরই মত। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ১৪·৭ পাউন্ড। সয়ুজের নভোচররা এর মধ্যে বাস করতেই অভ্যস্ত। অর্থাৎ ওই ভাবেই তাঁদের শারীরিক অবস্থাকে তৈরি করা হয়েছে।

অতএব প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, সয়ুজের নভোচররা অ্যাপলোর মধ্যে গিয়ে সুস্থ থাকবেন কি করে? অ্যাপলোর নভোচররাও সয়ুজের মধ্যে গিয়ে অনুরূপ অবস্থায় পড়বেন। তখন অবস্থাটা দাঁড়াবে কেমন?

সমস্যাটি দূর করার জন্যে ও'রা ডকিং মড্যুলটিকে অভিনব এক পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি করলেন। ঠিক হল, ডকিং মড্যুলটি হবে চোঙের মত। লম্বায় প্রায় দশ ফুট। ব্যাস পাঁচ ফুট। এর অর্ধাংশ তৈরি করবেন মার্কিন মহাকাশ সংস্থা। বাকি অর্ধাংশ তৈরি করবেন সোভিয়েত দেশ। এক একটি অর্ধাংশে থাকবে দুটি করে দরজা।

দুটি অর্ধাংশের মধ্যেই রইল অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের আধার। মহাকাশে অর্ধাংশ দুটি জোড় বাঁধার পর অ্যাপলোর ডকিং মড্যুলের অর্ধাংশের মধ্যে যান্ত্রিক উপায়ে ওই দুটি আধার থেকে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন বের করে দিয়ে সেখানকার আবহাওয়া সয়ুজের ভেতরকার আবহাওয়ার অনুরূপ করে তুলবে। এরপর প্রথম পর্যায়ে স্ট্যাফোর্ড এবং স্লেটন এসে ঢুকবেন ওই অর্ধাংশের মধ্যে। এবং ওই আবহাওয়ায় নিজেদের অভ্যস্ত করে নেবার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন। তা না করলে তাঁরা শারীরিক অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

নিজেদের ওইভাবে অভ্যস্ত করে তোলার পর লিওনভ সয়ুজের সঙ্গে জোড়া ডকিং মড্যুলের দরজা খুলে দেবেন। তখন অ্যাপলো নভোচররা গিয়ে ঢুকবেন সয়ুজের মধ্যে। এবং ওই একই পদ্ধতিতে সয়ুজের নভোচররা অতিথি হয়ে আসবেন অ্যাপলো মহাকাশযানে। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে ডকিং মড্যুলের মধ্যে কম চাপের বিশুদ্ধ অক্সিজেনের মধ্যে শ্বাসকাজ চালনার ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়ার পর তাঁরা গিয়ে ঢুকবেন অ্যাপলোর মধ্যে।

সমস্যা ছিল ভাষারও। এর জন্যে আমেরিকানরা শিখলেন কাজ চালানোর মত কিছু রুশী ভাষা। রুশীরা শিখলেন ইংরেজী।

বেতার সংকেতের সাহায্যে মহাকাশযানের গতিবিধি, অবস্থান—এ সব নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটাও কম সমস্যা ছিল না। কারণ, উভয় মহাকাশযান কিভাবে এগোচ্ছে, কোথায় আছে, তাদের পারস্পরিক দূরত্ব কতটা, দু দেশের পরিচালন-কেন্দ্রের কর্তারা যাতে সে সব বুঝে নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, সে দিকেও তো লক্ষ্য রাখতে হবে।

ব্যাপারটা কতকটা যেন প্লেন পরিচালনার মত। মনে করুন, একটি প্লেন নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করল। যাবে সিডনি। যখন যাত্রা করল, তখন প্রথম দিকে তার গতিপথের নির্দেশ দেবার ব্যাপারে দায়িত্ব থাকবে কেনেডি বিমানবন্দরেরই গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের ওপর। পরে ওই প্লেন কত দেশের ওপর দিয়ে উড়বে। কখনও লন্ডন, কখনও রোম, অথবা দমদম। যখন যে বিমানবন্দরের কাছ দিয়ে উড়বে তাকে পথের নিশানা যোগাবে সেখানকার গ্রাউন্ড কন্ট্রোল। অতএব বেতার সংকেত এবং তার আদানপ্রদানের ব্যাপারটা সেখানে এমন হওয়া চাই যাতে করে প্রত্যেক বিমানবন্দর এবং পাইলটের মধ্যে কথাবার্তা বোঝায় অসুবিধে না হয়। অ্যাপলো-সয়ুজের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে।

উভয় দেশের বিজ্ঞানীরা এ সমস্যাটিও কাটিয়ে উঠলেন।

*

নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী গত ১৫ জুলাই ভারতীয় সময় বিকেল পাঁচটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে কাজাখস্তানের বৈজানুরের কাছাকাছি একটি জায়গা থেকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সয়ুজ-১৯কে মহাকাশে উৎক্ষেপ

করেন। উৎক্ষেপণের পর সয়ুজ প্রথমে উপবৃত্তীয় পথে পৃথিবীকে বেষ্টন করে পরিক্রমণ শুরু করে দেয়। এর পর ক্রমে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল থেকে নিয়ন্ত্রিত করে মহাকাশযানটিকে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। পৃথিবী থেকে এই পথের দূরত্ব প্রায় ২২৫ মাইল।

সয়ুজ উৎক্ষেপণের প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা পর ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি মহাকাশ-কেন্দ্রের কমপ্লেকস ৩৯-বি উৎক্ষেপণ-মঞ্চ থেকে অ্যাপলো সয়ুজের উদ্দেশে দক্ষিণ-পূর্বে ৪৫.২ ডিগ্রি কোণ বরাবর যাত্রা করে। উৎক্ষেপণের ২ মিনিট ২০ সেকেন্ড পর প্রায় ৩৬ মাইল ঊর্ধ্বাকাশে এর প্রথম স্তর রকেটটির জ্বালানি শেষ হয়ে যায়। পর মুহূর্তে সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। অতঃপর শুরু হয় স্যাটার্ন আই-বি রকেটের প্রজ্বলন। এটি মহাকাশযানটিকে পৃথিবী থেকে স্বল্প দূরত্বে উপবৃত্তীয় পথে পরিক্রম করাতে থাকে। অর্থাৎ উপবৃত্তীয় পথে চলার সময় অ্যাপলোয় রইল তিনটি অংশ। প্রথম দিকে কম্যান্ড মডুল। যার মধ্যে তিন নভোচর তখন স্থির হয়ে বসে রয়েছেন। কম্যান্ড মডুলের পেছনে জোড়া রয়েছে সার্ভিস
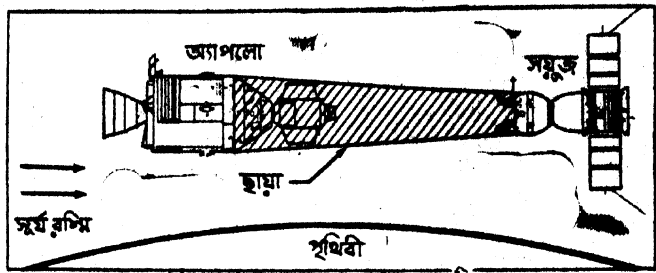
অ্যাপলো কিভাবে সূর্যগ্রহণ করল

মডুল। যার মধ্যে আছে নানারকম যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। সার্ভিস মডুলের পেছনে স্যাটার্ন আই-বি রকেট।

উপবৃত্তীয় পথে বিচরণ করার সময় নিয়মমাফিক প্রথমে স্যাটার্ন আই-বি রকেটটি সার্ভিস মডুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পেছনে সরে গিয়ে চলতে থাকে। এই রকেটের মধ্যেই বিশেষ ধরনের আবরণের মধ্যে ঢাকা ছিল ডকিং মডুলের অর্ধাংশ। সেটি এবার ওই আবরণ ভেদ করে রকেটের সামনের দিকে এগিয়ে আসে। ইতিমধ্যে সার্ভিস মডুল সহ কম্যান্ড মডুল কক্ষপথে চলতে চলতেই ১৮০ ডিগ্রি কোণ ধরে আবর্তন করে। যার অর্থ, কম্যান্ড মডুলের সূঁচলো ডগাটি ছিল এতক্ষণ সামনের দিকে মুখ করে। এবার তার ডগাটি এলো পেছন দিকে, রকেটের মুখ বরাবর। এর পর ওই অবস্থায় কম্যান্ড মডুল সার্ভিস মডুলকে পেছনে নিয়ে ডকিং মডুলের দিকে এগিয়ে আসে এবং সেটিকে ডগায় জুড়ে নিয়ে আবার ১৮০ ডিগ্রি পাক খেয়ে সামনে ঘুরে যায়। ঘোরার কিছুক্ষণ পর স্যাটার্ন আই-বি রকেট এগিয়ে এসে আবার সার্ভিস মডুলের সঙ্গে জুড়ে যায়। অর্থাৎ এবার দাঁড়াল : সূঁচলো কম্যান্ড মডুলের ডগায় ডকিং মডুল; পেছনে যথাক্রমে সার্ভিস

মডিউল এবং স্যাটার্ন আই-বি রকেট।

অতঃপর অ্যাপলো সয়ুজের কক্ষপথের দিকে সরে যেতে থাকে এবং প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টা পর সয়ুজের কাছাকাছি হলে স্যাটার্ন রকেটটি তার পেছন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও সমুদ্রে এসে পড়ে।

সয়ুজের ওপর জ্বলতে থাকে একটি আলো। সেই আলো দেখে ধীরে ধীরে অ্যাপলো সয়ুজের দিকে এগোতে থাকে। এবং প্রায় দু' ঘণ্টা পর ধীর গতিতে এসে সয়ুজের 'ডকিং মডিউলের' সঙ্গে গিয়ে অ্যাপলোর ডকিং মডিউল জোড় বাঁধে।

হ্যাঁ, সাফল্য! এ এক অসামান্য সাফল্য! এর পরমুহূর্তেই শুরু হল মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নবতম অধ্যায়। যে অধ্যায় প্রমাণ করল, ভৌগোলিক সীমা, রাজনৈতিক আদর্শ, ভিন্নতর ভাষা এবং সংস্কৃতির ঊর্ধ্বে বিজ্ঞান। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিজ্ঞানই আন্তর্জাতিক!

মহাকাশে দুটি মহাকাশযানের মিলন এমন কোনও নতুন ঘটনা নয়। এ কাজ সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বারবার করেছেন। স্যালুট-সয়ুজ মিলন অনেকবার ঘটেছে। মার্কিন বিজ্ঞানীরাও ঘটিয়েছেন। চাঁদে
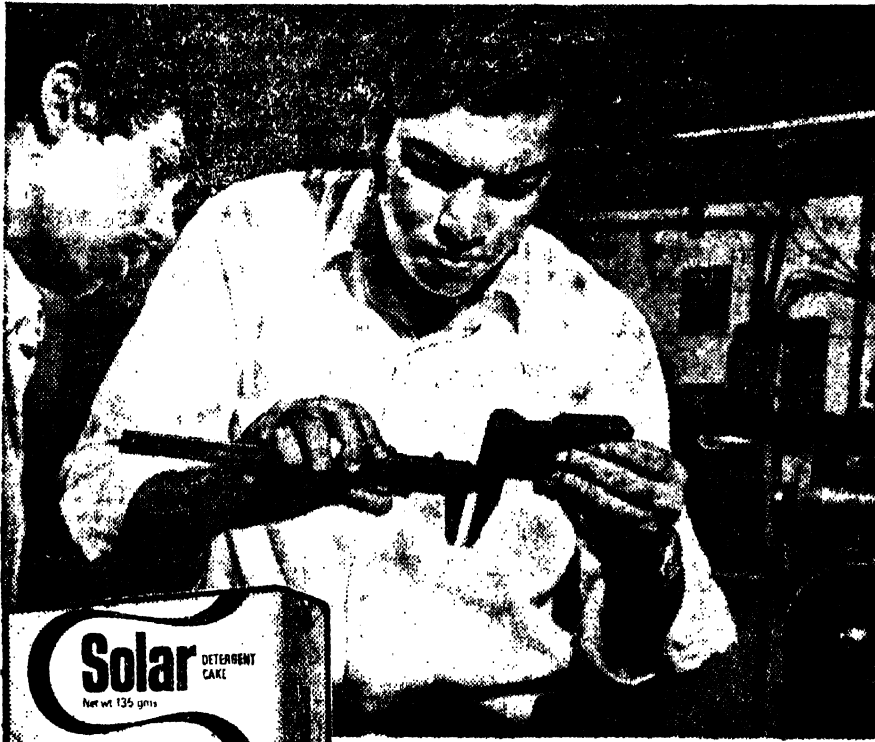
যাওয়ার আগে একাধিকবার জেমিনি মহাকাশযানের মিলন নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু মহাকাশ গবেষণা-ক্ষেত্রের দুই অগ্রজ দেশের দুটি মহাকাশ-যানের মধ্যে মিলন ঘটানো এই প্রথম। যার পরিণতি সুদূরপ্রসারী।

*

শুধু মিলন ঘটানোই নয়, জোড় বাঁধার পর, পর পর দুদিন মার্কিন এবং সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাও করে এসেছেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

এক, কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ ঘটিয়ে সৌরচ্ছটার ছবি তোলা। এর জন্যে প্রথমবার জোড় বাঁধার কিছুক্ষণ পর অ্যাপলো জোড় খুলে সয়ুজের কাছ থেকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে সরে যায় এবং সূর্যকে আড়াল করে। অ্যাপলোর দিগন্তরেখা বরাবর তখন সূর্যোদয় চলছে। সয়ুজ থেকে এই সময় সৌরচ্ছটার মধ্যেকার অতিবেগুনী রশ্মির ছবি তোলা হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে, কৃত্রিম উপায়ে সূর্যগ্রহণ সৃষ্টি করে এ ধরনের পর্যবেক্ষণ কোনও নতুন ঘটনা নয়। তবে পৃথিবীর বুকে বসে এইভাবে ছবি তুললে অতিবেগুনী রশ্মির বর্ণালীর সম্পূর্ণ অংশটি পাওয়া সম্ভব হয় না কারণ, বায়ুস্তর ভেদ করে আসার সময় তার বেশ কিছু অংশ বাতাস শুষে নেয়। অ্যাপলো-সয়ুজের এই প্রচেষ্টা অতিবেগুনী রশ্মির বর্ণালীর পুরো চেহারাটা বুঝে নিতে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করবে। আবহাওয়ার ওপর এই আলোর যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব সে ক্ষেত্রে আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণার কাজে এই উদ্যোগ সাহায্য করতে পারে।

দুই, গ্যাসের ওপর পরীক্ষা। এর জন্যে সয়ুজ থেকে অ্যাপলোর ওপর নজর রাখা হয়েছিল। অ্যাপলোর ভেতর থেকে যে সব গ্যাস মহাকাশে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অতিবেগুনী রশ্মি কিভাবে সেই সব গ্যাসকে—যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি আয়নিত করে তার ওপর পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, এতে করে ঊর্ধ্বাকাশে আয়নিত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের ঘনত্ব মাপার কাজটা সহজ হবে। যা আবহাওয়া-বিজ্ঞানের অনেক অজানা তথ্য জানতে সাহায্য করবে। বলতে বাধা নেই, এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত তেমন গবেষণা করা সম্ভব হয়নি।

তিন, বিভিন্ন ধরনের ছত্রাক নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। প্রচণ্ড গতি, শূন্য মাধ্যাকর্ষণ এবং দ্রুত স্থান-পরিবর্তনের ফলে জীব-কোষে কি কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, এই পরীক্ষা সে সব ব্যাপারে অনেক মৌলিক সূত্রের সন্ধান যোগাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

চার, কয়েক ধরনের জীবন্ত প্রাণিকোষের মিশ্রণ থেকে শূন্যে মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে 'ইলেকট্রোফোরেসিস'-এর সাহায্যে প্রাণিকোষদের পৃথক করারও চেষ্টা করেছেন এবারকার নভোচরেরা। অনুমান, এ ধরনের প্রচেষ্টা ক্যান্সার চিকিৎসার কাজে সাহায্য করবে। উল্লেখ্য, দ্রবণের মধ্যে যদি জীবকোষ ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করে এবং ওই দ্রবণে যদি তড়িৎচালক বল বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স প্রবাহিত করা হয়, তখন ওই ভাসমান কোষগুলি সঞ্চারিত হতে শুরু করে। বিশেষ পদ্ধতির সাহায্য কোষগুলি পৃথক করা তখন সম্ভব হয়। এ ধরনের পদ্ধতিকে বলা হয় ইলেকট্রোফোরেসিস।

পাঁচ, বিশেষ ধরনের চুল্লির মধ্যে তাঁরা অ্যালুমিনিয়াম এবং টাংস্টেন ধাতুর মিশ্রণকে প্রায় ১১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত গরম করে গলিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য বিগলনের পর শূন্য মাধ্যাকর্ষণে ওই দুই ধাতুর অণুগুলি সমানভাবে মিশে যায় কি না সেটা দেখা। পৃথিবীতে ধাতুসংকর তৈরি করা একটা বড় রকমের সমস্যা। ধরুন, দুটি ধাতু নিলেন। একটি অপরটির চেয়ে ভারী। এদের মিশ্রণকে গলানোর পর দেখা যায়, ভারী ধাতু পাত্রের নিচের দিকে বেশী জমেছে। ফলে, যে সংকর ধাতু তৈরী হবে তার ওপর স্তরে যে অনুপাতে ধাতুগুলি থাকে নিচের স্তরে সে অনুপাতে থাকে না। মহাকাশে শূন্য মাধ্যাকর্ষণে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা কম।

এ ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম-চূর্ণ গরম করা হয় ৭৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত। তারপর ওই ধাতুর মধ্যে বাতাসের বুদবুদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়।

আর একটি পরীক্ষায় জার্মেনিয়াম এবং সিলিকনের বিশুদ্ধ কেলাস তৈরি করা হয়েছে। সেটা কতটা বিশুদ্ধ এখন তা নিয়ে গবেষণা চলছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির উৎকর্ষ বাড়ানোর ব্যাপারে এ ধরনের পরীক্ষা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

*

সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত পরীক্ষার পর অ্যাপলো দ্বিতীয়বার সয়ুজের সঙ্গে জোড় বেঁধেছিল। ওই সময় মহাজাগতিক রশ্মি, এক্স-রশ্মি প্রভৃতির ওপর পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। মিলিতভাবে দুই দিন গবেষণা চালিয়ে সয়ুজ পৃথিবীতে ফিরে আসে। অ্যাপলো এর পর আর সাত দিনের কিছু বেশী সময় ধরে নানারকম গবেষণা চালায়। এদের মধ্যে ছিল ঝড়ের উৎপত্তিস্থল নির্ণয়, সমুদ্রের স্রোতের গতিবিধির ওপর তথ্য সংগ্রহ, গ্যাসীয় বা কঠিন আবর্জনার সঙ্গে ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরের প্রতিক্রিয়া এবং কি পরিমাণে সেখানে তারা ছড়িয়ে আছে সেটা জানা, অবলোহিত রশ্মিজ্ঞাপক কেলাস তৈরি প্রভৃতি।

এসব গবেষণা মৌলিক উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ এ কথা এই মুহূর্তে বলা শক্ত। তবে দুটি কারণে এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। **এক,** এই উদ্যোগ মহাকাশ গবেষণার মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে এল। **দুই,** আমরা দেখেছি, বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার দরুন আমেরিকা এবং রাশিয়া বহু ক্ষেত্রে একই গবেষণায় পৃথকভাবে উদ্যোগী হয়েছে। অথচ সবাই জানেন, এক একটি গবেষণার দরুন এ ক্ষেত্রে কি প্রচণ্ড পরিমাণ অর্থই না ব্যয় করতে হয়! এ ধরনের উদ্যোগ চালালে ডুপ্লিকেশনের দরুন যে বিরাট খরচ হয়, সেটা বেঁচে যাবে।

সংবাদ : গত ১৫ জুলাই অ্যাপলো-সয়ুজ কার্যক্রমের প্রথম দিনে কলকাতায় ইউনাইটেড স্টেটস ইনফর্মেশন সার্ভিস একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন। এতে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অভ রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিকসের অধ্যাপক মৃণালকুমার দাশগুপ্ত। অধ্যাপক দাশগুপ্ত বলেন, অ্যাপলো-সয়ুজ অভিযান মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন সন্ধিক্ষণ। সভায় প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল। টেলিভিশনে দুই মহাকাশযানের মিলনের পর্যায়গুলি দেখালে দর্শকরা খুবই কৌতূহলী হন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আহ্বায়ক শ্রীহুলরক ব্রাডলি।

সমরজিৎ কর

আসল তামাকের স্বাদে
উইল্‌স প্লেনের
তুলনা হয় না
WILLS
NAVY CUT
MADE IN INDIA
উইল্‌স প্লেন
খান—ভাল লাগবে
সর্বাধিক হার : টা. ১.২৫ পঃ ১০টি, স্থানীয় কর সাপেক্ষ

॥ একশো ছয় ॥

বৈজু আগে কাচের গেলাস দুটো বাড়িয়ে দেয় শীতল আর ছোটনের দিকে। ওর প্রায় পিছনেই ফুলবাসিয়া পুত্তলিকাবৎ, দুহাতে কলাই করা দুটো গেলাস। মাথায় ঘোমটা টানা, মুখ ঢাকা না, কিন্তু ঘোমটার ছায়ায় মুখের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। দেহাতি ভঙ্গিতে ওর ডান কাঁধে শাড়ির আঁচল, অনম্র শরীরে ঢাকা শাড়ির নানা অংশ আলো-ছায়ায় ওকে এই মুহূর্তে দেখায় যেন একটি প্রাচীন মায়াময় পাথরের মূর্তির মতো। শীতল আর ছোটনের চোখে অপরিচয়ের বিস্ময়। ওদের অনেক দিনের চেনা মেয়েটা যেন কোন্ এক অচেনা জগতে বিরাজ করে। অতি পরিচিত মানুষের ঢাকা মুখ যে কি গভীর রহস্যের সৃষ্টি করতে পারে, এ মুহূর্তের ফুলবাসিয়া তার প্রমাণ।

বৈজু ফুলবাসিয়ার দিকে ফিরে কলাই করা গেলাস দুটো ওর হাত থেকে নেয়। একটি গেলাস তুলে দেয় দয়ালের প্রসারিত হাতে। ফুলবাসিয়া এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে। ওর এই শান্ত শালীন আচরণের থেকেও বৈজু অধিক অস্বস্তি বোধ করে ঘোমটা ঢাকার জন্য। কেমন অস্বাভাবিক লাগে। বলে ওঠে, 'তুমি তো এদের সবাইকেই চেনো।'

ফুলবাসিয়া পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে সম্মতি জানায়। বৈজুর এই মুহূর্তের অস্বস্তির কারণ যে মনোবিকার, তা ওর নিজেরও অজ্ঞাত। ফুলবাসিয়ার ঘোমটা ঢাকা শালীন আচরণের মধ্যে এই পরিবারের সঙ্গে একটা বিশেষ ও নিবিড় পরিচয়কে যেন তুলে ধরে। ওর এই আচরণ কি ইচ্ছাকৃত না? বৈজু এই মনোবিকারে ভোগে, যা ওর পক্ষে স্বাভাবিক। যদিচ ইতিমধ্যেই ফুলবাসিয়ার প্রতি একটি সমবেদনা ওর হৃদয়ে স্থাপিত, এমন কি একটি বন্ধুতার সংকেত অনুভূতিতে জাগ্রত, তথাপি লোক-সমাজের কাছে-মানুষ এই রকম অসহায়, সে তার নিজের পরিচয়কে অন্যভাবে যাচাই করতে চায়।

'আমি তখন থেকে ভাবছি, আমার পায়ের কাছে এটা কী?' দয়াল হঠাৎ বলে ওঠে এবং নিচু হয়ে মাটির মেঝে থেকে তুলে নেয় এক টুকরো ভাঙা কাচের চুড়ি।

বৈজুর চোখে ঝিলিক দিয়ে যায় কিছুক্ষণ আগে এ ঘরের সেই উগ্র ক্ষ্যাপা প্রহারের ছবি। পরমুহূর্তের ছবি ফুলবাসিয়ার মুখ, নাক থেকে পড়া ফোটা ফোটা রক্ত। ভুরুর কাছে ফুলে ওঠা কালশিরার দাগ। ঘোমটার আবরণ ছাড়া উপায় কী? ও তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'ফুলবাসিয়ারই হাতের চুড়ির ভাঙা টুকরো হবে ওটা।'

'তা নয় তো কি, এ ঘরে আর কারোর ভাঙা চুড়ি থাকবে নাকি?' দয়াল হেসে বলে এবং খাটিয়ার অন্য পাশে মেঝের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওই তো, ওখানেও দু একটা ভাঙা টুকরো পড়ে আছে দেখছি। এতো চুড়ি ভাঙলো কী করে?' ও হেসে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে বৈজুর দিকে তাকাতে গিয়ে চকিতে একবার পিছন-ফেরা ফুলবাসিয়াকে দেখে নেয়।

বৈজুর বুকে ধক ধক করে ওঠে। উদ্বেগে ও বিভ্রান্তিতে কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। ফুলবাসিয়া রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। শীতল বলে ওঠে, 'তোর সে-খোঁজে কি দরকার, কি করে চুড়ি ভাঙলো? কতো রকমেই তো ভাঙতে পারে।'

বৈজু বিব্রত উৎকণ্ঠায় শীতলের দিকে তাকায়। শীতলের মুখে হাসি, যেন কিঞ্চিৎ ইশারাপূর্ণ। ও বৈজুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দয়ালের দিকে তাকায়। ছোটনও বৈজুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। বৈজু বিভ্রান্ত বোধ করে। দয়াল হেসে উঠে বলে, 'সে কি আর আমি জানি না, হাতের চুড়ি কতো রকমে ভাঙতে পারে? চুড়ি পরা লাজুক হাত ধরে টানাটানি করলেও,

চুড়ি ভাঙতে পারে। পুরো ঘর ছড়িয়ে যেতে পারে।' বলেই দয়াল হা হা শব্দে হেসে ওঠে।

'শালা।' শীতল বলে, এবং দয়ালের গলার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে হেসে ওঠে।

ছোটনও নিজেকে সামলাতে পারে না, সহসাই যেন হাসির কারণটা আবিষ্কার করে হা হা শব্দে হাসিতে স্বর মেলায়। বৈজুর বিভ্রান্ত উৎকণ্ঠা মুহূর্তেই বিস্ময়ে পরিণত হয়, এবং লাজুক হাত ধরে টানাটানি আর ঘরময় ছড়িয়ে যাওয়া ভাঙা চুড়ি, সহসাই যেন ওর ভিতরেও একটা হাসির বেগ সঞ্চারিত করে। ও হাসতে হাসতেই বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরকমও হতে পারে।'

'ওরকমও হতে পারে!' দয়াল যেন অতি বিস্ময়ে কথাটা বলেই অধিকতর উচ্চ রোলে চালাঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে।

শীতল ছোটনও দয়ালের কথায় ও হাসির দ্বারা সংক্রামিত হয়। বৈজুর অবস্থাও সেইরকম—একটা মিথ্যা অনুমান সত্যের ছলনায় ওকে যেন মুক্তি দেয়, আর মুক্তির আনন্দেই হাসে। দয়াল বলে ওঠে, 'তোমার জবাব নেই বৈজু ভাই।'

এই উচ্চরোল হাসির মধ্যেই চটের থলি হাতে ঘর্মাক্ত খালি-গা সাহুজীর প্রবেশ। তার কালো গোল চোখ দুটিতে প্রথমে ভ্রূকুটি বিস্ময়, পরমুহূর্তেই সে হইচই করার ভঙ্গিতে চিৎকার করে ওঠে, 'আরে, আমার ঘরে এরা কারা? জয় রামজী, আর আমার গরীব ঘরে হীরা মানিকের ভিড় লেগেছে, অ্যাঁ? আমার কি সৌভাগ্য, অ্যাঁ! জয় রামজী!' বলেই সেই হাতের চটের থলিটা এক পাশে রেখে প্রায় লাফিয়ে পড়ে দয়ালের পায়ের ওপর। দু হাতে দয়ালের পা স্পর্শ করে ঝটিতি তার লাল জিভের ডগায় ছুঁইয়ে মাথায় মোছে।

দয়াল কলাইয়ের গেলাস হাতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আরে এ কি হচ্ছে সাহু চাচা! ছি ছি ছি, আপনি এরকম করলে আমাকে অপমান করা হয়।'

বাবার আচরণ বৈজুকে অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত দেয়, বিচলিত করে তোলে, লজ্জা বোধ করে এবং একই সঙ্গে দয়ালের কথায় ও আচরণে ওর প্রতি কৃতজ্ঞতা জাগে। সাহু বলে, 'সে কথা বললে হয় না বাবা, তুমি হলে ব্রাহ্মণ। আমার বাপ ঠাকুরদা চৌদ্দ পুরুষ ব্রাহ্মণের পাদোদক খেয়ে এসেছি, এখন তা বদলাতে পারে না।'

'দুনিয়া বদলে যাচ্ছে চাচাজী।' দয়াল বলে, 'জমানা বদলে যাবে।'

সাহু হেসে বলে, 'হাঁ হাঁ বাবা, তোমাদের জমানা বদলে যাবে, আমার জমানা আমারই থাকবে। কী বলো তোমরা?' সে শীতল আর ছোটনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসার সুরে বলে, 'তোমরা ক্রান্তিকার, তোমাদের কথা আলাদা। আমার বেটা বৈজু যদি ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো না নেয়, তো আমি কি করতে পারি? আমি কিছুই করতে পারি না। কিন্তু আমি তো বাবা পারি না।' বলে সে বৈজুর দিকে তাকিয়ে হাসে এবং আবার বলে, 'তা এখন ওসব কথা যেতে দাও। আমার ঘরে আজ খুশি মানাবার দিন। তুমি তো বেটা ভকিলবাবুর লেড়কা, তাই না?' বলে শীতলের দিকে আঙুল দেখায়।

শীতল বলে, 'হ্যাঁ।'

'জানি জানি।' সাহু মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে বলে, 'তুমি ভকিল (উকিল) ঘোষবাবুর লেড়কা। আর এ সেই বড় বাড়ির লেড়কা, হালদারবাবুদের বাড়ির। তাই না?' বলে ছোটনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

ছোটন ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

'তোমার বাবা সাতকড়িবাবু আমাকে খুব খাতির করেন।' সাহু বলে, 'উনি আমার নৌকায় চেপে অনেক বেড়িয়েছেন। সে সব তোমরা জানো না, তোমাদের জানবার দরকার নেই। সাতকড়িবাবু বহুত রইস আদমি, দিলদরিয়া মানুষ।'

ছোটন অবাক চোখে সাহুর দিকে তাকিয়ে তার কথা শোনে। স্পষ্টতই বোঝা যায়, বাবার সঙ্গে সাহুর এরকম পরিচয়ের কথা ওর অজানা। ও শীতলের দিকে তাকায়। সাহু কোনো কথার জবাব প্রত্যাশা করে না, নিজের খুশি ভাবনা চিন্তাতেই মশগুল। আবার বলে, 'তা খুব ভালোই হলো। বৈজুর জন্য তোমরা সবাই আমার গরীবের ঘরে এসেছ। সবাই আজ এখানেই খাওয়া দাওয়া করে যাবে।'

দয়াল তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'ওটি হবে না সাহু চাচা, খানাপিনা আর একদিন হবে। আজ তো বৈজুর আমাদের বাড়িতে খাওয়ার কথা, আমরা ওকে নিতে এসেছিলাম।'

'সেটা কি করে হতে পারে মিশিরবাবা।' সাহু বলে, 'এতদিন পরে লেড়কা ঘরে এসেছে। আমি সব শুনেছি, তোমার কাছেই ও আগে এসেছে। ও জানতো না, আমি এখানে আছি কি না। দেখতে এসেছিল। তো, আমি আছি, আমার লেড়কা কোথায় যাবে? দেখ, আমি নিজে ওর জন্য বাজার করে নিয়ে এলাম। তো, আমি চাই, তোমরাও আজ ওর সঙ্গে খাওয়া দাওয়া কর।'

দয়াল মাথা নেড়ে বলে, 'সেটা আর একদিন হবে। আমরা আপনার এখানে এসে খাব। এখন তো বৈজু এখানেই থাকবে।'

'হাঁ, জরুর! আর কোথায় ও থাকবে?' সাহু তার সমস্ত দাঁত দেখিয়ে হাসে এবং বৈজুর দিকে একবার দেখে আবার বলে, 'ওর জন্য আমি আলাদা মোকাম বানাবো। এখানে এই ঘরে ও কেমন করে থাকবে, তাই না? সে সব তোমাদের বলবো, আমার অনেক মতলব আছে। কিন্তু আজ আমার যে কি খুশির দিন, তোমরা সব আমার ঘরে এসেছ! তো একটু মিঠাই মণ্ডা তো খেতে হবে।'

দয়াল বলে, 'না না, আজ ওসব কিছু না। আমরা চা খেয়েছি, এবার যাবো। তবে চাচা, একটা কথা, কাল দুপুরে কিন্তু বৈজুকে আমাদের ঘরে খেতেই হবে। তা না হলে বৈজুর মালপত্র ছাড়বো না।' বলে ও হাসে।

সাহু লাফায় না, কিন্তু তার সারা শরীরের পেশিসমূহ এমন নেচে ওঠে, দু হাত তুলে দোলায়, মনে হয় যেন সে লাফিয়ে ওঠে এবং হেসে বলে, 'খুব ভালো, খুব ভালো। ব্রাহ্মণের বাড়িতে খাবে এ তো ওর সৌভাগ্য। তাতে যদি ওর মালপত্র খালাস হয় আরো ভালো।' বলে সে গোঙানো স্বরে হেসে ওঠে, এবং জিজ্ঞাসার সুরে বলে, 'মগর ও তোমাদের বাড়ি খাবে, ওর বর্তন যেন গোয়ালার কোনো মজুর ধুয়ে দেয়।'

'তা তো হবে না চাচা।' দয়াল মাথা নেড়ে বলে, 'বৈজুর ঝুটা বর্তন আমিই ধোব।'

সাহু প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, যেন [illegible] দয়াল হা হা
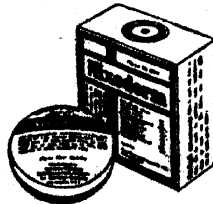
শব্দে হেসে ওঠে, ওর সংগে শীতলও আর ছোটেনও। বৈজুর অস্বস্তি ইতিমধ্যে চরমে ওঠে। বাবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'সত্যি তো আর দয়াল আমার বর্তন ধোবে না, তোমার জানা উচিত, ওদের ঘরে নোকর নোকরানি আছে। কিন্তু সত্যি জমানা বদলে যাচ্ছে। আমরা মনে করি, মানুষের কোনো জাত নেই।'

'আঁ!' সাহু আর একবার আতঙ্কিত স্বরে আর্তনাদ করে ওঠে।

দয়াল বলে, 'হাঁ চাচা, আপনি আর কখনো আমার পায়ে হাত দেবেন না। তা হলে আপনার পায়ে আমি আমার মুখ গুঁজে দেবো।'

সাহু যেন প্রকৃতই তীরবিদ্ধ আহত পশুর মতো চিৎকার করে ওঠে, 'আহ্...! না...।'

বৈজু গম্ভীর বিরক্ত স্বরে বলে, 'চুপ করো। এটা তো খাঁটি কথা, যে কোনো বড় মানুষের পায়ের ধুলো নিতে হয়, তা সে যে জাতের মানুষই হোক। বিদ্বান, পণ্ডিত খাঁটি মানুষের কোনো জাতপাত নেই।'

সাহুর সমস্ত শরীর যেন আতঙ্কে কুঁকড়ে ওঠে। সে বৈজুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দয়ালের দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিস-ফিস স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'আর তোমার বাবা, মিশিরজী যখন এ সব কথা শুনবেন, তখন কি বলবেন?'

দয়াল হেসে বলে, 'আমার বাবাও জরুর আপনার মতোই বলবে। আপনি ভয় পাচ্ছেন, আমার বাবা গোসা করবে। তো তাতে কি যায়-আসে। আমি আপনার ঘরে খেলেও তো মিশিরজী গোসা করবে।'

সাহু তৎক্ষণাৎ দয়ালের সামনে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে, 'না না, আমার ঘরে তোমাকে আমাদের হাতে পাকানো খাবার খেতে হবে না। সাধুবাবাদের খানা যে পাকায়, সে পাকিয়ে দেবে।'

'তা হলে তো আপনার ঘরে আমরা খাবোই না।' দয়াল হাসতে হাসতে বলে, 'জেলখানায় কোন্ ব্রাহ্মণ আমাদের খানা পাকাতো? আমরা তো ভিন্ জাতের হাতের রান্না খেয়েছি। আমাদের কি আর জাতপাত বলে কিছু আছে?'

সাহু আতঙ্কিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে, একটি কথাও বলতে পারে না। মুহূর্তপূর্বের আনন্দ যেন নিরানন্দে পরিণত হয়, সে সকলের মুখের দিকে তাকায়।

'চলি চাচা, ফির আসবো।' দয়াল বলে এবং ঘরের বাইরে চলে যায়।

দয়ালকে অনুসরণ করে সকলেই যায়। বৈজুও বাবার দিকে একবার তাকিয়ে বলে যায়, 'আমি ওদের এগিয়ে দিয়ে আসছি।'

হ্যারিকেনের আলোর খালি-গা সাহুকে দেখে মনে হয়, প্রাগৈতিহাসিক গুহার গভীরে একটি আতঙ্কিত অসহায় মানুষ, আত্মরক্ষায় অসমর্থ। গুহার বাইরে আক্রমণকারীদের পায়ের ও উল্লাসের শব্দ শোনা যায়।

*

বকুলতলা বৈঠকখানাবাড়ির সামনের ঘরে সবিতা পণ্ডিত অজয়ের সঙ্গে কথা বলে। এ ঘরের অনেকখানি জুড়ে তক্তপোশ পাতা, ওপরে বিছানো শতরঞ্চি। দীর্ঘ বেলা অবসিত প্রায়, আকাশের পশ্চিমের রক্তাভায় ছায়ার কালিমা। রাস্তার আলো জ্বলে। ঘরে ইতিমধ্যেই অন্ধকারের ছায়া ঘন, অতএব আলো জ্বলে ঘরেও। সবিতার মাথার ওপরে পাখা ঘোরে। ওর সামনে চীনে মাটির ডিসের ওপরে ভাঙা বাণ্ডিলের বিড়ি, পানের খিলি, শূন্য কলাপাতার টুকরোয় চুন। এ বস্তু চন্দ্রনাথের, কিন্তু তিনি এখন বৈঠকখানা ঘরে নেই। পাশের
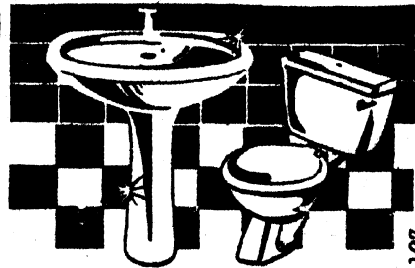
ঘর থেকে ক্যারামের ঘুঁটি আর স্ট্রাইকারের শব্দ ভেসে আসে, সেই সঙ্গে আপত্তি, সমর্থন ও মুগ্ধ প্রশংসার নানা কথার টুকরো। কথা ভেসে আসে ছেলেদের, একেবারে শেষের ঘর থেকেও। সেখানেও ক্যারাম এবং লুডোর আসর, শব্দে ও কথায় বোঝা যায়।

অজয়ের দুই চোখে ত্রস্ত উত্তেজনা। গোঁফ জোড়া স্ফীত দেখায়। সারা মুখে ঘামের বিন্দু, গায়ের পুরনো এ আর পি নীল শার্টটার বুক আর কাঁধ ঘামে ভেজা। সবিতা ভ্রূকুটি অবাক চোখে অজয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বিপিন মুখে সুভাষ বসুর সমর্থন করতে পারে, পার্টিবিরোধী কথাও বলতে পারে, আমি নিজেও তা শুনেছি। কিন্তু ওদের মিটিং-এ জয়েন করেছে, এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'তা হলে আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকুন পণ্ডিতদা, আমার কিছু বলার নেই।' অজয় ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, 'বিপিন ইজ ট্রেটর, সেটা পরে বুঝবেন। কিন্তু আমি যা কথা বলতে এসেছি তার কি করবেন? ওরা কিন্তু মিটিং শেষেই আসবে।'

সবিতা বলে, 'আসুক। কিন্তু তুমি যা বলছো, ওরা আমাদের মারবে, আমি তা বিশ্বাস করতে পারি না।'

অজয় তক্তপোশ থেকে নেমে দাঁড়ায়, ওর চোখে বিরক্তি। বলে, 'তা হলে আপনি এখানে বসে থাকুন, আমি মোহনদের একটু সাবধান করে দিয়ে আসি।'

সবিতা কিছু বলবার উদ্যোগ করতেই বৈঠকখানা ঘরের বাইরের দরজায় নিঃশব্দে কয়েকজন এসে দাঁড়ায়। শীতল ছোটন দয়াল এবং আরো কয়েকজন। দেখেই বোঝা যায়, ওরা ঘর্মাক্ত, নাসারন্ধ্র স্ফীত, ছুটে আসার বেগে দ্রুত নিশ্বাসে বুক ওঠা-নামা করে। প্রত্যেকের মুখ শক্ত, চোখে পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর ক্রোধ। ছোটন প্রথম আঙুলের ইশারায় ডাকে, 'পণ্ডিতদা, একবার বাইরে আসুন।'

'কেন?' সবিতা গম্ভীর স্বরে বলে, 'তুমিই ভেতরে এসো না।'

শীতল বলে, 'না, আমরা ক্লাবের ভেতরে যেতে চাই না, আপনার সঙ্গে বাইরে কথা বলবো।'

সবিতা তক্তপোশ থেকে নামে। অজয় বলে ওঠে, 'আপনি বাইরে যাবেন না পণ্ডিতদা।'

'তোমাকেও বাইরে আসতে হবে।' দয়াল বলে ওঠে অজয়ের দিকে তাকিয়ে, 'বেরিয়ে এসো তাড়াতাড়ি, কে দেশের দুশমন আর দোস্ত, তার বোঝাপড়া হবে।'

সবিতা দরজার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'এ সব কি বলছো দয়াল, তোমরা কি ঝগড়া করতে এসেছো?'

'ঝগড়া?' দয়াল এই কথা উচ্চারণ করেই ঝটিতি সবিতার বুকের জামা খামচে ধরে বাইরে টেনে নিয়ে যায়, চিৎকার করে বলে, 'ইংরেজের দালাল। আমরা সাম্রাজ্যবাদীর দালাল, আর তোমরা শালা দেশপ্রেমিক?' বলেই সবিতার গালে থাপ্পড় কষায় এবং টেনে রাস্তার ধারে নিয়ে যায়।

অজয় সবিতাকে বাঁচাতে যাবার চেষ্টা করতেই ছোটন তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গর্জায়, 'বল্, নেতাজী সুভাষ দেশের শত্রু, আর তোরা দেশপ্রেমিক? ব্রিটিশের পোষা কুত্তা!' বলে প্রচণ্ড ঘুঁষি হানে অজয়ের গালে।

সবিতা চিৎকার করে বলে, 'সাবধান দয়াল, এখনো থামো।'

'চুপ!' দয়াল আবার সবিতার গালে থাপ্পড় কষায়, বলে, 'শুয়োর! বল্, নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ!'

সবিতা এক মুহূর্তের জন্য ভ্রূকুটি করে তারপরে শক্ত মুখে স্থির চোখে দয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'বল্, বল্।' দয়াল আবার সবিতার গালে সজোরে আঘাত করে, 'বল্, নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ!'

সবিতা পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ, ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত পড়ে।

ক্রমশ

নদীর এ পার কহে

আমাদের এক লেখক বন্ধু সেদিন বলছিলেন, বিদেশে যাঁরা লেখেন-টেখেন তাঁরা লেখাকেই একমাত্র পেশা করে নিয়েছেন, দু-তিন বছরে একটা বই লিখলেও মোটামুটি তাঁদের চলে যায়। কথাটা তিনি একাই যে বলেছিলেন তা নয়, আরও কেউ কেউ তাঁর কথায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমাদের বেশীর ভাগের ধারণা বিদেশে লেখকদের আর্থিক দৈন্য নেই। অন্তত লেখক হিসেবে একবার আত্মপ্রকাশ করতে পারলে তো নয়ই। বলতে লজ্জা নেই, ব্যক্তিগতভাবে আমারও সেই রকম মনে হত, যদিও কখনো কখনো দু-একটি লেখায় পড়েছি, পেশাদারী লেখক হিসেবে যাঁরা টিঁকে আছেন—বিশেষ করে তরুণ লেখক—তাঁদের অনেকের পেট চলে খবরের কাগজ বা সাময়িকপত্রে সমালোচনা লিখে। বই, গান, সিনেমা, থিয়েটার, শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা লিখে তাঁরা রুজি-রোজগার করেন।

সম্প্রতি 'ডেলি টেলিগ্রাফে' রোনাল্ড ডানকান নামক এক কবির একটি লেখা পড়ে বিস্মিত হলাম; আমার পূর্ব ধারণাও অনেকাংশে ভেঙে গেল। প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভাল। যখন আমরা চলতি কথায় বিদেশী বই বলি—তখন শুধু ইংল্যান্ড-এর ছাপা বইয়ের কথা বলি না, মোটামুটি য়ুরোপ এবং আমেরিকার ছাপা বইয়ের কথাও বোঝাতে চাই। যাই হোক, এই রচনাটির বেলায় আমি শুধু ইংল্যান্ডের কথাই বলছি, অন্য কোনো দেশে প্রকাশিত বইয়ের কথা বলছি না।

রোনাল্ড ডানকান বয়স্ক কবি। তাঁর বয়েস এখন ষাট। গত দশ বছর ধরে তিনি একটি মহাকাব্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, সম্প্রতি শেষ করেছেন। তাঁর সেই কাব্যের নাম 'ম্যান'।

ইংল্যান্ডের লেখকদের দুরবস্থার কথা তিনি টেলিগ্রাফের একটি পাতায় নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করেছেন য়ুরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুন্দরতম সাহিত্য সৃষ্টি করেছে ইংল্যান্ড এ নিয়ে গর্ব বোধ করতে তাদের বাধে না অথচ সেই দেশের কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকারদের উপার্জন কতটুকু তা কি কেউ ভেবে দেখেছে? আমরা কি এই লেখকসমাজের জন্যে কিছু করেছি?

ডানকান আর্ট কাউন্সিলের '৭৩ সালের হিসেব উল্লেখ করে বলেছেন, আর্ট কাউন্সিল নামে যে সংস্থাটি

সাহিত্য প্রসঙ্গ

রয়েছে, সেই সংস্থাটি সরকারী তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থে নানা ধরনের দায়-দায়িত্ব পালন করে গোটা ইংল্যান্ডের জীবিত লেখকদের জন্যে মাত্র বিরাশী হাজার আট শ চুরাশি পাউন্ড খরচ করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, একজন ফুটবল খেলোয়াড় এক ক্লাব থেকে অন্য ক্লাবে ট্রানস্ফার নেবার জন্যে সম্প্রতি এর তিন গুণ টাকা পেয়েছেন।

কোনো সন্দেহ নেই আর্ট কাউন্সিল ইংল্যান্ডের প্রায় পঞ্চাশটি থিয়েটারকে অর্থ সাহায্য করেছেন। কিন্তু এই সাহায্যের কতটা তরুণ নাট্যকাররা পেয়েছেন? তরুণ নাট্যকারদের উৎসাহ দেবার জন্যে এবং

রোনাল্ড ডানকান

তাঁদের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করার জন্যেও যেখানে বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করা হয় সেখানেও এই নাট্যকাররা উল্লেখ করার মতন কিছু পান না। দুজন নাট্যকারকে তো আর্ট কাউন্সিল নিজেরাই সরাসরি সাহায্য করেছেন।

ডানকান বলেছেন, গত বছর আমায় কাউন্সিল আড়াই শো পাউন্ড সাহায্য করেছিলেন। আমি আমার দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ (ম্যান) নিয়ে কাজ করছিলাম। আমি মনে করি জীবিত কবি ও সংগীত রচয়িতাদের সরাসরি সাহায্য করা উচিত, বিশেষ করে যাঁরা তরুণ ও অখ্যাত। সাহিত্যের জন্যে গত বছর মাত্র আঠাশ জন লেখক কাউন্সিলের সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু আরও কত জনের তা প্রয়োজন ছিল তা কি কেউ খোঁজ করে দেখেছেন? আর্থিক দুরবস্থার জন্যে কত লেখকই লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো সময়েই জনা বারোর বেশী ভাল

কবি একই সঙ্গে জীবিত থাকেন না। তাঁদের সাহায্য করা যেতে পারে নানাভাবে, যেমন কাব্য পাঠের ব্যবস্থা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত কবিদের অর্থ মঞ্জুর করে। যাঁরা সিরিআস নভেলিস্ট—তাঁদের বই ছাপার জন্যে প্রকাশকদের অর্থ সাহায্য করা যেতে পারে—যাতে লেখকরা অন্তত বছরে আড়াই শো পাউন্ড রয়ালটি পান। এক বছর ধরে পরিশ্রম করে একটি উপন্যাস লেখার বদলে আড়াই শো পাউন্ড বেশী কি।

রোনাল্ড ডানকান আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যা আমাদের কাছে অবান্তর মনে হবে। মোট কথাটা এই যে, ডানকানের লেখা পড়ে মনে হয়, ইংল্যান্ডে কবি সাহিত্যিক নাট্যকারদের সাধারণ আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। জনপ্রিয় কিংবা বিখ্যাত লেখক কবি অথবা নাট্যকার না হলে সেখানেও শুধু লেখার ওপর নির্ভর করে বাঁচা যায় না। এক বছর ধরে পরিশ্রম করে একটি উপন্যাস লিখে যদি আড়াই শো পাউন্ড—মানে আমাদের টাকার হিসেবে হাজার পাঁচেক টাকা পাওয়া যায়, তা হলে ইংল্যান্ডের মতন দেশে কেমন করে সেই লেখকের চলবে আমি জানি না।

কাজেই যাঁরা মনে করেন, বিদেশে লেখক হয়ে জন্মালে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যেত—তাঁরা বোধ হয় ভুল করেন। অবশ্য জনপ্রিয় হয়ে গেলে—কিংবা কোনো কারণে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলে আলাদা কথা। তখন ব্রিটিশ লেখকদেরও শুনেছি আমেরিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, আমেরিকান এডিসনের অর্থের জন্যে। আবার আমেরিকার লেখকদেরও সমান অবস্থা—যতক্ষণ না কেউ কোনো কারণে বাজারে 'চাহিদা' হয়ে উঠছেন। ইটালী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি দেশের কথা বলতে পারি না, তবে সেখানেও নিশ্চয় লেখক মাত্রেই ধনী নন, প্রকাশকও সদয় হয়ে সকলের বই ছাপেন না (পানিন—যাঁর বিষয়ে ইতিপূর্বে লিখেছি, তিনিও তাঁর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থটির জন্যে প্রকাশক না পেয়ে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে বইটি ছেপেছিলেন)।

বাঙালী লেখকদের সম্পর্কে গল্প অনেক আছে। হতে পারে জনপ্রিয় বা বিখ্যাত লেখকরা লেখা থেকে ভালই উপার্জন করেন। ... আর কোন দোষ না হয়! কিন্তু সাধারণ লেখক অখ্যাত তরুণ লেখকদের কেউ কি অর্থ সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে?

আমাদের শিক্ষা দপ্তর থেকে ইদানীং কোনো কোনো বই ছাপার জন্যে লেখক অথবা প্রকাশককে টাকা দেওয়া হয় শুনেছি। ভাল কথা। কিন্তু আপাতত বইয়ের বাজারের যে অবস্থা তাতে অন্য ধরনের সাহায্যের প্রয়োজনও রয়েছে। সরাসরি অর্থ সাহায্য নানা গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে। তবে কাগজের মূল্য হ্রাস, সরকারী অর্থে লাইব্রেরীতে ভাল বই কেনার বরাদ্দ আরও বাড়ানো ইত্যাদি সাহায্যও করা যায়। তা ছাড়া, প্রবীণ ও বৃদ্ধ অনেক লেখক আছেন যাঁদের এখন আর্থিক সঙ্গতি নেই, সরকার এঁদের কিছু মাসিক সাহায্য করতে পারেন। এ-রকম সাহায্য যা করা হয় তা কিন্তু যথেষ্ট নয়।

অভিনন্দ

ভ্রম সংশোধন

২৬ জুলাই প্রকাশিত 'থ্রিলারের চরিত্র বদল' শীর্ষক লেখাটিতে জনৈক হিন্দী সমালোচকের নাম উল্লেখে ভুল হয়েছে। পুষ্পেশ পন্থ নামটি ভুল। সমালোচকের নাম ব্রিজভূষণ শর্মা।

॥ পঁয়ষট্টি ॥

অনেক দিন এমন এক সুন্দর দিন আসেনি। বাদল-মেঘ ছিঁড়ে মাঝে মাঝে শরৎকালের মতো আকাশ দেখা যাচ্ছে। শরৎকালই তো! ভাদ্র পড়ে গেল। বরাবরই শরৎকাল সোমেনের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। আবহাওয়া তো আছেই, তা ছাড়া বহুদিনকার লজ্জাকর ধারটা শোধ দেওয়া গেল। ফের অবশ্য ধার হয়েছে বউদির কাছে। তো সোমেনের জীবনটা বোধ হয় এইভাবেই যাবে। একজনের কাছে ধার নিয়ে অন্যজনকে শোধ করবে। তবু দিনটা আজ ভালই। যদি লক্ষ্মণদা চেষ্টা করে, যদি হয়ে যায় আমেরিকার একটা চাকরি!

দাড়িটা কামানো দরকার। আজ সেই ভুতুড়ে সিনেমার টিকিটের দিন। মনে পড়লেই বুকটা লাফিয়ে ওঠে রহস্যের গন্ধে।

পাড়ার সেলুনে আজ বড্ড ভীড়। চেনা নাপিত ফুলেশ্বর দুঃখ করে বলল—সারা সকাল দোকান খালি গেল বাবু, তখন তো এলেন না! এখন ভরদুপুরে যত ভীড়। বাবুদের সব সময় হয়েছে।

অগত্যা বাসায় ফিরে দাদার রেজার কামিয়ে নেবে বলে রণেনের ঘরে ঢুকছিল সোমেন। দাদা একটা ঝকঝকে নতুন জিলেট-এর ওয়ান পিস সেট কিনেছে। পুরোনো সেটটা দিয়েছিল সোমেনকে। কিন্তু সেটার প্যাঁচফ্যাঁচ কেটে গেছে, পড়ে ছিল। বুবাই টুকাই খেলতে নিয়ে কোথায় ফেলেছে কে জানে! নতুন সেটটায় কামিয়ে আরাম, দারুণ সব উইলকিনসন ব্লেডও আছে দাদার।

রণেন বিছানার একপাশে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। খালি গা, পরনে দারুণ একটা বাটিকের কাজ-করা জেলেমানুষী লুঙ্গি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা এঁটে বই পড়ছে। আজকাল রণেন একদম কথা বলে না। সে যে বাড়িতে আছে তা টের পাওয়াই ভার। বরাবরই সে শান্ত ছিল, কিন্তু এখনকার নীরবতা প্রায় নিশ্ছিদ্র।

সোমেনের খেয়াল হল, গত প্রায় দিন দশেক সে দাদার সঙ্গে কোনো কথা বলে নি। আজ বলল।

—দাদা, তোমার সেভিং সেটটা নেবো?

রণেন একবার তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

এধার ওধার কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না সোমেন। ড্রেসিং টেবিলের টানায় সাধারণত থাকে।

হাতের মোটা বইটা খুব জোর শব্দ করে বন্ধ করে দিল রণেন। বিরক্ত হয়ে বলল—কি খুঁজছিস? জমির দলিল? সে তো মার কাছে।

—জমির দলিল! একটু অবাক হয়ে সোমেন বলল—না তো। বললাম যে শেভিং সেটটা!

—ও! বলে রণেন উদাস হয়ে বলল—আমার কাছে নেই। তোর বউদিকে জিজ্ঞেস করিস।

—না হলেও চলবে। বলে একবার গালে হাত বোলায় সোমেন, বলে—না হয় বেরোনোর সময়ে সেলুনে কামিয়ে নেবো।

—তুই কি করিস আজকাল? রণেন যেন বা খানিকটা জবাবদিহি চাইবার মতো করে বলে—শুধু ঘুরে বেড়াস?

সোমেন দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে। দুপুরে রোদে ঘোরা শরীরটা তেতে আছে। মাথাও গরম। একটু চুপ করে থেকে বলল—কিছুই করি না। কি করব বল?

খুব বিরক্তির সঙ্গে রণেন বলে—এতগুলো ইন্টারভিউ আর রিটন টেস্ট দিলি, কিছু হয় না কেন? সকলের হয়, তোর হয় না?

সকলের হয় না, কারো কারো হয়। এ সত্য রণেনও জানে। তবু তার মুখে একথা

শুনে বিস্মিত সোমেন বলে—না হলে কি করব?

—কিছু তো করতেই হবে। বসে থাকা কি ভাল? নানা রকম বদ দোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তোকে যে আই এ এস দিতে বলেছিলাম।

বদ দোষ কথাটা কানে খট করে লাগল। তবু মাথাটা স্থির রেখে সোমেন বলে সে সব আমার দ্বারা হবে না। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা কি সকলের দ্বারা হয়? তা ছাড়া বয়সও বোধ হয় নেই।

রণেন চশমাটা খুলে তার দিকে গম্ভীর চোখে চেয়ে বলে—তোর বয়স কত হল যেন?

—পঁচিশ টচিশ হবে। ভাসা ভাসা উত্তর দেয় সোমেন। সঠিক উত্তর দিলে যদি আই এ এস পরীক্ষাটা আবার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় দাদা!

—পঁচিশ। বলে রণেন ভাবনায় পড়ে—তোরও পঁচিশ হয়ে গেল? অনেক বয়স হল তো তোর। সেদিনও ছোট্ট ছিলি আমার তাহলে কত হল? মাকে একবার জিজ্ঞেস করে আয় তো।

—জিজ্ঞেস করার দরকার কি? তুমি আমার চেয়ে কত বছরের বড় সেটা হিসেব করলেই তো হয়।

—তোর কি সার্টিফিকেটে বয়স বাড়ানো আছে?

—না তো। বরং কিছু কমানো আছে বোধ হয়।

রণেন অবাক হয়ে বলে—তাই বা হয় কি করে। সার্টিফিকেটেও তো বয়স বেশী বা কম থাকবার কথা নয়। বাবা নিজে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলেন বাবা তো আর বয়স ভাঁড়ানোর লোক নয়। তোর সার্টিফিকেটটা একটু দেখিস তো, ঐটেতেই ঠিক বয়স আছে। আচ্ছা দাঁড়া—

বলে রণেন উঠে খাটের তলা থেকে একটা পুরোনো কব্জাভাঙা তোরঙ্গ টেনে আনল। তার ভিতরে গুচ্ছের পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে কয়েকটা পাকানো কোষ্ঠীপত্র বের করে আনল। খুলে খুলে দেখতে লাগল।

মাথা নেড়ে বলল—তোরটা নেই। আমারটাও দেখছি না। মাকে একটু জিজ্ঞেস করিস তো কোথাও রেখেছে কিনা।

—করব।

—এত বয়স হওয়ার কথা তো তোর নয়। পঁচিশ! বলিস কি? তাহলে আমি কি চল্লিশ পার হলাম নাকি? তোরঙ্গটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে রণেন খাটে উঠে বসে বলল—এখানে বোস।

সোমেন বসে। কিন্তু রণেন কিছু বলে না। কেবল অন্যমনস্কভাবে কি ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণমুখে আঙুল মটকাতে থাকে।

এ সময়ে স্নান করে বউদি ঘরে আসে। শায়া, ব্লাউজের ওপর শাড়িটা ভাল করে পরা হয়নি, স্তূপ করে ধরে রেখেছে। চুল গামছা জড়ানো। সেটা খুলতে খুলতে বলল—যাও তো, বাথরুম খালি আছে এখন, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো। আমি ঠাকুরকে ফুলজল দিই।

রণেন সে কথায় কান না দিয়ে খুব অসহায়ভাবে বীণাকে বলে—সোমেন বলছে ওর বয়স না কি পঁচিশ!

বীণা একটা ভ্রূ ভঙ্গি করে বলে—পঁচিশ! যাঃ। বলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে কোল্ড ক্রীম মাখতে মাখতে বলে—বাইশ তেইশ হবে বড়জোর।

সোমেন বলল—বাঃ রে, তুমিই তো সেদিন হিসেব করে বললে আমার চব্বিশ পূর্ণ হয়ে পঁচিশ—

আয়নার ভিতর দিয়ে বীণা তাকে চোখ টিপে একটা ইশারা করল।

রণেন খুব টালমাটাল চোখে এদিক-ওদিক চাইছিল। বলল—ওর পঁচিশ হলে আমারও তো অনেক হয়ে গেল। ওর চেয়ে আমি বয়সে—

বীণা ধমক দিয়ে বলল—স্নান করতে যাবে না কি? তোমার আদুরে মেয়ে বাথরুমে ঢুকল কিন্তু একটি ঘণ্টা। সে আজকাল খুব সাজুনী হয়েছে। যাও।

—যাচ্ছি। রণেন বলে—তুই যেন কি খুঁজছিলি সোমেন?

—আমার রেজারটা ওকে দাও তো। বলে কি যেন বিড়বিড় করতে করতে রণেন উঠে যায়।

বউদি ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পিছন দিক থেকে শেভিং সেটটা বের করে দিয়ে বলে—ওর সামনে বয়সটয়সের কথা কখনো তুলো না। বয়স হওয়াকে ও ভীষণ ভয় পায়। কেবল মৃত্যুচিন্তা করে তো, তাই বয়সকে ভয়।

সোমেন আচমকা কিছু না ভেবেই বলে ফেলল—দাদাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে

দাও না। বাবা মন্ত্র-তন্ত্র নিলে ভাল হয়ে যেতে পারে।

বীণা একবার মুখটা ফেরাল। ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকে দেখে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল—সোমেন, শ্বশুরমশাই তাঁর গুরুর মন্ত্র বিলিয়ে বেড়ান। অনেকে তাঁকে বিশ্বাসও করে। এসব আমি জানি। কিন্তু তুমি কি তাঁর মন্ত্রে বিশ্বাস কর? কিংবা তাঁর আদর্শে? ঠিক করে বলো তো!

সোমেন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, ঠিক ভেবে দেখিনি। তবে থাকতেও পারে কিছু।

আয়নাতেও বীণার কোঁচকানো ভ্রূ দেখা যাচ্ছিল। তাহলে ওরকম বললে কেন? আজকাল সবাই না ভেবে না চিন্তে বড্ড আলটপকা কথা বলে। বলে হোমিও-প্যাথী করাও, কেউ বলে জ্যোতিষের কাছে যাও, কিংবা দীক্ষা দাও। আমি জানতে চাই, কোনটা ঠিক রাস্তা! কোন্ চিকিৎসাটা ঠিক চিকিৎসা। যে যা বলছে করছি, কিছু তো হল না। এখন ঘরের মানুষ তুমিও ওরকম সব উপদেশ দেবে নাকি?

সোমেন বড় অপ্রতিভ হয়ে বলে, দাদার অসুখটা তো আমি জানি না বউদি।

বীণা খুব ব্যথাতুর মুখে বলে—জানো না কেন? এক ছাদের তলায় থাকা, এক রক্তের সম্পর্ক, তবু কেন জানো না? তোমরা যদি একটু জানবার চেষ্টা করতে তাহ'লে আমাকে এত ভেবে মরতে হত না। একা আমিই ভাবছি, ছোটাছুটি করছি, আর সবাই বাইরে থেকে কেবল 'এটা করো সেটা করো' বলে। আমার মাথার ঠিক থাকে না। শ্বশুরমশাইয়ের কাছে মন্ত্র নিলেই যদি ভাল হত তো উনি সেটা দিয়ে দিলেই পারতেন। আমার অনুমতির দরকার ছিল না। তোমরা যদি ওর এত পর হয়ে যাও তো কি করে হবে?

সোমেন কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে উঠে এল।

ঝকঝকে শেভারটা নিয়ে যখন নিজের ঘরে দাড়ি কামাতে বসেছে, তখন কি জানি কেন তার দু চোখ ভরে জল এল। উঁচু নীচু, অসমান হয়ে গেল তার প্রতিবিম্ব। আবছায়ায় কাঁপতে লাগল। ভাবল, দাড়িটা কামাবে না আজ। থাক। সিনেমায় যাবে না।

এক গালে সাবান লাগানো হয়ে গিয়েছিল। সেটা গামছায় মুছে ফেলল সোমেন। শেভারটা দাদার ঘরে রেখে এল। সিগারেট খেতে লাগল শুয়ে শুয়ে। আর ঠ্যাং নাচাল। বাস্তবিক সে না ভেবে চিন্তে বলেছে ও কথাটা! সত্যিই তো, দাদার অসুখের জন্য তার তেমন মাথাব্যথা নেই। সে কেমন দিব্যি আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে,

ঘরে বেড়াচ্ছে। বৌদি দাদার সব তার বউদিরই। আর কারো নয়। মাঝে মাঝে দাদার কথা মনে করে কষ্ট হয় বটে। কিন্তু যৌবনের নানা দিকের ডাক এসে সব ভুলিয়ে দেয়। এবার, এখন থেকে সে দাদার কথা একটু বেশী ভাববে।

খাওয়ার পর দুপুরে শুতে গিয়ে সোমেন মার সঙ্গে ঝগড়া করল। বলল—বউদি ঠিকই বলে। আমরা কেউ দাদার জন্য কিছু করছি না। দাদার জন্য আমাদের একটুও সিমপ্যাথী নেই। একা বউদি কত দিক সামলাবে?

শুনে ননীবালা অবাক। বলেন—বলিস কি! কে ভাবছে না? দিনরাত ঠাকুরের কাছে মাথা কুটছি। এই সেদিন গোবিন্দপুরে নিয়ে গেলাম। ফকিরবাবার ওষুধ খাইয়ে আনলাম। তোর বাবা কোষ্ঠী বিচার করল ভাল করে। ওর এ সময়টা ভাল নয়। বলে দিল। ভাবছি না বললেই হত!

সোমেন খুশী হল না। বলল—আমি তো শুনি কেবল বাড়ি-বাড়ি আর টাকা-টাকা করছ দিনরাত। দাদার কথা ভাবলে কখন?

ননীবালা বলেন—তা বাড়ি বা টাকাই কি ফ্যালনা নাকি! সংসারে থাকতে গেলে নিজের একটা কুঁড়ে ঘর হলেও লাগে। সে হল সংসারের স্থিতু। লক্ষ্মীর থান। আর টাকার জোরেই মানুষ চলে, বড় হয়।

—তত্ত্ব কথা রাখো তো মা। সংসারের সব কিছুই মানুষের জন্য। মানুষটাই যদি কষ্ট পায় তো ওসব দিয়ে কি হবে!

—তো কষ্ট পাওয়ার থাকলে আমাদের কি করার আছে। ডাক্তার ফকির সবাই ওষুধ দিচ্ছে। আমরা ভগবানের ভরসা করতে পারি।

—ছাই ভগবান। বলে উঠে পড়ল সোমেন। প্রায় আড়াইটা বাজে। ঘরে থাকলে আরো মাথা গরম হবে। পোশাক পরতে পরতে বলল—আমার আর এসব ভাল লাগে না। সংসারের কথা শুনলেই মাথা গরম হয়ে যায়।

ননীবালা একটু নরম হয়ে বলেন—তো করবি কি? সংসারে থাকতে গেলেই একটু ভালমন্দ শুনতে হয়।

—আমার শুনতে বয়ে গেছে। আমি পালাচ্ছি শীগগীরই। অ্যামেরিকায় গিয়ে আর খোঁজও নেবো না, দেখো।

ননীবালার হতবাক ভাবটা তখনো যায়নি, সোমেন আর ভেঙে কিছু বলল না। বেরিয়ে এল।

সিনেমায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রাস্তায় বেরোনোর পর গরম মাথাটা টপ করে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর তখন ভূত-গ্রস্তের মতো তাকে সিনেমার টিকিটটা টানতে লাগল।

মেট্রোর তলায় যখন পৌঁছোল সোমেন তখন তিনটে বাজতে মিনিট পাঁচেকও নেই। পোর্টিকোতে বহু লোক দাঁড়িয়ে। একটাও চেনামুখ দেখা গেল না। তবু যে টিকিট পাঠিয়েছে তার জন্য একটু দাঁড়ায় সোমেন। হয়তো এখনো আসেনি। নিউজরীলের পরে ঢুকলেও ক্ষতি নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও যখন কেউ এল না তখন হল-এ ঢুকল সোমেন। অন্ধকারে টর্চ বাতি এসে পড়ল তার গায়ে। অচেনা হাত এসে টিকিট নিল। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রো-এর কাছে। প্রথম সীটটাই তার। পর্দার প্রতিফলিত আলোয় সে পাশে-বসা মেয়েটিকে দেখবার চেষ্টা করল। বাইরের আলো থেকে অন্ধকারে এসে চোখ ধাঁধিয়ে আছে। ঠিক দেখতে পেল না।

বসবার পর হঠাৎ নরম, আলতো একটা হাত এসে তার হাতের ওপর চাপ দিল। ধরে রইল। মেয়েলী হাত।

(ক্রমশ)

গোবিন্দপুর, সুতানুটি ইত্যাদি কয়েকটি নগণ্য গ্রাম দিয়ে যে নগরের পত্তন হয়েছিল একদিন, সেই কলকাতা যে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম নগরী হয়ে উঠবে, তা' কে ভাবতে পেরেছিল। সেকথা কেউ ভাবতে পারে নি অথবা সচেতন হয়ে ভাবে নি বলেই কলকাতা আজ পৃথিবীর কাছে একটি বিশেষ খবর। এবং ইতিমধ্যেই কলকাতার ভাগ্যে 'মিছিল নগরী', 'জঞ্জাল নগরী', 'দুঃস্বপ্নের নগরী' ইত্যাদি নানা ধরনের শিরোপা জুটে গেছে। শুধু তাই নয়, 'কলকাতার ভবিষ্যৎ কি', 'কো ভাদিস ক্যালকাটা' ইত্যাদি নানাবিধ দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন বিশ্বব্যাঙ্কের ম্যাকনামারা থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের মান্যগণ্য বুদ্ধিজীবীরা। এই গ্রন্থের লেখকও তাদের মধ্যে একজন। আমেরিকান হয়েও সহানুভূতি, যুক্তি এবং সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন কলকাতাকে।

'পৃথিবীর খুব কম শহরই কলকাতার মত আমাদের অনুভূতিগুলিকে আঘাত করে', ভারত সরকারের কোন এক ট্যুরিস্ট গাইডের পুস্তিকায় বলা হয়েছে। এ আঘাত এমন এক ধরনের আঘাত, যা আমাদের দূরে ঠেলে দেয় না, বরং কাছে টেনে আনে।

বিদেশী বই

হয়ত তাই কলকাতার বিশাল ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে নিষ্ঠুর দার্শনিকের মত বলতে ইচ্ছে করে, 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান'। যদিও চোখের সামনেই কলকাতার রাস্তায়-ঘাটে কাতারে কাতারে নগ্ন অস্থিচর্মসার রুগ্ন দেহ, ক্ষুধার্ত মুখ এবং নামহীন মৃত মানুষের মিছিল। সন্ধ্যার পর এই কলকাতা যখন শ্বাসরোধকারী ধোঁয়ার চাদরে ঢেকে ফেলে নিজেকে, নর্দমার নোংরা-আবর্জনা এবং ঘুঁটে পোড়ানোর গন্ধে কলকাতার অপরিসর রাস্তা খিকথিক করতে থাকে, সে সময় কেবলমাত্র

CALCUTTA: Text: Joseph Lelyveld, Photographs: Raghubir Singh, The Perennial Press, Hong Kong, Price: Rs. 156.00.

কয়েক গুচ্ছ বোগেনভেলিয়া ও দখিনা বাতাস ক্ষণিকের জন্য হলেও কলকাতাবাসীর মনে তবু যেন খানিকটা বেঁচে থাকার তৃপ্তি এনে দেয়। এই হল কলকাতা, অত্যন্ত বাস্তব কলকাতা।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে অসহায় রিকসাওয়ালার পায়ের তলায় পিচ গলতে শুরু করে, সমস্ত শহরে তখন শুধু মাছি, আবর্জনা, মহামারী কলেরা এবং মৃত্যুর তাণ্ডব। বিদেশী ট্যুরিস্ট পরের প্লেনেই পালায় রূঢ় এবং রুক্ষ কলকাতা ছেড়ে, উচ্চ-বিত্ত সম্প্রদায়ের লোক তখন পাড়ি জমায় হিমালয়ের তুহিন শীতল পরিবেশে, শিল্পী সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদদের আড্ডা কফি হাউসের ফ্যানের তলায়, অফিসওয়ালারা সবুজ ডাবের জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে চেষ্টা করে, আর যাদের পেটে দেবার মত কিছুই খাবার নেই, তারা তাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং হতাশা ভুলবার জন্য শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দিনগুলো পার করবার চেষ্টা করে। এমনিভাবে সময় পেরিয়ে যায়, কলকাতা পেরিয়ে যায়। প্রচণ্ড গরমের কামড়ে সমস্ত কলকাতা যখন অতিষ্ঠ, তখন এক সময়ে অনেক আশা আর কল্পনার মেঘ নিয়ে আসে বর্ষা। কলকাতার গ্রীষ্ম অসহ্য হলে কলকাতার বর্ষা অসহ্যতর। বিশেষত দরমার বেড়া আর কাদামাটি দিয়ে তৈরী বস্তিতে অথবা খোলা আকাশের নীচে ফুটপাতে যাদের বসবাস। প্রচণ্ড বর্ষায় জব চার্ণকের আমলে তৈরী হয়ে আসা পূতিগন্ধময় পয়ঃপ্রণালী, কাদায় খিকথিক করতে থাকে, পুরনো বাড়ির ভিতে ফাটল ধরে, ধসে পড়ে দেওয়াল। লেখকের চোখে পড়ে সেই কলকাতা। এমনিভাবে। প্রতিদিন, প্রতিরাত।

নতুন ট্যুরিস্টের চোখে অস্বস্তি, ঠোঁটের গোড়ায় সবচেয়ে প্রথমে যে প্রশ্ন-গুলি ফস করে চলে আসে, তা হল এভাবে কি মানুষ থাকতে পারে? এখনো তবে কেউ কিছু করছে না কেন? কলকাতা কি বাঁচবে? মাঝে মাঝে মনে হতে পারে, এই কলকাতা শহর—যা ছিল প্রথম দেড় শতক যাবৎ ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী, যেখানে পশ্চিমী চিন্তা ও ভাবধারার প্রথম স্ফুরণ ঘটেছে, তা' কি করে পৃথিবীর বৃহত্তম আবর্জনা নগরীতে পরিণত হল? তবে কি কলকাতা শহর গোড়াপত্তনের ভেতরে কোন গলদ থেকে গেছে? আসলে লেখকের মতে, কলকাতা শহরের স্থান নির্বাচন বিজ্ঞান-সম্মতভাবে হয় নি। কলকাতা শহর পত্তনের পেছনে কাজ করেছে একদল বিদেশী বণিকের ব্যবসায়িক চিন্তা এবং স্বার্থ।

আর তাই ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এক জলা জংলা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম রাজধানী। গোড়াপত্তনের পরে অনেকেই ভুলটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হয়ত ১৮২৩ সালে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষির মত লিখেছিলেন বিশপ হেবার, 'কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে এই সুন্দর বিশাল শহরের প্রচ্ছন্ন ভঙ্গুরতা।'

ম্যানিলা, হংকং, রোম অথবা নিউ ইয়র্কের তুলনায় কলকাতার অভিজাত সমাজের জীবনযাপন অনেক নির্জীব, স্বাদহীন এবং খানিকটা জটিল। কলকাতার অভিজাত সমাজের কথা বলতেই লেখকের মনে পড়ে যায়, চকোলেটের বার হাতে বহুমূল্য শাড়ি পরিহিতা মেদবহুল মহিলার কথা, যার সমস্ত শরীর ঢেকে সোনার গয়না; অথবা পার্ক স্ট্রিটের কোন হোটেলে পুরুষালী চেহারার নর্তকীর অবিরাম নগ্ন নৃত্য এবং তার চেয়েও নির্লজ্জ ব্যাপার, হোটেলের ডিনারে মিহি সুগন্ধী বাসমতী চালের ঢালাও সরবরাহ, যখন কলকাতার সাধারণ মানুষকে গিলতে হচ্ছে রেশনের মোটা চাল বছরের পর বছর। তাই কলকাতার আকাশে ঘনিয়ে আসে বারুদের গন্ধ, পাইপগানের শব্দ এবং দেওয়ালে রক্তের দাগ। কলকাতার রাস্তায় রক্তের হোলি খেলা চলে অবিরাম। তবু কলকাতা বেঁচে থাকে, বাঁচতে চায়। সুইট সিক্সটিন, কালী মাই কি জয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মার্বেল প্যালেস, অরবিন্দ, মিছিল, নেতাজী সুভাষ, একটা পয়সা ভিক্ষে দেবে, অন্ধ নাচার, সত্যজিৎ রায়, লুই মাল, স্টক এক্সচেঞ্জ, দুর্গা পুজো, মাও-সে-তুং, রেসকোর্সের মাঠ, কফি হাউসের আড্ডা, বেকার যুবক, কবি, সি-এম-ডি-এ, ট্র্যাফিক জ্যাম, মিছিল, ময়দান নিয়ে কলকাতা বেঁচে আছে।

কোন কবি যেন লিখেছিলেন, সবুজ মখমলের মত ময়দান কলকাতার ফুসফুস, যদিও কবি বোধহয় জানতেন না (এই লেখাটি পড়বার আগে বর্তমান সমালোচকও জানতেন না), ফোর্ট উইলিয়মের পাশে ময়দান তৈরীর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল, কোন বিরাট মারমুখী জনতাকে মোকাবিলা করবার জন্য সৈন্যদলের প্রয়োজন একটি বিরাট উন্মুক্ত স্থান, যাতে যে কোন মানুষের ভেতর থেকে অবলীলায় বের করে নেয়া যায় তার ফুসফুস।

লেখক কলকাতা ও তার মানুষকে দেখেছেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে, সে দৃষ্টি কখনো বা শল্য চিকিৎসকের ছুরি-কাঁচির চিয়েও নির্মম, সত্যানুসন্ধানী এবং মর্মভেদী, কখনো দার্শনিক, আবার কখনো বা লঘু পরিহাসপ্রিয় হিউমারাস্। লেখক দেখেছেন, বাঙালীরা প্রচণ্ড বুদ্ধিমান এবং কলকাতা শহরের গরম এবং আবর্জনার ওপর দাঁড়িয়ে তারা ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে পৃথিবীর যে কোন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে ভালবাসে। কিন্তু কলকাতার নিজস্ব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কিংবা চিন্তা, নৈব চ নৈব চ। কলকাতার যে-পুলিস দৃঢ় হাতে নকশালবাড়ী আন্দোলন ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলে, সেই কলকাতার পুলিসই উইলিয়াম থ্যাকারের লেখা সম্পর্কে লেখকের সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনার সূত্রপাত করে। তবু লেখকের মতে, সারা ভারতবর্ষে সাহিত্য ও রাজনীতির যে প্রবহমান ধারা লক্ষ্য করা যায়, সে ধারা থেকে আজকের বাঙালী অদ্ভুত-ভাবে বিচ্ছিন্ন। কারণ কলকাতার ভেতরেই রয়েছে বিচ্ছিন্নতার ঘুণপোকা এবং এভাবে কে কতদিন বাঁচাবে কলকাতাকে?

এই গ্রন্থটির সঙ্গে রয়েছে বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী রঘুবীর সিং-এর ৭৭ খানা রঙিন চিত্র, যা শুধুমাত্র কলকাতার নিসর্গচিত্র নয়। এই ছবিগুলির মধ্য দিয়ে কলকাতা এমন এক বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে উপস্থিত, যা আমাদের গভীরভাবে ভাবায় এবং আমাদের আপাতশান্ত মনোজগৎ এবং তার অনুভূতিগুলিকে আঘাত করে প্রচণ্ডভাবে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা খুবই পরিচ্ছন্ন এবং যথাযথ।

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য যদুনাথের জীবনী

আচার্য যদুনাথ : জীবন ও সাধনা। মণি বাগচি। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-২৯। মূল্য ১৮·০০ টাকা।

১৯০১ খৃস্টাব্দে যদুনাথ সরকার India of Aurangzib গ্রন্থ প্রকাশ করে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজের যা প্রচলিত নিয়ম—কোনোরকমে একখানি গ্রন্থ রচনা করার পর লেখাপড়ার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে সেখানি ভাঙিয়ে পদ মান আহরণের জীবন-ব্যাপী প্রচেষ্টা—তা অনুসরণ না করে তিনি একমুখী সাধনায় নিবিষ্ট হলেন। এই সাধনা তাঁর দীর্ঘ জীবনে সম্প্রসারিত হয়েছিল ১৯৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, যে-বৎসর প্রকাশিত হয় তাঁর Fall of Mughal Empire এর চতুর্থ খণ্ড। তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলিকে পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করলে আমরা যা পাই তা হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস। ঔরংজিব থেকে দ্বিতীয় শাহ্ আলম পর্যন্ত মুঘল রাষ্ট্র-বিবর্তনকে কেন্দ্র করেই তাঁর মূল রচনার কাঠামোটি গড়ে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে উনবিংশ শতকের আরম্ভকাল পর্যন্ত মারাঠা শক্তির উত্থানপতনের ইতিহাসও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। রচনার সর্বতোমুখী মূল্যানুগত্য ঐতিহাসিক হিসাবে সম্ভবত যদুনাথের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে তাঁকে দুটি বড় বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল, তার একটি বাহ্য অপরটি আভ্যন্তরীন। তাঁর উপকরণগুলি ছিল বহু ভাষায় সঞ্চিত, কেননা ভারত সর্বযুগেই বহুভাষী দেশ ; এবং এরও আবার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ছিল তখনো অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত। নিজের গবেষণার জন্য ফার্সী, মারাঠী, প্রাচীন রাজস্থানী, অসমীয়া, সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসী ও পর্তুগীজ ভাষায় রক্ষিত মূল উপাদান পাঠ করে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, অনুবাদ বা অনুবাদের অনুবাদ নিয়ে কারবার করেননি। এতগুলি ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য তাঁকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

ভাষাগত বাহ্য বাধা ছাড়াও ছিল প্রচলিত মনোগত সংস্কার-বিশ্বাসাদির আভ্যন্তরীণ বাধা। এ ক্ষেত্রেও কঠিন পরিশ্রমলব্ধ তথ্য ব্যবহার করবার সময়ে তিনি যে সর্বাংশে আপসহীন সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ভাবাবেগ, পূর্ব-সংস্কার ইত্যাদি কিছুই ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর নিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। এই নির্ভীক সত্যানুসন্ধান এদেশে অনেকের সংস্কারে আঘাত করেছে এবং ফলে অনেক সময়ে তাঁকে বিরূপ সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপে বলা যায় রক্ষণশীল মুসলমান পণ্ডিতমহল থেকে ইসলাম-বিরোধিতা ও দেশপ্রেমিক মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিকমণ্ডলীর দিক থেকে মুঘল-পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ যুগপৎ তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে। তিনি বিচলিত বা আদর্শ-চ্যুত হননি। রাজতরঙ্গিণী-কার কলহণের মতে আদর্শ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত হবে অহেতুক অনুরাগ ও অকারণ বিদ্বেষ বিবর্জিত। এই আদর্শের পূর্ণ রূপায়ণ মানুষে সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু মানুষ নিজ সাধনার দ্বারা এর কতটা নিকটবর্তী হতে পারে যদুনাথ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পরিতাপ ও লজ্জার বিষয় যে, এ-যাবৎ আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এই বিরাট জ্ঞানতপস্বীর জীবন ও কীর্তির একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রণয়নের কোনো প্রচেষ্টা হয়নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটির পক্ষ

থেকে শ্রীঅমলেন্দু দে ও শ্রীবিনয়ভূষণ রায় তাঁর রচনাপঞ্জী সংকলন ও প্রকাশ করে অবশ্য আমাদের একটি মহৎ অভাব দূর করেছেন। ঐতিহাসিক হিসাবে যদুনাথের কীর্তির বিচারশীল, সশ্রদ্ধ কিন্তু সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছেন স্বর্গত অধ্যাপক কালি-কারঞ্জন কানুনগো, স্বর্গত অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ও আরো কেউ কেউ। কিন্তু ইতিহাসবেত্তা না হয়েও শ্রীমণি বাগচি সর্বপ্রথম যদুনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রণয়ন করে আমাদের দীর্ঘদিনের লজ্জা দূর করলেন। সুখপাঠ্য জীবনচরিত রচনা করে বাঙলা সাহিত্যে তিনি নিজের একটি বিশিষ্ট পরিচয় গড়ে তুলেছেন ও আমরা তাঁর লেখনী থেকে প্রতিভাশালী ও কীর্তিমান বহু ভারতীয় ও বঙ্গসন্তানের জীবন ও কীর্তিকাহিনী উপহার পেয়েছি। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর এই শ্রেণীর রচনা-তালিকায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রমসহকারে তথ্য-সংগ্রহ করেছেন ও সুকৌশলে সেগুলিকে সাজিয়েছেন। যদুনাথ জীবনে ছিলেন গম্ভীর, আত্মসমাহিত, স্বল্পভাষী ও প্রচারবিমুখ। তাঁর পরিচিতের সংখ্যা ছিল অল্প, অন্তরঙ্গের সংখ্যা অল্পতর। সুতরাং জীবনচরিতের অনুপুঙ্খ-সংগ্রহের কাজটি গ্রন্থকারের পক্ষে সহজ হয়নি। এর সঙ্গে তিনি যদুনাথের ইতিহাস-গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়প্রদান ও মূল্যবিচারেও কার্পণ্য করেননি। যথোচিত বিনয়ের সঙ্গেই তিনি এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরীদের ঋণ-স্বীকার করেছেন এবং নিজ গ্রন্থের জন্য কোনো অতিরিক্ত দাবীও করেননি। পরি-শিষ্টে যদুনাথ রচিত এযাবৎ অপ্রকাশিত হিস্টোরি অফ জয়পুর গ্রন্থের আখ্যাপত্র ও ভূমিকা এবং প্রিয়শিষ্য মহারাজকুমার ডঃ রঘুবীর সিংহকে লিখিত যদুনাথের কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হয়েছে। যদুনাথের স্নেহধন্য অধ্যাপক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের একটি ভূমিকা নিঃসংশয়ে গ্রন্থখানির মূল্যবৃদ্ধি করেছে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

কবিতা

জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-১৬। দাম চার টাকা।

জনপ্রিয়তাকে তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে নায়ক-নায়িকার চর্চাহীন কণ্ঠের গান যেভাবে শোনানো হয়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না। চলচ্চিত্র-জগতের আপামর ফ্যানেরা কতটুকু খবর রাখেন জানি না, কিন্তু সাহিত্যের পাঠকের অবিদিত নয় যে, সাহিত্যচর্চা এই কান্তিমান রুচিবান চলচ্চিত্র-নায়কের জীবনচর্যারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একটি শোভন সাহিত্য-পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকরূপে তাঁর নাম যেভাবে যুক্ত তার সঙ্গে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার সম্পর্কটা তত বড়ো নয়, যতটা আঙ্গিক সম্পর্ক—এ কথাও সাহিত্যপাঠক স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। খুব অনুচ্চ গ্রামে হলেও এই পত্রিকাতেই তাঁর নিয়মিত সাহিত্য-সাধনার স্বাক্ষর ছড়ানো।

জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর বিনীত সকুণ্ঠ প্রার্থনাটুকু মনকে স্পর্শ করেঃ "পায়ের চিহ্নগুলি দেখতে দেখতে এতদিন পরে নিজের অভিব্যক্তির যদি একটা কোনো অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস খুঁজে পাই, সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই কিছু কবিতা এই বইতে গ্রন্থনা করেছি।"

কোনো কবিতার পৃথক শিরোনাম নেই, আটটি পৃথক গুচ্ছে কবিতাগুলি সাজানো, প্রতি গুচ্ছের একটি করে নাম। "একক-ভাবে এক-একটি কবিতার আস্বাদ" শ্রীচট্টো-পাধ্যায়ের অভিপ্রেত নয়, "একটি ধারাবাহিক ভাবনার পরিচয়" তুলে ধরার জন্য এই নির্বাচন, এ-কথাও তিনি জানিয়েছেন। কৈশোরের নসটালজিয়া থেকে যে-ভাবনার শুরু, পরিণতির মধ্যাহ্নে এসে তার দীপ্ত রূপ পাঠক অবশ্যই খুঁজে পাবেন। এখানে বরং টুকরো টুকরো পংক্তিতে ছড়ানো শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের কবিত্বের কিছু নির্ভুল স্বাক্ষর চয়ন করা যাক। "মলয় তার সঙ্গে দেখা হল, দেখতে দেখতে অক্ষরগুলো কথা হয়ে উঠল, রেখাগুলো ছবি"; "আমার সারাদিনটা প্রকাণ্ড গাছটির মতো চুপ করে দাঁড়াল", "আমি কোনোদিন তোমাকে একটা শাঁখের মতো বাজাতে চেয়েছিলাম", "হয়তো এই কুয়াশার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেলে আমি তোমার নিঃসঙ্গতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারি", "এই মরুভূমি দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাবে পিপাসার ওপারে আমরা বনরাজিনীলা ভালবাসা।"

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আশিস চৌধুরী মধুগড় (মুক্তধারা, ঢাকা ১, সাত টাকা) আকারে উপন্যাস-প্রতিম, স্বাদে ছোটগল্প। এক সাংবাদিকের জীবনের অবলুপ্ত প্রেমের পুনরুজ্জীবন এবং জনচক্ষুর অন্তরালে একটি প্রান্তরের মধ্যে সেই প্রেমের উন্মোচনকে চিরজীবী করে রাখার জন্য প্রান্তরটির কল্পিত নামকরণ 'মধুগড়' উপন্যাসের উপজীব্য। ছোট হলেও কুড়িটি অধ্যায় এর জন্য ব্যয়িত হয়েছে, আরম্ভের ঘটনা ও গতিপরম্পরাও মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্প্রীতি রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু একটা কথা ঠিক, যেভাবে উপন্যাসটির আরম্ভ ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের যে পর্বটি গল্পের পটভূমি, তা নিয়ে নিশ্চিত একটি নতুন স্বাদের কাহিনী গড়ে তোলা যেত। আশিস চৌধুরী কেন ইচ্ছে করেই সে-দিকে শেষ পর্যন্ত গেলেন না। একটি চিরাচরিত বৃত্তের মধ্যে মোড় ঘোরালেন উপন্যাসের। তাঁর উদ্দেশ্য যথাযথ অনুধাবন করা কঠিন।

*

কি করে আপনি আপনার নিজের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হতে পারেন (আর্ট অ্যানড লেটার্স পাবলিশার্স, কলকাতা-১২, পাঁচ টাকা) বইটি অনুবাদগ্রন্থ। মিলড্রেড নিউম্যান এবং বারনার্ড বারকোউইজ (জীনওয়েন সহ)-এর রচনা থেকে অনুবাদ করেছেন পরীক্ষিৎ। মানহাটান-এর দুজন মনস্তত্ত্ব-বিদের সামনে-রাখা কিছু প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে জীবনযাপনকে দুশ্চিন্তামুক্ত করার কিছু সহজ পদ্ধতি ব্যক্ত হয়েছে।

সন্দেহ নেই যে, পূর্ববর্তীদের তুলনায় বর্তমান যুগে মানুষদের দুঃখ-যন্ত্রণা-অতৃপ্তি-অস্বস্তির বোধ অনেক তীব্রতর। নানান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবেশ-গত কারণ এর পিছনে। কিন্তু অভিযোগ বাড়িয়ে তুললে হতাশার ভারও বৃদ্ধিই পাবে। নিজেদের দোষত্রুটি অভ্যাস-আচরণ যে এই হতাশার মূলে কতখানি তা খতিয়ে বিচার করার ধৈর্য খুব কম মানুষেরই রয়েছে। নিউম্যান এবং বারকোউইজ বিখ্যাত এই দুই মনস্তাত্ত্বিক বহু সাধারণ লোককে সাহায্য করেছেন অর্থপূর্ণ আনন্দ-ময় জীবনযাত্রার পথ খুঁজে পেতে। অন্তর্নিহিত গুণাবলীর চর্চা করে সহজ জীবন-যাপনের পথ আবিষ্কার করতে যাঁরা ইচ্ছুক তাঁরা যে এই বই পড়ে উপকৃত হবেন, কোনো সন্দেহ নেই।

বিবিধ ও পত্রিকা

ইস্টিশানের মিষ্টি গান। সরল দে। ভারতী প্রকাশনী ৮১।৩এ রাজা এস সি মল্লিক রোড। কলকাতা-৪৭ দু টাকা।

সরল দে-র ছড়া অর্ধেন্দু দত্ত-র আঁকা ছবি ছোটদের মন এবং চোখ দুই-ই কাড়বে।

অরুণোদয় (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ত্রৈমাসিক) সম্পাদক : সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়। পুলক-চন্দ্র বিশ্বাস। নন্দন দত্ত। ৩১ উপেন্দ্রনাথ মিত্র লেন। সালকিয়া। হাওড়া। দামের উল্লেখ নেই।

কিছু গল্প আর কিছু কবিতাই এই সংখ্যার পুঁজি। পত্রিকার উৎসাহীরা সবাই বয়সে কিশোর। তাদের সাহিত্যপ্রচেষ্টা সাধনাসাপেক্ষ।

খেলার মাঠে

সরকারী নির্দেশনামার নানাদিক

ক্রীড়া প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক প্রবর্তিত ছয় দফা নির্দেশনামা কুইনাইন গেলার মত গিলতে হয়েছে। আই ও এ-কেও স্বীকার করে নিতে হয়েছে রামস্বামী পরিচালিত হকি ফেডারেশনকে। ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিন গদি আকড়ে থাকা সম্পর্কে কয়েক বছর থেকে নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদের সংগে টানা-পোড়েন চলছিল। বার বার কর্মকর্তারা পরিষদের ফতোয়া বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে বহাল তবিয়তে তখ্‌তে দখল করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সরকার অত্যন্ত কঠোর হওয়ায় এবং সুযোগ সুবিধা ও বিদেশ সফরের অনুমতি দিতে অস্বীকার করায় খেলার কর্মকর্তারা পথে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাও হয়তো আসতেন না, যদি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পরিষ্কারভাবে সমঝে না দিতেন।

ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সবাই প্রায় ধরনা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। আকুল আবেদন করেছিলেন—১৯৭৬-এর মন্ট্রিল অলিম্পিক পর্যন্ত অন্তত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখুন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ওদের জানিয়ে দেন আর কোন আবেদন নিবেদন নয়, সর্বান্তকরণে সরকারের সংগে আপনাদের সহযোগিতা করা উচিত।

এরপর রথী মহারথীদের বুঝতে বাকি থাকে না সরকারের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। আভাস অবশ্য আগেই পেয়েছিলেন। ভারত যে এবার মারডেকা ফুটবলে দল পাঠাল না তার কারণ কর্তৃপক্ষ জানতেন সরকারের অনুমোদন পাওয়া যাবে না। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক কে জিয়াউদ্দিন—যিনি দীর্ঘ একুশ বছর গদি আকড়ে আছেন তিনি তো রীতিমত বিরক্ত হয়েই আই ও এর সভা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন, দিল্লীতে যে সভায় নির্দেশনামা পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তবু কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত আচরণবিধির শর্তগুলি পুরোপুরি মেনে নেওয়া হয়নি। সহ-সভাপতিকে কর্মকর্তা হিসাবে রেহাই দেবার আরজি আগেই স্বীকৃত হয়েছিল। আই ও এ আচরণবিধি মানার প্রস্তাব গ্রহণ করেও কোষাধ্যক্ষকে কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য না করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, জাতীয় এবং রাজ্য ক্রীড়া সংস্থার ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এবং আই ও এ-র ক্ষেত্রে ১৯৭৬-এর জানুয়ারির মধ্যে নির্দেশনামা কার্যকর করা হবে।

কিন্তু শুধু জাতীয় বা রাজ্য ক্রীড়া সংস্থায়ই নয়, ব্লক পর্যায়েও নির্দেশনামা কার্যকর করা সরকারের উদ্দেশ্য।

দীর্ঘকাল ধরে খেলাধুলোর প্রশাসনের মধ্যে যাঁরা রয়েছেন তাদের অবশ্য বক্তব্যঃ

ফুটবল সম্রাট পেলে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে ফুটবল হেড করার কৌশল দেখাচ্ছেন। একটি বলে নিজের নাম সই করে তিনি ফোর্ডকে উপহার দেন। এর আগে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকেও সই করে একটি বল উপহার দিয়েছিলেন

মন্ত্রীরা দীর্ঘকাল পদ আঁকড়ে রাখলে দোষ হয় না, আমাদের বেলায় মহাভারত অশুদ্ধ হয়। তাঁদের বেলায় কায়েমী স্বার্থ গজায় না, আমাদের বেলায়ই গজায়। তাঁরাও আসেন নির্বাচনের মাধ্যমে, আমরাও পদে থাকি নির্বাচনের মাধ্যমে। তবু 'উদ্বাস্তু' করার কেন এই চেষ্টা?

যুক্তিটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। খেলার উন্নতিতে ক্রীড়া প্রশাসকদের অনেকের অবদানও অনস্বীকার্য। তবু কোন ব্যক্তির হাতে দীর্ঘকাল ক্ষমতা থাকলে ক্ষমতার প্রতি তার মোহ জন্মায়—স্বার্থ গজিয়ে ওঠে এবং বহু ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে গোষ্ঠীচক্র যার ফলে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়, আরম্ভ হয় দল রাখা মুখ চাওয়ার অনাচার অবিচার। এবং ভারতের বহু ক্রীড়া সংস্থা আজ কলুষমুক্ত নয়। তাই সরকারের নির্দেশনামা।

কিন্তু নির্দেশনামাও পরিষ্কার নয়। এখন যেটা প্রযোজ্য, তা হচ্ছে কোন কর্মকর্তাই ৪ বছরের একটি টার্মের বেশি পদে বহাল থাকতে পারবেন না। দুটি টার্মে ৮ বছর থাকতে পারেন যদি দ্বিতীয় টার্মের নির্বাচনে তিন চতুর্থাংশ ভোট পান। ৮ বছরের বেশি কোনভাবেই থাকা চলবে না। কিন্তু যেসব প্রতিষ্ঠানে এক বছরের টার্ম, বছর বছর নির্বাচন হয় সে ক্ষেত্রে কি হবে? ৪ বছর বা ৮ বছর সম্পাদকের পদে থেকে পরে সভাপতি বা সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করা যাবে কি না। ফুটবল সংস্থার কর্মকর্তা ক্রিকেটে বা হকিতে যেতে পারবেন কিনা? কিংবা এক সঙ্গে দুটি ক্রীড়া সংস্থায় থাকা যাবে কিনা। অথবা সাময়িকভাবে সরে দাঁড়িয়ে এক বছর বা দু বছর পরে আবার তখ্‌তে বসা যাবে কিনা। এক রাজ্যের বিদায়ী কর্মকর্তা অন্য রাজ্যে পদ অধিকার করতে পারবেন কিনা। অবৈতনিক পদের পরিবর্তে কোন সংস্থা যদি বেতনভুক কর্মকর্তা পদ সৃষ্টি করে সে ক্ষেত্রে কি হবে—ইত্যাদি বহু বিষয়ে
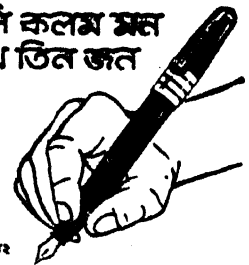
শিক্ষামন্ত্রকের ফতোয়া পরিষ্কার নয়। শোনা যাচ্ছে, এই আগস্টেই নতুন ফতোয়া জারী হবে। কিন্তু ছোট ছোট নিষেধের ডোরে বাঁধলেই যে 'বুড়ো-শিশুরা' ভাল ছেলে হয়ে যাবেন এমন আশা বৃথা। পদ গ্রহণ না করেও কেউ কেউ অঙ্গুলি হেলনে প্রশাসন চালাচ্ছেন এমন নজির এই কলকাতাতেই আছে। হতে পারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পদের জোরে কিংবা বহুদিন ধরে গোষ্ঠীচক্র গড়ে তোলার ফলে। সরকারী নির্দেশনামায় অবশ্যই এদের ক্ষমতা সংকুচিত হবে। কিন্তু সব চেয়ে ভাল কাজ হবে, যে উদ্দেশ্যে নির্দেশনামা রচিত হয়েছে সেই উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে ক্রীড়া প্রশাসকরা যদি নতুনদের কাজ করার জন্য পথ ছেড়ে দেন।

প্রাক-অলিম্পিক হকি ও পাকিস্তান

ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক ক্ষেত্রে এবং জাতীয় স্তরেও এক একটা মন্দ সময় আসে যা সহজে কাটিয়ে ওঠা যায় না। খেলার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বিশ্ব হকির মুখপত্র 'ওয়ার্ল্ড হকি'তেও ওই পত্রিকার সম্পাদক প্যাট্রিক রোলি লিখেছেন, সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক হকিতে এক সময়ের বিশ্ব শ্রেষ্ঠ ভারত অল্পের জন্য বার বার সাফল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বঞ্চনার সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেছে ১৯৭৩-এ আমস্টার্ডামে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলায়। দশ মিনিটের মধ্যে ২—০ গোলে এগিয়ে থেকেও টাই ব্রেকারে হেরে গেছে হল্যাণ্ডের কাছে। ভারত কিন্তু হেরে যাবার মত দল ছিল না। বার্সিলোনায় প্রথম বিশ্বকাপেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনালে ১—০ গোলে এগিয়ে থেকে হেরে গিয়েছিল। অলিম্পিকের অনেক খেলায়ও অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন দলের কাছে ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু কুয়ালালামপুরে তারা তৃতীয় বিশ্বকাপ জিতেছে হকি ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিনতম প্রতিযোগিতায়, যে প্রতিযোগিতায় সব চেয়ে বেশি সংখ্যায় শক্তিশালী দল অংশ নিয়েছিল—নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে খেলতে হয়েছিল। দীর্ঘ ১১ বছর পরে তারা আবার বিশ্ব হকির বিজয় মুকুটের অধিকারী হয়েছে। সহজাত দক্ষতা প্রকাশ এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার জন্য ভারতের এই জয়ের খুবই প্রয়োজন ছিল।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের কলা-কৌশলের প্রশংসা করে এবং যোগ্য দল হিসাবে ভারতের বিশ্বকাপ জয়কে স্বীকার করেও 'ওয়ার্ল্ড হকি'র সম্পাদক কিন্তু লিখেছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জয়সূচক গোলটি হকি ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কমূলক গোল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

সে কথা যাক। আসল কথা, নৈপুণ্য, দক্ষতা এবং পেলব কব্জির শিল্পফুল খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়েও ১১ বছরের মধ্যে ভারত আন্তর্জাতিক হকিতে বড় সাফল্য অর্জন করতে পারেনি মন্দ সময়ের জন্য।

পাকিস্তান হকির সময়ও এখন মন্দ যাচ্ছে। তিন বছরের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর কাছেই তিনবার হার স্বীকার করল। মুনিখ অলিম্পিকের ফাইনালে প্রথম। তারপর সম্প্রতি মন্ট্রিলে প্রাক-অলিম্পিক হকিতে দুইবার—গ্রুপ লীগে এবং ফাইনালে। দুইবারই পরাজয় ২—৩ গোলে। গত মার্চ মাসে কুয়ালালামপুরে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যে জার্মান দলকে পাকিস্তান ৫—১ গোলে পরাজিত করেছিল তাদের কাছে এক সপ্তাহে দু'বার পরাজিত হবার মত দল পাকিস্তান নিশ্চয়ই নয়। পাকিস্তান খেলোয়াড়দের প্রথা প্রকরণ এবং হাতের কলাশৈলী ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনুরূপ। জার্মানী কিংবা ইউরোপের যে কোন দলের চেয়ে অনেক উন্নত। তবু তাদের হার স্বীকার করতে হল।

পাকিস্তান অবশ্য সব ক্ষেত্রে আম্পায়ারের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। মুনিখে তো এই কারণে এক বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে সাসপেণ্ডই হয়েছিল। কুয়ালালামপুরের হারও সহজভাবে স্বীকার করতে পারেনি, মন্ট্রিলে হারের পর দুই আম্পায়ারের কাছে গিয়ে তাদের ধন্যবাদ প্রদানের ছলে মুর্দাবাদ জানিয়েছে। বলেছে—'আমরা ১৩ জনের বিরুদ্ধে খেলেছি'।

আমি বলব, আম্পায়ারিংয়ে যদি কিছু ত্রুটি হয়েও থাকে সেটা হয়েছে পাকিস্তান হকির মন্দ সময়ের জন্য। আম্পায়ারের ইচ্ছাকৃত কোন ত্রুটি নয়। আগামী বছর মন্ট্রিলের মূল অলিম্পিক খেলাতেও যদি এমন কোন ত্রুটিতে পাকিস্তানের বিপর্যয় ঘটে আশ্চর্য হব না। এবং বিস্ময়বোধ করব না, কৃত্রিম ঘাসের মাঠে প্রাক অলিম্পিক না খেলেও ভারত যদি ওই মাঠে খেলে মূল অলিম্পিকের সোনা জেতে।

খেলায় ধারাবাহিক মন্দ সময়ের অনেক নজির দেখানো যায়। অস্ট্রেলিয়ায় ও ইংলণ্ডে টানা ৭টি টেস্টের মধ্যে ইংলণ্ড কি ৫টিতে হারার মত শক্তিহীন দল? ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন টানা ২০টি কি ২২টি টেস্টের মধ্যে জয়ের মুখ দেখেনি তখন কি খুব শক্তিহীন দল ছিল? খেলার ক্ষেত্রেও সুসময় দুঃসময় আছে।

ভারত ও কৃত্রিম পিচ

মন্ট্রিলের প্রাক-অলিম্পিক হকিতে অংশগ্রহণকারী ৮টি দেশের স্থান নিম্নরূপ: ১। পশ্চিম জার্মানী, ২। পাকিস্তান, ৩। হল্যাণ্ড, ৪। আর্জেন্টিনা, ৫। গ্রেট ব্রিটেন, ৬। কানাডা, ৭। কেনিয়া, ৮। মেক্সিকো।

প্রাক-অলিম্পিকের জন্য মন্ট্রিলে দল না পাঠানোর ফলে আগামী বছর মূল অলিম্পিকের খেলায় ভারতের কতখানি অসুবিধা হবে তা ভবিষ্যতের প্রশ্ন।

মন্ট্রিলে যে মলসন স্টেডিয়ামে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে প্রাক অলিম্পিক-এর খেলা হয়েছে ওই স্টেডিয়ামে এবং ওই কৃত্রিম ঘাসের পিচে মূল অলিম্পিকের খেলা হবে। ভারতীয় খেলোয়াড়রা কোনদিন ওই পিচে খেলেনি। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য খেলার খুবই প্রয়োজন ছিল। নিখিল ভারত ক্রীড়া পরিষদ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল দল পাঠানো না হলেও দুজন প্রশিক্ষককে পাঠানো হবে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। কিন্তু কোন প্রশিক্ষকও পাঠানো হয়নি। কয়েকটি দেশ কিন্তু পাঠিয়েছে প্রাক-অলিম্পিকে দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা সত্ত্বেও। যেমন অস্ট্রেলিয়া। তিনটি অলিম্পিক ও বিশ্বকাপ দলের খেলোয়াড় ব্রায়ান গ্লেনক্রস ওই পিচ দেখে বলেছেন, এখানে সড়গড় হতে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে, গতিবেগ এবং দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে ভিন্ন ধরনের জুতো পরতে হবে। কানাডার কোচ এরল হার্টলের অভিমত : শিল্পফুল খেলোয়াড়রা এই পিচে আরও দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবে, খেলার গতিবেগ বাড়বে। যারা রাফ এবং বোলাস্ট হকি খেলতে অভ্যস্ত তাদের অসুবিধা হবে। ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক খেলোয়াড় এবং খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির সদস্য জার এস ভোলা অবশ্য গত বছর টরণ্টোতে কৃত্রিম ঘাসের পিচে হকি খেলা দেখেছেন। তাঁর মন্তব্য বিলিয়ার্ড টেবিলের মত মসৃণ ও সবুজ এই পিচে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে কোনো দলেরই বিশেষ অসুবিধা হবে না।

এক এক বিশেষজ্ঞের এক এক মত। সুতরাং পর্যবেক্ষক অথবা কোচ পাঠানো খুবই উচিত ছিল।

একলব্য

অতীতের এক ক্রীড়া প্রশাসক

গত ৩০ জুলাই সি এ বি-র নির্বাচনী সভায় বার্ষিক রিপোর্টের উপর চোখ বুলোতে বুলোতে একজন সদস্য বলছিলেন, আজ সি এ বি-র কোষাগারে ৪২ লক্ষ টাকা, অথচ একদিন অবস্থা ছিল ভাঁড়ে মা ভবানী। বেশ কিছু টাকার দেনা ছিল।

আলোচনা প্রসঙ্গে সেই মানুষটির কথা উঠল, যিনি সম্পাদক থাকাকালে সি এ বি-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্ফীত করে গিয়েছিলেন। দেনা মাথায় করে ঢুকেছিলেন। যখন সরে গেলেন তখন সি এ বি-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা ১৭ লক্ষ টাকা।

আমি পরলোকগত শৈলেন দে-র কথা বলছি, খেলাধুলোর প্রসার প্রচার, সংগঠন এবং প্রশাসনে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে অ্যালেন লীগ এবং এস বসু লীগের সঙ্গে এবার থেকে শুরু হয়েছে এস এন দে লীগের খেলা। আন্তঃ অফিস লীগের চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে নক আউট প্রতিযোগিতায় এস এন দে শীল্ডের ব্যবস্থা অবশ্য আগেই ছিল।

পরবর্তী জীবনে শক্ত হাতে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার হাল ধরলেও প্রথম জীবনে ফুটবল নিয়েই মেতে ছিলেন এবং কিশোর-কাল থেকে মেতে উঠেছিলেন খেলা ও খেলার সংগঠনের নেশায়। প্রমাণ, অরোরা ক্লাবের সৃষ্টি—যে ক্লাব অতীতে ফুটবলের প্রথম ডিভিসনে খেলেছে, এখন খেলছে ক্রিকেট লীগের প্রথম ডিভিসনে। প্রমাণ ক্যালকাটা রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিতে এবং অফিস স্পোর্টস ফেডারেশন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

প্রথম জীবনে খেলাধুলোও অবশ্য করেছেন। ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলেছেন এরিয়ান ও অরোরা ক্লাবে।

আদি বাড়ি ছিল জোড়াবাগান অঞ্চলে হরলাল দাস লেনে। বন্ধু হীরা দত্ত এবং কিছু ধনাঢ্য ক্রীড়া-উৎসাহীর সঙ্গে জোড়াবাগান পার্কে অরোরা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১৭ সালে। দীর্ঘদিন রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। পরে হন ওই সংস্থার সহ-সভাপতি এবং সভাপতি। তাঁর সময়েই সি আর এ ইংলন্ডের রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন লাভ করে এবং একটি সুসংঘবদ্ধ অ্যাসোসিয়েশনে পরিণত হয়। নিঃসন্দেহে শৈলেন দে-কে অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের জনক বলে অভিহিত করা যায়। আজ অফিস স্পোর্টস ফেডারেশন বিরাট এক ক্রীড়া-সংগঠন। কয়েক শত ক্লাব এর গণ্ডির মধ্যে। অফিস কর্মীদের খেলাধুলোর এখন অঢেল আয়োজন। কাজের জোয়াল কাঁধে করা মানুষ, সংসারের কঠিন আবর্তের মধ্যে যারা হাবুডুবু খায়, তাদের খেলাধুলোর কিছু নির্মল আনন্দ দেবার জন্য শৈলেন দে-র প্রচেষ্টায় অফিস স্পোর্টস ফেডারেশন গড়ে উঠেছিল। তিনিই ছিলেন ফেডারেশনের প্রথম সম্পাদক। আই এফ এ গভর্নিং বডির সদস্য হয়েছিলেন ওই সুবাদে, পরে সি আর এ-র প্রতিনিধি হিসাবেও গভর্নিং বডিতে ছিলেন।

দে'জ মেডিক্যাল-এর পরিচালক হিসাবে ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল সাফল্যের কথা অনেকেরই জানা আছে। জানা আছে সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথাও। জীবনের নানা দিকেই তিনি ছিলেন সফল পুরুষ। ছোটবেলা থেকে সংগঠনের নেশা ছিল বলেই জোড়াবাগান অবৈতনিক নাট্য সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। ওখানেও সংগঠনের দোসর ছিলেন হীরালাল দত্ত, যিনি পরে রেফারী

শৈলেন দে

অ্যাসোসিয়েশনেরও কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। হরলাল দাস লেনের ৪১ নম্বরে হীরালালবাবুর বাড়িতে ছিল অরোরা ক্লাবের অফিস, ৮ নম্বরে শৈলেন দে-র বাড়িতে ছিল শিল্পশ্রীর অফিস। নাট্য সমাজই পরে শিল্পশ্রীতে পরিণত হয়। অ্যামেচার স্টেজে হীরালাল-এর সিরাজদ্দৌলা এবং শৈলেন-এর ওয়াটস নাট্যরূপায়ণের নাকি দুই সার্থক সৃষ্টি। হ্যাঁ, অতীতের গুণগ্রাহী মহলের তাই অভিমত ছিল।

সাংবাদিক জীবনে বিশ-কুড়ি বছর নানা ব্যাপারে শৈলেন দে-র সান্নিধ্যে এসেছিলাম। দূর থেকেও দেখেছি, কাছ থেকেও দেখেছি। মানুষ আকর্ষণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁকে দেখলেই মানুষের সৌন্দর্য সত্তা আলোড়িত হত। সব সময় ধোপদুরস্ত পোশাক পরে খুব ছিমছাম থাকতেন। প্রশান্ত দৃষ্টির মধ্যে ভব্যতার রূপটি ফুটে উঠত। সংলাপের মধ্যে ছিল সংযম।

কলকাতার ক্রীড়াক্ষেত্রে 'দাদাভাই' নামে পরিচিত ছিলেন। সবারই দাদাভাই। বাড়ির, অফিসের, পল্লীর, ময়দান পাড়ার এবং আমাদেরও।

রেফারী অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক পরীক্ষায় কৌতূহলজনক যত প্রশ্ন আসত, বেশির ভাগ আসত দাদাভাইয়ের মাথা থেকে। অরোরা ক্লাবে বসন্ত ঘোষ নামে খেলার এক আইনবিশারদ ছিলেন। বিদেশ থেকে খেলার আইনের নানা বই আনিয়ে তিনি ও শৈলেন দে নানা কূট প্রশ্ন বের করতেন। নিজেরাও গবেষণা করে প্রশ্ন সেট করতেন। যেমন : একজন ফুটবল খেলোয়াড় আর কারো আইন-সম্মত স্পর্শ ব্যতিরেকে পর পর দুটি গোল বা তিনটি গোল করতে পারে কি না। উল্লেখ্য, কেউ একটি গোল করার পরই তার বিপক্ষ দলকে মাঝমাঠ থেকে খেলা আরম্ভ করতে হয়। তখনই তাদের বল স্পর্শ হয়ে যায়। সুতরাং অপর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে একজনের পক্ষে পর পর দুটি গোল করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা যে সম্ভব সি আর এ-র সম্পাদক শৈলেন দে প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

কিংবা প্রশ্ন, মাঠের মধ্যে একেবারেই না ঢুকে কেউ গোল করতে পারে কি না? অথবা কর্নার কিকের সময় অফসাইড হয় কি না? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি ফুটবল রেফারীদের জ্ঞান বাড়িয়ে গেছেন। তাঁর বিরাট অবদানের জন্য যতদিন ইচ্ছা সি আর এ-র সম্পাদক এবং সভাপতি হিসাবে থাকতে পারতেন। অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনের কর্তা হয়েও। কিন্তু তরুণদের কাজের সুযোগ দেবার জন্যই স্বইচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

অত্যন্ত প্র্যাক্টিক্যাল লোক ছিলেন। তাঁর সময়ে টেস্ট খেলার অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। অস্বীকার করছি না, এখন টেস্ট খেলার ডামাডোল এবং টিকিটের চাহিদা বেশি। কিন্তু আগেও খুব কম ছিল না। সব আয়োজন কিন্তু সুচারুরূপেই শেষ হয়েছে।

সেদিন ধীরেন দে বলছিলেন, দাদাভাইয়ের জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠি কোথায় ছিল জান? মায়ের কাছে। আমাদের মনে পড়ে না তিনি মায়ের অমতে কোন কাজ করেছেন। সব ব্যাপারেই মায়ের অনুমোদন নিয়ে কাজ করতেন। অথচ সেই মা বেঁচে থাকতেই ১৯৬৪ সালে মাত্র ৬৩ বছর বয়সে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোন কাজের অনুমোদনের জন্য যখনই আমরা মায়ের কাছে যেতাম দাদাভাইয়ের কথা বেশী করে মনে পড়ত। চোখ ফেটে জল আসত।

মুকুল

অরণ্যদেব ★ লী ফক

মোড়লরা এসো... অরণ্যদেব ডাকছেন...
জঙ্গলে ছড়িয়ে যাচ্ছে জরুরী বার্তা...

এ যে কীরকম অত্যাচারী, সে তোমরা হাড়ে-হাড়ে জানো...
এর কী করব, সেটা তোমরাই বলো...

বলছি। আমাদের সমস্ত লোক আর টাকাকড়ি তুমি ফেরত দেবে। ক্ষতিপূরণও চাই।
?!
12/29

কী করে দেব? তাহলে যে আমি সর্বস্বান্ত হয়ে যাব!
না দিলে তুমি মরবে।

আকবান সেই শর্ত মেনে নিল। তা ছাড়া তার উপায় ছিল না।
সর্বসান্ত মানে কী?
..মানে একদম ফতুর হয়ে যাওয়া–

সত্যিই নাকি লোকটা একেবারে ভিখিরী হয়ে গিয়েছিল.
একটা পয়সা দাও

জুমবা দেখছি দারুণ। সত্যি কী অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি!
জুমবা না থাকলে আমি প্রাণে বাঁচতুম না।

ওয়াকার কাকাকে* বাঁচিয়েছ। জুমবা, তোমাকে ধন্যবাদ।
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার কাকা
আগামী সপ্তাহে: নতুন গল্প।

"অসময়" (পরিচালনা : ইন্দর সেন) ছবিতে দীপংকর দে ও স্বরূপ দত্ত

মতামতের মন্তাজ

বাংলা ছবির সেনসর-ওয়াইজ রিলিজ-এর কথা শোনা যাচ্ছে। সেনসর-ভিত্তিক রিলিজ-এর একটা সুবিধা এই যে, সব বাংলা ছবিই মুক্তির আলো দেখতে পাবে। শুধু বড় তারকা অভিনীত বা বড় পরিচালকের ছবিই মুক্তির ব্যাপারে কেন অগ্রাধিকার পাবে তা নিয়ে চলচ্চিত্র মহলে বেশ আলোচনা চলছিল। এবার হয়ত তা বন্ধ হবে। সেনসর ভিত্তিক চিত্রমুক্তির কিছু অসুবিধাও থাকতে পারে। বছরের বিশেষ সময়ের সুযোগ নেবার জন্য কেউ কেউ ছবির কাজ আরম্ভ করেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন। অথবা সময় বুঝে সেনসরের জন্য প্রিণ্ট পেশ করবেন যাতে একটি বিশেষ সময়ে ছবির মুক্তির ব্যবস্থা হতে পারে। এইরকম ছোটখাটো নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

• • •

আবার এমনও হতে পারে যে কোন বাস্তববাদী পরিচালক বিশেষ এক ঋতুর অপেক্ষায় থাকবেন। ছবিকে সর্বদিক থেকে শিল্পমণ্ডিত করার জন্য তাঁর হয়ত সময় লাগবে অনেক। তাই সেনসরের জন্য তাকে ছবি পাঠাতে হবে দেরিতে। বছরে দুটো ছবি করার প্রেরণা বা সময় হয়ত তিনি পাবেন না।

• • •

এইসব সমস্যা গুরুতর নয়। সেনসর-ভিত্তিক রিলিজ-এর আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কারো কোন দ্বিধা বা দ্বিমত থাকার কথা নয়। সামান্য অসুবিধা যা দেখা দিতে পারে সেগুলিকে নিশ্চয়ই মানিয়ে চলা যাবে। যত বাংলা ছবি তৈরি হয় তার সব কটাই মুক্তিলাভ করুক এটাই সবাগ্রে কাম্য। যাঁরা ছবি করবেন তাঁরা অন্তত এই আশ্বাস পাবেন যে, তাঁর ছবি মুক্তি পাবে। তাতে বড় তারকা না থাকলেও ক্ষতি নেই। ছবি রিলিজ-চেন পাবে।

• • •

ছবির রিলিজের ব্যবস্থা হলেই হল না, ছবি যাতে চলে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। আসলে প্রযোজনার সংখ্যা বাড়ানো দরকার। ছবি ভাল না চললে ছবি তৈরির সংখ্যাও বাড়ে না। বাংলা ছবির প্রকৃত সংকট - এর প্রমোদ-মূল্য কমছে। এই সত্যটা মানতেই হবে। তবে সেনসর-ভিত্তিক মুক্তির ব্যবস্থা হলে বাংলা ফিল্ম ইনডাস্ট্রিতে আশার সঞ্চার হবে। ইতিমধ্যেই আশা জেগেছে। তাতে অনেকেই ছবি তৈরির ব্যাপারে নতুন করে উৎসাহিত। নতুন প্রযোজকরা আসবেন। নতুন ছবি তৈরির একটা উৎসাহ নিশ্চয়ই দেখা যাবে। সেদিক থেকে সেনসর-ওয়াইজ রিলিজ নীতি বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে নতুন প্রাণ উজ্জীবিত করবে সন্দেহ নেই।

সুতরাং

(বহুরূপী)

কিছুটা আজকের কিছুটা অল্পকাল আগের পরিস্থিতি বহুরূপীর নতুন নাটক "সুতরাং"-এ জানানো, দেখানো হয়েছে। এই অবস্থায় ভাইবোন সত্যব্রত ও সুব্রতা সুস্থ, সুন্দর জীবন পেতে পারে না। "সুতরাং" সুব্রতা নিজেই পিস্তলের গুলিতে ভাইকে মেরে ফেলে, যাতে গুণ্ডার হাতে মরবার অসম্মান তার না ঘটে। "সুতরাং" নামকরণের এটাই তাৎপর্য? হবেও তাই। "সুতরাং"-এর বিষয় নতুন

"সুতরাং"/তৃপ্তি মিত্র, অরিজিৎ গুহ

নয়। অনতি অতীত পশ্চিমবাংলার অস্থির ও ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে সম্প্রতি শৌখিন মঞ্চে অনেক নাটক হয়েছে, তবু বহুরূপী যখন এই বিষয় হাতে নিয়েছেন তখন তাতে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব কিছু থাকবেই। সেটা প্রধানত দেখা গেছে নাটক রচনায় ও পরিচালনায়, যার একক কৃতিত্ব তৃপ্তি মিত্রর। নাটক তিনটি 'এপিসোড' বা উপাখ্যানে বিভক্ত। পাপ ও ভ্রষ্টাচারের জগতে অসহায় ভাই-বোন ঘুরে বেড়াচ্ছে, পায়ের নীচে মাটি পাবার আশায়। তারা যেন একালের এক শ্রেণীর মানুষের শঠতা নির্মমতা ও ব্যভিচারের সাক্ষী। সমাজের চিত্রের একটি দিকই নাটকে দেখানো হয়েছে, অন্য দিকও আছে। তবে নাটকের পক্ষে বীভৎসতার দিকটাই ভাল, যদিও তার কিছুটা বাস্তব কিছুটা কল্পনা। বাইরে সম্ভ্রান্ত চেহারার আড়ালে বদমাশ ব্যক্তি (এ নাটকের নারায়ণ) অবলীলায় যে খলকর্ম সম্পন্ন করে বা গুপ্ত হত্যা সম্পাদন করিয়ে নেয় সেটা একমাত্র নাটক বা সিনেমাতেই বিশ্বাস্য। তার সাগরেদ যে ভিলেন (এ-নাটকে রামজী সিং) তার মত ধর্ষক হিন্দী চিত্রে হামেশাই দেখা যায়।

সুতরাং এই নাটকের বিষয়বস্তু এক দিক থেকে মামুলি। কিন্তু তাতে বহুরূপীর স্পর্শ আছে। নাটক রচনার গুণের কথা আগেই বলেছি। এবার প্রয়োগকর্মের সপ্রশংস উল্লেখ করতে হয়। "সুতরাং" কাহিনীতে নতুন কিছু মিলছে না এই বোধ থাকে, কিন্তু নাটকটি আগাগোড়া দর্শককে মঞ্চের দিকে মনোযোগী করে রাখে। এমনই নাটকের গতি, সংলাপ ও পরিস্থিতি নাটকীয়তার উত্তেজক চরম মুহূর্তে। তাছাড়া মঞ্চ পরিকল্পনা চমৎকার যাতে বাস্তব পটস্থল (কুমার রায় পরিকল্পিত) অনুভব করা যায়। সেটে চরিত্রদের জ্যামিতিক শৃঙ্খলায় উপস্থিত করা হয়েছে। তাপস সেনের আলোকপাত পরিকল্পনাও উঁচু দরের, যার গুণে বিভিন্ন দৃশ্যের সঠিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মঞ্চরূপ ও আলোর মায়া আবহ সুরকে (অসীম চ্যানারজি) অবশ্য চাপা দিতে পারেনি।

অভিনয়ের পারদর্শিতা দিয়ে আতঙ্কশঙ্কর বস্তুকেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা যায় সেটা 'সুতরাং'-এ প্রমাণিত। অবশ্য নাটকের দ্বিতীয় উপাখ্যানটি একান্ত বাস্তব। গল্পের দম্পতি রঞ্জিত-কুন্তলার জীবনের যন্ত্রণার রূপটি চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন শিল্পী একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আগাগোড়া সুব্রতা ও সত্যব্রত থেকে গেছেন তৃপ্তি মিত্র ও অরিজিৎ গুহ। তৃপ্তি মিত্রর অসামান্য অভিনয় নাটকটিকে গভীরতায় উত্তীর্ণ করেছে। কয়েকটি মুহূর্তেই তাঁর অভিনয়ে স্মরণীয়। অরিজিৎ গুহ তাঁর চরিত্রটির মর্মকথা প্রকাশ করতে পেরেছেন, অপ্রকৃতিস্থতা ও স্মৃতি-ভ্রংশের সময় তাঁর অভিব্যক্তি চমৎকার। বিশেষ অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনজন শিল্পী—কুমার রায়, দেবতোষ ঘোষ ও গীতা চক্রবর্তী। ওঁদের অভিনীত বিভিন্ন চরিত্র যেন জীবন্ত। শঙ্কর ঘোষ ও শান্তি দাস তাঁদের চরিত্রচিত্রণের জন্যও যথেষ্ট প্রশংসা পাবেন। উৎপল ভট্টাচার্য সমীর চ্যাটারজি, অসিত দাশগুপ্তের অভিনয়ও চরিত্রোচিত। আসলে অভিনয়ের যাদুশক্তি বহুরূপীর টিম-ওয়ার্ক-এ।

শুটিং চলছে ...

দরিদ্র আবু হোসেন স্বপ্ন জেগে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক অপ্সরা। মনে হয় সে পরী দেখছে। অনেকটা সেই অবস্থা হয়েছে এখন সুনীলের। ছেঁড়া চটে শুয়ে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে। তাড়া তাড়া নোট। বাড়ি গাড়ি ফ্রিজ টেলিভিশন। এই না হলে জীবন? সুনীল, উত্তীর্ণ চল্লিশ কিংবা পঁচিশে এসে পাশাপাশি গোপাকে না পেলে বড় গায়ক হবার স্বপ্ন দেখত না। তখন সে সময়ের কাছে একটু একটু করে হেরে যেতে যেতে মিলিয়ে যেত। অংকুরেই বিনষ্ট হত একটি প্রতিভা। যেমন হয় অনেক ক্ষেত্রে। আজ আর সুনীলের সেই আশংকা নেই। গায়কের জীবনটা স্বপ্নে নেই, অনুভবের মধ্যে মিশে গেছে। পিছনের ভাবনাগুলো মনের তলায় ফিরে আসতে চাইলেও গোপার মুখের দিকে তাকিয়ে সেগুলোকে সে জোর করে ফিরিয়ে দিতে পারে। তার

কোন অতীত নেই। সে শুধু আছে এবং থাকবে। গোপা ভাবছিল, একজনের জীবনের ঘূর্ণিতে আরেকজন অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে পড়ে বলেই প্রচলিত সমস্ত নিয়মের ভাঙচুর হয়। বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাওয়া যায়। এই না হলে জীবন?

দরজায় শব্দ হয়। সুনীল খানিকটা বিরক্তি বোধ করে। ঘুম ভাঙলেও ঘোর কাটে না। তার মুখে কথা আসে না। কেবল তাকিয়ে থাকে, অপলক। যেন গোপাকে সে প্রথম দেখছে। আসলে প্রথম দেখছে বিরজু। সুনীলের গুণমুগ্ধ শ্রোতা। বেকার যুবক। সে আপাতত ভৃত্যপদে বহাল হয়েছে। গোপা বিরজুর দৃষ্টির বাইরে এসে সুনীলের মুখোমুখি হয়। দুজনেই চোখের পাতা না ফেলে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনুক্ষণ অতিবাহিত হতে হাসির রোল।

হাসি থামিয়ে গোপা বিরজু-র দিকে একটুও না তাকিয়ে প্রশ্ন করে: এই, এইটিকে আবার কোত্থেকে জোটালে?

সুনীল: আপনি এসে গেছেন। সেদিন একটা গান প্র্যাকটিস করছি দেখি শ্রীমান জানলা থেকে মুখ বাড়াচ্ছে। মাথা নাড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করি, 'কি করছ?' বলে, 'কিছু না।' তারপর ওকে ঘরে আসতে বল্লি। সব শুনে........। কিন্তু গোপা, এত জামা কাপড় আমার জন্য?

বাংলা ভাষা যথাসাধ্য আয়ত্ত করলেও 'গোপা' উচ্চারণ করতে 'সুনীল'-এর ভূমিকায় বম্বের নায়ক-গায়ক শৈলেন্দ্র সিং একসময় হতচকিত। তাঁর মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে আসে 'গোতা'। সর্বনাশ। নায়িকা অপর্ণা সেনের খুব অভিমান হয়েছে। তিনি বলেছেন, গোপাকে 'গোতা' বললে আমি কিছুতেই শট দেব না! সঙ্গে সঙ্গে একজন সরস মন্তব্য করলেন ভাগ্যিস 'গুতো' হয়নি 'গোপা'!

'ববি'তে গান গেয়ে খ্যাত শৈলেন্দ্র সিং মূলত একজন অভিনেতা। পুনা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে 'অ্যাক্টিং'-এ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। অভিনয় বিষয়ে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। তিনি অভিনেতা হিসেবে সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। তারপর গায়ক হিসেবে। বম্বেতে শৈলেন্দ্র বর্তমানে প্রায় একডজন ছবির নায়ক। সাথে সাথে গানও গাইছেন—নিজের 'লিপ'-এ ও অন্যের 'লিপ'-এ।

এই ছবি 'অজস্র ধন্যবাদ': গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী ও গীত রচনা। পরিচালনা করছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালক: শ্যামল মিত্র। গানগুলি গেয়েছেন: শৈলেন্দ্র সিং, আশা ভোঁসলে, শ্যামল মিত্র এবং অমিত গাঙ্গুলী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রোমান্টিক পর্বে গানগুলি পিকচারাইজ করা হচ্ছে কালারে কারণ তখন নায়ক নায়িকার মনের পরিবেশ রঙীন।

শুটিং চলছে: "অজস্র ধন্যবাদ" ছবিতে বোম্বাইয়ের শৈলেন্দ্র সিং ফটো—দেশ

এ ছবিতে আরও একজোড়া নায়ক-নায়িকা, যথাক্রমে, রঞ্জিত মল্লিক—মহুয়া রায়চৌধুরী। 'বিরজু'র ভূমিকায় সুখেন দাশ। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন: অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কল্যাণী মণ্ডল, কাজল গুপ্ত, তপতী দেবী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য প্রমুখ।

একটানা পঁচিশ দিনের শুটিং প্রোগ্রাম। চলছে টেকনিসিয়ান ও নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে। এছাড়া কলকাতার পথে ঘাটে পার্কস্ট্রীট অঞ্চলের রেস্তরাঁ বার-এ।

• • •

কয়েকদিন আগে পর্যন্ত 'বহ্নিশিখা' ছবির বহ্নিকে নিউ থিয়েটার্স ১নং স্টুডিওর ফ্লোরে একটি দর্শনীয় সেটে দেখা গেছে। সেটটি ছিল বিখ্যাত স্মাগলার মিঃ সিনহার গোপন কর্মক্ষেত্র। 'জেমস্ বণ্ডে'র ছবিগুলিতে যেমন দেখা যায়। অটোমেটিক অপারেশনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম চলছিল। মিঃ সিনহার নির্দেশমত মস্তবড় এই র‍্যাকেট তৎপর। বহ্নি দলের অগ্রভাগে। সেই বহ্নি আজ পার্কস্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে প্রদ্যোতের সঙ্গে। প্রদ্যোৎ, সুদর্শন সপ্রতিভ যুবক, পুলিশ অফিসার—তাঁর প্রেমিক। এখন ও'দের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে একটি সুসজ্জিত রেস্টুরেন্টে। এবং বেশ বোঝা যাচ্ছে এখানেও মিঃ সিনহা উপস্থিত আছেন। দৃশ্যে নয় অদৃশ্যে। সারা ছবি জুড়ে কোন না কোন ভাবে তাঁর উপস্থিতি চোখে দেখা যায় অথবা উপলব্ধি করা যায়। কখনও বা তিনি মিঃ সিনহা কখনও বা ব্যারিস্টার বিলাসবিহারী। একদিক আলোকে উদ্ভাসিত। অন্যদিক অন্ধকারে নির্বাসিত। প্রধান এ দুটি চরিত্রের রূপকার উত্তমকুমার। বহ্নি: বাংলা দেশ থেকে আগত নায়িকা অলিভিয়া। প্রদ্যোৎ: রঞ্জিত মল্লিক। এছাড়া বিশিষ্ট চরিত্রের শিল্পীরা হলেন: কিরণ লাহিড়ী, শিবানী বসু, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুপ্রিয়া দেবী। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনীতে স্বরচিত চিত্রনাট্যে ছবিখানি পরিচালনা করছেন পীযূষ বসু। শ্রীবসু বলেন: 'জেমস্ বণ্ডে'র ছবিগুলির অনুকরণ বা অনুসরণ করবার প্রয়াস আদৌ নেই। ঐ ধরনের ছবিতে উগ্র সেক্স উগ্র ভায়োলেন্স দেখাবার প্রবণতা আছে। এ ছবির উদ্দেশ্য সেরকম কিছু নয়। ক্রাইম গল্প হলেও মানবিক আবেদনের দিকটা অনেক বেশী জোরালো।

বার্তাবহ

"বহ্নিশিখা" (পরিচালনা: পীযূষ বসু) ছবিতে বাংলাদেশের অলিভিয়া ও রঞ্জিৎ মল্লিক ফটো—দেশ

বোম্বাই-বিচিত্রা

সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ খুঁজছেন এমন কাউকে একটি ভূমিকা দিয়ে যদি সেই কাজ থেকে তাঁকে হঠাৎ অপসারিত করা হয় তবে ব্যাপারটা তাঁর পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় মর্মান্তিক। এই প্রসঙ্গে আশা পারেখের কথা মনে পড়ছে। বিমল রায়ের **বাপ বেটী** চিত্রে (১৯৫৪) তাঁর প্রথম অভিনয় দেখা যায়; আশা পারেখ তখন কিশোরী। চার বছর পরে বিজয় ভাট তাঁকে প্রকাশ পিকচারসের **বালযোগী উপমন্যু** চিত্রে নায়িকা চরিত্রের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেন। আশা পারেখ আনন্দে আত্মহারা। এই আনন্দের পরমায়ু যে অতি ক্ষণিক, আশা তা ভাবতে পারেননি। মাত্র চার দিনের শুটিঙের পর তাঁকে ছবি থেকে বাদ দেওয়া হয়। চিত্রনির্মাতা হঠাৎ বুঝতে পারলেন, নায়িকার উপযুক্ত রূপ এবং গুণ আশা পারেখের নেই। অন্য কোনও উঠতি শিল্পী এই ধরনের আঘাতে ভেঙে পড়তেন। আশা কিন্তু নিরাশ হবার পাত্রী ছিলেন না, তিনি তাঁর দিক থেকে সমানে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন, কয়েক মাসের মধ্যে তার ফলও ফলে গেল। ফিল্মালয়ের **দিল দেকে দেখো** ছবিতে তিনি পেলেন নায়িকার ভূমিকা, নায়ক সেখানে শাম্মি কাপুর। শশধর মুখোপাধ্যায় আশার স্ক্রীন টেস্ট নিয়ে তাঁকে মনোনীত করেছিলেন। তখনকার জনপ্রিয় নায়ক শাম্মি কাপুরেরও আশাকে পছন্দ হয়েছিল। নতুন অভিনেত্রীদের তিনি সহজেই পছন্দ করতেন কিনা!

ফিল্মালয়ের অভিনয়-বিদ্যালয়ে আশা অভিনয়-শিক্ষা পান। **দিল দেকে দেখো** ছবির শুটিং আরম্ভ হতেই বোঝা গেল, তাঁকে দিয়ে কাজ হবে। ছবিটি হিট করল এবং আশা পারেখের ভাগ্যও গেল খুলে। পনের বছর একটানা তিনি সাফল্যের সুখ পেয়েছেন। যে বিজয় ভাট একদা বলেছিলেন, আশাকে দিয়ে অভিনয় হবে না, তিনিই পরে সেধে আশাকে তাঁর ছবিতে নায়িকার ভূমিকা দিতে চেয়েছেন। কোনও অভিমান পুষে না রেখে আশা ওই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। আশার এই ব্যবহার তারিফ পাওয়ার যোগ্য।

• • •

বালযোগী উপমন্যু ছবির কাজ থেকে খারিজ হতে আশা পারেখের মানসিক অবস্থা যেমন হয়েছিল, ফিল্ম ও টি ভি ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা অধিকারী রীতা ভাদুড়ির মনোব্যথা আজ কতকটা সেই রকম। **আশিক হুঁ বাহারোঁ-কা** (পরিচালনা : জে ওমপ্রকাশ) ছবিতে রাজেশ খান্না এবং জিনাত আমনের সঙ্গে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে রীতা ভাদুড়ি আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। একে রাজেশ খান্নার সঙ্গে অভিনয়, তদুপরি পাঁচ সপ্তাহের জন্য ইউরোপ সফরের (ছবির কিছু আউটডোর শুটিং ওখানে হবার কথা) সুযোগ—রীতা ভাদুড়ির আনন্দবোধের যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু ওই ছবির শিল্পী আর কলাকুশলীর দল সম্প্রতি যখন বোম্বাই থেকে রওনা হলেন, দেখা গেল, দলে রীতা নেই। শোনা গেল, গল্পের কী সব অদল বদলের জন্য শিল্পী তালিকা থেকেই রীতা ভাদুড়ি বাদ হয়ে গিয়েছেন। যাই হোক রীতা **জুলি** চিত্রে ইতিপূর্বেই প্রথম অভিনয়ের সুযোগটি পেয়ে গিয়েছেন, সেইটুকু তাঁর সান্ত্বনা। তবু **আশিক হুঁ...** ছবিটি তাঁকে যে যন্ত্রণা দিল সেটা কাটিয়ে ওঠাও কম পরীক্ষা নয়। আশা পারেখের মতো ভাগ্য তাঁর হবে কিনা, সেটা দেখবার বিষয়।

"অমৃতের স্বাদ" (পরিচালনা : পরিমল ভট্টাচার্য) ছবিতে সমিত ভঞ্জ ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ফটো—দেশ

• • •

আগে বলেছি, শাম্মি কাপুর নতুন অভিনেত্রীদের পছন্দ করতেন। বস্তুত, হিন্দী সিনেমার নায়িকাদের অনেককেই তাঁর সঙ্গে প্রথম অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। উল্লেখযোগ্য তালিকাটি এখানে দিলাম : **তুমসা নেহি দেখা**—অমিতা; **দিল দেকে দেখো**—আশা পারেখ; **জংলী**—সায়রা বানু; **কাশ্মীর কী কলি**—শর্মিলা ঠাকুর; **প্রোফেসর**—কল্পনা। অমিতা এবং কল্পনা অবশ্য নামী তারকা হয়ে উঠতে পারেননি, বাকি তিন শিল্পীই কিন্তু অচিরেই নামী, দামী হয়ে উঠেছেন। আমি অনেক জনপ্রিয় অভিনেতার কথা জানি যাঁরা প্রতিষ্ঠিত নায়িকার সঙ্গে ছাড়া কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন। একটি উদাহরণ : রাজেন্দ্রকুমার। এক সময়ে তিনি শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে অভিনয় করতে চাননি। শর্মিলা তখনও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত নন। যাই হোক, আজ অবস্থাটা পরিবর্তিত। শর্মিলাকে ছাড়া হিন্দী সিনেমার এখনও চলে না, আর বেচারা রাজেন্দ্রকুমারকে টিঁকে থাকার জন্য স্ল্যাপস্টিক কমেডি চিত্রে কাজ খুঁজে নিতে হয়।

হিন্দী সিনেমার ক্ষেত্রে পুরুষ-তারকাদের প্রতিষ্ঠা বেশী, ছবি কতকটা তাঁদের নামের জোরেই বিকোয়। উদাহরণ : ধর্মেন্দ্র, রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন। অভিনেত্রীদের কদর হয় জনপ্রিয় জুটির একজন হিসাবে—যেমন, ধর্মেন্দ্র-হেমা মালিনী, দেব আনন্দ-জিনাত আমন, অমিতাভ বচ্চন-জয়া ভাদুড়ি। শাম্মি কাপুর ব্যাপারটা বুঝতেন। তাই তিনি যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে, নতুন নায়িকাদের সঙ্গে তখন অভিনয় করতে চাইতেন। জানতেন, নায়িকা যিনিই হোন, ছবি তাঁর নিজের নামের জোরেই চলবে।

সুরঞ্জন

অমিয়া ঠাকুরের গান

বেশ বিলম্ব হয়েছিল সেদিন। তার জন্য আফসোস রয়ে গেল মনে। যখন হাজির হলাম, তখন ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিকের প্রেক্ষাগৃহে রসের ভাণ্ড প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ করে প্রমদার গানের সুর আশ্চর্য সকরুণ পরিবেশ রচনা করেছে : 'আর কেন, আর কেন'। প্রায় সত্তরের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও একজন প্রবীণা শিল্পী যে এই গানে কত

অমিয়া ঠাকুর

সজীব, কত মর্মস্পর্শী করে পরিবেশণ করতে পারেন, কী অসামান্য দরদ দিয়ে একে ভরে দিতে পারেন, সেটা তাঁরাই বুঝেছেন যাঁরা ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন আয়োজিত অমিয়া ঠাকুরের (ওঁর সঠিক বয়স এখন ৬৭) গানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শুধু তো একটি নয়, তিনি শুনিয়েছেন সর্বসমেত তেরোটি গান এবং সর্বশেষের পূরবী রাগের হিন্দি গান 'এ ধনি ধনি চরণ পরগত' মূল এবং রবীন্দ্রিক রূপান্তরের (কী ধ্বনি বাজে) পরিবেশণাতেও তাঁর কণ্ঠস্বরে এতটুকু জড়তার চিহ্ন ছিল না।

কিন্তু এটা বিস্ময়ের হলেও, আসল কথা নয়। আসল কথা, তাঁর গাইবার ভঙ্গি। তাঁর আবেগের গভীরতা। রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গানে যে অতলস্পর্শ গভীরতা আছে, কী অনায়াসে তিনি সেখানে অবগাহন করেন এবং আমাদেরও বহন করে নিয়ে যান, ভাবতে অবাক লাগে। রবীন্দ্রনাথের দাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র হৃদিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী এই অমিয়া ঠাকুর একদা কোন্ মন্ত্রবলে গানে অভিনয়ে মায়ার খেলার প্রমদাকে সজীব করে তুলতেন, আজও তাঁর গান শুনে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। বলিষ্ঠ স্বরপ্রক্ষেপণ, সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবব্যঞ্জনা, নিখুঁত এবং সুস্পষ্ট সুরের সূক্ষ্ম কাজ, এবং সব মিলিয়ে একটা প্রগাঢ় উপলব্ধির স্পর্শ, অমিয়া ঠাকুর বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন, এই হল রবীন্দ্রনাথের গানে রসসৃষ্টির আসল রহস্য। যখন গাইলেন 'বড়ো বিস্ময় লাগে' তখন শিল্পী যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, সেই মগ্নচৈতন্যের অন্তর্লোক থেকে উৎসারিত সুরের তরঙ্গে কখনও তাঁর কণ্ঠস্বরে মীড়ের চিহ্ন আঁকা হয়ে যায়, কখনও বা কোমল গান্ধারে বা ষড়জে গানের সুর স্থিত, সমাহিত। মাঝে মাঝে তাঁকে বিশ্রাম নেবার অবসর দিয়েছেন ইন্দিরার শিল্পীরা কয়েকটি সম্মেলক গান গেয়ে এবং তাঁর গানের সঙ্গে এককভাবে সহায়তা করেছেন সুপূর্ণা চৌধুরী। সেদিনকার আসরে পরিবেশিত অন্যান্য গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'সখী, আঁধারে একেলা ঘরে', 'ওগো কাঙাল আমারে', 'সুধাসাগর তীরে' এবং আখরসহ 'আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ'।

—আনন্দবর্ধন

রবীন্দ্রজয়ন্তীর রবীন্দ্রসংগীত

রবীন্দ্রজয়ন্তীর এইচ এম ভি রেকর্ড বেরিয়েছে যথাসময়ে। শিল্পীরা বেশির ভাগই প্রবীণ ও গুণী। এঁদের গানের অনাদর কখনও হতে পারে না। সুচিত্রা মিত্র (গরব মম রয়েছে প্রভু, আঁধার রাতে একলা পাগল, ঘাটে বসে আছি, আমি যে সব নিতে চাই), কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (জননী তোমার চরণখানি, স্বপন যদি ভাঙিলে, এবার রাঙিয়ে গেল, আজ যেমন করে গাইছে আকাশ), নীলিমা সেন (এ কী করুণা, ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, কাছে যবে ছিল, ও চাঁদ চোখের জলে), ঋতু গুহ (দেখা যদি দিলে, নিভৃত প্রাণের দেবতা, সংশয় তিমির মাঝে, ও আমার ধ্যানেরই ধন), মায়া সেন (সন্ধ্যা হল গো, দাঁড়াও মন, ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে, গানের ভেলায়) এবং বনানী ঘোষ (আজি এনেছি তাঁহারি আশীর্বাদ, তোমায় চেয়ে আছি বসে, তারে দেখাতে পারি নে কেন, এ তো খেলা নয়)—রবীন্দ্রনাথের গানের মূল্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এঁদের দান যে অনেকখানি এটা এবারকার রেকর্ডেও সুস্পষ্ট। এঁরা প্রত্যেকেই এবারকার রেকর্ডে সমান কৃতিত্বের সঙ্গে গেয়েছেন তা নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের সব গানই প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, তাই কোন গায়িকার গলায় কী খুঁত থেকে গেল সেটা খুঁজতে ইচ্ছা করে না। তবে সুচিত্রা, কণিকা, নীলিমা, ঋতুর গানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ থাকে না। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর রেকর্ডও আছে। সুমিত্রা সেনের গানের আলাদা রেকর্ড কেন হল না সেটা কৌতূহলের বিষয়। সুমিত্রা ও সাগর সেনের সুপার সেভেন রেকর্ড। দ্বৈত গান দুটি—"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে" এবং "চলে ছলছল নদীধারা"। তাছাড়া সুমিত্রা দরদ দিয়ে গেয়েছেন "ছায়া ঘনাইছে বনে বনে" এবং "উতল ধারা বাদল ঝরে" এবং সাগর সেন—"আজি প্রণমি তোমারে," "হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে"।

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু" গানটি ঘুরে-ফিরে [illegible] পরিবেশিত শোনা গেছে—(এবার গেয়েছেন) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এই গানের [illegible]বগাম্ভীর্য তাঁর গলায় অনুভব করা যাবে—এই রেকর্ডে। আরও গান আছে—সংসার যবে মন কেড়ে লয়, কেন আমায় পাগল করে যাস, ওরা অকারণে চঞ্চল। গানগুলি জনপ্রিয় হবে সন্দেহ নেই। শিল্পী সুন্দর গেয়েছেন। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ও গেয়েছেন চারটি গান তাঁর নিজস্ব ঢঙে—হৃদয়ের মণি, ডাকিল মোরে জাগার সাথী, হৃদয় বসন্ত বনে, বিদায় যখন চাইবে তুমি।

গীতা সেন (যারা কাছে আছে, আমায় ছ-জনায় মিলে, কী ফুল ঝরিল, পূর্বাচলের পানে তাকাই) এবং সুশীল মল্লিক (কেন চেয়ে আছ গো মা, ফল ফলাবার আশা, আজি সাঁঝের যমুনায়, আজি আঁখি জুড়ালো) রেকর্ডে একলা গাওয়ার অধিকার পেয়েছেন। অথচ আরও কয়েকজন কৃতী শিল্পীকে অন্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন বীথীন বন্দ্যোপাধ্যায় (মুখপানে চেয়ে দেখি, আনমনা আনমনা) এবং অদিতি সেনগুপ্ত (এমন আর কতদিন চলে যাবে রে, হাসিরে কি লুকাবি লাজে)। এঁদের গান প্রশংসনীয়। গৌতম মিত্র (আমি কেমন করিয়া জানাব, ঝর-ঝর-ঝর ঝরে), রনো গুহঠাকুরতা (মা আমি তোমার কী করেছি, যারা কথা দিয়ে তোমায় বলে), শর্মিলা রায় (জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি) এবং কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা (পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জবনে, কোথা হতে শুনতে যেন পাই)—এঁদের গানও ভাল। সুপার সেভেন রেকর্ডে পূর্বা দাম (অমল কমল সহজে, আমি ফিরব না রে), স্বপন গুপ্ত (গায়ে আমার পুলক লাগে, কোন গহন অরণ্যে), স্বপ্না ঘোষাল (জগতে আনন্দ যজ্ঞে, মাটির বুকের মাঝে), পূরবী মুখোপাধ্যায় (দেবতা জেনে, ধরা দিয়েছি গো), সুবীর সেন (আমি হেথায় থাকি, তুমি তো সেই যাবেই চলে) এবং শ্রীলা সেন (আমারে যদি জাগালে আজি, আমি তোমারই মাটির কন্যা) দুটি করে গান পরিবেশন করেছেন। এই তালিকায় তিনজন করে শিল্পীর গানের পক্ষে সুপার সেভেন রেকর্ডের দাম মোটেই বেশি নয়।

লং প্লে রেকর্ড একটিই এবং রেকর্ডটি সব দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। বিলম্বে হলেও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের বারোটি গানের রেকর্ড যে বেরিয়েছে তাতেই শ্রোতারা খুব খুশি হবেন। এই রেকর্ড আরো আগেই বেরোতে পারত, কারণ রবীন্দ্র সংগীতের আসরে দ্বিজেনবাবুর সুনাম বহুদিন আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এই রেকর্ডে যথা-

ক্রমে পূজো ও প্রেম পর্যায়ের বারোটি গান নির্বাচন চমৎকার। এবং দুই পর্যায়ের গানের ভিন্ন অনুভূতি শিল্পীর মেজাজী কণ্ঠে পরিস্ফুট। বারোটি গান হল: আমার মাথা নত করে দাও হে, আজি এ আনন্দসন্ধ্যা, সফল কর হে প্রভু, প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে, তোমার হাতের রাখীখানি দয়া দিয়ে হবে গো মোর, মম যৌবন নিকুঞ্জে কিছু বলব বলে, ওগো বধূ সুন্দরী, দূরে রজনীর স্বপন লাগে, যেদিন সকল মুকুল, হায় অতিথি এখন কি হল তোমার। রেকর্ডটি বাজালে স্তব্ধ হয়ে শোনা ছাড়া উপায় থাকে না।

সম্প্রতি ভারতী রেকর্ডে নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নিজের সুরে দুখানি চমৎকার ভক্তিগীতি গেয়েছেন। গান দুখানি: কলির ঠাকুর রামকৃষ্ণ/পরমা প্রকৃতি তুমি মা সারদা।

গীতবিতানের গীতোৎসব

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র সদনে গীতবিতান আয়োজিত গীতোৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হল। চারটি পৃথক অধিবেশনে (১৪—১৭ জুলাই) রবীন্দ্রনাথের তেরো বছর বয়সে রচিত গান থেকে আরম্ভ করে কালানুক্রমিকভাবে শতাধিক গান পরিবেশিত হল। প্রায় প্রত্যেক গানের উপস্থাপনার পূর্বে পার্থ ঘোষ এবং গৌরী ঘোষ প্রদত্ত ধারাভাষ্যে সংশ্লিষ্ট গানের রচনাকাল, উৎস এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। এই উৎসবে স্বাগত সম্ভাষণ দেন শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়। তা ছাড়াও বিভিন্ন অধিবেশনের শুরুতে প্রশস্তি-ভাষণ শোনা গেল যাঁদের কণ্ঠে তাঁদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী, স্ব. কমলকান্তি ঘোষ, শৈলজারঞ্জন মজুমদার, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী। অধিবেশনের শুরুতে শোনা গেছে রেকর্ড বিধৃত কবিকণ্ঠ; আজি হতে শতবর্ষ পরে।

আজ থেকে একশ' বছর আগে সঙ্গীতের ভুবনে যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল, এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য গীতবিতান নিঃসন্দেহে রসিকজনের কাছ থেকে সাধুবাদ পাবেন। একটি একটি করে গান কীভাবে নক্ষত্রের মতন ছড়িয়ে পড়ে সেই দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছে, চারটি অধিবেশনে তারও ক্রমান্বিক পরিচয় পাওয়া গেল। যাঁরা গান শুনিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে মনে পড়বে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম, যাঁর গান শুনে ওঁরই গাওয়া একটি গানের প্রথম কলিটি ধার করে বলতে ইচ্ছে করে—'বড় বিস্ময় লাগে'। এ ছাড়াও বিভিন্ন অধিবেশনে তিনি গেয়েছেন, 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' এবং 'নীলাঞ্জন ছায়া'। দেবব্রত বিশ্বাসও মুগ্ধ করেছেন সংযত আবেগে পরিবেশিত কয়েকটি গানে যেগুলির মধ্যে মায়ার খেলার অন্তর্গত গান 'সকল হৃদয় দিয়ে' এবং 'আমি চঞ্চল হে' বিশেষত উল্লেখযোগ্য। (এমন মেজাজ আজকাল ওঁর অন্যান্য অনুষ্ঠানেও পাই না কেন?) এ ছাড়া প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মধ্যে মনে রাখবার মতন গান গেয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায়, নীলিমা সেন, মায়া সেন, গীতা সেন, গীতা ঘটক, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, সুমিত্রা সেন, বাণী ঠাকুর, সাগর সেন, পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা। খুবই ভাল গেয়েছেন ঋতু গুহ, কৃষ্ণা হাজরা, অমল নাগ, সুপূর্ণা চৌধুরী, অদিতি সেন, অরবিন্দ বিশ্বাস এবং সুশীল চট্টোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে কয়েকজন শিল্পীকে যেমন সাগর সেন ও অমল নাগকে বিশেষত সংগীতের বিড়ম্বনায় বিব্রত হতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উৎসবে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ভাষণটি তাৎপর্যবহ। তবে প্রথমোক্ত শিল্পীদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে যেন সেই সব গানই নির্বাচিত হয়েছে যে সব গান এঁরা প্রায়ই গেয়ে শোনান। তাতে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তনের পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যটি মহার্ঘ ধারাভাষ্যের সতর্ক প্রহরা সত্ত্বেও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এমন কি, মাঝে মাঝে ওই ধারাভাষ্যকে রসের আসরে অকারণ গুরুমশায়গিরি বলেও মনে হয়েছে। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের সংগীত-প্রতিভার ক্রমোত্তরণের চিহ্নটি এই অধিবেশন পরম্পরায় অধিকতর সুচিন্তিত গান নির্বাচনের সাহায্যে আরও স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলা যেত। যেমন ১৩১২-এ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের প্লাবন এসে কীভাবে বাংলার মাটির সুরকে আত্মস্থ করে নিল, এই উৎসবে সেই খবরটি অগোচরই থেকে গেল। তা ছাড়া রবীন্দ্ররচিত প্রথম গান হিসেবে একটি বিতর্কিত গান "গগনের থালে"র উপস্থাপনা কতদূর যুক্তিসংগত হয়েছে এ সম্পর্কেও প্রশ্ন থাকতে পারে।

এই উৎসবে নবীন শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজনের গানও উল্লেখের দাবি রাখে। সুন্দর মেজাজে, সাবলীল ভঙ্গিতে গান শুনিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন শর্মিলা রায়। মনে রেখাপাত করেছে কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা, এণাক্ষী মুখোপাধ্যায়, পূর্বা দাম, গৌতম মিত্র এবং বীথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানও। সম্মেলক গানগুলির মধ্যে 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'র পরিবেশন অনবদ্য। সুবিনয় রায়ের পরিচালনায় উৎসবের শিল্পীদের সম্মেলক কণ্ঠে গীত উদ্বোধন সঙ্গীতটিও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তেমনই দুর্বল পরিবেশন 'এ শুধু অলস মায়া'। সম্মেলক গানের প্রতি এই উৎসবে আরও সযত্ন দৃষ্টি দেবার অবকাশ ছিল—সংখ্যা এবং মান, উভয়তই। এই প্রসঙ্গে মঞ্চসজ্জা এবং পরিবেশন-কৌশলটি সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে যা সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যে আগাগোড়া একটা স্বচ্ছন্দ গতি বজায় রাখবার ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সবশেষে একটি কথা না বলে পারছি না। গীতবিতানের মতন ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানপত্রে এত মুদ্রণ প্রমাদ কেন?

আনন্দবর্ধন

সংশোধন: গত সংখ্যায় নিউ ইয়র্কে রবিতীর্থের "তাসের দেশ" নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যের ছবিকে ভুল করে "চিত্রাঙ্গদা"র একটি দৃশ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
অতিরিক্ত
আগরতলা বিমান মাসুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
প্রকাশকুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৫
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২·০০ টাকা	৪২·৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মাধ্যমে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

সারাদিন
ভোরের স্নিগ্ধতা
আর সুরভি
পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক ব্যবহার করুন—
সদ্যস্নানের শুচিস্নিগ্ধতা অনুভব করবেন
ঘণ্টার পর ঘণ্টা… সারাদিন আপনাকে
ঘিরে থাকবে মনোরম আবেশ।
সারা অঙ্গে ছড়িয়ে দিন এই ট্যাল্ক—
দেখবেন কত ঝরঝরে, ঠাণ্ডা মনে হবে।
মৃদু সৌরভ গায়ে লেগেই থাকবে।
ঘাম শুষে নিয়ে আপনাকে দেবে আরামের
আমেজ। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে ও
প্যাচপ্যাচে ভাব হতে দেয় না—
বিশেষ করে গরমের দিনে।
তাছাড়া পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক
রেশমের মত এমন চিকন মোলায়েম!
আপনি এটি মুখেও মাখতে পারেন।
পণ্ডস
ড্রিমফ্লাওয়ার
ট্যাল্ক
মিডিয়াম, ফ্যামিলি
আর এখন নতুন
১৯৬ গ্রামের বড়
সাইজে পাবেন।
Pond's
Dreamflower talc
Dreamflower talc Pond
চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংস্থাপিত)
HT-CP-6341

অতি ময়লা জামাকাপড়

পলকে ধবধবে

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪০
শনিবার ৭ ভাদ্র ১৩৮২

বন্দে মাতরম্

াজ হতে শতবর্ষ আগে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের রচনা করে দেশবাসীর প্রাণে যে একটি অনুরাগের প্রেরণা ত করেছেন, তার নাম দেশানু- সুতরাং আনন্দমঠেরই ঘটনার প্রাসঙ্গিক হয়ে যে বিশেষ এক ম সঞ্জীবিত হয়েছিল, তারও পূর্ণ হয়েছে। 'বন্দেমাতরম্' তর শতবর্ষ বললে যদিও জাতীয় সের শতবর্ষকালের অজস্র র অভ্যুত্থান ও আলোড়নের একটি ত রূপের শতবর্ষ বোঝায় না, এধরনের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জনজীবনের দেশানুরাগে ঞ্জিত কোন সংগীতের গুরুত্ব করবার পদ্ধতি নয়। এবং এই করাই যুক্তিসংগত যে, দেশানু- াভিরঞ্জিত যে সংগীত শতবর্ষ- রে জাতির কণ্ঠে ও প্রাণে অনু- হয়েছে, তাকে শতবর্ষকালের আগ্রহের একটি ভাবসত্যের াত প্রকাশ বলে মনে করতে হয়।

থিত আছে যে, পণ্ডিত মদন- মালব্য বন্দে মাতরং সংগীত অত্যন্ত ভাবাবিষ্ট ও বিহ্বল হয়ে ন। সাধারণ মনস্তত্ত্বের নিয়মে ায় যে, বিশ্বাসী মানুষের মন প্রভাবে এরকম ভাবাবিষ্ট ও হয়ে পড়েন। সুতরাং, 'বন্দে- কে একটি মন্ত্র বললে, কিংবা অনুরূপ একটি প্রেরণাসঞ্চারক ধ্বনিত রূপ বলে মনে করলে । যুক্তিবিচারের দিক দিয়ে র ব্যাপার হবে না। যুক্তির অন্য- বক্তব্য এই যে, হ্যাঁ বন্দেমাতরং : তার ভাব ও প্রভাবের গৌরবে মন্ত্র; জাতির ও ব্যক্তির প্রাণের শক্তি উজ্জীবিত করবার একটি মন্ত্র। ইতিহাসের ঘটনার অংশে যুক্ত হয়ে, নিতান্ত ভাবলোকের ধ্বনি হয়ে নয়, এই বন্দেমাতরম্ ধ্বনির প্রেরণা নির্মিত ও সংগঠিত হয়েছে। বরিশালের ধাতাসে নিনাদিত হতে গিয়ে এই বন্দে- মাতরং একদিন বিদেশী প্রভুশক্তির রুলেট লাঠির আঘাত পেয়েছিল। দেশকর্মীর মাথা ফেটে পথের মাটি শোণিতাক্ত হলেও তার মুখের বন্দেমাতরং ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায় নি। শুধু এই একটি ঘটনায় নয়, অনুরূপ শত শত ঘটনায় বন্দেমাতরং সংগীত ও বন্দেমাতরং ধ্বনি ইংরাজ-রাজের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে দেশপ্রেমের একটি উদাত্ত ধ্বনি হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছে। আনন্দমঠ, বন্দেমাতরং সংগীত ও বন্দেমাতরং ধ্বনি, সবই একদিন ভারতের ইংরাজ-রাজের রাজনীতিক রোষের ও কোপের লক্ষ্য হয়েছিল। প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, যে অনুরাগের সত্তা জনজীবনের আন্তরিক সত্যে আশ্রিত, তার ভাব ভাষা ও ধ্বনি কোন এবং কারও বিদ্বেষ ও উষ্মার আঘাতে নির্জিত হবার নয়। বন্দেমাতরং সংগীত ও ধ্বনি এই ঐতিহাসিক সত্যের সার্থক নিদর্শন।

ফরাসীর জাতীয় সংগীত মার্সে- ইয়েজ নিতান্ত সংগীত হিসাবে গায়ক ও ভাবুকের সমাদরের ঘরে পড়ে থাকলে, সে সংগীতের বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও গৌরব সম্ভাবিত হতো না। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যে সংগীত ছিল রয়্যালিস্ট ভাবনায় অনুভাবিত একটি সংগীত, সেই সংগীতই রাজতন্ত্রের বিনাশক এক বৈপ্লবিক আগ্রহের ভৈরব আবেদন সঞ্চারিত করেছিল। কথিত আছে যে, এই সংগীতের রচয়িতা লিসলে ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক রয়্যালিস্ট। এবং তাঁকেই একদিন তাঁর নিজেরই রচিত সংগীতের ধ্বনি শুনে ভয় পেতে ও ছুটে পালাতে হয়েছিল। গানটি বিপ্লবী ফ্রান্সের প্রিয় সংগীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এবং বিপ্লবের সংগ্রামী সৈনিকদের কণ্ঠে উচ্চারিত এই সংগীত তার রচয়িতা রয়্যালিস্ট লিসলেকে যেন তাড়া করে করে দূরাপ- সারিত করেছিল। প্ল্যাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের এক প্রুশীয় সেনাপতি আক্ষেপ করেছিলেন—কী ভয়ানক সংগীত এই মার্সেইয়েজ। এই সংগীত পঞ্চাশ হাজার জার্মান সৈনিকের প্রাণবিনাশ করেছে। ফরাসীর জাতীয় সংগীত মার্সেইয়েজ- এর এই বৃত্তান্তও প্রমাণিত করেছে যে, ঘটনার অভিষেক নিয়ে গান ও ধ্বনির শক্তি এবং তাৎপর্য গড়ে ওঠে। ঘটনা যদি দেশপ্রেমের বৈপ্লবিক চেতনার পূরক হয়, তবে তার সাক্ষাৎ স্পর্শে সংগীত ও ধ্বনির শক্তিও দেশপ্রেমের বৈপ্লবিক আগ্রহের উদ্দীপক হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ সংগঠন রাজনীতিক মুক্তির সংগ্রাম ও উদ্দীপনায় সংগঠন হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দেশানুরাগের ও রাজনীতিক মুক্তির সেই সংগ্রামশীল সংগঠনের প্রেরণাকে প্রতীকায়িত করেছিল একটি ধ্বনি—জয় হিন্দ্। এই ধ্বনিও ঘটনার ভিতর দিয়ে তার প্রেরণাকে পরিচালিত করেছে এবং স্বয়ং একটি ঐতিহাসিক প্রেরণার সঞ্চারক ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। বাঙালীর জীবনের একটি বিশেষ গৌরবের যে স্বীকৃতি এখন সারা ভারতেরই কাছে একটি উপভোগ্য বিস্ময়, তা এই যে, ভারতের জাতীয় আগ্রহের দুই ধ্বনি, বন্দেমাতরং ও জয়- হিন্দ্ দুইই দুই বাঙালী মনস্বীর ভাবনা ও অনুভবের সৃষ্টি।

বন্দেমাতরং-এর শতবর্ষ পূর্ণ হলো, কিন্তু সে কারণে বন্দেমাতরং-কে একটি শতায়ু ধ্বনি অথবা সংগীত বলে কেউ মনে করবে না। বন্দেমাতরং চিরায়ু। এই বন্দেমাতরং ধ্বনির সঙ্গে জাতীয় জীবনের শত শত মহত্ত্বের বীরত্বে ও আত্মত্যাগের ঘটনা ইতিহাসের পটে অঙ্কিত হয়েছে। এই ধ্বনি যেমন অতীতের শত-সহস্র-লক্ষ ভারতীয় প্রাণের কাছে মুক্তি ও মহান্ অভ্যুদয়ের অঙ্গীকার এনেছিল, তেমনই বর্ত- মানেও জাতির কাছে একটি সুন্দর সান্ত্বনার ধ্বনি, আশার ধ্বনি, সমুন্নতির ধ্বনি।

এই সপ্তাহ

সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদে দুটি বিল আনা হয়েছে। একটি বিল সংসদের উভয় কক্ষেই গৃহীত হয়েছে; আর একটি বিল রাজ্যসভায় পাস হয়েছে, লোকসভায় এখনও হয়নি।

যে-বিলটি সংসদে গৃহীত হয়েছে তার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার অধ্যক্ষের নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির ভার আদালতের বদলে সংসদীয় আইন অনুসারে গঠিত কোন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ হয় এক রকমের, প্রধানমন্ত্রী ও লোকসভার অধ্যক্ষের আর এক রকমের। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন হয় পদের জন্য; সংবিধানের পুরনো ব্যবস্থা অনুসারে তাঁদের নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার বিচারের ভার ছিল সুপ্রিম কোর্টের উপর। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গিরির নির্বাচনী মামলার বিচার হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। প্রধানমন্ত্রিত্ব বা লোকসভার অধ্যক্ষ পদের জন্য কোন সরাসরি নির্বাচন হয় না। সংসদে নির্বাচিত হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদীয় দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন; তেমনি লোকসভার সদস্যরা স্থির করেন তাঁদের মধ্যে কে অধ্যক্ষ হবেন। কাজেই এই দুটি ক্ষেত্রে নির্বাচনী বিরোধ তাঁদের সংসদে নির্বাচিত হওয়াকে কেন্দ্র করে, পদকে কেন্দ্র করে নয়। সংসদের অন্য সব সদস্যের মতো তাঁদের নির্বাচনী মামলাও এতদিন সংবিধানের বিধি অনুযায়ী হাইকোর্টে উঠত, পরে আপিলে সুপ্রিম কোর্টে।

সংবিধান সংশোধনের পর এই চারটি পদের অধিকারীদের নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার বিচার কোর্টে হবে না। সেগুলির নিষ্পত্তি করবেন এক নতুন কর্তৃপক্ষ। এই কর্তৃপক্ষ কীভাবে গঠিত হবে, কাদের নিয়ে গঠিত হবে, একটি বা একাধিক কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে কি না, এসব বিষয়ে কোন ঘোষণা এখনও পর্যন্ত হয়নি। সংসদে যখন নতুন কর্তৃপক্ষ গঠনের জন্য বিল আনা হবে তখন এগুলি জানা যেতে পারে।

সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে, পুরনো আইন অনুসারে যেসব মামলা এখন কোর্টে বিচারাধীন সেগুলি বাতিল হয়ে যাবে এবং সংসদে যে বিলটি আনা হবে তার বৈধতা ও সেই আইন অনুসারে গঠিত কর্তৃপক্ষের রায়ের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কোন মামলা দায়ের চলবে না। সংশোধনী বিলের মাধ্যমে সংবিধানের নবম তফসিলে যে তালিকা আছে তাতে ২৮টি নতুন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইন সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে যখন প্রথম সংবিধান সংশোধন করা হয় তখন এই নবম তফসিলটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নবম তফসিলে যে সব আইনকানুনের *উল্লেখ আছে সেগুলির বৈধতা বিচারের এক্তিয়ার আদালতের নেই।*

রাজ্যসভায় যে সংবিধান সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয়েছে তাতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা আনা চলবে না। এতদিন বিধান ছিল যে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কীভাবে তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন সে বিষয়ে তাঁদের আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকেও এই বিধানের আওতায় আনা হোক। সংবিধানের ৩৬১ অনুচ্ছেদে বলা আছে, রাষ্ট্রপতি বা কোন রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তাঁদের কার্যকালের সময় কোন ফৌজদারি মামলা আনা চলবে না বা তাঁদের গ্রেফতার করা কিংবা আটক রাখা যাবে না। সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে, এই অনাক্রম্যতা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তা ছাড়া মামলা ও গ্রেফতারের উপর নিষেধ ভবিষ্যতে শুধু কার্যকালেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রীর পদাধিকারীদের অবসর গ্রহণের পরও গ্রেফতার করা যাবে না বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা করা চলবে না।

বর্তমান বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কার্যভার গ্রহণের পূর্বে বা কার্যকালে ব্যক্তিগতভাবে যে সব কাজ করেছেন সে সম্পর্কে তাঁদের কার্যকালের মধ্যে দুই মাসের নোটিস ছাড়া কোন দেওয়ানি মামলা করা চলত না। সংশোধনী বিলে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য হবে। দুই মাসের নোটিসের প্রস্তাবটিও খারিজ করা হয়েছে, বলা হয়েছে কার্যকালের মধ্যে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি মামলা আনা চলবে না।

আমাদের সংবিধান চালু হয়েছে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী। রাজ্যসভায় যে বিলটি গৃহীত হয়েছে সেটি আইনে পরিণত হলে আমাদের সংবিধান চল্লিশবার সংশোধিত হবে। আরও একটি সংশোধনী বিল কিছুকাল আগে সংসদে আনা হয়েছিল, সেটি এখন সংসদের সিলেকট কমিটির বিবেচনাধীন।

জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার পর যে সব দল ও সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তাদের ৩৮০০ জন সদস্যকে এ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ২৩০০ জন, আনন্দ মার্গের ৪০০ জন, জামাত-ই-ইসলামির ৭০০ জন ও সি পি আই (এম এল)-এর ৪০০ জন সদস্য বিভিন্ন আইনে গ্রেফতার হয়েছেন। তা ছাড়া চোরাকারবার, মজুতদারি, মুনাফাবাজি ইত্যাদি অপরাধে আরও প্রায় ৬০০ জনকে ধরা হয়েছে।

পশ্চিম বাংলা ভিজিলান্স কমিশনের ১৯৭৩ সালের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কমিশনের সদর দপ্তরে আলোচ্য বছরে ১৩৫৪টি দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে ৭১২টি অভিযোগ সম্পর্কে কমিশন তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন; বিভাগীয় তদন্তের জন্য ৫০৩টি অভিযোগ পাঠানো হয়েছে, অ্যানটি করাপসন ব্যুরোর কাছে পাঠানো হয়েছে ২০৯টি। আলোচ্য বছরে কমিশন ৩৭ জন গেজেটেড অফিসারের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি, ৪৬ জনের বেলায় লঘু শাস্তি ও ২১ জনকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে নতুন নতুন ধরনের দুর্নীতি দেখা দিচ্ছে। এই প্রবণতা বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে নীচের তলার কর্মচারীদের মধ্যে, যাঁরা সরকারের জনহিতকর প্রকল্পগুলি রূপায়ণের সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত। কমিশন লক্ষ করেছেন যে, দুর্নীতিগ্রস্ত পদস্থ অফিসাররা তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীদের নথিপত্র চাপা দেওয়া ব নষ্ট করার প্ররোচনা দিয়ে তাঁদেরও দুর্নীতি পরায়ণ করে তুলছেন। কমিশনের মতে এটিও একটি নতুন ধরনের দুর্নীতি এব এ দুর্নীতিও বেড়ে চলেছে।

৯ আগস্ট কলকাতা টেলিভিশ কেন্দ্রের উদ্বোধন ও নিয়মিত অনুষ্ঠা প্রচার শুরু হয়েছে। কেন্দ্রটির উদ্বোধ করে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় বলে পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে যেদিন টি ভি পৌঁছবে সেদিনই এই কেন্দ্র স্থাপন সার্থ হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এ উদ্দেশ্যে টি ভি ক্লাব স্কুল কলেজ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি সে বিতরণের ব্যবস্থা করার চেষ্টা হবে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বিদ্যাচ শুক্ল বলেন, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নি অদূর ভবিষ্যতে সারা ভারত জুড়ে রাষ্ট্র ভিত্তিতে টেলিভিশনের জাল ছড়িয়ে দেও সম্ভব হবে। কলকাতার স্থায়ী টেলিভি কেন্দ্র হবে তিনটি আধুনিক স্টুডিও নি

একটি জারমান সংবাদপত্রের প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, ত সাধারণ নির্বাচন করতে প্রতিশ্রুত। দে অবস্থা কত তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আসবে জানতে পারলে নির্বাচনের দিন স্থির যেতে পারে।

১১-৮-৭৫

শংকর ঘো

বৈদেশিকী

শেষ অঙ্ক

দেবরাজ

ইউরোপের তামাম দেশের নিরাপত্তা আর তাদের মিলেমিশে কাজ করার উপায় বাতলাতে একটা বৈঠক বসবার কথা যখন ব্রেজনেভ ১৯৬৬ সনে পাড়েন তখন পশ্চিমী দুনিয়ায় তাঁকে বিশেষ কেউ আমল দেয়নি। ব্রেজনেভ কিন্তু হাল ছাড়েননি। পরে ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে ও ধরনের বৈঠক বসাবার চেষ্টা তিনি সমানে চালিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছে যে পূর্ণ হতে চলেছে তার আভাস পাওয়া গেলো বছর দুই আগে। ইউরোপের দেশগুলোর বিদেশ-মন্ত্রীদের বৈঠক বসলো ৩ জুলাই ১৯৭৩ সনে হেলসিংকিতে কী করা যায় তা ঠিক করতে। এর পর খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা চললো জেনিভাতে ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সন থেকে। ইউরোপে শান্তির ভিত যে পাকা করা দরকার এ কথা সবাই মেনে নিলেন। সাব্যস্ত হলো তার জন্যে যা যা করার দরকার তা ব্যাখ্যা করে দলিল তৈরী হবে, তাতে সই দেবেন ইউরোপের সব দেশেরই প্রধান হেলসিংকিতে একটা বিরাট বৈঠকে জমায়েত হয়ে। সেই হবে ইউরোপের শান্তির সনদ, দুনিয়ারও। কেননা এ শতকে যে দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে সে দুটোরই শুরু আর শেষ ইউরোপে। ইউরোপ শান্ত থাকলে বড় রকমের লড়াই দুনিয়াতে আর বাধবে না।

তিন দিন ধরে ৩০ জুলাই থেকে হেলসিংকিতে চলেছে ইউরোপীয় নিরাপত্তা আর সহযোগিতা সম্মেলনের বৈঠক। এমন বিরাট বৈঠক এর আগে ইউরোপে কখনও হয়নি—ইউরোপের বাইরে তো নয়ই। হেলসিংকির ফিনল্যান্ডিয়া হলে হাজির ছিলেন ইউরোপের ৩৩টা দেশের মাথা। ছোট বড়, কম্যুনিস্ট-অকম্যুনিস্ট, গণতন্ত্রী-অগণতন্ত্রী, জোটবাঁধা-জোটছাড়া কোনও দেশই বাদ যায়নি যায় ভ্যাটিকান পর্যন্ত। গরহাজির ছিল একা আলবেনিয়া, তার মুরুব্বি প্রজাতন্ত্রী চীনের এ বৈঠকে সায় ছিল না বলে। নইলে সেও হয়তো আসতো। সে ছাড়া ইউরোপের সব দেশের প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন হেলসিংকি বৈঠকে। গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিলেন ব্রেজনেভের সঙ্গে উইলসন-দেস্তাঁ, টিটো-চোসেস্কু। ফ্যাসিস্ট স্পেনকেও বাইরে রাখা হয়নি, নয়া পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি গোমেসও হাজির ছিলেন, হাজির ছিলেন অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড আর সুইডেনের মতো নিরপেক্ষ দেশের প্রধানরাও। এঁদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিলেন আমেরিকার দুই মাতব্বর—মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফোর্ড আর কানাডার প্রধানমন্ত্রী ত্রুদো। পঁয়ত্রিশটি দেশের পঁয়ত্রিশ মণি আলো করে বসেছিলেন হেলসিংকির সভা। ইউরোপে শান্তি বজায় রাখার শপথ তাঁরা নিয়েছেন যৌথ দলিলে সই করে। তার নাম শেষ অংক।

ইউরোপে অশান্তির এই শেষ কি না কে জানে। তবে এমন ব্যাপার এর আগে কখনও হয়নি। বড় বড় বৈঠক রাজনীতিকদের নিয়ে এ যাবৎ যা বসেছে তাদের কাজ ছিল যুদ্ধের আগুন নিবিয়ে দেওয়া। যুদ্ধ থেমে যাবার পর সে সব বৈঠক বসেছে আর তাতে ঠিক হয়েছে শান্তির শর্ত। এই প্রথম এমন একটা বৈঠক বসলো যা যুদ্ধের জের মেটাবার জন্যে ডাকা হয়নি—ডাকা হয়েছে শান্তির বুনিয়াদ মজবুত করে লড়াই বাধতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। এর পর ইউরোপে আর লড়াই বাধবে না এমন কথা হলফ করে অবিশ্যি বলা যাচ্ছে না। কিন্তু ইউরোপের এতগুলো হোমরাচোমরা নেতা একসঙ্গে বসে যে কথা দিয়েছেন তাঁরা সব বিরোধ আপসে মিটিয়ে নেবেন, লড়াই কখনও করবেন না তা কি নেহাতই কথার কথা? যে দলিলে তাঁরা সই করেছেন তাতে যে সব অংগীকার করা হয়েছে সেগুলো কেউ যদি না ভাঙেন তা হলে ইউরোপে আর লড়াই বাধবে কেমন করে? যুদ্ধের পর অবিশ্যি সকলেরই শ্মশানবৈরাগ্য আসে, যুদ্ধ করার ইচ্ছে সকলেরই লোপ পায়। দিনকতক যেতে না যেতে কিন্তু আবার যে কে সেই—যুদ্ধের দামামা আবার গর্জে ওঠে।

এবার কিন্তু একটু তফাত আছে। যুদ্ধ ইউরোপে শেষ হয়েছে তিরিশ বছর আগে। তার ঘা এতদিনে শুকিয়ে গেছে। যারা উঠতি বয়সের লোক যুদ্ধের আগুনের আঁচ তাদের গায়ে লাগেনি, যুদ্ধের গল্প তারা বাপ-পিতেমোর মুখে শুনেছে, বইয়ে পড়েছে, ছবিতে দেখেছে। যুদ্ধ যে কী ভয়ানক কান্ড তা কি তারা ঠিক বুঝতে পারে? তবুও যে শান্তি বজায় রাখার জন্যে তাদের এত আগ্রহ তাতে মনে হয় তাদের সে উৎসাহ খাঁটি, তাতে খাদ নেই। দুটো কারণে মনে হচ্ছে এটা সম্ভব হয়েছে। এক, লাল জুজুর ভয় ইউরোপে অনেকটা কেটে গেছে। এখন আর কোনও তরফই মনে করে না যে লড়াই ছাড়া গতি নেই, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে পশ্চিমী গণতন্ত্রীরা বনিয়ে চলতে পারবে না। বরঞ্চ পূব ইউরোপের সঙ্গে পশ্চিমের ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন বাড়ছে, লোক চলাচলও কিছু কিছু শুরু হয়েছে। তাই মনে হচ্ছে আপসে একসঙ্গে থাকা অসম্ভব নয়। দু নম্বর হচ্ছে, আবার যদি লড়াই বাধে তা হলে সেটা হবে পারমাণবিক যুদ্ধ। তার আগুন থেকে কেউ কী আর বাঁচবে? গোটা দুনিয়াটাই তো তখন ছারখার হয়ে যাবে। এরকম মহাপ্রলয় তো কেউ আর চায় না।

হেলসিংকির চুক্তিতে যাঁরা সই করেছেন তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—সব দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার মর্যাদা দেবেন, মেনে নেবেন তাদের বর্তমান সীমানা, অপরের ব্যাপারে কেউ আর নাক গলাবে না। কারুর কারুর মতে লাভ হয়েছে বেশী পূব ইউরোপের। কোনও কম্যুনিস্ট দেশের সীমানা নিয়ে আর প্রশ্ন তোলা চলবে না অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শান্তিচুক্তি সই হলে যা হতো কায়দা করে কম্যুনিস্টরা তা করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এসব সমালোচনার কোনও মানে নেই। পশ্চিমীদের পছন্দ হোক আর নাই হোক পোল্যান্ড, পূব জার্মানি, রুশিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার সীমানা পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে গেছে। আপসে ছাড়া আর রদবদল সম্ভব নয়। সেই বাস্তব সত্যটাই মেনে নেওয়া হয়েছে হেলসিংকি চুক্তিতে। এ কথাও তাতে বলা হয়েছে আপসে কিন্তু সবই বদলানো যাবে। তার পরে কোনও দিন যদি দু জার্মানি এক হতে চায় হেলসিংকি চুক্তি তার অন্তরায় হবে না। আবার কিছুটা মত বদল করতে হয়েছে রুশিয়াকেও। ব্রেজনেভ মেনে নিয়েছেন অন্য দেশের ব্যাপারে নাক গলানো কোনও অজুহাতেই চলবে না। তার মানে তাঁর সীমিত সার্বভৌমত্ব নীতিরও তিনি হেরফের করতে রাজী।

হেলসিংকির শেষ অংক অবিশ্যি সত্যিই শেষ অংক নয়। ওতে যে চার দফা প্রস্তাব করা হয়েছে তার শেষ দফায় আছে, যে শপথ ৩৫টা দেশ নিয়েছে তাকে বাস্তব রূপ দিতে গেলে অনেক কিছু করা দরকার। চুক্তির শর্ত মানার কোনও বাধ্যবাধকতা কারো নেই—সবই মর্জির ব্যাপার। কিন্তু আশা আছে খামখেয়ালিপনা করে হিটলার মুসোলিনির মতো কেউ আর প্রলয় কান্ড ইউরোপে বাধাবে না। রুশীরা চেয়েছিল একটা স্থায়ী তদারকি পর্ষৎ গড়ে তুলতে। তা বাতিল করে দিয়েছে পশ্চিমীরা। তবে ঠিক হয়েছে দু বছর পরে ফের বৈঠক বসবে ৩৫টা দেশের আমলাদের পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে। তারপর বৈঠকে বসবেন বিদেশমন্ত্রীরা। অনেক কিছু নির্ভর করছে দুনিয়ার দু প্রধান-রুশিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর। তারা যদি অস্ত্রশস্ত্র কমিয়ে ফেলে—মারাত্মক অস্ত্র আর না বানিয়ে পরামর্শ দেয় অনুগত দেশগুলোকে রণসজ্জা কমাতে তা হলে দুনিয়ার আকাশ থেকে যুদ্ধের ঘোরঘটা কেটে যাবে, শান্তির আলো ছড়িয়ে পড়বে সারা ভুবনে।

দেশ ও কাল

নেতাজী কি ফ্যাসিসট?

আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি বেরিয়েছে। এই চিঠির অভিযোগ, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একজন কমিউনিসট নেতা পূর্ব জারমানীর একটি কাগজে লিখেছেন যে, নেতাজী একজন ফ্যাসিসট ছিলেন।

এই কমিউনিসট নেতা বা তাঁর পার্টি সি পি আইয়ের পক্ষ থেকে অতঃপর আনন্দবাজার পত্রিকায় বা তাঁদের দলীয় পত্রিকা কালান্তরে এই চিঠির কোনও প্রতিবাদ দেখিনি। পূর্ব জারমানীর দূতাবাসের প্রচার দফতরও এ সম্পর্কে কোনও প্রতিবাদ করেননি। সুতরাং, এটা ধরে নেওয়া যায় যে, আনন্দবাজারে পত্রলেখক যে অভিযোগ তুলেছেন তা সত্য।

ভারতীয় কমিউনিসটরা নেতাজীকে ফ্যাসিসট বলছেন এটা কিছু নতুন ব্যাপার নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই তাঁরা এটা বলছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই অবশ্য কমিউনিসটরা নেতাজীকে ফ্যাসিসট বলতেন না। নেতাজী যখন ভারত থেকে পালিয়ে গেলেন, যখন বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে (রাশিয়া সহ) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাহায্য চাইলেন তখনও নেতাজী ভারতীয় কমিউনিসটদের দৃষ্টিতে ফ্যাসিসট নন। কিন্তু যুদ্ধে যখন রাশিয়া যোগ দিল এবং যখন ব্রিটিশ-রুশ-মারকিন আঁতাত হল জারমানী-জাপান-ইতালির বিরুদ্ধে, ভারতীয় কমিউনিসটদের দৃষ্টিতেও অমনি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটাই হয়ে গেল 'জনযুদ্ধ'! ভারতে ইংরেজ সরকারের হয়ে তখন কমিউনিসটরা আসরে নেমে পড়লেন। নেতাজী তখন বাইরে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ছেন। ভারতীয় কমিউনিসটদের বিচারে নেতাজী তখন থেকেই ফ্যাসিসট।

মাঝখানে একবার (যুক্তফ্রন্ট রাজত্বের সময়) নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে ফরওয়ারড ব্লক আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে সি পি আই (এম) নেতা জ্যোতি বসু বলেছিলেন, নেতাজীকে যে ফ্যাসিসট বলা হয়েছিল তা ভুল বলা হয়েছিল। আসলে তিনি ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী। নেতাজী সম্পর্কে সি পি আই নেতাদের এ রকম কোনও বক্তব্য অবশ্য এখনও আমার দৃষ্টিতে আসেনি। তবে, ইদানীং তাঁরা প্রকাশ্যে নেতাজীকে ফ্যাসিসট বলাটা এড়িয়ে চলতেন। বহুদিন পরে আবার একজন সি পি আই নেতা নেতাজীকে ফ্যাসিসট বললেন। তাও একটি বিদেশী পত্রিকায়।

ভারতীয় কমিউনিসটরা নিশ্চয়ই বলবেন, নেতাজী কি দুই ফ্যাসিসট শক্তি জারমানী এবং জাপানের সংগে হাত মেলাননি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মিলিয়েছিলেন। কমিউনিসটরা বলতে পারেন, তা হলে তাঁকে আমরা ফ্যাসিসট বলব না কেন?

আমি প্রশ্ন করতে পারি, স্তালিন কি একটা সময় হিটলারের সংগে সমঝোতা করেননি? তার ফলেই কি তিনি ফ্যাসিসট হয়ে গিয়েছিলেন? স্তালিন কি পরবর্তী কালে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতন্ত্রবাদী দুনিয়ার দুই নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্র ব্রিটেন ও মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে হাত মেলাননি? তার ফলেই কি তিনি সাম্রাজ্যবাদী বা ধনতন্ত্রবাদী হয়ে গিয়েছিলেন?

বলতে পারেন, নিজের দেশ রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্য তিনি যখন যাঁর সংগে হাত মেলানো প্রয়োজন তাই করেছিলেন। ঠিক কথা। স্তালিনের প্রধান লক্ষ্য ছিল রাশিয়াকে রক্ষা করা। সেই ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। তেমনি, নেতাজীরও লক্ষ্য ছিল ইংরেজের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করা। সেইমত ব্যবস্থাই তিনি করেছিলেন।

নেতাজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথমে বাইরের কার সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন? ঐতিহাসিক তথ্য বলে, সেই দেশ রাশিয়া। কাবুলে পৌঁছেই তিনি রুশদের সংগে যোগাযোগ করেছিলন। তিনি বারলিন যাওয়ার আগে মস্কোর কর্তৃপক্ষের সংগে কথা বলেছিলেন। নিজ দেশের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে মস্কো তখন নেতাজীকে সাহায্য করতে পারেনি। তাই নেতাজী জারমানীর সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন।

কিন্তু কত সাহসী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ তিনি ভাবুন, ভারতের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষায় কত আগ্রহী—প্রথম দিন দেখা করতে গিয়েছেন হিটলারের সংগে। সেই হিটলার যার ভয়ে তখন পৃথিবী কাঁপছে। সেই হিটলার যিনি তাঁকে যে-কোনও সময় গুলি করে মেরে ফেলতে পারেন। সেই হিটলারকে নেতাজী প্রথমেই বললেন: আপনি আপনার বইয়ে ভারতীয়দের সম্পর্কে যে অসম্মানজনক উক্তি করেছেন তা প্রত্যাহার করতে হবে। তাঁর কথা শুনে হিটলার তো চটে আগুন। নেতাজীও ছাড়বেন না। ফলে, হিটলার তাঁকে জেলে পুরলেন না বা গুলি করে মারলেন না বটে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ জারমান সাহায্যের ব্যাপারে সেই দিন থেকেই ভাটা পড়ে গেল।

হিটলার আজাদ হিন্দ অভিযানকে সাহায্য করতে উৎসাহী নয় দেখে নেতাজী কি করেছিলেন? তিনি তখন থেকেই যে-কোনওভাবে পূর্ব রণাংগনে চলে আসার চেষ্টা করছিলেন। পূর্ব রণাংগন থেকে ইংরেজ তখন পালাচ্ছে। নেতাজী পূর্ব রণাংগনে ভারতীয় বাহিনী গড়ে ভারত স্বাধীন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সেই বিপদসংকুল দিনে সাবমেরিনে ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ায় এলেন। গড়ে তুললেন বিরাট আজাদ হিন্দ বাহিনী। ঝাঁপিয়ে পড়লেন যুদ্ধে। যে কোনও সময় মারা যেতে পারতেন তিনি। নেতাজীও তা জানতেন।

এই ঝুঁকি না নিয়ে তিনি কি শুধু বারলিনে বসে থেকে বেতারে ইংরেজবিরোধী ও হিটলার-প্রেমী ভাষণ দিয়ে দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন না? বসে থাকতে পারতেন না কি সেই দিনের আশায় যেদিন ইংরেজ হারবে? এবং বসে বসেই কি তিনি এই চেষ্টা করে যেতে পারতেন না যাতে হিটলার তাঁর উপর খুশি থাকেন এবং ইংরেজ হারলে তাঁকেই ভারতের সিংহাসনে বসিয়ে দেন?

হ্যাঁ পারতেন এবং অন্য নেতারা অনেকে হয়ত তা করতেনও। কিন্তু নেতাজী ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে-কোনওভাবে ভারতকে মুক্ত করা।

এই জন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে তিনি ইংগ-মারকিন জোটের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে থেকেই তিনি যোগাযোগ শুরু করেছিলেন টোকিওর রুশ প্রতিনিধি জ্যাকব মালিকের সংগে। যোগাযোগ করেছিলেন হ্যানয়ে হো চি মিনের সংগে এবং তাঁদের মাধ্যমে চীনের কমিউনিসটদের সংগে।

নেতাজী কি তাহলে কমিউনিসট হয়ে গিয়েছিলেন? না, তাও হননি। নেতাজী প্রথমে যা ছিলেন, তখনও তাই ছিলেন। নেতাজী ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের একনিষ্ঠতম সৈনিক। নেতাজী বলেছিলেন: জাপান-জারমানী হেরেছে, আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু আমরা হারিনি, আমরা আত্মসমর্পণও করব না। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা পর্যায় শেষ হল, আর একটা পর্যায় শুরু হবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই লড়াইয়ে একদিন রাশিয়া ও চীনের কমিউনিসট শক্তি সাহায্য করবেই।

এই যে নেতাজী, তাঁকে ভারতীয় কমিউনিসটরা এখনও বলেন ফ্যাসিসট।

বিপ্লবের সময় লেনিন যখন বিদেশ থেকে রাশিয়া ফিরলেন তখন জার্মান কর্তৃপক্ষ তাঁকে রাশিয়ায় ফিরতে সাহায্য করেছিল। কিছুদিন পরেই সেই নজির তুলে ধরে কেরেনেসকি বলেছিলেন: লেনিনকে জারমান শত্রুরা পাঠিয়েছে রাশিয়ার নব গণতান্ত্রিক সরকারকে ধ্বংস করতে। সেই কেরেনেসকি লেনিনের বিরুদ্ধে এক বিরাট মামলাও দায়ের করেছিলেন তখন। লেনিন কার্যত আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য।

কেরেনেসকিরা লেনিনদের মত বীরদের চিরকালই বিদেশের চর বলে।

১১-৮-৭৫।

সমর র

সাহিত্য প্রসঙ্গ

হাস্যরস : বাঙালী জীবনে ও সাহিত্যে

মনে পড়ছে না, কে যেন লিখেছিলেন, বাঙালী প্রাণ খুলে হাসতে জানে না, যে কান্নায় বুক ভেঙে যায় তেমন করে কাঁদতেও জানে না; সে জানে শুধু অভিমান করতে। কথাটা হালকাভাবে নিলে গায়ে লাগার কথা নয়; খুঁটিয়ে দেখলে মনে হবে—এই কথার মধ্যে বাঙালী চরিত্রের অনেকখানি বলা হয়েছে, কিন্তু সবটা নয়। যে কোনো কারণেই হোক—মাটির গুণে এবং দীর্ঘকালের সামাজিক কারণে হয়ত বাঙালী কিছু অভিমানী, তা বলে সে বেরসিক এমন কথা কেমন করে বলব!

বাংলা সাহিত্য বাঙালী মনের একটি বড় পরিচয়। আমাদের সাহিত্যের দিকে তাকালে এ কথাটা মনে হতে পারে যে, উনিশ শতকের আধখানা গিয়েছে হাস্য-কৌতুকে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। যদিও এটা প্রধান নয়, তবু অপ্রধানও নয়। বাঙালী সরসতার উদাহরণ হিসেবে আমরা তা গ্রাহ্য করতে পারি। বিশ শতকের অন্তত প্রথম তিরিশ চল্লিশটা বছরও সেই সরসতার চিহ্ন সাহিত্যে বজায় থেকেছে, হাস্যরসের প্রাচুর্যও চোখে পড়ে। পরে অবশ্য বাংলা সাহিত্যে বিরাট এক মন্দা দেখা দিয়েছে।

হাস্যরস বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ ছিল। হাসি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—এর কোনো কিছুরই অভাব ঘটে নি সে যুগে। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বঙ্কিম, বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে পরশুরাম, পরশুরাম থেকে শিবরাম, অভাব তো দেখি না। এমন কি তারপরও ছিলেন মুজতবা আলি, রূপদর্শী এবং আরও দু একজন। দুঃখের বিষয় এই হাস্যরসের ধারা এখন শুষ্ক।

এরকম একটা ধারণা হয়ত করা যায় যে, আমাদের সাহিত্যে হাস্যরসের দুটি ধারা ছিল—নদীর দুই শাখার মতন। একটি শাখায় ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝাঁঝ। মুগুরের মতন আমাদের আঘাতও করত। অন্যটি ছিল সরল সাদামাটা হাসি।

প্রথম ধারায় 'হুতোম প্যাঁচার নকশার' মতন গ্রন্থগুলিকে ধরা যেতে পারে। হুতোম প্যাঁচার নকশার মতন বই বাংলা ভাষায় আর লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এমন মুক্ত, অকুণ্ঠচিত্ত, বিদ্রূপাত্মক, শ্লেষপূর্ণ লেখা আর চোখে পড়ে না। সেকেলে বাঙালী, বিশেষ করে বাবু বাঙালী, কেলকাতার বাবুরা হুতোম পড়ে মাথা নেড়া করেছিলেন কিনা সে সংবাদ আমার জানা নেই বটে তবে ওই বই পড়ে অনেকেরই অধোবদন হবার কথা। হুতোম প্যাঁচার প্রশংসা বহুজনেই করেছেন, তবু আজকের দিনে বইটি হাতে নিয়ে পড়তে বসলে যা মনে হয় তা হল—লেখকের সীমাহীন বিদ্রূপ, দুঃসাহস, কটাক্ষ এবং আক্রমণ। একটি উদাহরণ দি : "অনেক বড় মানুষ বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেণ্টর মত তাঁদের স্মরণার্থে বেঁচে রয়েছে।" এমন তাজা ভাষা, অসঙ্কোচ শব্দ ব্যবহার, লোকমুখে ব্যবহৃত কলকাতার নামান বুলি—গ্রন্থটিকে শুধু বাস্তব করে নি, প্রাণস্পন্দনে ভরে রেখেছে। হুতোম আজকাল পড়া হয় কি না জানি না। হলে ভাল।

মাইকেল মধুসূদনও যে কত বড় রসিক ছিলেন তা তাঁর প্রহসন থেকেই অনুমান করা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও কি কিছুমাত্র কম সরসতা দেখিয়েছেন। দীনবন্ধু মিত্রও ছিলেন মূলত বিদ্রূপাত্মক লেখারই লেখক। তাঁর লেখার মধ্যে প্রায়শই যে একটি উদ্দেশ্য থাকত—তা কে না জানে, তবু এই উদ্দেশ্য ছিল যথার্থ সামাজিক-বোধ সম্পন্ন লেখকের।

ত্রৈলোক্যনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র—এ-রকম তো আছেনই। দু' চারটি এলোমেলো নাম করে লাভ নেই, বাংলা সাহিত্যের পাঠক নিশ্চয় স্বীকার করবেন, দীর্ঘ কয়েকটি যুগ গিয়েছে ব্যঙ্গপ্রধান লেখার চর্চায়। বহু উঁচুদরের লেখক এই ধরনের রচনায় আমাদেব ঋণী করে রেখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এতই পরিশীলিত মেজাজের লোক ছিলেন যে, প্রচলিত হাস্য-রসকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করে তুললেন। অর্থাৎ সেটা হল মার্জিতজনের হাস্যরস, মার্জিত মন ও বিদ্যাবুদ্ধি না থাকলে হাসা চলে না। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' একেবারে সাধারণ লোকের বোধগম্য হাসির লেখা নয়, পড়ার, সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাস্য হাসার সুযোগ সাধারণের হবে না, কিছুটা শিক্ষা ও মনের সরসতা থাকলে ক্ষণে ক্ষণে নির্মল হাসি হাসা যাবে। এক একটি কথার মধ্যে লুকোনো যে রস তার স্বাদ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাসেও তাঁর মনের এই সরসতার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে, চিঠিপত্রেও। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীও আমাদের নমস্য। তাঁর হাস্যরস যেন আরও পাক ধরানো।

রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করা মুশকিল। অনুকরণ তো দুঃসাধ্য। তবু তাঁর পরিচ্ছন্ন হাস্যরসের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে পড়েছিল। 'পরশুরাম' রবীন্দ্রনাথের পথ ধরেন নি—তিনি বরং বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন হাস্যরসের ধারাকেই আরও শিল্পময় করে তুললেন। অর্থাৎ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ উদ্দেশ্য হলেও তা শিল্পময় হয়ে উঠল। পরশু-রামের প্রথম দিককার এক একটি গল্প হাসির খনি, তাতে কারুকর্ম আছে, চরিত্র আছে, বিদ্রূপ আছে, কটাক্ষ আছে, আবার নির্মল পরিচ্ছন্ন হাস্যরসও রয়েছে।

হাসির লেখায় বাংলা সাহিত্য দীন ছিল না। বঙ্কিমের সময়কালে, রবীন্দ্রনাথের সমকালে এবং পরবর্তীকালেও নয়। অমৃত-লাল বসু, ডি এল রায় বলতে এক সময় লোকে হাসির খোরাক পাবার জন্যে উঠে বসত। অমৃতলালের রসিকতা, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান বাঙালীর ঘরে ঘরে শোনা যেত। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক সময়ে খ্যাতি কম পান নি। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত পড়ার আগ্রহ কোন না পাঠকের হয়েছে।

আজ এঁরা কেউ বিগত কেউ বা প্রায়-বৃদ্ধ। শিবরাম চক্রবর্তী সারা জীবন ধরেই প্রায় একা হাস্যরসের ধারাটি জিইয়ে রাখার চেষ্টা করলেন।

মোটামুটি দেখতে গেলে গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর—মানে, আজ প্রায় বছর তিরিশ আমাদের সাহিত্য থেকে অতি দ্রুত হাস্যরসের অন্তর্ধান ঘটছে। দু চারজন হয়ত এখনও হাস্যরসের কারবারী কিন্তু তাঁদের উদ্যম ফুরিয়ে এল।

কেন এমন হল?

যদি আমরা ধরে নি—সাহিত্যে হাস্যরস নিম্নশ্রেণীর রস তা হলে বলতে হয় বাংলা সাহিত্যে গত তিরিশ বছর প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে। আমাদের লেখকরা সকলেই সিরিআস লেখক হয়ে গিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, এই দাবিটি কেউ স্বীকার করবেন না।

তা হলে?

দ্বিতীয় যুক্তি এই হতে পারে, বাঙালী জীবনে গত তিরিশ বছরে যে-ধরনের ভাঙাচোরা ঘটে গেছে, যে অস্বস্তিকর ক্লেশময় জীবন তাকে যাপন করতে হচ্ছে তাতে দু মুহূর্ত প্রাণ খুলে হাসার মন আর নেই। এই যুক্তিও সর্বাংশে সত্য নয়, কেননা বাঙালী সমাজে আড্ডা, গল্পগুজব হাসিঠাট্টার কদর কমেছে বলে আমার মনে হয় না। স্বীকার করি, যে সুস্থির মন, অবসর, রসবোধ থাকলে মন খুলে হাসা যায়—তার অভাব আমাদের ঘটেছে। কিন্তু হাসিই তো মনভার লাঘব করে।

হাস্যরসের রচনা যে বাংলা সাহিত্য থেকে অন্তর্ধান করতে চলেছে এর কারণ লেখকদের অক্ষমতা। যে বিষয়ে আমরা অক্ষম হই হয় তায় নিন্দা করি—না হয় তা দূরে ঠেলে সরিয়ে দি। বাঙালীর জীবন থেকে হাস্যরস মুছে যায় নি; তার সাহিত্য থেকেই হাস্যরস মুছে যেতে বসেছে।

অভিনন্দ

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮২

পূজা সংখ্যা মানেই আনন্দবাজার—এ-তথ্য আজ সকলেরই জানা এবং পুরনো। কিন্তু পূজা সংখ্যা আনন্দবাজার সব বছরেই নতুন, সব বছরেই নিয়ে আসে শ্রেষ্ঠ রচনার সেরা সমাবেশ। ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার এই শারদ-সংখ্যাটি যে রচনার উৎকর্ষে ও সম্পাদন-নৈপুণ্যে অন্যান্য পূজা সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি স্বতন্ত্র তার প্রমাণ এর বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রচার। সবরকম একঘেঁয়েমি মুক্ত এবারের শারদীয়া সংখ্যাটিও রুচি ও পরিকল্পনার অভিনবত্ব নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে মহালয়ার অনেক আগেই—যাতে উপন্যাস ও গল্পপ্রিয় বাঙালী পাঠক-পাঠিকার আনন্দ হয়ে ওঠে সমগ্র।

এই সংখ্যার সেরা আকর্ষণ

৬টি নতুন স্বাদের সুবৃহৎ উপন্যাস

সমরেশ বসু/রমাপদ চৌধুরী/নীললোহিত

বুদ্ধদেব গুহ/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়/শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র আনন্দবাজারেই এঁরা উপন্যাস লিখছেন

বড় গল্প — শংকর

একালের খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের উপরোক্ত রচনাগুলি ছাড়াও থাকছে প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের অনেকগুলি গল্প, প্রবন্ধ ও সরস রচনা এবং আধুনিক কবিদের নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ। সঙ্গে রঙীন আর্টপ্লেট এবং অন্যান্য অনেক কিছু।

দাম : ১০.০০ ॥ সডাক : ১১.৫০

শারদীয়া আনন্দবাজারের জন্যে এখন থেকেই ব'লে রাখুন আপনার কাগজ যিনি দেন তাঁকে, বা, আমাদের লিখুন :

সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০১

ABPC-14 BEN

রপ্তানি আয় বাড়াবার নতুন প্রয়াস

রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়াবার জন্য সম্প্রতি কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ১০ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানি বাড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন এবং বাণিজ্য বোর্ডের একটি সভায় তিনি বলেছেন, বর্তমান অবস্থায় দেশের উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান গতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমদানির পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমানো সম্ভব হবে না। যদি আমদানির পরিমাণ কমানো সম্ভব না হয় তবে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার যে ঘাটতি থেকে যাবে তা পূরণ করতে হবে রপ্তানিজাত আয় থেকে। যদি রপ্তানি-সামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় কমানো যায় এবং রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে শিল্পের উৎপাদনী শক্তি বাড়ানো যায় ও সেই সঙ্গে যদি উৎপাদন পদ্ধতি উন্নততর করা সম্ভব হয় তবে রপ্তানির পরিমাণ ১০ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো অসম্ভব হবে বলে শ্রীমতী গান্ধী মনে করেন না। তবে বেসরকারী ক্ষেত্রে যাঁরা রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করে থাকেন তাঁদের নতুন বিনিয়োগের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তার বোঝা নিশ্চয়ই বহন করতে হবে। আমদানি লাইসেন্স ব্যবস্থা আগেকার তুলনায় এখন যথেষ্ট সরল করা হয়েছে; এখন প্রয়োজন হল রপ্তানি বাড়াবার ব্যবস্থা আরও সরল করা। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্প্রতি রপ্তানি লাইসেন্স তালিকা থেকে ১৭৫টি জিনিসকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রপ্তানি তালিকা থেকে কাপড়, বাগিচায় উৎপন্ন সামগ্রী ও কয়েক প্রকার রাসায়নিক জিনিস বাদ দেওয়া হয়েছে।

যেসব শিল্প রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে তাদের শুল্ক-বিহীন আমদানির সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রপ্তানি বাড়াবার জন্য অন্যান্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে তার মধ্যে একটি হল ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের রপ্তানি শাখার কাজ আরও সম্প্রসারিত করা। রপ্তানি প্রকল্পের বিশেষ চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে এই ব্যাংক রপ্তানির অর্থসংস্থানে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রপ্তানি বৃদ্ধি সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন পরে মূল্য প্রদেয় ব্যবস্থার (Deferred Payment System) ভিত্তিতে বিরাট অঙ্কের মূলধনী জিনিস রপ্তানির চুক্তি পূরণ করতে হলে আর্থিক সংস্থাগুলিরও মনোভাবের পরিবর্তন করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন হলে সরকারকে স্বতন্ত্র নতুন আর্থিক সংস্থা গঠন করতে হবে। অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে রপ্তানি বৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা হল লাইসেন্সিং পদ্ধতি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মতে এই অভিযোগ যুক্তিসংগত নয়। তাঁর মতে রপ্তানি উৎপাদন বৃদ্ধির পথে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে কোথায় অর্থ বিনিয়োগ করা হবে এবং কিভাবে সীমিত সম্পদ বরাদ্দ করা হবে সে সম্পর্কে বাছাই করা দরকার। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বস্ত্রশিল্পে চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ২৪ লক্ষ মাকুর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বসানো হয়েছে মাত্র দুই লক্ষ মাকু। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী যাই বলুন না কেন, লাইসেন্সের ঝামেলা থেকে রেহাই পেলে রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনকারীরা যে উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে আরও উৎসাহ পাবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই তা স্বীকার করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের চর্মশিল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকারের ঘোষিত নতুন রপ্তানি নীতি কার্যকরী হলে চট শিল্পের অবস্থা অনেক উন্নত হবে। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও মন্দার ভাব বহুলাংশে হ্রাস পাবে। শিল্প কারখানাগুলি যদি নিয়মিত চালু থাকে তবে বেকার সমস্যা মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা সম্ভব হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানি ক্ষেত্রে নগদ আর্থিক সাহায্য প্রকল্প বিলোপ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে এক শ্রেণীর রপ্তানিকারীদের মধ্যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সরকারের নগদ অর্থানুকূল্যের সাহায্যে রপ্তানিশিল্প গড়ে উঠবে এটাও সবসময়ে কাম্য নয়। রপ্তানিশিল্পকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে এবং এজন্যই সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নতুন ব্যবস্থা নিয়েছেন। রপ্তানিকারীদের এখন উচিত রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদন-খরচ যথাসম্ভব হ্রাস করে উৎপাদিত সামগ্রীর গুণগত উৎকর্ষ বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে রপ্তানিযোগ্য সামগ্রীর উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করা। এজন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটা তাঁরা ধার করতে পারেন ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের কাছ থেকে। তাছাড়া রপ্তানি ঋণ নিশ্চয়তা কর্পোরেশনও (export credit guarantee corporation) এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। রপ্তানিশিল্পকে ভরতুকির উপর নির্ভরশীল করে রাখা ঠিক নয়।

রপ্তানি বাণিজ্যে ১০ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ ৩৮০০ কোটি টাকা যাতে হয় তার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল-জুনে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৪৩ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯০৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা। ফলে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩৩০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ১৯৭৫ সালের একই সময়ে রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ হয়েছে যথাক্রমে ৭৮৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা এবং ৯৮২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। ফলে চলতি বছরের এপ্রিল-জুনে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ কমাতে গেলে আমাদের পক্ষে এখন সবচেয়ে বেশি জরুরী হল রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে যতটা সম্ভব আমদানির বিকল্প জিনিসের উৎপাদন বাড়ানো। কিন্তু যদি আমদানির বিকল্প জিনিসের উৎপাদন করার খরচ আমদানি-খরচের চেয়েও বেশি হয় তবে তা লাভজনক নয়, সেক্ষেত্রে আমদানি করাই অধিকতর ভাল। আমাদের দেশে আমদানি লাইসেন্স নীতি সরল করা হয়েছে যথেচ্ছভাবে আমদানি বাড়িয়ে যাবার জন্য নয়, রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় আমদানি এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আমদানির ব্যবস্থা করার জন্য। অপেক্ষাকৃত কম খরচে আমদানির বিকল্প জিনিস উৎপাদন করতে পারলে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার কিছু সাশ্রয় হয় এবং সেই সঙ্গে দেশের ভিতর কর্মসংস্থান সম্প্রসারণেরও সম্ভাবনা থাকে। সম্প্রতি আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ যথেষ্ট প্রতিহত হয়েছে। বহু উন্নত এবং উন্নতিকামী দেশের যা মুদ্রাস্ফীতির হার পরিলক্ষিত হয়, এখন ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার তার চেয়ে অনেক কম। জাতীয় অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার যে প্রচেষ্টা এখন চলছে তার সঙ্গে উন্নয়ন হার ত্বরান্বিত করার প্রয়াস চালাতে গেলে রপ্তানি থেকে আয়ের পরিমাণ বাড়াতেই হবে। আমাদের রপ্তানি আয় যত বাড়বে তত বৈদেশিক সাহায্যের উপর আমাদের নির্ভরতাও কমবে। দেশের অর্থনীতিতে পরিপূর্ণ শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য রপ্তানি-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ যে অত্যাবশ্যক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সেজন্য এক্ষেত্রে সরকারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সমর্থনযোগ্য।

সুব্রত গুপ্ত

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১১ ॥

ওঁ

Darlington Hall
Totnes

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠির মধ্যে অনেক ভাববার কথা পেলুম। দূরে থেকে দেশের অবস্থা সর্বাঙ্গীণভাবে বুঝতে পারা শক্ত— কাছে থেকেও তার থেকে কম শক্ত নয়। যতদিন এদেশে আছি দেখতে পাই বাংলা দেশের চেহারা বিশ্বের কাছে যেন ঝাপসা হয়ে এসেচে। সমস্ত ভারতবর্ষের পরিচয় প্রধানত বোম্বাই দিচ্চে। তার কারণ দেশহিতৈষিতায় যদি জন্তুগিরি করে বাহাদুরী নিতেই হয় তাহলে অন্তত খুব জন্তু হওয়া সিংহ ব্যাঘ্রগোছের একটা কিছু। দোতলা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ইঁট্‌পাটকেল ছুঁড়ে কিম্বা পুলিশের হাতে চড়টা চাপড়টা খেয়ে নিজেকে দিগ্বিজয়ী বীর বলে ঘোষণা করলেও সে আওয়াজ নিজের আঙিনার বাইরে বেশিদূর পৌঁছয় না। এসব দেশের লোক মারণচণ্ডীর চেলা। যখন তার ভোগ বসে তখন ধ্বস্তাধ্বস্তি রক্তারক্তির কিনারা পাওয়া যায় না: তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যখন গুণ্ডাগিরির ন্যাকামি করি মাত্র তখন নকল লড়াইয়ের বুলি-সহযোগে তাকে ফাঁপিয়ে তোলা অসম্ভব। কিন্তু বোম্বাইয়ের মধ্যে যে-ভারতবর্ষ আজ প্রকাশ পেয়েছে সেই ভারতবর্ষ সুদূর সমুদ্রপারেও বিরাটরূপে দৃশ্যমান। কেননা শৌর্যের এই চেহারা মানবসমাজে বিরল। এইখানে ভারতবর্ষ জিতেছে। সেই জন্য অহিংস্রতাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করবার সাহস যে বাঙালীর নেই অথচ হিংস্রতাকেও পূর্ণভাবে প্রয়োগ করবার জোর যার দেখা যায় না, মারবার বেলায় যার চাতুরীর অভাব থাকে না উল্টে মার খেলেই যার নাকি সুরের নালিশ অভ্রভেদী হয়ে ওঠে সেই বাঙালী আজ চোখে পড়চে না বলেই ভারতবর্ষকে আজ বড়ো করে দেখে মন এমন আশান্বিত গৌরবান্বিত হয়ে উঠেচে। দূরে থেকে দেখবার এই একটা মস্ত গুণ,—যা দেখবার যোগ্য নয় তা আপনিই অদৃশ্য হয়ে যায় বলে যা সত্য তার খর্বতা ঘটে না। তোমরা কলকাতার রাস্তায় গলিতে ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষের ক্ষুদে ক্ষুদে পালোয়ানি দেখে হতাশ হচ্চ কিন্তু আসল আশার বার্তা সেইখানেই অবারিত হয়েচে যেখানে সমস্ত দুঃখ দৌরাত্ম্যের উপরে উঠে মনুষ্যত্ব সম্মানিত হল। এই কারণেই, কাছে থাকলে আমরা ক্ষুদ্রের উৎপীড়নকে বড়ো করে নিয়ে মুষড়ে পড়ি দূরে থাকলে বড়োকে দেখতে পেয়ে আমাদের ভরসা জাগে। এই ভরসাটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত। এই কারণেই গীতা বলেচেন স্বল্পমাত্র ধর্মও মহৎ ভয় থেকে পরিত্রাণ করে। নিজের যথার্থ শক্তিকে আবিষ্কার করতে পারলেই মানুষ বেঁচে যায়, যতক্ষণ তা না পারি তখন আত্মশক্তির পরে অশ্রদ্ধাবশতই আমরা পরের পরিত্যক্ত সাজসজ্জায় ন্যাকাবীরের ছদ্মবেশ পরে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করি—এ কথা ভুলে যাই যে তাতে আমাদের লজ্জা বেড়েই চলে। বোম্বাই যা করেচে তা সহজেই আপন মহিমায় মহীয়ান, তাকে নকল গড়ের খেলারূপে প্রতীয়মান করবার কোনো দরকারই হয় না। এই কারণে বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্ত দেখে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্যে আশা করবার কারণ আমাদের মনে জেগেচে। মহাত্মাজীর অহিংস-নীতিকে যারা মুখে স্বীকার ক'রে মনে মনে অশ্রদ্ধা করে সেই চালাক জাতি আজকেকার ভারত ইতিহাসে অতি অকিঞ্চিৎকর স্থান গ্রহণ করেচে এ কথা নিজে বুঝতে পারচে না। এরা না ঘাটের না ঘরের, না রণক্ষেত্রের না ধর্মক্ষেত্রের।

এখানে যা আমি বলেচি ও লিখেচি তার পুরোপুরি বিবরণ এতদিনে দলিল সমেত নিশ্চয়ই পেয়েছ। যা বলিনি সেইটি পেতেও তোমাদের বিলম্ব হয়নি বিশ্বাস করতেও। বৌমার কাছে শুনলুম কে তাঁকে লিখেচে দেশে মুখ দেখানো কঠিন হয়েচে। এ দেশ বিদেশ কিছুই, সেইজন্যে এই লালমণির রাজ্য থেকে আমার নীলমণির রাজ্যে যাবার উৎকণ্ঠায় মাঝে মাঝে মন পীড়িত হয়, কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে, যদিও বারবার অনেক অপ্রিয় কথা বলেচি তবু কখনো মুখ দেখাবার জন্য কোনো বাধা এখানে ঘটল না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে আজ জেগে উঠেচে সেটা হচ্চে আমরা কী চাই, আমাদের কি চাওয়া উচিত। সত্য কথা যদি বলতে হয় কিছু ভেবে উঠতে পারিনি। অন্য দেশ থেকে নজির ঘাঁটতে যাই, গোঁজামিলন দিতে চেষ্টা করি কিন্তু অঙ্কে মেলে না। ভরা তহবিলের হিসাব অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখি সেখানে সাতে তিনে দিব্যি দশ হয়েচে আমাদের জমাখরচের খাতায় কেন দুইয়ে তিনে দশ হবে না এইটে নিয়ে তুমুল গণ্ডগোল চলচে। অঙ্কটা মোটাকলমে জোরের সঙ্গে লিখে দেওয়া অসম্ভব নয় কিন্তু বিচারক আছেন। সে বিচারক পার্লামেণ্ট নয়,—পার্লামেণ্টকে ভোলানো চলে কিন্তু মহাকালের অডিট আপিসে ভুল এড়ায় না। অন্য-দেশের স্বাক্ষরের সঙ্গে ইতিহাসে জাল চলে না। যারা ডোমিনিয়ন্ রাষ্ট্রতন্ত্র পেয়েচে তারা নিজের প্রকৃতি থেকেই পেয়েছে—বাইরের থেকে কেঁদে কেটে চেয়ে চিন্তে কিম্বা ধার-ধোর করেও পায়নি—প্রকৃতিটা আমাদের অবিকৃত থাকবে অথচ আকৃতি হবে পরের মতো তাকেই বলে ছদ্মবেশ। কিন্তু রাষ্ট্রতন্ত্র ত দরজির দোকানের জিনিস নয় ওটা প্রাণধর্মের জিনিস—ওটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড দোকানে সস্তায় মেলে না। ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া যা পেয়েচে ইটালির প্রজা স্পেনের প্রজা তা পায়নি। যাই হোক্ গে, এসব কথা কাউকে মুখ ফুটে বলিনে। মনে মনে ভাবি এসব তর্কে আমার হয়তো অধিকার নেই। মোতিলাল নেহেরু প্রভৃতির মতো লোক না অবুঝ, না অবিশ্বান, না অর্বাচীন, তাঁরা যদি ভাবতে পারেন যে, যে পদার্থটা স্বতই ডোমিনিয়ন নয় সেখানে পরন্তঃ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস নামক পদার্থের আবির্ভাব হতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের ভাববার কোনো হেতু আছে। অবিরুদ্ধ

সমজাতিপ্রধান দেশ, এবং অসমজাতিপ্রধান, এমন কি, বিরুদ্ধ জাতিপ্রধান দেশের মধ্যে মূলগত প্রভেদ আছে, অথচ তাদের পলিটিক্সের বেলাতেই ফলগত কোনো প্রভেদ থাকবে না, এমন আবদার রক্ষা করা বিধাতার পক্ষেও অসম্ভব। এই কথাটা আমি ভাবি। কিন্তু আমার চেয়ে যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরা একথা যখন একেবারেই ভাবচেন না তখন নিজের বুদ্ধির পরে আমার অত্যন্ত সন্দেহ হয়।

যাকগে, আমি—আর সময় নেই। ইতি ২৬ জুন ১৯৩০.

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৯২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

প্রশান্ত, বহুকাল গত হল তোমাকে আর রাণীকে পত্র লিখেছিলুম। তোমাদের সম্মিলিত নৈঃশব্দ্য থেকে অনুমান করি সেই যুগল পত্র কৈবল্যলাভ করেছে। এমনতরো মহতী বিনষ্টি ভারতীয় ডাকঘরে আজকাল মাঝে মাঝে ঘটেছে বলে শঙ্কা করি। এই কারণেই আজকাল চিঠি লিখতে উৎসাহ বোধ করিনে। অন্তত তোমাদের দিক থেকে সাড়া না পেলে চুপ করে যাই। নিঃশব্দ রাত্রির প্রহরগুলোকে দীর্ঘ বলে মনে হয়—তেমনিতরোই নিশ্চিঠি কাল কল্পনায় অত্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে। তাই থেকে মনে হয় যেন লোকান্তর প্রাপ্তি হয়েছে তাই পাঁজি গেছে বদল হয়ে, ঘড়ি বাজচে লম্বা তালে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত আমার দেশে যাবার সময়কে যতই টান মারচে ততই অফুরান হয়ে বেড়ে চলেচে। যেদিন ফিরব সেদিন নিশ্চিতই ফিরব—আজকের দিন যেমন অব্যবহিত নিকটে সেদিনও ঠিক তেমনিই নিকটে আসবে এই মনে করে সান্ত্বনার চেষ্টা করি।

তা হোক, আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যে কাণ্ড করচে তার ভালমন্দ বিচার করবার পূর্বে সব প্রথমেই মনে হয়, কি অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থি মজ্জায় মনে প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে, তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেচে পর্বত প্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছু মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি, কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলচে সেটা দেখে আমি সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েচি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না, কেননা নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্চি বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইচে না, কেননা জগৎজুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে এরা যেটা চাচ্চে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়, হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।

এই যে বিপ্লবটা ঘটল এটা রাশিয়াতে ঘটবে বলেই অনেককাল থেকে অপেক্ষা করছিল। আয়োজন কতদিন থেকেই চলচে। খ্যাত অখ্যাত কত লোক কত কাল থেকেই প্রাণ দিয়েছে, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করেছে। পৃথিবীতে বিপ্লবের কারণ বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে কিন্তু এক একটা জায়গায় ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হয়ে উঠলেও এক একটা দুর্বল জায়গায় ফোড়া হয়ে লাল হয়ে ওঠে। যাদের হাতে ধন যাদের হাতে ক্ষমতা তাদের হাত থেকে নির্ধন ও অক্ষমেরা এই রাশিয়াতেই অসহ্য যন্ত্রণা বহন করেছে। দুই পক্ষের মধ্যে একান্ত অসাম্য অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে এই রাশিয়াতেই প্রতিকার সাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত। একদিন ফরাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল এই অসাম্যের তাড়নায়। সেদিন সেখানকার পীড়িতেরা বুঝেছিল এই অসাম্যের অপমান ও দুঃখ বিশ্বব্যাপী। তাই সেদিনকার বিপ্লবের সাম্য সৌভ্রাত্র ও স্বাতন্ত্র্যের বাণী স্বদেশের গণ্ডী পেরিয়ে উঠে ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু টিকল না। এদের এখানকার বিপ্লবের বাণীও বিশ্ববাণী। আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতির স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করচে এ বাণী চিরদিন টিঁকবে কিনা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।

এই যুগে বিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গভূমির পর্দা উঠে গেছে এতকাল যেন আড়ালে আড়ালে রিহার্সাল চলছিল, টুকরো টুকরো ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন কামরায়। প্রত্যেক দেশের চারদিকে ঘেরা ছিল। বাহির থেকে আনাগোনা করবার পথ একেবারে ছিল না, তা নয়, কিন্তু বিভাগের মধ্যে মানুষ সংসারের যে চেহারা দেখেচি আজ তা দেখিনে। সেদিন দেখা যাচ্ছিল একটা একটা গাছ আজ দেখচি অরণ্য। মানব সমাজের মধ্যে যদি ভারসামঞ্জস্যের অভাব ঘটে থাকে সেটা আজ দেখা দিচ্চে পৃথিবীর একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত। এমন বিরাট করে দেখতে পাওয়া কম কথা নয়।

টোকিয়োতে যখন কোরীয় যুবককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তোমাদের দুঃখটা কি, সে বললে আমাদের কাঁধে চেপেছে মহাজনের রাজত্ব, আমরা তাদের মুনফার বাহন। আমি প্রশ্ন করলুম, যে কারণেই হোক তোমরা যখন দুর্বল তখন এই বোঝা নিজের জোরে ঝেড়ে ফেলবে কি উপায়ে। সে বললে নিরুপায়ের দল আজ পৃথিবী জুড়ে, দুঃখে তাদের মেলাবে —যারা ধনী যারা শক্তিমান তারা নিজের নিজের লোহার সিন্দুক ও সিংহাসনের চারদিকে পৃথক হয়ে থাকবে তারা কখনো মিলতে পারবে না। কোরিয়ার জোর হচ্চে তার দুঃখের জোর।

দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্চে এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেচে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায়নি—অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেচে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারচে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায় অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেচে।

যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত হয়ে উঠচে। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে-শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলচে তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করচে—তার দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্চে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্চে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসল যাকে সবচেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল সে হচ্চে দুঃখীর দুঃখ—কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজের মুনফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা দুশো তিনশো

হায়ে মুনফা ভোগ করতে এদের হৃৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনফাকেই এরা শক্তি বলে জানে। কিন্তু মানুষের সমাজের সমস্ত অতিশয্যের মধ্যেই বিপদ, সে বিপদকে কখনোই বাইরে থেকে ঠেকানো যায় না। অতিশয় শক্তি অতিশয় অশক্তির বিরুদ্ধে চিরদিন নিজেকে বাড়িয়ে চল্‌তেই পারে না। ক্ষমতাশালী যদি আপন শক্তিমদে উন্মত্ত হয়ে না থাকত তাহলে সবচেয়ে ভয় করত এই অসাম্যের বাড়াবাড়িকে—কারণ অসামঞ্জস্য মাত্রই বিশ্ববিধির বিরুদ্ধে।

মস্কো থেকে যখন নিমন্ত্রণ এল তখনো বলশেভিকদের সম্বন্ধে আমার মনে স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাদের সম্বন্ধে ক্রমাগতই উল্টো উল্টো কথা শুনেছি। আমার মনে তাদের বিরুদ্ধে একটা খট্‌কা ছিল। কেননা গোড়ায় ওদের সাধনা ছিল জবরদস্তির সাধনা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখলুম ওদের প্রতি বিরুদ্ধতা য়ুরোপে যেন অনেকটা ক্ষীণ হয়ে এসেচে। আমি রাশিয়াতে আসচি শুনে অনেক লোকেই আমাকে উৎসাহ দিয়েচে। এমন কি, অনেক ইংরেজের মুখেও ওদের প্রশংসা শুনেচি। অনেকে বলেচে ওরা অতি আশ্চর্য একটা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত। আবার অনেকে আমাকে ভয় দেখিয়েচে—কিন্তু প্রধান ভয়ের বিষয় আরামের অভাব, বলেচে আহারাদি সমস্তই এমন মোটা রকম যে আমি তা সহ্য করতে পারব না। তা ছাড়া এমন কথাও অনেকে বলেচে আমাকে যা দেখাবে তার অধিকাংশই বানানো। এ কথা মান্‌তেই হবে, আমার বয়সের আমার মতো শরীর নিয়ে রাশিয়ায় ভ্রমণ দুঃসাহসিকতা। কিন্তু পৃথিবীতে যেখানে সব চেয়ে বড়ো একটা ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হত।

তা ছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজ্‌ছিল। মনে মনে ভাবছিলুম ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে—এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে? ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায় তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন, আমাদের শক্তিই বা কি, ধনই বা কত? আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের। যদি কেউ বলে দুর্বলের শক্তিকে উদ্বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে তা হলে আমরা কোন্ মুখে বলব যে তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই। তারা হয়তো ভুল করতে পারে—তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভুল করচে না তাও নয়, কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেচে যে, অশক্তের শক্তি এখনি যদি না জাগে তাহলে মানুষের পরিত্রাণ নেই, কারণ শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে—এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুললে ; নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায় হয়ে উঠ্‌চে—সমস্ত সুযোগ সুবিধা আজ কেবল মানব সমাজের একপাশে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।

এরই কিছুদিন পূর্বে থেকে ঢাকার অত্যাচারের কাহিনী আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল। কী সব অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, অথচ ইংলণ্ডের খবরের কাগজে তার খবরই নেই—এখানকার মোটর গাড়ির দুর্যোগে দুটো একটা মানুষ ম'লে তার খবর এদেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে—কিন্তু আমাদের ধনপ্রাণ মান কি অসম্ভব সস্তা হয়ে গেছে। যারা এত সস্তা তাদের সম্বন্ধে কখনো সুবিচার হতেই পারে না। আমাদের নালিশ পৃথিবীর কানে ওঠবার জো নেই, সমস্ত রাস্তা বন্ধ। অথচ আমাদের বিরুদ্ধ বচন জগতে ব্যাপ্ত করবার সকল প্রকার উপায় এদের হাতে। আজকের দিনে দুর্বল জাতির পক্ষে এও একটা প্রবলতম গ্লানির বিষয়। কেননা আজকের দিনের জনশ্রুতি সমস্ত জগতের কাছে ঘোষিত হয় ; বাক্যচালনার যন্ত্রগুলো যে সব শক্তিমান জাতির হাতে তারা অখ্যাতি এবং অপযশের আড়ালে অশক্ত জাতীয়দের বিলুপ্ত করে রাখতে পারে। পৃথিবীর লোকের কাছে এ কথা প্রচারিত যে আমরা হিন্দু মুসলমানে কাটাকাটি মারামারি করি, অতএব ইত্যাদি। কিন্তু য়ুরোপেও একদা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কাটাকাটি মারামারি চল্‌ত—গেল কি উপায়ে? কেবলমাত্র শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা। আমাদের দেশেও সেই উপায়েই যেত। কিন্তু শতাধিক বৎসরের ইংরেজ শাসনের পরে দেশে শতকরা পাঁচজনের কপালে শিক্ষা জুটেচে, সে শিক্ষাও শিক্ষার বিড়ম্বনা। অবজ্ঞার কারণকে দূর করবার চেষ্টা না করে লোকের কাছে প্রমাণ করা যে আমরা অবজ্ঞার যোগ্য এইটে হচ্চে আমাদের অশক্তির সব চেয়ে বড়ো ট্যাকসো। মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের মূলে হচ্চে তার সুশিক্ষা, আমাদের দেশে তার রাস্তা বন্ধ—কারণ law and order আর কোনো উপকারের জন্যে জায়গা রাখলে না, তহবিল একেবারে ফাঁকা। আমি দেশের কাজের মধ্যে একটি কাজকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলুম, জনসাধারণকে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা দেবার শিক্ষা দেব বলে এতকাল ধরে আমার সমস্ত সামর্থ্য দিয়েচি। এজন্যে কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যও আমি প্রত্যাখ্যান করতে চাইনি, প্রত্যাশাও করেছি—কিন্তু তুমি জান কতটা ফল পেয়েছি। বুঝতে পেরেছি হবার নয়। মস্ত আমাদের পাপ, আমরা অশক্ত।

তাই যখন শুনলুম রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য অঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে তখন মনে মনে ঠিক করলুম ভাঙা শরীর আরো যদি ভাঙে তো ভাঙুক ওখানে যেতেই হবে। এরা জেনেছে অশক্তকে শক্তি দেবার একটিমাত্র উপায় শিক্ষা—অন্ন স্বাস্থ্য শান্তি সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে। ফাঁকা law and order নিয়ে না ভরে পেট না ভরে মন। অথচ তার দাম দিতে গিয়ে আমাদের সর্বস্ব বিকিয়ে গেল।

আধুনিক ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় আমি মানুষ তাই এতকাল আমার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, প্রায় তেত্রিশ কোটি মূর্খকে বিদ্যাদান করা অসম্ভব বল্‌লেই হয়, এজন্য আমাদের মন্দ ভাগ্য ছাড়া আর কাউকে বুঝি দোষ দেওয়া চলে না। যখন শুনেছিলুম এখানে চাষী ও কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা হু হু করে এগিয়ে চলেছে আমি ভেবেছিলুম সে শিক্ষা বুঝি সামান্য একটুখানি পড়া ও লেখা ও অঙ্ককষা—কেবলমাত্র মাথা গুণতিতেই তার গৌরব। সেও কম কথা নয়। আমাদের দেশে তাই হলেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বাড়ি চলে যেতুম। কিন্তু এখানে দেখলুম, বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত,—নোট মুখস্থ করে এম এ পাশ করবার মতন নয়।

কিন্তু এসব কথা আর একটু বিস্তারিত করে পরে লিখব, আজ আর সময় নেই। আজই সন্ধ্যাবেলায় বার্লিন অভিমুখে যাত্রা করব, তার পরে ৩রা অক্টোবরে আটলান্টিক পাড়ি দেব—কত দিনের মেয়াদে আজও নিশ্চিত করে বল্‌তে পাচ্চিনে। কিন্তু শরীর মন কিছুতে সায় দিচ্চে না—তবু এবারকার সুযোগ ছাড়তে সাহস হয় না—যদি কিছু কুড়িয়ে আনতে পারি তাহলেই বাকি যে কটা দিন বাঁচি বিশ্রাম করতে পারব। নইলে দিনে দিনে মূলধন খুইয়ে দিয়ে অবশেষে বাতি নিবিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়া সেও মন্দ প্ল্যান নয়—সামান্য কিছু উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে রেখে গেলে জিনিসটা নোংরা হয়ে উঠবে। সম্বল যতই কমে আসতে থাকে মানুষের আন্তরিক দুর্বলতা ততই ধরা পড়ে—ততই শৈথিল্য ঝগড়াঝাটি

পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি। ঔদার্য, ভরা উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু যেখানেই যথার্থ সিদ্ধির একটা চেহারা দেখতে পাই সেখানেই দেখা যায় সেটা কেবলমাত্র টাকা দিয়ে হাটে কেনবার নয়—দারিদ্র্যের জমিতেই সে সোনার ফসল ফলায়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় যে অক্লান্ত উদ্যম, সাহস, বুদ্ধিশক্তি, যে আত্মোৎসর্গ দেখলুম তার অতি অল্প পরিমাণ থাকলেও কৃতার্থ হতুম। আন্তরিক শক্তি ও অকৃত্রিম উৎসাহ যত কম থাকে টাকা খুঁজতে হয় ততই বেশি করে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এখানে আমার ছবির আদর অন্য জায়গার চেয়ে বেশি বই কম হয়নি। এদের গ্যালারির জন্যে চারখানা ছবি কিনবে বলে এরা যথেষ্ট চেষ্টা করচে—কিন্তু এদের অর্থাভাব প্রায় আমাদের বিশ্বভারতীরই মতো—তবু কোনোরকম করে জোগাড় করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ইতি ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

[ক্রমশ]

শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালা দেবী

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

॥ ৫ ॥

আগেই বলা হয়েছে, 'নবম খণ্ড চিঠি-পত্র' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ২৬৪ খানা চিঠি। এই চিঠিগুলির মর্মকথা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে। এ ছাড়া গ্রন্থখানিতে ছাপা হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত হেমন্তবালা দেবীর তিনখানা চিঠি, তাঁর লেখা 'রবীন্দ্রসমীক্ষা' এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'পরিচয় লাভ ও পত্রবিনিময়' প্রসঙ্গ। হেমন্তবালা দেবীর এই লেখাগুলো থেকে তাঁর সাবলীল রচনাশক্তি, গভীর চিন্তা ও জ্ঞান এবং অধ্যাত্মবোধের কিছুটা পরিচয় পাঠক পাবেন।

এ ছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের লেখা আরো চিঠি—হেমন্তবালা দেবীর ভ্রাতা বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীকে লেখা দুখানা, পুত্র বিমলাকান্তকে ১২ খানা, কন্যা বাসন্তী বাগচীকে ৩২ খানা, জামাতা ডাক্তার নিখিল-চন্দ্র বাগচীকে লেখা একখানা এবং নবজাত দৌহিত্র কিশোরকান্তের সঙ্গে পত্রালাপ। চিঠিগুলো পড়লেই বোঝা যায়, কি রকম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্বন্ধ তিনি এই পরিবারের সকলের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন। কন্যা বাসন্তীর বিবাহ উপলক্ষে একখানা কবিতা (পৃঃ ৪১১) লিখে কবিগুরু আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। দৌহিত্র শৈশবে খুব নাচানাচি করত বলে দিদিমা আদর করে তাকে ডাকতেন 'নাচনচন্দ্র' বলে। দিদিমা হেমন্তবালা দেবী নাচনচন্দ্রের জবানীতে একখানা চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, তার জবাবী চিঠিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন 'নাচনচন্দ্রের দাদু' বলে। নাচনচন্দ্রের জন্ম উপলক্ষেও কবিগুরু একখানা কবিতা (পৃঃ ৪২৪) লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং তার নামকরণ করেছিলেন 'কিশোরকান্ত'। এই নাম রাখার তাৎপর্য হিসাবে তিনি জানিয়েছিলেন যে, হেমন্তবালা দেবীর পিত্রালয়ে নামের সঙ্গে 'কিশোর' এবং শ্বশুরালয়ে 'কান্ত' যোগ করার রীতি প্রচলিত, এই দুইয়ের সংযোগেই তিনি 'কিশোরকান্ত' নামটি গঠন করেছেন। ব্যাখ্যাটা যুক্তিসহ সন্দেহ নেই, কিন্তু এই নাম রাখার পিছনে রবীন্দ্রনাথের মনে হেমন্তবালা দেবীর শিক্ষাগুরু 'কিশোরানন্দ'-র নামটাও উঁকি দিয়েছিল কি না কে জানে? হেমন্তবালা দেবীর নৈরাশ্যে-ঘেরা যৌবনের স্পর্শকাতর চিত্তে কিশোরানন্দ ঠাকুর এক আদর্শ পুরুষের মোহজাল বিস্তার করে গভীরভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং তাঁর স্মৃতি এক অক্ষয় সম্পদের মত হেমন্তবালা দেবী বহুদিন আঁকড়ে ধরেছিলেন। দৌহিত্র 'কিশোর-কান্ত' যাতে 'ঠাকুর কিশোরানন্দ'-কে তাঁর স্মরণে জাগরূক রাখতে পারে, এই গোপন ইচ্ছাও কি কবিগুরুর মনকে নাড়া দিয়েছিল?

হেমন্তবালা দেবীর কন্যা বাসন্তীকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনি একলা দেখা করতে গেলে অনেক সময় বলতেন, "তোমার ছেলেমেয়েকে এখানে আনো না কেন?......ওরা আমার স্বজাতি, সগোত্র, সমবয়সী। তারাও তরুণ-তরুণী, আমিও তরুণ। তুমি তো দাশু রায়ের সমবয়সিনী।" (পুরনো দিনের কথা) আচার-নিষ্ঠায় হেমন্তবালা দেবী ছিলেন প্রাচীন-পন্থী, সেই সম্পর্কেই ঠেস দিয়ে তিনি মন্তব্যটা করেছিলেন। একদিন কন্যাকে সঙ্গে নিয়েই হেমন্তবালা দেবী গেছেন দেখা করতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতে কন্যার আগ্রহ কম ছিল না, তখন তাঁর বয়স অল্প, তিনি ছিলেন স্বল্পভাষিণী, চুপচাপ প্রকৃতির। সেদিন কবিগুরুর টেবিলের উপরে ছিল একটা সুন্দর জাপানী খেলনা, সম্ভবত কারোর উপহার দেওয়া। খেলনাটি ছিল এত চমৎকার যে সহজেই ছোটদের মন কেড়ে নেয়। হয়ত তার দিকে বাসন্তীর ঘন ঘন লোভাতুর চাউনি রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বাসন্তীকে বললেন, তুমি যদি ইচ্ছে কর খেলনাটি নিয়ে যেতে পার। ইচ্ছে যে ষোল আনা ছিল তা বলা বাহুল্য, কিন্তু লাজুক মেয়েটি ভাবলেন, এ কেমনতর দেওয়া! দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে নিজে হাতে তুলে দিলেই তো পারেন, তিনি আবার চাইতে যাবেন কেন? মনের অদম্য লোভকে

[illegible] পড়ে রেখে তিনি সেদিন চলে এসেছিলেন। এই ঘটনাটি যৌবনপ্রান্তে এসে আজও শ্রীমতী বাসন্তী বাগচীর স্মৃতিতে জেগে আছে। রবীন্দ্রনাথ বাসন্তীকে শান্তি-নিকেতনে নিয়ে গিয়ে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাওয়া ছিল তাঁদের পক্ষে কতকটা অলীক স্বপ্নের মত। বাড়িতে শিক্ষয়িত্রীর কাছে কিছু লেখাপড়া, একটু গান, একটু সেলাই শিখে নিতে পারলেই কন্যাকে বিবাহযোগ্য মনে করা হত। তখন-কার দিনে প্রায় সর্বত্রই যখন স্ত্রী-শিক্ষার সমাদর বাড়ছে, তখন হেমন্তবালা দেবীদের বাড়িতে স্ত্রী-শিক্ষার তত উৎসাহ নেই জেনে তিনি বিস্ময় বোধ করতেন। কিন্তু শান্ত স্বল্পবাক মেয়েটি তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করেছিল, বিশেষত তার গানের নেশা ও চর্চা আছে জেনে। হেমন্তবালা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—"বর্ষামঙ্গল উৎসব চলছে। আগামী বৃহস্পতিবার দিন স্থির হয়েছে। খুকু (অর্থাৎ বাসন্তী) যদি আসতে পারত্ত নাচগানে নিশ্চয় খুশী হয়ে যেত।" (১৮১নং) শ্রীমতী বাসন্তী গুরু-দেবের নানা গানের স্বরলিপি ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুশী হয়ে জবাব দিতেন।

পুত্র বিমলাকান্ত ও কন্যা বাসন্তীকে লিখিত চিঠিপত্রের মধ্যেই তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনর্গল স্নেহের নিদর্শন রয়েছে। বিমলাকান্ত কিন্তু গুরুদেবের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে একবার শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন এবং সেতার বাজিয়ে তাঁকে শুনিয়েছিলেন। তাতে তিনি খুশী হয়ে তারিফ করেছিলেন।

কন্যা বাসন্তীর বিয়ে উপলক্ষে রবীন্দ্র-নাথ বিয়েবাড়িতে গিয়েছিলেন। বিয়ের দিন যেতে পারবেন না, অন্য কাজ রয়েছে বলে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন, গিয়েছিলেন বিয়ের আগের দিন। এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। সকলেই বলাবলি করেছিলেন যে তিনি কি আর সত্যিই আসবেন? যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিই ছিল উৎসবের সামিল, তাঁর পুণ্য পদধূলিতে পবিত্র হয়ে গেল বিয়ের অঙ্গন, যেন ভগবানের মঙ্গল আশীর্বাদ নিয়ে এলেন স্বয়ং দেবদূত—এই রকম এক স্বর্গীয় সমারোহের ছোঁয়াচ লেগেছিল বিয়েবাড়িতে বলে সকলেরই সেদিন মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ দায়-সারা লৌকিকতার কর্তব্য সমাধা করে যে সেদিন সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছিলেন তা নয়। কিন্তু সেদিন মহা অপ্রস্তুতে পড়েছিলেন সকলে।

"বিবাহের তিন দিন আগে আমরা 'কমলচন্দ্রের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে এলাম, গোছগাছ কিছুই হয়নি, বিয়ের আগের দিন দুপুরে কতক জায়গায় নিমন্ত্রণ শেষ করে বাড়ি ফিরে স্নানের উদ্যোগ করছি, বাড়ির কর্তা এবং পুত্র বাজার করতে গেছেন। অন্য পুরুষরাও কেউ নেই, ঘরদোর অপরিষ্কার, অতিথি অভ্যাগতদের বসবার জায়গাও করে রাখা হয়নি, হঠাৎ শুনলাম কবি এসেছেন। তাড়াতাড়ি এসে দেখি আমাদের আত্মীয় টেনুবাবু স্থানাভাবে কবিকে যে ঘরে এনে বসিয়েছেন সেখানে এক ইঞ্চি পুরো ধুলো; বড় বড় অজগরের মত গালচেগুলো এক পাশে গুটোনো পড়ে আছে। আসনাভাবে বিবাহের যৌতুকের জন্য আনা একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসিয়েছেন এবং সম্মুখে বিবাহেরই যৌতুকের টেবিল একটি; কোথা থেকে একটি ফুলের তোড়া এনে

ফুলদানীতে করে সেই টেবিলে এনে বসিয়ে দিয়েছেন। লজ্জায় ভয়ে সম্ভ্রমে এবং আনন্দে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। একটি গোলাপ নিয়ে পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে নিজেদের ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে যেতেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তিনি ত আর পর নন, আমাদের ঘরের লোক, তাতে কী হয়েছে ইত্যাদি। তারপর আমার ভ্রাতৃবধূ ইন্দিরা এসে দাঁড়াতেই তাকে বললেন, দেখ তোমার দিদিমণিকে কিছু বলব না, কেননা উনি সংসার দেখেন না, কিন্তু তোমাকে বলব। ছি, ছি, ছি, তোমার ভাগ্নীর বিয়ে, তুমি বাড়ির গিন্নি, অথচ একখানা ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখোনি। আমি ত তোমাদের ঘরের লোক, কিন্তু যদি আজ আমি না এসে বরের বাবা আসতেন তা হলে কী হত বল দেখি! ইন্দিরা হাসতে লাগলেন। এমন সময় টেনুবাবু কবির হস্তাক্ষরে লাল কালিতে মুদ্রিত তাঁরই লেখা আশীর্বাণী এক কপি তাঁর হাতে দিলেন। তিনি 'দেখি দেখি, এ বুঝি বিয়ের কবিতা ছাপা হয়েছে, কে লিখেছে, কেমন লিখেছে' বলে যেন কিছুই জানেন না এমনি আগ্রহ করে আবৃত্তি করে খানিকটা পড়লেন, তারপর বললেন, বেশ লিখেছে ত, লিখতে জানে লোকটা, কী গো কী বলো, তোমার কী মত? বলে বাসন্তীর দিকে তাকালেন, সে সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এখানা তাঁকে একেবারে দান করা হয়েছে তো, তিনি রাখতে পারেন? জিজ্ঞাসা করে নিয়ে পকেটে পুরলেন। তারপর বললেন, তাঁর পিপাসা বোধ হচ্ছে, একটু পানীয় জল চাই। তখনো ঝি আসে নি, কলতলায় এঁটো বাসন এক ডাঁই পড়ে রয়েছে, একটি গেলাস নেই বাড়তি। মহা মুশকিল। বহুক্ষণ সময় নষ্ট করে টেনুবাবু কোথা থেকে একটা কাঁচের গেলাস এনে ধুয়ে তাতে জল ভরে আনলেন। এখন শুধু জল কী করে দেওয়া যায়? তখন কী বা যোগাড় করা যেতে পারে! সেইদিনই আমার বাবার মাসীমা বাসন্তীকে 'আইবুড়ো ভাত' দিয়েছিলেন। একটা কাঁসার থালায় সাজানাই ছিল চারদিকে কমলালেবু কয়েকটা আর মাঝখানে কিছু সন্দেশ। থালাটি ধরে ঐ টেবিলের উপরে দেওয়া গেল। অসময়ে এত কী করে খাবেন তিনি, খেলে অসুখ করবে, বুড়ো মানুষ বলে কি করুণা হয় না?" (পুরনো দিনের কথা)

সঙ্গে নিয়ে যান তবে, বলে "একটা মোরাদাবাদী মীনে-করা ঢাকনাযুক্ত বাটিতে কয়েকটি সন্দেশ ভরে দেওয়া হল। এক পকেটে পুরলেন বাটি, আর ছয়টি কমলালেবু আর এক পকেটে। এখন জল খাবেন কী উপায়ে?" (পুরনো দিনের কথা) কেন না, চুমুক দিয়ে জল খেলে ত ঘর অশুচি হয়ে যাবে—তিনি ব্রাত্য, পতিত, সমাজচ্যুত। যতোই তাঁকে আশ্বস্ত করা হয় যে, অন্দর মহলে আচার নিষ্ঠা আছে ঠিকই, বার মহলে শুচিবাইর কোনো বালাই নেই, ততোই যেন তিনি না শোনার ভাণ করে বাদানুবাদ করতে থাকেন। জল যদিবা খেলেন, এঁটো গেলাস রাখবেন কোথায়, সেও এক বিপত্তি, যেখানে রাখবেন সেখানটাই যে অশুচি হয়ে যাবে—ইত্যাদি রহস্য করে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই তাঁর "মনে পড়ল, গাড়িতে ওঁর সঙ্গী ডঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন আছেন, তাঁকে একটু মিষ্টিমুখ করানো দরকার। যেন তাঁর নিজেরই বাড়িতে তাঁর অতিথি, এইভাবে বাজার থেকে কী আনাতে হবে তাও বলে দিলেন টেনুবাবুকে। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, পয়সা আছে ত? কিন্তু না থাকলেই বা কী, তাঁর নিজের পকেটেও ত পয়সা নেই যে ধার দেবেন। তখন কাছাকাছি জানাশোনা দোকান থেকে আনতে পরামর্শ দিলেন। এই সমস্ত পরামর্শ দিয়ে আবার মনে পড়ল, গাড়ির ড্রাইভারও ত আছে। টেনুবাবু ওঁকে চিন্তিত হতে নিষেধ করে দ্রুত দোকানে

গেলেন।" সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর "বাসন্তীর হাতে একটি গোলাপফুল দিয়ে কবি বিদায় নিলেন।" (পুরনো দিনের কথা) এইভাবে ঘরোয়া আবহাওয়ার সৃষ্টি করে একেবারে আপনজনের মত বেশ খানিকক্ষণ বসে সরস বাক্যালাপে সকলকে স্নিগ্ধ করে তিনি বিয়ে বাড়িতে শুধু যোগ দেন নি, শুভ উৎসবে এক অপূর্ব সুরের রেশ ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। পরে একখানা মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি পাঠিয়েছিলেন লোক মারফৎ কন্যা বাসন্তীর বিয়েতে।

একদিন হেমন্তবালা দেবী রাত্রে দেখা করতে গেছেন জোড়াসাঁকোতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসো না কেন? তারা আমার দলের লোক, আমার ভক্ত। "তারা এখানে এলে আমার সংগে বোধ হয় খাবে, তা ত তাদের বোধ হয় জাত যাবে না। তুমি কী করে আসো এখানে? এই যা দেখছ, এই সব এ'টো, বাড়ি গিয়ে এত রাত্তিরে আবার স্নান করবে তো?...আমি ক্লিষ্ট হয়ে বলি, দেখুন, ও রকম করে বলাটা কি আপনার উচিত? আমি গাড়িতে চড়লেই কাপড় ছাড়ি বা দিনের বেলায় হলেও স্নান করি। আমার বাবার ওখানে গেলেও ও রকম করি। গাড়ির কাপড় থাকি না আমরা। আমাদের যেটা নিয়ম, তার উপরে অমন করে বলাটা কি আপনার উচিত?" (পুরনো দিনের কথা) এসব কথা রবীন্দ্রনাথ বলতেন তাঁকে আঘাত দেওয়ার জন্যে নয়, তাঁর সংস্কারকে ঘা দিয়ে তাঁর মনকে সংস্কারমুক্ত সহজ বুদ্ধিবৃত্তির পথে চালিত করার অভিপ্রায়ে।

সত্যপীরের পাঁচালি, লক্ষ্মীর পাঁচালি ও শনিঠাকুরের পাঁচালির কথা, আমরা শুনেছি, কিন্তু হেমন্তবালা দেবীর অশিক্ষিতা পরিচারিকা নলিনী দাসীর মুখে আমরা প্রথম শুনলাম 'রবি' ঠাকুরের পাঁচালি'র কথা, রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনলাম একদিন তার প্রতিধ্বনি। বাসন্তী বাগচীকে একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"এখানে এসে চুপচাপ আছি—রবিঠাকুরের পাঁচালি একদম বন্ধ।" (৮নং)

নলিনী দাসী হেমন্তবালা দেবীকে একদিন বলল, "হ্যা গো বউমা, তুমি ত চিৎপুরে কাদের বাড়িতে যাও, আমরা যে রবিঠাকুরের পাঁচালি শুনেছি, ঐ যিনি পাঁচালি বাঁধেন, সেই রবি ঠাকুরের কাছে যাও কি?' পাঁচালি! রবিঠাকুর আবার পাঁচালি বাঁধলেন কবে?—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তুমি শোনোনি বুঝি? আমরা অনেক শুনেছি।' একবার জোড়াসাঁকোতে গিয়ে ঐ পাঁচালির কথা বললাম। খুব হাসলেন রবি ঠাকুর, একদিন নলিনীকে সংগে করে নিয়ে আসতে বললেন। একদিন নিয়ে গেলাম ওকে, পাঁচালিকার রবিঠাকুরকে দেখাতে। ও প্রণাম করে মাথায় ঘোমটা টেনে জড়োসড়ো হয়ে একপাশে বসল। তিনি প্রশ্ন করলেন—'কী গো, রবিঠাকুরের পাঁচালি শুনতে খুব ভালোবাসো বুঝি?' নলিনী আর লজ্জায় কথা কয় না। বাড়িতে এসে আমাকে বলল, 'হ্যা গা বৌমা, তুমি সেই কথা ও'কে বলে দিয়েছ বুঝি? মা গো, কী লজ্জার কথা!" (পুরনো দিনের কথা)।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সনাতনী আচারনিষ্ঠা নিয়ে হেমন্তবালা দেবীকে কখনো কখনো খোঁচা দিয়ে কথা বলতেন, তিনিও সুযোগ পেলে পাল্টা কথা শোনাতে ছাড়তেন না, তখন তাঁর মনেই থাকত না যে, কাকে তিনি কী বলছেন—যেন কথা কাটাকাটি চলত সমানে সমানে। উভয়ের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পর্ক ও পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথই নিজগুণে। একদিন হেমন্তবালা দেবী বলেছিলেন—"আপনি যে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার নিন্দে করেন, একদিন ঐ পঞ্জিকায় আপনারও নাম উঠবে। আপনি যেসব নতুন নতুন উৎসব করছেন, সেগুলোও ঐ পঞ্জিকাতেই উঠে পড়বে। তা [illegible] হল, আমাদের কিছু নতুন জিনিস লাভ হল। আমাদের যা আছে তা ত থাকবেই, আরো নতুন জিনিসকে পেয়ে যাব আমরাই।" (পুরনো দিনের কথা)

আর একদিন "এক তর্কের মুখে আমরা বলেছিলাম, আমরা শ্রীকৃষ্ণ পুজো করি বলে তার সমালোচনা করেন, কিন্তু ধরুন যদি একশো বছর পরে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব থাকে, আর তারা যদি আপনাকে সূর্যের বা ইন্দ্রের অবতার ভেবে নিয়ে পুজো করে, তা হলে আপনি কী করবেন? তিনি কণ্ঠে একটু উত্তেজনা এনে বললেন, আমি ভূত হয়ে তার ঘাড় ভাঙবো। আমি রাগ করে বললাম—আপনার কপালে তাই আছে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তাই হবে। হবে কী, এখনি ত হচ্ছে। আপনি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখুন না, সব

উন্নত হয়ে চলুন
এলপার স্যুটিং-এ
এই স্যুটিং আত্মবিশ্বাস যোগায় সেই সব পুরুষদের —
যাঁরা জানেন কোথায় পৌঁছতে হবে, কেমন করে।
এলপারের ভাণ্ডারে আছে এঁদের স্টাইলের সঙ্গে তাল
রেখে সব রকমের স্যুটিং।
একেবারে পুরুষদের উপযোগী বুনটে
তৈরী। রঙে আর প্যাটার্নে অভিনব।
এছাড়া আছে বহু রকমারি উৎকৃষ্ট শার্টিং
শাড়ী আর জামার কাপড়।
যে কোন নামকরা স্টোরে পাবেন।
এলপারের অনন্য নিবেদন—
দাম ফেরত দেবার গ্যারান্টী,
যা শুধু এলপারই দেয়।
প্যারাগন
ELPAR
এলপার স্যুটিং
বিশ্বাসের
প্রতীক
রিটেল শপ:
জে. এস. মহম্মদআলী,
টাওয়ার হাউস, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা ১
everest/150/PTM-bn

ঘরে আপনার ছবি ঝুলেছে, আর তার গলায় ফুলের মালা দেওয়া হচ্ছে। অত কেন, এই যে সেদিন 'প্রবাসী'তে দেখলাম, ক্ষিতিমোহনবাবু বেদমন্ত্র পড়ে আপনার পুজো করছেন। পাদ্য, অর্ঘ্য, আরো কত কী! এসব কী? তখন ত দিব্যি সহ্য ক'রে যান আপনি, যত দোষ শ্রীকৃষ্ণের বেলায়? কবি বললেন, আরে, আমি ত বারণ করি, ওরা শোনে না যে! আমি বললাম, শুনবেন কেন, মানুষের স্বভাব, সে পুজো না করে থাকতে পারে না। আর মানুষ মানুষকেই পুজো করতে চায়। নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষকে কল্পনা করেই হোক আর যা করেই হোক সে ভক্তি শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারে না। আপনি যে বলেন পরিচিত বন্ধু হলে দোষ নেই, অপরিচিত বা কাল্পিত হলেই দোষ: তা একশো বছর পরে আপনিও ত পরিচিত থাকবেন না। এখন যেমন হচ্ছে, তখনও সেই রকমই হবে। এখন আমাদের চোখের সামনেই কেউ আপনার কথা শুনছেন না, তখন আরো ত কেউ শুনবেন না। আপনি বারণ করলে কী হবে, মানুষের এই স্বভাব।" (পুরনো দিনের কথা)।

একবার বিশ্বভারতীর জন্য চাঁদা তোলা হচ্ছিল, তখন হেমন্তবালা দেবী ঐ বাবতে কুড়িটি টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা না নিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, স্ত্রীলোক সেবা করবে সে অধিকার তার আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের দান নেওয়া পুরুষের পক্ষে অগৌরবের। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বা 'বিজয়া'র সর্ববিদিত কাহিনীটি শুনিয়ে তিনি বলেছিলেন, সেই মহিলা বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে দু লক্ষ টাকা দান করতে উৎসুক ছিলেন কিন্তু একই কারণে কবিগুরু তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

"আর একদিন গেছি সন্ধ্যার পরে। বললেন, তুমি এখনো বেঁচে আছ? এখনো মরোনি? যমে তোমাকে ছোঁয়নি, ছুঁতে বুঝি ঘেন্না করে! আমি বললাম, বাঃ, আপনি বেশ লোক ত, এমনি করে বুঝি মানুষকে অভ্যর্থনা করে? আপনার জীবনচরিতে এটা লিখতে হবে। তিনি বললেন, বলেছি কি আর তোমাকে, বলছি 'তোমাদের'—তোমরা সনাতনীরা এখনো বেঁচে আছ? আমার এত লেখালেখির পরও তোমরা মরলে না। আমি বললাম, মরব কেন? মুসলমান, ইংরেজ আমাদের মারতে পারেনি, এখন মরব কী?" (পুরনো দিনের কথা)

এইভাবে বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক চলত উভয়ের মধ্যে, কিন্তু তিক্ততার নামগন্ধ থাকত না তাতে, ছিল একদিকে অনাবিল স্নেহপ্রীতি, অন্যদিকে অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা। হেমন্তবালা দেবী ভাবেন,—"তিনি যার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে এসেছেন, বোধ হয় আমি মূর্তিমতী তাই। কিন্তু কেমন করে এই বিবদমান পক্ষদ্বয় একত্রে বসে স্নিগ্ধ হৃদ্যতা আস্বাদন করতে পারে এইটাই আশ্চর্য ছিল। কিন্তু এই অসম্ভবই ত সেদিন সম্ভব হয়েছিল। তাঁর মত একজন মহামনীষী, যিনি স্বভাবতই সরল, সুন্দর, স্নিগ্ধচরিত্র, বিশ্বপ্রেমিক, নিরভিমানস্বভাব, তিনি ত কখনোই কৃত্রিম সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য একটা বহুমূল্য সময় অপব্যয় করতে পারেন না। এখানেই তাঁর উদারতা, মহত্ত্ব, সমবেদনা, করুণা প্রভৃতি বৃহৎ পর্যায়ের সদ্গুণের সঙ্গে আরো একটু বিশেষ প্রকারের সংপ্রবৃত্তি অনুভব করেছি, তাকে বিশুদ্ধ স্নেহ ব্যতীত অন্য কিছুই বলা যায় না। সেই জন্যই সাশ্রুনেত্রে বসে বসে ভাবি যে আমি কি সেই স্নেহ পাবার যোগ্য ছিলাম?" (পুরনো দিনের কথা)

যথার্থই তিনি রবীন্দ্রনাথের অবিমিশ্র স্নেহ আকর্ষণ করেছিলেন এবং সেই স্নেহ অবিরল ধারায় নিরত ছিল তাঁর জীবনে। একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"তোমার পরে কত গভীর আমার স্নেহ এবং করুণা তা তুমি হয়ত উপলব্ধি করতে পার না।" (১৭৪ নং) নির্মল স্নেহ নির্বিচারে নিম্নগামী হয়ে থাকে এবং তা কখনো অপ্রকাশ থাকে না। পত্রগুচ্ছের মধ্যে কত সান্ত্বনা এবং জীবনে পথ-চলার পাথেয় তিনি দিয়েছেন দুঃখে যাতনায় বিভ্রান্ত এই নারীকে। এ ছাড়া স্নেহের আশীর্বাদী জিনিসও তিনি কম দেননি। উৎকৃষ্ট গরদের শাড়ি, চামড়ার পোর্টফোলিয়ো, টেবিলক্লথ সর্বদা পরার জন্য শ্রীনিকেতনের তাঁতের আটপৌরে শাড়ি অনেক সময় জোড়ায় জোড়ায় পাঠিয়েছেন হেমন্তবালা দেবীকে, তখন ঐ শাড়িই ছিল তাঁর প্রধান পরিধেয়। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত তাঁর কত বই যখন তখন পাঠিয়েছেন হেমন্তবালা দেবীর পড়ার জন্যে, কখনো পাঠিয়েছেন সাহায্যবাবত আশীর্বাদী টাকা। তা ছাড়া হেমন্তবালা দেবী ও তাঁর পুত্র কন্যাদের দিয়েছিলেন নিজের ব্যবহৃত কলম, পাঞ্জাবি ও জোব্বা, সেগুলো পুত্র কন্যার সংগ্রহে এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁর আঁকা একখানা ছবি বিমলাকান্ত গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের প্রদর্শনী থেকে কিনে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে স্বাক্ষরিত করে নিয়েছিলেন, কবিগুরু তখন মুকুল দে-র বাড়িতেই চৌরঙ্গীতে ছিলেন। ছবির নীচে সই করতে করতে বিমলাকান্তকে তিনি বললেন, বেছে বেছে এই ছবিটাই তুমি পছন্দ করলে? বিমলাকান্ত বললেন, কী করব। মুকুলবাবু এই ছবিখানাই দেড় শো টাকাতে আমাকে জোর করে গছিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটু রাগ করে বললেন, তুমি টাকা দিয়ে ছবি কিনতে গেলে কেন? আমার কাছে এসে চাইলেই ত পারতে। বিমলাকান্ত জানালেন, ছবি না কিনে আপনার কাছে আসতেই দিচ্ছিলেন না যে। শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, দ্যাখো ত কান্ড!

আচ্ছা সাইলকের পাতায় তুমি পড়েছিলে দেখছি।

একবার হেমন্তবালা দেবীর জন্মদিনে একটি বড় কবিতা (৯২০ ও ৯২১ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী দুই পৃষ্ঠাব্যাপী) লিখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। তার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

মনের যে ক্ষুধা চাহে ভাষা,
সঙ্গের যে ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে
কার আশা,
যে ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাগি
অন্তরে গোপনে রয় জাগি'
সবে তারা মিলি নিতি নিতি
নানা আকর্ষণবেগে গড়ি তোলে
মানস-আকৃতি।
কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা,
কত অভিলাষ,
কত না সংশয়তর্ক, কত না বিশ্বাস
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—
মন-গড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিন ভেঙে করে ঢেলা ইত্যাদি

কবিতাখানি সম্পর্কে হেমন্তবালা দেবী তাঁর মনোভাব সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন এই মর্মে—"আমি নূতন বিস্ময়ে অধীর হই।...আমার জীবনের একখানি ফোটো-চিত্র ঐ কবিতায় তোলা আছে।... কবিগুরু কি করে অন্তর্যামীরূপে অত কথা লিখলেন তাই ভাবি।" (পৃঃ ৪৭৮)

এই কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক বাদ দিয়ে 'অপূর্ণ' নাম দিয়ে পরে উহা 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বরাবর স্নেহের প্রশ্রয় দিয়ে তাঁর কাছে হেমন্তবালা দেবীর যাতায়াত ও আলাপ আলোচনাকে নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক করে রেখেছিলেন। "একদিন কিন্তু সত্যি সত্যিই রাগ করেছিলেন, তাঁর কালো মলাটের কবিতার খাতাটা অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে খুলে দেখেছি বলে। কিছু পড়িনি কিন্তু। সেদিন খুবই অন্যায় হয়েছিল, ক্ষমা চেয়েছিলাম। প্রথমে বলেছিলাম, দেখলে দোষ কী, এত আমাদের জন্যেই লেখা। যখন বললেন, ছাপা হয়ে প্রকাশ পাবার আগে এতে আমাদের কোনো অধিকার নেই। হয়ত কিছু বদলও করতে পারেন। সে কথাটা মেনে নিতে হল।

"আর একদিন। 'তোমার কেমন স্বভাব, খবর না দিয়ে ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে এটা সেটা নাড়াচাড়া করা?' বললাম কবে আবার আমি কোন্ ভদ্রলোকের বাড়িতে ঢুকে কী নাড়াচাড়া করতে গেছি। 'কেন, আমাকে কি তুমি ভদ্রলোক বলে বিশ্বাস কর না?' —'ও, তাই।'

'কেন, আমাকে কি তোমার ভদ্রলোক বলে মনে হয় না?'

'তা, আপনার বাড়িতে আসতে আবার অনুমতি নিয়ে আসতে হবে নাকি?' সেদিন এই নিয়ে তর্ক। আমারই কালো লেখা, তাকে না দেওয়া একখানি কার্ড হস্তগত করে নিলাম। আর, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে কি আছে, খুঁজছিলাম।

আর—একদিন বাসন্তী রঙের কাজ, মহাত্মাজীর আঁকা স্কেচগুলি দেখতে গিয়ে ঈষৎ ধমক খেয়েছিলুম, অল্প বয়সে।" (স্মৃতিকথা ৪)

স্বাভাবিক প্রকৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্থিতধী, প্রশান্তমূর্তি ও প্রসন্নচিত্ত, কিন্তু কখনো সখনো তাঁকে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতে দেখার অভিজ্ঞতাও ঘটেছে অনেকের। তখন সেই অগ্নিশর্মার অগ্নিস্রাবী কথার তোড়ের মুখে দাঁড়ানো ছিল এক বিষম পরীক্ষার ব্যাপার। মহৎ ব্যক্তিদের ক্রোধ যে ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রতীক। দপ করে যেমন রেগে জ্বলে উঠতেন, তেমনি আবার দপ করে নিবে যেতেও সময় লাগত না, যদি বুঝতে পারতেন যে, রাগ করাটা ঠিক হয়নি। এসব কাণ্ডকারখানাটা তিনি করতেন যাঁদের মনে করতেন অন্তরঙ্গ বা খানিকটা আপনজন তাদের সঙ্গেই, অন্যদের সঙ্গে নয়। অনেক সময় সন্দেহ হত, তাঁর এই ধরনের উষ্মা প্রকাশ কতটা আন্তরিক আর কতটাই বা ভান—আসলে উদ্দিষ্ট জনকে ধাক্কা দিয়ে সচেতন করে দিয়ে মনের মত করে গড়ে তোলাটাই তাঁর যথার্থ অভিপ্রায় থাকত কিনা কে জানে। যাই হোক হেমন্তবালা দেবীর জীবনেও একবার ঘটেছিল এই ধরনের এক অভিজ্ঞতা।

সেবার রবীন্দ্রনাথ এসে উঠেছেন বরানগরে। জোড়াসাঁকোতে এলে হেমন্তবালা দেবীর পক্ষে দর্শন লাভ করা সহজ হত। বরানগর যে অনেক দূরে, অত দূরে তিনি একা যাবেন কী করে—সে সময় তাঁর সঙ্গী হিসাবে সাধারণত আর কেউ থাকতেন না, তিনি একলাই জোড়াসাঁকোতে যাতায়াত করতেন। এসব দুঃখ জানিয়ে তিনি কবিগুরুকে একখানা চিঠি লিখলেন, সাড়া পেলেন সঙ্গে সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ একটা দিন নির্দিষ্ট করে তাঁকে খবর দিলেন যে, অমুক দিনে তিনি দুপুরবেলা জোড়া-

শাঁকোতে গিয়ে হেমন্তবালা দেবীর জন্য চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। অর্থাৎ, দুটো আড়াইটে নাগাদ যেন তিনি জোড়াসাঁকোতে আসেন, তা হলে কবিগুরুকে পাবেন খানিকক্ষণের জন্য। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন হেমন্তবালা দেবীর কাতর অনুনয়ে।

অন্য সব কাজকর্ম রেখে কথা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কর ছন জোড়াসাঁকোতে। এদিকে দুটো বাজল, তিনটে বাজল, চারটেও বেজে গেল, হেমন্তবালা দেবীর দেখা নেই। তিনি যখন এসে পৌঁছলেন তখন চার.ট পার হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে প্রণাম করতে না করতেই অভ্যর্থনা পেলেন তীক্ষ্ম বাক্যবাণের আঘাতের পর আঘাতে। বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের সে এক রুদ্র রূপ—কথার ছেদ নেই, বিরাম নেই, দাঁড়ি কমা সেমিকোলোনের বালাই নেই, একটানা চলছে ত চলছেই বাগ্বক্রোক্তি! তোমার কী, তোমার ত কোনো কাজকর্মের বালাই নেই! অখণ্ড অবসর! দুটো ঘণ্টা নষ্ট হল! কত ক্ষতি হল কাজের! তুমি তার কী বুঝবে! কাজের লোক হলে বুঝতে। সে জ্ঞানগম্যি কি আর আছে তোমার? ইত্যাদি ইত্যাদি। হেমন্তবালা দেবী একেবারে নির্বাক—"আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে অবাক হয়ে চে য দেখছি তাঁর পীতোত্তরীয়ভূষিত রেশমী রুপোলী চুলদাড়িশোভিত দেবোপম মূর্তি। কথাগুলো কানেও যাচ্ছে না। হঠাৎ এক সময় তিনি লক্ষ্য কর লন, যার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা, সে ওদিকে কর্ণপাতও করছে না, কথাগুলো নিতান্তই মাঠে-মারা যাচ্ছে। কী গো, কী হল তোমার? চুপ করে রয়েছ যে!" (পুরনো দিনের কথা) হেমন্তবালা দেবী শান্তভা.ব বললেন, ডাক্তার আপনাকে বিশ্রাম নিতে বলেন, কিন্তু আপনার কাজের আর শেষ হয় না। হলোই বা আমার কোনো কার.ণ দেরি। আপনাকে তো আজ দু ঘণ্টা বিশ্রাম করবার সুযোগ দিয়েছি, সেটা কি ভালো করিনি? মুলতুবি কাজ তো আর পড়ে থাক.ব না, সেগুলো এক সময় সেরে তুলতেই হবে। কিন্তু আমি বলি, তবু তো একটু জিরিয়ে নেওয়া হল। এত কটূক্তি শোনার পরও হেমন্তবালা দেবীর নির্বিকার ভাব দেখে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ হল, সঙ্গত কারণ একটা ঘটেছিল নিশ্চয়। ততক্ষণে তাঁর রাগ জল হয়ে গে.ছ। তখন জানা গেল আসল ব্যাপার।

সময় মত "আমি যাবার আয়োজন করছি, এমন সময় পিস্‌শাশুড়ি হরকুমারী দেবী বাধা দিলেন। আমার জীবনে ঘড়ির কোন স্থান নেই এবং স্নানাহারের সুনির্দিষ্ট সময় আমি সর্বদাই লঙ্ঘন ক.র থাকি। আমার ইচ্ছা ছিল বেলা দুটোয় যাবার জন্যে প্রস্তুত হব এবং সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসে স্নানাহারের ব্যবস্থা করব। পিসিমা কিছুতেই শুনলেন না। তাঁর কথা মত স্নান জপ সেরে খেয়ে যেতে হবে, এই তাঁর জেদ। অগত্যা তাঁর সঙ্গে আপস হল এই যে, আমি কিছু ফলটল খেয়ে যাব। এই সব গোলমালে বেলা চার.ট বেজে গেল।... সব শুনে (রবীন্দ্রনাথ) বললেন, 'তবু তো কিছু খাওয়া হয়েছে, এটা মন্দের ভালো এবং এর জন্য পিসিমাকে ধন্যবাদই দেওয়া যে.ত পারে।" (পুরনো দিনের কথা)

"একদিন একখানা ফোটো চেয়েছিলাম, দিলেন না। 'তোমাকে কেন দেব, যারা আমার ভক্ত, আমার আপন লোক, তাদের ত দিয়েছি।' বাসন্তীকে কাচকে দিয়েছেন। বললাম, না দিলেন ত না-ই দিলেন, আমার কি আর বন্ধুবান্ধব নেই? তারাই আমাকে দিয়েছে। আমার প্রতিবেশিনী শ্রীমতী ছবির স্বামী ও দেওর আমাকে কেমন সুন্দর একখানা ছবি দিয়েছে। ছবিটির বিবরণ শুনতে চাইলেন। বর্ণনা দিলাম। একটা উঠোনে চেয়ারে বসে আ.ছন, গলায় অনেকগুলি বেলফুলের মালা, হাতে একগোছা পদ্ম ফুল। ধুতি জামা পরা, পায়ে জুতো মোজা। 'সে কি গো, আমি কি বিয়ে করতে যাচ্ছি?' —বি য় করতে যাচ্ছেন কি না তা আপনিই জানেন, আমি পেয়েছি, তাই বলছি। কিছুতেই স্বীকার কর.তে চান না অত সাজগোজের কথা। —বাঃ, আমার কাছে আছে যে। আঁকা ত নয়, রীতিমত ফোটোগ্রাফ! জোর করে বলাতে অগত্যা স্বীকার করতেই হল। সে ছবি একজন চেয়ে নিয়েছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে। এখন কোথায় আছে তা জানি না।" (স্মৃতি কথা-৪)

জোড়াসাঁকোতে "একদিন গিয়ে দেখি, লাল বেনারসী জরিদার চেলীর জোব্বা পরে বসে আছেন। নাতনী গুই সম্পর্কে পরিহাসটা ঠোঁটের আগায় না এসে পারে না। বেশ বর সেজে বসে আছেন, কনে কোথায়? বিয়ে কখন ইত্যাদি। উত্তরে একটু অপ্রস্তুত ভাব, ও'র বেশভূষা নির্বাচনের ভার বধূমাতা প্রতিমা দেবীর উপর, ও'র কোনো হাত নেই। কিন্তু চোখ দুটির ভাষা মুখের ভাষার সঙ্গে মেলে না। আপাতদৃষ্টে বার্ধক্যকে সে হার মানিয়ে দেয়। তখন যারা পরিহাস করতে আসে, তাদেরই পরাজয় মানতে হয়।" (পুরনো দিনের কথা)

দশ বছরের যোগাযোগ। কত ঘটনা, কত কথা, কত তার স্মৃতি! সব কি আর মনে আসে সব সময়? হেমন্তবালা দেবীর দিনলিপি লিখে রাখার অভ্যাস ছিল না, গোড়ার দিকে লিখে রাখা নিরাপদও মনে করেননি। "অনেক কথাই বলবার আছে, কিন্তু লিখতে গেলেই সংকোচ বোধ হয়। প্রথমত কী রকম ভাষায় কী রকমভাবে তাঁর কথা লিখব। দ্বিতীয়ত সব কথা ত মনে পড়ছে না। কী জানি, নিজের অজ্ঞাতসারে ভুলত্রুটি হয়ে যায় যদি, তাঁর কথা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই তো লেখা উচিত। আমি এতদিন লিখতে সাহস করিনি। এখন আমারও বিদায়বেলা আসন্ন, তাই কিছু কিছু লিখে রেখে যাচ্ছি আমার কয়েকজন পরম সুহৃদের অনুরোধে। এ লেখার ভুলত্রুটির জন্য আগে থেকেই মার্জনা চেয়ে রাখছি সকলের কাছে।...ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে নিজের কথাই এসে পড়ে। হয়ত সেটা আসা উচিত নয়। কিন্তু নিজের কথা বাদ দিলে তাঁকে আমি

আমি ত তাঁর কাছে থাকতাম না, তাঁকে ভালো করে জানতামও না। আমি জানে ভুলে হয়ত বৎসরে দুই একদিন তাঁর দর্শন লাভ করেছি।" (স্মৃতিকথা—১)

হেমন্তবালা দেবীর সব কথা জেনে নিলেও একথা অবশ্যই সকলে স্বীকার করবেন যে, তাঁর কাছ থেকে এবং তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকপাতে রবীন্দ্রনাথের যে একটি বিশেষ পরিচয় আমরা জানতে পারছি, সেজন্য তিনি চিরদিনই রবীন্দ্রানুরাগীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

একবার একটি ঘটনাতে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীর উপরে আন্তরিক রুষ্ট হয়েছিলেন, দুঃখিতও হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিতে হবে—

"তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। [সজনীকান্তর] সঙ্গে তোমাদের আলাপ পরিচয় হওয়াতে আমি লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইনি। যে ঘটনাতে আমাকে হঠাৎ বিস্মিত করেচে সেটা এই—আমি কোনো কোনো লোকের চিঠিতে এই প্রশ্ন পেলুম যে [সজনীকান্তকে] আমি আমার একখানি বহির্বাস ও কলম উপহার দিয়েছি একথা সত্য কিনা? অন্তত সে এই কথা অনেককে বলেচে ও জিনিসগুলো প্রমাণ স্বরূপ দেখিয়েছে। শুনে ভাবলুম সেই জিনিসগুলো অনাদরে তুমি তাকে দান করেচ এবং এই রকম গুজব রটাবার অবকাশ দিয়েচ। [সজনীকান্তকে] কলম প্রভৃতি দান করা আমার দ্বারা অসম্ভব হোত না, চাইলেই আমি নিঃসঙ্কোচে দিতে পারতুম। কিন্তু কথাটা অসত্য—এবং তুমি যে আমার কোনো দান তার কাছে ফেলে রাখবে এইটেই আমার কাছে অসংগত লেগেছিল।" (১১৪নং)

এই সম্পর্কে ৬-১-৩৯ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-এর একখানা চিঠির অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে। "...আপনার কাছে আমার আর একটা আবদার আছে। এবার গিয়ে ব্যবহার করা কোন জিনিস আমি আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব। সজনীর কাছে আপনার একটা জামা আর একজোড়া জুতো আছে। সে কি করে জোগাড় করেছে জানি না। ওই বা কেন জিতে থাকবে! আমিও অমনি একটা কিছু চাই, তা সে যত তুচ্ছ হোক না কেন—সেটা বিশেষভাবে আমারই থাকবে আর কারোর নয়।" (দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২)

বর্তমান মুদ্রিত চিঠিতে অংশ সজনীকান্তর নাম বর্জিত রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়টির তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে হলে তাঁর নাম ও সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা এখন প্রকাশ করার স্বাধীনতা সত্যের খাতিরে নেওয়া অসংগত হবে না বলেই মনে করলাম।

ঐ সময়ে সজনীকান্ত তাঁর 'শনিবারের চিঠি'-তে নির্বিচারে রবীন্দ্রনাথের নামে কুৎসা রটনাতে পঞ্চমুখ ছিলেন, একথা কারো অজানা নেই। হেমন্তবালা দেবী তখন সজনীকান্তদের প্রতিবেশী ছিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে আলাপ পরিচয় খানিকটা সৌহার্দ্যে পরিণত হয়েছিল, তার উল্লেখ আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। সজনীকান্তর সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল অবিসংবাদিত, কিন্তু তাঁর ও তাঁর স্ত্রী সুধা দেবীর কতকগুলো চারিত্রিক গুণ হেমন্তবালা দেবীকে মুগ্ধ করেছিল। ওঁদের বাড়িতে একটি ঝি অনেককাল ধরে কাজ করত। তার যখন বয়স হয়েছে এবং সে মরণাপন্ন রোগে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল, তখন সজনীকান্ত মমতার সঙ্গে অনুক্ষণ তার সেবাশুশ্রূষা করেছেন, এমন কি নিজে অম্লান বদনে তার মলমূত্রাদিও পরিষ্কার করেছেন, যেন সে তাঁর পরমাত্মীয়, ঝিটি তাঁদের বাড়িতেই মারা যায়। এই ঘটনাতে সজনীকান্ত সম্বন্ধে তাঁর মনে খুব উচ্চ ধারণা জন্মেছিল—ইনি ত নিছক ভাববিলাসী কবি নন, হৃদয়ের প্রসারতায় ও আচরণে এক বিরল চরিত্রের লোক। এই ঘটনাটি একাধিকবার হেমন্তবালা দেবীর মুখে শুনেছি। কিছু মেলামেশার ফলেই হেমন্তবালা দেবী বুঝতে পেরেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলম চালনা করলেও সজনীকান্ত ছিলেন অন্তরে অন্তরে পরম রবীন্দ্রভক্ত, কবিগুরুকে যথার্থই তিনি পিতার মত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। বিপথগামী পুত্রের মত যেন তিনি পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এই ঘটনাতে হেমন্তবালা দেবী বেদনা বোধ করতেন এবং চাইতেন যে, উভয়ের মধ্যে বাধা বিরোধের অবসান হয়ে আন্তরিক মিলন ঘটুক। তার জন্য তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে যথার্থ সম্ভাব স্থাপনের চেষ্টাও যে না করেছিলেন তা নয়। তার নিদর্শন রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য চিঠিতেও।

"[সজনীকান্ত] যদি আমাকে চিঠি লিখতে চান নির্ভয়ে লিখতে বোলো আমি কখনো তাঁর অসম্মান করব না।" (১০১নং)

"[সজনীকান্ত] আমাকে শ্রদ্ধা করতে কল্পনা করতে স্বভাবতই অক্ষম সে জন্য তাঁকে আমি দোষ দিইনে। আমার রচনায় বা ব্যবহারে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা তাঁকে এতই উত্তেজিত করে যে তিনি আমাকে অপমান না করে থাকতে পারেন না। নিষ্কাম সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে তার প্রভেদ আছে। কিন্তু নিশ্চিত জেনো তাঁর প্রতি তোমার বন্ধুভাবকে আমি মনের এক কোণেও বাধা দিতে ইচ্ছে করিনে।" (১৫৭নং)

"একটা কথা মনে রেখো—আমার উপর যে যতই অত্যাচার করুক কারো উপরে রাগ পোষণ করে থাকা আমার ধাতে নেই। আমি তাতে লজ্জা পাই। অতএব [সজনীকান্ত] সম্বন্ধে কোনো সংকোচ কোরো না—তার সঙ্গে তোমাদের যে সম্বন্ধ হয়েছে সেটা রক্ষা কোরো তাতে আমি কোনোই অপরাধ নেব না। [সজনীর] চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো লোক আমাকে নিরন্তর আঘাত করেচে...

এই কথাটা মানতে হবে যে অহৈতুক অনুরাগের মতোই অহেতুক বিদ্বেষও আছে—ওটা প্রকৃতিসিদ্ধ। আমি কোনোদিন এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করিনি—এবং ভোলবারই চেষ্টা করেছি।" (১১৫নং)

চিঠিগুলো থেকে রবীন্দ্রনাথের বিরল গুণের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁর উদার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মসংযম এবং মর্যাদাবোধ।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে সজনীকান্ত তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এই নাটকীয় পরিণতি এখন ঐতিহাসিক কাহিনী। এই ব্যাপারে হেমন্তবালা দেবীর হয়ত কিছু অংশ ছিল। সজনীকান্তর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হেমন্তবালা দেবী আমাকে লিখেছিলেন—"সাহিত্যজগতের এই বভ্রুবাহনের সঙ্গে সব্যসাচীর সম্বন্ধ ও বিরোধের কথা কার বা অজানা? কিন্তু আজ স্বর্গীয় পিতাপুত্র একত্রে মিলিত।"

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে উল্লিখিত মূল ঘটনা ছিল এই—তাঁর স্নেহের দান, কলম ও জোব্বা, হেমন্তবালা দেবী সজনীকান্তকে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু 'অনাদরে দান' করেননি, দিয়েছিলেন গচ্ছিত রাখার জন্য তাঁর জিম্মায়। এই অমূল্য সম্পদগুলিকে সুরক্ষিত রাখার মত কোনো নিরাপদ জায়গা তখন তাঁর ছিল না, তাই এরূপ ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। সম্ভবত একটু বাহাদুরি ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্য সজনীকান্ত বন্ধুমহলে প্রচার করেছিলেন অন্যরকম, যার ফলে রবীন্দ্রনাথকে লোকের চিঠিতে প্রশ্নবাণের মুখে পড়তে হয়েছিল। হেমন্তবালা দেবী ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার পর রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত চিঠির শেষাংশে লিখেছিলেন—"তোমার চিঠি পেয়ে বোঝা গেল আমার দান তুমি তাকে দান করোনি—বাস কথাটা শেষ হোলো। কিন্তু তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, [সজনীকান্তর] সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব আমার কাছে অপ্রিয় এমন কথা কল্পনা কোরো না—যদি করো তবে সেটা আমার প্রতি অশ্রদ্ধার নিদর্শন হবে।" (১১৪নং)

এখানে বলা উচিত যে, সজনীকান্ত হেমন্তবালা দেবীর বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে ছিলেন এবং গচ্ছিত সম্পদ তাঁকে ফেরৎ দিয়েছিলেন। তিনি হেমন্তবালা দেবীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, ডাকতেন 'মা' বলে এবং তাঁর এক জন্মদিনে তাঁকে একটি কবিতা লিখে শ্রদ্ধার উপহার দিয়েছিলেন।

হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে এই পরিচ্ছেদ শেষ করা যেতে পারে—

"কল্যাণীয়াসু,

জরার প্রান্তসীমায় আমি আজ শয্যাগত। তোমরা যে অর্ঘ্য আজ আমাকে পাঠিয়েছ মুখে উপযুক্ত সমাদর প্রকাশ করতে পারলেম না। আনন্দ অন্তরে অব্যক্ত রইল। নিশ্চিত জানি তোমার কাছে তা অগোচর থাকবে না। তুমি আমার আশীর্বাদপূর্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করো। ইতি ১০।৫।৪১

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" (২৬৪নং)

চিঠিখানা ছিল অন্যের হস্তাক্ষরে লেখা, নীচের স্বাক্ষর ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজের। তখন নিজের হাতে চিঠিপত্র বা অন্য কিছু লেখা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য বা অসাধ্যই ছিল, তাঁর বক্তব্য তিনি মুখে মুখে বলে দিতেন ও অন্যরা তা লিখে নিতেন।

[ক্রমশ]
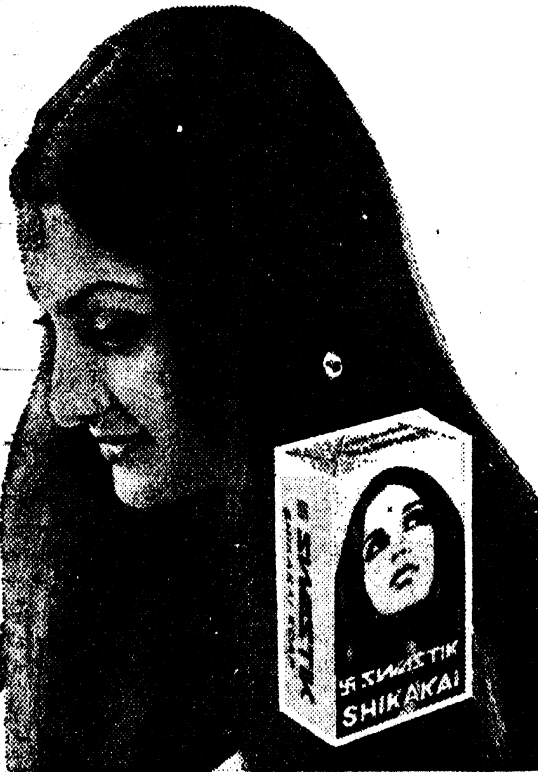
বিরাগ

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দু' কানের দু ইঞ্চি নীচে জুলফি। পিছনকার চুল ঘাড়ের নীচে লতিয়ে পড়েছে। গোঁফ কামানো। নিম্নাঙ্গে বেল-বটম স্ল্যাকস্। ঊর্ধ্বাঙ্গে নকশা-কাটা বেগুনে রঙের গুরু-পাঞ্জাবি। পায়ে কাবলি চপ্পল। মোটামুটি এই হচ্ছে ধীমান।

ধীমান নলিনাক্ষর ভাগ্নে। নলিনাক্ষ দোকানদার। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে তাঁর মনোহারী দোকান। পৈতৃক বাড়িটা দোতলা। জরাজীর্ণ না হলেও বাড়িটার চেহারা বেশ করুণ আর বুড়োটে ধরনের। অনেক বছর রঙ-টঙ পড়েনি। দোতলায় তাঁরা থাকেন। একতলার সামনের ঘরে দোকান। পিছনকার ঘর গুদাম।

শ্রাবণের আকাশ ঘনঘটা। মাঝে-মাঝে দমকা জোলো হাওয়া। মাঝে মাঝে ঝিরঝির, মাঝে মাঝে ঝমঝম বৃষ্টি। মাঝে মাঝে মেঘের চাপা গুরুগুরু।

সকাল নটা নাগাদ বাঁ কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে, ডান হাতে ছাতা নিয়ে ধীমান যথারীতি বেরিয়ে যাচ্ছিলো। কোনো রকমে বি-কম পাশ করার পর থেকে ধীমান কাজের কাজ কিছুই করে না। রোজ সকালে বেরোয়। দুটো আড়াইটে নাগাদ ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেল পাঁচটা-ছটা পর্যন্ত ঘুমোয়। তারপর আবার বেরোয়। ফিরতে রাত দশটা-এগারোটা। ধীমানকে নলিনাক্ষ মানুষ করেছেন। তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। তাই ধীমানকে নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনার শেষ নেই।

তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে নলিনাক্ষ হাঁক দিয়ে বললেন, "ওরে ধীমু, এখন বেরুসনি। এখনি আমাকে বাগড়ি মার্কেটে যেতে হবে মালপত্র কিনতে। যতক্ষণ না আসি দোকানটায় বোস।"

ধীমান অত্যন্ত বিনয়ী ছেলে। নলিনাক্ষর কোনো কথায় কখনো না বলে না। মনে-মনে ব্যাজার হলেও মুখে তার কখনো ব্যাজার ভাব ফুটে ওঠে না। দোকানের কাউন্টারের পিছনকার উঁচু টুলে গিয়ে সে বসলো। রবারের জুতো পরে, ছেঁড়া ছাতা নিয়ে নলিনাক্ষ রওনা হলেন। জোরে বৃষ্টি নামলো। কাঁধের ঝোলা থেকে খবরের কাগজে মোড়া একটা বই বার করলো ধীমান। এই দুর্যোগে কোনো খদ্দের আসবে বলে ধীমানের মনে হোলো না। তাই নিশ্চিন্ত মনে বইটা সে খুললো।

বইটা এক বিলিতি উপন্যাসের বাংলা তর্জমা। সদ্য প্রকাশিত। মলাটে এক শয়নরতা ফরাসী সুন্দরীর এমন একটা মনোহারী ভঙ্গীময় লোভনীয় ছবি যেটা নলিনাক্ষর চোখে পড়লে নলিনাক্ষ ও ধীমান—দুজনেই বিব্রত বোধ করবে। ধীমান তাই বইটা খবরের কাগজে মুড়ে রেখেছে। জোর গুজব, অশ্লীল বলে বইটা শিগগীরই বাজেয়াপ্ত হবে। এক বন্ধুর কাছ থেকে দু' দিনের জন্য বইটা ধীমান ধার করে এনেছিলো। কিন্তু নিরিবিলিতে পড়ার সুযোগ পাচ্ছিলো না। আজ বর্ষার দিনে দোকানের নিরিবিলিতে বইটা পড়বার সুযোগ পেয়ে ধীমান মনে-মনে তাই খুব খুশী হোলো।

চটপট পাতা উল্টে উপন্যাসের সারমর্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে ধীমানের আশ্চর্য

দক্ষতা। বইটার প্রথম কয়েকটা পাতা উলটে উপন্যাসের বিষয়বস্তু ধীমান ধরে ফেললো। মোটা অঙ্কের ট্রাভলার্স চেক নিয়ে কলিন্স পৌঁছেছে প্যারিসে বড় দিনের কটা দিন ফুর্তি করতে। তার আর্টিস্ট বন্ধু হেনরিকে আগেই সে খবর দিয়ে রেখেছিলো। স্টেশনে হেনরি হাজির ছিলো। তাদের ট্যাক্সি ছুটেছে প্যারিসের জনবহুল পথ দিয়ে। বিকেল পেরিয়ে গেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আলোয় ঝলমল করছে দু পাশের দোকান। আলো-অন্ধকারে অপূর্ব রহস্যময় হয়ে উঠেছে পথগুলো। ফুটপাথে ব্যস্ত মানুষের ভিড়। বাতাসের ঝাপটার মাঝে মাঝে মেয়েদের স্কার্ট উড়ে যাচ্ছে। ঝুঁকে পড়ে স্কার্ট নামাচ্ছে তারা। ফুটপাথ দিয়ে একলা যে তরুণী চলেছে সে কি টাইপিস্ট, নাকি আর্টিস্টের মডেল? পথের মোড়ে লাল আলো। বিরাট এক বেংটেলির পাশে তাদের ট্যাক্সি ব্রেক কষলো। সে গাড়িতে ফারের কোট পরা এক মহিলা। ঠোঁটে রঙ. গালে রঙ। আলোর সিগন্যালের লাল আলোর আভা তার মুখের এক পাশে পড়েছে। অপরূপ দেখাচ্ছে। কোথায় চলেছে? প্রেমিকের সঙ্গে লুকিয়ে কোনো ফ্ল্যাটে দেখা করতে? সন্ধের প্যারিসে অনেক বিস্ময়, অনেক সম্ভাবনা, অনেক রহস্য। কলিন্স ভাবলো, মাই গড্? কি উত্তেজনা আর ফুর্তির মধ্যেই না কটা দিন কাটবে! হোটেলটা রু দ্য রেনের কাছে নিরিবিলি এক পথে। দোতলায় তার ঘর। হোটেলের ডিরেক্টার নিজে তাদের সেই ঘরে নিয়ে এলো। পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ঘর। লাগোয়া বাথরুম। একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা ওয়ার্ডরোব, লেখার টেবিল আর চেয়ার। একটা ইজিচেয়ার। আর ঘরের মাঝখানে জোড়া খাট। লোভনীয় নরম বিছানা পাতা। ডিরেক্টার জানালো, জোড়া বিছানা থাকলেও একজনেরই ভাড়া সে নেবে। হেনরি হেসে বললো, যাকে ইচ্ছে তাকেই সে-ঘরে নিয়ে আসতে পারে কলিন্স। ডিরেক্টার আপত্তি করবে না।

এর পর ধীমান চটপট গোটা সতের পাতায় চোখ বুলিয়ে গেলো। তাতে ছিলো কলিন্স আর হেনরির ছেলেবেলার নানা খুঁটিনাটি কথা। অতীতে তাদের কয়েকটা নিতান্ত পানসে প্রেমের কাহিনী —সিনেমার অন্ধকারে আলগোছে হাত ধরা, সন্ধের প্রাচীন ওক্ গাছের তলায় দুরুদুরু বুকে চুমু খাওয়া, ইত্যাদি গোছের সাবেকি জোলো ব্যাপার।

তারপর......কলিন্সকে হেনরি নিয়ে এসেছে এমন এক নাইট ক্লাবে, সাধারণ টুরিস্টের পক্ষে যেটার হদিশ পাওয়া দুঃসাধ্য। তুর্কি পোশাক-পরা এক দ্বার-রক্ষী। প্রবেশ দ্বারের পরেই আবছা-অন্ধকার করিডোর। শেষ-মাথার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এক মহিলা। ত্রিশ-থেকে পঁয়তাল্লিশ—যে-কোনো একটা বয়স তার হবে। আবছা আলোয় মোটামুটি সুন্দরী বলেই মনে হয়। হেনরির সঙ্গে তার যে অনেক দিনের পরিচয় সে-কথা তাদের কথাবার্তার মধ্যে বোঝা গেলো। সেই মহিলা তাদের নিয়ে এলো এক হল-ঘরে। আলো আবছা। গোলচে টেবিলগুলোর চার পাশে চারটে করে চেয়ার। বেশীর ভাগ টেবিলেই দুজন—স্ত্রী ও পুরুষ। পুরুষদের পরনে ডিনার জ্যাকেট, মহিলা-দের সান্ধ্য ফ্রক। স্পষ্টই বোঝা যায় তারা টুরিস্ট—এসেছে প্যারিসের রাতের জীবন দেখতে, উপভোগ করতে। তুর্কি পোশাক-পরা সুদর্শন ছোকরা ভৃত্যরা হামেহাল হাজির। প্ল্যাটফর্মে অর্কেস্ট্রা—পিয়ানো, বেহালা, স্যাক্সোফোন। প্ল্যাটফর্মের সামনে দুটো বেঞ্চি। তাতে বসে জনা পনের তরুণী। তাদের পরনে ঢোলা তুর্কি ট্রাউজার, মাথায় তুর্কি পাগড়ি। তরুণীদের গলা থেকে কোমর পর্যন্ত আবরণহীন। সেই বেঞ্চেরই আরো কয়েকজন তরুণী গোলচে টেবিলে এক একজন টুরিস্টকে নিয়ে বসে। টুরিস্টদের অধিকাংশই আমেরিকান। তরুণীদের কথায় তারা হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ছে, তারপর স্খলিত হাতে তোয়ালে-জড়ানো শ্যাম্পেনের বোতল থেকে অদ্ভুত গড়নের বেঁটে গোলচে কাঁচের গেলাসে ফেনায়িত পানীয় ঢালছে।

একটা খালি টেবিলের চারপাশের চেয়ারে বসার পর সেই আধা-বয়সী আধা-সুন্দরী হেনরিকে প্রশ্ন করলো, মহিলাদের মধ্যে কলিন্সের কাকে পছন্দ। তাদের টেবিলে শ্যাম্পেন এলো। হেনরি প্রশ্ন করলো, আজ রাতে কুইনিকে পাওয়া যাবে কি না। বললো, কুইনিকে নিশ্চয়ই কলিন্সের খুবই পছন্দ হবে। কারণ সে সুন্দরী, ইংরিজি ভাষায় দক্ষ, আর্ট সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল—এবং কলিন্স আর্টের ভক্ত। এসেছে শুধু যে রাতের প্যারিস দেখতে তাই নয়, এসেছে খুঁটিয়ে লুভোর আর্ট গ্যালারিও দেখতে। সেই কুইনি-নামা মেয়েটিকে আগেই লক্ষ্য করেছিলো কলিন্স। এক টেবিলে একা সে বসেছিলো। ওয়েটার মেয়েটিকে কি যেন বলতে সে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালো তারপর প্রায় যেন ঝলমল করে এগিয়ে এলো তাদের টেবিলে। মাথায় তুর্কি পাগড়ি। পরনে ঢোলা তুর্কি পাজামা। মাসকারা আঁকা চোখের তারা গাঢ় নীল। যেন বিদ্যুতের শিখা। কুমারীর মতো তার অনাবৃত স্তন। আর স্তনাগ্র গোলাপ-কুঁড়ির মতো। লাল রং-করা—

—"অ মশাই, শুনছেন—!"

চমকে উঠে ধীমান ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। কাউণ্টারের সামনে আধ-ভেজা প্রৌঢ় এক লোক। তিনি বললেন, "আপনার যে দেখছি হুঁশ-পবন নেই! কতবার ছাতা ঠুকলাম। বলি—নিপিল আছে?"

ধীমান বললো, "নিপিল?"

"হ্যাঁ, মশাই, হ্যাঁ—নিপিল। ফিডিং বোতলে যেটা পরায়—"

"না—হ্যাঁ, মানে ইয়ে,—আছে—"

"কত দাম একটার?"

"দাম? ও, হ্যাঁ—মানে—এই দেখে বলছি—"

"দেখে বলছি!—তা হলেই ব্যবসা চালিয়েছেন। আপনাকে বলতে হবে না। আমি বলে দিচ্ছি। মাস খানেক আগে পঁচাত্তর পয়সা ছিলো। এখন একশ' পয়সা। কিন্তু পাঞ্জাবি-গুজরাটি দোকান-দার'রা আজ হাঁকছে একশ পঁচিশ।"--

সেই আধ-ভেজা বিরক্ত-মুখ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে এক টাকায় একটা ফিডিং বোতলের রবারের মুখ বিক্রি করে ধীমান আবার বইটা তুলে বসলো।

অর্কেস্ট্রায় নতুন সুরের ঝঙ্কারে উঠে দাঁড়িয়ে এক মুখ হেসে কলিন্সকে হেনরি বললো, একটা জরুরী কাজে তাকে যেতে হচ্ছে। বললো, কুইনি নাচে-গানে—সবদিক দিয়েই চৌকোস মেয়ে। কলিন্স যে তার সঙ্গসুখ সব দিক দিয়ে উপভোগ করবে তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।...

কলিন্স নিজে নাচে খুব ভালো। কিন্তু দেখলো নাচের ব্যাপারে কুইনি তার চেয়েও এক্সপার্ট।...অনেকবার তারা নাচলো। অনেক গেলাস শ্যাম্পেন পান করলো। কিন্তু মাঝ রাত এগিয়ে আসতে উসখুস করতে লাগলো কলিন্স। কারণ প্যারিসের এক বিখ্যাত গির্জের বড়দিনের আগের "মিডনাইট ম্যাস্" শুনতে যাবার দুটো টিকিট হেনরি তাকে দিয়েছিলো। এ-রকম সুযোগ আবার জীবনে কবে আসবে কলিন্স জানে না। সে আর্টের যেমন ভক্ত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরও ভক্ত তেমনি। তাই কুইনিকে সে বললো, ঘণ্টা খানেক পরে সে ফিরবে। কুইনি যেন অপেক্ষা করে।... "মিডনাইট ম্যাস"-এর দুটো টিকিট আছে জেনে কলিন্সকে কুইনি অনুরোধ করলো তাকেও নিয়ে যেতে।...গির্জেয় তারা যখন পৌঁছলো তখন সঙ্গীতানুষ্ঠান সবে শুরু হচ্ছে। গির্জের মধ্যে যেমন ভিড় তেমনি ঠাণ্ডা। বসার জায়গা নেই। একটা থামের পাশে দাঁড়িয়ে তারা শুনতে লাগলো।...খানিক পরে হঠাৎ কলিন্স দেখে কুইনি এমন অস্বাভাবিকভাবে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে যে, আশপাশের লোক তার দিকে তাকাচ্ছে কৌতূহলী দৃষ্টিতে?

কলিন্স মেয়েটির হাত ধরে বাইরে এলো। গুঁড়ো গুঁড়ো তুষার পড়ছে। ট্যাক্সি। ঘেঁষাঘেঁষি বসা।

কলিন্স প্রশ্ন করলো, "কোথায় যাওয়া যায়?"

কুইনি বললো, "বলভার মোঁপারনাসে"।

সিন নদী পেরিয়ে ট্যাক্সি থামলো এক জমকালো রেস্তরাঁর সামনে। বেজায় ভিড়। কোনো রকমে কোণের দিকে ছোটো একটা টেবিলের পাশাপাশি দুটো চেয়ারে তারা বসলো।

কুইনি বললো, "ক্রিসমাসের ফুর্তি করতে প্যারিসে তুমি এসেছো। ডোণ্ট বি এ ফুল! তুমি যাও। এনজয় ইয়োরসেল্ফ।"

মেয়েটির উপর কলিন্সের খুব মায়া পড়ে গিয়েছিলো। তার মনেই হচ্ছিলো না প্যারিসের এক প্রস্টিটিউটের সঙ্গে সে কথা কইছে। আবার শ্যাম্পেন আনালো কলিন্স। তারপর শুরু হোলো কুইনির কাহিনী। ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে সে। সংসার অভাব-অনটনে চলে। টাইপিস্টের কাজ করতো। আপিস থেকে ফেরার সময় একদিন এক তরুণ তাকে তার গাড়িতে লিফ্‌ট্ দেয়। সুপুরুষ। সুদর্শন। দামী স্যুট। তারপর সে তার সঙ্গে ডেট করতে শুরু করে। যে-দিনই ডেট করে সে-দিনই আসে নতুন-নতুন গাড়িতে। তারপর বিয়ে করার প্রস্তাব জানায়, অর্থাৎ প্রপোস করে। কুইনির মনে হয়েছিলো বিয়ের সেই প্রস্তাব তার কাছে স্বর্গলাভ। কিন্তু হায়, বিয়ের পর সে জানলো তার স্বামী শুধু গাড়ি-চোর নয়, অত্যন্ত লম্পট, ড্রাগ্ নিয়ে তার চোরা-কারবার। এবং জালিয়াৎ আর খুনে প্রকৃতির। ঘোড়-দৌড়ে তার বেজায় নেশা। তার আসল চেহারা কুইনি জানলো যে-দিন তার স্বামী এসেছিলো খুব নেশা করে। আর তার দামী স্যুটে ছিল দগদগে রক্তের দাগ। তার স্বামী তার সঙ্গে খুব নিষ্ঠুরভাবে প্রেম করেছিলো। হায়, সে জানতো না সেই কাল-রাতে সে জননী হতে চলেছে।...

শ্যাম্পেনে চুমুক দিয়ে মেয়েটি বললো, "I was a fool! জানো ভালোবাসার ব্যাপারটাই ফুলিশ" তারপর খানিক থেমে সে বলে চললো, "তখন চাকরি ছেড়েছি; যাকে বিয়ে করবো—ভেবেছি, করেছি। হা-হুতাশ করেছি। কিন্তু হায় প্রেম—তুমি যাও, এনজয় ইওরসেলফ। আজ বড়দিন। কাল আর বড়দিন আসবে না।..."

"ওগো বাবু, শুনেছো? শুনেছোনি কেন বাবু গো—?"

বইটা মুড়ে ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে ধীমান আর একটু হলেই চিৎপাত হয়ে পড়তো।

দেখলো, ময়লা থান পরা জুবজুবে ভিজে এক বুড়ি। হাতে তার কাপড় জড়ানো ছোট একটা পুঁটলি। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

ধীমান খুব বিনয়ী ছেলে। বুড়িকে প্রশ্ন করলো, "কি নেবেন, বলুন।"

বুড়ি বললো, "কিছু নিবোনি গো! বলি, শম্ভুনাথ হাসপাতালটা কুথায়? গোবরডাঙা থ-এ আইছি। নাতিনটার জন্যি খাবার আছে—"

ধীমান বলল, "শম্ভুনাথ হাসপাতাল তো শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটে নয়। আপনি সোজা গিয়ে, ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে এলগিন রোডে পৌঁছে যে-কোনো রিকশাওয়ালাকে জিগগেস করে নেবেন। সে দেখিয়ে দেবে—"

বুড়ি রাগে-দুঃখে গরগর করে উঠলো, "বাপের জম্মে শুনিনি—শম্ভুনাথ হাস-পাতাল শম্ভু পণ্ডিত রোডে নয়—এলগিন রোডে—বাপের জম্মে—"

উপড়ে-কড়া বইটা চিৎ করে, চেয়ারে বসে, কাউণ্টারে পা-দুটো তুলে, পরম বিনয়ী, অতিশয় শান্ত-স্বভাব ধীমান তার ডান পাশের জুলফি চুলকে আবার পড়তে শুরু করলো......

পাতার পর পাতা উলটে চললো ধীমান। কিন্তু কোথায় সেই আসল প্যাসেজ? কি করে কুইনির স্বামীকে পুলিশ ধরলো। কি ভাবে—দীর্ঘ দেড় বছর ধরে মামলার পর তার স্বামীর পঁচিশ বছরের জেল হলো। কুইনিদের সংসারের

চরম দারিদ্র্য। ছোটো ভাই-বোনগুলো খেতে পায় না। অস্থিচর্মসার হাতড়ায়। বাপ সারাদিন রুটি কারখানায় কাজ করে রাতে আকণ্ঠ মদ গিলে ফেরে—শেষটায় নাকি আরসাঁথ ধরেছিলো। কুইনির মাকে কাদা-ল্যাপটানো বুট-সমেত লাথি মারতো।। মা তখন বুড়ি। প্রায় অথর্ব। ভাইবোনগুলোর কারুর বয়েসই আট দশের বেশী নয়।—পুলিশ থেকে একদিন জানিয়ে গেলো—সিন নদীতে একটা মড়া পেয়েছে। মুখ দেখে চেনার উপায় নেই। শুধু পকেটে একটা ভিজে পকেট-বই। তাতে ঝাপসা নাম—কুইনির বাবার নাম। মর্গে গিয়ে সেই মড়াটাকে কুইনি তার বাবা বলে সনাক্ত করলে পুলিশের দায় থেকে।কুইনি গিয়েছিলো। সনাক্ত করেছিলো। বাবাকে জীবনে সে প্রথম ভালোবেসেছিলো। তার স্বামীকে—সেই গাড়ি-চোর খুনে সুপুরুষ যুবককে ভালোবেসেছিলো শেষবার।

—জীবনে সে ভালোবাসা নামক বস্তুকে হাড়ে হাড়ে সনাক্ত করেছে। তার চোখে আর জল থাকার কথা নয়।—নিশ্চয়ই সে নিতান্তই বোকা। এখনো তাই "মিড নাইট ম্যাস" শুনলে চোখের জল, বুকের কান্না সে সামলাতে পারে না।—কুইনি বললো, "—আমার কথা যাক। ক্রিসমাসে প্যারিসে এসেছো তুমি ফুর্তি করতে। এখানে অঢেল ফুর্তি। ডোন্ট বি এ ফুল। এনজয় ইয়োর-সেলফ। আমি চললাম আমাদের সেই নাইট-ক্লাবে। আজ অনেক ক্যায়েন্ট। আজ ভালো রোজগার হলে সাত দিন রেস্ট পাবো। বাড়ির সবাই দু বেলা খেতে পাবে।"

পড়তে-পড়তে ধীমানের বিরক্তি ধরে গেলো। তারপর ছাকা বাক্স পাতা ধরে কুইনি আর কলিন্সের ন্যাকা-ন্যাকা ঘোরানো-ফেরানো কথার মার-প্যাঁচ, অতি সূক্ষ্ম সাইকলজির ব্যাখ্যা—কোন শালা পড়তে চায়? কোন শালার ব্যাটার ধৈর্য থাকে?—এক দম ট্রেশ বলে পাতা উলটেই ধীমান কিন্তু তার ইন্টারেস্ট ফিরে পেলো। কলিন্স ছোঁড়া লাইনে এসেছে। কুইনিকে বলেছে আজ রাতে তার সংগে তার হোটেল কামরায় থাকলে এতগুলো ফ্রাঁ দেবে যাতে আগামী সপ্তাহটার খরচের জন্য তাকে চিন্তা করতে হবে না।

ধীমান মনে-মনে যখন প্রস্তুত, কলিন্স তার ফ্লাগুলো ক্রিসমাসের রাতে সুদে-আসলে উসুল করে নেবার ডিটেলস লেখক লিখবে—যাকে বলে ওস্তাদের মার শেষ রাতে—এমন সময়—

বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পথ জলে থৈ থৈ। এক রিকশা-ওয়ালা রিকশ থেকে ধরে-ধরে হরিপদবাবুকে তার দোকানে নিয়ে এলো।

হরিপদবাবু পাড়ার সবাইকার জেঠা-মশাই। ধীমানও তাকে বলে হরিজেঠু। এমনিতে ভালোমানুষ। পাড়ার সব ক্লাবে সরস্বতী থেকে দুর্গাপুজো পর্যন্ত মোটা চাঁদা দেন। সময় বুঝে কখনো ইস্টবেঙ্গল কখনো মোহনবাগানের সাপোর্টার হন। কিন্তু গাঁজা পার্ক থেকে রিকশ করে ফিরলেই চিত্তির। তখন আর তাঁর জিভে লাগাম থাকে না।

তাই সশঙ্কিত হয়ে বইটা কাউণ্টারের তলায় উপুড় করে লুকিয়ে রেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়ে ধীমান প্রশ্ন করলো, "কি চাই, হরিজেঠু?"

হরিপদবাবু টলতে-টলতে কাউণ্টার ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কি আর চাইবো রে, শালা। নলে হারামজাদাটা কোথায়?"

"আজ্ঞে, তিনি বাগড়ি মার্কেটে মাল কিনতে গেছেন—"

"মাল কিনতে, না মাল গিলতে, না মাল-মাগীগুলোর বাড়িতে?" আপন রসিকতায় বেদম হাসতে গিয়ে ভীষণ বিষম খেলেন হরিপদবাবু। "আমি মাল গিলি, আলবত গিলি। তবু বহালে তবিয়তে থাকি। কারণটা জানিস?—মাল-মাগীদের বাড়ি যাই না। রোগ-ফোগ পেনিসিলিন-টেনিসিলিন ফোঁড়াফুঁড়ি—ও সব ঝক্কির কি দরকার রে বাবা! বাড়িতে তো তোদের জেঠি মাগীটাই আছে—!" তারপর গলা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তোদের দোকানে নি—নি—"

কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

ধীমান শেষ করে দিলো। বললো, "নিপিল চাইছেন তো? নিপিল আছে। এক টাকায় একটা—"

হরিপদবাবু হা-হা করে হেসে বললেন, "না রে শালা, নিপিল নয়—বলছি স র কা রে র নি—নিরোধ। যেটা ব্যবহার করলে নিপিল-ফিপিলের আর দরকার হয় না। তোর জেঠিকে তো জানিস—ভারী ফার্টাইল। অংক-ফংক জানে না। একটা মাত্তর নামতা জানে: ছেলেকে কোলে নামলো হাতে রইলো পেট—"

রিকশওয়ালা পাড়ার চেনা লোক। হরিপদবাবুকে বিলক্ষণ চেনে। তাঁকে ধরে-ধরে রিকশয় তুলে জল ভাঙতে-ভাঙতে সে চলে গেলো।

কাউণ্টারের তলা থেকে উপুড়-করা বইটা তুলে চেয়ারে বসে কাউণ্টারে পা তুলে দিয়ে আবার আয়েস করে পড়তে শুরু করলো ধীমান। এবার আসল প্যাসেজের কাছে সে পৌঁচেছে। কারণ কুইনিকে নিয়ে কলিন্স ফিরে এসেছে রু দ্য রেনের কাছে সেই নিরিবিলি হোটেল ঘরে, যেখানের জোড়া-খাটে লোভনীয় নরম বিছানা পাতা।

কুইনি তার ছোট্ট টুপি খুলে ড্রেসিং টেবিলে রাখলো। সস্তা দামের রঙ-চটা ওভারকোটটা ঝোলানো চেয়ারে; বাথরুমে গেলো। ফিরলো সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। হোটেল ম্যানেজার লেখার টেবিলে ছোটো বালতিতে তোয়ালে-জড়িয়ে এক বোতল শ্যামপেন আর দুটো গেলাস রেখে গিয়েছিলো। ক্রিসমাসের টেনেণ্টদের সব চাহিদার কথা তার জানা। এক্সপার্ট হাতে কুইনি শ্যামপেনের বোতলটা খুলে দুটো গেলাস ভর্তি করলো। একটা গেলাস নিজে ঢকঢক করে শেষ করলো। অন্যটা কলিন্সকে দিলো। তারপর সোজা বিছানায় গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে সাদা ওয়াড়-দেওয়া কম্বলটা কোমর পর্যন্ত টেনে বললো, "ডার্লিং, কাম টু বেড।"

কলিন্সর গলা তখন শুকিয়ে গেছে।... মেয়েটির যে-কাহিনী সে শুনেছে তারপর তাকে সে স্পর্শ করবে কি করে? মেয়েটি তো দুঃখী একটি মানুষ। তার শরীরটা তো শুধুই রক্ত-মাংস-মেদে গড়া লোভনীয় ভোগ্য পণ্য নয়। কলিন্স বললো, "নো, থ্যাঙ্কস।" কুইনি বললো, "কেন? ক্রিসমাস এনজয় করতে এ-জন্যেই তো লণ্ডন থেকে এতো দূরে এসেছো, তাই না? সবাই তো তাই আসে।" কলিন্স বললো, "সবাই না।" কুইনি তার দিকে খানিক ক্লান্ত, খানিক অবাক চোখে তাকালো। তারপর বললো, "অ্যাজ ইউ প্লিজ।" আর তারপর পাশ ফিরে সাদা-ওয়াড়-ঢাকা কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে প্রায় মুহূর্তের মধ্যে অঘোরে পড়লো ঘুমিয়ে। জানালার পাশে ইজি-চেয়ারে পা ছড়িয়ে বসে কলিন্স ধরালো তার পাইপ।

বইটা এইখানে শেষ। শেষ হয়ে গেলো বলে ধীমান বিশ্বাস করতেই পারলো না। বইটার মলাটের ছবি বার কয়েক দেখে ভীষণ রেগে দোকানের মেঝেয় আছড়ে ফেলে প্রায় চিৎকার করেই সে বলে উঠলো, "রাসকেল—পাবলিশার দের যত বুজরুকি অশ্লীল না হাতি। লোক ঠকিয়ে সিরিয়াস বই পড়ানো!"

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের জল সম্ভবত কোমর ছাপিয়ে উঠেছে। এমন কি হাঁটুর উপর কাপড় তুলে কোনো মেয়েও তখন হাঁটছে না।
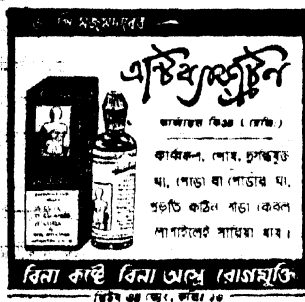
বিশ্ব বিজ্ঞান

চলন্ত গাড়ি এবং শব্দ

চমকে ওঠার মতই ব্যাপার।

ডানকুনি থেকে শিয়ালদহ যাওয়ার সেই লোকাল ট্রেনটি উল্টোডাঙ্গা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে সম্ভবত শ তিন গজ এগিয়েছিল; এবং সেই যাত্রীটি, যিনি ট্রেন-পথে সব সময়ই একটু আয়াস করতে চান, তিনি যথাযথ ঠিক জানালার পাশের একটি আসন দখল করে বসে ছিলেন। হয়তো বা কিছুটা অন্যমনস্ক। তা ট্রেনে বসে থাকার সময় মনকে কে আর 'বিশেষিত' অবস্থায় রাখে বলুন?

ঠিক সেই সময়। ভদ্রলোকের মনে হল প্রচণ্ড বাজ পড়ল যেন তাঁর কানের কাছেই। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটি ভনভন করে উঠল। মুহূর্তের জন্যে মনে হল কে যেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ওপর পড়ল হাতুড়ির ঘা! তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সংবিৎ হারালেন। আর ওই সময় আর সব যাত্রী, যাঁরা নিজেদের মধ্যে কথায় মশগুল ছিলেন, পলকে দেখলেন, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট-গামী একটি ট্রেন ঊর্ধ্বশ্বাসে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। এবং সেই যাত্রীটি, যিনি সংবিৎ হারিয়েছিলন তাঁর ঘোর কাটতে প্রায় পাঁচ মিনিটের মত সময় লেগেছিল। এর পর সারা দিন তিনি কারোর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে পারেন নি। একটানা বিরক্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এবং ক্লান্তি। সারা শরীর ঘিরেই কেমন যেন অস্থিরভাব।

শুধু তিনিই নন, রেলপথের যাঁরা যাত্রী, এ ধরনের অভিজ্ঞতা আজকাল তাঁদের অনেকের ভাগ্যেই ঘটে। বিশেষ করে ভাবনা-চিন্তা নিয়ে যাঁরা চলাফেরা করেন, শব্দের ব্যাপারে যাঁরা বেশী স্পর্শকাতর, তাঁদের ভাগ্যে তো বটেই। এবং শুধু উল্টোডাঙ্গা নয়, অনেক জায়গাতেই এমন অভিজ্ঞতা এখন আর বিরল ঘটনা নয়। ট্রেনের গতি বাড়ু। পাশের যাত্রীর সঙ্গে বসে দু' দণ্ড যে কথাবার্তা বলবেন, উপায় নেই। শুরু হল প্রচণ্ড বিরক্তিকর অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ। যান্ত্রিক ধ্বনি। কর্কশ, সূচের মত ঢুকে ঠিক মগজের মধ্যে গিয়ে যেন মাথাটা ছিঁড়ে খেতে চায়। মনে হয়, ... পুরো

এক নজরে
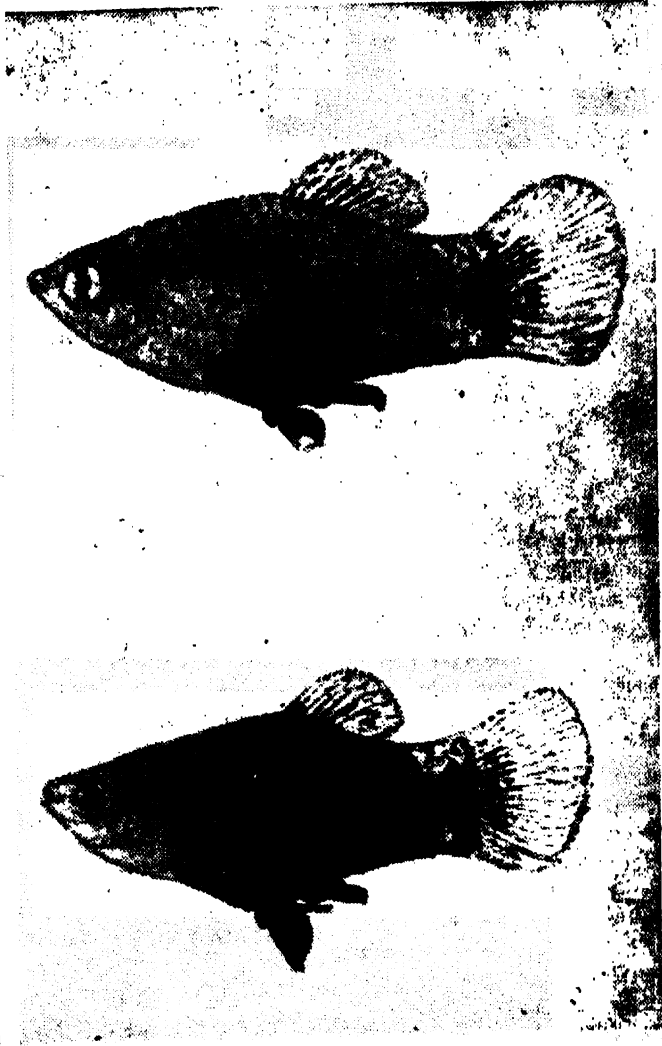
পশ্চিম জার্মানির গিয়েৎসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক গত পনের বছর একনাগাড়ে ক্যান্সার রোগের কারণ সন্ধান করতে গিয়ে সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, শুধু ভাইরাসই নয়, কোন কোন ক্যান্সার রোগের কারণ প্রজননগত ত্রুটি। যার অর্থ, ক্যান্সার কোন কোন ক্ষেত্রে বংশগত রোগ। এ সিদ্ধান্তটি করার আগে তাঁরা হাজার হাজার মাছের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছেন। নীরোগ এবং সুপুষ্ট মাছের দেহে ইনজেকশনের সাহায্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন জীন থেকে সংগ্রহ করা প্রাণরাসায়নিক যৌগ। যা সেই নীরোগ মাছগুলিকে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত করে। গবেষকদের বিশ্বাস এ ধরনের গবেষণা ক্যান্সার সৃষ্টিকারী জীন-জনিত রোগের হদিস দিতে সাহায্য করবে। আর তা যদি হয়, জীনের মধ্যেকার সেই বস্তুগুলি তাড়িয়ে দিয়ে ক্যান্সার সংক্রমণকে আমরা রোধ করতে পারব।

ছবিতে : নিচের মাছটি ক্যান্সার রোগে ভুগছিল। তার জীনের ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক যোগ উপরে মাছের দেহে ঢুকিয়ে দেবার এক মাসের মধ্যে উপরের মাছটির দেহে টিউমার দেখা দিতে শুরু করে।

গাড়িটার সমস্ত যন্ত্রপাতি নড়বড়ে হয়ে গেছে, নিচের স্প্রেং ভেঙে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে কোন কিছু বুঝে ওঠার আগে, তড়িৎ গতিতে কোন একটি ট্রেন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায়। তখন মাথার ওপর বাজ পড়ে। শেষোক্ত এই শব্দের কারণ হয়তো অনুনাদ। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় রেজোনেন্স। পাশাপাশি বিপরীত-গামী দুটি ট্রেন। রেলপথে ছুটে চলার সময় তারা এমন ধরনের শব্দ করছে, যার সময়-কাল বা পিরিয়ড সমান। একই সময়কালের দুই শব্দতরঙ্গ পরস্পর মিলিত হয়ে তুলছে অনুনাদ। সেই অনুনাদ এত তীব্র যে, তা শুনলে মনে হয় যেন কানের কাছে বাজ পড়ল।

উল্টোডাঙায় যে জায়গাটির কথা বললাম, তার পুব দিকে লাইন বরাবর তৈরী হয়েছে উঁচু বাড়ির সারি। রেলপথের দিকে পিঠ করে পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে। তার গায়ে অনুনাদ প্রতিফলিত হয়ে আরও জটিলতা সৃষ্টি করে। প্রতিফলিত শব্দ এবং ট্রেনের শব্দ পরস্পর মিলিত হয়ে এমন বিকট এক ধরনের মিশ্রধ্বনি সৃষ্টি করে, যা শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। যাত্রীরা এই শব্দের মধ্যে ডুবে থাকেন শুধু তাঁদের যাত্রাকাল পর্যন্ত। কিন্তু তাঁদের কথা ভাবুন—রেল পথের দু' পাশে যাঁদের বাড়ি। সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক বিকট শব্দ তাঁদের শরীর এবং মনের ওপর নিয়মিত যে চাপ সৃষ্টি করে, তার তুলনা নেই। কারণ, বিশেষজ্ঞদের মতে, যে-কোন শব্দ একটানা শোনার দরুন যতটা ক্ষতি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হয় যখন সেই শব্দ পর্যায়ক্রমিকভাবে মগজ দিয়ে আঘাত করে, শরীরের প্রতিটি কোষকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

❀

যাঁরা নিয়মিত গাড়ি চাপেন অথবা গাড়ি চালান, বিশেষজ্ঞরা তাঁদের ব্যাপারে এখন চিন্তিত। চিন্তিত দুটি কারণে। এক, অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ; দুই, ঝাঁকুনি অথবা গাড়ির নিজস্ব কম্পন।

রেলগাড়ির কথাই ধরুন। দ্রুত গতিতে চলার সময়, মাঝে মাঝে কানে তালা লাগানোর মত শব্দে রেলগাড়ির যাত্রীরা যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রবল ঝাঁকুনিতে অহেতুক দৈহিক শ্রমও তাঁদের হয় যথেষ্ট। মোটরগাড়ি যখন চলে, তখন তার আরোহী মাত্রই তিন রকমের কম্পন অনুভব করেন। এক, ইঞ্জিনের শব্দ। ইঞ্জিন যদি পুরনো হয়ে যায় কিংবা ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি ঠিক মত না করা হয়, তা হলে শব্দের মাত্রাও বাড়ে। এই শব্দ, যাঁরা আরোহী তাঁদেরই শুধু যে মানসিক বা শারীরিক বিপত্তি ঘটায় তা নয়, মোটরের যিনি চালক, বিশেষ করে বাস, ট্রাক অথবা ট্যাকসি যাঁদের চালাতে হয় দৈনিক নয়-দশ ঘণ্টা বা তারও বেশী, তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত হন সবচাইতে বেশী। ইদানীং গ্রামাঞ্চলে ভারী ট্রাকটার চালানো হচ্ছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়তো কাউকে পাহাড়ের পাথর কাটতে হয় বা বড় বড় সেতু এবং বড়বাড়ি তৈরির জন্যে ইঞ্জিনের মধ্যে বসে পাইল বসাতে হয়। এ সব করতে গিয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা শত শত শ্রমিক নানা কম্পাঙ্কের এবং তীব্রতর শব্দের মধ্যে দিন কাটান। এই শব্দ নিয়মিত অনুভব করতে করতে একসময়ে তাঁরা নানা-রকম রোগের শিকার হয়ে পড়েন।

সম্প্রতি সলফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ এম ই রায়ান তাঁর 'টেনটেটিভ ক্রাইটেরিয়া ফর অ্যাকসেপ্টেবল নয়েজ লেভেলস ইন প্যাসেঞ্জার ভেহিকল্‌স' নামে একটি গবেষণা-পত্রে উল্লেখ করেছেন, ৬৭ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দের প্রাবল্য থাকলে, বলা যেতে পারে, ওই শব্দ ক্ষতিকর নয়। এবং ওই প্রাবল্যের শব্দময় পরিবেশকে শান্ত পরিবেশ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে ৬৮ থেকে ৭৩ ডেসিবেল প্রাবল্য পর্যন্ত শব্দ কিছুটা বিরক্তি সঞ্চার করতে পারে। ৭৪ থেকে ৭৯ ডেসিবেল মাত্রার শব্দ আরও বেশী বিরক্তিকর। ৮০ থেকে ৮৫ ডেসিবেলের শব্দ বিপজ্জনক। এবং ৮৬ থেকে ৯১ ডেসিবেলের শব্দ অনেক বেশী বিপজ্জনক। উল্লেখ্য, ডেসিবেল শব্দের প্রাবল্য মাপার এক ধরনের একক। নিচু গলায় কথাবার্তা বলার সময় যে ধরনের শব্দ হয় মোটামুটিভাবে তার প্রাবল্যকেই শূন্য ডেসিবেল হিসেবে ধরে নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের শব্দকে ভিন্ন ভিন্ন ডেসিবেলে ভাগ করা হয়।

প্রশ্ন : ডেসিবেল বেশী হলে কি কি ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দানা বাঁধতে পারে?

মোটামুটি উত্তর, অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ হজমের গোলমাল ঘটাতে পারে। পেপটিক আলসার সৃষ্টি করতে পারে। রক্তচাপের গোলমাল, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক কম্পন, শরীরে রক্ত চলাচলে বিপত্তি, এমন অনেক কিছুই হতে পারে। এ সবের ফলে কর্মশক্তি কমে যায়।

এ ছাড়া, এই ধরনের শব্দ মনের ওপরও চাপ সৃষ্টি করে। যার ফলে, কথা-বার্তা মনে রাখা শক্ত হয়, কখনও বা অহেতুক মেজাজ খারাপ হয়, এবং দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকলে আপনি খিটখিটে হয়ে যেতে পারেন, নানারকম স্নায়বিক রোগ আপনাকে গ্রাস করতে পারে। বিশেষ করে শিশু এবং সন্তানসম্ভবা মা-দের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শব্দ এবং বিরক্তিজনক শব্দ খুবই ক্ষতিকর। অনেক সময় প্রচণ্ড শব্দ গর্ভ-পাতও ঘটাতে পারে। শিশুরা আংশিক বধির হতে পারে। তাদের স্মৃতিশক্তিও কমে যায়।

অবশ্য এ তো গেল সাধারণ শব্দের কথা। যে সব শব্দের কম্পাঙ্ক ২০ থেকে প্রায় ৩০০০০-এর মত তাদের কথা।

আর এক ধরনের শব্দ আছে, যার নাম ইনফ্রা-সাউণ্ড বা অব-কম্পন শব্দ। এই শব্দের কম্পাঙ্ক ২০র কম। এদের অস্তিত্বের আবিষ্কার বলতে গেলে মাত্র বারো-তেরো বছরের ঘটনা। এ সব শব্দ জেট প্লেন, রেলগাড়ি, মোটর প্রভৃতি থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। সাধারণ শব্দের মত এ সব শব্দ কানে শুনে বোঝা যায় না। কিন্তু এরাও কর্ণকুহরে গিয়ে ঢোকে। এবং কিছু কিছু অসুবিধেও সৃষ্টি করে। যেমন, বমি বমি ভাব, অন্যমনস্কতা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ডেসিবেল মাত্রা বেশী হলে, যেমন ধরুন ৯০ থেকে ১০০, এই শব্দ কখনও কখনও সাময়িক অন্ধত্ব ঘটাতে পারে। কারোর কারোর ধারণা মোটর-দুর্ঘটনার এটাও হয়তো একটি কারণ। দীর্ঘপথ মোটর চালানোর সময় চালকের ওপর এই শব্দ যখন প্রভাব বিস্তার করে, তখন হয়তো মুহূর্তের জন্যে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। আর তখনই হয়তো হাতের স্টিয়ারিংটি অসংলগ্ন হয়। ফল, দুর্ঘটনা।

ইনফ্রা-সাউণ্ড নিয়ে পৃথিবীর কয়েকটি গবেষণাগারে এখন নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে। দেখা গেছে, খুব নতুন হয়তো মোটরগাড়ি। দামী এবং শৌখিন গাড়ি। চালক ভেতরে বসে যেমন কোন শব্দই শুনতে পান না। সেই গাড়িতেও ইনফ্রা-সাউণ্ডের প্রাবল্য কখনও কখনও অনেক বেশী হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে ডঃ রায়ান বলছেন, গোল-মাল বাধে যখন চলন্ত গাড়ির জানালাটি আপনি খুলে দেন তখন। এমনিতে হয়তো সেই ভৌতিক শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু যেই জানালা খুলে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে তার ডেসিবেল গেল বেড়ে। শুরু হল নানা উপসর্গ। গা ঘিনঘিন, শারীরিক অস্বস্তি ইত্যাদি।

❀

ঝাঁকুনিও শরীরের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর। এর মূলে কাজ করে মূলত পথ-ঘাটের ব্যাপারটা। ইদানীং শহরগুলোর পথ-ঘাট নানারকম গর্তে ভরা। তা ছাড়া মসৃণতাও কম। এ সব পথে গাড়ি চলার সময় পুরো গাড়িটাই নানাভাবে দুলতে থাকে। ফলে, চালক তো বটেই, তার ভেতরে যাঁরা যাত্রী তাঁরাও ঝাঁকুনির অংশীদার হন। দিনের পর দিন এভাবে চললে স্বাস্থ্যের হানি হয়।

আর এক ধরনের কম্পনের উৎস গাড়ির

ইঞ্জিন। গাড়ি বলতে এখানে বাস, ট্রাক প্রভৃতিই বোঝাচ্ছি। অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছেন, গাড়ি কোন স্টেপে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে আপনি হাত রাখলেন। দেখবেন, আপনার হাত কাঁপছে। এর কারণ, ওই গাড়ির ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতিতে এমন কোন গোলমাল রয়েছে—যেমন কোন যন্ত্রাংশ হয়তো ঢিলে হয়ে গেছে, অথবা ফিটিং-এর কোন গোলমাল রয়েছে—যার ফলে পুরো গাড়িটাই কাঁপতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের পুরো দেহটিকেই কাঁপাতে থাকে। শরীরের স্বাভাবিক রক্তসংবহন, হৃদস্পন্দন, স্নায়বিক কার্যকর্ম এ সবের দরুন ব্যাহত হয়।

✼

প্রযুক্তি বিজ্ঞানীদের কাছে এ সবই আজ বড় রকমের সমস্যা। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নানারকম যানবাহনে যেখানে দৈনিক চলাফেরা করতে হয়, জনস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গটি নিশ্চয় সেখানে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এ কথা ভেবেই বিজ্ঞানীরা এখন রেলপথের কথা ভাবছেন, কিভাবে রেল বসালে, গাড়ির যন্ত্রপাতি অথবা বডি কিভাবে তৈরি করলে শব্দ, ঝাঁকুনি অথবা যন্ত্রের ত্রুটি-জনিত কম্পন কমিয়ে আনা যায়, তার চেষ্টা করছেন। যানবাহনের ভিড় যে সব পথে বেশী সেই সব পথের দু পাশের ঘরবাড়ির বাসিন্দারা শব্দের হাত থেকে যাতে রেহাই পান সে কথা মনে রেখে নগর পরিকল্পনা করছেন।

বলা বাহুল্য, বৈদ্যুতিক ট্রেনে চড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন শহর-গ্রাম করে থাকেন। কিন্তু ওই সব ট্রেনে বসে যে প্রচণ্ড শব্দ এবং ঝাঁকুনি তাঁদের সহ্য করতে হয়, জানি না, রেল কর্তৃপক্ষ সে ব্যাপারে কতখানি সজাগ। সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কিছু না করা হলে, একটা বড় রকমের ঝুঁকি নিয়েই যাত্রীরা পথ চলেন বলতে হবে। এবং আমাদের অনুরোধ, তাঁরা এ নিয়ে একটা সমীক্ষা করুন। যার বিষয়-বস্তুর মধ্যে থাকবে : এক, কোন্ কোন্ বগি কতটা শব্দ করে; দুই, রেলপথের কোন্ কোন্ জায়গায় বেশী শব্দ হয়; তিন ওই শব্দ যাত্রীদের সহনশীলতাকে কত পীড়িত করে; চার, কি কি ব্যবস্থা নিলে ওই সব সমস্যা কমিয়ে আনা যায়।

প্রাণিবিজ্ঞানীদের সভা

২৬ জুলাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে জুলজিক্যাল সোসাইটি তাঁদের ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা উদ্‌যাপিত করলেন। কর্মসচিবের বিবরণ পাঠ করেন ডঃ শান্তিগোপাল পাল এবং কোষাধ্যক্ষের বিবরণ ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ শচীপ্রসাদ রায়চৌধুরী তাঁর সভাপতির ভাষণে জীবতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ইদানীং জীন মিউটেশন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাগারে যে সব কাজকর্ম হচ্ছে, অদূরে ভবিষ্যতে তার সাহায্যে বহুমূত্র, স্কিজোফ্রেনিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি তো সারানো যাবেই, তা ছাড়াও ভ্রূণ অবস্থাতেই পরীক্ষা করে হয়তো বলা যাবে, ওই ভ্রূণ ভবিষ্যতে তার পরিপূর্ণ জীবনকালে কোন কোন দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে গর্ভপাত ঘটিয়ে একটি রুগ্ন মানুষকে আমরা নাও আহ্বান জানাতে পারি। ধন্যবাদ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

উল্লেখ করা যেতে পারে এই সংস্থাটি গত ২৮ বছর ধরে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে। যার নাম প্রোসিডিংস অভ দ্য জুলজিক্যাল সোসাইটি। ভারত এবং বিদেশের বহু নামী বিজ্ঞানী এর লেখক। এ ছাড়া এঁদের গ্রন্থাগারটি প্রাণিবিজ্ঞানের গবেষকদের কাছে একটি বড় রকমের সম্পদ। এঁরা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষৎ এবং এন সি এস টির কাছ থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছেন।

সমরজিৎ কর

খবরের কাগজে প্রায়ই দেখতে পাই কোথাও একটা দীঘি বা পুকুর খনন করতে গিয়ে পুরানো দিনের কোন দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে—কোনটা পাথরের, কোনটা ব্রোঞ্জের, কোনটা বা অষ্ট-ধাতুর। দেবতারা অমর, কাজেই কয়েক শতাব্দী মাটি-চাপা থাকলেও কংকালে পরিণত হন না, সশরীরেই অবস্থান করেন বড় জোর হাত পাভাঙা অবস্থায়। ভাঙা হোক, আস্ত হোক সমাদরের কোন ত্রুটি হয় না। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়; তাঁরা এর পৌরাণিকতা নির্ণয় করেন—সেন রাজা, পাল রাজাদের আমলে চলে যান। এসব খবর যখন পড়ি বা শুনি তখনই একটি প্রশ্ন আমার মনে জাগে—এই যে আজ কবছর ধরে সি এম ডি-এ কলকাতা শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করে একাকার করল, কই কোথাও একটা যৎসামান্য সামগ্রীও তো মাটির তল থেকে বের হল না—পাথরের বা ব্রোঞ্জের নাই বা হল, ইঁট কাঠেরও কিছুই পাওয়া গেল না! আপনারা বলবেন, কলকাতা প্রাচীনত্বের দাবি করে না; শহর বন্দরের সমাজে সে অর্বাচীন। সে আমি খুব জানি। এই তো সেদিন ওর জন্ম, এখনও বয়স তিন শ বছর পূর্ণ হয়নি। ঐতিহাসিকেরা পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে স্থির করেছেন যে ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে জব চার্ণক তাঁর লোকলস্কর সমেত জাহাজ নিয়ে গঙ্গার তীরে সুতা-নুটি গ্রামের ধারে নোঙর ফেলেছিলেন। সেদিন কলকাতার জন্ম হল। আপনাদের কাছে চুপি চুপি বলছি ২৪শে আগস্ট আমারও জন্ম দিন—তাই বলে অবশ্য ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে নয়, তার অনেক পরে। তাহলেও একই তারিখে জন্ম বলে কলকাতার সঙ্গে আমার একটা নাড়ীর যোগ আছে, ওর সঙ্গে আমার স্বভাবের মিলও অনেকখানি। এ প্রবন্ধের নামকরণে কলকাতা সম্পর্কে যে বিশেষণটি প্রয়োগ করেছি সেটি আমার প্রতিও প্রযোজ্য। অর্থাৎ কলকাতা যেমন ভেতর-ফোঁপরা, আমিও তেমনি। সে কথাই বলছিলাম। জন্ম-মুহূর্তেই শহর বন্দর হয়ে ওঠেনি, সে কথা মানি কিন্তু সুতানুটি, গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রামগুলো ছিল তো। সে সব গ্রামে পৌরাণিক নিদর্শন কিছুই ছিল না? দেব ধর্মের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিদেশী ব্যবসা-দারদের মতো দেশী বেনিয়ানরাও যে দু হাতে টাকা লুটেছিল সে সব কোথায় গেল? মাটির তলায় দু দশ ঘড়া মোহরও পাওয়া গেল না, কিম্বা বাদশাহী আমলের টাকা? ভাবলে হাসি পায়, দেশের সর্ববৃহৎ প্রত্ন-নিদর্শনাগারটি কলকাতায় অবস্থিত কিন্তু কলকাতার নিজস্ব দান তাতে কিছু নেই। সত্যি বলতে কি, ঐ ওর স্বভাব (বলা হল্যে আমারও)। স্বভাবটা কি জানেন? স্বভাবটা হল—পরের ধনে পোদ্দারি।

সত্যি বলছি, কলকাতা যে এতখানি অন্তঃসারশূন্য সে আমার জানা ছিল না। বোধ করি বয়সে নবীন বলেই ও একটু ফাচকে স্বভাবের, ওর মধ্যে গভীরতা নেই ভূগর্ভে যে কিছু তার সঞ্চয় নেই সেটা ওর ঐ স্বভাবসিদ্ধ অগভীরতার ফলে। নিজ নিজ দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি সকল মানুষেরই একটা আন্তরিক টান থাকে। সেখানে আধুনিক ভাবাপন্ন শিক্ষিতরাও অল্পবিস্তর রক্ষণশীল। শুধু দেশ নয়, নিজ শহর বা গ্রাম সম্বন্ধে সামান্যটুকু নিয়েও মানুষ কত গর্ব করে। কলকাতার সেই রক্ষণশীলতা নেই। সে এমন উগ্র রকমের আধুনিক যে রক্ষণশীল বলতে গেলে তেড়ে মারতে আসবে। সে নিত্য নতুনের পক্ষপাতী, পুরোনোকে আমল দেয় না। নিজের কত কত গর্বের জিনিসকে সে ভুলে গিয়েছে, কত মান্যজনকে অমান্য করেছে। রামমোহন এই শহরের আদি যুগের অধি-বাসী—তাঁর নিজ কালেও কলকাতা তাঁকে

খবে একটা পাত্তা দেয়নি. এ কালেও দিচ্ছে না। কলকাতা ছেড়ে বিদেশে গিয়ে দেহরক্ষা করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবৎকালে কলকাতাবাসীর যত গাল খেয়েছেন এমন আর কেউ নন, আর এই সেদিন তো কলকাতা তার মুণ্ডপাত করে ছেড়েছে। বিবেকানন্দের মুখে কালি মাখিয়েছে। অথচ ও যে মানুষকে সম্মান করতে জানে না এমন নয়। মেজাজ ভালো থাকলে বিদেশীকেও সম্মান দেখাতে জানে। লেনিন-এর মূর্তি আমাদের আর কোন শহরে আছে, হো চি মিন্-এর নামে এদেশে আর কোথায় রাস্তার নামকরণ হয়েছে ?

আসল কথা, ওর মতিস্থির নেই। কি চায়, কি পেলে খুশি হয় নিজেই জানে না—ফলে কোন কিছুর প্রতিই ওর মমতা নেই। সেজন্যেই ওর কোন সঞ্চয় নেই, ও কিছু রাখতে পারেনি। ও যেমন কিছু ধরে রাখেনি, ওকেও কেউ ধরে থাকতে চায়নি, ছেড়ে ছেড়ে গিয়েছে। বিদেশীরা কলকাতায় এসে বলে—সিটি অব রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি এখানে থেকেছেন? কলকাতা তাঁর ভালো লাগে নি, কলকাতার বাইরে গিয়ে বাস করেছেন। বিবেকানন্দের জন্মস্থান কলকাতা—তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন, পরিব্রাজক হয়ে দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ালেন। চিত্তরঞ্জন কলকাতার সমস্ত সম্পত্তি সর্বস্ব ত্যাগ করে বিলিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আর সুভাষচন্দ্র? তিনিও কি থাকতে পারলেন? তিনি থাকলে কলকাতার আজ এই দশা হত না, দেশেরও এমন দুর্দশা ঘটত না। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের কথা আগেই বলেছি; পরবর্তীকালের সুরেন বাড়ুজ্যে, আশু মুখুজ্যে কাউকেই সে নদায্য মূল্য দেয়নি। নিত্য নতুনকে যে চায় গড়ানে পাথরের মতো কপালে তার শেওলা জোটে না। যে ইংরেজ এ শহরের পত্তন করেছিল সে ইংরেজই কি থাকতে পেরেছে? মাঝে মাঝে মনে সংশয় জাগত শেষ পর্যন্ত বাঙালীরাই কি থাকতে পারবে না, মারোয়াড়ী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজীরাই সমস্তটা জুড়ে বসবে। এক সময়ে ইংরেজের শহরে দুনিয়ার সব দেশের লোক ছিল, কিন্তু বসীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। দেশ বিভাগের পরে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা এসে কলকাতায় আস্তানা গেড়েছে। তাতে ওর বাংগালী মূর্তিটা হঠাৎ যেন ফুটে বেরিয়েছে। পুরনো পরিভাষায় বলতে গেলে চেহারাটা হয়েছে অতিমাত্রায় 'নেটিভ'। আগের সেই কসমোপলিট্যান চেহারা নেই। এ যুগে আস্তানা দিতে হবে সকলকেই কিন্তু আস্কারা কাউকেই নয়। ইংরেজকে আস্কারা দিয়ে অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। কিন্তু বলছিলাম কি, এই যে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়, ঢং বদলায়, মন বদলায়—এটা বড় সুলক্ষণ নয়। কোন কিছুকেই এঁটে ধরে না, কাউকেই পাত্তা দেয় না। ফলে হবে কি, ওকেও কেউ আর পাত্তা দেবে না। এখনই তো সেই দশা। কে পোঁছে? ভাবলে দুঃখ হয়, একদিন ছিল রাজধানী। রাজমহিমা তো সেই কবেই গিয়েছে। তারপরেও বহুদিন ছিল সুয়োরানী; ইংরেজ রাজের সৌভাগ্য সূচনা এখানেই হয়েছিল বলে ইংরেজ কোনদিন ওকে অনাদর করেনি। সেকেণ্ড সিটি অব দা এম্পায়ার হিসাবে ইংরেজ যথাসম্ভব ওর মান মর্যাদা রক্ষা করেই আসছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সুয়োরানী হয়েছে দুয়োরানী। এখন কে ওকে দেখে? ইংরেজের আমলে যেখানে ছিল পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস, এখন তার দ্বিগুণেরও বেশি। বিরাট সংসারের ভার ও আর সামলাতে পারছে না; অভাব অনটনে জর্জরিত, ঝামেলার নেই অন্ত। আবর্জনাকুণ্ডের মধ্যে পড়ে আছে; দরজায় ঝুলেছে চট, দেয়ালের গায়ে ঘুঁটে। ঘুঁটেকুড়োনীর মতোই চেহারা হয়েছে। ছেলেগুলোও মানুষ হয়নি। যাদের অর্থে সামর্থ্যে কুলিয়েছে তারা দূরে সরে গিয়ে চটকদার সব বাড়ি করেছে, এখন সে সব জায়গাকেই বলে কলকাতা। দুঃখিনী মায়ের দিকে ফিরেও তাকায় না। আরেক দল এরও বাড়া। তারা ভয়ংকর মাতৃভক্ত সেজে রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে—আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা/মানুষ আমরা, নহি তো—থাক্, কথাটা উচ্চারণ না করাই ভালো, কে আবার গায়ে পেতে নেবে। এদিকে শুনে শুনে মায়ের তো কান ঝালাপালা। বলে, একটু থামো দিকি তোরা। আমি মরি আমার জ্বালায়, তোদের চ্যাঁচানি শুনলে মনে হয় তোদের ফূর্তির অন্ত নেই।

সন্তান কি রাজনীতি দিয়ে মায়ের দুঃখ দূর করে? দুঃখটা যেখানে অভাব অনটনের সেখানে মায়ের ভাঁড়ারে নিত্য রসদ জোগাতে হবে। সেটা তো বুলি আওড়িয়ে হবে না। প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনমান খাটতে হবে তবে তো মায়ের অভাব পূর্ণ হবে। কাজে ঠিক এর উল্টোটা হচ্ছে। কলকাতায় দুদিন পর পরেই বন্ধ। কলকারখানা বন্ধ, আপিস আদালত বন্ধ, যানবাহন বন্ধ, বন্দরে মাল ওঠা-নামা বন্ধ। হামেশা যদি এসব ঘটতে থাকে তাহলে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না। গত কুড়ি বাইশ বছর ধরেই দেখছি কলকাতা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ফলে আর্থিক দুর্গতি দিনে দিন বাড়ছে।

এককালে কলকাতা লক্ষ্মী সরস্বতী দুএরই আরাধনা করেছে সমান উৎসাহে, সমান নিষ্ঠায়। বন্দরের কথায় মনে হল, আজ যে বন্দরে কাজ চলে ঢিমে তালে সেই বন্দরই একদিন কলকাতাকে শ্রীমন্ত করেছিল, বন্দরের পথ দিয়েই লক্ষ্মী এসেছিল শ্রীমন্ত সদাগরের ঘরে। গঙ্গার দু তীরে সার বেঁধে কলকারখানা গড়ে উঠেছিল কলকাতা ছিল দেশের বৃহত্তম ব্যবসার কেন্দ্র।

মা গঙ্গা যে তাঁর বেণীটি এলিয়ে দিয়েছেন সাগরের দিকে তারই মধ্যে লক্ষ্মীর ঝাঁপিটি বাঁধা। স্যামসন-এর শক্তি যেমন ছিল তাঁর চুলের গুচ্ছে লুক্কায়িত, তেমনি কলকাতার ধনবল জনবলের রহস্য ছিল ভাগীরথীর বেণীর সঙ্গে যুক্ত। যেদিন ঐ বেণী সংহার হবে সেদিন কলকাতার ব্যবসা বাণিজ্য সবই গুটিয়ে নিতে হবে। গঙ্গার স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসছে আজ বহুদিন থেকে, আগে নজর দেওয়া হয়নি। এখন ফরাক্কা কতটুকু কি করতে পারবে মা-গঙ্গাই জানেন। ইদানীং নানা স্থানে নতুন নতুন বন্দরের পত্তন হচ্ছে; প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তাতেও কলকাতা বন্দরের প্রতিপত্তি কমে যেতে পারে।

কলকাতার বৈভব বাড়িয়েছিল ঐ বন্দর আর কলকাতার প্রভাব বাড়িয়েছিল মধ্য কলকাতার গোলদীঘির অঞ্চল। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, এ যুগের শিক্ষা দীক্ষার সূচনা ওখানেই হয়েছিল। কলকাতার তথা বাঙালী মনীষীর স্ফূর্তি এবং বাঙালী প্রতিভার দীপ্তি ওখান থেকেই সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ গাঙ্গেয় স্রোতের সঙ্গে বঙ্গীয় মনীষার স্রোতও ক্ষীণ হয়ে আসছে। বাঙালীকে বলা হয়েছে আত্মবিস্মৃত জাতি, কিন্তু কলকাতার মতো এমন আত্মবিস্মৃত শহর আমি দেখিনি। আজকের ছেলেমেয়েরা কলকাতা বলতে বোঝে বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, নিউ-আলিপুর ইত্যাদি অঞ্চল। শহর যেখানটায় গায়ে গতরে বেড়েছে সেখানটারই নাম হয়েছে কলকাতা। যেখানটায় ছিল ওর মাথা, মুখ চোখ নাক, যেখানে ছিল ওর আসল পরিচয় সেখানটাকেই ভুলেছে। মধ্য কলকাতার গোলদীঘি অঞ্চলেই হিন্দু কলেজ, সংস্কৃত কলেজকে কেন্দ্র করে আধুনিক যুগের প্রথম স্পন্দন দেখা দিয়েছিল। শুধু আধুনিক বঙ্গ নয়, আধুনিক ভারতবর্ষেরই জন্ম হয়েছে সেখানে। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতাব্দীকাল ধরে সেই শিক্ষা সংস্কৃতির প্রধান বাহন হিসাবে কাজ করেছে। এখন তারও গৌরব অস্তমিত। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ছাড়াও ধর্মে সমাজে রাজনীতিতে সর্বপ্রকার অগ্রগামী চিন্তার উৎপত্তি স্থল ছিল মধ্য এবং উত্তর কলকাতা। কলকাতার ইতিহাসই যে ভারতীয় রেনেসাঁস-এর ইতিহাস সে কথাই কলকাতা আজ ভুলে যাচ্ছে। এককালে কলকাতা কি বলে, শুনবার জন্যে সারা দেশ উৎকর্ণ হয়ে থাকত। এখন কেউ শোনে না ওর কথা বরং উঠতে বসতে ওকেই দশ কথা শুনিয়ে দেয়। আগে কলকাতার চিন্তা দেশকে পথ দেখিয়েছে, কলকাতার ভাবনা দেশকে ভাবতে শিখিয়েছে। এখন আর ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন নেই, চেঁচালেই হল চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করা যায়, দেশকে মাতানো যায় না। সত্যি বলতে কি, এখন কলকাতার স্বভাবে একটা পাড়াগেঁয়ে ভাব এসে গিয়েছে, পুরোনো দিনের সেই আরব্যানিটি বা মার্জিত রুচিটি আর নেই। সব দিয়ে থুয়ে এখন তার একমাত্র গর্ব সে দেশের বৃহত্তর নগরী। কিন্তু মেদবৃদ্ধি হলেই যে শ্রীবৃদ্ধি হয় না, সেকথা ভেবে দেখে না। জনবলের সঙ্গে যদি ধনবল বাড়ত তাহলেও না হয় কথা ছিল। বাস্তবিক পক্ষে দেশের বৃহত্তম নগরীটি এ মুহূর্তে দেশের দরিদ্রতম নগরী। সাংসারিক দারিদ্র্যের সঙ্গে বাঙালী জীবন যথেষ্টই পরিচিত। কিন্তু অন্যবিধ দৈন্য—বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্রের দৈন্য এমন প্রকট হয়ে ইতিপূর্বে কখনো দেখা দেয়নি।

রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ আকারে এত ক্ষুদ্র যে কলকাতাই তার বারো আনা জুড়ে আছে। বলতে গেলে কলকাতা দিয়েই তার পরিচয়। সেদিক থেকে কলকাতার দায়িত্ব এখন আরো বেড়ে গিয়েছে। বাইরের লোক কলকাতাকে যদি হেলাফেলা করতে শুরু করে তাহলে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গকেই কৃপার চক্ষে দেখবে। কলকাতার উপরে একবার আস্থা হারালে বাঙালীর উপরে আর আস্থা থাকবে না। বাংলা দেশকেও একথা স্মরণ রাখতে হবে। কলকাতার যে দায়িত্ব, ঢাকার সেই দায়িত্ব। বাংলা দেশে তবু ঢাকা ছাড়াও বন্দর হিসাবে চট্টগ্রামের কিছু প্রাধান্য আছে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা বাদ দিলে আর কিছু থাকে না। কিন্তু এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন কালের কথা বলছি না; এই কলকাতার যখন জন্ম তখনও মুর্শিদাবাদ জীবন্ত, কৃষ্ণনগর শ্রীমন্ত। অত্যল্পকাল পরে শ্রীরামপুরে ইংরেজের কর্মোদ্যোগ, চন্দননগরে ফরাসীর। কিন্তু আজকের কলকাতা হিন্দু মুসলিম,

ইংরেজ ফরাসী কোন আমলকেই আর আমল দিচ্ছে না।

ইংরেজ রাজত্ব নানা দোষে দুষ্ট। তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজের কাছ থেকে কলকাতা অনেক কিছু পেয়েছে, শিখেছে, জেনেছে। কলকাতার জীবন তাতেই নানা ভাবে পুষ্টি লাভ করেছিল। আলগা বিলিতিয়ানাকে গঙ্গাজলে ধুয়ে স্বদেশী ধ্যান ধারণার সঙ্গে দিব্যি মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছিল। গত এক শতাব্দী ধরে সেটাই বাঙালী কালচার নামে পরিচিত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরে আমরা ইংরেজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। ইংরেজকে ছেড়ে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতাম তাহলেও হত। কিন্তু, এখন আবার নতুন মুরুব্বি ঠাউরেছি—একদিকে রাশিয়া, অপর দিকে আমেরিকা। রুশ বিপ্লব বলতে তার যে বিপুল কর্মসাধনা সেটি আমরা গ্রহণ করিনি; আমরা শুধু তার থিওরী কপচাতেই ব্যস্ত। অর্থাৎ উপরকার ফেনাটুকু এবং সূর্যালোকিত অসংখ্য বুদ্বুদ কণিকায় রঙ-এর খেলা দেখেই আমরা রোমাঞ্চিত, উল্লসিত। রুশ এবং চীন বিপ্লবের পশ্চাতে যে আদর্শের প্রেরণা রয়েছে সেটা অবশ্যই ছোট কথা নয়। আমেরিকার জীবনদর্শনে তেমন কোন আদর্শের বালাই নেই। ইন-ডাস্ট্রিয়েল যুগের কল-কৌশলগুলি সে শক্ত হাতে রপ্ত করেছে, বিশ্ব-জোড়া এক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে এবং অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে বসেছে। রাতারাতি হঠাৎ গজানো বড়মানুষির স্থূল প্রকাশ সকল কথায়, সকল কাজে; নবাবীর ছাপ সর্বাঙ্গে। আজকের কলকাতার জীবনে তার ছাপ পড়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে বহু আমেরিকান ছেলেমেয়ে এখানে এসে ভিড় করেছে। এই যে কলকাতার জীবনে একটা ফচকেমির ভাব এসেছে—আচারে ব্যবহারে, চাল চলনে—এর অপর নাম ইয়াংকীপনা। আমেরিকার স্বভাবে গম্ভীরতার অভাব। ভাসা ভাসা উপর চালাকির ভান। সেটি এখন কলকাতাকে পেয়ে বসেছে।

কলকাতার বয়স তিন শ' বছর হতে চলল। এখন তাকে সাবালক হতে হবে; নাবালক-সুলভ অনুকরণপ্রিয়তা ছাড়তে হবে। নিজের উপরে আস্থা থাকলে তবে সস্তা অনুকরণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রহরে পাছে দেশ নতুনের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে দেয় সেই ভয়ে রামমোহন আমাদের নিজ সম্পদের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বেদ বেদান্ত গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে দিয়ে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিলিতিয়ানার পীঠস্থান হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিলিতি পোশাক, বিলিতি হাল-চাল কখনো বরদাস্ত করেননি। মাইকেল-এর ন্যায় উৎকট বিলিতি ভাবাপন্ন মানুষের এক সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান হিন্দু, অপর সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু আমাদের জাতীয়তাবাদের জনক। মধুসূদনও পরে আপন ভুল বুঝতে পেরে বলেছিলেন—'মাতৃকোষে রতনের রাজি' ভুলে গিয়ে পরদ্বারে ভিক্ষা যাচঞা করেছেন। যুগ-সন্ধিকালে একটু আত্মসচেতন থাকতে হয় নতুবা দিশেহারা হতে হয়। কলকাতার এখন সেই আত্মহারা অবস্থা। গোড়াতে কলকাতাকে যে অন্তঃসারশূন্য বলেছি সেটা এই কারণেই বলেছিলাম। গাল দেবার জন্যে বলিনি, মনের দুঃখেই বলছি।

সাবানের জন্মকথা

ডিটারজেণ্ট শব্দটির ব্যবহার আধুনিক কালের। পরিষ্করণ বস্তু অর্থে "ডিটারজেণ্ট" ব্যবহার হয়। আসলে ডিটারজেণ্ট সাবান বই আর কিছু নয়। সাবান সবচেয়ে পুরোনো পরিষ্কারক। কে আবিষ্কার করেছিল জানা কঠিন। তবে ২০০০ বছরেরও আগে সাবানের ব্যবহার হয়েছে। জলে ধুয়ে পরিষ্কার করা মানব সভ্যতার প্রথম অধ্যায়ে কে আরম্ভ করেছিল তার খবর কেউ রাখে না। হয়তো বা সে সময় তেল, লতাপাতার রস ইত্যাদি ব্যবহার হতো। রোমানরা গাল বা প্রাচীন ফ্রান্সের অধিবাসীদের কাছ থেকে সাবান বানাবার কায়দা শিখেছিল। তারা আবার শিখেছিল ফিনিশিয়ানদের কাছ থেকে। কিন্তু লিখিত ইতিহাসে প্রথম শতাব্দীতে রোমান লেখক প্লিনি সাবানের উল্লেখ করেছিলেন। ১৭৪৮ সালে যখন ধ্বংস হওয়া পম্পিয়াই শহরের খনন হয় তখন একটি বড় সাবানের কারখানা মেলে। আজকে আমরা যে সাবান ব্যবহার করি সে সাবানের মতই প্রায় তৈরী সাবান বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং অ্যামোনিয়াম সল্ট জলে মিশে যায়। ফেনা হওয়া ও পরিষ্কার করার গুণ এতে আছে। এই ক্ষার পদার্থ তেল বা অন্য কোন স্নেহের সংগে মিশিয়ে সাবান হয়। এ প্রক্রিয়ার নাম "Saponification"। ১৭৯১-এ নিকোলাস লেবলেন নামে বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম সোডা তৈরি করেন। তারপরই উনবিংশ শতাব্দীতে সাবান হয়ে উঠলো ঘরোয়া ব্যাপার। নিত্য-ব্যবহারের একটি জিনিস। ফরাসী রসায়নজ্ঞ মাইকেল ইউজিন শেভরেল ১৮২৩ সালে পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, জান্তব স্নেহ ব্যবহার করলেও Saponification সম্ভব। ক্রমশ দেখা গেল সাবানের জন্য তিমি মাছের তেল নিয়ে গরুর চর্বি পর্যন্ত ব্যবহার চলে। ওদিকে নারকেল তেল, সয়াবিনের তেল, জলপাইয়ের তেল ইত্যাদি বহু প্রকার উদ্ভিদ তেলও সাবানে সমানভাবে চলতে পারে। সাধারণ শক্ত সাবানে কস্টিক সোডা ব্যবহার হয়। নরম সাবানে কস্টিক পর্যাপ্ত দেওয়া হয়। ক্ষার ও স্নেহের পরিমাণ খুব সাবধানে হিসাব করতে হয়। ক্ষার পদার্থ বেশী হলে ত্বক জ্বলে যাব বা কাপড় কাচলে কাপড় পচে যাবে। স্নেহ বেশী হলেও বিপদ। সাবান তৈলাক্ত হব।

গায়ে মাখার সাবান অতি যত্ন সহকারে বানানো দরকার। ভাল স্নেহযুক্ত সাবান ত্বকের পক্ষে উপকারী। কাচাকুচি বা গাহস্থালির অন্য কাজের জন্য ব্যবহৃত সাবানে কখনও বা রজন ব্যবহার হয়। রজনে এমন অ্যাসিড আছে যা কস্টিক সোডার মিশ্রণে রজন সাবান প্রস্তুত হয়। রজন অন্য স্নেহ পদার্থের থেকে সস্তা। শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ রজন ব্যবহার সাবানে ফেনা ভাল হয় এবং সাবানটি বেশ চকচকে দেখতে হয়। তবে কাচবার সাবানে রজন বেশী হলে অনেক সময় কাপড়ে হলদে দাগ হতে পারে।

গ্লিসারিন বা চিনি মেশালে সাবান স্বচ্ছ হয়। ময়লা কাটানোর ব্যাপারে স্বচ্ছতা কোন সাহায্য করে না। কিন্তু গ্লিসারিন সাবান ত্বককে কোমলতা দেয়, ত্বক রুক্ষ হয় না। রুক্ষ, আর্দ্রতাবিহীন আবহাওয়ায় গ্লিসারিন সাবান ব্যবহার উপযোগী। অথবা যাঁদের দেহত্বক আর্দ্রতাবিহীন তাঁরা সাবানের গ্লিসারিনে ত্বক কোমল রাখতে পারবেন। গন্ধক, হেক্সাক্লোরোফিন ইত্যাদি মিশিয়ে জীবাণুনাশক সাবান তৈরী হয়। কার্বলিক সাবান কড়া জীবাণুনাশক বলে প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বেশী স্নেহযুক্ত সাবানে ভাল ফেনা হয়, দেহত্বক নরম ও সুকুমার রাখে। একথা সর্বদা মনে রাখবেন। বেবি সাবান বা স্যাম্পু এমন ভাবে তৈরী হয় যাতে শিশুর চোখে লাগলে কষ্ট না হয়। ক্ষার পদার্থ এতে কম দেওয়া হয়।

গায়ে মাখা সাবানে সাধারণত শতকরা

পাঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ স্নেহ থাকা উচিত। বাকি ক্ষার ও জলীয় অংশ। সুগন্ধ ও রং সামান্যই থাকে। স্পেশাল সাবানে যা সংযোগ করা হয় তার পরিমাণও কমই। স্পেশ্যাল সাবান বহু ধরনের হয়। স্বচ্ছ, জীবাণুনাশক, ঔষধ মিশ্রিত, দুর্গন্ধনাশক ডিটার্জেণ্ট কোমলতা আনে ইত্যাদি।

ডিটার্জেণ্টের বেলায় কাপড় বা যা কিছু ধোবেন তা যেন ঘণ্টা দুই ভিজোনো থাকে। এমন কি রঙীন না হলে রাতে ভিজিয়ে রাখবেন। তাতে অতি সহজে ময়লা কাটবে। সাবানের গোলা বা টুকরো দিয়ে ঘষলে এ উপকার হয় না যা ডিটার্জেণ্টে হয়। ডিটার্জেণ্ট ময়লা জিনিসর ময়লা ঢিলে করে ময়লা কাটাবার সাহায্য করে। দেখে থাকবেন একটি পোকা জলে পড়ে গেলে কেমন ভেসে থাকে, সহজে ডুব যায় না। এও অনেকটা সেরকম। জলের উপরে যেন আঁটো একটি সর থাকে। একটি পাত্রে জলের ফোঁটা ফেলুন, তাও ফোঁটা হয়েই থাকে। ডিটার্জেণ্ট জল ও ময়লা জিনিসটির সংযোগ সহজ করে দেয়। জল ছড়িয়ে পড়ে। ময়লা আলগা হয়ে গেলে সামান্য ঘষা বা নাড়াচাড়া হলেই ময়লা স্থানচ্যুত হবে, কাজেই গৃহিণীর পক্ষে কাচাকুচি সহজ হয়।

টুকিটাকি

সাবানে তেল ব্যবহার হয়। তার মধ্যে খাদ্যতেলও আছে। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি এবং খাদ্য ও পুষ্টি সমস্যায় খাদ্যতেল বাদ দিয়ে অন্য নানারকম তেলের সন্ধান করছেন সাবান প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলি। তেল যেমন দীর্ঘদিন রেখে দিলে দুর্গন্ধ বা বিস্বাদ হয়, তেমনই তৈলাক্ত সাবান, বিশেষত গায়ে মাখার সাবান তেলতেলে হয়ে যায়। কটু গন্ধ আসে।

খর জলে সাবানের ফেনা ভাল হয় না। ওই জলে সাবান দিয়ে মাথা ঘষলে চুল নিষ্প্রভ দেখায়। কাপড় কাচলে কাপড় তেমন সাদা হয় না।

রাসায়নিক প্রণালীতে তৈরী কৃত্রিম 'পরিষ্কারক' সাধারণ সাবানের দেড় বা দুই গুণ বেশী ময়লা কাটার ক্ষমতা রাখে। এই 'পরিষ্কারক' সহজে গলে এবং ঠাণ্ডা ও গরম জলে সমান কার্যকর হয়।

মাঝে সাবানের যে সমস্যা হয়েছিল, বর্তমানে তা অনেক কমেছে এবং বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কনজিউমার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ এবং দিল্লিতে কিছুদিন আগে ব্যাপক পরীক্ষার অভিযান চালিয়ে দেখেছেন যে, অনেক সাবান বাজারে গায়ে-মাখা সাবান হিসাবে চলছে, অথচ সেগুলি গায়ে-মাখা সাবান নয়। কাপড়-কাচা সাবান রঙ ও গন্ধ মিশিয়ে বাজারে গায়ে-মাখা সাবান বা টয়লেট সোপ হিসাবে বিক্রী হচ্ছে। এই সব সাবান ব্যবহার করে প্রায় আড়াই হাজার লোকের চর্মরোগ হয়েছে।

প্রায় সাত লক্ষ টন সাবান ও ডিটার্জেণ্ট আমাদের দেশে তৈরী হয়। তার অর্ধেকই হয় ছোটখাট অজানা প্রতিষ্ঠানে। তার মান নির্ণয় করা আরও কঠিন। ক্রেতা যেন সতর্ক থাকেন।

ভালভাবে প্যাক করে রঙ বা সুগন্ধি দিয়ে কাপড়-কাচা সাবান গায়ে-মাখা সাবান বলে চালালে সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা কঠিন। একটি সাধারণ উপায় হচ্ছে ওজন। গায়ে-মাখা সাবান একই আকারের কাপড়-কাচা সাবানের চেয়ে হালকা হবে।

সাবান প্রস্তুতকারকরা সস্তা তেল ব্যবহার করে পয়সা বাঁচান মাঝে মাঝে। খদ্দের কি করে সেটা ধরবে! কখনও বা সামান্য ওজনে ফাঁকি দেন। সাধারণ টয়লেট সাবানগুলি ১০০ গ্রাম ওজনের হয়। অবশ্য স্পেশ্যাল সাবান ৭৫ থেকে ১৪০ গ্রাম হতে পারে। ফাঁকি দেবার নানা পথ আছে। যেমন ধরুন, কোণগুলি গোল করে দিলে একটু সাবান বাঁচবে, কিন্তু চোখে ধরা যাবে না। সাবানের গায়ে কারুকার্য করে বা খাঁজ কেটে সাবান বাঁচানোর কায়দাও অনেকে অবলম্বন করেন। সম্প্রতি সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তাতে প্রত্যেকটি মোড়কে মোড়কের ভিতরের জিনিসের ওজন লিখে দিতে হবে। সাবানের বেলায় সেটি বিশেষ দরকার।

শ্রীমতী

পুরোনো কাপড়ে রঙ এনে দেওয়া

সাবান ময়লা দূর করে বটে, কিন্তু দীর্ঘ ব্যবহারে কাপড় যে বিবর্ণ হয় তার কি করা যায়? নীল ব্যবহারে সাদা কাপড়ের সাদা ভাব ফিরে আসে অনেকটা। হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করে পুরোনো কাপড়ের ছোপ উঠিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে ভাবনা থাকে কাপড় নষ্ট হবার বা পচে যাবার। সূর্যের আলোতে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রঙ আছে। যা দেখা যায় তা বেগুনি, বেগুনি-নীল, নীল, হলদে, কমলা ও লাল যে তরঙ্গ ভায়োলেটের চেয়ে ছোট বা যে তরঙ্গ লাল-এর চেয়ে বড় তা দেখা যায় না। কাপড় সাদা করার জিনিস সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রে ধরে দৃশ্য আলোতে পরিবর্তিত করে এবং তাতেই কাপড় উজ্জ্বল হয়। একে বলে ফ্লুরোসেন্স। সাধারণ লবণ একটু জলে দিলেও কাপড় উজ্জ্বল দেখায়। অবশ্য সাদা করার পদার্থের সঙ্গে দিলে আরও ভাল হয়। কারণ সাদা করার উপকরণ একরকম বর্ণহীন রঞ্জক। জলে মিশে যায় এরকম রঞ্জকের সঙ্গে বিশেষ মিল আছে। লবণ ব্যবহার করে যেমন রঙ পাকা হয় তেমন পরিষ্কার করার উপকরণে লবণ দিলে উপকার হয়।

আলোচনা

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ

গত ২রা অগস্ট, ১৯৭৫-এর 'দেশ' পত্রিকায় ('ভারতের অর্থনীতি' বিভাগে) শ্রীসুব্রত গুপ্তের লেখা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্বন্ধে নিবন্ধটি পড়লাম। সুব্রতবাবুর সঙ্গে আমরা একমত যে, "দেশের চৌদ্দটি বৃহৎ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের উদ্দেশ্য ছিল দেশের গরীব জনসাধারণ যাতে আরও বেশী করে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে সুফল ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা এবং কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়, রপ্তানি বাণিজ্য প্রভৃতি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলি যাতে আরও বেশী করে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পায় তা সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলির আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি ও শাখা সম্প্রসারণের কর্মসূচীর উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।"

যদিও জাতীয়করণের আগে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল, ১৯শে জুলাই ১৯৬৯ সালের জাতীয়করণের ঘোষণার পরে আমরা ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সুফল পেয়েছি। তবুও অনেক প্রত্যাশা এখনও পূরণ হয়নি। জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কের প্রভূত শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। আমানতের পরিমাণও বেড়েছে। দূর গ্রামাঞ্চলের চাষীরাও ব্যাঙ্কের ঋণ পাচ্ছেন। কিন্তু এই বিপুল কর্মযজ্ঞ এবং আনুষঙ্গিক অর্থব্যয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং গরীব চাষীভাইদের—যাদের হিতার্থে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়েছিল—কতটা উন্নতি করেছে তার একটা হিসেব নেওয়া প্রয়োজন। জাতীয়করণের পরে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন বিভাগের ক্রমবর্ধমান উন্নতি এবং সম্প্রসারণের তথ্য নানাস্থানে প্রকাশ করা হয়েছে। এই তথ্যগুলির সূত্রেই আমরা ব্যাঙ্কের অগ্রগমনের প্রকৃত পরিমাপ নির্ধারণ করতে পারি।

ব্যাঙ্কের মোট কৃষি-অ্যাকাউন্টের সংখ্যা জাতীয়করণের আগে, অর্থাৎ জুন ১৯৬৯-এ ছিল ১,৬৪,৪৮১ এবং মার্চ ১৯৭৩-এ তা বেড়ে হয়েছিল ১২,৭০,৫১৫। অর্থাৎ পাঁচ বছরে ৬৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ৭ লক্ষ গ্রাম এবং ৭০ কোটি কৃষি পরিবারের মাত্র ২ শতাংশ কৃষক এর দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের প্রভাব এখনও খুবই অকিঞ্চিৎকর। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট কৃষি অ্যাকাউন্টের সংখ্যা প্রতি বছর যে হারে পরিবর্তন হয়েছে তারও একটা নিজস্ব ইঙ্গিত আছে। ১৯৬৯-৭০ সালে অ্যাকাউন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৮৪ শতাংশ; ১৯৭০-৭১-এ ২৯ শতাংশ; ১৯৭১-৭২-এ ৩১ শতাংশ এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ১৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি বছরই চাষীদের মধ্যে অ্যাকাউন্ট খোলার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। কৃষিখাতে মোট ঋণদানের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ৮৫ শতাংশ; ১৯৭০-৭১-এ ১৮ শতাংশ; ১৯৭১-৭২-এ ১৪ শতাংশ; এবং ১৯৭২-৭৩-এ মাত্র ১০ শতাংশ। এই তথ্যগুলির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে, ব্যাঙ্কের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের লেনদেন প্রতি বছর বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে আনুপাতিক হারে কমছে। জাতীয়করণের প্রথম বছরে কৃষিখাতে অ্যাকাউন্ট এবং ঋণের পরিমাণ যে হারে লাফিয়ে উঠেছিল পাঁচ বছর পরে তার এই চুপসে যাওয়া আকার আমাদের এই উপসংহারে চালিত করে যে, ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণদানের জটিল ব্যবস্থাই গরীব চাষীদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের লেনদেন সম্পর্কের অবনতির কারণ।

এ ছাড়া ছোট এবং প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্কের ঋণদান পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু হিসেব নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বড় এবং বিত্তবান চাষীরাই সরকারী সুবিধা বেশী ভোগ করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের ঋণ কোন্ অর্থনৈতিক স্তরের কৃষিজীবী পেয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ২·৫ একরের নীচে যাদের জমি তারা মোট অ্যাকাউন্ট সংখ্যার ৪৫ শতাংশের অধিকারী। কিন্তু তারা মোট ঋণের মাত্র ২৪ শতাংশ পেয়েছেন। ২·৫—৫·০ একর জমির মালিকেরা ২৪ শতাংশ অ্যাকাউন্ট খুলে পেয়েছেন ২০ শতাংশ ঋণ; ৫—১০ একর জমির মালিকেরা ১৬ শতাংশ অ্যাকাউন্টের অধিকারী হয়ে পেয়েছেন ২০ শতাংশ ঋণ; ১০ একরের ঊর্ধ্বে জমির মালিকেরা মাত্র ১৪·৮ শতাংশ অ্যাকাউন্টের অধিকারী হয়েও পেয়েছেন ৩৪ শতাংশ ঋণ (মার্চ ৩১, ১৯৭৩ পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণের হিসেব।) অর্থাৎ সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকারী ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে এক শ্রেণীর গ্রাম্য পুঁজিপতির হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা

কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বড় জমির মালিকের পাতেই মুড়োটা পড়েছে। ছোট চাষীরা এঁটোকাটা নিয়ে খুশী থেকেছেন। কিন্তু ব্যাংক জাতীয়করণের সময় রিজার্ভ ব্যাংকের ঘোষিত নীতির মধ্যে একটি ছিল এই যে, গচ্ছিত মূলধনের ভিত্তিতে ঋণদানের নীতি পরিবর্তন করে ক্ষুদ্র অথচ উৎপাদনমূলক কর্মসূচীকে ঋণদান করা হবে। এখন দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়নি।

রাজ্যভিত্তিক যে ঋণদান করা হয়েছে তাতেও অসাম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। দক্ষিণ রাজ্যগুলি, অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক, পণ্ডিচেরী এবং লাক্ষা দ্বীপের চাষীরা মোট কৃষি অ্যাকাউণ্টের ৫৭·৪ শতাংশের অধিকারী হয়ে যেখানে মোট ঋণের ৩৫·২ শতাংশ পেয়েছেন, মধ্যাঞ্চলের রাজ্যদ্বয় মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ মাত্র ১২·২ শতাংশ অ্যাকাণ্টের মালিকানা সত্ত্বেও পেয়েছেন মোট ঋণের ১৬ শতাংশ, পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্য গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া দামন এবং দিউ ১৪·৯ শতাংশ অ্যাকাউণ্টের মালিকানার পরিপ্রেক্ষিতে পেয়েছেন মোট ঋণের ২৮·৩ শতাংশ এবং উত্তরাঞ্চলের দুইটি রাজ্য পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার কৃষিজীবীরা মাত্র ৬·৪ শতাংশ অ্যাকাউণ্টের অধিকারী হয়ে মোট ঋণের ১৪·১ শতাংশ পেয়েছেন। পূর্বাঞ্চলের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার কৃষকেরা ৮·৪ শতাংশ অ্যাকাউণ্টের অধিকারী হয়েও পেয়েছেন মোট ঋণের মাত্র ৬·১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ ৪·৩ শতাংশ অ্যাকাউণ্টের মালিকানার পরিপ্রেক্ষিতে পেয়েছে মোট ঋণের মাত্র ৩·৪ শতাংশ। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি রাজ্যের কৃষি অ্যাকাউণ্টের মালিকেরা অন্য রাজ্যের তুলনায় মাথা-পিছু অনেক বেশী ঋণ পাওয়ার সুবিধা ভোগ করছেন। সুতরাং রাজ্যভিত্তিক ঋণদানেও অসাম্যের প্রশ্ন আসছে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্প্রতি ঘোষিত ২১ দফা বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হল দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন করা। গ্রামের স্বল্পবিত্ত চাষীদের অগ্রগতির উপরে এই ঘোষণার পরিণতি অনেকাংশে নির্ভর করবে। সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার বুনিয়াদ গঠনের জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকগুলি যাতে ঠিকভাবে ঋণদান নীতি অনুসরণ করতে পারে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে। সরকারী ঋণের মাধ্যমে শুধু এক শ্রেণীর ধনী কৃষক যাতে লাভবান না হতে পারেন সেই প্রচেষ্টায় তাঁদের ব্রতী হতে হবে। সমগ্র দেশের আর্থিক উন্নতির কথা স্মরণ রেখে ঋণদানকে বহুমুখী এবং প্রয়োজনভিত্তিক করে তুলতে হবে। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র চাষীদের সংখ্যাও যেমন বেশী তাদের দারিদ্র্যও ততোধিক। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির তাদের দিকেই নজর দেওয়া বেশী প্রয়োজন।

বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-৪০

"কানে কম শোনেন"

দেশ ২৬ জুলাই সংখ্যায় শ্রীসমরজিৎ কর বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে তাঁর "যাঁরা কানে কম শোনেন" প্রবন্ধটিকে যথাসম্ভব তথ্যবহুল করার পরিশ্রম করেছেন—এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কতকগুলি তথ্য তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে অথবা তাঁর তথ্য সরবরাহকারী সূত্রগুলি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাঁকে যথাযথ অবহিত করতে পারেনিন।

১। শহর কলকাতায় কানে মাইক্রো-সারজারির হোতা নিঃসন্দেহে ডাঃ স্যামুয়েল রোজেন (১৯৫৬)। কিন্তু তাঁর পরে কে এ-কাজে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন? লেখকের মতে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ডাঃ পি কে খাসনবিশ। কিন্তু কর্ণরোগে শল্যচিকিৎসার প্রসারে পথিকৃৎ হিসাবে ডাঃ রোজেনের সমসাময়িক আর জি কর হাসপাতালের পরলোকগত মেজর এন দত্তের অবদান কলকাতার কোনও কর্ণরোগ বিশেষজ্ঞ ভুলে যেতে পারেন না।

২। কানের রোগ ওটোস্ক্লেরোসিসের চিকিৎসা সম্বন্ধে শ্রী কর যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে ভুল কিছু নেই, কিন্তু ওই রোগ চিকিৎসার আধুনিকতম পদ্ধতি হচ্ছে স্টেপিডেকটমি (Stapedectomy), এবং ওই পদ্ধতি বাহির বিশ্বে ১৯৬৪-'৬৫ থেকেই চালু হয়েছে। আমাদের শহর কলকাতায় ওই পদ্ধতিমত নিয়মিত চিকিৎসা হচ্ছে ১৯৭০ সাল থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোডের ক্যালকাটা হাসপাতালে।

৩। লেখক জানাচ্ছেন যে, কর্ণরোগ চিকিৎসায় মাইক্রো-সারজারির প্রচলনের ব্যাপারে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের পর আর জি কর হাসপাতালে চেষ্টা হয় এবং সম্প্রতি কারমাইকেল হাসপাতালে "ওই ধরনের ব্যবস্থার সূচনা করা হচ্ছে।" শ্রীসমরজিৎ করের ওই বক্তব্য ঠিক পরিষ্কার নয়। কেননা

কর্মযোগ চিকিৎসায় সংক্রামিতদের বিবিধ ধরনের শল্যজারি, যেমন স্টেপিডেক্টমি, ১৯৭০ সাল থেকে নিয়মিত এবং বহু সংখ্যায় ক্যালকাটা হাসপাতালে হচ্ছে। ওই হাসপাতাল ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান ও দক্ষিণপূর্ব রেল হাসপাতালেও স্টেপিডেক্টমি করা হয়েছে এবং সম্প্রতি এই মতোপযোগিতায় লটুন্টেশন হেকার হোমেও করা হয়েছে।

সবশেষে আর একটি কথা : ১০১৫ পৃষ্ঠার ছবির নীচে পরিচিতি বলছে—হাসপাতালে জনৈক রোগীর কানের ওপর মাইক্রো-শল্যজারি করা হচ্ছে। ছবিতে দেখছি ডাক্তারবাবু কোনও মাস্ক (mask) বা টুপী (cap) ব্যবহার করছেন না (যা সার্জেনরা

করে থাকেন)। তা তিনি নাই করলেন, কিন্তু অস্ত্রোপচার করতে গেলে কিছু অস্ত্রের প্রয়োজন আছে। সেগুলি কোথায়?

সত্যনাথ মজুমদার
কলিকাতা-২৬

শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ

গত ৯ই অগস্ট (১৯৭৫) 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সংগ্রাম সিংহ তালুকদারের পত্রখানি পড়লাম। এ-বিষয়ে আমি সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে—'শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালা দেবী' বিষয়ে লিখতে গিয়ে প্রবন্ধকার প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন কেন? হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের একটা সুস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় এবং যার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ওই পত্রাবলী থেকে 'উদার করে ধর্ম সম্বন্ধে' তাঁর 'মতটাকে প্রকাশ' করবার কথা ভেবেছিলেন। সম্ভবত এ-কথা মনে রেখেই প্রবন্ধকার সূচনাতেই কবির ধর্মমতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। দুঃখের বিষয়, অতি-সংক্ষিপ্ততার জন্য আলোচনার মধ্যে অস্পষ্টতা থেকে গেছে, ফলে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্বন্ধে অনেক পাঠকের মনেই খণ্ডিত-ধারণার জন্ম হতে পারে—এমন কি, প্রবন্ধের কোনো কোনো পঙ্‌ক্তির অপব্যাখ্যা হওয়াও অসম্ভব নয়। সেইজন্য পত্রলেখক সংগ্রামবাবুর উক্তি—"প্রবন্ধের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের ভাল লাগে নাই।" পড়ে মনে হয় যে, এর সংগত কারণ আছে। যখন এখানে ব্যাপক আলোচনার অবকাশ নেই, তখন প্রবন্ধকার অন্যভাবে প্রবন্ধের সূত্রপাত করতে পারতেন না কি?

প্রবন্ধকার লিখেছেন—"আদমসুমারিতে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] নিজেকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে অভিহিত করেছিলেন।" কিন্তু বিস্তারিতভাবে কিছুই বলেননি। প্রশ্ন—রবীন্দ্রনাথ সরাসরিভাবে কি নিজেকে কখনো 'হিন্দু ধর্মাবলম্বী' বলেছিলেন? শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭০ পৃঃ ১৫১) এ বিষয়ে আনুপূর্বিক আলোচনা করে লিখেছেন যে, ১৮৯১ সালে আদমসুমারি গ্রহণকালে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ সেনসাস অধ্যক্ষকে এক পত্রে জানান—"The members of the Adi Brahmo Samaj are really hindus." (দ্রঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)—কিন্তু এই উক্তিকে অত্যন্ত সতর্কভাবে গ্রহণ করতে হবে; 'হিন্দু' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না। আশা করি, সংগ্রামবাবু এবার বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করবেন।

পত্রলেখক সংগ্রামবাবু 'শান্তিনিকেতন' দ্বিতীয় খণ্ড থেকে 'সামান্য একটু অংশ' উদ্ধৃত করে 'কবির ধর্মমত সম্বন্ধে বিভ্রান্তি'-এর অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। এই উদ্ধৃত

'সামান্য একটু অংশ' ও উপসংহারের বক্তব্যটুকু পড়ে আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ যে 'ব্রাহ্ম' তা প্রমাণ করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত (৮ নভেম্বর ১৯৩২) রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্য করিনে।" এ-উক্তি থেকে আমি কি প্রমাণ করতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন না। না—তা পারি না। তাই প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক, কবির বিশেষ কোনো মুহূর্তের অ-সতর্ক মন্তব্যকে নিজের মত সমর্থনের প্রয়োজনে ব্যবহার করে কবিজীবনের বিচার করা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব-প্রসূত—যা আজকাল অনেকেই করে থাকেন।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কথাই উদ্ধৃত করি—"ধর্মমত আমার আছে, কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই।......আমি ধর্মসমাজের তকমাপরা ছাপ-মারাদের মধ্যে কেউ নই।" এই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক-অর্থ-সমন্বিত বক্তব্যের ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, আশা করি।

প্রবীরকুমার দেবনাথ
শান্তিনিকেতন

স্বদেশে দীক্ষার অভাব

গত ২রা আগস্ট "দেশে" অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'স্বদেশে দীক্ষার অভাব' শীর্ষক পত্রের উত্তরে আমরা যারা প্রবাসী বাঙ্গালী তাদের কিছু বলার আছে। ইংরেজ চলে গেছে, কিন্তু ইংরেজী যায়নি। ইংরেজী চলে গেলে হয়ত ভারতবর্ষে আমাদের ঠাঁই হত না, তার কারণ আমরা বাঙ্গালী। ইংরেজী চলে গেলে রাষ্ট্রভাষা হত হিন্দী এবং আমরা যারা বাংলাদেশে হন্যে হয়ে ঘুরেও চাকরি পাইনি তাদের পক্ষে রুটি রোজগারের জন্য বাংলার বাইরে আসা ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে'।

ইংরেজী আছে বলে ইন্টারভিউ দিয়ে হোক, লিখিত পরীক্ষায় পাস করে হোক আমরা অন্তত চাকরি জোগাড় করতে পেরেছি। হিন্দীময় জগতে আমরা কতখানি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারতাম সেটা জিজ্ঞাসা।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে শতকরা আশীজন চাকরিজীবী। বড় কোম্পানীতে বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরিজীবীদের স্থান হতে স্থানান্তরে বদলি করা হয়, এক্ষেত্রে সিনিয়র কেম্ব্রিজ ছাড়া আর অন্য কি রাস্তা আছে? আজকাল প্রায় সব প্রদেশেই একটা স্থানীয় ভাষা ঐচ্ছিক রাখা হয়, কোন কোন জায়গায় সেটা বাধ্যতামূলক। এ-হেন ভাষা সমস্যায় আমাদের ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে পাঠানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কে না চায় বাংলা ভাষায় নিজের ছেলেদের মানুষ করতে, কে না চায় বাংলার মেঠো ভাষায় উদাত্ত স্বরে দু কলি গান গেয়ে উঠতে, কিন্তু চাকরির বাজারে যখন দেখা যাচ্ছে সিনিয়র কেম্ব্রিজ-ধারী ছেলেরা অনর্গল ইংরেজী বুলি আউড়ে ইন্টারভিউয়ের চৌকাঠ সাবলীলভাবে অতিক্রম করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটি চোখের সামনে তুলে ধরছে তখন আমরা যারা বাবা, তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় আশা করি সে কথা বুঝিয়ে বলতে হবে না। "অমচিন্তা চমৎকারা" আশা করি এই সহজ ও সাবলীল সত্যটুকু নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন নেই।

সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বম্বে-৭৪

বিশ্ববিজ্ঞান

২ আগস্টের 'দেশে' সমরজিৎ করের লেখা অধ্যাপক দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের ওপর কিচারটি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। ব্যক্তিগত জীবনে আমি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র এবং দৌহিত্র। সমরজিৎবাবুর লেখাটি খুবই যথাযথ হয়েছে, তবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাদ গেছে। ১৯৪২(?) সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বরোদা অধিবেশনে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় প্রাণী ও পতঙ্গ বিভাগের সভাপতিত্ব করেন। বায়লজী অফ টারমাইটসের দু খণ্ডে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতবাদের শুধু উল্লেখ নয়, ২য় খণ্ডে তাঁর লেখা উইপোকার ভ্রূণতত্ত্বের (Embryology of termites) ওপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ও আছে। যতদূর জানি, গত সত্তর বছরে এই দুরূহ বিষয়ে মাত্র দু'জন উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন, তার মধ্যে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় একজন। এ ডি ইমস, যিনি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের মতবাদ গ্রহণ করতে পারেননি, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে কিন্তু দুর্গাদাসের উইপোকার ওপর মতবাদকে মর্যাদার সঙ্গে স্থান দিয়েছিলেন। ইমসের ব্যবহারে দুঃখিত হলেও ভেঙে পড়েননি; কারণ এই ঘটনার পর তিনি অনেক উচ্চমানের গবেষণা করেন এবং এই সমস্ত কাজের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি রয়েছে।

দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। অধুনালুপ্ত "প্রকৃতি"তে তাঁর লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভারতীয় চা-গবেষণা সংস্থা, টোকলাই গবেষণাগার, জোড়হাট, আসাম

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বাংলা ভাষার দুই ভগীরথ

বাংলা সাহিত্যের একদা তীক্ষ্ণ ও নির্ভীক সমালোচক এবং প্রতিভাসম্পন্ন প্রাবন্ধিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পর্কে শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের কৌতূহলোদ্দীপক অথচ তথ্যবহুল রচনা "অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বাংলা ভাষার দুই ভগীরথ" (দেশ। ১৯ জুলাই) পড়ে অশেষ উপকৃত হলাম। কিন্তু প্রবন্ধে উল্লেখিত একটি বিশেষ তথ্য সম্পর্কে আমার একটু খটকা আছে। হিন্দুমেলার (১৮৭৭) অক্ষয়চন্দ্রের উপস্থিতি প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে লেখক প্রবন্ধের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার কবি নবীনচন্দ্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে মেলায় পৌঁছোলেন।' কবি নবীন সেন যেদিন উক্ত মেলায় গিয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্রও যে সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন তা তাঁর সম্পাদিত ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'সাধারণী'র রিপোর্টেও তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—'একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষছায়ায় দূর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া রবীন্দ্রের কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি... একজন সুপরিচিত কবিও (নবীনচন্দ্র সেন) সেখানে উপস্থিত ছিলেন' (দেশ। ১৯ জুলাই। পৃঃ ৯২১)। অথচ নবীন সেন তাঁর "আমার জীবন" (চতুর্থ ভাগ) গ্রন্থে ন্যাশনাল মেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গীত শোনার প্রসঙ্গে পরিষ্কার লিখেছেন, মেলা দেখার 'দুই-একদিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি নেশনাল মেলায় গিয়া একটি অপূর্ব নবযুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি;......অক্ষয়বাবু বলিলেন—কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচামিঠা আঁব' (দ্রষ্টব্য। 'রবীন্দ্রজীবনী'। ১ম খণ্ড। ৪র্থ সংস্করণ। পৃঃ ৫৪)। এ থেকেই মনে সন্দেহ, কবি নবীন সেনকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দুমেলায় যাওয়া তো দূরের কথা, স্বয়ং অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গান এবং কবিতা পাঠের দিন ওই মেলায় আদৌ উপস্থিত ছিলেন কি না। কোনটি তা হলে ঠিক? সাধারণী'র পাতায় অক্ষয়চন্দ্রের স্বলিখিত রিপোর্ট, না নবীন সেনের আত্মজীবনীর বিবরণ?

প্রসঙ্গত আর একটি প্রশ্ন। যদি সাব্যস্ত হয়, অক্ষয়চন্দ্র হিন্দুমেলায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান শুনে এসেছেন, তা সেই শোনা কবিতা ও গানের সংখ্যা অক্ষয়চন্দ্রের উক্ত রিপোর্ট পড়ে মনে হয়, এক এক। কিন্তু নবীন সেনের বিবরণে দেখতে পাচ্ছি উভয় ক্ষেত্রেই তা একাধিক—'তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন' ('রবীন্দ্রজীবনী'। ১ম খণ্ড। ৪র্থ সংস্করণ। পৃঃ ৫৪)। এক্ষেত্রে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য কি?

অনিলবরন চক্রবর্তী
হুগলী।

আমাকে পেরুতে হ'বে সাঁকো

অধীর সারেঙ্গী

স্মৃতি, তুমি বড়ো মিথ্যে সান্ত্বনা যোগাও ;
অহেতুক অন্ধকারে ক্ষণোদ্দীপ্ত হয়ে
রোমন্থন করো সব বিস্মৃত সুখের মায়াজাল—
গভীর রাত্রির শেষে অনিবার্য ক্ষয়ে
তুমি এনে জড়ো করো গুনগুন একটি সকাল ঃ

স্মৃতি, তুমি কেন বৃথা পসরা সাজাও!

ভীতি, তুমি আজকাল বড়ো বেশি কাছাকাছি থাকো;
বারান্দায় স্তব্ধ রাতে চুপিচুপি কথা—
খানিক তফাতে থেকে ব্যর্থতার ক্লান্ত বিস্মরণ
হাত নাড়ে; সিঁড়িগুলো ঢেকে দেয় ব্যথা ঃ
প্রিয়া আছে একা শুয়ে, রাত কাটে বোবা অচেতন।

ভীতি, তুমি দূরে যাও, আমাকে পেরুতে হ'বে সাঁকো।

ঋণশোধ শব্দের মাধ্যমে

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

শব্দকে যেমনই ভালোবাসি
শব্দের সান্নিধ্য থেকে যূথবদ্ধ মশাদের শোণিত পিপাসা
ঘাড় ধরে নিয়ে যায় ধর্মের সন্ধানে, টানে হিংসার আশ্রয়ে
বস্তুত অহিংসা নিয়ে মৃত্যুর প্রশান্ত মুখ একমাত্র দেখা যায়
নির্বিরোধ উদারতা নিয়ে
স্তন্যপায়ী শিশুও বাঁচে না একরাত ;

শব্দ ছাড়া অন্য কোন তরবারি হাতে নেই,
সুতরাং শব্দেরই জিহবায়
তীব্র হলাহল ঢেলে কুরুক্ষেত্রে যেতে হবে—
যেহেতু রক্তের ঋণ রক্তক্ষরণেই শোধ হবে।

জবর বাড়ে

সন্তোষ চক্রবর্তী

গা পুড়ে যাচ্ছে।...আমি তাকে শিখিয়েছিলাম
ক-য়ে কলঙ্ক, খ-য়ে খেদ......
বলেছিলাম ঃ এই রইলো তোমার জন্যে
একজোড়া নুপুর-বসানো চটি।

দরোজার শব্দ আমার পিছু-পিছু সিঁড়ি দিয়ে
নেমে এসেছিলো।...

ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ বাজে......বাঁ-হাতে চশমার শেল
ঠেলে দিয়ে
প্রবীরদা আজও হাঁটছে...

আমার প্রেমের কথা মনে পড়ে যায়—
জবর বাড়ে॥

ঘরের আয়না

সঞ্জিতা সেন

ঘরের আয়না দিনে দিনে ঘষা কাচ হয়ে যায়—
মুখ দেখতে পারি না।
মাঝে মাঝে বিভিন্ন গাছের ছায়া দোলে,
বাইরে অস্পষ্ট আবছা ছবি কেবল ঝিলিক দেয়,
সূর্যের আলোয় রূপ বেঁকে চুরে যায়।

ঘষা কাচের মতন ঝাপসা আমার মুখের ছবি
জটিল আলোর মতো ফুটে ওঠে
পারাহীন কাচ শুষে নেয় আমার ভেতর,
ভাঙতেও পারি না, পাছে রক্ত ঝরে।
সামনে দাঁড়িয়ে থাকি একা—
আমার বুকের শব্দ চুপ করে শুয়ে থাকে
জলের মাটির নীচে প্রতিবিম্বের আশায়
সূর্য-আলো দেখবে বলে।

বধ্যভূমির পথে বন্দী

সামসুল হক

তার হাতে স্বর ও ব্যঞ্জনের স্নায়ুর শৃঙ্খল
মাথায় আলেকজান্দ্রিয়ার অগ্নিদগ্ধ পাঠাগারের
শেষ-কয়েকটি পেরেকের মুকুট
চৈত্রের বাতাসে ওড়া স্বেদের কার্পাসে তৈরি
অশ্রু-মাখানো রজ্জু কোমরে
শিশু ও মালতীর কঙ্কালের পাহাড়ের বেহোড়ে
আচম্বিতে আজ সে বন্দী
সূর্যগ্রহণের ছায়াকে বলি দিয়ে যে-রক্তসরোবরের সৃষ্টি

তার নীলপদ্ম থেকে একঝাঁক মৌমাছি উড়ে এসে বলতে থাকে
এই তবে সেই দস্যু এই তবে মহাদস্যু ভয় এরই নাম ভয়
মহাদস্যু ভয়ের বুক কেউটের বিচ্ছিন্ন লেজের ডগার মতো
কাঁপতে থাকে
দূরে লাল কুয়াশার ভিতরে বধ্যভূমির পতাকার অগ্রভাগ
লাঙলের ফলার অবয়বে দেখা যাচ্ছে
স্বপ্ন ও স্মৃতি দুই চিরজীবী তীরন্দাজ সেথানে প্রস্তুত

॥ একশো সাত ॥

অজয় সহসা আক্রমণে হতচকিত বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেও প্রথম আঘাতের পরই সে প্রতি আক্রমণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। সে-ই সবিতার কাছে বকুলতলা বাড়ির ক্লাব ঘরে ছুটে এসেছিল এই সম্ভাব্য আক্রমণের সংবাদ দিতে এবং সেই সঙ্গে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। সবিতা বিশ্বাস করতে দ্বিধা করেছিল এরকম আক্রমণ ঘটতে পারে। বিশেষত অজয় যাদের নাম করেছিল, তারা কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হলেও সকলেই পরিচিত। কলিয়ার মাঠের কংগ্রেসের ডাকে আজ যে সভা ছিল তার পোস্টারের ঘোষণাতেই কমিউনিস্টদের 'দেশের শত্রু' 'সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালাল কমিউনিস্টদেরদের দেশ থেকে তাড়াও' ইত্যাদি লেখা ছিল। সবিতা পণ্ডিত এ কথাও জানতো, কলিয়ার মাঠে আজকের সভায় আশেপাশের উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধীরা মিলিত হবে, যোগ দেবে কলকাতা থেকে আগন্তুক বিরোধীরাও। কলকাতার আগন্তুক বিরোধীদের সম্পর্কে একটা ক্ষীণ অবিশ্বাস তার মনেও ছিল, কিন্তু স্থানীয় ছেলেদের কথা একবারো সে ভাবেনি। যাদের সঙ্গে শহরে, পাড়ায় পাড়ায় অলি-গলিতে দুবেলা দেখা হয়, যারা কেউ কথা বলে, কেউ বলে না মুখ ঘুরিয়ে নেয়, কমিউনিস্ট বিরোধিতায় সম্প্রতি রীতিমতো সরব, তাদের সম্পর্কে এরকম উগ্র মারমুখী ক্ষিপ্ততার কথা তার মনে স্থান পায়নি। সম্ভবত স্থানীয় পার্টির কর্মীদের কারোরই মনে এরকম কোনো সন্দেহ ছিল না। থাকলে নিশ্চয়ই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হতো। অজয় কলিয়ার মাঠের মিটিং-এর বক্তাদের কথা ও দলের অন্যান্যদের কথা থেকে আক্রমণের সম্ভাবনার কথা বলতে এসেছিল। এখন তার অনুমানের কোনো অবকাশ নেই। আক্রমণ একটি পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তথাপি সবিতার বিস্ময় ঘোচে না। দয়ালের ঘুষির আঘাতে তার ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত গড়ায়।

'এবার ডাক তোর পি সি যোশী বাবাকে!' শীতল অজয়ের চওড়া গালে সপাটে এক থাপ্পড় কষায়।

অজয় তৎক্ষণাৎ শীতলের চোয়াল লক্ষ করে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি চালায়, বলে, 'পি সি যোশীকে ডাকতে হবে না, আমিই তোর জবাব দিচ্ছি।' বলে ও দ্বিতীয়বার শীতলকে আঘাত করতে উদ্যত হয়।

অজয় আঘাত করবার আগেই দুতিনজন এক সঙ্গে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মারতে শুরু করে এলোপাথারি এবং প্রতিশোধের উগ্রতায় অগ্নিমূর্তি শীতল অজয়কে আঘাত করার জন্য নিজের বন্ধুদের ব্যূহ ভেদ করতে পারে না। কে একজন চিৎকার করে ওঠে, 'ওরা শেতলকে মেরেছে।'

দয়াল শীতলের দিকে একবার তাকায় তার চোখে আগুন জ্বলে এবং তীব্র ঘৃণায় সে আরো ভয়ংকর হয়ে ওঠে। সবিতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বল, নেতাজী সুভাষ জিন্দাবাদ!' বলেই হাতের পিছন দিয়ে সপাটে সবিতার সমস্ত মুখ জুড়ে আঘাত করে।

সবিতার মুখ শক্ত, স্থির চোখের দৃষ্টি, নাকের ছিদ্র দিয়ে রক্ত পড়ে—তার চোখের সামনে প্রায় সাত আট বছর আগের একটি ঘটনার ছবি ভেসে ওঠে। এই দয়াল মিশির একটি নিরীহ লুটে আনা মেয়েকে বাঁচাবার জন্য কেমনভাবে দুই খলিফা মস্তানের বিরুদ্ধে লড়েছিল। সবিতা তখনো কমিউনিস্ট পার্টিতে আসেনি। এই সব কলকারখানা অঞ্চলের খলিফা মস্তান মানেই যাদের হাত রক্তমাখা, খুন যাদের কাছে জল ভাত। যারা এক-একটা মহল্লার অধিপতি। লীগ মিনিস্ট্রির প্রশ্রয়ে মুসলমান খলিফাদের ক্ষমতা অনেক বেশি, সরাসরি সহায়তার সুযোগ তাদের হাতে। দুইজন খলিফা মস্তানের লড়াই মানে, বাঘ সিংহের লড়াই। সবিতার চোখের সামনে ভাসে সেই ছবি। একটি তরুণী বিহারী মেয়ে, তাকে ঘিরে দুই হিন্দু মুসলমান খলিফা যুদ্ধংদেহী, উভয় পক্ষ মেয়েটির দাবিদার। এই দয়াল সেই বাঘ সিংহের মুখ থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ওর দাবি ছিল, মেয়েটি তার বউ, যদি এর পরেও কারোর সাহস থাকে, ওর গায়ে হাত দেবে, দিক। ও ওর বউকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। সবিতা যখন রুদ্ধশ্বাস হয়ে ভাবছে, দয়ালের মাথায় ডান্ডা পড়লো বলে, বা একটি ছুরি ঝিলিক দিয়ে ওঠার অপেক্ষা মাত্র, পরমুহূর্তেই দয়ালের নাড়ি-ভূঁড়ি বের করা রক্তাক্ত শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে, দয়াল তখন মেয়েটির হাত ধরে শান্তভাবে সকলের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছিল। অভূতপূর্ব সেই দৃশ্য! জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য তার বাস্তব ছবি। সৎসাহসের শক্তি যে কোথায় বোঝা গিয়েছিল দয়াল মিশিরকে দেখে। বাঘ সিংহরা দাঁতে দাঁত পিষেছিল, ল্যাজের ঝাপটা মেরেছিল, কিন্তু দয়ালের গায়ে থাবা বসাতে কেউ সাহস করেনি। এই সেই দয়াল। সবিতাকে যে বরাবর পণ্ডিতদা বলে ডাকে যদিচ সে সবিতার থেকে বয়সে কিছু বড়। সবিতা জানতো সেই মেয়েটিকে নিয়ে দয়াল দেশে গিয়েছিল, তাকে বিয়েও

করতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি সমাজকে ভয় পেতে আরম্ভ করেছিল. অতএব সমাজ থেকে দয়ালের কাছ থেকেও না বলে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপরেও এই বকুলতলা বাড়ির আর এক ঘটনা সবিতার এই মুহূর্তেই মনে পড়ে। বিয়াল্লিশের কংগ্রেসী আন্দোলনে দয়াল তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে। পালিয়ে এসেছিল এই বকুলতলা ক্লাবে. পিছনে পিছনে পুলিস এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর ওপরে, মেরেছিল। সবিতা যার প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু ওর প্রতিবাদের মুখে থানার বড় দারোগা কেবল ওর হাতের 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'ও'র জন্য ভাবতে হবে না।' সবিতা জনযুদ্ধ পত্রিকা ছিঁড়ে ফেলেছিল। নিজেকে অসম্মানিত বোধ করেছিল ও। যার পরিণতি পার্টিকে কৈফিয়ৎ। এই সেই দয়াল, যার প্রতি সবিতার বরাবরই একটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব ছিল। ওর ঠোঁটের কষে নাকের ছিদ্রে রক্ত, তথাপি স্পষ্ট স্বরে বলে, 'দয়াল তুমি যে এরকম কাপুরুষ, আমি তা ভাবিনি।'

'কাপুরুষ? আমি? কিসেরে সবিতা পণ্ডিত?' দয়ালের মারমুখী উগ্রতায় যেন নতুন উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়।

এই সময়েই একজন পিছন থেকে সবিতার দু হাত টেনে পিছমোড়া করে বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'শালাদের সাহস কম না, এখনো হাত চালায়।'

সবিতার ক্রোধ বাড়ে তথাপি শান্তভাবেই বলে, 'তা না হলে এরকম দল বেঁধে ঘর থেকে ডেকে এনে মারতে না। দল বেঁধে মারতে আসবে, আগে থেকে জানিয়ে দিতে পারতে। এ তো কাপুরুষের কাজ।'

'হ্যাঁ সবিতা পণ্ডিত, শালা বেইমান!' দয়াল সবিতার ঘাড়ের ওপর সপাটে হাতের আঘাত করে বলে, 'তোমরা শালা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের জেলে পাঠিয়েছ, পুলিসের স্পাইগিরি করে আমাদের ধরিয়ে দিয়েছ, আর আমরা হলাম কাপুরুষ? তুমি শালা খাঁটি মরদের বাচ্চা!'

দয়াল এবার সরাসরি সবিতাকে কোমরে পদাঘাত করে।

দু তিনজন হেসে ওঠে। দয়াল হাসে না, বলে, 'তোরা আমাদের বলেছিস পঞ্চম-বাহিনী, দেশের শত্রু। আমাদের জেলে পাঠিয়ে ময়দানে লাঠি ঘোরাচ্ছিলি। কাপুরুষ কারা? তোরা, না আমরা? আমরা কিসে ভয় পেয়েছিলাম রে বাহেন—? লাঠি না গুলিতে? না জেল খাটতে? শালা খয়ের খাঁ!' বলে সে আবার আঘাত করতে উদ্যত হয়েও চিৎকার চেঁচামেচি শুনে থেমে যায়।

সবিতাও চিৎকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। তার আগেই ওর চোখে পড়ে রক্তাক্ত অজয় জানু পেতে বসা। সবিতা দেখতে পায় অ্যাডভোকেট কমরেড বীরেন ঘোষ সাইকেল রিকশায় আসতে আসতে হঠাৎ রিকশা থামিয়ে নেমে পড়েন, এবং গঙ্গার ধারের রাস্তার দিকে দৌড় দেন। কয়েকজন চিৎকার করে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর জামা খুলে নেয়। সবিতা জানে, বীরেন ঘোষ দুর্বল আর অসুস্থ ব্যক্তি, হার্টের রুগী। কিন্তু তাঁর পালাবার ভঙ্গি দেখে ও কেমন সংকোচ বোধ করে। বীরেন ঘোষকে দূরে থেকে ভয়ার্ত দেখায়, তিনি এলিয়ে পড়েন। কে একজন চিৎকার করে ওঠে, 'এই, এ শালা উকীলটাকে বেশি প্যাঁদাসনে, বানচোত মরে যাবে। ওকে মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফুলে বেলপাতা চাপা দিয়ে রাখ।'

সামনেই জোড়া শিব মন্দির। দুজন বীরেন ঘোষকে নিয়ে সেই দরজার আগল-হীন প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে ঢুকে যায়। সবিতা উৎকণ্ঠা বোধ করে। কিন্তু ওর ভাবনাকে মুহূর্তেই অন্যদিকে চালিত করে রমণ, মোহনের দাদা। সে একটা দোকানের বারান্দায় উঠে বক্তৃতা আরম্ভ করে, 'বন্ধুগণ, এই কমিউনিস্টরা বলে, অ্যাণ্টিফ্যাসিস্ট লড়াইয়ের জন্য নাকি ওরা ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। যে ইংরেজ আমাদের দুশো বছর পরাধীন করে রেখে শুষেছে, রাশিয়ার এক কথায় সেই সাম্রাজ্যবাদীরা রাতারাতি এদের বন্ধু হয়ে উঠলো। কারণ, ওদের মতে সেটাই নাকি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা-বাদ! কিন্তু সুভাষচন্দ্র বিদেশে গিয়ে দেশের জন্য লড়লে তিনি হন দেশের শত্রু, তাঁকে বলে ফ্যাসিস্ট। গান্ধীজী হলেন বুর্জোয়া। এদের কাছে কমিউনিজম ইজ থিকার দ্যান ন্যাশনাল ব্লাড। আজ যদি

রাশিয়া হুকুম দেয় দেশ জনালাও, দেশের মানুষের মুখে তাকাবার দরকার নেই, তবে এরা তাই করবে। আসলে ওরা বিদেশের অনুচর, ওরা...।'

আবার একটা হইচই শোনা যায় উত্তর দিকে। সবিতা অভাবিত বিস্ময়ে লক্ষ করে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ইন্দ্রনাথকে কয়েকজন টেনে নিয়ে আসে। ইন্দ্রনাথ এ সময়ে এ তল্লাটে কেন? ত্রিদিবেশও কি তার সঙ্গে? পাঁচ মাইল দূরের অঞ্চল থেকে ইন্দ্রনাথ এখানে এ সময়ে কেন? ইন্দ্রনাথের উসকো খুসকো চুল এবং পাঞ্জাবির বুকে রক্তের ফোঁটা দেখেই অনুমান করা যায়, পীড়নের শুরু আগেই। তথাপি সবিতা অবাক চোখে লক্ষ করে পথচারী মানুষরা ঘরের পথে দ্রুতগামী, কেউ দাঁড়ায় না। গাড়ি রিকশা সবই দ্রুত ধাবমান। অনেক দোকানের ঝাঁপ আর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। রমণ নিজে যে দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে সেই দোকানের দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। অবাঙালী সাধারণ শ্রমিকরা সর্বাপেক্ষা বেশি পলায়নপর। কিন্তু অভাবিত, কেউ এই পীড়নের প্রতিবাদ করে না। যেসব লোক, দোকান কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়মিত চাঁদা দেয়, সবিতাদের সঙ্গে সমীহ ও প্রীতির সঙ্গে কথা বলে, কেউ প্রতিবাদ করে না। সকলেই একবার ভীরু চোখে তাকিয়ে চলে যায়। সবিতা অধিকতর অবাক হয় বকুলতলা ক্লাবের জানালায় ছেলেদের দিকে তাকিয়ে। প্রতিবাদের কোনো লক্ষণ ওদের চোখে মুখে নেই, বরং একটা ভয় মিশ্রিত কৌতূহল।

'আই অ্যাম দ্য লাস্ট পারসন টু সাবমিট টু ইউ অ্যান্ড একো ইয়োর শ্লোগান।' একটা আকাশ-ফাটানো চিৎকার, রমণের বক্তৃতাকে ছাপিয়ে ভেসে আসে।

সবিতা তাকাবার আগেই মোহনের স্বর চিনতে পারে এবং দেখতে পায় রমণ যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে, তার কাছাকাছি একটা ডাস্টবিনের কাছে প্রধানত ছোটন মোহনকে চুলের মুঠি ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। আর একজন কেউ চিৎকার করে, 'ঢোকা, ওকে ডাস্টবিনের মধ্যে ঢোকা, শালা খুব ইংরেজিতে বাত মারছে।'

রমণ ফিরে তাকায় না, বক্তৃতা করে চলে, 'আমি যখন এখান থেকে পালিয়ে মেদিনীপুরে যাই, ওরা ছায়ার মতো আমার পেছন নেয়। এই দেখুন, ওদের পুলিস আমার তিনটি আঙুল কেটে দিয়েছে।' বলে সে বাঁ হাত তুলে দেখায়।

মোহন তখন ডাস্টবিনের মধ্যে। রুমালের কোণে ইঁটের টুকরো বেঁধে ওর মাথায় ছোটন ঠাস ঠাস করে মারে। চিৎকার করে বলে, 'বল, বন্দেমাতারম্‌! বল, নেতাজী সুভাষ কি জয়। বল জয়হিন্দ!'...

'বলবো না, বলাতে পারবি না।' মোহনের ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা যায়, হাত তুলে বলে, 'তিন আঙুল না, গর্দান কাটলেও বলবো না।'

হঠাৎ কয়েকজনের হাসি ও হল্লা শোনা যায়। মন্দির থেকে একজন বেরিয়ে চিৎকার করে বলে, 'উকীলটা মাইরি ভিটকেল্লি মেরে পড়েছিল। যেই না বগলে সুড়সুড়ি দিয়েছি অমনি শালা বলে কী না, এই কী করছো, কাতুকুতু লাগছে। অমনি শালাকে মার মার মার...।'

সবিতা ফিক ফিক হাসি শুনে বকুলতলার জানালার দিকে তাকায়। মন্দিরের দিকে তাকিয়ে কয়েকজন হাসে।

'এখনো বলছি সবিতা পণ্ডিত, নেতাজী জিন্দাবাদ বলো।' দয়াল ক্ষ্যাপা বাঘের শেষ আক্রমণের মুহূর্তে নিচু স্বরে গর্জে ওঠে। ওর হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে।

সবিতার ঠোঁটের কষের রক্ত ঠোঁটে চারিয়ে যায়, নাকের কাছে রক্ত ড্যালা পাকাতে থাকে। ও কোনো জবাব দেয় না। এই সময়েই চন্দ্রনাথ প্রধান দেউড়ি দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসেন, অবাক উদ্‌ভ্রান্ত চোখে চারদিক দেখে দয়ালের সামনে এসে বলেন, 'এ কি দয়াল, তোরা এসব কী করছিস?'

'চন্দরদা, দালালদের হালাল করছি। এই লালঝাণ্ডাওয়ালারা বেইমানি করে আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে। আজ তার শোধ তুলছি।'

চন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বলে ওঠেন, 'ছি ছি ছি, তোদের কাছে আমি এটা আশা করিনি। যোশী গান্ধী চিঠি চালাচালি হচ্ছে, যা হবার সেখানেই হবে। তোরা কেন মারামারি করছিস।'

'আপনি আজ তফাত যান চন্দরদা।' শীতল চিৎকার করে ওঠে, 'আপনি কোনো দলের নন, আপনি আজ একটা কথাও বলবেন না।'

চন্দ্রনাথ উগ্রচণ্ড মূর্তি শীতলের দিকে তাকান এবং তাঁর পায়ের কাছে রক্তাক্ত জানু পাতা অজয়কে দেখেন। তিনি বলেন, 'তা বলে তোরা এরকম মারামারি করবি?' বলে তিনি সবিতাকে একবার দেখে দয়ালের দিকে ফিরে বলেন, 'তোরা পণ্ডিতকে এভাবে মারছিস?'

'হাঁ, পণ্ডিত হলো নেতা।' দয়াল বলে, 'শীতল ঠিক বলেছে চন্দরদা, আপনি আজ তফাত যান।' বলে সে শেষবারের মতো বলে, 'বলো পণ্ডিত, নেতাজী জিন্দাবাদ! ভারতমাতা কি জয়।'...

সবিতা চন্দ্রনাথের দিকে তাকায় না, দয়ালের দিকেও না। কিন্তু এই প্রথম একজন প্রতিবাদ করেন। ও রক্তাক্ত ঠোঁট শক্ত করে চেপে সামনে তাকিয়ে থাকে। দয়ালের হাত উদ্যত হয়।

ক্রমশ

গানের আসর

তালের বিবর্তন

আমাদের রাগসংগীতের বিবর্তন অনুধাবন করা যেমন শক্ত, তালের ক্রমবিকাশ নির্ণয় করা বোধ হয় ততই কঠিন। এক্ষেত্রেও ট্র্যাডিশন আমাদের পথ দেখায় না বললেই চলে। আমরা যেভাবে পুরুষানুক্রমে তাল দিয়ে আসছি, শাস্ত্র পাঠ করতে গেলে তার সঙ্গে কোনও মিল পাওয়া যায় না এবং এ সম্বন্ধে কোনও গবেষণা এই বঙ্গদেশে হয়েছে বলে জানি না। শাস্ত্রপাঠে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, একসময় তাল প্রদানের পদ্ধতি অন্যরকমের ছিল—যাকে বলা হয় মার্গতাল এবং দেশীতাল। কিন্তু আমরা যেভাবে "তিন তাল এক ফাঁক" রীতিতে মাত্রাবিন্যাস করে তাল প্রদান করি—উক্ত রীতিদ্বয় সে-রকমের ছিল না। তাহলেই প্রশ্ন ওঠে—এই যে লৌকিক তাল প্রদানের প্রণালী আমরা বর্তমানে অনুসরণ করছি, এর উদ্ভব কোন্ সময় থেকে? এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন এবং এই রহস্য মীমাংসা করবার মত চেষ্টাও হয়েছে বা হচ্ছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অতীতে আমাদের দেশে স্বরলিপির প্রথা ছিল, এর প্রমাণ আমাদের শাস্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, সেই সব স্বরলিপি ধারাবদ্ধভাবে চলে আসেনি এবং তা ইংরেজিতে যাকে 'ইলাবরেট' বলে সেই রকমও ছিল না। যাঁরা সংগীতে টেকনিকাল ব্যক্তি তাঁরাই এইগুলি বুঝতেন ও প্রয়োগ করতেন। ক্রমে তারও বিলোপ ঘটে, যেমন বিলোপ ঘটেছিল আমাদের নাট্যানুষ্ঠানের। ফলে কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থ তালের ইঙ্গিত সহ মার্গতাল সমন্বিত সামান্য পরিমাণ গানের স্বরলিপি উদ্ধৃত করেছেন। অবশেষে তাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে রহিত হয়ে গিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, যে বিরাট লৌকিক সংগীতে শতাধিক দেশী তালের গান প্রচলিত ছিল তার কোন স্বরলিপি পাওয়া যায় না। ফলে আমরা বুঝতে পারি না গানের সঙ্গে এদের তাল কিভাবে সমন্বিত হত; গানেও তো তার প্রতিফলন এযুগে চলে আসেনি গায়ক পরম্পরা। পদাবলী কীর্তনের তাল পদ্ধতিতে কিছু মার্গপদ্ধতির রীতি দেখা যায়, আবার দেশী পদ্ধতির মিশ্রণও তার সঙ্গে হয়েছে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনার প্রয়োজন—তাহলে অনেক ব্যাপার বুঝতে সুবিধা হবে। কিন্তু কীর্তনের তাল পদ্ধতি আমরা বৈঠকী সংগীতে বা কাব্য সংগীতে গ্রহণ করিনি। সেখানে বোধ করি দেশী তালের পদ্ধতিগুলিকেই আমরা ভেঙে আমাদের মত করে নিয়েছি। যদি বিভিন্ন দেশী তালের গানের স্বরলিপি মিলত তাহলে বোঝা যেত আমরা কেমন করে এই প্রথাকে পরিবর্তিত করে নিয়েছি।

শাস্ত্রানুসারে আমাদের দেশী তালসমূহ গীতের অবয়বের সঙ্গে সমতা ও শোভনতা রক্ষা করে দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত—এই চারটি মাত্রার প্রয়োগে সম্পাদিত হত। মার্গ এবং দেশী উভয় পদ্ধতিতেই পাঁচটি লঘু অক্ষরের উচ্চারণে যে সময় লাগে (যেমন—ক, চ, ত, ট, প—এই পাঁচটি অক্ষর। সেই সময়টুকুকে নিয়ে একটি "মাত্রা" স্বীকৃত হত। এই মাত্রার ডবল সময় হলে সেটি হত 'গুরু', তিনগুণ হলে সেটি হত 'প্লুত'—আর অর্ধেক হলে হলে সেটি হত "দ্রুত"। কিন্তু সব সময়ই যে এই পরিমাপই গ্রাহ্য হত এমন নয়, অনেক ক্ষেত্রে চারটি লঘু অক্ষরকে ধরেও একটি মাত্রা নির্ণয় করা হত। পাঁচটি বিজোড় সংখ্যার চেয়ে এই জোড় সংখ্যাটি বোধ করি ছিল অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। উদাহরণ স্বরূপ "দ্বিতীয় তাল"-এর লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—দুটি দ্রুত, একটি লঘু। চারটি লঘু অক্ষরকে মাত্রার ইউনিট ধরলে একটি দ্রুত হবে দুটি লঘু অক্ষরের সমষ্টি। তাহলে সমগ্র তালটি হবে দুই লঘু, দুই লঘু এবং চার লঘু মাত্রার সমষ্টি অর্থাৎ বর্তমান আট মাত্রার সমতুল্য। বিখ্যাত চর্যাগান এই তালেই গাওয়া হত, এমন কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এখন, এই যে মাত্রার বিভাগ, গীতের অক্ষরগুলির সঙ্গে এগুলি কিভাবে যুক্ত হত সেটি অনুমান করা দুঃসাধ্য। যে যুগে এই রীতির চলন ছিল সে যুগে প্রাকৃতভাষার পদগুলিও এর সহায়ক ছিল; কিন্তু ক্রমে প্রাকৃতভাষার যথেষ্ট বদল হয়েছে এবং দেখা গেছে এ পদ্ধতি আর প্রয়োগ করা চলে না। এ ছাড়া সেকালে অনিবন্ধ গান হিসাবে আলাপ করা হত বিস্তারিতভাবে, তার পরে গীতাংশে বিস্তারের প্রকাশ কমই থাকত। সুতরাং গীতটুকু যথাযথভাবে তালে গাওয়া হত। অবশ্য তাতে ছন্দের কাজ যথেষ্ট থাকত (যা মার্গ সংগীতেও থাকত) কিন্তু তাতে সেই কৃতিত্ব উপভোগ করায় কোনও বাধা সৃষ্টি হত না। বর্তমানে ধ্রুপদ গানেও অনেকে কাব্যাংশে বিস্তার করে থাকেন, যাতে তাল কেবল খুব 'অ্যাবস্ট্রাকট' ভাবে ছন্দকে বজায় রাখবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে ছন্দের কাজটা তেমন প্রত্যক্ষভাবে উপভোগ করা যায় না।

প্রাচীন দেশী তালেও বর্তমান ফাঁকের মত 'বিরাম' বলে একটা ব্যবস্থা ছিল। যেমন, তৃতীয় তাল বলে একটি তাল ছিল, যাতে পর পর তিনটি দ্রুতমাত্রা থাকত এবং শেষেরটির পরে বিরাম দেওয়া হত। এই বিরাম বলতে কি বোঝায়? আচার্য কল্লিনাথ বলেছেন, বিরাম হচ্ছে বিচ্ছেদ সূচক। শাস্ত্রমতে লয় ভেদ ঘটবার জন্যই বিরামের নির্দেশ দেওয়া হত। সেকালে নিয়ম ছিল, যে মাত্রার পরে বিরাম দেওয়া হত, সেই বিরামের কাল হত সেই মাত্রার অর্ধেক। অর্থাৎ, একটি লঘুর পরে যদি বিরাম নির্দিষ্ট হত তাহলে সেই বিরামের কাল হত উক্ত লঘুর অর্ধেক। এখন আমরা ফাঁকের বেলায় এই রীতি অনুসরণ করি না। ফাঁক এখন স্বাভাবিক তাল বিন্যাসের একটি অঙ্গ। 'ফাঁক' নামক কোনও শব্দের আজ আর আদৌ আবশ্যকতা আছে কি না সন্দেহ।

খুব সম্ভব, কালক্রমে চার বা পাঁচটি লঘু অক্ষরে এক একটি মাত্রা নির্ধারণের কোনও তাৎপর্য অনুভূত হত না; তার বদলে এক একটি লঘু অক্ষরকে এক একটি মাত্রা বলে ধরাই সুবিধাজনক বলে মনে হয়েছিল। সেই পদ্ধতিটিও আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এখন ক, চ, ত, ট—এই চারটি অক্ষর মিলিয়ে এক মাত্রা হয় না, এর প্রত্যেকটি অক্ষরই এক একটি মাত্রা হিসাবে স্বীকৃত। রাগ সঙ্গীতের মত তালের ক্ষেত্রেও সব ভেঙে, মিলে, মিশে কতটা অন্যরকম হয়ে গেছে, অথচ পুরোনো অনেক নাম এখনও ব্যবহারের মধ্যে রয়ে গেছে। অবশ্য, এটি এই লেখকের অনুমান মাত্র; যেহেতু তিনি তাল বিষয়ে আদৌ বিশেষজ্ঞ নন, সেই কারণে কোনও দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এক সময় তাল ব্যতীত কেবলমাত্র কবিতার ছন্দ অনুসারেও গান করবার প্রথা ছিল। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দের বহু বৈচিত্র্য থাকাতে এটি অনায়াসেই সম্ভব হত। যাঁরা গায়ক, তাঁরা আজও মন্দাক্রান্তা ছন্দে মেঘদূতের অংশবিশেষ সুর দিয়ে গান করে দেখতে পারেন—এ পরীক্ষায় তাঁরা অসফল হবেন না; কিন্তু আধুনিক বাংলায় ছন্দের এত বৈচিত্র্য নেই এবং ভাষাও বোধ করি তার অনুকূলে নয়, তাই এই রীতি আর প্রতিষ্ঠিত নেই। তথাপি রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে এ চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা এ দিকে একটা নির্দেশ দিয়ে গেছে। বর্তমান শিল্পীরা বোধ করি এ দিকে আরও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এই পদ্ধতি শাস্ত্র সমর্থিত নয়, এ নালিশ কিন্তু কেউ করতে পারবেন না।

শার্ঙ্গদেব

॥ উনচল্লিশ ॥

কি করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। গোবিন্দ পড়ে যাবার আগেই হাতের গেলাস টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছি। দু হাত বাড়িয়ে ধরতে পারলুম না ওকে। পড়ে গেল। ভীষণ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। গলাকাটা কালো রোগা কোনো পশুর মতো গড়াচ্ছে সারা ঘরময়। বেশ ভয় পেয়ে গেছি। ওর গায়ে হাত রাখতেও সাহসে কুলোচ্ছে না।

ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলুম,

—'কি হয়েছে? কি হল, গোবিন্দ? অমন করছো কেন?'

দলা পাকিয়ে দাপাচ্ছে গোবিন্দর শরীর। বুক পেট চেপে ধরে আছে দু হাতে। একবার কার্পেটটা খামচে ধরবার চেষ্টা করল। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় ভেঙে যেন হাঁটুর মধ্যে ঢুকে বুক ছুঁতে চাইছে। সারা গায়ে ঘাম। কোনো কথা বলছে না বা বলতে পারছে না। ওর সমস্ত রোমকূপ থেকে ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠে আসছে একটানা গোঁ গোঁ আওয়াজ।

পাশে বসে পড়লুম হাঁটু মুড়ে। কি করা উচিত ভাবতে না পেরে এতো অসহায় লাগছে! নিজের অস্বস্তি বলে বোঝান যাবে না, বউ। এই সমস্ত সময় মানুষের নিজের ওপর যে রাগ হয়, তার বর্ণনা নিজেই নিজের কাছে দিতে পারে না। ভূতের মতো ভয়, রাগ, অসহায়তা নিয়ে বোধ হয় দীর্ঘ সময় চলে গেল। একটু শক্ত, স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় গোবিন্দর ঘামে ভেজা পিঠে আলতো হাত রাখলুম। বললুম, খুব নরম কাঁপা কাঁপা স্বর বেরোলো গলা থেকে,

—'পেট কামড়াচ্ছে, গোবিন্দ? জল দেব? জল খাবে একটু?'

ক্লান্ত হয়ে গড়িয়ে গিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খেল শোধরি। বোবা মানুষ কথা বলার চেষ্টা করলে যেমন করুণ অপার্থিব আওয়াজ বেরোয়, তেমনি 'আঁ-আঁ' করে কি যেন বলল। কাছে এগিয়ে গেলুম আবার। জিগ্যেস করলুম,

—'জল দিই একটু?'

গোঙানির মধ্যেই বোধ হয় জবাব দেবার চেষ্টা করল, বুঝতে পারলুম না। ইস্! নিশ্চয়ই অসহ্য কষ্ট হচ্ছে বেচারার। কিসের যন্ত্রণা, কি রকম ব্যথা ওর? চোখের সামনে এই দৃশ্য, এই রকম যন্ত্রণার আওয়াজ বেশিক্ষণ চোখ মেলে দেখা বা কান পেতে চুপচাপ বসে শোনা অসম্ভব। ওর পিঠে হাত রাখলুম আবার। ভিজে টস্‌টস্ করছে। যতটা আত্মীয়তা, সান্ত্বনা এবং স্নেহ মেশানো যায়, সব একসঙ্গে জড়ো করে আস্তে আস্তে বললুম,

—'কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে গোবিন্দ? কোথায় ব্যথা?'

উত্তর নেই।

নিজেকে এত অপদার্থ লাগছে যে, রাগে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে গোবিন্দকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করল, 'কিছু একটা বল? আমি কি করতে পারি তোমার ব্যথা কমানোর জন্য সেইটুকু বলে, তারপর যত ইচ্ছে চেঁচাও আবার—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! গরুর মতো বসে আছি—'

আরো আস্তে, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললুম,

—'কি চাই, গোবিন্দ? কি চাই, বল, আমি এনে দিচ্ছি!'

বিকৃত গলায় ওর গোঙানির মধ্যে যেটুকু বুঝলুম, তা হলো,

—'ওষুধ—আলমারিতে—'

কথা কটি বুঝতে পেরে যে কি সোয়াস্তি হল! আহ্! যেন, আমিই প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলুম, ব্যথা সেরে গেল। একটা কিছু করতে পারব এখন—যেন চাঁদ পাওয়া গেল হাতে। এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। প্রায় ছুটে গিয়ে দেওয়াল আলমারি খুলে ফেললুম। কোথায় ওষুধ, কোথায় ওষুধ? খুঁজতে খুঁজতে দুটি তাকের ইস্ত্রি করা জামা কাপড় ওলোট পালোট হয়ে গেল। কিছু কাগজ-পত্র, বই ছিটকে পড়ল মেঝের ওপরে। নেই। কোনো ওষুধ নেই এখানে। এক টানে

নিচের দেরাজ খুলে ফেললুম। টুং-টাং, ঠুন-ঠনাং শব্দ হল। দেরাজ ভর্তি নানা আকারের ছোট-বড় ওষুধের শিশি, কৌটো। হেঁচকা টেনে খোলার জন্যে সব গায়ে গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। এখনো দুলছে গোবিন্দর মতো। প্রায় আট-দশটা শিশি। পাঁচ ছ'টি কৌটো। টিউব কতগুলো। ঘাবড়ে গেলুম আবার। কোনটা? কোন শিশিটি এখন গোবিন্দর এই অসহ্য যন্ত্রণা কমাবে? বোকার মতো অকারণেই শিশিগুলির ওপরে হাত বুলিয়ে দিলুম। চেঁচিয়ে জিগেস করলুম,

—'কোন্ শিশি? কি ওষুধ গোবিন্দ?'

কে কার কথা শোনে! সারা ঘরময় যন্ত্রণার আওয়াজ হেঁটে বেড়াচ্ছে। এক মুহূর্তও কান পেতে রাখা যায় না। মনে হল, আর দু চার মিনিট এমনি পাশবিক শব্দ শুনতে হলে আমি পাগল হয়ে যাবো। এক্ষুনি দরজা খুলে পালিয়ে যাই! ছোট্ট ঘরটির মধ্যে দমবন্ধ বাতাস থেকে পালিয়ে বাঁচি! কিংবা, কাউকে ডেকে আনি বাইরে থেকে। নিচে নাচ চলছে এখনো। কেউ না থাকলেও ফিরোজ আছে। কানাই হালদার আছে ঘরে। একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ এক ভয়ংকর শাস্তি। গোবিন্দর জন্যে কষ্ট ছাপিয়ে ভয় আক্রমণ করছে স্নায়ুকে। পরের মুহূর্তেই ভয় ছাপিয়ে মানুষটার জন্যে কষ্ট। বাইরে বেরিয়ে কাউকে ডেকে আনতে আনতেই যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়! টানটান সোজা হয়ে শুয়ে থাকে গোবিন্দর ঠাণ্ডা শরীর। নেশা আমার কেটে গেছে। তবু, মন বা মস্তিষ্ক এই অবস্থার মধ্যে মোটেই 'সুস্থ' বলা যাবে না। কোন্ শিশি, কোন্ ওষুধ ভাবতে ভাবতে পুরো দেরাজটাই টেনে বের করে আনলুম। দু হাতে ধরে ওষুধ-পত্রের দেরাজটি নামিয়ে নিয়ে এলুম গোবিন্দর কাছে। অথবা, গোবিন্দর মতো দেখতে সেই দলা পাকানো কুণ্ডলীটির কাছে। দ্রুত গলায় বললুম,

—'এই যে। সব ওষুধ নামিয়ে এনেছি গোবিন্দ। কোনটা? কোন্ ওষুধ চাই, বলো!'

গোঁ গোঁ শব্দের মধ্যেই বিকৃত উচ্চারণ করল বোধহয়,

—'গোলাপ—আঁ—গোলাপী ক্যাপসুল। দুটো।—'

ক্যাপসুলের শিশি সাধারণত ছোটই দেখেছি। ছোট সাইজের শিশিগুলো থেকে গোলাপী ক্যাপসুলের শিশিটি খুঁজে পেতে দেরি হল না। দুটি ক্যাপসুল হাতে নিয়ে দেখি, আমার আঙুল, হাত কাঁপছে তিরতির। বললুম,

—'নাও। এই নাও?

ওর মাথার চুলের কাছে খোলা হাতের চেটোয় ওষুধ নিয়ে ডাকলুম আবার, অনুরোধ করার মতো,

—'মুখ তোলো, গোবিন্দ। একটু মুখ তোলো! খেয়ে নাও ওষুধ। আমি জল আনছি।'

ভীষণ কষ্টে সামান্য মাথা তুলল। চোখ বোজা। কালো মুখে গভীর দাগের মতো রেখাগুলি বীভৎস কোনো পোর্ট্রেট মনে করিয়ে দিল। দাঁতে দাঁত চেপে আছে। অন্ধকার চামড়ায় ঘামের চকচকে ফোঁটাগুলি কাঁপছে। কোন রকমে ঠোঁট এইটুকু হাঁ করতে পারল। মুখে পুরে দিলুম ক্যাপসুল দুটো। উঠে জল নিয়ে ফিরে এসে দেখি, আবার যে-কে-সেই। তেমনি হাঁটুতে মাথা। দুমড়ে পড়ে আছে। তেমনি আওয়াজ কাঁপছে শরীর জুড়ে।

গলা তুলে বললুম,

—'গিলে ফেলেছো ওষুধ! জল চাই না, জল?'

কতক্ষণ সময় কেটে গেছে, জানি না। মনে হল অনন্তকাল। ঘড়ির হিসেবে বড়-জোড় মিনিট দশেক। টানটান না হলেও, শা হাত পা ছেড়ে গোবিন্দ কাৎ হয়ে পড়ে আছে কার্পেটে। কখন, কি ভাবে আমার কোলে ওর মাথা রেখেছে, মনে পড়ছে না। গোঙানির শব্দ নেই। হু হু করে শ্বাস ফেলছে এখন। কাজ দিয়েছে ওষুধে। যন্ত্রণার গোলাপী ওষুধে।

পাথরের মতো বসে আছি। নড়ছি না একটুও। খুব আস্তে শ্বাস নিচ্ছি, ফেলছি। পাছে, গোবিন্দর ব্যথা অথবা ব্যথার সেই ভয়ংকর শব্দ আবার শুরু হয়!

ওগুলো কি ঘুমের ক্যাপসুল? গোবিন্দ কি ঘুমিয়ে পড়ল!

ঘরের অবস্থা দেখলে হঠাৎ মনে হতে পারে, একটি ছোটোখাটো লড়াই হয়ে গেছে এখানে। শূন্য গেলাস পড়ে আছে। কার্পেটের খানিকটা জায়গা ভেজা। ওষুধ খোঁজার সময় আলমারির একগাদা কাগজপত্র, কতগুলো এক্সরে প্লেট ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে নীচে। পড়ে আছে। টেবিলের পায়ার কাছে দলা-পাকানো গোবিন্দর তোয়ালে। কার্পেট উঁচুনিচু, অবিন্যস্ত। যন্ত্রণার সময় বার কয়েক খামচে ধরেছিল গোবিন্দ।

ও কি ঘুমিয়ে পড়ল! একবার ভাবলুম, এখন উঠে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলে হয়। গোবিন্দ ঝিমিয়ে পড়তেই মিশেলের ভাবনা ছুটে এল। রাতের পর রাত এই ঘরে থেকে গেছে মিশেল। গোবিন্দর ব্যথা কি আজ হঠাৎ হল? না। তাহলে ওই গোলাপী ওষুধ ওর জানার কথা নয়। নিশ্চয়ই মাঝে মধ্যে এমন যন্ত্রণায় ভোগে গোবিন্দ। মিশেল কি জানে? স্বাভাবিক। এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে মিশেলের জন্য দুশ্চিন্তা হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল আবার। একলা, অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে গেছে মেজোতে আমি ছিলুম না বলে। বস্তা-মার্কা কতগুলো অ্যালসেশিয়ান মিশেলের ক্ষুধার্ত শরীরটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে না তো! শনিবার শেষরাতের কিছু মাতাল পশুর মধ্যে মিশেলের বুনো সুশ্রী মুখটি কল্পনা করে শিউরে উঠলুম।

—'গোবিন্দ। তুমি খাটে উঠে ঘুমোও। আমি যাই। মিশেলের একটু খোঁজ নিতে হবে।'

কোন সাড়া নেই ওর। আমার কোলে মাথা রেখে যেমন পড়েছিল, তেমনি রইল। নেশায় পরে এখন ঘুম ঘুম ভাব। খিদেও পেয়েছে। গা ছেড়ে দেবার মতো ক্লান্তি। পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়াতে গিয়ে ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। ঝিঁঝি ধরেছে। গোবিন্দর মাথা রাখার জন্যে, একই ভাবে এতক্ষণ থেকে জঙ্ঘা থেকে শুরু করে পুরো ডান পায়ে অবশভাব।

তারপর, আস্তে আস্তে অভদ্র কাপুরুষের মতো দার্শনিক হয়ে গেলুম। আমার কোনো দোষ নেই, বউ। আমি কি করতে পারি? একা কতকগুলো দস্যু মাস্তান বা আলজেরিয়ানের সঙ্গে আমার কিছু করবার নেই। ওরা ইচ্ছে হলে প্যারিসের নির্জন ফুটপাথে আমার লাশ ফেলে রেখে মিশেলকে ধর্ষণ করতে পারে। একা মিশেলের খোঁজে যাওয়া নিতান্তই বোকামি।

ফলে, সেই রুক্ষ, বিষণ্ণ, বুনো ফুলের মতো মুখটি সরল এবং ভীত চোখ মেলে একটা ইন্ডিয়ান কাপুরুষের দিকে চেয়ে রইল। এবং নিজের প্রতি ঘৃণা, অসহায় রাগ সরিয়ে ফেলতে অন্য একটি মুখ খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজতে খুঁজতে, খুঁজতে খুঁজতে আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা। মিশেল কি খুব ছোটোবেলায় এই মেয়েটির মতো দেখতে ছিল! রুক্ষ চুল, কচি মুখে কেমন ভীত অথচ উজ্জ্বল দুটি চোখ বসানো। নাম বোধ হয় প্যাট্রিসিয়া। ছোট্টো তো? ও বে বাচ্চা! বছর তিন-চার বয়েস। তাই, ওর বাবা ওর নাম বলেছিল, প্যাট্। বাবাটিকে তুমি চেনো, বউ। ছোটখাটো একটি ঝুঁকে-পড়া ল্যাম্পপোস্টের মতো চেহারা। হাত পা কাঠি কাঠি। পায়রার মত বুক। মাটি থেকে সাড়ে ছ' ফুট উঁচুতে রাগা অথচ উজ্জ্বল মুখ। চোখে পণ্ডিত-শাই গোছের নিকেলের চশমা। নিকেল কিংবা রুপোর। জেরি। জেরি শাট্‌স্। র কাছে আমি ঋণী। এই মুহূর্তেও ঋণী। প্যারিসে আসবার জন্যে ওর দেওয়া বড়ো জাহাজের বাতাস-টিকিট আমার কাছে যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে রাখা। ওর টকহোমের ঘরে এবং আপিসে আমার দুটি জল রঙ ছবি শোভা পাচ্ছে। জেরির কাছে আমি হয়তো সারা জীবন ঋণী থাকবো। কিন্তু, ওর যে নরম মনটিকে আমি ওর অজান্তে শ্রদ্ধা করেছিলুম, সেটি মরে গেল গত সপ্তাহে। ওর অজান্তেই। তার জন্য অবশ্য জেরিকে দোষও দেওয়া যায় না। কারণ, আমার অথবা তোমার মতো পৃথিবীর যাবতীয় দুঃ পেয়ে জীব-

জন্তুর মতোই জেরি শাটিস্‌ও সুখ খুঁজছে। সুখ, আহা সুখ! যা পাওয়া যায় না, অথচ খুঁজতে হয়। 'সুখ' শব্দটি 'দুখে'র সঙ্গে এক্কে মেলে এবং এতো হাস্যকর ব্যাপার ভাবা যায় না। এক একটি মুখ যেন সুখ সাজিয়ে বসে আছে আমার কিংবা তোমার জন্যে। যদু কিংবা মধুর জন্যে। ওরে, এ মুখে পাওয়া গেল না! চ, অমুক মুখ দেখি। ওখানে নিশ্চয়ই আমার জন্যে সুখ সাজানো আছে। কি সুসুখ, কি সুসুখ! মন এবং হুঁস আছে এই জাতীয় দু' চারজন মহা শক্তিমান মানুষ ছাড়া সুখ তো কেউ পায় না, বউ! কারণ 'আমি এখন সুখে আছি' কথাগুলোই ভুল। যেহেতু, সাময়িক অর্থে 'সুখ' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হাস্যকর। তৃপ্তি বা আনন্দ অথবা খুশি—এইসব বলা যায় যখন তখন। কিন্তু সুখ? দক্ষ অভিনেতার কোনো চরিত্র রূপায়ণের মতো, যা নিজে সে কখনোই নয়। সেই চরিত্রটির যতো কাছাকাছি যাওয়া যায় তারই চেষ্টা। সুখের পেছন পেছন দৌড়ে আসছে হাতড়ে যতটুকু পাওয়া যায়। যা পাওয়া গেল, তা-ই চিবোতে চিবোতে আবার 'খাজা কিংবা লুচির' মতো তার পেছনে দৌড়! সুখের পেছনে দৌড়োনোর নামই কি শান্তি? না, জীবন। কে জানে, বউ! ওসব মহাজনেরা ভাববেন। আমার ভাবনা এইটুকুই যে, আমাদের সকলের মতো জেরিও সুখ খুঁজতে খুঁজতে ওর প্যাটকে হারিয়ে ফেলল।

আমেরিকার বস্টন শহরে জেরির বাবা তাঁর একমাত্র ছেলের জন্যে অঢেল সম্পত্তি রেখে মারা গেলেন। সচরাচর এই জাতের একমাত্র ছেলেরা বাপের জন্যে কালো শোকের চিহ্ন মুছে অথবা নাপিতের হাতে মাথা মুড়িয়ে সরাসরি উচ্ছন্নের সরল পথ ধরে অলিম্পিক দৌড় দেয়। গোড়া থেকেই হিসেবি ছেলে জেরি, কিন্তু নিজের জন্যে জটিল পথ বেছে নিল। ছোটোখাটো ব্যবসায় হাত পাকিয়ে চলে এলো সুইডেনে। গোটা ইউরোপের বাজার বুঝে তৈরি পোশাকে'র বাণিজ্যে ঢুকে পড়ল। আমাদের দেশের তাঁত জেরির কোম্পানীতে আসতে লাগল। তারপর, ফ্যাশানদার পোশাক সেজে হু হু করে বিকোতে লাগল সুইডেন, জার্মানী, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্সের বাজারে। রাতারাতি না হলেও, পাঁচ বছরের মধ্যে জেরির সুইডিশ ক্রাউনের অংক ব্যাংকের হিসেবে ফেঁপে ফুলে ইউরোপের অন্যান্য পোশাক ব্যবসায়ীদের চোখ টাটিয়ে দিল।

এরই মধ্যে বস্টনের এক প্রেমিকা মারিয়াকে বিয়ে করে ফেলছে জেরি। ওদের দুজনের মধ্যে নিশ্চয়ই, তোমাদের সেই তথাকথিত ভাষায় 'ভালোবাসুসা' ইত্যাদি ছিল। কিন্তু, পাশ্চাত্ত্যের অবস্থা তো আমাদের মতো নয়! আমরা দিবারাত্র চুলোচুলি, ঝগড়া, মারামারি এবং অশান্তির অথৈ জলে ডুবে মারতে মারতেও ভালো-বাসুসা-প্রেম-পীরিতির প্লাস্টিকের ফুলের তোড়াটি চার হাতে তুলে জলের ওপরে রাখার চেষ্টা করি আজীবন। বর-বধূ থেকে সোয়ামী-ইস্ত্রী হয়ে মিনসে-মাগীতে পৌঁছোই আমরা। তবু ছাড়ান নেই! লোকে কি বলবে? 'ব' হয়েছে না আমাদের! জন্ম জন্মান্তরের কি বলে গিয়ে, সেই 'নিবিড়-বন্ধন' কি কাটানো যায়!

নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি চরমে ওঠবার আগেই জেরিরা অথবা মারিয়ারা মেনে নেয় তাদের 'ভালোবাসুসা' ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো, এবং। ...

সেই 'এবং'টির আগেই ওদের দুজনের ছোটো মেয়েটির নাম প্যাট। সে কোনো ভালোবাসাবাসির খবর রাখে না অথচ নটে গাছের শ্বাস নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখে ফেলে। প্যাট তিন বছরে পা দেবার আগেই ওদের ডিভোর্স হল। জেরি আর মারিয়ার। জেরির সঙ্গেই থাকার অধিকার পেল প্যাট। কোর্ট থেকে অবশ্যই। মারিয়াকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব ছিল না জেরির পক্ষে। কিন্তু, প্যাট? প্যাটের জন্যে পাপা রইল। পাপার জন্যে প্যাট।

মারিয়ার খবর আর কিছুই জানি না আমি। তবে প্যাটের ছবি দেখেছি। যেদিন বম্বের পাঁচ-তারকাওয়ালা হোটেলে আমার এ রাজ্যে আসার টিকিট ঠিক হয়ে গেল, সেদিন অথবা সেই সন্ধ্যায় জেরি আমাকে একটি অনুরোধ করেছিল। ওর মন তখন নরম, দুর্বল। প্যাটের জন্যে কি করতে পারা যায়, ভেবে অস্থির। ওর নরম মনে তখন গরীব-দুঃখী অথবা একলা শিশুর জন্যে অনেকখানি কপাট হা হা করে খোলা। সেই জন্যেই বোধ হয় তখন আমার দুঃখী শিশুদের ছবি ওর ভালো লেগেছিল।। সেইজন্যেই, সেদিন আমাকে ওর ক্যামেরায় তোলা ছবি দেখিয়েছিল অনেকগুলি। কচি একটি ধবধবে শিশুর সাদা-কালো, রঙিন ছবি। একটার পর একটা দেখিয়েছিল

—দেখো শিল্পী, স্নানের টাবে কেমন করে বসে আছে! জল নিয়ে খেলতে অ্যাতো ভালোবাসে—। এই, এই দেখো। বাগানের ব্যাকগ্রাউন্ডে ওর সোনালী চুল কি রকম উড়ছে এলোমেলো! ভালো না?'

—'হ্যাঁ। ভারি সুন্দর। কি নাম বললে?'

উত্তেজিত খুশিতে ঝলমলে গলায় জেরি কথা বলছিল,

—প্যাট। আমার প্যাট। এই দেখো, ও তখন এক বছরের, এতোগুলো বেলুনের মধ্যে কেমন জবুথবু হয়ে বসে আছে। মিষ্টি মিষ্টি। ছবিটা তোলার ফ্ল্যাশ বাল্বের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলেছিল।—'

বলতে বলতে জেরির গলায় হাসি। আবার বলছে,

—'ওর দ্বিতীয় জন্মদিনের ছবি—'

আমাকে কথা বলবার সুযোগই দিচ্ছিল না জেরি। অবশ্য, মানুষের এই সব ফেলে-আসা সময়ের কথা শুধু শুনে যাওয়ার অপেক্ষা রাখে। সহৃদয় শ্রোতা পেলেই হল।

—'এটা আসলে রঙিন তুললে ভালো হতো। টুপি আর পুরো সুটটার রং একেবারে ঝলমলে। আর এইটে দেখ, কেমন বোকা বোকা লাগছে আমাকে, তাই না? আসলে আমার কোলে চেপে যা দুষ্টুমি করছিল না, ভয় হচ্ছিল, পড়ে না যায়। আট মাসের প্যাট — দুটো দাঁতে হাসি হচ্ছে—দারুণ না?'

হ্যাঁ, দারুণ, জেরি। মনে মনে বললুম, তার চেয়েও দারুণ ভালো লাগছে তোমাকে। প্যাটের জন্যে তোমার শিশুদের মতো ব্যাকুলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার হৃদয়ে এক শ্রদ্ধার আসনে বসে পড়েছো তুমি।

—'শিল্পী। প্যারিসে বসে তোমার ইচ্ছে মতন ছবি আঁকতে আঁকতে এক ফাঁকে আমার প্যাটের একটা পোর্ট্রেট করে দেবে? ও ভীষণ জীবন্ত। প্রচন্ড প্রাণ নিয়ে বুনো পাখির মতো ও পৃথিবীতে এসেছে। ওর একটা প্রাণবন্ত ছবি তুমি আমাকে এঁকে দেবে? অয়েল পেইন্টিং। যে ছবি দেখে, আমার যদি কোনো কষ্ট থাকে, তা যেন ভুলে যেতে পারি। দেবে? প্যাটের মুখ, প্লীজ?'

চার পাঁচটি ফোটো বেছে রেখেছিলুম সেদিন আমার কাছে। জেরিকে শ্রদ্ধার আসনে তুলে, মাথা নেড়ে জানিয়েছিলুম, দেবো। নিশ্চয়ই দেবো, জেরি।

সেই জেরি, সেই প্যাটরিসিয়ার পাপা সুখ খুঁজতে খুঁজতে প্যাটকে হারিয়ে ফেলল।

(ক্রমশ)

প্রাচীন ভারতে পত্রলিখন রীতি ও গুপ্তচরবৃত্তি

মানিকলাল সিংহ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথিশালায় বিখ্যাত গুপ্তসম্রাট বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভারত্ন বররুচির 'পত্রকৌমুদী' পুঁথিটি রহিয়াছে। পুঁথিটির পত্রসংখ্যা চৌদ্দ। এই স্বল্পপরিসর পুঁথির মধ্যে বররুচি সেকালের পত্রলিখনের যে সমস্ত রীতি প্রচলিত ছিল তাহাই বিবৃত করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে রাজলেখক ও গুপ্তচরদের গুণাগুণ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। বররুচির পত্রকৌমুদী লিখিত হওয়ার পূর্বে পত্রলিখন ও গুপ্তচরবৃত্তি প্রসঙ্গে আরও কয়েকখানি পুঁথি রচিত হইয়াছিল; যেমন—'রাজনীতি চিন্তামণি', 'রাজনীতি রত্নাবলী', 'রাজনীতিচন্দ্রিকা 'পদ্মকাদম্বরী' ইত্যাদি। এই পুঁথিগুলির রচয়িতাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। বররুচি তাঁহার 'পত্রকৌমুদী'তে তাঁহার পূর্বে রচিত উপরোক্ত গ্রন্থগুলি হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া দিয়াছেন। পত্রকৌমুদী পুঁথিটিতে সেকালের পত্রলিখন রীতি ছাড়াও তৎকালীন ভারতের গুর্জর, পল্লব, মহারাষ্ট্র, হেন্দুস্থান প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত ভাষার নমুনাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারত সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাই বররুচি রচিত পত্রকৌমুদী পুঁথিখানি অতীব মূল্যবান তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পত্রকৌমুদী পুঁথির প্রারম্ভেই বররুচি সংক্ষেপে আপন পরিচয় দিয়াছেন। পরিচয়টুকু নিম্নরূপ :—

বিক্রমাদিত্য ভূপস্য কীর্তিসিদ্ধো নিদেশতঃ।
শ্রীমান বররুচি শ্রীধীমান তনোতি
পত্রকৌমুদীং॥

পত্রলিখন রীতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বররুচি পত্রপ্রমাণ, পত্রভঙ্গকরণ, পত্রচিহ্ন, পত্রের নয়নক্রম, পত্রকোণছেদন, পত্রপঠন, পদন্যাস, প্রকরণ, পত্রলেখকের গুণাগুণ রাজা, মন্ত্রী, গুরু, পণ্ডিত, স্বামী ইত্যাদির প্রশস্তি, রাজলেখকের গুণাগুণ এবং গুপ্তচরদের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে তিনি 'রাজনীতিচিন্তামণি', 'রাজনীতিরত্নাবলী', 'রাজনীতিচন্দ্রিকা', ও 'পদ্মকাদম্বরী' ইত্যাদি পূর্বগ্রন্থগুলি হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়াছেন। পত্রপ্রমাণ অর্থাৎ দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বররুচি লিখিয়াছেন :—

ষড়ঙ্গুলোধিকং হস্তং পত্রমুত্তমমীরিতং।
মধ্যম্ হস্তমাত্রং স্যাত সামান্য মুষ্টি
হস্তকং॥

অর্থাৎ উত্তমপত্রের দৈর্ঘ্য একহাত ছয় আঙ্গুলে প্রমাণ, মধ্যমপত্র একহাত এবং সামান্যপত্র মুষ্টিবদ্ধ একহাত হইবে। পত্রপ্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনার পর পত্রভঙ্গ প্রকরণ (ভাঁজকরা) সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বররুচি পত্রখানি তিনটি সমান অংশে ভাঁজ করিয়া উপরের দুইটি অংশ ত্যাগ করিয়া সর্বনিম্নের অংশে গদ্যপদ্য-সংযোগে পত্র লিখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। পত্রভঙ্গ প্রকরণে বররুচি পূর্ব গ্রন্থ রাজনীতিচিন্তামণি গ্রন্থের নির্দেশ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নাই। রাজনীতি-চিন্তামণিতে পত্রখানিকে একবার সমান দুইভাগে ভাঁজ করিয়া উপরের অংশ বাদ দিয়া নিম্নাংশে পত্র লিখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আবার পত্রখানিকে সমান তিন ভাগে ভাঁজ করিয়া উপরের দুই অংশ ত্যাগ করিয়া সর্বনিম্নাংশে গদ্য-পদ্য সহযোগে লিখিতে বলা হইয়াছে। পত্রের উভয় পার্শ্বে এক আঙ্গুল, দেড়আঙ্গুল পরিমাণ 'মার্জিন' রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বররুচি পত্রের মার্জিন বিষয়ে কোন নির্দেশ দেন নাই।

সেকালে পত্রের কোণ ছেদনের রীতি ছিল। পত্রের কোণ ছেদনের রীতি হইতে পত্রটি কাহার উদ্দেশে লিখিত তাহা চিনিতে পারা যায়। পত্রকৌমুদী পুঁথির পূর্ববর্তী 'রাজনীতিরত্নাবলী পুঁথির নির্দেশ বররুচি উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজনীতিরত্নাবলী পুঁথিতে পত্রের কোণ ছেদনের নির্দেশগুলি নিম্নরূপ :—রাজার উদ্দেশে লিখিত পত্রের নিম্নভাগের দক্ষিণাংশ এক অঙ্গুলি পরিমাণ ছিন্ন করিতে হইবে। কিন্তু এই ছিন্ন অংশটি দেখিতে অর্ধচন্দ্রের মত হইবে। নৃপতি মহিষীদের উদ্দেশে লিখিত পত্রের মধ্যভাগ ছিন্ন করিতে হইবে। স্বামীকে লিখিত পত্রের উপরের দক্ষিণভাগে এক অঙ্গুলি পরিমাণ, কিন্তু স্ত্রীকে লিখিত পত্রের উপরের বামভাগে অর্ধ অঙ্গুলি পরিমাণ ছিন্ন করিতে হইবে। পত্রটিকে সমান দুই ভাঁজ করিয়া মধ্যে বর্তুলাকার চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে পত্রটি পুত্রকে লিখিত হইয়াছে। এইরূপভাবে গুরু, যতি, সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে লিখিত পত্র বিভিন্নভাবে ছিন্ন করা হত। মন্ত্রীকে লিখিত পত্রের নিম্নাংশের বামদিকে এক অঙ্গুলি পরিমাণ এবং ভৃত্যকে লিখিতপত্রে অনুরূপভাবে সামান্যমাত্র ছিন্ন করিতে হয়। শত্রুকে লিখিত পত্রের নিম্নাংশে একখানি খড়্গ অঙ্কিত করিয়া উহার মধ্যভাগ ছিন্ন করা হইত। এই বিষয়ে বররুচি পূর্বগ্রন্থ "রাজনীতি-রত্নাবলী"র নির্দেশ যথাযথভাবে মানিয়া লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

পূর্ব গ্রন্থ গতং বাচাং সমাহৃত্য প্রযত্নতঃ।
সর্বেষামেব পত্রাণাং সমুদ্দীক্ষ্যতে॥

সর্বেষামেব পত্রাণাং যথোক্তস্যানুসারতঃ
শাস্ত্রদৃষ্টি প্রমাণেন ছেদয়েন্মতিমান নরঃ॥
ইতি পত্র কৌমুদ্যাং পত্র-লক্ষণ পরিচ্ছেদঃ॥

পত্রের কোণ ছেদন বাদেও চন্দন, কুমকুম, কস্তুরী ইত্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা পত্রগুলিকে চিহ্নিত ও সুরভিত করার রীতিও সেকালে প্রচলিত ছিল। পত্রের ঊর্ধ্বভাগে ছয় অঙ্গুলি নিম্নে চন্দ্রবিম্ববৎ বর্তুল চিহ্ন অঙ্কিত হইত। রাজার উদ্দেশে লিখিত পত্র কুমকুম ও কস্তুরী দ্বারা, পণ্ডিতের উদ্দেশে লিখিত পত্র চন্দন দ্বারা চিহ্নিত হইত। স্বামীকে লিখিত পত্র সিন্দুর দিয়া
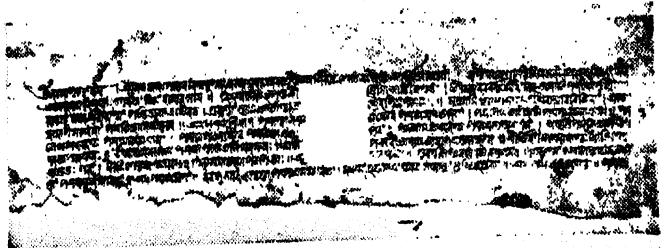
পত্রকৌমুদী

[illegible] হইত। কন্যাকে লিখিত পত্র [illegible] দ্বারা রঞ্জিত হইত। সন্ন্যাসী, পিতা এবং পুত্রকে লিখিত পত্র চন্দন দ্বারা, আবার বন্ধুদের পত্র কুমকুম দ্বারা চিহ্নিত করা হইত। কিন্তু শত্রুর পত্র রক্ত দ্বারা চিহ্নিত হইত। বিভিন্ন মাঙ্গলিক দ্রব্য দিয়া পত্রকে চিহ্নিত করার রীতির প্রায় সমস্তটুকুই লোপ পাইয়াছে। একালে বিবাহ ইত্যাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে লিখিত পত্রগুলি শুধুমাত্র হলুদ দ্বারা রঞ্জিত হয়।

পত্রের কোণ ছেদন, পত্রকে চিহ্নিত করণ বাদেও সেকালে পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রেও কতকগুলি বিশেষ রীতি অনুসৃত হইত। রাজার পত্র মূর্ধা স্পর্শ করিয়া—মন্ত্রীর পত্র ললাট, গুরু ও ব্রাহ্মণের পত্র মূর্ধা এবং যতি সন্নাসী ও স্বামীর পত্র মূর্ধা স্পর্শ করিয়া গ্রহণ করার রীতি ছিল। শত্রুর পত্র কণ্ঠ স্পর্শ করাইয়া গৃহীত হইত।

পত্র-লিখনের প্রারম্ভে মাঙ্গলিক অংকুশ চিহ্ন পত্রের উপরের অংশের মধ্যে অংকিত হইত। অংকুশ চিহ্নের মধ্যে স্বস্তি বিন্দু এবং অধোভাগে সাতটি-অংক সংকেত লিখিত হইত। ইহার পর যাহার উদ্দেশে পত্রটি লিখিত হইত প্রথমেই তাঁহার প্রশস্তি লিখিতে হইত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রশস্তি লিখিতে হইত। রাজার প্রশস্তি সুদীর্ঘ বাইশ দফায় বর্ণিত হইয়াছে। রাজপ্রশস্তির শুধুমাত্র কয়েকটির শেষাংশ প্রদত্ত হইল:—............ভূপাল কুলতিলকং শ্রীমহারাজাধিরাজেষু॥.........ভূমণ্ডল মণ্ডলায়িত শ্রীযুত মহারাজাধিরাজেষু॥......প্রবল প্রতাপ মহারাজাধিরাজ সচ্চরিতেষু॥ শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ মহাদান শৌণ্ডেষু ইত্যাদি॥ মন্ত্রী প্রশস্তি ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রশস্তি একদফাতেই সমাপ্ত হইয়াছে। মন্ত্রী প্রশস্তিতে সেকালের মন্ত্রীদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশ খানিকটা জানা যায়। পত্রকৌমুদীতে লিখিত মন্ত্রী প্রশস্তি নিম্নরূপ:—

স্বস্তি শ্রীমত সমস্ত সামন্ত সৈবক
নির্বাহকেষু
কোষ গো কৃষী হৃষী বন গজরাজি
গৃহপরিবার হর্ষহেতু—
নীতিসেতু রক্ষমান নিপুণেষু অস্মাদ্বিশ্বানে
কলিকেতনেষু
শ্রীশ্রীমন্ত্রী প্রবরেষু।

গুরু প্রশস্তিতে ভক্ত বা শিষ্যহৃদয়ের গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র গুরু প্রশস্তির শেষাংশে 'কোটিশঃ প্রণামাঃ' নিবেদিত হইয়াছে। স্বামী, ভার্যা, পিতা, পুত্র, সন্ন্যাসী, যতি সবারই উপযুক্ত প্রশস্তি লিখিয়া পত্র আরম্ভ করার রীতি ছিল। পিতাকে লিখিত পত্রে পুত্রের 'সাষ্টাঙ্গ সহস্রমজস্র' প্রণাম নিম্নভাবে নিবেদিত হইয়াছে—'মমবন্ধকর সংপুটৈস্যা পৃষ্ঠ লগ্নাং সাষ্টাঙ্গ প্রণতয়ঃ সহস্রমজস্রং বিজ্ঞাপণ্ড॥ অনুরূপভাবে পুত্রকে লিখিত পত্রে পিতা পুত্র প্রশস্তি নিম্নভাবে করিয়াছেন.........
"বিবিধগুণালঙ্কৃত নিজ বংশাবতংস—সকল বিশ্বাস নিধান নিজকুল পবিত্রী কৃতাত্ম প্রায়েষু শ্রীশ্রীশুদ্ধাচার পরিপূরিত পুত্রেষু শুভাশিষাং রাশয়সন্ত, বিজ্ঞাপণ্ড।"

এমন কি ভৃত্যের ক্ষেত্রও প্রশস্তির প্রচলন ছিল। ভৃত্যের উদ্দেশে লিখিত প্রশস্তি এইরূপ :—"স্বস্তি ভগবচ্চরণ পরায়ণ সকল......রক্ষক গো মহিষ্যাদির প্রতিপালক—নিখিল বংশানুসেবক বশম্বদম নুক ভৃতাং প্রতি।" শত্রুকেও যথারীতি প্রশস্তি করিয়া পত্র লিখিতে হইত।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রশস্তিগুলি দেখিয়া সহজেই বোঝা যায় যে, সেকালে কোন ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইত
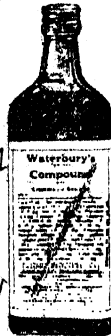
না। কোন ক্ষেত্রেই শিষ্টাচার বা শালীনতার সীমা লঙ্ঘিত হয় নাই।

পত্র পঠনের ক্ষেত্রেও সেকালে কয়েকটি রীতি পালিত হইত। পত্রটিকে দক্ষিণ হস্তের অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ করিয়া ব্যক্তি বিশেষ অনুসারে মূর্ধা, কপাল ইত্যাদিতে স্পর্শ করাইয়া পত্রপাঠ করিতে হইত। প্রথমেই মনে মনে দুইবার পত্রটি পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর সরবে পড়িবে। রহস্য পত্র কখনও সভায় বা একাধিক লোকের সম্মুখে পড়িবে না। অশুভ পত্র প্রথমে নিজকে পড়িয়া শোনাইতে হইবে তাহার পর সংবাদ উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে শুনাইবে।

পত্রলিখন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তির গুণাগুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যিনি পত্ররঞ্জন ভঙ্গ প্রমাণ, পত্রচিহ্ন ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ—রাজমহিষী, রাজবধূ, পাত্র মন্ত্রীদের মনোভাব সম্বন্ধে সচেতন তিনি 'পত্রনবিচ' হইবার যোগ্য।

এই ক্ষেত্রে বররুচি 'রাজনীতি চন্দ্রিকার' মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজনীতি চন্দ্রিকায় লিখিত রহিয়াছে যে, যিনি উত্তম, মধ্যম ও সামান্য পত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, পত্রের লিখন সম্বন্ধে যাঁহারা জ্ঞান রহিয়াছে; গুরু, পণ্ডিত, যতি, সন্ন্যাসী, মন্ত্রী, রাজা, রাজমহিষী ইত্যাদি পত্রগুলির চিহ্ন সম্বন্ধে যিনি সুনিশ্চিত—পত্র দেখিয়াই যিনি বুঝিতে পারেন পত্রটি কাহার উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে—যিনি পত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার পারঙ্গম, শাস্ত্রদৃষ্টির দ্বারা যিনি পত্রের সর্বদিকের বিচার করিতে পারেন তিনি 'তুরাণকাশবিদ্' বলিয়া পরিগণিত হন।

বররুচি তাঁহার পত্রকৌমুদী পুঁথিটিতে রাজলেখক ও কফিয়ানবিচের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই বিষয় বররুচি পূর্বগ্রন্থ রাজনীতিচিন্তামণি এবং রাজনীতিচন্দ্রিকার অনুসরণ করিয়াছেন। রাজলেখক নিম্নলিখিত গুণসম্পন্ন হইবেন—ব্রাহ্মণ, মন্ত্রণাভিজ্ঞ, রাজনীতিবিশারদ, নানান লিপি ও ভাষায় পণ্ডিত, মন্ত্রণাচতুর, ধীমান, সন্ধিবিগ্রহভেদজ্ঞ, রাজকার্য বিচক্ষণ, কার্যাকার্য বিচারজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, স্বরূপবাদী, শুদ্ধাত্মা, ধর্মজ্ঞ, রাজধর্মবিদ ইত্যাদি। যিনি সর্বদা রাজার অনুরাগী, বিশ্বাসভাজন, সর্বদা রাজার হিতচিন্তা করেন তিনিই রাজলেখক হইবেন। যিনি মাননীয় ব্যক্তিদের মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষা করেন, গদ্য ও পদ্য সংযোগে নির্দোষ মনোরম পত্র লিখিতে সক্ষম তিনিই রাজলেখক হইবার যোগ্য।

সেকালে রাজ লেখকদের সমান অথবা আরও যোগ্যতর আর একশ্রেণীর রাজকর্মচারী থাকিতেন। বররুচি তাঁহাদের কফিয়ানবিচ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কফিয়ানবিচ অর্থাৎ গুপ্তচরগণই রাজার চক্ষুস্বরূপ। বররুচি তাঁহার পূর্ববর্তী
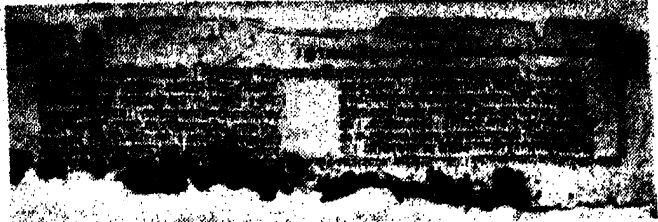
পত্র কৌমুদী

'রাজনীতিচিন্তামণি' নামক গ্রন্থখানি হইতে কফিয়ানবিচদের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। কফিয়ানবিচদের গুণাবলী রাজনীতিচিন্তামণি অনুযায়ী নিম্নরূপ ঃ—যিনি শাস্ত্রজ্ঞ, নীতিনিপুণ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, যথার্থবাদী ও ধর্মাত্মা তিনিই কফিয়ানবিচ হইবার যোগ্য। কফিয়ানবিচ—বৈদ্য, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, পথিক ইত্যাদির বেশ গ্রহণ করিতে পারদর্শী। কুরূপ ও মূক সাজিতেও সক্ষম। যিনি ভস্মের দ্বারা সর্বশরীর আচ্ছাদিত করিয়া মুণ্ডিতমস্তক বা জটিলকেশ যতি এবং চাররূপ ধারণ করিতে পারদর্শী তিনিই কফিয়ানবিচ। যিনি দেশদেশান্তর গমন করিয়া পাত্র, মন্ত্রী ইত্যাদির সংবাদ নিভৃতে সংগ্রহ করেন—তিনিই কফিয়ানবিচ। স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া যাহা শুনিবেন এবং যাহা দেখিবেন তাহার রহস্য যিনি রাজলেখককে যথাযথভাবে ব্যক্ত করিবেন

তিনিই কফিয়ানবিচ। তিনবার শুনিয়া এবং দেখিয়া যিনি যন্ত্রের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে পারেন এবং পরে তাহা যথাযথভাবে ব্যক্ত করিতে পারেন তিনিই কফিয়ানবিচ হইতে পারেন। দেশদেশান্তরে যাইয়া যাহা শুনিবেন যাহা দেখিবেন তাহাই মনোগত করিবেন পরে স্বুপাত্তর লেখককে তাহা সর্বতোভাবে ব্যক্ত করিবেন তিনিই কফিয়ানবিচ।

বররুচি তাঁহার 'পত্রকৌমুদী' পুঁথিটিতে পত্রলিখন পদ্ধতির বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজলেখক এবং কফিয়ানবিচদের যোগ্যতা এবং গুণাবলীর পরিচয় দিয়া সেকালের এক বহসাময় ঐতিহাসিক অধ্যায়কে আমাদের সম্মুখে উন্মাটিত করিয়াছেন। গুপ্তযুগে এবং তাহারও পূর্ববর্তী রাজাদের আমলেও যে ভারতের পত্রলিখন রীতি, রাজলেখক ও গুপ্তচরবৃত্তির প্রচলন ছিল তাহা উপরোক্ত বর্ণনা ও উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণিত হয়। সেকালের রাজকর্মচারীরা, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্মাত্মা ছিলেন। তাহারা যথার্থভাবে রাজসেবক ও প্রজাসেবক ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পত্রলিখন রীতির নমুনা পত্রকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এইগুলি হইতে গুপ্তযুগের আঞ্চলিক ভাষার স্বরূপ ও পার্থক্য বোঝা যাইবে।

অথ উত্থাপ্যাকাঙ্ক্ষা পত্রলিখন প্রকারঃ।

স্বস্তি শ্রীযুষ্মদান্তপর্যা মহাশয়েষু অমুককে রাম রাম আগে হম সুনভেহে' বো তুমারে মুল্লক সোঁ পাছাহিনোক আনকারি পেসে' ভীনেতেহে' ওর মল্লকতী পরমান করতেহে' বন্ধহয়ুডী চললেতে দেন ছাঁতিস বাস্তে যোইম বাতকো তেমোরী সংগতী হোমতেহে সফনলা দেশতে আপনি ফোজ আমিন ভের করি আপনাই আম্মন কারগে বাহ ভীয়াছী' ভাত সোচনা বেপে তোমারাভী মুল্লক আবাদনে হোয়..............॥

অথ উভয়কাঙ্ক্ষা পত্রলিখন প্রকারঃ॥

স্বস্তি শ্রীসর্বোপমাযোগ্য ফনলেকে' রাম রাম আগে হমকে ব্যাদান খাখাগো হম পীয়াসত হকী কতি পাইতুম লিখায়ে হেঃ মারে মুলক যো ফনালা জবরদস্তী সো শত মুলুকে কী খ আরী করতাহে তিসকা ইনাজ কুচকী যাচহী এতো হমতী ১০ ইসবাত কোরহতেছ হাতেতে হে যোউসকা ইনাজ করী এগতি সবাস্তি তুম উসকে মুলুক উপর আপানী ফোজ ভেজ দেব কো ভী লিখিতে' তু হমভী ফোজ ভেজেগে কোথাণ্ডে দিন সোইম কা ইনাজ হে বে জগাকিম্ববাত...........................॥

অথ শুঙ্কতেন অঙ্ক পল্লবী ভাষয়া পত্রলিখন প্রকারঃ।

তত্র অক্ষরাদিক্ষকারান্তা অষ্টৌবর্গাঃ
অ ই উ এ প্রথমো বর্গঃ।
ক খ গ ঘ ঙ দ্বিতীয়ো বর্গঃ।
চ ছ জ ঝ ঞ তৃতীয়ো বর্গঃ।
ট ঠ ড ঢ ণ চতুর্থো বর্গঃ।
ত থ দ ধ ন পঞ্চমো বর্গঃ।
প ফ ব ভ ম ষষ্ঠো বর্গঃ।
য র ল ব সপ্তমো বর্গঃ।
শ ষ স হ ক্ষ অষ্টমো বর্গঃ।

তত্র প্রথমং বর্গাঙ্কং দবোদ্বিতীয়মক্ষরাঙ্কং দরো তৃতীয়ং মাত্রাঙ্কং দরো অক্ষর সংকেতবোধাঃ॥

তথা চরামং পশ্যোত্তত্র—

৭২২।৬৫১৫।৬১১।৪১৭১১॥

এবমঙ্কা লিখনীয়ঃ। রামো জয়তি।

৭২২।৬৫১৩।৩৩১।৭১১।৫১৩।

পঞ্চাক্ষরান্যাং স্থানে পঞ্চঙ্কো বোধ্যা।

হেন্দুস্থানীয় ভাষয়া পত্রলিখন প্রকারঃ।

স্বস্তি শ্রীসর্বোপমাযোগ্য হমারে বিশ্বাস ধাম পরমাপ্তত্তম মহাশয়কো লিখনং আগে হকো তুমারে দেশকী ফনালী বতসচহে ভীহে' তিসবাস্তে হম তুমারে পাস অপনা ফমালা তুমারী বেগা বো তুর পোশোকা কাম পডর গায়া রহে মোজোখিক মকী ৬° রহো বতোক্ষপানে আদমী সাত.................॥

অথ গুর্জর ভাষয়া পত্রলিখন প্রকারঃ।

স্বস্তি শ্রীসর্বোপমাযোগ্য রাজমান্য শ্রীঅমুকনে অমুকনা অনেক নমস্কার বিশেষ। অক্কারু ইহাক্ষেম কুশল জনীনে পেতোনু কুশলখজো ফোজথী পরম সন্তোষ থায় অপর ভাইজী তমারু পত্র না দিবস থয়া আকুল থী তেমাটে খসীচিন্তা থাএ ছে তোমারু পত্র অমনে শীঘ্র পোচেহে একক করোজোতক্ষণে জইনে ইহ থী ঘনদিবস থয়াছে ঘনুশুনুথী এতমারে সাথে মনবাণী ঘনাইছাছে অনুলোভার মধাম হেএ জানজো কৃপাস্নেহ রাখ জো ঘনু তুন ঘর॥

অথ মহারাষ্ট্রে ভাষয়া পত্রলিখন প্রকারঃ।

স্বস্তি শ্রীসর্বোপমাযোগ্য রাজমান্য ফন্যাল্যা সফল্য স্যাচে আশীর্বাদ বিশেষ যৈথীন কশল জানু নিস্রক্ষেম পহলে জেনে করুণ সন্তোষ হেম উপর আক্ষসে ফনালীর তুমাপাহি যে না সোচীচক্ষপোশী ফনালাস পচ্ছবিনা আহেতে কার্যাসর্ব উত্তম প্রকার করুণ করান আলস্য ন করনে অলিখ হাঁজে কার্যকামনি কৃতে করণে রুপাদেয়নোগতিনডে পত্রান্ত নিকুল পাহনে আক্ষী পা পানচ দে উ চিন্তান করণে কৃপাস্নেহ অথদনে পত্র লিখিত পত্র জানে বহুত কামনি হারে॥

বররুচির 'পত্রকৌমুদী' এবং তাহারও পূর্ববর্তী পত্রলিখন পদ্ধতি সম্পর্কিত পুঁথিতে পত্রের মার্জিন দেওয়া, পত্র ভাঁজ করা ইত্যাদি নিয়মগুলির উল্লেখ হইতে বোঝা যায় এ সময়ে পত্র লিখার কাজে কাগজেরই ব্যবহার হইত। দ্বিতীয়ত, এই পুঁথি হইতে ওই সময়ের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারও একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কি ধরনের গুণ ও দক্ষতার প্রয়োজন হইত এই পুঁথি হইতে তাহাও বোঝা যায়। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে পত্রকৌমুদীতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রূপান্তরিত পত্রের নমুনাগুলি অতীব মূল্যবান। পত্রকৌমুদীতে পত্রলিখনের যে সমস্ত রীতির কথা বররুচি বিবৃত করিয়াছেন সেই সমস্ত রীতি গুপ্তরাজাদের পূর্ব হইতেই ভারতে চালু ছিল। বর্তমানে ইহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। কিন্তু নামের পূর্বে শ্রী, শ্রীমান শ্রীযুক্তের ব্যবহার এবং সম্ভাষণের ক্ষেত্রে সচ্চরিতেষু, প্রবরেষু, মহামহিমস্‌ ইত্যাদির ব্যবহার সেই পূর্বরীতিরই অনুবর্তন।

॥ সাতষট্টি ॥

নরম হাতটা তার হাত ছুঁয়েই সরে গেল। সোমেন একটু অবাক হয়ে তাকায় পাশের মহিলার দিকে। আর তখনই পাশাপাশি সীটে বসা পাঁচ ছ'জনের মধ্যে একটা চাপা হাসি খেলে যায়।

ও পাশের কে একজন বলে, আহা বেচারা! কত কি ভেবে এসেছিল!

আবছায়ায় পাশে-বসা অপালাকে তখন চিনতে পারে সোমেন। ভীষণ সেজেছে তাই চিনতে পারছিল না এতক্ষণ। তার ওপাশে পূর্বা, অণিমা একটা অচেনা মেয়ে, তারপর অনিল রায়। তার ওপাশে শ্যামল আর মিহির বোস।

—জানতাম তোরাই। সোমেন নিস্পৃহ গলায় বলে।

—আহা জানতিস! বলে অপালা একটা চিমটি দিল সোমেনের উরুতে। পূর্বার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, নাকি জানত! হুঁ!

—গাঁট্টা মার না। বলে পূর্বা।

অণিমা কিছু বলল না। একবার কেবল আবছায়ায় মুখ ফিরিয়ে দেখল। অণিমার পাশেই অচেনা মেয়েটি। সেইখানেই একটু রহস্য থেকে গেল। কে মেয়েটা?

সিনেমাটা ভালই। দেখতে দেখতে সোমেন রহস্য ভুলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কেবল অপালার চিমটি টের পাচ্ছিল। একবার চাপা গলায় বলল—বড্ড জ্বালাচ্ছিস তো। যা ও পাশে গিয়ে পূর্বাকে আমার পাশে দে।

—ইস্‌! তোমাকে প্ল্যান করেই এখানে বসানো হয়েছে বাবু। আমার পাশেই থাকতে হবে।

সোমেন চাপা গলায় বলে—ভাগ্যিস চিরকাল পাশে থাকতে হবে না।

—হবে না কে বলল? হতেও তো পারে।

—মিহির বোস তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে?

পূর্বা খুক করে হেসে ফেলল। আশপাশের লোকেরা বিরক্ত হচ্ছে। অনিল রায় ওপাশ থেকে একবার বললেন—চুপ।

—মেয়েটা কে রে? সোমেন খানিক বাদে জিজ্ঞেস করে।

—হবে কেউ! তোর দরকার কি তাতে?

—কৌতূহল।

—ইঃ। যদি একদিন পার্ক স্ট্রীটে খাওয়াস তাহলে বলব।

—খাওয়াবো।

—বলে যদি না খাওয়াস?

—ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। সোমেন বলে।

অপালা একটা শ্বাস ফেলে বলল—বাব্বা! এত কৌতূহল? হ্যাংলাও বটে তুই! আমরা এতগুলো মেয়ে পাশে থাকতেও ঐ একজনের কথা জানতেই হবে!

—তোরা মেয়ে নাকি? শাড়িপরা পুরুষ।

—মারব। বলে অপালা ফের চিমটি দেয়।

সোমেন 'উঃ' করে ওঠে।

ছবির পর্দায় তখন এক সাহেব এক মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধরে কষে চুমু খাচ্ছে। হলসুদ্ধ লোক শ্বাস বন্ধ করে আছে। চুমুর পর মেমসাহেব হঠাৎ রেগে গিয়ে সাহেবের গালে একটা চড় মারল।

—ঐ রকম একটা থাপ্পড় তোর গালে দিতে পারলে—অপালা বলে।

—থাপ্পড়ের আগেরটা কি হবে?

—কি বলছে রে? পূর্বা মুখ এগিয়ে জিজ্ঞেস করে।

—ঐ একটু আগে যা হল তাই চাইছে। অপালা বলে।

—থাপ্পড় দে না।

—দে বা, ছবিটা শেষ হোক।

ছবিটা টপ্ করেই শেষ হয়ে গেল। হাইয়েস্ট সবাইকে বেরিয়ে এসে অনিল রায় পাইপ ধরালেন। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া গেল। বললেন—ওঃ সোমেন, তোমার কাছে একটা ক্ষমা-প্রার্থনা বাকি আছে।

—কেন স্যার?

—একদিন তুমি আমার বাড়ি গিয়েছিলে। আমি তোমার সঙ্গে রিয়্যাল খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আইওয়াজ ড্রাংক।

—ও কিছু না স্যার। আমি ভুলেও গেছি।

—না, না। আমি সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। ইদানীং মাত্রাটা বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছিল। একা একা বড্ড ফাঁকা লাগত তো! আমার আবার খানিকটা ভূতের ভয়ও আছে।

—বলেন কি? বলে সোমেন অবাক।

—সত্যি স্যার? বলে চেঁচিয়ে ওঠে পূর্বা। অপালাও চেঁচায়।

—আস্তে। অনিল রায় বলেন—সবাই শুনতে পাবে। আমার ভূতের ভয়ের ব্যাপারটার বেশী পাবলিসিটি দিও না। চলো রেস্টুরেন্টে বসে বলছি।

দঙ্গলটা পার্ক স্ট্রীটের দিকেই এগোয়। আগে আগে শ্যামল আর মিহির বোস। বোধ হয় আগামী নাটকের ব্যাপার নিয়ে ওরা খুব উত্তেজিত আর মগ্ন হয়ে কথা বলতে বলতে দলছুট হয়ে হাঁটছে। একটু পিছনে অনিল রায়ের দু পাশে সোমেন আর অপালা, পিছনে ম্লানমুখ অণিমা, সেই অচেনা মেয়েটি পূর্বা। মেয়েটাকে লক্ষ করল সোমেন। সুন্দরী নয়। রোগা বেঁটে তবে বয়স খুব অল্প কুড়ি বাইশের মধ্যেই। মুখখানায় খুব একটা হাসিখুশী আনন্দের ভাব মাখানো বলে মনে হয়।

অনিল রায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন—বাই দি ওয়ে। অপালা সোমেনকে কি আর রহস্যের মধ্যে রাখা ঠিক হচ্ছে? ও হয়তো এ দলে একটি নবাগতাকে দেখে খানিকটা বিমূঢ় না কি যেন বলে হয়ে আছে। না?

—না স্যার, ওকে বলবেন না। চেঁচিয়ে ওঠে অপালা—ওর কাছ থেকে আগে খাওয়া আদায় করি তারপর বলব।

অনিল রায় স্মিত হেসে বললেন—খুব তো খাওয়া খাওয়া কর, কিন্তু খাওয়ার সময় তো দেখি সব পাখির আহার। তোমাদের তো আবার ডায়েট কন্ট্রোল না কি ছাই যেন আছে, তবে অত খাওয়ার আওয়াজ কেন?

—সামনেট হাড় কিপটে স্যার, খরচ করে না। অপালা বলে।

—থাকলে তো করব। সোমেন মৃদু হাসি হেসে বলে—দেখছিস তো চাকরি নেই।

—চাকরি হলেই বুঝি খাওয়াবি?

সোমেন চাপা গলায় বলে—আমারটা তো তুই-ই সারাজীবন খাবি বাবা!

—ইস, কি অসভ্য স্যার, দেখুন সোমেন আমাকে অসভ্য কথা বলছে! অপালা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে।

—বলেছো সোমেন? অনিল রায় স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করেন।

—না স্যার, যা বলেছি তা ওর বাপের জন্মে ওকে কেউ বলেনি। অসভ্য কথা! এঃ। বলে সোমেন মুখ ভেংচিয়ে বলল—কেউ বলবে না, ঐ মিহির বোসও না। এই শর্মাই বলল। যখন কেউ জুটবে না তখন এসে আমার দোরগোড়ায় বসে কাঁদবি।

—বয়ে গেছে। কাকের ঠোঁটে কমলালেবু! শখ কত!

—আমি কাক? তুই কমলালেবু? শুনুন স্যার, কত বড় আস্পর্দা!

অনিল রায় হাত তুলে দুজনকে থামান। বলেন—তুমি কি অপালাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলে সোমেন?

সোমেন মাথা চুলকে বলে—ঠিক তা নয় স্যার।

—এর আগেও যেন কয়েকবার তুমি কাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছো বলে শুনেছি। ওটাই কি তোমার 'হবি' নাকি?

সোমেন ম্লান মুখ করে বলল—কেউ রাজি হয় না স্যার, তাই সবাইকে বাজিয়ে দেখছি। যদি কেউ রাজি হয়ে যায়! বান্ধবীরা সব একে একে খসে পড়ছে। এরপর আর কে থাকবে?

অনিল রায় অন্যমনস্ক হয়ে বলেন—তাও বটে। আমিও অনেককে দিয়েছিলাম প্রস্তাব। কিন্তু বড় ফ্যান্টাস টাইপের ছেলে বলে কেউ রাজি হত না। তোমার অবশ্য অন্য প্রবলেম কাউকেই বোধ হয় কনভিনসড করাতে পারছ না যে তোমারও ভবিষ্যৎ আছে!

—ঠিক স্যার।

অনিল রায় উদার কণ্ঠে বললেন—অপালা, বী জেনেরাস। ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও। যদি বোঝো ও সত্যিই অপদার্থ তাহলে বরং পরে একটা ডিভোর্স করে নিও।

অপালা গম্ভীর মুখ করে বলে—শুভদৃষ্টির সময়ে ওকে দেখলেই যে আমার হাসি পাবে!

—হেসো। তবু রাজী হয়ে যাও।

—ভেবে দেখি স্যার। অপালা গম্ভীর মুখে বলে—না হয় একটা জীবন আত্মত্যাগ করেই কাটবে।

সোমেন চোখ তাকিয়ে বলে—এঃ, আত্মত্যাগ!

অপালা চোখ গোল করে বলল—তার চেয়েও বেশী। প্রাণত্যাগও করতে হতে পারে। তোকে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত সুইসাইড না করতে হয়।

পূর্বা পিছন থেকে করুণ স্বরে ডাকছিল—স্যার, স্যার, আপনারা কোথায়? এঃ মা, আমি কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না।

এসপ্ল্যানেডের অফিস-ভাঙা ভিড়ের শব্দের মধ্যে ডাকটা খুব ক্ষীণ হয়ে সকলের কানে পৌঁছোয়। ফুটপাথে নাচুনি পুতুল দেখে কিনতে বসে গিয়েছিল পূর্বা। পিছিয়ে পড়েছে।

সোমেন গিয়ে তাকে ধরে আনতে আনতে অনিল রায়কে বলে—এদের সব সময়ে একজন করে গাইড দরকার। তবু ছাড়া গরুর মতো ঘুরবে, কাউকে অ্যাকসেপ্ট করবে না।

পার্ক স্ট্রীটের দারুণ একটা রেস্তোরাঁয় সবাই এসে বসে হাঁপাচ্ছিল। অনেক দূর হাঁটা হয়েছে।

অচেনা মেয়েটি আর অনিল রায় পাশাপাশি।

অনিল রায় জিজ্ঞেস করেন—কেউ ড্রিংকস নেবে?

সোমেন মাথা নাড়ল। নেবে না। শ্যামল আর মিহির প্রায় একসঙ্গে বলল—জীন।

সেই রহস্যময়ী মেয়েটি বলল—আবার খাচ্ছো কেন?

অনিল রায় বললেন—খাচ্ছি কোথায়? এ ঠিক মদ্যপান নয়। জাস্ট অ্যাপারিটিফ বা অ্যাপেটাইজার—যা বলো।

মেয়েটা মুখটা একটু বিকৃত করে বলে—বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে। রাতে তো বাসায় খাবার খেতেই পারো না।

সোমেন হঠাৎ হেসে বলল—স্যার, আমি কিন্তু বলতে পারি উনি কে!

—কে বলো তো!

—নতুন মিসেস রায়।

অপালা বলল—আহা! কি বুদ্ধি তোর!

—কি ভীষণ বোকা রে [illegible] বুঝতে এত সময় লাগল? পূর্বা বলে।

—ঠিক বলেছি স্যার? সোমেন একটু বোকা-হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে।

অনিল রায় একটু ভেবে বলেন—ঠিক! হান্ড্রেড সেন্ট পারসেন্ট। এ হচ্ছে আমার স্ত্রী মিলু রায়। আর এই হচ্ছে সোমেন লাহিড়ী।

সোমেনের মনে হল, অনিল রায় একটা অদ্ভুত বিয়ে করেছেন। বয়সে মেয়েটি প্রায় অর্ধেক, দেখতেও তেমন কিছু নয়। তবে একটা জিনিস লক্ষ করার মতো। মেয়েটি বেশী সাজেনি। নতুন বউরা যেমন সাজে মোটেই সে রকম নয়। একটা হালকা ক্রীম রঙা শাড়ি পরেছে, মুখে প্রসাধন নেই, একটা এলো খোঁপায় চুল বাঁধা। বেশী সাজলে তাকে ভাল দেখাত না। একটু অহংকারী মেয়েটি। নমস্কার করে একটু হাসল মাত্র, কথা বলল না।

অনিল রায় বললেন—তুমি কিছু নিলে না সোমেন? একটু জিনও নয়!

—বড্ড মাথা ধরে স্যার।

—একটু বেশী করে খাও, সেরে যাবে। না হলে বরং হুইস্কি নিতে পারো।

সোমেন একটু দ্বিধা করে বলল—আচ্ছা, একটু খাই।

সোমেনের ডান ধারে অবনতমুখী অণিমা বসেছে। আজ বিকেলে সে প্রায় কথাই বলছে না। অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ করছে সোমেন। বুকটা মাঝে মাঝে শূন্য লাগছে।

হঠাৎ অণিমা সোমেনকে কনুই দিয়ে অল্প একটু ধাক্কা দিল।

সোমেন প্রথমে বুঝতে পারেনি। তাই একটু সরে বসে। তারপর নিচু'র টেবিলের তলায় অণিমার হাত সোমেনের হাঁটু স্পর্শ করে। অণিমা প্রায় শ্বাসবায়ুর শব্দে সোমেনের দিকে না ফিরে বলে—খেও না।

সোমেন ফের দ্বিধায় পড়ে। মদ খেতে বারণ করছে নাকি অণিমা? একবার মুখ ফিরিয়ে নতমুখী ও লাজুক মুখখানা দেখে নেয় সোমেন। অণিমা খুব গম্ভীর, মুখে ভ্রুকুটি।

সোমেনও আস্তে করে বলল—খাবো না?

—না।

—কেন?

—কেন আবার! আমি বলছি তাই খাবে না।

সোমেন সামান্য হাসল। বুকের মধ্যে মনের মধ্যে আজও কেন যে একটা থেমে যাওয়া ঝড় জেগে ওঠে!

সোমেন বলল—আচ্ছা।

বেয়ারা সোমেনের সামনে হুইস্কির গেলাস রেখে গেল। সোমেন সেটা হাতে নিল, দেখল। রেখে দিল আবার। বলল—স্যার, সেই ভূতের গল্পটা বললেন না?

—ও! হ্যাঁ! বলে হাসলেন অনিল রায়। বললেন—কে বিশ্বাস করবে বলো যে আমার ভীষণ ভূতের ভয় আছে! খুব ছেলেবেলা থেকেই ছিল অবশ্য, কিন্তু ইদানীং সেটা খুব বেড়েছিল। কাউকে বোলো না।

—না স্যার।

সেদিন রাতে শুয়েছি, বেশ নেশা ছিল, তবু কেন যেন ঘুম আসছিল না। যতবার ঘুমোই ততবার চটকা ভেঙে যায়। কে যেন জাগিয়ে দিচ্ছে। চাকরটার বাড়িতে অসুখ বলে এক বেলার ছুটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেও রাতে ফেরেনি। বার বার জেগে উঠে কান পেতে শুনছি যদি চাকরটা রাতের শেষ গাড়িতেও আসে বারুইপুর থেকে। একদম একা একটা ফ্ল্যাটে আমি, এটা ভাবতেই ভারী গা ছমছম করে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে, বেশ ভুতুড়ে দেখাচ্ছে সবকিছু। খুব নিস্তব্ধও চারদিক। এক একবার চোখ খুলে ঘরটার আলোছায়া দেখি। ফের চোখ বুজে ফেলি ভয়ে, পাছে কিছু দেখা দেয়! এ রকম কয়েকবার হল। বালিশের কাছেই রিভলভার থাকে, সেটা হাতে নিয়ে শুয়ে রইলাম। আবার ভয়ও করছে, যদি ওটা হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি তো ঘুমের মধ্যে ট্রিগারে চাপ দিলে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। কিন্তু কি করি! জেগে চোখ বুজে রিভলভার হাতে শুয়ে রাছি। এমন সময়ে ঠিক একটা টরেটক্কার তো শব্দ পেলাম। না, শব্দটা বাইরে কোথাও নয়, আমার মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে কোথাও হচ্ছিল। সে খুব নিস্তব্ধ শব্দ। যেন আমাকে চোখ খুলতে বলছে। একবার চোখ চাইলাম। ফাঁকা ঘর। কিন্তু মনে হল, কে যেন এসেছে। সে এসে বসল আমার বিছানার একটা ধারেই। আমি রিভলভারটা তুললাম। ফের সেই টরেটক্কার ভাষা শুনলাম, অস্ত্র নামাও। নামালাম। যে এসেছে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না। ঘরে শুধু ভুতুড়ে চাঁদের আবছা আলো। খুব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কে? ফের সেই টরেটক্কা বলল—তোমার একাকীত্ব। আজ রাতে সেই একাকীত্বের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

সবাই হেসে ওঠে।

অনিল রায় হাসলেন না। হাত তুলে বললেন—শোনোই না। খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

(ক্রমশ)

ফ্যাশন দুরস্ত অথচ টেঁকসই—এমন কাপড় যা শুধু বিনীই বানাতে পারে।

পুস্তক পরিচয়

মানবতাবোধের সার্থক কাব্যগ্রন্থ

কাস্তে। দিনেশ দাস। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী, ৪/১ আকতাব মল্লিক্ লেন, কলকাতা-২৭। দাম—তিন টাকা।

একটি রচনাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে তুমুল আলোড়ন—এর উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। সেই জন্যে দিনেশ দাস যখন বলেন, "'কাস্তে' কবিতাটি শুধু আমার জীবনে নয়, বাংলা সাহিত্যে একটি ঘটনা",—বিস্মিত হই না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কিছু টুকরো টুকরো ছবি, একটি কবিতাকে ঘিরে উত্তেজনা, আবর্ত, হৈচৈ, সাড়া-জাগানোর বিরল কিছু দৃশ্য। সে-দৃশ্য আজ ইতিহাস, তাই প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও তার অংশীদার হতে বাধা ঘটে না।

'কাস্তে' যখন লেখা হয় তখন দিনেশ দাস তরুণ হয়েও স্বীকৃত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনে দিনেশ দাসের 'মৌমাছি' কবিতাটি গ্রহণ করেছেন; শুধু 'কাস্তে' ছাপার জায়গা মেলেনি, দীর্ঘ এক বছর কবিতাটি বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে ছিল, এক বছর পরে কবিতাটি মুক্তি পেল ছাপার অক্ষরে। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হল কবিতাটি। আর, প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই ঘটল তুমুল আলোড়ন। অভিনন্দন এল নানাভাবে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' শিরোনামে দুটি কবিতা লিখলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিষ্ণু দে। ওই একই নামে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও একটি গল্প লিখলেন 'অলকা' মাসিকপত্রে। ওই ছত্রটিকে শিরোনাম করে পাল্লা দিয়ে কবিতা লেখার রেওয়াজ শুরু হল তরুণতর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে। বাংলা সাহিত্যে এমন ঘটনা বিরল।

আর কবির ভাগ্যে? একদিকে যেমন আকাঙ্ক্ষিত অভিনন্দন, অন্যদিকে তেমনই অনিবার্য রাজরোষ। কিন্তু বিশ্বাসে অটল, মতবাদে অবিচল কবি পর-পর লিখে চললেন রামপন্থী, ডাস্টবিন, হাতুড়ি, নববর্ষের ভোজ, ভুখমিছিল প্রভৃতি কবিতা। অন্তরের অন্তস্তলে নিরন্ন মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি যেমন একদিকে সেই সব কবিতার বিষয়, অন্যদিকে পুঁজিবাদী-দের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণা ও আক্রোশ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। "মানুষ এবং কুকুরেতে/আজ সকলে আর চাটি এক-সাথে,/ আজকে মহামনীষীদের/ আমরা কথা থাক পুঁথি ডাস্টবিনে"—এ রকম মর্মান্তিক ছবি যেমন ফুটেছে তাঁর তৎকালীন রচনায়, তেমনই তাঁর ক্ষোভ উৎসারিত হয়েছে মন্বন্তর-সৃষ্টিকারী মহাপ্রভুদের প্রতি : "আজ যে পথে আবর্জনার স্তৈরিতা/ বণিক-প্রভু, মহাপ্রভু!, সবই তোমার তৈরি তা দেখছি বসে দূরবীনে/ তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে।" অবিস্মরণীয় ধ্বনিব্যঞ্জনায় সমন্বিত হয়ে উঠলো নিরন্ন মানুষের 'ক্ষুধার্ত' মিছিল : "এই আকাশ স্তব্ধ নীল। /কোনোখানেই/ যুদ্ধ নেই/ হেথা আকাশ রুক্ষ নীল/ নিম্নে তিক্ত প্রতিনীড় মৌমাছির ভুখ-মিছিল।"

তাঁর আবেগ এবং সহানুভূতি, শব্দচেতনা ও মানবতাবোধ যেমন নিখাদ, অন্যদিকে তেমনি প্রকাশভঙ্গির নিজস্বতা, শব্দ-ছন্দে অনায়াস দখল, তাজা উপমার ব্যবহার, দিনেশ দাসকে আলাদা একটি আসন চিহ্নিত করে দিয়েছে বাংলা কবিতায়। সেই শ্রদ্ধার আসন থেকে তিনি যে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি তারই প্রমাণ 'কবিতা ১৩৪৩-৪৮' থেকে 'অসংগতি' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থে নিখুঁতভাবে ছড়ানো। শেষ পর্যায়ের কবিতাতেও মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার স্বাক্ষর একইভাবে পরিব্যাপ্ত। মহাকাশ-বিজয়ের যুগে তাই তাঁর অকৃত্রিম জিজ্ঞাসা : "সেখান থেকে সে কি দিতে পারবে এক টুকরো ছায়া/সেই চাষীর মাথার উপর/যে মেরুদণ্ডে ক্লান্ত সূর্যকে টেনে নিয়ে চলেছে?" তাঁর প্রত্যয় প্রসন্ন প্রশ্ন: 'মানুষের ভালবাসা কবে এক বাটি দুধ হয়ে/ চাঁদের মত আকাশে ভাসবে!"

গঙ্গোত্রী প্রকাশনী খুবে তাৎপর্যমণ্ডিত সময়ে দিনেশ দাসের 'কাস্তে' ও অন্যান্য কবিতার এই সংকলনটি প্রকাশ করেছেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের মহাবিজয়ের ত্রিশ বছর পূর্তি হল গত ৯ মে। সেই উপলক্ষ এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের সংগে যুক্ত করে এক আজীবন সময়-সচেতন কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনেরও এক মহৎ পন্থা অনুসৃত হল—নিঃসন্দেহে স্বীকার্য।

সঙ্গীত

রাগ-তালের মৌলবিষয় ও নূতন সংগীতলিপি পদ্ধতি। শ্রীনিখিল ঘোষ। জিজ্ঞাসা, ১-এ কলেজ রো। কলকাতা-৯। বারো টাকা।

গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে ১৯৬৮ সালে। এই গ্রন্থটি তারই বাংলায় অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। গ্রন্থকার খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ। বহু বৎসর ধরে বোম্বাই শহরে ইনি সংগীত শিক্ষাদানে রত আছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও নানা প্রদেশের শিক্ষার্থী তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। গ্রন্থকার প্রয়োজন-বোধে একটি নূতন স্বরলিপির প্রবর্তন করেছেন। এই উপলক্ষে তিনি পাশ্চাত্য স্টাফ নোটেশন পদ্ধতি থেকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এতে সহজ ও বোধ-গম্য চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থকার এই পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করে আশাতীত ফললাভ করেছেন। এই স্বর-লিপির মূল উদ্দেশ্য হল সংগীত থেকে লিপি এবং লিপি থেকে সংগীতের হুবহু পরিবেশনের উপায় নির্ণয়। মুখ্যত স্বর-লিপি প্রসঙ্গ ছাড়া এই গ্রন্থে সঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, বাদ্যযন্ত্রগুলির বর্ণনা ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন প্রসঙ্গের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্রগুলিও শিক্ষায় সাহায্য করবে। অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীগণ গ্রন্থটি থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন বলে মনে করি। অনুবাদের ভাষা মনোরম। ছাপা, প্রচ্ছদপট চমৎকার। গ্রন্থটি ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রকের আনুকূল্যে প্রকাশিত।

মানুষ ও মন। কালী কর। ওরিয়েন্টাল বুক সিন্ডিকেট। ৫৪।১এ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৯। সাড়ে সাত টাকা।

এই গ্রন্থে লেখক তাঁর রচিত একশত গান প্রকাশ করেছেন। গানগুলি মানুষের প্রতি উৎসর্গীকৃত। গ্রাম ও নগর উভয় দিকে লক্ষ রেখেই গানগুলি রচনা করা হয়েছে। যাঁরা দর্শনমূলক দেহতত্ত্ব গানের অভিলাষী তাঁরাও এই গ্রন্থে গাইবার মত গান পাবেন। গানের ভিতর দিয়ে যুবমনে কর্ম-উদ্দীপনা জাগ্রত করাও লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য। গানগুলির মধ্যে ভাব ও রচনাগত কোনও কৃত্রিমতা নেই, সহজভাবেই মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাহিত্য-আলোচনায় মুক্ত মনের সমালোচক বড়ো একটা পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ সমালোচকই নিজস্ব ধ্যান-ধারণার বাইরে সহজে চোখ খুলে তাকাতে অনিচ্ছুক। ফলে, বহু ক্ষেত্রেই প্রতিপাদ্য ঠিক হয়ে থাকে, শুধু প্রমাণ সংগ্রহের অপেক্ষায় পরিশ্রমটুকু ব্যয়িত হয়। সমালো-চকের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থাকবে না, এ-কথা বলা এর উদ্দেশ্য নয়। কথা হল, গ্রহণ-ক্ষমতাকে কিছুটা প্রসারিত করা। নতুন স্রোতকে যথার্থভাবে অনুধাবন করাও সৎ সমালোচকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সে-কথা অনেকেই মনে রাখেন না। আবদুল হাফিজ এর **আধুনিক সাহিত্যচর্চা** (মুক্তধারা, ঢাকা ১, দশ টাকা) বইটির পাঠক কিন্তু স্বীকার করবেন যে, তিনি সেই বিরল সমালোচকদের অন্যতম, প্রবীণ ও নবীন প্রতিভার প্রতি যাঁর দৃষ্টি সমান উৎসুক।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য নিয়ে তাঁর প্রথম নিবন্ধ। মনে রাখতে হবে, কবি সুধীন্দ্র-নাথকে নিয়ে আলোচনাই খুব কম, তাঁর গদ্য তো অনধীত বললেই চলে। আবদুল

হাফিজ তা সত্ত্বেও জানেন যে সুধীন্দ্রনাথের "গদ্য-পদ্যের অসমান উপলখণ্ড দু' হাতে সরালে সাবধানী ও অধ্যবসায়ী পাঠকচিত্ত অন্তঃশীলা ফল্গুধারার আবিষ্কারে আনন্দিত হতে বাধ্য"। তিনি সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের সেই ফল্গুধারার সন্ধান পাঠককে দিয়েছেন।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে যাঁর রুচি তিনি যে সমকালীন বাংলাদেশের কবিতা নিয়ে রসগ্রাহী আলোচনা ফাঁদতে পারেন এ-কথা বিশ্বাস্য হতো না, যদি-না সাম্প্রতিক কবিতার অন্যতম প্রতিনিধি আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেন। সাম্প্রতিক কবিতার অন্ধকার প্রবণতার দিকটিকে সবিস্তারে তুলে ধরেও তিনি অনুজ কবিদের শব্দ ব্যবহারের শক্তিমত্তায় আস্থা জানাতে ভোলেননি। এজরা পাউণ্ড বা জিভাগোর কবিতা সম্পর্কে আলোচনার পাশে গিনসবার্গ ও বীট-প্রজন্মকে স্থান দিয়েছেন। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সুকান্তর কবিতার অবদান সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েও রবীন্দ্র-বিরোধিতার মৌল প্রসঙ্গগুলিকে ক্ষুরধার যুক্তিশরে ছিন্ন করেছেন। জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে আলোচনা (বাংলাদেশে প্রথম জীবনানন্দ প্রসঙ্গ) কেন যে এই বই থেকে বাদ দিলেন, ভূমিকা থেকে তা তেমন স্পষ্ট নয়। শেষ পাঁচটি প্রবন্ধের বদলে ওই প্রবন্ধটি স্থান পেলে গ্রন্থের সাহিত্যমূল্য বাড়তো বই কমতো না।

*

দীপককুমার সরকারের "নন্দন কাননে" (ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা-১২, সাড়ে পাঁচ টাকা)। শুধু ভ্রমণ কাহিনীই নয়, একদিক থেকে ট্যুরিস্ট গাইডও বলা যায়। বইটির পরিশিষ্টে তিনি যাতায়াতের পথ সম্পর্কে একটি ছবির মতো বর্ণনা সংযোজিত করেছেন। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার দুরত্ব, থাকার জায়গা, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি তো বলেইছেন, এ ছাড়া কিভাবে ডাকবাংলো বুক করতে হবে, কোন্ সময় ভ্রমণের পক্ষে প্রশস্ত, কি কি নিয়ে যাওয়া উচিত, এমন কি চারজনের দলের একটা আনুমানিক খরচের হিসেব ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের তালিকাও যোগ করতে ভোলেননি। তাঁর নিজস্ব ভ্রমণ কাহিনীটিও বেশ স্বাদু।

*

'কুয়াশায় ক্লান্তমুখ শীতের সকাল'—/পাতার ঝরোকা খুলে ডানা ঝাড়ে ক্লান্ত হরিয়াল', 'মধ্যরাতে রাজপথে দেখি এক নারীর শরীর/যে নারী নাগিনী ছিলো কোনোকালে, এই পৃথিবীর', 'যখন ভোরের পাখি সোনা মেখে কোমল পাথায়/সুরের সাহানা রেখে বাতায়নে বকুল শাখায়/উড়ে গেল কোন দূর দিগন্তের দ্যুর্যাচীন বনে'—এই ধরনের পংক্তিতে কবিত্ব নেই বলা যাবে না, এই জাতীয় পংক্তি আজ থেকে বছর-কুড়ি আগে বাংলা কবিতায় আকছার দেখা যেত, কিন্তু আজ আর এভাবে কেউ লেখেন না, ভাষায়-ভঙ্গিতে ইতিমধ্যে বহু বদল ঘটেছে। আহসান হাবীব-এর ছায়া হরিণ (মুক্তধারা, ঢাকা ১, ছ' টাকা)। কাব্যগ্রন্থে এ-রকম পংক্তি প্রচুর ছড়ানো। অথচ তিনি কম দিন লিখছেন না। ১৯৪৬-এ রচিত একটি কবিতাও এই বইতে রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কাব্যরচনা প্রায় তিরিশ বছরের। তবু খুব বড়ো একটা বদল তাঁর ঘটেনি, না ভঙ্গিতে, না শব্দ ব্যবহারে। তবু তিনি জনপ্রিয়।

কলকাতায় প্রথম রোলার স্কেটিং

কলকাতায় সর্বপ্রথম জাতীয় রোলার স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে গেল, হিন্দি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে নতুন তৈরী রিঙ্কে। এটা ছিল ১৯তম জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ।

এর অর্থ আগে ১৮ বার রোলার স্কেটিংয়ের জাতীয় আসর বসেছে। কিন্তু কলকাতায় কেন, কোনবার পূর্ব ভারতের কোন শহরে চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা হয়নি। পূর্ব ভারতে স্কেটিং ছিল একেবারেই উপেক্ষিত। এর কারণ স্কেটিংয়ে প্রধানত বিত্তশালী পরিবারের ছেলেমেয়েদেরই আগ্রহ বেশি। তাছাড়া প্রয়োজন বিশেষ ধরনের রিঙ্কের।

কিন্তু কলকাতায় তো বিত্তশালীর অভাব নেই। তবু নানা কারণে এই শহরে স্কেটিংয়ের প্রসার হয়নি। স্বাধীনতা লাভের আগেও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের একটি মাত্র রিঙ্ক ছিল লাউডন স্ট্রিটে। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম স্কেটিং শুরু হয় ১৯৬৪ সালে বিদ্যামন্দির সোসাইটির উদ্যোগে ময়রা রিঙ্ক ক্লাবে। তিন চার বছর ধরে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে ওখানে স্কেটিং করেছিল। ১৯৬৮তে রিংকটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় ১৯৭১এ। কিন্তু চলতে থাকে ধিকিধিকি করে। ১৯৭৩ সাল থেকে ক্লাবটির কর্ম-তৎপরতা বাড়ে এবং পরের বছর সৃষ্টি হয় পশ্চিমবঙ্গ রোলার স্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন। কলকাতায় ছাড়া বাংলাদেশে আর মাত্র একটি রিঙ্ক আছে, দার্জিলিংয়ে। বলা বাহুল্য, বাঙালী ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখনো স্কেটিংয়ে আগ্রহী হয়নি। রাজস্থানী এবং পাঞ্জাবী ছেলেমেয়েদের মধ্যেই আগ্রহ বেশি।

স্কেটিং নিঃসন্দেহে উপভোগ্য স্পোর্টস। পায়ে বাঁধা ছোট চাকার উপর চলমান প্রতিযোগীর গতি, ছন্দ এবং নৈপুণ্য দর্শক চোখের তৃপ্তির খোরাক। বাজনার তালে তালে পেয়ার স্কেটিংয়ে নৃত্য ছন্দের মধ্যে একাধারে ব্যালের সৌন্দর্য এবং জিম-ন্যাস্টিকসের কলাকৌশল। দেখতে সত্যিই ভাল লাগে। তার চেয়েও আকর্ষণীয় স্কেট পায়ে হকি খেলা। হকি অন স্কেট পৃথিবীর ক্ষিপ্রতম খেলা। কারো কারো মতে অবশ্য আইস হকি আরও ক্ষিপ্র খেলা।

ফিল্ড হকির সঙ্গে স্কেট হকির পার্থক্য শুধু ক্রীড়াঙ্গনের মাপজোকে আর নিয়ম-কানুনের অল্পস্বল্প হেরফেরে। আসলে খেলা ফিল্ড হকিরই অনুরূপ। তবে স্কেট পরে কাঠের পাটাতনের উপর অল্প পরিসর জায়গায় হকি খেলতে দক্ষতার প্রয়োজন বেশি। স্টিক কন্ট্রোলেরও। প্রতি দলে থাকে পাঁচজন করে খেলোয়াড়। প্রতি অর্ধে ১৫ মিনিট করে খেলার সময় মোট ৩০ মিনিট। স্টিকচালিত বল বাইরে যাবার উপায় নেই। ক্যারম বোর্ডের ঘুঁটির মত পাটাতনের কানাতে-লেগে বল ফিরে এসে খেলার মধ্যেই থাকে। তাতে খেলায় অযথা ছেদ পড়ে না। গতিবেগ এবং চরম উত্তেজনা সবসময়ই বজায় থাকে। চাকার উপর চলমান খেলোয়াড়দের কলাকৌশল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে দেখতে মনে হয় সচল ছবির সামনে বসে আছি।

জাতীয় স্কেটিংয়ের হকি খেলায় কয়েকজন খেলোয়াড়ের স্টিক চালনার কৌশল বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। চণ্ডীগড় দলের হরদীপক এবং জিতেন্দ্র নৈপুণ্য ফিল্ড হকির বাবু বা বলবীরের নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

স্কেটিংয়েও অনেক ছেলেমেয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন।

খেলার মাঠে

লর্ডস টেস্ট

এজবাস্টন টেস্টে যে ইংলণ্ড ইনিংস ও ৮৫ রানে পরাজিত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে, নতুন অধিনায়ক টনি গ্রীগের নেতৃত্বে সেই ইংলণ্ড লর্ডসে অস্ট্রেলিয়াকে কোণঠাসা করে রেখে খেলা ড্র করেছে। খেলাটিতে ইংলণ্ড জিততেও পারত যদি পীচ বোলারদের সহায়ক হত। বলা বাহুল্য, লর্ডসে ইংলণ্ড নতুন প্রেরণা পেয়েছে গ্রীগের নেতৃত্বে। ছয় ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি দীর্ঘ মানুষটি ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীদের চোখে আরও দীর্ঘ হয়ে উঠেছেন।

শুধু নেতৃত্বের গুণেই নয়, ক্রীড়া ভূমিকারও বটে।

এজবাস্টনের প্রথম টেস্টের মত দ্বিতীয় টেস্টেও ইংলণ্ডের বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল প্রায় শুরু থেকে। মাত্র ৪৯ রানের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল মূল্যবান ৪টি উইকেট। উড, এডরিচ, অ্যামিস, গুচ কেউই দুই অঙ্কের রান করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি যে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল মাত্র ১৫ রানে ৫টি উইকেট দখল করে, সেই লিলির তখন সংহার মূর্তি। প্রথম ৯ ওভারে মাত্র ২৭ রান দিয়ে ৪টি উইকেটই দখল করেছিল লিলি। ওই সময় নতুন টেস্ট খেলোয়াড় ডেভিড স্টিল-এর সঙ্গে যোগ দিলেন নতুন অধিনায়ক টনি গ্রীগ।

জাতীয় রোলার স্কেটিংয়ের পেয়ারে গুজরাটের জুড়ি

আন্তঃ কলেজ টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণী দাশগুপ্তা ও শেফালিকা ধর ট্রফিতে চুম্বন করছে

খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন ব্যাটের বিক্রমে। পঞ্চম উইকেটে স্টিলের সংগে যোগ করলেন ৯৬ রান, ষষ্ঠ উইকেটে অ্যালান নট-এর সংগে ৭৭। নিজে আউট হলেন ৯৬ রান করে। ফলে ৪ উইকেটে ৪৯ রান থেকে ইংলণ্ড প্রথম দিনের শেষ করল ৯ উইকেটে ৩১৩ রান। দ্বিতীয় দিনের প্রথম ওভারেই ইনিংস শেষ হল ৩১৫ রানে।

গ্রীগের জন্য সবরাই আপসোস, তিনি মাত্র ৪ রানের জন্য সেঞ্চুরি করতে পারেননি। কিন্তু যে ইনিংস খেলেছেন তা কি সেঞ্চুরির চেয়েও মূল্যবান নয়?

ঠিক গ্রীগের মত কিংবা গ্রীগের চেয়েও এই টেস্টে বড় ভূমিকা অস্ট্রেলিয়ার রস এডওয়ার্ডস-এর। ইংলণ্ডের ৩১৫ রানের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে আরম্ভ করে অস্ট্রেলিয়া লাঞ্চের মধ্যে মাত্র ৬৪ রানে হারাল ৬টি উইকেট। অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল সহ সহোদর গ্রেগ চ্যাপেল, ওপনার টার্নার ম্যাককসকার, ওয়ালটার্স, মারস—সবাই আউট। ফলো-অনের সম্ভাবনা এবং সম্ভাবনা পরাজয়েরও। আউট হতে বাকি ছিল শুধু ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এডওয়ার্ডস এবং ২ জন বোলার। ৮১ রানের মাথায় ওয়াকারও আউট হয়ে গেল। তখনো ফলো-অন বাঁচাতে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৩৫ রান, হাতে মাত্র ৩টি উইকেট। লেংথ ও লক্ষ ঠিক রেখে তখন জন স্নো ও পিটার লিভার দারুণ বল করছে। কিন্তু বিপর্যয়ের মুখে রুখে দাঁড়াল রস এডওয়ার্ডস। শেষ পর্যন্ত সে শুধু ফলো-অনই বাঁচায়নি, অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসকে ভদ্ররূপ দিয়েছে, নিজে আউট হয়েছে সেঞ্চুরির মুখে, ৯৯ রানের মাথায়। ক্যাঙ্গারুর যে লেজের দাপট যথেষ্ট সেটা প্রমাণ করেছে ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলিও। ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ৭৩ রানে নট আউট। উল্লেখ্য অস্ট্রেলিয়ার অন্তিম উইকেটে যোগ হয়েছে ৬৯ রান, নবম উইকেটে ৬৬ এবং দশম উইকেটে ৬৯। অথচ প্রথম ৬ উইকেটে মাত্র ৬৪। একেই বলে ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা। প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ড ৪৭ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে দ্বিতীয় দিনের শেষে। তাদের ওঠে বিনা উইকেটে ৫ রান।

বড় ইনিংস গড়ার পক্ষে ইংলণ্ড সমস্ত তৃতীয় দিন ধরে ধীরে সুস্থে ব্যাট করে। সারাদিনে সংগ্রহ করে মাত্র ২৩১ রান দুই উইকেটের বিনিময়ে। একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিন চা বিরতির ৪০ মিনিট আগে ইংলণ্ড যখন ৭ উইকেটে ৪৩৬ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করল তখন জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৪৮৪ রান। খেলার সময় বাকি একদিন এবং ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট। ওই সময়ের মধ্যে জয়ের ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব ছিল। তাছাড়া বৃষ্টির ফলে শেষ দিনের খেলাও আরম্ভ হয়েছিল একঘণ্টা পরে। অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়েরই ভয় ছিল। কিন্তু পাঁচ ইংলণ্ড বোলারদের সহায়ক হয়নি। ফলে অস্ট্রেলিয়া নির্ভাবনায় ব্যাট করে গেছে। ম্যাককসকার, দুই চ্যাপেল এবং এডওয়ার্ডস ভাল রানও করেছেন।

গ্রীগ এবং এডওয়ার্ডসের দুর্ভাগ্য তাঁরা একটুর জন্য শত রানে বঞ্চিত হয়েছেন। দুটি টেস্টের মধ্যে সেঞ্চুরী করেছেন একমাত্র জন এড্রিচ। তাঁর ১৭৫ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় রান। দ্বিতীয় দিনের শেষে তিনি ব্যাট করতে নেমেছিলেন, সারা তৃতীয়দিন ব্যাট করে আউট হয়েছেন চতুর্থ দিন লাঞ্চের পরে। নিঃসন্দেহে তিনি নৈপুণ্যমূলক ক্রিকেট খেলেছেন। অধিনায়ক গ্রীগকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তুমি কি এড্রিচকে মন্থর ব্যাটিংয়ের উপদেশ দিয়েছিলে? গ্রীগের উত্তর: সে কি কথা? আমি উপদেশ দেব এড্রিচকে? উনি আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ। কতদিন ধরে টেস্ট খেলছেন।

১৯৩৪-এর পর লর্ডসে অস্ট্রেলিয়া হার স্বীকার করেনি। এবারও হারল না। সিরিজের আকর্ষণও বজায় আছে ইংলণ্ডের অ্যাসেজ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনায়। ইংলণ্ড দু'জন নতুন খেলোয়াড়কে খেলিয়েছে লর্ডস টেস্টে। ডেভিড স্টিল এবং বব উলমার এর আগে টেস্ট খেলেননি, যদিও স্টিল-এর বয়স ৩৩। দুই ইনিংসে তাঁর ৫০ ও ৪৫ রান দলে স্থান স্থায়ী করে রাখল।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৩১৫ (গ্রীগ ৯৬, নট ৬৯, স্টিল ৫০; লিলি ৪-৮৪, টমসন ২-৯২, ওয়াকার ২-৫২, ম্যালেট ২-৫৬)।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ২৬৮ (এডওয়ার্ডস ৯৯, লিলি নট আউট ৭৩, ম্যাককসকার ২৯, স্নো ৪-৬৪)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) ৪৩৬ (এড্রিচ ১৭৫, উড ৫২, স্টিল ৪৫, গ্রীগ ৪১, উলমার ৩৯)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ঃ উইঃ) ৩২৯ (ম্যাককসকার ৭৯, ইয়ান চ্যাপেল ৮৬, গ্রেগ চ্যাপেল নট আউট ৭৩, এডওয়ার্ডস নট আউট ৫২)।

একলব্য

পেয়ার স্কেটিংয়ে কুমকুম বক্সী ও প্রদীপ গার্নেরিওয়াল। দুজনেরই ডান পা মেঝেতে, বাঁ পা শূন্যে ফটো—সেন

ভারতের এক নম্বর স্কেটার

পায়ে খেলনা স্কেট বেঁধে ছোট ছেলেরা যেমন ফুটপাথের উপর দিয়ে এগিয়ে যায়, তেমন খেয়ালের বশেই মাত্র ছয় বছর বয়সে ছেলেটি পায়ে স্কেট বেঁধেছিল। চলে বেড়াত বিরাট বাড়ির বারান্দার উপর দিয়ে। হাংগারফোর্ড স্ট্রিটে ওদের বাড়ির পাশেই কলকাতার একমাত্র রোলার স্কেটিং রিংক—ময়ুরা রিংক ক্লাব নামে যার পরিচয়। সেখানে যাতায়াত শুরু হল এবং স্কেটিং করার মধ্যে বেশ কিছুটা আনন্দ পেল। কোচ টনি টালবট ছেলেটির প্রতি নজর দিলেন।

১৯৭০ সালের কথা। ছেলেটি তখন স্কুলে পড়ে। বয়স পনেরো বছর। গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করতে মুসৌরী গেল পরিবারের সংগে। সেখানে তখন রোলার স্কেটিংয়ের জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ হচ্ছিল। তখন ইভেন্ট ছিল ১০টি। প্রতিযোগীদের অনুশীলন দেখে ছেলেটি ভাবল ১০টি বিষয়েই সে প্রথম হতে পারবে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দিল। কিন্তু একটি বিষয়েও প্রথম হতে পারল না। ১০টি বিষয়েই লাস্ট। শুধু প্রতিযোগিতার বহির্ভূত বিষয় ফ্যান্সি ড্রেসে একটি সান্ত্বনা পুরস্কার পেয়েছিল।

"সে রাত্রে আমি একেবারেই ঘুমুতে পারিনি। মাঝে মাঝে আমার কান্না পাচ্ছিল। আমার ধারণা ছিল স্কেটিংয়ের অনেক কিছুই আমি শিখে ফেলেছি। কিন্তু প্রতিযোগিতায় নেমে দেখলাম এখনো আনাড়ি।"

যার এই সরল উক্তি সেই ছেলেটিই এখন ভারত চ্যাম্পিয়ন স্কেটার। নাম প্রদীপকুমার গার্নেরিওয়াল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের কমার্সের ছাত্র।

মুসৌরী চ্যাম্পিয়নশিপের সময় প্রদীপ কিন্তু কলকাতার এক নম্বর স্কেটারই ছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় নেমে দেখল ও কিছুই শেখেনি। সুতরাং শুরু হল নিবিড় অনুশীলন ও সাধনা। প্রতিদিন দু ঘণ্টা নিরলসভাবে অনুশীলন করত। প্রতিযোগিতার প্রাক্কালে অনুশীলন করত সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা। তার ফলেই ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪এ চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় রোলার স্কেটিংয়ে প্রদীপের চ্যাম্পিয়নের সম্মান এবং বিশ্ব স্কেটিংয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব।

'৭৪-এ চণ্ডীগড়ে স্কেট হকি বাদে পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রদীপ প্রথম হয়েছিল স্পিড স্কেটিং, ফিগার স্কেটিং, ফ্রি ফ্যান্সি ড্রেস এবং পেয়ার স্কেটিংয়ে। শুধু ব্রিজ জাম্পে কোন স্থান পায়নি। পেয়ারে ওর পার্টনার ছিল বাংলার কুমারী জে এম হাপিং। কিন্তু গত বছর আগস্ট মাসে স্পেনের লা করুনার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তরপ্রদেশের মেয়ে কুমকুম বকসীকে নিয়ে পেয়ার স্কেটিংয়ে দ্বাদশ স্থান দখল করে। আর্টিস্টিক স্কেটিংয়ে দখল করে ২১তম স্থান। আর্টিস্টিকে নিচে নেমে যাবার কারণ ভুল বোঝাবুঝির ফলে ফিগার স্কেটিংয়ে প্রতিযোগিতা না করা। ওই বিষয়ের পরীক্ষা ছিল ৫০ নম্বরের মধ্যে।

বলা বাহুল্য, ১৯৭৪-এর আগে ভারত কোনবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দেয়নি এবং ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের তুলনায় রোলার স্কেটিংয়ে ভারতের অবস্থা হাঁটি-হাঁটি-পা-পা। মানের কোন তুলনা চলে না। তবু বিশ্ব প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ করে পেয়ার স্কেটিংয়ে প্রদীপ ও কুমকুম বক্সীর দ্বাদশ স্থান দখল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। লা করুনা চ্যাম্পিয়নশিপের পর ক্যানাডার কোচ মার্টিন মুর বলেছিলেন, ভারতীয় প্রতিযোগীদের কাছ থেকে এর চেয়ে আমরা বেশি কী আশা করতে পারি?

কলকাতায় সদ্যসমাপ্ত ১৯তম জাতীয় স্কেটিংয়ে প্রদীপ ফিগার স্কেটিংয়ে প্রথম, ফ্রি ফ্যান্সিতে দ্বিতীয় এবং পেয়ারে কুমকুমের সংগে দ্বিতীয় হয়ে, আবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। তার আশা, এই বছর অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আরও ভাল ফল করবে।

স্কেটিং করতে করতে এই অপ্রচলিত দৃষ্টিনন্দন খেলার প্রতি প্রদীপের অসাধারণ ভালবাসা জন্মে গেছে। শুধু নিজের উন্নতির জন্যই নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলায় এবং ভারতে রোলার স্কেটিংয়ের প্রসার প্রচারের জন্যও। ১৯৭৩-এ ময়ুরা রিংক ক্লাবের চেয়ারম্যান হবার পর ক্লাবটির কর্মতৎপরতা বহুগুণে বেড়ে গেছে। নবগঠিত পশ্চিম বাংলা সংস্থার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছে এবং প্রধানত ওরই চেষ্টায় কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হল জাতীয় স্কেটিং। স্পেনে ভারতের দলটি নিয়ে যাবার ব্যাপারেও ওর ছিল মুখ্য ভূমিকা।

রুচিশীল ছেলেটির সংগীত এবং ফুলের বাগান তৈরির দিকে দারুণ ঝোঁক। সংগীতে কিছুটা জ্ঞান আছে বলেই বাজনার সংগে পেয়ার স্কেটিংয়ে নৃত্যের ছন্দে সৌন্দর্যের শিহরণ জাগে।

বিত্তশালী ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে। বাবার সংগে আগেও একবার ইউরোপ ঘুরে এসেছিল। তখন স্পেনেও গিয়েছিল। কিন্তু স্পেনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ওর নতুন অভিজ্ঞতা স্কেটিং সম্পর্কেই। বলছিল, "আমরা ভাবতেই পারিনি আলো-ঝলমল আয়নার মত রিংকে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সত্যিই রিংক ছিল মসৃণ আয়নার মত। তা থেকে আলো ঠিকরে উঠছিল। প্রথমটায় রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু রপ্ত হতে বেশী সময় লাগেনি। তা ছাড়া ইউরোপের তুলনায় আমাদের স্কেটিংয়ের পদ্ধতি পৃথক বলে তারিফও পেয়েছি।"

মুকুল

অরণ্যদেব ✱ লী ফক

অরণ্যদেব
অরণ্যদেব
?
?

চোখে পড়ে...
তাহলে বুঝবেন, আপনি অরণ্য-দেবের এলাকায় এসে পড়েছেন।

অনেক শতাব্দী আগে জলদস্যুরা একটি জাহাজে হানা দিয়েছিল।

আগে যা যা ঘটেছে
?
?
একটিমাত্র মানুষ রক্ষা পেয়ে যান। আফ্রিকার উপকূলে বামন-জাতির মানুষরা তাঁকে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

তিনিই প্রথম অরণ্যদেব; পিতৃহন্তার খুলি ছুঁয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন...
জলদস্যুদের আমি উচ্ছেদ করব। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আমি লড়ব।

গভীর অরণ্যে তিনি একটি গুহার সন্ধান পান। তার আকৃতি খুলির মতো।
এখানেই আমি থাকব।
1/5

তাঁর উত্তরপুরুষ এখন অরণ্যদেব।
বেঁচে আছেন...
তিনি মৃত্যুঞ্জয়
অরণ্যদেবের মৃত্যু নেই

বর্তমান অরণ্যদেব তাঁর একবিংশতিতম উত্তরপুরুষ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাই তিনি লড়ে যাচ্ছেন...
শুরু হল নতুন কাহিনী ১

"বাঘবন্দী" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী ও পার্থ মুখোপাধ্যায়

মতামতের মন্তাজ

সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, তবে পুনা ফিল্ম ইনসটিটিউটে আর নয়। এখন শুধু চেহারা বা ফিগার দেখে ইনসটিটিউটে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হবে না। চেহারা নির্বাচনের কোন মানদন্ডই নয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। এবং ফিলম অ্যাকটিং বা অভিনয় কোর্সে ভর্তি হতে হলে সিনেমা মিডিয়ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। জানা গেল, এবার ৪৪ জন মেয়ের মধ্যে মাত্র দুজন এই পরীক্ষায় পাস করেছেন।

* * *

পুনা ইনসটিটিউটে অভিনয় কোর্সে ভর্তি হবার এই নতুন নিয়মের তাৎপর্য আছে। ভারতীয় সিনেমার পুরনো যুগেও কিন্তু গ্ল্যামারের চাইতে অভিনয়-শক্তির উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হত। তখনকার দিনের শিল্পীরা অভিনয়কেই বড় মনে করতেন। সেদিনে অভিনেত্রী ছিল, স্টার (আজকের দিনে যেমন) ছিল না। আজকের দিনে স্টারডম ও গ্ল্যামারের কদর বেশি। গ্ল্যামার প্রতিষ্ঠার জন্য এখনকার স্টারদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা। কে কীভাবে গ্ল্যামার প্রকাশ করবেন তা নিয়ে বহু চিন্তা ও পোশাকের বাহার। অনেক ক্ষেত্রে নির্লজ্জতাও প্রকাশ পায়। অভিনয়-শিল্প অন্য বস্তু। বিদেশের, বিশেষ করে য়ুরোপীয় ছবিতে দেখা যাবে যে যাঁরা বড় অভিনেত্রী তাঁরা সকলেই সুন্দরী নন। টিকিটঘরে সুন্দর মুখের কদর থাকতে পারে, তাই বলে সুন্দর অভিনয়ের কদরও সামান্য নয়। বিদেশের সিনেমায় চরিত্রচিত্রণ ও অভিনয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কোন কোন ছবিতে অবশ্য গ্ল্যামারকেও মূল্য দেওয়া হয়, সেটা মূলত কাহিনী বা চরিত্রের প্রয়োজনে।

* * *

বোমবাই চিত্রজগত এখন গ্ল্যামার-শাসিত। তবু এর মধ্যে ইদানীং একটু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। নতুন অভিনেত্রী যাঁরা ফিলমে এসেছেন এবং অভিনয় ক্ষমতার জন্য সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের সকলেই কিন্তু তথাকথিত অর্থে গ্ল্যামার-স্টার নন। অভিনয়ের জন্য পুরস্কার ও প্রশংসা গ্ল্যামার-স্টাররা খুব বেশি পেয়েছেন বলা যায় না। উর্বশী পুরস্কারের কথাই ধরা যাক। এ-যাবত যাঁরা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের ঠিক গ্ল্যামার স্টার বলা যায় না। রূপ অভিনয়-জীবনের একমাত্র সম্বল হতে পারে না। সেই কারণেই পুনা ইনসটিটিউট এখন রূপের চাইতে বুদ্ধি বা জ্ঞানের উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

* * *

এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দরকার ছিল। বোমবাইয়ে এখন কমার্শিয়াল সিনেমার পাশাপাশি নতুন ধরনের ফিলমও তৈরি হচ্ছে। ওই সব ফিলমে চরিত্র রূপায়ণের প্রয়োজনটাই বেশি। নতুন জাতের ফিলমে স্টারের গ্ল্যামারের উপর মোটেই জোর দেওয়া হয় না। দর্শকের মন ভোলানোর মত অবাস্তব গল্পও তাতে থাকে না। মামুলি উপকরণেরও প্রয়োজন হয় না। এই জাতীয় ফিলম বড় স্টার ও বড় বাজেটের ছবিকে কোণঠাসা করে দেবে কিনা তা এখনই হয়ত বলা যায় না। তবে একটা নতুন ধারার যে গোড়াপত্তন হয়েছে সেটা সুনিশ্চিত। এবং স্টার সিস্টেম-এর প্রতি প্রযোজক বা পরিচালকদের মোহও ক্রমশ লোপ পাচ্ছে তার প্রমাণও পাওয়া যায়। এক কথায় দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। নতুন স্রোত আসছে। সেদিক থেকে পুনা ইনসটিটিউটের নতুন বিধির মূল্য ও তাৎপর্য অনেক।

রাজা

(এ বার দি প্রোফেশনাল)

তপন সিংহ তাঁর 'আপনজন'দের স্মৃতি আজও বিস্মৃতেই ছাড়তে পারছেন না। সমাজ-বিরোধী বা বিপথগামী তরুণদের অন্তরের কোমলবৃত্তির কথা জানাতে তিনি বদ্ধ-পরিকর। এই প্রচেষ্টা টিকিটঘরে একাধিক-বার সফল, তাই সম্ভবত "রাজা"-তেও এর পুনরাবৃত্তি। এই পৌনঃপুনিক বা একাদিক্রম প্রয়াসকে শিল্পীর আখ্যা দেওয়া অবান্তর।

সমকালীন বিষয় ভাল, কিন্তু সেটা যদি বাস্তবের সংস্পর্শ ছেড়ে নাট্যপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হয় তবে বোঝা দর্শকের নিরাশ হবারই কথা। "রাজা"-তে রমলা নামে যে মহিলা তাকে কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এই অবিশ্বাস্য চরিত্র প্রকাশ্যে শহর থেকে কলকাতায় হোটেলে অবাধে মেয়ে সরবরাহ করে। তপনবাবুর ছবিতে এমন অবাস্তব চরিত্র স্থান পেল কী করে? আরতি ভট্টাচার্য অভিনয় করেন ভাল, তাই রমলার সব কথা ও কাজ দর্শক আগ্রহের সঙ্গেই লক্ষ্য করবেন। অবাস্তবতার ভুরি ভুরি প্রমাণ-সমেত এই "রাজা"-র কোন কোন দৃশ্য বা ঘটনাকে বরং ফ্যানটাসি বলা যেতে পারে ("কোরাস" অনুপ্রাণিত?), যেমন বেকারদের নীরব মিছিল বা রাজ-নীতির অ্যাকশন দৃশ্য, যা ছবিতে প্রক্ষিপ্ত।

তপন সিংহ সাধারণত তাঁর ছবিকে গান-টান ও সংগীত অথবা লিরিক্যাল উপকরণ দিয়ে উপভোগ্য করে তোলেন। "রাজা"-র মেজাজ সেদিক থেকে ভিন্ন, এতে আজকের জীবনের রূঢ় দিকটাই দেখানোর চেষ্টা। তা সত্ত্বেও নদীর বুকে নৌকোয় গান আছে, গ্রামের মেলা আছে। হিন্দী গান অনুপ ঘোষালের গলায় বেশ সুখশ্রাব্য। রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদের গান এবার বাদ। এবার তপনবাবু সমসাময়িক সমস্যার কঠোর রূপকার হতে চেয়েছেন। যদিও ছবিতে তাঁর মোক্ষম অস্ত্র সেই নাট্যবস্তু যা আবেগপ্রসূত। প্রধান চরিত্র বখাটে-মস্তান রাজার মমতাবোধ দেখা গেছে জয়া নামে একটি মেয়ের প্রতি। এই নিয়েই নাটক। রাজার মতো ছেলের পক্ষে খোলাখুলি কথা ও সরাসরি কাজই সম্ভব। অন্যায় কাজে রমলার শিকার হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষত রাজা যেমন তেজী ছেলে। সে রমলার ষড়যন্ত্র থেকে জয়াকে বাঁচানোর জন্য সক্রিয় ও সরব হতে পারত। সেটা যে রাজা করেনি তা নিছক গল্পের (মূল রচনা : প্রফুল্ল রায়) স্বার্থে। কলকাতায় হোটেল-কক্ষে নির্যাতন নারী ব্যবসা দেখাতে গিয়ে তপনবাবু একবারও ভাবলেন না এটা সম্ভব কি অসম্ভব। কলকাতার বড় হোটেলে এটা কি এতই সোজা? আর ওই যে বড় হোটেলের ম্যানেজার দেওয়ালের গোপন ফুটো দিয়ে ঘরের জঘন্য কাণ্ডকর্ম দেখছেন সেটাও হিন্দীচিত্রের সিকোয়েনস-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই সব সাজানো মামুলি ব্যাপারের উপর রয়েছে ছবিটিকে 'অ্যাডাল্ট' করার জন্য কিছু অশালীন কথা ও ইঙ্গিত। তপনবাবুর বোধহয় এই ধারণা যে অশ্লীল কথাবার্তা (যার মুখে [illegible] কথা নয়) থাকলেই ছবিটা 'প্রোগ্রেসিভ' হয়। যদিও উকীল নির্মল-কুমারের মুখে "শয়োরের বাচ্চা" কথাটা জায়গা বিশেষে জুতসই।

"রাজা" সম্পর্কে অনেক ভাল কথাও বলবার আছে। সে হল নিখুঁত চিত্রনাট্য, চমৎকার ফটোগ্রাফি (বিমল মুখোপাধ্যায়) এবং নিখুঁত সম্পাদনা (সুবোধ রায়)। টেকনিক্যাল পারিপাট্যের দিক থেকে ছবিটি উঁচু পর্যায়ের। প্রয়োগের কাজেও আধুনিক বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন পরিচালক। চরিত্র এবং ঘটনার দিক বাদ দিলে অর্থাৎ বহিরঙ্গে "রাজা" তপনবাবুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছবি। বেশির ভাগ চরিত্র অস্বাভাবিক হলেও শিল্পীদের আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। দেবরাজ রায় এ-যাবৎ এ-ছবিতেই হয়ত সব চাইতে ভাল অভিনয় করেছেন। তাঁর চেহারার যাতে কোমল ভাব না আসে সে কারণে তাঁর মেক-আপের প্রতি পরি-চালক নজর দিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে খোঁড়া শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। শিউলি মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, মহুয়া রায়চৌধুরী, দেবিকা মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, ভীষ্ম গুহঠাকুরতা প্রভৃতি শিল্পীরা অভিনয়ের ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সমিত ভঞ্জ ছবিতে মাস্তান। এহেন চরিত্রে তাঁর দক্ষতা সন্দেহাতীত। অমিল চট্টোপাধ্যায়ের দাদাকেও ভাল লাগে, শিল্পীর অভিনয়ে চরিত্রটির প্রাণখোলা স্বভাবটি চিহ্নিত। অনিল চট্টোপাধ্যায় নতুন ধরনের চরিত্রের রূপ দিলেন অতি সহজেই। ছবিতে এই ভাল মানুষটা আছে বলেই রক্ষা। নইলে কেবল নৈরাশ্য আর রাগ দেখে অতিষ্ঠ হতে হয়—বিশেষ করে সেটা যখন বানানো। ছবিতে পাগলীও আছে—জয়ার দিদি। হাত তুলে বিড় বিড় করছে—আয়, আয়। পাগলীর ডাকে হয়ত দর্শক আসবে না, আসবে "রাজা"-র টানে।

দ্য টাচ

ইংগমার বারগমানের অধিকাংশ ছবি নিয়ে রসজ্ঞ মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার একটি কারণ, তাঁর ছবি যেমন একদিকে চিন্তা-উদ্দীপক, অন্য দিকে তেমনই তিনি শিল্পের অরূপতত্ত্বায় বিশ্বাসী। বারগম্যান কদাচ শেষ কথাটি বলে দেন না। ভাবনার বিস্তারটি ছবিতে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁর কাজ। আবার কী সেই ভাবনা তার হদিশ পেতে গেলেও বারগমানের ধ্যান-ধারণার কথা জানতে হয়।

এক হিসাবে জটিলতাই বারগম্যান-চিত্রের মজা। কলকাতায় গ্লোব সিনেমায় সম্প্রতি প্রদর্শিত তাঁর দ্য টাচ চিত্রটি সম্পর্কেও ওই মন্তব্য করা চলে। ১৯৭১ সনে নির্মিত, ইংরাজী ভাষায় তোলা বারগমানের এই প্রথম

"দ্য টাচ"/ম্যাক্স ভন সাইডো, বিবি এনডারসন

ছবিটি দেখে বৃটেন ও আমেরিকার সমালোচকদের অনেকে অবশ্য প্রথমে নিরাশ হয়েছিলেন। কেউ কেউ দ্য টাচকে তাঁর 'লাভ স্টোরি' বলে ঠাট্টাও করেছিলেন। কেউ বা বলেন, এ তাঁর 'মাইনর' কাজ। পরে কোন কোনও সমালোচককে মত বদলাতে হয়েছে, অন্তত বিশিষ্ট একজনকে নতুন করে লিখতে হয়েছে দীর্ঘ প্রবন্ধ।

রঙিন ইংরাজী ছবিটির বিষয় দুশ্যত প্রণয়। ঘটনাস্থল সুইডেনের ছোট একটি শহর। সেখানে এক সুখী দম্পতির জীবনে ছায়া ফেলেছে বাইরাগত এক ব্যক্তি—মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক ডেভিড (এলিয়ট গুল্ড)। অতিশয় ভদ্র, সহৃদয় স্বামী অ্যানড্রেস (ম্যাক্স ভন সাইডো) এবং দুই কন্যাকে নিয়ে কারিনের (বিবি অ্যানডারসন) শান্ত, সচ্ছল জীবন যাত্রা—সেখানে অভাব-অভিযোগের কোনও অবকাশই ছিল না। এই প্রেক্ষিতে একটি খনন-কর্ম উপলক্ষে আগত ডেভিড প্রথম সাক্ষাতেই কারিনকে টেনেছে দুর্নিবার আকর্ষণে। কারিন মোহাবিষ্ট; ডেভিডের সংগলাভের জন্য স্বামীর সংগে ব্যবহারে ছলনার আশ্রয় নিতে তার বাধেনি। ডেভিডের আচরণ কিন্তু দুর্বোধ্য—যাকে কখনও মনে হয় প্রেমিক, কখনও নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। ডেভিড ওর সুখ, ডেভিড ওর যন্ত্রণা—কারিনের অসহায়তার উপরই ছবির যবনিকাপাত ঘটান হয়েছে।

দ্য টাচকে নিছক প্রণয় কাহিনীরূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। দেখা যায়, ডেভিড আর কারিনের সম্পর্ক বিশ্লেষণের কাজটি এখানে যেন অসম্পূর্ণ। কারিনের আচরণকে মোহ হিসাবে যদি বা ব্যাখ্যা করা যায়, ডেভিডের কামনা-বাসনার স্বরূপ কিন্তু অস্পষ্ট। আসলে ডেভিডই এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র। জাতিতে ইহুদি, সে ছিন্নমূল একটি ব্যক্তি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসি-অত্যাচারের কবল থেকে পালিয়ে যে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিল। সমাজের সংগে তার আত্মিক যোগ নেই, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে মূল্যবোধে আস্থাও সম্ভবত না। ডেভিড তাই আধুনিক ইনটেলেকচুয়াল শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র হিসাবে গণ্য হতে পারে। ডেভিড আত্মহননের চেষ্টায় একবার সক্রিয় হয়েছিল, এই ঘটনার উল্লেখ ছবির এক জায়গায় আছে। আবার অন্যত্র কারিন বলেছে, ডেভিড নিজেকে ঘৃণা করে, তার পক্ষে তাই অন্যকে ভালবাসাও অসম্ভব। জীবনে আর জীবনের সদর্থক মূল্যে বিশ্বাসরহিত, ডেভিড তবে এমনই এক চরিত্র? সভ্যতার ধ্বংসের বীজ এদের হাতে রয়েছে, তাই কি পরিচালক এই ছবির মাধ্যমে জানাতে চেয়েছেন? সেই উদ্দেশ্যেই এই যন্ত্রণাকর প্রণয় কাহিনীর অবতারণা?

ভারজিন মেরির প্রোথিত মূর্তির উদ্ধার প্রসংগ এবং সেই সংগে অসংখ্য পোকার (যারা পৃথিবীর আলো পেয়ে ওই মূর্তির ক্ষয়কর্মে সক্রিয়) উল্লেখের কী তাৎপর্য? সুন্দরের নাশের আশংকার ইংগিত? বারগমানের ঈশ্বর-জিজ্ঞাসার সংগে মানুষের মংগল-অমংগল সম্পর্কিত প্রশ্ন যুক্ত থাকে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ঘুরে এসেছে এই চিত্রে। তাঁর অধিকাংশ ছবির কোথাও-না কোথাও —বিশেষত শেষাংশে—আমরা লক্ষ করেছি আশা-ভরসার কিছু ব্যঞ্জনা। সুনির্মিত এবং সুঅভিনীত এই চিত্রে কিন্তু তা অনুপস্থিত। প্রেম, বিশ্বাস কিছুই এখানে মূল্য পেল না, বড় হয়ে থাকল অপ্রাপ্তি আর অশান্তির ছায়া—সেই সংগে একটি আশংকারও।

মিলি

(সিপ্পি-মুখারজি)

আনন্দ এবং মিলির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। প্রথমজন আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সদানন্দ। মিলি (জয়া) একই অবস্থায় ক্ষণে ক্ষণে ভেংগে পড়েছে। সেদিক থেকে মিলি অনেক বেশী হিউম্যান বা মানবিক এবং স্বাভাবিক। "মিলি" ছবিটিকে "আনন্দ"-এর স্ত্রী-সংস্করণ বলা যেতে পারে। আবার বাঙালী দর্শকদের "মিলি" বাংলা ছবি "ছুটি"র কথাও মনে করিয়ে দেবে।

এই ধরনের ট্র্যাজেডি পরিবেশনে হৃষীকেশ মুখারজির যে বিশেষ কৃতিত্ব আছে সেটা "আনন্দ"-এই দেখা গেছে। তিনি যদি চান, দর্শককে কাঁদিয়ে দিতে পারেন। "মিলি" ক্লাইম্যাক্স-এর দিকে যত এগোয় দর্শকের চোখ ততই সজল হয়ে ওঠে। মিলি যখন মৃত্যুর অপেক্ষায় শেখর (অমিতাভ বচ্চন) তখন সব জেনেশুনেই তাকে বিয়ে করে। মরবার আগে যদি কিছুটা শান্তি বা সুখ দিতে পারে মিলিকে এই আশায়। মিলিকে নিয়ে শেখর বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। মিলির বাবা (অশোককুমার) জানেন, মিলি আর ফিরবে না।

"মিলি"/জয়া ভাদুড়ি

ওই অবস্থায় শেখর-মিলির বিয়েটা হয়তো নাটকের মোটা আঁচড়, কিন্তু পরিচালনার গুণে কোন ঘটনাই খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। ছবির শুরুতে মিলির প্রাণোচ্ছলতা দেখিয়েছেন পরিচালক। ফ্ল্যাট-বাড়ির সকলের প্রিয় মিলি, বাচ্চাদের নিয়ে নাচ-গান করে। এই জাতীয় ট্র্যাজেডিতে কনট্রাসট রচনার জন্য চরিত্রটিকে একটু বেশী প্রাণবান করতে হয়, স্বভাবেও সে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে।

ট্র্যাজেডি রয়েছে শেখরের জীবনেও। শেখরের মাকে খুন করেছে তার বাবা। শেখর তখন ছয় বছরের ছেলে। সেই থেকে সে বাড়ির চাকরের কাছে মানুষ। শেখরের জীবনে এই ঘটনার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে যখন সে যুবক, অর্থাৎ ছবিতে যখন উপস্থিত। সকলকে সে এড়িয়ে চলে, মদে ডুবে থাকে, কাউকে তার ভাল লাগে না, সর্বক্ষণ কুপিত। এই রাগী-ছোকরা ভাবটা অমিতাভ চমৎকার প্রকাশ করেছেন। মিলিদের উপরের ফ্ল্যাটে আসার পরই শেখরের জীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়। সে মিলির সংস্পর্শে এসে বাঁচতে শেখে, বাঁচার আনন্দ খুঁজে পায়। মিলির তেজ, শাসন ও মমতা শেখরের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। এই পর্বে এবং সমগ্র জয়া ভাদুড়ির অভিনয় মনে রাখার মতো।

ছবিতে লেখকের আলাদা গল্প রয়েছে। মিলির ট্র্যাজেডির সঙ্গে লেখকের গল্প মিলিয়ে দিয়ে একটি সুন্দর চিত্রনাট্য রচনা করা হয়েছে। তা ছাড়া 'মিলি'র মূল কাহিনী (রচনা : বিমল দত্ত) উপর-নীচের দুটি ফ্ল্যাটের মধ্যে ছড়ানো। ছোট ছোট আবেগপূর্ণ ঘটনার বিন্যাস পরিচ্ছন্ন ও সংযত। মিলি যখন জেনেছে সে বাঁচবে না তখন সে শান্ত, কেবল সময় সময় তার বাবার জন্য দুঃখে ব্যাকুল। বাবার ভূমিকায় অশোককুমারও তাঁর মনের ভিতরের প্রবল কষ্টের কথা দর্শককে অবশ্য জানতে দিয়েছেন, কিন্তু মিলিকে বুঝতে দেননি। ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের মধ্যে গোড়া থেকেকে দেখা গেছে, যিনি দর্শকদের হাসিয়েছেন। যদিও "মিলি" কাঁদায়, এই কষ্টবোধেই বুঝি 'মিলি' দেখার সুখ।

জয় সন্তোষী মা

(ভাগ্যলক্ষ্মী চিত্রমন্দির)

ধর্মমূলক ছবিতে ধর্মের ব্যাপারটা যদি প্রবল হয় তবে তা দর্শককে আকর্ষণ করে বেশি। 'জয় সন্তোষী মা' ছবিতে ওই গুণটিই বড়। দেবী সন্তোষীর ভক্ত কানন কৌশলকে যে অনেক দুর্যোগ পেরিয়ে সুখের মুখ দেখতে হয়েছে সেটা দেবী সন্তোষীর সঙ্গে অন্যান্য দেবীদের রেষারেষির কারণে। অবশেষে দেবী সন্তোষীরই জয় হয়েছে এবং কানন কৌশল তার স্বামী আশিসকুমারকে ফিরে পেয়েছে। সুখ তখন তাদের কানায় কানায় পূর্ণ। পরিচালক বিজয় শর্মা ছবিটিকে দ্রুত গতিতে টেনে নিয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত। ছবির আবেগের অংশগুলি তিনি সংযমের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। শিল্পীদের অভিনয়ও সংযমের মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি। ছবির ত্রুটিগুলি অবশ্য আরও তৎপরতার সঙ্গে গৃহীত হলে ভাল হত। টেকনিক্যাল কাজেও নানা ত্রুটিবিচ্যুতি। গানের আধিক্য কিছু বেশি। কিন্তু গানগুলির সুর (সি অর্জুন কৃত) এবং গাওয়া দুইই সুন্দর। এ ছবির গান হিট করতে পারে। সবার ওপরে রয়েছে সন্তোষী মায়ের মহিমা—যার অনেকটাই অলৌকিক। সেটাই দর্শকের কাছে বেশি উপভোগ্য।

কলকাতায় টেলিভিশন

অবশেষে কলকাতায় টেলিভিশন এল। ৯ আগস্ট সন্ধ্যায় টালিগঞ্জে কলকাতার অস্থায়ী টেলিভিশন কেন্দ্রটির উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল, ওই বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীধর্মবীর সিংহ এবং রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়। কলকাতার অধিবাসীরা টেলিভিশনে উদ্বোধন দৃশ্যটি দেখেন। কলকাতা ভারতের পঞ্চম রাজ্য যেখানে নিয়মিত টেলিভিশন চালু হল। আপাতত প্রতি সন্ধ্যায় তিন ঘণ্টা করে প্রোগ্রাম। পরে স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে প্রোগ্রামের সময় বাড়ানো হবে বলে জানা গেছে। এখন ৫০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যেকার অধিবাসীরা টেলিভিশন-দর্শনের সুযোগ পাবেন। পরে তা আরও বিস্তৃত হবে। কলকাতার অধিবাসীরা টেলিভিশন অর্থাৎ 'দূরদর্শন'কে স্বাগত জানিয়েছেন।
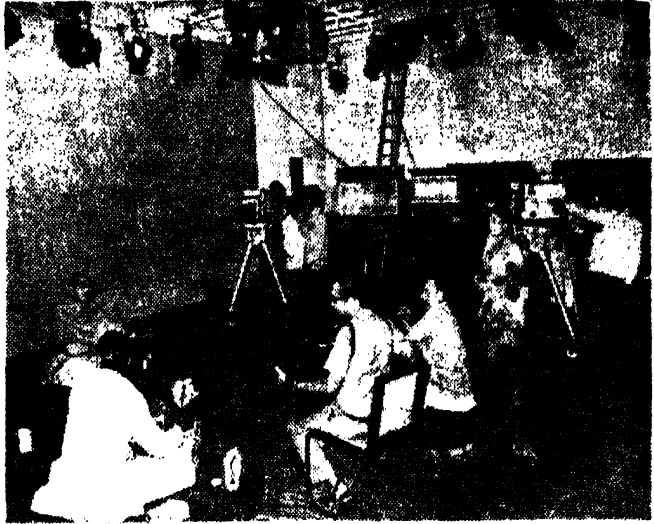
কলকাতায় টেলিভিশন। সংগীত পরিবেশনের একটি দৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে টেলিভিশন স্টুডিওতে ফটো—দেশ

শুটিং চলছে ...

আসুন, অনেকটা পিছিয়ে কোন এক দশকে—যখন লালন লালন ফকির হননি। এক অজ পাড়াগাঁয়ে সুখে শান্তিতে সংসার করছেন। সংসারে মা আছেন। স্ত্রী আছে। আত্মীয়পরিজনরা আছেন। একঘেয়ে সংসার ধর্ম পালন করতে করতে তাঁর মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল। স্থির করলেন তীর্থে যাবেন। যাওয়া হল পুরী। সঙ্গী দুই বন্ধু। পুরীতে গিয়ে লালন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর সারা গায়ে গুটি উঠেছে। বিনা চিকিৎসায়, অযত্নে, অবহেলায় ক্রমশ তাঁর অবস্থার অবনতি দেখে বন্ধুরা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বন্ধুর মতই কাজ করলেন বটে। অচৈতন্য লালনকে গঙ্গার ধারে ফেলে, গাঁয়ে এসে—। কি বলছেন তাঁরা? বলছেন, লালনের মৃত্যু হয়েছে। এই ধরনীতে তাঁর আর ফিরে আসা হবে না। গাঁয়ে শোকের ছায়া ধীরে ধীরে বিস্মৃতিলাভ করল। এদিকে লালন সুস্থ হয়ে উঠছেন। আশ্রিত এক মুসলমান জোলার ঘরে। এখানে ফতেমা আছেন, আছেন মতিবিবি। দুবেলা আসছেন সিরাজশাহ। অকাতরে সেবা, শুশ্রূষা আর ভালবাসা পাচ্ছেন লালন। কিন্তু তিনি কিছুতেই মনে করতে পারছেন না কে তিনি? কোথা থেকে এলেন? কেন এলেন? 'জানি না' একটি কথা বার বার ঘরের চার দেওয়ালে প্রতিধ্বনি করে। লালন কখনও অস্থির হয়ে ওঠেন। কখনও স্থির হয়ে বসে থাকেন তক্তপোষের এককোণে। কথা বলেন কম। ভাবেন বেশী। কোন কূলকিনারা হয় না। ফতেমা লালনকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। লালনের প্রতি দুর্বলতা মতিবিবির। তাঁকে সেবা করার ফাঁকে ফাঁকে সেটা প্রকাশিত হয়েছে। লালন সেটা উপলব্ধি করতে চান না। তাই বলে মতিবিবিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ মতিবিবি তাঁর অনুভবে তাঁর চেতনায় মিশে আছেন। নিঃশব্দ ঘরে আসেন। আলতো করে একতারা স্পর্শ করেন। শব্দ হয়।

—কে, মতিবিবি?

—কি করে চিনলে?

—তোমার সমস্ত কিছু আমার চেনা। তোমার ঐ একতারার টান। পায়ের শব্দ।

—তুমি আমার মনটাকে চেন?

—হ্যাঁ। তোমার মনটাকেও। ওপরটা

শুটিং চলছে : লালন ফকিরের সেই দৃশ্যটিতে অসীমকুমার ও সন্ধ্যা রায় ফটো—দেশ

খুব শক্ত হলেও ভেতরটা খুব নরম।

কথা শুনে মতিবিবি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয় এতদিনে লালনের মনের নাগাল তিনি পেয়েছেন। তাঁর বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। লজ্জায় থর থর করে কাঁপছে সারা শরীর। মতিবিবির ঘন কালো চোখ দুটোর দিকে অনুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন লালন। ওই মুহূর্তে দুজনেই বড় অসহায়। সময় বয়ে চলেছে। মতিবিবি লালনের দৃষ্টির নাগালের বাইরে চলে আসার চেষ্টা করলে প্রশ্ন হয় : কি হল মতিবিবি?

'কই, কিছু হয়নি তো' বলতে বলতে মতিবিবি আর্শিটা দুহাতের মাঝখানে লুকোবার চেষ্টা করলেন। একটু আগে যে আর্শি দিয়ে তিনি নিজের মুখটাকে গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন। এবং এখন লালন, মতিবিবির সুন্দর মুখটার দিকে, অপলক তাকিয়ে আছেন।

পরিচালক শক্তি চট্টোপাধ্যায় আপাতত এই দৃশ্যটি সেলুলয়েডে ধরে রাখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর ফ্লোরের একাংশে শিল্পনির্দেশক সুনীতি মিত্রের তত্ত্বাবধানে একটা মাটির ঘর তৈরী হয়েছে। সংলগ্ন দাওয়া, বাঁশের বেড়া ইত্যাদি। ঘরে লালনের ভূমিকায়, বলতে পারেন নায়কের ভূমিকায় অনেকদিন পর দেখা যাচ্ছে অসীমকুমারকে। মতিবিবির রূপসজ্জায় সন্ধ্যা রায়। এখন এঁদের দুজনকে নিয়ে কবিতার মত নিবিড় সন্ধ্যার পরিবেশ রচনা করতে তৎপর প্রবীণ চিত্রশিল্পী জ্ঞান কুণ্ডু। হ্যাজাকের আলোয় স্পষ্ট হবেন ওঁরা। চিত্রনাট্যের দাবি ... যায়ী চিত্রশিল্পী আলো করছেন। এখানে হ্যাজাকের আলো তীব্র নয়। হালকা। এই আলোকে স্পষ্ট দুজনা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। লালন ও মতিবিবি।

লালন ফকির জাতে হিন্দু। ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর আপোসহীন সংগ্রামের কথা ভোলবার নয়। স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবার পর লালন এই সমাজের কাছে ন্যায়বিচার আশা করেছিলেন। তিনি পাননি। সমাজ তাঁকে গ্রহণ করেনি। তাই তাঁকে পুনরায় আসতে হয়েছিল ফতেমার স্নেহচ্ছায়ায়। তারপর শুরু হয়েছিল তাঁর সাধনার জীবন সিরাজশাহির কাছে। সিরাজশাহির শিষ্য লালন একদিন লালন ফকির নামে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। দিকে দিকে তাঁর জয়গান। আলোকে উদ্ভাসিত একটি জীবন। রূপকার অসীমকুমার উজ্জীবিত। এবং এই চরিত্রে রূপদানের মাধ্যমে তাঁর আবার বাংলা ছবির নায়ক হিসেবে ফিরে আসা তাঁর কাছে রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মতিবিবি লালন ফকিরের সাধন সঙ্গিনী। ফতেমার পাতানো মেয়ে। সন্ধ্যা রায় রূপ দিচ্ছেন চরিত্রটিতে। সিরাজশাহি অসিতবরণ। ফতেমা দীপ্তি রায়। নাগ ফিল্মসের পতাকাতলে ছবিখানি প্রযোজনা করছেন গৌর নাগ।

বার্তাবহ

"যখন রব না আমি"

বিজ্ঞানের ছাত্র প্রণব রায়ের ইচ্ছা ছিল তিনি ইঞ্জিনীয়ার হবেন। কিন্তু বিধির ইচ্ছা ছিল অন্য। কলেজ জীবনে স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে প্রণব রায় কারারুদ্ধ হলেন। জেল থেকে বেরিয়ে যেন কিসের অজ্ঞাত তাড়নায় একটি ছোট্ট খাতায় বেশ কয়েকটি গান লিখে ফেললেন এবং এ-ঘটনা ভুলেও গেলেন। সেই গানের খাতা অনেকদিন পরে তৎকালীন নবীন সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্তের হাতে গিয়ে পড়ল এবং তা কাজী নজরুলের কাছে পেশ করতেই তিনি আদ্যন্ত গানগুলি পড়ে সবই রেকর্ডে প্রকাশের উপযোগী বলে মত দিলেন। এই সূত্রেই প্রণব রায় রচিত চারটি গান হিজ মাস্টার্স ভয়েস রেকর্ডে প্রকাশিত হল শারদীয়া পুজোপলক্ষে ১৯৩৪ সালে। এর মধ্যে কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে তুলসীদাস লাহিড়ীর সুরে দুটি ভাটিয়ালী গান—'ও বিদেশী বন্ধু' (রচনা হিসাবে এটি প্রণব রায়ের প্রথম গান) এবং 'যেথায় গেলে গাঙের চরে' অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করল। পরের মাসেই (নভেম্বর ১৯৩৪) প্রকাশিত হল যূথিকা রায়ের প্রথম রেকর্ড, তাঁরই লেখা এবং কমল দাশগুপ্তের সুরে—'আমি ভোরের যূথিকা' এবং 'সাঁঝের তারকা আমি'—যে

প্রণব রায়

রেকর্ডে কণ্ঠে, কথা ও সুরে শ্রোতারা পেলেন নতুন আস্বাদ।

এইভাবেই শুরু হল প্রণব রায়ের গীতিকার জীবন। হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও অন্যান্য গ্রামোফোন কোম্পানীর জন্য ক্রমে ক্রমে তিনি আরও গান লিখতে লাগলেন এবং গীতিকার রূপে প্রতিষ্ঠা পেতে তাঁর দেরী হল না। দু বছরের মধ্যেই তিনি চলচ্চিত্রের জন্যও গান লিখলেন।

সহজ কথায়, হালকা ছন্দে যে কোনও ভাব বা অনুভূতিকে প্রকাশ করায়, সামান্যকে অসামান্যতায় পরিণত করায় তাঁর ছিল স্বাভাবিক দক্ষতা। সেই জন্য চলচ্চিত্রের যে কোনও সিচুয়েশনের জন্য গান রচনায় তিনি ছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে সফল। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে, কিন্তু নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীটি তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন। পূর্বসূরীদের দ্বারা তিনি কদাচ প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং সমসাময়িক গীতিকারদেরও তিনি অনুবর্তী হননি। শুধু প্রত্যক্ষভাষিতায় তিনি ছিলেন কাজী নজরুলের সমগোত্রীয়। গভীরতা অপেক্ষা সার্বজনীন আবেদনে তিনি অধিকতর অভিনিবিষ্ট ছিলেন বলেই তাঁর গান অস্পষ্টতা-দোষ-বিবর্জিত এবং প্রসাদগুণে বিমণ্ডিত।

চল্লিশ বছরেরও বেশী সময়ে প্রণব রায় দু হাজারেরও বেশী গান লিখেছেন—যার মধ্যে বহু স্মরণীয় ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে। গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশিত তাঁর লেখা গানের মধ্যে 'প্রিয় হতে প্রিয়তর', 'জানি মিছে পথ-চাওয়া', 'পথ ভুলে কবে এসেছিলে' (জগন্ময় মিত্র); 'তুমি ফিরাবে কি শূন্য হাতে', 'শুধু মুখের কথাটি শুনে গেছ তুমি', 'ঘুমায়ে পড়েছে চাঁদ—বন্দিনী অন্ধকার', 'স্মৃতির বাঁশরী কার ফিরে ফিরে

[illegible] (হেমন্ত ভট্টাচার্য'); 'নাই বা ঘুমালে প্রিয়', 'অধম হব না আমি' (কুন্দনলাল সাইগল), 'সবার দেবতা তুমি আমার প্রিয়', 'পিউ পিউ গায় যে পাপিয়া', 'বনের কুসুম ঝরে ছিন্ন বন-শাখাতে', 'চরণ ফেলিও ধীরে' (যূথিকা রায়); 'এক হাতে মোর পূজার থালা', 'ভুল ভেঙেছে যাবে যবে' (উৎপলা সেন); 'মধুর আমার মায়ের হাসি' (সুধীরলাল চক্রবর্তী); 'এই কি গো শেষ দান', 'চাঁদের আলোর দেশে গো' (রবীন মজুমদার); 'জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা' (সন্তোষ সেনগুপ্ত); 'নীল সাগরের আরশিতে মুখ দেখে চাঁদ' (শৈল দেবী); 'ফেলে আস দিনগুলি মোর' 'জানি, জানি একদিন ভালোবেসেছিলে', 'পরদেশী কোথা যাও' (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়); 'হোরী খেলিবে গিরিধারী' (ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র); 'এ-জীবনে যত ব্যথা পেয়েছি' (মান্না দে); 'মধুমালতী ডাকে আয়', 'মরমী গো আজি মনের কথাটি বলো না', ওই চাঁদ দোলে' (সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি শুধু জনপ্রিয় হয়নি বৈচিত্র্যে তাঁর সৃষ্টি-কুশলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে। হিমাংশু দত্ত (সুরসাগর) রাইচাঁদ বড়াল, পংকজ মল্লিক কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্ত, শৈলেশ দত্তগুপ্ত, দুর্গা সেন, রবীন চট্টোপাধ্যায়, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, গোপেন মল্লিক, নিতাই ঘটক, নচিকেতা ঘোষ এবং অনিল বাগচী প্রমুখ বিশিষ্ট সুর-শিল্পীরা তাঁর গানে সুর দিয়েছেন।

কাহিনী-সংগীতে তিনি বাংলা গানে প্রথম পথিকৃৎ কিনা এ-প্রশ্নের মীমাংসা সহজে হবে না, কিন্তু তাঁর রচিত 'চিঠি', 'সাতটি বছর আগে' (জগন্ময় মিত্র), 'আমার সোনা চাঁদের কণা' (পংকজ মল্লিক? [illegible]) নবতর সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

চলচ্চিত্রের জন্য প্রণব রায় প্রথম গান লেখেন সতু সেন পরিচালিত 'পণ্ডিতমশাই' (১৯৩৬) কথাচিত্রের জন্য। এ ছবির তিনি ছিলেন অন্যতম গীতিকার। পরে এককভাবে বা অন্য গীতিকারের সঙ্গে বহু কথাচিত্রের জন্যই গান লিখেছেন। তার মধ্যে কাশীনাথ, গরমিল, দম্পতি, সাত নম্বর বাড়ী বিরাজ বৌ, মাইকেল মধুসূদন, নন্দিতা নন্দিনী, চন্দ্রনাথ, সাহেব বিবি গোলাম, মহানিশা এবং দীপ নেভে নাই প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কে তুমি' কথাচিত্রের গানের জন্য বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি ১৯৬৪ সালে প্রণব রায়কে শ্রেষ্ঠ গীতিকার রূপে সম্মানিত করেন।

বেশ কয়েকটি কথাচিত্রের কাহিনী, সংলাপ ও চিত্র-নাট্যও তিনি রচনা করেছেন। একাধিক চলচ্চিত্রের পরিচালক রূপেও তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি 'রাঙামাটি' (১৯৪৯)। কিছু গোয়েন্দা-কাহিনী ইত্যাদিও লিখেছেন। তবে তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে গীতিকার রূপেই। ২২শে শ্রাবণ তাঁর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কাব্য-সংগীতের এক গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল বলা চলে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

কল্যাণবন্ধু ভট্টাচার্য

রবিরশ্মির শ্রাবণসন্ধ্যা

রবিরশ্মির শ্রাবণসন্ধ্যা সম্প্রতি সাগর সেনের পরিচালনায় রবীন্দ্রসদনে সম্পন্ন হল। বর্ষার কিছু নির্বাচিত গান, একক, দ্বৈত এবং সম্মেলক কণ্ঠে, রবীন্দ্রকাব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ থেকে আবৃত্তি-সহ এই অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত। কয়েকটি গানের সঙ্গে নৃত্যেরও আয়োজন ছিল। এর মধ্যে অভিনবত্ব না থাকলেও প্রশংসনীয় রসবোধ এবং শিল্পনৈপুণ্যের অভাব ছিল না। আষাঢ়ের ঘন মেঘে নয়, বরিষণ মুখরিত শ্রাবণের গানের সুর এঁদের কণ্ঠে মন্দ্রিত হয়েছিল। শ্রাবণের ধারার মতনই ঝরেছিল একটির পর একটি গান। তারই ফাঁকে ফাঁকে দিলীপ ঘোষের কণ্ঠে ধ্বনিত আবৃত্তি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

একক গানের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'সঘন গহন রাত্রি' এবং সাগর সেনের 'বন্ধু রহো রহো' প্রগাঢ় অনুভূতির স্পর্শে রসোজ্জ্বল। সাগর সেনের 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো' সুমিত্রা মিত্রের প্রাণোচ্ছল নৃত্যের সহযোগে সেই শ্রাবণসন্ধ্যায় এক স্মরণীয় মুহূর্ত রচনা করেছিল। তবে [illegible] [illegible] কোনো কোনো অংশে বিশেষত [illegible] শিল্পীকে আরও [illegible] দেখতে পেলে ভাল লাগত। এই গানের সঙ্গে পূরবী মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'ওগো সাঁওতালি ছেলে'র সংমিশ্রণে একটি রোমান্টিক নাট্যমুহূর্ত রচনার পরিকল্পনাটি সুন্দর। নরেশকুমার এবং সুমিত্রা মিত্র কর্তৃক এই দুটি গানের নৃত্যরূপায়ণও প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশে বাণী ঠাকুরের 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে', পূরবী মুখোপাধ্যায়ের 'মেঘ ছায়ে সজল বায়ে' উল্লেখযোগ্য। সম্মেলক গানের শিল্পীর সংখ্যা অনুপাতে গানগুলি তেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। যন্ত্রানুষঙ্গও দু-একটি গান ছাড়া প্রত্যাশিত পটভূমি রচনায় সার্থক হতে পারেনি, বেশ কয়েকজন সুদক্ষ যন্ত্রশিল্পীর উপস্থিতি সত্ত্বেও। নৃত্য-পরিকল্পনা (নরেশকুমার) ভাল। উল্লিখিত নৃত্যগুলি ছাড়া 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে' অলকানন্দা রায়ের সুন্দর নৃত্যভঙ্গিমায় উপভোগ্য। রাবীন্দ্রিক নৃত্যে এঁরা ঘুঙুরের ব্যবহার করেছেন, ধ্রুপদী নৃত্যের ছন্দ এঁদের পায়ে ঝংকৃত হয়েছে, তবে সর্বত্র সেই নূপুরনিক্বণ খুব মানানসই বলে মনে হয়নি। তাপস সেনের আলোকসম্পাতের কাজটিও পরিচ্ছন্ন এবং শিল্পসম্মত।

আনন্দবর্ধন

নান্দীকারের "আন্তিগোনে"

রঙ্গনায় ভালোমানুষ-এর নিয়মিত অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নান্দীকার অন্যান্য মঞ্চে আন্তিগোনের অভিনয় শুরু করেছেন। আন্তিগোনের মঞ্চসজ্জা ও পোশাক পরিচ্ছদের দায়িত্বে আছেন কুমার রায়। আলোকসম্পাত কালীপ্রসাদ ঘোষ; রূপসজ্জা শক্তি সেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া চক্রবর্তী, সতিকা বসু, বীণ [illegible] অরুণ চট্টোপাধ্যায়, রণজিত চক্রবর্তী, মনোজ দাস কালীপদ সাহা, নিরঞ্জন পাল, বুদ্ধদেব রায়চৌধুরী, শিপ্রা সাহা ও পরিমল মুখোপাধ্যায়। নাটকটি পরিচালনা করেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

[illegible] [illegible] বর্ষ [illegible]
প্রচারে একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযোগী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
[illegible]
[illegible] বিমান মাশুল
৫ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
[illegible] চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩ ৯২৪৩
২৩-৫০৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২·০০ টাকা	৪১·৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মারফত)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

দে
৩০ অগস্ট, ১৯৭৫ ॥

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

"ঐ পাঁচটা দিন আমি সকলকে এড়িয়ে চলতাম
এখন পেয়েছি 'কেয়ারফ্রী'—মাসে
গোটা ৩০ দিনই এখন আমি নিশ্চিন্ত।"
নতুন "কেয়ারফ্রী" স্যানিটারী ন্যাপকিন আর সেই সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ স্ত্রীলোকদের শরীর পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ, পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখে।
মাসে পাঁচ দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার দরকার হয়। সে প্রয়োজন মেটাতে আপনি এখন পাচ্ছেন "কেয়ারফ্রী"।
অদ্ভুত ওয়াটারপ্রুফ সব জলীয় পদার্থ ভেতরের স্তরের মধ্যে টেনে নেয় নিমেষে। তাই আপনার গায়ের ত্বক শুকনো ঝরঝরে থাকে আর কোন অস্বস্তি বোধ হয় না।
একমাত্র "কেয়ারফ্রী" এমন জিনিস দিয়ে তৈরী যা সব জলীয় পদার্থ সারা ন্যাপকিনের ভেতরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। তাই ন্যাপকিনের এক জায়গায় সব জমে থাকে না। নীল রঙের একটি রক্ষা কবচ এর পুরো তলা আর দু'পাশ ঘিরে থাকে। তাই আপনার কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।
"কেয়ারফ্রী" ফেলে দিতেও কোন অসুবিধা নেই—বাথরুমে ফেলে দিয়ে জল ঢেলে দিলেই সব অদৃশ্য। বাইরে কাজে বেরুলে কিম্বা বেড়াতে গেলে আর কোন চিন্তার কারণ নেই আপনার।
তাছাড়া "কেয়ারফ্রী" আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিক ক'রে খাপ খাইয়ে পরে নিতে পারবেন। এই সঙ্গে প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে একটি "কেয়ারফ্রী" বেল্ট।
এখন আপনি মাসে গোটা ৩০ দিনই নিশ্চিন্ত
এখন নতুন ধরনের ছোট পরিমাণের প্যাকে
তাছাড়া, যেসব মহিলাদের পছন্দ বিশেষ ধরনের তাঁদের জন্য নতুন লাক্সারী আলাদাভাবে বেল্টও আলাদাভাবে পাওয়া যায়। কেয়ার ফ্রী স্যানিটারী ন্যাপকিন যে দোকানে বিক্রী হয় সেখানে এটিও পাবেন।
Carefree
জনসন অ্যাণ্ড জনসন একমাত্র স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার জন্যে

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্র বড়ুয়া

আশাপূর্ণা দেবীর

উপভোগ্য কিশোর-উপন্যাস

রাজকুমারের পোশাকে

দাম ৪·০০

ধরা যাক তোমার নাম টিকলু। তোমার বয়েস এ-ই সাড়ে বারো। বন্ধু বাপীর সঙ্গে গেছ এক মেলায়। মেলার মধ্যে হঠাৎ একটা মাঝবয়সী লোক তোমার জামার কলার চেপে ধরল। লোকটার গায়ে কোট, বগলে ছাতা, কাঁধে চাদর। কি ব্যাপার? না, তুমি নাকি কোন্ এক জায়গার রাজকুমার—বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছো। তারপরই দেখলে—জনা কয়েক

প্রকাশিত হল

ষণ্ডামার্কা লোক তোমাকে ঘিরে ধরেছে। এবং মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে তারা উধাও। তারপর লঞ্চ, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি—কত রকমের গাড়ি বদল করতে করতে দিন কয় বাদে এক রাতে এক অজ ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের প্রকাণ্ড এক পুরোনো প্রাসাদের দেউড়ির সামনে গিয়ে হাজির হলে তোমরা। সেই অন্ধকার-অন্ধকার প্রাসাদে ঢুকেই তোমার গায়ে চড়িয়ে দেওয়া হলো রাজকুমারের পোশাক। তারপর...? তারপর তোমার মতো ডাকাবুকো বাহাদুর ছেলে কি কি করতে পারে? যা যা পারে, সে সবই কিন্তু করেছে টিকলু—হ্যাঁ, এই বইয়ের টিকলু। কি ভীষণ আর ভয়ংকর সেই সব রোমহর্ষক ব্যাপার! মিলিয়ে নিলে দেখবে একেবারে হুবহু এক—তুমি যা যা করতে, ঠিক একেবারে তাই। ইচ্ছে হলে মিলিয়ে দেখতে পারো—আজই; কিংবা কাল, নয়তো যেদিন খুশি!

নানা স্বাদের বই

গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়ের

রবীন্দ্রনাথকে যে কথা বলা হইল না ৬.০০

অমিতাভ চৌধুরীর

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা ৫.০০

অতীককুমার সরকার সম্পাদিত

বাংলা নামে দেশ ১০.০০

মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উপলব্যথিত গতি ৫.০০

ফাদার দ্যতিয়েন-এর

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা ৬.০০

অন্নদা দত্তের

পল্লী ও নগর ৩.০০

সাগরময় ঘোষের

ঝরাপাতার ঝাঁপি ৪.০০

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের

ইন্দ্রজিতের আসর ৩.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী

শরদিন্দু অম্নিবাস (৫ম খণ্ড)

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্র কা শি ত হ ল
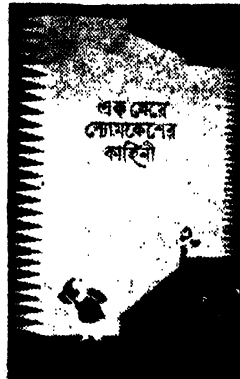
মেয়ে মাত্রই ব্যোমকেশ। জন্মসূত্রেই এক একটি টিকটিকি। কেবল যে কথায় কথায় টিকটিক করে তাই নয়, যাকে সে গ্রাস করবে বলে তাক করে, সে-বেচারা তার খর্পর থেকে বাঁচতে নিরুদ্দেশ হয়ে যেখানেই পালাক না, তার নায়ককে সে ঠিক ঠিক খুঁজে বার করবেই। তার হাত থেকে ত্রাণ নেই তার কিছুতেই। এ বইয়ের প্রথম কাহিনীটির নায়িকা সত্যসন্ধানী বিখ্যাত ব্যোমকেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে কিনা তার বিচার পাঠকের। তবে এটুকু বলা যায়, পুরাকালের সাবিত্রী যেমন একদা সত্যবানের অনুসরণে যমালয়ের দরজা অবধি এগিয়েছিল, এই নায়িকাটিও তেমনি তার সত্যবানের পিছু ধাওয়া করে বর্মা থেকে দেড় হাজার মাইল পেরিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছে-ছিল। এবং নিখুঁত ডিটেকটিভের মতই যথাকালে যথাস্থানে যথোচিতভাবে তার আসামীকে যথাযথ পাকড়েছিল।

দ্বিতীয় কাহিনীর নায়িকাও তার আসামীকে যথাযথ পাকড়েছিল; এবং পাকড়েছিল এক হত্যাকাণ্ডের ভিতর থেকে। তবু, মানে রহস্য এবং রোমাঞ্চের উপচার-উপচারগুলো ষোল আনা থাকা সত্ত্বেও, কাহিনী দুটি কতখানি রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর (নাকি একেবারেই 'হাস্যকর'?), সে চুলচেরা বিচারের ভারও কিন্তু গুণী পাঠকদের॥ দাম ৬·০০॥

শিবরাম চক্রবর্তীর

রহস্যময় 'হাস্যকর' যুগল-কাহিনী

এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০০০৯॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৪
শনিবার ১৪ ভাদ্র ১৩৮২

ভূমি সংরক্ষার আদর্শ

স্বাধীনতা দিবসের উদ্‌যাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত বেতার-ভাষণ যাঁরা শুনেছেন, তাঁদের অনেকের অবশ্যই মনে হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি বোধহয় দেশের ভূমি-প্রযত্নের আগ্রহকে রাজনৈতিক স্বদেশ-প্রীতির তুলনায় কম গুরুত্বের বিষয় বলে মনে করেন না। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে দেশের ভূমিক্ষয়ের প্রবলতা নিরোধ করবার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভূমির উর্বরতার মান বাড়িয়ে তোলবার কথাও তিনি বলেছেন। ভূমির কায়িক সৌষ্ঠব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রশস্ত আরণ্য পরিবেশ নির্মাণ করবার প্রয়োজন আছে। আর একটি নৈতিক সত্যের কথা তাঁর ভাষণে স্থানলাভ করেছে। এই নৈতিক সত্যটির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ধারণার কোন বিরোধ নেই। উপনিষদে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যের যে বিশেষ একটি তত্ত্ব বিবেচিত হয়েছে, তারই মধ্যে এই নৈতিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূমির কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তার সব অবশেষে ভূমিকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। তা না হলে ভূমির সহজ উর্বরতার অঙ্গীকার মিথ্যে হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতির ভাষণে বলা হয়েছে যে, দেশের অনেক স্থানের ভূমির উপরস্তর যথোচিত উর্বরতার মান হারিয়ে উদ্ভিদ ও শস্য ধারণ করবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে। অরণ্যের অভাবে ভূমিক্ষয় বাড়ছে, এবং ভূমিক্ষয়ের প্রকোপ বাড়বার কারণে অরণ্যের বিনাশ বাড়ছে। সংক্ষেপে বলা চলে : ভূমির যত্ন নানা কারণে ব্যাহত হয়েছে ও হয়ে চলেছে।

উপসর্গ মাতরং ভূমিম্—রাষ্ট্রপতির ভাষণ শোনবার পর কোন শ্রোতার মনে এই বৈদিক উক্তিটির অর্থ জানা দিয়ে সরব হয়ে উঠুক বা না উঠুক, প্রাসঙ্গিক বিচার ও সমালোচনার প্রয়োজনে এই উক্তির দুটি সহজ অর্থ স্মরণ করতে হয়। একটি অর্থ—মাতৃভূমির সেবা কর। অন্য অর্থ—ভূমিমাতার সেবা কর। বৃহত্তর আদর্শিক অর্থে এই দুই নির্দেশের মধ্যে প্রভেদ ও ভিন্নতা নেই। তবু জাতীয় প্রযত্নের কর্তব্য হিসাবে ভূমিমাতার সেবা রাজনীতিক স্বদেশ-প্রীতির তুলনায় ভিন্নতর একটি অনুশীলন। এবং একথার সত্যতাও মেনে নিতে হবে যে, স্বদেশপ্রীতিকে যদি নিতান্ত ভাবুকতার বিগ্রহ না হয়ে জাতীয় কৃতিত্বের একটি বাস্তবতার বনিয়াদ সত্য করে তুলতে হয়, তবে ভূমির প্রাকৃতিক উৎকর্ষের মান উন্নত করে তুলতে হবে। দেশপ্রীতির সঙ্গে ভূমি-প্রীতির সংযোগ চাই।

কবি লিখেছেন—যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ। কবির এই উক্তির মধ্যে ভারতের ভৌম অবয়বের সৃষ্টি ও আবির্ভাবের ঘটনা কল্পিত হয়েছে। ভূতত্ত্বের নির্ণীত সূত্র অনুযায়ী ভারতের ভৌম অবয়বের এ ধরনের আবির্ভাব তথা সৃষ্টির ঘটনা হুবহু সমর্থিত না হতে পারে, কিন্তু কবির উক্তিতে ভারতের ভৌম অবয়বের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে, সেটা জাতীয় উপলব্ধির একটি প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথের 'ভারত মাতা' চিত্রে ভারতের ভৌগোলিক মানচিত্রের একটি ভাবগূঢ় রূপ প্রমূর্ত হয়েছে। এক্ষেত্রেও অনুমান করলে বোধহয় ভুল হবে না যে, আধুনিককালের ভারতীয় শিল্পীর মনে ও চেতনায় যেন বৈদিক উক্তিটির আবেদন সঞ্চারিত হয়েছিল—উপসর্গ মাতরং ভূমিম্ ! এই ছবিকে যেমন মাতৃভূমির ছবি বলে মনে করা চলে, তেমনই ভূমিমাতার ছবি বলেও মনে করা চলে।

শোনা যায়, সরকারী বিবৃতিতেও প্রচারিত হতে দেখা গিয়েছে যে, রাজস্থানের মরু-অঞ্চলের পরিধি ক্রমেই বিস্তারিত হয়ে চলেছে। এমন মন্তব্যও কোন-কোন প্রবক্তার বিবৃতিতে শুনতে পাওয়া গিয়েছে যে, রাজস্থানের মরুভূমির সীমারেখা প্রতি বছর অগ্রসর হয়ে প্রায় এক-মাইল পরিমিত স্থান গ্রাস করে ফেলেছে। এ ছাড়া ভূমিক্ষয়ের সরকারী রিপোর্টের বর্ণনাও কম করুণ নয়। চিন্তাশীলের কাছে বোধ হবে, ভয়াবহ। ভূমির উপর-স্তরের উর্বরতা উদ্ভিদের আচ্ছাদনের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। স্থানে স্থানে ভূমির উর্বরতার স্তর ধুয়ে-মুছে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অরণ্যের সীমা সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে। ভূমির প্রাকৃতিক উৎকর্ষ ও সহজ উর্বরতার উপর যদি এধরনের ক্ষয় ও অবক্ষয়ের ক্রিয়া চলতে থাকে, তবে আজকালের মধ্যে না হোক, একশো বছরের মধ্যে ভারতের ভৌম অবয়ব শোচনীয় রিক্ততায় অভিভূত হয়ে পড়বে। স্বাদেশিক স্বার্থের কোন্ হানি এর চেয়ে আর বেশি ভয়ানক হতে পারে? ভূমিক্ষয়ের নিরোধ ব্যাপকভাবে সম্ভব করবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা বিহিত করা দরকার। কারণ, ভূমির যোগ্যতার মানরক্ষা করবার সম্যক ব্যবস্থা আজ গ্রহণ করলে, তার সম্যক্ সফলতা সম্ভব হবে প্রায় একশত বছর পরে।

ভূতাত্ত্বিকের ধারণার কথা, বর্তমান ইউরোপ সুদূরাতীত কালে গ্রীষ্মপ্রধান এক মহাদেশ ছিল। সুমেরু ও কুমেরু, চরম উত্তর ও দক্ষিণের যে দুই মহাদেশ বর্তমানে জীব ও উদ্ভিদের চিহ্নবর্জিত একটি নিরেট তুষারাচ্ছন্ন স্থলভূমি, তারাও দূরাতীত কালে উদ্ভিদের শ্যামল সমারোহ বহন করেছিল। সাহারা মরুভূমিও নাকি সুজলা-সুফলা ছিল। এই প্রাকৃতিক পরিবর্তন শুধু ভূমিক্ষয়ের কারণে সম্ভব হয়েছিল, এমনতর ধারণার ভিত্তি নেই। কিন্তু এটুকু বুঝবার পক্ষে যুক্তি আছে যে, বিরাট দেশাঞ্চলের মাটি উর্বরতা হারিয়ে ফেলতে পারে, যদি প্রাকৃতিক কারণের প্রকোপে দীর্ঘকাল ধরে ভূমিক্ষয় চলতে থাকে। ভূমিক্ষয়ের কারণে সভ্যতার জনপদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এই সপ্তাহ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান ১৫ই আগস্ট প্রত্যুষে এক সামরিক ক্যু দেতা-য় নিহত হয়েছেন। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

পাকিস্তান রেডিওর এক ঘোষণায় বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলি ও শেখ মুজিবের দুই ভাগিনেয়ও নিহত হয়েছেন। পরে বাংলাদেশ রেডিওর খবরে প্রকাশ, মনসুর আলি জীবিত আছেন। ইসলামাবাদের অসমর্থিত কূটনৈতিক রিপোর্ট উল্লেখ করে রয়টার বলেছেন শেখ মুজিবের স্ত্রীকেও হত্যা করা হয়েছে। কয়েকটি বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানিয়েছেন যে, নয়াদিল্লির কূটনৈতিক মহলের খবর, শেখ মুজিবের পরিবারের কয়েকজন নিহত হয়েছেন।

এই ঘটনা সম্পর্কে বাংলাদেশ রেডিওর প্রথম ঘোষণায় বলা হয়, খোন্দকার মুস্তাক আমেদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী বাংলাদেশের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেছেন। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই পদক্ষেপ। শেখ মুজিবর রহমান নিহত হয়েছেন এবং তাঁর স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানো হয়েছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খোন্দকার মুস্তাক আমেদ নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। মুজিবনগরে যে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়, তাতে তিনি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তারপর বাংলাদেশে যে কটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, তার সব কটিরই তিনি সদস্য ছিলেন। শেখ মুজিব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার পর যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তাতে খোন্দকার মুস্তাক আমেদ ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী। বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি কলকাতার খিদিরপুরে আকাদেমীর ছাত্র ছিলেন। "ভারত ছাড়" আন্দোলনে তাঁর রাজনীতির হাতে খড়ি।

খোন্দকার মুস্তাক আমেদকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ পড়ান বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মহম্মদ হুসেন। প্রধান বিচারপতি এ এম সঈম তখন ব্যাংককে ছিলেন। বাংলাদেশ রেডিও জানান, নতুন রাষ্ট্রপতির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও সমর্থন যাঁরা জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌ বাহিনীর তিন প্রধান, ইনসপেকটর জেনারেল অব পুলিস ও রক্ষী বাহিনীর অস্থায়ী ডিরেকটর জেনারেল আবদুল হামিদ খান। রক্ষী বাহিনীর ডিরেকটর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামানের কী হয়েছে, সে বিষয়ে রেডিওতে কিছু বলা হয়নি।

মুজিবর রহমান

সন্ধ্যায় বাংলাদেশের নতুন উপ-রাষ্ট্রপতি হিসাবে মহম্মদুল্লাহ শপথ গ্রহণ করেন। মুজিব সরকারের উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কোন খবর পাওয়া যায়নি। মুজিব যখন প্রধানমন্ত্রী, তখন মহম্মদুল্লাহ প্রথমে গণ-পরিষদের স্পীকার ও পরে রাষ্ট্রপতি হন। তিনি মুজিবের শেষ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। একই সময়ে খোন্দকার মুস্তাক আমেদের নতুন মন্ত্রিসভার দশজন পূর্ণমন্ত্রী ও ছয়জন রাষ্ট্রমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে রাষ্ট্রমন্ত্রী মোয়াজ্জেম হোসেন ছাড়া আর সকলেই মুজিব মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। পুরানো মন্ত্রিসভার যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ কামাল হোসেন, আবদুস সামাদ, কামারুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলি।

রাত্রে নতুন রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বলেন, বাংলাদেশের জনসাধারণ পরিবর্তন চাইছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই পরিবর্তন ঘটানোর জন্য সেনাবাহিনী এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, চরম দুর্নীতি ও আনুকূল্য বিতরণের ফলে এতদিন মুষ্টিমেয়ের হাতে সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে, সাধারণ মানুষের দুর্দশার লাঘব হয়নি। নতুন সরকারের পররাষ্ট্র নীতি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করার নীতি তাঁরা অনুসরণ করবেন। বাংলাদেশের আভ্যন্তরিক বিষয়ে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ তাঁরা বরদাস্ত করবেন না।

নতুন বাংলাদেশ সরকার প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছেন পাকিস্তানের কাছ থেকে। শুক্রবার রাত্রেই পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে, প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো এক বিবৃতিতে বলেছেন, পাকিস্তান সরকার "ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশকে" এখনই স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের জনসাধারণের পক্ষ থেকে উপহার হিসাবে ৫০ হাজার টন চাল ও দেড় কোটি গজ কাপড় বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সৌদি আরব ও সুদান সরকার শনিবার "ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশকে" স্বীকৃতি দেন। ঐদিন অধিক রাত্রে খবর পাওয়া যায়, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক। বাংলাদেশের ক্যু-এর খবর প্রথম প্রচারিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর থেকে; খবরের সূত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল ঢাকায় মার্কিন

দূতাবাসকে।

নয়াদিল্লিতে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশের ঘটনা সেখানকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবু ভারত সরকার ওই ঘটনা সম্পর্কিত সব রিপোর্ট সতর্ক-ভাবে পর্যালোচনা করছেন ও ঘটনার গতির উপর নজর রাখছেন। শেখ মুজিবর রহমানের শোচনীয় মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে মুখপাত্র বলেন; তিনি বাংলা-দেশের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারত-বাসীর কাছে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং আমাদের চোখে তিনি সমকালের এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। এই উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মুখপাত্র বলেন, এই অঞ্চলের সব দেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা ভারতের কাম্য এবং ভারত সরকার এই লক্ষ্য সাধনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের খবর বিনা মন্তব্যে প্রকাশ করা হয়েছে। মস্কোর কূটনৈতিক মহলের ধারণা, যত তাড়াতাড়ি ও সতর্কতার সঙ্গে এই সংবাদ পরিবেষণ করা হয়েছে, তাতে সোভিয়েট সরকারের উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, শেখ মুজিবর রহমান একজন অতি শ্রদ্ধেয় রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে ব্রিটেনের ব্যাপক জনসাধারণ দুঃখিত হবেন।

নিউ-চায়না নিউজ এজেন্সী কোন সরাসরি মন্তব্য না করে খবরটি প্রচার করেছেন। পশ্চিমী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী খোন্দকার মুস্তাক আমেদের গোষ্ঠী নিরপেক্ষ নীতির উপর জোর দিয়েছেন, বলেছেন নতুন সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা বাইরের হস্তক্ষেপ সহ্য করবেন না। নতুন সরকার যে ইসলামিক ও নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক রাখতে চান তারও উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয়, পিকিং-এ খবরটি ভালোভাবেই গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্যু-এর খবর লনডনে পৌঁছানোর পর নতুন সরকারের সমর্থকরা বাংলাদেশ হাই-কমিশনের বিভিন্ন অফিসে চড়াও হন। তাঁরা শেখ মুজিবের সমর্থক হিসাবে পরিচিত অফিসারদের বার করে দেন এবং অফিসগুলি দখল করেন। তাঁরা শেখ মুজিবের ছবি নামিয়ে ভেঙে ফেলেন বা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং কয়েকটি অফিস তছনছ করেন। হাই-কমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতানকে রেহাই দেওয়া হয়, কিন্তু হাই-কমিশনের অন্য কয়েকজনকে লাঞ্ছনা করা হয়।

খোন্দকার মুস্তাক আমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯২০ সালে ফরিদপুরের এক মাঝারি ভূস্বামী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় প্রথমে ছিলেন কলকাতায়, দেশ বিভাগের পর ঢাকায়। ১৯৪৮ সালে সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খান যখন পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল করেন তখন অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে মুজিবও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হন। গণ-আন্দোলনের ফলে ১৯৬০ সালে তিনি মুক্তি পান, কিন্তু দু বছর পরে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য আবার গ্রেফতার হন; মুক্ত হন ছমাস পরে। ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বশাসন অধিকারের জন্য তিনি তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা দাবি পেশ করেন। আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার চেষ্টা করছেন। এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। মুজিব সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। আয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে এক গণ অভ্যুত্থানের পর তাঁর বিরুদ্ধে সব অভিযোগ ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, পূর্ব পাকিস্তানে দুটি আসন ছাড়া জাতীয় পরিষদের আর সব কটি আসনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। যাঁর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা তাঁকে ইয়াহিয়া খান গ্রেফতার করেন ১৯৭১ সালের ২৫শে মারচ। এবার তাঁর বিচার হয় পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুর জেলে, অভিযোগ দেশদ্রোহ। মুজিব পরে বলেছিলেন, বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। মুজিবের অবর্তমানে তাঁর সহকর্মীরা ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল মুজিবনগরে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংবাদ ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের প্রেসিডেনট হিসাবে মুজিবের নাম ঘোষিত হয়, বলা হয় তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির কাজ চালাবেন। এই নতুন রাষ্ট্রকে প্রথম স্বীকৃতি দেন ভারত ও ভূটান সরকার—১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। ১৯৭৪ সালের সেপটেমবর মাসে বাংলাদেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হয়।

বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর পাকিস্তানের তখনকার প্রেসিডেন্ট ভুট্টো মুজিবকে মুক্তি দেন। তাঁকে লনডনে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরের দিন, ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২, মুজিব ঢাকা যাওয়ার পথে দিল্লি পৌঁছান। দিল্লিতে তিন ঘণ্টা অবস্থানের পর তিনি তাঁর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। বাংলা-দেশের নতুন সংবিধান চালু হয় ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এবং সংবিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের মারচ মাসে। এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে সাতটি ছাড়া আর সব কটি আসনেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়। এই বছর ২৫শে জানুয়ারী সংবিধান সংশোধন করে বাংলাদেশে 'প্রেসিডেন্সিয়াল' শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং মুজিব প্রেসিডেন্ট হন। ফেব্রুয়ারী মাসে মুজিব এক নির্দেশ জারি করেন যে বাংলাদেশে মাত্র একটি রাজনৈতিক দল থাকবে। এই নতুন দলের নাম দেওয়া হয় বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

মুজিব কলকাতায় এসেছিলেন ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। এখানে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়। ওই বছর মারচ মাসে দুই প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর আগে তিনি মস্কো গিয়েছিলেন; সেখানে তিনি ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন একটি যুক্ত বিবৃতি দেন। মুজিব এদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে এসেছিলেন গত বছর মে মাসে। তখন তাঁর সঙ্গে যে দুজন মন্ত্রী এসেছিলেন তাঁদের একজন বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মুস্তাক আমেদ। এই সফরের সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চিহ্নিত-করণের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বাংলাদেশে ভারতের ১২৫টি ছিট-মহলের সঙ্গে ভারতে বাংলাদেশের ৭৫টি ছিটমহল বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়।

১৮।৮।৭৫

শংকর ঘোষ

বৈদেশিকী

দেবরাজ

চোখের বালি

ভিয়েতনাম থেকে আমেরিকা বিদেয় নিয়েছে ১৯৭৩ সনে প্যারিস চুক্তি সই হবার পর। তারপরও তার ঝড়তিপড়তি যা ছিল তাও গেছে গোটা দক্ষিণ ভিয়েতনাম ভিয়েতকংয়ের দখলে আসার সংগে সংগে। আমেরিকার কোনও দায় দায়িত্ব আর ভিয়েতনামে নেই। তার কাছে ভিয়েতনাম দুনিয়ার আরও পাঁচটা দেশের একটা। তবে পুরোনো ইতিহাসের জের এখনও মেটেনি। দু ভিয়েতনামের কোনওটিকেই আমেরিকা কেতামাফিক স্বীকৃতি দেয়নি। তা ছাড়া ভিয়েতনামকে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে আর্থিক সাহায্য দেবার যে অংগীকার সে করেছে তা পূরণ করার উদ্যোগও শুরু হয়নি। তবে লোকে ধরে নিয়েছিল যে রকম ল্যাজে গোবরে হয়েছে মার্কিনীরা ভিয়েতনামে নাক গলিয়ে তা ভুলতে খানিকটা সময় লাগবে—এ সব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো কিছু করা যায় না। করার চেষ্টা করাও ঠিক নয়।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভিয়েতনাম তাকে যে দাগা দিয়েছে তা আমেরিকা ভুলতে তো পারেইনি—হয়তো কোনও দিনই পারবে না। নইলে দু ভিয়েতনামের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ঢোকার ব্যাপারে এমন বাগড়া দেবে কেন? উত্তর ভিয়েতনাম আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম দুটোই এখন স্বাধীন দেশ—তাদের কাউকেই অন্য কোনও দেশের তাঁবেদার বলা চলে না। একদিন হয়তো দু ভিয়েতনাম এক হয়ে একটা অখণ্ড রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। কবে যে তা হবে তার হদিশ এখনও কেউ জানে না। আপাতত তারা আলাদা হয়েই থাকবে বলে ঠিক করেছে যদিও তাদের মধ্যে দিব্যি মনের আর মতের মিল রয়েছে। তারা একসংগে থাকবে কী আলাদা হয়ে থাকবে সেটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার—তা নিয়ে অপরের মাথা ঘামাবার দরকার নেই—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেরও নয়, নিরাপত্তা পরিষদেরও নয়। তারা দুটো স্বাধীন আর সার্বভৌম দেশ এইটুকুই অপরের কাছে যথেষ্ট।

দুনিয়ার ছোট বড় সব দেশই এই যুক্তি মেনে নিয়েছে। একের পর এক দেশ দু ভিয়েতনামকেই কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমেরিকা বাদে। তা না দিকগে। সেও আমেরিকার নিজের ব্যাপার। কাকে সে বন্ধু বলে মেনে নেবে কাকে নেবে না সেটা ঠিক করার অধিকার তার ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। এ নিয়েও কারু কিছু বলা সাজে না। আর বলছেও না কেউ। এমন কী দু ভিয়েতনামও নয়। তবে তারা ভদ্র ভাষায় বলেছে তাদের আশা পুরোনো রাগ আমেরিকা পুষে রাখবে না—তাদের সংগে সহজ আর স্বাভাবিক সম্পর্ক পাতাবে—তাদের নিজের নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্যে সাহায্যও কিছু দেবে। তারা অবিশ্যি মার্কিন দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী ঠিক নয়—কিন্তু অন্তত উত্তরকে বৈষয়িক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি তো কাগজ-কলমে আমেরিকা দিয়েইছে। সে অংগীকারের কথাই তারা মনে করিয়ে দিয়েছে ওয়াশিংটনকে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে ভিয়েতনামে হারের জ্বালায় আমেরিকা এখনও দগ্ধে মরছে। দুনিয়ার দরবারে ভিয়েতনাম ঠাঁই পায় এ ইচ্ছে তার আদৌ নেই। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ঢুকতে চেয়েছিল উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনাম। কিন্তু তাদের সাধে বাদ সেধেছে আমেরিকা তাদের দরখাস্ত নাকচ করে দিয়ে। সে ক্ষমতা তার আছে। নিয়ম হচ্ছে নতুন কোনও রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হতে চাইলে তার দরখাস্ত বিবেচনা করে দেখে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য কমিটি। সে কমিটিতে থাকে নিরাপত্তা পরিষদের সব সভ্যই। সেখানে দরকার হলে তক্কাতক্কি করে সাব্যস্ত হয় কী করা হবে—দরখাস্ত মঞ্জুর হবে না খারিজ হবে। মঞ্জুর হলে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে। সেখানে পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর ব্যাপারটা যায় সাধারণ পরিষদে। সেখানে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ মেনে নেওয়াই রেওয়াজ।

জাতিপুঞ্জের দেউড়িতে পাহারাদার পাঁচ মহাশক্তি—আমেরিকা, রুশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন আর চীন। এরা একজনও কেউ না বললেই মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে হবে যে কোনও উমেদার দেশকে—তা সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক। তাকে আর সবাই মদত দিলেও একজন পাহারাদারের আপত্তি হলেই তার প্রবেশ নিষেধ। নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে জোড়া বাঁশ দিয়েছে আমেরিকা ১১ আগস্ট। নাকচ করে দিয়েছে উত্তর আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতিপুঞ্জের সদস্য হবার দরখাস্ত। অথচ তা মঞ্জুর করেছিল নিরাপত্তা পরিষদের পনেরোজন সদস্যের মধ্যে ১৩ জনই। একজন ছিল নিরপেক্ষ। কিন্তু তেরোজনের হাঁ না হয়ে গেল জাতিপুঞ্জের সনদের বিধানে আমেরিকা আপত্তি জানাতে। এখন আর কারুর কিছু করার নেই। প্রস্তাবটা অবিশ্যি আবার নিরাপত্তা পরিষদে তোলা যাবে। কিন্তু যতদিন না আমেরিকা মত পালটাচ্ছে ততদিন কিছুই হবে না—দু ভিয়েতনামই থাকবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাইরে।

বোঝা যাচ্ছে আজও ভিয়েতনাম আমেরিকার চোখের বালি। তাদের ওপর রাগ তার যায়নি। আমেরিকা অবিশ্যি বলছে দক্ষিণ কোরিয়ার দরখাস্ত বিবেচনা করে দেখতেও যে নিরাপত্তা পরিষদ রাজী হয়নি তারই প্রতিবাদে সে দু ভিয়েতনামের পথ আটকেছে। কিন্তু এ তো স্রেফ গাজোয়ারি। দক্ষিণ কোরিয়ার জন্যে আমেরিকা লড়তে চায় লড়ুক। কিন্তু তার জন্যে ভিয়েতনামের ওপর ঝাল ঝাড়া কেন? তারা তো আর চক্রান্ত করে দক্ষিণ কোরিয়ার দরখাস্ত নাকচ করায়নি। আসল কথা হচ্ছে তাদের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হবার যোগ্যতা আছে কিনা? আমেরিকা যদি মনে করে নেই তা হলে তাই বলুক। তা কিন্তু আমেরিকা বলছে না, বললে দক্ষিণ কোরিয়ার সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াবে। আক্রোশ তার খুদে ভিয়েতনামের ওপর। তার মতো বিরাট দেশকে নাস্তানাবুদ করে যে চূড়ান্ত অপমান তাকে ভিয়েতনাম করেছে তারই শোধ নিচ্ছে আমেরিকা তাদের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ঢোকা রুখে দিয়ে।

দেশ ও কাল

শেখ মুজিব

বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশেরই সামরিক বাহিনীর লোকের হাতে নিহত হয়েছেন। সামরিক বাহিনী অবশ্য প্রত্যক্ষ-ভাবে নিজের হাতে ক্ষমতা তুলে নেন নি। শেখ সাহেবের মন্ত্রিসভারই অন্যতম প্রবীণ সদস্য খোন্দকার মোস্তাক আমেদের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। নতুন যাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁরাও প্রায় সবই শেখ সাহেবের সরকারে মন্ত্রী ছিলেন।

বাংলাদেশের এই সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদে বিশ্বের অনেকেই চমকিত। সবাই জানতেন, শেখ সাহেব ছিলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদী নেতা। সেই জনপ্রিয় নেতাকে হত্যা করে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করতে পারে, এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। শেখ সাহেবের জনপ্রিয়তা বিশ্বের বহু নেতার ঈর্ষার বস্তু ছিল।

শেখ সাহেব বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে কতটা জনপ্রিয় ছিলেন বাইরের লোকের পক্ষে তা অনুমান করাই কঠিন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে না ঘুরলে তা বোঝাই যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই কঠিন হয়েছে, দ্রব্যমূল্য অভাবনীয়ভাবে বেড়েছে এবং সাধারণ মানুষ এর জন্য সরকারকে গালি-গালাজও দিয়েছেন। কিন্তু শেখের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি।

বাংলাদেশে শেখ সাহেব-বিরোধী কেউ ছিলেন না, তা বলব না। তাঁর দলের ভেতরেও বিরোধীরা ছিলেন, বাইরেও বিরোধীরা ছিলেন। কিন্তু শেখ সাহেবের ভক্তদের তুলনায়, অনুগতদের তুলনায় এদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সাধারণ মানুষ বলতে যাদের বোঝায়—অর্থাৎ যাঁরা বিশিষ্ট নন, অধিকাংশই দিন আনেন দিন খান এবং সরকারী কাজকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন শেখের ভক্ত। শেখের যে কোনও নির্দেশ পালন করতে এঁরা সব সময় প্রস্তুত ছিলেন।

শেখ সাহেব যেভাবে রাষ্ট্র চালাতেন, সেটা অনেকে পছন্দ করতেন না। শেখ সাহেব তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সব অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন বলেও অনেকে অভিযোগ করতেন। অনেকের অভি-যোগ ছিল এই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা প্রশাসনিক কাজকর্মে খুব বেশী হস্তক্ষেপ করেন এবং শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠতার সুযোগে অন্যদের উপর অত্যাচার করেন। শেখ সাহেব সম্প্রতি যে পুরনো টাকা বাতিল করে দিয়েছিলেন, তাতেও অনেকে চটে ছিলেন। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের মধ্যে এবং ধর্মীয় গোঁড়াদের মধ্যে একটা অংশ অবশ্য ছিল যাঁরা শেখ সাহেবের উপর চটে ছিলেন পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসায়—পাকিস্তানকে ভেঙে দেওয়ায়।

শেখ সাহেবের নিজের অবশ্য প্রচন্ড আত্মপ্রত্যয় ছিল। তিনি বিশ্বাসই করতেন না, তাঁকে অবজ্ঞা করে বাংলাদেশে কেউ কিছু করতে পারে। তিনি মনে করতেন, তিনি যে ব্যবস্থাই নেন না কেন, বাংলা-দেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁকে সমর্থন জানাবে।

এই জন্যই তিনি যখন যেমন ভাল মনে করেছেন ব্যবস্থা নিয়েছেন। দলের অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করাও খুব একটা প্রয়োজন মনে করতেন না। স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকারে শেখ সাহেব ছিলেন রাষ্ট্রপতি। তখন তিনি পাকিস্তানের জেলে। মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এসেই শেখ সে ব্যবস্থা পালটে দিলেন। শেখ বললেন : গণতান্ত্রিক শাসনে প্রধানমন্ত্রীই রাজ্য চালান, রাষ্ট্রপতি চালান না। শেখ নির্বাচন করলেন। নির্বাচনে বিরাটভাবে জিতলেনও। কিন্তু প্রশাসনের উন্নতি ঘটাতে পারলেন না। দেশের অর্থনীতি ক্রমেই দুর্বল হতে থাকল। দুর্নীতি প্রচন্ড-ভাবে বাড়ল। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছুঁল। বিরোধী দলগুলির তৎপরতা বাড়ল। শেখ তাঁদের অধিকাংশকে জেলে পুরলেন। ক্রমে সব দল ভেঙে দিয়ে একদল গড়লেন। রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা চালু করলেন। সংবিধানই পালটে দিলেন। সরকার ও দল—দুইয়েরই প্রধান হলেন নিজে।

শেখ মনে করতেন, তিনি যা করবেন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তা সমর্থন করবেই। শেখ ছিলেন এক অদ্ভুত ক্ষমাপ্রবণ মানুষ। যে-কোনও অন্যায় করে কেউ শেখের কাছে এসে পৌঁছাতে পারলে কিছুটা না কিছুটা সাহায্য পেতই। আবার যাঁদের তিনি তাঁর নেতৃত্বের বিরোধী মনে করতেন, মনে করতেন যে, তাঁর নির্দেশ বিনাবাক্যে মানছে না, শেখ তাঁদের ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান তরুণ নায়ক রবকে তিনি যেভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, সেইভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন সাহেবকে।

*

পররাষ্ট্র নীতিতে শেখ সকলের সঙ্গেই মোটামুটি ভাল সম্পর্ক রেখে চলতে চাইতেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আবার কারু সঙ্গেই নয়। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রেখেছিলেন, ভাল সম্পর্ক রেখে-ছিলেন আমেরিকার সঙ্গেও। তিনি ভারতের সঙ্গে মোটামুটি ভাল সম্পর্ক রেখে চলতে চাইতেন। আবার সেই সঙ্গে চীনের সঙ্গেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা সর্বতোভাবে করেছিলেন। জনমতের বৃহৎ অংশের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি সব পাক বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি ভুট্টোকে ঢাকায় স্বাগত জানিয়েছিলেন। পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও করেছিলেন।

মোটামুটি অবাধে তিনি বিদেশীদের বাংলাদেশে থাকতে দিতেন। এর ফলে নানা দেশ থেকে নানা ধরনের লোক এসে হাজির হচ্ছিল বাংলাদেশে। তাঁরা কেউ বাংলাদেশের তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারে বলে শেখ সাহেব বিশ্বাসই করতেন না। শেখ সাহেবের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তিনি যতদিন বেঁচে আছেন, কেউ কোনও ক্ষতি করতে পারবে না বাংলাদেশের।

শেখ মুজিবর রহমান বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দেশকে এবং দেশবাসীকে তিনি প্রচন্ড ভালবাসতেন। দেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতেও তিনি সত্যিই জাতির পিতা ছিলেন।

১৮-৮-৭৫।

সমর রায়

দ্বারবাসিনী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'এত পথ ভেঙে এসে অবশেষে দ্বারপ্রান্তে পাতিলে আসন
মানোনি তো পথের শাসন
কণ্টক-কঙ্কর-ক্লেশ সুতীক্ষ্ণ উপল
ছিন্ন ক'রে এসেছ যে সংসারের দুর্জর শৃঙ্খল
ছেড়েছ তো আর্যপথ শোনোনি তো কোনো ধর্মকথা
সম্বল করেছ শুধু হৃদয়ের উত্তাল বিপুল ব্যাকুলতা
নিরস্ত হওনি কভু পাষাণবর্ষণে
নিন্দনেরে রূপায়িত করেছ চন্দনে
শেষে কিনা গন্তব্যে পৌঁছিয়ে তুমি ব'সে আছ কাঙালের মত
বি-ব্রত বিরত!'
সে দ্বারবাসিনী নারী তৃপ্তমুখে সুধাকণ্ঠে বলে স্বতোৎসারেঃ
'চেন না আমারে?
কাঙালিনী নই আমি, এ বিশ্বের আমি রাজরানী
ভালোবাসা-ঠাকুরানী।'

'তাই যদি, তবে কেন দুয়ার অবধি? ঢুকে পড়ো ঘরে
অন্তঃপুরে—অভ্যন্তরে,
আবেগের স্বীকৃতিরে ধন্য করো আত্মসমর্পণের স্বাক্ষরে।
কেন আর ক্ষান্ত তুমি? দুয়ার কি আছে বন্ধ?' 'না, না, আছে খোলা
যে আমারে করেছে উতলা।
রাখেনি তো কোনোখানে কোনো বন্ধ দ্বার
চার ধার উদার অবার।'
'তবে কেন স্তব্ধ তুমি? ঘরে বুঝি কেউ নেই?'
'না, না, আছে,' বলে নারী ঃ 'প্রতি নিমেষেই
ঘর ভরা।' 'তবে আর কিসের কী কথা?'
'ঘর ভ'রে আছে এক জাগ্রত মহান নীরবতা
আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা।
তাই আমি নিত্য-আনন্দিনী
দুয়ারে বন্দিনী॥'

আধুনিক সাহিত্যের সেরা সম্ভার

শারদীয়
সংখ্যা
১৩৮২

রচনা সমাবেশ ও পরিকল্পনায় এ-বছরের শারদীয় 'দেশ' সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার। এবারের আলাদা আকর্ষণ :

শরৎচন্দ্রের
অপ্রকাশিত বড় গল্প
কোরেল

তাঁর মৃত্যুর পর অতিক্রান্ত হয়েছে চল্লিশটি বছর, কিন্তু আজও অপ্রকাশিত তাঁর প্রথম সাহিত্য-প্রয়াস 'কোরেল'। আমাদের সৌভাগ্য, শরৎ জন্ম-শতবর্ষে আমরাই এটা প্রকাশ করতে পারছি 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায়। প্রায় উপন্যাসের মতোই সুদীর্ঘ এই বড় গল্পের সঙ্গে মুদ্রিত হবে মূল রচনার প্রতিলিপি ও পটভূমি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের একান্ত সুহৃদ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তথ্যপূর্ণ ও বিশদ পরিচিতি-প্রবন্ধ।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

পুরনো দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে অনেক পরিশ্রমের পর এ-যাবৎ অজানা এক নতুন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই সুবৃহৎ মূল্যবান রচনাটি পরিবেশন করেছেন অমিতাভ চৌধুরী। সঙ্গে অসংখ্য ছবি, মানচিত্র এবং অপ্রকাশিত চিঠিপত্র।

৫টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়ের
(রহস্য-রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার)
জয় বাবা ফেলুনাথ

শংকরের
সম্রাট ও সুন্দরী

কালকূটের
তুষার সিংহের পদতলে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
এক জীবনে

বিমল করের
শমীক

এঁরা অন্য কোনো শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখছেন না।

এবং নির্বাচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ফিচার ও রঙীন ছবি। দাম : ১০.০০ ॥ সডাক : ১১.৫০

আপনার কপির জন্যে এখন থেকেই ব'লে রাখুন আপনার কাগজ যিনি দেন তাঁকে, বা, আমাদের লিখুন :

সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১

ভারতের অর্থনীতি

স্বাধীনতার আঠাশ বছর ও আমাদের অর্থনীতি

আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর আঠাশ বছর পার হয়ে গেছে। একটি জাতির জীবনে আঠাশ বছর হয়ত এমন কিছু সময় নয়; কিন্তু, অর্থনৈতিক প্রগতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে বলা যায়, আঠাশ বছরের মধ্যে বহু দেশ এমন অনেক কিছু অর্জন করতে পেরেছে যা আমরা এখনও করতে পারিনি। আবার আমরাও অনেক ক্ষেত্রে এমন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি যা সে-সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ১৯৪৭ সালে দেশের আয়, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মূল্যস্তর প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা খুব কঠিন। যখন ভারত বিভাগ হয় তখনকার আয়, উৎপাদন ও মূল্যস্তরকে ভিত্তি করে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করা হয় না। টাকার মূল্য আজ যে অনেক কমে গেছে তার হিসাবও করা হয়ে থাকে ১৯৬০-৬১ সালের মূল্যের ভিত্তিতে, ১৯৪৭-৪৮ সালের মূল্যের ভিত্তিতে নয়। ১৯৪৭-৪৮ সালের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে না পারলেও তখন থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে অসুবিধা কিছু নেই। স্বাধীনতার পর থেকে যে সমস্যাটির গুরুত্ব ও তীব্রতা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে তা হল বেকার সমস্যা। বলাতে দ্বিধা নেই, বেকার সমস্যার মূল কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পরিকল্পনা কাঠামোর ত্রুটি-বিচ্যুতি এজন্য কতকাংশে দায়ী। আজ যাঁরা কর্মক্ষম অথচ কাজের সুযোগ যাঁরা পাচ্ছেন না, তাঁদের মধ্যে ১৪ থেকে ২৮-এর মধ্যবর্তী বয়সের লোকেরা সবাই দেশ স্বাধীন হবার পর জন্মগ্রহণ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা হত এবং বেকার সমস্যার মোকাবিলা আগামী পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে কিভাবে করা হবে সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী কার্যকর হত, তবে বেকার সমস্যার তীব্রতা আজ হয়ত এতটা বেশী হত না। প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের গোড়া থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল এবং তৃতীয় পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাবার পর তার প্রভাব কিছু কিছু পরিলক্ষিত হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে জনসংখ্যানীতির সুষ্ঠু রূপায়ণ আমরা দেখতে পাইনি অথচ ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর গড়ে ২·১ শতাংশ হারে লোকসংখ্যা বেড়েছিল। দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনায় কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করা অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে গৃহীত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে একটি কর্মসংস্থাননীতিও তৈরি করা হয়। এ-কথা ভুললে চলবে না যে, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জন্য যা যা ব্যবস্থা এ পর্যন্ত গৃহীত হয়েছে তা কোনটি-ই প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত নয়।

শিল্পোৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনায় কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। দেশের গুরুভার ও মৌলিক শিল্পের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ছিল দ্বিতীয় পাঁচসালা যোজনার উন্নয়ন-কৌশলের প্রধান অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় যোজনায় আমরা শিল্পোৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখতে পেয়েছিলাম। তখন সরকারী উদ্যোগে তিনটি ইস্পাত প্রকল্প ও বহু কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল। তবে দ্বিতীয় যোজনায় আমরা দেখতে পেয়েছিলাম নিদারুণ বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রার সংকট; তাছাড়া ছিল খাদ্যসমস্যা। ১৯৫৮ সালের পর খাদ্যসংকট তীব্রতর হয়। প্রথম পাঁচসালা যোজনায় অবশ্য খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং সামগ্রিকভাবে কৃষি-উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। তখন যোজনা কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন যে, দ্বিতীয় যোজনাকালে খাদ্যসংকট তত তীব্র হবে না। প্রকৃতপক্ষে এ-কথাই পরবর্তীকালে পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রথম পাঁচসালা যোজনায় কৃষি-উৎপাদন বাড়লেও আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যতটা কৃষি-উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল, নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা তার চেয়ে কম ছিল। দ্বিতীয় যোজনায় যখন গুরুভার শিল্প ও মৌলিক শিল্পের উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। তৃতীয় পাঁচসালা যোজনায় কৃষি ও শিল্প উভয়ের উপর যুগপৎ গুরুত্ব আরোপ করা হলেও ১৯৬৪ সাল থেকে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে খাদ্যসংকট তীব্রতর হয়।

এক্ষেত্রে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে, ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে, অর্থাৎ তৃতীয় পাঁচসালা যোজনাকালে দুইবার ভারতকে বিদেশী আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছে, এবং দেশের অর্থনীতির উপর তার প্রভাব হয়েছে মারাত্মক। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে খাদ্যসংকট এমন মোড় নেয় যে সরকারকে চতুর্থ যোজনা তৈরি করতে হিমসিম খেতে হয়। শ্রীঅশোক মেটা যখন যোজনা কমিশনের সহ-সভাপতি হলেন তখন চতুর্থ পাঁচসালা যোজনার যে খসড়া তৈরি হয় তা মোটেই বাস্তবসম্মত ছিল না। পরে অধ্যাপক গ্যাডগিলের সহ-সভাপতিত্বে যোজনা কমিশনের পুনর্গঠন হয় এবং চতুর্থ পাঁচসালা যোজনা তৈরি হয়। এভাবে চতুর্থ যোজনা রূপায়িত হতে তিন বছর দেরি হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যে বাৎসরিক যোজনাগুলি তৈরি হয়েছিল, সেগুলিতে কৃষি-উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। নতুন কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতি দেশের কৃষি-বুনিয়াদকে সুগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সরকার ভূমি-সংস্কার, জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, জমিতে সার প্রয়োগ এবং উন্নত ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করার যে বলিষ্ঠ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তা আরও আগে গৃহীত হলে এতদিনে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য রূপান্তর হত।

বিগত আঠাশ বছরে দেশে যতটা অর্থনৈতিক অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল ততটা না হলেও নিরাশ হবার মত কিছু ঘটেনি। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে সরকার যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার কিছু সুফল দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি এখন কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রভৃতি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলির সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। পঞ্চম পাঁচসালা যোজনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তার অঙ্গ হিসাবে কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন, গরীব কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ ঋণের বোঝা কমানো, ভূমিসংস্কার, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের জরুরী কর্মসূচী, ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিসের বণ্টন, কালোবাজারি ও চোরাকারবার দমন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর একুশ দফা কর্মসূচীর উল্লেখ করা যেতে পারে। সরকার যে-সব উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন সেগুলি যাতে ঠিকভাবে কার্যকর হয় তার ব্যবস্থা করা এখন সবচেয়ে জরুরী।

সুব্রত গুহ

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ৯৩ ॥

ওঁ

বার্লিন
মেন্ডেলদের বাড়ি

কল্যাণীয়েষু,

প্রশান্ত, মস্কো থেকে তোমাকে একটা বড়ো চিঠিতে রাশিয়া সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখেছিলুম সেটা অমিয় ভ্রম-ক্রমে সেখান থেকে রেজিস্ট্রিডাকে পাঠিয়ে দিয়েচে। আমি তাকে কপি করতে দিয়েছিলুম, সে ভেবেছিল ডাকে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে চিঠি যদি পাও তবে কিছু খবর পাবে। আমার ইচ্ছে, এই চিঠিগুলি (তোমার এবং রাণীর) কপি করে আশ্রমে পাঠিয়ে দাও।

তপতীর যে কপি থেকে অভিনয় হয়েছিল আশা করি সেটা কারো না কারো কাছে আছে। অমিতা[১] কিম্বা দিনুর কাছে খোঁজ করে দেখো। একটা প্রেস কপি তৈরি করে অমিয়র হাতে দিয়েছিলুম সেটা এখন পাওয়া শক্ত হবে। মহুয়ার সংশোধনগুলি অনেকের বইয়েতেই আছে, অপূর্বর বইয়ে পাবে—মনে আছে বুলার কপিতেও ঠিক করে দিয়েছিলুম। লিখেচ মহুয়া আমাকে পাঠাচ্চ—কিন্তু আমি তো দুচার দিনের মধ্যেই আমেরিকায় পাড়ি দিচ্চি। বই পেতে দেরি হবে।

এখানে চাষীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে কতটা কাজ করা হচ্চে তারই বিবরণ রাণীকে কিছু দিয়েচি। আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক, মূঢ়, জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাদের মন অন্তর বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা পড়ে গেছে এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল তখন বুঝতে পারলুম সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে—কি অসীম তার অপব্যয়, কি নিষ্ঠুর তার অবিচার।

মস্কোতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম। এটা ওদের ক্লাবের মত। রাশিয়ার সমস্ত ছোটো বড়ো সহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এসব জায়গায় কৃষিবিদ্যা সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যাপার কৃষাণদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম প্রত্যেক বাড়িতে প্রাকৃতিক সামাজিক সকল প্রকার শিক্ষণীয় বিষয়ের ম্যুজিয়ম, তাছাড়া চাষীদের সকলপ্রকার প্রয়োজনের উপযোগী পরামর্শ দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়েচে।

চাষীরা কোনো উপলক্ষে গ্রাম থেকে যখন সহরে আসে তখন খুব কম খরচে অন্তত তিন সপ্তাহ এইরকম বাড়িতে থাকতে পারে। এই বহু ব্যাপক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সোভিয়েট গবর্মেণ্ট এককালের নিরক্ষর চাষীদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে সমাজব্যাপী নবজীবন প্রতিষ্ঠার প্রশস্ততম ভিত্তিস্থাপন করেচে।

বাড়িতে ঢুকে দেখি খাবার ঘরে কেউ কেউ বসে খাচ্চে, পড়বার ঘরে একদল খবরের কাগজ পড়তে প্রবৃত্ত। উপরে একটা বড়ো ঘরে আমি এসে বসলুম—সেখানে সবাই এসে জমা হল। তারা নানা স্থানের লোক, কেউ বা অনেক দূর প্রদেশ থেকে এসেচে। বেশ সহজ ওদের ভাবগতিক, কোনো রকম সঙ্কোচ নেই।

প্রথম অভ্যর্থনা ও পরিচয় উপলক্ষে বাড়ির পরিদর্শক কিছু বললে আমিও কিছু বললুম। তার পরে ওরা আমাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে।

প্রথমেই ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হয় কেন?

উত্তর দিলুম, 'যখন আমার বয়স অল্প ছিল কখনো এরকম বর্বরতা দেখিনি। তখন গ্রামে এবং সহরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না। পরস্পরের ক্রিয়াকাণ্ডে পরস্পরের যোগ ছিল, জীবনযাত্রায় সুখে দুঃখে তারা ছিল এক। এসব কুৎসিত কাণ্ড দেখতে পাচ্চি যখন থেকে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশীদের মধ্যে এইরকম অমানুষিক দুর্ব্যবহারের আশু কারণ যাই থাক এর মূল কারণ হচ্চে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা। কিন্তু যে-পরিমাণ শিক্ষার দ্বারা এইরকম দুর্বুদ্ধি দূর হয় আমাদের দেশে বিস্তৃতভাবে তার প্রচলন করা আজ পর্যন্ত হয়নি। যা তোমাদের দেশে দেখলুম এতে আমি বিস্মিত হয়েছি।'

প্রশ্ন। তুমি তো লেখক, তোমাদের চাষীদের কথা কিছু কি লিখেচ? ভবিষ্যতে তাদের কি গতি হবে?

উত্তর। শুধু লেখা কেন তাদের জন্যে আমি কাজ ফেঁদেচি। আমার একলার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তাদের শিক্ষার কাজ চালাই, পল্লীর উন্নতি সাধনে তাদের সাহায্য করি। কিন্তু তোমাদের এখানে যে প্রকাণ্ড শিক্ষাব্যাপার যে আশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হয়েচে তার তুলনায় আমার এ উদ্যোগ অতি যৎসামান্য।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রের একত্রীকরণের যে চেষ্টা চলচে সে সম্বন্ধে তোমার মত কি?

উত্তর। মত দেবার মতো আমার অভিজ্ঞতা হয়নি, মত তোমাদেরই কাছ থেকে শুনতে চাই। আমার জানবার কথা এই যে এতে তোমাদের ইচ্ছার উপরে জবরদস্তি করা হচ্চে কিনা?

প্রশ্ন। ভারতবর্ষে সবাই কি এই ঐকত্রিকতা এবং সাধারণভাবে এখানকার অন্য সমস্ত উদ্যোগের কথা কিছু জানে না?

উত্তর। জানবার মতো শিক্ষা অতি অল্প লোকেরই আছে। তাছাড়া তোমাদের খবর নানা কারণে চাপা পড়ে যায়। এবং যা কিছু শোনা যায় তাও সব বিশ্বাসযোগ্য নয়।

প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই যে চাষীদের জন্য আবাস ব্যবস্থা হয়েছে এর অস্তিত্বও কি তুমি আগে জানতে না?

উত্তর। তোমাদের কল্যাণের জন্যে কি করা হচ্চে

---

১ অজিত চক্রবর্তীর কন্যা এবং অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী অমিতা ঠাকুর।

মস্কোয়ে এসে তা প্রথম দেখলুম এবং জানলুম। যাই হোক, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর তোমরা দাও। চাষী প্রজার পক্ষে এই ঐকত্রিকতার ফলাফল সম্বন্ধে তোমাদের মত কি, তোমাদের ইচ্ছা কি? একজন যুবক চাষী, ইউক্রেন প্রদেশ থেকে এসেচে, সে বলল, "দুবছর হল একটি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে আমি তাতে কাজ করি। এই ক্ষেত্রের মধ্যে ফল ফসলের বাগান আছে তার থেকে আমরা সবজির জোগান দিই সব কারখানা ঘরে। সেখানে সেগুলো টিনের কোটোয় মোড়াই হয়। এছাড়া বড়ো বড়ো ক্ষেত আছে সেখানে গমের চাষ। আট ঘণ্টা করে আমাদের খাটুনি, প্রত্যেক পঞ্চম দিনে আমাদের ছুটি। আমাদের প্রতি-বেশী যে সব চাষী নিজের ক্ষেত নিজে চষে, তাদের চেয়ে আমাদের এখানে অন্তত দুনো ফসল উৎপন্ন হয়। প্রায় গোড়াতেই আমাদের এই ঐকত্রিক চাষে দেড়শো চাষীর ক্ষেত মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৯ সালে অর্ধেক চাষী তাদের ক্ষেত ফিরিয়ে নিলে। তার কারণ সোভিয়েট কম্যুনিস্ট দলের প্রধানমন্ত্রী স্টালিনের উপদেশ আমাদের কর্মচারীরা ঠিক মতো ব্যবহার করেনি। তাঁর মতে ঐকত্রিকতার মূল নীতি হচ্চে সমাজবদ্ধ স্বেচ্ছাকৃত যোগ। কিন্তু অনেক জায়গায় আমলারা এই কথাটা মনে না রাখাতেই গোড়ার দিকে অনেক চাষী ঐকত্রিক কৃষিসমন্বয় ছেড়ে দিয়েছিল। তার পরে ক্রমে তাদের মধ্যেকার সিকির ভাগ লোক আবার ফিরে এসেচে। এখন আগেকার চেয়ে আরো আমরা বল পেয়েছি। আমাদের দলের লোকের জন্যে নতুন সব বাসা, একটা নতুন সাধারণ ভোজনশালা, আর একটা ইস্কুলে তৈরি আরম্ভ হয়েচে।"

তার পরে সাইবীরিয়ার একজন চাষী স্ত্রীলোক বললে, "সমবেত ক্ষেতের কাজে আমি প্রায় দশ বছর আছি। একটা কথা মনে রেখো ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের (collective farm) সঙ্গে নারী-উন্নতি চেষ্টার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আজ দশ বছরের মধ্যে এখানে চাষীর মেয়েদের বদল হয়েছে যথেষ্ট। নিজের উপর তাদের অনেক বেশি ভরসা হয়েচে। যে সব মেয়ে পিছিয়ে আছে, ঐকত্রিক চাষের যারা প্রধান বাধা এরাই তাদের মন গড়ে তুলচে। আমরা মেয়ে ঐকত্রিকরা দল তৈরি করেছি তারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়ায় মেয়েদের মধ্যে কাজ করে, চিত্তের এবং অর্থের উন্নতি সাধনে ঐকত্রিকতার সুযোগ কত তা ওদের বুঝিয়ে দেয়। ঐকত্রিক দলের চাষী মেয়েদের জীবনযাত্রা সহজ করে দেবার জন্যে প্রত্যেক ঐকত্রিক ক্ষেত্রে একটি করে শিশু পালনাবাস, শিশু বিদ্যালয় আর সাধারণ পাকশালা স্থাপিত হয়েচে।"

সুখোজ প্রদেশে জাইগাণ্ট নামে একটি সুবিখ্যাত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে সেইখানকার একজন চাষী রাশিয়ায় ঐকত্রিকতার কিরকম বিস্তার হচ্চে সেই সম্বন্ধে আমাকে বললে: "আমাদের এই ক্ষেতে জমির পরিমাণ এক লক্ষ হেকটার (hectares) গত বছরে সেখানে তিন হাজার চাষী কাজ করত। এবছর সংখ্যা কিছু কমে গেছে কিন্তু ফসলের ফলন আগেকার চেয়ে বাড়বার কথা। কেননা জমিতে বিজ্ঞান-সম্মত সার দেবার এবং কলের লাঙল ব্যবহার করবার ব্যবস্থা হয়েচে। এইরকম লাঙল এখন আমাদের তিনশোর বেশি আছে। প্রতিদিন আমাদের আট ঘণ্টা কাজ করবার মেয়াদ। যারা তার বেশি কাজ করে তারা উপরি পারিশ্রমিক পায়। শীতের সময় ক্ষেতের কাজের পরিমাণ কমে, তখন চাষীরা বাড়ি তৈরি রাস্তা মেরামত প্রভৃতি নানা কাজে সহরে চলে যায়। এই অনুপস্থিতির সময়েও তারা বেতনের এক তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে আর তাদের পরিবারের লোক তাদের নির্দিষ্ট ঘরে বাস করতে পায়।"

আমি বলুলেম, "ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আপন স্বতন্ত্র সম্পত্তি মিলিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে তোমাদের আপত্তি কিম্বা সম্মতি যদি থাকে আমাকে স্পষ্ট করে বলো।"

পরিদর্শক প্রস্তাব করলে হাত তুলে মত জানানো হোক। দেখা গেল যাদের সম্মতি নেই এমন লোকও অনেকে আছে। অসম্মতির কারণ তাদের বলতে বললুম—ভালো করে বলতে পারলে না। একজন বললে, আমি ভালো বুঝতে পারিনে। বেশ বোঝা গেল অসম্মতির কারণ মানব চরিত্রের মধ্যে। নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা, ওটা তর্কের বিষয় নয়, ওটা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়। তার চেয়ে বড়ো উপায় যাদের হাতে আছে তারা সম্পত্তিকে গ্রাহ্য করে না, সমস্ত খুইয়ে দিতে তাদের বাধা নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তি-রূপের ভাষা—সেটা হারালে সে যেন বোবা হয়ে যায়। সম্পত্তি যদি কেবলমাত্র আপন জীবিকার জন্যে হোত আত্মপ্রকাশের জন্যে না হোত তা হলে যুক্তি দ্বারা বোঝানো সহজ হোত যে ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে। আত্ম-প্রকাশের উচ্চতন উপায়, যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণপনা, কেউ কারো কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে পারে না, সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া চলে, ফাঁকি দেওয়া চলে, সেই কারণেই সম্পত্তি বিভাগ ও ভোগ নিয়ে সমাজে এত নিষ্ঠুরতা এত ছলনা এত অন্তহীন বিরোধ। এর একটা মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে মনে করিনে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্ব-সাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। তা হলেই সম্পত্তির মমত্ব লুব্ধতার প্রতারণায় বা নিষ্ঠুরতায় গিয়ে পৌঁছয় না। সোভিয়েটরা এই সমস্যাকে সমাধান করতে গিয়ে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েচে। সে জন্যে জবরদস্তির সীমা নেই। একথা বলা চলে না যে, মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য থাকবে না কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজস্ব না হলে নয় কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই। আত্ম এবং পর উভয়কেই স্বীকার করে তবেই তার সমাধান সম্ভব। কোনো একটাকে বাদ দিতে গেলেই মানবচরিত্রের সত্যের সঙ্গে লড়াই বেধে যায়। পশ্চিম মহাদেশের মানুষ জোর জিনিসটাকে অত্যন্ত বেশি বিশ্বাস করে—যে ক্ষেত্রে জোরের যথার্থ কাজ আছে সে ক্ষেত্রে সে খুবই ভালো কিন্তু অন্যত্র সে বিপদ ঘটায়। সত্যের জোরকে গায়ের জোরের দ্বারা যত প্রবলভাবেই আমরা মেলাতে চেষ্টা করি একদা তত প্রবলভাবেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।

মধ্য এসিয়ার বাস্কির রিপাব্লিকের (Bashkir Republic) একজন চাষী বললে, "আজও আমার নিজের স্বতন্ত্র ক্ষেত আছে। কিন্তু নিকটবর্তী ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রে আমি শীঘ্রই যোগ দেব। কেননা দেখেচি স্বাতন্ত্রিক প্রণালীর চেয়ে ঐক-ত্রিক প্রণালীতে ঢের ভালো জাতের এবং অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করানো যায়। যেহেতু প্রকৃষ্টভাবে চাষ করতে গেলেই যন্ত্র চাই—ছোট ক্ষেত্রের মালিকের পক্ষে যন্ত্র কেনা চলে না। তাছাড়া, আমাদের টুকরো জমিতে যন্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব।"

আমি বললুম, "কাল একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম-চারীর সঙ্গে আলাপ হোলো। তিনি বললেন, মেয়েদের এবং শিশুদের সর্বপ্রকার সুযোগের জন্যে সোভিয়েট গবর্মেণ্টের দ্বারা যেরকম সব ব্যবস্থা হয়েচে এমন আর কোথাও হয়নি। আমি তাঁকে বললুম তোমরা পারিবারিক দায়িত্বকে সরকারী দায়িত্ব করে তুলে হয়তো পরিবারের সীমালোপ করে দিতে চাও। তিনি বললেন সেটাই যে আমাদের আশু সঙ্কল্প তা

নয়—কিন্তু শিশুদের প্রতি দায়িত্বকে ব্যাপক করে দিয়ে যদি স্বভাবতই একদা পরিবারের গণ্ডী লোপ পায় তাহলে এই প্রমাণ হবে সমাজে পারিবারিক যুগ আপন সঙ্কীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতাবশতই নবযুগের প্রসারতার মধ্যে আপনিই অন্তর্ধান করেছে। যা হোক, এসম্বন্ধে তোমাদের কি মত জানতে ইচ্ছে করি। তোমরা কি মনে করো যে তোমাদের একত্রীকরণের নীতি বজায় রেখে পরিবার বজায় থাকতে পারে?"

সেই যুক্রেনিয়ায় যুবকটি বললে, "আমাদের নূতন সমাজ ব্যবস্থা পারিবারিকতার উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করেছে আমার নিজের দিক থেকে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার পিতা যখন বেঁচে ছিলেন শীতের ছয় মাস তিনি সহরে কাজ করতেন আর গরমের ছয় মাস ভাই-বোনদের নিয়ে আমি ধনীর চাকরি নিয়ে পশুচারণ করতে যেতুম। বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা প্রায়ই হত না। এখন এরকম বিচ্ছেদ ঘটে না। শিশু বিদ্যালয় থেকে আমার ছেলে রোজ ফিরে আসে, রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়।"

একজন চাষী মেয়ে বললে, শিশুদের দেখাশোনা ও শেখানোর স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়াতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি ঢের কমে গেছে। তাছাড়া ছেলেদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যে কতখানি সেটা বাপ মা ভালো করে শিখতে পারচে।

একটি ককেসীয় যুবতী দোভাষীকে বললে, "কবিকে বলো, আমরা ককেসীয় রিপাব্লিকের লোকেরা বিশেষ করেই অনুভব করি যে অক্টোবরের বিপ্লবের পর থেকে আমরা যথার্থ স্বাধীনতা এবং সুখ পেয়েছি। আমরা নতুন যুগ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত, তার কঠিন দায়িত্ব খুবই বুঝি, তার জন্যে চূড়ান্ত রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা রাজি। কবিকে জানাও সোভিয়েট সম্মিলনের বিচিত্র জাতির লোক তাঁর মারফৎ ভারতবাসীদের পরে তাদের আন্তরিক দরদ জানাতে চায়। আমি বলতে পারি যদি সম্ভব হত আমার ঘর দুয়োর আমার ছেলে পুলে সবাইকে ছেড়ে তাঁর স্বদেশীয়ের সাহায্য করতে যেতুম।"

দলের মধ্যে একজন ছিল তার মঙ্গোলীয় ছাঁদের মুখ। তার কথা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব পেলুম, "সে খিরগিজ জাতীয় চাষীর ছেলে। সে মস্কো এসেছে কলে কাপড় বোনার বিদ্যা শিখতে। তিন বছর বাদে সে এঞ্জিনিয়র হয়ে তাদের রিপাব্লিকে ফিরে যাবে,—বিপ্লবের পরে সেখানে একটা বড়ো কারখানা স্থাপিত হয়েচে সেইখানে সে কাজ করবে।"

একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক কল-কারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্য এত অবাধ উৎসাহ ও সুযোগ পেয়েছে তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশে ব্যবহার করা হয় না। যত লোকেই শিক্ষা করুক তাতে সকল লোকেরই উপকার, কেবল ধনী লোকের নয়। আমরা আমাদের লোভের জন্যে যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামীর জন্যে শাস্তি দিই তালগাছকে। মাস্টার মশায় যেমন নিজের অক্ষমতার জন্যে বেঞ্চির উপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন ছাত্রকে।

সেদিন মস্কো কৃষি-আবাসে গিয়ে স্পষ্ট করে স্বচক্ষে দেখতে পেলুম দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার চাষীরা ভারত-বর্ষের চাষীদের কত বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে। কেবল বই পড়তে শেখে নি, ওদের মন গেছে বদলে, ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে। শুধু শিক্ষার কথা বললে সব কথা বলা হোলো না, চাষের উন্নতির জন্যে সমস্ত দেশ জুড়ে যে প্রভূত উদ্যম সেও অসাধারণ। ভারতবর্ষেরই মতো এদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, এই জন্যে কৃষিবিদ্যাকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে দিতে না পারলে দেশের মানুষকে বাঁচানো যায় না। এরা সে কথা ভোলেনি। এরা অতি দুঃসাধ্য সাধন করতে প্রবৃত্ত।

সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনের আপিস চালাবার কাজ করচে না। যারা যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চা বিভাগের যে উন্নতি ঘটেচে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে। যুদ্ধের পূর্বে এদেশে বীজ-বাছাইয়ের কোনো চেষ্টাই ছিল না, আজ প্রায় তিন কোটি মণ বাছাই-করা বীজ এদের হাতে জমেচে। তাছাড়া নতুন শস্যের প্রচলন শুধু এদের কৃষি কলেজের প্রাঙ্গণে নয় দ্রুতবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্চে। কৃষি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা আজর-বাইজান, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া, যুক্রেন্ প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশেও স্থাপিত হয়েছে। রাশিয়ার সমস্ত দেশ প্রদেশকে জাতি উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোল-বার জন্যে এত বড় সর্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্যন্ত করে তোলা যে সম্ভব এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারিনি। কেননা শিশুকাল থেকে আমরা যে law and order এর আবহাওয়ায় মানুষ সেখানে, এর কাছে পৌঁছতে পারে, এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি। এবার ইংলণ্ডে থাকতে একজন ইংরেজের কাছে প্রথম শুনেছিলুম সাধারণের কল্যাণের জন্যে এরা কিরকম অসাধারণ আয়োজন করেচে। চোখে দেখলুম—এও দেখতে পেলুম, এদের রাষ্ট্রে জাতিবর্ণ বিচার একটুও নেই। সোভিয়েট শাসনের অন্ত-র্গত বর্বরপ্রায় প্রজার মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে এরা যে প্রকৃষ্ট প্রণালীর ব্যবস্থা করেচে ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্লভ। অথচ এই অশিক্ষার অনিবার্য ফলে আমাদের বুদ্ধিতে চরিত্রে যে দুর্বলতা, ব্যবহারে যে মূঢ়তা দেশ বিদেশের কাছে তার রটনা চলচে। ইংরেজিতেই কথা চলিত আছে, যে-কুকুরকে ফাঁসি দিতে হবে তাকে বদনাম দিলে কাজ সহজ হয়,—যাতে বদনামটা কোনোদিন না ঘোচে তার উপায় করলে যাবজ্জীবন মেয়াদ ও ফাঁসি দুইই মিলিয়ে নেওয়া চলে। ইতি ১ অক্টোবর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৪ ॥

30 Mansfield Street
New Haven
Connecticut

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

বিছানায় পড়ে আছি। ডাক্তারের হুকুম এইরকম পড়েই থাকতে হবে যতদিন এদশে আমার ভোগ। তাড়াতাড়ি একটা জাহাজ নিয়ে দেশে ফেরবার খুবই ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ফিরব কোন দেশে? সেই দেশই তো আমাকে ঘরছাড়া করে এই জীর্ণ শরীর নিয়ে পরের দ্বারে ভিক্ষে করতে পাঠিয়েচে। সঙ্গ নেই সহায়তা নেই, বিচার বিতর্ক বিদ্রূপ বাধা নিন্দা সন্দেহ—দূর হোক গে ছাই। এখানে অন্তত শ্রদ্ধা করে এবং নিজেদের অত্যন্ত কাজের ভিড়ের মধ্যেও সহায়তা করবার আয়োজন করে। তাই শুয়ে শুয়ে মনে মনে ভাবি

বিদেশে দিবের বা
জীবনভার যদি থাকে,

খসুক গে। কিন্তু "রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে" একথা একেবারেই না। দরকার নেই। স্মরণ সভার

চৌকিটেবিল ভাড়া করবার জন্যে কেউ যেন চাঁদার খাতা নিয়ে বেরয় না। আমার স্মৃতি বক্তার কণ্ঠে ঘোষণা করবার দরকার হবে না। আমি যা পারি নিজেই ব্যবস্থা করে যাব। অবিলম্বে চলে যাবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু কিছু সংগ্রহ করে না গেলে তোমরা আমাকে বলবে কি—তোমাদের সভাসমিতি ভোট রেজোল্যুশন চলবে কিসের জোরে। ডাক্তার বলে আমি নিজেকে মারচি—কিন্তু এর চেয়েও আমাকে মারবে যদি স্বদেশে নিঃসহায়তার মরুপথে আবার আমাকে বিনা পাথেয় চলতে হয়। তাই যাত্রা পিছিয়ে দিলুম—মেঘ করচে বৃষ্টি হচ্চে অন্ধকার করেচে, গাছের পাতা ঝরে পড়চে, কুয়াসা এবং বরফ পড়ার দিন এগিয়ে আসচে অনাত্মীয়দের আত্মীয়তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে রইলুম পড়ে। তারপরে জীবতারা যদি খসে খসুকগে। ইতি ২৭ অক্টোবর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

(ক্রমশ)

শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালা দেবী

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

॥ ৬ ॥

কি রকম অবস্থায় পড়ে কিভাবে হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রের যোগাযোগ করতে দুঃসাহসী হয়েছিলেন, সে কথা আগে বলা হয়েছে। একটি পীড়িত আত্মার বেদনা, কবির সংবেদনশীল হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। "আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়—আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে......মানুষের মধ্যে যে দেবতা ক্ষুধিত, তৃষিত, রোগার্ত, শোকাতুর" (১৯ নং চিঠি) —এই ছিল যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, তিনি একটি শোকাতুর তৃষিত নারীর আবেদনে সাড়া না দিয়ে থাকবেন কি করে, হোক না সে অজানা, অচেনা। তার উপরে যখন দেখলেন যে, সেই নারী আবার 'জাত-লেখিয়ে'ও বটে, তখন তাঁর সঙ্গে পত্র চলাচলের প্রেরণাতে যোগ দিল এক স্বাভাবিক আনন্দ।

হেমন্তবালা দেবী দীক্ষামন্ত্র নিয়ে ইষ্টদেবতার আশ্রয়ে গুরুনির্দেশিত সাধন-ভজনের পথে অধ্যাত্মবোধের নিবিড় রসোপলব্ধিতে এক নূতন জীবনের অধ্যায়ে প্রবেশ করেছেন, এমন সময় সেখান থেকে তাঁকে ছিনিয়ে এনে সংসারজীবনে পুনরায় বন্দী করা হল। এই মর্মপীড়ায় তিনি কাতর ছিলেন, তদুপরি তাঁর উপাস্য গুরুঠাকুর, যাঁকে তিনি ধ্রুবতারার মত আঁকড়ে ধরেছিলেন, যিনি ছিলেন তাঁর জীবনের আলো, দেবোপম গুরুজ্ঞানে যাঁর কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন, তাঁর আকস্মিক তিরোভাবে হাহাকারে আচ্ছন্ন হল তাঁর মনপ্রাণ। সংসারের নানা বিরোধ সংঘাতে দিশাহারা হয়ে শরণ নিলেন রবীন্দ্রনাথের। এই ঋষিকল্প জ্ঞানতপস্বী মহাপুরুষ অন্তর্যামীর মত তাঁর অন্তর-বেদনার স্বরূপ যে বুঝলেন শুধু তাই নয়, সহানুভূতির সঙ্গে তাঁকে সান্ত্বনা এবং অভয়বাণীও শোনালেন। আশার আলোক পেয়ে হেমন্তবালা দেবীর নির্জিত প্রাণ-শক্তির উদ্বোধন হল নূতনভাবে। তাঁর অন্তরাত্মা আশ্রয় খুঁজল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

সংক্ষেপে এই হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর যোগাযোগের গোড়াকার মূল কথা। এবার রবীন্দ্রনাথের পত্রধারার অনুসরণ করা যেতে পারে।

আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সর্বান্তঃ-করণে। কিন্তু একটা বিষয়ে প্রথম থেকেই, এখন হেমন্তবালা দেবীর পরিচয় অজ্ঞাত তখন থেকেই, তিনি সতর্ক করে দিয়ে-ছিলেন হেমন্তবালা দেবীকে। গুরুবাদের দেশে অনেক সময়ই দেখা যায়, গুরুর উপরে সব বরাত দিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মচেষ্টা থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি উপভোগ করে বরং গুরুর আদেশকে নির্বিচারে মেনে চলাকেই ধর্মাচরণের আদর্শ বলে মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন, তেমন গুরু তিনি নন।

"আমি কাউকে কখনো আদেশ করিনে, তার কারণ আমি গুরু নই, কবি।" (৫নং) "আমাকে কোনো অংশেই গুরু বলে গণ্য করলে ভুল করা হবে।...মত নিয়ে যারা জবরদস্তি করে আমি সে জাতের মানুষ নই।" (৬ নং) "গুরু যাঁরা তাঁরা স্বভাব-সিদ্ধ গুরু,—আর গুরুমশায় সেই, যে চোখ রাঙিয়ে টিকি চড়ে গুরুগিরি করে। আমি উক্ত দুই জাতেরই বার।" (৭নং)।

এই চিঠিগুলি তিনি লিখেছিলেন হেমন্তবালা দেবীর পরিচয় জানার আগেই। তাঁর একতরফা চিঠিই এখানে আমাদের সম্বল, তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, হেমন্তবালা দেবীর প্রতি 'গভীর স্নেহ এবং করুণা' তাঁর পত্রধারাতে পরিস্ফুট, কিন্তু মিথ্যা স্তোকবাক্য বলে তিনি কখনো ফাঁকা সান্ত্বনা দেওয়ার ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেননি, বরং যত দুঃখকরই হোক অমোঘ সত্যকে তিনি এই বেদনাক্লিষ্ট মহিলার সামনে তুলে ধরতে ইতস্তত করেননি। মনে হয়, হেমন্তবালা দেবী

রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে মুগ্ধ হয়ে এই মহাপুরুষের ভিতরেই তাঁর লোকোত্তর গুরুকে আরোপ করে শান্তিলাভের পথ খুঁজছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু 'আদেশ' পেলে তিনি যেন বেঁচে যান, এই ছিল তাঁর মনের অবস্থা। তার জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"অন্তরে তুমি যাকে গ্রহণ করেচ তাঁরি ভাবরূপ যদি আমার মধ্যে কল্পিত করে থাকো তবে কিছুতেই ক্ষতি হবে না।" (২৭ নং চিঠি) কিন্তু 'গুরু'র পদ স্বীকার করে 'আদেশ' দিতে তিনি অক্ষম, একথা বার বার দৃঢ়ভাবে তিনি বলে গেছেন। "আমাকে তোমার গুরু ব'লে গণ্য কোরো না, আপনার জন বলেই জেনো।" (৩১ নং) "গুরুর পদ আমার নয়, সে আমি নিশ্চিত জানি। আমি অনুভব করি, আমি কথা কই এইটেই আমার স্বধর্ম। তোমার চিঠিতে আমি কথা কয়ে গেছি সেটা শুনিয়েছে অনুশাসনের মতো। কিন্তু প্রকাশ করা যদিও আমার স্বভাব-সঙ্গত, প্রচার করা একেবারেই নয় (৩২ নং)। "বার বার বলেচি গুরুর পদ আমার নয়। আমি কবি" (৯৯ নং)

হেমন্তবালা দেবীর চরিত্রের একটি প্রকৃতিগত প্রবণতা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের দেশে ঘরসংসার দেখাশোনা করার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই সাধারণত মেয়েদের সমগ্র চিন্তাবুদ্ধি ধ্যানধারণা ক্ষয়িত হয়ে যায়। তার চেয়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে বা গভীরতর উপলব্ধিতে যে বিরল নারীর জীবন দীপ্যমান হয়ে ওঠে, তাঁকে অ-সাধারণ বলেই মানতে হয়। হেমন্তবালা দেবীর জীবনে সেই পরিচয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গভীর নিষ্ঠাভক্তি, অধ্যাত্মবোধ ও আত্মনিবেদনের ধ্যানমগ্নতা রবীন্দ্রনাথের মনে নিগূঢ় আনন্দের স্পর্শ দিয়েছিল। পূর্বে উল্লিখিত ৪নং ৭নং ও ২৮নং চিঠিতে তার নিদর্শন আছে। তিনি আরো লিখেছেন—"তোমার মধ্যে আত্মোৎসর্গের যে দাক্ষিণ্য আছে তাকে আমার কবিপ্রকৃতি কখনোই উপেক্ষা করে না।" (১৭৮ নং) "তোমার নিষ্ঠা ভক্তির মধ্যে যে মাধুর্য আছে সেটাকে যে আমি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা করতে পারি তা নয় তার সৌন্দর্যে আনন্দিত হতে পারি" (১৪৬ নং)। "তোমার স্বভাবে অসামান্যতা আছে যা নানা বাহ্য আঘাতে পরিণতি লাভ করতে পারেনি; যা মিশিয়ে রয়েছে এমন সব অন্ধ সংস্কারের সঙ্গে যা তোমার মনকে মুক্তি দেবার প্রতিবন্ধকতা করছে" (১৪৪ নং)। অর্থাৎ, এই মহিলা 'অসামান্য গুণ নিয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেলেন অসম্পূর্ণ। কতকগুলো বদ্ধমূল সংস্কারে পাথর চাপা পড়ে রইল তার সুষ্ঠু পরিণতি। তাঁর জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী 'অপূর্ণ' কবিতাটি এই সঙ্গে স্মরণীয়।

আমাদের দেশে বিশেষভাবে মেয়েদের পক্ষে নিয়ম সংস্কার ও অভ্যাসের বন্ধনকে কাটিয়ে ওঠা দুষ্কর, কারণ, অজ্ঞাতসারে তা একেবারে মজ্জাগত হয়ে পড়ে। হেমন্তবালা দেবী বাল্যকাল থেকে দেখেছেন, মা সধবা হয়েও নিরামিষাশিনী, বাহ্য আচার অনুষ্ঠানকে সাত্ত্বিকতার অপরিহার্য অঙ্গের মত আঁকড়ে ধরেছিলেন, ছোঁয়াছুঁয়ির শুচি-বাইয়ের খুঁতখুঁতুনিতে চিরাভ্যস্ত এবং শুদ্ধতা ও শুচিতা রক্ষার জন্য দিনের মধ্যে কতবার যে জামাকাপড় ছাড়তেন ও স্নান করতেন, তার হিসেবই থাকত না। এইসব নিয়মনিষ্ঠা পালনে দিনরাত নিরত থাকত তাঁদের অখণ্ড মনঃসংযোগ। এই ধারা যে শুধু গৌরীপুরের বাড়িতেই ছিল তা নয়, সনাতনপন্থী ... গোঁড়া পরিবারেই ছিল সেকালে চালু এবং গোঁড়ারাই ছিলেন হিন্দুসমাজের কর্তা। বিয়ের পর নাটোরে গিয়ে দিদিশাশুড়ির পরিবেশেও হেমন্ত-বালা দেবী পেলেন একই ধারা। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর সেখানকার সাম্প্রদায়িক আচার-বিচারে চলল তার অনুবর্তন, বদ্ধমূল হয়ে গেল আবাল্যের কায়েমি সংস্কার। এই নিয়েই আর পাঁচজনের মত নির্বিধায় ও শান্তিতে কেটে যেতে পারত তাঁর বাকি জীবন। কিন্তু বুদ্ধিবিচারের একটা উপসর্গও ছিল তাঁর ধাতে, তাতেই ঘটল উৎপাত। তাঁর জীবনের এই মূল সমস্যা প্রাঞ্জলভাবে ধরা পড়েছিল রবীন্দ্র-নাথের কাছে। তিনি বলেছেন—'তুমি স্ত্রীলোক, নানা শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাসে সংস্কারে তোমাকে ঘিরেচে—তোমার আন্তরিক শক্তির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য হয় নি—তাই কষ্ট পাচ্চ—অথচ তোমার আর কোনো গতি নেই। নূতন যে পথ খুঁজতে যাবে, খুঁজে পাবে না, কষ্ট পাবে" (৬০ নং)। 'তোমার মধ্যে নিয়তই দ্বন্দ্ব চলছে

—কেবলি নিজেকে দুঃখ দিচ্চ। তোমার অভ্যস্ত সংস্কার এবং তোমার বুদ্ধির মধ্যে কিছুতেই মিল হচ্ছে না। মেয়েরা স্বভাবতই বিচারবুদ্ধির চেয়ে প্রথার প্রতি অন্ধভাবে আসক্ত (১৯৪ নং)। 'যে সংস্কার তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তাতে হয়ত তুমি আরাম পেয়েচ—তোমার নারীস্বভাব তার মধ্যে—আপন সেবা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পেরেছিল, (১৭৪ নং)। কিন্তু সব জেনেও রূঢ় সত্যকে তাঁর সামনে তুলে ধরতে তিনি কখনো দ্বিধা করেন নি। মাঝে মাঝে আমি তোমাকে আঘাত দিই, অবশেষে অনুতাপও হয়। কিন্তু আমার উপায় নেই। আমাদের দেশের ভক্তির সঙ্গে সর্বমানবের এমন বিচ্ছেদ, তার প্রতি এত ঔদাসীন্য যে সে আমি সইতে পারিনে। আচার-বিচারের মূঢ়তায় সমস্ত দেশের বুক যে কি জোরে চেপে ধরেছে তা একখানা পাঁজি পড়লেই বোঝা যায়' (৫৪ নং)।

আচার-বিচারের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হল শারীরিক কৃচ্ছ্রতা সাধন। অর্থাৎ, নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ধর্মাচরণ করতে গেলে দৈহিক ক্লেশকে ভয় করলে চলবে না। উপবাস করার উপলক্ষের অভাব নেই হিন্দুশাস্ত্রে। হেমন্তবালা দেবী নিজেই বলেছেন, তাঁর স্নানাহারের কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না। হয়ত সারাদিন কাটল অনাহারে, পুজো আহ্নিক, জপতপ, ধর্মগ্রন্থাদি পাঠে। সন্ধ্যার পর সময় জুটল স্নান সেরে, হয়ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফায়, যা হোক কিছু খেয়ে নেওয়ার—দুটি ভাতে-ভাত, দু-এক পদ নিরামিষ তরকারি থাকল বা না-ই থাকল, কিংবা শুধু এক বাটি ক্ষীর বা কিছু ফলমূল। শরীর পালনের অবহেলা তার শোধ তুলতে ছাড়ত না। এসব কথা যে কত মমতার সঙ্গে ভাবতেন রবীন্দ্রনাথ, তারও নিদর্শন রয়েছে তাঁর চিঠিতে। 'তোমার রোগের যে ফর্দ পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেল তোমার দেহে এক হাসপাতাল ভরা ব্যামো। তার অনেকগুলিই তোমার স্বরচিত বলেই আমার বিশ্বাস।... রোগসৃষ্টিকার্যে বিধাতার সঙ্গে তুমি টক্কর দিচ্ছ, ওঝার কর্ম নয় তোমাকে মুক্তি দেওয়া' (৩৯ নং)। আর একবার লিখেছিলেন—'অবসাদের ছায়াচ্ছন্ন তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি দুঃখবোধ করেছি। আমার বিশ্বাস তোমার এই মানসিক গ্লানি তোমার শারীরিক অস্বাস্থ্যেরই অনুবর্তী (২৩১ নং)। আবার কখনো তাঁকে একটা মূল্যবান সত্য কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করেছেন—'শরীরটা বিধাতার দুর্লভ দান, ওটাকে অবহেলা করবার অধিকার কারো নেই—লক্ষ টাকা দাম দিয়ে যদি ওকে কিনতে হোত, তবু এর উপযুক্ত মূল্য হোতো না। বিশ্বজগতের সঙ্গে ঐ ত যোগের সেতু—যতদিন বেঁচে আছো ওটাকে মেরামত রাখবে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এই সর্ত আছে' (২২০ নং)।

হেমন্তবালা দেবীর মধ্যে একটি পীড়িত আত্মার ক্রন্দন রবীন্দ্রনাথ গভীর দরদের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই এই নারীর মর্মবেদনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে উদ্বেগের অন্ত ছিল না। 'তোমার চিঠি পড়ি, তোমার কথা ভাবি। একটা কথা বার বার মনে আসে তোমার চিরাভ্যস্ত ধর্মমত ও আচার থেকে আমি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করি নি বিক্ষিপ্ত করেছি। তাই নিয়ে তোমার নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলচে—অথচ এ দুঃখ আমি কোনোদিন তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি নি। কারো মত নিয়ে আমার কোনো জেদ নেই, ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কারো প্রতি আমার বিরুদ্ধতা জাগে না' ১৪৬ নং)। 'তোমার পরে কত গভীর আমার স্নেহ এবং করুণা তা হয়ত তুমি উপলব্ধি করতে পার না। আমার চিন্তা এবং বোধের দিক থেকে সত্যকে তোমার সামনে আনবার জন্যে সেইজন্যেই আমি এত চেষ্টা করেছি। তাতে তোমাকে দুঃখ দেওয়া হয়েছে' (১৭৪ নং)। 'নিজের মনকে নিয়ে খুব বেশি টানাটানি কোরো না। অপরাধ হয়েছে বলে সর্বদা কল্পনা করাটা কল্যাণকর নয়। নিজের প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর বিরোধ করে চিত্তকে মোচড় দিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়া তার প্রতি অবিচার করা। বেশ সহজভাবে থাকতে চেষ্টা কর তাতে তোমার অন্তর্যামী প্রসন্নই হবেন' (৩০ নং)। 'তুমি গুহের ও সম্প্রদায়ের কঠোর বন্ধনে শৃঙ্খলিত এ রকম বন্দিদশা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। কৃত্রিম ও সংকীর্ণ নিয়মের নাগপাশে মানবাত্মাকে এমনভাবে সন্ত্রস্ত ও উৎপীড়িত করাকে আমি অধর্ম বলেই জানি। এ বন্ধনকে তুমি নিজেই যখন স্বীকার করে নিয়েছ, একেই তুমি যখন মুক্তি বলে কল্পনা কর তখন উপায় নেই। এ অবস্থায় বন্ধনে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেওয়াতেই তুমি আরাম পাবে। যতক্ষণ বাইরে থাকবে ততক্ষণ দ্বিধার টানাটানিতে তোমাকে বেশী দুঃখ দেবে' (৬৯ নং)। 'তোমার ধর্মদীক্ষা তোমার সংসারকে এবং উপাস্যকে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী করে দিয়েছে—একটাকে ত্যাগ না করলে তুমি স্থিতির আশা করতে পার না। আমি দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য করতে চাই আপন স্বভাবেরই প্রবর্তনায়' (১৮৭ নং)।

এইভাবে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ

হেমন্তবালা দেবীকে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের পথ খুঁজে নিতে উদ্বুদ্ধও করেছেন। মনের মধ্যে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের টানা-হেঁচড়াতে অযথা শক্তি ক্ষয় হয়। দুয়ের মধ্যে সহজভাবে সামঞ্জস্য সাধন করে শ্রেয় পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন। 'আমি যে গৃহে জন্মেছি সেখানকার ধর্মেই দীক্ষা নিয়েছিলুম। সে ধর্মও বিশুদ্ধ। কিন্তু আমার মন তারই মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনোমতেই রাজি ছিল না। তবু এ নিয়ে টানাহেঁচড়া না করে বেশ সহজভাবেই আপন প্রকৃতির পথে চলেছিলুম। সেই পথ ধরেই আজ আমি নিজের উপযোগী গম্যস্থলে পেঁচেছি' (৩০ নং)। তিনি আরো বলেছেন—'অবশ্য ধর্মমত আমার আছে কিন্তু কোনো সম্প্রদায় আমার নেই। আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে মনেই করি নে' (৪০৩ নং)। সাম্প্রদায়িক খাঁচার সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ ধর্মমতকে তিনি কখনো যথার্থ ধর্মমত বলে স্বীকার করেন নি। বলেছেন—'সংসারের খাঁচায় যারা কষ্ট পাচ্ছে ধর্মের খাঁচা বানিয়ে তারা নিষ্কৃতি পাবে এ কখনো হয় না' (৯৯ নং)। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিকূল, কেন না, 'মানুষের পূর্ণতা শতদল পদ্মের মতো, তার বিকাশে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রকৃতির অন্য সকল দিক খর্ব করে কেবল একটিমাত্র ভাবাবেগের প্রবল উৎকর্ষ সাধনকেই আধ্যাত্মিক সাধনার উৎকর্ষ বলে আমি গণ্য করি নে' (৩১ নং)।

এইভাবে কত উৎকণ্ঠা ও মমতার সঙ্গে কতভাবে এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীকে তাঁর অন্ধকার জীবনের পথে তিনি আলো দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আবার সন্দেহ প্রকাশ করে নিজেই বলেছেন—'আমি কি আজ পর্যন্ত কাউকে ভিতর থেকে আলো দিতে পেরেছি? আমি কি রকম জানো, যেন সূর্য-রশ্মিতে উদ্দীপ্ত অগ্নিবর্ণ সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। সে আলো চোখে দেখতে পাবে, ভালো লাগবেও হয়তো,—কিন্তু রাত্রের অন্ধকার পথে চলবার জন্যে তার থেকে কেউ কি আলো সঞ্চয় করতে পারবে, কেউ কি জ্বালাতে পারবে আপন ঘরের প্রদীপ?...'

'তোমার অন্তর যে শান্তি যে সান্ত্বনা চায় আমি কেমন করে তা দিতে পারি? রোগী আত্মীয়কে দেখে আত্মীয় যেমন বেদনা পায়, কিন্তু হাতুড়ে হয়ে ডাক্তারি করব কোন্ সাহসে? তাই তোমাকে বলি আমার স্নেহ যদি গ্রহণযোগ্য হয় তো গ্রহণ কোরো কিন্তু শিক্ষা যদি চাও তবে মুক আমি' (১০৫ নং)।

চিঠিগুলো পড়লেই বোঝা যায়, কত-দিক থেকে হেমন্তবালা দেবীর জীবন-সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁকে শান্তি-লাভ করার পথ বের করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর মনে পড়েছে, জ্ঞান এবং চিন্তাবুদ্ধির উজ্জ্বলতাতেও এই মহিলা গরীয়সী, তার আলোকে নিজের সত্য পথ নিজে যদি তিনি বের করে নিতে পারেন, সেই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা। বলেছেন—'তোমার বুদ্ধির পরে আমার আস্থা আছে। তুমি নিজের আলোকেই নিজের যথার্থ পথ খুঁজে পাবে —সে পথের সঙ্গে তোমার প্রকৃতির বিরোধ ঘটবে না' (৩৪ নং)। হেমন্তবালা দেবী চিঠিতে নানা রকমের তর্ক তুলতেন, হয়ত স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়ার আগ্রহই থাকত তার মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথ নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে বিশদভাবে সব বুঝিয়ে বলতে কখনো কার্পণ্য করেন নি, অযৌক্তিকতাকে খণ্ডণ করেছেন এবং তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছেন, কারণ তাঁর 'বুদ্ধির' উপরে আস্থা ছিল রবীন্দ্রনাথের। এই ধরনের প্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন—"যে জিনিসটিকে আশ্রয় করলে তোমার তৃপ্তির পর্যাপ্তি হত বলে নিজেকে দুঃখ দিচ্ছ খুব সম্ভব সেটি তোমার স্থায়ী অবলম্বনের পক্ষে সংকীর্ণ। তার প্রতি তোমার নিষ্ঠা সুদৃঢ় নয় বলে নিজের বুদ্ধিকে আজ নিন্দা করচ, তাই বলে নিজের বুদ্ধিকে খর্ব করে যেখানে তোমাকে ধরে না সেইখানেই নিজেকে কোনোমতেই ধরানোকে অবশ্য কর্তব্য মনে কোরো না" (৩০নং)। বিধাতা যে উজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পদের অধিকারী তাঁকে করেছেন, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেন—"তোমার পীড়িত কল্পনা তোমাকে বহুল পরিমাণেই অনাবশ্যক কষ্ট দেয়।...তোমার সংস্কার তোমাকে আঁকড়ে আছে অথচ তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারচে না। কিন্তু তাই বলে বুদ্ধিকে অন্ধ করে রাখায় শ্রেয় নেই। বুদ্ধি যিনি দিয়েছেন তাঁকে অমান্য করলেই তবে ধর্মপালন সম্ভব হবে এমন বিশ্বাস মনুষ্যোচিত নয়। তাই তোমার দ্বিধান্দোলিত মনের পীড়ায় দুঃখ বোধ করি কিন্তু পরিতাপ করিনে। অন্যান্য অনেক মেয়ের মতো তোমার চরিত্রে মূঢ়তাই যদি মুখ্য হোত তা হলে তারি গর্তে চোখ বুজে থেকে সংশয়ের আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে—কিন্তু তোমার দীর্ঘকালের অন্ধ অভ্যাস সত্ত্বেও ধর্মমূঢ়তা তোমাকে অভিভূত করতে পারেনি এই দেখেই আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করেছি এবং আমার চিন্তা থেকে তোমাকে দূরে রাখতে পারিনি" (২৫৪নং)।

হেমন্তবালা দেবীর বুদ্ধিশীলতার কথা যেমন ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ, তেমনি আবার ভেবেছেন তাঁর লেখনীর সাহিত্যিক গুণের কথা। তখন তাঁর মনে হয়েছে, এই পথের সাধনাতে হয়ত তিনি সংশয়দ্বন্দ্বের বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে উঠে মানসিক সাম্য লাভ করতে পারেন। পূর্বে উদ্ধৃত ৩, ৫, ৮ ও ৯নং চিঠি এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। গদ্য ও পদ্য উভয় রকম রচনাতেই হেমন্তবালা দেবীর সহজাত শক্তির পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ৩নং চিঠিতে তার উল্লেখ আছে। হেমন্তবালা দেবী আর একবার একটি স্বরচিত কবিতা পাঠিয়েছিলেন কবিগুরুর কাছে, তার ছন্দ ও ভাবভঙ্গি ছিল একটু সেকেলে ধরনের, যা হয়ত বর্তমান যুগে অচল। রবীন্দ্রনাথ একটু ঠাট্টাকৌতুকের টিপ্পনী কেটে তার উপরে মন্তব্য করেছিলেন—"ধ্যানযোগে জানলুম তোমার বয়স একশো দেড়শ-র কম হবে না—দাশরথী রায়ের চেয়ে বোধ করি কিছু ছোটো" (১২৬নং)। কিন্তু এই মন্তব্যকে সঙ্গে সঙ্গে পরের চিঠিতেই ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, হেমন্তবালা দেবীর আধুনিক ছন্দে ভাবে রচিত একটি নূতন কবিতা পেয়ে। তাঁকে বলতে হয়েছিল—"তোমার প্রাচীনতা নিয়ে উপহাস করেছিলুম। সেটা ফেরৎ নিতে চাই। এবারকার চিঠির সঙ্গে যে কবিতা পাঠিয়েছ সেইটেই যথোচিত উত্তর হয়েছে। দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক আধুনিক তরুণ কবির কাব্যরস অন্তরে ও লেখনী মুখে গ্রহণ করতে পেরেছ" (১২৭নং)। কবিতাটি তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কবিতাটিকে ছাপাবার প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই দিয়েছিলেন—"যদি তোমার সম্মতি পাই তবে ওটা কোনো একটা কাগজে প্রকাশ করার ইচ্ছা করি। তোমার নাম প্রকাশ করা [illegible] তোমার অভিপ্রেত হবে না—অনাম্নী [illegible]বেই চালানো যেতে পারে" (১২৭নং)। চিঠিতে হেমন্তবালা দেবীর রচনাকুশলতা রবীন্দ্রনাথকে কি রকম অভিভূত করত তার উল্লেখ পাই ১০১নং চিঠিতে—"তোমার চিঠির ভাষা কি সুন্দর! সহজ, গভীর, অকৃত্রিম। তোমার মন তোমার ভাষায় কোথাও বাধা পায়নি, ভাবনার ভঙ্গীর সঙ্গে ভাষার ভঙ্গী লীলায়িত হয়ে চলেচে। এরকম লেখা সহজ নয়। অনেকবার ভাবি তোমার এই শক্তি কেবল চিঠি লেখার খিড়কির রাস্তা দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া আসা করে কেন? চিঠি লেখার ভঙ্গী দিয়েই সদরের কিছু লেখ না কেন? কোনো একটা স্বতন্ত্র বিষয় নিয়ে। তোমার এক একটি চিঠি আমাকে বিস্মিত করে, আমার মনকে দুলিয়ে দেয়।" ২১২ নং চিঠিতে আছে—"তোমার রচনার শক্তি যখন তোমার মানসিক অবসাদ বা বিরক্তি ভেদ করে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তখন তার

অসামান্যতা আমাকে মুগ্ধ করে।" কিন্তু তাঁর সহজ শক্তির বিকাশ হয়নি বলে দুঃখ বোধও করেছেন রবীন্দ্রনাথ—"মনে দুঃখ হয় যে বাহিরে ও আন্তরিক নানা বাধার ভিতর দিয়ে তুমি মানুষ হয়েছ, অন্তরে বাহিরে প্রতিহত হয়েছে তোমার সহজ শক্তি" (২১৪ নং)। তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বারবার উৎসাহিত করেছেন সাহিত্য রচনার কাজে। "তুমি যে ভাষায় চিঠি লেখ সেই ভাষায় যদি গল্প লেখ নিশ্চয়ই সেটা উপাদেয় হবে। সাজিয়ে লিখতে গেলেই ঠকবে। তোমার জানা কথা ঘরের কথাকে গল্পে ফুটিয়ে তুললে সাহিত্যে তা আদর পাবে কেননা তোমার লেখায় সহজ রস আছে" (১৬ নং)।

এই সম্পর্কে আরো একখানা চিঠি বিশেষভাবে স্মরণীয়। যিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র রাজাধিরাজ, সেই রবীন্দ্রনাথের মনকে হেমন্তবালা দেবীর পত্র রচনা কি রকম নাড়া দিয়েছিল, অকুণ্ঠচিত্তে তিনি তার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন সেই চিঠিতে—"তোমার চিঠি থেকে তোমার লেখা কিছু কিছু চুরি করতে ইচ্ছে করে। হয়ত কোনদিন বা করব। তোমার মধ্যে দেখবার দৃষ্টি, ভাববার মন লেখবার কলম ও হৃদয়ের আবেগ এক সঙ্গে মিলেছে। তোমার লেখায় অনায়াসে তুমি রস সঞ্চার করতে পার" (১৭নং)। হেমন্তবালা দেবী বাংলা সাহিত্যে লেখিকা হিসাবে কোনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেননি, কিন্তু যে কোনো একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের পক্ষেও এর চেয়ে বড় সম্মান ও স্বীকৃতি আর কি কাম্য থাকতে পারে?

রবীন্দ্রনাথের স্বভাবতই মনে হয়েছিল যে, সাহিত্য-সাধনার পথে আত্মনিবিষ্ট হলে এই মহিলা জীবনে একটা চরিতার্থতার পথ অবশ্যই খুঁজে পাবেন এবং চিত্তবিক্ষোভ ও অশান্তির অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। তাই তিনি বলেছেন—"তুমি যদি তোমার অবকাশকাল সাহিত্যরচনায় নিযুক্ত করো তা হলে তোমার মন ভালো থাকবে, আর তোমার স্বাভাবিক রচনা শক্তির যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যেও ভালো ফল ফলবে" (১০২ নং)। আরো একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"মতে ও আচারে আমার সঙ্গে তোমার যতই পার্থক্য থাক তবু কখনো তোমাকে অশ্রদ্ধা করিনে। সেই সাম্প্রদায়িক পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে তুমি তোমার মত ও বিশ্বাস নিয়ে তোমার চিঠিতে যেসব আলোচনা করো এবং যেসব ভাবচিত্র পাঠাও সে আমার বিশেষ ভালো লাগে। তার একটা কারণ আমি অনেক কথা জানতে পাই যা আমার জানবার উপায় নেই কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, তোমার লেখার মধ্যে [illegible] আছে

যা দুর্লভ—সদ্য উৎসারিত সাহিত্যরসে সে আমাকে আনন্দ দেয়। সুসংলগ্ন করে বিস্তারিত করে লেখবার সাধনা যদি তোমার থাকা হোতো তা হলে সাহিত্যে তুমি কীর্তি লাভ করতে পারতে" (১৪৪নং)।

এইভাবে স্নেহ ও মমতার সঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর অন্তর জীবনের সমস্যা, তাঁর চরিত্রগত প্রকৃতি ও সহজাত শক্তিসামর্থ্যের কথা রবীন্দ্রনাথ নানা দিক দিয়ে ভেবেছিলেন এবং আত্মবোধ ও আত্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে যাতে তিনি নিজের জীবনের সত্যপথকে নিজেই খুঁজে নিতে পারেন, সেই পথনির্বাচনে রবীন্দ্রনাথ শরণাগত মর্মপীড়িতা মহিলাকে সাহায্য করেছেন। 'গুরু'র উচ্চাসনে বসে বাইরে থেকে আদেশ নির্দেশ চাপিয়ে অনুশাসন জারি করার সকাতর প্রার্থনাকে তিনি মোটেই আমল দেননি। একেবারে 'আপনজনের' মত হৃদয় দিয়ে হেমন্তবালা দেবীর আত্মার বেদনাকে তিনি আপনার আত্মচেতনায় অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাই এই জ্ঞানতপস্বী, আধ্যাত্মিক সাধনায় সমৃদ্ধ মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে হেমন্তবালা দেবী শান্তি ও সান্ত্বনার স্নিগ্ধ স্পর্শ পেয়েছিলেন।

এই সম্পর্কে হেমন্তবালা দেবী তাঁর নিজের উপলব্ধির কথা বলেছেন—"আপনি বলেন, আপনি গুরু নন, গুরুমশাই নন, পণ্ডিত নন—কিন্তু আপনিই যথার্থ আচার্য, অধ্যাপক, শিক্ষক। আপনিই পৃথিবীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সকল রোগের চিকিৎসক" (পৃঃ ৪৪৭)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিণত বয়সের ধর্মমত ও আত্মপরিচয় পত্রালাপযোগে ব্যাখ্যা করে গেছেন হেমন্তবালা দেবীকে এবং এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুরা এখানেই খুঁজে পাবে তাঁর "শেষ কথা"; তিনি নিজেই তা জানিয়ে গেছেন। অবশ্যই তিনি হেমন্তবালা দেবীকে যোগ্য অধিকারী বলে স্থির করেছিলেন, নতুবা তাঁর জীবনের নিগূঢ় মূল সুরকে তিনি অন্য কারো কাছে নয়, হেমন্তবালা দেবীর কাছেই উদ্ঘাটন করে যাবেন কেন? তাই রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীর এই সম্পর্ককে স্বতই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে পুরাকালের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গীর কথা। ধর্মজ্ঞান ও ধর্মানুশীলনের গভীরতা বা যোগ্যতার মাপকাঠিতে পৌরাণিক ও আধুনিক যুগের উল্লিখিত মনীষীদের মধ্যে তুলনা করার কোনো অভিপ্রায় এখানে নেই, আমরা শুধু উভয় কালের ঘটনা দুটির সুস্পষ্ট সাদৃশ্যের কথাই বলছি।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও বিচারের ভার যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আলোচ্য পত্রগ্রন্থ থেকে

তাঁর কয়েকটি বক্তব্যের প্রতি সাধারণ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব, যেখানে দৃঢ়সংবদ্ধ ভাষার অন্তর্লীন সত্যোপলব্ধি ও ব্যঞ্জনায় তাঁর সুস্পষ্ট অভিমতগুলি গভীর বাণীর মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

স্বকীয় ধর্মমতের মূল কথা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বলেছেন—"আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ থেকে, যে উপনিষদকে একদা বাংলাদেশের বেদবর্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিলেন রামমোহন রায়ের জাল-করা—যে উপনিষদ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার, সেই পরম চরিতার্থতা দেউলে দরোগায় নয়, পাণ্ডাপুরোহিতের পদসেবায় নয়। যে-য়ুরোপ জ্ঞানকে সংস্কারমুক্ত কর্মকে বিশ্বসেবার অনুকূল করেছে সেই য়ুরোপ উপনিষদের মন্ত্রশিষ্য, জানুক বা না জানুক" (২০নং)।

এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেছেন—"তোমরা উপনিষদকে যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু বলে স্বীকার কর কিনা জানিনে, আমি উপনিষদকে সর্বধর্মের ভিত্তি বলে মনে করি।...তুমি যখন দেবতাকে ভক্তির কথা ভালোবাসার কথা বলো তখন সেটা বুঝতে পারি, কিন্তু যখন তুমি বিচারের চেয়ে আচারকে, বুদ্ধির চেয়ে সংস্কারকে, পুরুষকারের চেয়ে গ্রহকে প্রাধান্য দিতে চাও, এবং গিয়ে বলো সেইটেই হিন্দুধর্ম

তখন মন অত্যন্ত পীড়িত হয়—একা তোমার জন্যে নয় এই শক্তিহীন বুদ্ধিহীন মোহাচ্ছন্ন দেশের জন্যে" (৫৮নং)।

ধর্ম সম্বন্ধে মূল কথা বলেছেন এই-ভাবে—"ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব—যেমন আগুনের ধর্মই অগ্নিত্ব, পশুর ধর্ম পশুত্ব। তেমনি মানুষের ধর্ম মানুষের পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতা কোনো এক অংশে বিশেষ-ভাবে খণ্ডিত করে তাকে ধর্ম নাম দিয়ে আমরা মনুষ্যত্বকে আঘাত করি" (৫৩নং)। অর্থাৎ কোনো সাম্প্রদায়িক বা বিশেষ ধর্মমতকে একমাত্র যথার্থ ধর্ম বলে প্রচার করলে বা আঁকড়ে ধরে থাকলে তাতে মানবের সত্য ধর্মকে খণ্ডিত এবং আঘাত করা হয়। সর্বমানবের অবাধ আমন্ত্রণ আছে যেখানে, সেখানেই আছে মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের অবকাশ এবং মানুষের ধর্মের সত্য অবলম্বন।

কোথায় পেয়েছেন তাঁর ধ্যানের ঠাকুরকে, তাঁর ভগবানকে, এই প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্র-নাথ বলেছেন—"আমার ভগবান মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে। তিনি মানুষের স্বর্গেই বাস করেন। মানুষের নরকও আছে—সেইখানে মূঢ়তা, সেইখানে অত্যাচার, সেইখানে অসত্য।...যেখানে জ্ঞানে ভাবে কর্মে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই তাঁকে (ভগবানকে) উপলব্ধি না করলে ঠকতে হবে" (৫নং)।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির শেষাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন—"খুব সম্ভব এ কবিতা তুমি পূর্বেই পড়েচ তবু আমার ঠাকুরের ধ্যান তোমার কাছে রাখলুম সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মাঝখানে, সকল বীরের তপস্যায়, সকল প্রেমিকের ত্যাগে। এ সব লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়, তার গভীরতম মর্মস্থানে যে কবি আছে তারই, সে কবির আসন সকল দেশেই সকল মানুষের—(য়ুরোপেও)" (২৪নং)।

"আমার মনের মানুষ কোনো ব্যক্তি-বিশেষ নন একথা নিশ্চয় জেনো। তাঁর আভাস পেয়েছি ইতিহাসে নরোত্তমদের মধ্যে। যেমন ভগবান বুদ্ধ" (৫২নং)।

সত্য ও সংস্কারের কথায় বলেছেন—"সত্য জানা বড়ো কথা নয় সত্য হওয়াই চরম সিদ্ধি" (৪৪নং)। "আমরা সংস্কারকে মানি সত্যকে মানিনে বলেই সর্বত্র এত বাহ্য আচার এবং আন্তরিক নোংরামি" (৮৯নং)।

ধর্মসাধনাকে আমরা এক ধরনের রস-সম্ভোগের অপধর্মে পরিণত করছি, হয়ত না বুঝে। "বাংলাদেশে আমরা শাক্ত কিংবা বৈষ্ণবধর্মে মুখ্যত রসসম্ভোগ করতে চাই। হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার সার্থকতা মনে করি। একে আধ্যাত্মিক বিলাস বলা যেতে পারে। সব রকম বিলাসের মধ্যেই বিকারের সম্ভাবনা আছে" (৩নং)।

ধর্মকর্মে শুদ্ধাচার, শুচিতা, বাহ্য উপকরণ ও আচারনিষ্ঠা ইত্যাদির যথার্থ তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলে গেলে, "শুচিতা জলে মাটিতে অশনে বসনে মন্ত্রে তন্ত্রে নেই—শুচিতা অন্তরপ্রকৃতিতে—যেহেতু মানুষ মুখ্যত আধ্যাত্মিক। যিশু-খৃষ্ট এই কথাই বলেছেন, ভগবান বুদ্ধেরও এই উপদেশ। ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেন যখন যজ্ঞকে তিনি বাহ্য উপকরণগত না বলে বলেছেন আন্তরিক। সত্যই যজ্ঞ, জীবে দয়া যজ্ঞ, সর্বমানুষে মৈত্রী যজ্ঞ। যেখানে সত্য নেই, দয়া নেই, চিত্তের নির্মলতা নেই আছে পূজা অর্চনা আছে ভক্তিরসের সম্ভোগ সেখানে আধ্যাত্মিকতা আত্মপ্রবঞ্চনা" (১৮৭নং)।

বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্জিত করে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের অভ্যাসকে কশাঘাত করতে তিনি ছাড়েননি। "বুদ্ধিকে অন্ধ করে রাখায় শ্রেয় নেই। বুদ্ধি যিনি দিয়েছেন তাঁকে অমান্য করলেই তবে ধর্ম-পালন সম্ভব হবে এমন বিশ্বাস মনুষ্যোচিত নয়" (২৫৪নং)। "যারা নিজেকে ধর্মকর্মের পুতুল করে তোলে তারাই আনুষ্ঠানিক অভ্যাসের প্রতিদিন পুনরাবর্তনের দ্বারা নিজের শূন্যতাকে ভরাট করে মনে করে জীবন সার্থক হোলো। যে সকল ক্রিয়াকর্মে বুদ্ধির অন্ধতা এবং হৃদয়ের জড়তা, সেই সমস্ত নিরর্থকতার জালে নিজেকে নিরত জড়িয়ে রাখা ভুলিয়ে রাখার মত দুর্গতি আর নেই। এই সমস্ত চিত্তহীন আচারে জীবন অসাড় হয়ে যায়" (৯৯নং)।

ধর্মের ধ্বজা উঁচিয়ে সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে মানুষের মন ও চিন্তাবুদ্ধি পঙ্গু হয়ে পড়ে। তাঁর মতে "বাতাসের চলাচলের মত চিন্তার চলাচল স্বাস্থ্যকর। বদ্ধমত ও রুদ্ধদ্বার মন নিয়ে যারা থাকে তারা জড় অভ্যাসের আরামে নিবিষ্ট হয়ে থাকে কিন্তু একে যত বড়ো নামই দাও না এর আসল নাম মানসিক তামসিকতা। এর চেয়ে চিন্তার আলোড়ন নিয়ে দুঃখ পাওয়া ভালো" (৩৫নং)।

এই ধরনের অমর বাণীর উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা আলোচ্য পত্রগ্রন্থটির মধ্যে তার অজস্র সন্ধান পাবেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ বাঙালী চরিত্রের একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"ভারতবর্ষে দ্রাবিড়জাতীয়দের সমাজ মাতৃতন্ত্র, অর্থাৎ সে সমাজে স্ত্রী প্রাধান্য। এটা যে হতে পেরেছে, তার প্রধান কারণ, তাদের ভাবপ্রবণ স্বভাব। সর্বদা ভাবরসে তাদের মন আর্দ্র।...বাঙালী অনেক অংশে দ্রাবিড়, এই জন্যে তার এত ভাবাকুলতা। বাঙালী অত্যন্ত বেশি মেয়েলি। তার মানসক্ষেত্রের এই অতিরিক্ত আর্দ্রতা যদি না ঘোচে তা হলে সে ভাবোচ্ছ্বেগে মরীয়া হতে পারবে কিন্তু কিছুই সৃষ্টি করতে পারবে না। একদিকে তার আছে কোনো একটা সংকীর্ণ কেন্দ্রকে ঘিরে ভাবাবিষ্ট অন্ধ আত্মনিবেদন, আর একদিকে নিজের চক্রের বাইরে ঈর্ষা বিদ্বেষ কলহপরতা। কি জানি আমার প্রকৃতির কাছে এই মাতামাতি, এই হৃদয়াবেগে আবর্তিত বিচিত্র নিরর্থকতা একান্ত অরুচিকর। অন্তত পুরুষের পক্ষে এটা একান্ত অমর্যাদাকর এবং দেশের পক্ষে এটা সাংঘাতিক দুর্বলতাজনক মনে হয়" (৮৮নং)।

আচার-আচরণে রুচিতে রবীন্দ্রনাথ যেন অনেকটা বিলিতি-ঘেঁষা, ভারতীয় হিন্দু রীতিনীতিকে তিনি আমল দিতে চান না, সম্ভবত এই ধরনের একটা অভিযোগ এসেছিল তাঁর বিরুদ্ধে, তার জবাবে তিনি বলেছিলেন—"গভীরভাবে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভারতীয়। যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাটা-কাটা হাড়-বেরকরা শুচি-বায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়। যে দেশ কেবলি বিশ্বের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে নাক তুলে চলে সে রুগ্ন দেশ—আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ—সেই ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যের প্রাবল্য দ্বারাই চিরশুচি—সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ" (১২১নং)।

মরুদেশে পান্থ-পাদপ তৃষ্ণার্ত পথিকের জন্য সুমিষ্ট জল নিজের গোপন ভাণ্ডারে সঞ্চিত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই তৃষ্ণা-নিবারক প্রাণসঞ্চারী অমৃতধারাকে খুঁচিয়ে সংগ্রহ করতে হয়। হেমন্তবালা দেবী তাঁর চিঠিপত্রে প্রশ্নবাণের খোঁচা দিয়ে তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কত অমৃত বাণীকে তাঁর গভীর উপলব্ধির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছেন। তাতে নিজের পীড়িত হৃদয়ের তৃষা যেমন দূর হয়েছে, তেমনি অনুরূপ তৃষিত আত্মাও চিরদিন এখানে শান্তির সন্ধান ও যথার্থ ধর্মপথের ইঙ্গিত পাবে। আর কিছু না হোক, এই একটি মহৎ কর্মের জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে হেমন্তবালা দেবী অমর হয়ে রইলেন।

ধর্মমত, পরমাত্মার সাধন পথ, আচার বিচার এবং বাহ্য উপকরণ অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যাখ্যান রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর অন্তিম বাণীর মত আলোচ্য গ্রন্থটির মধ্যে নিবদ্ধ রেখে গেলেন, একথা তিনি নিজেই বলেছেন। হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত 'চিঠিপত্র ॥ নবম খণ্ড' তাই একটি বিশিষ্ট গ্রন্থের মর্যাদায় চিহ্নিত হয়ে রইল। এ সম্পর্কে হেমন্তবালা দেবীর নিজের উক্তিও স্মরণীয়—"আপনি জানবেন আপনার সঙ্গে যে তর্ক করি, সে আপনাকে হারাবার দুরাশায় নয়, সত্য আবিষ্কারের জন্য।...

আমি যে ঘরে বাইরে দোষী হয়েও এসব চিঠি লিখছি ও আদায় করছি, নব্যভারত এর থেকে তার পথ বেছে নেবে। আমার উপকার না হোক, আমার দেশের আর সকলে উপকৃত হতে পারবে" (২নং চিঠি)।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটি সমালোচনা শোনা যায়—চিঠির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ তাতে থাকে নামমাত্র, সাহিত্য সৃষ্টিই হয়ে ওঠে প্রধান। অর্থাৎ চিঠির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি থাকেন উপলক্ষ মাত্র, রবীন্দ্রনাথের আসল লক্ষ্য থাকে পাঠক সাধারণের দিকে। তাঁর চিঠিপত্র বিশেষ একটি সাহিত্য-রসে সমৃদ্ধ, যাকে বলা হয় পত্রসাহিত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের হৃদয়-উত্তাপ সেখানে অনুপস্থিত অথবা অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু 'চিঠিপত্র নবম খণ্ড' তার একটি সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। এই চিঠিগুলিতে উদ্দিষ্টা মহিলার প্রতি তাঁর স্নেহ, করুণা এবং সমবেদনার উষ্ণ স্পর্শ পাঠকমাত্রই অনুভব করতে পারেন। এই ব্যক্তিগত হৃদ্য সম্পর্কের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি দীর্ঘ দশ বছর, রবীন্দ্রনাথের তিরোধান পর্যন্ত। হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে তিনি নিয়মিত চিঠিপত্রের যোগাযোগ রেখেছিলেন। শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকো থেকে তো লিখতেনই, যখন যেখানে গেছেন তিনি নানা কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও এই মহিলার কথা তাঁর মনের এক কোণে ঠাঁই করে রেখেছিল, তাই দেখতে পাই কলকাতায় এসে অন্য জায়গায় উঠলেও, যেমন, খড়দহ, বেলঘরিয়া, বরানগর বা চৌরঙ্গী রোড থেকেও যেমন তিনি চিঠি লিখছেন, বাইরে বেরলেও তেমনি অবিচ্ছিন্ন ছিল তাঁর এই পত্রালাপ। চন্দননগর, দার্জিলিং, কালিম্পং, মংপু, ভূপাল, পুরী, আলমোড়া বোম্বাই, এমন কি সিংহল সফরে গিয়েও তিনি চিঠি লিখতে ভোলেননি হেমন্তবালা দেবীকে। চিঠিপত্র নবম খণ্ডের চিঠিগুলিতে চিঠির রস তো পাওয়া যায়ই, লেখক যখন রবীন্দ্রনাথ তখন তাতে সাহিত্যরসেরও যে কোনো কমতি নেই তা বলাই বাহুল্য, আর আছে পত্রচ্ছলে গভীর তত্ত্ব ও অভিমতের স্বচ্ছ অভিব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনে দেশ-বিদেশের বহু নারী এসেছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। হেমন্তবালা দেবী তাঁদের অন্যতমা হলেও সকলের মধ্যে অনন্যা। অন্যরা এসেছেন রবীন্দ্রনাথের মতবাদ ও আদর্শবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে সদরের দেউড়ি পার হয়ে তাঁর কাছে। রবীন্দ্রনাথের উৎসবে, অনুষ্ঠানে, অভিনয়ে তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সদাসর্বদা, রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও সান্নিধ্য লাভের পরিচিতিতে তাঁরা প্রকাশ্য প্রচার ও সম্মান অর্জন করে সামাজিক গৌরব ও জীবনে বিশিষ্ট চরিতার্থতা লাভ করে ধন্য হয়েছেন। হেমন্তবালা দেবীও এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে ভক্তিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিয়ে, কিন্তু তিনি এসেছিলেন গোপনচারিণীর মত, কবিগুরুর স্নেহসঙ্গ তিনি পেয়েছিলেন নিভৃত নির্জনে। মুষ্টিমেয় লোক জানত তাঁর কথা, জনসাধারণের কাছে তিনি ছিলেন অজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অপরিচিতা। রবির প্রতিফলিত আলোকে যে চন্দ্রের দীপ্তির গৌরব, সে সংবাদ লোকসমাজের জ্ঞানগোচরে সুবিদিত, কিন্তু বনের কোণে যে একটি সূর্যমুখী ফুল লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে রবির প্রসাদ সুধাকে নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে, সে খবর আর ক'জন রাখে? হেমন্তবালা দেবীর নাম প্রথম প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হল রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের দীর্ঘ তেইশ বছর পরে ১৯৬৪ সালে, যখন রবীন্দ্রনাথের নবম খণ্ড চিঠিপত্র প্রথম প্রকাশিত হল। হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'পত্রধারা' ১৩৩৮ সালের প্রবাসীতে যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখনও তাঁর নাম ছিল গোপন। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন যে সব নারী, তাঁদের অনেকের প্রতি প্রকাশ্যে নানাভাবে নিজের স্নেহাশীর্বাদ জানাতে কবিগুরু তাঁর জীবিতাবস্থায় কখনো কার্পণ্য করেননি। তাঁদের কাছে তিনি চিঠি লিখেছিলেন, নানা প্রসঙ্গে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, কবিতা উপহার দিয়েছেন, এমন কি, তাঁর রচিত গ্রন্থও উৎসর্গ করেছেন—সাধারণ্যে তার কোনো কিছুই অবিদিত ছিল না। হেমন্তবালা দেবী এই সম্মান লাভে বঞ্চিত রয়ে গেছেন, কিন্তু সম্মান লাভের অযোগ্যা তিনি ছিলেন না কোনো অংশেই। তাঁকে এই সম্মান ও স্বীকৃতি দিতে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহও কিছু কম ছিল না বলেই মনে করি। কিন্তু হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে কেন যে তাঁকে গোপন রেখে চলাতে হয়েছিল, তার নানাবিধ কারণ সম্বন্ধে পাঠক অবশ্যই অবহিত হয়েছেন। হেমন্তবালা দেবীর পিতা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী মহাশয় যে নাম ও ব্যক্তিগত পরিচয় বাদ দিয়ে গ্রন্থাকারে 'পত্রধারা' প্রকাশ করাতেও অসম্মতি জানিয়েছিলেন আগেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। হেমন্তবালা দেবীর মা তো মনে করেছিলেন যে, রবি ঠাকুর তাঁর কন্যাকে ব্রাহ্মসমাজে ভিড়িয়ে নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয়েছিল—"তোমার মা আমাকে ভুল বুঝেছেন।...

তোমার মা আশংকা করেছিলেন, খৃষ্টান মিশনারির মতো ব্রাহ্মসমাজের আড়কাঠির কাজে বুঝি আমার উৎসাহ। মনে করা অস্বাভাবিক নয়। কেননা, দলপুষ্টি করার ইচ্ছা মানুষের মনে প্রবল, তোমার মায়ের মনেও সে ইচ্ছা প্রবল বলেই তিনি সাম্প্রদায়িক লোকসানের ভয়ে এত বেশী উত্তেজিত হয়েছেন—অন্যায় শাসনের দ্বারাও তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে কুণ্ঠিত হননি। সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধর্মই এই। ধর্মের ইতিহাসে সর্বত্রই সকল কালেই দেখতে পাই সম্প্রদায়ের থেকে নির্গমনপথে নির্যাতনের কাঁটার বেড়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর। সাম্প্রদায়িক অধিকার বৈষয়িক অধিকারেরই মতো—রাজার চেষ্টা প্রজাকে আপন শাসনে যেমন করে হোক ধরে রাখা, কেননা প্রজা যে রাজার সম্পত্তি—সম্প্রদায়েরও তেমনি সম্পত্তির বোধ তীব্র। মানুষ সংসার আশ্রম থেকে মুক্তি কামনা করে সাম্প্রদায়িক আশ্রমে প্রবেশ করে কিন্তু সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে যে সাধুনামধারী বিষয়বুদ্ধি জাল পেতে আছে তার থেকে উদ্ধার করবে কে" (১০৩নং চিঠি)? তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সম্মানের কাঁটার মুকুট পরিয়ে বেদনার্ত মহিলাটিকে জটিলতর বেদনার ঘূর্ণিপাকে ফেলতে পরাঙ্মুখ বোধ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

ভগবদ্ভক্তি ও ধর্মাচরণপথের সমস্যায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে নিজে থেকে সন্ধান করে হেমন্তবালা দেবী এসেছিলেন রবীন্দ্র-সান্নিধ্যানে, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। এরূপ প্রসঙ্গের জিজ্ঞাসা নিয়ে অন্য কোনো নারী রবীন্দ্রনাথের উপদেশপ্রার্থী হয়েছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। ধর্মমত ও ধর্মপথে হেমন্তবালা দেবী কিন্তু রবীন্দ্রানুসারী ছিলেন না, বিরুদ্ধ মতবাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে—শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে। এইসব প্রশ্নের গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন স্কুল-কলেজের শিক্ষায় বঞ্চিতা এই অন্তঃপুরচারিণী মহিলার মননশিক্তা ও অধ্যাত্মবোধে, তেমনি তাঁর উত্থাপিত প্রসঙ্গগুলি গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল নিজের অন্তরতম উপলব্ধিকেও। হেমন্তবালা দেবীর লেখার সাহিত্যিক গুণ, তাঁর ভক্তিনিষ্ঠায় আত্মনিবেদনের চরিত্রমাধুর্য অপ্রত্যাশিত আনন্দের স্পন্দন জাগিয়েছিল কবিমনে। এসব কথার উল্লেখ করা হয়েছে আগেও। সব মিলিয়ে হেমন্তবালা দেবী কবিগুরুর চিত্তলোকে এমন একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছিলেন যে, চিঠিপত্র নবম খণ্ডে লিখিত অপূর্ব চিঠিগুলি যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয়েছিল তাঁর লেখনীমুখে। একটা চিঠিতে তিনি তাঁকে বলেছিলেন—"পৃথিবীতে অনেক লোকেরই সংস্রবে আসতে হয়, কিন্তু যথার্থ পরিচয় হয় অল্প লোকেরই সঙ্গে। তুমি এসেছ আমার পরিচয়মণ্ডলের মধ্যে" (২৩৩নং)। এই অন্তরঙ্গ পরিচয়সূত্রে তিনি অপরিসীম স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধার চোখেও তাঁকে দেখেছেন এবং বলেছেন তাঁর চরিত্রে আছে 'অসামান্যতা'। অসামান্যা শুধু তিনি নন, রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসেছেন যত নারী, তার মধ্যে তিনি অনন্যা।

অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে, রবীন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত জীবনীতে এই অনন্যা-সাধারণ মহিলা একেবারেই উপেক্ষিতা এবং অনুক্তা। শুধু আধুনিকতম রবীন্দ্র-জীবনীর চতুর্থ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জীতে দেখা গেল, চিঠিপত্র নবম খণ্ডের উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁর নামটি শুধু ঐ বিশেষ স্থানেই অনিবার্যভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

[ক্রমশ]

অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল, কারণ যথেষ্ট সময় হাতে রেখেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল নিশীথ। কলকাতার পথঘাটের যা হাল—কোনো কিছুই বলা যায় না। সুতরাং যদি কোথাও যাওয়ার থাকে কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে, দেখা করার কথা থাকে কারো সঙ্গে, হাওড়া বা শেয়ালদা থেকে ট্রেন ধরার ব্যাপার থাকে—তা হলে হিসেব করা সময়ের চেয়েও বেশী সময় হাতে নিয়েই বেরোনো ভাল। এবং নিরাপদ। নইলে পরে আফসোস করার কারণ ঘটে যেতে পারে। না-হয় পৌঁছে যাবে কিছু আগে না-হয় সহ্য করতে হবে কিছু অপেক্ষার বিড়ম্বনা। কিন্তু ব্যর্থতা আর হতাশার চেয়ে সে বরং ভাল।

এ সমস্ত যুক্তি নিশীথের নিজের নয়। তার বাবা পরাশর মুখুজ্জে দীর্ঘজীবনের অনেক দেখাশোনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। মাঝে মাঝেই ছেলে নিশীথকে এ ব্যাপারে নানা পরামর্শ এবং উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাতে যে বিশেষ কাজ হয় এমন নয়। নিশীথ একটু আলস্যপরায়ণ, একটু বেশী বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়, গড়িমসি করতে ভালবাসে একটু। এই নিয়ে সকাল বেলাতেই মাঝে মাঝে গালমন্দ করতে শুরু করেন পরাশর। নিজের ঘরের বিছানায় মটকা মেরে শুয়ে চুপচাপ সব শুনে যায় নিশীথ। টুঁ শব্দটি করে না। কারণ, করার মুরোদ নেই। বেকারকে তেজ মানায় না।

পরাশরের বিশেষ আস্থা নেই নিশীথের উপর। প্রয়োজন দেখা দিলে নিজেই ঠেলে-ঠুলে তুলে দেন বিছানা থেকে সাতসকালে, চান করতে যাওয়ার জন্য তাড়া দিয়ে দিয়ে অস্থির করে দেন। তারপর তাড়াতাড়ি থেতে না দিলে শুরু হয় গৃহিণীর উদ্দেশে তর্জনগর্জন। আজকেও কিছু অন্যরকম হয়নি। চিঠিতে সময় দেওয়া ছিল বেলা এগারটা। সাতটা থেকেই স্নানের জন্য ঘন ঘন তাগাদা দিতে শুরু করলেন। বাপের মুখের উপর কিছু বলতে না পেরে নিশীথ মাকে হম্বিতম্বি করে, "কোথায় কি কিছু ঠিক নেই, গরু খেদানোর মত খেদিয়ে বেড়াচ্ছেন সেই ভোর থেকে। এ বাড়িতে আর মানুষ বাস করতে পারবে না—"

সুরবালা কিন্তু কর্তার অনুকূলেই সুর টানলেন, "আহা, ওঁর কি মাথার ঠিক আছে। বছরটা ঘুরলেই রিটায়ার হয়ে যাবেন। চিন্তায় চিন্তায় বলে মানুষটা পাগলের মত হয়ে গেল। আর কি যে বলিস তুই—"

আপন মনে গজরাতে গজরাতেই স্নান খাওয়া সেরেছে নিশীথ, তারপর আধ ঘণ্টার পথের জন্য দু ঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে। বেরোনোর সময় পর্যন্ত উপদেশ দিয়েছেন পরাশর, "ঢুকেই গুড মর্নিং স্যার বলবি। বসতে না বলা পর্যন্ত বসবি না। আর উলটোপালটা জবাব দিবি না একেবারে—"

সুরবালা যথারীতি পকেটে ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল গুঁজে দিয়েছেন আর পিছন থেকে অস্ফুটে উচ্চারণ করেছেন সর্বসংকটনাশিনী দুর্গানাম।

বেয়ারা-নির্দেশিত ঘরের মধ্যে ঢুকে নিশীথ একটু অবাক হয়ে গেল। সে নিজেই এসেছে যথেষ্ট আগে। তা সত্ত্বেও দেখল এর মধ্যেই বেশ কয়েকজন এসে গেছে। অপেক্ষা করছে বসে বসে। তার মধ্যে আবার গুটি তিনেক মেয়ে। এই এক জ্বালাতনবিশেষ। মনে মনে 'জ্বালাতন' কথাটা উচ্চারণ করল নিশীথ। যারা কেবল মেয়ে চায় তারা বিজ্ঞাপনে সরাসরি লিখে দেয় তা, আর যারা কোনো কিছু বিশেষভাবে উল্লেখ করে না সেখানে গিয়ে ঠিক দেখবে ছেলে আর মেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। তার ফলে সামিল হতে হয় এক অসম প্রতিযোগিতায়। স্বভাবতই মেয়েরা একটু কোমল, লালিত্য এবং লাবণ্যময়ী হয়, ফলে অবধারিতভাবে নির্বাচকের মন অজ্ঞাতসারেই ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে একটু। এ যেন রেসের ঘোড়াকে হ্যান্ডিক্যাপ দেওয়ার মত—

পরাশরের মত সাবধান প্রকৃতির মানুষ যে আরো অনেক আছে—এই আবিষ্কারটা যতখানি না অবাক করেছে নিশীথকে, তার চেয়ে আরো বেশী অবাক হয়েছে সে ভিন্ন কারণে। এক দিনই কাগজে বেরিয়েছিল বিজ্ঞাপনটা। ওয়াণ্টেড এ স্টেনোগ্রাফার কাম টাইপিস্ট—। একটা ছোটখাট সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে দেওয়া। নিশীথের কেমন ধারণা হয়েছিল খুব বেশী লোকের চোখে পড়বে না এটা, আর যদি বা পড়ে, যেহেতু ভ্যাকান্সি মোটে একটাই, কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনার পর দু-চারজনকে ডাকবে আর তার ভেতর থেকেই বেছে নেবে যোগ্যতম ব্যক্তিকে। খুব নিরাসক্তভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা পাঠিয়ে দিয়েছিল নিশীথ যেমন পাঠায় আরো নানান জায়গায়, তারপর ভুলে গিয়েছিল সব কিছু বেমালুম। পরশুদিন ইণ্টারভিউ-এর চিঠি পেয়ে বিজ্ঞাপনের কাটিংটা খুঁজে বার করল, এবং সচেতন মনের চরম নিস্পৃহতা সত্ত্বেও কেন জানি মনের খুব গভীরে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছিল নিশীথের।

কিন্তু এখানে পা দিয়েই সেই আশার বাষ্পটুকু নিমেষে অন্তর্হিত হল। এত আগে এত লোকের সমারোহ, নিঃসন্দেহে আরো অনেকে আসবে ক্রমে ক্রমে, এবং তারপর যথারীতি যা হয়, আর একটা নিষ্ফল উদ্যমজনিত হতাশা, মন খারাপ, বিশ্বসংসারের প্রতি ক্ষোভ, জ্বালা, ঘেন্না—

নিশীথ বেঞ্চের একটা ধার দখল করে বসল। তারপর হাতের ইংরিজী পত্রিকাটায় মনোনিবেশ করল গভীরভাবে। সিচুয়েশন ভ্যাকাণ্ট কলমটা তাকে দেখতে হয় না। ওটা পরাশরেরই প্রাত্যহিক দায়। ভোরবেলা কাগজ পাওয়ার সংগে সংগে তিনি নিজেই তন্ন তন্ন করে সব দেখেন এবং জুতসই কোনো বিজ্ঞাপন দেখলে লাল পেন্সিল দিয়ে ঘেরা দিয়ে দেন পাশে। পরে নিশীথকে বলেন, "একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দিস—"। নিশীথ এখন খবরের কাগজের নানারকম খবর পড়তে লাগল। সকালবেলা পড়ার সময় পায়নি। কিন্তু কিই বা আছে পড়ার! সেই তো শুধু বড় বড় কথার ফানুস ওড়ানো হাওয়ায়।

ক্রমে হলঘরটা নবাগত কর্মপ্রার্থীদের ভিড়ে ভরে উঠল। নিশীথের আশেপাশে চাপা স্বরে ফিসফাস কথাবার্তা। অনেকেই পুরো সুট পরে এসেছে। ইণ্টারভিউ-এর জন্য বিশেষ পোশাক। ওদের দেখলে হাসি পায় নিশীথের। ওতে এখন আর কারো মন ভেজে না। এসেছে মেয়েরাও। খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে নিশীথ মাঝে মাঝে দেখেছে আবার ডুবে গেছে কাগজের মধ্যে। হঠাৎ একেবারে কাছে মেয়েলী কণ্ঠস্বরে সে চমকে উঠল, "আরে, তুমি এখানে!"

নিশীথ চোখ তুলে সামনেই দেখল—অর্চনা। নির্বাক বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল কয়েক পলক। অর্চনাই অবশেষে আবার বলল, "তুমিও ইণ্টারভিউ দিতে এসেছ নাকি?"

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল নিশীথ। বলল, "সেই একই প্রশ্ন তো আমারও।"

সে কথার জবাব না দিয়ে অর্চনা বলল, "কই, সেদিন তো বলনি কিছু—"

মৃদু হাসল নিশীথ, "বলনি তো তুমিও।"

নিশীথ আর অর্চনা প্রেমিক প্রেমিকা। কিন্তু 'প্রেমিক প্রেমিকা' শুনলেই মান-অভিমান বিরহ-মিলন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত বিবাহের মাধ্যমে ভালবাসার চরম প্রতিষ্ঠালাভ ইত্যাদি যে সমস্ত অনুষঙ্গগুলো মনে জেগে ওঠে নিশীথ আর অর্চনার প্রেমে সেই সব ব্যাপারগুলো প্রায় নেই বললেই হয়।

বস্তুত ওদের বয়সের তুলনায় ওরা অনেক বেশী অভিজ্ঞ, পরিণত ও মোহমুক্ত। বাস্তববত্তাবোধ যথেষ্ট প্রখর। দুজনেই বেকার অথচ দুজনের উপরই সংসার অনেকখানি নির্ভরশীল। নিশীথের বাপ পরাশরের রিটায়ার করতে যদি বা দেরি আছে বছরখানেক, অর্চনার জন্মদাতা অনুতোষ পঙ্গু, চলৎশক্তিহীন, দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী। অর্চনার বড় ভাই সুব্রত বিয়ে করে বউ নিয়ে আলাদা বাসা করেছে ভবানীপুরে, নিজের খরচাপাতি চালিয়ে বাপের সংসারে কিছু সাহায্য করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সুতরাং অর্চনার একেবারে শিরে সংক্রান্তি। অথচ দুজনের কে যে কবে চাকরি-বাকরি পাবে, আদৌ পাবে কিনা—তা ওরা সঠিক বলতে পারে না কেউ।

তবু ওরা প্রেমিক প্রেমিকা। দুজন পছন্দ করে দুজনকে। সপ্তাহে এক দিন ওরা দেখা করে মেট্রোর সামনে অথবা কার্জন পার্কের ট্রাম গুমটির তলায়। দুজনেরই গুটি কয় করে কৃশকায় টিউশনি আছে। হয়তো দুজনে একসঙ্গে একটা সিনেমা দেখে, একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে সামান্য কিছু খায়, কিংবা হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় গঙ্গার ধারে। গড়ানে ঢালু পাড়ে পাশাপাশি বসে গল্প করে খানিক। সে গল্পে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো রঙিন জল্পনাকল্পনা থাকে না, নেহাতই সাদামাটা গদ্য আলাপ, বড় জোর 'তোমাকে আজ ভারী মিষ্টি লাগছে' বা 'সপ্তাহের এই একটা দিন বাকি ছটা দিনের রসদ যোগায়' এই পর্যন্ত কিছু নিরাপদ ভাবালুতা। বিয়ে-টিয়ের কথা কেউ উচ্চারণ করে না। ভাবেও না হয়তো।

টাইপ স্কুলে আলাপ। বি এ পাস করার পর বেয়াকুবের মত বসে থেকে থেকে হয়রান হয়ে গিয়ে নিশীথ টাইপ আর শর্টহ্যান্ড শিখতে ভর্তি হয়ে গেল যদি ঐদিক থেকে কিছু হিল্লে হয়ে যায়। অর্চনা অনেক বেশী চালাক। সে হায়ার সেকেন্ডারী পাস করেই ভর্তি হয়েছে টাইপ শিখতে। নিশীথ যখন সবে আনাড়ীভাবে টাইপের সরগম এ এস ডি এফ জি গতে আঙ্গুল ঠুকতে শুরু করল, ততদিনে অর্চনার স্পিড উঠে গেছে তিরিশ, আর শর্টহ্যান্ডের সাংকেতিক আঁকিবুকিও অনেক সহজ সরল হয়ে গেছে তার দৃষ্টির সামনে। অর্চনার পাশের টেবিলে বসেই টাইপ করত নিশীথ। প্রথম প্রথম এটা ওটা দেখিয়ে নিত, আলাপ আর একটু গাঢ় হলে টাইপ করিয়ে নিত চাকরির দরখাস্ত।

সেই আলাপ থেকে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। টাইপ স্কুল থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে খানিকটা হেঁটে যাওয়া, হাঁটতে হাঁটতে কথা প্রসঙ্গে পরস্পরের খোঁজখবর নেওয়া, কে কোথায় চাকরির দরখাস্ত ছাড়ল, কোনটার সম্ভাবনা কতটা এই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। ঐ অভ্যাসটা রয়ে গিয়েছিল টাইপ স্কুল ছেড়ে দেবার পরও। ততদিনে দুজনেরই হাত পেকেছে, মাস মাস মাইনে গুনতে কষ্ট হয় বলে ছেড়ে দিয়েছিল স্কুল। এখন সপ্তাহে এক দিন দেখা হয়। শনি বা রবিবার। মেট্রোর সামনে বা কার্জন পার্কের ট্রাম গুমটির তলায়। দেখা হলেই সারা সপ্তাহের জমা কথা উপচে ওঠে দুজনের মুখে, "এ জি বেঙ্গল অ্যাডভার্টাইজ করেছে।"

"রিজার্ভ ব্যাংকেরটা ছেড়েছ?"

"না। টেস্টিমোনিয়ালস সব এখনও যোগাড় হয়ে ওঠেনি।"

"ইনকাম ট্যাক্সে লোক নেবে শুনেছি—"

"ওখানে তো আবার এক্সচেঞ্জ থেকে ফরোয়ার্ড করাতে হয়—"

"আমার কার্ডটা আবার ল্যাপস্ করে গেছে—"

"রিনিউ করিয়ে নিও—"

গভীর গম্ভীর মুখে সব দরকারী কথাবার্তা। নিরুচ্ছ্বাস নিরুত্তাপ আবেগহীন হিসেবী আলাপ। অথচ সপ্তাহে ঐ একটা দিন কোনো কারণে দেখা না হলে দুজনেরই মন খারাপ হয়ে যায়। পরের সপ্তাহটাকে ছায়াহীন মরুভূমির মত উত্তপ্ত আর দীর্ঘ আর অনাবশ্যক মনে হতে থাকে।

আসলে আজকের এই চাকরির দরখাস্তের ব্যাপারটা দুজনেই বলতে ভুলে গেছে। এমনি ছোটখাট জায়গায় রাশি রাশি কত অ্যাপ্লিকেশনই তো ছাড়ছে। সপ্তাহান্তে দেখা হলে সবগুলোর কথাই কি মনে থাকে আর! এ সব গুরুত্বহীন অনুল্লেখ্য কত দরখাস্তই সাড়াশব্দহীনভাবে হারিয়ে যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে এখান থাকে দুজনেই সাড়া পেয়েছে। পেয়েছে ইন্টারভিউ-এর চিঠি। আর ইন্টারভিউ দিতে এসে দুজন দুজনকে দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেছে।

নিশীথ দেখছিল অর্চনাকে আজ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে ওর মুখে একখানা বিষাদের মেঘ সব সময় ছায়া ফেলে রাখে। যখন চুপ করে থাকে অর্চনা, কথা বলে না, দেখে মনে হয় সে বড় দুঃখী। কি যেন একটা গোপন ব্যথা সদাই কুরে কুরে খাচ্ছে ওর ভেতরটা। নিশীথের কোনো রসিকতায় হয়তো সাময়িকভাবে হেসে ওঠে সে, কিন্তু পরক্ষণেই বেদনার সেই প্রগাঢ় ছায়াটা আবার তার মুখে স্থায়ীভাবে ফিরে আসে। অথচ, নিশীথ দেখছিল অর্চনার মুখের সেই স্থায়ী বিষাদ আজ লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। তার চোখ দুটো চকচক করছে কি যেন এক অলৌকিক উত্তেজনায়, হাত পা নাড়ার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে খুশির বিদ্যুৎ। এই মুহূর্তে যদি সে হঠাৎ গুনগুনিয়ে গান গেয়ে ওঠে তা হলেও বুঝি খুব অবাক হওয়ার কিছু নেই। যেন অর্চনা হঠাৎ একটা খুব খোশখবর পেয়ে গেছে। মনের মত সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে পাকা হয়ে গেলে যেমন পরিবর্তন আসে মেয়েদের হাবেভাবে আচরণে চলাফেরায় দৃষ্টিপাতে, তেমনি একটা ঋতুবদল যেন উপচে অর্চনার ভেতর থেকে।

নিশীথ বলল, "কি ব্যাপার! আজ খুব খুশী খুশী দেখছি যে?"

অর্চনা খুশি গোপন না করেই বলল, "খুশী? কে খুশী?"

"তুমি।"

একটু চুপ করে রইল অর্চনা, চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিল কাছাকাছি কেউ আছে নাকি শ্রুতির সীমানার মধ্যে। তারপর বুকের কাছে অল্প সরে এসে গলা নামিয়ে

ফিসফিস করে বলল, "জান নিশীথ, আমার বোধ হয় হয়ে যাবে চাকরিটা—"

নিশীথ খুব অবাক হয়ে গেল। অর্চনা খুব একটা হালকা চরিত্রের মেয়ে নয়। সে যখন বলছে কথাটা তখন নিশ্চয়ই কিছু গূঢ়ত্ব আছে বলার মধ্যে। তবু লঘু স্বরে নিশীথ বলল, "সে তো সব ইণ্টারভিউ দিয়েই মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই তো টেকে না—"

"না, না। সেরকম মনে হওয়া নয়—" গম্ভীর হয়ে উঠল অর্চনা।

"তা হলে অন্যরকম কি শুনি—"

ক্ষণেক চুপ করে থেকে অর্চনা বলল, "জান, পরশুদিন তো পেলাম ইণ্টারভিউ-এর চিঠি, চিঠিটা পড়তে পড়তে হঠাৎ বাবার মনে পড়ে গেল এই কোম্পানির মালিক হলেন গিয়ে হরিসাধন দত্তগুপ্ত— মানে বাবার ছাত্র, মানে বাবা ছিলেন হরিসাধন দত্তগুপ্তের ছেলে-বেলাকার প্রাইভেট টিউটর। তখনই একটা চিঠি লিখে দিলেন বাবা। তাই নিয়ে ছুটলাম নিউ আলিপুরে। খুব ভাল ব্যবহার করলেন হরিসাধনবাবু, বাবার চিঠিটা পড়ে বললেন, "তুমি মাস্টার মশাইয়ের মেয়ে! তা হলে আর কি—" প্যাডের কাগজে একটা চিঠি লিখে দিয়ে বললেন, "এই চিঠিটা দেখিও স্টাফ ম্যানেজার অনিরুদ্ধ ঘোষকে। উনি একাই নেবেন ইণ্টারভিউ। তা হলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে—" বলতে বলতে অর্চনা নিজের হাতের ছোট্ট ক্লিপ ফাইল খুলে একখানা খাম বাড়িয়ে ধরল নিশীথের দিকে।

খাম খুলে চিঠিখানা পড়তে পড়তে নিশীথের মনে হচ্ছিল এ অন্যায়, ভীষণ অন্যায়। এখানে একরাশ ছেলেমেয়ে জড়ো হয়েছে, একটাই মোটে ভ্যাকান্সি, অথচ ভেতরে ভেতরে সেটা আগে ভাগেই ভর্তি হয়ে গেছে। এই সব ছেলেমেয়েরা বসে আছে সব ফালতু অকারণ। আসলে ভেতর থেকে টেনে নেবার লোক না থাকলে আজ-কাল কোথাও কিছু হওয়ার জো নেই। কথাটা খুব খাঁটি। এতদিনে অর্চনা সেই ভেতরকার টানের একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছে, সুতরাং নিঘাত একটা কিছু হয়ে যাচ্ছে ওর। আর নিশীথ নিজে এখনও পারল না, অতএব সে রইল পড়ে। একটা অস্পষ্ট রাগ আর জ্বালা তার মনের মধ্যে অস্থিরভাবে দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল—

নিশীথের অন্তরের ক্ষোভ বোধ হয় তার কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ল, "তাহলে আর কি হবে। বাড়ি চলে যাই—"

অকৃত্রিম বিস্ময়ে অর্চনা বলল, "কেন?"

"শুধু শুধু আর ইণ্টারভিউর ফাস্ট-নস্টি করে কি লাভ। চাকরি হওয়া যখন তোমারই পাকা"—

নিশীথকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যই অর্চনা বলল, "হবেই এমন কি গ্যারাণ্টি আছে। যদি আমার ইণ্টারভিউ খুব খারাপ হয়, যদি অনেক ভুল বেরোয় টাইপে আর শর্ট-হ্যাণ্ডে। এত ভুল যে—"

"থাম থাম!" যেন ধমকে উঠল নিশীথ, "ওসব কথায় লাভ কি। তুমিও জান আমিও জানি, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে—" শেষের দিকে নিশীথের কণ্ঠস্বরে তিক্ততা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

দু চোখে ম্লান বিস্ময় ফুটিয়ে নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অর্চনা। এই নিশীথকে যেন সে আগে কোনোদিন দেখেনি। চেনে না। বিষণ্ণস্বরে বলল,
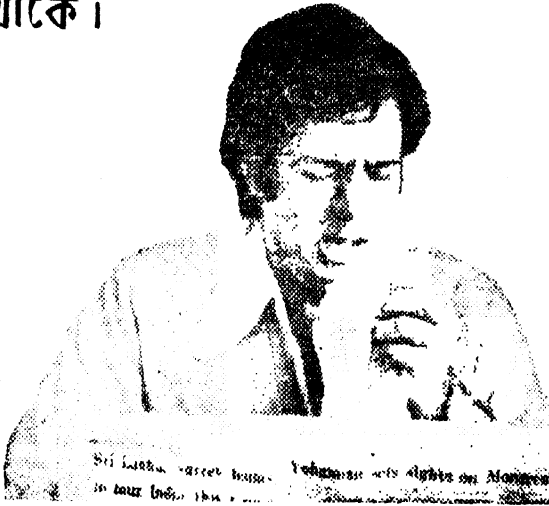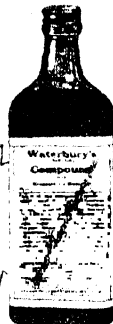
"আমার চাকরি হলে তুমি খুশী হবে না নিশীথ?"

আর অর্চনার এই প্রশ্ন যেন সহসা নিশীথকে তার সুস্থতা আর স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনল। আশ্চর্য। অর্চনা তার প্রেমিকা, ভালবাসার জন, একটা চাকরির বিশেষ প্রয়োজন, এই মুহূর্তে সে সেটা পেতে চলেছে—। এখন ত নিশীথের সুখী আর আনন্দিতই হওয়ার কথা। ভালবাসার মানুষের যদি কিছু ভাল হয়, উন্নতি হয়, মঙ্গল হয় তবে কার না ভাল লাগে। অথচ অর্চনার চাকরি হবে শুনে একটু আগে সে কি অদ্ভুত আচরণই না করছিল। রেগে গিয়েছিল নীচ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরের মত। তা হলে কি সে অর্চনাকে ভালবাসে না? প্রশ্নটা এক-খানা খড়্গের মত তার সামনে কিছুক্ষণ ঝুলে রইল। তারপর সে নিজেকেই নিজে উত্তর দিল : না, না। অর্চনাকে আমি ভাল-বাসি। খুব ভালবাসি। ওর যেন কোনো ক্ষতি না হয়, খারাপ না হয়। ভাল হোক ওর। উন্নতি হোক, চাকরি হোক—। তা হলে সে অমন খেপে গিয়েছিল কেন? নিজের সেই সমস্তকার মনোভাবের কোনো সমর্থ করতে না পেরে নিশীথ নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়ে উঠল।

অর্চনা আবার প্রশ্ন করল, "আমার চাকরি হবে শুনে তুমি খুশী হওনি?"

তাড়াতাড়ি জবাব দিল নিশীথ, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। হয়েছি। খুব খুশী হয়েছি। ভীষণ—ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আমার। জান অর্চনা, তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেলে আমরা কিন্তু একদিন সেলিব্রেট করব। পার্ক স্ট্রীটের একটা ভাল রেস্তরাঁতে—"

নিশীথের উচ্ছ্বাসটা একটু অতিরিক্ত শোনাচ্ছিল কি? সহসা থেমে গেল সে। দু চোখে হাসি নিয়ে নিশীথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অর্চনা, অবশেষে বলল, "নিশ্চয়, সে আর বলতে—"

এই সময় হলঘরের ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে গেল। সেই পথে ঢুকে এল একজন লোক, সাদা উর্দি পরা এক বেয়ারা। দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়েই লোকটি গলা তুলে বলল, "এই যে। আপনারা গোলমাল করবেন না। কাইন্ডলি সকলে কাছে এগিয়ে আসুন।"

পলকে পরস্পর কথোপকথনের মিলিত গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই পায়ে পায়ে এগিয়ে জড়ো হল সেই লোকটির কাছাকাছি। নিশীথ আর অর্চনাও গিয়ে দাঁড়াল এক-পাশে। একটু অপেক্ষা করে লোকটি বলতে শুরু করল, "শুনুন। আপনাদের ইন্টারভিউ নেওয়া এখনি শুরু হবে। বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আপনারা চুপচাপ বসে অপেক্ষা করবেন। গোলমাল করবেন না। বেয়ারা যেমন যেমন নাম ডাকবে একজন একজন করে ভেতরে যাবেন। ইন্টারভিউ হয়ে গেলে বাড়ি চলে যাবেন, এখানে দাঁড়িয়ে জটলা করবেন না অযথা। খবরাখবর প্রত্যেককে ডাকযোগে জানিয়ে দেওয়া হবে।"

প্রথমেই নিশীথের ডাক পড়ল। বাইরে এসে বেয়ারা হাঁকল, "নিশীথ মুখার্জি। নিশীথ মুখার্জি ভেতরে চলে যান।—"

নিশীথ অর্চনার দিকে তাকাল। ভয়-ভয় হাসি মুখে বলল অর্চনা, "এই মরেছে। প্রথমেই যে তোমার ডাক পড়ল।"

মনে মনে নিশীথ ভাবল : ভালই হল। প্রহসনপর্ব যত তাড়াতাড়ি চুকেবুকে যায় ততই মঙ্গল। তবুও অভ্যাসবশত সে তার শার্ট প্যান্ট একটু টেনেটুনে ঠিকঠাক করে নিয়ে বেয়ারার পেছন পেছন লাগোয়া ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঘরের বিপরীত দেয়াল ঘেঁষে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল. সেই টেবিল কোলে নিয়ে বিরাটবপু এক পুরুষ বসে আছেন। ধবধবে ফর্সা কাঁচাপাকা চুল সত্ত্বেও দু-পাশের জুলফি চিবুক পর্যন্ত নামান। পরিধানে কোট প্যান্ট টাই। মুখাবয়বে আত্মবিশ্বাস ও অহমিকা প্রকট। নিশীথ মনে মনে উচ্চারণ করল : স্টাফ ম্যানেজার। এতগুলো ছেলে-মেয়ের ভাগ্য নিয়ে খেলা করার সুযোগ পেয়ে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই এখন ভেতরে ভেতরে খুব ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। নিজেকে প্রায় ঈশ্বরের মত মনে হচ্ছে তার। কিন্তু হায়, ভদ্রলোক এখনও জানেন না তার সব ক্ষমতাই খর্ব হয়ে গেছে। তিনিও এখন নাচের পুতুল।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিশীথ বলল, "গুড মর্নিং স্যার।"

মুখ না তুলেই তিনি গুড বললেন প্রত্যুত্তরে। সামনের চেয়ার নির্দেশ করে অস্ফুটে বললেন, "সিট ডাউন। ইওর নেম প্লিজ?"

নিশীথ নিজের নাম বলল।

একটু দূরে একটা ছোট টেবিলে পোর্টেবল টাইপরাইটার নিয়ে একরাশ কাগজপত্র নিয়ে বসে ছিল অ্যাংলোর সেই লোকটি। তার দিকে তাকিয়ে স্টাফ ম্যানেজার বললেন, "অমিয়, নিশীথ মুখার্জির অ্যাপ্লিকেশন—"

সঙ্গে সঙ্গে সেটা এ টেবিলে পৌঁছে গেল।

দরখাস্তটা হাতে নিয়ে স্টাফ ম্যানেজার উলটে পালটে দেখলেন, চোখ বুলিয়ে নিলেন দ্রুত, তারপর বললেন, "আপনি চার বছর আগে বি এ পাস করেছেন?"

"ইয়েস স্যার।"

"এর আগে কোথায় কাজ করেছেন?"

"কোথাও না।"

চোখ তুলে নিশীথকে দেখলেন স্টাফ ম্যানেজার। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "কেন? হোয়াই?"

নিশীথ মনে মনে বলল : ন্যাকা। ইন্টার-ভিউ নিতে বসেই দেশের হালচাল ভুলে গেছ। মুখে বলল, "এর আগে কোথাও কাজ করার সুযোগ হয়নি।"

"দ্যাটস অফুলি ব্যাড। আফিসের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে আপনার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাহলে।"

খুব রেগে যাচ্ছিল নিশীথ। চাকরি হবে স্থির হয়ে আছে আর একজনের, আর এখানে বসে যত ভ্যানতাড়া শুনতে হচ্ছে তাকে। কাটা কাটা স্বরে জবাব দিল সে, "অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ যদি না পাওয়া যায় তবে অভিজ্ঞতা হবে কিভাবে?"

একটু যেন থতিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সামান্য নীরবতার পর মাথা নেড়ে নেড়ে তিনি বললেন, "দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট। ইটস এ প্যারাডকস্। নো ডাউট অফ দ্যাট। চাকরির বাজার মন্দা অথচ নিয়োগের সময় আমরা সর্বদা অভিজ্ঞ লোকের সন্ধান করি।"

তা হলেই বুঝুন—দু চোখে এই জাতীয় একটা দৃষ্টি ফুটিয়ে নীরবে বসে রইল নিশীথ।

হঠাৎ স্টাফ ম্যানেজার বললেন, "ডিক-টেশন নিন।"

নিশীথ তৈরী হয়েই এসেছিল। তাড়া-তাড়ি নিজের ফাইল খুলে ডিকটেশন নেওয়ার ছোট প্যাড আর পেন্সিল বার করল। স্টাফ ম্যানেজার টেবিলের ড্রয়ার টেনে ইংরাজি খবরের কাগজটা বার করলেন, তার-পর দ্রুত পড়তে শুরু করলেন যে কোনো একটা জায়গা থেকে। নিশীথ নীরবে মাথা নিচু করে শর্টহ্যান্ডের সাংকেতিক লিপিতে সেই ডিকটেশন তুলে নিতে লাগল। দেশের নিরন্ন এবং তীব্র বেকার সমস্যা সম্পর্কে সরকার বর্তমানে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। অবিলম্বে এমন সব কার্যকর ব্যবস্থা অব-লম্বিত হতে চলেছে যাতে করে এই ভয়াবহ সমস্যার কিছু অংশ সুরাহা হতে পারে। নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারে বৃহৎ বা ভারী শিল্পের চেয়ে ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা অনেক বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংক জাতীয়করণের পরে ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণ অনু-দানের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আশা করা যায়—

যেমন হঠাৎ শুরু করেছিলেন তেমন হঠাৎই থেমে গেলেন ভদ্রলোক। বললেন, "নাউ গেট ইট টাইপড্। অমিয়, মিস্টার মুখার্জিকে টাইপ মেশিনটা দেখিয়ে দাও।"

একখানি ডিকটেশন, মেশিনে চড়াতে না চড়াতেই টাইপ হয়ে গেল। অমিয়ই আবার নিশীথকে নিয়ে এল এ ঘরে। টাইপ কপিটা স্টাফ ম্যানেজারের টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, "রেডি মিনিট স্যার।"

"গুড। দ্যাটস ভেরি গুড।"

নিশীথ বেরিয়ে যাচ্ছিল। দরজার বাইরে

এসে টেনে দরজার পাল্লা ভেজাতে ভেজাতে শুনতে পেল স্টাফ ম্যানেজারের কণ্ঠস্বর অমিয়কে লক্ষ করে, "এ ভেরি স্মার্ট বয়। আই লাইক হিম—"

কিন্তু তাতে কি লাভ। কতটা কি আসে যায় মিঃ স্টাফ ম্যানেজার আপনার পছন্দে বা অপছন্দে—! অর্চনার মুখোমুখি হওয়ার আগেই মুখের তিক্ত হাসিটা মুছে ফেলল নিশীথ।

অর্চনা বলল, "তুমি কি এখনি বাড়ি চলে যাবে?"

নিশীথ বলল, "বসে থেকে কি আর হবে: তা ছাড়া থাকতে নিষেধও রয়েছে।"

অর্চনার মুখখানা অপরাধীর মত দেখাল, "একটু বসে গেলে দুজনে বেশ একসঙ্গে যেতে পারতাম—"

একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল নিশীথকে। কি যেন ভাবল। বলল, "বেশ।" অর্চনার পাশেই বসল সে।

খানিক চুপ করে থেকে অর্চনা বলল, "কেমন হল ইন্টারভিউ?"

"কি জানি—"

অর্চনা হাসল এবারে, "কি জানি মানে? তুমি ইন্টারভিউ দিলে আর তুমি জান না?"

অর্চনাকে দেখল নিশীথ। বলল, "হাবিজাবি প্রশ্ন করল। আমিও চ্যাটাং চ্যাটাং শুনিয়ে দিলাম। ল্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়—"

ইঙ্গিতটা অর্চনার কাছে প্রীতিকর নয়। আর কথা না বাড়িয়ে সে চুপ করে রইল। চুপ করে রইল নিশীথও। চুপচাপ বসে রইল দুজনে। বেয়ারা একের পর এক নাম ডেকে যাচ্ছে। একজনের পর একজন উঠে ভেতরে যাচ্ছে, পাঁচ সাত বা দশ মিনিট পরেই বেরিয়ে আসছে বাইরে, তারপর মুখে রাজ্যের গাম্ভীর্য ফুটিয়ে যে যার ব্রীফ কেস ঝুলিয়ে বা ফাইল বগলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে হলঘরটা ফাঁকা হয়ে এল। এখানে ওখানে বসে আছে দু চারজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

হঠাৎ নিশীথ প্রশ্ন করল, "তুমি ডিকটেশন নেওয়ার প্যাড এনেছ?"

চমকে ঘুরে নিশীথের দিকে তাকাল অর্চনা, "আঁ। না তো—"

"সে কি। স্টেনোগ্রাফারের পোস্টে ইন্টারভিউ দিতে এসেছ, আর ডিকটেশন নেওয়ার জন্য রেডি হয়ে আসনি!"

এবারে সত্যই অর্চনাকে অপরাধীর মত দেখাচ্ছিল, "তাই তো। একেবারে খেয়াল করিনি। খুব ভুল হয়ে গেছে—"

ঠোঁট টিপে টিপে হাসল নিশীথ, "আসলে চাকরি হওয়ার গ্যারান্টি পেয়ে গেলে কিছুই আর খেয়াল থাকে না—"

অর্চনার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে চুপ করতে বলে। নিশীথ যেন একটা পুরনো ঘা-কেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগদগে করে তুলতে চাইছে। অর্চনা বুঝতে পারছিল আসলে ওর মনের তিক্ততা আর জ্বালা বার বার নানা ছুতোনাতায় বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু অর্চনা কি করতে পারে। কেন বোঝে না নিশীথ নিছক তার মনস্তুষ্টির জন্য অর্চনা হাতের সুনিশ্চয় পাখিটাকে আকাশে উড়িয়ে দিতে পারে না। এ বড় কঠিন সময়। দয়াহীন নিষ্ঠুর। মোচার মত সরু হতে হতে ক্রমে সূচাগ্র শিখর। এখানে এখন একজনেরই ঠাঁই হতে পারে। কেবল একজনের—

দরজার বাইরে এসে বেয়ারা হাঁকল, "অর্চনা মিত্র।"

হাঁক শুনে চমকে দাঁড়িয়ে উঠল অর্চনা। নিশীথের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার নাম ডাকল। তাই না?—"

নিজের ফাইল খুলে ডিকটেশন নেওয়ার প্যাড আর পেন্সিল সামনে বাড়িয়ে ধরে নিশীথ বলল, "হ্যাঁ। এ দুটো সঙ্গে নিয়ে যাও। চাকরিটা পাকা হলেও ইমপ্রেসনের দাম আছে একটা—"

হাত বাড়িয়ে সে দুটো নিল অর্চনা, "থ্যাংক ইউ।" তারপর নিজের অটোক্লিপ ফাইল খুলে প্যাড পেন্সিল রাখতে রাখতে হঠাৎ কি ভেবে ফাইলের কাগজপত্র নেড়েচেড়ে দেখল একটু। প্রথমে আলগা ভাবে। তারপর নিশীথ দেখল অর্চনার হাত দুটো খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, একটার পর একটা কাগজ উলটোচ্ছে, খুলে খুলে দেখছে, পাগলের মত হাঁটকাচ্ছে কাগজপত্র সার্টিফিকেট প্রশংসাপত্র—

সবিস্ময়ে নিশীথ বলল, "কি ব্যাপার?"

ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই মুখ তুলে নিশীথকে দেখল অর্চনা। নিশীথ দেখল অর্চনার মুখ ছাই-এর মত সাদা, কে যেন পলকে সে মুখ থেকে সব রঙ সব রক্ত নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। বিবর্ণ ঠোঁট দুটো নেড়ে কোনো রকমে অস্ফুটে বলল অর্চনা, "চিঠিটা—"

"কোন্ চিঠিটা?"

"হরিসাধনবাবু দিয়েছিলেন—। চিঠিটা—ফাইলে নেই তো—"

আর সেই মুহূর্তে নিশীথ নিজের প্যান্টের বাঁ পকেটে একটা চৌকো খামের অস্তিত্ব অনুভব করল। অনেকক্ষণ ধরেই সেটা রয়েছে পকেটে, কিন্তু এতক্ষণ সে খেয়াল করেনি। এখন অর্চনা বলাতেই সেই খামের শক্ত চারটে কোণ যেন খোঁচা দিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে লাগল। সন্তর্পণে বাঁ হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে খামখানাকে চেপে ধরল নিশীথ। নিস্পৃহ মুখে বলল, "ভাল করে খুঁজে দেখ। যাবে কোথায়—"

অর্চনা আবার মুখ নামিয়ে পাগলের মত ফাইলের কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজছে, এলোমেলো অস্থির হাতে সব টেনে টেনে বার করছে, হতাশভাবে ফেলে দিচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়, নিশীথ সব কুড়িয়ে নিয়ে আসছে। চিঠিটা নেই—

নিশীথ ভাবল : এখনও সময় আছে। এখনও সে পারে পকেট থেকে খামটা বার করে অর্চনার দিকে বাড়িয়ে ধরতে : এই নাও তোমার চিঠি। মুখে টেনে আনতে হবে একটা দুষ্টুমির হাসি। তা হলেই ব্যাপারটা একটা ঠাট্টার স্তরে থেকে যায়, কেমন মজা করা গেল একটা—এই ভাব। নিশীথ যখন হাতে নিয়ে দেখছিল চিঠিটা ঠিক সেই সময় অমিয় নামে সেই লোকটি বাইরে বেরিয়ে এসে সব ইন্টারভিউ প্রার্থীকে কাছে জড়ো হতে বলেছিল। তাড়াতাড়িতে নিশীথ চিঠিটা খামে পুরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল নিজেরই পকেটে। ঈশ্বরের দিব্যি, কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তার তখন—। অর্চনার খেয়াল নেই, সে নিজের ফাইলের মধ্যেই খুঁজে মরছে নিরুদ্দেশ প্রাণভোমরা—। একমাত্র নিশীথই এখন পারে অর্চনাকে পুনর্জীবন দিতে—

কিন্তু সেই স্টাফ ম্যানেজার অনিরুদ্ধ ঘোষ অমিয় নামক কেরানীটিকে বলেছিলেন নিশীথ সম্পর্কে : এ ভেরি স্মার্ট বয়। আই লাইক হিম। ভাবনাটা একটা রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে দিল নিশীথের মনে। কে জানে কি হতে পারে, কত কি হওয়া সম্ভব, সকলের সামনেই রয়েছে সমান সুযোগ, আপন যোগ্যতার মাপকাঠিতে নির্ধারিত হোক, কে জয়ী আর কেই বা পরাজিত—

হঠাৎ নিশীথ দেখল অর্চনা তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে টানটান ভঙ্গিতে তার এক চোখে সন্দেহ, আর এক চোখে মিনতি। ফিস ফিস করে বলল অর্চনা, "তুমি জান না নিশীথ? সত্যিই জান না কি হল চিঠিটা?—"

এখন নিশীথ কি জবাব দেবে? ক্ষণকাল আগেকার অর্চনার সেই ভাবনাটাই অস্পষ্ট ভাবে ফিরে এল নিশীথের মনে। এ বড় কঠিন সময়। দয়াহীন নিষ্ঠুর। মোচার মত সরু হতে হতে ক্রমে সূচাগ্র শিখর। এখানে এখন একজনেরই ঠাঁই হতে পারে। কেবল একজনের—

অর্চনার সেই দৃষ্টির সামনে মুখ নামিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নিশীথ। বেয়ারার কণ্ঠস্বর বড় হলঘরের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল। অর্চনা মিত্র—। অর্চনা মিত্র—। অর্চনা—

বিশ্ব বিজ্ঞান

বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান লেখক

৪ থেকে ৯ আগস্ট এই ছয় দিন বিজ্ঞান লেখকদের একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র বসেছিল কথনো শহরে। উদ্যোক্তা নতুন দিল্লির প্রেস ইনস্টিটিউট্ অভ্ ইন্ডিয়া। আহ্বায়ক ওই ইনস্টিটিউটেরই ডাইরেক্টার এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীচঞ্চল সরকার, সহযোগী ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার, কানাডা এবং প্রেস ফাউন্ডেশান অভ এশিয়া। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার মোট পনের জন বিজ্ঞান লেখক এবং সাংবাদিক এই আলোচনা-চক্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান লেখকও এঁদের মধ্যে ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি গবেষণা এবং পারমাণবিক শক্তির যুগ্ম-সচিব ও বিজ্ঞান লেখক ডঃ আবদুল্লা আলমুতি সারাফুদ্দিন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মুখ্য বার্তা সম্পাদক শ্রীহাসানুজ্জামান খান। শ্রীলংকা থেকে এসেছিলেন ডঃ নন্দদাস কোডাগোডা এবং অধ্যাপক রাজা এন দ্য ফনসেকা। উপস্থিত ছিলেন বেইরুটের আল নাহার সংবাদপত্রের ম্যানেজিং এডিটর এবং ডাইরেক্টার শ্রীপাকারাদাউনি করিম, কায়রোর আল-আহ্রাম পত্রিকার বিদেশ সম্পাদক শ্রীমোহাম্মদ আলি হামেদ আইশা। আর ছিলেন অটোয়ার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের প্রকাশক বিভাগের ডাইরেক্টার শ্রীডেভিড স্পারজিওন এবং সেখানকার কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বাইওলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা শাখার প্রধান ডঃ যদুগোপাল সাহা। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বিজ্ঞান-লেখক সম্মেলন ভারতে এই প্রথম।

আলোচনা-চক্রের মূল লক্ষ্য ছিল তিনটি। এক, বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-লেখকদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ব্যাপারে কি ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তার ওপর বিশদ আলোচনা; দুই, বিজ্ঞান-সাংবাদিকতা এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বইপত্র লিখতে গিয়ে যে সব সমস্যা সচরাচর ঘটে থাকে, সাংবাদিক এবং লেখকরা সে-সব নিয়ে মুখোমুখি আলোচনা করুন। তিন, আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে কোথায় কি ধরনের কাজ হচ্ছে বিজ্ঞান-সাংবাদিক এবং বিজ্ঞান-লেখকরা শুনুন।

*

ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশেই শুধু নয়, বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের মধ্যে পেঁৗছে দেবার ব্যাপারটা কি উন্নতশীল কি উন্নত সব দেশেই এখনও পর্যন্ত একটা বড় রকমের সমস্যাই রয়ে গেছে। এক সময়ে এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিতেন শৌখিন লেখক। এই সব লেখকের মধ্যে কেউ হয়ত পেশাগতভাবে বিজ্ঞানী। ভারতে যেমন আচার্য জগদীশচন্দ্র। কেউ উচ্চতর বিজ্ঞানের পাঠ নিয়ে অধ্যাপক। যেমন জগদানন্দ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রভৃতি। আবার এমনও কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে হয়ত বিজ্ঞানের ছাত্র নন। কিন্তু সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড অথবা গবেষণা তাঁদের মনে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। এই আগ্রহই শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। আর তারই বশবর্তী হয়ে তাঁরা লিখে গেছেন নানা বিষয়ে প্রবন্ধাবলী। যার উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র। বলতে বাধা নেই, ওই সব রচনার মূল লক্ষ ছিল একটিই। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা। চলতি পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের যে সব বিষয় স্থান পেত না, অথচ পাঠকের মনকে যা সহজে আকর্ষণ করে, বিষয়বস্তু নির্বাচনে এ দিকটির ওপরই লেখকরা তখন গুরুত্ব আরোপ করতেন বেশি।

কিন্তু পটভূমিকার পরিবর্তন ঘটেছে। সে পরিবর্তন যে কত দ্রুত এবং কত ব্যাপক, গত দুই দশকের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যাঁরা সামান্যতমও খবর রাখেন, নিশ্চয় তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন। সর্বসাধারণের কাছে এই কর্মকাণ্ড দুই ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এক, নিছক কৌতূহল নিবৃত্তি। অর্থাৎ কতকটা যেন ম্যাজিক দেখার মত ব্যাপার। যেমন ধরুন, বিচিত্র রকমের প্লেন, রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, মানুষের চাঁদে অবতরণ, সুদূরতম গ্রহ নক্ষত্র বিষয়ক গবেষণা, পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ, এবং ইত্যাদি। সাধারণ মানুষের মনে এ-সব ব্যাপার যেন এক একটি অসম্ভব ঘটনা। হয়ত বা অবিশ্বাস্যও। এ সব ঘটনা জানার পেছনে একটি মাত্র মানসিকতাই কাজ করে। রোমাঞ্চকর মানসিকতা। কি ভাবে এরা ঘটছে, কেন ঘটছে, তার পেছনে কোন্ কোন্ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অথবা তথ্য কাজ করছে এ সব খুঁটিনাটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। ঘামাতে চানও না। তাঁদের ভূমিকাটি এখানে শুধু দর্শকের। নিজেদের কল্পনায় যার কিনারা করা যায় না, তাকে প্রত্যক্ষ করে উত্তেজনার উত্তাপ পোহানই যেন এ ক্ষেত্রে প্রধানতম উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক।

দুই, সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে গেলে বিজ্ঞান ছাড়া যে চলে না, অনেকেই এখন তা বুঝতে পেরেছেন। এর জন্যেই হয়ত, কলকাতা বেতার কেন্দ্রের কৃষিকথার আসর যখন প্রচারিত হয়, তখন হাজার হাজার চাষী নিবিষ্ট মনে বসে থাকে বেতার গ্রাহকের সামনে। আগ্রহ নিয়ে শোনে কখন বৃষ্টি হবে, কি ধরনের সার জমিতে দিতে হবে, অধিক ফলনশীল বীজের জন্যে কতটা সাবধান হওয়া দরকার। এই সব চাষীদের কেউ বিজ্ঞানী নয়, বিজ্ঞানের ছাত্রও হয়ত কেউ ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে এখন এরা জেনে ফেলেছে ইউরিয়া, সুপারফসফেট, গ্যামাক্সিন প্রভৃতির নাম। জেনে ফেলেছে কি ভাবে ধানের জমিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আল বেঁধে জল ধরে রাখতে হয়, এবং কৃষি বিজ্ঞানের শতেক খুঁটিনাটি তথ্য; কি কি ধরনের খাবার খেলে শরীর পুষ্ট হয়, পরিবার পরিকল্পনা কি ভাবে করতে হয় এবং কেন, খাদ্য সংরক্ষণ। অর্থাৎ প্রয়োজন তাদের বিজ্ঞানমুখী করে তুলেছে। নিজেদের প্রয়োজন মেটানর জন্যে নানা রকম বৈজ্ঞানিক খবরাখবর তারা জানতে চায়। তা সে খবরের কাগজ থেকেই হোক, অথবা রেডিও, টেলিভিশন, বইপত্র যেখান থেকেই হোক। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত কারণে বিজ্ঞান-লেখক এবং বিজ্ঞান-সাংবাদিকের ভূমিকা, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে এখন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কঠিনও বটে।

*

কেউ কেউ মনে করেন, পপুলার সায়ান্স বা জনপ্রিয় বিজ্ঞান, এ তো শুধু সাধারণের জন্যে। সাধারণ বলতে তাঁরা তাঁদের বোঝান, শিক্ষাগত যোগ্যতায় যাঁরা খাটো। বলতে বাধা নেই, এ ধারণাটাও এখন ভুল বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ, জীববিজ্ঞানী যিনি মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর এবং সাধারণ মানুষের জ্ঞানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে না বললেই চলে। একজন পদার্থ বিজ্ঞানীর কাছে ডি এন এ বা লিউকোমিয়া রোগের যে পরিচয়, যিনি স্কুলের সাধারণ পাঠ শুধু শেষ করেছেন তাঁর কাছেও ও সবের পরিচয় প্রায় একই পর্যায়ের। শিক্ষাগত দক্ষতার দরুন বিজ্ঞানীর পক্ষে ওই সব বিষয় বুঝে নিতে হয়ত শুধু সময় লাগে কম। প্রশ্ন তা নিয়ে নয়। নিজের অভিজ্ঞতার বাইরের ভিন্ন কোন জগতের বিষয়কে পরিষ্কার করে প্রাথমিক পর্যায়ে বুঝে নিতে গেলে বিজ্ঞানীকেও পাঠ শুরু করতে হয়, জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ অথবা বইপত্র থেকে।

আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পরিচালনা বিষয়ক রচনা। উল্লেখ্য, এ ধরনের লেখা লিখতে গিয়ে একজন লেখককে অনেক বেশি সতর্ক এবং সন্তর্পণ হতে হয়। যেমন ধরুন, ঠিক করা হল, দেশে ইলেকট্রনিক শিল্পকে সমৃদ্ধ করা হবে। যাতে করে ভবিষ্যতে আমাদের না পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। এ ধরনের কোন বিষয় নিয়ে লিখতে বসলে লেখককে অনেক কিছুর ওপর নজর দিতে হতে পারে। যেমন, ইলেকট্রনিক শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে গেলে প্রথমেই দেখা দরকার এ দেশে উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ বিজ্ঞানী বা কারিগর

আছে কি না। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যন্ত্রপাতি, উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা, অর্থ বিনিয়োগ, কতটা নতুন কর্মসংস্থান হতে পারে, কতটা বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হতে পারে, কতটা অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব, সময়ই বা কত লাগবে, এমন অনেক তথ্যের প্রয়োজন। এই সব তথ্য সম্পর্কে এতটুকু ভুল বোঝাবুঝি হলে ওই ধরনের লেখায় শুধু সাধারণ মানুষই নয়, যাঁরা দেশের উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত তাঁরাও বিভ্রান্ত হতে পারেন। যার ফলে জটিলতাও বাড়তে পারে।

*

এ সব সমস্যার কথা মনে রেখেই লখনৌ-এর আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল।

গোড়ায় বলেছি, এ ধরনের আলোচনা-চক্র এই প্রথম। কারণ, এই প্রথম দেশ বিদেশের কয়েকজন বিজ্ঞান-লেখক এবং বিজ্ঞান-প্রশাসককে মুখোমুখি বসানর ব্যবস্থা করেছিল দিল্লির প্রেস ইনস্টিটিউট অভ্ ইন্ডিয়া। আলোচনা-চক্র বসেছিল লখনৌর সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। যথারীতি নিজেদের মধ্যে আলোচনা ছাড়াও, আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা এসে মিলিত হয়েছিলেন লেখকদের সঙ্গে। ওই সময় এক-একজন বিজ্ঞানী এক-একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। যেমন, সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ নিত্যানন্দ এবং ডঃ ভি সি ভোরা বললেন ভারতীয় ওষুধ উৎপাদন এবং গবেষণা সম্পর্কীয় ব্যবস্থাদির ওপর। কোন্ কোন্ ওষুধ তৈরির ব্যাপারে ভারত এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ, কোন কোন ওষুধ এখন পরীক্ষামূলক অবস্থায় রয়েছে, এমন অনেক কথা। অথবা এ সব কাজের সুবিধে অসুবিধেই বা কি, ইত্যাদি। কয়েকদিনের আর সব আলোচনার মধ্যে ছিলেন ডঃ ও পি মাল, ডঃ এস সি অগ্রবাল। এঁরা বললেন, শস্যের রোগ সংক্রমণের ওপর। গুড়ের পরিত্যক্ত অংশকে কি কি ভাবে কাজে লাগান যায় তা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন ডঃ এম সি ভাটিয়া। বিশিষ্ট পুষ্টি-বিজ্ঞানী ডঃ সি আর কৃষ্ণমূর্তি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন জীবদেহে প্রোটিনের ভূমিকার কথা। ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অভ্ সায়ান্স অ্যান্ড টেকনোলজির ডঃ এস কে সুব্রামনিয়াম ঠিক কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সরকার বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিষয়ক পরিকল্পনা রচনা করেছেন, এর ভাল এবং মন্দ উভয় দিক কি কি, বিশদ বুঝিয়ে দিলেন।

এ ছাড়া বিজ্ঞান-লেখকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখানকার সুগারকেন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে, সেন্ট্রাল ইনডিজেনাস মেডিকেল প্ল্যান্ট অরগ্যানাইজেশন, রেলওয়ে ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অরগ্যানাইজেশন-এ। শেষোক্ত এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীজোসেফ গত দুই দশকে ভারতীয় রেলপথ, রেলগাড়ি এবং ইঞ্জিন নিয়ে কি ধরনের গবেষণা চলছে এবং ভবিষ্যতে দেশের লক্ষ লক্ষ যাত্রী এবং মালপত্র পরিবহনের জন্যে কী ধরনের গবেষণা চলছে সে সব নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করলেন। সুগারকেন রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গিয়ে লেখকরা আখ চাষের আধুনিকতম গবেষণার খুঁটি-নাটি সব নিজের চোখে দেখে এলেন। (পরবর্তী পর্যায়ে ওই সব গবেষণাগারের কাজকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করব।)

*

আসলে যা বলছিলাম। বরং বলি, শ্রীচঞ্চল সরকার যা বলছিলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, বিজ্ঞান-লেখক এবং বিজ্ঞানীরা মুখোমুখি বসুন। সরাসরি কথা বলুন। অভিযোগ, বিজ্ঞানীরা অনেক সময় অনেক কিছু বলেন, লেখকরা তার সবটা বুঝতে পারেন না। আবার লেখকদের অভিযোগ, আমরা যা জানতে চাই, বিজ্ঞানীরা তা বোঝাতে পারেন না।'

চঞ্চল সরকার বললেন, শুধু ভারতেই নয়, এ অভিযোগ পৃথিবীর সর্বত্র। এই আলোচনা-চক্রে আমরা এটাই চেয়েছি, বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-লেখকরা নিজেদের মধ্যে কি ভাবে কথাবার্তা চালালে ভুল বোঝাবুঝি থাকে না, সেটা বুঝুন।

আলোচনা-চক্রে লেখকরা বিজ্ঞানীদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন, গবেষণাগার ঘুরে ফিরে বিভিন্ন বিষয়ক গবেষণার ওপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

এই আলোচনা-চক্রের আর একটি লাভ, এখানে এসেছিলেন বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বিজ্ঞান লেখক। এর ফলে কোন কোন ভাষায় বিজ্ঞান লেখার ব্যাপারে কি ধরনের কাজকর্ম হচ্ছে তারও আভাস পেলেন সবাই।

ওড়িশার কথাই ধরা যাক। কটক থেকে এসেছিলেন ডঃ জি এন মহাপাত্র। ইনি কটকের র‍্যাভেনশা কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। মূল ওড়িয়া ভাষায় তিনি সত্তরেরও বেশি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লিখেছেন। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যে একজন লেখক যে এতগুলি বই লিখেছেন, কয়জন সে খবর আমরা রাখি?

ডঃ মহাপাত্র বললেন, কটকে আমরা একটি বেসরকারী সংস্থা গড়েছি। এর সদস্য সংখ্যা ষাট। সবাই এঁরা বিজ্ঞানের কোন না কোন বিষয় নিয়ে লিখছেন। সংস্থা এঁদের বই প্রকাশ করে, বিক্রি করে। লেখকরা নিয়মিত রয়্যালিটি পান।

এমন একটি প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

মালয়ালা মনোরমা পত্রিকার শ্রীমনোরকাড কে এম ম্যাথু জানালেন, ওঁদের পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞানের কলম রয়েছে। এই কলমে তিনি কৃষি বিজ্ঞান, পুষ্টি, আবহ বিজ্ঞান, এবং বিজ্ঞানের আরও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

শ্রীলংকার বিশিষ্ট বিজ্ঞান-লেখক ডঃ কোডাগোড়া পেশায় চিকিৎসক। টেলিভিশন, বেতার এবং দৈনিক পত্রিকায় আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানের ওপর লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে।

বাংলা দেশের আবদুল্লা আল-মুতির বড় এবং ছোটদের জন্যে লেখা বিজ্ঞানের বইগুলি একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বই দেখেছি। ভাষা এবং বিষয়বস্তুর অমন স্বাচ্ছন্দ্য এপার বাংলায় চোখে পড়ে কম।

আমাদের প্রশ্ন, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার লেখকদের মধ্যে নিয়মিত যাতে যোগাযোগ রাখা যায়, কোন্ ভাষায় ভাল বই লেখা হলে আর সব ভাষায় যাতে অনুবাদ করা যায়, এ ব্যাপারে প্রেস ইনস্টিটিউট কি কিছু করতে পারেন না?

ডেভিড স্পারক্সিওন বললেন, উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার লক্ষ ভিন্ন। কারণ, সে সব দেশে রয়েছে নানা রকম সমস্যা। খাদ্য উৎপাদন, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্য সংরক্ষণ—সে সব দেশের সাধারণ মানুষকে এসব ব্যাপারে অবহিত করতে না পারলে গঠনমূলক আর কোন কাজে হাত দেওয়াই শক্ত হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক ভাষায় এসব ব্যাপারে যাতে ব্যাপক আলোচনা করা যায় সে দিকে লক্ষ রাখা দরকার।

ডঃ যদুগোপাল সাহার মন্তব্য, বৈজ্ঞানিক সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে সাংবাদিকদের উচিত অনেক বেশি সতর্ক হওয়া। কোন সংবাদ যাতে না পাঠকমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। তা না করলে, পাঠকরাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হন তা নয়, বিজ্ঞানীরাও বিব্রত হন।

প্রেস ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শ্রীচঞ্চল সরকার বলেন, যেসব বিজ্ঞান-লেখক লেখার জন্যে দেশের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলিতে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চান প্রেস ইনস্টিটিউট তার খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

এমন একটি প্রস্তাবের জন্যে শ্রীসরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতের মত দেশে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার শুধু গুটিকয় লেখক দিয়ে সম্ভব নয়। বৃত্তিগতভাবে বিজ্ঞান-লেখা এবং টেলিভিশন ও রেডিওর জন্যে (বিশেষ করে) উপযুক্ত বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক, বক্তা এবং পরিচালকের প্রয়োজন। এর জন্যে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ চাই। চাই উপযুক্ত পরিকল্পনা। প্রেস ইনস্টিটিউট হয়ত অনেক কিছুই এ ব্যাপারে করতে পারে।

সমরজিৎ কর

॥ আটষট্টি ॥

অনিল রায় বড্ড চট করে মাতাল হয়ে যান।

টপাটপ চার পাঁচ পেগ খেয়ে আজও গেলেন। গেলাস রেখে বললেন—কি যেন বলছিলাম! একটা ভূতের কথা না!

—হ্যাঁ স্যার। সোমেন বলে।

অনিল রায় সামান্য ভ্রূ কুঁচকে ভেবে নিয়ে বলেন—খুব অদ্ভুত। পরিষ্কার সেই ভূতটাকে টের পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না। ভয়ে পাগল হয়ে যাই আর কি! ভীষণ ভূতের ভয় আমার। তো ভূতটাকে টের পেয়েই আমি ভয় ভর্তি রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকি। চেম্বার খালি হয়ে গেল, সটাক সটাক বুলেট বেরিয়ে আমার ক্যাবিনেট ফুটো করছে, দেওয়ালের ছবি ভাঙছে, চুনবালি খসাচ্ছে—সব টের পাচ্ছি। আর নিস্তব্ধতার মধ্যেই এক নিঃশব্দ হা-হা হাসি টের পাচ্ছি। আমার পিস্তলের গুলিতে তার কোনো রি-অ্যাকশনই হল না। কলকাতায় সব সময়ে বোমা বন্দুকের শব্দ হয় বলে লোকে গা করে না, তাই প্রতিবেশীরাও কেউ দৌড়ে আসেনি। সে যে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা! আমার একটা খাওয়ার টেবিল আছে, পুরোনো। এক সাহেবের কাছ থেকে সেটা কিনেছিলাম। আসল মেহগিনী। সেই টেবিলটাকে আমার বরাবর কিছু ভয় ছিল। সন্দেহ হয়, সেই টেবিলটার সঙ্গে এক মেমসাহেবের আত্মার কিছু যোগাযোগ আছে। সোমেন, তুমি মুখ লুকিয়ে হাসলে নাকি?

—না স্যার।

অপালা বলে—হ্যাঁ স্যার, হাসল!

অনিল রায় গম্ভীর হয়ে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন—তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে যে, আমি মাতাল হয়ে গেছি?

—একটু হয়েছো, আর খেও না।

—সবাই হাসছে নাকি? আমি খুব ভাল লক্ষ করতে পারছি না, তুমি একটু দেখ তো।

—না তো, কেউ হাসছে না।

অনিল রায় মাথা উঁচু করে সবাইকে বললেন—হেসো না। এটা সিরিয়াস ব্যাপার।

—সেই টেবিলটা স্যার! সোমেন বলে।

—কোন টেবিলটা? বলে ভ্রূ কোঁচকালেন অনিল রায়। পর মুহূর্তেই মাথা নেড়ে বললেন—ইয়েস। সেই মেহগিনী টেবিলটা। আমি অনেক দিন টের পেয়েছি, নিশুত রাতে কে যেন আসে। মেয়েলী হাই হিল জুতোর শব্দ; এসে ঘুরে ঘুরে টেবিলটার চার ধারে পাক খায়। সে টেবিলটার একপাশে চেয়ার টেনে বসে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদে।

—সত্যি স্যার? পূর্বা উত্তেজিত হয়ে বলে।

অনিল রায় মাথা নাড়লেন। বললেন—সত্যি। অনেকদিন ধরেই আমি তার আনাগোনা টের পাচ্ছি। বাপ্টির মা যখন ছিল, তখনো। তখন ওকে কতবার ডেকে বলেছি সে কথা। কিন্তু বড় বেশী মস্তান ছিল বলে গা করত না। আমাকে মাতাল ভাবত।

—ও সব কথা থাক না, দ্বিতীয়পক্ষ আস্তে করে বলে।

বিরক্ত হয়ে অনিল রায় বললেন—ওরা সব জানে। লজ্জার কিছু নেই। বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—তো টের পেলাম সেই রাতেও আমার রিভলভারের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পর একটা হাই হিলের শব্দ পাশের ঘরে আস্তে জেগে উঠল। কি পরিষ্কার টনটনে শব্দ। পর্দা সরালেই যেন দেখতে পাবো। ঘুরল, বসল চেয়ার টেনে। তারপর কাঁদতে লাগল। আমি পাগলের মতো সেই ঘরের দিকে রিভলভার তাক করে গুলি ছুঁড়বার চেষ্টা করি, আর কেবলই নিষ্ফলা ট্রিগারের ক্লিক ক্লিক শব্দ হয়। কিভাবে রাতটা কেটেছিল কে জানে। তবে আমি অনেকবার চিৎকার করতে চেষ্টা করেছি, দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি পারিনি।

—তারপর স্যার? পূর্বা শ্বাস বন্ধ করে শুনছে।

অনিল রায় আরো একটা নীট হুইস্কি খেয়ে নিলেন। মুখটা ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মতো হাতের পিঠ দিয়ে মুছে

বললেন—তো সকালে এই মেয়েটি এসে হাজির। তোমাদের জুনিয়ার, এ বছরই পরীক্ষা দিচ্ছে। হাতে বইখাতা, একটু ডিসকাস করতে এসেছে। আমি ওকে দেখে ধড়ে প্রাণ পেলাম। সোজা সামনে হাটু গেড়ে বসে পড়ে বললাম—তুমি যেও না, থাকো। তোমার পায়ে পড়ি।

বলে অনিল রায় মিলুর দিকে তাকালেন, বললেন—ঠিক বলিনি?

মিলু মাথা নেড়ে বলল—ঠিক।

অনিল রায় আর একটু মাতাল হয়ে বললেন—ও আমার চেহারা আর অ্যাটিচুড দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু আমারও তো উপায় নেই। সারাদিন কেবল চাকরটাই থাকে। তো সেও আসেনি। একটা ভুতুড়ে রাত্রির পর আমার ইমিডিয়েটলি একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী দরকার—যে থাকবে, ছেড়ে যাবে না। আমি ওকে দেখেই বুঝতে পারলাম, ও ঈশ্বরপ্রেরিত, ও আমার জন্যই নির্দিষ্ট, মেড ফর ইচ আদার। ও ভয় খেয়ে বলল—থাকব কি করে আমি যুবতী মেয়ে, লোকে বলবে কি? আমি তখন বিনা দ্বিধায় বললাম—বিয়ে করো আমাকে। বিয়ে করো, বিয়ে করো। বলেই ফের মিলুর দিকে তাকিয়ে বলেন—ক'বার কথাটা বলেছিলাম যেন মিলু?

—অনেকবার, মিলু বলল।

—হ্যাঁ অনেকবার, বলতে বলতে ও রাজি হয়ে গেল। আর সেইদিনই আমরা মিলুর অভিভাবকের অনুমতি নিই, রেজিস্ট্রি করি আর একসঙ্গে থাকতেও শুরু করি। বিশ্বাস করো সোমেন, তুমি বড্ড বেশী হাসছো।

—এ যে ভাবা যায় না স্যার।

উদারভাবে অনিল রায় বললেন—আমিও ভাবতে পারি না। দেয়ার ওয়াজ নো লাভ, নো থট, নো অ্যাট্রাকশন। ওনলি ওয়ান অর টু ঘোস্ট্স মেড আস হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। না মিলু?

মিলু মাথা নত করে বসে ছিল। সোমেন আচমকা লক্ষ করে যে মিলু কাঁদছে। বড় বড় ফোঁটা দু'একটা ঝরে পড়ল টেবিলে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল সোমেন, অণিমার নির্ভুল হাতটি তার হাঁটুতে চাপ দিল।

চুপ করে গেল সোমেন।

বহুকাল সে-দৃশ্যটা ভুলতে পারেনি। আর হাঁটুর ওপর অণিমার ঐ মৃদু স্পর্শ, কি বলতে চেয়েছিল অণিমা! সোমেন, ওকে কাঁদতে দাও। বোকা, মেয়েমানুষের বুকে কত কান্না জমা থাকে জানো না তো!

অণিমার সেই চপলতা নেই, ইয়ার্কি নেই। কেমন বিষণ্ণ গম্ভীর আর সুন্দর মহিলা হয়ে গেছে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার মধ্যেও একটা আলগা ভাব। কেবল অপালা আর পুর্বার সঙ্গে যা একটু ফিসফাস করে।

বিকেলটা খুব অনারকমভাবে কেটে গেল সেদিন। পরদিন অণিমা চলে গেল।

*

ঠিক যেমন একটা সিনেমার টিকিট ডাকে এসে চমকে দিয়েছিল সোমেনকে, তেমনি হঠাৎ এসে চমকে দিল মধুমিতার চিঠি। লিখেছে ডার্লিং, এখানে আসার পর বেশ লাগছে। হাসপাতালে অনেক চেক-আপ করতে হচ্ছে। আমি বাপির সঙ্গে এর মধ্যেই কন্যাকুমারিকা ঘুরে এসেছি, কি ভাল যে লাগল! একদিন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম। খুব বেড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় কি বলো! আজ ক'দিন হাসপাতালে শুয়ে আছি। পরশু অপারেশন হবে, শুনেছি। বাপি রোজ প্রায় সারা দিন আমার কাছাকাছি থাকে। বাপি খুব শক্ত মানুষ। এত শক্ত মানুষ আমি আর একটাও দেখিনি। ধরো, আমাকে যে এত ভালবাসে বাপি তা কিন্তু কখনো বাইরের আদর দিয়ে বুঝতে দেয় না। ছেলেবেলায় পর্যন্ত আমি বাপির কোলে উঠবার সুযোগ পাইনি। বাপি কোলে নিত না, হাসলে আদর করত না, এমন কি সারা দিনে হয়তো মাত্র এক আধবার দেখা হলে এক-আধ পলক তাকিয়ে দেখত মাত্র। কিন্তু তাইতেই বুঝতে পারতাম, পৃথিবীতে এই মানুষটাই আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে। কি করে বুঝতাম বলো তো! এই ভালবাসার ব্যাপারগুলো ভারী অদ্ভুত, ঠিক বোঝা যায়, বলতে হয় না। এই যে এখন বাপি আমার কাছে কাছে আছে, এখনো মুখে কোনো আদর নেই। কিন্তু দেখতে পাই, বাপি খুব অস্থির, চিন্তিত। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছে, আলোচনা করছে, ফাঁকে ফাঁকে আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে। তেমন বেশী কথা বলে না বাপি, মাঝে মাঝে কেবল সকালে উঠে গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করে শোনায়। হাসপাতালে বেড নেওয়ার আগে কয়েক দিন হোটেলে ছিলাম। মস্ত হোটেল। পুরো একটা অ্যাপার্টমেণ্ট নিয়ে আমরা ছিলাম। একদিন মাঝ রাতে মাথার যন্ত্রণা হতেই জেগে বাপিকে ডাকতে গিয়েই অবাক হয়ে দেখি, বাপি আমার মাথার কাছে চুপ করে বসে আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। এই বোধ হয় প্রথম বাপির মধ্যে একটা স্পষ্ট আবেগ বা দুঃখবোধ যা হোক দেখলাম। কোনোদিন কাঁদি-টাঁদি না, বুঝলে? কান্নাটান্না আমার আসেই না, কি করে কাঁদে লোক তাও জানি না। সেই রাতে হঠাৎ বাপির সেই চেয়ে থাকা দেখে আমার গলা-ব্যথা, চোখ জ্বালা করে কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হতে লাগল, বুকটা ধড়ফড় করছে। তারপর হঠাৎ ঠোঁটটোট কেঁপে, ফুঁপিয়ে একাকার কাণ্ড। কোনোদিন কাঁদি না তো, তাই সেই আচমকা কান্নাটা আমাকে একেবারে ভাসিয়ে নিল। ডার্লিং, বিশ্বাস করো, নিজের জন্য একটুও দুঃখ নয় কেবল মনে হচ্ছিল—আমি মরে গেলে [illegible] বড় দুঃখ পাবে। শুধু বাপির [illegible] শোকের কথা ভেবে ভয়ঙ্কর ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু সে মাত্র ঐ একবার। এখন আবার হেইল অ্যান্ড হার্টি আছি। বাপি যতক্ষণ কাছে থাকে, সারাক্ষণ নানা মজার গল্প বলে আমাকে খুশী রাখছে। আমি খুশীও হই। হবো না কেন বলো? পৃথিবীটা কি কারো জন্য থেমে থাকে? কারো মৃত্যু শোক পালন করতে সে কি এক সেকেণ্ডও তার আহ্নিক গতি বন্ধ করে? পৃথিবীতে কেউ অপরিত্যজ্য নয়। এমন কেউ নেই যাকে ছাড়া পৃথিবী চলে না। আমরা নিজেদের যত ইম্পর্টান্ট ভাবি মোটেই তা নই আমরা। তোমাকে একটা ছেলের কথা বলি। ভীষণ ভাল ছেলে, এক্স্ট্রিমিস্ট। অপরাজিতাদের বাইরের দেওয়ালে যে লেখাটা আছে, দেখেছো? প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ। কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো গড়ে তোলো ব্যারিকেড। ঐ কথাটা সে লিখেছিল। সেই ছেলেটাকে

আমার ভীষণ ভাল লাগত। একদিন থাকতে না পেরে আমি তাকে বলে বসলাম—জিতু, আমি তোমাকে চাই, বিয়ে করব। সে ভারী অবাক হয়ে বলল—বিয়ে করবে? কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত আমি তো বাঁচব না। আমি বললাম—কেন বাঁচবে না? সে কেবল হাসে আর বলে—আমার তো বাঁচার কথা নয়। আমি যত তাকে বলি—তোমাকে বাঁচতেই হবে। সেও তত বলে—বাঁচতে তো খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু মরবার দরকার হলে মরবো নাই বা কেন?

ডার্লিং, সে কিন্তু মরেনি। জীবনে প্রথম যে খুনটা ও করে সেইটের শক্ ও সামলাতে পারেনি। যারা ওকে খুন করতে উত্তেজিত করে তোলে তারা জানত না যে, ওর প্রকৃতি খুব দুর্বল, নার্ভ ভীষণ সেনসিটিভ। শুনেছি তিলজলার কাছে ও একটা ছেলেকে যখন খুন করে তখন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, চিৎকার করে নাচ গান করতে থাকে। তারপরও ও ছেলেটার হাত দুটো কেটে নিয়ে সেই কাটা হাত থেকে রক্ত মাংস চিবিয়ে খেতে খেতে চিৎকার করে বলতে থাকে—এই দ্যাখ, আমি শ্রেণীশত্রুর রক্ত খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি।

সেই থেকে ও উন্মাদ পাগল। এখনো ওকে সি আই টি রোডের কাছে দেখা যায়। আধ-ন্যাংটো, গায়ে ভীষণ ময়লা পড়েছে, মস্ত চুল-দাড়ি, সারাদিন বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়ায়। ওর উপর কেউ প্রতিশোধ নেয়নি। হয় পাগল বলে ছেড়ে দিয়েছে, নয়তো প্রতিশোধ নেবে যারা তারাও কেউ নেই।

ডার্লিং, জিতুর কথা কেন বললাম বলো তো! ঐ যে ও একটা কথা বলেছিল—মরবার দরকার হলে মরবো নাই বা কেন? তার মানে মরে যাওয়াটাই ও ধরে নিয়েছিল, একমাত্র সত্য বলে। কেউ ওর মাথায় সেই বিশ্বাসটাই সেট করে দেয়। আমার মাথাতেও সেই রকম একটা বিশ্বাস সেট হয়ে গেছে। তাই আর তেমন দুঃখ হয় না। কেবল একটা কথা ভেবে মন খুব খারাপ লাগে ডার্লিং। আমাকে তোমরা ভুলে যাবে না তো! মধুমিতা যাদের ভালবেসেছিল তারা তাকে ভুলে যাবে না তো? প্লীজ ভুলো না। যদি ভোলো তবে ধূপকাঠি নিবে যাওয়ার পর যে একটু গন্ধের রেশ থাকে, আমার সেটুকুও থাকবে না।

বাপি আমাকে সুন্দর সুন্দর লেখার প্যাড, আর হ্যাণ্ডমেড কাগজের খাম এনে দিয়েছে চিঠি লেখার জন্য। সবাইকে চিঠি লিখছি—ভুলো না, ভুলো না, মধুমিতাকে ভুলো না।

পরশু আমার অপারেশন হবে বোধ হয়। তারপরে কি হবে ডার্লিং? ব্রেন অপারেশন বড্ড শক্ত। কয়েকজন অচেনা, অনাত্মীয় ডাক্তারের হাতে আমার জীবন। ডাক্তারদের মধ্যে একজনের মুখে অনেকটা বাপির মুখের আদল দেখতে পাই। খুব ইচ্ছে হয়, ঐ লোকটাই আমার অপারেশন করুক ভুলো না।

তোমারই মধুমিতা।

বিকেলের আলোয় চিঠিটা পড়ছিল সোমেন। দীর্ঘ সন্ধ্যাটা তারপর যেন কাটতে চায় না। জীবন ভরে এক আলো-আঁধারি নেমে এল বুঝি।

চিঠি পাওয়ার কয়েকদিন পর একদিন উত্তরটা লিখতে বসল সোমেন। পুরো একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর দিকে লিখল—প্রিয় মধুমিতা,

তারপরই খেয়াল হল, কাকে লিখছে! এতদিনে মধুমিতার অপারেশন হয়ে গেছে। কি হয়েছে? যাই হোক, মধুমিতা এ চিঠি পড়তে পারবে না নিশ্চয়ই। তাই আর লিখল না সোমেন। একটা সাদা কাগজের ওপর দিকে কেবল ছোট্ট করে লেখা রইল—প্রিয় মধুমিতা, ব্যস্ আর কিছু নেই। বাকি সাদা কাগজটা ধু-ধু মরুভূমি।

যত্ন করে কাগজটা ভাঁজ করে সঞ্চয়িতার মধ্যে রেখে দিল সোমেন। দিনের আলোতেও এক অদ্ভুত আঁধার পৃথিবীতে নেমে এসেছে, সোমেন টের পায়। ফুসফুস ভরে বাতাস টেনেও যেন শ্বাসের তৃপ্তি হয় না। হাঁফধরা হয়ে থাকে বুক। সোমেন তাই ছটফট করে।

না, এ দেশে আর থাকবে না সোমেন। এই যে এত প্রিয়জন চারদিকে, এদের মধ্যে বেশী দিন থাকা ভাল নয়। কে কবে বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে চলে যাবে! বাবা মা বুড়ো হয়েছে, দাদার শরীর ভাল নয়। তা ছাড়া কার কখন নিয়তি কে জানে! মৃত্যু তার টিকিটঘর খুলে বসে আছে, ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে মানুষের মুখ। যখন যার মুখ পছন্দ হয় তখনই তাকে ধরিয়ে দেয় টিকিট। তাই প্রিয়জনদের কাছে বেশী দিন থাকা ভাল নয়।

ক্রমশ

সাহিত্য প্রসঙ্গ

আনন্দ পুরস্কার

গত পনেরোই আগস্ট আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে একটি ঘরোয়া এবং অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। অনুষ্ঠানটির উপলক্ষ্য : আনন্দ পুরস্কার প্রদান। পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে, বাংলা ১৩৮১ সালের আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী এবং শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উল্টোরথ পত্রিকা শ্রীসুনীল রায়-কে কাব্য রচনার জন্য এবারে সম্মানিত করেছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে এই তিন সাহিত্য-কর্মীকেই সম্মান জানানো হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আনন্দবাজার এবং দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয় প্রথমে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তারপর এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেন। ঘরোয়া ভাবে এবং সসঙ্কোচে তিনি জানান যে, কিছু বিলম্ব এই অনুষ্ঠানটির ব্যাপারে ঘটে গেছে, যার জন্যে তিনি দুঃখিত। অন্যান্যবার আনন্দ পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে বহুজন নিমন্ত্রিত হন, প্রীতি-সম্মেলনের আবহাওয়াও নানা দিক থেকে আরও মুখর হয়ে ওঠে। বর্তমান বছরে নানা কারণে তা সম্ভব হল না বলে তিনি দুঃখিত; কিন্তু যে-কারণে এই অনুষ্ঠান—সাহিত্যিকদের প্রতি সম্মান জানানো—সেই সম্মান প্রদর্শনের মর্যাদা কোথাও ক্ষুণ্ণ হবে না।

এরপর শিবরাম চক্রবর্তীকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয় শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ তা পাঠ করেন। অচিন্ত্যকুমারের হাত থেকে শিবরামবাবু মানপত্র ও পুরস্কার গ্রহণ করেন। শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়কে যে মানপত্রটি দেওয়া হয়—তা পাঠ করেন শ্রীসাগরময় ঘোষ। অচিন্ত্যকুমার একে একে শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীল রায়কে পুরস্কার দেন। শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী 'প্রফুল্লকুমার পুরস্কার,' শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় 'সুরেশচন্দ্র পুরস্কার' পান। দুটি পুরস্কারেরই অর্থ-মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। 'উল্টোরথ' কর্তৃপক্ষ এবার তাঁদের পুরস্কারের অর্থ হাজার টাকা করেছেন।

অচিন্ত্যকুমার তাঁর ভাষণে বলেন, এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি নিজেকেই পুরস্কৃত মনে করেছেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিক জীবন সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার কয়েকটি কথা বলেন। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল—সাহিত্য জীবনের

আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠানে সমবেত তিন সাহিত্যিক। 'প্রফুল্লকুমার সরকার পুরস্কারে' সম্মানিত শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী, 'সুরেশচন্দ্র পুরস্কার'-প্রাপ্ত কবি শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং 'উল্টোরথ' কবিতা পুরস্কার প্রাপ্ত কবি শ্রীসুনীল রায়

আদর্শ ও প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁর মনোভাব। তিনি বলেন, কোনো বিশেষ আপাত-সম্মান সাহিত্যিকের পক্ষে তেমন কিছু নয়, তার যথার্থ স্থান পাঠকের অন্তরে, মহাকালের নিরিখে। জীবন চেতনাই সাহিত্যের প্রাণ। জীবনানুসন্ধানই তার ব্রত।

আ-যৌবন বন্ধু শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী সম্পর্কেও তিনি অল্প কিছু বলেন এবং প্রত্যেককেই এই সম্মান পাবার জন্যে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানের শেষের দিকে শিবরামবাবু অল্প কয়েকটি কথা বলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তবু এই সদাহাস্য পুরুষ হালকা করেই যৎসামান্য কিছু বলে আমাদের আনন্দ দিয়েছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানান। সুশীলবাবুও।

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ সকলকে ধন্যবাদ জানানোর পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। আনন্দ পুরস্কার প্রদানের এই অনুষ্ঠানটিতে কোনো আড়ম্বর না থাকায় তার মাধুর্য যেন আরও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্রধানত যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই সাহিত্যসেবী। সহকর্মীদের সম্মানে নিজেরাও আনন্দ পেয়েছেন, প্রীতি ও অভিনন্দন জানিয়েছেন পুরস্কৃতদের। আমরাও তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

পরলোকে নলিনীকুমার ভদ্র

নলিনীকুমার ভদ্র মহাশয় গত ৪ আগস্ট কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। ১৯০৬ সনে আগস্ট মাসে তাঁর জন্ম। প্রায় সত্তর বছর বয়সে তাঁর এই জীবনাবসানের জন্য আমরা শোকপ্রকাশ করি।

নলিনীকুমার 'প্রবাসী' পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন; 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকার সঙ্গে এবং 'ভারত জ্যোতি' সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন একদা। নৃতত্ত্ব, রূপকথা, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের কয়েকটি হল : বনমল্লিকা, বিচিত্র মণিপুর, পাহাড়িয়া কাহিনী, সপ্তক ইত্যাদি।

অভিনন্দ

গ্ল্যাক্সো
সানশাইন
বাচ্চাদের বানায় তাগড়া
পদ্মিনী—
খুশিতে আর উদ্যমে ভরপুর।
সুবোধ— তেজী খুদে
তাগড়াজওয়ান বটে।
রেশমা—
স্বাস্থ্যে টগবগ
করছে।
মিশেল—
পরিশ্রমী আর প্রাণশক্তিতে
ভরপুর।
রয়— অন্য
সবার চেয়ে বাড়টা বেশী।
বিবেক—
ভাল খিদে পায় ওর।
শালিনী— হাড় কি শক্ত আর
কত মেহনতী।
SUNSHINE
Glaxo
BUILDS BONNIE BABIES
ENRICHED WITH VITAMINS
গ্ল্যাক্সো
খায় যে বাচ্চারা
—সাচ্চা তাগড়া হয় তারা।

আলোচনা

"চিরকুমার সভা" নাটকের পঞ্চাশ বছর প্রসঙ্গে

গত ৯ আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় 'চিরকুমারসভা নাটকের পঞ্চাশ বছর' শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। যা নিরসন হওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। প্রথমত, লেখক ১৯২৫ সালের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোন নাটক তেমনভাবে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের মত অনেকেরই ধারণা যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে পেশাদার মঞ্চগুলি অভিনয়ের বিশেষ কোন চেষ্টা করেননি। কিন্তু নাট্যশালার শতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, আমাদের এ ধারণা সহজেই দূরীভূত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ অজস্র কবিতা গান, গল্প ও উপন্যাস যেমন সারা জীবনে রচনা করে গেছেন, তেমনি তাঁর গ্রন্থতালিকায় আমরা দেখতে পাই দুই-একটি নাটকও প্রতি বছর প্রকাশিত। হয়েছে। বাংলা নাট্যশালার গোড়ার যুগ থেকেই বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি পেশাদার রঙ্গমঞ্চের পরিচালকদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এবং লাভালাভের কথা চিন্তা না করেই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে জনমানসের সামনে তুলে ধরার জন্যে তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন। লেখক বলেছেন, একমাত্র 'রাজা ও রানী' স্টার থিয়েটারে সামান্য কয়েকবার অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু নাট্যশালার ইতিহাস বলছে—এই 'রাজা ও রানী' নাটক নিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে—১৮৮২ সালে। বেঙ্গল থিয়েটারে কবির 'রাজা ও রানী' অভিনীত হয় ১৮৮২ সালের আগস্ট মাসে।' যাই হোক, সাধারণের অবগতির জন্য এই সঙ্গে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিতে অভিনীত রবীন্দ্রনাথের নাটক, গল্প ও উপন্যাসের নাট্যরূপের তালিকা পেশ করলাম। আশা করি, এর দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে। ১৮৮৬ সালের ৩রা জুলাই ন্যাশনাল থিয়েটারে 'রাজা বসন্ত রায়', 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। (নাট্যরূপ দান করেন, কেদারনাথ চৌধুরী)। ১৯০১ সালের ৬ই এপ্রিল মিনার্ভায় 'রাজা বসন্ত রায়'-এর পুনরাভিনয় হয়। ১৯০৪ সালের ২৭শে নভেম্বর, ক্লাসিক থিয়েটারে 'চোখের বালি' অভিনীত হয়। (নাট্যরূপ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)। ১৯১৩ সালের ৯ই আগস্ট মিনার্ভায় 'বিদায় অভিশাপ' অভিনীত হয়। ১৯১৪ সালের ১৩ জুন স্টার থিয়েটারে 'শাস্তি' গল্পের নাট্যরূপ 'অভিমানিনী' নামে মঞ্চস্থ হয়। ১৯১৪ সালের ১৩ই অক্টোবর, স্টার থিয়েটারে 'দিদি' গল্প অবলম্বনে 'অকলংক শশী' নামে নাটক মঞ্চস্থ হয়। (নাট্যরূপ দান করেন —রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)। ১৯২০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মিনার্ভায় 'বশীকরণ' অভিনীত হয়। ১৯২৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর, স্টার থিয়েটারে 'গৃহ প্রবেশ' নাটক মঞ্চস্থ হয়। পরে এই নাটকের সঙ্গে 'বশীকরণ'ও অভিনীত হতে থাকে। ১৯২৬ সালের ২৬শে জুন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক নিয়ে নাট্য-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯২৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে 'বৌঠাকুরানীর হাট'-এর নব-নাট্যরূপ 'পরিত্রাণ' নামে মঞ্চস্থ হয়। ১৯২৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, নাট্য-মন্দিরে 'শেষ রক্ষা' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩০ সালের ১৭ই মে, মনোমোহন থিয়েটারে 'মুক্তির উপায়' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩৩ সনের ১৭ই জুন, স্টার থিয়েটারে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়।/১৯৩৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর, নাট্যনিকেতনে 'গোরা' অভিনীত হয়। (নাট্যরূপ—নরেশচন্দ্র মিত্র) ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, নবনাট্যমন্দিরে (স্টার মঞ্চে) 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ হয়। এর পরে স্টার থিয়েটারে 'নৌকাডুবি'র নাট্যরূপও মঞ্চস্থ হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত লেখক লিখছেন—"শিশিরকুমার তখন নাট্যনিকেতনের কর্ণধার এবং তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করে কবির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্থির হয়—'চিরকুমার সভা'-কে নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করা হবে।" উত্তরে জানাই যে, শিশিরকুমার কোনদিনই নাট্যনিকেতনের কর্ণধার ছিলেন না। 'চিরকুমার সভা'র নাট্যরূপ নয়—'চিরকুমার সভা'র কাহিনীর নাম 'প্রজাপতির নির্বন্ধ'। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এবং আর্ট থিয়েটারের 'চিরকুমার সভা'র কাহিনী সপর্কে লেখক যা বিবৃত করেছেন, তা আমার অজ্ঞাত। তবে উক্ত নাটকের বিভিন্ন

চরিত্রে সেসময় যে সকল শিল্পী অভিনয় করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি মারাত্মক ভুল আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি শ্রীশ-এর ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বার দুই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুর্গাদাস শ্রীশ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। তিনি অভিনয় করেছিলেন, পূর্ণ-র ভূমিকায়। এবং এটি দুর্গাদাসের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অভিনয়। নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অভিনয় শিক্ষা' গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠার পর পূর্ণের ভূমিকায় দুর্গাদাসের আর্টপ্লেটের চমৎকার একটি ছবি আছে। যা দেখলে লেখক সহজেই তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন।

এখানে 'চিরকুমার সভা' নাটকে অভিনয় অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সম্পূর্ণ তালিকা লিপিবদ্ধ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ১৯২৪ সালের ১৮ই জুলাই আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কর্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' অভিনীত হয়। ভূমিকালিপি ছিল এইরূপঃ—চন্দ্রবাবু—অহীন্দ্র চৌধুরী, অক্ষয়—তিনকড়ি চক্রবর্তী, রসিক—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, বিপিন—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দারুকেশ্বর—হরিমোহন বসু, মৃত্যুঞ্জয়—ব্রজেন সরকার, নীরবালা — নীহারকণা, শৈলবালা — সুশীলা সুন্দরী, সুরবালা—রানী সুন্দরী, নৃপবালা —ফিরোজা, নির্মলা—নিভাননী, জগত্তারিণী —নন্দরানী।

দেবনারায়ণ গুপ্ত
কলকাতা-৬

॥ ২ ॥

৯ই আগস্ট, ১৯৭৫ সংখ্যা দেশ-এ শ্যামল চক্রবর্তীর "চিরকুমার সভা" নাটকের পঞ্চাশ বছর নামে সময়োপযোগী রচনাটির জন্য ধন্যবাদ। এ ব্যাপারে দু-একটি অসঙ্গতির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

শ্যামলবাবু রচনার শুরুতেই ধারণা করেছেন যে, শিশিরকুমার 'চিরকুমার সভা'য় যে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন, তা কবির মনঃপূত হয়নি। কিন্তু এ ধারণা যে যুক্তি-নির্ভর নয় তার বহু প্রমাণ আছে। প্রথমত, শিশির ভাদুড়ী চিরকুমার সভা-র কোন নাট্যরূপই দেন নি। শিশিরকুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথই স্বহস্তে কাহিনীটিকে রঙ্গালয়ের উপযোগী করে দেন। শিশিরকুমার তখন মনোমোহন থিয়েটারে। তিনি 'চিরকুমার সভা' অভিনয়ের আয়োজনও করেন। কিন্তু মুশকিল হয় অক্ষয়ের ভূমিকাটি নিয়ে। একই সঙ্গে ভাল গায়ক ও অভিনেতা তখন মনোমোহন থিয়েটারে ছিল না এবং ঐ ধরনের কোন শৌখীন শিল্পীকেও শেষ পর্যন্ত অভিনয়ে সম্মত করানো সম্ভব হোল না। এই বিলম্বের সুযোগ নিলেন আর্ট থিয়েটার সম্প্রদায়, যার ফলে নাটকটি শিশিরকুমারের হাত ছাড়া হয়ে যায় (দ্রঃ বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার—হেমেন্দ্রকুমার রায়) তাছাড়া চিরকুমার সভা সম্পর্কে শিশিরকুমার নিজেও বলেছেন, 'প্রথম এডিশনের কাটা বই-এ কাগজ মেরে রবিবাবুর হাতে লেখা কারেকশন, এতকাল আমার কাছেই ছিল...' (দ্রঃ শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু)।

দ্বিতীয়ত, ১৮ই জুলাই শনিবার রবীন্দ্রনাথ যে চিরকুমার সভার প্রথম অভিনয় দেখতে এসেছিলেন এ খবর শ্যামলবাবু কোথায় পেলেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ প্রথম অভিনয় দেখেন নি, দেখেছিলেন ২৫শে জুলাই-এর দ্বিতীয় অভিনয়। অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর আত্মজী[illegible] 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'তে জানিয়েছেন, 'অভিনয়ের দ্বিতীয় দিনে কবি এলেন দেখতে। ২৫শে জুলাই পঁচিশ সাল—বাংলা ৯ই শ্রাবণ শনিবার—রাত সাড়ে সাতটায়'। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন, '৯ই শ্রাবণ যে অভিনয় হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন'।

প্রসঙ্গত নাটকটি প্রথম অভিনয় রজনীতেই সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর পূর্বোক্ত আত্মজীবনীতে একথাও জানিয়েছেন প্রথম রাত্রিতে চলাফেরার টাইমিং-এ একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছিল বই কী! অবশ্য দ্বিতীয় রাত্রি থেকে আর হয়নি।

দীপক গোস্বামী
নন্দীপুকুর, দেউলপাড়া, নৈহাটী

শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮২

পূজা সংখ্যা মানেই আনন্দবাজার—এ-তথ্য আজ সকলেরই জানা এবং পুরনো। কিন্তু পূজা সংখ্যা আনন্দবাজার সব বছরেই নতুন, সব বছরেই নিয়ে আসে শ্রেষ্ঠ রচনার সেরা সমাবেশ। ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকার এই শারদ-সংখ্যাটি যে রচনার উৎকর্ষে ও সম্পাদন-নৈপুণ্যে অন্যান্য পূজা সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি স্বতন্ত্র তার প্রমাণ এর বিপুল জনপ্রিয়তা এবং প্রচার। সবরকম একঘেঁয়েমি মুক্ত এবারের শারদীয়া সংখ্যাটিও রুচি ও পরিকল্পনার অভিনবত্ব নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে মহালয়ার অনেক আগেই—যাতে উপন্যাস ও গল্পপ্রিয় বাঙালী পাঠক-পাঠিকার আনন্দ হয়ে ওঠে সমগ্র।

এই সংখ্যার সেরা আকর্ষণ

৬টি নতুন স্বাদের সুবৃহৎ উপন্যাস

সমরেশ বসু/রমাপদ চৌধুরী/নীললোহিত

বুদ্ধদেব গুহ/শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়/শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একমাত্র আনন্দবাজারেই এঁরা উপন্যাস লিখছেন

বড় গল্প — শংকর

একালের খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের উপরোক্ত রচনাগুলি ছাড়াও থাকছে প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের অনেকগুলি গল্প, প্রবন্ধ ও সরস রচনা এবং আধুনিক কবিদের নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ। সঙ্গে রঙীন আর্টপ্লেট এবং অন্যান্য অনেক কিছু।

দাম : ১০.০০ ॥ সডাক : ১১.৫০

শারদীয়া আনন্দবাজারের জন্যে এখন থেকেই ব'লে রাখুন আপনার কাগজ যিনি দেন তাঁকে, বা, আমাদের লিখুন :

সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০১

রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ

দেশ সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৮২) প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশ সংক্রান্ত চিঠিগুলোতে উল্লেখিত তথ্য, টীকা ও তারিখ সম্পর্কে পত্রলেখক শ্রীঅলকরঞ্জন বসুচৌধুরী মহাশয় পাঠকমনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কথা বলেছেন (২ অগস্ট। দেশ), তা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো। তবে একটি বিষয়ে আমি পত্রলেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'ঝরাপালক' (১৩৩৪) পড়ে জীবনানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠির তারিখ (১৩২২) এবং উক্ত চিঠির জবাবে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দের প্রথম চিঠির তারিখ (১৩৩৭) প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'দুজনের একজন কি ভুল বছর লিখেছিলেন?'। এ সম্পর্কে আমার নিবেদন, দুজনেই ভুল বছর লিখেছিলেন বলে মনে হয়। 'ঝরাপালক'-এর প্রকাশকাল যেখানে ১৩৩৪, সেখানে উক্ত কাব্যগ্রন্থের ওপর মতামত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ১৩২২-এ চিঠি লেখা একেবারেই অবাস্তব ব্যাপার। উক্ত গ্রন্থ ১৩৩৪-এর মাঝামাঝি সময়ে (আশ্বিন ১৩৩৪। লেখকের ভূমিকা। জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা। কবিতা'। ১৫২ পৃ।) প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার কিছুকালের মধ্যেই জীবনানন্দ নিশ্চিত তা রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে থাকবেন এবং সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ হবারই সম্ভাবনা খুব বেশী। অন্যদিকে, জীবনানন্দ যে ভুল বছর উল্লেখ করেছিলেন, তা প্রথমত তাঁর লিখিত তারিখের (১৩৩৭) পরে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন (২৭ পৃ। দেশ সাহিত্য সংখ্যা।) যুক্ত থাকাতেই স্পষ্ট করে ধরা পড়ে এবং '?' চিহ্নটি পত্রলেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলেই ধারণা। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৪-এর ২২ অগ্রহায়ণ চিঠি লিখে থাকলে জীবনানন্দের পক্ষে তার জবাব তিন বছর পর ১৩৩৭-এ না দিয়ে ৩রা পৌষ ১৩৩৪-এ দেওয়াই একান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত বলে মনে হয়। কাজেই আমাদের মতে, জীবনানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠির তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ এবং তার জবাবে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জীবনানন্দের প্রথম চিঠির তারিখ ৩রা পৌষ ১৩৩৪ হওয়াটাই সব চাইতে যুক্তিযুক্ত।

প্রসঙ্গত জীবনানন্দ দাশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিঠির পত্রপরিচিতিতে একটি নামের ভুল ধরা পড়লো। রবীন্দ্রনাথের ১নং চিঠিখানা যিনি জীবনানন্দের অবিন্যস্ত কাগজপত্রের ফাইল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি ভূপেন্দ্র গুহ (পত্রপরিচিতি। রবীন্দ্রনাথের চিঠি জীবনানন্দ দাশকে। পত্র ১। ৩৯ পৃ। সাহিত্য সংখ্যা) নন, ভূমেন্দ্র গুহ (দ্রষ্টব্য। 'ময়ূখ'। জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা। ২৭২ ও ২৯১ পৃ।)।

অনিলবরণ চক্রবর্তী
হুগলী

শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ

৯ই আগস্ট 'দেশ' সংখ্যায় শ্রীসংগ্রাম সিংহ তালুকদার, প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ' প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ যে হিন্দু নন, একজন খাঁটি ব্রাহ্ম সেটা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন সেই সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই।

এখন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ছিলেন না ব্রাহ্ম ছিলেন সেই আলোচনা হাস্যকর এবং ছেলেমানুষী, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই—তিনি ভারতাত্মা, ভারতীয় চেতনার অন্তর্বাহিনী জ্যোতির্ময় প্রবাহ যা যুগ যুগান্তরের বাহ্যবিক্ষোভের অন্তরালে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তাই রবীন্দ্রনাথে ভাস্বর, তিনি কোন সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয় রেখার বন্ধনীভুক্ত নন। ভারতীয় ধর্ম চেতনার আদি উৎস বৈদিক উপলব্ধি থেকেই হিন্দু, বৌদ্ধ, এমনি অনেক ধর্মপথের ধারা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়েছে সাধকের উপলব্ধি ও চেতনায়। ব্রাহ্ম ধর্মও সেই উৎসেরই শিশু। সাধক যাঁরা—যাঁরা মরমী তাঁদের সাধনা চলে অন্তরলোকে, সেই সাধনায় মিশে যায় কত মানুষের ধারা, সে সাধনা মেলায়, এবং মিলে যায় অনন্তে। রবীন্দ্রনাথ সেই অনন্তের পথিক।

জয়ন্ত ভট্টাচার্য
হাওড়া-৪

ঘরে বাইরে

গত ২রা আগস্ট ১৯৭৫ 'দেশ' পত্রিকায় 'গৃহসজ্জা ব্যবসায়' প্রবন্ধে লেখিকা শ্রীমতীর একটি তথ্য সম্পর্কে কিছু ত্রুটি রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। ওই সংখ্যার ৪৩ পৃষ্ঠায় মাননীয়া লেখিকা এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, "১৭৭০ সালে এঁরা বাইরে চালান দিতে আরম্ভ করলেন। তারপর এল সাত-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ।" আমরা যতদূর জানি, সাত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের প্যারিসের সন্ধি ও হিউবার্টস-বার্গ-এর সন্ধি দ্বারা।

অসিতকুমার দোলুই
কোলাঘাট

শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ

"শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদে আমার বক্তব্য এই যে, নবদ্বীপ ইতিহাসের প্রথম স্তর সেন রাজত্ব, দ্বিতীয় স্তর শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ববর্তী মুসলমান আক্রমণ ও রাজ্যাধিকার, তৃতীয় স্তর শ্রীগৌরাঙ্গ সমকালীন ও চতুর্থ স্তর শ্রীগৌরাঙ্গ পরবর্তী। এই বিরাট কাল-সীমাকে সামনে রেখে নবদ্বীপের ভূপ্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আবশ্যক। উক্ত প্রবন্ধ লেখক শ্রীক্ষুদিরাম দাস নবদ্বীপের ঐতিহাসিক স্তরগুলির উপর দৃষ্টিপাত না করে সোজাসুজি শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের আলোচনা করেছেন। চৈতন্যের জন্মস্থান নির্দেশ করতে যেয়ে শ্রীচৈতন্য জীবনী সাহিত্য "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" গ্রন্থ মুখ্য করেছেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান অনুসন্ধান বা আবিষ্কার আলোচনা এই প্রথম নয়। বহু পূর্বে বিষয়টি নিয়ে সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকবৃন্দ মতামত প্রকাশ করেছেন। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে স্তর বিভাগেরও বিশ্লেষণ হয়েছে। তাঁদের বহুমূল্য অবদানগুলিকে না দেখেই বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের সূত্র সন্ধান না করে শ্রীদাস সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হয়েছেন যে, পূর্বস্থলী অঞ্চলে ছিল শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান। সামাজিক ইতিহাস বলতে আমরা বুঝি প্রাচীন সাহিত্যসূত্র এবং পুরুষানুক্রমে সযত্ন-সঞ্চিত লোকশ্রুতি। কারণ অনেক অজ্ঞাতপূর্ব মূল্যবান তথ্য এখানেই মিলে। প্রাচীন সাহিত্যরূপে 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' সুস্পষ্টভাবে শ্রীচৈতন্যের বাড়ি ও তাঁর লীলাস্থলীর বিবরণ সাক্ষ্য দেয়। প্রথমেই এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বিবরণ 'খোল ভাঙ্গা' ভাঙ্গার সংবাদ। 'খোল ভাঙ্গা'র স্থানটি কোনখানে হতে পারে সেটার নিঃসন্দেহে প্রমাণ রেখেছেন শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে। দেখি—"যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে। ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।" এই স্থানটি নিশ্চয় কাজির অবস্থান অঞ্চলের নিকট ছিল। ছিল বলেই "খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা" আজ চিহ্নিত স্থান। শ্রীদাসের গবেষণা যে স্থানটিকে উল্লেখ করে শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ তথা লীলাভূমি নবদ্বীপের একটা অবাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থে কাজি উদ্ধার ঘটনা পাঠ করলেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কাজির সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের গ্রাম্য-সম্পর্কে সম্বন্ধের কথা কাজির মুখে ব্যক্ত হয়েছে। কাজির বাড়ি থেকে অতি দূরে যদি শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ি হত তা হলে গ্রাম-সম্পর্কের কথা উঠত কি? শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (আদি ১৭ অধ্যায়ে) কাজি বলছেন, "গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা। দেহ সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাচা। নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা। সেই সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।" কাজির অবস্থান পরিবেশ শ্রীযুক্ত দাসের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে এ কারণে যে—"নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া। নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া।" এই গতি-পথের মধ্যে সেকালের নবদ্বীপের প্রকৃত ইতিহাস ও ভূগোল। ইতিহাস শ্রীচৈতন্যের জীবনীসাহিত্যের মধ্যে আছে। নবদ্বীপের ঘাটগুলির কথা "শ্রীচৈতন্য ভাগবতে" লেখা যেমন আছে, ঠিক তেমনি সেগুলি যে খুব দূরে দূরে ছিল না তার প্রমাণ—"পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়, এই মত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়। প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই। ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঁই ঠাঁই। প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি। একঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি।" ঘাটগুলি দূরে দূরে ছিল এ কথা কি মানে হয়? লক্ষ্মণ সেনের আমলে নবদ্বীপ কোনখানে ছিল তা অনুধাবন করলেই অসত্য-সমর্থনের গরজ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। নবদ্বীপ ইতিহাসের প্রথম স্তরে দৃষ্টি না রাখলে তৃতীয় স্তরের সমস্যার সমাধান হওয়া দুষ্কর। কারণ নবদ্বীপে সেন-রাজত্বের রাজধানীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল নবদ্বীপের সমাজ ও সংস্কৃতি। সেন রাজত্বের পরিচয় বহন করছে বল্লাল ঢিবি ও বল্লাল দীঘি। বর্তমান বামুনপুকুর গ্রামে বল্লাল ঢিবি। রাজবাড়ির কাছে কাছে ভাগীরথী তীরে গড়ে উঠেছিল রাজধানীর বসবাস-কারীদের বিভিন্ন পল্লী। জলঙ্গী দিয়ে তখন ভাগীরথীতে সওদাগরী বাণিজ্যতরীও আসত। ভাগীরথী ও জলঙ্গীকে নিয়ে ছিল রাজধানী। নগর সভ্যতা রাজধানীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বলেই শ্রীগৌরাঙ্গের নগর সংকীর্তনের পরিক্রম পথে শাঁখারী পাড়া, তাঁতিপাড়া, গোয়ালপাড়া, বানিয়া পাড়া, মালিপাড়া, তাম্বুলীপাড়া ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। (শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ড দশম অধ্যায় এবং মধ্য খণ্ড ২৩শ

অধ্যায় প্রাচীন সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। এই রাজধানীতে চাঁদকাজি শাসনকর্তারূপে বাস করতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনদলের খোল ভাঙ্গার সংবাদ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কাজির বাড়ির থেকে খুব বেশী দূরে শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ি ছিল না। "শ্রীচৈতন্যের সময়ে নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" নবদ্বীপ সমস্যার সমাধান বহুকাল পূর্বেই হয়ে গেছে। উক্ত প্রবন্ধের লেখক স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ। ("চিত্রে নবদ্বীপ" গ্রন্থে প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে। প্রতিবাদ পত্রে উৎকলন করে বক্তব্যকে দীর্ঘতর করা নিষ্প্রয়োজন।) বহুকাল আগে আনন্দবাজার পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত অনুযায়ী বিচার করলে এ সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই পৌঁছান যায় যে, কাজীর বাড়ি থেকে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান দূরবর্তী ছিল না। উক্ত চরিতগ্রন্থে উল্লেখ করা ঘাট চতুষ্টয় 'বারকোণা ঘাট', 'নাগরিয়া ঘাট', 'মাধাইয়ের ঘাট' শ্রীগৌরাঙ্গের নিজের ঘাট' নবদ্বীপের এই অঞ্চলেই অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেনের কালের প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ নগরের গঙ্গার তীরে তীরে। সেখানে নবদ্বীপ ছিল পল্লীসভ্যতা-মূলক। গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানের স্নানের ঘাট খুব দূরে দূরে থাকত না, তা ছাড়া কাজির কবর এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ। কারণ কাজি শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন "মোর বংশে যত উপজিবে। তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে।" (চৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা ১৭)। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগ্রহ দন্ড অর্জন করলেন সুদুর্লভ সৌভাগ্যে। কবর তীর্থভূমিতে পরিণত হল। খোল ভাঙ্গা, নগরসংকীর্তন এবং মহান কীর্তন প্রচার মধ্যে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান যে সেন রাজত্বের রাজধানী অঞ্চল তা প্রমাণ করে। শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ের ব্রাহ্মণ পল্লী কাজির বাড়ির কাছে ছিল বলেই তো গ্রাম সম্পর্কের প্রসঙ্গ চরিতকাব্যে উল্লিখিত আছে। তা ছাড়া আরও প্রসঙ্গ আছে সেগুলি পাঠ করলে অনায়াসেই বুঝা যায় প্রাচীন নবদ্বীপ সেন রাজধানীকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

স্কন্দরামবাবু প্রবন্ধে সমস্যা সৃষ্টি করেছেন নানাভাবে। চৈতন্যের জন্মভূমি সেন রাজাদের নগর থেকে কাজির বাড়ী থেকে বহুদূরে ঠেলে নিয়ে এসেছেন—যা ইতিহাস ও ভূপ্রাকৃতিক দিক দিয়ে অচিন্তনীয়। এজন্যই ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রধানত অস্বীকার করেছেন। প্রবন্ধে প্রথমেই তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ 'শ্রীমায়াপুরকে' যোগপীঠ বলে যুক্তিজালে আক্রমণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটে বল্লাল ঢিবি এবং বল্লাল দীঘির কথা তিনি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। যদি এ প্রসঙ্গে তাঁর প্রবেশ ঘটত তাহলে নবদ্বীপ ইতিহাস স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করতেন। প্রাক্-শ্রীচৈতন্যযুগে এবং শ্রীচৈতন্যযুগে নবদ্বীপ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। 'মায়াপুর' শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানের একটি পাড়া বা তৎকালীন গ্রাম। চরিত-সাহিত্যে তার উল্লেখ না থাকার কারণ নগরের নামকেই মুখ্য করা হয়েছে। পরবর্তীকালে শ্রীভক্তিরত্নাকর লেখক জন্মস্থানটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতেই 'মায়াপুর' উল্লেখ করেছেন। তিনি স্বচক্ষে এই মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি দেখেছেন।—প্রাচীনত্বের বিদ্যমানতায় নিশ্চিতভাবে বক্তব্য স্থাপন করেছেন। এ সংবাদ কোথায় তিনি পেলেন? অবশ্যই শ্রীমন মহাপ্রভুর বাড়ীর সেবক ঈশান তাঁকে বলেছেন—আর বংশ-পরম্পরা লোকশ্রুতি নবদ্বীপের বুকে 'মায়াপুরকে' স্বাতন্ত্র্যে তিনি সংস্থাপন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক উদ্ভট অসংগতির সঙ্গে 'ভক্তিরত্নাকরকে' ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন দেখেছেন। 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' থেকে শ্রীদাস উদ্ধৃত করেছেন 'রাজপথ দিয়া প্রভু আইল একদিন...... মুকুন্দ যায়েন গঙ্গাস্নান করিবার' (আদি-সপ্তম) এই দেখাটা রাজপথে হওয়ায় তিনি রাজ-পথকে অবলম্বন করে সেকালের যে প্রশস্ত পথ অন্যত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনি একটু গভীর ভাবে বিবেচনা করলে দেখতে পেতেন শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান মূলুকপতির সন্নিহিত পল্লী মায়াপুরে গঙ্গার তীরে। প্রশস্ত রাজপথ নিশ্চয় ছিল। যেখানে এতগুলি পাড়া সেখানে, রাজপথ ছিল না? সেই রাজপথকে অন্যত্র দেবার যৌক্তিকতা কোথায়? কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক থেকে উদ্ধৃতিও এই ভাবে তিনি স্বীয় সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাজিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নির্ণয়ে তা মোটেই আলোকপাত করে না। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে শ্রীযুক্ত দাসের যুক্তি ও তথ্য পরিবেশনা কোথায়ও ঘাতসহ নয়। শ্রীযুক্ত দাসের বক্তব্যের মধ্যে মাত্র অনুমাননির্ভর অভিনবত্ব। নবটি দ্বীপকে তিনি কাল্পনিক বলেছেন! কারণ, মায়াপুরে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তা হলে শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ নিয়ে নূতন আলোচনার সূত্রপাত করা যায় না। অপসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা চলে না! মায়াপুর শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থানরূপে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পেয়েছে প্রায় একশত বৎসর হতে চলল, এখানে ইতিহাস ও ভূগোল সঙ্গতিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করেছে।

প্রণবচন্দ্র রায়চৌধুরী
কলকাতা-২৬

পর্যটকের পত্র

এবারের দেশে (৯ই আগস্ট) শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ের 'পর্যটকের পত্রে'তে দুটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ছে। প্রথমত উনি লিখেছেন, 'কানাডার ভূভাগ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণেরও বেশী'। আর এক জায়গায় উনি লিখেছেন 'মোট ছয়টি ভারতবর্ষ এক করলে তবে কানাডার ভূ-পরিমাণের আভাস পাওয়া যায়।'

লেখকের অসাবধানতাবশত দুটি তথ্য ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ভূভাগের পরিমাণ যথাক্রমে ১২,৫৯,৭৯৭ বর্গমাইল, ৩০,২৬,৭৮৯ বর্গমাইল ও ৩৮,৫১,৮০৯ বর্গমাইল।

তথ্যগুলো তিনটি বই থেকে নেওয়া হয়েছে। বইটি তিনটি যথাক্রমে: Hindusthan Year Book, আশুতোষ দেবের ইংরাজী বাংলা অভিধান আর O P Khanna-র General Knowledge.

প্রকাশ নন্দী
বাঁশবেড়িয়া

বাংলা ভাষার দুই ভগীরথ

গত ১৯-৭-৭৫ ইং তাং এর 'দেশ' পত্রিকায় (সংখ্যা ৩৮) 'শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্ত-এর লেখা 'অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বাংলা ভাষার দুই ভগীরথ'—শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটি খুবই তথ্যবহুল এবং উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু একটি বাক্য বিসদৃশ লেগেছে বলেই এই চিঠি।

বাক্যটি হ'ল—

'সূর্য উঠলে কে খোঁজ করে নক্ষত্রের।'

[পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২৩; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তি]

লেখক এখানে সূর্য বলতে রবীন্দ্রনাথ এবং নক্ষত্র বলতে অক্ষয়চন্দ্রকে বোঝাতে চেয়েছেন। এবং তুলনাটিতে বোঝাতে চেয়েছেন—সূর্যের তুলনায় নক্ষত্র ছোট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সূর্যও একটি নক্ষত্র, বরং অনেক নক্ষত্র আছে—যেগুলো সূর্যের চাইতেও অনেক বড়।

নরোত্তমচন্দ্র রক্ষিত
নিউ টাউন, কোচবিহার

॥ চল্লিশ ॥

—"মুখ চাই মুখ? আপনার পোর্ট্রে করে দেবো, মাদাম? সাদাকালো অথবা রঙীন?"

মহিলাটির প্রায় কানে কানে বললুম। ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে হাঁটছি। দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিরে তাকালো আমার দিকে। পরনে ম্যাক্সির মতো পোশাক। ঠিক ম্যাক্সিও নয়, গোড়ালি ঢাকা পড়ে না। গলার কাছে, নীচের দিকে ফুলকাটা ফুল-কাটা। ঠোঁটে ফরাসী ভদ্রতার হাসি।

আবার বলে উঠলুম,

—"মুখ এঁকে দিই আপনার—"

মহিলা চোখ টিপে থামিয়ে দিল আমায়। বলল,—"নোঁ! মেরসি।"

তারপর, গলায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে বলল, —"তিন চারবার তোমাদের এই মোঁমার্ত্রে পোর্ট্রেট করিয়েছি—একবারো মেলাতে পারেনি। ফুঃ—।"

তাড়াতাড়ি মুখটির রেখা, গঠন আর ত্বকের রং চোখ দিয়ে চেটে নিলুম। না! এমন তো দুরূহ পোর্ট্রেট কিছু নয়। আসলে, চট করে যে ব্যাপারটি বুঝলুম, তা হল, সুন্দরীর বয়েস কমসে কম চল্লিশ। চামড়া টেনে, বলিরেখা ঢেকে ঢুকে, বুক বাগিয়ে নিজেকে পঁচিশের বেশি কল্পনা করতে চান না। এঁর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়ে থাকলে অবাক হবার কিছু নেই। অথচ, সদ্য যুবতীটি সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! এবং, সেইজন্যেই হয়তো মোঁমার্ত্রের শিল্পীরা এঁর পোর্ট্রেট মেলাতে পারেনি। অর্থাৎ, এর মনমতোন মেলাতে পারেনি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি যতটা সম্ভব বিলিতি কায়দায় বিনীত হেসে নিবেদন করলুম,

—"পোর্ট্রে না মিললে একটি ফ্রাঁ-ও দেবেন না, মাদাম!"

অল্প ভুরু কাঁপিয়ে আশ্চর্য কৌশলে এক পলকের জন্যে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে তুললো। বললো,—"আমি মাদাম নই। মাদমোয়াজেল।"

ও হরি, তাই বলো। তা চল্লিশ ছুঁয়েও যদি 'মাদমোয়াজেল' অর্থাৎ কুমারী থেকে থাকো, তবে তো তোমার পোর্ট্রেট মেলানো একটু শক্তই হবে! দেখা যাক! নিজের কুমারীত্বের প্রতি জোর দেওয়ার জন্যেই কে জানে, আবার বলে উঠলো :

"মাদমোয়াজেল দ্যুরো! জীনেত দ্যুরো!"

—"বেশ তো, মাদমোয়াজেল, আমি আপনার পোর্ট্রেট মিলিয়ে দেবই।"

সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত বাড়িয়ে বলল,

—"বাজি?"

হাত মিলিয়ে হাসিমুখে বললুম—

"বাজি।"

—"কি বাজি?"

খুব চালাক সেজে চটপটে গলায় আগের কথাটিই আবার বলে দিলুম,

—"না মিললে কোনো পারিশ্রমিক দিতে হবে না আপনাকে। মিললে, একশো ফ্রাঁ।"

মহিলাকে বসবার চেয়ার এগিয়ে দিলুম। হেসে ফেলল। দাঁতগুলো নকল নয় তো? এতো পরিষ্কার ঝকঝকে দাঁত তো ফরাসীদের হবার কথা নয়। আমার চালাকি কাজে লাগল না। জীনেত বলল,

—"ও তো দামের কথা হল! বাজি কি?"

—"আমার সময়।"

ঠোঁট উল্টে জীনেতের জবাব,

—"বাহ্! আমার সময়ের বুঝি দাম নেই?"

সেলসম্যানের ঘাবড়ে যাওয়া চলে না। তাড়াতাড়ি বললুম,

—"ছিঃ। কি বলছেন আপনি! আপনার সময়ের দাম আমার সময়ের থেকে অনেক বেশি।"

বোর্ড বাগিয়ে ধরে বললুম,

—"তাহলে শুরু করে দিই!"

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে

আলতো হাতে চেপে চেপে মুখের কল্পিত ঘাম মুছে নিল।

বলল,

—"কিন্তু বাজি কি?"

হাল ছেড়ে দিলুম। কারণ, সময় বয়ে যায়। কত খদ্দের মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোমার্ত্রের মরসুম, ট্যুরিস্ট টানছে দলে দলে। এ মহিলা যদি পাগল, থুড়ি, পাগলী হয়, তাহলে এর সঙ্গে আমার সময় নষ্ট করা মানে, অন্য একটা পাকা খদ্দের হাতছাড়া করা। গত ক'দিন যে হারে মুখ এঁকে রোজগার করেছি, আজ তার তুলনায় কিছুই নয়। এগারোটা বাজে। মোটে একটি খদ্দের পেয়েছি।

হাই তোলার মতো বললুম,

—"মাদমোয়াজেল দুরেরাঁ। আপনি কি সত্যি সত্যিই আপনার পোর্ট্রেট আঁকাতে চান?"

ব্যাগ থেকে ইতিমধ্যে একটি ছোটো আয়না বেরিয়েছে। নিজের মুখের দিকে লক্ষ রেখে বলল,

—"আমাকে 'জীনেত' বললে কম সময় এবং অক্ষর ব্যবহার করতে হবে!"

'কেস' তো অন্যরকম ঠেকে! বুঝতে পারছি না ঠিক। অথচ হয় এর পোর্ট্রেট করে পয়সা বাগাই, নয় তো বাপু বিদেয় হও! অন্য মুখ খুঁজি।

জীনেত বললে,

"তাছাড়া আমি কি এখানে ইয়ার্কি মারতে বসে পড়েছি, মনে হচ্ছে?"

সোজা হয়ে বসলুম। নিজেকে সামলাবার জন্যে অবশ্যই। কারণ, মোমার্ত্রের মেলা বসার পর থেকে আজ অবধি আমার 'নিশ্চিত' সুনাম হয়েছে। যাঁদের মুখ এঁকেছি, তাঁরা নিশ্চয়ই গিয়ে বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনদের বলেছেন আমার কথা। দু'তিন জন এখানে এসে 'ইণ্ডিয়ান পেইণ্টারের' খোঁজ করে আমাকে দিয়ে পোর্ট্রে করিয়ে নিয়ে গেছেন। সাদা-কালো মুখ চল্লিশ ফ্রাঁতে আঁকতে শুরু করেছিলুম। এখন দাম বাড়িয়ে খদ্দের বুঝে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন করে নিয়েছি। রঙিন একশো।

খদ্দের লক্ষ্মী। সুতরাং সবিনয়ে বললুম,

—"আমাকে ভুল বুঝবেন না। মানে, বাজি ধরে পোর্ট্রেট কখনো আঁকিনি, তাই—"

আয়নায় চোখ রেখে ঠোঁটে লিপস্টিক বোলাচ্ছে। হাসতে হাসতে বলল,

—"ভীতু কোথাকার। আত্মবিশ্বাস নেই!"

এবার মনে মনে চটে গেলুম। জিভ চেপে গেল। আঁতে ঘা বলে কথা। মৃদু হেসে বললুম,

—"আপনার রঙীন পোর্ট্রে করে দিচ্ছি। না মেলাতে পারলে, আপনার মডেলিংয়ের সময়ের দাম হিসেবে একশো ফ্রাঁ দেব আপনাকে!"

খুব খুশি এবার। সঙ্গে সঙ্গে লিপস্টিক, পাউডারের কৌটো, আয়না ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল,

"ঠিক আছে। রাজি।"

বোর্ড কোলে ধরে হাল্কা বাদামি প্যাস্টেল হাতে নিয়ে জিগ্যেস করলুম,

—"আর, পোর্ট্রে মিললে?"

ব্যাগ থেকে ফরাসী সেন্টের শিশি বেরুলো। শরীরে স্প্রে করতে করতে জীনেতের চট-জবাব,

—"মিললে, তোমার পারিশ্রমিক একশো ফ্রাঁ তো দেবই। আর 'লা তুর দার্জাঁ'তে ডিনার খাওয়াবো। ফুল কোর্স।"

বোর্ডের দিকে চোখ ছিল। কথাটি শুনেই, আমি জানি, আমার চোখ বড় হয়ে গেছে এবং হাঁ করে এক পলক হলেও পাগলীটির দিকে তাকিয়ে থেকেছি। কারণ কে না জানে, লা তুরনেলের রেস্তোরাঁ 'লা তুর

দারুণ এলাহি ব্যাপার। বাইরে থেকে দেখেছি। নোৎরদাম ক্যাথিড্রেলের কাছে এই হোটেলে একজনের শুধু ডিনার খাবার দাম কম করেও একশো ফ্রাঁ, মানে, দেড়শো টাকার ধাক্কা। তাছাড়া মদের বিল আলাদা। একশো ফ্রাঁ ক্যাশ রোজগার এবং স্বর্গরাজ্যের বিলাসী হোটেলে দেড়শো টাকার খাবার—হে নারী!! তোমার পোর্ট্রেট আমাকে মেলাতেই হবে!

সেইদিন জেরি এসেছিল। প্যাটের পাপা জেরি শাঁটস লণ্ডন থেকে প্যারিসে। এবং আমার খোঁজে মোঁমার্ত্রে।

মাদমোয়াজেল দ্যুরোঁর ছবি শেষ করে বোর্ড সমেত মাটিতে প্যাকিং বাক্সে হেলান দিয়ে রাখতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠেছিল মহিলা। চেয়ারের পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আর নড়নচড়ন নেই। হাঁ করে নিজের দিকে তাকিয়ে ছিল। জেনেশুনে, ভেবেচিন্তেই ওর মুখের লুকোনো অথচ একেবারে অদৃশ্য নয় এমন সব বলিরেখা আমি এড়িয়ে গেছি। এই চেহারাটি ইচ্ছে করেই ওর চোখের সামনে তুলে ধরেছি যাতে বেচারি অন্তত দশ বছর আগের নিজেকে খুঁজে পায়।

আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে আমায় দেখল। আপন মনেই বলল যেন, আমি শুনতে পেলুম,

—"হে রিয়াঁ! খুব ভালো এঁকেছো আমায়! একেবারে আমি যা ছিলুম, যা থাকতে চাই—"

বলেই, সামলে নিল বুঝি,

—"মানে, যা আছি!"

তারপরে শুরু হল পাগলামি! খুশিতে আমার গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চক্‌-চক্‌-চকাস করে দুই গালে এবং ঠোঁটে চুমু খেল। খেতে খেতেই বলল,

—"তুমি দারুণ। অসাধারণ। জোঁন, জিনিয়াস।"

আমার গলা ছেড়ে দিয়ে একটু সুস্থ হল। আশেপাশে দেখার প্রয়োজন নেই। হাসি মুখে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলল আবার। আয়না, লিপস্টিক, আই-লাইনার বের করে প্রসাধন করতে বসল। আমায় চুমু খেতে গিয়ে লিপস্টিক নিশ্চয়ই ঠোঁট থেকে কমে গেছে। পাছে মুখের রেখা এক-আধটা লেপটে বেরিয়ে গিয়ে থাকে!

গালে পাউডারের পাফ বোলাতে বোলাতে বলল,

—"হেরে গেলুম, ইন্ডিয়ান। তোমার কাছে আমি হেরে গেলুম।"

বলে, করকরে একশো ফ্রাঁর একটা নোট আমার দিকে এগিয়ে দিল। আবার বললে,

—"সন্ধ্যে সাতটা। লা তুর দার্জ"। মিনিট পাঁচেক আগেই আমি যাবো। তোমাকে টেবিল খুঁজতে হবে না।"

নোটটি পকেটে গুঁজে রুমাল দিয়ে গাল ঠোঁট মুছতে মুছতে বললুম,

—"সত্যি সত্যিই খাওয়াচ্ছেন নাকি?"

পুরুষদের মতো সামান্য বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। কোমরে হাত রেখে বলল,

—"ধমনীতে জাত ফরাসী রক্ত। কথা দিয়ে কথার খেলাপ করতে শিখিনি। বাজি হেরেছি। ডিনার তোমার দাবি বা ন্যায্য পাওনা!"

বলে, চোখ টিপে জিজ্ঞেস করলে,

—"ইন্ডিয়ান যুবক, আগে থেকে অন্য কোথাও র‍াঁদেভু নেই তো?"

পকেটের ভেতর একশো ফ্রাঁর নোটে বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল বুলিয়ে সাহস পেয়ে গেছি। আমিও চোখ টিপে দিলুম। বললুম,

—"ফরাসী সুন্দরী! তুমি থাকতে আর কোথাও র‍াঁদেভু আমার থাকতেই পারে না।"

নিজের সদাযুবতী মুখ হাতে নিয়ে কায়দামাফিক আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলে গেল,

—"সন্ধ্যে সাতটা। লা তুর দার্জ"।"

শিল্পী, দর্শক, ট্যুরিস্ট, খদ্দের গমগম করছে চারপাশে। বেলা দুপুর। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। তবু সারা আকাশে সাদা মেঘের আলো। বাদল-বৃষ্টির ব্যাপার নেই। অভ্যেসের মেঘ। জোড়া জোড়া। শীত পাখার অলস্যের ঠাণ্ডা বাতাস কেউ চাইছে।

বন্ধুদের জন্যে চোখ ফেরাতেই, আশ্চর্য দৃশ্য। যিশু, দেনিস এবং মঁসিয় কোর্তোয়া পাশাপাশি হেঁটে আসছে গম্ভীর মুখে। এতো গম্ভীর মুখ এবং তিনজনের একসঙ্গে মার্চ করে আসার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, আক্রমণ করতে আসছে। তিন জোড়া চোখ যেন গিলে খাবে আমায়। বোর্ডে নতুন কাগজ পিন দিয়ে লাগাচ্ছি আর হাসিমুখ করবার চেষ্টা করছি। কি ব্যাপার বোঝা মুশকিল।

ওরা কাছে এগিয়ে আসতেই বোকা-বোকা হেসে জিজ্ঞেস করলুম,

—"কি? কি ব্যাপার? মারবে নাকি?"

তিনজনে এগিয়ে এলো আরো। জবাব দিল না। হাতে বোর্ড নিয়ে হুতোমের মতো দাঁড়িয়ে আছি। কিছু বোঝবার বা ভাববার সময় না দিয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। দেনিস ডান পাশে। মঁসিয় কোর্তোয়া বাঁয়ে। যিশু আমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল।

তারপরেই, একসঙ্গে তিনজনের কোরাস গলায় প্রশ্ন, তালে তালে, ছন্দ মিলিয়ে বলা যায়,

"সাতটা কিংবা সাড়ে সাতটায়,
ম্যাক্সিম নাকি লা তুর্ দার্জ"?"

এক পা পিছিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তার মানে!!"

জবাবে ওরা তিনজনে ঠোঁট মিলিয়ে আবার গাইল। একই সুরে, একই ছন্দ,

—"সাতটা কিংবা সাড়ে সাতটায়,
ম্যাক্সিম নাকি লা তুর্ দার্জ"?"

বোকা অবস্থা!

'ম্যাক্সিম' আরেকটি সেরা হোটেল। ওরা

কি আমাদের দুজনের কথা শুনতে পেয়েছে? কিন্তু, এদের তিনজনের কেউই তো কাছাকাছি ছিল না তখন!

যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে বললুম,

—"কি বলছো তোমরা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মাথামুণ্ডু!"

গম্ভীর মুখে পরামর্শ দেবার মতো যিশু বললে,

—"যাবার সময় পকেটে একটু অ্যান্টি-সেপটিক লোশন আর তুলো নিয়ে যেও।"

ওর কথা শেষ হতে না হতেই দেনিস আলতো দু আঙুলে আমার চিবুকে নাড়া দিল। জিভে চুক্-চুক্ শব্দ করে মাথা দুলিয়ে ভারিক্কি গলায় বললে,

—"অ্যান্টি টিটেনাস ইঞ্জেকশন একটা নিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্দি—"

হো হো করে হেসে উঠল তিনজনে। আমার দিকে দেখছে আর হেসে গড়িয়ে পড়ছে। চারপাশের মানুষজন অবাক। ঘুরে ঘুরে এদিকে দেখছে। পাক্কা এক মিনিট বাদে বেদম হয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগল ওরা।

জিজ্ঞেস করলুম,

—"এবার বলো, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার কথাবার্তা কি শুনতে পেয়েছো তোমরা?"

মুখে জবাব না দিয়ে তিনজনে মাথা নেড়ে জানাল, না।

মঁসিয় কোর্তোয়া তাঁর সরু গলায় বললেন,

—"আর কি! আপনার তো হিল্লে হয়ে গেল মশায়! যাকে বলে গিয়ে, জামাই-আদরে থাকবেন!"

দেনিস বললে,

—"ক' দিন—থুড়ি, মানে, ক' রাত—সেইটেই প্রশ্ন!"

নিজেদের মধ্যে ঠারে-ঠোরে কথা বলছে। আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে।

যিশু বললে,

—"আমার কপালে তো ভাই, সাকুল্যে দুটি রাত্তির!"

মঁসিয় কোর্তোয়া আমায় বললেন,

—"আমি মশায় এসব কিছু জানি না। বুড়ো হয়ে গেছি তো, জামাই আদরের কপাল কোথায়! তবে হ্যাঁ, এরা দুটিতে সুখ পেয়েছে।"

দেনিস সঙ্গে সঙ্গে বললে,

—"কেন? উনি? উনি তো সব্বাইকে টেক্কা দিয়ে ন' সন্ধ্যে ম্যাক্সিম। ন' দিন-রাত্তির জামাই—"

বলে, আঙুলে তুলে যাকে দেখাল, আমি তো অবাক। লিয়ঁ। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। থার্টি-টু অল-আউট করে হাসছে। যেন, এখানে কি আলোচনা হচ্ছে সবই ওর জানা। লিয়ঁকে আমি আজ অবধি হাসতে দেখিনি। সারাক্ষণ গম্ভীর, চুপচাপ। সেই মানুষ, তার লম্বাটে মুখে গালভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে। ওর এমন কি বলে সেই, 'অভূতপূর্ব' মুখ দেখে আমারও প্রায় হাসি পাবার জোগাড়। অথচ ভেতরে প্রশ্ন ঘুরছে! কি ব্যাপার? এ-সবের মানে কি? কোনো গূঢ় রহস্য নয় তো?

দেনিস লিয়ঁকে দেখিয়ে বলছে, হেসে হেসেই,

—"ঈশ্! এখন আবার হাসি হচ্ছে! দশ দিনের দিন যখন ফিরে এলে, চাঁদু, মুখের ছ' জায়গায় স্টিকিং প্লাস্টার সাঁটা! প্রেমের পরাণ পণ্ডা তোলি!—"

লিয়ঁ কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছে না, অথচ ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে যেন, সবই বুঝতে পারছে ও।

আমার দিকে ফিরে দেনিস বললে,

—"আমি টেনেটুনে চারদিন, ভাই। রোজই লা তুর দার্জে তুমুল পানাহার!"

যিশু বললে,

—"আমার সন্ধ্যে দুটি ম্যাক্সিমে। কী স্কচ! কী খাবার!"

বিরক্তিতে প্রায় ধমক দিয়ে উঠলুম,

—"উফ্! বলি, তোমরা একটু থামবে?"

তিনজনেই চুপ করে, মুখে মুচকি হাসি মেখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

গোড়ায় ভেবেছিলুম, একটু ভাঁট দেখিয়ে নেমন্তন্নের খবরটি এদের দেব। এখন হয়েছে উল্টো! এরাই আমাকে প্রায় ঘাবড়ে দেবার তাল করেছে। ঘটনা কি বোঝবার জন্যে পুরোপুরি সারেন্ডার করাই ভালো, ভেবে দেখলুম।

যিশুকে বললুম,

—"মাদমোয়াজেল দ্যুরৌকে তোমরা সবাই চেনো মনে হচ্ছে। আসলে, বাড়ি ছেড়ে সন্ধ্যে সাতটায় লা তুর দার্জে'তে খাবার নেমন্তন্ন করেছেন।"

দেনিস বললে মাথা দুলিয়ে,

—"উঁহু-উঁহু! শুধু খাবার নয়! খাবার-দাবার এবং আবার-আবারের নেমন্তন্ন!"

ফের হেঁয়ালি!

চটেমটে বলে দিলুম,

—"দ্যাখো, তোমরা যদি সোজাসুজি কথা না বলো, তা হলে আমি কিছুই শুনতে চাই না।"

বলে বোর্ড হাতে নিয়ে হাঁটা দিলুম। যিশু আমায় থামিয়ে দিয়ে হাসল। কাঁধে হাত রেখে বলল,

—"ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই। ব' কুরাজ, দোস্ত! লড়ে যাও। ভালো পোশাক পরে একটু সেজেগুজে যেও—দামী রেস্তোরাঁ তো!"

দেনিসও পিঠ চাপড়ে হাসল। বলল,

—"তবে, হ্যাঁ। ওই তুলো এবং লোশন কিনতে নিতে ভুলো না। পারো তো অ্যান্টি-টিটেনাসটা—"

মঁসিয় কোর্তোয়া চোখ টিপলেন। খ্যা খ্যা করে হাসতে হাসতে চলে গেল ওরা।

বুদ্ধু ভূতুমের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। কি ব্যাপার রে বাবা! এদের কোনো কথারই তো হদিশ পেলুম না। ঝুট্-ঝামেলা নেই তো! বিদেশে অচেনা পাগলীর পাল্লায় পড়ে বিপদ ডেকে আনছি কি না কে জানে! দূর! যা থাকে বরাতে! দেখা যাবে সন্ধ্যেবেলা। বিনি পয়সায় অত বড় হোটেলে ডিনার—কোনো কারণেই সুযোগ হাত-ছাড়া করা উচিত নয়। ডিনার মানেই স্কচও নিশ্চয়ই থাকবে সঙ্গে। বন্ধুরা একটু রসিকতা তো করবেই। মেয়েটির সঙ্গে বন্দেভূর কথা নিশ্চয়ই শুনে ফেলেছে ওরা। কিন্তু, ওই তুলো, লোশন আর অ্যান্টি-টিটেনাসের ঘটনাটা মাথায় ঢুকছে না। পাড়ায় নিয়ে গিয়ে ধোলাই খাওয়াবে না তো! সত্যি সত্যিই হয়তো জীনেতের মাথার ঠিক নেই। হয়তো আসবেই না ওখানে। আমি একা গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বোকা হয়ে ফিরে আসবো—বন্ধুরা হাসাহাসি করবে—

এই সব ভাবছিলুম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সেদিনই জেরি এসেছিল। ওর ছোট্ট মিন্টি মেয়ে চার বছরের প্যাটকে হারিয়ে গোমাঁর্তে এসেছিল জেরি শার্টস।

[ক্রমশ]

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা

প্রাণিদেহজ রস বিশেষ অর্থাৎ হর্মোন ঘটিত পরিবর্তনের সময় দাঁতের মাড়িতে নানা অস্বস্তি মেয়েদের জীবনে খুব দেখা যায়। সে সময় মুখের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া দরকার। মাসিক রজঃস্রাব সংক্রান্ত কোন বিশেষ বিশেষ সময় দাঁত ও মাড়ি উত্তেজিত হয় এবং যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। এইভাবেই গর্ভাবস্থায় মেয়েদের দাঁতের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। তখন মাঝে মাঝে মাড়ি ফুলে যায়, রক্ত পড়ে ও দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। হর্মোন ঘটিত পরিবর্তন স্থিতিলাভ করলে আবার দাঁতের স্বাস্থ্য ফিরে আসে।

দাঁতে রক্ত পড়া খুব সাধারণ একটি সমস্যা। নানা কারণে দাঁতে রক্ত পড়তে পারে। দাঁতের নীচে ছাতা যাকে দন্তমল বলা হয় তাতেও রক্তপাত হয়। দাঁত মাজার দোষেও রক্ত পড়া অসম্ভব নয়। সাধারণত ভিটামিন "সি" দাঁতের রক্ত পড়া বন্ধ করে বলে একটা ধারণা আছে। ভিটামিন 'সি' রক্তপড়া বন্ধ করে কিনা জানা কঠিন তবে অন্যান্য চিকিৎসার সঙ্গে ভিটামিন "সি" প্রয়োগে উপকার যে হয় এ কথা ঠিকই।

দাঁতের স্বাস্থ্যহীনতা থেকে অনেক সময় মুখে দুর্গন্ধ হয়। অবশ্য অন্যান্য অনেক কারণে মুখে দুর্গন্ধ দেখা যায়। গলা বা নাকের জীবাণুদুষ্ট অবস্থা, বদ হজম, ফুসফুসের অসুখ, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি থেকেও দুর্গন্ধ হয়। এই দুর্গন্ধ হওয়াকে 'হেলিটোসিস' বলা হয়। 'হেলিটোসিস'-এর জন্য বাজারে প্রচলিত নানারকম ঢালাও মুখ ধোয়ার জিনিস মেলে। তাতে তখনকার মত কিছু উপকার হয় কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এত রকমের জীবাণু মুখের মধ্যে থাকে যে ভাবলে অবাক হতে হয়। এক মিলি লিটার লালাতে ৫,০০,০০,০০০ জীবাণু থাকতে পারে। এমনকি তার কয়েক গুণ বেশীও থাকা অসম্ভব নয়। তার মধ্যে বেশীর ভাগ জীবাণু দাঁতের গোড়ায় অথবা দাঁতের ফাঁকে থাকে। মুখের যত্ন না নিলে বা কঠিন অসুখে এসব জীবাণু বাড়ে।

ছোটদের দাঁতের বিশেষ যত্ন দরকার। ছোটবেলা থেকে তাদের মুখাভ্যন্তর ও দাঁতের যত্ন নেওয়ার পদ্ধতি শেখানো উচিত। অল্প আঘাতে ছোট ছেলেমেয়ের দাঁতের ক্ষতি হয়। বিশেষ করে সামনের দাঁত। অনেক সময় তখন তখন বোঝা যায় না। পরে যন্ত্রণা হয়। তবে চিকিৎসক তার ব্যবস্থা করতে পারেন। আক্কেল দাঁত বা পূর্ণ বয়সে যে দাঁত ওঠে তা নিয়েও যন্ত্রণা পান অনেকে। গবেষণায় দেখা

ঘরে বাইরে

গেছে শতকরা ৩২ জনের সব কটা আক্কেল দাঁত থাকে না।

মানুষের দাঁত সযত্নে রাখলে সারাজীবন থাকে। মানুষের শরীরে সবচেয়ে শক্ত হলো দাঁত। হাড়ের চেয়েও কঠিন। স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুবার দাঁত হয়। কিন্তু কোন কোনও নিম্নস্তরের প্রাণী দাঁত ব্যবহার করে খাদ্য ধরে রাখবার জন্য। চিবোবার জন্য নয়। যেমন ধরুন ব্যাং। সারা জীবন ধরে তার ভাঙা বা পুরোনো দাঁতের জায়গায় নতুন দাঁত গজায়।

শিশু জন্মের আগেই, মায়ের গর্ভে চতুর্থ মাস থেকে তার দন্তোদ্গমের আয়োজন চলে। কাজেই গর্ভবতী মা বা স্তন্যপায়ী শিশুর জননীর প্রচুর ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ম ও ফসফরাস খাওয়া উচিত। গর্ভবতী মায়ের এমন কোন বিশেষ ওষুধ খাওয়া উচিত নয়, যাতে শিশুর দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। দুধের দাঁতের যত্ন অনেকে নেন না। পড়েই তো যাবে এই ভেবে দুধের দাঁত যেমন তেমন করে রাখা হয়। প্রাপ্ত বয়স্কের দাঁত দুধের দাঁতের নীচে লুকিয়ে থাকে। দুধের দাঁতের ক্ষতি থেকে সে দাঁতেরও ক্ষতি হতে পারে। দুধের দাঁত থাকে ২০টি। প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ৩২টি। কাজেই শিশু বড় হলে তার ১২টি বেশী দাঁত হয়। চোয়ালের হাড় বা হন্বস্থিতে বাড়তি দাঁতের জন্য জায়গা হতে থাকে। বাড়তি দাঁত চোয়ালের উপরে ও নীচে দুই দিকে তিনটি করে হয়। ছোট বেলায় হঠাৎ কোন কারণে দুধের দাঁত পড়ে গেলে (স্বাভাবিক ভাবে নয়) তলার দাঁতের সারি সমান না থাকতে পারে। তেড়া বাঁকা, অতিরিক্ত ঠাসাঠাসি ইত্যাদি পরিণতি পরের দাঁতের সারিতে বর্তানো বিচিত্র নয়। এসব ক্ষেত্রে আজকাল দন্ত চিকিৎসকরা সতর্কতা অবলম্বন করার বিধি ব্যবস্থা দিতে পারেন অবশ্য। ছোট বেলায় বুড়ো আঙুল চোষার জন্য দাঁতের অসমান উদ্গম হয়। তা ভিন্ন মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া, দাঁত কিড়মিড় করা অর্থাৎ দাঁতে দাঁতে ঘষা, নখ কামড়ানো ইত্যাদি অভ্যাস থেকে

ছোটদের দাঁত অসুন্দর হয়। তাই ছোটবেলায় শিশুদের এসব অভ্যাস থেকে মুক্ত করা কর্তব্য। তবে বকে বা ধমকে নয়। কারণ হয়তো অভ্যাসগুলির মূলে উৎস ভীতু স্বভাব বা স্নায়ুজনিত কোন দুর্বলতা থেকে। শাস্তি দেবেন না, ভয় দেখাবেন না। বরং খোঁজ করে দেখুন অভ্যাসের মূল। নাকে কোন অসুবিধা থাকলে মুখ দিয়ে নিশ্বাস নেয় বাচ্চারা। সঙ্গহীন বাচ্চারা অনেক সময় বুড়ো আঙুল চুষতে থাকে। দাঁতে দাঁতে ঘষা চিন্তা থেকেও হয়। কাজেই কারণ খুঁজে সংশোধন করুন। অল্প বয়সে দন্তোদ্গমের দোষ ত্রুটি সহজেই সংশোধন করানো যায়। কাজেই অল্প বয়সের ত্রুটি সম্পর্কে মনোযোগী হওয়া উচিত।

বছর পঁচিশ বয়স পর্যন্ত দাঁতে পোকা ধরা থেকে দাঁত তুলতে বেশী দেখা যায়। বেশী বয়সে পাইয়োরিয়া থেকে। দাঁতের রোগ থেকে সাবধান হওয়া যায়। দাঁতের রোগ হলে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার চেয়ে আগে থেকে সতর্ক হওয়া ভাল। মুখাভ্যন্তর যাতে সুস্থ থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। দন্ত রোগ থেকে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া আশ্চর্য নয়। দন্তঘটিত দোষ রক্ত প্রবাহে মিশে গিয়ে নানা রোগ হতে পারে। চোখ, মূত্রাশয় এমনকি গ্রন্থির রোগ দন্তরোগ থেকে হয়। কাজেই দাঁতের যত্ন নেওয়া বিশেষ ও শিশুদের দাঁতের যত্ন করতে একেবারে তাদের ছোটবেলা থেকে শেখানো দরকার।

এবার শীতে

এবার শীতের জন্য একটি নতুন জিনিস দেখলাম। শ্রীমতী তারা ভট্টাচার্যের নিজে হাতে করা। ভট্টাচার্য পরিবার রোমে থাকেন। বললেন এই লেপ তাঁদের রোমের শীত কাটাতে সাহায্য করেছে। বেশ গরম ও আরামদায়ক। তবে আমরা যদি অতো গরম দরকার না বোধ করি তবে হালকা জিনিস দিয়ে জোড়াতালির কাজটি করতে পারি। মোদ্দা কথা রঙ বা সাজানো সম্বন্ধে সামান্য সৌন্দর্যবোধ বা সুদৃশ্যতার জ্ঞান থাকা দরকার।

নানা টুকরো জুড়ে বা বিভিন্ন তালি সেলাই করে তৈরী জিনিস নাকি উত্তর আমেরিকার প্রথম যুগের সৃষ্টি। গৃহিণীরা সামান্যতম জিনিসও ফেলে দিতেন না। অভাব ছিল কাপড়ের বড্ড বেশী। জোড়াতালি দিয়ে, বিভিন্ন মানানসই এমনকি বেমানান জিনিস দিয়ে রূপ ও রঙের বাহার সৃষ্টি করতেন তাঁরা। আমাদের দেশে ওড়িশার তালির কাজ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন এ সৃষ্টিও কলারসিকের রচনার মতই অপরূপ।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য মোটা চাদর বা বেড-কভার একটি নিয়ে অকেজো গরম জিনিস দিয়ে অদ্ভুত এক শিল্প রচনা করেছেন। ছেলেদের ছোট হয়ে যাওয়া প্যান্ট, ফতো মোজা, অকেজো গরম কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি জোড়তালি দিয়ে তৈরী করা খোলের লেপটি দেখতে সুন্দর অথচ গায়ে দিয়ে গরম কাপড় বা পশমের কর্কশ স্পর্শবোধের অস্বস্তি নেই। সেলাইয়ে বৈচিত্র্য আছে, শোভা আছে এবং সবার উপর অতি অল্প খরচায় একটি কাজের জিনিস হয়েছে। আমাদের শীত আসতে দেরি আছে। বাক্স, পেটরা, তোরঙ্গ ঝাঁপি হাতড়িয়ে দেখুন হয়তো বা টুকরো-টাকরা অনেক কিছু মিলবে। সেই সব জুড়ে আরম্ভ করে পৌষ মাসের প্রস্তুতি শুরু করলে আরামে হিমেল হাওয়া ঠেকাতে পারবেন।
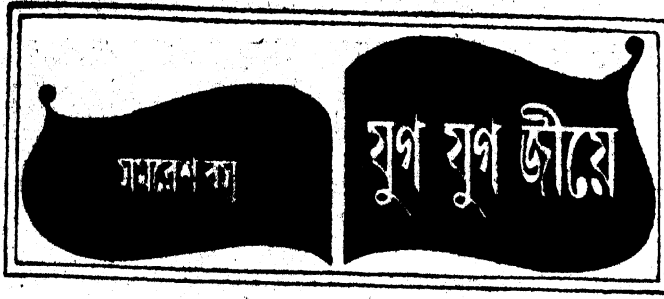
॥ একশো আট ॥

দয়ালের উদ্যত হাত সবিতাকে আঘাত না করেই হঠাৎ নেমে আসে, কিন্তু তার নিষ্ঠুর আক্রোশে কঠিন মুখ এবং চোখ দপ্‌দপ্‌ করে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'যাও পণ্ডিত, চন্দরদার সামনে তোমাকে আর মারবো না। তোমরা নিজেদের হাতে আমাদের মারো নি, ইংরেজেদের পুলিস আর মিলিটারি দিয়ে পিটিয়েছ। মনে রেখো, তার পালটা শুরু হলো। অনেক ভালো ছেলের মাথা তোমরা খেয়েছ, আর তা পারবে না।' বলেই থু থু করে সবিতার বুকের ওপর থু থু ছিটিয়ে দিয়ে চন্দ্রনাথের দিকে একবারও না তাকিয়ে দয়াল সরে যায়।

অজয়ের প্রতি প্রহার তখনো সমানে বর্ষিত হতে থাকে। অজয় জানু পেতে বসে নিজের মুখটিকে কোনো রকমে বাঁচাবার প্রয়াসে দু হাতে মুখ ঢেকে রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে সম্ভবত চোখ দুটোকে বাঁচাবার জন্যই দু হাতের আড়াল রাখে। দয়াল বলে, 'শীতল, ছেড়ে দে, আজ আর না।'

'কিন্তু দয়াল, এক শালার মুখ দিয়েও নেতাজী জিন্দাবাদ বের করা গেল না।' শীতল অতি আক্রোশে ফুঁসে ওঠে।

দয়াল বলে, 'বেরোবে বেরোবে, তার জন্য আরো দিন আছে। আজ ছেড়ে দে।' বলে দয়াল বড় রাস্তার উত্তর দিকে ইন্দ্রনাথকে বেষ্টিত দলের কাছে গিয়ে বৈজুর হাত টেনে ধরে হিন্দীতে বলে, 'ছেড়ে দাও বৈজু।'

ইন্দ্রনাথের কপাল ফুলে, বাঁ চোখ ঢাকা পড়বার উপক্রম। নাকের ছিদ্রে রক্ত, গায়ের পাঞ্জাবিতে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। ধুতির কোঁচা মাটিতে লোটানো, ধুলো কাদা মাখা। বৈজু বলে, 'এ লালঝাণ্ডাবালা আবার বলে, কারোর কথায় আমি ভারতমাতা কি জয় বলবো না। ভারত আমারো মা। আমার মাকে আমি জয় দেবো কী না, তা তোমাদের কথায় হবে না। শালা বক্তৃতা মারছে।' বৈজুর চোখে ক্রুদ্ধ ঘৃণার আগুন।

'বলেছে? এ লালঝাণ্ডাবালা বলেছে, ভারত ওর মা?' দয়াল যেন হিংস্র আনন্দে হেসে ওঠে, বলে, 'তবে ছেড়ে দাও এটাকে?'

শীতল বলে ওঠে, 'হ্যাঁ ভারত মা, কিন্তু বাবা হলো রাশিয়া। রাশিয়া হলো ওদের ফাদারল্যাণ্ড।'

দয়াল তথাপি হাসতে হাসতে ইন্দ্রনাথকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, বলে, 'যা বেকুব, আগে আপনা বাপের খোঁজ কর, তারপরে রাশিয়ার বাপের খোঁজ করিস।' বলে সে সবাইকে বলে, 'চলো, ছোটনকে আর রমণদাকে ডেকে আমরা চলে যাবো।'

রমণ তখনো বক্তৃতা দিয়ে চলে, 'ওদের পলিটব্যুরো আসলে কী? ইংরেজ গোয়েন্দচক্র ছাড়া কিছুই না। ওরা হোম ডিপার্টমেণ্টের হয়ে কাজ করেছে, পলিটব্যুরো আর হোম ডিপার্টমেণ্ট এক সঙ্গে সলা পরামর্শ করে আমাদের পেছনে স্পাইগিরি করেছে, আমাদের জেলে পুরেছে। মেদিনীপুরে মিলিটারি দিয়ে গ্রামকে গ্রাম ঘিরে পাইকারি হারে মারধোর করেছে, জেলে পুরেছে, কোনো গ্রামের একটি যুবতী বা কিশোরী বউ মেয়েকেও ধর্ষণ থেকে রেহাই দেওয়া হয় নি। কিন্তু এসব সংবাদ খবরের কাগজে সরকারি সেন্সারশিপের জন্য প্রকাশ করা যায় নি। এই বেইমান কমিউনিস্টদের সেই কথাটা আবার মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে, দেশের কুকুরের পুজো করবো, বিদেশের ঠাকুর ফেলে দিয়ে...।'

রমণের কথা শেষ হবার আগেই দয়াল সেখানে উপস্থিত হয় এবং দুজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হয়। রমণ বক্তৃতা থামায়, ঝাঁপ-বন্ধ দোকানের বারান্দা থেকে নেমে আসে। সবিতা লক্ষ করে, দয়াল সদলবলে ছোটনের দিকে এগিয়ে যায়। ডাস্টবিনের মধ্যে দাঁড় করানো মোহনকে ছোটন তখনো ইঁটের টুকরো বাঁধা রুমাল দিয়ে আঘাত করে। একমাত্র মোহনই দু হাতে আঘাত প্রতিহত করার চেষ্টা করে। ওর কাটা ঠোঁট নাক দিয়ে রক্ত পড়া সত্ত্বেও প্রতিবাদ করে যায়, 'তোদের কোনো কথাই শুনবো না, মানবো না। মেরে ফেলবি? ফ্যাল, তবু তোদের নেতাজীকে জিন্দাবাদ দেবো না।'...

দয়াল ছোটনকে নিয়ে সরে যায়। সবিতা লক্ষ করে, রমণ অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, মোহনের কাছে-পিঠে আসে না, তাকায় না

এবং দয়ালদের সমস্ত দলের সঙ্গে সেও দক্ষিণ দিকে চলতে থাকে।

'পণ্ডিত এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।' চন্দ্রনাথ বলেন, 'ক্লাবে ঢোকবার দরকার নেই, তুমি বরং আমাদের বাড়ির ভেতরে চলো, জল দিয়ে আগে রক্ত মোছ। আমি কানাই ডাক্তারকে ডেকে পাঠাচ্ছি, এখুনি সবাইকে ফার্স্ট এড দেওয়া দরকার।'

সবিতা হাত তুলে পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে নিজের মুখ মোছে, বলে, 'না চন্দরদা, এখন এদের ফেলে আমি কোথাও যেতে পারবো না। বীরেনদা এখনো মন্দিরের মধ্যে পড়ে আছেন, কি অবস্থা জানি না। মোহনের সারা মুখে রক্ত দেখতে পাচ্ছি।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ইন্দ্রনাথ সবিতার সামনে এসে দাঁড়ায়। সবিতা তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি হঠাৎ এ তল্লাটে কি করে এসে পড়লেন? আর ঠিক এ সময়েই?'

'আমি তো আপনার কাছেই বকুলতলায় আসছিলাম।' ইন্দ্রনাথ অবাক স্বরে বলে, 'আপনি তো ঘণ্টাখানেক আগে আমাদের বাড়িতে টেলিফোন করে আমাকে আসতে বলেছেন!'

'আমি? টেলিফোন?' সবিতার রক্তাক্ত মুখে অধিকতর বিস্ময় ফোটে এবং পরমুহূর্তেই শান্ত গম্ভীর স্বরে বলে, 'বুঝেছি, এটা প্রি-প্ল্যানড ব্যাপার। ওরা আজ আমাদের মারবে, এটা আগের থেকেই ঠিক করে রেখেছিল।'

অজয় আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। মোহন একটি ইস্কুলের ছাত্র, পার্টিদরদী ছেলে বিল্টুর হাত ধরে এদিকেই এগিয়ে আসে। পাড়া প্রতিবেশী জনতার আবির্ভাব হতে থাকে রাস্তার ধারে ধারে, জটলা বাঁধতে থাকে এবং নিচু চুপি চুপি স্বরে আলোচনা চলতে থাকে। সকলের দৃষ্টি বকুলতলা বাড়ির বাইরে চত্বরে।

'পণ্ডিত একটা কথা মনে রাখিস।' চন্দ্রনাথ বলেন, 'সিমলায় নেতাদের বৈঠক যতোই ব্যর্থ হোক, বড়লাট যা-ই বলুক, হাওয়া ঘুরতে আরম্ভ করেছে।'

সবিতা শক্ত মুখে গম্ভীর স্বরে বলে, 'তা ঘুরুক, কিন্তু এই যদি তার রেজাল্ট হয়, আমাদের নিশ্চয় কিছু ভাবতে হবে। আমরা এরকম পড়ে মার খেতে পারি না।'

'ইয়েস কমরেড, নো ডিফেন্স, অফেন্স শুড বী আওয়ার ওয়ে।' মোহন সামনে এসে বলে ওঠে, 'অফেন্সিভ অ্যাটাক ভারসাস ডিফেন্সিভ অ্যাকশন।'

সবিতা অজয়ের কাঁধে এক হাত রেখে বলে, 'অজয় তুমি ঠিক খবরই এনেছিলে, আমি বুঝতে পারিনি। ইন্দ্রনাথবাবুর কথা শুনে এখন আরো বেশি করে বুঝতে পেরেছি, এটা একটা প্রি-প্ল্যানড কন্সপিরেসি। কিন্তু কিছু করে ওঠার সময়ও আমাদের হাতে ছিল না। আমরা পারতাম কেবল টাউন ভ্যাকেট করে সরে যেতে, তারপরে তৈরি হয়ে মোকাবিলা করতে পারতাম। যাই হোক, আমরা সবাই এক সঙ্গে ডাক্তারখানায় যাবো, এখনও কিছু চিকিৎসা সকলেরই দরকার। তার আগে চলো, মন্দিরের মধ্যে বীরেনদা কি অবস্থায় আছেন দেখি।'

সবিতা সদলবলে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যায়। যারা মার খেয়েছে, তারা ছাড়াও একটি কিশোরের দল সঙ্গ নেয়, ইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র বিল্টু যাদের নেতৃত্ব করে। পাল্লাহীন প্রাচীন শিবমন্দিরের মধ্যে আব-ছায়া অন্ধকার। মন্দিরে পুজো হয়, তথাপি কুকুর এবং গরু ছাগলরা সময় বিশেষে আশ্রয় নেয়। সবিতা দেখতে পায় মন্দিরের ভিতরে বাঁ দিকে উঁচু পাথরের দাওয়ায় বীরেনদা শায়িত এবং প্রকৃতই ফুলে বেল-পাতা চাপা দেওয়া। বীরেনদার গোঙানির স্বর শোনা যায় এবং ভিতরে অনেকের পায়ের শব্দ পেয়েই কান্নার স্বরে ফুঁপিয়ে বলে ওঠে, 'প্লিজ আর মেরো না আমাকে, আমি মারা যাচ্ছি।'...

'আমরা এসেছি বীরেনদা।' সবিতা কাছে গিয়ে বলে।

বীরেন ঘোষ তৎক্ষণাৎ বেলপাতা ফুল সরিয়ে উঠে বসে, যা প্রায় অপ্রত্যাশিত। বলে, 'তুমি—তোমরা এসেছো। পণ্ডিত! দেখ ওরা আমাকে কিভাবে মেরেছে। আমার প্যান্টটা পর্যন্ত খুলে নেবার চেষ্টা করছিল। আমি প্রত্যেককে চিনে রেখেছি, প্রত্যেকের নামে আমি মামলা করবো।'

বীরেন ঘোষ একজন লইয়ার। সবিতা বলে, 'বীরেনদা, তার আগে চলুন, আমরা সবাই ডাক্তার কানাইদার ডিসপেন্সারিতে একবার যাই। এখনই কিছু কিছু চিকিৎসা হওয়া দরকার, দেরি করা ঠিক না।'

বীরেন ঘোষ পাথরের দাওয়ার ওপর থেকে দু হাতে প্যান্ট ধরে নেমে আসে। ফুল বেলপাতা ছড়িয়ে পড়ে [illegible]। জামার বোতাম খোলা, টাইটির চিহ্ন নেই। সে প্রকৃতই রুগ্ন, হাঁপায়। সবিতা তার হাত ধরে বাইরে বের করে নিয়ে আসে।

এই সময়ে একটি জীপ এবং পিছনে একটি পুলিসের ভ্যান বকুলতলা বৈঠকখানা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। আকাশ থেকে দিনের আলো সম্পূর্ণ অপসৃত। সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হতে থাকে। সবিতা সদলবলে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়। জীপ থেকে লাফিয়ে নামে থানার ও সি শিবপদ। ছুটে আসে সবিতার কাছে, বলে, 'কী ঘটেছে পণ্ডিতমশাই? শুনলাম এখানে নাকি মারামারি হয়ে গেছে?'

'কার মুখে শুনলেন?' সবিতার ঠোঁট বেঁকে ওঠে, ওর চোখে উত্তেজনা ফোটে।

শিবপদ বলে, 'খবর কি চাপা থাকে নাকি? আমি শুনলাম বকুলতলায় প্রচণ্ড মারামারি হচ্ছে।'

'বাট দ্যাট ইজ নট মারামারি, শুধু মারটি হয়েছে।' মোহন বলে ওঠে, 'এক
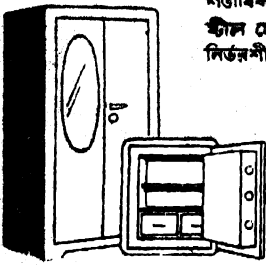
তফা মারা হয়েছে, ম..

শিবপদর মুখে ও চোখে দৃষ্টিতে রুষ্টতা ফোটে, সে মুখ ফিরিয়ে আবার সবিতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনাদের ইনজুরি তো দেখছি রীতিমতো সাংঘাতিক। আশ্চর্য, একটা খবর দেবেন তো।'

সবিতা নির্বিকার স্বরে বলে, 'খবর দেবার সময় ছিল না। থাকলেও দিতাম কিনা, আমি বলতে পারি না।'

ইতিমধ্যে লাঠি আর বন্দুক হাতে কয়েকজন সেপাই ভ্যান থেকে নেমে আসে। রাস্তার ধারে জমায়েত আর জটলা তৎক্ষণাৎ ভেঙে যেতে আরম্ভ করে, ফাঁকা হয়ে আসে। শিবপদ বলে, 'তা এখন বলুন, ঘটনাটা কী ঘটেছে।'

'যেন দারোগাবাবু জানেন না।' বিল্টু বলে ওঠে।

শিবপদ তৎক্ষণাৎ বিল্টুর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়, শক্ত মুখে বলে, 'তুমি কে হে ছোকরা, হঠাৎ বাজে কথা বলতে আরম্ভ করেছো?'

বিল্টু বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, বলে, 'বাজে কথা আমি বলিনি। ওসব ছোকরা টোকরা বলবেন না।'

'তবে কি তোমাকে আপনি আজ্ঞে করতে হবে নাকি?' শিবপদ ধমকের স্বরে বলে ওঠে, 'এ ছেলেটা কে পণ্ডিতমশাই? আপনাদের দলে তো আমি এরকম চোয়াড়ে ছেলে আগে দেখিনি।'

মোহন বলে ওঠে, 'এখন থেকে দেখতে পাবেন। নতুন চোয়াড় বিদ্রোহ আসছে।'

শিবপদ মোহনের দিকে একটু হেসে বলে, 'তাই নাকি? কিন্তু মোহনবাবু, আপনিও দেখছি খুব মার খেয়েছেন। কিন্তু—।' সে সবিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'পণ্ডিতমশাই, কিছু তো বলুন। আমাকে তো একটা অ্যাকশন নিতে হবে। এভাবে কারা আপনাদের মারধোর করে গেল, তাদের নাম ধাম আমার জানা দরকার।'

'ওসব নামধাম আপনাকে আমি কিছুই বলতে পারবো না।' সবিতা বলে, 'শুধু এইটুকু বলতে পারি, একদল কাপুরুষ গুণ্ডা আমাদের ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমরা আগে থেকে কিছুই জানতে পারিনি। তবে এটা বলতে পারি, গুণ্ডামিটা পুরোপুরি রাজনৈতিক।'

শিবপদ মাথার টুপি খুলে বলে, 'সেটা আমিও অনুমান করছি, কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল, তারা কারা? আমার কাছে দলের অবিশ্যি কোনো দরকার নেই। আমি তাদের নামগুলো জানতে চাই।'

'তা হলে আপনি এখানকার প্রবীণ কংগ্রেসী নেতাদের কাছে যান।' মোহন বলে ওঠে, 'তাঁরাই আপনাকে বলতে পারবেন,

তারা গুণ্ডামি করেছে।'

শিবপদ ভ্রূকুটি শক্ত মুখে বললো, 'এ ভাবে কথা বলবেন না মোহনবাবু, এতে কোনো সুবিধা হবে না। প্রবীণ কংগ্রেসী নেতারা কি ঘটনাস্থলে ছিলেন? আপনি কি তাঁদের দেখেছেন? কী বলতে চান আপনি?'

'বলা হচ্ছে, এটি একটি কংগ্রেসীদের ষড়যন্ত্র।' অজয় বলে ওঠে।

শিবপদ অজয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। হেসে বলে, 'এটা পুলিসের কাছে কোনো অভিযোগ হলো না ভাই। কাদের ষড়যন্ত্র সেটা জানবার আগে, আমার জানা দরকার, ঠিক কারা আপনাদের মেরেছে। আপনাদের কাছ থেকে অভিযোগ পেলে, আমি তাদের অ্যারেস্ট করবো, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবো।'

বীরেন ঘোষ বলে, 'দেখুন শিবপদবাবু, আপনি যা দেখে গেলেন, আমাদের এই অবস্থা, আপনি এটা নোট করে নিয়ে যান। আমরা এখন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।'

'আপনারা তা হলে থানায় কোনরকম ডায়রি করতে চান না?' শিবপদ বলে।

সবিতা বলে, 'এখন আমরা কিছুই করবো না। আমরা চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। আপনার নিজের যদি কোনো রেসপনসিবিলিটি থাকে, আপনি তা করুন। আপনার নিজের সোর্স আপনার কাজে লাগান।' বলে সে সবাইকে ডেকে এগিয়ে যায়, 'এসো এসো, কানাইদার ডিসপেন্সারিতে যাই।'

রাস্তায় বাতি জ্বলে ওঠে। সবিতা সদলবলে এগিয়ে যায়। শিবপদ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে, তারপরে হেসে জীপের দিকে এগিয়ে যায়। মাথায় টুপি পরে নেয়।

✻

স্ত্রী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার ভোরের ঘুমন্ত সারা বাড়িটাকে চকিত করে তোলে, 'ও গো, ছোট কত্তাবাবু নাইবার ঘরের দরজার কাছে মরে পড়ে আছে।'

স্ত্রীলোকটি চপলা, ছোট গিন্নি মালতীর দাসী। চিৎকার করতে করতে সে প্রথমে মালতীর শোবার ঘরের দরজায় ছুটে যায়। মালতী উঠে বসে, তীক্ষ্ণ চোখে চপলার দিকে তাকায়। তার গায়ে জামা নেই, সূক্ষ্ম সুতার তাঁতের লালপাড় শাড়িতে শরীর জড়ানো। খোলা চুল কাঁধে ঘাড়ে পিঠে ছড়ানো, যা প্রমাণ করে গত সন্ধ্যায় সে চুল বাঁধেনি, তার চোখের কোল বসা, ঠোঁটে নেই স্বাভাবিক তাম্বুলের রক্তাভা। বলে, 'আস্তে বলো যা বলার, চেঁচিও না, আমার ছেলের ঘুম ভেঙে যাবে।'

চপলা তথাপি আস্তে কথা বলতে পারে না, বলে, 'আস্তে বলবো কী গো ছোটমা, ছোট কত্তা নাইবার ঘরের সামনে দরজার চৌকাটের ওপর পড়ে আছে। মুখের ওপর গাঁজলা শুকিয়ে রয়েছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, শরীরটা ঠাণ্ডা শক্ত। নিশ্বেস পড়ছে না।'

বড় বউ এসে মালতীর শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। পিছনেই চন্দ্রনাথ।

বড় বউ জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে ছোট কাকীমা?'

'চপলাকে জিজ্ঞেস করো।' মালতী খাট থেকে নামতে নামতে বলে।

চপলা বলে, 'ওগো বড় বউমা, ছোটকত্তা মরে পড়ে আছে। ওই নাইবার ঘরের দরজায়।' বলে সে এগিয়ে যায়।

বড়বউদি চন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে, এবং দ্রুত চলে যায়। চন্দ্রনাথ মালতীর দিকে তাকান। তাঁর দু চোখে আতঙ্কিত জিজ্ঞাসা। মালতী তাঁর চোখের দিকে তাকায়, বলে, 'যাও, দেখে এসো।'

চন্দ্রনাথ তথাপি প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর আতঙ্কিত দৃষ্টি মালতীর মুখের প্রতি। ক্রমশ

ভারতবন্ধু শান: সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধ

প্রমিত সেন

'উনিশ শ আটাশ সালের তেসরা সেপ্টেম্বর, দুপুরের দিকে হাজির হলাম বিশ্বভারতীর কলকাতা অফিসে। প্রধান কর্মসচিব অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। চার বছর আগে উনিশ শ' চব্বিশ সালে যখন সবেমাত্র নিজের দেশ ছেড়ে সিঙ্গাপুরের পথে পা বাড়িয়েছি, শুনলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে এক ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল চীন সফরে আসছেন। রবীন্দ্রনাথকে কাছ থেকে দেখার ও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার এমন মূল্যবান সুযোগ হাতছাড়া হওয়াতে মনে মনে খুব কষ্ট পেলাম। বস্তুত সেদিন থেকেই শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল।' কথা হচ্ছিল বিশ্বভারতীর চীনা ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ তান উন সানের সঙ্গে। শান্তিনিকেতনে সবার কাছে তিনি 'তান সাহেব' নামে পরিচিত। বয়স পঁচাত্তরের কোঠায় পৌঁছুতে আর কয়েক মাস বাকী। চোখে চশমা, গায়ের রং ফর্সা, বয়সের তুলনায় এখনও সুস্থ সবল। দৃঢ় প্রত্যয়ে ভরপুর মন। ওঁর পাশে বসে ছিলেন মাদাম তান। সময় সময় আমার কথার জবাব দিচ্ছিলেন মাদামও। শান্তিনিকেতনের কথা উঠতেই দেখলাম ওঁর চোখও খুশীতে ভরে উঠেছে।

উনিশ শ' সাতাশ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তান সাহেবের প্রথম দেখা সিঙ্গাপুরে। রবীন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফরে বেরিয়েছেন। পরিচয় জানবার পর রবীন্দ্রনাথ তানসাহেবকে বিশ্বভারতীতে শিক্ষকতার কাজে আমন্ত্রণ জানালেন। চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্ক শিক্ষা। ঠিক সে মুহূর্তে কিছু অসুবিধে থাকায় কিছু দিনের সময় চাইলেন তানসাহেব। 'সেই থেকে আমার স্বপ্ন দেখা শুরু। তাই সেদিন যখন অধ্যাপক মহলানবিশ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন গুরুদেবের সঙ্গে কি আমি এখনই দেখা করতে চাই? আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, নিশ্চয়ই—এখনই দেখা করতে চাই। আমার ইচ্ছা মঞ্জুর হল। গুরুদেব তখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। অধ্যাপক মহলানবিশ আমাকে সেখানে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করলেন। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আমার দেহমন ভরে উঠল।'

গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হবার পর সেদিনই সন্ধ্যায় পাঠ-ভবনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীসত্যজীবন পালের সঙ্গে তান সাহেব রওনা দিলেন শান্তিনিকেতনে-র পথে। 'শুরু হল আমার পথ চলা। সুদীর্ঘ সাতচল্লিশ বছরে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে আমার ও মাদামের জীবন একসূত্রে বাঁধা হয়ে গেছে।'

কথার মাঝে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন সচিব শ্রীঅনিলকুমার চন্দ সস্ত্রীক এলেন তানসাহেব ও মাদামের সঙ্গে দেখা করতে। কথায় কথায় তিনি মাদামকে বললেন, এখন আর তানসাহেবকে বাইরে বেশী ঘোরাফেরা করতে না দেওয়াই ভাল। বয়েস হয়ে গেছে —কখন অসুস্থ হয়ে পড়বেন। না, ওঁর বিশ্রাম নেই। 'আমার কাঁধে এখনও অনেক দায়িত্ব। ভারত-চীন মৈত্রী আমার স্বপ্ন। আমি রাজনীতির চর্চা করি না। কিন্তু যখনই চীনা ভবন সম্পর্কে নতুন কিছু ভেবেছি—জহরলালজী, গান্ধীজীর কাছ থেকে গভীর সাড়া পেয়েছি। শ্রীমতী গান্ধীও সমানভাবে আমাকে সাহায্য করে এসেছেন। এ দু-দেশের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে অটুট রাখতেই হবে।' পঁচাত্তরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তান-সাহেব স্বপ্ন দেখছেন এক নতুন পৃথিবীর —বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে সে পৃথিবীর মঙ্গলসূত্র।

হুনান প্রদেশের চা-লিং জেলার অন্তর্ভুক্ত ওয়েনে চিয়াং হিয়াং অঞ্চলের এক ধর্মীয় চৈনিক পরিবারের ছেলে তান উন-সান। বাবা ছিলেন বৌদ্ধ ও তাও পন্থী। কনফুসিয়াসবাদী শিক্ষক। গোঁড়া বৌদ্ধ-ধর্মী মাও ছিলেন তাওবাদ ও কনফুসিয়াস বাদে বিশ্বাসী। চীনে বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়া-সিজম ও তাওবাদকে একই ধর্মের তিনটি ধারা বলে ধরা হয়। চীনাভাষায় একে বলা যায় "সান চিয়াও হো ই।" তান পরিবারও সেই ধারারই অনুসরণকারী ছিলেন।

উনিশ শ' এক-এর দশই অক্টোবর তানসাহেবের জন্ম। উল্লেখযোগ্য, মূল শান্তিনিকেতন আশ্রমের গোড়াপত্তনও ঐ একই বছরে। যদিও তানসাহেব এটাকে কোন ঐশ্বরিক যোগাযোগ বলে দাবী করেন না তবুও "গুরুদেবের কাছে আমার মন প্রাণ সমর্পণের এটা হয়তবা একটা অন্যতম কারণ।" মাত্র চার বছর বয়সী তান সাহেবের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি। শুরু 'চাইনিজ ক্লাসিকস' দিয়ে। বারো বছরের পাঠক্রমের মাত্র তিনবছরের মাথায় বাবা মারা গেলেন। ভর্তি হলেন স্থানীয় ওয়েন চিয়াং সু ইউয়ান ইনস্টিটিউটে। ক্লাসিকস্-এর অন্যতম শিক্ষক চেন লাল চি-এর তত্ত্বাবধানে নতুন করে পড়াশুনোর শুরু। কিন্তু দুর্ভাগ্য তান সাহেবের।

বাবার মৃত্যুর আঘাত কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই তিনবছরের মধ্যেই মা মারা গেলেন। "মার মৃত্যু আমায় কাছে আরও বেশী মর্মান্তিক লাগল।" চাইনিজ ক্লাসিকস্-এর অন্যতম শিক্ষক লুং জু ইউয়ান-এর তত্ত্বাবধানে মাই চিয়াং শু ইউয়ান ইনস্টিটিউটে পাঠক্রমের শেষ পর্যায়ের জন্য তৈরী হতে লাগলেন তান। পনেরো বছর বয়সে স্কুল শিক্ষা শেষ করে ভর্তি হলেন চাংসা-র হিউম্যান টিচার্স কলেজে।

উনিশ শ' উনিশ সালে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর দু-বছরের মধ্যেই 'চাইনিজ এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন এডুকেশন'-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ। চুয়ান-শান আকাদেমিতে শুরু হল পশ্চিমী সংস্কৃতি, দর্শন ও চিন্তাধারা সম্পর্কিত গবেষণা। আকাদেমিতে গবেষণাকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা লিখতে শুরু করলেন। এ সময় অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'নিউ লিটারেচার সোসাইটি',

দৈনিক সংবাদপত্র 'হ্নান জিপাও'-র পরিচালনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নিউ লিটারেচার'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তাল তাঁর উপরে। চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর অনুমোদিত সংস্থা 'সিন মিন স্যুচ হুই' এবং 'সিন ওয়েন হ্য়া স্যু সি'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন তিনি। তাছাড়া কিছু কালের জন্য কলেজ ছাত্র ইউনিয়ান এবং প্রাদেশিক ছাত্র ইউনিয়ান পরিচালনার দায়িত্বও ন্যস্ত হয়েছিল তাঁর ওপর—ইউনিয়ানের মুখপাত্র ও বিভিন্ন প্রকাশনা সম্পাদনার ভারও নিতে হয়েছিল তাঁকে।

১৯২৪ সালে যখন পড়াশোনা শেষ হল তখন চীনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। যুদ্ধবাজ নেতাদের মধ্যে তখন ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়েছে—নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধির আশায়। সাধারণ মানুষের অবস্থা তখন দুর্দশার চরমে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় আপনা থেকেই প্রতিদিন দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গজাতে শুরু করল। সবার লক্ষ্য এক: দেশকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এ সব সংস্থার মধ্যে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে একটি হল 'দি কুয়োমিনটাং' এবং অন্যটি 'দি কুনচানটাং'। প্রথমটির নেতা হলেন ডঃ সান ইয়াত-সেন এবং দ্বিতীয়টির চেয়ারম্যান মাও সে তুং। এ ছাড়া সে সময় দেশের ভিতর আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে দুটি পৃথক আন্দোলন দানা বাঁধছিল। এদের মধ্যে একটি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয় দেশগুলিতে বসবাসকারী চীনাদের মধ্যে চৈনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার। ইউরোপীয় দেশগুলিতে বিশেষ করে ফ্রান্সে ছাত্র এবং শ্রমিক হিসাবে 'এডভান্স স্টাডি' করা ছিল দ্বিতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। এ দুটি আন্দোলন তান সাহেবের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল। এ সম্পর্কে গবেষণা করার কথা ভাবলেন তিনি। তাছাড়া ভারতবর্ষে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম ও আর্যধর্ম নিয়ে চর্চা করার প্রবল ইচ্ছা মনের মধ্যে বাসা বাঁধল। ফা হিয়েন, হুয়েন সাং এবং ই সিং-এর পদাঙ্ক অনুসরণে ভারত ও চীনের প্রাচীন ধর্মীয় সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করা ও নতুন সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। তান সাহেব ঠিক করলেন প্রথম তিন চার বছর মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কাটাবেন। এরপর ভারতবর্ষে পাঁচ বছর। এর মধ্যে তিন বছর শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের সঙ্গে এবং দু-বছর সবরমতী আশ্রমে গান্ধিজীর সঙ্গে থাকা স্থির করলেন। কিন্তু আমার সমস্ত পরিকল্পনাই ওলট-পালট হয়ে গেল। শান্তিনিকেতনে এসে বাঁধা পড়ে গেলাম।'

শান্তিনিকেতনে তানসাহেবের ঠাঁই হল রতনকুঠিতে (যেটাকে আগে টাটা বিল্ডিং বলা হত)। রতনকুঠি মূলত ছিল বিদেশী অধ্যাপকদের বসবাসের জন্য। সে সময় সেখানে ছিলেন ইংরেজী অধ্যাপক ডঃ ডব্লিউ মার্ক কলিন্স ও রাশিয়ান অধ্যাপক এল বোগদানভ। রতনকুঠিতে আসার পর থেকে প্রতিদিনই আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ও বিধুশেখর শাস্ত্রী ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। চীনাভাষার অধ্যাপক হিসাবে কিভাবে কাজ শুরু করা যায়, কি ধরনের কাজ করা যায় মূলত এ বিষয়েই ওঁদের সঙ্গে আলোচনা হত। 'শুধুমাত্র শিক্ষক হিসাবে নয়, একজন ভারতীয় ছাত্র ও রিসার্চ স্কলার হিসাবেই আমার শান্তিনিকেতনে আসা। ভারতীয় ছাত্ররা যারা চীন সম্পর্কে পড়াশোনা করছে তাদেরকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হব।' ঠিক হল সপ্তাহে তিন দিন চীনা ভাষার ক্লাস নেবেন এবং অধ্যাপক সেনশাস্ত্রী তানসাহেবকে সপ্তাহে তিনদিন সংস্কৃত শেখাবেন।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পাঁচজন মেধাবী ছাত্রকে নিয়ে ক্লাস শুরু করলেন তানসাহেব। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় তানসাহেবকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। ফরাসী ভাষার অধ্যাপক এফ বেনোয়াও ছিলেন ওই প্রথম পাঁচজন ছাত্রের একজন।

বিশ্বভারতীর ক্লাস ছাড়াও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ কলিন্সকেও চাইনিজ ক্লাসিক্স অধ্যয়নের ব্যাপারে অধ্যাপক তান সাহায্য করতেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর কাছে নিয়মিত সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ চলতে লাগল। এরই ফাঁকে ছোটখাটো প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলেন তিনি। শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রচারিত ম্যাগাজিন 'তুং ফ্যাং শা চি'-তে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে 'ইন ডু কুয়ো চি-তা-হুয়ে' শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। সে সময় থেকেই ঐ পত্রিকায় অধ্যাপক তানের নিয়মিত লেখার শুরু। মূলত ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, আচার-ব্যবহার রীতিনীতি ও মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে লিখতেন তিনি। কবিতা লেখাতেও তাঁর মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অন দি ইন্ডিয়ান ওশান' এবং 'মাই ফার্স্ট অ্যারাইভ্যাল অ্যাট শান্তিনিকেতন' সম্পর্কিত দুটি দীর্ঘ কবিতা ক্যান্টনের ইউন বুক শপ কোম্পানী প্রকাশ করে। সিংগাপুর ও মালয়-এ থাকা কালীন বহু কবিতা এবং প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। সিঙ্গাপুরের তিনটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'লে পাও', 'কুয়ো-মিন জি পাও' এবং 'শাং পাও' বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক তানের প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, লেখার গুণে পত্রিকার সম্পাদক ত্রয়ের সঙ্গে অধ্যাপক তানের নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এক সময়ে 'লে পাও' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক মশয় তানসাহেবকে পত্রিকায় সম্পাদকের পদে যোগ দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অধ্যাপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে এই ভেবেই উনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। বিকল্প হিসাবে 'হিন কুয়াং'-এর আত্মপ্রকাশ 'কুয়ো নিন জি পাও'-র কার্যকরী সম্পাদকের কাছ থেকেও অনুরূপ অনুরোধ আসে। পত্রিকার সঙ্গে এক চুক্তি অনুযায়ী অধ্যাপক তানের সম্পাদনায় উনিশ শ' পঁচিশের অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ 'সা মো তিয়েন' পত্রিকার প্রকাশ। 'তুং-ফ্যাং তা-চিং'-তে বিশ্বভারতী সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রবন্ধটি পড়ে বহু চীনা অধ্যাপক, ছাত্র, গবেষক ও প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী সম্পর্কে তাঁদের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে অধ্যাপক তানের কাছে চিঠি পাঠান। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বভারতীতে যোগ দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করে, ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি মিলে প্রায় জনা বারো চীনা বিশ্বভারতীতে আসেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরই তাঁরা একে একে বিশ্বভারতী ছেড়ে চলে যান। অত্যন্ত স্বভাবিক ভাবেই এ ঘটনা অধ্যাপক তানকে আঘাত দেয়। এর পরের ঘটনা আরও বিস্ময়-

কর। উনিশ শ' উনত্রিশ সালের কথা। কানাডা সফর করে ফিরছেন রবীন্দ্রনাথ। মাঝপথে সিঙ্গাপুরে থামলেন কিছুক্ষণের জন্য। মস্ত বড় চীনা ব্যবসায়ী (বিখ্যাত টাইগার মেডিক্যাল হলের মালিক) রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এক বিরাট সমাবেশের আয়োজন করলেন। সে সমাবেশে ছাত্র, শিক্ষক, পত্রিকা সম্পাদক প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীদের আমন্ত্রণ জানানো হল। অধ্যাপক তানের লেখার উল্লেখ করে উক্ত ব্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথকে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন যে চীনা-ভাষা শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতীতে একটা 'চাইনিজ হল' তৈরী করার কথা তিনি ভাবছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর (ব্যবসায়ী মহোদয়ের) সাহায্য করা সম্ভব কি না, অধ্যাপক তানও রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে ব্যক্তিগত একটা চিঠি পাঠালেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও উক্ত ব্যবসায়ীটি কোনরকম সাহায্য পাঠান নি। অধ্যাপক তানের ভাষায়: 'এতে যে আমি নিরাশ হয়েছি শুধু তাই নয়। এ আমার দেশের ও জনগণের পক্ষে চরম অসম্মানের।' দমলেন না তিনি। রবীন্দ্রনাথকে জানালেন যে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি তাঁর দেশে ফিরে যেতে চান। যেমন করেই হোক্ 'চাইনিজ হল' তৈরী করতেই হবে।

'গুরুদেবের আশীর্বাদ মাথায় করে দেশে ফিরে এলাম।' সেটা ছিল ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর মাস।। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছে নিজে গিয়ে দেখা করলেন তানসাহেব। তাঁদের বুঝিয়ে বললেন বিশ্বভারতীর আদর্শের কথা, ভারত চীন সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বন্ধনের গুরুত্বকে নতুন করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৩৩ সালে নানকিং শহরে প্রতিষ্ঠিত হল 'সাইনো-ইণ্ডিয়ান কালচারাল সোসাইটি।' তিনবছর পর ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তানসাহেব শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। রবীন্দ্রনাথকে জানালেন তাঁর সোসাইটির কথা। ভারতেও এ-ধরনের সোসাইটির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ তথা রবীন্দ্রনাথের সচিব অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দের উৎসাহ ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সোসাইটির ভারতীয় কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হল, রবীন্দ্রনাথ হলেন সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক চন্দ যথাক্রমে সাধারণ সচিব ও সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সোসাইটির প্রথম এবং প্রধানতম কার্যসূচী ছিল 'চাইনিজ হল' তৈরী।

নিজের দেশের বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন তানসাহেব। ভারতীয়দের মধ্যেও কেউ কেউ এগিয়ে এলেন চীনাভবন নির্মাণের কাজে সাহায্য করতে। ১৯৩৭ সালের চৌদ্দই এপ্রিল বাংলায় শুভ নববর্ষে উদ্বোধন হল চীনা ভবনের। কিন্তু এর পরের কাজ আরও কঠিন। ভবনের শিক্ষক ও কর্মচারীদের খরচ কে জোগাবে? গ্রন্থাগারের বই সংগ্রহ হবে কি ভাবে? বিদেশী অধ্যাপক ও ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত কোথায় হবে? নানান সমস্যায় তানসাহেব তখন জর্জরিত। কিন্তু দমবার পাত্র নন। আস্তে আস্তে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। সংগ্রহ হল একলক্ষ 'চাইনিজ ক্লাসিক্যাল বুকস'। সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার অধ্যাপক ডঃ ডাব্লিউ পাশোর ভাষায় 'একথা ভাবতেই অবাক লাগে যে এই এক লক্ষ বইয়ের প্রতিটি পাতা অধ্যাপক তান নিজে পরীক্ষা করে নিয়েছেন।' কাজের প্রতি তাঁর এই একাগ্রতা ও আন্তরিকতার কথা ভাবলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে এলেন চিয়াং কাইসেক। ভবনের উন্নতিকল্পে চীনা জনগণের পক্ষ-থেকে ছ হাজার টাকা দান করলেন।

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি যখন চীনের রাজনৈতিক চেহারা বদলে যেতে লাগল, কেউ কেউ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন চীনা-ভবনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। অনেকে মনে করলেন দেশের নোতুন শাসককুল সম্ভবত চীনাভবনের প্রতি প্রাক্তন চীন সরকারের সহমর্মিতাকে ভাল দৃষ্টিতে

দেখবে না, চীনাভবনের অরাজনৈতিক চেহারাই কিন্তু এ ভুল ভাঙিয়ে দিল। ১৯৫৭ সালে নয়া চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই শান্তিনিকেতনে এলেন। এই সময়ে বিশ্বভারতী তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন। মুগ্ধ হয়ে গেলেন চীনাভবন দেখে। শুনলেন কিভাবে তিল তিল করে নিজের রক্ত দিয়ে তানসাহেব গড়ে তুলেছেন এই চীনাভবন। চীনাভবনের উন্নতিকল্পে বিশ্বভারতীকে ষাট হাজার টাকা দান করলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন ভবনের গ্রন্থাগারের জন্য চীনাভাষায় প্রকাশিত প্রয়োজনীয় সব বই তিনি পাঠাবেন। চৌ-এন-লাই ছিলেন তান সাহেবের ছেলেবেলার বন্ধু।

চীনা দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস সম্পর্কিত এক লক্ষ বই গ্রন্থাগারে আছে। এর মধ্যে বৌদ্ধ ত্রিপিটকের 'সাং মুদ্রণ' ও 'হ্রাকন মুদ্রণ'ও আছে। চীনের জনগণের কাছ থেকে তানসাহেব সাংহাই মুদ্রণের যে দশ সেট চৈনিক বৌদ্ধ ত্রিপিটক পেয়েছিলেন তার একটি চীনাভবনের জন্য, বাকি নটি সেটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিয়েছেন। উদ্দেশ্য চৈনিক বৌদ্ধ ত্রিপিটকের মূলমন্ত্র সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক তানের বিভিন্ন বক্তৃতা এবং লেখা চীনাভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত চীনের রাজনীতি, ইতিহাস সমাজ ও ধর্মীয় বিবর্তন সংক্রান্ত বক্তৃতা 'গান্ধীজীস্ হিন্দ স্বরাজ', সেন্ট-ফিলসফার গান্ধী' এবং 'পোয়েট-সেন্ট টেগোর'। এসব বইয়ের প্রতিটিই চীনে প্রচুর সমাদর লাভ করেছে।

সুদীর্ঘ আটাশ বছর ধরে চীনাভবনকে নিজের হাতে লালন-পালন করার পর বিশ্বভারতীর নিয়ম অনুযায়ী তানসাহেব সরকারীভাবে ভবনের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নেন। ১৯৬৭ সালে। বিভিন্ন সময়ে তানসাহেবের পাশে থেকে যাঁরা চীনাভবনকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী, ডঃ পি ভি বাপাত, অধ্যাপক ভি ভি গোখলে, পণ্ডিত শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী, শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কথা তানসাহেব আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। ভবনের বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম ডঃ ওয়েই-কুয়েই সুন গোড়ার দিকে চীন থেকে এসেছিলেন ছাত্র হিসাবে। অন্যান্যদের মধ্যে ডঃ জান জিন সুয়া আমেরিকায় ও ডঃ অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কানাডাতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন।

চীনা ভবনের জন্য তানসাহেব প্রায় সব সাহায্যই পেয়েছেন চীন দেশ থেকে। বিশ্বভারতীর উপগ্রন্থাগারিক বীরেনদা (শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) জানালেন যে, যুগোলকিশোর বিড়লা প্রমুখ কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য দিয়েছেন। শ্রীবিড়লা দিয়েছিলেন ২০,০০০ টাকা। তানসাহেব চীন থেকে ১৯৩৪ সালে তদানীন্তন চীনা ডলারের ৩০,০০০-এরও বেশী অর্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন। চীনে এসব কর্ম-কাণ্ডের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন লিয়াং চি-চাও। মহামান্য তাই-হু পরিচালিত চাইনিজ বুদ্ধিস্ট মিশন ১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করে। তাই-চি-তাও পরিচালিত মৈত্রী মিশন আসে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে। ১৯৪৩ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ডঃ ওয়াই এইচ কু-র নেতৃত্বে এক শিল্পী-সাংস্কৃতিক দল বিশ্বভারতী পরিদর্শনে আসেন।

মাদাম তান আগে ছেম নাই-ওয়ে নামে পরিচিত ছিলেন। বিয়ের পর তান ছেন-ওয়ে। তানসাহেবের বড় ছেলে তান ছি দিল্লীতে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। দ্বিতীয় ছেলে তান লী আমেরিকায় স্থাপত্য-বিদ্যার কাজে নিযুক্ত। সম্প্রতি হংকংয়ে গিয়েছেন। চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর সুধীর খাস্তগীরের মেয়ে শ্যামলীর সংগে ওর বিয়ে হয়। ওদের আনন্দ নামে একটি ছেলে আছে। এর পরে মেয়ে থান ওয়েন। বাংলাতে ডক্টরেট, দিল্লীতে অধ্যাপনা করছেন। এর পরের মেয়ে থান চামেলী কলাভবন থেকে পাশ করে এক নামকরা শিল্পীকে (কলাভবনের) বিয়ে করেছেন। ছেলে থান অমিত বর্তমানে শিকাগোতে আছেন। সর্ব কনিষ্ঠ আমেরিকার টেক্সাসে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করছেন। বড় ছেলে তান ছি ছাড়া আর সবাইর জন্ম শান্তিনিকেতনে। চীনা হলেও চলনে বলনে ওঁরা একেবারে খাঁটি বাঙ্গালী। বাংলা প্রায় মাতৃভাষারই মতন।

কথা বলতে বলতে তানসাহেব আমাকে নিয়ে গেলেন চীনাভবনে ওঁর নিজের ঘরটিতে। ঘরটির চারদিকে শুধু বই আর বই। দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম ওঁর জীবনের কোন স্মরণীয় ঘটনার কথা মনে আছে কি না। ওঁর স্মরণশক্তি আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে, কাজেই সবসময় সবকিছু মনে রাখা সম্ভব হয় না—তান সাহেব নির্দ্বিধায় সেকথা বললেন আমাকে। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন: দৈনন্দিন জীবনে মাদাম ও আমি যে ঘটনায় বেশী তৃপ্তি অনুভব করতাম তা হল গুরুদেবের চা খাওয়া নিয়ে। চীন-দেশের চা-এর প্রতি গুরুদেবের বরাবরই একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রায় প্রতিদিনই তিনি আমাদের কাছে সকালের দিকে আসতেন। কোনদিন মাদাম, কোনদিন আমি নিজের হাতে চা-তৈরী করে খাওয়াতাম গুরুদেবকে। গুরুদেবের পরই যাঁর কথা আমার মনে পড়ে। তিনি হলেন গান্ধীজী। আমার প্রতি ওঁর একটা গভীর ভালবাসা ছিল।'

কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছিল। ওঁর যাওয়ার সময় হয়েছে সে কথাটা মনে করিয়ে দিতেই হাসতে হাসতে তানসাহেব বললেন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনের ব্যাপারে এখন খুব কাজের চাপ পড়েছে। এখন সব চাইতে বড় সমস্যা কি করে কাজগুলোকে গুছিয়ে উঠব। ভারত-চীন রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা উঠতেই তিনি বললেন: 'রাজনীতির সংগে আমার কোন যোগ নেই। আমার বিশ্বাস হাজার বছরের পুরনো সাংস্কৃতিক বন্ধনকে যদি আমরা অটুট রাখতে পারি, জিইয়ে রাখতে পারি তা হলে এ দু-দেশের মধ্যেকার সব রকম ভুল বোঝাবুঝিই দূর হয়ে যাবে। বৌদ্ধ-ধর্মই হচ্ছে সে সম্পর্কের মূলমন্ত্র।' অধ্যাপক তান আজও অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন ভারত-চীন মৈত্রীকে সুদৃঢ় করার। এ বয়সেও। তাঁকে শান্তিনিকেতন আর বৌদ্ধগয়ায় প্রায়ই ছুটো-ছুটি করতে হচ্ছে। ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরবার সময় বার বারই মনে হচ্ছিল ওঁর কথা: 'আমার বিশ্রাম নেই। এখনও অনেক দায়িত্ব আমার ওপর। এখনও অনেকটা পথ চলতে হবে।'

ভারতের সুরলোকে

বীণ্‌কার ও বকশিশ

॥ ১ ॥

ইন্দোর দরবারের সে এক আশ্চর্য সংবাদ; তেমন ঘটনার কথা কোন দরবারে মজলিসে শোনা যায়নি। সেদিন আসরের প্রথমে কে কল্পনা করেছিলেন যে শেষ হবে এমনভাবে?

মহারাজা শিবাজী রাও হোল্‌কার? না। তাঁর কাছে অচিন্তনীয় ছিল এমন পরিণতি।

চুন্না বাই? তিনিও নিশ্চয় ভাবতে পারেননি।

বন্দে আলির মনে ছিল কি? কে জানে!

অথচ মহারাজা কত দিন থেকে কতবার এনেছেন বন্দে আলিকে। বীণা বাজিয়ে খাঁ সাহেব দরবার মাৎ করে দিয়েছেন। মোটা মুজরো পেয়েছেন। বকশিশও দিয়েছেন শিবাজী রাও। তবু তো বন্দে আলি দরবারের নিযুক্ত বীণ্‌কার।

আর ইন্দোরেই গল্প-কথার মতন আসর হয়ে গেল।

সেবার কিছুদিন বাইরে ছিলেন বন্দে আলি। ফিরে এসে মহারাজাকে সেলাম করলেন।

তখন শিবাজী রাও একদিন খাস দরবার বসালেন খাঁ সাহেবের জন্যে। সেদিন শুধু তিনি বাজাবেন। শ্রোতাদের মধ্যে হোলকরের সঙ্গে থাকবেন তাঁর প্রিয় ক'জন সভাসদ। আর চুন্না বাইও। দরবারী নর্তকী গায়িকা চুন্না বাই। কিন্তু সেদিন বাইজীর নাচ গান হবে না। তিনিও শুনবেন বন্দে আলীর বীণা।

ইন্দোর মহারাজার সবচেয়ে প্রিয় দরবারী গুণী বন্দে আলী। কি মিঠে তাঁর আঙুলের টিপ্। কি মধুর তাঁর বীণার ঝঙ্কার। যন্ত্রের সুরে তিনি যেন বশ করে রেখেছেন শিবাজী রাও হোলকরকে। মহারাজা তাঁকে সংগীতগুরুর তুল্য মান্য করে থাকেন।

সেকালের দিকপাল বীণ্‌কার বন্দে আলী খাঁ। উনিশ শতকের শেষ ২০।২৫ বছরে আর কজন তাঁর সমকক্ষ ছিলেন এ যন্ত্রে? কাশীর সাদিক আলী খাঁ কিংবা কাসিম খাঁ। এই দুই সেনীয়া বীণা গুণী ভিন্ন তাঁর চেয়ে নামী তখন আর কেউ নেই।

আসরে দরবারে কি নাম-ডাক সে যুগে বন্দে আলীর! আর তেমনি মুজরো।

ইন্দোর রাজ্যেই তিনি বেশিদিন থেকেছেন বটে। আর শিবাজী রাও তাঁকে দাক্ষিণ্যও করেছেন সবার চেয়ে বেশি। কিন্তু তিনি অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, বাজিয়েছেন। নানা দরবারে, আসরে। হায়দরাবাদ পুনা গোয়ালিয়র দাতিয়া বোম্বাই কাশী এমন কি নেপালের রাণা দরবার পর্যন্ত।

হাত ভরে তাঁর রোজগার। আর আসরে নাম যশ খাতির।

তবে খাঁ সাহেবের মেজাজ বড় খামখেয়ালী। আর চঞ্চল স্বভাবও। এক জায়গায় বেশিদিন তিষ্ঠতে পারেন না। কদিন হলেই —'আরে চালো চালো', তল্পি গুটিয়ে নিতে বলেন শিষ্যদের।

ব্যতিক্রম শুধু হোল্‌কর রাজ্যে।

যেমন আশ্চর্য শিল্পী, তেমনি বিচিত্র প্রকৃতি। যেন বিপরীতের সমাবেশ। একদিকে তাঁর দস্তুরমত ভোগসুখের লালচ। আবার অন্তরে কোথায় আছে এক মুসাফির। সে কেবল ভার হাল্‌কা করতে চায়। যত মুজরোর বহর, তত বে-হিসাবী দেমাক। ভর্তি থলিয়া ফাঁকা করে দিতে কতক্ষণ! হাতে রেস্ত থাকলেই আমীরী চাল ছাড়া বরদাস্ত হয় না। তখন একেবারে দিল্‌দরিয়া। খাইখিলাই পান ভোজন, এমন কি দান খয়রাৎ-ও। তারপর আবার সেই ফকিরের তাঁর মনো-বীণার সুরৈশ্বর্যের অন্তরালে কোথায় লুকিয়ে থাকে এক-স্বরা একতারাটি!

মধ্য বয়স থেকেই বন্দে আলী শিষ্যের দলে ঘেরা। অনেক শিষ্যসেবক তাঁর। তারাই তাঁর তদ্‌বির তদারক করে। নজর রাখে ওস্তাদজীর মেজাজ মর্জির দিকে। তাঁর নিজের কোন উদযোগই নেই। শিষ্য-সেবকরাই নিয়ে যায় দরবারে। এক আসর থেকে অন্য আসরে। তিনি জানেন শুধু আসর মাৎ করতে। সুরের ঝঙ্কারে মায়া-লোক সৃজন করে দিতে। তারপর মুজরোর তোড়া তেমন হলেই নবাবী শুরু। আবার হাল্‌কা হয়ে গেলেও নির্বিকার। কোন আফ্‌শোস নেই। বিনা মুজরোয় যে আসর করবেন না, তাও নয়। কদরদান মহ্‌ফিলে নিজের গরজেই বাজনা শোনাবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

অতি চিত্তাকর্ষক তাঁর বাজনার রীতি। আর 'সুরিলি' হাত। আঙুলের টিপে টিপে ঝরে পড়ে সুরের ধারা। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ

হয়ে যায়। যন্ত্রটির ওপর তাঁর অসামান্য অধিকার। সব পর্দায় সব স্বরে, এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে অবলীলায় তাঁর দুটি আঙুলের চলাফেরা। সুরের সঞ্চরণে, সুরের নির্ঝরে।

বন্দে আলীর হাতে যন্ত্র যেন কথা কয়। তাকে নিয়ে মজা করতেও দেখা যায় বাজনা নিয়ে। ঘরোয়া পরিবেশে কত ধ্বনি বার করেন খেলাচ্ছলে। যে-কোন শব্দ নিজের যন্ত্রে নকল করে দেখিয়ে দেন। কারুর কথার সঙ্গে মেলান বীণার স্বর।

ধ্রুপদ অঙ্গের বাজই তিনি শুনিয়ে থাকেন। ধ্রুপদ গানও করেন ইচ্ছা হলে, নিজেই বীণা বাজিয়ে। কিন্তু একেকদিনের মেজাজে ঠুংরির কাজও যন্ত্রে করেছেন, এমন 'অপযশ'-ও তাঁর আছে। তবে তা ব্যতিক্রম। স্বতঃস্ফূর্ত মতিভ্রম! আসরে দরবারে বন্দে আলীর প্রকৃত শিল্পী-রূপ—রাগ রূপায়ণে ধ্রুপদী নিষ্ঠা, সমাহিতচিত্ত। আর প্রায়শ উচ্চমানের বাজনা সর্ব আসরে। নেপাল দরবারে মোহর লাভেও যেমন, কোন খাতিরের আসরেও তেমনি।

তাঁর বাজনার স্মৃতি সবচেয়ে জীবন্ত আছে ইন্দোরে। শিবাজী রাও হোলকর তখন ইন্দোরপতি। যেমন সেদিনকার আসরটি হয়েছিল। সেই ১৮৮০।৮২ কিংবা তার কাছাকাছি কোন বছরে।

সে আসর ইন্দোর শহরের ত্রিতল বিশাল লালবাগ প্রাসাদে নয়। ও ত নতুন রাজভবন। আরো পুরনো আমলের আট-তলা প্রাসাদ ইন্দোরের। সেখানেই বিখ্যাত দরবার। রাণী অহল্যা বাইয়ের (মৃত্যু ঃ ১৭৯৬) সময়েও ছিল সেই আটতল রাজ-প্রাসাদ। আর তার দরবার। কিন্তু তখন কি গৌরব বৈভব তার! রানী অহল্যার শ্বশুরের সময়েই ত হোলকর রাজবংশের পত্তন হয়েছিল। তবে এ স্থানটি আরো অনেক কালের পুরনো। সেই প্রাচীন নাম ইন্দ্রেশ্বর। তাই থেকে ইন্দোর। মলহর রাও হোলকর (১৬৯৩—১৭৬৬) এই নতুন কালের ইন্দোর রাজ্যের প্রথম নৃপতি। হোল নামে গ্রামে মলহর আগে বাস করতেন। সেজন্যে তিনি হলেন (মরাঠী ভাষায়) হোল-কর। হোলের সামান্য এক কৃষিজীবীর পুত্র মলহর। কিন্তু যেমন তাঁর সাহস বীরত্ব, তেমনি বিচক্ষণ বুদ্ধি। শক্তিমান মরাঠা সাম্রাজ্যের পেশোয়া তখন প্রথম বাজী রাও। মলহর রাও সেই পেশোয়ার এক সেনাপতির পদ পেলেন। অতি তরুণ বয়সেই, বীরত্বের পরিচয় দিয়ে। তারপর ১৭২৮ সালে বাজী রাও জায়গীর দিলেন মলহর রাও হোলকরকে। তার কয়েক বছরের মধ্যেই মলহর মালবের সর্বাধিক হলেন। তারপর তাঁকে ইন্দোর প্রদেশের জায়গীরদার করলেন বাজী রাও পেশোয়া। তখন থেকেই ইন্দোর রাজ্যের পত্তন হল মলহর রাও হোলকরের হাতে। আর তার একালের রাজধানী ইন্দোর। মলহর রাওয়েরই পুত্রবধূ পুণ্যশ্লোকা অহল্যা বাঈ (জন্ম ঃ ১৭২৫।২৬)। ১৮ বছর বয়সে বিধবা রানী অহল্যা সন্ন্যাসব্রত নিয়ে অতি যোগ্যতায় রাজকার্য করে যান। ধর্মকর্মে প্রজা-পালনে ন্যায় শাসনে আর বীরত্বেও প্রাতঃস্মরণীয়া রানী তিনি।

অহল্যা বাইয়ের মৃত্যুর প্রায় ৮০ বছর পরে ইন্দোর-রাজ তখন শিবাজী রাও হোলকর। কিন্তু মলহর রাও কিংবা রানী অহল্যার মাহাত্ম্যের তুলনায় এ রাজ্য এখন নামমাত্র। বাহ্যরূপ শুধু যেন। কারণ শিবাজী রাও হোলকর ইংরেজের খেতাবী মহারাজা। প্রকৃত কর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা-হারা একটি 'দেশীয় রাজ্য' মাত্র।

তবে আগেকার ঠাট কিছু আছে। পুরনো রাজ্যপাটের কাঠামো। আর সে আমলের আটতল রাজপ্রাসাদ। তার সেকালের দরবার এখন কেবল সংগীতের দরবার। অতিশয় সংগীতপ্রেমী শিবাজী রাও। তাঁর কল্যাণে ইন্দোর দরবার হয়েছে উত্তর ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সংগীতসভা। নানা গুণীজনের আশ্রয় ও সম্মানের আসন এখানে। সদাশয় মহারাজা তাঁদের গুণগ্রাহী পোষক। আর তাঁর দরবারী গুণীমণ্ডলীর মধ্যমণি বন্দে আলী খাঁ।

সেখানে তাঁর সেই ১৮৮০।৮২ সালের আসরটির কথা। বন্দে আলীর তখন পরিণত বয়স। শিল্পী সত্তার চূড়ান্ত বিকশিত পর্ব। বহুদিনের সাধনায় অর্জিত বাদন-নৈপুণ্য এবং প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি।

সেদিন সন্ধ্যার পর খাঁ সাহেব আসরে এলেন। আজ বিশেষ দরবার, তাই শিষ্য-সেবকরা অনুপস্থিত।

খাস দরবারে আছেন মহারাজা। অনতি-দূরে তাঁর কজন বিশিষ্ট পাত্রমিত্র। আর এক পাশে দরবারের বাইজী চুন্না বাই। গুণ বিচারের আগে বাই সাহেবা দর্শন-ধারিণীও। মঞ্জরিত যৌবন নিকুঞ্জ।

শিবাজী রাও বন্দে আলীকে বাজনা আরম্ভ করতে বললেন। প্রথম প্রহর রাত্রি। সুসজ্জিত বিরাট দরবার কক্ষ। বর্তিশোভিত চিক্কণ ঝাড়লণ্ঠন। তার আলো বিচ্ছুরিত প্রতিফলিত হয়েছে হোলকরের মুক্তামালায়, উষ্ণীষের মোতিতে, অঙ্গুরীয়কের হীরক খণ্ডে। চুন্নাবাঈয়ের মণিহারে। দেওয়ালের বর্ণাঢ্য চিত্রাবলীতে। সুকোমল সুচিত্রিত গালিচায়। বন্দে আলীর সুদৃশ্য যন্ত্রটিতে।

সুগন্ধী নির্যাসে আমোদিত আবহ। সুখ-স্পর্শ আসনে বসে খাঁ সাহেব বীণা কোলে তুলে নিলেন। মহারাজকে নতি জানিয়ে, সুর মেলাতে আরম্ভ করলেন তন্ত্র চতুষ্টয়ে।

বন্দে আলীর বীণায় সুর বাঁধার বিশেষ প্রকরণ আছে তা বহু সময় সাপেক্ষ।

এই অবকাশে পরিক্রমা করে নেওয়া যায় তাঁর পূর্ব-বৃত্তান্ত ঃ

কিরানার সন্তান বন্দে আলী খাঁ। যুক্ত-প্রদেশের সাহারাণপুর অঞ্চলের একটি সামান্য গ্রাম কিরানা। কিন্তু সংগীতজগতে স্থান তার অসামান্য। কারণ গ্রামখানি কলাবৎ অধ্যুষিত। বহু সংখ্যায় বিভিন্ন রীতির গায়ক বাদকরা কিরানা থেকে সংগীতজগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বোধ-হয় শাহী আমল থেকে এখানে তাঁদের বসবাসের সূত্রপাত। দিল্লীর অনতিদূরে কিরানার অবস্থান। দরবারী গুণী হয়ে তাঁরা জমি জায়গীর পেয়েছেন শাহী ফর্মানে। বংশানুক্রমে এখানে স্থায়ী হয়েছেন। আর কালক্রমে গড়ে উঠেছে নানা সংগীত-সেবক পরিবার। উত্তর ভারতের সাংগীতিক মানচিত্রে কিরানার স্থান চিহ্নিত হয়ে গেছে। পৃথক পদ্ধতির গায়কশিল্পী, বিভিন্ন যন্ত্রের কলাবৎদের জন্ম দিয়েছে কিরানা। ধ্রুপদী খেয়ালীয়া এবং টপ্পা ঠুংরির গায়ক। সারঙ্গী বীণ্‌কার তবলিয়া। তাঁদের পরস্পর আত্মীয়তা তথা পারিবারিক সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সাঙ্গীতিক পরম্পরা কিংবা আদান-প্রদান সর্বথা নয়। একই বংশে বা পরিবারে দেখা দিয়েছেন ভিন্ন রীতির গীতশিল্পী, স্বতন্ত্র যন্ত্রী। তাই এত বড় সংগীতকেন্দ্র হয়েও এখানে কোন বৃহৎ ঘরাণার প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিন্তু হতে পারত, কোন বিশিষ্ট রীতির কণ্ঠ-সংগীত বা একটি যন্ত্রসংগীতের পীঠস্থান হলে। কিরানা ঘরাণা বলে যে খেয়াল পদ্ধতি প্রসিদ্ধি লাভ করে, তা আবদুল করিমের দৃষ্টান্তে এবং অনেক পরের কথা। বন্দে আলীর পরবর্তী প্রজন্মে। তাঁর শেষ বয়সে আবদুল করিমের সূচনাপর্ব। আর কিরানায় সংগীতচর্চার সূত্রপাত বন্দে আলীর অন্তত ৮।১০ পুরুষ, কিংবা আরো আগে থেকে। সুতরাং বলা যায় কিরানার ঐতিহ্য তার সামগ্রিক চর্চায়, কোন একটি বিশিষ্ট ধারায় নয়। আবদুল করিমের খেয়ালের চাল যেমন তাঁর নিজস্ব প্রতিভার দান, তেমনি বন্দে আলীর বীণাবাদনও। এই কেন্দ্রের ঐতিহ্য-মণ্ডিত সাঙ্গীতিক পরিবেশে উৎপন্ন হয়েছে তাঁদের মতন বিভিন্ন, বিচিত্র প্রতিভা।

সেই কিরানায় আনুমানিক ১৮৩০ সালে বন্দে আলীর জন্ম। তাঁর পিতাও বীণাবাদক ছিলেন, শোনা যায়। তবে বংশানুক্রমে ছিল না তাঁদের বীণার চর্চা। পিতাকে তিনি অল্প বয়সেই হারান। তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগও পাননি বন্দে আলী।

তিনি মাতুলের হাতে তৈয়ারী হন। বিখ্যাত ধ্রুপদী বহরম খাঁ জয়পুরের ডাগর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বন্দে আলীর মাতুল ও শিক্ষাদাতা। পিতৃহীন ভাগিনাকে তিনি কাছে রেখে তালিম দেন। বীণার বাজ ত ধ্রুপদ অঙ্গের। মাতুলের ধ্রুপদ-বিদ্যায় গঠিত হলেন বন্দে আলী। ধ্রুপদ অঙ্গ

বীণায় ওস্তাদেন। বহরম খাঁর তালিম কণ্ঠে নিতেন তিনি। ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চাও মাতুলের সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তে করতেন। গাইতেন ধ্রুপদ। ফলে গায়কও হয়েছিলেন। পরে আসরেও ধ্রুপদ গাইতেন বন্দে আলী, আপন বীণার সহযোগে। তার উদাহরণ পরে দেওয়া হবে।

মাতুলের সঙ্গীত সঙ্গ বন্দে আলী বাল্য থেকেই পান। কিরানা থেকে দিল্লী সেখান থেকে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের ঘনঘটায় চলে যান জয়পুরে, বহরম খাঁরই সঙ্গে। জয়পুরের মহারাজা বহরম খাঁকে দরবারে নিযুক্ত করেন। বন্দে আলী তখনো মাতুলের কাছে। এমনিভাবে প্রতিভা সাধনা ও শিক্ষায় যৌবনেই তিনি গুণী কলাকার হলেন।

কোন কোন মতে, বন্দে আলীর ওস্তাদ ছিলেন নির্মল শাহ্। তানসেনের কন্যা বংশীয় মহা গুণী তন্ত্রকার। বিখ্যাত বীণ্‌কার ওমরাও খাঁর শ্বশুর, খুল্লতাত ও ওস্তাদ নির্মল শাহ্। কিন্তু একথায় গম্ভীর সন্দেহ জাগে। কারণ, বালক বয়স থেকে বন্দে আলীর সমগ্র শিক্ষা পর্ব মাতুলের কাছেই উদ্‌যাপিত। নির্মল শাহের সঙ্গে বন্দে আলীর অন্তত দুই প্রজন্মের কাল-ব্যবধান। নির্মল শাহের সঙ্গে তাঁর কখনো সাক্ষাৎ ঘটার সম্ভাবনাও অল্প। তাছাড়া, সেনীয়া নির্মল শাহ্ অন্য বংশীয় এবং পেশাদার পরিবারের বন্দে আলীকে ঘরানা সম্পদ দান করতে যাবেন কেন! সেকালের রেওয়াজে তা অস্বাভাবিক। সঙ্গীত জগতের কোন শ্রুতি-স্মৃতিতেই নির্মল শাহের সঙ্গে বন্দে আলীর সংস্রব নেই। বহরম খাঁর সংগীত-জীবনের সঙ্গেই যুক্ত আছেন বন্দে আলী। মাতুলের কাছে তৈয়ারী হয়ে তিনি চলে যান গোয়ালিয়রে।

বরং গোয়ালিয়রে বন্দে আলীর একটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষার অধ্যায় পাওয়া যায়। তিনি গোয়ালিয়রে আসেন যুবক বয়সে। হদ্দু, হস্‌সু খাঁ দু ভাই তখন সেখানে দুধর্ষ খেয়ালের কলাবৎ। তাঁরা দুজনেই বীণ্‌কার ও সুকণ্ঠ তরুণ বন্দে আলীর গুণমুগ্ধ হলেন। ফলে তাঁকে দামাদ অর্থাৎ জামাই করে নিলেন হদ্দু খাঁ। আর হস্‌সু খাঁর কথায় তাঁর প্রিয় শিষ্য দেবজীবুয়া কিছুদিন বন্দে আলীকে ধ্রুপদ আর টপ্পা শেখালেন। হস্‌সু খাঁর এক যোগ্য বংশধর গুলে ইমামও, তখন দেবজীর তালিম পান বন্দে আলীর সঙ্গে।

গোয়ালিয়রের পর অন্য কোথাও বন্দে আলীর শেখার কথা জানা যায়নি। সেই বিবাহিত জীবন থেকেই তাঁর পেশাদার জীবনেরও আরম্ভ। নানা আসরে দরবারে মুজরো হতে থাকে। নাম যশ হয় গুণী বীণ্‌কার বলে। হায়দরাবাদ থেকে কাশী। আরো ওদিকে নেপাল দরবার পর্যন্ত।

হদ্দু খাঁর জামাতা বন্দে আলী দুই কন্যার জনক। দুজনেরই তিনি বিবাহ দেন মাতুল বংশে। বহরমের সহোদর অর্থাৎ বন্দে আলীর অপর মাতুল হায়দার খাঁ। বন্দে আলীর দুই জামাতা হলেন সেই হায়দরের দুই পৌত্র জাকরুদ্দিন ও আল্লাবন্দে। দুই ভ্রাতাই জয়পুর নিবাসী। আর পরের যুগে বন্দে আলীর জামাতাদ্বয় ধুরন্ধর ধ্রুপদী বলে নাম করেছিলেন।

একেই ত উড়ু উড়ু স্বভাব বন্দে আলীর। পারিবারিক কর্তব্য, দায়িত্ব চুকে যায় দুই মেয়ের সাদী দিয়ে। খামখেয়ালী স্বভাবও তাঁর বয়সের সঙ্গে বাড়তে থাকে। বেশিদিন ভাল লাগে না একত্র। আর চরিত্রের সেই বৈপরীত্য। সুরের ধ্যানী, জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন। আবার বিলাস ভোগেও নেই অরুচি। একই সত্তায় যাযাবর ও সুখ-নীড়ের কপোত।

তবে সেসব তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথা। শিল্প-সত্তার পরিচায়ক নয়।

বন্দে আলীর নাম শিল্পী এবং গুরু দুই গুণেই। বীণাবাদনে তিনি একটি ধারার প্রবর্তক। তাঁর যোগ্য শিষ্যরা পরের যুগে তার ধারক বাহক হন। শিষ্যদের জন্যেও চিহ্নিত থাকে ওস্তাদের নাম। তাঁর সেই পরিচয়ও দেবার মতন।

নানা সময় মিলে ইন্দোরেই তিনি বেশি কাটান। তাই তাঁর শিষ্যমণ্ডলীও গড়ে ওঠে এখানে। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনজন। গুরুর বিদ্যার উপযুক্ত আধার। বিশেষ মুরাদ খাঁ। অন্য দুজন হলেন বুন্দু খাঁ ও রজব আলী। তাঁরা তিনজনেই বন্দে আলীর তালিম পান বীণায় এবং ইন্দোরে থেকে। তাঁদের মধ্যে মুরাদ ও বুন্দু খাঁর সংগীত-জীবনও বেশির ভাগ ইন্দোরেই কেটে যায়। মুরাদ খাঁ ছিলেন একান্তভাবেই বীণ্‌কার। আর বুন্দু খাঁ সেই সঙ্গে সেতারও বাজাতেন। বন্দে আলীর তৃতীয় প্রসিদ্ধ শিষ্য রজব আলী একাধারে বীণ্‌কার ও খেয়ালীয়া। খেয়াল গানের তালিম রজব আলী তাঁর পিতা মুগলু খাঁর কাছে পান। তাঁর বীণা যন্ত্রে তালিম বন্দে আলীর কাছে।

বন্দে আলীর প্রধান শিষ্য মুরাদ খাঁ। তাঁর সবচেয়ে কৃতী উত্তরসাধক। মুরাদ খাঁ এই ধারার বীণাবাদনে যোগ্য শিষ্য গড়েছিলেন লতিফ, মজিদ দুভাইকে।

বন্দে আলীর নানা সাময়িক শিষ্যের মধ্যে একজন হলেন এমদাদ খাঁ, কলকাতার সুপরিচিত সেতার সুরবাহার গুণী। ইন্দোরে তিনি কিছুদিন বন্দে আলীর সঙ্গ করেছিলেন।

তাঁর কাছে আরো অনেকে শেখেন অনিয়মিতভাবে। সেই সব শিষ্যরা কৃতী কিংবা খ্যাতিমান হননি। কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গে থাকতেন তাঁরা। খিদ্‌মদগারী করতেন আর তাইতেই সন্তুষ্ট।

একজন মাত্র মহিলা বন্দে আলীর তালিম পেয়েছিলেন। কিন্তু সে শিষ্যার কথা এখন নয়।

বন্দে আলীর পূর্ব কথা এই পর্যন্ত। এবার আরম্ভ করা চলে ইন্দোর দরবারের সেই প্রসঙ্গ। তবে তার ক'বছর আগেকার বন্দে আলীর বিষয়ে একটি বিবরণ পাওয়া যায়। সেটি এখানে উদ্ধৃত করে দেবার মতন। বিবৃতিটি বারাণসীর ধ্রুপদী হরি-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের। কিশোর বয়সে তিনি কাশীরই দুটি আসরে বন্দে আলীর বীণা শুনেছিলেন। প্রথমটি ১৮৭৪।৭৫

বলে। আর একটি প্রায়ই কিছুদিন পরে'। সেই আসর দুটি হয় যথাক্রমে (কাশীর) দীঘাপতিয়া ভবনে ও মদনপুরায় রায়-বাহাদুর গিরীশচন্দ্র লাহিড়ীর গৃহে। বন্দে আলী সেই দুটি আসরেই অংশ নেন। আর যাঁরা একটি বা দুটি আসরে যোগ দেন তাঁদের মধ্যে বীণকার সাদেক আলী খাঁ, ধ্রুপদী গোপালপ্রসাদ মিশ্র, তাঁর শিষ্য (কলকাতার) ধ্রুপদ গায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, সেতারী আহম্মদ খাঁ ধ্রুপদী রামদাস গোস্বামী, বীণকার মহেশচন্দ্র সরকার, সেতারী গণেশীলাল বাজপেয়ী, পাখোয়াজী কাশীনাথ মিশ্র, পাখোয়াজী গণেশ সিংহের নাম উল্লেখ্য। হরিনারায়ণের বিবরণী থেকে বন্দে আলী খাঁর বীণার রঞ্জনী শক্তি, তাঁর যন্ত্র বাঁধার নিজস্ব রীতি, তখনকার সঙ্গীতসমাজে তাঁর সম্মান ও প্রভাব, বীণার সঙ্গে গান গাওয়া, তাঁর সরস সিক্ত চিত্ত, 'কারণ' করা ইত্যাদির অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্যে হরিনারায়ণের বিবৃতির অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হল বন্দে আলীর যন্ত্র বাঁধবার বর্ণনা থেকেঃ—

'তিনি এক একটি তার সুরে মিলাইয়া সেই তার ধরিয়া বীণা যন্ত্রটি তুলিয়া ধরিতেন; যদি তারটি নরম (বেসুরা) না হইত, তবে সে তার রাখিতেন, নচেৎ অন্য তার চড়াইতেন। এই প্রথম প্রকরণ। সমস্ত তার এইভাবে পরীক্ষা করিয়া চড়াইতেন, পরে একটি ঝঙ্কার দিতেন। সব তারের সুর মিলিত হইয়া একটি সুর (ধ্বনি) যতক্ষণ পর্যন্ত না বাহির হইত, ততক্ষণ তিনি সুর মিলাইতেন। ইহা দ্বিতীয় প্রকরণ।...বন্দে আলী খাঁ সরস্বতী স্তব ও প্রণামান্তে বীণা ঘাড়ে করিলেন এবং চারি প্রকার রীতি অনুসারে আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে তারপরণ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং গণেশ সিংহ মৃদঙ্গে সঙ্গত করিতে লাগিলেন।...গোপালবাবু 'চরণ মেরে মাথে' কল্যাণের ধ্রুপদ গান করিয়াছিলেন। রামদাসবাবু 'গোরা গণেশ' কল্যাণের ধ্রুপদ গান করিয়াছিলেন। গোপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই কি কেদারবতী (প্রাচীনকালের) চিত্র?' মহেশবাবু তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'কল্যাণের সনদী ধ্রুপদ দুই চারিটিই আছে।' বন্দে আলী খাঁ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কল্যাণকা দো চারহি ধ্রুপদে সনদী আগুর সব রামানন্দী।' খাঁ সাহেব একটু কারণ করিতেন। তিনি হাসিতে হাসিতে 'হাদি অ আল্লাহু' গান করিতে লাগিলেন এবং বীণা বাজাইতে লাগিলেন। আমি এই প্রথম বীণার সঙ্গে গান শুনিলাম, এবং পরেও আর একবার কাসিম আলী খাঁর গান বীণার সহিত শুনিয়াছি। তৃতীয়বার শুনি নাই। ৫০ বৎসরে কি ভীষণ পরিবর্তন।'...

'কিছুদিন পরে পুনরায় কাশীধামের মদনপুরায় স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র লাহিড়ী রায়-বাহাদুর মহাশয়ের বাটীতে তন্ত্রকারগণের সম্মেলন হইয়াছিল। 'বাজপেয়ীজী' সেতার বাজাইলেন, কিন্তু বীণার সমস্ত কার্য সেতারে দেখাইলেন। এই নিমিত্তই বন্দে আলী খাঁ অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন এবং বাজনা শেষ হইলে বাজপেয়ীজীকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। পরদিন বন্দে আলী খাঁর বীণা হইয়াছিল। খাঁ সাহেবের বীণাবাদনের কথা কি বলিব! সে ঝঙ্কার যিনি শুনিয়াছেন, তিনি ধন্য; এক্ষণে আর সেরূপ বীণাবাদন শুনা যায় না। এদিন ঝাঁপতাল সুর ফাঁকতাল চৌতালের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া তারপরণ বাজান হইয়াছিল। গণেশ সিংজী অবলীলাক্রমে সঙ্গত করিয়া খাঁ সাহেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। খাঁ সাহেবও তাঁহার প্রশংসাবাদ করিলেন।' (সঙ্গীতে পরিবর্তন, পৃষ্ঠা ৩-৮)।

সেদিন ইন্দোর দরবারেও এমনি বাজাতে লাগলেন বন্দে আলী খাঁ। তাঁর তখন মেজাজ শরীফ। কাশীর ওই আসরের মতন 'কারণ'-করার কারণেও হতে পারে। এবং/বা রূপদৃষ্টির উপলক্ষ্যও হয়ত।

সে যা-ই হোক, তাঁর বীণার সুরে জমজমাট হয়ে উঠল আসর। চিত্তহারী বাজনা। শিবাজী রাও বার বার সাধুবাদ করতে লাগলেন। আর উদ্বুদ্ধ হয়ে বাজিয়ে চললেন বন্দে আলী। মীড় ঘসিট ইত্যাদি অলংকারের ওস্তাদ তিনি। তেমনি নানা অলঙ্কারের পারিপাট্যে রাগকে প্রাণবন্ত করে তুললেন। অচল ঠাটের পর্দায় পর্দায় চলন্ত আঙুলের টিপে টিপে সুরের স্ফুলিঙ্গ।

সম্মোহিত হলেন ইন্দোর-পতি।

বাজনা শেষ হতে শিল্পীকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন 'কি অপূর্ব বীণা আজ শোনালেন খাঁ সাব। এখন আপনি কি বকশিশ চান, বলুন। যা চাইবেন, আজ আপনাকে তা-ই দেব।'

চুন্না বাঈয়ের দিকে এক নজর চেয়ে নিয়ে বন্দে আলী অকপটেই জানালেন, 'এই বাইজীকে তাহলে বখশিশ দিন, মহারাজ।'

অভাবিত আবেদন! অপ্রস্তুত শিবাজী রাও ক্ষণকাল স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'অন্য কেউ একথা উচ্চারণ করলে তার গর্দান যেত। কিন্তু আপনি ওস্তাদজী। আপনার কথা রাখব।'

চুন্না বাঈয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'খাঁ সাহেবের কথায় রাজি?'

সুর্মাটানা আঁখিপল্লব নত করলেন বাঈজী। তারপর ঈষৎ শির সঞ্চালনে সম্মতি জানালেন। তিনিও সুর-বিদ্ধা হয়েছিলেন।...

সে রাত্রে দরবার থেকে জীবন্ত বকশিশটি নিয়ে ঘরে ফিরলেন বন্দে আলী। আর অচিরেই চুন্না বাঈকে নিকা করে নিলেন।

বাঈজী হলেন বিবি। এবং শিষ্যাও। আগে থেকেই ত গায়িকা ছিলেন। এবার নতুন করে তালিম নিতে লাগলেন ঘরের এত বড় ওস্তাদের কাছে। বন্দে আলীর একমাত্র শিষ্যা চুন্না বাঈ।

কিছুকাল পরে বন্দে আলী ইন্দোর ত্যাগ করলেন। একা নয় অবশ্য। নতুন বিবিকে নিয়ে বোম্বাই চলে গেলেন।

শোনা যায়, সুখী হয়েছিল তাঁদের বিবাহিত জীবন। সম্মিলিত সঙ্গীতচর্চায় নাকি রমণীয় ছিল তাঁদের দাম্পত্যচর্যা। আর চুন্না বাঈ এক শ্রেষ্ঠা গায়িকা বলে নাম করেছিলেন।

এবারও একটি কন্যা সন্তান পান বন্দে আলী। তবে সে ধারায় সঙ্গীতচর্চা থাকেনি।

বোম্বাইতে বেশ কিছুদিন বাস করে বন্দে আলীরা চলে যান পুনায়। সেই তাঁর শেষ বসতি। অন্য কোথাও আর যাওয়া হয়নি।

পুনাতেই বন্দে আলীর শেষনিশ্বাস পড়েছিল। সেখানেই সমাধিস্থ, স্তব্ধ হয়ে আছে তাঁর বীণাধ্বনি! সে বোধ হয় ১৮৯৩ সালের কথা।

পুনায় তাঁর স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠান কয়েক বছর চলেছিল। কিন্তু চুন্না বাঈ আবার ঘরণী হয়েছিলেন নতুন করে। আর একজনের জীবনসঙ্গিনী হয়ে। সে ব্যক্তির কোন খ্যাতি বা পরিচিতি ছিল না। চুন্না বাঈও ছেড়ে দিয়েছিলেন নাচ গানের মুজরো।

বন্দে আলীর একটি বংশপরিচয় দেওয়া হয়নি। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন জ্ঞান সিং খাঁর থেকে এবং শের সঙ্গীতচর্চায় প্রসিদ্ধ। মোগল আমলের মাঝামাঝি সময়ে জ্ঞান সিং ছিলেন নামী ধ্রুপদী। কি কারণে তিনি মুসলমান হয়ে যান। তখন তাঁর নাম হয় সুরজ্ঞান খাঁ। পরের পুরুষ থেকে পুরোপুরি মুসলমানী নাম-পরিচয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

FOLKLORE AND FOLKLIFE IN INDIA, AN OBJECTIVE STUDY IN INDIAN PERSPECTIVE—
By Sankar Sen Gupta (Indian Publications, Cal-700069, Price 35.00 or $ 5.50)

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। মহাদেশ এর ভোগোলিক বিশেষণ। বৈচিত্র্য এর সারা দেহে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তো আছেই। মানবিক বৈচিত্র্যও অজস্র। সম্ভবত এর বিরাটত্ব, বৈচিত্র্যের অজস্রতা ও আড়ম্বরের দিকে লক্ষ রেখেই একে উপমহাদেশ বলা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতবর্ষ নামের নিজের দেশটির যথার্থ বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্য বহু শিক্ষিত লোকের অনুভবেরও দুর্বোধগম্য। এর প্রদেশগুলির সংখ্যা, এর আয়তন, এর লোক-সংখ্যা, লোক-গোষ্ঠীর আদিমতা ভাষা, উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার সংখ্যা, ভাষাগত জাতি উপজাতি গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর সংখ্যা বিস্ময়কর। এই অসংখ্য ভাষা উপভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার জাতি উপজাতি গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীর জীবন-ধারা এতই অভিনব, বিস্ময়কর ও উৎসাহ-ব্যঞ্জক যে, একটি মানুষের একক প্রচেষ্টায় একটি সীমিতকালের মধ্যে এই জীবনধারার সমগ্র তো দূরের কথা, খণ্ডাংশের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য—সম্ভবত অসম্ভব। শুধু ভারতবর্ষ ধরলে নয় কোনো দেশেই তা সম্ভব নয়। 'লোককথা' ও 'লোক-জীবনের' পরিচয় ফুটিয়ে তোলা ব্যাপারটাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ব্যাপার নয়, সম্মিলিত পরিকল্পনা ও প্রয়াসের বিষয়।

কাজেই 'ভারতবর্ষের লোককথা ও লোকজীবন'—এই ধরনের নামের কোনো গ্রন্থের কথা শুনলে বা দেখলে যে ধরনের সত্ত্ব প্রত্যাশা জেগে ওঠে আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটির উপাদানের মধ্যে তা মেটাবার কোনই আয়োজন নেই।

ফোকলোর ও ফোকলাইফ সম্পর্কিত যে কোনো গবেষণা ও গ্রন্থ-রচনা সাধারণ-ভাবে তিনটি দিক থেকে হতে পারে। (এক) অঞ্চল বিশেষের ফোকলোর ও ফোক-লাইফের পরিচয় সংগ্রহ করা, সেগুলির ঝাড়াই বাছাই করা, শ্রেণী নির্দেশ করা এবং সে-সবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা। (দুই) আজ পর্যন্ত সংগৃহীত ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত লোককথা ও লোকজীবনের উপাদান ও উৎসগুলি বিচার করে কোনো তাত্ত্বিক সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। (তিন) তাত্ত্বিক দিক থেকে ভারতবর্ষে লোককথা ও লোকজীবনের মশলা সংগ্রহের ও বিচার বিশ্লেষণের সুবিধা-অসুবিধা, জটিলতা এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সে সকল সম্পাদনের নিয়মনীতি বা পদ্ধতি আবিষ্কার অথবা সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা।

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি না-ঘরের না-ঘাটের। নামের চেকনাই আছে বটে, কিন্তু অভ্যন্তরের বিষয় বড় গোলমেলে। Folklore & Folklife in India এটা আবার সবিশেষ করা হয়েছে An objective study in Indian perspective বলে। মানে কি? ভারতবর্ষের লোক-কথা ও লোকজীবনের উপাদান সংগ্রহের আন্দোলন বা প্রচেষ্টার পরিচয় কি? না, তা তো নয়। তাহলে নামকরণের ইতি গজ অংশে
An objective study in Indian perspective কেন? objective study কিসের। ফোকলোর ফোকলাইফের—কোথা-কার ফোকলোর ও ফোকলাইফের? ভারত-বর্ষের?—আর তাই যদি হবে তাহলে আবার Indian perspective কেন?

প্রকৃতপক্ষের গ্রন্থটির বিষয়ের মধ্যে ঢুকেও অনুমানের সত্যতা দৃঢ় হল। ভারতবর্ষের লোককথা ও লোকজীবনের প্রসঙ্গ দু' একটি পরিচ্ছেদের কোনো কোনো অংশে ছাড়া প্রায় খুঁজেই পাওয়া গেল না। যা-নেই, তার objective study, তাও আবার Indian perspective-এ ব্যাপারটা একটু রহস্যময় এবং নামটা একটু গালভরা হয়ে পড়লো না কি?

এবার গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বিচার করে গ্রন্থ পরিচয়টা আর একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক।

গ্রন্থটি প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্ট সর্গসহ নয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রস্তাবনা অংশটি মূলত সমগ্র গ্রন্থের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ। একদিক থেকে এই পরিচ্ছেদটিই গ্রন্থের একমাত্র পাঠযোগ্য পরিচ্ছেদ। কারণ এইটি পড়লে অন্য প্রবন্ধগুলি পড়ার আর তেমন কোনো আবশ্যকতা থাকে না।

আবার এই প্রস্তাবনা অংশেই লেখকের গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয় সম্পর্কিত অপরিচ্ছন্ন চিন্তার কথাও গোপন থাকেনি। কখনো বলেছেন,
It will form a convenient introductory book on Indian folklife study
একটু পরেই আবার বলেছেন
there is a danger of a book on field science that deals with folklore and folklife, becoming out of date. অতএব 'a brief clear and concise book like the present one।'

রচনার প্রয়োজনীয়তা গ্রন্থকার অনুভব করেছেন। ব্যাপারটা একটু পরস্পর-বিরোধী হয়ে গেল নাকি? ফোকলোর ফোকলাইফের তথ্য সংগ্রহ এক জিনিস, তার বিচার বিশ্লেষণ আর এক জিনিস এবং এর Field Science সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। একই সঙ্গে এতগুলি কাজ করতে পারা বাহাদুরী বটে, কিন্তু সম্ভব কি?

দ্বিতীয় প্রবন্ধ, যেখানে লোককথার সুস্পষ্ট স্বরূপ লেখক বোঝাতে চেয়েছেন অর্থাৎ কোনটি লোককথা আর কোনটি নয় তার তফাৎ নির্দেশ করতে চেয়েছেন—সেখানে সাহেব সুবোদের বই থেকে উদ্ধৃতি তুলে তুলে এবং কথার জাল পাকিয়ে এমন জটিল করে তুলেছেন, তাতে না-বোঝা গেল ফোকলোরের সংজ্ঞা না-বোঝা গেল লোক-কথা-তর বিষয়ের সঙ্গে তার তফাৎ। তাছাড়া এই ১৭০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে যেখানে মূলত ভারতবর্ষের লোককথা ও লোকজীবনের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়ার কথা সেখানে এত তাত্ত্বিক আলোচনা কেন? এত চর্বিত চর্বন কেন? আর পুনরাবৃত্তির কথা তো লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন।

তৃতীয় প্রবন্ধটি গ্রন্থের আয়তন বাড়াতে সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়-সূত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। চতুর্থ প্রবন্ধে লোককথার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত থাকে, এটাও যে একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিষয়, মানব সভ্যতার উপর যে এর একটা প্রভাব আছে—এ-সব কথাই শুনতে হবে।

পঞ্চম প্রবন্ধে নিতান্তই অকস্মাৎ বাংলাদেশের কারুশিল্প, হস্তশিল্প ও শিল্পীদের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পাঞ্জাব নয়, রাজস্থান নয়, কেরলা কি মণিপুর নয়—নিতান্তই বাংলা-দেশের গ্রামীণ শিল্প ও শিল্পীর পরিচয়।

এর পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে লেখক যথাক্রমে ভারতীয় সঙ্গীত ও কবচ-মাদুলি, জাদুকর লৌকিক অষুধপত্র ও নিরাময়ের দেবদেবী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথমটিতে ভারতীয় সঙ্গীতের মোটা পরিচয় থাকলেও দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে যে ওঝা বৈদ্য বশীকরণ জাদুবিদ্যা ও নিরাময়ের দেব-দেবতার আলোচনা করেছেন, তা নিতান্তই বাংলাদেশ ও তার অঞ্চল বিশেষকে ভিত্তি করে। এটা ভারতীয় ব্যাপার বলে

চালানো মানে একদিকে সত্যের অপলাপ করা অন্যদিকে ভারতবর্ষের বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা।

অতএব লেখক যে প্রস্তাবনার দাবী করেছেন যে, 'the book will help in developing an adequate knowledge of folklore and folklife of India' সেটা নিতান্তই লম্বা একটা কথা।

কয়েকটি লাইন বড় বিসদৃশ লাগে। যেমন 'When the dinner is ready they consume that by the pale light of the lantern. (পৃষ্ঠা ১৪১).

Folklore is produced by a folk in a hoary past and it is still extant today as a fragmentary survival. (পৃষ্ঠা ২৬)

This appears to be as true of social institutions as it is of solids liquids and gases of a science class room (পৃষ্ঠা ৫৭)

ভুল ছাপা, ভুল বানান, ভুল বাক্য ও ভুল তথ্য (কবিগান সম্পর্কে ১২৬ পৃষ্ঠার শেষ স্তবক নিয়ে গ্রন্থাখানা) পাঠক, গবেষক, লোকথাকর্মী বইটির প্রতি খুব বেশী যে আকর্ষণ বোধ করবেন এমন মনে হয় না।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সাহেব বাঁধের বালিহাঁস (মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৯, চার টাকা) তরুণ গল্পকার দেবব্রত মল্লিকের প্রথম গল্প-সংকলন। সুধীর মৈত্র আঁকা চমৎকার প্রচ্ছদ, ঝকঝকে মুদ্রণ, নিখুঁত বাঁধাই—বইটির বাইরের আকর্ষণ বেশ বাড়িয়ে দিয়েছে, এ-কথা মানতেই হবে। নতুন লেখকের প্রথম বই, সুতরাং পাঠক ক্রেতার পক্ষে প্রথমেই দর্শন. বিচার যে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে জানা কথা। গুণ-বিচার পরবর্তী স্তর। প্রথম বিচারে বইটি উত্তীর্ণ।

দেবব্রত মল্লিক গল্প যে খারাপ লেখেন, এ-কথাও অবশ্য বইটি পড়ার পর কোনো পাঠকই স্বীকার করবেন না। তাঁর গল্প লেখার হাত বেশ তরতরে, ভাষাও মিষ্টি। গল্পে একটা স্নিগ্ধ পরিমণ্ডল তিনি অক্লেশে সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু একটা কথা মনে হতে পারে। তা হল, প্রতিটি গল্পের শেষ প্রায় একই রকম. একটা সুখের স্বপ্ন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি আনন্দের কোনো কল্পনা—তাঁর প্রতিটি গল্পেরই উপসংহার। কোনো চমক নয়, কোনো ঘটনা নয়, মানসিক স্তরে একটি আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ—অধিকাংশ গল্পের উপসংহার ঘটিয়েছে। বিন্দু, হরি, অসীমা, সুজয়, মনীষা, সন্দীপ, পরেশ, খাতু আর বাসিয়া—এই সংকলনের অন্তর্গত নটি গল্পের নটি চরিত্র। সমাজের নানা স্তরের প্রতিনিধি এরা। মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাপারে এরা সকলে একই রকম, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কোনো ছবিই এদের জীবনের পাথেয়। অথবা অন্য-ভাবে বলতে গেলে নানা দুর্বিপাকের মধ্যেও মধ্যবিত্ত জীবন আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন-সম্ভাবনা নিয়ে টিঁকে আছে—এ-কথাই হয়তো তরুণ লেখক বলতে চেয়েছেন এই গল্পাবলীর মধ্য দিয়ে। সেদিক থেকে অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ সার্থক।

❋

জয়ন্ত জোয়ারদার সম্পাদিত **চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গল্প** (পরিবেশক : বুক মার্ক, কলকাতা-১২, সাড়ে ছ টাকা) গ্রন্থে মোট ৬টি অনুবাদ গল্প। গত দশকের মধ্যভাগে চীনে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটে এই গল্পাবলী সেই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। এই গল্প-সংকলনের লেখকদের সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। যেমন এঁরা প্রায় সকলেই বয়সে তরুণ। শুধু তাই নয়, পেশাদার গল্পকারও কেউ নন। কেউ শ্রমিক, কেউ কৃষক। কেউ-বা গণ-ফৌজের সৈনিক। তবু যে অসি ছেড়ে মসী ধরেছেন তার কারণ, বিপ্লবের প্রেরণা। সাংস্কৃতির বিপ্লবের মূল তত্ত্বটি গল্পের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এঁরা। ফ্রম দি মাসেস, টু দি মাসেস'—এই তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ এঁদের রচনা।

এর ফলে প্রচলিত কাহিনী এঁরা বেছে নেন নি। মাও-এর বাণী, বিপ্লবের মতাদর্শ, 'শ্রেণীভিত্তি শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গী এবং অনুভূতির শিক্ষা' গল্পের মধ্যে যে-ভাবে এসেছে, তা হয়তো অনেকের কাছে আরোপিত, ছক-বাঁধা মনে হতে পারে। কিন্তু এঁদের উদ্দেশ্যই তাই। ব্যক্তির স্থান যে যৌথ প্রয়াসের ঊর্ধ্বে নয়, সবচেয়ে আগে যে মতাদর্শ; সে-কথা প্রতিটি গল্পেই ঘুরে-ফিরে এসেছে।

শা পিং তে-র 'শহরের আত্মীয়া' এবং চাঙ তাও-উ ও চাঙ চেও-উ রচিত 'তরুণ দম্পতি' গল্প দুটি এই সংকলনের সেরা গল্প। তবে অনুবাদের দুর্বলতা যে সব ছাপিয়ে গল্পগুলি আস্বাদের বড়ো বাধা, সে-কথা মানতেই হবে।

❋

আসন্ন শরৎ-শতবর্ষকে কেন্দ্র করে বেশ-কিছু হুজুগে বই যে প্রকাশিত হতে থাকবে এবং বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদে কান পাতা দায় হবে, এ-কথা বুদ্ধিমান পাঠক ইতিমধ্যেই বুঝে ফেলেছেন নিশ্চয়। যাঁরা ব্যাপারটি ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করার আগেই শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা দেখানোর অছিলায় এ-রকম কিছু বই অর্থের বিনিময়ে হস্তগত করবেন, তাঁদের জন্য করুণা ছাড়া কিছুই দেখানোর নেই। কেননা, এতে পাঠকও ক্ষতিগ্রস্ত, শরৎচন্দ্রেরও হেনস্তা কম হবে না।

অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-এর **শরৎ-প্রসঙ্গ** (ভাব ও লেখা, কলকাতা-১২, পনের টাকা) গ্রন্থটি হাতে নিয়ে কথাটা মনে এল। কেননা, বইটির মলাটে ও নাম-পত্রে কোথাও বলা নেই যে, এটি একটি সম্পাদিত গ্রন্থ। এবং সম্পাদিত লেখাগুলির কিছু অংশ যেমন মূল্যবান, বেশ কয়েকটি তেমনই সম্পূর্ণ অপাঠ্য। সূচীপত্র অবশ্য একটি রয়েছে এবং সে-পর্যন্ত এগোলে লেখকের নাম ও আলোচ্য বিষয় চোখে পড়ে। কিন্তু তাতে কি লাভ? অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু নিজে বলেছেন অতি অল্প কথাই। যা বলেছেন তা শরৎচন্দ্রের বহুজ্ঞাত জীবনপঞ্জী। সাহিত্য-বিচারের প্রসঙ্গে তিনি দিক্‌পাল সমালোচকদের উদ্ধৃতিতে-উদ্ধৃতিতে পাতা ভরিয়ে দিয়েছেন। তাহলে তাঁর লেখা পড়ব কেন? সেই সমালোচকদের মূল গ্রন্থগুলি পড়লেই হয়।

সান্ত্বনার মতো কিছু রচনা অবশ্য এই বইতে রয়েছে। সেগুলি লিখেছেন তারা-শংকর, নরেন্দ্র দেব, কালিদাস রায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। কিন্তু এঁদের কৃতিত্ব সম্বল করে মলাটে অন্য লেখকের নাম—সম্পাদকরূপে না হয়ে লেখকরূপে—দুঃখ বাড়ায় বই কমায় না।

বিবিধ ও পত্রিকা

স্বর্গে কেন হে ঈশ্বর। অন্নদাচরণ দাশ। গোপা প্রকাশনী। ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। চার টাকা।

নানা বিষয়ের উপর রচিত কবিতার সমষ্টি নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থটি। কবিতাগুলি মনের আকৃতি, বেদনা, প্রেম, বাস্তবমুখিতা, স্মৃতি রোমন্থন ইত্যাদি যা কিছুকেই প্রকাশ করেছে তার উপর পড়েছে নবীন হাতের সবুজ প্রলেপ। আশা করব এই ফসলে কোনোদিন সোনালী রঙ ধরবে।

পদাতিক (ত্রৈমাসিক) সম্পাদক : অসিত গুহঠাকুরতা। বারুইপুর পুরাতন বাজার। ২৪ পরগনা। ৫০ পঃ।

এবারের সংখ্যা শুধুই কবিতায়। প্রথম কবিতা নজরুল ইসলামের। কিন্তু এ কোন নজরুল ইসলাম? যদি তিনি না হন তবে এই বিখ্যাত নাম ব্যবহার গর্হিত। কয়েকটি কবিতা ভাল। তাদের রচয়িতা রণজিৎকুমার মজুমদার, বাণীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার দাস, অসিত গুহঠাকুরতা।

সুইটজারল্যাণ্ডের চমকপ্রদ তরুণ লেখক পেটার বিকসেলের প্রথম ছোটোগল্পের বই **AND REALLY FRAU BLUM WOULD VERY MUCH LIKE TO MEET THE MILKMAN** বেরুবার মাত্র বিকসেল তাঁর অতীব অভিনব ও টাটকা গল্পগুলোর জন্য বহুবাঞ্ছিত গ্রুপে ৪৭ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর আগে আর যাঁরা এই বিশিষ্ট সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম করলেই বোঝা যাবে এই গোষ্ঠী ৪৭ পুরস্কারটির কদর ইওরোপে কতটা : হান্স মাগনুস এন্‌ৎসেনবেরগের, গুন্টার গ্রাস, পেটার হ্বাইস, পেটার হানডকে প্রভৃতি। এবার বেরিয়েছে বিকসেলের দ্বিতীয় ছোটো গল্পের সংকলন : Stories for Children, আর এই বইটি নির্ভুল ও অবিসংবাদিতভাবে তাঁকে ইওরোপের সর্বাগ্রগণ্য গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পেটার বিকসেল অসাধারণ লেখক। তাঁর লেখার বিষয় সরলসোজা, তাঁর মানুষজন চেনাশোনা, ঘটনাগুলো দৈনন্দিন অথচ আস্তে আস্তে তাঁর গল্পগুলো আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা বিষয়ে গভীর ও মর্মস্পর্শী মন্তব্য হয়ে ওঠে। অথচ তাঁর গল্প বলার ভঙ্গিমা অনাড়ম্বর ও অনলংকৃত; তাঁর ভাষা কঠোর, পরিচ্ছন্ন ও প্রত্যক্ষ; তাঁর এই অনুরণনময় গল্প-গুলোয় না আছে কোনো জমকালো জম্পেশ ঘটনা, না বা কোনো জঙ্গী জাঁদরেল দামামার আওয়াজ। অথচ তৎসত্ত্বেও বা হয়তো সেইজন্যেই ক্রমশ তারা হয়ে ওঠে আধুনিক নীতিকথা, 'ফেবল' ঈশপ বা ক্রিলফের উত্তরসূরী—কিন্তু আবার পিতামহদের চেয়ে ভিন্নও কেননা তাঁর এই 'ফেবলগুলো' জ্ঞানী কিন্তু অন্তর্ঘাতী। তাঁর গল্পগুলো বলে আমরা কি করি আর কি করি না; কি জানি আর কি জানতে চাই না; কি স্বপ্ন দেখি, আর কোন স্বপ্ন দেখার সাহস হয় না। আর ক্রমশ এই মমতামণ্ডিত কাহিনীগুলো বিচ্ছেদ ও মৃত্যু, প্রস্থান ও অপসারণ •এবং উন্মত্ততা সম্বন্ধে গভীর চিন্তা হয়ে ওঠে। গভীর এবং বিষাদময়।

ইওরোপে (পূর্ব আর পশ্চিম—এতেই) আজকাল 'ফেবল' লেখার ভারী চল। এটাকে হুজুগ বলে ভাবা বিষম ভুল হবে। অনেক সময়তেই অনেক দেশে সোজাসুজি বলবার সুযোগ থাকে না—বলতে হয় তির্যকভাবে, ঘুরিয়ে, পেঁচিয়ে দিতে হয় ছদ্মবেশ—কৌতুক আর আড়ালে চিন্তার ফাঁকে-ফাঁকে মন্তব্য করা হয় সমকাল ও সমাজ সম্বন্ধে। যেমন সোরাভোমির মোজেক-এর বই 'দি এলিফ্যান্ট' এই তরুণ পোল নাট্যকার ও গল্পলেখক এককালে ঠাট্টার ছবি আঁকতেন ক্রীড়া-সাপ্তাহিকে। হয়তো সেইজন্যেই নির্মম ও ক্ষুরধার ব্যঙ্গে তাঁর 'হাতি' বইয়ের গল্প-গুলো অন্তর্ঘাতমূলক, নাশকতামূলক বিস্ফোরণে পরিণত হয়েছিলো—যেমন সচরাচর তাঁর নাটকগুলোও। কিন্তু বিকসেলের রচনা তাঁর বা তাঁর মতো বহু লেখকের চেয়েই আলাদা। বিকসেলের রচনাতেও হাসি আছে কৌতুক আছে, রসিক-তার চাপা বিচ্ছুরণ আছে—কিন্তু তা অনেক বেশি শিক্ষিত ও পরিশীলিত—আর তাঁর

STORIES FOR CHILDREN by Peter Bichsel. Signature 10, Calder & Boyers, London. 50 p.

পরিহাসগুলোর কোনো অব্যবহিত লক্ষ্য নেই, নেই কোনো আঘাত ও প্রতিঘাত। সেই অর্থে ম্রোজেক বা অন্যান্য লেখকদের মতো রাজনৈতিক নন তিনি। কিন্তু হয়তো আমরা জিগেস করতে পারি, একেবারেই কি নন।

বিকসেল গদ্য লেখেন কবির মতো। তাঁর প্রথম বইটি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলো তুর্গেনিভের গদ্য কবিতা কি রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র কথা—যদিও তাঁর গল্পগুলো ছিলো আরো নগ্ন ও উন্মোচিত, আরো অসহায়, মমতাময় কিন্তু কৌতুকে ভরা—অনেক আপাত পরস্পর বিষয় অঙ্গাঙ্গী মিশিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব এক ভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন। সেটা তাঁর প্রথম বই।

তাঁর এই দ্বিতীয় বই আধুনিক জীবন-যাত্রার শিকার, যে-সব মানুষ তাদের নিয়ে আরো অনেক বেশি উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত—সেই সব মানুষ যারা ছোটোখাটো, ক্লান্ত, বয়েসের ভারে দোমড়ানো; সেই সব মানুষ যারা স্মৃতির নিগ্রহে মৃতপ্রায়; সেইসব মানুষ, যারা আর কিছুই—কোনো কিছুই জানতে চায় না; এমন সব আবিষ্কারক, যাদের আবিষ্কারগুলো অনেক আগেই অন্য লোকে আবিষ্কার করে ফেলেছে—অনেক বছর আগে। এই গল্পগুলোয় কেউই জগতের অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। তাঁর জগৎ নির্মমভাবে একরকম—তাতে কিছুই ঘটে না; ঘটে না কোনো আবিষ্কার, আসে না কোনো চমক বা বিস্ময়, নেই কোনো অদল-বদল ওলোট-পালটের সম্ভাবনা। এমনকি ভাষা—তাও রোজ এমনই একরকম যে মন খারাপ করে দেয়। সেইজন্যই এক বুড়ো, 'তার ঘাড় শুকনো, ভাঁজে ভরা; তার শার্টের কলার তার ঘাড়ের তুলনায় অনেক চওড়া' শেষ অবধি কথা বলাই ছেড়ে দেয়। সেই-জন্যই ইয়োডক খুড়ো তাঁর প্রীতি প্রেরণ করেন, আর সব কিছুই 'ইয়োডকবাদে' ভরে যায়। এমনকি যে ছোটো ছেলেটি আমেরিগো ভেসপুচ্চিকে নতুন জগতের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলো সে শুধু জানে না, 'আমেরিকা বলে সত্যি কোনো দেশ আছে কিনা'। এখানে পৃথিবী সব সময়েই গোল, টেবিল শুধু টেবিল শুধু টেবিল, আর পালাবার সব রাস্তাই আটকানো। অথবা হয়তো এই পৃথিবী থেকে পালাতে হলে লোককে যাত্রা করতে হবে ভিতরমুখো—স্কিৎসোফ্রেনিয়া আর বিচ্ছিন্নতার মিশোলে তৈরি এক ভিতর রাস্তা খুঁজে বার না করে উপায় নেই হয়তো।

অথচ বিকসেলের এই জগৎ হাসিতে-পাওয়া, কৌতুকভরা—নিরুপায় আর্তনাদের সঙ্গেই মেশানো আছে হাস্যরসের বিজয়-বার্তা। তাঁর শুষ্ক তিক্ত হাসির একটানা খড়খড়ে আওয়াজ আমাদের মাথার মধ্যে 'ফেবলগুলো' শেষ হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

অথচ পুনর্বার মনে করিয়ে দেয়া উচিত, অলংকারে বিকসেলের বেদম বাম পায়; ভিতরের সব দ্বন্দ্ব অধিজ্ঞাতা ও অস্থিরতা তিনি প্রকাশ করেন এক চাপা ভাষায়—কমিয়ে বলেন তিনি, স্বর নামানো, আর তাতে লুকোনো আছে হিন্টগেনস্টাইনীর রসিকতা আর নাছোড় চোরাবালি। তিনি এই গল্পগুলোর নাম দিয়েছেন 'ছোটোদের গল্প', আর সেটাই তার রসিকতার একটা মস্ত পরিচয়। তিনি বলেন, সাধারণ লোকের কথা, ছোটোখাটো লোকের কথা, চেনাশোনা লোকের কথা; এমন মানুষ, যারা কথার ফাঁদে বন্দী, একঘেয়েমিতে ভারাক্রান্ত, স্মৃতির জালে ধরা পড়ে ছটফট করছে। আর আমরা, চমকে উঠে ঘাবড়ে গিয়ে তাদের মধ্যে দেখতে পাই রহস্যময় ও আশ্চর্য সব চেনা মুখের আদল—আর হঠাৎ অনুভব করে বসি ঐ মুখগুলো আর কারু নয়, আমাদেরই।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজভবনে ব্লু বিতরণ উৎসবে রাজ্যপাল ও উপাচার্যের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী খেলোয়াড়রা ফটো—দেশ

খেলার মাঠে

খেলাধূলার বিভিন্ন শাখার ক্রীড়াবিদদের মধ্যে যোগাযোগ এবং মৈত্রীর সেতু রচনার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা দিবসে তাদের সমবেত পথপরিক্রমা অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা। এ বছরই প্রথম এই প্রচেষ্টা হল দক্ষিণ কলকাতায়। পরের বছর হবে উত্তর কলকাতায় এবং জেলায় জেলায়। ভাল পরিকল্পনা এবং মার্চ পাস্টের দৃশ্যও তারিফ করার মত। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে সমবেত হয়ে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি শাখার পুরুষ-মেয়ে খেলোয়াড় এবং সাঁতারুরা নিজ নিজ অ্যাসোসিয়েশনের পতাকা নিয়ে দক্ষিণ কলকাতা প্রদক্ষিণ করেছে শোভাযাত্রা সহকারে। সঙ্গে ছিলেন বহু ক্রীড়াপ্রশাসক, অতীত দিনের নামী খেলোয়াড়রা এবং স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্যগণ। এক সঙ্গে এদের দেখাও বিরল সুযোগ বলা যেতে পারে।

কিন্তু বছরে একদিন মিলিত হয়ে শহরের একাংশ প্রদক্ষিণ করলেই কি ক্রীড়াবিদদের মধ্যে যোগাযোগ এবং মৈত্রীর সেতু রচিত হবে? তার জন্য চাই স্থায়ী কোন ব্যবস্থা। এই উদ্দেশ্যে অতীতে প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠেছিল। সে সংস্থা এখন মৃত।

খেলোয়াড়দের একত্র সমাবেশের জন্য মাঝে মাঝে নানা আয়োজন করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, এই সমাবেশের সবচেয়ে ভাল মাধ্যম হয় যদি শহরে একটি আদর্শ স্পোর্টস লাইব্রেরী গড়ে ওঠে। স্পোর্টস লাইব্রেরী করার ক্ষেত্রে অর্থও প্রতিবন্ধক নয়। আকর্ষণীয় ফুটবলের একটি চ্যারিটি খেলার অর্থ দিয়েই কাজ আরম্ভ হতে পারে। স্পোর্টস কাউন্সিল সচেষ্ট হলে স্থান সমস্যারও সমাধান হতে পারে অতি সহজে।

ব্লু বিতরণ

সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধূলায় যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে প্রতি বছর তাদের ব্লু বিতরণ করে উৎসাহ দেওয়া হয়। এবারও হয়েছে। রাজভবনে অনুষ্ঠিত উৎসবে এবার ব্লু পেয়েছে ১৩৮ জন ছাত্র-ছাত্রী, যারা ফুটবল, ক্রিকেট, সাঁতার, ওয়াটারপোলো, ডাইভিং, কাবাডি, ব্যাডমিণ্টন, অ্যাথলেটিকস, ভলিবল প্রভৃতি খেলাধূলায় কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল।

উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন তাঁর রিপোর্টে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যর্থতা ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করে সাঁতারে ছাত্রদের এবং ভলিবল খেলায় ছাত্রীদের জন্য গর্ব প্রকাশ করেছেন। পর পর দু বছর এরা আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য এবং রাজ্যপাল শ্রীডায়াস আশা প্রকাশ করেছেন অগ্রগতি ধীর হলেও খেলাধূলায় ছাত্ররা এগিয়ে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলেছেন, লেক অঞ্চলেই এই কমপ্লেক্স তৈরি হোক।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছেলেমেয়ের খেলাধূলা করার এবং অনুশীলনের স্থানের অভাব বহুদিনের। সেই অভাব পূরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকেও একবার অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। যে কারণেই হোক, কাজ কিছুই হয়নি। রাজ্যপালের ইচ্ছা পূরণের জন্য কতটা চেষ্টা হবে জানি না। খেলাধূলার উন্নতির জন্য স্পোর্টস কমপ্লেক্স কিন্তু অবশ্যই দরকার।

মাইল দৌড়ের নতুন নায়ক

ইংলণ্ডের ডাক্তার রজার ব্যানিস্টার, নিউজিল্যাণ্ডের জন ল্যাণ্ডি এবং

আমেরিকার জিম রায়ানের পর আর এক দৌড়বীর বিখ্যাত হয়ে উঠলেন মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতায়। ইনিও নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী। নাম জন ওয়াকার। ৩ মিনিট ৫০ সেকেন্ডের প্রাচীর ভেঙে ওয়াকার এক মাইল দৌড়ে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। সময় হয়েছে ৩ মিনিট ৪৯·৪ সেকেন্ড। বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৩ মিনিট ৫১ সেকেন্ড, তানজিনিয়ার ফিলবার্ট বেয়ির। ওয়াকার দুদিন আগে নিজেই বলেছিলেন, এই শতাব্দীতে ৩ মিনিট ৫০ সেকেন্ডের চেয়ে ভাল সময় করা সম্ভব নয়। কিন্তু নিজেই অবিশ্বাস্যভাবে দৌড়ে সময়কে কমিয়ে এনেছেন।

কতটুকু সময় কমিয়েছেন? দুই সেকেন্ডেরও কম। ১·৬ সেকেন্ড। কিন্তু মানুষ যখন শক্তি ও গতির প্রায় চরমে পৌঁছে যায় তখন এই দেড় সেকেন্ড সময় কমানো প্রায় অবিশ্বাস্যের পর্যায়। ১০০ মিটার দৌড়ে জেসি ওয়েন্সের ১০·২ সেকেন্ড বিশ্ব রেকর্ড দীর্ঘ ২০ বছর পরে ভেঙেছিল ১০·১ সেকেন্ড সময়ে।

মাইল দৌড়ে প্রথম ৪ মিনিটের বাধা ভেঙেছিলেন ইংলন্ডের রজার ব্যানিস্টার ২১ বছর আগে। সেই সংবাদে পরে তাঁর স্যার খেতাব লাভ। তারপর চ্যাটওয়ে-ল্যান্ডি, রায়ান প্রভৃতির গতি ও সাধনা ২০ বছরে সময়টাকে কমিয়েছে প্রায় ১০ সেকেন্ড। ওয়াকারের নতুন বিশ্ব রেকর্ডের খবর শুনে লন্ডনে স্যার রজার বলেছেন, এই শতাব্দীতে মানুষ সাড়ে তিন মিনিটে মাইল দৌড়বে। শতাব্দীর বাকি আর ২৫ বছর। এর মধ্যে আর ২০ সেকেন্ড সময় কমানো অসম্ভব, শরীর বিজ্ঞানের নিরন্তর সাধনা সত্ত্বেও। তবু মানুষ নিশ্চয়ই থেমে থাকবে না। অসম্ভবের পেছনে ছুটবেই।

পরলোকে কুটস—মাইল দৌড়ে জন ওয়াকারের কীর্তির পরের দুঃখজনক খবর ভ্যাদিমির কুটস-এর পরলোকগমন। ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে রাশিয়ার এই দূর পাল্লার দৌড়বীর ৫ হাজার ও ১০ হাজার মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন নতুন বিশ্ব রেকর্ড করার কৃতিত্বসমেত। ফিনল্যান্ডের পাভো নুর্মি, চেকোশ্লোভাকিয়ার 'মানব ইঞ্জিন' এমিল জাটোপেক, ইংলন্ডের গর্ডন পিরির মতই দূরপাল্লার দৌড়ে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেশের কাছ থেকে পেয়েছিলেন খেলাধুলার সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অব লেনিন' পুরস্কার। অ্যাথলেটিকসে সাধনার ক্ষেত্রে কুটসের তুলনা বিরল। তাঁর ধ্যানজ্ঞান সবই ছিল অ্যাথলেটিকস। জাটোপেকের চেয়েও নাকি কঠোর অনুশীলন করতেন এবং নিজেকে সব সময় নিয়োজিত রাখতেন অ্যাথলীটদের প্রশিক্ষণের কাজে।

স্বাধীনতা দিবসে খেলোয়াড়দের পথ পরিক্রমা শোভাযাত্রায় ইস্ট বেংগল ক্লাবের ফুটবলার অশোক ব্যানার্জি, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সলিল দাস প্রভৃতি ফটো—দেশ

ইডেনে আগামী ক্রিকেট

আগামী ক্রিকেট মরসুমে ইডেন আপাতত তিনটি খেলা পেয়েছে, প্রতিনিধি-মূলক যে খেলা তিনটি দর্শকদের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। এই তিনটি খেলা হচ্ছে রনজির পূর্বাঞ্চলীয় লীগে বাংলা ও আসামের খেলা, দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলের চারদিনব্যাপী খেলা এবং শ্রীলংকা ক্রিকেট দলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের তিন দিনব্যাপী খেলা।

রনজির খেলা হয় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের মধ্যে পারস্পরিক ভিত্তিতে। অর্থাৎ বাংলা এ বছর যদি বোম্বাইয়ে খেলে বোম্বাই রাজ্য দলের সঙ্গে, তবে আগামী বছর বোম্বাইকে খেলতে হবে বাংলায় এসে। কোন বিশেষ কারণ ছাড়া এই নীতিই চলে আসছে। বাংলা যদি এবার পূর্বাঞ্চল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয় তবে নক আউটের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে উত্তরাঞ্চল রানার্সের সঙ্গে। কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলে সেমি-ফাইনাল খেলতে হবে সম্ভবত পশ্চিমাঞ্চল চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে শক্তিশালী বোম্বাইয়ের সঙ্গেই মিলিত হবার সম্ভাবনা। এবং সম্ভাবনা ইডেনে আর একটি খেলা হবার।

শ্রীলঙ্কা দলের ভারত সফরে চার দিনব্যাপী তিনটি বেসরকারী টেস্ট হবে হায়দরাবাদ, আমেদাবাদ ও নাগপুরে। যে সব কেন্দ্রে ইংলন্ডের সঙ্গে এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ভারতের টেস্ট খেলা হয়েছে সে সব কেন্দ্রে শ্রীলঙ্কা দলের টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়নি। ভালই হয়েছে। কেননা, খেলার জনপ্রিয়তা এবং প্রসারের জন্য অপ্রধান কেন্দ্রে খেলার আসর ছড়িয়ে দেওয়াই উচিত। এই দিক দিয়ে এ বছর জুনিয়র জাতীয় ক্রিকেট (সি কে নাইডু ট্রফি) প্রতিযোগিতা এবং স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার (কোচবিহার ট্রফি) খেলা-গুলি ক্রিকেটে উপেক্ষিত কটকে করার ব্যবস্থা বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত।

একলব্য

গৌরব-সূচনার নায়ক সোমানা

সম মর্যাদার এবং প্রায় সমশক্তির একাধিক খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও এক এক সময় এক একজন ময়দানের শীর্ষ তারকা হয়ে ওঠে, ক্লাব মাহাত্ম্য, ব্যক্তিত্ব এবং ক্রীড়া-গুণের সংমিশ্রণে। যেমন অতীতে ছিলেন গোষ্ঠপাল, সামাদ, রসিদ, লক্ষ্মীনারায়ণ, শৈলেন মান্না, আমেদ খাঁ, মেওয়ালাল, চুনী গোস্বামী প্রভৃতি। এদেরই মত একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে ময়দানের শীর্ষ তারকা ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সেন্টার ফরোয়ার্ড এ সি সোমানা।

সেই সোমানা মাত্র ৫৬ বছর বয়সে সম্প্রতি পরলোক গমন করায় তখনকার ফুটবলের বেশ কিছু স্মৃতি ভেসে উঠছে। বিশেষ করে মনে পড়ছে তাঁর খেলার কথা।

সত্যি কথা, ইস্টবেঙ্গলে তখন গুণী খেলোয়াড়ের অভাব ছিল না। ফুটবলও নয় একজনের খেলা। তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই, প্রধানত সোমানার ক্রীড়া দক্ষতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা। ওরই অধিনায়কত্বে ১৯৪২ সালে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ এবং প্রধানত ওরই ক্রীড়াগুণে ১৯৪৩ সালে প্রথম আই এফ এ শীল্ড জয়। এবং ১৯৪৫ সালে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হয়ে ডাবল লাভের ক্ষেত্রেও ওঁর অবদান অনেকখানি। ১৯৪৪-এ ইস্টবেঙ্গল যে লীগ বা শীল্ডে সফল হতে পারেনি তার কারণ সাময়িকভাবে সোমানার দলত্যাগ। ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সামান্য মত বিরোধের ফলে অভিমান করেই ভবানীপুর ক্লাবে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটি ম্যাচও খেলেন নি ভবানীপুরের হয়ে। শীল্ডে আবার ইস্টবেঙ্গলে খেলতে চেয়েছিলেন। তখন আই এফ এ-র অনুমোদনক্রমে এক ক্লাবের হয়ে লীগ এবং অপর ক্লাবের হয়ে শীল্ড খেলা যেত। সোমানার ক্ষেত্রে আই এফ এ কিন্তু আর্জি মঞ্জুর করেন নি।

বলা বাহুল্য, পুরো একটি মরসুম পায়ে বল ছোঁয়াতে না পারায় এবং ১৯৪৫-এও লীগের শেষ মুখে আবার ইস্ট বেঙ্গলে খেলার অনুমতি পাওয়ায় সোমানার ক্রীড়া দক্ষতায় ভাটা পড়ে। তবু মাত্র ২৭ বছর বয়সে কলকাতার ফুটবল থেকে বিদায় নেবার মত খেলোয়াড় ছিলেন না সোমানা। তখনও তাঁর পায়ে যেমন দুরন্ত শট, তেমন দেহের দোলায় প্রতিপক্ষকে মাতাল করার ক্ষমতা। কিন্তু ধনী পিতা তাঁর পুত্রকে আর কলকাতায় পাঠাতে রাজি হননি। মহীশূর হাইকোর্টের চীফ জাস্টিসের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে এবং বিরাট ব্যবসায়ের মধ্যে বেঁধে রেখেছিলেন।

সোমানা বাঙ্গালোরের বিখ্যাত খেলোয়াড় লক্ষ্মীনারায়ণের আবিষ্কার। ক্রীড়াগুরুও বটে। ১৯৩৮ সালে বাঙ্গালোর থেকে কুড়ি বছরের ছেলেটিকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। বাবা ছাড়তে চাননি। লক্ষ্মীনারায়ণ বলেছিলেন, খেলার জন্যই শুধু কলকাতায় নিতে চাইছি না, ওখানে খেলবে এবং আমার তত্ত্বাবধানে থেকে কলেজে পড়াশুনা করবে। অতঃপর বাবা রাজি হয়েছিলেন। বিরাট ধনী পিতার অর্থের কোন প্রয়োজন ছিল না। সৌম্যকান্তি, নাতিদীর্ঘ, প্রিয়দর্শন

এ সি সোমানা

বলিষ্ঠ ছেলেটির সর্বাঙ্গে ছিল আভিজাত্যের ছাপ। ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সদস্য এবং তখন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক মুকুন্দ চক্রবর্তী ছেলেটিকে লুফে নিয়ে তাঁর কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। পরে বঙ্গবাসী কলেজ থেকেই সোমানা বি এ পাশ করেছিল।

আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ দু বছর সোমানা বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। লেফট ইন এবং লেফট আউট দুই পজিশনে মানানোর চেষ্টা করেছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। চল্লিশ থেকে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে ওঁর সফল ভূমিকা। একচল্লিশ এবং বিয়াল্লিশ দু বছরই ছিলেন লীগে শীর্ষ গোলদাতা। প্রথমবার করেছিলেন ২৪টি গোল, দ্বিতীয়বার ২৬টি। গোলদাতাদের তালিকায় শুধু শীর্ষস্থান নয়, ওই দু বছর লীগে মোহনবাগানের যে চারটি খেলা হয়েছিল সেই চারটি খেলাতেই ইস্ট বেঙ্গল জিতেছিল এবং প্রতি খেলায় সোমানা গোল করেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, বিয়াল্লিশে ক্যালকাটা মাঠে ফিরতি লীগের চ্যারিটি খেলার আগে মোহনবাগানের এক কর্মকর্তা অধিনায়ক অনিল দেকে বলেছিলেন, আর কিছু চাই না শুধু সোমানাকে আটকে রেখো, তাহলেই ম্যাচ আমাদের। ম্যাচ কিন্তু হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গলের, সোমানারই গোলে। উল্লেখ্য, ওই বছর কলকাতার ফুটবল মরসুমের পর সোমানা বাটা দলের হয়ে রোভার্সে খেলতে যান এবং রোভার্স কাপ প্রথম কলকাতায় আসে ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিয়া দলের বিরুদ্ধে সোমানার দুটি গোলে। ফল হয়েছিল ৩-১। তৃতীয় গোলটি করেছিল রসিদ।

সোমানার অধিনায়কত্বে প্রথম লীগ জয়ের কথা আগেই লিখেছি। তেতাল্লিশে প্রথম শীল্ড জয়ের ভূমিকাটা দেখা যাক। দ্বিতীয় রাউন্ডে কুষ্ঠিয়ার শিবকালী স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে সোমানার চারটি গোল, তৃতীয় রাউন্ডে বি আই ব্যাটেলিয়ানের বিরুদ্ধে দুটি, কোয়ার্টার ফাইনালে ভবানীপুরের বিরুদ্ধে একমাত্র জয়সূচক গোল, সেমিফাইনালে বি অ্যান্ড এ রেলের বিরুদ্ধে চারটি এবং ফাইনালে পুলিশের বিরুদ্ধে একটি। আই এফ এ শীল্ডের দীর্ঘ ইতিহাসে আর কেউ ১২টি গোল করেছে কিনা সন্দেহ।

অসম্ভব পজিশন জ্ঞান, অ্যান্টিসিপেশন এবং ডজ ছিল। এবং ছিলেন অত্যন্ত ক্লিন খেলোয়াড়। ডিফেন্ডারের ডানদিক দিয়ে বল নিয়ে বের হবেন কি বাঁ দিক দিয়ে, তার হদিস পাওয়া ছিল শক্ত। দু'পায়ে ছিল চকিত-চমক জোরালো শট এবং মাথায় ছিল বুদ্ধি। খেলার মাঠে এবং মাঠের বাইরে আচার আচরণেও সোমানা ক্রীড়ামোদীদের চিত্ত জয় করেছিলেন।

১৯৪৫ সাল। মোহনবাগানের সঙ্গে শীল্ড ফাইনাল। ফাইনালে দুই প্রধানের সেই প্রথম খেলা। সোমানা জার্সি গায়ে খেলার জন্য প্রস্তুত। বার্ণপুর থেকে শেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছলেন পাকসুলে। সোমানা নিজের গা থেকে জার্সি খুলে পাকসুলের হাতে দিলেন। পাকসুলে আপত্তি করলে বলেছিলেন, আপনি আমার চেয়ে সিনিয়র খেলোয়াড়। তাছাড়া আমি দুবার শীল্ড ফাইনাল খেলেছি। আপনার এই প্রথম। সেদিন কেউ আন্দাজ করতে পারেনি, সোমানা আর কোনদিন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে দেবেন না।

মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

অরণ্যদেব আছেন, তাই অরণ্যের শান্তি নষ্ট হয় না।
আমরা লড়ব
বেশ তো এসো।
আহা, তোমরা ঝগড়া করছ কেন?

উৎসব-অনুষ্ঠানেও তিনি যোগ দেন বই কী!
কয়েকটা বিজ্ঞ উপদেশ দিয়ে দিন
নিশ্চয়ই দেব।
কী আনন্দ

ওয়াম্বেজিরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে··· কীলা-উম্বিতে তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আপনাকে যেতে হবে।
বেশ তো, ফিরে এসে তারপর যাব।

মাঝে-মাঝে ছুটি নিয়ে অরণ্যদেব তাঁর নন্দন-বনানীতে চলে যান।

কয়েকটা দিনের বিশ্রাম চাই তাঁরও·····
প্রায় এসে পড়েছি··· সমুদ্রের নোনা গন্ধ···
EDEN

হিংস্র-পিরানহায় ভর্তি নদী তিনি পার হয়ে যাচ্ছেন·····

নন্দন-বনানী। সম্পর্কে খাদ্য-খাদকের, এমন প্রাণীরা সেখানে মিলেমিশে বাস করে··
কেমন আছিস তোরা?
1/12

তটভূমির কাছেই ওদিকে ···
২
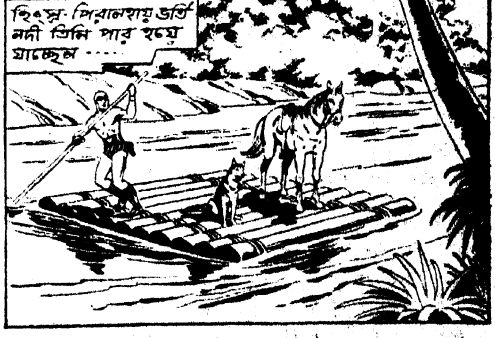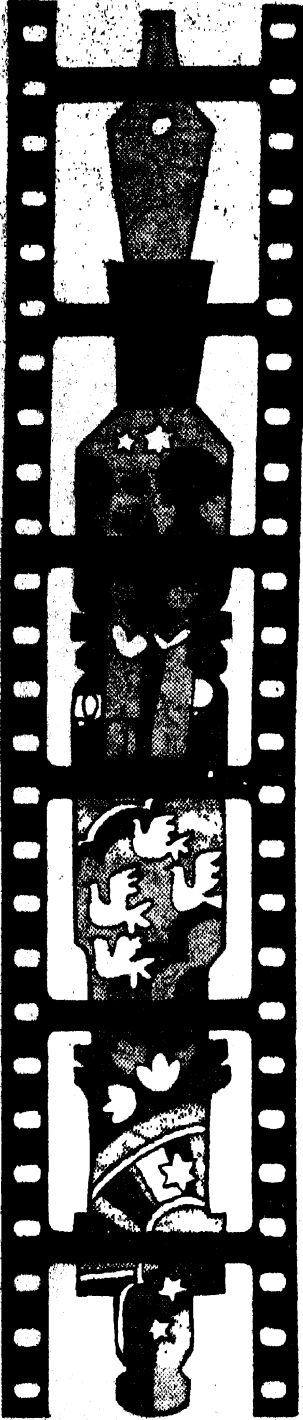
চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের রঙীন পূজাবার্ষিকী

আনন্দলোক

'আনন্দলোক' রঙীন পূজাবার্ষিকী প্রথম প্রকাশিত হয় গত বছর এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জন করে বিপুল জনপ্রিয়তা। সত্যি বলতে, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত এই সংখ্যাটি অনেক পাঠক চড়া দামেও সংগ্রহ করেন। তার পরের ঘটনা পাঠক-পাঠিকার অজানা নয়। পূজাবার্ষিকীর অভূতপূর্ব সাফল্যের পর গত জানুয়ারী থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে চলচ্চিত্রের রঙীন পাক্ষিক 'আনন্দলোক'—প্রচার সংখ্যায় ও জনপ্রিয়তায় এই পাক্ষিক এখন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সেরা সাময়িকী! এবারের 'আনন্দলোক' পূজাবার্ষিকীর পরিকল্পনা করা হয়েছে অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার সুস্পষ্ট চাহিদার কথা মনে রেখে—যাতে বোম্বাই ও বাংলার চলচ্চিত্র জগতের ভিতর-মহল সম্পর্কে তাঁদের অফুরন্ত কৌতূহল মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাদর পায় তাঁদের সাহিত্যানুরাগ। তাছাড়াও এই বৃহৎ কলেবর সংখ্যাটিতে থাকবে আধুনিক ফ্যাশান সম্পর্কে সচিত্র ও বিস্তৃত আলোচনা, যাত্রা ও থিয়েটার জগৎ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ রচনা। এক কথায়, এবারের 'আনন্দলোক' পূজাবার্ষিকী যা দেবে অন্য কোনো পূজা সংখ্যাই তা দিতে পারবে না। সবকিছুর পরেও থাকবে এর সেরা আকর্ষণ: প্রকাশন সৌন্দর্য—অফসেটে ছাপা, রঙীন ও অসংখ্য চিত্রসম্বলিত।

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের চারটি সুবৃহৎ উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

(রহস্যভেদী কিরীটী রায়কে নিয়ে এবারের পুজোয় একমাত্র উপন্যাস)

প্রতিভা বসু, দিব্যেন্দু পালিত, অরুণ বাগচী

এঁরা অন্য কোনো পূজা সংখ্যায় উপন্যাস লিখছেন না

বিশেষ ফিচার

★ চলচ্চিত্র জগতের এক বছরের ঘটনা ও রটনা ★ বোম্বাই ও কলকাতার শীর্ষস্থানীয় চিত্রতারকাদের নিয়ে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর রচনা ★ বোম্বাই ও কলকাতার জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের ইণ্টারভিউ ★ অতীতের খ্যাতনামা চিত্রতারকাদের সম্বন্ধে বিশেষ রচনা ★ চিত্রতারকাদের কোষ্ঠীবিচার: আগামী বছর কেমন যাবে?

ফ্যাশান ও রূপচর্চা

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে ফ্যাশান ও রূপচর্চা সম্পর্কে ধারণা—বদলাচ্ছে পোষাক-আশাক, রূপ ও রুচি। ফ্যাশান ও রূপচর্চা নিয়ে অনেকগুলি পৃষ্ঠাব্যাপী রঙীন ও সচিত্র এই বিভাগটি এবারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

যাত্রা ও থিয়েটার বিষয়ে পৃথক সচিত্র রচনা

★

চিত্রতারকাদের অসংখ্য পূর্ণপৃষ্ঠা রঙীন ছবি ও ক্লোজ-আপ

দাম: ১০.০০ টাকা

সডাক: ১১.৪০ টাকা

'আনন্দলোক' রঙীন পূজাবার্ষিকী সংগ্রহের জন্যে এখনই তৎপর হোন। আপনাকে যিনি কাগজ দেন তাঁকে বলুন বা আমাদের লিখুন:

সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দলোক,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১

AALO-7 BEN

'অর্জুন' (পরিচালনা : ইন্দর সেন) ছবিতে সমিত ভঞ্জ ও সন্ধ্যা রায়

রঙ্গ জগৎ

মতামতের মন্তাজ

কলকাতায় টি ভি আসবে। এই বার্তা ঘরে ঘরে রটে যাবার পর খুব বেশি সময় পার হয়নি। টি ভি—টেলিভিশন এসে গেল। যথাসময়ে কলকাতায় টেলিভিশনের উদ্বোধন হল। জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে বোঝা যায়, কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে টি ভি যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। যে কর্মতৎপরতার মধ্যে টালিগঞ্জে টেলিভিশন স্টুডিও স্থাপিত হল তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে জনসাধারণ ধন্যবাদ জানাবেন। অভিনন্দন বিশেষভাবে রাজ্য সরকারেরই প্রাপ্য। টি ভি একটি শক্তিশালী 'কমিউনিকেশন মিডিয়াম'। সাংস্কৃতিক মাধ্যমও বটে। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান-সূচীতে সংবাদ পরিবেশন ও রিপোর্টাজ-এর মতো সাংস্কৃতিক প্রয়োজনাও প্রাধান্য পাবে। কলকাতার মতো একটি বিশেষ সংস্কৃতি-কেন্দ্রে টেলিভিশনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার উপর দিয়ে যত ঝড়ই বয়ে যাক এই শহরের সাংস্কৃতিক কর্মধারা কখনও ব্যাহত হয় না। সারা বছর জুড়ে নাটক, নৃত্যনাট্য, সংগীতের জলসা, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার এই সংস্কৃতি-জীবনের পরিচয় এখন টেলিভিশনেও পাওয়া যাবে। মাধ্যম আরও একটি বাড়ল, যা সিনেমার মতই দৃষ্টি ও শ্রুতিকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে রাখবে।

* * *

বিদেশে দূরদর্শন বা টেলিভিশনের জন্মলগ্নেই একটা আশংকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। টেলিভিশনের জন্য কি সিনেমার কদর কমবে? এই প্রশ্ন প্রথম শোনা গিয়েছিল বিদেশে। ওই আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক প্রতিপন্ন হয়ত হয়নি। সিনেমা ও টেলিভিশন—একে অপরের পরিপূরক বা পরিপন্থী কোনটাই হয়নি। টেলিভিশন অনুজ হয়েও তার স্থান করে নিয়েছে। অগ্রজেরও বিশেষ ক্ষতিসাধন হয়নি। তবে অনেকেরই বক্তব্য, টেলিভিশন সিনেমার কিছু দর্শক কেড়ে নিয়েছে। ঘরে বসে টেলিভিশনে ফিল্ম দেখাটা ঠিক ফিল্ম দেখা হয়ত নয় অনেকের কাছে। সেটা টেলিভিশন-চিত্র দেখা। টেলিভিশনের জন্য যেসব অল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র তৈরি হয় তাতে সিনেমার স্বাদ, গল্প ও ট্রিটমেন্ট মেলে না। এ যাবৎ বেশির ভাগ টেলিভিশন-চিত্র তৈরি হয়েছে কোন তথ্য বা প্রামাণিক ঘটনার উপর। তবে ওয়াইড স্ক্রীন-এ সিনেমা দেখার অন্য আনন্দ। তা ছাড়া একালে সিনেমার স্ক্রীন ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে, তার ডাইমেনশন বাড়ছে। তাই সিনেমার আকর্ষণের একটি আলাদা ক্ষেত্র আছে। টেলিভিশনের চ্যালেনজ সেভাবেই সিনেমা সামলে উঠেছে।

* * *

কথা হচ্ছে কলকাতার টেলিভিশন নিয়ে। এখানে সবে টেলিভিশন শুরু হয়েছে। অতএব এখনই সিনেমা-ব্যবসায়ীদের আশঙ্কিত হবার কারণ নেই। তাছাড়া বোমবাইয়ে সিনেমা টেলিভিশনের চ্যালেনজ-এর সম্মুখীন হয়েছে বেশ কিছুদিন হল। সেখানে এই নিয়ে কোন সোরগোল হয়নি। বরঞ্চ কলকাতায় টেলিভিশন শুরু হওয়ায় সাংস্কৃতিক জগত নতুন উদ্দীপনা লাভ করবে। শিল্পিগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক সংস্থা তাঁদের শিল্প-চর্চার জন্য একটি নতুন মাধ্যম পেলেন। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে টেলিভিশন প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার করেছে। টেলিভিশনে জন-

প্রিয় বাংলা ছবি যা তার বংশধিবদের দেখানো হবে। পুরনো আমলের বিখ্যাত বাংলা ছবিও দেখানো যেতে পারে। হয়ত দেখানো হবে। তাতে বাংলা চলচ্চিত্রেরই জনপ্রিয়তা বাড়বে। টেলিভিশনের মূল্য ও ভূমিকা বিরাট। কলকাতায় যে শূন্যতা ছিল টেলিভিশন আসাতে তা পূর্ণ হল।

দো জাসুস

(ডিমপুলে ফিল্মস)

গল্পের গোয়েন্দাদের সাধারণত যে রকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে দেখা যায় (খবরের কাগজে খুনের খবর পড়েই খুনীর চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া, কিংবা অকুস্থলে পৌঁছেই বাতাসের আঘ্রাণ নিয়ে খুনীর সন্ধান পেয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি) ছবির দুই জাসুস (রাজ কাপুর ও রাজেন্দ্রকুমার) অর্থাৎ গোয়েন্দার তেমন কোন অসাধারণ গুণ ছিল না। তবে ওদের ছিল দুটি নির্মল হৃদয় এবং ঈশ্বরে অচলা ভক্তি। প্রথম কেসটি হাতে পেয়ে তাই ওরা সর্বাগ্রে ছুটেছে মন্দিরে মসজিদে আর গির্জায়। ছবির শুরু কমেডির ঢঙে, রাজ ও রাজেন্দ্র দুজনেই তাঁদের অভিনয়ে কমেডির শর্ত পূরণ করেছেন, দর্শকরাও তখন আনন্দ পেয়েছেন। কিন্তু পরিচালক নরেশকুমার সম্ভবত কমেডির উপর তেমন ভরসা রাখতে পারেন নি। দুই জাসুসকে এমনিতে যতই বোকা-বোকা দেখাক মারপিটের সময় ওরা প্রায় ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কদের মতই। দুজনে বাইশজনের সঙ্গে সমানে লড়ে গেছে। ছবির দুই তরুণ প্রণয়ী (শৈলেন্দ্র সিং ও ভাবনা ভাট) বিপদে পড়েছে ঠিকই, তবে সে-সব ক্ষেত্রে ওদের তেমন মাথা ঘামাতে হয়নি। যা করবার দুই জাসুসই করেছে। নায়ক নায়িকার কাজ ছিল প্রেম করে যাওয়া এবং মাঝে মাঝে গান গাওয়া, ওরা সেটা যথাযথভাবেই করেছে। রবীন্দ্র জৈন গানের সুর ভালই দিয়েছেন। শৈলেন্দ্র অভিনয় ছাড়া গানও গেয়েছেন। গোয়েন্দা-কাহিনীতে দর্শককে নির্বাক রাখার প্রধান অস্ত্র কৌতূহল সেটা কিন্তু এ ছবিতে ছিল না বললেই হয়। তা সত্ত্বেও ছবিটি দর্শকের কাছে উপভোগ্য দুই জাসুসের অভিনয়ের গুণে।

শুটিং চলছে ...

দমদম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে তখন অবিরাম ব্যস্ততা চলছে। ভেসে আসছে অ্যানাউন্সমেন্ট...টুকরো টুকরো কথার শব্দ। প্লাইট আসছে যাচ্ছে—তার শব্দ। দেখতে দেখতে মানুষের ভিড় একটা প্লাইট ল্যান্ড করা লক্ষ্য করছে। সকলকে ছাপিয়ে একটা মুখ...একটা বেদনাহত মুখ...একটা লিপ-স্টিক রঙ মাখা মুখ...একটা ক্লান্ত মুখ স্পষ্ট হয়। যেন একটা ভাঙা আয়নার মধ্যে মুখটা অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। কেন এমন হল? কেন আমি এভাবে বেঁচে আছি? কার জন্যে? প্রশ্নগুলি একসঙ্গে এসে সুপ্রিয়াকে থামিয়ে দেয়। সচকিত করে। ল্যান্ডেড প্লাইট থেকে যাত্রীরা সব একে একে নেমে আসছেন। এক দুই তিন। তৃতীয় যাত্রী অরুণ! সুপ্রিয়া চমকে ওঠে। এর চেয়ে এই মুহূর্তে বজ্রপাত হওয়া ঢের ভাল ছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে অরুণের দাদু আর মা। সুপ্রিয়া যাঁকে রিসিভ করতে এসেছেন তিনিও সহাস্যে এগিয়ে আসছেন। অরুণ ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে থাকে একটা মুখ। যে মুখ লিপ-স্টিক রঙ মাখে না...যে মুখে আনন্দে উজ্জ্বল থাকে সর্বক্ষণ...যে মুখ সুশ্রী বললেও কিছু বলা হল না। সুপ্রিয়া সরে যাবার আগেই অরুণ তার নাম ধরে ডাকে। পিছনে না তাকিয়ে সুপ্রিয়া কয়েক পা এগিয়ে যায়। একটু ঝুঁকে ভিড়ের মধ্যে মিশতে চায়। শেষ পর্যন্ত পারে না। অরুণ দৌড়ে এসে তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে একজন আরেকজনের দিকে। সুপ্রিয়ার দু-চোখ বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। কৃত্রিম সাজগোজ অশোভন হয়। অবাক হয়ে যায় অরুণ এ কি সাজ সেজেছ! সুপ্রিয়া জানে অরুণ কৃত্রিম সাজ অপছন্দ করে। এটা তার স্বভাববিরুদ্ধ। অতএব অরুণ বলছে : এই নাও রুমাল। মুছে ফেল। শিগগির মুছে ফেল।

এত পাপ কি একটা চতুষ্কোণ রুমালের মাঝে ধরবে? আর এ পাপ কি মুছলেই ধুয়ে যাবে? সুপ্রিয়া তার একাকিত্বে ঠোঁট এবং মুখে রুমাল ঘষতে থাকে। মুছে চলেছে! যথাসম্ভব হাতের জোরে। সে বোধ হয় তার সর্বশরীর থেকে পাপ মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। ফলে ক্রমশ তার অভিব্যক্তিতে বিষাদ গাঢ় হয়ে আসে। এক পলক অরুণের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু তা সে এক পলকই। তার দৃষ্টিতে অনেক কিছু বলবার থাকলেও সুপ্রিয়া বলতে পারে না। কি করে বোঝাবে...কি করে বলবে সে...আমি নষ্ট হয়ে গেছি অরুণ...আমি নষ্ট হয়ে গেছি... এ ফুল দিয়ে আর কোন দেবতার পুজো [illegible] না।

...একটি মেয়ের স্বপ্ন ছিল কেউ তো জানে না। হাসতে গিয়ে কাঁদল কত কেউ তো জানে না।...জানবেন, এই মেয়েটির নামই সুপ্রিয়া। একদা সে নতুন থাকত। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। তখন কোন এক সূত্রে সে গিয়েছিল এক জায়গায় ব্যাড-মিন্টন খেলতে। সেখানে খেলাধুলো করেন প্রধানত ন্যাভাল অফিসাররা যখন ছুটিতে আসেন। ব্যাডমিন্টন খেলতে গিয়ে সুপ্রিয়ার সঙ্গে অরুণের আলাপ। খেলার পার্টনার ক্রমাগত লাইফ পার্টনার হবার স্বপ্নে বিভোর হয়। অরুণ তার বাড়িতে জানায়।

শ্যুটিং চলছে : "অপরাজিতা" ছবির সেই দৃশ্যোটিতে রাজশ্রী বসু ফটো—দেশ

মা আর দাদু আপত্তি করেন না। এদিকে সুপ্রিয়ার বাবাও প্রস্তাবে অসম্মত হন না। ঘটনা সুন্দর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবার মুখে সুপ্রিয়ার বাবা অকস্মাৎ মারা গেলেন। সুপ্রিয়া অকল্পনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি। সুযোগ বুঝে মামা মামী জাল দলিল করে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে সুপ্রিয়াকে ঘরছাড়া করবার চেষ্টায় আছেন। এমন সময় এক সুন্দর প্রাতঃকালে সুপ্রিয়া খবরের কাগজে দেখল অরুণ যে জাহাজে পাড়ি দিয়েছিল সেই জাহাজ সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গেছে। হতাহতের সংখ্যা অগণিত। তন্মধ্যে অরুণের নাম স্পষ্ট—সে নিহত। সুপ্রিয়া স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। তার পায়ের তলাকার মাটি একটু একটু করে সরতে আরম্ভ করেছে। পৃথিবীতে যে সবচেয়ে আপনজন সেও তাকে ছেড়ে চলে গেল। তার মাথার ওপরে প্রশস্ত নীল আকাশ যেন কালো ঢেউয়ের সমুদ্র। এখন অজিত নামক এক যুবকের আগমন হচ্ছে। তার বাবা আর সুপ্রিয়ার বাবা বন্ধু ছিলেন—সেই সুবাদে। বলতে গেলে মানসিক বিপর্যয়ের হাত থেকে আপাতত অজিত সুপ্রিয়াকে উদ্ধার করছে। সান্ত্বনা দিচ্ছে। সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে স্বনির্ভরতা ফিরে পাচ্ছে। অজিতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। কাল হল। অজিতের মুখোশ খসে পড়ল। মাল্টি-স্টোরিড হোটেলের একটি কামরায় কামনা বাসনার উত্তাল তরঙ্গ। বেহুঁশ সুপ্রিয়া কিছু জানল না কিছু বুঝল না। সকালের আলোয় সে এক নতুন সুপ্রিয়াকে আবিষ্কার করল। অজিতের সহচর বেঞ্জামিনের মেয়ে লিলিও নতুন সুপ্রিয়া হতে পারত যদি বেঁচে থাকত। তাই নতুন সুপ্রিয়ার বেঁচে থাকা দরকার। বেঁচে থাকা! এ কি-হল। অরুণ কোথা থেকে? জাহাজডুবি হয়েছিল ঠিকই, তখন সে জাহাজে ছিল না, অসুস্থ অবস্থায় ছিল রেঙ্গুনের হাসপাতালে। অরুণ আবার ফিরে আসবে, সুপ্রিয়ার জীবনে আবার ঝড় উঠবে—স্বাভাবিক। ঝড় ওঠে। আকাশ কাঁপে। বাতাসে তোলপাড় হয় জানলা কপাট। ফুলদানিটা ভেঙে চুর-চুর হয়ে যায়। ঘরের মেঝেতে রজনীগন্ধা। সুপ্রিয়া কি করবে এখন? কি করে বলবে? কি করে বোঝাবে?...আমি নষ্ট হয়ে গেছি অরুণ...আমি নষ্ট হয়ে গেছি...এ ফুল দিয়ে আর কোন দেবতার পুজো করা যাবে না...

অপরাজিতা সুপ্রিয়া। 'অপরাজিতা' ছবির নাম। অপরাজিতা রাজশ্রী বসু। এই দুরূহ জটিল চরিত্রের রূপদান সমাধা করে শ্রীমতী বসু গত সপ্তাহে কানাডা যাত্রা করেছেন। যাত্রার প্রাক্কালে বলেছেন, 'আমি জানি আপনারা আমাকে ভুলতে পারবেন না। আজ পর্যন্ত যে কটি চরিত্রে রূপ দিয়েছি প্রত্যেকটিতেই দর্শকদের কাছ থেকে সাড়া পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দর্শকেরা সুপ্রিয়াকে কখনও ভুলতে পারবেন না।' ওঁর বিপরীতে এ ছবির নায়ক অরুণ : রঞ্জিত মল্লিক। অরুণের মা ও দাদু যথাক্রমে শিপ্রা মিত্র ও উৎপল দত্ত। অজিত : অসমীয়া ছবির খ্যাতনামা নায়ক বিজু ফুকান। বেঞ্জামিন একটি বিশেষ চরিত্র, রূপায়িত করছেন তরুণকুমার। রঞ্জিৎ মিত্রের প্রযোজনায়, প্রবীণ সম্পাদক রমেশ যোশীর পরিচালনায় সম্প্রতি এক প্রস্থ শ্যুটিং হয়ে গেল ছবিটির।

• • •

লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক অরুণাভ মুখার্জির পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ছে। অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি রূপাকে নিয়ে চলে এসেছেন লক্ষ্মীপতিপুরে। এই গ্রামে রূপার পিসিমা থাকেন। রূপা বাড়িতে এসেছে। এমন হঠাৎ করে অরুণাভ আসবে সে অনুমান করে নি। যাই হোক ওরা এসেছে। এবং এখন নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওর ফ্লোরের মধ্যে রাজা প্রতাপনারায়ণের প্রাসাদে রূপাকে কনের সাজে দেখা যাচ্ছে। পরিচালক সুশীল মুখোপাধ্যায় জানালেন, আমরা অরুণাভর পূর্বজন্মে চলে এসেছি। স্বজ্ঞ অরুণাভ, রাজা প্রতাপনারায়ণে রূপান্তরিত। এই হচ্ছে

'সুদূর নীহারিকা' (পরিচালনা : সুশীল মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সোমা দে ফটো—দেশ

সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী। হ্যাঁ সেই রূপা! বাসর ঘর আলো করে যেন রানী বসে আছেন রাজার অপেক্ষায়। টকটকে লাল বেনারসী, আঁচলে জরির কারুকাজ, সুশ্রী মুখটা চন্দনচর্চিত—চারিদিকে ফুল আর ফুলের সৌরভ। এর মাঝখানে বসে আছেন কনের বেশে নায়িকা সোমা। বলা বাহুল্য, অপ্সানা সুরঙ্গমের 'সুদূর নীহারিকা' ছবির সেট জমে উঠেছে। শ্যুটিং ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। এ ছবির নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় —অরুণাভ। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীতা দে।

• • •

ইতিমধ্যে একদিন স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এর প্রাঙ্গণে সেই 'ছুটি' খ্যাত অভিনেতা মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। দেখি প্লে-ব্যাক চালু হচ্ছে আর মৃণাল তাতে ঠোঁট মেলাচ্ছেন। সঙ্গী এক বালিকা নাম তার শুক্লা। অর্থাৎ গান পিকচারাইজ করা হচ্ছে। কি ছবি? 'বন্দী বিধাতা'। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে পরিচালনা করছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। শেষ পর্যায়ের শ্যুটিং চলছে।

মৃণাল এ ছবির নায়ক, অনেকদিন পর তাঁকে আবার দেখা যাবে। কারণ তিনি এখন বোম্বাই প্রবাসী। কয়েকটি হিন্দি ছবিতে কাজ করা হয়েছে। মৃণাল দুর্ভাগ্যের কথা বলছিলেন, 'বম্বেতে গিয়েই বি আর ইশারার ছবিতে কাজ পেলাম। একটা নয়—পর পর ছবিতে। এর অন্তত দুটি ছবির শুটিং শেষ। সেন্সরের ছাড়পত্র পাচ্ছে না। অথচ এই ছবি দুটি মুক্তি পেলে ভাগ্যের চাকা ঘুরতে পারত। বর্তমানে আমার অন্য একটি ছবি বম্বেতে চলছে। বেশ ভাল রিপোর্ট। আরেকটা সুখবর ইশারা'র একটা ছবি সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। এবার মুক্তি পাবে। এ ছবি সম্পর্কে আমি খুব আশাবাদী। এতদিন ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেছি। আশা করছি জিতে যাব।' কলকাতায় নিয়মিত ছবি করার ইচ্ছে আছে কিনা জানতে চাইলে মৃণাল স্পষ্ট বললেন—সবটাই নির্ভর করছে বন্দী বিধাতার ওপর। এ ছবি দেখে দর্শকদের যদি আমাকে ভাল লাগে তাহলে আমি আবার ফিরে আসবো।

বার্তাবহ

বোম্বাই-বিচিত্রা

সেদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি এসেছেন আমেরিকা থেকে. নাম পল সোনি। জন্মসূত্রে শিখ, পল সোনি (২৯) বেশ কয়েক বছর হল কানাডা-বাসী। স্বদেশের মাটির সঙ্গে পরিচয়ের জন্য আপাতত দু-বছর পুনায় থাকছেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচিশ, তখনই তিনি নিযুক্ত-পতি। বোম্বাইয়ের ওবেরয় শেরাটন হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের জন্য একটি পার্টির আয়োজন করা হয়। সেখানেই তার সঙ্গে কথাবার্তা হল।

পল সোনি রীতিমতো ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। এবং এই ব্যক্তিত্ব তিনি প্রকাশ করে থাকেন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। তাঁকে দেখে প্রথমেই শক্তিমান অভিনেতা মনে হয়েছিল। পল সোনিকে সে-কথা বলতেই তিনি হেসে জানালেন, কানাডার টি-ভি'র জন্য তিনি যে চারখানি চিত্র নির্মাণ করেছেন তার দুখানিতে নিজে অভিনয় করেছেন। তবে অভিনয়কে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবার ইচ্ছা বা সময় কোনটাই তাঁর নেই। টরন্টোতে তাঁর দরজির ব্যবসা, সেটাই পল সোনির প্রধান ব্যবসা। বাস ড্রাইভার থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের নানা ধরনের ইউনিফর্ম তাঁর ব্যবসায় কেন্দ্রে তৈরি হয়। পল সোনি, শোনা গেল, পড়তি ব্যবসাকে

"নেকড়ে" (পরিচালনা : অঞ্জন সাহা) ছবিতে ছন্দা চট্টোপাধ্যায় ও অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করে তুলতে সিদ্ধহস্ত। তিনি প্রায়ই নাকি এ কাজ করে থাকেন। পড়তি ব্যবসা নিজের হস্তগত করে তাকে দাঁড় করিয়ে যথাকালে মোটা মুনাফায় সেটি বেচে দেওয়ার কায়দা তাঁর জানা। বোঝা যাচ্ছে মার্কিনী ব্যবসাবুদ্ধি তিনি বেশ আয়ত্ত করেছেন। তিনি অবশ্য মার্কিন মুলুকের মানুষদের খুব একটা বুদ্ধিমান মনে করেন না। পল সোনি বললেন, যে-কোনও বুদ্ধিমান লোক ওদেশে গিয়ে ওদের বোকা বানাতে পারে। পল সোনি যা বিশ্বাস করেন, সোজাসুজি বলে দেন।

বোম্বাইয়ে অবস্থান কালে পল সোনি ভারতীয় সিনেমায় প্রযোজক হিসাবে যোগ দেবেন কি না ভাবছিলেন। তিনি তাঁর পুরোনো সহপাঠী-বন্ধু সমীর ঘোষের (শব্দযন্ত্রী ঈশান ঘোষের ছেলে) সঙ্গে এ-ব্যাপারে পরামর্শ করেন। সমীর পল সোনির সঙ্গে চিত্র-পরিচালক কমল মজুমদারের যোগাযোগ করিয়ে দেন। কমলবাবু সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে সাবধান করে দিয়েছেন, বলেছেন, এদেশে ফিল্ম ব্যবসায় টাকা ঢালা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়, লাভের আশার চেয়ে লোকসানের আশংকাই এখানে বেশী। কানাডার নাগরিক পল সোনি তখন থেকে টি-ভি ফিল্ম তৈরির কথা ভাবছেন।

পল সোনির ধারণা, ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ যদি টি-ভি চিত্রে তুলে ধরা যায়, তবে তা আমেরিকার দর্শকদের পক্ষে নিশ্চিতই হবে আকর্ষক। এই পরিকল্পনাকে তিনি উত্তম ব্যবসায়িক প্রস্তাব বলে মনে করেন। পল সোনি প্রসঙ্গত বললেন, পাশ্চাত্ত্য দেশে ভারত সম্পর্কে যেসব টি-ভি চিত্র প্রদর্শিত হয়, সেগুলিতে এদেশের অবস্থা মনে হয় গ্লানিকর। আমেরিকার সাধারণ নাগরিকরা মনে করেন, ভারতবর্ষের সকলে মাটির কুটিরে বাস করে, সাপখোপ তাদের নিত্যসঙ্গী। 'আমি দেখছি', তিনি মন্তব্য করলেন, 'আপনাদের এখানে পাশ্চাত্ত্য জগতের জন্য টি-ভি চিত্র নির্মাণের কোনও উদ্যোগই নেই। যা আছে সে ওই ছিটেফোঁটা কিছু নিউজরিল আর ডকুমেন্টারি। ভাবতে সত্যি অবাক লাগে।'

পল সোনি স্থির করেছেন, তিনি কিছু ভাল গল্প নিয়ে টি-ভি চিত্র নির্মাণ করবেন। কমল মজুমদার হবেন তাঁর ছবির পরিচালক। ভারতীয় শিল্পী এবং কলাকুশলীদের সহযোগিতায় ছবিগুলি নির্মিত হবে। এই কাজে নিয়োজিত হবে অবশ্য ভারতীয় টাকা নয়, বিদেশী মুদ্রা।

পল সোনি আপাতত শিল্পী-সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। আমেরিকার অভিজ্ঞতা সম্বল করে তিনি ভেবেছিলেন, কোনও এজেন্টকে ফোন তুলে নির্দেশ দিলেই তিনি অজস্র উঠতি শিল্পী পেয়ে যাবেন। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি পুনা ফিল্মস অ্যান্ড টি-ভি ইনস্টিটিউটে আসেন। অতি কষ্টে ওখানে তিনি দুটি ঠিকানা সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

পল সোনি এদেশে তাঁর প্রথম টি-ভি চিত্র তুলবেন অকটোবরে। সেটি হবে দেড় ঘণ্টার ছবি। অতঃপর ওই সিরিজের ২৬ খানি চিত্র নির্মিত হবে, প্রত্যেকটির প্রদর্শন-কাল হবে এক ঘণ্টা। মোটামুটি এই তাঁর পরিকল্পনা।

সুরঞ্জন

আমীর খাঁ কলাকেন্দ্রের অনুষ্ঠান

কিছুদিন আগেকার একটি অনুষ্ঠান। স্থান : কলামন্দির। উদ্যোক্তা : আমীর খাঁ কলাকেন্দ্র। অনুষ্ঠানটির বিবরণ পেশ করা আমার আপাত উদ্দেশ্য। প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় একটি অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত দেয়া। তিনটি শিল্পী যাদের যৌবন ছিল মধ্যাহ্ন সূর্যের মত উজ্জ্বল, দীপ্তিময় এবং এখন যাঁরা জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত তাঁদের ঘিরেই একটি সুন্দর স্নিগ্ধ এবং সুগভীর অভিজ্ঞতা। যিনি পাঁচালীর দোরগোড়ায় তিনি হলেন কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিত। এক

বছর পিছিয়ে আছেন গোলাম রসুল খাঁ। আর প্রবীণতম আহমদ জান থেরাকুয়া পাঁচানব্বইয়ের অভিমুখী। বয়সের জীর্ণতা এসেছিল চোখে। হয়ত বা বেজেছিল কানে। তবু বিস্ময়, বিস্ময়! দু-একটি স্বর কখনও ক্ষীণ, কখনও বা লুপ্ত হয়ে গেলেও রুক্সরাও তাঁর গায়কীর স্বকীয়তা ও বুনেদিয়ানা পুরোপুরি ধরে রেখেছিলেন পুরিয়া, শঙ্করা আর মায়কী কানাড়ায়। সাত দিনের সম্মেলনটি যাঁর উদ্দেশে নিবেদিত সেই ফৈয়াজ খাঁর আত্মীয় এবং বহুদিনের সহযোগী গোলাম রসুলের হাতে হারমোনিয়াম এখনও কথা বলে। তিলক কামোদ এবং দেশ-এর যা কিছু বিশেষ সবটুকু পরতে পরতে মেলে দিলেন বৃদ্ধ শিল্পী। প্রবীণতর থেরাকুয়া পুরোনো বন্ধুকে আশ্বাস দিলেন নিপুণ হাতে। তবু থেরাকুয়াকে পূর্ণতর রূপে পেলাম। তাঁর একক তবলা লহরায়। বোল, ছন্দ, গতি অনায়াস অথচ মোহময়। ত্রয়ীর তুলনায় নবীন, যদিও চৌত্রিশ অতিক্রান্ত, রামারাও নায়েক এসেছিলেন বাঙ্গালোর থেকে। স্বল্পপরিচিত কোলকাতায় তিনি শোনালেন পরিচিত রাগ তোড়ী আর গৌড় সারংগ। মধুর ও বলিষ্ঠ কণ্ঠ। গায়কীর চালে ফৈয়াজ খাঁর আদল পাওয়া গেল। ভাট এবং গন্ধে জুটি একটির পর একটি রাগ শুনিয়ে গেলেন—খাম্বাজ অংগের দীপক, বাহার, বসন্ত বাহার, হিন্দোল বাহার, আড়া চৌতালে নিবদ্ধ নট বেহাগ, দেশাশ্রিত গৌরী এবং খাম্বাজ। দেখা গেল পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এবং রতনজনকারের প্রয়াসলব্ধ আগ্রা এবং গোয়ালিয়র গায়কীর সমাহৃত উপাদানগুলি দুজনার ভংগীতে অনায়াসে অন্বিত। তবে সবটুকুই পরাজিত বৈভবের সুষ্ঠু বিতরণমাত্র নয়। সরগমে তাঁদের স্বকীয়তার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। আমীর খাঁর অনুগামী রসিকলাল আন্ধারিয়া মসৃণ একটি কোমল রেখাব আশাবরীর পরে নতুন একটি রাগ রাখলেন যা নামে জ্ঞানকেলী, মূলত মালকোষ। কেবল মালকোষের কোমল গান্ধার সরে গিয়ে কোমল ঋষভকে জায়গা করে দিয়েছিল। রসিকলালের কণ্ঠ যেমন উদাত্ত তেমনই মধুর। ক্লান্ত করেছিলেন সরাফত হোসেন খাঁ। আলাপের পর্বে একই ছকে ঘুরে ঘুরে যখন সময় প্রায় দেউলিয়া, তখন নিরুপায় সরাফত বিলম্বিত খেয়াল ডিঙিয়ে একেবারে ঝন ঝন ঝন ঝন পায়েলের (নট বেহাগ) ঝনৎকার শুরু করে দিলেন। আশা ছিল,—কারণ ঘোষণায় বলা হয়েছিল—তিনি দাদরা দিয়ে ইতি করবেন। পরিবর্তে পাওয়া গেল বেহাগের তারানা। আগ্রা ঘরানার অপর শিল্পী ওস্তাদ লতাফত হোসেন খাঁ কণ্ঠস্বরের কিছু বৈগুণ্য ঢাকা দিয়ে দিলেন নির্ভুল নান্দনিক চেতনায়। তাঁর বসন্ত বাহার, হোরী ঠুমরী

'সন্ন্যাসী রাজা' (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং দুখানি দাদরায়—বিশেষত পুকার এবং বোল বাজানায়, ফৈয়াজ খাঁর স্মৃতি সজাগ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কামোদের প্রথম পর্বে নিষাদের ওপর অনাবশ্যক একটু ঝোঁক দেখেছিলাম বটে। তবে কালক্রমে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। ইউনুস হোসেন খাঁর পট বেহাগ, আনন্দী এবং সাহানা তাঁর গায়কীর বিশেষ লক্ষণটি ফুটিয়ে তোলে। আগ্রা ও আলাদীয়া ঘরানার সমন্বয় হয়েছে তাঁর গায়কীতে। পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুরের চাল চলন দেখাবার চেষ্টা করলেন অতুল দেশাই তাঁর শুদ্ধ কল্যাণে। কতটা হল তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে।

গলা একটু ভাঙ্গা ছিল তবু দিপালী নাগ ভৈরো ঠাটের কাফের গৌরী এবং আনন্দীতে আত্মবিস্তারের সুযোগ করে নিলেন। স্বরবিস্তার বোলতান সরগম ইত্যাদি বুঝিয়ে দিল শিল্পী শুধু কৌশলে রপ্ত নন, অভিজ্ঞতা ও কল্পনায় পরিণত। তাঁর শেষের বাংলা রাগপ্রধান 'মেঘমেদুর বরষায়' শেষ হল শ্রোতার আবার শোনাবার অনুনয় নিয়ে। নট কামোদ, মীরাবাঈ কি মল্লার এবং বসন্ত কেদার এই তিনটি রাগ চয়ন করেছিলেন ধন্ধুবাঈ। এখনও তাঁর নিজের পথ খুঁজে পাওয়া হয়নি। এখনও তিনি কেশরী বাঈয়ের অনুকরণ করে চলেছেন। বড় দুর্বল অনুকৃতি। বেগম আখতারের দীক্ষাপ্রাপ্ত রীতা কোঠারী ঠুমরীর কাবারসের খোঁজ রাখেন, কিন্তু কায়দা কানুনে এখনও যথেষ্ট পারঙ্গম নন। তুলনায় রেবা মহুরী নিঃসন্দেহে শ্রেয়তর।

দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বলরাম পাঠক সেতারে ইমন কল্যাণ ও কিরবানী বাজালেন। এক ছেলে অশোক সেতারে অপর জন বিনোদ তবলায় সাহায্য করেন। দুটি ছেলেই প্রতিশ্রুতিময়। খুব শক্ত হাতে নিয়ম মেনে অথচ কোথাও অভিব্যক্তির ঘাটতি না ঘটিয়ে সেতারী অরবিন্দ পারেখ বেহাগ শোনালেন। ভি জি যোগের বেহালায় শ্যাম কল্যাণ ভালই বেজেছে। দেবেন্দ্র মুর্দেশ্বর চমৎকার বাঁশী শোনালেন। পুরিয়া, ঝিঁঝিট এবং মালকোষ তিনটি সুন্দর লেগেছে। অপূর্ব লাগল রণধীর রায়ের এস্রাজ। রস ও কলানৈপুণ্যের সার্থক সমন্বয়। তিনি দীপাবলী সাজিয়েছিলেন।

সুররসিক

তটিনীর বিচার

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'তটিনীর বিচার' নাটক দেখে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে দর্শকের যে মুগ্ধতা ছিল আজকের দর্শকের কাছে যদি সে নাটক ঠিক একই মুগ্ধতায় গৃহীত হয় তবে তা নিঃসন্দেহে নাটকেরই গুণ। আনন্দবাজার পত্রিকা ড্রামাটিক পারফরমেনস কমিটি ১৯৭০ প্রযোজিত এই নাটকে (স্টার রঙ্গমঞ্চে সম্প্রতি অভিনীত) মুগ্ধতার আরও কয়েকটি কারণ ছিল। পরিচালক অমরেশ ভট্টাচার্য নাট্যদৃশ্যের কিছু রদবদল করে-ছিলেন। একেবারে শেষের আদালত দৃশ্যের কিছু অংশ তিনি প্রথমে এনে সেখান থেকে ফ্ল্যাশব্যাকে মূল নাটকে ফিরে গেছেন। নাট্যঅংশের এই পরিবর্তনে কৌতূহল যেমন বেড়েছে তেমনি চমকও আছে খানিকটা। এছাড়া পরিচালক একটি প্রায় নিখুঁত টিমওয়ার্কের জন্ম দিয়েছেন। মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতা অনেকেরই কম, তবে আন্তরিকতা ছিল বেশি। সেইহেতু নাটকটি আদ্যন্ত উপভোগ্য। অভিনয়ে

সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় (শৈলেশ), বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য (বসন্ত), এবং ডাঃ ভোসের চরিত্রে পরিচালক স্বয়ং। স্ত্রী-চরিত্রে সবিতা মুখোপাধ্যায় (কৃষ্ণভামিনী), রুমেলা সরকার (তটিনী) এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (হেরমোহিনী) দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন অমর ভট্টাচার্য, ভূপাল ঘোষ, কৃষ্ণকুমার ঘোষ, বিশ্বদত্ত সেন, মুরারীভূষণ বণিক, সুবোধ নিয়োগী, অজয় মিত্র অনাদি ঘোষাল, অনাদি মহাপাত্র, সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, সুশীল দাস, ধনঞ্জয় মণ্ডল, অমর ঘোষ, রমেশ জেনা, বুলু বাঁদুড়ী, দীপক গাঙ্গুলি, বিমলকান্তি পাল, অধীর মাইতি, জীবনকৃষ্ণ দে, অজয় সাহা এবং শিবানী ভট্টাচার্য ও সর্বানী দে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রীসুধাংশুকুমার বসু ও শ্রীমতী মলিনা দেবী।

জীবনরঙ্গ

গ্র্যাণ্ট অ্যাডভারটাইজিং রিক্রিয়েশন ক্লাবের সাম্প্রতিক নিবেদন 'জীবনরঙ্গ' (৪ঠা জুলাই, স্টার রঙ্গমঞ্চে) নাটকটি কাহিনীর দুর্বলতা সত্ত্বেও শিল্পীদের সপ্রাণ অভিনয়ে প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। শৈলেশ গুহনিয়োগী রচিত এ নাটক সামাজিক কুসংস্কারের পটভূমিকায় রচিত। নাটকের পরিচালক (পিকল নিয়োগী) অপেক্ষাকৃত ছোট চরিত্র ও অফিস দৃশ্যের প্রতি আরও যত্নবান হলে নাটকটির টিম-ওয়ারক তৈরিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হতেন।

অধিকাংশ শিল্পীর সপ্রাণ অভিনয়ে নাটকটি প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও বিশেষ করে নাম করতে হয় চুনী ব্যানার্জি ও শিবানী ভট্টাচার্যের। এ'রা ছিলেন সর্বাধিক প্রাণবন্ত জুটি। শ্রীব্যানার্জির একক অভিনয় নাটকটির মর্যাদা ও শিল্পবোধকে অনেকখানি বাড়িয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর পরই দর্শককে আনন্দ দেন তিমিরবরণ দাস (অভিব্যক্তির কিছু অভাব সত্ত্বেও)। এ'দের অভিনয়ের উপর নাটকটি দাঁড়িয়েছিল বললে বেশী বলা হবে না। প্রভাস দাস, মীরা কাককার, বলাই কর্মকার, বটকৃষ্ণ মণ্ডলের অভিনয়ও প্রশংসা পায়। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন ধীরেন রায়, সমীররঞ্জন দাস, নারায়ণ ঘোষ, ভক্তকৃষ্ণ নন্দী, সুখেন পোদ্দার ও শীতল নাথ। আবহ-সঙ্গীতে সেতারের প্রয়োগ সুন্দর। আলো মন্দ নয়।

পথের দাবী

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত। শরৎ জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে তাই ওয়েস্ট বেঙ্গল মাস্টার প্রিন্টারস অ্যাসোসিয়েশন প্রযোজিত 'পথের দাবী' নাটকের অভিনয় (স্টার রঙ্গমঞ্চে) একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পীদের সম্মিলিত অভিনয় নাটকটিকে উপভোগ্য করে তোলে। নির্দেশনায় অনিল মিত্র কিছু সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের পরিচয় রেখেছেন। অভিনয়ে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তৃপ্তিকুমার মিত্র (সব্যসাচী), সিদ্ধেশ্বর দে (শশীকবি) তারা মুখার্জী (তেওয়ারী), বিপুল কুণ্ডু (তলোয়ারকর) এবং মুকুন্দ ব্যানার্জী (নিমাই)। স্ত্রী-চরিত্রের শিল্পীরাও সকলেই প্রশংসনীয় অভিনয় করেন।

গণদেবতা

তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' নিঃসন্দেহে একটি যুগসন্ধির দলিল। গ্রামবাংলার বুকে স্বদেশ চেতনার অনুপ্রবেশের ওই মুহূর্তটিকে লেখক যেমন করে এঁকেছিলেন, মঞ্চের বুকে তেমন করে আনতে পারা কঠিন কর্ম সন্দেহ নেই। সম্প্রতি কলামন্দিরে প্রদর্শিত "গণদেবতা" নাটকে (ওয়েসট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত) সেই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন নাট্যকার ও নির্দেশক রতনকুমার ঘোষ। উপন্যাসের চরিত্রগুলি জ্বলন্ত ও জীবন্ত চেহারা নিয়ে মঞ্চে এসেছে। সুন্দর টিমওয়ার্ক। আলো এবং আবহের ব্যঞ্জনাও সুন্দর। অভিনয়ে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন দুর্গার চরিত্রে মমতা চট্টোপাধ্যায়। স্বৈরিণী মেয়ের চরিত্রটি তার অভিনয়ে প্রাণবন্ত। দেবু ঘোষের চরিত্রে অনিমেষ চক্রবর্তী, ন্যায়রত্নের চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দ্বারকা চৌধুরীর চরিত্রে তপেন্দ্রমোহন চৌধুরী এবং যতীনের চরিত্রে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে হরিসাধন চৌধুরী (ছিরু পাল), শিবদাস চক্রবর্তী (দারোগা), মাণিকলাল শূর (অনি কামার), বটকৃষ্ণ কুণ্ডু (জগন ডাক্তার), সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (দাসজী), উৎপল চট্টোপাধ্যায় (বিশ্বনাথ), বিমল দাস (তিনকড়ি), সমীর দাশগুপ্ত (হরিশ) এবং পদ্ম ও বিলুর চরিত্রে যথাক্রমে সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জু দত্ত সাবলীল অভিনয় করেন। নাট্যানুষ্ঠানের পূর্বে রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশন করেন সাগর সেন।

আলোচনার ভিত্তিতে সংগীত

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি 'বিচিত্রা' ভবনে একটি সংগীতানুষ্ঠান হয়ে গেল। "রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে নিঃসঙ্গতাবোধ" শীর্ষক আলোচনার ভিত্তিতে গানগুলি গ্রথিত হয়েছিল। শ্রীমতী কমলা বসু তিনখানি গান গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তার মধ্যে 'নিবিড় মেঘের ছায়ায়' এবং 'চিত্ত আমার হারালো' হৃদয়কে স্পর্শ করে। সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে' গানটিতে প্রাণের আবেদন ছিল। বুলবুল সেনগুপ্তের শেষ গানটি (আমার দিন ফুরালো) অনবদ্য। নবীন শিল্পীদের মধ্যে বিভাস ঘোষ ও মধুমাধবী ভট্টাচার্য প্রতিভার পরিচয় দেন। মধুমাধবীর কণ্ঠে গীত 'বন্ধু, রহো রহো সাথে' গানটিতে নিখুঁত অলংকরণ পরিস্ফুট ছিল। নির্মল দে ও স্বপন রায়বর্মণ যথাক্রমে এস্রাজে ও খোলে সহযোগিতা করেন। সম্মেলক গানগুলির মধ্যে 'তিমিরময় নিবিড় নিশা' উল্লেখ্য।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
সচিত্র সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে
অতিরিক্ত বিমান মাশুল
৭ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪৩
২৩-৮৫৪১

পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২·০০ টাকা	৪১·৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লনডন অফিস মাধ্যমে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

REGD. NO. WB|CC|184|74

দেশ
৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ ॥ ৪০ পয়সা

টিয়াঁরা
সব রকম চুলের জন্য উৎকৃষ্ট শ্যাম্পু
TIARA EGG SHAMPOO
এগ
(প্রোটিন বিহীন চুলের জন্য)
TIARA SHIKAKAI HERB SHAMPOO
শিকাকাই
লম্বা ও ঘন চুলের জন্য
TIARA LANOLIN SHAMPOO
ল্যানোলিন
দুর্বল চুলের জন্য
কনসেনট্রেট
নির্জীব, অবিন্যস্ত,
তেলতেলে চুলের জন্য
সুন্দর চুলের প্রয়োজন টিয়াঁরা
ARMS-HC-15-140 মন

সূচীপত্র

(সি ১০৯৬৬)

সূচীপত্র

বীণা, লতা, নিশ্‌মা, কারেন, গীতা আর মোনা রূপমাধুরী ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করে পণ্ডস ফেস পাউডার

পণ্ডস ফেস পাউডার –. রূপসীদের জন্যে অনবদ্য সৌন্দর্য প্রসাধন। যেমন মোলায়েম তেমনি রেশমের মত মৃদুস্পর্শী। কাজ-কর্মের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আপনার রূপকে দীপ্ত তাজা রাখে। ছটি মন কাড়া রঙ থেকে আপনার পছন্দমত বেছে নিন। তারপর প্রিয়তমের দিকে তাকিয়ে দেখুন রূপের প্রভাব।

"আমি মেক-আপ পছন্দ করি না। তবে পণ্ডস-এর কথা আলাদা। কত স্বাভাবিক।"

"আমি ভাবতেই পারতাম না, আমার ত্বক এমন সুন্দর হতে পারে।"

"ওর জন্যেই তো পণ্ডস মাখি।"

"আমার মুখ তো মোটে একটা। পণ্ডস ছাড়া অন্য কিছু লাগাতে পারি না।"

"ছ'টি অপূর্ব রঙ – একটা পছন্দ হবেই।"

"আমার মনে হয় আমি একজন ফিল্ম স্টার বনে গেছি।"

পণ্ডস ফেস পাউডার

সুন্দরীদের সবচেয়ে প্রিয় ফেস পাউডার

চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক
(সীমিত দায়িত্বসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংস্থাপিত)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : লালচাঁদ দে

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৫
শনিবার ২১ ভাদ্র ১৩৮২

সুনিয়ন্ত্রিত বন্যা

বন্যার নিরোধ অসম্ভব, বন্যাকে শুধু নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়। যদি কোন গতিকে কিংবা বিশেষ কোন পদ্ধতির কৌশলে, অথবা প্রাকৃতিক কারণে কোন অঞ্চলের বার্ষিক বন্যা নিরোধ করা সম্ভব হয়, তবে অঞ্চলের যাবতীয় পরিণাম ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করবে। আঞ্চলিক জীবনের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ঘোরতর অবনতি হতেও পারে। বন্যার ভয়াল প্রকৃতি সম্পর্কে কাব্যিক মানুষের মন্তব্যে কঠোর ভর্ৎসনা থাকলেও ভৌম বিজ্ঞানের গবেষক মনস্বীদের অভিমতে সেরকম কঠোর কোন অভিযোগ নেই। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই ধারণা, বন্যার প্রয়োজন আছে, বন্যারও বিশেষ একটি সার্থকতা ও উপকারিতা আছে। পৃথিবীর ভূ-দেহ যে প্রক্রিয়ার কারণে গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে বন্যার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গানদীর একটি বন্দনায় এই নদীকে পতিতোদ্ধারিণী বলে অভিহিত ক'রে সেই সঙ্গে 'তট-বিপ্লাবিনী' বলেও অভিহিত করেছেন। নদীর তটবিপ্লাবিনী প্রকৃতির মধ্যে ধ্বংসপ্রবণ আবেগ আছে বটে, কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, তারই মধ্যে অঞ্চলের ভৌম মাঙ্গল্যের অনেক উপচার ও অনেক অঙ্গীকার নিহিত আছে। অঞ্চলের ভূমিদেহকে উর্বরতার প্রলেপ দিয়ে ঐশ্বর্যান্বিত করে যে নদী, সে নদী হলো বন্যার আবেগে উচ্ছলিত সরিদ্বরা কোন নদী, শান্তসলিলা কোন নদী নয়। পৃথিবীর ভূ-দেহ নির্মিত হবার প্রাচীনপর্বে নদীর বন্যাবিহ্বল ও পরিস্ফীত জলের প্রবাহ বস্তুত স্থপতির কাজ করেছে। শ্রীজওহরলাল নেহরু ওড়িশার বন্যার নিয়ন্ত্রণের বিধি-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করে প্রসঙ্গত এমন কথাও বলেছিলেন যে, বন্যাকে স্তব্ধ করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বন্যাকে অঞ্চলের একটি সহজ প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলে মনে করতে হবে। শুধু দেখতে হবে যে, বন্যা যেন মানবীয় বসতির নিদারুণ কোন ক্ষতি না করতে পারে। অর্থাৎ বন্যাকে 'নিয়ন্ত্রিত' করতে হবে।

এ বছরের আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্রে ভারতের নানা অঞ্চলের প্রাকৃতিক জীবনে প্রতি বৎসরের সেই অভ্যস্ত দৃশ্যটিকে আবার দেখতে পাওয়া গেল। নদী আপন বেগে পাগলপারা! নানা অঞ্চলে বহুবিস্তীর্ণ অংশ বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে। ওড়িশার বন্যা সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ প্রকারে বিতীর্ণ অঞ্চলের কৃষি ও জনবসতির ক্ষতি ঘটিয়েছে। আসাম, পশ্চিম বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও আর কয়েকটি রাজ্যে চিরন্তন বন্যার অঞ্চল আছে। যদি কোন বছরে এই-রকম কোন অঞ্চলে বন্যা দেখা না দেয়, তবে সেটা আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতি বছর বন্যা হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের রীতি-নীতিকে বাস্তবতাসম্মত হতে হলে এই আদর্শিক লক্ষ্য মেনে নিতে হবে যে, বন্যাকে এইসব আঞ্চলিক আয়তনের কৃষি, জনবসতি, সড়ক, রেলপথ ইত্যাদির নিদারুণ এক প্রতিকূল ঘটনায় পরিণত হতে না দিয়ে যথাসম্ভব অনুকূল ঘটনায় পরিণত করতে হবে। কথাগুলি কিছুটা স্ববিরোধী অভিমতের ভাষণ বলে মনে হলেও বাস্তবতার বিচারে খুবই যুক্তিযুক্ত কথা। কোন নদীর জলভার পরিস্ফীত হয়ে দুই তটের স্থলভাগ প্লাবিত করলেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনজীবনে যেন দুর্গতিময় হাহাকার জেগে ওঠে। চাষীর কুটির, গোলা, গো-মহিষ ভেসে যায়। কৃষির ক্ষেতের কাঁচা-পাকা শস্যের সমারোহ দুর্ভাগ্যে অভিভূত হয়ে পচতে শুরু করে। সড়ক স্থানে-স্থানে ভেসে যায়, রেলপথেরও একই দশা। সংক্ষেপে বলা চলে, বন্যা যেন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রাণ ও দেহ দুইই ছিন্নভিন্ন ও বিপর্যস্ত করে দেয়। সুতরাং, সংক্ষেপে একটি সিদ্ধান্তও করে নিতে পারা যায়। বন্যার আঘাত ও প্রকোপের আকস্মিকতাই হলো ক্ষতি ও ক্লেশের অন্তত আট-আনা ভাগের দায়ী। সচেতন হয়ে প্রস্তুত থাকলে এবং সেই সঙ্গে কিছু আত্মরক্ষাকর ব্যবস্থার রীতি-নীতি সচল ক'রে রাখলে বন্যাজনিত দুর্ভাগ্যের ভার অবশ্যই কিছুটা লঘু হতে পারে।

বন্যার আঘাত থেকে আত্মরক্ষাকর প্রয়াসের মধ্যে জনবসতির বাস্তু-নির্মাণের রীতি-নীতিকে সব চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হয়। ভারতের গ্রামের কৃষক, সাধারণ ভাবে বলা চলে, গ্রামীণ বসতির প্রায় সব মানুষের বাসগৃহ বস্তুত অতি-ভঙ্গুর উপাদানে তৈরী করুণ চেহারার এক-একটা কুটির। খড়ের ছাউনি, মাটির কিংবা বাঁশকঞ্চির ঠাট দিয়ে তৈরী দেয়াল, এই তো খাঁটি গ্রামীণ কুটির। হরিজনের কুটিরের চেহারা তো আরও মর্মান্তিক দৃশ্য। চার-পাঁচ হাত উঁচু মাটির ঘেরাণের উপর তালপাতার আবরণ। এমন বাস্তু-রূপ যেমন সামান্য বন্যাজলের তোড়ে, ভেসে যায়, তেমনই সামান্য একটা বৈশাখী ঝড়ের টোকা লেগে উড়ে যায়।

কৃষির আঞ্চলিক আয়তনের উপর বন্যাজলের প্রকোপ নিয়ন্ত্রিত করবার মতো পূর্তগত পদ্ধতি উদ্ভাবিত করা খুব কঠিন গবেষণার ও অধ্যবসায়ের ব্যাপার নয়। বিখ্যাত নদী-বিশেষজ্ঞ উইলফ্রেড উইলকক্স লিখেছেন : বাংলার ছোট ছোট অনেক নদী বস্তুত প্লাবনের উচ্ছৃঙ্খল জলরাশিকে নির্দিষ্ট গতিপথে প্রবাহিত করবার জন্য নির্মিত কাটা-খাল। চিরন্তন বন্যার অঞ্চলে রেলপথ সড়ক সেতু ইত্যাদিরও নতুন প্রকারের রূপনা ও নির্মাণ চাই। তবু মনে হতে পারে, একাজ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রথম অভিনবত্বের প্রয়াস হিসাবে গ্রামীণ কুটিরের বাস্তু-সৌষ্ঠবের নতুন প্রকরণ অবশ্যই সম্ভাবিত হতে পারে। এক্ষেত্রে টাকার যথোচিত সঙ্গতির অভাবটাই একমাত্র সমস্যা। গ্রামীণ কুটিরের নির্মাণ-রীতির অভিনবত্ব উদ্ভাবিত করা দেশের পূর্ত-বিশেষজ্ঞ কৃতীদের পক্ষে কঠিন কোন কাজ নয়। জাপানে ও অন্য কয়েকটি দেশে চিরন্তন ভূকম্পের এলাকা আছে। এই সব এলাকার জনবসতি কৃষি ও বাস্তু-নির্মাণের পূর্তরীতির মধ্যে বিশেষ অভিনবত্ব আছে। ভূমিকম্পের প্রকোপজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা যেন ন্যূনতম হয়, এরকমের রীতিগত অভিনবত্ব।

প্রাচীন ইন্দোচীনের এবং মেসোপটেমিয়ার নানা ভূভাগে এমন বহু প্রাচীন সভ্যবসতির চিহ্ন আজও দেখা যায়, যেগুলি নদী-নিয়ন্ত্রণের তথা বন্যাজল নিয়ন্ত্রণের সার্থক সফলতার স্মৃতি বহন করছে। ঐতিহাসিকের ধারণা এই যে, আনাম চম্পা ও কাম্বোডিয়াতে আগন্তুক ভারতীয় ঔপনিবেশিকের কৃতিত্বে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সফলতার কারণে বহু নতুন সভ্যতার জনপদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিসের বন্যাজলের প্লাবন যুগ যুগ ধরে শস্যপ্রসূ উর্বরতার অঞ্চল প্রশস্ত করেছিল। বন্যার জল নিয়ন্ত্রিত করবার প্রথা তুচ্ছ করেছিল বাবিলন। বাবিলনের সমৃদ্ধির শ্যামলতা তাই কয়েক শতাব্দীর মধ্যে শুকিয়ে গিয়ে বাবিলনীয় সভ্যতা-কেও স্তব্ধ করে দিয়েছিল।

এই সপ্তাহ

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর বাংলাদেশে আরও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছে। একদিকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে আবু সয়ীদ চৌধুরী, এ আর মল্লিক, মনোরঞ্জন মজুমদার, ফণী মজুমদার প্রমুখদের নিয়ে, অন্যদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান প্রমুখদের প্রথমে গৃহবন্দী, পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবের শোচনীয় মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্রও শোক প্রকাশ করে বলেছেন, শেখ মুজিবকে ভারত একালের এক অসাধারণ ব্যক্তির উচ্চাসনে বসিয়েছিল। আমাদের দূতে সমর সেন ঢাকায় বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে দেখা করে দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের দূতে শামসুর রহমানও দিল্লিতে পররাষ্ট্র সচিব কেবল সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে সখ্য বজায় রাখতে আগ্রহী। আবার ওদিকে প্রথমে বাংলাদেশ, পরে ভারত দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এন বি সি টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহে ভারত বিপন্ন হবে বলে তিনি মনে করেন না। তবে যেভাবে উসকানি দেওয়া হয়েছিল, তাতে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

শ্রীমতী গান্ধী এই একই সাক্ষাৎকারে আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সংসদে নির্বাচনের বিষয় সম্পর্কে সম্প্রতি যে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে, সেটা আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা তা বলার এক্তিয়ার সুপ্রিম কোর্টের আছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর সংসদে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়টি আদালত-বহির্ভূত করার জন্যেই সংসদের গত অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন করা হয়। তা ছাড়া শ্রীমতী গান্ধী স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, বিচার বিভাগ ও সংসদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মানের দিক থেকে দুটিই সমান।

দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরও অত্যাবশ্যক কয়েকটি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অনেক কলকারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই, লে-অফ, লক আউট ইত্যাদি অব্যাহত আছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

পূর্ব ভারতে বন্যা আবার প্রবল আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে আসাম, বিহার এবং ওড়িশায়। ওড়িশায় বন্যাত্রাণে বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়েছে। বন্যার দাপটে পাটনা শহরের একাংশ প্লাবিত হয়েছে। আসামের লখিমপুর জেলার কয়েকটি গ্রামের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অবশেষে নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পাঁচ কিস্তির মহার্ঘ ভাতা ওদের বকেয়া পড়ে। সবটাই এখন দেওয়া হচ্ছে বটে, তবে ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত বকেয়া ভাতার অর্ধেক জমা পড়বে আবশ্যিক জমা প্রকল্পে। বাকি অর্ধেক জমা পড়বে প্রভিডেন্ট ফান্ডে। কর্মীরা সেপ্টেম্বর থেকে ওই বকেয়া পাঁচ কিস্তি নিয়মিত ভাতা হিসাবে মাস মাইনের যে অংশ প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা পড়বে, তা ১৯৭৭ সালের মার্চের আগে তুলতে পারবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের বকুলতলায় তেলের খোঁজ পুরোদমে চলছে। ড্রিলিংয়ের কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। কেন্দ্রীয় তৈলমন্ত্রী কেশবদেব মালব্য সরেজমিন কাজ দেখতে এসেছিলেন বকুলতলা। তা ছাড়া কাছাড়ের চরগোলা কাঞ্চনপুর মাছিমপুর বদরপুরেও তৈল অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে তেলের খোঁজে জাহাজ পাঠানো হচ্ছে। জাহাজটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি; আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত।

দার্জিলিং জেলার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে বিদেশীদের ভ্রমণ সম্পর্কে অনেক বিধিনিষেধ ছিল। সরকার সম্প্রতি আইনের কড়াকড়ি শিথিল করে দিয়েছেন। এখন থেকে তাঁরা নিষিদ্ধ এলাকায় ভ্রমণের জন্য নির্দিষ্ট অনুমতিপত্র ছাড়াই একসঙ্গে একটি দলে পনেরো দিন ওসব জায়গায় থাকতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও সেচমন্ত্রী জগজীবন রাম সব মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠিতে বলেছেন, পল্লী ঋণ আদায় স্থগিত রাখার পরবর্তী অবস্থা দ্রুত গ্রহণ করতে হবে। পল্লী ঋণের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সমস্যা পরীক্ষা করে দেখার জন্য পল্লী উন্নয়ন বিভাগ যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলি আইনের খসড়া তৈরির সময় স্মরণ করার কথা উল্লেখ করেও কৃষিমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীদের জানিয়ে দিয়েছেন, প্রয়োজনে তাঁরা অন্য মডেলও গ্রহণ করতে পারেন।

কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বরুয়া একটি বক্তৃতায় বলেছেন, যাঁরা নিজের জমি সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করে সরকারকে ভুল পথে চালাচ্ছে, তাদের ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী কড়া শাস্তি দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, এই অভিযোগে অন্তত দু বছর জেল ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখতে হবে।

লোকসভার স্পিকার জি এস ধীলন মন্তব্য করেছেন, সংসদ সদস্যদের অনেকের আচরণ গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বহির্ভূত। তিনি বলেছেন, জনসাধারণের মতোই জনপ্রতিনিধিকেও তার দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার বোধ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। জরুরী অবস্থার সময় যদি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক ঠিক পালন করা হয়, তা হলেই দেখা যাবে তাতে অনেক কাজ হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয়, গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থার বদলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জনপ্রতিনিধিরা গণতন্ত্রের আদর্শবিরোধী কাজ করে যাচ্ছেন। গত কয়েক বছরে এই রকম দুঃখজনক অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে বলে ধীলন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, ক্রোধ প্রকাশ স্বাভাবিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল, আইনসভার কাজ বানচাল করার জন্য শারীরিক ক্ষমতার প্রয়োগ পর্যন্ত হামেশা হয়েছে।

পঞ্চাশজন কংগ্রেসী এম পি এক বিবৃতিতে ব্রিটেনে ভারতবিরোধী প্রচারের নিন্দা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ব্রিটেনে প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে জানা গেছে, লনডনে টেলিভিশনে ষষ্ঠীব্রত নামে একজন ভারতীয় লেখক শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে নানা কটূক্তি করেছেন। এম পি-রা দাবি করেছেন, ষষ্ঠীব্রতর পাসপোর্ট বাতিল করা হোক এবং তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে এনে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ষষ্ঠীব্রত নাকি বলেছেন, খুব শীঘ্রই ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হবে, তাই তিনি জনসমক্ষে আসতে ভয় পাচ্ছেন। কে হত্যা করবে, তাও নাকি তিনি জানেন!

দেবরাজ

নজির নেই

পনেরোই আগস্ট আচমকা বাংলাদেশ বেতার ধরে যারা জরুরী ঘোষণাটা শুনেছিল নিজেদের কানকে তারা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনি। শেখ মুজিবর রহমানকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হবে তাও শেষ রাতের অন্ধকারে ঢাকায় ধানমুণ্ডিতে তাঁর নিজের বাড়িতে যে বাড়ি ঘিরে ছিল কড়া ফৌজী পাহারা এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায়নি। অথচ তাই ঘটেছে। একা মুজিবকে নয় গুলি করে মারা হয়েছে বেগম মুজিবকে, তিন ছেলে জামাল, কামাল আর রাসেলকে। বড় আর মেজো ছেলের বউদের, দুই জামাইকে, ভাই শেখ নাসেরের সঙ্গে বউদিকেও। মুজিব পরিবারের যাঁরা সেদিন ৩২ নম্বর ধানমুণ্ডিতে ছিলেন তাঁরা কেউই রেহাই পাননি। পুরুষ বলতে তাঁর বংশে আর কেউ নেই। বেঁচে গেছেন দুই মেয়ে হাসিনা আর রেহানা তাঁরা বিদেশে ছিলেন বলে। হানাদাররা কেবল মুজিবের বাড়ির ওপরই হামলা করেনি হামলা চালিয়েছিল আরও দুটো বাড়িতে। একটাতে থাকতেন মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি। আর একটাতে মুজিবের ভগ্নীপতি আর মণির শ্বশুর আবদুর রব সেরনিয়াবাত। হানাদাররা খতম করেছে শেখ মণি আর তাঁর বউকে, শ্বশুর সেরনিয়াবাতকে।

কতক্ষণ লেগেছে ওই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শেষ করতে? আধ ঘণ্টা বড় জোর পৌনে এক ঘণ্টাতেই কাজ শেষ! এই নারকীয় নাটকের নায়ক নাকি ফৌজের জনকয়েক ছোকরা অফিসার। তাঁদেরই একজন হচ্ছেন মেজর সরিফুল হক। ডাক-নাম তাঁর ডালিম। নিজেদের বাহাদুরির খবরটা তিনিই প্রথম জাহির করেন বাংলাদেশ বেতার থেকে। রেডিওর প্রোগ্রাম শুরু হতে তখনও এক ঘণ্টা দেরি। হঠাৎ বেতারে শোনা গেল সেই ভয়ংকর ঘোষণা—রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে এক সামরিক অভ্যুত্থানে, নতুন রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তাঁরই মন্ত্রিসভার বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ। জানানো হলো দেশে আবার মার্শাল ল' জারী হয়েছে, গোটা দেশ জুড়ে কার্ফুও। প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন প্রধান—স্থল-বাহিনী, নৌবাহিনী আর বিমানবাহিনীর তিন কর্ণধার—নতুন সরকারের আনুগত্য স্বীকার করলেন, নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি হতেও দেরি হলো না। বাংলাদেশের নয়া মন্ত্রিসভার সদস্য একুশজন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন রাষ্ট্রমন্ত্রী।

মুজিবের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে তামাম দুনিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কী অপরাধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু যে তাঁকে এমন নির্মমভাবে খুন করা হলো? কাদের তাঁর ওপর এমন আক্রোশ ছিল যে তাঁর পরিবারের যাঁরা ঢাকায় ছিলেন তাঁদের একটি প্রাণীকেও বাঁচতে দেওয়া হয়নি? কী তাদের ইচ্ছে? ইতিহাসের পাতা থেকে শেখ মুজিবের নাম মুছে দেওয়া? তাঁর কীর্তির সামান্য চিহ্নটুকুও কোথাও না রাখা? কিন্তু তা কী সম্ভব? বাংলাদেশকে তিনি যে নিজের হাতে গড়েছেন, জানের পরোয়া না করে লড়েছেন বাংলা ভাষা আর বাঙালীর জন্যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জঘন্য অত্যাচার থেকে সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশীকে বাঁচিয়েছেন, সে দেশের মরা গাঙে বান ডাকিয়ে নতুন জীবনের সাড়া জাগিয়েছেন এ সব কী দুঃশাসন করেনি নিজেরা ভুলতে আর দুনিয়াকে ভোলাতে চান বলে মিছে হয়ে যাবে? ইতিহাস অনেক মিথ্যে বলে বটে কিন্তু এমন জলজ্যান্ত সত্য উড়িয়ে দেবার সাধ্য তারও নেই। মুজিবকে যারা খুন করেছে তারা তাঁর নশ্বর দেহটাকেই নষ্ট করতে পেরেছে, তাঁর অসাধ্য-সাধনকে কীর্তিনাশার জলে ডুবিয়ে দিতে পারেনি।।

মুজিবের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে লোকে যেমন অবাক হয়েছিল তেমনি হয়েছে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম জেনে। একজন বাদে তাঁরা সবাই ছিলেন মুজিব মন্ত্রিসভায় খোদ রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ পর্যন্ত। তাঁদের দপ্তরের রদ বদলও তেমন কিছু হয়নি অর্থাৎ যিনি যা ছিলেন তিনি তাই রয়ে গেছেন। বাদ গেছেন শেখকে ধরে জন নয়েক। তাঁদের মধ্যে দুজনকে তো খুনই করা হয়েছে। ছাঁটাই মন্ত্রীদের সবাই এখন প্রায় আটক। প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলিও রেহাই পাননি। কিন্তু এঁদের বাদ দিলে বাইরে থেকে বোঝা যায় না সাংঘাতিক একটা ওলট পালট হয়ে গেছে হঠাৎ বাংলাদেশে। মুজিব গেছেন অথচ তাঁর এতগুলি অন্তরঙ্গ রয়ে গেছেন ক্ষমতার গদিতে এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। শুধু তাঁর আমলের মন্ত্রীরা নয় ফৌজী প্রধানরা (একজন বাদে) আর হোমরা-চোমরা আমলারাও তো টিঁকে রয়েছেন। যদি মুজিবের স্বাভাবিক মৃত্যু হতো তা হলেও তো হেরফেরটা এই ধরনেরই হতো। আরও এক আশ্চর্যের ব্যাপার নতুন সরকার উলটো পথে না চলে পুরনো সড়ক ধরেই চলার চেষ্টা করছেন। মুজিব গেলেও মুজিবিয়ানা বাংলাদেশ থেকে যায়নি—তার যাবার লক্ষণও নেই।

এ ধরনের সামরিক অভ্যুত্থানের নজির আর নেই। ক্ষমতা জবর দখল করার পর পুরনো আমলের সব কিছু ভেঙে ফেলাই রেওয়াজ—সরকার, প্রশাসন, নীতি সবই ঢেলে সাজানো হয়। সে ব্যবস্থা বাংলাদেশে হলে নতুন কিছু হতো না। আলেন্দেকে মেরে ফেলে তাই করেছে চিলির ফৌজী চক্র। সেরকম কিছু কিন্তু বাংলাদেশে ঘটেনি। গোড়ায় পাকিস্তান রটিয়েছিল নতুন সরকার বাংলাদেশের নাম পাল্টে রেখেছেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র। আর মানে তাঁরা মুজিবের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন। রটনাটা ভুল। বাংলাদেশের পোশাকী নাম যা ছিল তাই আছে, তা বদলানো হয়নি, বদলাবার কথাও ওঠেনি। নতুন রাষ্ট্রপতি স্পষ্টই বলেছেন দেশের সংবিধান তাঁরা বাতিল করে দেননি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ তাঁদের যা ছিল তাই আছে। অঙ্গীকার করেছেন আগের সরকারের সব চুক্তিই তাঁরা মেনে চলবেন, সব প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করবেন। এও তিনি বলেছেন কোনও জোটে তাঁরা ভিড়বেন না মুজিবের আমলে বাংলাদেশ যেমন জোট-ছাড়া দেশ ছিল তেমনই থাকবে। ইসলামিক কনফারেন্সে মুজিবও গিয়েছিলেন তাঁরাও যাবেন। কমনওয়েলথে বাংলাদেশ তখনও ছিল, এখনও থাকবে।

সে না হয় হলো। তা হলে প্রশ্ন ওঠে মুজিবকে কেন খুন করা হয়েছে? কোন কর্মে একটা ফৌজী অভ্যুত্থান ঘটেছে? চক্রান্ত যে নিখুঁত ছিল তাতে ভুল নেই। ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে যায়নি, বেশ ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় কাণ্ডটা করা হয়েছে। নাটের গুরু কে? কারুর কারুর মতে এও সি আই এ-র কীর্তি। বেশ কিছু সি আই এ-র লোক যে ঢাকায় আছে এ কথা বলেছেন অনেকেই। তারা নিশ্চয়ই সেখানে ঘাস কাটছিল না। দেখা যাচ্ছে মুজিবের মৃত্যুর খবর সব আগে দুনিয়াকে জানিয়েছিল আমেরিকা আর তা শুনে নেচে উঠেছিল পাকিস্তান। তড়িঘড়ি নতুন সরকারকে ইসলামাবাদ স্বীকৃতি দিয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সাহায্য দেবারও। পরে অবিশ্যি পাকিস্তানীরা হাত কামড়াচ্ছে বাংলাদেশ হালচাল পালটায়নি বলে। তাহলে নিশ্চয়ই কেউ ভুল খবর দিয়েছিল। কিন্তু সে কে? আমেরিকার সঙ্গে পাকিস্তানের যেরকম দলাঢলি তাতে অনেকের সন্দেহ পাকিস্তানকে আমেরিকাই নাচিয়েছে। এর অবিশ্যি কোনও প্রমাণ নেই। তবে ঠেকাচ্ছে পশ্চিমীরাও আমেরিকা তো বটেই। বাংলাদেশের নতুন সরকার তাদের পায়ে দাসখত লিখে দেননি।

দেশ ও কাল

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পরই নিত্য-প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসের দাম কিছুটা কমেছিল। তারপর আবার তা বাড়তে আরম্ভ করেছে বলে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলী এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বলেছেন : অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে আনতেই হবে।

কি ধরনের 'কড়া ব্যবস্থা' নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাবার চেষ্টা করবেন তা অবশ্য পরিষ্কার নয়। সে কথা তাঁরা বলেন নি। জরুরী অবস্থার শুরুতে অবশ্য সরকার এই সম্পর্কে কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। যেমন, সরকার বলেছিলেন সব দোকানী ও মহাজনকে প্রত্যেকদিন তাঁর মজুতের পরিমাণ ঘোষণা করতে হবে। ঘোষণা করতে হবে জিনিসপত্রের দরও। সরকার আরও বলেছিলেন, প্যাকেটে করে যেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রী করা হয় সেগুলির ক্ষেত্রে প্যাকেটের গায়েই জিনিস-পত্রের দাম ছাপতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই আশা করে-ছিলেন যে এইসব ব্যবস্থায় ফল পাওয়া যাবে। আশা করেছিলেন যে এর ফলেই জিনিসপত্রের দাম কমবে। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের ঘোষণাতেই পরিষ্কার যে তা হয়নি। জিনিসপত্রের দাম তো তেমন কমেই নি, কতগুলি ক্ষেত্রে বরং বেড়েছে।

এরপর জিনিসপত্রের দাম কমাবার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব আর কি কি ব্যবস্থা নিতে চান সেইটাই দেখবার।

*

আমাদের দেশে অধিকাংশ নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসেরই দর ঠিক হয় খোলা বাজারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরটা স্থির করেন পাইকারী ব্যবসায়ীরা। উৎপাদন, যোগান, চাহিদা প্রভৃতির বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁরাই স্থির করেন কোন জিনিসের কখন কি দর হবে। সেই অনুসারেই জিনিস কেনাবেচা চলে বাজারে। এই পাইকাররা এখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে। তাঁদের যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুব ভাল। কালো টাকাও তাঁদের হাতে প্রচুর। সুতরাং জিনিসপত্রের দর স্থির করে দিতে এবং সেই অনুসারে বাজার নিয়ন্ত্রণে তাঁদের খুব বেশি অসুবিধা হয় না।

জিনিসপত্রের দর কমানো বাড়ানোর ব্যাপারে উৎপাদক বা খুচরা বিক্রেতাদের কোনও ভূমিকা থাকে না তা বলছি না। তবে এদের ভূমিকা গৌণ। মুখ্য ভূমিকা হল পাইকারদের।

যেমন ধরুন চাল। চাল উঠলেই পাইকাররা বাজারে লোক নামান চাল কিনতে। গোটা বাজারের পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁরা মোটামুটি একটা দর স্থির করে দিয়ে সেই দরে তাঁদের লোক-জনদের চাল কিনতে নির্দেশ দেন। সেইটাই হয় বাজারে চালের দর। সেই দর অনুসারেই কেনা বেচা চলে। তারপর যখন চাল ওঠার মরসুম শেষ হয়ে যায় তখন পাইকাররা আবার একবার পরিস্থিতিটা বিচার করেন। গোটা দেশে চালের পরিস্থিতিটা দেখেন। এবং সেই অনুসারে প্রত্যেক মাসে আবার চালের দর স্থির করে দেন। সম্পন্ন চাষী যাঁরা আস্তে আস্তে চাল বেচতে আসেন, তাঁরাও মোটামুটি এই পাইকার-নির্ধারিত দরই মানতে বাধ্য হন।

এইভাবেই প্রায় সব জিনিসের দর নির্ধারণ চলে। গম, ডাল, তেল, মাছ সব কিছুর। যোগান ও চাহিদার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাঁরাই নিত্যপ্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসের দর ঠিক করে দেন।

পাইকাররা কি একেবারে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত জিনিসপত্রের দর নির্ধারণ করতে পারেন? না, তা পারেন না। তাঁদের প্রধানত দেখতে হয় চাহিদা ও যোগানের ব্যাপারটা। উৎপাদন মূল্যের দিকটা তাঁরা খুব বেশি দেখেন না। তাঁরা প্রধানত দেখেন বাজারে কত মাল এসেছে বা আসতে পারে এবং কত মালের চাহিদা আছে বা হতে পারে। এইটা অনুমান করেই তাঁরা একটা দর নির্ধারণ করেন।

ধরুন আলুর উৎপাদন একবার খুব বেশি হয়েছে। পাইকাররা দেখবেন, গোটা দেশে আলু কেমন হয়েছে। আলু বেশি হয়েছে এটা বুঝলে তাঁরা দর নামাবেনই। আলু উৎপাদনে চাষীর কী ব্যয় হয়েছে সেটা তাঁরা দেখতে যাবেন না। আলু বেশি হয়েছে বুঝলে পাইকাররা কখনও দর বেশি তুলতে সাহস পান না।

পাইকারদের সবচেয়ে সুবিধা হয় তখনই যখন কোনও জিনিসের উৎপাদন কম হয়—বাজারে যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি থাকে। ধরুন, পাইকাররা দেখলেন চাহিদার চেয়ে যোগান শতকরা ২০ ভাগ কম। তখন কি তাঁরা জিনিসের দর মাত্র ২০ ভাগই বাড়ান? না, তা করেন না। তাঁরা সেই সুযোগে জিনিসের দর শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই খেলা তাঁরা খেলেন প্রধানত উৎপাদকের হাত থেকে মালটা পাইকারের গুদামে চলে আসার পর। গত কয়েক বছর ধরেই এই খেলা প্রচণ্ডভাবে চলছে। এবং এই জিনিস ততদিন চলবেই যতদিন বাজারে জিনিসপত্রের মূল্য নির্ধারিত হবে মূলত চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে, আর সে মূল্য নির্ধারণ করবেন পাইকারী ব্যবসায়ীরা। বাজারে যদি যোগান বাড়ে তাহলে দাম কমবেই, বাজারে যদি যোগান কমে, তাহলে দাম বাড়বেই।

সরকার দর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না তা নয়। সেটা তাঁরা পারেন গোটা বাজারটা নিজের হাতে নিয়ে নিয়ে। ধরুন, চালের দর নিয়ন্ত্রণ করলেন। তাহলে প্রথমেই সরকারকে বাজারে সব চাল কিনতে ও বিক্রি করতে নামতে হবে। সরকার স্থির করলেন চাল কিনবেন ১ টাকা কিলো দরে এবং বেচবেন ১ টাকা ১০ পয়সা দরে। এইটা করতে হলে এক বিরাট বিশাল সরকারী ব্যবস্থা চাই। আমাদের সরকার মনে করেন না যে এটা সম্ভব। বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনায় তাঁরা নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাজারটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে মোটেই আগ্রহী নন।

তাহলে দর নিয়ন্ত্রণের আর একটি মাত্র পথ থাকে। সেই পথটা হল উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ফারাকটা কমিয়ে আনা। যাতে দর না কমুক, অন্তত না যেন বাড়ে। বাজারে যোগান বাড়লে পাইকারদের পক্ষে দর বাড়িয়ে রাখা কঠিন। (সব সময়ই অসম্ভব, তা বলব না।)

এইজন্যই আমাদের সরকারের সামনে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর কমাবার একটি মাত্র পথ খোলা। সেই পথটা হল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি। সরকার এই ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি করতে পারেন ততই মূল্য নিয়ন্ত্রণে তাঁরা সফল হবেন।

আর উৎপাদন বৃদ্ধি শুধু মিটিং করে বা প্রস্তাব পাশ করে করা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন সত্যিকারের কাজ। যেটুকু সম্পদ আমাদের আছে তারই পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা। এবং সমস্ত স্তরের মানুষকে, বিশেষ করে গ্রামের মানুষকে উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া।

এটা না করতে পারলে কিছু হবে না।

২৫।৮।৭৫

সমর রায়

কে জানে

যোগব্রত চক্রবর্তী

এই যে ভোরের রোদ এর কোন মানে আছে কিনা
আমি তা জানি না।
বাতাসে বাতাসে হাওয়ার হাওয়ার সুখবর ছুটে যায়
এরও কিছু মানে আছে বুঝি?
কে জানে তা প্রকৃত প্রেমিক।

কিংবা মেঘলা আকাশ নদীতে দুরন্ত ঢেউ
খ্যাতির পেছনে কেউ
এলোমেলো জীবন যাপন প্রেমহীন সহবাস
নারীর গোপন অঙ্গে হাত রেখে লোকে বলে
কি সুখ কি সুখ।

নারী কি নারীই শুধু
নীরা নয় মনীষাও নয়
ওষ্ঠে স্তনে যোনির খাঁচায় শুধু মেয়েছেলে
প্রেমে নয় ভালবাসায় নয়
কখনও কি হয়?
রোদ্দুর লুকালো মুখ মেঘের আড়ালে
খুকু তুমিই তো বলেছিলে...
'ভাল থেকো আমাকে না পেলে।'

মৃত্যু

[illegible] চক্রবর্তী

গোলাপ বনের দিকে ছুটে আসে চৈত্রের খড়
এবার বাবার সময় হলো।
শেষ কলাপাতে বসে প্রভাতের ম্লান কুবো পাখী।
বাদল গাড়োয়ান রেডী
দাঁ-পড়া মেয়েটি চলে যাবে, মুখে এলা মাটি, ভরা বুকে
হিংলাজের সবুজ নেকলেস
খনখনে টিনশেডে আখুটে শ্রমর
আমাকেই চলে যেতে হবে
বাতাসে ধূপের গন্ধ, খুলে যায় বিদায়-সরণী
সমস্ত জীবন ঠিকা নয়, হুট, চলে যাওয়া
থাকা মানে জায়গা জুড়ে থাকা
একটা মানুষ যাবে, একটা হর্তেল বন প্রস্তুত হয়েছে, পুড়ে যাবে।

রাখাল ছেলেটির জন্য মায়া হয়
আমার অন্যায় ওকে প্রশ্রয় দিয়েছে পাইপ গান
ওকে আড় বাঁশি কিনে দেওয়া হোক
এত গুপ্ত হত্যা, যুবতীর রাঙা হাতে কঙ্কালের শাদা শঙ্খ হয় না
নদীর ওপারে কোন খেলা নেই
কোন স্বপ্ন মুখিয়ে ওঠেনি কোন দিন
এসব জানার পর দেরী করা যায়।

শেষ কলাপাতে বসে প্রভাতের ম্লান কুবো পাখী

দার্জিলিং দার্জিলিং

সাধনা মুখোপাধ্যায়

মনের মধ্যে এক দুঃখিত ঘণ্টা
অবিরত ধ্বনিত হয় টিং টাং টিং টিং
বিদায় দার্জিলিং বিদায় দার্জিলিং
আর তো উপায় নেই
জীবন উচ্ছল কলকাতা
ডাকছে জীবিকা স্রোতে
ঝাঁপ দিতে
লাফ দিতে
আয়ুর এ নকসী কাঁথা
তাতে তুমি রয়ে গেলে কয়েকটি দিনের ফোঁড়
ঘুম আর বাতাসিয়া লুপে
বন্য গোলাপ ফুলে
আর রাস্তার ধারে
লিলিয়্যাক পুষ্পের রূপে
যখন দগ্ধ দিন
যখন হতাশ মন
মন্ত্রণা দেয় বারবার
অর্থ নেই এমন বাঁচার
এ যেন কঠিন এক মৃত্যুর
নিমন্ত্রণ উদ্‌যাপন
শম্বুক গতিতে তিলে তিলে
তখন তোমাকে আমি নিয়ে যাব
সূর্যের প্রত্যয় ভরা সুউচ্চ টাইগার হিলে
আবার নতুন দ্যুতি
দেখা দেবে
মেঘে মেঘে
তপ্ত কাঞ্চন রঙ নতুন আশার
আমার মনের মধ্যে
বপন করেছ বীজ
তুমি যে এ পাহাড় পাইন বন অর্কিড
ঘন কুয়াশার
তার থেকে জন্ম দিও
স্মৃতিময় জলসেকে
বহু কবিতার ঘাস গুল্ম পাদপ আর লতা
দার্জিলিং দার্জিলিং
ভুলব না এ জীবনে
তোমার আতিথ্যভরা পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে
যা পেয়েছি—অতল অথৈ প্রগাঢ়তা

স্কেচ

গিরিধারী কুণ্ডু

তুমি আমাকে দিয়েছ পাতা গাছ নয়;
তুমি আমাকে দিয়েছ কাঁটা, ফুল নয়;
ভুলেরা তবু ফুল সাজে, প্রহরী হয়।
সে-সব অস্থির কাঁটা ছুটন্ত কুশ হয়ে
অনর্থক পা ফেলে, দাপায়।
বুকের গভীরে রক্ত ক্ষরিয়ে ক্ষরিয়ে
কথা থেমে আসে॥

G.E.C.
Osram

ভারতের অর্থনীতি
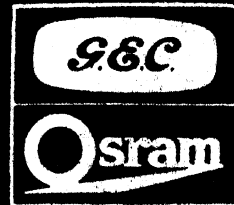
মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পাওয়া প্রসঙ্গে

ভারত সরকারের দাবি হল, দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার অনেক কমে গেছে। এক বছর আগে আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতির বাৎসরিক হার ছিল ৩০ শতাংশ; চলতি বছরে মুদ্রাস্ফীতির হার হয়েছে বাৎসরিক ৭ শতাংশেরও সামান্য কম। এবছর জুলাই মাসের মাঝামাঝি পাইকারী মূল্যসূচী গত বছরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় ২·০৬ শতাংশ কম ছিল। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার জন্য গত এক বছরে সরকার অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ব্যাংক রেট ৯ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো, সামগ্রিকভাবে মুদ্রা সংকোচন নীতি ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানতের উপর সুদের হার এবং ঋণের উপর সুদের হার বাড়ানো ছাড়াও বাধ্যতামূলক আমানত প্রকল্প, বর্ধিত বেতন পুরোপুরি আটকে রাখা এবং বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার অর্ধাংশ আটকে রাখা প্রভৃতি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। দেশে টাকার যোগানও ১৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মতে সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলেই মুদ্রাস্ফীতির হার এত কমে গেছে। ব্রিটেনে এখন মুদ্রাস্ফীতির হার ২৬ শতাংশ, বিশ্বের বহু উন্নত ও উন্নতিশীল দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ভারতের চেয়ে এখন অনেক বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান, ইটালী প্রভৃতি দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির, বিশেষ করে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে এখন মুদ্রাস্ফীতির চূড়ান্তরূপে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেই দেশগুলির তুলনায় ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার এখন অনেক কম।

ভারতে গত আর্থিক বছরে মুদ্রাস্ফীতির যে রূপ আমরা দেখেছিলাম, সে তুলনায় এখন মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা কিছুটা কমেছে ঠিকই; কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পাওয়ায় অবস্থার কোন হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না। জিনিসপত্রের মূল্যসূচী সামগ্রিকভাবে খানিকটা কমে গেলেও প্রয়োজনীয় বহু জিনিসের দাম এখন বেড়ে গেছে। খাদ্যসামগ্রীর মূল্যসূচী এক বছরে সামগ্রিকভাবে ৫·৫৩ শতাংশ কমেছে। তার মধ্যে খাদ্যে ব্যবহার করা হয় এমন তেলের দাম কমেছে ২৯·৭৬ শতাংশ, ফল ও কোন কোন তরিতরকারীর দাম সামগ্রিকভাবে কমেছে ১৮·৯ শতাংশ। অপরদিকে চিনি এবং তার সহযোগী সামগ্রীর দাম বেড়েছে ১১·২ শতাংশ, মাছ, ডিম এবং মাংসের দাম বেড়েছে ৩·৪২ শতাংশ, দুধ ও দুধের তৈরি জিনিসের দাম বেড়েছে ৫·৪ শতাংশ ও তামাকের দাম বেড়েছে ৯·৪৯ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের কাছে মুদ্রাস্ফীতি কমে যাবার ঘটনাটি যতটা গুরুত্ব লাভ করা উচিত ছিল ততটা করেনি। কেননা মাছ, মাংস, ডিম, চিনি, অন্যান্য মিষ্টি, দুধ এবং এমনকি চালের দাম গত বছরের চেয়ে এ বছর আরও বেড়ে গেছে। তেলের দাম গত বছরের তুলনায় অনেক কমেছে সন্দেহ নেই। ডালের দাম জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর সামান্য কমেছে। এক্ষেত্রে দাম কমে যাবার সুবিধার অনুপাতে ক্ষেত্রবিশেষে দাম বেড়ে যাবার অসুবিধাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। কয়েকটি খাদ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম বেড়ে যাওয়া ছাড়াও সাধারণ মানুষের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে পরিবহন খরচ বেড়ে যাবার দরুন। রেলের ভাড়া তো বেড়েছেই; পশ্চিমবঙ্গে বাসের ভাড়া এবং কলকাতা মহানগরীতে বাস-ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম ভাড়াও বেড়ে গেছে। মুদ্রাস্ফীতির হার কমে যাবার দরুন সাধারণ মানুষ যে সুবিধা ন্যায়সংগতভাবে ভোগ করতে পারেন, তা ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না অন্যদিকে খরচের পরিমাণ বেড়ে যাবার দরুন। অথচ গত এক বছরে লোকের আয় বাড়েনি। যাঁরা বর্ধিত আয়ের সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের বর্ধিত বেতনের সবটাই এক বছরের জন্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার ৫০ শতাংশ দুই বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের কাছে জমা রাখতে হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির হার কমে যাওয়ায় অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি।

মুদ্রাস্ফীতির হ্রাসের সুবিধা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে। শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের দাম কিছু কমে যাওয়ায় এবং কাঁচামালের সরবরাহ বাড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গৃহীত হওয়ায় শিল্প উৎপাদন বেড়ে যাবার লক্ষণ বর্তমানে পরিস্ফুট হয়েছে। উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর দামও কোন কোন ক্ষেত্রে কমেছে। কিন্তু সুতীবস্ত্রের দাম ২·৮৩ শতাংশ কমে গেলেও জুতোর দাম বেড়েছে ১৯·২৯ শতাংশ, ধাতব সামগ্রীর দাম বেড়েছে ১০·৯ শতাংশ, রবারের দাম বেড়েছে ৬০·৭৪ শতাংশ এবং কাগজে তৈরি জিনিসের দাম বেড়েছে ৭·৪৬ শতাংশ। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় কয়লা, পেট্রোল, পরিশোধিত স্পিরিট প্রভৃতির দাম বেড়েছে। কয়লার দাম বেড়েছে ৩৫·৭ শতাংশ। সাধারণ মানুষের অবস্থা এক্ষেত্রেও শোচনীয়। পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ার ঘটনাটির আন্তর্জাতিক গুরুত্ব খুবই বেশি। পৃথিবীর সব দেশেই পেট্রোলের দাম বেড়েছে; তবে ভারতের ক্ষেত্রে একটু বেশি হারে বেড়েছে। এজন্য মোটরগাড়ি চালাবার খরচ বেড়ে গেছে; ট্যাক্সি ভাড়াও অনেক বেড়ে গেছে।

মুদ্রাস্ফীতি কমে যাবার যে দাবি সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে তার পেছনে তথ্যগত সমর্থন থাকলেও বাস্তবে সাধারণ মানুষের দিক থেকে অবস্থার গুরুত্ব ঠিকভাবে অনুধাবন করা হয়নি। যদি নিত্যব্যবহার্য একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির দাম কমে যেত তবে সাধারণ মানুষ মুদ্রাস্ফীতির চাপ যে কমে গেছে তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারত। তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সরকার অবস্থা আয়ত্তে আনতে পেরেছেন। সামগ্রিকভাবে মুদ্রাস্ফীতির হার যে অনেক কমেছে তা ঠিকই। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই গৃহীত হয়েছে এবং সেগুলির কিছু সুফলও পাওয়া গেছে। অন্তত মুদ্রাস্ফীতির হার যে আর বাড়তে দেওয়া হয়নি এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি নতুন শৃঙ্খলাবোধের সৃষ্টি করেছে। যদি উৎপাদন ব্যবস্থায় এই শৃঙ্খলাবোধ টিকিয়ে রাখা যায় তবে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে রপ্তানির পরিমাণ ৩১ শতাংশ বেড়েছে বলে জানা গেছে। সরকারের দিক থেকে আশা করা হয়েছে যে, এবছর, অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সালে জাতীয় আয় ৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির হার আশাপ্রদ। মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করার জন্য উৎপাদন বাড়ানোই সব চেয়ে জরুরী। উৎপাদনের হার দ্রুত বাড়াতে না পারলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা যাবে না। অথচ দেশের উন্নয়ন-হার দ্রুত বাড়াবার অন্যতম প্রধান শর্ত হল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা।

সুব্রত গুপ্ত

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রশান্ত, তোমার লম্বা চিঠিখানা পেয়ে প্রথমে তোমাকেই জবাব দিতে বসেছিলুম। কিন্তু সময় সঙ্কীর্ণ; সন্দেহ হোলো তোমাদের দুজনকেই লেখা সম্ভব হবে কিনা। চিন্তা করে দেখলুম যদি একজনকে লেখাই অপরিহার্য হয় তাহলে রানীকে লেখাই ভাল। শুনলুম শৈলশিখর থেকে নেমে সে তেমন ভালো নেই। এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম মধ্যোরুপায়, সম্প্রতি এসেছি কোপেনহেগেন—আকাশ থেকে যেমন প্রত্যহই বৃষ্টি পড়চে আমার বক্তৃতাধারাও তেমনি প্রত্যহই প্রবাহিত। আজও আছে কালও আছে পরশুও আছে। একদা ছিলুম বাণীবিলাসী এখন হয়ে পড়েছি বাণীবিরাগী। কথার কারবার করতে আর ভালো লাগে না। হয়ত ছবির নেশা তার একটা কারণ। বিশ্বাস করা শক্ত এগুলো সত্যিকার ছবি, এখানকার ওস্তাদরা তো তাই বলচে। তোমরাও বলেছিলে মন্দ হয়নি, কিন্তু কিছু যেন মৃদুস্বরে, এবং অনেকখানি হাতে রেখে। এরা অনেকে বলচে যে আমাদের ছাড়িয়ে গেছ। আমার মনে হচ্চে রাস্তা খুলে গেছে। চিত্রের পর্যায় নতুন নতুন আকারে দেখা দেবে। কেবল মাত্র এই আগ্রহে দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—একটা নিভৃত কোণে রঙীন কালি নিয়ে আপন মনে রঙমহল সৃষ্টি করতে থাকব। এখানে পথে চলতে চলতে অনেক ছবি এঁকেচি। প্যারিসে যেগুলো এঁকেছিলুম এদের খুব ভাল্লা লেগেচে। কোপেনহেগেনেও পর্শু থেকে প্রদর্শনী খুলবে। রাশিয়ার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ বার্লিনে আমার ছবি দেখে মস্কোর জন্যে দরবার করে গেছেন।

তোমাদের চিঠিতে দেখলুম তোমরা বাড়ি ভাড়া করতে উদ্যত। আমাদের বিচিত্রার বাড়ি নাও না। কলকাতার বাসা রাখা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেচে। রথী ভাড়া দেবে বলে পাকাপাকি স্থির করেচে নিতান্ত বাইরের লোক এলে জোড়াসাঁকো অত্যন্ত পীড়িত হয়ে উঠবে। তোমাদের পক্ষে নেওয়া যদি সম্ভব হয় তাহলে কোনো কথাই থাকে না।

কিশোরী ১ লিখেচে তপতী ছাপবার কথা। আমি ফেরবার আগে ছাপা সম্ভব হবে না। কেননা অনেক রূপান্তর করবার আছে। সংশোধিত পরিবর্ধিত পরিবর্তিত কপিটা ফিরে গিয়ে খাড়া করতে হবে।

বাংলা পাঠ বইগুলোর ছবি খুব ভালো লাগল। কিন্তু ছাপার ভুল দেখে ভালো লাগচে না। "[illegible]" দন্তানকে মূর্ধন্য করা হয়েচে তা ছাড়া আরো ভুল দেখলুম। ইংরেজি এবং বাংলা পাঠগুলো বাজারে চলবে কিনা আমাকে একটু খবর দিয়ো। মনে মনে একটু একটু সন্দেহ হচ্চে।

ডাক্তার মেণ্ডেলদের বাড়িতে দুদিন ছিলুম আবার ফিরে গিয়ে তাদের বাড়িতে উঠব—বেশ লাগল। বলবার কথা অনেক আছে কিন্তু কি জানি কলম সরেনা। ব্রজেন্দ্র শীল-মশায়ের মতো অবস্থা কোনটা রেখে কোনটা বলি। তাছাড়া ভয় হয় পাছে যথাযথ না হয়। নিজের বিবরণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অত্যুক্তি এসে পড়বার আশঙ্কা আছে। যেটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে একটু তার আভাস পেলেই অনেকখানি বিশ্বাস করে ফেলা স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বৃত্তির কর্তনী নিজের সম্বন্ধীয় অতিশয়তার উপর চালনা করতে বুকে বাজে। অতএব ও কাজটা নিজের হাতে নেওয়া কিছু নয়। যথাকালে সংবাদপত্রিক বিবরণের খণ্ড ও অখণ্ডাংশের তর্জমা পাঠাতে চেষ্টা করব। রথী এক তাড়া পাঠিয়েচে শোনা গেল। অমিয়কে এ সম্বন্ধে উৎসাহ দেব—সে নানাবিধ সংবাদ কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝুড়ি ভর্তি করচে। আমার পক্ষে জার্নালে লেখা সম্প্রতি কিছুতেই সম্ভব নয়। এই যে তোমাদের চিঠি লিখলুম এও অনেক কর্তব্যের ভিড় ঠেলে।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রশান্ত, তোমার লেখাটি আমার কাছে বেশ ভালো লাগল। তুমি যেরকম ধারাবাহিক করে আমার মানববোধের ইতিহাসটি বিবৃত করেচ তাতে এই পরিচয়টি আমার কাছেও স্পষ্ট হয়েচে। এইরকম করে দেখলে বুঝতে পারা যায় জিনিসটা কতটা গভীরভাবে সত্য। গোড়ায় যখন মন কথা কইতে আরম্ভ করেচে তখনো তার সম্পূর্ণ অর্থটি ফোটেনি বলেই স্মৃতিতে সেটা ফিকে হয়ে গেছে। তাই তোমার লেখায় যে ছবিটা প্রকাশ করেচ সেটা আমার কাছেও অনেকটা নতুন ঠেকল। তোমার প্রবন্ধটিকে বাংলায় আরো বিস্তারিত করে লেখবার যে প্রস্তাব করেচ সে আমার ভালোই লাগল।

তুমি লিখচ সত্য উপলব্ধিতে বিশ্বমনের যে প্রকাশ সেটা বোঝা যায় কিন্তু রসের অনুভূতিতে বিশ্বমনকে হৃদয়ঙ্গম করি কিনা সন্দেহ থেকে যায়। অর্থাৎ অনুভূতিতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়ে গিয়ে শাশ্বত চরমতায় পৌঁছন যায় কিনা সেইটেই বিচার্য। সৌন্দর্যবোধের চরম আদর্শ বিশ্বমনের মধ্যে স্পষ্ট আছে না, যে দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষ নিত্য? এই বোধ যদি ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বস্তুতই স্বতন্ত্র হয়ে থাকে এবং যদি সার্বভৌমিক নিত্য আদর্শ না থাকে তাহলে সকলের প্রকাশে উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার চলতে পারেনা। অন্তত সে বিচারের আদর্শকে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল, প্রাদেশিক ও কৃত্রিম বলতে হয়। শিক্ষার দ্বারা সাধনার দ্বারা এই বোধের উচ্চতর বিকাশের কথাটাকেও অপ্রামাণ্য বলতে হয়। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে দেখতে পাচ্চি শিল্প সৌন্দর্য যেখানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেচে সেখানে সকল কালের ও সকল দেশের মন মিলিত হচ্চে। গ্রীসে রোমে চীনে ভারতে দক্ষিণ আমেরিকায় জাভায় জাপানে মধ্যযুগের গথিক প্রাচীনে যেসব শিল্পসম্পদ দেখা দিয়েচে তাদের মধ্যে দেশ কাল ও জাতির পার্থক্য প্রভূত, তাদের বাহ্যরূপেও যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য, তবুও

১ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের একদা-প্রকাশক কিশোরীমোহন সাঁতরা

মানুষের আনন্দের সম্মতি এখানে বাধা পাচ্ছে না। একথা সত্য যে নিঃশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি কোনো শিল্প সামগ্রীতে এক জাতীয় রস পায় না। যেমন অনেকে আছে যারা বর্ণকানা তেমনি আবার অনেকে রূপকানা—তারা নিজের ব্যক্তিগত বিশেষ অভিরুচির বাইরে দেখতেই পায় না—তারা যখন ভালো জিনিসকে বলে আমার ভালো লাগলনা তখন চুপ করে যেতে হয়, কিম্বা বলতে হয় হতভাগার বিশ্বরসদৃষ্টি নেই।

সত্যবোধ সম্বন্ধেও ব্যক্তিগত চিত্তের অভিব্যক্তি বিশ্ব-চিত্তের অভিমুখে ক্রমশ যাচ্ছে। বিশুদ্ধ সংস্কারমুক্ত ভাবে সত্যকে অনুধাবন করবার শক্তি সকলের সমান নয়—এমনকি শিক্ষার দ্বারাও সকলে সমান ক্ষেত্রে পৌঁছয় না। তবু আমাদের সন্দেহ নেই যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে বহুতর ত্রুটি স্খলন সত্ত্বেও মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিশ্বমানব বুদ্ধিতে মুক্তিলাভ করচে।

বুদ্ধি জিনিসটা অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু রুচিটা উপরি পাওনা। এমন কি সৌন্দর্য রুচির ক্ষুধায় অনেক সময় মানুষের স্বার্থ হানি করে। যাদের সৌন্দর্যবোধ অসম্পূর্ণ সংসারে তারা সার্থকতা লাভ করে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সেই কারণেই আদিকাল থেকে দায়ে ঠেকে ঠেকে মানুষ আপন বুদ্ধিকে সংযত করতে বাধ্য হয়েচে—নইলে নিরস্ত্র অসহায় মানুষ টিঁকতেই পারত না। শ্রেয়োবুদ্ধি সম্বন্ধেও তাই—ব্যব-হারের ভালো মন্দ বিচারে যদি তার জড়তা থাকে তাহলে সামাজিক সম্বন্ধ বিকৃত হয়ে তার অধোগতি এমনকি বিনাশ ঘটায়। যে সব জাতের মধ্যে ভালো করে প্রকাশ পায়নি তারা হয় মরেই গেছে নয় বনে জঙ্গলে জন্তুর মতো প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এই কারণে ভাল মন্দ বোধ সম্বন্ধে একটা নিত্য আদর্শ নানা কালের নানা জাতির লোকে বহুবিধ বিকারের মধ্যেও জেগে উঠেচে।

কিন্তু সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে কোনো সাংঘাতিক তাগিদ নেই। এই জন্যে এদিকে মানুষের শৈথিল্য ঘটেচে। এই বিষয়ে যথেচ্ছাচার আছে বলেই যে সার্বমানবিক নিত্যবোধ মূলেই নেই তা আমি মানব না। যা বিশ্বজনীনভাবে সুন্দর, যা উৎকৃষ্ট, তার সঙ্গে সর্বত্র আমাদের সকলেরই চেতনার অনু-কম্পন ঠিক তালে মেলেনি সে তো প্রতিদিনই দেখতে পাচ্চি কিন্তু তবুও তো হাল ছেড়ে দিয়ে বলচিনে তবে আর কেন, সাহিত্যে শিল্পে উৎকর্ষের সাধনা তো মরীচিকার অনুসরণ। সকল প্রকার বাধা বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও অন্তরের মধ্যে জানি যে উৎকর্ষের আদর্শ আছে, তাকে উপহাস করলেও অস্বীকার করলেও সে আছে। যুক্তি স্বীকারকারী বুদ্ধি মানুষের যত পাকা হয়েচে সৌন্দর্য স্বীকারকারী রুচি মানুষের তেমন পাকা হয়নি তবুও মানব সমাজে সৌন্দর্য সৃষ্টির মতো অত্যন্ত অদরকারী কাজে মানুষের যত শক্তির প্রয়োগ হচ্চে এমন অল্পবিষয়েই দেখা যায়। এইজন্যেই বলতে হয় রসো বৈ সঃ।

তোমাদের সময়মত কোনো এক সময়ে এখানে যদি সপরিজনে আসতে পার খুসি হব।

তোমাদের দুই পক্ষের রোগের যে যুগল মিলন হয়েচে সেটা সম্প্রতি কি ভাব ধারণ করেচে এখনো খবর পাইনি। ইতি ১৭ নভেম্বর ১৯৩১

কবি

ক্রমশ

শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালা দেবী

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

॥ ৭ ॥

১৯৩৯ সালে যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিই, তখন থেকেই শুনেছি হেমন্তবালা দেবীর নাম এবং তাঁর কথা কিছু কিছু জেনেছিলাম সেই সময়েই। গুরুদেবের দপ্তরে তাঁর দু'একখানা চিঠি বা তার অংশবিশেষ এবং তার জবাব সদ্য সদ্য পড়ে দেখার সুযোগ তখন নিইনি এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। প্রবাসীতে যখন 'পত্রধারা' প্রকাশিত হচ্ছিল তখন মনোযোগের সঙ্গেই পড়েছি সেগুলো এবং চিঠিগুলো যে হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত, তাও অজানা ছিল না। বলা বাহুল্য, তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ জন্মেছিল তখন থেকেই। কিন্তু তাঁর সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটেছিল অনেক পরে, ১৯৪১ সালে, গুরুদেবের তিরোধানের পরে। ঠিক কি সূত্রে কিভাবে আলাপ পরিচয় ঘটেছিল সঠিক মনে নেই। তখন কর্মজীবনে কলকাতাবাসী হয়েছি। মনে আছে, সেই বছরের পূজাবকাশে শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও সুধীরচন্দ্র কর সুহৃদ বন্ধু দুজন আশ্রম থেকে এসে দিন কয়েক আমাদের বাসায় ছিলেন। ঐ সময়েই আমরা তিনজন গিয়েছিলাম হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে। সন্ধ্যার পর গিয়েছিলাম তাঁর পুত্র বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর সেবক বৈদ্য স্ট্রীটের বাড়িতে। কচিবাবু তখন সস্ত্রীক ঐ বাড়িতে থাকতেন। সেখানেই প্রথম আলাপ হয়েছিল হেমন্তবালা দেবী এবং তাঁর পুত্রকন্যা ও পুত্রবধূর সঙ্গে। তখন সদ্য দেহরক্ষা করেছেন গুরুদেব, স্বভাবতই তাঁর প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো আলোচনাই হয়নি সেদিন। যত না আলোচনা, তার চেয়ে বেশী হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান। শৈলজাবাবু এবং সুধীরবাবু প্রধান অংশ নিয়েছিলেন গান শোনাবার, কিন্তু কচিবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী তৃপ্তি দেবী এবং শ্রীমতী বাসন্তী বাগচীও আমাদের গান শুনিয়েছিলেন। সেদিনের মশগুল বৈঠক ভাঙতে ভাঙতে বেজে গিয়েছিল রাত বারোটা। তারপর দিনের পর দিন জমেছিল এই ধরনের আসর, কখনো ও'দের সবাইকে পেয়েছি, কখনো শুধু হেমন্তবালা দেবীকে। ঘণ্টার পর রাতের ঘণ্টা গড়িয়ে যেত কোন্‌দিকে, সে খেয়ালই থাকত না কারো। সেই সব দিনের কথা হেমন্তবালা দেবী স্মরণ করে বলেছেন —"এ'রা তিন বন্ধু, প্রভাতবাবু, শৈলজাবাবু এবং করমশায় সেই ১৩৪৮, ২২ শ্রাবণের পর আমার পৃথিবী এবং বিশ্বের পৃথিবী যখন সকলের পায়ের নীচে থেকে সরে গেছে, সেইদিনে সুরের জগতে নিয়ে গিয়ে যে স্নিগ্ধতা দান করেছেন, তা অবিস্মরণীয়। সেই দুর্দিনে গান ছাড়া সান্ত্বনার কিছু পাইনি খুঁজে। আজও গানের মধ্যেই আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই এবং মনে করি তাঁর রচনা এবং তাঁর গানের মধ্য দিয়েই তাঁকে আমরা সমস্ত রাবীন্দ্রিক বিশ্ববাসীরা সর্বজনীন পরম আত্মীয়রূপে অনুভব করতে পারি। অন্য সান্ত্বনা পাই না কোথাও খুঁজে।" (স্মৃতি কথা—১)

হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা আজও মনে পড়ে। তিনি বরাবর নিজেকে গোঁড়া পরিবারের গ্রাম্য কুলবধূ বলে অভিহিত করেছেন। বাইরের দৃষ্টিতে সাদাসিধে সাজপোশাক ও চালচলনে তাঁর সেই আত্মপরিচয়ের উলটো কিছু ধারণা করার মত ছিল না, তা ঠিক। দেখলাম, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের চেয়ে লম্বা একহারা তাঁর গড়ন, ফরসা রং, কিন্তু ভিতরের কোনো তপঃক্লিষ্ট অগ্নিতেজে যেন গায়ের রঙকে পুড়িয়ে চেহারার নিটোলতাকে ঝরিয়ে দিয়েছে। যখন বাক্যালাপ করছিলেন তখন মননশীলতার দীপ্তি ফুটে উঠছিল কথাবার্তায়, কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রকাশ পাচ্ছিল তাঁর প্রগাঢ় উপলব্ধির ব্যঞ্জনা। মনে হচ্ছিল, এই বাস্তব জগতের অন্তরালবর্তী অন্য কোনো এক জগতে যেন তাঁর মন পাড়ি দিয়ে চলেছে।

তখন হেমন্তবালা দেবী হাজরা লেনের (বর্তমান নাম মতিলাল নেহেরু রোড) একটা বাড়িতে একলা থাকতেন। শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী স্বামীপুত্র সহ বাবার সঙ্গে থাকতেন মনোহরপুকুর রোডের অন্য একটি বাড়িতে। সেই বাড়িতেও গিয়েছি, কিন্তু

হেমন্তবালা দেবীর স্বামীর সঙ্গে কখনো দেখা-সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি, তিনি তখন হৃদরোগ ও হাঁপানিতে অসুস্থ ছিলেন।

পুত্রকন্যার বিবাহ হয়ে যাওয়ার পর কন্যা বাসন্তীর যখন সন্তান-সম্ভাবনা, তখন ডাক্তারের নির্দেশে তাঁকে মুরগীর সূপ খেতে দেওয়া হয়। তারপর মুরগীর ডিম কেক বিস্কুট ইত্যাদিও যখন ক্রমে ক্রমে বাড়ির ভোজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল, তখন এই অনভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে নিরামিষাশিনী আচারপরায়ণা হেমন্তবালা দেবী তাঁর মজ্জাগত সংস্কার নিয়ে স্বভাবতই সংকুচিত বোধ করতে লাগলেন, সেখানে টিকে থাকাই তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। তাই ১৯৩৮ সাল থেকেই তিনি হাজরা লেনে আলাদা বাড়ি করে বাস করতে লাগলেন। ব্যাপারটা আপস-রফাতেই ঠিক হয়েছিল, এ নিয়ে কোনো রকম বাদবিসম্বাদ হয়নি। "বাহিরে আচরণে কোনো অসনাতনী জিনিস নাই। আমি নিরামিষাশী, এক সন্ধ্যা খাই, যার তার হাতে খাই না, গঙ্গা জলে স্নানাহার করি, গুরুমন্ত্র জপ না করে জল খাই না। আমি যে একা থাকি তার প্রধান কারণই হচ্ছে আমার স্বামীপুত্রাদির বিজাতীয় আহার ও আচার। আমার এখানে থাকার জন্য তাঁরাই দায়ী এবং তাঁদের অনুমোদিতভাবেই বৃন্দা স্বর্ণঠাকুরানীদের নিয়ে থাকি। মাতাঠাকুরাণী স্থানান্তরে যে, আমি একা পৃথক বাসায় থাকি, অথচ আমার পক্ষে বর্তমান অবস্থায় তাঁর কাছে থাকাটা অত্যন্ত ক্লেশজনক, কেননা তাঁরাও গোঁড়া, তাঁরা আমার মনের এদিকটা বুঝতে পারেন না।" (স্মৃতি কথা—৮)

প্রসংগত ততদিনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে চিনে নিয়েছেন, পরস্পরের সম্বন্ধে অনেক ভুল-বোঝাবুঝি দূর হয়েছে এবং চালচলন ও প্রকৃতিগত বৈষম্যকে মেনে নিয়ে তাঁরা পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। আলাদা বাড়িতে থাকলেও সকলের মধ্যে যাতায়াত ও যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালে স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই জীবন কাটিয়েছেন হেমন্তবালা দেবী। অর্থাৎ, তাঁর ৫৩ বছরের দাম্পত্যজীবনে ২৫ বছরই কেটেছে স্বামীর থেকে দূরে দূরে। স্বামীর মৃত্যুশয্যাতেও তিনি কাছে থাকতে পারেননি, তখন তিনি কলকাতাতেই ছিলেন না।

সাংসারিক জীবনে হেমন্তবালা দেবী কোনো যোগ্যতার পরিচয়ই দিতে পারেননি। অবশ্য এর জন্য কোনোরকম দায়দায়িত্বের প্রত্যাশা ছিল না তাঁর কাছ থেকে। রান্নাবান্না এবং কাজকর্মের জন্য যেমন লোক ছিল, ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করার ভারও আলাদা ঝি-চাকরের উপরেই সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। তাঁর নিজস্ব সত্তার মহলে আলাদা রান্নাবান্নার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। আসল কথা, পরেনীর আশ্রম জীবন থেকে ফিরে আসার পর সংসারে আর তাঁর মন ছিল না।

অথচ বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে তিনি স্বপ্ন দেখেননি বা সেই জীবনের প্রতি গোড়া থেকে কোনোরকম বিরাগ বা বিতৃষ্ণা তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। যুগেধারার যূপকাষ্ঠে তিনি পড়েছিলেন বললেই হয়ত ব্যাপারটার একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেকালে আমাদের দেশে তৈজসপত্রের মত স্ত্রীও ছিল অপরিহার্য, তার বেশি মূল্য তার ছিল না। আর জলকে যেমন তেমনি পাত্রীকেও যে-কোনো পাত্রেই পাত্রস্থ করা হোক না, সে সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করবে, এও ছিল স্বতঃসিদ্ধ। সাধারণভাবে পুরুষমাত্রেরই ছিল এই মনোভাব। মেয়েরাও এই মাপে নিজেদের মানানসই করে মানিয়ে নিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে অভ্যস্ত হয়েছিলো।

এই ছিল তখনকার সমাজের অবস্থা, এরই মধ্যে বাংলার দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুইটি কিশোর-কিশোরী মিলিত হলেন বিবাহ-বন্ধনে। এবার হেমন্তবালা দেবীর জবানিতেই শোনা যাক ওঁদের মনোভাবের কথা—"ছেলেদের মনস্তত্ত্ব বোধহয় বলতে পারেন ছেলেরাই। তবে অনুমানে বোধ হয় যে, তিনি চেয়েছিলেন এমন এক নারীকে, যে নারী হবে চরণের দাসী, চির-সেবিকা, আত্মভোলিনী, পরম ধৈর্য পরম সহিষ্ণুতা নিয়ে যে পারবে চিরদিন তার স্বামীর সমস্ত আবদার অত্যাচার সহ্য করতে, তার বোঝা বইতে, তার সংগত অসংগত সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করতে। নিজের কোনো মনের বালাই বা পছন্দ-অপছন্দ থাকবে না তার কিছুই, স্বামীর সে হবে ছায়ার ন্যায় একান্ত অনুগামিনী, উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। রান্না করা সেলাই করে সে সাজিয়ে রাখবে নিজেকে আর নিজের সংসারকে একমাত্র পতিদেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্যের মত করে। তার অন্য কোনো চিন্তা চেষ্টা থাকবে না স্বামীর তুষ্টিবিধান ছাড়া, এবং স্বামীর কৃত সমস্ত সংগত অসংগত ব্যবহারও একান্ত কাম্য বরণীয় হয়ে উঠবে তার ভক্তি-মিশ্রিত প্রেমের জোরে। সে হবে অসূর্যম্পশ্যা, গম্ভীরস্বভাবা, একান্তই কুলবধূ। এই রকম একটি বউ পেলে ছেলেটি বেঁচে যেত। এরকম লক্ষ্মী বউ সংসারে সচরাচর যে মেলে না, তাও তো নয়।" (স্মৃতিকথা-৬)

তার মেয়ে? "মেয়েটির মধ্যে কি স্বতন্ত্রতা ছিল না কিছু? ছিল যথেষ্টই, সে অল্প বয়সেই হয়ে উঠেছিল তার চেয়ে বেশি বয়সের মেয়ের মত তার বাড়বাড়ন্ত ছিল বেশি বেশি, হৃষ্টপুষ্ট ছিল তার শরীর, মন ছিল তার বনহরিণীর মতই
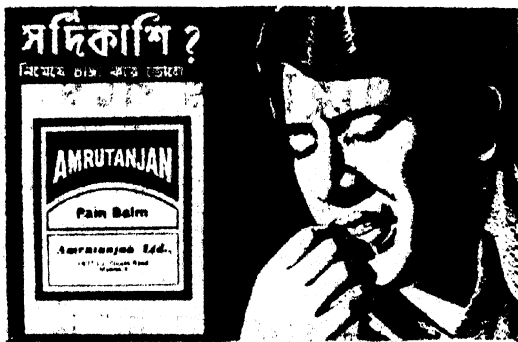
বন্ধনহীন।...মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে বসে বসে ভাবত রূপকথার গল্প, মনে মনে রচনা করত রূপকথা, আর মাঝে মাঝে অনির্বচনীয় বেদনার তারে তারে আঘাত লেগে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠত তার মনের মাঝে—

'আয় রে হীরামন তোতা' সে যে কবে একটি সুন্দর সুরে গাওয়া একটা গানের কলি শুনেছিল এক গ্রাম্য সাধারণ স্ত্রীলোকের মুখ থেকে—'আয় রে হীরামন তোতা!' সেই গানের সুরে সুরে জড়ানো একটা কল্পলোক তার চিত্ত করে অভিসার। ...সে হীরামন তোতা এ জগতের নয়, অন্য জগতের, কোনো এক সুদূর জগতের। এইখানে কবিগুরুর সঙ্গে তার মনের মিল—'আমি চঞ্চল হে, সুদূরের পিয়াসী।'

"শ্বশুরবাড়ি এসে সে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ত বঙ্কিমের নভেল। সাগর-বউয়ের পা টিপে দিচ্ছে ব্রজেশ্বর, তার মজা লাগত। সারা গায়ে ফুলের গয়না-পরা, এও তার লাগত বেশ। ভ্রমরের আবদারটাও লাগত বেশ।...সে ছোটবেলায় যে গল্প শুনেছিল, স্বামীরা থাকবেন নিরন্তর করজোড়ে স্ত্রীদের মন যোগাতে, আর স্ত্রীরা থাকবেন কপটরোষে অভিমানিনী, এই ছবিটি তার বেশ লাগত। বোধ হয় এই জন্যই সে বৈষ্ণবধর্ম এতো পছন্দ করে ফেলেছিল, তখন বৈষ্ণবধর্মের কোমল দিকটাই ভেসে উঠেছিল তার চোখে, কঠিন দিকটা দেখতে পায়নি তার অন্তরাত্মা। তখন তার বয়স চৌদ্দ পনেরো।" (স্মৃতি-কথা-৬)

দুইটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের রুচি-প্রকৃতি ও মনোভাবের বৈষম্যের চিত্র উল্লিখিত বিশ্লেষণে যা ফুটে উঠেছে তার উপরে তৃতীয় ব্যক্তির কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমরা আগেই জেনেছি, স্বামী রাজেন্দ্রকান্ত ছিলেন চলনে-বলনে রুচি ও অভ্যাসে ইংরেজিয়ানাতে রপ্ত, আর স্ত্রী হেমন্তবালা দেবী ছিলেন গোঁড়া ঘরের কুলবধূ, ধর্মপরায়ণা, অথচ সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্না এবং তীক্ষ্নধী ও বুদ্ধি-শালিনী মহিলা। আচারে সংস্কারে আবদ্ধ থাকলেও মূলত ধর্মানুরাগ অথবা ভগবদ্ভক্তি পরায়ণতাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার উপরে হেমন্তবালা দেবী আরো একটি কথা বলেছেন। দুজনেই ছিলেন "সমান জেদী, সমান অনমনীয়, সমান বিপ্লবী। নিজের নিজের স্বার্থের জন্য সবই করতে পারে। মাঝে মাঝে আপসের ভাব যে না আসে তা নয়, তবে সে আপস টেঁকে না।" (স্মৃতিকথা-৬) সুতরাং তাঁদের দাম্পত্যজীবন যদি মাধুর্য-মণ্ডিত না হয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী করতে হলে দায়ী করতে হয় সেই [illegible]

তৈরি করেছিলেন দুজনকে এবং নির্মম নাট্যকারের মত জীবন-নাট্যের রঙ্গশালায় দুজনকে আবার মিলিত করেছিলেন বিবাহের বন্ধনে।

এবার ফিরে আসা যাক আগেকার কথায়। হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে কত কথাই শুনেছি তাঁর কাছে, শুনতে স্বভাবতই ভালো লাগত আমাদের, বিশেষত তাঁর মনের অনুভূতিতে রাঙানো তাঁর সহজ সাবলীল ভঙ্গির কথাবার্তা। আমরা ত তুচ্ছ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, 'তোমার সমস্ত প্রকৃতি কথা নয়, ঝরণা যেমন কথা কয় তার সমস্ত ধারাটিকে নিয়ে।' হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে একটা সহজ হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল আমাদের, যেন গুরুভাইয়ের মত সৌহার্দ্যের চোখে তিনি গ্রহণ করেছিলেন আমাদের। শৈলজাবাবু এবং সুধীরবাবু আশ্রমে ফিরে যাওয়ার পরও তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯৪২ সালে আমাকে সপরিবারে কাশীতে থাকতে হয়েছিল প্রায় বছর খানেক। দৈবের যোগাযোগে হেমন্তবালা দেবীও তখন কাশীবাসী হয়েছিলেন। সেবার তাঁরই উৎসাহে উদ্যোগে ঘটা করে পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রজন্মোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল তাঁরই বাড়িতে। তিনিই অগ্রণী হয়ে শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ কবিরাজ মশায়কে উৎসবের পৌরোহিত্য করতে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। কলকাতার ট্রাংক কল করে স্বর্গত স্নেহাস্পদ সুচিত্রা রায়কে এই উপলক্ষে গান গাওয়ার জন্য কাশীতে আনাবার ব্যবস্থা আমাকে করতে হয়েছিল। উৎসবে 'উত্তরা'র সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং সেখানকার গণ্যমান্য আরো অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। আমার ছোট ছেলেমেয়েরা আবৃত্তি করেছিল এবং গান গেয়ে মাতিয়ে রেখেছিল সুচিত্রা, গান গাইতে তার কোন ক্লান্তি ছিল না। উৎসব সভায় কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন মনে নেই, তবে একটা কথা খুব মনে পড়ে। উৎসব-

শেষে আমন্ত্রিতরা প্রায় সবাই চলে যাওয়ার পর তার রেশ নিয়ে জমল আমাদের ঘরোয়া আসর। সেই আসরে গান গেয়ে আমাদের শুনিয়েছিলেন হেমন্তবালা দেবী। তিনি গেয়েছিলেন—

স্বপনে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে
আমার দ্বারে, হায়!
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে হায়। ইত্যাদি

গান তিনি কেমন গেয়েছিলেন সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, রবীন্দ্রস্মরণে সেদিন তিনি এতই উদ্‌গত হয়েছিলেন যে, গান গাওয়ার জন্য তাঁকে আমাদের বেশি অনুরোধ করতে হয়নি। মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়েছিল সুজিতের আরো গান দিয়ে। বড় মধুর প্রকৃতির ছেলে সুজিত, অল্প বয়সেই সে দুরন্ত রোগে মারা গেল, তার কথা ভোলবার নয়। সে আমাদের বাড়িতে দিন কয়েক এবং হেমন্তবালা দেবীর ওখানে আরো ক'দিন থেকে অবিরল গানের পর গান শুনিয়ে সকলের মনপ্রাণকে যেন স্নিগ্ধরসে ভরিয়ে দিয়ে চলে এসেছিল। হেমন্তবালা দেবী 'রবিবর্তিকা' নামে একটি সংস্থার পত্তন করে সেবারকার রবীন্দ্র-জন্মোৎসব দিয়ে তার সূচনা করেছিলেন। এর পর তিনি যতদিন কাশীতে ছিলেন, 'রবিবর্তিকা'র আলো জ্বালিয়ে রেখে-ছিলেন। পরের বছরের উৎসবে সেখানে ছিলাম না কিন্তু একটি ছোট লেখা আমাকে পাঠাতে হয়েছিল। প্রতিমা দেবীও আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন, তাঁকে হেমন্তবালা দেবী 'মা' বলে ডাকতেন। রবীন্দ্রনাথের নেপথ্য-চারিণী গুণমুগ্ধা মহিলা তাঁর সেবারকার কাশীবাসকালে এইভাবে প্রকাশ্যে রবি-বন্দনায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

মনে পড়ে আর একটি ঘটনা—১৯৫৫ অথবা ১৯৫৬ সালের কথা। ওই দুই বৎসর গীতবিতান থেকে ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়েল হলে পঁচিশে বৈশাখ উপলক্ষে পঞ্চাহব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের বিশেষ আয়োজন করা হয়ে-ছিল। একদিন অনুষ্ঠান চলছে, লোকে লোকারণ্য, ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে সময়, এমন সময় একজন এসে খবর দিল, কে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কৌতূহলী হয়ে গিয়ে দেখি, শ্রদ্ধেয়া হেমন্তবালা দেবী এসেছেন অনুষ্ঠান শুনতে। এ যে কল্পনাতীত। বলা বাহুল্য, এই অপ্রত্যাশিত সম্মানীয় অতিথিকে সানন্দে একটি ভালো আসনে বসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। অনুষ্ঠান দেখে তিনি খুব খুশি হয়ে-ছিলেন। সাধারণ প্রেক্ষাগৃহের জনতার মধ্যে বসে প্রকাশ্য রবীন্দ্রানুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভবত তাঁর জীবনে সেই প্রথম।

কাশীবাসকালে প্রায় প্রত্যহই হেমন্ত-বালা দেবীর কাছে যেতাম, অনেক সময় সপরিবারে—যদিও তিনি থাকতেন দূরে। কত আলোচনা হত। চিঠিপত্র নবম খণ্ডের অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠিগুলি একটি বড় বাঁধানো খাতায় তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল। তিনি যেমন সব সময় উলটে-পালটে দেখতেন চিঠিগুলি, আমরাও তখন কত পড়েছি সেই সব চিঠি এবং সেই সংক্রান্ত কত কথা শুনেছি তাঁর কাছে। শুনে আনন্দ পেয়েছি কিন্তু মনে কি ধরে রাখতে পেরেছি সেই সব কথা? সেই সময় তিনি একদিন আমাদের বাড়িতে এসে রাত কাটিয়েছিলেন আমার পরিবারবর্গের সঙ্গে। আমি সেদিন কাশীতে ছিলাম না, অফিসের কাজে কলকাতায় আসতে হয়ে-ছিল। নানা রকম গল্পগুজব করে ছেলে-মেয়ে দুজনের মন ভুলিয়ে তাদের একেবারে তিনি বশ করে নিয়েছিলেন। তাদের তিনি ডাকতেন 'বন্ধু' ও 'বান্ধবী' বা 'সখী' বলে। মা ছিলেন তখন আমাদের সঙ্গে,

একজন রাঁধুনী বামুনী ঠাকরুনও ছিলেন বাড়িতে, তাই হেমন্তবালা দেবীর আচার-সম্পৃক্ত আহারপর্বের কোনো অসুবিধা হয়নি। যার নাম ছিল আবার হেমন্তকুমারী, তাঁর তখন বেশ বয়সও হয়েছে। বিশেষভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্যেই তিনি সেদিন এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। হয়ত নাম-সাযুজ্যের জন্যও আলাপ করার আগ্রহ অবচেতনে কিছুটা জন্মেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে সেদিন যার সঙ্গে গল্পগুজব করেছিলেন, নিজের জীবনের বহু কথাও বলেছিলেন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে ত যথেষ্ট আলাপ পরিচয় ছিলই। হেমন্তবালা দেবী লিখেছেন—"শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত তো সপরিবারেই আমার আত্মীয় মধ্যে গণ্য।" (স্মৃতিকথা-১) এই আত্মীয়তার সম্পর্ক তিনি নিজগুণে বরাবর বজায় রেখেছেন, আমার মেয়েদের বিয়েতে তিনি কবিতা রচনা করে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

খানিকটা ব্যক্তিগত কথার অবতারণা করতে হল এই জন্যে যে, হেমন্তবালা দেবী একটা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধন আমাদের সঙ্গে চিরকাল বজায় রেখে চলেছেন, একে আমি একটা সৌভাগ্য বলেই মনে করি। কলকাতায় থাকলে আমরা যেমন গিয়েছি তাঁর কাছে, তিনিও মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের বাসায়। তারপর তিনি যখন কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন, কখনো থাকতেন কাশীতে, কখনো ভুবনেশ্বরে এবং শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন পুরীর 'সোনার গৌরাঙ্গ মঠে'র আশ্রমে, তখন থেকে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে চিঠির যোগাযোগ রেখে চলতেন আমার সঙ্গে। যোগাযোগ বললে হয়ত ঠিক বলা হয় না, চিঠি লিখতেন সপ্তাহে দুখানা তিনখানা করে, হয়তো-বা একদিনেই দু'-খানা। কখনো পোস্টকার্ড, কখনো দু'-চার পৃষ্ঠা, কখনো বা দশ বারো পৃষ্ঠায় চিঠির তাঁর চিঠি লেখা ছিল সহজ ভঙ্গিতে কথা কওয়ার সামিল। কথা বলা, নিজেকে প্রকাশ করা, আলাপ-আলোচনার কল্লোলে মুখরিত থাকা তাঁর প্রকৃতিগত প্রয়োজন। তাই অনর্গল তিনি লিখতেন চিঠি। কিন্তু স্বর্গচ্যুত কলকল্লোলিনী গঙ্গার ধারাবেগকে ধারণ করা ও তাকে সার্থকভাবে প্রবাহিত করে দেওয়া একমাত্র মহাদেবাদিদেব মহেশ্বরের মত অমিত শক্তিধারীর পক্ষেই সম্ভবপর। রবীন্দ্রনাথকে হারিয়ে তাই মহিলার হয়েছিল নিরুপায় অবস্থা। তবু নিজের তাগিদেই তিনি লিখে যেতেন চিঠি—যেন আত্মকথন। তার যোগ্য জবাব দেওয়ার যোগ্যতা আমরা পাব কোথায়? আমি শুধু তাঁকে অনুরোধ করতাম, আপনি একদিক থেকে যখন যা মনে আসে, সেইভাবে লিখে যান রবীন্দ্রস্মৃতি ও আত্মস্মৃতির কথা। তার ফল কিছুটা ফলেছিল। তিনি মাঝে মাঝে লিখে গেছেন সেই সব কথা, যখন যেমন খেয়াল হয়েছে লিখেছেন—কখনো খাতায়, কখনো ছেঁড়া পাতায়, কখনো চিঠির মধ্যে দু'-একটি ঘটনার কথা। আবার তাঁর দ্বিধাও জাগত মনে—"যেসব কথা লিখব তা লিখতে সংকোচ বোধ হচ্ছে...আজে বাজে কথা লোকে পড়বে কেন, বলবে যে ব্যক্তিগত কথা লিখেছে।" (চিঠির অংশ) "পাছে স্পর্ধা প্রকাশ পায় এই ভয়েই কিছু রাখিনি লিখে।" (স্মৃতিকথা-১) যাই হোক, এইভাবে আমার কাছে সংগৃহীত হয়েছিল তাঁর কিছু লেখা। তাঁর সব লেখা এবং চিঠিপত্রই যে সযত্নে রক্ষা করতে পেরেছি, এমন কথা হলপ করে বলা কঠিন। তাঁর লেখা কয়েকখানা খাতা তাঁর কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী বাগচীকে দিয়েছিলাম, তিনি সেগুলিকে সম্পাদনা করে 'পুরনো দি[illegible] কথা' আখ্যায় গল্পভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করেছেন। ১৩৭৬ সালের আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তা ছাপা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে 'পুরনো দিনের কথা' থেকে অনেক উধৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর অন্যান্য অপ্রকাশিত বিক্ষিপ্ত লেখা যা আমার জিম্মায় এখনো রয়েছে, সেগুলিকে 'স্মৃতিকথা'-১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তার থেকে উধৃতি দিয়েছি, সংকলন করেও লিখেছি। যেমন, গোড়ার দিকে 'খদ্যোতবালা' ও ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়ের কথা সংকলিত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন যে, হেমন্তবালা দেবীর লেখা শুধু 'খিড়কির রাস্তা দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া আসা করে কেন', সদরের জন্য তিনি কিছু লিখছেন না কেন? সম্প্রতি তাঁর দুখানি ছোট বই রঞ্জন পাবলিসিং হাউস থেকে ছাপা হয়ে
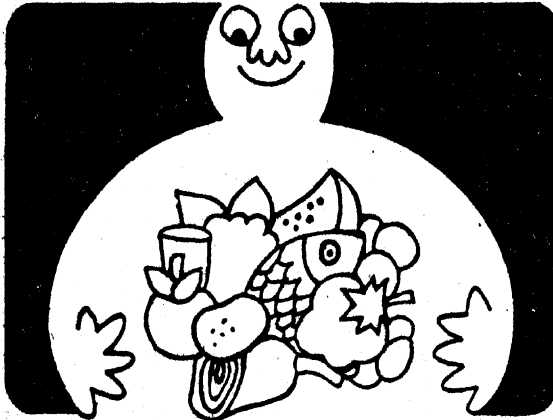
সদরে আত্মপ্রকাশ করেছে। একখানি ৭২ পৃষ্ঠার চটি বই, বেশির ভাগই কবিতা, তিনটি মাত্র ছোট গদ্য রচনা। বইটির নাম 'হেমন্তবেলায়', ভূমিকা লিখেছেন শ্রীকানাই সামন্ত, যাঁর সম্বন্ধে হেমন্তবালা দেবী লিখেছেন, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য বন্ধনে তিনি "ভগ্নী বলেই জানেন আমাকে।" একটা চিঠিতে তিনি আরো লিখেছিলেন—"শ্রীকানাই সামন্ত বহু টাকা নষ্ট করেছেন আমার জন্য। আমাকে না দিয়ে তিনি খান না। আর জন্মের ভাই আমার, যদিও জন্মান্তর সম্বন্ধে আমার মনে খটকা আছে।" ভূমিকায় কানাইবাবু লিখেছেন—"এ লেখার বিশেষ গুণে হল আন্তরিকতা বা তন্ময়তা। যা কিছু লিখেছেন তাতে কোনো সংযোজন বা সংশোধনের প্রয়োজন হয়নি, অবকাশও থাকেনি—যেন কালি তুলির কাজ, কোনো ছাপ-ছোপ টান-টোনই যার পালটে নেওয়া চলে না, বদল করা যায় না। সাহিত্য হিসাবে প্রচারের একটু অসুবিধাও আছে এই লেখার। একটু অবহিত হলেই রসজ্ঞ ভাবজ্ঞ ব্যক্তি আর সূক্ষ্মদর্শী লেখক সমাজ এ লেখায় লাভবান হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের আয়ত্তের বাইরে থাকবে এর বৈচিত্র্য, এর প্রাচুর্য।" কারণ, "যা এখানে সমাহৃত, আধুনিক নগর-সভ্যতার অভ্যাস ও সংস্কার কিছুক্ষণের জন্য পরিহার করতে পারলে ও ভাবগ্রাহী হলে তারও অন্তর্নিহিত ভাবসৌষম্য, নূতন বক্তব্য ও হৃদ্যগুণ কারো অগোচর থাকবে না।" প্রসঙ্গত শ্রীকানাই সামন্তর 'অসম্পূর্ণ' কাব্যগ্রন্থে 'কৃষ্ণপ্রিয়া' নামক কবিতাটি পাঠকদের পড়ে দেখতে অনুরোধ করি, যাতে তিনি হেমন্তবালা দেবীর একখানি মর্মচিত্র আঁকবার চেষ্টা করেছেন।

হেমন্তবালা দেবীর দ্বিতীয় বইখানির নাম 'অনন্ত চিন্তা'। ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। ভূমিকায় তিনি বলেছেন—"পাঠক হিসাবে আমাদের দুর্ভাগ্য, 'সুসংলগ্ন করে বিস্তারিত করে লেখবার সাধনা' থাকা হতে পারেনি বলে হেমন্তবালা দেবীর গল্প, প্রবন্ধ অথবা কবিতা—কোনো কিছুই তাঁর সারস্বত-শক্তির যোগ্য হয়ে ওঠেনি। আলোচ্য প্রবন্ধ সংকলনে 'গ্রামীণ সংস্কৃতি' থেকে 'ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি যে মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা যে-কোনো মহৎ সারস্বত চিন্তারই সমকক্ষ। রক্ষণশীলতার দুর্গে বাস করেও যে তাঁর চিত্তমুক্তি ঘটেছিল 'অনন্তচিন্তা'র প্রবন্ধগুলিতে তার প্রকৃত নিদর্শন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।" এই প্রসঙ্গে জগদীশবাবু আরো বলেছেন—"তিনি কবিগুরুকে যেসব পত্র লিখেছেন সে সব পত্র গ্রন্থাকারে একত্র সংগৃহীত না হলে তাঁর সারস্বত জীবনের প্রধান অংশই লোকলোচনের অন্তরালে থেকে যাবে। পত্রালাপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাঁর কাছে তাঁর শেষ জীবনের চিন্তা ও অনুভূতিকে অকৃত্রিম ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তাঁর অমূল্য পত্রগুচ্ছ প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য বলেই মনে করি।" আমরাও এই প্রস্তাবের সমর্থন করি, তবে হেমন্তবালা দেবীর পত্রগুচ্ছ উপযুক্তভাবে সংকলন ও সম্পাদনা করেই প্রকাশ করা উচিত।

'রূপকথা' নামে হেমন্তবালা দেবীর আর একখানি বই মুদ্রিত হয়েও কোনো অজ্ঞাত কারণে প্রকাশিত হয়নি, একমাত্র প্রকাশকই তা বলতে পারেন, কিন্তু বলছেন না বলে শুনেছি। তাঁর 'পুরনো দিনের কথা' এবং আরো দু-একটি লেখা পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থাকারে আর কিছু মুদ্রিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত ওস্তাদ আলাউদ্দিন সাহেবের একখানা চিঠির উল্লেখ করা হয়ত অবান্তর হবে না। তিনি যে ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন ও যে-রকম বানান ব্যবহার করেছিলেন, তার কোনোরকম পরিবর্তন না করে চিঠির কিয়দংশের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

মাইহার ষ্টেট
মধ্য প্রদেশ

মাননিয় মহোদয়ানি,

স্নেহের বোন বড়দিদি, আপনার পত্র ও মনমুগ্ধকর কবিতা পাঠ করে বড়ই আনন্দ পাইলাম। আপনার কবিতা অতি উচ্চ দরের, আমার মতন অনবিজ্ঞ মূর্খমতি আপনার কবিতার মর্ম্ম কি বুঝিব, সে শক্তি আমার নেই। আপনার লিখা কবিতা সব, যত্নের সকল করে রাখিলাম, সপ্তাকরে লিখার উপযুক্ত আপনার কবিতা সব, আপনি দেবী, মায়ের শক্তী আপনার মধ্যে। ...বোনের কাছে আমার একটি নিবেদন, ধ্রুপদ অঙ্গের ও হরি অঙ্গের, খিয়াল অঙ্গের ও ঠুমরি অঙ্গের কতকগুলি গান করুন। পরমার্থীকে ভাবের ও ভজন, কৃষ্ণলিলা, কির্ত্তন অঙ্গের গান রচনা করুন। গান রচনা করে আমার কাছে পাঠাবেন—সেই গানের অঙ্গ হিসাবে সুর করে আপনাকে পাঠিয়ে দিব, পরে ছাপিয়ে দিবেন। পূর্ব্বজন্মের তপবলে এই শক্তী ভগবান আপনাকে দান করেছেন, জগতে সেই শক্তী দান করে গেলে সুখি হব। ইতি

সদেশের দিনহীন কাঙ্গাল ভাই
আলাউদ্দিন

এই ভক্তসাধক সংগীতগুরু হেমন্তবালা দেবীর কবিতার মধ্যে ঐশী শক্তির প্রকাশ অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর কাছে ভক্তিমূলক পারমার্থিক ভাবের গান ফরমাস করেছিলেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন সাহেব গৌরীপুরের বাড়িতে অনেক দিন ছিলেন ও ব্রজেন্দ্রকিশোরকে তিনি পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। আরো একখানা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"আমার বোনটি তপস্বিনী।" শিক্ষা-দীক্ষাহীন ভক্তহৃদয়ে হেমন্তবালা দেবীর জীবনসত্তার মূল রূপটি অতি সহজেই ধরা পড়েছিল।

এই প্রসঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর একখানা চিঠি থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—"যখন পাঁচ বছর পিত্রালয়ে বৈষ্ণবীয় ভাবের অনুশীলন, তখনকার লেখার সংকলন করে শ্রীশ্রীশিক্ষাগুরুদেব সাত খণ্ড মোটা মোটা বড় খাতায় (যদিও কাঁচা রচনা) 'প্রীতিপুষ্প' নাম দিয়ে স্বহস্তাঙ্কিত চিত্র-শোভায় সাজিয়ে একটা সংকলন করেন। বর্তমান আশ্রমের কর্তৃপক্ষ নাকি তার কিছুই জানেন না। সে একেবারে নিপাত্তা! তার পরে বহু আমার চিঠি সব পুড়িয়ে
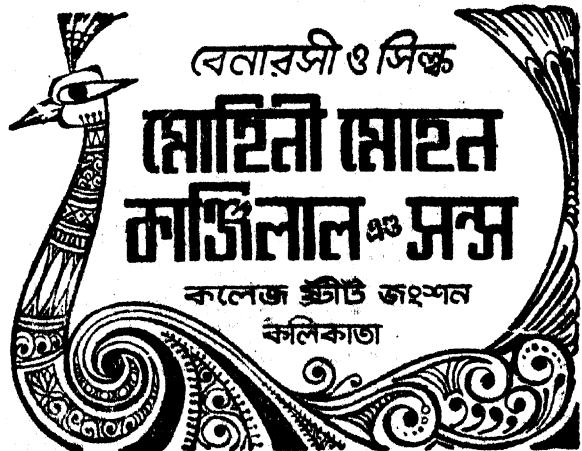
লুচি ভাজা হোত্তো আশ্রমে। প্রতি বৎসর দোলের সময় ফরমাসী গান দিয়েছি ১০০।১৫০, তার মধ্যে ১০।১২টা নির্ব্বাচিত হোতো, বাকিগুলো লুচি ভাজায় যেত। ছয় বৎসরে অন্তত ৬০।৭০টা তো থাকবার কথা। তাও এখন লুপ্ত। তারপর আমি যখন রবিগ্রস্ত, তখন আমার নামাঙ্কিত গানের অদল-বদল হয়ে অন্যের নামে কতক আশ্রমে রইল। কতক গেল। যাক, আমি নিজে খানকতক পুরনো গান একটা খাতায় সংগ্রহ করলাম, তাও হারালো। তারপর আপনাদের গুরুদেবের প্রেরণায় একটা উপন্যাস লিখলাম, সে বোধ হয় সজনীকান্তের কাছে, নয়ত বিশ্ব-ভারতীতে, মনে নেই, সজনীকান্তের কাছে আরো দু'-একটা লেখা ছিল। সজনীকান্ত বলতেন, আপনি লিখতে জানেন না, আপনার শুধু লেখা লেখা খেলা।...যাক। আর তো কোন দুঃখ নাই। এককালে শ্রীশ্রীগুরুঠাকুরদেব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, অন্যকালে আপনাদের গুরুদেব। এই আমার জীবনের যথেষ্ট পুরস্কার।"

পথ ও মতবাদে বিরুদ্ধপন্থী কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগিণী এ অন্তঃপুরচারিণী মহিলা রবীন্দ্রমণ্ডলীভু অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় তাঁদের কথাও তিনি বলেছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী মাঁরা দেবী ও প্রতিমা দেবীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৬৮ সালে হেমন্ত-বালা দেবী লিখেছেন—"এখন জোড়া-সাঁকোয় গেলে আর কেউ, আমাকে না চিনলেও ভোলাবাবু চিনতে পারেন। কাছে এসে কুশল প্রশ্ন করেন এবং সেদিনকার কথা ভেবে এবং সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হর্ষবিষাদ অনুভব করে থাকেন। চিনতো বনমালী, দেখা হলেই নমস্কার করে পথ দেখিয়ে দিত। ঝণ্টুর সঙ্গেও দেখা করেছি এই জোড়াসাঁকোর শূন্য ভবনে। পুরাতন লোকজনেরা আক্ষেপ করত অতীত সুখের দিন স্মরণ করে, যখন তারা কবিগৃহিণীর আশ্রয়ে ছিল। সেই সময়কার গার্হস্থ্য ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করে সেই তুলনায় পরবর্তীকালের প্রায়-সন্ন্যাসী অথবা সুদূরপ্রবাসী প্রভুগৃহের বিশ্ববন্দিত পরিবেশকেও তারা অভিনন্দিত করেনি। তাদের কাছে আগেকার দিনই নাকি শান্তিময় ও সুন্দর ছিল। তারা প্রভুর 'লম্বাচোড়া' অভিযান বেশ ভালো চোখে দেখতে পারেনি। কিন্তু বনমালী তার প্রভুর সঙ্গে যেখানে যেখানে গেছে, বেশ খুশি হয়েই থেকেছে মনে হতো। ছিলেন গোপালবাবু—তিনিও চাইতেন, আর দশজন বড়লোকের মত তাঁর কর্তাও সংসার থেকে শেষ বয়সে বিশ্রামসুখ উপভোগ করুন, সাধারণ গৃহস্থ সংসারের মত কন্যা-বধূ-নাতনীদের সেবায় যত্নে সুখে শান্তিতে আরামে দিন কাটান। দেখেছি, এই সমস্ত ভৃত্য আশ্রিত ও কর্মচারীরা তাদের প্রভুকে আন্তরিক স্নেহে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় ভক্তিতে মনে মনে পূজা করতেন এবং নিজেদের মনের মাঝেই তাঁর জন্যে আন্তরিকভাবে শুভকামনা করতেন।" (স্মৃতিকথা-১)

ঠাকুরবাড়িতে কবিগুরুর আত্মীয়পরিজন অনেকের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবেও এসেছিলেন হেমন্তবালা দেবী। তাঁদের কথাও বলেছেন তিনি—"জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আর যাঁরা ছিলেন এবং যাঁরা এখনো আছেন, সেই আত্মীয়স্বজনেরাও আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ এবং স্নেহ করে তাঁদের আপন বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের ঘরে বসেও কতদিন তাঁদের কাছে তাঁদের কথা এবং কবিগুরুর কথা শুনেছি। স্মরণ করতে পারছি না, সে আমারই অপরাধ। আমি জোড়াসাঁকোর বাড়ির বারান্দায় দূরে থেকে দিনুবাবুকে প্রথম ও শেষবার একবার মাত্রই

দেখেছি, তার অল্প দিন পরে তাঁর দেহান্ত হয়। আমি কমল বউঠানকে সধবা বিধবা উভয় অবস্থাতেই দেখেছি, গল্প করেছি, গল্প শুনেছি। তাঁর সাধনভজনের কথাও শুনেছি। কমল বউঠানের অন্তিম অসুখের সময়েও দেখেছি একদিন। বড়মাও আমাকে বিশেষ স্নেহ করে থাকেন। আমি স্বর্গীয়া রমা দেবীকে সুস্থ ও অসুস্থ অবস্থায় দেখেছি, তাঁর গান শুনেছি।......আমাকে দেখলে তিনি বিশেষ খুশি হতেন, আমার হাতখানি হাতে নিয়ে কত গল্প করতেন। তাঁর জননী এবং ভাগিনীর সৌহার্দ্যও অনুভব করেছি। শ্রীযুক্তা অমিয়া বউঠান, অমিতা বউঠান, এঁদের কথাও অবিস্মরণীয়। অমিয়া বউঠানের মধুকণ্ঠের গান শুনেছি, শিখতে চেষ্টা করেও শিখতে পারিনি, সে কণ্ঠ কোথায় পাব? পূজনীয় ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, আমার মামীমা, যাঁর সম্পর্কে জোড়াসাঁকোয় আমার আসা, তাঁর স্নেহের ও করুণার কথা আর কী বলব? দুঃখের বিষয়, কবিগুরুর জীবিত সময়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়নি। পূজনীয় প্রথম চৌধুরী মাতুল মহাশয়ের জন্মোৎসব অথবা অন্য কোন কারণে জোড়াসাঁকোয় তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়, সেই সময় প্রথম আলাপ। পরে পূজনীয় মাতুল মহাশয় আমার পিত্রালয়েও গিয়েছিলেন একবার। মামীর কাছে যখনই গিয়েছি মার মত স্নেহ পেয়েছি। পত্রালাপও ছিল অনেক দিন, শেষ পর্যন্ত।

"শ্রীযুক্তা হৈমন্তী দেবী আমাকে দুখানা চিঠি লিখেছেন, আলাপ করেছেন ভ্রাতার সহিত। তাঁর শ্বশ্রূমাতা স্বর্গীয়া অনিন্দিতা দেবী আমাকে চোখে দেখবার আগেই কত ভালোবেসে পত্রালাপ করতেন, তাঁর শ্রীক্ষেত্রধামপ্রাপ্তির কিছু আগে তিনি কলকাতায় হাজরা রোডে আসেন, তখন দেখতে যাই তাঁকে। আমার পরিচয় পেয়ে 'তাই কি?'—বলে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেন আমাকে। তাঁর স্নিগ্ধ মাতৃহৃদয়ের এই পরিচয়। শ্রীযুক্তা রানী মহলানবিশকে কত সময় অসময়ে এসে যে উত্ত্যক্ত করেছি, সুবিধা অসুবিধা বুঝিনি তাঁর, তার ত অন্ত নেই। এক ঝুড়ি ফলের সওগাত নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। আর শ্রীযুক্তা রানী চন্দ আমার মামী।...মাতৃকুল সম্পর্কে আমার এক দাদামহাশয়ের সহপাঠী পরম বন্ধু ছিলেন শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয়। আর আছেন শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন।......তা ছাড়া বিশ্বভারতী সম্পর্কে শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায় পত্রালাপে আমাকে স্নেহ দান করেছেন। এবং শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাশ উপাচার্য মহাশয় থেকে বিশ্বভারতীর অনেক কর্মীই দয়া করে আত্মীয়তার স্পর্শ দান করে সম্মানিত করেছেন।...এ ছাড়া যাঁর যাঁর কথা এই রচনা লিখবার সময় সহসা স্মরণে আসছে না, তাঁদের সকলেই আমার প্রতি অনুগ্রহশীল নন, এ কথা বলতে পারি না।......আমার বিস্মৃতি হয়ে থাকে যদি, সবাই মনে করিয়ে দেবেন।"

যত দূর জানি, অন্তত আরো একজনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হয়তো অনবধানতাবশত তা করা হয়নি। তিনি হলেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। তাঁরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ লাভ করেছেন হেমন্তবালা দেবী। মৈত্রেয়ী দেবী এখনো হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন।

"পরিশেষে এক কথায় বলতে পারি, এমন একজনকে আমি এই চর্মচক্ষে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, যাঁর সম্বন্ধে সারা বিশ্বের পরস্পরবিরোধী অথচ রবীন্দ্র সম্পর্কে ঐক্যবদ্ধ বিশিষ্ট পরিমণ্ডলীর মধ্যে নিজের মত ক্ষুদ্র প্রাণীকেও গণ্য করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য না মনে করে পারি না। এ আমার গুণে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমি যাঁর কাছে যে স্নেহ লাভ করেছি, সে সমস্তই সেই একজনের গুণে—তাঁরই সম্বন্ধে।

"যথাস্থানে কেন লিখতে ভুলে গেলাম পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথের কথা। তাঁকে জীবনে দুইবার দেখেছি এবং মাত্র একবারই—সেই প্রথম ও সেই শেষ—বহুক্ষণ ধরে তাঁর মুখের কথাও শুনেছি। তাঁর পুত্রবধূ আমাকে সেকালের স্মৃতিচিহ্ন সেই হলঘর, সেই দক্ষিণের বারান্দা, সব দেখিয়েছেন। তারপরেই ত বাড়ি চলে যায় অপরের হাতে। ঐটুকু সময়ের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের যে আন্তরিকতা এবং দেবতার মত ভবিষ্যৎবাণী দৈববাণী শুনেছি, ভাবতে রোমাঞ্চ হয়, যখন সেই ভবিষ্যৎ বাণী ফলতে দেখলাম আমার জীবনে। যদি মনে থাকে, সে কথা পরে লিখব।" (স্মৃতিকথা-১) দুঃখের বিষয়, অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর কোনো লেখার সন্ধান পাইনি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

একমাত্র লীক-রোধক ব্যাটারী
যার এত কম দাম,
এত বেশী জান
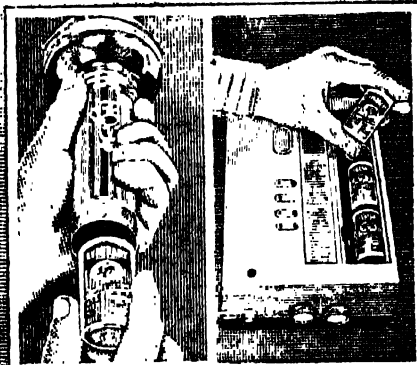
EVEREADY
TRADE MARKS
DOUBLE ACTION
955
সদ্য সুগঠিত!
"পলি ল্যামিনেট"
মোড়ক যাতে
"লীক"
আটকায়
সহজে

সাধ

প্রভাত দেবসরকার
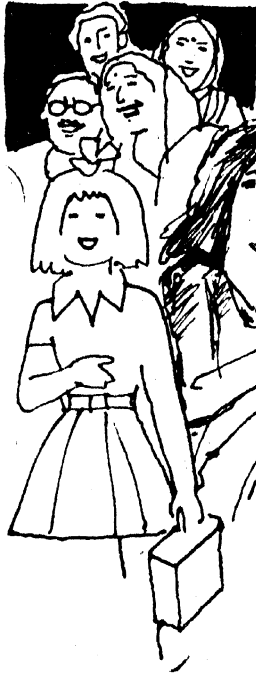
আজ এ বাড়িতে সকাল থেকে বড় ব্যস্ততা; মনে হয়—আসন্ন একটা উৎসবের জন্যে গৃহবাসী সকল আত্মীয়পরিজন বিশেষ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাড়িটা ভোর থেকেই বেশ সরগরম! কারণ—

দোতলার দালান থেকে খোলা কলতলার রোয়াকের সামনে দাঁড়িয়ে একটি প্রৌঢ়া মহিলা রুক্ষ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, কি রে সাবি, কতক্ষণ ধরে বাসন মাজছিস! এখনো হলো না? তোদের যদি কোন কাজে হুঁশ থাকে, একটা দিন আর তোদের নিয়ম বাঁচিয়ে কাজ না করলেই নয়? পই পই করে বলে দিলুম—

সাবি অর্থাৎ সাবিত্রী এ বাড়ির ঠিকে ঝি—বাসন মাজে, রান্নাঘর ধোয়, এঁটো-কাঁটা পরিষ্কার করে উনোনে আঁচ দেয়, গোবর-মাটি দিয়ে নিকোন-পোছান করে, নিত্য দুবেলা।

কলতলা থেকে বাসনের গোছা সশব্দে নেড়েচেড়ে সাবিত্রী বললে, আমি কি করবো মা, বাসন তো সব মাজা করেছি কখন, কলে জলই এসেনি, ধোবো কি দিয়ে?

তেমনি রুক্ষ কণ্ঠে মহিলাটি তাড়া দিয়ে বললেন, আমার মুণ্ডু দিয়ে! দয়া করে দু'এক বালতি জল বাইরে থেকে বয়ে আনলে কি তোমার গতর পড়ে যাবে? এক দেখলে আজকে তাড়া—

সাবিত্রী নিজের মনে গজগজ করতে লাগলে—তাড়া ভারও! সেই কখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, ঘুঁজ্‌গো রাত থেকে, এক বাড়িতেই যদি এতক্ষণ কেটে যায় বাসন মাজতে, আর পাঁচটা বাড়িতে কাজ শেষ করবে কখন? সবাই তাড়া দেয়, একটু সকাল-সকাল আসতে পার না বাছা, বেলা-দুপুর করে বাসন মাজতে এলে কখনো চলে, তোমার জন্যে কি রোজ রোজ অদ্দেক বাসন মেজে নেব, কোনদিন তো রান্নাঘর ধুলে না, উনুনে নেতা বুলোলে না! এমন ঝি রেখে লাভ কি?

এক-একদিন রাগ করে সাবিত্রী বলে ফেলেছে মনিবদের মুখের ওপর, না পোষায় আপনারা নতুন লোক দেখে নিন, এর চেয়ে আগে আমি এসতে পারবুনি মা, পাঁচ বাড়ির কাজ পাঁচজনাকে দেকতে হবেনি?

কিন্তু ঐ পর্যন্ত, কেউ-ই সাহস করে সাবিত্রীকে ছাড়িয়ে দেয়নি। পাঁচ বাড়ির কাজ এখন দশ বাড়ি হয়েছে, না হলে পেট চলে না, বস্তির ভাড়া, তিন চারটি ছেলে-মেয়েকে খাওয়ান-পরান সবই প্রায় তার একার রোজগারে। ঘরের মানুষটা তো মাসের মধ্যে বিশ দিন বসে থাকে, কলকাতা শহরে ঘরামিদের কাজ কোথায় যে তিরিশ দিন কাজ করবে! তারপর বাঁশ-বাখারির যা দাম হয়েছে লোকে কাজ করাবে কি! তাই নিজে উদয়-অস্ত গতর খাটিয়ে সাবিত্রী সংসারটা মাথায় করে রেখেছে।

সব মনিব বাড়িতে ঐ একই অভিযোগ শুনে শুনে সাবিত্রীর গা-সওয়া হয়ে গেছে, মুখে আর কিছু বলে না, নিজের মনে গজগজ করে।

সাবিত্রী দুটো বড় বড় বালতি নিয়ে উঠোনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সামনে সদর রাস্তার ওফুটে একটা টিউবওয়েল আছে, বাড়তি জলের চাহিদা ওখান থেকেই মেটে।

পিছন থেকে প্রৌঢ়া মহিলাটি বললেন, গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নি যেন!

সাবিত্রী সাড়া করলে না, দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে চলে গেল।

প্রৌঢ়া মহিলার স্বরটা যেন একটু নরম হল, লক্ষ্মীটি, আজকের দিনটা চালিয়ে দে, আর তোকে বলবো না! মুখপোড়ারা রোজ রোজ এমনি দেরি করে জল দিলে কার ভাল লাগে!

সাবিত্রী ওসব কথা ঢের শুনেছে, আর শোনবার দরকার নেই! বাপ্‌রে বাছা, লক্ষ্মী সোনা কত কথাই না মনিবরা কাজ উদ্ধারের জন্যে বলে, তারপর কাজ ফুরোলে—

অবশ্য এ বাড়ির কথা আলাদা, মাইনেটা ভাল দেয়, কাজও বেশী নয়—কর্তা গিন্নী দুই ছেলে, বড় ছেলের বউ আর তার একটা ছোট্ট মেয়ে! মেয়েটা আজ কোনো মেম সাহেবদের স্কুলে ভর্তি হবে তাই গিন্নীমা ভোর থেকে উঠে তাড়া দিচ্ছেন। না হলে

রোজ যখন কাজ সেরে সাবিত্রী চলে যায়, তখন ঐ গিন্নীমা ছাড়া আর কারো বুঝি ঘুম ভাঙে না। সাবিত্রীকে বলা আছে, তুই বাপু বাসন মেজে ঐ সিমেণ্টের পোতাটার ওপর রেখে যাস, রোজ তোকে অত ডাকা-ডাকি করতে হবে না!

এখনো পাড়াটা বেশ অন্ধকার, চারপাশে বাড়ি উঠে তলার রাস্তাটা মজা নদীর মতন, প্রথম শীতের কুয়াশা আর ধোঁয়ার আবরণে ঢাকা। কিন্তু এরই মধ্যে টিউবওয়েলে বেশ ভিড় হয়েছে—দূরে থেকে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনে সাবিত্রী মনে মনে বিরক্ত হল। কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে কে জানে, কেবল এ বাড়ির জন্যে নয়, আর পাঁচটা বাড়িতে মুখ শুনতে হবে—দেরি কেন গো, ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? কেউ আবার রসিকতা করবে, কত্তা বুঝি ছাড়েনি? হাঁ, ঘুমিয়েই পড়েছিল! এক এক সময় মনে হয় একেবারে ঘুমিয়ে পড়তে পারে না সে, তা হলে আর কাউকে কৈফিয়ত দিতে হয় না! ঝি-বৃত্তির কি জ্বালা মাগো!

কলকাতায় এখন ভিড় ঐ জল-বহ ভারীদের। সাবিত্রীর মত ওরাও রাত থেকে উঠে বাঁকে করে জল বয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়। কর্পোরেশন তো জল দেয় না, ওদেরই এখন পোয়া-বারো! একটা বাঁক আর দুটো কেনেস্তারা টিন, ব্যবসায় আর কোন মূলধন দরকার নেই; দিব্যি মজা, দিনে দশ বার টাকা রোজগার!

বাঁকে করে বাড়ি বাড়ি জল দেবার কথা সাবিত্রী একদিন মন্মথকে বলেছিল। শুনে মন্মথ মারতে উঠেছিল, কি বললি, বাঁকে করে জল বইবো! কেন শুনি?

কেন আবার? ওজগার হবে, চল্লিশ-পঞ্চাশ পয়সা করে এক ভার জল! বসে আছিস, নয় ঐ কাজ করবি! ক্ষেতিটা কি?

উদাত্ত হাতটা নামিয়ে নিয়ে বালিশের তলা থেকে বিড়ির কৌটো আর দেশলাই বার করে মন্মথ বললে, সে তুই কি বুঝবি, বাবুর বাড়ি বাসন মেজে মেজে তোর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, নালে ওই ভারীদের কাজ তুই আমাকে করতে বলিস! জানিস ঘরমীর কাজে কত মান্যি খাতির!

রেখে দাও তোমার মান্যি খাতির! মাসের মধ্যে পাঁচ দিনও কাজ জোটে না। বাসন মেজে মেজে পরিবারের গতর কালি হয়ে গেল সেদিকে খেয়াল নেই! সব জেতের লোকেরা করে, আর বাঙালীরা বসে বসে, মাগের ওজগারে খায়! কত মানী সব জানা আছে!

বিড়ি ধরিয়ে কোলের কাঁচটাকে পা দিয়ে ঠেলে মন্মথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিকুচি করেছে, তোর রোজগারে আমি পেচ্ছাব করে দিই।

সাবিত্রী আর কোনদিন কাজকর্মের কথা বলেনি মন্মথকে; কাজ করুক আর নাই করুক, ঘরে বসে থাকলেও অনেক উপকার। মেয়েমানুষ একলা থাকার কি জ্বালা সাবিত্রীর জানা আছে, সাধে আর মন্মথকে ডেকে এনে ঘরে ঢুকিয়েছে, বস্তিতে কত রকমের যে উটকো লোক বাস করে তার ঠিক নেই! মন্মথ আসা থেকে সাবিত্রী নিশ্চিন্ত, একটা ভাবনার শেষ!

জল নিয়ে এসে সাবিত্রী দেখে বড় মেয়ে আঙুরবালা কখন এসে সিমেণ্টের পোতাটার ওপর বসে আছে।

সাবিত্রী মেয়েকে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠলো, তুই কখন এলি? কার সঙ্গে এলি?

মেয়েটা কোন উত্তর দিলে না, সাবিত্রীর মুখের দিকে ঠায় চেয়ে রইল। সাবিত্রী মেয়ের হাত ধরে সিমেণ্টের পোতা থেকে নামিয়ে মারের উপক্রম করে বললে, সেই বলবি না, কার সঙ্গে এলি?

আঙুরবালা কাঁদতে কাঁদতে বললে, একা এইচি!

কেন, কেন? সাবিত্রী রাগে ভয়ে মেয়ের গালে এক চড় মেরে বললে, অ্যাঁ, যদি গাড়ি চাপা পড়তিস! একটুখানি পথ অ্যাঁ?

আঙুরবালা কাঁদতে কাঁদতে বললে, তুই কেন আমায় নে এলি না? বলিছিলি—

মেয়েকে কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে সাবিত্রী বললে, কি বলিছিলুম?

ছোট এতটুকু মেয়ে হলেও বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে আঙুরবালা, চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, ইস্কুলে দিয়ে আসবি না?

সাবিত্রী কপাল চাপড়ে বললে, হা আমার কপাল, মেয়ে সেই কথা মনে করে রেখেছে! ইসকুলে পড়বে, শখ কত!

কলতলায় চেঁচামেচি শুনে এ বাড়ির গিন্নী এবং একজন আত্মীয়াকুটুম্ব বেরিয়ে এসে রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েচে রে সাবিত্রী, সকাল থেকে কার সঙ্গে চেঁচামেচি করচিস? জানিস আজ বাড়িতে একটা শুভ কাজ—

সাবিত্রী ওঁদের সাক্ষী মেনে বললে, দেখুনে না মা মেয়ের সাহস, সেই পেয়ারা বাগান থেকে একা এয়েচে, আবার বলে কি না ইসকুলে দিয়ে আয়! কি জ্বালা!

উভয়ে তখন ছোট্ট মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, কে রে সাবিত্রী, মেয়েটা কে?

কে আবার মা, আমারই পেটের জ্বালা!

আত্মীয়া কুটুম্ব মহিলাটি বললেন, ঠিক আমাদের অনুর মতন! কত বয়েস রে তোর মেয়ের?

সাবিত্রী বললে, এই সাত চলচে মা!

গিন্নী হঠাৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, বেশ ভদ্রলোকদের মত বয়েসের হিসেব রাখিস তো! অত বড় মেয়ে কিনা সাত!

সায় দিয়ে আত্মীয়া বললে, আমিও তাই ভাবছিলুম, আমাদের অণুর চেয়ে অনেক বড়!

বড় হোক ছোট হোক, কিন্তু তাদের অণুর চেয়ে যে সুন্দর দেখতে সে বিষয়ে গিন্নীমা এবং তাঁর আত্মীয়ার মনে কোন সংশয় নেই। মনে মনে তাঁরা কি ভাবছেন, গোবরে পদ্মফুল!

গিন্নীমা বললেন, তা মেয়েকে ইস্কুলে দিস্‌নি কেন? আহা, পড়তে যখন চায়—

সাবিত্রী মেয়েকে আর এক দফা শাসন করে বললে, পেটে ভাত জোটে না, নেকা-পড়ার বায়না—জ্বালিয়ে খেলে! পয়সা কোথায় যে ইস্কুলে পড়বে মা?

কেন? গিন্নীমা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, করপোরেশনের স্কুলে পড়বে, মাইনে লাগবে না!

দাতব্য চিকিৎসার কথা সাবিত্রী জানে, কিন্তু দাতব্য শিক্ষার কথা কিছু জানে না, শোনেনি কখনো বোধ হয়। অবাক হয়ে বললে, বিনা পয়সায় নেকাপড়া হয় না, শুনি নি তো! কোথাকে সে ইস্কুল?

গিন্নীমা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, কোথায় আবার, সব জায়গায় অলিতে-গলিতে! তোরা খোঁজ রাখবি না তা কি হবে!

সত্যিই অপরাধটা যেন তারই, সাবিত্রী মেয়েকে বললে, শুনলি তো, এবার তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেব।

গিন্নীমার আত্মীয়া মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মাইনে লাগবে না, তা হলেই তো আর হলো না, বই-খাতা-পেনসিল আছে— তার খরচ কম না!

তাই তো, সাবিত্রী সে কথা ভাবেনি, হতাশার সুরে বললে, নেকাপড়া চাড্ডিখানি কিনা, জানি তো ভদ্দরলোকেরা কত কত টাকা খরচ করে ছেলেমেয়েদের নেকাপড়া শেখাচ্ছে! তাই তো বলি যে, পয়সায় পড়বি সে পয়সায় পেটে দুটো খাবি, ফাইফরমাস খেটে দুটো পয়সা রোজগার করবি, তা নয় অসম্ভব বায়না দেক দিকি মা? নেকাপড়া!

বলতে বলতে এ বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি, যাকে নিয়ে এত ব্যবস্থা, যার ইংরেজী স্কুলে ভর্তির জন্যে সকলে উত্তেজিত এবং উদ্বিগ্ন, কলতলার রোয়াকের কিনারে এসে দাঁড়াল।

গিন্নিমা হইহই করে উঠলেন, আত্মীয়া মহিলা ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন, আর সাবিত্রীর মেয়ে আঙুরবালা কলতলা থেকে অবাক দৃষ্টিতে সমবয়সী মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে হয়তো ভাবলে, কি সুন্দর পোশাক পরেছে মেয়েটা, পুতুলের মতন, ইস্কুলে যেতে গেলে অমন পোশাক পরতে হয় বুঝি!

এ বাড়ির অণু নামে মেয়েটি কোলে চড়ে জিজ্ঞেস করলে, ও কাঁদছে কেন? কি হয়েছে?

আত্মীয়া মহিলা বললেন, তোমার মত ইস্কুলে পড়তে চাইছে!

অণু বললে, পড়ছে না কেন?

কারণটা সবাই জানে, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে প্রকাশ করলেন না। কেবল সাবিত্রী এক সময় মেয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিন্ন বাড়িতে কাজ করতে যেতে যেতে বললে, কাঙালের ঘোড়া রোগ!

তারপর এক সময় পেয়ারা বাগান বস্তিতে ফিরে সারা দিন আঙুরবালার মনে হয়েছিল, স্কুলে পড়তে যাওয়া কত আনন্দের, মার মনিব বাড়ির সমবয়সী মেয়েটির মত সেও যদি একদিন অমন সেজেগুজে স্কুলে যেতে পারত কত মজা হত; বস্তিতে তার একদম খেলতে ভাল লাগে না! ইচ্ছে করে—

সাবিত্রীবালা তাড়না করে মেয়ের অসম্ভব বায়না যখন থামাতে পারেনি তখন মেয়েকে কোলের মধ্যে চেপে ধরে নানাভাবে বুঝিয়েছে, ও'রা ভদ্দর নোক, বড় নোক, ও'দের মতন কি আমাদের নেকাপড়া করতে আছে? দেখছিস না তোর বন্ধু চাঁপা, বকুল, বেদানা, খেঁদি এরা কি নেকাপড়া করে, না ইস্কুলে যায়? আমাকে তাই দেখ, বাপের জন্মে কখনো ইস্কুলে গেইচি? তোর বাপকে শুধো না, বিশ্বাস না হয়!

ভোর রাত্রে কচিটার মুতের কাঁথা বদলে দিতে গিয়ে সাবিত্রীবালার খেয়াল হল, আঙুরবালা প্রবোধ মানেনি, ঘুমের মধ্যে যেন এখনো ফোঁপাচ্ছে। কি মেয়েরে বাবা, বাপের জন্মে সাবিত্রী দেখেনি ইস্কুলে যাবার জন্যে বায়না করে; তারা কই কখনো তো করেনি।

হঠাৎ কেমন মনটা খারাপ হয়ে সাবিত্রীবালার মেয়েটার জন্যে বড় মায়া হয়; নিজেকে সে বড় অপরাধী মনে করে, সত্যিই তো লেখাপড়া শেখা তো খারাপ নয়! কিন্তু—

সাবিত্রীবালা জেগে থেকে আবোল-তাবোল ভাবতে চেষ্টা করে তাদের সাধ-আহ্লাদ কি এই ঘর, এই দোর, এই অন্ধকার বস্তি জীবন? এর থেকে কি কোনদিন তাদের উদ্ধার নেই? আঙুর-বালার বায়নার কি কোন মানে নেই?

হয়তো তাই, নাইতে-খেতে মেয়ে

একদিন ... এ বায়না ভুলে যাবে। তারপর একদিন বড় হবে, ঘর-সংসার যদি কপালে থাকে করবে, নয়তো তার মত দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে করে শেষ হ'য়ে যাবে!

আবার কি, যত সব বড়মানুষী শখ! হঠাৎ সাবিত্রীবালার ইচ্ছে করে মেয়েটাকে মেয়ে খুন ক'রে ফেলে, ঘুচিয়ে দেয় তার লেখাপড়ার 'আকিংখা!' ঘরামীর মেয়ে বড়-মানসের মত চাল-চলন!

সাবিত্রীবালা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, কুলায় ভোরের আলো চোখে-পড়া পাখিদের উসখুস মত। আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবে, ঘড়ি না থাকলেও সাবিত্রীবালা জানে চারটে কখন বেজে গেছে, কতদূর থেকে দু' একবার মোরগ যেন ডেকেছে, সবজীর ট্রেন শেয়াল-দায় পেঁাছে গেছে।

ঘরের বাইরে এসে টিনের দরজাটা ঠেলে বন্ধ ক'রে সাবিত্রীবালা চেঁচিয়ে বললে, সব অইল, দেইখো! ওগো শুনছো—

মন্মথ কুটি ঘরের ভেতর থেকে সাড়া দিলে, হুম-ম্!

আবার সাবিত্রীবালা বললে, একটু খেয়াল রেইখো, সজাগ থেইকো!

আর মন্মথ সাড়া করলে না। সাবিত্রী-বালা গজ্‌গজ্ করতে করতে বস্তি থেকে বেরিয়ে এল, বড় রাস্তার মোড়ে চৌমাথায় এসে পরনের কাপড়-চোপড় সামলাতে সামলাতে খানিক থমকে দাঁড়িয়ে যেন অবাক বিস্ময়ে চারিদিক চেয়ে দেখলে, আকাশে চাঁদটা আজ জ্বল্ জ্বল্ করছে রাস্তার আলোগুলোও জ্বলছে; তাহলে কি ভোর হয়নি, কাজে যাবার সময় পেরোয়নি? এত সকালে মনিববাড়িতে দোর খোলা পাবে তো? এ রকম ভুল সাবিত্রীর হয়েছে প্রথম প্রথম কলকাতায় ঝি-খাটতে এসে, ক...ন রাত দুপুরে এসে মনিববাড়িতে কড়া নেড়েছে, মনিবের মুখ-ঝামটা খেয়ে বস্তিতে আবার ফিরে গেছে! এখন অবশ্য 'টাইমের' ভুল সাবিত্রীর বড় একটা হয় না, রাত থাকতে ঘুম ভাঙলেও সে বুঝতে পারে, ভোর হ'তে আর কত দেরী!

সময় মত সব বাড়ির কাজ বজায় রাখে বলেই তো তার এত দাম, সাবিত্রী, সাবিত্রী সবাই করে! নিজের কাজের দাম বুঝলেও সময় সময় সাবিত্রীর কেমন ভয় হয়, প্রতি দিনের কাজকর্মের প্রতি কেমন যেন বিতৃষ্ণা বোধ হয়, ইচ্ছে করে সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়! কিন্তু কোথায় পালাবে? আবার সেই বাবুদের বাড়ি ঝি-খেটে বেড়ায়, তাদের কেউ মুখ করে, কেউ ভাল বলে, কেউ দয়া করে মাইনের ওপর কিছু উপরি দেয়, মাথার তেল কি গায়ে মাথা সাবানের টুকরো, কি খাবার জন্যে আনাজের খোসা। সব নিরুৎসাহ, সব ভয়, সব বীতরাগ জীবনের

প্রতি হয়ে হয়ে যায়, মন দিয়ে কাজকর্ম করে সাবিত্রীবালা!

আজ আঙুরবালা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে, কি অসম্ভব বায়না নিয়েছে, চাঁদ ধরার মতন, ইস্কুলে যাব, নেকাপড়া শিখবো ভদ্দলোকদের মেয়েদের মত। আর কিছু তো চাইতে পারতিস, তা নয় নেকাপড়া! সে সাধ কি দিয়ে মেটাবে? ঐ তো দেখছে লেখাপড়ার রকম। অতটুকু মেয়ে অনুভা তার জন্যে বাড়িসুদ্ধ সবাই ব্যতিব্যস্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। গিন্নীমা, বউমা, বুড়োকর্তা হইহই করছে—নাতনী ইংরেজী স্কুলে পড়ছে বলে কথা! আবার যে-সে স্কুল নয়, মেম-সাহেবদের স্কুল! গিন্নীমা বলেন, সব টাইম মত চাই, একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই! সাবিত্রী, তুই আর একটু সকাল সকাল আসিস, নটার মধ্যে অনুভা স্কুলে চলে যাবে, তারপর তার বাবার আপিস, সনতের কলেজ! বুঝলি না?

সব মনিববাড়িতে সব রকমের তাড়া। উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সাবিত্রীর নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর নেই, কেবল খেটে মর, তোমাদের বাড়-বাড়ন্ত হোক তোমরা বড় হও, আমরা যেমন আছি তেমনি থাকি! তোমরা লেখাপড়া কর, চাকরি কর আপিস আদালত যাও, গাড়ি-ঘোড়া চড়—

বড্ড মনে পড়ে গেল—লিখাপড়া শিখলে কি হয়? কথাটা ঘুরে ফিরে সাবিত্রীর মনের মধ্যে ফিরতে লাগল, অনেকদিন আগের এক স্মৃতি মনে উঁকি দিয়ে তাকে যেন উতলা করে তুললে। সাবিত্রীর মনে পড়ে, তখন সে ঐ আঙুরের মত ছোট ছিল। সকালে উঠে তারা গ্রামের গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়তে যেত, কি পড়তো, না পড়তো মনে নেই, কিন্তু একটা ছড়ার কথা তার এখনো মনে আছে, কানে এখনো লেগে আছে।—লেখাপড়া করে যে, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে! খুব বজ্জাত তারা!

হাতি-ঘোড়া, মিছে কথা! সাবিত্রীর পরখ করে দেখার সুযোগ হয়নি কোনদিন। ঝি-খাটতে খাটতে গতর কালি হয়ে গেল! ঐ তো মন্মথ নাকি নেকাপড়া কিছু জানে বলে, সে কত গাড়ি-ঘোড়া চড়ছে? মাগের রোজগারে খেয়ে ঘরে বসে বসে লেজ নাড়ছে।...

দুমদাম করে বাসনগুলো ফেলে ছড়িয়ে সাবিত্রী যেন নিজেকে শাসন করলে, নেকাপড়া শিখবে, কত শখ যায়! দেব বাবুদের বাড়ির কাজে ভিড়িয়ে তখন বুঝবে ঠেলা!

বাসনের পাহাড় দেখে সাবিত্রীর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, আজ এ বাড়িতে দুগুণ বাসন বার করে নিয়েছে মাজা করার জন্যে! গতর সস্তা দেখেছে, দেবে ভেঙে-চুরে!

শব্দ শুনে [illegible] বাড়ি এক-[illegible] আর এলেন, কি রে সাবিত্রী, বাসনগুলো ঠুকে ঠুকে ভাঙছিস নাকি?

সাবিত্রী নিজের মনে [illegible] লাগল। এত বাসন কে [illegible] বাসনের পাহাড়!

অনুভার ঠাকুমা বললেন, একটু দেখে শুনে মাজবি না তো আর কি করবি?

উচ্চকণ্ঠে সাবিত্রী উত্তর করলে, দেখে-শুনে মাজ্‌চি না তো আর কি করচি?

গিন্নীমা নরম সুরে বললেন, তাই বলছি—জিনিসপত্তরের বড্ড দাম রে!

সাবিত্রী যেন জোর পেয়ে যায়, বললে, রোজ রোজ আপনারা বাসন বাড়াবেন, আর সব বাড়ির কাজ কখন করি? এক বাড়িতে সারাদিন কাটিয়ে দিলে চলবে!

গিন্নীমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, রোজ রোজ কি বলচিস রে, আজই না কেবল দু একখানা বাড়তি বাসন [illegible] হয়েছে মা? তুই যে [illegible] বসে আছিস!

সাবিত্রী [illegible] মুখ, যাই [illegible], আমি আর [illegible] অন্য লোক দেখো!

গিন্নীমার সুরে আরো [illegible] এল, [illegible] বললেন, [illegible] টা দিন [illegible] কি করবো [illegible], হঠাৎ [illegible] তো আর তাড়িয়ে দিতে [illegible] আদর-আপ্যায়ন তো করতে হয়!

তা তো হয়, কিন্তু তার [illegible] এত বাসন [illegible] বার করতে হবে? [illegible] ঝি পেয়েছেন কিনা!

গিন্নীমা কারণটা অতঃপর [illegible] বললেন, অনুভার নতুন স্কুলের দিদিম[illegible] কাল রাতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে গেছেন, [illegible] পোলাও মাছ-মাংস অনেক কিছু হয়েছিল, সেগুলো দেওয়া-নেওয়ার জন্যে বাসন চাই না? হাতে-পাতে তো আর ভদ্রলোকদের

দেওয়া যায় না!

তাতে তার কি, সাবিত্রী নিজের মনে গজ্‌রাতে থাকে।

গিন্নীমার হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়, বেশ আপ্যায়নের সুরে বললেন, তোর মেয়ের জন্যে খাবার রেখেছি রে দালানের ওখানে চাপা দেওয়া আছে, নিয়ে যাস্ মনে করে—ভাত রুটি মাছ মাংস গুছিয়ে রেখেছি, নিয়ে যাস্, ভুলে যাসনি যেন!

ঘৃণা! সাবিত্রীর মনে হল, আহা কত আদিখ্যেতা, কাজ উদ্ধারের জন্যে! পাতের এঁটোকাটা দিয়ে আপ্যায়িত করছেন! কই, রাতের বেলা তো বলতে পারলেন না, মেয়েকে সঙ্গে করে আনিস্ সাবিত্রী, খেয়ে যাবি! এখন উচ্ছিষ্ট খাইয়ে মাথা কিনতে চাইছেন।

কেন ভিখিরী নাকি সে, বললেই অমনি পাত-কুড়নো জিনিস নিয়ে যাবে? ইচ্ছে হয় ফেলে দাও, সাবিত্রী কখনো নিয়ে যাবে না!

সাবিত্রী মাথা নিচু করে বাসন মাজতে মাজতে আপন মনে গজ্ গজ্ করছিল, লক্ষ্যই করেনি কখন আঙুরবালা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল। অনুভার ঠাকুমা কি একটা বাসন-মাজার জন্যে তাড়া দিতে এসে দেখতে পেয়ে বললেন, ওরে সাকি, দেখ তোর পেছনে কে দাঁড়িয়ে আছে? তোর মেয়ে—

সাবিত্রীবালা পিছন ফিরে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়ের গালে ছাই-পাঁশ মাখা হাতে এক চড় কষিয়ে বললে, ফের এইচিস! হারামজাদি, পই-পই করে বললুম—

আঙুরবালাকে দেখিয়ে দিয়ে গিন্নীমা যেন লজ্জায় পড়েছেন, বললেন, ছি ছি মেয়েকে মারলি কেন? আহা, বেচারা চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল, কিছু তো করেনি!

সাবিত্রী ঝাঁঝিয়ে উঠলো, করেনি? জ্বালিয়ে খেলে, প্রাণ আমার বার করে দিলে, বায়না বায়না! অত বড় মেয়ে বোঝালে বোঝে না!

গিন্নীমা সস্নেহে ডাকলেন, আয় তুই আমার কাছে আয়—

সাবিত্রীবালার মাথায় যেন খুন চেপে গেছে, মেয়েকে আরো ঘা কতক চড়-চাপড় দিয়ে চুলের মুঠি ধরে বললে, না, খবরদার যাবি না হারামজাদি বেহায়া! এখানে আদিখ্যেতা করতে এয়েচো! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!

গিন্নীমা বেশ ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন, শুধু শুধু তুই ওকে মারচিস্ কেন? আচ্ছা মা তুই—

মেয়েকে ঠেলে দিয়ে সাবিত্রী বললে, আমরা আর কি মা! ভদ্দরলোকদের মতন তো খাওয়াতে-পরাতে লেকাপড়া করাতে পারি না! কুকুর-বেড়ালের অধম। বেরো বেরো! বেরো!

আঙুরবালা মায়ের রুদ্রমূর্তি দেখে মার খেয়ে কাঁদতে ভুলে গেছে যেন, ভ্যাবা-চাকা খেয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছুটে পালাবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে ভাবতে পারলে না।

এদিকে গিন্নীর সম্মানে লেগেছে বুঝি। তিনি রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, খুব যে চেটাং চেটাং করে বলছিস, ভদ্দরলোক ছোটলোক! কেন তোকে কি বলা হয়েছে? তোর মেয়েকে তুই মারিস্ কাটিস্ আমার কি, কিন্তু এখানে ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি—

এতক্ষণে সাবিত্রীবালা নিজের হট-কারিতায় যেন লজ্জা পায়। মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে বাসন-মাজায় মন দেয়। চোখ জ্বালা করে দুফোঁটা অশ্রু যেন হাতের ওপর গড়িয়ে পড়ে। মেয়েকে কেন সে মারল অমন নিষ্ঠুরের মত বুঝতে পারে না—

মনিববাড়ির উচ্ছিষ্ট খেতে এসেছিল বলে, না লেখাপড়ার বায়না নিয়ে ভদ্রলোক হতে চেয়েছে বলে?

ইতিমধ্যে কলতলায় মার-খোর চেঁচামেচি শুনে বাড়িসুদ্ধ সবাই উঠে পড়ল—কল-তলার সামনে এসে জড় হল। গিন্নীমা সবাইকে ঘটনাটা বললেন, সাবিত্রীবালার আস্পর্ধার কথাও ব্যাখ্যা করলেন; আসলে অনুভা বড় স্কুলে পড়ছে বলে ঐ ঝি-মাগির হিংসে হয়েছে! কিছু করতে পারে না তো, তাই কচি মেয়েটাকে ধরে ধরে দেখিয়ে দেখিয়ে তার সামনে ঠেঙাচ্ছে! ছোটলোক আর কাকে বলেছে!

বড় যাঁরা তাঁরা হয়তো ব্যাপারটা বুঝলেন, কিন্তু অনুভা ছোট, সে কিছু বুঝতে না পেরে রোয়াদ্যামানা শিশু-কন্যাটিকে লক্ষ ক'রে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, ও কাঁদছে কেন? ওর কি হ'য়েছে!

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কেউ প্রয়োজন বা আবশ্যক বোধ করলেন না।

রোজকার মতন সাবিত্রীবালা ঝুঁঝকো রাত থেকেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। শীতের রাত শেষে পেয়ারাবাগান বস্তিটা যেন নিঃঝুমে মেরে আছে। এক নজরে ঘরের মধ্যে সবকটাকে সাবিত্রী দেখতে পায় না, মন্মথ কাঁথার সবটাই দখল করে নিয়েছে। ছেলেমেয়েগুলোর গায়ে চাপা নেই। কি স্বার্থপর লোক রে বাবা! আঙুরটার শীত করেছে বেশী, কেমন কুঁকড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সাবিত্রীর বড় মায়া হল, নিজের কাঁথাটা নিয়ে মেয়ের গায়ে চাপিয়ে দিলে, আহা ঘুমচ্ছে ঘুমক! না, ওকে আর ডাকবে না—তুলবে না—

দরজা খুলে বাইরে বেরুতে সাবিত্রী যেন যেন হোঁচট খেল, মুখে চোখে কোথা যেন আলো এসে পড়ল। শীতের শেষ রাতে চাঁদটা কখন উঠেছিল কে জানে। ডুবে যাবার আগে তাদের বস্তিতে [illegible] দিয়ে যাচ্ছে। কি ভেবে সাবিত্রী হেসে মুড়িসুড়ি দিয়ে কাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। (চাঁদ মামা, দয়া করে তোমার আর গরীবের ঘরে আলো দেখাবার দরকার নেই!)

বাসন মাজতে কত বেলা হয়েছিল সাবিত্রীবালার খেয়াল ছিল না। অনুভার ঠাকুরমার ডাকে খেয়াল হল। চোখ তুলে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে, আমাকে বলচো মা?

গিন্নীমা বললেন, হাঁরে কই, মেয়েকে কাজে আনলি না?

সাবিত্রী বাসন মাজতে মাজতে বললে, না মা, সে এখনি ইস্কুলে পড়া করবে।

গিন্নীমা আর কিছু বললেন না, মনে মনে হেসে বোধ হয় নিজের ঘরে চলে গেলেন খবরটা সবাইকে জানাবার জন্যে: ঠিকে ঝি-এর মেয়ে আঙুরবালা ইস্কুলে পড়ে বাবুদের মেয়ের মত মানুষ হবে! কত সাধ দেখব কালে কালে!

পরিস্থিতি

আজকাল সঙ্গীতজগতে নানারকম চাহিদা আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে "লিরিসিস্ট" অর্থাৎ যাকে বলে গীতিকার; সেই সঙ্গে আরও একটি পদের প্রয়োজন হয়—সেটি "কম্পোজার" অর্থাৎ সুরকার। একজন যেমন দরকার পড়ে তেমন গান লেখেন, আর একজন তাতে সুর আরোপ করেন। সেরকম গুণের অধিকারী হলে এক ব্যক্তিই যুগপৎ দুটি পদের অধিকারী হতে পারেন। সম্প্রতি কয়েকজন হবু গীতিকার তথা সুরকারকে প্রশ্ন করেছিলুম—"আপনারা কি আদর্শ নিয়ে লেখেন বা এমন সুর প্রয়োগ করেন?" উত্তরে অধিকাংশই নীরব রইলেন. কেউ কেউ বললেন—"ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন অনুসারে আমরা গান লিখি বা সুর দিই।" সেই প্রয়োজনটা কি? বলা বাহুল্য, সেটা পণ্য সম্বন্ধীয় যাকে ইংরাজিতে বলে কমার্সিয়াল। এমন উত্তর বা ইঙ্গিত কারুর কাছ থেকে মিলল না যে এই অমর গীতিকারের তিরোধান সত্ত্বেও সঙ্গীত রচনা থেমে থাকবে না, যাঁর প্রাণে গানের সাড়া জাগবে তিনি গান লিখবেন, যাঁর মনে সুর আসবে তিনি সুর দেবেন। আর্টের দিক থেকে সঙ্গীতকে উপলব্ধি করবার কথাটা যেন আর কারুর চিন্তার মধ্যে নেই—সংগীত এখন একটা "কমোডিটি" বা পণ্য যা চাহিদা অনুসারে রচিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু চাহিদা নামক বস্তুটি আগেও ছিল এবং সেটি নিতান্ত অসার ছিল না। এক সময় হেমেন্দ্রকুমার, নজরুল ইসলাম, অজয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি বহু গীতিকার গান লিখেছেন, হিমাংশুকুমার দত্তের মত ব্যক্তি সুর দিয়েছেন। এঁরা সকলেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তথাপি চাহিদা মিটিয়েও আরও কিছু করছিলেন—সেটি হচ্ছে নতুন সুস্থ রসসম্মত চাহিদার সৃষ্টি। আজকালকার গীতিকার তথা সুরকারের মত নিয়োগকারীর অঙ্গুলি হেলনে তাঁরা চলেননি, যদিচ অনেক ক্ষেত্রে আপোস করেছেন। আন্তরিক প্রেরণা যে রচনায় নেই সে রচনার দীনতা পরিস্ফুট এবং সে রচনা কালজয়ী হওয়া দূরের কথা তার আয়ু নিতান্ত স্বল্পকালেই নিঃশেষ হয়ে যায়। গীতিকার বা সুরকারের পক্ষে সবদিক বজায় রেখেও আর্ট সৃষ্টি করা যায় না একথা বিশ্বাসের অযোগ্য, প্রতিভা থাকলে তাঁর স্ফুরণ অবশ্যম্ভাবী সে যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। প্রতিভার অঙ্ক প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে এমন বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হয় না। আসলে মনে হয় অর্থই সব মহলে অনর্থ বাধিয়েছে এবং এমন একটা বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ভিত্তি-

গানের আসর

স্থাপন করেছে যে কাব্যগত প্রেরণা থেকে যে সৃষ্টি তা কোনক্রমেই খাতার বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার নয়। অতএব যদি কোনও সোনালী অবসরে কোনও গীতিকার তথা সুরকারের মনে একটা একান্ত আপন স্বকীয় রচনার প্রেরণা জাগে তাকে তৎক্ষণাৎ অন্য খাতে প্রবাহিত হতে দেওয়াটাই তিনি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন।

বাংলা গানের অপর একটা দিক আছে, সেখানকার মনোভাবও বেশ চমকপ্রদ। এ ক্ষেত্রে অনেক গুরু, অনেক প্রতিষ্ঠান, অনেক আদর্শের উক্তি। এখানেও সঙ্গীত পণ্যগত চাহিদার পিছনে আবর্তিত হচ্ছে। আমাদের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত সঙ্গীতকে এঁরা পুরোপুরি পণ্যের স্তরে এনে ফেলেছেন। অথচ ব্যাপার এই যে, নিজেদের ট্রেডকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাকে এঁরা প্রচার করেন মহান আদর্শ বলে। সবাই তাঁদের মেনে চলতে বাধ্য, মনোভাবটা এই-রকম। এঁদের মধ্যে যেটা মর্মান্তিক কুৎসিত সেটা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি অসহনীয়তা এবং সঙ্গীতে ভেদনীতিকে জীইয়ে রাখা। ওর কাছে শিখতে যেও না, আমার কাছে এসো; অমুক প্রতিষ্ঠান অতিশয় অযোগ্য আমার প্রতিষ্ঠানে এসো; অমুক স্বরলিপির কিছু জানে না, আমার স্বরলিপিটা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য—অতএব আমারটাই অনুসরণ কর; আমি নাম করেছি সুতরাং যে কোনও সুপরিচিত গানের কাঠামোটাই আমি আমার বুদ্ধি অনুযায়ী পালটে দেব এবং অনুরূপ বুদ্ধিমানদের সহায়তায় দল বেঁধে বাহবা আদায় করাবই। আমি যা শেখাই তার বাইরে আর কিছু শিখলে (এমনকি শুনলেও) সেটা মহাপাতক বলে গণ্য হবে (নইলে আমার ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি ঘোরতরভাবে মার খাবে)। যে আমাকে মানবে না তাকে আমি স্বনামে, বেনামে, শিষ্যপরম্পরা গাল দিয়ে চোদ্দপুরুষ সহ উদ্ধার করে দেব। এই হচ্ছে এঁদের আদর্শবাদের নমুনা।

কিন্তু পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন স্বয়ং সংগীত সরস্বতী। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর তাবৎ সংগীত একান্ত অনাদৃতভাবে অবলুপ্তির পথে। এখানেও কি নিশ্চিন্দি আছে? তথাকথিত পুরাতনী গাইয়েরা বা ভক্তিগীতির প্রচারকেরা একটা "বাঙালীর গান" জোগাড় করে পুরোনো গানগুলো একেবারে কলি ফিরিয়ে গেয়ে রাতারাতি বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ভক্তের অভাব এ পোড়া দেশে হয় না, তাঁদেরও নেই। যিনি যেভাবে পারছেন পদাবলী কীর্তন গেয়ে এক একটা ধারা স্থাপন করবার প্রয়াসী হয়েছেন। বাংলা গানকে সামগ্রিক-ভাবে দেখতে একজনও উৎসুক নন। শিক্ষার জন্যই বাংলা গানকে বোঝবার বা জানবার চেষ্টা এ যুগে একটা মূর্খের প্রচেষ্টারই নামান্তর। কেউ একবারও মনে করেন না যে, বাংলা গানকে সম্পূর্ণভাবে না উপলব্ধি করলে কোনও শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। পরন্তু নিজেরটিকে বাঁচিয়ে অপর শ্রেণীর গানকে কষে গালমন্দ করাটাই হচ্ছে সঙ্গীতশিক্ষার উৎকৃষ্টতম পলিসি। প্রতিটি মোরগ যেমন নিজস্ব সঞ্চয়ের স্তূপ থেকে আস্ফালন করে, এঁদের গুরুগিরি এবং মোড়লী হচ্ছে তেমনি।

আরও আছে, সেটা ডকটরেটের থিসিস। প্রযুক্ত সঙ্গীতকে একেবারে পরিহার করে সাহিত্যিক আলোচনা দ্বারা সঙ্গীতবিষয়ক ডকটরেট অর্জন করা কঠিন নয় এবং সেদিকেই সঙ্গীত সাহিত্যের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই দুর্লভ আলোচনা ফেনিল হতে হতে পাঁচ শত পৃষ্ঠায় ব্যাপ্ত হলেই বা ক্ষতি কি?

শার্ঙ্গদেব

॥ উনসত্তর ॥

এদিককার জমিতে ভাল আখ হয় না। যৌবনকালে ব্রজগোপালের খুব প্রিয় ছিল আখ। বলতেন—মিষ্টি লাঠি। কেষ্টঠাকুরের মতো ধুতিটা কোমরে বেঁধে, খালি গায়ে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁ চলে যেতে যেতে যৌবন বয়সে কতবার ক্ষেত থেকে আখ ভেঙে নিয়েছেন। চিবোতে চিবোতে লম্বা পথ ফুরিয়ে গেছে। এখন দাঁত নেই বলে চিবোনোর প্রশ্নই ওঠে না। তবু রান্নাঘরের মুখোমুখী একটু জমিতে কয়েকটা আখ গাছ লাগিয়েছিলেন। ভাতের ফ্যান, তরকারির খোসা এই সব দিয়ে দিয়ে বেশ ফনফনে হয়ে উঠেছে গাছগুলি। গোড়াগুলো বাঁশের মতো মোটা। ষষ্ঠীচরণ বুক দিয়ে দাদুর আখ গাছ পাহারা দেয়, সেও আবার নিজের বিবেচনা মতো। পচা গোবর, খোল যা পারে এনে আখের গোড়ায় দেয়। জমি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করেছেন ব্রজগোপাল। আপেল ন্যাসপাতি লাগিয়ে দেখেছেন, ডালিম লাগিয়েছেন, কমলা লেবুও। ষষ্ঠীচরণ সে সবও আগলে আগলে বেড়ায়। তার ধারণা, দাদুর সব গাছেই ফল ফলবে। সে খাবে। পেয়ারা গাছটায় এবার ঝেঁপে ফল ধরেছে, দিন রাত পাখি-পক্ষীর অত্যাচার, দু'চারটে হনুমান আছে, তারাও এসে হামলা করে। ষষ্ঠীচরণ লাঠি হাতে দিন রাত পাহারা দেয়। বহেরুর অন্য সব নাতিপুতির সঙ্গে সেই কারণেই তার ঝগড়া হয় রোজ। দৌড়ে এসে দাদুকে নালিশ করে—ও দাদু, অমুক আমাকে এই বলল, কি সেই বলল।

ব্রজগোপালের আর তেমন মায়া হয় না ফলপাকুড়ের প্রতি। তিনি বলেন—তা পেয়ারাগুলো যতদিন কচা ছিল ততদিন পাহারা দিয়েছিস, এবার সব পেকে উঠছে, এখন সবাইকে দিবি। দেখিস, যেন গাছ না ভাঙে।

ষষ্ঠীচরণের সে কথা পছন্দ নয়। সে বলে—ও তো তোমার গাছ, ওরা খাবে কেন?

ব্রজগোপাল বলেন—তুই বড় কৃপণ মানুষ হবি তো! যা ব্যাটা, গিয়ে পেয়ারা পেড়ে ওদের সব হাতে হাতে দে। নিজে গাছে উঠবি না। বরং কালিপদকে বল, পেড়ে দেবে। কয়েকটা পাকা পেলে আমাকে এনে দিয়ে যাস, কলকাতায় যাবো আজ, ওদের জন্য নিয়ে যাবো।

এই বলে ব্রজগোপাল দা হাতে বেরিয়ে গোটা দুই মস্ত আখ কেটে আনেন। আগার প্যাতাটাতাগুলো ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নেন। রসে টসটস করছে মিষ্টি লাঠি। তা শহুরে ছেলেমেয়েরা এ সব জিনিস পছন্দ করবে কি আজকাল? আখ-টাখ তারা বড় একটা খায় না। শীলা বহেরুর কলটল দেখলে নাক সিঁটকোয়, সোমেন রণেন ওদেরও দেখেছেন এ সব পছন্দ করে না বেশী। অথচ ব্রজগোপালের যৌবন বয়সে এ সবই ছিল প্রিয়। ক্ষেত থেকে কাঁচা ছোলা গাছ থেকে এক ঝাড় তুলে খোসা খুলে মুখে ফেলতে ফেলতে মাইল মাইল পার হয়ে গেছেন। এমন কি দন্তকলস গাছের ফুলের মধুটুকুও চুষে খেতে কত ভালবাসতেন। দেশ মাটির সঙ্গে ঐরকম-ভাবে বাঁধা পড়ে যেতেন গভীর মায়ায়। কলকাতায় বড় হওয়া তার ছেলেপুলেরা জীবনের এ সব মজা কখনো উপভোগ করে নি, কিছুটা করেছিল কেবল রণেন। গাছের ফুটি কিংবা মাদারফল, পানিফল কতবার দিয়ে এসেছেন কলকাতার বাসায়। কেউ খায়নি, পচে ফেলা গেছে। এই সরস আখের স্বাদও ওরা বুঝবে কি?

না বুঝুক, তবু নিজের হাতে করা এই সব ফলপাকুড় প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে না দিয়েও পারেন না তিনি। দেওয়া নিয়ে কথা। ওরা যদি ফেলে দেয় তো দেবে।

ষষ্ঠীচরণ আর তার বাপ বিশাল ধামা-ভর্তি রাজ্যের পেয়ারা নিয়ে আসতেই ব্রজগোপাল রেগে উঠে বলেন—গাছশুদ্ধ পেড়ে নিয়ে এলি নাকি বোকারা?

—তাই তো বলেছেন শুনলাম। কালিপদ মাথা চুলকে বলে।

—দূর ব্যাটা! পাখিপক্ষীর জন্যও তো কিছু রাখতে হয় গাছে, না কি! তোরা বড় স্বার্থপর হয়েছিস, সব কেবল নিজে দখলাতে চাস। এরকম কৃপণ হলে তোদের সব বাড়িঘরে আর পাখিটাখিও আসতে চাইবে না, ভূতের বাড়ি হবে সব। যা, সবাইকে বিলি করে দে। আমি এত নিয়ে কি করব, গুটি দশেক বেছেগুছে রেখে যা। যাদের জন্য নিয়ে যাই তারা এ সব আদর করে খাবে কিনা কে জানে।

ব্রজগোপাল পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে তৈরি হচ্ছিলেন। সেদ্ধ ভাত খেয়ে নিয়েছেন এক চিমটি। হাতেকাচা পরিষ্কার ধুতি পরেছেন, ফতুয়ার ওপর পাঞ্জাবিটা চাপাবেন

কেবল, এই সময়ে বহের এসে রাগারাগি শুরু করল—কর্তা, এই শরীর নিয়ে বেরোচ্ছেন, ভালমন্দ কিছু হলে তখন সবাই বলবে, বহের কর্তাকে দেখেনি। এই তো সেদিনও বুকের ব্যথাটা উঠল আপনার।

সত্য বটে, ক'দিন আগেও ব্যথাটা উঠেছিল। সেদিনও শীলার ছেলের নামটা দিয়ে আসবেন বলে একটা পরিষ্কার কাগজের ওপরে ঠাকুরের নাম লিখে, নাতির নামটা গোটা গোটা অক্ষরে মাঝখানে লিখেছিলেন। কোষ্ঠীর ছকটাও করেছিলেন সেই সঙ্গে। কোষ্ঠীপত্র তৈরি করতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে। ছকটা বিচার করেও একটু ভাবনায় পড়েছিলেন। নাতিটার ভবিষ্যৎ খারাপ নয়, কিন্তু ছ বছর বয়স থেকে কেতুর দশা পড়বে, তখন ভোগাবে। এ সব বিষয়ে আগে থেকেই শীলাকে সতর্ক করে আসাও দরকার।

সেদিনও এরকম তৈরি হয়ে বেরোবার মুখে হঠাৎ যেন একখানা ভারী দৈত্যের হাত এসে বুকটাকে চেপে ধরল। সে কি শ্বাসকষ্ট, ব্যথা! সেই হাতটাই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল বিছানায়। দিন চারেক উঠতে দেয়নি। যাদের কাছে কলকাতায় যাচ্ছেন, তারা জানেও না। জানাবার চেষ্টাও নেই।

ব্রজগোপাল একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—শুয়ে মরার চেয়ে হেঁটে মরা ভাল। যা তো এখন, দিক করিস না। আমার কোনোখানে যাওয়ার নাম হলেই তোর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

বহের খুব কষ্ট চক্ষে চেয়ে আছে। মনে মনে নানারকম প্যাঁচ কষছে, যাতে ব্রজঠাকুরকে আটকানো যায়, এটা ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারেন ব্রজগোপাল। তবে চাষাড়ে মাথায় বেশী বুদ্ধি খেলে না। তাই কিছুক্ষণ ভেবে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে—তবে যান, আমাদের ওপর তো আপনার মায়া নাই। মানুষ না কি আমরা!

ব্রজগোপাল মৃদু হাসেন। বহের অভিমান করে চলে যায়। অত বড় মানুষটার অভিমানী মুখ দেখলে মজা লাগে।

গাড়ির এখনো ঢের দেরি আছে। ক'দিন হল বহের একটা ঝকঝকে রিকশা কিনেছে। খুব বাহারী রিকশা। তার হুড-এ নানা রকম রঙীন কাপড়ের ফ্রিল লাগানো। বেলদার সাইনবোর্ড লিখিয়ে অম্বিকাচরণ নানা রঙের আঁকিবুকি নকশা করে দিয়েছে গায়ে। রিকশার পিছনে একটা আকাশের গায়ে বক উড়ে যাওয়ার ছবি এঁকে তলায় লিখে দিয়েছে—পরিত্যক্ত বহেরু গ্রাম। সেই রিকশাটা এখন দশজনে ব্যবহার করে এখানকার লোকেরা, কে চালায় তার ঠিক নেই। কখনো কোকা বা কাপল, কখনো কোনো মনীশ কিংবা কালীপদ। আজকাল ঐ রিকশাতেই স্টেশনে বেশ যাওয়া চলে। অবশ্য ব্রজগোপাল হাঁটতেই ভালবাসেন। কিন্তু বহেরু হাঁটতে দেয় না। ডাক্তারের বারণ।

কিছুক্ষণ বাদে রিকশাটা এসে দরজার সামনে ঘণ্টি মারে। মনীশটা সীট থেকে নেমে এসে জানান দিয়ে যায় যে, রিকশা তৈরি আছে। ব্যাগ আর একটা পোঁটলা নিয়ে গিয়ে রিকশায় তুলে রাখে।

ঠাকুরের ছবির কাছে একটি সর্বাঙ্গীণ প্রণাম করলেন ব্রজগোপাল। প্রণাম রোজই করেন, কিন্তু প্রণাম কি আর রোজ হয়? মাথা নীচু হয় বটে, কিন্তু মনটা তার সর্বস্ব নিয়ে ঐ পায়ে ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়ে না তো! দেহ প্রণাম করে তো মনটা আলগা আনমনা হয়ে সরে বসে থাকে। সংসারী মানুষের এ বড় বাধা। যদিও সংসার বলতে কিছুই নেই তাঁর। তবু মনের মধ্যে কেবলই এক সংসারের ছায়া ঢুকে বাস করে। কত কি চিন্তা আসে, কত উদ্বেগ, কত দখল সত্ত্ব, কত অভিমান ও ক্ষোভ আজও মনের মধ্যে ইঁদুরের গর্তের মতো রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে গেছে। সবাইকে পরিপূর্ণ সখ্য করে নেওয়া হল না আজও। এখনো কত পাওনা-গণ্ডা যেন আদায় হয়নি, কত প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি, কত ঋণ শোধ করেনি লোকে। এই সবই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পিছু টান প্রণামকে প্রণাম হতে দেয় না। আজ বহুকাল বাদে একটা সুন্দর প্রণাম হল। যখন মাথা নীচু করলেন তখন যেন তাঁর সঙ্গে পূর্ণ জগৎটাও ঝুঁকে পড়ল তাঁর পায়ের ওপর। ঢেউ উঠে ভিজিয়ে দিল তাঁর পা।

যখন উঠলেন তখন দুই চোখে জল, মুখটা তৃপ্ত, মনটা বড় শান্ত ও উদাস। তুমি আজ প্রণাম নিয়েছো, সে তোমারই দয়া। ঠাকুর, আর কিছু না, রোজ যেন একবার আমার প্রণাম প্রণামের মতো হয়।

কপাটের আড়াল থেকে ছোট্ট একটা মাথা সাবধানে উঁকি দিচ্ছে।

উদার আনন্দে ব্রজগোপাল ডাকলেন—কে রে, ষষ্ঠী? আয়।

—না। আমি মতিরাম।

এই বলে বামন মতিরাম ঘরে ঢোকে। মুখটা বিবর্ণ। ওকে ঠিক এরকম গম্ভীর মুখে মানায় না। সব সময়ে ফষ্টিনষ্টি ইয়ার্কি করে; তাই ওটাই ওর স্বাভাবিক ব্যাপার।

—কি গো মতিরাম? বলো।

—[illegible] কলকাতায় নিয়ে যাবেন [illegible] পালাবো।

—[illegible]?

—[illegible] এরা। কালও কপিল লাথি মেরেছে। [illegible] কেবল ঐ কথা, চলে যা, বসে খেতে পারবি না। তা আমি খাই কতটুকু [illegible]? পেটটা দেখুন না, কতটুকু!

—তাই পালাবি? বহেরুকে বলগে যা না।

—ও বাবা, সে বড় কড়া মনিব। তার ওপর ছেলেমেয়ের ভয় খায়। আপনি রিকশায় যান, আমি বেলদার বাজার পর্যন্ত ছুটে

চলে যাবো, সেখানে আমাকে রিকশায় তুলে নেবেন। কলকাতার রাস্তায় ছেড়ে দেবেন। ঠিক পেট চালিয়ে নেবো। কলকাতার লোকে মজা দেখতে ভালবাসে।

—বহের্দ্ শুনলে রাগ করবে।

—কর্ক রাগ। তখন তো আমাকে খুঁজে পাবে না।

ব্রজগোপালের মনটা খারাপ হয়ে যায়। ডাকাত বহেরুরও একটা গৃহস্থ মন ছিল। সে কাউকে ফেলত না। তার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন যারা তার জায়গায় দখল নিচ্ছে তারা লম্বায় চওড়ায় কম নয়, কিন্তু মনুষ্যত্বে ঐ মতিরামের মতোই বামন।

ব্রজগোপাল বললেন—যাবি তো চল।

এক গাল হেসে মতিরাম চলে যায়।

ব্রজগোপাল খড়ি দেখে রিকশায় উঠতে গিয়ে দেখেন বহেরু সাজগোজ করে এসেছে। গায়ে পিরান, পরনে পরিষ্কার ধুতি, পায়ে একটা দেশী মুচির তৈরি চটিও। ব্রজগোপাল উঠতেই সেও উঠে রিকশার পা রাখার জায়গায় ব্রজগোপালের পা ঘেঁষে বসে পড়ে বলল—চলুন আমিও যাচ্ছি। একা আপনাকে ছাড়ব না।

ক্রমশ

মাদুলি মহিমা

একটা গল্প দিয়ে শুরু করি। তার আগে ভূমিকা হিসেবে বলি, আজ থেকে বছর ষাট আগে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানসী ও মর্মবাণী' মাসিকপত্র প্রকাশিত হত। প্রভাতকুমার নিজে যেমন অভিজাত, শিক্ষিত ও রুচিবান ছিলেন তাঁর পত্রিকাটিকেও তিনি সেইভাবে উচ্চমানের পত্রিকা করে তুলেছিলেন। কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো লাইব্রেরী কিংবা বাড়িতে হয়ত 'মানসী ও মর্মবাণী'র দু' চারটি সংখ্যা এখনও দেখা যেতে পারে। এই রকম একটি সংখ্যা—বাংলা ১৩৩২ সালের, মানে আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগেকার, আমার হাতে এসে পড়ল। ওই পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে 'মাদুলি মহিমা' নামের একটি গল্পের ওপর আচমকা চোখ পড়ে গেল। লেখক অখ্যাত, কিন্তু গল্পটি বড় সরস। প্রভাতকুমারের লেখার যাঁরা অনুরাগী—তাঁরা জানেন—এই ধরনের সরস হাস্যপূর্ণ লেখার তাঁর নিজেরই পরম দক্ষতা ছিলেন।

গল্পটি এইরকম :

শ্যামলবাবু নামে এক গ্রাম্য জমিদার ছিলেন, তাঁর স্ত্রী সুমতি দেবী। এঁরা নিঃসন্তান। ইদানীং বছর তিন কর্তা গিন্নীতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। স্বামীর চিত্তকে আর কোনো ভাবেই সুমতি দেবী আকৃষ্ট করতে পারছেন না। পুরোনো তাক-তুকেও কোনো কাজ হচ্ছে না। এমন সময় এক নতুন গ্রহাচার্যকে পেয়ে সুমতি দেবী, ধরনা দিয়ে পড়লেন। গ্রহাচার্য মহিলাকে একটি তামার মাদুলি দিয়ে বললেন, পবিত্র হয়ে বাঁ হাতে পরতে হবে, আর—মাদুলি ধোয়া গঙ্গাজল বারো দাগ স্বামীকে যেমন করেই হোক পর পর বারো দিন খাওয়াতে হবে।

সুমতি দেবী তাঁর খাস ঝি বামাকে ডেকে বললেন, যেমন করেই হোক দুধে বা জলের সংগে এই শিশির বারো দাগ জল কর্তাবাবুকে খাওয়াতে হবে। জল এবং মাদুলির গুণে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল। মাদুলির মহিমায় শ্যামলালবাবু আবার স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। এতই আকৃষ্ট যে স্ত্রীকে ছেড়ে আর নড়তে চান না। সুমতি দেবী কার্যসিদ্ধির পর মাদুলির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। একদিন সেটি তাঁর হাত থেকে খসে খাটের তলায় পড়ে গেল। তিনি জানতেই পারলেন না। বিগতযৌবনা বামা ঝি ঘর ঝাট দিতে এসে মাদুলিটি পেল। জমিদার গিন্নী তামার মাদুলির ওপর একটা সোনার পাত দিয়ে মুড়ে নিয়েছিলেন। বামা ঝি সেই মাদুলি তৎক্ষণাৎ নিজের কোমরে ঘুনসিতে বেঁধে ফেলল।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

মাদুলির গুণ যাবে কোথায়? শ্যামলালবাবু বামা ঝির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষে এমন হল, বামা কাছে না এলে কর্তাবাবুর আহার হয় না, পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে না দিলে ঘুম হয় না। গিন্নী লজ্জায় মরে যান। বাড়ির ঝি দাসীরা হাসাহাসি করে।

বামা ঝি স্নান করতে গিয়ে জলে সেটি হারাল। সেই মাদুলি গ্রামের ভট্টাচার্য মশাই কুড়িয়ে পেলেন ঘাটে বসে পুজো আহ্নিক করার সময়। তিনি সেটি নিজের ডান হাতে রুদ্রাক্ষ মালার পাশে বেঁধে রাখলেন। শ্যামলালবাবু দেখতে দেখতে ভট্টাচার্য মশাইয়ের ভক্ত হয়ে উঠলেন, তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। দরিদ্র ভট্টাচার্যের অবস্থাও দিন দিন ফিরতে লাগল।

এমন সময় ভট্টাচার্য মশাইয়ের তেরো বছরের নাতনী সেই মাদুলিটি দেখতে পেয়ে দাদুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের হাতে বাঁধল।

মাদুলিহীন ভট্টাচার্য মশাই শিষ্যের বিরাগভাজন হলেন, দক্ষিণাটক্ষিণা আর তেমন পাওয়া যেত না। হঠাৎ শ্যামলালবাবু ঘোষণা করলেন, তিনি আবার বিয়ে করবেন। বংশরক্ষার জন্য বিয়ে না করলেই নয়। আর তাঁর বিয়ের পাত্রী হবে ভট্টাচার্য মশাইয়ের সেই নাতনী কুমুদিনী।

প্রৌঢ় শ্যামলালবাবুর সংগে কিশোরী কুমুদিনীর বিয়ে হয়ে গেল। 'শ্যামলালবাবুর অসাময়িক রূপোন্মত্ততা দেখিয়া কুমুদিনীর ভারী আমোদ বোধ হইত।'

এরপর একদিন দশহারায় গংগাস্নান করতে ভট্টাচার্য মশাই সস্ত্রীক ত্রিবেণী যাচ্ছিলেন। কুমুদিনী স্বামীর কাছে জেদ ধরল, গংগাস্নানে যাবে দাদামশাইয়ের সংগে।

শ্যামলাল কুমুদিনীকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কেন? তিনিও গংগাস্নানে চললেন।

ত্রিবেণীতে গংগাস্নানের সময় কুমুদিনীর হাত থেকে মাদুলিটি খুলে জলে পড়ে গেল।

শ্যামলালবাবুর আর কোনো আসক্তি থাকল না কুমুদিনীর ওপর। তিনি একবার করে গংগায় ডুব দেন আবার ভেসে ওঠেন। আবার ডুব দেন। কুমুদিনীদের তিনি বাড়ি ফিরে যেতে বললেন।

শ্যামলালবাবুর যে কী খেয়াল চাপল, বারবার ডুব দিতে লাগলেন গংগায়। দিতে দিতে কখন যেন অতলে তলিয়ে গেলেন।

*

এই মজার গল্পটি শুনে এক অতি প্রবীণ সাহিত্যিক আমায় হেসে হেসে বললেন, এই রকমটিই হয় ভাই, সংসারে সর্বত্রই এই মাদুলি কাজ করছে, কখনো চোখে পড়ে, কখনো পড়ে না। ফরাসিতে এই ধরনের গল্প আছে, সেখানে মাদুলির বদলে আঙটি-টাঙটি ছিল। বেতাল পঞ্চবিংশতি খুঁজলে এর কাছাকাছি গল্প পাওয়া যাবে। বোধ হয় সব ভাষাতেই এই রকম দু পাঁচটা গল্প আছে। মানুষ বড় বিচিত্র। সকলকে নিয়ে মজানো যায় না—মজাও যায় না। বলে তিনি নানা প্রসংগ টেনে শেষে সাহিত্যের কথায় এসে বললেন, আজকালকার ছেলেছোকরাদের লেখা দেখেছ? বিদেশী মাদুলি হাতে পরে নাচছে। নাচুক দু পাঁচ বছর, তারপর সেটি খুলে যেই পড়ে যাবে তখন দেখো কি হাল হয়? এই বলে তিনি আমার পি ই এন-এর পত্রিকার একটি লেখার উল্লেখ করলেন। লেখাটিকে নাকি বলা হয়েছে, বিদেশে যখন কোনো আধুনিকতার আন্দোলন ফুরিয়ে যায়—তখন এদেশের লেখকরা তাই নিয়ে হইচই করেন। ওখানে যা পুরাতন, মৃত আমাদের কাছে তা আধুনিক।

এ-ধরনের কথার সমর্থক নিশ্চয় কিছু আছেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার নতুন ও তরুণ লেখক সম্প্রদায় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা নেই। আজকাল যত নতুন লেখক লিখছেন, তা কবিতাই হোক আর গল্পই হোক—তার সব একজন পড়তে এবং বুঝতে পারবে—তাও বোধ হয় সম্ভব নয়। সাধারণত বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর অন্তর সাহিত্যে একদল নতুন লেখকের আবির্ভাব দেখা যায়, চলতি কথায় আমরা বলি নতুন গ্রুপ। মানুষের বয়েস বাড়ে, ধ্যান ধারণা পাল্টে যায়, নিজের পুরোনো পরিবেশ সে হারিয়ে ফেলে। তখন যা নতুন তা বুঝতে কিংবা অনুভব করতে অসুবিধে হয়। হয়ত পারে না। সেইরকম—যা পুরোনো তাকেও আমরা বহু সময় বুঝি না। আমরা

অনেকেই আজ পুরোনো বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কৃপা প্রদর্শন করে থাকি। কারণ সে-কালের সেই মেজাজ, সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ, জীবন-যাপনের অনেক কিছুই জানি না, অনুভব করতে পারি না।

কোনো সন্দেহ নেই, বিদেশী গ্রহাচার্য অনেকে কখনো আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে মর্যাদা দিয়ে যান। সেই মার্কিন ধরণ করে কিছুকাল সাহিত্যে আমাদের খুব হইচই হয়। আবার সেটি হারিয়ে গেলে অসহায় বোধ করি। কিন্তু এ-দোষ, যদি দোষ বলেই গণ্য করতে হয়, তবে কি তা শুধু আজকালকার তরুণ লেখকদের? নিশ্চয় তা নয়। এমন ঘটনা বার বার ঘটে যাচ্ছে, সেই কোন পুরোনো আমল থেকেই। মাইকেলকেও তো ওই দোষে তাহলে দোষী করতে হয়। সম্ভবত, এটা কোনো দোষ নয়, বাইরে থেকে যা পাওয়া যায় তাকে যাচাই করে নিষ্ঠা ও মননের সঙ্গে গ্রহণ করার যদি পরিশ্রম থাকে তবে তা দোষের কেন হবে? গ্রহণ না করার দ্বারা আমরা এমন কী পেতে পারি আমি জানি না।

[illegible] অভিনন্দ

আলোচনা

শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ

২৪ শ্রাবণ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসংগ্রামসিংহ তালুকদারের চিঠিখানা পড়েছি। ৭ ভাদ্র সংখ্যায় এই সম্পর্কে শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথের আলোচনার ফলে আমার জবাব দেওয়া খানিকটা সহজ হয়েছে সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবী ধর্মজিজ্ঞাসা নিয়ে ও নিজের জীবনের গভীর সমস্যায় বিভ্রান্ত হয়ে কিভাবে রবীন্দ্রনাথের শরণ নিয়েছিলেন এবং কিভাবে তাঁর উপদেশ ও প্রভাবে আত্মোপলব্ধির পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, সেই কাহিনী বিবৃত করাই এই রচনার মূল উদ্দেশ্য। তাই রবীন্দ্রনাথের ধর্মোপলব্ধি ও ধর্মমতের উল্লেখ গোড়াতেই করা সমীচীন মনে হয়েছে। কিভাবে প্রবন্ধের সূত্রপাত করা হবে তা স্থির করার স্বাধীনতা প্রবন্ধকারের অবশ্যই আছে, 'অন্যভাবে করা যেত কি না' সে প্রশ্ন অবান্তর। প্রবীরবাবু ঠিকই বলেছেন, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্পর্কে 'ব্যাপক আলোচনার অবকাশ নেই', সেরূপ উদ্দেশ্যও ছিল না। 'অতি সংক্ষিপ্ততার জন্য আলোচনার মধ্যে অস্পষ্টতা থেকে গেছে' বলে তিনি অভিযোগ করেছেন এবং সংগ্রামবাবুর আক্ষেপও ঐ একই কারণে। একদিক দিয়ে ঐ 'অস্পষ্টতা' থেকে যাওয়াতে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত সম্বন্ধে লোকের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে বুঝতে পেরে তিনি নিজেই যে হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত চিঠি থেকে সার সংকলন করে তাঁর ধর্মমতকে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেইদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। প্রবীরবাবু যথার্থই বলেছেন, 'হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রাবলীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।' সেক্ষেত্রে এ সম্পর্কে আমাদের পক্ষে তার বিশদ ব্যাখ্যান করতে যাওয়ার প্রয়োজনই নেই বলে মনে করি। যাঁরা আগ্রহী তাঁরা চিঠিপত্র নবম খণ্ড গ্রন্থখানি নিজেরা পড়ে নেবেন বলে আশা করাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া প্রবন্ধের অন্যত্র 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও বিচারের ভার যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দিয়ে' এ সম্পর্কে নিজের যোগ্যতার অভাবকে স্পষ্ট ভাষাতেই স্বীকার করে নিয়েছি।

ভূমিকাংশে যাতে কোন তথ্যগত ভুল, বিকৃতি বা অপলাপ না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে চেষ্টা করেছি। ১৮৯১ সালের আদমসুমারির কথা প্রবীরবাবু তুলেছেন। রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডে ঠিক

তার পরেই উদ্ধৃত হয়েছে—'বহুকাল পরে যখন আর একবার ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না প্রশ্ন ওঠে, তখনও রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সঙ্গে এই মতই প্রচার করেন যে, ব্রাহ্মরা হিন্দুজাতির অন্তর্গত শাখা।' (পৃঃ ২৩৮, বৈশাখ ১৩৫০ সংস্করণ) রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে (মাঘ ১৩৫৫ সংস্করণ) ১৯১১ সালের আদমসুমারির পুনরায় উল্লেখ করে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — 'রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখদের মতে ব্রাহ্মরা হিন্দু। তিনি (রবীন্দ্রনাথ) বলিলেন, 'আমি হিন্দু সমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি।...... আমরা যে ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়া চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুচিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।' (পৃঃ ২৭২) ভগিনী নিবেদিতা প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা হিন্দুরা যত বড় লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন, তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব' ইত্যাদি। অন্যদিকে প্রবীরবাবু রবীন্দ্রনাথের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করিনে।' রবীন্দ্রনাথের আর একখানি পত্রাংশে আছে—'আমি যে গৃহে জন্মেচি সেখানকার ধর্মেই দীক্ষা পেয়েছিলুম। সে ধর্মও বিশুদ্ধ। কিন্তু আমার মন তারই মাপে নিজেকে ছেঁটে নিতে কোনো মতেই রাজি ছিল না।' (৩০৯, চিঠিপত্র নবম খণ্ড) রবীন্দ্রনাথের এই সব অভিমতকে প্রবীরবাবু 'কবির বিশেষ কোনো মুহূর্তের অসতর্ক মন্তব্য' বলেছেন; আমরা কিন্তু তা মেনে নিতে পারলাম না। বরং আপাতবিরোধীর মতো

প্রতিভাত হলেও তাঁর বিভিন্ন অভিমত-গুলিকে সুচিন্তিত বলেই গণ্য করা উচিত. তার ভিতর থেকে সামঞ্জস্যের সূত্রটিকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে। হয়তো তা কঠিন নয়।

সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্মানুগত্যের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজেকে 'ব্রাহ্ম' বলে গণ্য করতেন না, তেমনি 'হিন্দু' বলেও নয়। আবার গভীর অর্থে অর্থাৎ ধর্মোপলব্ধির গভীর সত্য-বোধে তিনি যেমন ব্রাহ্ম ছিলেন, তেমনি হিন্দুও ছিলেন. দুইয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব আছে বলে তিনি স্বীকার করতেন না। আমাদের মনে হয়, এ সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই ওঠা উচিত নয়। মূল কথাটা অবশ্যই সকলে স্বীকার করে নেবেন যে, রবীন্দ্র-নাথের মত মহামানবদের ধর্মবোধের প্রকৃতি বিশ্বজনীন। সম্প্রদায়গত, লোকাচারগত বা শাস্ত্রের নৈষ্ঠিক অনুশাসনগত সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে তাঁরা ধর্মকে সর্ব দেশ সর্ব জাতি ও সর্বকালের মানবদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে, অগ্নির ধর্ম যেমন অগ্নিত্ব, মানুষের ধর্মও তেমনি মনুষ্যত্বের বিকাশে, বিশ্বমানবকে নিয়েই তার আহ্বান। সেই উদার আহ্বানকে বাধা দেয় সব রকমের গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও সংস্কারগত নৈষ্ঠিকতা। তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন উদ্যত খড়্গের মত তাঁর শাণিত লেখনীকে নির্মমভাবে চালনা করে গেছেন। বিদ্বেষভাবে তা করেননি, করেছেন তাঁর মানবতাবোধের সহজাত প্রেরণা থেকে। হিন্দুসমাজকে তাঁর তীব্র আঘাত থেকে তিনি রেহাই দেননি, ব্রাহ্ম সমাজকেও নয়। 'ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে কোন্‌টা ব্রাহ্ম কোন্‌টা অ-ব্রাহ্ম লইয়া যে খুঁতখুঁতানি দেখা যায়, তাহা কবির মতে উদারতার পরিচায়ক নহে।' (রবীন্দ্রজীবনী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮) একেও এক ধরনের ছুঁৎমার্গের রকমফের বলা যেতে পারে। এই সংকীর্ণ মনোভাব ও ধর্মান্ধতাকে তীক্ষ্ণভাবে কষাঘাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' উপন্যাসে। ব্রাহ্মসমাজের বিকৃত মনোভাবের যে প্রতিমূর্তি তিনি এঁকেছেন 'অক্ষয়' ও 'পানুবাবু'র চরিত্রে, তার হাস্যাস্পদ ব্যঙ্গচিত্র চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যে. কোনো সাধারণ সমালোচনার তীব্রতা তার ধারেকাছেও যায় না।

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

বিশ্ববিজ্ঞান

দেশ পত্রিকায় ২৬শে জুলাই সংখ্যায় বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে 'যাঁরা কানে কম শোনেন' শীর্ষক আলোচনাটি অত্যন্ত সুখ-পাঠ্য ও সময়োপযোগী হয়েছে। কারণ আজও বধিররা আমাদের দেশে অন্ধ বা অন্যান্য বিকলাঙ্গদের মত সমবেদনার পাত্র না হয়ে উপহাসের পাত্র হয়ে আছে। অবহেলিত বধিরদের জন্য আজও আমাদের দেশে উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক ও চিকিৎসা কেন্দ্রের অভাব রয়েছে এবং আজ পর্যন্ত বধিরতা নিবারণের জন্য এদেশে কোন সার্থক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সেই কারণেই শ্রীকরের রচনাটিকে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা গেলেও সমগ্র আলোচনাটি পড়ে মূল উদ্দেশ্যের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সম্ভবত রচনাটির উদ্দেশ্য ছিল বধিরতার কারণগুলি অনবহিত পাঠক সাধারণকে জ্ঞাত করা যাতে তারা বধিরতার হিংস্র থাবা থেকে নিজে-দের রক্ষা করতে পারে এবং বধিরদের চিকিৎসার জন্য এই শহরে যে আয়োজন আছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, সেই উদ্দেশ্যে বোধকরি শ্রীকর এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ বারীন রায়চৌধুরীর সহায়তা নিয়েছেন। কিন্তু ডাঃ রায়চৌধুরী প্রদত্ত তথ্যে রয়েছে কিছু ত্রুটি, কিছু অসম্পূর্ণতা এবং কিছু অকারণ কথা।

আমাদের দেশে কানে 'ক্রনিক' পুঁজের জন্যই বধিরতার প্রথম ও প্রধান কারণ হলেও দ্বিতীয় প্রধান কারণ নিশ্চয় ওটোস্কেলেরোসিস রোগ নয়। ওটো-স্কেলোরোসিস শ্বেতাঙ্গদের রোগ। আমাদের দেশে এ রোগ থাকলেও তার প্রাদুর্ভাব ওদেশের মত নয়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলি বধিরতা নিবারণকল্পে বিগত দুই শতাব্দী ধরে সচেষ্ট আছেন। উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা ও জনশিক্ষার ফলে পাশ্চাত্ত্যে আজ বধিরতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্যের সবচেয়ে বড় অবদান ওটো-মাইক্রোসস্কোপের আবিষ্কার। যার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে দেওয়া যায় কানের একান্তে গভীরের গভীরে এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে অপারেশন করে কানের পর্দার ছেঁদা মেরামত করা যায় বা ওটোস্কেলেরোসিস-জনিত বধিরতা সারিয়ে তোলা যায়। ওটোস্কেলেরোসিস একটি বংশগত রোগ এবং এই রোগের প্রকোপে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের অনেক বেশী সংখ্যায় ভুগতে হয় বলেই বোধকরি ওদের দেশেই ওটোমাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার ও মাইক্রোসার্জারির সূচনা সম্ভব হয়েছিল। ঠিক যে কারণে আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার ও তার নিরাময়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। আমেরিকার হোমগ্রীন সাহেব ১৯২৩ সালে প্রথম মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে ওটো-স্কেলোসিস রোগের অপারেশন করেন। তারপরে যথাক্রমে লেমপারট (১৯৩৮), স্যামবো (১৯৪০), হল (১৯৪৫), হাউস (১৯৪৮), কথর্ন (১৯৫১) ও রোজেন (১৯৫২) এই কাজে ব্রতী হন। ১৯৫৬

পূজো সংখ্যা আনন্দবাজার
NORTH BENGAL STATE LIBRARY
COOCH BEHAR

সালে ডাঃ রোজেন কলকাতায় এসে তৎকালীন চিকিৎসকদের মাইক্রোসার্জারির শিক্ষা দেন ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে। ভারতবর্ষে মাইক্রোসার্জারির পত্তন ঠিক তার পরেই। শহর কলকাতাই তখন অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করলেও বর্তমানে দিল্লি বোম্বাই ও মাদ্রাজ এর চেয়ে পশ্চাদপদ হয়ে পড়েছে। শ্রীকরের রচনায় ডাঃ রায়চৌধুরী কলকাতায় মাইক্রোসার্জারির অভ্যুত্থানের যে ইতিহাস বিবৃত করেছেন তাও দেখা যায় সম্পূর্ণ ভুল ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি ডাঃ পি কে খাশনবিশকে অগ্রণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ফলত ডাঃ খাশনবিশের মত একজন সৎ এবং সরলপ্রাণ মানুষ নিশ্চয় সম্মানিত বোধ করার চেয়ে বিব্রতই বোধ করেছেন। তাছাড়া বারীনবাবু কলকাতায় যে যে হাসপাতালে বধিরদের জন্য এই বিশেষ অপরেশনের ব্যবস্থা আছে তাও জ্ঞাত করেননি যার দ্বারা তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত চিকিৎসা পেতে পারেন।

কলকাতায় মাইক্রোসার্জারিতে অগ্রণী হন তিন প্রথিতযশা চিকিৎসক ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে ডাঃ সতীজীবন চ্যাটার্জী, আর জি করে 'মেজর নরেন দত্ত ও নিজস্ব চেম্বারে ডাঃ এস দাশগুপ্ত, ঠিক এ'দের পরেই ডাঃ দয়াল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হাসপাতালে মাইক্রোসার্জারির পত্তন করেন। এর বহুকাল পরে 'ক্যালকাটা হাসপাতালে' ডাঃ পি কে বোস ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ডাঃ এস ঘোষ এই অপারেশন শুরু করেন। অধুনা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে ডাঃ সন্তোষদেব মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বারীন রায়চৌধুরী ও ডাঃ তরুণ পালিত এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। আজ কয়েক মাস হল সরকারী প্রচেষ্টায় প্রথম মাইক্রো-সার্জারির পত্তন হয়েছে ডাঃ এস কে দেব নেতৃত্বে এস এস কে এম হাসপাতালে। ডাঃ নাগচৌধুরী ও ডাঃ বি দে অবশ্য বহুদিন এই সুযোগ তাদের নিজস্ব চেম্বারে জনসাধারণকে দিয়ে আসছেন। ছাত্রদের জন্য এই সুযোগ সীমিত আছে ডাঃ সন্তোষদেব মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে স্টুডেন্টস হেলথ হোমে। আর জি কর হাসপাতাল সমেত আরও বেশ কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্রে সরকারী প্রচেষ্টার এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এ ছাড়াও কলকাতায় বেশ কিছু মাইক্রোসার্জেন আছেন যাঁরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সুযোগের অভাবে কাজ করতে পারছেন না।

তবে এ ধরনের অস্ত্রোপচারে ভারতে সর্বাধিক কৃতীর অধিকারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক ডাঃ ভি এ সুব্রামনিয়াম। মাদ্রাজবাসী ... প্রবীণ চিকিৎসকের স্বীকৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ডাঃ শান্তনু ব্যানার্জী
কলি-২৭

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রসঙ্গত

এই পত্রিকার ২রা আগস্ট, ১৯৭৮ সংখ্যার ৪৬ পৃষ্ঠায় দিল্লির শ্রীমতী মীনাক্ষী মিত্র "আলোচনা" শীর্ষক পত্রাবলীর মধ্যে যে মনোভাব প্রকাশ করেছেন, সেই সম্বন্ধে এবং ৭ই জুন থেকে ১২ই জুলাই পর্যন্ত সংখ্যাগুলিতে মোট ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী "সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রসঙ্গত"—নামক যে প্রবন্ধ 'বুদ্ধদেব বসুর পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা বসু লিখেছেন, সেই সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধক কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীমতী বসুর প্রবন্ধে "প্রসঙ্গত" কথাটি ব্যবহার করার জন্য 'সত্যেন্দ্রনাথের বিষয় লিখতে গিয়ে 'সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু

কথা লেখা এমন গুরুতর দোষণীয় হয়নি। সব মনীষীদের জীবনীতেই তাঁদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সংক্রান্ত বিষয় থাকে, নচেৎ জীবনী সুখপাঠ্য হয় না। শ্রীমতী প্রতিভা বসু 'সুধীন্দ্রনাথের বিষয়ে "দেশ" পত্রিকার স্তম্ভের মাত্র ১২০ পঙক্তি লিখে এমন কিছু অপরাধ করেন নি, কারণ তাঁর প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য ২১ পৃষ্ঠাব্যাপী।

শ্রীমতী বসু ঐ প্রবন্ধে 'সুধীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অজ্ঞাতসারে কয়েকটি ভুল তথ্য প্রকাশ করেছেন, যদিও সেগুলি মারাত্মক ভুল নয়। এগুলি তাই হিসাবে সংশোধন করা আমার কর্তব্য। 'সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ বয়সে ছোট ছিলেন বলে গুরুজন 'সত্যেন্দ্রনাথকে 'তুমি' বা 'হে' বলে সম্বোধন করতেন না। 'আপনি' এবং 'স্যার' বলতেন। 'সত্যেন্দ্রনাথ 'সুধীন' বলে সম্বোধন করতেন।

'সুধীন্দ্রনাথের স্ত্রী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীর অক্লান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ সুস্থ হন, এখনও জীবিত আছেন এবং কয়েক বছর পরেই জেনিভায় সুধীন্দ্রনাথের গৃহে ফিরে আসেন। সে সময় যক্ষ্মার সব চিকিৎসাই গবেষণা-স্তরে, সুতরাং ঐ সময় পরীক্ষামূলক চিকিৎসা করাতে করাতে সুধীন্দ্র প্রায় সর্বস্বান্ত হন।

তাঁর পিতা (জাস্টিস স্যার) 'বিপিনবিহারী ঘোষ তাঁকে বিদেশিনী বিবাহ করার জন্য 'ত্যাজ্যপুত্র' করেন নি। তাঁকে উইলে অন্য ছেলেদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, তার কারণ সুধীন্দ্রের খামখেয়ালিপনা, লেখাপড়া করতে গিয়ে ১৯২০ সাল থেকে যাবজ্জীবন ইউরোপে বাস করা, পাঠ্য বা গবেষণা বিষয় বার বার পরিবর্তন করা এবং ১০।১২ বছরে পিতার প্রচুর অর্থব্যয় করা।

সুধীন্দ্র আগে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, কিন্তু দেশী ও বিদেশী সাহিত্যানুরাগ অপরিসীম ছিল, তাতে বাবা বরং সুখীই হতেন এবং সমস্ত সাহিত্যিকের বই কিনে আনতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের ডিগ্রী নিয়ে সুধীন্দ্র ইউনিভার্সিটি কলেজে বায়োকেমিস্ট্রি বা জৈবরসায়ন নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। অধ্যাপকের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি প্যারিস পাস্তুর ইনস্টিটিউটে গিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু এখানেও মন টিকল না, স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে Pre-Raphaelite Brotherhood এর বিষয়ে গবেষণামূলক থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রী পান। পৃথিবীতে এরকম খামখেয়ালি ও খ্যাতিমান লোক অনেক ছিলেন ও আছেন।

১৯৪০ সালে উনি ইউরোপে যুদ্ধের সময় জেনিভা ছেড়ে লণ্ডনে চলে যান। ১৯৫৯ সালে বিশ্বভারতীতে চাকরি করতে আসেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে ইংরাজীর অধ্যাপকের পদ ছাড়া লাইব্রেরীর ও ক্যানটিনের অপচয় বন্ধ করার ভার দেন। সময়ে ক্লাস আরম্ভ না হওয়ায় ও নিয়মানুবর্তিতার অভাবের সমালোচনা করায় তিনি সকলের অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। শেষে একটি নাটকের মহড়ায় সময় বচসা ও অপ্রিয় ঘটনা ঘটে।

(ডক্টর স্যার) 'রাসবিহারী ঘোষ সুধীন্দ্রের জ্যাঠামশাই ছিলেন, 'পিতামহ' নন, যা শ্রীমতী বসু লিখেছেন।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সুধীন্দ্র তাঁর স্বোপার্জিত অর্থে লণ্ডন ফিরে যান, তিনি অর্থ ভিক্ষা করেন নি। ওখানের ছাত্ররা অবশ্যই তাঁকে পছন্দ করতেন, অর্থ সাহায্য পাঠাতে চেয়েছিলেন ও ফিরে যেতে লেখেন।

কিছু শান্তিনিকেতনবাসী তাঁর নামে মদ্যপায়ী বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলেন। তবে এক চুমুক মদ্যপান করলে মারাত্মক দোষ হবে এ ধারণাও তিনি পোষণ করতেন না। বেশীর ভাগ উপার্জিত অর্থই তিনি বই কিনে খরচ করতেন। মদ্যপান ত দূরের কথা, পেট ভরে খেতেন না। ১৯৬৫ সালে সুধীন্দ্র হৃদরোগে লণ্ডনে মারা যান। বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত কঠোর নিয়মের জন্য আমরা কেউ যেতে পারি নি, লণ্ডনেই বন্ধুবান্ধব শেষকৃত্য করেন।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
কলিকাতা-২৯

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী

দেশ সাপ্তাহিকের ২৬ জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী পাঠ করে মনে একটু সংশয় জেগেছে। ৬৯ নম্বর চিঠিটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রশান্তচন্দ্রকে ছন্দ-সমস্যা সম্পর্কে এক জায়গায় লিখছেন : "ভাঙা ছন্দকে যে আদর্শ ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে গড়ে তুলতে হবে সে আমি নীচে নীচে লিখে দিলুম—সংশোধনটা দিলুম না, সে তোমরা নিজে চেষ্টা করে ঠিক কোরো।" ছন্দ-রসিক ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, উদাহরণগুলির প্রত্যেকটিই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। আমাদের সংশয় ও প্রশ্ন চতুর্থ উদাহরণটিকে ঘিরে। ছাপা হয়েছে :

বরষণ সমারোহ চুকি গিয়েছে
আজি মেঘ ভরে উঁকি মারিয়েছে

সবাই জানেন, এটিও ৪।৪।৪।১ এই পর্ববিন্যাসের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা, যার পাঠ এইরকম :

বরষণ সমারোহ গিয়েছে চুকি
আজি মেঘ ভয়ে মারিছে উঁকি

আমাদের জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় পংক্তিটিতে 'আজি মেঘ ভয়ে মারিছে উঁকি' হবে, না 'আজি মেঘ ভয়ে ভয়ে মারিছে উঁকি' বা 'ভয়'-এর মতন দু মাত্রার কোনো শব্দ ওই জায়গাটিতে দিয়ে তবেই পংক্তিটি পড়তে হবে? রবীন্দ্রনাথ ওই জায়গায় দু মাত্রার কোনো শব্দ দিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না। যদি না দিয়ে থাকেন, অথবা যদি এটি ছাপার ভ্রম হয়, তা হলে scansion-এর সময় এবং বিশেষ করে পাঠ ও ভাবের বেলায় যেন যথেষ্ট অস্বস্তি অনুভূত হয়।

অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা বিভাগ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

॥ একচল্লিশ ॥

প্রথমে চিনতেই পারিনি জেরিকে। কেতা দুরস্ত কোট-প্যান্ট-টাই, মাথায় ফেল্টের টুপি-পরা ভদ্রলোক অল্প ঝুঁকে দোপ্ত ফরাসীতে অভিবাদন জানিয়ে কুশল প্রশ্ন করলেন,

—'বঁ জুর মঁসিয়ে। কোমঁতালে ভু? সাওয়া!'

মেজাজ গোলমেলে ছিল। জীনেদের নেমন্তন্ন নিয়ে বন্ধুদের ঠাট্টা ইয়ার্কির কিছু হদিশ পাইনি। ওরাও কিছুই ভেঙে বলেনি। ভূরিভোজের সময় হবে দুপুরে। ইচ্ছেও ছিল না বিশেষ। সন্ধ্যেবেলার ফুলকোর্স এবং ফোকোটে পাওয়া ডিনারের আশায় খিদে বাড়াচ্ছিলুম, বলা যায়।

আলুভাজা দিয়ে কালো কফি খেয়ে খদ্দেরের পর খদ্দের ধরেছি। বেলা তিনটের মধ্যেই আজ চার-চারটে মুখ হয়ে গেছে। আড়াই শো ফ্রাঁ গজগজ করছে পকেটে। পঞ্চম খদ্দের ধরে ফেললুম।

বিচিত্র পোশাক-পরা এক বুড়ো। বড়দিনের সান্তা ক্লজের মতো মাথায় সেই লাল টুপি। সাদা বর্ডার দেওয়া লাল কোট। প্যান্টও নিচের দিকে চাপা, হাঁটুর ওপরে ঢোলা। লাল রং। স্লেজ গাড়ি আর উপহারের থলেটি ছাড়া একেবারে জলজ্যান্ত সান্তা ক্লজ। তুলোর মতো দাড়ি ফুরফুর হাওয়ায় উড়ছে। এ বুড়ো যখন আসরে ঢুকেছে তখন থেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছে অনেকে। দেখার মতোই ব্যাপার তো? মে মাসে কে কবে সান্তা ক্লজের কথা ভাবতে পারে? কারণ, সান্তা মানেই ক্রীসমাস। সবে বৃষ্টি থেমে সূর্য উঠেছে। এমন সময় রোদের মধ্যে ক্রীসমাসের কথা কার মাথায় আসবে! তাই, প্রায় সকলেই মজার বুড়ো দেখতে চোখ ফিরিয়েছে। যাদের পাশ দিয়ে হাঁটছে, তারা ঠাট্টা ইয়ার্কি ছুঁড়ে দিয়ে হাসাহাসি করছে। কে যেন ঘন্টার শব্দের মতো করে টিন বাজালো। হো হো করে হেসে উঠল সেই দলের লোকেরা। সান্তার ভ্রূক্ষেপ নেই। হেঁটে আসছে। পা টলছে এপাশে ওপাশে। আপনমনে হেলে দুলে হাঁটা।

ওদিককার মুখ-আঁকিয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই মাতাল বা পাগল বুড়োকে খদ্দের বানাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পাত্তা পাচ্ছে না কেউ। সমস্ত ভীড়, জটলা পেরিয়ে, চারপাশের অজস্র রং এবং হাসা-হাসির মধ্যে দিয়ে লাল-সাদা ছোট্ট পাড়ুবটির মতো এগিয়ে আসছে বুড়ো মানুষটি!

দেনিস হাসতে হাসতে পেট চেপে বসে পড়েছে। লিয় গম্ভীর-মুখে ছোট্ট একটি হাঁ করে তাকিয়ে। বিশু বোধ হয় দুবার বলল,

—'মুখ চাই, মঁসিয়? আপনার পোর্ট্রে?—'

জবাব নেই। বেখেয়ালে হেঁটে আসছে সান্তা। পেছনে কাঁচি কুচি ছেঁড়া সাদা কাগজ শূন্যে ছুঁড়ে দিল কেউ। তিরতির কেঁপে কেঁপে নেমে আসছে ওগুলো। বুড়োর টুপি, কাঁধ ছুঁয়ে মাটিতে এসে পড়েছে। এক আধটা সাদা কুচি লাল কোটের হাতায়, বুকের কাছে লেগে থাকলো। ডিসেম্বরের তুষারপাত নাকি!

আমার প্যাকিং বাক্সটির ওপরে বসে সিগারেট খাচ্ছিলুম। মজা দেখছিলুম বুড়োর। পেছন পেছন কয়েকটি বাচ্চা হাততালি দিচ্ছে। বিদেশী টুরিস্টদের ছেলে-পিলে হবে, কারণ, ইংরিজিতে গান গাইছে,

'হে! জিংগল বেলস জিংগল বেলস,
জিংগল অল দ্য ওয়ে।
স্যান্টা ক্লজ ইজ কামিং অ্যালং
অন এ ওয়ান-হর্স ওপন স্লে!'

আমার পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে হল, সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। দুহাতের অঞ্জলি পেতে একেবারে বুড়োর মুখোমুখি। বললুম,

—'সান্তা ক্লজ! আজকের এমন বড়-দিনে আমার জন্যে কি এনেছেন?

ব্যস, মুখ তুলে ঢুলুঢুলু চোখে আমায় দেখল এবং এক-দাড়ি হেসে ফেলল।

আবার বললুম, হাত পেতেই আছি,

—'বড়দিনের সান্তা ক্লজ, কি এনেছেন আমার জন্যে?'

লাল কোটের পকেট হাতড়ে মুঠো-ভর্তি দশ ফ্রাঁর নোট বের করল। যেন অন্যায় হয়ে গেছে, এইভাবে জিভ কেটে একটু হেসে আবার পকেটেই রেখে দিল ওগুলো। চট্‌ করে হাত দিল মাথায়। টুপি তুলে ডান হাতে উল্টো করে ধরল। মাথাজোড়া টাক। আট দশটা কাগজের গোলাপ টুপির মধ্যে। একটা আমার হাতে দিয়ে হাসিমুখে বলল,

—'তুমি ঠিক ধরেছো, বিদেশী! আমি যেমন সান্তা ক্লজ, এই গোলাপগুলোও তেমনি ফুল।'

বলে, ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনের বাচ্চাদের হাতে একটা করে ফুল দিল। নিজের জন্য একটি রেখে আবার পরে ফেলল টুপি। ছেলেরা মহাখুশি। অল্পক্ষণের জন্যে থেমেছিল। আবার হইচই করে গান জুড়ে দিল।

ফুল সোঁকার ভঙ্গি করে বললুম,

—'আমি কিন্তু দারুণ সান্তা ক্লজ আঁকতে পারি। আপনি মডেল হবেন?'

মুখ থেকে ভক ভক মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল,

—'বলো কি হে! তুমি সান্তা ক্লজ আঁকতে পারো, আর আমি মডেল হবো না!'

ব্যবসা মাথায় রেখে হাসিমুখে বললুম,

—'আপনাকে দেখে রঙিন সান্তা ক্লজ অর্থাৎ আপনার পোর্ট্রে যদি বানিয়ে দিই, কি দেবেন আমায়?'

—'কি চাই বলো?'

—'বেশি কিছু না। আমার পারিশ্রমিক একশো ফ্রাঁ।'

—'ব্যস্?'

বলে, পকেট থেকে নোটের গোছা বের করছিল, বাধা দিয়ে বললুম,

—'আগে এই চেয়ারে চুপচাপ শান্ত-শিষ্ট মডেল হয়ে বসুন, ছবিটা আঁকি, তারপর দেবেন পয়সা।'

—'বাহ্। তুমি তো খুব ভালো ছেলে গো!'

বসতে বসতে সান্তা খুশির গলায় জানিয়ে দিল।

বোর্ড বাগিয়ে ধরে একবার চারপাশে চেয়ে দেখলুম। ছেলেরা এখন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে বুড়ো দেখছে। সবচেয়ে ছোট্টটি, বছর তিনেক হবে, কচি দু'হাতে কাগজের ফুলটি ধরে আপ্রাণ গন্ধ সোঁকবার চেষ্টা করছে। ওকে দেখে সান্তার চোখে কী গভীর তৃপ্তি! যেন, চোখ ছলছল করছে। আমায় বললে,

—'দ্যাখো, দ্যাখো বিদেশী। এই বয়সে ওর বোঝার ক্ষমতা নেই—কে সত্যি, কে মিথ্যে। কি কাগজ, কি প্রকৃতি! সবকিছুতেই সমান সুখ। আহা!'

তারপর, নিজের মনেই যেন বললে,

—দূর ছাই, আমি কেন এইসব বুঝতে পারি!'

অপরিচিত মুখ-আঁকিয়েরা দূর থেকে আমায় দেখছে। আড়ে আড়ে। ওদের মুখের হাসি অথবা সান্তাকে দেখে সেই মজার ভাব যেটুকু হয়েছিল, এখন আর তা নেই। ঈর্ষা কি চোখে ওদের?

আরো দূরে, রেস্তোরাঁর কাছাকাছি যিশু, দেনিস, লিয়ং, মঁসিয় কোত্তোয়া সারা মুখে হাসি নিয়ে হাততালি দেবার ভঙ্গি করছে। মাথা ঝাঁকিয়ে বাহবা জানাবার ভঙ্গি করছে। কোনো শব্দ নেই। পৃথিবীর বন্ধুরা শব্দ দিয়ে, চিৎকার করে জানায় না কিছু। শব্দহীন হৃদয়ের হাত বাড়িয়ে সমস্ত শরীর ছুঁয়ে যায়। ওদের চারজনের দিকে আমি বোধ হয় দু'তিন সেকেন্ডের বেশি তাকাইনি। চোখ সরিয়ে আনতে আনতে বুক ভরে গেছে। এইসব মনের অবস্থার কথা যিশুকে, দেনিসকে, লিয়ং বা মঁসিয় কোত্তোয়াকে আমি কি ভাবে বলব? নানান্ স্বাদু জিনিস খেয়ে পেট ভরলে ঢেঁকুর তুলে বলতে পারো, পেট ভরে গেছে। মন ভরলে বলা যায় না কিছু বউ! শুধু, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

সান্তা বললে,

—'চেয়ার সরিয়ে আমি মোঁমার্ত্রের মেঝের শোবো, শিল্পী! তুমি ঘুমন্ত সান্তার ছবি আঁকতে পারবে?'

বিপদে পড়ে গেলুম!

এখানে এমন প্রশস্ত জায়গা নেই যে, মডেলকে শুইয়ে দেওয়া যায় এবং তারপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার মুখ আঁকা যায়!

তাড়াতাড়ি বলে দিলুম,

—'ঘুমন্ত সান্তার মুখ চাই তো?'

বুড়ো মাথা নেড়ে জানালে,

—'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে বললুম,

—'কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। টান হয়ে বসে থাকুন আপনি। আমি সান্তার মুখ এঁকে দিচ্ছি আপনাকে দেখে। ছবি শেষ হলে দেখাবেন, সান্তা শুয়ে আছে।'

ঢুলন্ত বুড়োর মুখ মিলিয়ে, টুপি,

জামার বুক অবধি সাদা দাড়ির তিন পাশে লাল প্যাস্টেল ঘষে ঘষে মোটামুটি বুড়োকে সান্তা বানালুম। বোর্ড-সমেত ছবিটি কাৎ করে দেখিয়ে বললুম,

—'সান্তা ক্লজ! দেখুন, মে' মাসে আপনি কেমন ঘুমিয়ে আছেন!'

বুড়ো ঘাড় কাৎ করে মিনিট খানেক দেখে হাততালি দিয়ে উঠল ছেলেমানুষের মতো। খুশিতে ডগমগ। রোল করে ছবিটি হাতে তুলে দিলুম। গুনে গুনে একশো' ফ্রাঁ আমায় দিয়ে জড়ানো গলায় বললে,

—'ডিসেম্বরে দু'হাতে সব বিলিয়ে যায় সান্তা ক্লজ। বাকি বছর কেউ পোঁছে না আমায়। তাই, মে মাসে সান্তা ক্লজ নিজের ঘুমন্ত মুখ কেনে।'

কেমন ভার ভার গলায়, যেন কান্না চেপে বললে শেষের কথা ক'টি।

অপরাধির মতো বললুম,

—'আমি কি কিছু অন্যায় করেছি, সান্তা ক্লজ?'

বাঁ হাতের পিঠে শুকনো চোখ রগড়ে হাসল। আমার চিবুক ধরে সামান্য নাড়া দিয়ে বললে,

—'না, খোকাবাবু—ঠিকই করেছো তুমি। সান্তার ঘুমন্ত মুখ তুমি ছাড়া আর কেউ আঁকতে পারতো না। গড্ ব্লেস্!'

বলে, টালমাটাল পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে মেলার চত্বর থেকে বেরিয়ে গেল। চারপাশের হাসি ঠাট্টা, ছেলেদের গান হাততালির মধ্যে আপন মনে হেঁটে চলে গেল বুড়ো। ওর চলে যাওয়া দেখছিলুম, কাঁধের কাছে যিশুর গলা,

—'উনি কে জানো, দোস্ত্?'

যিশুর দিকে ফিরে বললুম,

—'হ্যাঁ। মে মাসের সান্তা ক্লজ!'

যিশু হাসল।

একটু থেমে বলল আবার,

—"উনি হলেন মঁসিয় জিলবার দলান। বয়েস প্রায় সত্তর। মালটিমিলিয়নেয়ার। দেখলে না, মোঁমার্ত্রের সব মুখ-আঁকিয়েরা কেমন ওঁকে ছেঁকে ধরেছিল। কয়েকটি বিখ্যাত গ্যারেজ এবং দুটো বিরাট ওয়াইন কোম্পানির মালিক। তা ছাড়া, প্যারিসের চার পাশে ছড়িয়ে আছে ওঁর বিশাল জমিজমা, ক্ষেতখামার এবং ডজনখানেক পোলট্রি ফার্ম। মঁসিয় দলানের ঠিক ঠিক কটা গাড়ি এবং বাড়ি প্যারিসে আছে, নিজেই হয়তো হিসেব করে বলতে পারবেন না।"

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"তা এরকম পাগলের মতো পোশাক পরে ঘোরেন কেন? এখন কি ক্রীসমাস যে, সান্তা ক্লজ সাজতে হবে?"

হেসে জবাব দিল যিশু,

—"শীত-বৃষ্টির পরে যখন প্রথম রোদ ওঠে প্যারিসে, সারা শহরে সূর্যের আলো পাকাপোক্তভাবে দিনকে দিন করে রাখে, সেই সময় হঠাৎ এক সুন্দর সকালে মঁসিয় দলান সূর্যের নাম করে রোদ ওঠার আগেই আনন্দের চোটে প্রচুর মদ খেয়ে ফেলেন। এবং আপন মেজাজমাফিক পোশাক পরে বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। গাড়ি নেই, ড্রাইভার নেই। পায়ে হেঁটে প্যারিসের নানান্ জায়গায় ঘুরে বেড়ান। মোঁমার্ত্রে, আইফেল টাওয়ারে। সেন নদীর বুকে ভাড়াটে নৌকোয় অথবা শাঁজেলিজের চওড়া রাস্তায়।"

পকেট থেকে গোলওয়াজের প্যাকেট বের করল যিশু। দুজনে দুটি সিগারেট ধরালুম। যিশু বললে,

—"বছর দশ বারো হয়ে গেছে, শুনেছি, এইভাবেই নাকি উনি সূর্য বন্দনা করেন। ফি বছর একবার।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"গেল বছর কি পোশাক পরেছিলেন?"

—"পিরাতের পোশাক।"

বুড়োকে কিছুতেই জলদস্যুর পোশাকে কল্পনা করতে পরাছিলুম না। বললুম,

—"সান্তা ক্লজের মতো নিশ্চয়ই মানায়নি!"

যিশু বললে,

—"তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, ইন্ডিয়ান। একেবারে মধ্যযুগের জলদস্যু সর্দার যেন মোঁমার্ত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।"

জিজ্ঞেস করলুম,

—"ওঁর দাড়ি কি আজকে আসল ছিল?"

—"অবশ্যই। উনি কোনো মেক্-আপের ধার ধারেন না।"

একটু থেমে আবার বললে যিশু,

—"গেলবার ওঁর পোর্ত্রে করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। পিরাত মানে জলের দস্যু তো? ভারি সুন্দর কথা বলেছিলেন, মনে আছে, 'পৃথিবীর একঘেয়ে জলকে যে হরণ করে তার নাম সূর্য, তাই, আমি জলদস্যু সেজেছি।' যদিও, শব্দের অর্থটি একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন, তবু, শুনে বেশ মজা পেয়েছিলুম। মোঁমার্ত্রের অনেককেই উনি চেনেন। তবে, এই দিনটি বোধ হয় কাউকেই চিনতে পারেন না। প্রচুর মদ খেয়ে ফেলার জন্যে অথবা চিনতে চান না আর কাউকে, একমাত্র সূর্য ছাড়া।"

সিগারেটে লম্বা টান দিল যিশু। ধোঁয়া গিলে ফেলে কথা বলতে লাগল আবার। কথার সঙ্গে সঙ্গে হালকা নীল ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে হাঁ-মুখ থেকে, নাক থেকে.

—"তুমি এবারে ওঁর মুখ এঁকে অনেকেরই চক্ষুশূল হয়েছো, ইন্ডিয়ান। তা ছাড়া, আমাদের ছোট্ট হুল্লোড়ে দলটিকে বেশ কিছু মুখ-আঁকিয়েরা মনে মনে ঈর্ষা করে, আমি জানি। একটু সাবধানে থাকতে হবে। কারণ, তুমি একেবারে অবিশ্বাস্য কপাল করে এসেছো, দোস্ত্!"

মঁসিয় দলানকে নিয়ে কৌতূহল শেষ হয়নি আমার। যিশুর কথা ভালো মতো মাথায় ঢুকল না। জিজ্ঞেস করলুম,

—"মঁসিয় দলান তার আগের বছর কি সেজেছিলেন?"

হো হো করে হেসে ফেলল যিশু। হাসতে হাসতে বলল,

—"রেড ইন্ডিয়ান। খালি গা'। মাথায়, কোমরে নানান্ রংয়ের পালক গুঁজে—সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! প্রায় পাগলের মতো হেসেছিল সারা মোঁমার্ত্র। আমাদের দেনিস তো হাসতে হাসতে বিষম টিষম খেয়ে, বমি করে একাকার কাণ্ড! তবু, হাসি থামে না।"

বুড়োর বিশাল চেহারাটি রেড ইন্ডিয়ানের বেশে কল্পনা করে আমিও হাসলুম। বললুম,

—"সেবারে কে করেছিল ওঁর পোর্ত্রে?"

—"অন্য দলের শিল্পী। ওইযে!"

বলে, উল্টোদিকে কাফের দরজার দিকে আঙুল তুলে দেখালে যিশু,

—"ওই যে, সেই নওজোয়ান!"

দেখি ষণ্ডামার্কা এক আলজেরিয়ান বগলে ড্রয়িং বোর্ড চেপে ধরে বিকৃত মুখে আলুভাজা চিবোচ্ছে।

যিশু বললে,

—"গেল বছর মঁসিয় দলানের পোর্ত্রে করার সুযোগ আমি নিজেই ছেড়ে দিয়েছিলুম বলে, ও এবং ওর দলের সব আমার ওপরে খাপ্পা। তার ওপরে, এবারেও আবার তুমিই পেলে ওঁকে।"

কি কায়দায় সুন্দর সঙ্গে ভাব জমিয়েছি বলতেই খুশির হাসি ছুঁড়ে পিঠ চাপড়াল যিশু,

—"মহা শেয়ানা তুমি, ইন্ডিয়ান!"

বললুম,

—মঁসিয় দলানকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হল আমার!"

অনেকখানি শ্বাস ফেলে যিশু বললে,

—"নিঃসঙ্গই বলা যায়! এ পাড়ায় বেশী বয়েসের সব মানুষই প্রায় নিঃসঙ্গ।"

—"উনি কি সংসারত্যাগী?"

—"ঠিক উল্টো। তিন-তিনবার বিয়ে। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স। দ্বিতীয়া মারা গেছেন। তৃতীয় পক্ষের বয়েস এখন পঞ্চান্ন-ষাট। ছেলেমেয়ে সারা প্যারিসে ছড়িয়ে আছে কম্সে কম্ বোধ হয় তেরো কি চোদ্দটি। চোদ্দ নম্বরকে তুমি চেনো।"

আমি চিনি? সান্তা ক্লজের ছেলে-মেয়েকে? বলে কি যিশু! হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,

—"যাহ্! কি বলছো? আমি চিনি ওঁর ছেলেকে?"

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খদ্দের ধরতে চলল যিশু। ওর পথ আটকে কপট রাগের গলায় বললুম,

—"ভালো হবে না কিন্তু, বলে দিচ্ছি! সেই সকাল থেকে আমার পেছনে লেগেছো। সামনে 'হিচকক্' দিয়ে যাচ্ছো। জঁনেত্তের সঙ্গে আজ সন্ধ্যার রঁদেভূ নিয়ে কি উদ্ভট রসিকতা করলে বুঝলুম না। এখন আবার—"

আবদারের সুরে প্রশ্ন করলুম,

—মঁসিয় দলানের কোন্ ছেলের কথা বলছো, আমি চিনি?"

মুচকি হেসে যিশুর জবাব,

—"শুধু চেনো নয়, যথেষ্ট দোস্তি আছে! ছেলে নয়, মেয়ে। মাদাম ঈভলীন দুপোঁ।"...

তার একটু বাদেই জেরি এসেছিল।

আমার সিগারেট শেষ হতেই ঘুরে তাকিয়ে দেখি, লম্বু সাহেব! খদ্দের ঠাউরে ছবি আঁকার কথা জিজ্ঞেস করতে যাবো, জেরি বললে,

—"বঁ জুর মঁসিয়!—"

নীল, ঢিলেঢালা গেঞ্জি গায়ে ভারতবর্ষে দেখা সেই হিপিকে চিনতেই পারিনি। গলার আওয়াজ এবং চোখে পণ্ডিতমশাই গোছের চশমা দেখে ধরে ফেললুম। দু' হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরলুম জেরিকে। ও আমার চেয়ে এত লম্বা যে, গলা জড়িয়ে ধরার প্রশ্নই ওঠে না। দু' বগলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে আলিঙ্গন।

জেরি হাসছে। বলছে,—

—"চিনতে পারোনি তো!"

দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে বললুম,—

—"কি করে চিনবো বলো? এমন কেতাদুরস্ত সুট-বুট-টাইতে তোমাকে তো দেখিনি আগে! তাছাড়া পাঁচ মাস হয়ে গেছে, শেষ দেখেছি তোমাকে হিপির পোশাকে।"

ঘুরে দাঁড়াল জেরি। ডান হাত বাড়িয়ে বলল,

—"আলাপ করিয়ে দিই। মিস্ করিন্ ফ্রিক্স—"

এতক্ষণ খেয়াল করলুম ওর পেছনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ দেখতে। প্রায় আমার সমান লম্বা। টুকটুকে আপেল রংয়ের কারিন্ ফ্রিক্স। সুইডেনের মেয়ে। চোখের মণির সঙ্গে রং মিলিয়ে হালকা সবুজ বুকখোলা কোট গায়ে। মুখে ভারি মিষ্টি হাসি। বয়েস কুড়ি-পঁচিশের বেশি নয়।

হাত মেলালুম। নতুন শেখা শব্দ উচ্চারণের মতো করিন্ বলল,

—"গুড্ মর্নিং।"

বলেই, জিভ কেটে জেরির দিকে তাকাল।

জেরি হেসে ওকে বোধ হয় সুইডিশ ভাষায় ভুল শুধরে দিল। লজ্জা পেতে গিয়ে মেয়েটি আমার দিকে ফিরে আবার বললে,

—"সরি! গুড্ আফটারনুন।"

বিকেল প্রায় চারটে তখন। জেরি বলল,

—"চলো। তোমাদের ফরাসী মতে একটু 'পেতি কাফে নোয়া' খাওয়া যাক।"

রসিকতা করেই 'তোমাদের' শব্দটি ব্যবহার করল। আমি লুফে নিয়ে বললুম,

—"খাঁটি ফরাসীদের পকেটে পয়সা থাকলে, এমন সুন্দর রোদের বিকেলে তারা বন্ধুদের ফরাসী শ্যাম্পেন খাওয়ায়। সুতরাং, চলো, শ্যাম্পেন খাওয়াবো তোমাদের।"

জেরি, সেই জেরিই আছে আমার চোখে। তখনো।

ভুরু নাচিয়ে বললে,

—"এখানে রোজগারপাতি ভালোই হচ্ছে, বলছো।

হেসে জানালুম, হ্যাঁ।

আমার পিঠ চাপড়ে বলল,

—"তাহলে, ঠিক আছে। চলো। তোমার প্যারিসে রোজগারের পয়সায় শ্যাম্পেনই খাওয়া যাক।"

রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটতে হাঁটতে ও বলতে লাগলো, লণ্ডন থেকে প্যারিসে এসেছে দুপুরবেলা। এসে, আমার পাঠানো ঠিকানা হাতড়ে মেজোন্দ্যল্যান্দ্-এ পৌঁছে খবর পেয়েছে, আমি এখানে।

—"তোমাদের স্বর্গরাজ্যে তো' বেশ জমিয়ে নিয়েছো, হে! বলি, আসল ছবিটবি কিছু আঁকছো?"

টেবিলে বসে শ্যাম্পেনের অর্ডার দিয়ে বললুম,

—"আটটা ছবি শেষ করেছি। তবে, গ্যালারী এখনো পাইনি।"

গেলাস হাতে তুলে জেরি বললে,

—"চিয়ার্স! পেয়ে যাবে। গ্যালারী তুমি পেয়ে যাবে। আমি জানি, আমার ঘোড়া কখনো 'ফেল' করে না। সারা প্যারিসে তুমি হৈচৈ বাঁধিয়ে দেবে, বলে রাখলুম।"

মেয়েটি বললে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজিতে,

—"জেরি বলেছে, আপনি অসাধারণ শিল্পী। আপনার শিল্পী জীবনের জন্যে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। চিয়ার্স।"

উৎসাহের চোটে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলুম,

—"চলুন। আপনাদের আমার নতুন ছবি দেখাই। আমার দেশের ক্ষুধা, দারিদ্র্যের ছবি। আমি যেভাবে দেখি, তাই এঁকেছি। চলুন, নিয়ে যাবো।"

জেরির দিকে ফিরে বললুম,

—"আজ আর এখানে কাজ নেই। অনেক রোজগার হয়েছে একদিনের পক্ষে। বেশি পয়সায় আমার আবার বদহজম হয়। তার ওপরে, এখানকার অনেক শিল্পীরই নাকি চোখ টাটাচ্ছে—"

জেরি বাধা দিল। বলল,

—"একটি কাজ বাকি আছে, শিল্পী।"

জিগ্যেস করলুম,

—"কি?"

জবাবে ও করিনের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। ঘুরে বললে আমায়,

—"করিন দারুণ মেয়ে। আশ্চর্য প্রাণ আছে ওর মধ্যে। দেখছো না কি দারুণ 'লাইভ্‌লি'!"

বলে, আবার আদর করল মেয়েটিকে।

আমি ভাবছিলুম, ঠিক এই ধরনের কথাই যেন কোথায় শুনেছি? কোথায় শুনেছি? কে বলেছিল?

করিন যেন বা লজ্জায় মাথা অল্প নিচু করল। এক ফালি হাসি ছুঁড়ে দিল আমায়।

জেরি বললে, ঘোষণা করবার মতো,

—"আগামী কুড়ি তারিখে করিনের সঙ্গে আমার বিয়ে, শিল্পী।"

মনে পড়েছে বউ! মনে পড়েছে, কোথায় শুনেছিলুম প্রায় একই সুরে কথাগুলি। জেরিই বলেছিল। ওর প্রাণের মেয়ে প্যাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে—। ভেতরে ভেতরে কেমন কুঁকড়ে গেলুম যেন।

গাল টেনে হেসে, মাথা ঝুঁকিয়ে বললুম,

—"কনগ্র্যাচুলেশন্‌স!"

মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল। বলল,

—"থ্যাংক ইউ, ইণ্ডিয়ান!"

জেরি বললে,

—"সন্ধ্যে সাতটার প্লেনে আমাদের স্টকহোমে ফিরে যেতে হবে, ভাই।"

আমি অবাক,

"সে কী! আমার ছবিগুলো দেখবে না?"

—"এ যাত্রা হবে না! তুমি আমাদের বিয়েতে এসো। হনিমুন করতে প্যারিসেই আসবো, ভাবছি। তখন দেখবো।"

তারপর জেরি যা' বলল, আমি শুনতে পেলুম, 'আমার চার বছরের কন্যা প্যাট্রিসিয়া শীটস্ গত কয়েক মাস যাবৎ হারাইয়া গিয়াছে। গায়ের রং ফরসা। উচ্চতা তিন ফুট দুই ইঞ্চি। যে কোনো বাগানের পটভূমিকায় ওর সোনালী চুল এলোমেলো উড়িতে থাকে। ফোটো তুলিতে গেলে ফ্ল্যাশ বালবের আলোয় ভয় পাইয়া কাঁদিয়া ফেলে। যে কেহ সন্ধান পাইয়া নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে পুরস্কৃত করিব। মেয়েটির পরনে—'

[ক্রমশ]

বিশ্ব বিজ্ঞান

মঙ্গল সম্পর্কে

সোভিয়েত মহাকাশযান মার্স-৩ এবং মার্স-৪ এবং মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-৯ প্রায় বছর চার আগে পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গল সম্পর্কে যে সব তথ্য পাঠিয়েছিল সেগুলি আরও খতিয়ে দেখার জন্যে মার্কিন দেশ নতুন পর্যায়ে কাজ শুরু করেছেন। চির রহস্যময় সেই লোহিত গ্রহটির অনুসন্ধানে এবার তাঁরা পাঠিয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মহাকাশযান। নাম ভাইকিং। বলা হয়েছে, মুখ্যত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে ভাইকিং-কে তাঁরা মঙ্গল গ্রহে পাঠিয়েছেন। এক, পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের মঙ্গল গ্রহে অবতরণের কাজটি সুগম করা। দুই, মঙ্গলের ভূ-প্রকৃতি এবং জীব জগৎ (যদি কিছু থাকে) সে সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান। "নাসা"র বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ভাইকিং ৪ জুলাই, ১৯৭৬ মঙ্গল গ্রহে গিয়ে অবতরণ করবে।

ভাইকিংকে ধীরগতিতে মঙ্গলের বুকে অবতরণ করানোর ব্যাপারে শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ এই মহাকাশযানটি যখন মঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছবে, তখন এই প্রথম মার্কিন দেশের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিলতম প্রযুক্তিগত পরীক্ষার দিকে অনেক বেশি নজর দেবেন। যেমন, এক, মূল বাহক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই মহাকাশযানটি মঙ্গল গ্রহের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ মিটার দূরত্বের কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটি রকেট জ্বলে উঠবে। তার ধাক্কায় ভাইকিং-এর সঙ্গে লাগিয়ে রাখা অতিকায় একটি প্যারাসুট খুলে যাবে। এই সময়ে মঙ্গলে নামার ভেলাটি থাকবে সংকর ধাতুর তৈরি একটি আধারের মধ্যে। এই আধারটি এমন ভাবে তৈরি যাতে করে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল ভেলাটিকে এতটুকু না স্পর্শ করতে পারে। অর্থাৎ দ্রুতগতিতে নামার সময় মঙ্গলের বাতাসের ঘর্ষণে ভেলাটি যাতে না জ্বলে উঠে পুড়ে যায়, তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। দুই, ভাইকিং-এর এই আধারটি যখন মঙ্গলের খুব কাছে এসে পড়বে, তখন রকেটের ধাক্কায় প্যারাসুটবাহী অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে ঠেলে দেয়া হবে। যাতে করে অবতরণ করার পর এই প্যারাসুট ভেলাটিকে না ঢেকে দেয়। তিন, মাটির কাছাকাছি হওয়ার পর আধারটি বিযুক্ত হবে। ডিম ফুটে যেমন পাখি বের হয় ঠিক

শিল্পীর চোখে ভাইকিং যখন মঙ্গলের বুক থেকে ৬০০০ মিটার দূরে। রকেট কী ভাবে প্যারাসুটটি খুলে দিচ্ছে, লক্ষ করুন। কঠিন আধারের মধ্যে রয়েছে মঙ্গলের ভেলা

তেমনি সেই আধারের মধ্যে থেকে ধীর গতিতে মঙ্গলের ভেলাটি হাত-পা ছড়িয়ে বেরিয়ে আসবে। পরে কয়েকটি খুদে রকেটের উর্ধ্বগতি ধাক্কা তার গতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকবে। এবং অবশেষে শান্ত পদক্ষেপে মঙ্গলের বুক স্পর্শ করতে সাহায্য করবে।

বলা বাহুল্য, বিশেষ এই কৌশলটির সঠিক তাৎপর্য কি, ঠিক এই মুহূর্তে বলা শক্ত। অনেকেই জানেন, চাঁদের বুকে চাঁদের ভেলা নামানোর সময় মার্কিন বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিটির সাহায্য নিয়েছিলেন, সেটি ভিন্ন রকমের ছিল। ওই সময় অ্যাপলো মহাকাশযানটিকে চাঁদের চারপাশের একটি কক্ষপথে পরিক্রমণ করানো হয়। সেখান থেকে চাঁদের ভেলা যাত্রা করে গিয়ে নামে চাঁদের বুকে। পরে মহাকাশচারীরা তাঁদের কাজকর্ম সেরে ওই ভেলায় চড়ে পরিক্রমণরত মহাকাশযানে ফিরে আসেন এবং ওই যানে চড়ে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করেন।

ভাইকিং-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটছে অন্যরকম। মঙ্গলের চারপাশের কোন পরিক্রমণ পথে কোন মহাকাশযানকে স্থাপন করার ব্যবস্থা হয়নি। পরিবর্তে, কতকটা চাঁদের ভেলার মত আকৃতির ভাইকিং স্বয়ং গিয়ে নামছে মঙ্গলের বুকে। এসব দেখে মনে হয়, হয়ত মার্কিন দেশ ভবিষ্যতে মহাকাশে কোন স্টেশন স্থাপন না করেই সরাসরি মূলযানের সাহায্যেই মঙ্গলে মানুষ পাঠানর চেষ্টা করবেন। তাতে মহাকাশ-প্রযুক্তিগত অনেক জটিল সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

তবে এমনও হতে পারে, চাঁদের বুকে সরাসরি সার্ভেয়ার গোষ্ঠীর যন্ত্রচালিত যান পাঠিয়ে প্রথম পর্যায়ে যেমন চাঁদের পরিমণ্ডল, ভূ-প্রকৃতি এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছিল, হয়ত এ ক্ষেত্রেও তেমনটি করা হবে। ভাইকিং সরাসরি মঙ্গলের বুকে অবতরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাঠাবে। তার
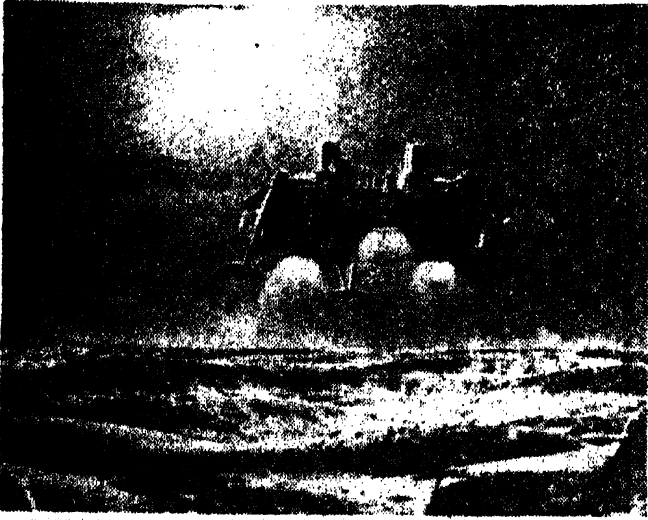
মঙ্গলের ক্রাইসে অঞ্চলে ৪ জুলাই, ১৯৭৬ এই ভাবে ভাইকিং-এর অবতরণ করার কথা

ওপর নির্ভর করে ঠিক করা হবে, মঙ্গল গ্রহের ঠিক কোন অঞ্চলে মানুষ পাঠান সম্ভব, পাঠালে সেখানে তাদের নিরাপদে রাখার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে, ইত্যাদি। অতঃপর সেই অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে মানুষ গিয়ে অবতরণ করবে মঙ্গলের বুকে।

এবং তখন ঠিক যে পদ্ধতিতে চাঁদের বুকে মানুষকে অবতরণ করান হয়েছিল, মার্কিন বিজ্ঞানীরা সেই পদ্ধতিটিই বেছে নেবেন।

এর সপক্ষে যুক্তিটি এই রকম : মঙ্গলের দূরত্ব চাঁদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ফলে মঙ্গলে যেতে গেলে আরও বেশি পরিমাণ জ্বালানি বয়ে নিয়ে যেতে হবে। নভোচরদের খাবারদাবার এবং স্বাস্থ্যগত প্রয়োজনের টুকিটাকি জিনিসপত্রের পরিমাণও বেশি হবে। যার অর্থ মানব-আরোহী মঙ্গলযানের 'পে লোড' অর্থাৎ বোঝা অ্যাপলোর 'পে লোড' থেকে বেশি। এত বেশি জিনিসপত্র বহন করে সড়সড় একটি মহাকাশযানকে মঙ্গলের বুকে নামিয়ে দেয়াটা খুব একটা শক্ত কাজ হয়ত হবে না। কিন্তু মুশকিল হবে ফেরার সময়। অতবড় একটি যানকে মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে ঠেলে তুলে আনা সহজ কাজ হবে না। কারণ তার জন্যে চাই শক্তিশালী রকেট। প্রচুর জ্বালানি।

তার চেয়ে বরং চাঁদে নামার পদ্ধতিটিই সহজ। মঙ্গলের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দূর আকাশ পথে পরিক্রমণ করতে থাকবে একটি মহাকাশ স্টেশন। অ্যাপলোর কম্যান্ড মড্যুলের মত। সেই স্টেশন থেকে নভোচররা হাল্কা একটি ভেলায় চড়ে মঙ্গলের বুকে গিয়ে নামবেন। যেহেতু ভেলাটি হাল্কা, মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ উপেক্ষা করে কম জ্বালানির সাহায্যেই তাঁরা আবার মহাকাশ স্টেশনে ফিরে আসতে পারবেন। এতে ঝুঁকি কম। সেই সঙ্গে খরচও।

*

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা মঙ্গলের পরিমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে মেরিনার-৯ যান্ত্রিক মহাকাশযান পাঠিয়েছিলেন ৩০ মে, ১৯৭১। এর কয়েক দিন আগে সোভিয়েত দেশ এই একই উদ্দেশ্যে পাঠালেন তাঁদের আন্তগ্রহযান মার্স-২ এবং মার্স-৩, যথাক্রমে ১৮ মে এবং ১৯ মে। মেরিনার-৯ মঙ্গলের বুকে অবতরণ করেনি। পরিবর্তে এই গ্রহটির চারপাশ পরিক্রমণ করে কয়েক হাজার তথ্যবাহী ছবি তুলে পৃথিবীর গবেষণাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মার্স-২ও মঙ্গলের বুকে অবতরণ করতে পারেনি। কিন্তু সফল হয়েছিল মার্স-৩। এই মহাকাশযানটি ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ মঙ্গলের বুকে ধীর গতিতে অবতরণ করে পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম সেতুবন্ধন রচনা করে। উল্লেখ্য এদেরও আগে মার্কিন যান মেরিনার-৬ এবং ৭ মঙ্গলের দূরবর্তী মহাকাশ অঞ্চল থেকে কিছু কিছু মূল্যবান তথ্য পাঠাতে সমর্থ হয়েছিল।

পুরানো সেই সব মহাকাশযান থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে জানা গিয়েছিল, মঙ্গল চাঁদেরই মত কতকগুলি গহ্বরে ভরা। তার বুকে তথাকথিত খালের কোন অস্তিত্বের তারা সন্ধান করতে পারেনি। সেখানে অক্সিজেন নেই। সম্ভবত নাইট্রোজেনও। এতদিন যাদের আমরা সাগর বলে জেনে এসেছি, সে সব জায়গায় এক বিন্দু জলেরও চিহ্ন ধরা পড়েনি। এমন কি, মঙ্গলের মেরু অঞ্চলের শুভ্র মেঘের মত যে ছায়াকে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে জলকণার সমাবেশ বলে ঘোষণা করে এসেছেন, তারও মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল মেরিনার-৭। ৫ অগাস্ট ১৯৬৯ এই আন্তগ্রহযানটি

মঙ্গলের নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে ৫০০ কিলোমিটার দক্ষিণে তাই থানিয়াস লেকাস অঞ্চলে অবস্থিত ৫০০ কিলোমিটার লম্বা এবং ১২০ কিলোমিটার চওড়া ফাটলের এই ছবিটি পাঠিয়েছিল মেরিনার-৯। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে এই ফাটলটি একটি বড় রকমের জিজ্ঞাসা

সেখানকার দক্ষিণ মেরুতে জমে থাকা যে সব মেঘের ছবি পাঠিয়েছিল, মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ রবার্ট লাইটন সেই সব ছবির প্রাথমিক পরীক্ষার কাজ শেষ করে মন্তব্য করেছিলেন, ওই মেঘ অসংখ্য বরফকুচি দিয়ে তৈরি। তবে সে বরফ জলের নয়, হিমশীতল কার্বন ডাই-অকসাইডের। অর্থাৎ এক কথায় মঙ্গল সম্পর্কে পৃথিবীর প্রত্যাশাটি মেরিনার-৭ সেদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

পরে মেরিনার-৯ যে সব তথ্য পাঠায়, তাদের মধ্যে খানিকটা আশার আলো চোখে পড়ে। মার্স-৩ পরিবেশিত তথ্যগুলিও সে আশার সমর্থক। এই দুই যানের পরিবেশিত তথ্য থেকে যেটুকু জানা গেছে তার সার কথা, মঙ্গলে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে অকসিজেন, নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেনের অকসাইড, কার্বন ডাই-অকসাইড এবং জলীয় বাষ্প ধরা পড়েছে।

এ ছাড়া মেরিনার-৯'এর পাঠান ছবিগুলি পরীক্ষা করে আরও কয়েকটি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

যেমন ধরুন, সেখানকার কোপরেটস গিরিখাদটি। এটি লম্বায় ২৭০০ কিলোমিটার, চওড়ায় ১৫০ কিলোমিটার এবং ৬ কিলোমিটার গভীর। মঙ্গলের আগ্নেয়গিরি অধ্যুষিত অঞ্চল থারসিস মালভূমি থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে এই অতিকায় গিরিখাদ। বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্ত। এত বড় গিরিখাদ! এ যেন কল্পনাই করা যায় না।

মঙ্গলের উভয় গোলার্ধের চরিত্রটাই যেন পুরোপুরি বিপরীত। পৃথিবীকে পূব থেকে পশ্চিম বরাবর ভাগ করা হয়েছে বিষুব রেখার সাহায্যে। যে রেখাটি পৃথিবী নামক গোলকটিকে সমান দুটি অংশে ভাগ করেছে। কিন্তু মঙ্গল নামক গোলকটিকে যে বিষুব সমগোত্রীয় রেখা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে সেটি সেই গ্রহের ৫০ ডিগ্রি দূরে। এই রেখার এক পাশের অঞ্চলে জ্বালামুখ বা খাদের সংখ্যা কম। আর এক গোলার্ধে (?) রয়েছে প্রচুর জ্বালামুখ, অজস্র আগ্নেয়গিরি। এ থেকে সম্প্রতি প্যারিসের ইনসটিটিউট দু গ্লোবের দুজন বিজ্ঞানী—ডঃ ভি ই কোরতিলে ও সি জে আলেগার এবং লাবরেতোরি দ্য জিওলগি স্তাকচারেল-এর ডঃ এম মাতুত্তর মন্তব্য করেছেন—মঙ্গলগ্রহের দুই গোলার্ধের অভ্যন্তরিক গঠন ভিন্নতর। পৃথিবীর মত সেখানকার ভূ-স্তরও চলাফেরা করছে।

বিতর্ক এখনও চলছে। আপাতত প্রতীক্ষা। দেখা যাক, আগামী বছর ভাইকিং আবার নতুন কি সংবাদ পরিবেশন করে।

সমরজিৎ কর

মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলায় বিশেষ নতুন চেক

ডি সি এম সিল্ক মিলের নতুন চেক আপনি নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন। সুন্দর। নতুন ধরণের। নতুন ফ্যাশনের। দামেও সস্তা।

আজকাল সকলেই চেক পরেন।
কেমন যেন একঘেয়ে ধরণের।

কিন্তু ডি সি এম এর চেকগুলি দেখুন। এত রকমারি আগে কখনও দেখেন নি। যেমন মনের মত রং তেমনই বুননের কাজ। দেশের কয়েকজন সেরা কাপড় ডিজাইনারের তৈরী—যাঁরা কাপড় যাতে নিখুঁত ও টেকসই হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

আর এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্যে প্রত্যেক ডিজাইনের কাপড় খুব সীমিত পরিমাণে তৈরী করা হয়। তাই আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন ডি সি এম এর যে স্যুটিং আপনি পরেছেন সেটা আর চট করে আপনার নজরে পড়বে না।

ডি সি এম স্যুটিং গুণে যতটা এগিয়ে দামে কিন্তু ততটাই পিছিয়ে।

বিশেষ
'টেরিন' স্যুটিং
DCM
সিল্ক মিলের তৈরী

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ৫ ॥
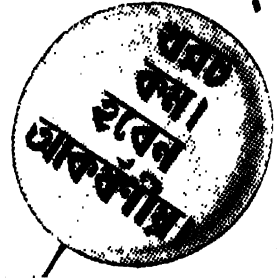
এক অজানা থেকে অন্য অজানায় এগিয়ে যাচ্ছিলুম। ফ্লোরিডা থেকে প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ লুজিয়ানা স্টেটে পৌঁছবার আগে একবারটি দেখে নিলুম জর্জিয়া স্টেটের রাজধানী আটলাণ্টাকে। এখানে আমার আমন্ত্রণ ছিল স্বর্গত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ছেলে প্রীতীন্দ্র চৌধুরীর ওখানে। কিন্তু আমার সময় ছিল কম। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য ঘুরে যেতে গেলে বছরখানেক অন্তত সময় লাগে। সুতরাং, পুরনো ফরাসী উপনিবেশের রাজধানী নিউ অর্লিয়েন্সের অলিগলি এবং ডাউন-টাউন আপাতত সরিয়ে রেখে আমি সোজা এসে পৌঁছলুম টেক্সাসের দক্ষিণ শহর হিউসটনে (Houston)। চন্দ্র-অভিযানের যুগে হিউসটন ও পূর্ব ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি একালে খুবই খ্যাতি লাভ করেছে।

রাত ১২টা বেজে গেছে। এক ভদ্রলোককে একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন করলুম এবং তিনি হাসি মুখে আমার পিঠে হাত রেখে প্রত্যেকটি কথার জবাব দিয়ে গেলেন যার এক বর্ণও আমি বুঝলুম না। আমেরিকান ইংরেজী এবং তার একসেণ্ট না বুঝলে আমেরিকায় ভ্রমণ করা চলে না। কিছুদিন আগে বেস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যিনি ইংরেজী সাহিত্যে উচ্চমানের পি-এইচ-ডি করেছেন, তাঁর গম্পগুজবের কালের ইংরেজী এখনও স্মরণীয়। কোনও এক ব্যক্তির প্রতি উত্তেজিত হয়ে তিনি বলছিলেন, He don't know nothing ! পরে শুনলুম আমেরিকান সমাজে কথালাপের মধ্যে এ ধরনের ইংরেজী বহুক্ষেত্রেই চলে। এদেশে এমন হাজার হাজার শব্দ প্রচলিত আছে, যে গুলি চেম্বার্স-অক্সফোর্ড-ওয়েবস্টার কোনও অভিধানেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিমানঘাটিতে যিনি আমাকে অত রাত্রে নিতে এসেছিলেন তিনি এক অমায়িক বাঙালী যুবক দীপক ব্যানার্জি। তিনি বিবাহিত, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ভারত থেকে এখনও এখানে এসে পৌঁছননি। উনি আমাকে নিয়ে চললেন ফিনিক্স নামক এক অঞ্চলে ওঁর দোতলার ফ্ল্যাটে—যার সামনে একটি সুইমিং পুলে শ্বেতাঙ্গিনীরা বিকিনি পরে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে—যে দৃশ্য দেখলে পুরোহিতরাও লজ্জা পায়! দীপক একজন ইঞ্জিনিয়ার, শনি-রবিবার ছাড়া প্রতিদিনই তাকে বেরোতে হয় সকাল সাতটায়, ফিরে আসে বিকাল পাঁচটায়। এ অঞ্চল মেক্সিকো উপসাগরের উত্তর তীর—গ্রীষ্মকাল এখানে প্রবল।

পরদিন আন্দাজ বেলা ১১টায় আমার একটু চমক লেগেছিল সে কথা না বলে পারছিনে। দীপক বলে রেখেছিল এ অঞ্চলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন—এ সব লেগেই আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিগ্রোরাই এ সব করে। তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকারি প্রচুর। লেখাপড়া বা কারিগরি বিদ্যায় তারা অনেক পিছিয়ে। ফ্ল্যাটের ভিতরে লোক থাকা সত্ত্বেও তারা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে লুঠপাট করে। সঙ্গে থাকে পিস্তল—যা বাজারে যখন-তখন কেনা যায়—সুতরাং সাক্ষী থাকার ভয়ে তারা আগে খুন করে, পরে লুঠ করে। পুলিস আসে পরে। কিন্তু পুলিসের কর্তা যদি আবার কৃষ্ণাঙ্গ হয় তবে সোনায় সোহাগা! সুতরাং আপনি একটু সতর্ক থাকবেন, দরজা সহজে খুলবেন না। সম্প্রতি অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে।

এই অজানা মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে এক শহরের ফ্ল্যাটে আমার আশঙ্কার যখন কূলকিনারা পাচ্ছিলুম না তখন হঠাৎ ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে থেকে ঘণ্টা বাজলো। এবার নিশ্চয় দরজা ভাঙবে অতএব দরজা না খুলে উপায় নেই। আত্মসমর্পণের জন্য আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। কিন্তু দরজা খুলতেই দেখি এক তরুণী শ্বেতবর্ণা অতি সুশ্রী মেমসাহেব। পরণে হট্ প্যাণ্ট, গায়ে 'টি' শার্ট এবং দুই হাতে বড় বড় দু'তিনটে কাগজের ঠোঙা। ইংরেজী প্রশ্ন করতে গিয়ে যখন থতিয়ে গেলুম, তখন এই অষ্টাদশী পরিষ্কার বাঙলায় বলল, আমার নাম রিনা, দীপককে আমি কাকা বলি। আপনার জন্য আমি রান্নাবান্না করে দেবো। আজ সন্ধ্যায় অনেকে আপনার এখানে আসবেন দেখা করতে।

তোমাকে মেমসাহেব বানালো কারা?

মেয়েটি হেসে উঠে রান্নার আয়োজনে লাগল। বলল, আমাদের বাড়ি লখনৌ, মা-বাবার আমি একই সন্তান। আমি কনভেণ্টে পড়াশুনো করেছি। আমার স্বামী রতন আর দীপক—সবাই আমরা লখনৌর লোক।

ওরা কাকী-ভাইপো দুজন সম্পর্কে। আমার বিয়ে হয়েছে বছর দেড়েক। এখন উনিশে পড়েছি। রান্নাবান্না কাজকর্ম সব শিখেছি বিয়ের পর। আমি মেমসাহেব নই। কিন্তু শাড়ি পরে রাস্তায় বেরোইনে—লোকের চোখে পড়ে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মেয়েটি চারটে গ্যাসের উনুনে একে একে ডাল ভাত, মাংস, কপির তরকারি, বেগুনভাজা—সব প্রস্তুত করে বলল, চলুন, আপনাকে শপিং সেণ্টার দেখিয়ে আনি। কাকা বলেছেন আপনার যা যা দরকার, কিনে দেবো।

রিনা আমাকে নিয়ে ড্রাইভ করে চললো। স্বামী-স্ত্রীর দুখানা গাড়ি। এ দেশে ভারতীয় কর্মী মেয়েরা শাড়ি পরে না। আপিসের কর্তারা বলেন, ওতে অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে থাকলে কাজের ব্যাঘাত ঘটে। সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুরের চিহ্ন অন্যের কৌতূহল সৃষ্টি করে। সকলের মধ্যে মিলিয়ে না গেলে সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম হয় না।

টেকসাস স্টেটে কম-বেশী দু' হাজার ভারতীয়দের মধ্যে প্রায় একশ' বাঙালী আছেন। সকলেই কোনও না কোনও কাজে নিযুক্ত। সাধারণভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উপার্জন করলে মোট দেড় হাজার ডলার মাসে ঠিকই হয়। এ দেশে ১০ বা ১৫ বছর চাকরি করে অধিকাংশ ভারতীয়ই দেশে ফিরে যেতে চায়। অনেকে আবার থেকেও যায় সাচ্ছল্য এবং বিলাস ব্যবস্থার লোভে। কিন্তু এ দেশে যাদের সন্তানাদি প্রতিপালিত হয়, তারা ভারতীয় প্রকৃতি লাভ করে না। বহু ভারতীয় তথা বাঙালী পরিবার দেখেছি, যাদের সন্তানরা প্রায় আমেরিকান বনে গেছেন। এক বিশিষ্ট ও সচ্ছল বাঙালী পরিবারে দেখেছি, তাঁদের তরুণ বয়স্ক ছেলেটি ঢীলা-ঢালা ছেঁড়া-খোঁড়া পোশাক পরে ও মাথায় মেয়েলী চুল রেখে আমেরিকান 'হিপি' (Hippie) বনে গেছে। সে বাঙলা বলতে ভুলেছে। আরেক ক্ষেত্রে একটি সুশ্রী মেয়ে—যার পিতামাতাও বাঙালী—সে বি-এ পাস করার পর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের মতো অন্যত্র ঘরভাড়া করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সামাজিক জীবনে এমন একটি উদার স্বাধীনতার প্রশ্রয় থাকে, যার আস্বাদ বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই।

সম্প্রতি এ দেশে মন্দা বাজারের জন্য দলে দলে মেয়েপুরুষ চলে আসছে উত্তর দেশ থেকে টেকসাসের দিকে। এখানে কয়লা, তুলো, গম, লোহা এবং অন্যান্য খনিজ ও ফসল প্রচুর। এই দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগে এসে দাঁড়ালে প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। শিল্পপতিরা উপযুক্ত কর্মী পেলে মহা খুশী। যাদেরকে কথায় কথায় লে অফ' করা হচ্ছে, তাদের ভাত-কাপড়, আশ্রয় ও মোটরের অভাব নেই। একখানের ঘর-কন্না তুলে দিয়ে অন্য দেশে এসে সংসার পাততে তাদের দেরি লাগে না। 'ইউ-হল' কোম্পানির বড় বড় গাড়ি সর্বদা মাল বহন করতে প্রস্তুত। তারা মালপত্র এনে নতুন সংসার পেতে দিয়ে যায়। আমেরিকানরা আয় করে প্রচুর, ধার করে তার চেয়েও বেশী। গাড়ি, বাড়ি, বাজারহাট, কাপড়-চোপড়, ওষুধপত্র, ঘরের সমস্ত আসবাব, সর্বপ্রকার বিলাসবস্তু—সমস্তই ধারে পাওয়া যায়। পেট্রল ধারে কেনা, যে কোনও খাদ্য বা পানীয় সব ধারে। শিল্পপতিরা বা দোকান-বাজারের মালিকরা শুধু দেখে নেয় তোমার 'ক্রেডিট কার্ড' বা তোমার উপার্জনের ক্ষেত্র। তারা দেনা শোধ চায় না, চায় বছরে শতকরা ১৮ ডলার সুদ। সামগ্রীসম্ভার তুমি যতই অপচয় করবে, শিল্পপতিরা ততই খুশী। ওতে উৎপাদনের মাত্রা বাড়ে। উপার্জনের শতকরা ৫০ বা ৬০ অংশ খরচ করলে তুমি রাজার চালে থাকতে পারো। বহু ভারতীয় আছেন যাঁরা দুখানা বা তিনখানাও পণ্টিয়াক গাড়ি রাখেন। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যাদের একটু অবস্থা ভালো, তারা প্রথমেই কাডিলাক গাড়ি কেনে। তারা শ্বেতাঙ্গদের টেক্কা দিতে চায় যে কোনও সুযোগে।

হিউসটনে সম্প্রতি রুশ ও মার্কিনীরা যৌথভাবে চন্দ্রযান পাঠাবার আয়োজনে ব্যস্ত রয়েছে। এখানে দেখাশোনা ও বন্দোবস্ত করার জন্য বহু সোভিয়েট বিজ্ঞানী পরিদর্শনের কাজে এসেছেন। উভয় দেশ থেকে একই সঙ্গে একই সময়ে দুটি রকেট উড়বে আকাশপথে, এবং দূর মহাশূন্যে কোথাও গিয়ে উভয়ের রকেট

(শে ১৯৩৪)

পরিকল্পনাকে স্পর্শ করবে এবং পাইলট অদল-বদল করা হবে—এই ছিল সিদ্ধান্ত। রকেট ছুটি পাঠানো হবে ১৫ জুলাই।

হিউস্টনে একটি 'টেম্পোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে সব বাঙালীদের চেষ্টায় তাঁদের মধ্যে রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় খুবই সচেষ্ট ও সক্রিয়। এঁরা একটি বড় রকমের নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন এবং সেখানে স্বাধীন বাঙলা দেশের প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কোন কোনও মহিলা ও তাঁদের স্বামীর পাণ্ডিত্য ও মিষ্টব্যবহার খুবই স্মরণীয়। আমেরিকার প্রায় প্রত্যেকটি ভারতীয় আপন আপন কর্মক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করে রয়েছেন। অপর একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে কিছু বলবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলুম। সেটির নাম 'হিন্দু ওয়ারশিপ সোসাইটি।' এটা অনেকটা গির্জার মতো। প্রতি রবিবারে ওখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের আলোচনা ও সংগীতাদি নিয়ে এক প্রার্থনা সভা বসে এবং গুজরাটি ও পাঞ্জাবীদের সঙ্গে বহু আমেরিকান নরনারীও কার্পেটের উপর পা মুড়ে বসে অনুষ্ঠানে অংশ নেন। গানগুলি হয় হিন্দিতে, ভাষণ বা বক্তৃতা হয় ইংরেজীতে। কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠানটি যাঁরা নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালী আছেন, তাঁর নাম অরবিন্দ ঘোষ। তিনি জনসঙ্ঘের নেতা ও অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র।

হিউস্টন থেকে ২০।২২ মাইল দূরে 'নাসা প্রজেক্ট' (National Aeronatic and space administration) প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের নামে উৎসর্গ করা। এই প্রজেক্টটি নিয়ে 'নাসা' নামক একটি শহর গড়ে উঠেছে। এটি একেবারেই নতুন, কিন্তু এটি অন্যতম প্রধান জাতীয় সম্পত্তি। বলা বাহুল্য, এটি নিষিদ্ধ এলাকা। পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানী ও আকাশতত্ত্ববিদরা এই নাসার দিকে চেয়ে থাকে। এর ভিতরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রজটিলতা এবং তার বিচিত্র আণবিক কর্মকুশলতা রয়েছে, তার খবর স্বয়ং পাইলটরাও জানে না, কারণ তারাও যন্ত্রপরিচালিত। শ্রীমান দীপক যখন আমাকে নাসা প্রজেক্টে নিয়ে হাজির করল, তখন সেখানে মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে পাইলটরা প্রশিক্ষণকর্মে ব্যস্ত।

আমরা ঘুরে ঘুরে সেই অতি বৃহৎ এবং সুরক্ষিত বনবাগান দিয়ে ঘেরা অনেকগুলি বহুতল অট্টালিকা পরিদর্শন করছিলুম। অভ্যাগতদের জন্য কয়েকটি অট্টালিকার কোন কোনও অংশ খোলা ছিল। প্রথম যে আমেরিকান মডিউলটি চাঁদের মাটিতে নামে—যেটির পাগুলি ছিল মাকড়সার পায়ের মতো, সেটি এখানে এনে রাখা হয়েছে—যার ছবি অনেকেই দেখেছে। ভিতরে তিনটি মানুষ কি প্রকারে ছিল, কিভাবে ও কিসের সাহায্যে তারা নামল, কেমন করে হাঁটল, কিভাবে ছুটিতে গিয়ে ভেসে চললো—তার সমস্ত কাহিনী। চাঁদের মাটিতে প্রথম পদার্পণ করে হেড পাইলট নীল আর্মস্ট্রং যে কথাটি এই নাসার গবেষণাগারে বলে পাঠান এবং যেটি কোটি কোটি নরনারী টেলিভিসনের সাহায্যে শোনে, সেটি এই,
"That's one small step for a man, one giant leap for mankind,"
—এটিও সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। ওয়াশিংটন মিউজিয়মে যেমনটি দেখে এসেছি, এখানেও তেমনি চাঁদের মাটি ও পাথর এরা বহু যত্নে প্রদর্শনীর মধ্যে রেখেছে। এ কথা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন, হিউস্টনের এই বিশ্ববিখ্যাত গবেষণা ও পরীক্ষাগার থেকেই মহাকাশের যে কোনও রকেট, স্যাটেলাইট প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেপ কেনেডি বা প্রাক্তন ক্যানাভেরাল এখান থেকে দেড় হাজার মাইলেরও বেশী দূরে, কিন্তু এই নাসার কোনও এক অট্টালিকা থেকে প্রত্যেক রকেটের উৎক্ষেপ, গতি ও প্রগতি, পরিচালনা, দূরত্ব, তার বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ক্রিয়াকলাপ, পাইলটদের জীবনরক্ষণ, বিভিন্ন ধরনের ছবি তোলার ক্যামেরা, রেডিও, টি ভি প্রভৃতি—এই অট্টালিকার থেকেই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হয়। এর Reumote control থাকে 'computor' মেসিনে। বলা বাহুল্য, রকেট যে স্থান থেকে অগ্নিস্রাবের ভিতর দিয়ে আকাশপথে উৎক্ষিপ্ত হয়, তার দশ মাইলের মধ্যে জনপ্রাণী কেউ থাকে না। এখানে বলা দরকার, একালে শহরে নগরে ইদানীং বিভিন্ন দোকানে যে মেশিনগুলিতে জিনিসপত্রের দাম কষা হয়, সেগুলি ক্যাল্‌কুলেটর—কম্পিউটার নয়।

সেদিন সারা দিন ধরে আমরা নানাবিধ বিস্ময়জনক দৃশ্যাদি দেখে ফিরেছিলুম।

দিন চারেক পরে হিউস্টন থেকে মোটর বাস ধরেছিলুম উত্তরপথে। রিনা ও তার স্বামী রতন ব্যানার্জি, রঞ্জিতবাবু ও তাঁর স্ত্রী ডাঃ মৃদুলা ব্যানার্জি, দীপক—ওরা এসেছিলেন আমাকে তুলে দিতে। রিনা আজ এসেছিল শাড়ি পরে। সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর, হাতে, কানে ও গলায় অলংকার।

এ দেশে মোটর বাস একটু অন্য

রকমের। কাঁচের জানলাগুলি ঈষৎ রঙীন ভিতরটা এয়ার কনডিশনড। প্রত্যেকটি সীটে নরম মোড়া গদি। যারা ধূমপান করবে তাদের সীট পিছন অংশে। এককোণে টয়লেট, ও হাত ধোয়ার বেসিন ও জলের কল, এপাশে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা। আমাদের পথ মাত্র ২৫০ মাইল দূরে ডালাস শহরে। এর মধ্যে বাস থামবে মাত্র দুবার। প্লেনের মতো প্রত্যেক সীটের সঙ্গে টেবিলযন্ত্র। চলাফেরার পথটি মোটা কার্পেট দিয়ে মোড়া। একটি তরুণী মেয়ে ছোট আকারে প্রত্যেককে লাঞ্চ দিল টেবিলে। একটি বানরুটি, মাংসের চপ, সবজি সিদ্ধ, সামান্য ভাতের পোলাও ছোট এক গেলাস চকোলেট দেওয়া ক্ষীর ও একটি কমলালেবু। সুশ্রী মেয়েটি এক ফাঁকে সহাস্যে জানালো, না, এর জন্য আলাদা দাম দিতে হবে না। আহারাদির পর চা বা কফি বা কোক যত ইচ্ছে খাও।

মোট ৪ ঘণ্টার রাস্তা। কিন্তু হাইওয়ে পথ এত মসৃণ যে, অনেকে ব্যাগ খুলে চিঠিপত্র লিখতে বসলো। গাড়ি কোথাও হোঁচট খায় না। ডালাসে পৌঁছিয়ে গাড়ি ছেড়ে যাবার আগে মেয়েটি জানিয়ে গেল, সে গ্র্যাজুয়েট স্কুলের ছাত্রী। এ দেশে সহজে কেউ কলেজ বলে না, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসের মধ্যেই 'স্কুলগুলি' প্রতিষ্ঠিত। কলকাতা থেকে কেউ এখানে পি-এইচ-ডি করতে এলে তাকে এক বছর বা দু বছর গ্র্যাজুয়েট স্কুলে পড়তে হয়।

ডালাস শহরে ম্যার্টেল নামক এক নিরিবিলি পল্লীতে এসে উঠেছিলুম। সাধারণত বড় শহর যা তার ডাউন-টাউন ছাড়া লোকজন পথে ঘাটে হাঁটে না, কারণ গাড়ি ছাড়া কেউ চলে না। ডাউন-টাউন মানে কলকাতার ডালহাউসী স্কোয়ার বা এসপ্লানেড বা চৌরঙ্গী অঞ্চল। ম্যার্টেল মানে বালীগঞ্জ। পথগুলি সুন্দর, প্রতি বাড়ির সঙ্গে একটু বাগান। পল্লী প্রকৃতি নিঃঝুম শান্ত। এখানেও আরেক দীপক ও তার স্ত্রী শ্রীমতী চিত্রাকে পাওয়া গেল একটি শিশুকন্যা সহ। দীপক ইঞ্জিনিয়ার, চিত্রা শিক্ষয়িত্রী। আমার আসার খবর এরা জানত। সেটি রবিবার। জন পনেরো মহিলা ও পুরুষ ওদের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা ও কুমিল্লারও জনতিনেক গুণীব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ আনোয়ার খান ও শ্রীমতী সালিমাকে মনে পড়ছে। অতগুলি মহিলার মধ্যে কেউ শাড়ি পরেনি, অধিকাংশই টাইট বা হটপ্যান্ট পরা। সেই সন্ধ্যার হৈচৈ-এর মধ্যে যে মেয়েটির আলাপচারী সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মনে হয়েছিল তার নাম জয়শ্রী। পরণে শুধু আলগা পা জামা, গায়ে হাত-কাটা ফতুয়া। সে রাজনীতি বিজ্ঞানের পি এইচ ডি, এখানে অধ্যাপনা করে। চীন, জাপান, ভারত, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, রাশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা—এদের রাজনীতিক তত্ত্ব তার নখদর্পণে। জয়শ্রী অবিশ্বাসবাদ নিয়ে আলোচনা তুলল। ধর্ম, সমাজ, লোকসংস্কার, জনকল্যাণের প্রয়োগ-নীতি, চলিতকালের শিক্ষার ধারা,—এগুলির অসারতা নিয়ে সে উচ্চকণ্ঠে আলোচনা চালাচ্ছিল। তার স্বামী ছিল নীরব শ্রোতা। এমন বিদুষী, চিন্তাশীল এবং উগ্রপন্থী মেয়ে চট করে চোখে পড়ে না। আমেরিকার আন্তর্জাতিক রাজনীতির এমন রূঢ় বিশ্লেষণ ও কঠোর সমালোচনা এ যাত্রায় অন্য কোথাও শুনিনি। বাঙালী মেয়ের মুখে এমন অনর্গল ও চমৎকার ইংরেজিও সহসা শোনা যায় না। এখানে দিন তিনেকের জন্য আমি থেকে গেলুম।

ডালাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকলুম। এখানে একটি ছোট্ট অ্যাপার্টমেণ্টে থাকে সন্দীপ ও তার স্ত্রী রমা। সন্দীপ বর্ধমান কলেজের অধ্যাপক, এখানে পি-এচ-ডি করতে এসেছে স্কলারশিপ নিয়ে। ওদের একটি শোবার ঘর, তার সঙ্গে স্নানাগার, রান্নাঘরে যথারীতি কুকিং রেঞ্জ, এবং বিবিধ উপকরণ। শোনা গেল, এই ক্যাম্পাসের ডর্ম-এ অবিবাহিত ছাত্র ও ছাত্রী একই ঘরে থাকতে পারে। এরা বলে, সমাজনীতির সঙ্গে উচ্চশিক্ষা-বিধির যোগ নেই। বিশ্ববিদ্যায় যোগ্যতা তোমার আছে কিনা, এইটি আগে বিচার্য। তোমার পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, মেধা, ধীশক্তি—এরাই আসল। ব্যক্তিগত জীবনে তোমার সংযম বা নীতিবোধ আছে কিনা—এটি বিচার্য নয়। তোমার কীর্তিই বড়, যৌন-চরিত্রের শুচিতা কতটা তোমার আছে, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কম। বোস্টনে দেখেছি ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী একেকটি উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। কিন্তু ক্যাম্পাসের বাইরে এখানে ওখানে তাদের রেন্দেভো। সেখানে একটির পর একটি স্বেচ্ছাচারের কেন্দ্র, মদ্যপানের বার, নাইট ক্লাব ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ছাত্র বা ছাত্রী উভয়েই হোমোসেক্সুয়াল। ছেলে ছেলেকে এবং মেয়ে মেয়েকে বিয়ে করেছে,—আদালতের বিচারে এটি নিষিদ্ধ হয়নি। আর্টিস্টের সামনে উলঙ্গ ছাত্রী মডেল হিসেবে দাঁড়াচ্ছে, স্বল্পালোকিত মদের হোটেলে উলঙ্গ ছাত্রী নানা ভঙ্গীতে নেচে উপার্জন করছে,—এ দৃশ্য যেখানে সেখানে। কোনও বিষয়ে 'ট্যাবু' নেই। গরম কালে বিকিনি পরা ছাত্রী ক্লাসে ঢুকছে, কেউ ভ্রূক্ষেপ করে না।

বনে-বাগানে-ঝোপে আলোছায়ায় ঘেরা ডালাস শহর ছবির মতো। শহরের উপান্তে সমৃদ্ধ একটি লেক-এর নাম হোয়াইট রক। এরই চারিদিকে যাঁদের বাগানবাড়ি একটির পর একটি—তারা প্রায় সবাই মিলিয়নেয়ার বা বিলিয়নেয়ার। এরাই শুধু তাঁদের বাড়িতে ঝি বা চাকর দারোয়ান বা সশস্ত্র পাহারা রাখতে পারেন, যাদের প্রত্যেকের বাৎসরিক বেতন কমপক্ষে ৩০ হাজার ডলার। এই কোটিপতিদের হাতে রয়েছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান,—এবং এঁরা প্রত্যেকে এক একটি শিল্প সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। এঁদের হাতে রয়েছে টেক্সাস স্টেটের তেল, তুলা, খনিজ সামগ্রী, শস্যক্ষেত্র, কাগজ, বনসম্পদ এবং বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী। এঁদেরই উৎপন্ন শস্য পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানি হয়।

টেক্সাসের রাজধানী ডালাস। ১৯ নবেম্বর ১৯৬৩ তারিখে এই নগরের সুবিশাল ডাউন-টাউনের একান্তে ঠিক যে স্থলটিতে প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডিকে হত্যা করা হয় সেইখানটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। তিনি নিগ্রো সমাজের প্রতি

বৌদ্ধিমায়ার সহানুভূতিশীল ছিলেন. এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তাঁকে গুলী করা হয় একটি বহুতল অট্টালিকার উপরতলা থেকে। সেই তলাটি চিহ্নিত রয়েছে। সেই চৌমাথা রাস্তার কোণের বাড়িটির নিচেকার মস্ত হলে রয়েছে কেনেডি মিউজিয়ম। ওইটির মধ্যে ঘুরে-ঘুরে দেখছিলুম। চারিদিকের দেওয়ালে পৃথিবীর সকল দেশের সংবাদপত্রের রিপোর্টগুলি বড় বড় হেডলাইনে টাঙানো। পণ্ডিত নেহরুর শোকবার্তাও সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে, কারণ কেনেডি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, "রাজনীতি শিক্ষার নেহরু আমার গুরুস্থানীয়"। ফিরবার সময় দেখলুম কেনেডির একটি বাণী দেওয়ালে উৎকীর্ণ করা রয়েছে. "Ask not what the country can do for you, ask what you can do for the country."

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণববাদের অগণিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কালক্রমে স্থাপিত হয়েছে। বেলুড় মঠের বর্তমান সেক্রেটারী স্বামী গম্ভীরানন্দ এদেশের ১৩টি শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কাছে আমার হাত দিয়ে চিঠি পাঠান—যাতে আমি ওগুলি পরিদর্শন করি। বোস্টনে, রোড আই-ল্যাণ্ডে, নিউ ইয়র্কে, ফিলাডেলফিয়ায়—আমি ওঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলুম। কিন্তু যেমন ওয়াশিংটনে দেখেছি, তেমনি এই ডালাসেও দেখছি শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের মস্ত এক বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠান। এখানেও আমেরিকান পুরুষ ও মহিলারা রয়েছেন। তাঁদের জীবনযাত্রা শুচিশুদ্ধ এবং সকলেই নিরামিষ আহার করেন। এঁদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে 'হরে কৃষ্ণ' বলে সম্ভাষণ করেন। মেয়েদের পরণে সাধারণ শাড়ি, মাথায় ঘোমটা, নগ্ন-পদ। পুরুষদেরই মুণ্ডিতমস্তক পরণে গৈরিক বাস এবং শিখাধারী। ওঁদের এই শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ মন্দিরাশ্রমে গিয়ে ভোগ-রান্নার আয়োজন দেখছিলুম এবং বীরলক্ষণ নামক এক সেবাইতের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলুম। সেদিন ভক্তি বেদান্তস্বামী উপস্থিত ছিলেন না। এই ভক্তিবাদী ও অন্ধবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের শুচিশুদ্ধ জীবন-যাত্রার চেহারা আমার ভাল লেগেছিল। মহিলারা শাড়ি পরেন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখেন,—পাছে যৌনচেতনার উদ্দীপন ঘটে। এখানকার প্রভুপাদ হলেন এক প্রবীণ বাঙালী, এঁরা সকলেই পুরীধাম, নবদ্বীপ মায়াপুরের মন্ত্রশিষ্য। বলা বাহুল্য, সকল কালের ইতিহাসেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতি পৃথিবীর বহু দেশকেই অনু-প্রাণিত করে এসেছে। এটি তারই অন্যতম। আসবার সময় বীরলক্ষণ আমাকে জানালেন,

আমাদের গুরু প্রভুপাদ একদিন এই তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী থেকে সেই চিরন্তন কালের জ্যোতির্ময় লোকে মহাপ্রভুর সমীপে আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দেবেন! গুরু আমাদের পথ দেখাবেন! হরে কৃষ্ণ, হরে রাম!

আমার সময় ছিল কম। সেই দিনই অপরাহ্ণে দীপঙ্কর ও চিত্রা আমাকে তুলে দিয়ে এল ডালাস বিমানঘাঁটিতে। আমি যাচ্ছিলুম কলোরাডো স্টেটের রাজধানী ডেন্‌ভার নামক নগরে।

এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি 'এয়ার লাইন' এক এক শিল্পপতির নিজস্ব সম্পত্তি। ডেল্‌টা, ইস্টার্ন, ইউনাইটেড, ওয়েস্টার্ন প্রভৃতি অনেকগুলি। আমার বিমান পথ ছিল মাত্র দু ঘণ্টার। ডেন্‌ভারে যখন এসে পৌঁছলুম তখনও রৌদ্র রয়েছে, কিন্তু প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। যিনি এসে তাঁর গাড়িতে আমাকে তুললেন তিনি বাঙালী এক পরিণত যুবা। তিনি যদিও নিউক্লিয়ার ফিজিকসে পি-এচ-ডি, তবুও তিনি ভারতের সঙ্গে এদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে লিপ্ত। চাকরি করতে তিনি চান না। ১৮ বছর ধরে ইনি কলোরাডোতে আছেন। ইনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলছিলেন, আমি বাঙলার বাইরে মানুষ, বাঙালা বই আজও পড়িনি। শুধু আপনার নাম শুনেছি আমার মায়ের মুখে। উনিশ বছর বয়সে বাপের অবাধ্য হয়ে এদেশে চলে আসি দিল্লী থেকে। আমি দুজন আমেরিকার মেয়েকে বিয়ে করি পর পর। প্রথম জনের দুটি ছেলেমেয়ে আমার কাছে থাকে বছরে ন' মাস, আর স্কুলের তিন মাসের ছুটিতে থাকে মায়ের কাছে। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদের পর এই ইনি—আমার দ্বিতীয় স্ত্রী। আমার ছেলেমেয়ে দুটির বয়স নয় আর এগারো। ওদের মা আবার বিয়ে করেছে।

ওঁর বাড়িতে আমেরিকান স্ত্রীটি পাশে বসে স্বামীর ইংরেজি গল্প শুনে হাসছিল। মেয়েটির বয়স আন্দাজ বছর পঁচিশেক। আমি ভয় পাচ্ছিলুম দুটি বাঘা বাঘা কুকুর মাঝে মাঝে এসে আমার গা শুঁকছিল। এক একটার আকার বাছুরের মতো। কুকুর আমার পক্ষে আতঙ্কের বস্তু।

শ্রীমতী রোজ্ এক সময় উঠে আমার সুটকেশটা নিয়ে একটি ঘরে ঢুকলো, বিছানা ঝাড়লো এবং এক পেয়ালা চা তৈরি করে দিল। ভদ্রলোকটি ততক্ষণে মদ্যপান আরম্ভ করে দিয়েছেন। ভদ্রলোক সরল ও স্পষ্টবাদী শুধু নয়, নির্ভুলভাবে অপ্রিয়ভাষী। এ বাড়িটি তাঁর নিজের। বেশি নয়, পঞ্চাশ হাজার ডলারে এ বাড়ি কেনা। রোজ তার নিজের গাড়ি চালায়। নিজের গাড়ি মানে আমারই। কিছু পোশাকপত্র আর একখানা চার হাজার ডলারের গাড়ি—এ দিয়ে যে কোনও আমেরিকান মেয়েকে কেনা যায়! না, আমি মা বাপ কারোকে পরোয়া করিনে। আমি আমেরিকান। এই ত আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন দয়া করে। কিন্তু জানেন, আপনাকে তুড়ি দিয়ে ওড়াতে পারি?

কড়া মদ্য হুইস্কি খেয়ে এই বলিষ্ঠকায় ও পেশীবহুল যুবা ঈষৎ মাত্রা হারিয়েছিলেন। শ্রীমতী রোজ আমার জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। ওঁর স্বামী [illegible] রাতে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আমার ঘরে ঢুকলুম। মানুষটি অতি ধ- পরায়ণ।

কলোরাডো অধিকাংশই পার্বত্য স্টেট। [illegible]র ভয়ঙ্করীষণা নীলবর্ণা নদী [illegible] তার বহুমুখী ধারা পৃথিবীর অন্যান্য নদী অপেক্ষা অনেক বেশি গভীর। এই খরস্রোতা নদী পাহাড়ের পর পাহাড় কেটে চলেছে পশ্চিম থেকে পূর্বে আবার দক্ষিণে বেঁকে চলেছে দূর দিগন্তে। দক্ষিণ কলোরাডোর [illegible] পাহাড়েরা 'অ্যাসপেন' নামক এক ছোট্ট শহরে আমার পৌঁছবার কথা। সেখানকার 'স্কাইস্ক্রিং' নামক এক সাময়িক পত্রের সম্পাদক মিঃ মাইকেল কেনেডি আমাকে কলকাতা থাকাকালীন এক আমন্ত্রণপত্র দিয়ে রেখেছেন। হিমালয় সম্বন্ধে ওঁদের কৌতূহল প্রচুর।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ নিচে নেমে এসে দেখি স্বামী-স্ত্রী আলিঙ্গনাবদ্ধ এবং চুম্বিত হয়ে রয়েছেন। অতঃপর রোজ্ হাসিমুখে আমাকে শুভপ্রভাত ও বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন গাড়ি নিয়ে। ভদ্রলোক বললেন, আমি বাথরুমে যাচ্ছি, এক্ষুনি বেরোবো। আপনি ততক্ষণ চা করে খান। শুনুন, আমরা দিনের বেলা বাইরে খাই। না, না—ভয় পাবেন না, কুকুর কিছু করবে না,— আপনার যা ইচ্ছে রান্না করে খাবেন। সব রয়েছে রান্নাঘরে। কুকুর দুটোকে আমরা দিনের বেলা খেতে দিইনে।

ও দুটো কি আপনার সঙ্গে যাবে?

ভদ্রলোক বললেন, না না, আপনি যতক্ষণ আছেন, ওদের পাহারা দিন। দেখবেন যেন বাইরে না যায়। যদি বাইরে গিয়ে কুকুর কারও বাড়ির ধারে যায়, তবে পুলিস এসে ওদের গাঙ্গী করবে। কুকুর দুটোর রাগ একটু বেশি।

তিনি বেসমেণ্টের বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। কুকুর দুটো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছিল।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাবার পর আমেরিকা ভ্রমণ আমার মাথায় উঠল। শুনেছি যে বাড়িতে চুরি হয় সে-বাড়িতে চোর ঢুকে আগে কুকুরকে মাংস খাইয়ে শান্ত রাখে। ওই দুটি জন্তুকে বশ করার জন্য আমিও রান্নাঘরের বাক্স থেকে দু-তিন রকমের বিস্কুট, খান দশেক রুটির টুকরো, ফ্রিজারের থেকে সিদ্ধ মাংস, দুটোকে দু পেয়ালা দুধ, গোটা চারেক ডিমসিদ্ধ—একে একে সব খেতে দিলুম। আমার নিজের খাদ্যসামগ্রী ছিল প্রচুর।

উত্তপ্ত রৌদ্রে চারদিক জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। দুপুরে ফিরে এলেন ভদ্রলোক। আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলুম। সুটকেসটি নিয়ে যখন বেরোচ্ছি কুকুর দুটো ল্যাজ নেড়ে আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালো। ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে সেই প্রখর রৌদ্রে ডেন্‌ভার [illegible] দেখাতে বেরোলেন। আমার মেজাজ মর্জি ভাল ছিল না।

সেই দিনই অপরাহ্ণে ওয়েস্টার্ন লাইন্‌স-এর একটি প্লেন ধরে পশ্চিম দেশের দিকে রওনা হয়ে গেলুম। আমার গন্তব্য ছিল নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা ও লাস ভেগাস হয়ে সুদূর পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ক্যালিফর্নিয়ার দিকে। আটলাণ্টিক থেকে প্যাসিফিক—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী মহাদেশের প্রত্যেকটি স্টেট দেখে দেখে আমার ভ্রমণ শেষ করব।

॥ একশো নয় ॥

মালতীর শোবার ঘরের বাইরে, তার মহলের অন্য অংশে আরো অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়। সম্ভবত পরিবারের সকলেই, এবং গৃহের সকল দাস দাসী এই মহলের স্নান ঘরের দিকে ছুটে যায়, যে-ঘরের সংলগ্ন খাটা পাইখানা ও প্রস্রাবাগার। সেখান থেকে নানা কথার অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসে।

কিন্তু মালতীর শোবার ঘরের খাটের ওপাশে এপাশে দরজার সামনে, মালতী আর চন্দ্রনাথ মুখোমুখি। খাটের বিছানায় চাঁদ ঘুমায়। চন্দ্রনাথের চোখে আতঙ্ক, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা। তাঁর সেই চোখের প্রতি মালতীর আয়ত চোখের অপলক দৃষ্টি, স্থির বিদ্ধ। আতঙ্কের কোনো চিহ্ন নেই, বা উদ্বেগ অথবা শোকের। কিন্তু তার চোখেও যেন একটি নিবিড় জিজ্ঞাসা। তার চিবুক ও চোয়ালের পেশি শক্ত। ঠোঁটের কোণের রেখাটিকে হাসি বলে ভ্রম হয়।

চন্দ্রনাথের কানে বাজতে থাকে মালতীর কথা, 'আমার জন্য আর কারোকেই কিছু করতে হবে না, যা করবার আমিই করবো।'... কী করবে মালতী? চন্দ্রনাথের নিজের সেই তীব্র আতঙ্কিত জিজ্ঞাসার কথা, মনে পড়ে, এবং খিড়কি পুকুরে ডুবে মালতীর সেই কালরাত্রির সকালে আত্মহত্যায় উদ্যত ছবি। মালতীর সেই কঠিন প্রতিজ্ঞার পর থেকে, কালরাত্রির সকালের সেই আত্মহত্যায় উদ্যত ছবিই বারে বারে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তিনি কান পেতে থেকেছেন এই মহলের দিকে, কখন হঠাৎ কার আর্তনাদে এক দারুণ সংবাদ ঘোষিত হয়। এ মহল অতি স্তব্ধ, তখন তিনি নিজে নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্থির থাকতে পারেন নি। ইতিমধ্যে ধর্ষিতা বুঁচি গর্ভবতী, এবং কার দ্বারা সকলেরই তা জানা। ছোটকা—মৃগেন্দ্রনাথ। প্রাচীন অভিজাত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার এ কলঙ্ক মাথা পেতে নিতে পারে না, অতএব বহু, অর্থ-ব্যয়ে বুঁচি নবদ্বীপে নির্বাসিতা। শেষ শর্ত, বুঁচি নিজেকে মুক্ত করে আবার এ গৃহে ফিরে আসবে। কিন্তু বুঁচির অনিবার্য জিজ্ঞাসা ছিল, 'ওই ক্ষ্যাপা রাক্ষসটা যে আবার আমাকে হেনস্তা করবে না, তা কে বলবে?' কেউ তা বলতে পারে নি।

এখন বুঁচির সেই ক্ষ্যাপা রাক্ষস স্নান ঘরের দরজার কাছে মৃত ও পতিত। চন্দ্রনাথের সেই শঙ্কা আতঙ্কিত আর্তনাদের দারুণ সংবাদ এই মহল থেকে ভেসে গিয়েছে ঠিক, কিন্তু তা মালতীর বিষয়ে না, মৃগেন্দ্রনাথের অভাবিত মৃত্যুসংবাদ। স্নান ঘরের দরজার চৌকাঠের ওপর মৃগেন্দ্রনাথের শক্ত ঠান্ডা মৃতদেহ, ঠোঁটের কষে শুকিয়ে যাওয়া গাঁজলার দাগ।

'একবার দেখতে যাবে না?' মালতী নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে, তার মুখের ভাব একটু বদলায় না।

চন্দ্রনাথের মনে হয়, মালতীর নিচু স্বরে যেন অতি ধার, যা অনুভবের আগেই কেটে দিয়ে যায়। তাঁর মুখের আতঙ্কিত ভাব ধীরে অপসারিত হয়, তীক্ষ্ণ সন্দেহ জাগে, এবং যেন বহু দূরে থেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী দেখতে যাবো?' তিনি চৌকাঠ অতিক্রম করে ঘরে পা দেন, ধীর পায়ে মালতীর দিকে এগিয়ে যান।

মালতী তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দেয় না, স্থির অপলক চোখে তাকায়। চন্দ্রনাথ পায়ে পায়ে এগিয়ে আসেন। মালতী স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। চন্দ্রনাথের চোখে সহসাই যেন অতিমাত্রায় একটা বিস্ময়ের ঝিলিক হেনে যায়, চমকিয়ে ওঠা স্বরে বলেন, 'তুমি! কখন, কী ভাবে?'

'জানি না।' মালতী তেমনিই ধারালো নিচু স্বরে বলে।

চন্দ্রনাথ যেন মালতীর জবাব শুনতে পান না, নিজের মনেই বলেন, 'ছোটকা আত্মহত্যা করে নি। তার কোনো অসুখ ছিল না।' মালতীর সন্নিকটে এসে দাঁড়ান।

'জানি না।' মালতী এক স্বরে, একই কথা বলে।

চন্দ্রনাথের গলার শিরাগুলো ফুলে ওঠে, তাঁর চোখের তারা দুটো অতি দীপ্ত। তিনি রুদ্ধ গোঙানো স্বরে বলেন, 'হত্যা! কখন, কী ভাবে?'

'জানি না।' মালতী এক স্বরে কথার পুনরাবৃত্তি করে, এবং নিশ্চল থাকে।

চন্দ্রনাথের দুই হাত ঘন ঘন মুষ্টিবদ্ধ হয়, খোলে, ঝাপটানো স্বরে বলে ওঠেন, 'জানো, তুমি জানো!'

'আমি জানি না' মালতীর এক জবাব।

চন্দ্রনাথের চোয়াল চিবুক থর থরিয়ে কাঁপে, গলার শিরাগুলোও। তাঁর চিন্তার ভারসাম্য যেন লুপ্ত হতে থাকে। মালতীর গলার দিকে তাকান, এবং আবার মুখের দিকে! ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকান বিছানার ঘুমন্ত চাঁদের দিকে। মালতীর স্থির দৃষ্টি চন্দ্রনাথের দিকে। চন্দ্রনাথ আবার তাকান মালতীর দিকে, জিজ্ঞাসা করেন, 'কী দেখতে যেতে বলছিলে তুমি?'

'বাড়ির সবাই যা দেখতে যাচ্ছে।' মালতী অপরিবর্তিত স্বরে বলে।

চন্দ্রনাথের মুখ শক্ত, দাঁতে দাঁত চাপা

গোঙানো স্বরে বলেন, 'তোমার কীর্তি দেখতে?'

মালতী কোনো কথা বলে না। চন্দ্রনাথ বলে ওঠেন, 'তুমি তুমি তুমি।'

মালতী কোনো জবাব দেয় না। চন্দ্রনাথ বলে ওঠেন, 'এই তোমার নিজের ব্যবস্থা নিজে করার চেহারা। বিষ দিয়ে খুন।'

মালতী নিশ্চুপ, তার চোয়াল চিবুক আর টিপে রাখা ঠোঁটের কোণে বাঁকা রেখা। চন্দ্রনাথ বলেন, 'তোমার বিয়ের পরের দিন সকালে, তোমাকে সেই পুকুরে ডুবতে যাওয়ার কথা আমি রোজ ভেবেছি।'

'ভেবেছিলে, তা-ই আমার হবে।' মালতী বলে, জিজ্ঞাসা করে না।

চন্দ্রনাথ বলেন, 'রোজ ভেবেছি, কোন্ দিন তুমি একটা ভয়ংকর কিছু করে বসবে। রোজ রোজ ভয়ে ভয়ে থেকেছি।'

'কিন্তু যা ভেবেছিলে তা হয় নি।' মালতী বলে, 'বিয়ের পরের দিন, আর আজ অনেক তফাত।'

চন্দ্রনাথ বাতাসের ঝাপটার মতো শাসিয়ে ওঠেন, 'চুপ।' তাঁর হাত উদ্যত হয়ে ওঠে। মালতী স্থির অপলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখে রক্তের ছটা লাগে, কিন্তু একটুও নড়ে না।

'চন্দর, তুই এখানে?' নীরেন্দ্রনাথ দরজায় দাঁড়িয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল স্বরে বলেন।

মালতী মাথায় অল্প করে ঘোমটা টানে। চন্দ্রনাথ ফিরে তাকান। নীরেন্দ্রনাথ এক মুহূর্ত দুজনকে দেখে বলেন, 'আমি কোদনকে বলেছি, বাড়ির ঝি চাকর কারোকে যেন বাইরে যেতে না দেওয়া হয়। তুই একবার আয়, বাবা তোকে ডাকছেন।' বলে আর একবার মালতীকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে যান।

চন্দ্রনাথ মালতীর দিকে একবার দেখেই দ্রুত ঘরের বাইরে চলে যান। দুই ঘর অতিক্রম করেই থমকিয়ে দাঁড়ান। স্নান ঘরে যাবার আধো অন্ধকার অলিন্দ থেকে কয়েকজন মৃগেন্দ্রনাথের মৃতদেহ ধরাধরি করে নিয়ে আসে। নীরেন্দ্রনাথ সামনেই দাঁড়িয়ে, নির্দেশ দেন, 'এখানে আর না, একেবারে নিচে নিয়ে যাও। আয় চন্দর।'

চন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়ে অচলার ওপর। কয়েকজন অন্যান্য দাসীর সঙ্গে চপলার ভয়ার্ত দৃষ্টি তাঁর প্রতি। চন্দ্রনাথ তার দিকে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়। চন্দ্রনাথ চপলার চোখের দিকে তাকিয়েই চমকিয়ে ওঠেন। চপলার চোখে গভীর আতঙ্ক, হত্যাকারী যেন তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে! চন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ অনুমান করতে পারেন, মৃগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দায়ে ইতিমধ্যেই তিনি অভিযুক্ত। মালতী একা না।

'কী হলো, তোমরা সব এ ভাবে দাঁড়িয়ে কেন?' জ্যাঠাইমার ক্রুদ্ধ স্বর ঝংকৃত হয়ে ওঠে। অলিন্দের পিছন থেকে তিনি এগিয়ে আসেন, বলেন, 'তোমাদের শোক যে একেবারে উথলে পড়ছে। যাও যাও, দু তিনজন গিয়ে স্নান ঘর ভালো করে ধুয়ে দাও।'

চন্দ্রনাথ নীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বড় বারান্দার দিকে এগিয়ে যান। তাঁর সামনে দিয়ে কয়েকজন মৃগেন্দ্রনাথকে বহন করে নিয়ে যায়। মৃগেন্দ্রনাথের চোখ আধ বোজা, চোখের স্থির মণি দুটো সামান্য দেখা যায়। মুখের হা সামান্য খোলা, ওপর পাটির কয়েকটি দাঁত দেখা যায়। কোনো বিকৃতি নেই। কোমরে ধুতি এলোমেলো ভাবে জড়ানো, খালি গায়ে পৈতা। ইদানীং কালের উদ্যত চোখ-পাকানো মূর্তি না, ঘুমে অচেতন শিশুর মতো শান্ত।

বারান্দার খাঁচার পাখিগুলো লোকজনের ভিড়েই সম্ভবত খাঁচার গভীরে সরে যায়, ভীত চোখে তাকায়। কেবল অতিকায় টিয়ানি, যা একটি ভিন্ন জাতের বিদেশী পাখি, নির্ভয়ে তাকিয়ে থাকে। খাঁচার সরু তারের জালে বদরিগুলো মিশে থাকে।

চন্দ্রনাথ দীপেন্দ্রনাথের বসবার ঘরের দরজার সামনে থমকিয়ে দাঁড়ান। পারিবারিক চিকিৎসক কালীপদ ঘোষের সঙ্গে, জ্যাঠামশাই নিচু স্বরে কিছু আলোচনা করেন। চন্দ্রনাথের পিছনেই নীরেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ান। দীপেন্দ্রনাথ মুখ তুলে বলেন, 'আয় তোরা ভেতরে আয়। ওকে নিচে নামিয়ে এনেছে?'

'হ্যাঁ, মাঝখানের দালানের সামনে বারান্দায় রেখেছে।' নীরেন্দ্রনাথ জবাব দেন।

ডাক্তার কালিপদ ঘোষ উঠে দাঁড়ান। দীপেন্দ্রনাথেরই বয়সী, মাঝের লম্বা শরীরের সাঁবশেষ মিল। গায়ে গলা-বন্ধ চীনা কোট খোলে ধুতির ওপরে। মাথার চুল ধূসর, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ন। দীপেন্দ্রনাথকে বলেন, 'তোমাকে উঠতে হবে না, তুমি যা করবার এখানে বসেই করো। আমি ওদিকে দেখছি।'

দীপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি তোমার গাড়ি নিয়ে এসেছ তো?'

'হ্যাঁ, বড় রাস্তায় রেখে এসেছি, কোচোয়ান আছে।' কালিপদ ডাক্তার বলেন, 'যা বললাম তাই করো।' বলে তিনি এগিয়ে এসে একবার চন্দ্রনাথকে দেখে নীরেন্দ্রনাথকে বলেন, 'মৃগেন যে-বিছানায় কাল রাত্রে শুয়েছিল, সব নামিয়ে নিয়ে এসো। বারান্দায় সেই বিছানা পেতে ওকে শোয়াতে বলো। তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

চন্দ্রনাথ জ্যাঠামশায়ের দিকে তাকান। দীপেন্দ্রনাথ বলেন, 'তোমরা ছেলেরা সব তৈরি থাকো। তোমাদেরই শ্মশানে যেতে হবে। ছোটবউমা কোথায়?'

চন্দ্রনাথের গলায় স্বর ফোটে না, শুকনো ভাঙা গলায় বললেন, 'ওপরে।'

দীপেন্দ্রনাথ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার পরে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'তুমি বরং একবার বাইরের বৈঠকখানা বাড়িতে যাও। ঘর খোলা হয়েছে?'

চন্দ্রনাথ সঠিক বুঝতে পারেন না জ্যাঠামশাই কী বলতে চান। জবাব দেন, 'এত সকালে কি খুলেছে? সবিতা পণ্ডিত বোধ হয় এখনো ঘুমোচ্ছে।'

'তা হলে সবিতাকে তুই গিয়ে [illegible] তোল।' দীপেন্দ্রনাথ নির্দেশ দেন, 'বল্ বাড়িতে ছোটুর অবস্থা খারাপ, ডাক্তার এসেছে। যে কোনো সময়েই মারা যেতে পারে। কোনো আশা নেই।'

চন্দ্রনাথ অবাক স্বরে বলেন, 'একটা জলজ্যান্ত লোক, কোনো অসুখ বিসুখ নেই, হঠাৎ কেন এ অবস্থা হলো, কী বলা যাবে?'

'তার জন্য তোকে ভাবতে হবে না।' দীপেন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলেন, 'সে জবাব ডাক্তার দেবে। মানুষের কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। জন্ম মৃত্যু বিবাহের কথা কেউই বলতে পারে না।' বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

চন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখতে পান, জ্যাঠামশাইয়ের মৃদু ভাষার সঙ্গে তাঁর মুখের

প্রতিবাস্তির কোনো মিল নেই। চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণতা তাঁর মুখে, কিন্তু পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুরুষের কর্তব্য পালনে স্থির ও শান্ত। চন্দ্রনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। উত্তর দিকে অলিন্দ দ্বারা বিভক্ত মহলের মাঝখানে বারান্দায় পরিবারের অনেকে দাঁড়িয়ে। শায়িত মৃগেন্দ্রনাথ ওদের আড়ালে। চন্দ্রনাথ সেদিকে না গিয়ে দক্ষিণে যান। ডাইনে মোড় নিয়ে পশ্চিমের বারান্দা দিয়ে ঠাকুরদালানের চত্বরের দিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। ঠাকুরদালানের দেওয়ালের পিছনে পশ্চিমের বারান্দার ফালি গলি জায়গায় চারজন ছুতোর দ্রুত হাতে একটি খাট তৈরি করতে ব্যস্ত। সকলেই তাঁর পরিচিত। বয়স্ক মিস্তিরি কপালে হাত ঠেকিয়ে করুণ চোখ মুখ করে চন্দ্রনাথের দিকে তাকায় বলে, 'এই হয়ে এলো বলে। পায়া, বাজু, মোটামুটি ধরে তৈরেই ছিল। বঙচঙের তো দরকার নেই। ওদিকে হতে হতেই, আমাদের হয়ে যাবে।'

চন্দ্রনাথ বিস্ময় বোধ করেন। সবই যেন পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা। যদিচ তা না। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত ব্যবস্থাই জ্যাঠামশাইয়ের দ্বারা অতি দ্রুত পরিচালনায় অগ্রসর হয়। কিন্তু এতো দ্রুত, যেন অভাবিত। চপলার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সকলের সঙ্গে তিনিও মৃগেন্দ্রনাথের মহলে গিয়েছিলেন। বয়স্ক মিস্তিরি ব্যস্তভাবে তাড়া দেয়, 'নে নে, আরো জোরে হাত চালা। বাটাম চারটে এবার জুড়ে ফ্যাল, অতো আর মেজে চাঁচতে হবে না। বাড়ির লোকজন কি মড়া আগলে বসে থাকবে নাকি?'

চন্দ্রনাথ হতবাক বিস্ময়ে মিস্তিরির কথা শোনেন, এবং বুঝতে পারেন বয়স্ক মিস্তিরির স্থির ধারণা, তাদের কাজ দেখতেই তাঁর আগমন। তিনি আর দাঁড়ান না, উত্তর দিকে এগিয়ে যান। ডান দিকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশের বড় দেউড়ি, ঠাকুর দালানের চক মেলানো উঠোনের আড়াল করে উঁচু প্রাচীর খাড়া। চন্দ্রনাথ প্রাচীরের বাইরে যেতেই, কোদন তাঁর নিজের কনিষ্ঠ ভাই শশীনাথকে দেখতে পান। কোদন রেবার সঙ্গে নানা কথায় ব্যস্ত। দাদাকে প্রথমে চোখে পড়ে না। ওর হাতে সিগারেট। চন্দ্রনাথ কোদনের কথা শুনতে পান না। তাঁর পায়ের শব্দে ও আর রেবা দুজনেই ফিরে তাকায়। দুজনেই চমকায়, চুপ করে যায়, অবাক চোখে তাঁর দিকে তাকায়।

চন্দ্রনাথের চোখে কিছুক্ষণ আগের দেখা চপলার মুখ ভেসে ওঠে, তার সেই চমকে ওঠা ভয় পাওয়া চোখ। কোদন না রেবার চোখে ভয় নেই, কিন্তু ওদের চোখে চন্দ্রনাথ যেন অচেনা। এর একটাই অর্থ, মৃগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পিছনে তাঁর অদৃশ্য হাত সকলের চোখে স্পষ্ট। জীবনের বাস্তবতা কী অদ্ভুতপূর্ব! তিনি জানেন, কোদন এখানে প্রহরীর কাজ করে। এদিক দিয়ে কোনো দাস দাসী যেন এখন বাইরে না যেতে পারে। তিনি উঠোনের ওপর দিয়ে বাইরের বৈঠকখানা বাড়ির দিকে যান। দেখতে পান, বড় ঘরের দরজা খোলা। সবিতা পণ্ডিতের হাতে সিগারেট কোলের ওপর একটি ইংরেজি দৈনিক। তাঁকে দেখেই সবিতা পণ্ডিত জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার চন্দরদা, সাত সকালে কালিপদ ডাক্তারের ঘোড়ার গাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে? কার অসুখ?'

—"ছোটকা।" চন্দ্রনাথ বলেন, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি অন্য দিকে, 'বোধ হয় আর বেশীক্ষণ নেই।'

সবিতা ভ্রুকুটি জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। চন্দ্রনাথ নিজের দুর্বলতা টের পান, তিনি ঘরের দরজার কাছ থেকেই নেমে ফটকের দিকে যান। রাস্তার কাছে, ডাক্তারের গাড়ির সামনে দাঁড়ান।

'চন্দর চন্দর শীগগির আয়।' নীরেন্দ্রনাথ ছুটে এসে ডাকেন, 'ছোটকা এই মাত্র মারা গেলেন।'

বলেই তিনি ঘরের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'পণ্ডিত আছো দেখছি। একটু থেকো দরকার টরকার হতে পারে।'

সবিতা বলে, 'নিশ্চয়ই। এর আবার বলাবলির কি আছে নীরেনদা।'

চন্দ্রনাথ ফটকের দিকে ঘুরে দাঁড়ান, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছুটে বাড়ির দিকে যেতে পারেন না। সমস্ত ঘটনাই যেন এখনো তাঁর কাছে বিস্ময়কর আর রহস্যময় মনে হতে থাকে। যেন এক অদৃশ্য মন্ত্রবলে সমস্ত কিছুই অতি দ্রুত ঘটতে থাকে। ইতিহাস কি এই ভাবেই তার পট পরিবর্তন করে? বকুলতলা বন্দোপাধ্যায় বাড়িতে আজকের ঘটনা ঐতিহাসিক। তাঁর কানে বাজে মালতীর কথা, শুভেবেছিলে, তা-ই আবার হবে।...বিয়ের পরের দিন, আর আজ অনেক তফাত।'...অতএব আত্মহত্যা না, হত্যা। চন্দ্রনাথ লক্ষ করেন না। কারা তাঁর আশপাশ দিয়ে ছুটোছুটি করে। কারা যেন তাঁর চারপাশে এসে দাঁড়ায়। একজনের স্বর শোনা যায়, 'কী আর করবেন গো সেজদাদাবাবু। চিরদিন কেউ থাকে না। যান, ভেতরে যান, আপনাকে ডাকছে।'

'আসুন চন্দরদা।' সবিতা পণ্ডিত এসে তাঁর হাত ধরে টানে এবং বাড়ির ফটকের ভিতরে যায়।

চন্দ্রনাথ সবিতার সঙ্গে ভিতর বাড়ির পুব দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ান। মৃগেন্দ্রনাথের মৃতদেহ বিছানায় শোয়ানো। ধূপ জ্বলছে। চন্দন মৃতের সারা মুখে। মিস্তিরিরা খাট সামনে এনে নামায়। কে যেন বলে ওঠে, 'খাটের ওপর তুলে দাও।"

কোনো স্ত্রীলোকের ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার স্বর শোনা যায়, 'আহ্‌! এ কি দৈব?'...

চন্দ্রনাথ স্বরের লক্ষ্যে তাকিয়ে দেখেন, তাঁর মা দু হাতে মুখ ঢাকেন। কালিপদ ডাক্তার বলে ওঠেন, 'জীবনটাই দৈব, এর

জন্য আর কেঁদে কী হবে।'

মৃগেন্দ্রনাথকে কয়েকজন মিলে তৈরি খাটে তুলে [illegible] সাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহ। দীপেন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলেন, তোমরা। চন্দর, তোরা সব ভাইয়েরা মিলে কাঁধ দে। চাঁদকে নিয়ে যা, ওর বাবার মুখে আগুন দেবে।'

চন্দ্রনাথের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, জ্বলন্ত আগুনের শলাকা হাতে চাঁদ। কিন্তু চিতায় শায়িত তিনি নিজে।

*

ত্রিদিবেশ চৌরঙ্গীর ওপরে খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকায়। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। ট্রাম যাওয়া আসা বন্ধ, মাঝে মাঝে দু একটি বাস, প্রাইভেট গাড়ি যায়। কিন্তু প্রতি মিনিটেই প্রায় সশস্ত্র পুলিস আর মিলিটারি গাড়ি গর্জন করে ছুটে চলে।

আজ ষোলই আগস্ট, মুসলিম লীগ কর্তৃক ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। কলকাতা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় লিপ্ত। ও শিয়ালদহে গিয়ে ট্রেনে চেপে কেমন করে ফিরে যাবে, সেই দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন।

ক্রমশ

ভ্রমণ কাহিনী ॥ দৃষ্টি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র
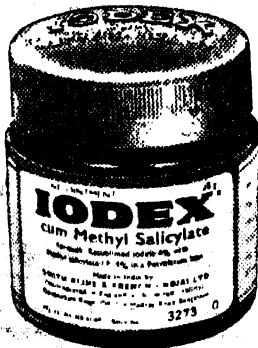
চেনা শোনা। অন্নদাশঙ্কর রায়। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য : ছয় টাকা।

'চেনাশোনা' নামক রচনাটির রচনাকাল ১৯৪১-৪২, তারপর দীর্ঘ বিরতি, কিন্তু 'সিংহলে', 'দাক্ষিণে' এবং 'সিংহল থেকে ফিরে' পরম্পরা রেখে মধ্য সত্তরে শেষ হয়েছে। এই চতুরঙ্গ ভ্রমণকাহিনীই 'চেনা শোনা'—অন্নদাশঙ্করের ভাষায় 'এক হিসাবে জীবনস্মৃতি।' এবং বেদনার অনুষঙ্গও বটে। কারণ এই বইয়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মহত্তম দুঃখ। বোম্বাই, বরোদা, বাঙ্গালোর এমন কি কলম্বো, কান্ডি এখন বহুজনের কাছেই বাড়ির উঠোন। ভ্রমণের স্থান নয় এগুলো, কাজের আখড়া। সকালে এক জায়গায় প্রাতঃরাশ সেরে রাত্রে আরেক জায়গায় নৈশ-আহার করা চলে। সুতরাং সেদিক দিয়ে বিচার করলে অন্নদাশঙ্করের এই ভ্রমণ খুবই সরল ভ্রমণ। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনীর পূর্ণতা শুধু স্থান-মাহাত্ম্যে নয়, দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যে; বোম্বাই শহর এমনিতে কারুর ভালো লাগার কথা নয়; ব্যবসায় এবং ব্যস্ততায় তার স্বরূপ সদাই আচ্ছন্ন। কিন্তু লেখকের এই স্থানটি সম্পর্কে মোহ আছে। তাঁর মতে বহির্ভারতের সার পাওয়া যায় একমাত্র ওইখানে। মারাঠি, গুজরাতি, পারসি যাদের সঙ্গে যখন যেখানে চেনা-শোনা হয়েছে, তাদের সামাজিকতা, আচার অনুষ্ঠান, জীবন-যাত্রার মধ্য থেকে লেখক শ্রেয় চরিত্রটিই লক্ষ করতে চেয়েছেন। এটি তাঁর মনুষ্য-প্রীতির নিদর্শন। বাকি রচনাগুলিতেও সেই সম্প্রীতি ও সমন্বয় খোঁজার অভাব নেই। এরই ফাঁকে টুকরো ইতিহাস, ধর্ম, ভাষা ও রাজনীতি বিশেষ ব্যক্তি চরিত্র ছবির মতো প্রবেশ করেছে। তবে খানিক রাবীন্দ্রিক, খানিক বীরবলী অথচ প্রবল-ভাবে অন্নদাশঙ্করীয় লেখার স্বাদ পাওয়া যায় প্রথম রচনাটিতেই। বরোদার ওরিয়েণ্টাল সিরিজের সম্পাদক বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের কথা লেখক সস্নেহে ও সংশয়ে একবার মাত্র উল্লেখ করেছেন। অথচ বিনয়-তোষ মহাপণ্ডিত লোক; হরপ্রসাদ শাস্ত্রির ছেলে, 'বুদ্ধিস্ট আইকনোগ্রাফী', 'বুদ্ধিস্ট এসোটেরিসিজম' গ্রন্থের লেখক। প্রাচীন ভারত ও চীন বৌদ্ধ ও তন্ত্র বিষয়ক তাঁর বহু মতামত দেশে বিদেশে সমাদৃত। একেবারে শেষ কোথায় ঘরের হাওয়ায় মৃত্যু প্রবেশ করেছে। ঢেনকানাল লেখদের জন্ম স্থান, সেইখানে অকস্মাৎ তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু বইয়ের কোথাও সেই শোকের গুরুভার নেই, শুধু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে। 'পথে প্রবাসে'র আকর্ষণ 'চেনা শোনায়' নেই, লেখকও তা জানেন। তবু এর একটি সহজ মূল্য আছে।

গুপ্তচর কাহিনী

নতুন যুগের স্পাই। বিক্রমাদিত্য। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৯। চৌদ্দ টাকা।

গোপন খবরের প্রতি মানুষের কৌতূহল অসীম। গুপ্তচর কাহিনীর আকর্ষণ সেখানেই। যদিও 'নতুন যুগের স্পাই' নিছক উপন্যাস নয়, তথাপি পাঠক এই গ্রন্থে রোমাঞ্চ ও উত্তেজনালাভে বঞ্চিত হবেন না। ছদ্মনামী লেখক বিক্রমাদিত্য গুপ্তচর ক্রিয়াকলাপের আবরণ খুলে পাঠকদের সরাসরি নিয়ে গেছেন গুপ্তভান্ডারে।

সি আই এ—নামটি সকলেরই খুব পরিচিত। কারণে-অকারণে শব্দটি ব্যবহারও হয় ভীষণ। বিক্রমাদিত্য উদ্ঘাটন করেছেন সি আই এ'র উৎস ও ক্রমপরিণতি।

কিভাবে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালক রাইনহার্ড গেহলেন জার্মানীর পরাজয়ের পর আমেরিকান সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও রাশিয়াবিদ্বেষী এই ব্যক্তির সাহায্যে সি আই এ পরিপুষ্ট হলো—অপারেশন গোল্ড, অপারেশন সেক্স, বিচিত্র কাহিনী, অপারেশন সিসারো—পাঠককে খুবই আবিষ্ট রাখবে। 'স্পাই অব দি সেঞ্চুরী'র নায়ক সিসারোর কাহিনী যে কোনো কল্পিত গুপ্তচর গল্পকে হার মানিয়ে দেয়।

ক্ষমতার লড়াই ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে প্রায় সব দেশই গুপ্তচরবাহিনীকে সক্রিয় রাখে। মিলিটারি ইনটেলিজেন্স যে কোনো দেশেরই অপরিহার্য অঙ্গ। বিসমার্কের অনুরোধে অষ্টাদশ শতকে জার্মান সিক্রেট সার্ভিস নামে যে ভ্রূণ গুপ্তচর সংস্থা গড়ে ওঠে—নানা হাতবদলে এই সংস্থা কিভাবে সারা দুনিয়াব্যাপী জাল ছড়িয়ে দেয়, গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। যখন চার্চিল ছিলেন নৌ-মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্ট্যাম্প সংগ্রহের নেশার সূত্র ধরে এক সাংবাদিক কিভাবে চার্চিল ও রুজভেল্টের সব খবরাখবর এডমিরাল কানারীকে পাঠাতেন, অথবা ১৯৪০-এর ২৯ জুলাই রুজভেল্ট ও চার্চিলের টেলিফোনের আলাপ-আলোচনা হিমলার এবং হিটলারকে উপহার দেওয়া হলো—যা গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর, এই রকম এক জগতে বিক্রমাদিত্য আমাদের নিয়ে গেছেন। সেদিন রুজভেল্ট ও চার্চিলের গোপন কথা না শুনলে হিটলার ইতালী আক্রমণ করতেন কি?

'নতুন যুগের স্পাই' হিসেবে লেখক যা বলতে চেয়েছেন, তা কিন্তু মানুষ নয়। এই স্পাই হলো ইলেকট্রনিক যন্ত্র, স্যাটেলাইট, রাডার এবং রেডিও। এই ধরনের উন্নত যন্ত্রের দৌলতে আজ কারোর কিছুই অপরের কাছে অজানা নয়। জার্মানবিজ্ঞানী-দের সাহায্যে রাশিয়া এবং আমেরিকা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশলে শ্রেষ্ঠ হতে চেয়েছে—তার সুষ্ঠু বিবরণী লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থের সব চাইতে বিস্ময়কর ঘটনা ১৯৬০ সালের ১ মে থেকে শুরু। এইদিনই আমেরিকার গুপ্তচর প্লেন 'ইউ টু'র পাইলট ফ্র্যান্সিস গ্যারী পাওয়ার রাশিয়ার হাতে ধরা পড়েন। এই কাহিনী পাঠের উত্তেজনা স্বাভাবিকভাবেই অনুমেয় এবং সেটি সম্ভব হয়েছে লেখকের কুশলতায়। শব্দের চেয়ে তিন গুণ বেশী গতিবিশিষ্ট 'কালোপাখি' প্লেন ৭০,০০০ ফুট উঁচুতে উড়ে কিভাবে ছবি নেয়, লেখক খুব যত্নের সঙ্গে সেটি ব্যাখ্যা করে অনেক জিজ্ঞাসু মনকে নিবৃত্ত করেছেন।

জার্মান সিক্রেট সার্ভিস 'আরম্ভের' ও এডমিরাল কানারীকে নিয়ে এই কাহিনীর শুরু। সি আই এ এবং আফিম স্মাগলিং-এর বিবরণী দিয়ে শেষ। শেষের আগে যদিও তিনি নতুন করে শুরুর ইঙ্গিত দিয়েছেন, তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। 'নতুন যুগের স্পাই'-এর ক্রিয়াকৌশল অনেক পরে আরম্ভ হওয়ায় প্রথমার্ধের সবটুকুই যেন ভূমিকায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রবন্ধ

বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজন। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। রত্না প্রকাশন, কলকাতা-২৭। মূল্য : ২৫ টাকা।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্য বণিকদের প্রবল শোষণে এ দেশের যখন ভগ্নদশা, সেই দুঃসময়ে বাংলাদেশে আশীর্বাদের মতো উপস্থিত হয়েছিলেন উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজনবৃন্দ। খৃস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মযাজক হিসেবে এলেও বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ বিধানেই তাঁরা আত্মনিয়োগ করেন। বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে কেরী-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর মিশনের অবদান চিরস্মরণীয়। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণযন্ত্রে বাইবেলের বঙ্গানুবাদ দিয়ে এদেশে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ শুরু হয়। ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রশাসনিক কারণে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর এদেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। সে কারণে ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ কেরী বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান-রূপে সেখানে নিযুক্ত হন। সহকারী হিসেবে যুক্ত হন তাঁর বাংলাভাষা শিক্ষক রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিতগণ। কেরীর উৎসাহে রচিত রাম-রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ১৭৩৪ সালে পর্তুগালের লিসবন শহরে এক পর্তুগীজ খৃস্টধর্ম যাজক রোমান অক্ষরে দুটি বাংলা গ্রন্থের রচনা ও মুদ্রণ করেছিলেন—একটি হল 'পর্তুগীজ ও বাংলা ভাষার অভিধান', অপরটির নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।' অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যগ্রন্থের উৎপত্তি ও

রুমবিকাশের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। উইলিয়ম কেরী বা শ্রীরামপুর মিশনারীদের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ যাবৎ তেমন চোখে পড়ে নি। আলোচ্য গ্রন্থটি সে অভাব অনেকটাই পূরণ করেছে। এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য, লেখক কেরীর ছ'জন পাশ্চাত্য সহকারীর কর্মজীবনের নানা তথ্য পাঠককে জানিয়েছেন। পৃথকভাবে তাঁদের কর্ম প্রয়াসের পরিচয় আমরা এখানে পাই; যেমন—মার্শম্যান পরিবারের বিশিষ্টতা, সংবাদপত্রের দক্ষ পরিচালনায় উইলিয়ম ওয়ার্ডের বিশেষত্ব, মুদ্রণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে ফেলিকস্ কেরী ও জন ম্যাকের বৈশিষ্ট্য বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার সূচনায়। সর্বোপরি ছিলেন সুযোগ্য পরিচালকও উইলিয়ম কেরী।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলিত রূপ এই গ্রন্থটি; সে কারণে আলোচনার ধারাবাহিকতা কিছুটা বিক্ষিপ্ত মনে হয়। তথাপি অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে বইটি যথেষ্ট মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে। পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

কাব্য অনুবাদ

সুলতানা রিজিয়া। পুরুরাজ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সুশীল রায় অনূদিত : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। চার টাকা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ইংরেজী রচনাগুলি গবেষক ও দু'চারজন কৌতূহলী পাঠক ছাড়া সাধারণ পাঠক-সমাজে তেমন পরিচিত নয়। অথচ রচনাগুলির মধ্যে মাইকেলের নিজস্ব কবিমনের বিকাশসূত্রটিকে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বাঙলা কাব্যে রোম্যান্টিক কবিতা ও বড় কাহিনী-কাব্য লেখার সূত্রগুলিও পাওয়া যায়। মাইকেলের এই দুটি ইংরেজী কাব্য প্রমাণ করে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকেই বাঙালীর রোমান্টিক কবিমন তৈরি হয়ে গেছে—যদিও মাধ্যম বিদেশী ভাষা। সুশীলবাবুর সাবলীল অনুবাদে একদিকে মাইকেলী ভঙ্গির কিছুটা স্বাদ যেমন অক্ষুণ্ণ আছে, অন্যদিকে তেমনি আধুনিক ভাষা-ভঙ্গিও (যা অনিবার্য) প্রমাণ করেছে রোমান্টিক চিন্তায় মাইকেল বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার কত কাছাকাছি ছিলেন। রিজিয়ার আত্মজর্জর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যখন হয়, তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্য-নাট্যের চরিত্র কথা বলছে।—

কাঁদিতে পারি না আমি। গত সন্ধ্যাকালে
দূর ওই অরণ্যের গভীরে বিশাল
সুউচ্চ বৃক্ষের নীচে ছিলাম বসিয়া।
অতি উচ্চ সেই বৃক্ষ অভ্রভেদী যেন,
কিন্তু জীর্ণ, পত্রহীন—জীর্ণ জাহাজের
নগ্ন মাস্তুলের মত, সমুদ্র ঝঞ্ঝার
ক্রুদ্ধরোষে জর্জরিত ভগ্ন যে জাহাজ।
'পত্রহীন বৃক্ষতলে লক্ষহীন রানী
উভয়ের এ মিলন রাজযোটকের
মতই; পতিত দোহে।'

ভাষার কথা ভুলে গিয়ে যদি কল্পনা-ভঙ্গির কথা ভাবা যায়, তাহলে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক চিন্তাভঙ্গির যোগাযোগ কি স্পষ্ট হবে।

পুরুরাজ কবিতায় পরাজিত রাজা পুরু কিভাবে তার নির্ভীক বীরত্বে স্বাধীনতা ফিরে পেল তার কাহিনী। বোধ হয় কোনো বাঙলা রচনায় মাইকেল এতো স্পষ্টভাবে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্যে বিলাপ করেন নি।

সুশীলবাবুর এই অনুবাদে মাইকেলের কবিমন ও বাঙলা কাব্যধারার মূলসূত্রটি ধরা পড়লো কাব্যরসিক সাধারণ পাঠকের কাছে। এর চেয়ে বড় কৃতিত্ব অনুবাদকের আর কি থাকতে পারে?

উপন্যাস

হয়তো সবাই ঠিক। আশাপূর্ণা দেবী। ডিম এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য : সাত টাকা।

আসলে এটি সহাবস্থানের উপন্যাস। পুরনো মূল্যবোধ এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বৈত আভাস এর কাহিনীতে। এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে, গ্রাম থেকে শহরে গল্প এগিয়েছে। ফুলপুর গ্রামের কালীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের ছেলে সারদাপ্রসাদ বংশে কালি দিয়েছিল; তার বউ বিষ খায় এবং সারদাপ্রসাদ দূর সম্পর্কের বিধবা সাবিত্র সঙ্গে কলকাতায় ঘর করতে চলে আসে। শুদ্ধাচারী কালীপ্রসাদ তাঁর একমাত্র নাতি শ্যামলকে নিজের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি কঠোর নিয়ম পালন বুঝতেন, বার ব্রতকে গুরুত্ব দিতেন কিন্তু মায়া মমতা, সহজ সম্পর্কে তাঁর কমই আস্থা ছিল। নিজের বিধবা মেয়ে একাদশীর দিন জল খেয়ে ফেললে তিনি তার হাতে

অমগ্রহণ করতেন না। এই সব সার্বেক অন্ধ বইটির মূল ঘটনাকে প্রভাবিত রেখেছে [illegible] বইতে [illegible] গ্রামের ঘোঁটা আবহাওয়া [illegible] বেশি প্রাচীন। শ্যামল একালের ছেলে কিন্তু তার মধ্যে এক পরিণামী সামঞ্জস্য কাজ করছে। ঠাকুর্দার মতো হৃদয়হীন শুদ্ধাচারী সে যেমন হয়নি, তেমনি খোলামেলা, ঢালাও অনুমোদনের আওতায় মানুষ-হওয়া মিনু মেয়েটির মতো বন্ধে যাওয়াও তার হয়নি। শ্যামলের চোখে সিনেমার ছবির মতো সব কিছু ফুটে উঠেছে, শেষ দিকে কাহিনী এগিয়েছে আকস্মিক ঘটনাচক্রে। অবশ্যই আশাপূর্ণা দেবীর এটি প্রধান উপন্যাস নয়।

সঙ্গীত

গীত প্রতিমা। গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভারতী, ১৩ রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা-৪, ছয় টাকা।

এই গ্রন্থে লেখক তাঁর রচিত বাইশটি গান আকারমাত্রিক স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেছেন। গানগুলি আধুনিক কাব্যগীতি এবং কোন কোনটির সুর মর্মস্পর্শী। লেখক আধুনিক পর্যায়ের গীতে যে অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে তার অনুসরণ করেননি। তাঁর লিরিকগুলি সরল এবং সুন্দর। সুরও তাঁরই দেওয়া। যাঁরা গাইবার জন্য ভাবসমৃদ্ধ সুললিত কাব্য-সংগীত অনুসন্ধান করেন তাঁরা এই গানের বইটি পেলে সুখী হবেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শংকর মিত্র সম্পাদিত **সানাই** (পরিবেশক : বুকমার্ক, কলকাতা-১, তিন টাকা। ছোটদের জন্য নির্বাচিত রচনার সংকলন। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া, ঐতিহাসিক কাহিনী, উপকথা, শিকার কাহিনী, রূপকথা—এই রকম পাঁচমিশেলি রচনা একত্র সংগ্রহ ছাড়া আলাদা কোনো সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্য বা দৃষ্টিকোণ অবশ্য ধরা পড়েনি সংকলনটিতে। রচনার মানও নির্দিষ্ট স্তরের উপরে-নীচে ওঠানামা করেছে। লেখার ভালোমন্দ ব্যাপারে সব সময় যে সম্পাদকের হাত থাকে, এ-কথা ভাবা যায় না ঠিকই। এ-সত্ত্বেও কিশোর সংকলনের রচনায় কিছুটা সম্পাদনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সেটা হয় নি বলেই মনে হয়। হলে প্রদীপ পালের 'ছড়ার মজা'র কিছু অংশ বা অজিতকুমার হাইতের গল্পের কিছু সংলাপ বর্জিত বা পরিমার্জিত হত। প্রদীপ পালের ছড়ায় ভাষা ও বক্তব্য ছাড়াও ছন্দোগত দুর্বলতা এত বেশী যে ছড়ার মজা শেষ পর্যন্ত মজা থাকে নি, যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অজিতকুমার হাইত-এর রচনায় 'অভিজ্ঞতার সন্ধি-বিচ্ছেদ হল ভীষণ রকমের অজ্ঞতা', 'তাপ্পি মরা', 'ঘাড় নাড়া', এইচ ডি পাল-এর উল্লেখ কিংবা 'বাংলার বাঘে'র রসিকতাটি ঋণ স্বীকার না ক'রে ব্যবহার করা—স্থূল রুচির পরিচায়ক। কমলেশ সেন ব সনৎ বন্দোপাধ্যায়ের উপকথা ও রূপ-কথা দুটি স্বাদে অতারতীয়। মৌলিক হলে কিছু বলার নেই, অন্যথায় উৎস-উল্লেখ বাঞ্ছনীয় ছিল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনী দাশ, আশা দেবী, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, জয়ন্ত জোয়ারদার এবং সুধীরকুমার করণের রচনা সংকলনটির রচনার মান অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে বলেই অন্যান্য রচনাগুলিকে বেশী জলো লাগে।

*

কমল ঘোষের **ঠিকানা ওদের পারাপার** (সমকাল প্রকাশনী, কলকাতা-৯, আট টাকা) উপন্যাসের পটভূমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে রচিত অনেক হালকা রচনার পাশে কমলবাবুর এই উপন্যাসটি কিছুটা ব্যতিক্রমই বলা যায়। যুদ্ধের পটভূমিতে কয়েকটি সাধারণ মানুষের পরিবর্তিত জীবনস্রোত খণ্ড খণ্ড রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন তিনি। প্রতিটি টুকরো ঘটনার স্বাদে নিটোল ছোট গল্পের আমেজ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলেই তাঁর এই উপন্যাসটির পাঠযোগ্যতা কখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। যুদ্ধের ধর্ষণ, নিপীড়ন, মর্মান্তিকতা সব কিছুকে খুব সূক্ষ্মভাবে অনুভব করা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ বর্ণনার একঘেয়েমি নেই। উপন্যাসটি শেষ করার পর তাই আয়েষা এবং শাকিলার জন্য সহানুভূতি জেগে থাকে। যুদ্ধ এঁদের জীবনকে ছিন্নমূল করে দিয়েছে, কিন্তু পাঠকের চিত্তে এঁদের দুঃখ-যন্ত্রণার [illegible]টি দাগ গেঁথে দিয়েছেন [illegible]বাবু। তরুণ উপন্যাসিকরূপে এ সার্থকতা কম কী।

*

বহুদিন পরে (প্রাপ্তিস্থান : নবভারতী ভবন, কলকাতা-৯, ন টাকা। সুবোধকুমার বন্দোপাধ্যায়ের চারটি কবিতার খাতার একত্র সংকলন। ১৯৩৩ থেকে ১৯৫২র মধ্যে লেখা এই রচনা সংগ্রহের ভূমিকা লিখেছেন সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। অল্প কথায় সুবোধবাবুর রচনার সুন্দর মূল্যায়ন করেছেন তিনি : 'প্রাঞ্জলতাই তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।' এই সংগ্রহের পাঠক শ্রীযুক্ত মিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হবেন।

লীডসের এই সেই হেডিংলি মাঠ, যে মাঠের পীচ খঁড়ে তেল ঢেলে টেস্ট খেলা ভণ্ডুল করা হয়েছে

খেলার মাঠে

টেস্ট ক্রিকেটের ১০০ বছরের ইতিহাসে নাশকতার কারণে খেলা পরিত্যক্ত হবার ঘটনা ঘটে গেল ক্রিকেটের মাতৃভূমি খোদ ইংলণ্ডে। একটি বলও না হয়ে আবহাওয়ার কারণে টেস্ট খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে। ১৯৬৯এ করাচিতে ইংলণ্ড ও পাকিস্তানের একটি টেস্টও পরিত্যক্ত হয়েছে মাঠে দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণে। কিন্তু নাশকতা কাজে টেস্ট বন্ধ হবার এটি প্রথম ঘটনা।

ঘটনাস্থলে লীডসের হেডিংলি মাঠ। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এই সিরিজের তৃতীয় টেস্টের শেষদিনের খেলা আরম্ভের দেড় ঘণ্টা আগে ঘোষণা করা হয়, খেলা সম্ভব নয়। কারণ, কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এসে পীচের উপর পাতা ত্রিপলের আচ্ছাদনের নীচ দিয়ে ঢুকে ঠিক যেখানটায় গুডলেংথের বল পড়ে, পীচের সেখানটায় আধ ফুট চওড়া ও তিন ইঞ্চি গভীর গর্ত খুঁড়ে গ্যালনখানেক এনজিনের তেল ঢেলে রেখেছে। দুই অধিনায়ক টনি গ্রীগ ও ইয়ান চ্যাপেল, দুই আম্পায়ার আর্থার ফ্যাগ ও ডেভিড কনস্ট্যান্ট এবং দুই দলের ম্যানেজার আলেক বেডসার ও ফ্রেড বেনেট একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খেলা সম্ভব নয়।

খেলার আইন বলছে : যে পীচে খেলা আরম্ভ হয় সেই পীচ খেলার পক্ষে অনুপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলার মধ্যে পীচ বদল হতে পারে না এবং ওই নতুন পীচেও খেলা হতে পারে না দুই অধিনায়ক একমত না হলে।

খবরে বলা হয়েছে, ইংলণ্ড অধিনায়ক টনি গ্রীগ নতুন পীচে খেলতে চেয়েছিলেন কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল রাজি হননি। ফলে তৃতীয় টেস্ট পরিত্যক্ত হয়েছে ৪ দিন খেলার পর।

দুই দলেরই সামনে ছিল জয়পরাজয়ের আশা-আশঙ্কা। পীচের মাটিতে তেমন মারপ্যাঁচ ছিল না। চতুর্থ দিনে মাটি থেকে বলও বিশ্রীভাবে লাফিয়ে ওঠেনি। ওই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া বাকি ৭টি উইকেটে ২২৫ রান যোগ করে ম্যাচ জিততেও পারত। আবার একটি দুটি উইকেট তাড়াতাড়ি পড়ে গেলে হারতেও পারত। তাই অস্ট্রেলিয়া কোন ঝুঁকির মধ্যে যায়নি। ১—০ এগিয়ে আছে বলে না খেলে অ্যাশেজ অধিকারে রাখা নিশ্চিত করে রেখেছে। চার টেস্ট সিরিজের ৬ দিনব্যাপী শেষ টেস্টে হারলেও সিরিজ ড্র হবে। অ্যাশেজ থাকবে অস্ট্রেলিয়ারই দখলে।

খেলার অবস্থা কিন্তু অসম্ভব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। চতুর্থ ইনিংসে ৪০০র বেশি রান করে টেস্ট জেতার যে একটিমাত্র নজির আছে সে নজির সৃষ্টি হয়েছিল এই হেডিংলি মাঠেই ২৭ বছর আগে। ডন ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া দল চতুর্থ ইনিংসে ৩ উইকেটে ৪০৪ রান করে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছিল। এবার অস্ট্রেলিয়াকে করতে হত ৪৪৫ রান। তার মধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে তারা ২২০ রান তুলে নিয়েছিল। জিতলে দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি হত। অপরদিকে হারলে ১—১ হয়ে চতুর্থ টেস্টের আকর্ষণ তুঙ্গে উঠত। সে সব কিছুই হল না। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার রিক ম্যাককসকার, যে চতুর্থ দিনের শেষে ৯৫ রানে নট আউট ছিল সেও জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করতে পারল না। সব ভেস্তে দিল সশস্ত্র ডাকাতির অভিযোগে ২০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত জর্জ ডেভিসের সমর্থকরা।

জর্জ ডেভিস লণ্ডনের অধিবাসী। গত বছর থেকে জেল খাটছে। সম্প্রতি তার মুক্তির জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। মুক্তি সংগ্রাম বাহিনী গঠিত হয়েছে। তাদের অভিমত, ডেভিস নির্দোষ। বিনা অপরাধে জেল খাটছে। টেস্ট খেলা পরিত্যক্ত হবার পর এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বি বি সিকে টেলিফোন করে জানায় আমাদের দলই পীচ খুঁড়েছে। লণ্ডন থেকে এই উদ্দেশ্যে ৬ জনের একটি দল ইয়র্কশায়ারে গিয়েছিল। হেডিংলির দেওয়ালেও শ্লোগান লেখা ছিল; 'জর্জ ডেভিস নিরপরাধ। এমন কাজ করতে হল—দুঃখিত।' আর একটি শ্লোগানের ভাষা : 'জর্জ ডেভিসের ২০ বছরের বদলা'।

মুক্তি সংগ্রাম বাহিনীর সংগঠক পিটার চ্যাপেল বলেছে, এই খেলাটিতে অত্যধিক আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ায় এই খেলাটিকেই তারা ব্যবহার করেছে ডেভিসের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্য। চ্যাপেল আরও বলেছে, হাজার হাজার ক্রিকেট অনুরাগীর নৈরাশ্যের জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু নির্দোষ এক ব্যক্তির ২০ বছর কারাদণ্ড ক্রিকেট খেলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ডেভিস নির্দোষ কিনা এবং তার কারাদণ্ড টেস্ট ক্রিকেটের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, এই নাশকতার ঘটনায় ক্রিকেটস্রষ্টা ইংরেজ জাতির উপর কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে, যে ইংরেজ ক্রিকেট খেলাকে মনে করে একটি আচরণ, অন্যায়কে ধিক্কার জানায় 'ইট ইজ নট ক্রিকেট' বলে এবং মুখে বলে যে ক্রিকেট খেলে না সে ইংরেজ নয়।

পরিত্যক্ত খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ২৮৮ (স্টিল ৭৩, এডরিচ ৬২, গ্রীগ ৫১, গিলমোর ৬—৮৫, টমসন ২—৫৩)।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ১৩৫ (ইয়ান চ্যাপেল ৩৫, এডমণ্ডস ৫—২৮, স্নো ৩—২২)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ২৯১ (স্টিল

৯২, মৌল ৬৯, এভাঙ্জ ৩৫, মই ৩১; ম্যানেই ৩—৫৩, লিজমোহ ৩—৭২, ডিভিশ ২—৪১)।

আসাদিনা—দ্বিতীয় ইনিংস ৩ উইঃ ২২৩ (ওয়াকজনকার নট আউট ৯৫, ইমাম চ্যাম্পল ৬২)।

কেন শীল্ড খেলতে অনীহা?

যে কারণেই হোক, আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার অতীত গৌরব অনেক দিন আগে থেকেই ম্লান হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে ভারতের নামী ফুটবল দলগুলি আই এফ এ শীল্ডে খেলায় আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

কেন এই অনীহা? কারণ একাধিক। শীল্ডের খেলা যখন হয় তখন কলকাতার এবং বাংলার বেশির ভাগ জায়গায় মাঠ ভিজে থাকে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংগালোর হায়দরাবাদ, পাঞ্জাব প্রভৃতি যে সব জায়গার খেলোয়াড়রা শুকনো মাঠে খেলতে অভ্যস্ত সে সব জায়গার দল ভিজে মাঠে ভাল খেলতে পারে না। তার চেয়ে বড় কারণ টার্মস অ্যান্ড কণ্ডিশন। শীল্ড খেলতে আসার জন্য আই এফ এ বাইরের দলগুলিকে যে খরচ এবং সুযোগ সুবিধা দেয় তা তাদের কাছে মোটেই আকর্ষণীয় নয়। রোভার্স, ডুরাণ্ড, ডি সি এম খেলতে গেলে কলকাতার ক্লাবগুলি কিন্তু অনেক বেশি সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকে।

আই এফ এ গভর্নিং বডিতেই এবার কথা উঠেছিল, যদি বাইরের নামী দলগুলি শীল্ড খেলতে না আসে তবে আই এফ এ মোহনবাগান, ইস্টবেংগল, মহমেডান স্পোর্টিংকে রোভার্স, ডুরাণ্ডে খেলার অনুমতি দেবে না। অবশ্যই কাজুয়াল কথা এবং রাগের কথা। আসলে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় ভারতের সব নামী দলের অংশ গ্রহণ সব রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনেরই কাম্য। ব্যাপারটা এখন দাঁড়িয়ে গেছে ফ্যালো কড়ি মাখো তেল-এর মত। যে সব প্রতিযোগিতা নামী দলের যাতায়াত বিমান ভাড়া বা প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া এবং প্রথম শ্রেণীর হোটেল খরচ দিচ্ছে সেই সব প্রতিযোগিতা জমজমাট হচ্ছে। আই এফ এ যতদিন বাইরের দলকে এই সুযোগ-সুবিধা না দেবে ততদিন বাইরের নামী দল শীল্ড খেলতে আগ্রহী হবে না।

সম্প্রতি কয়েক বছর বিদেশী কয়েকটি দল আসা সত্ত্বেও শীল্ডের জলুস তেমন বাড়েনি। এবার তো বিদেশ থেকেও কোন দল আসছে না, ভারতের নামী দলগুলির মধ্যেও শুধু নাম দিয়েছে গোয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সুতরাং, অতীতের ঐতিহ্যশালী সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা স্থানীয় প্রতিযোগিতার মতই সাদামাটা প্রতিযোগিতায় পরিণত হবে।

শ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়ের পুরস্কার কে ডি ঘোষ ট্রফিটি পেয়ে চুম্বন করছে হেনরি ক্লডিয়াস। অলিম্পিক হকি অধিনায়ক লেসলি ক্লডিয়াসের পুত্র হেনরি বিগত মরসুমে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে

ফটো—দেশ

বিজয় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে

নৈপুণ্য এবং দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নামী খেলোয়াড়দের ধারাবাহিক ব্যর্থতার প্রচুর নজির আছে। সাফল্যের জন্য যেমন নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসের। আত্মবিশ্বাসের অভাবেই ভারতের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা জয় করতে পারেনি। হ্যাঁ, ১৭ মাস ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বেড়ালেও। ১৭ মাস পরে জিতেছে কলম্বাস আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, ফাইনালে যুক্তরাষ্ট্রের বব লুজকে ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে পরাজিত করে। এবং পেয়েছে জীবনের সর্বাধিক পুরস্কার অর্থ—৭২ হাজার টাকা।

বিজয়ের কাছে বব লুজের হার কিছুটা শ্রান্তি, ক্লান্তির ফল। বিমানে ৩৬ ঘণ্টা কাটিয়ে, ছয় হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করে কলম্বাসে এসে তাকে ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। ওয়ার্ল্ড টিম টেনিসের প্লে অব ম্যাচ খেলতে কলম্বাস থেকে সে ফিনিক্সে গিয়েছিল। খেলার পরই আবার বিমানে চেপে কলম্বাসে ফিরে আসে। লুজ বলেছে, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ওড়াউড়ি করায় স্বাভাবিকভাবেই তার মনের উপর চাপ পড়েছে, শরীরে অবসাদও ছিল।

তবু বিজয় যথেষ্ট দৃঢ়তা এবং বুদ্ধি খাটিয়ে লুজের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। লুজ ব্যাকহ্যাণ্ডে খুবই পটু। ফোরহ্যাণ্ডে কিছুটা দুর্বল। সব সময় বিজয় তার ফোরহ্যাণ্ডে বল রাখতে চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া বেশিক্ষণ র‍্যালি করিয়েছে যাতে ক্লান্ত লুজ আরও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। খেলার এই ট্যাকটিকসেই শেষ পর্যন্ত বিজয় বিজয়ী হয়েছে।

এই জয়ের পরই বিজয়ের কৃতিত্বপূর্ণ জয় সাউথ অরেঞ্জ টেনিস উইক ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৃথিবীর এক নম্বর খেলোয়াড় জিমি কোনর্সের বিরুদ্ধে—যে কোনর্সের কাছে উইম্বলডনের দ্বিতীয় রাউণ্ডে হেরে গিয়েছিল।

বিজয়ের পক্ষে খেলার ফল ৪-৬, ৭-৬ ও ৬-৪। স্কোর থেকেই প্রমাণিত তীব্র সংগ্রাম হয়েছে এবং দ্বিতীয় সেটের মীমাংসা হয়েছে টাইব্রেকারে। প্রথম সেটে এগিয়ে থাকা কোনর্স ১২ পয়েন্টের টাই-ব্রেকারেও এগিয়ে যায় ৪—২ পয়েন্টে। কিন্তু প্রচণ্ড সার্ভিস এবং সুনিয়ন্ত্রিত পাসিং শটে বিজয় সেট জেতে এবং মীমাংসা সূচক তৃতীয় সেটে ৫—৪ গেমে এগিয়ে থাকা অবস্থায় কোনর্সের সার্ভিস ভেঙে ৬—৪ করে খেলা জেতে। এটাই আত্মবিশ্বাসের পরিচয়।

ডেভিস কাপ ও ভারত

বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সংস্রব বর্জন—সরকারের এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারত ১৯৭৪-এ ডেভিস কাপের ফাইনাল খেলেনি। তারপর ভারতীয় লন টেনিস ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা ডেভিস কাপের মধ্যে থাকলে ভারত খেলবে না। কিন্তু সম্প্রতি লন টেনিস ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভারত ও তাইল্যানডের পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলাটি হবে অমৃতসরে ২৬, ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর। ভারতের জয়ের ধারা যদি অব্যাহত থাকে তবে পর পর খেলতে হবে জাপান, ফিলিপিনস ও নিউজিল্যানডের সঙ্গে। পূর্বাঞ্চল সেমি-ফাইনালে নিউজিল্যানডের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত সব খেলায় ভারতের সহজ জয়ই আশা করা যায়।

চিন্তাটা যদিও দূরপ্রসারী এবং সম্ভাবনাও কম তবু একটা প্রশ্ন, ভারত যদি আবার ফাইনালে ওঠে এবং অপর দিক থেকে ফাইনালে ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকা তবে কি আবারও দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়াকওভার পেয়ে ডেভিস কাপ দখলে রাখবে? ভারত কেন, রাশিয়া বা বর্ণবৈষম্য নীতি বিরোধী কোন দেশ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হয় সেক্ষেত্রেই বা কি হবে?

একলব্য

বিশ্ব নারী বর্ষে খেলায় যিনি সম্মানিত

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে খেলাধুলোয় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত হয়েছেন শিরিন কন্ট্রাক্টর। এখন অবশ্য উপাধি আর কন্ট্রাক্টর নয়, গত জানুয়ারি মাসে শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার মেরিন এঞ্জিনিয়ার খুসরু কিয়াস-এর সঙ্গে বিয়ে হবার পর হয়েছেন শিরিন কিয়াস। শিরিনই ভারতের একমাত্র নারী যিনি নারীবর্ষে খেলায় জন্য বিশেষ পুরস্কার পেলেন।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এর লেডিজ স্টাডি গ্রুপ খেলাধুলো ক্ষেত্রের সমস্ত মেয়ের ভূমিকা খতিয়ে দেখে শিরিনকে নির্বাচিত করেছেন। পুরস্কার হিসাবে দিয়েছেন ১১ হাজার টাকা এবং সম্মানপদক।

২৬ বছর বয়সী পার্শী মেয়ে শিরিন সর্ববিদ্যাবিশারদ খেলাপটু মেয়ে। এবং একমাত্র মেয়ে যিনি তিনটি খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মেয়ে কেন, তিনটি আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এমন পুরুষ খেলোয়াড়ের নামও তো মনে আসছে না।

১৯৬৩ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্কেটবল, হকি ও ক্রিকেটে নানা কৃতিত্বের অধিকারিণী শিরিন এশীয় হকিতে, এশীয় বাস্কেটবলে এবং মেয়েদের টেস্ট ক্রিকেটে ভারত দলে খেলেছেন। এ ছাড়া টেবল টেনিস, অ্যাথলেটিকস এবং টেনিকোয়েট খেলেছেন স্কুল ও কলেজে।

জন্ম বোম্বাইতে ১৯৪৯-এর পয়লা নভেম্বর। ছোটবেলাতেই বাবা-মার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন এবং ৮ বছর বয়স থেকে শুরু করেন খেলাধুলো। কোন বিশেষ খেলার দিকে ঝোঁক ছিল না। সহপাঠী এবং সমবয়সীদের সঙ্গে সব রকমের খেলায় যোগ দিতেন। ১৯৬৩তে মেয়েটি নজরে পড়ে বাস্কেটবল কোচ রামনাথ মুদগলের। তিনি ওকে বাস্কেটবলের কলা-কৌশলে পটু করে তোলেন। ওই বছরই ওয়েস্ট বেঙ্গল উইমেনস বাস্কেটবল লীগে পার্শী সি দলে খেলতে শুরু করেন। পরের বছর আরম্ভ করেন হকি খেলা। শেখানোর দায়িত্ব নেন অ্যান লামসডেন এবং এইচ রড্রিগস। বাস্কেটবলের মত প্রথম বছর থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল উইমেন্স হকি লীগেও খেলতে শুরু করেন ডভি হিল দলের পক্ষে। ডভি হিল হয় লীগ রানার্স এবং নকআউট ও লেডি টেগার্ট টুর্নামেন্টে বিজয়ী। ওই বছর ওর প্রথম প্রতিনিধিত্ব-মূলক খেলার সুযোগ কিন্তু টেবল টেনিসে। মণিপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আন্তঃ-স্কুল শরৎকালীন চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার স্কুল দলে ছিলেন। আন্তঃস্কুল টেনিকোয়েটে ওর স্কুল ক্যালকাটা গার্লস-এর পক্ষে খেলেন ১৯৬৬তে এবং লরেটো কলেজের হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দেন ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯এ। ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন ১৯৭৪ থেকে মহিলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে। ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছেন কালিঘাট ক্লাবের সুনীল দাসগুপ্ত।

রামনাথ মুদগল, অ্যান লামসডেন;

শিরিন কিয়াস ফটো—দেশ

এইচ রড্রিগস, সুনীল দাসগুপ্ত—সব কোচেরই অভিমত, শিরিনের শেখার আগ্রহ অসাধারণ। তার ফলে যখন যে খেলা শুরু করেছে অল্প দিনের মধ্যে সেই খেলার প্রথা প্রকরণ এবং নৈপুণ্য আয়ত্ত করে নিয়েছে। এবং স্কুল, কলেজ, ক্লাব, বাংলা রাজ্য দল এবং ভারত দল—যখন যেখানে খেলেছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকার অধিকারিণী হয়েছেন। অধিনায়িকাও হয়েছেন প্রায় সব ক্ষেত্রে। এমনকি ওর অফিস ইউনিয়ন কারবাইডেও। ইউনিয়ন কারবাইডের অধিনায়কত্ব করেছেন আন্তঃ অফিস বাস্কেটবল লীগে। বাস্কেটবল, হকি এবং ক্রিকেটের পরে যেটা শিরিনের চতুর্থ খেলা সেই টেবল টেনিসেও কিন্তু দক্ষতা কম নয়। না হলে মুনিশ চ্যাটার্জি প্রতি স্মৃতি প্রতিযোগিতা, মেট্রোপলিটান গার্লস স্টুডেন্টস প্রতিযোগিতা এবং আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় লরেটো কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলার সুযোগ পাবেন কেন?

প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক খেলা থেকেই উল্লেখ্য কৃতিত্ব। ১৯৬৬ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত গোয়ালিয়র ও বাংলা দলের মধ্যে প্রদর্শনী হকি খেলায় বাংলা ৩—০ গোলে জিতেছিল। তিনটি গোলই করেছিলেন শিরিন। অর্থাৎ প্রথম খেলতে নেমেই হ্যাট্রিক। তারপর ১৯৬৭ থেকে এ পর্যন্ত প্রতি বছর লীগ হকি ও জাতীয় হকিতে প্রচুর গোল করেছেন, হ্যাট্রিক করেছেন, জাতীয় ও রাজ্য বাস্কেট বলে করেছেন রাশি রাশি পয়েন্ট। ত্রিবান্দ্রামে জাতীয় হকিতে 'প্লেয়ার অব দি উইক' হবার সম্মানও আছে (১৯৬৭)। এবং ১৯৬৮তে কোট্টায়ামে জাতীয় বাস্কেটবলে আছে 'অলস্টার প্লেয়ার' হবার সম্মান।

ক্রিকেটেও এ বছরই ইডেনে অনুষ্ঠিত জাতীয় ক্রিকেটের সেমিফাইনালে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ৪১ এবং ফাইনালে কর্নাটকের বিরুদ্ধে ৬৬ রান করে বেস্ট ব্যাটসম্যানের পুরস্কার পেয়েছেন। বাংলা চ্যাম্পিয়ন হবার মূলে শিরিনের কৃতিত্ব অনেকখানি।

ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে খেলায় পুনার প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২১ রান এবং পঞ্চম উইকেটে ফৌজী খালিলির সঙ্গে যোগ করেন ৪১ রান। দিল্লির দ্বিতীয় টেস্টে নবম উইকেটে শান্তা রঙ্গস্বামীর সঙ্গে ৭৪ রান যোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে শিরিনের ধৈর্য ও দৃঢ়তা। কলকাতার তৃতীয় টেস্টেও ভারত ফলো-অন থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল ডায়না এদুলজির সঙ্গে ব্যাটিং শৌর্যে বহুক্ষণ টিকে থেকে তাঁর ২৯ রানের জন্য।

আর্টসে স্নাতক শিরিন পড়াশুনায়ও চিরদিন ভাল। খেলার জন্য ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরেছেন, কিন্তু পড়ায় কোনদিন ফাঁকি দেননি। ক্যালকাটা গার্লস স্কুলে বেস্ট অল-রাউণ্ডারের পুরস্কার 'আদা-পদ্ম গোল্ড মেডাল' পেয়েছেন পর পর দু বছর।

মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

অরণ্যদেবের জঙ্গল-কানন, পাশেই নদী, তাতে মাংসাশী পিরানহা মাছের এমন দাপট যে, কেউ নদী পার হতে সাহস করে না।

অন্যদিকে খাঁড়ি। তাতে প্রচুর মাছ।

অরণ্যদেব আসায় জঙ্গল - কাননের সমস্ত প্রাণীই খুশী।
তোদের দেখতে এলুম।

বাঘ ও সিংহের পিঠে সওয়ার হয়েছেন অরণ্যদেব।
নে, জোরে ছোট্!

পোষা গোরিলা। আনন্দে অরণ্যদেবকে জড়িয়ে ধরেছে।
ছাড় ছাড়, দম-বন্ধ হয়ে মারা পড়ব যে!

খাঁড়িতে খেলে বেড়ায় দুই পোষা শুশুক!
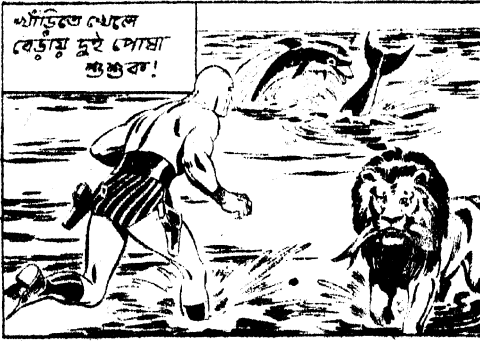
সলোমন ও নেফারতিতি, অরণ্যদেবের আশ্চর্য নৌবেগ!
চল, একটু ঘুরে আসি।

সালি আর লেফি আজ সমুদ্রের দিকে যেতে চাইছে না কেন? হাঙরের ভয়ে?

"হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ" (পরিচালনা : স্বদেশ সরকার) ছবিতে দীপংকর দে ও আরতি ভট্টাচার্য
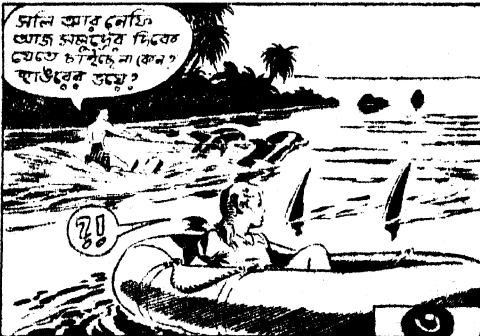
কলকাতায় বাংলা চিত্র প্রদর্শন ক্ষেত্রে অচিরেই বিপ্লব ঘটবে। বর্তমানে তারই প্রস্তুতি চলছে। সেনসরের ভিত্তিতে মোট একুশটি হলে বাধ্যতামূলক কলকাতায় তৈরি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। রাজ্য সরকার তথা তথ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখার্জি এই নতুন পরিকল্পনার উদ্যোক্তা। কলকাতায় সিনেমা হলের সংখ্যা বর্তমানে পঁচাশি। তার মধ্যে বাংলা ছবির জন্য নির্দিষ্ট হলের সংখ্যা পনেরোটিরও কম। এই নিদারুণ সমস্যায় বাংলা ছবি বাঁচতে পারে না। হালের হিসাবে এই মুহূর্তে ২৩টি বাংলা ছবি সেনসরের ছাড়পত্র নিয়ে মুক্তির দিন গুণছে। সেনসরের অপেক্ষায় রয়েছে মোট ৪০টি ছবি। তাই এখনই যদি কোন সুব্যবস্থা না হয় তবে এই ছবিগুলির দশ ভাগের এক ভাগও এই বছরে মুক্তি পাবে না। এই দুর্দশা শুধু এবারেই নয়, বছরের পর বছর ধরে চলছে। প্রযোজক ছবি তৈরি করেন, কিন্তু জানেন না কবে তাঁর ছবি মুক্তির আলো দেখবে। প্রেক্ষাগৃহে ঢোকার অধিকার সকলের নেই। প্রদর্শনের সব শর্ত পূরণ করতে গিয়ে প্রযোজকের কপালে বিশেষ কিছুই জোটে না। তাছাড়া বেটা আসল সমস্যা সে হল সব প্রযোজক তাদের ছবি সময় মত দেখাতে পারেন না। এক বছর তো বটেই, আরও অনেক বেশি সময় ছবির মুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এই দুরবস্থায় বাংলা চলচ্চিত্র বাঁচতে পারে না। কয়েকটি স্টার-শোভিত ছবি মুক্তি পেলেই চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যার সমাধান হয় না।

• • •

সেনসরের ভিত্তিতে এবং প্রযোজকদের স্বার্থরক্ষা করে কী-ভাবে কলকাতায় তৈরি

মতামতের মন্তাজ

সব ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করা যায় তা নিয়ে মন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখারজি কিছুকাল যাবত চলচ্চিত্রশিল্পের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুখের বিষয়, ই-আই-এম-পি-এ নীতিগতভাবে সেনসর-ভিত্তিক চিত্রমুক্তি মেনে নিয়েছেন। এবং সাগ্রহে এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। কতকগুলি শর্ত অনুযায়ী সেনসরের ভিত্তিতে বাংলা ছবি দেখানো হবে। সব শর্ত সব প্রদর্শকের মনঃপূত নাও হতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার লক্ষ্য যে পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচানো সে-বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। চিত্রপ্রদর্শকরাও এই বিষয়ে সহযোগিতার মনোভাব দেখাবেন আশা করা যায়। যে-সব প্রদর্শকের এতকাল বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যার বিষয় ভাববার দায়িত্ব ছিল না এবং যাঁরা বেশির ভাগ সময়ে হিন্দীচিত্রই দেখাতেন অর্থাৎ যাঁদের কাছে কলকাতা ও বোমবাই চলচ্চিত্র দুই-ই সমান এবং যে বেশি পয়সা দেবে সে-ই ভাল, তাঁদের এখন বাংলা তথা কলকাতার চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন হবার সময় এসেছে। তাঁদের ব্যবসা কলকাতাতেই, অতএব কলকাতার চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কেও তাঁদের একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের আপস মেনে চলতেই হবে। এতকাল শুধু বোমবাই চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্গে তাঁদের লেনদেন চলেছে। এবার পশ্চিমবাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের সুখ-দুঃখের ভাগ তাঁদের নিতে হবে। আশা করা যায়, এ-ব্যাপারে তাঁরা উৎসাহই দেখাবেন। বিশেষত ই-আই-এম-পি-এ যেখানে সেনসর ভিত্তিক বাংলা ছবি মুক্তি এবং বাংলা ছবির প্রদর্শন-ক্ষেত্র প্রসারের

জগতে সেখানে প্রদর্শকগোষ্ঠীও তাঁদের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবেন।

• • •

পুজোর পরেই যাতে সেনসর-ভিত্তিক চলচ্চিত্র-মুক্তির ব্যবস্থা হয় সে বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং ই-আই-এম-পি-এ-কে তৎপর হতে হবে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বিজ্ঞপ্তি পুজোর আগেই প্রচার করা দরকার। কারণ, সেনসর অনুযায়ী চিত্রমুক্তির প্রস্তুতির জন্যও সময় চাই। যে-সব ছবি সেনসরের ছাড়পত্র পেয়েছে সেগুলির তালিকাও তৈরি করতে হবে। এই বছরেরই শেষে মোট একুশটি হলে সেনসর-ভিত্তিক চিত্রমুক্তি শুরু হলে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পে যে নতুন আশার আলো সঞ্চারিত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এতদিন-কার একটি অব্যবস্থার চাপে বাংলা ছবির প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। এখন যদি তার প্রতিকার হয় কলকাতার চলচ্চিত্র-শিল্পে বিপ্লব ঘটবে। রাজ্য সরকারকে চলচ্চিত্রসেবী মাত্রই অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাবেন।

শুটিং চলছে ...

যে কথা অগোচরে অন্তরের মধ্যে ছিল সে কথা আজ সুধার মুখে উসখুস করছে। কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছে না। চোখের পাতা আনন্দে বিস্ফারিত, ক্রমে তার কালো চোখ দুটো স্বপ্নময় হয়ে এল। তার দেহে বসন্ত মধুর শিহরণ খেলে গেল। অভি এল। সুধাকে দেখে তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। লজ্জা পেয়ে সুধা মাথা নীচু করল।

শুটিং চলছে : "তীর ভাঙা ঢেউ" ছবির একটি দৃশ্যে মৈনাক মিত্র ও বিশাখা মজুমদার

ফটো দেশ

অভি পাশে এসে বসল। এখনও সে বিস্ময়ভরে দেখছে তার স্ত্রীকে। এই কি সেই সুধা! যে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারত না। যে এর গাছের আম ওর গাছের পেয়ারা না চুরি করে ঘুমোতে পারত না। পাড়াপড়শীরা সর্বদাই যার নামের পাশে 'ডানপিটে' কিংবা 'গেছো' বিশেষণ যুক্ত করে দিত। সেই সুধা এখন শান্ত ধীর স্থির। বিবাহিত জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হয়েছে তার। সে রমণীয় সুখ অনুভব করেছে। আজ, বিশেষ করে আজ যেন অভি তাকে পূর্ণতার সম্ভবনায় উজ্জ্বল দেখছে। একটা ডল পুতুলে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে সহসা গভীরভাবে চেপে ধরে সুধা। বুকের মধ্যে নিয়ে যত জোরে পারে তত জোরে চেপে, সুগভীর নিশ্বাস নিল, মনে হয় তার লক্ষ সাধ মিটেছে। লক্ষ স্বপন মূর্তি পেয়েছে। সুধার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে অভি চলেছে, আর—সুধা চলতে শুরু করল অভির হৃদয়ের ভিতর দিয়ে পথ করে। দেখতে পেল সুন্দর অনাগত শিশু, অঙ্গটি তার মাতৃস্নেহের মাধুর্যে দিয়ে গড়া, কল্পনায় অবিকল অভি। স্বামীর নিবিড় সান্নিধ্যে অস্ফুটে স্ত্রীর কণ্ঠ হতে বেরিয়ে এল, এই জন—।...কি?... মেজবউদির বলছিল—।...কিছু না।...আঃ বল না কি বলছিল?...শোন, এক কাজ কর। পা-টা তুলে বোস। চোখ বন্ধ কর।...অভি চোখ খুলতে দেখে সুধা অদৃশ্য। তার কোলের ওপর ডল পুতুলটা প্রাণ ভরে দেখতে থাকে। এ দেখা, যেন নিজেকে দেখা। এই মুহূর্তে ওকে কাছে না পেলে! ভাবলে, সুধাকে কিভাবে ডাকা যায়, ইতিমধ্যে সুধা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অভি দৌড়ে ওকে ধরতে চায়। পারে না। সুধা তার হাতের নাগালের বাইরে চলে যায়। ওর মধুর কাজুক পালিয়ে যাওয়া লক্ষ করে অভি। হাসে। হাসি চাপতে পারে না, হাসি যেন ছুটে আসে, না হেসে থাকতে পারল না। সহসা যেদিন দূরের দখিন হাওয়া আসে, তেমনি এক অজানা অনুভূতি, কিশোর অভির অনুভাবনার প্রতিটি বিন্দুতে—শিরায় উপশিরায়। মফঃস্বল শহরের কলেজে পাঠরত অভি পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে ক্যামেরার দিকে এগিয়ে এলেই পরিচালক অরুণ চৌধুরী দৃশ্যের ছেদ অথবা 'কাট' ঘোষণা করেন। এবং জানালেন, কিছুদিন ধরে এই ছবি 'তীর ভাঙা ঢেউ'-এর শুটিং চলছে কলকাতা মুভিটোন স্টুডিওতে। বর্তমানে সমাপ্তির মুখে। একেবারে লো-বাজেটের ছবি। স্টার-কাস্ট নেই। বারবহুল কোন সেটও নির্মাণ করা হয়নি। অথচ একটা ভাল ছবি তৈরী করার চেষ্টা রয়েছে।

মাস অ্যান্ড মুভিজ নিবেদিত এ ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার পরিচালক স্বয়ং। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন বিশাখা মজুমদার (সুধা), মৈনাক মিত্র (অভি), শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি, কার্তিক চ্যাটার্জি, জীবন ঘোষ, নিশীথ সিনহা, শেফালী ব্যানার্জি এবং মধুমিতা। সঙ্গীত পরিচালক অনিল দত্ত।

• • •

এই যে এখানে সন্ধ্যা রায়। 'এরা এক যুগ' ছবির সেটে, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ফ্লোরে, শেঠজীর সঙ্গে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন। পরিচালক অসীম চক্রবর্তী বললেন—শেঠজীর অনেক টাকা। ওকে

"এরা এক যুগ" (পরিচালনা : অর্চন চক্রবর্তী) ছবিতে সমিত ভঞ্জ, পিনাকী সেনগুপ্ত, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় ও দিলীপ বসু

চিট্ করতে হবে। ওরা চার হাজার টাকার জুয়েলারী কিনছেন। দোকানের মালিক শেঠজী সুন্দরী মহিলা দেখে স্বভাবতই একটু ঝুঁকেছেন এদিকে। এটা হচ্ছে ট্রিক। মাথা খাটিয়ে একটার পর একটা চিটিং করছে এরা। এ তার ক্ষুদ্র নমুনা। দেখুন কেমন করে চার হাজার টাকার জুয়েলারী কিনে দিব্যি চেক ধরিয়ে দিচ্ছে শেঠজীর হাতে। শেঠজী ভয়ানক হুঁশিয়ার। বিশেষ করে রুপিয়া পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে। তিনি সবিনয়ে চেক প্রত্যাখ্যান করছেন। তাতে দমে যাবার পাত্র নয় এরা। সুন্দর, মানে 'রিং লিডার', প্রস্তাব দিচ্ছে—আপনার একজন বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে দিন। আমি আমার দোকানে গিয়ে এখুনি ক্যাশ পেমেন্ট করে দিচ্ছি। প্রস্তাবে সম্মত হলেন শেঠজী অর্থাৎ ফাঁদে পা দিলেন। এইভাবে একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে চলে এরা—সুন্দর, শান্তনু, শ্যাম আর রীণা—এরা এক যুগ। এই যুগ অন্ধকারের। এই যুগ অসততার। এই যুগ প্রতিহিংসার। এই যুগ বঞ্চনার। এই যুগ যুগযন্ত্রণার। এরা—এরা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। আলোকে উত্তরণ নেই। পায়ের তলায় মাটি নেই। মাথার ওপরে আকাশ নেই। বিশ্বাস ও মানবিক মূল্যবোধের শেষ আশ্রয়টুকু এরা হারিয়েছে।...

প্রধান চারটি চরিত্র সুন্দর, শান্তনু, শ্যাম ও রীণা রূপায়িত করছেন যথাক্রমে সমিত ভঞ্জ, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, পিনাকী সেনগুপ্ত ও সন্ধ্যা রায়। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন: শেখর চট্টোপাধ্যায়, শিবানী বসু, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, জয়শ্রী রায়, দিলীপ বসু প্রমুখ। শেষোক্ত শিল্পী—শেঠজীর ভূমিকায়। দিলীপ, তরুণ কৌতুকাভিনেতাদের অন্যতম। ইদানীং অনেকগুলি ছবিতে তাঁকে শুটিং করতে দেখা যাচ্ছে।

চিত্রগ্রহণ করছেন: দীপক দাশ। শিল্প-নির্দেশনায় আছেন: সঞ্জীব সেন। সম্পাদনা করবেন: রমেশ যোশী। সুর সংযোজক: প্রবীর মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তিনখানি গান রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা ভঞ্জ। আবহ-সঙ্গীত পরিচালনা করবেন, ওয়াই এস মুলকী। শান্তনু মুখোপাধ্যায় নিবেদিত, আর বি এণ্টারপ্রাইজ প্রযোজিত এ ছবির তৃতীয় পর্যায়ের শুটিং চলছে। চতুর্থ পর্যায় আউটডোর লোকেশনে। দীঘার সমুদ্রসৈকতে।

* * *

ছবি 'দুই বোন'। উমা আর সীমা। মধ্যবিত্ত পরিবারের পটভূমিকা। বাবার করুণ মুখ, মায়ের অসুস্থ শরীর আর ছোট ভাই বাবলুর উদাস দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বাণীর ভালবাসাকে উপেক্ষা করে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল বড় বোন উমা। ছোট বোন সীমা গেল বিপথে। বাবা মারা গেলেন। মা ও ছোট ভাই বাবলুও—বিনা চিকিৎসায়। চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন উমা—পায়ের নিচে মাটি নেই, মাথার ওপরে আকাশ নেই, কোথায় যাবে সে? এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উমা একটা বস্তিতে এসেছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলেছে এখানে। উমাও অসুস্থ। তার মুখের দিকে তাকালে কষ্ট হয়। যেন কোন রকমে সে এসে দাঁড়াল ক্যামেরার সামনে। তার অনেক কথা বলার আছে। সময় মনোযোগ দিয়ে শুনবে তার কাহিনী। কাহিনী শৈলেশ দে-র রচনা। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা শচীন অধিকারীর। সঙ্গীত মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। উমা ও সীমার চরিত্র রূপায়ণে আছেন সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও বিদ্যা রাও।

বার্তাবহ

বিশ্বভারতীর চিত্রাঙ্গদা

উন্নত শিল্পনৈপুণ্য, সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্যচেতনা এবং রাবীন্দ্রিক নৃত্যনাট্যের স্বকীয়তাসমুজ্জ্বল পরিবেশ-রচনা, সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতন থেকে এসে বিশ্বভারতীর শিল্পীরা যে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য পরিবেষণ করলেন, এই গুণগুলি থাকবার জন্যই তা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-রচিত এই নৃত্যনাট্যের মূল রূপটি এঁরা প্রায় আগাগোড়া বজায় রেখেছেন। প্রত্যেকটি গান এবং প্রত্যেকটি নাট্যমুহূর্তকে সার্থকভাবে পরিস্ফুট করে তোলবার ব্যাপারে এঁদের সযত্ন শিল্প-দক্ষতার পরিচয় সর্বত্র লক্ষণীয়। কণ্ঠ-সঙ্গীত, নৃত্যছন্দ ও নৃত্যাভিনয় এবং আবহসংগীত—নৃত্যনাট্যের এই তিনটি অঙ্গেই এঁদের শিল্পসাধনার সার্থক নিদর্শন রয়েছে।

চিত্রাঙ্গদার সংগীতাংশে ছিলেন নীলিমা সেন এবং অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ বিশ্বভারতীর অন্যান্য অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রী। অর্জুনের গান একমাত্র অশোক-তরুর কণ্ঠেই শোনা গেছে এবং এই ভূমিকার ব্যক্তিত্ব এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব শিল্পীর কণ্ঠস্বরে সার্থক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। চিত্রাঙ্গদার সংগীতাংশ অবশ্য নীলিমা সেন ছাড়াও আরও কয়েকজনের কণ্ঠে বণ্টন

ভরে দেওয়া হয়েছিল এবং এ'রা প্রত্যেকেই তাঁদের দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করেছেন। নীলিমা সেনের 'রোদন-ভরা এ বসন্ত' অবিস্মরণীয়। মদনের গান অবশ্য তুলনায় বেশ দুর্বল।

নৃত্যাংশে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অর্জুনের ভূমিকায় প্রবীণ নৃত্য-শিল্পী কেলু নায়ার। বয়সের দিক থেকে তাঁকে এই ভূমিকায় ভাবা যায় না অথচ যে বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে এবং অসামান্য নৃত্য-নৈপুণ্যে অর্জুনকে তিনি সজীব সপ্রাণ করে তুলেছিলেন, সেটুকু দেখাও যে একটা সৌভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা, একথাও এই সঙ্গে স্বীকার করতে হয়। চিত্রাঙ্গদার দুটি ভূমিকায় কৃষ্ণা সেন এবং মাধুরী মিশ্র প্রশংসনীয়। এ'রা কিছু কিছু ভরত-নাট্যমের মিশ্রণ-সহ মূলত মণিপুরী ভঙ্গিতে এই চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন। তবে মণিপুরী নৃত্যভঙ্গিমার সবচেয়ে সার্থক নিদর্শন পাওয়া গেল মদনের ভূমিকায় যোগীন্দ্র সিং-এর প্রাণবন্ত নৃত্য-ছন্দে। সম্মেলক নৃত্যের পরিকল্পনা চমৎকার কিন্তু কিছু অপটু শিল্পীর উপস্থিতি বেশ কিছু মুহূর্তে রসাভাসের কারণ ঘটিয়েছে।

সবশেষে অথবা বলা উচিত ছিল সবচেয়ে আগে যাঁর কথা, তিনি অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় আগাগোড়া এস্রাজের সুরে আবহভূমি রচনা করে তিনি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন (ধ্যানমগ্ন অর্জুনের মুহূর্তটি ভোলা যায়?) ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীর পরিবর্তনে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন এই নৃত্যনাট্যের রসের ভাণ্ড যে তারই ফলে অশেষ হয়ে উঠেছে, এ-কথা সেদিন বারংবার মনে হয়েছে। তালবাদ্যের ভূমিকাও এই অনুষ্ঠানে লক্ষণীয় মাত্রা যোজনা করেছে। শেষ দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার প্রবেশের মুহূর্তটি এ-প্রসঙ্গে বিশেষত উল্লেখযোগ্য। সব মিলিয়ে এই দৃশ্যের নৃত্যপরিকল্পনায় যে চিত্ররস ফুটে উঠেছিল, সে-ও ভোলবার নয়।

আনন্দবর্ধন

"শ্যামা" নৃত্যনাট্যে নরেশকুমার ও সুমিত্রা মিত্র

শ্যামা

(ক্যালকাটা ইয়ুথ ব্যালে ট্রুপ)

বজ্রসেনরূপী নরেশকুমার কিংবা শ্যামার বেশে সুমিত্রা মিত্র মঞ্চে এই প্রথম উপস্থিত হয়েছেন তা নয়। সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তীয়কে তো কতবারই দেখা গেছে। শিবশংকরের কোটালও অদেখা নয়। তবু ক্যালকাটা ইয়ুথ ব্যালে ট্রুপের "শ্যামা"-য় (রবীন্দ্রসদন, ১৭ আগস্ট) নতুন কিছু দেখবার ছিল। সেটা প্রধানত নরেশকুমারের নৃত্যপরিকল্পনা। "শ্যামা"-র গান ও দৃশ্য কোনটাই বাদ যায়নি। গানগুলি চমৎকার গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (বজ্রসেন), বনানী চৌধুরী (শ্যামা) এবং শৈলেন মুখোপাধ্যায় (উত্তীয়)। রাখাল রক্ষিত পূর্বসূরীর অনুকরণে গেয়েছেন কোটালের গান। বন্ধুর গান রবীন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুখশ্রাব্য। সেদিন এই গান শোনার সুখটুকুর অতিরিক্ত যা ছিল সেটা দেখবার—"শ্যামা"-র নৃত্যরূপায়ণ। চিত্রচরিত্র, প্রয়োজনমত মুকাভিনয় আঙ্গিকেও নতুনত্ব ছিল। তবে ফ্ল্যাশব্যাকে —শ্যামার স্মৃতির সূত্র ধরে—উত্তীয়কে মৃত্যুর পর দেখানোর মধ্যে কিছুটা চাপল্য প্রকাশ পেয়েছে। আজকাল নাটকের আঙ্গিকে অনেক সিনেমাটিক ধাঁচ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যকে এসব পরীক্ষাকর্ম থেকে বাদ দেওয়াই ভাল। রস গ্রহণের জন্য শ্যামার কথা ও গানই যথেষ্ট, ভিস্যুয়াল ট্রিটমেনট-এর প্রয়োজন হয় না। উত্তীয়-বধের দৃশ্যটা গায়ে কাঁটা দেয়। সেখানে কোটালের সঙ্গে একাধিক অস্ত্রধারী দেখা গেছে। "শ্যামা"-কে ভিস্যুয়াল সৌন্দর্যে চিত্তাকর্ষক করার একটা চেষ্টা ছিল। এবং সেটা সফল। তাছাড়া প্রধান তিন শিল্পীর (নরেশকুমার, সুমিত্রা ও সন্দীপ) নাচ ও অভিনয় খুবই সুন্দর। বিশেষত নরেশ-কুমারের। নৃত্যপরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে ঠিকই, তাই বলে "শ্যামা"-র রস আস্বাদনে কোন ক্ষতি হয়নি। অর্থাৎ নৃত্য রসকে বা গানকে ছাপিয়ে ওঠেনি। দুয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখা গেছে।

নবজাত সংস্থায় নবাগত শিল্পী

চেনা মুখ নয়, তাই চেনার জন্যে দরকার হল তাঁদের গান শোনা অথবা বাজনা। নর্থ ক্যালকাটা মিউজিক সারকেল অর্থাৎ যে সংস্থা তাঁদের একত্র করেছিল সে নিজেও নবজাত। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে সকালবেলার অনুষ্ঠানটি শুরু হতেই পেল হীরুবাবুর আশীর্বাদ। সুরেলা গলায় আরতি চক্রবর্তী আহির ভৈরোঁতে খেয়াল শোনালেন। অপর গায়ক মানিক সান্যাল গেয়েছিলেন তোড়ী ও বৈরাগী। তাঁর অনুষ্ঠানটিও মন্দ লাগেনি। গানের দুই শিল্পীর সঙ্গে সুন্দর সংগত করেন অদ্বৈত সান্যাল। দুটি খেয়ালের ফাঁকে সেতারে নট ভৈরোঁ এবং ভৈরবী ধুন বাজালেন হরশংকর ভট্টাচার্য। [illegible]নার চালচলনে গুরু হালিম জাফর খাঁর কিছু কিছু লক্ষণ খুবই স্পষ্ট।

—সুররসিক

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় সরকার
সহকারী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

মূল্য ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অভয়কুমার চাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩ ২২৪৩
২৩-৮৫৪৯

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬ ০০ টাকা	২৩ ৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭ ০০ টাকা	৪২·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২ ০০ টাকা	৪১ ৫০ টাকা	x
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মারফত)	২৫২ ০০ টাকা	১২৬ ০০ টাকা	৬৩ ০০ টাকা

দেশ

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

সূচীপত্র

বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৬
শনিবার ২৭ ভাদ্র ১৩৮২

পথের দাবী

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান জীবন কেন্দ্র এই কলকাতা শহরের পথের দাবীর নানা কথা নানা কর্তৃপক্ষের চিন্তায় ভাবণে ও বিবৃতিতে অনেকবার মুখরিত হতে শোনা গিয়েছে। কোন শহরের পথ যদি বহু রকমের ক্লেশে ও দোষে অভিভূত পথ হয়, তবে বুঝতে হবে যে, সেই শহরের পৌর মর্যাদার মান খুবই অবনত অবস্থায় আছে। জলে প্লাবিত পথ, খানা-খন্দ ও গর্ত দিয়ে পরিবৃত ও আবৃত পথ, জীর্ণতায় ও বিনা মেরামতের কারণে অদ্ভুত রকমের ভগ্ন-ভঙ্গ পথ কোন শহরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা পৌর গৌরবের পরিচয় নয়। নিরপেক্ষ সমালোচক বরং এই সিদ্ধান্তই করবে যে, এহেন ক্লিষ্ট বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত পথ নাগরিক জীবনের অস্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বস্তির একটি নিদারুণ পরিচয়। লোকমুখে অভিযোগ শোনা যায়, কলকাতার পথের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার কারণে যানবাহনের, বিশেষ করে মোটরযানের যান্ত্রিক যোগ্যতার যে ক্ষতি হয়, তার আর্থিক পরিমাণ সামান্য নয়। সাধারণ বিশেষজ্ঞের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী এই ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ বাৎসরিক অন্ততঃ তিন-চার কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, এই বিপুল পরিমাণের আর্থিক দণ্ড বিনা দোষে শহরের মোটর যানের মালিক নাগরিকেরা প্রতি বছর দিয়েই চলেছেন। মোটরযানের ট্যাক্স বেড়েছে, কিন্তু পথের স্বাচ্ছন্দ্যের মান উন্নত হয়ে গাড়ির ক্ষতির পরিমাণ একটুও হ্রাস করেনি।

পথের দাবীর দ্বিতীয় দিকের প্রশ্ন এই যে, পথ যদি গণ-অনাচারের আঘাত থেকে রক্ষা না পায়, তবে পথের সার্থকতার কী ও কতটুকু আর বেঁচে থাকে? দোকান বসবে শহরের পথের উপর, মেলা বসবে শহরের পথের উপর, তেলেভাজাওয়ালার উনুন জ্বলবে পথের উপর, মোটরকারের মিস্তিরীদের কারবারী দরকারে ও স্বার্থে মেরামতকামী ও অথর্ব মোটর গাড়িরা কাতার দিয়ে পথেরই উপর দিনের পর দিন পড়ে থাকবে: পথের মর্যাদার ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপর এ কী ভয়ানক অনাচার। এমন দৃশ্য বিরল নয় যার মধ্যে দেখা যায় যে, নাপিতের দল পথেরই উপর উবু হয়ে বসে চুল কাটার কাজ সারছে, ধুনকর লেপ তোষকের তুলো ধুনছে পথের উপর কিংবা ফুটপাথের উপর। এ ধরনের অনেক বাধায় পথের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাণ যে কত অবরুদ্ধ, তার পরিচয় কলকাতা শহরের পথের দিকে তাকালেও দেখতে পাওয়া যায়।

কী উপায়ে এবং কী রকমের বিধি-নিষেধ চালু করে দিলে শহরের পথের এই দুর্দশার দ্রুত প্রতিকার সম্ভব হয়, সেটা প্রধানত বিভিন্ন সংশিলষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার বিষয়। উপায় নিরূপণ করবার দায়িত্ব তাঁদেরই। এ বিষয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে সহযোগিতা চাইবার বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। জনসাধারণ যেখানে স্বয়ং বিড়ম্বিত, জনসাধারণেরই স্বার্থ যেক্ষেত্রে ক্ষুণ্ন হয়ে চলেছে, সেক্ষেত্রে কোন কর্তৃত্বের পক্ষে জনসাধারণের সহযোগিতাকে একটা বড় শর্ত করে তোলবার বিশেষ কোন অর্থ হয় হয় না। পথের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করছে যে-ব্যক্তি, পথের অবরোধ সৃষ্টি করছে যে-ব্যক্তি তাকে জনসাধারণের একজন বলে মনে করবার কোন যুক্তি নেই। তাকে জনস্বার্থের ঘাতক বলে মনে করতে হয়, এবং তার অনাচারের যথোচিত শাস্তি বিহিত করতে হয়। পৌর কর্তৃপক্ষ হোক বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ হোক, পথের দাবীর প্রশ্নে জনসাধারণের সহযোগিতা বলতে তাঁরা কী বোঝেন, সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

আর একটি অদ্ভুত অনাচারের দৃশ্য কলকাতা শহরের সব ঠাঁই দেখতে পাওয়া যায়: শিশুরা খেলার আনন্দে পথের উপর ছুটোছুটি করছে। জনতা হঠাৎ চমকে ওঠে, কর্কশ শব্দ তুলে ব্রেক কষেছে একটি মোটরগাড়ি; আর-একটু হলেই চাপা পড়তো একটি বাচ্চা ছেলে। পাড়ার ভিতরের রাস্তায় দৃশ্যটা আরও আতঙ্কজনক। শিশুরা ঘরের বাইরে এসে পথের উপর জটলা করে হাসাহাসি মারামারি ও খেলাধুলি করছে। তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবার মতো সামান্য একটু প্রশস্ততার পথ পাচ্ছে না গাড়ি। হর্ন বাজালেও শিশুর জটলা নড়ে না, সরে না। কেউ কেউ বরং উৎসাহিত হয়ে গাড়িকে মারবার জন্যে ঢিল খুঁজতে থাকে। দৃশ্যটা আপাতদৃষ্টিতে ওই শিশুদের জটলার একটা অনাচার বলে বোধহয় বটে। কিন্তু মূলত প্রধানত ও বিশেষত এটা শিশুদের বাপ-মা কিংবা অন্য কোন ধাড়ি অভিভাবকেরই নিরেট এক দায়িত্ববিহীন স্বভাবের অনাচার। তাকা করলেই দেখতে পাওয়া যায়: দু পাশের বাড়ির বারান্দায় ও দাওয়াতে স্বয়ং বাপ-মা নির্বিকার চক্ষু নিয়ে তাদেরই শিশুদের প্রাণের ভয়াবহ বিপত্তির সম্ভাবনায় পূর্ণ এইরকমের একটি দৃশ্য দেখছেন। কেউ বিচলিত হন না, কিংবা ব্যস্ত হয়ে হাঁকডাক দিয়ে শিশুদের পথ থেকে সরে আসতে বলেন না।

সহরের পথের উপর মানুষের জীবনের নিরাপত্তা যে-সব ভয়াবহ অনাচারে বিনষ্ট হয়ে থাকে, তার মধ্যে দায়িত্ববোধবিহীন অভিভাবকের নিরেট ঔদাসীন্য একটি বড় অনাচার। দুই-তিন-চার বছর বয়সের শিশুকে সহরের যানবাহনের প্রবল আনাগোনার কাছে ছেড়ে দিয়ে যে-সব মাতা-পিতা ও ধাড়ি অভিভাবক নিশ্চিন্তে বসে থাকেন কিংবা ঘরের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকেন তাঁদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবিধির নির্দেশ না থাকলে পথের উপর জীবনহানির মর্মান্তিক ঘটনার আর্তনাদ বাড়তেই থাকবে। তথ্য সংগৃহীত হলে বোধহয় এই সত্যই প্রমাণিত হবে যে, পথের দুর্ঘটনায় নিহত মানুষের মধ্যে শিশুর সংখ্যা সর্বাধিক না হলেও কম নয়।

লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার বিপুলে রকমের লোকচলাচলের প্রবলতায় চঞ্চলিত একটি সহুরে এলাকা। প্যারিসের কংকর্ডও তাই। বহু দিক হতে আগত বহু পথের সংযোগ স্থলগুলি আধুনিক সহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের এক-একটি কঠিন পরীক্ষাগার বলে বিবেচিত হতে পারে। লণ্ডন ও প্যারিসের ওই দুই স্থানের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বস্তুত নিয়ন্ত্রণী দক্ষতার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। কলকাতাতেও বিপুল জনতার যাতায়াতে চঞ্চলিত বহুপথের সংযোগ স্থলের সংখ্যা কম নয়। দৃষ্টান্ত: শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়। দুঃখের বিষয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা কৃতিত্ব ও যোগ্যতার মান যতটা উন্নত প্রকারের হলে এ ধরনের বহুপথের সংযোগ স্থলের যানবাহনের চলাচল স্বচ্ছন্দ হয়, এবং পথচারী মানুষের প্রাণ বিপন্ন করবার মতো কোন অনাচারের সহজ সুযোগ থাকে না, তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। পথের দাবী বহু বছর ধরে উপেক্ষিত হয়েছে বলেই কলকাতা সহরের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের মান ক্রমেই অবনত হয়েছে। আসন্ন ও অপরিহার্য প্রধান একটি কর্তব্যের কথা এই যে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। পথেরই প্রধান দিকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে অনাচারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব করা চাই।

বন্যা অনেক হয়েছে ভারতবর্ষে কিন্তু পাটনার প্লাবন বে-নজির। পাশাপাশি রাজ্য ওড়িশাতেও এবার বন্যার তাণ্ডব চলছে, কিন্তু বিহারে অন্যরকম। গঙ্গা আর শোন নদীর হঠাৎ হানায় সমগ্র শহর চলে যায় জলের তলায়, অনেক জায়গাতেই চার থেকে দশ ফুট জল। জল ঢুকেছে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে, হাইকোর্টে, অফিস কাছারি স্কুল কলেজ, সর্বত্র। সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য, সে এক অসহনীয় অবস্থা। বন্যাত্রাণে নিযুক্ত করা হয়েছে সেনাবাহিনীকে। জল স্থল বিমান—তিন শাখার জওয়ানরা প্রাণপণ লড়াই করেছেন শহর আর শহরবাসীদের বাঁচাতে। জল ঢোকার প্রথম দিন থেকেই পাটনাবাসীদের চলে যেতে হয় নিজ নিজ বাড়ির ছাদে। ট্রেন যায়নি, বিমান যায়নি। যাবেই বা কি করে, *রেল স্টেশন বিমানবন্দর সবই ছিল জলের তলায়। টেলিফোন টেলিগ্রাফেরও ছিল একই অবস্থা। এই বিপর্যয়কর অবস্থা বেশ কয়েকদিন চলার পর অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।*

বাংলাদেশের নতুন সরকারকে আরও অনেক রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন। এদিকে ভারতও সরকারীভাবে বাংলাদেশের প্রতি তার বন্ধুত্বের মনোভাব জানিয়েছে। দিল্লিতে বাংলাদেশের দূত মারফৎ খোন্দকার মুশতাক আহমেদ আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি বার্তা পাঠান। তাতে খোন্দকার সাহেব ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সব চুক্তি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেছেন দুই দেশ বন্ধুত্ব সৌভ্রাত্র বজায় রেখে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করবে। তারই উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ভারত তার সব প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী, উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় ভারত তার ভূমিকা পালন করে যাবে। তাছাড়া পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশের নতুন সরকারকে নতুন ভাবে স্বীকৃতি দেবার কোন প্রয়োজন নেই, পুরোনো স্বীকৃতিরই জের চলবে। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের স্বাভাবিক সম্পর্ক আগেও ছিল, এখনও আছে। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কায়রোর বিখ্যাত আল্-আহরাম পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে আরও বলেছেন, ভারতের একান্ত আশা যে আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত তাকে উজ্জ্বল রাখতে বাংলাদেশের বর্তমান নেতারা সচেষ্ট থাকবেন। কিন্তু হত্যা সব সময়ই [illegible] এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মতো একজন মহান প্রশাসক এবং দেশের স্বাধীনতার একটি প্রতীক

এই সপ্তাহ

চরিত্রের নিহত হওয়ার ঘটনা আরও বেশি নিন্দনীয়।

কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের বকুলতলা ঘুরে গেলেন, তিনি বলেছেন বিজ্ঞানীদের আশা, বকুলতলায় তেল মিলবে। বকুলতলা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের আরও কয়েকটি জায়গায়, ত্রিপুরার সোনামুড়ায় এবং কাছাড়ের চরগোলা কাঞ্চনপুর মাছিমপুর ও বদরপুরে তেল ও গ্যাসের জন্য খোঁজাখুঁজি চলছে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন সুন্দরবনের আরও দক্ষিণে তেলের সন্ধানে নেমেছেন। সব দক্ষিণের একটি অঞ্চলে বিদেশী এক কোম্পানিকে সন্ধান চালানোর জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছে। *তাছাড়া বঙ্গোপসাগরেও কাজ শুরু হতে চলেছে।*

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুখ্য সচিবদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যে-সব অফিসার জরুরী ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন, 'তাঁদের বিরুদ্ধে যেন দ্রুত ও দৃষ্টান্তযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ব্যবসায়ী করদাতা এবং শিল্পপতি ছাড়াও যাঁরা আইন মেনে চলেছে, তাদের স্বার্থের জন্য তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এটা করতে হবে। তাছাড়া যে কোন ক্ষেত্রেই অসদাচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় সরকারী মনোভাবের কথা মনে রাখা দরকার। যাঁরা উৎপাদনের কাজে যুক্ত তিনি যে-ই হোন না কেন, কৃষক বা শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী—সরকার তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ওই বৈঠকেই ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সচিব বি ডি পাণ্ডে মুখ্যসচিবদের বলেছেন, তাঁরা যেন আগামী নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে রাখেন। নির্বাচন কবে হবে, সেই সম্পর্কে অবশ্য তিনি স্থির কোন কিছু বলেননি। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিন ঠিক হলে এ রাজ্যে এক মাসেই নির্বাচন সম্ভব। নির্বাচনের ব্যাপারে প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ, ভোটার তালিকাও সংশোধিত।

পাকিস্তান আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতে অভ্যন্তরীন জরুরী অবস্থা থেকে দেশবাসীর মনযোগ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তৎপর হতে পারে বলে পাকিস্তানী দূতাবাসগুলি যে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দিল্লি ইসলামাবাদকে অনুরোধ করেছে এবং বলেছে, এই প্রচার বন্ধ করা না হলে আবহাওয়া বিষাক্ত হতে বাধ্য। এই প্রতিবাদপত্রে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানী সংবাদপত্রও ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর এমন কথাও বলা হচ্ছে যে, ভারত নাকি বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারে।

বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য খবর, সে দেশে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। এই সঙ্গে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত দেশের একমাত্র দল বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগও বাতিল হয়ে গেল। একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে, আদেশ অমান্য করলে সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাবাস এবং জরিমানা অনিবার্য। তাছাড়া এই অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না, এমন কি আদালতেও নয়।

একটি সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, পরিচালনায় কর্মীদের অংশ গ্রহণ করতে সরকার বিধিবদ্ধ করতে চান। সরকার মনে *করছেন, উৎপাদন বাড়াতে হলে প্রতিষ্ঠানের একেবারে নীচের তলা থেকে পরিচালকমণ্ডলীর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মীদের অংশ গ্রহণ আইনের দিক থেকে আবশ্যিক করার সময় হয়েছে। ইতিমধ্যে* সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত কিছু প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালকমণ্ডলীতে কর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা চালু করতে সরকার সচেষ্ট হয়েছেন।

রাজ্যপাল ডায়াস আচার্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের (বিশ্বভারতী বাদে) সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে বেআইনিভাবে বাইরের চাপে ভর্তি করার প্রয়োজনে রাজ্য সরকার একটি নতুন আইন আনবেন। তাছাড়া গণটোকাটুকি বন্ধের ব্যবস্থাও করা হবে। ডায়াস বলেছেন, শিক্ষকতার মান নিম্নমুখী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠক্রম শেষ হয় না। সুতরাং এ অবস্থার অবসান ঘটাতেই হবে।

গত জুনের শেষ সপ্তাহে জরুরী অবস্থা জারি হবার পর যাঁদের মিসা-য় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সরকার তাঁদের প্রসঙ্গ পর্যালোচনা শুরু করেছেন এবং ইতিমধ্যে মিসায় ধৃত এক তৃতীয়াংশকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি বিভিন্ন রাজ্যকে জানিয়ে দিয়েছেন পর্যালোচনা যেন অবিলম্বে শুরু করা হয়।

সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের উদ্বোধন হয়েছে আনুষ্ঠানিকভাবে। দুই এক বছরের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট চালু হবে বলে আশা করা যায়। এই দ্বিতীয় ইউনিট চালু হওয়ার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ ১২০ মেগাওয়াট বেড়েছে।

(১-৯-৭৫)

আধুনিক সাহিত্যের সেরা সম্ভার
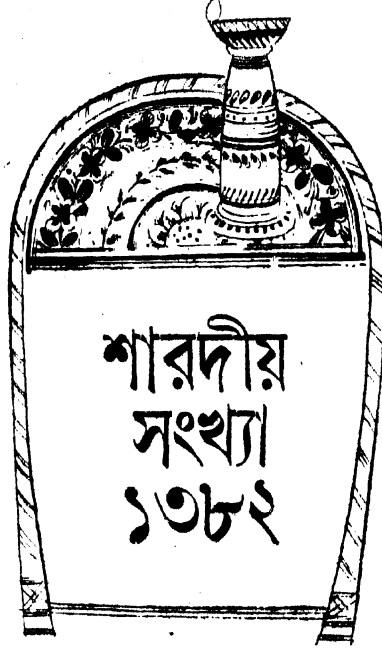
রচনা সমাবেশ ও পরিকল্পনায় শারদীয় 'দেশ' সত্যিই এক অভাবনীয় ব্যাপার। এবারের বিশেষ আকর্ষণ:

শরৎচন্দ্রের

অপ্রকাশিত বড় গল্প

কোরেল

তাঁর মৃত্যুর পর অতিক্রান্ত হয়েছে চল্লিশটি বছর, কিন্তু আজও অপ্রকাশিত তাঁর প্রথম সাহিত্য-প্রয়াস 'কোরেল'। প্রায় উপন্যাসের মতোই সুদীর্ঘ এই বড় গল্পের সঙ্গে মুদ্রিত হবে মূল রচনার প্রতিলিপি ও পটভূমি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের একান্ত সুহৃদ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তথ্যপূর্ণ ও বিশদ পরিচিতি-প্রবন্ধ।

৫টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

সত্যজিৎ রায়

(রহস্য-রোমাঞ্চ অ্যাডভেঞ্চার)

শংকর/কালকূট

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/বিমল কর

এঁরা অন্য কোনো শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখছেন না।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

এ-যাবৎ অজানা এক নতুন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই সুবৃহৎ মূল্যবান রচনাটি পরিবেশন করেছেন অমিতাভ চৌধুরী। সঙ্গে অসংখ্য ছবি, মানচিত্র এবং অপ্রকাশিত চিঠিপত্র।

প্রবন্ধ: সন্তোষকুমার ঘোষ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, সেবাব্রত গুপ্ত প্রভৃতি।

গল্প: বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রতিভা বসু, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কবিতা: অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অজিত দত্ত, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

রঙীন আর্টপ্লেটও অন্যান্য। দাম: ১০.০০ ॥ সডাক: ১১.৫০

আপনার কপির জন্যে এখন থেকেই ব'লে রাখুন আপনার কাগজ যিনি দেন তাঁকে, বা, আমাদের লিখুন:

সার্কুলেশন ম্যানেজার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১

ADPC-15 BEN

আমরা আলাদা

ইংরেজদের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যের ওপর আঘাত হেনে তাকে যাঁরা টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইমন ডি ভ্যালেরার জুড়ি বোধ হয় নেই। সাতশো বছর ধরে চেষ্টা করেও ইংরেজরা যে ঘরের পাশে আয়ার্ল্যান্ডকে নিজেদের ভাবে রাখতে পারেনি তার কারণ অবিশ্যি আইরিশরা কোনও দিনই ইংরেজদের জাতভাই বলে মনে করেনি। ১১৫২ সনে প্রথম যখন ইংরেজরা আয়ার্ল্যান্ডের মাটিতে পা দেয় তখন থেকেই আইরিশরা তাদের ওপর খড়্গহস্ত জোর-জবরদস্তি করে সেখানে যদিও তারা নিজেদের রাজত্ব কায়েম রেখেছিল। অমন সাধের জমিদারী ছাড়তে কিছুতেই রাজী হয়নি ইংরেজরা। কিছু আইরিশকে হাত করে তারা চেষ্টা করেছে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আয়ার্ল্যান্ড আলাদা হয়ে গেলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। ১৯২২ সনে হলো ডোমিনিয়ন, ১৯৪৮ সনে সে পাট চুকিয়ে কমনওয়েলথের বাইরে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র।

এই নাটকের শেষ অঙ্কের মহানায়ক ইমন ডি ভ্যালেরা। ৯৩ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন ডাবলিনের শহরতলীতে লিনডেন নার্সিং হোমে ২৯ আগস্ট। ঘটনাটা ষাট বছর আগে ঘটলে ইংরেজদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তো। তাতেও হয়তো তাদের আয়ার্ল্যান্ডে টিঁকে থাকা সম্ভব হতো না, তবে তাদের রাজত্বের মেয়াদ আরও দিনকতক বাড়লেও বাড়তে পারতো। ডি ভ্যালেরা ছিলেন জন্মবিপ্লবী। ইংরেজদের আয়ার্ল্যান্ড থেকে তাড়াবেন এই পণ নিয়েই বুঝি তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর জন্ম কিন্তু আয়ার্ল্যান্ডে নয়। জাতে তিনি আমেরিকান। আমেরিকাতেই তাঁর জন্ম ১৮৮২ সনে। বাবা স্পেনের বাস্ক এলাকার লোক। মা আয়ার্ল্যান্ডের মেয়ে। তাঁরা ঘর বেঁধেছিলেন আমেরিকার নিউ ইয়র্কে। আয়ার্ল্যান্ড হচ্ছে ডি ভ্যালেরার মামার বাড়ি। যখন তাঁর বয়েস দু বছর তখন তাঁকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লেখাপড়া তিনি সেখানেই শেখেন। দিনকতক মাস্টারিও করেন পড়াশোনার পাট সাঙ্গ করে। কিন্তু শান্তশিষ্ট হয়ে ইস্কুল-মাস্টারি করার ধাত তাঁর ছিল না। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন আয়ার্ল্যান্ডের মুক্তি-আন্দোলনে, ইংরিজী ছেড়ে শিখলেন আইরিশ ভাষা গেলিক। বাপ-মা তাঁর নাম দিয়েছিলেন এডওয়ার্ড—সেটা পালটে করলেন গেলিক ইমন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বেঁধেছিল আয়ার্ল্যান্ডে ১৮৭০ সন থেকে। তবে দাবি ছিল হোম রুল অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন। তাও দিতে নারাজ ছিলেন ইংরেজ সরকার। জাতীয়তাবাদীদের পাটিয়ে তাদের সঙ্গে

বৈদেশিকী

দেবরাজ

মিটমাটের চেষ্টা করতে লাগলেন তারা। বেশ কিছু নেতা সে ফাঁদে পা-ও দিলেন। দেশভক্তদের মনে ক্রমে এ ধারণা হলো সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না—আঙুল বাঁকানো চাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধলো তখন তাঁরা গড়ে ফেলেছেন তাঁদের দল—আইরিশ রিপাবলিকান ব্রাদারহুড। লড়াই করে সে দল নিজেদের ন্যায্য দাবি আদায় করবে এই পণ করেছিল। এরই জঙ্গী শাখা সিনফিন অর্থাৎ আমরা আলাদা। আইরিশরা যে আলাদা এই কথাই লোককে বুঝিয়ে দেশকে তাঁরা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলবার আন্দোলন জোরদার করে তুললেন। ১৯১৬ সনে যখন জার্মানদের সঙ্গে লড়াই চলছে ইংরেজদের তখন সিনফিন অভ্যুত্থান ঘটাল ডাবলিনে। ইতিহাসে তারই নাম ইস্টার বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ প্রেরণা যুগিয়েছিল তামাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের—ভারতবর্ষও বাদ যায়নি।

সে বিদ্রোহ সফল হয়নি বটে, কিন্তু তার আগুন আয়ার্ল্যান্ড স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত নেবেনি। ইস্টার বিদ্রোহের সেনাপতি ছিলেন ডি ভ্যালেরা। আইরিশ মুক্তিবাহিনীর ৫০ জনের মধ্যে মারা যান ৪১ জন। বেঁচে যান ডি ভ্যালেরা। বিচারে তাঁর রাজদ্রোহের অভিযোগে ফাঁসির হুকুম হয়। সে হুকুম কিন্তু তামিল হয়নি আন্তর্জাতিক আইনের মারপ্যাঁচে। জন্মসূত্রে ডি ভ্যালেরা ছিলেন মার্কিন নাগরিক। তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার অধিকার ইংরেজ সরকারের আছে কি না এ নিয়ে তর্ক ওঠে। আপত্তি জানিয়েছিলেন মার্কিন সরকার। তা মেনে নিয়ে তাঁকে চিরজীবন জেলে রাখার বিধান দেওয়া হয়। বছর খানেক জেলে থাকার পর তিনি ছাড়া পান যখন ১৯১৭ সনে সব রাজনৈতিক বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। জেলে থাকতে থাকতেই পার্লামেন্টে নির্বাচনের জন্য সিনফিন দলের তরফ থেকে তাঁর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। সে নির্বাচনে তিনি জেতেন ছাড়া পাবার পর। এবার তিনি হয়ে দাঁড়ালেন আইরিশ মুক্তি-যোদ্ধাদের প্রধান নেতা। সিনফিনের তিনি সভাপতিও নির্বাচিত হলেন।

আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো ১৯১৮ সনে আইরিশদের ব্রিটিশ ফৌজে নাম লেখাতে বাধা দেওয়ার অপরাধে। যুদ্ধ যখন থামলো তখন তিনি জেলে। তারপর যে সাধারণ নির্বাচন হলো বিলেতে তাতে আয়ার্ল্যান্ডে জয়জয়কার হলো সিনফিনের। জেল থেকেই ডি ভ্যালেরা জিতলেন দু দুটো কেন্দ্রে। পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্যরা কিন্তু অন্যদের সঙ্গে ওয়েস্টমিনস্টারে বৈঠকে যোগ দিলেন না। তাঁরা ডাবলিনে গড়লেন নিজেদের আলাদা পার্লামেন্ট ডয়েল আইরীন। জেল থেকে পালালেন ডি ভ্যালেরা ১৯১৯ সনে। তাঁকে আইরিশ পার্লামেন্টের অধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হলো। আইরিশ প্রজাতন্ত্রকে আমেরিকা যাতে স্বীকৃতি দেয় সেই চেষ্টায় তিনি পাড়ি দিলেন আটলান্টিক। তাঁর প্রস্তাবে সায় দেননি মার্কিন সরকার, কিন্তু ৬০ লাখ ডলার তিনি মুক্তি আন্দোলনের জন্যে যোগাড় করে আনলেন আমেরিকা থেকে। দেশে যখন তিনি ফিরলেন তখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন ইংরেজ সরকার। অকথ্য অত্যাচার চলছে আইরিশ মুক্তি-যোদ্ধাদের ওপর। যে ইংরেজ পুলিশ ওই জঘন্য কাণ্ড করছিল তাদের বলা হতো ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান। তাদের চাঁই ছিলেন স্যার জন এন্ডারসন, যাঁকে বাংলার লাট করে পাঠানো হয়েছিল বিপ্লবীদের শায়েস্তা করতে।

আপস হলো ১৯২১ সনে। একটা প্রতিনিধি দল গেল লন্ডনে রফার ব্যবস্থা করতে। তার সঙ্গে কিন্তু ডি ভ্যালেরা গেলেন না। যে রফা হলো তাতে তিনি সায় দেননি। স্বাধীন আয়ার্ল্যান্ডের দাবি ব্রিটেন মেনে নিলে, কিন্তু গোটা দেশের নয়। আরও ঠিক হলো বিলিতী রাজা-রানীর আনুগত্য মেনে নিতে হবে। তাতে ডি ভ্যালেরা রাজী হলেন না। দল দু-ভাগ হয়ে গেল—চললো গৃহযুদ্ধ। আবার জেলে যেতে হলো ডি ভ্যালেরাকে। শেষ পর্যন্ত চুক্তি হলো ১৯২৭ সনে। এর আগের বছর তিনি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর নিজের দল ফিয়ানা ফল অর্থাৎ আয়ার্ল্যান্ডের সৈনিক। ১৯৩২ সন পর্যন্ত তিনি ছিলেন আইরিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা। ১৯৩৭ সনের নতুন সংবিধানে আনুগত্যের শপথ তুলে দেওয়া হলো। আয়ার্ল্যান্ড হলো পুরোপুরি স্বাধীন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোনও জোটেই সে ভেড়েনি। ১৯৩২ সনে তিনি হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দল হেরে গেলে ১৯৪৮ সনে তিনি ইস্তফা দেন। আবার ফিরে আসেন ১৯৫১ সনে। সেবার গদিতে ছিলেন তিন বছর। এর পর শেষবার প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৫৭ সনে। ১৯৫৯ সনে ইস্তফা দিয়ে তিনি হন রাষ্ট্রপতি। সে পদে তিনি ছিলেন ১৯৭৩ সন পর্যন্ত। শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর ক্ষোভ ছিল গোটা দেশটাকে তিনি ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারেননি। আয়ার্ল্যান্ডের ৩২টা জেলার ছটা আজও ইংরেজদের তাঁবে। সে এলাকায় কিন্তু শান্তি নেই। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে। ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্ট্যান্টদের চলছে দারুণ খুনোখুনি।

দেশ ও কাল

তামিলনাড়ু

তামিলনাড়ুর ডি এম কে সরকার অনেক ব্যাপারেই রেকর্ড স্থাপন করেছে। তাঁদের একটা বড় রেকর্ড হল দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করা—আর কোনও নির্ভেজাল অ-কংগ্রেসী সরকার একাদিক্রমে এতদিন ভারতের কোনও রাজ্যে রাজত্ব করতে পারেনি। ডি এম কে সেই যে ১৯৬৭ সনে তামিলনাড়ুতে অর্থাৎ মাদ্রাজে ক্ষমতা দখল করেছে নানাভাবে কারু পক্ষে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। কামরাজ নানা চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এখনও কিছু করতে পারেননি। রামচন্দ্রণের বিদ্রোহ এবং ভাঙ্গন এক সময় প্রায় মহামারির মত ডি এম কে-কে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু তাতেও দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়নি।

এমন যে ডি এম কে সরকার সেই সরকার এবার একটা বড় রকমের সংকটে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধিকে নিয়ে। দলেরই এক মন্ত্রীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে করুণানিধি পদত্যাগ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর পদত্যাগের সংকল্প তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্যরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কারণ, তাঁরা জানেন, শত দোষ থাকা সত্ত্বেও করুণানিধিই বর্তমানে দলের প্রধান নেতা। সেই করুণানিধি পদত্যাগ করলে নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন নিয়ে দলে বড় রকমের ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে দল হয়ত সরকারী ক্ষমতাই হারাতে পারে। দলের বেশ কয়েকজন প্রবীণ নেতা তাই সঙ্গে সঙ্গে একত্র হয়ে করুণানিধিকে বাধা দেন। তাঁদের চাপাচাপিতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই করুণানিধি তাঁর পদত্যাগের সংকল্প প্রত্যাহার করে নেন।

কিন্তু সংকটটা আপাতত এইভাবে কাটানো গেলেও এই ঘটনা সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, ডি এম কে দীর্ঘকাল সরকারে থাকতে পারলেও তার ভেতরে সব ঠিক নেই। রামচন্দ্রণের বিদ্রোহের সময় বিরোধীরা অনেকে দল থেকে বেরিয়ে গেলেও দলের ভেতরে এখনো অনেক গণ্ডগোল থেকে গিয়েছে।

ডি এম কে সরকার যে এতদিন ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে পেরেছে তার অনেকগুলি কারণ আছে। একটা বড় কারণ হল, তাঁদের আঞ্চলিকতাবাদ। আঞ্চলিকতাবাদে সুড়সুড়ি দেওয়া ডি এম কে নেতৃত্বের একটা বড় অস্ত্র। বিপদে পড়লেই তাঁরা এই অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করেন।

দ্বিতীয় যে বড় কারণে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও ডি এম কে সরকার এতদিন টিঁকে থাকতে পেরেছে তা হল এরা তামিলনাড়ুর গরীব মানুষের জন্য সত্যিই কিছু করেছে। তাঁদের সস্তা দরে চাল দিচ্ছে, তাঁদের মজুরী কিছু বাড়াবার ব্যবস্থা করেছে, তাঁদের চাকরিবাকরির কিছু নতুন সুযোগ করে দিয়েছে; গ্রামের গরীব চাষীদেরও কিছুটা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিতে পেরেছে ডি এম কে সরকার।

সবচেয়ে বড় জিনিস, ডি এম কে সরকার তামিলনাড়ুর গরীব মানুষকে এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে, তাঁরা গরীব বলেই ক্ষমতাহীন ও দুর্বল নন; তাঁদেরও কতকগুলি অধিকার আছে, তাঁদেরও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কতকগুলি কাজের মধ্য দিয়ে ডি এম কে সরকার তামিলনাড়ুর গরীবদের মধ্যে একটা নতুন চেতনা আনতে পেরেছে। যেমন ধরুন, মাদ্রাজের মেরিন ড্রাইভ অর্থাৎ সমুদ্রতীরে গরীবদের জন্য বাড়ি করা। মাদ্রাজের মেরিন ড্রাইভ হল সবচেয়ে ভাল এলাকা। রাজ্যপালের বাড়ি, বড় বড় অফিস, খুব অভিজাতদের ক্লাব টাব, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে বালুর ওপর ঝুপড়ি করে কিছু জেলেও বাস করত। ডি এম কে সরকার সেই ঝুপড়িগুলি ভেঙে দিয়ে সেখানে ফ্ল্যাটবাড়ি করে দিয়েছে। খুব ছোটখাট ফ্ল্যাট। এবং সেগুলি দিয়েছে ওই জেলেদেরই। খুব অভিজাত এলাকা বলে ওখান থেকে জেলেদের সরিয়ে দেয়নি। অন্যত্র তাঁদের ফ্ল্যাট করে দেয়নি। ওইখানেই বসিয়ে দিয়েছে।

ডি এম কে সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে তামিলনাড়ুর শহরের গরীবদের মধ্যে আবার একটা মারমুখো ভাবও এসেছে। তাঁরা সব সময়ই যেন বলতে চান, "ভদ্রলোকদের মানি না।" এর ফলে তামিলনাড়ুর শহরগুলিতে একটা নতুন ধরনের উত্তেজনাও এসেছে এবং ভদ্রলোক শ্রেণীর লোকজন, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা এবং উচ্চবর্ণের অনেকেই এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ। তাঁদের তীব্র ডি এম কে-বিদ্বেষের এটা একটা বড় কারণ।

ডি এম কে-র ভেতরে যে গণ্ডগোল তার একটা বড় কারণ হল, [illegible] ক্ষমতার মোহ এবং দুর্নীতি। ক্ষমতা দখলের লড়াই ডি এম কে-র ভেতরে সব সময়ই চলছে।

ডি এম কে রাজত্ব তামিলনাড়ুতে ব্যাপক দুর্নীতিও আমদানী করেছে। মাদ্রাজে এত দুর্নীতি কোনও দিন ছিল না। '৬৭ সন পর্যন্ত মাদ্রাজে দুর্নীতি কম ছিল। মাদ্রাজের মধ্যবিত্ত সমাজ দুর্নীতির জন্য ডি এম কে-র উপর অত্যন্ত চটা।

এই টাকা-পয়সা, সুযোগ-সুবিধা নিয়েও ডি এম কে-র ভেতরে প্রতিনিয়ত ঝগড়াঝাঁটি চলছে। প্রায়ই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

একটা আশ্চর্য জিনিস, তামিলনাড়ুর গরীব মানুষেরা কিন্তু এই দুর্নীতির খুব নিন্দা করেন না।

১-৯-৭৫।

সমর রায়

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]
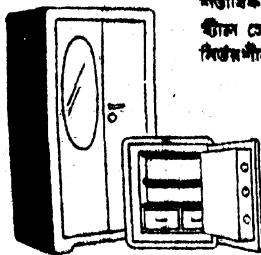
॥ ১৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তাড়াতাড়িতে এবং অনবধানে তোমার চিঠির পুরো জবাব কাল দেওয়া হয়নি।

প্রথম কথা হচ্চে, সকল মানুষের মন সমষ্টীভূত হয়ে বিশ্বমনের মহাদেশ সৃষ্টি হয়েচে একথা বললে বোধহয় ভুল বোঝা হবে। যদিও বিশ্বমনের মধ্যে ব্যক্তিমনের আশ্রয়, তবু সমস্ত ব্যক্তিমনের যোগফল বিশ্বমন নয়। তাহলে যা-আছে তাই বড়ো হয়, যা-হতে পারে তার জায়গা থাকে না। অথচ দেখচি মানুষের ইতিহাসে, যা-হয়নি কিন্তু হতে-পারে, তারি জোর তারি দাবী বেশী। সেই ইচ্ছা এত দুর্নিবারভাবে প্রবল কেন, যার প্রচণ্ড আকর্ষণে মানুষের সভ্যতা কেবলি বর্তমানের সীমা লঙ্ঘন করে এগিয়ে চলতে চায়। সর্বমানবের মধ্যে সেই এগোবার অবকাশ তাহলে আছে। শাবক ডিম ছাড়া আর কিছুই জানে না, তার জগৎ ঐ খোলার মধ্যে—কিন্তু সে তবু চাইছে খোলা ভাঙতে—তার থেকে বুঝি, খোলার বাইরে তার বৃহত্তর জগৎ আছে বলেই সে খোলা ভাঙতে ব্যগ্র—অর্থাৎ যা অবর্তমান যা অজ্ঞাত তাই তার বর্তমানের চেয়ে তার জ্ঞানগম্যের চেয়ে সত্য বলেই তার সীমাবদ্ধ আশ্রয়কে বর্জন করাই তার ধর্ম হয়েচে। তেমনি যে-কোনো বিশেষ যুগে সমস্ত মানুষের যা কিছু জানা তাই নিয়েই বিশ্বচিত্তের পরিধি পর্যাপ্ত নয়। যে পরিপূর্ণতার অভিমুখে ব্যক্তিমন নিয়ত আকৃষ্ট হচ্চে নিখিলমানবমনের মধ্যে তা আইডিয়ারূপে সত্য হয়ে আছে, ব্যক্তিমন তাকে যতই বিষয়ীকৃত করবে ততই আইডিয়ার সত্যতা সার্থক হবে।

যে-গ্রহ গোচর হয় নি সেই গ্রহেরও অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্যোতিষীরা নিঃসন্দিগ্ধ হন যখন তাঁরা দেখেন অন্য গ্রহের গতি আপন নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে বিচলিত। মানুষের মনও নির্দিষ্ট কক্ষপথের রেখা যথাযথ আবৃত্তি করে চলচে না—কেবলি অনির্দিষ্টের দিকে ঝুঁকচে—তার থেকেই বুঝতে পারি এই ঝোঁকটা একটা আকস্মিক খেয়ালমাত্র নয়—এতে একটা বৃহৎ সত্যের নিরন্তর আকর্ষণ প্রমাণ করে। Religion of Man-এ একজায়গায় বলেচি মানুষ ভাবীকালেই বাস করে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা অধ্যবসায় ভাবীকালে ফল ফলাবার জন্যে—বর্তমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করতে তার দ্বিধা নেই—তার কারণ ভবিষ্যতেই সে সত্যরূপে বর্তমান—তার home-sickness সেই ভবিষ্যতের জন্যে। এই যে অনিশ্চিত অবর্তমানের দিকে তার একান্ত আগ্রহ, তার কারণ এই অনিশ্চিতের মধ্যেই তার নিশ্চিত রয়েছে—তারই অভিসারে বারম্বার ব্যর্থ হয়েও তবু মানুষ হতাশ হয়ে যাত্রা বন্ধ করতে পারলনা। এটাকে বলা উচিত ছিল পাগলামী কিন্তু মানুষ একেই বলেছে মহত্ত্ব। কোন ভূমার মধ্যে এই মহত্ত্বের ধ্রুব আশ্রয়? সেই হচ্চে মহামানব। সে আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অধিকার করে সকলকেই অনেকদূরে অতিক্রম করেচে।

তার পরে প্রশ্ন এই আমার মনে যে সুখ দুঃখের অনুভূতি সেটা বিশ্বমনের মধ্যে আছে কিনা। ভেবে দেখতে হবে হৃদয়াবেগের বিশেষ অনুভূতি আমাদের অহং-এর বিশেষ সীমার দ্বারা। নিন্দা শুনলে আমি যদি অত্যন্ত দুঃখ পাই তার কারণ হচ্চে, যে-অহং নিন্দিত তাকে আমি অত্যন্ত সত্য বলে কল্পনা করি কিন্তু আমি যখন কোনো বড়ো সাধনায় ব্যাপৃত থাকি, বড়ো আনন্দে মগ্ন থাকি তখন কে আমাকে কী বললে আমার গায়ে বাজেনা। তার কারণ তখন আমার অহং আপন সীমা অতিক্রম করে বৃহতের মধ্যে প্রসারিত হয়ে যায় তাই বাহিরের লাভ ক্ষতি সুখ দুঃখ তার পক্ষে আর একান্ত হয়ে ওঠে না। আপনাকে বৃহতের মধ্যে উপলব্ধি করাই মানুষের সত্য, নিজের অহং-এর মধ্যে অবরুদ্ধ জানাই তার অসত্য। দুঃখ এই অসত্যের অনুষঙ্গী। বুদ্ধদেব যখন মানুষের দুঃখের মূলচ্ছেদ করবার উপায় খুঁজে পেলেন তখন তিনি একান্ত অহংবোধকে অজ্ঞান বলে প্রচার করলেন। সত্যকে না জানা না মানার মধ্যেই দুঃখ। উত্তরোত্তর জ্ঞানের দ্বারাই দুঃখ ক্ষয় হতে থাকে। অতএব দুঃখটা নঙর্থক, এটা বিরাট মানবের মধ্যে নেই, সেই বিরাট মানবকে উপলব্ধি দ্বারাই দুঃখ থেকে ও সকল প্রকার রিপু থেকে মুক্তি,—ধর্মের শেষ ফল হচ্চে অজ্ঞানের দুঃখবন্ধন থেকে মুক্তি—মহামানবের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে সেই মুক্তি।

দাই পাশের ঘরে গেছে, অবোধ শিশু মনে করে এই বিরহটা সত্য—মহা কান্না জুড়ে দেয়। এই কান্না বেদনা রূপে বাপকে স্পর্শই করেনা, বাপ জানে ছেলের দুঃখ যতই বাস্তব হোক্ ওটা কিছুই না। তেমনি অহংবদ্ধ জীবের দুঃখ দুঃখ আকারে ভোগ করেন না।

তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা কিসের যোগে যদি জিজ্ঞাসা কর তবে তার উত্তর এই যে দেশে কালে ক্রমে ক্রমে তাঁর পূর্ণতাকে আমাদের অপূর্ণতার ভিতর দিয়ে আমরা বিষয়ীকৃত করব এই অপেক্ষা তাঁর মধ্যে আছে। বস্তুত সীমাবদ্ধ অহংকে বিশ্বাত্মার মধ্যে ব্যাপ্ত করবার সাধনার মধ্যে দুঃখই একটি প্রধান উপকরণ। সুতরাং আমরা দুঃখকে যে ভাবে দেখি বৃহতের মধ্যে সে ভাব থাকতে পারে না। অপ্রাপ্তকে পাবার পথে চেষ্টা, এবং সকল চেষ্টার মধ্যেই দুঃখ—অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তীর্ণ হবার মোড়ে আছেন রুদ্র—আমরা উদ্ধার পেতে চাই সেই পাওয়ার দুঃখকে রুদ্রের প্রসন্নতা বলেই জানতে হবে। যদি তাঁকে দয়াময় বলি তাহলে বলতে হয় যে তাঁর অপার করুণা দুঃখ থেকে আমাদের বাঁচায়। কিন্তু বাঁচায় তো না। যখন জিয়োমেট্রি শিখছিলাম তখন দয়াময় তো সরস্বতীরূপে শেখবার দুঃখ একটুও বাঁচাননি। কিন্তু দুঃখটা চরম নয়, শেখাটাই চরম এইখানেই গুরুর প্রসন্নতা।

অপূর্ণতা ক্ষয়ের দ্বারা তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলনকে বিশুদ্ধতর ঘনিষ্ঠতর অভিপ্রায় বিশ্বমানবের মধ্যে আছে। তাঁর প্রতি প্রেমের দ্বারাই আমরা তাঁর প্রেমকে সার্থক করব যুগে যুগে এই প্রতীক্ষা আমাদের ইতিহাসের মধ্যে কাজ করচে। ইতি ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

কবি

ক্রমশ
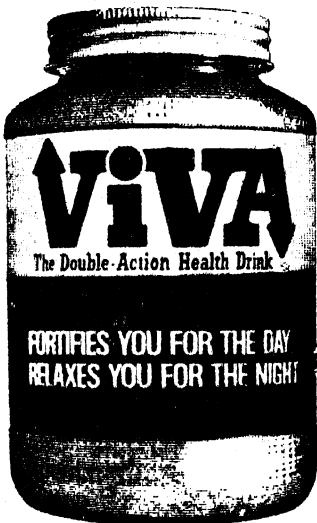
শরণদাতা রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালা দেবী

প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

॥ ৮ ॥

হেমন্তবালা দেবী রবীন্দ্রনাথকে কি চোখে দেখেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে তিনি জীবনের কি পাথেয় পেয়েছিলেন, তা জানতে সকলেরই কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। আগেকার প্রসংগক্রমে এ সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি ধারণা অবশ্যই জন্মেছে, তবু বিষয়টাকে আরো খানিকটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে। চিঠিপত্র নবম খণ্ডে মুদ্রিত হেমন্তবালা দেবীর চিঠিগুলি এবং তাঁর অন্যান্য লেখা এ সম্পর্কে অনেকটা আলোকপাত করে।

জৈবধর্মে মানুষ সিদ্ধির পথ খোঁজে সহজ, সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দতার পথে, কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় যে, জৈবধর্মকে অতিক্রম করে অন্তরাত্মার নিগূঢ় আহ্বান আবার কোনো কোনো মানুষকে ভুলিয়ে দেয় সেই পথ। তখন এক অলক্ষ্য আদর্শ-বোধ এবং মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ত্যাগ ও তপস্যার অভিমুখে। এইভাবে সূত্রপাত হয় আধ্যাত্মিক জীবনের এবং ধর্মপিপাসা ও ঈশ্বরকে খোঁজার প্রেরণা। হেমন্তবালা দেবীর জীবনে এই স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তা আমরা আগেই জেনেছি। ধর্ম-সাধনার পথে সহায়ক, দিশারী, পথপ্রদর্শক বা 'গুরু'র অন্বেষণ করাও মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। হেমন্তবালা দেবী তেমন গুরু পেয়েছিলেন জীবনে। কিন্তু গতানুগতিকভাবে তিনি কোনো কৌলিক গুরুর কাছ থেকে অন্ধ প্রথা অনুসরণ করে দীক্ষা নেন নি, বৈষ্ণব ধর্মে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন এমন একজনের কাছ থেকে, যাঁর চরিত্রের মহিমা তাঁর অন্তরাত্মাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। এই দীক্ষাগ্রহণ তাঁর জীবনে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। কারণ, তিনি জানতেন যে, তাঁর এই কাজ তাঁর সাংসারিক জীবনে বিরোধ, সংঘাত, অশান্তি ও দুঃখ ডেকে আনবেই, এবং তার ফলে যথার্থই অভিশাপ নেমে এসেছিল তাঁর জীবনে। কিন্তু এই দুঃখ-দ্বন্দ্বের ভয় তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে নি। এইখানেই তাঁর চরিত্রের এক অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় আমরা পাই, যা তখনকার দিনে গোঁড়া পরিবারের অন্তঃপুরচারিণী এবং আধুনিক শিক্ষায় বঞ্চিতা এক কুলবধূর পক্ষে ছিল একান্তই দুর্লভ ও অভাবিত। আসল কথা, মানুষের স্বভাবে যখন মহিমার স্পর্শ ও উপলব্ধির উদ্বোধন ঘটে, তখন সেই স্বভাবের অভিব্যক্তি আসে বিরোধের ভিতর দিয়েই, সেই পথের পথিককে পরম সুখকে পেতে হয় চরম দুঃখের মূল্য দিয়েই।

স্নেহ, প্রেম, ভক্তির আধার ও আশ্রয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন সম্ভবত স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাভাবিক। হেমন্তবালা দেবী জীবনে দুজন পুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন—প্রথম জীবনে তাঁর শিক্ষাগুরু 'কিশোরানন্দ' এবং মধ্য জীবনে রবীন্দ্রনাথ, যে দুজন পুরুষ তাঁদের চরিত্রের অসামান্যতাগুণে তাঁকে মুগ্ধ করেছিলেন এবং তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। দুজনকেই তাঁর মনে হয়েছিল 'অসাধারণ' পুরুষ, তাঁর ভাষায় বলতে গেলে দুজনের মধ্যেই ছিল 'শ্রীভগবানের বিভূতি'। তবে হেমন্তবালা দেবীর সঙ্গে কিশোরানন্দর সংযোগ ঘটেছিল যখন তিনি স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ণযৌবনা নারী, যে বয়সে মন থাকে স্বভাবতই কোমল এবং যে বয়সে বিচারবুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগই থাকে প্রবল। হেমন্তবালা দেবী নিজেই বলেছেন—"যেদিন শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করি, তখন জ্ঞানবুদ্ধি বেশী ছিল না। পর্যবেক্ষণক্ষমতা ছিল না, আনন্দে মাতিয়া আত্মহারাভাবে দিন কাটিত।" (৩নং চিঠি) আর, রবীন্দ্রনাথের দেখা তিনি পেয়েছিলেন যখন তাঁর বয়স হয়েছে এবং যখন জীবনের নানা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রূঢ় শিক্ষায় হৃদয়াবেগ পরিমার্জিত হয়ে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিও প্রখরভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সুতরাং, তাঁর জীবনের উপরে প্রথমজনের পক্ষে প্রভাব বিস্তার করা যত সহজ ছিল দ্বিতীয়জনের পক্ষে তত নয়, তবু এই দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথই হেমন্তবালা দেবীর জীবনে স্থায়ী এবং গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলেন।

এই দুজন পুরুষের সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক বিচারের ভাব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, হেমন্তবালা দেবীর মনে আসা অনিবার্য ছিল। তাঁর শিক্ষাগুরু 'ঠাকুর' কি রকম বিশিষ্ট চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন তার একটি রেখাচিত্র আগেই আমরা হেমন্তবালা দেবীর কাছ থেকে জানতে পেরেছি। তাঁর সম্বন্ধে হেমন্তবালা দেবী আরো বলেছেন—"তিনি গম্ভীর, সরস, সুন্দর, আনন্দময়, সরল ও করুণার্দ্র ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনমত উগ্র কঠোরও হইতে জানিতেন। তখন একটুও দয়ামায়া আসিত না। রাশভারি ছিলেন, কণ্ঠধ্বনি ছিল গম্ভীর।...এগুলি দেখিয়াছি, কিন্তু অত বিচার করিয়া দেখি নাই।" (৩নং চিঠি)

তুলনায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে হেমন্তবালা দেবীর ধারণা তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন—"আমার মনে হয় আপনার প্রকৃতি অধিকতর দৃঢ়, স্থির, আত্মনির্ভর ও সহিষ্ণু। আপনি প্রশান্ত, আপনার করুণার, স্নেহের অন্ত নাই, কিন্তু তাহার আবেগ প্রচ্ছন্ন। আপনার বল এত বেশী যে, সে বল প্রয়োগের জন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ের প্রয়োজন হয় না। না মিনতি, না দণ্ড প্রয়োগ। আপনার কঠোর আদেশেরও প্রয়োজন নাই। মুখের অতি সাধারণ কথাই যথেষ্ট। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট আস্থা আছে বলিয়াই আপনি তাহার অপপ্রয়োগ দূরের কথা, প্রয়োগ করিতেও ইতস্তত করেন। পাশুপত অস্ত্র ছিল বলিয়াই অর্জুন যুদ্ধে অনিচ্ছু হইয়াছিলেন, যাঁদের সে অস্ত্র ছিল না, যুদ্ধোৎসাহ তাঁদেরই ছিল বেশী।" (৩নং চিঠি) এক কথায়, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সম্পর্কে গীতার বর্ণিত শ্লোক উদ্ধৃত করে ঐ চিঠিতেই তিনি প্রথমেই লিখেছেন—"এগুলি আমার জীবনে আসা অসম্ভব বলিয়াই আমার চিরদিনের ধারণা। কিন্তু এমন মানুষ তো চোখে দেখিতে পাইলাম।" রবীন্দ্রনাথকে মহামানবের স্বীকৃতি দিয়ে এর চেয়ে মহিমাময় শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার আর বাকি কি রইলো? তিনি আরো বলেছেন—"বৈষ্ণব দর্শন বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত 'মহাকালপুর' নামক জ্যোতির্ময় কারণলোকে ব্রহ্মানন্দমগ্ন আত্মারাম ঋষিগণের চরম গতিস্থান। আপনাকে দেখলে সেই ব্রহ্মবাদী বেদজ্ঞ ঋষিগণের সত্তারই উপলব্ধি করি।" (১নং চিঠি) শুধু বেদজ্ঞ ঋষিরূপে নয়, রবীন্দ্রনাথকে তিনি নিজ ইষ্টদেবতার একাত্মরূপেই অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, এ কথা অসংকোচে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি—"হে ঋষি, আমার কবি আমার ইষ্টদেবতার অঙ্গে লীন হয়ে রয়েছেন, যখন তাঁকে প্রণাম করব, সেই প্রণামেই কবিকে প্রণাম করা হবে। যখন সেই চিরকিশোরের সুন্দর চরণকমল আমার লীলাস্পদ হয়ে শিরে, নেত্রে, ললাটে, কপোলে পেলবস্পর্শ দান করবেন, তখন আমি আমার কবিরই স্নেহস্পর্শ যুগপৎ অনুভব করব।" (১নং চিঠি) অন্তরের সমস্ত ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে পরিপূর্ণভাবে এবং নিঃশেষেই রবীন্দ্রনাথের কাছে আত্মনিবেদন করেছিলেন হেমন্তবালা দেবী, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ ও মতকে তিনি জীবনে গ্রহণ করতে পারেন নি, এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। আপাতত আমরা ঠাকুর কিশোরানন্দ প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই।

'ঠাকুর' সম্পর্কে হেমন্তবালা দেবী নিজেই রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন—"তাঁর শৈশবের, বাল্যের কুলাচরিত প্রথায় সম্প্রাপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গ-উপাসনা সেদিন নবরূপে নবরূপে সুন্দর হইয়া উঠিল, যেদিন তিনি আপনার কাব্যরস পান করিলেন। আপনার 'অন্তর্যামী' 'জীবনদেবতা' তাঁর হৃদয়দয়িত ও প্রাণেশ্বরী সেদিন এক হইলেন।" (৩নং চিঠি) এ সম্পর্কে তিনি আরো লিখেছেন—"আমার নিজের দুঃখ এ জীবনে ঘুচবার নয়, বিশেষত সম্প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৩১৪ সালের একখানি ডায়েরির নকল আমার চোখে পড়ায় এ দুঃখ আরো বেশী হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অতি সরলভাবে 'রবি-কবি'র তখনকার দিনের রচনা থেকে ভাব নিয়ে ভাব নিয়ে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সেগুলি নিজের কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর ছিল মধুকর-বৃত্তি। নানা ফুলের রস নিয়ে নিজের মনোমত মধু রচনা করতেন। ঐ অংশ দেখে লজ্জা পাই, দুঃখ পাই। তিনি

কি জানতে পেরেছিলেন, সেই তাঁর 'রবি-কবি'ই তাঁর আশ্রিতার গুরুভক্তি ব্রতনিষ্ঠা বিচলনের উপলক্ষ-স্বরূপ হয়ে তাঁর আশ্রমে একটি বিরোধের সূচনা করবেন? আর রবীন্দ্রনাথই কি তা জানতেন বা চেয়েছিলেন? কোনো কারণেই রবীন্দ্রনাথের আমাকে কোনোই প্রয়োজন ছিল না, এবং তিনি আমাকে প্রশ্রয়ও দিতে চাননি। তিনি আমাকে আমার নিজের আশ্রয়ে ফিরে যেতেই বার বার উপদেশ দিয়েছিলেন। তথাপি অন্তরের ভক্তি এলো তাঁর পানে। রবীন্দ্রনাথ কি করতে পারেন? মানুষের মনের উপরে তাঁর হাত নেই।" (স্মৃতিকথা-৭) ঠাকুরের দেহান্ত ঘটেছিল, কিন্তু তাঁর প্রতি হেমন্তবালা দেবীর অন্তরের গভীর ভক্তি নিষ্ঠা ছিল অবিচলিত এবং ঠাকুরের স্মৃতিকে এক অক্ষয় সম্পদের মত লালন করে সেখানেই তিনি জীবনের সার্থকতা খুঁজতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পরম ভক্তিনিষ্ঠা শুধু যে বিচলিত হয়েছিল তাই নয়, তা যেন আধার বদল করে দ্বিগুণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে ধাবিত হয়েছিল। হেমন্তবালা দেবী বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঠাকুরের কাব্যপ্রীতি কাব্য প্রতিভার 'উৎস' ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি রবীন্দ্রনাথকেই বলেছেন—"আমার শ্রীগুরুকে আমি আপনার হৃদয়নন্দনের অমূল্য পারিজাত বলি, অথবা আপনার হৃদয়কুঞ্জের মঞ্জুতুলসী।......আমি আমার শ্রীগুরুর যে আনন্দসৌরভে মত্ত হইয়াছিলাম, তাহা শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গবাহিত হইলেও তাহার মূল বনিয়াদের অনেকখানি আপনারই হৃদরণ্যপ্রসূত। সেই গন্ধ ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আপনাকে পাইয়া গিয়াছিলাম, রাখিতে পারিলাম না—নিজের কর্মদোষে। আপনি আমার নন, আপনি বরঞ্চ ঐ য়ুরোপীয়দেরই। কিন্তু আপনার বুকের অন্তস্তলে সেই কৃষ্ণতুলসীর শিকড় এখনো বর্তমান—যার মঞ্জুরী একদিন শ্রীশ্রীগৌরকিশোরের বনমালা-বৈজয়ন্তীর স্তবকে দুলিয়াছিল, আর শোভিত হইয়াছিল কনককিশোরীর দুটি চারুকর্ণে। আপনার মর্মের সেই তুলসীমূলেটুকু যেন বিল্ব বট অশ্বত্থ সহকারের শিকড়ের চাপে মরিয়া না যায়, এই আপনার সেবিকার শেষ নিবেদন।" (৩নং চিঠি) তিনি আরো বলেছেন—"এতদিন আপনি আমার অদেখা হইয়া কোথায় লুকাইয়াছিলেন? আমার শ্রীগুরুর যে সকল সদগুণে আমি আকৃষ্ট, তার অনেকটাই আপনার হৃদয়প্রসূত। এ কথা আশ্রম হয়তো স্বীকার করিবেন না—আমাকে দোষ দিবেন।" (৩নং চিঠি) রবীন্দ্রনাথকে তিনি পেয়েছিলেন, এ যেমন তাঁর এক সৌভাগ্য, তাঁকে তিনি দৈবের বিপাকে পড়ে অকুণ্ঠচিত্তে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারলেন না, এও তাঁর এক দুর্ভাগ্য। রবীন্দ্রনাথকে তিনি পেয়েও পেলেন না, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নন, কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথেরই আশ্রিতা, রবীন্দ্রনাথেরই সেবিকা। "এ জন্মে আর আপনাকে দেখা, আপনার কথা শোনা, আপনাকে জানা চেনা আমার হইল না। আমার জীবন অসমাপ্ত সৌভাগ্যে, সুসমাপ্ত দুর্ভাগ্যে পূর্ণ রহিয়া গেল। —তবুও মনে রাখিবেন, আমি যতই কেননা অধম হই, আমি আপনার।" (৩নং চিঠি)

রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে হেমন্তবালা দেবী বলেছিলেন—"আপনি আমার দেবতা...আমার কল্পলোকের রাজা।" (১নং চিঠি) এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আমার রুপরূপেকে আশ্রয় করে যাঁকে তুমি হৃদয়ে উপলব্ধি করেচ আমি তাঁরই পূজা করে থাকি, তিনি আমাদের সকলের মধ্যেই, তিনি পরম মানব।" (২১নং) কল্পলোকের রাজা এবং আরাধ্য দেবতার চোখে দেখে যাঁর কাছে হেমন্তবালা দেবী আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তিনি মর্মজীবনের কি অবলম্বন পেয়েছিলেন এবং কেনই বা অনুরক্তা হয়েও অনুগতা শিষ্যের মত রবীন্দ্রনাথের অনুগামী হতে পারলেন না তিনি? হেমন্তবালা দেবীর কাছ থেকে আগেই আমরা জেনেছি যে, রবীন্দ্রনাথের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভ করে তিনি অশান্তিময় জীবনে শান্তি পেয়েছিলেন এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু এইটুকু স্বীকারোক্তি থেকে আমাদের সব জিজ্ঞাসার সদুত্তর মেলে না। আমাদের মনে হয়, হেমন্তবালা দেবীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সংগে পত্রবিনিময়, ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনা ও তাঁর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে হেমন্তবালা দেবীর চিত্তের আবরণ ঘুচে গিয়েছিল, কিন্তু আচরণের বন্ধন থেকে তাঁর মুক্তিলাভ ঘটেনি।

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়ে সেই সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারের সংকীর্ণ গণ্ডিতে হেমন্তবালা দেবীর জীবন আবদ্ধ হয়েছিল, সাম্প্রদায়িক ধর্মনিষ্ঠা মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে। এর দ্বারাই আবৃত ছিল তাঁর চিত্ত, যথার্থ ধর্মবোধ ও ধর্মের সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করার পথে এই বাধাকে মানুষ সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীর মনের এই মোহাবরণকে ছিন্ন করে দিয়েছিলেন—ক্রমাগত তাঁর অন্তর্নিহিত বুদ্ধিশক্তি ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন, তোমাকে হয়তো আমি দুঃখ

দিচ্ছি—যা আমি দিতে চাইনি—কিন্তু সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে সব বুঝিয়ে বলা দরকার, এতে দুঃখ পেলেও ক্ষতি হবে না [illegible]। "ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি যা কিছু আলোচনা করেছি সে তোমার বুদ্ধিকে স্পর্শ করে থাকবে কিন্তু তোমার সংস্কারকে পরাভূত করতে পারেনি। যে পথে তোমার পূজাবৃত্তি এতকাল তৃপ্তি পেয়েছে সেই পথেই তোমার হৃদয় স্বভাবতই ছুটতে চায়। তোমার বুদ্ধিশক্তি আজ তাকে বাধা দিয়েছে কিন্তু বিমুখ করতে পারেনি। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে তোমার স্বভাব আজ পীড়িত। এই ব্যথা তোমাকে আমি দিয়েছি—গভীরভাবে তাতে তোমার ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করিনে। ভক্তিকে বুদ্ধি থেকে ভ্রষ্ট করলে তার মূল্যহানি করা হয়—তাতে নিজের মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়।" (১৩০নং) ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে হেমন্তবালা দেবীর সত্যদৃষ্টি উন্মুক্ত হয়েছিল, তাঁর চিত্তের আবরণ যথার্থই ঘুচে গিয়েছিল বলেই তিনি আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনে। সাম্প্রদায়িক ধর্মের খাঁচা মনুষ্যত্বের
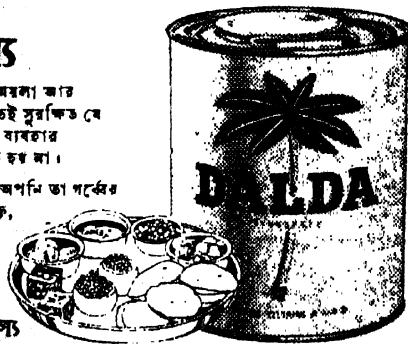
অবমাননা করে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা লাভের পথকে অবারিত রাখাই মানুষের যথার্থ ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের এই ডাক পৌঁছেছিল হেমন্তবালা দেবীর অন্তরে—আদেশ নির্দেশের অনুশাসন নয়, অন্তরকে উদ্বোধন করার বাণী। এই সব কথা জানতে পারি হেমন্তবালা দেবীর উক্তি থেকেই। আরো জানতে পারি, ধর্মের এই মূল বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু জীবনে প্রতিফলিত করতে পারেন নি হেমন্তবালা দেবী। "আপনি ঠিক জানবেন, আপনার প্রতি আমার ভক্তি আছে। কেবল পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে, আশ্রমের মুখ চেয়েই আমি নিজের বিশ্বাস নিয়ে আছি। নইলে আপনি কি বিশ্বাস করেন দাদা, আপনার ডাক শুনবার পরও আমি নিজের গণ্ডিতে পড়ে থাকতাম?......আচারকে যে আঁকড়ে আছি, সে কেবল পূর্ব প্রতিজ্ঞার জন্যে। আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার পূর্ণ পূজা আপনার চরণে দিতে পারছি না। আপনি কি আমার মন দেখতে পারছেন না দাদা?" (২নং চিঠি) অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতকে হেমন্তবালা দেবী গ্রহণ করেছিলেন অন্তরে, জীবনে নয়।

যদি জীবনেও তিনি গ্রহণ করতে পারতেন সেই উদার ধর্মমত ও পথকে, তবে একটা চরম সাহসিকতা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্তে অতুলনীয় হয়ে উঠত তাঁর জীবন। একবার কিন্তু তেমন দৃঢ়তা তিনি দেখিয়েছিলেন জীবনে। "যেদিন শ্রীগুরুদেবের ডাক শুনি, সেদিন কি আমার সংসার সমাজ আমাকে আটকাতে পেরেছিল? সে সময়ে তখনকার অভ্যস্ত সংস্কার ও অভ্যাস কি আমি ছাড়িনি? আজকের এদিনকে তার চেয়ে কম বলে আমি মনে করি না। আপনাকে আমি কারুর চেয়ে কম ভাবতে পারি না।" (২নং চিঠি) কোথায় বাধা অনুভব করেছিলেন তিনি? দুটো বাধার কথা বলেছেন হেমন্তবালা দেবী—'পূর্ব প্রতিজ্ঞা' এবং 'আশ্রমের কথা' ভেবেই তিনি অভ্যস্ত আচার ও সংস্কারকে জীবনে আঁকড়ে ধরে থাকা স্থির করেছিলেন, যত দুঃখকরই হোক সে জীবন। 'পূর্ব প্রতিজ্ঞা' বলতে দীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞার কথাই নিশ্চয় ভেবেছেন। এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মানেই সত্যভ্রষ্ট হওয়া, তা কখনো তাঁর চরিত্রসংগত হত না। কিন্তু একটা কথা বলা যায় এই সম্পর্কে। আমাদের যৌবনের সত্যোপলব্ধি যখন শৈশবের সত্যোপলব্ধিকে ছাড়িয়ে যায়, তখন শৈশবের সত্যকে বর্জন করলে সত্যভ্রষ্ট হওয়া বলা চলে না, বরং ঠিক তার উল্টো। হেমন্তবালা দেবী যখন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তখন তাঁর যে ধর্মোপলব্ধি ছিল, রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার পর তার অভিব্যক্তি এবং পরিবর্তন ঘটেছিল। সুতরাং দীক্ষাকালীন 'প্রতিজ্ঞা' তখন তার আন্তরিক সত্যবোধের আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে অসার ও মূল্যহীন হয়ে পড়েছিল, সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারলে তখন তিনি সত্যভ্রষ্ট হতেন না, বরং যথার্থ সত্যনিষ্ঠতার পরিচয়ই দিতেন। তা যে তিনি পারেন নি, আমাদের মনে হয়, তার মূলে অন্য কারণ ছিল। নারীসুলভ কোমল হৃদয়বৃত্তিই ছিল তাঁর আসল বাধা। আমাদের ধারণা, ঠাকুর কিশোরানন্দ যদি তখন জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর সঙ্গে যুক্তিতর্ক ও আলোচনায় নেমে নিজের রূপান্তরিত ধর্মমতকে দৃঢ় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করে সাম্প্রদায়িক ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিকে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে কিছুমাত্র ইতস্তত করতেন না হেমন্তবালা দেবী, কারণ, সর্বধর্মের মূলগত ধর্মের উদার আহ্বান পৌঁছেছিল তাঁর অন্তরের উপলব্ধিতে। কিন্তু লোকান্তরিত কিশোরানন্দ তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলেন। মৃত সন্তানের স্মৃতির অপমান কোনো মায়ের প্রাণে সয় না। হেমন্তবালা দেবীর স্নেহকোমল হৃদয়ও তেমনি লোকান্তরিত শিক্ষাগুরুর স্মৃতিকে অপমান করার হেতু হতে সায় দিতে পারেনি। কিশোরানন্দ একদিন তাঁকে জীবনে গুরুরূপে আনন্দলোকের স্পর্শ এনে দিয়েছিলেন, সেই স্মৃতি তো ভোলবার নয়। আজ তিনি মরজগতে নেই, তাই তাঁর ধর্মাচরণের পথকে ও তাঁর আশ্রমকে একেবারে বর্জন করা তাঁর স্মৃতিকে অপমান করারই সামিল, তা করতে হেমন্তবালা দেবীর স্বভাবতই প্রাণে বেজেছে। তাই নিতান্ত মান বজায় রাখার মত হলেও তিনি পার্বতন আশ্রমজীবনকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন।

আরো একটা কথা এই সম্পর্কে জেনে রাখা উচিত। আচারবিচার ও সংস্কারের

অসারতাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেও জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া একটা দুরূহ কাজ, বিশেষত স্ত্রীলোকের পক্ষে। বাস্তব জীবনের অভ্যাস ও আচরণে তার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আবাল্য যিনি নিরামিষাশিনী এবং ছোঁয়াছুঁয়ি ও হরেক রকমের নিয়ম পালনের সংস্কার যাঁর মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, বুদ্ধিবিচারে তার অসারতাকে মনে মনে বুঝতে পারলেই যে হঠাৎ একদিন ৩৭।৩৮ বছর বয়সে তাঁর পক্ষে আমিষ আহার গ্রহণ অথবা তার স্পর্শ গন্ধ সহ্য করা কঠিন হবে না, এরূপ প্রত্যাশা নিষ্ফল হতে বাধ্য, কারণ, এই ধরনের সংস্কার ও নিয়মনিষ্ঠার অভ্যস্ত নিগড় বন্ধন থেকে অত সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। হেমন্তবালা দেবী বলেছেন —"এই আচার নিয়মের দরুণ আমার ইচ্ছামত অনেক কাজই হয় না—আমি অলস, আমার এই আচারের জন্য আমার ইচ্ছামত খাওয়াদাওয়া হয় না।" (২নং চিঠি) আচার বিচারে অনেক বিড়ম্বনা আনে জীবনে, তবু তাকে পালন করে চলছেন কেন তিনি? "এই জন্যে আচার আছে যে, হয়তো কোন না কোন দিন আমি আশ্রমে যেতে পারব। আশ্রমে আমার শ্রীগুরুদেবের স্মরণতীর্থে যেতে পারলে সেখানকার পাঁচজনের একজন বলে গণ্য হতে পারলে—শ্রীগুরুদেবের শেষ ইচ্ছা সার্থক হবে। তবে যে ও'দের আজ্ঞা অমান্য করে আপনার কাছে এসেছি, এটা ও'দের মতে অপরাধ এবং আমার মতে আমার প্রাণের টান। আমি এ অপরাধ মেনে নিলাম। আমি যদি আচার ত্যাগ না করি, তবে ও'দের এ ক্রোধ চিরদিন থাকবে না—অন্তত বাইরে থেকেও আমার পুজো নিবেদন করা চলবে। এই জন্য আচার করি।" (২নং চিঠি)

হেমন্তবালা দেবীর জবানীতে আমরা জানতে পারছি যে, তাঁর লোকান্তরিত গুরুদেবের স্মৃতির প্রতি দুর্বলতাই আশ্রম এবং আশ্রমের আচার অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে তাঁকে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দিয়েছে। অন্তরে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে বাইরে থেকে আশ্রমে আনুষ্ঠানিক পুজো নিবেদন করার ঠাট বজায় রেখে চলতেও তিনি রাজি, তার দ্বারাই পরোক্ষভাবে গুরুদেবের স্মৃতির প্রতি অসম্মানকে ঠেকিয়ে রাখবেন, মনের সঙ্গে এই বোঝাপড়া করেই চলছেন তিনি বলে মনে হয়। অন্তত আশ্রম ও আশ্রমের আচারবিচারকে তিনি বর্জন করলেন না, এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হল এবং এর দ্বারাই শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলছেন তিনি বিদেহী গুরুর স্মৃতির প্রতি। আর, অন্তরের উন্মোচন ঘটাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, অন্তরের রাজাধিরাজ হয়েই রইলেন তিনি। হয়তো

খানিকটা আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নেওয়া হল, কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় তিনি নিরুপায়।

হেমন্তবালা দেবী বলেছেন—"আমি স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ক্রমে ক্রমে আমি স্বধর্মেরই একটি নূতন ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছি, যাহা আমারই জীবনের অনুকূল। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা অন্য কেহ গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু আমার নিজের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। এই আত্মনির্ভর অবস্থাটি লাভের জন্য আমি কবিগুরুর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আমি তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাঁহার বাণী হইতেই প্রেরণা পাইয়া উদ্বুদ্ধ হইয়াছি।" (স্মৃতিকথা-৩) এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কোন্ বাণী তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, নিজেই তিনি তা বলেছেন—"তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে নিজের ধর্ম নিজেই আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। সে ভবিষ্যদ্বাণী কিছুটা ফলিয়াছে; আমি এক রকম করিয়া মনের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া শান্তি পাইয়াছি। কিন্তু তিনি এখন তাহা জানিলেন না।" (পৃঃ ৪৬০)

অন্তিমশয্যায় রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ ঘটেছিল হেমন্তবালা দেবীর। তার বর্ণনা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক—

"আবার বাইশে শ্রাবণ সমাগত। একটি অন্তিমশয্যা ঘিরিয়া গুণমুগ্ধ অনেকে সময় গণনা করিতেছেন। মাটিতে বসিয়া রামানন্দবাবু প্রার্থনা করিতেছেন। কোনো কোনো আত্মীয়া বালিকা শিবনেত্রা। কোনো কোনো শ্রদ্ধাবতী অতি কষ্টে আত্মদমন করিতেছেন, মুখমণ্ডল আরক্ত। একখানি চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, পদপ্রান্তে সদ্য ফোটা চাঁপা ফুল। মুখখানি প্রশান্ত, নয়ন নিদ্রানিমিলিত, শ্বাসপ্রশ্বাস অস্বাভাবিক কষ্টদায়ক, কণ্ঠ শ্লেষ্মারুদ্ধ। ললাট এখনো স্বাভাবিক উষ্ণ, কোমল। মুখমণ্ডলে এখনো স্বাভাবিক গোলাপী আভা। শিয়রের দিকের বারান্দায় গৈরিকাম্বরা জনৈকা মহিলার পরিচালনায় মৃদু গুঞ্জন গীত 'কর তাঁর নাম গান'—রামমোহন রায়ের রচনা বোধ হয়।

"আমি মনে মনে বলিতেছিলাম, প্রভু নিত্যানন্দ তাঁহার বংশীয় খড়দহের গোস্বামী-শিষ্যের এই সন্তানটিকে কৃপা করুন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ ইঁহাকে গ্রহণ করুন। এই জীবাত্মা এই ব্রাহ্মণদেহে ম্লেচ্ছসংসর্গে যাহা কিছু নিজ বর্ণাশ্রম-বিরোধী অনাচার করিয়াছেন, তাহার ফল সংক্ষয়পূর্বক ইঁহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর ইঁহাকে কৃপা করিয়া শান্তিধামে লইয়া যান। আমার হাতে অদৃশ্যরূপে গঙ্গাজল, তুলসী, মৃত্তিকা, তিলকমাটি প্রভৃতি মাখানো ছিল, সেই হাতে ললাটে হাত বুলাইয়া দিয়া আমি যুক্তকরে ইহাই সেদিন মনে মনে প্রার্থনা করিলাম। তারপর, শরীরে প্রাণ থাকিতে থাকিতেই পরবর্তী দৃশ্য আর দেখিব না বলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পরে শুনিলাম, সবই শেষ হইয়াছে, শোকযাত্রা শ্মশানে চলিয়াছে। ভৃত্যের হাতে ফুল পাঠাইয়া দিলাম।" (স্মৃতিকথা-৯)

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণদেহে ম্লেচ্ছসংসর্গে বর্ণাশ্রমবিরোধী অনাচার করে কিছুটা পাপের ভাগী হয়েছিলেন, হেমন্তবালা দেবীর এই আশংকা তাঁর সুস্থচিন্তার আন্তরিক মনোভাব ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। আসন্ন শোকে অভিভূত হয়ে হয়তো তাঁর মনে এই ভয় ঢুকেছিল যে, পাপপুণ্যের বিচার আমরা সঠিক জানি না, বলা যায় না—যদি এই মুমূর্ষু মহামানবের জীবনে কোনো কারণে কোনো রকম পাপের স্পর্শ লেগে থাকে, তবে যেন নিত্যানন্দপ্রভু তার ক্ষয় করিয়ে তাঁকে তাঁর অনন্ত শান্তিধামে যাওয়ার পথ সুগম করে দেন। এই কাতর প্রার্থনা না জানিয়ে সেদিন তিনি থাকতে পারেননি, অন্তিম শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি এ ছাড়া যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা যখন ঘনিয়ে আসে মনে, তখন মানুষের চিন্তাধারা স্বাভাবিক থাকে না। সুস্থ মস্তিষ্কে কিন্তু হেমন্তবালা দেবী চিন্তা করেছিলেন অন্য রকম। সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডি এই মহামানবকে কিছুতেই আটকে রাখতে পারে না, মানব-

সবসময়
তরতাজা
থাকুন
THOL
LUXURY
TOILET POWDER
BY
Godrej
সিন্থল টয়লেট পাউডার
অসহ্য গরমের দিনেও
অস্বস্তিকর গায়ের দুর্গন্ধ
থেকে বাঁচিয়ে আপনাকে
ঝরঝরে তাজা রাখে।
এর মনমাতানো গন্ধটিও
কি অপূর্ব ! সারাদিন
আপনাকে ঘিরে থাকে।
গোদরেজ-এর তৈরী সিন্থল
সিন্থল
Interpub/GSP/12/74 BEN

রূপী জগৎ-প্রকাশকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে বলেছিলেন—"আপনি নরদেহে ভগবদবতার্ণ, তাই আপনি বিশ্বের পরমাত্মীয়। আপনাকে কেহ স্বীকার করুন আর না-ই করুন, আপনি নিজ মহিমায় চিরবিরাজিত। আপনি যদি হিন্দু আচারনিষ্ঠ হইতেন, বিশ্ব বঞ্চিত থাকিত। আপনি যদি ব্রাহ্ম-ধর্মনিষ্ঠ হইতেন, নটরাজের বন্দনা গান হইত না—মানবরূপী ভগবান আপনাকে ধরা দিতেন না।" (৩নং চিঠি)

'হয়তো রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা তির্যক মনোভাব ছিল হেমন্তবালা দেবীর। কবিগুরু কেন বৈষ্ণবভাবের আরো চর্চা করলেন না জীবনে, এই একটা আপসোস ছিল তাঁর মনে। রবীন্দ্রনাথ যদি খাঁটি বৈষ্ণব হতেন, তবে হেমন্তবালা দেবীর দুদিকই বজায় থাকত। নিজে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী থেকেও রবীন্দ্রনাথকে পুরো-পুরি পেতে তখন কোনো বাধা থাকত না, তাঁর জীবনের একটা বড় সমস্যার হাত থেকে তিনি রেহাই পেতেন। "এই রবীন্দ্র-নাথ যদি খাঁটি বৈষ্ণব কবি হতেন, তবে তিনি কী না করতে পারতেন। তাঁর আশীর্বাদে আমরা 'আদিত্যবর্ণ' মহান্ত পুরুষ', রুক্মবর্ণ 'কর্তা, ঈশ, পুরুষ ব্রহ্মযোনি', এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মকেই শ্রীগৌররূপে এই বাংলা দেশের শ্যামল প্রান্তরে আবিষ্কার করে ধন্য হতাম। 'আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে', 'ঐ যে তোমার আলোকধেনু', 'ঐ আসন-তলের মাটির পরে', 'ওগো কিশোর আজি', 'এসো শ্যামল সুন্দর' এবং ভানুসিংহের পদাবলীর যিনি রচয়িতা গায়ক, তাঁর হতে উৎসারিত সাধিকতর অমৃত সংগীত আমরা শুনতে পেতাম সেই এক, অদ্বিতীয় শাশ্বত পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত গীতাঞ্জলির মাধ্যমে। তিনি যদি তেমন গুরু পেতেন এবং সেই ভাবের ভাবুক হতেন, আমরা কৃতই না লাভবান হতাম।" (বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীর দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসংগীত, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ॥ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা)

এই সব কথার জবাব রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেছেন তাঁকে। "তুমি যে পাকা ইঁটের প্রাচীর-ঘেরা রসলোকে বাস করচ আমার পথের এক অংশে একদা আমি তার মধ্যেও প্রবেশ করেছিলুম—চৈতন্য-ভাগবতে আমিও একদিন ডুব মেরেচি - কিন্তু আমার যে পথ আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়েছিল সেই পথই আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়েও এল—যদি ওখানে আমাকে কোনো কারণে থাকতে হত বাসিন্দা হয়ে থাকতে পারতুম না বন্দী হয়ে থাকতুম।" (১১নং চিঠি এবং "আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায়নি। কিন্তু তার সংগেই আছে শৈব, —ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে নটরাজের নৃত্যও হয়—যমুনার নৌকা ভাসান দিয়ে শেষকালে পাড়ি দিয়ে সেই গঙ্গায় যে গঙ্গা গৈরিক পরে চলেছেন সমুদ্রে।" (১৪নং)

যাই হোক, অন্তিম সময়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে যাওয়ার ফলে তাঁর আশ্রমের সংগে হেমন্তবালা দেবীর বেশ মনোমালিন্য ঘটেছিল। ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে শেষ দেখা দেখে আসার পর শোকযাত্রায় আর তিনি যোগ দেননি। "নিজে অর্ত ভিড়ে না গিয়া বাড়িতে শ্রীগুরুস্থানে আসিলাম। সেখানে গুরুভগিনীর তিরস্কার। পূর্বদিন নিজ ইষ্টদেবতার বার্ষিক নিত্যাবির্ভাব-বাসরে উপস্থিত হইতে পারি নাই কেন? উত্তরে বলিলাম, একজন মুমূর্ষু বন্ধুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার কাছে সে জন্য যথেষ্ট তিরস্কৃতা হইলাম। নিষ্ঠাভংগ, কর্তব্যের অ-পালন, মায়ামোহ এবং অন্যান্য দোষের জন্যই তিরস্কৃতা হইলাম। একজন শ্লেষব্যংগও করিলেন। মায়ামোহিত জীবের এই সব সুখদুঃখ মাথাব্যথা বুঝিতে ইঁহারা অক্ষম। ইঁহারা সূর্যপক্ব বালুকা। সূর্য উদার, ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। মা গংগারও দয়া আছে। ভগ্নীর মারফত পারীতে পাঁচ টাকা পাঠাইয়াছিলাম। ভগ্নির পত্রে ও মৌখিক আলাপে জানিলাম, পাঁচ টাকার মহাপ্রসাদ আনাইয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া আমার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীগুরু মাতৃদেবী আমাকে জানাইতে আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার (কবির) আত্মার সদ্গতি হইয়াছে। সেজন্য আমি যেন চিন্তা না করি। সকলকে বলিয়াছেন, ও সবাই শোকার্ত। উঁহাকে কেহ কিছু যেন না বলেন। উঁহার মাথা খারাপ।

"হে আত্মন, আমি ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব নামধারিণী অথচ স্বধর্ম পালনে অক্ষমা অপরাধিনী একজন বিশ্বের উপেক্ষিতা অতি সামান্যা নারী। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা জানি, তাহাই করিয়াছি। সেজন্য তোমার অনুগতদের পবিত্রপ্রাণ অহংকার কি বাধা করিতেছে? তাহা হউক, কিন্তু আমি জানি, তুমি সর্বজনীন, সর্বতোমুখ, সর্বান্তিকবাদী ছিলে। অন্যে যাহাই করে করুক। তোমার যে-তুমি বিশ্ব-জনীন, তাহার পক্ষে আমার অস্তিত্ব তো বুদ্বুদে মশকেরই ন্যায়।...কিন্তু যে তুমি বিশ্বচরাচরকে ভালবাসিতে শিখিয়াছ, উদ্ভিদকে, প্রাণীকে, পক্ষীকে ভালবাসিয়াছ এবং বিশ্বপতির শ্রীচরণোদ্দেশে ভাব-ভাবনার গীতাঞ্জলি উপহার অর্পণ করিয়াছ, যে-তুমি আপন হৃদয়ের ক্রন্দনকে রাগরাগিণীর রূপ দিয়া সেই গানে গানে সকলকে কাঁদাইয়াছ, তোমার প্রিয়বিয়োগের শোক-সংগীতকে আপন মহাপ্রয়াণের দিনের শোকসংগীতকে পরিণত করিয়া রাখিয়া গিয়াছ, তোমার আপন গানকে আমাদের গান করিয়া আমাদের প্রিয়জনকে উৎসর্গ করিবার সুযোগ দান করিয়াছ, সেই গন্ধর্ব তোমাকে তোমার মহাপ্রয়াণদিনে আমি পূর্বোক্তভাবে স্মরণ না করিয়া পারি নাই। এই জন্যই আমি তোমার জন্য আমার দেবতাকে

অন্তরের ভক্তির আমার শ্রদ্ধা কামনা নিবেদন করিয়াছি।" (স্মৃতিকথা-৯)

এইভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমন্তবালা দেবীর দশ বছরের বাহ্য জীবনের আদানপ্রদান পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু সময়ের মাপকাঠিতে কখনো আন্তরিক যোগের পরিমাপ করা যায় না।

হেমন্তবালা দেবীর জীবনী পর্যালোচনা করলে স্বতঃই মনে হয় যে, সে যেন নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বের মালায় গাঁথা এক অভিনব কাহিনী। বাস্তব জীবনের বাহ্য ঘটনার ঘাত-অভিঘাতেই সাধারণত জেগেছে মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তার হাত থেকে তিনি যেন রেহাই পেলেন না কোনো দিন।

অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো তাঁর কিছুটা মনোভঙ্গ ও মানসিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল, যখন তিনি দেখলেন যে, রুচি ও প্রকৃতিতে স্বামী-স্ত্রী যেন পরস্পরবিরোধী জগতের বাসিন্দা। তারপর তাঁদের বিবাহিত জীবনে যে প্রবল সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, সে সব আগেই আমরা জেনেছি। এই বিড়ম্বনার মধ্যে শান্তিলাভের আশায় তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিলেন, কিন্তু সেই ধর্মজীবনে তন্ময় হয়ে পড়তে না পড়তেই নূতনভাবে দ্বন্দ্ব দেখা দিল যখন তাঁকে অনিচ্ছায় ফিরে আসতে হল আবার স্বামীর সংসারে। তারপর সংসারের বন্ধন ও আশ্রমের প্রতি আকর্ষণের টানাপোড়েনে যখন তাঁর মন জর্জরিত, তখন তিনি খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তিনি শান্তি পেয়েছিলেন, মনুষ্য জীবনের স্বরূপ ও সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং আত্মনির্ভরতার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল আবার নতুনভাবে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সংযোগকে তাঁর পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজন অনেকেই ভালো চোখে নিতে পারেন নি, তাঁর পুরীর আশ্রম কর্তৃপক্ষ তো রীতিমত বিরূপই হয়ে পড়লেন। অথচ মুশকিল হল, কোনো পক্ষকেই তিনি নির্মমভাবে একেবারে বর্জন করতে পারেন না—বিশেষভাবে নারীর স্বাভাবিক স্নেহ দুর্বল মনোবৃত্তির দরুণ। মানুষ সহজ প্রবৃত্তিতে সর্বদাই অন্তর্দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে যেতে চায়—হয় কঠোর পন্থায় ছেদন করে, অথবা একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করে। হেমন্তবালা দেবী সামঞ্জস্যের পথ বেছে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা হয়েছে কতকটা গোঁজামিলের মত। তাই দোটানায় দ্বিধা বিভক্ত মনের যা অবশ্যম্ভাবী ফল, সে মনের অশান্তি নিত্যসঙ্গী হয়ে রয়েছে তাঁর জীবনে। হেমন্তবালা দেবী নিজে অনুভব থেকে একটি খাঁটি কথা বলেছেন 'আমার নিজের দুঃখ এ জীবনে ঘুচবার নয়।'

এই ধর্মানুরাগিণী মহিলার সংসারে যথার্থ আসক্তি ছিল না, সংসারকে তিনি ছেড়েও চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সংসার তাঁকে ছাড়েনি। সাংসারিক জীবনে তাঁকে দীর্ঘকাল কাটাতে হয়েছে। এই সময়ে তিনি স্বামীর সঙ্গে যেমন থেকেছেন, স্বামীর সঙ্গে থেকে আলাদাও দিন কাটিয়েছেন। স্বামী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করেছেন, কখনো বা তাঁদের সকলকে ছেড়ে আলাদা বাসায় থেকেছেন। স্বামীবিয়োগের পর কিছুকাল কন্যা বাসন্তীরা এসে বাস করেছেন তাঁর সঙ্গে, আবার কিছুকাল তিনি নির্জে আলাদা সংসার পেতে সম্পূর্ণ একলাই থেকেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কলকাতার বাস উঠিয়ে তিনি চলে গেছেন তাঁর পুরীর আশ্রমে। সেও হল আজ দীর্ঘকাল। আশ্রম কর্তৃপক্ষ এবং গুরু ভ্রাতা-ভগ্নীদের সঙ্গে যে বেশ মিলেমিশে বনিবনা করে আছেন তাও নয়। সেখানে আশ্রমেরই একটি [illegible] নিজস্ব পরিচারকের উপরে নির্ভর করে চলছে তাঁর স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা। আশ্রমবাসীরা যে তাঁর উপরে খুব সন্তুষ্ট তা নয়, কারণ, তিনি রবীন্দ্রানুরাগী, অনেক বিষয়ে মনের চিন্তায় ও মতপ্রকাশে তিনি আশ্রমবিরোধী, আশ্রম গুরুর প্রতি তাঁর সেই অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তি শ্রদ্ধা আর অবিচলিত নেই। তবু আশ্রমবাসীদের পক্ষে তাঁকে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, কারণ, বাহ্যিক আচার আচরণে তিনি আশ্রমের নিয়মানুষ্ঠান যথাযথ পালন করেই চলেন, সেখানে কোনো দোষত্রুটি ধরার সুযোগ তিনি কাউকে দেন না। হেমন্তবালা দেবী মনের শ্রদ্ধাঞ্জলি স্থানান্তরে নিবেদন করলেও আপন ব্যক্তিত্বের জোরে আশ্রমে নিজের একটি আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন।

হেমন্তবালা দেবীর বয়স হল একাশি বছর। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, স্বাস্থ্য ভগ্ন, শরীর জীর্ণ,

চিঠি লিখতে গেলে হাত কাঁপে। এই বয়সে, শারীরিক এই অক্ষম অবস্থায় লোকে স্বভাবতই আত্মীয়পরিজনের সঙ্গ ও সেবা-যত্ন কামনা করে এবং তার উপরে নির্ভর করে অপটু দেহভার নিয়ে ক্লেশকর জীবন যাত্রাকে যতটা সম্ভব সুসহ করে নিতে উন্মুখ থাকে। তাঁর পুত্রকন্যা জামাতা দৌহিত্র দৌহিত্রীরা সকলেই তাঁকে নিজেদের কাছে রাখতে উদ্গ্রীব, কিন্তু তিনি বহুদিন আগে থেকেই নিজেকে তাদের সকলের সংস্রব থেকে সরিয়ে নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনে অভ্যস্ত হয়েছেন এবং বার্ধক্যের অসহায়তা সত্ত্বেও একলা চলার সংকল্পে অটল রয়েছেন। কন্যা-জামাতারা মাঝে মাঝে পুরীতে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন ও তাঁর সঙ্গে দিনকয়েক কাটিয়ে আসেন। এর থেকে কি বুঝতে হবে যে, হেমন্তবালা দেবীর মনে মায়া-মমতা স্নেহ-ভালোবাসার বালাই নেই? তাঁর স্পর্শকাতর চিত্তে বরং সব রকম সুকুমার ও সুকোমল বৃত্তির স্পন্দন অতি সহজেই আলোড়ন তোলে বলে আমরা দেখেছি। আসল কথা, স্নেহভালোবাসা তাঁর মনে অপরিমিত মাত্রাতেই আছে, কিন্তু তার আসক্তি থেকে ক্রমেই তিনি নিজের মনকে মুক্ত করে নিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন—"বাসন্তী ও তার পুত্রকন্যার প্রতি যে আসক্তি, তাহাতে ক্রমে ক্রমে কড়া পড়িয়া বা পক্ষাঘাতের মত হইয়া আসিতেছে, হঠাৎ ঘা লাগিলেই ঝিনঝিন করিয়া ওঠে।" (স্মৃতি কথা-১০)। স্নেহের গভীরতা ও প্রবলতা আছে, কিন্তু তা আর তাঁকে বেঁধে রাখে না। তাই স্নেহভাজনদের কাছ থেকে তিনি সরে গেছেন দূরে, এক নিঃসঙ্গ স্বতন্ত্র জীবনচর্যার মধ্যে।

হেমন্তবালা দেবী শেষ জীবনের দীর্ঘ-কাল কাটাচ্ছেন পুরীর আশ্রমে, কিন্তু সেখানে তিনি আছেন নির্লিপ্তভাবে এবং বোঝাপড়া করে চলেছেন নিজের সঙ্গে। কিসের এই বোঝাপড়া? কেন সারা জীবন কাটল তাঁর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংশয় এবং পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের আঘাত-সংঘাতে? এই সব প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মন তাঁর কখনো অসাড় হয়ে যায়নি বলেই পদে পদে দেখা দিয়েছে সংশয়, নতুবা বিনা দ্বিধায় স্বচ্ছন্দে তিনি বাস্তব জীবনের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে ছেঁটেকেটে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারতেন। অন্তরের সায় না পেলে কোনো কিছুকে জীবনে গ্রহণ করতে সর্বদাই বাধা দিয়েছে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতা। তার উপরে তাঁর আছে এক প্রবল স্বাতন্ত্র্যবোধ। নিজেই বলেছেন, তাঁর 'জেদী' প্রকৃতি। আরো বলেছেন—"আমি হেমন্তবালা দেবী তো জমিদারেরই মেয়ে, বিশ্বেশ্বরী দেব্যারই নাতিনী, আমার গর্ব ও দম্ভ যাবে কোথায়?" (পুরনো দিনের কথা)। তিনি যাকে 'গর্ব, দম্ভ ও জেদ' বলতে চেয়েছেন, আসলে সেগুলো হল তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধেরই লক্ষণ। মন তাঁর কোমল, কিন্তু এই কোমল মনের অন্তরালে আছে তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধের এক অনমনীয় দৃঢ়তা। তাই জীবনের ঘাটে ঘাটে তাঁর ঠোকাঠুকি লেগেছে অন্তরঙ্গদের সঙ্গে—স্বামী, পুত্র, কন্যা, মাতা, ভগিনী এবং আশ্রমের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের সঙ্গে। অন্তর দেবতাকে কখনো তিনি ফাঁকি দিতে চাননি, তাই মনের গভীরে কঠিন বোঝা-পড়ার ভিতর দিয়েই চলতে হয়েছে তাঁকে সারা জীবন। নিরন্তর এই মানসিক সংগ্রামের অন্তর্দাহে যতই তিনি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর অন্তরের ঊর্ধ্বমুখী প্রদীপশিখাটি ততই যেন অনির্বাণ তেজে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তাঁর এই জীবনাভিজ্ঞতাটিই উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে

আমাদের সামনে। রবীন্দ্রনাথ এবং গুরু সত্যুকে নিয়ে তাঁর জীবনে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল তার সমাধান বা সামঞ্জস্য তিনি কতটা করতে পেরেছেন, তাঁর মুখ থেকেই তা শোনা যাক।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে হেমন্তবালা দেবী বলেছেন—"আমি নিজে একটি সর্ব-বন্ধনমুক্ত বনের পাখি। তোমার বৃক্ষ লতা শাখায় ক্ষণিক আশ্রয় লইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার মায়ায় জড়িত হইয়া এখন কেবলই গ্রহের ন্যায় ব্যর্থ পরিক্রমা করিতেছি। আমি না পারি তোমার শাখায় নীড় বাঁধিতে, না পারি তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে। অথচ, তোমার স্মরণে আমি কী-ই বা করিলাম?" (স্মৃতিকথা-৯)

আশ্রমে কিভাবে কাটছে তাঁর জীবন?

"একদিন একজন প্রশ্ন করিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার পরও কিরূপে—?... তাই তোমার অশান্তি ঘুচিবার নয়। তুমি যথাযথ স্থানে যথাযথ ব্যবহার করিলেই শান্তি পাও, কিন্তু তাহা চাও না। আমি বলি, তাহা হইলে যে আমি ভণ্ড হইব। তিনি বলিলেন, বরং ভণ্ডামিও ভালো, কিন্তু প্রতিকূল কথা লইয়া আলোচনা

করিতে আসিলে কি অপমান করা হয় না?" (স্মৃতিকথা-১০) গুরুভাইকে কৈফিয়ত দেওয়ার কথা না হয় ছাড়া গেল, "কিন্তু নিজের গভীর মর্মপ্রদেশে হিসাব নিকাশ চলিতেছে, সেখানে কি কৈফিয়ৎ দিব? কবির গুণে মুগ্ধতা ও ভক্তিরাজ্যের কর্তব্য —যে কর্তব্য একদা প্রেমেরই একটি ঠিকানা ছিল—এ দুয়ের আপস মীমাংসা হয় কীরূপে? ইষ্টদেবতা চান ষোলো আনা, তিনি ফাঁকি বুঝিতে পারেন—আর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ কি সত্যই বাতাস-লাগা প্রদীপের মতই নিবিয়া গিয়াছেন? ...আজ যদি মনে মনে তাঁর পায়ে মাথা লুটাইয়া ক্ষমা চাই, সে প্রণাম পৌঁছিবে কোথায়? তিনি কি আছেন? তিনি কি শুনিতেছেন? তিনি তো নিবিয়া গিয়াছেন।" (স্মৃতিকথা ১০)

মনে মনে একটা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাও যে তিনি না করেছেন এমন নয়। 'শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেবতার আসনে বসাইয়া জগতের বহু উর্ধ্বে রাখিয়াছি। তাঁহাকে স্বপ্নের সুষমা মাখাইয়াই রাখিয়াছি। তিনি তো তাহাই চাহিয়াছিলেন, তিনি তো আটপৌরে হইতে চান নাই। তবে তিনি যে উচ্চ আদর্শের দিকে টানিয়াছিলেন, ডাকিয়াছিলেন—যে অপার্থিব পবিত্র দেবজীবনে নবজন্ম লাভ করিয়া এই পার্থিব জন্মের কথা ভুলিয়া একান্ত মনে ভজনসাধনে মন দিতে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি আর পারিলাম না। এ জন্মে আমার কিছু হইল না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আটপৌরে জীবনে মানুষ, তিনি আমাদেরই একজন, তাঁহাকে উর্ধ্বে রাখি নাই, পাশে বসাইয়া রাখিয়াছি। এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি নহেন।" (স্মৃতিকথা-১০)

কিন্তু অত সহজে কি এই ধরনের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? এর পরেই একটা চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন "আপনি আমাকে আমার নিজের পথ নিজেকেই সৃষ্টি করিতে বলিয়াছিলেন, তিনিও তাই বলিয়াছিলেন। আপনি আমার অনেক কথা জানেন, সুতরাং উপসংহারটা জানা ভাল। বর্তমানে আমার জীবন একটা নীতি বা শক্তিকে আশ্রয় করিতেই চাহিতেছে। আমার গুরুদেবের ভজনসাধন কিছুই আমার দ্বারা হইল না। তারপর আর যাহা কিছু, সেখানেও আমার দ্বারা ভালো কোনো কিছুই হয় নাই। এই ব্যর্থতার মূল নিজেরই জীবনের সব রকম ত্রুটিতে নিহিত। এখন ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, সমস্ত কিছুকেই মন হইতে সরাইয়া মনকে খোলা রাখিয়া শ্রীভগবানের দয়ার প্রত্যাশায় থাকিব। সৃষ্টিকর্তার কি নিজের অকীর্তির জন্য একটুও পরিতাপ বোধ হইবে না কোনদিন? এ কী ব্যর্থ সৃষ্টি তাঁহার?" আবার অন্য একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন—"আমি এখানে একটি মনের মত সাথী পাই না, যে আমার সুখ-দুঃখ বোঝে, আমাকে স্বপ্ন দেখায় ও নিজে স্বপ্ন দেখে। সাথীর অভাব জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ অনুভব করে থাকে।" আমি তাঁকে স্মৃতিকথা লেখার জন্য প্রায়ই তাগাদা দিতাম, এই সূত্রে তিনি আমাকে একবার পুরীতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কারণ, "যে সব কথা লিখব, তা লিখতে সংকোচ বোধ হচ্ছে। সেইজন্যে কথোপকথন দ্বারা বিষয়টা পরিষ্কার করা দরকার।" আমিও যাওয়ার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় তিনি লিখলেন—"আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন, সাক্ষাৎ করলেই যেন ভালো হয়।" তারপর ক্রমে হাতের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়ে, চিঠি লিখতে কষ্ট হত, চিঠিপত্রের যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এক সময় প্রায় বন্ধই হ[য়ে]

গেল। পুরীতে আমার যাওয়া হয়নি। শেষের দিকে তাঁর যে-সব চিঠিপত্র আসত, তাতে 'ঝরনাধারার মত অনর্গল কথা কয়ে যাওয়া' থাকত না, থাকত শুধু কুশল সংবাদ দেওয়া-নেওয়া—সে নিতান্তই বাইরের খবর, তাঁর চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণার স্পর্শ আর পাওয়া যেত না। সে রকম চিঠি লেখা তাঁর পক্ষে শারীরিক অপটুতার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তাঁর কাছ থেকে শেষ যে চিঠি পেয়েছি, তা ২৬-২-৭৫ ইং তারিখে লেখা। অত্যন্ত বাঁকাচোরা হরফে লেখা, এক লাইনের সঙ্গে অন্য লাইন জড়িয়ে গেছে—বয়সের জীর্ণতা হাতের অচলতার ছাপ রেখেছে সর্বত্র। তার উপরে পোস্ট কার্ডের সব দিক দিয়েই লেখা শুরু করেছেন—উপর দিক থেকে নীচের থেকে, আবার পাশাপাশি দু দিক থেকেও। অনেক জায়গায় কোন্ লাইনের সঙ্গে কোন্ লাইনের যোগসূত্র, ধরা শক্ত। সব মিলিয়ে চিঠিখানার পাঠোদ্ধার করতে রীতিমত ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়।

যাই হোক, মোটামুটিভাবে চিঠিখানা যা পড়া গেল, তা নিম্নলিখিতরূপ—

"নমস্কার। বহুদিন খবর নিইনি। অবস্থা বেশি খারাপ। ভালো করে লেখা অসম্ভব। হাত চোখ সূর্যালোক ও কলমটা বৈরী। সকালবেলা ১১টায় ঘুমিয়েছি। রাত্রে ঘুম নেই। ৮০ বছর ৪ মাস বয়স মাত্র। নিশীথে নাকি পোস্টমাস্টারবাবু ও জনৈকা ভক্তিমতী তীর্থবাসিনী ও গোপালসেবিকা সুরে বেসুরে বেতালে রবিগীত শুনতে পান। অতীত ব্যক্তিদের কথা মনে আসে। পরামর্শ করে গল্পগুলো মেরামত করে আপনি ও বাসন্তী যদি পত্রিকায় দেন, তবে কৃতজ্ঞ থাকি। আমার 'মনের কথা' খাতাগুলো থেকে রচনা বেছে নিন।"

এ ছাড়া লিখেছেন আমার 'চেলাচামুণ্ডা' অর্থাৎ নাতিনাতনীদের কথা। তারা "আঁকিবুকি কাটে। হিজিবিজি লেখে। তারা বাংলা ভাষা জানে। খেলার ছলে একটু খাটিয়ে নিন। ইশারা দিলাম।" এই মজার খেলার ইশারা দিয়েছেন বাচ্চাদের দিয়ে তাদের খেয়ালখুশিমত আঁকিবুকি ছবি আঁকাবার ও হিজিবিজি রচনা লেখাবার—কিন্তু বর্তমান যন্ত্রযুগের কোনো উপকরণ তারা ব্যবহার করতে পারবে না। তাদের ফিরে যেতে হবে বৃদ্ধ প্রপিতামহের যুগে। "বিজলী বাদ। কলের জল বাদ। কাগজ কালি রং ছাপাখানা। ও সব বাদ।" তাদের ধরতে হবে রেড়ির তেল। কঞ্চি বা শরের কলম, তুলির জন্য ছাগলের গলার লোম। হীরাকষ বা ভুষা কালি ব্যবহার করতে হবে। তাদের রং বানাতে হবে গাঁদা, শিউলি-বোঁটা, সীমপাতার রস, গিরিমাটি, লালমাটি, আলতা, খয়ের ইত্যাদি থেকে। আর, 'পটভূমি' বানাবে শক্ত মোটা সাদা কাপড়ে যব, সাগু, তেঁতুলবীচির শাঁসগুঁড়ো, তুঁতে, চুন, খয়ের, গাছের আঠা ইত্যাদি দিয়ে। এই সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে তারা পৌরাণিক যুগের ছাঁদে শিল্পী ও লেখকের কাজে নামুক। এই হল তাদের জন্য এক নতুন ধরনের খেলার ইঙ্গিত।

চিঠিখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অর্থবহ। বয়সের জীর্ণতা ক্রমেই তাঁর শরীরকে দুর্বল, অসহায় ও পঙ্গু করে ফেলছে, তার এক করুণ চিত্র যেমন পাই, সঙ্গে সঙ্গে এও জানতে পারি যে, তাঁর চিন্তাবুদ্ধি ও কল্পনাশক্তি এখনো প্রখর ও সতেজ রয়েছে। মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েনি বলেই আগ্রহ করে ছোটদের জন্য আনন্দের খোরাক জোটাবার কথা তিনি ভাবতে পেরেছেন এবং তাদের জন্য এক নতুন ধরনের মজার খেলা বাতলে দিয়েছেন। আমরা আরো অনুভব করতে পারি যে, তাঁর অন্তরতম সত্তা যে তপোবহ্নিতে জ্বলে উঠেছিল, তার অনির্বাণ তেজ এখনো অম্লান রয়েছে। রবীন্দ্র-গীতির স্বপ্নলোকে এখনো তাঁর চিত্তের বিচরণ ও বিনোদন অব্যাহত। লোকান্তরিত অন্তরঙ্গ আত্মাদের আহ্বান আবেগে তাই সাড়া জাগায় তাঁর মনে। তাঁর আনন্দ-বেদনার স্মৃতি-বিজড়িত 'মনের খাতা'র লিপিবদ্ধ উপলব্ধির মধ্যে আজও তিনি মনের সান্ত্বনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আত্মার মধ্যে পরমাত্মার নিগূঢ় আমন্ত্রণ পেয়ে একদা ত্যাগ ও দ্বন্দ্বের সংঘাতে দুশ্চর তপস্যার অভিমুখে তাঁর মর্মজীবনের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তাঁর ভাগ্যবিধাতা আজও তাঁর সেই পরিক্রমাকে পরিচালনা করে চলেছেন। পরিপূর্ণ সার্থকতার আনন্দে কবে তাঁর জীবনের অভিপ্রায় সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে, সে কি ইহ জীবনের আয়ুষ্কাল মধ্যে অথবা অন্যতর জীবনের অভিব্যক্তিতে, কে তার রহস্য ভেদ করবে? আমরা শুধু অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পারি, প্রণাম জানাতে পারি এই মহীয়সী মহিলাকে, দীর্ঘ জীবনের কঠোর দুঃখবেদনা, ঝড়-ঝঞ্ঝা যাঁকে তাঁর অন্তরের সংকল্প, ধ্যান ও

আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও বিচ্যুত করতে পারেনি। সেই সব মর্মন্তুদ কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন-বাণীর পরিচিতি। তাঁর মর্মগত সত্য রূপকে অনুভব করতে পারলেও দুর্বল লেখনীমুখে কতোখানি যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছি জানি না, সেই বিচারের ভার অন্যদের উপরে। কিন্তু নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয় সন্দেহের দ্বিধাকে কাটিয়ে উঠে এই পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছি ভেবে আজ ধন্য বোধ করছি।

॥ উপসংহার ॥

বলা বাহুল্য, প্রধানত শ্রীযুক্তা হেমন্তবালা দেবীর কাছ থেকে পাওয়া উপকরণ এবং চিঠিপত্র নবম খণ্ড গ্রন্থকে অবলম্বন করেই এই রচনা গড়ে উঠেছে। তিনি সব সময়েই বলেছেন, লেখাগুলোকে 'সংশোধন' করে নেবেন, মেরামত করে নেবেন। কিন্তু এই প্রবন্ধের পাঠকরা হেমন্তবালা দেবীর রচনার যতটুকু পরিচয় পেয়েছেন, তার থেকে নিশ্চয়ই ধারণা করতে পেরেছেন যে, তাঁর সাবলীল পারিশীলিত রচনা সংশোধনের কোনো অপেক্ষা রাখে না। সে রকমের কিছু করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হত বলেই মনে করি। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছিল, লেখাগুলোকে তিনি অসংলগ্ন বা ধারাবাহিকভাবে লেখেননি, এলোমেলোভাবে যদৃচ্ছাক্রমে তা লেখা, পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে অনেক জায়গায়। তাই লেখাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে যথাযথভাবে সংকলন না করে প্রকাশ করা চলে না। অথচ, এই দুরূহ কাজে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে বরাবরই সংশয় বোধ করেছি। হেমন্তবালা দেবী কিন্তু আমার উপরেই সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—"আপনিই ত লেখাটা লেখাচ্ছেন আমাকে দিয়ে।......এ সম্বন্ধে আমি আপনার উপরেই নির্ভর করি। যা ভালো হয় করুন।" এই দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার জন্য বিবেকের অনুশাসন অবচেতন মনকে বহুকাল পীড়া দিয়েছে। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে কাজে হাত দিয়েছি। জীবনে অনেক কর্তব্যই পালন করা হয়নি, শেষ বয়সে আর একটা অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বিদায় নেওয়া গর্হিত হবে, এই বোধ থেকেই বর্তমান কাজে প্রেরণা পেয়েছি।

লেখাটাতে হেমন্তবালা দেবীর নিজস্ব উক্তিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি। তথ্যগুলোও প্রধানত তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। আরো তথ্যের উল্লেখ করেছিলেন হেমন্তবালা দেবী তাঁর একটি চিঠিতে—"শ্রীমতী রানী চন্দ রবীন্দ্রস্মৃতিকথা ফেরত দিলেন না......১৩৫৬ থেকে ১৩৭৭ সাল পর্যন্ত যা যা লিখেছি, একগাদা ক্ষেমেন্দ্রবাবুর (ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন) কাছে, কতক বাসন্তী ও বিমলাকান্তর কাছে; কতক শ্রীকানাই সামন্ত নিয়েছেন, কতক বিলুপ্ত। কিছুটা আমার কাছে।" এই তথ্যগুলিতে নতুন বিষয়বস্তু কি আছে জানি না, কিন্তু সেগুলিকে দেখা বা বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহার করার সুযোগ ঘটেনি। কিছু কিছু তথ্য তাঁর কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী বাগচী এবং পুত্র কবিশেখর কাছ থেকে পেয়েছি। কচিবাবু 'চিঠিপত্র নবম খণ্ড' ও 'পুরনো দিনের কথা'র ফাইল কপি আমার ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে দিয়ে বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন। অধ্যাপক আলাউদ্দিন সাহেবের চিঠিগুলিও তাঁর সংগ্রহ থেকেই দেখেছি। শুধু পারিবারিক তথ্যাদি নয়, আরো কত বিভিন্ন রকমের নির্ভরযোগ্য তথ্যসংকলন যে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে করে চলেছেন, তার দৃষ্টান্ত আমাদের ঢিলেঢালা চরিত্রের দেশে বিরল। কচিবাবু এই লেখার পাণ্ডুলিপিও আদ্যোপান্ত দেখে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের উভয়ের কাছে ঋণ স্বীকার করি। কিছু তথ্যাদি বাড়ির লোকেও যুগিয়ে সাহায্য করেছেন। বন্ধুবর শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী লেখার গোড়াপত্তন থেকেই প্রবন্ধটিকে অনুসরণ করে গেছেন এবং এর উৎকর্ষ সাধনে তাঁর মূল্যবান মতামত আমাকে সাহায্য করেছে। তাঁর এই সহৃদয়তা ভোলবার নয়। বাইরের এবং অন্তরের ঘটনার তাৎপর্যকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলতে স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মন্তব্যের অবতারণা করতে হয়েছে, তার দায়িত্ব সম্পূর্ণত লেখকের, তা বলাই বাহুল্য।

প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত চিঠির নম্বর ও পৃষ্ঠাঙ্ক 'চিঠিপত্র নবম খণ্ড' গ্রন্থের অন্তর্গত বলে ধরে নিতে হবে। কোথাও শুধু নম্বরের উল্লেখ থাকলে উহা ঐ গ্রন্থেরই অন্তর্গত চিঠির নম্বর বলেই বুঝতে হবে।

সমাপ্ত

যেমন
আপনি,
তেমনি উজ্জ্বল,
বলিষ্ঠ
আর সুন্দর...
এখনকার
বিনী সিল্ক
বিনীর
বৈচিত্র্যময়
বিশুদ্ধ রেশমের কাপড়
বিনী
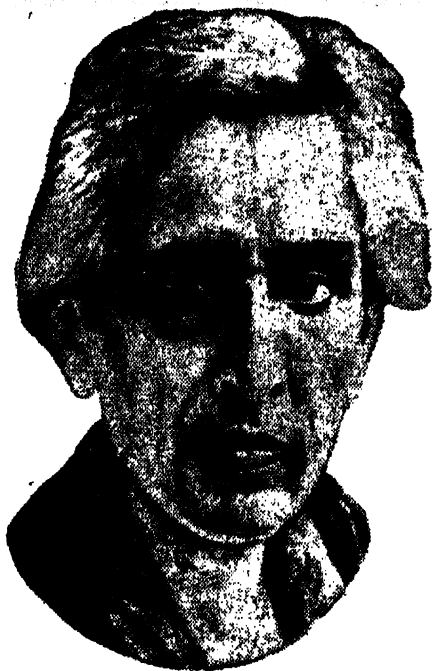
শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

[শরৎচন্দ্রের শততম জন্মোৎসবের প্রারম্ভে আমরা 'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশের আয়োজন করেছি। রচনাটি শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর। রাধারাণী দেবী দীর্ঘকাল শরৎচন্দ্রের স্নেহ-সান্নিধ্য লাভ করেছেন। মানুষটিকে অন্তরঙ্গভাবে দেখা ছাড়াও তিনি শরৎ-জীবনের ও সাহিত্যের বহু ঘনিষ্ঠ বিষয়ের ভান্ডারী ছিলেন। লেখিকা শরৎ-সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিনী। এই পারদর্শিতা ছাড়াও শরৎ-সান্নিধ্যের ফলে যে সকল সাহিত্যগত তত্ত্ব ও তথ্য জেনেছিলেন তা এ-যাবৎ অন্যের জানার সৌভাগ্য হয় নি। এই স্মৃতিমূলক রচনায় এমন বহু ঘটনা ও কথা রয়েছে যা শরৎ-সাহিত্য বিচারে বিশেষ প্রয়োজনীয়। রচনাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি বক্তৃতামালার পরিবর্ধিত রূপে। বর্তমান সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে এই রচনাটি প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে আমরা আনন্দিত। সম্পাদক]

বন্ধনহীন গ্রন্থি

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা তাঁর রচনার প্রথম মুদ্রণের তাৎক্ষণিক লগ্নেই শুরু হয়ে গেছে। আলোচনা নয়, বিস্ফোরণ। বিস্ময়-বিহ্বল আনন্দ-চকিত আলোড়ন।

১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশের কথা আমি বলছি। আটষট্টি বছর আগের কথা। বাঙালী পাঠক-সমাজে ঠিক এই ধরনের অভ্যর্থনা এর আগে আর কোনও লেখক পেয়েছেন বলে জানি না, তার পর থেকেই তাঁর সাহিত্য নিয়ে নানা উত্তেজনা বয়ে গেছে সম্পাদক-পাঠক প্রকাশক মহলে। বিরুদ্ধ সমালোচনাও বড় কম হয়নি পরবর্তী সময়ে। 'পল্লীসমাজ', 'পথনির্দেশ', 'পরিণীতা', 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা' ইত্যাদি আরও অনেক বই নিয়ে দুর্নীতির কুরুচির অভিযোগ উঠেছে। সাহিত্যে অস্বাস্থ্য আনার সাহিত্যিক-মামলা। পথের-দাবী নিয়ে রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা।

বর্তমান কালের বিরুদ্ধ-সমালোচনার ধরনটাই আলাদা, অস্বচ্ছ। সুতরাং আপত্তি-জনক। যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত না করে ওপর-ওপর অজুহাত দেখিয়েই সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

এখন শোনা যায়, শরৎসাহিত্যে ধারও নেই, সারও নেই ; অর্থাৎ—আসলে কোন ভারই নেই। মানসিকতার ব্যাপকতার অভাব, বৈদগ্ধ্যের অভাব, জটিলতার অভাব। শিল্পের মানও নাকি তেমন উঁচু নয় তাঁর, ভাবসম্পদ সামান্য। কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তি নিয়ে মেয়েলী কান্নায় ভরা সীমায়িত সামগ্রী। যা সময় আর পরিপার্শ্বের দ্বারা এত দুঃশাসিত যে, দূরবর্তী কালের কাছে তার মূল্য কেবল ঐতিহাসিক মাত্র, শৈল্পিক নয়। অর্ধশিক্ষিত পুরুষ আর অন্তঃপুরিকা মেয়েদের মন ভেজানোর মত বস্তু ভিন্ন শরৎসাহিত্যে বিশেষ কিছু নেই।

এ কথার উত্তরে প্রকাশকরা বলছেন—আজও শরৎচন্দ্রই কিন্তু বেস্ট-সেলার লিস্টের চূড়ামণি হয়ে আছেন,—মৃত্যুর সাঁইত্রিশ বছর বাদেও। তার মানে কি, অন্তঃপুরিকা আর অর্ধশিক্ষিতরাই প্রধানত বই কেনেন? আমি অবশ্য একবারও বলছি না—বিক্রয়তালিকা দিয়েই মহৎশিল্পের মান নির্ণয় করা যায়। তবে, জনপ্রিয়তা, শিল্পের কালোত্তরণের একটি প্রমাণ তো বটেই।

শরৎসাহিত্য 'কিছুই নয়' একথা যাঁরা বলছেন, বলুন। বলা ভালো। 'কিছুই নয়' বললে তবেই না সেটাকে 'কিছু বটে' প্রমাণ করার প্রয়োজন ঘটে। তখন তা নিয়ে আলাপ আলোচনা বিশ্লেষণ হয়। অস্বীকৃতি তো অবহেলা নয়। আসলে, কালজয়ী শক্তি থাকে যে রচনার মূলে, খণ্ডকালের ঝড়ে জলে ধরায় তা মরে না,—শীর্ণ হতে পারে মাত্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনী-শক্তি নিজেই প্রমাণ করে আবার তাজা হয়ে ওঠে।

আমি শরৎসাহিত্য নিয়ে পাণ্ডিত্য আলোচনার যোগ্যব্যক্তি নই। পণ্ডিতেরাই আছেন সে কাজের জন্যে। নিরবধি কালের তীব্র দৃষ্টির সামনে খোলা রইলো শরৎ-সাহিত্য। কিন্তু, মানুষ-শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে

ঝাপসা থেকে ঝাপসাতর হতে থাকবেন। —আমি সেখানেই সাধ্যমত হাত দিতে চাই। শিল্প স্বনির্ভর। শিল্পী কিন্তু তা নয়। সমকালীন মানুষদের সাক্ষ্য, বন্ধু-বান্ধব আত্মজনের স্মৃতিচারণ, দিনপঞ্জি, চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁকে পৌঁছুতে হয় পরবর্তী যুগে। অন্যেরা যতটুকু প্রমাণসহ ভাবে লিখে যান, ততটুকুই বিধৃত থাকে ভবিষ্যতের দপ্তরে।

স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মশায় আমাকে বহুকাল ধরেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিকথা লেখার জন্য অনেকবার অনুরোধ করেছেন। বিশেষ করে, তাঁরা শরৎচন্দ্রের জীবিতকাল থেকেই জানতেন এবং 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস সমাপ্ত করার পরে (হয়তো বা প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে হতে পারে) জেনেছিলেন, শরৎচন্দ্রের অন্তর্জীবনের কিছু জরুরী তথ্য আমার গোচরে আছে। এঁরা দুজনে ছাড়া, আরও অনেক সাহিত্যিক শুভার্থী বন্ধু আমাকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লেখার জন্য অবহিত করেছেন। এঁরা জানতেন এবং জানেন, শরৎচন্দ্রের জীবনের এমন একটা দিক আমাদের জানার সুযোগ হয়েছিল, যা হয়তো ঠিক সেভাবে অন্যদের জানা হয়নি।

কিন্তু শরৎদাকে নিয়ে স্মৃতিকথা লিখতে কিছুতেই আমার হাত সরতো না। চেষ্টা করেও না। প্রায় চারদশক হতে চললো শরৎচন্দ্র তিরোহিত হয়েছেন। আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখনও না বলে গেলে হয়তো আর সময় থাকবে না, তথ্যগুলি বিনষ্ট হবে। তাছাড়া, সেই রঙ্গমঞ্চের মানুষেরাও তো সব একে একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। এখনও সামান্য কয়েকজন মাত্র আছেন,—তার মধ্যে আমি একজন।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার আরও একটি বিশেষ বাধা ছিল সেই সময়ে। তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে একটি বাস্তবযোগ ঘনিষ্ঠভাবে যেখানে ঘটেছিল, সেটি নিয়ে তখন কোনও-মতেই বাইরে কথা কওয়া সম্ভব ছিল না। জীবনের সেই করুণ অন্তরায়ও এখন সরিয়ে নিয়েছে মহাকাল, যাঁর অটল ইচ্ছার সম্মানে শরৎদা আমৃত্যুকাল নিশ্চুপ থেকেছেন। তাঁর কণ্ঠ ধ্বনেছিল সাহিত্যের মধ্যে, সমাজে নয়। আমি তো তখন নীরব থাকবই। আজ তাঁরা সমাজ সংসারের সংকীর্ণ কুটিল দৃষ্টির বাইরে, সকল সংকোচ কুণ্ঠার ঊর্ধ্বে চলে গেছেন।

প্রারম্ভিক প্রয়োজনে একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় ভাল। শরৎচন্দ্র বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। তার মধ্যে, কতক বইতে আমার ও আমার স্বামীর মুখে শোনা কথাবার্তা, আমাদের নিজস্ব অভিমত, ব্যাখ্যা যেন লেখকেরই নিজের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এই আকারে মুদ্রিত না করে পাদটীকায় স্বীকৃতিসহ প্রকাশ করলে হয়তো ভাল হতো। এতে শরৎচন্দ্রের কিংবা আমাদের কিছুই ক্ষতি হয়নি। কিন্তু, এখন আমাকেই না অন্যের কথা ধার নেওয়ার অপবাদে উলটো বিপত্তিতে পড়তে হয়, এই ভাবনা। লেখক নিজে কখনই এমন অভিযোগ তুলবেন না নিশ্চয় জানি। তবে, ভবিষ্যতে, গবেষকরা সন তারিখ মিলিয়ে আমার লেখার আগেই এমন কথা অন্যের বইতে মিলেছে, লিপিবদ্ধ করবেন। আমার এবং আমার স্বামীর মুখ থেকে অনেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সামান্য দুই একটির স্বীকৃতি আছে, অন্য-গুলির দিতে ভুলে গেছেন।

এই প্রবন্ধমালায় আমি যা বা বলবো, তার দায়িত্ব আমার নিজের।

'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' রচনাটি আমি তিনটি ভাগে সাজিয়েছি। প্রথম ভাগের শিরোনাম—'বন্ধনহীন গ্রন্থি'। আজ দেখাবো মানুষ-শরৎচন্দ্রের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক চেহারাটি। কোনো শিল্পীরই একটিমাত্র চেহারা থাকে না। প্রায় সমস্ত মানুষেরই বাইরে একটি চেহারা, ভিতরে অন্য আরেকটি চেহারা থাকে সকলেই জানি। এই দুটি সত্তা সবাইকারই চেনা-জানা। শিল্পীদের কিন্তু বাইরেও একাধিক সত্তা আর ভিতরেও একাধিক সত্তা লক্ষ্য করা যায়। এঁদের নিজের মধ্যে বিভিন্ন সত্তাকে বশ মানিয়ে চলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান লিখিয়ে সত্তার সঙ্গে ছবি

আঁকিয়ে সত্তার কোনোই মিল ছিল না। কাব্যমনায় রবীন্দ্রনাথে ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তা উদ্ভাসিত। শরৎচন্দ্রেরও অনেকগুলি ব্যক্তিসত্তা ছিল। ভিতরের মানুষটির সঙ্গে বাইরের মানুষটির একেবারেই মিল ছিল না।

শরৎচন্দ্র নিজের অন্তরের গভীরতার দিকটিকে এতই সংগোপনে অসংস্পৃশ্য রাখতেন, সেই লোহার দুর্গ ভেদ করে অন্দরে পৌঁছুনো কঠিন ছিল। তিনি নিজে ইচ্ছা না করলে, কারুরই শক্তি ছিল না সেখানে প্রবেশের। যেন একটি অতি পবিত্র কিছু সেখানে আছে, বাইরের চোখের দৃষ্টির ছোঁয়া লাগলে মলিন অশুচি হয়ে যাবে এমনি একটি ভাবভঙ্গি। অথচ তাঁর বাইরের আচরণে ছিল হালকাপনার মজবুত মুখোশ

শরৎচন্দ্রের প্রকৃত বিশেষত্ব ছিল এই খানেই। ব্যক্তিগত জীবনে, নিজের হৃদয়কে তিনি কোনোদিন প্রকাশ্যে শোভাযাত্রা করিয়ে নিয়ে বেড়াননি। তাঁর স্বনির্ভর প্রেম, তাঁর নিঃশব্দ বেদনা, তাঁর গভীর অভিমান, নিরুপায় ব্যর্থতার কষ্ট—সবই থাকতো তাঁর নিজের ভেতরে লোহার তালা-আঁটা সিন্দুকে তোলা।

তিনি কবিতা লিখতেন না। লিরিক লিখে আত্মমুক্তির সহজ পন্থায় নিজে জীবনে অন্তত তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না কবিরা অন্তরের বোঝা নামিয়ে হালকা হ[illegible] পারেন। রবীন্দ্রনাথের এক একটি গানে [illegible] অনাবিল মুক্তি, হৃদয়ের গ্লানি-ধৌ[illegible] যন্ত্রণা-উত্তরণের আরাম নি হি [illegible] ঔপন্যাসিকের তো ঠিক সেই ভাবে অ[illegible] কথনের সুযোগ হয় না। তাঁরা [illegible] পড়েন নিজের ভেতরে নিজে। আরো-আরো ভেতরে। আরও গভীরে। নিজেকেই কুরে কুরে খান। শেষ পর্যন্ত প্রসূত হয় একটি উপন্যাস। সার্থক বা ব্যর্থ যাই হোক না।

শরৎচন্দ্রের ভাগ্যদোষে এখানেও মুক্তির পথ ছিল বন্ধুর, কাঁটায় ভরা। শিল্পের মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণের স্বচ্ছন্দ খেলাটা শ্রীকান্তে খেলেছেন বটে, কিন্তু এখানেও তাঁকে বাধায় ঠেকতে হয়েছে। প্রথম দিকের বইগুলিতে তাঁর ইচ্ছা অবাধ স্বাধীনতা পায়নি সর্বত্র। তবে, এই বাধাটিই আবার শরৎচন্দ্রের শিল্প জীবনে শাপে-বর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কলম নিরুচ্চার ভাষণের আঙ্গিকে অভ্যস্ত হতে হতে সিদ্ধহস্ত হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র জীবনে ছিলেন বঞ্চিত মানুষ। যে যন্ত্রণা, যে বঞ্চনা তাঁকে আমৃত্যু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেই অবরুদ্ধ কষ্টই সহজ-সরল অথচ ইঙ্গিত-কুশল আঙ্গিকের আড়ালে থেকে তাঁর লেখাকে গভীর অন্তস্পর্শী করে তুলেছে। তিনি তাঁর প্রধান বক্তব্যকে শব্দের মাধ্যমে নয় শব্দহীনভাবে উচ্চারণ করে [illegible]ছেন। জীবনের মহৎ বঞ্চনা, একান্ত অপ্রাপ্তি, শিল্পে তাঁকে প্রাপ্তিতে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর সব লেখাই অনুভব দিয়ে,—অনুভব দিয়েই তাকে পড়া যায়।

যাঁরা সমাজের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভিত্তিতে শরৎচন্দ্রের রচনাকে সাহসিকতা-ভীরুতার মানদণ্ডে খোলামেলা বিচার করেন, তাঁরা বোধ হয় কিছুটা ভুল করেন।

সমাজ তাঁর শিল্পের মুখ্য লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি আরও গভীরে কলম ডুবিয়েছেন। সমাজ ব্যাপারটি যেখান থেকে, আর যার প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছে, তিনি আছেন সেইখানে। তিনি আছেন মানুষে। [illegible]নবমন আর মানব চরিত্র নিয়ে [illegible]র গোটা সাহিত্য। এই মানব [illegible]ন আর মানব জীবনের চাহিদাতেই তো সমাজ ব্যাপারটির উৎপত্তি। ধীরে ধীরে নানা দেশে নানা আকারে গড়ে উঠেছে, কালে কালে চেহারা বদল হয়ে বিভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করেছে বিশ্ব-দুনিয়ায়।

শরৎচন্দ্রের রচনায় এই মানবমন আশ্চর্য। মানবমন অদ্ভুত। সে কুলিশ-কঠিন, আবার কুসুম-কোমল। সে সর্বত্যাগী অথচ উন্মত্ত ভোগী। তার গতি প্রকৃতির হদিশ মেলা ভার। যুক্তির জাল বিছিয়ে একে ধরা যায় না সহজে, অঙ্ক কষে ফল বার করা অসম্ভব।

স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি সব মানুষের থাকে না। এটি প্রকৃতিদেবী কাউকে দেন, কাউকে দেন না। বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য সাধনায়, পরিশ্রমে অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু তৃতীয়

"একরাশ সুদীর্ঘ চুল—বহুমূল্য
ছোট বাদামের কাছে অমূল্য
ঋণে ঋণী" বলেন
অ্যানিটা রবিনস!
এজপোর্ট হাউস একজিকিউটিভ
এরই রূপায় পুরোনো
দিনে অযোধ্যের বেগমরা
তাঁদের পায়ের গোড়ালী
পর্য্যন্ত লম্বা চুল নিয়ে
গর্ব করতে পারতেন!
তাঁরা জানতেন যে
নারকোল, চীনেবাদাম
বা রেড়ির দানার
চেয়ে বাদামের
পুষ্টিগুণ অনেক
শ্রেষ্ঠ!
আজও বাদামের
সহজাত পুষ্টিগুণ দিয়ে
চুলওঠা বন্ধ করে
আপনি পেতে পারেন
ঝলমলে সুন্দর,
সুস্থ চুল! রোজ রাত্রে
আর সকালে চুলের গোড়ায়
লিওর আমণ্ড হেয়ার অয়েল
মালিশ করুন। রাত্রে, এ আপনার
চুলে পুষ্টি যুগিয়ে চুলের গোড়া শক্ত
আর সজীব করে তোলে; দিনে,
চুলকে রাখে পরিপাটি সুন্দর!
যে সব স্ত্রী বা পুরুষরা পরিপাটি আর
সুস্থ চুল চান তাঁদের জন্যে মনোরম
সুগন্ধে ভরা লিওর আমণ্ড হেয়ার
অয়েল অপরিহার্য্য!
লিওর
"লিওর আমার চুলে আনে লোভনীয়
সৌন্দর্য্য...আমণ্ড হেয়ার অয়েল
মেলায় তাতে স্বাস্থ্য অপরিহার্য্য!"
PERFUMED
ALMOND HAIR OIL
Creative Unit-1922 -Ben

নেত্রটি যার থাকে, তার আপনিই থাকে। শরৎচন্দ্র একটি কথা তাঁর সাহিত্যে লিখে রেখে গিয়েছেন—"সংসারে যে যত ভাল বেসেছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তার কাছে তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।" এটি একটি মৌলিক সত্য।

আমার এই রচনার দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম 'অদৃশ্য তর্জনী'। সেখানে আমরা প্রবেশ করব শরৎ সাহিত্যের কেন্দ্রীয় সত্তা এবং সমস্যার অন্তঃস্তলে। কি ছিল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির এবং সাহিত্য দৃষ্টির প্রেরণা, কি ছিল তাঁর শিল্পপথের বিঘ্ন, কিসের নেশায় তিনি মেতেছিলেন আযৌবন মৃত্যু পর্যন্ত।

আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতায়, আর তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ অকপট সংস্রবে সত্য বলে যা জেনেছি—সততার সঙ্গে সাবধানে তা আলোচনা করবো।

তৃতীয় এবং শেষ ভাগের শিরোনাম—'শেষের পরিচয়'। শরৎচন্দ্রের একখানি অসমাপ্ত উপন্যাস সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার মত অনুপযুক্তের ওপরে পড়েছিল। কি কারণে, কেন ঐ গুরুদায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছিল সে কথাটা বলে যাওয়া দরকার বিদায় নেওয়ার আগে।

শরৎ সাহিত্যের নায়িকাদের চরিত্র আমার প্রধান আলোচ্যবস্তু হবে এই তিনটি আলোচনায়। সেই চরিত্রগুলির মধ্যে লেখকের নিজের অন্তর্জীবনের অনুভূতি কতটা পরিস্ফুট সেটাও আমি দেখাতে চেষ্টা করবো। শরৎ সাহিত্যের মূল ছিল লেখকের বাস্তবজীবনের মর্মমূলে গভীরভাবে প্রোথিত। তাঁর বইগুলিতে সব ঘটনা, সব চরিত্র বাস্তব মানুষের জীবন থেকেই প্রত্যক্ষ উঠে আসা। কল্পনা থেকে উঠে আসা নয়। কল্পনা আছে, কিন্তু তা মূলে নয়, বহিরঙ্গে। কোথাও যেমন তাঁর কষ্টকল্পনা ছিল না, তেমনিই কোথাও বাস্তব-অতিরিক্ত স্বপ্নের তির্যক আলোকপাতও ঘটেনি। সেই কারণেই হয়তো এতটা সৎ, এতটা সত্য এতদূর জীবনভিত্তিক তাঁর শিল্প। অথচ এই একই কারণেই আজ আমরা কেউ কেউ বলছি, তাঁর শিল্প সীমায়িত, ব্যাপ্তিহীন সংকীর্ণ।

বিদগ্ধজনের দৃষ্টির উৎসকেন্দ্র মস্তিষ্ক। এঁদের চোখে জীবনের মধ্যেই জীবনোত্তরণের নিহিত ছন্দটি সহজে ধরা পড়ে না। মহৎশিল্পীর দৃষ্টির উৎস হৃদয়ানুভব। প্রকৃত শিল্পরসিক পাঠকেরও তাই। শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির লগ্নে মস্তিষ্ক প্রভু হয়ে হাজির থাকে না, প্রহরী হয়ে সতর্ক থাকে। হৃদয়ানুভব এখানে প্রেরণারূপে কাজ করে, খেলা করে, মস্তিষ্ক সেবকের নিপুণতায় তাকে যথোচিত উপযুক্ত করে বাইরে এনে ধরে।

শরৎ শতবার্ষিকী এলো। এই ৩১শে ভাদ্র তাঁর জন্ম তারিখ নিরেনব্বুই পূর্ণ হয়ে শতকে পদার্পণ করলো। শরৎচন্দ্রকে এখন নতুন করে বিচার করার, নতুন চোখে পড়ার, নব মূল্যায়নের সময় এসেছে। এখন যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুন করে পড়া হচ্ছে, তেমনি শরৎচন্দ্রকেও নতুন করে পড়া দরকার। কোনও বিশেষ ধরনের মানসিক প্রত্যাশা নিয়ে নয়, ধারণাবদ্ধ মন নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে নতুন করে শরৎ সাহিত্যকে দেখুন। ধারণাবদ্ধ মন, বা অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে উঠলে নবীন পাঠকরা হয়তো এবার তাঁকে চিনতে ভুল করবেন না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সংসার যাত্রা নিয়ে লিখলেই শিল্পীর নজরটা সংসারী হয় না, গল্পে বিধবার বিয়ে না দিলে মানুষটাও বিধবা বিবাহ-বিরোধী হয় না, ছাপোষা মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র আঁকলেই ছাপোষা মধ্যবিত্ত মানসিকতা হয় না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক শিল্পীটি স্বকীয় জীবৎকালে সহজ ঔদাস্যে হাসি-মুখে অপরিসীম ভুল বোঝার পর্বত প্রমাণ ভার স্বেচ্ছায় কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছেন। শিল্পকার্যেও বিনা দৃকপাতে এমন কীর্তি রেখে গেছেন, যাতে ভবিষ্যতের অসীম আকাশেও তাঁর ছায়া, সেই তীব্র বিভ্রান্তির বোঝাটি কাঁধে নিয়েই শূন্যে ভেসে বেড়াবে।—এই বিভ্রান্তি মোচনের দায়িত্ব আছে সৎ সমালোচকের।

আমি একদা তাঁর কাছে যে পিতৃস্নেহ পেয়েছি, তাতে ঋণমুক্ত হওয়ার এই একটিই সুযোগ। শরৎদার প্রকৃত মুখ, তাঁর অন্তর্মুখটি আমার ক্ষুদ্রশক্তিতে যতটুকু সাধ্য উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা করবো ভবিষ্যৎ কালের সামনে।

শরৎদার মত এমন অবাস্তব, অমধ্যবিত্ত, অসামাজিক অথচ অপার্থিব মানুষ, আমার জীবনে তো আমি আর কাউকে দেখিনি। ঠিক এই বিশেষণগুলিই গুরুদেবকেও দেওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি হলেন অপার্থিব মানুষ, এই পার্থিব জগতে এ কথা কে না বলবে? তার কারণ, তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ। তাঁর ব্যক্তিত্বে মহিমার সীমা ছিল না। এমন উজ্জ্বল আলোকিত মানব-ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে হয়তো কদাচিৎ মেলে। কিন্তু শরৎচন্দ্র? তিনি তো সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন, নিরুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ একটি গ্রামীণ মানুষ মাত্র। চরিত্রে, চেহারায়, আচরণে জীবনের মূল ভিত্তিতে এবং জীবন-সাদৃশ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবুও আমি উপরোক্ত বিশেষণ ক'টি তাঁর ভিতরকার শিল্পী মানুষটির প্রতি প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত নই। সেই কথাই বলতে চেষ্টা করবো।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রচনায় যেমন দেখতে পাই, সৎ আর মহৎ সুন্দর মানবসত্তা বহির্জীবনে একটি বিপরীত খোলসে ঢাকা থাকে—তিনি নিজেই আসলে সেই বিপরীতে ঢাকা প্রচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন।

তাঁর বাইরের আচরণগত মূর্তির সঙ্গে ভিতরের মানুষটির কোনো সাদৃশ্য ছিল না।

আমার সুদীর্ঘ জীবনে পরিচিত মানুষ যত দেখেছি তাঁর মতন ভালবাসবার শক্তি আর কারুর মধ্যে এতখানি দেখেছি মনে পড়ে না। তাঁর মতন অকপট মন আর নিঃশব্দ আত্মত্যাগও দ্বিতীয়টি দেখিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে মহৎ ত্যাগ স্বীকার, প্রাণ দুঃখ বহন অনেক মানুষই করেছেন, করেন। সহিষ্ণু আদর্শবাদী মানুষের পক্ষে তা শক্ত নয়। কিন্তু শিল্পীরা যে স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক হন। তাঁদের স্বার্থপর হতে হয় বেশ একটু। যেহেতু, শিল্পের দাবী তাঁদের কাছে জীবনের দাবীর চেয়ে বেশি। যিনি শিল্পী—বিশেষ করে যিনি সচেতনভাবেই নিজের শিল্পসত্তার মান জানেন—তাঁর পক্ষে শিল্পের ক্ষতি করেও জীবনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা সহজ নয়। এ ত্যাগের বিশেষ চরিত্র আলাদা। শিল্প চিরকালের জন্য জীবন আপাতকালের জন্য এ সবারই জানা। সেই আপাতকালের জন্য চিরকালকে পরিত্যাগ করা শিল্পীর পক্ষে কঠিনতম আত্মত্যাগ।—ডান হাতের অংগুষ্ঠ কেটে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার কাহিনীটি মনে পড়ে যায়। একলব্য, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি সামনে রেখে নিজের চেষ্টায় ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হন। যে গুরু নিষাদ-বালককে হীনজাতি বলে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেননি, তাঁকেই গুরুদক্ষিণা দিতে হয়েছিল একলব্যকে—তীর নিক্ষেপের প্রধান আঙুলটি কেটে ফেলে। শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনায় মানুষের মহত্ত্ব আর মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতার দৃষ্টান্ত দেখে মহাভারতের ঐ কাহিনীটিই আমার মনে পড়ত।

শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনে যাঁকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর সান্নিধ্য থেকে চিরকাল নিজেকে অনেক দূরে রেখেছেন নিজের সামাজিক অযোগ্যতার জন্য। মনের ভিতরে তাঁর সান্নিধ্য গড়ে নিয়ে শিল্পে তা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁকে বঞ্চিত হতে হয়েছে। শিল্পীর দক্ষিণ অংগুষ্ঠ কেটে তিনি নিজের নিঃশব্দ প্রেমের নিঃশর্ত দক্ষিণা দিয়ে গিয়েছেন।

তিনি আমাকে লেখা একটি বহু পরিচিত চিঠিতে "আমার একটি গারজেন আছে" বলে যাঁর উল্লেখ করেছিলেন, তিনি শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—শরৎচন্দ্র যেন বালবিধবা চরিত্র নিয়ে তাঁর গল্প উপন্যাসে আলোচনা না করেন। আরও তো অনেক রকমের নারী চরিত্র আছে, বালবিধবা বাদ দিলে ক্ষতি হবে না।

শরৎচন্দ্র এর উত্তরে জানিয়েছিলেন—"আমার কলমে যে সকল চরিত্র আপনা থেকেই সহজে আসতে চায়, তাকে রোধ করে রাখা আমি উচিত মনে করি না। তবে কোনো ভয় নেই, আমি এমন বালবিধবা কোনওদিন আঁকবো না, যা তোমার সম্মানে বা মনে আঘাত দিতে পারে।"

এই করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনীটি আমার কাছে গল্প করার পরে শরৎচন্দ্র আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন কখনও কাউকে এ তথ্যটি জানাবে না। বলেছিলেন, "তোমাদের পেটে খবর কখনোই হজম হয় না। তুমি যদি এটা প্রকাশ করে ফেলো মুশকিলে পড়বে। আমি তখন সরাসরি অস্বীকার করে বসবো ও কথা আমি তোমাকে বলিনি। তুমিই অপ্রস্তুতে পড়ে যাবে কিন্তু।" আমি বলেছিলুম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বড়দা। মেয়েদের মধ্যে অনেক কিছুই আপনি দেখতে পেয়েছেন, যা অন্যে দেখতে পায়নি। এই শপথ নিলুম মনে মনে—আমার মুখ থেকে আপনার যা' একান্ত গোপন, তা' বাইরে আসবে না।"

হেসে আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন। আর কিছু বলেননি।

আজ দূরলোকবাসী শরৎচন্দ্রের কাছে শপথ ভঙ্গ করে তাঁর মুখ থেকে পাওয়া দু'চারটি তথ্য আমার দেশের বর্তমান ও অনাগতকালের মানুষদের সামনে প্রকাশ্যে রেখে যাচ্ছি। মহাকাল সময়ের স্রোতে সেদিনের সেই তীব্র উৎকণ্ঠা আর কলঙ্কভীতির অস্বস্তিকর আবহাওয়া ধুয়ে নিয়ে গেছে। আজকের দিনের সামাজিক আবহাওয়ায় শরৎচন্দ্রের জীবনসত্য প্রকাশিত হলে কোনও ব্যক্তি কিংবা কোনও পরিবারের সামাজিক অস্বস্তি ঘটবে না। কারো কোনও হানির সম্ভাবনা নেই।

স্বভাব-বিদ্রোহী বেপরোয়া-প্রকৃতির মানুষটির সামাজিক বিদ্রোহের স্বাধীনতা হরণ করে দক্ষিণা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর 'গারজেন'। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রেরই একান্ত স্বনির্ভর প্রগাঢ় প্রেম। তাঁর শিল্প যন্ত্রণা বুঝতে হলে এটি নিশ্চয়ই একটি জরুরী তথ্য। সন্দেহ নেই, একজনের কাছে শপথ-পালনের দায়িত্বে শিল্পী শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বিশ্বাসের পথে অবাধ চলায় তাঁর বাধ ঘটেছে। সামাজিক কলঙ্কভীতি নিন্দাভীতি শরৎচন্দ্রের নিজের যে একটুও ছিল না তা' বলা বাহুল্য।

(ক্রমশ)

আমি টের পেয়ে গেছি, প্যাটের সেই মুখের আর তেমন দরকার নেই জেরির। তুমি এ'কে দিলে নিশ্চয়ই নেব। তবে, যে আগ্রহে, যে আদরে, যত্নে তাকে রাখতুম,—আজ বোধ হয় আর ততটা পারবো না। ভাতে বা রুটিতে আমার খিদে মেটে বলেই যে, ডাল দিলে নেবো না, তা' তো' হতে পারে না জীবজগতে। ডাল পেলে নিশ্চয়ই চাই। নাহলেও, সুখের জন্যে যে পেট নিরন্তর খালি, সেখানে এখন এই ভাতটুকু আমার চাই-ই চাই। ভাতের নাম করিন ফ্লিক্ক।

—"প্যাটের পোর্ট্রেটের কথা বলেছিলে ভারতবর্ষে থাকতে। চাই না?"

সাধাসিধে প্রশ্নটির জবাবে, জেরি বেচারী একটুও বিচলিত হ'ল না। ঘুঘু সেলস্‌ম্যানের মতো আগ্রহে বলল, —"হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চাই! বাহ্, চাই না মানে? তবে, ইয়ে, কি বলে গিয়ে, আমার করিনের ছবিটা চট্‌পট্ করে দাও আজকে। প্লেন

॥ বিয়াল্লিশ ॥

জেরি বললে,

—"তোমার তো' খুব বেশি সময় লাগবে না, করিনের একটা 'লাইভ্‌লি' পোর্ট্রেট এ'কে দাও, শিল্পী।"

হিসেব করলে এবং ঠিকঠাক মিললে হয়তো দেখা যাবে, তুমি যেহেতু ক'য়ের কাছ থেকে যা' আশা করেছিলে, তা' পাওনি বা পাচ্ছো না, তাই 'খ' পেয়ে ভাবলে 'খ' মানেই সুখ। 'ক'য়ের মতোই তুমি 'খ'কেও বিশ্বাস করলে, বউ। পৃথিবীর একটি মুখের নাম যদি তীর্থংকর হয়, তো', সেই মুখই তোমাকে তৃপ্তি আনন্দ এবং সবচেয়ে অসম্ভব শব্দ 'সুখ' দু'হাতের মুঠোয় তুলে ধরবে তোমার জন্যে, এই আশায় তুমি ভাবলে এমন মুখের ছবি তুলে রাখা দ র কা র। এইখানে-দিবারাত্র-ফটো-তোলা ভয়'তে গিয়ে তোমরা দু'জনে মিলে হয়তো ছবি তুলিয়ে রেখেছো নিজেদের। তোমার সুখের আশার ছবি। তারপর এখন, ফোটোর দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তেমনি বিশ্বাস, তেমনি আশা করেই তুমি বলবে,

—"তোমার একটা ছবি আমার চাই।"

আমি লজ্জা পেয়ে যাবো এবং দু'জনে মিলে খুব বোকা-বোকা একটা ছবি তুলিয়ে নেব। এ রাজ্যে আসবার আগে সেই 'অশোক স্টুডিও'তে এই ব্যাপারটাই হয়েছিল, মনে আছে।

মারিয়ার সংগে ডিভোর্স না হয়ে গিয়ে থাকলে, আজ, এখন জেরি মারিয়ারই একটি পোর্ট্রেট করতে বলতো আমাকে। মারিয়া নেই, তাই প্যাট্। 'প্যাটের একটা প্রাণবন্ত ছবি তুমি এ'কে দেবে? যে ছবি দেখে, আমার যদি কোনো কষ্ট থাকে, ভুলে যেতে পারি যেন—!'

মারিয়া নয়, প্যাট নয়। তীর্থংকর নয়, আমি নই। সুখ। আপন আপন সুখের ছবি খু'জে মরি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা।

ভালোমানুষের গলায় জিগেস করলুম,

—"প্যাট্ কেমন আছে?"

—"কে? ও, প্যাট্ আমার মেয়ের কথা বলছো?"

পাকা ব্যবসায়ীদের মুখের রেখার ধাতই অন্য। মনের কষ্ট, ক্ষতি, লাখ টাকা লোকসানের খবরেও নড়েচড়ে না। যেমন-কে-তেমন। ওইসব মুখে অপ্রস্তুত ভাব ফোটাবার জন্যে যেন রেখাদের সৃষ্টিই হয়নি। নির্বিকার মুখে অল্প হেসে কথা শেষ করল জেরি,

—"ভালোই আছে। তবে, এই বয়েসে একটু সমবয়সী সংগী-সাথীর দরকার তো,—। ভাবছি, ওকে একটা ভালো বোর্ডিং হাউসে পাঠাব।—"

বলে, করিনকে সাক্ষী রাখার মতো বললে আবার, —"সমবয়সী বাচ্চাদের সংগে হইচইয়ের মধ্যে লেখাপড়াটাও শিখতে থাকবে।"

"এর আগে আমার কোন আয়ের পথ ছিল না। এখন আমি প্রতিমাসে ৫০০ টাকারও বেশী রোজগার করি—ঘরে বসেই!"

আপনি কি শ্রীমতী সিং-এর গুপ্তরহস্যটা জানতে চান?

সিঙ্গারের কল্যাণে অনেক মেয়েরাই প্রতিমাসে নিয়মিত বেশ টাকা রোজগার করেন…সিম্যাক নিটিং মেশীন ব্যবহার ক'রে। সিঙ্গার আপনাকেও সাহায্য করবে।

নিয়মিত একটি আয়ের পথ ক'রে নিন

এর আগে যদি আয় না ক'রে থাকেন তাহ'লে ভাববেন না। সিম্যাক নিটিং মেশীন দিয়ে এখন আপনি প্রতিমাসে নিয়মিত টাকা রোজগার করতে পারেন। তার জন্যে ঘরের কাজ ফেলে রোজ সকালে ছুটতে হবে না আর পরিবারের যাবতীয় দৈনন্দিন কাজ সেরেও এটা করতে পারেন।

৩ ঘন্টার মধ্যে কার্ডিগান বুনতে পারবেন।

সিম্যাক ব্যবহার করলে আপনা থেকেই আপনার হাতের কাজ পাকা হবে। তিন ঘন্টার মধ্যেই আপনি একটা কার্ডিগান বুনে ফেলবেন। এতে রয়েছে একটি 'অটোম্যাটিক নীডল সিলেক্টার', একটি 'অটোম্যাটিক রো কাউন্টার', এমনকি সবসময় দরকারমত জামা টানটানভাবে ধরে রাখার জন্যে একটি 'টেনসন ডায়াল'। তাছাড়া ১০০১টিরও বেশী অপূর্ব সব প্যাটার্ন থেকে আপনার পছন্দমত প্যাটার্ন বেছে নিতে পারেন।

যা ইচ্ছে তাই বুনুন।

বড় রকম বিছানার চাদর • বাচ্চাদের জুতো • শাল • ব্লাউজ • পোশাক • দস্তানা • মাফলার • টেবিল রানার্স • বেরেট • ব্যাগ • স্ল্যাক • মোজা • টি কোসী-ও।

আপনি একটি রঙে বা বহু রঙে যেমন চান বুনতে পারেন।

গ্রীষ্ম বা শীতের পোশাক বুনতে পারেন!

সিম্যাক দিয়ে শুধু পশমের পোশাকই বুনতে পারবেন তা নয়, সুতীর জামাকাপড়ও বুনতে পারবেন। কুরুশ কাঠি দিয়ে তৈরী করার মত—ঠাণ্ডা, বেশ হাওয়া খেলে এমন জামাকাপড়ও তৈরী করতে পারবেন। তাছাড়া সিন্থেটিক সুতো দিয়েও বুননির কাজ করতে পারবেন।

সিম্যাক ব্যবহার করা কত সহজ তা দেখে যান। কাছাকাছি অনুমোদিত বিক্রেতা কিম্বা সিঙ্গারের দোকানে চলে আসুন আর ব্যবহারের পদ্ধতি বিনাখরচায় স্বচক্ষে দেখে নিন।

সিঙ্গার সর্বদাই উৎকৃষ্ট জিনিস তৈরী করে

সিঙ্গার সোইং মেশীন কোম্পানী, ২০৭, ডি.এন. রোড, বোম্বাই ৪০০ ০০১

* সিঙ্গার কোম্পানীর ট্রেডমার্ক

CHAITRA-SM-83 Ben

ধরতে হবে তো? সাতটার ফ্লাইট্‌। প্যাটের পোর্ট্রেট একটা ধীরে-সুস্থে বাঁধিয়ে রেখো, সময়-সুযোগ মতো এসে নিয়ে যাবো—!"

জেরি সেই শ্রদ্ধার আসন থেকে ধপ্‌ করে পড়ে গিয়ে, গা'-হাত-পায়ের ধুলো ঝেড়ে আমার সামনাসামনি এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে, বক্‌ বক্‌ করে প্রায় এক নিশ্বাসে অনেকগুলো অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে লাগল, যেন, পাছে ওর গায়ে-লাগা ধুলো আমার চোখে পড়ে যায়।

বললুম,

—"করিনের ছবি কি রকম চাই? সাদাকালো না রঙিন?"

শ্যাম্পেনে শেষ চুমুক এবং ফিঁয়াসের ঠোঁটে একটি ভালোবাসার চুমু খেয়ে খুব সুখী পুরুষের গলায় জেরি জানাল,

—অবশ্যই রঙিন!"

যদিও, এই মিষ্টি মেয়ে, যার মুখের নাম করিন সে তো কোনো দোষ করেনি! জেরির সঙ্গে ওর প্রেম ইত্যাদি হয়েছে। দুজনের দুজনকে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে। দুজনেই স্বাভাবিক নিয়মমাফিক মনে করছে, একে অন্যের কাছ থেকে যা-চাই-তাই পেয়ে যাবে। অ্যাড্‌জাস্ট্‌মেন্টের দেওয়ালের মধ্যে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংয়ের আশা। এই দুটি মন্থন করে উঠে আসবে সুখ। জেরিকেও ঠিক একই কারণে, কোর্ট-কাছারি দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। কিন্তু প্যাট! প্যাট কি দোষ করেছে? প্যাটের পাপা, পাপাই থাকবে। কিন্তু সে পাপা কি থাকবে? মারিয়াহীন সেই 'প্যাট-বলতে-পাগল' পাপা কি আর থাকবে, না আছে! পাল্টে গেছে জেরি। ওর ভাবী বধূ করিনের প্রতি কোনো রাগ বা বিদ্বেষ কিছুই নয় তবু, করিনের ছবি আমার আঁকতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু, কি করে বলবো জেরিকে? আমি যে ওর কাছে ঋণী! এই মুহূর্তে, এখানে আমার অস্তিত্বের জন্য ঋণী।'

বললুম,

—"তেল রংয়ে চাই; না প্যাস্টেলে?"

যেহেতু কেউ কারুর ভাবনার কথা, মনের কথা জানে না, তাই, জেরিও টের পেল না আমি কি অনিচ্ছায় ওর বাগদত্তার পোর্ট্রেট করতে বাধ্য হচ্ছি। ঋণ না থাকলে ওকে হয়তো সোজাসুজি বলে দিতে পারতুম, মাপ করো ভাই, করিনের ছবি আমার আঁকতে ইচ্ছে নেই। আগে প্যাটের ছবি, তারপর করিন।

ও বললে,

—"তেল রংয়ে করতে পারলেই ভালো জমত। কিন্তু, তুমি তো' এই এক-দেড় ঘণ্টা সময়ে তা পারবে না। চলো, প্যাস্টেলেই হয়ে যাক্‌!"

পা টেনে টেনে আমার প্যাকিং বাক্সটির কাছে ফিরে এলুম। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললুম করিনকে।

মেয়েটি তেমনি মিষ্টি হেসে বলল,

"—থ্যাংক্‌ য়ু।"

বলে, বসে পড়ল।

মনে মনে বললুম, তুই আমার ওপর রাগ করিস না। তোর ছবি আমার আঁকতে ইচ্ছে করছে না মোটেই। জোর করে আঁকতে হবে তো, মেলাতে পারবো কিনা জানি না। আমায় ক্ষমা-ঘেন্না করে দিস্‌, ভাই। আমার আঁকা মুখ মিলল কিনা, তাই নিয়ে ভাবিস না। দ্যাখ্‌, জেরি বেচারাকে সুখী করতে পারিস কিনা, আজীবন। তোর জন্যে সাধের প্যাটকে খুইয়েছে। তোর মুখের দিকে মুখ তুলেছে, সূর্যের দিকে সূর্যমুখীর মতো। সুখের আশায় তুইও ওর দিকে মুখ তুলেছিস। তোকে আমি চিনি না। মনে-প্রাণে চাইছি, দুজনে সুখী হও। কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না প্যাটকে। ওর গলার স্বর আমি শুনিনি কখনো। তবু, যেন, বাগানের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে সোনালী চুল হাওয়ায় উড়ছে। কোনো কচি কণ্ঠস্বর বলছে, আমার মুখ আঁকবে না, শিল্পী! আমার পোর্ট্রেট তো তোমার আগে আঁকার কথা।

কোলে বোর্ড রাখতে রাখতে এইসব ভাবছিলুম। কিছুই না জেনে, না শুনে

সারাদিন
ভোরের স্নিগ্ধতা
আর সুরভি
পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক ব্যবহার করুন—
সদ্যস্নানের শুচিস্নিগ্ধতা অনুভব করবেন
ঘণ্টার পর ঘণ্টা··· সারাদিন আপনাকে
ঘিরে থাকবে মনোরম আবেশ।
সারা অঙ্গে ছড়িয়ে দিন এই ট্যাল্ক—
দেখবেন কত ঝরঝরে, ঠাণ্ডা মনে হবে।
মৃদু সৌরভ গায়ে লেগেই থাকবে।
ঘাম শুষে নিয়ে আপনাকে দেবে আরামের
আমেজ। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে ও
প্যাচপ্যাচে ভাব হতে দেয় না—
বিশেষ করে গরমের দিনে।
তাছাড়া পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক
রেশমের মত এমন চিকন মোলায়েম!
আপনি এটি মুখেও মাখতে পারেন।
পণ্ডস
ড্রিমফ্লাওয়ার
ট্যাল্ক
মিডিয়াম, ফ্যামিলি
আর এখন নতুন
১৯৬ গ্রামের বড়
সাইজে পাবেন।
Pond's
Dreamflower talc
চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড

আমার নিজের সঙ্গে লড়াইয়ের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিলো যিশু। যিশু আর ঈভলীন। কোত্থেকে প্রায় দৌড়ে এসে দাঁড়ালো দুজনে।

ঈভলীন হাত ধরে টেনে তুললো। বলল,

—"একটু দরকার ছিল, ইণ্ডিয়ান।"

ততক্ষণে যিশু আমার ড্রয়িং বোর্ড ছিনিয়ে নিয়েছে।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল জেরি। অবাক গলায় বললে,

—"এরা কারা? কি ব্যাপার?"

ওদের দুজনকে আলাপ করাতে যাবো, ঈভলীন প্রায় গায়ের জোরে টানলো আমায়। বেশ দ্রুত গলায় বললে,

—"শিগগীর চলো আমার সঙ্গে—"

মনের মধ্যে লড়াইয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যে আনন্দ হ'ল, তা'তে এই প্রথম, আজকে এখন ঈভলীনকে খুব কাছে টেনে এনে গভীরভাবে চুমু খেতে ইচ্ছে করল।

জেরিকে বললুম,

—"কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। শুনে আসছি এক্ষুনি।"

ঈভলীন হাত ধরে টানছেই। ঘুরে ওকে জিগ্যেস করলুম,

—"কি হয়েছে? এমন টানাটানি করছো কেন?"

ঈভলীনের চোখেমুখে ভয়, উৎকণ্ঠা। ব্যস্তভাবে জেরিকে বলে দিল,

—"মাপ করুন। একে আমার ভীষণ দরকার। এক্ষুনি। বিপদে পড়েছি একটু।"

যিশু আমার বোর্ড বাগিয়ে ধরে, আমারই প্যাকিং বাক্সের ওপরে বসে পড়েছে। দ্রুত গলায় আমার বলল,

—"যাও হে। খুব দরকার। ঘুরে এসো।"

মুখ ফিরিয়ে মৃদু হেসে জেরিকে নিজের নাম জানাল,

—"আমি পিয়ের ভালমি।"

ঈভলীন হাত ধরে সমানে টানছে। 'না' বলতে পারছি না। ওর সঙ্গে দু' 'পা' এগিয়ে মুখ ঘোরালুম। জেরিকে বললুম,

—"এক্ষুনি আসছি। এরা আমার ভীষণ বন্ধু।—"

জেরি খুব গম্ভীর মুখে বলল,

—"করিনের পোর্ট্রেট করে দিয়ে বন্ধুত্বের আড্ডায় গেলে ভালো হ'ত না!"

আরো এক পা' টেনে নিয়েছে ঈভলীন। জেরিকে দেখিয়ে যিশুকে বললুম,

—"জেরি। ও আমার বন্ধু না হলে আমি প্যারিসে আসতেই পারতুম না।"

ঘুরে করিনকে বললুম,

——"এক্সকিউজ মি! আসছি এক্ষুনি।—"

করিনের হাসিমুখ নেই। কেমন অপমান আর রাগ কোলে করে বসে আছে যেন। পরে যিশুর মুখে শুনেছিলুম, ও খুব ভুরু কুঁচকে যিশুকে জিগ্যেস করেছিল,

—"এই অসভ্য মেয়েটি কে?"

কিছুই বুঝতে পারেনি, এমনিভাবে যিশু বলেছিল,

—"কার কথা বলছেন, ম্যাডাম!"

করিনের নাক সিঁটকোনো জবাব,

—"ওই যে মহিলা ইণ্ডিয়ানকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল!"

কি বলবে যিশু! ওর কিছু বলার নেই। কারণ, ঈভলীন আমাকে কিভাবে সাহায্য করেছে, করছে, ও জানে কিছুটা। জেরির দিকে তাকিয়ে বলল,

—"ইণ্ডিয়ান আপনার খু-উ-ব বন্ধু?"

ক্ষুব্ধ গলায় জেরির জবাব,

—"ইণ্ডিয়ানরা যে অ-সভ্য, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই!"

যিশু গোলওয়াজের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে জেরিকে বললো,

—"খাবেন?"

জেরির মুখ গম্ভীর। রাগ রাগ গলায় বললো,

—"আমি সিগারেট খাই না। ধন্যবাদ।"

করিন সুন্দরী উঠে দাঁড়িয়েছে।

যিশু তাড়াতাড়ি বলল,

—"ও কি, উঠছেন কেন? বসুন, ইণ্ডিয়ানের হয়ে আমি আপনার পোর্ট্রেট করে দিচ্ছি। খদ্দের হিসেবে নয়। ইণ্ডিয়ানের বন্ধু হিসেবে। বসুন। কি রকম মুখ চাই, রঙিন না সাদাকালো?"

জেরি করিনের হাত ধরে মুখ ফিরিয়ে যিশুকে বলল,

—"ধন্যবাদ। আমরা ফোটোগ্রাফারের কাছে যাব এবং রঙিন ছবি তুলিয়ে নিতে পারবো। চলো করিন।"

দু' পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। থুতু ছেটাবার ধরনে বলেছে,

—"আপনার ইণ্ডিয়ান দোস্তকে বলে দেবেন, কৃতজ্ঞতা বলে একটা সাধারণ ব্যাপার সভ্য জগতে চালু আছে, যেটা জংলীরা জানে না।"

খানিক দূর অবধি পায়ে পায়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে গেছে যিশু। বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, ভীষণ দরকারেই ইণ্ডিয়ানকে

ভলীন টেনে নিয়ে গেছে। একটু অপেক্ষা রে গেলেই সব কার্যকারণ জানতে ারবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোনো কথাই কানে তোলেনি জেরি। তুন প্রেমে হাবুডুবুখোর জেরি প্রেমিকার াত ধরে গটগট করে চলে গেছে মমার্ত্র থেকে। প্যারিস থেকে। যেতে যেতে অনেক দূরে! আমার স্মৃতি-বিস্মৃতির সীমানায় ঝাপসা হয়ে গেছে জেরির মুখ। ক্ষমা চেয়ে, অবস্থার কথা জানিয়ে কয়েকটি চিঠি লিখেছিলুম। রাগে, অভিমানেই বোধ হয় জবাব দেয়নি। শোধ করতে পারিনি ঋণ। ওর কাছে আজীবন ঋণী থাকলেও আমি দুঃখিত নই। কারণ সাধারণ সুখ-সন্ধানী মানুষের মধ্যে জেরিও একজন। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে জন্ম দেওয়ার জন্যে প্যাট নিশ্চয়ই ওর কাছে ঋণী থাকবে সারাজীবন। ও যদি ছোট্ট এবং সারা পৃথিবীতে ভীষণ একলা একটি রক্তের শিশুকে তার একান্ত প্রয়োজনীয় আসন থেকে সরিয়ে আপন সুখের আশায় অন্য কাউকে সেখানে বসাতে পারে, তবে জেরিকে শ্রদ্ধার আসন থেকে নামিয়ে এনে ভুলে যেতে আমি একটুও লজ্জা পাবো না। মন বড় ছোটো আমার, বউ! ক্ষমা-ঘেন্না করতে শিখিনি বলে মাঝে মধ্যে নিজের ওপরেই ঘেন্না ধরে যায়। কিন্তু কি করে অস্বীকার করবো যে, আমিও সাধারণ মানুষের পালের মধ্যে একজন। আমিও সুখ খুঁজছি। তফাৎ বোধ হয় এইটুকুই, যে, আমি তোমাদের মতো বলতে পারি না, 'বেশ সুখে আছি, ভাই'। আমি জানি, আমি সুখে নেই। কেন, তা' জানি না। আসলে সুখ কাকে বলে তাই-ই জানি না। সেইজন্যেই পরশপাথরের মতো সুখ আমিও খুঁজে মরি। এবং সে কথা বলতে আমার লজ্জা নেই।

যথেষ্ট অনিচ্ছায় হলেও করিনের ছবি আঁকতে বসে অমন করে উঠে আসতে খারাপ লাগছিল। তবু ঈভলীন বা যিশুকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। কয়েক মুহূর্তের জন্যে দোটানায় পড়ে-ছিলুম। যে আমাকে প্যারিসে আসার বাতাস-টিকিট উপহার দিয়েছে, তাকে বেশি গ্রাহ্য করবো, না, যারা আমাকে এখানে শ্বাস টেনে টিঁকে থাকতে সাহায্য করেছে, করছে, তাদের কথা শুনবো? ঠিক তখনই, ঈভলীন বললে, "একটু বিপদে পড়েছি।" ঈভলীন বিপদে পড়ে আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। তার মানে, ওর এখন আমার সাহায্যের দরকার। এক ধাক্কায় ঈভলীনের হাত ছাড়ানো যেতো কি, বউ। ঈভলীনের? জেরি তো' তেমন কোনো বিপদে পড়েনি। প্যাটকে ভুলে আপন ফিঁয়াসের ছবি আঁকাতে এসেছে। বিপদের কোনো ব্যাপারই নেই।

আমাকে টানতে টানতে শিল্পীদের চত্বরের বাইরে নিয়ে এল ঈভলীন। পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিলুম। জেরি কি যেন বলছে যিশুকে। রেগে গেছে, মনে হচ্ছে। করিন উঠে দাঁড়াল।

ঈভলীনকে বললুম,

—"কি ব্যাপার? কি এমন বিপদে পড়েছো?"

আগের মতোই ব্যস্তভাবে বলল,

—"বলছি।"

যিশুও উঠে দাঁড়াল। হাত-পা' নেড়ে, যেন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে ওদের।

বললুম,

—"এক মিনিট, ঈভলীন। আমি ওদের একটু বুঝিয়ে আসি। ওরা চটে গেছে বোধ হয়।"

বলতে বলতে দেখি, করিনের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করেছে জেরি।

চট করে ঈভলীনের হাত ছাড়িয়ে বললুম,

—"চলে যাচ্ছে ওরা। এক্ষুনি আসছি—"

বলে, দৌড়োতে যাবো, ঈভলীন শক্ত করে আমার ডান হাতের কব্জি চেপে ধরল। পরিষ্কার গলায় জানিয়ে দিল,

—"ওরা আবার আসবে। কিন্তু তুমি যদি এখন আমার কথা না শোনো, তবে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

পারিপার্শ্ব মাথায় থাকা সত্ত্বেও লোভ সামলাতে পারলুম না।

দুষ্টুমির গলায় জিগ্যেস করলুম,

—"কি সম্পর্ক আছে, এখন?"

হাসলো ঈভলীন। বলল,

—"সুখের সম্পর্ক।"

—"তার মানে?"

—"বলছি। এসো।—"

রেস্তোরাঁর মধ্যে টেনে আনল আমাকে।

টেবিলে বসতে বসতে জেরিকে আর খুঁজে পেলুম না। হারিয়ে গেল জেরি। যিশুকেও দেখতে পাচ্ছি না আর। ঈভলীনের না হয় আমাকে দরকার পড়েছে। কিন্তু বিশু আমার বোর্ড ছিনিয়ে নিল কেন? পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, কোনো প্রশ্নের জবাবই ঠিকঠাক মাথায় এল না।

হঠাৎ কি বিপদে পড়ল ঈভলীন? আমা হেন হরিদাস কোন্ উপকারে আসবে ওর?

এ সব কৌতূহল একটু পাশে সরিয়ে রাখলুম। কারণ ও নিজেই বলবে এখন। তাই আবার জিগ্যেস করলুম,

—"কি সম্পর্ক, বললে না?"

ওকে কি সামান্য উত্তেজিত দেখাচ্ছে? নাকি চোখের ভুল! কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে ও অমন বারবার বাইরে তাকাচ্ছে কেন?

আমার প্রশ্নটি শুনে গাঢ় চোখ মেলে আমার দিকে তাকালে তুমি। যেন বললে, শুনতে পেলুম,

—"জানো না! আমি তো' তোমার স্ত্রী। তোমার বউ! মন, আত্মা এবং শরীরের গুহ্যতম, গভীরতম প্রদেশে আমাদের সম্পর্ক লেখা হয়ে আছে। মা'-বাবা, ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন-বন্ধুর সঙ্গে যে সম্পর্ক হতে পারে না, সেই সম্পর্ক তোমার-আমার। আমার অতীত হয়তো তোমার চোখে আমাকে ছোটো করে রেখেছে। আমি তা' জানি। তুমি যতোই বলতে, যতোই বলো, যে, আমার ফেলে-আসা সময় তোমাকে বিরক্ত করে না, অসুখী করে না—আমি জানি, তুমি এ সব কথা জোর করে নিজের ওপর আরোপ করতে চাও। তোমার গায়ের চাদরের খুঁটের সঙ্গে যখন আমার আঁচল বাঁধা হচ্ছিল, তখন ভাবছিলুম, ফেলে-আসার মতো আমার কিছু না থাকলেই ভালো ছিল। আমার অভিজ্ঞতা কষ্ট দিচ্ছে তোমাকে। তোমরা পুরুষ। তোমাদের অভিজ্ঞতার দাম আলাদা। আমি বা আমরা যে পরিবেশে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সেই সামাজিক পরিবেশের ইতিহাস এই বিংশ শতাব্দী ফুরিয়ে এলেও পাল্টায়নি। তাই আমি বা আমরা মায়ের পেট থেকে পড়েই অমোঘ নিয়মের মতো বিশ্বাস করতে শিখে গেছি,—বাবা ছাড়া আমাদের মায়ের আর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কতো নারীসঙ্গের অভিজ্ঞতা তোমার আছে, তোমার মুখ থেকে সে গল্প শোনবার জন্যে আমার প্রবৃত্তি বা মন মোটেই উৎসুক ছিল না। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যা' বলে গেছেন, সেই কথাগুলিই আমার কানে বাজছিল। নারীরা পুরুষের অলংকার। একটি পুরুষ, নারীর জীবন। নারীর অহংকার। সেই তীর্থকেও আমি একটি এবং একমাত্র পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলুম। ও আমার মধ্যে তেমনি বিশ্বাসই প্রবেশ করিয়েছিল। যে অপমান আমি ভুলতে পারি না, পারবো না। তাই তোমার জন্যে কষ্ট হয়। পায়ে পায়ে সাতপাক তোমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে পুরুতঠাকুরের মন্ত্র শুনছিলাম। ঠোঁট মিলিয়ে উচ্চারণ করছিলে তুমি। অর্থ কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। শুধু নিজেকে বড় অপবিত্র মনে হচ্ছিল। রান্না করে পাতে দেবার আগে যেমন মাছের আঁশ, পিত্ত জাতীয় আবর্জনা শরীর কেটে টেনে টেনে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি তখন আমি মনেপ্রাণে আমার সমস্ত অপ্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা টেনে টেনে ছিঁড়ে সেই যজ্ঞের আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছিলুম। কিন্তু তা' তো সম্ভব নয়! তাই যেন বাপের বাড়ি ছেড়ে আসতে হবে, এই দুঃখে চোখে আঁচল চেপে কাঁদছিলুম। সেখানে বাবা-মা', দাদা বা তীর্থ কারুর কথা ভেবেই কষ্ট পাচ্ছিলুম না। আমার অভিজ্ঞতার ওপর রাগে, ক্ষোভে ঘুরে ঘুরে কাঁদছিলুম। তোমার কথা অনুযায়ী, সব সাধারণ মানুষ-মানুষীর মতোই আমিও সুখ চাই। আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত সুখ তোমার মুখের মধ্যেই নিহিত আছে। আমার আপন মনের চোখে তোমাকে যেন সুখী দেখতে পাই—তাতেই আমার সুখ—"

কে বললে কথাগুলি! আমি ভাবলুম, না, তুমি বললে বউ? নাকি আমি ভাবলুম, তুমি বললে! না। তুমি নও, এ তো' ঈভলীন! কারণ, ঈভলীন হাসছে।

হঠাৎ হঠাৎ মামদোবাজির মতো গুলিয়ে ফেললেও ও যখন হাসে, একেবারে ঘুম থেকে জেগে উঠি। টের পাই, এ তো' আর কেউ হতেই পারে না—শুধু ঈভলীন।

হেসে বললো,

—"অমন করে গিলে খাচ্ছো কেন?"

আমি অবাক,

—"গিলে খাচ্ছি!"

আবার হাসল,

—"হ্যাঁ। চোখ দিয়ে।"

লাজুক হেসে সামলে নিলুম। কমসে-কম মিনিটখানেক ওর নীল চোখের মধ্যে ডুবেছিলুম। বললুম,

—"সম্পর্ক খুঁজছিলুম।"

এবারে শব্দ করে হেসে ফেলল ও। বললো,

—"পেয়ে তো' গেছোই।"

চমকে উঠলুম মনে মনে।

—"কি?"

—"এতক্ষণ ঠিক যা' ভাবছিলে, তাই।"

বলে কি ও? থট রিডিং-ফিডিং না কি সব আছে, তাই জানে নাকি ঈভলীন!

বললুম,

—"কি ভাবছিলুম বল তো'?"

সঙ্গে সঙ্গে ওর জবাব,

—"আমাদের সুখের সম্পর্কের কথা!"

বলেই দরজার বাইরে এক পলক দেখে নিল।

মন ঝাড়া দিয়ে টান হয়ে বসলুম। দূর! আমার মনের কথা কেউ জানে না। ঈভলীনই বা জানবে কোত্থেকে! সবাই যদি আমরা পরস্পরের মনের কথা জানতে পারতুম ঠিকঠাক, তাহলে তো' প্রলয় হয়ে যেতো। অথবা সেই আশ্চর্য অসম্ভব শব্দ 'সুখপাখি'র সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যেতো! হ্যাঃ!

বললুম,

—"কি বিপদের কথা বলছিলে, তাড়াতাড়ি বলে, অনেকক্ষণ হিচকক্ দিয়েছ।"

ওয়েটারকে দু'টো লাল ওয়াইনের অর্ডার দিয়ে টেবিলে-রাখা আমার হাত স্পর্শ করল। চোখের ইশারায় আমাকে বাইরে তাকাতে বলল,

—"ওই দ্যাখো—!"

কি দেখাতে চাইছে ও, কিছু বুঝলুম না। মোঁমার্ত্রের মেলার প্রায় আধখানা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। নতুন কিছু বা অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না। বিকেলের রোদ পড়ে সারা [illegible] খুশিতে, রংয়ে ঝলমল।

বললুম,

—"কি দেখব?"

শ্বাস ফেলার শব্দে কথা বলল ঈভলীন,

—"তুমি যেখানে বসে ছবি আঁকো, সেই প্যাকিং বাক্সের কাছে—"

চেয়ে দেখি, তিন-চারটে ফরাসী খদ্দের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

বললুম,

—"শাঁসালো খদ্দের মনে হচ্ছে, ঈভলীন। একটাকে গিয়ে পাকড়াই, চলো!"

ঈভলীন আমার হাত চেপে ধরে কানে কানে বলল,

—"সেইজন্যেই তোমাকে ধরে নিয়ে এলুম। ওদের খদ্দের ঠাউরে তুমি নিজেই ধরা পড়ে যেতে। ওরা পুলিসের লোক!"

[ক্রমশ]

॥ সতের ॥

একটা দানো-র মতো বিশাল বহেরু, উবু হয়ে পায়ের কাছে বসে আছে। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় রিকশাটা জোর ঝাঁকুনি দিচ্ছে মাঝে মাঝে, বহেরু, গাড়োয়ান যেমন তার গরুর গাড়ির গরুকে ধমকায়, ঠিক তেমনই ধমক মারে রিকশাওলাকে—এ্যাঁ, এ্যাঁ, হেই!

মুণীশটা রিকশা চালাচ্ছে, সে তেমন পাকা লোক নয়। রাস্তাটাও খারাপ। বর্ষার পর রাস্তার খানাখন্দ সব বেরিয়ে পড়েছে। কবে যে কে এ রাস্তা মেরামত করবে তার ঠিক নেই।

বহেরু মুখটা তুলে ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে বলে—বহুকাল কলকাতায় যাই না।

ব্রজগোপাল ভ্রূকুটি করে বলেন—যাওয়ার দরকারটা কি ছিল?

—সেখানকার মচ্ছবটা দেখে আসি একটু। কালিমায়ের মন্দিরেও যাবো। মাথাটা ঠুকে দিয়ে আসি। বহুকাল যাই না।

ব্রজগোপালের অবশ্য অন্য চিন্তা। নৃত্যরাম বলেছিল বেলদার বাজারের কাছে এসে রিকশায় উঠবে। একটু কষ্ট হল ব্রজগোপালের। বহেরুকে দেখলে ভড়কে যাবে নৃত্যরাম। বেঁটে মানুষ বলে তাকে কেউ পাত্তা দেয় না, ছেলেছোকরারা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে গাঁট্টা মারে, খামোখা চড় চাপড় দেয়। এমনই মজা। কিন্তু নৃত্যরামের জীবনটা এইসব মজায় তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। এখন আবার দোটানায় পড়ে বেচারার প্রাণ যায়। বহেরু তাকে রাখে তো, ছেলেরা তাড়াতে চায়। তা আজ বোধ হয় নৃত্যরামের পালানো হল না।

ঐ সামনে বেলদার বাজারের বড় বটগাছটা দেখা যাচ্ছে।

ব্রজগোপাল বলেন—গাড়ির দেরী আছে নাকি রে?

বহেরু বলে—অনেক দেরী।

বটগাছের কাছে মুণীশটা রিকশা থামিয়ে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায়। রিকশা চালিয়ে অভ্যাস নেই, হেঁদিয়ে গেছে।

বলে—একটু চা মেরে আসি। গাড়ির দেরী আছে। বসেন।

বহেরুও নেমে পড়েছে। ময়লা ধুতীর ওপর ফর্সা পিরানে তার চেহারায় গেঁয়ো ভাবটা ফুটে উঠেছে। বলল—এই ঝাঁকোর-ম্যাকোর করে রিকশায় আসতে মাজাটা ধরে গেল। হাঁটাচলা না করলে জুৎ পাচ্ছি না।

গাঁ-গঞ্জের লোকের স্বভাবই এই, কোথাও যাওয়ার তাড়া থাকে না, রাস্তায়-ঘাটে দশবার জিরোয়, দশবার চেনা লোকের খবর করে।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন—মুণীশটাকে তাড়া দে। নইলে ঠিক গাড়ি ফেল করাবে। তারপর ঘণ্টাভর বসে থাকো পরের গাড়ির জন্য।

বহেরু হুমহাম করতে করতে মুণীশকে তাড়া দিতে গেল। ব্রজগোপাল জানেন, বহেরু এখন বাজারের বিস্তর লোকের খবর করবে, বিষয় কর্মের ধান্ধা মেটাবে, তারপর আসবে।

ব্রজগোপালও রিকশা থেকে নেমে পড়েন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র। বুড়ো রাম কবিরাজ বলেছিল গোলমরিচ দিয়ে একটা পেটের অসুখের ওষুধ তৈরী করে দেবে। বাজারের পশ্চিম ধারে তার একটা টিমটিমে দোকান-ঘর আছে।

একটা গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সামনেই। গরু দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধা। গাড়িটা পেরিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রজ-

গোপাল, হঠাৎ শুনলেন মতিরামের গলা—ব্রজকর্তা!

ব্রজগোপাল একটু চমকে চারদিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন না। বেঁটে মানুষ, কোথায় কোন আড়ালে পড়ে গেছে। বললেন—সামনে এসো, অত ভয়ের কি?

গরুর গাড়ির চাকার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল মতিরাম, ডাক শুনে বেরিয়ে এল। তার মুখ ঘামে জবজবে। একটু কেমনধারা কষ্টের হাসি হাসছে।

বলল—রিকশায় বহেরুকে দেখে ঘাবড়ে লুকিয়ে পড়লাম।

ব্রজগোপাল বললেন—বরং ফিরে যাও মতিরাম। মাথা ঠান্ডা করে ভাবো গে যাও। পরে না হয় বলে কয়ে যেও। পালিয়ে গেলে লোকে নানা সন্দেহ করে। তার ওপর ধরো যদি কোনো জিনিসপত্র বা টাকা পয়সা এধার ওধার হয় তো তোমাকে চোর বলে সন্দেহ করবে। তার চেয়ে আমিই বরং বহেরুকে বলবখন, সে তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে।

মতিরাম কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে অসহায়ভাবে। তারপর উবু হয়ে বসে পায়ের একটা ফাটা আঙুলের ক্ষতটা

নিবিষ্টভাবে দেখার চেষ্টা করে বলে—দৌড়ে এসেছি। কোথায় যে হোঁচট খেয়ে চোটটা লাগল, বুঝতে পারলাম না। এখন ব্যথা করছে বড়।

এই বলে রাস্তার ধুলো তুলে ক্ষতে চাপা দিচ্ছিল।

ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বললেন—ওটা কি করছ? বিষিয়ে যাবে যে!

—ধ্যুৎ! ব্রজকর্তা কিছু জানেন না। ধুলোর মতো ওষুধ নেই। যখনই কাটবে একটু ধুলো চাপান দিয়ে দেখবেন, একদম ফর্সা।

ব্রজগোপাল আর কিছু বলেন না। যার যেমন বিশ্বাস।

মতিরাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে দেখল। বলল—একটা রিকশা হলে চলে যেতে পারতাম। এ পা নিয়ে কি হাঁটা যায়!

রিকশা তো আছেই, ফিরতি পথে তোমাকে নিয়ে যাবেখন, আমি বলে দেবো।

মতিরাম হাসে—ব্রজকর্তার যেমন কথা। নিয়ে যাবে কি! আপনি বললে এমনিতে না করবে না। কিন্তু মুণীশ ব্যাটাদের আমাকে দেখলেই নানারকম মজা চিড়বিড়িয়ে ওঠে। ঠিক মাঝপথে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। নয়তো এই বেলদার বাজারেই লোক জড়ো করে আমাকে বাঁদর নাচ নাচাবে। তার ওপর বহেরু যদি টের পায় যে পালিয়ে এসেছি তো বড্ড রেগে যাবে। রিকশায় কাজ নেই ব্রজকর্তা, হেঁটেই মেরে দেবো।

এই বলে মতিরাম কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল সট করে। ব্রজগোপাল দেখলেন, বহেরু আটাচাক্কির দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। মুণীশটাও রিকশার ভেঁপু বাজাচ্ছে প্যাঁ প্যাঁ করে। বহেরু বলল—কর্তা, সময় গড়িয়ে গেছে, গাড়ি এল বলে।

ভিড়ের গাড়ি। অফিসের লোক ঠেসেঠুসে উঠেছে। তার মধ্যেই বহেরু একটা চেনা লোক পেয়ে হেঁকে বলল—ওঠো তো কালাচাঁদ, উঠে এই বুড়ো মানুষকে বসতে দাও। ব্রাহ্মণ মানুষ দাঁড়িয়ে যাবেন নাকি!

কালাচাঁদ নামে লোকটি তাড়াতাড়ি উঠে ব্রজগোপালকে সত্যিই জায়গা ছেড়ে দেয়।

ব্রজগোপাল লজ্জা পান, বিরক্তও হন, বলেন—তোর যত গাজোয়ারী ব্যাপার বহেরু। লোকটাকে ওঠালি, দরকারটা কি ছিল?

—না না, ও দাঁড়িয়ে যাবেখন আমার সঙ্গে গল্পগাছা করতে করতে। আপনি বুড়ো মানুষ।

ব্রজগোপাল হেসে ফেলেন। বলেন—বয়েস কি তোরই কম নাকি!

—চাষার আবার বয়েস! বলে বহেরু মাথা চুলকোয়।

সারাক্ষণ দরজার কাছে বসে ব্রজগোপালের চোখের আড়ালে ওরা গাঁজা টানল দুজনে। ব্রজগোপাল স্পষ্টই টের পেলেন। হাওড়ায় নেমে দেখেন, বহেরুর চোখ দুটো ভারী ঝলমল করছে, মুখখানা টসটসে। তার অর্থ, বেশ নেশা হয়েছে।

—কোনদিকে যাবি? ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেন।

—কালিমায়ের থানটাই আগে দেখে আসি।

বাইরে বেরিয়ে এসে বহেরু অবাক মানে।

বলে—কর্তা, এ শহর যে থিক থিক করছে লোকে।

—হুঁ।

—ই বাবা, কতদিন, কতদিন পরে এলাম! তা এত পাল্টে গেছে বুঝবো কি করে! সবই অন্যরকম লাগছে।

বাসে উঠবার হুড়োহুড়ি চলছে। একটা বাস চলে গেল। আর নেই। লোকজন হা পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছে।

—এত গুঁতোগুঁতি আপনার সইবে না কর্তা, চলুন হেঁটে মেরে দিই। কত দূর আর হবে!

ডালহৌসী পর্যন্ত হেঁটেই এলেন ব্রজগোপাল বহেরুর সঙ্গে। সেখান থেকে বাসে উঠে কালিঘাট পর্যন্ত এক সঙ্গে। বহেরু নেমে যাওয়ার আগে বলল—ছ'টা পাঁচের ট্রেনে থাকব কিন্তু কর্তা।

ব্রজগোপাল স্নিগ্ধ স্বরে বলেন—আচ্ছা। দুপুরে কোথাও দুটি খেয়ে নিস।

বেশ লাগছে। শরৎকালটা বেশ সুন্দর। গোবিন্দপুরের তুলনায় কলকাতায় একটু গরম বেশী। তা হোক, তবু এই বর্ষার পরে ভারী চমৎকার লাগে চারদিক। মনটাও ভাল, কারণ এখন আর কারো কাছে কোনো প্রত্যাশা নেই।

ঢাকুরিয়ার বাড়িতে পা দিয়েই কিন্তু বড় থতমত খেয়ে গেলেন ব্রজগোপাল। দরজা খুললেন ননীবালা নিজেই। খুলে বিষণ্ণ অদ্ভুত একটা মুখ বের করে খুব অবাক হয়ে দেখলেন ব্রজগোপালকে। চিরকালের সেই বড় বড় টানা চোখ ননীবালার, এই চোখই পেয়েছে সোমেন। এই বুড়ো বয়সেও ননীবালার চোখ দেখলে মন জুড়িয়ে যায়।

কিন্তু সেই বড় বড় চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে টসটস করছিল। ননীবালা আঁচলে আড়াল করলেন মুখ। কথা বলতে পারলেন না। একবার কেবল ফুঁপিয়ে উঠলেন।

বুক কাঁপছিল। তবু ব্রজগোপাল গলা ঝেড়ে বলেন—কি হল?

(ক্রমশ)

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ৬ ॥

যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র সাধারণ লোকরা এই কথাটাই শুধু জানে, ভারতবর্ষ হাড়-দরিদ্র এবং ভারতীয়রা পৃথিবীর সকল দেশে অন্ন ভিক্ষা করে বেড়ায়। হতভাগ্য এবং গরীব দেশকে আমেরিকা করুণার চোখে দেখে, এবং অন্ন ও অর্থ দিয়ে তাদের কাছ থেকে বশ্যতা কিনে রাখে। ভিখারীদের মধ্যে কেউ যদি আত্মস্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা ও স্বাধীন মতবাদের পরিচয় দেয়, আমেরিকা তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা পায়। আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট শক্তের কাছে নরম থাকে।

কিন্তু আমেরিকার নিজের ভূভাগের যে একটা বিশাল অংশ শত শত বছরের দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অন্নাভাবে জরোজরো তার কথা একটু না বলে পারছিনে। আমি যখন ষড়ৈশ্বর্যময় টেক্‌সাস স্টেটে ভ্রমণ করছিলুম এবং কোটিপতি ব্যবসায়ীদেরকে হাততালি দিয়ে যাচ্ছিলুম, তখন টেক্‌-সাসের পশ্চিমাঞ্চল রায়ো গ্রাণ্ডে-র (Rio Grande) হতভাগ্য অধিবাসীদের দিকে আমার চোখ ছিল। যাঁরা মার্কিন ভূমির খবর একটু আধটু রাখেন তাঁরাই জানেন, এই ভূখণ্ডের মধ্য-পশ্চিম, দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর পশ্চিম এবং কালিফর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বভাগ—সব মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা আজও অনুন্নত। যেমন ধরুন, পশ্চিম কলোরাডো, নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা, লাস ভেগাস,—এদের মরুভূমি, অনধ্যুষিত উপত্যকা, রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চল, অবহেলিত লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুদলের জীবনযাত্রা—অদ্যাবধি রাষ্ট্রের আনুকূল্য যথেষ্ট পরিমাণ পায়নি। এর মধ্যে 'রায়ো গ্রাণ্ডে'র দুর্দশা ও দারিদ্র্য অকথনীয়। এই ভূভাগটুকুর পরিমাণ মাত্র নয়শ মাইল এবং এরই পাশে নিউ মেক্সিকো। এখানে আধুনিক কালের সুবিধা সুযোগ আজও পৌঁছয়নি। এ অঞ্চলে কোথাও ইলেকট্রিক, কলের জল, রোগের ওষুধ, আহার্য সামগ্রীর হাট বাজার—কিছু নেই। মরা-নদীর কাদা গোলা জল খেয়ে এরা বাঁচে, মাছধরা নৌকার সাহায্যে বহুমাইল পথ পেরিয়ে আর্লিংটন নামক ছোট শহরে চিকিৎসককে ডাকতে যায়, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে মরে, ছোট ছেলে মেয়েরা খাদ্যসামগ্রীর খোঁজে চারদিকে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, প্রবীণ বয়স্করা ঈশ্বরকে ডাকে এবং রক্ত আমাশয়ে ভোগে। উক্ত নয়শ মাইল অঞ্চলের অধিবাসী প্রায় ২০ লক্ষ লোকের খোঁজখবর নেয় স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তাররা বছরে দু'একবার মাত্র। চারিদিকের এই দারিদ্র্য, অন্নাভাব ও অনড় দুর্ভাগ্যের দিকে চেয়ে তারাও আর বিশেষ ও-পথ মাড়ায় না। রোগীরা দলে দলে নদীর ধারে এসে জড়ো হয় কমবেশি ৬০।৭০ মাইল পথ পেরিয়ে। এদের না আছে শিক্ষা, না স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়, না বা কোনও প্রকারে বাঁচাবার সুযোগ। এদের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে আদিবাসী—যাদের নাম দেওয়া হয় ইণ্ডিয়ান, আর রয়েছে পুরাকালের স্প্যানিস এবং বাকি মেক্সিকান। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা এককালে এদেরকেই মারধর করে দূর-দুরান্তরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। শক্তিমান শাসকদের দিকে চেয়ে এরা আজও তাদের নিরুপায় জীবন যাপন করে। নেভাদা, ইউতাহ্ প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যগুলির প্রায় একই অবস্থা।

কলোরাডোর উত্তরভাগ জুড়ে রয়েছে 'ফ্রণ্ট রেঞ্জের' বিশাল পর্বতমালা। তারই ভিতর দিয়ে বোধ করি পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম নীল নদী কলোরাডো নেমে এসেছে দক্ষিণ পশ্চিমের মরুভূমির পথ ধরে পাহাড় পর্বত ও মরুউপত্যকা পেরিয়ে। যখন এই নদী উত্তর আরিজোনায় ঢুকেছে, তখন সে তার সর্পিল গতিপথে এসে প্রবেশ করেছে 'গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন' নামক এক বিশ্ববিখ্যাত ভূগর্ভে। ভূতত্ত্ববিদরা জানেন, এই জটিল ভূগর্ভের ওই সর্পিলভঙ্গী ফাটল সৃষ্টির কোন্ কাল থেকে এই ভূভাগের বিদারণ ঘটিয়েছিল। এই 'গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন্' বহুস্থলে ৫ মাইল অবধি চওড়া এবং এই আঁকাবাঁকা বৃহৎ ফাটলের এক মাইল নিচে দিয়ে খরস্রোতে বয়ে চলেছে কলোরাডো নদী—বালককাল থেকে যার বিস্ময়কর কাহিনী পড়ে এসেছি বার বার। প্রায় তিনশ মাইল জুড়ে রয়েছে উত্তর আরিজোনায় এই 'গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন'—যার অপার্থিব এবং বর্ণবাহার দৃশ্য দেখার জন্য পৃথিবীর বহু পর্যটক হাজার

মাইল মরুপাহাড় পেরিয়ে দুঃসাধ্য পথ ধরে এসে হাজির হয়।

কিন্তু এই মরু পাহাড়পথ কলোরাডোকে ধরে দক্ষিণ পশ্চিমে ক্যালিফর্নিয়ায় এসে এক সময় সুদূর দক্ষিণে উপসাগরে এসে মিলেছে। পূর্ব ক্যালিফর্নিয়ায় এই মরুভূমির নাম হয়েছে 'সান বার্নাডিনো'। কিন্তু এই ঊষর, অনুর্বর মরুপ্রান্তর ও রুক্ষ পাহাড়ের চারিদিকে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ওয়েসিস ও খেজুরের বন, মাঝে মাঝে নদী এবং তৃণভূমি। কিন্তু এদের পশ্চিম সীমান্তের মরুলোক পেরিয়ে গেলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ক্যালিফর্নিয়ার সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্যের মধ্যে পৌঁছনো যায়। আমেরিকানরা বলে, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিম ক্যালিফর্নিয়াই হল প্রকৃত স্বর্ণভূমি।

একদা এক অপরাহ্ণকালে লস এঞ্জেলেসে এসে পৌঁছলুম। মহাসাগরের তীরবর্তী এই মহানগরীর যে অংশটির নাম 'হলিউড' তারই ক্রোড়ভূমির নাম 'বিভার্লি হিল্‌স'—সেটি পার্বত্যভাগ। এই পার্বত্য উপত্যকার বিভিন্ন সুন্দর পথগুলি একে

একে নেমে এসে কয়েকটি প্রশস্ত রাজপথের সঙ্গে মিলেছে। যেটি সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ও প্রশস্ত—সেই পথটির নাম উইলশায়ার বুলেভার্ড। এই পথের উপরে একটি বহুতল অট্টালিকায় উঠে বাসা বেঁধেছিলুম।

সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে যদি এক সুবিশাল পার্বত্য উপত্যকাভূমি বলে বর্ণনা করি তাহলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। এই মহাদেশকে একদিকে আটলান্টিকের গ্রাস থেকে রক্ষা করছে প্রায় আড়াই হাজার মাইলব্যাপী উপত্যকাভূমি উত্তর থেকে দক্ষিণে, এবং পশ্চিমের প্রশান্ত মহাসাগরের জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে দু'হাজার মাইলেরও বেশি দীর্ঘ তিনটি উপত্যকাময় অঙ্গরাজ্য কালিফর্নিয়া, ওরেগন ও ওয়াশিংটন। লস এঞ্জেলেসে এসেও দেখছি এর ব্যতিক্রম হয়নি। তিনদিকের পার্বত্য উপত্যকা দিয়ে এই সুবৃহৎ নগরটি যেন পরম যত্নে আগলিয়ে রাখা হয়েছে। এ নগর যেন সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময়।

আমাদের সুউচ্চ অট্টালিকার পিছনে যে দুটি বিভার্লি হিলস্ দেখতে পাচ্ছি ও দুটি জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছে সিনেমা চিত্র প্রযোজকদের কৃপায়। ওখানে দেখতে পাচ্ছি 20th Century Fox, Warner Bros, Metro Goldwin Meyers, Universal প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ধনকুবের প্রযোজকদের প্রাসাদ ও তাঁদের স্টুডিয়ো। যাঁরা বিশ্ববিশ্রুত অভিনেতা ও অভিনেত্রী—যাঁদের জীবনযাত্রা নিয়ে পৃথিবীর সকল দেশে ও সমাজে বিভিন্ন বিচিত্র গল্প, উপকথা, বাস্তব ও অবাস্তব কাহিনী এবং আজগুবী কল্পনার নানা সংবাদ প্রচলিত,—তাঁদের দেখতে পাচ্ছি যখন তখন। কিন্তু হলিউড যেন আগাগোড়া নীরব এবং বৈষয়িক। আমোদ, আহ্লাদ, হইচই, স্বেচ্ছাচার, শিল্পীজনোচিত বেপরোয়া ভাব, নিয়মনীতিজ্ঞানহীনতা—কোনটাই চোখে পড়ছে না, চারিদিক শান্ত এবং নিরুদ্বেগ। ওদের মধ্যে একজন ব্যালেরিনা নর্তকী আমাদের ফ্ল্যাটে আসে, নাম মেরিয়া—সুশ্রী ও সুন্দরী,—সে এসে আমোদ আহ্লাদ করে সকলকে সমাদর জানিয়ে হইচই করে চলে যায়। আর আসেন একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী—নাম শার্লি ম্যাকলীন। যে-ব্যক্তি শার্লির প্রিয়জন তার নাম শ্রীমান্ বিক্রম চৌধুরী,—বলিষ্ঠকায় এক তরুণ যুবক। বিক্রম হল পরলোকগত বিষ্ণু ঘোষ মহাশয়ের ছাত্র ও শিষ্য। এখনও তার বয়স তিরিশ হয়নি। সে হঠযোগের বহুপ্রকার নিয়মনীতিতে সিদ্ধহস্ত। প্রথম জীবনে সে যৌগিক ব্যায়ামের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বোম্বাই শহরে। পরে সে জাপানে আসে এবং নিজ উদ্যম ও প্রচেষ্টায় টোকিও শহরে বিরাট এক যোগ-ব্যায়ামের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। জাপানের এক কোটিপতি নুব্জদেহ মহিলাকে সে ছয় মাসের মধ্যে যৌগিক ব্যায়ামের দ্বারা সম্পূর্ণ সহজ করে তোলে, তার জন্য বিক্রমের খ্যাতি রটে যায় সর্বত্র। মহিলার নাম মিসেস ওসানো। অতঃপর সে আসে আমেরিকায়। সান ফ্রান্সিসকো এবং লস এঞ্জেলেসে সে মস্ত দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের নাম হয় 'Yoga College of India।' এখানে এসে দেখছি, জাপানের মতো এখানেও তার শত সহস্র ছাত্র-ছাত্রী। ওদের মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী, ছাত্র, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ব্যবসায়ী, আপিসের কর্মী, শিক্ষক, নর্তকী—সকলেই ওর শিক্ষাকেন্দ্রে আসে যৌগিক ব্যায়াম করার জন্য। শিরা উপশিরা ও পেশীর বিভিন্ন পরিচালনা, শরীরের ওজন কমানো, পেশীকে শক্ত রাখা, দুরারোগ্য ব্যাধি বা বিভিন্ন নামের বাত সারানো,—এই নিয়ে সকলকে 'আসন' করতে দেখছিলুম। সুদূর বিদেশে এসে একজন বাঙালী যুবকের এই অনন্য কৃতিত্ব দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলুম। হলিউডের বহু অভিনয়শিল্পীরা গুরুর মতো বিক্রমকে মান্য করে। এই কীর্তিমান ব্রাহ্মণ যুবকের এশিয়া ও আমেরিকা জোড়া খ্যাতির চেহারা দেখে ওর নাম রেখেছিলুম 'সম্রাট বিক্রমাদিত্য।' এমন সংযত নিরভিমান ও চরিত্রবান যুবক সহসা চোখে পড়ে না।

লস এঞ্জেলেস শহর ছাড়িয়ে প্রান্তর পেরিয়ে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চলে যাচ্ছিলুম উত্তরের মরুভূমি অঞ্চলে। এই মরুলোক 'মাজাভে' নামে পরিচিত। প্রায় ১৫০ মাইল পথে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন বিক্রমের এক ছাত্রী শ্রীমতী টেরী। সঙ্গে ছিলেন বিক্রমের মা শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী, পিতা কালীকিঙ্কর, ভগিনী শ্রীমতী লুসাই, শ্রীমতী জেনেট, অরুণ

ধুরী ও বিক্রম। এই টুরিস্ট ভ্যানটি টি ৮জনসহ দূর রুক্ষ ও কর্কশ মরুপথে ওয়েসিসে গিয়ে দাঁড়াল, সেটি ক্ষুদ্র কটি জনপদ, নাম পামস্প্রিং। দুধারে জুরের বনবাগান আর নানা ধরনের লোক সজ্জা। সেখান থেকে আরও ৩০ ইল এগিয়ে সন্ধ্যারাত্রে যে রাজকীয় ংলোয় গিয়ে রাত্রিবাসের জায়গা নিলুম টি এক ধনবতী মহিলা শ্রীমতী অ্যানি রীর দৌলৎখানা। ইনি বিক্রমের ছাত্রী বং এ'দের নাকি নিজস্ব অনেকগুলি জট বিমান আমেরিকার আকাশে ওঠে। ই বাংলোটি তাঁদের শখের বাগানবাড়ি। খানে যে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিটি বাগানবাড়ির দারক কাজে লিপ্ত তার সাপ্তাহিক বেতন ৫০ ডলারের কিছু বেশি। এই াংলোটি আগাগোড়া 'এয়ার কনডিশন' রা এবং মোটা কার্পেট ছাড়া এর মেঝে কাথাও দেখা যায় না। ভিতরের আসবাব-পত্রের বাজার মূল্য ২ লক্ষ ডলার। এর সঙ্গে কাঠের কাজ, চিত্রাঙ্কন, মদের সেলার, বিবিধ অলঙ্করণকার্য, তৈজসাদি, স্নানাগারগুলির নানাপ্রকার খুঁটিনাটি, সুইমিং পুল, শয্যাসমারোহ, আলোকসজ্জা প্রভৃতি ভারতের প্রাক্তন মোগল বাদশাহদেরও ঈর্ষার কারণ ঘটাতে পারত। শুনলাম এ সম্পত্তির দাম নাকি কম বেশি ১০ লক্ষ ডলার। সুদূর মরুলোকে যেখানে সূর্যের খরতাপ ১৩০ ডিগ্রিতে ওঠে, সেইখানে এক বাংলোর মধ্যে সর্বাঙ্গীন মধুর স্নিগ্ধতা যথেষ্ট আরামদায়ক বইকি। মেয়ে ও ছেলেরা পরম আনন্দে সাঁতারের পোশাক পরে 'ওয়াটার পলো' খেলা নিয়ে পরদিন সকাল থেকে ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করে দিল।

এই পামস্প্রিং মরুভূমির এক পাহাড়ের সাড়ে ৮ হাজার ফুট উঁচুতে মাত্র ১৪ মিনিটে তুলে দেয় একটি 'রোপওয়ে' যার অপর নাম ট্রামওয়ে। এটি একটি বড় বাক্স —যার মধ্যে অন্তত ৫০ জন মানুষ ধরে। সোজা চূড়ায় উঠে আমরা দেখি মস্ত লাউঞ্জ এবং রেস্তোরাঁ। 'কিউরিয়ো শপ' এখানে ওখানে। ভিতরটি ঠাণ্ডা। এটি নতুন। শুনলাম দু'বছরে এটি তৈরি হয়েছে; খরচ পড়েছে ৯০ লক্ষ ডলার। চারিদিকে অনন্ত মরুভূমি তখন যেন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আমরা নেমে এসে আবার ফিরে চললুম।

পূর্ণিমার রাত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের উচ্চ তীরভূমি থেকে লস এঞ্জেলেসের আলোকমালা এক অপার্থিব দৃশ্যের অবতারণা করে। সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী যেন ফুলঝুরির খেলায় মেতে ওঠে সন্ধ্যা-রাত্রে—যখন কুইন মেরী ও মেরীনা বীচ পেরিয়ে দূর দূরান্তরে চলে যাচ্ছিলুম।

এই নগরের হাজার হাজার প্রাসাদোপম অট্টালিকার মধ্যে যেটি সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি মস্ত এক বাগানবাড়ি, নাম 'অ্যামবাসাডর হোটেল।' এই হোটেলটির ঠিক বাইরে একদা নেমে আসবার সময় রবার্ট কেনেডিকে হত্যা করে এক লেবানিজ যুবক, নাম সিরহান। রবার্ট কেনেডির অপরাধ, তিনি প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হয়ে নির্বাচনে নামবার আয়োজন করছিলেন। তিনজন কেনেডির একে একে অপমৃত্যু ঘটে, এখন বাকি রইলেন এডওয়ার্ড কেনেডি।

পশ্চিম মহাসাগরের তীরে আমেরিকার সর্ববৃহৎ বন্দরগুলি লস এঞ্জেলেসকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উঠেছে। এর এক একটি 'বে' কয়েকটি জাহাজ-ঘাটার কেন্দ্র। এই মহানগরী আপন সম্পদে, বৈভবে, প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যে, ফলনে ও ফসলে, নাগরিকদের সচ্ছল জীবন ব্যবস্থায়—সমগ্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

আমেরিকার কয়েকটি রাজ্য—যেমন টেক্সাস, কলোরাডো, নিউ মেক্সিকো, আরিজোনা, উত্তরের ডাকোটা, নেভাদা, ওরেগন, মনটানা প্রভৃতি আজও ক্ষুধার্ত ও অনুন্নত। এদের কান্নাকাটি এখনও রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের কানে উঠছে না। কিন্তু সম্প্রতি আদিবাসীদের বিলুপ্ত সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ঘটতে আরম্ভ করেছে। তাদের মধ্য থেকে এক বিরাট ও বিক্ষুব্ধ নেতৃত্ব উঠে দাঁড়াচ্ছে। তারা মনে করে বিগত চারশ' বছর ধরে তারা বঞ্চিত, লুণ্ঠিত এবং প্রতারিত। ঔপনিবেশিক আমেরিকানরা, যারা শ্বেতাঙ্গ, —যারা আজ রাষ্ট্রের হর্তা-কর্তা, যারা শত শত বছর ধরে 'রেড ইণ্ডিয়ান' নাম দিয়ে তাদেরকে মারণাস্ত্র দ্বারা নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে এসেছে, তাদের হিসাব নিকাশের দিন সমাগত। এই সম্পর্কে প্রাক্তন কমিশনার (U. S. Commissioner of Indian

Affairs) মিঃ জন কোলিয়ার গভীর বেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে আমেরিকার আদিবাসীদের আদি ও বর্তমান ইতিহাস নিয়ে যে প্রসিদ্ধ একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেই বইটির নাম, 'Indians of the Americas.' এই জগৎ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন কোলিয়ার প্রাচীনতম ইতিহাস উদ্ধার করে জানিয়েছেন, এই আদিবাসীরা হল এশিয়াবাসী মঙ্গোলীয় রক্তজাত। এরাই হল আদি চীনা, জাপানি, বর্মি, সিয়ামি, তিব্বতীয়, মালয়ী, এস্কিমো, ল্যাপ, ফিন, ম্যাগিয়ার তুর্কি এবং বন্য সম্প্রদায়ের মানুষ। আমেরিকার ভূমি হল তাদেরই যারা বেরিং প্রণালী ডিঙিয়ে আলাস্কার ভিতর দিয়ে দক্ষিণ পথে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও ব্রেজিলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মিঃ কোলিয়ার ১৫ হাজার বছর আগে সেই প্রস্তর যুগ থেকে অদ্যাবধি ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

একদা সমস্ত পৃথিবী হাঁটকিয়ে সকল দেশ থেকে প্রতিভাবানদেরকে ডেকে এনে আমেরিকা তার আপন দেশকে সাজিয়ে গড়ে তুলেছে বিপুল সম্পদে ও বৈভবে। বিজ্ঞান প্রগতিতে বিশ্বে তার জুড়ি নেই। নির্মাণ, গঠন, সংরক্ষণ প্রভৃতি বিদ্যায় সে অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছে গত একশ' বছরে। এখন সে নতুন-নতুন দিগন্তের দ্বার খোলবার চেষ্টা পাচ্ছে। নব নব প্রয়াস নিয়ে সে যদি আরও এগিয়ে যেতে না পারে, যদি অধিকতর উন্নতির পথে অভিযান না করতে পারে, তবে তার এই অতি বিলাস ব্যবস্থার মধ্যেই দেখা দেবে শৈথিল্য ও আলস্য। এরই মধ্যে, তার বশম্বদ কয়েকটি দেশ তার পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সরবরাহের ভার নিয়েছে, যেমন কোরিয়া, ফিলিপিন, টাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি। জাপানি যন্ত্রপাতি ও মোটর 'তয়োতা'য় আমেরিকার বাজার ছেয়ে যাচ্ছে। তবে যদি পৃথিবীর কোথাও আবার বড় রকমের যুদ্ধ বাধে, তবেই আমেরিকার শিল্পপতিরা আরেকবার সক্রিয় হয়ে উঠবে, কেননা তারা জানে তাদের অর্থনীতি হল যুদ্ধকেন্দ্রিক (war based)। ও ব্যাপারে তারা নির্দয় ও নির্মম। তারা 'বরের ঘরে মাসী, কনের ঘরে পিসি।' তখন চোর একদিকে চুরি করবে, গৃহস্থ অন্যদিকে সতর্ক হবে।

লস এঞ্জেলেস থেকে চারশ' মাইল উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমি ধরে একদা এসে পৌঁছলুম সান ফ্রান্সিসকো শহরে। এটি সম্পূর্ণ পার্বত্য শহর, পাহাড়গুলির প্রতি দেওয়ালে এবং প্রতিটি বড় বড় উপত্যকায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ মানুষ বাসা বেঁধে রয়েছে। একদা

সেঞ্চুরীর
ডোরিয়া শাড়ী
এমন মনোরম উঁচু মানের জিনিষ
শুধু সেঞ্চুরীই উপহার দিতে পারে।
সেঞ্চুরীর ডোরিয়া শাড়ীতে নতুন আরাম-
দায়ক শীতলতা আবিষ্কার করুন। বার বার
ধোনার পরও এর রঙের ঔজ্জ্বল্য, নকশার
প্রাণবন্ততা, ছাপার উজ্জ্বলতা, সতেজ ভাব,
সব বজায় থাকে। সেঞ্চুরীর ডোরিয়া—
শাড়ীর দুনিয়ায় এবটি নতুনত্ব
স্থাপন।

স্প্যানিশ ধর্মযাজক সেণ্ট ফ্রান্সিস এখানে এসে ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সুতরাং এই শহর তাঁরই নামাঙ্কিত। 'কো' মানে পাহাড়, এটি এশিয়াবাসীরা জানে। এখানকার সমুদ্রে কয়েকটি ছোট বড় দ্বীপ, ক্রীক, উপদ্বীপ—এগুলি দৃশ্যত সুন্দর। পাহাড়ে সমুদ্রে বনশোভায় এবং নিত্যবসন্তের আবহাওয়ায় এই পার্বত্য নগরী মনোরম ও সমৃদ্ধ। আমার বাসস্থান পেয়েছিলুম এই শহরেরই প্রান্তে 'ডেলি সিটি' নামক এক নিরিবিলি অঞ্চলে। এখানে আমার ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু রমেন চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী অর্চনা নিজস্ব বাড়িতে থাকেন। দুঃখের কথা, আমাদের সুপরিচিত বন্ধু অধ্যাপক ও দার্শনিক হরিদাস চৌধুরী মহাশয় মাত্র ৫ সপ্তাহ আগে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গেছেন। তাঁর উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী শ্রীমতী বীণা চৌধুরী সন্তানাদি নিয়ে তাঁদের নিজেদেরই বাড়ি কাম্বারল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডলোরেস পাহাড়ের চূড়ায় বাস করেন। আমার পৌঁছবার পরদিনই সন্ধ্যায় তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করেন।

দার্শনিক হরিদাসবাবু বোধ করি ২২।২৩ বছর আগে এদেশে আসেন এবং American Academy of Asian Studies নামক প্রতিষ্ঠানে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান হয়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অধ্যাপনা করেন। এখানে তিনি ধীরে ধীরে দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার একটি হল, 'Cultural Integration Fellowship' এবং অন্যটির নাম 'California Institute of Asian Studies' শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম দর্শনবাদের প্রবক্তা হিসাবে হরিদাসবাবুর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ভারতের মতো এদেশেও ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব ঘটেনি। আমেরিকান সমাজের উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত মহলে তিনি বহুজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে কালিফর্নিয়া স্টেট হল বহুকাল থেকে সকল ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে চীনা সম্প্রদায় একটি বড় অংশ—কিন্তু তারা বহুকালের। তাদের সঙ্গে রক্তিম চীনের যোগাযোগ নেই,—যেমন কলকাতায় দেখা যায়। তারা বৌদ্ধ ও কন্‌ফুসিয়াসপন্থী। স্প্যানিস, মেক্সিকান, জাপানিজ, মুসলীম, হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান—সকলেই রয়েছে গায়ে গায়ে। বহু বাঙ্গালী আছেন কালিফর্নিয়ায়। একদা স্বামী বিবেকানন্দ এখানকার হ্যামিলটন পাহাড়ের চূড়ায় একটি 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। সেটি এখন নেই। তাঁরই অনুগামী স্বামী যোগানন্দ ও অশীতিপর শ্রীযুক্ত বসুকুমার বাগচী মহাশয় মিলিতভাবে এদেশে একটি যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে আসেন স্বামী পরমানন্দ ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী যাঁদের কথা পূর্বপত্রে আলোচনা করেছি। তাঁরা এসে 'আনন্দ আশ্রম' গড়ে তোলেন। শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বার 'গদর' পার্টির কর্মকেন্দ্র—এরা একে একে গড়ে উঠেছে বহুকাল থেকে।

পৃথিবীব্যাপী এখন যে 'হিপ্পি' আন্দোলন চলছে—যারা আজ ছড়িয়ে পড়েছে ৫।৬টি মহাদেশে, তাদের প্রথম 'জন্ম' ঘটেছিল এই সানফ্রান্সিসকো নগরের অ্যাসবেরি অঞ্চলে। সম্পদ ও বৈভবের অতি প্রাচুর্য, পিতৃমাতৃ সমাজের বিবাহ-বিচ্ছেদ, অবহেলিত সন্তান সম্প্রদায়, শিল্পপতিদের ভয়াবহ ধনলোভ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানবসমাজের দিশাহারা জীবন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নৈতিক বুদ্ধির অবনতি, যুদ্ধের কালে লক্ষ লক্ষ জারজ সন্তানের আবির্ভাব—এদের সম্মিলিত প্রভাবের মধ্যে এই সমাজবিরোধী জাতিধর্মবিরোধী, আদর্শবাদবিরোধী এক সম্প্রদায়ের জন্ম ঘটে এই শহরে,—যারা নিজেদেরকে সর্বপ্রকার শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিলাস বিসর্জন দেয়, ধনদৌলতের প্রতি বিরূপ হয় এবং দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এরা গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, দেশসেবা—কোনটার প্রতি আসক্ত নয় এবং এরা সর্বসংস্কারমুক্ত এক নতুন জাত।

আমি চলে যাচ্ছিলুম দূর থেকে দূরে—গোল্ডেন ব্রিজ গেট পেরিয়ে মেরিন কাউন্টি ছাড়িয়ে 'সান আমসেলমো' আর 'সান কুইনটন ও আলকাটরাজ' দ্বীপের ধার দিয়ে অজানা আরণ্যলোকের নির্জনতায়। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এক স্থলে যেখানে এসে থামলুম, সেখানে দেখি ভিক্টোরীয় যুগের গম্বুজযুক্ত এক অট্টালিকা—যেটির নাম 'আলী আকবর কলেজ অফ মিউজিক।' এখানে আমার বন্ধু নৃত্যশিক্ষক প্রহ্লাদ দাস মহাশয়ের ছেলে শ্রীমান চিত্রেশ আমেরিকান ছেলেমেয়েদেরকে নাচ শেখান। দোতলায় উঠে দেখি বিভিন্ন বিভাগে বাদ্যযন্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এটি বাঙ্গালীর গৌরবজনক প্রতিষ্ঠান।

অতঃপর 'ট্রেজার আইল্যাণ্ডের' পথ ধরেছিলুম। চললুম সাত মাইল লম্বা একটি ব্রিজের উপর দিয়ে—যার নাম 'বে ব্রিজ'। এখান থেকে পথ গেল ক্যাসস্ট্রো মার্কেটের দিকে। দূরে দেখতে পাচ্ছি নগরের নাভিকেন্দ্র, বহুতল অট্টালিকাশ্রেণী—যার নাম ডাউন টাউন। পার হয়ে গেলুম 'সান রাফেল রিচমণ্ড ব্রিজ।' দেখতে দেখতে বহু পথ মাড়িয়ে বহুপথ ঘুরে আবার চললুম একখান থেকে অন্যখানে। কালিফর্নিয়ার রাজধানী 'সাক্রামেণ্টো'র দিকে যাবার চেষ্টা ছিল। এ যেন নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানো। আরম্ভ করেছি সেই কোথায় কানাডার পূর্বপ্রান্ত থেকে—তারপর আটলাণ্টিকের পশ্চিম সীমা ধরে দূর দক্ষিণে দেখতে দেখতে এসে ফ্লোরিডার তলা দিয়ে মেক্সিকো উপসাগর ডিঙিয়ে এসে পড়েছি একটির পর একটি স্টেটের ভিতর দিয়ে। সমস্তটা ভাবলে নিজেই অবাক হই। এখানে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বতীরে দাঁড়িয়ে ভাবছি, তিন মাসের এই অশ্রান্ত ভ্রমণ কোথা থেকে কোথায় আমাকে নিয়ে এল। এখনও কতদূরে যাবো, কোন্‌-কোন্‌ স্টেটে এক-একে থামব, নিজেই তার হিসেব জানিনি। দুরারোহ পাহাড়, অন্তহীন [illegible], অজানা মরুভূমি, লেক সুপিরিয়রের উত্তরবর্তী তুষার লোক ইউকন, উত্তরমেরু অঞ্চল—এরা সবাই মিলে আমাকে যেন অদৃশ্য নিয়তির মতো আকর্ষণ করে চলেছে একে একে। এই বিরাট মহাদেশ পরিক্রমায় আমার পক্ষে বিশ্রাম নেবার কথা ওঠে না।

সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমে সূর্যাস্তকাল দেখছিলুম। আমার মনে পড়ছিল কন্যাকুমারীর সেই দক্ষিণবিন্দু যেটি গান্ধী স্মৃতি সৌধ। তারই বারান্দায় প্রভাত ও সন্ধ্যায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায়, বাঁ দিকে সমুদ্রের ভিতর থেকে রক্তিম সূর্য উঠছে এবং ডান দিকে সেই রাঙা সূর্য ভারত মহাসাগরের তলায় ডুবছে। এখানে আমি যাচ্ছিলুম তীরভূমি ধরে দক্ষিণ পথে প্রায় একশ' মাইল দূরে। পিছনে ফেলে যাচ্ছি সাগরের কোলে সেই তিনটি ছোট ছোট রক-পাহাড়,—মৈনাকের

মতো মাথা উঁচু করা। ওই পাহাড়ে বাসা বেঁধে থাকে সিন্ধুঘোটক, অপভ্রংশে যার নাম sea-lion আর থাকে শিলমাছ—যারা জলের তলায় ঢুকে মাছ ধরে খায়। ওদের কাছ থেকে মাছের ভাগ নিতে আসে Sea gull-রা—তারাও সাদা ও পাঁশুটে রংয়ের সিন্ধুপাখি বা সিন্ধু শকুন। একদিকে আমার পাশে রয়েছে পশ্চিমসাগরের সূর্যাস্তকাল, অন্য দিকে বিশাল পর্বতশ্রেণীর আঁকাবাঁকা ক্রোড় উপত্যকায় কখনও বেরির বন, কখনও কমলা আপেল আর আঙুরের বন, কখনও বা অন্তহীন হরিৎ বর্ণ সব্জীর ক্ষেত। সেখানে কপি, লেটুস, আলু, টমাটো, শসা, মটর প্রভৃতির চাষ আবাদ। সেই মসৃণ সর্পাকৃতি পথ একসময় ছেড়ে প্রশস্ত হাইওয়ে ধরে সন্ধ্যাকালে এসে ঢুকলুম এক বৃহৎ মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে। স্বল্পালোকিত ভিতরটা। সুন্দরী ও প্যান্টপরা রমণীরা হাসিমুখে খাবার দিয়ে যাচ্ছে এবং পাত্রে পাত্রে কড়া মেক্সিকান মদ ঢেলে দিচ্ছে। এই বৃহৎ শহরের নাম 'সান্তা ক্রুজ।' আমি স্প্যানিশ, মেক্সিকান, চাইনীজ, পর্তুগীজ, ব্রেজিলিয়ান প্রভৃতি বিচিত্র খাদ্যবস্তুর অনুরাগী। ভুট্টাকে ওরা শুধু বলে 'কর্ন।' সেই কর্নের পাঁপর দিয়ে আরম্ভ। মাছের কাই, মাংস বাটা, এদের উপর লাল লঙ্কার ক্রীম, কাদা ডালের সঙ্গে টমাটো সস, দু-এক চামচ ভাত,—সব মিলিয়ে উপাদেয়। বহু দূরে পাহাড় পর্বত থেকে শৌখীন নরনারীরা এই হোটেলে খেতে আসে।

আন্দাজ রাত দশটায় পৌঁছলুম সান্তা ক্রুজ ইউনিভার্সিটির এক কৃতী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বসু মহাশয়ের বাগানবাড়িতে। এটি উপত্যকা অঞ্চল। পথ উঁচু নিচু। দিলীপকুমারের আদরিণী আমেরিকান স্ত্রী শ্রীমতী ক্যাথারিন ওরফে ক্যাথি সহাস্য অভ্যর্থনায় আমাকে ভিতরে ডেকে নিলেন। অতঃপর দিন চারেকের জন্য এ বাড়িতে আমার বিশ্রামলাভ স্থির হয়ে গেল।

শ্রীমান্ দিলীপ প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন ছাত্র। তিনি বি-এ ও এম-এ তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হন। ইতিহাস ও অর্থনীতি তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি হার্বার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনের ইতিহাস ও সাহিত্যের কাজে পি-এচ-ডি করেন। এ ছাড়া বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি চীন স্টাডিতে এম-এ করেন। সম্প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সম্মতিক্রমে ইনি চীন দেশে কাটিয়ে এসেছেন কয়েক মাস। পরিহাসরসে ও গল্পগুজবে তাঁর প্রচুর দক্ষতা। বয়সে তিনি এখনও যুবক। এ বাড়ি ওঁর নিজের।

এই সুন্দর ও ধনীপ্রধান পার্বত্য গ্রামটির নাম 'অ্যাপ্‌টোস।' ক্যাথি নিজেও এখানকার এক ধনীকন্যা। মেয়েটির অমায়িক সরলতা ও সদ্ব্যবহার দেখে আমি আনন্দিত হয়েছিলুম। এখন দিলীপের ছুটির দিন, সুতরাং আমরা তিনজনে অবাধ আনন্দ ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলুম। ওঁরা নিজের হাতে একটি ফুলের বাগান রচনা করেছেন। সেই বাগানে ছোট ছোট 'হামিং বার্ডের' জটলা দেখছি সারাদিন। এই ক্ষুদ্রকায় পাখির আয়তন দেড় ইঞ্চির বেশি নয় এবং ফড়িংয়ের মতো এর পাখার ভঙ্গী। কালিফর্নিয়ার পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া এ পাখি অন্য কোথাও দেখা যায় না।

এখানকার পৌরসভার বোর্ডে ক্যাথারিন কাজ করে। সান্তা ক্রুজের প্রাকৃতিক শোভা ও শান্তি পাছে বিঘ্নিত হয়, এজন্য ক্যাথি এ অঞ্চলে কলকারখানা বা বড় হোটেল হতে দেয় না। সান্তা ক্রুজ এ বাড়ি থেকে প্রায় ১৫ মাইল। দিলীপ রোজ ওকে আপিসে পৌঁছে দেয় এবং ফিরিয়ে আনে। আরেকজন স্কলার সঞ্জয় ঘোষকে দেখলুম এখান থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে এক পাহাড়ের চূড়ায় ঘন বনের মধ্যে—যেখানে দিনের আলো ঢোকে কম। তাঁর স্ত্রীও আমেরিকান, নাম 'গেইল।' সঞ্জয় এম এস-সি, বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে এবং পি এচ-ডি করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। শ্রীমতী গেইল ওই জঙ্গলের মধ্যে মেসিনের সাহায্যে কুমোরের মত মাটির বাসন তৈরি করে সান্তা ক্রুজের বাজারে বিক্রির জন্য দিয়ে আসে। ওই গভীর বনমধ্যে ওরা ছবির মতো লাল কাঠের একটি দোতলা বাড়ি বানিয়েছে, যার ৮০ ভাগ মিস্ত্রীর কাজ করেছে ওরা দুজনে। ওদের ওই অঞ্চলটির নাম 'রেড উড এস্টেট'। একদিন রাত্রে ওরা ডিনারে ডেকেছিল।

কালিফর্নিয়ার ১১টি বিশ্বদ্যালয়ের একটি হল এই পার্বত্য অঞ্চলে। পাঁচ হাজার একর পরিমাণ এক বনময় ভূখণ্ড নিয়ে পাহাড়ের উপরতলি অঞ্চলে এটি প্রতিষ্ঠিত। এখানে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রায় সকলেরই গাড়ি আছে। সারা দিন ও রাত ওরা থাকে এই ক্যাম্পাসে সর্বপ্রকার কলরব-কোলাহলের বাইরে। ওদের সকলের জন্য শ্রেষ্ঠ আহার ও সর্বাধুনিক ধরনের বাসস্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। ওখানে আরেক ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্ রয়েছেন, তাঁর নাম অধ্যাপক তারকনাথ পাণ্ডে। ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখানে আসেন। ইনি কাশীরই ছেলে এবং এখনও অবিবাহিত, এঁর পরিহাস ও মিষ্ট আলাপ সকলের পক্ষেই আনন্দদায়ক। ইনি আগে থেকেই আমাকে জানতেন।

বিদায় নেবার আগে সাগরতীরের জনস্রোতের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দিনমান কাটল বইকি। সামুদ্রিক মাছের হাটে বাগদা চিংড়ি আর ম্যাকরেল আর 'বাফেলো' মাছ কিনলেন দিলীপকুমার। স্নানের ভিড় ছিল ঘাটে ঘাটে। সেখানে শত সহস্র মেয়ে-পুরুষের আত্মহারা স্নানের উদ্দামতা চোখে পড়লে বিদেশী পর্যটকের পক্ষে চক্ষু-লজ্জার কারণ ঘটে বইকি। আমরা ওই কাছেই একটি বড় চাইনীজ হোটেলে ঢুকে অসংখ্য বিকিনি পরা এবং প্রায়-নগ্না মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে লাঞ্চ খেতে বসলুম। শত সহস্র চীনা রেস্টুরেন্ট আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

শ্রীমতী ক্যাথি ও দিলীপ সন্ধ্যার পরে এক কাব্যসভার আয়োজন করল। বন্ধুদলের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের এক সুশ্রী দম্পতি শ্রীমান হায়দার ও নাদেরা, পর্তুগীজ কবি শ্রীমান টম মাদেরস, শ্রীমতী লীন ম্যালি, শ্রীমতী ববিন হলকম্ব ও শ্রীমান পাণ্ডে। সেই রাত্রে ক্যাথির লাউঞ্জে শ্রীমান পাণ্ডে ও দিলীপের কৃপায় তুমুল হাসির ঝড় উঠছিল কথায় কথায়। ওদের মধ্যে টম ও শ্রীমতী লীন নিজেদের ছোট ছোট কবিতা পড়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল। শ্রীমতী হলকম্ব একজন বাংলা ভাষার ছাত্রী এবং টমের সঙ্গে একত্র বসবাস করে।

সেদিন মধ্যরাত্রির পরও আহারাদির পর্ব শেষ হতে চায়নি।
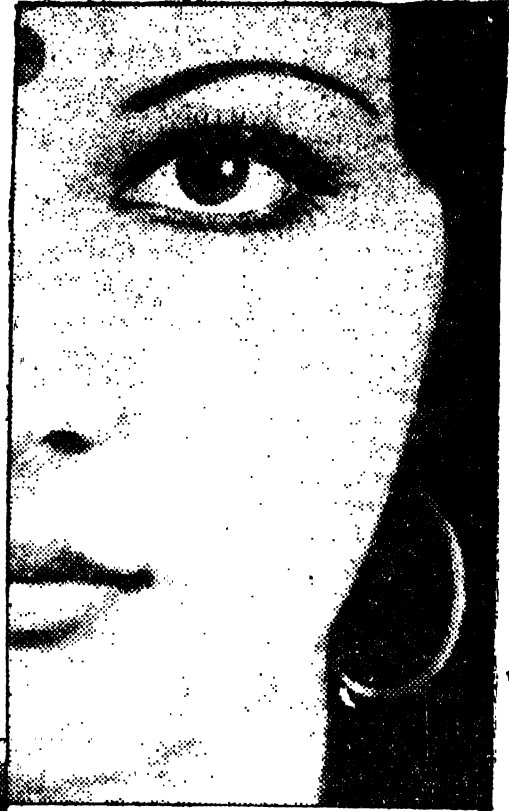
॥ একশো দশ ॥

এখন বেলা প্রায় চারটে। এই সময়ে ত্রিদিবেশ রোজই অফিসের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এটি একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক পত্রিকা এবং পুস্তক প্রকাশনা অফিস। কয়েকজন প্রগতিশীল কমিউনিস্ট আর সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত। সবিতা পণ্ডিত বলেছিল, ডিসট্রিক্ট সেক্রেটারি কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরীকে। নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেছিলেন কাকাবাবু—কমরেড মুজাফর আহমদকে। ত্রিদিবেশ এখানে চাকরি পেয়েছিল তাঁর কথায়। কলকাতা এমনিতেই ত্রিদিবেশের কাছে অচেনা, কঠিন আর দুর্ভেদ্য। জীবনে কয়েক রাত্রি এক সংগে কলকাতায় কেটেছিল প্রথম রশীদের সংগে ধুকড়িবাগানের এক বীভৎস গলিতে, অসহনীয় পরিবেশে, যে-বাড়িটির দোতলার সামান্য অংশ ছাড়া বাকী সমস্তটাই ছিল বেশ্যালয়। ভয়াবহ সেই রাত্রি, গোটা বেশ্যালয় জুড়ে টমিদের ওপরে মিলিটারি পুলিসের ঝাঁপিয়ে পড়া। এখন ত্রিদিবেশ বুঝতে পারে, সেই গলিটার কয়েকটা বাড়ি মৌমাছির চাকের মতো, আর তার গায়ে উপচে পড়া পোকার মতো নানা জাতের নানা পোশাকের মেয়ে। পাহাড়ের নাক বোঁচা, উঁচু চোয়াল, নরুনচেরা-চোখ থেকে বাঙালী ওড়িয়া বিহারী, প্রায় সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান মেয়ে। শরীর বেচা-কেনার একটা নির্লজ্জ মহোৎসবের আসর।

ত্রিদিবেশের অভিজ্ঞতা শিল্পাঞ্চলের নরোয়ামাদের বস্তি, নদীর ওপারে ফরাসী চন্দননগরের শৌখীন সাজানো গোছানো বড় বড় বাড়ির বেশ্যালয়। জন্মের পর থেকেই এ সব দেখা, ছেলেবেলা থেকে চলাচল আর ঘুরে বেড়াবার পথে পথে। নিষিদ্ধ অতএব ভয় আর কৌতূহল চিরদিনের। এবং ঘৃণাও, কিন্তু সেই সংগে রক্তে একটা নিষিদ্ধের প্রতি হাতছানি কখনো অস্বীকার করা যায় না। ছেলেবেলা থেকে মাতাল আর বেশ্যা-সক্ত পুরুষ কম দেখা নেই। এবং সেই সংগেই ওদের শিল্পশহরের পাড়ায় আনাচে কানাচে গৃহস্থ বেশ্যা, যারা গৃহস্থ ভদ্র প্রতিবেশীদের সম্মান ও সমীহ করে, প্রতিবেশিনীদের প্রীতিও তাই। নানা ঘরোয়া সম্বোধনে কথাবার্তাও বলে, কেউ দুধ বিক্রি করতে আসে, কেউ বয়স হারিয়ে দাসীর কাজে। পাড়ার সেই সব রমণীরা ত্রিদিবেশদের কাছে কেউ দিদি, কেউ মাসী। সেখানে নিষিদ্ধ হাতছানি বা উত্তেজনা নেই। প্রতিবেশী। কিন্তু ধুকড়িবাগান এক অনন্য চিত্র ও চরিত্র। দিন আর রাত্রি সমান, দলা পাকানো পোকার কিলবিল, নগ্নতা যৌনতা বীভৎসতা নিরন্তর আবর্তে পাক দেয়। নিশ্চয় যুদ্ধের আত্যন্তিকতা, তবু এক অনন্য ছবি, যা কেবল ভোগ না, যেন ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসী ক্ষুধা। মানুষের সেই অবস্থাকে কী বলা যায়? রশীদ ওর পরিচিত, আর কোনো মানুষের সন্ধান পায় নি, ধুকড়িবাগানে উঠেছিল। রশীদ এখন কোথায়? কাঁচরাপাড়ার ট্রেনিং সেন্টারে?

ত্রিদিবেশের মনে রশীদ বারে বারে উঁকি দেয়। আজ রশীদ কোথায়, এই প্রত্যক্ষ দিবসের দিনে? কালা দিবস যার নাম। রশীদ মনে-প্রাণে একজন পাকিস্তানের দাবিদার, এ কথা ও কারোর কাছেই গোপন করে না। যে-কোনো রকমেই হোক, পাকিস্তান চাই, এই ওর বক্তব্য। আজকের জিন্নাহ-এর এই প্রত্যক্ষ দিবসের ডাক সেই কারণেই। আত্মীয়স্বজন বাদ দিলে, ওর বন্ধুবান্ধব অধিকাংশই হিন্দু। ত্রিদিবেশ জানে রুজেভেল্ট টাউনের সেই সন্তোষের সংগে এখনো ওর নিয়মিত দেখাশোনা হয়। কাঁচরাপাড়া আর রুজভেল্ট টাউনের দূরত্ব মাত্র দু মাইল। সন্তোষ এখন বিরাট বড়লোক। কলকাতা থেকে বারাকপুর মহকুমায় এখন ওর জমি বাড়ি সম্পত্তির পরিমাণ প্রচুর। সেই সন্তোষ আর নেই, রুজভেল্ট টাউনের আমেরিকান সৈনিকদের বন্ধু, স্ত্রীলোক সংগ্রহকারী, মদ এবং টিনজাত খাদ্যের প্রসাদপুষ্ট। এই কয়েক বছরের মধ্যেই সন্তোষের চেহারার পরিবর্তন অভূতপূর্ব। সেই রোগা কালো শুকনো চেহারা নেই, কথায় কথায় খিস্তি আর হাসি নেই। রীতিমতো মাংসলো ঝকঝকে চেহারা, দামী জামা প্যাণ্ট গায়ে। কথাবার্তায় গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি ভিন্ন—রাগী আর তীক্ষ্ন। গাড়ি চালিয়ে ঘোরে। কখনো একটা জীপ, কখনো পিছন দিকটা প্রায় অর্ধবৃত্তাকার একটা কালো গাড়ি।

ত্রিদিবেশের সংগে সন্তোষের দু তিন বারের সাক্ষাৎ রশীদের কাঁচরাপাড়া ট্রেনিং হোস্টেলে। সন্তোষ কমিউনিস্টদের ঘৃণা করে, এ কথা অকপটেই বলে এবং কংগ্রেসের একজন গোঁড়া সমর্থক। ত্রিদিবেশের পক্ষে বিস্ময়ের থেকে বিরক্তিকর বেশী মনে হয়েছিল, ওর কথার প্রতিবাদ না করে পারে নি। ও বলেছিল, 'তোমার আবার কংগ্রেস কমিউনিস্ট কিসের? তোমার ঘৃণাতে কমিউনিস্টদের কিছু যায়-আসে না,

কংগ্রেসও তোমার মতো লোকের সাপোর্ট চায় না।' সন্তোষ বাঘের মতো চোখ করে ত্রিদিবেশের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু কোনো জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সেই চুপ করে থাকা আরো অসহনীয় বোধ হয়েছিল। ত্রিদিবেশ আরো কিছু কঠিন কথা শোনাবার জন্য বলেছিল, 'চুপ করে গেলে কেন? কমিউনিস্টরা তোমার দু চোখের বিষ, এ কথা তুমি কেন বলছো?' ওকে অবাক করে দিয়ে সন্তোষ ওকে আপনি সম্বোধন করে বলেছিল, 'আমি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো কথা বলতে চাই না।' ত্রিদিবেশ আচমকা আপনি সম্বোধনে অবাক হলেও, তথাপি নিরস্ত হতে পারে নি, বলেছিল, 'তা হলে আমার সামনে তুমি কমিউনিস্টদের নিন্দা করো না, রাজনীতির কথা বলো না।' সন্তোষ ওর দিকে না তাকিয়ে রণদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। রণদী হেসে বলেছিল, 'ওরে শালা কমরেড, ওসব ছেলেমানুষি কথা রাখ। সন্তোষ এখন বিরাট তালেবর। কলকাতায় কংগ্রেসের লিডারদের সঙ্গে মেলামেশা করে, মোটা টাকা চাঁদা দেয়। ওয়ার শেষ হয়ে আসছে,

তোদের খেলাও শেষ হয়ে আসছে। রাগারাগি করছিস কেন? দ্যাখ না কী হয়।' বলে সন্তোষের দিকে ফিরে বলেছিল, 'তুই বা শালা জেনেশুনে ত্রিদিবেশের সামনে কমিউনিস্টদের গালাগালি দিচ্ছিস কেন? জিভ চুলকে উঠছে? তবে যা শালা, দুটোতে ময়দানে গিয়ে লড়ে যা।' সন্তোষ হেসেছিল, বলেছিল, 'তোর মতো, লড়কে লেংগে পাকিস্তান?' রশীদ বলেছিল, 'হ্যাঁ রে শালা, লড়কেই লেংগে। দুনিয়ায় এমন কোনো পাওয়ার নেই, পাকিস্তান আটকে রাখবে।' সন্তোষ রশীদের উরুতে চাপড় মেরে বলেছিল, 'শালা রইলো তোর সংগে আখেরি লড়াই।' ত্রিদিবেশের রীতিমতো কৌতুক বোধ হতো ওদের দুজনের কথায়। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ, যারা দুই পরস্পর যুধ্যমান শিবিরের মুখোমুখি, তাদের দুই সমর্থকের মধ্যে এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব থাকে কেমন করে! সন্তোষ কখনোই ত্রিদিবেশের বন্ধু ছিল না, কিন্তু সে ত্রিদিবেশকে অত্যন্ত বিদ্বেষের চোখে দেখতো, কারণ ও কমিউনিস্ট। রশীদের চরিত্র ভিন্ন, ও কংগ্রেস কমিউনিস্ট সকলের সংগেই মেশে, ওর কেবল একটি কথা, পাকিস্তান চাই-ই চাই। ত্রিদিবেশ এখন জানে, রশীদ মিত্তান্ত মিথ্যা কথা বলে নি। সন্তোষকে আজকাল প্রায়ই কংগ্রেসের লোকজনের সংগে দেখা যায়। কংগ্রেসের সভা সমিতিতে তার নিয়মিত যাতায়াত।

কিন্তু রশীদ কোথায়, আজ এই প্রত্যক্ষ দিবসের দিনে? এই অফিসে ইতিমধ্যেই অনেক সংবাদ এসেছে। কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত। কিছুক্ষণ আগেই লাঠি ডান্ডা সহ একদল মুসলমান মনুমেণ্টের পাদদেশে জমায়েত হয়েছিল, তাদের প্রত্যক্ষ দিবসের একটি ঘোষণা হলো, দাবি না মানা পর্যন্ত খুনের ফোয়ারা বইয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কাদের খুন? হিন্দুর? সকাল থেকেই ট্রাম বাস জ্বালানো হয়েছে, লোকজনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেপরোয়া ছুরির মারামারি চলেছে। এখন বিভিন্ন মহল্লায় মুখোমুখি যুদ্ধ চলছে। দোকানপাট লুঠ হয়েছে ইতিমধ্যেই মির্জাপুর-আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে, চিৎপুর আর মানিকতলায়, আগুন লাগানো হয়েছে নানা জায়গায়। এই অফিসে যারা এসেছে, তাদের মুখের সংবাদ, এখন আর এক পক্ষের লড়াই না, দু পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত। পুলিস কাছে দাঁড়িয়েও নির্লিপ্ত পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে লড়াই দেখছে, খুনোখুনি দেখছে, লুঠপাট আগুন লাগানো দেখছে। সমস্তই যেন একটা নাটকের মতো ঘটে চলে, যা আগে থেকেই মহড়া দেওয়া। যথাসময়ে মঞ্চের দৃশ্য উন্মোচন, কুশীলবেরা অভিনয় করে চলে। অন্যথায় কেন আজ ছুটির দিন বলে ঘোষণা? শয়তানি। এই একটি মাত্র কথাই ত্রিদিবেশের মনে আসে, শয়তানি। এই সরকারী ছুটি ঘোষণা একটি শয়তানের খেলা। যেন প্রাণভরে খেলার জন্যই ছুটি, অথচ প্রধানমন্ত্রী নামক জীবটির বক্তব্য ছিল, শান্তিরক্ষার জন্যই এই ছুটি। আদৌ তা সত্যি না। ছুটি, আজ কোনো কাজ না, আজ কোনো দায় দায়িত্বের চিন্তা না, আজ বেপরোয়া খেলা।

ত্রিদিবেশের মনে হয়, সমস্ত ঘটনাগুলো যেন পরস্পর সাজানো। সিমলায় নেতাদের সম্মেলন' ব্যর্থ, গভর্নর জেনারেল যেন তা জানতেনই, অথচ সার্থক করে তোলার কী অদম্য চেষ্টা! ব্যর্থই যদি, তবে তার ঘোষণা অতএব পূর্বাবস্থা বহাল। এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে হিরোসিমায় আণবিক বোমা, সাতই আগস্ট। একই সংগে খুশি আর বীভৎসতার একটা অনুভূতি ওর মনে জেগেছিল। ফ্যাসিস্ট জাপানের ওপরে ওর ঘৃণা ছিল। কিন্তু সাতই আর নয়ই আগস্টের আণবিক বোমা ফেলার ভয়াবহতা যতই ওর কানে আসছিল, মারণ ক্ষমতার কথা কাগজে পড়ছিল, ততোই ওর শরীরটা যেন শিউরে শিউরে উঠছিল। এমন ভয়ংকর মারণাস্ত্র মানুষ তৈরি করতে পারে, অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। ওর খুশির অনুভূতিটা আস্তে আস্তে একটা উৎকণ্ঠিত ভয়ে পরিণত হয়েছিল। প্রতিশোধের স্পৃহা আর তেমন জ্বলে ওঠে নি। নারী আর শিশুদের অসহায় মৃত্যুর খবরে ত্রিদিবেশ শিউলি আর ওর সন্তানের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। যদিচ তার আগেই পশ্চিমের আর রাশিয়ার বিভিন্ন সিনেমায় ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার আর নির্বিচার হত্যার ছবি দেখেছিল।

আণবিক বোমার সংগে ভারতের রাজনীতির যোগাযোগ কিছু ছিল বলে মনে হয় নি। কিন্তু একটা আচ্ছন্নতা ছিল। সেই আচ্ছন্নতার থেকে মুক্তি পেয়েছিল, এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের নৌবিদ্রোহে। ত্রিদিবেশের মনে আছে, আঠারোই ফেব্রুয়ারি সেই দিন। উত্তেজনা সারা দেশে। তার আগে কে কবে শুনেছিল ভারতীয় নৌসেনারা বিদ্রোহ করেছে? সিপাহী বিদ্রোহের সংগেই সে ঘটনার তুলনা চলে। কিন্তু নৌবিদ্রোহ কার্যত কোনো যুদ্ধ করতে পারে নি। বম্বের কমিউনিস্টরা যাতে কোনোক্রমে এর নেতৃত্বের ধারে-কাছে না যেতে পারে কংগ্রেস তার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নামটাই বেশী করে মনে পড়ে। কংগ্রেসের আয়রন ম্যান। কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় নৌবিদ্রোহ তুলে নেওয়া হয়েছিল, আত্মসমর্পণ করেছিল বিদ্রোহীরা। কমিউনিস্ট পার্টি আখ্যা দিয়েছিল, বিশ্বাসঘাতকতা।

নৌবিদ্রোহের পরেই, পরের মাসে, চব্বিশে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসে পৌঁছেছিল। সেটাও একটা খেলা, রাজনীতির খেলা, যার চার মাস পরেই, মুসলিম লীগের এই ক্রুদ্ধ আহ্বান, 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস।'

এখন বেলা চারটে অতিক্রান্ত। মনুমেণ্টের নীচে থেকে মুসলমানরা তাদের সভা শেষ করে এখন দিকে দিকে ধাবিত। দুপুরে যে কয়টি জায়গার নাম শোনা গিয়েছিল, এখন ক্রমাগত তার সীমানা বেড়ে চলে, ইন্টালি বাজার, রাজাবাজার, ওয়েলেসলি স্ট্রিট, ওয়েলিংটনের মোড়, ধর্মতলা। চৌরঙ্গী থেকে শিয়ালদহ যাবার প্রতিটি রাস্তায় বাধা। ত্রিদিবেশের চোখের সামনে দিয়ে সশস্ত্র পুলিস মিলিটারি আর দ্রুত ঘণ্টা বাজানো ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি দুরন্ত বেগে ছুটে চলে। খিদিরপুরের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে শিউলি—গর্ভবতী শিউলি এবং ছেলে। শিউলি ওকে বারণ করেছিল আজ কলকাতায় আসতে। ওর ছুটি ছিল না এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এই ছবির কথা কেবল ওর না, এই প্রগতিশীল বামপন্থী কমিউনিস্ট প্রকাশন সংস্থার ডিরেক্টরদেরও মনে উদয় হয় নি। এখন টেলিফোনে বারে বারে চেয়েও এক্সচেঞ্জ থেকে অপারেটরের কোনো জবাব নেই। অফিসের ডিরেক্টরদের ধারণা, ট্রেন ইতিমধ্যেই বন্ধ, কলকাতার বাইরে যাবার যানবাহন নেই।

ত্রিদিবেশ অসহায় ব্যাকুল চোখে একবার পিছন ফিরে অফিসের দিকে তাকায়। এ সময়ে ও রোজই একবার বাইরে চলে আসে। এ সময়ে ডিরেক্টর তিনজন বিকালের টিফিন করেন। তাঁদের সুসজ্জিত আলাদা ঝকঝকে টেবিল চেয়ার। প্রত্যেকের টেবিলের ওপরে ভালো সিগারেটের প্যাকেট। বিকালের টিফিন টোস্ট মাটার কলা ডিম চা। ত্রিদিবেশের প্রাপ্য এক কাপ চা, কিন্তু ও জানে, ডিরেক্টররা ওর সামনে খেতে হয়তো অস্বস্তি বোধ করেন। কারণ খাবার সামনে পরিবেশিত হলেই তাঁরা কেমন গম্ভীর হয়ে যান, আর ত্রিদিবেশের দিকে চোখের কোণে তাকান। ত্রিদিবেশের নিজেরও বিশেষ সঙ্কোচ হয়, ও এ সময়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

আজও ও এখন বাইরে, ডিরেক্টররা জল পান করেন ভিতরে। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাওয়ার কী উপায়? আজ বৃহস্পতিবার এ কথাও শিউলি বলেছিল। ত্রিদিবেশ তো বারবেলায় বিশ্বাসী না। তবু কোন্ পথে এখন শিয়ালদহে যাওয়া যায়? সেখানে গিয়ে ও প্রত্যক্ষ করতে চায়, ট্রেন চলে কী না। কলকাতায় ও থাকতে চায় না।

ক্রমশ

গ্ল্যাক্সো
সানশাইন
বাচ্চাদের বানায় তাগড়া
পদ্মিনী—
খুশিতে আর উদ্যমে ভরপুর।
সুবোধ— তেজী হৃদে ভারতসন্তান বটে।
রেশমা—
স্বাস্থ্যে টগবগ করছে।
মিশেল—
পরিশ্রমী আর প্রাণশক্তিতে ভরপুর।
রয়— অন্য সবার চেয়ে বাড়টা বেশী।
বিবেক—
ভাল খিদে পায় ওর।
কামিনী— হাড় কি শক্ত আর কত মেহনতী।
SUNSHINE
Glaxo
BUILDS BONNIE BABIES
FOR INFANT FEEDING
ENRICHED WITH VITAMINS
গ্ল্যাক্সো
খায় যে বাচ্চারা
—সাচ্চা তাগড়া হয় তারা।

বিশ্ব বিজ্ঞান

মস্তিষ্কের মানচিত্র

পৃথিবীর মানচিত্র দেখে যে কেউ বলে দিতে পারেন, কোথায় পাহাড় আছে, কোথায় সমুদ্র, মরুভূমি, কোন একটি বিশেষ দেশ এবং ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের ব্যাপারটা কি রকম?

কোটি কোটি স্নায়ুকোষ এবং আরও বিভিন্ন ধরণের কোষ দিয়ে তৈরি মস্তিষ্কের বড় "রকমের একটি অংশ প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং যুক্তি তর্ক দিয়ে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন, প্রাণীর সমস্ত রকমের কাজকর্মের চাবিকাঠি এই মস্তিষ্কের মধ্যেই আটক হয়ে থাকে। চোখে আলো এসে পড়ল। সেই আলো ক্যামেরার ছবি তোলা ফিল্মের মত চোখের মধ্যেকার এক ধরনের পর্দা, যার নাম রেটিনা, সেখানে আপতিত হয়ে রূপান্তরিত হল বিশেষ ধরনের বৈদ্যুতিক সংকেত। সেই সংকেত স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে গিয়ে হাজির হবে মস্তিষ্ক কোষে। কোষের মধ্যে বিশ্লেষিত হয়ে, যে বস্তুটি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়েছিল, যার চোখের মধ্যে আলো গিয়ে ঢুকেছিল, তার মাথায় ফুটে উঠবে তার প্রতিবিম্ব। এই ভাবেই প্রাণীরা তাদের চারপাশের জিনিসপত্র দেখতে পায়।

শুধু দেখা নয়। আমরা কান দিয়ে শুনি নাক দিয়ে আঘ্রাণ নিই, ত্বক আমাদের স্পর্শজনিত অনুভূতিগুলি জানিয়ে দেয়, আর জিভের সাহায্যে বুঝতে পারি কোন বস্তুর স্বাদ কি রকম। চোখ, কান, জিভ, নাক এবং ত্বক—পঞ্চেন্দ্রীয়র সমস্ত অনুভূতিই বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষে গিয়ে বিশ্লেষিত হওয়ার পরই এ সবের যথাযথ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া সম্ভব।

আবার দেখুন, কারোর শরীরের মধ্যে কোন রোগের জীবাণু অথবা বিষাক্ত কোন পদার্থ গিয়ে হাজির হল। নিখুঁত এক স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিক সংকেত স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্যাপারটা মস্তিষ্ক কোষকে জানিয়ে দেবে। মস্তিষ্ক কোষ মুহূর্তের মধ্যে সেই সংকেত বিশ্লেষণ করে বুঝে নেবে শরীরে ক্ষতিকর যে বস্তুটি ঢুকেছে তার স্বরূপটি কী রকম। তাকে ধ্বংস করতে গেলে কী ধরনের বস্তুর প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে যাবে কোষের মধ্যেকার জিনের কাছে। জিন বা ডি এন এ ধ্বংসকারী সেই বস্তুটি তৈরি করে ক্ষতিকর ভাইরাস জীবাণু অথবা বিষাক্ত পদার্থকে সাবাড় করতে এগিয়ে আসবে।

শব্দ শুনে আমরা বিরক্ত হই, পাহাড়ের চূড়া থেকে দূরের সবুজ উপত্যকা মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে, সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তৃত সৌন্দর্য, আকাশের লক্ষ নক্ষত্র, দৈনন্দিন জীবনের হাসি, কান্না, ভালবাসা—এ সবের যাবতীয় অনুভূতি মস্তিষ্কের কারখানাতেই বিশ্লেষিত হয়। আমাদের বাইরের অভিব্যক্তি সেই সব বিশ্লেষণলব্ধ ফলাফলেরই বহিঃপ্রকাশ। যার সূত্রের অনেক কিছু আবার সংরক্ষিত হয়ে থাকে মস্তিষ্কের কোষে। ফটোগ্রাফির ঠিক নেগেটিভ প্রিন্টের মত। এক কথায় যাকে বলা চলে স্মৃতি। প্রয়োজনে নেগেটিভ প্রিন্ট থেকে যেমন মূল প্রতিবিম্বকে উদ্ধার করা যায়, এই স্মৃতি থেকেও তেমনি বাস্তব ঘটনাগুলিকে কখনও কখনও প্রক্ষেপ করা হয়।.

প্রশ্ন এই, এত বিচিত্র ধরনের কাজকর্ম কি একই ধরনের মস্তিষ্ক কোষ করে থাকে? অথবা আর একটু বিশদ করলে কথাটা দাঁড়ায়, মস্তিষ্কের সমস্ত অংশই কি যুগপৎ সব রকমের কাজ-কর্মের দায়িত্ব পালনে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে?

গত কয়েক বছর ধরে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজকর্ম নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান চালিয়ে আসছেন। এবং ওই সব গবেষণা থেকে অনেকেই এখন

কমলা

নিশ্চিত, এক এক ধরনের কাজ কর্মের জন্যে যেমন বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা-সম্পন্ন মানুষের দরকার হয়, ঠিক তেমনি মস্তিষ্কের এক একটি অংশের উপর দায়িত্ব রয়েছে এক একটি শারীরিক এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর কাজ কারবার করার। অর্থাৎ, শব্দ করুন। সেই শব্দে মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশের স্নায়ু-কোষগুলিই উদ্দীপ্ত হবে, অন্য জায়গার কোষগুলি নয়। গন্ধ শুঁকুন। সেই গন্ধ অপর কোন অংশকে উদ্দীপ্ত করবে। আমাদের ভাল মন্দ অনুভূতি সংরক্ষিত হয়ে থাকে অন্য কোন অংশে। বিশেষ বিশেষ এই অংশের কাজকর্ম যখন ব্যাহত হয়, তখনই ঘটে যত সব বিপত্তি। শরীর খারাপ হতে পারে। নানা রকম মানসিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এবং ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীদের সামনে এখন তাই সমস্যা দাঁড়িয়েছে দুটি। **এক**, মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশ কী কী দায়িত্ব পালনের জন্যে দায়ী, সেই অংশগুলির যথাযথ চিহ্নিত করণ। **দুই**, ওই সব জায়গা চিহ্নিত করণের পর, সেখানে কীভাবে কাজকর্ম হয়ে থাকে, কী ভাবে বিকৃতি ঘটে, সে সব সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত এই কাজে সফল হওয়া সম্ভব হলে বহুমূত্র, হৃদরোগ, ক্যানসার প্রভৃতি বিপাকীয় ত্রুটিজনিত রোগ (যা ইংরেজিতে যাদের বলা হয় 'ডিজিজেস ডিউ টু মেটাবোলিক এররস' এবং মানসিক রোগ নিরাময় হয়ত সহজতর হবে।

বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের চিহ্নিতকরণেরই নাম রেখেছেন মস্তিষ্কের মানচিত্র। কী ভাবে এই মানচিত্র করা যেতে পারে?

সম্প্রতি বেথেসডার ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ-এর বিশেষজ্ঞ ডঃ সি কেনেডি ও তাঁর সতীর্থ এবং পেনসিল-ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এম রিভিথ এ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, শরীরের কোন অংশ যখন বেশি পরিমাণ কাজ কর্ম করতে চায়, তখন সেখানকার কোষগুলি বেশি মাত্রায় সচল হয়ে পড়ে। বেশি সচল হতে গেলে দরকার বেশি পরিমাণ শক্তি। সবাই জানেন, গ্লুকোজ রক্তের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে শরীরের কোষে শক্তি যোগায়।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম। ধরুন, কানের পাশে শব্দ হল। সেই শব্দ কানের পর্দায় গিয়ে পড়বে। পর্দা কম্পিত হয়ে স্নায়ুর মধ্যে সৃষ্টি করবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। সেই তরঙ্গ মস্তিষ্কের বিশেষ একটি অংশে পৌঁছে সেখানকার মস্তিষ্ক-কোষগুলিকে উদ্দীপ্ত করবে। উদ্দীপ্ত হওয়ার দরুন যে অতিরিক্ত কাজ করতে হবে তার জন্যে প্রয়োজন শক্তির। ফলে অতিরিক্ত পরিমাণ রক্ত সেখানে গিয়ে হাজির হবে। যা বয়ে নিয়ে যাবে শক্তিদায়ী গ্লুকোজ। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল এই, মস্তিষ্ক কোষের যেখানে গিয়ে এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্লুকোজ গিয়ে জমবে, ধরতে হবে ওই অঞ্চলে কোষ শব্দের ক্ষেত্রে সুবেদী।

ডঃ কেনেডি, ডঃ রিভিথ এবং কয়েকজন গবেষক তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ সমন্বিত ডিঅক্সি গ্লুকোজ-৬-ফসফেট নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন বানর এবং গিনিপিগের ওপর। এর জন্যে প্রথমে ওই সব প্রাণীর শরীরে কার্বন ১৪ সমন্বিত গ্লুকোজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় ইনজাকশনের সাহায্যে। কিছুক্ষণ পর তাদের কানের কাছে শব্দ করা হয়। এখন শরীরের যে-যে অঞ্চলে এই তেজস্ক্রিয় কার্বন সমন্বিত অণু গিয়ে পৌঁছবে সেই-সেই অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ধরা পড়বে। যদি বেশি গিয়ে পৌঁছয় তাহলে সেই বিকিরণের মাত্রাও হবে বেশি। ওই গবেষকরা এইভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন, শব্দের দরুন প্রাণীগুলির মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই ও ধরনের বিকিরণের মাত্রা বাড়ে। ওঁদের বক্তব্য, উত্তাপ, ঘ্রাণ এবং বিভিন্ন রকমের শারীরবৃত্তীয় ঘটনায় কি ভাবে এবং মস্তিষ্কের কোন কোন অঞ্চলের কোষ উদ্দীপ্ত হয়, একই ভাবে তা জানা যেতে পারে। এবং জানা গেলে, মানসিক এবং শারীর বৃত্তীয় ঘটনাবলী মস্তিষ্কের কোন্ কোন্ অংশ নিয়ন্ত্রিত করে তার হদিশও পাওয়া যাবে। মস্তিষ্কের এই মানচিত্র তখন হয়ত নানা রকম রোগ নিরাময়ের কাজে যথেষ্ট সাহায্যও করবে।

সমরজিৎ কর

বাঙালীর বাণিজ্য উদ্যম

বাণিজ্যে বাঙালী: একাল ও সেকাল। সুভাস সমাজদার।. শঙ্খ প্রকাশন, কলকাতা-৯

বাঙালী জাতির বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও বাণিজ্যে উদ্যমের আনুপূর্বিক বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে লেখক একটা বড় কাজ করেছেন। এর উদ্দেশ্য সম্ভবত বাঙালী জাতিকে নব-উদ্যোগে আবার বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধ করা। উদ্দেশ্য সাধু, এ কথা একবাক্যে স্বীকার করতে হবে।

লেখকের একটি উক্তি সম্বন্ধে একটু খটকা লাগছে, তিনি আলোচনা করতে-করতে এক জায়গায় বলেছেন, "স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, সমগ্র গণসমাজকে সেকালে পরিশ্রম করে উদরান্ন সংগ্রহ করতে হতো। তখনও জমিদারী প্রথা চালু হয়নি। বাঙালীর মেরুদণ্ডের হাড়ে-হাড়ে তখনো অলসতা আর স্বপ্নবিলাসের বিষ প্রবাহিত হয়ে যায় নি।"—পৃ ৭৯। এটুকু পড়ে মনে হয় একালের বাঙালী সবাই স্বপ্নবিলাসের বিষে জর্জর ও অলসতায় বিভোর- এই কথাই লেখক বলতে চেয়েছেন, তাঁর এ কথা সকলে মেনে নেবেন কিনা সন্দেহ।

অজস্র গ্রন্থ মন্থন করেছেন লেখক, বিস্তর উপাদান সংগ্রহ করেছেন! কিন্তু বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে স্থানে-স্থানে এমন উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন যে, আসল বক্তব্য হারিয়ে গিয়েছে। বৈদিক মন্ত্র দিয়ে তিনি আরম্ভ করেছেন তাঁর কথা, সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় অনেকটা জায়গা খরচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের বই লিখতে হলে তার একটা পদ্ধতি আছে। বক্তব্যটা জানিয়ে দিয়ে রেফারেন্স হিসেবে অমুক বেদের অমুক মন্ত্রর উল্লেখ যথেষ্ট। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বইয়ের গোড়ার দিক পরিপূর্ণ- লেখক যে পরিশ্রমবিমুখ নন ও অলস প্রকৃতির নন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বিস্তর উপাদানও তাঁর আয়ত্তে, কিন্তু তার ব্যবহারে তেমন যোগ্যতা দেখাতে পেরেছেন কিনা—এ প্রশ্ন অনেকের মনে আশা স্বাভাবিক।

বেদ পুরাণ রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি থেকে তিনি অনেক শ্লোক উদ্ধার করে বাঙালীর বাণিজ্যিক উদ্যমের প্রমাণ দিয়ে খুব ভালো কাজ করেছেন। অনেক অজানা বিষয় জানা গেল। কিন্তু সেটা অনেকটা ইতিহাস জানা, কিছু কিছু ভূগোলও। কালিদাসের রঘুবংশ শকুন্তলার কথাও উঠে পড়েছে, সেকালের সমুদ্রযাত্রা, বিদেশী বাণিজ্য, নৌযুদ্ধ এবং দেশ-দেশান্তরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ইতিবৃত্ত জানাবার জন্যে।

তাঁর 'কৈফিয়ৎ'এ লেখক বলেছেন যে, 'বিস্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে গেছে যারা সেই মসলিনের শিল্পী এবং বাংলার বাণিজ্যের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে পাঠক-দের কৌতূহল এবং অনুসন্ধিৎসার কিছুটা যদি চরিতার্থ হয় তাহলেই আমার বিপুল শ্রম সার্থক মনে করবো।'

আমরা অকপটে বলব, তাঁর শ্রম সার্থক হয়েছে। কিন্তু আর-একটু কম বা বেশি পরিশ্রম করে আর-একটু গুছিয়ে সব বিবরণ দিতে পারলে তা সার্থকতর হত।

ঢাকার ট্যাক্স কালেক্টর মহম্মদ আলী কলকাতার গর্বনরকে কী চিঠি লিখেছে এবং অসাধু উপায়ে ইংরেজ কুঠিয়ালদের অর্থ রোজগার করতে হত কেন, তাদের মাসিক বেতন কত ছিল ইত্যাদি বিবরণ (পৃ ১৫৫-১৫৬) আলোচ্য গ্রন্থের উপ-যোগী নয়, তার প্রয়োজনও নেই। কিন্তু এই ধরনের অনেক উপাদান এতে ছড়ানো। লেখকের 'কৈফিয়ৎ' থেকে জানা যায় তিনি জাতীয়-গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত, তাঁর হাতের কাছেই নানা ধরনের বইয়ের পাহাড়, উপাদানের অভাব ঘটেনি; সে সবই তিনি এই বইতে দিয়ে বইটি অযথা ভারাক্রান্ত করেছেন। পাদটীকাগুলির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।

'বাঙালীর বাণিজ্য, বাঙলার শিল্প একদিন তার বর্ধিষ্ণু জেলাগুলোকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল'—গ্রন্থের শেষে সেই অতীত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ব্যবসাবাণিজ্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে জেলাওয়ারিভাবে—দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মালদহ, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ নদীয়া, হাওড়া, বীরভূম, চব্বিশ-পরগনা, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, কলকাতা ইত্যাদি স্থানের বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য। এতে অনেকে অনেক কথা জানতে পারবেন।

কিন্তু মনে হচ্ছে, এসব তো সেকালেরই কথা। একালের বাঙালীর বাণিজ্যের কথা তো তেমন নেই। কয়েক বছর আগে দেশ

পত্রিকাতেই 'বিশ্বকর্মা' একালের বাঙালীর শিল্প-উদ্যোগের কথা লিখে-ছিলেন, বই হয়েও তা বেরিয়েছে. অতুলচন্দ্র সুর লিখেছেন একটা বই এই বিষয়েই। গ্রন্থপঞ্জীতে তার উল্লেখ নেই। অথচ গ্রন্থ-পঞ্জী তো বেশ দীর্ঘ। মুদ্রণ-প্রমাদও অনেক।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অশোক চট্টোপাধ্যায়, মহাদেব নন্দী ও নয়নকুমার রায়—এই তিনজনের একত্র সম্পাদনায় প্রকাশিত **কাব্যসংকলন** ১৩৮২ (চন্দননগর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, পাঁচ টাকা) গ্রন্থটির ভূমিকা পড়ে এঁদের সম্পাদকীয় যোগ্যতা সম্পর্কে প্রথমেই কিছু প্রশ্ন জেগে ওঠে। এঁদের মতে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সুধীন দত্ত লেখা যে উচিত নয়, সে জ্ঞানের পরিচয় নেই) এবং অমিয় চক্রবর্তী 'স্বকীয় রচনা রীতিতে সিদ্ধহস্ত হতে পারেন নি শেষ পর্যন্ত।". দ্বিতীয় মত, "যে জীবনানন্দ বর্তমান যুগের অনেক কবিতা লেখকেরই দেবতাস্বরূপ—সেই জীবনানন্দ সম্পর্কেও আধুনিক প্রতিষ্ঠিত অনেক কবিরই প্রবল অনীহা।" দ্বিতীয় মতটি অবশ্য পরিমল রায় কথিত ভেগো-লজির চূড়ান্ত নমুনা! পড়ে বোঝাই শক্ত—কারা ভক্ত এবং কাদের অনীহা, সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। প্রথম মত পড়ে মনে হতে পারে 'স্বকীয় রচনারীতি' বলতে এঁরা বোধহয় এমন কিছু বোঝেন আধুনিক বাংলা কবিতায় যার প্রমাণ নেই, এই সংকলনে কিছু বিরল দৃষ্টান্ত পরি-বেশিত হবে! কিন্তু সঙ্কলনটি পড়ার পরই ভুল ভেঙে যায়। দুটি মাত্র রচনায় কবিতার ছায়া পড়েছে, রচনা দুটির লেখক শ্রীঅমিয়কুমার সেনগুপ্ত এবং শ্রীকৃষ্ণসাধন নন্দী। বাকি রচনা পদ্যের থেকেও কাঁচা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতার ক্লাশের "কেউ কেউ কবি নয় সকলেই কবি' কথাটা এরা জীবনানন্দ-বিরোধী মত বলে ধরে নিয়েছেন বলেই বোধহয় এই

বিপত্তি। কথাটার মধ্যের ঠাট্টাটা ধরতে পারেন নি, ফলে যা ধুন্ধুমার হবার তাই হয়েছে। নীরেন্দ্রনাথও অবশ্য এহেন আশঙ্কাই করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য, 'কবিতার ক্লাশ', পৃষ্ঠা : ১০০)।

※

বিকেলের রঙ (পরিবেশক : পুষ্প পুস্তকালয়, পাঁচ টাকা)। শ্রীমতী বেলা দেবীর প্রথম কাব্যসংকলন। খুব সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে কবিতার মধ্যে অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন বেলা দেবী। 'রোদ চিকচিক করে ভেজা পাতা পাখির ডানায়' হাসির ঝিলিক যেন কুমারীর কান্না-ভেজা চোখে', 'এখানে জীবন আজ চিনিহীন চায়ের মতন একান্ত বিস্বাদ" কিংবা "বুকের ভিতর মুগ্ধ নিথর হাজার কথাকলি" ধরনের চিত্রকল্পে তার কবিকৃতির যে-পরিচয় ছড়ানো তার স্নিগ্ধ সুরটি সব ছাপিয়ে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তবে ব্যক্তি ও উপলক্ষ কেন্দ্রিক রচনাগুলিতে বড়ো বেশী পদ্য-পদ্য গন্ধ।

খেলার মাঠে

ফুটবল মরসুমের দ্বিতীয় প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগানের কাছে ৩—১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং-এর পরাজয় এক দিকে যেমন ইস্ট বেঙ্গলের টানা ছয় বছর লীগ জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে, অপর দিকে তেমন ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষীণ আশাও জাগিয়ে তুলেছে। বলা বাহুল্য, মহমেডান স্পোর্টিং যদি ইস্ট বেঙ্গলকে পরাজিত করতে পারে তা হলেই ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা। খেলাটি ড্র হলেও সম্ভাবনা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের নতুন কীর্তি অর্জনের। এবং অপরাজিত থেকেই।

কলকাতা ফুটবল লীগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অতীতে মাঝারি শক্তির দলগুলিও শক্তিশালী দলের কাছ থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছে, পরাজিত করেছে। ইস্ট বেঙ্গলে যখন প্রচুর গুণী খেলোয়াড়ের সমাবেশ ছিল তখন অন্তত তিনবার তারা লীগ-জয়ী হতে পারেনি শেষমুখে শক্তিহীন দলের কাছে পরাজয়ের ফলে। না হলে ইউরোপীয় ফুটবলের যুগে, মহমেডান স্পোর্টিং-এরও আগে, প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ইস্ট বেঙ্গলই লীগ চ্যাম্পিয়ন হতে পারত। শুধু ইস্ট বেঙ্গল কেন, গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগানকেও শক্তিহীন দলের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। অপরাজিত থেকে লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছিল অনন্য সম্মান। কিন্তু এখন ওর মধ্যে যেন কোন বিশেষ সম্মান নেই। স্বাধীনতা লাভের পর ধনী যেমন আরো ধনী হয়েছে, মধ্যবিত্ত যেমন হয়েছে বিত্ত-হীন, তেমন সাম্প্রতিক কালের ফুটবলে শক্তিশালী দল ফুটবলের সব সম্পদ পুঞ্জী-ভূত করছে। শক্তিহীন দল হয়ে পড়েছে প্রায় নিঃস্ব। সম্পদ অর্থে আমি জীবন্ত সম্পদের কথাই বোঝাতে চাইছি। অর্থাৎ নামী খেলোয়াড়দের কথা। তিন প্রধানের পারস্পরিক খেলার ফলেই সম্প্রতি চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হচ্ছে। অবশ্য গতবার মোহনবাগানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে গেছে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত ফলে। এবার এই লেখা পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত ফল নেই বললেই চলে। তাই মনে হয় ইস্ট বেঙ্গল নতুন কীর্তির সমীপবর্তী।

মহমেডানের শক্তি সম্পর্কে সাধারণের যে প্রত্যাশা ছিল প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় মহমেডানের খেলোয়াড়রা সে প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেনি। ৩—১ গোলে

মোহনবাগান-মহমেডান খেলায় পেনাল্টি সীমার মধ্যে জহর দাসকে ধরে রেখেছে আনোয়ার হোসেন

হেরে গেছে বলেই নয়, দেখা গেছে মন্থর ভিজে মাঠেও বিপক্ষের গতির সঙ্গে তাল রেখে তাদের খেলার ব্যর্থতা। সাধারণত একটু স্লো খেলোয়াড়রা ভিজে মাঠে নিজেদের অনেকটা মানিয়ে নিতে পারে, শুকনো মাঠে যেটা পারে না। কিন্তু ইডেনের নরম মাঠেও মোহনবাগানের গতির সামাল দিতে পারেনি মহমেডান ডিফেন্স। এককালের নামী খেলোয়াড় নায়িম অতি সাধারণের পর্যায়ে নেমে এসেছে। হাবিব অনেক নিষ্প্রভ। চন্দন গুপ্ত গতিবেগ হারিয়েছে। সুতরাং ইস্ট বেঙ্গলের গতির কতটা সামাল দিতে পারবে মহমেডান সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তবে মোহনবাগানের বিস্তৃত প্রাধান্য সত্ত্বেও মহমেডান কিন্তু সারাক্ষণ সংগ্রাম করে গেছে। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণের ওঠা-পড়ায় খেলাটির মধ্যে থ্রিলও ছিল পুরো ৭০ মিনিট। নিঃসন্দেহে এটি ইডেনের এক স্মরণীয় খেলা। দর্শকদের উপভোগের দিক দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সেরা খেলাও বলা যেতে পারে।

এক-একদিন এক-একজনের খেলা এমন খুলে যায় যে, বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। মহমেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে মোহনবাগানের লেফট আউট শিশির গুহ দস্তিদারের অপূর্ব খেলারও সেদিন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ছোট ও মাঝারি অনেক দলের বিরুদ্ধে ক'বছর ধরেই তো শিশির নিয়মিত খেলছে, কিন্তু কোন দিন কি এত ভাল খেলতে পেরেছে? দু বছর আগে যখন মহমেডানে খেলত তখন মহমেডান সমর্থকরা ওকে বলত 'জিলাপি'। বল নিয়ে জিলাপির মত প্যাঁচ করত। তাতে আক্রমণের গতি ব্যাহত হত। কিন্তু মহমেডানের বিরুদ্ধেই সে যেমন দেখিয়েছে গতির গরিমা, তেমন জিলাপি প্যাঁচের পরাকাষ্ঠা। কেউই তাকে আটকে রাখতে পারছিল না। প্রধানত ওর খেলাতেই মহমেডান ডিফেন্স বেসামাল হয়ে পড়েছিল। শিশির খেলেছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ খেলা।

গতির সঙ্গে মহমেডানের শক্তি-সংগ্রামের দৃঢ়তা সত্ত্বেও খেলায় মোহন-বাগানের বেশী গোলে জেতা উচিত ছিল। দুটি অবধারিত পেনাল্টি থেকেও বঞ্চিত হয়েছে মোহনবাগান। পেনাল্টি সীমার মধ্যে একবার বল নিয়ে ধাবিত উলাগানাথনকে পেছন থেকে দু হাতে জড়িয়ে আটকে রেখেছিল চন্দন গুপ্ত। আর একবার জহর দাসকে একইভাবে পেছন থেকে এক হাতে টেনে ধরেছিল আনোয়ার হোসেন। দুটি ক্ষেত্রেই পেনাল্টির নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল।

খেলার পর অনেককে বলতে শুনেছি, যখন নিশ্চিত গোলের সম্ভাবনা ছিল না, তখন রেফারি পেনাল্টি না দিয়ে

ভালই করেছেন। কিন্তু ফুটবল আইনে গোল সম্ভাবনার তো প্রশ্ন নেই। যে ৯টি অপরাধে ডিরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দেওয়া হয়, ওই ৯টির যে-কোন একটি অপরাধ পেনাল্টি সীমার মধ্যে হলে পেনাল্টি কিক দিতে হবে, এটাই আইনের বিধান—গোলের সম্ভাবনা থাক আর নাই থাক।

আমার নিজের ধারণা, গুরুত্বপূর্ণ বড় ম্যাচ খেলানোর প্রথম সুযোগে বড় দলের বিরুদ্ধে চরম দণ্ড প্রদানে রেফারি তারক সেন স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধায় পড়েছিলেন। ওই ত্রুটি ছাড়া তাঁর পরিচালনা কিন্তু মন্দ হয়নি। খেলাটিতে মোহনবাগানের পক্ষে দুটি গোল করে জহর দাস, একটি কৃষ্ণ মিত্র। মহমেডান স্পোর্টিং-এর গোলটি করে আকবর। বোম্বাই থেকে কলকাতায় আসবার পর জহরও বোধ হয় এইদিন শ্রেষ্ঠ ম্যাচ খেলে।

লীগ এখন শেষমুখে। দু-তার দিনের মধ্যেই সব উত্তেজনা শেষ হয়ে কেন্দ্রীভূত হবে শীল্ডের খেলায়।

একলব্য

ব্রিজ-এর বিজ্ঞমাস্টার শান্তি সেন

রাইটার্স বিল্ডিং ব্রিজ টুর্নামেন্টের ন্ত জয়ন্তী উৎসবের খেলা হচ্ছিল াইটার্স বিল্ডিংয়েই। রীতিমত জমাটি াসর। সব বিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সমাবেশ। ান্তি সেন খেলছিলেন গোবিন্দ ট্টাচার্যের সঙ্গে। পাশে বসে খেলা দখছিলেন শ্রমমন্ত্রী গোপালদাস নাগ। ান্তি সেনের বিডিংয়ে ভুল হতেই শ্রমমন্ত্রী ায় চেঁচিয়ে উঠলেন। "আপনার মত বজ্ঞ খেলোয়াড়ের এই ভুল"।

শান্তি সেনের সহজ উত্তর—"বুড়ো য়েছি তো। তাই এখন মাঝে সাজে ভুল য়"।

অথচ আশ্চর্যের কথা, ওই বৃদ্ধই ৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫এ পর পর বছর "প্লেয়ার অফ দি ইয়ার"-এর সম্মান পয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রিজ অ্যাসো- সয়েশনের কাছ থেকে। ৭৩-৭৪এ রবি ায়ের সঙ্গে বেস্ট পেয়ার চিহ্নিত হয়েছেন। াস্টার এবং গ্রান্ড মাস্টারের খেতাব তো াবনকালেই জুটে গিয়েছিল।

এতকাল ভারতে একজন মাত্র খেলোয়াড় হলেন যিনি রুইয়া গোল্ড ট্রফি, গরুদত্ত ফি, সিংহানিয়া ট্রফি এবং হোলকার ট্রফি জয়ীর সম্মান পেয়েছিলেন। রবি রায়ের ই সম্মান লাভের পর সর্বভারতীয় ব্রিজ ক্ষেত্রে শান্তি সেনও চারটি ট্রফি জয় রেছেন গত বছর কলকাতায় অনুষ্ঠিত াতীয় ব্রিজে মুন্দ্রার স্কারলেট দলের হয়ে সংহানিয়া ট্রফি জেতার পর। হ্যাঁ, রুইয়া, হালকার ও গরুদত্তর সঙ্গে এই শেষ ংযোজন বাষট্টি বছর বয়সে।

ভারতীয় ব্রিজের কথিত কাঞ্চন ীড়ানট। রবি রায়ের মতে ভারতের শ্রেষ্ঠ খলোয়াড়। বলেছিলেন, বোম্বাইয়ের এস াব শেঠি এবং বাংলার শান্তি সেনের াছে আমরা এখনো শিশু।

অবাক হবার কথা, এই শান্তি সেন কন্তু অপর খেলোয়াড়দের মত ব্রিজের ইপত্র ঘাটাঘাটি করেন না। সহজাত াধারণ বুদ্ধির বলেই খেলে যাচ্ছেন দীর্ঘ চল্লশ বছর ধরে।

—"কীভাবে আপনার মধ্যে এই তাসের েশা ঢুকল?"

শান্তিবাবু জানালেন, খেলতে খেলতে বং অতীত দিনের বিখ্যাত খেলোয়াড় ামিনী গাঙ্গুলীর সংস্পর্শে এসে। তেরো-আঠারো বছর থেকে তাস খেলতে ারম্ভ করেন এবং একটু নাম হবার পর ন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বন্ধুদের রোচনায় গিয়ে পড়েন যামিনী গাঙ্গুলীর াান্সডাউন ক্লাবে।

—"আচ্ছা যামিনী গাঙ্গুলী কি খুব ড় খেলোয়াড় ছিলেন?"

—"খুব বড় খেলোয়াড় নয়, তবে ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু কারো নামের আগে যদি 'তাসপাগল' কথাটি প্রয়োগ করতে হয় তবে যামিনী গাঙ্গুলির ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। পদ্মপুকুর ইনস্টি- টিউটের পাশে ল্যান্সডাউন রোডে নিজের বাড়িতে ক্লাব ছিল। প্রায় সব সময়ই ফরাসের উপর তাস চলত। বিশ-বাইশজন সভ্যের চা জলখাবার নিজেই সরবরাহ করতেন। একবার ওর ছেলের কঠিন অসুখ। জীবন-মরণ সমস্যা। ডাক্তারকে বললেন, ছেলে রইল আপনার জিম্মায়। ধরুন এ আপনারই ছেলে। আমি যাচ্ছি তাস খেলতে। বলা বাহুল্য, সত্যিই আমাদের সঙ্গে কম্পিটিশনে খেলতে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে ছেলেকে আর জীবিত দেখতে পাননি।

যামিনীবাবুর মৃত্যুর পর আমরা যখন তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাই তখন তাঁর স্ত্রী আমাদের হাতে নতুন একজোড়া তাস দিয়েছিলেন। চিতা সাজিয়ে তাঁর বুকের উপর সেই তাস রেখে তাঁকে দাহ করা হয়েছিল।"

—'আপনার মতে তখন সবচেয়ে বড় ব্রিজ খেলোয়াড় কে ছিলেন?'

—'শাঁখারীপাড়ার ককফোর্ড'স ক্লাবের নীতিশ মিত্র। তিনিও যামিনীবাবুর মত নিজের বাড়িতে ক্লাব করেছিলেন। অসাধারণ খেলোয়াড় ছিলেন। ষষ্ঠেন্দ্রিয় ছিল অত্যন্ত প্রখর। বইপত্র বিশেষ পড়তেন না। নিজেই নানা প্রোব্লেম বের করে নিজেই তার সমাধান করতেন।"

এই নীতিশ মিত্র এবং যামিনী গাঙ্গুলীর সময়ে শান্তি সেন ব্রিজে বহু কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। অবশ্যই সহ খেলোয়াড়দের সঙ্গে। কারণ ব্রিজ একজনের খেলা নয়। তখনকার সবচেয়ে নামী প্রতিযোগিতা খেটাবেটো গোল্ড কাপ ফাইনালে চারবার খেলে দুবার বিজয়ী হয়েছিলেন। একবার সেমিফাইনালে নীতিশ মিত্রের দলকে পরাজিত করেছিলেন ৪ হাজার পয়েন্টের ব্যবধানে। একবার ল্যান্স- ডাউন ক্লাবেরই দুটি দল ফাইনালে উঠে- ছিল। এক দলে ছিলেন যামিনী গাঙ্গুলী, রতন দত্ত, সুকুমার দত্ত এবং মিনি মুখার্জি। অপর দলে শান্তি সেন, কানাই পাল, সুশীল গুপ্ত এবং বিজয় পাল। গোল্ড কাপ পেয়েছিলেন শান্তিবাবুরাই।

তখন বিমান মিত্রের দলও ব্রিজে দারুণ শক্তিশালী ছিল। বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির টুর্নামেন্টে ওই বিমান মিত্রের দলকে সেমিফাইনালে ৪ হাজার পয়েন্টে পরাজিত করে ফাইনালে ছত্রভঙ্গ দলকে সত্যিই ছত্রভঙ্গ করেছিলেন ৬ হাজার পয়েন্টে হারিয়ে।

কণ্ট্রাক্ট ব্রিজের মাস্টার শান্তি সেনের প্রথম পুরস্কার জয় ভেনাস ক্লাবের ডুপ্লিকেট অকশান ব্রিজে। কণ্ট্রাক্টে প্রথম বিজয়ী ম্যাকলিয়ড ইনস্টিটিউটের প্রতিযোগিতায়। তারপর নানা প্রতিযোগিতা জয়ের সুবাদে গিনি, হাফগিনি, কাপ মেডেল এসেছে ভূরি ভূরি। সব মিলিয়ে সংখ্যা ৩০০-র কাছাকাছি।

তাস খেলার জন্য সারা জীবন হিল্লি- দিল্লি ঘুরেছেন। সিঙ্গাপুরে ফার ইস্টার্ন টুর্নামেন্ট খেলেছেন। তবু অফিসের কাজের চাপে অন্তত ৮ বার জাতীয় ব্রিজে যোগ দিতে পারেননি। বাংলা দলে নির্বাচিত হয়েও একবার ছুটি পাননি। কাজ করতেন ইণ্ডিয়ান রেড ক্রসে।

যাঁদের তাসের নেশা স্বভাবতই সংসার সম্পর্কে তাঁদের কিছুটা উদাসীনতা থাকে। শান্তিবাবুরও ছিল। 'রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার তাসকে নিয়েই থাক'— সহধর্মিণীর এমন উক্তিও শুনতে না হয়েছে এমন নয়। কিন্তু ওই গিনি ও হাফগিনিগুলিই শান্তিবাবুর সংসারের শান্তি বজায় রেখেছিল। মেয়ের বিয়ের গয়না গিনি ভেঙেই করে দিয়েছিলেন। এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। প্রায় বাউণ্ডুলে ভাবের মধ্যে ছেলেমেয়ের পড়া- শুনার প্রতি কোনদিন নজর দিতে পারেননি। কিন্তু মেয়ে এম এ পাশ করেছে, দুই ছেলেও এঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরিয়েছে।

রবি রায় সম্পর্কে শান্তিবাবুর অভিমত: গত ১০ বছর ধরে ইণ্ডিয়ার বেস্ট। শান্তিবাবুই কিন্তু রবি রায়কে ল্যান্সডাউন ক্লাবে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রিজে ওর সহজাত দক্ষতা দেখে।

মুকুল

অরণ্যদেব

লী ফক

অন্দর-মহলে পোষা প্রাণীদের নিয়ে খেলা করছেন অরণ্যদেব...

তারপর খাঁড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুশুকের নৌকোয় চড়ে...

ওখানে ওটা কী?
1/26

শুশুকের নৌকোয় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল।
একটা বাচ্চা মেয়ে--কাছেই হাঙর।

আয় তোরা, হাঙরের সঙ্গে লড়বি!

আর-কিছুকে ভয় না পেলেও শুশুকদের ভীষণ ভয় পায় হাঙর। তার কারণ, হাঙরের তুলনায় শুশুক আরও চালাক। ক্ষিপ্রও বটে!

ভয় পেয়ো না... এক্ষুনি তীরে পৌঁছে যাবে!
!
কিন্তু বিপদ কাছেই!
৪

"সেই চোখ" (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে মহুয়া রায়চৌধুরী

রঙ্গ জগৎ

মতামতের মন্তাজ

পুজো আসছে। ফিলম জগতেও এখন তোড়জোড়। পুজোয় কোন্ প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ছবি দেখা যাবে এই নিয়ে দর্শকদের মধ্যেও নিশ্চয়ই জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। পুজোর সময়টা বাংলা ছবির সময়। বাংলা ছবি অবশ্য সারা বছর জুড়েই চলে। তবে পুজোয় বাংলা ছবির জন্য দর্শকের অপরিসীম আগ্রহ থাকে। জনপ্রিয় সব তারকারই কোন না কোন ছবি তৈরি হয়ে আছে। পুজোয় কোন্ ছবিগুলি মুক্তি পাচ্ছে এখনই হয়ত বলা যাবে না। খুব বড় তারকা নিয়ে যাঁরা সাধারণত ছবি করেন না এমন জনপ্রিয় পরিচালকের ছবিও আছে। এখন কেবল মুক্তির তালিকা দেখা বাকি। পুজোর আগেই সম্ভবত সেনসর-ভিত্তিক বাংলা ছবি মুক্তির নীতি ঘোষিত হবে। তবে সেটা পুজোর আগেই কিংবা পুজোর সময় বলবৎ হবে এমন সম্ভাবনা নেই। আশা করা যায়, পুজোর অল্পকাল পরেই সেনসর-ভিত্তিক নীতিতে বাংলা চলচ্চিত্রের মুক্তি ঘটবে। এবং বাংলা ছবি দেখার হলও বাড়বে। বাংলা ছবিকে যাঁরা সত্যিই ভালোবাসেন তাঁদের কাছে এটা নিশ্চয়ই সুসংবাদ।

* * *

বাংলা ছবি ভাল হলেই চলবে, আসলে ছবিই চিত্তাকর্ষক হয় না তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে—এই ধরনের একটা কথা শোনা যায়। এই কথার মধ্যে একেবারেই যুক্তি নেই বলছি না। আমরাও একাধিকবার বলেছি, বাংলা ছবির একটি সংকট এই যে ছবি চিত্তাকর্ষক হচ্ছে না। কিন্তু উপভোগ্য ছবি একেবারেই হচ্ছে না তা নয়। উঁচু শিল্পমানের ছবিও প্রতি বছরে একটি বা একাধিক দেখা যায়। সেসব ছবির প্রতি কি সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকতা আকৃষ্ট হন? মোটেই না। তাই বাংলা ছবির প্রতি বাঙালী দর্শকের অনুরাগ বেশি একথা বলা যায় না। ছবি উপভোগ্য বা চিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার—এই কথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

* * *

এখন যে সেনসরের ভিত্তিতে ছবি মুক্তির ব্যবস্থা হচ্ছে তাতে সকলেই সমান-ভাবে খুশি নাও হতে পারেন। কে কেন অখুশি তার অবশ্য আলাদা কারণ আছে। আগেও বলা হয়েছে, সেনসর-ভিত্তিক চিত্র-মুক্তির কিছুটা সমস্যা আছে। কিন্তু বাংলা ছবির উপকারের জন্য এই নীতির প্রয়োজন আরও বেশি। এই নীতিতে অনেক সমস্যার সমাধানও হতে পারে। তা-ছাড়া এখনই এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে না। বাংলা ছবি যদি ব্যাপকভাবে দেখাতে হয় কিংবা এর বর্তমান প্রদর্শন-ক্ষেত্র যদি বাড়াতে হয় তবে সেনসর-ভিত্তিক রিলিজ ছাড়া গ্রহণ-যোগ্য অন্য কোন পন্থা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এদিকে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে হলে এর ব্যাপকতর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতেই হবে। তাই বাংলা ছবির চেন বাড়িয়ে সেনসরের ভিত্তিতে ছবি রিলিজ করা। বাংলা ছবি চিত্তাকর্ষক হলেই চলবে—এই কথা বলে ব্যাপক প্রদর্শনের যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়া অন্যায়। ছবি যত ভালই হোক, সেটা ভালভাবে চলার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা দরকার। বাংলা ছবি রিলিজ করার জন্য যদি দুর্ভোগ ভুগতে না হয় তবে প্রযোজকরাও আপসের পথে না গিয়ে ভাল ছবি তৈরির সাহস পাবেন। শুধু উপভোগ্য ছবিই নয়, শিল্পসম্মত ছবিও হওয়া দরকার। শেষোক্ত শ্রেণীর ছবির জন্য অনুকূল পরিবেশ এখন কোথায়? তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন এমন এক সুব্যবস্থা যেখানে ছবি রিলিজের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। ছবি চিত্তাকর্ষক বা সুখভোগ্য হলে চলে নিশ্চয়ই। তাই বলে কি ব্যাপক প্রদর্শন এবং অবাধ রিলিজের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে হবে? কোণঠাসা অবস্থায় যে-ছবি

"হোটেল স্নো ফক্স" (পরিচালনা : যাত্রিক) ছবিতে অমরনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিঠু মুখোপাধ্যায়

ভাল চলে প্রদর্শনের সুযোগ-সুবিধা পেলে সে-ছবি আরও ভাল চলবে। তাই ছবি 'চিত্তাকর্ষক হওয়া দরকার' এই কথা বলে দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়ানো কোন কাজের কথা নয়। পুজোর আগে হয়ত সেনসর-ভিত্তিক রিলিজ চালু হবে না, কিন্তু পুজোর আগে যদি এই আশ্বাস মেলে যে অচিরেই তা কার্যকর হবে তবে এই পুজোতেই চিত্রামোদীদের আনন্দ আরও বাড়বে।

গুপ্ত বিজ্ঞানের ছবি

কামশাস্ত্র (আর্ট ফিলম)

বোমবাইয়ের চিত্রপ্রযোজকরা কামশাস্ত্র-জ্ঞান বিতরণের জন্য হঠাৎ কেন এমন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সেটা অবশ্য অনুমান করা যায়। তবে ছবিতে এই জ্ঞান প্রচারের পদ্ধতি রীতিমত হাস্যকর। "কামশাস্ত্র"-র মহিলা গাইনোকোলজিস্ট অভিনেত্রী অলকা (চরিত্রের নামও তাই) রতিবিলাসিনীর মত সেজে পুরুষদের কাছেও সমানে গুহ্য কামবিজ্ঞান বর্ণনা করে গেছেন। পুরুষ ডাক্তারও ছবিতে আছে। ওদের প্রত্যেকের হাতেই অফুরন্ত সময়, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে তাদের বক্তৃতা আর শেষ হয় না। তাছাড়া যৌনবিজ্ঞানের ক্লাশও আছে।

অলকার কথাবার্তায় এমনিতে স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের লক্ষণ আছে, কিন্তু যেই তিনি কামশাস্ত্রের বিষয় বলতে আরম্ভ করেন তখন আর অভিনয় হয় না, তার কথা ক্লাশ লেকচারের মতো শোনায়। একটা গল্পের আদলেই অবশ্য বিষয়টা উপস্থিত করা হয়েছে। অলকা ও মনীষা দুই বোন লোকের দাম্পত্যজীবন সুখময় করার জন্য নিবেদিত প্রাণ। কারণ তাদের বাবা-মার বিবাহিত জীবন ছিল অত্যন্ত দুঃখের। ওদের মার হাতেই ওদের বাবা খুন হন।

ছবির শুরুতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হেলেন (বাঈজীর ভূমিকায়) এক বক্তৃতা দিলেন। দেশে যৌনশিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন যে কত গভীর সেটাই তাঁর বক্তব্য। সেখানেই গল্পের শুরু। গল্পে ছোটো খাটো ভিলেনও আছে। গাইনোকোলজিস্ট নায়িকার সঙ্গে ভিলেন পারবে কেন? অলকা ওই শয়তানের গোপন অঙ্গে এমন ছুরি দিয়েছেন যে সে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। অলকা মনীষা দুজনেই ছবিতে অবিবাহিত রয়ে গেলেন। মনীষার প্রেমিক জুটেছিল, সে এক প্লে-বয়। কলকাতার মৃণাল মুখারজি এই চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন। মনীষার অভিনয়ও ভালই। তিনিই নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে মৃণালকে আর এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলেন—মৃণাল যার সর্বনাশ করেছিল। আসল বিষয়টা লোকশিক্ষার দিকে নজর রেখেই ছবিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এবং গল্প বিষয়ের সঙ্গে ওই উদ্দেশ্য খাপ খেয়ে গেছে। ছবিটাও ওই সব অংশে মেডিকেল ফিল্মের রূপ নিয়েছে। তথ্য পরিবেশনের দিক থেকে পরিচালক প্রেম কাপুর যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন বোঝা যায়।

গুপ্তশাস্ত্র (ভোরা ইনটারন্যাশনাল)

বিষয়, বলা বাহুল্য, দুটি ছবিরই এক। জ্ঞান পরিবেশনের পদ্ধতিতেও মিল আছে। তবে "গুপ্তশাস্ত্র"-য় গল্পের ভাগ বেশি, এবং তাতে ভিলেনের কার্যক্রম একটু বিস্তৃত। হীনা কৌসর এই ছবির মহিলা গাইনোকোলজিস্ট। সকল অবস্থাতেই তাঁর অভিনয় স্বাভাবিক। তিনি এবং মহেন্দ্রকুমার (তরুণ ডাক্তার) তাঁদের দায়িত্ব শেষ করে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার বাসনা প্রকাশ করলেন। যৌনবিজ্ঞানের শিক্ষা এ ছবি থেকেও লাভ করা যায়, তবে পরিচালক শ্রীরাম ছবিটাকে গল্পঘটনার দিক থেকেও উপভোগ্য করতে চেয়েছেন। এমনও মনে হয়, মূল বিষয়টা—গুপ্তশাস্ত্র—যেন ছবিতে গৌণ। যদিও যৌনজীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও শিক্ষা দেবার চেষ্টা এ-ছবিতেও রয়েছে।

শুটিং চলছে ...

একা থাকাই মানে একটু একটু করে নিজের ভিতরের যন্ত্রণার কাছে ফেরা। পিছনের দিনগুলিতে দৃষ্টিপাত। সারা শরীরে দংশনের বিষ। এইভাবে বেঁচে আছেন কোকিল রায়। চারিপাশের এবং নিজস্ব অস্থিরতা ভেঙে ভেঙে সাময়িক প্রশান্তির কাছে পৌঁছতে চাইছেন। পারছেন না। যেন এ একটা আবর্ত। এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা

শ্যুটিং চলছে : "অবতার" ছবির সেই দৃশ্যে মাধবী চক্রবর্তী ও অনিল চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

যায় না কিছুতেই। মনের তলায় সারাক্ষণ প্রশ্নের ঝড় বইতে থাকে। আমি এখানে কেন? কিভাবে এলাম? কেন এলাম? একাধিক প্রশ্ন এসে থমকে দাঁড়ায়। প্রশ্নের মুখোমুখি কোকিল রায়। দেয়ালে পিঠ রেখে। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ: আগে কিম্বা কখনও তিনি খুব বেশী করে ভেবে দেখেননি নিজের কথা। তিনি সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেছেন। ঠকিয়েছেন। জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নি। জীবনের ওই বিপর্যয়টা ঘটে যাবার আগের দিন পর্যন্ত! তাঁর কাছে আর পাঁচটা মানুষের সুখ-দুঃখের কোন মূল্যে ছিল না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন কাজ নেই, করেন নি। ভেবেছিলেন সময়ের স্রোত যেদিকে খুশী সেদিকে যাক—তিনি সুখের সাগরে ভেসে যাবেন নির্বিকল্পভাবে! সুখ? কথাটা ভয়ানক ব্যঙ্গ করে তাঁকে। অথচ দেখে বোঝবার উপায় নেই। সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব। কোনো জটিলতা নেই। গলার স্বর স্পষ্ট ও গভীর। বেশ সুন্দর করে কথা বলতে পারেন। বুদ্ধির যে দীপ্তি পুরুষকে যথার্থ পুরুষ করে তোলে তাঁর মুখে তা সারাক্ষণ উদ্ভাসিত হয়ে থাকে।

কে এই কোকিল রায়? একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন। দেশ সেবা তাঁর ধর্ম অথবা পেশা বলতে পারেন। স্বাভাবিক নিয়মে তাঁকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। এতকাল তিনি জয়ের মুখ দেখেছেন। প্রথম পরাজয়। খবরটা জানাজানি হ'তে শ্রীরায় নিজে বড় বিব্রত বোধ করেন। এত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এত স্বপ্ন দেখিয়েছেন। নানাভাবে শঠতার আশ্রয় নিয়েছেন। দলের ক্যাডারদের তিনি কি জবাব দেবেন। ওরা ভাঙতে পারে। গুঁড়িয়ে দিতে পারে। ক্রোধের আগুনে সবকিছু জ্বালিয়ে ছারখার করে দিতে পারে। অনিবার্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তেই হ'ল। আঘাতে আঘাতে সংজ্ঞা হারালেন কোকিল রায়।

আপাতত বিশাল ফ্ল্যাট বাড়ির একটি ঘরে বন্দী। সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই তাঁকে এখানে আনা হয়েছে। এনেছেন তাঁর জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। বন্ধুরই ফ্ল্যাট। থাকেন এক অল্পবয়েসী মহিলা। বন্ধুর রক্ষিতা। এখন এই মহিলা শ্রীরায়ের দেখাশোনা করছেন। প্রথম কয়েকটা দিন অস্বস্তিতে কেটেছে। দুজন দুই মেরুতে অবস্থান করেছেন। ধীরে ধীরে দুজনের পরিচয়! কথাবার্তার পরিধি বিস্তৃত। কিন্তু সব সময়ই উভয়ের মধ্যে মানসিক অসংযোগ। দেখুন কেমন বাক্য বিনিময় হচ্ছে :

মহিলা : জীবনে এত পুরুষ মানুষ দেখেছি যে এখন একবার দেখলেই বলে দিতে পারি—আসলে পুরুষ মানুষদের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। রাম শ্যাম যদু মধু সবাই এক।

শ্রীরায় : আপনি তো বেশ কথা বলতে পারেন দেখছি।

মহিলা : এ লাইনে থাকতে গেলে শিখতে হয়।

শ্রীরায় : শিখলেন কোত্থেকে...কলকাতায় নানান বিদ্যে শেখাবার জন্য স্কুল আছে জানি কিন্তু রক্ষিতাকে শিক্ষিতা করবার স্কুল আছে জানিনা তো।

শ্যুটিং চলছে। দক্ষিণ কলকাতার বিশাল ফ্ল্যাটবাড়ির একটি ঘরে। মহিলা, মাধবী চক্রবর্তী। শ্রীরায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়। ছবি, 'অবতার'। পরিচালনা করছেন : সৈকত ভট্টাচার্য।

সৈকত ভট্টাচার্য : তরুণ রায়ের মঞ্চসফল 'পরাজিত নায়ক' নাটক অবলম্বনে আমার এ ছবির চিত্রনাট্য। নাটকটি দেখার পরই আমি এর চলচ্চিত্র সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছি। কারণ বিষয়ের গভীরতা। আজকের এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। 'সোস্যাল রিয়্যালিটির পয়েন্ট অফ ভিউ' থেকে মূল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রধান চরিত্র 'বেসিকালি' সৎ। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার বৃত্তে—এই সমাজ ব্যবস্থার বৃত্তে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ রুদ্ধ।।

মাধবী চক্রবর্তী : অনেক চরিত্রের ভীড়ে হারিয়ে যাবার মত চরিত্র এটি নয়। এর বৈশিষ্ট্য আছে। ক্ষণে ক্ষণে মনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

অনিল চট্টোপাধ্যায় : চরিত্রটি, জনগণের প্রতিনিধি বলা হয়েছে। ফলে তার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। দায়িত্ব সে পালন করে না। বঞ্চিত করে। ঠকায়। আসলে চরিত্রটির মধ্যে চেতনা রয়েছে। আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সে সেটা উপলব্ধি করতে পারে। এখানে তার

"ফুলেশ্বরী" (পরিচালনা : সারথী) ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

মানসিক দ্বন্দ্ব আর সংঘাত। পরিবেশ থেকে বেরুতে পারে না। চরিত্রটির অসহায়তা এক একসময় আমার অন্তরকে তোলপাড় করেছে। এক সুন্দর প্রাতঃকালে টেলিফোন আসে আমি ভোটে হেরে যাইনি। ভুল গণনা হয়েছিল। পুনর্গণনায় দু'শ পঞ্চাশ ভোটে জিতেছি। সুতরাং আমি আর একা নই। লক্ষ লক্ষ জনতা আসছে আমাকে অভিনন্দন জানাতে। এখন আমি একজন রক্ষিতার ঘরে আশ্রিত এটা যেন জানাজানি না হয়। এখনই আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। আমি একটু পরেই উদার আকাশের নীচে মানুষের মিছিলে যোগ দেব। আমি আসছি। আপনারা সব অপেক্ষা করুন।

পুনশ্চ : এ ছবির সম্পূর্ণ দৃশ্যগ্রহণ নির্ধারিত স্টুডিওর বাইরে। দৃশ্যগ্রাহক : তপন গুহঠাকুরতা।

*　*　*

সর্বেন্দ্র বরের বেশে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কনের সাজে স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ-এর এই ফ্লোরে এলেন 'ফুলশয্যা' ছবির শট দিতে। পরিচালক সারথী গোষ্ঠীর কুশলীরা তৎপর। চিত্রশিল্পী বিজয় দে ক্যামেরায় চোখ রেখেছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সব আলো জ্বলে উঠল। স্পষ্ট হ'ল একটি বাসর ঘর। ও'রা ঘনিষ্ঠ হবেন এমন সময় একটি পরিচিত পুরুষ কণ্ঠ ভেসে আসে...ভালই হ'ল, শুভদিনে এসেছি...। তৎক্ষণাৎ সাবিত্রী অর্থাৎ সুচন্দ্রার যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। শোভনের ভূমিকায় সর্বেন্দ্র অপলক তাকিয়ে রইলেন সেই মানুষটার দিকে যার প্রতীক্ষায় সুচন্দ্রা তার জীবনের মহামূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছে। নতুন জীবন শুরু করার প্রারম্ভে এমন অভাবিত আগমন হবে মানুষটার কেউ কল্পনা করতে পারবেন না। পরিচালক গোষ্ঠী দাবী করলেন, ছবির এই পরিণতিতে দর্শকরা বিস্মিত অভিভূত হবেন—চোখের জল ফেলবেন আনন্দ বেদনায়।

জুপিটার প্রোডাকসনের প্রথম ছবি। তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরা হলেন : নির্মলকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, অলকা গাঙ্গুলী, মাধবী মুখোপাধ্যায় এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়।

—বার্তাবহ

সবাই রাজা

থিয়েটার প্লেসের 'সবাই রাজা' নতুন প্রযোজনা হিসাবে মোটামুটি সার্থক। একাডেমি মঞ্চে পরিবেশিত এই নতুন উপহারের টিমওয়ারকটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। নাটকের বিন্যাস ও ব্যঞ্জনাগত ত্রুটিটুকু অভিনয় দিয়ে মুছে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টাটুকু যে বিফল হয়েছে তা বলা যায় কি? সুন্দর একটি পরিবেশ ও'রা রচনা করতে গিয়েছিলেন, কিছু কিছু নাটকীয় মুহূর্ত রচনাও ছিল উপভোগ্য। কিন্তু বাক্-সর্বস্ব চরিত্ররা সর্বত্র নিজেদের ঘর গুছিয়ে উঠতে পারলেন কোথায়? প্রয়োগগত ভাবনাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই চমৎকার ব্যাপ্তি এনেছিল। ওই ব্যাপ্তি বজায় থাকলে 'সবাই রাজা' সম্ভবত আমাদের অবাক করে দিতে পারত।

দুই অঙ্ক তিন দৃশ্যের নাটকে একটি সোনালী সুখী পরিবারকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার চিত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু যে রাজা হয়েছে হাজার রাজার প্রতীক, সমাজ ব্যবস্থার ওপর তার এত ঘৃণা কেন? কোন সমাজ বা ওই সমাজের কে বা কারা মখমলের মোড়া সিংহাসনটা পালটে ধরণীর ধুলোয় আসন পাততে দিচ্ছে না—একথা কি সুস্পষ্ট? নাটকের 'রাজা' নিজে বাক্-সংযমী হলে বোধ হয় হবু রাজাদের সামনে একটি বলিষ্ঠ আদর্শ রাখা হতো। সে কারণেই বাঞ্ছিত প্রলয়ের চেহারা স্পষ্টপুষ্ট হতে পারল না।

নাট্যকার গৌরীনাথ ব্যানার্জি নিজে রচনা করেছেন মঞ্চপরিকল্পনা। প্রয়োগকে এ-পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর। নির্দেশনাগত ভালো-মন্দর দিকটি আগে আলোচিত। অভিনয়ে হরনাথ ব্যানার্জির 'প্রলয়' যথাযথ। মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জির 'অমিতপ্রসাদ'ও সার্থক। সতীনাথ ব্যানার্জির 'গণপতি' রঙ্গরসে আকর্ষক হয়ে ওঠে। সংগীতা করের 'সংযুক্তায়' আর একটু প্রাণের স্পর্শ কাম্য ছিল। নাট্যকার অভিনীত চরিত্রটি প্রশংসা পাবে। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন তপন চ্যাটার্জি, রতন দেব, উত্তম ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, শিবু দত্ত ও পারুল দাস।

—প্র-ব-অ

শ্যামা

শ্যামা নৃত্যনাট্য। সুতরাং নতুন কিছু নয়। প্রযোজনাতেও নতুন কিছুর দাবি ছিল না। নতুন শুধু সুরদীপ সংস্থা। তবু বলতে পারি না যে গোর্কি সদনে তাঁদের অভিনীত শ্যামা দেখে কোথাও অস্বস্তি বোধ করেছি। শ্যামার ভূমিকায় শিপ্রা সেন—যিনি আবার পরিচালনার রাশটিও হাতে নিয়েছিলেন—আবেগ ও অভিব্যক্তির মণিকাঞ্চন যোগ ঘটাতে পেরেছিলেন। শিপ্রা চৌধুরীর বজ্রসেন সার্থক হয়েছিল। সেই সঙ্গে সার্থক বটু পালের কোটাল। গানের পরিচালনায় ছিলেন অজিত শীল। তিনি তাঁর সহযোগী শিল্পীদের সহযোগিতায় বঞ্চিত হননি। শ্যামচাঁদ সেনের সঙ্গত [illegible] সুন্দর লেগেছে।

—সুররসিক

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
উচ্চ শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৬০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
উত্তরাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
[illegible]কুমার গাঙ্গুলী
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩ ২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলাদেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লন্ডন অফিস মাধ্যমে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

দেশ

৪ অক্টোবর, ১৯৭৫ ॥ ৮০ পয়সা

মাখুন রেশমী কোমল
ল্যাকমে
আল্ট্রা-সিল্ক
ফেস পাউডার আর কমপ্যাক্ট
রেশমী কাপড়ে ছাঁকা যেমন সূক্ষ্ম,
তেমনি হাল্কা আভা অথচ দাগ ঢাকে
আলতো করে... আপনার মুখে ফোটায়
আলোকদীপ্ত শোভা ! ল্যাক্‌মে আল্ট্রা
সিল্ক ফেস পাউডার ৮টি সুন্দর
শেডে পাওয়া যায় । সরাসরি
বা মেক-আপের ওপর মাখুন !
এই পাউডার ঠেসে তৈরী
ল্যাকমে আল্ট্রা ফেস
পাউডার কমপ্যাক্ট—
সঙ্গে রাখা সুবিধে !
সৌন্দর্য্য
সাধনায়
ল্যাক্‌মে
dCP/LFP/1G BEN
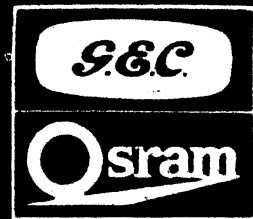
তোয়ালে
এত সুন্দর
যে পরতে আপনার মন চাইবে
TOWELS
DCM
TEXTILES
dcm/41

সূচীপত্র

ডাক্তাররা বলেন,
৩ মাসের পর, শুধু দুধই
যথেষ্ট নয়। সর্বাঙ্গীণ বিকাশের
জন্যে আপনার
বাচ্চার
চাই শক্ত
আহার।
ফ্যারেক্স!
Glaxo
FAREX
Baby's first solid food for all-round growth
আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাকে
ফ্যারেক্স কত কি দেয় দেখুন :
● সুস্থ রক্ত আর উচ্ছল প্রাণশক্তির জন্যে যথেষ্ট আয়রণ
● মজবুত দাঁত আর হাড়ের জন্যে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি২
● দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্যে সহজ পাচ্য প্রোটিন
● বাড়ন্ত বাচ্চার বয়েস আর পরিবর্তন অনুসারে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট শক্তি
আপনার বাচ্চার জন্যে কি অনুপাতে
ফ্যারেক্স বাড়ানো প্রয়োজন :
বাচ্চার বয়েস — ফ্যারেক্সের পরিমাণ
৩-৬ মাস — ১-২ চায়ের চামচ, দিনে দুবার
৬-৯ মাস — ৩-৪ চায়ের চামচ, দিনে তিনবার
৯ মাস-৩ বছর — ৪-৬ চায়ের চামচ, দিনে চারবার
FAREX
ফ্যারেক্স
৩মাসের পর, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যে
আপনার বাচ্চার প্রথম শক্ত আহার
বিনামূল্যে! ফ্যারেক্স পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত আপনার নামঠিকানা (যে ভাষায় চান জানিয়ে) এই ঠিকানায় পাঠান : ডিপার্টমেন্ট D-7, পোস্ট বক্স ১০০৫৮, বম্বে ৪০০ ০২৫।
গ্ল্যাক্সো

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ—শঙ্কর মজুমদার

সমরেশ বসুর

ছোটদের অনবদ্য উপন্যাস

মোক্তার দাদুর কেতুবধ

দাম ৫·০০

হ্যাঁ, ইনি সেই বিখ্যাত সমরেশ বসু—গত দু' দশকে যিনি দারুণ দারুণ সব লেখা উপহার দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন বাঙালী পাঠকদের, এবং এখনও দিয়ে চলেছেন। তবে, সে সবই বড়দের জন্যে। এবার কিন্তু তিনি তোমাদের—ছোটদের—দিকে নজর দিয়েছেন। এর আগে কয়েকটি নতুন ধরনের গোয়েন্দা-উপন্যাস যদিও লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি ঠিক ছোটদের জন্যে নয়। এই প্রথম তিনি একটি বড় আকারের সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখলেন তোমাদের জন্যে।
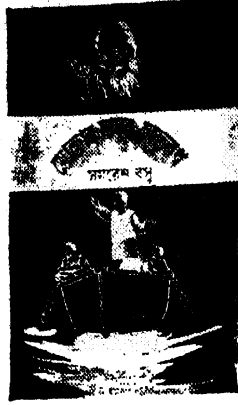
না, 'শ্বাসরুদ্ধকর' কোনও গোয়েন্দা-গল্প কিংবা আন্তর্জাতিক সিক্রেট এজেন্ট-এর কোনও 'রগরগে' অপরাধ-কাহিনীও এটা নয়; এমন কি, নিছক কোনও দুঃসাহসিক অ্যাডভেনচারের উত্তেজনা-ছড়ানো গল্পও নয়, বা কোনও আজগুবী কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী। একেবারে স্রেফ সাদামাটা তোমাদের মতো একটি কিশোর এবং সত্তর-ছাড়ানো এক বুড়ো দাদুর গল্প। অসমবয়সী দুটি মানুষের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক নিয়ে লেখা এই অনবদ্য রচনাটি তোমাদের মনে এমন একটি স্নিগ্ধতার আবেশ ছড়াবে—যা তোমরা এখনকার আর কারও লেখাতেই পাও না।

প্রকাশিত হল

ছোটদের আরও বই

- রাজকুমারের পোশাকে ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ ৪·০০
- দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ॥ অমরনাথ রায় ॥ ১০·০০
- বাতাস বাড়ি ॥ লীলা মজুমদার ॥ ৪·০০
- আমার নাম টায়রা ॥ শৈলেন ঘোষ ॥ ৫·০০
- ক্লাস সেভেনের মিস্টার ব্লেক ॥ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৪·০০
- রয়েল বেঙ্গল রহস্য ॥ সত্যজিৎ রায় ॥ ৫·০০
- তিন নম্বর চোখ ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০
- সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ॥ সত্যজিৎ রায় ॥ ৬·০০
- সীমানা ছাড়িয়ে ॥ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬·০০
- জীবজন্তু ॥ সুকুমার রায় ॥ ৮·০০
- হুম্পোকে নিয়ে গপ্পো ॥ শৈলেন ঘোষ ॥ ৫·০০
- ওআন্ডার মামা ॥ বিমল কর ॥ ৬·০০
- অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

নারায়ণ চক্রবর্তীর গোয়েন্দা-উপন্যাস
হলদে সবুজ কৃষ্ট্যাল ১০·০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দা-উপন্যাস
বসন্তের দিন শীতের রাত্রি ১০·০০

তরুণকুমার ভাদুড়ীর উপন্যাস
বিলকিস বেগম ৮·০০

ইন্দ্রমিত্রের গল্প-সংকলন
শুভাদিন ৬·০০

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের গল্প-সংকলন
যাদের কথা কেউ ভাবে না ১০·০০

সমরজিৎ করের কল্পবিজ্ঞান-কাহিনী
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০

শংকরলাল ভট্টাচার্যের উপন্যাস
এই আমি একা অন্য ৪·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
অবনী বাড়ি আছো ৪·০০

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
সহবাস ৪·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা কাহিনী | চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

আগ্রা যখন টলমল ৫.০০

সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা-উপন্যাস | পঞ্চদশ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বাদশাহী আংটি ৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৪৯
শনিবার ১৭ আশ্বিন ১৩৮২

মহৎ কথাশিল্পী

জাতি কিংবা সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে কৃতিত্বের প্রকাশ যদি বিশেষ একজন অতিগুণীর প্রতিভাধীন অবদান হয়, তবে সেটা জাতি ও সমাজের পক্ষে একটি বিরল সৌভাগ্যের প্রসন্ন উপহার বলে অবশ্যই বিবেচিত হবে। কোন কোন মনীষীর ও সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, সংস্কৃতির চরিত্র ও কৃতিত্বের এ ধরণের মহদনুসরণ এক হিসাবে জাতিক বা সামাজিক প্রতিভার পরবশ অবস্থা তথা অধীনতার ব্যাপারও বটে। ভারত সাহিত্যে কিংবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই দুই-একটা যুগ চিহ্নিত হতে পারে; যার কৃতিত্বের রূপ বিশেষ একজন অসাধারণ প্রতিভাধর গুণীর প্রভাব মেনে নিয়ে, তাঁর চিন্তার রীতি-নীতি অনুসরণ করে, তাঁরই রচনার আঙ্গিক প্রথা মান্য করে নিয়ে বিবিধ বৈচিত্র্যে প্রকারিত হয়েছে। এটা ঐতিহাসিক নিয়মের অবান্তর কোন ব্যাপার নয়, বরং সংগত ব্যাপারই বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু বহু গুণীর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে ও কৃতিত্বে সাহিত্যের রূপান্তর জাতি অথবা সামাজিক প্রতিভার বিশেষ একটি শক্তির সার্থকতার প্রমাণ বহন করে। একটি চন্দ্রের কৃতিত্ব তমিস্রা অপসারিত করে; অজস্র তারা কিন্তু সে-কাজ করতে পারে না—প্রাচীন নীতিশ্লোকের ভাষাতে যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, সাহিত্য-প্রতিভার ক্ষেত্রে সে অভিমত একেবারে ষোল আনা নির্ভুল নয়।

তাই রবীন্দ্র-প্রভাবিত সাহিত্যযুগে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার বিশেষ মহত্ত্ব ও স্বকীয়তা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি শুভদায়ক সংঘটন বলে বিবেচিত হতে পারে। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী বস্তুত সাহিত্যের একটি বিশেষ গুণান্বিত রীতি ও সৌকর্যের প্রতি সাংস্কৃতিক জনসাধারণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। শরৎচন্দ্রের মনস্বিতার মান কোন গুণী কিংবা জ্ঞানীর মনস্বিতা ও প্রতিভার সঙ্গে তুলনা করবার বিষয় নয়। তিনি তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তায় বাংলার কথা-সাহিত্যে যে অভিনব রমাতার রূপ চিত্রিত করেছেন, সেটা নিজেরই গৌরবে ও সার্থকতায় সম্পূর্ণ। পূর্বতন ধারা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেও তিনি কৃতিত্বের ক্ষেত্রে একটি মহান একক, স্বাতন্ত্র্যে অভিনন্দিত একটি ব্যক্তিত্ব, এবং নব মধুরতার শিল্পী।

দেশপ্রেম যে জাতির চারিত্র্য ও নৈতিক অভ্যুন্নতির, এবং সাংস্কৃতিক সদাচারেরও একটি বড় সম্বল, এই সত্য বাংলা-সাহিত্যে যে-সকল গুণী ও মনস্বী মহাজনের চিন্তায় ও লেখায় বিবৃত হয়েছে, শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁদেরই আগ্রহের ধারানুযায়ী একজন কৃতী; মানবিক কল্যাণের জন্য অত্যুচ্চ ভাবনা ও আন্তরিক ব্যাকুলতায় অনুপ্রাণিত একজন শিল্পী। জাতীয় চিন্তায় এমন দুর্ভাগ্যের দিনও দেখা দিয়েছিল, যেদিন শরৎচন্দ্রের আন্তরিক উপলব্ধির দরদ ও মায়া দিয়ে লেখা দেশমমতার এবং সামাজিক করুণা ও অকরুণার বিচার কোন কোন সমালোচকের উদ্ধত কঠোরতার মন্তব্যে ক্ষুদ্রতা ও বাজে সংস্কারের কলরব বলে নিন্দিত হয়েছিল। কালের বিচারে এখন এই সত্যই প্রমাণিত হয়ে গেল যে দেশের ও সমাজের জন্য মায়া-মমতার উদাত্ত প্রেরণা সাহিত্যেরও কল্যাণ সৃষ্টি করে; এবং সাহিত্য অভিনব সংবেদনায় পরিস্পন্দিত হয়।

শরৎচন্দ্রের লেখা কথাসাহিত্য বাঙালী জীবনের বহু বিচিত্র চরিত্রের প্রতিচ্ছবি বহন করে। সুখ-দুঃখ [illegible] মনুষ্য-হীনত্ব, মধুরতা ও তিক্ততা, বাঙ্গালীর জীবনের ভাল-মন্দের সবই শরৎচন্দ্রের লেখনীর কৃতিত্বে পরিস্ফুট হয়েছে। তার সমগ্রতার রূপ লক্ষ্য করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, শরৎচন্দ্রের প্রাণের একটি নিগূঢ় সমবেদনার প্রলেপ তার জিজ্ঞাসা চিন্তা ও অভিমতের, এক কথায় তাঁর সাহিত্যকীর্তির সব চেয়ে সুন্দর অভিনবতা সম্পন্ন করেছে। তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস ও কাথিকা, সবই বাঙালীর জীবনের আখ্যায়িকা বটে, কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই নিছক বাঙালীত্বের ছবি নয়। সেটা বস্তুত মানবতারই ছবি। বাঙালী-জীবনের বর্ণসুষমা দিয়ে তিনি মানবীয় সত্যের মহান রূপেরই একটি পরিচয় নির্মাণ করেছেন। পৃথিবীর সব দেশের সব মহান্ শিল্পী ও সাহিত্যিকের সম্পর্কে যে-কথা বলা চলে ,আমাদের বাংলার শরৎচন্দ্র সম্পর্কেও সে-কথা বলা চলে। তিনি বাঙালীর ঘরের আঙিনার তুলসীতলার প্রদীপ হয়েও সর্বজনীন আনন্দের দীপ্তি সঞ্চারিত করেছেন, প্রচারের সমস্যায় তাঁর লেখার এই মহান্ সার্থকতা বিদেশের জনতার কাছে যদিও তেমন-কিছু বিজ্ঞাপিত হতে পারেনি।

অন্য গুণীর সঙ্গে তুলনা করে শরৎ-চন্দ্রের গুণিত্বের মান নির্ণয় করবার কথা আজকের এই প্রসঙ্গে আসতে পারে না। আজ তাঁর জন্মশতবর্ষের একটি দিনে আমরা তাঁর প্রতিভার সমগ্র দানের মর্যাদা অনুভব ও স্মরণ করতে চাই। তাঁর লেখায় জাতির সমাজের ও শিক্ষিত সাংস্কৃতিকের দুই পুরুষের জীবন আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাঁর ভাষার রীতি তাঁর কাহিনীর শিল্প-রূপেরই মতো একটি বিশিষ্ট স্নিগ্ধতা ও সরল ব্যঞ্জনার অনুগত রূপ। তিনি কোন মতবাদ তৈরী করবার চেষ্টা করেননি, তিনি তাঁর চিত্তের অনুরাগ-বিরাগের নৈরাজ্য থেকে যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করে চলেছেন। আজ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে সকলেরই মনে হবে, তাঁর সম্পর্কে [illegible] 'দরদী' কথাটি সত্যই তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে সার্থক পরিচয়।

এই সপ্তাহ

ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে নাক গলিয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতে যা ঘটেছে, তা নাকি দুঃখজনক ঘটনা। শুধু তাই নয়, আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে তিনি বলে বসেছেন, মার্কিন মুলুকে পরিচিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি অচিরেই ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। সংগত কারণেই ফোর্ডের এই মোড়লী ভারত পছন্দ করেনি। দিল্লির একজন সরকারী মুখপাত্র ক্ষুব্ধকণ্ঠে বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছেন, প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি না বুঝেই ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন। ওই মুখপাত্র আরও বলেন, আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নীতির বহু দিক রয়েছে, যা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করা যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রীতি ও সৌজন্য অনুযায়ী বাইরের দেশ কখনই সরকারীভাবে ওই রকম কোন মন্তব্য করে না। তা ছাড়া, প্রত্যেক দেশই তার আদর্শ ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নানা সময়ে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়। ভারত যেমন নেয়, তেমনি নেয় আমেরিকাও। ভারতের জনগণ তাঁদের সংবিধান সন্নিবিষ্ট গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং সম্প্রতি নেওয়া ব্যবস্থাদির বিধান রয়েছে ওই সংবিধানেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা প্রেসিডেণ্ট ফোর্ডের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ওই একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন। দিল্লিতে শিক্ষাবিদদের এক সর্বভারতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, বিদেশের অনেক জায়গায় এখন খোলাখুলিভাবেই বলা হচ্ছে যে, অন্য দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে অর্থনৈতিক এবং সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার স্বাধীনতা তাদের আছে। অথচ ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে যা করেছে তাকে ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। এমনকি এ'ও বলা হয়েছে যে, ভারত নাকি পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি দেশ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার তুলে নিয়েছেন, তাঁরা কি মনে করেন যে, ২৯ জুনের পর তাঁকে, তাঁর পরিবারবর্গকে এবং তাঁর সমর্থক মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁদের পরিবারবর্গকে হত্যা করলেই দেশটা গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হত?

প্রধানমন্ত্রী ওই একই বক্তৃতায় আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন ভারত মার্কিন বিরোধী বা সোভিয়েট সমর্থক নয়। ভারত দু' জায়গা থেকেই সাহায্য নিয়েছে। এতে লজ্জার কিছু নেই। কেন না এই সাহায্য নিতে গিয়ে ভারত আদর্শচ্যুত হয় নি। তবে কোন একটি দেশ ভারতকে সাহায্য দিয়ে ভারতের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আসলে দেশকে গড়ে তুলতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই। শ্রীমতী গান্ধী এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনেল ও সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনেলের কথাও পাড়েন বক্তৃতা প্রসঙ্গে। তিনি বলেন, এরা খুন-টুন হলে খুব দুশ্চিন্তা বোধ করেন না, কিন্তু যদি কাউকে বন্দী করে রাখা হয়, তখন তাঁরা তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন। শ্রীমতী গান্ধীর প্রশ্ন, এ কী রকম বুদ্ধিজীবী-সুলভ সততা?

পশ্চিমবঙ্গে আগামী খারিফ মরশুমে চাল সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়ে তিন লাখ টন করা হয়েছে। গতবার ধরা হয়েছিল পাঁচ লাখ টন। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জগজীবন রামের সঙ্গে আলোচনার পর কলকাতায় ফিরে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ বলেন, এবার নির্দিষ্ট পাঁচ লাখ টনের জায়গায় এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ২২ হাজার টন সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া আর একটি সংবাদে জানা যায়, আগামী নবেম্বর থেকে নতুন যে খাদ্য-নীতি চালু করা হচ্ছে, তাতে রাজ্য সরকার নতুন সংগ্রহ-নীতিতে ধানের দাম বাড়াতে চান না।

কোল মাইনস অথরিটি, ভারত কোকিং কোল লিমিটেড ইত্যাদি কার্যত তুলে দিয়ে অন্ধপ্রদেশের সিংগারেনি কয়লাখনি বাদে দেশের সব রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনির জন্য একটি নতুন হোলডিং কোমপানি গঠিত হল। তার নাম হয়েছে কোল ইনডিয়া লিমিটেড। তার ফলে কয়লা শিল্পের কোক কয়লা ও কাঁচা কয়লার খনিগুলির পরিচালন ব্যাপারে আলাদা আলাদা সংস্থার উপর যে ভার আছে তা উঠে যাচ্ছে। কয়লা শিল্পে এখন একই ক্যাডারের কর্মকর্তা থাকবেন। তাঁরা এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে বদলি হতে পারবেন।

তথ্য বেতারমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল বলেছেন, জরুরী অবস্থা উঠে গেলে সংবাদপত্রে সেনসর করার ব্যবস্থাও উঠে যাবে। তবে জরুরী অবস্থা কবে নাগাদ উঠবে, তা তিনি বলেন নি। তাঁর মতে সব কিছু ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে, তাই সেনসর যে আছে তা মনে না রেখেই কাজ চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কেন না সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষাই করতে চান।

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী শ্রী টি এ পাই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন শিল্প লাইসেনসের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আরও কিছু উদারনীতি গ্রহণ করবেন। কাঁচা মাল ও যন্ত্রপাতি দেশে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি স্বীকৃত শিল্পের লাইসেন্স আর প্রয়োজন হবে না। এদের তালিকা যোজনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যে সরকার সিমেণ্ট ও কাগজ একচেটিয়াভাবে বিক্রির জন্য এজেন্ট নিয়োগ পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন। চিনি ও বনস্পতির ক্ষেত্রে অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা গত ৫ সেপ্টেম্বর জারি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি গুরুত্ব-পূর্ণ সিদ্ধান্ত, নতুন আই এ এস-দের এ বছর থেকে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার ও অতিরিক্ত জুনিয়ার ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হবে। ইতিমধ্যেই ১১ জন আই এ এস অফিসারকে ১১টি জেলায় বি ডি ও পদে নিয়োগ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য গ্রামের লোকদের দুঃখদুর্দশা স্বচক্ষে দেখে গ্রামীণ উন্নয়ন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

অশান্তির আভাস

পাঁচ বছর আগে শ্রীলংকায় যে তিন-ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে শ্রীমতী বন্দরনায়ক রাজ্যপাটে বসেছিলেন তার তিনটে ঘোড়াই কিন্তু সমানজোরী ছিল না। বলতে গেলে ঘোড়া ছিল একটিই, তাঁর স্বামী সলোমন বন্দরনায়কের নিজের হাতে গড়া শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি। ভোটের বাজি সে দলই মাত করেছিল। ১৫৭ আসনের মধ্যে তারা জিতেছিল ৯১টা। এমনটা যে হতে পারে তা অবিশ্যি শ্রীমতী বন্দরনায়কের আশার বাইরে ছিল না। তবুও যে তিনি তাঁর জুড়িতে আরও গোটা দুই ঘোড়া জুতে নিয়েছিলেন তা দেশে একমাত্র বামপন্থী জোট যে তাঁরই সে কথাই প্রমাণ করতে। তাঁর চালে ভুল হয়নি। সে নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা পাত্তা পায়নি। জোটের শরিকরা কেউ অবিশ্যি খুব বেশী আসনে জিততে পারেনি। তাদের মধ্যে দু নম্বর দল লংকা সমসমাজ পার্টি পেয়েছিল ১৯টা আর তিন নম্বর দল মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টরা ৬। কিন্তু তাতে কী? কেল্লা ফতে তো করেই বসেছে শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি। ওদিকে প্রধান বিরোধী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টির ভাগ্যে ১৭টার বেশী জোটেনি।

শ্রীলংকার বনেদী দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টিই। সে দল কিন্তু দক্ষিণ-পন্থী। তার প্রতিপত্তি কমে যায় সলোমন বন্দরনায়ক তাঁর সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টির পত্তন করার পর। একজন ঘাতকের হাতে তিনি খুন হন ১৯৫৯ সনে। দল কিন্তু ভেঙে যায়নি। তার ভার পড়লো তাঁরই বিধবা সিরিমাভো বন্দরনায়কের ওপর। সেই থেকে দল তিনিই চালাচ্ছেন দিব্যি শক্ত হাতে। শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি অনেকটা ভারতীয় কংগ্রেসের ধাঁচে চালাই করা। উগ্র দল তো নয়ই—মোটামুটি যাকে বাঁ-ঘেঁষা মধ্যপন্থী বলা যায় ও দল তাই অর্থাৎ গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী। মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাদের মিল যে হবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। তেমনই তাদের ওপর বেজায় আক্রোশ মাও-বাদীদের। কিন্তু শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টির সঙ্গে ট্রটস্কিপন্থী লংকা সমসমাজ পার্টির মিল হওয়া বেশ একটু খাপছাড়া গোছের ব্যাপার। এশিয়ার কোনও দেশে এমনটি আর হয়নি। মস্কোপন্থী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তারা তো আদায় কাঁচকলায়।

ওই অসম্ভবই ঘটলো কলম্বোয় ১৯৭০ সনে। শ্রীমতী বন্দরনায়ক যে মন্ত্রিসভা গড়লেন তাতে ঠাঁই পেলেন তাঁর নিজের দলের লোকেরা আর কম্যুনিস্টরা ছাড়া তিন-তিনজন ট্রটস্কিপন্থী বাঘা নেতা। তাঁরা কেউই তো হেঁজিপেঁজি নন। তাঁদের দেওয়া হলো নামকা ওয়াস্তে ছোটখাটো দপ্তর নয়—

বৈদেশিকী

দেবরাজ

রীতিমতো দরকারী সরকারী বিভাগ। দলের নেতা এন এম পেরেরা পেলেন একেবারে অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব অর্থাৎ দেশের আর্থিক বনিয়াদ তৈরি করার অধিকার। ডেপুটি লীডার ডঃ কলভিন আর ডি সিলভা সাংবিধানিক সমস্যা আর বাগিচা শিল্প, আর লেসলি গোওয়ানেওয়ারদানে পরিবহণ—তিনটেই যাকে বলে বাঘা বাঘা দপ্তর। লোকে টিপ্পনি কাটলে শ্রীমতী বন্দরনায়ক তো খাল কেটে কুমির ডেকে আনলেন—কোন্ দিন তাঁকে সরিয়ে দিয়ে গদি দখল করবে-ট্রটস্কি-পন্থীরা—পেরেরাই হবেন দেশের প্রধান। শ্রীমতী বন্দরনায়ক কিন্তু ঘাবড়াননি। তাঁর সাফ কথা—আমি ডাইনেও যাচ্ছি না, বাঁয়েও না সোজা চলেছি মাঝপথ ধরে সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রের দিকে।

দুনিয়া থেকে ট্রটস্কিপন্থী দল আজও উঠে যায়নি। দক্ষিণ আমেরিকার দেশে দেশে তাদের ঘাঁটি। হালে পশ্চিম ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রেই তারা মাথা তুলেছে যদিও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি তাদের কতটা তা বলা শক্ত। কিন্তু এশিয়ায় তাদের প্রধান ঘাঁটি শ্রীলংকায় আর সে ঘাঁটি বেশ পোক্ত। নেতা-সর্বস্ব দল লংকা সমসমাজ পার্টি নয়। চাষী, ক্ষেতমজুর, বাগিচার খেটে-খাওয়া মানুষের ওপর তাদের বেশ প্রতিপত্তি। নেতারা অনেকেই তাদের ঘরের মানুষ, শহরের বুলি-কপচানো, বাণী-বিলোনো, বক্তিয়াবাজ নন। শ্রীলংকার দুটো প্রধান শিল্প রবার আর চা। তাদের বিলিতী মালিকরা অকথ্য অত্যাচার করে এসেছে কর্মীদের ওপর। লংকা সমসমাজ দল চায় তাদের কোনও ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ করতে, তারপর সেই জমি চাষী মজুরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে।

বাগিচাগুলো বিদেশীদের বেহাত হোক এ দাবি সরকারী জোটের সব শরিকেরই—কেবল কম্যুনিস্ট কিংবা সমসমাজ দলের নয়। এ নিয়ে প্রস্তাব সলোমন বন্দরনায়কই এনেছিলেন। এতকাল পরে শ্রীমতী বন্দর-নায়কের আমলে তা আইনে পরিণত হতে চলেছে। তবে এক পয়সা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে তা করা হবে না। মালিকরা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। গোলমাল এই নিয়েই। ট্রটস্কি-পন্থীরা এ বিধানের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে তারা গাল দিয়েছে সলোমন বন্দরনায়ককে পর্যন্ত। তাদের দাবি, যা কিছু করলো তারাই আর বাহাদুরি নেবে সরকারী দল। তারা চাইলে বাগিচাগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর সেগুলো দেখাশুনোর ভার যে দপ্তরের ওপর পড়বে তার দায়িত্ব দিতে হবে তাদেরই।

চটে আগুন শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি। তাদের একদল তো ট্রটস্কিপন্থীদের ওপর হাড়ে চটা। তার ওপর একে মনসা তায় ধুনোয় গন্ধ। সলোমন বন্দরনায়ককে নিন্দে করাতে তারা ধুয়ো ধরলে হয় ট্রটস্কি-পন্থীদের বিদেয় দেওয়া হোক মন্ত্রিসভা থেকে নয় তারা দলের মধ্যে ভাঙন ধরাবে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও মোটে খুশী হননি এসব কাণ্ডকারখানা দেখে। তিনি ট্রটস্কিপন্থীদের দপ্তর সব পালটে দিলেন। এ চরম অপমান সইতে তাঁরা নারাজ। তাঁরা ইস্তফা দিয়েছেন ২ সেপ্টেম্বর। তাতে অবিশ্যি সরকারে কোনও সংকট দেখা দেয়নি। তবে চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে দেশে বিশেষ করে ক্ষেতে খামারে বাগ-বাগিচায়। তাই বলে বড় একটা কিছু যে ঘটতে চলেছে এমন কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

দেশ ও কাল

দুই কমিউনিস্ট পার্টির বিতর্ক

প্রথমে বিতর্কটা চলছিল সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর ভেতরে। বিতর্কের বিষয়বস্তু, কোন্ দল থেকে লোক চলে যাচ্ছে—সি পি আই, না সি পি আই (এম)। তারপর এখন সেই বিতর্কটা চলছে সি পি আই-এরই ভেতরে। অর্থাৎ, সি পি আই নেতৃত্বের সঙ্গে দলত্যাগী সি পি আই নেতাদের।

এই দলত্যাগের বিতর্কটা প্রথমে তোলেন সি পি আই। সি পি আই নেতারা বলতে শুরু করেন যে, সি পি আই (এম) নেতাদের "ভ্রান্ত নীতির" প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বহু রাজ্যে বহু সি পি আই (এম) সদস্য দলত্যাগ করছেন। সি পি আই নেতারা এই সঙ্গে সঙ্গে আরও বলেন যে, কয়েকজন সি পি আই (এম) নেতা গোপনে গোপনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও চালাচ্ছেন।

সি পি আই (এম) নেতারা প্রকাশ্যেই এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা সি পি আই নেতাদের দুটো অভিযোগই অস্বীকার করেছেন। বলেছেন, গোপনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার অভিযোগটাও অসত্য; বহু সদস্যের দলত্যাগের অভিযোগটাও বানানো।

গোপনে কয়েকজন সি পি আই (এম) নেতা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন এই রকম একটা প্রচার সি পি আই মহল বহুদিন থেকেই করছে। কিন্তু প্রকাশ্যে এই ধরনের গোপন আলাপ-আলোচনার কোনও ছাপ এখনও দেখা যাচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ এই দুই রাজ্যেই সি পি আই (এম)-কে বেশ ভালভাবে পর্যুদস্ত করেছেন। সেই সি পি আই (এম)-কে তিনি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেবেন কেন? বরং, সি পি আই (এম) আবার যাতে মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেই রকম ব্যবস্থাদি করাই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক। এখন তাঁর পক্ষে সি পি আই (এম)-কে বে-আইনী করারও কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ, যে রাজ্যে সি পি আই (এম)-এর পুনরুত্থানকে কেন্দ্র সবচেয়ে ভয় করে সেই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে অদূর ভবিষ্যতেও এই দলের পুনরুত্থানের কোনও আশংকা আছে বলে দিল্লিতে কেউ মনে করেন না।

সি পি আই (এম) নেতারা প্রকাশ্যে যে সব বিবৃতিবিবৃতি দিয়েছেন হাজাফিল তার কোনওটা থেকেও এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি যে, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কোনও গোপন আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। কোনও সি পি আই (এম) নেতা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাজাফিল দেখা করেছেন কি না জানি না, (করে থাকতেও পারেন)—কিন্তু দলগতভাবে তাঁদের সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনায় যাওয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কী? ১৯৭১ পর্যন্ত হয়ত তেমন প্রয়োজনীয়তা কিছুটা ছিল; কিন্তু আপাতত তা আর আছে কি?

তা হলে সি পি আই মহল এই জিনিস অবিরামভাবে রটাচ্ছে কেন? আমার মনে হয়, এটা দলের বর্তমান রাজনীতির প্রতিক্রিয়া। সি পি আই এখন কংগ্রেসের খুব কাছে। জরুরী অবস্থারও উগ্র সমর্থক। এর প্রতিক্রিয়া সি পি আই দলের কর্মী এবং সমর্থকদের ওপরও পড়েছে। তাঁরা অনেকে এতে ক্ষুব্ধ। দলের নেতৃত্ব প্রধানত এই বিক্ষুব্ধদের উদ্দেশেই প্রচার চালাচ্ছেন যে, "শুধু আমরা নই, গোপনে সি পি আই (এম) নেতারাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রফার চেষ্টা করছে।" এটা সেই যেমন বাচ্চা ছেলেরা কোনও দুষ্টুমি করে ধরা পড়লে বলে, "শুধু আমি নই, ও-ও করেছে", তেমনি ব্যাপার আর কি!

*

আর দলত্যাগের ব্যাপারটা।

সি পি আই (এম)-এর ভেতরে সব ঠিক চলছে তা নয়। দলের একদল সদস্য বেশ বিক্ষুব্ধ। কিন্তু এই বিক্ষুব্ধদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন আরও বেশি বামপন্থী। তাঁরা দলের নেতৃত্বের উপর এইজন্য ক্ষুব্ধ যে "এই প্রবীণ নেতৃত্ব" কোনও "সংগ্রামী কর্মসূচী" দিতে পারছেন না। সি পি আই নেতৃত্ব যে রাজনীতি এখন করছেন তার সমর্থক সি পি আই (এম)-এর ভেতরে হাজারে পাঁচজনও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আজকাল সি পি আই সম্পর্কে অধিকাংশ সি পি আই (এম) কর্মী যে ভাষা ব্যবহার করেন তা ছাপা যায় না।

তবে, সি পি আই (এম)-এর এখন দুর্দিন। দুর্দিনে প্রত্যেক দল থেকেই কিছু লোক সরে যেতে পারে। বিশেষ করে সুদিনে আরও সুদিনের আশায় যদি বহু লোক দলে বা দলের কাছে এসে থাকে। আমার নিজের ধারণা, সি পি আই (এম)-এর বহু সমর্থক ও কিছু কর্মী আসলে বসে গিয়েছেন। রাজনৈতিকভাবে এরা এখন নিষ্ক্রিয়। দলকে যদি এই দুর্দিনের ভেতর দিয়ে আরও কিছুদিন চলতে হয় তা হলে আস্তে আস্তে আরও বহু সমর্থক এবং কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বেন।

কিন্তু তা বলে ব্যাপক হারে সি পি আই (এম) কর্মীরা সি পি আইয়ের বর্তমান রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দল ত্যাগ করছেন এটা আমি বিশ্বাস করি না। সম্ভবত, সি পি আই নেতারা তথ্য দিয়ে তা প্রমাণও করতে পারবেন না।

*

এবার আসা যাক সি পি আই থেকে দলত্যাগ প্রসঙ্গে।

সি পি আই থেকেও ব্যাপক দলত্যাগ হচ্ছে না। আসলে সি পি আইয়ের ভেতরেও সি পি আই (এম)-এর মত একটা অস্থির অবস্থা চলছে। সম্ভবত তার চেয়েও বেশ কিছুটা বেশি। দলের বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে পথ ধরে চলছেন রাজ্যের বহু কর্মী ও নেতা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে তার ঘোরতর বিরোধী। তাঁরা মনে করছেন, এর ফলে দলের খুব বড় রকমের সর্বনাশ হচ্ছে। তাঁদের আশংকা, '৪২ সনের আন্দোলনের সময় দলীয় নেতৃত্ব ভুল পথে চলে দলের যতটা ক্ষতি করেছিলেন এ বারের ক্ষতি তার চেয়েও অনেক বেশি। তখন পেটে অন্তত কিছু পড়েছিল; এবার নাকি পেটে তো কিছু জুটছেই না, অথচ পিঠে বড় রকমের পড়ার ব্যবস্থা দলের নেতারাই করে রাখছেন।

কিন্তু এই বিক্ষুব্ধরা ব্যাপক ভাবে দলত্যাগ করছেন সেটা বলা ভুল। এরা বিক্ষুব্ধ, রুদ্ধ—কিন্তু এখনও দলত্যাগী নন।

জে এম বিশ্বাসের সঙ্গে পুরুলিয়ার কিছু পার্টি সদস্য দলত্যাগ করেছেন ঠিকই। গোপাল ব্যানার্জী বা রাজেশ্বর রাও এই সত্য উড়িয়ে দিতে পারবেন না। কিন্তু এই ঘটনাকে ব্যাপক দলত্যাগ বলা চলে না। জে এম বিশ্বাসরা দলের ভেতরে একেবারে দক্ষিণ-পন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। এর পর দলের আরও কিছু দক্ষিণ-পন্থী পদত্যাগ করতে পারেন। তার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

এবং, দলত্যাগ করার পরই চিরা-চরিত কমিউনিস্ট ঢং-এ এদের চরিত্র-হনন শুরু হয়ে যাবেই—জে এম বিশ্বাসের মতই অন্যান্যদেরও পুলিশের চর বা ওমনি কিছু বলা হবেই। কমিউনিস্টরা চিরকাল এ জিনিস করে।

২২-৯-৭৫।

সমর রায়

পত্রাবলী

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১০৫ ॥

প্রশান্ত

এই পাণ্ডুলিপিটা একবার দেখে যদি কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকে নোট করে দিয়ো

14th April, 1937

রবীন্দ্রনাথ

॥ ১০৬ ॥

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

প্রশান্ত, দীর্ঘকাল তোমাদের কোনো খবর পাইনি। তিন-দিন হোলো রানীকে একখানা চিঠি লিখেছিলেম এখনো জবাব এলো না। রানী কি অসুস্থ, কিংবা হিজ্‌লাবটে, কিংবা গিরিডিতে? একলাইন লিখে দিয়ো, উদ্বিগ্ন আছি।

মাঝে আমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিল, আবার এখন সহজ হয়ে এসেছে কিন্তু এত অত্যন্ত কাজের ভিড় আমার কখনো ছিল না। কত লোকের কত দাবী জমে উঠেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে কথা চিন্তা করে মন খারাপ হয়ে যায়। দিনে রাত্রে ঘর থেকে বেরতেই পারিনে। তোমাদের সেই ব্যাপারটা নিয়ে জানি উৎকণ্ঠিত আছো। জিতেন সেন এখানে যখন এসেছিলেন তাঁর কাছে খবর নিয়েছিলেম, তিনি তো দুশ্চিন্তার কারণ আছে বলে মনে করেন না। যা হোক এটা সম্পূর্ণ চুকে গেলেই ভালো।

বৃষ্টি সর্বত্রই হচ্চে এখানেও তাই। তবে এখানে বৃষ্টিতে বন্যার আশঙ্কা নেই। ফসলের পক্ষে এখনো ভালই যাচ্চে। কিন্তু ফসল ঘরে আনার পূর্বে পর্যন্ত চাষীদের শান্তি নেই। এবারে চারিদিকে দুর্ভিক্ষের মূর্তি দেখে মন অত্যন্ত পীড়িত হয়ে আছে।

২২শে তারিখে শনিবারে এখানে বর্ষামঙ্গল। সেই উপলক্ষে তোমরা এখানে আসবে আশা করে রইলেম, দেখবে আমার ভাঙা ঘর। এখানে বর্ষামঙ্গলের এক অংশ হবে—সমস্তটা কলকাতায় গিয়ে সমাপ্ত করব—নিবেদিতার[১] একটু অসুখ হওয়াতে দেরি করতে হোলো। ইতি ১৫।৮।৩৬

এলে খুসি হব। তোমাদের কবি

॥ ১০৭ ॥

ওঁ

প্রশান্ত,

পদ্মায় থাকতে দেখতুম এখানে ওখানে ছোট একটুখানি জঞ্জালে ঠেকে স্রোতটা প্রতিহত হয়ে বাঁক সৃষ্টি করে, হঠাৎ একদিক ভাঙা আর একদিক গড়া চলতে থাকে। শেষকালে হিসাব নিলে দেখা যায় মোটের উপর বড়ো স্রোতটা এগিয়ে চলেছে। মানুষের সম্বন্ধের ধারাও তেমনি একদম সিধে চলে না—একটু আধটু তুচ্ছতায় ঘেঁকে ঘুরে যায়, তাতে মূলে ক্ষতি হয় না। স্বভাবের বিশেষত্ব অনুসারে থেকে থেকে আমাদের বোঝাপড়ায় গোলমাল ঘটে, সেটুকু মিটিয়ে মিটিয়েই চলতে হবে। এর থেকে প্রমাণ হতে থাকে মানুষের জীবনযাত্রা নিতান্ত সহজ নয়।

আমি কর্মের পথে নেবেছি প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এই দীর্ঘকালের ব্যবহারে এটা স্পষ্ট বুঝেছি যে, কাজ সম্বন্ধে আমার ঔদাস্য নেই কিন্তু অত্যাকাঙ্ক্ষাও নেই। সেই জন্যে আমার কাজটাকে সহজে বাড়তে দিয়েছি নিজের ভিতর থেকে। বাইরের কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করিনি এবং বাইরের দিকে জিনিসটাকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলবার প্রবর্তনাই আমার ছিল না। অভাব অনটনের ভিতর দিয়ে এ আমার সৃষ্টির খেলা ছিল। কনস্টিট্যুশনের ফাঁদে পড়ে আমার হাত থেকে এ এখন দশজনের হাতে পড়েছে। দশজনে মালমসলা জুটিয়ে গড়তে পারে, নিজের আনন্দে নিভৃতে সৃষ্টি করতে পারে না। তাদের কাজে নানা প্রকার জোগাড়যন্ত্রের দরকার এবং ভিড়ের হাটে যে জিনিসটার প্রচলিত মূল্য বেশি তারি পরে তাদের ঝোঁক বেশি। সেই জন্যেই বহু আপত্তি করেও কলেজটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলুম না। বাইরের দিকের অতি-বাড়ে এখন সব জিনিসটাই অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়েছে। অথচ এখনো এর দায় আমার এবং এর মান অসম্মান সমস্তই আমারি। ভাবের দিকে এ যতই শস্তা, ভারের দিকে ততই দুর্বহ।

যাক্‌গে—মনটাকে আবর্জনামুক্ত করে নিজের কাছ থেকে দূরত্ব সাধনার চেষ্টা করচি।

এ পর্যন্ত এই স্থির হয়েছে ২৬শে তারিখের সায়াহ্নের গাড়িতে যাত্রা করে রাত্রে পৌঁছব কলকাতায়—২৯শে তারিখে আলমোড়া যাত্রার দিন।

অত্যন্ত বেশি কাজের ভিড় পড়েছে। ইতি ২২।৪।৩৭

কাকা

তোমার Village Reform Schemeটা পেলুম। মুশকিল এই আমার কাজের ধাতটা ঠিক হয়তো বৈজ্ঞানিক নয়। আমার কাজের গোড়াপত্তন মুখ্যত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মৈত্রী ও সেবাপরতার সম্বন্ধ নিয়ে—ছেলের প্রতি মায়ের যে সম্বন্ধ। গৌণত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা গৌণকেই প্রাধান্য দিলে জিনিসটা পল্লবিত হয় বেশি ফলবান হয় কম। আমি নিজে প্রথম পথ দিয়েই অশিক্ষিত পটুত্বযোগে এগোচ্ছিলুম। স্বীকার করি এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও সতর্কতাকে জড়িত করা দরকার। তার জন্যে লোকবল অর্থবল নিয়ে বহুমুখী সাহায্যের দরকার—আমাদের মতো অল্পশক্তি লোকের পক্ষে অসাধ্য। যাই হোক আমি তো কাজ করচি নে, যাঁরা করচেন তাঁরা চিন্তা করে দেখবেন। আমি যেটুকু ধাক্কা দিয়েছিলুম তার বেগ এখনো ভিতরে ভিতরে কাজ করচে।

[ক্রমশ]

---

[১] নন্দলাল বসুর পুত্রবধূ নিবেদিতা বসু

ডাকটিকিটে গান্ধীজী

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা না হয়েও যিনি রাজসম্মানে সারা পৃথিবীর ডাকটিকিটে বন্দিত হয়েছিলেন তিনি আমাদের অতি প্রিয় স্বাধীনতা-সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধীজী। ডাকটিকিটের জন্ম ১৮৪০ সালে ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্যে। সেখানে দেখেছি রাজারানীর ভিড়। ব্যতিক্রমের দলে যাঁরা পড়েন, তাঁরাও ছিলেন রাজানুগৃহীত, রাজসম্মানে সম্মানিত অথবা বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দিকজয়ী। ডাকটিকিটে তাঁরা বন্দিত হয়েছেন। কিন্তু নিজের

নিজের দেশের ডাকটিকিটেই আমরা তাঁদেরকে দেখেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিজেতা দেশগুলি শ্রদ্ধা-সম্মান জানাল রুজভেল্ট, স্তালিন এবং চার্চিলকে তাঁদের ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তখনও দেখা গেছে পরাজিত গোষ্ঠী দেশগুলি বিমুখ বাসনায় তাঁদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন। অথচ গান্ধীজী, তিনি এক মহা ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব। শ্রেণী-নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি দেশ তাঁর প্রতি সম্মানের ডালি উপহার দিয়েছে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করাই তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল, সেই গ্রেট ব্রিটেনও তাঁর ডাকটিকিট প্রকাশে কার্পণ্য করেন নি। তিনি বন্দিত হয়েছেন আমেরিকায় আবার রাশিয়ায়। অথচ এ দুই দেশ অন্তত নীতির দিক দিয়ে দুই মেরুপ্রান্তের অধিবাসী। কিসের জোরে তিনি সকলের মন জয় করলেন? সে কোন্ মন্ত্র, যার দ্বারা সাদাকালোর সব বিভেদকে দূর করে, সমস্ত ইজম্-এর ঊর্ধ্বে উঠে, তিনি সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়কে সমসূত্রে গ্রথিত করতে পারলেন? সে ওই সত্য, অহিংসার তথা সত্যাগ্রহের মন্ত্র। এই নীতিতে আস্থাবান হয়ে আপন উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রবর্তী হলে যে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়, তার উদাহরণ তিনি নিজেই। তাঁর নীতির প্রতিধ্বনি শুধু দেশের মধ্যেই সীমারিত থাকেনি পরন্তু দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রের করেছিল সমাধি রচনা। বিনা রক্তপাতে যে কেমন করে অভিলাষিত বস্তু লাভ করা যায়, তার অপূর্ব কৌশল দেখে এমনকি আমেরিকা, রাশিয়া এবং ব্রিটেনও চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই এই অদ্ভুত-কর্মা মানুষটির অত্যাশ্চর্য কৌশলটিকে তাঁর শতবর্ষপূর্তি দিবসে অভিনন্দিত না জানিয়ে তাঁরা থাকতে পারেননি।

গান্ধীজী আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। কিন্তু পৃথিবীর এই বিরাট গণতান্ত্রিক দেশ ভারত, আজও এই ঋষিকল্প মানুষটির আশীর্বাদ নিয়েই উচ্চাশার অগ্রশীর্ষে আরোহণ করে চলেছে।

পৃথিবীর উনপঞ্চাশটি দেশ গান্ধীজীর উপর ৭৪টি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার মিনিয়েচার শীট, বিশেষ ধরনের ওভারপ্রিন্ট, আকর্ষণীয় প্রথম দিবসের আবরণ, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বলিত খাম, পোস্টকার্ড, ইনল্যান্ড, এয়ারোগ্রাম ইত্যাদি প্রকাশ করে এই মহামানবকে শ্রদ্ধা-সম্মান নিবেদন করেছেন।

ভারত (আগস্ট ১৫, ১৯৪৮) স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতির জনকের ৪টি ডাকটিকিট প্রকাশ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছে। চারটি সাধারণ টিকিট। চারটি সার্ভিস টিকিট। সার্ভিস টিকিটগুলি সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেগুলি অল্পসংখ্যক ছিল, তাই ওগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য টিকিটের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে ১০ টাকার টিকিটখানির বাজার দর বর্তমানে হাজার টাকার কাছাকাছি। গান্ধী-স্মারক ডাকটিকিট চারটির মূল্যমান ছিল যথাক্রমে ১½ আনা, ৩½ আনা, ১২ আনা এবং ১০ টাকা সার্ভিস টিকিটগুলির মূল্যমানও ঐ একই রকম। ছবির ও রঙেরও কোন হেরফের ছিল না। শুধু টিকিটগুলির উপর 'Service' কথাটি যুক্ত ছিল। চারটি টিকিটেই গান্ধীজীর আবক্ষমূর্তি অঙ্কিত। কেবল ১০ টাকার টিকিটটির আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড়। প্রতিটি টিকিটের বাঁদিকে হিন্দিতে এবং ডানদিকে উর্দুতে 'বাপু' কথাটি লিখিত। টিকিটের নীচে ইংরেজীতে লেখা 'Mahatma Gandhi', ২ অক্টো ১৮৬৯-১৯৪৮।

১৯৬১ সালে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা চ্যাম্পিয়ান অব লিবার্টি সিরিজের ডাকটিকিটের মধ্যে গান্ধীজীকে স্থান করে দেন। আমেরিকার ডাকবিভাগ ওই

উপলক্ষে চার সেণ্ট এবং আট সেণ্টের দুটি ডাকটিকিট গান্ধীজীর উপর প্রকাশ করেন। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে গান্ধীজীকে একাসনে ঠাঁই করে দিয়ে সেদিন আমেরিকা তাঁর যথার্থ উদার মনেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই টিকিট দুটিতে মুদ্রিত ছিল, 'মহাত্মা গান্ধী ১৮৬৯-১৯৪৮ অ্যাপস্‌ল্ অব ননভায়োলেন্স'। ভারতীয় শিল্পী আর এল, লেথি-র অঙ্কিত ছবিকে অবলম্বন করেই এই ডাকটিকি দুটি প্রকাশ করা হয়।

গান্ধীজীর শতবর্ষে যত ডাকটিকিট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে তার সমস্ত বিবরণ কারো একার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। কেউ যদি সম্যকরূপে অনুসন্ধান করেন, তবে সেই সমস্ত ডাকটিকিটে এই মহামানবের জীবন, চিন্তা ও কার্যক্রমের মহামূল্যবান প্রতিফলন দেখে চমৎকৃত হবেন। এখানে আমি কয়েকটি বিশেষ দেশের কার্যক্রম নিয়েই আলোচনা করব।

মরিসাস দেশ গান্ধীজীর উপর দুটি

ডাকটিকিট প্রকাশ করে। প্রতিটি টিকিটই আকারে বড় এবং চমৎকারভাবে মুদ্রিত। ২ সেন্টের ডাকটিকিটে দেখান হয়েছে ১৮৮৭ সালের গান্ধীজীকে। তখন তিনি লন্ডনে আইন পাঠরত ছাত্র। তৎকালীন ইংরেজী পোশাক পরিহিত অবস্থায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে। আইন পাঠের জন্য গান্ধীজী লন্ডনে চার বছর ছিলেন। তখন তিনি বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন এবং এই সময়ই আবিষ্কার করেন যে, জিহ্বা নয় মনই হচ্ছে আস্বাদ গ্রহণের প্রকৃত অধিকর্তা। ১৫ সেন্টের টিকিটে গান্ধীজীকে আমরা পাই ১৯০৬ সালের জুলু রিবেলিয়ানের সার্জেন্ট মেজরের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায়। ডারবানে বসবাসকারী ২৪ জন ভারতীয়কে নিয়ে তিনি গঠন করলেন ইনডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর। যেখানে বিপদ-সংকেত দেখা গেছে সেখানেই তিনি এবং তাঁর বাহিনী স্ট্রেচার নিয়ে পদব্রজে ছুটে গেছেন। সময়ে সময়ে ৪০ মাইল পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু গান্ধীজী বলেছেন, 'এই সময়েই আমার জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল মুহূর্তটি রচিত হয়েছিল।' তাঁর এই অতন্দ্র সেবা শত্রু ও বন্ধু-নির্বিশেষে সকলেরই প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছিল।

৫০ সেন্ট ডাকটিকিটে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী হিসাবে গান্ধীজীকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম সত্যাগ্রহ অভিযান। বর্ণবিদ্বেষের বিষকে উপড়ে ফেলবার জন্য সুদীর্ঘ সাত বছর ধরে একটানা অভিযান চালিয়ে গেছেন গান্ধীজী। পরিশেষে শত্রুকেও (Smuts Government) বন্ধুতে পরিণত করে আপন পরিশ্রমের ফলভোগী হয়েছিলেন।

৬০ সেন্টের ডাকটিকিটে গান্ধীজীকে পাচ্ছি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর লন্ডনস্থিত বাস-ভবনে। ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোল টেবিল কনফারেন্স — ভারত-স্বাধীনতার প্রাথমিক কথাবার্তা ওখানেই হয়েছিল। গান্ধীজী সেখানে গিয়েছিলেন ধুতি আর চাদরখানি মাত্র পরে। ভারতের যা একান্ত নিজস্ব তারই স্বীকৃতিকে অঙ্গে ধারণ করে লন্ডনের আসরেও তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। বাহিরে তিনি অর্ধ-উলঙ্গ ফকির কিন্তু অন্তরে তাঁর সমুদ্রের গতিকে স্তব্ধ করে দেবার দুর্দমনীয় শক্তি।

১ টাকার ডাকটিকিটে মরিসাসে অবস্থিত গান্ধীজীকে আমরা দেখতে পাব। ১৯০১ সাল, মরিসাসের অবস্থাও তখন দক্ষিণ আফ্রিকার মতো। গান্ধীজী ভারতে ফেরার পথে সেখানে নেমেছিলেন এবং মরিসাসবাসীদের আত্মশক্তিকে বর্ধিত করতে সহায়তা করেছিলেন। এই টিকিটে গান্ধীজীকে ইউরোপীয় পোশাকে কিন্তু মাথায় ভারতের বিশেষ ধরনের শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় আমরা দেখতে পাই।

২ টাকা ৫০ সেন্টের টিকিটে গান্ধীজীর চমৎকার আবক্ষমূর্তি। সত্য ও অহিংসার দিব্য প্রতিমূর্তিই সেখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে মরিসাস ডাকবিভাগ ওই ছখানি ডাকটিকিটের একটি সুন্দর মিনিয়েচার সীটও প্রকাশ করেছেন। তার চারদিকের অঙ্গসজ্জায় উদাহৃত হয়েছে ভারতীয় জীবনধারার বিভিন্ন রূপকল্প।

গ্রেনাডা গান্ধীজীর উপর চারখানি ডাকটিকিট এবং সেগুলির সমবায়ে একটি মিনিয়েচার সীট প্রকাশ করেছে। সেখানে ৬ সেন্ট টিকিটে দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজী ধুতি-চাদর পরে অবনত মস্তকে হেঁটে চলেছেন, তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে এক মহান বেদনার ছাপ। ১৯৪৬ সালের নোয়াখালিতে যে হিংসানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল তাকে প্রশমিত করতেই তাঁর এই পদযাত্রা। সেটাই এই টিকিটের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ১৫ সেন্টের টিকিটে একটি জনসেবায় বক্তৃতা দেবার কালে প্রশান্ত মূর্তিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। ২৫ সেন্টের টিকিটে গান্ধীজীকে দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনীয় কাগজহস্তে প্রার্থনা-সভায় ছুটে যেতে। ১ ডলার টিকিটে পাচ্ছি চিন্তাক্লিষ্ট গান্ধীজীকে। দেশের সমস্যার কথা চিন্তা করে তিনি বিশেষ ব্যাকুল। সেই ব্যাকুলতা তাঁর কুঞ্চিত কপালে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত।

শতবার্ষিকীতে ভারতে গান্ধীজীর ২০পঃ, ৭৫পঃ, ১ টাকা ও ৫ টাকা—এই চারখানি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। ২৫ পয়সার টিকিটে গান্ধীজী রয়েছেন তাঁর

যোগ্য সহধর্মিণী কস্তুরবার সঙ্গে। টিকিটটির ডিজাইন তৈরী করেন দিল্লীর শ্রীসুরজসাধন। মাত্র তের বছর বয়সে তাঁরা বিবাহিত হয়েছিলেন। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে ৬২ বছর তাঁরা একত্র ছিলেন। গান্ধীজী-সহধর্মিণীর মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৪৪ সালে। এই মহীয়সীর স্মরণকল্পে ভারতের ডাকবিভাগ ১৯৬৪ সালের ২২শে ফেবরুয়ারী ১৫ পয়সার একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। ৭৫ পয়সার ডাকটিকিটটির ডিজাইন তৈরী করেন ইন্ডিয়া সিকিউরিটি প্রেসের শ্রী পি বি চিটনী। ডাকটিকিটটি বড় সুন্দর। সহাস্য গান্ধীজীর শুচিশুভ্র মূর্তিটি এখানে চমৎকার ফুটেছে। বর্ণ নির্বাচনেও বিশেষ মুন্সিয়ানা দেখা গেছে। ১ টাকার টিকিটের মূর্তিটি সংগ্রহ করা হয়েছে সুবিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বোসের অঙ্কিত ডাণ্ডী অভিযানের গান্ধী অবলম্বনে। ৫ টাকার টিকিটের ডিজাইন তৈরী করেছেন দিল্লীর শ্রী সি আর, পাকরাশী। এখানে গান্ধীজী প্রচলিত পদ্ধতিতে চরকায় সুতো কাটছেন। টিকিটের ডানদিকে অঙ্কিত রয়েছে সূর্য আর পদ্ম। সূর্য সত্যের প্রতীক পদ্ম অহিংসার। চারটি টিকিটই নাসিকের সিকিউরিটি প্রেস থেকে ফটোগ্রেভার পদ্ধতিতে ১৯৬৯ সালের ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হয়েছিল।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি ছোট্ট দেশ

ডোমিনিকা। তাঁরাও তিনটি আকর্ষণীয় ডাকটিকিট প্রকাশ করে গান্ধীজীকে সম্মান জানিয়েছিলেন। ৬ সেণ্টের টিকিটে গান্ধীজীকে সুতো কাটতে দেখা যাচ্ছে, বামদিকে লণ্ডনের বিগ বেন। ৩৮ সেণ্ট ডাকটিকিটে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে [illegible] গান্ধীজী বামদিকে আকবরের সমাধি-মন্দির। ১ পাউণ্ড ১০ সেণ্টের ডাকটিকিটে প্রসন্নচিত্ত গান্ধীজী, বামদিকে শোভা পাচ্ছে আগ্রার তাজমহল।

গ্রেট ব্রিটেন গান্ধীজীর ১ শিলিং ৬ পেন্সের একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। বহুরঙা এই টিকিটটিতে গান্ধীজীর আবক্ষ প্রশান্ত মূর্তি অঙ্কিত। পশ্চাদ্‌পটে ভারতের জাতীয় পতাকা, ঊর্ধ্বদেশে দক্ষিণকোণে ক্ষুদ্রাকারে ইংলণ্ডের রানীর মূর্তি। এই টিকিটের ডিজাইন তৈরী করেন ভারতীয় সুখ্যাত ডিজাইনার শ্রীবিমান মল্লিক। ৩৫টি দেশের ৬০টি ডাকটিকিটের মধ্যে এই টিকিটটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে এক প্রদর্শনীতে বিবেচিত হয়। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় এই আন্তর্জাতিক গান্ধী ডাকটিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

আরেবিয়ান রিপাবলিক সিরিয়া

গান্ধীজীর উপর দুখানি ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। একটি ১২½পি, অন্যটি ২৭½পি। টিকিট দুটিতে গান্ধীজীর প্রসন্ন মূর্তি আরেবিক প্রতিলিপিতে সুন্দরভাবে উদাহৃত হয়েছে।

ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো-ও গান্ধীজীর দুখানি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন। এক-খানি ১০ সেণ্টের আর একখানি ৩০ সেণ্টের। ১০ সেণ্টে গান্ধীজীর দণ্ডায়মান স্ট্যাচুর প্রতিমূর্তি, ৩০ সেণ্টের টিকিটে গান্ধীজীর আবক্ষ মূর্তি। দক্ষিণ দিকের ঊর্ধ্ব কোণে ভারতের জাতীয় পতাকা।

সোমালিয়ার তিনখানি ডাকটিকিট যথাক্রমে ০-৩৫স, ১-৫০স এবং ১-৮০স। প্রথম ডাকটিকিটখানিতে গান্ধীজীর আবক্ষ প্রসন্ন মূর্তি; দ্বিতীয়খানিতে আবক্ষ গান্ধীর বামপার্শ্বে উড্ডীয়মান শান্তির দূত পায়রা, পশ্চাদপটে ভূগোলক এবং তৃতীয়-খানিতে পুস্তকহস্তে গান্ধীজী বসে রয়েছেন আনন্দিত চিত্তে।

ব্রাজিলের ২০ সেণ্টের গান্ধী টিকিট-টিতে কালো এবং হলদে এই দুটি রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। বাঁদিকে গান্ধীজীর

ছবি, ডানদিকে ব্রাজিল দেশীয় সুতাকাটা কল।

সরাজা (sharjah) স্বাধীনতা মুক্তিযোদ্ধাদের ডাকটিকিট প্রকাশ করেন তখন আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি, মার্টিন লুথার প্রভৃতির সঙ্গে গান্ধীজীর ডাকটিকিটও তাঁরা প্রকাশ করেন। আবার বিশ্বশান্তির ডাকটিকিট প্রকাশ কালেও গান্ধীজীকে পুনর্বার স্মরণ করেন। প্রত্যেক বারই ৩৫ ডি এইচ, ৬০ ডি এইচ ও ১ আর এল-এর তিনখানি করে ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়।

মাল্টা ভূমধ্যসাগরের এক ক্ষুদ্রতম দ্বীপ। সেখানেও কালো এবং সোনালী রঙের ১ শিলিং ৬ পেন্সের একটি চমৎকার গান্ধী ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। সেখানে গান্ধীজী নিজস্ব পোশাকে পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে। ডানদিকের কোণে শোভা পাচ্ছে পবিত্র অশোকচক্র।

এ ছাড়া গান্ধী-বন্দনায় যে সমস্ত দেশ এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাশিয়া, কঙ্গো, ক্যামেরুন, সাই-প্রাস, গ্যাবন, মৌরিটানিয়া, নাইজার, আপারভল্টা, চাদ (Tchad), সেনেগাল, খোর ফাক্কন, মালি, চিলি, মেক্সিকো,

টোগো, মরক্কো, ইউ এ আর, ভুটান, গায়েনা, হাঙ্গেরী, আয়ারল্যাণ্ড, ইরান, সুরিনাম, সাউদার্ন ইয়েমেন, উরুগুয়ে, ওয়েস্ট জার্মানী, গ্রীস এবং আরও অনেকে।

ভারতের এই একটিমাত্র মনীষী ভারতের গৌরবকে যে তুঙ্গশীর্ষে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন ভারতবাসী হিসাবে তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

লং-ক্লথের টেক্কার দর খুব সস্তা যাচ্ছে!

কমলার কাপড়-
কম দাম, দেখতে দামী
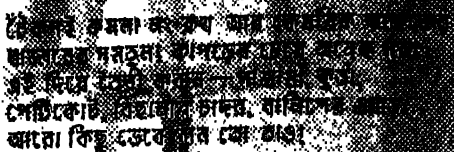
C. U.-A 1935 -Ben.

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী
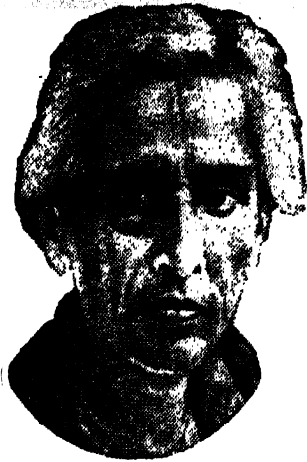
॥ ৪ ॥

আমাদের নতুন সংসার রচনায় তাঁর উৎসাহ আগ্রহের সীমা ছিল না।

'বাঃ, পর্দাগুলো তো চমৎকার কিনেছিস তোরা? রাস্তা থেকে দেখতে ভারি সুন্দর লাগছিল। কে পছন্দ করলো? তুই না নরেন? ওঃ, বুঝেচি, দুজনে মিলে কিনতে গিয়েছিলি নিশ্চয়। কতো দাম পড়লো রে?"

'ও—রাধু, তোদের জন্যে কয়েকটা টোকা, কয়েকটা চুবড়ি আর একটা কুলো রাসের মেলা থেকে কিনে আনলুম। —কেমন? পছন্দ হয়?—"

'ও বড়দা, এতগুলো টোকা কী হবে?'

—'আরে, ও যে ভারী জরুরী জিনিস। আমি লক্ষ্য করেচি তোদের রান্নাঘর অনেক দূরে—বাগানের কোণে। বৃষ্টির দিনে গুণনিধি দুহাতে খাবারের বাসন ধরে রান্নাঘর থেকে আনা-গোনা করে জলে ভিজে যায়। ছাতা ধরার উপায় থাকে না। ওর জন্যে এই বড়ো টোকাটা নিলুম। তোদের মালীর জন্যেও এইটে এনেচি। আর এই দ্যাখ, এই ছোট্টো টোকাটি তোর জন্যে। টুপির মতন মাথায় চড়িয়ে বাগানে বেরুতে পারবি।"

—'ও বড়দা, এত্তো বড়ো কুলো কী হবে?"

স্বামী এতক্ষণ হাসিমুখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাদা আর বোনের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—'ঐটে ঝড়ে বেশ বাতাস দিতে পারবে আমার বন্ধু বান্ধবদের।"

বড়দা স্প্রিংএর মতন লাফিয়ে উঠলেন। '—কীই—কি বল্লে? এমন অলুক্ষুণে কথা! ছি—ছি। —দেখে নিও নরেন, তোমার ঘরে আমি লক্ষ্মী তুলে দিয়ে গেলুম। তোমার বন্ধুবান্ধবদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন।...রাধু, তুই ওর ঐসব অপয়া কথায় কান দিসনে। দ্যাখ্ তো চুবড়িগুলো, কুন্‌কে দুটো কেমন হয়েচে!"

সবুজ আর লাল রঙের নক্‌শা-তোলা বাঁশের চেঁচাড়ির চুবড়ি নানা সাইজের, গোটা দুই ছোট সাইজের বেতের ধামা আর দুটো কুনকে। জিনিসগুলো সত্যিই সুন্দর। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবো স্বাভাবিক।

আমার উল্লাস তিনি পরিতৃপ্ত হাসিতে গ্রহণ করে গুণনিধির হাত থেকে গড়গড়া নিয়ে বাগানে বাঁধানো বেদীতে গিয়ে বসলেন।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—'আমি ঠিক জানি, রাধু এগুলো পেলে আহ্লাদে আটখানা হবে। মেয়েরা দেখেচি ঘরকরনার সামগ্রী পেলে বেজায় খুশি হয়। ছোট্টো ছেলেরা দেখবে ব্যাটবল, মার্বেল, তীরধনুক পেলে খুশি,—কিন্তু ছোটো মেয়েরা হাঁড়ি-কুঁড়ি বেণেপুতুল পেলে ভারি খুশি।'

আমার স্বামী সেদিন বলেছিলেন—'আর ধেড়েছেলেরা কী পেলে খুশি হয়, বললেন না তো শরৎদা।"

শরৎচন্দ্র অল্পক্ষণ আমার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন—'শক্ত প্রশ্নই ধেড়ে ছেলেরা কী পেলে খুশি হয়, কেউ জানে না। তারা নিজেরাও যে জানে না। আমি কী করে জানবো বল?"

শরৎচন্দ্র লঘু কৌতুকের হাল্‌কা মেজাজেই বেশি সময় থাকতেন। কিন্তু এক এক সময়ে হঠাৎ সিরিয়াস মেজাজ এসে যেতো। সমস্ত ব্যক্তিত্বটাই তাঁর তখন পালটে যেতো। সিরিয়াস শরৎদার কাছে আমাদের অস্বস্তি হোতো। আড়ষ্টতা এসে যেতো মনে। অবাধে খুশিমতন কথা কইতে বাধতো। জিভে লাগাম পড়তো আপনিই।

একবার পাঁচ সেরি ঘিয়ের ঢাকনা-আঁটা কৌটোয় তিন টিন চিঁড়ে, মুড়ি আর খৈয়ের মোওয়া নিয়ে এসে হাজির হলেন লিলুয়ার 'দেবালয়' বাগানে। এই বাড়ীটি আমার শ্বশুর-পরিবারের সম্পত্তি ছিল তখন। এখানেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল।*

শরৎদা এসেই বললেন,—'দ্যাখ্ রাধু, সেদিন চার ঘণ্টা তোর এখানে বসে বসে দেখলুম, প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন আসে, আর প্রতি ট্রেনেই কলকাতা থেকে কেউ-না-কেউ তোদের 'দেবালয়ে' হাজির হচ্চে। আমি তোকে সংসার করা শিখিয়ে দিচ্চি। অর্ডার দিয়ে কর্পূর এলাচ দেওয়া মোওয়া করিয়ে এনেচি। ভাঁড়ারে তুলে রেখে দে। ভেবে দেখলুম, অতিথি-সমাগমের জন্যে খরচও তো তোদের বেশ হচ্চে। একটা ব্যবস্থা করা দরকার। যে-যখন আসবে দু'রকম মোওয়া সাজিয়ে চায়ের সঙ্গে দিলে বেশ হবে। বাগানে কলাগাছের ঝাড়ে কয়েকটা কাঁদি পড়েছে দেখেচি। কলার কাঁদি কাটিয়ে ভাঁড়ার ঘরে দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখবি। সবাইকে মোওয়ার সঙ্গে কলাও দিতে পারিস। হরদম্ ময়রার দোকান থেকে সামাজিকতা করতে গেলে ফতুর হয়ে যায় গেরস্থ মানুষে।"

আমার চোখ ভিজে উঠেছে তখন। বুকের মধ্যে অব্যক্ত বেদনাভরা আনন্দের চাপ। একবার সংসার, দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার কেউ ছিল না আমাদের।

'—মোওয়া ফুরিয়ে গেলে চিঠি লিখে আমাকে জানাবি একটু আগে থেকেই। লজ্জা করবি না কিন্তু। আমি আবার পাঠিয়ে দেবো কাউকে দিয়ে,—কিংবা, নিজেই নিয়ে আসব।"

'আমি গভীর সত্য উচ্চারণে স্বীকার করে যাব, আমাদের বিবাহিত জীবনে শরৎচন্দ্রের দান অনেকখানি। মনের সাহসই শুধু জোগাননি, বিয়ের পরেও পক্ষপুট দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন অনেক দিন ধরে দুটি মানুষ, শরৎচন্দ্র আর জলধর সেন। সর্বজন-প্রিয় জলধর সেন বাংলা সাহিত্যে তখন সবচেয়ে বেশি সুপরিচিত নাম। তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকার দপ্তর থেকে উঠে সোজা হাওড়া স্টেশনে তিনটের ট্রেন ধরতেন লিলুয়ার। আমার স্বামী কলকাতা থেকে না-ফেরা পর্যন্ত তিনি জলযোগ করতেন না, এক কাপ চা খেয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। তিনি বাড়ি ফিরলে দু'জনে একসঙ্গে জলযোগে বসতেন। এটি আমাদের দৈনন্দিন নিয়ম ছিল।

---

* পারিবারিক পদবী নামাঙ্কিত এই বাগান বাড়িটিকেই শ্রীমান প্রবোধকুমার সান্যাল বিভ্রমবশতঃ 'লিলুয়ার এক রেলওয়ে কোয়ার্টার' বলে উল্লেখ করেছেন 'দেশ' পত্রিকার তাঁর 'বনস্পতির বৈঠক' স্মৃতিকথায়। আমাদের সম্পর্কে আরও কিছু ভুল উক্তি আছে তাঁর লেখায়।

শরৎচন্দ্র আশ্চর্য মানুষ। একদিকে সামাজিক নিয়ম, রীতি, নীতি কিছুই মানেননি কোনও দিন; যার জন্য বারে বারে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশে, বিহারেও, অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে। সেই সামাজিক বন্ধন ছেঁড়া বোহেমিয়ান মানুষটি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে হৃদয়ের গ্রন্থনা করেছেন অন্যের জন্য ঘর বাঁধার আগ্রহে।

আমাদের নতুন সংসার হয়েছিল যেন তাঁর আনন্দের খেলাঘর। একদিকে উচ্ছৃঙ্খলতার অসংসারী, অন্যদিকে লক্ষ্মীশ্রীর পূজা। আমার প্রতি শরৎচন্দ্রের স্নেহ অনেকটা যেন মায়ের মমতার মতই ছিল। অতি কোমল, দ্রবীভূত,—একটু যেন অন্ধও।

আমার খুব অবাক লাগতো। ঠিক এই ধরনের পুরুষমানুষ এর আগে আমি দেখিনি। পরেও আর দেখিনি। প্রথম-প্রথম কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ হত। আমার স্বামী বলতেন—"শরৎদা বড় স্নেহপিপাসু মানুষ। স্নেহ করবার, ভালবাসবার একটা জায়গা খুঁজে বেড়ান। ও'র হৃদয়টা মাতৃহৃদয়। তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে ও'র খুব উদ্বেগ। আমাকে যে কতোরকম উপদেশ দেন তোমার সম্বন্ধে, তার শেষ নেই। অন্তত সাত আটটি টোট্‌কা ওষুধের খবর লিখে দিয়েছেন তোমার হাঁপানির জন্যে।"

তখন প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই হাওড়া থেকে লিলুয়ায় আর লিলুয়া থেকে হাওড়ায় যাতায়াত সহজ ছিল। প্রত্যেক ট্রেন লিলুয়ায় থামতো। ডাউন মেল ট্রেন-গুলির লিলুয়াতে টিকিট চেকিং হতো। থার্ড ক্লাসের ভাড়া চার পয়সা, ইণ্টার ক্লাসের ছয় পয়সা। শরৎদা ট্রেনের সুবিধা আর স্টেশন থেকে বাড়ি আসতে দু'মিনিটও লাগে না—এইজন্য দারুণ খুশি ছিলেন। বলতেন—"তোমরা স্বর্গ-রাজ্যে আছো বাপু! আমার ভাগ্যে যা' ঘটেছে, গ্রীক পুরাণে শাপগ্রস্তদেরও এত শাস্তিভোগ করতে হয়নি। একেই তো বাড়ি স্টেশন থেকে ক্রোশখানেক দূরে,—তাও কি মানুষ-হাঁটা পথ আছে? পথ নেই, চষা জমি, ধানখেত। বর্ষাকালে আল ধরে সাপের ভয়ে মনসা-মনসা জপ করতে করতে হাঁটে ও দেশের মানুষ। শহুরে মানুষেরা একদিন সেই পথ পাড়ি দিয়েই নাকে খৎ দিয়ে পালিয়ে আসে। লোকজন ভালবাসতেন শরৎদা। সবাইকেই বলতেন—"সামতাবেড়ে যেও। আগে কিন্তু একটা পোস্টকার্ড লিখে ডাকে ফেলে দিও, স্টেশনে পাল্কী পাঠাব, নইলে কষ্ট হবে।" আমি বরাকর পাল্কীতে গেছি। তিনি পাল্কী পাঠাতেন। আমার স্বামী পাল্কীতে চড়তেন না, তিনি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন। আমি কখনো কখনো হেঁটে যাওয়ার আগ্রহ করলে শরৎচন্দ্র রেগে যেতেন।

আমার স্বামী বলতেন—"শরৎদা, আপনি 'দেবালয়ে'র এত গুণ ব্যাখ্যা করছেন, আর একটা বাড়তি সুবিধে তো ধরলেন না। কলকাতা সুদ্ধু সমস্ত মানুষের চট করে আউটিংএর একটা সুব্যবস্থা করে ফেলেছি আমরা। অতিথি সৎকারের বিপুল পুণ্য অর্জন করছি, সেটা তো ধরা হয়নি।"

শরৎদা হো হো করে হেসে উঠেছেন।—"হ্যাঁ, তা' যা' বলেছো। এমন কারুর সঙ্গেই এখন কলকাতায় দেখা হয় না যে না বলে—"অমুক রবিবারে লিলুয়ায় গিয়েছিলুম।" এক কাজ কোরো তোমরা। রবিবার এলেই ভোরের ট্রেনে তোমরাও আউটিংএ বেরিয়ে পোড়ো দুজনে।"

আমাদের অতিথি সৎকারের সুবিধের জন্যে শুধু রকমারি মোওয়াই নয়, একবার তিনি কয়েকখানি মিহিবুনট্ খেজুর পাতার চ্যাটাই এনে দিয়েছিলেন। বলে-ছিলেন—"বাগানে চবুতারায় বিছিয়ে বসতে বেশ সুবিধে হবে। সহজে নষ্ট [illegible] না।"

রূপনারায়ণের তাজা তপ[illegible] মাছ তো বরাবর পাঠাতেন লিলুয়ায়, কলকাতাতেও।

আজকাল 'হাইজ্যাকিং' বলে একটা কথা চালু হয়েছে। শরৎচন্দ্রকে একবার সাহিত্যিকেরা 'হাইজ্যাক্' করেছিলেন। তিনটে বড় বড় ইলিশমাছ সমেত শরৎচন্দ্রকে হাওড়া স্টেশন থেকে 'হরণ' করে দেবালয়ে এনে ফেলেছিলেন ভারতী-গ্রুপ। শিশির ভাদুড়ি মশায়ও সেদিন ছিলেন সেই দলের সঙ্গে। হেমেন্দ্রকুমার রায় সেদিন ট্রেনে বসে মুখে-মুখে ফেরিওয়ালাদের সুরে একটা গানই বানিয়ে ফেলেছিলেন।

—"বাবু, পাঁচ মিনিটের ট্রেন জার্ণি—
টিকিট এক আনা—
দেব-দেবী দর্শন মিলেগা—
ইলিশ মুর্গী খানা—"

গল্পটা বলি। সেদিন রবিবার। বেলা তখন প্রায় তিনটে বাজে। আমাদের কাছে
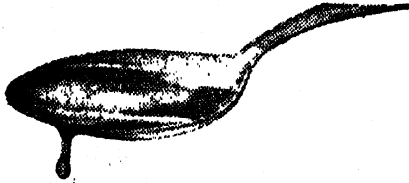
যথারীতি সকালের দিকে কিছু বন্ধুবান্ধব এসে এক দফা আড্ডা দিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। আমরাও স্নানাহার শেষ করে সাড়ে তিনটে নাগাদ কলকাতায় রওনা হবো বলে বারান্দায় বসে আছি। কলকাতার আপট্রেন এসে স্টেশনে থামলো। বারান্দা থেকে প্ল্যাটফর্ম স্পষ্ট দেখা যায়। আমরা অভ্যাসমত ট্রেনের দিকে নজর ফেলেছি। দেখি, ট্রেন থেকে একে একে নামছেন শিশির ভাদুড়ি, শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, মায়া রায়, গিরিজা-কুমার বসু, তমাললতা বসু এবং আরও দুটি অচেনা অল্পবয়সী কলেজ ছাত্র-মার্কা ছেলে।

স্বামী তো ও'দের দেখে মহা খুশি,—উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত গলায় বললেন—'আরে, ভাগ্যিস আমরা এখনও বেরিয়ে পড়িনি! ওরা যে সব্বাই মিলে দলবেঁধে আসচে—" আমি বললুম—"গুণীনিধি কোথায়? শীগগির দুটো উনুনে আগুন দিক। বেলা যে অনেক হয়ে গেছে।'

স্বামী বাগানে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি গেটের দিকে যেতে যেতে বললেন—"এত বেলায় কি আর না-খেয়েদেয়ে এতগুলো মানুষ বেরিয়েছে?"

হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর সদ্যপ্রসূত 'বাবু, পাঁচ মিনিটের ট্রেন-জার্নি" গানটি ট্রেনের কামরার ফেরিওয়ালাদের সুরে গলা খুলে গাইতে গাইতে আসছেন, সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন চারু আর মায়া। মস্ত মস্ত তিনটে ইলিশ মাছ চারু মায়া আর প্রেমাঙ্কুরের হাতে দুলেছে। শিশিরবাবু উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে গেটে ঢুকছেন— 'বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এককোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা—"
পাশে শরৎদার প্রসন্ন মুখে উজ্জ্বল পরি-তৃপ্তির হাসি।

ব্যাপারটি এই। ভারতী-গ্রুপের ও'রা সবাই আজ দশটার সময়ে শিশিরবাবুর থিয়েটারের আড্ডায় গিয়েছিলেন। গিরিজা-কুমার ও তমাললতাও ঐ দলে আটকে গেছলেন। ও'রা তমালবৌদিকে সুদ্ধু নিয়ে থিয়েটারে গিয়েছিলেন। বেলা দেড়টা বেজে গেলে তমালবৌদি চুপি চুপি ওদের তাড়া দিচ্ছিলেন ওঠার জন্যে। হেমেন্দ্র-কুমার বিদ্রোহের সুরে বলেন—"রবিবারে এত শীগগির বাড়ি ফিরলে তাজা মুড়ু নুন হয়ে গলে যাবে। আমি বাগবাজারে যাবো না, ফিলুয়ায় যাবো।"

বাস? সব্বাই হৈ হৈ করে উঠলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বেশ ভালো।'

চারুবাবু বলেছেন—"ওখানে মুর্গী দারুণ শস্তা। স্টেশনের পাশে জমীর মিঞার বাড়ি থেকে কয়েকটা মুর্গী কিনে নিয়ে দেবালয়ে বলি দিয়ে প্রসাদ পাওয়া যাবে।" তারপরেই তিনি বলেছেন—"কিন্তু গুণীনিধি যদি বাড়ি না থাকে, পুজো-পাঠের ব্যবস্থা করবে কে? কুছ পরোয়া নেই, আমিই আজ গোরানিজ-বাবুর্চির পার্টটা দেখিয়ে দেবো।" এই সময়ে মায়া রায়ের ফোন এসে পড়লো। চারুর বাড়িতে চারুর জন্যে কে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছেন। বলছেন, জরুরী কাজ আছে। চারুবাবু মায়াকে বলে দিলেন—বলে দাও, আমরা লিলুয়ায় চলে গেছি। রাত্তিরে বাড়ি ফিরবো। কিন্তু তুমি এক্ষুনি হাওড়া স্টেশনে রওনা হও, এই মুহূর্তেই। সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের পাবে। তোমাকে গিয়ে মুরগী-মুসল্লম রাঁধতে হবে।"

বলা মাত্রই মায়া ট্রামে চেপে হাওড়া স্টেশনে রওনা। সেকালে একা একা একটি মেয়ের পক্ষে দূরে যাতায়াত, তাও ট্রামযোগে মোটে সহজ ছিল না। তখন পুরো হাওড়া ব্রীজটি পায়ে হেঁটে পার হতে হতো। বাস তখনও কলকাতায় হয়নি। মায়া রায়ের মত স্মার্ট মেয়ে সে যুগে অল্পই দেখা যেত। যেমনি হাসিখুশি প্রফুল্ল স্বভাব, তেমনি পরিশ্রমী আর স্বচ্ছন্দ প্রকৃতি।

এ'দের তোড়জোড় দেখে শিশিরবাবু বলেছেন—"আমি 'ঘরেবাইরে' বইটা নাটক করতে নরেনকে দিয়েছি। সেটা তৈরি হয়ে গেছে, সে খবর দিয়েছে। আমার এখানে সর্বদাই নানা লোকের ভীড় থাকে, নাটক নিয়ে আলোচনায় ডিস্টার্ব করে। চলো, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই তাহলে, সকলে মিলেই নাটকটা শুনে আসা যাবে। তোমরাও মতামত দিতে পারবে।"

অতো বেলায় অস্নাত অবস্থায় সবাই মিলে হাওড়া স্টেশনে এসেছেন। এসে দেখেন—শরৎচন্দ্র তিনটি মস্ত মস্ত ইলিশ মাছ তাঁর পলটী ছোকরার হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরুচ্ছেন।

আর যায় কোথায়? ডাকাত পড়ার মতন সবাই রূপনারায়ণের রুপোলী ইলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এর মধ্যে নাকি চারুবাবুই দলপতি। গিরিজা তাঁর পার্শ্বচর।

"কোথায় ইলিশ যাচ্ছে?..."

ছোকরাটি উত্তর দিয়েছে—"শোভাবাজার"।

শরৎদা এগিয়ে এসে বলেছেন—"একজনদের ইলিশ খাওয়াবো বলে দাঁড়িয়ে আছি, ভাই—"

চারু-প্রেমাঙ্কুর সমকণ্ঠে বলে উঠেছেন "আপনি রূপনারায়ণ থেকে ইলিশ ধরে শোভাবাজারে প্রতিশ্রুতি পালনে চলেছেন—আমরা ইলিশ সমেত আপনাকে ধরে দেবালয়ে রবিবার পালনে চলেছি। শীগগির ট্রেনে উঠে পড়ুন আমাদের সঙ্গে।"

শরৎচন্দ্র এঁদের সবাইকে খুব ভালবাসতেন। বিশেষ করে শিশিরবাবু সুদ্ধ যাচ্ছেন দেখে তিনি আর বাক্যব্যয় না করে মহা উল্লাসে ওদের দলে ভর্তি হয়ে গেলেন। হাইজ্যাকড হয়ে শোভাবাজারের ইলিশ দিল্লুয়ায় চললো।

সেই দিনটির কথা মন থেকে মুছবার নয়। সারাদিন খুব আনন্দ করা হয়েছিল। শরৎদাও খুব দিলখোলা মেজাজে ছিলেন সারাদিন। 'ঘরেবাইরে'র মাটারূপে পড়া হয়নি। শরৎদা পড়তে দেননি। বললেন—"আউটিংএ বেরিয়েও কাজ-পড়োবার মতলব
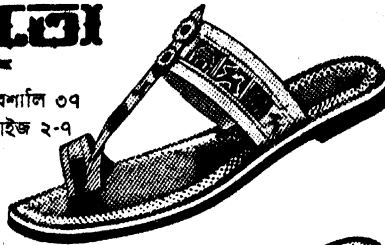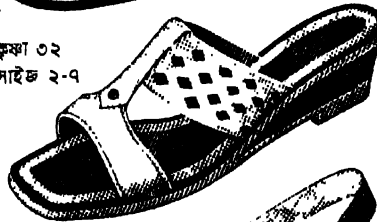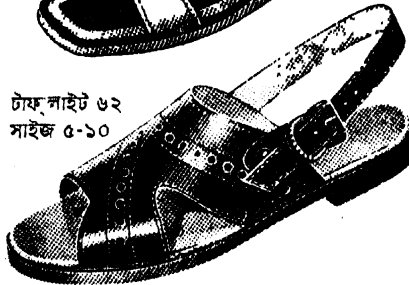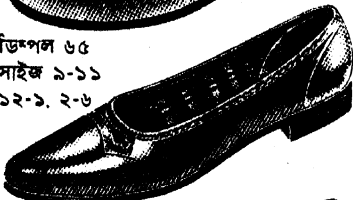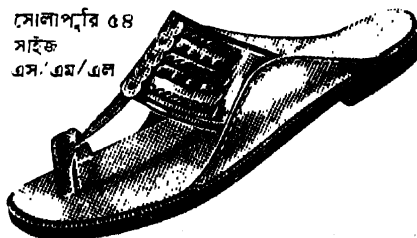
ঠিক নয় শিশির ও অন্য একদিন হবে। নাটক পড়তে বসলে আবহাওয়াটা সিরিয়াস হয়ে উঠবে। না, না, সে হবে না। মতলবী লোকেরা ঐরকম রূপ দেখতে গিয়ে কলা বেচে আসে।"

সেদিন শিশিরবাবুরই উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কচ ও দেবযানী'—আর শেক্স‌পীয়রের বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন নাট্যাংশ—সবাইকে অন্য এক রসাস্বাদের জগতে পৌঁছে দিয়েছিল। চয়নিকা থেকে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে শাজাহান কবিতা আবৃত্তি করানো হলো। তিনি কিছুতেই পড়বেন না—"শিশিরের গলার পাশে আমার গলা! পাগল হয়েছো তোমরা। সিংহের গর্জনের পাশে ব্যাঙের গোঙানি!" শেষ পর্যন্ত পড়েছিলেন। শাজাহান শরৎচন্দ্রের খুব প্রিয় কবিতা ছিল। ওর বিভিন্ন স্তবক প্রায়ই তাঁর মুখে আবৃত্তির আকারে স্বগতোক্তির মত লেগে থাকতো। "হায় রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়" কিংবা—"হীরামুক্তা মানিক্যের......যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক শুধু থাক একবিন্দু নয়নের জল, কালের কপোলতলে—" ইত্যাদি অনেকেই তাঁর মুখে শুনেছেন, এখনও নিশ্চয় মনে করতে পারবেন।

মুরগী সেদিন চারু-প্রেমাঙ্কুরবাবুর কেনা হয়নি, রান্নাও হয়নি। প্রায় এক কাঁদি পাকা কলা আর সেরখানেক মুড়ি কাড়াকাড়ি করে অদৃশ্য করে ফেললেন সকলে। তারপরে চায়ের পরে চা। ওদিকে মায়া আর তমাল-বউদি আমাকে ও গুণনিধিকে নিয়ে প্রকাণ্ড ফলসা গাছের তলায় ইট সাজিয়ে খিচুড়ি চাপালেন। মায়া ইলিশ মাছ কুটতে বসে গেল। বাগানের চত্বরটায় কলাপাতা পেতে সারিবন্দী হয়ে বসতে সূর্য প্রায় পাটে এসে গেল। সাড়ে চারটে আন্দাজ, জলধর সেন আর অমল হোম একসঙ্গে এসে পৌঁছুলেন। তাঁরাও পংক্তিভোজনে আনন্দ করে বসে পড়লেন। সেদিন ওঁদের সঙ্গে যে দুটি তরুণ ছেলে এসেছিল (হয়তো শিশির-বাবুরই কোনও সাগরেদ হতে পারে) তাদের নাম মনে নেই—তারা কিন্তু সেদিন অপূর্ব গান গেয়েছিল সারাদিন, শিশিরবাবু আর শরৎদার ফরমাস মত। রবীন্দ্র-সংগীত, দ্বিজেন্দ্র-সংগীত, নজরুল-সংগীত।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিরূপের মোটামুটি একটি রেখাচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলুম শিল্পী শরৎচন্দ্রের পটভূমিকা হিসেবে। তিনি নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে নিঃশব্দ থাকতেন। একান্ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সম্বন্ধে মুখ খুলতে চাইতেন না। সাহিত্যেও তিনি ব্যক্তিগত জীবনকে বেশী স্পষ্ট করে উন্মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন না। আড়ালটা জরুরী মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে পড়বে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন—সাহিত্যে ব্যক্তিগত জীবনের হুবহু ছবি দিতে নেই। দিলে সার্থক-সাহিত্য হবে না। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সমস্যাও উপস্থিত হয় বলে তিনি শৈল-বালা ঘোষজায়ার উল্লেখ করেছিলেন।

শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের গোপন মহলকে তিনি সম্মান দিতেন, মূল্য দিতেন।

শরৎচন্দ্র খুব ভালো শ্রোতা ছিলেন। অপরের কথা মন দিয়ে শোনার আগ্রহ ছিল তাঁর। এই গুণটি শিল্পীদের মধ্যে প্রায়ই অনুপস্থিত দেখা যায়। শিল্পীরা অন্যকে শোনাতেই ব্যস্ত থাকেন, নিজে শুনতে বড়ো চান না। অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি, শরৎচন্দ্রকে ধৈর্যশীল শ্রোতা করেছিল মনে হয়। নিজের সম্পর্কে যেমন, নিজের সাহিত্য সম্পর্কেও তেমনি, জনসমাজে চুপচাপ থাকাই তাঁর প্রকৃতি ছিল।

বলতেন—"আমার বইয়ের চরিত্রগুলি বিভিন্ন পাঠকের মনে কতো বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া আনে—দেখে আমার বেশ মজা লাগে। কে যে কার কাছে কোন্ তাৎপর্যে, কোন্ রস নিয়ে দেখা দেয় এর বাঁধাধরা মাপজোক তো নেই। সবারটাই সত্য, অথচ—সবটাই তার সত্য নয়। জীবন্ত মানুষ নিয়েও সংসারে এই ব্যাপারই চলে। আমাকে তুমি যে-মানুষটি দেখতে পাচ্ছো, অন্য একজন সম্পূর্ণ আলাদা আরেকটি মানুষ দেখছে। কারুর দেখাই ভুল নয়। কিন্তু একটা কথা। বহিরঙ্গ-দৃষ্টির মানুষ সংসারে নব্বুই ভাগ। এঁরা ভিতরের আসল মানুষটাকে মোটে নজরই করতে পারেন না।" বহিরঙ্গ দৃষ্টির মানুষদের বিদ্যার সম্পদ, জ্ঞানের সম্পদ, যুক্তি আর বিচারের ধারালো হাতিয়ার সমস্তই হয়তো ঝক্‌ঝক্ করে—কিন্তু হায়, থাকে না শুধু নিজস্ব গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলো।

শিল্পের রসসৃষ্টির জন্য যেমন,—শিল্পের রসাস্বাদনের জন্যও তেমনি অন্তরের চক্ষুটি মেলে রাখা একান্ত জরুরি।

(ক্রমশ)

॥ তিয়াত্তর ॥

ননীবালা কেন স্যুটকেস গোছাচ্ছেন তা অনুমান করতে ভয় পাচ্ছিলেন ব্রজগোপাল। নিপাট ভালমানুষের মতো বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে করে বললেন—শোনো, এখন বয়স হয়েছে। তোমারও, আমারও।

ননীবালা মুখ তুলে বলেন—সে তো জানি। বলছ কেন?

—এখন হুট করে কিছু করতে নেই, দৃষ্টিকটু দেখায়।

ননীবালা একটু শ্বাস ছাড়লেন। স্যুটকেস যেমন গোছাচ্ছিলেন তেমনই গোছাতে লাগলেন। বললেন—হুট করে নয়। অনেকদিন ধরেই এটা ভেবে আসছি। আজকাল আর মন টেঁকে না এখানে। ছেলেপুলে নাতিনাতনী সব থেকেও কেমন হাঁফ ধরে যায়। মনে হয় আমি বুঝি বাড়তি মানুষ।

ব্রজগোপাল ধীরগম্ভীর স্বরে বলেন—সে তো ঠিকই। তবু এমন কিছু কোরো না যাতে ওদের সামনে একটা কু-দৃষ্টান্ত থাকে। সংসারে সবসময়েই সব কাজেরই নিন্দে হয়।

ননীবালা তাঁর বিখ্যাত বড় বড় চোখে অপলক চেয়ে রইলেন ব্রজগোপালের দিকে। তারপর আস্তে করে বলেন—আমাকে বোঝা ভাবছ! না? ভাবছ আমি এই বুঝি ঘাড়ে চেপে বসলাম পেত্নীর মতো।

ব্রজগোপাল উদারভাবে হেসে বলেন—আমি এই কথাটারই ভয় পাচ্ছিলাম। তোমাকে তো চিনি। আর তোমারই বা কথা কি, দুনিয়ার বোধহয় সব মেয়েমানুষই ঐরকম করে ভাবতে শেখে। সংসারে কারো কাছে তার ওজন কমে গেল বুঝি কখন।

ননীবালা স্যুটকেসের ডালা বন্ধ করে বলেন—আমি ঠিক জানতাম, তুমি ভাল মনে আমাকে আর নিতে পারবে না। একেবারেই কি সংসারের বাইরে চলে গেলে? আর কি কখনো বাউণ্ডুলেপনা ছাড়তে পারবে না?

ব্রজগোপাল তটস্থ হয়ে বলেন—ও সব কথা থাক না। আমার কথা তো একটা জীবন ধরে সবাইকে বলে বেরিয়েছো। আমি যা ঠিক তাই। ও নিয়ে আর উত্তেজিত হয়ো না। বলি কি, যাবেই যদি তো সবাইকে আগে থেকে বলে কয়ে রাজী করিয়ে তারপর চলো। আমিও তো পথ চেয়েই আছি। বুকে মাঝে মাঝে ঠেলা ধাক্কা লাগছে, কবে কি হয়ে যায়! শেষ বয়সটা না-হয় তুমি আমার কাছেই একটু কষ্ট করে...

ব্রজগোপাল আর বলতে পারলেন না। গলাটা ধরে এল। সহজে বিচলিত হন না। কিন্তু এখন হলেন। বারবার গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন। এ সব দুর্বলতা কেন যে এখনো রয়ে গেছে! সকালে খুব সুন্দর একটি প্রণাম নিবেদন করে এসেছেন ঠাকুরকে। ভেবেছিলেন, সংসারের কাছে তাঁর সব প্রত্যাশা বুঝি চুকেবুকে গেছে। কিন্তু যায়নি তো। বুকের কোন গর্ত থেকে এই দুর্বলতার কালসাপ বেরিয়ে এল!

ননীবালা অত্যন্ত কটাক্ষে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ উঠে পাশে এসে বসে পিঠে আলতো হাত ছুঁইয়ে বললেন—কেন অত পাষাণ হওয়ার চেষ্টা করো বলো তো! তোমার মতো মানুষ কি কখনো ওরকম হতে পারে! সংসারের দিক থেকে যতই চোখ ফিরিয়ে থাকো, তোমাকে আমি চিনি।

ব্রজগোপাল সামলে গেলেন। হেসে বললেন—ভাল, ভাল।

—ভালই তো। তুমি ভেবো না, আমি যে তোমার কাছে চলে যাবো এ কথা আমি আগে থেকেই গেয়ে রেখেছি। আমার আর ভাল লাগে না। তোমার ছোটো ছেলেটা কোনোদিনই আমাকে দেখতে পারে না। তার ধারণা তোমাকে আমিই পর করেছি। তাই ভাবি, তোমার কাছে গিয়ে থাকলে বোধহয় তার মন পাবো। নইলে ও ডাকাত ঠিক আমেরিকা না কোথায় চলে যাবে।

ব্রজগোপাল আবার হেসে বলেন—বেশ বাবসাবুদ্ধি তোমার। ছেলের মন পাওয়ার অত চেষ্টা করো কেন? এটা ঠিক জেনো, তুমি যত ওদের ভালবাসবে তার অর্ধেক তোমাকে ভালবাসার ক্ষমতাও ওদের নেই। স্নেহ নিম্নগামী, এ তো জানোই।

ননীবালা ব্রজগোপালের পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে পানের বাটা খুলে বসলেন।

বললেন—ছেলেদের জন্য অনেক করেছি। তুমি ঠিকই বলেছো, অত করতে নেই। তাই এবার একটু দূরে সরে যেতে চাইছি। তাইতে হয়তো সম্পর্কটা ভাল থাকবে।

ব্রজগোপাল হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললেন—কিংবা হয়তো সম্পর্ক থাকবেই না। সোমেন যখন আমার কাছে প্রথম গেল তখন চিনতে কষ্টই হচ্ছিল। বাবা বলে ডাকল, খুব আশ্চর্য লাগছিল শুনে। আমারই ছেলে, তবু সম্পর্ক রাখত না বলে কত পরের ছেলের মতো হয়ে গেছে। ছেলেরা সম্পর্ক রাখবে কেন, ওটা তো তাদের দায় নয়। চোর-দায়ে ধরা পড়েছে যত মা-বাপ।

ননীবালা মুখখানা ম্লান করে বললেন—না গো, ওরকম ভাবা তোমার ভুল হয়েছে। সোমেন ফিরে এসে থেকেই তোমার কথা কত বলেছে। আমার ওপর সে কি চোটপাট! বড় হয়ে বুঝতে পেরেছে তো বাপ কত আপন। সেই বাপকে সংসার পর করে দিয়েছে এটা ও সইতে পারে না। ওকে খারাপ ভেবো না। একটু রাগী আর গোঁয়ার ঠিকই কিন্তু মনটা ভাল।

ব্রজগোপাল পায়ের ওপর পা তুলে বসেছিলেন। গ্রীষ্মকালে ডাবের জল খেলে যেমন ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, এ কথা শুনে তাঁর ভিতরটাও তেমনি ঠাণ্ডা হচ্ছিল। কথাগুলি তিনি পান করছিলেন পরম আনন্দে।

বললেন—[illegible] দোষ। [illegible] কেউ কিছু [illegible] পারবে না, এমন-কি বাপও নয়। [illegible] করেই [illegible] ছেলেপুলে নষ্ট করো।

ননীবালা ব্রজগোপালের কণ্ঠের স্নিগ্ধতা লক্ষ করে হেসে ফেলে বললেন—সেও ঠিক কথা। আমরা মায়েরাই নষ্ট করি। তুমিও তো ঐরকম মায়ের আদর পেয়েই বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়াতে। সে কথা ভুলে যাও কেন!

ব্রজগোপাল অন্যমনস্কভাবে মনশ্চক্ষে এক জগদ্ধাত্রীর রূপ দেখতে পেলেন। বয়সের ভার, বিস্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে সেই বিসর্জিত প্রতিমার স্মৃতি আজও দেখা দেয়। গাঢ়স্বরে বললেন—মা! মায়ের মতো জিনিস আছে!

বহুকাল পরে সেই মা-ন্যাওটা শিশুর মতোই বুকটা আকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় মরার তো দেরী নেই। মরে মায়ের কাছে যাবো। মা কত নাড়ু মোয়া করে রেখেছে!

ননীবালা বললেন—শোনো, আমি যা ঠিক করেছি তার আর নড়চড় হবে না। আমি যাবোই। তুমি একটু বসো, সোমেন দুপুরে খেতে আসবে। ওকে সব বুঝিয়ে বলে আমি যাবো। বীণা আর রণোকে দুই খোট চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। ভয় পেও না, ওরা কিছু মনে করবে না।

—যাবেই?

—হুঁ। নইলে সম্মান থাকে না। তোমারও আমাকে দরকার। বহেরুর ঐ ভূতের রাজ্যে কে তোমাকে দেখে বলো তো! ঘাড়ের বোঝা মনে করো, পেত্নী ভাবো, তবু জেনো আমার চেয়ে আপনার তোমার কেউ নেই।

ব্রজগোপাল উত্তর করলেন না। শুধু অস্ফুট 'হুঁ' দিলেন।

ননীবালা উৎকণ্ঠায় বললেন—কি? কিছু বলছ না যে!

—বড় হুট করে ঠিক করলে তাই ভাবছি। ঠিক আছে গুছিয়ে নাও।

ননীবালা অবহেলার ভাব করে বললেন—গোছানোর আর কি! তেমন কিছু নিজের বলতে নেইও। সবই রণোর সংসারের। এই দু-চারখানা জামাকাপড়...

কড়া নড়ল। ননীবালা উঠে গিয়ে সদর খুললেন। বিভ্রান্তের মতো সোমেন ঘরে এসে ঢুকেই থমকে গেল।

—বাবা!

—আয়।

সোমেন ভরদুপুরের ক্লান্ত মুখশ্রী ভেঙে ফেলে খুব খুশীর একটা হাসি হেসে বলল—কখন এলেন? কেমন আছেন বাবা।

ব্রজগোপাল মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন।

(ক্রমশ)

যে রোগ এখনও এক বিমূর্ত বিভীষিকা

প্রাণচঞ্চল শিশুটিকে নিয়ে সবাই স্বপ্ন দেখছিলেন। তার বাবা মা তো বটেই। এমন কি আশপাশের দু-একজন প্রতিবেশীও। পেশায় সবাই তারা জেলে। আবহমানকাল ধরে মাছ ধরা তাদের পেশা।

প্রতিবেশীরা বলত, দেখে নিও, এ ব্যাটা আমাদের চেয়েও এক কাঠি ওপরে উঠবে। দরিয়ার যত মাছ সাবাড় না করে ছাড়বে না। আরও অনেক কথা।

এ সব কথা শুনে বাবা মা গর্ব অনুভব করতেন। বিশেষ করে এক বছরের মধ্যেই শিশুটি দাঁড়িয়ে উঠে যখন সবেগে চলাফেরার চেষ্টা করল, চিৎকার করে দুরন্তপনায় ঘর-বাড়ি মাতিয়ে তুলল, তখন বাবা এবং মা পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসতেন। আর নিজেদের ব্যবসাটাকে ফাঁপিয়ে তোলার জন্যে কত রকমের কল্পনাই না করতেন।

কিন্তু তাঁদের সমস্ত স্বপ্ন যেন ধূলিসাৎ হয়ে গেল যখন শিশুটির বয়েস গিয়ে দাঁড়াল ছয় বছরে।

একদিন ঘুম থেকে জেগে মা দেখলেন ছেলেটি তখনও বিছানার ওপর শুয়ে।

তিনি চমকে উঠলেন। এমন তো এর আগে কখনও ঘটেনি? এতকাল তাঁর ঘুম ভাঙার আগেই ছেলে জেগে উঠেছে। উঠে হুটোপুটি করেছে বিছানার ওপরই।

শরীর খারাপ হল?

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন তিনি ওর বিছানার পাশে। শান্ত গলায় আদর করে ডাকলেন। আর তারপরই আরও বেশি চমকে উঠলেন।

শিশুটি মায়ের ডাকে কোন সাড়া দিল না। পরিবর্তে প্রায় নিশ্চুপ হয়েই শুয়ে রইল।

মা ডাকলেন, ওঠো সোনা।

শিশুটির মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এল। অস্পষ্ট। অস্ফুট কণ্ঠস্বর। বিড়বিড় করে কি বকছে। হাতপা থর থর করে কাঁপছে। দুই চোখে কেমন যেন পাগলের দৃষ্টি।

মা'র ডাকে বাবা ছুটে এলেন। দুজন ধরাধরি করে কোন রকমে বিছানা থেকে ছেলেটিকে তুলে দাঁড় করানর চেষ্টা করলেন। ছেলেটি দাঁড়াল। কিন্তু অনেক কষ্টে যেন। মুখে তার আর সে প্রাণপ্রাচুর্য নেই। সেই উচ্ছল কথা নেই।

কুসংস্কার সব সমাজেই আছে।

বাবা মা ভাবলেন তাঁদের ছেলেকে বুঝি ভূতে পেয়েছে। গুণিন দিয়ে তাঁরা তার চিকিৎসা করালেন। ফল হল না। ডাক্তার দেখালেন দিনের পর দিন। অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে চিকিৎসা চলল দিনের পর দিন। কিন্তু রোগ সারা তো দূরের কথা, যেন আরও বেড়েই চলল। ছেলেটি সব সময়

মা'র কোলে মিনামাটা আক্রান্ত শিশু

অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ করে। সেই সঙ্গে তার হাত পা শুরু হতে শুরু করল। পায়ের পাতা গেল দুমড়ে। অবশেষে সে পায়ে ভর দিয়ে চলার ক্ষমতাও হারাল। শুরু হল হামাগুড়ি দিয়ে চলা। এবং অবশেষে বাবা মা'র স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়ে একদিন সে মারা গেল।

রোগটির নাম মিনামাটা। এবং যার জন্যে দায়ী জাপানের এক নামকরা পেট্রো-রাসায়নিক এবং প্লাস্টিকের কারখানা কিসো করপোরেশন।

*

দুর্ঘটনার সূত্রপাত এইভাবে ঘটেছিল।

জাপানের দক্ষিণে কিউসু দ্বীপ। তার পশ্চিমে মিনামাটা উপসাগর। সিরানুই সাগরের দক্ষিণ দিকে মুখ করে এর অবস্থান। মিনামাটা উপসাগরের বেলাভূমির ওপর ছড়িয়ে রয়েছে একের পর এক গ্রাম। আবহমানকাল ওইসব গ্রামের মানুষের একমাত্র জীবিকা মাছ শিকার। এই উপসাগরেরই পূব দিকে দাঁড়িয়ে মিনামাটা শহর। আর এখানেই গড়ে উঠেছে কিসো করপোরেশনের সেই কারখানা। গত কয়েক বছর ধরে সেখানকার মানুষেরা দেখে আসছে, এই কারখানার পরিত্যক্ত অবশেষ নালা অথবা নলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পড়ছে উপসাগরের জলে। কি পড়ছে সেটা জানার কৌতূহল কখনও তাদের হয়নি। এমন কি কোন বিজ্ঞানীও এ নিয়ে তেমন কোন মাথা ঘামান নি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ সালে স্থানীয় অধিবাসীদের চোখে ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ল। উপসাগরে জাল ফেলে মাছ ধরতে গিয়ে তারা দেখল, যেসব মাছ তাদের জালে এসে পড়েছে তাদের অনেকেই মৃত। শুধু তাই নয়, তাদের ডিঙির আশপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মরা মাছের ঝাঁক। বিশেষ করে চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি। এমন কি কোন কোন জায়গায় সামুদ্রিক আগাছাও যে মরে যাচ্ছে এমন ঘটনাও তাদের নজর এড়াল না।

১৯৫২ নাগাদ এই ঘটনা আরও প্রকটরূপে দেখা দিল। উপসাগরের যত্রতত্র মরা মাছের সংখ্যা দারুণভাবে বেড়ে গেল। স্রোতের টানে তারা গিয়ে পড়ছে সিরানুই সাগরে। বিশেষ করে শামুক জাতীয় এক ধরনের মাছ (Cuttle fish) সাঁতরে চলার সময় এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, বাচ্চারা শুধু হাতেই টপাটপ তাদের ধরতে লাগল।

এর পরের বছর স্থানীয় বিড়ালগুলির মধ্যে দেখা দিল অদ্ভুত এক ধরনের রোগ। স্থানীয় অধিবাসীরা যার নাম দিল নাচুনে রোগ বা বেড়ালে রোগ। দেখা গেল এই রোগে আক্রান্ত বেড়ালগুলি কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। মাঝে মাঝে তাদের মুখে লালা ঝরে। এবং পায়ে অদ্ভুত খিঁচুনি। ওই সময় একই জায়গায় উদ্দণ্ডভাবে কানামাছি খেলার মত পাক খেয়ে ঘুরতে থাকে। আর এইভাবে চলতে চলতে কয়েকদিন পর মারা যায়। বলতে কি, ১৯৫৮ সালের মধ্যেই ওই অঞ্চলের সব বেড়াল অদ্ভুত এই রোগে নিঃশেষ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে সেই বেড়ালে রোগের আবির্ভাব ঘটল আর একভাবে। জনৈক জেলে ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে পাঁচ বছরের এক শিশু কন্যাকে নিয়ে এসে ভর্তি করল কিসো করপোরেশন কারখানার হাসপাতালে। সে জানাল কয়েকদিন ধরে তাঁর এই মেয়েটি অদ্ভুত কতকগুলি উপসর্গে কষ্ট পাচ্ছে। তাল মিলিয়ে সে হাঁটতে পারে না। কথায় আড়ষ্ট। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকে।

এই ঘটনার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল ওই মেয়েটির ছোট বোন এবং আরও কয়েকটি স্থানীয় পরিবারের লোকজন একই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ব্যাপারটা লক্ষ করে কারখানার হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক স্থানীয় জনসংস্থা বিভাগকে জানালেন: 'কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রজনিত অজ্ঞাত এক রোগের আমরা সন্ধান পেয়েছি। এর কারণ এখনও অস্পষ্ট।' ১৯৫৬ সালে রোগটি মহামারীরূপে দেখা দিল। বেশির ভাগ রোগীই মিনামাটা শহর এবং তার আশ-পাশের গ্রামগুলি থেকে আসার দরুন রোগটির নাম দেয়া হল মিনামাটা।

স্থানীয় স্বাস্থ্যসংস্থা তিরিশজন রোগীর কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন। এদের অনেকেই বেশ কিছুকাল ধরেই ওই রোগে ভুগে আসছিল। তাদের উপসর্গগুলি পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা মনে করেছিলেন, অতিরিক্ত মদ্যপান, অজ্ঞাত কোন ভাইরাস আক্রমণের দরুন মস্তিষ্কের প্রদাহ বা অনুরূপ কারণেই বুঝি এমনটি ঘটছে। পরে কুমামাতো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের একদল বিজ্ঞানী অনুসন্ধান চালিয়ে বলেন, ওই অঞ্চলের সামুদ্রিক মাছই এই রোগের কারণ। ওইসব মাছের দেহের মধ্যে যে সব ভারী ধাতু সঞ্চিত রয়েছে, সেই সব ধাতুই মাছের মাধ্যমে মানুষের শরীরে গিয়ে অমন বিপত্তি ঘটিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, মিনামাটা উপসাগরের মাছের দেহে ভারী ধাতু এলোই বা কি করে? এবং ওই সব ভারী ধাতুর মধ্যে বিপত্তির মূলেই বা কাজ করছে কোন ধাতুটি?

উত্তরে বলা হল, কিসো কারখানার পরিত্যক্ত অবশেষই যত অনিষ্টের মূল। ওই কারখানার ধোয়ানির মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ, থেলিয়াম, আরসেনিক, পারদ, সেলেনিয়াম, তামা এবং সিসে। হয়ত এদেরই কোনটি বিপত্তির মূল কারণ।

১৯৫৬ সালের শেষে ৫২ জন নতুন রোগীর সন্ধান পাওয়া গেল। গোড়ায় একই উপসর্গ। প্রথমে স্নায়ুবিক দৌর্বল্য। পরে অস্পষ্ট কথাবার্তা, দৈহিক দৌর্বল্য, হাত পা থরথর করে কাঁপা এবং অবশেষে শারীরিক বৈকল্য, খিঁচুনি এবং অসাড় হয়ে পড়া। রোগের উপসর্গ ধরা পড়ার এক বছরের মধ্যেই এই ৫২ জন রোগীর মধ্যে ২১ জনই মারা যায়। মৃত্যুর পর তাদের শব ব্যবচ্ছেদ করা হলে দেখা যায় তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে পারদঘটিত রাসায়নিক যৌগ ছড়িয়ে রয়েছে। এবং ১৯৬০ সালে চূড়ান্ত পরীক্ষার পর জানা গেল, এই রোগের মূল কারণ মিথাইল মারকারি নামে এক ধরনের যৌগ। পেট্রো-রাসায়নিক এবং প্লাস্টিকের ওই কারখানা থেকে বছরের পর বছর ওই যৌগ মিনামাটা উপসাগরের জলে গিয়ে সঞ্চিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলে তার মাত্রা বাড়তে শুরু করে, সেই সঙ্গে সেখানকার জলজ উদ্ভিদের মধ্যেও। মাছের ঝাঁক সেই বিষাক্ত পদার্থ সমন্বিত উদ্ভিদ খাওয়ার ফলে তাদের শরীরেও বেড়ে ওঠে মিথাইল মারকারির মাত্রা। আর সেই মাছ খেয়েই মানুষ এবং বেড়ালের মধ্যে মড়ক।

অনিবার্য কারণে কিসো করপোরেশন ব্যাপারটা মেনে নিতে চায় নি। ১৯৫৬ সালে ওই কারখানার জনৈক চিকিৎসক কারখানার পরিত্যক্ত ধোয়ানির কিছুটা নমুনা একটি বিড়ালকে খাইয়ে পরীক্ষা চালানর চেষ্টা করেন। বেড়ালটি এর ফলে অল্প-দিনের মধ্যেই মিনামাটা রোগে আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়। ভদ্রলোক এরপর আরও কয়েকটি বেড়ালের ওপর অনুরূপ পরীক্ষা চালাবেন বলে কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানান। কিন্তু তাঁরা এই প্রস্তাবে রাজী হন নি। এবং ওই চিকিৎসক কারখানা থেকে এ[illegible]কু নমুনা যাতে সংগ্রহ করতে না পারেন, সেদিকে নজর রাখেন। বলতে বাধা নেই, এই অসহযোগিতার দরুন আরও বেশ কিছু সংখ্যক মানুষকে মূল্য দিতে হয়েছে।

পরে অবশ্য এ নিয়ে জনমত সৃষ্টি হয়। সরকার এগিয়ে আসেন। শুরু হয় পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পরীক্ষার কাজ। যার ফলে জানা গেল পারদই মিনামাটা রোগের কারণ। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের জানিয়ে দেয়া হয় মিনামাটা উপসারের মাছ যেন কেউ না খান। আইন প্রয়োগ করে কারখানাকে পরিত্যক্ত তরল পদার্থ সমুদ্র এবং নদীতে ছেড়ে দেয়ার আগে তা থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে নিরাপদ কোন জায়গায় নিক্ষেপ করতে বাধ্য করা হয়।

বলা বাহুল্য, শুধু মিনামাটা উপসাগরেই নয়। জাপানের অন্যত্রও নদী এবং সমুদ্রের

জলে মিথাইল মারকারির মাত্রা বেড়েছে বলে জানা গেছে। বেড়েছে বালটিক সমুদ্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেক মিশিগানের মত বড় বড় হ্রদে—কানাডার হ্রদগুলিতে এবং পৃথিবীর অন্যত্রও। কিভাবে বাড়ল, কেন বাড়ল এবং কতটাই বা বাড়ল বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালাচ্ছেন।

✻

না। শুধু মিনামাটাই নয়। জল দূষণের দরুন এই ধরনের বিপত্তির সম্ভাবনার ব্যাপারে ভারতকেও বাদ দেয়া যায় না। এদেশেও বেশ কয়েকটি নাব্য নদীর দু' ধারে গত কয়েক দশকে গড়ে উঠেছে নানারকম কলকারখানা। রাসায়নিক শিল্প, কাগজের কল, রঞ্জক কারখানা ইত্যাদি। ওই সব কারখানায় কত রকমের রাসায়নিক দ্রব্যই যে কাজে লাগান হয় তার হিসেব দেয়া শক্ত। তাদের অবশেষ গিয়ে পড়ছে নদীগুলির জলে। ফলে নদীর জল দূষিত হচ্ছে। হয়ত বা কোন কোন রাসায়নিক যোগ ওই সব নদীরও জলজ-প্রাণীর দেহে গিয়ে জমছে। আর তার মাধ্যমে এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের শরীরে।

কলকাতার কেন্দ্রীয় পরিবেশ গবেষণা কেন্দ্রের জনৈক বিজ্ঞানীর সঙ্গে কিছুকাল আগে এ নিয়ে কথা বলেছিলাম। হুগলী নদীকে প্রসঙ্গ করে।

ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, জল দূষণের ফলে মাছের শরীরে শুধু যে ক্ষতিকর কিছু কিছু ভারী পদার্থের রাসায়নিক যোগই জমার সম্ভাবনা থাকে তা নয়। ক্ষতি অন্যভাবেও হতে পারে। যেমন ধরুন, কোন কোন রাসায়নিক যোগ নদীর জলে যদি বেশি মাত্রায় মিশে থাকে, তাহলে নদীর জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। ফলটা তার এই দাঁড়ায়, মাছেরা নদীতে যখন ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটে যখন ছানা হয়, ওই ছানারা বেঁচে থাকার মত জল থেকে আর অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে না। তারা মারা যায়।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে হুগলী নদীতে ইলিশ এবং অন্যান্য মাছ হ্রাস পাওয়ার এটাও হয়ত অন্যতম কারণ।

একথা ঠিক প্রকৃতি নিজেই একটি অতিকায় শোধনাগার। মানুষ জঞ্জাল ফেলে পরিবেশকে কলুষিত করছে। প্রকৃতি নিজস্ব পদ্ধতিতে নিষ্কলুষ করার চেষ্টা করছে। তবু দূষণের মাত্রা যখন বেড়ে যায়, পরিবেশকে পরিশুদ্ধ করে তোলা প্রকৃতির পক্ষেও তখন আর সম্ভব হয় না।

অভিযোগ এই, আমাদের জলীয় পরিবেশে কলকারখানা থেকে ঠিক কত-রকমের রাসায়নিক যোগ গিয়ে মিশছে তার হিসেব আমাদের গবেষকরা পুরোপুরি এখনও করে উঠতে পারেন নি।

তাঁদের বক্তব্য, বড় বড় কারখানার ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুসন্ধানের কাজে অসুবিধে হয় না। কিন্তু মুশকিল বাধে অনামী বেনামী কারখানাদের নিয়ে। এইসব কারখানার বস্তী এবং শহরের ঘিঞ্জি অঞ্চলে অবস্থান। অনেকের যথাযথ লাইসেন্সও হয়ত নেই। অনেকে লুকিয়ে ছাপিয়ে ওই সব জায়গায় এমন সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে যা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। স্থানীয় অধিবাসীরা যদি এ ব্যাপারে সজাগ হন এবং প্রতিবিধানের জন্যে এগিয়ে আসেন, তবেই এক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব।

যাঁরা পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত গবেষণায় নিযুক্ত রয়েছেন, এ প্রসঙ্গে তাঁদেরও কয়েকটি কারণ ভেবে দেখতে অনুরোধ করা যেতে পারে।

যেমন ধরুন, গত কয়েক বছর ধরেই আমরা শুনে আসছি এই এই ভাবে জল দূষিত হয়, তার ফলে এই এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ইত্যাদি। এই সব বক্তব্যের সমর্থনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেসব তথ্য বা উদাহরণের কথা বলা হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই বিদেশী অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি।

প্রথমত, ভাগীরথী, যমুনা অথবা গোদাবরীর দু' পাশে তো বহু কলকারখানা আছে। ওই সব কলকারখানার দরুন ওই ওই নদীর জল কতটা কলুষিত এবং কিভাবে হয় তার ওপর বিশদ তথ্য এখনও অজ্ঞাত। দ্বিতীয়ত, ওই সব নদীর জল মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করছে অথবা ওই সব নদীর মাছ মানুষ খাচ্ছে। এর ফলে মানুষের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা বা হতে পারে কি না, সেটা যাচাই করে দেখার জন্যে : এক নির্ভরযোগ্য সমীক্ষার কাজ এদেশে এখনও হয় নি; দুই, মানুষ অথবা মনুষ্যেতর প্রাণীকে ভলানটিয়ার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারা অনুযায়ী কতটা কাজ হয়েছে, আদৌ নির্ভরযোগ্য কাজ হয়েছে কিনা এখনও জানা যায় নি। বলা বাহুল্য, এই শেষোক্ত ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এবং জটিলও বটে। কারণ কোন কোন রাসায়নিক যোগ আছে যাদের শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠতে সময় লাগে। এমনও হতে পারে তেমন কোন বস্তুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজের জীবনে সরাসরি কেউ হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত নাও হতে পারেন, কিন্তু সেই ক্ষতি হয়ত গিয়ে বর্তাবে তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে। এ সব যাচাই করে দেখতে হলে মৌলিক গবেষণার প্রয়োজন। সময়মত এ কাজটি না করা হলে মিনামাটার মত কোন বিভীষিকা হঠাৎ একদিন এ দেশেও যে দেখা দেবে না, কে বলতে পারে?

সমরজিৎ কর

সুখবা দুঃখবা

অমল মুখোপাধ্যায়

সময়টা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে। অনেকদিন ধরেই খারাপ। জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। টাকার আর কোনই মূল্য নেই। টিফিনের সময় রুটির সঙ্গে একটা-কিছু যোগ করতে ইচ্ছা যায় মাঝে মাঝে। বিবাদী বাগের সেই বিখ্যাত লাল দালান বাড়িটা থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের জলখাবারের মেলায় বার-দুই চক্কর দেই। পয়সার হিসাবে কোনে কিছুতেই মন ওঠে না। পাঁচ-আঙুলের ফাঁকে একটু ছানা—দাম পঁচাত্তর পয়সা। ওটাই একটু চিনি দিয়ে পাক দেওয়া। দিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে কাঁচা-গোল্লা। দাম করেছে এক টাকা। না-কিনলেও দাম শুনেই মাথায় রক্ত উঠে যায়। দুটো কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। বলতে ইচ্ছে করে বাপের জন্মে কোনোদিন কাঁচা-গোল্লা খেয়েছিস্? দাম যা নেবার নে। তাতে আমার বলার কি আছে। তবে মাখনতোলা ছানায় সয়াবিনের ভেজাল দিয়ে আর যাই নাম দেবার, দয়া করে ওটাকে কাঁচাগোল্লা বলিস না। জিলিপির মত সরু প্যাঁচের অমৃতিগুলি—এই তো সেদিনও দশ কি পনের পয়সা ছিল। এখন প্লাস্টিকের লাল বোর্ডে সাদা ইংরেজী হরফে লেখা পঁয়ত্রিশ পয়সা। একটা কিনলে মুখেই লাগবে না। ও আবার রসের প্যাঁকটা। অম হলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে সেঁটে যায় অনেকটা।

তবু যাই হোক একটা কিছু কিনবোই ঠিক করেছিলাম। পকেট থেকে পয়সা বার করতে যেটুকু ইতস্তত করা—তারই ফাঁকে ফলের দোকানটায় থোকা থোকা আঙুরের গুচ্ছ চোখে পড়ল। পড়তেই কেমন একটা অপরাধ-বোধ শীতের চাদরের মত আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমার কিছু কেনা হলো না।

কাল ছোট মেয়েটা বলছিল, বাবা অনেক দিন আঙুর খাই না। শুনে মনটা অনেকক্ষণ ভারী হয়েছিল। অবশ্য ওকে তা একদমই বুঝতে দিইনি। বরং খুব বড় এক ধমক লাগিয়ে দিয়েছি। বলেছি, দিনকাল খুব খারাপ। জিহ্বাকে সংযত রেখো। আর একদম বড়লোকী চালের মধ্যে যেও না। লেখাপড়া করে যাও। কপালে থাকলে খাবে, নিশ্চয় খাবে।

নিজের অবশ্য মনটা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শত হলেও আমি তো পিতা। আমার উপর ওরা নির্ভর করে আছে। আমার উপর ওদের সমস্ত বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আর আমি পৃথিবীর এক হীনতম

(সি-১২৮৩৮)

জীবের মত, পনের টাকা ইনাক্রমেণ্টের তারিখ পয়লা এপ্রিলের দিকে তাকিয়ে আছি। পৃথিবীতে আমার চেয়ে অপরাধী আর কে আছে। অথচ আমার এই অপরাধের জন্য সমস্তটাই আমি দায়ী নই। আমার দশ বছর আগের রোজগারে—হ্যাঁ—শীলাতার (আমার বড় মেয়ে) যখন এক বছর বয়স—তখন ওকে প্রায়ই আঙুর বেদানা ইত্যাদি এনে দিতাম। তখন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বড় জোর চল্লিশ পয়সায় মরশুমে একশ' আঙুর আমি আলবৎ কিনেছি। এখন এক টাকা কুড়ি ত্রিশ-এর নীচে একশ গ্রামের দামই শুনি না। অথচ আমার আয় তো বাড়ে বছরে পনের টাকা।

রসিকতা করে হয়তো বলা চলে আমি গল্পের শৃগাল হয়ে গেছি। আসলে এই সব কথা ভাবলে পঞ্চাশের দরজায় এসে নিজের দিকে তাকিয়ে কান্না পায়। কি করলাম জীবনে। আর তো মোটে দশটা বছর চাকরি। প্রভিডেণ্ট ফান্ড বলতে তো নিজে জোর করে যে-কয়টা টাকা কাটিয়েছি। গ্র্যাচুয়িটি যা পাওয়া যাবে তাতে খান কতক ইঁট কেনা যাবে হয়তো। পেনশন? থাকলে আছে, না-থাকলে নেই। হঠাৎ চোখ বুজলে আমার
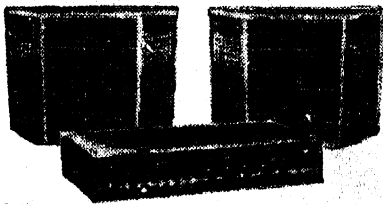
সংসারের কি হবে। চোখে অন্ধকার দেখি। কি করলাম জীবনে। আপার ডিভিশন কেরানীর কাজই যদি করলাম—(তাও পরীক্ষা দিয়ে, সার্ভিস কমিশন পার হয়ে) ব্যাঙ্ক ছিল, কোম্পানী ছিল, ও-টির অফিস-গুলি ছিল। শেষ পর্যন্ত কপাল কিনা দিঘির পাড়ের ওই লাল বাড়িটাতেই টেনে নিয়ে গেল!

মেয়ে সেই কবে থেকে বলছে বাবা এটকা রেকর্ড-প্লেয়ার। বলে, চোখের দিকে এমন করুণ ও দুষ্টুমির চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকে—বুকের ভেতরটা কষ্টে ভরে যায়। ভাবি কত কম ওদের বাচ্ছা ওদের বাবার কাছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে হয়তো কত কি শোনে। কই কোনোদিন তো আমাকে সে সব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত করেনি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতটা সত্যি ওরা দুজনে খুবই ভাল-বাসে। সেই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশেই রেকর্ড প্লেয়ারের অনুরোধটা। তা ছাড়া আমিও একবার মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম ক্লাসে ফার্স্ট হও নিশ্চয় দেব। আশালতা তো বেশ ভালভাবেই ফার্স্ট হয়েছে। নয়ন-মণি (ছোট মেয়ে) একটু বেশী ছটফটে। একটা অঙ্ক ভুল না-করলে সেও ফার্স্ট হতো।

ওদের দাবি আছে। আমি গরীব অথবা অপারগ বলে সে কথাটা তো মিথ্যে হয়ে যায় না! তবে তারও চেয়ে আরো গভীরতর সত্য আমার স্ত্রী শিশিরকণার নীরবতা। নীরবতা না বলে অসহায়তা বরং বলা ভাল। গত কিছুকাল ধরেই শরীরটা আমার দুর্বল দুর্বল লাগছিলো। শরীরের আর দোষ কি। দিন নাই রাত নাই দুটো পয়সা কিসে আসবে সেজন্য ধান্ধা করবো। আর খিদে পেলে পাকস্থলীর দেয়াল রক্ষার্থে বড় জোর বাতাসা দিয়ে জল খাব। এমন করে তো আর শরীর টেঁকে না। ডাক্তারের কাছ থেকে পাকা খবর নিয়ে এলাম। আমার লো-প্রেসার হয়েছে। সেদিন থেকেই একটি অপরাধীর মত শিশিরকণা আমার যথাসাধ্য যত্ন করে চলেছে। কিন্তু লো-প্রেসারে সেবাযত্নে আর কি হবে। ভাল খাওয়া দাওয়া দরকার। মাছ মাংস ডিম দুধ ফলফলাদি। ডাক্তার যেমন অনায়াসে বলে যান তেমনি অবলীলায় এসব যদি জোগাড় করা যেত—হয়তো অনেক সমস্যাই মিটে যেত। যা-নিয়ে বাজারে যাই তাতে ব্যাগ ভর্তি পাতা, ডগা, ডাঁটা ছাড়া আর কিছুই আনা যায় না। শাকসব্জীটা আমার আবার একদম সহ্য হয় না। উইন্ড হয়। মাংসের দাম বার তের করে। চারটি মুখের জন্য কম করে দুশো গ্রাম তো দরকারই হয়। তারও দাম তিন টাকা। সঙ্গে কত অনুপান। পিঁয়াজ রসুন। আদা। অতিরিক্ত তেল আর আলু মশলা তো আছেই। মানে একবেলা একখণ্ড মাংসের স্বাদ পেতে হলে পাঁচটি টাকা যায়। মাসের প্রথম সপ্তাহে যদি বা জোরজার করে ব্যবস্থা করা যায়। মধ্য বা অন্ত মাসে একেবারেই অসম্ভব।

এই সব অবস্থা দেখে বা বুঝে কিনা জানি না—চাহিদা পছন্দ ফরমাশ ইত্যাদি সম্পর্কে শিশিরকণা একেবারেই নীরব। ওর নাকি কিছুই চাই না। চাওয়ার নাকি এ সংসারে ওর কিছুই নেই। আমি অনেক সময় অনেক ভেবেও বুঝে উঠতে পারিনি, আসলে এটা কি ওর বৈরাগ্য অথবা দুঃখকে অনেক গভীরে চেপে রাখার চেষ্টা অথবা আমার মত অশেষ এক অপদার্থের প্রতি গভীরতম ভালবাসা বা অনাসক্তির সংক্ষ্মতম প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে যে বাড়ি থেকে ও এসেছে—তাতে ভদ্র পল্লীতে একটা ফ্ল্যাট, দুটো নতুন পাখা, নয়নমনোহর একটা রেডিও বা রেডিওগ্রাম চাওয়া অন্যায় কিছু হতো না। বিয়ের পর চার পাঁচ বছর যখন আমাদের সংসার বাড়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি, তখন কোনো কোনোদিন প্রেমের উত্তাপ

বোঝাতে গিয়ে আমি ওকে বলেছি, যতই অপদার্থ মনে কর-না কেন, দেখো তোমার সব কিছুই হবে।

ও এসব কথা কিভাবে ধরেছিল জানি না—আমি পার্থিব সুখদা উপকরণগুলোর কথাই বলেছিলাম। তখন কি সাহসে এসব কথা বলেছিলাম আজ আর মনে করতে পারি না। তবে যাকে বলেছিলাম কথা-ভঙ্গের অপরাধে সে আমাকে একদিনের জন্যও অপরাধী করেনি। তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ—একথা বললে পাছে ন্যাকামির মত শোনায় তাই আমি বলতে চাই না।

কিন্তু মেয়ে দুটির কথা যখন ভাবি........। মাঝে মাঝে আমি অফিসে নিজেদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনার আমার তরুণতম সহকর্মীদের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষেপে যাই। এফিসিয়েন্সি বার-এ আটকে গেছি। প্রমোশন প্রসঙ্গে বড় কর্তা-দের নীরবতা সহ্যশক্তিকে পরীক্ষার শেষ সীমায় নিয়ে এসেছে। পে কমিশন মাইনে বাড়ানোর ব্যাপারে—রাষ্ট্রের কর্ণধারণ করে আছেন যে অফিসারকুল—তাদের কথা ভাবতে গিয়ে গরীব কেরানী জাতির দিকে নজর দেওয়ার সময় পাননি। অথচ শুনি, অধি-কারী-অনধিকারী ভেদে বলে যাচ্ছে, কেরানীরাই নাকি প্ল্যানের সাজানো বাগান শুকিয়ে দিচ্ছে। এই সব কথার ইঙ্গিতমাত্রে অসহায় আক্রোশে আমাদের নবীন অফিসার অমরেশবাবুর সঙ্গে অনেকদিন তর্ক করেছি। বলেছি, দেখুন স্যার যদি কিছু মনে না করেন, ইট ইজ সিয়ার লাক অর অ্যান অ্যাকসিডেন্ট যে আজকে আমি এই পদে আর আপনি ওই পদে। আমাদের যোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে কেউ বিচার করে দিয়েছেন—এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। আপনি সহজে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডিগ্রি পেয়েছেন, চাকরী করতে করতে একটু কষ্টে-সৃষ্টে হলেও আমিও সেটাই পেয়েছি। আমি কেরানী। গুহ্য বিচারে আপনিও তাই। আপনি একটু ডিগনিফায়েড। তাই, আমি বাঁ দিকে সই করি—আপনি ডান দিকে। কেবলই পুট আপ করা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই—আপনি সেটুকু দায় থেকেও মুক্ত। শুধু সই করলেই হয়। তাই কি আমাদের মধ্যে ফারাকটা বড্ড বেশি।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি উত্তর দিয়েছেন, অ্যাবসোলিউট কারেক্ট জাজমেন্ট বলে কিছু হয় নাকি? সার্ভিস কমিশনের অতগুলো সভ্যের মতামতকে এত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায়?

—থিউরেটিকেলী হয়তো যায় না। কিন্তু রিয়্যালিটিকে যদি কনসিডার করা হয় তা হলে বলতেই হবে অনেকখানা হাসির ব্যাপার আছে। আমরাও তো দেখছি, স্যার। এই ধরনের তর্কে কোনোদিন মীমাংসায়

আনা যায় না। তর্কে জেতাটাই প্রধান হয়ে ওঠে। সিদ্ধান্তে পৌঁছনো, অন্যের বক্তব্যের প্রতি সহানুভূতি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। আমাদের তর্কেও তাই হলো। অমরেশবাবু ভুলতে পারলেন না যে, উনি আমার উপরওয়ালা। আমার নিজেকে খুব একটা বুদ্ধিমান মনে করার কারণ নেই বলে উনি কটাক্ষ করলেন। আমারও মুখে এসে গিয়েছিল, আপনার বৌদ্ধিক পে যখন আমার চেয়ে অনেক বেশি, আপনার বক্তব্যের অকাট্যতাও অনেক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক একেবারে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসলেন। বললেন, সেখুন সুধীনবাবু খেয়ে-পরে বেঁচে তো আছেন?

আমি স্বীকার করি ঃ হ্যাঁ বেঁচে আছি। এই মাত্র।

তাহলে এত কুলস্পেটিয়াম কেন বলুন তো? ভদ্রলোক আমার উপর ঝুঁকে পড়ে, ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার চোখে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আসলে, কি হতে চেয়েছিলেন বলুন তো? সত্যি বলুন এবং পরিষ্কার বলুন।

অকস্মাৎ অপরিচিত অস্ত্রের প্রয়োগে আমি একটু দিশেহারা হয়ে পড়লাম। কথা-

গুলো জড়িয়ে আমি তো আমি তো করতে থাকলাম। ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছি। প্রকৃতপক্ষে আমি কি হতে চাইছি অথবা হতে চেয়েছিলাম তা আমি কোনোদিন ভাবিনি। জীবন চিরকালই আমার কাছে অস্পষ্ট এক বনপথ। যখন যেমন প্রয়োজন অনুভব করেছি, তার জন্য হাত বাড়িয়েছি। না-পেলে দুঃখ ও হতাশা বুকে নিয়ে আবার চলতে শুরু করেছি।

এবার অমরেশবাবু অকরুণ মুষ্টি-যোদ্ধার মত আমাকে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলেন। বললেন, দেখুন সুধীন-বাবু, সত্যি কথা বলতে কি দেশ-গড়ার উদার নীতিতে আপনার আমার সম্পর্কে ভাবার সময় সরকারের থাকা উচিত নয়। ষাট কোটি লোকের দেশ এই ভারতবর্ষ। একবেলাও পেট পুরে খেতে পায় না এমন লোকের সংখ্যা অগণিত। শামুক গুগলি জলকচু বনকচু খেয়ে কত লোক বেঁচে আছে তার সীমা সংখ্যা নেই। সেইখানে আপনি ব্যক্তিগতভাবে অথবা কেরানী জাতি অথবা অফিসার জাতি হিসাবে সরকারী ভাবনার কতটুকু অংশ দাবী করতে পারেন? আপনি কি ইর্‌রিপ্লেসেবল্‌? আপনি কি বৈজ্ঞানিক? আপনি কি কারিগরী বিশেষজ্ঞ? আপনি কি আদর আপ্যায়ন করে ধরে রাখার মত ডাক্তার? আপনি কি না-মুছে যাবার মত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক?—তীরের পর তীর চালিয়ে উনি থামলেন এবং একটু বিরতি দিয়ে বললেন, আপনি এর একটা কিছুও নন। আপনি ভাল ড্রাফট লিখতে পারেন, সুন্দর নোট দেন—দেশ গঠনের বিরাট কর্মযজ্ঞে সেটা কনসিডার করবার মত ব্যাপারই না। বলে, একটু হাসির রেখা মুখে নিয়ে শিকারের প্রতি নিশ্চিত শরসন্ধানের তৃপ্তিতে প্রশস্ত চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

আমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে থাকলো। কিন্তু মুখে কোনো কথা এল না। মনে মনে ভেবে দেখলাম কথাগুলি খুব একটা মিথ্যা নয়। এই পৃথিবীর সম্ভবত কোনো অংশেই আমি অপরিহার্য নই। কোম্পানীগুলির হিসাবনিকাশে চতুরতা ও কৌশলের পরিচয় দিয়ে অপরিহার্য যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, আমি তা নই। ষোল থেকে বত্রিশ, বত্রিশ থেকে চৌষট্টি টাকা ভিজিট করলেও যে ডাক্তারের অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের খাতা উপচে পড়ে—আমি তেমন কেউ নই। অ্যাটমিক রিসার্চে আমার কোনো ভূমিকা অকল্পনীয়। বহু টাকার বিনিময়ে আইনগত কূটবুদ্ধি বিক্রয়ের আমি অনধিকারী।

অনেকদিন পরে প্রাকৃতিক নিয়মে লব্ধ আত্মবিশ্বাসের মসৃণ পাত্রটি নড়ে উঠলো। গোপনে বহুকাল লালিত একটি গর্ব ও অহঙ্কার, সযত্নরক্ষিত একটি আত্মতৃপ্তি—আহত হয়ে অস্ফুট যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকলো। এমন একটা কাঁচা বিষয় নিয়ে এমন একজন ওপরওয়ালার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে যাওয়ার মধ্যে যে বুদ্ধি-হীনতা আছে—এই মুহূর্তে সেটাই নিজেকে দংশন করতে থাকলো। আমি উঠে পড়লাম। বললাম, ডেভেলপমেণ্টের ফাইলটা এখনো ফিরে আসেনি। আজ একটু রাজভবন হয়ে যাব স্যার। একটু আগেই বেরিয়ে পড়বো। অকস্মাৎ ভদ্রলোক যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সুদর্শন ভদ্রলোক। একমুখ চার-মিনারের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। আমার কথায় আবার কিছু মনে করেননি তো। আমি ম্লান হেসে মাথা নাড়ার সাহায্যে জানালাম যে কিছু মনে করিনি।

সত্যি কথা বলতে কি সেদিন আমার মনটা বিষাদে ভরে গিয়েছিল। দিঘির ধার ধরে রাজভবনের দিকে হেঁটে চলেছিলাম। দুপুরের রেশ তখনও আছে। নিদাঘ দুপুরের উত্তাপ গলন্ত পীচ থেকে যে তাপ বিকিরণ করছিলো তা চারদিকে কেমন একটা শব্দহীন মুহ্যমানতা এনে দিয়েছিল। রাস্তায় লোক চলাচল খুবই কম। এধারে ওধারে দু-একটা ভাবওয়ালা, কোণের দিকে ছাতাধারী একজন গনৎকার খদ্দেরের অভাবে দেয়ালে ঢুলে পড়েছে। আমার মনে চার্চের ঘণ্টাধ্বনির মত একটা কথাই বার বার বেজে

[illegible]—প্রকৃতপক্ষে আমি কি হতে চেয়েছিলাম। আমি মহাকালের একজন প্রবীণ পুরোহিত। আমার লেখা লেখার নোট লেখা, মাইনে পাওয়া। পৃথিবীর কাছে আমি খা-তায় আছি তাই আমার পরিচয়। অন্য পরিচয় নেই। থাকা হাস্যকর। অত বড় জাগতিক সত্যটাকে মুছে ফেলার করুণ চেষ্টা মাত্র।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে, রাজ-বলের পাশ দেবদারু, অশোক ও শিরিষের ছায়া দিয়ে চলতে চলতে আমি আকাশ-পাতাল অনেক কিছু ভাবছিলাম। আমার শৈশব, হারিয়ে যাওয়া মাতাপিতার কুয়াশাচ্ছন্ন অবয়ব, নিঃস্ব রিক্ত হয়ে মামার মেসে শিয়ালদহ আগমন, পকেটকাটার বৃত্তি-যাপন, পরে হাবড়ার অনাথ আশ্রমে আশ্রয় প্রাপ্তি, সেখান থেকে তৃতীয় মাসে পলায়ন এবং শেষত আমার একমাত্র মামা মামীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভের দৃশ্যাবলি সুতীব্র রং নিয়ে চলচ্চিত্রের মত আমার চোখের সামনে আসতে শুরু করেছিল। মেধার যে অংশে অতীতকে ফিরিয়ে আনার শক্তি একটা বিশেষ বয়সে জমা বিক্ষিপ্ত ও অসাড় হয়ে পড়ে থাকে, তাকে সংহত করে আমি স্মৃতির অতল জলে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। আলোড়িত সরোবরের ঢেউয়ে হঠাৎ শতভঙ্গ একটি আবছা মুখ আমার নজরে এল। আমি চমকে অধীর আগ্রহে আরো ভাল করে তাকালাম। স্মৃতির উৎক্ষিপ্ত সরোবর স্থির হলে, আমি পরিষ্কার মুখটি দেখতে পেলাম। শাসনহীন একমাথা চুল, অপ্রশস্ত কপাল। জোড়া ভুরুর নীচে টিকলো ছোট নাক, প্রথম উদ্গত নরম রেশমী গোঁফের রেখা—এরই সঙ্গে সংলগ্ন উজ্জ্বল একমুখ হাসি। চোখের তারায় সম্ভাবনার হীরক-দ্যুতি। সাতাশ বছর পর আমি আমার শেষ কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নিভৃততম বন্ধু পূর্ণেন্দুকে চিনতে পারলাম।

আস্তে আস্তে আমার সব কিছু মনে পড়তে লাগলো। পূর্ণেন্দুর জন্য অথবা নিজের জন্য অথবা সেই বন্ধুর বিগত জীবনের জন্য আমার সমস্ত চিত্ত ভরে উঠলো। সেই মুহূর্তে পূর্ণেন্দুকে কাছে পাওয়ার জন্য, ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য, ওর সঙ্গে আর একবার নিভৃতে বসার জন্য আমার সমস্ত অন্তরাত্মা আকুল প্রার্থনায় ভরে উঠেছিল। যদিও আমি জানতাম, আজ সাতাশ বছর পরে নক্ষত্রলোকের অজস্র অঘটনের নিয়মেও আমার শেষ-কৈশোর ও প্রথম যৌবনের নিভৃততম বন্ধু পূর্ণেন্দুর সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবু আমি পূর্ণেন্দু-বিষয়েই ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম।

পূর্ণেন্দু আজ কোথায় আছে আমি জানি না। ও কত বড় হয়েছে, দেখতে কেমন হয়েছে—কল্পনায় আনতে পারি না। হিসেব করে দেখলাম, খুঁজে বার করতে গেলে তাও যে পারবো এমন বিশ্বাস নেই। কারণ, যাদের কাছে গেলে আমি পূর্ণেন্দুর কিছুটা হদিস করতে পারতাম, তাদের ঠিকানা আমি ভুলে গেছি—অনেক ক্ষেত্রে তাদের গোটা নামটাও আমার মনে নেই। বলা বাহুল্য, ব্যবধানটা সাতাশ বছরের।

অথচ পূর্ণেন্দু ছাড়া আমার কোনো সাক্ষ্য নেই। আদালতের বিশ্বাসযোগ্য কোন কাগজপত্র আমি পেশ করতে পারব না। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি আর কোনো মানুষকে ভাড়া দিয়েও জোগাড় করতে পারব না। সেই ইতিহাস তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হবে এবং কোনক্রমেই সে অকিঞ্চিত-

কম ইতিহাস জানাটে মানুষের প্রশ্রয় পাবে না। অথচ পূর্ণেন্দুকে পেলে কি যে ভাল হত। কিছু একটা সহজ হয়ে যেত কাজটা। হয়তো আমাদের সমর্থন করতে হত না। ওকে দাঁড় করিয়ে, ওর পক্ষ সমর্থন করলেই—অমরেশবাবু আমার জবাব পেয়ে যেতেন।

দুই

কৃষ্ণচূড়া এবং দেবদারুপ্রধান লাল সুরকি মাটির এক মফস্বল শহরের শহরতলিতে একটা পুরনো নির্জন গির্জার ধারে ওদের ভাড়া বাড়ি ছিল। ওরা উদ্বাস্তু হয়ে কেন ঐ শহরেই এসেছিল আমি জানি না। ওর মা খুব রুগ্ন ছিলেন। আমি যতদিন দেখেছিলাম, ওর মাকে আমি রোগশয্যাতেই দেখেছিলাম। অসুস্থ ছিলেন বটে, মাসিমাকে আমি দুধের মতন সাদা বিছানায় তারও চেয়ে সাদা থান কাপড় পরে শুয়ে থাকতে দেখতাম। পূর্ণেন্দু মাথার কাছে বসে হাত-পাখায় হাওয়া দিত। আমি শহরের অন্য প্রান্ত থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ওর সান্নিধ্যের জন্য যেতাম। পূর্ণেন্দু মায়ের অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসত। আমরা কোনো দিন যেতাম রেল-লাইনের ধারের আল বেয়ে ইস্টিশান পর্যন্ত, কোনো দিন কংসাবতীর পাড়ে বিস্তীর্ণ আখের খেতের ছায়ায় বসতাম—যেদিন দূরে যেতে ইচ্ছা করত না সেদিন পাদ্রী পিতার অনুমতি নিয়ে গির্জার কোণে ঝাপালো বটগাছের মত শাখাপ্রশাখা ও পত্রসঙ্কুল বকুল গাছের নীচে গিয়ে বসতাম। আর দারিদ্র্য দুঃখ ও জীবন নিয়ে কি করবো—সে বিষয়ে আলোচনা করতাম।

পূর্ণেন্দুর দিদি ক্রিশ্চান মিশন স্কুলে পড়াতেন। দেখতে সুন্দর ছিলেন। কিন্তু মুখমণ্ডলে একটা বিষণ্ণতার ছায়া আমি বরাবরই দেখেছিলাম। যদিও পূর্ণেন্দুকে কোনো দিন জিজ্ঞেস করিনি তবু আমার মনে হয়েছিল সুলতাদিই সংসার চালাতেন।

পূর্ণেন্দুদের আমার কখনো গরীব মনে হত না। পূর্ণেন্দুর মত অসাধারণ মেধাবী ছাত্র যে বাড়ির ছেলে তাদের দারিদ্র্য আমার চোখে পড়ত না। মনে মনে ভাবতাম, পূর্ণেন্দু তো একাই একশ। ইচ্ছা করলে কত টাকা রোজগার করতে পারে। কিন্তু করবে না। সারা দিনরাত শুধু পড়বে। পড়ার বই গল্পের বই কবিতার বই। বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে তো বটেই, বাংলায় ইংরেজীতে পূর্ণেন্দুর তুলনা নেই। ক্লাসের ছেলেরা পর্যন্ত ওর কাছে পড়তে চায়। ও এত জানে। অঙ্কগুলো বোঝায় যেন জলের মত। ফিজিকসের অঙ্ক, কেমিস্ট্রির অঙ্ক ডিনামিক্স কি কোঅর্ডিনেট—সব যেন ওর কাছে জলভাত। বড় হয়ে না-জানি কত বড় চাকরি করবে পূর্ণেন্দু। ইংরেজীর অধ্যাপক মন্মথ সিকদার, অঙ্কের অধ্যাপক বারী সাহেব একবাক্যে বলেন, পূর্ণেন্দু অ্যান একসেপশান।

যখন ক্লাসসুদ্ধ সবাই পূর্ণেন্দুর বন্ধুত্ব পেতে উন্মুখ—তখন পূর্ণেন্দু আমাকে কেন বেছে নিয়েছিল ওর সঙ্গী হিসেবে আজ নিঃসংশয়ে বলতে পারবো না। ওকে দেবার মত আমার কিছুই ছিল না। ময়লা মলাটের একটা এক্সারসাইজ খাতায় কিছু কবিতা লিখেছিলাম। অনাদরে অনেক খাতা পাতার নীচে চাপা পড়েছিল। সাহস সঞ্চয় করেই পূর্ণেন্দুকে বলেছিলাম। পড়িয়েও ছিলাম। প্রতিক্রিয়া পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। বোঝার জন্য মাথাব্যথাও কিছু ছিল না। কারণ পাস করে মামা-

মামীর রোজকার জন্য তখন তাদের বিরক্তির মুহূর্তে তীব্র আক্রোশ থেকে আমরকনাই আমার একমাত্র উপেক্ষা ছিল। তাই পূর্ণেন্দুর সঙ্গে মিশে পাস করার মত অঙ্কটা শিখে নিতে চেষ্টা করছিলাম। ও বড় যত্নতায় আমাকে শেখাতো। ওর পক্ষে যে অঙ্ক ছিল জলভাত—আমাকে দু' তিন বার করে বোঝাতো। তাতেও যদি বুঝতে অসুবিধা হতো পূর্ণেন্দু আমার জন্য নূতন কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করে আমাকে বোঝাতো। বুঝতে পেরে আমি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠতাম। কিন্তু পূর্ণেন্দু আমাকে কখনো ছোটো করে দেখতো না। মনে মনে ভাবতাম শিশু বয়সে বাবা মা হারিয়েছি—কেরানী মামার সংসারে গঞ্জনা সয়ে লেখাপড়া শিখছি—এটা জেনেই হয়তো ও ওর মা ও দিদি আমার প্রতি এত দয়াপরবশ।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। একদিন দিঘির নির্জন ছায়ায় বসে কলেজ ম্যাগাজিন হাতে করে আমাকে বলল, আমার হয়তো আর পড়াশুনা হবে না। দিদি সিমলায় একটা কনভেন্টে চাকরি পেয়েছে। মার জন্য যেতে পারছে না। মা

হয়তো আর বেশী দিন বাঁচবেও না।

শুনে আমার খুব দুঃখ লেগেছিল। আমি ওকে কি সান্ত্বনা দেব, বুঝতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর ও হঠাৎ আমাকে সহাস্যে জড়িয়ে ধরে বলল, মন খারাপ করবার কিছু নেই। যা হবার তাই হবে। আমরা মন তৈরী করে ফেলেছি।

শুনে আমার কান্না এসে গিয়েছিল। পূর্ণেন্দু মুহূর্তে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পালটে, মুখের কোণে দুষ্টুমির হাসি এনে বলল, একটা অপূর্ব কবিতা শুনবে? বলে, কলেজ ম্যাগাজিন খুলে, একটা কবিতা, যেন নিজেরই লেখা কণ্ঠস্বরের এমন মমতায় পড়ে চললো।

শুনতে শুনতে আমি মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ চৈতন্য ফিরে পেয়ে আবিষ্কার করলাম, কবিতাটা আমারই লেখা। নাম 'বেনামী ঈশ্বর'। সম্ভবত আমার লেখা তৃতীয় কি চতুর্থ কবিতা। ঈশ্বর ও একটি নিষ্ঠুর মেয়েকে অভিন্ন করে দেখার কবিতা। কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপার জন্য অনেক দিন আগে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু একবারও কল্পনা করিনি আদৌ ছাপা হতে পারে। কাঁপা কাঁপা হাতে ম্যাগাজিনটা পূর্ণেন্দুর হাত থেকে নিয়ে দেখলাম, আমার কবিতাটি ম্যাগাজিনের প্রথম লেখা এবং প্রথম কবিতা। আনন্দে আত্মহারা হলেও, ষড়যন্ত্র ধরে ফেললাম। পূর্ণেন্দুই কলেজ ম্যাগাজিনের সহকারী ছাত্র সম্পাদক। প্রথম বাছাই তারই হাতে। পূর্ণেন্দু কবিতাটা বার দুই স্বরগ্রাম উঁচু নিচু করে পড়লো। তারপর গলায় অত্যন্ত মমতা ও আন্তরিকতার সুর ফুটিয়ে বলল, কবিতা তুমি লিখে যেও। হয়তো এটাই তোমার পথ।

এর পর অনেকবার ওকে নিভৃতে নির্জনে কবিতা শুনিয়েছি। সব বারই মগ্ন হয়ে শুনেছে এবং অনেক পরে বলেছে, কবিতা তুমি লিখে যেও। হয়তো এটাই তোমার পথ।

ইণ্টারমিডিয়েটের ফল বেরুল। আমি মাঝারি ফল নিয়ে পাশ করলাম। পূর্ণেন্দু গোটা জেলার প্রথম স্থান অধিকার করলো। চার বিষয়ে লেটার পেল। নিজের জন্য আমার যাই দুঃখ হোক, পূর্ণেন্দুর জন্য খুবই আনন্দ ও গর্ব হল। দেখা করতে গেলাম ওদের বাড়িতে। অভিনন্দন জানাতে এমন একটা প্রতিক্রিয়া দেখালো যেন অতি সাধারণ একটা ঘটনা ঘটেছে। তারপর এক সময় নানান কথার মধ্যে জানালো, বিষ্ণুপুর পলিটেকনিক থেকে চিঠি এসেছে। হয়তো কয়েক দিনের মধ্যে ভর্তি হয়ে যাবে। পক্ষকালের মধ্যে হয়তো সেখানে চলেও যেতে পারে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। পূর্ণেন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দশ জনের একজন। সে পলিটেকনিকে পড়তে যাবে, এটা মন কিছুতেই মানতে চাইছিলো না। বললাম, কেন হিজলিতে পড়বে না? অন্তত অনার্স নিয়ে পড়ো প্রেসিডেন্সি বা সেণ্টজেভিয়ার্সে।

হেসে জবাব দিল, দূর পাগল! অত টাকা কোথায়? একটু থেমে বলল, তা ছাড়া দেরী করবার সময় আমার একদম নেই। তুমি তো সবই জানো।

পূর্ণেন্দু যেদিন শতরঞ্চিতে বিছানা বেঁধে গোমো প্যাসেঞ্জারে বিষ্ণুপুর রওনা হল, আমি সেদিন স্টেশানে গিয়েছিলাম। সাত মিনিটের মত ট্রেন স্টেশানে দাঁড়িয়েছিল। আমি ট্রেনে উঠে ওকে একটা কাগজ হাতে দিলাম। বলাবাহুল্য সেটা বন্ধু-বিচ্ছেদের একটা গভীর বেদনার কবিতা। ও খুলে পড়লো। তারপর ডান হাতটা আমার কাঁধের উপর রেখে বলল, দূর পাগলা ছেলে। যে-কোনো দিন চলে আসবি বিষ্ণুপুরে। হোস্টেলে থাকার কোনো অসুবিধা হবে না। খুব মজা হবে। দূরে গেলে আরো যোগ বাড়ে। অনেক কবিতা নিয়ে আসবি।

ট্রেন ছাড়বে। আমি প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছি। গার্ডের হুইসল পড়ে গেছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পূর্ণেন্দু বলল, কবিতা লেখা ছেড়ো না। এই তোমার পথ।

আমি কেমন কবি ছিলাম, অথবা কেমন কবিতা লিখতাম তা বোঝানোর শেষ উপাদান অশেষ জঞ্জাল মনে করে আমার আমগ্রাহী মামী হয় পুরনো কাগজের সঙ্গে বিক্রী করে দিয়েছিলেন অথবা উনান সাজাতে ঘুঁটের অভাব পূরণ করেছিলেন। আমার গ্রন্থের প্রতিপালকও আমার এই বিলাসিতা কোনো দিন প্রশ্রয় দেননি। সামান্য যে কয়টি কবিতা বেঁচে গিয়েছিল, সাতাশ বছর আগে হয়তো অভিমানে, অনিচ্ছায়ও হতে পারে কিংবা অনাদরে হারিয়ে ফেলেছি। আজ আর আমার কাছে আমার কবিতা লেখার অবশিষ্ট চিহ্নটুকুও নেই। যে অনাদি অনন্ত মহাকালের নির্লিপ্ত বিচারে সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, গেটে মুকুন্দরাম ও অমিতাভ মহাপাত্রের কবিতার মূল্য একই ধরা আছে আমার কবিতাও সেইখানে চলে গেছে। এ ছাড়া আমার কবিতা লেখার জীবনের স্মৃতি বা সান্ত্বনা বলে আর কিছুই নেই।

অথচ পূর্ণেন্দুর সেকেণ্ডইয়ারের শেষ দিকে বিষ্ণুপুরে ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। স্টেশনে নিতে এসে আবেগ উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরে প্রথম কথা জিজ্ঞেস করলো, কিরে কবিতা এনেছিস তো? এনেছি

জানতে আরো উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইলো, অনেকগুলো এনেছিস তো? আমি জানালাম, বেশ কতকগুলো এনেছি।

হস্টেলে এসে পূর্ণেন্দু ওর সহপাঠীদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিল। আমার পরিচয় ছিল আমি নাকি কবি। কবিতা কয়েকটা লিখেছি বটে কিন্তু আমার বন্যতম কল্পনায়ও নিজেকে কবি বলে মনে হয়নি। পূর্ণেন্দু যখন সবার কাছে সগর্বে আমার সেই পরিচয়টা দিল তখন বুঝতে পারলাম পূর্ণেন্দু শুধু একজন অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র নয়, পূর্ণেন্দু মহৎও বটে। ওর ঘরের কয়েক জন উৎসাহী সহপাঠীকে নিয়ে, অনেক রাতে, একই কবিতা (একটি প্রেমের কবিতা) বার বার করে শুনলো।

পরের দিন বিকেলের দিকে শহরে বেড়াতে বেরুলাম। শহরের প্রান্তে অনেকগুলো পুরনো মন্দির পরিত্যক্ত আক্‌ঙ্কার মত পড়ে আছে। মন্দিরগাত্রের কারুকাজ, পৈঠাগুলোর প্রশস্ততা এবং সুপ্রসারিত প্রাঙ্গণের সবুজ ঘাসের নিবিড়তা আমাদের বিহ্বল করে দিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে বিকেলের দিকে 'জলাধার' পেরিয়ে দলমাদলের কাছে এসে পৌঁছলাম। দলমাদলের কালো মসৃণ গায়ে হেলান দিয়ে সামনের সবুজ লতাগুল্মের কুঞ্জকে সাক্ষী রেখে অনেক কবিতা পড়লাম। অনেক শোনার অনেকটা পরে পূর্ণেন্দু আমাকে বলল, কবিতা লেখাটা তুই ছাড়িস না। এটাই তোর পথ। শুনে আবেগে উত্তেজনায় এক রহস্যময় অনুভূতিতে একদিকে বুক যেমন ভরে গিয়েছিল—দুঃখও হয়েছিল খুব।

পূর্ণেন্দু বিষ্ণুপুর যাওয়ার পর ওদের বাড়িতে আর যেতে পারিনি। ও জানালো, ওর মায়ের মৃত্যু আসন্ন প্রায়। হয়তো পক্ষকালের মধ্যেও ঘটতে পারে। কি অবস্থায় কি হতে পারে তা নিয়ে নানান আলোচনা হল। কথার শেষে অস্ফুটস্বরে পূর্ণেন্দু আমাকে জানালো, মা যদি মরেই যায়—আমি আর পড়বো না। দিদিকে আর কষ্ট দেব না। একটা চাকরি নিয়ে নেব।

গত দু' দিন ধরে কবিতা পাঠ ও যৌবনের নানা উত্তেজক আলোচনায় পূর্ণেন্দু আমার বৈষয়িক খবর নিতে ভুলে গিয়েছিল। যখন ওকে জানালাম, আমি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি—মামা আর পড়াতে অক্ষমতা জানিয়েছেন টিউশানি পাই না অথচ কবিতা লিখি—মামী এই বিলাসিতায় সায় দিতে রাজি নন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন—মাস দুই হল দুটো টিউশানি পেয়েছি—কালেকট্রীতে কিছু কিছু কিস্তির কাজ করি— তখন পূর্ণেন্দু দুঃখে নীল হয়ে গিয়েছিল। এই আমি প্রথম ওর চোখের কোণ ছলছল করতে দেখলাম। ও বলেছিল, জানিস সুধীন আমরা যা হতে চাই আমরা কোনোদিন তা হতে পারব না।

তিন

এই ঘটনার অতি স্বল্পকালের মধ্যে মামা সাঁত্রাগাছিতে বদলী হয়ে এলেন। মামাতো ভাই বোনের পড়াশুনার কথা চিন্তা করে কুমারটুলীতে নতুন বাসা হল। অভাব অভিযোগ যায় না। নতুন জায়গায় টিউশানি পাওয়া মুশকিল। চাকরি-বাকরি তো অনেক দূরের কথা। লজ্জায় ও আত্মধিক্কারে মাথা নিচু করে চলি।

একদিন কতকটা কারণে কতকটা অকারণে মন খুব খারাপ ছিল। একটা চাকরির উমেদারিতে মামা তাঁর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠালেন বৈদ্যবাটিতে। যাওয়ার একদম ইচ্ছা ছিল না। চাকরির উমেদারির লোভে আত্মীয়স্বজন, মামার বন্ধুবান্ধবের কাছে যাওয়ার এটা ছিল বত্রিশ সংখ্যক চেষ্টা। হাওড়া স্টেশানের চত্বরে মন্থর গতিতে হাঁটছিলাম। হঠাৎ যে যাত্রীটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল, সে পূর্ণেন্দুর রুমমেট রাখাল সাহা। আমরা দুজনেই দুজনকে চিনতে পারলাম। রাখাল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বিষ্ণুপুর থেকে ফিরছে। সঙ্গে কুলীর মাথায় বাক্স পেটরা। পূর্ণেন্দুর কুশল জিজ্ঞেস করতে রাখাল একটু অবাক হল। উল্টো জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি কিছুই জান না। আমি বললাম, না। অনেক দিন আগে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, উত্তর পাইনি।

রাখাল জানালো পূর্ণেন্দুর মা মারা গেছেন। পূর্ণেন্দুর দিদি সিমলায় একটা কনভেন্ট স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। মায়ের মৃত্যুর পরই পূর্ণেন্দু পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। অধ্যাপকরা অনেক বুঝিয়েছেন। কোর্স শেষ হতে আর আট ন' মাস বাকি ছিল। ওর ফার্স্ট হওয়া কেউ আটকাতে পারতো না। তাই অধ্যাপকদেরও একটা স্বার্থ ছিল। কিন্তু কোনো কথা শুনলো না। বলল, আমার আর কিছুরই দরকার নেই।

পূর্ণেন্দু নাকি আউত ত্রিহুতে রেলওয়ের একটা বড় কনস্ট্রাকশানের কাজে এক ঠিকাদারের অধীনে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। খুব আফশোষ করলো রাখাল। এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে। সব দিক থেকে ব্রিলিয়াণ্ট—কীভাবে শেষ হয়ে গেল! পরিতাপ জানিয়ে রাখাল ট্যাক্সি ধরার জন্য দ্রুত স্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়ালো।

হাওড়া স্টেশানে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে আমার কি মনে হয়েছিল, কতটা দুঃখ হয়েছিল, কতখানি অসহায়তা আমাকে বিষাদের দ্রাক্ষারসে ডুবিয়ে দিয়েছিল—আজ আর মনে নেই। মা সন্তান হারানোর দুঃখ ভোলে। সময়ের আবর্তে আমি পূর্ণেন্দুর কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। চলতি পথে কখনো হঠাৎ, নিতান্তই হঠাৎ কোনো গন্ধ, কোনো দূরাগত কণ্ঠস্বর, কোনো নিবিড় বৃক্ষ ছায়ার ইঙ্গিতে পূর্ণেন্দুর কথা আমার মনে হলেও মোটের উপর কলকাতার ধান্ধাবাজির জীবনে আমি ওকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। সে আজ প্রায় পঁচিশ বছর হল।

চার

ঠিক এই মুহূর্তে—এই রাজভবনের বৃক্ষছায়া দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, আমি ঈশ্বর সান্নিধ্যের মত যদি কারু সান্নিধ্য কামনা করি—সে আমার শেষ কৈশোর ও প্রথম যৌবনের একমাত্র বন্ধু পূর্ণেন্দু-মোহন মিত্রের। আজ এমন একটা বয়সে এসে পড়েছি যে সবাই আমার উপর নির্ভর করতে চায়। কাজের জন্য অফিসার অমরেশবাবু, অর্থও সামান্য হলেও যশ ও প্রতিপত্তির জন্য আমার স্ত্রী শিশিরকণা, ভালবাসা বল বিশ্বাস ও দৃঢ়তার জন্য আমার দুটি মেয়ে আশালতা ও নয়নমণি। অথচ আমি কোথায় দাঁড়াই। ছোটবেলায় বাবা মা হারিয়েছি—কৈশোরে মামার সংসারে হারিয়েছি স্নেহ মমতা ভালবাসা। তবুও মামা মামীই ছিল শেষ সম্বল। বাইরের আপাত কঠোরতার মধ্যে এই দুই নর-নারীর অনুভূতির চিকনতমতলে আমার জন্য কিছু যে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা গোপনে রাখা ছিল—আজ তা সহজেই অনুভব করি। তাঁরাও চলে গেলেন।

এখন আমি নিঃসঙ্গ একক এক মতলবী মাতাল। পূর্ণেন্দুর স্মৃতির বিষ আমি রাজভবনের কাছে এসেই আমার হৃদয়-বিষাদের জলে ভিজিয়ে দিয়েছি। যে কাজের জন্য রাজভবনে যাবো ভেবেছিলাম, তাতে আর মন নেই। এইবার ইডেন উদ্যানকে ডাইনে রেখে গঙ্গার ধার দিয়ে আউটরাম জেটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে পূর্ণেন্দুর স্মৃতির তারক রস ঢুক ঢুক করে আকণ্ঠ পান করতে থাকবো। নেশার ঘোরে স্বপ্নে বা কল্পনায় যদি অমরেশবাবু আমার সামনে আসার সাহস রাখেন তাহলে আমি গর্জন করে উঠবো—জিজ্ঞেস করুন এই ভদ্রলোককে। এর নাম পূর্ণেন্দুমোহন মিত্র। স্যাব্রিকে ফার্স্টগ্রেড স্কলার। ইণ্টারমিডিয়েটে স্কলার। তার চেয়েও বড় প্রফেসার সিকদার, প্রফেসার প্রতিহার ও প্রফেসার বাগ্চী সাহেবের ভাষায়—পূর্ণেন্দু অ্যান্ একসেপ্শান। জিজ্ঞেস করুন তাকে, আমি কি হতে চেয়েছিলাম। আমি কি হতে পারতাম।

মাই লর্ড। মাফ করবেন। আমি এখন একটু পান করবো। পূর্ণেন্দু স্মৃতির তারক রস। পান করে ঐ গঙ্গার ধারে ঠান্ডা হাওয়ায় গুলমোর গুল্মের ছায়ায় সবুজ ঘাসের গালিচার মধ্যে শুয়ে থাকবো। ঘরছাড়া ঠিকানাহারা এক-গামছার দেহাতীর মত যদি অসার নিদ্রায় মগ্ন হয়েও পড়ি, বিশ্বাস করুন, সন্ধ্যার দিকে আবার আমি চাঙ্গা হয়ে উঠবো। বাড়ি যাবো। মেয়েদের হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসার নির্দেশ দেব। অফিস ফেরৎ সন্ধ্যাকালীন খাবার হিসেবে স্ত্রীর হাতের রুটি ও তরকারি যথেষ্ট স্বাদ পেতে পেতে খাব। এবং আগামীকাল অফিসে গিয়ে টেবিলের যমন্ত-না-হোক, অনেক ফাইল অবশ্যই ক্লিয়ার করে দেব।

শুধু
পাঁচ মিনিট
এই বিজ্ঞাপনটি
পড়ে দেখুনঃ

এবার পাখা কেনার সময়

২৫০ টাকারও বেশী বাঁচাতে পারবেন

র‍্যালিফ্যানের তিনভাবে পয়সা বাঁচাবার পরিকল্পনার মত লাভের সুযোগ অন্য ব্র্যাণ্ডে পাবেন না।

এখন

১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর পর্যন্ত দামে বড় রকম বাদ

নীচের নানা রকমের পাখার সম্ভার থেকে আপনার পছন্দমত পাখা বেছে নিন আর র‍্যালিফ্যান তিনভাবে পয়সা বাঁচাবার পরিকল্পনার সুযোগের দ্বারা লাভবান হোন। দামের কাটান* লক্ষ্য করুন।

*(সর্বাধিক অনুমোদিত বিক্রয় মূল্য, অন্তঃশুল্ক সমেত। স্থানীয় কর আলাদা।)

৪০০ মি. মি. ডিলাক্স ৩৭৫ টাঃ

৪০০ মি. মি. ডিলাইট ৩১০ টাঃ

৯০০ মি. মি. ট্রাইস্টার ৩১০ টাঃ

১০৫০ মি. মি. ট্রাইস্টার ৩২৫ টাঃ

১২০০ মি. মি. ট্রাইস্টার ৩৪৯ টা

১৪০০ মি. মি. ট্রাইস্টার ৩৮০ টা

সাহিত্য প্রসঙ্গ

পুজো সংখ্যা

মানুষ তার স্মৃতিকে বড় ভালবাসে। অবশ্য সুখস্মৃতি, কিংবা যদি কোনো বেদনার স্মৃতি তাকে আলোড়িত করে থাকে—সেই বেদনার স্মৃতিও। এটা কোনো তর্কের কথা নয়, সাধারণ কথা। মানুষের স্বভাবের এই এক দুর্বলতা।

আজকাল যখনই পুজো এসে পড়ে, নানা ধরনের কৈশোর ও যৌবন-স্মৃতির সঙ্গে আমার মনে পড়ে সে আমলের শারদ-সাহিত্যের কথা। স্বীকার করব, শারদ-সাহিত্য কথাটা একদিক থেকে অর্থহীন, ওটা আমরা মুখে বলি, চলতি কথা মাত্র, আসলে পুজোর মুখে মুখে যত কাগজপত্র লেখা বেরোয় তার কথাই বোঝাতে চাই।

আমাদের একেবারে ছেলেবেলায় দু' একটি পুজো-বার্ষিকী ছাড়া আর কিছু দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। ছোটদের এই বার্ষিকীগুলি আমাদের যে কী লোভনীয় সম্পদ ছিল তা আজ আর কাউকে বোঝানো যাবে না। কেমন করে বোঝাব, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কঙ্কাল সারথি' পড়ে দিনের পর দিন কী রোমাঞ্চ অনুভব করেছি।

তখন বড়দের জন্যে মাসিকপত্র ছিল আধিক্য। কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্রভাবে শারদীয় বা পুজো সংখ্যা বলে কিছু প্রকাশিত হত কিনা তা মনে পড়ছে না। তবে যতদূর মনে পড়ছে, পুজোর মাসে পত্রিকাগুলির কলেবর বোধ হয় সামান্য স্ফীত হত। দু' একটি পত্রিকা হয়ত আরও স্ফীতকায় হয়ে বেরুতো, যেমন গল্পলহরী।

ঠিক কবে থেকে যে আমাদের এখানে শারদীয় সংখ্যার প্রচলন হয়ে পড়ল তা জানি না। বোধ হয় তিরিশের দশক থেকেই। কেউ যদি এ-বিষয়ে সঠিক কিছু জানাতে পারেন ভাল হয়। আমরা শুনেছি আনন্দ-বাজার পত্রিকাই প্রথম পাকাপাকিভাবে পুজো সংখ্যার প্রচলন করেন।

আমরা যখন সদ্য যুবক—স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়েছি তখন থেকে পুজো সংখ্যার চলন দেখতে পেয়েছি। বেশ মনে পড়ে, তখনকার দিনের দু'একটি সিনেমা সাপ্তাহিক ছাড়াও কোনো কোনো সাহিত্য পত্রিকার পুজো সংখ্যা প্রকাশের রেওয়াজ শুরু হয়ে গেছে। তিরিশের শেষাশেষি থেকে শারদীয় সংখ্যা স্থায়ী হয়ে গেল।

তখনকার সঙ্গে এখনকার অনেক তফাত। তখন বাঙালী পাঠক সংখ্যা খুব একটা বেশী ছিল না, দুই বাংলা যুক্ত থাকা সত্ত্বেও। স্বভাবতই পুজো সংখ্যার প্রচার আজকের তুলনায় নিশ্চয় অনেক কম ছিল। পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালকরা অনেকটা যেন কোনো নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করছেন এই ধরনের এক বোধ নিয়ে পুজো সংখ্যা প্রকাশ করতেন। বাঙালী বহু সাহিত্যিকের আমন্ত্রণ থাকত সেখানে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে দিয়েও তাঁর শেষ বয়েসে গল্প লেখানো হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার সে এক গৌরব।

আমরা যারা তখন যুবক, সাহিত্য পড়তে ভালবাসি, তাদের কাছে পুজোর উৎসব বলতে ' শারদীয় সংখ্যার প্রলোভন কম ছিল না। এক-একটি লেখা—যেন কতই আদরের ধন—এমন করে পড়তাম, কত অসংখ্যবার ছবি দেখতাম, নাকের কাছে পত্রিকা নিয়ে তার গন্ধ শুঁকতাম।

এতকাল পরে, মাঝে মাঝে মনে হয়, ওটা কী আমাদের ছেলেমানুষী ছিল? নিতান্তই ভাবাবেগ? তা কিন্তু নয়। মনে রাখতে হবে, আজ বাংলা বইয়ের পাঠক বলতে যদিও শুধু [illegible] মানুষ, এবং বাইরের কিছু [illegible] মাত্র—তবু আজকের পাঠকসংখ্যা সেদিনের তুলনায় অনেক বেশী। তখন পাঠক ছিল কম, বই প্রকাশের সংখ্যাও ছিল তুলনায় অনেক কম, কিছু লাইব্রেরী ছাড়া বই পড়ার সুযোগও তেমন ছিল না। কাজেই একটি পুজো সংখ্যা ব্যক্তিগত সংগ্রহ হিসেবে কেনা ও পড়ার লোভ ছিল। তা ছাড়া, আমার যতটুকু মনে আছে, বাংলা সাহিত্যের তখনকার সকল প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনাই এই পুজো সংখ্যায় পাওয়া যেত। অনেক স্মরণীয় রচনা আমরা এই ভাবেই পড়েছি, উপন্যাস এবং গল্প দুই-ই। কবিতাও।

আজ বাংলা সাহিত্যের পাঠক কম নয়। শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন ও তার প্রচার নিশ্চয় আমাদের বিস্মিত করবে। আর্থিক অনটনের মধ্যেও এতগুলি পত্রিকা বাঙালী পাঠকের সাহিত্যপ্রীতির জন্যে মোটামুটি ভালই বিক্রী হয়। তবু কখনও কখনও মনে হয়, সেকালের সেই চাঞ্চল্য একালে যেন অনেক কমে গেছে। হতে পারে, আমার এ-ধারণা ভুল। তা ছাড়া কালের পরিবর্তন তো থাকবেই। তাকে কেমন করে বন্ধ রাখা সম্ভব!

আজকালকার পুজো সংখ্যা নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলেন। তামাশাও করেন। এঁদের সমস্ত বক্তব্যই যে অকারণ তা নিশ্চয় নয়। কিন্তু যা বলেন তা যে সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য তাও নয়।

অস্বীকার করা যাবে না, হালের পুজো সংখ্যা—বিশেষ করে বিখ্যাত পত্রিকা থেকে কয়েকটি জিনিস বাদ যেতে বসেছে। যেমন প্রবন্ধ। ছোট গল্পের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে ক্রমশ। কবিতার পৃষ্ঠা সংখ্যাও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। বলা বাহুল্য, উপন্যাসই এখন পুজো সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ।

কোনো সন্দেহ নেই, প্রবন্ধ, ছোট গল্প ও কবিতার যদি কিছু প্রাধান্য থাকত শারদীয় সংখ্যায় তা হলে এক শ্রেণীর পাঠক নিশ্চয় আরও খুশী হতেন।

এই ত্রুটি বাদ দিলে, আমার ধারণা, একটি বছরের পুজো সংখ্যা মোটামুটিভাবে বাংলা সাহিত্যের এক পরিচয় তুলে ধরে। সেটা ভাল কি মন্দ তা আমার আলোচনার বিষয় নয়। তবে, এখন পর্যন্ত এই পুজো সংখ্যার কোনো কোনো রচনা যে পাঠক মহলকে আলোড়িত করে তাও আমরা দেখেছি।

অভিনন্দ

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

যিশুকে ফিরে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালুম। কাছে এসে আমার পিঠে হাত রাখল যিশু। বলল,

—"তোমাকে এক্ষুনি একটা উপহার দেব। কথা দাও, সেটি কাল সকালের আগে তুমি খুলে দেখবে না!"

বললুম,

—"কি উপহার?"

—"সেটাই তো কাল সকালের আগে তুমি জানবে না। কথা দাও।"

—"কিন্তু কি জন্যে উপহার হঠাৎ?"

—"সন্ধ্যেবেলা তোমার রঁদেভুর জন্যে শুভকামনাসমেত—।"

মাথা নেড়ে হাসলুম,

—"ঠিক আছে। কথা দিলুম কাল সকালে দেখব। দাও।"

ব্রাউন কাগজে মোড়া ছোট্ট একটি প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিল যিশু। কুড়ি সিগারেটের প্যাকেটের মতো দেখতে।

আঙুলের চাপ দিয়ে জিগ্যেস করলুম,

—"সিগারেট?"

হাঁ-হাঁ করে উঠল যিশু,

—"এই, এই! করো কি? চাপ দিও না। রাত ফুরোলে খুলে দেখো।

ঈভলীন বিল মিটিয়ে ফিরে এল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললুম,

—"তুমি যতোটা আমাকে কচি খোকাবাবু ভাবো, ততটা আমি নই। দেশে অন্তত একশো মেয়ের সঙ্গে বিছানায় বেড়িয়ে এসেছি, ম্যাদাম!"

ঈভলীন হেসে উঠল। কানে কানে বলল,

—"তোমার সেসব দৌড় বোঝবার মতো বোধবুদ্ধি আমার হয়েছে, মঁসিয়। তবে, ভুলে যেও না, ভারতবর্ষ আর প্যারিসে এখনো দূরত্ব অনেক। এখানে তুমি আজও কচি খোকা।—"

তারপর, আমার গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে গলা তুলে বলল,

—"গুডলাক। ঘুরে এসো।"

যিশুও বললে, কপট অসন্তোষ দেখিয়ে,

—"যদিও এমন ভাবে কানে কানে কথা বলা অসভ্যতা, তবুও, ব' কুরাজ, মনামি। আভোয়া!"

গালে হাত বুলিয়ে বললে,

—"তবে, দাড়িটা অন্তত কামিয়ে যেও, দোস্ত!"

ড্রয়িং বোর্ড, থলেটি যিশুর জিম্মায় রেখে ওদের বিদায় জানালুম। হেঁটে হেঁটে চলে এলুম 'গার-দু-নর'। নাকের কাছে হাত তুলে জ্যাকেটের গন্ধ শুঁকলুম। দুর্গন্ধ-ঠিক নয়, বোটকা সাঁৎসেঁতে বা তেলচিটে গন্ধ। আসল রংটাই ময়লা জ্যাকেটের। সুতরাং কতদূরে ময়লা হল, চট করে বোঝবার উপায় নেই। শৌখিন সেলুনে ঢুকে তিন দিনের বাসি দাড়ি কামিয়ে নিলুম। খসে গেল পাঁচ ফ্রাঁ, প্রায় আটটা টাকা। এক ফ্রাঁ বখশিশও দিয়ে দিলুম নাপিত ভায়াকে। ওকে 'নাপিত' বলবে কোন শালা।

মেত্রোয় চেপে সোজা অ'দিয়'। বিকেল সাড়ে ছটা। রোদ নেই। অথচ আজ যে রোদ ছিল প্রায় সারাদিন, রাস্তার লোক দেখলেই তা বোঝা যায়। চারিদিকে রঙিন পোশাকের ছড়াছড়ি। শীত-বৃষ্টির ধূসর ভাব নেই বললেও চলে। সব রেস্তোরাঁর সামনে, ফুটপাথে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে গেছে মানুষ-মানুষী। হাসি-ঠাট্টা, হুল্লোড়ের শব্দে সারা প্যারিস খুশির গয়না পরে নিয়েছে। স্যেন নদীর গায়ে গায়ে হাঁটতে লাগলুম।

লা তুর দাজ"। সাতটা বাজতে দশ। জীনেত্ত এখনো নিশ্চয়ই এসে পৌঁছোয়নি। কাচের দেওয়াল পেরিয়ে হোটেলের ভেতরকার চেহারা, সাজগোজ দেখেই দুশ্চিন্তা হল। আমার এই বীভৎস পোশাকে ঢুকতে দেবে তো!

একটু সরে এসে রাস্তার দিকে চেয়ে সিগারেট ধরালুম। দু' চার টান দিতে না দিতেই বিশাল একটি কালো গাড়ি এসে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়াল। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে। শেভ্রলেই বোধহয়। হেড-লাইট থেকে পেছনের নম্বর-প্লেট পর্যন্ত লম্বায় প্রায় একটি সরকারী বাস। দামী হোটেলের ঝকঝকে গেটবয় দৌড়ে এসে পেছনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। সম্মান দেখাতে সামান্য ঝুঁকে। কালো গাড়ি থেকে ফেনার মত সাদা এক সম্রাজ্ঞী রাস্তায় আলতো পা রেখে বেরিয়ে এলেন।

সন্ধ্যে উতরে গেছে বলা যাবে না। অথচ দিনের সেই উজ্জ্বলতা নেই আর। আকাশের নীলও প্রায় অন্ধকারের মত গাঢ়। দেওয়াল ঘেঁষে একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছিলুম, যাতে গেটবয়টির নজরে না পড়ি। কারণ, ও যদি দেখে একটা ভিখিরি নোংরা পোশাকের লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল এবং সেই লোকটাই হোটেলে ঢুকে গেল, তাহলে, নাক সিঁটকে অবাক হতে পারে। ওকে অবাক

করবার ইচ্ছে আমার নেই। তা ছাড়া, দামী এক মহিলার সঙ্গে নামী-দামী, যাকে বলে গিয়ে, 'পশ' একটি হোটেলে ঢোকবার জন্যে ও'ত পেতে গেটের সামনে অপেক্ষা করছি —এতে সম্মান খুব বাড়বে না। আসলে, ওই সাহেব নাপিতকে দিয়ে দাড়ি কামিয়ে তাকে বখশিশ দেবার পর এই মানসিকতাটি তৈরী হয়েছে। গেটবয় হলেও আমার চেয়ে পোশাক-আশাকে একশোগুণে দুরন্ত বলেই মানুষটি আমাকে এক পলক হলেও ঘেন্নার চোখে দেখবে, এটা হজম করতে পারছিলুম না অবচেতনায়। অথচ ওর নাম জানি না, চিনি না, ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, ছিল না, থাকবার কারণও বিশেষ দেখি না। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে করতে ভাবলুম, কমপ্লেক্স? হবেও বা!

এই রকম মাটিতে লুটিয়ে-পড়া ছড়ানো সাদা পোশাকে জীনেতকে চিনতে ভুল হতেই পারে! তবু, যেহেতু মুখটি আমার আঁকা, তাই এখন স্বপ্নের সম্রাজ্ঞীর মতো দেখালেও ওকে চিনে ফেলতে বিশেষ অসুবিধে হল না।

জ্বলন্ত সিগারেট জুতোর চাপে নিবিয়ে দিলুম। ভেবে দেখলুম, হ্যাঁ হ্যাঁ করে এক্ষুনি এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা। ওজন কমে যেতে পারে! গাড়ি দেখেই বোঝা যায়, মহিলার অগাধ পয়সা-কড়ি। আমি ওর তুলনায় ফোতো কাপ্তেন! ওকে ভেতরে ঢুকতে দিয়ে, রয়ে সয়ে এমন কি একটু দেরি করে দেখা দিলেও ক্ষতি নেই। গমক বজায় রাখতে হবে তো! আর একটা গোলওয়াজ ধরিয়ে ফেললুম। মোটামুটি আট থেকে দশ মিনিট মতো লাগে একটা সিগারেট পুড়তে। এটা শেষ হলে, ধীরে-সুস্থে জীনেতের কাছে যাবো।...

—"জল! একটু জল দেবে?"

চমকে উঠলুম বাংলা শুনে!

কোথায় জীনেত? কোথায় কি? ঝিমুনি আসছিল। কি ভাবতে ভাবতে কোত্থেকে কোথায় পৌঁছে গিয়েছিলুম। গোবিন্দর মাথাটি কোলে নিয়ে, ওর ঘরে বসে আছি। শেষ রাতে মেজেয় ঘরে।

জল চাইছে গোবিন্দ।

—"দিচ্ছি।"

বলে, দু' হাতে ধরে ওকে আমার কোল থেকে উঠে বসতে সাহায্য করলুম,

—"একটু উঠে বোসো। আমি নিয়ে আসছি।"

খাটের পায়ায় হেলান দিয়ে বসল গোবিন্দ। অনেক যন্ত্রণার পর ম্লান হাসল আমার দিকে চেয়ে। চিবিয়ে চিবিয়ে জড়ানো গলায় বলল,

—"তুমি না থাকলে, আরো অনেক বেশি কষ্ট হতো, ভাই!"

গোবিন্দর ভার আমার কোলে নেই

আর। তবু, আমি উঠে দাঁড়াতে পারছি না। ডান পায়ে ঝিঁঝি ধরে পুরোপুরি অবশ। একটু টান করবার চেষ্টা করছি আর সারা পায়ে ঝনঝন বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। দু' হাত, হাতের আঙুল, মাথা, এমন কি, ডান পায়ের অবধারিত সঙ্গী বাঁ পায়ের কিছুই হয়নি। প্রায় আধ ঘণ্টাটাক গোবিন্দর মাথার ভার সয়ে ইনি একেবারে শরীর থেকে যেন আলাদা হয়ে গেছেন। কড়ে আঙুলের আলতো টোকা সইতেও রাজী নন। শব্দ-হীন ঝংকার তুলে আপত্তি জানাচ্ছেন! হাসি পেয়ে গেল।

গোবিন্দ বললে,

—"কি হল?"

হেসেই বললুম,

—"কিছু না। এই, ঝিঁঝি ধরেছে একটু। এক সেকেণ্ডে ঠিক হয়ে যাবে। উঠে, জল দিচ্ছি তোমায়।"

গোবিন্দ নিজেই উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গী করল। বলল,

—"ঠিক আছে। তুমি বোসো। আমি নিজেই নিয়ে নিচ্ছি।"

হাত ধরে বারণ করলুম।

জোর-জবরদস্তি বুড়ো আঙুল নাড়তে লাগলুম খুব ধীরে ধীরে। চিমটি কেটে, মৃদু চাপড় দিয়ে পা টানটান করে ফেললুম। এই রকম সাময়িক আশ্চর্য অস্বস্তির জন্যে হাসি পাচ্ছে। যন্ত্রণা নয়, ব্যথা নয়। একেবারে অন্য রকম অসুখ। গোবিন্দর মতন পাশবিক ব্যথা-যন্ত্রণার পর আমার এই ঝিঁঝি-ধরা খুব সাধারণভাবেই হাস্যকর অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। চোখে মুখে হাসির সঙ্গে বিরক্তি কুঁকড়ে ওর দিকে তাকালুম। বেচারা! বন্ধুর পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, হাসি পাবারই কথা। গোবিন্দও হাসছে। কিন্তু ক্লান্ত ম্লান মুখে সামান্য হাসির রেখাটি কেমন করুণ দেখাচ্ছে।

'দূত্তোর' বলে উঠে দাঁড়িয়ে মনের জোরে পা ঝাড়া দিতেই আস্তে আস্তে টের পেলুম, হ্যাঁ, আছে! এই তো আমার সবেধন নীলমণি ডান পা! আছে!

কার্পেটের কোণে গোবিন্দর গেলাশ কাত হয়ে পড়েছিল। তুলে, বেসিন থেকে জল ভরে এনে ওকে দিলুম। কত্‌কত্‌ শব্দে সব জলটুকু খেয়ে ফেলল গোবিন্দ। খেয়ে, চোখ বুজে দীর্ঘ সময় ধরে তৃপ্তির শ্বাস ফেলল,

—"আহ্‌!"

তারপর, গেলাশ সমেত হাত বাড়িয়ে যা বলল, তাতে আমি চমকে উঠলুম, না ভয় পেলুম, না রেগে গেলুম—নিজেই বুঝতে না পেরে কয়েক সেকেন্ড ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকলুম হাঁ করে।

ও তখন আবার বললে,

—"কি দেখছো কি হাঁ-করে? দাও, খানিকটা মাল দাও ঢেলে!"

বললুম,

—"তোমার ওই প্রচন্ড ব্যথার পর আবার মদ খাবে এখন?"

হেসে হাত ঝাঁকাল গোবিন্দ,

—"দূদ্দুর! কিস্‌সু হবে না ওতে! দাও!"

একবার ভাবলুম, বলে দিই, 'না, দেব না'। পরের মুহূর্তেই মনে হল, মাসীমা, ঠাকুমা বা গুরুজন সাজবার আমার দরকারটা কি? তোমার ব্যথা, শালা, তুমি বুঝবে, আমার বয়েই গেল! শুধু, ওই অসহ্য যন্ত্রণার মুখ আমি দেখতে চাই না আবার।

বোতলে তিন-চার পেগ আছে। এগিয়ে দিলুম টেবিল থেকে।

এক হাতে গেলাশ অন্য হাতে বোতল নিয়ে খাটে উঠে বসল গোবিন্দ। জুত্‌ করে দেওয়ালে হেলান দিয়ে, পা ছড়িয়ে। কে বলবে, এই লোকটাই আধ ঘণ্টা আগে কি ভয়ঙ্কর শব্দে গলাকাটা জন্তুর মতো কাত্‌রাচ্ছিল।

ওকে আরামে বসে পড়তে দেখে অন্য ভাবে খোঁচা দিতে ইচ্ছে হল। মিশেলের ঠোঁটের কোণে রক্তাক্ত কেটে যাওয়ার দাগটিই বোধহয় আমার অজান্তে আমাকে খুঁচিয়ে দিল এখন।

বললুম,

—"মনে হয় না, অমন যন্ত্রণা-ব্যথা শুধু শারীরিক অত্যাচারের ফল। একটা সরল পরদেশি মেয়েকে কব্জায় পেয়ে, তার ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে যখন-তখন অসম্মান, মারধোরের ফলও সেই সঙ্গে জড়িয়ে। তোমার মন-টন নেই বলেই হয়তো দৈহিক কষ্ট হয়ে সেইসব পাশবিকতা ফিরে আসে তোমার শরীরে। সুতরাং, তোমার মত্তা বা ব্যথাটাথার সঙ্গে মদের তেমন সম্পর্ক নেই বোধহয়। খাও। ঢেলে-ঢুলে, জমিয়ে খাও, ইচ্ছে মতন। আমাকেও দাও দেখি খানিকটা!"

বলে, টেবিলে রাখা আমার গেলাশের তলানিটুকু এক চুমুকে শেষ করে দিলুম। ওর পাশে বসে বাড়িয়ে ধরলুম খালি গেলাশটি।

মদটুকু ভাগাভাগি করে ও বলল, নিজের সঙ্গেই কথা বলছে যেন,

—"সেই জাপানী 'বোমা'র দিন, দোতলার বাথরুমে তোমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, আমি জানি।"

বলে, হাসল।

বড় এক ঢোঁক গিলে ফেলে, হাতের মধ্যে ঘোরাতে লাগল গেলাশটা। বলল,

—"তোমাকে আজ কিছু কথা, মানে, আমার হৃদয়ের গোপন কথাই বলে ফেলব, ভাবছি। মেজোর কাউকে, দেশে আমার বাবাকেও আর এসব কথা বলার মানে হয় না। মেজোর কেউ বুঝবেই না, বা গুরুত্ব দেবে না। তুমি সেন্‌সিটিভ্‌, তুমি বোঝার চেষ্টা করবে। মিশেল জানে না। ওকেও বলিনি, তাই ও পারে নি। তুমি হয়তো ভেবেচিন্তে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে। বাবাকে বললে, বুড়ো বয়সে, শুধু অকারণে কষ্ট ভুগবেন।—"

সামনের দেওয়ালে শূন্য চোখ মেলে চেয়ে থাকল।

বেসিন থেকে জল মিশিয়ে আনলুম গেলাশে। ওকে বললুম,

—"জল চাই সঙ্গে?"

আমার দিকে না ফিরে, সামান্য মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, না।

ওর পাশে চুপচাপ বসে পড়লুম আবার।

দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই প্যারিসের রাত শেষ হয়ে যাবে। নেশা-ঘুম-খিদে সব চটকে একাকার। নিচের 'রুমে' নাচটাচ বোধহয় শেষ এতক্ষণে। ফিরোজ, কানাই যার যার ঘরে কম্বলের তলায় আরামে ঘুমোচ্ছে এখন। প্যারিসে অথবা পৃথিবীর যে সব রাজ্যে রাত এখনো ফুরোয়নি, সেখানে কে কে অথবা কত মানুষ-মানুষী আলাদা আলাদা আপন কারণে বা প্রয়োজনে এখনো যন্ত্রণায় জেগে আছে, আমি জানি না। আমি জানি, আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে একটি কালো মানুষ দেশি-ছাপ-মারা, দেশের গন্ধ-মাখা অল্প চেনা বা অচেনা শরীর নিয়ে নিজের গোপন কথা, মনের শব্দ ভাবছে। দূরে কোথাও, এই মায়াবী শহরেই, রুক্ষ, বুনো অথচ সুশ্রী একটি মুখ হয়তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হ'য় পড়ে আছে। ক্ষুধার্ত, ধর্ষিতা মিশেল কি তার উলঙ্গ, রক্তাক্ত শরীর নিয়ে শীতের দেশের ফুটপাথে ঘুমিয়ে পড়েছে?

তাড়াতাড়ি মন ফিরিয়ে গোবিন্দর দিকে তাকালুম।

এ কি! ও তো কাঁদছে! দেওয়ালে হেলান দেওয়া মুখ। গেলাশ নিয়ে হাতটি কোলের ওপর রাখা। চোখ বুজে আছে গোবিন্দ। চোখ বন্ধ করে থাকলেও, জল কেন বেরিয়ে আসে, বোঝা দায়। বিংশ শতাব্দীর যে কোনো পশুর কালো মুখে চকচকে ফাটলের মতো জল। দুই গাল এবং নাকের দু পাশের উপত্যকা বেয়ে শীর্ণ নদীর স্রোত। ওর চোখের জল যদি উষ্ণ হয়, তবে, উষ্ণ স্রোত। ওর চোখের জলে যদি নুন মেশানো থাকে, তাহলে, উষ্ণ-নোনা জল। নুনের জ্বালায় বন্ধ চোখের ফাটল ভেঙে ফোটা ফোঁটা বেরিয়ে আসছে। চিবুকের দু পাশে এসে জড়ো হচ্ছে। এক দন্ড চকচকে ফোঁড়ার মতো ঝুলে থেকে, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পড়ে যাচ্ছে ওর কোলে। কোলের গেলাশে।

নীট জিনের সঙ্গে উষ্ণ-নোনা জল মিশিয়ে আমি খাইনি কখনো। তাই, কেমন লাগবে বুঝতে পারলুম না। তবু, নিতান্তই মানুষিক প্রবৃত্তির জন্যেই বোধ-হয় ডানহাত গোবিন্দর মুখের কাছে পৌঁছে গেল। যে হাতে বহু মারামারি করেছি, ঈভলীনের নরম আঙুলে মৃদু চাপ দিয়েছি, ছবি আঁকছি এবং যে হাত দিয়ে এই গোবিন্দর পিঠেই একটি জোর থাপ্পড় মেরেছিলুম, সেই মানুষের হাতই ওর গাল, চোখের কোল কেমন দ্বিধাহীন মুছিয়ে দিল।

আস্তে আস্তে বললুম, খুব নরম গলায়,

—"কি কথা বলবে বলছিলে! বলে ফেলো। হালকা লাগবে।"

চোখ মেলে চেয়ে এক ঢোঁকে গেলাশ শেষ করল গোবিন্দ। বাঁ হাতের পিঠে টেক্সাস ছবির নায়কের ধরনে ঠোঁট মুছতে মুছতে চোখও মুছে নিল, টের পেলুম। যে কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক লোকের মতো উঠে গেলাশ রাখল টেবিলে। ধীরে ধীরে হেঁটে আলমারির কাছে এগিয়ে গেল। মেঝেয় এবং কার্পেটে ছড়ানো সব কাগজপত্র তুলে আনল খাটে। ফিরে গিয়ে, আলমারির থেকে সেই কফির কৌটো বের করে এক মুঠো গোলমরিচ হাতে নিতেই বলে ফেললুম,

—"এক্ষুনি আবার খাচ্ছো ওইসব!"

ঘুরে তাকিয়ে হাসল। কিছু বলল না। মনে মনে চটে গিয়ে আবার ভাবলুম, মাসীমা ঠাকুমা বা গুরুজন সাজবার দরকারটা কি আমার? যেই কাটা-পাঠার মতো ছটফটাতে আরম্ভ করবি—এক লাথি কষিয়ে বেরিয়ে যাবো!

গোবিন্দ খাটে এসে বসল। আমাদের দুজনের মধ্যিখানে কাগজপত্র, ফাইল, এক্স-রে প্লেটগুলি। একটা কালচে প্লেট হাতে তুলে গোবিন্দ বললে,

—"আমার পেট থেকে গলা অবধি তোলা ছবি। দ্যাখো!"

হাতে ধরিয়ে দিল। ওর গলা বা পেট দেখবার কি আছে, না বুঝেও আলোর সামনে ধরে গম্ভীর মনোযোগে দেখবার চেষ্টা করলুম।

ও হেসে বললে,

—"কি বুঝছো!"

ফিরিয়ে দিলুম ওর হাতে। বললুম,

—"কিচ্ছু না।"

ফরাসী নার্সিং হোম, হাসপাতালের কাগজগুলো ঘাটতে লাগল। ঘাটতে ঘাটতে একটা সাদা বড় খাম। তার ভেতর থেকে বড় সড় কাগজ বেরোলো একখন্ড। কলকাতার নামী ক্লিনিক-ল্যাবরেটরির ছাপ মারা কাগজ। এক-দুই-তিন নম্বর দিয়ে টাইপ করা অজস্র ডাক্তারী শব্দ, যার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারা ভার। কত-গুলো লাল শব্দ দেখিয়ে গোবিন্দ বললে,

—"এগুলো পড়ো। বুঝতে পারবে।"

মনে মনে বিড়বিড় করে আওড়ালুম। বুঝলুম--কচু!

দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে গোবিন্দ। আগের মতো পা ছড়িয়ে আরামের ভঙ্গি। চোখ বুজে বলল,

—"পড়ো। জোরে জোরে পড়ো, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

পড়লুম,

"ভেন্ট্রি... সেপটাল ডিফেক্ট অফ এ মাইল্ড ভ্যারাইটি... লীডিং টু হার্ট এনলার্জমেন্ট অ্যান্ড ফেইলিওর।..."

চোখ বুজে শুনেছে গোবিন্দ। বললে,

—"বুঝতে পারছো না! আমার বিশাল হৃদয়ের গোপন খবর বলছে। পড়ো, দু' নম্বরটা পড়ো।"

—"রিউম্যাটিক এওর্টিক ভালভুলার ডিজীজ...ডায়াফ্র্যামেটিক্ হার্নিয়া উইথ্ সিম্পটমস অফ হাইপার অ্যাসিডিটি অ্যান্ড আলসার... কার্ডিয়াক অ্যাস্থমা...! দূর, এসব কী গোবিন্দ? কিছুই বুঝতে পারছি না!"

চোখ না খুলেই হাসল। তারপর তাকাল আমার দিকে। বলল,

—"যাবার রাস্তার নাম-পরিচয়। আমার মরে যাবার রাস্তার!"

হেসে বললুম, কাগজটি ভাঁজ করে খামে ভরতে ভরতে,

—"দুঃখবিলাস ভালো গোবিন্দ! তবে, ভোর রাতে নয়! আমার ঘুম পাচ্ছে আবার। চলি।"

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও, ভোর হবার আগেই গোবিন্দ আমার বুকে জোড়া পায়ে লাথি মারল। মাথা নীচু করে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। জেনে এলুম, ও আসছে মাসে দেশে ফিরে যাচ্ছে। মরতে যাচ্ছে। স্টাইপেন্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে চলে যেতে হয় ছাত্রদের। কারণ, তার ভাবী-মৃত্যুর জন্যে কারো মাথাব্যথা নেই। কত লোক মরে, বাঁচে। হরিদাস পাল অথবা গোবিন্দ শোধরির মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

স্টাইপেন্ড জোগাড় করে আসলে চিকিৎসা করাতে এসেছিল গোবিন্দ। নিখরচায় হাসপাতালে ছিল প্রায় ন' মাস। হৃদয় বড় হয়ে যায় ওর। হৃদয়ের আশে-পাশে অজস্র জটিলতা। দু-দুটো অপারেশনেও জট ছাড়িয়ে মৃত্যু পেছোনো যায় নি। এখানে থাকতে পারলে, আবার ফরাসী সরকারের খরচায় হাসপাতালে চলে যেতো। ঘন ঘন শরীরের চামড়া কেটে এখানকার বিখ্যাত ডাক্তাররা ভেতরের জট ছাড়িয়ে জীইয়ে রাখতে পারতো ওকে, হয়তো। ভিসা, স্টাইপেন্ডের মেয়াদ ফুরোলে, আশা ফুরিয়ে যায়। গোবিন্দর মতো কেউ কেউ আগে থেকেই জেনে যায় —চলে যেতে হবে।

গোবিন্দ বললে,

—"মিশেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যখন একটা কাছের মানুষীকে পাবার আশা তৈরি করছে, তখনই, নথিপত্র, হাসপাতাল এবং ডাক্তারের কাছে খবর নিয়ে জানলুম, আমার ভিসা, স্টাইপেন্ডের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে।"

একটু থেমে, আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলেছে, নিজের মনে মনেই

যেন,

—"ও আমাকে ভালোবাসতে বাসতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। আমার স্ত্রী হবার বড় বাসনা মিশেলের। ইন্ডিয়ান শোধরির ঘরের বউ। ওকে সরাতে পারছিলুম না। অপমান করেছি, মেরেছি—কেঁদে-কেটে ও আমাকে ভালোবেসেছে। তুমি বা তোমার ওই সুন্দরী বান্ধবী ঈভলীনের সাহায্য ছাড়া ওকে আমি সরাতে পারতুম না!—"

প্রচন্ড লাথিটা হজম করে চুপচাপ বসে রইলুম।

ও বললে,

—"সেই জাপানী বুমের দিন কিন্তু ওকে আমি আঘাত করিনি। অন্য একটা যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে নেচে ওকে অপমান করতে চাইছিলুম। ও আমাকে ছাড়বেই না। ধাক্কা দিয়েছিলুম। পড়ে গিয়ে ঠোঁটের কাছে লেগেছিল।—"

ফিরে তাকিয়ে বলল,

—"ধন্যবাদ, ভাই। বাঁচিয়ে দিয়েছো আমাকে।—"

কাঁদছে গোবিন্দ। ঝরঝর করে কাঁদছে। এবার আর ওর চোখের কোল মোছাতে আমার হাত উঠল না। থম্ ধরে বসে থাকলুম।

একটু বাদে জিগ্যেস করলুম, খুব আস্তে আস্তে,

—"ওকে দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেই পারতে! তোমার মৃত্যুর দিন তো তুমি জানো না।"

—"আমার বাবার সোঁদা ঘর পাল-পাড়ার ক্যাম্পে। বাবা গোঁড়া মানুষ। সহ্য করতেন না। আমার বড় হৃদয় নিয়ে আমি ও'র আগেই মারা যাবো, উনি জানেন না। জানেন শুধু দেশে ফিরছি আসছে মাসে। বিলেত-ফেরৎ শিল্পী ছেলে দেশে ফিরছে, বড় চাকরি, সব দুঃখ ঘুচবে—সেই আনন্দে আছেন। মিশেলকে নিয়ে গোনাগুনতি দিন কয়েকের জন্যে ঘর বাঁধা যেত। কিন্তু, ও তো ওর স্বপ্নের ইন্ডিয়ার কিছুই পেত না। আমার এতো [illegible] ওর কি হতো?"

গোবিন্দকে এখন আর বলতে ইচ্ছে করল না, যে, মিশেল এখন, এই মুহূর্তে বেঁচে আছে কিনা জানি না। আমার খোঁজে আমার কাছে এসে, আমি না থাকায়, এখন যদি ও কোথাও বিকৃত, ধর্ষিতা নারী হিসেবে পড়ে থাকে, তবে, গোবিন্দকে সে কথা জানিয়ে লাভ নেই। ও যে মরে যাবে দেশে ফিরতে ফিরতেই, তা আমি টের পেয়ে গেছি। ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় গোবিন্দর বাবা, সেই আমাদের রঘুপতির ছেলের মত, দুঃখিত এক ছেলের নীল মুখ আমি কল্পনায় দেখতে পেলুম। যে ছেলে তার বড়সড় হৃদয়টির জন্যে বিদেশ ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

পা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম। দোতলার করিডোর ধরে হাঁটছি। নিঝুমে ঘুমোচ্ছে মেজোন্দ্যালুন্দ। শুধু আমার জুতোর বেতালা শব্দ গমগম করছে।

করিডোরের শেষে আমার ঘর। চোখ তুলে দেখলুম, মৃদু আলোয় আমার বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে গুটিসুটি বসে আছে মেয়েটি। আমার অপেক্ষায় ক্ষুধার্ত সারা রাত জেগে দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখ দেখতে না পেলেও চিনতে একটুও কষ্ট হলো না। মিশেল!

(ক্রমশ)

চুল এভাবে রঙ করবেন না!
নতুন!
গোদরেজ
পার্মানেন্ট
হেয়ার ডাই
ব্যবহার করুন
ভারতের
প্রথম হেয়ার
ডাই যা আপনা থেকে
ছড়িয়ে পড়ে!
Godrej
Permanent
hairdye
স্বাভাবিক আর সমানভাবে আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে!
এখন আর কষ্ট করে সিঁথি কেটে
এক একটি চুলে আলাদা করে রঙ
লাগানোর দরকার নেই। এই
অভিনব আর প্রমাণিত গোদরেজ
ফরমূলা চুল ডাই করাকে চুল ধোয়ার
মতই সহজ ব্যাপার করে তুলেছে,
কারণ এই ডাই লাগানোর সঙ্গে
সঙ্গে আপনা থেকে সমানভাবে
সহজে ছড়িয়ে পড়ে।
গোদরেজ পার্মানেন্ট হেয়ার ডাইতে
কোনো হানিকর রাসায়নিক পদার্থ
নেই। আছে এক হাল্কা মিষ্টি সুগন্ধ।
অনেক সপ্তাহ ধরে এ আপনার চুলকে
করে রাখে- নরম, তারুণ্যপূর্ণ, সুন্দর এবং
স্বাভাবিক কালো!
পুরুষদের জন্যে, মহিলাদের জন্যেও!
২টি রঙে: স্বাভাবিক কালো, গাঢ় খয়েরী।
গোদরেজ পার্মানেন্ট হেয়ার ডাই, সব ডাইকে ছাড়িয়ে গেছে, এটি লাগানো—
শ্যাম্পু করার মতই সহজ!

গানের আসর

একটি স্মৃতিচারণ

শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্যায়ে যারা বাল্যাবস্থা থেকে কৈশোরকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের সংখ্যা কমে এসেছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বললে কবিগুরুর এমন একটি পরিচয় পাওয়া যায়. যা চিত্তাকর্ষক এবং তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হয়। এই স্বল্প কয়েকজনের মধ্যে একজন হচ্ছেন আগরতলার ঠাকুর শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন। ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা আজ সর্বপরিচিত. কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন আগরতলায় আসতেন তখন আগরতলা স্বল্পপরিচিত। শুধু তাই নয় কলকাতা থেকে এই রাজ্য তখন দুরধিগম্যই ছিল। আজ সকলেই জানেন. ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল। সেই সম্পর্ক শুধু মধুরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না. তা ছিল অনেকখানি ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শকে ত্রিপুরা গভীরভাবে গ্রহণ করেছিল। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারের কেহ কেহ বা তাঁদের নিকট আত্মীয়বর্গের অনেকেই ধারাবাহিকভাবে শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করে এসেছেন। নরেন্দ্রচন্দ্র ত্রিপুরা রাজ্যের অতি অভিজাত পরিবারের সন্তান। আজও মহারাজ বীরচন্দ্র, রাধাকিশোরের আমলের ঠাকুর মহিম কর্নেলের নামে পরিচিত কর্নেলবাড়ি আগরতলার সকলেরই পরিচিত। কর্নেল সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুর সোমেন্দ্র দেববর্মন (রেণু ঠাকুর) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি হারভারড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। পরবর্তী-কালে যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রবিনিময় হত। নরেন্দ্রচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠ। আজ তাঁর বয়স বাহাত্তর। দীর্ঘকাল কলকাতায় কাটিয়ে অবসর জীবন যাপন করছেন স্বগৃহে, সেই কর্নেলবাড়িতে। কলকাতার সংগীত এবং নাট্যজগতে একদা তাঁর গতিবিধি ছিল. কিন্তু তিনি পেশাগতভাবে কোনটিকেই গ্রহণ করেননি। ক্রমে অপরাপর বিষয় ছেড়ে কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন। কলকাতায় থাকবার সময় অনাদিকুমার দস্তিদার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল এবং বহু গান যা তাঁরা এক সময় শিখেছিলেন তা আবার ঝালিয়ে নিতেন যখন আলাপ-আলোচনা হত। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে 'রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা' গানটির সুর সম্বন্ধে অনাদিদা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং অনাদিদা এ গানটির স্বরলিপিও করে রেখে গেছেন বলে জানি। সম্প্রতি এই বয়সেও নরেন্দ্রচন্দ্র কতিপয় ছাত্রছাত্রীকে গান শেখাচ্ছেন। দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাক্ষাৎভাবে শেখা তাঁর গানের ধারাকে যদি এই ছেলেমেয়েরা গ্রহণ করতে পারে তবে তারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথার্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে, যা এ যুগে দুর্লভ।

সম্প্রতি আগরতলায় নরেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সে

ঠাকুর শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মন
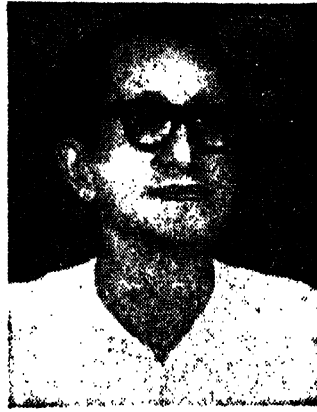
যুগের শান্তিনিকেতনের স্মৃতিচারণ করলেন যা অকপটে পাঠকদের গোচর করলে তাঁরাও আনন্দিত হবেন বলে আমার মনে হয়েছে।

নরেনবাবু বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ১৯১৩ সালে যখন তাঁর বয়স দশ বছর। তখন নাকি আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী বয়স বারো বছরের বেশী হলে ভর্তি করা হোতো না। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের সবাইকেই তিনি চিনতেন। নরেনবাবু বললেন, ত্রিপুরায় মহারাজ রাধাকিশোর মানিক্যের আমলে গুরুদেব যখন আগরতলায় আসতেন তখন দু এক-বার তাঁদের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করে-ছিলেন. রাধাকিশোরের সম্মতি অনুসারে। এই সময় একবার তাঁর পিতাকে তিনি 'গহনকুসুম কুঞ্জ মাঝে' এবং 'কেন যামিনী না যেতে'—এই দুটি গান শিখিয়েছিলেন। মহারাজ খবর পেলেন গুরুদেব খালি গলায় গান করছেন. তাই রাজবাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিলেন হ্যাল্ড্ কোম্পানির একটা বড় অর্গ্যান। সেই অর্গ্যানটা বহু বছরই তাঁদের ঘরে ছিল, পরে সেই অর্গ্যানের কি দশা হল তা তাঁর জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথই বিদ্যালয়ে তাঁকে গান শেখবার জন্য দিনেন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিয়মিতভাবে দিনুবাবুর ক্লাসে যোগ দিতেন; শুধু তাই নয় তাঁর বহু আলোচনা তিনি আজও মনে করে রেখেছেন। তখনকার দিনে রোজই সন্ধ্যা-বেলায় গানের ক্লাস হোতো, এমন কি বুধবারও বাদ যেত না। দুপুরবেলা পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দী গান শেখাতেন রীতিমত তাল-লয়ের দিকে নজর রেখে। দরকার পড়লে তিনি নিজে তবলা বাজিয়েও বুঝিয়ে দিতেন তাল লয়ের ব্যাপারগুলি। নরেনবাবু বললেন—'মাঝে মাঝে গুরুদেব আমাদের ক্লাসে এসে ভীম-রাও শাস্ত্রীকে বলতেন—পণ্ডিতজী ছেলেদের সারেগামা-টা ঠিক করে দিন তাহলেই চলবে। পরে বুঝেছি গুরুদেব একথা কেন বলতেন।' অবশ্য এটা নরেন-বাবু জানালেন যে হিন্দী গানের সেই ধরনের অনুশীলন যা গলায় একটা এক-ঘেয়ে ভাব এনে দেয় বা একরকম জড়তার সৃষ্টি করে সেই রীতিকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তিনি নিজেও এই বয়সে অতিরিক্ত হিন্দুস্থানী স্বরসাধনা করা যে সব গলা দেখছেন সেখানেও অনুভব করছেন রবীন্দ্রনাথের গানের নমনীয়তাকে ঠিক ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে না। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে হলে গলার নমনীয়তা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বললেন—'গুরুদেব এবং দিনুবাবু দুজনের কণ্ঠই খুব 'ফ্লেক্সিবল' ছিল। গমক, ছোট ছোট কাজগুলি তাঁরা এত পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলতেন এমন সাবলীল ভাবে যে তা না শুনলে কেউ ধারণা করতে পারবে না। ওঁদের দুজনের গলাই তারার পঞ্চম পর্যন্ত অবলীলাক্রমে ছুঁয়ে আসতো দরকার হলে। তাঁদের কোনোদিন রেওয়াজ করতে শুনি নি, অথচ যখন গান শেখাতেন তখন গলার আওয়াজে কোনরকম জড়তাই দেখি নি।' নরেনবাবুর মনে আছে ভীমরাও শাস্ত্রী খুব ভোরে তানপুরাসহ ভৈরো, আসোয়ারিতে কিছুক্ষণ রেওয়াজ করতেন তবে আস্তে আস্তে, গলা ছেড়ে শোনা যেত না। দিনুবাবু গান শেখাতেন সাধারণত এসরাজের সঙ্গে. কখনো কখনো তাঁর বুলবুল অর্গ্যান দিয়েও শিখিয়েছেন। তবে. সঙ্গে কোনও তালযন্ত্র বা তবলা থাকত না। তিনি হাতে তুড়ি দিয়ে বা তাল দিয়ে গানের গতিবিধি, তাল, লয় বুঝিয়ে দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের নতুন রচনা সম্বন্ধে

স্মৃতিচারণ উপলক্ষে নরেনবাবু বললেন—'একটা নতুন গান তৈরি হয়ে যাবার পর দিনুবাবুর সঙ্গে যোগস্থাপন না করতে পারলে সন্ধেবেলা গুরুদেব নিজেই গান লেখা কাগজটি হাতে করে নিয়ে এসে বসতেন আমাদের গানের ক্লাসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতেন—ওটা এখন রাখ, এটা নিয়ে নে এই বলেই আমাদের সবাইকে তিনি নিজেই সেই গানটি শেখাতে আরম্ভ করে দিতেন। ইত্যবসরে দিনুবাবু আমাদের কারুর খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পেনসিল দিয়ে 'র‍্যাপিড রাইটিং'-এর মত করে স্বরলিপি করে যেতেন। এমনটি আমি আর কোথাও দেখি নি, পরেও দেখলুম না। গানটি একবার গাওয়া শেষ করে গুরুদেব বলতেন—হোলো? তখন দিনুবাবু গানের কাগজটা চেয়ে নিয়ে তাঁর করা স্বরলিপির পাশাপাশি রেখে এসরাজের সঙ্গে অবলীলাক্রমে গেয়ে যেতেন। গুরুদেব নিশ্চিন্ত হয়ে বলতেন—নে, এবার ভাল করে এদের শিখিয়ে দে।'

শান্তিনিকেতনে ওঁরা অচলায়তন, বাল্মীকি প্রতিভা, শারদোৎসব, বিসর্জন ইত্যাদি প্রায়ই করতেন। 'ফাল্গুনী' তৈরি হোলো বোধহয় ১৯১৬ সালে। আশ্রমে একবারমাত্র কলনসই রিহার্সাল দিয়ে কলকাতায় করা স্থির হল বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষে সাহায্য করবার জন্য। তিনি তখন গানের দলে ছিলেন। নরেনবাবুর স্মরণ হয় ওঁরা দুমাস আগে থেকেই কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে রিহার্সাল দিয়েছিলেন। অভিনয় দুদিনের জায়গায় তিনদিন করতে হয়েছিল। বেশ কয়েকটা আসন বাড়িয়েও বহু লোককে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদালানের পরিসর তেমন বড় নয় বলেই এই অসুবিধা। তাঁর মনে আছে পরলোকগত ডক্টর শশধর সিংহের ভাই সমরেশ সিংহ—'ওগো দখিন হাওয়া' গানটি দোলনায় বসে বসন্ত রঙের রাজোচিত পোশাক পরে গেয়েছিলেন। চমৎকার উদাত্ত এবং সুমিষ্ট কণ্ঠ ছিল তাঁর তখন। এই উদাত্ত কণ্ঠের প্রসঙ্গে তিনি বললেন—'আমাদের গান শেখাবার সময় গুরুদেব বলতেন উদাত্ত কণ্ঠে গাইবি। আর দিনুবাবু বলতেন—কি ম্যান ম্যান করে গাইছিস, গলা ছেড়ে গাইতে পারিস না? সেই অভ্যাস আমার আজও অক্ষুণ্ণ আছে। মাঠে মাঠে গলা ছেড়ে গেয়ে আমাদের অভ্যাস, সে কি আর নামানো যায়? গুরুদেবের গলা বেশ উচ্চগ্রামের এবং তাঁর গাওয়া গানে যত সূক্ষ্ম কাজ আর কারুকলা আছে, সবই কি আমরা নিতে পেরেছি?' এ প্রসঙ্গে স্বরলিপির কথা তুলে তিনি বললেন—'হাল আমলের স্বরলিপি আমার নেহাৎ সাদামাটা লাগে। মনে হয় গুরুদেবের গলার বহু কাজই ওগুলিতে নেই। বৃদ্ধ বয়সে গুরুদেব যাদের গান শিখিয়েছেন তাঁরা এগুলি কি করে পাবেন? সে বয়সে তাঁর গলায় আগের মত সব কাজ বোধ হয় আসত না, ইচ্ছে থাকলেও,—তাই সম্ভবত স্বরলিপিগুলি ওরকম সাদামাটা হয়ে গেছে।' এই ফাল্গুনীর রিহার্সালের সময় শ্রীযুক্তা সাহানা দেবী আসতেন। অপূর্ব কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর। এছাড়া ১১ই মাঘের উৎসবেও তিনি আসতেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। প্রত্যেক বৎসরই এই উৎসবে গাইবার জন্য নতুনের সঙ্গে কিছু পুরোনো গানও অভ্যাস করিয়ে দিতেন দিনুবাবু। তাঁর মনে আছে ১৯১৭ কিম্বা ১৯১৮ সালে 'অন্ধকারের উৎস হতে' 'অনেক দিনের শূন্যতা মোর'—এই সব গানের সঙ্গে পন্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন। আচার্যের আসনে সাধারণত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং থাকতেন। যদি কোনও কারণে বাইরে না যেতে হোতো।

দিনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাঁরা পূজা পর্যায়ের বহু গান শিখেছিলেন এবং সেগুলির অধিকাংশই ছিল রাগভিত্তিক এবং তালভিত্তিক। এই প্রসঙ্গে নরেনবাবু বললেন—"অন্ধকারের উৎস হতে—গানটি আমরা শিখেছিলাম এক তালে। ৪৫নং স্বরবিতানে দেখলাম গানটি দাদরা তালে লিপিবদ্ধ করা আছে। এরকম কত যে হয়ে গেছে কে তার হিসাব রাখে। স্বরলিপি থেকে যাঁরা,—জীবন যখন শুকায়ে যায়—গানটি তোলেন তখন দেখেছি তাঁরা অকারান্ত করেই গান যেহেতু হসন্ত নেই। রেকর্ডও এরকমই হয়েছে শুনেছি। আমাদের দিনুবাবু শিখিয়েছিলেন—"জীবন্ যখন্ শুকায়ে যায়"। এই রকম হসন্ত দিয়ে। বহু গানই আজকাল ছোটোখাটো ব্যাপারে বদলে গেছে কালের গতিতে বা বর্তমানের উচ্চারণপ্রবণতায়।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা আপনারা কি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁর কোনও ধ্রুপদ গান শুনেছিলেন?" উত্তরে নরেনবাবু বললেন—"আমি গুরুদেবের গলায় ধ্রুপদ ঢঙে কোনও গান শুনেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের যেসব গান তিনি নিজে শিখিয়েছিলেন সেগুলি প্রায়ই দাদরা, কাহারবা, কেননা আমরা ছিলাম ছেলেমানুষ। তবে একটা কথা তোমায় বলি, গুরুদেব কাহারবা শব্দটা পছন্দ করতেন না। একদিন গানের ক্লাসে দিনুবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় বলেছিলেন—'কাহার্‌—বা', নামে দিনু এ যেন কেমন ভাল শোনায় না, তুই বরং কাওয়ালি বল।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"রবীন্দ্রনাথের গানে তান, বিস্তার যোগ করা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?" নরেনবাবু বললেন—"আগেই বলেছি ওঁদের কাউকেই কোনওরকম করতে দেখিনি। তবে দিনুবাবু কথা উঠলেই বলতেন রাধিকাবাবুর কাছে ধ্রুপদ শেখবার সময় তিনি গলা সাধতেন। তাঁর কাছ থেকেই শুনেছি আমাদের বাঙালী বড় বড় গাইয়েরা গুরুদেবের সামনে বসে একটু ওস্তাদি ধরনে তাঁর গান গাইলেও তিনি বেশ ভাল করেই শুনেছেন, কাউকে থামিয়ে দেননি। তবে আমি তো আগেই বলেছি হিন্দুস্থানী রীতিতে অতিমাত্রায় প্রবণতা থাকলে গলায় কতকগুলি ম্যানারিজম এসে পড়ে সেগুলি কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। সেরকম কণ্ঠের গান শুনলে গুরুদেব দুঃখিত হতেন এটা যাঁরা তাঁকে জানতেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন। ভাষান্তরিত হলে তাঁর গানে মাধুর্য থাকবে কিনা সে সম্বন্ধেও তাঁর সন্দেহ ছিল। বোধ হয় ১৯১৬।১৭ সাল হবে একদল গুজরাটি ছেলে এসেছিল আশ্রমে শিক্ষার্থী হিসাবে। তখন এইরকম একটা প্রস্তাব উঠেছিল ভীমরাও শাস্ত্রী বা অন্য কারুর মাধ্যমে। গুরুদেব মত দেননি।"

সে সময় আর যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন তাঁদের প্রসঙ্গে নরেনবাবু পরলোকগত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বললেন। তাঁর গলা এক সময় ভালই ছিল এবং গুরুদেব বা দিনুবাবুর কাছে তিনিও অনেক গান শিখেছিলেন। একবার তিনি পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় ঘুরেছিলেন রবীন্দ্র সংগীত প্রচার করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে দিয়েছিলেন একটি ডালসোটিনা হারমোনিয়াম। নরেনবাবু বললেন—"ঢাকার দিক শেষ করে কুমিল্লায় এসেছিলেন তিনি। রেণুদাদার নিমন্ত্রণে সেখান থেকে আমাদের আগরতলার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন কয়েকদিনের জন্য। সেটা বোধ হয় ১৯২৩।২৪ সাল হবে।"

সেকালকার শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের কথা উঠল। নরেনবাবু বললেন—'প্রথমে আমাদের পড়াতেন তেজেশবাবু, নগেন আইচ, কালীমোহনবাবু—এঁরা। পরে ইংরেজি পড়াতেন এন্ড্রুজ সাহেব। পিয়ার্সন সাহেবের কাছে আমি পড়িনি। প্রভাতবাবু, প্রমদাবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু, বিধুশেখর শাস্ত্রী, হরিচরণবাবু, এমন কি দিনুবাবু আর পন্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীও পড়ার ক্লাস নিয়েছেন। সায়েন্স, অংক—এসব সাবজেকটে ছিলেন সন্তোষ মজুমদার, গৌরগোপাল ঘোষ, জগদানন্দ রায়। ইতিহাস, ভূগোল পড়িয়েছেন নেপাল রায়। গুরুদেব নিজে আমাদের নিয়মিতভাবে ইংরেজি পড়াতেন আশ্রমে থাকলে। ছবি আঁকা শেখাতেন অসিত হালদার আর সন্তোষ মিত্র। খেলাধুলো শেখাতেন সন্তোষবাবু আর গৌরদা।"

আগরতলায় এক বর্ষার দিনে আমাদের কথা হচ্ছিল। এই বর্ষার স্মৃতিচারণ

করে নরেনবাবু বললেন—"বর্ষার দিনে ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে আমরা আশ্রমের সব ছেলেরাই বেরিয়ে পড়তাম ঘর ছেড়ে এবং দারুণ রকমের ভিজে খোয়াইতে ডুব দিয়ে এসে ডাক্তারখানা থেকে কুইনিন মিকসচার খেয়ে নিতাম। অবশ্য তার আগে কুয়োর জলে আর একবার স্নান করে নিতাম। মিকসচার খাওয়াটা একেবারে অবশ্য কর্তব্য ছিল, খেতেই হোতো প্রত্যেককে। তখন যে সব বর্ষার গান হোতো তার মধ্যে "ঝরি ঝরে ঝর ঝর" গানটি ছিল প্রধান। দিনুবাবু আমাদের সঙ্গে যেতেন মাঝে মাঝে।—গুরুদেবকে আমাদের সময় কোনওদিন বৃষ্টিতে ভিজতে দেখিনি। শুনেছি আগে তিনিও নাকি ওইরকম ছেলেদের সঙ্গে বের হতেন। আবার পরিষ্কার পূর্ণিমা রাত্রির কথা শোনো। গুরুদেব আর দিনুবাবু আমাদের পারুল বনে নিয়ে যেতেন। সবাই হেঁটেই যেতাম। পারুল বন খুব পরিষ্কার—অনেক শাল গাছে ভরা। গুরুদেব ঘাসের ওপরেই বসে পড়তেন। তারপর আমাদের দুভাগ করে সামনা সামনি দাঁড় করিয়ে "তুমি কোন পথে যে এলে", "আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ"—এইসব গান গাওয়াতেন। এমন কি, কিভাবে কাশের গুচ্ছ, ধানের মঞ্জরী হাতে নিয়ে গাইতে হবে তা নিজে দেখিয়ে শিখিয়ে দিতেন। একদল যেই গাইত "তোমরা চেন কি?" আর এক দলকে দিয়ে জবাব দেওয়াতেন—"চিনি তোমায় চিনি" ইত্যাদি। ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত।"

১৯২০ সালে পারিবারিক কারণে নরেনবাবুকে আশ্রম ছেড়ে আসতে হয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন আগরতলার উমাকান্ত অ্যাকাডেমি থেকে, তারপর ভর্তি হলেন কলকাতার সিটি কলেজে। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এলেন আগরতলায়। তাঁকে দেখে বললেন—"তুই আশ্রমে আয়, আবার গানটা শেখা আরম্ভ কর।" কিন্তু আর আশ্রমে ফিরে যাওয়া তাঁর হয়ে উঠল না। রেণু ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ যখনই চিঠি লিখেছেন তখনই তাঁকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। অবশেষে ১৯২৮ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে এলেন। গুরুদেব খুশী হয়ে বললেন—"এসেছিস, দিনুর কাছ থেকে পুরোনো সব গান শিখে নে।" কিন্তু মাস তিনেকের বেশী থাকতে পারলেন না তিনি। "আশ্রমের পরিবেশ যেন আগের মত নেই মনে হলো" বললেন নরেনবাবু—"আর তেমন ভাল লাগল না, তাই চলে এলাম। গুরুদেবকে বললাম—কয়েক দিনের জন্য বাড়ি যাচ্ছি। গুরুদেব বললেন—শিগগিরই চলে আসিস। কথা রাখিনি, আজ পরিতাপ করি। থেকে গেলে কত ভাল হত আমার। আমারই দুর্ভাগ্য।"

কলকাতায় থাকবার সময় দিনুবাবুর সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর। তিনি তাঁকে খবর পাঠিয়েছিলেন কলকাতায় এসেই। অনাদিদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা তো হতই। তারপর বহু বৎসর কেটে গেছে। কলকাতায় নানা বিষয়ে চাকরিতে ব্যাপৃত থেকেছেন তিনি। ১৯৬০ সালে একবার গেলেন শান্তিনিকেতনে। তখন এক ঘরোয়া আসরে তিনি গান শোনালেন। সেই আসরে ছিলেন ক্ষিতীশ রায়। তাঁর অনুষ্ঠান উপভোগ করেছিলেন শ্রোতারা।

শেষে আবার দিনেন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করে নরেনবাবু বললেন—"দিনুবাবু আমাকে তাঁর বুলবুল অর্গ্যান সহযোগে গীতপঞ্চাশিকার স্বরলিপি তুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন গান তোলবার পদ্ধতি। এসরাজেও তাঁর কাছেই আমার হাতেখড়ি। ভীমরাও শাস্ত্রীর কাছে তবলার ঠেকাগুলি সম্বন্ধে ধারণা করেছিলাম। দিনুবাবুও বলতেন স্বরলিপি একটা স্কেলিটন মাত্র, গায়ককে এর ওপর প্রাণসঞ্চার করতে হবে। গুরুদেবের গলায় কত কাজ দেখেছিস? সবই কি স্বরলিপিতে দেওয়া যায়, না তা সম্ভব? আরও কত ছোটখাটো কথা যে স্মৃতিতে আসে। একবার একটা ভৈরবী রাগিণীর গান শিখে সন্ধেবেলায় ঘরে বসে গাইছিলাম। দিনুবাবু ঐদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন, ঘরে ঢুকে বললেন—কিরে গুরুদেবের কি রাত্রির রাগিণীর গানের অভাব আছে যে তুই ভরসন্ধের সময় ভৈরবী গাইছিস? রাত্তিরে রাতের সুর গাইবি। দেখ, গানের বেলায় স্থান কাল পাত্র সম্বন্ধে কত বিবেচনা ছিল তাঁর। আচার্য বলতে এঁদেরই বোঝাতো।"

শাঙ্গর্দেব

॥ একশো তেরো ॥

পুলিশ? এই একটি মাত্র জিজ্ঞাসাই ত্রিদিবেশের মনে জাগে। গাড়িটা জীপ। চকিতের জন্য একবার আলো নেভে, আবার জ্বলে। আর তখনই গাড়ির সামনের দিকে তিনটি নিশানকে এক সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পায়। অস্পষ্ট হলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, ত্রিবর্ণ, সবুজ আর লাল নিশান একত্র বাঁধা, যার একটাই অর্থ, মিলন। তিন সঙ্গী হাতে হাত ধরা, শান্তি। গাড়ির এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে, ভিতর থেকে স্পষ্ট বাংলায়, ঝাঁঝালো বিরক্ত জিজ্ঞাসা ভেসে আসে, 'কে ওখানে? আপনি কে? কোথায় যাবেন?'

জীপের ভিতরের মানুষদের কারোকেই দেখা যায় না। বৃষ্টির ধারা সমানে বয়ে চলে। কিন্তু ত্রিদিবেশের প্রাণে এখন অনেকখানি ভরসা, জীপের সামনে তিনটি ঝাণ্ডাকে একত্র বাঁধা দেখে। ও দু পা এগিয়ে গিয়ে বলে, 'আমি বৌবাজারে যাবো, ২৪৯-এ।'

পাল্টা জিজ্ঞাসা ভেসে আসে, '২৪৯-এ?'

'হ্যাঁ, টি ইউ অফিসে।' ত্রিদিবেশ জবাব দেয়। 'আমি চৌরঙ্গি থেকে আসছি। কলকাতার বাইরে থাকি, আটকে পড়েছি।'

এঞ্জিনের আর বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে প্রায় ধমকের স্বর ভেসে আসে, 'আপনি তো মশাই অদ্ভুত লোক! আজ এখন আপনি চৌরঙ্গি থেকে আসছেন? একলা একলা? বলিহারি সাহস! মরবার সখ হয়েছে নাকি?'

ত্রিদিবেশ বৃষ্টিতে ভেজে, এবং এ কথার কী জবাব হতে পারে, ওর ধারণা নেই। ও কেবল জানায়, চৌরঙ্গির কোন পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থা থেকে ওর আগমন। জবাবে আবার সেই ধমকের স্বর, 'আপনাদের লেখক শিল্পীদের সব মাথা খারাপ। যান যান, তাড়াতাড়ি এক ছুটে ২৪৯-এ চলে যান।'

ত্রিদিবেশ দৃষ্টি যথেষ্ট তীক্ষ্ণ করেও, গাড়ির ভিতরের কারোর মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় না। গাড়ির সামনে এবং পিছনে ছায়া ছায়া কতগুলো মূর্তি দেখতে পায়। সকলেই কিছু বলাবলি করে, একটু আধটু হাসিও শোনা যায়। ত্রিদিবেশ গাড়ির পাশ দিয়ে, বৌবাজারের ট্রাম রাস্তায় পড়ে। জীপটা একটু এগিয়ে, ডান দিক ঘেঁষে পার্টি অফিসের সামনেই দাঁড়ায়। ও ২৪৯ নম্বরের দরজায় গিয়ে ওঠে। দু পাশে ঘর, মাঝখানের করিডরে একটা টিমটিমে আলো জ্বলে। নিচের দু পাশের সব ঘরগুলোর দরজাই বন্ধ। ত্রিদিবেশ এগিয়ে গিয়ে, বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠে। সিঁড়ির নিচের অংশ অন্ধকার, ওপরের অংশে দোতলার আলো। তিন চার জনের গলার স্বর এগিয়ে আসে, তাদের চেহারা দেখা যায়। সকলেই নিচের দিকে নেমে আসে, ত্রিদিবেশের ভেজা কাক মূর্তির দিকে তাকায়। চোখে তাদের জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসা ত্রিদিবেশের চোখেও, কিন্তু সকলেই ওর অপরিচিত। তারা কেউ দাঁড়ায় না, ব্যস্ত ভাবে নিচে নেমে যায়। ত্রিদিবেশ ওপরে উঠে, ডান দিকে ফিরে খানিকটা গিয়ে, বাঁ দিকের একটা ঘরের সামনে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে বেশ কিছু মানুষের ভিড়, সকলেই নানা কথায় ব্যস্ত। এ ঘরের আলো কিছুটা উজ্জ্বল। সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় কুয়াশার মতো ঘরের আবহাওয়া। বৃষ্টির ছাঁটের জন্য পুবদিকের জানালাগুলো বন্ধ। একটি মাত্র পুরনো ময়লা সিলিং ফ্যান ঘোরে। সকলের নানা কথাবার্তার মধ্যেও, ফ্যানের ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ যান্ত্রিক ভাবে বেজে চলে। কে একজন রীতিমতো হুংকার দিয়ে ওঠেন, 'কমরেড, আপনারা একটু চুপ করবেন, না কী? টেলিফোনের একটা কথাও আপনাদের

গোলমালের জন্য শোনা যাচ্ছে না।'

ত্রিদিবেশের কানে গলার স্বরটা চেনা লাগে। টি ইউ নেতা ঋষিকেশ ব্যানার্জির স্বর মনে হয়। ওর কাছে এটাও একটা ভরসা, অন্তত ওর পরিচিত একজন চেনা মানুষ এ ঘরে বর্তমান। ঋষিদাকে—হ্যাঁ, ও তাঁকে ঋষিদা বলে। কমরেড ঋষিদা। ত্রিদিবেশদের শিল্পাঞ্চলে প্রায়ই যান। সহজ-প্রাণ মানুষ, দেখলে খুব রাশভারি মনে হয়, অনেকটা বঙ্কিম মুখার্জির মতো, কিন্তু আসলে হাসিখুশি প্রাণখোলা লোক। বঙ্কিম মুখার্জির মতোই। কিন্তু বঙ্কিমবাবু সারা ভারত খ্যাত ট্রেড ইউ-নিয়ন নেতা, ঋষিদা সেই পর্যায়ে এখনো পড়েন না।

ত্রিদিবেশ দরজার ভিতরে পা দিয়ে দেখতে পায়, ঋষিদার ধমকে কাজ হয়। অনেকেই এদিকে ওদিকে সরে যায়। সেই মুহূর্তেই আর একটি অব্যর্থ পরিচিত স্বর শোনা যায়, 'কমরেডরা শান্তি শান্তি করে আপনারা অশান্তি করবেন না। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জিকে টেলিফোনে একটু কথা বলতে দেন। খোঁজ খবর নিতে দেন। উনি আপনাদের জন্যই খোঁজ খবর

নিচ্ছেন। সব এলাকার খবর পাবেন, নিজেরা একটু চুপ করেন। সরে আসেন, সবাই সরে আসেন।'

অব্যর্থ চেনা স্বর নিত্যানন্দ চৌধুরীর। জাগুলিয়ার সঙ্গে কলকাতার ভাষার মিশ্রণ ওঁর কথায়। স্বর আর ভাষা আর বলার ভঙ্গি শুনলেই বোঝা যায়। ত্রিদিবেশ আরো নিশ্চিন্ত বোধ করে। ওর আরো একজন পরিচিত এখানে বর্তমান। নিত্যানন্দ চৌধুরীর কথাতেও কাজ হয়, সকলেই ঘরের অন্যান্য দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কে একজন নিচু স্বরে, পাশ থেকেই বলে ওঠে, 'আলমবাজার কি সত্যি খবর দেবে নাকি? আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না।'

বঙ্কিম মুখার্জিকে দেখা যায়, তিনি চেয়ারে আসীন, কানে টেলিফোনের রিসিভার। চেঁচিয়ে চিৎকার করে এমন ভাবে কথা বলেন, যেন টেলিফোনে কথা বলেন না, নদীর এপার ওপারে কথা হয়। ত্রিদিবেশ শুনতে পায়, তিনি ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বলেন, 'ইয়েস ইয়েস, নট হাওড়া, নর্থ টুয়েন্টিফোর পরগণা—টিটাগড়-কামারহাটি, টিটাগড়, বারাকপুর, ইছাপুর, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, গৌরীপুর।'...

ত্রিদিবেশের চোখে পড়ে, দেওয়ালের ওপরে পাশাপাশি দুটি ছবি। গলা বন্ধ কোট, স্ট্যালিনের ছবি, জেনারেলিসিমো কমরেড স্ট্যালিন—রঙিন। তার পাশে লেনিন। পাখার ব্লেডের ছায়া, ছবি দুটোর ওপর দিয়ে নিরন্তর চক্রবৎ ঘুরে যেতে থাকে। দেওয়ালের ওই জায়গায়, ছবি দুটো ত্রিদিবেশ আগেও দেখেছে, দিনের বেলায়। তখন পাখার ছায়া ছবির গায়ে পড়ে না। রাত্রের আলোয় এখন ব্লেডের ছায়া ছবি দুটোর ওপর দিয়ে নিরন্তর ঘুরে যায়। যেন ছিন্নভিন্ন করতে চায়, কিন্তু পারে না। ছবির মূর্তিরা নিশ্চল। বরং ঘূর্ণিত ছায়ায় ছবি দুটো যেন সজীব মনে হয়। যেন তাঁদের মুখ নড়ে, চোখের পাতা কাঁপে, দৃষ্টি ঘন ঘন সঞ্চালিত হতে থাকে।

বঙ্কিম মুখার্জি টেলিফোনে কথা শোনেন; আর একরকম ভাবেই চিৎকার করেন। ত্রিদিবেশ দৃষ্টি ফিরিয়ে, অন্য টেবিলে নিত্যানন্দ চৌধুরীকে দেখবার চেষ্টা করে। তাকে দেখা যায় না, কিন্তু ও অবাক অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে একটি মুখের দিকে। অবিশ্বাস্য মনে হয়, আজ এখন এই মুহূর্তে ওই মুখ এখানে! ত্রিদিবেশের বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়, ভয় লজ্জার শেষ চিহ্নও যেন মন থেকে সরে যায়। সবিতা পণ্ডিত। পণ্ডিতরা নিত্যানন্দ চৌধুরীর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার উৎকণ্ঠিত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি বঙ্কিম মুখার্জির দিকে। ত্রিদিবেশ এখন আর বঙ্কিম মুখার্জির কথা শোনে না, সবিতারতর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে। অপ্রত্যাশিত! চৌরঙ্গি থেকে এখানে আসার সিদ্ধান্তে, নিজের প্রতি ওর আস্থা বেড়ে যায়, সাহস ফিরে পায়। সহসাই ওর দৃষ্টিকে চমকিয়ে দিয়ে, সবিতা পণ্ডিত মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে ওঠে, মুখ নামিয়ে কিছু বলে। নিশ্চয়ই নিত্যানন্দ চৌধুরীকে বলে। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, চৌধুরীর চেয়ারের এক পাশে সে দাঁড়িয়ে, এবং মুখ নামিয়ে চৌধুরীকেই কিছু বলে। ত্রিদিবেশ, চৌধুরীকে দেখতে পায় না, তাঁর টেবিলের সামনে কয়েকজন দাঁড়িয়ে, তাঁকে ঘিরে।

'কমরেড পণ্ডিত, আপ্ হাঁসতে হ্যায়?' একজনের স্বর শোনা যায়, 'ইস্‌নে হাসনে কা ক্যায়া বাত হ্যায়? শুনা নহি, আলমবাজার মে রায়ট শুরু হো গয়া?'

ত্রিদিবেশের এখন ক্রমাগত অবাক হবার পালা। হিন্দী ভাষার স্বরটিও ওর বিলক্ষণ চেনা। এ স্বর কমরেড শরাফত আলীর। শরাফত বিশেষ করে কামারহাটি আলমবাজারের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা। তার স্বরে কিছুটা ক্ষোভ আর বিস্ময়ের ঝাঁঝ। সবিতা পণ্ডিত বলে, 'তব ক্যায়া, রোয়েগা? আলমবাজার মে দাঙ্গা ফাসা হ্যায়, তো হুঁয়া পর শান্তিকে লিয়ে লড়নে পড়ে গা। হমারা ইলাকা মে পুরা শান্তি হ্যায়, এ তো খুশ কি বাত হ্যায়। হ্যায় না?'

কেউ কেউ হেসে ওঠে। সবিতা সকলের দিকে তাকায়, এবং আবার বলে, 'আপকো সাথ হাম আলমবাজার যায়েগা, উস্‌মে ক্যায়া হ্যায়, মগর হমারা ইলাকা পিসফুল হ্যায়, কুছ ভি নেই হুয়া।'

'তা কমরেডরা, আপনারা কি এখন নিজেদের মধ্যে আপোসে লড়বেন নাকি?' নিত্যানন্দ চৌধুরী তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, 'সেটা তো আর এক বিপদের কথা।'

আবার কেউ কেউ হেসে ওঠে। শরাফত আলীর স্বর শোনা যায়, 'ঠিক হ্যায় পণ্ডিত, আপকো হাম আলমবাজার লে যায়েগা।'

ত্রিদিবেশ এ সব কথায় আর কান দেয় না। ও জানে, শরাফত আলী আসলে সবিতাকে ইচ্ছে করেই একটু বিব্রত করার

আর রাগাবার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে তার এরকম প্রবণতা দেখা যায়। সবিতা জবাব দেয়, 'জরুর যায়েগা, উস্‌কে পহ্‌লে হাম আপনা এলাকা দেখ্‌নে যায়গা। নহি তো জেলা কমিটি সে আপলোগ জবাব মাংগিয়েগা।'

ত্রিদিবেশ সবিতা পন্ডিতের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সবিতা তার দিকে তাকিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে, তারপর ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করে, 'এ কি, তুমি এখন এখানে? কোথা থেকে এলে?'

নিত্যানন্দ চৌধুরীও ত্রিদিবেশের দিকে ফিরে তাকান। ত্রিদিবেশ বলে, 'চৌরঙ্গি থেকে।'

'চৌরঙ্গি?' সবিতা বিভ্রান্ত মুখে জিজ্ঞেস করে।

ত্রিদিবেশ বলে, 'হ্যাঁ, অফিস থেকে।'

'একলা? এইরকম ভিজতে ভিজতে?' নিত্যানন্দ চৌধুরীও অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করেন।

প্রশ্নগুলো এমন ভাবে জিজ্ঞাসিত হয়, ত্রিদিবেশ অপরাধী ও লজ্জা বোধ করে, হাসে, এবং ঘটনা বলে। নিত্যানন্দ চৌধুরী বলেন, 'বেশ করেছেন কমরেড, শহীদটা

হতে পারলেন না, এটাই যা দুঃখ। নিন সবিতা পণ্ডিত, আপনার কমরেড আর্টিস্টের সঙ্গে কথা বলেন।'

সবিতা সরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, 'আজ কি তোমার অফিস খোলা ছিল নাকি?'

'হ্যাঁ'

'অদ্ভুত! খোলা থাকলেও তুমি আসতে গেলে কেন? এলে কী করে?'

'ট্রেনে। আমি যখন এসেছি, তখনো ট্রেন চলছিল। ট্রামেও কোনো গোলমাল হয় নি। একটু পরেই শুরু হয়েছে।'

'আশ্চর্য! যাচ্ছেতাই ব্যাপার।'

'আপনি কি করে এলেন?'

'আমি তো কাল এসেছি। ছিলাম নরেনদার ওখানে। কিন্তু এখন তুমি বাড়ি যাবে কেমন করে?'

ত্রিদিবেশ কোনো জবাব দিতে পারে না, অসহায় চোখে তাকায়। সবিতা বলে, 'তুমি তো এক নম্বরের বুদ্ধু। গোলমাল শুরু হতেই চলে যাওনি কেন? আজ রাত্রে তো ফেরার কোনো প্রশ্নই নেই। কালও যে ফেরা যাবে, তাতেও সন্দেহ আছে।'

ত্রিদিবেশ উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, 'শিউলির জন্য ভীষণ চিন্তা হচ্ছে।'

'শিউলির জন্য চিন্তার কিছু নেই। বারাকপুরের নর্থে কোনো গোলমাল নেই।'

'শিউলি আমার জন্য ভাববে। ওকে কী করে একটা খবর যে দেবো।'

'অসম্ভব। খবর দেবার কোনো উপায় নেই। লালবাজার থেকে, কোনো রকমে মফস্বলের থানাগুলো থেকে সংবাদ নেওয়া হচ্ছে, কোথায় কোথায় দাঙ্গা লেগেছে। তাতে কেবল এটুকু জানা গেছে, আমাদের ওদিকে কিছু ঘটেনি। অবিশ্যি ঘটতেই বা কতোক্ষণ? সবটাই তো তৈরি ব্যাপার।'

ত্রিদিবেশ পরিচিত মানুষদের সামনে এসে যেরকম সাহস ফিরে পেয়েছিল, নিশ্চিন্ত বোধ করছিল, তা মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। নতুনতর উদ্বেগ ওকে ভাবিত করে তোলে। বলে, 'শিউলি সারা রাত ছট-ফট করে মরবে।'

'মরবে।' সবিতা বলে, 'সেটা তোমারই আহাম্মুকি। কিন্তু এখন এই ভেজা জামা-কাপড়ের কি করবে? ভিজে তো জোল হয়ে গেছে। এর পরেই অসুখ করবে।'

ত্রিদিবেশ এ কথারও কোনো জবাব দিতে পারে না। কারণ ওর জানা নেই, এখন ওর কী কর্তব্য। সবিতার বিরক্তিতে ও বিমর্ষ বোধ করে। জামাকাপড় নিশ্চয়ই ছাড়া উচিত, বদলানো দরকার। তার থেকেও বেশী দরকার মনে হয়, শিউলিকে একটা খবর পাঠানো, যা এখন প্রকৃতই অসম্ভব। সবিতা আবার বলে, 'এখন তোমাকে শিউলির চিন্তা করতে হবে না। ওকে দেখবার লোকের অভাব হবে না। খবর পাঠানো কোনো রকমেই যাবে না। শিউলি ধরে নেবে, তুমি কোথাও আছো। এখন আলাদা কাপড়চোপড় কোথায় পাওয়া যায়?' কথায় জিজ্ঞাসার সুর, কিন্তু জবাবের কোনো প্রত্যাশা নেই। তাকে চিন্তিত দেখায়।

ত্রিদিবেশ জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি এখন নরেনদার বাড়ি ফিরে যাবেন?'

'মাথা খারাপ নাকি?' সবিতা বলে, 'এখন এখান থেকে কে আমাকে ল্যান্সডাউনে নিয়ে যাবে? আমি তো ভেবেছি, এখানেই অফিসে পড়ে থাকবো, নয় তো কেণ্ডারডাইন লেনে রাতটা কাটিয়ে দেবো। কাল অবিশ্যি রেল না চললেও আমাকে ফিরে যাবার কোনো চেষ্টা দেখতে হবে। এখন আমাদের ইমিডিয়েট কাজ হলো, মহল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটি তৈরি করা।'

নিত্যানন্দ চৌধুরী ডেকে বলেন, 'এই যে কমরেড শিল্পী, আপনার পায়জামার তলায় আণ্ডার ওয়্যার-টোয়্যার কিছু আছে? না থাকলে গায়ের জামাটা খোলেন, খুলে নিংড়ান, তারপরে মাথাটা মোছেন। যান, বাইরে যান, আর পাখার তলায় দাঁড়াতে হবে না।'

ত্রিদিবেশ একবার সবিতা পণ্ডিতের দিকে তাকায়। সবিতা পণ্ডিত বলে, 'তাই করো, মাথাটা আগে মুছে এসো।'

বঙ্কিম মুখার্জি'র তখনো টেলিফোন নিয়ে একভাবে চিৎকার করে সংবাদ সংগ্রহ চলতে থাকে। দেওয়ালের ছবিতে ব্রেড চক্রবং ঘুরে যায়। অন্যান্যরা উৎসুক ব্যাকুল চোখে বঙ্কিম মুখার্জি'র দিকে তাকিয়ে কথা শোনে। ত্রিদিবেশ ঘরের বাইরে যায়। করিডরের দক্ষিণ প্রান্তে রেলিং-এর সামনে দাঁড়ায়। পায়জামার নিচে আণ্ডারওয়্যার থাকা সত্ত্বেও, পায়জামা খোলার কথা ভাবতেই পারে না। ও গায়ের জামাটাই টেনে খোলে। ভিজে ভারি জামা গায়ের সঙ্গে ল্যাপটানো। খুলতেও কসরত করতে হয়। কিন্তু মাথা মোছাটা ওর কাছে এখন মোটেই জরুরী মনে হয় না, যদিচ জামা খুলে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে নিংড়ায়। চোখে পড়ে, বৃষ্টির প্রাবল্য খুবই স্তিমিত। রাস্তার আলো জ্বলে। যানবাহন আর জন-মানবহীন সন্ধ্যারাত্রের রাস্তা যেন শ্মশানের মতো খাঁ-খাঁ করে। তথাপি বৃষ্টি থামতে দেখে ত্রিদিবেশ যেন আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং পরমুহূর্তেই আবার নিভে যায়। শিয়ালদায় যদি বা পৌঁছুনো সম্ভব হয়, বাড়ি যাবার কোনো উপায় নেই। ট্রেন বন্ধ। ও নিংড়ানো জামা দিয়ে মাথা মুছতে থাকে।

এই সময়ে একটা গাড়ি এসে রাস্তার ওপরে এই বিল্ডিং-এর নিচেই দাঁড়ায়। ত্রিদিবেশ নিচে উঁকি দেয়। মনে হয়, সেই তিনটি ঝাণ্ডা লাগানো জীপ গাড়িটাই। কয়েকজনের লাফিয়ে পড়ার আর ভিতরে ঢোকার শব্দ শোনা যায়। ত্রিদিবেশ ভেজা গেঞ্জি গায়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। উত্তর প্রান্তের সিঁড়ির দিক থেকে কয়েকজন এদিকে ছুটে আসে। ত্রিদিবেশ ঘরে ঢোকবার আগেই তারা ছুটে ঘরের মধ্যে ঢোকে। ত্রিদিবেশ তাদের পিছনে ঘরে ঢোকে। একজনের উত্তেজিত স্বর শোনা যায়, 'কমরেড বৃষ্টি থামতেই আবার নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের এখনই সে-সব জায়গায় যাওয়া দরকার।'

আর একটি স্বর বলে ওঠে, 'ব্যাপার খুবই সিরিয়স হয়ে উঠেছে। কয়েক জায়গায় এখন পুলিস আর মিলিটারি গুলি চালাতে আরম্ভ করেছে। অবস্থা পুলিসেরও আয়ত্তের বাইরে। সব থেকে খারাপ কথা, আমাদের কিছু নতুন ক্যাডারও কোনো কোনো এলাকায় দাঙ্গায় নেমে পড়েছে—স্পেশালি নর্থ ক্যালকাটায়।'

অমিদার স্বর শোনা যায়, 'ওসব কথা এখন থাক। সেই সব ক্যাডারকে পার্টি থেকে তাড়ানো হবে। এখনই প্রাদেশিক কমিটির সঙ্গে একটা যোগাযোগ করা দরকার। রাত্রের মধ্যেই কমরেডদের যতো বেশি সংখ্যায় জড়ো করতে হবে।'

এই সময়ে একজন দুটি বিশেষ এলাকার নাম করে বলে ওঠে, 'সেখানে কেউ যদি যাবার থাকে, আমাদের সঙ্গে গাড়িতে যেতে পারেন।'

সবিতা বলে ওঠে, 'আমি যাবো, আর আমার সঙ্গে একজন।'

'তবে আসুন, আর দেরি করবেন না।' সেই স্বর বলে।

সবিতা ত্রিদিবেশের সামনে এসে বলে, 'চলো, আমরা চলে যাই।'

'কোথায়?'

'মধুদির বাড়িতে। গাড়ি সেদিকে যাচ্ছে।'

বিভ্রান্ত ত্রিদিবেশ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবিতা ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলতে শুরু করে।

(ক্রমশ)

ভারতের অর্থনীতি

চলতি বছর কেমন যাবে
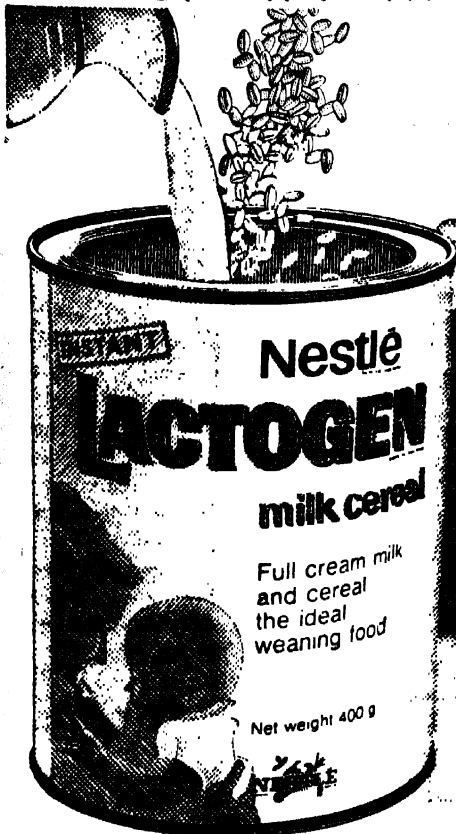
চলতি বছর কেমন যাবে,—সে সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিবেদন খুবই আশাব্যঞ্জক। রিজার্ভ ব্যাংকের বাৎসরিক প্রতিবেদনে (১৯৭৪-৭৫) বলা হয়েছে যে ১৯৭৫-৭৬ সালে দেশের উন্নয়ন হার ৫ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে থাকবে। চলতি বছরে শিল্প-উৎপাদন বেড়ে গেছে; কোন কোন শিল্পে পুনরুজ্জীবনের সূচনা হয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহেরও যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে, পরিবহণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা দূর করার সফল প্রচেষ্টা চলছে, এবং সর্বোপরি ভাল বৃষ্টিপাতের দরুন কৃষি-উৎপাদন, বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনের হার যথেষ্ট বেড়েছে। সেই সংগে সার, ভাল বীজ ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াবার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহও বেড়েছে। সুতরাং সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। এ বছর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সরকারী সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে যদি চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় তবে দেশের অর্থনীতির পক্ষে তা শ্লাঘার বিষয় হবে। মুদ্রাস্ফীতির হার কমতে কমতে প্রায় শূন্য-র কাছাকাছি এসেছে বলে সরকারী মহল থেকে দাবি করা হয়েছে। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেখানে মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে হিমসিম খাচ্ছে, সেখানে ভারতে যেভাবে মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য যে-সব ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে সে-গুলির পুরো ফল পেতে কিছু দেরী হবে ঠিকই। তবে মুদ্রাস্ফীতির হার এক বছরে যেভাবে কমেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে শৃংখলা ক্রমশ ফিরে আসছে। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা এবং জরুরী অবস্থার শ্রমবিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে না-ওঠা, উভয়ই মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাংকের বাৎসরিক প্রতিবেদনে দেশের জরুরী অবস্থা এবং নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, দেশের অর্থনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন ও মূলধন-বাজারে আস্থার ভাব ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই দুইটি ব্যবস্থার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের কর-প্রশাসন আরও সুদৃঢ় করায় সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তির পরিমাণও বেড়েছে। গ্রামীণ ঋণ মকুব করা, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা ঠিকভাবে কার্যকরী করা এবং জমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি নিয়ন্ত্রণ করা—প্রভৃতি ঘোষিত ব্যবস্থা ঠিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত হলে দেশে কৃষি-উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে বলে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম যে হঠাৎ কমে গেছে তার অনেক কারণ থাকলেও দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকার চোরা-কারবার, চোরা-চলান, কালো টাকা জমানো, মজুতদারী প্রভৃতি দমন করার জন্য যে সর্বাত্মক অভিযান চালিয়েছেন তার সুফল পরিলক্ষিত হয়েছে মূল্যস্তর হ্রাসের মধ্যে। ১৯৭৫ সালের ১৯শে জুলাই পাইকারী গড় মূল্যসূচী আগেকার বছরের স্তর অনুযায়ী ২·৭ শতাংশ কমে গিয়েছিল। রিজার্ভ ব্যাংকের আশা, খাদ্যসংগ্রহ ও খাদ্য আমদানির কর্মসূচী ঠিকভাবে অনুসৃত হলে মূল্যস্তর হ্রাসের যে প্রবণতা এখন দেখা যাচ্ছে তা বজায় থাকবে।

যদিও রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা ফিরে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তবুও ঘাটতি অর্থসংস্থান সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনে পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার কোন্ খাতে কত রাজস্ব পেয়েছে এবং কিভাবে তা খরচ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যাদির অভাবেই রিজার্ভ ব্যাংক এ-বিষয়ে কোন বিশ্লেষণ উক্ত প্রতিবেদনে করেনি। তবে এ-কথা বলা হয়েছে যে, ১৯৭৪-৭৫ সালে রেকর্ড পরিমাণ সম্পদ আহরিত হলেও (১,০৪৮ কোটি টাকা) ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭২৭ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালে ঘাটতির পরিমাণ ১৯৭৩-৭৪ সালের তুলনায় ২৩৪ কোটি টাকা বেশি। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ বেশি হলে সেই ঘাটতির অর্থসংস্থানের জন্য নতুন মুদ্রা ছাপার ব্যবস্থা হল অন্যতম পন্থা এবং স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যেতে পারে যে, নতুন মুদ্রা ছাপা হলে বর্তমান অবস্থায় তার পরিণতি হবে মুদ্রাস্ফীতি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, ১৯৭৪-৭৫ সালে দেশে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ ১৫ শতাংশ থেকে প্রায় ৬ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে। যে মুদ্রাসংকোচন নীতি বর্তমানে অনুসৃত হচ্ছে তা দেশের মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। অন্য দিকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক প্রদত্ত ঋণ সহজলভ্য করে তোলার চেষ্টা চলায় দেশের মোট বিনিয়োগও বাড়ছে। রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বর্তমানে ব্যয়-সংকোচন নীতি অব্যাহত রাখা উচিত এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনমূলক ও আয়-সৃষ্টিকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা উচিত। রিজার্ভ ব্যাংক এই প্রসংগে ঋণ-পরিকল্পনার (ক্রেডিট প্ল্যানিং) প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছেন। সে ঋণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা দিতে পারে, তার বণ্টন যাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক ও প্রয়োজনভিত্তিক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত বলে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাংকের বাৎসরিক প্রতিবেদন সর্বদাই তথ্যনিষ্ঠ হয়ে থাকে। যদি রিজার্ভ ব্যাংকের আশা অনুযায়ী ১৯৭৫-৭৬ সালে পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ পর্যন্ত উন্নয়ন-হার বাড়ানো সম্ভব হয় তবে আমাদের অর্থনীতি অন্ধকারের যুগ পেরিয়ে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে; কিন্তু সমস্যা হল, শুধু এক বছর পাঁচ শতাংশ থেকে ছয় শতাংশ পর্যন্ত জাতীয় আয় বাড়ালেই অর্থনৈতিক সংকট কাটবে না। জাতীয় আয় বাড়াবার ক্ষেত্রে যদি রিজার্ভ ব্যাংকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়, তবে পরবর্তী বছরগুলিতেও যাতে জাতীয় আয় অনুরূপ হারে অথবা তার চেয়েও বেশী হারে বাড়তে পারে তার ব্যবস্থা এখন থেকেই করতে হবে। এজন্য প্রধান প্রয়োজন হল কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহণ ব্যবস্থা ও শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা। দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার সাফল্যের উপর তা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

সুব্রত গুপ্ত

(সি ১২৭৮৩)

বাঁকুড়া ও বীরভূমের পূজা পার্বণ

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (চতুর্থ খণ্ড)। সম্পাদক অশোক মিত্র। দি কণ্ট্রোলার অব পাবলিকেশনস। দিল্লি। দাম ১০.৫০ টাকা।

১৯৬১ সালের আদমসুমারির ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকা ও গ্রাম সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের যে কর্মসূচী লোকগণনা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন, এই বইটি সেই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পূজো-পার্বণ ও মেলার বিবরণ সমেত তিনটি খণ্ড আগেই প্রকাশিত হয়েছে, বর্তমান খণ্ডে স্থান পেয়েছে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার পূজা-পার্বণ, মুসলমান, খৃস্টান ও আদিবাসীদের ধর্মীয় উৎসব এবং সেই সঙ্গে দুটি জেলার যাবতীয় মেলা। এই বইটিতে দুটি জেলার ৫৬৪টি শহর, বাজার ও গ্রামের বর্ণনা আছে। কোন্ গ্রামে কী কী দর্শনীয় বস্তু আছে, মন্দির বা পীর সাহেবের সমাধিস্থান থাকলে তা কত দিনের পুরানো, কখন মেলা হয়, মেলায় কী কী জিনিস বিক্রি হয়, কীভাবে ওই সব মেলায় যাওয়া যায়, সবই মোটামুটি এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এদিক থেকে এই বইকে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। বিস্তৃত বর্ণনা আছে বীরভূম জেলার বক্রেশ্বর, সাঁইথিয়া, তারাপীঠ, চারকলগ্রাম, চণ্ডীদাসের নানুর, লাভপুর, জয়দেব, কেন্দুবিল্ব, জামথালিয়া, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এবং বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী, জগন্নাথপুর, পাত্রসায়ের, ময়নাপুর, পাঁচাল, বিষ্ণুপুর, মটগোদা, গংগাজলঘাটির তপোবন আশ্রম (যেখানে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির শুভাগমন ঘটেছিল), শুশুনিয়া, ঝাঁন্টি পাহাড়ী, ছাতনা, বাঁকুড়া প্রভৃতির। বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল সম্প্রদায়ের তিনটি পুজো ও মেলার জন্য বিখ্যাত বেলবনি (নাগরদোলা মেলা), জামথেলোয় (বাঁধন পরব) এবং ধোবারগ্রাম (মারাংবুরু পুজো)। ধোবারগ্রামে পুজো ও মেলা সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। বিভিন্ন জনপদ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ থাকায় এই বইটি পড়েই জানা যায় যে, বীরভূমের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তকরণ হিন্দু থেকে হয়নি, হয়েছে বৌদ্ধ থেকে। ছাতনার রাজা চন্দ্রবর্মা সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের সম-সাময়িক হওয়ায় শুশুনিয়াতে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার যে স্বাভাবিক ঘটনা, বইটি পড়লে তা জানা যাবে।

আলোচ্য গ্রন্থে ২৬ পৃষ্ঠাব্যাপী "অন্বীক্ষা"য় তত্ত্বাবধায়ক সুকুমার সিংহ বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় সাক্ষর ও নিরক্ষরতার পরিসংখ্যান দিয়ে দুটি জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ বর্ণনা করেছেন। এই প্রসংগে দুটি জেলায় বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের তুলনামূলক জনসংখ্যার হিসাবও দেওয়া হয়েছে। জেলা দুইটিতে দীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করা সত্ত্বেও "রাজপুত ক্ষত্রিয়" ও "পশ্চিমা মাড়োয়ারি" সম্প্রদায় পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ব্যাপারে এ রাজ্যের মানুষদের দায়িত্ব কতখানি, শ্রীসিংহ সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৫৩ সালে নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউনে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন যে, ইংরেজ শাসন "হিন্দু তাঁত ও সুতা শিল্পীদের উচ্ছেদ করে এই অর্ধ-বর্বর, অর্ধ-অসভ্য সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অবসান ঘটিয়েছে এবং এশিয়ায় সবচেয়ে বড় এবং সত্যি কথা বলতে কী, সবচেয়ে মহৎ সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।" ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লব ও ইংরেজ বণিক সমাজ ভারতে আধুনিক সমাজ গড়ে তুলেছে বলে মার্কসের যে ধারণা হয়েছিল, বীরভূমের

গ্রাম্য সমাজ, তার প্রাচীন কুটিরশিল্পের অস্তিত্ব মার্কসের ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে বলে শ্রীসিংহ মন্তব্য করেছেন এবং এই মন্তব্যের পিছনে যে যুক্তির অভাব নেই, তা বলাই বাহুল্য।

দিল্লি থেকে প্রকাশিত হলেও কলকাতাতেও বইটি কিনতে পাওয়া যায়, এটা একটা সুসংবাদ।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উজ্জয়ন ভট্টাচার্যের বাদামী ঘোড়ার শেষ অশ্বারোহী (বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯, তিন টাকা) সম্ভবত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। তিন ফর্মার এই স্বল্পায়তন গ্রন্থে একটি মাত্র রচনাই পদ্য-ছন্দে লেখা। ছন্দ সেখানে কোনক্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মিল অস্পষ্ট, ছন্দও বেশ কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত। যেমন, "আর আমি নই পূর্ণ স্বাধীন/নেইও এখন আর সে সুদিন" পংক্তিতে 'ও' এবং 'সে' যে মাত্রা-জোগানোর তাড়নাসম্ভূত ধরা যাচ্ছে, 'স্বাধীন-সুদিন' মিল রূপেও দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর। অথচ, এই কবিই অবশিষ্ট কবিতাবলী যখন গদ্য-ছন্দে

লেখেন মনে হয় দারুণ কেতাদুরস্ত, সপ্রতিভ। বাদামী রঙের ঘোড়ার আরোহী তখন কী দৃপ্ত গতিতে ছোটান তার অশ্ব : "দেখো কেমন সূর্য নেমে যাচ্ছে মধ্যাহ্ন কাছে চলে/এখন কেমন শুধু শুধু বাদামী চাঁদের কথা মনে পড়ে যায়/এখন কেমন তোমার কাছে আর যাওয়া নেই কোন ছলেই/এখন কেমন পাখি শিকারীর মত অপেক্ষায় বসে থাকা!" এই জাতীয় 'ছন্দোহীন ছন্দে' উদয়ন ভট্টাচার্য এক ধরনের অনায়াস দক্ষতা অর্জন করেছেন, তার নিজস্ব একটি কণ্ঠস্বর ক্রমশ ফুটে বেরুচ্ছে। খুবই আশার কথা, কিন্তু তার আগে একটু ছন্দটন্দ জেনে নিলে বোধকরি উপকারই হবে। ছন্দ-ডাণ্ডার খেলা ছন্দ না জেনে ঠিকমতো খেলা যায় না শেষ পর্যন্ত।

*

অশোককৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত **আমরা যোগী** (প্রাপ্তিস্থান : বকমারী পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-১২, পাঁচ টাকা) একটু পুরনো ধাঁচের নাটক। অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাজাগরণ ও গার্হস্থ্য চক্রান্তের ওপর ভিত্তি করে লেখা এই নাটকে খুন আর গান সমান প্রাধান্য পেয়েছে। তবে ফাল্গুনী বক্সী ওরফে ফালারামের সংলাপ প্রমাণ করে, অশোকবাবু ভালো নাটক লিখতে চাইলে লিখতে পারবেন।

FACTS ABOUT FOREST

Multi-faceted Forest Development Plan Implemented by the West Bengal Forest Development Corporation in North Bengal.

Forest wealth of West Bengal is not adequate enough to meet the growing demand of forest produce in this State.

In order to fill the widening gap, the plan, based on clearly-defined objectives, lays emphasis on a seven-pronged development drive which would serve the interest of the people and the country. Involvement, co-operation and understanding are the keynotes of the scheme.

- Development and utilisation of hitherto untapped forest wealth in the hilly region.
- Construction of roads (at least 500 km in length) into dense forest areas with a view

to facilitate procurement and transportation of forest produce.

- Introduction of mechanised logging with modern equipment and ropeways.
- Continuous supply of raw materials to feed and develop forest-based industries.
- Plantation of special types of trees covering 9000 hectares of additional land in the next ten years for setting up a paper mill in North Bengal.
- Promotion of Tourism in the wild and beautiful natural surroundings in forest areas.
- Upliftment of socio-economic condition in the hitherto backward region of North Bengal and providing additional employment.

For the supply of forest-based raw materials and produce for your industry, please contact:

WEST BENGAL FOREST DEVELOPMENT CORPN. LTD.

(A Govt. of West Bengal Undertaking)
6A, Raja Subodh Mullick Square, 7th floor,
Calcutta-700013.

এক ফুটবলপ্রেমী রসিকতা করে বলছিলেন, "ঝাউতলার খেলা এখন বটতলায়। বাঁশি বিচারকের মুখে। আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলছে আইনজ্ঞদের মধ্যে।"

ইডেনে অবশ্য এখন ঝাউগাছ নেই, সিটি সিভিল কোর্টের পাশেও নেই বটগাছ। কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ইডেনের লীগ খেলা আদালতে যাওয়ায় ফুটবলের আমেজ যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শুধু মামলার ফলেই নয়, শেষ মুখের লীগ খেলাও অনেক পানসে হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি খেলা না হওয়ায়। আন্তঃরেল ফুটবলের জন্য বি এন আর এবং ইস্টার্ন রেল শেষদিকের কয়েকটি ম্যাচ খেলেনি। খিদিরপুর ক্লাব তাদের শেষ ম্যাচ খেলেনি ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে। বাটা স্পোর্টস ক্লাবও মোহনবাগানের সঙ্গে শেষ ম্যাচ খেলেনি। এবং যা আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে শীল্ডেরও দুই-একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলাও না হতে পারে।

খেলার জন্যই ক্লাব এবং ক্লাবের জন্যই প্রতিযোগিতার আয়োজন। লীগই হোক আর শীল্ডই হোক খেলা না হলে তার গুরুত্ব এবং মর্যাদা কমে যায়। প্রকারান্তরে নিয়ামক সংস্থাকেও হেয় করা হয়। এই কারণেই আই এফ এ-র বিদায়ী সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত মাঠে অনুপস্থিত দলের পয়েন্ট কাটার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব পাশ করাতে পারেননি।

আই এফ এ কে? না, ক্লাব প্রতিনিধি-দের নিয়ে গড়া ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। ক্লাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতার। ক্লাবই যদি কোন কাজের দ্বারা নিয়ামক সংস্থাকে হেয় করে তবে তার মর্যাদা বাড়বে কিভাবে? কিভাবেই বা সেই সংস্থা শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রশাসন চালাবে? একেই তো নানা কারণে এখন প্রশাসন চালানো অনেক শক্ত। আমরা কথায় কথায় ব্রিটিশ আমলের প্রশাসন সম্পর্কে পঞ্চমুখ হয়ে উঠি। কিন্তু তখন কি এত ঝটঝামেলা ছিল? চ্যারিটি খেলার অনুমোদন, খেলার তারিখ এবং মাঠ পাবার জন্য তখন কি আই এফ এ-কে রাজ্য সরকারের মুখাপেক্ষী হতে হত? নাকি খেলার ব্যাপার আদালতে গড়াত? না খেলে মাঠ থেকে বের হয়ে যাওয়া বা খেলতে অস্বীকার করার ঘটনাও ঘটেনি কালেভদ্রে ছাড়া। আর এখন ফুটবলকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল লেগেই আছে। একটি বড় খেলার ব্যবস্থা করতে আই এফ এ-কে হিমসিম খেতে হচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই, খেলার জনপ্রিয়তা যত বাড়ছে, খেলার ও খেলোয়াড়ের সংখ্যা যত বাড়ছে তত কমে যাচ্ছে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব।

খেলার মাঠে

মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্ট বেঙ্গলের খেলা নিয়ে মহমেডান দলের মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এত কথা বলতে হল। অবশ্যই অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অধিকার সবারই আছে। সুবিচারের জন্য আদালতে যাবার প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না, অবিচার হলে। কিন্তু বিচারের আগেই আদালতে যাওয়া সাংগঠনিক নিয়মের পরিপন্থী।

আই এফ এ-র সংবিধানেই রয়েছে, গভর্নিং বডি, সাব কমিটি বা কোন শৃংখলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন ক্লাব আদালতে যেতে পারবে না। কিন্তু কে মানছে সেই সংবিধান। খেলতে অস্বীকার করা বা মাঠ ত্যাগ করা গুরুতর অপরাধ হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু সে অপরাধও তো হামেশাই ঘটছে।

তবু সুখের কথা, নানা অসুবিধা এবং বাধাবিপত্তির মধ্যেও লীগের খেলা শেষ হয়েছে, শীল্ডও শেষ হবার মুখে। অবশ্য আদালতের রায়ে বা নতুন মামলার ফলে ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা অসিদ্ধ হলেও বলব আই এফ এ সুষ্ঠুভাবেই মরসুম শেষ করেছে।

ডেভিস কাপ ফাইনালে সুইডেন

ডেভিস কাপের খেলায় সুইডেন সর্ব-প্রথম ফাইনালে উঠেছে, সেমিফাইনালে চিলিকে ৪—১ খেলায় পরাজিত করে। এখন তাদের ফাইনাল খেলতে হবে অস্ট্রেলিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে অপর সেমি-ফাইনালের বিজয়ীর সঙ্গে।

সুইডেনের বাসটাড শহরে চিলি-সুইডেন খেলাটিকে কেন্দ্র করে টেনিস মহলে দুশ্চিন্তা জেগে উঠেছিল। চিলিতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সুইডেনে জনমত প্রবল। উড়ো চিঠি দেওয়া হয়েছিল চিলি দল যদি বাসটাডে খেলতে আসে তবে তাদের এক নম্বর খেলোয়াড় জেইম ফিলোলকে হত্যা করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো তো হবেই। হত্যার হুমকিতে ফিলোল সহ চিলির শীর্ষস্থানীয় তিনজন খেলোয়াড়ই বাসটাড যেতে অস্বীকার করে। তার ফলে ওদের বদলে আর তিনজন খেলোয়াড়কে নিয়ে চিলির ডেভিস কাপ দল গড়া হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক টেনিস সংস্থার অভয় বাণী এবং সুইডিস সরকারের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে প্রথম তিনজন মত বদল করে বাসটাডেই খেলতে আসে। তারা পরাজিত হবার পর অবশ্য প্রাণ নিয়েই দেশে ফিরে গেছে। কিন্তু প্রায় তিন হাজার জনতার বিক্ষোভ এড়াতে পারেনি, প্রচুর প্রহরী বেষ্টিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও। আগে থেকে আরও হুমকি দেওয়া হয়েছিল খেলা হলে সুইডেনের রেডিও এবং টেলিভিসন ভবন বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

টেনিস যুদ্ধ তো নয়, যেন বাসটাডে সত্যিকার যুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। চিলির খেলোয়াড়দের রাখা হয়েছিল কোর্টের অদূরে কয়েক সহস্র সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত এক ছোট কাঠের ঘরে। তারা যখন কোর্টে অনুশীলন করছিল তখন আকাশে উড়ছিল সশস্ত্র বাহিনীর হেলিকপটার, চারদিকে ছিল প্রহরীর পাহাড়। খেলার সময়ও একই অবস্থা। খেলা দেখার জন্য দর্শকদের কাছে টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল পুংখানুপুংখ-ভাবে বিচার-বিবেচনা করে।

খেলাকে কেন্দ্র করে এ কী বিড়ম্বনা। হত্যার হুমকিতে ফিলোল আগেই বলেছিল, এই ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে কোন খেলোয়াড় কি তার যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে? খুবই সত্যি কথা। যদিও শক্তি, নৈপুণ্য এবং স্ট্র্যাটেজি খেলা জয়ের মূল কথা, তবু মনের সঙ্গে ক্রীড়াভূমিকার সম্পর্ক অনেকখানি। অবশ্য দেশের পক্ষে ফিলোলই একটি সিঙ্গলস জিতেছে অলন্ডাসনের বিরুদ্ধে। সুইডেনের ৪—১ খেলায় জয়ের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা বিয়র্ন বর্গের।

একলব্য

ল্যাকমে
এক্সোটিকা
ট্যাল্ক এক্সোটিকার মন মাতানো সৌরভ দিকে
দিকে ভেসে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে চলছে
চলবে চলছে চলবে চলছে চলবে
ল্যাকমে
dCP/LE/4a Ben

খেলাধুলোয় প্রবাসী ভারতীয় পুরোহিত

ভবানীপুর ক্লাব তাঁবুতে ক্রীড়া-সাংবাদিকদের সান্ধ্য মজলিসে প্রায় প্রতি দিনের সঙ্গী ছিলেন দীনবন্ধু ব্যানার্জী। এমন দিন কমই ছিল যেদিন তিনি উপস্থিত থাকতেন না। মুখ্যত ভলিবল খেলা এবং চেতলা রাখী সঙ্ঘের সাংগঠনিক কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। রাখী সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সহ-সম্পাদক ছিলেন। ভলিবলের রেফারি হিসাবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন।

সেই সুবাদেই ১৯৫৬-য় চলে গেলেন প্যারীতে বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের রেফারি হয়ে।

কোনো কোনো ভারতীয় আম্পায়ার অবশ্য আগে আন্তর্জাতিক হকি খেলা পরিচালনা করেছেন। কিন্তু খেলাধুলোর কোনো বিশ্ব প্রতিযোগিতায় দীনবন্ধু ব্যানার্জীই প্রথম ভারতীয় পরিচালক। সম্ভবত এশিয়ার মধ্যেও প্রথম। প্যারীতে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন। না হলে ফাইনাল পর্যায়ে রুমানিয়া ও ফ্রান্সের খেলার পরিচালনার ভার ওঁর উপর পড়ত না। ওই খেলার পর আবার তকমা জুটল 'পৃথিবীর প্রথম সারির একজন'। তকমা দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশনই।

তারপর দীনবন্ধু ব্যানার্জী আর ভবানীপুর ক্লাব তাঁবুর সান্ধ্য মজলিসে ফিরে আসেননি। আমরা যখন তাঁর কথা প্রায় ভুলতে বসেছি তখন ক্যালকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী স্মারক পুস্তিকায় দেখলাম তাঁর পাতাজোড়া ছবি।

১৯৫১-য় ভলিবল রেফারি হবার পর ১৯৫২-য় হকি আম্পায়ার হয়েছিলেন। ১৯৫৩-য় হয়েছিলেন ক্রিকেট আম্পায়ার ও রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। বলা বাহুল্য, সব ক্ষেত্রে পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে পাস করে এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে। সি আর এ-র স্মারক পুস্তিকা থেকে জানা গেল তাদের সদস্য এখন ইংলণ্ড রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং ইংলণ্ডে ফুটবল খেলা পরিচালনা করছেন। এদিক দিয়ে রবীন সরকারের পর দীনবন্ধু ব্যানার্জী দ্বিতীয় ভারতীয়। ভারতের আর কেউ এখন পর্যন্ত ইংলণ্ড রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে পারেননি।

খবর নিয়ে আরও জানা গেল, ১৯৫৬-র প্যারিস থেকেই দীনবন্ধু ব্যানার্জী ইংলণ্ড চলে গিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেননি। ওঁর সম্বন্ধে মাঝে সাঝে খবরাখবর পেলেও শেষ খবর পাই গত বছর তেহরান থেকে ফিরে আসা দুই একজন ভারতীয় প্রতিনিধির কাছে। আন্তর্জাতিক প্যানেলের রেফারি লণ্ডন থেকে তেহরান এসেছিলেন এশিয়ান গেমসের ভলিবল খেলা পরিচালনা করতে। দীর্ঘ ১৮ বছর পরে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন।

খেলাধুলোর পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতের অনেকেরই সুনাম আছে। যেমন রেফারি প্রতুল চক্রবর্তী, আর কে দত্ত, নৃসিংহ চ্যাটার্জী, হকি আম্পায়ার ডি ঘোষ, গিয়ান সিং প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন। তবু ভলিবল, ফুটবল, ক্রিকেট এবং হকি খেলার পরিচালক হিসাবে দীনবন্ধু ব্যানার্জী বিশেষত্ব দাবী করতে পারেন।

চারটি খেলার পরিচালক হিসাবে যোগ্যতার সনদ কলকাতা থেকে লাভ করলেও ভলিবল ছাড়া অন্য তিনটি খেলা

দীনবন্ধু ব্যানার্জী

পরিচালনার জন্য বিলেতেও পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ইংলণ্ডে এফ এ (ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) থেকে পেয়েছেন রেফারির সার্টিফিকেট, সাদার্ন কাউন্টি হকি আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে হকি আম্পায়ারের এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্রিকেট আম্পায়ার্স থেকে ক্রিকেট আম্পায়ারের।

এই ১৮ বছর ধরে বিলেতে চারটি খেলা পরিচালনার জন্যই ওঁর ডাক পড়েছে। লণ্ডন অ্যামেচার ফুটবল লীগ এবং সিনিয়র কাপের প্রথম শ্রেণীর খেলার জন্যও। সম্ভবত ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফরকালে ভারত বা পাকিস্তানের উদ্বোধনী খেলায় দীনবন্ধু ব্যানার্জীর আম্পায়ার হওয়া প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। সাউথ গেট ভলিবল ক্লাব ইংলণ্ডের একটি নামী দল। ওরা যখন হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী বা ফ্রান্স সফরে যায় আম্পায়ার হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যায় খেলার ওই ভারতীয় পুরোহিতকে। ওই সব জায়গার সংগঠক সমিতির কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ডাক আসে। চার বছরের জন্য এশিয়ান ভলিবল রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ার সাংগঠনিক দায়িত্বও কম নয়। ৫৫ বছর বয়সী এই অবিবাহিত ভারতীয় খেলাধুলোর আইনকানুন এবং পরিচালনা নিয়ে আনন্দের মধ্যে বিলেতে দিন কাটাচ্ছেন।

ওদেশের পরিচালনার সঙ্গে আমাদের দেশের পরিচালনার পার্থক্য এবং পরিচালকদের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ নিয়ে দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে সেদিন অনেক আলাপ হচ্ছিল। দীনবন্ধু বললেন, আমাদের দেশের পরিচালকরা আইনকানুন সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, পরিচালনার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই। তবে শারীরিক পটুতা এবং মানসিক দৃঢ়তার দিক দিয়ে ইউরোপের পরিচালকরা বেশী যোগ্যতার অধিকারী। আর অ্যালাউন্সের পরিমাণ বেশি বলে তারা জীবনযাপন সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত। আইন-এর মধ্যে ডুবে থাকতেও উৎসাহী। ফুটবল ম্যাচের গ্রেড অনুযায়ী একজন রেফারি প্রতি খেলার জন্য পান দুই থেকে দশ পাউণ্ড। অর্থাৎ ৪০ থেকে ২০০ টাকা। এর উপর আছে যাতায়াত ও হোটেল খরচ। ক্রিকেট আম্পায়াররা সাধারণত প্রতি দিনের জন্য পান ৫ পাউণ্ড (প্রায় ১০০ টাকা)। অফ সিজিনে প্রতি সপ্তাহে ১৫ পাউণ্ড করে। টাকাটা দেয় এম সি সি। ভলিবল এবং হকি খেলার পরিচালকরা সাধারণ ম্যাচের জন্যও ২০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত পেয়ে থাকেন। আর আমাদের দেশে রেফারি, আম্পায়ারদের পক্ষে সারা বছরের অ্যালাউন্স দিয়ে বুট, বাঁশি, প্যাণ্ট, জামার খরচ সংকুলান করা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত দীনবন্ধু ব্যানার্জীকে ফুটবল খেলায় গোলকিপারকে চার্জ করার প্রশ্নটি তুলেছিলাম। আমাদের এখানে গোলকিপার বল ধরলে আক্রমণ দলের খেলোয়াড় তার কাছে গেলেই ফাউলের নির্দেশ দেওয়া হয়, গায়ে গায়ে স্পর্শ না হলেও। দীনবন্ধুবাবু বললেন, বিলেতের রেফারিরা ফেয়ার চার্জে কখনো বাঁশি বাজান না। গোলকিপার ধরলে তাকে আইনসম্মতভাবে অবশ্যই চার্জ করা যায়।

মুকুল

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

থেকে একটি ছোট্ট
মেয়েকে বাঁচিয়ে
!!

...তীরে ফিরে আসছেন।

এবারে বলো, তোমার নাম কী...
না, বলব না...

অরণ্যদেবের নন্দন-কাননে---
কোথায় বাড়ি তোমার?
তাও বলব না।

আমার কিচ্ছু মনে পড়ছে না ---- কিচ্ছু না---
আশ্চর্য ব্যাপার!

কিচ্ছু মনে নেই!
তাতে কী হয়েছে.. চলো, ওই হরিণ ছানার সঙ্গে খেলবে।

কী সুন্দর হরিণ!
কিচ্ছু মনে নেই! আশ্চর্য! গলায় ওই রত্নহার.. হীরে ---চুনি--পান্না--- কে এই মেয়েটি?

সমুদ্রের মধ্যে কে ওকে ভেলায় ভাসিয়ে দিল?
কে এই ছোট্ট মেয়েটি?
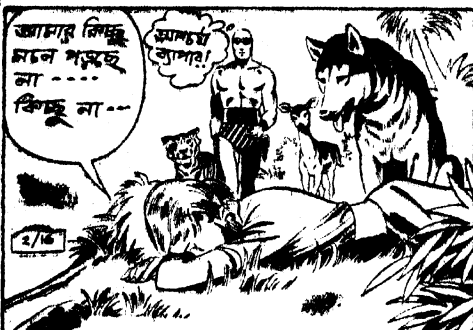
"সেই চোখ" (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে উত্তমকুমার ও মহুয়া রায়চৌধুরী

মতামতের মন্তাজ

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এ দেশে নতুন নয়। কিন্তু রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এর আগে কখনও আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি। এই প্রথম পশ্চিম বাংলা সরকার কলকাতায় আন্তর্জাতিক উৎসবের আয়োজন করেছেন। আগামী মাসেই উৎসব। এ ধরনের উৎসব আয়োজনের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলা সরকারের অগ্রণী ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে। আন্তর্জাতিক উৎসবের জন্য কলকাতার চাইতে বেশি উপযুক্ত শহর ভাবতে আর কোথাও নেই। কলকাতায় ফিলম তৈরির এবং ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর যে ঐতিহ্য রয়েছে সেটাও অন্যত্র দুর্লভ। এই উৎসবে বিদেশ থেকে ৩৫ এবং ১৬ মিলিমিটারের প্রায় ৪২টি ছবি আসছে। আশা করা যায়, প্রতিটি দেশের সর্বাধুনিক ছবিই এখানে পাঠানো হবে।

• • •

আন্তর্জাতিক ফিলম ফেস্টিভ্যালের প্রভাব, তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন কথা বলার প্রয়োজন হয় না। ভারতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসবের প্রভাবে এ দেশে যে নতুন ধারার ফিলমের জন্ম হয়েছিল সেটা অনেকেরই জানা। একাধিক শিল্পনিষ্ঠ পরিচালক এই ফেস্টিভ্যাল থেকে নতুন জাতের ছবি তৈরির প্রেরণা পেয়েছিলেন। তবে দুঃখের সঙ্গে এই কথাও বলতে হবে, কলকাতায় নতুন ধারার ছবি তৈরির আন্দোলন বা প্রচেষ্টা তেমন ব্যাপক হল না। দু-একজন পরিচালক অবশ্য চিরাচরিত নিয়মের বাইরে ছবি করেন, কিন্তু গতানুগতিক ধারাকে অস্বীকার করে ছবি করার মতো পরিচালক খুব বেশি নেই। হয়তো পরিবেশ প্রতিকূল। এবং এখানকার বর্তমান ফিলম ইনডাসট্রিতে আপসহীন পরিচালকদের স্থান নেই। কলকাতার পক্ষে এটা লজ্জার বিষয়। কোন কোন দুঃসাহসী পরিচালক নানা রকম বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আপসহীন ছবি তৈরির কাজে লেগে যান। বোমবাইয়ে এমন দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ইদানীং খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় যে তার অভাব এটাও দুঃখের বিষয়।

• • •

এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় যে "ইনটারন্যাশনাল ফিলম ফেসটিভ্যাল অব দ্য আদার সিনেমা" অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার মূল্য অনেক। "আদার সিনেমা" কথাটা অবশ্য খুব পরিষ্কার নয়। আদার সিনেমা বলতে কি "প্যারালাল সিনেমা" বোঝাচ্ছে? যদি তাই হয় তবে সেটা নিশ্চয়ই আশার কথা। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তথাকথিত কমারশিয়াল ছবির ফেসটিভ্যাল করার কোন মানে হয় না। ফেসটিভ্যাল-এ সব সময়েই বিভিন্ন দেশের প্রথম সারির ছবি এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চিত্রকর্ম দেখা যায়। এখানে যখন "আদার সিনেমা" কথাটির উল্লেখ রয়েছে তখন আশা করা যায় যে, নতুন ধরনের ছবিই বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা হবে। অর্থাৎ এমন ধরনের ছবিই ফেসটিভ্যাল-এ আসবে যেগুলিকে কোনভাবেই সাধারণ প্রমোদ-চিত্র বলা যায় না। তাই এই ফেসটিভ্যাল-এর গুরুত্ব অনেক বেশি। কমারশিয়াল সিনেমাকে কতভাবে চিত্তাকর্ষক করা যায় তার নিত্য নতুন চেষ্টা তো এ দেশে নিয়মিতই হচ্ছে। একমাত্র একসপেরিমেনটাল বা আর্ট ফিলম তৈরির চেষ্টাই বিশেষ দেখা যায় না। আদার সিনেমার ফেসটিভ্যাল দেখে এখানকার তরুণ চিত্রপরিচালকরা যদি নতুন ধারায় ছবি তৈরির প্রেরণা পান তবেই ফেসটিভ্যাল সার্থক হবে। যাঁরা বকস-অফিসের স্বার্থে ছবি করেন তাঁদেরও বিদেশী ছবি থেকে অনেক কিছু নেবার আছে। বিদেশী ছবির টেকনিক্যাল কাজ সব সময়েই লক্ষ করার মতো। ফেসটিভ্যাল দেখার বড় লাভ অবশ্য তাঁদেরই যাঁরা সিনেমা মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কিছু সৃষ্টি করতে চান। অতএব কলকাতায় আসন্ন ফেসটিভ্যালের জন্য বোদ্ধা দর্শক এবং চিত্রনির্মাতারা যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন তাতে সন্দেহ নেই।

রাগ-অনুরাগ

(সত্যানুধ্যা প্রোডাকসনস)

রাগ-অনুরাগ-এর অতি আধুনিক নায়িকা এক আধুনিক গায়কের অন্ধ ফ্যান, কিন্তু সে তার আইডল-এর চেহারা কখনও দেখেনি—না সাক্ষাতে না ছবিতে। এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাই হচ্ছে "রাগ-অনুরাগ" কমেডির ভিত্তি। নায়িকা কেন তার প্রিয় গায়কের ছবি দেখতে পায়নি তার একাধিক যুক্তি অবশ্য ছবিতে দেওয়া আছে। এক, গায়ক-নায়ক বেতার-শিল্পী এবং সে কোন বিচিত্রানুষ্ঠানে গান করে না। দুই, সে কাগজে তার ছবি ছাপতে দেয় না। তিনকে নয়, ফিলমে নয়, শুধু রেডিওতে গেয়েই নায়ক জনপ্রিয়। রেডিওতেই বা সে মাসে কয়টা সিটিং পায়? শুধুই রেডিওশিল্পী আজকের দিনে কতখানি জনপ্রিয় হতে পারে সেটা আর কেউ না জানুক কাহিনীকার-

"রাগ-অনুরাগ"/রঞ্জিত, সুমিত্রা, অনুপ

গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জানার কথা। যাই হোক, গল্প গল্পই। তা ছাড়া, কমেডিতে বুদ্ধি বিসর্জনের সুবিধা তো আছেই। কাজেই নিজেকে বরুণ বলে পরিচয় দিয়ে এবং বন্ধু বরুণকে (অনুপ-কুমার) বিখ্যাত গায়ক শঙ্কর সাজিয়ে নায়ক অর্থাৎ শঙ্কর সেন (রঞ্জিত মল্লিক) নায়িকা মিতাকে (অপর্ণা সেন) ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবে তাতে আর অসুবিধা কী। অসুবিধা অবশ্যই আছে, কারণ বরুণ গান জানে না। এই অসুবিধাগুলিই কমেডির উপকরণ।

পরিচালক দীনেন গুপ্ত তাঁর এই ছবিকে কমেডি হিসাবেই উপস্থিত করেছেন। সব ঘটনাই যে মেনে নেওয়া যায় না সেটা তিনিও নিশ্চয়ই জানতেন। তবে তিনি দর্শককে যে প্রায় অনবরত হাসাতে পেরেছেন এটাই তাঁর কৃতিত্ব। চিত্রনাট্যও (শেখর চট্টোপাধ্যায়কৃত) তর তর করে এগিয়ে গেছে। আসল গল্প যেখানে এগোচ্ছে না, ছবিটি সেখানেও কিন্তু মন্থর নয়। এক্ষেত্রে এডিটিংয়ের (রমেন ঘোষ) দান আছে। ঘটনা বা পরিস্থিতি পৌনঃ-পুনিক হলেও তাতে হাসির খোরাক আছে। তা ছাড়া, কালিম্পংয়ের পটভূমি পরিচালক ভালভাবে ছবিতে ব্যবহার করেছেন। ক্যামে-রার কাজও (পরিচালকের নিজের) বেশ ভাল। তাই ছবিটি দেখতেও ভাল লাগে।

কমেডি চিত্রে রূপ-অভিনয় সব চাইতে ভাল করেছেন রবি ঘোষ। অনুপকুমারও কম যান না। তাঁর প্রণয়িনীর বেশে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ও স্বচ্ছন্দ। নায়কের চালাকি ধরে ফেলার পর বরুণের সঙ্গে নায়িকা অপর্ণা সেনের প্রেমের অভিনয় করে যাওয়ার অভিনয়ে কেমন যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কালিমপংয়ে ওই সময়ে শীত একটু কম, তাই বলে গ্ল্যামারাস হওয়ার জন্য কলকাতার গরমে যে পোশাক মানানসই কালিমপংয়ে সেটা বেমানান। নিজের তৈরি দুর্দশার মধ্যে নায়ক রঞ্জিত মল্লিক নিজেকে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছেন। হাসির কারণ ঘটিয়েছেন চিন্ময় রায়, যদিও ওই চরিত্রটি অপরিহার্য নয়। শেখর চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা

মজুমদার প্রমুখ শিল্পী তাঁদের অভিনীত চরিত্রে স্বাভাবিক।

গায়ক-নায়ককে ছবিতে সাধারণত ভোর-বেলায় তানপুরা হাতে নিয়ে রাগ-সংগীত সাধতে দেখা যায়। তারপরই সে চুটিয়ে আধুনিক গান (পশ্চিমী ঢঙ মেশানো পপ জাতীয় গানও বাদ যায় না) গাইতে শুরু করে। এ ছবিতে অবশ্য একটি গান রাগ-ভিত্তিক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া গানের সুর এবং তাঁর গাওয়া গান প্রায় সব ক'টিই হিট করবে। আধুনিক গানের সুর সত্যিই উপভোগ্য। গানই ছবির প্রধান আকর্ষণ বলা চলে। গানগুলি, বলা বাহুল্য, কাহিনীকার পুলকেরই রচনা। প্রথম গানটি শুনেই দর্শক প্রথম পুলকিত হবেন—কথা ও সুরের জন্য। নায়িকার মুখেও লতা মঙ্গেশকরের গান আছে। কিন্তু নায়িকা বেতার-শিল্পী হয়ে দেশবিখ্যাত হল না।

শুটিং চলছে...

আজ থেকে কুড়ি-একুশ বছর আগে মালা সিন্‌হা, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর এই ফ্লোরে, সর্বপ্রথম মুভি ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তখন ভবানী-পুরের উঠ্‌তি গায়িকা বেবী সিন্‌হা। অল্প দিনের ব্যবধানে নায়িকা মালা সিন্‌হা। যুগপৎ বাংলা ও হিন্দী ছবিতে কাজ করতে করতে প্রতিষ্ঠা হিন্দী ছবিতেই। এতদিন হিন্দী ছবির জগতে জনপ্রিয়তার প্রায় শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করে আজ বম্বের প্রবাস থেকে, অবসর জীবনযাপনের অভিপ্রায়ে, স্বামীর কর্মক্ষেত্র কাঠমাণ্ডু যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতায় এসেছেন—বেশ কিছু দিন বিরতির পর পুনরায় একটি বাংলা ছবিতে কাজ করতে। আর এমনই ঘটনাচক্র সেই ফ্লোরে—। এখন শুটিং চলছে। ছবির নাম: দম্পতি। যথাক্রমে সরোজ-সুচারু রূপায়িত করছেন রঞ্জিত মল্লিক-মালা সিনহা। পটভূমিকা, বেনারস। আপাতত অন্দরের আঙিনায় হুলস্থুল কাণ্ড। অদূরে দাওয়ায় বসে সরোজ খবরের কাগজ পড়ছে। মা, ধীরে ধীরে এগিয়ে যান সেদিকে। সাতসকালে ধর্মকথা শুনিয়ে হিন্দুদের নানা রকম সংস্কারবোধের প্রতি সরোজের মনকে বিশ্বাসী করে তুলতে চান যাতে করে তাঁর উদ্দেশ্যটা সফল হয়। উদ্দেশ্যটা কি শুনি? একটা কবচ ধারণ করতে হবে। কেন? কেননা, এই সংসারে স্নেহময়ী মা আছেন। তাঁর হীরের টুকরো দুই পুত্র—সরোজ এবং পঙ্কজ। এ ছাড়া লক্ষ্মী প্রতিমার মত পুত্রবধূ সুচারু। সব কিছু থেকেও যেন কি নেই। নেই সরোজ-সুচারুর সন্তান। এ নিয়ে অবশ্য দুজনের মধ্যে কোনরকম মানসিক অসংযোগ নেই। শত হলেও মায়ের মন। মনে মনে সুচারুরও তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই সুন্দর সংসারে একটা ফুটফুটে শিশু আসুক। ঘর আলো করুক। আনন্দ একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠুক। মার ধারণা কবচ যদি সে হাতে ধারণ করে তা হলে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যাবে। সরোজের মন সংস্কারমুক্ত। সে এসব বিষয়ে ঘোর অবিশ্বাসী। সুতরাং, তার মুখে সংলাপ 'তোমরা কি আমাকে পাগল পেয়েছ—।' সংলাপ শেষ হতে না হতে সে উঠে ঘরে চলে যায়। তার যাত্রাপথের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মা। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পঙ্কজ ও সুচারু উপস্থিত। ওরা পরস্পরের দিকে মৃদু হাসে। মাকে লক্ষ করে পঙ্কজ কিন্তু বেশ রাগতস্বরে বলে, "আচ্ছা, কি আরম্ভ করেছ! দাদাকে তোমরা পাগল না করে ছাড়বে না?" মা তবুও হাল ছাড়তে পারেন না।

শ্যুটিং চলছে : "সম্পতি" ছবির সেই দৃশ্যে মালা সিন্‌হা ও পার্থ মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

সুচারুকে অনুরোধ করেন, 'দেখ বউমা তুমি যদি পার—।' শাশুড়ির কথা ফেলতে পারে না। সুচারু কবচটা নিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হলে পরিচালক অনিল ঘোষ ঘোষণা করলেন 'কাট' অথবা ছেদ। এবার ক্যামেরা স্থান পরিবর্তন করবে। পরবর্তী দৃশ্য গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হবে। মধ্যান্তরে পরিচালক জানালেন এ ছবি নির্মিত হচ্ছে ফিল্ম আর্ট ইনটারন্যাশনালের ব্যানারে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দৈনন্দিন' অবলম্বনে। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সুমনা ভট্টাচার্য এবং তিনি, যুগ্মভাবে। আজকের সেটে উপস্থিত শিল্পীদের মধ্যে শোভা সেন (মা), পার্থ মুখোপাধ্যায় (পঙ্কজ), সন্তোষ ঘোষাল (সরোজের বন্ধু) প্রমুখরাও আছেন। আছেন উৎপল দত্ত, সুলতা চৌধুরী, মহুয়া রায়চৌধুরী এবং রবি ঘোষ। এ ছবির বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। অসাধারণ কিছু করবার প্রয়াস নয়। সাধারণ গল্প সহজ, সরলভাবে বলার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শ্রীঘোষ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন কলকাতার স্টুডিওতে। একদা পরিচালক রাজেন তরফদারের প্রধান সহকারী ছিলেন। অতঃপর বমবেতে পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের। কিছুদিন পূর্বে বমবেতে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করেছেন। প্রথম ছবি 'অনুমান' শেষ। সেখানে দ্বিতীয় ছবি শুরু করবেন। এখানেও—'শকুন্তলা', কালারে। নায়ক-নায়িকা হবেন খুব সম্ভবত রঞ্জিত মল্লিক ও মিঠু মুখোপাধ্যায়।

শ্যুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে মালা সিন্‌হা গল্প করছিলেন। প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছিলেন।

—কত বছর পর কলকাতায় এলেন?

—তা অনেক দিন হল। 'অভয়া শ্রীকান্ত'র শ্যুটিং করে যাবার পর আসিনি।

—কেমন লাগছে?

—ভীষণ ভাল লাগছে। কত পুরনো পুরনো কথা মনে পড়ছে। কত চেনা জানা লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আমি আমার জন্মস্থানে ফিরে এসেছি ভাবতেই ভীষণ ভাল লাগছে। কিন্তু কলকাতার দৈন্যদশা দেখে ভারী দুঃখ হচ্ছে।

বার্তাবহ

ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ারড অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল ২১ সেপ্টেম্বর, লাইট হাউস সিনেমায়। সভায় আসতে না পেরে প্রধান-অতিথি তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখারজি এক বার্তায়

চলচ্চিত্র আন্দোলনে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা-এর অবদানের প্রশংসা করেন। বিজেতাদের হাতে পুরস্কারগুলি দেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী। 'কোরাস' ছবির জন্য পুরস্কার নেন মৃণাল সেনের স্ত্রী গীতা সেন। পুরস্কারজয়ীদের অনেকেই অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। সভার শেষে পুরস্কৃত ছবিগুলির কিছু কিছু অংশ পর্দায় দেখানো হয়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃত্তি ও কয়েকজন শিল্পীর সংগীত পরিবেশনের পরে সভা শেষ হয়।

বোম্বাই-বিচিত্রা

বোম্বাইয়ের আরও একটি সিনেমা-পত্রিকা নিজেদের তরফে পুরস্কার প্রবর্তন করল। পত্রিকাটি হল ফিল্ম ওয়ারল্ড। সম্প্রতি উত্তর বোম্বাইয়ের বিরাট ষন্মুখানন্দ হল-এ তাঁদের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত, ওইখানেই গত কয়েক বছর ফিল্ম ফেয়ার-এর পুরস্কার-দান অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। স্টার ডাস্ট-এর মতো ফিল্ম ওয়ারল্ডও কোনও সংবাদপত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নয়। সম্পাদক টি এম রামচন্দ্রনের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলেই বিদেশে ওই পত্রিকার কিছু প্রচার সম্ভব হয়েছে। ১১ সেপটেম্বর অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। বিদেশী চিত্রতারকা রেক্স হ্যারিসন কিন্তু সেখানে হাজির হন নি, যদিও ফলাও করে তাঁর যোগ দেবার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কেন তিনি আসতে পারলেন না, তার কারণ উদ্যোক্তারা জানানোর দরকার বোধ করেন নি। অথচ কয়েক সপ্তাহ আগে ওই পত্রিকার পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক-সভা ডাকা হয়েছিল, রেক্স হ্যারিসন তাঁদের প্রথম পুরস্কার-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন, শুধু এই খবরটি দেবার জন্য। উক্ত সাহেব-তারকার বদলে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মহারাষ্ট্রের মাননীয় রাজ্যপালকে। তিনি মাত্র পনের মিনিট উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেই তিনি বিদায় নেন।

পুরস্কার জয়ীদের নাম ওই অনুষ্ঠানেই প্রকাশ করা হয়। তাঁরা সকলেই যাতে উপস্থিত থাকেন, সে-বিষয়ে অবশ্য লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগে চলচ্চিত্র সমালোচকদের নিয়ে গঠিত বিচারকমন্ডলী তাঁদের রায় দেন। শ্রেষ্ঠ চিত্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে 'অঙ্কুর'। বাসু চট্টোপাধ্যায় 'রজনীগন্ধা' ছবির জন্য পেলেন শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার। অমিতাভ এবং জয়া যথাক্রমে 'দীবার' এবং 'মিলি' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে পুরস্কৃত। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনয়ের পুরস্কার পেয়েছেন উৎপল দত্ত ('অমানুষ') এবং নাদিরা ('জুলি')। অন্যান্য পুরস্কার-জয়ী : জয়দেব—শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালনা ('প্রেম পর্বত'); মহম্মদ রফি ও সুলক্ষণা পন্ডিত—শ্রেষ্ঠ নেপথ্য সঙ্গীত, যথাক্রমে 'হাবাস' ও 'সংকল্প' ছবির জন্য; সেলিম-জাবেদ—শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনা ('দীবার')।

পত্রিকাটির অ্যাওয়ারড নিয়ে বাদানুবাদ হয় নি। বিচার এক রকম সঙ্গতই বলা যায়। কেবল সঙ্গীতের পুরস্কার সকলের প্রত্যাশা অনুযায়ী নয়। 'প্রেম পর্বত' ছবিটি এমনিতে বেশী দিন চলেনি, ফলে ওই ছবির গানের প্রচারও তেমন হয় নি। তবে জয়দেব যে গুণী সুরকার, সেটা মানতেই হবে। লতা মঙ্গেশকর ইতিপূর্বে প্রকাশ্যভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে যেন পুরস্কারের আওতার বাইরে রাখা হয়। ফলে সুলক্ষণা পন্ডিত এক্ষেত্রে লাভবান হয়েছেন। 'সংকল্প' ছবিটি কিন্তু দর্শকদের সমাদর পায় নি। 'হাবাস' চিত্রটিও না। অবশ্য ছবির জনপ্রিয়তা উৎকর্ষ বিচারের মাপকাঠি না হওয়াই ভাল। আমার বক্তব্য, ওই তিনটি ছবির সঙ্গীত সম্পর্কে দর্শকদের ধারণা অস্বচ্ছ। ফলে এই ব্যাপারে বিচার সম্পর্কে তাঁদের মতামত দেওয়াও কঠিন।

গণপতি বা গণেশ পুজো মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব, যা চলে দশ দিন ধরে। সর্বজনীন পুজো-মন্ডপে মন্ডপে লাউডস্পীকারের মাধ্যমে নতুন ফিল্মের গান প্রচারের প্রকৃষ্ট সুযোগ এই সময়ে পান চিত্রনির্মাতা এবং সুরকারেরা। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও তাঁদের ভুল হয় না। পুজোর উদ্যোক্তাদের বিনামূল্যে শত শত ডিস্ক ধার দেওয়া হয়ে থাকে। একই গান বার বার বাজাতে যাঁরা রাজি থাকেন, তাঁরা নগদ মূল্যও তার জন্য পেয়ে যান। পাড়ার লোকেদের কী অবস্থা হয়, সেটা সহজেই অনুমেয়। লাউডস্পীকারে গান বাজানোর কিছু নিয়ম কানুন আছে বটে, তবে এতকাল সে-নিয়ম কেউ বড় একটা মানতেন না।

জরুরী অবস্থা চালু থাকার জন্য এ বছর পরিস্থিতিটা একেবারে ভিন্ন রকম। পুলিস কমিশনার একটি আদেশ জারি করে বলেছেন, বাড়ির ভিতরে ছাড়া অন্য কোথাও লাউডস্পীকার ব্যবহার করা চলবে না—এবং সেখানেও আওয়াজের মাত্রা একটি সীমার মধ্যে রাখতে হবে। আদেশে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে যে, সিনেমার গান আদৌ বাজানো চলবে না। ফলে এবারকার গণপতি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে শান্ত সুন্দর পরিবেশে। এমন পরিবেশ আগে কখনও দেখা যায় নি। সিনেমার সঙ্গীত পরিচালকরা অবশ্য বিক্ষুব্ধ বোধ করেছেন। প্রচারের এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল—সে কি কম দুঃখের কথা? তাঁরা সভা-টভা করেছিলেন, পুলিস কমিশনারের কাছে একটি প্রতিনিধিদলকে পাঠানোর প্রস্তাবও সেখানে গৃহীত হয়। শেষ পর্যন্ত সুখের বিষয়, শুভ-বুদ্ধির জয় হয়েছে। নিষেধাজ্ঞাটি সকলে বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছেন। কলকাতার খবর জানি না, জানতে সাধ হয়। সেখানে দুর্গা পুজোর সময় গান বাজানোর ব্যাপারে এই ধরনের বাধা-নিষেধের ব্যবস্থা হবে কি?

সুরঞ্জন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
[illegible]

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অক্ষয়কুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩ ৮৪০১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২.০০ টাকা	৪১.৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লনডন অফিস মারফত)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

প্রতিটি দিন আপনার ত্বক থেকে শুষে নেয় অল্প কিছু আর্দ্রতা, কিছু তারুণ্য

প্রতিটি দিন যা শুষে নেয় তা ফিরে পেতে সাহায্য করে নতুন জনসন্স * বেবী লোসন

সুন্দর ত্বকই যে-কোনো নারীর সবচেয়ে পরম সম্পদের অন্যতম। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য অম্লান রাখা সত্যি এক সমস্যা! আগামী বহু বছর ধ'রে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য্য অম্লান রাখতে এখনই এর উপযুক্ত পরিচর্য্যা শুরু করুন। আর এর জন্যই আপনার দরকার নতুন জনসন্স বেবী লোসন। এটি সৌন্দর্য্য সাধক এমন এক বিশেষ লোসন যা ত্বকের মূল্যবান আর্দ্রতার ভারসাম্য বজায় রাখে। আর তা'র ফলে শীতের শুখনো-রুক্ষ মাসগুলোয় এবং সারা বছর ধ'রেই আপনার ত্বক থাকে পেলব, সজীব আর উজ্জ্বল। রোজই সকালে এবং রাতে নতুন জনসন্স বেবী লোসন ব্যবহার করা শুরু করুন। মাখুন—আপনার মুখে, ঘাড়ে আর হাতে। আর এভাবে ত্বকে ফিরিয়ে আনুন শিশির-সুলভ সতেজতা।
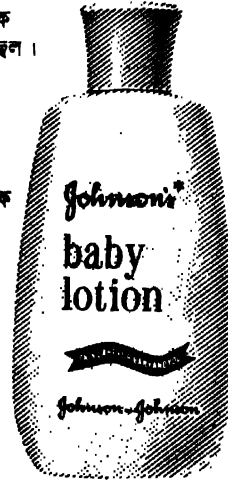
নতুন জনসন্স বেবী লোসন আপনার ত্বক রাখে পেলব, সজীব, উজ্জ্বল

আসল
তামাকের স্বাদে
উইল্‌স প্লেনের
তুলনা হয় না
WILLS
NAVY CUT
MADE IN INDIA
উইল্‌স প্লেন
খান—ভাল লাগবে

"আমি খুবই খুশী যে আমার বাচ্চা রবি গর্ভে থাকাকালীন
আমি নিয়মিত হরলিক্স খেতাম"
"ওর এবং আমার দুজনের প্রয়োজনেই,"
বলেন সুচিত্রা দেবী।
গর্ভাবস্থায় সুচিত্রা দেবীর শরীর খুবই ভাল ছিল আর বাচ্চাও জন্মেছিল সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে। এর জন্য তিনি হরলিক্সকে ধন্যবাদ দেন। হরলিক্স তাঁকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যুগিয়েছিল। কারণ হরলিক্সে রয়েছে শরীর গঠনকারী প্রোটিন ও জীবনীশক্তিদায়ক কার্বোহাইড্রেটস—যা গর্ভবতী জননী এবং ভাবী সন্তানের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য্য।
এমনকি রবি জন্মাবার পরেও সুচিত্রা দেবী তাঁর হরলিক্স খাওয়ার অভ্যাসটি বজায় রেখেছেন। সন্তান জন্মের পর মায়ের শরীরে শক্তি ফিরিয়ে আনতে, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভাল রাখতে যে যত্নের প্রয়োজন—হরলিক্স থেকে তা তিনি পাচ্ছেন।
"হরলিক্স পুষ্টির এক প্রধান উৎস। সন্তান সম্ভবা ও প্রসূতিদের জন্য প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে তৈরী হরলিক্স একান্তই অপরিহার্য্য—যা অতি সহজেই দেহ গ্রহণ করতে পারে। মায়েদের বুকের দুধ বাড়াতেও এটি সাহায্য করে। এই কারণেই রাত্রে শুতে যাবার আগে এবং সকালের অসুস্থতা এড়াতে—দিনে দুবার হরলিক্স খাবার পরামর্শ আমি দিই।"
Horlicks
স্বাস্থ্যের অন্যতম উৎস
হরলিক্স
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়
হরলিক্স—রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক।
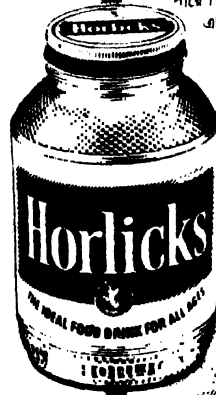
ভারতের অতি আধুনিক

দেশ

১৮ অক্টোবর, ১৯৭৫ ॥ ৮০ পয়সা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : লালচাঁদ দে

(দেশ ১৩৬৪৩)

কতশত ডিজাইনে!
কালো! তারও
কতশত আভা, কতশত শোভা!
দেখে মুগ্ধ হবেন। সবসমেত
২৬০টি রকমারি অপূর্ব রঙ আর
ডিজাইনের মধ্যে এতো মাত্র একটি।
অজস্র রঙের আর ডিজাইনের
এই ধরনের বিচিত্র
বিপুল সম্ভার
এর আগে
কেউ কোথাও
দিতে পারে নি।
মদুরার কাপড়
মদুরা কোটস-এর উৎপাদন
122-BEN

পুজোর সময় কত বিজ্ঞাপনই তো বেরোয়। এই সময় চাই নতুন জুতো নতুন জামা। চাই নতুন সাহিত্য, আরো কত কি। সি এম ডি এ-র জন্য চাই একটা নতুন নাম। পুরোনো নামে আর চলছে না।

এতদিন শুনে আসছি যে, সি এম ডি এ মানেই "কাটছি মাটি, দেখছি আয়," কেউ কেউ আবার জলেডোবা কলকাতাকে মনে করে নাম দিয়েছিলেন ড্রাউনিং অথরিটি। সব নাম পুরোনো হয়ে গেছে।

এ বছর বর্ষার পর দেখা গেছে যে, কলকাতার বহু রাস্তায় জল জমেনি, আর জমা জলও বেশীক্ষণ দাঁড়ায়নি। কারণটা কি? মন্ত্রবলে হয়েছে? মন্ত্রে হয়নি যন্ত্রে হয়েছে। কারও আশীর্বাদে হয়নি মানুষের চেষ্টায় হয়েছে। জলনিকাশী ব্যবস্থার কিছু সুফল এবার পেলেন, এর পরের বছর আরো পাবেন, তার পরের বছর আরো। জল জমাটা একেবারে বন্ধ করা যাবে না। তবে জল জমলেও বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না। শুধু কলকাতা নয়, বৃহত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়।

কিন্তু বর্ষার সময় জল জমাটাই কি কলকাতার একমাত্র সমস্যা? বৃহত্তর কলকাতার বস্তীতে ২৩ লক্ষ লোক বাস করেন। তাঁদের জীবনে নাগরিক সুবিধা কি ছিল? কিছুই নয়। সে এক অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি। আর আজ অন্ততঃ ১,৫০০ বস্তীর ১২ লক্ষ লোক পানীয় জলের সুযোগ পাচ্ছেন। সেখানে খাটা পায়খানার বদলে স্যানিটারী পায়খানা দেওয়া হয়েছে। সেখানকার রাস্তাও পাকা, সেই রাস্তায় বিজলী আলো। সব কি মন্ত্রবলে হয়েছে?

না, এগুলি হয়েছে কলকাতা উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনায়।

হাওড়ার সুড়ঙ্গপথ, উল্টোডাঙ্গা সেতু, চওড়া কালীঘাট ব্রিজ এবং গুরুসদয় রোড, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, আনোয়ার শাহ রোড ইত্যাদি। কত নাম করবো, বিশেষ করে নাম করছি ডায়মণ্ড-হারবার রোডের, একবার গিয়ে দেখে আসুন চিনতেই পারবেন না।

পুজোয় চাই নতুন নাম

এগুলি কি মন্ত্রবলে হয়েছে? না, এর মূলে আছে সি এম ডি-এর চেষ্টা।

আপনারা জানেন কি এখন কত বড় এলাকার কত লোক পানীয় জল পাচ্ছেন? আগে যে সরবরাহ পাওয়া যেত, তাতে কি এত লোকের জলের প্রয়োজন মিটতো? এটিও হয়েছে সি এম ডি এ-র পরিচালনায়, টালা পলতার শক্তি বৃদ্ধি করে, ৩০০ গভীর নলকূপ খুঁড়ে।

খবর রাখেন কি যে, অন্ততঃ দু হাজার নতুন শয্যা হাসপাতালগুলিতে বাড়িয়ে দিয়েছে সি এম ডি এ. ভ্রাম্যমাণ এবং স্থানু ডিসপেন্সারীগুলি হয়েছে সি এম ডি এ-র দৌলতে?

ছ-শোর মত প্রাথমিক স্কুলগুলি আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন, প্রায় [illegible]টি মিউনিসিপ্যালিটি নিজেদের এলাকার উন্নতি করেছেন সি এম ডি এ-র পরচালনাধীনে।

কাজেই আগে যা বলছিলাম এখন সি এম ডি-এর নতুন নামকরণের সময় এসেছে। পুরোনো নামে আর চলছে না, পুরোনো সমালোচনা আর খাপ খাচ্ছে না।

সমালোচনা করুন, তবে জেনেশুনে।

নামকরণ করুন, তবে সেটা জেনে শুনে।

তবে কি সব কৃতিত্বই সি এম ডি এ-র? তা বলছি না। এ সব কৃতিত্ব হল জনগণের, যাঁরা কলকাতাকে ভালবাসেন, কলকাতার উন্নতির জন্য যাঁরা সহযোগিতা করছেন।

আমাদের কাজের পরিচয় কিছু কিছু নিশ্চয়ই জানেন। আরো জানবার চেষ্টা করুন—না হলে সি এম ডি এ-র নতুন নামটা তেমন জমছে না।

—জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, কলকাতা-১৭

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫১
শনিবার ১ কার্তিক ১৩৮২

সমৃদ্ধির নব দিগন্ত

কবি কামিনী রায়ের একটি কবিতায় বিশেষ একটি উপলব্ধির আনন্দ অভিব্যক্ত হয়েছে। 'তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, শুনে যা আমার আশার কথা।' কবির এই আবেদনের সঙ্গে তাঁর একটি উপলব্ধির কথাও আছে : নয়নের জল এখনও নয়নে রয়েছে; তবুও যেন ব্যথা ঘুচে গিয়েছে। জাতির জীবনে এধরনের অনুভূতি ও উপলব্ধির পরিচয় কবিদের প্রিয় উপমার সাহায্যে বিবৃত করা যায়। ঈশান কোণে এক খণ্ড কালো মেঘের আবির্ভাব লোকের চোখে আসন্ন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মহাঘোর সঙ্কেত বলে বোধ হয়ে থাকে। এহেন একখণ্ড কালোমেঘ তাই কবি ও শিল্পীর ভাবনাতে দুর্ভাগ্যের উপমা হয়ে ঠাঁই পেয়েছে। অন্য দিকে ভোরবেলার পূর্বাকাশের রক্তিম আভা আসন্ন এক শুভ সুযোগের সঙ্কেত বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। পূর্বাকাশের রক্তিম আভা হলো আসন্ন এক অত্যুজ্জ্বল অরুণোদয়ের ইশারা। সৌভাগ্যের কোন ঘটনার সঙ্কেত ও সূচনা তাই কবি ও শিল্পীর ভাবনাতে পূর্বাকাশের রক্তিম আভার সঙ্গে উপমিত হয়েছে। জাতির ভাগ্যের আকাশপটে এই দুই দৃশ্যকেই দেখতে পাওয়া যায়। ঘটনার রূপ কখনও আসন্ন এক দুর্যোগের সঙ্কেত হয়ে দেখা দেয়; কখনও বা নতুন সৌভাগ্যের আভাস হয়ে। রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিক; জাতির জীবনের এই তিন ক্ষেত্রেই সুপরিণামের শুভ সম্ভাব কিংবা দুর্ভাগ্যের দুঃখকর সম্ভাব ঘটনার মধ্যে ছায়াপাত করে থাকে। সহজ ও সাধারণ যুক্তিতে সেই জাতিকেই সৌভাগ্যবান বলে মনে করা চলে, যার জীবনের আকাশে ঈশান কোণের কালো মেঘের তুলনায় পূর্ব আকাশের রক্তিম আভার প্রকাশই বেশী। এইবার আমাদের এই ভারত ও ভারতীয় জাতির ভাগ্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ পরিণামের প্রসঙ্গে এসে যদি কোন মন্তব্য করতে হয়, তবে অন্তত এটুকু বলতে পারা যায় যে, কৃষ্ণমেঘের নিদারুণ ঘোর কেটে না গেলেও ফিকে হয়ে এসেছে। এবং, পূর্ব আকাশের রক্তিম আভা যেন আরও একটু রক্তিম হয়ে উঠেছে। অত্যুজ্জ্বল এক অরুণোদয়ের আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক কোন শুভ সূচনার প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে বিশেষ একটি অর্থনীতিক প্রসঙ্গে এসে আজ একটি উদাত্ত আশার অজস্র অঙ্গীকারের কথা যেমন কল্পনা করে তেমনই বিচার করেও বুঝতে পারা যায়। আর তিন বছর পরে ভারত তার অর্থনীতিক প্রয়োজনের সমগ্র তেলের তথা পেট্রলের চাহিদা নিজের তৈলকূপের উদার সরবরাহের যোগানোয় পূর্ণ করে তুলতে পারবে। আশান্বিত সম্ভাবনার দ্বিতীয় অঙ্গীকার : আর পাঁচ বছর পরে ভারত বিদেশে প্রচুর তৈল সরবরাহের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবে। বোম্বে হাই ভারতের আসন্ন সৌভাগ্যের এই প্রতিশ্রুতি স্পষ্টতর করে তুলেছে। দেশের নানা স্থানে, বিশেষ করে উপকূলসংলগ্ন সামুদ্র স্থলের নানা জায়গায় একের পর এক নতুন কূপের সন্ধান এবং আবিষ্কার সম্ভব হয়ে চলেছে। পূর্ব উপকূলভাগেও তেলের প্রাপ্তির সুস্পষ্ট অঙ্গীকার সঙ্কেতিত হয়েছে। কল্পনা করলে ভুল হবে না যে, ফসিল তৈল এই পেট্রলের বিরাট সম্ভার ও সম্বল ভারতের জাতীয় পরিণামের রূপ আন্তরিক প্রকারে প্রভাবিত করবে। কয়লা ও লোহা ভারতের জাতীয় অর্থনীতিক যোগ্যতাকে যতটা উন্নীত ও উন্নত করতে পেরেছে ও পারবে সুপরিণত ও বিরাট এক পেট্রল উৎপাদক শিল্প তার চেয়ে অনেক বেশী, বস্তুত সামগ্রিক ও সমগ্র প্রকারে প্রভাবিত করবে বলে মনে করা চলে। মামুলি ভাষায়, জাতির অর্থনীতিক পরিণামের এই আসন্ন ও বিপুল রূপান্তর তৈল-বিপ্লব বলে আখ্যায়িত হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বলা ভাল, নব শুভোদয়। নতুন দিগন্তের রূপ অনাবৃত হয়ে জাতির জীবনের সম্মুখে নতুন এক আশার অনুপ্রাণিত আগ্রহের পথ অবারিত করে তুলবে। আজ যে ঘটনা মামুলি ভাষায় তৈল-বিপ্লব বলে আখ্যাত হতে পারে, সে ঘটনাকে ভারতীয় জীবনেরই বৈষয়িক রূপের একটি সর্বার্থক বিপ্লব বলে ধারণা করা চলে।

সমালোচকেরা তাঁদের সন্দেহের একটি যুক্তির জোরে এত বেশী আশার আবেগ বাতিল করে দিতে পারেন। বিজ্ঞানের কৃতিত্বে যদি কোনদিন কৃত্রিম ফসিল-তৈলের বিপুল উৎপাদন সাধারণ শিল্প-কৃতিত্বের ব্যাপারে পরিণত হয়, তবে ভবিষ্যতের ভারতের ফসিল-তৈলের বিপুল সম্ভার অর্থনীতিক শক্তির সম্পদ হলেও তার গৌরব অবশ্যই খর্ব হয়ে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু এটা একেবারে ষোল আনা বাস্তবতার ও সম্ভাবনার কথা না হতেও পারে। এরকম সন্দেহকে কাল্পনিক নৈরাশ্যের ব্যঙ্গে ভ্রূকুটি বলে মনে করাও চলে। কয়লাকে যদি কালো হীরা বলে গৌরবের উপাধি দেওয়া চলে, তবে ফসিল-তৈল পেট্রলকেও তরল সোনা বলে প্রশস্তি করতে ও গৌরব দিতে পারা যায়। আদিম পৃথিবীর প্রথম জৈব যুগের অগণ্যকোটি কীটের যে দেহরস ভূগর্ভে সমাহিত হয়েছিল, সেটা আজ বিশ্বজনের বৈষয়িক প্রয়োজনের কাছে মূল্য মর্যাদা ও সার্থকতায় অবশ্যই তরল সোনা বলে স্বীকৃত পাবে। পরিণামদর্শী ঐতিহাসিক, যিনি স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সুষ্ঠু যুক্তি-বিচারের কৃতী মানুষ, তিনি ভারতে ফসিল তৈলের বিপুল সম্বল সম্ভার ও সম্বলের আবিষ্কারে জাতীয় পরিণামের একটি বিপুল রূপান্তরের সূচনা ও সার্থকতার সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

'ভাগ্য' নামক অবস্থাসূচক কথাটাকে অন্য এক যুক্তিতে মনোবৃত্তির পরিতৃপ্তির কথা বলে মনে করা চলে। সুতরাং, ভাগ্য নামে কথাটাকে সুখবোধক একটা ব্যাপার বলে মনে না করে শুভসূচক একটা কথা বলে মনে করাই ভাল। এর পর এই ধারণা করতে যুক্তির অথবা কল্পনার কোন বাধা থাকে না যে পেট্রলের বিপুল সম্ভারের সন্ধান এবং আবিষ্কার ভারতে জাতীয় ভবিষ্যতের একটি বিরাট ভাগ্যের, অর্থাৎ শুভসূচক পরিণামের সঙ্কেত।

দেবরাজ

শেষ ঘাঁটি

দুনিয়ার সবচেয়ে টেঁকসই ফ্যাসিবাদী সরকার স্পেনের জেনারেল ফ্রাংকোর। যাঁদের কাছ থেকে তিনি রাজনীতির প্রথম পাঠ নিয়েছেন তাঁর সেই দুই গুরু—জার্মানির হিটলার আর ইটালির মুসোলিনি—কবে অতলে তলিয়ে গেছেন, কিন্তু আজও বিরেশী বছর বয়সে তিনি দিব্যি বহাল তবিয়তে বজায় রয়েছেন। তাঁর যে ভীমরতি হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। তাঁর প্রশাসনের রাশ তিনি একটুও আলগা করেননি, তাঁর ক্ষমতায় একটুও ভাটা পড়েনি, তাঁর মনের ভাব একটুও পালটায়নি। ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ ইউরোপের বুক থেকে মুছে গেছে, হয় গণতন্ত্র না হয় সমাজতন্ত্র তার জায়গা নিয়েছে। এমন কী তাঁর এত-কালের দোসর ঘরের পাশে পর্তুগালও ফুলের বাতাস দিয়ে বিদেয় দিয়েছে ফ্যাসি-বাদকে গেল বছর। ফ্রাংকো কিন্তু নির্বিকার। চাল পালটাবার কোনও মতলবই তাঁর নেই। পাছে বাইরে থেকে আলো এসে তাঁর আঁধার ঘরে রোশনাই জেলে দেয় তাই তিনি সব কটা দরজা জানলা শক্ত করে এঁটে দিচ্ছেন। এমন কী পর্তুগালের সংগেও কূটনীতির পাট তিনি তুলে দিয়েছেন। তাঁর যারা বিরোধী তাদের ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করাই তাঁর রীতি। তাতেও না শানালে চরম দণ্ড দিতে তাঁর কোন দ্বিধা নেই।

কোনও ফ্যাসিবাদী দেশে একটার বেশী দুটো দল থাকে না। স্পেনেও নেই। রাজ-নৈতিক দল বলতে একটিই—তাঁর ফ্যালাঞ্জিস্ট দল। তাঁকে মদত দিয়ে এসেছে গোঁড়া ক্যাথলিকরা। তাদের জংগী সংগঠনও পুরোপুরি ধর্মীয় নয়—আধা রাজনৈতিক। বামপন্থী কোনও দল ফ্রাংকোর রাজ্যে তো নেই-ই, নেই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জাতীয়তা-বাদী দলও। অবিশ্যি চোরাগোপ্তা কাজ চালাচ্ছে এমন সংগঠন বেশ কিছু আছে। কিন্তু ফ্রাংকোর যা কড়া শাসন তাতে বিশেষ কিছু তারা করে উঠতে পারছে না। তাদের আড্ডা বেশির ভাগই বিদেশে। দেশের বাইরে থেকেই তারা ফ্রাংকো সরকারকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফল বড় একটা কিছু হয়নি, ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন আসলে আজও দানা বাঁধতে পারেনি। তাদের ভরসা ফ্রাংকোর বয়স। ফ্যাসিবাদকে জিইয়ে রেখেছেন তিনিই। তিনি চোখ মুদলে তাঁর সাজানো বাগান আপনিই শুকিয়ে যাবে। তখন সেখানে গণতন্ত্রের গোলাপ ফোটানো সম্ভব হবে এই লোকের বিশ্বাস।

মুসোলিনি যেমন ছিলেন ইল দুচে, হিটলার ফুয়েরার তেমনই তাঁদের চেলা ফ্রাংকো হচ্ছেন এল কোদিলো অর্থাৎ নেতা। দেশের সব এলাকার লোক তাঁকে যমের মতো ভয় করে বাদে বাস্ক আর কাটালোনিয়া অঞ্চলের বাসিন্দারা। তাদের সংগে তাঁর সম্পর্ক চিরদিনই আদায় কাঁচকলায়। স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ওই এলাকায়। অকথ্য অত্যাচার করে সেখানকার গণ-তন্ত্রীদের আন্দোলনকে শেষ করে দেয় তাঁর সাংগোপাংগরা। বাস্কদের এমন সাধ্য নেই যে ফ্যাসিবাদীদের হাত থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু গণতন্ত্রের ওপর তাদের বিশ্বাস আজও অটুট যদিও বাইরে তার বড় একটা প্রকাশ নেই। ঘা খেয়ে খেয়ে তারা স্পেনের ওপর এমন বিরক্ত হয়ে উঠছে যে একটা আলাদা বাস্ক রাষ্ট্র গড়তে চাইছে। বাস্কদের বসতি কেবল স্পেনেই নয়, আশেপাশের রাজ্যেও বাস্কদের বাস। তারা এখন চাইছে ও সব এলাকা এক করে নয়া বাস্কদেশ বানাতে। এ সব কিছুই বোধ হয় হতো না যদি স্পেনে গণতন্ত্র থাকতো বাস্করা স্বাধীনভাবে দেশে বসবাস করতে পারতো। মাঝে মাঝে তারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু কোনও ফয়দা হয়নি।

বাস্করা কিন্তু হার মানেনি। বছর দুই আগে তারা খাস মাদ্রিদে তখনকার প্রধান-মন্ত্রী অ্যাডমিরাল কারেরো ব্লাংকোকে খতম করেছিল দিন-দুপুরে। তারপর থেকেই ফ্যাসিবাদী সরকার খাপ্পা হয়ে উঠেছেন তাদের ওপর। শিরদাঁড়া কিন্তু তাদের এখনও সোজাই আছে। উগ্রপন্থীরাও এদিকে এদের গুপ্ত সংগঠন গড়ে তুলেছে। তারাও সুবিধে পেলেই হামলা চালাচ্ছে ফ্যাসিবাদী সরকারের কর্মীদের ওপর। পুলিসের ওপরই তাদের আক্রোশ বেশী। অনেককে তারা খতমও করেছে। হাতেনাতে কাউকেই ধরতে না পেরে জন এগারো বিপ্লবীকে ফাঁসিকাঠে লটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ফ্রাংকো সরকার। বিচারের প্রহসন অবিশ্যি একটা হয়েছিল। কিন্তু তার নমুনা দেখে গোটা পশ্চিম ইউরোপের লোকেদের চোখ কপালে উঠে গেল। দোষ কোনও আসামীরই প্রমাণ হয়নি—অন্য যে কোনও দেশ হলে ওরা সকলেই বেকসুর খালাস হতো। এদের মধ্যে কেউ কেউ মাও-বাদী হলেও বেশির ভাগই বাস্ক বিপ্লবী। সরকার চেয়েছিলেন ওই এগারোজনকে চরম দণ্ড দিয়ে সরকারবিরোধীদের শায়েস্তা করতে। স্পেনে মৃত্যুদণ্ড আজও একটা বীভৎস ব্যাপার। লোহার হাঁসুলি পরিয়ে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হয় আসামীকে। একমাত্র ফ্যাসিবাদী স্পেনেই ওই ধরনের প্রথা চালু রয়েছে।

ব্যাপারটা নিয়ে এমন প্রতিবাদের ঝড় উঠলো সারা ইউরোপে যে ভড়কে গেলেন ফ্রাংকো সরকার। স্পেন ক্যাথলিক দেশ। গোঁড়া পাদরীরা সব সময়ই ফ্যাসিবাদের পক্ষে। কিন্তু ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু পোপও বিচারবিভ্রাট দেখে এমনই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে, তিনিও ফ্রাংকোকে ওই এগারো-জনের মৃত্যুদণ্ড মকুব করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। ফাঁপরে পড়লেন স্পেন সরকার। পোপের সে অনুরোধ আর ইউরোপের প্রতিবাদ তাঁরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না আবার মেনে নিতেও তাঁদের মন সরলো না। তাঁরা মাঝামাঝি আপসের পথ নিলেন। তাঁরা রেহাই দিলেন ছ'জনকে। বাকী পাঁচজনের দণ্ড বহাল রইলো। এবার তাদের সাবেকী প্রথায় নিষ্ঠুরভাবে খুন না করে মারা হলো গুলি করে। সে পালা চুকে গেছে ২৭ সেপ্টেম্বর। সারা দুনিয়া ধিক্কার দিচ্ছে ফ্রাংকো সরকারকে তাদের বর্বরতার জন্যে। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও খাস স্পেনেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে যদিও সেটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চাপা। গোটা ইউরোপ তো বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। একের পর এক পশ্চিমী সরকার তাঁদের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরিয়ে এনেছেন প্রতিবাদ জানাতে। তাদের মধ্যে আছে ব্রিটেন, হল্যান্ড, নরওয়ে আর দুই জার্মানি। কাজটা কারুর পছন্দ হয়নি।

প্রতিবাদের তোয়াক্কা অবিশ্যি ফ্রাংকো করেন না। কিন্তু আর কদ্দিন তাঁর রাজ্য টিঁকবে? এতদিন লোকে মনে করতো তিনি থাকতে স্পেনে ফ্যাসিবাদের ঘাঁটি অটুট থাকবে। এখন কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে তাতে বোধ হয় ফাটল ধরেছে—একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব নয়। ফ্রাংকোর আমলের স্পেনের সংবিধানে বলা আছে, "কোদিলোর" পর গদিতে কে বসবেন আর কীভাবেই বা দেশ চলবে তা ঠিক করবেন তিনি নিজেই। বিধান একটা তিনি দিয়েছেনও। তাঁর পরই স্পেনে ডিক্টেটরি খতম, আবার চালু হবে রাজতন্ত্র। তা হলে আইনত সিংহাসনে বসার কথা ত্রয়োদশ আলফনসোর ছেলে কাউন্ট অব বার্সিলোনার। তিনি একটু উদার প্রকৃতির লোক—ফ্যাসিবাদের ভক্ত তিনি নন। তাই ফ্রাংকো তাঁর দাবি খারিজ করে দিয়ে বেছে নিয়েছেন তাঁরই ছেলে রাজকুমার জুয়ান কার্লোসকে। তাঁকে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হয়েছে সেইভাবেই। ফ্রাংকোর আশা, রাজকুমার কার্লোস সিংহাসনে বসলে স্পেনে সাবেক ধারা বজায় থাকবে। পাঁচজন গেরিলার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এত যে হট্টগোল হচ্ছে এমন কী পোপও যা দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তা নিয়ে রাজকুমার কার্লোস টুঁ শব্দটি করেননি। কিন্তু মনে হচ্ছে না নির্বিঘ্নে তিনি সিংহাসন দখল করতে পারবেন। এ তো তার দাবিদার অনেক, তায় তাঁর বা পর্যন্ত তার ওপর যুগের হাওয়া তিনি ক এড়াতে পারবেন?

সাহিত্য প্রসঙ্গ

ডিজরেয়লির প্রেম

ঊনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের সেই চমৎকার-বুদ্ধ মহামান্য গ্ল্যাডস্টোন চোরা পথে কোনো পতিতালয়ে গিয়ে বিবস্ত্র এক পতিতাকে তার জীবনকথা বলতে বলছেন—এ-কথা শুনলে কেমন লাগে? কেমন লাগে যদি শুনি—গ্ল্যাডস্টোন যখন হাঁটুগেড়ে-বসা নগ্ন সেই বারাঙ্গনার কথা শুনছেন—তখন অন্য দিক থেকে লুকিয়ে পার্লামেণ্টের দুই সদস্য মত্ত অবস্থায় এই দৃশ্য দেখছেন? মনে হয়, আমরা—ভারতীয়রা আমাদের কোনো রাজনৈতিক নেতা, মান্য মন্ত্রী অথবা প্রসিদ্ধ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমন কথা শুনলে নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হব। মনে রাখা প্রয়োজন, গ্ল্যাডস্টোন ছিলেন আরও বড় ব্যক্তিত্ব, ঊনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের অর্ধেকেরও বেশী তাঁর যুগ। কম করেও চার চারেক প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ইংল্যাণ্ডের। অথচ এই মানুষটি সম্পর্কেই আজ এই কুৎসা।

কিন্তু যে ভদ্রলোক তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসে এমন একটি কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন তিনি মোটেই কুৎসা রচনার জন্যে কিছু লেখেন নি। ভদ্রলোক নিজেই একজন পার্লামেণ্ট সদস্য, গত তিরিশ বছর ধরেই তিনি লেবার দলের হয়ে পার্লামেণ্টের সদস্য রয়েছেন; বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে কবে। পেশায় ছিলেন সাংবাদিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সাংবাদিকতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এঁর নাম মরিস এডেলম্যান। মরিস এডেলম্যান তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা করেন ১৯৫১ সালে। তারপর থেকে এ-যাবৎ অনেকগুলি উপন্যাসই রচনা করেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং পড়াশোনার ওপর নির্ভর করে। বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক নেতা বা যাঁরা ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন তাঁদের জীবনকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় তাঁর ঝোঁক বেশী। এই ধরনের রচনায় শুধু একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষকেই যে পাওয়া যায় তা নয়—সেই সঙ্গে তখনকার সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা, ভুল-ত্রুটি ইত্যাদির কথাও জানা যায়।

মরিস এডেলম্যান ইংল্যাণ্ডের একদা বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ডিজরেয়লির জীবনী অবলম্বন করে তিন খণ্ডের এক উপন্যাস রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, প্রথম খণ্ডের নাম 'ডিজরেয়লি ইন লাভ'। দ্বিতীয় খণ্ডের 'ডিজরেয়লি রাইজিং'। মনে রাখতে হবে গ্ল্যাডস্টোন আর ডিজরেয়লি ছিলেন সমসাময়িক, দু জনের মধ্যে রেষারেষি কম ছিল না। ওপরের কাহিনীটুকু ডিজরেয়লিকে নিয়ে লেখা এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত।

মরিস এডেলম্যান আর ডিজরেয়লির মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে। যেমন দু জনেই রাজনীতি করেন, দু জনেই লেখক। ডিজরেয়লি যে ঔপন্যাসিক ছিলেন এ-কথা আমরা অনেকেই ভুলে যাই। কিন্তু কথাটা খাঁটি। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল, রাজনৈতিক জীবনের খ্যাতির চেয়ে সে খ্যাতি কম নয়। তিনি অনেকগুলি উপন্যাসই লিখেছিলেন। ভিভিয়ান গ্রে, সিবিল, ভেনেসিয়া—এই ধরনের তিন চার খণ্ডে লেখা গ্রন্থগুলি খুবই সমাদর পেয়েছিল সে-সময়ে। রাজনৈতিক জীবনীও তিনি লিখেছিলেন লর্ড জর্জ বেনটিংকের।

এডেলম্যানের রাজনৈতিক প্রতিভা ডিজরেয়লির ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। তা ছাড়া তিনি রাজনৈতিক জীবনে উচ্চাভিলাষী নন। লেখক হিসেবে বেঁচে থাকাকেই বড় মনে করেন।

'ডিজরেয়লি ইন্ লাভ' নামে ডিজরেয়লি জীবন-কাহিনীর যে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পেয়েছে তার জনপ্রিয়তার কথা শুনলে আমাদের মাথা ঘুরে যেতে পারে। হার্ড কভার এডিসনে তিরিশ হাজার। পকেট বই এডিসনে পাঁচ লক্ষ। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বই বিক্রী হয়ে গেছে।

এ থেকে কেউ যদি মনে করেন, কেচ্ছা কাহিনীতে ভরতি বলে এই ধরনের গ্রন্থের বিক্রী বেশী হচ্ছে—তা হলে কথাটা ঠিক হবে না। ডিজরেয়লির জীবন-কাহিনীর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বহু দুঃখের কথা লুকিয়ে আছে, লুকোনো আছে তাঁর আজন্ম দেনার কথা। ডিজরেয়লি যে জন্ম-সূত্রে ইহুদী ছিলেন, পরে তেরো বছর বয়েসে ব্যাপটাইজড হন সে-কথা জানার পর বোঝা যায় তাঁর ইহুদী শিক্ষা-দীক্ষার কথা ইংল্যাণ্ডের লোক সহজে ভুলতে পারত না, যদি না তিনি অসাধারণ হতে পারতেন। তাঁর অসাধারণ মেধা, বাগ্মিতা, বুদ্ধি কে অস্বীকার করবে! এডেলম্যান বলেছেন, আমি এই মানুষটির চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে চাইনি, সে উদ্দেশ্য আমার নয়। তাঁকে যথার্থ মানুষ হিসেবে লোকচক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি, শ্রদ্ধার সঙ্গে। দেখাতে চেষ্টা করেছি একটি দ্বৈত-চরিত্রের আশ্চর্য মানুষকে।

ডিজরেয়লি যাকে ভালবেসে ছিলেন তিনি ছিলেন সমাজের অভিজাত ঘরের নারী। লেডী হেনরিয়েটা সাইকস্। বিবাহিতা এই মহিলাকে পেয়ে ডিজরেয়লির প্রেমের ক্ষুধা মিটেছিল কিনা সে প্রশ্নের আলোচনা এখানে অবান্তর। তবে সমাজে দুর্নাম রটেছিল। মনে রাখতে হবে, ডিজরেয়লি যাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি বয়েসে ছিলেন অনেক বড়। এডেলম্যান বলেছেন, নিতান্তই অর্থের লোভে তিনি এই বিয়ে করেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনেও ডিজরেয়লি ছিলেন সুবিধেবাদী। টোরি দলে যোগদান করার মধ্যে সেই দুর্বলতা ধরা পড়ে। অবশ্য এই ধরনের রাজনৈতিক দুর্বলতা এখনও আছে।

গ্ল্যাডস্টোনের অভ্যাস ছিল সোহো-র পল্লীতে ঘুরে বেড়ানো। এডেলম্যান বলেছেন, সোহোর পল্লীতে পতিতাদের দুঃখের কাহিনী শোনার চেয়ে পার্লামেণ্টে এদের সম্পর্কে একটা বিল পাশ করলে বোধ হয় বেচারী সোহো-মেয়েদের অনেক উপকার হত। কিন্তু গ্ল্যাডস্টোন তা করতেন না। আর ডিজরেইলি বরাবর এক ধরনের ইহুদী দুর্বলতা—যাকে কিনা মমতা বলা যায়—সেই মমতার দৃষ্টিতে সব কিছু গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

যাই হোক, একটি চরিত্র যত বড়ই হোক—তার জীবন-কাহিনী লেখার সময় উপাদান সংগ্রহের মতন নজর রাখতে হবে মানুষটির মনের কথা বোঝাবার। এটা লেখকের নিজের ব্যাপার। অনুভূতি এবং বোধ ছাড়া তা বোঝা যায় না।

মরিস এডেলম্যানের 'ডিজরেয়লি ইন লাভ'-এর মতন কোনো বই যদি আমাদের দেশের কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা হয়—তা হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে? বই নিশ্চয় আগুনে পুড়বে।

অভিনন্দ

সব পাপ ধুয়ে যায়

শান্তনু দাস

(বনগাঁ শিমুলতলার কবি বন্ধুদের উদ্দেশে)

ইছামতী বয়ে যায়......
এখনো নোঙর ফেলে মহাজন, ফেরেপবাজ, আদার ব্যাপারী।
নৌকোর ওপরে ব্রিজ,
ব্রিজের ওপরে চাঁদ,
চাঁদের ওপরে কোনো আকাঙ্ক্ষার গায়ে জমা ইন্দ্রধনু
খেলা করে রক্তাক্ত সময়ে।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয়
লেবুর পাতায় করমচায়

এখনো বৃষ্টি আসে, মেঘ হয় বুকের কোটরে,
রক্তের ভেতরে এসে সরাসরি বাইচ খেলে স্মৃতি,
স্মৃতি কিংবা স্বপ্ন, স্বপ্ন কিংবা মায়া, মায়া বা মতিভ্রম—
সবাই কখন যেন আলটপকা নেমে আসে পৃথিবীর কোলে।

পৃথিবী জঙ্গল হয়ে যেতো :
এখনো হয়নি—
কারণ মাটিতে এখনো কিছু পাগল, মাতাল হেঁটে যায়।
এখনো হয়নি—
কিছু প্রলাপ সত্যি হয় উদোম রাস্তায়।
এখনো হয়নি—
কিছু জ্বলন্ত টিকে নাচে আমাদের হৃদপিণ্ড জড়িয়ে।
তাই
নিয়মিত ভোর হয়
বুকের ওমেয় জাগে সূর্য।

ইছামতী বয়ে যায়......
যশোর বনগাঁ রোডে কিছু যুবক—
কাটা মুরগীর মতো লাফাতে লাফাতে আঁকে যন্ত্রণার ছাপ;
সব পাপ ধুয়ে যায়,
সব ঘণ্টা থেমে গেলে—
রক্তাক্ত কলজে নিয়ে কবিতায় জেগে থাকে পাগল যুবক॥

উলের মোজা

সুব্রত চক্রবর্তী

যুবক একটু বাইরে গেছে, যুবতী একা ঘরে
দেরাজ খুলে বের করেছে রুপোর দু'টি কুরুশ,
দেরাজ খুলে বের করেছে রঙিন কিছু উল;
যুবক একটু বাইরে গেছে—যুবতী দুপুরবেলা
রুপোর কুরুশ দিয়ে বোনে ছোট্ট, নরম মোজা।

যুবক একটু বাইরে গেছে, যুবতী একা ঘরে
দেরাজ খুলে বের করেছে স্তব্ধ মোজা দু'টি—
রোগা আঙুলে স্পর্শ করে খুলে যাচ্ছে উল;
যুবক একটু বাইরে গেছে, শূন্য খাঁ খাঁ ঘরে
যুবতী কেন ঘুমিয়ে পড়ে উলের হাহাকারে।

প্রার্থনায় মৌল অমন্ত্রতা

ফণিভূষণ আচার্য

তুমি যখন চুল খুলে পরপুরুষের সঙ্গে চলে যাও
দীঘায় কিংবা গোপালপুরে
আমি পৃথিবীর দিকে আমার তর্জনী উঁচিয়ে ধরি
চোখের রেটিনা থেকে ছিঁড়ে নাও হাহাকার
ঝাউবন ফ্লোসিংমিরার
পাহাড়ের নীল ঢেউ, সব তুমি শিল্পের জন্মের জন্য
ইচ্ছে মতো খালি করে দাও

স্বর্গীয় বাগান থেকে বেনোজল সরে যাচ্ছে
উপেক্ষিত ব্যথাগুলো জেগে থাকে অন্ধকারে
মৃত ঘাসজোনাকির ভিড়ে
নুলো কুঁজো বিকলাঙ্গ প্রতিশ্রুতিগুলো
পানাপুকুরের ধারে কতকাল পড়ে আছে
পড়ে থাক বুকখানি সূর্যাস্তের পর

এভাবে অনেকবার স্নায়ু কেটে আত্মঘাতী হয়েছি
উঠোনে দাঁড়ের শব্দ মরে যায় আমার নির্জন রক্তে নৌকোডুবি
বোধিচেতনার জাল ভেঙে মৃদু মেঘ ঝরে পড়ে
ফিকে হয়ে আমার নিশ্বাস থেকে তোমার পায়ের ছন্দ
মুছে যায় উদাসীন শঙ্খের শব্দের মতো
নিরুদ্দেশর পর্যটন শেষে
সমস্ত পৃথিবী ঘুরে ছিটকিনি তুলে দিয়ে রাতের প্রস্তাবমতো
ফিরে যায়

তুমি যখন চুল খুলে পরপুরুষের সঙ্গে চলে যাও
দীঘায় কিংবা গোপালপুরে
আমি স্বর্গের দিকে আমার তর্জনী উঁচিয়ে ধরি

চৌলগ্রামের মত ঝড়

সুতপা মিত্র

প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে আসতে চেয়েছিলে।
নকল সোনার গয়না বড় বেশী চকচকে,
অর্থহীন।
নির্মোকহীন আত্মার সামনাসামনি দাঁড়ালে
সব কথার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়
সব ব্যর্থতার বিশ্লেষণ।
অথচ সেই দৃশ্য ভয়াবহ
মাঝরাতে চৌলগ্রামের মত ঝড়
নক্তচর
দরজায় টোকা না দিয়েই
কে কখন ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে,
প্রস্তুতির অপেক্ষা রাখে না
ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাকে
বসবার জায়গা দিতে হয়।

রণসজ্জার প্রয়োজন নেই—
খালি পায়ে হেঁটে যাও আকীর্ণ মাটিতে।

গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা — ভারতের ব্যাংকিং-ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন

এ বছর ২রা অক্টোবর তারিখে ভারতে পাঁচটি গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে; তার মধ্যে একটি হল পশ্চিমবংগের মালদায়। এ-ধরনের আরও ৪৫টি গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৭৭ সালের মধ্যে স্থাপিত হবে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে ব্যাংকিং কমিশন দেশে গ্রামীণ সহযোগী ব্যাংক (Rural Subsidiary Bank) গঠন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ব্যাংকিং কমিশনের মতে গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ হবে (১) স্থানীয় সঞ্চয় সুসংহত করা, (২) কৃষিক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করা এবং জমি উন্নয়ন ব্যাংকের এজেন্ট হিসেবে কৃষিক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করা, (৩) কৃষকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের তত্ত্বাবধানে কার্যকর করা, (৪) স্থানীয় জনসাধারণকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা, (৫) প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংরক্ষণ করার জন্য গুদামঘর তৈরি করা ও বজায় রাখা, (৬) কৃষির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা, (৭) কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় করণের ব্যবস্থা করা এবং (৮) নিজের অঞ্চলে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা। ব্যাংকিং কমিশনের মতে গ্রামাঞ্চলে প্রতি ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্যন্ত লোকের জন্য একটি গ্রামীণ ব্যাংক থাকা উচিত। গ্রামীণ ব্যাংকের উচিত মধ্য সম্পত্তি ও স্বল্প সম্পত্তিসম্পন্ন কৃষকদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করা। প্রয়োজন হলে গ্রামীণ ব্যাংক সঞ্চয় বৃদ্ধি কল্পে বেশি সুদ ধার্য করতে পারে। কিন্তু কমিশনের মতে গ্রামীণ ব্যাংকের কোন অবস্থাতেই রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে পুনঃ ঋণের সুবিধার জন্য প্রার্থী হওয়া উচিত নয়।

ব্যাংকিং কমিশনের প্রতিবেদন বেরোবার আগেও গ্রামীণ ঋণের সমস্যা এবং কৃষকদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তৃত সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে নিখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee) এবং পরবর্তীকালে গ্রামীণ ঋণ পর্যালোচনা কমিটি (All India Rural Credit Review Committee) গ্রামীণ ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুসংহত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আমাদের দেশে আগে গ্রামীণ ঋণের প্রধান উৎস ছিল বণিক বা গাঁয়ের মহাজন—প্রতিষ্ঠান নয়। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কখনই গ্রামীণ ঋণ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া গঠিত হওয়ার পর গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের আর্থিক অসুবিধা মেটাবার জন্য নতুন ব্যাংক-শাখা খোলা হতে থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই নগণ্য। ১৯৬৯ সালে চোদ্দটি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের নতুন শাখা স্থাপন করার প্রবণতা বেড়ে যায়। কিন্তু আমাদের দেশ এত বড় যে তাতে বিরাট গ্রামাঞ্চলকে ঋণ ব্যাংকিং ব্যবসায়ের আওতায় আনা খুবই কঠিন।

যে গ্রামীণ ব্যাংক ভারতে স্থাপিত হয়েছে তার সংখ্যা এখন মাত্র পাঁচ; তবে সরকারের মতে এটা একটি সূচনা মাত্র। আমাদের দেশে গ্রামের মানুষের প্রতি বছর তিন হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রয়োজন হয়। ব্যাংকসহ বিভিন্ন ধরনের সরকারী সংস্থা তার মধ্যে আটশ কোটি টাকা সরবরাহ করতে পারে। গ্রামের মানুষকে এখনও ২২০০ কোটি টাকার জন্য গ্রামের মহাজনদের উপর নির্ভর করতে হয়। আশা করা যায় গ্রামীণ ব্যাংকগুলি কৃষকদের গ্রামীণ ঋণের জন্য চাহিদার একটি বিরাট অংশ মেটাতে পারবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, গ্রামীণ ব্যাংকগুলি যে কাজ করবে, সে কাজ কি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি করতে পারত না? তার উত্তরে বলা যায় গ্রামীণ ব্যাংকগুলি যে কাজ করবে শুধু সে কাজ করার জন্যই এই ব্যাংকগুলি গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যাংকের কাজ হবে শুধু কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য গ্রামীণ ঋণ বা কৃষি মূলধন সরবরাহ করা। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আরও কাজ আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কৃষিকে তো অগ্রাধিকার দেবেই, তা ছাড়া ছোট শিল্প, ছোট ব্যবসায় প্রভৃতির দিকেও তাদের তাকাতে হবে। বড় বড় শিল্প তো আছেই; সেগুলিও ব্যাংকের কাছে ঋণ পেয়ে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকগুলির গুণগত ভূমিকা বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাংক থেকে ভিন্ন ধরনের হবে। গ্রামীণ ব্যাংকগুলি ছোট ও প্রান্তিক চাষী, কারিগর ও কৃষি শ্রমিকদের চাহিদা মেটাতে ও উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহদানের জন্য তাদের ঋণদানের ব্যবস্থা করবে। যে প্রথম পাঁচটি গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপিত হল, তার দুটি হয়েছে উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ ও গোরক্ষপুরে এবং বাকী তিনটি স্থাপিত হয়েছে যথাক্রমে রাজস্থানের জাওয়ানে, হরিয়ানার ভিওয়ানীতে এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদায়। দেশের আঞ্চলিক আগ্রসরতার কথা মনে রেখে সর্বত্র গ্রামবাসীগণ যাতে এই বিশেষ ধরনের ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারেন সেদিকে নজর দিয়েই গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন করা হচ্ছে। সরকারের বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে অর্থাৎ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে আরও দশটি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপিত হবে এবং ১৯৭৭ সালের মধ্যে মোট ৫০টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এক কোটি মানুষের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। অনেকে ভাবতে পারেন, নতুন গ্রামীণ ব্যাংকগুলির সংগে হয়ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির প্রতিযোগিতা হতে পারে। কিন্তু তা হবে না। কারণ, গ্রামীণ ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সহযোগী ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পশ্চিমবংগের মালদায় যে গ্রামীণ ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পঁয়ত্রিশ শতাংশ মূলধন এসেছে ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া থেকে। গ্রামীণ ব্যাংকগুলির মূলধনের অর্ধাংশ সরবরাহ করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। এই ব্যাংকগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সুতরাং সরকারের ঘোষিত নীতিই এই ব্যাংকগুলির কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হবার কথা। গ্রামীণ ব্যাংকগুলিও গ্রামের মানুষের কাছ থেকে আমানত গ্রহণের জন্য সব রকম চেষ্টা চালাবে। ঋণ প্রদানকালে গ্রামীণ ব্যাংকগুলি যে সুদ গ্রহণ করবে তা স্থানীয় সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কর্তৃক নির্ধারিত সুদের চেয়ে বেশি হবে না।

ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইতিহাসে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা (তাও আবার সরকারী নিয়ন্ত্রণে) একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু দেখতে হবে, এই ব্যাংকগুলির দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত হবে তারা যেন নিছক আমলাতন্ত্রের প্রশ্রয় না দেন। গ্রামের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও সমস্যার সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয় যাদের আছে এবং যাঁরা কিভাবে কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি ও উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁদের সাহায্যেই এই ব্যাংকগুলির দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করা উচিত। তবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের মূল নীতি অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিকে এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম হবেন, এ ধরনের ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

সুব্রত গুপ্ত

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১১১ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এখান থেকে অসুস্থ শরীর নিয়ে বোটে গিয়েছিলুম বোট থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে ফিরেছি। শরীর রীতিমত অপটু। অক্সফোর্ডের বোঝা এসে পেঁচেছে। দোহাই তোমার একবার Week endএ এখানে দুই একদিনের মতো এসে যদি ঠিকঠাক করে যাও তাহলে বাঁচি। কিছুতে মনোযোগ করবার মতো মাথা নেই। ওদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। আশা করি রানীর শরীর ভালো আছে। ইতি ৫ নবেম্বর

তোমাদের
কবি

॥ ১১২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রশান্ত—হঠাৎ সিটি কলেজের জন্যে টাকার আপিল করতে বসা আমার পক্ষে কি অত্যন্ত খাপছাড়া হবে না? এ কাজ বিশ্বভারতীর জন্যেও আজ পর্যন্ত করি নি। ছাত্রদের আচরণ সম্বন্ধে কিছু বলা সেটা আমাকে শোভা পায়—কিন্তু যে কলেজের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই তার সঙ্গে যোগ স্বীকার করা ঠিক ঠেকচে না। একে তো পাব্লিকের সামনে বেরোতে কুণ্ঠিত হই—তার পরে টাকার জন্যে বেরোতে—তার পরে কোন অনুষ্ঠানের জন্যে যার সঙ্গে কোনোদিন আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। চললুম।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১১৩ ॥

ওঁ

প্রশান্ত

Education Commissionএর কাছ থেকে questionare এসেচে—ভালো করে তার জবাব দেওয়া উচিত। অপূর্ব সেটা নিয়ে গেচে। বোধ হয় তোমরা কয়েক জনে মিলে ওটা ভালো করে বিবেচনা করে লেখা উচিত হবে। জিনিসটা যেন বিশ্বভারতীর যোগ্য হয়।

আজ তোমাদের মীটিং হয়ে গেলে আরিয়ামকে পাঠিয়ে দিয়ো। আজ রাত্রি হয়ে যাবে। কাল সকালে এসে যেন আমাকে খবর দিয়ে যায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১১৪ ॥

VISVA-BHARATI
Santiniketan, Bengal

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

জর্মান কন্সল জেনেরাল Bakeকে১ বলেছে যে, Prussian Academy থেকে আমাদের নামে বই এসেছে কিন্তু Custom duty দিয়ে কে যে খালাস করে নেবে তার কোনো ব্যবস্থা হচ্চে না। কাকে প্রশ্ন করব তা জানিনে, আমরা দুই আপিসের দুই নৌকোয় পা দিয়ে আছি। Sten Konowর২ সাতখানা রেজেস্ট্রি চিঠি কর্নোয়ালিশ স্ট্রীটের আপিসে এখান থেকে রি-ডাইরেক্টেড্ হয়ে গিয়েছিল তার একখানাও Konow পাননি, তা নিয়ে নরোয়ে এবং ইণ্ডিয়া পোস্টমাস্টার জেনেরালের মধ্যে লেখা চালাচালি চলচে—অবশ্য প্রমাণ হবে সে চিঠিগুলি কলকাতা আপিসে গিয়েছিল অথচ মালেক তা পাননি। এই রকম করে দুই জায়গায় দুই ছিদ্র রেখে কি কাজ ভালো হচ্চে?

বসুমতীতে সেই দুখানা বক্তৃতার কি গতি হল। দ্বিতীয় বক্তৃতার প্রুফ পাইনি—হয়ত দেবেও না কিন্তু ফাইল পেলে এখানে ছাপতে দিতে পারি।

বলাকা সম্বন্ধে সুরকুমারকে৩ জিজ্ঞাসা করেছিলুম সে বলে তোমাদের পণ্ডিতের দোষ। আমার বিশ্বাস দোষ উভয়পক্ষেই। প্রুফ দেখবার ভালো লোক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিয়ে একজন কাউকে ঠিক করা উচিত। আমি পণ্ডিতের প্রুফ দেখবার যে চাল দেখেচি তাকে কোনো মতেই দ্রুত বলা যায় না এবং নির্ভরযোগ্যও না, কেননা তিনি মানে বোঝেন না। নীহাররঞ্জনের৪ মত কাউকে রাখা উচিত।

রথীকে শোধবোধের কপি দিয়েছিলুম, ছাপতে দিয়েচে কি? ঋতু উৎসবের খানিকটা ছাপা হয়েছিল এখন পণ্ডিতের হাতে পড়লে তার উদ্ধার হবে না। এখানে ১লা বৈশাখে "বসন্ত" কিম্বা কিছু একটা করবার ইচ্ছা ছিল, বইটা হাতে থাকলে হয়ে যেত। যদি একসঙ্গে পাঁচ ছয় ফর্মার second proof আমাকে পাঠাও আমি একদিনে ঠিক করে দেখে ফেরৎ পাঠাতে পারি। পণ্ডিতের চেয়ে শীঘ্র কাজ হবে।

এখানে শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালই আছে। রাণী কেমন আছে? আমার Sulphur 200 খেয়েও তার যদি উপকার না হয়ে থাকে তাহলে তাকে আমি বয়কট করব। Ester এর ছুটিতে আসতে পারবে না? সেই ডায়ারির প্রথম খসড়াগুলো পেলে মিলিয়ে দেখতে পারি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

---

১ সংগীতবিদ আরনল্ড বাকে
২ খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদ
৩ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র সুকুমার সেন
৪ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

ক্রমশ
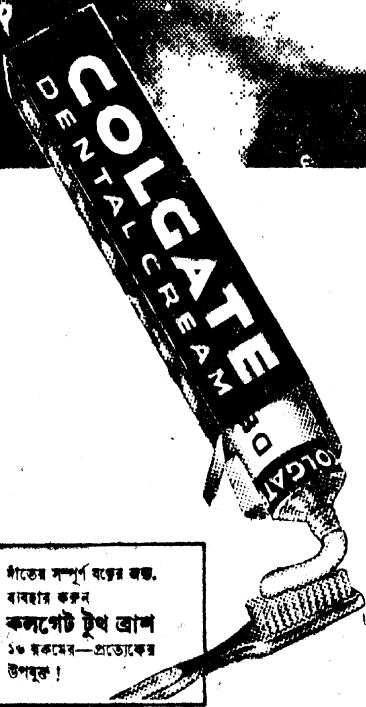
মুখের দুর্গন্ধ মস্ত অন্তরায়...
কলগেট দু'জনের
মিলন ঘটায়
COLGATE
DENTAL CREAM
কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে
মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন...
সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পন্থায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয়— যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ, কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়।
সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিণ্টের গন্ধ—তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালবাসে!
মধুর, স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও উজ্জ্বল দাঁতের জন্য...
দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট!
দাঁতের সম্পূর্ণ যত্নের জন্য,
ব্যবহার করুন
কলগেট টুথ ব্রাশ
১৬ রকমের—প্রত্যেকের উপযুক্ত!

অ্যাপেনডিক্স্

দীপালি দত্ত রায়

লাঞ্চ আওয়ারের পর তপন অফিস থকে বাড়িতে টেলিফোন করলো। বিছানায় ়্য়ে ময়না একটা শিল্প-ম্যাগাজিনের পাতা ল্টাতে ওল্টাতে হাই তুলছিল। এ সময়ে টেলিফোন—হয় রং নাম্বার নয় তপন, ভবে মন্থর গতিতে এসে ময়না রিসিভার লেলো। 'হ্যালো।' 'ময়না? কফি পার্টি কমন হলো?' 'ভালো। মহিলাটি বেশ মায়িক। তোমারও ভালো লাগবে।' আমার সঙ্গে আপাতত দেখা হচ্ছে না। শানো, আমার স্যুটকেসটা গুছিয়ে রেখো। আজ রাত্রেই আবার মিডল ইস্ট যেতে হচ্ছে।' 'আজই? কই আগে বলনি তো?' বড়সড় একটা হাই আসছিল, সেটাকে সামলাতে সামলাতে জড়ানো গলায় ময়না বললো। 'আজই টেলেক্স এসেছে। আমাদের একটা কনসাইনমেণ্টে কি একটা ইরেগুলারিটি দেখা দিয়েছে। আচ্ছা আমার লাইট ওয়েট স্যুট গোটা দুই, নাঃ থাক। একটাই দিও। একটা তো পরাই থাকবে।' 'কতদিন থাকবে?' 'সাত আট দিন।' 'কালকের পার্টির কি হবে?' ময়নার গলা অপ্রসন্ন। 'ও তুমি একলাই যেয়ো। একা না যেতে চাও শ্রীবাস্তবকে বলে দেব, ওদের সঙ্গে তুলে নেবে।' 'বলতে হবে না। আমি যাবো না।' 'কেন?' 'এমনি।' 'উইক্ল ইট বী ওআইজ?' 'না হোক।' 'আচ্ছা রাখছি। চীয়ার্স!' 'চীয়ার্স!' মিডল ইস্ট। রিসিভার নামিয়ে রাখতে রাখতে ময়না দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করলো। আজ বৃহস্পতিবার। এই উইকেণ্ডটা তো নষ্টই, খুব সম্ভব পরেরটাও যাবে। সামনের শনিবারের আগে কি আর ফিরবে? তাও ফেরে কিনা সন্দেহ।

তপন ফেরার পর স্যুটকেসে টুকিটাকি ভরতে ভরতে ময়না বললো, 'মিডল ইস্টে

তো প্রায়ই গণ্ডগোল।· ওখানে অত যাবার কি দরকার?' 'ইউ আর অ্যাক্টিং নাইভ্ ময়না! খুব ভালো করে জানো, ওখানেই বিজনেস, তাই ওখানে যেতে হয়। ইট্স্ নট্ এ প্লেজার ট্রিপ।' ময়নার মুখ-ভার কাটলো না। 'কোন জায়গায় যাচ্ছ?' 'কুএইটে। তারপর হয়তো আবু দাবিতেও।' 'কুএইটেই বেশী দিন থাকছ?' 'হ্যাঁ। হুঁ।' 'হুঁ মানে?' 'ওখানে এত ঘন ঘন যাবার কি দরকার?' 'রিয়েলি ময়না! কতবার বলেছি. ওখানে আমাদের মার্কেট ডেভেলাপ করতে হচ্ছে। আমাদের প্রোডাক্টের ডিম্যাণ্ডও বাড়ছে, তাই এত বারবার যেতে হচ্ছে। আমার ভালো লাগে বলে কি যাই? কাজে যাই।' 'তুমিই কেন বারবার? শ্রীবাস্তবও তো যেতে পারে মাঝে মাঝে?' 'শ্রীবাস্তব? একটা ডিসিশন নিতে এক মাস লাগে। এই কম্পিটিটিভ মার্কেটে, ফার্ম ফুটহোল্ড মেইনটেন করার জন্য অন দ্য স্পট কতখানি আণ্ডার কোট করা যায় তাই আজ পর্যন্ত মাথায় ঢুকলো না।' 'তুমিই একমাত্র এফিসিয়েণ্ট লোক। কে হতে বলেছিল?' 'ডোনট্ বী ডাফ্‌ট ময়না!' 'তুমিও ব্র্যাগ করো না।' 'অ্যাণ্ড ডোনটিউ ন্যাগ টু!' রাগ করতে গিয়েও ময়না হেসে ফেললো। 'কি সুন্দর রাইম করছে দেখ। ব্র্যাগ অ্যাণ্ড ন্যাগ। তোমরা সব সময় ব্র্যাগ কর আর আমরা মাঝে মাঝে ন্যাগ করি।' তপনও হাসলো। 'নিজের বেলায় অমনি মাঝে মাঝে হয়ে গেল। দাঁড়াও চট করে স্নানটা সেরে নিই। সময় বেশী নেই।' তপন নিজের কাগজপত্র পাসপোর্ট, এয়ার টিকিট ইত্যাদি ব্রীফকেসে ভরতে ভরতে অন্যমনস্কের মতন জিজ্ঞেস করলো, 'সব ঠিকমতন দিয়েছ তো? আণ্ডার ক্লোদস বেশী দিয়েছ?' 'চেক করে নিলেই পার।' 'দাঁড়াও আসছি।' ব্রীফ-কেসটা আলাদা সরিয়ে রেখে স্নান করতে গেল। স্নান সেরে এসেই তাড়াতাড়ি করে জামা কাপড় পরা শুরু করলো। 'এখন যত হড়বড়। এত দেরি করে ফিরলে কেন?' 'আর বোলো না। শিপিং ডিপার্টমেণ্টটাই গোলমাল করে দিল। সরকার আজ আসে নি। তাই কোথায় শিপিং ইনশ্যুরেন্স, কোথায় ফ্রেইট ইনশ্যুরেন্স, এই সব স্ট্রেইটন আপ করতেই অনেকটা সময় চলে গেল। তার ওপর আজ আবার নতুন চেয়ারম্যান এসেছেন।' 'তোমার ওখানকার কাজটা কি এতই জরুরী যে, নতুন চেয়ারম্যানকে মীট করার পার্টিটাও মিস করছ?' 'চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার আজ অফিসেই দেখা হয়েছে। শুধু দেখা নয়, এক্সপোর্ট সেল্‌স নিয়ে বেশ কিছু ডিস্‌কাসনও হয়েছে।' টাই-এর নটটা বেঁধে ঠিক করে নিয়ে, ড্রেসিং-টেবিলের ওপর থেকে আফটার শেভ লোশন হাতে নিয়ে ঢালতে ঢালতে তপন বলে উঠলো, 'এ কি? ব্রুটটা দিলে না? কোলনটা দিয়েছ তো?' 'অন্য আফটার শেভটা দিয়েছি।' 'না না এটাই দাও। এটার গন্ধ আমার বেশী ভালো লাগে। ওখানে যা গরম। চারদিকে শুধু ঘামের গন্ধ।' 'যাচ্ছ তো কাজে। একটা হলেই হলো।' ময়না উদাসভাবে বললো। 'না! এটাই দাও।' ময়নার মুখ কালো হয়ে গেল। 'অত রাগের কি আছে? ব্রুট না হলে যদি না চলে, তবে নিজেই ভরে নাও। অত কথা না বাড়িয়ে আরেকটা কিনেও নিতে পারতে।' স্যুটকেস খুলে ওটা আবার ভরে দিয়ে ঝপ করে ডালাটা বন্ধ করে দিল। এ সব বিষয়ে সাধারণত তপন খুব শৌখিন নয়। বরং ময়নারই ওকে বলে বলে এ সব ব্যবহার করাতে হয়। কিন্তু আজকাল দেখছে ওসব জায়গায় যেতে হলেই তপনের শৌখিনতা বেড়ে যাচ্ছে। কেন, সেটা যেন আন্দাজও করতে পারছে। তপন যখন ফিরে আসে, স্যুটকেস খুললেই ওর কাপড়চোপড়ের মধ্য থেকে একটা আলাদা ধরনের [illegible] মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। থমথমে মুখে জিজ্ঞেস করলো, 'কবে ফিরছ? শুক্রবারে?' 'দেখি।' 'দেখি?' 'শনিবারে খুব সম্ভব এসে পড়বো।' 'তার মানে শনিবারেও না।' 'কোনও পার্টিটার্টি আছে নাকি?' 'তোমার [illegible] সার্কেলের নয়, তাই বলে লাভ নেই।' তপন জুতো পরছিল। ফিতে বাঁধা শেষ করে ঠক্ করে পা মাটিতে ফেলে উঠে দাঁড়ালো। 'তুমি দেখো ঠিক এসে যাবো। তবে ডেফিনিটলি কিছু তো বলা যায় না?' খাবারের প্লেটসুদ্ধ টেবিলটা ওর সামনে এগিয়ে দিতে দিতে ময়না বললো, 'তুমি অন্য কাজ নাও।' 'পাগল হয়েছ? এই তো সবে উঠছি। এখন কাজ বদলানো যায়?' 'এমনি বারবার বাইরে যেতে ভালো লাগে? আমার লাগে না।' 'আই নো। কিন্তু কি

করা যাবে? কাজ পড়লে যেতেই হবে। এত কে খাবে? সরিয়ে নাও।' 'তুমি খাও না যা পার। এমন ম্যাটার অব ফ্যাক্টলি কথা বলছ, যেন কিছুই এসে যায় না।' 'এসে যায় না? কি বিষয়ে বলতো?' 'থাক বলে লাভ নেই। ফ্যামিলির জায়গা যে তোমাদের মনে কোথায় তা তো জানাই আছে।' 'ফ্যামিলি? ফ্যামিলির আবার কি হলো? ওঃ! তা কি করি বল? ডোণ্ট থিংক আই ডোনট মিস ইউ অল। করি। যখনই একলা হই তখনি ভীষণভাবে মিস করি।' 'প্রতিবার যাবার সময় খুশী খুশী মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়।' 'খুশী খুশী?' তপন গম্ভীর হলো। 'প্লীজ ময়না! ডোণ্ট স্টার্ট ইওর ইমোশন্যাল অ্যান্টিকস নাও। দিস ইজ হার্ডলি দা টাইম। তা ছাড়া এ সব বাজে কথা ভাবার কোনও কারণ আছে কি? তুমি আজকাল বড্ড বেশী ইম্যাজিনেটিভ হয়ে পড়ছ। অ্যাট দ্য মোস্ট, রোজকার রুটিনের একটু চেঞ্জ হয়। কাজ যে কি হায়রানির আর ঝামেলার তা তো বোঝো না?' ময়না কথা পালটালো 'হিলটনেই থাকছ তো?' 'হ্যাঁ। দা ওয়ান অ্যান্ড ওনলি লাক্সারি গ্রাণ্টেড টু আস। তাও আর থাকবে না। এ দেশে তো নয়ই।' 'কেন? তোমার জন্য অন্তত স্পেশাল ব্যবস্থা থাকা উচিত। নাই বা হলে ডিরেক্টার।' খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালো তপন। 'মাই ডার্লিং ডার্লিং ময়না! ইওর স্পেশাল ইজ নট কমপেনিজ স্পেশাল। এসো।' ওকে ধরে এনে দুই গালে দুটো বড় বড় চুমু খেল। 'মাই ভেরি ভেরি স্পেশাল পার্টিং গিফ্ট টু ইউ।' ধরে রইলো কিছুক্ষণ ওর কপালে গাল ঠেকিয়ে। 'কি আনব বল? এনিথিং স্পেশাল? বাহারিনের মুক্তোর মালা তো বলেই রেখেছি। পেয়ে গেলে নিয়ে আসবো এবার। আর কিছু?' তপনের বুকে মাথা ঠেকিয়ে প্রাণপণে চোখের জল চেপে ময়না অস্ফুটে বললো, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। কিচ্ছু চাই না আমি।' 'চলি এখন কেমন?' বাঁ হাতে ওর থুতনি তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে গালে আদরের হালকা চাপড় মারতে মারতে বললো, 'এ সব আজেবাজে কথা ভেবে মোটেই মন খারাপ করবে না। ভালো থেকো। তাড়াতাড়ি চলে আসবো দেখো। বাপ্পা কোথায়?' ঘড়ি দেখলো। দেখেই শিস দিয়ে উঠলো, 'এঃ একেবারে সময় নেই। চলি। আর শোনো ড্রাইভারকে অফিস আওয়ারস-এর পরেও দরকার পড়লে রাখতে পারো। বাড়িতে বসে থেকো না এ কদিন। ঘুরেটুরে বেড়িয়ো।'

ওকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে ময়না উঠে এলো নিজের ঘরে। নিষ্ফল একটা রাগ আর ক্ষোভের জলুনী মনের মধ্যে। তপনের অফিসের কাজে বাইরে যাওয়া এই প্রথমও নয়, নতুনও নয়। বিয়ের বছর দুই পরই একটা প্রোমোশন। তারপর থেকে এই ছ' বছর ধরে তপনকে কেবলই বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। থাকে না যখন মন খারাপ লাগে, একা লাগে। এদিক ওদিক, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, সিনেমা থিয়েটার কনসার্ট, আর্ট এগজিবিশন এই সব করেই সময় কাটিয়ে দেয় কোনও মতে। বাড়িতে ফিরতে বা থাকতেই ভালো লাগে না বেশী। কিন্তু বাপ্পা আছে তাই থাকতেই হয়। ওকে নিয়ে দিনের বেলাটা আর সন্ধ্যার খানিকটা কাটে কিন্তু বাকি সময় যেন আর কাটতেই চায় না। কিন্তু এই অসহায় রাগ আগে হতো না। এটা হচ্ছে আজ কিছুদিন ধরে। ঠিক হিসাব ধরলে, আজ বছরখানেক ধরে। মনে আছে ময়নার, গত বছর জুন মাসে, এই মিডল ইস্টেই গিয়েছিল তপন। কুএইটে। দিন দশেক থাকার কথা ছিল, কাজের জন্য দিন পনেরো থেকেছিল। ফিরে আসবার পর, সেবারই প্রথম এই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধটা ওর স্যুটকেস থেকে জামাকাপড় বার করার সময় পেয়েছিল। তখন কিছু মনে হয়নি। ভেবেছিল পারফিউমের গন্ধ। এই এত বড় একটা ক্রিশ্চিয়ান ডিঅরের বোতল এনেছিল ওর জন্য। আরো নানান সব টুকিটাকি। পেস্তার টিন, খেজুর এই সব। ব্রুট বলে আফটার শেভ লোশনটাও সেবারই প্রথম কিনে আনে। আসার পর কদিন ওর হাবে-ভাবে কেমন একটা বলন্দদ ভাব। কেবল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা। আদরের মাত্রাটা একটু বেশী বেশী। ময়না তখন বেশী মাথা ঘামায়নি এ নিয়ে। আসলে প্রথমটায় এত সব লক্ষ্যও করেনি বিশেষ। ওর ফিরে আসার আনন্দেই মাতোয়ারা হয়ে কেটেছিল কটা দিন।' সংশয়ের সূত্রপাত পরের বার যাবার সময়। তপন যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নিজেকে সামলাচ্ছে। ময়নার অভিমান হয়েছিল। দূরে যাবার আগে আসন্ন বিচ্ছেদের কোনও দুঃখই ওর মধ্যে দেখতে না পেয়ে। তবু ভেবেছিল, বারবার যেতে যেতে সয়ে গেছে। তারপর ও যাবার পরদিনই সুন্দর দু ডজন লাল গোলাপ ওর নামে এসে হাজির। সঙ্গে কার্ড। তাতে লেখা, 'ডার্লিং আই লাভ ইউ। ইওরস এভার তপন।' হঠাৎ গোলাপগুলি পেয়ে চোখে জল এসেছিল। ও লাল গোলাপ ভালোবাসে, তপন জানে। হয়তো কাজের

চিন্তায়, প্রাক-বিদায় ব্যবহারের ত্রুটি ওর নিজের মনেই ধরা পড়েছে, তাই এ গোলাপ। যত্ন করে, ঘরে এনে সাজিয়ে রেখেছিল। তারপর থেকে যতবারই যায়, পরদিন ঐ গোলাপের তোড়া এসে হাজির হয়। আর ফেরার পর, স্যুটকেস থেকে নির্ভুলভাবে সেই মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। উপহারের মাত্রাও দিন দিন বাড়ছে। ভালো লাগে না ময়নার। বুঝতে পারছে, কাজের পর মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ওখানে প্রচুর এবং তপনও অসঙ্কোচে তার সদ্ব্যবহার করছে। এখন আর ফেরার পরের ব্যবহারেও সেই অপরাধ সঙ্কোচের জড়তা নেই। অযথা উচ্ছ্বাস নেই। তবু সেই গোলাপ আসে। ইংরিজীতে বলে, সে ইট উইথ ফ্লাওয়ারস্। কি বলতে চাইছে তপন? লাল গোলাপ তো ভালোবাসার প্রতীক? কি সব উল্টোপাল্টা কাজ করছে ও কি বুঝতে পারছে না? কেন মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে দিয়ে ওকে এভাবে অপমান করছে? প্রথমবারের পর ফিরে জিজ্ঞেস করেছিল 'আ—ফুল পেয়েছিলে? দিয়ে গিয়েছিল তো ঠিক? ময়না ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিলো হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ? এই এমনি। তুমি তো ফুল ভালোবাস। মুখ সামানা লাল হয়ে উঠেছিল। এর পর আর কোনও বারই জিজ্ঞেস করেনি। ময়নাও বলেনি কিছু। শুধু ফুলগুলি নিয়মিত এসেছে। আর ময়না শুধু নিজের মনে জ্বলেছে। একঘেয়ে রুটিনের বদল তো নিশ্চয়ই ভালো; কিন্তু তাই বলে কি কোথাও কোনও সীমারেখা থাকবে না? অপমানিত লাগে নিজেকে। অর্থহীন মনে হয়। তার সম্পদ সম্ভারের যেন আর কোনও দাম নেই। অখন্ড প্রয়োজন নেই। যেন তপনের ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার মতন যথেষ্ট ক্ষমতা আর নেই তার। সমস্ত ব্যাপারটার বিচারহীনতায় ওর মন জ্বলে। কেন এমন হবে? পুরুষ বহুপিপাসু সত্যি কথা, কিন্তু তাই বলে কি ভালোবাসা কিম্বা একনিষ্ঠতার কোনও মূল্য নেই? মনে মনে একটু সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করে। ভালোবাসায় তপনের মনে কোনও চিড় ধরেনি। কিন্তু সে আশ্বাসই বা সে পাচ্ছে কোথায়? কোনও দিন কি পেয়েছিল? বিয়ের পর দুটো বছরই শুধু তপন ওর প্রতি উদাসীন ছিল না। তারপর আস্তে আস্তে কত সরে গেছে সে? সারাদিন রাত্রির মধ্যে কতটুকু সময় ময়নার জন্য রাখা আছে তপনের দৈনিক ক্যালেণ্ডারে? এমন একটা দিন কি যায় আজকাল, যখন তপন সন্ধ্যেবেলাতেও কাজ কিম্বা কাজের প্ল্যান অথবা তার সমগোত্রীয়দের সংগে আলাপ আলোচনা কিম্বা তাদের আপ্যায়ন অভ্যর্থনায় মগ্ন থাকে না? সংসারের কোন ব্যাপারে সে মাথা গলায়? অথবা গলাতে চায়? আর ময়না? যে কিনা তার সব কাজ সাংগ করে সন্ধ্যেটুকু শুধু তপেনেরই জন্য তুলে রাখে, তপন কি ফিরেও চায় ওর দিকে? ডোনট বী ডাফট, ডোনট ন্যাগ, ডোনট বী নাইভ কিম্বা ইউ আর টূ এগজ্যাকটিং এই তো বুলি ওর মুখের। বিনা প্রয়োজনে কখনও কাছে আসে না। এলেও কেমন অন্যমনা। কাজের চাপে সব সময়েই ক্লান্ত। অফিসেও নিত্য নতুন সার্কুলার আজকাল। সেলস ডিপার্টমেন্টের ওপরই যত চাপ। মন মেজাজ ওর বেশীর ভাগ সময়েই খারাপ। এ সব নিয়ে তাই কথা তুলতেও ইচ্ছা করে না। আত্মসম্মানেও লাগে। তাছাড়া বলবে বা কখন? সকালে প্রশ্নই ওঠে না। সন্ধ্যের পর ফেরে যখন তখনও বলা চলে না। ছুটির দিনগুলি কোথা দিয়ে কেটে যায় নানান ঝামেলায়। নয়তো তপনের গলফ খেলায় কিম্বা বীয়ার সেশনে। উইকেণ্ডের রাত্রিগুলির একটাতে বলা যায়। কিন্তু প্রায়ই তপন অল্পবিস্তর নেশাগ্রস্ত থাকে, অতএব বলবে কাকে? তাছাড়া এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা কিভাবেই বা করা যায়? করেও কি কিছু সুরাহা হবে? তপন কি মেজাজ ঠিক রাখবে? যদি কথাবার্তার মোড় তেমনভাবে নেয়, তার কি একসংগে থাকা যাবে? না, ময়না সাহস খুঁজে পায় না। তাছাড়া নিঃসংশয় বিশ্বাস কি নিজের মনেও আছে? তপনের বরাবরের উদাসীনতার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। কিন্তু আর যা ভাবছে ও মনে মনে তাতো শুধু মাত্র অনুমান আর অনুভূতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে এখনও। যদি সে ভুল বুঝেই থাকে? তখন কি হবে? তবু যখন ঐ লাল গোলাপগুলি নির্ভুলভাবে এসে পৌঁছতে থাকে, তপন রওয়ানা হবার পরদিনই, মনের জ্বালা যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। কখনও নিষ্ফল আক্রোশে কখনও উপায়হীন হতাশায় ভোগে। প্রতিবার বলে, এই শেষ বার। আর না! সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবার এলে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। কিন্তু আসার পর আর সে উদ্যম কিম্বা ইচ্ছা থাকে না।

কেন কোম্পানী অন্য কাউকে ওসব জায়গায় পাঠায় না? যেতে যেতেই শিখে নিত ওরা? কেন বার বার তপনকেই যেতে হবে? ভাবে বটে, কিন্তু জানে ওদের কোম্পানীতে এক্সপোর্ট সেলস নিয়ে তপন বলতে গেলে এক্সক্লুসিভলি ডিল করে। এর সিঁড়ি বেয়ে বেয়েই তপনের আরো অনেক ওপরে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। ওর এফিশিয়েন্সি দেখেই কোম্পানী ওকে এই জায়গায় বসিয়েছে। এফিশিয়েন্সি! কোথায় তপন কোথায়? বাড়ির বাইরের এফিশিয়েন্সিটা কি বাড়িতে আসার সময় লকারে বন্ধ করে রেখে আস? নিজের বাড়ির ভেতরে কি মেস সৃষ্টি করেছ, তা কি বুঝতে পারছ না?

আজও তপন দমদম এয়ার পোর্টে বম্বের প্লেন ধরতে চলে যাবার পর ময়না ভাবলো, কালও যদি আবার ঐ ফুলগুলি আসে, ছুঁড়ে ফেলে দেব। একার একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। আমি আর পারছি না। কাজের খাতিরে তো কতজনেই যায় বাইরে, কিন্তু আমার মতন ক'জনের স্ত্রী ভোগে? ঠিক আছে, এবারটা দেখব। যদি ও শনিবারের মধ্যে না আসে, পুরো উইকেণ্ডটাই কাটিয়ে আসে, তবে এবার একটা কিছু করতেই হবে। কি পেয়েছে কি ও? ওর স্যুটকেস আর ছোঁবই না। ব্লাডহাউণ্ডের মতন গন্ধ শুঁকে শুঁকে আর ছিঁড়ে খাবার ইচ্ছা দমন করে করে এ কোথায় নাবছি?

আগে আগে, মা এসে থাকতেন, তপন চলে গেলে পর। বাপ্পা তখন বড্ড ছোট। কিন্তু মা এসে তপনের সম্বন্ধে এত প্রশ্ন করেন, তপনের সংসার সম্বন্ধে উদাসীনতা নিয়ে এত আলোচনা করেন, ময়নার ভালো লাগে। নিজেকে যেন বড় বেশী দুর্ভাগা অন্যের মুখ থেকে শুনতে অপমানিত লাগে নিজেকে যেন বড় বেশী দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়। অকারণ হতাশা আসে। তুচ্ছ জিনিসও বড় হয়ে ধরা পড়ে চোখে। মা বোঝেন না। ওর প্রতিও কটাক্ষ করেন। তুমি নিশ্চয়ই ভালো করে যত্ন করো না। ভালোমতন সংগ দাও না—ইত্যাদি। ময়না রেগে যায়। 'তুমি এমনভাবে বলছ, যেন ও আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতেই বাইরে যায়। ও তো যায় অফিসের কাজে। ওদের কম্প্যানীর এক্সপোর্ট সেলস ওই হ্যাণ্ডল করে। নতুন মার্কেট ওগুলো, তাই তদ্বির তদারকির প্রয়োজন বেশী। ফরেন এক্সচেঞ্জের ব্যাপারও রয়েছে। এসবে

ও এয়ারপোর্ট খুব তাই ওকে যেতে হয়।' সবই বুঝলাম। কিন্তু ঘর ভেসে যাবে, সেটাও ওর ভেবে দেখা উচিত।' 'ভেসে যাবে আবার কি? আমিই তো রয়েছি। কি যে বল না তুমি!' 'তোমার জন্যও ভাবনা নেই বুঝি? তোমায় দেখে কে?' 'আমার আবার দেখার কি আছে? আমি কি ছেলেমানুষ? আমায় কারু দেখতে হবে না। তাছাড়া গাড়ি রয়েছে। তেমন দরকার পড়লে তোমরাও আছ। মাসে তো মোটে আট দশদিন। তাও সব মাসেই নয়।' তপন যখন থাকে না, তপনের হয়ে ওকালতি করা যায়। কিন্তু সামনাসামনি হলে পর, সে বাদী পক্ষ। তখন এসব কথা মুখ ফুটে না বললেও মনে ঠিকই আসে। ওর নিজেকে সামাজিকভাবে খবরদারি করার প্রয়োজন অবশ্যই নেই। আজ মেয়েরা অনেক স্বাধীন এবং যথেষ্ট সতর্ক। কিন্তু তাই কি সব? মাও তাই বোঝাতে চান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। তাই লাগে বেশী। মার জন্যই বেশী বেশী ঘোরাঘুরি করে নিজেকে প্রফুল্ল দেখাবার চেষ্টা করতে হয়। তখনও মা আবার বলেন, 'একা-একা কিম্বা যার তার সঙ্গে বেশী ঘুরে বেড়িয়ো না। একটু এদিক ওদিক হলেই জানো তো কথা রটতে সময় লাগে না।' 'যতক্ষণ না কিছু ঘটছে, কিছু রটলেই বা কি এসে যায়?' বিরক্ত-ভাবে বলে ময়না। মার ধারণা ময়না এখনও অবুঝ। যেন সে যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গেই বছরের পর বছর কাটাচ্ছে না এইভাবে। তপনকে কাজের জন্য বাইরে যেতে হবে, থাকতে হবে কদিন দূরে, এনিয়ে ওর মন খারাপ লাগলেও, নালিশ তো নেই? কি করা যেতে পারে? এতো মেনে নিতে হবেই। নিয়েছেও। কিন্তু তপন যে আজ-কাল কি করছে, তাই ভেবেই তো সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে ছটফট করছে। তপনের সন্ধ্যাগুলো ভীষণ ভালোভাবে কাটছে এই আশঙ্কাতেই তো ওর নিজের সন্ধ্যেগুলো এত জগদ্দলের মতন ভারী হয়ে উঠছে।

মন বড় বেশী স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে। সেদিন কে যেন ঠাট্টা করে বললো 'ময়না বী কেয়ারফুল। তপন দেখো ঠিক একটা হারেম টারেম নিয়ে আসবে।' সারা শরীর জ্বালা করে উঠেছিল। হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মনের মধ্যে জ্বালা থেকেই গিয়েছিল। একে ময়না নিজের যন্ত্রণায় অস্থির, তার ওপর আবার ঐসব বদ রসিকতা। অথচ এ ধরনের রসিকতা তো হরদমই কত লোক কতজনের উদ্দেশ্যে করছে?

এবারের সন্ধ্যেগুলো বড় বেশী জ্বালাচ্ছে। কদিন তবু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে সময় কাটালো ময়না। কিছু কেনাকাটা, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করানো, নতুন করে সাজানো। এইসব নিয়েও আরো কিছু সময় কাটলো। কিন্তু এ সবই প্রায় দিনের বেলায়। বন্ধুদের বাড়িও সন্ধ্যেবেলা যাওয়া যায় না। সকলেই যে যার স্বামী সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তার মধ্যে দরিদ্র আত্মীয়ের মতন গিয়ে রসভঙ্গ করতে ওর ইচ্ছা করে না। কিছু উৎসাহী অবিবাহিত যুবক বন্ধু যে ময়নার নেই তা নয়। তারা জানতে পারলেই সিনেমা থিয়েটারে নিয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানায়। ময়না যেতে চায় না। সে জানে তার চেহারায় একটা বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে। পুরুষের মনে যা যথেষ্ট বিভ্রমের সৃষ্টি করে। এতে যে তার নিজস্ব কোনও হাত নেই; শারীরিক মেটাবলিজম্-এর এক দুর্জ্ঞেয় করুণাই এর হেতু, একথা অনেকেরই মনে থাকে না। এ তার চরিত্রেরই একটা বিশেষ আঙ্গিক বলে ভুল করে বসে। এবং তার সুযোগ নিতে চায়। প্রায়ই অন্ধকার অডিটোরিয়ামের ভেতরে পাশে বসা লোকটির বসার ভঙ্গী বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে অনাহূত একটি হাত এসে ওর কাঁধে ঘাড়ে কিম্বা পিঠে থামবেই। বিরক্ত হলেও আগে এটাকে অগ্রাহ্য করার মতন মনের অবস্থা ছিল। এখন নেই। এখন মনে হয় একটা লোকের উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে এরা সবাই ওকে অপমান করছে। নিজের ওপর আস্থাও যেন দিন দিন কমে আসছে। নিজেকে অনাথ এবং অনুকম্পার বস্তু বলে মনে হচ্ছে। কি যে করবে, কেমন করে মনের এই অবস্থা কাটিয়ে উঠবে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না। এদেরই কাউকে বাড়িতে ডেকে দু'এক সন্ধ্যা কাটানো যায়। কিন্তু এদের মাত্রাজ্ঞানও বড় কম। এক সন্ধ্যার আমন্ত্রণ পেলেই এরা নিজেদের কয়েকসন্ধ্যার সীজন টিকিটের মালিক বলে মনে করে বসে। তবু এখন বাপ্পা আছে বাড়িতে। যত ছোটই হোক, একটি প্রিয় সঙ্গী। আর কতদিনই বা ও বাড়িতে থাকবে? আরেকটু বড় হলেই তো চলে ঘাড়ে কিম্বা পিঠে থামাবেই। বিরক্ত হলেও নিজের স্কুল দার্জিলিং সেণ্টপলস-এই ওকে বুক করে রাখা হয়েছে। আর দু বছর পরই চলে যাবে সেখানে। তখন কি করবে ময়না? তপন তো যতই ওপরে উঠবে, ততই ওর সময় কমবে। এখনই কতটুকু সময় বাড়িতে থাকে? থাকলেও কতটুকু সময় ময়না ওকে নিজের মতন করে পায়? সে যেন কেউ নয়। তার কোনও নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই। নেই কোনও আলাদা সত্ত্বা। শুধু তপনের ব্যবসায়িক বন্ধুবান্ধব, পরিচিতদের আদর আপ্যায়ন করার হোস্টেস মাত্র। কেন তপন বোঝে না, এই শুধুমাত্র 'আমি তুমি'র জগতে, তুমিটি যদি প্রায়ই শারীরিকভাবে এবং সর্বদাই মানসিকভাবে অনুপস্থিত থাকে, তবে সে জগতের ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে না? সেও তো একটা মানুষ? সে কি শুধুই ঘর-সংসার দেখার জন্য একটা ভাড়া করা লোক?

পরের বৃহস্পতিবারে অবশ্যম্ভাবীভাবে তপনের অফিস থেকে টেলিফোন এলো, মিঃ সেন রবিবারের আগে ফিরতে পারবেন না। আজই টেলেক্স মেসেজ এসেছে। জানিয়ে দিতে বলেছেন, গাড়িটা যেন রবিবার রাত্রে নটার মধ্যে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' ময়না অস্ফুটে বললো জানতাম। আমি জানতাম।' 'বেগ ইওর পার্ডন?' 'না কিছু না। অনেক ধন্যবাদ।'

চোখ ফেটে জল এলো। অনেক কিছু আশা করে রেখেছিল। ধরে রেখেছিল, এবারে যদি ঠিক দিনে আসে, তবে জানবে ওর এসব ধারণা ভুল। সতিই কল্পনা। কোনও সত্যতা নেই এতে। এলো না। আসবে না। যদিও এতে কিছুই প্রমাণ হয় না, তবু মন দমে গেল। কুসংস্কার সে বিশ্বাস করে না, তবু জোর করে উড়িয়েও দিতে পারে না। ছোটবেলার সেই অভ্যাস যায়নি। বোধ হয় যায়ও না। বুকের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতা। হারিয়ে যাচ্ছে তপন, হারিয়ে যাচ্ছে। কেন আমি আর ওকে ধরে রাখতে পারছি না? আমার আর কোনও আকর্ষণই নেই ওর কাছে। এইবারটি তুমি আসতে পারলে না? শুধু এইবারটি? আবার ভাবলো, কাজের জনাই তো দেরি হচ্ছে। নিজের কোনও উদ্দেশ্যসাধন করার জন্য কি এসব ক্ষেত্রে দেরি করা সম্ভব? কিন্তু প্লেনের টিকিটের বুকিং নিয়েও তো একটা দিন দেরি করা যায়। যায় না? ঠিক আছে। কর দেরি। আমিও বসে থাকবো না—। পার্থ কাল টেলিফোন করেছিল। একা [illegible] জেনে শনিবারে সিনেমা আর বাইরে [illegible] নেমন্তন্ন করেছিল বলেছি, পরে জানাবো—যাবো। ওর সঙ্গেই যাবো—। কেন আমি বসে বসে শনিবারের সন্ধ্যা বাড়িতে একা একা কাটাবো? তুমি কিসব করছ ভেবে জ্বলে জ্বলে মরব? আমিই শুধু জ্বলবো? তুমিও একটু জ্বলবে না?

রবিবারে রাত দশটা নাগাদ তপনকে নিয়ে গাড়ি বাড়িতে ফিরলো। হাসিখুশী মুখ নিয়ে উঠে এলো ওপরে। ময়না রান্নাঘরে। তপনের পছন্দমতন ডিনার নিজের হাতে গরম গরম বানাতে ব্যস্ত। ঘর ঘুরে, কোট টাই খুলে, রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো তপন। 'কি করছ?' রাখ এসব। ঘরে এসো।' একপলক ওর দিকে তাকিয়ে ময়না চোখ নামালো। মনোযোগের সঙ্গে রোস্টের চিকেনটা উল্টে দিতে দিতে বললো 'তুমি যাও ঘরে। আমি এক্ষুনি

আসছি। এক মিনিট, ঠিক এক মিনিট। প্লীজ।' তপন চলে গেল। নিজের হাতেই স্যুটকেস খুলে ওর জন্য আনা জিনিসগুলি একটা একটা করে ড্রেসিং টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলো। বাপ্পার জিনিসগুলি নিয়ে কিউবোর্ড ওপর রাখতে যাবে, নজর পড়লো সুন্দর ফুলদানীটার ওপর। হলুদ গোলাপ দিয়ে সাজানো। সুস্থ, পুষ্ট গোলাপগুলি। হলদে গোলাপ তপনের প্রিয়। ফুলদানীর গায়ে একটা কার্ড দাঁড় করানো। তাতে লেখা 'ডার্লিং আই লাভ ইউ। এভার ইউরস ময়না?' হাসি ফুটলো মুখে। একটু অস্বোয়াস্তির ছাপও। আলতো করে ফুলগুলির ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিল। কি যেন ভাবছে। আস্তে আস্তে মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠছে সারা মুখে। বিস্ময়, অবিশ্বাস ভরা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো ফুলগুলির দিকে। চোখ সরাতে পারছে না। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সারা মুখ লাল হয়ে উঠছে। কোথা থেকে এক দুর্দমনীয় রাগ এসে সারা শরীর অবশ করে দিচ্ছে। কি বলতে চাইছে ময়না? কি?

ঝনঝন্ শব্দে হলুদ গোলাপ সুদ্ধু ফুলদানী আছড়ে পড়লো মাটিতে। জলে, ভাঙ্গা কাঁচে, আছড়ানো গোলাপে, সারা মেঝে কার্পেট মাখামাখি। খাঁচায় পোরা বাঘের মতন কবার পাক খেলো ঘরের মধ্যে। তারপর হঠাৎ থেমে, জানালার পর্দা ঝড়াং করে টেনে সরিয়ে ভ্রূকুটি কুটিল মুখ নিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরের অন্ধকারের দিকে।

রান্নাঘর থেকে ময়না ঠিক ঠিক শুনলো, সে আওয়াজ। এরকম একটি প্রতিক্রিয়ারই আশংকায় কাঁটা হয়েছিল সে। বিষণ্ণতার ছাপ পড়লো মুখে। সবই তো স্পষ্ট হয়ে গেল আজ। আবার স্বস্তিরও। ময়নার দাম, তাহলেও কমেনি আজো। বেয়ারাটা ছুটে গেল বেডরুমের দিকে। ময়না একা দাঁড়িয়ে রইলো রান্নাঘরেই। একটু সময় চাই তার। মন বিকল। পা অচল। দিনের পর দিন, নিজের মনাক, বিবেককে সান্ত্বনা দিতে মিথ্যা বলে চলেছে তপন। একটু যেন হাসিরও আভাসও পাওয়া যাচ্ছে ঘটনাটির মধ্যে। এখনও তপন ইচ্ছে করলে ফিরতে পারে, এমন একটা সম্ভাবনাও মনে মনে। তপনের কাছে প্রার্থনা জানালো, 'তোমার এ মিথ্যে আমি ক্ষণিকের দুর্বলতা বলে সয়ে নিচ্ছি তপন, কিন্তু আর বোলোনা। আমাকেও যেন না বলতে হয়। প্লীজ তপন এটুকু মান আমার রেখো।' দুর্বলতা নিয়েই তো মানুষ। তপনও এদেরই একজন। সেই একই দুর্বলতা থাকার জন্যই হয়তো মানুষ এখনও মায়ামমতার শেকলে বাঁধা থাকে। ময়না এবার আস্তে আস্তে ঘরের দিকে এগোল।

ঘরে ঢুকে তপনের মুখোমুখি হতে ওর সংকোচ হচ্ছে। তপন এখনও নিজেকে সামলে উঠতে পেরেছে কিনা বুঝতে পারছে না। কোনও সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। তবু ময়নাকে ঘরে যেতেই হবে। নইলে হয়তো পরে তপনকে বোঝানো যাবে না, হলুদ গোলাপগুলি খাঁটি সত্য কথা বলছে। শুধু ময়নার ভালোবাসাই নয়, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশ্বাসও ময়না ওগুলির মারফৎ তপনকে দিতে চাইছে। পেতেও চাইছে। এখনও সময় আছে, এখনও তারা ফিরে আসতে পারে, তাদের সেই আগেকার জীবনে। তবু ঘরে ঢোকার সময় বুক কাঁপলো। ঢুকতে গিয়েও সরে দাঁড়াতে হলো। বেয়ারা ওর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ডাস্টপ্যানের মধ্যে ভাঙ্গা কাঁচ আর বিক্ষত গোলাপগুলিকে তুলে নিয়ে।

তপনও কিছুটা সময় পেয়েছে। ফুলদানী ভাঙ্গার আগে ও পরে কয়েকটা মুহূর্ত কেটেছে অসহনীয় রাগ আর অপমানের জ্বালায়। ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাও হয়তো ছিল ঐ সঙ্গে। কিন্তু ময়না শুধু ধরেই ফেলেনি, একই অস্ত্রে পাল্টা আঘাত করতে চাইছে, এ যেন কল্পনারও অতীত। অবশ্য ময়নার এটা একটা চালও হতে পারে। ওকে বুঝিয়ে দিতে চাওয়া, দেখ আমি সবই বুঝতে পারছি। জানালা থেকে সরে এসে একটা সিগারেট ধরালো। বুক ভরে ধোঁয়া টেনে, মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাঠিয়ে দিল সেই ধোঁয়া। বিশুদ্ধ বিদেশী তামাকের ধোঁয়া যখন মগজে ঘোরাফেরা করলো, আকস্মিক রাগে পালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিটাকেও ক্রমশ আয়ত্তের মধ্যে ফিরে পেলো। তখন মনে হলো, এ মিথ্যা চাল নাও হতে পারে। হয়তো ময়না সত্যিই প্রতিশোধ নিতে চাইছে। অথবা নিয়েছে। যদি নাও নিয়ে থাকে, এ নিয়ে তর্কবিতর্ক তুলতে চাইছে। অসম্ভব। ও পথে পা দেওয়াই বোকামি—। অযথা বাকবিতণ্ডায় সময় নষ্ট। ময়না যদি বুঝিয়ে দিতে পারে, এটা ওর মিথ্যে চাল, তাহলেই আমাকে কতগুলি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। অনেক সুখসুবিধা ছাড়তে হবে। ময়নাকে অনেক সময় এবং সান্নিধ্য দিতে হবে। এর কোনওটাই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অতএব অনেক রাগারাগি কান্নাকাটির সম্মুখীন হতে হবে। আমাকেও কিছু অনুশাসন জারি করতে হবে, যা পালন করা হচ্ছে কিনা জানার আমার কোনও উপায়ই থাকবে না। অতএব সব সময় সন্দেহ, ঈর্ষা ইত্যাদি কতগুলি বাজে ঝামেলায় পড়তে হবে। তার চেয়ে এসব উপেক্ষা করাই ভাল। লেট হার লিভ্ হার ওন লাইফ। আই শ্যাল লিভ্ মাই ওন। সোজা হিসেব। কারুরই কাউকে অনুযোগ অভিযোগ করার কিছু থাকবে না। এই ভাল। এতেই অনেক সুবিধা। ঘরের পেছনে নষ্ট করার মতন এত সময় আমার হাতে নেই। ময়না নিজেই এ সুবিধা করে দিল। ওরও দোষ আছে ভাবলেই ঝামেলা মিটে যাবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই তপন তার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। সে শ্রীবাস্তব নয়। প্রয়োজনে ব্যবসার গুডউইল এবং উজ্জ্বল সম্ভাবনার জন্য সনাতন এবং শাশ্বতকে কতটা আন্ডারকোট করতে হয়, মুহূর্তের মধ্যে সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারাটাও কৃতী এগজেকিটিভের বিশেষ গুণ। তপন নিঃসন্দেহে কৃতী। তার সামনে বিস্তৃত ভবিষ্যৎ। আজকের সেলস এগজেকিটিভ তপন সেন অদূর ভবিষ্যতে সেলস ডাইরেক্টার হবে। হয়তো বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টারও। চেয়ারম্যানই বা নয় কেন? তার কৃতিত্ব, তার পৌরুষ পৃথিবীর দিকে দিকে প্রচারিত হবে, আদর পাবে। ম্যানেজমেন্ট কমিটির মেম্বার হয়ে সে কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ টাকার * সেলস প্রোগ্রাম তৈরী করবে। অধস্তন এগজেকিটিভদের সেলস প্রোমোশনের জন্য চাপ দেবে। ভারত সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের স্ফীতির কারণ হবে। সেমিনারে, কনফারেন্সে, মীটিংএ তার মুখ থেকে মুক্তোর মতন দামী দামী কথা ঝরে পড়বে। এসব ঘরোয়া ব্যাপার, মন নামক গোলমেলে বিষয় এবং সামাজিক রীতিনীতির দায়-দায়িত্ব নিয়ে জড়িয়ে পড়লে তার চলবে না। তাই ময়না যখন দুরু দুরু বুক নিয়ে ভীরু পায়ে এসে ঘরে ঢুকলো, অনায়াসেই সে হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারলো। এসো। সরি। তোমার সুন্দর ফুলদানীটা ভেঙ্গে ফেললাম। ধাক্কা লেগে পড়ে গেল। আরেকটা কিনে নিও। -আর আ—থ্যাঙ্কস্ ফর দ্য ফ্লাওয়ারস। দে আর লাভলী।

ময়নার আর ভালো করে ঢোকা হলো না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো। শুধু স্তব্ধ বিস্ময়ে তপনের ঐ নির্বিকার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সব কিছু কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে। সামান্যক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হয়ে এলো। কোনও সংশয়েরই আর অবকাশ নেই। যে মোক্ষম আঘাত দিয়ে তপনকে সে আত্মস্থ করবে ভেবেছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। তপনের উচ্চাশার বর্মে লেগে আজ থেকে সব আঘাতই একভাবে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে তার নিজের কাছে। যত আগুনই জ্বলুক তার চোখে সে আগুনে শুধু সে নিজেই দগ্ধ হবে। তপনের কিছু হবে না। ঐ উদার হাসি দিয়ে সে এ কথাই বলবে। আজ নয় শুধু। চিরকাল।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

॥ ৬ ॥

শরৎচন্দ্রের মধ্যে বালকোচিত ভাবটি মাঝে মাঝেই নানাভাবে ফুটে উঠতো। কৈশোর-মন যে তাজা উৎসাহকে এক একটি সামান্য কাজে নিজের ইচ্ছাকে বিজয়ী করার জন্যে অসামান্য পরিশ্রম করে শরৎচন্দ্রকে ছোটোখাটো সামান্য ব্যাপারে সেই ধরনের মহা উৎসাহী হয়ে উঠতে কখনো সখনো দেখা যেতো। হয়তো কোনো পাড়ার ছেলেরা একটি ক্লাব গড়তে চেষ্টা করছে, কিছু বাধা বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে,—শরৎদা সেই ব্যাপারে একেই সিরিয়াস হয়ে তাদের জন্যে ভাবনা চিন্তা চেষ্টা চরিত্র শুরু করতেন, মনে হোতো, তিনি নিজেই যেন একজন কিশোর উদ্যোক্তা। কোথায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কোথায় থানার ও সি কোথায় কোন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—কাকে ধরলে পারলে সমস্যাটির ফয়শালা হতে পারে—তার জন্যে মহা উদ্বেগ। সাহায্যপ্রার্থী উদ্যোক্তা ছেলেদের সঙ্গে তিনি যেন তাদেরই বয়সী হয়ে গিয়ে শলাপরামর্শ করতেন। তাঁর অন্তর-সত্তার থেকে চঞ্চল একটি ছেলে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তো দুরন্ত বেগ নিয়ে বয়স্ক সত্তার দেহ দুর্গের স্থির পর্দাটি অস্বীকার করে। সবাই আমরা বলতুম—'বেজায় খেয়ালি মানুষ।'

এইরকম ব্যাপারে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত একটি গল্প বলি। এ গল্পটি রবিবাসর সংস্থার 'রবিবাসর' নামে বইতে বোধ হয় খুব সংক্ষিপ্ত উল্লেখে আছে মনে হচ্ছে। বইটি হাতের কাছে নেই। ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে খুলে বললে শরৎচন্দ্রের চরিত্রের একটি দিক কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে।

'রবিবাসর' নামে সাহিত্যিকদের একটি মিলন-সংস্থা তখন নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েক বছর। সদস্যরা সকলে কিন্তু সাহিত্যিক নন। বেশির ভাগই সাহিত্যরসিক, সাহিত্য পাগল, সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী মানুষ। এ'রা সাহিত্যিকদের সাহচর্যের জন্যে উৎসাহ করে সদস্য হয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে প্রথম দিকে বছরে বার দুই, শেষ দিকে প্রতি বছরে একবার করে রবিবাসরের বৈঠক বসেছো। রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন মশায় একদিন ৫নং হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে বললেন—'রাধাকে এবারে আমাদের রবিবাসরের সদস্য করে নিতে হবে।' শরৎচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রবলভাবে আপত্তি করে উঠলেন—'না। কখনও না। রবিবাসরে মেয়ে সভ্য নেওয়া চলবে না।' আমার আত্মসম্মানে লাগল। আমি বিদ্রোহ করে বললুম—'কেন? মেয়েরা কি সাহিত্যিক নয়? সাহিত্য সংস্থায় যে-কোনো পুরুষ মেয়ের যোগ দেবার সমান অধিকার। মেয়েরা কি লিখছে না? তারা কি সাহিত্য পাঠক নয়?' শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন — মেয়েরা সাহিত্যিকও বটে, পাঠকও বটে। কিন্তু তাদের স্বজাতীয় নিজস্ব আড্ডা অনেক আছে, যেখানে পুরুষেরা উঁকিও দিতে পারে না। তারা অবাধে যা' খুশি প্রাণমন খুলে বলতে পারে। রবিবাসরকে 'সাহিত্য সভা' করে তোলা হবে না, ওটাকে সাহিত্যিকদের 'সাহিত্য-আড্ডা' করে গড়ে তোলা দরকার। তোমরা এসে ঢুকলে আমাদের জিভে লাগাম লাগিয়ে কথাবার্তা কইতে হবে। না,—না—সে ঠিক হবে না। ভুল হবে। এমনিতেই তো কেউ কেউ ওটাকে সাহিত্য সভা বানাবার মতলবে উঠে পড়ে লেগেছেন। সভাপতি,—প্রস্তাবক,—ঘোষণা মাফিক সাহিত্য পাঠ—ধন্যবাদ জ্ঞাপন—আরে ছি—ছি—গোটা জ্যান্ত — জীবটাকে কবরে ঠেলে দিয়ে তার চমৎকার স্ট্যাচু বানিয়ে আহ্লাদ করা। স্বচ্ছন্দ অবাধ ব্যাপার হতে না দিয়ে আড়ষ্ট কৃত্রিম ব্যাপার করে তোলা। রবিবাসর হবে স্রেফ আড্ডা। পরস্পরে দেখাশুনো, গল্প-গুজব, চা, তামাক সিগ্রেটের ধোঁয়ায় রাজা উজীর মারা। তারই মধ্যে যে যা' লিখেছে বা লিখচে তাই নিয়ে পরস্পরে আলোচনা। চলতি সাহিত্য মাসে মাসে বাজারে যা নতুন উঠছে—তাদের নিয়ে মত-বিনিময়। এ ছাড়া অন্য কিছু ঠিক নয়। জলধর সেন বললেন—কিন্তু সাহিত্য সংস্থায় মহিলা সাহিত্যিকরা বাদ পড়লে অসম্পূর্ণ হবে না কি? আমি বিতর্কে যোগ দিয়েছিলুম। উপস্থিত সকলেই মহিলা সদস্য নেওয়ার স্বপক্ষে একমত—একমাত্র শরৎচন্দ্রই অটল বিরোধী। তর্ক বেশ উত্তেজনায় পৌঁছে গেলে—শরৎচন্দ্র বললেন—বেশ, রবিবাসরে মহিলা সদস্য নেওয়া হবে কি হবে না, এটা কবির উপরে বিচারের ভার দেওয়া হোক। তিনি যদি বলেন মেয়ে সদস্য নেওয়া হোক,—তা হলে তাই হবে। কিন্তু, আমি বলছি,—তিনি কখনোই মেয়ে সদস্য নেওয়ায় সম্মতি দেবেন না।

আমরা উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলুম—তিনি কখনোই অমত করতে পারেন না। করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

শরৎচন্দ্র হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে। ঐ কথাই তাহলে রইলো।

জলধরবাবু বলেছিলেন—কবি বোলপুর থেকে কলকাতায় এলে আমি একদিন জোড়াসাঁকোয় গিয়ে তাঁকে জানিয়ে, তাঁর মত জেনে আসবো।

এর বোধ হয় মাসখানেক বাদে গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছেন। তাঁর নতুন লেখা বই পড়া হবে, খবর পাঠিয়েছেন।

তাঁর পাঠ শোনার সময়ে অনেক লোকের ভীড় থাকে। কাছে গিয়ে বসা, কথা শোনা বা বলার সুযোগ থাকে না। তাঁর কাছে যাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় ছিল ভোরের বেলা। সদ্য সূর্যোদয়ের পরেই গিয়ে পৌঁছলে বেশ কিছুক্ষণ বসা যেতো। যদিও সেই সময়েও আমাদেরই মত আরও অনেকে আসতেন। কবির মন মেজাজও ঐ সময়টিতে

বেশ তাজা থাকতো। আমি চেষ্টা করেও সেদিন বেশি সকাল-সকাল পেঁছতে পারিনি। প্রায় আটটা বেজে গিয়েছিল। বিচিত্রা বাড়ির কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি—চেয়ে দেখলুম, সিঁড়ির ঠিক সামনের ছোটো ঘরটির ভারী পর্দা ঠেলে শরৎদা বেরিয়ে আসছেন, তাঁর পিছনে বেরুলেন তুলসী গোঁসাই মশায়।

আমি তো অবাক! কালও রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত শরৎদা আমাদের বাড়ি আড্ডা জমিয়েছেন,—কৈ? এখানে আজ আসবেন, কিছুই তো বলেননি! শরৎচন্দ্র দরজার বাইরে নিচু হয়ে জুতো পরতে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপরে জুতো না পরে আবার চট করে পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। তুলসীবাবু বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন মনে হলো।

আমি উপরে উঠে বাঁ-হাতি বিচিত্রা ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, বেশ কয়েকজন মহিলা, অধিকাংশই আমার পরিচিত, কেউ কেউ মুখচেনা,—কবির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। আমি সেখানে গিয়ে তখন না বসে দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইলুম শরৎচন্দ্র বেরিয়ে যদি কিছু কথা বলেন। অল্প সময় পরেই শরৎচন্দ্র আবার পর্দা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। চেয়ে দেখি সারা মুখ চাপা হাসিতে যেন ফেটে পড়ছে।

তুলসী গোঁসাই একটু বিস্ময়ের সুরে বললেন—কী হোলো দাদা? আবার কোন কথা আপনার মনে পড়লো?

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন 'না'—সূচক। আমি তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। তিনি আমার দিকে চেয়ে কৌতুক-ঝলমল মুখে-চোখে ডান হাতের তর্জনী নাচিয়ে নাচিয়ে ইঙ্গিত করলেন। যার ভাষা—'কেমন জব্দ!' কিংবা 'ঠিক হয়েছে এবার!' তারপরে জুতো পরে তুলসীবাবুর সঙ্গে নিচে নেমে গেলেন। আমি তো হতভম্ব। কিছুই বুঝতে পারলুম না। বারান্দায় বেরিয়ে দেখলুম, তুলসীবাবুর মোটরে তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্র চলে গেলেন।

আমি বিমূঢ় মনে বিচিত্রায় গিয়ে অন্য মেয়েদের কাছে বসলুম। আকুশিদি (শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, কেদার চট্টোপাধ্যায় মশায়ের পত্নী) উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন—শরৎ চাটুজ্যে, না? তুমি তো চেনো শুনেছি।

অন্য আরও দুই একজন বলে উঠলেন—হাঁ, হ্যাঁ, শরৎ চট্টোপাধ্যায় নিশ্চয়ই। আমি ও'কে দেখেছি অনেকবার।

আমি বললুম,—হ্যাঁ, উনিই।

কবি এসে ঘরে ঢুকলেন। আমরা সকলে উঠে তাঁকে প্রণাম করতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালুম। প্রসন্ন হাসিতে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত ছুঁইয়ে আশিস স্পর্শ দিলেন—প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কুশল কিম্বা অন্য প্রশ্ন করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—এই যে, তুমিও এসেছ দেখছি। না বাপু, আমিও শরতের সঙ্গে একমত। তোমরা ছেলেদের একটুও জিরোতে দেবে না, সব জায়গায় পাহারা নিয়ে হাজির থাকবে—এ হয় না। ওরা একটু আড্ডায় আলগা হয়ে যা-খুশি কথা কইতে হো--হা—করতে পাবে না এ কি করে হবে? ওটা তো ঠিক সভা-সমিতি নয়, আড্ডা। বন্ধুবান্ধবের, সাহিত্যিকদের নিশ্চিন্ত আড্ডা। ওখানে ওরা তামাক চুরুট খাবে, খোলাখুলি কথা কইবে হাসি-তামাশা যেমন খুশি করবে।

আমার মনে পড়ে গেল রবিবাসরের কথা। আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম ব্যাপারটি।

আমি কবিকে জিজ্ঞেস করলুম—উনি কি ঐ মতামত নিতে এখন আপনার কাছে এসেছিলেন?

কবি বললেন—না, না। ওকে তুলসী ধরে এনেছিল, ওদের রাজনীতির একটা কাজের দরকারে। আমি 'পারব না' বলে দিয়েছি। ওরা ভুলে যায়, আমার বয়স আর শরীরের কথা।

আমি বুঝতে পারলুম, শরৎচন্দ্রকে তুলসীবাবুই ধরে এনেছেন। বেরুবার সময় আমাকে সিঁড়িতে দেখতে পেয়ে শরৎচন্দ্রের মনে-পড়ে গেছে সেই বিতর্কের কথা। মনে পড়া-মাত্রই এবাউট টার্ন। তৎক্ষণাৎ কবির ঘরে দ্বিতীয়বার বিনা খবরেই ঢুকে পড়লেন।

ঘরের ভিতরে শরৎচন্দ্র কি বলেছেন, কবির কাছে জেনে নিতে অসুবিধা হল না। কবি বললেন—শরৎ বললে,—তোমরা দুই মতের দল আমাকে নাকি আম্পায়ার করেছ। আমি তো প্রথমে বলে ফেলেছিলুম—মেয়ে সদস্য নিশ্চয়ই নেবে বৈকি। তারাও তো সাহিত্যিক। এতে রবিবাসরের আকর্ষণ আরো বাড়বে।"

শরৎ বললে—"তা হলে ওটি আলোচনা-সভার সিরিয়াস মূর্তি ধরবে নাকি? শুনেছিলুম, আপনি নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন—রবিবাসরকে তোমরা সাহিত্যিক-আড্ডা করে গড়ে তোলো। কথাটা আমারও ভারি পছন্দ হয়েছিল। মেয়ে-সদস্য নিয়ে সভা করা যায়, আড্ডা দেওয়া যায় না যে।" তখন নাকি কবি বলেন—হ্যাঁ, এটা ঠিকই বটে। জিভের রাশ ছেড়ে যা খুশি বলা—মেয়েদের সামনে—সম্ভব হবে না। ওটা তাহলে তোমরা স্বজাতির মধ্যে নির্ব্যূঢ় শর্তে লেখা-পড়া করে নাও। ভিন্ন জাতের কাউকে ঢুকতে দিও না।'

কবি কৌতুক করে সমস্ত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সেদিন রবিবাসরকে নারীবর্জিত সংস্থা করার কথা বলার সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর পরিহাস করেছিলেন। সবগুলি সুস্পষ্ট মনে না থাকায়, আবছা স্মৃতি থেকে কোনও কিছু লিখলুম না।

আমার উজ্জ্বল ভাবে মনে আছে—শরৎচন্দ্রের সেই মামলায় জয়ী হওয়ার মত উল্লাস-বিস্ফারিত দৃষ্টি। আনন্দ যেন ফেটে পড়ছিল চাউনিতে।

আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, কবি কখনও নারীবর্জিত রবিবাসর চাইবেন না। শরৎচন্দ্র যদি তুলসীবাবুর প্রয়োজনে আকস্মিক ওখানে না গিয়ে পড়তেন, কিংবা আমাকে

যদি হঠাৎ ওখানে তিনি দেখতে না পেতেন তাহলে হয়তো তাঁর মনেই পড়তো না রবিবাসরের কথা। তিনি নিজে কবিকে ব্যাপারটি খুলে না বোঝালে মামলার ডিক্রিটা আমাদের দিকেই এসে যেতো। কবি বলেছিলেন—শিল্প স্রষ্টাদের কিছুটা মানসিক মুক্তির জায়গা না থাকলে সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কড়া সমাজে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মন আর অভ্যস্ত নীতি নিয়ম কানুনে সর্বদা বন্দীদশায় থাকে সামাজিক মানুষেরা। এরা যদি নিজেদের বন্ধু-বান্ধবের কাছেও আলগা কিছুক্ষণের জন্য না হতে পারে, রুদ্ধশ্বাস হয়ে জড়ত্বপ্রাপ্ত হবে ইত্যাদি।

আমার কিন্তু তখন ও-সব কথা শুনতে বিশেষ মন ছিল না। রবিবাসরে প্রবেশের জন্যে বিন্দুমাত্রও কিছু এসে যায় না, আসল ক্ষোভ শরৎদার কাছে হেরে যাওয়ার জন্যে। তাও আবার গুরুদেবের এজলাসে। অপমানে অভিমানে মন তখন অভিভূত।

এ সব মিটে যাওয়ার কয়েকমাস বাদে (১৯শে জুলাই, ১৯৩৬) শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে রবিবাসরের বৈঠক বসলো। রবীন্দ্রনাথ এলেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে সেই বৈঠকে, শরৎচন্দ্রের এবং রবিবাসরের নিমন্ত্রণে।

সাজ-সাজ রব উঠে গেল। শরৎচন্দ্র এসে আমার হাত দুখানি ধরে বললেন—"আর, সমস্ত ভার কিন্তু আমি তোদের দুজনের উপরে রাখচি। তোরা গিয়ে কি করতে হবে না হবে সব ব্যবস্থা করবি।"

আনন্দিত উৎসাহে দুজনে মিলে লেগে গেলুম। শরৎদার বৈঠকখানা খালি করে ধোওয়ানো মোছানো, সাজানো হোলো। শ্বেতপদ্মগুচ্ছ, কদম্ব ফুল, কেয়াফুল পানিত্রাসের দিকের গ্রাম থেকে ঝুড়ি ভরে এসে গেল। সুগন্ধি ধূপ, জুঁইফুলের সুদীর্ঘ মালের মোটা গোড়ে মালা, রজনীগন্ধা, ফটকের দুই পাশে আর বাড়ির দরজার দুপাশে চিত্রিত মাটির ঘট, সশীষ ডাব, কলাগাছ কিছু বাদ গেল না। বারান্দায়, চৌকাঠে আলপনা।

ওদিকে, উপরতলায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। প্রায় শতাধিক লোকের খাওয়ার মত আয়োজন হয়েছিল। পোলাও, লুচি, মাছ, মাংস, দই, রাবড়ী, মিষ্টান্ন। ক্ষীর-ভোজ। আমরা সকাল থেকেই অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে আছি। সারাদিন পরিশ্রমের পরে, বিকেলের দিকে জোড়াসাঁকোয় মোটর পাঠানো হোলো কবিকে আনার জন্য। সেই গাড়িতে শরৎচন্দ্রের ভাইঝি মুকুল মালাকে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে দেওয়া হোলো শরৎচন্দ্রের বাড়ির পক্ষ থেকে। সে তখন খুব ছোটো ছিল। রবিবাসরের পক্ষ থেকে গাড়িতে কে গিয়েছিলেন, মনে নেই।

জোড়াসাঁকোয় গাড়ি রওনা হওয়ার পরেই আমি অশ্বিনী দত্ত রোড থেকে হিন্দুস্থান পার্কে চলে এলুম। শরৎদা কিছুতেই আসতে দেবেন না। "এইখানেই গা ধুয়ে কাপড় বদলে নাও না! আবার বাড়ি যাবে কেন এখন? এখন তোমার চলে যাওয়া ঠিক হবে না।" আমি বাড়িতে কাপড় বদলানোর সুবিধের অজুহাতে পালিয়ে এলুম। উনি বলতে লাগলেন—খুব শীঘ্র ফিরে এসো। কবিকে গাড়ি থেকে নামাবার সময়ে তোমার থাকা চাই। এখানে তো সবই তাঁর অচেনা মুখ,—চেনা-মুখ দেখলে তাঁর ভাল লাগবে। অচেনা মুখের ভিড়ের ভেতর চেনামুখ দেখতে পেলে আমার বেশ আরাম লাগে, আমি জানি। দেরী কোর না।"

আমি তখন মনে মনে হাসছি। আমি জানি, আমি আর ফিরব না। রবিবাসরে উপস্থিত থাকব না।

শরৎদার বাড়িতে গুরুদেব আসছেন,—এটি আমার কাছে কতোখানি আনন্দের আর আগ্রহের ব্যাপার, তৃপ্তির ব্যাপার,—উল্লেখ করা রইলো। অল্প বয়সের অভিমান উত্তেজনায় শরৎদার উপরে প্রতিশোধ নিতেই বোধহয় সেদিন আমি নিজেকে দারুণভাবে বঞ্চিত করেছিলুম। এখন ভাবলে খুব আফশোস হয়!

আমার ফিরতে দেরী দেখে তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে সবাইকে অস্থির করে তুলেছিলেন, বারেবারে হিন্দুস্থান পার্কে লোক পাঠিয়ে। গুরুদেব এসে পৌঁছে যাওয়ার পরে কালী ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এলো—পিসিমা চলুন। বড়বাবু সবাইকে অস্থির করে তুলছেন, আপনার দেরীর জন্যে। সভা শুরু হয়ে গেছে। আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন বড়বাবু।"

আমি সেদিন কি জানি, বোধহয় পাষাণ হয়ে গিয়েছিলুম। বলেছিলুম—"বলে দিও কালী, পিসিমা বলেছেন রবিবাসরে মেয়েদের যেতে নেই। তাই তিনি আসতে পারলেন না।" গাড়ি ফিরে গেল।

শরৎদা এলেন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময়ে আমার স্বামীর সঙ্গে। লোকজনের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে সবাইকে বিদায় দিতে এগারোটা বেজে গেছে। শরৎদা বলেছেন—নরেন, তুমি বাড়ি চলে যেও না। আমি তোমার সঙ্গে তার কাছে যাবো আজ রাত্রেই।

আমার স্বামী তাঁর জন্য অপেক্ষা করে এত রাত অবধি বসেছিলেন। গাড়ি থেকে এক ঝুড়ি লুচি পোলাও ইত্যাদি, এক হাঁড়ি দই, আধহাঁড়ি রাবড়ি, মিষ্টান্নাদি নামিয়ে নিয়ে এলো একটি চাকর। শরৎদার সেই রাত্রির বিষাদ-মলিন কাতর মুখটি মনে পড়লে এখনও চাবুকের মত তীর আঘাত অনুভূত হয় মনে। কী করে যে অমন ছেলেমানুষী করেছিলুম,—ভাবলে বেজায় কষ্ট আর লজ্জা হয়। রবিবাসর সংস্থার ১৯৩৫।৩৬ সালের রেকর্ড দেখলে দেখা যাবে, সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে রবিবাসরে মহিলা সদস্য নেওয়া হবে না। প্রস্তাবক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমর্থক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাধ্যক্ষ—জলধর সেন।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত মহিলা বর্জিত 'সাহিত্য-আড্ডা' হয়ে ওঠেনি সংস্থাটি। সাহিত্য-সমিতির চেহারাই নিয়েছে। কিন্তু আমি ঐ সংস্থায় যোগ দিতে আর কখনও পারিনি; শরৎচন্দ্রের বেদনা-ম্লান মুখখানি আমার মনে উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

এইবারে আমি শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের একটি অন্তরঙ্গ আড়াল—যা তাঁর সাহিত্যেও কঠিন আড়াল সৃষ্টি করেছিল, সেই তথ্যটি বুঝাবার চেষ্টা করবো। এই অংশটির নাম দিয়েছি 'অদৃশ্য তর্জনী'॥

[ক্রমশ]

বিনীর
রেঞ্জের
হাল ফ্যাশানের
নতুন চমক!!
বিচিত্র বহু রঙের বাহার
ব্যবহার করতে
শুরু করুন
বিনী
পলিয়েস্টার রেঞ্জ
ফ্যাশন দুরন্ত অথচ টেকসই—এমন কাপড় যা শুধু বিনীই বানাতে পারে।
Interpub/BB/66/75 Ben

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান সংঘ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং কয়েকজন অধ্যাপক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের কার্যক্রম হিসেবে গত ২০ সেপটেম্বর একটি বিজ্ঞান সংঘ প্রতিষ্ঠা করলেন। সংঘের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই উপাচার্য ডঃ প্রতুল মুখোপাধ্যায়। প্রথম দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল মহাকাশ বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞানে তার প্রভাবের ওপর একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা। সেই সঙ্গে আলোচনা।

একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মিলে এই যে বিজ্ঞান সংঘ গড়লেন এর মূলে উদ্দেশ্য কি?

জাতীয় সেবা প্রকল্পের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভাপতি এবং বিজ্ঞান সংঘেরও সভাপতি অধ্যাপক শ্যামাপদ সেন আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দেখুন ছেলে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া, গবেষণা এসব তো করছেনই। আমরা চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের জগতের সঙ্গেও তাঁরা পরিচিত হন, সেই সঙ্গে কিছু জনসেবামূলক কাজকর্ম করার ব্যাপারে মানসিকতা অর্জন করুন। এর জন্যেই এই বিজ্ঞান সংঘের প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং সাধারণ মানুষ যাতে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি জেনে নিজেরা উপকৃত হতে পারেন বিজ্ঞান সংঘ আপাততঃ সে দিকটায় লক্ষ রেখে কাজ করবে।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার ব্যাপারে কীভাবে আপনারা এগোতে চান?

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সংঘের সম্পাদক হিমাদ্রি দেবনাথ বললেন, দেখুন, আমাদের সামর্থ কম। তাই খুব বড় রকমের কিছু ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আপাততঃ আমরা এই কল্যাণী অঞ্চলেরই কয়েকটি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করব। আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে ওঁদের মধ্যে বিনামূল্যে বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রপত্রিকা প্রচার, ওঁদের নিয়ে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, গবেষক এবং অধ্যাপকদের সাহায্যে স্কুল কলেজে নিয়মিত বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করা, প্রতি মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার

ডঃ পূর্ণেন্দু রায় পরলোকে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগের রীডার এবং বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ পূর্ণেন্দু রায় ১৯ সেপ্টেম্বর পরলোকে গমন করেছেন। তাঁর বয়েস হয়েছিল ৫০।

১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিতে এম এস-সি পাশ করার পর ডঃ রায় কিছুকাল কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণাগারে উচ্চতর গবেষণার কাজে যোগ দেন। এই সময় অধ্যাপক বসুর কাছে তিনি কোয়ান্টাম মেকানিকস বা অখণ্ড বলবিদ্যার বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিকের ওপর অধ্যয়ন করেন।

১৯৫৫ সালে তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়ান্স অ্যাণ্ড টেকনলজিতে গবেষণায় রত হন। এই সময় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ সালাম এবং অধ্যাপক পি টি ম্যাথ্যুস-এর কাছে মৌল-কণা পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা করেন মেসন, জোড় নিউক্লিওন প্রভৃতির ওপর। এখানেই ১৯৫৯ সালে তিনি পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন।

পরে কলকাতায় ফিরে এসে ডঃ রায় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর গবেষণাগারে সিনিয়ার সায়ান্টিস্ট হিসেবে যোগ দেন এবং অধ্যাপক বসুর ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী বা একীকৃত ক্ষেত্র তত্ত্ব এবং কণাপদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার সক্রিয় সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি রীডারের পদে উন্নীত হন। মৃত্যুর পরেও তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনসটিটিউট অব ফিজিকাল সায়েন্সেস-এ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের পঠন কাজের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন।

বলা বাহুল্য, আপেক্ষিকবাদ এবং অখণ্ড বলবিদ্যার ওপর ডঃ রায়ের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। মনে পড়ে, গত বছর আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কারোর কারোর মুখে বলতে শুনেছি, 'আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে খুব ভালবাসতেন', 'সত্যেন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক কাজকর্ম সম্পর্কে আমিই একমাত্র অথরিটি' ইত্যাদি। সদ্য পরলোকগত আচার্যের ওপর লেখার রসদ সংগ্রহের জন্যে বর্তমান লেখক তখন সারা কলকাতার বিজ্ঞানী মহলে ছোটাছুটি করছেন।

দেখলাম যাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের কাজের অথরিটি বলে নিজেদের জাহির করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ফাঁপা। 'বোস-স্ট্যাটিসটিকস'-এর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এর আগে সত্যেন্দ্রনাথকে নিয়ে একাধিক লেখক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিশেষ একটি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকাতেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। দেখলাম ও সবগুলিও প্রায় এই পর্যায়ের। অতএব লাভ হল না।

একজন বললেন, 'পূর্ণেন্দুকে ধরুন। হয়তো পেয়ে যাবেন।'

গেলাম। একগাল হাসলেন পূর্ণেন্দুবাবু। অমন প্রাণখোলা হাসি, যা মুহূর্তে পরকে আপন করে, সচরাচর চোখে পড়ে কম। বললেন, জানি না কতটা সাহায্য করতে পারব আপনাকে।

পরে দেখলাম, সাহায্য? ওঁর সাক্ষাৎ না পেলে বুঝতেই পারতাম না 'বোস স্ট্যাটিসটিকস' বস্তুটি কি।

জুলাই ১৯৭৪ সংখ্যার একটি ইংরাজী বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার একটি বিশেষ এস এন বোস সংখ্যা প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেওয়া হলে ডঃ রায়কে গিয়ে ধরলাম। বললাম, এমন একটি প্রবন্ধ দিতে পারেন, যা পড়লে বোঝা যাবে ঠিক কোন পটভূমিকায় সত্যেন বোস তাঁর সংখ্যায়ন উদ্ভাবনায় মগ্ন হন, সংখ্যায়নটাই বা কি এবং এর দ্বারা উত্তরকালের পদার্থবিজ্ঞান কিভাবে লাভবান হয়েছে—এ সব ব্যাপার? এই সঙ্গে দুটি অনুরোধ করব, এই প্রবন্ধে এক লাইনও অঙ্ক থাকবে না। এবং এমনভাবে লিখতে হবে, মৌলিকত্ব না হারিয়েও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার লোকও এর বিষয়বস্তু বুঝতে পারে।

ডঃ রায় এই সময় অসুস্থ ছিলেন। তবু অনুরোধটি রাখলেন। হয়তো বা গুরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলিবশত। দীর্ঘ প্রবন্ধ। শারীরিক অসুস্থতার দরুন বসে লিখতে পারেন না। লিখতে দেরি হচ্ছে। বিরক্তও হচ্ছি আমি। প্রচুর রেফারেন্স। কষ্টে জোগাড় করলেন। বলতে বাধা নেই, প্রবন্ধের বক্তব্যকে স্বচ্ছ এবং একান্ত নির্ভরযোগ্য করতে হলে কী অমানুষিক পরিশ্রম দরকার, নিজে চোখে দেখলাম। পরিষ্কার লেখা। সাবলীল ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গি। অধ্যাপক বসুর সংখ্যায়নের ওপর ঐতিহাসিক পটভূমিকা তুলে ধরে এমন রচনা আর কেউ লিখেছেন কিনা জানি না। গত কয়েক বছরের মধ্যে তো নয়ই। এক কথায় এ ব্যাপারে তিনি 'খরো'।

আবার 'খরো' আড্ডাতেও। সাহিত্য, খেলা, অথবা বৈঠকি গল্পে। ছাত্র অধ্যাপক-মণ্ডলী এবং অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন কাছের মানুষ।

ব্যবস্থা এবং স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিতর্ক এবং রচনা প্রতিযোগিতা। সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীদের এই ভাবে কাজ-কর্মের ফলে একটা সম্প্রসারিত মনোভাব গড়ে উঠবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের সভাপতি উপাচার্য মুখোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে শুধু বড় রকমের একটি সমাজ সেবাই করবেন, তা নয়। সমাজের মূল সমস্যা সম্পর্কেও তাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। সঙ্গে গঠনমূলক কাজে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক এবং কর্মী যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উৎসাহও দেখলাম অনেক, যা এর আগে এ দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখি নি।

দেখে ভাল লেগেছিল। আর সেই সঙ্গে ভাবছিলাম, একটু চেষ্টা করলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কত রকমের ভাল কাজই না করতে পারেন।

কারোর ওপর কোন রকম কটাক্ষপাত না করে একটা কথা বলব। বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়েছে সে তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বিজ্ঞান পাঠক্রমের, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাকাডেমিক লোড, বা চাপ এখনও অনেক কম। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রদের অবসর অনেক।

এই অবসর নিজেদের একান্ত প্রয়োজনে কয়েক ভাবে তাঁরা কাজে লাগাতে পারেন। যেমনঃ

এক, পঠন পাঠন বা গবেষণার ব্যাপারে এক-একটি বিষয়কে অন্যান্য বিষয় থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে দেখা হত। এই স্বতন্ত্র বোধ যে কি সাংঘাতিক রকমের সংস্কারে পরিণত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে লেখা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটি চিঠি পড়লেই বোঝা যায়। বিলেতের বিজ্ঞানীদের মানসিকতা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র জনৈক বিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করেন। যিনি নিজে রসায়নবিদ্। জনৈক পদার্থবিজ্ঞানী, যিনি তখন পরমাণুকে ভেঙে ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি দেখার কথা ভাবছেন, তাঁর সম্পর্কে এই বিজ্ঞানীর মন্তব্যঃ অ্যাটম নিয়ে যাই ভাবুন, কিন্তু তাই বলে ভাঙাচুর করা? মনে রাখবেন, পদার্থের অ্যাটম হল আমাদের ব্যাপার, পদার্থবিদদের নয়।

অর্থাৎ যা বলছিলাম, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, গাছপালা হল তাঁদের সম্পত্তি, তা নিয়ে প্রাণী অথবা পদার্থবিজ্ঞানীর ভাবনার কি থাকতে পারে? রাসায়নিকরা ভাবতেন চুম্বক শক্তি পদার্থবিজ্ঞানীর ব্যাপার। ও নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামানর কারণ নেই।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। এবং এখন অনেকেই জানেন, একটি বৃক্ষের মূল কাণ্ডের সঙ্গে লেগে থাকা শাখা-প্রশাখার মতই যেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র। রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, এই সব। কাণ্ডের মত তাদেরও সংযোগ একটি মূল সূত্রকেই যেন কেন্দ্র করে। যেমন ওই শাখা প্রশাখার উৎস কাণ্ড।

ইদানীং এই বোধের দরুণই একজন পদার্থবিজ্ঞানীকে প্রাণীকোষের গঠনের কথা মাঝে মাঝে ভাবতে হয়, যখন দেখা যায়, উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের মধ্যে জীব কোষ দ্রুত বিভাজিত হতে থাকে। অথবা শব্দের প্রভাবে প্রাণীদেহে হরমোন বা অন্তঃস্রাবী রস ক্ষরণ ব্যাহত হয়। একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীকে ভাবতে হয়, গাছের গোড়ায় যে লবণ দেওয়া হল, সে লবণ তো চরিত্রে একটি ইলেকট্রোলাইট বা তড়িৎবিশ্লেষ্য সামগ্রী, জলীয় মাধ্যমে এই ইলেকট্রোলাইট অয়নিত হয়। এই অয়ন উদ্ভিদ কোষের মধ্যে দিয়ে কিভাবে অগ্রসর হয় জানা দরকার। যার অর্থ রাসায়নিক কিছু তত্ত্বকে আয়ত্ত করতে হবে।

আসলে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই, এখনকার ছাত্রছাত্রী পদার্থবিজ্ঞানই পড়ুন অথবা প্রাণীবিদ্যা, বিজ্ঞানের আর সমস্ত বিষয় নিয়েও তাঁদের ভাবা দরকার। না ভাবলে বিজ্ঞানের পরিধি এবং বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝে ওঠা শক্ত হয়। যা তাদের পরবর্তী জীবনে গবেষণা, এমন কি বৃত্তিগত কাজে বাধা সৃষ্টি করে।

আমার প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার ফাঁকে সময় যা থাকে, তার কিছু অংশ আলোচনাচক্রের জন্যে তাঁরা ব্যয় করতে পারেন না? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের কথাই ধরা যাক। একই চত্বরে পাশাপাশি কয়েকটি বিষয়ের ওপর এখানে পড়ান হয়। ধরুন, মাসে অন্ততঃ দুদিন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিজ্ঞান অথবা প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা মিলিত হয়ে, যে কোন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসতে পারেন। ওই সব বিষয়ের পরিধি, সাম্প্রতিককালে সে সব নিয়ে কি ধরনের কাজ হচ্ছে, অথবা পদার্থবিজ্ঞানের এমন কিছু কিছু ব্যাপার যা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কিছু কিছু মৌলিক রহস্যের সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে, ইত্যাদি। হয়তো এই আলোচনাচক্রে কোন বিশেষজ্ঞ এসে মূল বক্তব্যটি তুলে ধরলেন। পরে ছাত্রছাত্রীরা চালাও আলোচনা করলেন। এতে করে নিজেদের বিষয়ের ওপর দখল এবং আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়বে, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের প্রতি আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে। এতে করে গড়ে উঠবে বিজ্ঞান জগতে নেতৃত্ব দেবার মত চরিত্র।

দুই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বক্তৃতা, আলোচনাচক্র, মডেল তৈরির কাজে সাহায্য করতে পারেন। এর জন্যে অবশ্য সংগঠন দরকার। নির্দিষ্ট কার্যসূচী তৈরি

করে কে কোন্ দিন কোন্ স্কুলে যাবেন, কি নিয়ে কথা বলবেন, কি ধরনের বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করবেন, সেই মতো রুটিন মাফিক কাজ করবেন।

তিন, বছরে একবার এক-একটি দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা গ্রামেও যেতে পারেন। গরমের সময় গেলেই ভাল হয়। তাতে করে শীতের কাপড়চোপড় বয়ে নেওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। প্রয়োজন হলো মাঠের মধ্যে তাঁবু খাটিয়েও তাঁরা থাকতে পারবেন।

গ্রামে গিয়ে কি কি কাজ তাঁরা করতে পারেন ?

যেমন ধরুন, গ্রামের সব চাইতে বড় সমস্যা অপুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, যক্ষ্মা, সংক্রামক রোগ, সেচ এবং কৃষি উৎপাদন নিয়ে। নিরক্ষরতা এবং অপরিসর মানসিকতা নিয়ে গ্রামে যাঁরা বাস করছেন, তরুণ এবং শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংগ পেলে তাঁরা উৎসাহিত হবেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে তাঁরা সচেতন হতে পারেন। যেমন, অপুষ্টি দূর করতে গেলে গ্রামেই যে সব জিনিস পাওয়া যায় তাদের খাওয়া চলে কিনা, এ নিয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা, জলে দিয়ে রাঁধতে না বেশি সার নষ্ট হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ, অথবা সহজে নিরক্ষর চাষীই চেষ্টা করলে কীভাবে তাঁর জমির মাটি পরীক্ষা করে নিতে পারেন সে ব্যাপারে সাহায্য করা, এমন অনেক কাজেই তাঁরা সাহায্য করতে পারেন।

হয়তো পদার্থবিজ্ঞান শাখা থেকে একটি দল গেলেন কোনো গ্রামে। সেখানে গিয়ে স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং উৎসাহীদের নিয়ে আবহাওয়া মাপার যন্ত্রপাতি তৈরি করে দিয়ে আসতে পারেন তাঁরা। ছোট্ট একটি ব্যারোমিটার তৈরি করলেন। তৈরি করলেন হাওয়ার গতি এবং অভিমুখ নির্ণয়ের যন্ত্র। অথবা বাতাসের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র। এসব থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কী উপকার তাদের হবে, বুঝিয়ে বলা। এ সবও করা যায়। এতে করে শুধু যে জনকল্যাণমূলক কাজই করা হবে তা নয়; এ সব কাজ করতে গিয়ে তাঁরা এমন অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারেন, পরবর্তীকালে যা তাঁদের উল্লেখযোগ্য গবেষণার কাজেও সাহায্য করতে পারে।

মাইক্রোসকোপ নিয়ে গিয়ে শিশু, যুবক, বৃদ্ধবৃদ্ধা সবাইকে দেখিয়ে দিন, যে জল তাঁরা পান করেন খোলা পুকুর অথবা কুয়ো থেকে, তাদের মধ্যে অগণিত জীবাণু কেমন কিলবিল করছে।

এমন অনেক রকম পরিকল্পনা নিয়েই কাজ করতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের মধ্যে আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদেরও ধরছি।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সংঘের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত পঠন পাঠন ছাড়াও আঞ্চলিক মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্যে যে ধরনের পরিকল্পনা তাঁরা নিয়েছেন, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন দৃষ্টান্ত এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। আমাদের আশা, তাঁদের মত আর সব বিশ্ববিদ্যালয়ও এগিয়ে আসবেন। বিজ্ঞানকে জনকল্যাণে যাতে লাগানো যায়, সে ব্যাপারে তাঁরা সাহায্য করুন। বলা বাহুল্য, শহরেও এ ব্যাপারে পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।

এক নজরে
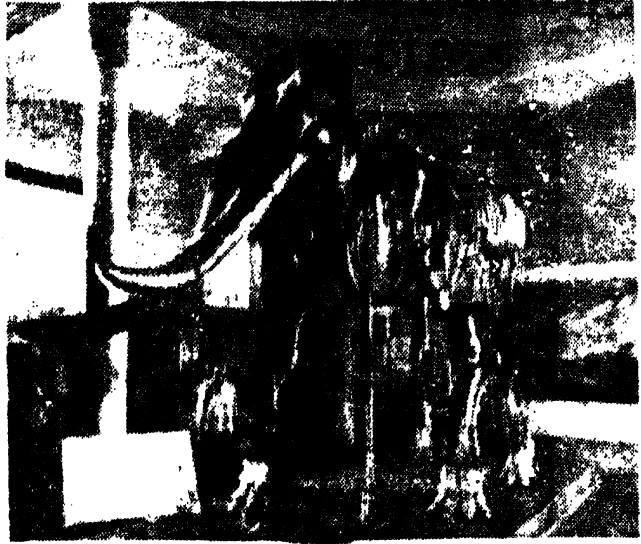
চীনের পীত নদী অধ্যুষিত অঞ্চলে অতিকায় এই প্রাণীটির কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল বছর দুই আগে। পিকিং-এর ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়াম এখন এটি সংরক্ষিত। উচ্চতায় চার মিটার, লম্বায় আট মিটার। বিশেষজ্ঞদের ধারণা নদী বা হ্রদের জলে ডুবে গিয়ে জন্তুটি প্রাণ হারিয়েছিল। এবং যখন সে মারা যায় তখন তার বয়েস হয়েছিল প্রায় ১০০ বছর। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে স্টেগোডোনস গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এই প্রাণী আধুনিক হাতি এবং প্রাচীন ম্যামথদের মাঝামাঝি বছর পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। এরা পৃথিবীর বুকে শেবারের মত বিচরণ করেছিল সম্ভবত কুড়ি লক্ষ বছর আগে।

আলোচনা-চক্র

২০ সেপ্টেম্বর ইনডিয়ান ফিজিকস অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা শাখা) **পদার্থবিজ্ঞানে সাম্প্রতিক গবেষণার ধারা** এই পর্যায়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু উপস্থিতবর্গকে স্বাগত জানান। উদ্বোধন করেন অধ্যাপক হরপ্রসাদ দে।

আলোচনাচক্রে নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যার ওপর বক্তৃতা করেন কলকাতার লবণ হ্রদে প্রতিষ্ঠিত ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন প্রোজেক্টের ডঃ এ স ডিভাতিয়া, জীবপদার্থবিদ্যার ওপর বলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ অমিত ঘোষ। জিনের রূপান্তর এবং তার প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে মানুষের ভালমন্দ কি হতে পারে ডঃ ঘোষের বক্তৃতার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল এটাই। যাদবপুরের ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেসন অব সায়ান্সের ডঃ প্রতীপপ্রসাদ রায় বলেন, ইলেকট্রন এবং পরমাণুর পারস্পরিক সংঘর্ষজনিত প্রতিক্রিয়ার ওপর। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পদ্মনাভ দাশগুপ্ত বলেন, প্লাজমা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। কালটিভেশন অব সায়ান্সের আর একজন বক্তা ডঃ শিবপ্রসাদ সেনগুপ্ত আলোচনা করেন সলিড স্টেট ফিজিকস এর ওপর এবং সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিকস-এর ডঃ সুনীল মজুমদারের বিষয়বস্তু এক্স রশ্মি কেলাস তত্ত্ব। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বিজ্ঞানী এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিতবর্গকে ধন্যবাদ জানান অ্যাসোসিয়েশনের (কলকাতা শাখা) সম্পাদক ডঃ সুপ্রকাশচন্দ্র রায়।

সুমরজিৎ কর

॥ পঁচাত্তর ॥

অনামনস্ক সোমেন আজও খেটে পেরিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল রিখিয়াদের বাড়িতে। হঠাৎ একটা মোটরের হেডলাইট পড়ল এসে সেই লেখাটার ওপর—প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ। কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। লেখাটা নজরে পড়তেই চমকে উঠল সোমেন। এই লেখাটার কথাই চিঠিতে তাকে জানিয়েছিল মধুমিতা। দেওয়ালে এ ক'টা কথা লিখেছিল জিতু নামে একটা ছেলে, যে প্রথম মানুষ খুন করার শক্ সামলাতে পারেনি। খুন করে নিহত মানুষের হাত কেটে নিয়ে যে শ্রেণীশত্রুর রক্ত মাংস খেয়েছিল, তারপর উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজও। সেই জিতুকে ভালবাসত মধুমিতা।

জিতুকে চেনেও না সোমেন। তবু আজ মধুমিতার চেয়েও বেশী হঠাৎ করে জিতুর কথা মনে হয়। কেমন ছিল ছেলেটা! সোমেনের মতোই কি? হয়তো এরকমই বয়স, একমাথা বোঝাই নানা অবাস্তব স্বপ্ন আর চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াত। রোমান্টিক বিপ্লবী। হঠাৎ কেউ ভুল করে তাকে শ্রেণীশত্রুর রক্তপাত করতে প্ররোচিত করে। সেটা খুবই ভুল হয়েছিল। পৃথিবীতে যারা জন্মায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যাদের খুনীর ইনস্টিংক্ট থাকে, আর কারো তা থাকে না। সেই জিতুকে একবার দেখতে খুব ইচ্ছে হয় সোমেনের। ছেলেটা কি আজও বেঁচে আছে? থাকলেও নেই। ওরকম উন্মত্ত অস্তিত্বের কোনো মানে হয় না। সোমেন শুধু অনুভব করে, দেশময় লক্ষ লক্ষ অল্পবয়সী ছেলে কিছু একটা করতে চাইছে, এমন কিছু—যার জন্য সর্বস্ব পণ করা যায়, প্রাণ দেওয়া যায়, নেওয়া যায়। শুধু সেই মহৎ কারণটি তাদের হাতে দাও, তারা লড়ে যাবে। কিন্তু তা তো হল না। কেউই আদর্শ বলে কোনো জিনিস দিতে পারল না যুবাদের। তারা তাই আদর্শের পিপাসা মেটাতে ভিনদেশ থেকে রাজনৈতিক মত ধার করে আনল, আর তার জন্যই কত কাণ্ড করল তারা। বেকারকে চাকরি দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের একটা সুন্দর আইডিয়াল দেওয়া, বাস্তবোচিত চিন্তা ও ব্যাপকতার ধারণায় সমৃদ্ধ একটি কার্যকরী আদর্শ। কে বুঝবে সে কথা? সস্তা কথা শুনে শুনে সকলের কান পচে গেল।

অচেনা এক জিতুর জন্য প্রাণটা হঠাৎ হু হু করতে থাকে তার। অবশ্য সেই হুহু করা বুকে মায়ের জন্যও খানিকটা অভাব বোধ আছে, বাবার জন্যও আছে একরকম ব্যথা। আর আছে তার সারা জীবনের নানা ব্যর্থতা ও অসফলতার স্মৃতিও। কোনো কারণে মনে একটু দুঃখ এলেই হাজারো দুঃখের স্মৃতি ভিড় করে আসে।

মধুমিতার চিঠিটার কোনো জবাব দেয় নি সোমেন। ও কেমন আছে?

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে রিখিয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিল সোমেন। খেয়াল হল, বাড়িটা বড় নিস্তব্ধ। এত চুপ কেন সব? মিটমিট করে ভুতুড়ে সব কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে, বড় বাতিগুলো সব নেবানো। শৈলীমাসীর কিছু হয়নি তো? একটু অসঙ্গতি দেখলেই আজকাল কেবল অজানা ভয়ে বুকে চলকে রক্ত ঝরে যায়।

রিখিয়া তার ঘরে নেই, পড়ার ঘরেও নয়। একা একা এঘর থেকে ওঘর খুঁজে দেখল সোমেন। চারধারে দামী জিনিস ছড়ানো। ক্যামেরা, ঘড়ি, কলম, ট্রানজিস্টার, সেট, ফিটকের জগ। সে যদি এর কিছু তুলে নিয়ে চলে যায় তো কেউ ধরতে পারবে না। বড় অসাবধানী এরা।

সোমেন করিডোরে এসে ডাকল—রিখিয়া।

গলাটা কেঁপে গেল। সোমেন একটু চুপ থেকে আবার ডাকল।

অপ্রত্যাশিতভাবে শৈলীমাসীর ঘরের দিক থেকে রিখিয়ার বাবা বেরিয়ে এলেন। খুবই উদভ্রান্ত ও অনামনস্ক মুখ চোখ। দরজা খুলে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সোমেনের দিকে। খুবই গম্ভীর তাঁর মুখ।

সোমেন চমকে গিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। দুজনে দুজনের দিকে খামোখা চেয়ে আছে। কেউ কথা বলতে পারছে না। কথা নেই বলে। এমনি সময়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ করে সেই অন্ধ কুকুরটা এসে সোমেনের পায়ে কুঁই কুঁই করে চেটে চেটে লেজ নেড়ে অসম্ভব আদর জানাতে থাকে। কুকুরেরা ভোলে না।

রিখিয়ার বাবা আজও নেশা করেছেন। কুকুরটাকে ধমক দিয়ে বললেন—স্টপ!

সেই স্বর শুনেই বোঝা গেল, গলাটা অন্য রকম।

সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন—কুকুরটা তোমাকে চেনে দেখছি! তুমি কি এ বাড়িতে প্রায়ই আসো?

—মাঝে মাঝে। শৈলীমাসী আমাকে চেনেন।

উনি হাত তুলে বললেন—বুঝেছি। আর পরিচয় দিতে হবে না। তুমি বোধ হয় ওঁর সইয়ের ছেলে! না?

খুব বিস্মিত হয়ে সোমেন বলে—হ্যাঁ।

সে ভাবতেই পারে না যে, এ লোকটার অত মনে থাকে। কিন্তু তার চিন্তাকে আর একবার চমকে দিয়ে লোকটা বলে—একদিন সন্ধেবেলা তোমাকে দেখেছিলাম এখানে, সোমেন লাহিড়ি না তোমার নাম?

সোমেন এত অবাক হয় যে, বাতাস গিলে বলে—হাঁ। আপনার আমাকে মনে আছে?

উনি তেমনি একটা উদাসীন ভাবলা চোখে চেয়ে থেকে বললেন—আমার সবই মনে থাকে। এসো। এ ঘরে শৈলী আছে, রাখু আছে। আমরা সবাই বসে একটু গ্যাদারিং করছি। কাম অ্যান্ড জয়েন দি ক্রাউড।

সোমেন দ্বিধাভরে বলল—আমি বরং চলে যাই।

উনি বললেন—যাবে কেন? ইউ আর এ ভেরী হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান। তবে একটু লিন অ্যান্ড থিন। তবু তোমাকে দেখলেই বেশ একটা ফ্রেশনেস আসে। চলে এসো।

বলে উনি দরজার পাল্লাটা মেলে ধরলেন। কুকুরটা আগে গেল। পিছনে সোমেন।

প্যাসেজ দিয়ে ঢুকলে শৈলীমাসীর ঘরের আগে আর একটা ঘর পড়ে। সেটা বসবার ঘর বলে মনে হয়। এখন সেখানে ধুলো পড়ছে। কেউ ব্যবহার করে না।

ওদের কত ঘর অব্যবহৃত পড়ে থাকে।

সেই ঘরে এসে রিখিয়ার বাবা একটু দাঁড়ালেন। পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরণে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দামী গ্যাসলাইটার বের করে সিগারেট ধরিয়ে বললেন—তুমি কার কাছে আসো বলো তো? রাখুর কাছে, না শৈলীর কাছে?

সোমেন লজ্জা পেয়ে বলে—কারো কাছে পার্টিকুলারলি নয়। আসি।

—ও। তোমার বয়সী আমার একটা ছেলে আছে, জানো?

—জানি।

—সেটা একটা হতচ্ছাড়া ছেলে। হি রাইট্স টু আস অল দি ব্রুয়েল থিংগস। সে নাকি আর কখনো আসবে না। আমরা তার প্রতি কোনো অন্যায় ব্যবহার করিনি, স্বাধীনতা দিয়েছি, তার পিছনে টাকাও কম খরচ করিনি। তবু হি হ্যাজ বিকাম আনবিকামিং......

সোমেন ইংরিজি কথাটা ভাল করে বুঝল না। ইংরিজিটা এখনো তার খুব রপ্ত হয়নি। অ্যামেরিকায় যাওয়ার আগে রামকৃষ্ণ মিশনে স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে ভর্তি হয়ে শিখে নেবে, এরকম ইচ্ছে আছে।

উনি বললেন—আজও তার চিঠি এসেছে। শৈলী খুব কাঁদছে। তুমি এ ঘরে একটু অপেক্ষা করো, আমি শৈলীকে একটু খবর দিই, তুমি এসেছো শুনলে ও নিশ্চয়ই শান্ত হবে।

—আমি বরং—

বলে সোমেন উৎসুক হয়ে চলে যাওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিল। উনি মাথা নেড়ে বললেন—না, যাবে কেন? উই ট্রুইল লাইক ইওর কম্প্যানী। এ সময়ে আমার ছেলের বয়সী কেউ সামনে থাকলে ভাল লাগবে। তুমি কি করো?

কিছু করছি না।

—বেকার?

—হ্যাঁ।

—সবাই বেকার আজকাল। আমার অফিসে আর কারখানায় কত ছেলে ছোকরা রোজ এসে কাজ খুঁজে যায়। অত কাজ কে কাকে দেবে?

সোমেন মৃদু একটু ম্লান হাসল।

—কি করবে ঠিক করোনি?

সোমেন একটু ইতঃস্তত করে বলে—আমি বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

উনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কোথায়? অ্যাব্রড?

—হ্যাঁ। অ্যামেরিকায়।

—ওঃ। বলে উনি স্তব্ধ থেকে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর গভীর একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন—আমি কয়েকবার গেছি। বেশ ভাল দেশ। যাও।

সোমেন মাথা নত করে।

উনি বললেন—এই বুড়ো বয়সে আবার হয়তো যেতে হবে।

—কোথায়?

—লন্ডন। ছেলের খোঁজ খবর করতে। কেন সে আর আমাদের পছন্দ করে না তা জেনে আসতে। আমি নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছি না, শৈলীর জন্য যেতে হচ্ছে। দাঁড়াও ওদের খবর দিই—

বলে উনি ও ঘরে চলে গেলেন।

মুহূর্ত পরেই রিখিয়া দৌড়ে আসে, পর্দা সরিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত একটা আনন্দে শ্বাসরুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বলে—তুমি!

তুমি শুনে একটু হাসে সোমেন। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, এই বালিকাটিকে সে...সে বোধ হয়...হ্যাঁ...ভীষণ

ভাবতেই সোমেন—যে সোমেন মেয়েদের সঙ্গে বহুকাল ধরে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছে, কারো কারো শরীরও ছুঁয়ে রেখেছে—সেই সোমেনের কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে লজ্জায়। বুকে ডুগডুগি বাজে।

সোমেন বলে—কেমন আছো?

—এতদিনে মনে পড়ল? কথা বলব না তো, কিছুতেই না।

—আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম।

—কি নিয়ে শুনি।

সোমেন কি উত্তর দেবে! সে কিছু নিয়েই ব্যস্ত ছিল না, আবার ছিলও।

—প্রায় এক মাস। রিখিয়া বলে।

—তুমিও তো খোঁজ নাওনি। সোমেন বলে।

রিখিয়া মুখ ভার করে বলে—আমাকে কোথাও বেরোতে দেয় বুঝি! আজকাল খুব কড়া ডিসিপ্লিনে রেখেছে মা। কোথাও ছাড়ে না। দাদা ওরকম করেছে বলেই এখন আমার ওপর সকলের নজর। বলে মৃদু আদুরে একটু হাসি হাসে। আবার গাম্ভীর্য হয়। বলে—অবশ্য রাস্তাঘাটও ভাল চিনি না। তা হলেও ঠিক একদিন চলে যেতাম ঢাকুরিয়ায়। রোজ ভাবি, আজ আসবে। ওমা, কেউ আসে না।

—তুমি কোনোদিন যাওনি বলেই আসিনি। সোমেন মিথ্যে করে বলে। পরমুহূর্তেই যোগ করে দেয়—তুমি না গেলেও মধুমিতা কিন্তু যেত।

একটু যেন শিউরে ওঠে রিখিয়া। বড় চোখে চেয়ে বলে—কে গিয়েছিল? মধুমিতা?

সোমেন মাথা নাড়ল। মধুমিতার কোনো খবর সে এখনো জানে না। বুকের মধ্যে মেঘের মতো ভয় জমে ওঠে শহরে শহরে। আস্তে করে বলল—সে কথা থাক।

রিখিয়া বোধ হয় বুঝল। সেও বলল—থাক গে। কিন্তু আপনার বাসায় যেতে আমার খুব লজ্জা ছিল। মধু তো আমার মতো নয়। ওর কোনো লজ্জা নেই। এমন কি ও স্কুলের দেয়াল টপকে ক্লাস থেকে পালায় ছেলেদের সঙ্গে মিশবে বলে। পুলিস দেখলে টিল ছুঁড়ত।

—তাই নাকি!

রিখিয়া মুখ গম্ভীর করে বলে—আমি অত স্মার্ট নই। আপনি তো জানেন।

—আবার আপনি করে বলছ কেন?

রিখিয়া অবাক হয়ে বলে—আপনি করেই তো বলি।

—একটু আগেই 'তুমি' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলে যে।

—যাঃ! ভুল হয়েছিল তবে।

—ভুল!

—ভুলই। আসুন, মা বসে আছে আপনার জন্য।

সোমেন ঘরে ঢুকে দেখে, শৈলীমাসী খুব রোগা আর শুকনো হয়ে গেছেন। তাঁর শরীরে যেটুকু জীবনীশক্তি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু সব জমা হয়েছে চোখে। বোঝা গেল, একটু আগেও কাঁদছিলেন। এইমাত্র চোখ মুছে হাসিমুখে বসেছেন। চোখ সজল।

ভারী গলায় বললেন—বাবা, তুমি কেন আমেরিকায় যাবে? উনি এসে এইমাত্র বললেন, তুমিও চলে যাচ্ছো।

সোমেন হেসে বলে—এখনো ঠিক নেই, তবে চেষ্টা করছি।

—না, না। কেন যাবে? ননী তোমাকে যেতে দিচ্ছে কেন? ও কি রাজি হয়েছে?

—না।

—ওকে শীগগীর একদিন আসতে বোলো। আমি ওকে বলে দেবো, যেন কিছুতেই তোমাকে যেতে না দেয়।

—কেন মাসী? ছেলেরা কি চিরকাল ঘরে থাকে?

শৈলীমাসী হঠাৎ চুপ করে কি যেন ভেবে বলেন—সে কথাও ঠিক। ছেলেদের আটকে রেখে আমরা তাদের ক্ষতিই তো করি। কিন্তু, তোমরা সব দূরে গিয়ে পর হয়ে যাও যে! আমার ছেলেটা—বলে শৈলীমাসী বিছানা হাতড়ে একটা এয়ারোগ্রাম খুঁজে পেয়ে সোমেনের দিকে বাড়িয়ে বললেন—দেখ।

সোমেন চিঠিটা নিল না, বলল—থাক মাসী।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে থেকে শৈলীমাসী অনেকক্ষণ বাদে বললেন—উনি যাচ্ছেন লন্ডনে। কিন্তু তাতে কিছু হবে না। আমি নিজে যদি যেতে পারতাম! বলে সোমেনের দিকে চেয়ে বলেন—কি করে যাবো বলো তো। কত দূর! আমি তো এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারি না। পৃথিবীটা যে আমার কাছে কি বিরাট জায়গা হয়ে গেছে তা তোমরা বুঝবে না। কেবল মনে হয় চারদিকটা আমার কাছ থেকে কত কত ভীষণ দূরের হয়ে গেছে।

রিখিয়ার বাবা কোণের দিকে অন্ধকারে একটা ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন, পায়ের কাছে কুকুর, হাতে গেলাস। আস্তে, সেই এড়ানো গলায় বলেন—অত অ্যাটাচমেণ্ট বলেই তো ছেলে তোমাকে পছন্দ করে না। ছেলেরা একটু বয়স হলে ওর মা-বাপের অতিরিক্ত স্নেহকে ভাল চোখে দেখে না। তখন তারা অনেকের ভালবাসা আর মনোযোগ চায়। কিন্তু এসব সাইকোলজি তুমি তো মানো না।

—মানি। শৈলীমাসী বলেন—ওকে ফিরিয়ে আনো, দেখো আমি আর ওর অত ছেলে-ছেলে করব না। করার আর সময়ও নেই। বেশীদিন কি বাঁচবো বলে ভেবেছো নাকি তোমরা?

—মা, চুপ! রিখিয়া ধমক দেয়।

আজও সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা হচ্ছিল সোমেনের। শৈলীমাসীর অস্তিত্ব থেকে যেন মৃত্যুর জীবাণু উড়ে আসছে ঝাঁক বেঁধে। শ্বাসে শ্বাসে ঢুকে যাচ্ছে বুকের ভিতরে।

শৈলীমাসী বলেন—যাও সোমেন, রিখিয়া, ওকে নিয়ে যা। রুগীর ঘরে অত বসে থাকতে নেই।

সোমেন চেয়ার ছেড়ে উঠে এল।

রিখিয়ার ঘরে এসে উজ্জ্বল আলোয় রিখিয়ার দিকে তাকাতে সংকোচ হচ্ছিল সোমেনের।

রিখিয়া কথা বলছিল না। হুট করে এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে বোধ হয় চাকরকে চা খাবারের কথা বলে এল। এসে গোমড়া মুখে বসে থাকল সামনে। অ্যালবামের পাতা ওলটাচ্ছে। উপেক্ষা নয়, অভিমানের ভঙ্গী।

সোমেন বলে—রিখিয়া, মধুমিতা তোমাকে চিঠি লেখেনি।

—লিখেছিল। কেন?

—এমনিই।

—ওর কথা ভুলতে পারছেন না?

সোমেন মাথা নেড়ে বলে—ভুলব কেন? ও একটু অদ্ভুত মেয়ে ছিল।

—ওর কোনো খবর পাননি?

—না।

—আমিও না। ও আসে না। বোধ হয়—

বলে খুব বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রিখিয়া চোখ নামিয়ে নিল। বলল—জানাই ছিল।

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?

—বলব কেন? আপনি আমেরিকায় কেন যাবেন?

সোমেন বিষণ্ণ মুখে বলে—কেন যাবো না বলো তো? কেউ যেতে দিতে চাইছে না। মা না, বাবা না, তোমরা নও। কেন?

—উই হ্যাড বিটার এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু সে কথা থাক।

রিখিয়া অ্যালবাম বন্ধ করে বলে—আমেরিকায় আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে। বিদেশ কার না ভাল লাগে বলুন? কিন্তু এখন আমি মত পাল্টে ফেলেছি। দাদার জন্যে।

—জানি। কিন্তু আমার তো তা নয়!

—না হোক গে। আপনি যাবেন না। আমার তাহলে ভীষণ খারাপ লাগবে।

এ খুবই গোলমেলে কথা। কিন্তু সোমেন কথাটা বুঝল। তবু দুষ্টুমী করে বলে—কেন খারাপ লাগবে রিখিয়া?

—আমার চেনা জানা লোকের সংখ্যা খুব কম। আমার ভাল লাগে এমন লোক হাতে গোনা যায়। তার মধ্যেও যদি একজন চলে যায় তো খারাপ লাগবে না!

—তোমার ভাল লাগা লোক কে কে রিখিয়া?

রিখিয়া হাসছিল। এ কথা শুনে হেসে উপুড় হয়ে পড়ল। বলল—আপনাকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনি কিছুতেই অ্যামেরিকায় যাবেন না।

—সে কি।

—আপনি যেতে চাইছেন না।

—কি করে বুঝলে?

—আমি বুঝি।

—তুমি থট্ রিডার?

রিখিয়া ঠ্যাং নাচিয়ে বলে—নয় কেন?

সোমেন খুব নিস্পৃহভাবে যেন ভুল বুঝতে পেরে বলে—তাই তো! নয় কেন?

রিখিয়া বলে—বাবা অনেক মহাপুরুষের বই এনে মাকে শোনান। এর মধ্যে একটা বই থেকে বাবা পড়ছিলেন। একজন মহাপুরুষ বলেছেন—আমি যে তোমার অন্তর্যামী তা কিন্তু এমনিতে নয়। তুমি যতক্ষণ আমাকে ভালবাসো ততক্ষণই আমি তোমার অন্তর্যামী। তোমার ভালবাসাই আমাকে অন্তর্যামী করেছে নইলে আমি তোমার কেউ নই।

বলে রিখিয়া হাসল। সোমেন ওর বুদ্ধি দেখে অবাক। তারপর অনেক ভেবে বলল—শোনো রিখিয়া, আমি মরে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার এক চেনা ভদ্রলোক কতগুলো ফার্মের ঠিকানা দিয়েছেন, আমি অ্যাপ্লাই করেছি আমেরিকায়। সেই ভদ্রলোক ওখানেই থাকেন, তিনি ফিরে গিয়েও চেষ্টা করবেন যাতে আমি একটা চাকরি পেয়ে যাই। ওখানে অনেক প্রসপেক্ট। এখানে আমার কিছু হবে না।

—যান না, কে বারণ করছে।

—তুমিই তো করছো।

—আমার বারণে কার কি যায় আসে?

সোমেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এই সব ভাবপ্রবণতাকে কি সে প্রশ্রয় দেবে? দিয়ে কি লাভ? সেই গান্ধীকে পড়িয়ে জীবন কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রিগ্রেট লেটার পাবে। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে, সরকারী চাকরি আর পাবে না, প্রাইভেট ফার্মেও না। কি হবে থেকে? বড়জোর কয়েকজন মানুষ খুশী হবে।

—আমাকে যেতে হবে রিখিয়া।

রিখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে—তাহলে আমি খুব কাঁদব।

অনেকটা রাত করে সোমেন বাড়ি ফিরল।

সবাই শুয়ে পড়েছে, বউদি এসে দরজা খুলে দিল। বলল—তোমার খাবার ঢাকা আছে সোমেন।

—হুঁ।

—তোমার দাদাকে সামলাতে পারছি না। কি কান্না! এ অবস্থায় ও'কে ফেলে মার চলে যাওয়াটা বোধ হয় ভাল হল না সোমেন।

সোমেন অন্যমনস্কভাবে বলে—দাদা অত কাঁদছে কেন? আমারও তো মন খারাপ, কাঁদছি না তো।

—তোমার সঙ্গে ও'র তুলনা করছো

কেন? ও তো নরমাল নয়। সব সময়ে একটা শিশুর মতো ছায়ভাব, শিশুর মতো ই খুঁতখুঁতে। এখন ওর মা বা বাবাকে দরকার। নইলে খুব হোমসিকনেস ফিল করে।

সৌমেন বুঝে মাথা নাড়ল। বউদি চলে গেলে সে একা একা খেয়ে নিয়ে ঘরে এসে সিগারেট নিয়ে বসে। মার বিছানাটা ফাঁকা। তার খুব খারাপ লাগছে না। এ ঘরটা আজ থেকে তার একেবারে একার ঘর হয়ে গেল। কেউ ডিস্টার্ব করবে না।

আজ অনেকক্ষণ জেগে থাকতে ইচ্ছে হল সোমেনের। অন্য দিন এ সময় ঘুম পায়। মা পানের বাটা নিয়ে কথার ঝুড়ি খুলে বসে। সে সব কথা শুনতে ইচ্ছে করে না সোমেনের। আজ কেউ বকার নেই, তাই বুঝি ঘুম আসে না।

অনেকগুলো সিগারেট খেল সোমেন। আমেরিকায় যাবে কি যাবে না তা নিয়ে অনেকবার লটারী করল। ছোট্ট ছোট্ট কাগজে কয়েকবার 'যাবো' আর 'যাবো না' লিখে কাগজগুলো ভাঁজ করে দু হাতের তেলো জড়ো করে ভাল করে মিশিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর ফেলল ছড়িয়ে। চোখ বুজে একটা তুলে নিয়ে খুলে দেখল, লেখা আছে—যাবো না। দ্বিতীয়বার উঠল—যাবো। বারবার তিনবার। তিনবারের বার কাগজ তুলতে যাচ্ছে, এমন সময় তাকে ভীষণ চমকে দিয়ে কে যেন কাছ থেকে ডাকল—সোমেন।

সোমেন ঘুরে বসে দেখে, দাদা।

—দাদা!

—মা চলে গেল? বলে উদভ্রান্ত রণেন ঘরের চারদিকে তাকায়।

সোমেন উঠে বলে—রাত একটা বাজে দাদা, ঘুমোবে না?

—তুই কি করছিস?

—ও কিছু নয়। ঘুম আসছিল না।

—আমারও আসছে না। মা যাওয়ার সময়ে কেঁদেছিল?

—হ্যাঁ।

রণেন মায়ের চৌকিতে বসে বলে—আমার হার্ট খুব খারাপ। ডাক্তার বলেছে। আমি মা বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তাহলে হার্ট আরো খারাপ হবে। আমাকে মার কাছে কাল পৌঁছে দিয়ে আসবি।

—বাঃ, তাহলে চাকরি করবে না?

—চাকরি করব কি করে? শরীর যদি ভাল না থাকে!

—বউদি, আছে, দেখবে। ডাক্তার ওষুধ দেবে। চিন্তা কি?

—না। রণেন খুব জোরে মাথা নাড়ে। বলে—আমি যাবোই।

—আচ্ছা, এখন গিয়ে শুয়ে থাকো।

রণেন চলে গেল। কিন্তু একটু বাদেই সোমেন শুনল, বাইরের ঘরে রেডিওগ্রামে খুব মৃদুস্বরে বাজছে রবি ঠাকুরের নিজের গলায় গাওয়া সেই অবিস্মরণীয় গান—অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ ..

চোখ ভরে জল আসে সোমেনের। কি করবে সে? কিছু করার নেই।

তবু উঠে গিয়ে বাইরের ঘরে দেখে, রণেন সোফা-কাম বেডে বসে আছে চুপ করে। ভূতের মতো। তাকে দেখে ঠোঁটে আঙুল তুলে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল।

সোমেন আস্তে আস্তে গিয়ে দাদার পাশে বসে থাকে।

গান শেষ হয়। রেকর্ডে পিনের একটা ঘষটানির শব্দ হতে থাকে।

রণেন মুখ ফিরিয়ে বলে—জান না?

—কি দাদা?

—গানটা?

—খুব ভাল।

রণেন মাথা নেড়ে বলে—খুব। আমাকে একটা সিগারেট দে। আমার প্যাকেটে আর নেই।

খুব লজ্জা পায় সোমেন। দাদা তার কাছে সিগারেট চাইছে! কত বড় দাদা তার চেয়ে!

তবু সোমেন উঠে গিয়ে নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট এনে দেয় রণেনকে।

সিগারেটটা নিয়ে বসে থাকে রণেন। অনেকক্ষণ বাদে বলে—কাঁদবি না?

—কেন কাঁদব?

—মার জন্য? আয় দুই ভাই মিলে একটু কাঁদি।

সোমেন হেসে ফেলে বলে—পাগলামী কোরো না দাদা। কেঁদে লাভ কি? মা গিয়ে ভালই হয়েছে। নইলে বাবার বড় কষ্ট।

রণেন কয়েকবার কেঁপিয়ে উঠল। তারপর অতি কষ্টে সংযত হয়ে বলে—মাকে তুই চিনবি কি করে? তোর বয়সে কতদিন মাকে দেখেছিস। আমি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে...

বলেই রণেন থমকায়, হঠাৎ বলে—কত বয়স হল আমার বল তো! অ্যাঁ!

বীণা অন্ধকারেই নিঃশব্দে উঠে আসে। কোনো ভূমিকা না করেই এসে রণেনের হাত ধরে বলে—চলো তো।

রণেন সন্ত্রস্ত চোখে তাকায়, তারপর ওঠে। রেডিওগ্রামের খুব মৃদু আলোতেও ওর মুখ দেখতে পায় সোমেন। অদ্ভুত একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিদ্ধ মুখ।

সোমেন দাদার মুখটা ভুলতে পারে না। তার সারারাত ভাল ঘুম হল না। মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখে উঠে বসল বার বার। ভোরের দিকে ঘুমোলো খানিকক্ষণ। বেলা করে উঠল।

সকালে উঠেই তার মনে হল, দাদা এখনো তার আমেরিকায় যাওয়ার প্ল্যান জানে না। জানলে? আবার চেঁচামেচি করবে, কাঁদবে, বলবে—তুই যাস না। গেলে আমি বাঁচব না। দাদা কিরকম, স্পর্শকাতর আর সাঁতসেঁতে মানুষ হয়ে গেছে।

সকালবেলাতে আবার সে ভাবতে বসল। কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। কি করবে?

তার এই বয়সে, এখন মাত্র দুটো জিনিস ভাবতে খুব ভাল লাগে। এক হল, রিখিয়ার কথা। আর একটা, আমেরিকার কথা।

একটা শ্বাস ফেলল সে। দুটোই পরস্পরকে শত্রুতা করছে। হঠাৎ কেন যেন খুব বাবার কথা মনে পড়ছিল। খুব ইচ্ছে করছে কাউকে সব উজাড় করে বলতে। সে শুনবে, ভাববে, সিদ্ধান্ত নিয়ে সোমেনকে বলে দেবে পথ। এরকম ঈশ্বরের মতো মানুষ একজনকেই সে চেনে। বাবা।

যাবে নাকি একবার বাবার কাছে?

যাবে। আজ না হয় কাল। মার জন্য মনটা খারাপ লাগে। মা চলে যাওয়ার পর একটা দিন চলে গেল। আরো দিন যাবে। তারপর আর খারাপ লাগবে না।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছন্দ

ছন্দ সম্বন্ধে যতটা আলোচনা কাব্য-সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে হয়েছে, ততটাই বা ততোধিক হয়েছে সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে। একদা কি সংস্কৃতে কি প্রাকৃতে, বহু গান ছন্দকে অবলম্বন করেই গাওয়া হত। ছন্দগায়নের ভিত্তি ছিল লঘু গুরু বর্ণের সমাবেশ এবং এই দুটি বর্ণের উচ্চারণকালের পরিমাণ অনুসারে নির্ধারিত মাত্রার ইউনিট। বাংলায় সে রীতি প্রায় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, কারণ আমাদের উচ্চারণ সংস্কৃত বা তৎসম্পর্কীয় রীতিকে অনুসরণ করে না।

আদিকালে বেদমন্ত্রের প্রয়োগে ছন্দের প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করা হত। ছন্দের অক্ষরসংখ্যা অনুযায়ী বহু ক্রিয়া-কলাপের প্রণালী নির্ধারিত হত, এমন কি উপচার প্রভৃতিও নির্দিষ্ট হত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মন্ত্রভাগে প্রায়ই ছন্দের দিক দিয়ে দুএক অক্ষরের শৈথিল্য বর্তমান থাকত। সেগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া হত। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিতের স্বরগুলি একইভাবে নির্ধারিত ছিল, কিন্তু কালক্রমে নানা সম্প্রদায় এসে নানারকম একসেপশন সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। পরবর্তী-কালে তা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, স্বরস্থাপন কোনও কোনও ক্ষেত্রে একেবারে পালটে গেল বললেও অত্যুক্তি হয় না। যাগযজ্ঞে যখন গ্রামগেয় বা অরণ্যগেয় রীতিতে উদ্গাতারা সামগান করতেন তখন ছন্দ বলে কোনও বস্তু আদৌ থাকত না। সামবেদের প্রথম মন্ত্র উদ্ধৃত করছি:—

"অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে। গৃণানো
হব্যদাতয়ে।"

এটি অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী ছন্দে রচিত। কিন্তু, যেই যাগযজ্ঞে উদ্গাতারা গাইলেন অমনি এটি হয়ে গেল এই রকম:—

"ওগ্নাই। আয়াহীবীইতোয়াই। তোয়াই।
গৃণানোহ। বাদাতোয়াই।"

এখানে ছন্দ কোথায়? আবৃত্তির বেলায় ছন্দ ঠিকই ছিল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামগানের বেলায় আর ছন্দ রক্ষিত হলো না। তথাপি, মন্ত্রগুলির নির্দিষ্ট ছন্দগুলিই প্রাচীনকাল থেকে গ্রামগেয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই যে বৈলক্ষণ্যের সৃষ্টি হয়েছিল এ সম্বন্ধে কোনও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা নেই। আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের উদ্দেশ্যও বোঝা কঠিন। লৌকিক প্রয়োগে যে যে পরিবর্তন হয়েছে সেগুলিকেই ব্যাকরণ বা সূত্র দ্বারা আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু, এই সব পরিবর্তন যে কি করে হয়েছে তা অনুসন্ধান করা হয়নি। তা হলে ইতিহাসের

গানের আসর

দিক থেকে আমাদের অনেক সুবিধা হত। যাই হোক, ছন্দের কথাতেই আসি।

আমরা যাকে পদ বলি তার স্বভাবতই দুটি প্রকারভেদ দেখা যায়—একটি নিবন্ধ, অপরটি চূর্ণ। চূর্ণ শব্দে যা বোঝায় সেটি তল গদ্য, অর্থাৎ সুনিয়ন্ত্রিত অর্থবোধক পংক্তি। নিবদ্ধ পদই হচ্ছে কবিতা। যে পদবন্ধ নিবিড়ভাবে আবদ্ধ তাকেই বলে নিবদ্ধ পদ। সেটি সম্পাদন করে ছন্দ। এর মূলে আছে শব্দের অনুশাসন। শব্দকে অনুশাসন করে বর্ণ। অতএব, ছন্দের আলোচনায় একেবারে গোড়ার কথা হচ্ছে বর্ণ অর্থাৎ অক্ষর। এই অক্ষরগুলি যে কোনও নিবদ্ধপদে প্রমাণ অনুসারে নিরত বা নিয়ন্ত্রিত থাকে। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে বিরামেরও আবশ্যকতা থাকে। তা হলে সংজ্ঞাটি এরকম দাঁড়ালো যে, লঘুগুরু বর্ণের দ্বারা গঠিত অর্থজ্ঞাপক শব্দে চারটি পাদে (চরণে) গ্রথিত যে পদবন্ধ তাই হচ্ছে ছন্দসমন্বিত কবিতা। সুধী পাঠক সকলেই অবগত আছেন যে, ছন্দ অনুসারে পদ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—জাতি এবং বৃত্ত। জাতি মাত্রা দ্বারা নিয়ত এবং বৃত্ত গুরু এবং লঘু অক্ষরে বিন্যস্ত। কিন্তু, এই অক্ষরগুলি সংখ্যা দ্বারা সীমিত। এই কারণে একে বলা হয় অক্ষরবৃত্ত। এই গণনার নিয়ম অনুসারে আবার অক্ষরবৃত্তের তিনটি শ্রেণী নির্ধারিত হয়েছে,—সম, অর্ধ-সম এবং বিষম। একটি পদের প্রতিটি চরণে অক্ষরসংখ্যা যখন সমান থাকে তখন সেটি হয় সমবৃত্ত। যখন, প্রথম ও তৃতীয় পাদের তথা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের অক্ষরসংখ্যা সমান হয়, তখন তাকে বলা হয় অর্ধসম বৃত্ত। আর, যখন চারটি পাদই ভিন্ন চিহ্নে লক্ষিত হয়, তখন তাকে বলা হয় বিষম বৃত্ত। সব অক্ষরের ওজন উচ্চারণ করবার সময় সমান হয় না। আমরা যখন "চরণ" শব্দটি উচ্চারণ করছি তখন প্রত্যেকটি অক্ষরে লঘুবর্ণ উচ্চারণের সময় নিচ্ছি; কিন্তু যখন "চঞ্চল" শব্দটি উচ্চারণ করছি তখন সময়টা ঈষৎ দীর্ঘ হচ্ছে, কারণ 'চ' বর্ণের জায়গায় ধ্বনিটা হচ্ছে 'চন্', অর্থাৎ আর একটা বর্ণের ভগ্নাংশ এসে জুটছে এক্ষেত্রে। এইখানে 'চ'টি গুরুবর্ণ বলে পরিগণিত হচ্ছে। ছন্দশাস্ত্র অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের পূর্বে বর্ণটি গুরু বলে বিবেচিত হয়। এই লঘু ও গুরু বর্ণকে নিয়ে উচ্চারণের নির্দেশকে সহজ করবার জন্য ছন্দবিশেষজ্ঞেরা 'গণ' নামক একটি কোশের উদ্ভাবন করলেন। তাঁরা বিধান দিলেন যে বৃত্তগুলি গণ দ্বারা প্রবর্তিত হবে। লঘু, গুরু তিনটি বর্ণের সমাবেশে এক-একটি কোশ গঠিত হল; পরিভাষায় একে বলা হল—'ত্রিক' বা 'গণ'। উপরে উদ্ধৃত 'চরণ শব্দটি 'ন-গণ'-এর পর্যায়ে পড়বে। কারণ, এটি তিনটি লঘুবর্ণে গঠিত। 'চঞ্চল' শব্দটি 'ভ-গণ'-এর পর্যায়ভুক্ত, কারণ এর আদি অক্ষর গুরু, পরের দুটি লঘু। এইভাবে সর্বসমেত আটটি গণ আছে, যেগুলি ভ, ম, য, র, স, ত, জ ন—এই কয়টি অক্ষর দ্বারা সংজ্ঞিত হয়। এগুলি কিছুই নতুন কথা নয়, যে কোনও সংস্কৃত ছন্দের বইতেই এগুলি আছে, আমরা শুধু তার সংক্ষিপ্ত সারটুকু বললাম মাত্র।

এখন লঘু আর গুরু বর্ণ বললেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বোঝানো যায় না বা পরিমাপ সংজ্ঞিত হয় না। সুতরাং সময়সূচক আর একটি ইউনিটের প্রয়োজন হয়। এইখানেই উপস্থিত হয় মাত্রার প্রয়োজনীয়তা। লঘুকে যদি একমাত্রা ধরা যায় তা হলে গুরুবর্ণ হয় দুই মাত্রা এবং ক্ষেত্র বিশেষে একটি গুরুবর্ণ ত্রিমাত্রিকও হতে পারে, তখন তাকে বলা হয় প্লুত। কিন্তু, গণগুলি লঘু, গুরু অনুসারে বিভক্ত হয়ে প্রকারান্তরে মাত্রার ইউনিটকেই স্বীকার করে নিচ্ছে। এক্ষেত্রে কেবল অক্ষর সংখ্যার গণনার দিক থেকে ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বললেও আসলে পড়বার সময় সেটি পুরোপুরি মাত্রাবৃত্ত বা জাতির পর্যায়েই পড়ে। একটা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করি। অষ্টাক্ষরা বৃত্ত অনুষ্টুপের অন্তর্গত একটি শ্লোক:—

যামুনসৈকতদেশে
গোপবধূজল কেলী।
কংসারিপোগীত লীলা
চিত্রপদা জগদব্যাৎ॥

এটি পাঠ করতে গেলে প্রত্যেকটি লঘু, গুরু বর্ণের ওজন ঠিক রাখতে হবে, অর্থাৎ মাত্রা অনুসারেই পড়তে হবে। অতএব, মূলত এটি জাতির প্রকৃতিতেই আবৃত্তি

করতে হবে, কিন্তু প্রতি চরণে আটটি অক্ষর রয়েছে,—এই অক্ষর গণনার নিয়মে নিবন্ধ বলেই একে বলা হয় অক্ষরবৃত্ত।

একদা উপরে বর্ণিত গণ-নিয়মকে মেনে নিয়ে বহু গান সম্পাদিত হত এবং বহু ছন্দও গানের পর্যায়ে উঠে এসেছিল। এ ছাড়াও মাত্রা হিসাবে দুই মাত্রা থেকে ছয় মাত্রা পর্যন্ত গণবিভাগ করা হয়েছিল। সেগুলি ছ-গণ (ছয়মাত্রা), প-গণ (পাঁচ মাত্রা), চ-গণ (চার মাত্রা), ত-গণ (তিন মাত্রা) দ-গণ (দুই মাত্রা)—এইভাবে গঠিত হয়েছিল। মধ্যযুগে কত ছন্দ যে গানের চাহিদা মিটিয়েছে, তা সেই যুগের সঙ্গীতগ্রন্থ, বিশেষ করে সঙ্গীতরত্নাকরের প্রবন্ধ অধ্যায় পড়লে বোঝা যাবে। এরও বহু পূর্বে সুপ্রাচীন নাটকের ক্ষেত্রে ধ্রুবা-গানে বহু ছন্দের প্রয়োগ হত: ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে। বাংলায় কিন্তু উচ্চারণের এই নিয়ম সর্বত্র চলে না। বাংলা ভাষার উচ্চারণ লৌকিক প্রথা অনুসারে স্বীকৃত হয়ে থাকে। যেমন,—"চঞ্চল। চপল। শঠন। টবর" এখানে সব বর্ণই লঘুর পর্যায়ে পড়ছে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত কবিতার বেলায় কিন্তু কদাচ "চঞ্চল" শব্দের "চ"-কে লঘু বলে বিবেচনা করা যেত না, তাকে গুরুর নিয়ম অনুসারে দীর্ঘায়িত করতেই হত। আবার,—

> ক্ষণে ক্ষণে তার বাতায়নদ্বার
> যায় যে খুলি
> অঞ্চলখানি চঞ্চল হয়ে
> উঠে যে দুলি।

এক্ষেত্রে 'চঞ্চল' এর 'চ'-কে আমরা গুরু হিসাবে স্বীকার করে নিচ্ছি। 'ঐ—আসে। ঐ—অতি। ভৈ—রব। হরষে।' এক্ষেত্রে, 'ঐ', 'ভৈ', "ষে"—এই তিন বর্ণের বেলায় আমরা গুরুত্ব স্বীকার করছি, কিন্তু আসে''র "আ" এবং "সে"-কে লঘু হিসাবে উচ্চারণ করছি। ছন্দকে এইভাবে মেনে নিয়ে বাংলায় পঠনপাঠন চলে, সংস্কৃত গণনিয়ম সেখানে আরোপ করা সম্ভব হয় না।

এর পরে যে পারিভাষিক সংস্কৃত শব্দটি আসে, তাকে বলা হয় 'কলা'। আমরা সাধারণত যেসব ছন্দশাস্ত্র পড়ি সেখানে কলা শব্দে একটি মাত্রা বোঝায়। ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে "চতুষ্কল" শব্দে চতুর্মাত্রিক বোঝানো হয়েছে; কিন্তু আদিতে কলা সম্পর্কীয় ধারণা এইরকম ছিল না। নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার সমাবেশে গঠিত তালের এক একটি ভাগকে "কলা" বলা হত। ওপরে যে "ঐ আসে ঐ ভৈরব হরষে" চরণটির তাল অনুসারে চারটি ভাগ দেখানো হয়েছে, তার একটি ভাগ বা তাল খণ্ড হচ্ছে একটি "কলা" এবং সমস্ত ফেরটি "চতুষ্কল"। সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে ধ্রুবা গানের যে সব স্বরলিপি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও কলার এই অর্থই প্রমাণিত হয়। মূলে শাস্ত্রানুযায়ী ছন্দের একটি বিভজনই হচ্ছে একটি কলা। সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রে এককল, দ্বিকল, চতুষ্কল, ষোড়শকল—এইভাবে মাত্রা-সহযোগে তাল বিভাগ করা হয়েছে। একটি প্রাচীন শাস্ত্র বলছেন—"নিমেষাঃ পঞ্চমাত্রা স্যাৎ মাত্রাযোগাৎ কলা স্মৃতা"; অর্থাৎ পাঁচটি নিমেষের সমাবেশে একটি মাত্রা নির্ধারিত হয় এবং মাত্রার সমষ্টিতে নির্ধারিত হয় একটি কলা। এই এক একটি নিমেষ হচ্ছে এক একটি লঘু অক্ষর, কেননা শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী পাঁচটি লঘু অক্ষরের উচ্চারণের কালটুকুই হচ্ছে এক একটি মাত্রার পরিমিতি। শাস্ত্র বলছেন—"পঞ্চলঘ্বক্ষরোচ্চারমিতা মাত্রেহ কথ্যতে।" এই পাঁচটি লঘু অক্ষর হল—ক, চ, ত, ট, প। এই কটি অক্ষর সংখ্যার সমষ্টিকেই বর্ধিত করে যা খণ্ড করে গুরু, লঘু, দ্রুত এবং প্লুত এইগুলি নির্ণয় করা হত। এই কারণেই দেশী তালকে "খণ্ডতাল"—এই আখ্যাও দেওয়া হত। লঘু বলতে যে পরিমাণ হবে, তার ডবল যদি গুরুর পরিমাণ হয়, তাহলে সেটি হবে দশটি লঘু অক্ষরকে উচ্চারণ করতে যতখানি সময় লাগে ততখানি এবং প্লুতের পরিমাণ হবে পনেরোটি লঘু উচ্চারণের পরিমাণকাল। দ্রুতের পরিমাণ হবে একটি লঘুর অর্ধেক। তবে পঞ্চ লঘুর সমাহারকে মাত্রার ইউনিট ধরলে কিন্তু খানিকটা অসুবিধা হয় দ্রুতের পরিমাণ নির্ণয় করতো কারণ, পাঁচের অর্ধেক আড়াইকে গণনায় আনা দুঃসাধ্য। এই কারণেই অনেকে চতুর্লঘু অক্ষরে মাত্রার পরিমাপ করতেন যাতে দ্রুতের পরিমাণ নির্ণয়ে কোনও অসুবিধা না ঘটে। সেক্ষেত্রে একটি দ্রুতের কাল হত দুটি লঘু অক্ষর উচ্চারণ করতে যতটা সময় লাগে ততটা। আচার্য কল্লিনাথ বলেছেন যে মার্গরীতিতে পঞ্চলঘু অক্ষরেই মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হত। কেহ কেহ কালসাম্যতা রক্ষার জন্য একে নূন করে চতুর্লঘু পরিমিতিটুকু অবলম্বন করতেন। আবার, অন্যত্র ষট্ লঘু অক্ষরের পরিমিতিকে অবলম্বন করতেও দেখা যেত। আমাদের বর্তমান বিলম্বিত একতালে এক একটি মাত্রা এই চতুর্লঘু ইউনিট অনুযায়ী নির্ধারিত হচ্ছে, যদিচ যাঁরা এটি পালন করেন তাঁর এতটা থিওরির উপলব্ধি নিয়ে করেন কিনা সন্দেহ, তাঁদের কাছে এটা একটা প্র্যাকটিস। এক কথা, যেখানে যে রকম হলে ভাল দেখাতো সেখানে পরিমাপটি সেইভাবে নির্ধারণ করা হত। উদাহরণস্বরূপ কল্লিনাথ বলছেন, গোপালনায়ক "কুড়ুক্ক" তালের বেলায় চতুর্লঘু অক্ষরকালকেই মাত্রার পরিমিতি হিসাবে ধরতেন। এই "কুড়ুক্ক" তালে দুটি দ্রুত এবং দুটি লঘু মাত্রার প্রয়োগ হত। অর্থাৎ বর্তমান মাত্রার নিয়মে ২।২।৪।৪ এই বিন্যাসে সেটি হয় মোট বারো মাত্রার তাল। এইরকম দ্রুত, লঘু, গুরু এবং প্লুত এই মাত্রাগুলির সমন্বয়ে বহু সংখ্যক দেশীতাল নির্ধারিত হয়েছিল এক সময়ে।

ছন্দের বিশ্লেষণে অসংযুক্ত এবং সংযুক্তবর্ণ—এই দুটি নিয়েই বিচার করতে হয়। অসংযুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রে গোলযোগ কম, কারণ তা হ্রস্ব বা দীর্ঘ হতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের ক্ষেত্রে ঝামেলা আছে। এক্ষেত্রে একটি অক্ষরের সঙ্গে আর একটি অক্ষরের ভগ্নাংশ যোজিত হতে পারে। যেমন, "অন্তর" শব্দটির বর্ণ বিশ্লেষণ করলে দাঁড়াবে অন্, ত, র। এই যে "অন্" ভগ্নাক্ষর বা সিলেবল, এটি সংস্কৃত ছন্দোবিধি অনুযায়ী দীর্ঘ হিসাবে বিবেচিত হবে এইরকম সিলেবলসমূহের ওজন যাতে অবহেলিত না হয় সেইজন্য "গণ" বা "কলা" হিসাবে ছন্দের বিভাজন ঘটেছে। "ভ-গণ" বললে বোঝাবে তিনটি বর্ণের একটি ইউনিট যার প্রথমটি গুরু এবং পরের দুটি লঘু। এই নিয়মেই "অন্" এই ভগ্নাক্ষরটি গুরুবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, বাকি দুটি অক্ষর ত এবং র লঘু হিসাবে থাকছে। ছন্দের ক্ষেত্রে গণরীতির পিছনে এইরকম বহু চিন্তা আছে এবং "ত্রিক" বা তিন বর্ণের ইউনিট ছিল এই সিলেবল বিশ্লেষণের পক্ষে সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ইউনিট। বিসর্গযুক্ত বর্ণকে নানা-কারণে ছান্দসিকেরা ক্ষেত্র বিশেষে প্লুত বলে ধরতেন, তখন সেটি হত ত্রিমাত্রিক।

সুপ্রাচীন মার্গসঙ্গীতে দুটি মুখ্য মার্গতাল ছিল—"চঞ্চৎপুটঃ" এবং "চাচপুটঃ"। প্রথম শব্দটির বিশ্লেষণ করা হত এইরকম—চন্।চৎ।পু।টঃ। এখানে চন্ এবং চৎ দুটিই দীর্ঘ, পু লঘু এবং টঃ এই বিসর্গযুক্ত অক্ষরটিকে প্লুত হিসাবে ধরা হয়েছিল। একে বলা হত যথাক্ষর বা এককল। সব মিলিয়ে এখানকার নিয়মে এটি হচ্ছে অষ্টমাত্রিক। এইভাবে অষ্টমাত্রিক, ষোড়শমাত্রিক রীতিতে চঞ্চৎপুট তালের আবর্তন ঘটত। একে বলা হত চতুরশ্র জাতি। অনুরূপভাবে "চাচপুটঃ" নামক অপর শব্দটির বিশ্লেষণ ছিল এইরকম—চা।চ।পু।টঃ। এখানে নিয়মানুসারে "চা" এবং 'টঃ'কে গুরু ধরা হত এবং চ ও প এই দুটি অক্ষর স্বভাবতই লঘু। সব মিলিয়ে এটি হচ্ছে ষটমাত্রিক। এইভাবে ষটমাত্রিক, দ্বাদশ মাত্রিক রীতিতে চাচপুট তালের আবর্তন ঘটত। একে বলা হত ত্র্যশ্রজাতি।

আলোচনাটি বোধ হয় একটু বেশী পারিভাষিক হয়ে পড়ল, তাই এর সারাংশটুকু আর একবার সহজভাবে বলা যাক। আমরা তিনটি বিষয়ের উত্থাপন করেছি, যথা—গণ, মাত্রানির্দিষ্ট দেশী তাল এবং কলা। গণ হচ্ছে লঘুগুরু বর্ণের উচ্চারণ দ্বারা

ছন্দরক্ষা করে কাব্যপাঠ বা গানক্রিয়া। দেশী তালের বেলায় মাত্রাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাপকাঠিতে নির্ণয় করা হত। কুম্ভক নামক দেশী তালের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, একটি লঘুর পরিমাপ ছিল চারটি লঘু অক্ষর উচ্চারণের কালটুকু। এটি বর্তমান চার মাত্রার সমান, কারণ বর্তমান মাত্রার ইউনিট অনুসারে ক, চ, ত, ট—এই চারটি অক্ষরকে চতুর্মাত্রিক বলা যেতে পারে। কলা হচ্ছে একটি ফেরের একটি ভাগ; অর্থাৎ ষোলোমাত্রায় একটি ফেরকে আমরা যখন চারটি ভাগে করি সেই চতুর্মাত্রিক একটি তালখণ্ড হচ্ছে একটি কলা এবং ষোলোমাত্রার সমগ্র ফেরটি হচ্ছে চতুষ্কল। এক্ষেত্রে কিন্তু লঘুগুরুর বিন্যাস অনেকাংশে শিথিল ছিল। প্রতি কলায় মাত্রাসংখ্যা সমান থাকলেই সেটি অনুমোদিত হত। অনেক সময় দেখা যেত একটি কলায় একটি লঘুবর্ণও ত্রিমাত্রিক বা চতুর্মাত্রিক হয়ে গেছে।

ছন্দচিন্তার ব্যাপারটা সাহিত্য এবং সঙ্গীত উভয় ধারাকে আশ্রয় করে মোটামুটি এইভাবে অগ্রসর হয়েছিল। বর্তমানে যাঁরা কেবলমাত্র সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁরা সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রের গণরূপে গঠিত ছন্দনির্দেশকে তেমন গুরুত্ব প্রদান করেন না। এর প্রধান কারণ পূর্বেই বলেছি বাংলা ছন্দের লঘুগুরু কোনও শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে চলে না, সেটা লৌকিক প্রথায় যেমনটি চলে আসছে তেমনটি হয়ে থাকে। বাংলায় সংস্কৃত লঘুগুরু ছন্দ অনুসারে গান করতে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়, কিন্তু যদি করা যায় তাহলে তা কিছুমাত্র অসার্থক হবে না। উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের "কেশর কীর্ণ কদম্ববনে, মর্মর মুখরিত মৃদুপবনে" এই ধরনের কলির উল্লেখ করা যায়। এখানে লঘুগুরুকে স্বীকার করেই কলিটি সম্পাদিত হয়েছে বলে ছন্দটি এত সুন্দর এবং প্রত্যক্ষ লাগে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই এমনটি হবার জো নেই। বাংলা গান যে ছন্দকে ছেড়ে তাল সহযোগেই অনুষ্ঠিত হয় তার প্রধান কারণই বাংলার অনির্দিষ্ট লঘুগুরু উচ্চারণঘটিত প্রচলন বা অসুবিধা যাই বলা হোক না কেন।

গান এবং কবিতা উভয়ের সঙ্গে ছন্দ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল একদা এবং আজও নিয়মানুসারে সেটি আছে। অতএব সংস্কৃত বা প্রাকৃত গানে ছন্দসমূহের চিন্তাকর্ষক প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে ছন্দবিজ্ঞানের বিচার সামগ্রিকভাবে অনেক বৃহত্তর পটভূমিকায় সম্পাদিত হতে পারে।

শার্ঙ্গদেব

গুরুশিষ্য সংবাদ : অবনীন্দ্রনাথ ও শৈলেন্দ্রনাথ

তারাকুমার বিশ্বাস

বিশ্বনাথের মন্দির যেমন পুণ্যার্থীদের এক পরম তীর্থ তেমনি কলারসিকদের চোখে কাশীর অন্যতম আকর্ষণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট মিউজিয়াম—ভারত কলা ভবন। ভারতীয় শিল্পকলায় উৎসাহী দেশ বিদেশের রসিকজন মিউজিয়ামটির বিচিত্র সম্পদ সংগ্রহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মিউজিয়ামটির সূত্রপাত হয়েছিল যে গুণীজনের একক এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সেই জ্ঞানবৃদ্ধ সংস্কৃত পুরুষ রায় কৃষ্ণদাস আজ আশীর কোঠায়। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ক্রমশ অপসৃয়মান ভারতীয় সংস্কৃতির অতীত গৌরবকে ফিরিয়ে আনবার একান্ত চেষ্টায় রায় সাহেব কাশীতে গড়ে তুলতে চাইলেন এক সংস্থা যেখানে ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য ও শিল্পকলায় উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার আয়োজন থাকবে, আর সেই সঙ্গে থাকবে একটি আর্ট মিউজিয়াম যার সংগ্রহ ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে যাবে প্রতিনিয়ত মানসিক উৎসাহ। রায় সাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহের মাধ্যমে যে মিউজিয়ামটির অঙ্কুর জন্ম নিয়েছিল সেই মিউজিয়ামটি আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আর্ট স্কুলটি গড়ে তুলতে গিয়ে রায় সাহেবের সামনে একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। উপযুক্ত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যায়? আর এই সমস্যাটির সমাধান কি ভাবে করা যায় তাই জানতে তিনি চিঠির মাধ্যমে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সাহায্য চাইলেন। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে রায় সাহেবের পূর্ব পরিচয় ছিল এবং ঠাকুর-বাড়িতে রায় সাহেবের মাঝেমধ্যে আসা যাওয়াও ছিল। অবনীন্দ্রনাথ রায় সাহেবের একটি চিঠির উত্তরে জানালেন,—

My dear Rai Sahib,

Sailendro is going to Benares, he has finished his course here and has nothing more to learn. He will be just the man to take charge of the studio in your Kala Parishad and I know that you require a really good artist for the work. So I send Sailendro with instructions to you. Your committee must make up its mind to have serious work done there and leave the teaching work in charge of Sailendro, otherwise it is no good producing third rate painters for your society.

Yours sincerely,
Abanindra Nath Tagore.

রায় সাহেব কাশীতে যে সংস্থাটি গড়ে তুলছিলেন তার নামকরণ করা হয়েছিল ভারত কলা পরিষদ। সেই ভারত কলা পরিষদের আর্ট স্কুলের ভার নিতে অবনীন্দ্রনাথ এই চিঠির সঙ্গে শিষ্য শৈলেন্দ্রনাথ দে-কে পাঠালেন কাশীতে রায় সাহেবের কাছে। শুধুমাত্র শিল্প-শিক্ষাই নয়, শিষ্যদের জীবনে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ব্যাপারে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ গভীর চিন্তা করতেন। গুরু অবনীন্দ্রনাথের এই সুন্দর মানপত্র নিয়ে শিল্পী শৈলেন্দ্রনাথ এলেন কাশীতে। কলা পরিষদের আর্ট স্কুল তখনও গড়ে ওঠেনি, তাই রায় সাহেব বরুণা নদীর ধারে তাঁর বাগানবাড়িতে শৈলেনবাবুর জন্য একটি স্টুডিও করে দিলেন। রায় সাহেব শুধুমাত্র কলা রসিক বলেই নয়, হিন্দী সাহিত্যের জগতে এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। রায় সাহেবের বহুদিনের বাসনা ছিল মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের কিছু অংশের চিত্ররূপ দেওয়ার। একদিন তিনি শৈলেনবাবুর কাছে কথাটা পাড়লেন। অমায়িক নিরহংকার শৈলেন্দ্রনাথ রায় সাহেবের অনুরোধে রাজী হয়ে গেলেন মেঘদূতের কিছু কিছু অংশকে চিত্রে রূপায়িত করতে। গুরুদেব ছাড়া শৈলেন্দ্রনাথ এত বড় একটা কাজ হাতে নিতে সঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। কেবলই সংশয় রায় সাহেবের পছন্দ হবে তো? নিজের উপর সঠিক আস্থা না থাকায় শৈলেন্দ্রনাথ প্রথমে মেঘদূতের কিছু কিছু অংশ পেন্সিল স্কেচে নিজের মন থেকে রূপ দিয়ে গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে পাঠালেন তার সুচিন্তিত মতামতের জন্য, যদি কিছু ভুল ত্রুটি থাকে তবে তা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। শিষ্যবৎসল অবনীন্দ্রনাথ শৈলেনবাবুর পেন্সিল স্কেচগুলির উপর পেন্সিলেই তার সমালোচনা করলেন আর সেই সমালোচনার প্রতি ছত্রে প্রকাশ পেল অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিল্প এই দুই জগতের উপর সুগভীর জ্ঞান আর সূক্ষ্ম রসবোধ।

শৈলেন্দ্রনাথের একটি স্কেচে বনজংগলে ঘেরা উঁচু নিচু পাহাড়ের মাঝে এক কৃশকায় বিরহী যক্ষকে তাকিয়ে থাকতে দেখা যায় দূরে পাহাড়ের উপর ভেসে চলে যাওয়া মেঘগুলোর দিকে। যক্ষের পরনে ধুতি আর ঊর্ধাঙ্গে উত্তরীয়। বেশবাস আলুথালু। হাত-পা অত্যন্ত রুগ্ন, শরীর অস্থিচর্মসার। এই স্কেচটির উপর অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—'এটা যেন পিলে রোগী হয়েছে। এটা একবার ভাল করে চেষ্টা করে দেখো। মানুষের চেয়ে যক্ষরা একটু অন্য রকমের দেখতে, কতকটা

বিরহী যক্ষ। শিল্পী : শৈলেন্দ্রনাথ দে—ভারত কলাভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

বিরহিনী যক্ষিণী—শিল্পী : শৈলেন্দ্রনাথ দে—ভারত কলাভবনের সৌজন্যে প্রাপ্ত

পাহাড়ি লোকেদের চেহারা, খুব টানা চোখ এবং বেশ একটু জোরালো চেহারা। কালিদাস শ্লোগা লিখেছেন বলেই যে একেবারে কাঠির মত করে লিখতে হবে, তা নয়। গাছগুলোর যেমন পাতা ঝরে গেলেও সুন্দর এবং একটু শুকনো, তেমনি এই যক্ষকে তার সৌন্দর্যের মধ্যেই একটু কৃশতা দিয়ে লিখো। যেন তৃষিত পৃথিবী জল পেয়ে তাজা হয়ে গেছে, এই ভাবটা দিলে ভাল হবে।'

মাত্র কয়েকটি কথার মাধ্যমে গুরু শিষ্যের মধুর সম্পর্কটি অত্যন্ত সরলভাবে অনাবৃত হয়েছে। বিদ্রূপের কশাঘাত নয়, সহজ অথচ সঠিক উদাহরণে অবনীন্দ্রনাথ এঁকে দিলেন শিষ্যের মনের মধ্যে বিরহী যক্ষের চেহারাটা। যোগ্য শিষ্যকে আর দ্বিতীয়বার ভ্রম সংশোধন করতে হয় নি। গাছগাছালি লতাগুল্ম ইতি-উতি ছড়ানো পাহাড়িয়া পরিবেশে বিরহ-কাতর যক্ষ বসে আছে আর তাকিয়ে আছে দূরে ভেসে চলে যাওয়া ঘন নবীন কাল মেঘের দিকে। হয়তো সেই সঙ্গে মনে মনে ভাবছে,—

'নবীন মেঘ দেখে মিলিত সুখীজন
তারাও হয়ে যায় অন্যমনা,
কি আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে, যে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন'

শৈলেন্দ্রনাথ তাঁর অন্য একটি স্কেচে বিরহিনী যক্ষিণীর রূপ দিলেন। একটি ছোট্ট পায়া বিশিষ্ট পালঙ্কে যক্ষিণী এক পাশ হয়ে শুয়ে আছে। তার ডান হাত মাথার নীচে তাকিয়ার উপর। যক্ষিণীর পরনের শাড়ি আলুলায়িত; মাথার চুল অদনুরূপ। স্তনের উপরাংশ অনাবৃত, বাঁ হাতে মাত্র একগাছা চুড়ি। ঘরে দ্বিতীয় কোন আসবাব নেই। অদূরে একটা বাতায়ন'। এই স্কেচটির এক পাশে অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বিরহিনী মানবী নয়, এ যে যক্ষিণী। তার মত চেহারা একেবারে হয় নি। কোচে শুয়ে বিরহ দ্বিজুবাবুর গানে চলে, কালিদাসে নয়।' আর বাতয়নের উপর লেখা 'European হয়ে গেছে।'

বিরহিনী যক্ষিণীর রূপ বিচার করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একটি ছোট্ট humour করলেন কয়েকটি হাতে গোনা অক্ষরে আর সেই কয়টি অক্ষর দিয়ে এঁকে দিলেন কালিদাসের কালের বিরহ কাতর যক্ষিণীর চেহারাটি। শৈলেন্দ্রনাথ কোচটি সরিয়ে নিলেন চিত্র থেকে. বিরহিনী যক্ষিণীকে শুইয়ে দিলেন কঠিন মেঝেতে। আলুথালু কেশবাস আর যক্ষিণীর কাতরতায় ঢেলে দিলেন কারুণ্যের পরশ। ধোঁয়ার অনুকরণে সজল মেঘের আনাগোনায় বাতায়নটি হয়ে দাঁড়ালো সম্পূর্ণ ভারতীয় আর

'দেখবে সাধ্বীরে ভূতলশয্যায়, নিদ্রা-লেশ নেই চক্ষে
মহৎ সুখ দিয়ো সৌধ বাতায়নে আমার সমাচার জানিয়ে'

কালিদাসের এই ছত্র দুটি শৈলেন-বাবুর তুলিতে অপরূপ রূপ নিলো।

শৈলেন্দ্রনাথ তাঁর তৃতীয় একটি স্কেচে একটি মনোরম বাগানের ছবি আঁকলেন। বাগানের মাঝে একটা শান বাঁধানো জলাশয়। সিংহমুখ দিয়ে বাইরে থেকে জল এসে পড়ছে জলাশয়ে। তার মধ্যে হাঁস বিচরণ করছে। জলের উপর ভেসে আছে পদ্মপাতা আর পদ্মফুল। বাগানের একটি গাছের পাশে এক তরুণী নারী পেখম মেলা ময়ূরের নাচ দেখছে। সুদূর আকাশে মেঘের ইশারা কয়েকটি রেখায় তুলে ধরা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ এই স্কেচটির পাশে লিখেছেন, 'আর সব ভাল হয়েছে কেবল ময়ূরটা সোলার হয়েছে। রায় সাহেবের বাগানে কি ময়ূর নাই? না থাকে তো একটা পোষা ময়ূর দেখে এঁকো।' কালিদাসের লেখা 'ভবনশিখিভির্দত্তো-নৃত্যোপহার' শব্দটির যথাযথ রূপ দেওয়াই ছিল অবনীন্দ্রনাথের বোধ হয় উদ্দেশ্য।

গুরুর নির্দেশানুযায়ী শৈলেন্দ্রনাথ পর পর মেঘদূত থেকে অনেকগুলি ছবি আঁকলেন। সেই ছবির কিছু ভারত কলা-ভবনে সংগৃহীত আছে আর কিছু আছে রায় কৃষ্ণদাসজীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে। শৈলেন্দ্রনাথের সমস্ত স্কেচগুলির সঠিক সন্ধান নেই। যে কয়টি স্কেচ ভারত কলা ভবনে আছে, তার মধ্যে যে কয়টি বর্তমান লেখককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তারই আলোচনা করা হল। এই কয়েকটি স্কেচের মধ্যে গুরুশিষ্যের মধুর সম্পর্কের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু সম্পূর্ণ যে চিত্রগুলি ভারতকলা ভবনে আছে সেগুলির। বাকী স্কেচগুলির আর হদিশ পাওয়া যায় না। হয়তো সেই হারিয়ে যাওয়া স্কেচগুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের সুগভীর রসবোধের আরও অনেক পরিচয় পাওয়া যেতো।

প্রাচীন ভারতে পত্রলিখন রীতি ও গুপ্তচরবৃত্তি

শ্রীভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় (শিলচর-১) মহাশয় দেশ পত্রিকার ২৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় গত ২৩ আগস্ট 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার 'প্রাচীন ভারতে পত্রলিখনরীতি ও গুপ্তচরবৃত্তি' প্রবন্ধটির সমালোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সযত্নে পাঠ করিয়া তাহার সমালোচনা করার জন্য আমি শ্রীচট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় বররুচির পত্রকৌমুদী পুঁথির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। একথা বলা বাহুল্য যে বররুচির 'পত্রকৌমুদী' পুঁথিটি পুনর্লিখিত এবং প্রাচীন যুগের সমস্ত পুঁথিই তাহাই। প্রাচীন পুঁথিগুলি বহুবার পুনর্লিখিত হইতে হইতে আমাদের নিকট পৌঁছায়। পাঠভেদে পুঁথির অল্পবিস্তর পরিবর্তনও প্রায়শই পরিলক্ষিত হয়। ইহা যে কোন পুঁথির বিভিন্ন কপি লইয়া বিচার করিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

'পত্রকৌমুদী' পুঁথির পুষ্পিকাতে বররুচির নামের সঙ্গে শ্রীমান বররুচি শ্রীধীমান দেখিয়া শ্রীচট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন 'বররুচির মত খ্যাতিমান পণ্ডিত স্বীয় নামের পূর্বে এই শব্দগুলি ব্যবহার করিবেন বিশ্বাস হয় না।' তাঁহার এই সন্দেহ সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি বররুচির পরিচয় সম্বন্ধীয় লাইন দুইটি ভাল করিয়া পড়েন নাই। বররুচির 'পত্রকৌমুদী' পুঁথিখানির লেখক বররুচির নামের সঙ্গে শ্রীমান ও শ্রীধীমান শব্দ যোগ করিয়াছেন। 'শ্রীমান বররুচি শ্রীধীমান তনোতি পত্র কৌমুদীং।' এখানে তনোতি ক্রিয়াটি প্রথমপুরুষ এক-বচনের রূপে ব্যবহৃত। এ সম্বন্ধে আরও বলা যায় যে, সেকালে নামের সঙ্গে প্রশস্তি-বাচক-পদবী ব্যবহারের বহুল প্রচলন ছিল। সেই প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ করিয়া আজও আমরা নিজ নিজ নামের পূর্বে 'শ্রী' শব্দটি যোগ করি এবং আজও খ্যাতনামা ব্যক্তিরা নিজেদের নামের পূর্বে এবং পরে বিভিন্ন পদ-পদবী ব্যবহার করেন যেমন—কবিশেখর বিদ্যানিধি, রায়সাহেব, পদ্মশ্রী, বঙ্গশ্রী, ভারতশ্রী ইত্যাদি।

পত্রকৌমুদী পুঁথিখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখায় বর্তমানে সংরক্ষিত। এই পুঁথিশালায় পাঁচ হাজারেরও অধিক পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুঁথিশালায় এমন অনেক পুঁথিই রহিয়াছে যাহা দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য। যে সমস্ত পুঁথির উল্লেখমাত্র পাওয়া গিয়াছে—পুঁথি

আলোচনা

পাওয়া যায় নাই তেমন বহু পুঁথিরই সন্ধান এই সংগ্রহশালায় মিলিয়াছে। আলোচ্য পুঁথিটি বিষ্ণুপুর শহরের চার-মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী ধরাপাট গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই পুঁথির সঙ্গে আরও যে সমস্ত পুঁথি ছিল তাহাদের মধ্যে নীতিবর্মার কীচকবধ, ধোয়ীর পবনদূত, প্রশস্তকরপাদের পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ, ঘটকর্পরের ভেরুণ্ডসংহিতা, প্রাকৃতপিঙ্গল, কালিদাসের যাবতীয় কাব্য, বরাহমিহিরের জাতকার্ণব ইত্যাদি। ইহারই দুইমাইল দূরের কাঁকিলা গ্রাম হইতেই বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রামের দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত গড়হাটি (পূর্বনাম গহীরহাটি) গ্রাম হইতে বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', 'রোমক সিদ্ধান্ত' 'পৌলিশসিদ্ধান্ত' আর্যভটের 'আর্য-সিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থ উৎপল ভট্টের 'লঘুজাতক' ইত্যাদি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

এই গড়হাটি গ্রামের দেড় মাইল পূর্বে অবস্থিত ডিহর গ্রাম হইতে মৌর্য ও মৌর্য-পূর্ব যুগের এবং তাহা অপেক্ষাও বহু প্রাচীন যুগের মুদ্রা, চিত্রিত কোদাল, প্রাচীন মৃৎপাত্র, টেরাকোটা উপরস্তর শালদানা প্রভৃতি প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রামের সংলগ্ন গ্রাম জন্তা (বৌদ্ধ অর্থ স্নানঘর) এবং অদূরে রাউতড়া এবং অবন্তিকা। এই সব প্রত্নবস্তুর নিরিখে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে মৌর্য এবং মৌর্যপূর্ব যুগ হইতেই এই গ্রামের সঙ্গে মালব-সংস্কৃতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'পশ্চিমবঙ্গ' (৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫) পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা 'মল্লভূমে মালব সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় আমার মূল প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতে পত্রলিখন রীতি ও গুপ্ত-চরবৃত্তি' সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করেন নাই। কিন্তু যে পুঁথিটির উপর নির্ভর করিয়া প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে তাহাতে উল্লিখিত আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত পত্র-গুলির নমুনার ভাষার মধ্যে আরবী শব্দের ব্যবহার এবং অন্যান্য হিন্দী শব্দের ব্যবহার হইতে পুঁথিটির কাল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহা একখানি জাল পুঁথি বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে আরবী শব্দের আগমন সম্ভব নয়। এই সম্বন্ধে বলা যায় যে, শ্রীচট্টোপাধ্যায় বররুচির সম-কালীন বরাহ-মিহির এবং তৎপূর্ববর্তী আর্যভটের পুঁথিগুলি এবং তাহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষীর মতামত সম্বন্ধে অবহিত নন।

আর্যভট তাঁহার গ্রন্থে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা নির্দেশার্থে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণমালা দ্যোতক স্বরূপ ব্যবহার করিয়া-ছেন। যেমন বোপদেব সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দ্বারা ব্যাকরণকে, কতকগুলি অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনি আর্যভট অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ এবং ক খ ইত্যাদি ব্যঞ্জনবর্ণের এক এক সংখ্যাবাচক অর্থ দিয়া অতি সহজে বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন। আরবগণও এইরূপ করিতেন। আর্যভটকে গ্রীকগণ অন্দুবেরিয়স এবং আরবগণ অর্জভর নামে অভিহিত করিতেন। আর্যভট কোন যবন পণ্ডিত হইতে জগণ পাতাদি সংস্কৃতাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। আরব জ্যোতিষীদের দ্বারা এবং আর্যভটের দ্বারা বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা দ্যোতনা

রীতিই বররুচির পত্রকৌমুদী পুঁথির 'অথ সংঙ্কেতেন অঙ্ক পল্লবী ভাষয়া পত্র লিখন প্রকারঃ'—বিষয়টিতে অনুসৃত হইয়াছে।

আর্যভটের কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে বরাহ-মিহিরের আবির্ভাব ঘটে। তিনি মগধের অন্তর্গত কাম্পিল্যা গ্রামে খৃষ্টীয় ৫ম শতকে জন্মলাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম আদিত্য দাস। তিনি পিতার নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়া অবন্তী নগরে গমন করেন। অবন্তী বা শিপ্রা নদীর দক্ষিণতীরে অবন্তী নগরী ছিল। ইহাই উজ্জয়িনী। ইহার দক্ষিণে নিমার জেলায় মহিষ্মতীর নিকট আর এক অবন্তী রহিয়াছে। এই অবন্তীর প্রতিধ্বনি বিষ্ণুপুরের অনতিদূরবর্তী অবন্তিকা (ছোট অবন্তী) গ্রাম। এই অবন্তিকা সংলগ্ন গ্রাম ডিহির হইতে মালব সংস্কৃতির বহু প্রাচীন প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হইতেছে। বরাহ-মিহির রচিত পৌলিশ সিদ্ধান্ত পুঁথিখানি গ্রীক পৌলশ (Paulus Alexandrinus) নামক গ্রীক জ্যোতিষীর সিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত বেবর এবং ভাউদাজী এইরূপ মনে করেন। ডাঃ কার্ণসাহেব মনে করেন পৌলিশ সিদ্ধান্তের মূলে কোন যাবনিক গ্রন্থ রহিয়াছে। বরাহ-মিহিরের পৌলিশসিদ্ধান্তে যবনপুর বা আলেকজান্দ্রিয়া (সৈন্দ্র) হইতে উজ্জয়িনী ও বারানসীর দেশান্তর রহিয়াছে।

বরাহ তাঁহার বৃহজ্জাতকে যবনাচার্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎকালে যবনেরা ফলিত জ্যোতিষের অধিকতর চর্চা করিত। তাহাদের নিকট হইতেই এদেশে জাতক-গণনা পুষ্টিলাভ করিয়াছে। প্রথমে হোরাশাস্ত্র এবং পরে আরবীর সংস্রবে তাজক গণনা ভারতে শুরু হয়। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বরাহের কালেই বহু আরবী শব্দের আগমন ঘটিয়াছে। বররুচির পত্রকৌমুদীতে ব্যবহৃত আরবী শব্দের ব্যবহার তাই সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

বররুচির 'পত্রকৌমুদী' মৌলিক রচনা নহে। বররুচি তাঁহার পূর্ববর্তী আমলের লিখিত রাজনীতি চিন্তামনি, রাজনীতি চন্দ্রিকা, রাজনীতি রত্নাবলী এবং পদ্য কাদম্বরী ইত্যাদি পুঁথিগুলি হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া দিয়া তাঁহার 'পত্রকৌমুদী' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পত্রকৌমুদী সংকলন গ্রন্থ মাত্র। আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত পত্রের নমুনাগুলিতে কিছু সংখ্যক অর্বাচীন শব্দের ব্যবহার দেখিয়া 'পত্রকৌমুদী'র মৌলবস্তু সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায় না।

আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত নমুনা পত্রগুলির মধ্যে 'অথ শংকেতেন অঙ্ক পল্লবী ভাষয়া পত্র লিখন প্রকারঃ' অংশটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ইহা বররুচির কালের। কারণ এই রীতি অব্যবহিত পরবর্তী কালেই লুপ্ত হইয়া যায়। বাংলা হিন্দুস্থান সীমার কোথাও ইহার প্রচলন ছিল না। এই অবস্থায় সুদূরে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন লেখকের পক্ষে উক্ত রীতির অনুবর্তন সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

মানিকলাল সিংহ

শতবর্ষের আলিপুর চিড়িয়াখানা

আপনার সাপ্তাহিকে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫) প্রকাশিত শ্যামল চক্রবর্তীর 'শতবর্ষের আলিপুর চিড়িয়াখানা' পড়লাম। ঐ প্রবন্ধে দেয়া কয়েকটি তথ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করতে চাই।

প্রবন্ধে এক জায়গায় শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন,—'চিড়িয়াখানার অন্যান্য আকর্ষণ হল—আসামের জঙ্গল থেকে আনা 'নীলগাই', হরিণ জাতীয় এই বৃহৎ জন্তুটি...' ইত্যাদি। পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, যে আসামের জঙ্গলে 'নীলগাই'-এর সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, এবং এই জন্তুটি আদৌ হরিণ জাতীয় নয়। Gaur (ইণ্ডিয়ান বাইসন), ব্ল্যাক বাক বা চিনকারার মত নীলগাই Bovidae ফ্যামিলির অন্তর্গত; হরিণের সঙ্গে তাহাদের পার্থক্য অনেক।

প্রবন্ধের অন্য এক জায়গায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে নতুন সংযোজনের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'কেনিয়া থেকে নু নামক হরিণ' বস্তুতপক্ষে, শুধু কেনিয়া কেন, আফ্রিকার কোথাও হরিণ পাওয়া যায় না। প্রবন্ধে উল্লিখিত 'নু' সম্ভবত একটি এণ্টিলোপ।

চিড়িয়াখানার অপর আকর্ষণ ঝিল এবং মাইগ্রেটরী বার্ড সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন,—'পৃথিবীর আর কোন চিড়িয়াখানায় এ ধরনের মাইগ্রেটিং বার্ড নেই।' 'এ ধরনের' বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন জানি না। তবে, এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বেশী দূর যেতে হয় না, দিল্লীর চিড়িয়াখানাতেই মাইগ্রেটরী বার্ডের একটি সুন্দর নেস্টিং কলোনি আছে।

মাইগ্রেটরী বার্ডদের শীতকালীন আগমন সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন, 'এর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।' বস্তুতপক্ষে, পক্ষীবিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে, অর্থাৎ 'মাইগ্রেশন' সম্বন্ধে একাধিক কারণ 'খুঁজে' পেয়েছেন। পাখি সম্বন্ধে ভাল লিটারেচারের আজকাল কোন অভাব নেই। আমার কথার যথার্থতা সহজেই বিচার্য।

অচিন্তকুমার সিংহ
আমবাসা, ত্রিপুরা।

শরৎ-রবি

এবারের পুজোসংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় অমিতসূদন ভট্টাচার্যের 'শরৎ-রবি' প্রবন্ধে দেখলাম, তিনি লিখেছেন—১৩২৬ সালের ২৪ পৌষ, ডিসেম্বর ১৯১৯, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লেখেন। চিঠির একটি অংশ—আজ আমরা আপনার নিকটে যাইতেছিলাম—ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের এই চিঠির তারিখ ১৩২৬ সালের ২৪ পৌষ নয়, এর তারিখ ১৩২৪ সালের ২৯ পৌষ। তাই ইংরাজি ডিসেম্বর ১৯১৯ও নয়, হবে জানুয়ারি ১৯১৮।

অমিত্রবাবু এই চিঠির তারিখের ভুল করেই বলেছেন—'এই পত্র পাঠ করে মনে হয় কলকাতায় ১৯১৯-এর কিছু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।"

যতদূর জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয় ১৯১৭-র শেষে অথবা ১৯১৮-র গোড়ার দিকে। পরিচয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রার আসরে। আর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৪৮ সালের আশ্বিন মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখেছেন—১৯১৮-র মার্চে বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধ পাঠের সভায় শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। এবং সভার শেষে, বিচিত্রার পরবর্তী অধিবেশনে একটি গল্প লিখে এনে পড়বার জন্য শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুরুদ্ধও হয়েছিলেন। সেদিনের ঐ সভায় নলিনীবাবু নিজে ছিলেন।

১৩৬৯ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত সুকুমার বসুর 'বিচিত্রা পর্ব—স্মৃতিকথা' প্রবন্ধ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের এবং শরৎচন্দ্রেরও গল্প পাঠের সঠিক তারিখ দুটি জানা গেছে। ঐ তারিখ দুটি হল যথাক্রমে ১৩২৪ সালের ৬ই চৈত্র এবং ১৩২৪ সালের ১৪ই চৈত্র। সুকুমারবাবু তাঁর প্রবন্ধে তাঁকে লেখা ঐ দু'দিনের বিচিত্রায় নিমন্ত্রণপত্রও ছেপেছেন। সুকুমার-

বাবুর প্রবন্ধ থেকে এটাও জানা যায় যে, শরৎচন্দ্র কিঁচরায় সেদিন তাঁর 'বিলাসী' গল্পটি পড়েছিলেন।

অমিয়বাবু লিখেছেন—রেঙ্গুনে রবীন্দ্র সম্বর্ধনায় বাংলা মানপত্রটি শরৎচন্দ্রের রচিত।

'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত আমার এক প্রবন্ধে এবং আমার দুটি বইয়েও আমি বারবার বলেছি—ঐ মানপত্র শরৎচন্দ্রের রচিত নয়। তার কারণ, প্রথমত—রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে যাওয়ার মাসখানেক আগেই শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এসেছিলেন। দ্বিতীয়ত—কেউ যদি বলেন, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগের আগে ওটি লিখে দিয়ে এসেছিলেন, তার উত্তরে আমার বক্তব্য—ঐ ছোট্ট মানপত্রটির মধ্যে, কয়েকবার 'নব নব' সাতবার 'আনন্দ', ছবার 'হৃদয়' এবং একাধিকবার 'নিখিল', 'কাব্যবীণা', 'আলোক' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় মনে হয়, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। কেননা, একটুমাত্র পরিসরের মধ্যে একই শব্দের এত বেশী ব্যবহার শরৎচন্দ্র কখনই—এমনকি তাঁর বাল্য রচনাতেও করেন নি। আর ঐ মানপত্রের মধ্যেকার 'পারস্পন্দিত' শব্দটা দেখেও

মনে হয়, এটি শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত শব্দ নয়। শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে কোথাও 'পরিস্পন্দিত' শব্দটা কই ত দেখছি না।

অমিত্রবাবু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে লেখার পাদটীকায় গিরীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের নাম করেছেন। কিন্তু গিরীনবাবু বলেছেন বলেই কি তা মেনে নিতে হবে! এই গিরীনবাবুই ত ঐ রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গেই লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ ফেরার পথে আবার রেঙ্গুনে এলে সেদিন শরৎচন্দ্রসহ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আমেরিকা ও ইনল্যাণ্ড ভ্রমণের গল্প শুনেছিলেন। গিরীনবাবু তাঁর বইয়ে এও লিখেছেন—শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেই রেঙ্গুন ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন।

অথচ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে পরিষ্কার দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইনল্যাণ্ডেই গিয়েছিলেন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে। অতএব গিরীনবাবুর রবীন্দ্র-শরৎ প্রসঙ্গ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অমিত্রবাবু তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক শরৎচন্দ্রের নিষ্কৃতির ইংরাজি অনুবাদ (দিলীপকুমার রায়কৃত) গ্রন্থের ভূমিকা লেখা, ১৯৩৬-এ কলকাতার টাউন হলে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে সেই বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথকে আনার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের ভূমিকা ও অংশ গ্রহণ প্রভৃতি 'শরৎ-রবি' সম্পর্কের অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনাই বলেননি।

গোপালচন্দ্র রায়
কলকাতা-১২।

ছন্দ

গত ৬ই সেপ্টেম্বর (৪৫ সংখ্যা) প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা বিভাগে পত্রলেখক অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে প্রশ্ন করে নিজেই তার সঠিক জবাব দিয়েছেন—'আজি মেঘ ভয়ে ভয়ে মারিছে উঁকি।' কিন্তু আমার বক্তব্য ঠিক তা নিয়ে নয়। শ্রীঅতে বন্দ্যোপাধ্যায় ধরেই নিয়েছেন যে, মাত্রাবৃত্তের পর্ব বা যতিবিন্যাসের একটি প্রকার হল ৪ মাত্রা। একথা কি ঠিক? মাত্রাবৃত্তে ৪ মাত্রার উচ্চারণের পর পূর্ণ যতি পড়ে কি? ৮ মাত্রার পর্ব (পূর্ণযতি যুক্ত) যেখানে, সেখানে পর্বাঙ্গ হবে ৪-এ, এই তো মনে হয়। আর ৬ মাত্রার পর্বে পর্বাঙ্গ ৩-এ। যদি ৪ মাত্রার অর্ধযতিকে পূর্ণ ধরি এবং পর্ব ধরি তা হলে ৩ মাত্রাই বা পর্বের মহিমায় অপাংক্তেয় থাকবে কেন? বস্তুত একমাত্র ছড়ার ছন্দ ছাড়া ৪ মাত্রায় পূর্ণ পর্ববিভাগ সমীচীন মনে হয় না, শ্রুতিতে লাগে।

মোঃ মুসাকালিম
বাংলা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সংকট

২০ সেপ্টেম্বরের 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'দেশ ও কাল' শীর্ষক আলোচনায় পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ সংকট প্রসঙ্গে ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীসময় রায় লিখেছেন, 'এই কেন্দ্রগুলির মজা হল এগুলি চালু করলেই পুরো উৎপাদনে যেতে হবে অথবা একেবারে বন্ধ রাখতে হবে। এগুলিতে প্রয়োজনমত উৎপাদন বাড়ানো কমানো অসম্ভব।' শ্রীরায়ের এই উক্তি ঠিক নয়। প্রথমত ১২০ মেগাওয়াটের মত বড় বয়লার-টারবাইন-জেনারেটর ইউনিট সম্পূর্ণ চালু করতে গেলে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। কোন কোন সময় এমন সব বাধা আসে যা অতিক্রম করা সেই মুহূর্তে অসম্ভব হয়ে ওঠে। এরকম একটা ইউনিটকে পূর্ণশক্তিতে চালু করতে গেলে ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে হয়। কখনো বয়লার, কখনো টারবাইন কখনো বা জেনারেটরে এমন সব সমস্যা দেখা যায় যেগুলো স্বাভাবিক এবং তা অতিক্রম করতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

সাধারণত পাউডারের মত মিহি কয়লা পুড়িয়ে আধুনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। কয়লা গুঁড়ো করা হয় Coal Mill বা কয়লা-পেষণ যন্ত্রে। একটা ১২০ মেগাওয়াট ইউনিটের জন্যে সাঁতালদি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে আছে চারটে মিল, তার একটা অতিরিক্ত, বাকি তিনটে চালিয়ে এত কয়লা গুঁড়ো করা যায় যাতে ১২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তির উপযুক্ত উত্তাপপূর্ণ স্টীম বয়লারে তৈরি করা সম্ভব। সুতরাং যদি একটা মিল চলে তাহলে ৪০।৫০ মেগাওয়াট অবধি বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাবে। তেমনি দুটো মিল চললে ৮০।৯০ মেগাওয়াট অবধি বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটা, দুটো বা তিনটে মিল চালিয়ে এই সব ইউনিটে ১২০ মেগাওয়াটের মধ্যে যে-কোন পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি যে কোন সময় উৎপাদন করা সম্ভব। অবশ্য এর জন্যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করা চাই এবং অল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় যখন একটা বা দুটো মিল চলে তখন বয়লার ফারনেসে আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্যে জ্বালানি তেল স্প্রে করার দরকার হতে পারে। তাছাড়া আংশিক উৎপাদনে কিলোওয়াট আওয়ার প্রতি কয়লার খরচও কিছুটা বেশি পড়ে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে চাহিদা ও সরবরাহের সমতা রক্ষা করা সবচেয়ে বড় জিনিস। উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা যদি কমে যায় তাহলে জেনারেটরের ওপর বৈদ্যুতিক বোঝা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যাবে। তেমনি চাহিদা বেড়ে গেলে বৈদ্যুতিক বোঝাও বেড়ে যাবে। দুটো অবস্থাই টারবাইন-জেনারেটরের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং, চাহিদা যদি অনেক কমে যায় তা হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও সেই পরিমাণে কমাতে হবে। যদি বড় ইউনিটগুলোকে আংশিক উৎপাদনে চালানো অলাভজনক হয়ে পড়ে তাহলে অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিটগুলোকে রাত্তিরে বন্ধ রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে ঐসব ছোট ইউনিটে তিন শিফটের বদলে দুই শিফটে কাজ চালানো যেতে পারে। বড় ইউনিটের তুলনায় ছোট ইউনিট সারা রাত বন্ধ রাখার পর আবার চালানো সাধারণত অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম সময়-সাপেক্ষ।

মনোজ ঘোষ
দুর্গাপুর-৬

॥ সাতচল্লিশ ॥

বোনটি আমাদের বিয়েতে এসেছিল। জব্বলপুর থেকে। তুমি ওকে দেখেছো, বউ। সেই যে বাসরঘরে খুব গিন্নীবান্নির মতো খবরদারি করছিল? তোমাকে সরবৎ এনে দিল! ভুল সুরে দু'তিনটে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়েছিল, মনে আছে? মুখখানি মিষ্টি রয়ে গেছে আগের মতোই। চেহারা একটু ভারী হয়েছে এখন। সোয়ামীর ঘরে আরামে আছে। খায়-দায় ঘুমোয়।

তখন বোধ হয় স্কুল ফাইনাল দিয়েছে, নাকি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে বোনটি। কলেজে আমার তৃতীয় বছর। দিন কয়েক হ'ল প্রথম নিউড্ স্টাডির ক্লাস করেছি। সব ছাত্রদের মাথায় চাপা উত্তেজনা। মডেলের বসবার ভঙ্গি ঠিক করে মাস্টারমশাই ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন,

—"যাও তোমরা। স্টাডি করবার দরকার নেই। আজ শুধু স্কেচ্ করো।"

মাথায় বুকে দপাদপ শব্দ। উত্তেজনা দাঁড় করানো বোর্ড। যে যার বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সাদা কাগজের দিকে তাকিয়ে আছি। মাথা সামান্য কাৎ করলেই মডেলকে দেখা যাবে। দেখতে এতো ইচ্ছে করছে, দেখবার জন্যে যাকে বলে গিয়ে 'প্রাণ' আইঢাই' করছে তবু ঘাড় কাৎ করতে পারছি না দু'ইঞ্চি। না বাঁদিকে, না ডানদিকে। লজ্জাই বোধ হয়। গোটা একটি উলঙ্গ নারী তার আশ্চর্য শরীর নিয়ে বসে আছে, এই ভাবনাতেই কেমন গা' ছেড়ে দিচ্ছিল। অথচ, সেদিনই প্রথম টের পেয়েছিলুম, পুরোপুরি নগ্ন শরীর চাক্ষুষ দেখার মধ্যে যে উত্তেজনা, সামান্য কল্পনার সুযোগ থাকলে তার চেয়ে ঢের বেশি। রহস্যই বোধ হয় সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মেয়েদের। একটু জানি, একটু বুঝি, আর একটু কল্পনার খোরাক। এই রকম, নাকি, এই রকম!

ঝকঝকে মনে নেই, তবু, কি যেন একটা খুঁজতে মায়ের ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম দুপুরবেলা। নাটক নাকি স্পোর্টসের জন্যেই বোধ হয় টিফিনে সেদিন ছুটি হয়ে গিয়েছিল কলেজ। ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, স্কুল ফাইনাল দিয়ে ঘরেই বসেছিল বোনটি তখন। দল বেঁধে দার্জিলিং যাবার কথা চলছে।

মায়ের ঘরের দরজা সাধারণ নিয়মে খোলাই থাকে। ভেজানো ছিল—সেদিন অতটা খেয়াল করিনি, ঠেলা দিয়ে ঢুকে পড়েছি।

ফি বছর বোনটি আমার হাতে রাখী বাঁধে। ভাই ফোঁটা দেয় কপালে। 'যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা' বলতে বলতে যদি কাঁধ থেকে ওর আঁচল খসে পড়ে হঠাৎ, তাহলে, তখন সেই অন্যরকম মানসিকতার ঘোরে আমি হয়তো কিছুই খেয়াল করব না। ওর কড়ে আঙুল আমার দুই ভুরুর মাঝখানে এগিয়ে আসবে ঘি চন্দন অথবা কাজল নিয়ে। কপালের অদৃশ্য বিন্দুতে শিরশির ভাব। আমি চোখ বুজে ফেলব। কিন্তু, ধরো যদি, বোনটি আমার তাড়াতাড়িতে স্নান করে ব্লাউজ পরতে ভুলে গিয়ে থাকে এবং শুধু ব্রা পরেই চলে এসে আমার কপালে ফোঁটা দেবার জন্যে হাত তুলে ফেলে, তবে কি আমি চোখ বুজে গণেশ অথবা কেষ্ট-ঠাকুরের ফোটো দেখতে পাবো? আমি অন্ততঃ পারিনি সেদিন।

আপনার বোনকে কেমন দেখতে?

কুচ্ছিৎ!

মোটেই না, মশায়! দারুণ সুন্দরী!

সেই আমার সুন্দরী বোন সেদিন মায়ের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ছিল দাঁড়িয়ে। আমি ঢুকে পড়েছিলুম। ও টেরই পায়নি। এক ঝটকায় দেখতে পেয়েছিলুম কোমরে জড়ানো শাড়ির আঁচল মেঝেয় লুটোচ্ছে। ছোট্ট বোনটি আমার অসম্ভব যুবতী হয়ে গেছে হঠাৎ। সদ্য যৌবনে নিজেকে দেখতে কার না ইচ্ছে করে! তাছাড়া, ডানদিকে ঘরের কোণে ড্রেসিং টেবিল, তাই, ও আমাকে দেখতেই পায়নি। আমার চোখের সামনে খোলা পিঠ এবং আয়নায় প্রথম যৌবন প্রতিফলিত।

সেদিনকার সেই যে কৌতূহল, অবচেতনায় সেই যে প্রথম চাপা বিচিত্র উত্তেজনা, সেদিনই কি গুবরে পোকাটা খিদুর রসে রসে জন্ম নিয়েছিল? বোঝা মুশকিল। সেদিন, সেই কয়েকটি মুহূর্তে আমি কিছুই বুঝিনি। উচিত-অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় শব্দগুলি সদ্যজাত গুবরেটাকে লাথি মেরে পিষে ফেলতে চেয়েছিল অন্ততঃ তিন-চার সেকেন্ড পরে। কতটা ইচ্ছায়, কতখানি অনিচ্ছায় আমি চোখ সরিয়ে মাথা নিচু করে ঘর থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এসেছিলুম এবং দরজাটি আবার ভেজিয়ে, টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলুম, কিছুই মনে নেই। মনে পড়ে শুধু, বোনটিকে দেখতে বড় ভালো ছিল সদ্য যৌবনে।

ডাক্তারবাবু আমার মনের কথা জানলে, তালতলার চটি-পেটা করে আমাকে হয়তো খুনই করে ফেলতেন। সেই চমচমখোর জমিদার বেঁচে থাকলে আমার মুখদর্শন করতেন না। সেই গ্রাম থাকলে, আমার তার ত্রিসীমানায় যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যেত।

সমাজ-সংস্কারকরা উচিত কথা বলবেন,

—"লম্পট! দুশ্চরিত্র! ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে বোনের যৌবন দেখে বেড়ানো হচ্ছে!"

কিন্তু, উচিতার্থে বিধিলিঙ্! কারণ, তাঁরাই সাগ্রহে জানতে চাইবেন।

"কি হে!! তোমার বোনটি দেখতে শুনতে কেমন হল?"

—"সুন্দরীই হয়েছে, হুজুর।"

—"বলি, বোনের বয়েস-টয়েস হ'ল?"

—"আজ্ঞে, যৌবনে পা দিয়েছে সবে।"

জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে হ্যা হ্যা করে মাথা দুলিয়ে হুজুর বলবেন,

—"বাহ্! ভালো কথা। পাত্র-টাত্র খুঁজতে শুরু করে দাও হে!

হে হে!"......

জীনেতেরও শরীর ছিল ভালো। মুখে বয়েস ঢাকতে মেক-আপ করলেও, শরীরে ওর পাকা ফলের মতো যৌবন। আপেল রঙের চামড়ায় আমার অসাবধান হাত পিছলে যাচ্ছিল।

অঢেল মদ আর যথেচ্ছ খাবারের পর ও বললে,

—"চলো। নাচি গে' কোথাও। যাবে?"

রাত এগারোটা বেজে গেছে লা তুর দার্জ থেকে বেরোতে। চোখে চাওয়া, হাতের স্পর্শ, আলতো চুমুটুমু জাতীয় সনাতন উপক্রমণিকা ইত্যাদি সারা হয়ে গেছে ততক্ষণে। পৃষ্ঠা উলটে নাচের আসরে পৌঁছে গেলুম। আগে আসিনি এ তল্লাটে। বাড়ির গায়ে সাঁটা রাস্তার নাম পড়লুম, রু দা রেন।

গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চললুম দুজনে। জীনেত বললে,

"এই সব জায়গায় গাড়ি নিয়ে আসতে চাই না। ড্রাইভাররা মালকিনের ব্যক্তিগত জীবন-টীবন সম্পর্কে উৎসুক হয়ে উঠতে পারে।"

ওর কোমর জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললুম,

—"কি রকম?"

আমার পা' কি সামান্য টলছে! বোধ হয়। জীনেতের নরম শরীরের বাঁদিকে হাঁটার তালে তালে আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার। তুলতুলে নিতম্ব। বুকের এপাশ। পেছন থেকে কোমর জাপটে হাঁটছি।

ও বললে,

—'ডিস্‌কোতে নাচতে যাবার খবর টের পেলে চাকরবাকররা হাসাহাসি করবে।"

—"বাড়িতে তোমার কে কে আছে?"

—"একা। খুব একলা থাকি।" বলে, হাসল জীনেত।

কথার মধ্যে কিসের ইঙ্গিত বুঝতে পারলুম, আবার পারলুমও না বলা যায়। মধ্যরাতে কোনো মেয়ে যদি বলে, বাড়িতে একলা আছি, তাহলে, 'চলে এসো' নেমন্তন্ন মনে মনে ভেবে নেওয়া যায়। কিন্তু খুব একলা থাকি কেমন যেন ব্যথাট্যাথা মেশানো। যেতে যেতে দেয় না যেতে!

বললুম,

—"একলা তো আমরা সবাই থাকি।"

আমার গালে একটা চুমু ছুঁইয়ে বলল,

—"এই কথাটি জেনে, বুঝে বা ভেবে তোমার কষ্ট নয় না?"

—"না তো! কেন হবে? সকলের যা কপাল, আমারও তাই! এই ভেবেই শান্তি।"

শব্দ করে হাসল জীনেত। বলল,

—"লটারির ফলাফল বেরোলে, কেউ কিছু পায়নি এই রকম খবরে যেমন আরাম, সেইরকম বলছো?"

—"প্রায় তাই!"

চেয়ে দেখি খাঁচা। লা কাজ ডিসকোয় ঢোকবার মুখে ও বললে,

—"তোমাকে দেখে মনে হয় না, খুব হালকা ধরনের শিল্পী তুমি। অথচ, কথাবার্তা যেন কেমন-কেমন!"

হেসে বললুম,

—"আসলে, তোমার জীবন কেউ সিরিয়াস্‌লী দেয়নি তোমাকে!"

আমার থুতনি নেড়ে দিয়ে জীনেত বলল,

—"তোমার বিন্দুমাত্র নেশা হয়নি!"

হাসলুম,

"তাহলে, আরো একআধ পেগ হান্ড্রেড্ পাইপারস খাওয়াবে নিশ্চয়ই।"

'লা কাজ'-এ ঢুকতে ঢুকতে কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল,

—"একশো বার।"

ডিসকোর বাজনায় ব্রহ্মাণ্ডের আর কোনো শব্দ শোনা অসম্ভব।

দুজনে জড়াজড়ি করে আধো-অন্ধকার 'খাঁচায়' নেচে কুঁদে বেরিয়ে এলুম। রাস্তার খোলা হাওয়া মাথায় লেগে প্রথম যে বোধের জন্ম, তা হল, ফেনার মতো সাদা পোশাকের ভেতরে জীনেতের যে শরীর আছে, সেটি বড় স্বাদু। চুমু খেয়ে, বুকে-পিঠে-পেছনে হাতড়ে দেখেছি—ওটি আমার চাই। জীনেত কোথাও এতটুকু এমার্জেন্সির বাধা-নিষেধ আনেনি। গুহার পোকাটি তার কিলবিলে কিছিরি মিছিরি নিয়ে তিন জোড়া পায়ে মাথার ঘিলুকে ঘিরে আদিম নরখাদকের নাচ নাচছে। জঙ্গলের প্রাগৈতিহাসিক ঢাকের বাজনা বাজছে পোকাটার তালে তালে।

জীনেতের প্রকাণ্ড শোবার ঘরে ঢুকে বললুম,

—"কি পানীয় দেবে অতিথিকে?"

দেয়াল-ঘেঁষা 'বার' থেকে গেলাসে ঢেলে মদ নিয়ে এল।

বলল,

—"কুঁইয়াক।"

ওর হাত ধরে টেনে এনে খাটে বসলুম দুজনে। 'বসলুম' না বলে, 'ডুবে গেলুম' বলা ভালো। কারণ, এত নরম বিছানায় কবে শুয়েছি মনে নেই, কোনোদিন শুয়েছি কিনা হলফ করে বলতে পারব না।

সুখের শব্দের মধ্যে ডোবা শুরু হল আমাদের। জীনেত আমার ঠোঁট কখন কামড়ে দিল, টের পাইনি। প্রচণ্ড জ্বালায়, জিভে নোনা স্বাদ লাগতে বুঝলুম, আপন ঠোঁটের রক্ত চেটে নিচ্ছি। ডুবতে ডুবতে ভুলে গেলুম ঠোঁটের কথা, ব্যথার কথা। কারণ, এই নরম শরীর বড় ভালো।

আহ্লাদের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার খোলা পিঠে হাত বোলাচ্ছে জীনেত। আঁচড়ে দিল। খামচে ধরল গলার কাছে। উঃ আঃ! অসহ্য জ্বালায় ভেসে উঠলুম। চাপা ধমকের মতো বললুম,

—"আহ্! লাগছে জীনেত!"

—"আহ্—আঃ—!"

—"ভীষণ লাগছে!"

ডানহাতের কয়েকটা নখ আমার পিঠের চামড়ায় ঢুকিয়ে দিল জীনেত। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলুম,

—"এই! কি কচ্ছো কি?"

বাঁহাতের অনেকগুলো ধারালো নখ পিঠ ছিঁড়ছে বেড়ালের মতো। সহ্য করতে না পেরে প্রচণ্ড এক চড় কষালুম মেয়েটির গালে। উঠে বসলুম। ও আমাকে এলোপাথারি চার হাত-পায়ে চড় ঘুষি-লাথি মারতে আরম্ভ করল।

আমি পুরোপুরি হতভম্ব, হতবাক। প্রেম করার এ কী ছিরি? একটু আগেই তো ভালো-লাগার হা-হুতাশ শুনতে পাচ্ছিলুম। বিছানায় বলদের মতো এমন মারধোর জীবনে খাইনি। হঠাৎ রাগে চড়টা কষিয়ে খুব খারাপ লাগছিল। শত হলেও মেয়ে তো! গায়ে হাত তোলা ঠিক পৌরুষের পর্যায়ে পড়ে না। ভাবছিলুম, ক্ষমা চেয়ে মিটমাট করে নেব। তার আগেই এলোপাথারি আক্রমণ।

ক্ষ্যাপার মতো উঠে বসে পেছন থেকে নিজের গায়ের সঙ্গে আমাকে জাপটে ধরল জীনেত। ওর নরম বুকের উষ্ণতা আমার পিঠের জ্বালার সঙ্গে জড়িয়ে গেল। আদর-খেকো বেড়ালের গরগর শব্দ করছে গলায়। কাঁধের কাছে মুখ, ঠোঁট ঘসটাচ্ছে। রাগ প্রায় কমে আসছিল আমার। বলা নেই কওয়া নেই, ঘাড়ের কাছে কামড়ে দিল আচমকা। আক্! উফ! এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালুম। অসম্ভব! আমার কাঁধের খানিকটা মাংস ওর বন্ধ দাঁতের কপাটের মধ্যে রয়ে গেল বুঝি, এমন জ্বালা। ক্ষত দেখতে পাচ্ছি না। হাত চলে গেছে ওখানে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়। বেশ খানিকটা তাজা রক্ত নিয়ে ফিরে এল চোখের সামনে। ঘরের সিলিং থেকে মৃদু নীল আলো ফুটে বেরুচ্ছে। বাইরে দেখা যায় না। হাতে-লাগা রক্ত কালচে ক্রিমসন দেখায়। ঘুরে তাকালুম। দেখি, বুক অবধি সাদা চাদর দুহাতে চেপে ধরে আছে জীনেত। সমস্ত শরীর হালকা নীল আলোয় থরথর কাঁপছে। যেন, শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। ক্ষ্যাপা চোখে রাগ এবং ভয়। মেঝে থেকে প্যান্ট জামা তুলে পরে নিলুম। জ্যাকেটটা পিঠে চাপিয়ে হাঁটতে লাগলুম দরজার দিকে। পেছনে না তাকিয়েই বলে দিলুম,

—"ধন্যবাদ। চলি।"

শুধু আমার পিঠের ছেঁড়া চামড়া, মাথা এবং বুকের ভেতরে দপ্‌দপ্ শব্দ ছাড়া এদিককার সমস্ত পৃথিবী নিঃঝুম। দরজার কাছে পৌঁছে ফিরে দেখলুম। বালিশে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে কাঁদছে জীনেত। খোলা ধবধবে নরম পিঠ, বিস্রস্ত চুল। জীনেতের সমস্ত শরীর ধিকিধিকি কাঁদছে আগুনের মতো অথবা আবদ্ধ জলে ঢিল পড়লে যেমন গোল গোল ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে যায়, তেমনি ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো।

ঠোঁটে, বুকে, পিঠে অসহ্য জ্বালা নিয়েও আবার এগিয়ে গেলুম পালঙ্কের কাছাকাছি। ওকে স্পর্শ করতে নয়, সান্ত্বনা দেবার জন্যে নয়। শুধু বলতে যে, 'তোমার এসব পাগলামো হজম করবার ক্ষমতা বা ইচ্ছে আমার নেই!'

কি যেন বলছে জীনেত! চাপা গোঙানি এবং কান্না জড়িয়ে অস্পষ্ট কথা। বুঝতে পারছি না। আরো দু'পা এগিয়ে গেলুম। আবার আক্রমণের ভয়ে খুব সাবধানে অল্প ঝুঁকে কান পাতলুম,

—"চলে যাও! তোমরা সব চলে যাও। আমার কাউকে চাই না। মুখ মেলাতে পারবো না, তোমরা কেউই আমার কেউ নও।—"

ফোঁপাচ্ছে, ঝেঞ্জরের মতো কাঁপছে জীনেত,

—"তোমাদের কারুর কাছেই কিছু চাইনি আমি। না মন, না ভালোবাসা। বাঁধতেও চাইনি কাউকে। শুধু একটু সুখ চেয়েছিলুম শরীর জুড়ে।"

মুখ তুলে তাকাল। সমস্ত প্রসাধন ধুয়ে-মুছে একাকার। কিছুই নেই। শুধু একলা বয়েস ওর সারা মুখ এখন মাকড়সার মতো জড়িয়ে ধরে আছে। সেই ভীষণ ভয়-পাওয়া ভয়ঙ্কর মুখ দেখে এক পা পিছিয়ে এলুম।

ভাঙ্গা গলায় চেঁচিয়ে উঠল জীনেত, বিশাল নিস্তব্ধ ঘরে ওর কান্না আমাকে আড়ষ্ট করে দিল,

—"যাও। বেরিয়ে যাও, ইন্ডিয়ান। তোমাদের, পুরুষদের মুখ আমি দেখতে চাই না—!"

দরজা খুলে বেরিয়ে আসছি, শুনতে পেলুম, বালিশে চাপা গোঙানী, কান্নার শব্দে নিজের মনেই বিড়বিড় করছে, মাতালের মতো,

—"শুধু আমাকে ঠিকানা বলে দাও।—যে দেশে বয়েস নেই, সেই দেশের ঠিকানা বলে যাও, মানুষ।—"

ভোর রাতের প্রথম পাতাল রেলে চেপে ফিরে এসেছি দফ্যা রুশরো। গাড়ি বদলে নিতে। মেজো অবাধ হেঁটে আসতে আসতে সকাল হয়ে গেছে প্যারিসে। শরীরের রক্তাক্ত যন্ত্রণায় এবং জীনেতের কান্না, উদ্ভট ব্যবহারে এতোই বিহ্বল হয়ে ছিলুম, খেয়াল হয় নি। ঘরে ঢুকে জামা খুলতে, চাপ চাপ রক্ত দেখি জামার পিঠে, ঘাড়ে। আয়নার মুখে, গাল, কপাল নখের আঁচড়ে ফোলা ফোলা। প্যান্ট বদলে লুঙ্গি পরতে যাবো, হঠাৎ মনে পড়ল। পকেটে হাত দিতেই যিশুর দেওয়া উপহারের ছোট্ট প্যাকেটটি পেলুম। খুলে দেখি, কুড়ি সিগারেটের একটা খালি বাক্সের ভেতরে পেনিসিলিন মলমের টিউব, গোলাপী তুলো খানিকটা এবং ছোট্ট ভাজ-করা কাগজ একখণ্ড। তাতে লেখা, "কন্‌গ্রাচুলেশন্‌! এখন তোমার নতুন নাম, 'জিগোলো'। জিগোলো শব্দের আভিধানিক অর্থ—পেশাদার নাচের সঙ্গী (পুং), অলস এবং ধনীকন্যারা যাদের ভাড়া করতে পারে (অর্থ, মদ অথবা খাবার দিয়ে)!"

তারপর, সামান্য জায়গা ছেড়ে লেখা, "ভাই ইন্ডিয়ান! মহিলার জন্যে তোমার মতো আমারও কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু, কিছু করার নেই! আমরা ওর এই অ-সুখের জন্যে দুঃখিত হওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারি না।—ইতি তোমার 'যিশু'।"...

এখন এসব কথা মনে পড়ছে কেন কে জানে! মিশেলের নরম বুকে চোখ ফেলে কোথায় কোথায় বেড়িয়ে এলুম। গুবরেটার গায়ে মদের ফোটা। জীনেতের একাকিত্ব, কষ্ট, অ-সুখের অনুভূতি তলিয়ে গেল, মাথা ঘিরে গুবরেটার দাপাদাপির শব্দে, প্রাগৈতিহাসিক বাজনার তালে তালে। মিশেল নামে একটি বুনো নরম শরীর আমার জামা-কাপড় পরে, একা ঘরের মধ্যে আমার বিছানায় আমারই ইঞ্চের নাগালের মধ্যে বসে আছে।

বুকের দ্বিতীয় বোতামটি বন্ধ করল মিশেল। সামান্য ভীতমুখে হাসল। বলল,

—"কি দেখছো হাঁ করে? সিগারেটটা কম্বলে পড়ল। তুলে নাও!"

তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত সিগারেট তুলে অ্যাশট্রেতে চেপে দিলুম। কম্বলে একটা নয়া পয়সার মতো ফুটো।

(ক্রমশ)

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ৯ ॥

উপমহাদেশ ভারত ভূখণ্ডের আকারটিকে তিন দিয়ে গুণ করলে যে পরিমাণ আয়তন হয়, এই মধ্যমহাদেশ যুক্তরাষ্ট্র তারই অনুরূপ। সুতরাং এই বিশাল ভূভাগকে কিছু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অন্তত বছর তিনেক লাগে। কিন্তু আমার মতো যারা চার-পাঁচ মাসের মধ্যে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রকে গিলে খেতে চায়, তাদের গতির দ্রুততা সহজেই অনুমেয়। এখন পর্যন্ত মাত্র মাস চারেক হল এদেশে পদার্পণ করেছি। এই সময়টুকুর মধ্যে উত্তর-পূর্বে কানাডা থেকে দক্ষিণের শেষ প্রান্ত ফ্লোরিডা এবং দক্ষিণ ও মধ্য দেশগুলি হয়ে কালিফোর্নিয়ার প্রায় আগাগোড়া—এই সমস্তগুলি শেষ করে আমাকে ওরেগন ও ওয়াশিংটন স্টেট দুটি মাড়িয়ে সুদূর আলাস্কায় যেতে হয়েছে এবং তারপর মধ্য মহাসাগরে পলিনেশিয়ান হাওয়াই। অতএব এই প্রায় চার মাসকাল আমার দৌড়ঝাঁপের চেহারাটা এবং ইতিহাসটি ভাবলে নিজেই আমি এখন অবাক হই। মনে হচ্ছে আমি নয়, আর কেউ—যে-ব্যক্তি দেখতে দেখতে যায়, জানতে জানতে গতি লাভ করে। সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক এই, একদিনের জন্যও এই দেশকে ঠিক বিদেশ এবং ভিন্ন রাষ্ট্র মনে হয়নি। যা খুশি করো, যেখানে খুশি যাও, যে কোনও প্রতিষ্ঠানে ঢোকো, যে কোনও ধরনের পোশাক পরো—এমন কি ধুতি, পানজাবি, গেঞ্জি পা-জামা বা চটি পায়ে দিয়ে হাঁটো বা বড় শহরে ঘোরো, খালি গায়ে পথে ঘাটে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কামপাসে ঘুরে বেড়াও—কেউ দেখবেও না, গ্রাহ্যও করবে না। ইউরোপ বা ইংল্যান্ডে এই দৃশ্য কোথাও দেখা যায় না। ধরো, পায়ে মোজা নেই, গলায় নেকটাই নেই হাফশার্টের তিনটে বোতাম খোলা—বাবু এসে ঢুকলেন সকাল আটটায় আপিসে—এমন দৃশ্য হাজার হাজার! মানুষের এই সচ্ছল অবাধিত স্বাধীনতা, সর্বপ্রকার নৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসন থেকে মানুষের এই মুক্তিচেতনা—পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। বোধ হয় এই কারণেই উত্তর আমেরিকাকে 'ফ্রি ওয়ার্ল্ড' বলা হয়ে থাকে।

এদেশে একবার এসে ঢুকলে কেউ কারও খোঁজ রাখে না। না গভর্নমেণ্ট, না পুলিস, না বা গোয়েন্দা বিভাগ। 'কনডাক্টেড' পর্যটন বলে এদেশে বিশেষ কিছু নেই। হাতে যদি পয়সা থাকে তবে যেখানে খুশি যাও, প্রশ্ন করবে না কেউ। পথ হারালে অসুবিধা নেই, যে কোন মেয়ে বা পুরুষ তোমাকে সাহায্য করবে বন্ধুর মতো। এদেশের কর্তৃপক্ষ তোমাকে দিয়ে সুখ্যাতি লিখিয়ে নিতে চায় না, নিন্দা বা প্রশংসা গ্রাহ্যও করে না। তুমি গিয়ে পুলিস আপিসে ঢোকো, গোয়েন্দা আপিসে গিয়ে খোঁজখবর করো, সামরিক বিভাগে ঢুকে তোমার কৌতূহলের জবাব নাও, রেকর্ড বা ফাইল ওল্টাও, কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ করো—কেউ কিছু মনে করবে না। সর্বত্র ঢিলেঢালা, তোড়জোড় আলগা—কেউ কারও পরোয়া করে না। কংগ্রেসের সভা, প্রতিনিধি সভার সভা—এঁদের পিছনে পিছনে স্তাবকের দল ছোটে না, প্রতিপত্তিশালী পার্টির লোককে কেউ 'দাদা' বলে হাত কচলায় না, বাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে হাতে-লেখা কাগজ লটকিয়ে কেউ কারো সম্বন্ধে বলে না, যুগযুগ জিয়ো! এদেশে কর্মীবিক্ষোভ রয়েছে, কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন বলতে যা বুঝি তার চিহ্নও চোখে পড়েনি। এরা মজুরি বা মাইনে বাড়াবার ফিকির খোঁজে, কিন্তু রাজনীতিক ক্ষমতা গ্রাসের কৌশল আঁটে না। সরকারী আইন অনুসারে এখন প্রতি ঘণ্টার মজুরির হার হল ২ ডলার ২৫ সেণ্ট। কিন্তু কোনও শ্রমিক কর্মস্থলে পৌঁছবার জন্য পায়ে হেঁটে আসে না, তাদের জন্য সর্বত্র গাড়ির বরাদ্দ থাকে। এদেশের গভর্নমেণ্ট তখনই ভেঙে পড়বে যদি কোন সংবাদপত্র একটিমাত্র খবর ছাপে, অমুক ব্যক্তি না খেয়ে মরেছে অথবা অমুক ব্যক্তিকে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখা গেছে। এখন এদেশে চলছে রিসেসন, মুদ্রাবন্দি, ছাঁটাই, মুদ্রাস্ফীতি এবং বহু কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের গণেশ ওলটানো—কিন্তু জনজীবনে এর উগ্র প্রতিক্রিয়া তেমন কিছু চোখে পড়ে না। যদি কারও চাকরি যায় তবে সে এক বছর চার মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে প্রায় একশ' ডলার 'বেকার ভাতা' পায়। প্রতি সপ্তাহে তার খাই-খরচ পড়ে ২০ ডলার। এদেশে এক কোম্পানি ফেল পড়ছে, অন্য কোম্পানি গজিয়ে উঠছে। এক চাকরি যাচ্ছে—অন্য চাকরি পাচ্ছে। কেউ বসে নেই। চাকরি বা উপার্জন এদেশের পথে ঘাটে ছড়ানো। ১৬ বা ১৮ বছরের ছেলেমেয়েও এখানে ৮ ঘণ্টা খাটলে ১৮ বা ২০ ডলার রোজগার করে। মজুর, সাধারণ কর্মী, মিস্ত্রি, ইনজিনিয়ার, মেসিনম্যান, বিজ্ঞানী—এরা এদেশে রাজা! একজন সুদক্ষ মিস্ত্রি মাসে ৩ হাজার ডলার রোজগার করলে কেউ বিস্মিত হয় না। একজন ভাল ডাক্তার—তার মধ্যে ভারতীয়রাও আছেন—বছরে ১ লক্ষ ডলার অনায়াসে উপার্জন করেন। একজন বিজ্ঞানী—তাঁর মধ্যে বহু বাঙালীও আছেন—তাঁর মাসিক উপার্জন অনেক সময় ৫ হাজার ডলারও ছাড়িয়ে যায়। ভারত গভর্নমেণ্ট এঁদের খবরও রাখেন এবং এঁরা যখন দেশে ডলার পাঠান তখন ভারত গভর্নমেণ্ট খুশী হন। এঁদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে কাজ করতে চান, কিন্তু ভারত থেকে কোনও সাড়া আসে না।

সানফ্রান্সিসকো থেকে বিদায় নেবার আগে ছোট ছোট কয়েকটি পার্বত্য শহর দেখে যাচ্ছিলুম। আলামেদা, ওকল্যান্ড, ডেলি সিটি এবং সবশেষে বার্কলে। এ শহরটি পার্বত্য এক উপত্যকা এবং এর নিচেই সমুদ্র। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় জগৎপ্রসিদ্ধ। যেমন বোস্টন, যেমন নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া, যেমন শিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়। কালিফোর্নিয়ার ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বার্কলে অন্যতম। পৃথিবীবাসীর অনেকেই জানে, এই বার্কলের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রথম আণবিক বোমার ফরমুলা তৈরি হয় এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জন্ম ঘটে। এই বোমাই নিক্ষেপ করা হয় হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ১৯৪৫ সালে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রথম ছাত্রছাত্রীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ তোলে এবং এদের সঙ্গেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৪ হাজার ইউনিভার্সিটির ২ কোটি ছাত্রছাত্রী চারদিক থেকে মিছিল বার করে রাজধানী ওয়াশিংটনের দিকে অভিযান করে। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করছিলুম, এখানে মার্কসিয় সাহিত্য ও দর্শন, কম্যুনিজম, আধুনিক সোভিয়েট ও চীন সাহিত্য এবং মাও-সে-তুংয়ের প্রত্যেকখানি বই সযত্নে পড়ানো হয়। দেখতে পাচ্ছিলুম প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে, হাটবাজারে-ফুটপাথের দোকানে—সর্বত্র কম্যুনিস্ট সাহিত্যের সর্বশ্রেণীর বই অবাধে ছেলেমেয়েরা পড়ছে এবং কিনছে। কোথাও কোনও বই নিষিদ্ধ নয়। নেবার শিল্পপতিদের এই দেশে এমন একটি বৈজ্ঞানিক অর্থনীতি

এবং 'সমাজতন্ত্রবাদ' প্রচলিত, যেখানে জনজীবনের সামান্যতম বিক্ষোভও সাগর-তরঙ্গের মতো মাথা তুললেও আবার জনসমুদ্রে মিলিয়ে যায়। সেই কারণে এখানে কম্যুনিজম কোথাও দল বেঁধে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

সানফ্রান্সিসকোয় 'চায়না-টাউন' একটি দ্রষ্টব্য পল্লী। এরা আমেরিকান চীনা। যেমন আমেরিকান-ভারতীয়, আমেরিকান-জার্মান, আমেরিকান ইহুদী, আমেরিকান ইতালীয় বা ফরাসী বা স্প্যানিস বা কিউবান প্রভৃতি। আমেরিকায় যাদের স্থায়ী বসবাস, তারাই আমেরিকান। জাত নিয়ে যদি কথা ওঠে, তখন সবাই পৃথক। চায়না টাউনে গিয়ে ঢুকলে মনে হয় এটি ইংরেজিভাষী আমেরিকা নয়। এর বাড়িঘরের বর্ণবিন্যাস, মঙ্গোলীয় গঠনশিল্প, দোকান বাজারে চীনা শিল্পসামগ্রী ও তাদের সৌন্দর্যশিল্প-সৃষ্টি, আসবাবপত্রের কারুকার্য—এ যেন এক দেশ-কালের জগৎ। এদেশে চীনারা এসেছে শত শত বছর আগে, বোধ হয় ইউরোপীয়ানদেরও আসবার আগে। তাদের নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা, লোকাচার, সমাজব্যবস্থা, শিল্পকলা—সমস্তই অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে। হাজার হাজার চীনা রেস্টুরেন্ট খুলে তারা সমগ্র আমেরিকায় রুচিকর আহার যুগিয়ে এসেছে। সেইজন্য চীনা হোটেল আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা প্রিয়। একটি উঁচুদরের চীনা হোটেলে পার্টি দেওয়া আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। এটি বলা দরকার, এরা কেউই অত্যাধুনিক কালের চীন দেশ থেকে আসেনি।

ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য প্রথমেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার সমুদ্র-তীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল ধনে, সম্পদে, শোভায় সমৃদ্ধিতে যেন নিরবধি ঝলমল করছে। কিন্তু এগুলি সব পশ্চিম প্রান্তে। পাহাড়গুলির ওপারে পূর্বদিকে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ওদিকে লক্ষ লক্ষ বর্গ-মাইলব্যাপী উষর ধূসর মরুভূমি। এক একটি স্টেট, যেমন আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো, ইউটা, নেভাদা, ওরেগন, ইদাহো প্রভৃতি জঙ্গল-পাহাড়ে মরুতে ভরপুর। এমন এমন স্টেট রয়েছে যেখানে জনসাধারণের গায়ের জামা, পায়ের জুতো, উপযুক্ত আহার বা বসবাসব্যবস্থা জোটে না। কিন্তু শিল্পপতিরা ব্যবসায়ের লোভে সেই সব দুর্গত অঞ্চলেও সরবরাহ পাঠিয়ে নিজেদের লভ্যাংশ আদায় করে।

বার্কলে ছাড়বার আগে ওই শহরের টেলিগ্রাফ এভেন্যুর কথাটা ভুলতে পারছি না। ওই পথটায় 'হিপি' নরনারীদের আড্ডা। ওরা আদিম নরনারীর অপরিচ্ছন্ন ও ছিন্নভিন্ন চেহারাটায় আনন্দ পায়। পুরুষের গায়ে জামা নেই, মেয়েদের লজ্জা নিবারণের দায় নেই। পথে বসে উভয়ে তামাক, গাঁজা, চরস খাচ্ছে, দোকান দিচ্ছে, ছবি আঁকছে, ভাগ্যগণনা করছে, বই পড়ছে, পুঁতির মালা বেচছে, পথের উপরে কাগজ পেতে খাবার খাচ্ছে, ফুটপাথের ধারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, কেউ নেশায় বুঁদ হয়ে ঝিমোচ্ছে। পুলিস ওদেরকে ভয় করে, রাষ্ট্র ওদেরকে এড়িয়ে চলে। ওরা কিছুকাল আগে এ পাড়ায় বহুতল অট্টালিকা নির্মাণে বাধা দিয়েছিল, বুক পেতে দিয়েছিল পুলিসের গুলির সামনে—গভর্নমেণ্ট সেক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করেছিল। ওরা সেটার নাম দিয়েছে 'পার্ক পেলস' আন্দোলন। ওদের মধ্যেই রয়েছে শ্রেষ্ঠ ছাত্র, অধ্যাপক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক। এই একা বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই মোট ১৬ জন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অনেকেই জানে এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যানসার রোগ গবেষণার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এবং এই বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন একজন বাঙালী বিজ্ঞানী, তাঁর নাম ডাঃ সত্যব্রত সেনী।

পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্র শেষ করে এবার পূর্বপথ ধরেছি। সানফ্রান্সিসকো থেকে প্রায় আটশ মাইল অতিক্রম করে এসে পেলাম বিশাল এক লবণহ্রদ; তারই ধারে এক মরু-পার্বত্য শহর 'সল্ট লেক সিটি'তে এসে দাঁড়ালুম। দূর-দূরান্তব্যাপী পাহাড় এবং উষর উপত্যকা। এই স্টেটের নাম 'ইউতা'। কিন্তু দিগন্তজোড়া মরুভূমির ভিতরে-ভিতরে নগর নির্মাণ করতে এদের বাধে না। তিনটি প্রধান বস্তু, যুক্তরাষ্ট্রের চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য। কোটি কোটি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন, বহু কোটি টেলিফোন যন্ত্র ব্যবস্থায় সমগ্র দেশ নিখুঁতভাবে বাঁধা এবং ৫০ হাজার মাইলব্যাপী কয়েকটি সুদীর্ঘ হাইওয়ে। এদেশে একটি বাক্য সর্বত্র প্রচলিত—"এ মাইল এ মিলিয়ন" অর্থাৎ প্রতি এক মাইল পথ নির্মাণ করা হয়েছে দশ লক্ষ ডলার খরচ করে। হাইওয়ে ছাড়া ফ্রি-ওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে কত হাজার মাইল, তার সংখ্যা আমার হাতের কাছে নেই। উভয়ের মধ্যে তফাত, কে কতটা চওড়া! যেগুলি 'ইন্টার স্টেট হাইওয়ে', সেগুলি অধিকাংশই ২৫০ ফুট প্রশস্ত বলে শুনেছি, সেগুলিতে পথচারীদের হাঁটা আইনবিরুদ্ধ। এই হাইওয়েগুলি পূর্ব-উপকূল থেকে পশ্চিম উপকূল অবধি বিস্তৃত অর্থাৎ আটলান্টিক থেকে প্যাসিফিক অবধি। ফ্রি-ওয়েগুলিও তাই, এগুলি থাকে প্রতি নগরের গায়ে গায়ে। হাইওয়েতে রোড-সিগনালের শাসন নেই, ফ্রি-ওয়েতে আছে। প্রত্যেক হাইওয়ে তিন থেকে চার হাজার মাইল লম্বা—এ-কূল থেকে ও-কূল পর্যন্ত। যে কোনও বিদেশী, যাদের কাছে এদেশ অজানা, যারা পথ-হারাবার ভয়ে আড়ষ্ট, তাদের পক্ষে আমেরিকা পরম রমণীয়। এই দেশজোড়া হাইওয়ে বা ফ্রিওয়েতে প্রতি ১০ মাইলের মধ্যে অজস্র পেট্রল ওরফে গ্যাস, শ্রেষ্ঠ খাদ্যসামগ্রী, মনোরম বাসস্থান, প্রতি পদক্ষেপে টেলিফোন ব্যবস্থা, কিছুদূরে হাসপাতাল এবং শপিং সেণ্টার। জাতি হিসাবে আমেরিকানরা নিত্য বিচরণশীল। কোথাও বংশানুক্রমে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এদের ধাতে নেই। এই শহর ভাল লাগছে না, তবে অমুক শহরে বাস করতে চলো। অমুক থেকে আবার অমুকে। দু ঘণ্টার মধ্যে এরা এক সংসার তুলে অন্য সংসার বাঁধে। এক চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও চাকরি নেওয়া যায় যখন তখন। টেকনিক্যাল কাজ কিছু জানলে সোনায় সোহাগা, হাতের কাজ জানলে তো বরপুত্র! ছয়, সাত বা আটশ ডলার মাইনে যেখানে সেখানে। ওভারটাইম যদি খাটো তবে তিন ডলার যে কোনও আপিসে। তোমার যোগ্যতার বিচার হবে তোমার কাজের ফলাফলে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যতগুলো ডিগ্রিই তোমার থাক না কেন, আসলে তুমি কাজের উপযুক্ত কি না এইটি প্রধান বিচার্য। তুমি পি-এইচ-ডি করা বড় ইঞ্জিনিয়ার, তোমার সঙ্গে কাজ করছে এক অর্ধশিক্ষিত সুদক্ষ কারিগর—তার উপার্জন তোমার চেয়ে অনেক বেশি।

সল্ট লেক সিটি ছাড়িয়ে ক্যানসাস সিটি পৌঁছলুম কমবেশি দু হাজার মাইল বিমান-পথ পেরিয়ে। ওই বিমানের মধ্যেই এক বয়স্ক আমেরিকান দম্পতি কথায়-কথায় বলছিলেন, এদেশের সবই ভাল। কাজ বলুন, কীর্তি বলুন, আবিষ্কার বলুন, উৎপাদন-শক্তি বলুন—পৃথিবীতে আমেরিকার জুড়ি কেউ নেই। কিন্তু এসব কি হচ্ছে? শতকরা ৪০ থেকে ৫০টা বিয়ে টিঁকছে না কেন? আজকের ভালবাসা, কালকের ঘৃণা? বিয়ের পর দু-তিন মাসের মধ্যেই বিচ্ছেদ! দেশের যত উন্নতি, সমাজের ততই কি অবনতি? ভালবাসার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, বিয়ের সঙ্গে বিশ্বাস নেই! না, এতটা কিন্তু আমাদের কালে ছিল না!

আমি হাসছিলুম। ভদ্রলোক বললেন, আবার দেখুন নতুন উৎপাত! একটি মেয়ে ঘুমোচ্ছে দুটি ছেলের সঙ্গে, দুটি ছেলে 'ঘুমোচ্ছে' একটি মেয়েকে নিয়ে। এ যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? এই তো আমরা তিন দিনের জন্য গিয়েছিলুম 'লাস ভেগাসের' মরু-শহরে। ওখানে পুলিসের শাসন কম। কি দেখলুম শুনবেন—?

থাক থাক—মহিলা বাধা দিলেন।

না, বলবো না কেন? পরশু রাত্রে 'গো-গো' নাচে দেখলুম অন্তত ২০টা ছেলেমেয়ে একসঙ্গে সম্পূর্ণ 'নিউড' হয়ে নাচছে! কী তাদের অঙ্গভঙ্গী! এরা কিন্তু সবাই ভদ্র-ঘরের!

ক্যানসাস সিটিতে এসে ডক্টর মধুবাগেন্দু-

কুমার দে-র বাড়িতে উঠেছিলুম। ইনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পি-এইচ-ডি, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং স্ত্রীগর্ভ ও জননরহস্য নিয়ে মৌলিক গবেষণার কাজে নিযুক্ত। এঁর এক একটি আবিষ্কারের উপর অনেকগুলি রিপোর্ট ছাপা হয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্নালে। এঁর সৌজন্য এবং অমায়িক ব্যবহার খুবই আনন্দদায়ক হয়েছিল।

এ অঞ্চল আমেরিকার মধ্যদেশ। এই মধ্যদেশ চারটি বড় বড় স্টেটে বিভক্ত এবং তারা হল নেব্রাস্কা, আইওয়া, কানসাস ও মিজৌরি। এদেরই পশ্চিমে কলোরাডো স্টেটটি পাঁচ সপ্তাহ আগে ভ্রমণ করে আমি ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিলুম। যাই হোক, এই চারটি স্টেটকে নিয়ে বলা হয় সমগ্র আমেরিকার শস্য-ভাণ্ডার। যে পরিমাণ গম, ভুট্টা, ধান, জোয়ার প্রভৃতি এই ভূভাগে ফলে তাই দিয়ে সমস্ত পৃথিবীবাসীকে সম্পূর্ণ এক বছর ধরে খাওয়ানো চলে। এইটিই এদের গর্ব। এর মধ্যে নেব্রাস্কা ছিল মরুলোক। কিন্তু আমেরিকার ভূ-বিজ্ঞান গবেষণার সহায়তায় এই মরুভূমিকে একালে সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা করা হয়েছে। এদেরই ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে মিজৌরী, মিসিসিপি, সালিন প্রভৃতি নদ ও নদী।

সুধাংশু দেশে চলে যাবে কারণ এদেশ তার প্রিয় নয়। এখানে আমেরিকান পরিবেশে সন্তানদের পক্ষে 'মানুষ' হওয়া অসম্ভব। ইংরেজি ছাড়া শিক্ষা নেই, শুয়োর-গরু-মুরগি ছাড়া খাদ্য নেই। মাকে মাম্মি, বাপকে ড্যাডি, কথায়-কথায় 'ও-কে,' আচ্ছার বদলে 'ইয়া'—এসব সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। হ্যাঁ, আর দু'বছর থাকব এদেশে। আরও কিছু টাকা জমিয়ে নেবো। দেখতে পাচ্ছি ইউনিভার্সিটি আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, কিন্তু আমি ছাড়বই। আমার দেশে ফিরে আমার বিদ্যে অনুযায়ী দেশের কাজ করব। কী হবে আমেরিকার বিজ্ঞানের উন্নতি করে? আমি নিজের হাতে গবেষণা করে একটির পর একটি আবিষ্কার করছি, আর নাম হচ্ছে আমার সিনিয়র প্রফেসরের। কে থাকবে মশাই এদেশে? আপনি জানেন, বার্কলে আর বোস্টন ইউনিভার্সিটির পাঁচ-ছয়জন বাঙালী বিজ্ঞানীর পক্ষে নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এদেশের কৌশলবাজি তা পেতে দেয়নি? আপনি জানেন, এরা যে চাঁদে পাড়ি দিল—তার শতকরা তিরিশ ভাগ বাঙালী বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব? কিন্তু এরা সেসব স্বীকার করতে নারাজ। না মশাই, থাকব না এদেশে। বাচ্চা ছেলেটার চার বছর বয়স হলেই আমি দেশে পালাবো। আমার বাবা মা ভাই বোন—সকলের মাঝখানে গিয়ে থাকব। আধপেটা যদি খেয়ে থাকি সেও ভালো।

এই নিয়ে বহু বাঙালী ও ভারতীয়র মুখে প্রায় একই ধরনের কথা শুনে যাচ্ছিলুম। শতকরা ৭০।৮০ জনের ইচ্ছা, দশ বা পনেরো বছর এদেশে কাজ করে তাঁরা দেশে পাড়ি দেবেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যক্ষেত্রে। যাঁদের ছেলেমেয়ে আমেরিকান স্কুলে পড়াশুনো করছে, আমেরিকান ছেলে মেয়েদের মাঝখানে মানুষ হচ্ছে, মাতৃভাষা ভুলতে বসেছে,—তারা অদূরে বা সুদূরে ভবিষ্যতে ভারতের সঙ্গে যোগ হারাবে এবং ভারতকেই বিদেশ মনে করবে। ঠাকুমা দিদিমা খুড়ো জ্যাঠা মাসি পিসি,—এরা হয়ে উঠবে 'বিদেশী'। সুধাংশুর ভয় হল সেইখানে। এই ভয় দেখে এসেছি বহু ভারতীয় মহলে।

দিন তিনেক পরে একরাত্রে ডাঃ দীপঙ্কর চৌধুরী এসে তাঁর নিজের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন। দীপক স্থানীয় হাসপাতালের এক বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শ্রাবণী ওরফে বুলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা করে। মেয়েটির বয়স অল্প। এরই মধ্যে সে এম-এসসি করে পি-এচ-ডির দিকে চলেছে। ওরা দুটিতে থাকে বেশ সচ্ছল পরিবেশের মধ্যে। দুজনের দুখানা গাড়ি ছাড়া চলে না। এই অঞ্চলটিকে মিজৌরী স্টেটের ধনাঢ্য অংশ বলা হয়, এবং এই বনবাগান ও পুষ্পশোভায় ভরা গ্রামটির নাম 'ইনডিপেনডেন্স।' এ বাড়িটি ওরা অল্পদামেই তৈরি করিয়েছে অর্থাৎ ৭০ হাজার ডলারের মতো পড়েছে। দীপকেরও বয়স কম। এখনও বোধ হয় ৩০।৩২ হয়নি। সে সকালে ৭টার মধ্যে বেরোয়, ফেরে সন্ধ্যা ছয়টার পর।

এই নিয়ে অনেকগুলি গ্রাম দেখতে-দেখতে যাচ্ছিলুম। প্রতিটি গ্রাম বিদ্যুৎ-শক্তিতে ভরা। প্রতি গ্রামের আশেপাশে একেকটি 'ওভারহেড ট্যাঙ্ক'—যার উচ্চতা ১৫০ ফুটের কম নয়। প্রতি বাড়িতে ইলেকট্রিকের কুকিং রেঞ্জ, একটা বা দুটো টেলিভিশন, দুটো বা তিনটে টেলিফোন। বুলাদের বাড়ির গ্যারাজে রয়েছে ইলেক-ট্রনিক্ কম্পিউটর। অর্থাৎ রাস্তা থেকে গাড়ি নিয়ে গ্যারাজে ঢোকবার আগে নিজের থেকেই গ্যারাজের দরজা 'মন্ত্রবলে' খুলে যায়। তবে কিনা সঙ্গে একটি দেশালাইর বাক্সর মতো ছোট্ট যন্ত্র শুধু টিপতে হয়। এটি প্রথম দেখি লস এঞ্জেলেস থেকে দেড়শ' মাইল দূরে পামস্প্রিং মরুভূমিতে শ্রীমতী অ্যানি মেরীর সেই বাগান বাড়িতে।

'ইনডিপেনডেন্স'-কে যদি গ্রাম বলি, তবে কলকাতার চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট-ক্যামাক স্ট্রীট অঞ্চলকে স্বল্পোন্নত গ্রামাঞ্চল বলতে বাধে না। যদি বলি এদের যে কোনও গ্রামের পুষ্পলতাশোভিত মসৃণ ও চিক্কণ প্রশস্ত পথগুলিতে এক ইঞ্চি পরিমাণও খালা খোন্দল, ধূলিকণা, কাগজের কুটি, সিগারেটের টুকরো, ফলের খোসা—কিছুই দেখা যায় না, এবং প্রতি ছিমছাম বাংলো-বাড়ির লনগুলিতে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা—তাহলে আমার কথায় অতিশয়োক্তি পাওয়া যাবে না। আমেরিকার নাগরিক জীবনের সুখ্যাতি করার কালে আমি ঠিকই জানি, ওরা আমার মনকে ঘুষ খাওয়াচ্ছে না অথবা আমার মতো নিরাসক্ত পর্যটককে দিয়ে নিজের দেশের সুখ্যাতি লিখিয়ে নিচ্ছে না। ওদের কাছে আমার কোনও কৃতজ্ঞতা, ঋণ, বাধ্যবাধকতা বা সাহায্যের আশ্বাস তিলমাত্র নেই। বাইরের জগতের কাছে ওরা কিছু লুকোয় না, নিজের দেশের শাসক দলের লোককে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতে ওদের বাধে না, নিজেদের কলঙ্ক কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরতে ওরা একটুকু ভয় পায় না, ওদের হাত দিয়ে পৃথিবীর কোথাও কোনও অবিচার ঘটলে ওরা সেটিকে প্রকাশ করতেও দ্বিধা করে না। সি-আই-এর কলঙ্ক এদেশে সর্বত্র বিদিত।

কানসাস ছেড়ে সোজা উত্তরপথে উইসকনসিন স্টেটের ম্যাডিসন শহরে এসে পৌঁছলুম। বিজ্ঞানবিদ বিভূতিরঞ্জন দাশ-গুপ্ত সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ে উভয়ের কাছে ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও বিভূতিরঞ্জন পরম পরিচিতের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। উদ্দীপ্ত উৎসাহে বললেন, একুশ বছর ধরে যে পরিব্রাজকের কথা প্রতিদিন ভেবেছি এবং যিনি আমাকে অদৃশ্য ইশারায় হিমালয়ে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে আজ দু'হাতের মধ্যে পাবো কখনই ভাবিনি। আসুন আসুন—

বিভূতির স্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া উচ্চ-পর্যায়ের ডাক্তারি পড়ছেন এখন বোস্টনে—ম্যাডিসন থেকে বহু দূরে। ঘরে রয়েছেন বিজয়ার মা ও বাবা—শ্রীমতী বীণা চৌধুরী ও তাঁর স্বামী। চৌধুরী মহাশয় একজন প্রাক্তন দেশকর্মী এবং ইংরেজ আমলে দীর্ঘকাল অবধি কারাবাস করেছেন। বিভূতির ছোট ভাই শ্রীমান দীপঙ্করও এখানে রয়েছে—সে এক উচ্চশিক্ষিত বিদ্যুৎবিদ্। শীঘ্রই সে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে দক্ষিণ মেরুতে অর্থাৎ আণ্টার্কটিকার তুষার জগতে। বাঙালী যুবক এই প্রথম যাবে দক্ষিণ মেরুলোকে—এটি গৌরবের কথা। বাঙালী এখন অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে, দক্ষিণ আমেরিকায়, আলাস্কায়—নিঃসঙ্কোচে চলে যাচ্ছে। এতে 'ঘরকুনো' বাঙালীর অপবাদ ঘুচে যাবে

সন্দেহ নেই। দীপঙ্করকে আমি অভিনন্দন জানালুম।

ম্যাডিসন অপেক্ষাকৃত ছোট শহর, কিন্তু এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ও পৃথিবী প্রসিদ্ধ। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন অবাধ গবেষণার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বেতার যন্ত্র প্রস্তুত করেন অধ্যাপক আর্ল-এম-টেরী ও তাঁর ছাত্ররা ১৯১৭ সালে এবং সেটিকে পরীক্ষার দ্বারা সাফল্যমণ্ডিত করা হয় আমেরিকান্ নৌবাহিনীর কাছে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে—এই ম্যাডিসনের আশেপাশে সমুদ্রবৎ কয়েকটি হ্রদের উপর থেকে। বোধ হয় এই কারণটির জন্যই ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের নিজেদের খরচে ও তত্ত্বাবধানে এখানে অতি বৃহৎ এক বেতার এবং টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে এক মহিলা কর্মী আমার কাছ থেকে একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে নেন্।

আগেই বলেছি ভারত থেকে যাঁরা পর্যায়ক্রমে এদেশে এসেছেন তাঁরা আপন আপন বিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেই এখানে এসে কাজে লেগেছেন। তাঁরা কেউই সামান্য বা নগণ্য নন্। মহিলারাও তাই। অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় বা বিজ্ঞান কলেজের কৃতী ছাত্রী। এ ছাড়া ইতিহাস, অর্থনীতি, জীববিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন—কোন বিষয়েই মেয়েরা কম যায় না। 'অন্তঃপুরের সাধারণ মেয়ে', এদেশে কেবল স্বামীর পরিচর্যা ও সন্তান পালনের দায়িত্ব নিয়ে আসে না। এদেশের বিরাট কর্মযজ্ঞে তারাও এসে অংশ নেয়। ভারতীয় কর্মী মেয়ে যাঁরা—যাঁদের দু-একটি শিশুসন্তান রয়েছে, তাঁরা ওই শিশুকে রেখে যান্ 'বেবি-সিটার'-এর কাছে প্রতি ঘণ্টায় এক ডলার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এমন-এমন বয়স্কা মহিলাও আছেন যিনি ঘরে বসেই এইভাবে কমবেশি এক হাজার ডলার উপার্জন করেন। মেয়েই বলো, পুরুষই বলো, উপার্জন ছাড়া আমেরিকায় বসবাস দুঃসাধ্য, কেননা প্রতি পদে নিজকে অতিশয় নিরুপায় মনে হয়।

আমেরিকান সমাজ সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু প্রশ্ন ছিল। সেই কারণে সেদিন এক আমেরিকান দম্পতির সঙ্গে আলাপ করতে বসেছিলুম। এ'রা উভয়েই ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী। স্বামীর বয়স আন্দাজ পঁয়তিশ, এবং স্ত্রীর বয়সও ওই কাছাকাছি। স্বামী কাজ করেন স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে এবং স্ত্রী রয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানে। ও'দের নাম মিস্টার ও মিসেস ওয়েস্টনার। উভয়ের চেহারাই সুশ্রী. —স্বামী দাড়ি রেখেছেন এতখানি। এ বাড়ি ও'দের নিজের।

ও'রা বললেন, আপনি যতটা শুনেছেন সব সত্যি নয়। শতকরা ৫০টা বিয়ে এদেশে ভেঙে যায়, এটি অতিশয়োক্তি। অন্যায় বা দুষ্কৃতি সব দেশের মতো এখানেও আছে। ছেলে মেয়েরা অনেক সময় উচ্চশিক্ষাকে এড়িয়ে চলে, বহু ছেলে-মেয়ে নষ্ট হয়, বখাটে হয়ে যায়। কিন্তু একটা সময় আসে যখন তারা রোজগার করতে বাধ্য হয়। মা-বাপ সর্বপ্রকারে সাহায্য করে বৈকি। কেউই চায় না তাদের সন্তানরা যা খুশি তাই করুকগে। আমেরিকায় শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি করেছে এরাই। কারও ঘরেই শান্তি নেই, এ অনুমান ভুল। চারদিকে লক্ষ লক্ষ পরিবার শান্তি ও সচ্ছলতার মধ্যে রয়েছে। যে কোনও গৃহস্থ পল্লীতে বেড়িয়ে আসুন, টঁু শব্দটি কোথাও পাবেন না। অবিবাহিত মেয়ে পুরুষের একত্র বসবাস, কথায় কথায় বিবাহবিচ্ছেদ, অতিশয় উচ্ছৃংখলতার ফলে যৌনব্যাধি—এগুলো বিশেষ বয়সে ঘটে বৈকি। কিন্তু ওগুলোকে ছাড়িয়ে ওঠে আমেরিকান ছেলেমেয়েরা। তারা দিনে দিনে জানতে পারে, কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এদেশে বাঁচবার উপায় নেই। এদেশে যত পরিশ্রম, তত উপার্জন। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মাগিং (ছিনতাই) খুনখারাপি—প্রচুর হচ্ছে এদেশে। মেয়ে চুরি, রেপিং, কিডন্যাপিং—কোনটাই কম নয়। কিন্তু ওইটিই সব নয়। শিল্প ও বিজ্ঞানকে নিয়ে আমেরিকান সভ্যতা যতই এগিয়েছে, তত বেশি সামাজিক জঞ্জালের স্তূপও বেড়েছে। এদেশে বিজ্ঞানচিন্তা, আবিষ্কার, নির্মাণ কৌশল, দিগ্বিজয়ী কর্মধারা, অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার আশ্চর্য সাফল্য, সমাজ জীবনে সাচ্ছল্য সৃষ্টির শত শত পরিকল্পনা,—এই সব নিয়েই আমেরিকার 'মেটিরিয়ল্' সভ্যতা। কিন্তু যেসব কাজে কোনও আদায় নেই ('নন-প্রফিটেবল্'), যা ফলপ্রসূ নয়, সেদিকে আমেরিকান সভ্যতার উৎসাহ অপেক্ষাকৃত কম। যেমন ধরুন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, চারু-শিল্প, ললিতকলা, মহত্তর সংস্কৃতি, অধ্যাত্ম দর্শন, কাব্যচিন্তা—এরা সব পিছিয়ে পড়েছে। এরা আছে বহু জায়গায়, কিন্তু কতকটা স্তিমিত। একথা আপনি জেনে রাখুন, জ্ঞানলাভের ক্ষুধা আমাদের অপরিসীম। পৃথিবীর অন্তত একশটি দেশে এই নিয়ে আমেরিকা এক একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। রকেফেলার ট্রাস্ট ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ফুলব্রাইট স্কলারশিপ ইত্যাদির নাম সবাই জানে।

ক্যাপিটালিস্ট কারা?

ক্যাপিটালিস্ট নয়, বলুন ইন্ডাসট্রিয়ালিস্ট। ওরা শুধু পুঁজিবাদী হলে মরে যেতো! ফেডারাল বা স্টেট গভর্ণমেণ্টের ট্যাক্স যোগাতে গিয়ে ওরা সর্বস্বান্ত হতো। কিন্তু ওরা টাকা রোল করাতে জানে। ওদের 'চেইন' ইনডাস্ট্রিতে কোটি কোটি লোক খাটে। ওরা হাজার হাজার কোটি ডলার প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাণ্ট দেয়। সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছে ওদের ওই টাকায়। ওরা ওই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করে শিল্পোন্নতির কাজে। খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, বিলাস-সামগ্রী, যানবাহন, ঔষধপত্র, সব রকমের কল-কারখানা, বিমান-বহর, সর্বপ্রকার উৎপাদন-ব্যবস্থা আগাগোড়া সব শিল্পপতিদের হাতে। ওরাই গভর্নমেণ্টের হর্তাকর্তা, ওরাই কংগ্রেস, ওরাই টেলিভিশনের মালিক, ওদের হাতেই বেতারকেন্দ্র। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ওরাই ঘটিয়েছে। রাষ্ট্রের কর্তারা ওদের হাতের পুতুল।

এদেশে কম্যুনিজম কি আসবে কোনদিন?

ওরা হেসে উঠলেন। বললেন, কেমন করে আসবে? এদেশে সর্বাপেক্ষা যারা গরীব, তাদেরও আছে সোস্যাল সিকিউরিটি। যারা চুরি-ডাকাতি খুনখারাপি করে তারা লোভী, কিন্তু নিরন্ন নয়। এদেশে এখন শতকরা ১০ জন বেকার, কিন্তু তারা মাসোহারা পায় চারশ' ডলার। তা'রা কুকুরের খাবার (Dog food) খেয়েও টাকা জমায়। কুকুর এদেশে শ্রেষ্ঠ খাদ্য খায়, সেই খাদ্য উপাদেয় এবং 'টিনপ্যাকে' সর্বত্র মেলে।

ঘণ্টা তিনেক আলোচনার পর সেদিন বিদায় নিয়েছিলুম।

বিভূতিরঞ্জন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়ো-কেমিস্ট্রি বিভাগে গবেষণা করেন এবং তিনি এক বিশিষ্ট স্কলার ও পি-এচ-ডি। কিন্তু বাঙলা সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অনুরাগ প্রচুর। সেই অনুরাগ ও আলোচনায় যোগদান করেন তাঁর উচ্চ-শিক্ষিতা শাশুড়ী বীণা চৌধুরী ও শ্বশুর মিঃ চৌধুরী। শ্রীমতী বীণা মারাঠা সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিনী। এ'রা উভয় মিলে একদিন আমাকে নিয়ে এক প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। ওরই মধ্যে একদিন শ্রীমান দীপঙ্কর আমাকে পথ

সৌখিনে নগর ভ্রমণে নিয়ে গিয়েছিল। তার সহায়তায় বহু দ্রষ্টব্য স্থান—এমন কি পুলিস বিভাগের প্রধান কেন্দ্রটির ভিতরে গিয়ে আগাগোড়া পরিদর্শন করেছিলুম। সেইদিনই প্রথম জানলুম, যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতিক বন্দী একজনও কেউ নেই। আমেরিকান পুলিসের কর্তারা আমাকে সর্বপ্রকারে সেদিন সাহায্য করেছিলেন।

আমার সময় এবার কমে এসেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিক্রমা প্রায় শেষ হতে চলেছে। এবার আমি একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিলুম আমার পূর্বপথে। আমার এই ভ্রমণ শেষ হতে আর মাত্র মাসখানেক বাকি। এতদিন ধরে সর্বত্র মন দেয়া-নেয়া করে যাচ্ছিলুম। এবার সব ছেড়ে যাবার সময় আসছে। স্নেহ মোহবন্ধন ভ্রাম্যমাণ জীবনের বৈরী।

একদা অপরাহ্ণকালে বিভূতির শাশুড়ী, দীপঙ্কর ও বিভূতিরঞ্জন নিজে আমাকে নিয়ে শিকাগো যাত্রা করলেন তাঁদের গাড়িতে। আমরা উইসকনসিন্ স্টেটের রাজধানী 'মিলওকি' হয়ে যাবো সোজা দক্ষিণ হাইওয়ে ধরে। আমাদের বাঁদিকে থাকবে সমুদ্রবৎ মিসিগান লেক।

॥ একশো পনেরো ॥

ত্রিদিবেশ সিঁড়িতে পা দেবার আগেই ওর নাকে ওষুধের গন্ধ লাগে। দৃষ্টি পড়ে ডানদিকে। মধুদিকে সেদিকেই যেতে দেখা যায়। নিচের তলার বারান্দাটা অন্ধকার, বাইরের দিকে ত্রিপল বা কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা। রাস্তার দিক থেকে ভিতরের কিছু চোখে পড়ে না। ঘরের তিনটি দর-জার ভিতরের আলো রেখা এবং ভিতরে লোকজনের কথা শোনা যায়। ওষুধের গন্ধটা ঝাঁঝালো, টিনচার আয়োডিন বা সেই জাতীয়। হাসপাতালের অপারেশন ঘরের কথা মনে করিয়ে দেয়। চাপা গোঙানো আর্তনাদের স্বর ভেসে আসে।

'মধুদি ওপরে যেতে বললেন কেন?' সবিতা পণ্ডিত বলে, 'সবাই তো নিচেই রয়েছে মনে হয়। একটু দেখে যাই।' বলে সে ত্রিদিবেশের পাশ দিয়ে নিচের অন্ধকার বারান্দায় এগিয়ে যায়।

ত্রিদিবেশ কৌতূহল বোধ করে, সবিতার পিছনে এগিয়ে যায়। এ বাড়ির নিচের তলার ঘর দরজার সম্পর্কে ওর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বোমা পড়ার সেই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্না রাত্রেও ওপর তলায় গিয়েছিল এবং ওপর তলারও সব ঘর দেখা নেই। বারান্দায় প্রথম দরজায় দাঁড়াতেই ভিন্ন দৃশ্য চোখে পড়ে। ঘরের মেঝেয় এবং লম্বা সোফায় কয়েকজন শায়িত, সকলেরই শরীরের নানা অংশে ব্যান্ডেজ বাঁধা। ভিতরের দরজা দিয়ে অন্যান্য ঘরে যাবার পথ এবং সেইসব ঘরে আরো মানুষের স্বর, ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিত। তার সঙ্গে ফুঁপিয়ে কান্না এবং গোঙানি। ত্রিদিবেশ মুখ ফিরিয়ে সবিতা পণ্ডিতকে আর দেখতে পায় না। ও এগিয়ে যায় পাশের ঘরের দরজায়। সেখানে মেঝেয় এবং খাটের ওপর আরো আহত মানুষ। অভ্যন্তরের অন্য কোনো ঘরে স্টোভের সোঁ সোঁ শব্দ ভেসে আসে। একটা টেবিলের ওপরে একজন শায়িত, সেখানেই ভিড় বেশি। মধুদি সেখানেই দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁর চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। সবিতা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে শুনতে টেবিলের দিকে ঘন ঘন তাকায়।

'মধুদি।' একটি গম্ভীর স্বরের ডাক শোনা যায়, 'একবার এদিকে আসুন।' তারপরেই সেই স্বরে বিরক্তি ফোটে, 'আঃ, আপনারা টেবিলটা ছাড়ুন না। আপনারা কী দেখছেন এখানে?'

টেবিলের কাছ থেকে দু তিনজন সরে যায়। মধুদি বলে ওঠেন, 'না, ওভাবে সরে গেলে হবে না। আপনারা সবাই ওপরে চলে যান। সুস্থ মানুষ যাঁরা আছেন, তাঁরা নিচের তলার ঘরে ভিড় করছেন কেন, আর এ ঘরে পুরুষরা আসছেন কেন? যান যান, আপনারা চলে যান।'

দুজন পুরুষ বেরিয়ে আসে বারান্দায়। ত্রিদিবেশের দিকে একবার তাকায় এবং একজন নিচু স্বরে বলে, 'বাঁচাতে পারবে না। মেয়েটাকে কুকুরের মতো ছিঁড়ে খেয়েছে।'

ত্রিদিবেশ এবার ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপর একটি মেয়েকে শায়িত অবস্থায় দেখতে পায়। একটি উজ্জ্বল টেবিল ল্যাম্পের আলো মেয়েটির চাদরঢাকা গায়ে। চোখ বোজা, মুখে কোনো ক্ষত দেখা যায় না। কিন্তু হিমাংশুদাকে দেখে ত্রিদিবেশ অবাক হয়। ডাক্তার হিমাংশু ঘোষ একজন পার্টি মেমবার। প্রতি সপ্তাহেই একদিন বা দুদিন শিল্পাঞ্চলে গরীব শ্রমিক কমরেডদের দেখতে যান। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুপুরুষ, প্রসন্ন মেজাজের মানুষ। ডাক্তার হলেও নানা বিষয়ে আগ্রহী। শিল্প সাহিত্য গান, সব বিষয়েই কথা বলেন, আলোচনা করেন, আর অনেক মজার গল্পে ওঁর ভাণ্ডার ভরা। সব গল্পই পার্টির ছেলেমেয়েদের নিয়ে, শিল্পী সাহিত্যিকদের নিয়ে, তাদের প্রেম ভালবাসা ঝগড়া বিবাদ বোকামি সাহসিকতা এমন কি কারোর পার্টি-বিরোধী ভূমিকা নিয়েও হেসে ঠাট্টা করে গল্প করেন। হিমাংশুদাকে এ সময়ে মধুদির বাড়িতে আহত মানুষদের চিকিৎসায় নিযুক্ত দেখে ত্রিদিবেশ অবাক হয়, যদিচ তার কোনো কারণ নেই এবং মনে মনে একটা খুশিও বোধ করে। এখন বুঝতে পারে হিমাংশুদা-ই মধুদিকে ডাকছিলেন এবং টেবিলের পাশ থেকে সবাইকে বিরক্ত স্বরে চলে যেতে বলেছিলেন।

ত্রিদিবেশ বাইরে থেকে লক্ষ করে, ঘরের মধ্যে শায়িত সকলেই স্ত্রীলোক। ভিতরে যেতে ইচ্ছা করলেও যেতে পারে না। হিমাংশুদা স্বর নামিয়ে মধুদিকে কিছু বলেন। তাঁর সারা মুখ ঘামে ভেজা, চোখে দুশ্চিন্তার ছায়া। মধুদিরও অন্য ভিন্ন রূপ। খুব সাধারণ একটি শাড়ি আর জামা তাঁর গায়ে, মাথার চুল খোলা। ঘামে ভেজা কপালে গালে ঘাড়ে গলায় ল্যাপটানো চুল। তাঁদের দুজনের কথার মধ্যেই একজন, একটি মেয়ে প্রায় কুড়ি বাইশ বছরের, ইনজেকশানের সিরিঞ্জ হিমাংশুদার দিকে এগিয়ে দেয়। হিমাংশুদা তৎক্ষণাৎ কথা থামিয়ে ওষুধ ভরা সিরিঞ্জ নিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েন। ত্রিদিবেশের অচেনা মেয়েটি টেবিলের আহত মেয়েটির কাঁধের কাছ থেকে সাদা চাদরের ঢাকনা সরিয়ে ডানা চেপে ধরে। টেবিলের পাশেই একজন বর্ষীয়সী মহিলা, হঠাৎ শাড়ির আঁচল মুখে চেপে ফুঁপিয়ে ওঠেন। মধুদি তাঁর দিকে ফিরে তাকান এবং হাত ধরে দরজার কাছে টেনে নিয়ে আসতে আসতে বলেন, 'মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কাঁদছেন আপনি? ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার চেষ্টা হচ্ছে, জেগে গেলে মুশকিল হয়ে যাবে। আপনি ওপরে যান।' বলতে বলতে তাঁকে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে আসেন।

বর্ষীয়সী মহিলা কান্না স্ফুরিত স্বরে বলেন, 'আমি তোমাদের কী করে বোঝাবো মা। মেয়েকে মরতে দিতেও ইচ্ছে করছে না কিন্তু বেঁচে উঠলেই বা ওকে নিয়ে আমি কোথায় যাবো? এর পরে কি আর এ মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে?'

'ছি ছি ছি, এ সব কী বলছেন আপনি?' মধুদির স্বরে বিস্মিত ভর্ৎসনা, 'আপনার মেয়ের অপরাধটা কী? বিয়ে না দিতে পারেন দেবেন না, আপনাদের সমাজে আর ঘরে ওর যদি জায়গা না হয় জায়গার অভাব হবে না। এর জন্য যদি বিয়ে না হয় না-ই হবে। ওটাই জীবনের সব নয়। এখন ওকে বাঁচাতে দিন। আপনার ছেলে, ছেলের বউ সব ওপরে আছে, আপনি সেখানে যান।' বলতে বলতে মধুদি মহিলাকে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে যান।

ত্রিদিবেশ সেইদিকে তাকিয়ে বিষয়টা বোঝবার চেষ্টা করে এবং ওর কয়েক হাত দূরেই নিচু স্বরে শুনতে পায়, 'মুসলমান

রেপ্‌ করেছে, ও মেয়ের জীবন শেষ। এ খবর কোনোদিন চাপা থাকবে না।'

ত্রিদিবেশ স্বরের লক্ষে মুখ ফিরিয়ে তাকায়, দুটি অস্পষ্ট মূর্তিকে দেখতে পায়। আর একজনের স্বর শোনা যায়, 'লতা—হারুবাবুর মেয়ে লতাকে তো খুঁজেই পাওয়া যায়নি। কোনোদিন পাওয়া যাবে বলেও মনে হয় না।'

মধুদি ফিরে আসেন এবং ত্রিদিবেশের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কে?'

'আমি, ত্রিদিবেশ।'

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?' মধুদি অবাক স্বরে বলেন, এবং বারান্দার অন্য ধারে অস্পষ্ট মূর্তি দুটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ওখানে কারা?'

জবাব আসে, 'আমরা এ পাড়ারই, সতেরো নম্বর বাড়ির।'

মধুদি বলেন, 'আপনারা ভাই ওপরে যান। ওপরে দুটো ঘর বারান্দা সবই আপনাদের জন্য খোলা রয়েছে। এখানে ইনজিয়োরডদের চিকিৎসা হচ্ছে, আমরা দেখাশোনা করছি। আপনাদের থাকবার কোনো দরকার নেই।'
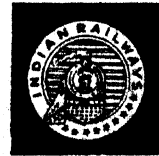
একজন বিব্রতভাবে বলে, 'আবার কাকে কীভাবে নিয়ে আসে, তাই দেখবার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। এখনো সব ক'টা হিন্দু বাড়ির লোক আসতে পারে নি, আটকে আছে। তাদের কী হলো না হলো, বুঝতে পারছি না।'

'আশ্চর্য!' মধুদির স্বরে ক্রুদ্ধ বিস্ময়, 'সেটা এখানে দাঁড়িয়ে কী করে বুঝতে পারবেন? তা হলে আপনাদের এখন পাড়ার মধ্যে যেতে হয়। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা এ লোকালিটির প্রায় সব কটা হিন্দু ফ্যামিলিকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিয়েছি। আমাদের মুসলিম কমরেডরা তাদের দায়িত্ব নিয়েছে। এ বাড়িও তারাই পাহারা দিচ্ছে। আপনারা ওপরে চলে যান।'

মূর্তি দুটি এবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। মধুদি ত্রিদিবেশকে বলেন, 'তুমি এখানে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ওপরে যাওনি?'

'পণ্ডিতদা এদিকে চলে এলেন, তাই আমিও এলাম।' ত্রিদিবেশ বলে।

মধুদি ত্রিদিবেশের পাঞ্জাবির হাতা চেপে ধরে বলেন, 'ভেতরে এসো, বাইরে কেন।' বলে দরজার দিকে পা বাড়িয়েই অবাক স্বরে বলে ওঠেন, 'একি, তোমার জামা ভেজা নাকি?' বলতে বলতেই পাঞ্জাবির হাতা ছেড়ে দিয়ে বুকে এবং কাঁধে হাত স্পর্শ করেন।

ত্রিদিবেশ বলে, 'হ্যাঁ, আমি বৃষ্টিতে ভিজেছি।'

'চমৎকার!' মধুদি ত্রিদিবেশের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, 'আর এই ভেজা জামা কাপড় পরেই এখনো রয়েছো? এই কাটা ছেঁড়া সেলাই করতে গিয়ে এখন আবার তোমার আলাদা চিকিৎসা করতে হবে।'

হিমাংশুদা সিরিঞ্জটা সামনের মেয়েটির হাতে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকান। অবাক স্বরে বলে ওঠেন, 'একি, আর্টিস্ট তুমি এখন এখানে?'

সবিতাব্রত বলে, 'ত্রিদিবেশ ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ, তাই আজও কলকাতায় চাকরি করতে এসেছিল, আর চৌরঙ্গি থেকে জলে ভিজতে ভিজতে একলা বোবাজারে এসে উপস্থিত।'

'বাহ্!' হিমাংশুদা বলে ওঠেন এবং ঘরের আহত মহিলাদের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন, 'এদের ছবি আঁকবে নাকি? তিনটে ঘরে অনেক আহত মানুষ আছে। ছবি আঁকো, নাম দেওয়া যাবে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির শিকার।' বলে হেসে ওঠেন এবং টেবিলের দিকে ঝুঁকে সাদা চাদরের ভিতরে হাত দেন।

মধুদি বলেন, 'এখন ছবি আঁকার সময় নেই, আপনি আর ওসব বলবেন না। এখন তুলি ছেড়ে সেবার কাজে লাগতে হবে।'

হিমাংশুদা বলেন, 'তা অবিশ্যি ঠিক। তুলি কলম ছেড়ে শিল্পীদের কখনো কখনো বন্দুক হাতে নিতে হয়। আবার সেবার কাজও করতে হয়।' বলেই তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, 'সালমা।'

ভিতরের ঘর থেকে জবাব আসে, 'যাই হিমাংশুদা।' বলতে বলতেই, দরজায় সেই বিশ-বাইশ বছরের মেয়েটি এসে দাঁড়ায়। সে চকিতের জন্য একবার ত্রিদিবেশের দিকে কৌতূহলিত চোখে তাকায়। হিমাংশুদা বলেন, 'সতুকে বলো, সব থেকে বড় সিরিঞ্জটা পরিস্কার করতে। গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি আছে তো?'

সাল্‌মা যার নাম, সে ঘাড় কাত করে বলে, 'এক হাজার সিসি পর্যন্ত।'

'ব্যস্, ওতেই হবে।' হিমাংশুদা টেবিলের দিকে চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলেন, 'ভয়ের কিছু নেই। পালস্ ভালো, আগের থেকে ভালো। নতুন আর কেউ আসবার আগে তোমাকে আমি দশ মিনিটের ছুটি দিচ্ছি, তুমি ভেতরে গিয়ে এক কাপ চা খেয়ে এসো।'

সালমা হাসে। সামান্য গজ দাঁতের হাসিটা সুন্দর, ক্লান্ত তথাপি যেন উজ্জ্বল, ঈষৎ লজ্জিত। মধুদির দিকে তাকায়। ফরসা অনতিদীর্ঘ, সালমার ডাগর কালো চোখ দুটি গভীর। নাকটা সামান্য ছোট, অগ্রভাগ কিছুটা চাপা, কিন্তু পুষ্ট দুটি ঠোঁট সব মিলিয়ে তার মুখখানি স্নিগ্ধ আর মিষ্টি। শাড়ির ওপরে নার্সদের মতো সাদা অ্যাপ্রন, কোনো অলঙ্কার নেই, বাঁ হাতের কবজিতে একটি ঘড়ি। বলে, 'থ্যাংক্যু হিমাংশুদা।' বলে দরজার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ত্রিদিবেশ জানে না সালমা মেয়েটি কে। নাম থেকে অনুমান করে সালমা মুসলমান। কী তার পরিচয়, এবং কোন্ সূত্রে এখানে সেবার কাজে উপস্থিত, কিছু অনুমান করতে পারে না। কিন্তু মনে মনে বিস্মিত আর মুগ্ধ হয়। এ ঘরে আহত মহিলারা সকলেই হিন্দু, কোনো সন্দেহ নেই। মধুদির বাড়ি, এবং এর চারদিকের অনেকখানি অঞ্চল মুসলমান অধ্যুষিত। আজ এই রাত্রে যে-কোনো হিন্দুর পক্ষে এ অঞ্চল ভয়াবহ আর বিপজ্জনক। পণ্ডিতদা বোবাজার অফিস থেকে হঠাৎ কেন এখানে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ত্রিদিবেশ জানে না। আজ রাত্রে দূরের কথা, আগামীকাল দিনের বেলাও কি এখান থেকে বেরনো সম্ভব? তাণ্ডব যে সারা দিন ধরেই চলেছে, এবং এখনো ইতস্তত চলছে, এই আহতদের ভিড় তার প্রমাণ। ত্রিদিবেশ একটু আগে শুনেছে, লতা না'ম একটি মেয়ে নিখোঁজ। টেবিলের ওপর এই মেয়েটি ধর্ষিতা। পাড়ার অনেক হিন্দু পরিবার এ বাড়িতে আশ্রিত। মুসলমান কমরেডরা আরো কয়েক জায়গায় হিন্দুদের নিরাপদে রেখেছে, মধুদির কথায় তা ব্যক্ত। হিন্দু এলাকায় মুসলমানদের কী অবস্থা? হয় তো এ রকমই। হয় তো কেন, নিশ্চয়ই। বোবাজার অফিসেই শোনা গিয়েছে, পার্টির হিন্দু ক্যাডারদের মধ্যে অনেকে দাঙ্গায় নেমে পড়েছে। হয় তো মুসলমানদের মধ্যেও একই ঘটনা ঘটছে।

ত্রিদিবেশ নিজের মনকে স্পষ্টই চিনতে পারে। ভয় শঙ্কা ছাড়াও, একটা অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ ওর মনের কোণে লুকিয়ে-ছিল। এই অঞ্চলে জীপ গাড়ি ঢোকার সময় যে-পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়েছিল, যে-সব কথা শুনেছে, তার অনেক আগে, বিকালে মনুমেন্টের তলায় মুসলমানদের সভা ওর মনকে অনেকখানি বিষিয়ে করে তুলেছিল। এখনো ওর মনের ধারণা, আজকের ঘটনার জন্য মুসলমান নেতাদের নেতৃত্ব, আর তার অধীন মুসলমানেরা দায়ী। এটা একটা পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। কিন্তু মধুদির বাড়ির এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে, মধুদি হিমাংশুদা এবং সর্বোপরি সাল্‌মা, ওর মনের সংশয় বিদ্বেষকে মুছে দেয়। এই সমস্ত আশ্রিত আর আহতদের মধ্যে সাল্‌মা যেন সকল সন্দেহের নিরসন। বিষিয়ে মনে ধিককার জাগায়, মনে মনে লজ্জা বোধ করে।

এ অঞ্চলে, হয় তো মুসলিম কমিউনিস্ট আর পার্টি দরদীরা, দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আক্রান্তদের বাঁচাতে ব্যস্ত। কিন্তু একা সাল্‌মা যেন সকল সংগ্রামের প্রতীক। বিষণ্ণ গম্ভীর কিন্তু উজ্জ্বল ওর হাসি। হিমাংশুদা ওকে যে-ভাবে দশ মিনিটের চা খাবার ছুটি দেন, বোঝা যায়, সেবার কাজে ও সারাদিনই অক্লান্ত।

'সাল্‌মা এ বাড়িরই মেয়ে, এই নিচের তলাটা এদেরই।' মধুদি বলেন, 'তুমি তো সেই একবারই আমার বাড়িতে এসেছিলে, তারপরে আজ। এলে, সাল্‌মার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়ে যেতো। ওর বাবার নাম বোধ হয় শুনেছো, সৈয়দ বদরুজ্জা সাহেব।'

ত্রিদিবেশ বিভ্রান্ত বোধ করে, মনে করতে পারে না। মধুদির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে। মধুদিও অবাক হয়ে বলেন, 'সৈয়দ বদরুজ্জা সাহেব আমাদের পার্টির মেম্বার নন, কিন্তু তার থেকেও বেশি। তুমি ও'র লেখা পড়ো নি? ইতিহাসের ওপর অনেক লিখেছেন। উনি মার্কসিস্ট ঐতিহাসিক।'

ত্রিদিবেশের তথাপি মনে পড়ে না। পড়ে থাকলেও, এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারে না। মধুদি নিজেই বলেন, 'বুঝেছি,

তোমার খেয়াল নেই। ঠিক আছে, ও'র সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো পরে। আগে চলো, তোমার ভেজা জামা কাপড়-গুলো ছাড়বে। আর আপনি?' মধুদি সবিতাব্রতর দিকে তাকান, 'আপনি কী করবেন? নিচেই থাকবেন?'

সবিতা একটু হেসে বলে, 'নিচেও থাকতে পারি, ওপরেও যেতে পারি, যা বলবেন। তবে একটু চা কি পাওয়া যাবে?'

'দেখ পন্ডিত, যা বলবে, পরিষ্কার করে বলবে।' হিমাংশুদা বলেন, 'এখানে আমরা একটা হসপিটাল চালাচ্ছি, আর এক কাপ চা দিতে পারবো না? কিন্তু আমাদের হসপিটালের কাজে লাগতে হবে। আর্টিস্ট, তুমিও জামা কাপড় ছেড়ে নিচে চলে এসো। সারা রাত্রি জেগে আহতদের সেবা করতে হবে।'

মধুদি বলেন, 'ত্রিদিবেশ আর পন্ডিতকে আমিই ওপর থেকে চা খাইয়ে দিচ্ছি।'

ত্রিদিবেশ আর সবিতা মধুদির সঙ্গে ওপরে যায়। যেতে যেতে সবিতা ত্রিদিবেশের ঘটনা বলে। ওপরের সিঁড়ির মুখেই অনেক মেয়ে পুরুষের জটলা। বারান্দায় বাইরের দিকে চিক ঢাকা। ভিতরে স্তিমিত আলোয় দেখা যায়, কেউ বসে, কেউ শুয়ে। শিশুরা কেউ ঘুমন্ত, জাগ্রতরা অস্থির, কিন্তু পরিস্থিতির উদ্বেগে যেন তারাও আক্রান্ত। সামনের দুটি ঘরেও পাড়ার নানান শ্রেণীর হিন্দু পরিবারের লোকজনের ভিড়। বারান্দার শেষ প্রান্তে বাঁ দিকে ঘুরে একটি ঘরে এখন মধুদির নির্জন সংসার। এ ঘরে বাইরের কেউ নেই। খাটে একটি ফ্রক পরা কিশোরী পাশ ফিরে গুটিশুটি ঘুমায়। অনুমান করা যায়, মধুদির মেয়ে। মধুদি ঘরে ঢোকবার আগেই ডান হাত তুলে কাউকে ডাকেন। একটি বিধবা স্ত্রীলোক এসে দাঁড়ায়। ত্রিদিবেশ চিনতে পারে, স্ত্রীলোকটি মধুদির ঘরের কাজ করে। মধুদি স্বর নিচু করে বলেন, 'তুমি তিন-চার কাপ চা তাড়াতাড়ি করো, করে এখানে নিয়ে এসো।'

সবিতা ঘরের মধ্যে ঢুকেই খাটের ওপর বসে পড়ে, এবং নিজের কথার সূত্রেই বলে যেতে থাকে। বলে, 'আজ রাত্রে না ফিরতে পারলে, শিউলি সারা রাত জেগে থাকবে, ভীষণ ভাববে। কোনো মানে হয়? শিউলি ভাবলেই বা তুমি ফিরবে কী করে। গাড়ি কোথায়?'

মধুদি বলেন, 'আজ রাত্রে যদি বা গাড়ি পাওয়া যেতো, আমার মনে হয় কাল সকাল থেকে একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তো শুনেছি, আজ সন্ধের দিকেও শিয়ালদা থেকে কয়েকটা গাড়ি ছেড়েছে।'

'তাই নাকি?' ত্রিদিবেশ আশাহত বিস্ময়ে বলে ওঠে।

মধুদি বলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমার এতো দুশ্চিন্তার কী আছে? শিউলির জন্য ভেবে এখন তুমি কিছুই করতে পারবে না। পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারা উচিত।' বলতে বলতে তিনি খোলা আলনা থেকে একটা ধোয়া পায়জামা তুলে এগিয়ে দেন, 'এখন এটাই পরো। পুরুষের জামা-কাপড় বলতে আমার বাবারটা ছাড়া এ বাড়িতে আর কারোর নেই। পায়জামাটা লম্বায় তোমার বড় হবে। একটু গুটিয়ে পরো। গায়ে দেবার জন্য কিছু দিচ্ছি।' মধুদি আবার আলনার কাছে যান এবং সেখান থেকে বলেন, 'হয় তো আগামীকালও তুমি ফিরতে পারবে না, কিম্বা পরশুও। শিউলির জন্য দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক, কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাক-বার মানে হয় না। এখন সব থেকে জরুরী, দাঙ্গার বিরুদ্ধে লড়াই করা। তুমি এখন যেখানে আছো, সেখানে নিজের কাজ করো। তাতেই ভালো থাকবে। তোমার সংসারের মতো সংসার, বা শিউলির মতো অনেক মেয়ের জীবন তোমার আশেপাশে ছারকার হয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে থাকো, তাদের সঙ্গে থাকো। একটা কি দুটো রাত শিউলি ভীষণ ভাবলে, কী আসে যায়?' বলতে বলতে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি ত্রিদিবেশের দিকে বাড়িয়ে দেন।

ত্রিদিবেশ পায়জামা আর পাঞ্জাবি নিয়ে এক মুহূর্ত ভেবেই, দরজার বাইরে পা বাড়ায়। পিছন থেকে মধুদির স্বর শোনা যায়, 'বাথরুমে যেতে হবে না, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই বদলে নাও। ভেজা জামা কাপড়গুলো এক কোণে জড়ো করে রাখো। আমি বরং এ দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছি।'

ত্রিদিবেশের পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ওর সামনে এখন কেউ নেই। দোতলার সামনে থেকে আশ্রিত লোকজনের কথাবার্তার নানা স্বর ভেসে আসে। ত্রিদি-বেশ একবার রান্নাঘরের দিকে তাকায়। কারোকে দেখা যায় না। ও দ্রুত ভেজা পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে, এক দীর্ঘতর ব্যক্তির পায়জামা পাঞ্জাবি পরে। পায়-জামাটা কোমরে অনেকখানি গোটালেও, পাঞ্জাবিটা ঝুলতে থাকে আলখাল্লার মতোই। মধুদির বাবা কোথায়? এই জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গেই মধুদির এই মুহূর্তে বলা কথাগুলো মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। মধুদির স্বরে কোনো বিরক্তি বা বিদ্বেষের ঝাঁজ ছিল না। 'পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে পারা উচিত।'...... মধুদির কথা, শিউলির মতো মেয়ে ও সংসার ছারখার হওয়ার কথা বলেন কেন? ত্রিদিবেশের দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ কি স্বার্থপরের মতো?

দরজা খুলে যায়, মধুদি এগিয়ে এসে বলেন, 'ছেড়েছো? ভেতরে বসো। তুমি আমার কথায় কিছু মনে করোনি তো?'

ত্রিদিবেশ বলে, 'না। কী মনে করবো?' 'শিউলি খুব ভাববে, কোনো সন্দেহ নেই।' মধুদি বলেন, 'তবে শিউলিরা ভালোই থাকবে। পন্ডিতের মুখে শুনলাম, তোমাদের ওদিককার পরিস্থিতি ভালো। আমি কী বলতে চাইছি জানো? তোমাকে এখন বাঁচাতে হবে, যে সব শিউলিরা মরছে। এখন নিজের শিউলির চিন্তা নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বসো আসছি।' মধুদি ঘরের বাইরে বারান্দার ডান দিকে চলে যান।

ত্রিদিবেশ ভিতরে আসে। সবিতা আধ-শোয়া হয়ে সিগারেট টানে। ত্রিদিবেশ বলে, 'পন্ডিতদা, আমাকে একটা সিগারেট দিন।'

✻

ত্রিদিবেশ চা খেয়ে যখন মধুদির সঙ্গে নিচে আসে, তখন দূর এলাকা থেকে আবার নানা ধ্বনি ভেসে আসতে থাকে। কাছাকাছিও কোলাহল শোনা যায়। আবার আহতদের ভিড় হতে থাকে। ত্রিদিবেশ, হিমাংশুদা সাল্‌মা মধুদি সতু হানিফ সবিতাব্রত এবং আরো অনেকের সঙ্গে সকলের চিকিৎসা ও সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শিউলি সন্তান সংসারের কথা ওর মনে থাকে না। নিচের তলা একটি ছোট-খাটো হাসপাতাল। ওপর তলায় আশ্রিতদের জন্য সৈয়দ সাহেবের বাড়ির পিছনে রাত্রের রান্নার আয়োজন। এখন আর কোন জাত বিচার নেই। সারাদিন অভুক্ত মানুষদের পাড়ার কয়েকটি হিন্দু মুসলমান ছেলে মেয়ে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়ায়। সাল্‌মার সঙ্গে ত্রিদিবেশের পরিচয় হতে সময় লাগে না, এক সময় নিজেদের প্রয়োজনেই, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়ে যায়।

হিমাংশুদাকে অপারেশন আর সেলাই উভয়বিধ ব্যাপারেই সাল্‌মা সাহায্য করে চলে। মনে হয় সাল্‌মাও একজন ডাক্তার। রাত্রের দিকে যে-কয়টি আহত আসে, তার মধ্যে তিন জনের শরীরে ছুরির আঘাত, দু জনের বন্দুকের গুলি।

শেষ রাত্রের দিকে, যখন চারদিক নিঝুম, কোথাও থেকে কোনো গোলমাল ভেসে আসে না, ত্রিদিবেশ কয়েকজন পুরুষ আহতদের কাছে বসে, প্রত্যেকের অবস্থা লক্ষ করে, তখন চারজনের একটি দল নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। সামনের লোকটির পরণে লুঙ্গি, গায়ে শার্ট, গলায় রুমাল বাঁধা। মেদবর্জিত সবল, তীক্ষ্ন চোখ, শক্ত চোয়াল যুবক, দরজায় দাঁড়িয়ে ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়। ভ্রূকুটি অনুসন্ধিৎসা তার চোখে। সে ঘরের মধ্যে পা বাড়ায়।

(ক্রমশ)

সারাদিন
ভোরের স্নিগ্ধতা
আর সুরভি
পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক ব্যবহার করুন—
সদ্যস্নানের শুচিস্নিগ্ধতা অনুভব করবেন
ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সারাদিন আপনাকে
ঘিরে থাকবে মনোরম আবেশ।
সারা অঙ্গে ছড়িয়ে দিন এই ট্যাল্‌ক—
দেখবেন কত ঝরঝরে, ঠাণ্ডা মনে হবে।
মৃদু সৌরভ গায়ে লেগেই থাকবে।
ঘাম শুষে নিয়ে আপনাকে দেবে আরামের
আমেজ। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে ও
প্যাচপ্যাচে ভাব হতে দেয় না—
বিশেষ করে গরমের দিনে।
তাছাড়া পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
রেশমের মত এমন চিকন মোলায়েম;
আপনি এটি মুখেও মাখতে পারেন।
পণ্ডস
ড্রিমফ্লাওয়ার
ট্যাল্ক
মিডিয়াম, ফ্যামিলি,
আর এখন নতুন
১৯৬ গ্রামের বড়
সাইজে পাবেন।
Pond's
Dreamflower talc

ঘরে বাইরে

মরসুমী পরিচর্যা : আপনার চুলের

এবার যা বিপুল বর্ষা নেমেছিল তাতে মনে হয় পুজো আর দেওয়ালি কাটতে না কাটতে শীতের হাওয়ার স্পর্শ মিলবে। জীবনযাত্রার নানা ঝঞ্ঝাটের দিক সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেহত্বক, আপনার কেশ সবই নতুন দাবী নিয়ে আসবে। উৎসবের অবসরে হয়তো অবহেলা করেছেন কিন্তু খেসারত সহ সময় না দিলে রুক্ষ রুক্ষ আর বিবর্ণ কেশ আপনাকে বিব্রত করবে।

প্রথমে চুলের কথা বলি। বারান্তরে ত্বকচর্চা আলোচনা করবো। যাঁদের মরামাস বা খুস্কি সহজে হয় তাঁদের এ মৌসুমে আর্দ্রতার অভাবে সেটা বাড়ে। নানা লোকে নানা উপদেশ দেন, কিন্তু daudruff বা খুস্কির কারণ ঠিক কেউই জানেন না। যাঁরা হেয়ার-স্প্রে ব্যবহার করেন তাঁদের

হয়তো ঐ স্প্রে করা জিনিস কিছু চুলে লেগে থাকে। অসাবধানতার সঙ্গে অনেকে শ্যাম্পু করেন। পরিষ্কার করে শেষটুকু পর্যন্ত ধুয়ে ফেলেন না। শ্যাম্পুর অবশিষ্ট থেকে যায়। মানসিক চাপ, চিন্তা, এমনকি অতিরিক্ত তেল ঘি খেলেও নাকি খুস্কি হয়। কারণ যাই হক, বাজারে খুস্কি নষ্ট করার বহু প্রক্রিয়ার খবরই থাকুক, খুস্কি বা মরামাস থেকে একেবারে রেহাই পাওয়া কত কঠিন তা যাঁর খুস্কি হয় তিনিই জানেন। তবে খুস্কি কিছুটা সামলানো সম্ভব। মরামাস নষ্ট করে এরকম শ্যাম্পু বাজারে মেলে। তা দিয়ে মরামাস চলেট চুল ধুয়ে নেবেন। তারপর যতবার পারেন জল দিয়ে আলতো ভাবে ধোবেন। সবার শেষে যদি ধারাস্নান ব্যবহার করবার সুযোগ থাকে তবে বেশ জোরে ধারাস্নান করবেন ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারা লাগাবেন। একটি কথা ভুলবেন না। শ্যাম্পু করবার আগে বেশ করে তেল মালিশ করবেন। রক্ত সঞ্চালন ভাল হবে সঙ্গে সঙ্গে মরামাস আলগা হয়ে যাবে।

শীতে আমরা রোদে বসি, বেড়াই ও রোদ্দপোয়ানো ভালবাসি। কিন্তু অতিরিক্ত সূর্যের তাপে চুল বিবর্ণ হয়। যাঁরা কলপ লাগান বা নানা কৃত্রিম প্রক্রিয়া দিয়ে চুলে বাহার দেবার চেষ্টা করেন তাঁদের বেলায় তো কথাই নেই, এমনকি স্বাভাবিক চুলও রুক্ষ হয় অতিরিক্ত রোদ লাগলে। চুলের ডগা ফাটে ও চুল টুকরো হয়ে যেতে চায়। খুব কড়া রোদে মাথায় কাপড় দেওয়া অথবা স্কার্ফ বাঁধার ব্যবস্থা ভাল। যদি চুল রুক্ষ হয়ে যায় তবে নিত্য নিয়মিত আঙুল দিয়ে মাথা ম্যাসাজ করবেন। সপ্তাহে একবার শ্যাম্পু করবেন। রুক্ষ নিস্তেজ চুলে তেল মালিশ করলে খুব উপকার হয়। মালিশ করবার সময় সযত্নে করবেন যাতে নখের খোঁচায় মাথার ত্বকের ক্ষতি না হয়। তেল মেখে গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে তা দিয়ে দশ মিনিট মাথায় জড়িয়ে রেখে তবে শ্যাম্পু লাগাবেন।

শ্যাম্পু করার শ্রেষ্ঠ প্রণালী হচ্ছে প্রথম গরম জল দিয়ে মাথা ভিজিয়ে নেওয়া বেশ ভাল করে, তারপর মাথার ত্বকে শ্যাম্পুর ফেনা মালিশ করা। মাথার চাঁদি ও দুটি পাশকে যেন অবহেলা করবেন না। এবার মাথায় জলের বন্যা বইয়ে দেবেন। অন্তত দু মিনিট জলের ধারা মাথায় লাগানো চাই। এভাবে একাধিক বার ধুতে পারেন। যাঁরা খুব ঘনঘন শ্যাম্পু করেন তাঁদের একবারই যথেষ্ট। প্রথম উষ্ণ জল ও আস্তে আস্তে সইয়ে যতটা ঠাণ্ডা সম্ভব জল ব্যবহার করবেন। যত ঠাণ্ডা সইবেন চুলের তত চমক লাগবে। ঠাণ্ডা জলে লোমকূপগুলি ছোট হয়ে যায় ও চুলের উজ্জ্বলতা আসে।

প্রশ্ন হচ্ছে শীতে চুল রুক্ষ কেন হয়? চুলের গোড়ায় যে sebaceous gland থাকে, যা থেকে তৈলাক্ত পদার্থ বের হয়ে চুলকে স্নেহময় করে তা শীতে কম হয়। এই স্নেহ অল্প বয়সের বাচ্চারও বেশী বয়সে কম থেকে। পুরুষেরও মেয়েদের চেয়ে কম থাকে। প্রথম বসন্তের ফলফুল যেমন হঠাৎ কোথা থেকে এসে প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে, যৌবনারম্ভে নারীরও রূপ যেন ভরা বসন্তের মত কানায় কানায় উপচে পড়ে।

বাঙালী মেয়ে ও কেরলকামিনীদের চুল দীর্ঘ ও ঘন হয় বলে সবাই মনে করেন। শুনেছি শর্করা বা কার্বো হাইড্রেট ও স্নেহপ্রধান খাদ্য তার একটি কারণ। কাজেই দেহত্বকের সংগে চুলের সৌন্দর্যের নিকট সম্বন্ধ বোঝা যায়। বয়স বাড়ার সংগে সংগে দুয়েরই যত্ন বেশী করে নেওয়া দরকার। চুলের ডগাও বেশী বয়সে ফাটে। তারও কারণ আর্দ্রতার অভাব। তখন মাথায় মালিশ করা, তেল ব্যবহার করা, নিয়মিত ব্রাশ করা বিশেষ প্রয়োজন। চুলের ডগা ফাটার কোন ওষুধ নেই। ফাটা ডগা কেটে ফেলাই দরকার।

মেয়েরা চুল উঠলে বিশেষ চিন্তিত হন। দিনে চল্লিশ থেকে আশীটি চুল পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তা নিয়ে ভাববার কিছুই নেই। অনেক সময় হর্মোনঘটিত গোলমাল, মানসিক চিন্তার চাপ, রক্তে লোহার অভাব, কোন কোন ওষুধ যেমন অ্যান্টিবায়োটিক, গর্ভনিরোধক পিল ইত্যাদি থেকেও চুল ওঠে। যদি বেশী চিন্তার কারণ হয় তবে চর্মচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। চুল তেমন যাঁদের ঘন

নয় তাঁরা 'ব্যাক কম্বিং' না করে একটি সহজ প্রক্রিয়া করে দেখতে পারেন। মাথা ঝুঁকিয়ে চুল উপরের দিকে ব্রাশ করুন। এবার ঝাঁকি দিয়ে মাথা তুলে আস্তে আস্তে মাথার উপর ব্রাশ করবেন। তখনকার মত আপনার চুল ঘন ও নিবিড় দেখাবে। চুলেরও ক্ষতি কিছু হবে না। বেশী কেশ সজ্জা বা নানারকম কেশ প্রসাধন ব্যবহার করলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। চুল কোঁকড়া করবার জন্য যে রোলার ও বাঁধি পিন ব্যবহার করা হয় তাতেও চুল টুকরো হবার ভয় থাকে।

এক সময় ব্রাশ করাকে চুলের পক্ষে খুব উপকারী বলে ধরা হতো। এখন অনেকে মনে করেন, বিশেষ করে কেশ-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা বলেন, অতিরিক্ত ব্রাশ করা ভাল নয়। যাঁদের অতিরিক্ত নরম ও পাতলা চুল থাকে তাঁদের বেলায় তো নয়ই।

দিনে বিশ তিরিশবার ব্রাশের টান দেবেন। গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত ব্রাশ করলে মাথার ত্বকে ভাল রক্ত সঞ্চালন হয়। তাতে অপকার হয় না, উপকারই পাওয়া যায়। যাঁরা চুল শুকিয়ে নেবার জন্য হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করেন তাঁরা বেশী গরম ড্রায়ার-এর তলায় মাথা রাখবেন না বরং হাতের ড্রায়ার ভাল। তাতে চুলের ভিতর হাওয়া ঢুকে চুল ঘন দেখায়।

অনেকের চুল শ্যাম্পু করলে নরম ও সতেজ দেখায় কিন্তু দু'একদিন যেতে না যেতেই যেন নেতিয়ে পড়ে। নিস্তেজও নিষ্প্রভ দেখায়। কেন? বেশী তৈলাক্ত চুল এভাবে সহজেই সৌন্দর্যহীন হয়ে যায়। প্রথমেই ভাববেন আপনার খাদ্যে ত্রুটি আছে কিনা। সংসাগুস ও কম স্নেহবিশিষ্ট খাদ্য ভাল। বার বার

শ্যাম্পু কর... ব্রাশ করে তেলাতেলে ভাব মাথার উপর থেকে নীচে নেবেন। মাঝে মাঝে ওডিকোলোনে একটু তুলো ভিজিয়ে চুলের গোড়ায় ত্বকে লাগাবেন।

চুলে জট হ'লে ধৈর্য হারাবেন না বা টানাটানি করে চুলের ক্ষতি করবেন না। একটি ব্রাশের সাহায্যে চুলের শেষ ভাগ আস্তে আস্তেও ছাড়াতে থাকুন। তারপর আর এক ইঞ্চি, তারপর আর একটু উপরে এরকম করে মাথা পর্যন্ত পৌঁছে যান। এভাবে করলে চুল উঠবে অনেক কম। মাথা ঘষার পর অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশী রকম জট হয়। তখন আঙুল দিয়ে আগে একটু একটু করে অংসগা করে নিয়ে তবে ব্রাশ ব্যবহার করবেন।

শীতে যদি কখনও সমুদ্রে স্নান করুন মনে রাখবেন নোনা জল সব সময়ই চুলের পক্ষে খারাপ। নোনা জলের রেশটুকুও ধুয়ে মুছে ফেলবেন।

শ্রীমতী

জেমস কার্কউড এক অভিজাতবংশ লেখক। লস এঞ্জেলেস-এ তাঁর জন্ম। এখন থাকেন লং-আইল্যাণ্ড-এর ইস্ট হ্যাম্পটনে। এই উপন্যাসের নায়ক পিটার কিলবার্ন-এর মতো তাঁর বাবা (এবং মা-ও) মঞ্চ-মজ্জায় থিয়েটারের লোক। কার্কউড নিজেও অভিনয় করে থাকেন। অবশ্য সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পর এখন তাঁর ইচ্ছে তিনি খুব ধরে-বেঁধে, বাছ-বিচার করে অভিনয় করবেন। স্কুল থেকে স্কুলে তিনি চালান হয়েছেন এবং পর-পর আটাশটি স্কুলে পরিক্রমা সেরে পেশাদারী বিদ্যায় তাঁকে ছেদ টানতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে তাঁর যাওয়া হয়নি। উপন্যাসে কার্কউড-এর নিজের চরিত্র। অর্থাৎ বেশ পালটে এবং মুখোশ পরে লেখককে প্রায়ই কিলবার্ন সাজতে হয়েছে। কখন 'আমি' এবং 'সে', 'জেমস' এবং 'পিটার' এক ও অভিন্ন হয়ে ওঠে তা অবশ্য বলা শক্ত, কারণ সেটাই আদি অকৃত্রিমরহস্য; শুধু সাহিত্যে-শিল্পে নয়—পরিপূর্ণ জীবনের ক্ষেত্রেও। জেনে অথবা না-জেনে আমরা অনেকেই নিজেদের স্বাবলম্বী কেন্দ্র থেকে অন্যের জায়গায় অভিনয় করে চলি। কার্কউড এবং কিলবার্নের প্রথম মিল 'ক' অক্ষরে কিন্তু সেটা আপাতিক এবং তুচ্ছ। দ্বিতীয় মিল দুজনেই অভিনেতা পিতার ছেলে। উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাদ্য স্কুল জীবনের সমস্যা। কার্কউড-এর আঠারো-দফা স্কুল-সূচী দেখে এ-সিদ্ধান্ত করা হয়তো অসমীচীন হবে না যে, স্কুল তাঁর জীবনের এক ঘোরতর সমস্যা ছিল। তাছাড়া কথা থাক, ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে মার্কিন প্রতিবাদটুকুই তাঁর; খুনের দায়ে কিলবার্নকে জেলে যেতে হয়েছিল, উপন্যাসের পাতা থেকে শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে উঠেছে খুনে সেই নৈশ দৃশ্যকল্প একা কিলবার্নেরই। যদিও এই অবিশ্বাস্য ঘটনার নায়কের চরম উক্তি, 'না আমার এরকম হতে পারে না', বর্তমান অনাবশ্যিক-চক্র পৃথিবীর আকাংক্ষায় অস্তিত্বের এক করুণ অভিপ্রকাশ। এই অনতিক্রম্য '[illegible] সংকট' কার্কউড এবং কিলবার্ন এবং আমরা বহু, অ-সতর্ক, ক-সতর্ক, ম-সতর্ক [illegible] বা অজস্রকে আজ এক মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটে বেঁধে রেখেছে। কল্যাণ রাষ্ট্র অথবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যা-ই হোক, শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজ-জীবনের অন্যতম শাখিক অংশ। এই নিয়ে ওদের দেশে গল্প উপন্যাস নাটক বহুদিন যাবৎ লেখা হচ্ছে। আমরা এখানে খবরের কাগজে একটু-আধটু হাঙ্গামা করি—তার পর সুবিধামতো ভুলে যাই। এই প্রসঙ্গে টেরেন্স র‍্যাটিগান-এর সেই একদা-বিখ্যাত

'উইনস্লো বয়' নাটকটির কথা মনে পড়বে। অবশ্য সেখানে আছে শুধু বুর্জোয়া নৈতিকতা এবং ইংল্যাণ্ডের শুদ্ধ রক্ষণ-শীলতার লড়াই। আমেরিকানরা যাকে বলে 'হুকি', সে-রকম ব্যাপার-স্যাপার বালক উইনস্লোর মধ্যে নেই। তবু সেটাও ছিল স্কুলেরই সমস্যা।

কিন্তু তরুণ কার্কউড-এর এই উপন্যাসের সঙ্গে জে ডি স্যালিঞ্জার-এর 'ক্যাচার ইন দি রাই'-এর তুলনা করা

Good times. Bad times. James Kirkwood, Penguin Books, Price, 60 P.

হয়েছে। এ তুলনা স্বাভাবিক, কারণ স্যালিঞ্জারও তাঁর হারানো কৈশোর এবং স্কুল জীবনের স্মৃতিচিত্র দিয়ে মন্দ-ভালোর সম্পর্ককে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন। নিজের উপন্যাসে স্যালিঞ্জার হয়তো মধ্যবিত্ত এবং কার্কউড নিম্ন মধ্যবিত্ত। দুটি বইয়েরই কেন্দ্রে রয়েছে সাধারণের আত্মিক প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ। কিন্তু তলিয়ে দেখলে তুলনা শুধু এই দুজন লেখকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। হুকি বা বাউণ্ডুলে ধরনের ছেলে-ছোকরারা বিশেষ করে আমেরিকান সাহিত্যে বারবার এসেছে। সেদিক থেকে মার্ক টোয়েন থেকে শুরু করে স্যালিঞ্জার, কার্কউড পর্যন্ত সুন্দর এক মালাবৃত্ত রচনা করা চলে। টম স্যয়ার কিংবা হাকলবেরী ফিন জাতে হয়তো আলাদা কিন্তু ভাবে তো কিলবার্ন এবং হোলডেনের (এইরকমই কি যেন নাম স্যালিঞ্জারের নায়কের) পূর্ব-সূরী। স্যালিঞ্জারে এবং কার্কউডে আরেকটি মানসিক প্রবণতা লক্ষণীয়। সেটা অবশ্য এই সময়েরই লক্ষণ। মেয়েরা শুধু মেয়েই নয়, কেউ বোন, কেউ মা। ভালবেসে বা সম্ভোগ করেই তাদের কাজ ফুরোয় না; তাদের কাউকে বোন কিংবা মায়ের চরিত্রে অবতীর্ণ হতে হয়। স্যালিঞ্জারকে যেমন এক সুনীতিবালা ছদ্মবেশী বোনের হাতে পড়তে হয়েছিল এবং কার্কউড তো আসলে ঃ উপন্যাসের তিনশ' ছ' পাতায় খোলাখুলি লিখেই দিয়েছেন। কিলবার্নের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা হবার পর তারা সেই নিয়ে মোটে কথা বলল না তাদের গোটা সম্পর্কটা বদলে যাচ্ছিল—অ্যান্ড সী ওয়াজ মাই মাদার।' মেয়েটি তাকে জলে নিয়ে গেল, জল খুলে দিল, এমনকি তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে-টুছিয়েও দিল। অর্থাৎ একই সঙ্গে মেয়েটির মধ্যে নাবালক ও সাবালক ভাব কাজ করছে এবং সেই সঙ্গে খানিক ফ্রয়েড ও গ্রীক ট্র্যাজেডির জটিলতাও এসে পড়ছে।

উইলিয়াম ফকনারের দক্ষিণাবর্তে কেউ তথাকথিত খল চরিত্র নয়; মানুষে-শয়তানে মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে। তাঁর চরিত্রেরা নিমগ্ন খুনে আত্মশুদ্ধি খোঁজে। কার্কউডের উপন্যাসেও সেই মনোভাব টের পাওয়া যাবে—বস্তুত আমেরিকান আধুনিক উপন্যাসে এইরকমই রেওয়াজ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এতে বিপদ এই যে, বিদ্রোহ বা বিপ্লব কোনদিনই সম্পূর্ণ সামাজিক আকার নেয় না নিছক ব্যক্তি-বিলাসে দাঁড়ায়। আমাদের সাহিত্যেও এক-ধরনের অগ্রগামী বিদ্রোহ-প্রবণতা লক্ষণীয়। তবু জেমস কার্কউড তরুণ গোষ্ঠীর এক বিশেষ ক্ষমতাবান লেখক। তাঁর লেখা বাতাসের বেগে ছোটে। মার্ক টোয়েনের সরলতা কিংবা আধাকাব্যিক ভাষা তাঁর নেই। এক ধরনের চাপা-ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গীতে নতুন এক রীতি তিনি আয়ত্ত করেছেন।

অসিত গুপ্ত

গল্প সংকলনঃ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি মানব নিয়তি

একালের বাঙলা গল্প। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা-২৯। মূল্য : ষোল টাকা।

গল্প ভাঙার গল্পই এ যুগের গল্প, কেবল গল্পের রীতি ভাঙা নয়, নতুন চোখে গল্পানুসন্ধান, গল্পের অন্তর্বর্তী গল্পকে খুঁজে বের করা। নইলে ফর্ম বা রীতি পৃথক করে কিছু নয়, প্রতি গল্পই তার জৈবিক নিয়মে নিজের যথার্থ রীতিমাধ্যম স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুঁজে নেয়। ওপর থেকে পোশাকের মত কখনই তাকে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তাই একটা প্রায় মধ্য দশক পার হয়ে ছোটগল্প এই সত্তরে আবার ফিরে এল নতুন চেহারায়।

মোট বাইশটি গল্প নিয়ে মুস্তাফা সিরাজের এই আলোচ্য সংকলনটি একালের বাঙলা গল্প সিরিজের প্রথম বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সিরাজ যদিও পঞ্চম দশকী গল্প আন্দোলনে সামিল ছিলেন না, কাগজে কলমে তাঁর লেখকজীবনের সূত্রপাত আর একটু পরে তবু মানসিকভাবে তিনি এই নতুন লেখকদেরই সমগোত্রীয়। শক্তিমান গল্পকাররূপে সিরাজ ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। একসঙ্গে এতগুলি বিভিন্ন স্বাদের গল্প পড়তে পাওয়ার সুযোগে পাঠকের কাছে লেখকের ব্যক্তিজীবন এবং ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বলা প্রয়োজন, জীবন সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে, যদিও লেখকের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ভরে উঠতে থাকে তবু, তার চাবিকাঠিটি সবাই পেয়ে যান বাল্য-বয়ঃসন্ধিকালের মধ্যেই। সিরাজও তাই পেয়েছেন, সেই চাবিকাঠি, সেই চোখ তিনি শৈশব-কৈশোরের গল্প না লেখার দিনগুলিতে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থের আদি গল্প মৃত্যুর ঘোড়া মূলত সেই জীবনেরই উপক্রমণিকা। এক বয়সে তিনি যেমন করে জলে-জঙ্গলে ঘুরেছেন, চাষবাসী মানুষের গা ঘেঁষে থেকেছেন, প্রকৃতিকে প্রকৃতিস্থ-অপ্রকৃতিস্থ জনমনুষ্যের মত দুই রূপে দেখেছেন, রূপকথা লোকশ্রুতির সঙ্গে যেভাবে ব্যক্তিগত রোমাঞ্চ অনুভব করেছেন—সেই জগৎ এবং জীবন উত্তরকালে তাঁর কালিকলমে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাঁর বয়স বেড়েছে, বুদ্ধিবিদ্যা বেড়েছে, দেশান্তর-কালান্তরে তাঁর সেহমন অন্য অভ্যাস আরাম আয়ত্ত করেছে, তিনি হয়ত যাপন করছেন অন্য জীবন, কিন্তু সেই গ্রাম, সেই বাংলা, সেই আদিম জীবনযাপন ভুলতে পারেননি। অতিআধুনিক শহরজীবনে এসে, বুদ্ধিজীবিতার আভিজাত্য-অহংকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি তার অন্তঃসারশূন্যতা টের পেয়ে গেছেন। রক্তের মধ্যে যে বিপন্ন বিস্ময় রয়ে গেছে, তার হাত থেকে কোন মানুষেরই পরিত্রাণ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহমরণ কোথাও সত্য হয়ে উঠেছে।

আদিমতাকেই স্বাগত স্বীকৃতি দিয়েছেন গল্পকার। প্রকৃতি এবং যৌনতা, এই দুয়ে মিলে মানুষের নিয়তি তৈরী হয়ে চলেছে। ভেতরে বাইরে এই দুই মৌল শক্তি কাজ করে যাচ্ছে নিয়ত। মানুষের রক্তের স্পন্দনে এবং গভীরে এরই সর্বনাশা টান, মানুষ যতই সভ্য হোক, পরতে পরতে পোশাক পরুক তার চৌম্বকক্ষেত্র এক। এই ভাবনা থেকেই সিরাজ প্রধানত গল্প লেখেন। গল্পের অর্থে গল্প নেই তাঁর গল্পে, অর্থাৎ নিটোল কাহিনী, টানাবোনা প্লট; কতকগুলি ঘটনা পরম্পরা এবং পরিবেশ তাঁর গল্পের জনমানুষকে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলকে নিয়ে পৌঁছে দেয়। পৌঁছে দেয় জীবনের নিদারুণ অন্ধকারে। জীবন যে কত ঠুনকো, কত দরিদ্র এবং গভীন্যগামিক, বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্ন দিগন্ত আবিষ্কৃত হয়। শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীর মাঝখানকার নিষ্ঠুর ও হাস্যকর দেওয়ালটি তুলে দিলে দুই মানুষ কত ভয়ংকর রকমে কাছাকাছি অথচ পরস্পরের দিকে অন্ধের মত পিঠ ফেরানো প্রচ্ছন্ন খেলাঘের সঙ্গে সিরাজ তাঁর একাধিক গল্পে এই তত্ত্বতাৎপর্য তুলে ধরেছেন।

সিরাজের গল্পের একটা নিজস্ব আদল তৈরী হয়ে গেছে—অনেক নবীন গল্পকারের নাম মুছে দিলে যেমন তাঁদের গল্প পৃথক করে চেনা যায় না—সেরকম নয়, পড়লেই স্বাদে চেনা যায়। তাঁর ভাষাটিও বিশিষ্ট। একই সঙ্গে কবিত্বময় এবং জীবনধর্মী, রুক্ষ, অসমান। নিচু মানুষের মুখের অপভাষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কলমে। এক বিশেষ অঞ্চলের শব্দ শুধু নয়, যেন গন্ধও।

তাঁর সূর্যমুখী, নীল পালক, পুষ্পবনে অগ্নিকান্ড, মাটি, ইন্তিপিসি ও ঘাটবাবু, আরেক গাছের গল্প, ঘর, জননী প্রভৃতি গল্পগুলি বহুকাল মনে রাখবার মত। একটা বিষয় লক্ষ্য করবার, আলোচ্য গ্রন্থে অনেকগুলি জোড় মেলান গল্প আছে—যারা কবিতার মত এক সূক্ষ্ম সুরের গ্রন্থিতে যুগলবন্দী, কেবল বিষয়ের সাদৃশ্যেই নয়।

যেমন 'কালবীজ'-এ উঠতি বয়েস থেকে দেশচরা মেয়ে কুসুমের জীবনেও নারীর সর্বস্ব সমর্পণের একটা মুহূর্ত এসেছিল। চুড়ি ফেরি করে বেড়ায় সে, একদিন মাঠের মধ্যেই তার জীবনসন্ধির সংকট ঘনিয়ে এল, সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় সংশয় পার হয়ে সে একটানে নিজেকে খুলে দিল : থাবড়া বড় বড় হাতের থাবা পড়ল গায়ের পরে। চোখের পলকে আকাশমাটি যেন বদলে গেল। কিন্তু তারপর? সেই তো রহস্য, তারপর। ঠিক সূর্যমুখী গল্পের মতই এর ভতুড়ে রেশ। অবচেতন মনের দুঃস্বপ্ন না অশরীরী ব্যাপার! দুটি গল্পেই একটি নারী আর একটি পুরুষের জীবনের চরম মুহূর্তের স্মৃতি সোনা হয়ে আছে। 'মাটি' আর 'ঘর' গল্প দুটিরও গভীর শিকড় মিল। যেমন মিল 'ইন্তিপিসি ও ঘাটবাবু'র সঙ্গে 'জাতীয় মহাসড়কে' গল্পটির। ভিত অকারণ হয়ে যাওয়া ভেসে বেড়ানো মানুষের কাহিনীই এ যুগের কাহিনী, সিরাজের কাহিনী। প্রকৃতির প্রজননশীল মাটি সরে গেছে আজকের মানুষের পায়ের তলা থেকে।

গল্পগুলির প্রতীকী উপসংহার একটা সূক্ষ্ম তান বিস্তার করে চলে। 'বরের প্রত্যাশা', 'বাথরুম', 'আরেক গাছের গল্প' 'পলাতক' এই চারটিও এই ধরনের গল্প। 'আমি ও বিপাশা' এবং 'সবুজ জলা' বার্থ প্রেমের বিষণ্ণতার সঙ্গে প্রকৃতির একটা সজীব ভূমিকা মিশেছে।

সিরাজের কাছে আমাদের আরও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা থাকল। গ্রন্থটিতে সূচীপত্র থাকলে ভাল হত।

পর্বতাভিযান কাহিনী

লাহুলে সিংহের সন্ধানে। শিশির ঘোষ। **দেয়া পুস্তকালয়,** ৮।১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২। মূল্য ছয় টাকা।

প্রতিটি পর্বত আরোহণকারীর পক্ষে একটি নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চ্যালেঞ্জ। শুধু তাই নয় পরিবর্তনশীল স্বভাবের জন্য পর্বত বিভিন্ন অভিযাত্রীর কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা উপস্থাপিত করে, নতুন সমস্যার নিরিখে আরোহণকারীর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে যাচাই করে নেয়। সেইজন্য পর্বতারোহণের কাহিনীর প্রতিটিরই একটি নিজস্ব আকর্ষণ থাকে। অবশ্য কাহিনীকারের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতা ও গভীরতা এবং প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষের ওপর সেই আকর্ষণ অনেকাংশে নির্ভর করে।

"লাহুলে সিংহের সন্ধানে"-র লেখক শিশির ঘোষ এই প্রথম একটি পর্বতারোহণ অভিযানের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনায় নবাগতের ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। স্বল্প দৈর্ঘ্যের বইটিতে তিনি অত্যন্ত সাবলীল ও চিত্তাকর্ষকভাবে কয়েকজন বাঙালী তরুণের ১৯৭২ সালে লাহুল হিমালয়ের 'লায়ন' ও 'সেন্ট্রাল' শৃঙ্গ দুটিতে সফল অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

ঐ অঞ্চলে পূর্ববর্তী অভিযানগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংযোজন, এবং বিভিন্ন পর্বতারোহণকালে বিপদের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির সাহসিকতা ও স্বার্থত্যাগের কয়েকটি মানবিক আবেদন সমন্বিত ঘটনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ বইটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর নাম বাংলা উচ্চারণে র‍্যাঁবো লেখাই চলতি রীতি। র‍্যাঁবো এবং ভের্লেনের কবিতার সব থেকে সফল অনুবাদক শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বইতে ওই উচ্চারণ এবং ওই বানানই রেখেছেন। শুধু বছর দশেক আগে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যখন অন্য দেশের কবিতার বাংলা রূপ উপহার দিচ্ছিলেন, তখন জানা গিয়েছিল, ফরাসীরা নাকি 'হ্যাম্বো' উচ্চারণ করে। তা 'হ্যাম্বো' অবশ্য টেঁকেনি। বাংলায়, তার পরেও এ-যাবৎকাল র‍্যাঁবোই চলছিল।

আরতি দাশ অনূদিত **পল ভ্যারলেনের কবিতা** (পরিবেশক : দে বুক স্টোরস, কলকাতা ১২, পাঁচ টাকা) গ্রন্থে প্রথম ধাক্কা ভ্যারলেন, দ্বিতীয় আঘাত র‍্যাঁবোকে লেখা 'রিমবড'। আরতি দাশ যে মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছেন তা তো লিখিত আকারেই জানিয়েছেন, সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর করার জন্য মূল ফরাসী এক পৃষ্ঠায় রেখে অন্য পৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদ ছেপেছেন। এতে যে কী লাভ জানি না। মূল ফরাসী যিনি জানেন না, তার জন্যই তো বাংলা অনুবাদ। সুতরাং ফরাসী কেন? আর ফরাসী যাঁর জানা, শ্রীমতী দাশের অনুবাদ ফরাসীর প্রতি আনুগত্য-টুকু কতটা খুঁজে পাবেন জানি না কিন্তু বাংলা ভাষায় তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য পদে-পদে চোখে পড়বে। কবিতার অনুবাদের জন্য কাজ-চালানো বাংলা জানাটাই যথেষ্ট নয়, ফরাসী জানা তো নয়ই, বাংলা কবিতার ভাষাতেও কিঞ্চিৎ দখল থাকাটা জরুরী। শ্রীমতী দাশের যে সেটা নেই তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর করা অনুবাদ ও পূর্বসূরীর অনুবাদ পাশাপাশি তুলে ধরছি। "আমি চলেছি আমার/বাতাসে ভর করে।/হেথা সেথা মরা পাতা/যেমন উড়ে পড়ে। (শরতের গান, শ্রীমতী দাশের অনুবাদ)। এর পাশাপাশি রাখছি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত একই কবিতার অনুবাদ-রূপ : "প্রবল ক্ষ্যাপা ঝড়ে/আমায় নিয়ে ওড়ে/কোথায় হে বিধাতা,/জানি না কোন্‌খানে/চলেছি কার টানে/যেমন ঝরাপাতা।" (হেমন্তের গান : র‍্যাঁবো, ভের্লেন এবং নিজস্ব)।

*

উদ্‌ভ্রান্ত বিরচিত **উদ্‌ভ্রান্তের ডায়েরী** (রামায়নী প্রকাশ ভবন, কলকাতা ৯, তিন টাকা)। টুকরো-টুকরো রম্য রচনার সংগ্রহ। রম্য রচনা বলতে যে-বিশিষ্ট সাহিত্য-প্যাটার্ন মনে ভাসে, এগুলিকে যথার্থ অর্থে তার প্রতিরূপ বলা যাবে না। এর মধ্যে এক পৃষ্ঠার রূপক রচনা যেমন রয়েছে, তেমনি পদ্য-আকারে রঙ্গ-ব্যঙ্গও পরিবেশিত, আবার চার লাইনের হাস্যরসও স্থান পেয়েছে। ডায়েরীর ছিন্নপত্র কথাটাই বোধ হয় অনেক কাছাকাছি। শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী তাঁর ছোট্ট ভূমিকায় অবশ্য তাই বলেছেন।

'উদ্‌ভ্রান্ত' ছদ্মনামের আড়ালে এই ডায়েরী-লেখক কে জানি না, কিন্তু তাঁর কিছু রচনায় ব্যঙ্গরস সৃষ্টি ক্ষমতার নির্ভুল পরিচয় ছড়ানো। চারপাশের এই সমাজের অসঙ্গতি ও বিচ্যুতির প্রতি, অসাম্য ও দুর্দশার প্রতি, ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি সজাগ, কলমও সেই অনুযায়ী তৎপর। দৃষ্টির এই তির্যকতাকে সম্বল করে বড়ো ধরনের ব্যঙ্গ রচনায় তিনি যে সফলতা দেখাতে পারবেন সে-প্রতিশ্রুতিময় আভাস ফুটে উঠেছে এই গ্রন্থের কয়েকটি রচনায়।

*

বঙ্কিমচন্দ্র ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাস— এই শিরনামে দুটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ এবং ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৫—এই দশ বছরে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের সাতটি উপন্যাস নিয়ে পৃথক আলোচনা গুচ্ছ স্থান পেয়েছে **ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র** (প্রকাশক : অশোককুমার ভট্টাচার্য, চন্দ্রনিলয়, পর্ণশ্রী-পল্লী, কলকাতা ৬০, তিন টাকা) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে। এই গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। যতদূর অনুমান, বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক, লোকসাহিত্যবিদ, নাট্যসাহিত্যের আলোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য ইনি নন। অভিন্ন নামের নবীন সমালোচক।

কিন্তু নবীন হলেও শ্রীভট্টাচার্যের আলোচনারীতির স্পষ্টতা ও ভঙ্গি বেশ আস্বাদনযোগ্য। দুর্গেশনন্দিনী থেকে চন্দ্রশেখর পর্যন্ত উপন্যাসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি অনাড়ষ্ট, মুক্ত, যুক্তি-পূর্ণ ভঙ্গিতে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন : প্রাঞ্জল তাঁর ভাষা, নির্ভুল তাঁর গদ্য স্বচ্ছন্দ তাঁর বিচরণ। শুধু বড়ো সংক্ষিপ্তায়তন তাঁর আলোচনা—এই আক্ষেপ মাঝে-মাঝে মনে উঁকি দিতে পারে পাঠকের। যেমন "শরৎচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই সমধিক"—এই জাতীয় মন্তব্য এক পংক্তিতে শেষ না হয়ে কিছু বিশ্লেষণ দাবি করে। কিন্তু স্থানাভাবে তিনি সেই দাবি মেটাতে পারেননি।

*

মহারাজ তোমাকে (অধুনা সাহিত্য, হালিশহর, তিন টাকা)। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। নীলে আর রূপোলিতে নিজেরই আঁকা প্রচ্ছদ, খুব যত্ন নিয়ে ছাপা এই বই, নিষ্ঠাবান, সমর্পিত-প্রাণ এক সাহিত্য প্রেমিক যুবককে অক্লেশে চিনিয়ে দেয়। হৃষীকেশ গল্পও লেখেন, তবু কবিতা নিয়ে তাঁর গোপন অহঙ্কার চাপা থাকেনি "আমি শব্দকে কখনো শব্দহীন করেছি, কখনো কোলাহল/শব্দের শরীরে আরোপ করেছি সুর/তাকে ভরিয়ে দিয়েছি রঙে/আর অবশেষে তুলে ধরেছি পতাকা" কিংবা "আমরাও একদিন বর্তমান ফেলে যাবো অনেক পিছনে/আমাদের জন্যেও একদা সমবেত প্রার্থনা হবে/আসন্ন সেদিন/অন্তত একজনও, আমি, কিছু দিয়ে যেতে পারি তরল আগুনে।" হৃষীকেশের ভাষা বেশ জোরালো, কিন্তু কোথাও কোথাও অতি-কথনের প্রবণতা। বিশেষত, ব্যক্তি-বিশেষকে উদ্দেশ করে লেখা রচনায় এই ভঙ্গি প্রকট। অন্যত্র, যেমন, "আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি দাঁড়িয়ে রয়েছি আর দাঁড়িয়ে রয়েছি" তিনবার ব্যবহারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার ক্লান্তি ও কাতরতা, বিমূঢ় গন্তব্যহীনতা চমৎকার ফুটেছে, কিন্তু হৃষীকেশ ভরসা না রেখেই পরের পংক্তিতে লিখলেন 'গতিহীন, অসম্ভব কাতর অস্তিত্ব'। দ্বিতীয় পংক্তিটি যে শুধু অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, ক্ষতিকরও।

খেলার মাঠে

ফুটবল ডাবল এবং অনন্য কীর্তি

একই বছরে লীগ ও শীল্ড জয়কে বলা হয় ফুটবলে 'ডাবল' লাভ, যেমন এক বছরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ, ডুরান্ড কাপ জয়কে বলা হয় ট্রিপল ক্রাউন। ইস্ট বেঙ্গলের ট্রিপল ক্রাউন লাভের নজির আছে। ডাবলসের সম্মান তো বহুবার। গত তিন বছর ধরেই পাচ্ছে। আগেও পেয়েছে, এবারও পেল।

কিন্তু এবারের বিশেষত্ব, উপর্যুপরি ছ' বছর লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ এবং উপর্যুপরি চার বছর শীল্ড জয়ের সঙ্গে 'ডাবল'। প্রতিটি ঘটনা পৃথক পৃথকভাবে যেমন নতুন রেকর্ড, তেমন যুগ্মভাবেও নতুন কীর্তি। কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে সিভিল, মিলিটারি এবং ইউরোপীয় কোন দল টানা ৪ বছর শীল্ড বিজয়ী হতে পারেনি, কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়নও হয়নি টানা ৬ বছর। আগের সপ্তাহেই লিখেছি, পর পর ৬ বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার মধ্যে আবার পাঁচ বছরই অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব। এটাও নতুন রেকর্ড। আর একটি নতুন রেকর্ড এবার শীল্ড ফাইনালে চির-প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাবকে ৫—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা।

১৯২০ সালে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব সৃষ্টির পর থেকে মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের ক্রীড়া সংগ্রাম লেগেই আছে এবং দুই প্রধানের খেলাটা দাঁড়িয়ে গেছে মর্যাদার লড়াইয়ে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনবার ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পাঁচটি গোল করতে পারেনি। ১৯৩৬এ লীগের খেলায় চারটি গোলই ছিল রেকর্ড। অপরদিকে শুধু ইস্ট বেঙ্গল কেন, মোহনবাগান কি তার সুদীর্ঘ ক্লাব ইতিহাসে আর কোনদিন কোন ক্লাবের কাছে এমন শোচনীয় হার স্বীকার করেছে? হ্যাঁ, স্মরণীয় কালের মধ্যে একবার হেরেছিল সফরকারী চাইনিজ দলের কাছে ১—৮ গোলে। কিন্তু সেটা ছিল প্রদর্শনী খেলা। কলকাতার মাঠে কিভাবে যেন গোলগুলি হয়ে গিয়েছিল। চাইনিজ দল যে তেমন শক্তিশালী ছিল না তার প্রমাণ, আই এফ এ একাদশের কাছে পরের খেলায় তাদের শোচনীয় পরাজয়।

মোহনবাগানের এই বিপর্যয়ের যারা কোন হদিস পাচ্ছেন না বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে লীগের খেলায় প্রশংসনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্য দল হিসাবে ইস্ট বেঙ্গলের জয়ের কৃতিত্ব কণামাত্র খাটো না করেও তাদের বলব, খেলায় এমন ফলাফল মাঝেসাঝে ঘটে থাকে। যেমন ঘটেছিল ওই চাইনিজ দলের বিরুদ্ধে। যেমন হয়েছিল ১৯০০ সালের শীল্ড ফাইনালে। সে সময় ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানের মত ক্যালকাটা ও ডালহৌসি ক্লাব ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯০০ সালে দুই দলের প্রথম দিনের ফাইনাল খেলাটি ছিল গোল শূন্য। পাল্লা চলেছিল সমানে সমানে। দ্বিতীয় দিনের ফাইনালে ক্যালকাটা ৬—০ গোলে ডালহৌসী ক্লাবকে পরাজিত করেছিল। আই এফ এ শীল্ডের ৮৩ বছর ইতিহাসে সেই ৬ গোলই ফাইনালে বেশি গোলের রেকর্ড। আর একবার ফল মীমাংসা হয়েছিল ৫—১ গোলে। ১৯২৫ সালের ওই ফাইনালে বিজয়ী হয়েছে স্কট ফুসিলিয়ার্স এবং বিজিত চেশায়ার রেজিমেন্ট। ছিল প্রায় সমশক্তিসম্পন্ন সামরিক ফুটবল দল। সুতরাং মাঝেসাঝে খেলায় এমন ফল হয় বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা করা চলে না। তাই মোহনবাগানের বিপর্যয়, যার ফলে উমাকান্ত পালোধি নামে সাউথ সিঁথি রোডের এক যুবক বিষপানে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে, তাকে আমি ক্রীড়া লজ্জার দৈন্য বলে ধরে নেব না। ৯০ মিনিটের ছোট ছোট ভুল, অনভিজ্ঞ তরুণ গোলরক্ষকের সাথে তা, স্নায়ুচাপ, আর সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনার ত্রুটিতেই ব্যাপারটা ঘটে গেছে। একটি গোল খাবার পর পেনাল্টি কিকের নির্দেশে ... মেজাজ খারাপ করায় পৌঁছিয়েও খেলতে পারেনি। অপরদিকে শুরু থেকে গোলের গন্ধ পেয়ে ইস্টবেঙ্গল মেতে উঠে ক্রীড়াবিন্যাসে পারিপাট্য দেখিয়েছে। সময়

শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ৫—০ গোলে জয়ের পর কোচ প্রদীপ ব্যানার্জিকে কাঁধে তুলে ইলিশ মাছ সহ মাঠ প্রদক্ষিণ করছে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা

শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগানকে ৫—০ গোলে পরাজিত করার পর দর্শকদের অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে মাঠ প্রদক্ষিণ করছে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক অশোক ব্যানার্জি

শীল্ড ফাইনালে চারটি গোল খাবার পর দুঃখে ও হতাশায় মাঠের মধ্যে বসে কাঁদছে মোহনবাগান গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলী

ও গোলের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস বলীয়ান হয়েছে। যদিও ফাইনালে মোহনবাগান ছাড়া অন্য কোন খেলায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়নি, তবু কোয়ার্টার ফাইনালে পুলিসের বিরুদ্ধে ৫টি এবং সেমিফাইনালে বেহালা ইয়ুথের বিরুদ্ধে ৭টি গোল করায় ইস্টবেঙ্গলের আত্মবিশ্বাস আগে থেকে বেড়েই ছিল।

বড় খেলায় একটি গোল করে এগিয়ে যাওয়া প্রতিপক্ষের মনোবল নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। দুটি গোলে এগিয়ে গেলে তো কথাই নেই। এই দুটি গোলই কিন্তু হয়েছে মোহনবাগানের তরুণ গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলীর ভুলের ফলে। সত্যি কথা বলতে, রঞ্জিত মুখার্জির তৃতীয় গোলটি ছাড়া বাকি চারটি গোলের ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়দের কৃতিত্বের চেয়ে মোহনবাগান ডিফেন্সের ব্যর্থতাই বেশি করে প্রকট হয়েছে। চতুর্থ গোলটি তো ভাস্করের অমার্জনীয় ত্রুটির ফল। এবং সেটা বুঝতে পেরেই ছেলেটি মাঠের মধ্যে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল গ্লানি, লজ্জা ও হতাশায়। গোলকিপার হচ্ছে লাস্ট লাইন অফ ডিফেন্স। তার একটি ভুলই মারাত্মক। সেখানে ভুলের পর ভুল হলে যা হয় খেলার সেই ফলই হয়েছে। ১৯৪০ সালেও হয়েছিল। সেবার এরিয়ান ফাইনালে মোহনবাগানকে হারিয়েছিল ৪—১ গোলে।

আমার এই লেখা পড়ে কেউ যেন মনে না করেন আমি মোহনবাগানের ব্যর্থতার সাফাই গাইছি—ইস্টবেঙ্গলের কৃতিত্বের কদর করছি না। অবিশ্বাস্য এক ফলের সমীক্ষার জন্যই এত কথা বলতে হল। নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গল খেলেছে শৌর্য ও শৈলীর সঙ্গে সুর, লয়, ছন্দ মিলিয়ে। দলগত সংহতি ও মানসিক দৃঢ়তার সংমিশ্রণে। যে শিল্পী সমন্বয়ে ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণ অধ্যায়ের হীরকদ্যুতি তার মধ্যে নিঃসন্দেহে দেদীপ্যমান ছিল সুরজিৎ সেনগুপ্ত। এমন পরিমার্জিত, বুদ্ধিপ্রযুক্ত এবং খেলার মধ্যে শিল্পীর সৌন্দর্য কমই দেখা গেছে। পাঁচ গোলে পরাজিত দলের পক্ষে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে সুব্রত ভট্টাচার্য তার বলিষ্ঠ ক্রীড়া ভূমিকায়।

রেকর্ডের জন্যই লিখছি। ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে গোল করে সুরজিৎ সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপা (২), রঞ্জিত মুখার্জি ও শুভঙ্কর সান্যাল। পেনাল্টি কিক থেকে গোল করতে পারেনি শ্যাম থাপা। ইস্টবেঙ্গল প্রথমার্ধে তিনটি ও বিরতির পর দুটি গোল করে। ফুটবল মরসুমের একেবারে শেষদিনে, অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে মোহনবাগান মাঠে অনুষ্ঠিত এই ফাইনাল খেলার রেফারী ছিলেন আসামের বাবুল বার্মিজ।

সাড়ে ১৭ কোটি টাকার লড়াই

গত ১ অক্টোবর কয়েজন সিটির ফিলিপিন কালিসয়ামে হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের খেতাবী লড়াই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লড়াই হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বংশ পরম্পরায় আলোচিত হবে এই লড়াইয়ের কথা। ইতিহাসের কোন মুষ্টিযুদ্ধে দুই মহাশক্তিধরের মধ্যে এমন তীব্র সংগ্রাম হয়নি, কোন মুষ্টিযুদ্ধে এত অর্থও সংগৃহীত হয়নি।

এখনও পাকা হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে উদ্যোক্তাদের ধারণা, দর্শনী এবং টেলিভিশনের রয়্যালটি থেকে কম করে ২২ মিলিয়ন ডলার পাওয়া যাবে। ২২ মিলিয়ন আমাদের মুদ্রার হিসাবে দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। বিজয়ী মহম্মদ আলী পেয়েছে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, বিজিত জো ফ্রেজিয়ার ৪ কোটি টাকা। দুজনের মাত্র ৪২ মিনিটের উপার্জন।

দুই নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধার তিনটি লড়াইয়ের উপার্জন কত? মহম্মদ আলীর ১১ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, জো ফ্রেজিয়ারের ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। সবাই জানে ১৯৭১-এর মার্চ মাসে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ১৫ রাউন্ড-ব্যাপী লড়াইয়ে আলী পয়েন্টে হেরে গিয়েছিল ফ্রেজিয়ারের কাছে। গত বছর জানুয়ারি মাসে ওই একই যায়গায় ফ্রেজিয়ার হেরেছিল আলীর কাছে পয়েন্টে ১২ রাউন্ড লড়াইয়ের পর। প্রথম লড়াইয়ে দুজনই পেয়েছিল ২ কোটি করে টাকা, দ্বিতীয় লড়াইয়ে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ করে। এছাড়া মুষ্টিযুদ্ধ থেকে দুজনে আরও কত
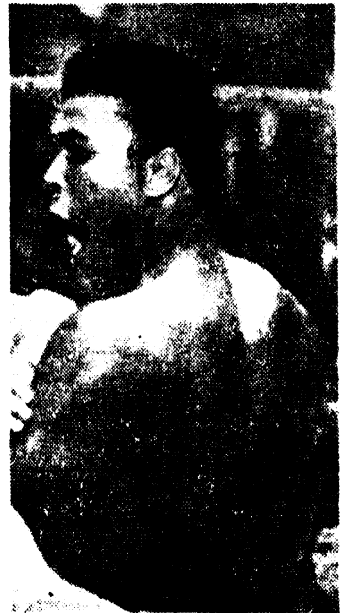
মহম্মদ আলী

কোটি টাকা উপার্জন করেছে তার হিসাব মেলানো শক্ত।

যাই হোক ফ্রেজিয়ারকে টেকনিক্যাল নক আউটে পরাজিত করে অবিসংবাদী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবে আলী তার ভাবমূর্তি বজায় রেখেছে। ১৪ রাউন্ড লড়াইয়ের পর ফ্রেজিয়ারের অসহায় অবস্থা দেখে তার ম্যানেজারের পরামর্শ মত রেফারী লড়াই বন্ধ করে দেন।

একলব্য

ভাগ্যবান সংগ্রামী বক্সার

হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে স্মরণীয় সংগ্রামের অভাব নেই। কিন্তু এবার ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত খেতাবী লড়াইয়ে বিজয়ী মহম্মদ আলী বিজিত জো ফ্রেজিয়ারের সংগ্রামের যে বিবরণ দিয়েছে, তা শুনে মনে হয় এমন সংগ্রাম আর হয়েছে কিনা সন্দেহ।

অমিত শক্তির অধিকারী যে মহম্মদ আলীর ঘুষির জোরের মতই মুখের জোর —যে সহজে প্রতিদ্বন্দ্বীর শৌর্যের স্বীকৃতি দিতে চায় না, সেই মহম্মদ আলী অকপটে স্বীকার করেছে, তার পরেই পৃথিবীর শক্তিশালী কঠিন মানুষ হচ্ছে জো ফ্রেজিয়ার।

আরও বলেছে, "যে লড়াই আমরা আজ করলাম মৃত্যুর সঙ্গে তার পার্থক্য সামান্য। যে মুষ্ট্যাঘাত ফ্রেজিয়ার সহ্য করেছে, আমি অন্তত তা সহ্য করতে পারতাম না। পৃথিবীর কোন হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা পারত কিনা সন্দেহ। সম্ভবত ব্যতিক্রম শুধু রকি মার্সিয়ানো, যে জীবনে কোনদিন পরাজিত হয়নি। এবং বলা বাহুল্য, ফ্রেজিয়ারের লড়াইয়ের ভঙ্গি মার্সিয়ানোরই মত। আমার উপর দিয়েও কি কম ধকল গিয়েছে? ওর আঘাতের পর আঘাতে কাহিল হয়ে দশম রাউণ্ডে আমি রণে ক্ষান্ত দেবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবলাম, আমি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, রণে ভঙ্গ দেওয়া আমার সাজে না। আমি জিতেছি বটে, কিন্তু এখনও আমার পা টলছে। আমি ক্লান্ত—অত্যন্ত ক্লান্ত। বিশ্রামের প্রয়োজন।"

সত্যিই ১৪ রাউণ্ডে ৪১ মিনিট ধরে দুই মহাবলী জঙ্গলের হিংস্র জন্তুর মত লড়াই করেছে। ষষ্ঠ ও দশম রাউণ্ডে দুইবার ফ্রেজিয়ারের প্রচণ্ড লেফট হুকে আলী টলতে আরম্ভ করেছিল। মনে হচ্ছিল রিংয়ের উপর সে পড়ে যাবে। কিন্তু নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে আবার প্রত্যাঘাত করে।

আলী বড়াই করে বলত, আমি রিংয়ের উপর প্রজাপতির মত নেচে বেড়াই, মৌমাছির মত হুল ফোটাই। এবার বলেছে—'আমি মৃত্যুর প্রায় মুখোমুখি হয়েছিলাম। 'স্মোকিন জো' অসাধারণ ফাইটার।

জোও বলেছে, 'আগের দুবার আমরা এমন তীব্র সংগ্রাম করতে পারিনি। আমি আলীর শালপ্রাংশু হাতের ঘুষিতে কাতর হয়নি। ১৪ রাউণ্ডের পর চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না'।

১৯৭১-এর মার্চে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে দুই বক্সার প্রথম লড়াইও কি কম তীব্র ছিল? ১৫ রাউণ্ডের পর ফ্রেজিয়ার পয়েণ্টে জিতেছিল বটে কিন্তু তিনমাসের জন্য তাকে হাস-পাতালে শয্যা নিতে হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন ফ্রেজিয়ার আর লড়তে পারবে না। তার কিডনি জখম হয়েছে। বউয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে আর লড়বে না। কিন্তু সেই ফ্রেজিয়ার যে এভাবে সংগ্রাম করবে, ইতিহাসের স্মরণীয় সংগ্রামে এমন শৌর্যের পরিচয় দেবে, অনেকেই আগে কল্পনা করতে পারেনি। তাই বিজয়ী আলীর মত বিজিত ফ্রেজিয়ারের ভাব-মূর্তিও বড় হয়ে উঠেছে।

কুয়ালালামপুরে খেতাবী লড়াইয়ে ইউ-রোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন জো বাগনারকে পরাজিত করবার পর 'দেশ'-এর ৩৯ সংখ্যায় (২৬ জুলাই ৭৫) মহম্মদ আলী সম্পর্কে লিখেছিলাম, বর্ণাঢ্য চরিত্রের বিস্ময়কর বক্সার। ফ্রেজিয়ার সম্পর্কে আজ লিখছি ভাগ্যবান সংগ্রামী বক্সার।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হলে কি সে ১৯৬৪তে টোকিও অলিম্পিকে হেভি-ওয়েটের স্বর্ণপদক পেত? কিংবা মহম্মদ আলীর কাছ থেকে মার্কিন সরকার বিশ্ব-

জো ফ্রেজিয়ার
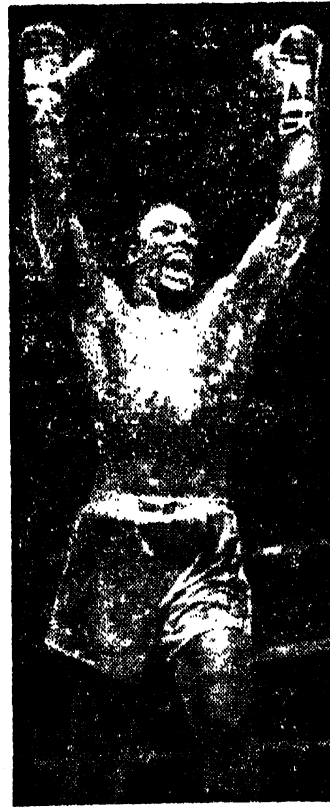
জয়ীর খেতাব কেড়ে না নিলে—৪৩ মাস আলী অনুশীলনের সুযোগ না পেলে কি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের গৌরব পেত? অথবা একজন কয়াই-এর পক্ষে কি ক্রীড়ায় কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা সম্ভব হত?

হ্যাঁ, ফ্রেজিয়ার ছিল ফিলাডেলফিয়ার একজন কসাই। দরিদ্র নিগ্রো পিতার সন্তান। শক্তিশালী বিরাট জোয়ানকে বক্সিংয়ের তালিম দিয়েছিল রেলের এক ওয়েল্ডার। নাম ইয়ান্সি ডারহাম। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যামেচার বক্সিংয়ে জো যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তখন বিশাল দেহী বাস্টার ম্যাথিস এক নম্বর বক্সার। কোনদিনই তাকে জো হারাতে পারেনি। অলিম্পিকের ফাইনাল ট্রায়ালে জোর মাথায় ঘুষি মেরে ম্যাথিস হাত ভেঙ্গে হাস-পাতালে গেল। জো গেল টোকিও অলিম্পিকে। সেখানে স্বর্ণ লাভও খুব সহজ হয়নি। ফাইনালে জার্মানীর একটু বেশি বয়েসী বক্সার হ্যানস হুবারের বিরুদ্ধে কোনরকমে পয়েণ্টে জিতে সোনা পেয়ে-ছিল। উল্লেখ্য, সেই ৬৪তেই সোনি লিস্টনকে হারিয়ে ক্যাসিয়াস ক্লে (পরবর্তী কালে আলী) হয়েছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। যাই হক, টোকিও থেকে ফিরে ফ্রেজিয়ার গেল হাসপাতালে, চোট লাগা হাত অপারেশন করাতে। চাকরীটিও হারাল। অলিম্পিক স্বর্ণ জয়ীর তখন নিদারুণ আর্থিক সংকট। সাহায্যের আবেদন এল সংবাদপত্র মারফৎ।

বক্সিংয়ের মাধ্যমে ওকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ফিলাডেলফিয়ায় গড়ে উঠল ক্লোভারলি ইনকর্পোরেটেড নামে এক সংস্থা। ২৫০ ডলার করে প্রথমে ওই সংস্থার শেয়ার হোল্ডার হয়েছিল ৪০ জন। ঠিক হয়েছিল পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধের উপার্জন থেকে ফ্রেজিয়ার সপ্তাহে পাবে ১৩০ ডলার আর উপার্জনের ৫০ ভাগ। বক্সিং টাকার খেলা। অল্পদিনের মধ্যে ফ্রেজিয়ার ফুলে ফেঁপে উঠল। ক্লোভারলি সংস্থার সদস্য হল ১০০০। প্রতি শেয়ারের মূল্য তখন ৭৫০০ ডলার। ৬৪তে বাস্টার ম্যাথিসের বিরুদ্ধে জয়ের পর ফ্রেজিয়ারকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে ধরে নিলেও (আলী তখন খেতাবহীন) প্রকৃত চ্যাম্পিয়নের সম্মান ১৯৭১এ আলীকে হারানোর পর।

শুধু আলীর সঙ্গে তিনটি লড়াইতেই পেয়েছে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। অস্কার বোনাভেনা, জর্জ চুভালো, ডাগ জোনস এডি মাচেন প্রভৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে আরও কয়েক কোটি। সহধর্মিণী ফ্লোরেন্স এবং পাঁচ সন্তানকে নিয়ে ৩১ বছর বয়সী ফ্রেজিয়ারের শান্তির সংসার। সম্ভবত আর বক্সিংয়ে ফিরে আসবে না।
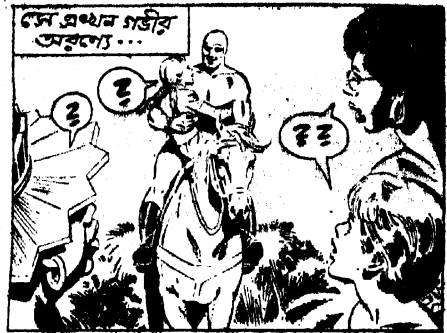
মুকুল

অরণ্যদেব লী ফক

সমুদ্র থেকে যে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে
হু!

কিন্তু আমার মনে পড়ছে না...

সে এখন গভীর অরণ্যে...
?
?
??

ইনি হচ্ছেন মিস টাগামা, ইনি গুরান-সর্দার, আর ওর নাম রাজা।
ওর নাম কী?
ভাল্লাগছে না...

আমি.. আমি বলব না।
নাম জিজ্ঞেস করে অন্যায় করলাম নাকি?
না, রাজা।

মেয়েটি সমুদ্রে একটা ভেলায় ভাসছিল, হাঙরের ঝাঁক ওকে ঘিরে ধরেছিল... কিন্তু ওর মনে নেই...একে বলে স্মৃতিভ্রংশ।
3/2

ওর সঙ্গে আমাকে খেলতে হবে নাকি?
ওকে আপন করে নাও, রাজা।

ছুঁয়ে দিয়েছি, রাজা!
না, ছোঁওনি!
হ্যাঁ, ছুঁয়েছে!
যাক, বেশ মিলেমিশে গিয়েছে!

আমি রানী... তোমরা আমার প্রজা...
মেয়েটি কে, কারাই বা ওকে ভেলায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, জানতে হবে।
মিষ্টি মেয়ে... কে ওর অনিষ্ট করতে চায়?
৯

"সুদূর নীহারিকা" (পরিচালনা : সুশীল মুখোপাধ্যায়) [illegible] সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

কলকাতার স্টুডিওগুলিতে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি দিনে ছবির মহরতের সংখ্যা বেড়ে যায়। রথ, মহালয়া, শ্রীপঞ্চমী ইত্যাদি ইত্যাদি তিথিগুলি প্রযোজকরা বেছে নেন মহরতের জন্য। এবারেও মহালয়ায় বেশ কয়েকটি ছবির মহরত হয়েছে। তার মধ্যে একটি ছবি কালারে তোলা হবে। বাংলা ছবি কালারে তুলতে খরচ যা পড়ে তাতে ছবির বাজার অনুপাতে খরচ ওঠানো মুশকিল। তবু কেউ কেউ সাহস করে এগিয়ে আসছেন। হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে গেলে কালারের প্রয়োজন খুবই বেশি। তবে এমন অনেক বাংলা ছবি সাদা-কালোয় তৈরী হয় যার খরচ কালার ছবির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সে ঝুঁকি যদি প্রযোজকরা নিতে পারেন তবে কালারের ঝুঁকি নিতে অসুবিধা কোথায়। অবশ্য কোন পরিচালকের পরীক্ষামূলক ছবির কথা আলাদা। তাঁরা ছবির বিষয়বস্তু অনুযায়ী ছবি কালারে করবেন কি সাদা-কালোয় করবেন সেই সিদ্ধান্ত নেন। বাকি ছবিগুলি, যা বকস-অফিসের দিকে নজর রেখে তৈরী হয় তা

কালারে করতে পারলে বোধ হয় ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রযোজকরা লাভবান হতে পারেন।

* * *

কিন্তু কমার্শিয়াল ছবি—তা কালারেই হোক আর সাদা-কালোতেই হোক—উপভোগ্যতাই সেসব ছবির সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি। দর্শকের ভালো লাগার কথা ভেবে যে-ছবি তৈরী তা যদি দর্শককে পরিতৃপ্ত করতে না পারে তবে কালারে তোলা হলেও বাঁচতে পারবে না। একটি উপভোগ্য ছবি যদি রঙীন হয় তবে তা ওই জাতীয় সাদা-কালো ছবির চেয়ে বেশি ব্যবসা করতে পারে। বড় বাজেটের ছবিতে যে টাকা লাগে তার কিছু কাটছাঁট করে কালারের খরচ খানিকটা যদি তোলা যায় তবে প্রযোজক লাভবান হতে পারেন।

রঙীন ছবির চাহিদা পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন কয়েকটি রাজ্যেও আছে বলে মনে হয়। কালারের কল্যাণে বাংলা ছবির বাজারের কিছুটা বিস্তৃতি ঘটানোও সম্ভব।

* * *

বাংলা ছবির রিলিজ সমস্যা মেটানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে পুজোর পর কিছুদিনের মধ্যেই সেনসর ওয়াইড রিলিজের ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। একটি ছবি রিলিজের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন বাক্সবন্দী অবস্থায় পড়ে থাকলে তার আনুষঙ্গিক খরচ বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে ছবি যদি তাড়াতাড়ি মুক্তি পায় তবে প্রযোজকের যে খরচটা বেঁচে যাচ্ছে সেটা কালার ছবির জন্য যে অতিরিক্ত খরচ তার কিছুটা পূরণ করতে পারে। প্রযোজকরা যদি এই সব দিকগুলি চিন্তা করে কালার ছবি তৈরীতে উৎসাহিত হন তবে বাংলা ফিলম ইনডাস্ট্রির কল্যাণ হতে পারে।

সন্ন্যাসী রাজা

(উমা [illegible])

ছবির শেষ ভাগে উত্তমকুমার যখন সন্ন্যাসী তখন তাঁকে দেখে যিশু-খৃষ্টের কথা মনে পড়তে পারে। কিন্তু এটা নিছক রূপসজ্জাই। ওই রূপকল্পনার মধ্য দিয়ে চরিত্রের অন্য কোন ব্যঞ্জনা দিতে চাননি পরিচালক পীযূষ বসু। কাহিনী (অসীম সরকার) এই পর্বে মহত্তর উত্তরণের সন্ধান দিতে পারত। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' সংগীত সহযোগে (অপূর্ব গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) তেমন একটি পরিবেশও রচিত হয়েছিল। কিন্তু পরিচালক বারোদী স্টেটের নির্যাতিত প্রজাদের দুঃখমোচনের কথাই ভেবেছেন। সেই সঙ্গে ভেবেছেন বাংলা সিনেমার গরিষ্ঠ সংখ্যক দর্শকের কথাও—যাঁরা নাটকেই তুষ্ট। রাজা সূর্য-কিশোর (উত্তমকুমার) তাই সন্ন্যাসীর বেশেই ফিরে গেছেন নিজের রাজ্যে। তখন ওই সন্ন্যাসী রাজাকে কেন্দ্র করেই নাটকের জটিলতা। প্রজারা জানত রাজা মৃত। রাণী ইন্দুমতী (সুপ্রিয়া দেবী) তাই জানতেন। কারণ একরকম তাঁর চোখের সামনেই ডাক্তার (রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়) রাজাকে খুন করেছে। একটি রাতের অসহায় দুর্বলতার পাকে রাণী তখন নিজেই নিজের কাছে বন্দী। সন্ন্যাসী রাজা আসল কি নকল এটা নির্ভর করছিল কমিশনের সামনে তাঁর স্বীকারোক্তির উপর। যার জন্যে তাঁকে জীবন দিতে হল ওই খল ডাক্তারের হাতেই। কমিশনের সামনে অমন করে কাউকে খুন যে করতে পারে এটা বিশ্বাস করা শক্ত। তাছাড়া কমিশনে যখন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত তখন উপযুক্ত প্রহরার ব্যবস্থা থাকাও উচিত ছিল। ব্যাপারটা ব্রিটিশ আমলের কিনা!

"সন্ন্যাসী রাজা"/উত্তমকুমার

ছবির যা কিছু নাটকীয়তা এবং চমক তার সবটাই শেষার্ধে। প্রথম দিকে দর্শকদের পরিতুষ্ট থাকতে হয় গানে গানে। নচিকেতা ঘোষ গানগুলির সুন্দর সুর করেছেন এবং মান্না দে গেয়েছেনও চমৎকার। রাজা সূর্যকিশোর সংগীতজ্ঞ এবং নৃত্যরসিক। নাচ-গানের আকর্ষণে তিনি নিজের স্ত্রীকেও যথোচিত সঙ্গ দান করেন না। এটা বোঝাতে গিয়ে পর পর অনেক গান দর্শককে হজম করে ফেলে। ছবির গতিও যেন ঝিমিয়ে পড়ে। তবে উত্তমকুমারের মুখে মান্না দে-র গান তো! দর্শকরা তাই কিছুটা আনন্দ পান বইকি। ডাক্তারের হাতে রাণীর নারীত্ব যে রাত্রে লাঞ্ছিত হল সেই রাত্রে একদিকে শয়নঘর আর একদিকে নাচঘর এই দৃশ্যপরম্পরা চিত্রনাট্যে চমৎকারভাবে বিন্যস্ত। গানের সুরের মধ্যেও যেন তখন আসন্ন প্রলয়ের আভাস। প্রজাবৎসল সংগীতরসিক খেয়ালী রাজার চরিত্রে উত্তমকুমারকে দর্শকরা যেমন পছন্দ করেন তেমন বোধ হয় আর কাউকে নয়। কিন্তু তাঁর অভিনয়ের গভীরতা আছে সন্ন্যাসী পর্বে। চিত্রনাট্য তাঁকে সাময়িক স্মৃতিভ্রষ্ট করেছে। এটার আদৌ কোন দরকার ছিল না। বরং উল্টোটা হলেই ভাল হত। আর স্মৃতিভ্রষ্টই যখন করা হল, তখন এত সামান্য আঘাতে স্মৃতি-শক্তি ফিরে আসা কেমন কেমন লাগে। তা সত্ত্বেও এসব জায়গায় উত্তমকুমারের অভিনয় খুব উঁচুদরের। সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয়ও শেষের দিকেই বেশি ভাল। প্রথম দিকে বঞ্চিতা রমণীর ভাব প্রকাশে একটু বাড়া-বাড়ি থাকলেও শেষ দিকে মুক্তবসনা সংসার-নির্লিপ্ত ভাবটি তিনি অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে দেখিয়েছেন। খল-চরিত্র রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের রাগিয়ে দিতে পেরেছেন। অভিনয়ে বেশি বাড়াবাড়ি ছিল না বলেই তাঁর অভিনয় এত ভাল। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে শম্ভু ভট্টাচার্য, স্বপনকুমার, তরুণকুমার, তরুণ মিত্র, মনোজ চক্রবর্তী, সুজাতা চৌধুরী প্রমুখ শিল্পীরা ভাল অভিনয় করেছেন। ক্যামেরার কাজও (বিজয় ঘোষ) উঁচু মানের। সেই সঙ্গে সম্পাদনা (বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়) এবং শিল্পনির্দেশনায় (সূর্য চট্টোপাধ্যায়) কাজও প্রশংসা পাবার মত।

প্রিয় বান্ধবী

(এস এম [illegible])

অনেক বছর আগে নিউ থিয়েটার্স প্রিয় বান্ধবী-র চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। অনেকগুলি কারণে সে ছবি স্মরণীয়। পরিচালক সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের সেই প্রথম চিত্র পরিচালনা। সেই ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গান গাওয়া। এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেটি শেষ অভিনীত ছবি। আজকের দর্শকরা সে ছবি হয়তো দেখেননি, সে-যুগের যাঁরা দেখেছেন তাঁদের স্মৃতিও অনেকটা ঝাপসা। হয়তো সেটাই বর্তমান চিত্ররূপের রক্ষাকবচ।

প্রবোধকুমার সান্যালের এই কাহিনী সেই যুগের যখন ইচ্ছা করলেই রোমান্টিক না হয়ে যাওয়া যেত। সে-যুগের অনেক উপন্যাসের চরিত্রই এমনটা হত। ওরকম একটা ফ্যাশন তখন চালু ছিল। আজকের দর্শকের কাছে তাই জহরের (উত্তমকুমার) চরিত্রটি অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে শ্রীমতীর (সুচিত্রা সেন) চরিত্রও। স্বামীর ঘর পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একটি মানুষের সঙ্গে রাত্রিবাস করতে গেলে (তা সে যতই নির্দোষ ব্যাপার হোক) আজকের মেয়েরা একশোবার ভাববে।

তবু, ধরা যাক, যদি এমন কোন পরিস্থিতিতে কোন মহিলা কোন পুরুষের স্কন্ধারূঢ় হয়ে পড়ে তখন সে কি করবে? যা যা করতে পারত অথচ করল না সেটাই আড়াই ঘণ্টার চিত্রনাট্যে বিন্যস্ত। জহর

"প্রিয় বান্ধবী"/সুচিত্রা, উত্তম

ধাবাবর। তার এই জীবনবিমুখতার কারণ কি? চিত্রনাট্যে তার উত্তর নেই। সে কি দার্শনিক? না তাও তো নয়। সুখ এবং ঐশ্বর্য তাকে রুদ্ধশ্বাস করে। গ্রাসাচ্ছাদন চলে কেমন করে? জুয়া খেলে। এবং সেই সঙ্গে দার্শনিক সুলভ গান গেয়ে। অচল আধুলি দিয়ে লোক ঠকিয়ে। মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে। মনুষ্যচরিত্র সত্যিই দুর্জ্ঞেয়। শ্রীমতী যখন তার পিতার বিপুল সম্পত্তি হাতে পেল এবং সেই সঙ্গে পেল সমাজসেবার দায়িত্ব তখনও তাতে জড়িয়ে পড়েনি জহর। কারণ তার জীবন উদ্দেশ্যহীন, অবলম্বনহীন। অগত্যা শ্রীমতীকেই পালটাতে হল জীবনের ধারা। সব ছেড়ে সে জহরের সঙ্গে পথকেই অবলম্বন করল। জহর কিন্তু তখন তাকে আর ফেরাতে পারল না। কারণ সে তো আর মহাপুরুষ নয়। নিছক উদ্দেশ্য-হীন একটি পুরুষমানুষ মাত্র।

অবিশ্বাস্যতার এই পর্বতপ্রমাণ বোঝা মাথায় নিয়েও পরিচালক হীরেন নাগ ছবিটিকে যে মোটামুটি এগিয়ে নিয়ে গেছেন সেটাই তাঁর বড় কৃতিত্ব। ছবিতে তিনি কোন কালের আভাস দেননি। ইচ্ছেমত বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় দেখে মনে হতে পারে যুদ্ধপূর্ব যুগের। কিন্তু দেওয়ালের লিখন আবার অন্য কথা বলে। সেখানে সমকালীন শ্লোগান।

এই পরিস্থিতির মধ্যেও আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেন। একটি অবিশ্বাস্য চরিত্রও ব্যক্তিত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে উত্তমকুমারের অভিনয়ের গুণে। তীক্ষ্ণ সংলাপের ক্ষেত্রেও যেমন তিনি দর্পক-বলিষ্ঠ, নিরুচ্চার ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁর অভিনয় তেমনি সূক্ষ্মতার স্পর্শে উজ্জ্বল। সুচিত্রা সেনও তাঁর অভিনয়ে অসহায়তা, নির্ভরতা, তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব সব কটি ভাবই চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন। ওঁদের এই সম্মিলিত অভিনয় ছবির বড় সম্পদ। হয়তো একমাত্র সম্পদ। না, আরও একটি সম্পদ আছে। সেটা কানাই দে-র ক্যামেরার কাজ। ছবির মুড অনুযায়ী তিনি আশ্চর্য সুন্দর কাজের পরিচয় দিয়েছেন। গান আছে তিনটি। নচিকেতা ঘোষের সুরে প্রায়শই একটি মাদকতা থাকে। এখানে তা অনুপস্থিত। গানগুলি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়। ওঁদের কণ্ঠসম্পদের গুণে দর্শকরা তৃপ্তি পাবেন কিছুটা। এছাড়া অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে সুশীল মজুমদার, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, গীতা দে, অরুণ রায়, নির্মল ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, হরিধন প্রমুখ শিল্পীরা চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়েছেন। অল্প অব-কাশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছেন।

শুটিং চলছে ...

ফুল এখন: ফুল এখন দুজনার মাঝ-খানে। নয়ন আর শ্যামা। নয়নের চেহারাটা রুক্ষ। একমুখ দাড়ি। চোখে সানগ্লাস। লম্বা দেহ। চোখ নাক তীক্ষ্ণ। চিবুকটা ঈষৎ ঝুঁকেছে। চোয়াল ক্রমশ শক্ত হচ্ছে। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে প্রতিবাদের। শ্যামার চেহারাটা কোমল। চোখে আয়নার গভীরতা। লাবণ্যে ভরা মুখ। শরীরে সাধারণ শাড়ির আবরণ। অনুভবে ভোরের আলো। সুখের অন্বেষণ। নয়ন, প্রাক্তন সময়ের অন্তরে নিমেষেই আসা যাওয়া করতে পারে। এবং সময় তার সকল অস্তিত্বের সঙ্গী হয়। চোখের পাতা বন্ধ অন্ধকারে অস্থির হয়ে ওঠে। তার কেবলই মনে হয় একটা শাণিত ছুরি অন্ধকারকে দুভাগ করে দিচ্ছে। একটা আর্ত চিৎকার প্রতিধ্বনি করছে। উষ্ণ নিশ্বাস বইছে। রক্ত। গলগল করে রক্ত ঝরছে। এ রক্তের চরিত্র আলাদা। একে-বারেই আলাদা। পাপের না পাপমোচনের তা সে জানে না। জানে, বাবার অনেক টাকা আছে—অনেক সম্পত্তি আছে—অনেক লোভ আছে। অতএব ছকে বাঁধা জীবন ও সাফল্যের পথটা তার জানা ছিল। আজ সে ডাক্তারী পাস করে একটা সুন্দর সাজানো শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিলাসবহুল চেম্বার-এ বসে থাকতে পারত। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারত। গাড়ি হাঁকিয়ে শহরের বুকের ওপর দিয়ে দিব্যি হতে পারত তার যাতায়াত। অথচ সে আপাতত পুরুষোচিত ক্লান্তি অথবা হতাশার মধ্যে আত্মস্থ। হতাশার ঝাপটা তাকে দিনের পর দিন ভীষণ করে তুলছে। ঠিক এমনটাই যে হবে সে জানতো। ভালবাসার ফোনাগুলো একদিন উথলে উঠবে সে জানত। শ্যামার কাছে পৌঁছতে গিয়ে নয়ন শেষ পর্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সাপের বিষ ধারণ করেছে: এই পরিণতিও বোধহয় তার জানা ছিল। কেননা শ্যামা, কলেজে পাঠরতা কলকাতার সপ্তদশী কিম্বা অষ্টাদশী, নয়নের রুক্ষতা পছন্দ করেনি...নয়নের হতাশা আপন করে ভাবেনি ...নয়নের ভালবাসা বুঝতে পারেনি। নয়নের ভীষণ হয়ে ওঠা, শ্যামার অন্তরীক্ষের অসহায়তা, জগদীশ সাপুড়ের মনের তলায় তুফান, তারার আত্মহত্যা—পলাশপুরের সমস্ত আবহাওয়ায়, বহু দূরের আকাশে নক্ষত্রে ও চাঁদে, হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরে।

ফুল এখন; ফুল এখন শ্যামার করতলে। নয়ন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন করে : ফুলটা কার জন্য তুললে?

শ্যামা : যার জন্য তুলি না...তুমি এখানে এসেছ কেন?

শুটিং চলছে : "নয়নশ্যামা" ছবির সেই দৃশ্যে সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

নয়ন : তুমি জানতে না আমি আসব।

শ্যামা : না জানতাম না।

নয়ন : যখন ফুলটা তুললে কার মুখ ভাবছিলে?

শ্যামা : সে তুমি নও। তোমার মুখ ভাবিনি।.........

কলকাতার উপকণ্ঠে মল্লিকপুর। মল্লিকপুর এখন 'নয়নশ্যামা' চলচ্চিত্রের নিমিত্তে পলাশপুরে রূপান্তরিত। গত সপ্তাহে তরুণ চিত্র পরিচালক নীতিশ মুখোপাধ্যায় এখানে শুটিং শুরু করলেন। প্রধানত একটা বাড়ি, তার চারপাশের পরিবেশ, নির্বাচিত লোকেশন। কয়েকদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ অংশ চলচ্চিত্রায়িত হয়। চিত্র গ্রহণ করেন দীপক দাশ। নয়ন ও শ্যামার ভূমিকায় রূপদান করলেন যথাক্রমে নবাগত প্রবীর রায় ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়। নবাগত প্রবীরের ক'দিনের অভিজ্ঞতা খুব ভাল। জটিল এ চরিত্রে রূপ দিতে তিনি ক্ষণে ক্ষণে উৎসাহিত। সুমিত্রা, এই প্রথম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন। তাঁর কথায় : "স্বতন্ত্র, যেহেতু এ চরিত্রের মধ্যে গতানুগতিক ব্যাপার নেই। নাটকীয়তা কম। সবচেয়ে বড় কথা যেটি চরিত্র আগাগোড়া একভাবে চলেছে। কোথাও সমতার অভাব নেই। খুব শক্ত চরিত্র। জানি না, কতখানি সফল হতে পারব।" এছাড়া জগদীশ সাপুড়ে—আরও একটি ভিন্নধর্মী অসাধারণ চরিত্র চিত্রণ করছেন সন্তু মুখোপাধ্যায়।

'নয়নশ্যামা' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রচনা। গ্রাম ও শহরের পটভূমিকায় সমকালীন বিষয়বস্তু। পরিচালকের মতে আউট অফ দ্য ট্র্যাক। তিনি বলতে চান একদিন সূর্য-র বিপরীত। এতে থাকছে প্রচণ্ড উত্তেজনা আর গতি। তবু কাব্যধর্মী। কেন্দ্রবিন্দু নয়ন। পটভূমিকা যখন গ্রাম—অন্যায় অত্যাচার কুসংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিবাদ। পটভূমিকা যখন লক্ষ্যে উত্তরণের প্রয়াস। এখানে প্রতীক ব্যবহার করা হচ্ছে সাপ এবং পাখি। সাপ সামাজিক অবস্থা, তাকে পাকে পাকে জড়াচ্ছে। পাখি, সে পাখির ডাক ডাকতে পারে, পাখি তার সূক্ষ্ম বোধ বুদ্ধিকে জিইয়ে রেখেছে। ফলত, তার আলোকিত লক্ষে উত্তরণের প্রয়াস। পরিচালক এই সময়টাকে অনুশীলন করে এ ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে অগ্রগামী। তিনি মনে করেন গতানুগতিকতার বাইরে কিছু করবার জন্য কয়েকজনের মধ্যে আছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তাঁর 'একদিন সূর্য' গতানুগতিকতা বর্জিত পরীক্ষামূলক প্রয়াস হিসাবে স্বীকৃত। তিনি আরও মনে করেন এদেশে একদিন হয়ত ফিলম শুধু 'জনমনোরঞ্জন' নয়, শুধু শিল্প হবে। কে
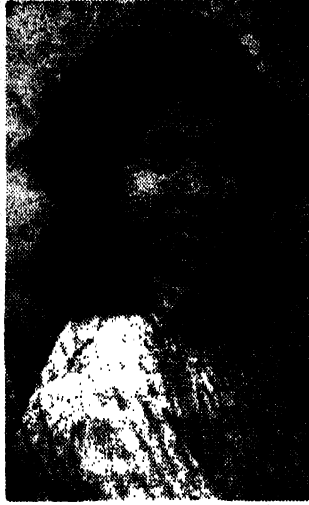
"দুষ্টু মিষ্টি" (পরিচালনা : রাজকুমার রায়চৌধুরী) ছবিতে পাঞ্চালী সেন

বলতে পারে আমাদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক, হয়ত তারই প্রস্তুতি।'

বার্তাবহ

বোম্বাই-বিচিত্রা

বন্যাত্রাণ তহবিলে টাকা তোলার জন্য ২৬ সেপটেম্বর ফিল্ম ইনডাস্ট্রির উদ্যোগে বোম্বাই শহরে যে বিরাট মিছিল বেরিয়েছিল, সেটি দেখতে পথে পথে কী-রকম ভিড় হয়েছিল, অনুমান করতে পারেন? অফিস-কর্মীরা সেদিন তাঁদের নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে থাকতে পারেননি, প্রায় সবাই চলে এসেছিলেন রাস্তায়। চিত্রতারকাদের দশ মাইল দীর্ঘ পথ পরিক্রমার (শিবাজী পার্ক থেকে টারফ ক্লাব) দর্শক-সংখ্যা পঁচিশ থেকে ত্রিশ লক্ষের মধ্যে।

সম্প্রতি **চৈতালী** চিত্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এস বি চবনের কিছু অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হয়। তিনি সম্ভবত আশা রেখেছিলেন, এবার চিত্রতারকারা শৃঙ্খলার তথা সময়ানুবর্তিতার পরিচয় দেবেন। শিবাজী পার্ক থেকে মিছিলের যাত্রা শুরু হওয়ার কথা ছিল সকাল সাড়ে আটটায়। শোভাযাত্রা আরম্ভ হয় এগারোটায়। ততক্ষণে শ্রীচবন এবং অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী বেনুগল রাও অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গিয়েছেন।

মিছিল বেরোনোর আগে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রজনী প্যাটেল চিত্রতারকাদের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, তাঁরাই যেন প্রথমে নিজের নিজের দানের ঘোষণা করেন। ব্যক্তিগতভাবে সর্বাধিক অঙ্কের দান ঘোষণা করলেন রাজেশ খান্না—দুই লক্ষ টাকা। রাজ কাপুরও অবশ্য একই অঙ্কের টাকা দান করছেন—তবে সেটা কাপুর-পরিবারের পক্ষ থেকে (ওই পরিবারে রয়েছেন পাঁচ নায়ক : রাজ, শাম্মি, শশী, রণধীর ঋষি)। দিলীপকুমার জি পি সিপ্পি ধর্মেন্দ্র মনোজকুমার শত্রুঘ্ন সিন্হা প্রেমনাথ—এঁরা প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। ওঁদের মধ্যে ধর্মেন্দ্র অবশ্য গোড়ায় পঞ্চাশ হাজার বলেছিলেন, পরে রজনী প্যাটেলের অনুরোধে অঙ্কটা দ্বিগুণ করতে রাজী হন। বাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের একাংশ পঞ্চাশ হাজার, অপর অংশ পঁচিশ হাজারের সীমায় রাখলেন দানের ঘোষণা। প্রতিশ্রুত দানের মোট অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৩১ লক্ষ টাকারও বেশি।

'ঘোষণা' বলেছি, তাই না? ঠিকই তো। এখন প্রশ্ন হল, চেকগুলি কবে পাওয়া যাবে? এই প্রশ্নটা তুলতে সত্যিই খারাপ লাগছে। তবে এটা না লিখেও পারছি না যে, এই ধরনের দানের ঘোষণা সম্পর্কে চিত্রতারাকারা অতীতে প্রায়শ বিস্মরণশীলতার নজির রেখেছেন। ধরুন, বাংলাদেশের জন্য জনৈক অভিনেত্রী সেই যে কবে এক হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; ওই টাকা কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর দেওয়া হয়নি। এবার তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যাই হোক, রজনী প্যাটেলের প্রতি আমার নিবেদন, তিনি যেন প্রতিশ্রুতি আদায়ে তাঁর কাজ শেষ হয়েছে মনে না করেন, অতঃপর টাকা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে কি না সেই দিকে লক্ষ্য রাখবার যথোচিত ব্যবস্থা যেন করেন। চেকগুলি পাওয়া গেলে তার প্রচার-ব্যবস্থাতেও যেন ত্রুটি না থাকে।

সাত ঘণ্টার পথ-পরিক্রমায় কত টাকা আদায় হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে শোনা গেল, পথচারীদের অধিকাংশ খুচরো পয়সা দিয়েছেন। কথাটা সত্যি হলে, সংগৃহীত টাকার অঙ্ক বেশি হবে না। আমরা তো জানি, অনুরূপ এক শোভাযাত্রায় মাত্র সাতাশ হাজার টাকা তোলা সম্ভব হয়েছিল।

শিবাজী পার্কে চিত্রতারকারা যখন তাঁদের দানের প্রতিশ্রুতি একে একে দিচ্ছিলেন, তখন ও পি রলহান ডায়াস-এ উঠে মাইকের সামনে কিছু বলতে চেয়ে খুব-একটা বুদ্ধির পরিচয় দেননি। তিনি কী বলেছিলেন, জানেন? বলেছিলেন, এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে দানের ঘোষণা করা সম্ভব নয়, তার

জন্য তাঁকে যেন মাফ করা হয়। তাঁর নতুন বাড়িটি নির্মাণ করতে প্রচুর ধার-দেনা হয়ে গিয়েছে. সেই সব দেনা শোধ হয়ে গেলে তিনি অবশ্যই যথাসাধ্য দান করবেন। নিজের আর্থিক সমস্যার কথা সবিস্তারে ওখানে বলা যে সমীচীন নয়, সেটা তিনি বুঝতে পারেননি।

লালবাগে জনৈক শ্রমিক নগদ এক টাকা দেবার আগে বলেন, তিনি নীতু সিংয়ের একটু নাচ দেখতে চান। তা, নীতু তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। সেদিনের ওই বিরাট মিছিলকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনও গণ্ডগোল হয়নি। পুলিসের ব্যবস্থা ছিল পরিপাটি। কলবাদেবী এলাকায় অবশ্য একটি দোকানের টিনের চাল ভেঙে পড়েছিল (কেন, তা তো বুঝতেই পারছেন), তবে ওই দুর্ঘটনায় কেউ গুরুতর আঘাত পাননি। অন্য একটি দুর্ঘটনায় এক যুবক আহত হন, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

ওই দিন সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। দুপুরে আকাশ ছিল পরিষ্কার। চড়া রোদে পরিশ্রান্ত তারকাদের ঠাণ্ডা পানীয় বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় হল, আবহাওয়া অফিসের পরিভাষায় যাকে বলা হয়, বজ্র-বিদ্যুৎ সহ বর্ষণ। পথ-পরিক্রমার শেষাংশে তারকারা একেবারে ভিজে গেলেন, সিক্ত বসনে সকলে পৌঁছলেন শেষ সীমা টারফ ক্লাব অঞ্চলে। আকাশের অবস্থা যখন যেমনই থাকুক—চড়চড়ে রোদেও যেমন, প্রবল বর্ষণের সময়ও তেমনই—তারকা-দর্শনার্থীদের তরফে উৎসাহ বরাবর ছিল অব্যাহত। ঘটনাটা অনেকেই মনে রাখবেন। বিশেষ করে মনে রাখতেই হবে ভাগ্যহত মোটর-চালক আর বাস-যাত্রীদের—যাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থাণু অবস্থায় কাটাতে হয়েছে।

সুরঞ্জন

"মোহনবাগানের মেয়ে" (পরিচালনা : মানু সেন) ছবিতে রবি ঘোষ ও সুজয় গুহ

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণী সঙ্গম

একটির পর একটি সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রসজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন। সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে দুই সন্ধ্যাব্যাপী আর একটি উৎসবে এঁরা রবীন্দ্র-সংগীতেরই যে দিকটি উন্মোচিত করলেন, তা হয়তো অনেকেরই অগোচর নয়। কিন্তু তাকে এমন স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ যে এর আগে কখনও ঘটেনি, একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল : 'রবীন্দ্র-সংগীতে ত্রিবেণীসংগম'। রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানের একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ঘাটিত হল এই অনুষ্ঠানে। এ সম্পর্কে একদা অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী রচিত 'রবীন্দ্র-সংগীতে ত্রিবেণীসংগম' নামেই প্রকাশিত একটি পুস্তিকায়। কিন্তু সেদিন মূল গানের পাশাপাশি রবীন্দ্র-সংগীতের পরিবেষণায় যে এক বিস্ময়কর রসলোকের সন্ধান পাওয়া গেল, তার বুঝি কোনো তুলনা নেই। অধিকাংশ গানে মূল গানের সুর অবিকল বজায় রয়েছে, বাণীটুকু কেবল রবীন্দ্রনাথের, অথচ ওই আশ্চর্য কথার আলোটুকু পেয়ে যেন এক নতুন ভুবন উদ্ভাসিত হয়েছে। ওই কথাটুকু দিয়েই সুরের ভিতরকার ভাবের খনির সন্ধান মিলেছে কত অনায়াসে, ভাবতে অবাক লাগে। ভাঙা গান হলেও এই সব গান তাই নতুন সৃষ্টির মহিমায় উজ্জ্বল।

সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত এই অনুষ্ঠানের প্রথম অধিবেশনের মূল উপজীব্য ছিল ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত। ধ্রুপদের আসরে মূল গানগুলি শুনিয়েছেন দেবশংকর দ্বিবেদী, ভি ভি ওয়াঝেলওয়ার, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংশ্লিষ্ট রবীন্দ্র-সংগীতের পরিবেষণায় ছিলেন প্রফুল্লকুমার দাস, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিনয় রায় এবং সেই সঙ্গে ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠীর সম্মেলক কণ্ঠ। ওয়াঝেলওয়ারের মন্দ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর স্মরণীয় পরিবেশ রচনা করেছিল। ওঁর গাওয়া 'নাচত ত্রিভঙ্গ রে'-র বেশ টেনে সম্মেলক কণ্ঠে 'বিপুল তরঙ্গ রে' এই পর্বের উল্লেখযোগ্য পরিবেষণা। খেয়ালের মূল গান গেয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসূন দাশগুপ্ত। প্রথমোক্ত শিল্পী খেয়ালের কেবল আস্থায়ী-অন্তরার মধ্যেই গানকে বেঁধে রাখায় গানের মেজাজটি ঠিক ফুটতে পারল না। সেদিক থেকে মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোল রে পাপিয়ারা' যেমন প্রাণবন্ত পরিবেষণা, তেমনই সুন্দর ভাবঘন এবং নিপুণ কণ্ঠে ওই গানের প্রতিধ্বনি শোনা গেল সুপর্ণা চৌধুরীর 'কোথা যে উধাও হল'র মধ্যে। চণ্ডীদাস মাল 'ও মিঞা বেজনুওয়ালে' বেশ সুন্দর মেজাজে গেয়েছেন, তেমনই ওই একই সুরের খেয়ায় আর এক জগতে আমাদের নিয়ে গেলেন নীলিমা সেন, যখন তিনি শোনালেন নিখুঁত ভঙ্গিতে 'এ পরবাসে রবে কে'। ওই আসরে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত রচিত হয়েছিল নটমল্লারে গ্রথিত তেলেনায় যার অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'সুখহীন নিশিদিন'। মূল গানটিকে যেমন তানে-মূর্ছনায় অপরূপ লাবণ্যে ভরে দিয়েছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনই তার সেই গতিভঙ্গি নিরবচ্ছিন্নভাবে সঞ্চারিত হয়ে গেছে অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ সাবলীল কণ্ঠে। 'এসো শ্যামল সুন্দর' এবং 'মোর ভাবনা রে'-র মূল সেতারের গত্ বাজালেন রীণা চক্রবর্তী। প্রথম অধিবেশনের সর্বশেষ অনুষ্ঠানে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সম্মেলক কণ্ঠে ভজন-কাওয়ালী 'অবদিন থোড়ি রহি' বেশ কৌতূহলোদ্দীপক পরিবেষণা।

দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় ছিল, বাংলা গান, লোকসংগীত এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গান এবং পাশ্চাত্য সংগীত। মূল গানের খাঁটি স্বাদটুকু অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্যাপারে এঁদের প্রশংসনীয় যত্নশীলতা প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। চণ্ডীদাস মাল, প্রসূন দাশগুপ্ত এবং অমর পালের গাওয়া লোকসংগীত, এ-প্রসঙ্গে যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনই সবিস্ময়ে শুনেছি স্নিগ্ধা ওয়াহির মাধুর্যমণ্ডিত কণ্ঠে গাওয়া পাঞ্জাবী 'বাঁদে বাঁদে রময়াবীণ'। দাক্ষিণী গানে মঙ্গলম মানীর কানাড়ী গানের চেয়ে কাবেরী অনন্তকৃষ্ণনের

মহীশূরী ভজন অপেক্ষাকৃত সুগীত। এর সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে রবীন্দ্ররচিত গানগুলি গেয়েছেন শ্রীনন্দা মল্লিক, জয়শ্রী রায়, প্রসাদ সেন, অর্ঘ্য সেন, নীলিমা সেন এবং ঋতু গুহ।

এই উৎসবের শেষ পর্বটিকে স্মরণীয় করে তুলেছিলেন ইংরেজী গানে অসামান্য পারদর্শী কয়েকজন শিল্পী যাঁদের মধ্যে অলকা চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখ্য। ওঁর পরিচ্ছন্ন, সুনিয়ন্ত্রিত এবং তারসপ্তক-সঞ্চারী সুরেলা কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত মূলে ইংরেজী গানগুলি শোনা রবীন্দ্রসংগীত-রসিকদের কাছে এক পরম অভিজ্ঞতা। ওঁর সঙ্গে দুটি গানে সহশিল্পীরূপে হার্মনি-সহযোগে মূল গান শুনিয়েছেন প্রদীপ নাগ, অঞ্জলি সেনগুপ্ত, পল গনসালভেস এবং পিয়ানোয় সহযোগিতা করেছেন মণীষা চৌধুরী। এই পর্বে রবীন্দ্রসঙ্গীতে একক-শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অর্ঘ্য সেন, অশোকতরু বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীনন্দা চৌধুরী। অলকা চক্রবর্তীর গাওয়া 'রবিন এডায়ারে'র সঙ্গে শ্রীনন্দা চৌধুরীর 'সকলি ফুরালো'র ব্যঞ্জনাময় পরিবেশনা এই উৎসবের স্মরণীয় সমাপন। **আনন্দবর্ধন**

সুপ্রিম ম্যাজিক নাইট

সুপ্রিম ম্যাজিক কোম্পানি বিদেশের অন্যতম নামী জাদু সংস্থা। জাদু-সরঞ্জাম নির্মাণ, জাদু-পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি জাদু-চর্চার নানাবিধ ব্যাপারে এই সংস্থার অগ্রণী ভূমিকা। সম্প্রতি এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় থিয়েটার সেন্টার হলে 'সুপ্রিম ম্যাজিক নাইট' নামে একটি অভিনব অনুষ্ঠান পরিবেশিত হল। তরুণ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন স্থানীয় উদ্যোক্তা।

সর্বশ্রী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক দত্ত, শিশির রায়, শৈলেশ্বর, তাপস বসু ও শ্রীমতী বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়—এই সাতজন শিল্পী মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। সুপ্রিম ম্যাজিকের চিত্তাকর্ষক সর্বাধুনিক খেলাই ছিল এঁদের মুখ্য পরিবেশন। কিছু পুরনো অথচ নয়নহরণ খেলাও অবশ্য এঁরা অনুষ্ঠানসূচীতে রেখেছিলেন দর্শককুলের মনোরঞ্জনের জন্য। অনুষ্ঠান সমাপ্তও হল সম্পূর্ণ জাদু-রীতিতে, চমকপ্রদ একটি খেলা দিয়ে। সুপ্রিম ম্যাজিক কোম্পানির প্রতিশ্রুতি ছিল, শ্রেষ্ঠ প্রদর্শক ও দ্বিতীয় প্রদর্শককে পুরস্কারস্বরূপ জাদুপত্রিকা পেনটাগ্রাম ও ম্যাজিগ্রামের বিনামূল্যে বার্ষিক গ্রাহক করে নেওয়া হবে। বিচারে শ্রেষ্ঠ জাদুকরের সম্মান পেলেন জাদুকর শৈলেশ্বর, তাপস বসু পেলেন দ্বিতীয় স্থান। উদ্যোক্তা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নিজের নাম এই প্রতিযোগিতার অ ন্ত র্ভু ক্ত করেননি। বিচারকের সঙ্গে দর্শকরা সম্পূর্ণ একমত হতে পেরেছেন।

সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটির মান অবশ্য ছিল খুবই উঁচুগ্রামে বাঁধা। সাত মিনিটে গোটা দশেক বিস্ময়কর খেলা দেখিয়ে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় সূচনায় যে গতি ও আবহ তৈরি করে যান তা শেষ পর্যন্তও বজায় ছিল। প্রত্যেকেই চমৎকার খেলা দেখিয়েছেন। প্রবীণ শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর হাতে বলের খেলা, নবাগতা বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালার চেঞ্জিং রেকর্ড', তরুণতর অলোক দত্তের 'কিউব ইন এ টিউব' একই রকম উজ্জ্বল। শিশির রায়ও এদিন খুব দাপটের সঙ্গে 'কিং কিং রোপ রিংস' এবং 'ভিসিবল টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' খেলাগুলি দেখালেন। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে গতিময় খেলাই দেখালেন তা নয়, তাঁর 'কালার চেঞ্জিং কেন' 'ক্লিনক্লাট পিজিয়ন ভ্যানিস', 'ডাভ ইন বেলুন' 'সিল্ক ইন বেলুন', 'ডবলডেকার ডাভ ভ্যানিস' দক্ষতা ও প্রদর্শনভঙ্গিমার এক বিরল সমন্বয়। কথা না বলে শুধু ভঙ্গির সাহায্য নেওয়ায় তাঁর খেলা যেন বেশী খুলেছিল সেদিন।

কথা অবশ্য তাপস বসুও বলেন না। অল্পদিন দেখাচ্ছেন এই তরুণ শিল্পী, তবু সপ্রতিভতার এক ঈর্ষণীয় শীর্ষে তিনি ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত 'অ্যাপিয়ারিং কেন' তো ছিলই, নতুন খেলাগুলিও প্রত্যেকটি সুন্দর অনুশীলিত ভঙ্গিতে প্রদর্শিত। এর মধ্যে 'সিল্ক অ্যান্ড লিকুইড', 'স্পটেড ক্যাব', 'ডাভ টু সিল্ক', 'ডাভ ফ্রম ব্যাগ' এবং 'ডাভ ভ্যানিসে'র খেলাগুলি ভোলা যায় না।

শৈলেশ্বর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মানে বিভূষিত। তাঁর খেলার পরিচ্ছন্ন ভঙ্গি, বৈঠকী ঢঙের কথাবার্তা, কমেডিয়ানসুলভ চালচলন, নিপুণ অভিনয় ও দক্ষ হস্ত-কৌশল বরাবরই পৃথক একটি মাত্রা যোজনা করে তাঁর জাদু-অনুষ্ঠানে। নতুন খেলার মধ্যে 'ডাইস থ্রু সিল্ক', 'স্পট কার্ড', 'সুপ্রিম স্লেট' অনবদ্য।

—**বিশেষ প্রতিনিধি**

ঘরোয়া অনুষ্ঠান

জন্মদিনের ঘরোয়া অনুষ্ঠান। একই সঙ্গে দুজনের জন্মদিন—এছাড়া উপায়ও নেই কারণ শ্যামল বসু এবং কমল বসু যমজ ভাই। সেদিন তাঁরা একই সঙ্গে একচল্লিশে পা দিলেন। দু ভাই দেখতেই শুধু এক নন, রুচি আর পছন্দেও অভিন্ন। পেশাতেও এক হবার সাধ ছিল। দুজনার শুরুও হয়েছিল তবলা দিয়ে। কিন্তু উত্তর-কালে কমল বাঁক নিলেন গানে। দু ছেলের জীবনের গোড়ার কথাটা আলগা আলগা ভাবে শোনাচ্ছিলেন প্রবীণ অনাথ বসু। বাঁধুনি আলগা অথচ কি তপ্ত নিবিড় স্মৃতিচারণা—শ্রোতাকেও স্পর্শ করেছিল বৈকি।

আর সেই ভরা মন নিয়েই শুনলাম মণিলাল নাগের সেতার। মিঁয়া মল্লার। রাগের বিস্তারিত বিশ্লেষণে আগ্রহী সেতারীকে তবলায় মদত দিলেন শ্যামল বসু। শ্যাম বসুকে তবলায় নিয়ে দেশ রাগের সুন্দর একটি ছবি আঁকলেন সরোদিয়া কমল মল্লিক। শুরুতে কিশোর কৌশিক সাহা মাতিয়ে দিয়েছিলেন তবলা লহরায়। কৌশিক শ্যামলেরই ছাত্র। বাজনা শুনেই বোঝা যায় প্রতিভা আছে, আছে প্রচুর প্রতিশ্রুতি। প্রেমা বসুর রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছিল একেবারে গোড়ায়। গান ভাল লাগল। কল্লোলের সঙ্গতও। **সুররসিক**

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
অরূপকুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলাদেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২·০০ টাকা	৪১·৫০ টাকা	×
বিদেশে (আমাদের লনডন অফিস মাধ্যমে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

দেশ
২৫ অক্টোবর, ১৯৭৫ ॥ ৪০

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ অসিত পাল

আমি এখন মাসে-দু-টিন-
খাওয়া এক পালোয়ান !
আমাদের সবার
পছন্দেই ভাল !
কারণ, আমি বেশ বেড়ে উঠছি
বলে মা খুব খুশী, সারা রাত
ঘুমোই বলে বাবাও খুশী !
আমি খেতে ভালবাসি বালআমূল
আর দুধ, বালআমূল আর সুপ,
বালআমূল আর ফলের রস।
এক কথায় বালআমূল
আমার চাই-ই।
বিনামূল্যে !
বালআমূল সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা
বিনামূল্যে পেতে হলে এই ঠিকানায়
(ইংরেজীতে) লিখুন: পোস্ট ব্যাগ ১০১২৮
বোম্বাই ৪০০০০১
৩ মাস বয়েসের পর খাওয়ান
বালআমূল
দুধ মিশ্রিত শস্যাহার
মস্তিষ্ক আর শরীরের পুরোপুরি বৃদ্ধির জন্যে
দেখবেন ! দুধ ছাড়িয়ে শক্ত আহার ধরানোর
সময় আপনার বাচ্চা যেন যথেষ্ট প্রোটিন
পায় ! বালআমূল হল, ইউনাইটেড নেশনস্
-এর প্রোটিন-ক্যালোরি অ্যাডভাইসরী গ্রুপ
দ্বারা নির্ধারিত প্রোটিন ও ক্যালোরির হার
মান অনুসারে তৈরী— দুধ মিশ্রিত
শস্যাহার !
বালআমূল বোতলে-খাওয়া :
১/২ আমূলস্প্রে, ১/২ বালআমূল
বালআমূল চামচে-খাওয়া :
পুরো আহার বালআমূল মিশিয়ে
Bal-amul
cereal with milk
বিজ্ঞাপন : গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, আনন্দ।

সম্পাদকীয়

৪২ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৫২
শনিবার ৮ কার্তিক ১৩৮২

বাগ্মিতার সেই ঐতিহ্য

রোমের ইতিহাসে দ্বিতীয় একজন সিসেরো, এবং গ্রীসীয় এথেনস্-এর ইতিহাসে দ্বিতীয় একজন ডেমোস্থিনিস আর দেখা দেয় নি। অর্থাৎ বাগ্মিতার সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। বলা চলে, ত্রিশ শতকের শুরু হবার আগেই সেই যুগের অবসান হয়েছে। বাগ্মিতার অন্য নাম যদি বক্তৃতা-কলা হয়, তবে বলতে হবে বাগ্মিতা একদিন সাংস্কৃতিক সৌকর্যের একটি রম্যকলা বলে স্বীকৃত ও সম্মানিত হতো। বুঝতে পারা যায় না, এবং সামাজিক তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের কোন পণ্ডিত খুব ভাল করে এমন কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেননি, যেটা বক্তৃতা-কলার দীনতা ও অবনতির একটি কারণ বলে সকলজনের বিশ্বাসে গৃহীত হতে পারে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গবেষক দুঃখ প্রকাশ করে এমন মন্তব্যও করেছেন যে বাগ্মিতা ও বক্তৃতা-কলার সেই গৌরবশশী চিরকালের মতো অস্তমিত হয়েছে, ফিরে আর কোনও দিনও দেখা দেবে না। অর্থাৎ বাগ্মিতার সুদিন আর ফিরে আসবে না।

সংবাদে প্রচারিত হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী প্রসংগত বাগ্মিতার ঐতিহ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন; তিনি আধুনিক ভারতীয়ের বাগ্মিতা ও বক্তৃতা-কলার যোগ্যতা এবং উৎকর্ষের মান অতীতের তুলনায় নিম্নতর হয়ে গিয়েছে বলে মনে করেন। আন্তর্জাতিক আলোচনার যে-কোন সভা সমাবেশ ও অনুষ্ঠানের আসরে ভারতীয় প্রতিনিধিরা অতীতের যে উচ্চমানের বাগ্মিতার গুণে সকলজনের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারতো, সে বাগ্মিতার পরিচয় বর্তমানে আর ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভাষণে পাওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ করে একটি ক্ষেত্রের নাম করেছেন, আন্তর্জাতিক আলোচনার আসর। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে, জাতীয় জীবনের প্রায় সবরকম বিষয় প্রসংগ ও প্রয়োজনের আলোচনা এবং সভার আসরে অথবা মঞ্চে মনস্বী মহাশয়েরও ভাষণে উচ্চমানের উৎকর্ষে ও সৌকর্যে অলংকৃত বাগ্মিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বহু বিজ্ঞজনের বেতার-ভাষণ দেশের মানুষকে প্রায়ই শুনতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন করবার যুক্তি আছে, এইসব বেতার-ভাষণে সেই বাগ্মিতার তথা সুষ্ঠু বাচনভংগীর কতটুকু প্রকাশ থাকে, যার বিশেষ একটি রম্যতার স্বাদ শ্রোতার মনে সঞ্চারিত হয়ে তার মানসিক পরিতৃপ্তির মান বাড়িয়ে দেয়? সংসদ বিধানসভা ও আরও কয়েকটি বিশেষ প্রকৃতির সদস্য-সমাবেশ অথবা প্রতিনিধিত্বের আসরে বক্তার পক্ষে বাগ্মিতা প্রকাশ করবার সুযোগ অনেকটা সীমায়িত হলেও তারই মধ্যে সুভাষিত প্রকারে বক্তব্য পরিবেষণ করতে তেমন-কিছু বাধা নেই। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সফলতা ও কৃতিত্বের নিদর্শন খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। বরং জনজীবনের একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রথার ক্ষেত্রে বাগ্মিতার বিশেষ রকমের সুষ্ঠু মনোজ্ঞ ও শ্রুতিসুখকর প্রকাশ বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এটা হলো ধর্মতত্ত্বের ও ধর্মকাহিনীর নানা প্রকারের কথকতার আসর। এই কথকতার মধ্যে সাঙ্গীতিক মধুরতার আবেশ থাকে, এবং বিষয়বস্তু জনসাধারণের আত্মিক বিশ্বাসের সম্পদ। সুতরাং, এ-ক্ষেত্রে সামান্য বাগ্মিতার পক্ষেও জনচিত্তের তৃপ্তি এবং সমাদর অর্জন করবার সহজ সুযোগ থাকে। প্রশ্ন হলো, আজকের রাজনীতিক সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক বিষয়ের আলোচনার আসরে অথবা বিরাট জনসমাবেশের সম্মুখ-মঞ্চে একজন কেশবচন্দ্র বিপিনচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথকে দেখতে পাওয়া যায় না কেন? ইংলণ্ডের বিখ্যাত এক পত্রিকার সম্পাদক বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন : যখন জন ব্রাইটের বক্তৃতা শুনি, তখন মনে হয়, জন ব্রাইটই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। আর যখন কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনি, তখন মনে হয়, কেশবচন্দ্র সেনই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। কথিত আছে, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার শক্তি গুণ ও সৌন্দর্যের স্বাদ অনুভব করবার ইচ্ছায় কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা শুনতে উৎসুক হয়ে উঠতেন। যা-ই হোক, দুঃখকর সত্যটি এই যে, বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সব ক্ষেত্রে যে-সব মনস্বীর বাগ্মিতা একদিন একটি রম্য অনুশীলনের সম্বল ও সম্পদ হয়ে উঠেছিল, তাঁরা প্রায় সকলেই উনিশ শতকের প্রতিভার সৃষ্টি।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাট্টা করে জাতীয় জীবনের একটি দুর্বলতার সমালোচনা করেছেন : আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি। ঠাট্টার কথা ছেড়ে দিয়ে কিন্তু ঐতিহাসিকের অভিমত অনুযায়ী বলতে পারা যায় যে, সত্যিই, সে-রকম বক্তৃতা হলে সেটা যুদ্ধের অস্ত্র হয়ে জাতির সহায়ক হতে পারে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের যুদ্ধকালীন বক্তৃতা-সমূহের সম্পর্কে এইচ জি ওয়েলস্ তাঁর বিশ্ব-ইতিহাস গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, চার্চিলের সেইসব বক্তৃতা ছিল বস্তুত ইংলণ্ডের প্রতিরক্ষার একটি বড় সম্বল।

বহুজনের জীবনে বিশ্বাসের ও সংকল্পের প্রেরণা সঞ্চারিত করতে, অনুভূতি ও উপলব্ধির মুগ্ধতা এবং মধুরতা সম্ভাবিত করতে বাগ্মিতার সুলিখিত কাব্য কাহিনী ও নিবন্ধের তুলনায় কম শক্তির শালিতা বলে মনে করা চলে না। রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাভাবের কাব্যনিদর্শনের প্রভাব ও শক্তির সঙ্গে এ-ক্ষেত্রে অবশ্য বাগ্মিতার শক্তিকে তুলনা করবার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের কর্তব্যে সুভাষিত বক্তৃতা কোন সুলিখিত নিবন্ধের চেয়ে নিশ্চয়ই কম প্রভাবের সম্বল নয়।

বরং সাংস্কৃতিক নিয়মের একটি বড় সত্য এই যে, বৃহৎ ও মহৎ ভাবনায় অনুপ্রাণিত জাতির জীবনে বাগ্মিতা ও বক্তৃতা-কলার অনুশীলন ও সুষ্ঠু প্রকাশ সহজে সম্ভব হয়। আধুনিক ভারতীয় জীবনে বাগ্মিতার সেই গৌরবশশী অস্তমিত হয়েছে বলে দুঃখ বোধ করলেও এমন নৈরাশ্যও বাস্তবতার সম্মত কোন সত্য নয় যে, সে গৌরব আর কখনও ফিরে আসতে পারবে না। জাতির শিক্ষার মান ও প্রকারের নতুন উৎকর্ষে, এবং সামাজিক আগ্রহের আন্তরিক সততায় শ্রুতিরম্য ও মনোজ্ঞ সেই বাগ্মিতার ঐতিহ্য পুনর্জাগৃতি লাভ করতে পারে।

এই সপ্তাহ

পর পর কয়েকটি বড় রকমের ঘোষণা হয়ে গেল সম্প্রতি। এবারের গান্ধীজয়ন্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন, প্রকাশ্যে মদ্যপানে বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। আর একটি ঘোষণা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর। সংগঠন কংগ্রেস নেতা কুমারস্বামী কামরাজ পরলোকগমন করেছেন গত ২ অকটোবর, গান্ধীজয়ন্তী দিবসে। দিল্লিতে কামরাজের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস এক শোকসভার আয়োজন করেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কামরাজের দলের সদস্যদের কংগ্রেসে যোগ-দিতে আহ্বান জানান। তিনি বিশেষভাবে আবেদন জানান তামিলনাড়ু সংগঠন কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, জীবনের শেষ দু'মাস কামরাজ আন্তরিক-ভাবে চেয়েছিলেন দুই কংগ্রেসের কর্মীরা দেশের এই সংকটকালে মিলিতভাবে কাজ করুন। এই মিলিত প্রয়াসেই ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ভারত গড়ে উঠবে। কামরাজ নিজে আরও চেয়েছিলেন জনগণের সামনে যে সব সমস্যা রয়েছে, সমগ্র জাতি তার মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে।

এদিকে নতুন এক অরডিন্যান্সে ঘোষণা করা হয়েছে, হিসাব বহির্ভূত আয় ও সম্পত্তির কথা যারা স্বেচ্ছায় প্রকাশ করবেন, তাদের কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হবে। অর্থাৎ সুবিধা মিলবে কালো টাকা কত আছে ঘোষণা করলে। এইভাবে ঘোষিত আয় ও সম্পত্তির উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে একটা ন্যায়সংগত হারে কর দিতে হবে এবং ঘোষিত আয়ের শতকরা ৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটিতে লগ্নি করতে হবে। এটা যিনি করবেন, তাঁকে কোন প্রকার শাস্তি দেওয়া হবে না। বলা হয়েছে, কালো টাকাকে উৎপাদনমূলক কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা। কী পরি-মাণ ঘোষিত আয়ের জন্য কী হারে কর দিতে হবে অরডিন্যান্সে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে। এই হার বিভিন্ন পর্যায়ে শতকরা ২৫ ভাগ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত।

ওদিকে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও মূলধন লগ্নি বাড়াবার জন্য ভারত-মার্কিন যুক্ত কমিশন একটা ছয় দফা পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। ওয়াশিংটনে সম্প্রতি এই কমিশনের দু' দিনের বৈঠকের প্রধান সিদ্ধান্ত হল, উভয় দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি যুক্ত বাণিজ্য পর্ষদ গঠন করা হবে। এই পর্ষদের প্রথম বৈঠক বসবে নয়া দিল্লিতে ফেবরুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। তৃতীয় কোন দেশে শিল্পস্থাপনে ভারতীয় ও মার্কিন প্রতি-ষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহিত করার এবং ১৬ ও ১৭ অকটোবর ওয়াশিংটনে দুই দেশের মধ্যে চুক্তি নিয়ে আরও কথা বলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অর্থ-নৈতিক বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহ-যোগিতার এক ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের খবর—ঢাকা ও পিকিং কূট-নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আবু সয়ীদ চৌধুরী এবং চীনের বিদেশমন্ত্রী চিয়াও কুয়ান হুয়োর-র এক দীর্ঘস্থায়ী বৈঠকের পর ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গত ১৫ আগস্ট নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতিদানের পাঁচ সপ্তাহ পর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়। গত ৩১ আগস্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই বাংলা-দেশের রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুশতাক আমেদকে একখানি চিঠি লেখেন ও একই সঙ্গে ৪ হাজার টন বাংলাদেশী পাট কেনেন।

রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ আর একটি অরডিন্যান্স জারি করে রেল কর্তৃপক্ষকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন যে, রেলে কোন মাল গন্তব্যে পৌঁছবার সাত দিনের মধ্যে তুলে না নিলে কর্তৃপক্ষ তা নিলামে বেচে দিতে পারবেন। কিছু কিছু ব্যবসায়ী এতদিন ওয়াগন প্ল্যাটফর্ম সাইডিং ইত্যাদি জায়গায় মাল ফেলে রেখে গুদামের মতো ব্যবহার করেছিলেন। ওয়াগন আটকে রাখায় অন্যরা বঞ্চিত হচ্ছিলেন এবং তার ফলে বাজারে কৃত্রিম অভাবও সৃষ্টি হচ্ছিল। এখন নতুন অরডিন্যান্সের বলে প্রাপককে নোটিস না দিয়েই রেল কর্তৃপক্ষ দাবিদার-হীন জিনিসপত্র নিলামে চড়াতে পারবেন। রেলের পাওনা কেটে রেখে বাকিটা প্রাপককে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। অত্যাবশ্যক পণ্য রেলকর্তৃপক্ষ সমবায় সমিতিকে দিয়ে দেবেন। কোন কোন স্টেশনে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে তা সময়ে সময়ে নোটিস দিয়ে জানানো হবে। তবে এই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যাতে না হয়, তাও দেখা হবে।

বিয়েতে যৌতুক নিষিদ্ধ করে সংশোধিত আইন পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনে যে-শাস্তি বিধান ছিল, বর্তমান রাজ্য আইনে তার পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। যেমন বর্তমান আইনে কারাদণ্ডের সর্বোচ্চ কাল ছয় মাস থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করা হয়েছে এবং জরিমানার পরিমাণ ২০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনে মামলা রুজু করতে হলে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হতো, এখন আর সেই অনুমতির প্রয়োজন রইলো না, যে কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা তাঁর পিতামাতা বা অন্তত পাঁচ বছরের কোন সমাজকল্যাণ সংস্থা মামলা করতে পারবেন। বিয়েতে পণ নেওয়া শুধু নয়, বিয়ের আগে, সময়ে বা পরে যৌতুক না দেওয়ায় বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সেই ব্যক্তিকে ২০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা জরিমানা অথবা তিন মাস বা সর্বাধিক এক বছর জেল অথবা উভয় শাস্তি দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে রক্ষিবাহিনীর আর আলাদা অস্তিত্ব থাকছে না। তাদের বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে নিয়ে নেওয়ার জন্য অরডিন্যান্স জারি হয়েছে। বলা হয়েছে, রক্ষীবাহিনীর যে-কোন সদস্য উপযুক্ত গণ্য হলেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হবেন। সরকার নির্দিষ্ট শর্তে এই নিযুক্তি হবে। রক্ষীবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সাজসরঞ্জাম স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্কের টাকা গাড়ি ইত্যাদি সব কিছু সেনাবাহিনীর হাতে বর্তাবে। তাছাড়া বাজেটে যে টাকা রক্ষী বাহিনীর জন্যে মঞ্জুর হয়েছে, তা সেনা বাহিনীর জন্যে মঞ্জুরীকৃত টাকা হিসাবে গণ্য হবে। ওদিকে বাংলাদেশ সরকার বাজারের উপর ওদিকে বাংলাদেশ সরকার বাজারের উপর রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন। ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেবরুয়ারি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুশতাক আমেদের ঘোষণার পর ঐ সব বন্দীদের মুক্ত করা হয়। তবে যারা ডাকাতি বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র রাখা অপহরণ ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাধে জেল খাটছে, তাদের এখন মুক্তি দেওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া সামরিক আদালতে যারা শাস্তিপ্রাপ্ত, তাদেরও ক্ষমা করা হবে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। পরিষদের সংগ্রহশালায় বহু মূল্যবান জিনিসপত্র আছে। এর রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য প্রয়োজন অর্থের, প্রয়োজন পরিকল্পনার। সাম্প্রতিক খবর- কেন্দ্রীয় শিক্ষা দফতর পরিষদের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য তৎপর হয়েছেন। একটি কমিটি নিয়োগ করে রিপোর্ট দাখিল করার ভার দেওয়া হয়েছে আর সি দত্তের উপর। শ্রীদত্ত ইতিমধ্যে কয়েকবার পরিষদ ঘুরে গিয়েছেন এবং পরিষদের সভাপতি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যপাল ডায়াস ও শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন এই ব্যাপারে।

বর্ধমানে আবার একটি রহস্যময় রোগের খোঁজ মিলেছে। জেলার দুর্গাপুরে ও সংলগ্ন এলাকায় খণ্ডজাতির মধ্যে এই রোগের প্রকোপ এবং দশজন লোক ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন।

ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা

রাজনীতি/কূটনীতি নিয়ে রুশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে যত অবনিবনাই থাকুক না কেন দু দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু দিব্যি চলছে। পাকা একটা বাণিজ্য চুক্তি না হলেও রুশ-মার্কিন বাণিজ্যে ভাঁটা পড়ে নি। আর পড়বেই বা কেন? মার্কিনীদের কাছে ব্যবসা হচ্ছে ব্যবসা—যার সঙ্গে দর পটবে তাকেই তারা মাল বেচবে এই হচ্ছে তাদের রীতি। আদর্শবাদের বালাই ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের কাছে নেই। ওদিকে রুশীরা বাস্তববাদী। তাদের কাছে দেশের আর জাতের স্বার্থটাই বড়। সে স্বার্থের তাগিদে অকম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাতেও তাদের আপত্তি নেই। তাই তাদের ভাব কেবল সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর সঙ্গে নয় বিস্তর পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গেও। পুঁজিবাদী দেশগুলোর চাঁই আমেরিকাও তার কাছে একেবারে অচ্ছুৎ নয়। অনেক ব্যাপারেই তার সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে। রুশিয়ার দরকার পড়লে তার কাছ থেকে মাল কিনছে রুশিয়া, আবার বেচছেও। মার্কিনী কারিগরী বিদ্যাকে কাজে লাগাবার জন্যে আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রুশিয়া বেশ আগ্রহী। দু দেশের ভিন্ন আদর্শ এ ব্যাপারে কোনও বাধা নয়।

কাজেই মার্কিনী গম আমদানি করার যে কথাবার্তা রুশিয়া চালাচ্ছে তাতে চোখ কপালে তোলার কিছু নেই। রুশিয়ার এবার অজন্মা। এমন দুর্ভিক্ষ এ দশকে আর হয়নি। ইউক্রেন হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নের গমের ভাঁড়ার। সেখানেই এ বছর নাকি ফলন তিন ভাগের এক ভাগ কম। তা হলে গোটা দেশের অবস্থাটা যে কী তা আঁচ করা কষ্ট নয়। তা বলে রুশ সরকার তো দেশের লোককে উপোসী রাখতে পারেন না। খাবারের ঘাটতি মেটাবার জন্যে তাঁরা আগে ভাগেই উদ্যোগী হয়েছেন। যাতে দেশের কোনও তল্লাটে গমে টান না পড়ে তার জন্যে গম আমদানির ব্যবস্থা চলছে আমেরিকা থেকে। মার্কিনী খাঁই মেটাতে রুশীরা রাজী এ আভাস আমেরিকা পেয়েছে। তারও রুশিয়াকে গম বেচতে অনিচ্ছে নেই। তার কারণ অবিশ্যি ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা নয়—তা হলে গরিব দেশগুলোতে ভারে ভারে গম পাঠাতো মার্কিনীরা। তাদের কথা হচ্ছে ফেলো কড়ি মাখো তেল, তুমি কী আমার পর? সে কড়ি ফেলবার সংগতি রুশিয়ার আছে। কাজেই আমেরিকাও তাকে গম পাঠাতে তৈরি।

আমেরিকা থেকে গম রুশীরা এই প্রথম কিনছে না। ঠেকায় পড়লেই তারা বিদেশ থেকে গম আমদানি করে। তাদের গম যুগিয়েছে এর আগে কেবল আমেরিকা নয় অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, এমন কী ফ্রান্সও। তারা আমদানি করেছে গম ছাড়া মোটা দানার শস্যও। এবারও তাই করবে। এক ১৯৭২ সনেই তারা নাকি বিদেশ থেকে কিনেছিল তিন কোটি টন খাদ্যশস্য। এ বছরে তাদের চাহিদা আরও বেশী। রুশীদের দরকার বছরে ২০ কোটি টন খাদ্যশস্য। সে লক্ষ্যে তারা পৌঁছুতে পেরেছিল একবারই—১৯৭৩ সনে। এ বছর তাদের আশা ছিল ফলন হবে সাড়ে একুশ কোটি টন। হবে কিন্তু তার ঢের কম। মার্কিন কৃষি দফতরের হিসেবে রুশিয়ায় এ মরসুমের ফলন সাড়ে সতেরো কোটি টনের বেশী হবে না। গম তার মধ্যে সাড়ে আট কোটি টন। তার মানে সব মিলিয়ে ঘাটতি হবে চার কোটি টনের মতো। সেটা চাট্টিখানি কথা নয়। এত গম কিংবা অন্য ধরনের শস্য যোগাবার সাধ্যি আমেরিকা ছাড়া আর কার আছে? তাই মার্কিনীদের শরণ নিয়েছে বিপদ কাটাবার জন্যে রুশীরা।

গম কী অন্য ধরনের শস্য রুশিয়াকে আমেরিকানরা ঠিকই দেবে। তবে তারা তো আর দাতব্য করতে বসেনি। পাওনা তাদের কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবে। ব্যবসায় তাদের চক্ষুলজ্জা নেই, খাতির তারা কাউকে করে না, রুশিয়াকেও নয়। সস্তায় রুশীদের গম যোগাবে এমন বান্দা মার্কিনীরা নয়। দাম নেবে তারা ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। তা দিতে রুশীদের অনিচ্ছে নেই। এক তো পেটের দায় বড় দায়, তার ওপর মার্কিনীদের খুশী করার মতো টাকা তাদের আছে। তাই মনে হচ্ছে চুক্তিটা নির্বিরোধেই সই হবে। কংগ্রেসের রুশ-বিরোধী সদস্যরা হয়তো ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করবেন। এমন কথাও উঠেছে, একজন খরিদ্দারকে এত গম বেচা ঠিক হবে না। কিন্তু সেখানে খাস রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে তাঁর প্রশাসনের যাঁরা মাথা তাঁরা সবাই রুশীদের দিকে। তখন তাদের গম পাওয়া ঠেকায় কে? টাকা ধার করে আপাতত গমের দাম তাদের দিতে হবে। সে টাকাও ধার দেবে মার্কিন ব্যাঙ্কগুলোই। আইনকানুনে আটকাবে বলে বোধ হচ্ছে না।

এবারের গম আমদানি পর্বটা অন্যবারের থেকে আলাদা। এতকাল যখন যেটুকু ঘাটতি পড়েছে সে-টুকুই আমদানি করেছে রুশীরা। এবার কিন্তু কথা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির। এক বছরের সংস্থান না করে রুশিয়া করতে চাইছে ভবিষ্যতের সংস্থান। চুক্তি কতদিনের হবে তা ঠিক হয়নি। শোনা যাচ্ছে তা হবে তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্যে। তার মানে বেশ কিছুদিনের জন্য রুশীরা নিশ্চিন্ত হতে চায়। এ ব্যবস্থা হলে কোনও বছর অজন্মা হলে তারা চোখে সর্ষে ফুল দেখবে না। এর পর ফলন যদি বছরের পর বছর ভালো হয় তা হলে তারা একটা বাড়তি খাদ্যশস্যের ভাঁড়ার গড়ে তুলতে পারবে। বিপদের দিনে সে জমানো গম নিজেদের কাজে তো লাগবেই দরকার হলে তা থেকে মিত্র দেশগুলোকে সাহায্য দেওয়াও চলবে। বোঝা যাচ্ছে যতটা গম কী অন্য খাদ্যশস্য দেশে উৎপন্ন করা দরকার ততটা রুশিয়া উৎপন্ন করতে পারছে না, দু-এক বছরের মধ্যে যে পারবে সে ভরসাও নেই। তাই আমেরিকার সঙ্গে সাবেক চাল পাল্টে নতুন ধাঁচে চুক্তির বন্দোবস্ত। আমেরিকার তাতে লাভ বই লোকসান নেই। সেও তাই এ প্রস্তাবে সায় দিয়েছে।

গম আমদানির চুক্তি করেই অবিশ্যি রুশীরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে না। তারা উঠে-পড়ে লাগবে গমের ফলন বাড়াতে, চাষবাসের উন্নতি করতে। কিন্তু মুশকিলে পড়বে যে সব দেশ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করে তারা। রুশিয়া বিদেশ থেকে গম আমদানি শুরু করতে না করতেই তার দাম বেড়ে গেছে দুনিয়ার বাজারে—আমেরিকায় তো বটেই অস্ট্রেলিয়ায়, কানাডায়। অত দাম দিয়ে গম কেনার সামর্থ্য খুবই বেশী দেশের নেই। পশ্চিম ইউরোপের অনেক দেশও বিদেশ থেকে গম আমদানী করে, তারাও রুশ-মার্কিন গম চুক্তির শর্তের কথা শুনে প্রমাদ গণছে। দাম তো চড়ছেই, তার ওপর খুব বেশী বাড়তি গম তো দুনিয়াতে নেই। যাদের পয়সা আছে তারা বিভ্রাট এড়াতে পারবে, কিন্তু গরিব দেশগুলো—যাদের দরকার সবচেয়ে বেশি—তাদের হাল কী হবে? কেবল মার্কিন গমই যদি রুশিয়া কেনে তা হলে অন্যরা কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনে সংকট কাটাতে পারবে। কিন্তু রুশীরা সে বাজারেও যে ঢুঁ মারবে না এমন কথা বলা যাচ্ছে না। তা ছাড়া সে গমও তো সস্তা নয়। গম কিনতেই যদি টাকা ফুরিয়ে যায় তা হলে গরিব দেশগুলো গরিবিয়ানা হটাবে কেমন করে?

সাহিত্য প্রসঙ্গ

সহজ ব্যাখ্যা ও ভ্রান্তি

আর্থার কোয়েসলার তাঁর একটি বইয়ে একজন জনপ্রিয় ইউক্রেনের লেখকের এক সমস্যার কথা বলেছিলেন। কোয়েসলার তখন মস্কোতে—একদিন এই লেখকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, তিনি লণ্ডনের পটভূমিকায় একটি গল্প লিখেছেন। গল্পের এক জায়গায় রয়েছে, একজন শ্রমিক সকালে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হঠাৎ এক পুলিস তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। এখন লেখকের প্রশ্ন, কী ধরনের কথা, কোন ধরনের শপথ বা গালাগাল দিয়ে পুলিসটা কথা বলবে, বললে তা যথাযথ শোনাবে?

কোয়েসলার অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, পুলিসটা ধাক্কা মারবে কেন?

লেখক বললেন, কেন, লোকটা তো শ্রমিক।

কোয়েসলার মন্তব্য করছেন, লেখক বন্ধুটির কোনো দোষ নেই, সত্যি সত্যি তাঁরা বিশ্বাস করতেন পুঁজিবাদী লণ্ডনে পুলিসরা সর্বহারাদের অহেতুক রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

এই গল্পটি আমি সোভিয়েতের সাধারণ লেখকদের উপহাস করার জন্যে বলছি না। বলছি অন্য কারণে। কোনো কোনো ব্যাপারে লেখকদের মিথ্যা ধারণা ও অজ্ঞতা যে কতটা হাস্যকর হতে পারে—এই গল্পটি তার দৃষ্টান্ত। ইউক্রেনের লেখকটিকে দোষ দিয়ে লাভ কী, এমন দৃষ্টান্ত ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসী, জার্মান সব দেশের লেখকদের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে খুঁজলে। অনেক কাল আগে একটা বই পড়েছিলাম এক বৃটিশ লেখকের; তাতে দেখেছিলাম, কলকাতায় কলেরা মহামারী হয়ে দেখা দেবার পর মৃতদেহগুলি গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। লেখক-মশাইয়ের বোধ হয় ধারণা ছিল, কলকাতার মানুষগুলো অর্ধ-বন্য এবং শহরটা আবর্জনার মধ্যে চাপা পড়ে আছে, শুধু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চুড়োটাই যা দেখা যায়। লণ্ডন তবু অনেক দূরের জায়গা—ভারতেরই এমন বনেদী শহর আছে যেখানে সাময়িক পত্রিকায় স্থানীয় ভাষায় দু একটি এমন লেখা ছাপা হয় যা পড়লে বাঙালীর মুখ লজ্জায় ঘৃণায় লাল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে বাঙালী চরিত্রের নৈতিকতা নিয়ে কেচ্ছা রটনার কথাও শুনেছি। কিন্তু এ-সব কথা থাক। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে বা ঈর্ষাবশত যদি কেউ কেউ কোনো কথা বলে তা নিয়ে কলহ করে লাভ কী?

প্রশ্নটাকে অন্যভাবে বিচার করা যাক। বিচার করে দেখা যাক, আমাদের অধিকাংশ বাঙালী লেখকরা যা লেখেন তার মধ্যে পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো সাদামাটা সহজ ধারণা এবং অজ্ঞতা আছে কিনা? যদি কেউ বলেন, নেই, তবে তাঁর কাছে কথা চলে না। আবার কেউ যদি বলেন, আছে, তবে—তাকে ভেবে দেখতে হবে—এর দ্বারা আমরা যথার্থকে কত বিকৃত করছি!

কোনো লেখকই সর্বজ্ঞ হতে পারেন না। বা স্বীকার করে নেওয়া গেল, কদাচিৎ এক আধজন হতে পারেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাধারণ লেখকরা সকলেই এক ধরনের সামাজিক গণ্ডির মধ্যে যেমন থাকেন, মানসিকভাবেও তাঁদের এক গণ্ডি আছে। তবু কখনও কখনও এই লিমিটেশান তাঁরা ভাঙতে চান। সেটা যে অন্যায় তা নয়, কিন্তু ভাঙতে গিয়ে যথার্থকে বিকৃত করার প্রবণতা যদি দেখা দেয়—তবেই মুশকিল। আজকাল এমন লেখা প্রায়ই চোখে পড়ে যার মধ্যে লেখকের নিজের জানাশোনা জগতের বাইরে অন্য সমাজের কথা থাকে। সে সমাজ উচ্চবিত্ত সমাজের হতে পারে, আবার একেবারেই বিত্তহীনের সমাজ হতে পারে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই সব ক্ষেত্রে সাধারণ মধ্যবিত্ত লেখকরা নিজেদের মামুলি কতগুলো ধারণাকে নির্দ্বিধায় চালিয়ে দেন। অর্থ থাকলেই একটা লোক পুরোপুরি শয়তান হবে, মদ্যপ হবে, তার লাম্পট্য অন্যদের হার মানাবে—এও যেমন অবিশ্বাস্য হতে পারে, সেই রকম কারখানার কোনো শ্রমিক হলেই সর্ব অর্থে সাধু হবে—এও কী অবিশ্বাস্য নয়? বাংলা গল্প উপন্যাসে আকছার দেখা যায়, অফিসের বড় বড় অফিসাররা অফিসের সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং মেয়েরা লিফ্‌ট পায়। বাঙালী সুন্দরী মেয়েদের এমন সৌভাগ্য কবে থেকে হল কে জানে! আবার গল্পে এও দেখেছি, জুট মিলের এক শ্রমিকের স্ত্রী, তিন-চারটি বাচ্চার মা, হবার পরও এমনই গায়ে-গতরে লোভনীয় যে রাস্তার টিউবওয়েলে দাঁড়িয়ে জল তোলার সময় বহু লোকের নজর তার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। আমি এ-কথা বলি না, অর্থবান মদ্যপ হতে পারে না, শ্রমিকের স্ত্রীর সুগড়ন স্বাস্থ্য থাকতে পারে না। নিশ্চয় এটা হতে পারে—কিন্তু হবার আগে তার যুক্তিগ্রাহ্য প্রস্তুতি থাকা দরকার। আমাদের অধিকাংশ লেখকই এই বিষয়ে মাথা ঘামাতে চান না। বিশ্বাসযোগ্যতা যেমন সাহিত্যের অন্যতম গুণ, সেই রকম একটি চরিত্রকে তার নিজের মানসিক গঠন এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সজীব হয়ে উঠতে হয়—যাতে সে যথার্থ মনে হবে।

অভিনন্দ

বিস্মৃতি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'বিস্মৃতিই শুধু নয়, প্রয়োজনে করি অস্বীকার
তোমাকে ছাড়াও চলে অনায়াসে আমার এ নাস্তির সংসার,
সন্ধ্যায় নক্ষত্র ফোটে প্রভাতে প্রসূন
ব্যঞ্জনেও লেগে থাকে নুন
দিন যায় রাত কাটে যতই হই না কেন বিরূপ-দ্বিগুণ।
তবু যদি কদাচিৎ নাম শুনি, ওঠে কোনো কথা,
সর্ব অঙ্গে কাষ্ঠ-আড়ষ্টতা
ভাব করি কোথাকার বিদেশী অচেনা
কোনো কালে হয়নি তো কোনো লেনাদেনা।
তবু যদি তর্ক ওঠে ইতি-নেতি কোনো আলোচনা
নিন্দায় মুখর হয় রসালো রসনা
ধরি দোষ, আরোপিত গুণে করি ছিদ্রের খনন
করি তীব্র চরিত্রহনন
রক্তের গভীরে শুধু ঘৃণার রণন।
দুর্বার নিয়তি যদি দয়াময়ী দুর্ঘটঘটনী
তোমারে ঘেরিয়া রচে কোনোদিন কষ্টের বেষ্টনী
পঙ্গু করে দিয়ে যায় সৃষ্টির লেখনী,
তবে বুঝি তুঙ্গতম আনন্দেরে ছুঁই
ধর্ম দেখি, তৃপ্ত হই, শান্তিতে ঘুমুই।'

এ এক আশ্চর্য প্রেম! কুমারলতিকা তুমি কুলিশকঠিনা!
'একে তুমি প্রেম বলো? এ এক আনন্দ ঘৃণা
কুম্ভীপাক বিষানলময়।'
মিথ্যা কথা। এই এক নিত্যপ্রীতি শুদ্ধা অত্যন্তহীনা
লয় ব্যয় ক্ষয় নাই—পরমনিলয়।
ঘৃণাতেও সে যে ভালোবাসে
ভুলে থেকে বেঁচে থাকে ভোলে নাই তাহারি আশ্বাসে।
বর্তমান গত হয় বিগত তো হয় না অতীত
রবীন্দ্রসংগীত থাকে রবীন্দ্রসংগীত ॥

কেবলই গর্তের দিকে

মৃণাল বসু চৌধুরী

টানে
কেবলই গর্তের দিকে টানে
অনুপম সাপের সুষমা
জিভ ও চামড়ার
অস্পষ্ট মর্মর নিয়ে
পড়ে থাকে হাজার কিংশুক
ঘোলাজল
শুকনো আফিমে
গর্ভিনী নারীর ঠোঁটে
বহুবর্ণ ডানার অসুখ
টানে

কেবলই গর্তের দিকে টানে
আত্মসুখ
লোকধর্ম
টানে কলাবতী সাপের সুষমা

তোমাকেও চাই

রত্নেশ্বর হাজরা

তোমাকেও চাই—তুমি যেহেতু আমার দিকে বাড়িয়েছ হাত
যেহেতু নাভিতে ঘন গন্ধ মাখো
এবং আমার রাতে হও অন্ধকার—
যেহেতু যুবতী হও ইচ্ছেমতো—সোমরস পান করো
পাহাড়ের কাছে গিয়ে চেনাও প্রপাত
এবং আমাকে বলো তোমার যুবক হতে
তোমার বিশ্বাসী দুঃখ
ঐতিহ্যের মতো অহংকার...........

তোমাকেও চাই—তুমি যেহেতু মরণশীল, তুমি
মৃত্যুকে চেনাও মৃত্যু—এবং যেহেতু তার মুখে
জল দিয়ে চুমু খাও- চুমুর আস্বাদে থাকে শেষ সম্বল—
যেহেতু আমার হাতে জন্মদিনে তুলে দাও
বিষাক্ত গাছের পাকা ফল
অথচ বলো না কবে কেড়ে নেবে সবটুকু বায়ু।
তোমাকেও চাই তুমি যেহেতু আমার জন্য রোদ্দুর পাঠাও, আর
এখনো প্রার্থনা করো আয়ু..........................

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১১৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

দিনের পর দিন তোমার আগমনের প্রত্যাশায় কেটে যাচ্চে। ওদিকে সুরুলের জন্যে মন উদ্বিগ্ন আছে। শীঘ্রই কিছু উপায় করা অত্যাবশ্যক হয়েচে যত দিন যাচ্চে ততই মুশকিল গভীর করে শিকড় গাড়চে। তুমি আসবে কি আসবে না, অথবা কবে আসবে সে সম্বন্ধে কোনো সাড়া শব্দই না পাওয়াতে তোমাকে বাদ দিয়ে কিছু করা যেতে পারে কিনা তাও ঠিক করতে পারচিনে।

পূরবীর প্রুফ একটুখানি উঁকি মেরেই গা ঢাকা দিয়েচে। প্রবাহিনীর সংবাদ পাইনি। চয়নিকার এক অংশ এখনো এখানেই পড়ে আছে। গল্পগুচ্ছের একটা ফাইল আমার হাতে এসেছে তাতে নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের দৃষ্টির চিহ্ন আছে কিন্তু অতি বিরল। Talks in Japan কি অবস্থায়? রাণুর[১] বিবাহ উপহার বাঁধানো হল কিনা জানতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি যদি না হয় তবে সময়মত খবর পেলে আর কিছু যাহোক একটা দেবার চেষ্টা করতে পারি। আমি বিবাহে যেতে পারব না—রেলপথে যাওয়া আসা এবং কলকাতা বাসের উৎপাতকে ভয় করি। সেই জন্যেই বিবাহের উপহারটা মনের মত হয় এই আমার একান্ত ইচ্ছা—কিন্তু এতদিনেও যখন সাড়াশব্দ পেলুম না তখন মনে নানা সংশয় উপস্থিত হচ্চে। শীঘ্র তোমার এখানে আসার সম্ভাবনা নেই আশঙ্কা করে আজ তাগিদ পাঠাচ্চি। রাণীর শরীর অসুস্থ ছিল এখন কেমন আছে?

মীরার খবর কি?

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Talks in Chinaর যথেষ্ট প্রচার হয়নি বলে লোকে গুপ্তরুজের কাছে নালিশ জানিয়েছে।

॥ ১১৬ ॥

কল্যাণীয়েষু

অগত্যা সেদিন তোমার হাতে বসুমতীর প্রুফ দিয়ে এসেচি। কিন্তু মন সুস্থির হয়নি। প্রবাসীর প্রুফটি আর্ট প্রেসে চালান হয়ে গিয়েছিল। এটার কি গতি হবে কে জানে। বসুমতীতে আমার যে দুটো বক্তৃতা আটকে আছে সে দুটোর কপি না পেলে ছাপতে দিতে পারচিনে।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১১৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

হঠাৎ মনে পড়ল, তোমার হাতে যে-পূরবীখানা দিয়েছিলেম, তাতে "শীত" কবিতায় অনন্যমনস্কভাবে একটা লাইন বিপর্যস্ত করে দেবার চিহ্ন দিয়েছিলেম। সেই চিহ্নের নির্দেশ যদি পালন করা হয় তাহলে সেই জায়গাটুকুতে একটা পাগলামীর আবর্ত সৃষ্টি হবে। অতএব সেটা উপেক্ষণীয়।

রামানন্দবাবু শাস্ত্রীমশায়কে[২] বলেছেন যে শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা থাকা হলে সকল রকমেই আমাদের সুবিধার কারণ হয় এই কথাটা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কেন বুঝচেন না তা তিনি আন্দাজ করে উঠতে পারচেন না। তিনি বলেন সাধারণ-ভাবে ছাপাখানা ও বিশেষভাবে কলকাতার ছাপাখানা সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর মতে শান্তিনিকেতনে ছাপাখানা করা ছাড়া নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অনেক দুঃখ পেয়ে একদিন হয়ত সেই প্ল্যানই ঠিক করবে, কিন্তু ইতিমধ্যে?

এখানে ভালোই আছি। তোমরা কিছুদিনের মতো যদি আসতে পার তাহলে অনেক কাজ এগিয়ে যায়। কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। ইতি

॥ ১১৮ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রুফ দেখে দিলুম। একটি নূতন কবিতা মহুয়ার জন্যে পাঠাই। এটা লেখা হয়েছে তপতীর জন্যে। কিন্তু এই কবিতাটি মহুয়ার উপযুক্ত ভূমিকা। পত্রাঙ্কিত পাতাগুলোর পূর্বে সব প্রথমে এইটে বসবে—তাহলে পরবর্তী কবিতাগুলোর তাৎপর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

অভিনয়ের উপযুক্ত লোকের অত্যন্ত অভাব। এই কারণেই হয়তো কলকাতায় গিয়ে কিয়দংশ রিহার্সাল জমাতে হবে। মুশকিল হবে।

অনেকগুলো বই একসঙ্গে ছাপানো ব্যবসা হিসাবে ভুল। ব্যস্ত আছি।

তোমাদের কবি

দূত।

ছিনু আমি বিষাদে মগনা
অন্যমনা
তোমার বিচ্ছেদ অন্ধকারে।
হেনকালে নির্জন কুটীরদ্বারে
অকস্মাৎ
কে করিল করাঘাত,
কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, "অতিথি এসেছি, দ্বার খোলো।"
মনে হোলো
এ যেন তোমারি স্বর শুনি ;

---

১ লেডি রাণু মুখার্জি

২ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী

এ [illegible] বায়ু [illegible] রবির [illegible]
দিগন্ত আলিম্প পূর্বপারে
পাঠালো নিবেদন তার স্বর্ণলাঞ্ছিত [illegible]।
কেঁপেছিল বক্ষতল
বিকম্প করিনি তবু অর্ঘ্যদল।
মুহূর্তে মুছিনু অশ্রুবারি
বিরহিণী নারী:
ছাড়িনু খেয়ান তব তোমার সন্ধানে।
ছুটে গেনু দ্বারপানে।
শুধালেম, "তুমি দূত কার?"
সে কহিল, "আমি তো সবার।"
যে ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি সাদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
আনিলাম অর্ঘ্যথালি,
দীপ দিনু জ্বালি'।
দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
যে মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে ॥
প্রিয়ার চঞ্চু চুম্বিত মোর পাখা
সে কি আর র'বে কুলায়ের কোণে ঢাকা?
নিয়ে যাবে তার উধাও আবেগ সে যে,
বাতাসে উঠিবে তারি হুঙ্কার বেজে,
দিবে সে মেলিয়ে প্রভাত-রবির তেজে
পালখে পালখে যে বর্ণ তার আঁকা ॥
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৮

॥ ১১১ ॥

"UTTARAYAN"
Santiniketan, Bengal

ॐ

কল্যাণীয়েষু

প্রশান্ত, Hopkins প্রভৃতি সেবককায়দের বাঁচাবার উদ্দেশে ম্যাজিস্ট্রেট অনায়াসে আমাকে Sacrifice করেচে। এখন কি উপায় করতে পারো করো। ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠিখানা অপূর্বর কাছে। তার জবাবও দেওয়া হয়নি। সুভাষ ৩ কিছু করবেন কিনা জানিনে। এরা আমার প্রতি অন্যায় করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না তার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

আজকাল এখানে খুব ভীড় খুব কাজ, মন স্থির করা অসম্ভব হয়েচে। সেই জুজুৎসুর লেকচারটা নিয়ে কালীমোহনকে৪ কলকাতায় যেতে বলেচি। সেখানে সে আরো কারো কারো সঙ্গে দেখা করে যদি কিছু করতে পারে তারি চেষ্টা করতে তাকে বলেচি। ইতি বুধবার

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৩ সুভাষচন্দ্র বসু
৪ কালীমোহন ঘোষ

॥ সমাপ্ত ॥

চৌকির ওপর আধশোয়া অবস্থায় পত্রিকা পড়তে পড়তে দেখতে পায় যুধাজিৎ, বারান্দায় ওর ছোট বোন শম্পা খেতে বসেছে। অফিস যাবার সময় এতকাল বাবা যে থালায় করে ভাত খেতেন, সবচেয়ে বড় সেই কাঁসার থালায় ভাত, বাটিতে ডাল, প্লেটে এক টুকরো মাছ, থালার একপাশে আলুভাজা সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে মা। বারান্দায় মাছির উপদ্রব বড্ড বেশী, মা তাই হাতপাখা দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে টুকটাক সাংসারিক কথা বলে যাচ্ছে। শম্পা মায়ের দিকে বিশেষ না তাকিয়ে, নিয়মরক্ষার মত দু'একবার ঘাড় নেড়ে দিব্যি যান্ত্রিক গতিতে খেয়ে যায়। সাড়ে ন'টায় অফিসে হাজিরা, তাই ন'টার মধ্যে ওকে বেরোতেই হবে। প্রাইভেট কোম্পানী, হাজিরার ব্যাপারে এমনিতেই বেশ কড়াকড়ি। তার ওপর শম্পা নাকি খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পি-এ অর্থাৎ পার্সোনাল অ্যাসিস্টাণ্ট।

শম্পার পাশে বসে মায়ের হেসে হেসে পরিপাটি কথা বলা আর হাতপাখা নাড়িয়ে হাওয়া করা দেখে যুধাজিতের বিরক্তি ধরে যায়। ধুত্তোরি! ন'টা বাজতে চলল। ক্ষিদেয় চোটে পেটে চড়া পড়ে গেল, এদিকে সকালের জলখাবারের পাত্তা নেই এখনো। অথচ সেই কোন সকালে একবার গঙ্গাজল মার্কা চা খেয়েছে এক কাপ, সংগে একটা বিস্কুট পর্যন্ত না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে শম্পার দু'প্রস্থ খাওয়া প্রায় শেষ। যুধাজিৎ কেবল দেখে যায়, বাড়ির সবলের এখন শম্পার সুবিধে অসুবিধের দিকেই দৃষ্টি, মুভি ক্যামেরার মত। শম্পার সামান্যতম অসুবিধের ব্যাপারগুলি পর্যন্ত আজকাল মায়ের চোখ এড়ায় না। তেইশ বছরের বেকার দাদা যুধাজিৎ ভাবে, ওদের সংসারটা বলতে গেলে এখন শম্পার রোজ-গারেই চলে, যুধাজিৎ নিজে ডিস্টিংসন নিয়ে বি এসসি পাশ করেও গত তিন বছর ধরে বেকার, আর এতদিনকার রোজগেরে বাবাও গতমাস থেকে সরকারী পেনশন পাওয়া অকর্মণ্য ফালতু লোক।

যুধাজিৎ সেই কোন সকালে ঘুম থেকে উঠে রাস্তার কলে লাইন মেরে বালতি চারেক জল, বউদির দোকান থেকে মুসুরী ডাল নিয়ে এসেছে, এছাড়া এক ফাঁকে খবর দিতে হয়েছে কয়লার দোকানে। তারপরই খানিকটা ফুরসৎ পেয়ে খবরের কাগজটা পড়ছে। ওর কাছে অবশ্য খবরের কাগজ পড়া মানে কর্মখালির বিজ্ঞাপনগুলি তন্নতন্ন করে পড়া—একবার দু'বার, তিনবার, বাচ্চা ছেলের মত মুখস্ত করে পড়া, একেবারে ঘেন্না ধরে গেছে। এরপর শালা বিজ্ঞাপন মাফিক অ্যাপ্লিকেশন ছাড়ো, পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটগুলো টাইপ করো, সারা কলকাতা ঢুঁড়ে গেজেটেড অফিসার ধরে সার্টিফিকেটের কপিগুলো অ্যাটেস্ট করো, চরিত্র সম্পর্কে প্রশংসাপত্র আদায় করো, কোথাও কোথাও আবার পোস্টাল অর্ডারের বায়নাক্কা। কম ঝামেলা আর খরচার ব্যাপার! এত টাকা পয়সাই বা পায় কোথায়! সব টাকা কি আর বাবার কাছ থেকে চাওয়া যায়! তাছাড়া এতসব করে অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে তো একোন লাভ নেই। মাস তিনেক বাদে নিয়মমাফিক রিগ্রেট লেটার আসবে, অনেক জায়গা থেকে আবার তাও না।

আগে যখন সকালের বাজারটা হাতে ছিল, প্রায় রোজই আট আনা বারো আনা পয়সা ম্যানেজ হয়ে যেত। কিন্তু কথায় বলে, অতি লোভে তাঁতী নষ্ট, তাই একদিন বেশী পয়সা সরাতে গিয়েই সন্দেহ হ'ল। ব্যস, তারপর থেকে বাজারটা বাবার কব্জায়। তাছাড়া অফিস থেকে রিটায়ার করে বাবাই বা করবেন কি? ওঁরও তো করবার মত কাজকর্ম চাই। ফলে আজকাল সারা সকালটা জলখাবার খাওয়ার আগে পর্যন্ত এই সময়টা শুধু অলসভাবে গড়াগড়ি দেওয়া আর খবরের কাগজ পড়া ছাড়া অন্য সাংসারিক কাজকর্মের বিশেষ চাপ থাকে না। শম্পা খেয়েদেয়ে অফিসে বেরিয়ে গেলে ন'টা নাগাদ জলখাবার খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার রকে বসবে। তারপর রকে বসে বসে নিছক আড্ডা, দিনের পর দিন।

অথচ কিছুদিন আগে যুধাজিৎও সারা-দিন ব্যস্ত থাকত খুবই। সকালে ঘুম থেকে উঠে গুড় দেওয়া আদা আর সদ্য অংকুর গজানো ছোলা খেয়ে খানিকটা ব্যায়াম, তারপর রাস্তার কল থেকে জল আনা, বাজার করা, পত্রিকা পড়া সবই নিত্য

[illegible] এবং নিয়মমাফিক। এরপর দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে, ভাত-টাত খেয়ে দশটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ত। মা যত্ন করে খেতে দিত, হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করত. বাবারও সবসময় নজর থাকত ওর সুবিধে অসুবিধের ওপর। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেড-ডালহৌসীর অফিসপাড়ায় টো টো করে ঘুরে বেড়াত যুধাজিৎ। কখনো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে, কখনো বা অফিসে খোঁজ করত কোথাও কোন চাকরি খালি আছে কিনা। দু'-তিনশ' টাকার যে কোন চাকরির খোঁজ থাকলে ডাকবিভাগের ওপর ভরসা না করে নিজের হাতে দিয়ে আসত দরখাস্ত, 'উইথ রেফারেন্স টু ইয়োর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট' অথবা 'আনডার-স্ট্যান্ডিং ফ্রম এ রিলায়েবেল সোর্স' ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন সামনে অনেক আশা, ভরসা, ভবিষ্যতের রঙীন উজ্জ্বল স্বপ্ন, শুকাই স্ক্রেপার অফিস, সবুজ ময়দান, সাজানো গোছানো সুন্দর ফ্ল্যাট, লিফ্‌ট্, হ্যালো... ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং... লাল টিপ পরা একটি মুখ, এসব কিছু হাতছানি দিয়ে ডাকত রহস্যময়ীর মত।

কেবল ও নিজে নয়, ওর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজন এবং বাড়ির সকলেই বিশ্বাস করত, যুধাজিৎ এত চালাক চতুর স্মার্ট ছেলে, ভাল একটা কিছু জুটে যাবেই। কিন্তু ক্যালেণ্ডারের দিন পেরিয়ে গেল. প্রতিদিন সূর্য উঠল, আবার অস্ত গেল, জুতোর সুকতলা ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাতলা কাগজের মত হয়ে এল, তবু চাকরি হল না। এই দীর্ঘ তিনবছরে একশ' তিনটে জায়গায় দরখাস্ত দিয়ে মাত্র এগারোটা জায়গা থেকে ইণ্টারভিউয়ের ডাক এল। কিন্তু ইণ্টারভিউ দিতে দিতে বুঝতে পেরেছে যুধাজিৎ, সব চাকরির জন্যই আগে থেকে লোক ঠিক করা থাকে। ইণ্টারভিউয়ের ব্যাপারটা বাত্রাদলের সং সেজে ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। ইণ্টারভিউয়ের চিঠি এলেও আজকাল তাই আর রোমাঞ্চ হয় না, মনটা ভবিষ্যতের স্বপ্নে উন্মুখ হয়ে ওঠে না। তাই এসব কথা ভুলতে চায় ও। তবু প্রথম ইণ্টারভিউয়ের কথাটা প্রথম প্রেমের মত এখনো মনে আছে স্পষ্ট।

ঝকঝকে ঘরে সুন্দর চকচকে মেহগনি টেবিলের ওপাশে তিন ভদ্রলোক। প্রত্যেকেই স্যুট টাই পরা নিখুঁত ভদ্রলোক। মাঝের ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, মাথায় কাঁচা পাকা চুল। যুধাজিতের মনে হল, উনিই বোধ হয় চাকরি দেবার আসল মালিক। ঠোঁট থেকে দামী ইমপোর্টেড চুরুটটা নামিয়ে অমায়িক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন,

—'ইউ আর মিঃ যুধাজিৎ চ্যাটার্জী?'

—'ইয়েস স্যার।'

ভেতরে খানিকটা নার্ভাস হলেও যুধাজিতের কণ্ঠস্বর শান্ত, সংযত। ভদ্রলোকের অমায়িক ভঙ্গিতে আশ্বস্ত হয় যুধাজিৎ।

—'কোন কলেজ থেকে পাশ করেছেন?'

—'আশুতোষ কলেজ।'

—'বাঃ, বাঃ, দেখছি ডিসটিংশনও পেয়েছেন। কিন্তু এম এসসি পড়লেন না কেন?'

—'সিট পেলাম না, তা'ছাড়া বাড়ির অবস্থা—'

—'ওঃ আই সী।' ভদ্রলোকের চোখে মুখে সমবেদনার ছায়া, যা আশ্বস্ত করেছিল অস্থির যুধাজিতকে।

এবার দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রশ্ন করবার পালা।

—'আচ্ছা, মিঃ চ্যাটার্জী, আমাদের তো অ্যালুমিনিয়ামের ফ্যাক্টরী। ক্যান য়ু টেল মী দ্য মেন ওর অফ অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড ইটস কেমিক্যাল ফরমুলা?'

—'বক্সাইট, এ এল টু ও থ্রি। টু এইচ টু ও।' যুধাজিৎ চটপট উত্তর দেয়।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের চোখে মুখে সন্তুষ্ট হবার ভঙ্গী। এবার তৃতীয় ভদ্রলোকের প্রশ্নের পালা। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য খুব ভালো, মনে হয় এককালে খেলাধুলোর চর্চা করতেন।

—'আপনি তো লিখেছেন আপনি ভালো ফুটবল খেলতেন, তা' আমাদের অফিস টিমে খেলতে পারবেন তো?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কলেজ টিমে তো রেগুলার খেলতাম।'

আচমকা প্রশ্নের মোড় ঘুরে যায়।

—'আচ্ছা, পার্টি-ফার্টি করেন না তো?'

কলেজে পড়বার সময় যুধাজিৎ মাঝে কিছুদিন পার্টি করত, একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে ভোটেও দাঁড়িয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত জিততে পারে নি। কিন্তু ও জানে, এবং বাবাও বারবার বলে দিয়েছেন, এসব কথা কোন ইন্টারভিউ বোর্ডে নৈব চ নৈব চ।

দম দেওয়া পুতুলের মত বলে গেল যুধাজিৎ, 'ওসব দিকে কোনদিনই ইন্টারেস্ট নেই স্যার।'

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে এবার প্রথম ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'বাঃ, বাঃ, এই তো চাই, আপনার মত স্মার্ট এবং এফিসিয়েন্ট লোকই তো দরকার আমাদের।'

একথা শুনে ভেতরে ভেতরে যুধাজিৎ খুবই উল্লসিত, উত্তেজিত। ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরিটা ও আটকায় এবার। মাস গেলে চারশো টাকা মাইনে। ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নের ফানুসগুলো আবার ওর মনের আকাশে জড়ো হতে শুরু করে।

তারপর থেকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তের প্রতীক্ষা। সেই কোম্পানী থেকে গোলাপী রংয়ের খাম দিন এল, কিন্তু চাকরি হবার চিঠি নয়, না হবার রিগ্রেট লেটার। রিগ্রেট লেটার পড়তে পড়তে যুধাজিতের হৃৎপিণ্ড দুমড়ে মুচড়ে মুহূর্তের মধ্যে রক্তাক্ত হয়ে উঠল। শরীরের রক্ত কণিকাগুলো প্রচণ্ড ছোটাছুটি করে একসময় ক্লান্ত, অবসন্ন।

পরে ভেতর থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যুধাজিৎ, চাকরিটা শেষ পর্যন্ত পেয়েছে ঐ কোম্পানীর পারসোনেল ম্যানেজারের ভাগনে। টু ক্লাস টু মেকস ফোর, সুতরাং চাকরি পাবার ইতিহাসটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ও বুঝে গেছে, চাকরি হবার রাস্তা দরখাস্ত এবং ইন্টারভিউ নয়, অন্য কোন গোপন আঁকাবাঁকা রাস্তা আছে সেখানে পৌঁছবার। ভাবতে ভাবতে সমস্ত মনটা বিদ্রোহ করে ওঠে, সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলতে চায়। এ পৃথিবীর সমস্ত নিয়মকানুন, সব কিছু।

—'কি রে দাদা, চাকরি বাকরির কোন খোঁজ পেলি?'

শম্পার আলতো কথায় কল্পনা এবং ভাবনার জগৎ থেকে ছিটকে পড়ে যুধাজিৎ। তাকিয়ে দেখে, অফিসে বেরোবার আগে শেষবারের মত মুখে মেকআপ বুলিয়ে নিচ্ছে শম্পা। ওর পরনে সবুজ কালো প্রিন্টেড ভয়েল শাড়ি, সঙ্গে ম্যাচ করা হাতকাটা ব্লাউজ, সারা মুখে ফাউন্ডেশন ক্রীমের অদৃশ্য প্রলেপ, ঠোঁটে পীঙ্ক লিপস্টিক, হাতের নখগুলো পর্যন্ত ম্যানিকিওর করা। শম্পাকে দারুণ লাগছে দেখতে, নিজের বোন বলে চেনাই মুশকিল। অফিসে কাজ করতে হলে কি এত সাজগোজ করতে হয়! সত্যি, এ কমাসে কি দারুণ বদলে গেছে। একটা মাঝারী প্রাইভেট কোম্পানীর খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পি-এ। নগদ ছ'শ টাকা মাইনে।

—'না, এখনো তেমন কিছু পাই নি।'

উত্তরটা দিয়ে যুধাজিতের নিজেকে খানিকটা বোকাবোকা মনে হয়, কারণ উত্তরটা ভালো করে শোনেই নি শম্পা, কিংবা হয়তো শোনার প্রয়োজন তেমন বোধ করে নি। কারণ ও যে চাকরি পায়নি কিংবা পাবে না, সেটা অনেকটা স্বতঃসিদ্ধের মত দাঁড়িয়ে গেছে। শাড়িটা একটু ঠিকঠাক করে ড্রেসিং টেবিল থেকে সুদৃশ্য ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শম্পা।

—'চলি রে দাদা।'

ওর অপসৃয়মান শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যুধাজিতের চোয়াল দুটো ধীরে ধীরে গ্র্যানিট পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে। কি এক দুর্বোধ্য কারণে শম্পার প্রতি একটা তিক্ততায় ভরে যায় সমস্ত মন। অথচ এই শম্পা এককালে ওর কত আদরের বোন ছিল। সেই ছেলেবেলায় কতদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প না বললে ঘুমোতই না শম্পা।

খানিকক্ষণ পরে ঘরে ঢোকে যুধাজিতের মা, হাতে অ্যালুমিনিয়ামের থালায় সকালের জলখাবার। ওর সামনে থালাটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে যায় মা। নিঃশব্দে। যুধাজিৎ তাকিয়ে দেখে, থালায় গোটা তিনেক দোমড়ানো আটার রুটি আর কিছুটা

ভেলিগড়ে। মনটা আগে থেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল, এখন এই খাবার দেখে মেজাজটা গরম হয়ে ওঠে।

প্রয়োজনের চেয়ে একটু জোরেই ডেকে ওঠে, 'মা—'

চলতে চলতে নির্লিপ্তভাবে ফিরে তাকায় মা, 'কি, পিছন থেইক্যা ডাকস ক্যান?'

'তোমাকে কতদিন বলেছি না, শুকনো রুটিকুটি খেতে পারব না। আমার জন্য মুড়ি না হয় চিঁড়ে—'

যুধাজিতের বলার ভঙ্গিতে বেশ ঝাঁঝ ছিল, তাতেই বোধ হয় মায়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

—'নিজের ইচ্ছা মতন খাইতে হইলে রোজগার করতে হইবে, একটা মাইয়ার উপর ফুটানি চলব না।'

—'ঠিক আছে, তোমাদের পয়সায় তোমরাই খাও, আমার আর খেতে হবে না।'

এই কথা বলে ঝোঁকের মাথায় রুটির থালায় একটা কিক মেরে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যুধাজিৎ আচমকা।

মা পেছন থেকে ডাকে, 'যুধা, শোন, শোন, খাইয়া যা—'

দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে বাড়ির দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে শুনতে পায় মায়ের গলার স্বর। তীব্র তীক্ষ্ন ধারালো কথাগুলি ক্ষতবিক্ষত করে দেয় ওকে।

—'থাউক, থাউক, আর ডাকতে হইব না। প্যাটে গোত্তা মারলে যাইব কই—'

বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যুধাজিৎ, একটা চাকরি যোগাড় না করে বাড়ির ভাত আর খাবে না।

এদিকে সারাটা অঞ্চল জুড়ে রাস্তা খুঁড়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেন তৈরির আয়োজন। চারিদিকে শুধু কাঠের তক্তা, হিউম পাইপ মাটির স্তূপ আর পাম্পের যন্ত্রপাতি। উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে ঝিল রোডের মোড়ের কাছে পৌঁছতেই দেখতে পেল সকালের আড্ডা অন্যদিনের মতই জমে উঠেছে। ওর বন্ধুরা —গাবলু, শংকর, সৌমেন, অমিতাভ, বাচ্চু সবাই হাজির। সশব্দে গুলতানি চলছে।

যুধাজিৎ রকের কাছে পৌঁছতেই বাচ্চু চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে গুরু, কি ব্যাপার, এত দেরী? সেই পিকনিকের ব্যাপারটা আজ সব ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে না! তুই ডোবাবি মাইরি।'

বাচ্চুর কথায় পিকনিকের ব্যাপারটা মনে পড়ে যায় যুধাজিতের, সামনে তেইশে জানুয়ারী ডায়মণ্ডহারবারের পিকনিক, মাঝে আর মাত্র পাঁচদিন বাকি, তাই আজই সব-কিছু ঠিকঠক করে ফেলবার কথা। গাবলু সিগারেট খাচ্ছিল। ওর দিকে হাত বাড়ায় যুধাজিৎ, 'দে তো গাবলু, একটা সিগারেট ছাড়।'

—'আর সিগারেট নেই, এই আধখানাই নে তবে।'

জ্বলন্ত সিগারেট থেকে ছিঁড়ে আধেকটা দিল যুধাজিৎকে। ও ছেঁড়া সিগারেটটা জ্বালিয়ে খুব জোরে টানল, তারপর একগাল ছাই রংয়ের ধোঁয়া আকাশের দিকে ছড়িয়ে বলল, 'পিকনিক কিকনিক বাদ দে, শালা, আজ মনমেজাজ বড্ড খারাপ।'

—'সে কি, প্রতি বছরের তেইশে জানুয়ারির পিকনিক এক কথায় গুবলেট। তা ছাড়া তুই তো বললি, তোর ঐ ইয়ে—' ওদের রকের উল্টোদিকের বাড়িটার দোতলার ব্যালকনির দিকে একবার তাকিয়ে নিল শংকর, 'তুই সেদিন বললি, ইন্দ্রাণী যাবে এই পিকনিকে। আর এখন বলছিস শালা, পিকনিকই হবে না। মাইরি, এসব নকশা ছাড়।'

গাবলু হাতের পোড়া সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে মারে, 'যুধাজিৎ, এই চাকরি ফাকরি যোগাড় কর, না হলে তোর ইন্দ্রাণীও ফুটে যাবে।' গলাটা একটু নামিয়ে বলে চলে গাবলু, 'দিনকয়েক ধরে দেখছি, বেপাড়ার এক ছোকরা ওদের বাড়িতে আজকাল সারাদিন গুজুর গুজুর ফুসুর—'

—'চুপ কর শালা,' এক ধমকে গাবলুকে থামিয়ে দেয় যুধাজিৎ।

এখানেও আবার সেই চাকরির খোঁটা, তাও আবার ইন্দ্রাণীকে জড়িয়ে। শান্ত হয়ে আসা মনটা আবার ষাঁড়ের মত ক্ষেপে উঠতে শুরু করে। একটা বিচ্ছিরি গালাগাল গলার কাছে উঠে আসে, কিন্তু লাগাম টেনে ধরে অতিকষ্টে। ইন্দ্রাণীদের দোতলার ফাঁকা ব্যালকনির দিকে চোখ চলে যায় অজান্তেই। ওদের বাড়ির উল্টোদিকে এই রকটায় বসলে কিভাবে যেন নিজের প্রতি আস্থা ফিরে পায় ও। বিশেষত মাঝে মাঝে যখন যখন বোগেনভেলিয়া ফুলে ছাওয়া দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায় ইন্দ্রাণী, ওর দিকে তাকিয়ে বিশেষভাবে হাসে, তখন নিজেকে সত্যিই সুখী মনে হয়। এই পৃথিবীতে ইন্দ্রাণী ভালবাসে ওকে, ও ভালবাসে ইন্দ্রাণীকে। এটাই তো জীবনের ধ্রুব সত্য। আর তাই সবাই যখন যুধাজিতের প্রতি আস্থা হারাতে চলেছে, তখন ইন্দ্রাণীর এই নির্ভরতা, ভালবাসা ওকে শক্তি যোগায়, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে।

কিন্তু আজ তো একবারও ইন্দ্রাণী এসে দাঁড়াল না। আধ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, তবুও না। তবে কি ইন্দ্রাণী বাড়ি নেই, নাকি গাবলুর কথাটা—। একটা আশংকা পেণ্ডুলামের মত মনের ভেতর দুলতে থাকে।

গাবলুর দিকে ফিরে তাকায় ও, 'গাবলু, তুই কি যেন বলছিলি—'
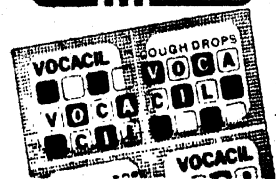
—'বলব কি শালা, এমনভাবে দাবড়ে দিলি! তোর ভালোর জন্যেই—'

—'ধানাই পানাই না করে বলেই ফেল না।'

—'কিছুদিন হলো এক কার্তিক তোর হবু ফাদার ইন ল'র বাড়িতে যাতায়াত করছে। আমার চোখকে ধুলো দেওয়া শালা শিবের বাপেরও অসাধ্যি। ব্যাপারটা নজরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে লোক লাগিয়ে জেনে ফেললাম, কার্তিকটি ইঞ্জিনীয়ার, কোন একটা ফার্মে বারো শ' টাকা মাইনে পায়।'

—'বা-রো-শ'-টা-কা!' সিসমোগ্রাফের মত কাঁপতে থাকে গলার স্বর।

সিগারেটের আগুন হাতে এসে ঠেকতেই চমকে উঠে দূরে ছুঁড়ে মারল যুধাজিৎ।

—'শুধু তাই নয়, তোমার ইন্দ্রাণী আজকাল কার্তিকটার দিকে—মানে—একটু ইয়ে আর কি। সেদিন সিনেমায়ও গিয়েছিল দুজনে।'

হঠাৎ যেন আগুন ধরে যায় মগজের কোষে কোষে। ইচ্ছে করে ইন্দ্রাণীদের বেগেনভেলিয়ায় ছাওয়া সুন্দর দোতলা বাড়িটাকে এক টুকরো কাগজের মত দু'হাতে দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়িয়ে ফেলে। কিন্তু কি করে, কিভাবে! ভাবতে ভাবতে আবার অবসন্ন হয়ে পড়ে। চিন্তা করতে করতে আবার কখন চোখ চলে যায় রাস্তার ওপাশে মরা শিমুল গাছটার দিকে। দেওয়ালে রাইফেলের ছবি।

অমিতাভর অবস্থা ওদের মধ্যে খানিকটা ভালো। পলিটিক্যাল সায়েন্সে এম-এ, সন্ধ্যেবেলার দিকে একটা কলেজে পার্ট টাইম পড়ায়, তা'ছাড়া গোটা দুয়েক টিউশানি।

অমিতাভর দিকে ক্লান্ত চোখে তাকায় গাবলু, 'অমিতাভ, আর পারা যাচ্ছে না; কিছু একটা যোগাড় করতেই হবে। একটা টিউশানি দে না।'

—'টিউশানি' তিক্ত হাসি অমিতাভর মুখে, 'আজকাল আর টিউশানি পাওয়া যায় না রে! মাস্টার কে রাখবে বল, টুকেই যখন পরীক্ষা পাশ হয়ে যাচ্ছে।'

সৌমেন এতক্ষণ বিশেষ কথা বলে নি, শিস দিয়ে একটা ফিল্মি গানের সুর তুলছিল। শিস থামিয়ে ওদের দিকে তাকাল, তারপর বলল,

'এই যুধাজিৎ, তোকে বলতে ভুলে গেছি, শুনছি সি এম ডি-এ নাকি প্রচুর লোক নেবে।'

—'কেন? নর্দমা তৈরী করতে নাকি?' অমিতাভর গলায় ব্যঙ্গের আভাস।

—'আরে থাম না। চাকরি দিলে নর্দমা কেন, পায়খানা তৈরী করব। সৌমেন, বল না মাইরি। কোথায় কাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে।' যুধাজিৎ হঠাৎ খুব আশাবাদী হয়ে পড়ে।

—'এমনি অ্যাপ্লাই করলে হবে না, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে আসতে হবে।' সৌমেনের মুখে অল্প অল্প হাসি।

—'ও তো কবে থেকেই নাম লেখানো আছে। ওতে শালা চাকরি হয় কখনো! আমার অনেক দেখা আছে। সি এম ডি এ-র কোন বড় অফিসারকে ধরতে হবে। তাতে যদি হয়। বুঝলি?'

সৌমেন শিস দিয়ে ওঠে, 'আরে আমি কি আর তা' জানি না। তাই তো নতুন প্ল্যান ভেঁজেছি একটা। ঠিকঠাক মত লাগাতে পারলে আমাদের চাকরি রোখে কে। শুনবি?'

—'আরে অত গ্র্যাভিটি নিচ্ছিস কি, যা বলবি বলে ফেল না বাবা।' সৌমেনকে ঘিরে পাঁচটা উৎসুক মুখ, উজ্জ্বল চোখ।

এবার গলার স্বর নামিয়ে ফেলে সৌমেন, 'বুঝলি, সোজা পথে এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে কিংবা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে চাকরি হবে না, এই মোদ্দা কথাটা বুঝে গেছি আমরা। সুতরাং অন্য বাঁকা পথ ধরতে হবে। কি, তোরা স্বীকার করিস কিনা।'

—'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই,' সবাই সায় দেয় একসঙ্গে।

—'তাহলে আমার প্ল্যানটা শোন। খবর পেলাম, সি এম ডি এ-র কোন এক হোমরা-চোমরা অফিসার নাকি আজ এখানে নর্দমা ইন্সপেকশন করতে আসছেন। আমার প্ল্যান হ'ল, আমরা সবাই মিলে ওকে ঘেরাও করতে পারি। ঘেরাও ঠিক নয়, এই সবাই মিলে তাকে বুঝিয়ে বলতে পারি আমাদের চাকরির প্রয়োজনের কথা। এখানে নর্দমা তৈরী হচ্ছে, সুতরাং স্থানীয় ছেলেদের দাবী সবচেয়ে আগে। প্রথমে খুব ভালায়েমভাবে কথা বলব, পরে প্রয়োজন হলে আমরা কিছুটা ভয়ও দেখাতে পারি।'

শঙ্কর ফস করে জিজ্ঞেস করে, 'কি, পেটো ছুঁড়তে হবে নাকি?'

—'আরে না, না, শালা বুদ্ধু নাকি! পেটো ছুড়লে চাকরি পাবি ভেবেছিস, উল্টে শ্রীঘর যেতে হবে।'

যুধাজিৎ খুব গম্ভীরভাবে ওদের কথা শুনেছিল, ওর চোখ একবার ইন্দ্রাণীদের ব্যালকনির দিকে, আর একবার বাড়ীর দেওয়ালে আঁকা রাইফেলের দিকে চলে যাচ্ছে রাডারের মত স্বয়ংক্রিয়ভাবে।

—'কখন আসবে তোর হোমরা-চোমরা অফিসার?'

—'এর মধ্যে তো এসে যাওয়া উচিত ছিল, তবে বড় অফিসার তো, ওদের তো আর সময় মেনে চলতে হয় না।'

ওরা ছটি ছেলে বসে রইল রকে, হোমরা চোমরা অফিসারের জন্য।

এদিকে রাস্তা খুঁড়ে নর্দমা তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। রাস্তার মাঝখানে লম্বা গর্তের দু-পাশে খাড়া কাঠের পাটাতন, তার ভেতরে লম্বা গোল হিউম পাইপ বসাচ্ছে ঘর্মাক্ত মজদুরেরা, ছোট পুলীর সাহায্যে। হেই মারো, হেই জোয়ান—

তদারক করছে কণ্ট্রাক্টরের লোক আর সি এম ডি এ-র কর্মচারী। আজ সবাই কাজের ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার। বড় সাহেব তদারকে আসছেন। যুধাজিৎ তাকিয়ে দেখে, চারিদিকে শুধু নর্দমা, ডাঁই ডাঁই মাটি খুঁড়ে বসানো হচ্ছে পাইপ। ভবিষ্যতের সুখের প্রতিচ্ছবি। এখানে আর কোনদিন কাদা-জল জমবে না, সমস্ত আবর্জনা, নোংরা জল এই নর্দমা দিয়ে চলে যাবে সকলের চোখের আড়ালে, নিঃসাড়ে। আর কোনদিন ঘোলা দূষিত জল জমবে না রাস্তায়, শহরে, নগরে।

খানিকক্ষণ পরে ওরা দেখতে পেল, নর্দমা তৈরির জায়গাগুলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে দত্তদের বাড়ির সামনে একটা জীপ এসে থেমেছে। এর চেয়ে বেশী আসা সম্ভব নয়, কারণ এর পর থেকেই কাঠের পাটাতন, গর্ত আর মাটির স্তূপ। জীপের গায়ে লেখা সি এম ডি এ। তা থেকে নামছেন মধ্যবয়সী এক সুবেশ ভদ্রলোক, বেশ রাশভারী চেহারা। সঙ্গে আরো একজন। খুব সম্ভবত চাপরাশী কিংবা বেয়ারা। ভদ্রলোককে জীপ থেকে নামতে দেখে ইতিমধ্যে কণ্ট্রাক্টরের লোক এবং সি এম ডি এ-র কর্মচারীটি ছুটে গেছে।

একটা শিস দিয়ে সৌমেন বলল, 'আরে এই তো সেই অফিসার। চল, এগোন যাক।'

ওরা সবাই মিলে দল বেঁধে এগোল অফিসারের দিকে।

কণ্ট্রাক্টরের লোকটি মুখে অমায়িক হাসি ফুটিয়ে তুলল, 'নমস্কার, স্যার।'

অফিসারটি হাসলেন, 'কি, সব ঠিকঠাক চলছে তো, নাকি—'
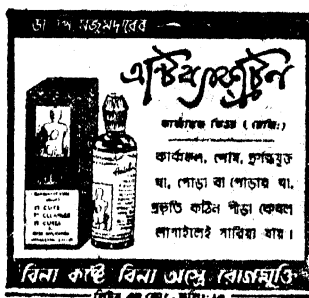
—না স্যার, কোন ঝামেলা—'

অফিসার ভদ্রলোক হঠাৎ ওদের দেখতে পেলেন, চোখে মুখে অবাক হবার চিহ্ন, 'কি ব্যাপার! আপনারা?'

সৌমেন বলল, 'এই, কিছু না স্যার মানে বলছিলাম কি, আমরা সব পাড়ার ছেলে, বেকার। একটা চাকরি যদি—'

আর্জি শুনে অফিসারের মুখ গম্ভীর, ভুরু কুঁচকে বললেন, 'চাকরি! চাকরি কোথায় পাব? গভর্নমেন্টের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ রয়েছে, সেখানে যান।'

অফিসারটি এবার এগিয়ে গেলেন খানিকটা, একটা খোঁড়া গর্তের কাছে উবু হয়ে বসে কি যেন পরীক্ষা করতে লাগলেন। পেছন পেছন ওরাও এগোল। ওদের দেখে অফিসারটি আবার উঠে দাঁড়ালেন। যুধাজিৎ এবার সামনে, দু-হাত দিয়ে মাথার অবাধ্য ঝাঁকড়া চুলগুলিকে ঠিক করতে করতে বলে, 'কিন্তু স্যার, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে আমার নাম তিন বছর ধরে লেখানো আছে. বিশ্বাস করুন এই তিন বছরে ওদের কাছ থেকে মাত্র তিনটে ইণ্টারভিউ পেয়েছি। চাকরি তো দূরের কথা।'

গাবলু পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বলুন স্যার, আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।'

ওদের কথার ধরনে অফিসার ভদ্রলোক স্পষ্টতই বিরক্ত, খানিকটা ক্রুদ্ধও হয়ত এবং তা ফুটিয়েও তোলেন কথাবার্তায়, 'কিন্তু সেজন্য আমার কি দায়িত্ব? আমি কি করতে পারি?'

যুধাজিৎ বলে, 'তা হয়ত ঠিক, কিন্তু আপনি একটা অফিসের বড়কর্তা, আপনাকে না বলে বলব কাকে? আমাদের চাকরির ব্যাপারে আপনাদের কি কোনও দায়িত্ব নেই?'

পেছন থেকে বাচ্চু হঠাৎ ফোড়ন কেটে বসে, 'সোজা রাস্তায় না হলে বাঁকা রাস্তা ধরতে হবে আমাদের।'

অফিসারটি থামছেন, বিরত এবং খানিকটা ভীত, হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'রাম সিং—'

দূর থেকে রাম সিংয়ের বিকট আওয়াজ ভেসে এল, 'আতা হ্যায়, হোজৌর।'

অফিসার ভদ্রলোক ওদের জটলা ছাড়িয়ে বাইরে বেরোবার চেষ্টা করছে। যুধাজিৎ হঠাৎ এগিয়ে এসে রাস্তা আটকে দাঁড়ায়, 'স্যার, আমাদের চাকরির ব্যাপারে কথা আপনাকে দিতেই হবে। না হলে আপনাকে তো চলে যেতে দিতে পারি না।'

—'তার মানে, আপনারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, মারবেন নাকি— রাম সিং—'

এই জটলায় তাড়াহুড়ো করে ভিড় ঠেলে বেরোতে গিয়ে অফিসারটি হোঁচট খেয়ে উলটে পড়ে গেলেন। আর পড়বি তো পড় একেবারে সদ্য-কাটা গর্তের ভেতরে। ভদ্রলোকের গলা থেকে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল সেই কর্মচারী দুজন। ওরা অফিসারটিকে টেনে তুলছে।

আচমকা এরকম একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় ওরা সবাই খুব ঘাবড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যে যার মত ছুটতে শুরু করল এলোপাথাড়ি। রাম সিং পেছন থেকে ছুটে এসে যুধাজিতের পিঠে একটা কাঠের ডাণ্ডা দিয়ে ধাই করে মেরে বসল। মার খাবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় একবার ককিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে রাম সিংয়ের তলপেটে বসিয়ে দিল দু-মনি লাথি। লোকটা ঘুরে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল আর একটা গর্তের ভেতরে। অফিসার ভদ্রলোক ততক্ষণে গর্ত থেকে উঠে তারস্বরে চিৎকার করতে করতে জীপের দিকে ছুটছেন। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিস, পুলিস, টেলিফোন—' কুলীরা সব লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে। মাত্র দু-তিন মিনিটের মধ্যে সমস্ত জায়গাটা একটা ছোটখাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বাচ্চু, গাবলু, সৌমেন, অমিতাভ শংকর যে যার সাধ্যমত কুলীদের মোকাবিলা করছে।

যুধাজিৎ ছুটছে, রাম সিংয়ের লাঠির আঘাতে ওর সমস্ত পিঠটা টনটন করছে ব্যথায়। এখান থেকে পালাতে চায় ও, তাই দিকবিদিকশূন্য হয়ে পাগলের মত ছুটছে। কিন্তু কোথায় পালাবে ও, যেদিকেই তাকায়, সেদিকেই শুধু গর্ত, কাঠের বড় বড় তক্তা, জল, বালি, সিমেণ্ট কাদায় ভর্তি যুদ্ধের পরিখার মত গর্ত। প্রথমে বাঁ দিকের গলিতে ঢুকল যুধাজিৎ, তারপর ডান দিকের গলিতে এর পর সামনের গলিটায়, সমস্ত কাটা গলি জুড়ে খালি ঢাউস সাইজের জঞ্জাল সাফ করার সিউয়ারেজ তৈরির আয়োজন। পালাবার কোন রাস্তা নেই।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

রাধারাণী দেবী
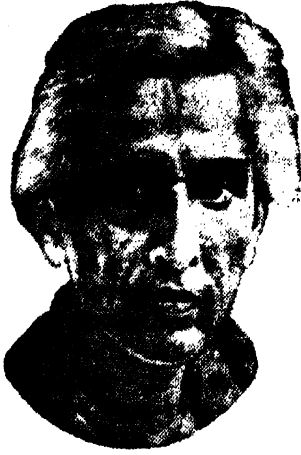
॥ ৭ ॥

অদৃশ্য তর্জনী

এর আগে মানুষ-শরৎচন্দ্রের মোটামুটি একটি রেখাচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। ওর মধ্যে একটি জরুরী তথ্যও জানিয়েছি। সে তথ্যটি এই,—ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রদের ক্ষুদ্র সাহিত্য-চক্রের মহিলা সদস্য, বিভূতিভূষণ ভট্টের ছোটবোন, 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'দিদি' উপন্যাস লেখিকা নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে উপন্যাসে বালবিধবা চরিত্র না আঁকলে ভাল হয়। এর জবাবে শরৎচন্দ্র জানিয়েছিলেন—কলমে আপনা হতে যা এগিয়ে আসে, তাকে রোধ করে রাখা উচিত নয়। তবে, এমন বালবিধবা চরিত্র কখনো আঁকবেন না যাতে অনুরোধকারিণীর মনে কিংবা মর্যাদায় আঘাত লাগে।

শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়নের জন্য এই তথ্যটি বিশেষ জরুরী, পাঠক-সমালোচক-গবেষকদের কাছে, আমার মনে হয়।

একটি অদৃশ্য তর্জনী শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ও সাহিত্যকে নিঃশব্দে নিয়ন্ত্রণ করতো। যে-নিয়ন্ত্রণকে শরৎচন্দ্রের হৃদয় কোনো দিন অস্বীকার করতে পারেনি। যে-নিয়ন্ত্রণের ফলে, শরৎচন্দ্রের জীবনও যেমন, সাহিত্যও তেমনি দিক্ বদল করে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। সারাটা জীবন নিজের শিল্পকে অন্যের মুখ-চাওয়া করে রাখার মধ্যে শিল্পীর যে অসামান্য আত্মত্যাগ আছে,—বাউন্ডুলে অসংসারী মানুষ বলেই তা সম্ভব হয়ে থাকবে। এই আত্মসমর্পণের কোনও স্পষ্ট প্রতিদান তিনি সারা জীবনে কখনো পান নি। সে নিয়ে তাঁর যে অভিমান ছিল না তা' নয়। তবু, প্রশ্নহীন ভাবে এই বিদ্রোহী যুবক এক অন্তঃপুরিকার বিভ্রান্ত চিত্তের নির্দেশ মাথা নত করে পালন করে গিয়েছেন। বিন্ধ্যপর্বতের মত চিরদিনের জন্য নুইয়ে রেখেছেন তাঁর সমুন্নত তেজ, তাঁর বিদ্রোহী সত্তাকে এক অদৃশ্য তর্জনীর সম্মানে।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন কেন, কেনই বা তিনি কাউকে কিছুই না জানিয়ে আকস্মিক কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন? এখানে অবান্তর হলেও আমি এই তথ্যটি জানার পুরো পটভূমিকা বলবো। কারণ, এইদিনই প্রথম তিনি নিজে মুখে আমার কাছে নিরুপমা দেবীর বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন এমন একটি পরিবেশে—যেখানে নিসর্গই হয়তো তাঁকে গ্রন্থি-উন্মোচনে সহায়তা করেছিল এক বিশেষ নিভৃতির সৃষ্টি করে।

বেয়াল্লিশ বছর আগের কথা আজকের মতন সেও ছিল এক বর্ষার দিন। সকালে বেলা দশটা নাগাদ চন্দননগর সাহিত্যসভা করতে বেরিয়েছিলাম শরৎদার সঙ্গে আমরা স্বামী-স্ত্রী। সভা-টভা শেষ হলে স্বর্গীয় হরিহর শেঠের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তাড়াতাড়ি কলকাতার দিকে ফেরা হচ্ছে, আকাশের অবস্থা একটুও সুবিধের নয়। যাত্রার অল্প সময় পরেই' প্রবল জোরে বৃষ্টি নেমে এলো,—সঙ্গে ঝোড়ো বাতাসের উন্মাদনা, তীব্র বাজের আওয়াজ, বিদ্যুৎ-এর ঝলকানি। শরৎচন্দ্র গাড়ি থামাতে বললেন। তাঁকে উদ্বেগে একটু যেন বেশি উত্তেজিত দেখা গেল। তিনি মোটর থেকে নেমে পড়ার জন্যে বালকের মত অধীর।

আমার স্বামী বললেন—'এত ঝড় বৃষ্টিতে কোথায় নামবেন এখানে? তা হলে বরং ফিরে চলুন হরিহরবাবুর বাড়ি।'

শরৎচন্দ্র বললেন—'ঝড়ে জলে দুর্যোগে পথে ঘাটে মানুষ কোথায় আশ্রয় নিয়ে থাকে? সামনে যেখানে যা' পায় সেখানেই।

ঐ তো স্ট্যান্ডের ওধারে রাস্তার ওপরেই সুন্দর সুন্দর পাকা বাড়ি রয়েছে। চলো না—একটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ি।'

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে লাল রঙের একটি একতলা সুদৃশ্য বাংলোর সামনে রাখলো। আমরা শরৎদার সঙ্গে ভিজতে ভিজতে নামলুম। মাথার উপরে আকাশ তখন ঘন ঘন বিদ্যুতের চাবুকে ফেটে পড়ছে চৌচির হয়ে,—কানের পর্দা ফটানো বাজের কামান ছোঁড়া আওয়াজ।

বাংলোর বারান্দায় গিয়ে উঠলে সুঁচলো দাড়ি এক মুসলমান বেয়ারা এসে স্যালিউটের ভঙ্গিতে সেলাম করলো।

শরৎদা জিজ্ঞেস করলেন—ভিতরে কারা আছেন? আমরা অল্পক্ষণের জন্যে আশ্রয় চাই।

নিচু নম্র গলায় চোস্ত উর্দুতে বেয়ারাটি বললো—সাহেব পরশু ট্যুরে বেরিয়েছেন, কাল ফিরবেন। মেমসাহেব বাচ্চারা বোম্বাইতে আছেন। কুঠিতে সে ছাড়া এখন আর কেউ নেই।

শরৎচন্দ্র বিব্রত গলায় বললেন—তাহলে তুমিই না হয় ঘর খুলে আমাদের একটু বসতে দাও। বৃষ্টি কমলে আমরা কলকাতা চলে যাব।

বেয়ারাটি সম্ভ্রম ও সৌজন্যের ভঙ্গিতে চওড়া বারান্দার একপাশের একটি শার্সি-কাচের বড় দরজা খুলে দিল। আমরা প্রকান্ড হলঘরে ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়লুম।

ঘরে ঢুকে শরৎচন্দ্র ছাদ থেকে দেয়াল মেঝে চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করে বললেন—'এ ঘরে এসে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে, এখানে কবে যেন আমি ছিলুম।'

আমার স্বামী হেসে বলেছিলেন—'ভালো করে একটু মনে করুন আ... ঠিক মনে পড়ে যাবে।'

শরৎদা প্রকান্ড হাতাওয়ালা একটা ইজিচেয়ারে বসে পড়ে চুরুট ধরাতে ধরাতে বলেছিলেন—'পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই। এই রকম ঘরে এসে পড়লে পূর্বজন্মের স্মৃতি নড়ে ওঠে বোধহয়। কেমন যেন কী-একটা মনে হতে থাকে।... ক্ষুধিত পাষাণের মতন গল্প সহজেই মগজে আসে।' তার পরেই তিনি তাঁর সর্বক্ষণের মেজাজে মানে, ব্যঙ্গ-গূঢ় অথচ সহজ কৌতুকতরল কথাবার্তায় ফিরে এলেন। 'নরেন, ভূতের গল্প লেখার এটি একটি চমৎকার ঘর, নয়?'

স্বামী হেসে বললেন—"লিখুন না বসে, কাগজ কলম জোগাড় করে দিচ্ছি।"

আমি তখন ধরে বসলুম—বড়দা, বৃষ্টি থামতে সময় নেবে, আপনি একটা ভূতের গল্প বলুন।

শরৎদা বিনা প্রতিবাদে ভূতের গল্প শুরু করলেন। তাঁর বাবার মুখে শোনা। তাঁর গল্প বলায় সেই আকর্ষণীয় শিল্পের

সঙ্গে যাঁরা বাস্তবে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা জানেন—শরৎদার গল্প বলা কেমন ছিল। অন্যের পক্ষে প্রকাশ করা সহজ নয়। —রোমহর্ষক ভূতের গল্প বিস্তার করে করে যথাসময়ে গুটিয়ে এনে শেষকালে অনির্দেশ্যতার মধ্যে মিলিয়ে দেওয়া। আমার স্বামী গল্প শেষের আগেই সাবেকী ভারী কোচে ঘাড় কাৎ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাতাসের গুমরোনি আর বৃষ্টির আছড়ানি তখনও দুর্বল হয়নি। শরৎদা একটু চঞ্চল হয়ে বললেন—"চা খেতে ইচ্ছে করছে। অনেকক্ষণ বকেছি।"

ঘর থেকে বারান্দায় গিয়ে বেয়ারাকে খুঁজে নিয়ে তার হাতে একটি টাকা দিয়ে দোকান থেকে এক কাপ বা দু'-কাপ চা সংগ্রহ করে দিতে পারবে কিনা জানতে চাইলুম। সে একগাল হেসে 'মোয় খুদাহি বনা শকতা—' বলে সেলাম ঠুকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে তিন পেয়ালা ধুমায়মান গরম চা পাওয়া গেল পরিচ্ছন্ন পেয়ালা-পিরিচে। স্বামী তখন ঘুমের অগাধে পেঁৗছোচ্চেন ক্রমশ। শরৎচন্দ্র তাঁর নাসাধ্বনি নিয়ে আমাকে রাগিয়ে তুলবার চেষ্টায় নানা কৌতুক করছেন। আমি তাঁর কাঁচা ঘুমে ধাক্কা দিতে মোটে রাজী নই। তিনি চা খান না। আমি নাসাধ্বনির অজুহাতে, চায়ের অজুহাতে বিশ্রাম নষ্ট করব না। বাইরে বাজের আওয়াজ বৃষ্টির আওয়াজের চেয়ে কি বড়দা, বা আমার ঘরের অশ্রুতপ্রায় ক্ষীণ আওয়াজে কষ্ট হচ্ছে? এই নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার কৃত্রিম ঝগড়া চলছে।

কথাবার্তা ক্রমশ এমনদিকে মোড় ফিরছে, আর আমি মনে মনে শরৎদার ওপরে বেশ রেগেই যাচ্ছি, ওঁকে জাগিয়ে তুলে অপ্রস্তুত করতে চান বুঝে। শরৎদার মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় কাপ চা-টা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, এটা নষ্ট হবে, আপনি সদ্‌গতি করে দিন। আচ্ছা বড়দা,—একটা কথা অনেকদিন থেকে আমার জানতে ভারী ইচ্ছে। আপনাকে বলতেই হবে। ভাগলপুর থেকে একবার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন আপনি। আবার কলকাতা থেকে বর্মায় আপনি কাউকেই না জানিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছিলেন কেন? আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও কেউ জানতে পারেনি—আপনি অকস্মাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

শরৎচন্দ্র চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন—জানতে পারলে ওরা কি যাওয়া পণ্ড করে দিতো না? যেতে দিতো আমাকে? বললুম—"সুরেন মামার মুখে শুনেছি, কলকাতায় আপনি ওঁদের-কি একটা জরুরী প্রোগ্রামের ভার নিয়েছিলেন তখন। নাটক টাটক হবে বোধহয়। কাক-পক্ষীও জানতে পারেনি। একদিন সকালে দেখা গেল তোরঙ্গ বাক্স, বইটই, জামাকাপড়, মায় বাঁশিটা পর্যন্ত নেই। শরৎচন্দ্র উপভোগের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—সে-সব তো নামমাত্র কড়িতে বেচারামবাবুর গলিতে পাঠিয়ে তবেই তো সাগর ডিঙোতে হনুমান-লাফ দিয়েছিলুম। আমি ব্যগ্র হয়ে বলেছিলুম—কিন্তু কেন, কেন বড়দা? বলুন না সত্যি কথা। আমাকে ধোঁকা দেবেন না, বানিয়ে বলবেন না। না-বলতে চান বলবেন না, আমি কষ্ট পাবো না। মিথ্যে ধোঁকা দিলে খুব কষ্ট পাবো জানবেন।...বলুন না, কেন সব বিক্রি করে দিলেন?

করুণ চাপা হাসিতে জবাব দিয়েছিলেন —এবারে তো আর পদাতিক সেনা নই, নৌ-সেনা যে! পদযাত্রায় পয়সা-কড়ি লাগে না। সমুদ্র যাত্রা তা নয়। তবে, নিজের সব সম্পত্তি বেচে ফেলেও কিছু ধার করতে হয়েছিল বৈকি!

—কে ধার দিলো বড়দা?

—তোমাদের ভদ্দরলোকেরা নয়। তারা বুদ্ধিমান। আমার মতন চাল-চুলো-হীনকে তখন বিশ্বাস করতো চাল-চুলো-হীন লোকেরাই। বিপন্নকে বিশ্বাস করে তারা ধারও দিতে পারতো। টাকা দিয়েছিল একটা মুখরা ঠিকে-ঝি। তার বাসায় গিয়ে টাকা নিয়েছিলুম। তার টাকাটা আমি মণি-অর্ডারে শোধ করে দিয়েছিলুম। যদিও, আসল দেনা শোধ হয় না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে নিস্তব্ধ রইলেন। বোধহয় মনটা অতীতে তখন ডুবে গেছে।

আমি আবার মিনতি করে বলেছিলুম—"আমি কোনোদিন কাউকে বোলবো না কথা দিচ্ছি আপনাকে। বলুন না, কেন ওরকম হঠাৎ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন?...

তেমনিই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলেছিলেন,—'ছোটো একটা চিঠি পেয়েছিলুম একজনের।' মুদিত চোখ খোলেন নি। ঐটুকু বলেই আবার চুপচাপ।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তখন থমকে গেছি। কথা কইতে আর ভরসা হচ্ছে না। এই একটু আগেই আতঙ্ক ভরা অলৌকিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে ভূতের গল্প জমিয়ে তুলেছিলেন এই মানুষটিই, কে বলবে?

আমি নিস্তব্ধ হয়ে তাঁর মুদিত চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে আমার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিষণ্ণ উদাস হাসলেন।

"—একটা চিরকুট এসেছিল ডাকে। ছোট্ট কয়েকটি লাইন।

...এখানে যোগাযোগ কখনও আর রাখবেন না। আপনি অনেক দূরে চলে যান। আমাকে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন।"—ব্যস! এক লাফে সাগর-পার।...

অবিশ্যি আগে থেকেই যাবো-যাবো ভাবছিলুম। দপ করে দেশলাই কাঠি জেলে দিলো ডাকে আসা লাইন ক'টা। দু'তিন দিনের মধ্যেই বিলিবন্দেজ করে ফেললুম। দেরি করিনি।"

আমি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে ফেলেছিলুম—"কে বড়দা, কে? ঐ ডেথ্‌-সেনটেনসের এতন হুকুম—"

আবার তাঁর সেই বরফ ঠাণ্ডা পাথুরে কণ্ঠস্বর। "জানতে চেয়ো না। জানতে চাইতে নেই।"

এই চিরকুটের কথা শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা। তার মর্মার্থ মোটামুটি যা স্মরণে আছে, সাবধানে যথাযথভাবে দিতে চেষ্টা করলাম। 'নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন' কথাটি স্পষ্ট মনে আছে। কারণ বরাবর মনের মধ্যে ঐ ক'টি কথা আমি অনেক নাড়াচাড়া করেছি। শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি যে কারুর পক্ষে শ্বাসরোধী হতে পারে, এটা তখন ঠিক বুঝতে পারতুম না। এতদিনে বয়স আর অভিজ্ঞতা সব কিছুই পরিষ্কার করে দিয়েছে।

সেদিন দুর্যোগ থামলে আমরা বাড়ি ফিরেছিলুম। দীর্ঘ পথে শরৎচন্দ্র গাড়ির ভেতরে একটিও কথাবার্তা বলেননি। সমস্ত পথ অন্যমনস্ক ছিলেন।

এর কয়েকদিন পরে এক সময়ে আমার কাছে এসে বলেছিলেন—"আমি জানি, তুমি পেটে কথা রাখতে পারবে না। মেয়েমানুষের পেটে কথা হজম হয় না, ব্রহ্মশাপ আছে।"

আমি সেদিন তাঁর পায়ে হাত রেখে বলেছিলুম—"এই আপনার পা ছুঁয়ে রাখলুম। কোনওদিন কথার নড়চড় করবো না।"

করিনি শরৎদার কাছে কথার নড়চড়। মুখে কোথাও উচ্চারণ করিনি। শরৎদাকে নিয়ে কিছু লিখিওনি আমি। লিখি না। লিখতে পারি না। চেষ্টা করতে বসে কলম আটকে গেছে। মনে হয়েছে—সত্য-ভঙ্গ করছি।

(ক্রমশ)

গ্ল্যাক্সো
সানশাইন
বাচ্চাদের বানায় তাগড়া
পদ্মিনী–
খুশিতে আর উদ্যমে ভরপুর।
সুবোধ– তেজী যুদে
ভারতসন্তান বটে।
রেশমা–
স্বাস্থে টগবগ
করছে।
মিশেল–
পরিশ্রমী আর প্রাণশক্তিতে
ভরপুর।
রয়– অন্য
সবার চেয়ে বাড়টা বেশী।
বিবেক–
ভাল খিদে পায় ওর।
শালিনী– হাড় কি শক্ত আর
কত মেহনতী।
SUNSHINE
Glaxo
BUILDS BONNIE BABIES
ENRICHED WITH VITAMINS
গ্ল্যাক্সো
খায় যে বাচ্চারা
–সাচ্চা তাগড়া হয় তারা।

বিশ্ব বিজ্ঞান

চুম্বকের রহস্য এবার কি উদ্ঘাটন করা যাবে ?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ছোট ছোট বিন্দু চৌম্বক একক-মেরু বা ম্যাগনেটিক মনোপোলের ছাপ।

সংবাদটি নাটকীয়ভাবে প্রথম প্রচার করা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। ওই সময় টেকসাসের হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ লরেন্স পিনস্কি ও ডঃ উল্লু জ্যাক অসবোর্ন এবং বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ পি বুফোর্ড প্রাইস ও ডঃ এডোয়ার্ড সার্ক এই চারজন বিজ্ঞানী আইওয়ার সিওকস শহরের ঊর্ধ্বাকাশে একটি বেলুন পাঠিয়ে মহাজাগতিককণা সম্পর্কিত পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। বেলুনটির সঙ্গে পাঠান বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল কয়েকটি প্লাস্টিকের পাত এবং ছবি তোলার সাজসরঞ্জাম। ওঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মহাজাগতিক পরিমণ্ডল থেকে পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে কী কী ধরনের ভারী পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস ছুটে আসে তার অনুসন্ধান করা। ভেবেছিলেন, ওই সব কণারা প্লাস্টিকের পাতের ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় আঁচড় কেটে যাবে। এবং সেই সঙ্গে বিশেষ ধরনের ক্যামেরায় লাগান ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর কোন কোন কণার সঞ্চারপথের ছবিও উঠবে। পরে গবেষণাগারে ওই সব আঁচড়ের দাগ এবং সঞ্চারপথের ছবিগুলি পরীক্ষা করে ওঁরা জানতে পারবেন ওই সময় সেখানকার ঊর্ধ্বাকাশে কী কী ধরনের কণার আগমন ঘটেছিল। সেই সঙ্গে তাদের শক্তির পরিমাণ গতি এবং বিভিন্ন চরিত্র।

কিন্তু গবেষণাগারে এই পরীক্ষার কাজটি চালাতে গিয়ে যেন চমকে উঠলেন ওই চার বিজ্ঞানী। প্লাস্টিকের পাতের ওপর আঁচড় পড়েছিল ঠিকই। ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর অসংখ্য সঞ্চারপথের ছবিও উঠেছিল। ওরা দেখলেন, ওই সব আঁচড় এবং সঞ্চারপথ বিভিন্ন ভারী পদার্থের পরমাণুকেন্দ্র তৈরি করেছে ঠিকই। তবে কয়েকটি আঁচড়ের দাগ এবং সঞ্চারপথ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। শেষোক্ত এই দাগ এবং সঞ্চারপথ পরীক্ষা করে ওঁরা সিদ্ধান্তে করেন: তথাকথিত সাব-অ্যাটমিক পার্টিকল বা অধিপরমাণুকেন্দ্রিক কণা নয়, ও সব আঁচড় এবং সঞ্চারপথ চুম্বকের মৌলিক কণার। অর্থাৎ একক চৌম্বক মেরু সমন্বিত কণার। এই কণার কোনটি হয়ত শুধু চুম্বকের উত্তর মেরু, কোনটি বা দক্ষিণ মেরু। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় ম্যাগনেটিক মনোপোল।

গোড়ায় যথেষ্ট বিতর্ক ঘটে গেলেও, কোন কোন বিজ্ঞানী সম্প্রতি এই ঘটনাকে সমর্থন করছেন। যদিও অবাধ্য প্রমাণের জন্যে আরও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। এবং শেষ পর্যন্ত যদি ওঁদের সিদ্ধান্ত সত্য বলে প্রমাণিত হয়, বলতেই হবে, পদার্থবিজ্ঞানে ওঁদের এই আবিষ্কার বর্তমান শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

*

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, এক সময়ে স্বতঃসিদ্ধের মত ধরে নেয়া হয়েছিল পরমাণুই সমস্ত পদার্থের একক অদ্বিতীয় এবং অভিন্ন অবস্থা। পরমাণুকে কখনও ভাঙ্গা যায় না।

এ তথ্যকে ভুল প্রতিপন্ন করলেন উত্তরকালের পদার্থবিজ্ঞানীরা। প্রমাণিত হল পরমাণু পদার্থের অখণ্ড দশা নয়। আরও ক্ষুদ্র কণিকা দিয়ে পরমাণু তৈরি। এই কণিকারা ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক বিদ্যুৎধর্মী। এর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে, নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ আধান আছে। ইচ্ছে করলে কোন পদার্থ থেকে একটি ইলেকট্রন কণা বিচ্ছিন্ন করে আমরা বলতে পারি, এই যে কণা এর নাম ইলেকট্রন। এর মধ্যে একক পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি বাস করে। প্রোটনের মধ্যে থাকে এক এক ধনাত্মক বিদ্যুৎ শক্তি। আর ইলেকট্রনের মধ্যে থাকে এক একক ঋণাত্মক বিদ্যুৎ। তুলনায় বৈদ্যুতিক দশার দিক দিয়ে নিউট্রন বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণিকা। অর্থাৎ এই কণিকায় ঋণাত্মক বা ধনাত্মক কোন প্রকার তড়িৎ প্রভাবই বাহ্যিক দিক দিয়ে পরিলক্ষিত হয় না।

কিন্তু এ তো গেল এক দিক। পদার্থবিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন প্রখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাকসওয়েল, যখন প্রকাশিত হল তাঁর যুগান্তকারী তড়িৎ চৌম্বক সমীকরণ। ম্যাকসওয়েল দেখালেন, বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের সম্পর্ক যেন সমসূত্রে গাঁথা। যেখানেই বিদ্যুৎ কণা সেখানেই চুম্বকের অস্তিত্ব। যেখানেই চুম্বক সেখানেই বিদ্যুতের সম্ভাবনা।

প্রশ্ন এই, তা না হয় হল। কিন্তু একক বিদ্যুৎ আধান, সে ঋণাত্মকই হোক, অথবা ধনাত্মক—তাকে যেমন পৃথক করে পাওয়া সম্ভব, চুম্বকের বেলায় একক চৌম্বক আধান অথবা চৌম্বক মেরু পাওয়ার কি হবে?

অনেকেই জানেন, প্রত্যেক চুম্বকেরই দুটি মেরু থাকে। উত্তর এবং দক্ষিণ। বড় একটি চুম্বক খণ্ডকে ভাঙ্গাতে ভাঙ্গাতে যখন আমরা আণবিক পর্যায়ে আসি—তখন সেই অণুর মধ্যেও থাকে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু। বিজ্ঞানীরা পরমাণুর মধ্যেও ধরে নেন এই দুই ধরনের মেরুর অস্তিত্ব। এর এক একটির মধ্যে থাকে একক পরিমাণ চৌম্বক শক্তি। একক চৌম্বক শক্তি সমন্বিত এই

মেরুকেই বলা হয় মনোপোল বা একক-মেরু। উত্তর একক চৌম্বক মেরুর মধ্যে যে চৌম্বক শক্তি থাকে তাকে বলা হয় ধনাত্মক চৌম্বক মেরু। এবং দক্ষিণ চৌম্বক শক্তির একক মেরুর মধ্যে যে শক্তি থাকে তাকে বলা হয় ঋণাত্মক চৌম্বক-মেরু। পরিমাণগতভাবে এদের শক্তির মাত্রা সমান। তবে আচরণে তারা বিপরীত ধর্মী। বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধানের ক্ষেত্রে।

ব্যতিক্রম শুধু এই বিদ্যুৎ শক্তিকে যেমন পৃথক আধান হিসেবে পাওয়া যায়, চৌম্বক শক্তির ক্ষেত্রে সেটা কখনই সম্ভব হয়নি। তাত্ত্বিকভাবে মনোপোল বা একক চৌম্বক মেরুর অস্তিত্বের কথা বলা হলেও পৃথকভাবে একটি চৌম্বক উত্তর-মেরু অথবা একটি চৌম্বক দক্ষিণ মেরু যে আলাদা করে সংগ্রহ করা যাবে অথবা যায়—সে ব্যাপারে কোন আলোকপাত করাও সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, চৌম্বক মনোপোল সম্পর্কে প্রথম অস্তিত্ব সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন ব্রিটিশ নোবেল বিজ্ঞানী পল আঁদ্রে মরিস ডিরাক। ১৯৩১ সনে। সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি একক চৌম্বক মেরুর চৌম্বক শক্তির পরিমাণ কতটা হবে সে কথাও তিনি উল্লেখ করেন। পরে ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ১৯৩৬ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিকস-এ (১০ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা) তাঁর নিজস্ব তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেন, ডিরাক একক চৌম্বক মেরুর মধ্যে চৌম্বক শক্তির যে পরিমাণের কথা বলেছেন, একক চৌম্বক মেরুর মধ্যে তিনিও সেই পরিমাণ শক্তির অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। এর পর তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে একক চৌম্বক মেরুর শক্তির মান নির্ণয়ের কথা আলোচনা করেন অধ্যাপক এইচ এ উইলসন (ফিজিক্যাল রিভিউ, ৭৫ খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা, ১৯৪৯)। বলা বাহুল্য, এ কাজটি এঁরা প্রত্যেকেই করেছিলেন কোয়ান্টাম মেকানিকস বা অখণ্ড বলবিদ্যার যুক্তির ওপর নির্ভর করে। পরীক্ষিতভাবে উভয় একক মেরুকে পাওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু করা সম্ভব হয়নি।

✻

ইতিমধ্যে বছর ছয় আগে নতুন এক ধরনের মৌল কণার কথা শোনালেন নোবেল বিজ্ঞানী অধ্যাপক জুলিয়ান সইংগার। এই কণার মধ্যে নাকি বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক আধান যুগপৎ অবস্থান করে। সইংগার এই কণার নাম দিলেন ডায়ওন।

সইংগার বললেন, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মৌল কণার সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই ডায়ওন। আপেক্ষিকবাদ এবং কোয়ান্টাম মেকানিকসের 'কনস্ট্রেইনটস' বা 'অবরোধ-দশা'র সাহায্য নিয়ে তিনি বললেন, নিউক্লিয়ার ফোর্স বা পরমাণুকেন্দ্রিক বলের চেয়ে বিপরীতধর্মী দুটি একক চৌম্বক মেরুর মধ্যে প্রতিক্রিয়ারত বলের পরিমাণ প্রায় চারশ গুণ বেশি। হয়ত এই কারণেই কোন চুম্বক থেকে তার ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক চৌম্বক আধান বা মনোপোলকে আলাদা করে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

চমকপ্রদ তথ্য এই, সইংগারের বক্তব্য, একটি ডায়ওন কণার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ মৌল বিদ্যুৎ শক্তি, কিংবা চৌম্বক শক্তি বাস করে। এখানে মৌল বিদ্যুৎ শক্তি বলতে ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধানকেই বলা হয়েছে। আর মৌল চৌম্বক শক্তি বলতে ধরে নেয়া হয়েছে দক্ষিণ অথবা উত্তর চৌম্বক মনোপোলের মধ্যে অবস্থানরত চৌম্বক শক্তি।

এর আগে গেল-মান 'কোয়ার্কস' নামে এক ধরনের কাল্পনিক মৌল কণার কথা উল্লেখ করেন। এই কণাগুলিতেও ভগ্নাংশ পরিমাণ বিদ্যুৎ আধান থাকতে পারে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। তবে বলা হয়, চৌম্বক আধানের ব্যাপারে এই কণারা নিরপেক্ষ বা নিউট্রাল। পরে 'কোয়ার্কস'-এর ছবিটি ধরে নিয়ে গেল-মান 'ওমেগা মাইনাস' নামে এক ধরনের কণার কথা উল্লেখ করেন। এদের অস্তিত্ব পরে প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ডায়ওন এখনও পর্যন্ত পরীক্ষিত সত্য হিসেবে প্রমাণিত নয়।

তবু চৌম্বক মনোপোল প্রসঙ্গে ডায়ওনের কথা এই কারণে উল্লেখ করলাম যে, এর তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে চৌম্বক মনোপোলের সংযোজন মৌল-কণা সৃষ্টির ব্যাপারে নতুন একটি চিন্তাসূত্র খুলে দিয়েছে।

যেমন ধরুন, সইংগার বলেছেন, যদি বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ মেসোনের মত কোন মৌল কণা তৈরি করতে চান দরকার হবে দুটি ডায়ওন কণা। এই দুটি ডায়ওন কণার একটিতে বিদ্যুৎ আধান থাকবে +⅓ এবং চৌম্বক আধান থাকবে —⅓। এবং অপর কণাটির মধ্যে বিদ্যুৎ আধান থাকবে —⅓ এবং চৌম্বক আধান থাকবে +⅓। এই রকম, একটি ধনাত্মক বিদ্যুৎধর্মী মেসন কণা তৈরির জন্যে চাই এমন দুটি ডায়ওন কণা, যাদের একটিতে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক আধান থাকবে +⅓ এবং +⅓ এবং অপরটিতে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বক আধান থাকবে যথাক্রমে —⅓ এবং +⅓। এই ভাবে একটি প্রোটন কণা তৈরির জন্যে দরকার হবে তিনটি ডায়ওন কণা। যাদের চৌম্বক আধানের পরিমাণ যথাক্রমে +⅓, —⅓ এবং —৪/৩। উল্লেখ্য, ভগ্নাংশগুলি একক চৌম্বক আধানের পরিমাণ নির্দেশ করছে।

✻

মুশকিল এই, পার্টিকল ফিজিকস বা কণা-পদার্থ বিজ্ঞানের অনেক ব্যাখ্যা যোগানর জন্যে চৌম্বক মনোপোলের সাহায্য নেয়া হলেও, পৃথকভাবে এ বস্তুটিকে নিরীক্ষা করার সৌভাগ্য আজও পর্যন্ত কারোর ভাগ্যে ঘটে নি। পরীক্ষাগারে কি ধরনের ব্যবস্থা নিলে এদের পৃথক ভাবে অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তার যথাযথ হদিশও বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত করে উঠতে পারেন নি।

তুলনায় হিউস্টন এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে প্রমাণ দাখিল করেছেন তাতে খানিকটা যেন অভিনবত্ব আছে। অন্তত এই প্রথম জানা গেল (অবশ্য যদি তাঁদের বক্তব্য খাঁটি বলে বিবেচিত হয়), মহাকাশের পরিমণ্ডলে অসংখ্য মৌল কণার মত একক চৌম্বক কণাও বিচরণ করে।

যদিও সইংগারের মতবাদ অনুসারে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে দুটি। এক, সইংগার বলেছেন, নিউক্লিয়ার ফোর্স বা পরমাণুকেন্দ্রিক বলের তুলনায় বিপরীত ধর্মী দুটি চৌম্বক আধানের মধ্যেকার আকর্ষণ বল প্রায় চারশ গুণ বেশি। তাই যদি হয়, অনেকেই তো জানেন, কোন বস্তুর পরমাণুকেন্দ্রকে চূর্ণ করে তার মধ্যেকার মৌলকণাকে বের করে নিয়ে আসতে কী প্রচণ্ড শক্তিরই না প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে দুটি চৌম্বক মেরুকে বিচ্ছিন্ন করতে কতটা শক্তি দর-

কার—প্রচণ্ডতম যে শক্তি—তা সহজেই অনুমান করা যায়। মহাকাশে এই শক্তির উৎসটি কি? অথবা সূর্য এবং সুদূরে নক্ষত্র থেকে যেমন মহাজাগতিক কণারা ছুটে আসছে, ঠিক তেমনি চৌম্বক মনোপোলও সেখান থেকেই ছুটে আসছে। দুই, হয়ত বা প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রাথমিক মহাজাগতিক কণারা পরস্পর সংঘর্ষ বাধিয়ে অথবা পৃথিবীর ঊর্ধ্বাকাশে বাতাসের কণার সঙ্গে ধাক্কা মেরে যখন তৈরি করে সেকেণ্ডারি কসমিক পারটিকল বা গৌণ মহাজাগতিক কণা সেই সময় উদ্বৃত্ত খানিকটা চৌম্বক-শক্তি (মনোপোল) তা সে ভগ্নাংশই হোক, অথবা একক মানের, ওই সব মহাজাগতিক রশ্মি থেকে বেরিয়ে এসে নিঃসঙ্গ অবস্থায় মহাকাশে বিচরণ করে। ফটোগ্রাফিক ফিল্ম এবং প্লাস্টিকের পর্দায় এদেরই অস্তিত্ব হয়ত ধরা পড়েছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ইলেকট্রনের আবিষ্কার যেমন বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারকে সম্ভাবনাপূর্ণ করে তুলেছে, একক চৌম্বক মেরু পৃথক করা সম্ভব হলে ঠিক তেমন সম্ভাবনাপূর্ণ একটি অধ্যায়ের সূচনা হবে। এর ফলে এখনকার চেয়ে আরও বেশি শক্তিসম্পন্ন ত্বরণযন্ত্র (পারটিকল অ্যাকসেলারেটর) তৈরি করা হয়ত অসম্ভব হবে না। তৈরি করা যাবে অনেক ছোট আকারের এবং এখনকার তুলনায় অনেক বেশি কার্যক্ষম মোটর এবং জেনারেটর। বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগ যেমন ক্যানসার, নিরাময়ের কাজ সুগম হবে।

মহাকাশে প্রথম চৌম্বক একক মেরুর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন বলে যাঁরা দাবী করেছেন: (বাঁ দিক থেকে) জ্যাক অসবার্ন, এডোয়ার্ড শার্ক, পি বুফোর্ড প্রাইস এবং লরেন্স পিনসকি।

মহকুমা বিজ্ঞান পরিষদ, কাটোয়া

ওঁরা কাজ শুরু করেছেন খুবই নাটকীয়ভাবে। গত বছর রাজস্থানের মরুভূমিতে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যখন পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালেন, সেই সময় কয়েকজন ছাত্র, স্কুলের শিক্ষক এবং অধ্যাপক মিলে ঠিক করলেন, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই অসামান্য কৃতিত্বের ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা একদিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

আলোচনা তাঁরা করলেন। এবং সেই সঙ্গে স্থির করলেন একদিন নয়। সংগঠিতভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁরা নিয়মিত আলোচনা করবেন। যাতে অংশ গ্রহণ করবেন স্থানীয় এবং কাছাকাছি অঞ্চলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সাধারণ মানুষ। এই সঙ্গে চালানো হবে দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জন্মজয়ন্তী পালন, ছাত্রদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ওপর প্রশ্নোত্তর, প্রতিযোগিতা, মডেল তৈরি এবং বিজ্ঞান প্রদর্শনী।

এ সব উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মাত্র এক বছর আগে কাটোয়া মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শুধাংশুশেখর সেনকে সভাপতি করে তৈরি হয় এখানকার মহকুমা বিজ্ঞান পরিষদ।

এর মধ্যে ওঁরা আলোচনাচক্র বসিয়েছেন বেশ কয়েকটি। প্রশ্নোত্তরের প্রতিযোগিতা করেছেন ভারতে রসায়নের বিকাশ স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। এবার ভাবছেন, শুধু বক্তৃতা নয়, বিজ্ঞানের সাহায্যে জনকল্যাণমূলক কিছু কিছু কাজ করার কথা।

২ অকটোবর কাটোয়া কলেজে এই প্রতিষ্ঠানটি মহাকাশ বিজ্ঞান এবং মানব কল্যাণ এই বিষয়টির ওপর একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। উপস্থাপনা করলেন কাটোয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক কালীচরণ দাস। পৌরোহিত্য করলেন অধ্যক্ষ ডঃ হরিদাস সরকার। মহাকাশ ছাড়াও তরঙ্গ এবং কণার ওপর মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ডঃ প্রণব সেনগুপ্ত।

ওই আলোচনাচক্রে উপস্থিত বর্তমান লেখকের এক প্রশ্নে অধ্যক্ষ ডঃ সরকার বললেন, দেখুন, ভাল যে পড়াব, কলেজে ভাল ছাত্র পাচ্ছি না আমরা। স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং অধ্যাপকরা এভাবে মিলেমিশে কাজ-কর্ম করলে অন্তত দুভাবে আমরা উপকৃত হব। এক, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এবং পারদর্শিতা বাড়বে। দুই, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, অন্তত এ অঞ্চলের কোন কোন ছাত্রছাত্রী এ সব কাজে এবং লেখাপড়ায় ভাল করছে আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারব। তাতে ভাল ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ করা কলেজের পক্ষে সহজ হবে।

বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান ক্লাবকে এভাবে যে কাজে লাগান যায়, জানি না অন্য কেউ ভেবেছেন কি না। সে দিনের অনুষ্ঠানে উদ্দীপনা দেখেছি প্রচুর। ভিড়ও হয়েছিল যথেষ্ট। এবং সব চাইতে ভাল লাগল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের একাত্ম হয়ে কাজ করার অনুকরণীয় প্রচেষ্টা।

সমরজিৎ কর

অন্য কোনো স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় সম্পূর্ণ আহার নয়

ICMGC.16-234 BN

॥ আটচল্লিশ ॥

চোখে চোখ রেখে জিগ্যেস করলুম,

—"সেই জাপানী বাড়িতে আমাদের প্রথম ঘনিষ্ঠতার কথা মনে আছে, মিশেল?"

ডান পাশে ঘাড় কাত করে জানালো, হ্যাঁ, আছে।

—"সব মনে আছে?"

—"হুঁ।"

—"কি কি হয়েছিল, শুনি!"

—"সে সব পুরোনো কথা শুনে কি হবে, ইন্ডিয়ান?"

এমন প্রাপ্ত-বয়স্কাদের মতো সচেতন গলা মিশেলের আমি কখনো শুনি নি আগে। অবাক লাগল। তবু বললুম,

—"বলোই না!"

—"শোধরি আমাকে অনেক লোকের সামনে 'বুমে'র আসরে মেরেছিল সেদিন।—"

এই মুহূর্তেও গোবিন্দ বেঁচে আছে। তেতলার ছত্রিশ নম্বর ঘরে এখনো ওর নাম-ঠিকানা। ওর কথা মনে পড়তেই মিশেলকে বাধা দিলুম,

—"ও তোমাকে মারেনি। তুমি পড়ে গিয়েছিলে।"

—"হ্যাঁ। অন্য মেয়েদের সঙ্গে নাচবে বলে আমাকে ধাক্কা মেরেছিল। ওর শরীর ভালো ছিল না—আমি বারণ করেছিলুম, তাই—"

মিথ্যে বলেনি গোবিন্দ। আমার কাছে সাফাই গাইতে অথবা সেই ব্যথার পর আমার সামান্য সহানুভূতি আদায় করতে গল্প শোনায়নি কিছুই। তখন, শেষ রাতে সবই সত্যি মনে হয়েছিল ওর কথা। পরে, সারাদিন মিশেলের সঙ্গে থেকে মাঝে মাঝে কেমন আশায় ভুগছিলুম, হয়তো বেচারার সব কথা সত্যি নয়। হয়তো, ওর দুঃখ-বিলাস। এখন, নিশ্চিত জেনে গেলুম, ওর মৃত্যুকে ও দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

গোবিন্দকে মনে আনতে চাইছি না। ঘুরিয়ে দিলুম মিশেলের কথা। বললুম,

—"আহা, শোধরির ব্যাপার বলছি না। তোমার সঙ্গে আমার কি কি হয়েছিল সেদিন, মনে আছে?"

এইবার মিশেল অবাক চোখে তাকাল,

—"কি?"

অল্প এগিয়ে দু'হাতের অঞ্জলিতে ওর মুখটি ধরে চুমু খেলুম। ও বাধা দিল না। সাড়াও দিল না। চামড়ার পুতুলকে চুমু খেলুম যেন। বললুম,

—"তুমি আমাকে চুমু খেয়েছিলে। মনে পড়ছে?"

আস্তে ঘাড় কাত করে জানালো, হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তারপর, ঠোঁটের কোণে ম্লান হেসে বলল,

—"কেন খেয়েছিলুম, তোমার মনে আছে?"

ভাবছি, ভাবছি। কেন চুমু খেয়েছিল মিশেল আমাকে! ভালোবেসে, অত দ্রুত চুমু-টুমু খেয়ে ফেলা হাস্যকর! তাছাড়া, গোবিন্দর সঙ্গে তখন ওর প্রচন্ড প্রেম! মনে পড়েছে। বললুম,

—"তুমি যা' যা' আমাকে সেদিন বলেছিলে, সেইসব কথা আমি যা'তে তোমার শোধরিকে বলে না দিই, সেইজন্যেই বোধহয়!"

হেসে ফেললুম,

—"তার মানে, আজ আর আমাকে চুমু খাবার তেমন দরকার নেই তোমার। কারণ, গোবিন্দর কাছে তোমার কোনো কথা লুকোতে হবে না!—"

মিশেল হাসল এবার। ঠোঁট খুলে, শব্দ করে। বলল,

—"না। আমি আর কাউকে ভয় পাই না, ইন্ডিয়ান!"

ও যে ভয়ের কথা বলল, তা' এক রকম। আমি অন্য রকম ভাবে বললুম,

—"আমাকেও ভয় পাও না?"

ঠোঁটে আলতো আদর মাখিয়ে হাসল আবার। বলল,

—"ভয় পেলে কি আর তোমার বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে থাকি সারারাত. নাকি, এখন এই রাত দুপুরে তোমার পোশাক পরে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকি তোমার খাটে!"

একজনের খাটে দু'জন শুলে গায়ে গায়ে ঘন হয়ে শুতে হয়। মিশেল দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। দুজনের গলা অবধি কম্বল। ওর নরম মসৃণ পিঠে খুব ধীরে ধীরে হাত বোলাচ্ছি। অন্তরবাস নেই। ইচ্ছে করলেই ওর পিঠের দেওয়াল পেরিয়ে আমার হাত ওপারে চলে যেতে পারে। পিঠের গন্ধ শুঁকলুম। না, সেই বুনোফুলের গন্ধটি পাচ্ছি না। মিশেলের গায়ে কারখানায় তৈরি সাবানের সুগন্ধ মানায় না। আঙুল দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘষে ঘ্রাণ নিয়ে দেখলুম আবার, না, মিশেলকে পেলুম না। শুধু সাবান।

ও একটু কেঁপে উঠে বলল,

—"উঁ! সুড়সুড়ি লাগছে!"

হেসে, হাত বোলাতে লাগলুম আবার। পিঠে, ঘাড়ে, কোমরে। বললুম,

—"ক'জন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে এমনি বিছানায় শুয়েছো, মিশেল?"

—"কেন?"

—"এমনিই! শুনতে ইচ্ছে করছে!"

—"মনে করতে পারছি না।"

—"অনেক বুঝি সংখ্যায়?"

—"হুঁ।"

ওর ঘাড় ছুঁয়ে, গাল বেয়ে ঠোঁট দুটিতে পৌঁছে গেল আমার হাত। দোতারায় টুং-টাং করবার মতো তর্জনি দিয়ে মিশেলের ঠোঁট বাজালুম। শব্দ হল না। জিগ্যেস করলুম,

—"শ'খানেক?"

হাতের মধ্যে হেসে ফেলল মিশেল। ওর উষ্ণ শ্বাস, হাসি আমার তর্জনী, হাত বেয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল। জঙ্গলের প্রাগৈতিহাসিক লজ্জাহীন ঢাকের শব্দে শুরু হল আদিম নাচ।

বললুম,

—"হাসলে কেন?"

—"আমাকে দেখে তোমার মনে হয় বুঝি আমি একশো জনের সঙ্গে শুয়েছি?"

—"মোটেই না।"

—"তবে?"

—"তুমি ঠিক ঠিক জবাব দিলে না তো', তাই, আন্দাজে যা' ইচ্ছে বলে দিলুম।"

একটু চুপ থেকে ও বললে,

—"দুজন।"

—"আমাকে নিয়ে?—"

আবার হাসল। হাসতে হাসতে গোটা শরীর-মুখ নিয়ে আমার দিকে পাশ ফিরল। বলল,

—"তুমি খুব আশাবাদী, ইন্ডিয়ান!"

বদমায়েসের মতো হেসে ওর ঠোঁটে চুমু খেলুম।

আবার বললে মিশেল,

—"শুধু শোধরি এবং আর একজন!"

—"কে সে?"

—"তুমি চিনবে না। সেও ইন্ডিয়ান। এই মেজোঁতেই ছিল।"

মনে পড়ল, ঈভলীনের মুখে শুনেছিলুম, মিশেলের আগের প্রেমিকের কথা, যে ওকে মিথ্যে আশা দিয়ে ভোগ-টোগ করে দেশে ফিরে গেছে। প্যারিসে পড়তে বা বেড়াতে এসে কয়েকটি রাত্রিযাপনের ফূর্তির জন্যে এমন সরল এবং ফরাসী বোকা মেয়ে ফোকোটে পেয়ে গেলে এক-আধটা মিথ্যেকথা তো' নস্যি!

সোজাসোজি বলে দিলুম ওকে,

—"আমি কিন্তু তোমাকে বিয়েও করতে পারবো না, ইন্ডিয়ায় নিয়ে যাবার ক্ষমতাও আমার নেই।" বলে ফেলে বেশ হালকা লাগল।

—"জানি।"

—"কি জানো?"

—"তুমি বিবাহিত এবং তুমি খুব ভালোমানুষ।"

আহ্! এই সমস্ত সময় নিজের প্রশংসা শুনতে কী যে ভালো লাগে! টর্চে নতুন ব্যাটারি ভরবার মতো। সঙ্গিনীর গভীর গভীরতর অপরিচিত অন্ধকার পথ-ঘাট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—"কে বললে?"

—"ঈভলীন।"

অসংখ্য ধন্যবাদ, ঈভলীন! তোমার সার্টিফিকেট কেমন হাতে-নাতে কাজে লেগে গেল! তোমাকে আমি আজও চিনতে পারলুম না। অথচ, তুমি আমাকে নিপাট ভালোমানুষ কোত্থেকে ঠাওরালে, তুমিই জানো! মেরসি বোকু, মাদাম!

মিশেল জিগ্যেস করলে,

—"দেশে তোমার আর কে আছে?"

—"ছোট্ট একটি ছেলে।"

বউ, কেন জানি না, ফট্ করে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। মনে মনে ঈভলীনকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে কি তুমি এসে পড়লে মামদোবাজির মতো। আর, সঙ্গে সঙ্গে মিশেল-টিশেল, প্যারিস-গুবরে সব ছেড়ে-ছুড়ে, এই দেখ, তোমার পেটে কেমন কান পেতে আছি। পাবলিক টেলিফোনে দু'টি নম্বর ঘুরিয়ে রিসিভার কানে লাগিয়ে রেখেছি। পয়সা ফেলতে হয় না। শুধু শুনবো তো'! তোমার নাভির গর্তে কান পেতে শুনতে পাচ্ছি তুমুল ঝড়ের শব্দ। দাপিয়ে, ঝাঁপিয়ে দূর দিগন্ত থেকে দামাল ছেলে ছুটে আসছে। কচি স্বর স্পষ্ট কানে এল আমার,

—"এই তো, বাবা। আসছি আমি! এসে গেলুম। তোমার নাম, তোমার শরীর-মনের সমস্ত স্নেহ-কোমলতা, স্বপ্ন-সফলতা নিয়ে টগবগ ছুটে আসছি আমি সবুজ ঘোড়ায় চেপে।—"

বউ, তুমি সাবধানে থেকো। মাঝে মধ্যেই আজকাল আমি টের পাই, ভয় তোর স্যাঁত-সেঁতে পাঁশুটে মুখ নিয়ে শব্দহীন পায় পায়ে আমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে। গ্যালারী এখনো পাওয়া যায় নি। জোগাড় হয় নি প্রদর্শনীর টাকা। শুধু, দিন যায়। ছবি-টবি আঁকছি ঠিকই। তবু, দিগেনদা, জর্জ, জানী, অজস্র অচেনা পরাজিত মুখ আমার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে চেয়ে থাকে। তোমার এখন খুব কঠিন সময়, বউ। একটি প্রাণ, আমাদের তৈরি এক স্বপ্নের দায়িত্ব বইছো। খুব সাবধানে হাঁটাচলা করবে। কোথাও পিছলে পড়ে যেও না। ভারী জিনিসপত্র মোটেই বইবে না তুমি। ও আসছে। সবুজ ঘোড়ায় চেপে, দামাল ঝড়ের আকাঙ্ক্ষা আমার সব ভয় ভেঙে দিয়ে টগবগ ছুটে আসছে।...

মিশেল আমার বুকে হাত দিয়ে গালে ঠোঁট ছুঁয়ে রেখেছে। খুব অস্ফুটে কি যেন বলল। শুনতে পেলুম না। জিগ্যেস করলুম,

—"উঁ?"

ঘরের অন্ধকারে ওর স্পর্শ ছাড়া কিছুই টের পাচ্ছিলুম না। দেখা যায় না কিছুই। এইবার, চমকা ওর সেই আপন গায়ের গন্ধটি পেলুম। ও বললে,

—"আমি তোমার কাছে খুব সামান্য একটি জিনিস চাইবো, দেবে?"

চিত হয়ে শুয়ে আছি। মিশেল তার সমস্ত শরীর-মন নিয়েই হয়তো আমার পাশে। পুরোপুরি বুঝতে পারছি না।

আপন মনেই জিগ্যেস করলুম,

—"কি?"

—"আগে বল, দেবে?"

—"আমার ক্ষমতায় কুলোলে, হ্যাঁ, দেব।"

একটু সময় চুপচাপ। আমার বুকে ভারি নরম আলতো হাত বোলাচ্ছে মিশেল। পাখির পালকের মতো হালকা। বলল,

—"আমি আর তোমাদের দেশে যাবার আশায় বন্ধু, সঙ্গী অথবা স্বামী খুঁজবো না। তিন বার ভালোবাসার সাহস আমার নেই আর। কোনো পুরুষকে নিয়ে ঘর করবার ইচ্ছেও ফুরিয়ে গেছে। শুধু, সারা জীবনের জন্যে ছোট্ট কিছু চাইবো তোমার কাছে। খুব ছোট্ট, এই এতটুকু।—"

সজাগ হয়ে কান পেতে আছি। ওকে দেবার মতো কি আছে, ভেবে পাচ্ছি না। ছোটো-খাটো পেইন্টিং? কারো মুখ এঁকে দিতে হবে!

ও তেমনি ঠান্ডা অস্ফুট গলায় বলল,

—"শোধরির সঙ্গে সবকিছু ভেঙে যাবার পর থেকে আমি আর ওই সব ওষুধ খাই না। দরকার হয় না।—"

আবার একটু সময় নিল। যেন কিভাবে বলবে, বুঝতে পারছে না। নিজেকে গোছ-গাছ করে নিল। দু-হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে নিল ওর বুকের সঙ্গে। ওর বুকে, শরীরে স্রোতের শব্দ পাই। একটা মৃদু শব্দ। খুব আদর করে আমার মুখ চুমু খেল মেয়েটি। তপ্ত, গভীর শ্বাস ফেলার মতো কথা বলল, ভিক্ষে চাইল বুঝি,

—"ইন্ডিয়ান, আমাকে একটি ছোট্ট এই-টুকু শিশু উপহার দিয়ে যাবে?"

দারুণ চমকে উঠলুম। হৃৎপিণ্ডের শব্দ কি তাল-মাত্রায় ভুল করল! ওকে জড়িয়ে রাখা হাত দুটি আমার আলগা হয়ে গেল আপনা-আপনি।

দেশে যাদের সঙ্গে এই সব ভালো-বাসাবাসি করেছি, তারা তো শুধু একটি বিশ্বাস পুরোপুরি পেলেই খুশি। 'বিয়ে যখন আমাদের হবে না, তখন দেখো সাবধান! আমাকে যেন বিপদে ফেলে চলে যেও না।'

মিশেল তো এখন সেই বিপদটাকুই ভিক্ষে চাইছে। মাথা খারাপ হয়ে গেল না তো মেয়েটার?

বললুম

—"পাগলের মতো কি বলছো মিশেল?"

অন্ধকারেই বুঝতে পারলুম, ওর কোঁকড়া রুক্ষ চুল ঝাঁকিয়ে বলল,

—"না, ইন্ডিয়ান। পাগলের মতো মোটেই নয়। আমি তোমার দেশের একটি বাদামী শরীর পেটে ধরতে চাইছি। ভিক্ষে চাইছি। তুমি ভালোমানুষ। তুমি একটি এইটুকু গাঢ় রংয়ের শিশু আমাকে উপহার দিয়ে যেতে পারো।—দেবে না!"

"কিন্তু, তা কি করে সম্ভব, মিশেল? তুমি বিবাহিতা নও। শিশুটির বাবার নাম কি হবে? কি হিসেবে ও সমাজে স্থান পাবে? ওর জীবন কি দাঁড়াবে ভেবে দেখেছো তুমি?"

খুব ভারিক্কি মায়ের গলায় জানিয়ে দিল,

—"আমি তো ওর মা হবো! এ দেশে আর কিচ্ছু দরকার নেই। বলবো, আমার ভালোবাসার সন্তান। যে কোনো কল্পনার নাম রেজেস্ট্রি করে নিলেই হবে!"

মিশেলের মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না এখন। খুব ইচ্ছে করছে দেখতে। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে দিলাম। আলো জ্বলে উঠতেই দেখি, ইন্ডিয়ান কোনো শিশুর জননী হয়ে মিশেলের চোখ ভর্তি জল। খুশিতে সমস্ত মুখ উপছে উঠছে ওর। সেই ছবির লাজুক বুনো পাখির মুখ এমন উজ্জ্বল, এমন উচ্ছ্বাসে মমতাময় হতে পারে আমি কল্পনা তও দেখিনি কখনো। সকল সাধ-আশা ভাঙতে ভাঙতে এখন শুধু ওর স্বপ্নের ইন্ডিয়ার ছোট্ট একটি প্রাণ বহন করতে পালন করতে আদর করতে ভালোবাসতে চাইছে।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় আমার দুই গাল ওর হাতের অঞ্জলিতে চেপে ধরল। মুখ নামিয়ে আদর করল আমায়। চোখ ভরে ছিল। উষ্ণ একটি ফোঁটা আমার গালে পড়ল টের পেলাম।

ও বলছে,

—"তুমি আমার ভালোমানুষ ইন্ডিয়ান। আমাকে এইটুকুন ছোট উপহার তুমি দিয়ে যাও। ঠিক এমনি করে আমি ওকে আদর করবো, ভালোবাসবো। ইন্ডিয়ার গন্ধ মাখা গাঢ় শরীর নিয়ে ও দু-পা তিন-পা হাঁটবে, পড়ে যাবে, কাঁদবে, আমি কোলে তুলে নেব। প্লীজ—"

দাঁড়িয়ে কিছুই ভাবতে বা বুঝতে পারছি না। প্রথম ভেবেছিলুম পাগল-মানুষী। এখন, মিশেলের জন্যে কি ভীষণ খারাপ লাগছে, কাউকেই বলে বোঝানো যাবে না। ওকে এই রকম বোধ হয় কেউই দেখেনি। হাহাকারের মতো অবাস্তব চাওয়া। শূন্য হৃদয়ের কিছু তো পূর্ণ হোক।

বললুম,

—"কিন্তু, শিশুটির বাবার নাম কি জানবে লোকে, শিশুটি নিজে?" ও এক মুহূর্ত ভাবল। বলল,

—"যা হোক কিছু বলে দেব। সে চিন্তা কোরো না ইন্ডিয়ান। রেজিস্ট্রির সময় বলে দেব, মরে গেছে।"

—"তবু, কি নাম বলবে, ভাবো আগে!"

—"যে কোনো নাম। ধরো, শোধরি। যে কোনো শোধরি।—"

তিনতলার সাঁইত্রিশ নম্বর ঘরে আস্তে আস্তে টোকা দিলুম। মিশেল আমার হাত ধরে আছে। কাঁপছে থরথর। বৃষ্টিতে ভেজা পাখির মতো ভয়ে, উত্তেজনায়। বিশ্বাসে, অবিশ্বাসে। আশায়, হতাশায়।

গোবিন্দর সব কথা যখন ওকে বললুম, বিশ্বাস করেনি একটুও। রেগে খাট থেকে উঠে গেছে,

—"তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছো, ইন্ডিয়ান। ভিক্ষেই তো চেয়েছিলুম। না দেবে, দিও না। অপমান কোরো না, প্লীজ।"

গোবিন্দ দরজা খুলতে খুলতে বলল,

—"কে?"

"মিশেলকে তোমার ঘরে পৌঁছোতে এলুম।"

গোবিন্দ শোধরি এক রাতেই এগিয়ে গেছে অনেকটা। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। ম্লান, বিবর্ণ মুখটি খুশিতে অবাক,

"একি এসো, এসো, কেমন আছো, মিশেল?"

আমার দিকে ফিরে বলল,—"ভেতরে এসো।"

হাত ধরে মিশেলকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "তোমার কাছে দিতে এসেছি ওকে। যাবার আগে তোমায় সব কথা ওকে বলবে, এই অনুরোধ। ওকে ... দিও। বুঝতে দিও, তুমি ওকে ভালোবাসো। পারো তো ওর ইচ্ছেমতন ছোটোখাটো উপহার রেখে যেও।—"

মিশেলের গালে আলতো চুমু খেয়ে বিদায় জানালুম। ও মাথা নিচু করে কাঁদছে। বললুম,—"ভালো থেকো, মিশেল।"

কি আশ্চর্য কান্ড বটে, সুশ্রী একটি বুনো পাখিকে মৃত্যুর ঘরে পৌঁছে দিয়ে কি অসম্ভব আরাম লাগল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বরের মতো নিজের ঘরে ফিরে এলুম। মনে হল, কি ভালো, কি ভালো! পৃথিবীর সবকিছু বড় ভালো! (ক্রমশ)

এক বিস্মৃত সাহিত্যিক

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা, মার্চ মাস নাগাদ মেজবৌঠান, অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী একদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথকে জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে ছোটদের জন্য একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানালেন। সে যুগে ছোটদের উপযুক্ত সচিত্র মাসিক পত্র তেমন আর কই? মেজবৌঠানের মনে হয়েছিল, এই ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করতে পারলে সাময়িকপত্র জগতে নতুন স্বাদ আনা তো যাবেই, উপরন্তু বাড়তি লাভ—বাড়ির সম্ভাবনাময় বালকেরা, যেমন সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি এতে লিখে হাত পাকাতে পারবে। ঝক্কির কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ ইতঃস্তত করছেন দেখে জ্ঞানদানন্দিনী বলেন, আচ্ছা—যদি তুমি কার্যাধ্যক্ষের ভার নাও, তাহলে আমি সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে পারি।

এ প্রস্তাবে রাজি হলেন রবীন্দ্রনাথ, মাসিক পত্রটির নাম রাখা হল বালক, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস থেকে ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র বালকের সূচনা।

এখানে একটু থেমে পূর্বকথা সামান্য আলোচনা করে নিলে সে যুগের পটভূমিকা এ যুগের পাঠকের কাছে স্পষ্ট হবে। আমরা সকলেই জানি জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবল উৎসাহে মাসিক ভারতীর সূচনা।

প্রকাশকাল ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ। প্রথম ৬ বছর অসামান্য প্রভায় এই মাসিকপত্র ভাস্বর হয়ে ওঠে। ভারতীর সপ্তম বছরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এক সাংঘাতিক অঘটন ঘটে গেল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আনন্দের উৎস নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী ১৯শে এপ্রিল আত্মহত্যা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মনঃস্থির করলেন ভারতীর প্রকাশ বন্ধ করে দেবেন। সেই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও ছাপা হল—"অনিবার্য কারণে ভারতী আর প্রকাশিত হইবে না।" স্বর্ণকুমারী দেবী তখন এগিয়ে এসে নিজে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করায় ভারতী তখনকার মতো নির্ঘাত অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়।

এই পটভূমিতেই বালকের আবির্ভাব। মাত্র এক বছর আগের অসহনীয় দুঃখের স্মৃতি কারুর মন থেকে মোছেনি।

যাই হোক, যথাসম্ভব উৎসাহের সঙ্গে বালকের সূত্রপাত হল। রবীন্দ্রনাথের বরাবরের অভ্যাস—যখন যে কাজ হাতে আসে, খুব যত্নসহকারেই তা করেন। বয়েস তাঁর তখন মাত্র ২৪ হলে কি হয়, এরই মধ্যে ১৫ খানা বই লিখে ফেলেছেন। খ্যাতির সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বালকের জন্য তাঁর কলম রীতিমতো সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক বছর স্থায়ী বালকে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও "রাজর্ষি" উপন্যাসের ২৬টি অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে বার হয়েছিল।

বালকের শ্রাবণ সংখ্যায় বর্ষার চিঠি নামে রবীন্দ্রনাথের চমৎকার এক রম্যরচনা প্রকাশিত হয়। তৎকালীন এক উঠতি সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে উদ্দেশ করে লেখা পত্রাকারে এই দীর্ঘ রচনাটি সে যুগে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন সুদূর করাচীতে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের সেই সরস লেখাটির অল্প একটু অংশ উদ্ধৃত করলে মন্দ হয় না, কারণ দীর্ঘ ৯০ বছর আগে লেখা রম্যরচনাটি আজকাল তেমন প্রচলিত নয়। "বর্ষার দিন আমাদের দীর্ঘ বারান্দায় আমরা ছুটে [illegible] দরজা পড়ত, প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ তার সমস্ত অন্ধকার নিয়ে লড়ত, উঠোনে একহাঁটু জল দাঁড়াতো, ছাতের ওপরকার চারটে টিনের নল থেকে স্থূল জলধারা উঠোনের জলের ওপর প্রচণ্ড শব্দে পড়ত ও ফেনিয়ে উঠত, বাগানের মাঝে মাঝে বেলফুলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের ওপর জেগে থাকত এবং পুকুরের বড় বড় মাছ পালিয়ে এসে বাগানের জলমগ্ন গাছের মধ্যে খেলিয়ে বেড়াত তখন হাঁটুর কাপড় তুলে কল্পনার বাগানময় জলে দাপাদাপি করে বেড়াতেম। বর্ষাকালের সন্ধ্যে বেলায় যখন বারান্দা থেকে সহসা গলির মোড়ে মাস্টার মহাশয়ের ছাতা দেখা দিত, তখন যা মনে হত তা যদি মাস্টার মহাশয় টের পেতেন—তাহলে?"

যৌবনে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তখন তাঁর আনুমানিক বয়েস ২৩

রম্যরচনাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উদ্দেশে এক প্রশ্নও জুড়ে দিয়েছিলেন—"সুহৃদ্বর, আপনি তো সিন্ধু দেশের মরুভূমিতে বাস করছেন। সেই অনাবৃষ্টির দেশে বসে একবার কলকাতার বাদলাটা কল্পনা করুন...।"

পরের মাসেই, ভাদ্র সংখ্যায় বালকে সুদূর করাচী থেকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের জবাব এসে গেল। সুন্দর জবাব, সেটিও পত্রাকারে লেখা রম্যরচনা। কৈশোরে দেখা কলকাতার বর্ষার এক উপভোগ্য বর্ণনা দিয়ে নগেন্দ্রনাথ উপসংহার করেন এইরকম, "বর্ষার সময়টা সবকিছু ঘরের ভিতর আসে। ইচ্ছা করে সবাই মিলিয়া ঘরের ভিতর ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া বাহিরে বৃষ্টি দেখি। প্রবাসী বর্ষা প্রারম্ভে ঘরে ফিরিবে, কতকাল এ নিয়ম রহিয়াছে। একটা গান আছে 'সাঁইয়া ঘর না আয়ে বরখ গয়ে বদরা'—সাঁইয়া কি শুধু প্রণয়ী? আমার তো এমন বোধ হয় না। নহিলে সাঁইয়া কাছে থাকিলেও বর্ষার সময়ে ঘরে ফিরিতে ইচ্ছা করে কেন? বর্ষার দিনে সকলে বসিয়া ছেলেবেলার গল্প করিতে ইচ্ছা করে। কে কয়বার বৃষ্টিতে স্নান করিয়া ছিল, কে কয়বার শিল কুড়াইয়া খাইয়াছিল, তাহার হিসাব আবার নূতনভাবে করিতে ইচ্ছা করে...।"

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে আজ কেই বা মনে রেখেছে? অথচ বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার সুসাহিত্যিক লেখক [illegible] গুপ্তের বিচিত্র চরিত্র এবং মানসিকতা ও

তাঁর সঙ্গে তরুণ রবীন্দ্রনাথের সংযোগের অধ্যায়টি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক আকর্ষণীয় দলিল।

১৮৬১ খৃঃ নগেন্দ্রনাথের জন্ম, রবীন্দ্রনাথের জন্ম-ও ঐ একই বছরে। নগেন্দ্রনাথের বাবা ছিলেন সাবজজ। সচ্ছলতার মধ্যেই নগেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে। মেধাবী ছাত্র ছিলেন, এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে খুব উচ্চস্থান পেলেও ঘটনাচক্রে কলেজি শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাননি। কিন্তু তাতে কিই বা আসে যায়? কত রকমের বই যে জোগাড় করে নিজের পরিকল্পনা মতো পড়াশুনো চালাতে লাগলেন তার ইয়ত্তা নেই। ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যের দিকে ঝোঁক—বিশেষত ইংরেজি লিখতে পারতেন দুর্দান্ত। ১৯ কি ২০ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূত্রপাত। প্রিয়নাথ সেনের (১৮৫৪—১৯১৯) সঙ্গে বছরখানেক আগে থেকেই নগেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব খুব জমে গেছে, একে অপরের বাড়িতে যান ঘন ঘন, বই চালাচালি করে পড়েন, সাহিত্য নিয়ে চলে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্কবিতর্ক, দুবন্ধু কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর বাড়িতেও যান প্রায়ই। তরুণ রবীন্দ্রনাথ তখন সবে ইংলণ্ড থেকে ফিরে এসেছেন জোড়াসাঁকোয়। দুবন্ধুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ—এবং অচিরেই তা তিন বন্ধুর গাঢ় সখ্যতায় পরিণত হল।

প্রিয়নাথ সেন তাঁর সেই তরুণ বয়স থেকেই সাহিত্য সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্যরসে নিমগ্ন তিন বন্ধুর প্রথম যৌবনের দিনগুলি কি আনন্দেই না কেটেছে! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সোনামাখা দিনগুলি বিস্মৃতির অন্ধকারে পুরোপুরি তলিয়ে যেতে দেননি নগেন্দ্রনাথ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত তৎকালীন অতি প্রসিদ্ধ ইংরেজি মাসিকপত্র মডার্ন রিভিউতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লেখা এক অপূর্ব স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কিছু অংশকে অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করে গেছেন। ফুটে উঠেছে তরুণ রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ নিখুঁত পরিচয়। এই তথ্যনিষ্ঠ ইংরেজি প্রবন্ধটি বর্তমান কালের পাঠকদের কাছে আদৌ পরিচিত নয়। তাই আমি এর কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করে উদ্ধৃত করছি। নগেন্দ্রনাথ বলছেন, "২০ বছরের রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্ট মনে পড়ে। কারণ ঐ বয়েসেই তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সূত্রপাত। কি চমৎকারই না দেখাতো তাঁকে! লম্বা ছিপছিপে চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ কালো চুল, একটুখানি দাড়িগোঁফও আছে। তখন তাঁর সন্ধ্যাসঙ্গীত ও প্রভাতসঙ্গীত সবে প্রকাশিত হয়েছে। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি তখন ভারতীর সম্পাদনার কাজে খুব ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে আমার ঘন ঘন দেখা হত প্রধানত তিন জায়গায়—প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে, তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এবং আমার গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে। প্রায় প্রায়ই তিনি তাঁর সদ্যোলিখিত কবিতাগুলি আমাকে শোনাতেন। একদিন বেশ মজার ঘটনা ঘটে। প্রেসে পাঠাবার আগে তিনি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক পাণ্ডুলিপি থেকে আগাগোড়া আমাকে পড়ে শোনান ও আমার অভিমত জিজ্ঞেস করেন। নাটকটি অতি অপূর্ব হলেও শেষটা আমার তেমন ভালো লাগলো না। নাটকের সমগ্র অংশের সঙ্গে শেষ অংশ কেমন খাপছাড়া। আমি তা রবীন্দ্রনাথকে জানালাম। শুনে তিনি হেসে বললেন, বড়দাও (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) হুবহু একথাই বলেছেন, শেষাংশ তাঁরও পছন্দ হয়নি।

এরপর নাটকটি প্রেসে ছাপাতে দেয়ার সময়ে শেষাংশ সম্পূর্ণ পালটে দেন রবীন্দ্রনাথ...। খুব প্রতিভাবান ব্যক্তিদের চরিত্রে খানিকটা উদ্ভটতা, খামখেয়ালীপনা কখনও বা ঈষৎ পাগলামির প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে তা ছিল না মোটেই। সেই তরুণ বয়েস থেকে তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ, আঁটোসাঁটো স্বভাবের—আলগা আতিশয্য একেবারে ছিল না তাঁর মধ্যে। ধূমপান বা অন্য কোনোরকম নেশা করতে কখনো তাঁকে দেখা যায় নি। তাঁর ভাত বা অন্য খাদ্য খাওয়ার সময় অনেকদিন আমি উপস্থিত থেকেছি, আশ্চর্য লেগেছে তাঁর খাওয়ার পরিমাণের স্বল্পতা দেখে। জামা কাপড়েও তাঁর কোনোরকম বিলাসিতা ছিল না। কতোদিন আমার গ্রে স্ট্রিটের বাড়িতে এসেছেন ধুতির ওপর খালি গায়ে লংক্লথের মোটা একখানা চাদর জড়িয়ে। এই বেশে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁকে ঘুরতে দেখেছি বহুবার। পায়ে সাধারণত দিতেন খুবই সস্তা ধরনের চটি। আমার বেশ মনে পড়ে করাচী থেকে তাঁর জন্য আমি কয়েক জোড়া খুব সুন্দর সিন্ধী চটি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পরে শুনেছি সেগুলো তাঁর ভোগে লাগেনি। তিনি পায়ে দিতে না দিতেই চটিগুলি অন্য ব্যক্তিরা তাঁর কাছ থেকে উপহার (!!) বলে নিয়ে নেন। একবারই তাঁর মনে ভবঘুরে চিন্তা (Bohemian) উঁকি দিয়েছিলো। তাঁর খুবই ইচ্ছে হল, কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে সম্পূর্ণ হাঁটাপথে কলকাতা থেকে পেশোয়ার যাবেন। পয়সাকড়ি ও জিনিসপত্র নেয়া হবে খুব কম—রাত্তিরে শোয়া হবে রাস্তায়। ভাগ্যক্রমে তাঁর ইচ্ছে কাজে পরিণত হয়নি। অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। অতি সাধারণ আয়োজন। তাঁর কয়েকজন মাত্র বন্ধু আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমন্ত্রণপত্রটি ছিল অদ্ভুত, নিজের হাতে লেখা চিঠিতে তিনি বন্ধুদের জানিয়েছিলেন, তাঁর পরমাত্মীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে হবে।"

আমরা আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই। তিন বন্ধুর সাহিত্যের বৈঠক খুব জমে ওঠার ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ "ভারতী" মাসিকপত্রে নিয়মিত লিখতে লাগলেন। ভারতীকে অবলম্বন করেই নগেন্দ্রনাথের লেখক জীবন শুরু হল। ১৮৮২ খৃঃতে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কবিতার অনুসরণে "স্বপ্ন সংগীত" কবিতা সংকলন ও পরের বছর ঐতিহাসিক উপন্যাস "পর্বতবাসিনী" প্রকাশ করলেন—একেবারে আকিঞ্চিতকর লেখা! ১৮৮৪তে নগেন্দ্রনাথের জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। ২৩ বছরের তরুণ চলে গেলেন সুদূর করাচীতে। সেখানে ফিনিক্স নামে এক ইংরেজি সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার নিলেন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার চিঠির জবাবে করাচী থেকে প্রবাসের চিঠি লেখার উল্লেখ তো আগেই করেছি, এরপর বালকের জন্য নগেন্দ্রনাথ লিখে পাঠালেন 'করাচীর চিঠি'। এদিকে তাঁর কলমের জোর ও সংবাদ যথাযথ উপস্থাপনার গুণে ফিনিক্স খুব জেঁকে ওঠে এবং চার বছরের মধ্যেই সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করে। ফিনিক্স সম্পাদনার ফাঁকে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন 'অমর সিংহ" নামে এক সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস—রীতিমতো জনপ্রিয় হয়েছিল সে যুগে তা উপন্যাসটির তিনটি সংস্করণের কথা শুনেই বোঝা যায়। সে যুগের বিদগ্ধ সমালোচকেরাও "অমর সিংহে"র প্রশংসা করেছিলেন। বর্তমানকালের পাঠকদের খুব ভালো না লাগলেও নেহাৎ মন্দও লাগবে না—রহস্য রোমাঞ্চের উপাদানের সঙ্গে একটি ত্রিভুজ প্রেমের ছবি গাঁথা হয়েছে সম্ভাব্যতার সীমায়।

একটানা সাত বছর করাচীতে ফিনিক্স সম্পাদনার পর কাজ ছেড়ে চলে এলেন লাহোরে। লাহোরের বিখ্যাত ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করলেন শুরু। নরম ও গরম দুরকমই লিখতে হাত চলতো দুর্দান্ত, তাছাড়া অম্লরসাত্মক টিপ্পনীর তো তুলনা নেই। হুহু করে ট্রিবিউনের বিক্রি ঠেলে উঠলো। অবিভক্ত ভারতবর্ষে তো বটেই, খোদ ইংলণ্ডে ট্রিবিউন সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাকে বলে অর্থ উপার্জন ও প্রতিষ্ঠা—নগেন্দ্রনাথ এ সময়ে পেলেন বিপুল পরিমাণে। ১৮৯২ খৃঃ লাহোর থেকেই নগেন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক উপন্যাস লীলা প্রকাশ করেন। উপন্যাসটি ১২৯০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা থেকে ১২৯১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় পর্যন্ত ১৭ মাস ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে চলেছিলো। তেমন

আগামী রবিবার ২৪শে
অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভ-
লগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক।
আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে
৬ নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের
ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি
সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং
আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।
ইতি

অনুগত
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের বিবাহের আমন্ত্রণলিপি

সুবিধের না হলেও পাঠকদের আনুকূল্যে লীলার তিনটি সংস্করণ হয়। "লীলা" সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিও অনুকূল অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন —কিন্তু কাহিনী সাজানো মন্দ না হলেও আবেগে ভরপুর ও জটিলতামুক্ত এই সাদামাঠা উপন্যাস এ যুগের পাঠকের আদৌ মনে ধরবে না।

অবিভক্ত বঙ্গে প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় বাংলা সাময়িকপত্র লাহোরে নিয়মিত আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ এবং এর অনেকগুলিতেই নিয়মিত প্রবন্ধ ও গল্প লিখতেন। কাজেই দূর প্রবাসে থাকলেও বাংলা ভাষার সমসাময়িক সাহিত্যের স্রোতধারার সঙ্গে যোগ রাখায় তাঁর অসুবিধে কোথায়?

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি হঠাৎ লাহোরের ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদনা ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। করাচীর ফিনিক্স সাত বছর ও লাহোরের ট্রিবিউন প্রায় ন বছর —মোটমাট ১৬ বছর একটানা বহুল প্রচারিত দুটি ইংরেজি পত্রিকার সফল সম্পাদনায় তাঁর খ্যাতি তখন একেবারে তুঙ্গে!

তাঁর মনের গভীরে দীর্ঘদিনের এক সুপ্ত-বাসনা ছিল—বাংলা ভাষায় একটি উচ্চমানের বড় আকারের সাপ্তাহিক প্রকাশ করার, যে সাপ্তাহিক কিনা বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে তার স্থায়ী পরিচয় রেখে যেতে পারে।

মোটামুটি হিসেব করেও দেখলেন নিয়মিত ঠিক তারিখে প্রকাশনা চালিয়ে যেতে পারলে বছর খানেক পরেই সাপ্তাহিকটির নিজের পায়ে না দাঁড়ানোর কোনো কারণ নেই।

সেই সময় বড় আকারের এক নতুন সচিত্র মাসিকপত্র সবে চালু হয়েছে কলকাতায়—নাম 'প্রদীপ'। সম্পাদক কে এক তরুণ প্রবাসী অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। মাসিকটি যেমন বিভিন্ন স্বাদের লেখায় ঠাসা তেমনি সম্পাদনার মধ্যেও বেশ অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় বইকি! নগেন্দ্রনাথের কয়েকটি লেখা 'প্রদীপে' বার হলো। কয়েকমাস পরে 'প্রদীপে'র স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে মতভেদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনা থেকে সরে গেলেন।*

এবার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নগেন্দ্রনাথ। তিনিও কয়েকটি মাত্র সংখ্যা সম্পাদনা করে ঐ একই কারণে বিদায় নেন। অনিয়মিত ভাবে বছর দুই চলবার পর 'প্রদীপে'র আলো নিবে গেলো। নগেন্দ্রনাথ 'প্রদীপ' সম্পাদনায় এগিয়ে এসেছিলেন সম্ভবত বাংলা সাময়িক পত্রের সম্পাদকের কাজের হালচাল বোঝার জন্য। সে ইচ্ছে পূর্ণ না হলেও নিজের সাপ্তাহিক প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি, যাকে বলে, দৃঢ়-সঙ্কল্প। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে তিনি নিয়মিত লেখা পাওয়ার আন্তরিক অনুরোধ জানালেন।

প্রিয়বন্ধুর অনুরোধের জোর ছিলো তো বটেই, তাছাড়া নতুন সাময়িক পত্রের প্রতি কি এক অজ্ঞাত কারণে বরাবরই রবীন্দ্রনাথের তীব্র আকর্ষণ! তাই লেখা দিয়ে সাহায্য করার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেন। এরপর নগেন্দ্রনাথ গেলেন সুখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের (১৮৪৮-১৯০৯) কাছে। তিনিও লেখা দিয়ে সহায়তার আশ্বাস দিলেন। তৎকালীন অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য লেখকদের লেখাও সংগ্রহ করতে দেরি হল না।

নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'প্রভাত' প্রকাশিত হতে শুরু করে। কিন্তু আটঘাট বেঁধে নামলেও বাংলা সাময়িকপত্র সম্পাদনা ও তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার, আরেকবার প্রমাণিত হতে দেরি হয় নি! ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদনে এতো সফল হলেও 'প্রভাত' সম্পাদনায় পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন নগেন্দ্র-নাথ। 'প্রভাতের' অনেকগুলি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তা উচ্চমান বা নতুন স্বাদ এনে দিতে পারে নি। রসিক পাঠক ও সমালোচক তো দূরের কথা, সাধারণ পাঠককেও আকর্ষণ করে নি। অভিনবত্ব আনতে গিয়ে আড়ম্বরই সার হয়েছে! 'প্রভাতে' যথেষ্ট ভালো ভালো লেখা প্রকাশিত হলেও সম্পাদনার দোষে সাপ্তাহিকটি খাপ ছাড়া হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও গল্প (যথা, যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ, উলুখড়ের বিপদ, প্রতিবেশিনী প্রভৃতি) দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রভাতের হাল ফেরানো গেল না। ক্রমেই 'প্রভাতের' বিক্রি একেবারে নীচের কোঠায় নেমে এলো।

সাপ্তাহিকটির মান দিন দিন নেমে যাচ্ছে দেখে রবীন্দ্রনাথ তো অত্যন্ত ক্ষুব্ধ! কিন্তু নগেন্দ্রনাথ এতো আশা করে চালাচ্ছেন, তাঁকে মুখের ওপর একথা বলেনই বা কি করে? অথচ 'প্রভাতের' হালচাল দেখে হতাশ না হয়েও তো পারা যায় না। প্রিয়বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের কাছে লেখা কয়েকটি একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের মনের ক্ষোভ স্পষ্ট—কখনো লেখেন,—প্রভাত একেবারে বাজে পত্রিকা, 'না আছে ঝাঁজ, না আছে উজ্জ্বলতা,' এ ভাবে চালিয়ে লাভ কি? কখনো লেখেন,—নগেন্দ্রবাবুর সম্পাদনার দোষে প্রভাত যে ভাবে শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে তাতে এ পত্রিকা টিঁকিয়ে রাখা যাবে কিনা সন্দেহ, এতে লিখতে আমার মোটেই ইচ্ছে করে না।

---

*কয়েকটি মাত্র সংখ্যা সম্পাদনা করলেও 'প্রদীপে'র শিখা বাংলা সাময়িক-পত্র জগতে এবং শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে রীতিমত তাৎপর্য-পূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে (বৈশাখ ১৩০৮) নতুন স্বাদের ও আধুনিক রীতির সচিত্র যে মাসিক বাংলা সাময়িক পত্রের রীতি-প্রকৃতির মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দেয়, সেই 'প্রবাসীর' বীজ অঙ্কুরিত হয়ে-ছিলো ঐ সময়েই।

আবার একথাও লিখলেন,—প্রভাতে প্রকাশিত আমার লেখাগুলি কি কেউ পড়ে? আমার তো মনে হয় না! 'প্রভাতে লেখা দেওয়া আর গঙ্গাসাগরে ছেলে বিসর্জন দেওয়া একই কথা।' নগেন্দ্রবাবুর কাছে লেখা পাঠিয়ে দিন দিন হতাশাই বাড়ছে।

[illegible] সেন মহাশয়কে এতোসব কথা গোপনে জানাতেন বটে রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে কখনো বিমুখ করেন নি—প্রার্থনা করা মাত্রই প্রবন্ধ বা গল্প কিংবা কবিতা দিয়ে দিতেন। একবার তাঁর লেখা পাঠাতে কিছু দেরি হয়েছিল, তিনি তখন শিলাইদহে। কলকাতা থেকে চমৎকার একটি চিঠি লিখে নগেন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন—'প্রভাতেই' তো 'রবির' নিত্য আগমন—তবে লেখা পাঠাতে দেরি হচ্ছে কেন?

রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন চিত্তে অনতিবিলম্বে একটি প্রবন্ধ 'তৈলাক্ত শিরে তৈলসেক' পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু একদা অতিপ্রশ্রয়ধন্য নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর ঈষৎ ঔদাসীন্যের তখন থেকেই শুরু।

১৯০১ খৃস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-

গ্রন্থ 'জীবন ও মৃত্যু' ও উপন্যাস 'তমস্বিনী' প্রকাশিত হলো। 'তমস্বিনী'-ই তাঁর সবচেয়ে বিতর্কমূলক উপন্যাস—বলা চলে কুখ্যাত! অনেকদিন থেকেই তিনি ভেবেছেন কোনো রকম লুকোচাপা, ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে একেবারে খোলামেলা উপন্যাস লিখবেন। বারবনিতা, বেশ্যালয় ও সেখানকার দালাল টাউট, অপরিমিত মদ্যপান, পরস্ত্রী গমন, ভ্রষ্টাচার, অবৈধ প্রেম, বয়স্কা নারী ও অল্পবয়সী তরুণ প্রেমিক, বিধবার প্রেম—মানে, যে সব বিষয় লেখা সে-যুগে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিলো আরকি, সব খুলে মেলে পাঠকের সামনে তুলে ধরবেন!*

কেন হঠাৎ এ রকম একটা বই লেখার ইচ্ছে নগেন্দ্রনাথের মনে দৃঢ় মূল হয়েছিল, তা বলা আজ খুব কঠিন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ও শুচি-শুভ্র জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন, অসংযমের পথে পা বাড়ান নি কখনো—এবং 'তমস্বিনী'তে যে সব বিষয় বর্ণনা করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর আদৌ একদিনের অভিজ্ঞতাও ছিলো কিনা—এই প্রবন্ধ লেখকের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে!

তবে এটা হতে পারে যে, তিনি সমাজের অতিরিক্ত গোঁড়ামী ও 'গেল গেল' রবের বিরোধীতা করতে গিয়েছিলেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে, তিনি এই উপন্যাসে একথাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন—গোপনে কাপুরুষ অসংযমের চেয়ে প্রকাশ্য নির্ভীকতা ভালো।

আজ অবশ্য সঠিক উত্তর জানার কোনো উপায় নেই, সে যুগে যখন এই উপন্যাসের বিরুদ্ধে তিক্ত সমালোচনার ঝড় উঠেছিলো, নগেন্দ্রনাথ তখন কিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য না করে ছোটো গল্প লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। তবে, একথা অতি অবশ্য স্বীকার্য যে, 'তমস্বিনী' উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য তাঁর যা-ই থাক না কেন, সে যুগে (অর্থাৎ ৭৫ বছর আগে) এমন অতি জটিল বিষয় লেখার লৌহ-কঠিন মানসিকতা তাঁর ছিল না মোটেই। প্রতিপদে তাই তিনি হোঁচট খেয়েছেন, বিশেষ বিশেষ 'উত্তেজক ঘটনা' উপস্থাপন করে সামলাতে পারেন নি বা খানিকটা এগিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভেবে আচমকা হুড়মুড় করে পিছিয়ে এসেছেন! ফল যা হবার তাই হলো, উপন্যাস হিসেবে তমস্বিনী গেল একেবারে ব্যর্থ হয়ে।*

তমস্বিনী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেন অত্যন্ত ব্যক্তিগত ভাবে পরস্পরের কাছে লেখা চিঠিতে যে মূল্যায়ন করেছেন তার তুলনা হয় না। Realism সম্বন্ধে দু বন্ধুর মতামত সাহিত্য বিচারের অভ্রান্ত কষ্টিপাথর!

সম্মুখে : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী । প্রিয়নাথ সেন । বৈকুণ্ঠনাথ দাস
পশ্চাতে : রবীন্দ্রনাথ । প্রমথনাথ রায়চৌধুরী । নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শিলাইদহ,
২০ সেপ্টেম্বর ১৯০১,

ভাই,

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের তমস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয় নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাংলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism-এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করিনে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে এসে ঘোমটা সাজে না, তেমনি ওরকম বিষয় লিখতে বসে কিছু হাতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই-ই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্বক সব কথা পরিষ্কার ভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি, সেই জন্যই তাঁর Self Conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটিকে লজ্জিত করে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা

---

*তমস্বিনী এখন বাজারে পাওয়া যায় না, বহুকাল ছাপা নেই। তবু উৎসাহী পাঠক পুরনো লাইব্রেরী থেকে বইখানি সংগ্রহ করে পড়ে দেখতে পারেন একবার। ঈষৎ আলঙ্কারিক হলেও ভাষা চমৎকার, পড়তে ভালোই লাগবে। আলাদা বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে কয়েক খণ্ডে নগেন্দ্রনাথের যে বিপুলায়তন গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যেও এই উপন্যাসটি আছে। উপরোক্ত বিষয়বস্তু ছাড়াও 'দুর্দান্ত পরিস্থিতির'-ও প্রয়োগের চেষ্টার ত্রুটি নেই! যেমন, সদ্যবিবাহিতা তরুণীরা তাদের বিবাহ পরবর্তী অভিজ্ঞতা আভাসে ইংগিতে বলছে—তাদের সংলাপে রাখা হয়েছে ঈষৎ আঁষটে গন্ধ, কিংবা বেশ্যায় প্রবলভাবে আসক্ত 'ভালো ঘরের শিক্ষিত' এক যুবক তার সমস্ত সম্পত্তি, মায় কিশোরী বধূর গায়ের অলংকার, বেশ্যার চরণে খোয়াবার পর যখন দেখলো তার নয়নের নিধি তাকে ত্যাগ করে টাকার লোভে অন্য উপপতি সংগ্রহ করেছে তখন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে কেমন ভাবে সে বেশ্যাটিকে খুন করলো, অথবা ২৩ বছরের একটি বিধবা তরুণী ও ১৭ বছরের কিশোরের অবৈধ মেলামেশা, একটি দৃশ্য উদ্ধৃত করি— ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে নির্জন ঘরে খাটে শুয়ে তরুণীটি 'মুচ্‌কাইয়া মুচ্‌কাইয়া' হাসছে, এবং তার পায়ের কাছে বসে কিশোরটি মৃদুস্বরে 'অতিকদর্য আদিরসাত্মক টপ্পা' গাইছে। হেনকালে বিধবা ও কিশোরটির গার্জেনের প্রবেশ!!! ইত্যাদি, ইত্যাদি।

* একটি চিত্তাকর্ষক তথ্যের উল্লেখ নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'তমস্বিনী' প্রকাশের বহু বহু বছর পরে সেই ১৩৩০ এর বৈশাখে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস আবেগ ও তেজে ভরপুর মাসিক 'কল্লোলে'র প্রকাশ। প্রথম সংখ্যাতেই ৬২ বছর বয়স্ক নগেন্দ্রনাথ 'পুটেরাম' নামে গল্প লিখলেন। বিষয়বস্তু অবৈধ প্রেম। অর্থাৎ পুটেরাম নামক তরুণের সঙ্গে অপরের বিবাহিতা স্ত্রী চাঁপার পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। অবশ্য ততোদিনে ও সব ব্যাপার বাংলা সাহিত্যে জোলো ও বাসী। তাছাড়া গল্পটির জেল্লাও একেবারে ম্লান।

ক্রিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসংকোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করে করেছেন। সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে এক জন ছোকরার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপনই করলেন, তবে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার না করে ছাড়লেন কেন? এ রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎস মূর্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এসব জিনিস তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেজন্য সব কথা ভালোভাবে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভালোভাবে গোপন করতেও পারেন নি। —ইতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের উত্তর এসে গেল।

৯ সেপ্টেম্বর
কলকাতা

ভাই,

তমস্বিনী সম্পর্কে তোমার সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায়টি ঠিক বলিয়াই বোধ হয়।

নগেন্দ্রবাবু যখন আমাকে বইখানি দিতে আসেন, তখন তিনি একটু গর্বের সহিতই যেন বলিলেন যে এই উপন্যাসে তিনি অনেক বিষয় খুব খোলাখুলি লিখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, উহার ভিতর বারাঙ্গনা প্রভৃতি অনেক কথা আছে। কিন্তু কোন গ্রন্থে কি আছে না আছে তাহাতে কি আসিয়া যায়—যাহা আছে তাহা বেশ স্বভাবসঙ্গত এবং কলা সৌন্দর্যে উদ্ভিন্ন কিনা তাহাই বিবেচ্য। তুমি গ্রন্থে যে দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছ তাহা ছাড়াও ইহাতে একসূত্রতার বিলক্ষণ অভাব আছে। যেন কয়টা গল্প পরস্পরের অধ্যায়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া এক নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঘটনা অনেক আছে কিন্তু তাহাদের স্বাভাবিক পরিণামও নাই, আবর্তও নাই। সুতরাং পাঠ শেষে কেমন নিরাশ হইতে হয়—তৃপ্তি আদপেই হয় না। প্রিয়নাথ সেন।

এতো পরিশ্রমের ও সাধের সাপ্তাহিক 'প্রভাত' উঠে গেছে, শুধু উঠে গেছেই নয়, পাঠক চিত্তে বিন্দুমাত্র দাগ না রেখে জলের আল্পনার মতো মিলিয়ে গেছে! বাংলা লিখে যে প্রতিষ্ঠা আশা করেছিলেন, নতুন কিছু দিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন, তাও সফল হলো না। তাই ৬ বছর কলকাতায় কাটিয়ে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ চিত্তে নগেন্দ্রনাথ চলে গেলেন এলাহাবাদে। সেখানে প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান পিপল' নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক ও পরে প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'লীডার'-এর সম্পাদনা করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে সাদর আহ্বান জানালে তিনি ট্রিবিউনের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্র জগৎ থেকে ৫৩ বছর বয়সে অবসর নিয়ে ফিরে আসেন কলকাতায়।

প্রচুর ছোটো গল্প তিনি লিখেছিলেন, সংখ্যার দিক দিয়ে প্রায় ১০০। নিজেকে সফল ঔপন্যাসিকরূপে চিহ্নিত করতে তাঁর বরাবরের ঝোঁক থাকলেও বরং উপন্যাসের চেয়ে ছোটো গল্প লেখকরূপে তিনি অনেক বেশি সার্থক। হিন্দু নায়ক ও মুসলমান নায়িকাকে নিয়ে লেখা 'মিলন' গল্পটি তো অতি চমৎকার। এছাড়া তাঁর সে যুগের বিখ্যাত ও জনপ্রিয় গল্পগুলি হলো, ব্রাহ্মনাবাদ, টিকিয়াশাহ, ভৈরবী, সুরজকাওর, মেহেরজান, রোশেনারা, অলকা মায়াবিনী, ছায়া দুইবার—প্রভৃতি। নগেন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে রহস্যের সঙ্গে রোমান্স, শিহরণের সঙ্গে কল্পনা, লৌকিকরসের সঙ্গে অলৌকিকরসের সংমিশ্রণ করতে জানতেন। তাই তাঁর গল্পে একটি বিশেষ আলাদা স্বাদ থাকতো। এই সঙ্গে অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, বহু ছোটো গল্প তিনি সুন্দর আরম্ভ করেও সমতার অভাবে এলোমেলো করে ফেলেছেন। গুছিয়ে শেষ না করতে পারায় তাঁর অনেক গল্প ও গল্পের চরিত্র রীতিমত নড়বড়ে হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু বাছাই কবিতার কি অনবদ্য ইংরেজি অনুবাদই না করে গেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত! কবিতা অনুবাদের সবচেয়ে যা বড় গুণ, মূলভাব অক্ষুণ্ণ রেখে যথার্থ মহিমায় প্রকাশ—সেই দুরূহ কর্মে তিনি সফল হয়েছেন নিঃসন্দেহে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় কতখানি গভীরতা ও রসজ্ঞ পরিশীলিত মনের অধিকারী হলে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সার্থক অনুবাদ সম্ভব, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ৮৮টি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ এবং তার সঙ্গে "রবীন্দ্রনাথ টেগোর : দি ম্যান অ্যাণ্ড দি পোয়েট"—এই বিখ্যাত প্রবন্ধটি যুক্ত করে আন্তর্জাতিক পুস্তক ব্যবসায়ী সংস্থা ম্যাকমিলান কোম্পানীর হাতে দেন নগেন্দ্রনাথ। বইটির নাম রাখা হয় SHEAVES টাইটেল পেজটি এরকম—

SHEAVES: THE POEMS AND SONGS By Rabindra Nath Tagore. Selected and Traslated by Nagendra Nath Gupta, 1929.

অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতের বাইরে অনুবাদ সংকলনটি উচ্চপ্রশংসা ও বিশেষ সমাদর লাভ করে, তৎকালীন বহু প্রসিদ্ধ ইংরেজি দৈনিক ও সাময়িক পত্রে সংকলনটির ফলাও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বিশেষত আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনে 'সিভস' বিক্রিও হয়েছিল খুব।

রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কবিতা 'উর্বশী'র একটি স্তবক ও নগেন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ আপনাদের সামনে রাখছি।

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী!
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা॥

Like a flower without a stem
blooming in itself,
When didst thou blossom
Urvasi?
Out of the churned sea thou didst
rise
in the primal spring morn
With the chalice of ambrosia in
thine right hand,
the poison cup in thy left;
Like a serpent charm-stilled the
mighty
Ocean wave—tost
Sank at thy feet bending its million
having hoods
In obeisance.
White as the Kunda flower, in beauty
undraped, the lord of the gods
bowing before thee
Fair Art thou!

জন্ম একই বছরে—চলে যাওয়া এক বছরের তফাতে। নগেন্দ্রনাথ ১৯৪০, রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১। তরুণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতার আশ্চর্য মধুর দিনগুলি কিছুতেই ভুলতে পারেননি তিনি—বরং যতো দিন গেছে, মনের মণিকোঠায় স্মৃতি দুর্মূল্য হয়েছে আরো। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছড়ানো টুকরো স্মৃতিচারণে বিষণ্ণতার ঈষৎ আভাস লুকোতে পারেননি—নাকি, চাননি নগেন্দ্রনাথ? যৌবনের সোনালী দিন—আহ্ সে কি আর ফিরে আসে! প্রতিভার অভাবনীয় দীপ্তিতে এবং খ্যাতির শীর্ষে উঠে রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই নগেন্দ্রনাথের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সেই পুরুষোত্তমকে আবার পুরনো বন্ধুত্বের গণ্ডীর মধ্যে ফিরিয়ে আনা যায় কই! অবশ্য নগেন্দ্রনাথের তরফে চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। "ভাই রবি" সম্বোধনে নিয়মিত লিখতেন চিঠি [১৯২৬-এর পর সেই মানবশ্রেষ্ঠকে এমন সম্বোধন করার মতো ক'জনই বা ছিলেন?]। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ প্রায় হারিয়েই ফেলেছিলেন।

তবু, জীবনের শেষপর্বে অন্তত একবার অরুণোৎসবের দিন এসেছিল। ১৯৩৬ খৃঃ এক সামাজিক অনুষ্ঠানে দুজনের দেখা—বয়স তাঁদের তখন ৭৫, ঘরে আরও অনেকে উপস্থিত। কথা প্রসঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক আবর্তের সামান্য আভাস এসেছে। রবীন্দ্রনাথ শান্ত কণ্ঠে দু-চারটি কথা বললেন। সকলেই উৎকর্ণ। তাঁর কথা শেষে আরো কেউ কেউ কিছু বলছেন এ সম্বন্ধে। নগেন্দ্রনাথ খুব পাশেই বসেছিলেন, কি মনে হলো, মৃদু কণ্ঠে বললেন, ফেলে আসা দিনগুলো মনে পড়ে? সেই—

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাসলেন। আর কিছু বললেন নি।

নগেন্দ্রনাথের উপলব্ধি উদ্ধৃত করেই এ প্রবন্ধের ইতি করি, 'আমার প্রশ্ন শুনিয়া রবি হাসিলেন। সেই কোমল, মধুর অনির্বচনীয় হাসি। প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজিয়া পাইলাম—সেই হাসি আমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিলো, বুঝিলাম কিছুই হারায় নাই, কিছুই হারায় না...।'

পর্যটকের পত্র

প্রবোধকুমার সান্যাল

॥ ১০ ॥

চিঠি লিখতে এবার একটু দেরি হয়ে গেল। নানা কারণে। একে একে যে সব স্টেট দেখে চলেছি, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার যোগাযোগ নিয়ে অনেক সময় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। অনেক সময় ঠিক কোথায় এবং কার কাছে গিয়ে উঠে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্রাম লাভ করব, সে প্রশ্নও মনে মনে থাকে। আমি কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছি তাই নয়, উড়ে উড়েও বেড়াচ্ছিলুম। পায়ের সঙ্গে মনও পথ পেরিয়ে চলে। কিন্তু লিখতে গেলে অবকাশ চাই।

শিকাগো পৌঁছবার আগে বনপথের ধার দিয়ে যাচ্ছিলুম। এই মহাদেশে কথায় কথায় অরণ্যানী ও পার্বত্যালোক চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে তারই ভিতর দিয়ে যখন পার হতে থাকি, তখন প্রায়ই চোখে পড়ে ঘন বন ও ফসলের ক্ষেতের ধারে লেখা 'ডিয়ার পার্ক' অর্থাৎ হরিণের বন। শিকাগোর মতো সুবৃহৎ নগরের এত কাছে এই মৃগদাব কিছু বিস্ময় আনে। যাই হোক, শিকাগোর প্রতি আমার আকর্ষণ অনেক কালের এবং সেটি এক ঐতিহাসিক কারণে। এই নগরেরই একখানে দাঁড়িয়ে ১৮৯৩ সালে ভারতীয় এক যোগতপস্বী মাত্র ৬ মিনিটের এক ভাষণে পৃথিবীবাসীকে অভিভূত করেছিলেন। সুতরাং আমি যাচ্ছিলুম অনেকটা যেন তীর্থ পরিক্রমায়। নইলে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন শিকাগো আমার কাছে একই কথা।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম 'সিয়ার্স টাওয়ার' যেটি আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বহুতল অট্টালিকা—যার উচ্চতা ১৪৬৫ ফুট, এবং ১২০ তলা। এটি নির্মাণ করেছেন একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী, যিনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে এদেশে এসেছিলেন। তাঁর নাম ফজলুর রহমান। তাঁর আদি বাড়ি ঢাকায়। তাঁর ডিজাইনে অপর একটি ওই প্রকারই অতি বৃহৎ বহুতল অট্টালিকাও নির্মাণ করা হয়েছে, সেটির নাম 'জন হ্যানকুক' বিল্ডিং। সেটি শিকাগোর ডাউন টাউনের বৃহত্তম ল্যান্ড মার্ক। শিকাগো শহরে যখন বর্ষার মেঘ নামে তখন এ দুটি অট্টালিকার শীর্ষলোক মেঘে ঢাকা পড়ে।

শিকাগো হল যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। প্রথম নিউ ইয়র্ক, দ্বিতীয় লস এঞ্জেলেস—যেখানে মাস দেড়েক আগে কয়েক দিনের জন্য বাস করেছিলুম। শিকাগোর উত্তর ও পূর্ব অংশ হল মিসিগান সমুদ্র—যেটি দিবা রাত্র পুরীর সমুদ্রের মতো তরঙ্গসংকুল এবং যেটি চওড়ায় দুশ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে লম্বায় পাঁচশ মাইলেরও বেশি। বস্তুত, এই মিসিগান 'লেক'ই মিসিগান স্টেটকে উত্তর দিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে,—যার উত্তর দিকে কানাডার 'লেক সুপিরিয়র', এবং পূর্বে 'লেক হুরন' ও 'লেক ইরি'। এই কয়েকটি বৃহৎ ও সমুদ্রবৎ জলরাশির পরিবেশের আশে পাশে রয়েছে কয়েকটি স্টেট—যেমন মিনেসোটা, উইসকনসিন, মিসিগান, ইলিনয়েস এবং কানাডার অন্তর্গত টরন্টোর উপদ্বীপ অঞ্চল। এই সমগ্র ভূখণ্ডের চারিদিক দেখার জন্য কিছুকাল থেকে আমি ঘোরাঘুরি করছিলুম।

ইলিনয়েস বা 'ইলিনয়' স্টেটের উত্তর-পূর্বে মিসিগান লেকের তীরে শিকাগো শহর। এই শহরের সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত হাইওয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'লেক শোর রোড'। একশ বছর আগে তদানীন্তন শিকাগো নগরীর অধিকাংশ আগুন লেগে ছারখার হয় যে কারণে, সেটি হল এক গরুর গোয়ালে খড়ের গাদায় গরুর পায়ের চাট লেগে কেরোসিনের প্রদীপ ও পাত্র উল্টিয়ে আগুন ধরে যায়। নিকটবর্তী সমুদ্রের প্রবল বাতাসে সেই আগুন ক্রমে বহুদূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে। তখন যুক্তরাষ্ট্রে দমকল জন্মায়নি এবং বিদ্যুৎ বা মোটরগাড়ির প্রসার হয়নি। এটি ১৮৭৪-এর ঘটনা। দিবারাত্রির এই প্রবল বায়ুবেগের জন্য শিকাগোকে বলা হয় 'উইনডি সিটি'। এই 'উইনডি' সিটির সমুদ্র তটের কাছাকাছি যাঁর বাড়িতে আমি আশ্রয় নিয়েছিলুম, তাঁরা হলেন এই স্টেটে আতিথেয়তা ও স্নেহময়তার জন্য সুপ্রসিদ্ধ দুই সহোদর ভাই—গিরীন রায় এবং গিরীশ রায় ও তাঁদের দুই পত্নী গৌরী ও প্রদীপ্তা। এই দুই নারীর সদাজাগ্রত অতিথি বাৎসল্য, আপ্যায়ন এবং মধুর ব্যবহার আমার বসবাস ব্যবস্থাকে আনন্দ মুখরিত করে রেখেছিল। এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। গিরীনবাবু এখানকার দুর্গাপূজা ইত্যাদির অন্যতম অধিকর্তা।

শিকাগোর যিনি ভারতের বর্তমান কনসাল জেনারেল, তিনি হলেন অলকচন্দ্র ... স্থাপন করেছিলেন এবং হাজার ... আমেরিকান নর-নারী সেই দৃশ্য দেখেছেন। এঁদের পুরুষরা মুণ্ডিতমস্তক, এবং মহিলারা বাঙ্গালী ধরনে শাড়ি, সিঁদুর ও চুড়ি পরেন। এঁরা মেঝের উপরে বসে থালা পেতে 'প্রসাদ' খান এবং সকালে দুপুরে ও সন্ধ্যায় হরিসংকীর্তন করেন। এঁদের যিনি 'প্রভুপাদ' এবং যাঁর

নতুন লাক্স পাউডার সৌখীন জামাকাপড় নতুনের মত মসৃণ করে তোলে

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বাগচী। তাঁর বাড়ি নবদ্বীপে। তিনি একাধারে ভারতীয় পর্যটন বিভাগেরও ডাইরেক্টর। একদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাকে নিয়ে এক বন্ধু সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। এই নগরে কম বেশি চারশ বিশিষ্ট বাঙ্গালী রয়েছেন এবং তাঁদের অধিকাংশই বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক চিকিৎসক এবং বিজ্ঞান গবেষক। লক্ষ্য করেছি, সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বা কানাডায় দিবা ভাগে কোনও বন্ধুর দেখা পাওয়া যায় না, তাঁরা প্রভাতকাল থেকেই নিজেদের কর্ম-কেন্দ্রে কাজে ব্যস্ত—সেই ব্যস্ততার মধ্যে কোনও ফাঁক বা ফাঁকি নেই, বাড়ির খাওয়া তাঁদের কপালে জোটে না। তাঁরা একবার মাত্র সন্ধ্যাকালে পেট ভরে খান এবং তখন থেকে সর্বপ্রকার সামাজিক জীবন শুরু হয়। সমস্ত কাজকর্ম পড়ে থাকে শনি ও রবিবারের জন্য। ওই দুটি দিন ছুটি। অন্য দিন স্বামীরা কর্মস্থলে বেরিয়ে গেলে স্ত্রীরা হয়ে ওঠেন ঝি, ধোবানি, পাচিকা ঝাড়ুদারনি বা জমাদারনি। আর্থিক সচ্ছলতা যতই থাক—বছরে সাধারণভাবে কমপক্ষে ১০ হাজার ডলার, বরং বহু-লোকের অনেক বেশি—কিন্তু গৃহকর্মের সাহায্যকারী এদেশে কেউ নেই। সুতরাং কঠোর কায়িক পরিশ্রম ছাড়া মেয়ে বা পুরুষের পক্ষে এদেশে বাঁচার উপায় নেই। এমন বহু দেশে ঘটেছে—যেমন নিউ ইয়র্কে, দক্ষিণ দেশ টেকসাস-এ, কলোরাডোয়, সানফ্রান্সিসকোয়, সান্টাক্রুজে—যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভোর সাতটায় কাজে বেরিয়ে যান—সেখানে আমাকে রান্না, বাসন ধোওয়া প্রভৃতি কাজ করে নিতে হত। স্বামীরা অনেক সময়ে আপিস থেকে ফিরে রান্না ও বাসন মাজা নিয়ে ব্যস্ত হন।

এখন থেকে ৮২ বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ যে সুবৃহৎ অট্টালিকার হলে আন্তর্জাতিক ধর্মসভার বিশ্বখ্যাত সম্মেলনে যে অবিস্মরণীয় ভাষণটি দিয়েছিলেন, সেই অট্টালিকার এখন নাম হয়েছে আর্ট ইনস্টিটিউট অফ শিকাগো। এটি ডাউন টাউনের কাছে এক সুপ্রশস্ত রাজপথের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। রাজপ্রাসাদের মতো এর সুবিস্তৃত সোপান শ্রেণী—তারই দুই দিকে দুই বৃহদাকার কেশরী সিংহের মূর্তি—ওরা যেন পূর্ব প্রাচীর দিকে চেয়ে রয়েছে, যে পথ ধরে একদা ভারতের সেই বীরকেশরী চলে গিয়েছেন নিজের পথ দিয়ে। এই প্রাসাদপুরীর ভিতরে একালে বিভিন্ন কক্ষে পৃথিবীর বহু দেশের চিত্র-কলা শোভা পাচ্ছ। ভিতরে বিশাল অঙ্গন, সেখানে বহুবিধ শিল্প সামগ্রীর সমাবেশ দেখা যায়। আমি বাইরে এসে ওই পাথরের সোপান শ্রেণীর এক পাশে অনেকক্ষণ একা বসে রইলুম। ঠিক অমন করে কেউ বসে না, সেজন্য বিদেশী পথচারীরা যখন দেখে-দেখে চলে যাচ্ছিল, তখন মনে-মনে আমি মহাকবির একটি 'চরণ' আওড়াচ্ছিলুম, 'তোমার ধূলায় ধূলায় ধূলায় আমি ধূসর হবো—।' আমার দুই চোখ বোধ হয় শুষ্ক ছিল না।

৮২ বছর আগে যে তারিখে স্বামীজি এখানে ভাষণ দিয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনটিতে অর্থাৎ ১১ সেপ্টেম্বরে আমি প্রবেশ করেছিলুম 'বিবেকানন্দ বেদান্ত আশ্রম' নামক এক অট্টালিকায়। এটি আশ্রমের প্রধান কেন্দ্র, কিন্তু আরও তিনটি কেন্দ্র এই শিকাগো শহরেই বর্তমান। এই আশ্রমটি এবং অন্য তিনটি কেন্দ্রের পরিচালনার বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ হল ১ লক্ষ ২০ হাজার ডলার। এই অর্থ যুগিয়ে দেন স্বামীজির সংখ্যাতীত অনুরাগীমন্ডলী—যাঁদের প্রায় সকলেই আমেরিকান্। এই বাড়িটির মধ্যেই একটি উপাসনা মন্দির দেখতে পাচ্ছিলুম যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী, বিবেকানন্দ, বুদ্ধ ও খৃস্টের ছবি পাশা-পাশি সাজানো রয়েছে। ভিতরে এক একটি কক্ষে বিভিন্ন ভাষায় অধ্যাত্মবাদের গ্রন্থাদি, বিবেকানন্দ রচিত বিভিন্ন বই ও গ্রন্থাবলী দুটি পাঠাগারে রক্ষিত রয়েছে। দু-চারটি শ্বেতাঙ্গ নর-নারী এগুলি দেখাশোনা করছিলেন।

স্বামী ভাষ্যানন্দ ওরফে বসন্ত মহারাজ এখন এই আশ্রমের পরিচালক। তিনি কর্ণাটকের মানুষ, কিন্তু আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলছিলেন। তিনি কিছুদিন আগেও কলকাতায় ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, পরলোকগত বরোদার মহা-রাজার প্রস্তাব ও অনুরোধের ফলে মিসিগান স্টেটের গভর্নর একদা একটি স্থানীয় জনপদের নামকরণ করেন 'সিটি অব গ্যানজেস' ওরফে 'গঙ্গানগর'। এই গঙ্গানগরে এখন যে বেদান্ত আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানে আপাতত ১৯ জন আমেরিকান ব্রহ্মচারী তপশ্চর্যা করছেন এবং তাঁরা কিছুকালের মধ্যেই সন্ন্যাস নেবার জন্য বেলুড় মঠে যাবেন। প্রসঙ্গক্রমে ভাষ্যানন্দ বললেন, যুক্তরাষ্ট্রে আরও তিনটি ভারতীয় নামের জনপদ রয়েছে, সেগুলির নাম কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজ। অপর একটির নাম বরোদাও রাখা হয়েছে। স্বামীজির বসবার ঘরের দেওয়ালে বিবেকানন্দের একটি বড় ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। এটি ৮২ বছর আগেকার ছবি এবং ছবির নিচে বিবেকানন্দের স্বহস্তে নাম সই করা। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী পরমানন্দ এসেছিলেন আমেরিকায়। তিনি কালিফোর্নিয়ায় সান-ফ্রান্সিসকো নগরে একটি বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি আমি আমার ভ্রমণ-কালে দেখে এসেছি, বলাই বাহুল্য। সেই আশ্রমটি ছিল পরমানন্দের নিজস্ব সম্পত্তি। তাঁর মৃত্যুর আগে সেটি তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী তপস্বিনী শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীর নামে লিখে দিয়ে যান। গায়ত্রী দেবীর কথা এর আগে আমি লিখেছি। বোস্টনে থাকা-কালীন গত ২৬ জুন তারিখে আমি 'কোহাসেট' নামক এক বনময় অঞ্চলে গিয়ে শ্রীমতী গায়ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই-রাত্রে সেখানে বহু আমেরিকান নর-নারী উপস্থিত ছিলেন। গায়ত্রী তাঁর নামাঙ্কিত বেদান্ত আশ্রমটি এখন 'বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসায়েটি'কে দান করতে চান।

শিকাগো শহরের আরেক স্থলে 'হরে কৃষ্ণ' সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র দেখ-ছিলুম। এ'দের অবস্থা খুবই সচ্ছল এবং এ'রা পৃথিবীর বহু দেশে ইতিমধ্যেই অসংখ্য নামকীর্তন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে চলেছেন। এটি এখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আমি এ'দেরকে দেখে আসছি নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ডালাস, লসএঞ্জেলেস সানফ্রান্সিসকো প্রভৃতি বহু শহরে। এ বছরে এ'রা শিকাগোয় জগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা উদ্‌যাপন করেছিলেন এবং হাজার হাজার আমেরিকান নর-নারী সেই দৃশ্য দেখেছেন। এ'দের পুরুষরা মুন্ডিতমস্তক, এবং মহিলারা বাঙ্গালী ধরনে শাড়ি, সিঁদুর ও চুড়ি পরেন। এ'রা মেঝের উপরে বসে থালা পেতে 'প্রসাদ' খান এবং সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় হরিসংকীর্তন করেন। এ'দের যিনি 'প্রভুপাদ' এবং যাঁর

কৃপায় এঁদের মোক্ষলাভ ঘটবে, তিনি জনৈক বাঙ্গালী বৈষ্ণব, নাম অভয়চরণ দাস ভক্তিবেদান্তস্বামী। ইনি প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি এবং এঁর অসামান্য কৃতিত্ব সর্বত্র সমাদৃত। এঁর যাঁরা অনুরাগী তাঁরা সকলেই 'অন্ধ' ভক্তিতে নিত্য ভাসমান। এঁরই কোনও এক রচনায় প্রকাশ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ নাকি বেদান্তের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন! তাঁর এই ধরনের কথাগুলি আমার কানে ঠেকেছিল। সম্ভবত আমি ভক্তিভাসমান নই বলেই তাঁর মন্তব্যের প্রতি আমার ঔদাসীন্য ছিল। এদেশে একে একে বহু অধ্যাত্মবাদী, ভক্তিবাদী ও যোগবাদী সম্প্রদায় এসে জায়গা নিয়েছেন, কারণ আমেরিকায় বাধা নিষেধের বেড়াজাল কোথাও নেই। পৃথিবীর সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ এদেশে এসে অবাধ ও নিরবচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করে। এদেশে বহু-বহু কম্যুনিস্ট মনোভাব সম্পন্ন নরনারী বাস করে সন্দেহ নেই। কোন কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাও সে-তুঙের বাণী ঝোলানও দেখে এসেছি। কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে চক্রান্ত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ। হিংসাবাদী নর-নারী বহু আছে কিন্তু তারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার না করা পর্যন্ত পুলিস তাদেরকে কিছু বলে না—এ কথাটি আমাকে জানিয়ে ছিলেন ম্যাডিসনে পুলিস বিভাগের কর্তৃপক্ষ। জনৈক পুলিস অফিসার আমার হাতে একটি দামী রিভলভার দিয়েছিলেন পরীক্ষা করে দেখার জন্য। এগুলি এদেশের যে-কোনও দোকানে মাত্র ২০ ডলারে কিনতে পাওয়া যায়, কোনও নিষেধ নেই। খুনী আসামী ধরা পড়লে খুনের বিচার হয়, কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের বিচার হয় না। পুলিসের অন্যতম কর্তা আমাকে বলেছিলেন, আপনি ভিজিটর হিসাবে দু'চারটে আগ্নেয়াস্ত্র এদেশ থেকে অনায়াসে কিনে নিয়ে যেতে পারেন, কেউ বাধা দেবে না। শুধু বিমান-ভ্রমণকালে আপনার পকেটে গুলিভরা রিভলভার না থাকলেই হ'ল!

এদেশে কোথাও কোথাও মহেশ যোগীর নামডাক আছে। তাঁর আদর্শ হল যৌগিক অতীন্দ্রিয়বাদ। ওটার একটা অসুবিধা এই, চর্মচক্ষে কিছু দেখা যায় না! আমেরিকার সামাজিক জীবনে অতি-সচ্ছলতার ফলে একপ্রকার মানসিক অরুচি দেখা দেয়, তার ফলে জীবনযাত্রা একঘেয়ে মনে হয় এবং বিষয়-বিরাগ আসে। সুতরাং নতুন কিছুর দিকে কেউ যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তার খদ্দের জুটতে বিলম্ব ঘটে না। অর্থ উপার্জন, চাঁদা আদায় ডোনেশন, সম্পত্তি কেনা, প্রতিষ্ঠান স্থাপনা নতুন হুজুগে মাতিয়ে তোলা, এগুলি সুসাধ্য। এদেশের সংবাদপত্র দিয়ে ভারতীয়দের ক্রিয়া কীর্তি-কলাপ কিছু কিছু ছাপিয়ে নিতে পারলে ভারতবর্ষে তার খাতির ও কদর বাড়ে। সেগুলি আবার একত্র করে যদি পুস্তিকা ছাপা হয় তবে ত' কথাই নেই!

শিকাগো শহরের 'উইলমেট' নামক অঞ্চলে 'বাহাই' মন্দিরটি দেখে প্রকৃত আনন্দ পেয়েছিলুম। এটি মিসিগান হ্রদের পারে একটি উচ্চ মালভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর শোভা-সৌন্দর্য, কারুকার্য, ভাস্কর-শিল্প, অকাতর অর্থব্যয় বোধ করি তাজমহলকেও হার মানায়। এই মন্দির নির্মাণের পিছনে যাঁর ধ্যানকল্পনা কাজ করেছে তিনি এক মহৎপ্রাণ ইরানী, নাম বাহাউল্লা। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বাহাউল্লা তাঁর যৌবনকালে এক নতুন বিশ্বমানবধর্ম প্রচার করেন, যার মূল কথা হ'ল পৃথিবীর সকল ধর্মের একই পথ, যার অপর নাম ঈশ্বর-লাভ। মহাপুরুষগণ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মবাদ প্রচার করে এই একই কথা বলতে চেয়েছেন। বাহাউল্লার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন আর্যজাতি-সম্ভূত। কিন্তু তাঁর এই বিশ্ব-ধর্মবাদ পারস্য দেশের মুসলমান সমাজ বরদাস্ত করেন নি। তাঁর ওই মতবাদ প্রচারের ফলে ইরান সরকার ও ইসলামের নেতৃবৃন্দ তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু তাঁর পরিবর্তে তাঁর ২০ হাজার শিষ্যকে হত্যা করা হয়। অতঃপর তাঁকে স্বদেশ থেকে বাগদাদে, পরে অন্যত্র দেশে, এবং তারপর প্যালেস্টাইনে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৮৯২ সালে কারাজীবনে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

উইলমেটের নয়টি স্তম্ভে বাহাউল্লার যে কথাগুলি উৎকীর্ণ দেখতে পাচ্ছিলুম তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করি:
"All the prophets of God proclaim the same faith. Religion is a radiant light and an impregnable stronghold. Ye are the fruits of one tree, and the leaves of one branch. So powerful is unity's light that it can illumine the whole earth. Consort with the followers of all religions with friendliness. O Son of Being! Thou art my lamp and my light is in thee. O Son of Being! Walk in my statutes for love of me. Thy paradise is my love; thy heavenly home is reunion with me. The light of a good character surpasseth the light of the sun."

বাহাউল্লাকে বলা হত তিনি ইসলামের শত্রু এবং তাঁর জন্য ইসলাম বিপন্ন। তাঁর জীবৎকাল অবধি তিনি পারস্য দেশে ঘৃণার পাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধি পৃথিবীর বহু দেশে হাজার হাজার কোটি ডলার ব্যয়ে বহু মন্দির নির্মাণ করা হয়। কোনও 'বাহাই' মন্দিরে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রকার ক্রিয়াকলাপ

নেই। শুধু চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকা যায়।

শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ারের উপরে উঠবার লোভ সামলাতে পারি নি। দেড় ডলার মূল্যের টিকিট লাগে উপরে উঠতে। ছুটির দিনে প্রায় ৮।১০ হাজার লোক উপরে ওঠে। লিফ্‌ট ওরফে এলিভেটর তুলে নিয়ে যায় এক মিনিটে। ১৩৫৩ ফুট উঁচু পর্যন্ত তুলে নামিয়ে দেয় 'স্কাই ডেক' নামক এক বিশাল চতুষ্কোণ হলে। উপর থেকে দেখে নাও বিশাল শিকাগো এবং মিসিগান লেক। কিন্তু স্কাই-ডেকের উপরের তলাগুলিতে ওঠবার হুকুম নেই। এই অতিকায় অট্টালিকা নির্মাণে ৭৫ হাজার টন শুধু ইস্পাত-লোহা লেগেছে, এবং এর মধ্যে কেবলমাত্র টেলিফোন ব্যবস্থার জন্য যে পরিমাণ তার খরচ করা হয়েছে, সেগুলি পরস্পর লম্বায় যোগ করলে দাঁড়ায় প্রায় ৫০ হাজার মাইল অর্থাৎ বার দুই পৃথিবী পরিক্রমার মতো দূরত্ব। নিউ ইয়র্কে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ১২শ ফুট, ওয়ার্লড ট্রেড সেণ্টার যেন ১৩শ কত, এবং এই সিয়ার্স টাওয়ার ১৪৬৫ ফুট উঁচু। সিয়ার্স হল এদেশের মস্ত শিল্পপতি,—যারা বিলিয়নের হিসাবে ডলারের পরিমাণ গোনে। কিন্তু আমি এদেশে এখন 'আদার' ব্যাপারী, সব 'জাহাজের' খবর রাখতে পারছিনে।

সম্প্রতি শিকাগোতে 'শিক্ষক ধর্মঘট' চলছিল। তাঁদের ইউনিয়ন খুবই শক্তিশালী। দেখতে পাচ্ছিলুম হাজারে হাজারে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বেতনবৃদ্ধির আন্দোলনে যোগ দিয়ে পথে পথে মিছিল বার করছিলেন। ৭।৮ দিন এইভাবে চলছিল। এমন সময়ে নগরের যিনি সর্বোচ্চ কর্তা, যাঁকে মেয়র বলা হয়, তিনি এক বিবৃতি প্রচার ক'রে বললেন, আমার হাতে এমন উদ্বৃত্ত অর্থ নেই যা দিয়ে শিক্ষকদের মাইনে বাড়ানো চলে। সুতরাং ধর্মঘট শেষ ক'রে দাও।

আশ্চর্য, তাঁর এই একটি কথায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল! রাজভক্ত প্রজারা শান্ত মনে যে যার কাজে চলে গেল।
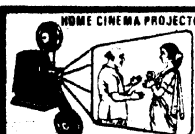
প্রত্যেক স্টেটের গভর্নরের নিচেই হলেন মেয়র। মেয়রই সর্বেসর্বা। এদেশে না আছে মুখ্যমন্ত্রী, না শিক্ষামন্ত্রী, না বা উপমন্ত্রীর দল। জনসাধারণ অত্যান্ত শান্ত ভাবে সব রকমের আইন ও নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শিক্ষকের নিজস্ব গাড়ি আছে। সর্বাপেক্ষা কম বেতনের শিক্ষকও বছরে ১০ হাজার ডলার উপার্জন করেন। প্রতি শিক্ষক বছরে এক হাজার গ্যালন গ্যাস বা পেট্রল খরচ করেন এবং তার মূল্য বছরে পড়ে ছয়শো ডলার বা একটু কম। এ ছাড়া ঘরখরচ, সন্তানপালন, ফ্ল্যাট ভাড়া, ইনকাম ট্যাক্স, সোসাল সিকিউরিটি ট্যাক্স, হাত-খরচ, সামাজিকতা—কী নেই? সুতরাং ৮।৯ শ' ডলারের এই মূল্যবৃদ্ধির কালে গৃহস্থের পক্ষে চলবে কেমন করে? এইসব কারণে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই কাজ নিতে হয়। কাজ পেয়েও যায় সহজে।

শিকাগোর 'ইনডাসট্রিয়াল' যাদুঘর দেখলে হাসি পায়। দু'শ' তিনশ' বছর আগে যখন বিজ্ঞান ও টেকনোলজি আঁতুড়ে অবস্থায় ছিল তখন এরা কি-কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত, তারই যাদুঘর। যেমন ধরো ছুতোর মিস্তিরির করাত, বাটালি, র্যাঁদা, ছেনি তুরপুন—এরা এখন সেই সব সুপ্রাচীনকালের যন্ত্রাদি দেখে কৌতুক বোধ করে। এদের ঠাঁই হল এখন যাদুঘরে। ভারতীয় ছুতোর যে কাজ সাত-দিনে করে, এরা ইলেকট্রিক যন্ত্রে সেকাজ সাত মিনিটে করে! রাজধানী ওয়াশিংটনের এক ময়দানে দেখেছিলুম, একটি সুবিশাল গাছের গুঁড়ি কেটে নামাতে এদের এক মিনিটও লাগল না।

এদেশে আসার পর থেকে আমি বহু গ্রামে ভ্রমণ করেছি। এক একটা বড় শহরের আশে পাশে একশ' মাইলের মধ্যে মাঝে মাঝে গ্রাম গড়ে উঠেছে। সেই গ্রাম যেন এক-একখানি পটে আঁকা ছবি। প্রতিটি বাড়ি আগাগোড়া কার্পেট মোড়া, প্রতি বাড়িতে টেলিফোন, একটা বা দুটো টিভি সেট, একখানা বা দুখানা মোটর, সামনে ও পিছনে ফুল ও ফলের বাগান, প্রতি বাড়িতে ফ্রিজার, ইলেট্রিক কুকিং রেঞ্জ, বাসন মাজা ও ধোওয়া-মোছার মেসিন, বাথরুমে গরম ও ঠাণ্ডা জলের শাওয়ার এবং প্রতি বাড়িতে হিটিং ও কুলিংয়ের ব্যবস্থা, দিবারাত্রি কলের জলের বন্দোবস্ত। শুধু বোতাম টেপো, কাটা ঘোরাও—সব কিছু নিখুঁত ভাবে অনায়াসে পাবে। প্রত্যেক বাড়ির লনের সামনে একটি স্ট্যাণ্ডে দুটি করে বাক্স লটকানো—একটি চিঠির বাক্স, অন্যটিতে দিয়ে যাবে সংবাদপত্র। মোটরে আসবে ডাক-পিওন আর নিউজ বয়। চিঠি লিখে তোমাকে নিজের হাতে ডাকে ফেলতে হবে না। বাক্সের সঙ্গে লটকিয়ে রাখো, ওরাই নিয়ে যাবে। প্রত্যেক গ্রামে মাকড়সার জালের মতো একেকটি সুন্দর ও মসৃণ পাকা সড়ক এখান ওখান ঘুরে হাইওয়েতে মিলবে। প্রত্যেক গ্রাম সজীব কিন্তু শান্ত। শপিং সেণ্টার, স্কুল, হাসপাতাল, পুলিস চৌকি, ডাকঘর, গলফ ক্লাব, লাইব্রেরি—সমস্তই হাতের কাছে। যদি তুমি প্রশ্ন করো, বাজার বা হাসপাতাল এ গ্রাম থেকে কত দূরে মশাই? কেউ একজন জবাব দেবে, এই ত কাছেই, মিনিট দশেকের পথ! তুমি তখনই বুঝে নেবে ওটা দশ মাইল মোটরের পথ। যদি কেউ বলে, ওয়াকিং ডিসটেন্স, তখন বুঝবে এক মাইলের মধ্যেই। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বিগত চার মাসের মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে কোনও কাজের জন্য দু' মাইল অবধি হাঁটতে দেখিনি।

বড় বড় শস্য প্রান্তরের আশে পাশে চাষীদের বসবাস দেখছিলুম। প্রত্যেক

চাষীর দু' তিনখানা মোটর, নিজস্ব বৃহৎ বাগানবাড়ি, চার পাঁচখানা যন্ত্রযান, বিরাট এক একটা বার্ন বা শস্যভাণ্ডার, জন্তুদের 'ফডার' খাবার একটি সুউচ্চ গম্বুজের মতো একই ধরনের গোলা, প্রত্যেকের বাড়িতে রেডিয়ো বা টি-ভি সেট, প্রতি ঘরে কার্পেটের মেঝে, রান্নাঘরের একই ধরন—এবং প্রতি বাড়িতে ইলেকট্রিক ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। একশ' একর জমি চাষ করে একজন মাত্র ব্যক্তি একদিনে। যন্ত্রযানের সাহায্যে রাসায়নিক সার দেয় ওই পরিমাণ জমিতে মাত্র একদিনে, একদিনে বীজ বপন করে, নিড়েন দেয়। দেড় থেকে দু' মাসের মধ্যে ফলন শেষ হয় এবং যন্ত্রযানের সাহায্য ফসল কেটে ওই যানের মধ্যেই পুঁজি করে ভাণ্ডারে তুলে আনে। কোনও ফসলের ক্ষেতে খোলা আকাশের নিচে কোনও চাষীকে কাজ করতে দেখা যায় না। ঘরে বসে ইলেকট্রিকের সাহায্যে ক্ষেত খামারে বিশেষ পাইপের দ্বারা জলসেচন করা হয়। কোন কোনও স্টেটে বিশ, তিরিশ বা পঞ্চাশ বর্গমাইল-ব্যাপী জমি এক একজন চাষী পরিবারের অধিকারে রয়ে গেছে। স্বয়ং গভর্নমেন্ট অধীদেরকে সমীহ করে চলেন।

নিত্যসেবাব্রতী শিরীন ও শিরীশ রায়ের পরিবার ছিলেন আমার গাইড। তাঁদের সঙ্গে কখনও যাচ্ছি ডাউন টাউনের আপিস পাড়ায়, কখনও মিসিগান সমুদ্রতীরে, কখনও বা দূরেপাল্লার 'হায়াৎ রিজেন্সি' হোটেলের দিকে যার সাততলার উপরে 'পোলারিস' নামক একটি ঘূর্ণমান রেস্টুরেন্ট—যেটির বিরাট আয়তন অবিশ্রান্তভাবে ঘুরে-ঘুরে সমগ্র দিগন্ত-জোড়া শিকাগোকে দৃশ্যমান করে তুলছে। তখন খাবার টেবিলে বসে তুমি সব দেখে নিতে পারো। ওখানেই দেখা যায় একটি কাঁচের এলিভেটর—যেটি অলঙ্কৃত এবং আলোকমালো সুসজ্জিত। এখান থেকে কাছেই বিশ্ববিখ্যাত বিমানঘাঁটি ও-হেয়ার—যেখানে ইলেকট্রনিক-কম্পিউটারের সাহায্যে প্রতি আধ মিনিটে একখানি বিমান ওঠে ও নামে। অর্থাৎ প্রতি ২৪ ঘণ্টায় আড়াই হাজার বিমান ওঠানামা করে! এই বিমান-ঘাঁটিতে যাত্রী ছাড়া কোনও অপারেটরকে দেখা যায় না—শুধু কমপিউটর যন্ত্রের সাহায্যে সমস্তই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এক অদৃশ্য সঙ্কেতে।

প্রতি শহরে নগরে বা গ্রামের উপকণ্ঠে একটি দুটি বা চারটি বিশ্ববিদ্যালয়। শিকাগোয় সব মিলিয়ে মোট ছয়টি। প্রধানতম হল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়—যেটি বন-বাগানঘেরা একটি স্বতন্ত্র নগর। কমবেশি একশখানা বিশাল অট্টালিকা নিয়ে এর ক্যাম্পাস—যেখানে অন্ততপক্ষে ৫০ হাজার ছেলেমেয়ে, শিক্ষক, অধ্যাপক, রিসার্চ স্কলারের দল নিয়ত কাজ করে চলেছে। কিন্তু চারিদিক দিবারাত্র নিঃঝুম নিস্তব্ধ। পথঘাট জনবিরল, শান্ত, নিরুদাসীন, বন্ধুহীন—দেখলে যেন গা রোমাঞ্চ হয়। বনবাগানে গাছপালার মর্মরশব্দ ও পাখির ডাক ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ 'ফস্টার' হলে কিছু বলবার জন্য যখন আমার ডাক পড়েছিল, সেই রাত্রে আমার মনে একটু কাঁপন ধরেছিল বইকি। ঘণ্টাতিনেক ধরে আমার সাহিত্য ও ভ্রাম্যমান জীবন সম্বন্ধে কি-কি বলেছিলুম, এখন আর একটুও মনে নেই। বিগত চার মাসে প্রায় ৪০ দফায় আমাকে নানা স্টেটের নানা শহরের জনসমক্ষে ও বন্ধুসম্মেলনে দাঁড়াতে হয়েছিল। এখনও কয়েকটি বাকি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের দুইজন অধ্যাপক ক্লিনটন সীলি ও রালফ নিকলাসের সঙ্গে একদিন নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলুম।

আমার আমেরিকা ভ্রমণ শেষ হতে এখনও প্রায় মাসখানেক বাকি। এখন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, এদেশে শরৎকাল। মাঝে মাঝে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। রাত্রে কম্বল জড়াতে হয়। কিন্তু এখনই বনে জঙ্গলে পাহাড়ে মাঠ-ময়দানে গাছপালার রং বদলাতে আরম্ভ করেছে। দেখতে দেখতে গাছগুলো হয়ে উঠছে রক্তরাঙা, কোথাও বা ঘন হলুদবর্ণ। আর এক মাসের মধ্যে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র বর্ণচ্ছটার বন্যায় প্লাবিত হবে। তারপর থেকে পাতা ঝরতে আরম্ভ করবে। সেই ঋতুর নাম 'ফল্'। আমি এই ফল-এর আগে ইউরোপের দিকে যাব।
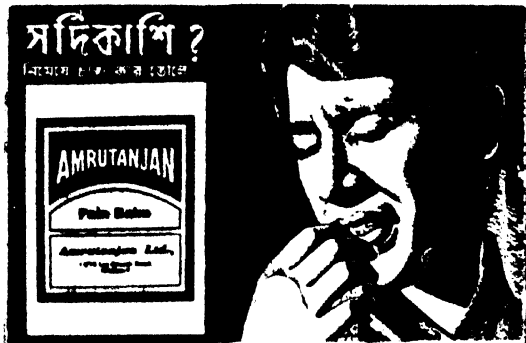
আমার এই ভ্রমণকালে মাঝে মাঝে মহামায়ার মায়া আমাকে ঘিরে ধরছিল। স্নেহমোহবন্ধন ভ্রাম্যমান জীবনের পক্ষে বাধাস্বরূপ। কানাডার নীলাদ্রি ও রানু, গুয়েল্ফ-এর মঞ্জু ও কেনেথ কেলি, অরবিন্দ ও সবিতা, বিশ্বনাথ ও বেণু, নিউ ইয়র্কের মনোরঞ্জন দত্ত, রেণুকা বিশ্বাস, নিউ পাল্টজের ভবানী সরকার আর মঞ্জুশ্রী, হিউস্টনের দীপক, রিনা, রতন ও রণজিৎ ব্যানার্জি, ডালাসের শান্তি ও দীপক—এরা নিতান্ত আপন হয়ে রইল। লস এঞ্জেলেসের দিদিভাই, সানফ্রান্সিসকোর রমেন্দ্র আর অর্চনা, আলাস্কার একমাত্র বাঙালী নীরেন্দ্র বিশ্বাস, হনলুলুর সত্যাংশু, বার্কলের তুষারকুমার, কানসাস ও মিজৌরীর সুধাংশু, অঞ্জনা, দীপক ও শ্রাবণী, ম্যাডিসনের বিভূতিরঞ্জন ও বীণা চৌধুরী—এঁদেরকে ভুলবার আর উপায় রইল না। শিকাগোর গৌরী বউমাকেও ভুলতে পারব না।

একদিন এঁদেরই বাঁধন কেটে ডেট্রয়েটের দিকে রওনা হলুম।

॥ ছিয়াত্তর ॥
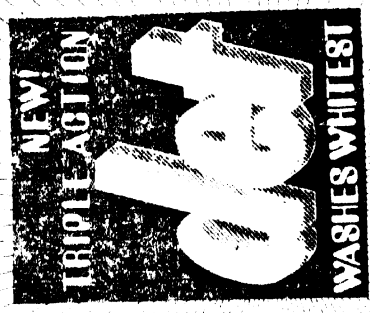
অনেকরকম ভয়ভীতি ছিল ব্রজগোপালের মনে। ঠাকুর যেমন চাইতেন তেমনি. জীবনটাকে খুব সাদামাটা করে এনেছিলেন তিনি। খুব কম আয়োজন তাঁর জীবনে। যত অল্প উপকরণে দিন কাটানো যায় ততই মনটা ভাল থাকে, বিষয়লগ্ন হয় না বলেই উর্ধ্বমুখী হয়। এখন ননীবালা এলেন. ব্রজগোপালকে বুঝি আবার সংসারী করে গেলেন।

টর্চ জেবলে জেবলে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে রাস্তা থেকে ঘর পর্যন্ত যখন ননীবালাকে নিয়ে আসছিলেন তখনই এরকমটা মনে হল। একটু ভয়, একটু সংশয়। অবশ্য ভাল না. লাগলে ননীবালা ফের চলে যাবেন এবং ব্রজগোপালও আবার যেমন কে তেমন হয়ে যাবেন। তবু মনটা উদ্বিগ্ন লাগছিল।

ঘরে একট চৌকি ছিলই। সেটাতে বিছানা পাতা হল ননীবালার। নিঝুম রাত। ঘুম আসে না নতুন জায়গায়। কয়েকদিন বার বার রাতে উঠে পান খেতেন. ব্রজগোপালকে সজাগ করে বাইরে যেতেন।

ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেন—মন খারাপ করছে তো ওদের জন্য? বরং আবার কিছুদিন গিয়ে থেকে এসো।

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন—না। এখানে এসে পৌঁছ সংবাদ দিলাম. সে চিঠিটারও উত্তর আসেনি। ওরা কি আমার কথা ভাবে নাকি? আমারও আর দরকার নেই যাওয়ার।

—ওরা না ভাবুক, তুমি তো মা. তোমার তো আর ছাড়ান কাটান নেই।

ননীবালা অন্য কথা পাড়েন—শোনো, খুব তো পরের জমিতে আর পরের ঘরে বাস করে কর্তাত্তি করছো, বহেরু চোখ বুজলে উৎখাত হবে। বরং বাস্তু জমিটায় একটু কুঁড়েঘর হলেও তোলো। এরকম থাকা আমার ভাল লাগে না। পাকিস্তান হয়ে অবধি পরের দরজায় পড়ে আছি।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন—গুচ্ছের টাকা নষ্ট। আমরা চোখ বুজলেই সব ফর্সা। ছেলেরা কি এতদূর আসবে?

ননীবালা বলেন—আসল কথাটা কি বলো তো? এর আগের বার এসে বহেরুর মেয়ের কাছে শুনেছিলাম ষষ্ঠীচরণকে নাকি সব উইল করে দিয়েছো।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন—দিয়েছি কিছু। দু কাঠা বাস্তু, সে ঐ পুবধারে। ও জমিটা দিইনি. ও তো তোমার নামে কেনা। কুয়ো কাটিয়ে, বাঁধিয়ে, চারধারে বেড়া দিয়ে যত্নে রেখেছি।

—সে বেশ করেছো। এবার ঘর তোলো। বহেরুকে আজই বলবো. বাঁশ টিন সব জোগাড় করবে।

বহেরু পরদিন এসে সব শুনলো, রামভক্ত হনুমানের মতো। তারপর লাফ দিয়ে উঠে বলল—কর্তার এক পয়সা খরচ করতে হবে না। বাড়ি আমি তুলে দেবো।

ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বলেন—তুই তুলবি কেন?

—ব্রাহ্মণকে গৃহ দান মহাপুণ্য। ও আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার কর্মফল কিছু কাটুক। অনেক খুনজখম করেছি কর্তা, এই দুই হাতে আপনার মতো সৎব্রাহ্মণের জন্যও কিছু করি। তারপর আপনি গুরুস্থানীয়ও বটে।

ব্রজগোপাল আরো ধমকালেন। বহেরু শোনে না। সে বলে—বাঁশ টিনের পলকা জিনিস বছর বছর পালটাতে হয়। গতবারে ইঁট কেটেছিলাম, তার হাজার দশেক পড়ে আছে এখনো। সিমেন্ট না পাই চুন সুড়কির গাঁথনি দিয়ে পাকা ঘর তুলে দেবো।

বিশাল দলবল নিয়ে বহেরু গিয়ে জমিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মচ্ছবের মতো ব্যাপার লাগিয়ে দিল, তার চোখেমুখে একটা প্রচণ্ড আনন্দ। দিনে পাঁচবার এসে ননীবালাকে ডাকে—মাঠান, এসে দেখে যান. কেমন হচ্ছে।

ব্রজগোপাল গা করেন না। কিন্তু ননীবালা যান. বলেন—ও বাবা বহেরু, পায়খানা বাথরুম সব অত দূরে দূরে করিস না। শহরে থেকে অভ্যাস. সব সেখানে এক ছাদের তলায়। তোদের এখানে শেয়াল কুকুর সাপ ভূতের তো অভাব নেই. রাতবিরেতে বেরোতে ভয় করে। তার ওপর বুড়ো বুড়ি, কে কখন হোঁচট টোঁচট খেয়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙি।

বহেরু রাজি, বলে—তাই হবে। বাংলো প্যাটার্ন।

শুনে ননীবালা হাসেন। এক ছাদের তলায় হলেই তা বহেরুর কাছে সাহেবী বাংলো। অনেক কাল আগে কলকাতায় বাসা দেখে টেখে ও বলেছিল—এ হচ্ছে বাংলো প্যাটার্ন। কার থেকে যেন শিখেছিল ইংরিজি কথাটা। তাই শুনে কত হেসেছে রণেন আর সোমেন।

ব্রজগোপাল ঘরেদোরে বেশী থাকেন না। বেরিয়ে পড়েন যাজনে। ঘরবাড়ি তার জন্য নয়। মানুষ যে আছে সে হল তার অস্তিত্ব. আর মানুষ যে কিছু হয় সে হল তার বৃদ্ধি। এই অস্তি-বৃদ্ধির রসদ সংগ্রহ করতে হয় আবার পরিবেশ থেকে। সার কথা, নিজের পরিবেশকে সেবা দিয়ে সাহায্য দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে পরিপুষ্ট করে তোলে। তা নইলে সে যদি শুকিয়ে যায় তো জীবনের রস টানবে কোত্থেকে? তুমিও শুকিয়ে মরবে যে, তা যতই তুমি কেষ্টবিষ্টু হয়ে থাকো। সিধে মানুষ, বড় মানুষ বড় একটা দেখা যায় না আজকাল, সব পোকা লাগা। হাত-পাওলা মানুষও কেমন যেন নুলো-ন্যাংলা, ধনীও ভিখিরির সামিল হয়ে হা-পয়সা জো-পয়সা করে খাবি খাচ্ছে। আজকাল লোকজনের চোখে মুখে সব সময়েই একটা মাতলা ভাব লক্ষ্য করেন ব্রজগোপাল. কেমন একটা মানসিক নেশার ঘোরে চলেছে। কলকাতার মতো বড় শহরে সে-ভাবটা আরো বেশী। মানুষ বড় তিতিবিরক্ত. রাগী. লোভী. বড্ড বেশী অস্থির। কিসে ভাল হবে বুঝতে পারে না। যত মানুষ তত সমস্যা। এই রকম গোলমেলে সমাজে ব্রজগোপাল সুস্থির হয়ে বসে থাকেন কি করে! ঘুরে ঘুরে পচনের ধারাটা দেখেন. লক্ষ্য করেন কতটা নিরাময়ের যোগ্য. আর কতটাই বা কেটে বাদ দিতে হবে। দেখে শঙ্কিত হন। অবসাদও আসে। ঠাকুরই আবার শক্তি যুগিয়ে দেন। এই বয়সেও ব্রজগোপাল ফের কর্মসচিক্কণ হচ্ছেন।

ননীবালা বলেন—অত সইবে না. এখন বসে বিশ্রাম নেওয়ার বয়স।

ব্রজগোপাল শান্ত স্বরেই বলেন—ঠাকুর

শরীর দিয়েছেন বসিয়ে রাখার জন্য নয়, কাজ করার জন্য।

—ভূতের বেগার। ধর্মকথা আজকাল কেউ বা শুনছে?

ব্রজগোপাল ভেবে বলেন—ঠিক। তবে, বাজ, আজকাল ধর্মের বড় দাপট বেড়েছে। কত ম্যাজিকওলা দু-পয়সা করছে দেখছ না! দেশে এখন দীক্ষার বান ডেকেছে। গুরু গুরু করে পাগল হচ্ছে লোক। নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে এরকম ক্ষেপে যায় মানুষ। ম্যাজিক না দেখলে কিছু বিশ্বাস করে না। সবাই কৃপা চাইছে। বোঝে না যে কৃ অর্থে করা, তারপর পা অর্থাৎ পাওয়া। মানুষকে এটুকু বোঝানো দরকার যে সেই চির-রাখাল আজো বসে আছেন কদম্ব-বৃক্ষের তলায়, কত বাঁশি বাজাচ্ছেন, তবু তাঁর হারানো গোধন দূরের চারণক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবার পথ পাচ্ছে না। তাঁর সেই হারানো গোধন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। আর কি করব?

দুমাসের মধ্যেও চিঠিপত্র এল না কলকাতা থেকে। কেউ দেখা করতেও এল না। মনটা বড় উচাটন লাগে ননীবালার। দিন-রাত পাঁচালি পাড়েন—কে কি রকম আছে কে জানে! খবরবার্তা নেই। খোঁজ না নিস, নিজেরা কেমন আছিস তা তো দু ছত্র লিখে জানাতে পারিস?

ব্রজগোপাল শুনে মাথা নেড়ে বলেন—তোমার মন কেমন করছে। যাও বরং গিয়ে দুচারদিন থেকে এসো।

ননীবালা ঝামড়ে ওঠেন—কেন যাবো? ওদের যদি টান না থাকে তো আমারই বা কি দায় ঠেকেছে? দু মাস হয়ে গেল! একটা পোস্টকার্ড পর্যন্ত লিখতে পারল না।

ব্রজগোপাল হেসে বলেন—এ হল অভিমানের কথা। ওরা তো দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেই। জানা কথা। দায় তোমারই।

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন—না। দেখি, কতদিনে বুড়োবুড়ির কথা মনে পড়ে।

সারা দিনটাই প্রায় নয়নতারা এসে ননীবালার আশে পাশে ঘুরঘুর করে বেড়ালের মতো। বিন্দু আসে রোজ, রান্নার কাঠ দিয়ে যায়, ক্ষেতের কলাটা মূলোটা রেখে যায়, কোটা চিঁড়ে, ভাজা মুড়ি পৌঁছে দেয়। আসে মতিলাল বামনবাবুর কালীপদ ষষ্ঠীচরণ এসে খেলা করে দোরগোড়ায়! বামনবাড়ির পেসাদের লোভে হামাগুড়ি দিয়ে গুণধ বিশ্বেশ্বর এসে বসে থাকে রান্নাঘরের দরজায়। চোখে দেখে না, কিন্তু নাকে গন্ধ টেনে বলে—উরেব্বাস, কি গন্ধ গো মাঠান, তোমাদের ছেঁচড়াতে! কোকা কপিল যেমন-তেমন হোক একবার দিনান্তে এসে খোঁজ নেবেই। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় লক্ষ্মীর পাঁচালী শুনে বাতাসা শশা আর ফলতলের প্রসাদ নিতে সবাই জুটে যায়। হরির লুটের বাতাসা কুড়োতে আসে।

এসব ভুলে গিয়েছিলেন ননীবালা কলকাতায়। এখানে এসে আবার সব করতে শুরু করেছেন। সকলের সঙ্গে জড়িয়েও পড়েছেন খুব। ছেড়ে যেতে মন চায় না। এবছর প্রথম দুর্গাপুজো করল বহেরু। পুজোর আগেই চলে এসেছিলেন ননীবালা। দুঃখ ছিল। বহেরুর পুজোয় মেতে গিয়ে সে দুঃখ ভুললেন। বেশ লাগল গাঁয়ের পুজো, অনেক কাল পর। একটু একটু করে কলকাতাকে ভুলছেন। কত বড় জায়গা এটা, আর কি শীতটাই পড়েছে এবার!

বহেরু ময়দানবের মতো খেটে বাড়িটা খাড়া করে দিল। ছাদ ঢালাইয়ের অনেক ঝামেলা বলে ওপরটায় টিন লাগাল। জানলা দরজা বসে গেছে। গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন করে ফের কলকাতায় চিঠি দিলেন ননীবালা। বুকটা দুরদুর করে। আসবে তো কেউ?

ননীবালা সবিস্ময়ে একটা জিনিস বুঝতে পারেন। আগে ভেবে রেখেছিলেন যে, হাভাতে স্বামীর ঘর করতে এসে বুড়োবয়সে বড় অভাবের কষ্ট পাবেন। কিন্তু এসে দেখছেন, কোনোদিন অভাবের ছায়াও মাড়াতে হচ্ছে না। যা চাইছেন তাই জুটে যাচ্ছে। শুধু যে বহেরু দেয় তা নয়, হঠাৎ হঠাৎ কোত্থেকে কোন দূরান্তের মানুষ এসে ঝপাস করে এক জোড়া চওড়াপেড়ে শাড়ি পায়ে ফেলে উবু হয়ে প্রণাম করে যায়। কেউ বা এক ঝুড়ি তরকারী এনে ফেলে গেল। ব্রজগোপাল যাজনে বেরিয়ে যখন ফেরেন তখন কত কি বয়ে আনেন। বলেন, সব জোর করে গছিয়ে দেয়, ফেলতে পারি না। তা দেওয়ার অভ্যাস ভাল। যে দিতে শেখে, তার বুদ্ধি অনেকটা ঠিক আছে। ব্রজগোপাল নিজে গুরু নন, গুরুর নাম বিলিয়ে বেড়ান ঋত্বিক বা পুরোহিত হিসেবে। কেউ তাঁকে গুরু বলে ভুল করলে হেসে বুঝিয়ে দেন—গুরু মানে হচ্ছে ওজনে ভারী। যার জ্ঞানের ওজন, উপলব্ধির ওজন যত বেশী সে তত বড় গুরু। সেই হিসেব ধরলে দুনিয়ায় কে গুরু নয় বলো, কাঙালের কাছেও শেখবার আছে, তার নিজস্ব অর্জিত জ্ঞানও তো কম নয়! কিন্তু সদগুরু যিনি, সন্ত যিনি তাঁর মধ্যে থাকে সর্বজ্ঞত্ব বীজ। আমি তাঁর পাঞ্জাধারী পুরুত, লোককে তাঁর ঠিকানা দিয়ে বেড়াই। তোমরা নিজের চেষ্টায় পৌঁছোও বাবারা। তো পুরুত হয়ে তাঁর যজমান কম নয়। ব্রজগোপালকে হাত পাততে হয় না, লোকে হাত পাতবার আগেই দেয়। তাই ব্রজগোপালের কোনো অভাব নেই।

এইটে দেখে বড় বিস্ময় ননীবালার। হাড়-হাভাতে বাউণ্ডুলে তাঁর স্বামী। তিনি কষ্ট পাবার জন্য তৈরী হয়েই এসেছিলেন। এসে দেখেন, ঘরে সোফাসেট বা রেডিওগ্রাম না থাকলেও ব্রজগোপালের ঘরে লক্ষ্মীর গায়ের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে তরিতরকারী বিলিয়ে দিতে হয়। দু মাসে প্রায় তিরিশখানা মিহি জমির শাড়ি পেয়েছেন। প্রণামীর টাকা প্রতি মাসেই অন্তত শ খানেক কেবল তাঁরই হাতে এসেছে। ননীবালা এসব নিয়ে খুব খুশী। বলেন—তোমার যে খুব রবরবা গো।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন, এ কি দেখছো। বিবেকানন্দের নামে কত হাজার বিদেশী কারেন্সীর প্রণামী আসে একবার জেনে এসো। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। তাই ভাবি, ফরেন ক্যাপিটালের জন্য হা-পিত্যেশ করে না থেকে যদি একশ বিবেকানন্দ তৈরী হত দেশে তো টাকাপয়সায় ভাসাভাসি কাণ্ড হত। লোককে যদি ধর্মজ্ঞান করতে পারো তো পঞ্চভূত এসে তোমার সংসারে বেগার খেটে যাবে।

গৃহপ্রবেশের আয়োজন নমো-নমো করে সারতে চাইলেও হল না। ব্রজঠাকুরের বাড়ি হচ্ছে শুনে বৈঁচী, গোবিন্দপুর, বর্ধমান থেকে বিস্তর লোক খোঁজখবর করতে এল। জানালা দরজার কাঠ পাওয়া গেল বিনা পয়সায়, রং পাওয়া গেল, সস্তায় কিছু লোহালক্কড়ও দিল একজন। সবাইকে বলতে হয়। তাই বললেন ননীবালা, বাদ রাখলেন না।

উৎসবের দিন মচ্ছব লেগে যাবে আন্দাজ করে বহেরু বলে দিল—কর্তা, সোজা খিচুড়িভোগ, লাবড়ার তরকারি, আর চাটনীর ব্যবস্থা করুন। শেষ পাতে কিছু মিহিদানা আর দই।

*

কলকাতার জমিতে বাড়ি হবে-হবে করেও হল না। কত আশা ছিল ননীবালার। একবার কৌশল করে রণেনের ঐ জমিটা নিজেও কিনতে চেয়েছিল। জমিটায় অভিশাপ আছে বোধ হয়। কতকাল পড়ে থাকবে কে জানে! ছেলেরা কি করবে তাও ঠাকুর জানেন। কিন্তু এখানে এতদিন পর স্বাধীন হতে পেরেছেন তিনি। যেমন হোক, তবু নিজের বাড়ি। চারদিকে অনেকটা জমি। বাচ্চারা জমি কুপিয়ে এর মধ্যেই গাছ লাগিয়েছে কত! বাড়ি তৈরি শেষ হওয়ার আগেই জমির ক্ষেতে ফুল ফল আসতে লেগেছে। এখানে জীবনটা শান্তিতে না হোক স্বস্তিতে কাটবে। একটু একা লাগবে কি! লাগুক। বলতে কি, জীবনটা তো তাঁর একাই হয়ে গেছে। ছেলেরা খোঁজ নিল না।

গৃহপ্রবেশের দিনটায় সকাল থেকে পুজোর শেষ অবধি উপোস করে থাকা ছাড়া আর কোনো ঝক্কি পোয়াতে হয়নি ননীবালার। রাশি রাশি জিনিসপত্র জড়ো হয়েছে। কে কুটছে, কে কাটছে বোঝা মুশকিল। তবে চেনা অচেনা সবাই খাটছে। বিশাল এক তেরপলের তলায় যজ্ঞির রান্না

হচ্ছে। পুজো চলছে উঠোনে। ব্রজগোপাল নিজে পুজো করলেন না, পুরুত করছে। তিনি গা আলগা দিয়ে বছরের উঠোনে বসে আছেন খোলা রোদে তাঁকে ঘিরে বিস্তর লোক ঠাকুরের কথা শুনছে। উপোসী মুখে কোনো ক্লান্তি নেই, বৈকল্য নেই। পারেও বটে লোকটা—ননীবালা ভাবেন। প্রতি মাসে একবার করে চতুরহ সহ শিশু প্রাজাপত্য করেন। সে ভারী কষ্টের। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে হবিষ্যান্ন মাত্র, দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে একবার হবিষ্যন্ন, তৃতীয় দিন অযাচিত—অর্থাৎ কেউ ব্রতর কথা জেনে কিছু দিলে তাই দিয়ে হবিষ্যান্ন, চতুর্থ দিন কাঠ-উপোস। ননীবালা আপত্তি করলে বলেন—কত অজ্ঞানিত অপরাধ করছি প্রতিদিন, তার প্রায়শ্চিত্ত করে রাখি। প্রায়শ্চিত্ত মানে দণ্ড নয়, পুনরায় চিত্তে গমন, স্বাভাবিকতায় বা প্রকৃতিতে ফিরে আসা।

ননীবালা তত্ত্বকথা বোঝেন না, কষ্টটা বোঝেন। মানুষটা চিরজীবন তাঁর অচেনা রয়ে গেল। এখন অবশ্য আর বাধা দেন না। এখানে এসে বুঝেছেন, ব্রজগোপাল খুব হালকা লোক নন। চারদিকে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়ার লোকের অভাব নেই। ফকিরসাহেব পর্যন্ত এসে কত সম্মান আর আদর দেখিয়ে যান রোজই। স্বামীর সম্মানের ভাগ এই প্রথম পাচ্ছেন ননীবালা। এর আগে কয়েক দিনের জন্য এসে এত বুঝতে পারেননি।

উৎসবের এত হইচইয়ের মধ্যেও ননীবালা উদ্গ্রীব হয়ে আছেন রাস্তার দিকে। কেউ কি আসবে না? বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। কলকাতার গাড়ির খোঁজ নিচ্ছেন বার বার। মনে মনে নিজেকে বোঝাচ্ছেন—ওরা তো সব দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর চা-টা খেয়ে রওনা হবে, হাওড়া তো কম দূর নয়। হাওড়া থেকে প্রায় দু ঘণ্টা গাড়িতে এসে আবার এতখানটা পথ। সময়ের হিসেব করে ননীবালা দেখেন, বারোটা একটার আগে এসে পৌঁছোবে না কেউ। তবু যদি আসে। কাউকে জোর করার নেই, দাবি-দাওয়া নেই, দয়া করে যদি আসে। বড় অভিমান হয় ননীবালার। একটা জীবন বুকে দিয়ে ছেলেপুলে আগলে রেখে মানুষ করলেন, ওরা তবু কি করে সব ভুলে যায়!

বাপার-বাড়িতে কিছু গণ্ডগোল হবেই। কপিলের ছেলে গাছে উঠেছিল, পড়ে গিয়ে তার ডানা ভেঙেছে! হইরই কাণ্ড। বৈঁচীর হাসপাতালে তাকে নিয়ে রওনা হল কজন। এর মধ্যে রব উঠল, নন্দলালের পাঞ্জাবির সোনার বোতাম চুরি হয়েছে। নন্দলাল থানা-পুলিস করবে বলে চেঁচাচ্ছে। বিন্দু এসে ননীবালাকে বলে—এ হচ্ছে মেঘু ডাক্তারের ছেলেদের কাজ। ওরা বড্ড চোর। নন্দলাল যেমন পাঞ্জাবি খুলে বেড়ার গায়ে রোদে দিয়ে গেল, ফিরতে না ফিরতে চুরি। এত চটপটে হাত আর কার হবে! ফকিরসাহেবের ভুতুড়ে বাড়িতে দিনমানে লোক যায় না, সেইখানে পর্যন্ত গিয়ে ওরা ফকিরসাহেবের পেতলের মোমদানী চুরি করেছিল। অমন ডাকাবুকো আর কে আছে!

এই সব গোলমালে ননীবালা একটু আনমনা হয়েছেন, ঠিক এই সময়ে নয়নতারা ধেয়ে এসে চেঁচিয়ে বলল—ও মা, তোমার ছেলেরা সব এসেছে, নাতিপুতি সব। দেখ গে যাও, চার রিকশা বোঝাই।

ননীবালা বড্ড তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়েছেন উঠে। মাথাটা চন্ করে পাক মারল, বুকটায় ধরল চাপ। শ্বাসকষ্ট। উপোসী শরীরের দুর্বলতাও আছে। চোখ অন্ধকার করে ধীরে ধীরে বসে পড়েন ফের। নয়নতারাই এসে ধরে তাঁকে—ও মা, কি হল গো?

ফ্যাকাসে ঠোঁটে ননীবালা বলেন—নয়ন, তুই যা, ওদের নিয়ে আয়। আমার বুকটা...

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেন না। বুড়ো বয়সের শরীর, বেশী সয় বয় না। নয়নতারা হাপুরহুপুর হাতপাখার হাওয়া করে, বুক মালিশ করে দেয়। বলে—চিন্তা করো না মা, এসেছে যখন সবাই ঠিক তোমার কাছে আসবে।

—তবু তুই যা। বলে ননীবালা নিজেই ওঠেন আবার। বলেন—এখন একটু ভাল লাগছে।

ননীবালা বাইরে আসেন। বিশ্বাস হয় না, তবু দেখেন, কুঞ্জলতায় ছাওয়া শুঁড়ি পথ ধরে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে চারদিক দেখতে দেখতে সব আসছে। পথ দেখিয়ে আনছে বহেরু। সে ননীবালার দিকে চেয়ে একটা ডাকাতে হাঁক পেড়ে বলে—মাঠান, সব আসে পড়েছে! দেখেন। জয় ভগবান।

ভগবানের বড় দয়া। বড় দয়া। ননী-বালার বুকের অন্তস্থলে থিতিয়ে ছিল চোখের জল, নাড়া খেয়ে তারা উঠে এল। চোখ ঝাপসা, কণ্ঠায় আটকে আছে কান্নার দলা।

প্রথমে সোমেন, তার হাত ধরে টুবাই, পিছনে রণেন, বীণা, বুবাই আর রেক-কুঁড়ি। কিন্তু তার পিছনে ছেলে কোলে সুন্দর মেয়েটা কে? ও মা! শীলা নাকি! কি সুন্দর হয়েছে শীলা! কোল-ভরা মোটা-সোটা ছেলেটাই বা কি সুন্দর! স্বয়ং গোপাল। ও কি অজিত? তাই তো! হায় সর্বনাশ, এ আবার কাকে দেখছেন ননী-বালা? এ কি সত্যি? ইলা না! বন্দে থেকে ইলা আবার কবে এল? হাত ধরে গুটগুটিয়ে তার ছেলেও আসছে। ইলার পিছনে ইলার বরকেও দেখা যাচ্ছে যে! এ কি স্বপ্ন দেখছেন ননীবালা? সত্যি তো! ভগবান এটা যেন স্বপ্ন না হয়। এটুকু দয়া করো ভগবান।

রণেনের হাতে বিশাল এক মিষ্টির হাঁড়ি, সোমেনের হাতে মস্ত সন্দেশের বাক্স, রণেন এসে সোজা পায়ের ওপর পড়ে কান্না—মাগো, আমাদের কি আর মনে পড়ে না?

তাকে ধরে তুলবেন কি, তার আগেই রক্তের ছানাপোনারা সব ঘিরে ধরেছে তাঁকে —মা ঠাকুমা ডাকে অস্থির করে তুলল বাতাস। এত সুখ বুঝি সইবে না শরীরে! বুঝি দম ফেটে মরে যাবেন। বুকের ভিতর তুফান ছুটছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে অবিশ্বাস্য আনন্দে। অবিরল বয়ে যাচ্ছে চোখের জল। ফোঁপাচ্ছেন।

ইলা এসে জড়িয়ে ধরে ঘর নিয়ে যায়, টুবাই কোলে চড়ে বসে থাকে। শীলা তার ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে—বাব্বা! কি রাস্তা!

ননীবালা একটাও কথা বলতে পারেন না। অবিশ্বাসে বোবা হয়ে যান। ছেলেরা জামাইরা প্রণাম করে যাচ্ছে, আশীর্বাদটুকু পর্যন্ত মনে করতে পারছেন না। কেবল মাথায় হাত রাখছেন। কাঁদছেন। বিশ্বাস হয় না।

ব্রজঠাকুরের ছেলেপুলে শহর থেকে এসেছে শুনে বিস্তর ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। বহেরুর বউরা সব ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়াল, বড় মেয়ে এল, পড়শীরা এল। বামন মতিলালও ঝলমলে পোশাক পরে এসে কয়েকটা ডিগবাজি দেখিয়ে দিল সবাইকে।

ব্রজগোপাল এসে দাঁড়ালেন একটু দূরে, পর মানুষের মতো। তিনি জানেন একটু দূরে থাকলেই সঠিক নিরীক্ষণ হয়। বড় মাখামাখি করলে, যত কাছে টানলে তত দেখাটা হবে অস্পষ্ট। তাঁর মুখে শান্ত সংযত ভাব। ছেলে মেয়ে জামাই আর নাতি-নাতনীরা প্রণাম করছে তিনি চোখ বুজে দয়াল ঠাকুরকে স্মরণ করছেন। দয়াল ওরা যেন সুখে থাকে। যেন ওরা কারো দুঃখের কারণ না হয়। ওদের সুখ যেন কাউকে দুঃখী না করে। নিজে সুখী হয়ে ওরা যেন সবাইকে সুখী করে।

এই সুখ-দুঃখের ভারের মধ্যেই পৃথিবীর সব সত্য নিহিত আছে। বড় শক্ত ব্যাপার। নিজে সুখী হও সবাইকে সুখী করো—এ কি পারবে তোমরা?

ছোটো জামাই বিদেশ থেকে এসেছে। হাসিমুখে সে বলল—এ খুব খাঁটি জায়গায় আছেন বাবা। গাছ পালা মাটি—এ সবই হচ্ছে মানুষের এসেনশিয়াল জিনিস।

—তোমরা কবে এলে?

—আমি বম্বে ফিরেছি দিন পনের আগে। লণ্ডনের এক কোম্পানী দারুণ অফার করেছে কলকাতায় ওদের অফিসে। তাই চলে এলাম কাগজপত্র দেখাতে। মাস-খানেক পরে এসে জয়েন করব। কলকাতার এত কাছে মাঝে মাঝে উইক এন্ড চলে আসব এখানে। কি সুন্দর জায়গা।

অজিত কোনো কথা বলে না। ব্রজগোপাল তার দিকে চেয়ে বলেন—অজিত, তোমার শাশুড়ির বাড়ি দেখেছো?

—দেখব। বাইরে থেকে দেখেছি। খুব ভাল লাগছে।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন—ভালই। তিনচারখানা ঘর হয়েছে শেষ অবধি। আমার প্রথমে খুব ইচ্ছে ছিল এখানে বাড়ি করার, পরে নানা কারণে আর ইচ্ছে হয়নি। তোমার শাশুড়ি এসে পড়ায় শেষ পর্যন্ত হল। অনেকগুলো ঘর আছে, কলকাতার ওপর কখনো বিরক্তি এলে তোমরা চলে এসো এখানে, যতদিন খুশী থেকে যেও।

—আসবো। জায়গাটা বড় ভাল। অ্যাওয়ে ফ্রম ম্যাডেনিং ক্রাউড।

—চলো, দেখবে। বলে ব্রজগোপাল জামাইদের নিয়ে এগোন। চোখের ইঙ্গিতে সোমেনকে ডাকেন, সেও আসে।

নতুন চুনের সোঁদা গন্ধওলা ঘর। চারদিকের জানালা দরজা খোলা। ফটফটে রোদ আর হাওয়ায় ঝলমল করছে। সামনের ঘরে যজ্ঞ হচ্ছে, পুরুতের মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। গেঁয়ো উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র, তবু শুনতে শুনতে শৈশব ফিরে আসে। ঘুরে ঘুরে ঘরদোর দেখান ব্রজগোপাল। সোমেনের দিকে চেয়ে বলেন—কেমন?

সোমেন তার সুন্দর মুখশ্রীতে চমৎকার হাসির আলোটি ছড়িয়ে দিয়ে বলে—আমাদের কোথাও একটা বাড়ি আছে, এটা ভাবতেই ভাল লাগবে এখন থেকে।

ব্রজগোপাল ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে আস্তে করে বলেন—কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু ওর অর্থ ভাল নয় বাবা, তুমি তো অসহায় নও যে দুনিয়ার কোথাও তোমার আশ্রয় নেই এ বাড়িটা ছাড়া।

—আমাদের নিজের বলতে তো কিছু নেই বাবা।

ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলেন—জানি। তবু বলি, পুরুষ মানুষ হয়েছো, নিজেকে কখনো নিরাশ্রয় ভেবো না। ঠাকুর সকলের জন্যই সব দিয়ে রেখেছেন, খুঁজে পেতে অর্জন করে নিতে হয়। আবার স্বার্থপরও হতে নেই। তোমার ঘর যেন হয় মন্দিরের মতো।

ননীবালার কান্না থেমেছে। শরীরে শক্তির জোয়ার এল বুঝি। নাতিদের, ছেলেপুলেদের নাড়ু-মোয়া দিচ্ছেন, জল গড়িয়ে আনছে নয়নতারা। ননীবালা বলেন—একটু খেয়ে নে সব। ভাতে বসতে দেরী আছে।

বীণা বলে—এবার পুজোর আপনাকে

মাইনে-টাইনে সব কেটে নিত তো কামাইয়ের জন্য। এখন ফিরে এনেছে।

ননীবালা বলেন—কাপড়! সে কথা বোলো না বউমা, কাপড়ের অভাব নেই। এসে অবধি এ পর্যন্ত কতগুলো যে পেয়েছি! এক ছেলে দেয়নি তো কি হয়েছে, কত ছেলে আমাকে দিয়ে যায়।

ঝোলা ব্যাগ থেকে বীণা শাড়ি বের করে দেখায়। বেশ শাড়ি, খুব চওড়া পাড়ে মুগার সুতোর টান রয়েছে। অন্তত ষাট পঁয়ষট্টি তো হবেই। শীলা আর ইলাও শাড়ি এনেছে। ননীবালা বলেন—তোরা কি আমাকে শাড়িতে ঢেকে দিবি নাকি?

ভারী আনন্দ। ঘর ভর্তি আপনজনদের কথার কলরোল, হৃৎপিণ্ডের শব্দ, রক্তের গুঞ্জন। বাতাসটা পবিত্র হয়ে গেল।

শীলার ছেলেটা চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একরাশ জুঁই ফুল পড়ে আছে যেন। ননীবালা বলেন—ও শীলা, আমার এই বরটির নাম কি রেখেছিস শুনি!

শীলা মোয়ায় কামড় দিয়ে বিষম খেয়ে হেসে ফেলল। ননীবালা বললেন—ষাট ষাট।

সামলে নিয়ে শীলা বলে—আবার কি! বাবা নাম লিখে পাঠিয়েছিল, সেই নামই রাখল তোমার জামাই। বলল—শ্বশুরমশাই শাস্ত্রজ্ঞ লোক, জেনেশুনে বুঝেই নাম রেখেছেন নিশ্চয়ই। তাই নাম রাখা হয়েছে ঋতম্ভর।

—বেশ নাম ইলা, তোর ছেলের?

—আর বোলো না, আমার শাশুড়ি নাম রেখেছেন ননীচোর। সেই নামই নাকি থাকবে। বড় হয়ে ছেলে আমাদের মারতে আসবে দেখো। চোর-টোর দিয়ে কেউ নাম রাখে। তার ওপর আবার দিদিমার নামও ননীবালা। কিন্তু কে কাকে বোঝাবে! বরং স্কুলে ভর্তি করার সময়ে চুপ চুপ করে নাম পাল্টে দিয়ে আসবো।

নাম শুনে সবাই হাসে।

ননীচোরকে নিয়ে বেলকুঁড়ি বাইরে কাক বক দেখাচ্ছে। ননীবালা তাকে ডাক দিয়ে বলেন—ননীবালাকে চুরি করবি নাকি ও ভাই? নিয়ে যা চুরি করে। তোর দাদু বুড়ো বয়সে একটু কাঁদুক।

শীলা বলে—মা, বেশ তো থেকে গেলে এখানে! একবার খবরটাও দিয়ে আসোনি। আমি শুনে তো হাঁ। বিশ্বাসই হয়নি প্রথমে যে তুমি সবাইকে ছেড়ে বাবার কাছে চলে আসতে পারো।

ননীবালা চুপ করে রইলেন খানিক। ভেবে বললেন—হুট করে এলাম বটে, কিন্তু কাজটা খারাপ হয়নি মা। এখানে এসে বেশ আছি। মনটা হু-হু করে বটে, তবু বেশ লাগে। তোরা আসবি, থাকবি, বেড়িয়ে

না কোথাকার পোকা যে ঢুকেছিল মাথায়!

শীলা মাথা নেড়ে বলে—লক্ষ্মণবাবু ফিরে গিয়ে সোমেনকে লিখেছেন—না আসাই ভাল। লক্ষ্মণবাবুও ফিরে আসছেন। চাকরি-বাকরি করবে না, নিজেই একটা কোম্পানী খুলবেন বলে ঠিক করেছেন এখানে। সোমেনকে সেখানে চাকরি দেবেন।

—ওমা, তাই নাকি?

শীলা হেসে বলে—গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। তবে লক্ষ্মণবাবু মানুষটা তো খুব খাঁটি। যা বলেন তাই করেন।

ননীবালা বলেন—সে যেমনই হোক, ভুইয়ে বুইয়ে ভুলিয়ে রাখিস ওকে। কোথাও যেতে দিস না। ওর জন্যই আমার চিন্তা। বলতে কি, ওর জন্যই আমার এখানে আসা।

—কেন মা?

—ও বড্ড বকত আমাকে। বুঝতাম, বাবাকে আলাদা রেখে মা ছেলের সংসারে থাকে—এটা ও ভাল চোখে দেখে না। তাই বুঝি আমাকে ইদানীং সহ্য করতে পারত না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সব দিক বজায় রাখতে চলে এসেছি। এখন যদি ও আবার দূরদেশে চলে যায় তবে বড় দুশ্চিন্তা নিয়ে মরব।

*

ঘুরে ঘুরে সব দেখে সোমেন। এর আগে এমনি এক শীতকালে সে এসেছিল এখানে। এর মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু সেই বিশাল মানুষ বহেরু একটু যা বুড়িয়ে গেছে। গন্ধ বিশ্বেসেরও বাঁচার শেষ নেই। এখনো টিকে আছে। মচ্ছবের গন্ধে-গন্ধে এসে বসে আছে গাব গাছের তলায়। দিগম্বরকেও ভিড়ের মধ্যে এক আধবার দেখা গেছে। খোলটা গলায় আছে, যখন নির্জনতা পাবে বাজাতে বসবে। বিন্দুর সঙ্গেও চোখাচোখি হয়েছে কয়েকবার। সেবার যখন এসেছিল তখন বিন্দুর শরীরের অসহ্য উত্তাপ টের পেয়ে গেছে। এবার তাই লজ্জা-মেশানো ভয় করল তাকিয়ে, সে বড় ভীতু। হেমন্ত বা অন্য বন্ধুরা কেউ হলে, এমন কি শ্যামল যদি আসত তাহলেও একটা কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রেস করতই। সে পারে না। ব্রজগোপালের ছেলে তো, তাই কতগুলো ভয়-ভীতি ছেলেবেলা থেকেই বাসা বেঁধে আছে ভিতরে।

চারদিকেই গুরুজন বলে সে উত্তরধারে কাঁটাঝোপের পাশে একটা ঢিবির ওপর এসে নির্জনে সিগারেট ধরিয়ে বসল। এখান থেকে অনেকটা দেখা যায়। বহেরুর বাড়ি ক্ষেত, আর একটু দূরে তাদের নতুন বাড়িটা। যজ্ঞধূমের গন্ধ আসছে, থিক্ থিক্ করছে লোকজন। হাল্লা-চিৎকার শোনা যাচ্ছে। শীতের বাতাস এই দুপুরেও হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে,

পুকুরের জলে বিশাল জলহস্তীর মতো রণেন সাঁতার কাটছে। না, জলহস্তী বলা ঠিক হল না। রণেন আর তেমন মোটাসোটা নেই। অনেক রোগা হয়ে গেছে। প্রায়ই বলে—আমি মা-বাবার কাছে চলে যাবো। এছাড়া আর কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। হ্যাঁ, আর একটা আছে। এখনো রাতের বেলা চুপি চুপি উঠে কলের গান শোনে। নইলে, সবই ঠিক আছে।

সোমেন অনেকক্ষণ বসে থাকে ঢিবিটার ওপর। মনে কত রকমের চিন্তা শরতের মেঘের মতো ছায়া ফেলে যায়। এত চিন্তা সোমেনের ছিল না কখনো। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। এই তো কিছুদিন আগে ম্যাক্স চলে গেল। তাকে দমদমে তুলে দিতে গিয়েছিল সোমেন, যাওয়ার সময়ে ম্যাক্স তার হাত ধরে বলেছিল—নোংরা এবং গরীব ঠিকই, তবু তোমার দেশের বেশী কিছু শিখবার নেই বিদেশ থেকে, একসেপ্ট সাম টেকনিক্যাল নলেজ, এনডিভার, অ্যান্ড এ প্র্যাকটিক্যাল আউটলুক ইন সাম ম্যাটার্স।

কথাটা শুনে খুব অহংকার হয়েছিল সোমেনের। নিজের দেশ সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানে না সোমেন, কিন্তু ম্যাক্স জেনে গেছে। ম্যাক্স সারা ভারতবর্ষ কয়েকবার ঘুরেছে, কাশীতে সংস্কৃত শিখে বেদ-বেদান্ত পড়েছে, ভিখিরি কাঙাল থেকে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের সঙ্গে অবাধে মিশেছে, উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বিপ্লব করতে গিয়ে কিছুদিন জেলও খেটে গেছে। রোগা সাহেবটা অল্প কদিনে যা করে গেছে সোমেন হয়তো সারা জীবনেও করতে পারবে না। উল্টেপাল্টে এদেশকে দেখে গেছে ম্যাক্স। তাই তার কথায় নিজের দেশের ওপর আবার আস্থা ফিরে আসে সোমেনের। লক্ষ্মণকে এইসব কথা বলেছিল সোমেন। লক্ষ্মণ অনেক চিন্তা করে বলেছিল—সেক্স আর টেকনোলজি ছাড়া ওদেশে কিছু নেই, এমন নয় সোমেন। তবে ভাল যা আছে তা সবই একটু থমকে গেছে। কিন্তু যেহেতু ওরা খুব উদ্যোগী মানুষ সেই হেতু যেদিন ভুল ধরা পড়বে সেদিনই ভূতের মতো খেটে ভুল শোধরাতে কাজে লেগে যাবে। আমাদের মতো ম্যাদামারা মানুষ ওরা নয়। বারংবার ম্যাক্সও বলে গেছে—সোমেন, ইওর্স ইজ এ গুড কান্ট্রি। আমি বুড়ো বয়সে বেনারসে এসে সেট্‌ল্ করব দেখো।

বাতাসে সিগারেটটা তাড়াতাড়ি পুড়ে যাচ্ছে। দাদা এখনো সাঁতার কাটছে। বোধ হয় বার দুই তিন পুকুরটা এপার ওপার করল। আর বেশীক্ষণ জলে থাকলে ওর ঠান্ডা লেগে যাবে। সোমেন তাই ঢিবির ওপর থেকে নেমে আসে আস্তে আস্তে। পুকুরধারে গিয়ে ডাকে—দাদা!

রণেন গলা-জলে দাঁড়িয়ে মুখে জল সমেত বলে—আয়, আসবি? তোকে সাঁতার শিখিয়ে দিই।

—আমি জানি দাদা। তুমি উঠে এসো।

—আর একটু থাকি। খুব ঠান্ডা।

—সর্দি লাগবে যে।

রণেন তার দিকে তাকিয়ে বলে—পাগলের কখনো সর্দি লাগে না, বুঝলি, সর্দি লাগলে পাগলামী সেরে যায়।

সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে—তাহলে বউদিকে ডেকে আনি।

রণেন কোমর থেকে গামছা খুলে ছপাং করে জলে লম্বা করে ফেলে বলে—দাঁড়া, উঠছি।

গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল। অনেক লোক জুটে ব্রজগোপালের সামান্য জিনিসপত্র মুহূর্তের মধ্যে বয়ে এনে দিল নতুন বাড়িতে। শীলা আর ইলা সাজাতে লাগল। বীণা রান্নাঘর গুছোয়। বলে—মা, আমাদের একটা জায়গা হল এতদিনে।

ননীবালা গভীর শ্বাস ফেলে বললেন—আর জায়গা! কখনো কি এসে থাকবে বউমা? আমরা বুড়োবুড়ি মাটি কামড়ে পড়ে থাকব মরা ইস্তক। যদি মন হয় তো এসো। আমাদের বুক জুড়িয়ে দিয়ে যেও। মা দুর্গার মতো ছানাপোনা নিয়ে ঝমঝমিয়ে আসবে যাবে, তা কি আমার ভাগ্যে হবে বউমা!

সোমেনকে দেখে নিরালায় ডাকেন ননীবালা, বলেন—কিরে, রোগা হয়ে গেছিস নাকি?

—না, তোমাদের সবসময়েই রোগা দেখা।

—হ্যাঁ রে, একা লাগে না ঘরটার মধ্যে ওখানে, অ্যাঁ? মায়ের কথা মনেও পড়ে না বুঝি?

সোমেন হেসে লজ্জার ভাব করে বলে—পড়বে না কেন?

—খুব সিগারেট খাস, না? ঠোঁট কালো হয়ে গেছে। চোখ বসা কেন? রাগ-রাগ করিস না তো বউদির সঙ্গে?

—না না। তুমি যে কি ভাবো!

ননীবালা কাঙালের মতো বলেন—এখন তো তোর হাতে কোনো কাজ নেই, থাকবি এখানে কদিন?

—এখানে?

—তবে কোথায় বলছি! থেকে যা, একটু শরীরটা সারিয়ে দেবখন। আমাদের দুদুটো গরু রোজ পনেরো ষোলো সের দুধ দিচ্ছে। কত তরিতরকারী, মাছ, ফল। খায় কে! এত ঘী আর ক্ষীর করে রেখেছি। আজ সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি কলকাতার জন্য। তুই কদিন থেকে যা।

সোমেন উদাস গলায় বলে—পাগল হয়েছো! কলকাতায় কত কাজ!

—আহা! কি কাজ তা তো জানি! একশ টাকায় একটা টিউশানী।

সোমেন মৃদু হেসে বলে—না মা, তুমি খোঁজ রাখো না। সেই টিউশানী আছে বটে, আবার এক বন্ধুর সঙ্গে ঠিকাদারীর কাজে নেমেছি।

—তাই নাকি?

—অবশ্য আমার তো টাকা নেই, তাই খুব কিছু হয় না। টাকা থাকলে হত।

—তোর বাবার কাছ থেকে নিস।

—বাবা! সোমেন অবাক হয়ে বলে—বাবা কোত্থেকে দেবে?

জবাব দিতে গিয়ে ননীবালার গলাটা অহংকারী হয়ে যায়, তবু আস্তে করে বলে—তাঁকে ভিখিরি ভাবিস না। আমার এখানে লক্ষ্মীর বাস। চেয়ে দেখিস, দেবে।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে—এখন থাক। পরে দরকার মতো দেখা যাবে।

খাওয়া-দাওয়া সারতেই শীতের বেলা ফুরিয়ে গেল। দূর মাঠপ্রান্তরে সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছায়া। পাখি উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে। দিনশেষ। সারাদিন লোকজন ছিল, তারা সব বিদায় নিয়েছে। কুকুরেরা এখনো ঝগড়া করছে এঁটো পাতা নিয়ে, কাক ওড়াউড়ি করছে। হু-হু করে শীতের বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সব কিছু।

মেয়েরা তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। সাজও শেষ। ছেলেরা জামাইরা পোশাক পরে বসে আছে নতুন বাড়ির বারান্দায়। ননীবালা কাঁদছেন শীলার ছেলেকে বুকে চেপে, অন্য হাতে ধরা আছে টুবাই। আঁচল ধরে টান দিচ্ছে ননীচোর। সারাদিনে তার দিদিমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বেলকুঁড়ি আর বুবাই কাঁদছে, রণেন ভ্যাবলার মতো বাপের পাশে বসে আছে বারান্দায়। দুই জামাই নীচু স্বরে কথা বলছে পরস্পর। সোমেন বাড়ির বাগানে কুয়োর ধারে আড়ালে সিগারেট খায়।

কে যেন রাস্তায় হাঁক পাড়ছে—কলকাতার লোকেরা ফিরবে, চারটে রিকশা নিয়ে আয় গোবিন্দপুর থেকে। ছটার গাড়ি ধরবে সব।

সোমেন ঘড়ি দেখে বিরক্ত হয়। খুব বেশী সময় নেই। মেয়েছেলে যেখানে, সেখানেই দেরী।

রিকশা এসে গেল। হর্ন মারছে। ছেলেরা এগিয়ে গেল। মেয়েরা ননীবালাকে ঘিরে কাঁদছে এখনো।

—আবার কবে আসবি সব? ননীবালা জিজ্ঞেস করেন।

—আসব গো, এখন তো আমাদেরই বাড়ি এটা।

—ওসব দুঃখের কথা। ননীবালা বলেন—শোন, তোদের বাড়ির সব উৎসব অনুষ্ঠান যখন করবি, তখন এ বাড়িতে এসে করিস। আমি খরচ দেবো। কলকাতার মানুষদের না হয় সেখানে পার্টি দিবি।

এ সবই স্তোক। জানেন ননীবালা, ওরকম হয় না। হবে না। চোখের জলের ভিতর দিয়ে ভাঙাচোরা দেখায় চারধার। সেই অস্পষ্ট দৃষ্টির ভিতর দিয়েই ওরা চলে গেল। রিকশা যোজন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পৃথিবীটা কি বিশাল।

একা একা ঘরের দিকে ফিরছিলেন দুজন। ব্রজগোপাল বললেন—আজ আর কোথাও বেরোবো না।

ঘরে এসে অন্ধকারেই বসলেন ননীবালা। বুকটা খামচে ধরে আছে চাপা একটা দুঃখ, একটা ব্যথা। একটু বাদেই নয়নতারা এসে লণ্ঠন জ্বালে। বিন্দু এসে ননীবালার চুল আঁচড়ে দিতে থাকে। বহেরু এসে বাইরের ঘরে তক্তপোশের তলায় মেঝেতে ব্রজগোপালের পায়ের কাছে বসে থাকে। তত্ত্বকথা শোনে। ষষ্ঠীচরণ তার বইপত্র নিয়ে এসে গুটি গুটি খোলা দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে। মতিলাল আনাচ-কানাচ দিয়ে ঘুরঘুর করে আর কুকুর বেড়াল তাড়ায়। দিগম্বর খোল নিয়ে এসে বসে বাইরের ঘরের কোণে। ষষ্ঠীর মা আসে খোঁজ নিতে, বহেরুর বউ আসে। ঘর ভরে যায়। মানুষজন বড় ভালবাসেন ব্রজঠাকুর। মানুষজনও তাই তাঁকে ভালবাসে। ননীবালার খারাপ লাগে না। ওরা এসে চলে গেল বলে যে দুঃখটা ছিল তা ডুবে গেল মুহূর্তের মধ্যে। একটু বাদেই তিনি হেসে কথা বলতে থাকেন। এখানে তিনি কর্ত্রী, ব্রজবাবুর বামনী ঠাকরুণ, তাঁর দাম অনেক।

*

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অনেকক্ষণ বাদে বীণা বলল—মা বাবা এখানে বেশ আছেন।

শীলা মাথা নাড়ল। ইলা বলল—বেশ কিন্তু।

সোমেন কলকাতার দিকে বহমান গাড়ির ভিতরে বসে ভাবছিল, তাকে কে যেন ক্রমান্বয়ে পিছনে টানছে। সেই টানটুকু বড় ভাল লাগল সোমেনের। পৃথিবী যেখানে যখনই সে থাকুক, মনে হবে, তার একটা নিজস্ব জায়গা আছে পৃথিবীতে।

সমাপ্ত

ভারতের সুরলোকে

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(২) দিল্লীর শেষ দরবারী

মুরাদ খাঁ নাকি এখনো বেঁচে আছেন! আর থাকেন এই দিল্লী শহরেই।

বাহাদুর শা জাফরের দরবারী ধ্রুপদী মুরাদ খাঁ।

কতদিন থেকে মুরাদ খাঁর নাম জানা, তাঁর কথা শোনা। এককালের কত বড় ধ্রুপদী। এখনো তিনি দিল্লিতে রয়েছেন। আর এতদূর থেকে এসে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না? সুযোগ হবে না তাঁর গান শোনার? এ যে আফসোসের কথা।

কিন্তু কোথায় তাঁর ঠিকানা? আগন্তুক যাকে জিজ্ঞেস করেন, কেউ বলতে পারে না।

পুরনো আমলের দিল্লী। কিন্তু তাঁর কাছে নতুন। এই প্রথম এ শহরে এসেছেন। কোন জানাশোনা লোক নেই। পথঘাটও অচেনা। মুরাদ খাঁর ঠিকানাও নিজে জানেন না।

একেকবার হতাশ বোধ করেন আগন্তুক। আবার আশায় আশায় খুঁজতে থাকেন।

পুরনো দিল্লির একটা এলাকা। চৌকের কাছাকাছি। নোংরা সরু সরু রাস্তা। ছোটখাটো দোকানপসার। সেকেলে ছাঁদের নিচু নিচু বাড়ি ঘর। তারই মধ্যে কাউকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করছেন,

'মেহেরবানী করে মুরাদ খাঁর ঠিকানাটা......'

'কৌন মুরাদ খাঁ?'

'বাদশা বাহাদুর শার দরবারে ধ্রুপদ গাইতেন।'

'মালুম নেহি।'

ওই এক জবাব। কেউ জানে না। কি আশ্চর্য। এত বড় কালোয়াতের নাম শোনেনি এরা?

দরবারী মুরাদ খাঁ দূরের কথা। বাহাদুর শার নামই বা কজন মনে রেখেছে? সেই কবে, ৩০ বছরেরও আগে দিল্লি ছেড়ে গেছেন বাহাদুর শাহ্ জাফর। মহাবিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ার পর্ব তখন। বৃদ্ধ, অক্ষম নামে মাত্র বাদশাকেও ইংরেজরা বন্দী করে নিয়ে গেছে রেঙ্গুনে। সেখানেই ৪।৫ বছর পরে তিনি মাটি নিয়েছেন। সেও কত বছর হয়ে গেল। কম বয়সীরা এসব খবর রাখে কে? কিছু বুড়ো মানুষ রইস্ লোক হয়ত বাহাদুর শাহ বা তাঁর দরবারের কথা জানে। শেষ মোগল বাদশা। তবে নামে মাত্র। স্বাধীনতা রাজ্য রাজস্ব কিছুই ছিল না। শুধু দিল্লী কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে বৃটিশের বৃত্তিধারী জীবন। কিন্তু অন্তরের গুণে তাঁর দুর্দান্ত পূর্ব-পুরুষদের চেয়ে হয়ত বড় ছিলেন বাহাদুর শাহ। কবি, গীত রচয়িতা তিনি। 'জাফর' লেখনী নামে উৎকৃষ্ট কিছু কবিতা লেখেন। রচনা করেন কয়েকটি গান। আধ্যাত্মিক গভীরতার জন্যে যার কোন কোনটি বেঁচে থাকে। যেমন—তুমসে হামনে দিল্‌কো লাগায়া যো কুছ্ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়। এক তুঝ্‌কো আপনা পায়া যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।'......সুফী ভাব-ধারার মানুষ ছিলেন বাহাদুর শাহ্ জাফর। আর ছিল তাঁর—সেই দুরবস্থার মধ্যেও যতটুকু সম্ভব—সঙ্গীত দরবার। নামমাত্র হলেও বাদশা ত। তাই একটা শাহী কেতা ছিল। সেই লাল কেল্লার পুরনো দরবারে আসর বসত বাদশার জন্যে।

তিনি যেমন কবি, তেমনি কাব্যপ্রিয়। কবি-সঙ্গ পসন্দ করেন। তাঁর কাছে আসেন খালিব নামে সুপরিচিত মীর্জা আসাদ উল্লা খাঁ শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি ও গজল রচয়িতা। তাঁর নতুন রচনা গজল শোর রসিক বোদ্ধা বাদশাকে শোনান। কোনদিন জমে ওঠে গান বাজনার মহ্‌ফিল। তলব যেমন হোক কজন গুণী তো ছিলেন দরবারে। বিশেষ দুজন—মুরাদ খাঁ ও নাথ খাঁ। তাঁরা দরদী বাহাদুর শাহকে গান শোনাতে আসতেন। তাঁদের পেয়ার করতেন বাদশা। দুজনেই ধ্রুপদী। তবে নাথ খাঁ সেই সঙ্গে খেয়াল টপ্পা ইত্যাদিও গাইতেন। একবার কলকাতায় এসেছিলেন নাথ খাঁ। বউবাজারের সুপরিচিত সঙ্গীতাসর সরকার বাড়িতে গান শুনিয়েছিলেন। তার বিবরণ দিয়েছেন (মনীষী শিক্ষাবিদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র) মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ঃ—'...একদিন কলিকাতায় বহুবাজারে সরকারদের বাড়িতে খাঁ সাহেবের গান হইতেছিল, 'রামলাল দত্ত মহাশয় ('সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, কোন্নগরের নিকটবর্তী ভদ্রকালী নিবাসী 'দীন রাম' ভণিতা সংযুক্ত ভক্তি পরিসিক্ত গানসমূহ ইঁহার বিরচিত') তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি গান শুনিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গীত সমাপ্তির পর রামবাবু বলিলেন, 'খাঁ সাহেব, আপনি নায়ক।' খাঁ সাহেব বলিলেন, 'বাবুজী, আমি নায়কও নহি, গায়কও নহি। আমি কেবল ভজন করি।' ...নাথ খাঁ বলিলেন, 'বাবুজী, আমি দিল্লির ভূতপূর্ব সম্রাট বাহাদুর শার সভায় গায়ক ছিলাম। দিল্লির রাজসভায় স্থান পাইতে হইলে দরবারীর তিনটি ভাষা জানা অত্যাবশ্যক ছিল—ফার্সী, সংস্কৃত ও উর্দু।' ...বাহাদুর শার নাম করিয়াই খাঁ সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন। দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট...ঘটনাচক্রে ইঁহাকে মিউটিনির সম্রাট হইয়া পড়িতে হইলে, ইনি সর্বপ্রথম ঘোষণা-পত্রে ভারতবর্ষে গোহত্যা ও শূকর মাংস বিক্রয় নিষেধ করেন।' (মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—আমার দেখা লোক, পৃষ্ঠা ১৭০)।

নাথ খাঁর মতন বাহাদুর শাহের দরবারী মুরাদ খাঁ। তিনি দিল্লিতেই রয়ে যান সেই থেকে। আর বাহাদুর শাহের ১৮৬২ সালে রেঙ্গুনে জীবন সমাপ্তি ঘটে। তারপরও কেটে গেছে ২৭ বছর।

এখন ১৮৮৯ সালের কথা। কিন্তু মুরাদ খাঁ এখনো জীবিত আছেন। আর রয়েছেন দিল্লিতেই। দিল্লির এই নতুন অতিথি এ কথা শুনেছেন। কিন্তু মুরাদ খাঁর সন্ধান পাচ্ছেন না অচেনা শহরে। কেউ জানে না তাঁর নাম বা আস্তানা। সেকালের বিখ্যাত গায়ক আপন অঞ্চলেই আজ বিস্মৃত।

'আপনি কি জানেন মুরাদ খাঁর ঠিকানা? আগেকার আমলের দরবারী গায়ক মুরাদ খাঁ?'

খোঁজ করতে করতে আগন্তুক চৌকে এসে পড়লেন। ওই প্রশ্নই করলেন এক বৃদ্ধ মুসলমানকে দেখে। এবার আশাপূর্ণ উত্তর পেলেন, 'জী, হাঁ। মুরাদ খাঁর পাত্তা আমার জানা আছে।'

'আমি তাঁর কাছে যেতে চাই।'

বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'তা হলে আসুন আমার সঙ্গে।' তারপর চলতে আরম্ভ করলেন একদিকে। তিনিও সেই অপরিচিত পথে অচেনা লোকটির সঙ্গী হলেন।

দিল্লিতে তিনি নবাগত। আর বাইরে কোথাও তিনি জানাতেন না আত্মপরিচয়। কিন্তু বাংলায় তিনি বংশগৌরবে সুপ্রসিদ্ধ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়।

তখনো তিনি অবশ্য আপন পরিচয়ে বিখ্যাত হননি। কারণ সে সময় তিনি ২১ বছরের তরুণ। মাত্র সেই বছরেই নাটোর জমিদারীর ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন। সালটি

১৮৮৯)। কলেজের পাঠ সমাপ্ত করেছেন আগের বছর। আর সেই প্রথম বাংলার বাইরে, পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেছেন। উদ্দেশ্য —তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শন এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয়। বৈদ্যনাথধাম গয়া বারাণসী প্রয়াগ আগ্রা ভ্রমণের পর এসেছেন দিল্লিতে। এখান থেকে লাহোর যাবেন।

দিল্লির দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি দেখেছেন জগদিন্দ্রনাথ। মুরাদ খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ শুধু বাকি ছিল। এখন সেই আশায় মুসলমান বৃদ্ধটির সঙ্গে চলেছেন পুরোনো দিল্লির অপরিচ্ছন্ন পথে।

তাঁর মনে কোন বিকার নেই। যে সব সদ্গুণে তিনি সুপরিচিত হন পরবর্তীকালে, সেই তরুণ বয়সেও তাঁর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। অহমিকাশূন্য মানস, ধনী দরিদ্রে অভেদ আচরণ। উদার দরদী ব্যথার ব্যথী। গুণীজনের আদর ও কদরে অকুণ্ঠ অকৃপণ। সুকুমার শিল্পে আগ্রহী। বিশেষ আকর্ষণ সংগীতে। ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যেও ললিতকলার স্বপ্নলোকচারী। শান্ত মধুর ব্যক্তিত্ব। স্নিগ্ধ সহজাত আভিজাত্য।

অথচ, বিস্ময়ের বিষয়, জন্মসূত্রে অভিজাত নন জগদিন্দ্র। তাঁর আভিজাত্য আপন স্বভাবগুণে অর্জিত। কারণ তিনি অতি সাধারণ, অখ্যাত পরিবারের সন্তান। তাঁর জনক শ্রীনাথ রায় নাটোর স্টেটের এক কর্মচারী। রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন। নাটোরের রানী ব্রজসুন্দরী পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন জগদিন্দ্রকে। স্বনামধন্যা রানী ভবানীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ, তাঁর পুত্র বিশ্বনাথ, তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র, তাঁর পোষ্যপুত্র গোবিন্দনাথ। শেষোক্তজন অপুত্রক গত হলে তাঁর বিধবা রানী এক বছর দু মাসের শিশু জগদিন্দ্রকে পোষ্য নেন। তখন থেকেই সে শিশু নাটোর রাজভবন নিবাসী। পরিণত বয়সে পালিকা রাজমাতার প্রতি জগদিন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন আত্মজীবনীতে, তিনি 'দরিদ্রের সন্তানকে রাজাধিরাজ করিয়াছেন' বলে। 'অতি শৈশব হইতে...দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত যাঁহাকে গর্ভধারিণী জননী বলিয়াই আমার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল।' (শ্রুতি ও স্মৃতি। মানসী ও মর্মবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩, পৃষ্ঠা ৪৭৪—৪৭৫)।

পরবর্তীকালে নাটোর মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ যখন বাংলার সম্ভ্রান্ত ও বিদগ্ধ সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয়, সে সময়েই সুপরিচিত সাহিত্য পত্রিকা 'মানসী ও মর্মবাণী'তে ধারাবাহিক এই স্মৃতি কথা প্রকাশ করেছেন। কি নিঃসংকোচ সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা! প্রচার না করলেও পারতেন : 'যে পুণ্যশ্লোকা প্রাতঃস্মরণীয়া রানী ভবানীর নাম...উচ্চারণ করিয়া আজও অর্ধবঙ্গের নরনারীগণের অন্নসংস্থানে বাধা হইতেছে না, নিতান্ত দীন দরিদ্রের ঘরে দীনার অংকে জন্মিয়াও যাঁহার পুণ্যগৃহের এক কোণে স্থান পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে' (ঐ, চৈত্র, ১৩২৪; পৃষ্ঠা ২০৭)। অমুদ্রিত থাকলে বহু লোকের কাছেই তাঁর পূর্ব বৃত্তান্ত অজ্ঞাত থেকে যেত। কিন্তু এখানেই তাঁর বিনীত মহত্ত্ব। অভাবিত বৈভবের অধিকারী হয়েও তাঁর ছিল দার্শনিক নির্লিপ্ততা। বৈষয়িক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে তিনি। পরিণতকালে বিদ্বৎ সংগ ও সংগীতের অনুষ্ঠানে সবচেয়ে স্ফূর্তিলাভ করতেন। কাব্যসাহিত্য-প্রেম থেকে রীতিমত চর্চা আরম্ভ করেন সাহিত্যের। 'সন্ধ্যাতারা' কাব্যগ্রন্থ, 'নূরজাহান' ঐতিহাসিক কাহিনী, বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ, (১৮২৬, জানুয়ারিতে আকস্মিক মৃত্যুর ফলে অসম্পূর্ণ) সুদীর্ঘ স্মৃতিচারণ 'শ্রুতি ও স্মৃতি' ইত্যাদি তার সাক্ষ্য। মাসিক 'মানসী', সাপ্তাহিক 'মর্মবাণী' এবং শেষে 'মানসী ও মর্মবাণী' মাসিকপত্র (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে) সম্পাদনাও তাঁর সাহিত্যচর্চার অংগ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যও প্রধানত সাহিত্যের সরণিতে।

কিন্তু সে সব অনেক পরের প্রসংগ। সাহিত্যচর্চা তাঁর অকালগত জীবনের শেষ ১৫।১৬ বছরের কথা। এ কাহিনী তাঁর প্রথম যৌবনকালের। সাহিত্যচর্চা তখনো প্রকাশ পায়নি। তবে সংগীতের চর্চা কিছু আরম্ভ করেছেন পাখোয়াজে। নাটোর রাজবাড়িতে সাংগীতিক আবহ তাঁর আগেও ছিল। রানী ব্রজসুন্দরীর স্বামী গোবিন্দনাথ ছিলেন (সুরবাহারী?) মহম্মদ খাঁর শিষ্য।

জগদিন্দ্রনাথ সেই তরুণ বয়সেই সংগীতপ্রেমী। সংগীতশিল্পীদের দরদী। তাঁদের অনুষ্ঠানের আস্বাদ তিনি অতিশয় আনন্দের অভিজ্ঞতা মনে করেন। গুণীজনের প্রতি তাঁর সহৃদয় সৌজন্য।

তাই এই দূরে দিল্লিতে এসেও মুরাদ খাঁর সন্ধানে চলেছেন। পরিস্থিতি আরামের নয়, বরং কষ্টকর তাঁর পক্ষে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশও অপ্রীতিকর বোধ হতে পারত। কিন্তু জগদিন্দ্রনাথ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। ভস্ম আচ্ছাদনের মধ্যেও রত্নের সন্ধানী। তাই এক শিল্পী-সন্নিধানে চলেছেন দ্বিপ্রহরের দিল্লির পথে পথে।

আরো কিছুক্ষণ পরে, বৃদ্ধটি তাঁকে নানা রাস্তা পার করে নিয়ে এল। দাঁড়াল একটি সংকীর্ণ গলিতে।

তারপর একটি নিচু বাড়ির দোতলার দিকে আঙুল তুলে জানালে—ওই ঘরে থাকেন মুরাদ খাঁ।

বৃদ্ধ বিদায় নিলে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়িটির নীচে এলেন জগদিন্দ্রনাথ। দেখলেন, বাইরে থেকেই দোতলায় ওঠবার কাঠের সরু সিঁড়ি আছে।

সেই ঘোরানো, নোংরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলেন তিনি। সামনেই ঘরখানি। কিন্তু দিনের বেলাও সেখানে আলো বড় কম। তিনি ঘরের মধ্যে এসেও প্রথমে তেমন ঠাওর করতে পারলেন না।

একটু পরে নজর পড়ল ঘরের একটি দেওয়ালে। এক অতি বৃদ্ধ সেখানে ঠেস দিয়ে বসে। যে এতক্ষণ তাঁকে পথ দেখিয়ে এনেছিল, তার চেয়েও এ ব্যক্তির বার্ধক্য অনেক বেশি। একেবারে জরাজীর্ণ, স্থবির যেন। শুষ্ক চর্মসার শীর্ণ শরীর। কত বয়স তা ধারণা করা কঠিন। ৯০ হতে পারে। আরো ক' বছর বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়।

বৃদ্ধের মুদ্রিত চক্ষু দুটি। সামনে এসে জগদিন্দ্র সম্ভাষণ করলেন। ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়া নেই।

নিদ্রাচ্ছন্ন নাকি?

গায়ে হাত দিয়ে ঠেললেন অল্প অল্প। তখন সেই ঝুলন্ত ভ্রূর ফাঁক দিয়ে কোটর-গত চক্ষু খুলতে দেখা গেল।

জগদিন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিই কি মুরাদ খাঁ?'

অস্ফুট জবাব ভেসে এল, 'হাঁ। আমারই নাম মুরাদ খাঁ।' তারপর ধীর স্বরে প্রশ্ন, 'কিন্তু আপনার কি দরকার? কোথা থেকে এসেছেন?'

এখানেও আত্মপরিচয় দিলেন না নাটোর। শুধু খাতির করে বললেন, 'আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি, খাঁ সাব। আপনার গান শুনতে আমার বড়ই ইচ্ছে।'

মুরাদ খাঁ প্রথমেই উত্তর দিতে পারলেন না। আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর। চক্ষুকোটর ছাপিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তারপর একটু আত্মস্থ হয়ে বলতে লাগলেন, 'বাবুজী, কেয়া তাজ্জব! আপনি সেই বাংলা মুলুক থেকে আমার গানা শুনতে এসেছেন? কিন্তু এই দিল্লিতে কোন মানুষ আমার কাছে আসে না। কেউ [illegible] খোঁজ খবর নেয় না, বাবুজী। গান কেউ শুনতে চায় না। আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। সহায়সম্বল কিছু নেই। আমিও দুনিয়ার কোন খবর রাখি না। এই ঘরের কোণে পড়ে আছি। বাবুজী, গান আমি আর গাই না। বাদশা বাহাদুর শাহ মারা যাবার পর থেকে গানের দিন আমার চলে গেছে। ওই দেখো, ও-কোণে তানপুরাটা পড়ে আছে। কিন্তু একটাও তার নেই। বাহাদুর শাহ বেঁচে থাকলে কি আমার এ হাল হত!' মুরাদ খাঁ একটু থামলেন।

জগদিন্দ্রনাথ দেখলেন তানপুরাটা। বহুকালের হাত-না-পড়া অবস্থা। জোয়ারিটা আছে বটে, তবে কোন তারই নেই।

তিনি হতাশ বোধ করলেন। বৃথা হল [illegible] কষ্ট করে আসা। বৃদ্ধের এই অশক্ত শরীরে, এই পরিস্থিতিতে কি করে গানের অনুরোধ আর করবেন?

কিন্তু, না। ভাগ্য তাঁর সুপ্রসন্ন।

মুরাদ খাঁ একটু যেন বিশ্রাম করে, বলে উঠলেন, 'লেকিন বাবুজী, আজ আমি গাইব। আপনি বাংলা মুলুক থেকে আমার কথা মনে করে এসেছেন। আমার গান আপনি শুনতে চান। আপনাকে আমি ফেরাতে পারব না, বাবুজী। তবে আপনাকে তানপুরার তার কিনে আনতে হবে।'

আশা পূরণের আশ্বাসে প্রফুল্ল জগদিন্দ্রনাথ। তখনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমি তার কিনতে যাচ্ছি, খাঁ সাব।'

'আর একটা কথা বাবুজী', একটু ইতস্তত করে বললেন—বলতে গিয়ে আবার কাঁদলেন মুরাদ খাঁ, 'আজ তিন দিন আমি অনাহারে আছি। পেটে একটা দানা পড়ে নি। খাওয়ানো দূরের কথা, বেঁচে আছি কিনা তালাস করতে আসেনি কেউ...'

নাটোর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন রাস্তায়।

একটু পরেই পুরী মিঠাই নিয়ে ফিরলেন। আর স্টীল ও পেতলের তার।

মুরাদ খাঁ তৃপ্তি করে নাস্তা করলেন। তারপর তানপুরায় নতুন তার চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সংগত কে করবে? সংগে কাকেও এনেছ?'

'না। আমি একাই এসেছি।' জগদিন্দ্র সবিনয়ে জানালেন, 'তবে যদি অনুমতি দেন, সুরের সংগে ধা মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করব।'

ঘরের পাখোয়াজটার অবস্থাও প্রায় তানপুরার মতন। নাটোর সেটিকে সাফ-সুতরো করলেন কাজচলা গোছের।

বৃদ্ধের সেই বিশীর্ণ মুখেও আনন্দের উদ্ভাসন হল। ঈষৎ হাসির রেখা ফুটল যেন। তিনি গুন গুন করে একটু সুর ভাঁজলেন। তারপর তানপুরায় সুর মেলালেন বেশ মনের মতন করে। তানপুরা বেঁধে, দুই নিপুণ আঙুলে খানিকক্ষণ সুর ছাড়তে লাগলেন। সুর মধ্যম সুর পঞ্চম। সুর মধ্যম সুর পঞ্চম। সা পা সা মা। সা পা সা মা। সুরের ভ্রমর-গুঞ্জন আরম্ভ হল ঘরের মধ্যে। বেশ আওয়াজী যন্ত্রটি।

এইবার বুঝি মুরাদ খাঁ গান ধরবেন—ভাবলেন জগদিন্দ্রনাথ।

কিন্তু খাঁ সাহেব যেন সুরটি পরখ করে তানপুরা নামিয়ে রাখলেন। একটা বাক্স ছিল ওদিকে। তার মধ্যে থেকে বার করলেন—প্যাঁচদার পাগড়ির আলগা খোলা জট। কতকাল তাতে হাত পড়েনি, পাগড়ির আকারে মাথায় চড়েনি সেটি! মলিন বিবর্ণ হয়ে গেছে। কি যে তার আসল রঙ ছিল, বোঝা যায় না এখন।

সেই ন্যাকড়াগুলো তুলে নিয়ে মুরাদ খাঁ পাগড়ি বাধতে বসলেন।

শবে ফতে হয়ে গেছে বাহাদুর শার দরবার। কিন্তু তাতে কি? তাঁর দরবারী ওস্তাদ না মুরাদ খাঁ? দরবারী কেতা সহবৎ তিনি ভুলবেন নাকি? সে সব যে গানের স্বরের মতন তাঁর সত্তার সংগে মিশে আছে।

ছোট ঘরটির সর্বাংগে প্রকট দৈন্যদশা। শ্রোতা মাত্র একজন। তা হোক। বাহাদুর শার দরবারী ধ্রুপদীকে পাগড়ি বাঁধতে হবে রেওয়াজ মাফিক! কত দূরের সেই বাংলা মুলুক থেকে তাঁর গান শুনতে এসেছেন রইস লোক! খানদানের সমঝদার। বিনা পাগড়িতে কি আসর করা যায় মেহমানের সামনে?

পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সেই পাগড়ি বাঁধতে লাগলেন মুরাদ খাঁ। ঝুলেপড়া ভ্রূ জোড়ার চোখ প্রায় ঢেকে ফেলেছিল। ভ্রূর সংগে যেন ঝুলে পড়েছিল চোখ দুটোও। পাগড়ি বাঁধার সংগে সেই ঝুলন্ত ভ্রূ চোখ তিনি টেনে তুললেন। প্যাঁচদার পাগড়ি যখন মাথায় ঠিক বসে গেল, চোখ ভ্রূ-ও উঠল স্বস্থানে। মুখাবয়বের লোলচর্ম একটু টান টান দেখাল।

এবার তানপুরাটি কোলে উঠিয়ে নিলেন মুরাদ খাঁ।

নাটোরকে পাখোয়াজ নিতে দেখে কোমল স্বরে বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, পারবে কি? তা বেশ, এস। দুজনে মিলে একটু গানালাপ করি।'

গান আরম্ভ করবার আগে তাঁর আঁখি-পট আর একবার চিক্ চিক্ করে উঠল। কিন্তু এবার আনন্দের সজলতা।

'কতদিন, কতদিন পরে আজ গাইতে বসেছি।'

গান একেবারেই ধরলেন না মুরাদ খাঁ। দরবারী কানাড়ায় রীতিমত আলাপ আরম্ভ করলেন। আর তাঁর স্বর একটু শুনেই জগদিন্দ্র বুঝলেন—হ্যাঁ, কানাড়া গাইবারই উপযুক্ত কণ্ঠ। ধীর গম্ভীর দরাজ। মনোহারী মীড়ের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ। আলাপ-চারীর অগ্রগতির সংগে দীন কুঠুরির পরিবেশ পরিবর্তিত হতে লাগল। তার মলিন পায়জামা পিরান পাগড়ি আবৃত করে সুরে ভরপুর হয়ে উঠল চার দেওয়ালের মধ্যে।

সেই লোলচর্ম, স্খলিতপ্রায় চক্ষু জীর্ণ-দেহীর এই সংগীত কণ্ঠ। প্রত্যক্ষ না করলে সে শ্রোতা বিশ্বাস করতে পারতেন না।

সেদিনের গানের বর্ণনায় জগদিন্দ্রনাথ পরে বলতেন, 'মুরাদ খাঁর গলা অত বয়সে খরজেও যেমন মোটা ভরাট ছিল, চড়ার দিকেও আওয়াজ ছিল যুবক দুর্মি খাঁর মতন।'

আলাপের পর চৌতালে দরবারী কানাড়ায় গানও তিনি শোনালেন। গাইলেন মোট প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর শ্রান্ত হয়ে গান বন্ধ করলেন।

দরদী শ্রোতা আশার অতীত লাভ করেছেন স্থবির শিল্পীর কাছে। চমৎকৃত পরিতৃপ্ত তিনি।

সেলাম করে বললেন, 'ওস্তাদজী, যে সুধা কানে ঢাললেন জীবনে তা ভুলব না। কাল আমি লাহোর যাচ্ছি। সেখান থেকে ফিরে আসতে এক সপ্তা হবে। তখন আবার আপনার কাছে আসব। গানের জন্যে বিরক্ত করব আপনাকে।'

বলতে বলতে একখানি একশ টাকার নোট কলাবতের হাতে গুঁজে দিলেন।

কৃতজ্ঞতার কোন ভাষা ফুটল না মুরাদ খাঁর মুখে। নীরবে তিনি অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।

বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন জগদিন্দ্র-নাথ।

মুরাদ খাঁ তখন অন্তরের স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করলেন, 'খোদা তোমার মঙ্গল করুন, বাবুজী।'

সে-যাত্রায় লাহোর দেখতে গেলেন জগদিন্দ্রনাথ। সেখান থেকে আবার দিল্লিতে এলেন। কিন্তু ফিরতে দেরি হয়ে গেল একদিন। দিল্লী পৌঁছেই মুরাদ খাঁর কথা তাঁর মনে হল।

ওস্তাদের উদ্দেশে বেরিয়ে প্রথমে চৌকে এলেন। তারপর সেইসব রাস্তা ধরে এসে গলির মধ্যে সেই নীচু দোতলা বাড়ি।

তার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরটির সামনে দাঁড়ালেন।

দরজা ভেজানো ছিল।

বাইরে থেকে ডাকলেন একবার। সাড়া মিলল না। ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে এসে বললেন, 'খাঁ সাব, আমি এসেছি।'

কোন সাড়া শব্দ নেই। প্রথম নজরে কাউকে দেখতে পেলেন না আবছায়ায়। তবু আরো একবার ডাকলেন, 'খাঁ সাব।'

জনহীন কামরায় শুধু একটা প্রতি-ধ্বনি গুমরে উঠল। কেউ নেই দেখে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন নীচে। পাশের বাড়িতে একজনকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও ঘরের মুরাদ খাঁ কোথায়?'

লোকটি তাঁর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে সংবাদ দিলে, 'তিনি মারা গেছেন কাল। গোরও হয়ে গেছে।'

স্তব্ধ হয়ে শুনলেন জগদিন্দ্রনাথ। আর কিছু জানতে চাইলেন না। ক বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল তাঁর চোখ দিয়ে।

বাহাদুর শার দরবারী কলাবতের উদ্দেশে নাটোরের স্মৃতি তর্পণ।......

সেদিনই তিনি দিল্লী ত্যাগ করলেন।

॥ একশো বোল ॥

ত্রিদিবেশ অবাক চোখে যুবকের দিকে তাকায়। ধারণা করে, সে মুসলমান। কিন্তু তার পিছনের বাকী তিনজনের পরনে পায়জামা আর গেঞ্জি। সবাইকেই যেন ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত দেখায়। যুবক ত্রিদিবেশের দিকে দেখে, পাশের ঘরের দিকে একবার তাকায়, তারপরে আবার ত্রিদিবেশের দিকে।

ত্রিদিবেশ অস্বস্তি বোধ করে। যুবকটি বলিষ্ঠ চেহারা সুন্দর, উন্নতনাসা, তীক্ষ্ন ঠোঁট, ঈগলের মতো দুটো চোখ। অবিন্যস্ত চুলের গোছা ভুরুর ওপর, ঝকঝকে চোখে অবিন্যস্ত চুলের ছায়াপাতে তাকে যেন বায়স্কোপের রুপোলি পর্দার নায়কের মতো দেখায়। অন্তত ত্রিদিবেশের সেইরকম মনে হয়, এবং ওর মনে হওয়াকে আরো বাস্তব করে তোলে যুবকের কাঁধ ঝাঁকুনি আচরণে, আর জিজ্ঞাসায়, 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?'

ত্রিদিবেশ জবাব দেবার আগেই বাইরের বারান্দায় মধুদির স্বর শোনা যায়, 'এই যে ওস্তাদ খলিফার দল, এই শেষ রাত্রে আসবার সময় হলো।' বলতে বলতেই তিনি ঘরের মধ্যে এসে ঢোকেন। যুবকটির দিকে তাকিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে কৌতুক করে হেসে বলেন, 'আপনি কি এই পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নাকি?'

যুবকটি কিন্তু হাসে না, ঘাড় বাঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করে মধুদির দিকে তাকায়। বলে, 'হাসছেন কমরেড মধুদি? কিন্তু এই পোশাকটাই আমার রক্ষাকবচ। এণ্টালি থেকে পার্ক সার্কাস, সমস্ত মুসলিম এরিয়া আমি চষে বেড়িয়েছি এই পোশাকে। আমার নাম সেলিম, কেউ আমাকে চিনতে পারেনি। এই কমরেডরা জানে, আমরা এমন সব এলাকায় গেছি, যেখানে আমাকে হিন্দু বলে চিনতে পারলে, কোনোরকমেই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারতাম না।' বলে সে তার অন্যান্য সঙ্গীদের দিকে তাকায়।

মধুদি যেন একটু বিব্রত হয়ে ওঠেন, বলেন, 'আমি সেরকম ভেবে কিছু বলিনি অহীনবাবু, আপনি কি সীরিয়াসলি নিচ্ছেন নাকি?'

যুবক—যার নাম অহীন, সে মধুদির জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দেয় না, বলে, 'বেনিয়াপুকুর, এণ্টালি, তালতলা এলাকার প্রায় কুড়ি একুশটা হিন্দু ফ্যামিলিকে আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি। নিজে অবিশ্যি হিন্দু এলাকায় ঢুকতে পারি নি। বরং শশীভূষণ আর ক্রীক রোতে ঢুকতে গিয়ে হিন্দুদের তাড়া খেয়েছি। বেঁচে গেছি অল্পের জন্য। কাঁধে একটা পাথর এসে লেগেছিল।' বলতে বলতে সে তার বাঁ-কাঁধের জামা তুলে দেখায়।

ত্রিদিবেশ দেখতে পায়, কাঁধের কাছে রক্তের দাগ। মধুদি বলে ওঠেন, 'একি, কেটে গেছে নাকি?'

যুবক বলে, 'না, একটু মাংস ফেটে গেছে। পাথরটা মাথায় লাগলে, আমাকে কারমাইকেলে গিয়ে ঢুকতে হতো, নয় তো এখানে ছুটে আসতে হতো। ওদিকটায় মনে হলো, রাত্রের অন্ধকারে স্ট্যালিনগ্রাডের হাতাহাতি লড়াই চলছে।' বলে সে অন্যান্য সঙ্গীদের দিকে তাকায় এবং হাসে।

'স্ট্যালিনগ্রাড!' মধুদি অবাক হয়ে বলেন।

অহীন বলে, 'একরকম তা-ই। অন্ধকারের মধ্যে হিন্দুরা মুসলমান এরিয়ায় ঢুকে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই মেরে পালিয়ে যাচ্ছে, মুসলমানরাও তা-ই করছে। এরকম কয়েকটা ডেডলি ইনজিয়োরড লোককে রাস্তা থেকে তুলে আমরা কারমাইকেলে দিয়ে এসেছি। আমাদের ভয় একমাত্র পুলিসকে, হঠাৎ যদি গুলি চালিয়ে দেয়। তবে—।' অহীন হঠাৎ থেমে যায়। তার অন্যান্য সঙ্গীদের দিকে একবার দেখে, মধুদির দিকে তাকায়। তার ঈগলের মতো চোখে যেন একটা ভিন্ন সংকেত ঝিলিক হেনে যায় এবং তার দৃষ্টি ত্রিদিবেশের দিকে ফেরে। জিজ্ঞেস করে, 'একে ঠিক চিনতে পারলাম না। তা সে যাই হোকগে, কমরেড মধুদি, আমাদের সকলেরই খুব খিদে পেয়েছে, কিছু পাওয়া যাবে? আমরা আবার এখুনি বেরিয়ে যাবো। একবার পার্টি অফিসে যেতে হবে। কমরেড মজুমদার সেখানে আছেন। প্রাদেশিক কমিটির সব লিডারই বোধ হয় আজ রাত্রে ওখানে রয়েছেন, আমাকে রিপোর্ট করতে হবে।'

'হ্যাঁ, খাবারের ব্যবস্থা আমি এখুনি করছি। তবে এখন ভাই আপনাদের ঠাণ্ডা খিচুড়ি খেতে হবে।' মধুদি বলেন, 'মনে হয়, এখন আর উনোনে আগুন নেই, গরম করা যাবে না।'

অহীন ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে হাসে, ভঙ্গিটা একান্তই যেন নাটুকে। সঙ্গীদের দিকে তাকায়, বলে, 'সুলতান, কমরেড মধুদি কী বলছেন, শুনেছো? ঠাণ্ডা খিচুড়ি! চলবে তো?'

সুলতান এবং বাকি দুজন হেসে ওঠে। অহীন বলে, 'পাথরের মতো শক্ত হলেও আমরা খিচুড়ি খাবো। পেটে রীতিমতো ইঁদুরে ডন মারছে। কমরেড মধুদি, আপনি সুলতানকে চেনেন তো?'

মধুদি সুলতানের দিকে তাকিয়ে হাসেন, অহীনের দিকে ফিরে বলেন, 'আপনি আমার পাড়ার ছেলেদের চেনাবেন নাকি? সুলতান আর করিম, দুজনকেই চিনি। ওদের বন্ধু হানিফ আর আবদুল, দুজনেই আশেপাশের ঘরে আছে। আমি চিনতে পারছি না শুধু একজনকেই। উনি কে?' মধুদি তৃতীয় যুবককে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন।

তৃতীয় যুবক অহীনের থেকে বয়সে কিছু কম, তেইশ চব্বিশ হতে পারে। পায়জামা আর গেঞ্জি। কোমরে বেল্টের মতো পাকিয়ে জড়ানো গায়ের শার্ট। অহীনের মতোই তার শরীর বেশ বলিষ্ঠ। বলিষ্ঠ বললে ঠিক বোঝায় না, বলিষ্ঠ এবং সুগঠিত, আকারে অহীনের অপেক্ষা দীর্ঘ। মাথায় বড় বড় চুল, চোখে মুখে আপাতদৃষ্টিতে একটি মেয়েলি কোমলতা বর্তমান। অহীন তৃতীয় যুবকের দিকে তাকিয়ে, অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসে, বলে, 'তোর নাম কী?'

'মোজাম্মেল।' যুবক লজ্জিত হেসে জবাব দেয়।

সুলতান আর করিম হেসে ওঠে। করিম বলে, 'যেমন আপনার নাম সেলিম।'

অহীন মধুদির দিকে ফিরে বলে, 'ওর

(সি ১৩২৪৬)

নাম পীযূষ, গোয়াবাগানের ছেলে। আমাদের জিমনাসিয়াম ক্লাবের মেমবার। চারশো পাউণ্ডের বারবেল অনায়াসে তোলে।'

মধুদি সপ্রশংস চোখে পীযূষের দিকে দেখেন, অহীনকে বলেন, 'আপনার চেলা?'

'চেলাটেলা বলবেন না কমরেড মধুদি।' অহীনের আপত্তির স্বরে কিঞ্চিৎ ঝাঁজ ফোটে, 'কথাটা মোটেই ভালো শোনায় না। ভক্ত চেলা, এসব জাতীয় কথা আমার মোটেই ভালো লাগে না। পীযূষ এখন আমাদের পার্টি সিমপ্যাথাইজার।'

মধুদি হেসে বলেন, 'আপনি তো মশাই সব সময়েই দেখছি ভারি সিরিয়াস। চেলা বলতে আমি খারাপ কিছু বোঝাইনি। পীযূষবাবু তো আপনারই ফ্রেণ্ড, আপনিই নিশ্চয় ও'কে পার্টির আদর্শে টেনে এনেছেন?'

'তা এনেছি, কিন্তু চেলা বললে যেন কেমন খারাপ লাগে।' অহীন বলে, 'ওসব সাধু সন্ন্যাসীদের ভাষা, চেলা চামুণ্ডা ওদেরই থাকে।'

মধুদি হেসেই ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করেন, 'আর আপনাদের ডিসাইপল? শিষ্য?'

'তা-ই বা কেন? আমরা সবাই পার্টি-ম্যান, কমরেডস।' অহীনও হেসেই জবাব দেয়, 'পীযূষ আমার ফলোয়ার।'

মধুদির ঠোঁট ঈষৎ বেঁকে ওঠে, বলেন, 'বাঙলায় যাকে বলে অনুগামী। যাক, এসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি দেখি, খাবারদাবার কী আছে।'

'সালমা কোথায় গেল?' অহীন জিজ্ঞেস করে এবং মাঝখানের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে তাকায়।

মধুদি বলেন, 'হিমাংশুবাবু আর সালমা, দুজনকেই আমি একটু শুতে পাঠিয়েছি। বোধ হয় ঘণ্টা খানেক হলো ওরা বিশ্রাম করতে গেছে। ত্রিদিবেশ আছে এঘরে। অন্যান্য ঘরে সবিতাব্রতবাবু, হানিফ আর মল্লিকা আছে।'

অহীন আবার ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। ত্রিদিবেশের মনে আছে, মধুদিকে ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেও, জবাবের প্রত্যাশা না করেই অহীন দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিল। এখন আবার জিজ্ঞেস করে, 'একে—মানে, এ ভদ্র-লোককে তো আগে কখনো দেখিনি।'

'কিন্তু ওদের এলাকায় আপনি গেছেন দু-একবার।' মধুদি বারান্দার দিকে যেতে গিয়ে দরজার কাছ থেকে বলেন, 'ওকে হয় তো দেখেন নি। ওর নাম ত্রিদিবেশ—ত্রিদিবেশ সরকার।'

অহীন বলে ওঠে, 'শুনেছি, উনি ছবি-টবি আঁকেন। আর্টিস্ট ইনটেলেকচুয়েলদের ব্যাপার, ওসবের মধ্যে আমি নেই। সবিতা পণ্ডিতের সঙ্গে এসেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।' মধুদি বলেন, 'কিন্তু ত্রিদিবেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টেই কাজ করে।'

অহীন কোনো কথা বলে না, বা ত্রিদিবেশের দিকে তাকায় না। সে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলে, 'কমরেড মোজাম্মেল, একটা সিগারেট দেখি।'

মোজাম্মেল, আসলে যে পীযূষ, সে কোমরের পিছন দিকে হাত দিয়ে যেন কোনো গুপ্তস্থান থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে। মধুদি ইতিমধ্যে অদৃশ্য। মাঝখানের দরজায় সবিতাব্রত উদয় হয়, বলে, 'কথাটা শুনতে পেলাম, তাই আসতে হলো। কমরেড অহীন মুখার্জি, একটা সিগারেট খাওয়ান তো।'

'ওঁত পেতে ছিলেন দেখছি, কমরেড পণ্ডিতজী।' অহীনের ঠোঁটে বিদ্রূপের বক্রতা।

সবিতা তার মোটা গম্ভীর স্বরে বলে, 'ওঁত পেতে না, কান পেতে ছিলাম। যেই সিগারেটের কথা শুনলাম, অমনি উঠে এলাম।'

অহীন সবিতাকে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। সবিতা এগিয়ে এসে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরে বলে, 'এবার আমাদের মজুর এলাকায় লাগাতার কয়েকদিনের জন্য আসুন, আপনাকে আমাদের কাজে লাগবে।'

'কেন কমরেড, আমি কি বলদ নাকি যে কাজে লাগাবেন?' অহীন হেসে উঠে বলে।

পীযূষও হেসে ওঠে। সুলতান আর করিম, এই মুহূর্তে বারান্দায়। সবিতা বলে, 'বলদ না, আপনি একজন বিশিষ্ট পার্টি কর্মী। আমাদের এলাকায় গিয়ে আপনি কয়েকদিন থাকলে ভালো হয়। আপনার তো কলকাতায় থাকা উচিত না, আপনি আসলে আমাদের জেলার লোক। আপনি চব্বিশ পরগণা জেলার মেমবার।'

'হ্যাঁ, বাড়ি আমার দমদমে বটে, মেমবারশিপও ওই ডিসট্রিক্টের।' অহীন বলে, 'কলকাতা আমাকে নির্দেশ দিলেই যাবো।'

সবিতা সিগারেট ধরিয়ে বলে, 'সেই নির্দেশ যাতে আপনি পান, আমি তার ব্যবস্থা করবো। তা ছাড়া ন'মাসে ছ' মাসে একদিন গিয়ে বিজলি মজুরদের আন্দোলন হয় না। আপনাকে যাতে পার্মানেন্টলি পাই, সেই চেষ্টা দেখতে হবে।'

'কেন, আপনারা নিজেরাই একটা বিজলি মজুরদের ফ্রণ্ট খুলতে পারেন।' অহীনের ঈগল চোখে ও ঠোঁটে বাঁকা হাসির ঝলক। ঘাড় বাঁকিয়ে তাকানোর ভঙ্গিটা রাশিয়ান ফিলমের লেনিনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

সবিতাব্রত এবার ভুরু কুঁচকে তাকায়। তার গম্ভীর মুখে বিরক্তির আভাস, বলে, 'এখন এসব কথা আলোচনা করার কোনো মানে হয় না—।'

'কেন, করুন না।' অহীন বাধা দিয়ে যেন ঠাট্টা করে বলে ওঠে। চোখের কোণে পীযূষের দিকে দেখে নেয়, এবং একবার ত্রিদিবেশকেও।

সবিতা এসব ভ্রূক্ষেপ না করে শান্ত-ভাবে বলে, 'না, করবো না। তবে বিজলি মজুরদের অফিস আমরা করেছি, অথচ আন্দোলনের সমস্ত বেসটা রয়েছে কল-কাতায়। বিজলি মজুররাও কলকাতার নেতৃত্বের পথ চেয়ে বসে থাকে। আমাদের চটকল ইউনিয়নের সঙ্গে তারাও কোনো যোগাযোগ করে না, আমরাও তাদের কাছে যাই না। এ বিষয়ে আমি অমাদের ডিসট্রিক্ট কমিটিকে আগেও জানিয়েছি। এবার ভাবছি, আপনাকে দিয়ে একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করবো।' সবিতা হঠাৎ থামে, দ্রুত প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়, 'এসব কথা এখন থাক, দাঙ্গার পরিস্থিতি কী, বলুন শুনি।'

বারান্দা থেকে আবদুল এগিয়ে এসে বলে, 'অহীনদা, আপনারা খেতে যান, মধুদি আপনাদের ডাকছেন।'

অহীনের ঠোঁটে তীব্র বিদ্রূপের হাসি ঝলকায়, সবিতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দাঙ্গার পরিস্থিতির খবর, কাল খবরের কাগজে পড়বেন কমরেড, আপাতত আপনি সিগারেট টানুন, আমরা খেতে চললাম।' বলে সে পীযূষের পিঠে একটা চাপড় মেরে বারান্দার অন্ধকারে চলে যায়।

ত্রিদিবেশ সে-দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সবিতা পণ্ডিতের দিকে তাকায়। সবিতা কোনো কথা না বলে সিগারেট মুখে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। ত্রিদিবেশ কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। অহীন লোকটিকে ও ঠিক বুঝতে পারে না। অহীনের চেহারা ওর মনে একটি বিশেষ রেখাপাত করে। বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে, অহীনের চেহারায় অবিকল কবি বায়রনের ছাপ বর্তমান। সুগঠিত বলিষ্ঠ শরীর। তেজোদীপ্ত চলা ফেরা, ঘাড় ফেরাবার ভঙ্গি, কথার উচ্চারণ আর স্বর, ওকে যেন মুগ্ধ করে। অথচ তার কথাবার্তা আচরণে কেমন একটা ঔদ্ধত্য, যা ওর মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। অহীনের ছদ্মবেশের পোশাকের প্রশংসাও না করে পারে না। নিখুঁত একজন দরিদ্র শ্রমজীবি শৌখীন যুবক মুসলমানের মতো। লোকটা সবাইকেই এরকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে কথা বলে নাকি? মধুদিকে তো যেন ধমকেই কথা বলছিল। মধুদি অবিশ্যি হাসছিলেন। ত্রিদিবেশের আরো খারাপ লাগে শিল্পী-দের বিষয়ে অহীনের মন্তব্যে। আর্টিস্ট ইনটেকলেকচুয়েলসের ব্যাপারে সে নেই, এবং এই না থাকার ব্যাখ্যাটা কী? অথচ অহীনকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত তো এক জন আর্টিস্টই মনে হয়।

ত্রিদিবেশের অহীন-চিন্তায় বাধা পড়ে, গোঙানির স্বর শুনতে পেয়েই চকিত হয়ে, দেওয়ালের ধারে মেঝেয় মাদুরের ওপরে শোয়ানো একজন আহতের দিকে ওর দৃষ্টি পড়ে। ও দ্রুত উঠে তার কাছে যায়। লোকটির গলার সঙ্গে বাঁ হাতের কনুই অবধি ব্যান্ডেজ বাঁধা। ছুরি দিয়ে ছিন্ন করা আঘাত, বাঁ হাতের মূল থেকে ডানার কনুইয়ের প্রান্ত পর্যন্ত। লোকটি ঠোঁট নেড়ে বলে, 'জল।'

ত্রিদিবেশ এক কোণে রাখা টেবিলের ওপর থেকে ফোটানো জল এনে পরিমাণ মতো দেয়। আহতের কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করে, লোকটির শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক। লোকটা গোঙানো স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'আমার বাড়িতে খবর পাঠানো হয়েছে? আমি দিদিমণিকে ঠিকানা দিয়েছিলাম।'

ত্রিদিবেশ প্রথমেই মিথ্যা বলতে উদ্যত হয়, 'হয়েছে।' কিন্তু ওর মুখে আটকে যায়, বলে, 'দিদিমণিকে বলেছেন যখন, হয় তো খবর পাঠিয়েছেন। আপনি এখন ঘুমোন। দিদিমণি একটু ঘুমোতে গেছেন, এলেই জানতে পারছেন।'

এ ভিখিরীণ সাল্মা যার কথা আহত বলে। লোকটি ঘোলাটে চোখে একবার ত্রিদিবেশের দিকে তাকায়, তারপরে চোখ বোজে, কিন্তু তার ঠোঁট নড়তে থাকে। ত্রিদিবেশ আস্তে আস্তে সরে এসে নিজের জায়গায় বসে। মধুদি এসে ঢোকেন। ত্রিদিবেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মধুদি ওর কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'বোস তুমি। অহীন মুখার্জিকে কেমন দেখলে?'

'আমার খুব ভালো লাগছিল—মানে, খুব স্মার্ট, আর আমরা যাদের মিলিটান্ট বলি, সেইরকম।' ত্রিদিবেশ বলে, 'ও'কে আমি আগে কখনো দেখি নি। পণ্ডিতদার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। উনি পার্টির কোন্ ফ্রণ্টে আছেন?'

মধুদি ত্রিদিবেশের চেয়ারের হাতলে কোমর ঠেকিয়ে, শরীরে একটি হেলান দেবার ভঙ্গি করেন, বলেন, 'খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটর, শোন ওর কথা বলছি।' বলতে বলতে তিনি চেয়ারের পিছনে নিজের পিঠ ঠেকান, ত্রিদিবেশের কাঁধের ওপর দিয়ে হাত রাখেন।

(ক্রমশ)

পরিচয়

ভারতবর্ষ : ম্যাক্সমূলারের দৃষ্টিতে

I Point to India by F. Max Mueller edited by Nanda Mookerjee Shakuntala Publishing House, 10 Garden Homes, 1st Road, Khar, Bombay 400052.--

"আমাকে যদি পৃথিবীর এমন কোন দেশ খুঁজে বের করতে হত যে দেশ প্রকৃতি বা সম্পদ, শক্তি ও সৌন্দর্য দান করতে পারে যে দেশ কোন কোন অংশে ভূস্বর্গের মতো, তা হলে আমি ভারতের দিকে সবাইকে তাকাতে বলব। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হত—কোন আকাশের নীচে মানুষের মন তার সবচেয়ে ভালো বৃত্তিগুলি নিয়ে পুরোপুরির বিকশিত হয়েছে, কোন আকাশের নীচে মানুষ জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছে এবং কোন কোন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে যা তাঁদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—যাঁরা প্লেটো এবং কান্ট অধ্যয়ন করেছেন, তবে আমি সবাইকে ভারতের দিকে তাকাতে বলব। আমি যদি নিজেকেই প্রশ্ন করি, আমরা, যাঁরা গ্রীক ও রোমান চিন্তাধারায় লালিত হয়েছি, কিভাবে অন্তর্জীবনকে পূর্ণ করার জন্য, আরও গভীর অভিনিবেশ ও বিশ্বজনীনতার সাহায্যে জীবনকে শুধু ইহকালের জন্যই নয়, চিরকালের জন্য আরও পূর্ণ বিকশিত করতে পারি, তখনও আমি সবাইকে ভারতের দিকে তাকাতে বলব"—এই কথাগুলি বলেছিলেন ভারত-প্রেমিক সত্যনিষ্ঠ ঋষি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার, যাঁর সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, "ভারতের জন্য তাঁর কী অপার ভালবাসা! আমার যদি নিজের মাতৃভূমির জন্য এই ভালবাসার একশতাংশও থাকত!" ছোটবেলায় স্কুলে নিজের একটি প্রথম পাঠের বইতে বারানসীর ছবি দেখে তিনি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ছিল বারানসী দেখার এবং গঙ্গার পবিত্র জলে অবগাহন করার। কিন্তু ভারত-প্রেমিক ম্যাক্সমূলারের এই স্বপ্ন সার্থক হয়নি; তবুও ভারতের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতামালা দিয়েছিলেন তা-ই ১৮৮২ সালে "India—What Can It Teach Us ?" নামে একটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। ম্যাক্সমূলার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী লিখেছেন, কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন এবং কেশবচন্দ্র সেন, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির কাছে বহু চিঠি লিখেছেন, এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু ভারত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে কত গভীর সে সম্পর্কে খুব স্বল্প পরিসরে আমরা ধারণা করে নিতে পারি নন্দ মুখোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ সংকলন থেকে। শ্রীমুখোপাধ্যায় এই বইয়ে ম্যাক্সমূলার সম্পর্কে যে ভূমিকা লিখেছেন, অল্প কথায় ম্যাক্সমূলারের ভারত-প্রেম সম্পর্কে এত সুন্দর আলোচনা এবং ম্যাক্সমূলার সম্পর্কে এত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আমরা খুব কমই দেখতে পাই। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, রায়বাহাদুর শালিগরাম সাহেব, কেশবচন্দ্র সেনের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব, ভারতের ধর্মীয় আন্দোলন, এবং 'মাই ইণ্ডিয়া করেসপনডেন্স'—এই দশটি অধ্যায়ে বইটিকে ভাগ করা হয়েছে। বইটি ম্যাক্সমূলারেরই লেখা; ভারত সম্পর্কে তাঁর অজস্র লেখা থেকে এই সুনির্বাচিত সংকলনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে বইটির সম্পাদকের প্রাপ্য। আমাদের দেশে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় তাঁদের নিয়ে ম্যাক্সমূলার লিখেছেন এবং এমন তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন যা আমরা ভারতীয়রা নিজেরাই অনেকে জানি না। ম্যাক্সমূলার ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষায় সুপণ্ডিত। ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের ঐতিহ্য এবং তার মূলধারা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। বেদ সম্পর্কে ম্যাক্সমূলারের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করাতে পারেনি, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বিপিনচন্দ্র পালকে করতে পেরেছিল। রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব দ্বারকানাথ ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি ব্যক্তিদের যে মূল্যায়ন ম্যাক্সমূলার করেছেন, তা পড়ে আমরা আমাদের নিজেদের ধারণা আরও স্বচ্ছ করতে পারি এবং একক্ষেত্রেই বর্তমান বইটি আমাদের সাহায্যে লাগতে পারে।

রাজা রামমোহন কিভাবে প্রচলিত ধর্মকে সংস্কার করে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং প্রচলিত কুসংস্কারকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিদেশীদের প্রথম ওয়াকিবহাল করেন ম্যাক্সমূলার, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও বিদেশীদের কাছে তিনিই প্রথম পরিচিত করেন। "A Real Mahatman" প্রবন্ধের মাধ্যমে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্পর্কে ইউরোপীয় পাঠকদের প্রথম পরিচয় করান ম্যাক্সমূলার ১৮৯৬ সালে। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে ছিল ম্যাক্সমূলারের নিবিড় ও অকৃত্রিম বন্ধুত্ব।

কেশবচন্দ্র সেনকে যখন অনেকেই ভুল বুঝেছিলেন, তখন এই বিদেশী ভারত প্রেমিক এগিয়ে এসেছিলেন কেশবচন্দ্রের প্রেরণাদাতা হিসেবে। এই বইয়ে কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে ম্যাক্সমুলার যা লিখেছেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন নানক, কবীর ও চৈতন্যদেবের কথা। অবাক লাগে, কি-ভাবে এত বছর আগে ভারতে না এসেও ম্যাক্সমুলার ভারত সম্পর্কে এত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রামতনু লাহিড়ী সম্পর্কেও তিনি কত খোঁজখবর রাখতেন তারও পরিচয় আমরা পাই এই বইয়ে। রায়বাহাদুর শালিগ্রাম সাহেব যে কত বড় ভক্ত ছিলেন, তার পরিচয়ও তিনি পাঠকদের দিয়েছেন। কেশবচন্দ্র সেন যে ব্রাহ্ম হয়েও রামকৃষ্ণদেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন ম্যাক্সমুলার। ম্যাক্সমুলার তাঁদের আদর্শ মানুষ হিসেবেই বিশ্লেষণ করেছেন—দেবতা হিসেবে নয়। কিন্তু এ জন্য রামকৃষ্ণদেব অথবা কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব আমরা দেখতে পাইনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে "Ramakrishna : His Life and Sayings" বইয়ে রামকৃষ্ণদেব ও সারদা-দেবীর সম্পর্ক নিয়ে ম্যাক্সমুলারের বিশ্লেষণ। কজনের কাছ থেকে এ-বিষয়ে আমরা এত বাস্তব অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্লেষণ পেয়েছি?

ম্যাক্সমুলারের বিভিন্ন লেখার সংকলন আমরা আরও দেখেছি। কিন্তু এত সুচিন্তিত ও সুনির্বাচিত সংকলন খুব কমই হয়েছে। এই দুর্লভ সংকলন পাঠক-দের উপহার দিয়ে বইটির সম্পাদক অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইন্দ্রজিৎ বসু ও জীবন সরকার সম্পাদিত **ভালোবাসার কবিতা** (রানার প্রকাশনী, কলকাতা-২. দু টাকা) আঠাশটি প্রেমের কবিতার সংকলন। না, ঠিক প্রেমের কবিতা বললে অর্থের সঙ্কোচন ঘটবে। ভালোবাসা কথাটাই যথার্থ, ব্যাপ্ত এবং অর্থপরিধি। প্রেম বলতেই নারী ও পুরুষের একটি বিশেষ সম্পর্ক যেন ভেসে ওঠে, ভালোবাসায় ধরা পড়ে স্বদেশপ্রীতি, টুকরো উপলব্ধি, ব্যক্তিগত ভালো লাগা-মন্দ লাগা, সৃষ্টি রহস্যের প্রতি মমতা, কলকাতার ওপর টান, প্রিয় নারীর বন্দনা। ঈশ্বরের জয়গাথা, এমন-কি নৃত্যনাট্যের নায়িকারও বিষয় হতে বাধা থাকে না।

এই সংকলনে উল্লিখিত সব ক'টি বিষয় নিয়ে রচিত কবিতাই স্থান পেয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, সুশীল রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, কবিতা সিংহ, শিবশম্ভু পাল, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিকের কবিতার সঙ্গে কিছু তরুণতর কবির কবিতা যুক্ত করে এই সংকলন। তরুণতরদের মধ্যে অশোক পোদ্দারের সপ্রতিভ শব্দচয়ন, গৌতম সেন-গুপ্তর ভাবনার নতুনত্ব, জীবন সরকারের চিত্রময় পরিবেশ এবং ইন্দ্রজিৎ বসুর স্বচ্ছন্দ আন্তরিকতা বেশ ছাপ ফেলে মনে। সংকলনটির চেহারাও বেশ ঝকঝকে। কিন্তু বড্ডো ছোট।

*

ইরা সরকারের একক কাব্যগ্রন্থ **শিয়ালদহ** (ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা ৬, তিন টাকা)। ১৯৭১ থেকে ১৯ ৩-এর মধ্যে রচিত এই গ্রন্থের কবিতাবলী অর্থাৎ এই কবির কাব্যজীবন খুব বেশী দিনের নয়। তবু এই সংকলনের বেশ কিছু কবিতায় স্বচ্ছন্দ একটি ভঙ্গি সঞ্চারিত। ইরা সরকার সব কবিতাই যে নিপুণতার সঙ্গে লিখতে পেরেছেন তা অবশ্য বলা যাবে না। 'পারবে না পারবে না তুমি/হৃদয় আমার করিতে ক্ষত' কিংবা 'ছেলেরা মেয়েরা জেগে নিশান ওড়ায়/একমুঠো সকালের আশায় আশায় ধরনের পংক্তিতে 'করিতে'র ব্যবহার অথব 'ওড়ায় আশায়' মিল বিষম কানে লাগে। কিন্তু 'শিয়ালদা', 'যশোরের মা', 'আন্ত-র্জাতিক' কিংবা 'ফুটপাতে মহাভারত' জাতীয় কবিতায় গল্পের ঢং মিশিয়ে নিজস্ব একটি রচনারীতি তিনি যে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছেন পাঠকের তা নজর এড়াবে না। তবে ছন্দের ব্যবহারে তিনি যে এখনো শিথিল, তেমন কিছু প্রমাণ ইতস্তত ছড়ানো।

ভারতের অর্থনীতি

কালো টাকা উদ্ধারের নয়া ব্যবস্থা

কালো টাকার কালিমা দূর করা যে কত শক্ত সরকার তা বুঝতে পারছেন প্রতি পদে পদে। তা না হলে নানা জায়গায় তল্লাসী চালিয়েও এবং কিছু কালো টাকা উদ্ধার করা সত্ত্বেও সরকারের পক্ষে সব কালো টাকার একটি ক্ষুদ্র অংশও উদ্ধার করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অঘোষিত আয় এবং সম্পত্তির পরিমাণ স্বেচ্ছায় ঘোষণার জন্য সরকার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। রাষ্ট্রপতির একটি অর্ডিন্যান্সের বলে স্থির করা হয়েছে যে যাঁরা অতীতে তাঁদের আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণা না করে কর ফাঁকি দিয়েছেন তাঁরা যাতে যুক্তিসম্মত পরিমাণ কর প্রদান করে ভবিষ্যতে নাগরিক দায়িত্ব পালনের পথে ফিরে যেতে পারেন তার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সঞ্চিত কালো টাকা অর্থনীতির সামগ্রিক স্বার্থে কাজে লাগানো হবে।

আমাদের দেশে গত দুই বছর মুদ্রাস্ফীতির যে তীব্র রূপ পরিলক্ষিত হয়েছিল তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কালো টাকার খেলা। প্রত্যক্ষ কর তদন্ত কমিটি বা ওয়ানচু কমিটি হিসাব করেছিলেন যে, ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৪০০ কোটি টাকার আয়ের উপর কর ফাঁকি দিয়েছিল; এই আয়ের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ছিল আয়কর বাবদ সরকারের প্রাপ্য। কমিটির মতে ১৯৬৮-৬৯ সালে কালো টাকার লেনদেন বা কারবারের পরিমাণ ছিল আনুমানিক সাত হাজার কোটি টাকা। তবে ওয়ানচু কমিটি স্বীকার করেছেন যে এই হিসাবটি বহুলাংশে অনুমানের উপর নির্ভরশীল। কালো টাকার প্রচলনে একশ্রেণীর লোকের হাতে ক্রয়শক্তি বাড়তে থাকে। কালো টাকার খরচ বেড়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই কালো টাকার অধিকারী বেশি দাম দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারেন। চোরা কারবার এবং কালো বাজারের কীর্তিও কালো টাকার লেনদেনের উপর নির্ভরশীল। কালো টাকা থেকে যে বিপদ আসতে পারে সে সম্পর্কে সরকারও অবহিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, কালো টাকাকে সাদা করার জন্য এ যাবৎ সরকার যে-সব ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা কি সফল হয়েছে? সরকারী প্রচেষ্টা যে এক্ষেত্রে সফল হয়নি তা সরকার নিজেও জানেন। তল্লাসী চালিয়ে সরকার কালো টাকা উদ্ধার করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তা অবশ্য এখনও অব্যাহত থাকবে। নতুন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কালো টাকার অধিকারীদের যে-সব সুবিধা দেওয়া হয়েছে আটক চোরাচালানী এবং বৈদেশিক মুদ্রার চোরাকারবারীরা তা থেকে বঞ্চিত হবে। যাদের বিরুদ্ধে আটকের আদেশ জারী করা হয়েছে তারাও এ-সুযোগ পাবে না। তল্লাসীর ফলে যাদের হিসাবের কাগজপত্র কিংবা মূল্যবান সম্পত্তি আটক করা হয়েছে তারাও সীমিতভাবে এই পরিকল্পনার সুবিধা পাবে। ১৯৭৫ সালের ৮ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁরা নিজেদের কালো টাকা বা সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণা করবেন তাঁদের সম্পর্কেই পরিকল্পনাটি প্রযুক্ত হবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত পর্যায়ের যে কোন একটির অধীন অঘোষিত আয়ের পরিমাণ ঘোষণা সম্পর্কে প্রযোজ্য—(ক) যে আয় সম্পর্কে কোন ব্যক্তি আয়কর আইন অনুসারে হিসাব দাখিল করেননি, (খ) ৮ অক্টোবরের আগে দাখিল করা হয়েছে এরকম আয়ের হিসাবে অঘোষিত আয়ের পরিমাণ এবং (গ) যে আয় আয়কর বিভাগের হিসাবের নজর এড়িয়ে গেছে।

কোম্পানি ছাড়া করদাতাদের ক্ষেত্রে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘোষিত আয়ের জন্য আয়করের হার হবে ২৫ শতাংশ। ২৫০০১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত পর্যায়ে করের হার হবে ৬২৫০ টাকা এবং সেই সঙ্গে ২৫ হাজার টাকার ঊর্ধ্ব পরিমাণের জন্য ৪০ শতাংশ। ৫০ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে করের হার হবে ১৬২৫০ টাকা তদুপরি ৫০ হাজার টাকার ঊর্ধ্ব পরিমাণের জন্য ৬০ শতাংশ। যে সব কোম্পানি অঘোষিত আয় স্বেচ্ছায় ঘোষণা করবে তাদের ক্ষেত্রে করের হার হবে ৬০ শতাংশ।

কালো টাকার অধিকারী যাঁরা তাঁরা হয়ত অনেকেই ভয়ে নিজেদের অঘোষিত টাকার হিসাব দিতে পারছেন না। তাঁদের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা অনেকটা সাহায্য করবে। কিন্তু সরকার কি এই অবস্থায় আশানুরূপ সাড়া পাবেন? আগেও একবার বলা হয়েছিল যে কালো টাকার অধিকারীরা যদি সরকারের প্রতিরক্ষা বণ্ড কেনেন, তবে তাঁদের আয়ের উৎস দেখাতে হবে না। কিন্তু সরকারের এই নীতি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়নি। তা ছাড়া এক্ষেত্রে আরও একটি জিনিস বিচার্য। যারা কালো টাকার অধিকারী তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন সেই ব্যবস্থা যতটা সফল হওয়া উচিত, ততটা হচ্ছে না কেন? সরকারের নতুন পরিকল্পনাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, ঘোষিত আয়ের পরিমাণের পাঁচ শতাংশ বস্তি-উচ্ছেদ এবং স্বল্প আয়-ভোগীদের জন্য গৃহনির্মাণ প্রভৃতি প্রকল্পে ব্যয় করা হবে। যদি এমন ব্যবস্থা করা হত যে, কালো টাকার অধিকারীরা গৃহনির্মাণে অথবা উৎপাদনমূলক কাজে (যার ফলে কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ হতে পারে) বিনিয়োগ করলে টাকার উৎস দেখাতে হবে না, অথচ সরকার তৈরী বাড়ির উপর যথারীতি কর ধার্য করে যাবেন এবং উৎপাদনমূলক কাজে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেকার যুবকের কাজ সুনিশ্চিত করার জন্য বিনিয়োগকারীকে বাধ্য করবেন, তবে হয়ত আরও কিছু কালো টাকার হদিস পাওয়া যেত। গৃহনির্মাণ সমস্যা, বিশেষ করে মধ্য-আয় ও নিম্ন-আয়সম্পন্ন লোকদের ক্ষেত্রে এখন খুবই জরুরি। যাঁরা কালো টাকা সঞ্চিত করে রেখেছেন তাঁদের টাকায় যদি নতুন নতুন কল-কারখানা খোলা যায় তবে বেকার সমস্যার সমাধানের পক্ষেও তা সহায়ক হবে। ওয়ানচু কমিটির মতে করদাতারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গোপন আয় প্রকাশ করবে এই ধারণা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কমিটির মতে, আয়করের প্রশাসন বিভাগকে আয়কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য আরও সতর্ক থাকতে হবে; কোটা, লাইসেন্স ও পারমিট ব্যবস্থায় যে চোরাকারবার চলছে তা বন্ধ করার জন্য এই ব্যবস্থাগুলির সঠিক মূল্যায়ন করা দরকার। যাঁরা আয়কর ফাঁকি দেন তাঁদের শাস্তি দেওয়ার সময়ে জরিমানার পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত কতটা আয়কর ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তার উপর, সম্পূর্ণ আয়ের উপর নয়।

অঘোষিত আয়ের টাকা উদ্ধারের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা সমর্থনযোগ্য হলেও প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সরকারকে কালো টাকা উদ্ধার করার জন্য আরও ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে কালো টাকা সন্ধানে তল্লাসী ও কালো টাকা আটক করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগকে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া উচিত। কালো টাকা আরও বেশি করে উদ্ধার করতে পারলে সরকারকে বাজেটের ঘাটতি অর্থ সংস্থানের উপর কম নির্ভর করলেও চলবে এবং সে-ক্ষেত্রে মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা রক্ষায় আমাদের দেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

সুব্রত গুপ্ত

খেলার মাঠে

ঋতুচক্রের মতই ক্রীড়াচক্রের আবর্তন। ফুটবলের পর ক্রিকেট, ক্রিকেটের পর হকি। এই নিয়মেই চলছে প্রধান তিনটি মরসুমী খেলা। অন্যান্য খেলারও কামাই নেই। ভলিবল, বাস্কেটবল, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, টেবল টেনিস, অ্যাথলেটিকস। এগুলি প্রধানত শীত মরসুমের খেলা। ক্রিকেট মরসুমের সঙ্গেই চলে। আবার গ্রীষ্ম বর্ষায়ও আসর বসে। ফুটবল বহুকাল ধরে গ্রীষ্মেরই খেলা ছিল। কিন্তু এখন প্রায় সারা বছরই ফুটবলের আসর জমিয়ে থাকে। কলকাতার ফুটবল মরসুম শেষ হলেও এখনো ডুরাণ্ড, রোভার্স বাকি। বাকি সারা ভারতের আরও বহু ফুটবল প্রতিযোগিতা। ডুরাণ্ড, রোভার্স তো বটেই ওই সব প্রতিযোগিতায়ও কলকাতার বড় বড় ক্লাব প্রতি বছরই যোগ দিয়ে থাকে। তাই এখন ক্রিকেটের জন্য কলকাতার মাঠ খোঁড়াখুঁড়ি এবং পীচ তৈরীর কাজ চললেও ফুটবলের জন্যও ক্লাবে ক্লাবে ব্যস্ততা কম নয়।

মাঝ মরসুমে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের গ্যালারি ভাঙার দুর্ঘটনায় ফুটবল খেলা মাসখানেক বন্ধ থাকা সত্ত্বেও এবার ফুটবল মরসুম কিন্তু সময় সীমার মধ্যে নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে। তবে ফুটবল নিয়ে যত মাতামাতিই হোক, আর মাঠে জনসমাবেশ যতই হোক, নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে খেলা ভাল হয়েছে, এমন কথা বলতে পারছি না। আর আই এফ এ শীল্ডের ৮৩ বছর ইতিহাসে এবারের মত এমন পানসে প্রতিযোগিতা তো আর কোনবারই হয়নি। বাইরের দল বলতে শীল্ডে খেলেছে শুধু কটক কম্বাইণ্ড ও বিহার স্টেট ট্রান্সপোর্ট। এই দুই শক্তিহীন দলকে প্রাথমিক খেলায় 'পত্রপাঠ' বিদায় নিতে হয়। কলকাতার প্রথম ডিভিশনের দুটি দল মহমেডান স্পোর্টিং এবং কালীঘাটও মূল পর্যায়ে খেলেনি। ফলে, ইস্টবেঙ্গলকে সেমিফাইনালে দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ রানার্স বেহালা ইয়ুথের সঙ্গে খেলতে হয়। মোহনবাগানকে সেমিফাইনাল খেলতে হয় টালিগঞ্জ অগ্রগামীর সঙ্গে। পরস্পরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের ফাইনাল ছিল এ বছরের শীল্ডের যা কিছু আকর্ষণ। অথচ অতীতে আই এফ এ শীল্ড ছিল ভারতের সবচেয়ে নামী ও জমকালো ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই সেদিনের প্রতিযোগিতা এবং একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা ডি সি এম-এতেও ভারতের সব নামী দল খেলছে, ভারতের বাইরের তিন চারটি দলও এসেছে। দিন দিন ওদের সমৃদ্ধি বাড়ছে। আমাদের কমছে। যে কলকাতা ভারত এবং প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ ফুটবল কেন্দ্র—যে কলকাতায় ফুটবল নিয়ে এত হই-চই, এত টাকার খেলা সেখানে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার দৈন্য বড়ই দুষ্টিকটু। এবারের মরসুম তো শেষ হয়ে গেল। আশা করি আই এফ এ এবং রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের কর্মকর্তারা ভেবে দেখবেন কিভাবে আই এফ এ শীল্ডের অতীত ঐতিহ্য রক্ষা করা যায়।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 'ডাবল' লাভ এবং লীগে ও শীল্ডে নতুন রেকর্ডের কথা আগেই বলেছি। বিগত মরসুমে মোহনবাগানকে দুবার হার স্বীকার করতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলের কাছে, লীগে ও শীল্ডে। লীগের আর একটি খেলায় খিদিরপুরের সঙ্গে ড্র করে রানার্সের সম্মান পেয়েছে মোহনবাগান। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগের দুটি খেলায় হার স্বীকার করেছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের কাছে। লীগে তৃতীয় স্থান দখল করলেও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১-৩ গোলে পিছিয়ে থাকা অবস্থায় আর খেলতে অস্বীকার করায় শীল্ডে নাম দিয়েও না খেলায় এবং বরদলুই ট্রফিতে পাঞ্জাব পুলিসের সঙ্গে দ্বিতীয় দফার সেমিফাইনাল না খেলে চুপি চুপি ফিরে আসায় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ভাবমূর্তি ক্রীড়ামোদিদের চোখে অনেক ছোট হয়ে গেছে। খেলার ব্যাপারে কোর্টকাছারী করাও অনেকে ভাল চোখে দেখেননি।

খেলোয়াড়দের যোগ্যতার যাচাই হয় সমানে সমানে পাল্লায়। কিংবা শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে শক্তিহীন দলের খেলোয়াড়দের ক্রীড়াভূমিকায়। শক্তিহীন দলের কিছু কিছু খেলোয়াড় বিগত মরসুমে অবশ্যই ভাল খেলেছে। তবে নামী দলের জামা গায়ে নেই বলেই তেমন প্রশংসা ও প্রচার পায়নি। সমানে সমানে পাল্লার খেলাগুলিতে দেখা গেছে ইস্টবেঙ্গলের রঞ্জিত মুখার্জি এবং শুভংকর সান্যাল আগামী দিনের আশা। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের লিংকম্যান নটরাজও। মোহনবাগানের শিশির গুহনিয়োগীর মত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ছিল মাঠের ২২ জনের মধ্যে সেরা। লিঙ্কম্যান প্রসূনের খেলায় আগের চেয়ে পরিমার্জন বেশি। সুব্রত ভট্টাচার্য এবং দিলীপ পালিত প্রতিরোধে এবং দৃঢ়তায় দৃপ্ত।

ইস্টবেঙ্গলের সুভাষ ভৌমিক এবং সমরেশ চৌধুরী আগের চেয়ে ম্লান হলেও মহমেডান, ও মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সুভাষের খেলা মনে রাখার মত। বিশেষ করে মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে একক প্রচেষ্টায় মহমেডানের বিরুদ্ধে তার গোলটি। শ্যাম থাপা প্রতি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছে। লীগে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তার গোলটিকে সাম্প্রতিককালের ফুটবলের এক বুদ্ধিপ্রযুক্ত গোল বলা যেতে পারে। সুরজিৎ সেনগুপ্তের শেষ দিকের খেলাগুলি যথেষ্ট পরিমার্জিত। শিল্পের সঙ্গে ফুটবলের যে যোগ রয়েছে সুরজিৎ সেটা প্রমাণ করেছে। সুধীর কর্মকার এখনো রক্ষণ ব্যূহের অতন্দ্র প্রহরী। তবে সুধীরের খেলায় যেন বয়সের ছাপ পড়ছে।

মহমেডান স্পোর্টিংয়ের হাবিব ও আকবর দুই ভাই সেই যোগাযোগ ও চাতুর্য দেখাতে পারেনি, ইস্টবেঙ্গলে যেমন দেখিয়েছে। মনে হয় হাবিবের খেলার দিনও সংক্ষেপিত হয়ে আসছে নামী খেলোয়াড় নাইমের মত।

যেসব খেলোয়াড় সম্পর্কে দর্শকদের ধারণা খুব উঁচু—দর্শক মানে যাদের বহু স্মরণীয় খেলার স্মৃতি সবাই যাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—খেলা পড়ে গেলে তাদের আর মাঠে না নামাই ভাল। তাতে মিছামিছি তাদের ভাবমূর্তি [illegible] হয়, দলেরও ক্ষতি হয়। নাইম উদ্দেশ্য করেই আমি একথা লিখছি তবে আরো অনেকের ক্ষেত্রেই কথাটা প্রযোজ্য।

রেকর্ডের জন্য লিখছি, এবার দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সালকিয়া ফ্রেণ্ডস, তৃতীয় ডিভিসনে ঐক্য সম্মিলনী। চতুর্থ ডিভিসনের ফল ঘোষণার উপর আদালতের ইনজাংশন আছে। ওপেন ক্লাবের ৭১টি দল থেকে চতুর্থ ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে গরলগাছা ও পথচক্র। প্রথম ডিভিসনে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষস্থানে আছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের আকবর ২০টি গোল করে।

একলব্য

আর এক ব্রিজ মাস্টার

বাংলা ও ভারতের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম ব্রিজ খেলোয়াড় সুবিনয় ঘোষ প্রথমেই বললেন—"আই অ্যাম নট এ গুড প্লেয়ার বাট এ গুড পার্টনার।"

আমি বললাম, কি রকম?

বললেন, বাংলার হয়ে সর্বভারতীয় ব্রিজ ক্ষেত্রে রুইয়া ট্রফিই জিতি, সিংহানিয়া ট্রফিই জিতি আর হোলকার ট্রফিই লাভ করি—সহ খেলোয়াড়দের কৃতিত্বেই জিতেছি। আমি শুধু তাঁদের তালে তাল দিয়ে গেছি।

বললাম, এ তো আর গান নয় যে, তাল না ঠেকা দিলেও চলে যাবে। বিডিং, ডিফেন্স এবং প্লে আউট তিনটি ব্যাপারেই নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার প্রয়োজন। বিশেষ করে ডিফেন্সে ওপেনিং লীড-এর ব্যাপারে। তখন তো কারো তাসই দেখতে পাচ্ছেন না। সুবিনয়বাবু শুধু একটু হেসে বললেন, ওই ওদের সংগগুণেই চালিয়ে গেছি আর কি।

বলা বাহুল্য, সুবিনয়বাবুর এই বিনয়ের সঙ্গে ব্রিজ বিশারদরা সায় দিতে পারবেন না। শান্তি সেন, রবি রায়, সুখরঞ্জন ঘোষ, শান্তি সেন প্রভৃতি নামী ব্রিজ মাস্টারদের সঙ্গে খেলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেও নিজের যোগ্যতা ছাড়া ওদের সঙ্গে খেলার সুযোগ ঘটত না, প্রাইজও হাতে আসত না।

ভারতের মাত্র দুজন খেলোয়াড় রবি রায় এবং শান্তি সেনের যেমন চারটি বড় প্রতিযোগিতা রুইয়া গোল্ড ট্রফি, গুরুদত্ত ট্রফি, সিংহানিয়া ট্রফি ও হোলকার ট্রফি জয়ের নজির আছে, তেমন বাংলার একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে সুবিনয় ঘোষের আছে তিনবার পেয়ার কম্পিটিশন, হোলকার ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব। বোম্বাইয়ের হেমনানি ও শিবদাসানী ছাড়া অন্য কোন জুড়ি হোলকার ট্রফি জয় করতে পারেননি।

সুবিনয়বাবু কিন্তু তিন বারই বিজয়ী হয়েছেন নতুন নতুন পার্টনার নিয়ে। ১৯৬৮তে লখনৌয়ে খেলেছিলেন শান্তি সেনের সঙ্গে, ১৯৭০-এ ব্যাঙ্গালোরে সুধীর দেবের সঙ্গে এবং ১৯৭২-এ কোকনদে রবি রায়ের সঙ্গে। ওই তিন বছর জয়ী হওয়া ছাড়াও ১৯৭৩-এ কেভেন্দ্রাটোরের জাতীয় আসরে হোলকারে রানার্স হয়েছেন অম্বর বালকৃষ্ণ রাওয়ের সঙ্গে খেলে। ফাইনালে রবি রায় এবং শান্তি সেনের কাছেই হেরে গিয়েছিলেন। সুতরাং আগে যাঁরা ছিলেন পার্টনার তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন।

অবশ্য সব খেলাতেই এমন হয়। ব্রিজ খেলায় হয় বেশি। কিন্তু সুবিনয়বাবুর বিশেষত্ব সবার সঙ্গেই চমৎকার মানিয়ে নিতে পারেন।

১৯৭২-এর একটি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। ফার ইস্টার্ন চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রায়ালের আয়োজন হয়েছিল কলকাতায়। ফার ইস্টার্ন চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী দলের বিশ্ব ব্রিজ চ্যাম্পিয়নশিপ বারমুডা বৌল-এর খেলায় যাবার কথা। সুতরাং ওই ফার ইস্টার্নের খেলা বিশ্ব প্রতিযোগিতার ট্রায়াল-এর খেলা এবং কলকাতার খেলা প্রকারান্তরে বিশ্ব ব্রিজ-এর ট্রায়াল।

কুমারের টিমের হয়ে সুবিনয় ঘোষ ১৯৬৬তে রুইয়া গোল্ড কাপ জিতলেও

এবং হোলকার হোলকার এবং একবার সিংহানিয়া ট্রফি পেলেও কলকাতার ট্রায়ালে কিন্তু সুবিনয়বাবুর ডাক পড়ল না। এক্ষেত্রে বলা হল সুবিনয়বাবু এখন থাকেন শিলিগুড়িতে। ট্রায়ালের আগে রবি রায় গিয়েছিলেন শিলিগুড়ি বেড়াতে। সুবিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, অল ইণ্ডিয়া সিলেকশন ট্রায়ালের জন্য কয়েক দিন পরেই তো কলকাতায় আসছেন? সুবিনয়বাবু জানালেন তিনি আমন্ত্রণ পাননি। রবি রায় বিস্মিত হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। উদ্যোক্তাদের কাছে কথাটা পাড়তেই তাঁরা জানালেন টেবল কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর খেলোয়াড় ঢোকাবার জায়গা নেই। রবি রায় বেঁকে বসলেন। বললেন, সুবিনয় না খেলতে পারলে আমি খেলব না। শেষ পর্যন্ত আমন্ত্রণ পেলেন সুবিনয় ঘোষ। আমন্ত্রণ তো পেলেন। কিন্তু খেলবেন কার সঙ্গে। পার্টনার কোথায়? রবি রায় বললেন, তুই শান্তিদার সঙ্গে খেল। এর অর্থ শান্তি সেনের জুড়ি রবি রায় সরে দাঁড়াচ্ছেন বন্ধুর জন্য। সুবিনয় ঘোষ বললেন, তা হয় না রবি, তুই আমাকে মোটামুটি ভাল একজন পার্টনার দে। কোথায় মোটামুটি ভাল পার্টনার? শেষ পর্যন্ত মিলন রায়ের পার্টনার অমিয় ঘোষ এই বলে সরে দাঁড়ালেন যে, সুবিনয় ঘোষের মত খেলোয়াড় খেলতে পারবে না, আর আমরা খেলব? মিলন রায় এবং সুবিনয় ঘোষ আগে কোনদিনই জুড়ি বেঁধে খেলেননি। বলা বাহুল্য, ওই জুড়িই ট্রায়ালে প্রথম স্থান দখল করেছিলেন। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন রবি রায় ও শান্তি সেন, তৃতীয় সুভাষ আগরওয়াল ও কে কে কেডিয়াল। প্রথম তিন জুড়িই সিঙ্গাপুরে খেলতে গিয়েছিলেন। ফার ইস্টার্নের ওই খেলা সম্পর্কে সুবিনয়বাবুর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য: "আমরা ভাল খেলতে না পেরেই হেরে গিয়েছিলাম। কেউই ভাল খেলতে পারিনি।"

গ্যারেজো বেলেডোনা, ডরথী হেডন, অ্যালান ট্রুসকট, মিসেস চার্লস উই প্রভৃতি ইতালি ও আমেরিকার শীর্ষ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া আন্তর্জাতিক ব্রিজ দলের সঙ্গে খেলার জন্যও বোম্বাইয়ে ১৯৭১-এ ডাক পেয়েছিলেন সুবিনয় ঘোষ।

১৯৬৪ সালে জাতীয় ব্রিজে খেলার আগে সুবিনয়বাবু কোন কোন অপ্রধান প্রতিযোগিতার ফাইনাল জিতেছেন এবং কটি ফাইনালে হেরেছেন ঠিক মনে নেই। তবে জীবনের প্রথম বড় প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠে ওদের সাউথ ক্যালকাটা কার্ড ক্লাব যে বিখ্যাত এম এম ক্লাবের কাছে তিন হাজারেরও বেশি পয়েন্টে হেরে গিয়েছিল সেটা মনে আছে। ১৯৭০ থেকে শিলিগুড়িতে বাস করছেন। তাই নিয়মিত সব প্রতিযোগিতায় খেলতে পারেন না। এখন মেতেছেন ব্রিজ-এর সংগঠন নিয়ে। ওঁরই উদ্যোগে দার্জিলিং ব্রিজ অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছে। জেলা চ্যাম্পিয়নশিপও হয়ে গেছে। পেয়ার্সে উনিই জিতেছেন। কার্শিয়াং চ্যাম্পিয়নশিপে ডুপ্লিকেট জিতেছেন ছেদন রঞ্জন ঘোষকে পার্টনার নিয়ে। ওখানে ব্রিজ-এর লাইব্রেরী করার ওঁর ইচ্ছে রয়েছে। সামার ন্যাশনাল দার্জিলিংয়ে করার জন্য ভারতীয় ব্রিজ ফেডারেশনের কাছে প্রস্তাবও দিয়েছেন। হ্যাঁ, ১৯৭৩ সালেই।

ব্রিজ সম্পর্কে ভীষণ সিরিয়াস। কখনো হালকাভাবে খেলেন না। বললেন, যখন ভুল করি, জেনে চিন্তে সিরিয়াসলিই সে ভুল করি। তাই ভারতের সবচেয়ে বড় ব্রিজ বিশেষজ্ঞ বিরিটিশিয়ান নির্মল বিজ্ঞানভূষণ গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন—হি প্লেজ লাইক প্রোফেশনাল।'

মুকুল

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

সমুদ্র থেকে একটি মেয়েকে উদ্ধার করবার পর

আমি জানতে চাই, ও কে, কারাই বা ওকে মারতে চেয়েছিল...
এমন মিষ্টি মেয়েরও শত্রু আছে.. আশ্চর্য

আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে!
না না, ওকে জুডোর প্যাঁচ শেখাচ্ছিলুম!
তার চেয়ে বরং তোমার পোষা জন্তুগুলো ওকে দেখাও।

তোমার পোষা ইঁদুরটার সঙ্গে খেলবে?
!
না না, ইঁদুর-টিদুর নয়!

অরণ্য-প্রহরীরা কেউই আজ পর্যন্ত তাদের রহস্যময় কমাণ্ডারকে দেখেনি।
আমি কর্নেল ওরুরুর সঙ্গে কথা বলব।
কমাণ্ডার!

কর্নেল, কমাণ্ডার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।
ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি ওরুরু কথা বলছি।
কর্নেল... খোঁজ করুন খবর মেয়ে হারিয়েছে বয়স দশ... মাথার চুল সোনালী...
3/9

ঘুম ভাঙাতে হল বলে দুঃখিত।
দুঃখিত ক্যাপটেন।
অ্যাঁ?
অ্যাঁ..?
অ্যাঁ?
দুঃখিত মেজর... মেয়ে হারিয়েছে..

কোনও খবর পাওয়া গেল না, স্যার।
বেশ, খোঁজ নিন, গত ৭২ ঘণ্টায় কোন্ কোন্ জাহাজ পয়েন্ট পামেটের বন্দর দিয়ে গিয়েছে...
৭২ ঘণ্টা..
খোঁজ নিচ্ছি, স্যার!
১০

"দত্তা" (পরিচালনা : অজয় কর) ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুচিত্রা সেন

মতামতের মন্তাজ

আগামী মাসের শুরুতে কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোন্ কোন্ দেশ থেকে ছবি আসবে তা এই লেখার সময় অবধি জানা যায় নি। তবে মোট চল্লিশটি দেশ উৎসবে যোগ দেবে বলে আশা করা যায়। রাজ্য সরকার এই উৎসবের উদ্যোক্তা। সুষ্ঠুভাবে যাতে উৎসব উদ্‌যাপিত হয় সে বিষয়ে সরকারী তরফে কোন গাফিলতি থাকবে না। চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে ফেস্টিভ্যাল কমিটি তৈরী করা হয়েছে। কলকাতার চিত্রেসকরা এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। মোট তিনটি হলে চৌদ্দ দিন ধরে ছবি দেখানো হবে। উৎসবের ছবি দেখার জন্য মফঃস্বল থেকেও দর্শকরা ভিড় করে আসবেন কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে বহু উৎসাহী দর্শক আসবেন না এমন কথাও বলা যায় না। কলকাতার দর্শকরা এই ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে বেশি আগ্রহী। তা ছাড়া কলকাতায় ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন আন্দোলন এখন খুবই জোরদার। তাই বিদেশ থেকে যে সব পরীক্ষামূলক ছবি আসবে সেগুলি দেখবার জন্য বিদগ্ধ দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য ফেস্টিভ্যালের ছবি এলে টিকিটের জন্য মারামারি লেগেই থাকে। আন্-সেনসরড বিদেশী চিত্র দেখার জন্য একশ্রেণীর দর্শক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এরা ফিল্মের সমঝদার নয়। ওদের জন্য বোদ্ধা দর্শকরা হলে ঢোকবার সুযোগ পান না। এক্ষেত্রে কারোর কিছু করার নেই। তবে আশা করা যায় সরকার টিকিট বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার দিকে নজর দেবেন।

* * *

একশ্রেণীর দর্শকের জন্য ফিলম ফেস্টিভ্যাল খুবই জরুরী। এঁরা হলেন ফিলম টেকনিসিয়ান ও শিল্পী এবং বিভিন্ন ফিলম ক্লাবের সভ্য। কলাকুশলী ও শিল্পীদের বিদেশী ছবি দেখা দরকার। কারণ তা না হলে বিদেশী চিত্রের যে সব গুণ সেগুলি এদেশের চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হবে না। বিভিন্ন ফিলম ক্লাবের যাঁরা সভ্য তাঁরাই ফিলম অ্যাপ্রিসিয়েশন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই আন্দোলনের ফলে যে কোন দেশের চলচ্চিত্র লাভবান হয়। সুতরাং ফেস্টিভ্যালের ছবি যাঁদের দেখা খুবই দরকার তাঁরা লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট পাবেন কিনা বলা কঠিন। শিল্পীদের পক্ষে টিকিটের জন্য লাইন দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে এঁদের জন্য ছবি দেখার কোন আলাদা ব্যবস্থা করা যায় কি না সেটা ভাবা দরকার। আবার বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করারও অসুবিধা আছে। কারণ ফেস্টিভ্যাল জনসাধারণের জন্য। আসল কথা ফেস্টিভ্যালের সব ছবি সকলের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। ফেস্টিভ্যালের চলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি ছবির প্রদর্শনীর সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। সেই সংখ্যা অতিক্রম করা যায় না। তাই এই সীমায়িত প্রদর্শনীর দরুন বেশ কিছু দর্শককে নিরাশ হতেই হবে। তিনটি হলে চৌদ্দ-

দিন ধরে মোট বেয়াল্লিশটি ছবি দেখানো হবে। অর্থাৎ একটি ছবির মাত্র তিনটি শো। এই নিয়েই বিশাল দর্শকগোষ্ঠীকে তুষ্ট থাকতে হবে। অনেক দর্শক নিরাশ হবেন সত্য, কিন্তু বহু দর্শক ছবি দেখার সুযোগও পাবেন। সেটাই যথেষ্ট লাভ। এবং ফেস্টিভ্যালের একটা বিশেষ তাৎপর্যও থাকে। আগামী ফেস্টিভ্যালের গুরুত্ব সেদিক থেকে সুদূরপ্রসারী হবে বলেই মনে হয়।

শুটিং চলছে ...

যেখানে আকাশের নীল শুধু নীল, যেখানে স্বপ্নের সমুদ্র শুধু সমুদ্র, যেখানে সারাটা দিন সারাটা রাত টুপটাপ শুধু টুপটাপ—অনুভবে পাতাঝরার শব্দ... সেখানে সুন্দর, শান্তনু, শ্যাম আর রীনা চারি পাশ দেখতে দেখতে চলেছে। বিস্তৃত জলরাশি, সারি সারি ঝাউগাছ, বালির ঢিবি এবং সমতলে খিলখিল করে হাসছে একটি শিশু। একটু সুখের মুখ দেখবে বলে এরা শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর স্মৃতির দিকে এক পা এক পা করে এগোতে নিজের সঙ্গে দেখা। সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের। ভোরের আলো, পাতা, ফুল, ঘাস, লতা—এই ঐশ্বর্যের মাঝে

শুটিং চলছে : "এরা এক যুগ" ছবির সেই দৃশ্যে কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, পিনাকী সেনগুপ্ত, অজিত ভক্ত ও সনাতন

ফটো : দেশ

সুন্দর ক্রমশ শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে যৌবন অভিমুখে রওনা হচ্ছিল। অকস্মাৎ বিপর্যয়। ধস নামার মত অবস্থা, সংসারটা ভেঙে পড়ল। এক অসম্ভব দায়িত্বের বোঝা এসে পড়ল সুন্দরের ঘাড়ে। মা গুরুতর অসুখে পড়লেন। ওষুধ কেনবার পয়সা নেই। অনন্যোপায় সুন্দর ওষুধ চুরি করতে গিয়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়ল। বিনা ওষুধে মা মারা গেলেন। সুন্দরের শাস্তি হল—জেল। 'আমি ছুটছি কেন?' প্রথম প্রথম প্রশ্নটা কেবল সুন্দরকে থামিয়ে দিয়ে জবাব দিত। এখন 'আমরা ছুটছি কেন?' প্রশ্নটা একসাথে চারজনকে থামিয়ে দেয়। জবাব প্রতিধ্বনি করে 'বাঁচার তাগিদে'। শান্তনু, তার অতীত বড় ধূসর। সে বর্তমানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। একবারের জন্যও ফিরে যেতে চায় না। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলেও খুব সচেতন থাকে—মুখের ভাব অপরিবর্তিত রাখে। চোয়াল দুটো শক্ত করে। ওর ধারণা এ জীবন থেকে উত্তরণ নেই। এরা সামাজিক হতে পারবে না কোনদিন। অসামাজিক থাকবে। অপাংক্তেয় থাকবে। সহজে যা পাবে না জোর করে ছিনিয়ে নেবে। শ্যাম, আশ্চর্যভাবে এ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সেও এতদিনে বুঝতে পেরেছে মুক্তি নেই। কিন্তু আশা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে—তাই ত সে বাল্যকালে/কৈশোরে ফিরে ফিরে যায়। শান্ত স্নিগ্ধ পৃথিবীর গন্ধ বুকভরে গ্রহণ করে। রীনা বিশ্বাস করে এ সমাজ, সমাজের ছানিপড়া চোখ নয়। এদের সুস্থভাবে বাঁচতে দেবে। নতুন করে শুরু করতে দেবে। আবার সেই সুখের দুঃখের দিনগুলিতে ফিরে যেতে পারবে সেই বয়সটাতে, যখন সে আশ্রয় পেয়েছিল সুন্দরদের বাড়িতে, সুন্দরের দু' চোখের মণিতে। যতক্ষণ সে সুন্দরের পাশাপাশি থাকে ভালবাসায় আনন্দে বেদনায়, অতীত মনের তলায় ফিরে আসতে চাইলে, ফিরিয়ে দিতে পারে না। সে সুন্দর, শান্তনু ও শ্যামকে নিয়ে এক অনাবিল সুখী ভবিষ্যৎকে স্পর্শ করতে চায়। এখানে দুঃখ নেই। থাকবে না। এরা থাকবে, শুধু থাকবে।

এই মুহূর্তে এরা পুনরায় অস্থির সময়ের মুখোমুখি। ঐ দূরে নিরীহ জেলেদের পর্ণকুটীর উত্তাল। এরা প্রত্যক্ষ করছে একটা জটলা। শুনতে পাচ্ছে আর্তনাদ। নারীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ। একদল পুরুষের নির্মম হুংকার। তি জন এগিয়ে যায়। রীনা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে। স্পষ্ট হয় একটি জেলে মেয়েকে বীরপুরুষের দল টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। নিস্তব্ধ নিথর। মেয়েটির চোখের জল শুকিয়ে গেছে। কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ। জনৈক মধ্যবয়স্ক, মেয়েটির অসহায়ভাবে চলে যাবার দিকে তাকিয়ে, কপাল চাপড়াচ্ছে। নিকট দূরত্বে এলে কুটীরে কুটীরে এরা দেখতে পায় অত্যাচারিত নিপীড়িত মানুষের মুখ। কান্নায় ভেঙে পড়ে মধ্যবয়স্ক, যার নাম মনুয়া, বলে : বাবু তুরা আমার নাতনীকে ফিরিয়ে আন, আমি তুদের কিনা গুলাম হয়ে থাকব।...

বিস্তারিত হল এই যে, জেলেদের ওপর অন্যায় অত্যাচার চালাচ্ছে রামলাল। তার পরিচয়, স্থানীয় গুন্ডা। তার একটা বেশ বড়সড় দল আছে। তাকে সবাই ভয় করে।

'খোকন' (পরিচালনা : অরুণ চৌধুরী) ছবিতে শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি ও মাস্টার জমিদার
ফটো : দেশ

প্রতিবাদ করবার সাহস পায় না। তা হতে পারে না, একটা লোক দিনের পর দিন অন্যায় করে চলবে আর সবাই মুখ বুজে সহ্য—' শ্যামের কথা শেষ না হতেই সুন্দর শপথ গ্রহণ করার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে: 'আমরা মায়ের দুধ খেয়েছি, সেই মায়ের ইজ্জত রাখা আমাদের কর্তব্য।'

দীঘার সমুদ্র সৈকতে, আশেপাশে, উড়িষ্যা সীমান্তে—গত মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এ মাসের প্রথম অবধি—শাণিত ছুরি, বারুদের গন্ধ, গুলির শব্দ, সম্মুখ লড়াই, বোমা, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় একাকার, মৃত্যুর পাশে মৃত্যু—এরা এক যুগ ছবির শুটিং চলছে। এরা কারা? এরা সুন্দর : সমিত ভঞ্জ, শাম্তনু : কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম : পিনাকী সেনগুপ্ত ও রীনা : সন্ধ্যা রায়।

আর বি এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত এ ছবির অন্যান্য শিল্পীরা হলেন : শিবানী বসু, সনাতন মুখোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, পদ্মা দেবী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, চিন্ময় রায় ও জয়শ্রী রায়।

• • •

শুভ মহালয়ায় শুভ সূচনা। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওর ফ্লোর-এ 'সোনায় সোহাগা'। সঙ্গীত পরিচালক অজয় …রেকর্ড করা হল একাধিক গান। গাইলেন বনশ্রী সেনগুপ্ত ও হৈমন্তী শুক্লা। ঠিক দুদিন পরে ঈদের দিন আরও দুটি গান গৃহীত হল। গাইলেন : তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য এবং নতুন গায়ক সমীর মুখোপাধ্যায়। নভেম্বর থেকে নিয়মিত শুটিং। চঞ্চল পট্টনায়কের কাহিনীতে পরিচালনা করবেন : রঞ্জন মজুমদার।

• • •

মাস আণ্ড মুভিজ প্রোডাকশন্সের প্রথম প্রয়াস 'খোকন'। ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর ফ্লোরে খোকন (মাঃ জমিদার) ও খোকনের মা (শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি) ক্যামেরার সম্মুখীন। ক্ল্যাপস্টিক পড়ল, শুভ মহরৎ শট। অরুণ চৌধুরীর কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা।

• • •

বিগত সপ্তাহে 'দস্যু সর্দার রত্নাকর' ছবির কয়েকখানি গান রেকর্ড করা হল নচিকেতা ঘোষের সংগীত পরিচালনায়। এ ছবির প্রযোজিকা শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রসংগত জানান—রত্না ফিল্ম করপোরেশনের দ্বিতীয় ছবি পরিচালনা করবেন উত্তমকুমার। 'বনপলাশীর পদাবলী'র অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এবারও তিনি একটি বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবেন। চিত্রনাট্য রচনা তাঁর নিজেরই। বলা বাহুল্য, প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার।

• • •

'আমি এসে গেছি। কই আমার মা পাঁপড় ভাজা।' রঞ্জিত মল্লিক দরজা খুলে ঘরে এসে, ক্যামেরার মুখোমুখি, এক উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিমায় সংলাপ উচ্চারণ করতে করতেই চলচ্চিত্র ভারতীর 'দিন আমাদের' ছবির শুভ সূচনা। পরিচালক অগ্রদূত গোষ্ঠী। শংকর চট্টোপাধ্যায় রচিত কাহিনীর ভিত্তিতে অমর ভট্টাচার্যের চিত্রনাট্য। নির্মীয়মান এ ছবি আধুনিক তরুণ-তরুণীদের নিয়ে। এক বিদেশী তরুণীর চোখে শহর কলকাতা। বিশেষত তরুণ-তরুণীদের জীবন চেতনা। পরিপ্রেক্ষিত শহর কলকাতা। ফিল্ম টেকনিকায় এবং গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রীভট্টাচার্য জানালেন, ছবির নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হচ্ছে নভেম্বর মাসে। বলা বাহুল্য নায়ক রঞ্জিত মল্লিক। নায়িকা রীতা ভাদুড়ী—বর্তমানে বোম্বাইতে একগাদা হিন্দি ছবির নায়িকা। কিছুদিন আগে অগ্রদূত গোষ্ঠীর পরিচালনায় 'একদা' নামে একটি ছবিতে কাজ করেছেন। এছাড়া আছেন কল্যাণ চ্যাটার্জী, তরুণ চক্রবর্তী, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীরা। প্রসঙ্গত শেষোক্ত শিল্পী 'একদিন সূর্য' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখার্জী।

বার্তাবহ

"দিন আমাদের" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে) রঞ্জিত মল্লিক
ফটো—দেশ

বোম্বাই-বিচিত্রা

বোম্বাই চলচ্চিত্র শিল্পে নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠানের রেওয়াজ আছে। ছবির জগতের লোকেরা সে সব নিষ্ঠার সংগে পালন করেন। সেখানে নিজেদের ধর্মমত কোনও বাধা হয় না। মুসলমান প্রযোজকও ছবি শুরু করার আগে মহরৎ অনুষ্ঠান করে নেন। কখনও কখনও দুই ধর্মের রীতি অনুযায়ী দুটি অনুষ্ঠান হয়—খাফিলা ছবির বেলায় যা দেখলাম। প্রথমে হিন্দু মতে হল পুজো, পরে মুসলিম রীতি অনুসারে একটি উপাসনা-সভা।

গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছবির মুসলমান প্রযোজক দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি তীর্থস্থলে প্রথমে, পরে জম্মুর বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকটির ধারণা, তাঁর ওই তীর্থ সফরের ফলেই ছবিটি টিকিটঘর জয় করতে পেরেছিল—তার নিজস্ব গুণের জোরে না। জনৈক হিন্দু প্রযোজক সাগর তাঁর ছবির মুক্তির দুই দিন আগে গিয়েছিলেন আজমীরের দরগায়। তাঁর ছবিটিও ঘরে এনেছে যথেষ্ট টাকা।

এই সেদিন, একটি ছবির মুক্তির আগে

প্রযোজক ভদ্রলোক গেলেন শিরডিতে যেখানে রয়েছে সাঁইবাবার মন্দির; তাঁর [illegible] তীর্থে গিয়ে দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে এলেন। ছবির দিল্লি-অঞ্চলের পরিবেশক ব্যক্তিগত সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তিনি ছবির কিছু রিল চেয়ে পাঠালেন। সেগুলি নিয়ে তাঁর বৈষ্ণো দেবীর মন্দিরে যাবার ইচ্ছা ছিল। কালার ল্যাবরেটরিতে তখনও প্রোসেসিংয়ের কাজ চলছিল, তাই তাকে রিল পাঠানো সম্ভব হয়নি। শোনা যায়, এই খবরে উক্ত পরিবেশকের এতই মন খারাপ হয়ে যায় যে, তাকে শয্যা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের এম এম এ চিন্নাপ্পা দেবরের নাম তো আপনারা শুনেছেন, যিনি জন্তু-জানোয়ার নিয়ে ছবি করেন, ভারতের ওয়াল্ট ডিজনি হওয়ার উচ্চাশা যাঁর মনে। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, যা-কিছু খ্যাতি, অর্থ, সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন সে সবই প্রভু মুরুগানের কৃপায়। দেবরের উপার্জনের অর্ধাংশ চলে যায় কয়ম্বাটোর থেকে বারো মাইল দূরে অবস্থিত মারুতা-মালাই মন্দিরে। এই দানে তাঁর কখনও ভুল হয় না। শোনা যায়, দেবর নাকি আয়কর বিভাগের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছেন, প্রভু মুরুগান তাঁর পার্টনার!

দক্ষিণ ভারতের আর এক প্রযোজকের প্রায়-অবিশ্বাস্য একটি গল্পের উল্লেখও এখানে না করে পারছি না। তিনি কী করেছিলেন জানেন? যাবতীয় কালো টাকা কয়েকটি প্লাসটিক ব্যাগে ভরে তিনি সোজা একদিন চলে গিয়েছিলেন কাশী; সেখানে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেছিলেন টাকাভর্তি সেই ব্যাগগুলি। এইভাবে তিনি নিজেকে পাপমুক্ত করেন।

আমার কেমন যেন মনে হয়, প্রযোজকদের তরফে তীর্থযাত্রার ব্যাপারটা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। তার কারণ সম্ভবত এই ব্যবসার অনিশ্চয়তা। সেটাও যে এখন আগের তুলনায় অধিক। হয়তো শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন উৎসাহী কিছু ট্র্যাভল এজেন্ট - প্রযোজকদের এই ধরনের তীর্থ সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন। ওঁদের কাছে ব্যবসার একটা নতুন দিক তখন খুলে যাবে।
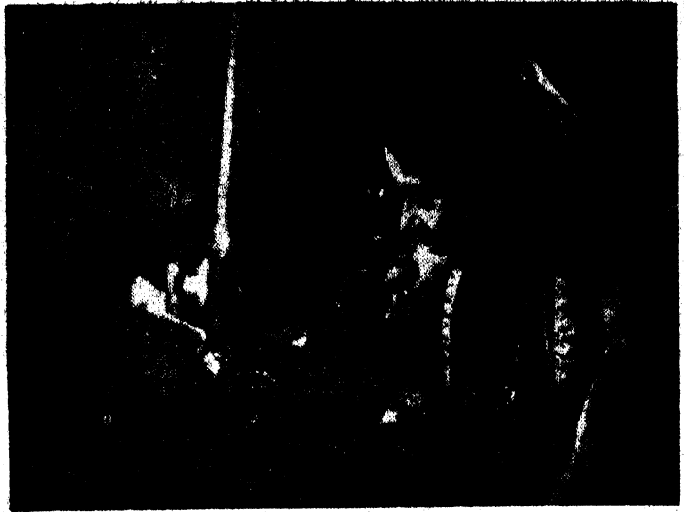
“দস্যুসর্দার রত্নাকর” (পরিচালনা : জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে শেখর চট্টোপাধ্যায় ও রেহানা সুলতান

জনৈক চিত্র পরিচালককে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তাঁর ছবি হিট করবে কিনা। প্রশ্নটির উত্তর দেবার আগে তিনি একটি গল্প বলেন। গল্পটি এই রকম :

'প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ একদিন ব্রিটেনের একটি বেস্ হসপিটাল পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। হাসপাতালে ছিলেন বহু আহত সৈনিক। প্রতি সৈনিকের শয্যার নীচে একটি কার্ডে তার আঘাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা রোগের নাম লেখা। সম্রাট লক্ষ করলেন, অনেক রোগীর কার্ডে বিশেষ জায়গাটিতে শুধু তিনটি অক্ষর চিহ্নিত : জি ও কে। পরিদর্শনের পর সম্রাট কথায় কথায় ডাক্তার-দের বললেন, তিনি একটি রোগের নাম দেখতে পাচ্ছেন—জি ও কে। এটা কি মহামারীর আকারে প্রকাশ পেয়েছে? এই রোগটাই বা কী ধরনের? ইতিপূর্বে তিনি তো ওই নামটাও কখনও শোনেননি! সম্রাটের প্রশ্নে চিকিৎসকরা কিছু বিব্রত বোধ করেন। অস্বস্তি কাটিয়ে অবশেষে তাঁকে জানানো হল, যখন রোগনির্ণয় করতে পারা যায় না, তখনই ওই তিনটি অক্ষরের শরণ নেওয়া হয়ে থাকে।'

এই গল্পটি বলে পরিচালক মহাশয় মন্তব্য করলেন : “ছবি আসর জমাতে পারবে কিনা এই প্রশ্ন সম্পর্কেও আমার ওই একই উত্তর—জি ও কে। অর্থাৎ কিনা, গড ওনলি নোজ্ (একমাত্র ঈশ্বরই জানেন)।”

এই অনিশ্চয়তাবোধ আজ চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ীদের আচ্ছন্ন করেছে। এবং সম্ভবত সেটাই ওঁদের ঈশ্বরভক্তির মূলে।

সুরঞ্জন

অজাতক : নতুন রূপে

এম বি এনটারপ্রাইজের "অজাতক" ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ রচিত এই নাটক বোদ্ধা দর্শকের কাছে সমাদরও পেয়েছে। সম্প্রতি অ্যাকাডেমি মঞ্চে "অজাতক" আবার মঞ্চস্থ হল নতুন রূপে। তিনটি চরিত্র নিয়ে এই নাটক। স্বামী, স্ত্রী এবং জনৈক নাট্য পরিচালক। স্বামী বিকাশের চরিত্রে আগের মত নিমু ভৌমিকই অভিনয় করেছেন। শিল্পী বদল হয়েছে বাকি দুটি চরিত্রে। স্ত্রী বনানীর ভূমিকায় এবার দেখা গেল ছায়াছবির সুখ্যাত শিল্পী আরতি ভট্টাচার্যকে। পরিচালক সীতেশের চরিত্রে রূপ দিলেন অসিত মুখোপাধ্যায়।

মূলত "অজাতক" দুটি চরিত্রের নাটক। এক অসুখী দম্পতি, যারা জীবনের এক যন্ত্রণাবোধের শিকার, তাদের নিয়েই নাটক। নাটকের ভিতরে আবার নাটক, তাই একজন নাট্য-পরিচালকের চরিত্রও আছে। তবে সে চরিত্র অনেকটা সূত্রধারের মত। সমাপ্তিতে দেখা যায় নাটক আর জীবন কখন যেন এক হয়ে গেছে। এক যন্ত্রণাময় স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে এই দম্পতি সকল পাপবোধ হতে মুক্তি পেতে চেয়েছে।

স্বামী বিকাশের চরিত্রে নিমু ভৌমিক এবার যেন আগের চেয়ে আরও পরিণত, অনেক সূক্ষ্ম। চরিত্রের গভীরে তিনি স্বচ্ছন্দে অবগাহন করতে পেরেছেন। স্ত্রী বনানীর চরিত্র অনেকটাই অন্তর্মুখী। আরতি ভট্টাচার্য সেই যন্ত্রণার সকরুণ রূপটি আশ্চর্য দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। শেষ মুহূর্তে তাঁর ভেঙেপড়া ভাবটি কোনদিনই ভোলবার নয়। পরিচালকের চরিত্রে অসিত মুখোপাধ্যায় স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয়ে চরিত্রটি নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। ভাস্কর মিত্রের আবহসুরেও এবার নতুন ব্যঞ্জনা। আবহ নাটকের মর্মকথার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের আলোর কাজও প্রশংসনীয়।

"অজাতক" নাটকে নিমু ভৌমিক, আরতি ভট্টাচার্য ফটো—দেশ

"বন্দী বিধাতা" (পরিচালনা : প্রভাত মুখোপাধ্যায়) ছবিতে মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও শুক্লা মুখোটি ফটো · দেশ

ক্যালকাটা মিউজিক সার্কল

মঞ্চের মধ্যমণি যদিও বিলায়েত খাঁ তথাপি তিনি কুণ্ঠিত, তবে স্বেচ্ছায়—কারণ, তাঁর সংকল্প সহবাদক পুত্র সুজাত উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ হোক, ছিনিয়ে নিক শ্রোতার নজর আর নজরানা। রাগ হাম্বীর বিলাবল—সংকর রাগ, আছে সুরের জটিল সমাবেশ যার উপলব্ধি এবং রূপায়ণ দাবি করে পরিণত বুদ্ধি ও পরিশীলিত সাধনা। অথচ কেমন অবলীলায় অনায়াস নৈপুণ্যে কিশোর সুজাত রাগটির প্রাণ প্রতিষ্ঠায় পিতাকে সাহায্য করে গেলেন। কোথাও ভুল হল না, পিতার তুলনায় গতি শ্লথ হল না। আর এই পিতা পুত্রের যৌথ উদাম সতর্ক হয়ে অনুসরণ করলেন সঙ্গতীয়া কিষেণ মহারাজ। এমন বললে কি অত্যুক্তি হবে যে কলা মন্দিরে অনুষ্ঠিত দি ক্যালকাটা মিউজিক সার্কলের সাম্প্রতিক সংগীত সম্মেলনের ঐ অনুষ্ঠানটিই সবচেয়ে বড় লাভ? এবার সম্মেলনের তিন বছর পুরো হল।

পাঁচ দিনের আসরে শ্রোতা বাড়াবার জন্যে শিল্পীর ভীড় বাড়াবার কায়দা করা হয়নি। সাধু বুদ্ধি। শিল্পীর সংখ্যা কম থাকায় প্রতিজনে যেমন নিজেকে ষোল আনা নিংড়ে দিতে পেরেছেন তেমন শ্রোতারাও গান বাজনার মজাটুকু আঁজলা ভরে ধরে নিয়েছেন।

এবারে একদিন সন্তুর শোনা গেল। বাজালেন শিবকুমার শর্মা। তাঁর হাতের গুণে এবং কল্পনার তেজে শ্রী বেশ একটি সরল শ্রী নিয়ে দেখা দিল। অনবদ্য বেহালা শোনালেন গোপাল কৃষ্ণণ। যেমন রূপ, তেমন রস। যে দুটি রাগের বিন্যাস ঘটালেন তাদের একটির সঙ্গে উত্তর ভারতের মালকোষ এবং অন্যটির সঙ্গে পূর্ব-কল্যাণের আত্মীয়তা আছে। সরোদে দেশ-এর বাহার ফোটালেন রাজীব তারানাথ। আহামরি না হলেও মন্দ হয়নি। লোকের খুব কৌতূহল ছিল তাল-বাদ্য-সঙ্গম নিয়ে। তিনটি বাদ্যের সঙ্গম—তাসা, নাকাড়া আর তবলা। অতএব শিল্পীও তিনজন—কিষেণ মহারাজ, দিলওয়ার খাঁ আর শ্যামকুমার মিশ্র। সবই হল, হল না শুধু রস। ত্রয়ীর মধ্যে একমাত্র দিলওয়ারই কানে লাগছিল। আর লোকে কিছুটা বা বিরক্ত হয়ে কিষেণকে তাসা বদলে তবলা ধরতে বলছিলেন।

গানের আসর জমজমাট করতে এগিয়ে এসেছিলেন আলাদীয়া ঘরণার পণ্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুর আর মেওয়াতী ঘরানার পণ্ডিত জসরাজ। খাম্বাজ বাহার আর আড়ানায় জসরাজ আর প্রথমজন নিয়মকানুনের শুকনো ডাঙায় দাঁড়িয়েও শিল্পরসের সরল স্পর্শে রাগগুলিকে রসিয়ে রেখেছিলেন সারাক্ষণ। বিশেষত নটকামোদ, ইমন কল্যাণ ও গৌড়-

মল্লার। মল্লিকার্জুন কণ্ঠসহযোগে মালবিকা কানন আর তবলা সঙ্গতে শ্যামল বসুকে পেয়েছিলেন। সাধু সঙ্গ; অতএব সং-সহযোগ। দরবারী কানাড়া, গৌড় মল্লার রসবোধ এবং নান্দনিক চেতনার পুনর্বার প্রমাণ রাখলেন। তাঁকে অতি নীরবে অথচ অতি যত্নে হারমোনিয়ামের সুরে সাহায্য করলেন সোহনলাল শর্মা। দিনকর কৈকিনীর পরিবেশনায় ইমন কল্যাণ এবং ধানী শ্রীভ্রষ্ট হয়নি। আমিনউদ্দিন ডাগর এক অসম্ভবের চেষ্টায় তৎপর হয়েছিলেন, 'অদ্ভুত কল্যাণ' নামে একটি রাগ রূপায়িত করার প্রয়াস করলেন। রূপায়ণে কারিগরি যতটা প্রকাশ পেল, কারুকার্য ততটা নয়। ঔড়ব জাতের রাগে মধ্যম পঞ্চম বাদ দিয়েও কায়দা দেখানো যেতে পারে তবে রস লাঞ্ছিত হয়। বিস্তার আর তান কর্তবের চটক সত্ত্বেও কিশোরী আমনকর ভীমপলশ্রীর কাঠামোটি দোষমুক্ত রাখতে পারেননি। তুলনায় কেদারা উপভোগ্য। মীরা ব্যানার্জীর গুর্জরী টোড়ী আর ঠুমরী পরিচ্ছন্ন ও পরিণত। সুররসিক

প্রবীণ শিল্পীর একক আসর

সম্প্রতি অ্যাকাদমি অব ফাইন আরটসে সংগীতম আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীতের আসরে একক শিল্পীরূপে গান শোনালেন সুবিনয় রায়। ষোলটি সুনির্বাচিত গানের ফুলে সাজানো সেদিনকার সুরের অর্ঘ্য সৌন্দর্যে ও শিল্পরসে স্মরণীয়। এই প্রভাতী অনুষ্ঠানের শুরু হয়েছিল 'প্রভাতে বিমল আনন্দে' এবং সবশেষে 'যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ'—তাদের সকলকে প্রণতি জানিয়ে শিল্পী বিদায় নিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের একটি সুন্দর ভাবপরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, সেখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব। একটা আত্মনিবেদনের আর্তিই ছিল সেদিনকার অনুষ্ঠানের মূল সুর। গানের কথায়, সুরে যেমন, শিল্পীর দরদী কণ্ঠেও তেমনই সেই সুর সহজ ও স্বতস্ফূর্তভাবে অনুরণিত হয়েছে।

তবে সুবিনয় রায়ের একটু সময় লেগেছে নিজেকে খুঁজে পেতে। ওঁর গলায় সুর যে কতটা নিখুঁত, রবীন্দ্রসংগীতের সুনির্দিষ্ট সুরে তালে তিনি কতখানি বিশ্বস্ত, তা কারোরই অজানা নেই। কিন্তু তবুও প্রথমার্ধের গানগুলি যেন ঠিক সেই মোহ বিস্তার করতে পারল না, যা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, অভিভূত করে। 'ধনে জনে আছি জড়ায়ে'র মতন আশ্চর্য সুরে গ্রথিত গান শিল্পী গেয়েছেন যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে, 'তরুতলে ছিন্ন বৃন্ত মালতীর ফুলে'র পরিবেশনার ভঙ্গিটি চমৎকার—তাহলেও দ্বিতীয়ার্ধেই যেন কলালক্ষ্মীরও অসীম প্রতাপ উপলব্ধি করা গেল যখন শিল্পী ধরলেন : 'জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ'। এর পর শিল্পী অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছেন 'সুধাসাগর তীরে', ভিন্ন স্বাদের স্পর্শ দিয়েছেন 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে'র পরিবেশনায়। এর মাঝখানে 'চির সখা হে ছেড়ো না'র সুরের সূক্ষ্ম কাজ স্বচ্ছন্দে মিশে গেছে এক গভীর ভাবানুভূতির সঙ্গে। এই ব্যাপারটি কিন্তু লক্ষ করবার মতন। অনেক সময় কঠিন সুরের কাজ শিল্পীকে ভাবলোক থেকে যেন হরণ করে নিয়ে যায়। তাতে শিল্পচাতুর্য বাহবা পেলেও, রবীন্দ্রসংগীতের রসমাধুর্যের অনিবার্য হানি ঘটে। আবার অনেক সময় ভাবাবেগের তাড়নায় শিল্পীকে সুর-তাল-লয়ের সুনির্দিষ্ট এলাকায় খুঁজে পাওয়া যায় না। এই দুয়ের সহজ ও স্বচ্ছন্দ মিলনেই যে রবীন্দ্রসংগীতের রস সার্থক, সুবিনয় রায় সেদিন তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আনন্দবর্ধন

ভাল-খারাপ লোকসংগীত

ক্যালকাটা ইউথ কয়ারের সপ্তদশ বার্ষিক অনুষ্ঠানে (রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত) বাংলার বাইরের কয়েকটি গোষ্ঠীর লোকসংগীত শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছিল। ইউথ কয়ারের সদস্যদের দ্বারা পরিবেশিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ও জনসঙ্গীতে নতুন উপস্থিত রসিকদের কর্ণের উদ্রেক করে। এমনিতেই একটি শহুরে গোষ্ঠীর পরিবেশনায় লোকসংগীত খুবই দুর্বিষহ হয়; আরও হয় যদি সে সব গান ভারতবর্ষের মত একটি বিরাট দেশের যত্রতত্র থেকে বিনা পরিশ্রমে আমদানি করা হয়ে থাকে।

শ্রোতাদের অশেষ ধন্যবাদ কুড়িয়েছেন রাজস্থানের দুটি দল—লঙ্গা এবং মঙ্গনিয়ার। লঙ্গা দলের পরিবেশনায় আমরা মাণ্ড, পাহাড়ী, ঝিঁঝিট জাতীয় রাগের ছায়ায় ছায়ায় এবং কাওয়ালী আঙ্গিকের গড়নগঠনে (বিশেষ বিশেষ জায়গায়) আমরা রাজস্থানী গ্রামের মানুষের পালা পার্বণ (যেমন বিবাহাদি) এবং সাথীহারা মনোবেদনার যে ছবি ফুটে উঠতে দেখেছি তা ভোলবার নয়। মঙ্গনিয়ার দলের পরিবেশনায় কারুগুণের প্রাধান্য আরও বেশীই ছিল। তবে গলার খেলায়, ভাবের মত্ততায় এবং অনুভবের গভীরতায় দুটি দলই অনমনীয় কাজ দেখিয়েছেন।

অসমীয়া গান গেয়ে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিলেন শ্রীভূপেন হাজারিকা। গোয়ালপাড়ার গান শুনিয়ে বিভোর করেছিলেন প্রতিমা পাণ্ডে। গলায় স্বরের সূক্ষ্মতা, বোধ এবং লোকগীতির প্রাণস্পর্শ তাঁর গানের মুখ্য আবেদন।

ইউথ কয়ার সম্প্রদায় বিরতির পর স্টেজে আসেন এবং ভি বালসারা সুরারোপিত ও'দের অতিনাটকীয়, লক্ষ্মীছাড়া 'ইউথ কয়ার' গানটি শোনান। গানের দুর্বলতা এবং লাইটিঙের আলো-আঁধারি খেলা মিলেমিশে দিনের আসরের পুরো মেজাজটাই আমূলে বদলে দেয়। এর পর অবশ্য ইকবালের 'সারা জঁহা সে অচ্ছা' গানটি ও'রা মোটামুটি ভালই গাইলেন। কিন্তু তারপর? "আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো" গানের সঙ্গে কিম্ভূত কিমাকার নাচ ফের অশান্তির সূচনা করল। পরে এল গোয়ার গান এবং অনেক অনেক কিছু। যা নিয়ে কিছু লেখা বা বলা খুব সহজ না। সংগীত সমালোচক

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
অশোককুমার সরকার
সহযুক্ত সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
অশোককুমার চ্যাটার্জি
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	৮২·০০ টাকা	৪১·৫০ টাকা	x
বিদেশে (আমাদের লণ্ডন অফিস মারফৎ)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(৪২ বর্ষ)

(৪০ সংখ্যা থেকে ৫২ সংখ্যা পর্যন্ত)

চুল এভাবে রঙ করবেন না!
ব্যবহার করুন ভারতের প্রথম হেয়ার ডাই যা আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে!
তুন!
গাদরেজ
র্মানেন্ট
হেয়ার ডাই
ভাবিক আর সমানভাবে আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে!
ন আর কষ্ট করে সিঁথি কেটে
একটি চুলে আলাদা করে রঙ
ানোর দরকার নেই। এই
নব আর প্রমাণিত গোদরেজ
লো চুল ডাই করাকে চুল ধোয়ার
সহজ ব্যাপার করে তুলেছে,
এই ডাই লাগানোর সঙ্গে
আপনা থেকে সমানভাবে
ছড়িয়ে পড়ে।
গোদরেজ পার্মানেন্ট হেয়ার ডাইতে
কোনো হানিকর রাসায়নিক পদার্থ
নেই। আছে এক হাল্কা মিষ্টি সুগন্ধ।
অনেক সপ্তাহ ধরে এ আপনার চুলকে
করে রাখে, নরম, তারুণ্যপূর্ণ, সুন্দর এবং
স্বাভাবিক কালো!
পুরুষদের জন্যে, মহিলাদের জন্যেও!
২টি রঙে: স্বাভাবিক কালো, গাঢ় খয়েরী।
রেজ পার্মানেন্ট হেয়ার ডাই, সব ডাইকে ছাড়িয়ে গেছে, এটি লাগানো—
শু করার মতই সহজ!
Godrej
Permanent
hair dye
CMGS-69-234 BEN

call—cloth
Shilpi 2 CM-6/75 BEN

কেয়ারফ্রী* সুরক্ষা

এর মানে হ'ল সম্পূর্ণ সুরক্ষা। আপনি এর জন্য যে মূল্য দেন উপকৃত হন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী।

মাসের ওই পাঁচটা দিন স্ত্রীলোকদের শরীরের জন্য বিশেষ ধরণের সুরক্ষার প্রয়োজন হয়, যাঁর ওপর তাঁরা নির্ভর করতে পারেন : এটি হ'ল কেয়ারফ্রী সুরক্ষা। স্ত্রীলোকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে জগদ্বিখ্যাত জনসন এণ্ড জনসন তৈরী করেছেন এই কেয়ারফ্রী, যেটির অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য স্ত্রীলোকেরা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

বিশেষ ওয়াণ্ডাররাপ কভার

এর জন্য কেয়ারফ্রী অবিকৃত অবস্থায় থাকে... সাধারণ ন্যাপকিনের মত কুঁচকে যায় না। তাছাড়া এটি সব জলীয় পদার্থ ভেতরের স্তরের মধ্যে টেনে নেয় বলে, আপনার ত্বক শুকনো ঝরঝরে থাকে এবং কোন অস্বস্তি বোধ হয় না।

নীলরঙা প্ল্যাস্টি-শীল্ড রক্ষাকবচ

কেয়ারফ্রী-র তলা আর অন্য পাশ রক্ষাপ্রদ পলিথিন দিয়ে ঘেরা—যার ফলে ছিটিয়ে পড়ার বা কাপড়ে দাগ লাগার কোন ভয় নেই।

বাড়তি শুষে নেবার ক্ষমতাসম্পন্ন জিনিষ

ভালভাবে শুষে নেয়, নিশ্চিন্তভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে।

প্রান্তে টুকরো কাপড় যাতে খাপ খাইয়ে পরা যায়

একমাত্র কেয়ারফ্রী বিন্যাসযোগ্য দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়, যাতে আপনার শরীরের গঠন অনুযায়ী ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। প্রত্যেক প্যাকের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যের একটি কেয়ারফ্রী বেল্ট।

সহজে ফেলে দেওয়া যায়

কেয়ারফ্রী ন্যাপকিন নিরাপদে সহজেই ফেলে দিতে পারা যায়, কেননা ফ্লাশ করলেই জলের মধ্যে সব অদৃশ্য...তাই আপনি যখন ঘরের বাইরে থাকেন, কিম্বা ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখন এটি প্রকৃত সহায়।

কেয়ারফ্রী সুরক্ষা : যে স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ নিরাপত্তার কথা ভাবেন, তাঁদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

১৮টি ন্যাপকিনের সাশ্রয়মূলক ইকনমি প্যাক কিনুন

Carefree
SANITARY NAPKINS
WITH 3-WAY PROTECTIVE PLASTI-SHIELD

© J&J 76

কেয়ারফ্রী : যুগপৎ সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা

স্যানিটারী ন্যাপকিনের ব্র্যাণ্ড। কেয়ারফ্রী এবং জনসন এণ্ড জনসন হ'ল ইউ এস এ-র জনসন এণ্ড জনসন-এর ট্রেডমার্ক। Johnson & Johnson*

চিঠিপত্র

বিবাদী স্বর

গত ৮ই জুলাই তারিখের দেশ পত্রিকায় "রাগ-অনুরাগ" প্রবন্ধের আলোচনায় দেখলাম সুভাষ চন্দ মহাশয় বিবাদী স্বরের প্রসঙ্গে পণ্ডিত রবিশঙ্করের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। পণ্ডিত রবিশঙ্কর এক জায়গায় বলেছেন, "...যে সুরটা লাগে না, লাগলে রাগের রূপ নষ্ট হয় তাকে বলি বিবাদী।" সুভাষবাবুর মনে হয়েছে পণ্ডিতজী "বিবাদী" অর্থে "বর্জিত" বোঝাতে চেয়েছেন। যদিও সুভাষবাবু তাঁর আলোচনায় তথ্যসহ "বিবাদী" এবং "বর্জিত" স্বরের আলাদা অর্থ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তবুও বলব পণ্ডিত রবিশঙ্করের বক্তব্যে কোনও ভুল ছিল না।

বিবাদী স্বর কাকে বলে? যে স্বর রাগের শত্রু অর্থাৎ যে স্বরের প্রয়োগে রাগরূপ নষ্ট হয়, তাকে বলে "বিবাদী স্বর"। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে রাগের সঙ্গে এ স্বরের বিবাদ। বিবাদী স্বরের প্রসঙ্গে সংগীত শাস্ত্রেও বলা হয়েছে "...স্বরো বিবাদী বৈরী"। সংগীতের ধনামধন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বিবাদী স্বরের আলোচনায় যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি [illegible]য়েছেন, সেখানেও পাওয়া যাচ্ছে [illegible] বিবাদী বর্জিতস্বরঃ", "...বিবাদী তু [illegible] ত্যাজ্যঃ", "...রাগেষু শত্রুতুল্যাঃ [illegible]দিনঃ" এই রকম সব উক্তি। আমরা [illegible]ন বর্জিতস্বরের প্রয়োগে রাগের রূপ [illegible] হয়ে যায়। তাহলে "বিবাদী" এবং [illegible]র্জিত" স্বরের দুটি আলাদা অর্থ [illegible] কি?

[illegible] তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা [illegible] যে বিবাদী অর্থাৎ বর্জিত স্বরের [illegible]ং প্রয়োগ রাগের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে [illegible]র। তবে এই রকম প্রয়োগের মধ্যে [illegible]ষ্ট সতর্কতা এবং মুনশীয়ানার [illegible]য়োজন আছে। অনেক বিদগ্ধ সংগীত-[illegible]রী ইমন রাগের গান্ধারের সঙ্গে অল্প [illegible]টু শুদ্ধ মধ্যমের স্পর্শ লাগিয়ে [illegible]গের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে [illegible]লেন। এ যেন শত্রুর ঘাড় ধরে নিজের [illegible]জ করিয়ে নেওয়া। তবে সব সময় [illegible]ন রাখা উচিত যে বিবাদী মানেই [illegible]গের বর্জিত স্বর। কাজেই এর স্বল্প [illegible]বহারও সতর্কতা এবং কৌশল-[illegible]পেক্ষ। অসাবধান হলেই রাগভ্রষ্ট [illegible]বার সম্ভাবনা।

বিবাদী স্বরের সংজ্ঞা বোঝাতে এতদিন পরে সুভাষবাবু ভরতের নাট্যশাস্ত্র উপস্থিত করেছেন। সুভাষবাবু নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে ভরতের মতে ললিত, বেহাগ এবং দরবারী কানাড়ায় যেসব স্বরের "বিবাদী" হওয়া উচিত ছিলো, সেগুলি ঐসব রাগে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এর কারণ কি? সুভাষবাবু ভুলে গেছেন যে ভরতের যুগের স্বরগ্রাম, শ্রুতি ব্যবস্থা, রাগের নিয়মকানুন প্রভৃতির খোল নলচে এতদিনে সবই বদলে গেছে। এ যুগের সংগীতের আলোচনায় ভরতের মতামত টেনে আনবেন না। সংগীত শাস্ত্র অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

আট দশক আগে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "গীতসূত্রসার" গ্রন্থে [illegible] "বিবাদী" এবং "বর্জিত" স্বরের আলাদা অর্থ খাড়া করে সেই একই গোলমালের সৃষ্টি করেছেন। তিনিও দেখছি বর্জিত স্বরকে বিবাদী বলতে নারাজ। বর্জিত স্বর যদি রাগের ক্ষেত্রে বিবাদী (বিবাদের সৃষ্টিকারী) না হয়, তাহলে রাগের বিবাদ আর কার সঙ্গে? গায়ের জোরে "বিবাদী" এবং "বর্জিত" স্বর নাম দিয়ে দুটো আলাদা সংজ্ঞা তৈরী করা যায় না। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে "বিবাদী"ই বর্জিত এবং বর্জিতই বিবাদী। যিনি ব্যাঘ্র, তিনিই শার্দুল।

আশা করি উপরোক্ত আলোচনাটি সুভাষবাবুর বিভ্রান্তির অবসান ঘটাতে কিছুটা সাহায্য করবে।

প্রদীপকুমার চক্রবর্তী
কটক-১

দাদাঠাকুর

গত ৮ই জুলাই তারিখের দেশ পত্রিকায় শ্রীহিমানীশ গোস্বামী মহাশয় আমার 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর' গ্রন্থের যে সমালোচনা করেছেন তা পড়লাম। দাদাঠাকুরের বিখ্যাত গান 'কলকাতার ভুল' গ্রন্থের শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয় তাঁর 'দাদাঠাকুর' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আমার 'সেরা মানুষ দাদাঠাকুর' বইতেও আমি গানটি তুলে দিয়েছি। হিমানীশবাবু লিখেছেন 'নলিনীবাবুর বইতে যে গান ছাপা হয়েছে সেটি নির্মলবাবুর বইতে ছাপা গানের কাছাকাছি হলেও প্রচুর পার্থক্য রয়ে গেছে' এবং আমি কোন সূত্র থেকে গানটি পেয়েছি তার উল্লেখ না থাকায় 'একটু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এবার আমার পাওয়ার সূত্রটি জানাই। একদা দাদাঠাকুর নিজে হাতে ওই 'কলকাতার ভুল' গানটি আমার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন এবং তিনি যেমনটি লেখেন আমি আমার বইতে হুবহু ঠিক তেমনটি উদ্ধৃত করেছি। দাদাঠাকুরের সেই লেখাটির একটি আলোকচিত্র এই পত্রের সঙ্গে দিলাম। দাদাঠাকুরের কাছ থেকে শুনিনি বা তাঁর কাছ থেকে পাইনি এমন কোনো তথ্য আমার বইতে যে লিপিবদ্ধ করিনি এই আলোকচিত্রটি তার একটি প্রমাণ। হিমানীশবাবু লিখেছেন 'কোন সূত্র থেকে পাওয়া গেছে সেটা জানানো দরকার ছিল বলে মনে হয়।' এই কথার তাৎপর্য আমার বোধগম্য হল না। আমি দাদাঠাকুর সম্বন্ধীয় একাধিক গ্রন্থ বা একাধিক লোকমুখ থেকে এই কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিনি। সুতরাং সূত্র প্রকাশের প্রশ্নই ওঠে না। দাদাঠাকুর আমাদের বাড়িতে আসতেন এবং আমাদের সৌভাগ্যবশত দীর্ঘদিন থাকতেন। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনা করতেন সেই সময়। তাঁর সেই সরস আলাপচারিতা থেকেই আমার যা কিছু সংগ্রহ। দাদাঠাকুর আমাদের ভালোবাসতেন বলেই নিজের লেখা আত্মজীবনীর অংশটি আমাদের হাতেই তুলে দিয়ে যান, যা এই গ্রন্থের প্রথমেই ছাপা হয়েছে। তা ছাড়া দাদাঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র, স্নেহভাজন শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত আমার লেখা বইটি পাঠ করে লিখেছিলেন 'বই খুব ভালো হয়েছে।'

এরপর আমার দিক থেকে কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

নির্মলরঞ্জন মিত্র
কলকাতা-১।

[পত্রলেখক কর্তৃক প্রেরিত ফটোস্টাট কপি আমাদের হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণ কর্মে অসুবিধার জন্য তা প্রকাশ করা গেল না।—স]

সফদর হুসেনের গান : সমালোচকের জবাব

গত ৮ই জুলাইয়ের দেশে শ্রীসমর ভট্টাচার্য তাঁর 'মেহেদি হাসানের গজল' শীর্ষক চিঠিতে আমার 'সফদর হুসেনের গান' শীর্ষক রচনার কিছু মন্তব্যের মধ্যে 'ত্রুটি' আবিষ্কার করার যে প্রয়াস করেছেন তা তাঁর সংগীত ও গজলের বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণাই প্রকাশ করেছে—আর কিছু না।

প্রথমেই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আমি 'অলংকার' কি তা জানি না। তিনি লিখেছেন ('আমার অবগতির জন্য') : "অলংকার হচ্ছে নিয়মানুগ স্বরের আরোহণ-অবরোহণ" এবং "গলার সূক্ষ্ম কারুকার্য বা স্বরের কম্বিনেশন আর অলংকার এক জিনিস নয়।" প্রথমত তিনি অলংকার বলতে যা বোঝেন তা অলংকারের দুই শ্রেণীর একটি শ্রেণী মাত্র—অর্থাৎ শার্ঙ্গদেব বর্ণিত বর্ণালংকার। আবার এই শ্রেণীর অলংকারের বিষয়ে তাঁর ধারণাও ভ্রান্ত। শাস্ত্রীয় বর্ণালংকার চার শ্রেণীর—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী। শাস্ত্রে একটিও সম্পূর্ণ "আরোহণ-অবরোহণ" দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত গলার সূক্ষ্ম কারুকার্য অর্থাৎ মীড়, মুড়কী, খটকা, আশ (আমার "আবিষ্কৃত" প ম প অলংকার), গমক, জমজমা, কণ্, ঝটকা, গিটকারী ইত্যাদি সবই অলংকারের পর্যায়ভুক্ত—এইগুলিকে শব্দালংকার বলা হয়। শ্রীভট্টাচার্য আমার সংগীতজ্ঞানের বিষয়ে নিঃসন্দেহ নন বলেই মনে হয়, কাজেই তিনি বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর 'ভারতীয় সংগীতকোষ' (৪-৬) বা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর "সংগীত প্রবেশ" (তৃতীয় ভাগ,১৩৬-১৩৭) দেখে নিতে পারেন। স্বরের কম্বিনেশন ব্যাপক অর্থে দুই শ্রেণীর অলংকারও বোঝাতে পারে, তবে শ্রীভট্টাচার্য যেভাবে এই কথাটির প্রয়োগ করেছেন তাতে তিনি অলংকারহীন স্বরের পারস্পরিক সম্বন্ধই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন বলেই মনে হয় এবং তা না হলে তাঁর "বেগম আখতারের গজলে অলংকারের ব্যবহার নেই, আছে স্বরের কম্বিনেশন্ এবং মেহেদির বেলাও তাই" উক্তিটির কোনো অর্থ হয় না। কাজেই তাঁর "গলার সূক্ষ্ম কারুকার্য বা স্বরের কম্বিনেশন" কথাগুলিতেও পরস্পর বিরোধিতা দেখা যাচ্ছে।

শ্রীভট্টাচার্য প্রথমেই তাঁর সংগীতজ্ঞানের যা পরিচয় দিয়েছেন তা নিশ্চয় তাঁর বাদবাকি মতামতের বিস্তৃত বিশ্লেষণ বা আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রাখে না। তবুও ভ্রান্তকে পুরোপুরি ভ্রান্তির অন্ধকারে ফেলে ... অবগতির জন্য জানাই বেগম আখতারের গানে দুই শ্রেণীর অলংকারেরই যথেষ্ট প্রয়োগ ছিল এবং মেহেদি হাসানের গানে এইগুলির ব্যবহার লক্ষণীয় ভাবে সীমায়িত। তবে আমি মেহেদি হাসানের গানে কোনো অলংকার নেই এই রকম কোনো কথা লিখিনি—আমি লিখেছি "আজকালকার গজল, অর্থাৎ বেগম আখতারের গজল নয় মেহেদি হাসানের গজল, প্রায় অলংকারবিহীন লম্বা লম্বা স্বর গঠিত......"। অর্থাৎ এই ধরনের গজলে প্রধান অংশ লম্বা লম্বা স্বর, অলংকার বা জটিল কারুকার্য নয়। শ্রীভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য "প্রায়" কথাটি বাদ দিয়ে গিয়েছেন। শ্রীভট্টাচার্যকে দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে তিনি মেহেদি হাসানের কাজের যে স্বরলিপি দিয়েছেন তাতে আমি বিশেষ কোনো সূক্ষ্ম বা জটিল কম্বিনেশন্ খুঁজে পেলাম না বরঞ্চ বুঝতে পারলাম অতি সরল জিনিস শ্রীভট্টাচার্যকে "বিস্ময়"-এ ভরে দেয়—তিন মাত্রার মধ্যে র্স র্র র্জ র্র র্স তান (অর্থাৎ দুনির থেকে একটি স্বর কম) লাগানোর মধ্যেই বা কি জটিলতা আছে এবং তারপর "দমদম জজ্জরসর" ব্যবহারেও যে কি সূক্ষ্মতা আছে, আজকালের গজলের লয়ে, তা বোঝা আমার পেড় খাওয়া সংগীত বিশ্লেষণ ক্ষমতার বাইরে।

"রঞ্জিশহী সহী দিলহী" গজলটিতে গাওয়ার 'যথেষ্ট মুনশীয়ানা' (মণ্ডের কাজ বলে তিনি যে স্বরলিপি দিয়েছেন তাতে কিন্তু কোন মণ্ডের উপাদান খুঁজে পেলাম না) থাক বা না থাক তার সংগে ঢুলু ঢুলু ফিল্মি ন্যাকামির কি সম্পর্ক? সেটা তো একটা কণ্ঠস্বরের আমেজের ব্যাপার এবং শ্রীভট্টাচার্য সেটি মেহেদি হাসানে যে নেই তা প্রমাণ করতে পারেননি।

মহফিল শব্দের প্রত্যেকটি অক্ষর স্বল্পস্থায়ী এবং যে একমাত্র শেষের 'ল্' অক্ষরের উপর কাজ করা যায় সেটা আমার অজ্ঞাত নয়। সফদর হুসেনের কাজের আগে একমাত্র মালিকা পুখরাজের একটি রেকর্ড—"এহদে রংগীকি ইয়াদগার"—উনকা সতায় তমাম রাত' লাইনের 'না' অক্ষরের উপর চার স্বরের কাজ ... বলেই এইটি উল্লেখযোগ্য মনে করেছিলাম। মেহেদি হাসানের "মহব্বত করনেওয়ালে"র কথা লেখার সময় মনে আসেনি। কিন্তু শ্রীভট্টাচার্য নিজেই এই গানের কথা টেনে এনে আমার বিচারে নির্ভুলতা প্রমাণ করে দিয়েছেন—তিনি লিখেছেন "শিল্পী 'মহফিল' শব্দে 'প নি সা' এই স্বর তিনটি ব্যবহার করেছেন।" আমি লিখেছিলাম "যেখানে আজকালকার গজল গায়করা মহফিল শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে খুব বেশী করে দু-তিনটি স্বর লাগান......"—দেখুন কি ভাবে মিলে গেছে। এই তিনটি স্বর ব্যবহার করার পর মেহেদি হাসান মাপা লয়ে মুখড়ায়ে ফিরে এসেছেন কিনা তা অপ্রাসংগিক।

শেষে বলতে চাই আমার লেখার মন্তব্যের লক্ষ্য মেহেদি হাসান ছিলেন না এবং আমি একবারও বলতে চাইনি যে তিনি গজল গাইতে পারেন না। আমার লক্ষ্য ছিল বছর দশ পনেরর ... গড়ে উঠেছে

মহেদি হাসান যার একটি প্রতীক য) এবং যাঁদের এ ব্যাপারে আগ্রহ াছে তাঁরা বরকত আলী খাঁ, মালিকা খরাজ এবং বেগম আখতারের আদি র্বের গজলের রেকর্ড বা টেপ শুনে চার করতে পারেন যে আজকালকার নে গজলের আমূল পরিবর্তন হয়েছে না এবং সে পরিবর্তন ভালোর জন্য য়ছে না খারাপের জন্য।

লাক্ষ গুপ্ত

ীশু কে ছিলেন

আপনার ২৪ জুনের পত্রিকায় ীশু কে ছিলেন?" এই প্রবন্ধটি ড়ছি। শ্রীমতী কেতকী কুশারী সেন তাঁর কথায় সমর্থন কিউপিড ং আর্মস্ট্রং-এর গ্রন্থে পেয়েছেন। তু যীশু খ্রীষ্টের জীবনচরিত ল্লষণ চলছে বহু শতাব্দী থেকে। রোপে যাঁরা খ্রীষ্টান নন তাঁরা ুকে সাধারণ স্তরে নামবার া করেছেন। গত শতাব্দীতে না থেকে এদেশে রামমোহন প্রিসেপটস অব যিসাস) ন্ত বহুজনই মানবপুত্রকে মানব তে চেয়েছিলেন। তিনি মানব তো লনই, উপরন্তু ঈশ্বরের একমাত্র র্ অবতার ছিলেন—ভক্ত খ্রীষ্ট-বাসীরা একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস ন। এ বিশ্বাস যীশুর দ্বাদশ তরুণ শিষ্যদেরও হয়েছিল। সাক্ষাৎ ারা ছিলেন সাধারণ মানুষ—জেলে, না আদায়কারী প্রভৃতি—তারা ুর মৃত্যুর পর ছত্রভংগ হন। পূর্ব ত্রতে কেউ কেউ ফিরে যান। কিন্তু ন একটি ঘটনা ঘটেছিল—ঘটেছিল । সেইকাল থেকে খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস য়ছিলেন—যা আবার তাঁদের এক-গার জমায়েত করে। সেটা হলো ষ্টের পুনরুত্থান। "অ্যাক্টস অব অ্যাপসলস্" গ্রন্থে এ সবের বিবরণ ছে। সাক্ষাৎ শিষ্যরা মনগড়া একটা পারের কথা জোর গলায় প্রচার করে-, এ যুক্তি টেঁকে না। কারণ া বানিয়ে তার জন্যে কেউ প্রাণ য়ছেন এমনটি কি হয়? তাঁদের বাসে সত্যের জোর ছিল। না হলে ক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপ, ফ্রিকা, এসিয়ার কোন কোন দেশের শ বিশেষ, এমন কি ভারতবর্ষের ক্ষণাত্যে খ্রীষ্টধর্মে মানুষ দীক্ষিত না। এ সব "মিথ" বলে উড়িয়ে ার প্রবণতা সেকাল থেকে একাল ন্ত পন্ডিত এবং মূর্খ করেছেন। ষ্টমণ্ডলী (চার্চ) এই ঐতিহ্য াংশিষ্যদের কাছেই পেয়েছিলেন। ষ্টধর্মাবলম্বীদের স্বকপোলকল্পিত া এর জন্যে নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং াবরণ করতে মানুষ রাজি হত মানবসেবার এমন আদর্শ তাঁরা তুলে ধরতে পারতেন?

ভারতবর্ষেও যাঁরা মহৎ মানুষ া খ্রীষ্ট চরিতমানসের অনুপম টা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। রাম-ন, কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ, কানন্দ থেকে গান্ধীজী খ্রীষ্টকে ন করেননি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শুতীর্থ"-এর মত কবিতা লিখে-ছেন।

নিয়ে ক্যালভারীযাত্রী খ্রীষ্ট, যামিনী রায় যীশুর জীবনের নানা ঘটনার ছবি, নিখিল বিশ্বাস খ্রীষ্টের যন্ত্রণা-ভোগ এবং মৃত্যুর দৃশ্য এঁকেছেন। খ্রীষ্ট যদি শুধুই সাধারণ মাপের ধর্মগুরু হতেন তাহলে এই ভারতবর্ষের নেতা, ধর্মতত্ত্ববিদ, কবি, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের হৃদয়ের এমন ভক্তি ভালবাসা পেতেন কি? দুই সাহেবের সমালোচনা সত্ত্বেও শ্রীমতী ডাইসনকে এই দিকগুলো সম্বন্ধে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

ইউরোপে "ডিমাইথলজাইস" বা পুরাণের মোড়ক খুলে ফেলার ঝোঁকটা তোলেন জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ রুডলফ বুলটম্যান প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। তারপর অ্যালবার্ট সোয়েৎসার লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইন কোয়েস্ট ফর দ্য হিস্টরিকাল যিসাস"। বুলটম্যান, কার্ল বার্থ থেকে বিশপ জন রবিন-সন পর্যন্ত ধর্মতত্ত্ববিদদের কাছে সমস্যাটা হল—কিভাবে নৈরাশ্য এবং অবিশ্বাসের যুগে খ্রীষ্টের সুসমাচার বোধগম্য করবেন। সুতরাং কিউপিড বা আর্মস্ট্রং যুগান্তকারী কিছু করেছেন শ্রীমতী ডাইসনের এই দাবিটা ভুল। ইউরোপ আমেরিকায় তর্ক চলছে অনেক দিন ধরে। দুই সাহেবের গ্রন্থটি তর্কটা অ্যাকাডেমিক সারকেল থেকে সাধারণ জনপ্রিয় স্তরে এনেছে এইমাত্র।

তর্কটা খুবই জটিল। এর বহু দিক। এসব ভাল করে জানা না থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা। সব ভুলগুলি চিঠির ক্ষুদ্র পরিসরে বলা সম্ভব নয়। না বুঝে সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার রূপটা কি দাঁড়ায় সেটা বিনীতভাবে আমি দেখাবার চেষ্টা করব।

তাসিতুসের "অ্যানালস" সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তাও পরের কাছ থেকে ধার করা। তাসিতুসের বই-এর আসল বয়ান নিম্নে দিলাম: (রোমে সম্রাট নীরো আগুন লাগিয়ে-ছিলেন) এই গুজব দূর করার জন্য নীরো ঐ লোকদের (অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের) ওপরে সব দোষ চাপিয়ে দিলেন এবং তাদের ওপর খুব অত্যাচার চালাতে লাগলেন। তাদের দুষ্কৃতির জন্য তারা সকলের ঘৃণার পাত্র। লোকে তাদের খ্রীষ্টান বলে। এই নামের উৎপত্তি হয় খ্রীস্টাস নামে একটি লোকের নাম থেকে। সে সম্রাট টাই-বেরিয়াসের আমলে পন্টিয়াস পাইলেট কর্তৃক প্রাণদন্ডে দন্ডিত হয়েছিল। এইভাবে এই ক্ষতিকর কুসংস্কার সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়েছিল। কিন্তু পরে শুধু জুডিয়া প্রদেশেই নয়, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় এই কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং শেষে রোমেও এল। সেখানে দুনিয়ার যাবতীয় বিশ্রী জঘন্য কুসংস্কার চারিধার থেকে এসে জড়ো হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে।"

শ্রীমতী ডাইসন বলেছেন, তাসিতুসের লেখা থেকে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টবিরোধী কথাগুলো বাদ দিয়েছে। তাই যদি হতো তাহলে উপরের উদ্ধৃত অংশটা তারা কেন রাখবে? তাসিতুস ছাড়াও আরেকজন সমসাময়িক প্রসিদ্ধ

সম্বন্ধে লিখেছেন। কিন্তু শ্রীমতী ডাইসন সে বিষয়ে কিছুই বলেননি। প্লিনি সম্রাট ট্রেজানের কাছে লেখা একটি চিঠিতে খৃীষ্টানদের সম্বন্ধে লিখেছেন যে, অনেক খোঁজখবর করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন —"তাদের (অর্থাৎ খৃীষ্টানদের) দোষত্রুটির নীট যোগফল এই যে নির্দিষ্ট একটি দিনে তারা একত্র হয়ে খৃীষ্টের উদ্দেশে স্তবস্তুতি করে এমন-ভাবে যেন তিনি একজন দেবতা। তারা শপথ নেয়—অন্যায় করার জন্য নয়—বরং চুরি, ডাকাতি ব্যাভিচার ও বিশ্বাসভঙ্গ না করার জন্য।........ এই অনুষ্ঠান শেষে........তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে। এ ব্যাপারে আমি তাদের কোনো দোষ দেখিনি। আমি আইনজারী করে যাবতীয় গুপ্ত সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করায় ওরা এটা বন্ধ করেছে।" (মূল লাতিন থেকে অনুবাদ।) মনে হয় শ্রীমতী ডাইসন তাসিতুস বা প্লিনির লেখার সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন।

তাসিতুসের লেখার ফাঁকগুলো সম্বন্ধে প্রাচীন লাতিন সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন। তাঁর Annals গ্রন্থের ষোল খণ্ডের মধ্যে তিন খণ্ডের অংশবিশেষ পাওয়া যাচ্ছে। চার খণ্ড লুপ্ত। খৃীষ্টানরা এই সব গ্রন্থ নষ্ট করেছেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন, কিন্তু তার কোনো প্রমাণ দেননি। তিনি বোধ হয় জানেনই না এতগুলো গ্রন্থ কালের কবলে পড়েছে। তাসিতুস রোম সাম্রাজ্যের ইতিহা[স] লিখছিলেন। যা তাঁর দৃষ্টিতে ইহুদীদের ধর্মীয় কোন্দল তা তা[র] ইতিহাসে কেন স্থান পাবে? খৃী[ষ্ট] সম্বন্ধে যেটুকু উল্লেখ আছে তা রো[ম] এবং সম্রাট নীরো সম্পর্কিত বলে স্থা[ন] পেয়েছে।

প্রশ্ন হলো যীশুখৃীষ্ট যা[দি] "মিথিক্যাল ফিগার" হন তাহলে ধর্ম[ে] বিশ্বাস এবং মানবসেবার জন্য যুগে যুগে এত মানুষ এমন অকপটভাবে প্রাণ দিতে পারতেন কি? এ[ই] শতাব্দীতেও দীনবন্ধু এনড্রু[জ], অলবার্ট সোয়েৎসার, মার্টিন লুথা[র] কিং, মাদার টেরেসা এবং আর[ও] অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত মানুষ সে[ই] কল্পিত মানবপুত্রের জন্য এভা[বে] আত্মোৎসর্গ করতেন কি?

ওঁর লেখার কয়েকটি ভুলমা[ত্র] এখানে নমুনাস্বরূপ উল্লেখ কর[া] হলো। যাতে পাঠকরা বুঝতে পারে[ন] ব্যাপারটা।

বিশপ জেমস ডি রেয়ার
(বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিশপ)
কলকাতা-৮

লালবিহারী দে

১লা জুলাই তারিখের দে[শ] পত্রিকায় সুমিতকুমার সেনগুপ্তে[র] 'রাগী সমালোচক বনাম শান্ত লেখক' প্রসঙ্গে দু-একটি কথা।

লালবিহারী দে বাংলা এব[ং]

...লিখেছেন।
...লেখক ও'র দুটি বিখ্যাত বই-উল্লেখ করেন "গোবিন্দ সামন্ত" ... "ফোক টেলস অফ বেঙ্গল।" ...তীয়টি ইংরেজীতে লেখা কিন্তু ...টি পড়ে কোন মতেই জানা যায় "গোবিন্দ সামন্ত" লেখক কোন ...য় লিখেছেন। "চন্দ্রমুখীর ...খ্যান" প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লেখক বলেন ...চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান নামক একটি ...না উপন্যাসের লেখক...." অথচ ...তে "গোবিন্দ সামন্ত"-র ভাষা ...খ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। ...খ যখন দেখি চার্লস ডারউইন ...টির প্রশংসা করেন তখন অনুমান ...নিতেই হয় বইটি উনি বাংলাতে ...ননি।

বইটি লেখক ইংরেজীতেই লিখে-...ন। ভূকৈলাসের সত্যবাদী ঘোষাল ...বিন্দ সামন্ত" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ...া অনুবাদ করেন। ১৮৮৩ সালে ...চন্দ্র মুখার্জী নামে এক ভদ্রলোক ...বিন্দ সামন্ত"-র অনুবাদে অগ্রসর ...লালবিহারী দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট, ৬ ...ম্বর, ১৮৮৩' সংখ্যায় লেখেন, ...warn all concerned that ...l proceedings will be ...n against any person who ...lishes the translation of ...inda Samanta into Benga-...r any other language".

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, কবি ...সনও গোবিন্দ সামন্তের ...সিত প্রশংসা করেন এবং চার্লস ...ইন গোবিন্দ সামন্ত পড়ে বইটির ...শক ম্যাকমিলানদের লিখেছিলেন, ...hall be glad if you would ...him with my compliments ...much pleasure and ins-...on I derived from read-...few years ago Govinda ...nta". (১৮ই এপ্রিল ১৮৮১) ...যে একটি প্রশ্ন। "আমরা তো ...রি না", "বরং আমরা বলি" (১৮ ... "কিন্তু আমরা মনে করি" ...পাতা, এসব "আমরা"-র লেখকের ...-র সংগে আর কে কে আছেন ...হলো না। এসব জায়গায় ...লেখা যায় কি-না জানার জন্যেই ...জিজ্ঞাসা।

...কপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
...পাড়া, হুগলী।

...র্ড সমালোচনা

...দশই জুন এর "দেশ"-এ ...ত শ্রীদেবাশিস দাশগুপ্তর ...-সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য

...শগুপ্ত দেবব্রত বিশ্বাসের সম্প্রতি ...ত ই-পি রেকর্ড-এর সমালোচনা ... লিখেছেন "...এদেশের নিয়ম ...রী ফিল্মে ব্যবহৃত হলেই সকলে ...সঙ্গীত নিয়ে মেতে ওঠেন।" ...তিনি এই অসাধারণ " গানের ...টি ("কেন চেয়ে আছো গো মা") ...কোন আলোচনাই করলেন না—...গানটি চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। ...নটি প্রসঙ্গে বলা যায় যে ...ে ব্যবহৃত হবার আগে অধিকাংশ ... গানটি শোনেননি। ফলে গানটির ...জন্মেছে চলচ্চিত্রে শোনার পরেই। ... চলচ্চিত্রে দেবব্রত বিশ্বাস ও

...দু...জনে গানটি গেয়েছেন —প্রধান কণ্ঠ সুশীল মল্লিকের।

দেবাশিসবাবুর লেখা আরেকটি বাক্য—বয়েসের জন্য অনেক সময় হয়ত কণ্ঠ ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি অথবা "ওই যে ঝড়ের মেঘে" গানে তাঁর কণ্ঠই ঝড়ের দোলা আনতে পারে বেশ গোলমেলে। 'অথবা' বাক্যটির প্রয়োজনের যাথার্থ্য বোঝা গেল না। তাছাড়া 'ঈপ্সিত লক্ষ্য' জিনিসটি কি? যদি ভাবসঞ্চার-এর কথা বলা হয় তবে প্রশ্ন দেবব্রত বিশ্বাসের গানে ভাবের অভাব কখনও ঘটেছে কি? আর 'কেন চেয়ে আছো গো মা' রেকর্ডটি প্রসঙ্গে বলা যায় 'পারফেকশনের' ওপর কেনো কথা চলে না। অবশ্য এটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। কারণ "রস আর রসায়ন" এক জিনিস নয়। বিশ্লেষণে রস কমই হয়। দেবব্রত বিশ্বাস সম্প্রতি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে গান না গাইলেও দু-তিন বছর আগেও যখন নিয়মিত গাইতেন তখনও তো তাঁর গলার ঐশ্বর্য সন্দেহাতীত ছিল। আর "কেন চেয়ে আছো গো মা" দেবব্রতবাবু ১৯৬৯ সালে রেকর্ড করেন (এই রেকর্ড-এর প্রকাশিত অন্যান্য গানগুলিও মোটামুটি ঐ সময়েই রেকর্ড করা হয়েছিল);—তখনই তাঁর গলায় বয়েসের ছাপ পড়ে যাওয়ায় তিনি ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেন না। দেবাশিসবাবুর এই আবিষ্কার অত্যাশ্চর্য—সন্দেহ নেই। দেবাশিসবাবুর "ওই যে ঝড়ের মেঘের কোলে"র প্রিলিউড মিউজিক অধিকন্তু মনে হয়েছে। ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকেরও তো নিজস্ব একটি ভাষা আছে। তার সাহায্য নেওয়া দোষের হবে কেন?

পরিশেষে বলি দেবব্রত বিশ্বাস আজকের দিনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্বাসিত নায়ক—এই ঘোষণায় ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে দেবব্রত বিশ্বাস রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ডের ব্যাপারে নানা নিষে-ধাজ্ঞার প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড করা বন্ধ করে দিয়েছেন। (এখন তাঁর যে সমস্ত রেকর্ড বের হয় তা বহুদিন আগেই রেকর্ড করা হয়েছিল।) একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে তাঁর রেকর্ড করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেটি ঠিক নয়।

সত্যজিৎ ঘোষ কলিকাতা-১৭

জয় হোক মানুষের

১৯৭৮, ৮ই জুলাই দেশ পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় গৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের "জয় হোক মানুষের" লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মানবদেহধারী সব মানুষ যে মনুষ্যত্বগুণসম্পন্ন নয় এটা সর্বত্র সর্বদা দেখতে পাই। মানবিকতা বোধ হারিয়ে মানুষ নিজেও কষ্ট পাচ্ছে এবং অপরকেও কষ্ট দিচ্ছে। এই সময়ে "জয় হোক মানুষের" এই লেখাটি মানুষের চৈতন্যকে জাগাতে সাহায্য করবে। নমস্কারান্তে

কমলা দেবী কলিকাতা-৫৪

ভ্রম সংশোধন

২২ জুলাই, দেশ-এ 'অবসরের গান: বোলান' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক সুধীর চক্রবর্তী। ভুলে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের নাম ছাপা হয়েছে।

৪৫ বর্ষ ৪০ সংখ্যা
২০ শ্রাবণ ১৩৮৫

চীপত্র

রবর্তী আকর্ষণ

পাদক : সাগরময় ঘোষ
নন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে
াদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং
ন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮
আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
ত।
এক টাকা
ান মাসুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
ঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

প্রশাসনিক বাস্তবতার দাবি

সম্পাদকীয়

হিরোসিমার উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করবার একটি নৈতিক যুক্তি ও সমর্থ ঘোষণা করেছিলেন সেদিনের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান। সেই ঘোষণার মর্মার্থ : বহু লক্ষ নিরীহ মানুষের প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা পরিহার করবার জন্য কয়েক হাজার নিরীহ ব্যক্তির প্রাণ বিনষ্ট করা মানবতার স্বার্থসঙ্গত নীতির অন্যথাচরণ নয়। ট্রুম্যানকথিত এই নীতির সূত্র ধরে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, বহুসংখ্যকের শান্তি ও স্বস্তির জন্য কিছুসংখ্যকের শান্তি ও স্বস্তি অপসারিত করলে সেটা অ-নৈতিক কোন বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে না। ভারতে আটক আইনের সরকারী বিধাতাদের কাছে ট্রুম্যানকথিত এই নীতি বস্তুত একটি আকাঙ্ক্ষিত তত্ত্বের সম্বল বলে বোধ হয়েছে ও সমাদৃত হয়েছে। সাধারণ জনজীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি স্বস্তির পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যদি কিছুসংখ্যক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক করে রাখবার দরকার হয়, তবে তাই করতে হবে। 'মিসা' এহেন অনুশাসনের একটি প্রত্যক্ষ নিদর্শন, যার উৎকট মহোৎসবে দেশের হাজার হাজার নাগরিক মানুষকে বিনা বিচারে কারাবাস ও নির্বাসনের শাস্তি স্বীকার এবং সহ্য করতে হয়েছে। উদারতর গণতান্ত্রিক আদর্শের ধারক-বাহক হবার অঙ্গীকার যাঁদের রাজনৈতিক কর্তব্যের একটি প্রধান ঘোষণা, তাঁদের পক্ষে বিনা বিচারে আটক করবার অথবা কারারুদ্ধ করে রাখবার কোন আইন অথবা প্রথার অনুমোদন অবশ্যই সম্ভব নয়। ভারতীয় জীবনে কেন্দ্রীয় শাসনিক ক্ষমতার পদ হতে কংগ্রেসের অপসারিত হবার পর যে জনতা-সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবং কয়েকটি রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতা যে অকংগ্রেসী একাধিক রাজনীতিক দলের দখলে এসেছে, তাঁদের প্রত্যেকেই বিনাবিচারে আটক আইনকে অনৈতিক অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করে প্রবল ভর্ৎসনার আঘাত হেনেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বামপন্থী সরকারও তাই করেছেন, বিশেষ করে বামপন্থিতার প্রধানতম নেতৃত্বের দল অর্থাৎ সি-পি-আই-এম। বিনা বিচারে আটক বন্দীদের এবং বিচারাধীন বন্দীদেরও অনেকের মুক্তি ঘোষণা করেছেন রাজ্য-সরকার।

কিন্তু জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে আইন ও শৃঙ্খলার দুরবস্থা এবং স্বস্তি-শান্তি-নিরাপত্তার নানারকম হানির ভয়াল দৃশ্য দেখে দেশের সকল শ্রেণীর নিরীহ-নির্দোষ মানুষের মনে আতঙ্কের যে প্রকোপ দেখা দিয়েছে সেটা নিতান্ত রাজনীতিক ইচ্ছাচারিত কোন দলের প্রচারের মুখরতা বলে মনে করা চলে না। সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্য যাদের কাছে অভ্যস্ত এক জীবিকাকর্মের মতো আচরণিক প্রকৃতি লাভ করেছে, তাদেরও পক্ষে গণতান্ত্রিক সমবেদনার এই যুক্তি আছে যে, তাদের বিনা বিচারে আটক করে না রেখে বিচারের মঞ্চে সমুপস্থিত করাই উচিত। কিন্তু এ ধরনের কোন দায়িত্ব-নীতি রাজ্যের সরকারী চিন্তার নিয়ামক হয়নি। তাঁরা বিনা-বিচারে আটক করা বন্দীদের অবাধ মুক্তি প্রদান করছেন ও করবেন।

কিন্তু বিচারাধীন বন্দীর মুক্তি ঘোষণা করবার কোন নৈতিক দায়িত্ব কি সরকারের থাকতে পারে? এই প্রশ্নে গণতান্ত্রিক বিবেকের বক্ষ হতে এই বাণীই সদুত্তর হয়ে ধ্বনিত হবে যে, বিচারাধীন বন্দীকে ক্ষমাময় মুক্তি প্রদান করা বা না-করা নিতান্তরূপে বিচারকের বিবেচনার অধীন একটি ক্রিয়াচার। আলিপুর বার এসোসিয়েশন প্রতিবাদ জ্ঞাপিত করে তাঁদের একটি বিবৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারকে এই অনুরোধ করেছেন যে, সরকার যেন বিচারাধীন বন্দীর বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলা তুলে নেবার নীতি পুনর্বিবেচনা করে দেখেন। বিশেষ করে নিদারুণ রকমের ঘৃণ্য ও ভয়াবহ যত ধর্ষণ, হত্যা ও ডাকাতির মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলা প্রত্যাহার ও তাদের মুক্তি যেন নির্দেশিত না করা হয়। এসোসিয়েশনের মন্তব্য : এই শ্রেণীর অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার অবসিত করে মুক্তি দিয়ে দিলে সমাজকে অপরাধপ্রবণ দুর্বৃত্তদের করুণার (অর্থাৎ অকরুণার) মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এক আলোচনার আসরে দুর্বৃত্তদের তথা সমাজবিরোধী অপরাধক্রিয়ার দমনের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা এবং পুলিশের অধিকতর তৎপরতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন, সেটা প্রত্যেক সভ্য দেশের সামাজিক জীবনের একটি আদর্শিক কর্তব্যের কথা। সামাজিক চেতনা প্রবল হয়ে বাধা না দিলে সরকারের কোন বিভাগীয় কর্মতৎপরতার একক কৃতিত্বে নিরাপত্তা সুবিহিত করা সম্ভব নয়। পুলিশের পক্ষ থেকে একটি অসুবিধার অভিযোগ এই যে, আদালতের সিদ্ধান্ত পুলিশের অভিযোগের নিবেদন প্রমাণসিদ্ধ বলে বিশ্বাস করতে না পেরে অর্থাৎ প্রমাণাভাবে প্রায়ই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিয়ে থাকেন। এটা একটা সমস্যা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে মুখ্যমন্ত্রীর কথিত একটি বিস্ময়কর পরামর্শের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি পুলিশকে এমনভাবে অভিযোগের নিবেদন রচনা করতে বলেছেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যেন জামিনে মুক্ত হওয়া সম্ভবই না হয়। ভয় হয়, মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য পুলিশের পক্ষে একটি প্রহেলিকার ভাষণ বলে বোধ হবে। তবে কি মামলাকে অর্থাৎ অভিযোগের বয়ানকে বেশ কঠোর করে 'সাজাতে' হবে? এটা কি গণতন্ত্রের সার্থক প্রক্রিয়া? বলা বাহুল্য, এধরনের উপদেশ পুলিশের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতার উৎসাহকারক কোন প্রস্তাব নয়। প্রশাসনিক বাস্তবতার দাবি সব সময় ও সকল ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক বিনয় মেনে চলতে পারে না। এ এক বিচিত্র স্ববিরোধিতার ক্রিয়া। আইন ও বিচারে, প্রশাসন ও প্রশাসিত জনজীবন সব ক্ষেত্রের পরিদৃশ্যে যে দুরপনেয় স্ববিরোধিতার প্রকোপ দেখা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর এহেন উক্তিতে সেই স্ববিরোধিতারই একটি ঝলক-দর্শন দেখা গেল।

অশ্বমেধ - অশ্বের সঙ্গে
মোকাবিলা
হিন্দি
আধিপত্য
দক্ষিণের
রাজ্য সমূহ
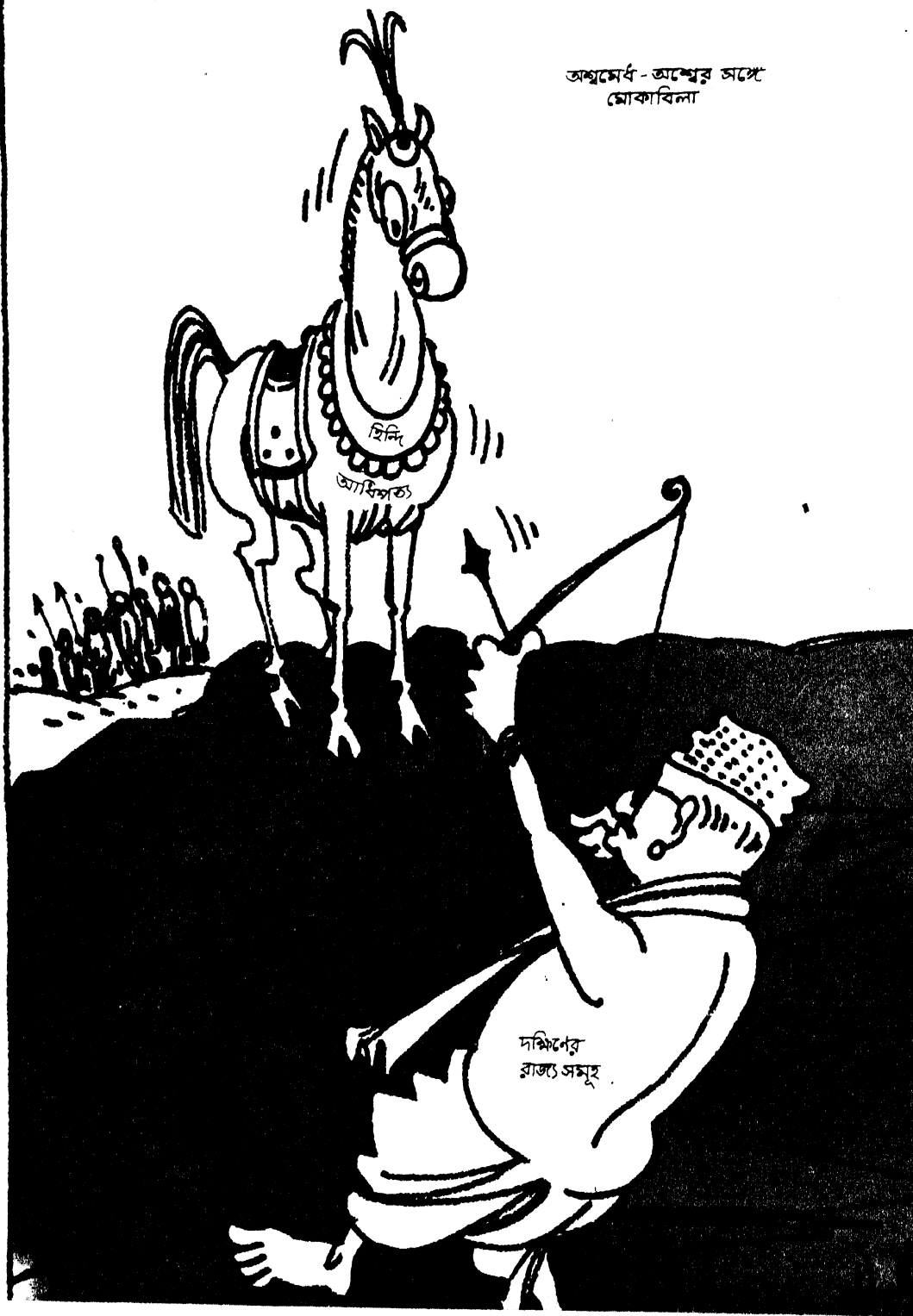
শান্তিনিকেতন: উত্তরায়ণের উদ্যান

দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনে উদ্যানের সূচনা করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ছাতিম গাছকে কেন্দ্র করে ১৮৬৩ সালে মহর্ষিদেব রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি ক্রয় করে তাঁর পরিকল্পিত নির্জন সাধন-পীঠ স্থাপন করলেন। তারপর তিনি এই বৃক্ষহীন জনশূন্য প্রান্তরে কাঁকর মাটি সরিয়ে উৎকৃষ্ট মাটি এনে আম জাম কাঁঠাল হরিতকী মহুয়া নারিকেল তাল শাল দেবদারু বকুল কদম্ব প্রভৃতি ফলবান ছায়াতরু রোপন করলেন। সাধারণ লোকের কাছে শান্তিনিকেতনের নাম হলো 'বাগান'—।

১৯০১ সালের ১৩ অক্টোবর 'UNITY AND MINISTER' নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত 'PILGRIMAGE OF SANTINIKETAN OF BOLPUR' নিবন্ধে যা প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮২৩ শকের ফাল্গুন সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় তার বিবরণ আছে—

"মহর্ষিদেব কলিকাতার হট্টগোল ছেড়ে মাঝে মাঝে এসে তাঁবু ফেলে শান্তিনিকেতনের ডাঙ্গায় নির্জন বাসে কাটাতেন। ঐ ছাতিম গাছ দুটোর তলা ছিল তাঁর ভগবৎ আরাধনার বিশেষ স্থল। ক্রমে ক্রমে জমি কেনা হোল, গাছ-গাছড়া পোঁতা হয়ে একটি বাগান হোল। একজন মালী এল এর পরিচর্যায়। মালীর একটু পরিচয় আছে। শান্তি-নিকেতনের বাগান যে মালীর হাত দিয়ে সে ছিল রাজা রামমোহনের পরিচারক। তাঁর নাম রামদাস। প্রভুর মৃত্যু হলে সে দেশে আসে এবং বর্ধমানের মহারাজার গোলাপ বাগানে নিযুক্ত হয়। খবর পেয়ে মহর্ষি তাকে নিয়ে এসে লাগান শান্তিনিকেতনের বাগান তৈরিতে।

'UNITY AND MINISTER' এর ভাষায়—

"It is a noteworthy fact that the gardener by name Ramdas, who laid the Shantiniketan garden had at first been in the employment of Raja Rammohan Roy who took him to England, and after the death of the master he returned to India and was engaged by the Burdwan Maharaj to his famous "Golap Bug" garden. The Maharshi whose taste in these matter is princely, had engaged this man for doing good work."

মহর্ষিদেব 'শান্তিনিকেতন' বাড়ি তৈরি করলেন, উদ্যান-এর ভিত্তি স্থাপন করলেন। ঠাকুর পরিবারে পুষ্প আর উদ্যানপ্রীতি বংশানুক্রমিক। শান্তি-নিকেতনে বাস করতে এসে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর নীচু বাংলার বাড়ির চারিপাশ সাজিয়েছিলেন ফুল ফলের বৃক্ষলতায়—তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ সাজিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন বাড়ির চারিদিক।

উত্তরায়ণের উদয়ন বাড়ি, বাগান শুরু হয় ১৯২৮-২৯ সাল

স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের নিয়ে চলে এলেন শান্তিনিকেতনে। 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নাম দিয়ে বিদ্যালয় আরম্ভ করলেন— সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। শালবীথি, আম্রকুঞ্জ, মাধবীকুঞ্জ প্রভৃতি তৈরি করলেন। কিঞ্চিৎ কম চাল্লশ বৎসর পূর্বেকার স্মৃতিচারণ করে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় "বিশ্বভারতীর অঙ্কুর' প্রবন্ধে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৬) লিখেছেন—

"শান্তিনিকেতন একটি প্রকাণ্ড সুন্দর বাগান, বাগানে নানাবিধ ফলকর বৃক্ষ ও ফুলের গাছ, বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে অট্টালিকা। অট্টালিকা হইতে দক্ষিণ দিকের ফটক পর্যন্ত একটি সুন্দর সরল বিস্তৃত পথ। ...উত্তর দিকের ঐ পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছ। আমরা যে ছোট ছোট ঝোপ দেখিয়াছিলাম সেগুলি শাল গাছের চারা, অধিকাংশ গাছ কোমর সমান উচ্চ, দুই চারিটা তিন হাত সাড়ে তিন হাত উচ্চ হইয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে রবীন্দ্রবাবু এই খানে একটা শালবন তৈয়ারি করিতেছেন। ঐ সকল শালের চারা দূর হইতে আনাইয়া রোপন করা হইয়াছে"—।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে পিতার নির্দেশে কৃষির উন্নতির জন্য শিলাইদহে কাজ শুরু করলেন। ১৯২১-২২ সালে পিতার নির্দেশেই শিলাইদহ থেকে রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে চলে এলেন; শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে কাজ শুরু করলেন। রথীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীর অনলস চেষ্টায় বিশেষ করে রথীন্দ্রনাথের কৃষি ও বাগান সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও প্রীতির ফলে আশ্রম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। উত্তরায়ণ, ছাতিমতলায়, নন্দনে এক বিশেষ ধরনের বাগান তৈরি হল। ১৯১৯ সাল থেকে গুরুদেব রবীন্দ্র-নাথ উত্তরায়ণের ভিতরে বসবাস শুরু করলেন। উত্তরায়ণের বাগান বাড়ির সঙ্গে সমতা রেখে বাড়তে লাগল। উত্তরায়ণে প্রথম বাড়ি কোণার্ক উদয়ন তারপর শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী গড়ে

উঠলো। বাড়ি ও বাগানের পরিকল্পনায় ছিলেন রথীন্দ্রনাথ-প্রতিমা দেবী, আর তাঁদের সাহায্য করলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আর রবীন্দ্র-স্নেহধন্য শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এই দুই শিল্পীর কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। আশ্রমের উদ্যান-রচনায় অধ্যাপক জগদানন্দ রায় ও তেজেশচন্দ্র সেনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও তাঁদের গাছপালার প্রতি ভালোবাসা বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের 'তালধ্বজ' বাড়িতে তেজেশচন্দ্র থাকতেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বনবাণী কাব্যের 'কুটির বাসী' কবিতায় তাঁর উল্লেখ করেছেন 'তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু' নামে। শান্তিনিকেতনের খবরাখবর দিয়ে প্রবাসী গুরুদেবকে (গুরুদেব তখন ভিয়েনায় ছিলেন) লেখা চিঠির উত্তরে গুরুদেব তাঁকে যে চিঠি লেখেন সেটির অংশবিশেষ বনবাণীর ভূমিকায় অন্তর্গত হয়েছে। কবি তেজেশচন্দ্রকে প্রথমেই লিখেছেন "তোমার লেখাগুলি শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলির মর্মর ধ্বনি করে উঠবে, তাতেই আমার মন পুলকিত করে দিল।" উত্তরায়ণের বাগান ও আশ্রমের গাছপালা সব সময় তাঁর মনে আলোড়ন তুলেছে। বাগানের কোথায় কোন্ গাছ লাগানো হবে তার জন্য সব সময় তিনি চিন্তা করতেন। উত্তরায়ণের গাছগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 'শিমুল গাছ' (কোণার্কের সামনে) কি ভাবে বাড়বে—কি সার দেওয়া হবে—তার গায়ে কোন্ লতা দিলে শোভা পাবে এ বিষয়ে তাঁর সদা-সতর্ক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী 'রবীন্দ্রনাথের পুষ্পপ্রীতি' প্রবন্ধে (প্রবাসী মাঘ ১৩৭৩) এর স্মৃতিচারণ করেছেন—

'কোণার্কের পিছনের জমিতে কন্টিকারী এবং নানান রকম কাঁটা গাছ পোঁতালেন, বললেন, এই বাগানটা হবে তোমাদের Civilised ফুলের নয়, এখানে আমার মতো সাধারণ গাছ থাকবে।...গুরুদেব যেমন অন্যান্য ফুল ভালবাসতেন সেই রকম Cactus জাতীয় ফুল, কাঁটা গাছ ও'র খুব প্রিয় ছিল। খোয়াইতে ঝামা পাওয়া যায়, সেই ঝামা দিয়ে তিনি বাগান বানিয়েছিলেন। Cactus এবং এখানে যে সব গাছ জন্মায় তা' দিয়ে সুন্দর করে বাগান সাজানো হল। সে সব দেখে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। ঐ সমস্ত গাছ আপনা থেকে বেড়ে বেড়ে ওঠে, বেশী সার লাগাতে হয় না। কাঁটা গাছের বাগান তৈরীর সময় তাঁর বয়স ছিল ষাটের মত। বাবলা জাতীয় এক ধরনের কাঁটা গাছ ছিল ত্রিপুরা থেকে আনা। তার নাম রাখা হয় 'কাঁটা নাগেশ্বর'—।"

উদীচী বাড়ির গায়ে 'বনপুলক' ও মালঞ্চে (কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর বাড়ী) বসে 'অগ্নিশিখা' ফুলের নামকরণ-প্রসঙ্গে প্রতিমা দেবী উক্ত প্রবন্ধে বলেছেন :

"ফুলের নতুন নতুন নামকরণও করে গেছেন। কেউ হয়তো কোপাই-এর ধারে গেছে, কোন ফুলের গন্ধ ও বর্ণ ভালো লাগলে বলতেন, ঐ ফুল নিয়ে আসিস। শান্তিনিকেতনে লাগানো হল। এ রকম একটি বনফুল বোধহয় কোপাই থেকে এনে ও'কে দেখায় এবং তার নাম দেন 'বনপুলক'—। সে গাছ উদীচী বাড়ির গায়ে লাগানো হল। এখনও আছে।

আর একটা ফুল আছে, তার ইংরেজী নামও আছে, সাঁওতালরা ঐ ফুল ভালবাসে, তারা একে বলে 'লাঙ্গুল ফুল—ফুল হয় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে, শরতের শেষ পর্যন্ত খুব ফোটে। সুন্দর বাহারে ফুল, সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় পরে—রঙ হচ্ছে লাল আর হলদে, অগ্নিশিখার মতই, তাই গুরুদেব নাম রাখলেন 'অগ্নিশিখা'—।"

উত্তরায়ণের বাগান—এক অভিনব বাগান। নানা বৈচিত্র্যে ভরা —আমাদের এই দেশে নানান জায়গায় বহু বৈচিত্র্যময় উদ্যান আছে কিন্তু শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণের উদ্যানের বৈচিত্র্যের সঙ্গে কোনো বাগানের তুলনা হয় না। কি গঠনবৈচিত্র্য, কি স্বাভাবিকতায় এবং প্রকৃতির সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে স
রকম কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে
বাগান রূপায়িত করা হয়েছে। যে-যে
ঋতুতেই এই বাগানকে মনে হবে
প্রকৃতির সযত্ন রচিত নানা রঙের স
নিয়ে সে আত্মপ্রকাশ করছে। উত্তরায়
বাগানের আর একটি বৈশিষ্ট্য,
উদ্যানে আন্তর্জাতিক তরু
পুষ্পের অপূর্ব মিলন ঘটেছে।
বিদেশী গাছ কিভাবে পাশা
অবস্থান করছে তাদের সমস্ত সৌন্দ
পসরা সাজিয়ে—দেখে বি
হতে হয়। এই উদ্যানে যে
গাছই অপাঙক্তেয় নয়।
'আমরা সবাই রাজা।' উত্তর
বাগানের গঠনশৈলী দীর্ঘ দিনের
নিরলস পরিশ্রমে ও অভিজ্ঞতা-
প্রসূত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে
তৈরি করা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের
উদ্ভিদ বিজ্ঞানের এমন সুসমঞ্জস মিলন
উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাছে বিস্ময়ের
বস্তু। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে
এই উদ্যান এক জীবন্ত পরীক্ষাগার।

উত্তরায়ণ বাগানের প্রবেশ মুখে
দু পাশে সারি সারি ইউক্যালিপ্টাস
আর দেওদার। বাঁ দিকে বিচিত্রা
রবীন্দ্র-প্রদর্শ-শালা—তার সামনে ও
পাশে কেশিয়া, স্প্যাথোডিয়া, আমলকী,
পীলতে মাদার, শিরিষের মাঝে মাঝে
ইউক্যালিপটাসের ঘন ছায়া, নীচে
শৌখিন গাছের 'গাছঘর', আর এক-

জোড়া সারস থাকার জন্য খড়ের ছাওয়ানো একটি সুন্দর ঘর। উত্তরায়ণে ঢুকবার দুপাশে স্বল্পচ্ছায়ার দেশী বিদেশী হরেক রকমের ফুলগাছের সারি। তার মধ্যে কোন অসংগতি নেই। ল্যান্ডস্কেপ বলতে যা বোঝায় তার সংগে মানুষের স্বহস্তে রচিত উদ্যান মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তারপরে কাঁকর-বিছানো প্রাঙ্গণে প্রবেশের মুখে কেন্দ্র আর কেশিয়া গাছ আর মাটির সংগে মিশে-থাকা বোগানভেলিয়া। উদয়ন-বাড়ি—যার এক ছাদের সংগে অন্য ছাদের মিল নেই—এক আশ্চর্য ও মনোরম স্থাপত্য—তার সংগে সংগতি মিলিয়ে দুই সারি নারিকেল গাছ আর সামনে কুরচি মুচকুন্দ—হিমঝুরির সারি। তার সামনেই মোগল কৌণিক নকশায় সাজানো গোলাপ বাগান। যেখানে দাঁড়ালে মনে হবে এক দরবারী পরিবেশ। গোলাপ বাগানের সামনের রাস্তার দিকে—কোন বাড়াবাড়ি নেই—মুচকুন্দ শিরীষ আর শিশু গাছের সারি—যার ছায়া প্রচণ্ড রৌদ্র থেকে অতি কোমল গোলাপের পাপড়িগুলিকে রক্ষা করছে—আর তার নীচে নানা জাতের স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক দেশী বিদেশী বুশ—যারা বাগানের মূল শোভাকে কোনোরকমেই উৎপীড়িত করে না। গোলাপ ও অন্যান্য বাগানের বেড়ার বৈশিষ্ট্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টগর, মেহেদি, কামিনী, কনকচাঁপা, বনপুলক, রঙ্গন, তেঁতুল গাছ আর নানা জাতের লতা মালতী, মাধবী, নীলমণিলতা ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে জমাট সবুজের রেখা।

গোলাপ-বাগানের প্রবেশ পথের দুপাশে দুটো বিরাট ও আশ্চর্য গঠনের কলসী। এ দুটি ঐতিহাসিক। এই কলসীতে জোড়াসাঁকো বাড়ীতে গঙ্গার জল জমিয়ে রাখা হতো 'জীবন-স্মৃতি'তে যার উল্লেখ আছে। এই দুটি জোড়াসাঁকো বাড়ী থেকে রথীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর গোলাপবাগের সামনে বসিয়ে মোগল শৈলীর পাশে একটু চৈনিক আমেজ বুলিয়ে দিলেন। গোলাপ বাগানের ঠিক সামনে কংকর বীথিতে দুপাশে ছাতার মতো কেশিয়া গাছ আর মাঝখানে তাল গাছ—'এক পায়ে দাঁড়িয়ে'...। সামনে কোণার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী বাড়ীর প্রবেশ পথের কংক্রীটের তোরণ নালন্দায় বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরি। তার উপরে শুভ্র মালতী-যুই, মধু-মালতী ছায়াময় করে রেখেছে। শুভ্রতার দুই পাশে রক্ত-বেরক্ত-এর বাগান বিলাসের সৌন্দর্য তৃপ্তিদায়ক। প্রথম কোণার্ক বাড়ি—তার সামনে এক মহাবৃদ্ধ শিমুল গাছ—মালতী-মধুমালতী লতার আলিঙ্গনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। কোণার্কের গায়ে সেই বিখ্যাত লতা—যে লতা গাছ নিয়ে এসেছিলেন পিয়ার্সন সাহেব, যখন ফুল ফুটল তখন তার নীল রঙ দেখে গুরুদেব এই গাছের নাম দিলেন 'নীলমণিলতা', কবিতাও লিখলেন—'নীলমণিলতা' নামে।

কোণার্কের পাশে এক কালের 'মুন্ময়ী' বাড়ি ভেঙে যাওয়ার পর তৈরি হয়েছে 'মৃন্ময়ী চাতাল'—যা রাজপুত স্থাপত্যের আমেজ এনে দিয়েছে। তার চার কোণে বাগান বিলাস আর ছোট ছোট মরসুমী বাহারী ফুলের কেয়ারী—যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সংগে সামঞ্জস্য সাধন করেছে। এর পাশেই ঐতিহাসিক 'শ্যামলী'—মাটির বাড়ি। যার পাশে ও পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছায়াঘন জাম, আম, তেঁতুল, বেল, ইউক্যালিপটাসের অলৌকিক গম্ভীর দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট শ্যামলীর স্থাপত্যকে জীবন্ত করে তুলেছে। মনে হবে যেন বৌদ্ধ বিহারে প্রার্থনার জন্য প্রবেশ করছি। এই জন্য গান্ধীজী ভালোবাসতেন এই শ্যামলীকে। শ্যামলীর সামনে গুলঞ্চ বা কাঠটগর শ্যামলীর অংগসজ্জাকে যেন আরো ঘরোয়া করে তুলেছে। পুনশ্চ উদীচীর সামনে স্থাপত্যের সংগে মিল রেখে হরেক রকমের দেশী বিদেশী খ্যাত অখ্যাত ফুল আর পাতাবাহারের গাছ।

উদয়ন বাড়ির পিছনে প্রধান উদ্যান। যার শোভা অপূর্ব এবং বিচিত্র। এই উদ্যানের প্রবেশ মুখের অংশটি জাপানী ল্যান্ডস্কেপ-গার্ডেনের আদর্শে তৈরি। ফুলের কেয়ারী থেকে শুরু করে বাগান

উদ্যানে বৈকালিক ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ

গঙ্গার ধারে রথীন্দ্রনাথ